কিশোর কাহিনী সমগ্র

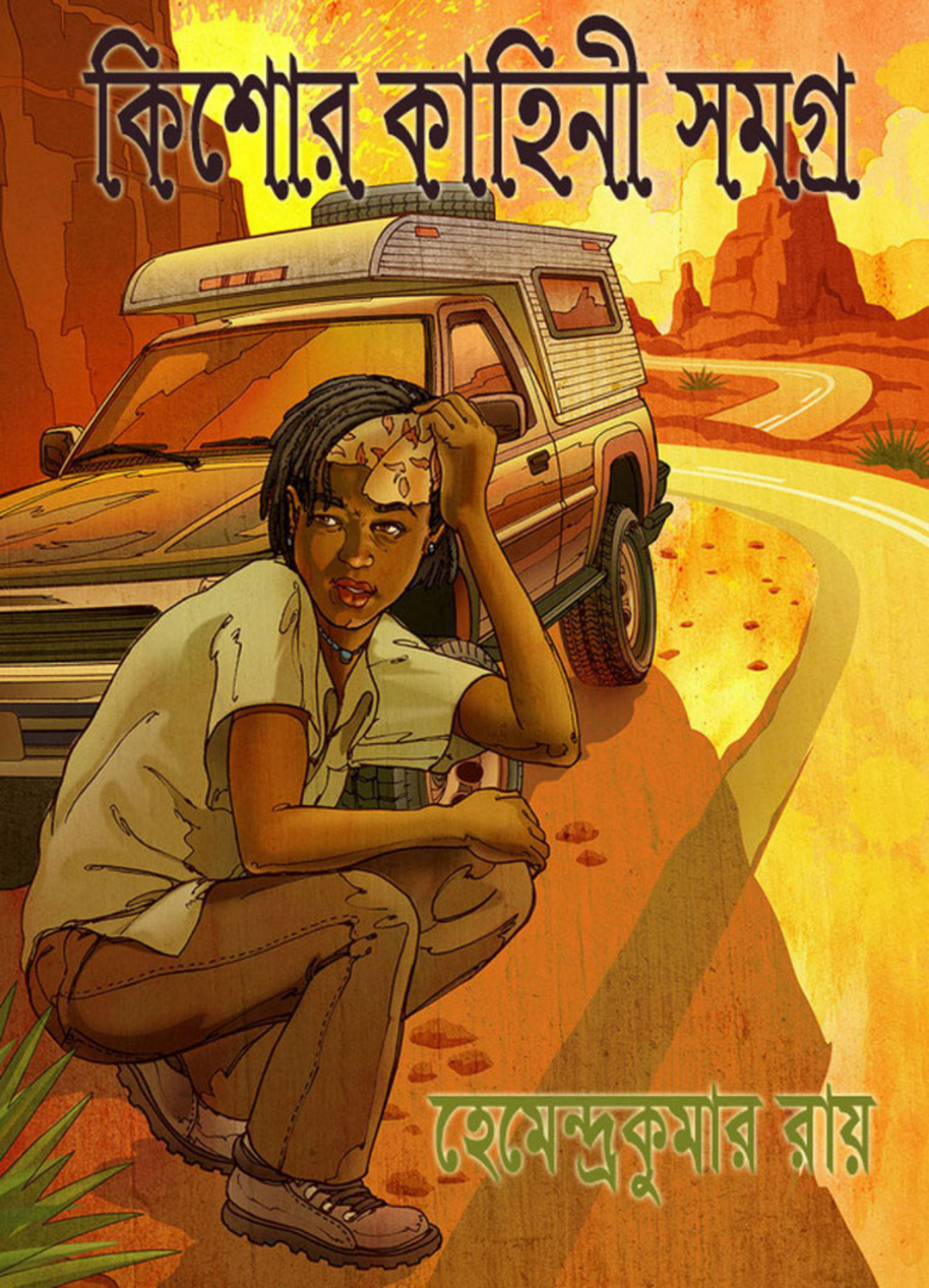

হেমেন্দ্রকুমার রায়

কিশোর কাহিনী সমগ্র

হেমেন্দ্রকুমার রায়

banglabooks.in

জন্ম
সেপ্টেম্বর ২, ১৮৮৮

মৃত্যু
এপ্রিল ১৮, ১৯৬৩

banglabooks.in

উপন্যাস

সূচীপত্র

অজানা দ্বীপের রানী

বাঘরাজের অভিযান

বিমানের নতুন দাদা

ছোট্ট পমির অভিযান

দেড়শো খোকার কান্ড

হারাধনের দ্বীপ

হিমাচলের স্বপ্ন

কিং কঙ

মানুষের প্রথম অ্যাডভেঞ্চার

মানুষের গন্ধ পাই

রুনু টুনুর অ্যাডভেঞ্চার

তারা তিন বন্ধু

সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র

জলদস্যু কাহিনী

হন্তারক নরদানব

রক্ত বাদল ঝরে

রহস্য কাহিনী

রহস্যের আলো ছায়া

নাটক

আঁক কষবার নতুন উপায়

বৈশাখী

রংমহলের রঙমশাল

দুষ্টুমি

এখন যাঁদের দেখছি

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানুষ অবনীন্দ্রনাথ

অবনীন্দ্রনাথের গল্প

স্যার যদুনাথ সরকার

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নজরুলের জন্মদিন স্মরণে

এখন যাঁদের দেখছি

গামা হাসানবক্স ছোটগামা
যামিনী রায়
শ্রী কালিদাস রায় প্রভৃতি
যতীন্দ্র গুহ
ইয়াঙ্কিস্থানে বাঙালী মল্ল
বাঙালী মল্লের অভিযান
দিলীপকুমার রায়
কৃষ্ণচন্দ্র দে
আমাদের দল
আমাদের দলের আরো কিছু
শিশিরকুমারের আত্মপ্রকাশ
শিশিরকুমারের নাট্যসাধনা
নেপথ্যে শিশিরকুমার
কল্লোলের দল
কল্লোল গোষ্ঠীর দুইজন
কল্লোল গোষ্ঠীর ত্রয়ী
ঘরোয়া গানের সভা
কুমার শচীন্দ্র দেব বর্মণ

এখন যাঁদের দেখছি

ঘরোয়া বৈঠকের শিল্পীগণ
সজনীকান্ত দাস
নির্মলচন্দ্র চন্দ্র
সেরাইকেলার রাজাসাহেব
মোহিতলাল মজুমদার
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়
অসিতকুমার হালদার
প্রেমাঙ্কুর আতর্থী
অহীন্দ্র চৌধুরী
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
শিবদাস ভাদুড়ী
মরণ-বিজয়ীর দল
দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ছড়া ও কবিতা

গল্প

সূচীপত্র

হাবুবাবুর কীর্তিকাহিনী
সাদা ঘুষি আর কালো ঘুষি
মানুষের বন্ধু আমেরিকার সিংহ
সংলাপী রবীন্দ্রনাথ
প্রজাপতির রূপকথা
হালুয়ার ভাঁড়
মহাযুদ্ধের গল্প
ধর্মসংহিতার মজার গল্প
চোরের নালিশ
বাঘের মাসির গ্রহণযাত্রা
হবু গবুর মুল্লুকে
বাহাদুর হাবু
ছিদামের পাদুকা পুরাণ
আশার বাতি
বউনির দিনে
বুদ্ধদেবের বুদ্ধি
কাঠুরের কপাল
হাঙর মানুষের চোখের জল

গল্প

সূচীপত্র

ভুলুর ভুল
মুরগিচাচা
বুদ্ধদেবের গল্প
একটার বদলে দুটো
বংশীধারীর বাঁশি
নতুন সিনেমার ছবি
দাদুর গল্প
ইঁদুরের কীর্তিকাহিনী
বাঁদরের মেটুলি চচ্চড়ি
বিখ্যাত চোরের অ্যাডভেঞ্চার
বাগানের বাঘ
সাপ, বাঘ, মুরগি
বিপদ নাট্যের দুটি দৃশ্য
আমার অ্যাডভেঞ্চার
ভোম্বলদাসের ভাগনে
ফরাসি বিপ্লবে বাঙালির ছেলে
অ্যাডভেঞ্চারের রোমাঞ্চ
গুপ্তধন চাই

গল্প

সূচীপত্র

গোবেচারা

রূপকথার ঘুম

গোলাপের জন্ম

নকল শিকারির সঙ্কট

প্রাইভেট ডিটেকটিভ

একদিনের অ্যাডভেঞ্চার

বনবাসী অভিশাপ

জঙ্গলের নাট্যাভিনয়

উপন্যাস

অজানা দ্বীপের রানি

banglabooks.in

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

গোড়ার কথা

ফুটবল খেলা শেষ। খেলার মাঠে বসে আমরা কয়বন্ধুতে মিলে একটু জিরিয়ে নিচ্ছি। কারণ খেলোয়াড়দের চেয়ে, এ খেলা যারা দেখে তাদেরও খাটুনি হয় না বড়ো কম।

প্রথমে টিকিট কিনতেই তো জনতার ধাক্কায় আর কনুইয়ের গুঁতোয় জান হয় হয়রান, গতর যায় থেঁতো হয়ে; তারপর খেলা শুরু হবার আগে ঘণ্টা দুই-তিন ধরে রোদে বসে তেষ্টায় কাঠ হয়ে অপেক্ষা;—তারপর খেলার সময়ে উত্তেজিত হয়ে ষাঁড়ের মতন চিৎকার করা আর পাগলের মতন হাত-পা ছোড়া এবং মাঝে মাঝে গ্যালারি ভেঙে হুড়মুড় করে 'পপাত ধরণীতলে' হওয়া!—এর পরেও কিঞ্চিৎ বিশ্রাম না করলে চলবে কেন?

'মোহনবাগান' যেদিন জেতে সেদিন উৎসাহ আর আনন্দের ভিতরে তলিয়ে যায় সব কষ্টই। কিন্তু মোহনবাগানকে আজ উপর-উপরি তিন-তিনটে আস্ত গোল হজম করতে দেখে আমাদেরও সমস্ত রক্ত যেন জল হয়ে গেছে!

অসিত অত্যন্ত বিরক্ত স্বরে বলছিল, 'দুত্তের নিকুচি করেছে! আর খেলা দেখতে আসব না—যেদিন আসব, সেইদিনই হারবে? ডিসগ্রেসফুল!'

অমিয় বললে, 'এ কথা তো রোজই বলি, কিন্তু মোহনবাগান খেলবে শুনলে বাড়িতে হাত-পা গুটিয়ে বসেই বা থাকতে পারি কই?'

পরেশ বললে, 'ওই তো আমাদের রোগ; চড়ুকে পিঠ সড়সড় করে যে!'

নরেশ বললে, 'না এসেই বা করি কী বলো? বাঙালির জীবনে আর কোনও অ্যাডভেঞ্চার নেই তো। তবু আমাদেরই জাতভাইরা গোরাদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করছে, খানিকক্ষণ এটা দেখলেও রক্ত খানিকটা গরম হয়ে টগবগিয়ে ওঠে!'

বীরেনদা এতক্ষণ চুপ করে একপাশে বসে শিস দিচ্ছিল, হঠাৎ সে বলে উঠল, 'ওঃ, ফুটবল খেলা দেখা যদি অ্যাডভেঞ্চার হয়, তাহলে মায়ের কোলে শুয়ে শুয়ে হাত-পা ছোড়াও তো মস্ত বড়ো অ্যাডভেঞ্চার!'

বীরেনদা আমাদের সকলের চেয়ে তিন-চার বৎসরের বড়ো। তাই আমরা সকলেই তাকে অনেকটা দলপতির মতোই দেখি। তর্ক-বিতর্ক হলে তাকেই মধ্যস্থ মানি, বিপদে-আপদে তার কাছ থেকেই সাহায্য পাই। সে কুস্তি জানে, বক্সিং জানে, লাঠি তরোয়াল খেলতে জানে, জাপানি যুযুৎসুরও এমন-সব আশ্চর্য প্যাঁচ জানে যে, তার চেয়ে ঢের বড়ো জোয়ানকেও চোখের নিমেষে তুলে আছাড় মারতে পারে। তার উৎসাহে আমরাও রোজ ব্যায়াম করি বটে, কিন্তু গায়ের জোরে আমরা কেউ তার কাছ দিয়েও যাই না।

এ-হেন বীরেনদা হঠাৎ প্রতিবাদ করাতে সকলে একেবারে চুপ মেরে গেল।

বীরেনদা একটু থেমে আবার বললে, 'অ্যাডভেঞ্চারের কথা তো বললে, কিন্তু আসল শক্তি আছে কি?'

আমি বললুম, 'বীরেনদা, তোমার কথায় আমরা তো শক্তিচর্চায় অবহেলা করি না! আমাদের গায়ে তোমার মতো জোর না থাকলেও, আমরাও নেহাত দুর্বল নই তো!'

বীরেনদা বললে, 'আমি সে-শক্তির কথা বলছি না—সে তো পশুর শক্তি! সাহস, সাহস—সাহসই হচ্ছে আসল শক্তি! মোষের চেয়ে চিতেবাঘের গায়ে ঢের কম জোর। তবু চিতেবাঘের কবলে মোষ যে মারা পড়ে তার কারণ মোষ হচ্ছে চিতের চেয়ে কম-সাহসী জীব। সহজে পোষ মানে, সহজে মারা পড়ে। বাঙালিরও আসল অভাব সাহসের,—তার মুখে তাই অ্যাডভেঞ্চারের কথা শুনলে আমার হাসি পায়।'

নরেশ বললে, 'বীরেনদা, আমাদের যে সাহসেরও অভাব আছে, এমন কথাই বা তুমি মনে করছ কেন?'

বীরেনদা বললে, 'মনে করবার কারণ নিশ্চয়ই আছে! ঘরের কোণ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়া, তাতে আর কতটুকু সাহসের দরকার! কিন্তু বাঙালির সেটুকু সাহসও নেই! তারা ঘরের কোণে শুয়ে রোগে ভুগে মরবে, তবু চৌকাঠের বাইরে পা বাড়াবে না।'

পরেশ বললে, 'কিন্তু আমরা সে দলে নই। আমরা বাইরে বেরুতে রাজি আছি—কোথায় যেতে হবে বলো!'

গম্ভীর মুখে বীরেনদা বললে, 'তাহলে চলো দেখি আমার সঙ্গে!'

—'কোথায়?'

—'কাম্বোডিয়ায়!'

—'কাম্বোডিয়ায়? স্যায়ামের কাছে?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যায়ামের কাছে! পারবে যেতে?'

সবাই চুপ।

বীরেনদা হা হা করে হেসে উঠে বললে, 'কী, আর কারুর মুখেই রা নেই যে? এই না বললে, তোমরা বাইরে বেরুতে রাজি আছ?'

—'হ্যাঁ', রাজি আছি। আগ্রা চল, দিল্লি চল, আমরা সর্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু এককথায় সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যেতে কি রাজি হওয়া চলে?'

—'নিশ্চয়ই চলে,—তাকেই তো বলি অ্যাডভেঞ্চার! কাম্বোডিয়া তো ভারতের দরজার কাছে, যারা অ্যাডভেঞ্চার চায় তারা এককথায় উত্তরমেরুর ওপারেও যেতে রাজি হবে! দিল্লি-আগ্রা তো একটা শিশুও যেতে পারে, তাতে আর বাহাদুরিটা কী?'

অসিত বললে, 'বীরেনদা, তুমি কি আমাদের পরীক্ষা করছ? সত্যিই কি তুমি কাম্বোডিয়ায় যেতে চাও?'

—'আমার যে কথা, সেই কাজ। আজ ক-দিন ধরে আমার মনে কাম্বোডিয়ায় যাবার সাধ হয়েছে। সেদিন সেখানকার ওঙ্কারধাম নামে এক মন্দিরের কথা পড়লুম। সেখানে নাকি বিরাট এক নগরের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে, আর তার ভেতরে এক অদ্ভুত মন্দির! সে-সব প্রাচীন ভারতবাসীর কীর্তি, আর সে কীর্তির কাছে নাকি জগন্নাথ, ভুবনেশ্বর, সাঁচীর মন্দিরও ম্লান হয়ে যায়, জানো, আমি আমার ভারতবর্ষকে কত ভালোবাসি? তাই ভারতের সেই অমরকীর্তি আমি দেখতে যাব!'

আমি বললুম, 'বীরেনদা, তোমার সঙ্গে আমি যাব!'

বীরেনদা আনন্দে দুই চোখ বিস্ফারিত করে বললে, 'সত্যি? সত্যি বলছ সরল?'

আমি হেসে বললুম, 'আমার নামও সরল, আমি কথাও কই সরল ভাষায়। যখন যাব বলছি, নিশ্চয়ই যাব!'

বীরেনদা বললে, 'শুনে সুখী হলুম। কিন্তু সরল, ভেবে দ্যাখো, ওঙ্কারধামে যেতে গেলে বাবুয়ানা চলবে না, আরামেরও সম্ভাবনা নেই প্রথম কয়দিন কাটবে জাহাজে—অগাধ, অপার সমুদ্রের উপরে। তারপরে রেলগাড়ি, তারপর কীসের গাড়ি—তা জানি না। হয়তো ক্রোশের পর ক্রোশ পায়ে হেঁটেই যেতে হবে প্রাণটি হাতে করে।'

—'প্রাণ হাতে করে কেন?'

—'ওঙ্কারধামের ত্রিসীমানার ভিতরে লোকালয় নেই। ক্রোশের পরে ক্রোশ খালি জঙ্গল আর জঙ্গল—তেমন জঙ্গল হয়তো আমরা জীবনে চোখেও দেখিনি! গভীর অরণ্যের ভিতরে সেই প্রাচীন মন্দির আর শহরের ধ্বংসাবশেষ! অতি সাহসীরও বুক সেখানে যেতে ভয়ে কাঁপতে পারে। সেখানে মানুষের বাস নেই বটে, কিন্তু তবু মানুষ থাকাও অসম্ভব নয়। তবে সে-সব মানুষের সঙ্গে দেখা হলে আমাদের জীবন নিয়ে তারা যে টানাটানি করবে না, একথাও জোর করে বলা যায় না। তার ওপরে বাঘ, ভাল্লুক, হাতি, সাপেরা সেখানে নিত্যই হোম-রুল-এর স্বাধীনতা ভোগ করছে। আমাদের মতন অতিথিদের দেখলে তারা আদর করবে না নিশ্চয়ই, কারণ তারা এখনও বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়নি। তার ওপরে আছে রোগের ভয়, দৈব-দুর্ঘটনা। হঠাৎ কিছু হলে ডাক্তার নীলরতন সরকারকেও খবর দেওয়া চলবে না, অ্যাম্বুলেন্স-কার-ও ডাকা যাবে না। এ-সব কথা তলিয়ে ভেবে দ্যাখো, সরল!'

দৃঢ়স্বরে বললুম, 'আমি কিছু ভেবে দেখতে চাই না বীরেনদা, আমি খালি তোমার সঙ্গে যেতে চাই।'

অমিয় আচম্বিতে বলে উঠল, 'আমিও কিছু ভাবব না বীরেনদা, তোমার সঙ্গে পোঁটলা বেঁধে বেরিয়ে পড়ব।'

বীরেনদা সবিস্ময়ে বললে, 'তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে!'

—'কেন যাব না, আমি কি কাপুরুষ?'

—'না, তোমার কথা শুনে তোমাকে আর কাপুরুষ বলতে পারি না, কিন্তু তুমি

আমাদের সঙ্গে কেমন করে যাবে? তুমি তো সরলের মতন স্বাধীন নও, তোমার মা আছেন, বাবা আছেন। তাঁরা তোমাকে যেতে দেবেন কেন?'

অমিয় বললে, 'আচ্ছা, মা-বাবাকে রাজি করাবার ভার আমার ওপরে রইল। বীরেনদা, তুমি জানো না তোমার ওপরে আমার মা আর বাবার কতখানি শ্রদ্ধা! এই সেদিন কথায় কথায় বাবা বলছিলেন, 'বীরেন সঙ্গে থাকলে অমিয়কে আমি যমেরও মুখে ছেড়ে দিতে পারি। বীরেন যে দুর্ভেদ্য বর্ম—দেবরাজের বজ্রও সে বর্মে লেগে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যায়।' তুমি কি মনে করো বীরেনদা, আমার বাবা মিছে কথা বলছিলেন?'

বীরেনদা মৃদু মৃদু হেসে বললে, 'না, তা বলি না, তবে তাঁর বিশ্বাস অন্ধ হতেও পারে তো?'

অমিয় বললে, 'তোমাকে যে চিনেছে সেই-ই এই কথা বলবে। তোমার সঙ্গে মরতেও আমার ভয় করে না। আমি তোমার সঙ্গে যাব বীরেনদা!'

—'বেশ, তোমার মা-বাবা যদি মত দেন, আমারও অমত নেই।'

আমি বললুম, 'তাহলে কবে আমরা রওনা হচ্ছি?'

—'দু-হপ্তার ভেতরে। কিন্তু যাবার আগে তিনটে বন্দুকের পাস চাই। রিভলভার তো আমার কাছেই আছে। জঙ্গলের ভেতরে বন্দুক-রিভলভারের মতন বন্ধু আর নেই।'

অসিত বললে, 'তাহলে সত্যিই তোমরা যাবে?'

বীরেনদা বললে, 'তোমার সন্দেহ হচ্ছে নাকি?'

পরেশ বললে, 'আমি একে সাহস বলি না, এ হচ্ছে গোঁয়ারতুমি।'

নরেশ বললে, 'তা নয় তো কী!'

বীরেনদা বললে, 'বেশ, আমরা একটু গোঁয়ারতুমি করেই দেখি না কেন? তোমাদের মতন বুদ্ধিমান মাথা-ঠান্ডা লোকেদের অ্যাডভেঞ্চার-এর জন্যে ফুটবল খেলার মাঠ আছে, বায়স্কোপের ছবি আছে, ট্রামগাড়ির বাঁধানো রাস্তা আছে, আর ম্যালেরিয়া জ্বরে শুয়ে শুয়ে আরাম করে কাঁপবার জন্যে নরম বিছানা আর পুরু লেপ আছে। কিন্তু গোঁয়াররা উড়োজাহাজ চড়ে, হিমালয়ের টঙে ঠান্ডা হাওয়া খেতে ওঠে, সাব মেরিনে বসে সমুদ্রের অতলে ডুব দেয়—খালি মরবার জন্যেই। কিন্তু তারা না মরলে তো সারা পৃথিবীর মানুষ আজ বাঁচতে পারত না! গোঁয়াররা মরতে জানে বলেই মানুষ হয়েছে আজ শ্রেষ্ঠ জীব!'

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

ভারতের অশ্রু

নীলিমার অসীম জগতে চলেছি, ভেসে চলেছি!

মাথার উপরে প্রশান্ত নীল আকাশ, পায়ের তলায় অশান্ত নীল সাগর,—যেদিকে তাকাই, আর কোনও রং নেই! বিশ্বময় যেন থই থই করছে নীলিমা!

এরই মাঝখান দিয়ে জাহাজ ভেসে চলেছে সিন্ধুর বুকে বিন্দুর মতো, এমন এঁকে রেখে, নীল পটে সাদা ফেন-আলপনায় দীঘল রেখা!

পৃথিবীর মাটির গান আর শোনা যায় না—বনের মর্মর, পাখির রাগিণী, নদীর তান! বাতাস শুধু মাটির স্মৃতি বহন করে আনছে, কিন্তু তার উদাসী নিশ্বাস আজ হারিয়ে ফেলেছে ফুলের মৃদু গন্ধ!

কী বিস্ময়! কী আনন্দ!—চারিদিক থেকে আজ যেন আমাদের আকুল আহ্বান করছে অনন্ত!

অমিয় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল—'বীরেনদা, বীরেনদা! আমাদের এতদিনের চেনা পৃথিবী যে দু-দিনেই এমন অচেনা হয়ে উঠতে পারে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি তো!'

বীরেনদা হেসে তার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে বললে, 'মায়ের কোলে শুয়ে আর ইস্কুল-বই পড়ে কি পৃথিবীকে চেনা যায় ভাই? কূপে বসে ব্যাং যেমন দেখে জগৎ কূপের মতো, ঘরে বসে আমরাও তেমনি দেখি পৃথিবীকে চার দেওয়ালের মাঝে বন্দিনীর মতো! কিন্তু আজ আমরা স্বাধীন পৃথিবীর সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি,—স্বাধীনতার যে কত রূপ এবারে আমরা চোখের সামনে তা দেখতে পাব!'

আমি বললুম, 'কিন্তু দেশের জন্যে আমার বড়ো মন কেমন করছে বীরেনদা! মনে হচ্ছে পৃথিবীর যত রূপই থাক, আমার বাংলা দেশে বসে সবুজ গাছপালার ভিতরে, ধান-দোলানো সোনা-ছড়ানো মাঠের উপরে যে অপরূপ রূপ দেখি, সে রূপের চেয়ে মিষ্টি যেন আর কিছুই নেই!'

বীরেনদা মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল।

আমি বললুম, 'তুমি হাসছ বীরেনদা? কুনো বাঙালি ভেবে মনে মনে আমাকে বুঝি ঘৃণা করছ?'

বীরেনদা গম্ভীর হয়ে বললে, 'না ভাই সরল, আমি কি তোমাকে ঘৃণা করতে পারি? তুমি মানুষ, তাই দেশের জন্যে তোমার প্রাণ কাঁদছে! তোমাকে শ্রদ্ধা করি। দ্যাখো না, এই যে ইংরেজ জাত, দেশ ছেড়ে তারা পৃথিবীর কোথায় না যায়? তা বলে তাদের প্রাণ কি কাঁদে না? কাঁদে বই কি! তবু তারা দেশ ছাড়ে দেশকেই বড়ো করবার জন্যে। কিন্তু তারা যেখানেই থাক—আফ্রিকার জঙ্গলে, সাহারার মরুপ্রান্তরে আর হিমালয়ের তুষার-শিখরে

বসে তারা শুধু এক গানই গাইবে—'হোম, হোম, সুইট হোম'। বিলাতের কুয়াশাকেও তারা ভালোবাসে। আর আমাদের বাবুসাহেবরা? বিলাতে গিয়ে তাঁরা স্বদেশই ভুলতে চান! পরেন হ্যাট-কোট, ধরেন ফিরিঙ্গি চাল আর স্বপ্ন দেখেন ইংরেজিতে! বাংলা ভাষা ভুলে যাওয়া তাঁদের কাছে জাঁকের কথা! তাদের আমি ঘৃণা করি সরল, কারণ 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি',—এ গান তারা গাইতে জানে না! দেশের জন্যে আমাদের মন কাঁদবে বই কি,—আমরা তো দেশকে ভোলবার জন্যে বিদেশে যাচ্ছি না ভাই, আমরা যে যাচ্ছি স্বদেশকে ভালো করে চেনবার জন্যে!'

অমিয় বললে, 'স্বদেশকে ভালো করে চেনবার জন্যে?'

—'হ্যাঁ ভাই! আমরা যাচ্ছি আমাদের সোনার ভারতের গৌরব দেখবার জন্যে। আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে গেলে ভারতের বাইরে বসেও ভারতের মূর্তিকে আরও বড়ো করে দেখতে পাব।'

আমি বললুম, 'ওঙ্কারধাম তো অজন্তা, ইলোরা, ভুবনেশ্বরের কি মাদুরার মন্দিরের মতনই একটি মন্দির?'

—'না, ওঙ্কার হচ্ছে প্রাচীন হিন্দুজাতির আরও বড়ো কীর্তি, তোমার ইলোরা কি ভুবনেশ্বরের মন্দির বিপুলতায় তার কাছে দাঁড়াতেও পারে না। সাগর পার হয়ে কৌণ্ডিল্য নামে এক ব্রাহ্মণ প্রায় দুই হাজার বছর আগে কাম্বোজে হিন্দু রাজত্বের সূচনা করেন। কয় শত বৎসর পরে সেই ছোটো উপনিবেশ একটা বৃহৎ হিন্দু সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। তার রাজধানীর নাম হয় যশোধরপুর। আমরা ভারতের বাইরে সেই ভারতকেই দেখতে চলেছি—যেখানে সাতশো বছর ধরে উড়েছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের বিজয়-পতাকা। যশোধরপুরের ধ্বংসাবশেষ আজ ক্রোশের পর ক্রোশ জুড়ে পড়ে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছে, তার অগুনতি মন্দিরের ভিতরে একটিতেও আজ সন্ধ্যাদীপ জ্বালবার মানুষ নেই। দেশের জন্যে এখনই তোমার প্রাণ কাঁদছে তো সরল, কিন্তু যশোধরপুরে গিয়ে আমরা কী করব বলো দেখি?'

—'আমরা কী করব বীরেনদা?'

—'কাঁদব!'

—'কাঁদব! কেন?'

—'একদিন যে হিন্দু নিজের বীরত্বে সমুদ্রের ওপারে বিপুল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল, ভারতের বাইরেও ভারতবাসীর জন্যে নতুন আর স্বাধীন স্বদেশ তৈরি করেছিল, আজ তারই সন্তানের সেখানে গিয়ে কাঁদবার অধিকার ছাড়া আর কোনও অধিকারই যে নেই! হ্যাঁ সরল, যশোধরপুরের ধ্বংসাবশেষের উপরে আমরা কেবল ফোঁটা-কয়েক অশ্রু রেখে আসব।'

বলতে বলতে বীরেনদার গলার আওয়াজ ভারী হয়ে এল, আমরা অবাক হয়ে চেয়ে দেখলুম তার দুই চোখে ভরে উঠেছে অশ্রুজল।

ভারতবর্ষকে কত ভালোবাসে বীরেনদা!

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

জাগরণের দেশ

আমাদের জাহাজ সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছল। জাহাজ এখানে অনেকক্ষণ থামবে শুনে আমরা তীরে নেমে পড়লুম। আজ ক-দিন পরে ডাঙার মানুষ পায়ের তলায় আবার মাটিকে পেয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

সিঙ্গাপুরের কথা সকলেই জানেন, কাজেই সে কথা আমি আর এখানে বলতে চাই না।

সিঙ্গাপুরে নানাজাতীয় রকম-বেরকমের মুখ দেখলুম—এ শহরটা যেন দুনিয়ার নানা জাতির চেহারার নমুনা নেবার জায়গা। এখান থেকে আমরা কোচিন-চিনের বন্দর সাইগনে যাত্রা করব—সেও প্রায় চার দিনের পথ। তার পর সেখান থেকে যাব যশোধরপুরের ওঙ্কারধামে।

জাহাজ যখন সিঙ্গাপুর ছাড়ল, দেখলুম যাত্রীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। এই নতুন যাত্রীরা সবাই প্রায় চিনেম্যান।

অমিয় বললে, 'এইবার থেকে থ্যাবড়া-নাকের দেশ শুরু হবে!'

বীরেনদা বললে, 'না অমিয়, এইবার থেকে স্বাধীন এশিয়া শুরু হবে! ঘুমের দেশ থেকে এইবার আমরা জাগরণের দেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি—যে-দেশ সাদা চামড়ার লোহার বেড়ি পায়ে পরেনি!'

আমরা চলেছি উত্তর দিকে—বাঁ দিকে আছে মালয় উপদ্বীপ।...

দ্বিতীয় দিনের রাত্রে হঠাৎ আমাদের ঘুম ভেঙে গেল!—জেগে উঠেই শুনি ভীষণ গোলমাল, বন্দুকের শব্দ, অনেকগুলো পায়ের ছুটো-ছুটির আওয়াজ, অনেকগুলো কণ্ঠের চিৎকার আর আর্তনাদ!

আমাদের দুজনকে কামরা থেকে বেরুতে বারণ করে বীরেনদা তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে গেল।

হতভম্বের মতন বসে আছি, বীরেনদা আবার দ্রুতপদে ফিরে এসে কামরার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলে—তার মুখ বিবর্ণ।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী হয়েছে বীরেনদা?'

—'বোম্বেটে!'

—'বোম্বেটে?'

—'হ্যাঁ, সিঙ্গাপুর থেকে একদল বোম্বেটে যাত্রী সেজে জাহাজের উপরে উঠেছিল। তারা জাহাজের লোকদের আক্রমণ করেছে!'

আমি আর অমিয় এক লাফে বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলুম।

বীরেনদা বললে, 'এই চিনে-সমুদ্র হচ্ছে বোম্বেটের স্বর্গ! এ বোম্বেটেরা বড়ো নিষ্ঠুর, কারুকে এরা ক্ষমা করে না।—সরল, অমিয়!'

বন্দুকের বাক্স খুলতে খুলতে আমি বললুম, 'তাহলে কি আমাদের এখন বোম্বেটের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে?'

—'বোম্বেটেরা দলে ভারী, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা বৃথা। তবে এও ঠিক যে, আমরা কাপুরুষের মতন মরব না। কী বলো সরল? কী বলো অমিয়?'

বন্দুকে টোটা পুরতে পুরতে আমি বললুম, 'মরি যদি, মেরে মরব!'

অমিয় বীরেনদার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমি তো আগেই বলেছি বীরেনদা, তোমার সঙ্গে মরতেও আমার ভয় করে না!'

বীরেনদা বললে, 'জানি, তোমরা হচ্ছ খাঁটি ইস্পাত, দুমড়োলেও ভাঙবে না!'

বাইরে যাত্রীদের কান্না আর বোম্বেটেদের চিৎকার আরও বেড়ে উঠল।

বীরেনদা বললে, 'কাপুরুষদের কান্না শোনো! ওরা ভুলে গেছে, কেঁদে কেউ কোনওদিন বাঁচতে পারে না!'

অমিয় বললে, 'বীরেনদা, লড়াই করবার জন্যে আমার হাতদুটো নিসপিস করছে!'

—'সব যথাসময়ে ভাই, সব যথাসময়ে! মরবার সময় এলে হাসিমুখেই মরব, কিন্তু এখন দেখা যাক বাঁচবার কোনও উপায় আছে কি না!'

আমি বললুম, 'ডাঙা হলেও কথা ছিল, কিন্তু এ যে অগাধ সমুদ্র বীরেনদা! মুক্তির কোনোই উপায় নেই!'

—'গোলমালটা হচ্ছে জাহাজের বাঁ দিকে। ডান দিকে কোনও সাড়া শব্দ নেই! আচ্ছা, তোমরা আমার পিছনে চুপি চুপি এসো! আমি না বললে কিন্তু বন্দুক ছুড়ো না।' —এই বলে বীরেনদা কামরার দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে বাঁ দিকে একবার চেয়ে দেখলে। তারপর আমাদের ইঙ্গিত করে ডান দিকের পথ ধরলে। আমরা দুজনে গুড়ি মেরে তার পিছনে পিছনে চললুম।

জাহাজের এদিকটা অন্ধকার, সমুদ্রের বুকে অন্ধকার, আকাশেও আলোর রেখা নেই।

আচম্বিতে কী-একটা শব্দ হল, পরমুহূর্তেই বীরেনদা সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল এবং তার পরেই সমুদ্রের ভিতর ঝপাং করে আর-একটা শব্দ!

কিছুই বুঝতে না পেরে আমরা দুজনেও দাঁড়িয়ে পড়লুম।

চুপিচুপি বললুম, 'কী হল বীরেনদা?'

—'একটা বোম্বেটে কমল! অন্ধকারের ভেতর থেকে লোকটা হঠাৎ আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছিল, কিন্তু সে জানত না যে আমার এই হাতদুটো ছ-মন বোঝা তুলতে পারে! তোমরা টের পাবার আগেই, একটা টুঁ-শব্দ করতে না করতেই তাকে তুলে সমুদ্রে ছেড়ে দিয়েছি! পাতালে যেতে তার আর দেরি লাগবে না!'

যে-হাত এত সহজে এমন কাণ্ড করতে পারে, অন্য সময় হলে সে-হাতের শক্তির কথা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে ভাবতুম! কিন্তু এখন আর ভাববার সময় নেই, কারণ পিছনে কাদের চিৎকার আর পদশব্দ শুনলুম!

বীরেনদা বললে, 'সাবধান! দৌড়ে আমার সঙ্গে এসো!'

কিন্তু বেশি দূর দৌড়তে হল না,—আমরা একেবারে জাহাজের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ালুম। তারপরেই রেলিং, আর তার নীচেই সমুদ্র!

বীরেনদা বললে, 'আপাতত আমরা বেঁচে গেলুম!'

—'কী করে বীরেনদা, বোম্বেটেরা যে এসে পড়ল!'

—'না, ওরা আমাদের দেখতে পায়নি। এদিকে কোনও কামরা নেই, ওরা বোধ হয় খানিকক্ষণ এদিকে আসবে না। কিন্তু তার আগেই আমরা নিরাপদ হতে চাই! আমি এদিকে এসেছি কেন জানো? এই দড়িগুলোর জন্যে! এই দড়িগুলো যে এখানে আছে, আমি দিনের বেলাতেই তা দেখেছিলুম।'

সেখানে অনেকগুলো কাছি কুণ্ডলী-পাকানো অজগরের মতন পড়ে আছে বটে!

আমি বললুম, 'কিন্তু এ দড়িগুলো নিয়ে আমরা করব কী?'

বীরেনদা বললে, 'দেখছ, এই দড়িগুলো জাহাজের সঙ্গে বাঁধাই আছে? তিনগাছা দড়ি সমুদ্রের ভিতরে ফেলে, আপাতত আমরা কি আর-একটা রাত দড়ি ধরে ভাসতে পারব না?'

—'কিন্তু তারপর?'

—'পরের কথা পরে ভাবা যাবে! আবার পায়ের শব্দ শুনছি, নাও—আর দেরি নয়!'

বীরেনদার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও এক এক গাছা দড়ি সমুদ্রের ভিতরে ফেলে দিলুম। অনেক জিমনাস্টিক করেছি, সুতরাং দড়িগুলো ধরে নীচে নেমে যেতে আমাদের কোনোই অসুবিধা হল না!

সমুদ্রের জল যখন আমার কোমর পর্যন্ত গ্রাস করেছে, বীরেনদা হাসতে হাসতে বলে উঠল, 'আমরা অ্যাডভেঞ্চার খুঁজছিলুম, কিন্তু আর তাকে খুঁজতে হবে না, কী বলো সরল?'

আমি বললুম, 'তবে এ অ্যাডভেঞ্চার-এর গল্প দেশে গিয়ে করতে পারব না, এই যা দুঃখ!'

অমিয় বললে, 'সেদিন তুমি বলছিলে না বীরেনদা, আমরা জাগরণের দেশের দিকে যাচ্ছি? সে কথা ঠিক! আজ সারা রাতই আমাদের আর ঘুমোতে হবে না!'

আমি বললুম, 'হায় হায়! তিন-তিনটে ভারত-সন্তান জেগে উঠে মোটা কাছি নিয়ে গভীর রাতে যে আজ সাগর-মন্থনে নেমেছেন, যাঁরা স্বদেশি কবিতা লেখেন এ দৃশ্য তাঁরা দেখতে পেলেন না তো!'

অমিয় দড়ি ধরে ভাসতে ভাসতে গুনগুন করে একটা হাসির গান গাইতে লাগল এবং তার সঙ্গে শিস দিতে শুরু করলে বীরেনদা।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

মস্তবড়ো হাঁ আর ধারালো দাঁত

অন্ধকারের তরঙ্গ বইছে মাথার উপরে,—সমুদ্রের তরঙ্গ বইছে দেহের চারিপাশ ঘিরে!—দড়ি ধরে আমরা ভাসছি আর ভাসছি, যা দেখছি আর অনুভব করছি এ কি সত্য, এ কি স্বপ্ন?

হঠাৎ আমাদের আশেপাশে ঝপাং করে শব্দ হতে লাগল!—যেন উপর থেকে কী সব পড়ছে! ভাবলুম, বোম্বেটেরা নিশ্চয় টের পেয়েছে যে, জাহাজের সঙ্গে আমরাও দড়ি ধরে ভেসে চলেছি, তাই আমাদের মারবার জন্যে ভারী ভারী জিনিস ছুড়ছে।

কিন্তু বীরেনদা বললে, 'আমি শুনেছি, বোম্বেটেরা যখন জাহাজ দখল করে তখন মাঝে মাঝে যাত্রীদের হত্যা করে সমুদ্রে ফেলে দেয়। আমাদের চারিদিকে যেসব শব্দ হচ্ছে, নিশ্চয় তা এক-একটা লাশ পড়ার শব্দ!'

সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল!—জাহাজের উপরে থাকলে আমাদেরও তো এই অবস্থা হত! এতক্ষণে আমাদেরও দেহ হয়তো চিন-সমুদ্রের জলে ভাসতে ভাসতে চলে যেত কোথায় কে জানে!

আচম্বিতে আমার খুব কাছেই একটা শব্দ হল—এত কাছে যে, সমুদ্রের জল ছিটকে আমার চোখে-মুখে লাগল! একটু পরেই কি একটা জিনিস আমার গায়ে এসে ঠেকল! হাত দিয়ে সেটাকে ঠেলে দিতে গিয়েই বুঝলুম, মানুষের দেহই বটে!—ঠান্ডা, অস্বাভাবিক ঠান্ডা, জ্যান্ত মানুষের দেহ এত ঠান্ডা হয় না!

তাড়াতাড়ি দেহটাকে দূরে ঠেলে আমি অস্ফুট চিৎকার করে উঠলুম!

বীরেনদা বললে, 'কী হল, কী হল সরল?'

আমি শিউরোতে শিউরোতে বললুম, 'একটা মড়া! আমি একটা মড়ার গায়ে হাত দিয়েছি।'

বীরেনদা বললে, 'সেজন্যে আঁতকে উঠলে কেন?'

—'জীবনে এই প্রথম আমি মড়ার গায়ে হাত দিলুম! হাত দিতেই আমার দেহের ভিতরটা যেন কীরকম করে উঠল!'

—'সেজন্যে আজ আঁতকে উঠে লাভ নেই সরল! যে-অবস্থায় আমরা পড়েছি, কালকে হয়তো আমাদেরই ওই-রকম মড়া হতে হবে! রবিঠাকুরের ভাষায় এখন আমাদের 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য'—প্রাণ নিয়ে এখন আমাদের খেলা করতে হবে—তা সে প্রাণ নিজেরই হোক, আর পরেরই হোক!'

অমিয় বললে, 'বীরেনদা, সেদিন একটি কবিতা পড়েছিলুম আজ আমার তাই মনে হচ্ছে!'

বীরেনদা বললে, 'শাবাশ অমিয়, তুমি বাহাদুর ছেলে বটে! এমন সময়েও তোমার কবিতার কথা মনে হচ্ছে?'

—'কবিতার খানিকটা শোনো

মরণ আমার খেলার সাথি,
জীবনও মোর তাই,
এই দুনিয়ায় খেলতে আসা;
ভাবনা কিছুই নাই!
নেচে বেড়াই দরাজ বুকে,
অট্টহাসি হাসছি মুখে,
বাঁচি যেমন পরম সুখে,
মরেও আমোদ পাই—
হো হো, ভাবনা কিছুই নাই!—

সত্যি বলছি বীরেনদা, আজকের রাতটিকে আমার ভারী ভালো লাগছে!'

প্রথম সূর্যোদয় দেখলুম! কালকের রাতে যে-সব হতভাগ্যের বুকের রক্ত সমুদ্রের ওপরে ঝরে পড়েছে, যেন তাই মেখেই রাঙা হয়ে জলের ভিতর থেকে সূর্যদেব আজ তাঁর মাথা তুলে নীলাকাশের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন!

কোনওদিকে তীরের আভাস পেলুম না—থই থই করছে খালি অনন্ত নীল জল। জাহাজের ওপরে নিরাপদে বসে এই কয়দিন সমুদ্রকে যেমন মধুর লাগছিল, আজ আর তেমনটি লাগল না।

সারা রাত জলে থেকে এখন সকালের বাতাসে দেহের ভিতরে শীতের কাঁপুনি ধরল। তার উপরে নানান ভাবনা। সমুদ্রে ভেসে না-হয় বোম্বেটের ছুরি থেকে আপাতত রেহাই পেয়েছি, কিন্তু মানুষের দেহ তো লোহা কি পাথর নয়, এমন ভাবে জলের ভিতরে আর ক-দিন থাকতে পারব? আর না হয় জলেরই ভিতরে কোনওরকমে রইলুম, কিন্তু কী খেয়ে বেঁচে থাকব?

অমিয় আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, 'হাঙর! হাঙর!'

চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখি, মস্তবড়ো একটা হাঁ, আর তার ভিতরে কতকগুলো ধারালো চকচকে দাঁত! সাদা মাছের মতো প্রকাণ্ড একটা দেহও চোখে পড়ল! কিন্তু পরমুহূর্তেই দেহটা জলের ভিতরে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলিয়ে মিলিয়ে গেল।

বীরেনদা দড়ি ধরে ওপরে উঠতে উঠতে বললে, 'ওপরে ওঠো, ওপরে ওঠো!'

অমিয়ের সঙ্গে আমিও দড়ি ধরে ওপরে উঠে গেলুম এবং পরপলকেই দেখলুম, হাঙরটা ঠিক আমাদের নীচে এসে হাজির হয়েছে!

শিকার পালিয়েছে দেখে সে যে খুবই খাপ্পা হয়েছে, তার প্রমাণ দেবার জন্যে জল থেকে

আমাদের দিকে আমাদের মস্ত একটা লম্ফ ত্যাগ করলে, কিন্তু আমরা তখন তার নাগালের বাইরে।

তবু সে আশা ছাড়লে না—জাহাজের পিছনে পিছনে আসতে এবং মাঝে মাঝে দাঁত বার করে কুৎসিত হাই তুলতে লাগল!

এদিকে দড়ি ধরে ওপরে ঝুলতে ঝুলতে আমাদের হাত ভেরে এল—অথচ আমাদের এখন ওপরে ওঠবারও জো নেই বোম্বেটের ভয়ে এবং জলে নামবারও উপায় নেই হাঙরের ভয়ে!

এমন সময়েও আমি ঠাট্টা করবার লোভ সামলাতে পারলুম না। অমিয়কে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী ভায়া, এমন অবস্থায় পড়লে তোমার কবি কী বলতেন? মরণকে কি তাঁর খেলার সাথি বলে মনে হত?'

অমিয় তখনও দমবার পাত্র নয়। সে হেসে বললে, 'আচ্ছা সরলদা, হাঙরের ক-টা দাঁত আছে গুনে দ্যাখো দেখি।'

আমি অগত্যা মনে মনে হার মেনে প্রকাশ্যে বললুম, 'সেজন্যে এখনই মাথা ঘামাবার দরকার নেই। একটু পরে সকলকেই তো হাঙরের পেটের ভিতর ঢুকতে হবে, তখন দাঁত গুনে দেখবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে!'

অমিয়ের মুখ তখন রাঙা-টকটকে হয়ে উঠেছে, সে যেন নিজের কণ্ঠ প্রাণপণে চাপতে চাপতে বললে, 'না সরলদা, আমাকে কিন্তু এখনই মাথা ঘামাতে হচ্ছে। আমার হাত একেবারে অবশ হয়ে গেছে, আমাকে এখনই হাঙরের পেটের ভিতরেই যাত্রা করতে হবে!'

বীরেনদা তাড়াতাড়ি জামার ভিতর দিকে হাত চালিয়ে একটা রিভলভার বার করে বললে, 'বোম্বেটেরা পাছে শুনতে পায় সেই ভয়ে এতক্ষণ রিভলভার ছুড়তে পারছিলুম না। কিন্তু এখন দেখছি না ছুড়ে আর উপায় নেই।' —বলেই সে হাঙরটিকে লক্ষ্য করে উপরি-উপরি দু-বার রিভলভার ছুড়লে।

হাঙর-বাবাজি মানুষের বদলে দু-দুটো গরম সিসের গুলি খেয়েই চোঁ করে জলের তলায় ডুব মারলে! বাঁচল কি মরল জানি না, তবে জলের ওপরে দেখা গেল, খানিকটা রক্তের দাগ!

রিভলভারের আওয়াজ যে জাহাজের ওপর থেকে কেউ শুনতে পেয়েছে, তারও কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না। আমরা তখন নিশ্চিন্ত হয়ে আবার জলের ভিতরে নামলুম।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

দড়ি কে টানে

সকালবেলায় সূর্যকে দেখে খুব খুশি হয়েছিলুম। কিন্তু তখন ভাবতে পারিনি যে, সেই সূর্যকেই পরে অভিশাপ দিতে হবে!

কে আগে জানত যে, রোদে সমুদ্রের জলও এমন গরম আর সূর্যের তাপ এমন অসহনীয় হয়ে ওঠে? তরঙ্গের সঙ্গে নৃত্যশীল সূর্যকিরণ যে এত তীব্র হয়ে উঠে চোখ প্রায় কানা করে দিতে পারে, তাও আমাদের জানা ছিল না।

একে কাল রাত থেকে একঢোঁকও জল পান করিনি, তার উপরে সূর্যের এই অত্যাচার! সমুদ্রের বিপুল জলরাশির ভিতরেও বারংবার ডুব দিয়ে মনে হতে লাগল, বুকের ভিতরটা যেন মরুভূমির মতন শুকিয়ে গিয়েছে—জল নেই, সেখানে এক ফোঁটাও জল নেই!

অদৃষ্টের কী নিষ্ঠুর পরিহাস! এত জল এখানে, অথচ জলাভাবে আমরা মরতে বসেছি!

এক-একবার আর সইতে না পেরে সমুদ্রের জলে চুমুক দি, আর তা ভীষণ নোনতা বলে তখনই উগরে ফেলতে পথ পাই না! অমন নীলপদ্মের নীলিমা-মাখানো সুন্দর জল, কিন্তু তা পান করা কী অসম্ভব!

কাল থেকে ঘুমোইনি। সারাদিন আহারও নেই। তার উপরে সমানে দড়ি ধরে ঝুলে থাকা—জলের ভিতরে ভাসছি বটে, কিন্তু হাতদুটো যেন ছিঁড়ে পড়ছে!

জাহাজ সমানে চলেছে—কিন্তু তখনও কোনওদিকে ডাঙা দেখা যাচ্ছে না।

তারপর সূর্য যখন অস্ত গেল, তখন আমরা প্রায় মরো মরো হয়ে পড়েছি।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এল, ধীরে ধীরে আবার সেই অন্ধকার ঘন হয়ে উঠতে লাগল—যে অন্ধকারের ভিতর কাল এক রাত্রেই আমাদের জীবনটা উলটে-পালটে একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে!

সন্ধ্যা এল, আঁধার এল, রাত্রি এল। কিন্তু সূর্যের তাপে কণ্ঠের ভিতরে যে তৃষ্ণার আগুন জ্বলে উঠেছে, সে আগুন না-নিবে প্রবল হয়ে উঠল দ্বিগুণতর।

আমি বললুম, 'বীরেনদা, মরতে আমি ভয় পাই না, কিন্তু এমন তিলে তিলে মরণের দিকে এগিয়ে যাওয়া ভয়ানক নয় কি?'

অমিয় বললে, 'হ্যাঁ সরলদা, এবারে আমিও তোমার সঙ্গে একমত। এমন বেঁচে থাকার কষ্ট আর সওয়া চলে না! তার চেয়ে এসো, আমরা দড়ি ছেড়ে ডুব দি, পাঁচ মিনিটেই সব ব্যথা জুড়িয়ে যাবে।'

বীরেনদা একটাও কথা কইলে না।

জাহাজের ছায়া যেখানে জলের উপরে শেষ হয়েছে তার পরের অনেকখানি জায়গা আলোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এ আলো আসছে জাহাজের উপর থেকে। এই আলো

দেখছি আর মনে হচ্ছে, আমরা অন্ধকারে অনাহারে অনিদ্রায় তৃষ্ণায় আর পরিশ্রমে মরণোন্মুখ হয়েছি; আর জাহাজের ওপরে আলোকিত কক্ষে বসে একদল হত্যাকারী শয়তান—

আমার চিন্তায় বাধা দিয়ে অমিয় বললে, 'বীরেনদা, আর নয়,—এই আমি দড়ি ছাড়লুম!'

বীরেনদা বললে, 'না অমিয়, আর একটু অপেক্ষা করো।'

—'আর অপেক্ষা করে মিছে কষ্ট বাড়াই কেন বীরেনদা? মরণ আমাদের ধরবার আগে আমরাই কেন মরণকে এগিয়ে গিয়ে ধরি না?'

বীরেনদা বললে, 'একটু সবুর করো। আমি একবার জাহাজের ওপরে গিয়ে দেখে আসি, কোনও উপায় আছে কি না?'

আমরা দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলুম, 'তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

—'না না, তাহলে গোলমাল হবার সম্ভাবনা। আমি একলাই যাব।'

—'কিন্তু তুমি যদি বিপদে পড়ো?'

—'তাহলে তোমরা দুজনে থাকলেও কোনও উপকার হবে না।' —এই বলে বীরেনদা দড়ির সাহায্যে আবার উপরে উঠতে লাগল।

পনেরো মিনিট। আধ ঘণ্টাও কেটে গেল বোধ হয়।

আমি বললুম, 'অমিয়, এখনও বীরেনদার দেখা নেই!'

অমিয় বললে, 'আমি যেন উপর থেকে মাঝে মাঝে কাদের হট্টগোলের শব্দও শুনতে পেয়েছি! চলো, আমরাও উপরে উঠি।'

—'না, আর-একটু দেখি। বীরেনদার কথা অমান্য করা উচিত নয়।'...

বোধ হয় আরও আধ ঘণ্টা গেল। তবু বীরেনদার দেখা নেই! আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল—নিজের কষ্টের কথা ভুলে গেলুম।

অমিয় বললে, 'সরলদা, আর নয়—বীরেনদা নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছেন!'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, চলো, আমরাও উপরে উঠি। এখানে এমন করে মরার চেয়ে উপরে গিয়ে বীরের মতন মরা ঢের ভালো।'—

আমার কথা শেষ হতে না হতেই উপর থেকে একসঙ্গে আমাদের দুজনেরই দড়িতে টান পড়ল, কারা যেন আমাদের টেনে তুলছে।

অমিয় বললে, 'নিশ্চয় বীরেনদা আমাদের টেনে তুলছেন!'

আমি হতাশভাবে বললুম, 'না অমিয়,—এ বীরেনদা নয়! দেখছ না, একসঙ্গে আমাদের দুজনেরই দড়িতে টান পড়েছে, নিশ্চয়ই একজনের বেশি লোক দড়ি ধরে টানছে।'

—'তবে কি—'

—'হ্যাঁ, আর কোনও সন্দেহ নেই,—বোম্বেটেরা আমাদের কথা টের পেয়েছে!'

—'আমরা যদি দড়ি ছেড়ে দি?'

—'সমুদ্রে ডুবে মরব।'

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

নীলগোলাপের ছাপ

আমরা ক্রমেই উপরে উঠছি! মানুষ ছিপের সুতোয় বেঁধে টেনে তোলবার সময়ে মাছ-বেচারাদের মনের ভাব যে-রকম হয়, আমাদেরও মনের অবস্থা তখন বোধ করি অনেকটা সেই রকমই হয়েছিল!

নীচে অতল সমুদ্র যেন হাঁ করে আছে—আমাদের গিলে ফেলবার জন্যে, আর উপরে প্রস্তুত হয়ে আছে বোম্বেটেদের নিষ্ঠুর তরবারি—আমাদের ধড় থেকে মুণ্ডটা তফাত করে ফেলবার জন্যে!

অমিয় বললে, 'সরলদা, এসো আমরা দড়ি ছেড়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি!'

আমি হতাশভাবে বললুম, 'তাতে আর লাভটা কী হবে ভাই?'

—'বোম্বেটেরা তো আমাদের ধরতে পারবে না!'

—'কিন্তু সমুদ্রের গ্রাস থেকেই বা বাঁচব কেমন করে? এ তো আর পুকুর কি নদী নয়, যে সাঁতার দিয়ে পার হয়ে যাব!'

—'কিন্তু ছোরা-ছুরির খোঁচা খেয়ে মরার চেয়ে কি ঠান্ডা জলের তলায় তলিয়ে যাওয়া ঢের ভালো নয়?'

ততক্ষণে আমরা জাহাজের ডেকের কাছে এসে পৌঁছেছি।

চার-পাঁচ জন লোক উপর থেকে মুখ বাড়িয়ে আগ্রহভরে আমাদের দেখছে! একজনের হাতে লণ্ঠন, তারই আলোয় দেখলুম—প্রত্যেকেরই নাক খ্যাঁদা আর চোখগুলো কুতকুতে। তারা সকলেই চিনেম্যান!

অমিয় আবার বলে উঠল, 'সরলদা! এখনও সময় আছে—দড়ি ছেড়ে দাও, এদের হাতে পড়ার চেয়ে ডুবে মরা ভালো!'

সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে বীরেনদার গলার আওয়াজে শুনলুম, 'না অমিয়, দড়ি ছেড়ো না! তোমরা উপরে উঠে এসো!'

বীরেনদা বেঁচে আছে! আমাদের উপরে যেতে ডাকছে! বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলুম!

বীরেনদার গলা পেয়ে অমিয় আর ইতস্তত করলে না, চটপট দড়ি বেয়ে তখনই ডেকের উপর গিয়ে উঠল!...আমিও তাই করলুম।

উপরে গিয়ে দেখলুম, অদ্ভুত দৃশ্য! পঁচিশ-ত্রিশ জন লোক আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের সকলেই প্রায় চিনেম্যান, তবে তিন-চার জন কালো চেহারার লোকও দলের ভিতরে ছিল—দেখলে তাদের ভারতবাসী বলেই মনে হয়।

বীরেনদা দাঁড়িয়ে আছে বুক ফুলিয়ে তাদের মাঝখানে—নিজের দীর্ঘ দেহ নিয়ে, সকলের মাথার উপরে মাথা তুলে। বীরেনদার মাথায় একখানা কাপড় জড়ানো—কাপড়খানা রক্তে

রাঙা। তার জামাকাপড়ও স্থানে স্থানে ছিঁড়ে গিয়ে দেহের লোহার মতো কঠিন মাংসপেশিগুলো প্রকাশ করে দিয়েছে! দেখেই বুঝলুম, বীরেনদার সঙ্গে বোম্বেটের বিলক্ষণ ধস্তাধস্তি হয়ে গেছে।

অন্যান্য মুখগুলোর উপরেও তাড়াতাড়ি একবার চোখ বুলিয়ে গেলুম—সে-সব মুখের উপরে শয়তানি আর পশুত্বের ছাপ সুস্পষ্ট, তারা ভুলেও যে কখনও দয়া-মায়ার স্বপ্ন দেখেছে, এমন কথা কল্পনাও করা যায় না। আমাদের দিকে তারা তাকিয়ে আছে—যেমন করে তাকায় ইঁদুরের দিকে বিড়ালরা!

অমিয় বললে, 'বীরেনদা, তোমার মাথায় কী হয়েছে?'

বীরেনদা দু-পা এগিয়ে এসে, তার পিঠ চাপড়ে হেসে বললে, 'ও কিছু নয় ভাই, সব কথা পরে বলব।'

আমি বললুম, 'কিন্তু এরা আমাদের টেনে তুললে কেন? খুন করবার জন্যে?'

—'এ প্রশ্নেরও উত্তর পরে পাবে।'

—'কিন্তু এরা আমাদের নিয়ে যা খুশি করুক, আপাতত আমাদের একটু জল দিক—তেষ্টা আর সইতে পারছি না। মরতে হয় তো, দানাপানি খেয়ে একটু জিরিয়েই মরব!'

বীরেনদা ফিরে একটু গলা তুলে বললে, 'কং-হিং! তোমরা কি আমার বন্ধুদের একটু জল দেবে না?'

একটা চিনেম্যান দলের একজনকে কী বললে—সে তখনই চলে গেল, বোধ হয় জল আনতেই।

আমি সবিস্ময়ে বললুম, 'হ্যাঁ বীরেনদা, তোমার বাংলা কথা এরা বুঝতে পারলে?'

বীরেনদা কোনও জবাব না দিয়ে একদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল, চারজন চিনেম্যান একটা বড়ো ভারী পিপে তোলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।

বীরেনদা মৃদুস্বরে বললে, 'সরল! অমিয়! তোমরা দুজনে ওই লোকগুলোকে সরিয়ে পিপেটাকে উপরে তুলে রেখে এসো তো!'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কেন বীরেনদা?'

—'ওদের এই সুযোগে দেখিয়ে দাও তোমাদের গায়ের জোরটা। তাহলে তোমাদের উপরে এদের শ্রদ্ধা বাড়বে—কারণ এ-সব লোক শ্রদ্ধা করে শুধু শক্তিকেই।'

আমরা এগিয়ে গেলুম। যে-চারজন লোক পিপেটাকে নিয়ে টানাটানি করছিল, বারংবার বিফল চেষ্টার পর তারা তখন পিপে ছেড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিল।

আমরা দুজনে পিপের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। ইশারায় জিজ্ঞাসা করলুম, 'পিপেটাকে কোথায় তুলে রাখতে হবে?'

লোকগুলো বিরক্তি-ভরা মুখভঙ্গি করে আমাদের পানে হিংস্র চোখ তুলে তাকালে, একটা লোক অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পাশের একটা উঁচু জায়গা দেখিয়ে দিলে।

আমি আর অমিয় খুব সহজভাবে ও অনায়াসেই পিপেটাকে তুলে যথাস্থানে স্থাপন করলুম।

চারিদিকে বিজাতীয় ভাষায় অস্ফুট ধ্বনি উঠল। বোধ হয় সকলে আমাদের বাহবা দিচ্ছিল, ...কারণ ফিরে দেখি, সকলেরই বিস্ময় ও সম্ভ্রম ভরা দৃষ্টি আমাদের দিকে আকৃষ্ট!

বীরেনদা বললে, 'এখন এদের কাছে তোমাদের প্রেস্টিজ অনেক বেড়ে গেল। ভবিষ্যতে তোমাদের সঙ্গে লাগবার আগে এরা ভাববে। ...ওই নাও, তোমাদের জল এসেছে।'

আমরা দুজনে সাগ্রহে গেলাসের পর গেলাস ভরে জলপান করলুম। জল যে এত মিষ্টি লাগে, এর আগে তা জানতুম না!

বীরেনদা চেঁচিয়ে বললে, 'কং হিং! এখন তোমাদের সর্দার আমাদের নিয়ে কী করতে চান?'

কং হিং হচ্ছে একজন আধবুড়ো লোক, একমাত্র তারই মাথায় চিনাদের সেই বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির মতন পুরাতন ও সুদীর্ঘ টিকি, কুণ্ডলী পাকানো সাপের মতো জড়ানো রয়েছে। বীরেনদার কথা শুনে কং হিং তার পার্শ্ববর্তী একটা চিনেম্যানের কানে কানে কী বললে।

বীরেনদা চুপি চুপি বললে, 'কং হিং যার সঙ্গে কথা কইছে, ওই হচ্ছে বোম্বেটেদের সর্দার। ওর নাম চ্যাং-চুং-চ্যাং।'

চ্যাং একটা পিপের উপরে বসেছিল, কং হিং ছাড়া আর সব বোম্বেটেই তার কাছ থেকে সসম্ভ্রমে তফাতে দাঁড়িয়ে আছে। চ্যাং বয়সে চল্লিশের কাছাকাছি—দেহেও খুব প্রকাণ্ড। দেহ দেখলেই বোঝা যায়, তার গায়ে বুনো মহিষের মতন শক্তি আছে। পরে শুনেছি, কেবল চাতুর্যের জন্যে নয়, সে সর্দার হতে পেরেছে তার আসুরিক গায়ের জোরেই। চ্যাঙের ডান চোখ কানা। ডান চোখের ঠিক উপরেই কপালে একটা কাটা দাগ দেখে আন্দাজ করলুম, কোনও দাঙ্গা-হাঙ্গামাতেই চোখটি সে খুইয়েছে। চিনেদের প্রায়ই গোঁফ থাকে না, চ্যাঙের কিন্তু গোঁফ আছে। আর সে গোঁফের মতন গোঁফই বটে, কারণ সেই গোঁফজোড়া একেবারে তার বুকের উপর পর্যন্ত গলদাচিংড়ির দুটো বড়ো বড়ো দাঁড়ার মতন ঝুলে পড়েছে। ডান হাতে লম্বা একটা চণ্ডুর পাইপ নিয়ে চ্যাং কথা কইতে কইতে সোঁ সোঁ করে ধোঁয়া টানছিল আর ছাড়ছিল। তার সেই কাটা কপাল, সেই কানা চোখের গর্ত, সেই জাঁদরেলি গোঁফ আর সেই বিরাট দেহ দেখলে মনের ভিতরে সত্য-সত্যই একটা বিভীষিকার ভাব জেগে ওঠে! মনে হয় এ লোক কারুর কাছে কখনও দয়া চায়নি, কারুকে কখনও দয়াও করেনি!

কং হিং দু-পা এগিয়ে এসে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'নীলগোলাপের ছাপ! নীলগোলাপের ছাপ! বাবু, তোমাদের নীলগোলাপের ছাপ নিতে হবে!'

বীরেনদার দিকে চেয়ে দেখলুম, সে দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরল, তারপর একটা মাথা-ঝাঁকুনি দিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল, 'নাঃ, তা ছাড়া আর উপায় নেই!'

আমি উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলুম, 'নীলগোলাপের ছাপ কী বীরেনদা?'

—'আমাদের হাতে বোম্বেটেদের দলের চিহ্ন দেগে দেবে। এরপর আমরা যত দিন বাঁচব—এই অপমানের ছবি আমাদের হাতের ওপরে আঁকা থাকবে। এ ছবি দেখলে লোকে আমাদের বোম্বেটে জেনে ঘৃণায় দূরে সরে যাবে!'

—'কিন্তু এ ছবি যদি আমরা হাতের ওপর আঁকতে না দি?'

—'তাহলে এখনই আমাদের মরতে হবে।'

অমিয় বললে, 'বোম্বেটে হব? তার চেয়ে এখনই পৃথিবী থেকে গোটাকয়েক বোম্বেটে কমিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া উচিত নয় কি?'

বীরেনদা বললে, 'না অমিয়, আমরা যে বোম্বেটে হব না, এটা একেবারে ঠিক কথা।'

—'তবে এই চিহ্ন আমাদের হাতে দেগে দেবে কেন?'

—'ওরা অবশ্য জানবে যে, আমরা ওদেরই দলের লোক। কিন্তু আমরা যে ওদের লোক কখনোই হব না, সে-বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই! আর ওদেরও সেই সন্দেহ আছে বলেই আমাদের ওরা একেবারে মার্কামারা করে ছেড়ে দিতে চায়।'

—'কিন্তু আমাদের দলে নেবার জন্যে ওদের এতটা উৎসাহ কেন?'

—'ওদের উৎসাহ কেন? আমার সব কথা শুনলেই পরে তোমরা বুঝতে পারবে। ওই নীলগোলাপের ছাপ আমাদের হাতের ওপরে দেগে দিয়ে ওরা আমাদের বেঁধে রাখতে চায়! কারণ এর পরেও আমরা যদি ওদের বিশ্বাসঘাতকতা করি, তাহলে ওরাও আমাদের ধরিয়ে দিতে পারবে। এই বিখ্যাত নীলগোলাপের ছাপ সব দেশের পুলিশই চেনে। যারই হাতে এই ছাপ থাকে তারই একমাত্র দণ্ড হচ্ছে প্রাণদণ্ড।...এখন প্রস্তুত হও। ওই দ্যাখো, ওরা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এইবার আমাদের নীলগোলাপের ছাপ নিতে হবে—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'অর্থাৎ এইবার আমাদের বোম্বেটে হতে হবে?'

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

'মানোয়ারি' জাহাজ

হাতের ওপরে আমরা নীলগোলাপের ছাপ নিয়েছি!—একটা মড়ার মাথার উপরে গোলাপ ফুটে আছে—সমস্তটাই নীল রঙের উলকিতে আঁকা! এ ছাপ আমাদের হাতে দেখলে সাধুরা ভয়ে পালিয়ে যাবে, পুলিশ আমাদের পিছনে তাড়া করবে!

চোখের সামনে ফাঁসিকাঠের স্বপ্ন দেখতে দেখতে নিজেদের কামরায় ফিরে এলুম।

অমিয় প্রথমেই বললে, 'বীরেনদা, আগে তোমার গল্প শুনব।'

বীরেনদা যা বললে, তা হচ্ছে এই:—'ভাই, অতক্ষণ পানাহার না করে জলের ভিতরে

ভাসতে ভাসতে আমার সর্বশরীর যে নেতিয়ে পড়েছিল, সে-কথা স্বীকার না করলে মিথ্যা কথা বলা হবে। সত্যিই আমার ভারী কষ্ট হচ্ছিল!...কিন্তু সে-কষ্টও আমাকে তত ব্যথা দিচ্ছিল না, যত ব্যথা পাচ্ছিলুম তোমাদের কাতরানি আর ছটফটানি দেখে। একে তো তোমাদের আমি ভাইয়ের মতন ভালোবাসি, তার উপরে আমার পরামর্শ শুনেই তোমরা প্রাণ দিতে বসেছ। কাজেই যাতনায় আর অনুতাপে প্রাণ আমার ফেটে যাবার মতো হল। মনে মনে পণ করলুম, প্রাণ তো যেতেই বসেছে, তবু তোমাদের জন্যে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব। তাই তোমাদের ভরসা দিয়ে আমি কাছি ধরে আবার জাহাজের উপরে গিয়ে উঠলুম।

'কিন্তু চেষ্টা করেও কিছু যে ফল হবে, সে আশা আমার ছিল না মোটেই। তবু ডুবে মরবার সময়ে মানুষ খড়ের কুটোও জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করে—আমার এ চেষ্টাও অনেকটা তারই মতো। মরব যখন নিশ্চয়ই, মরার ভয়ও ছিল না! তখন আমি মরিয়া। পাগলা হাতির সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারি অনায়াসে। মনে মনেই বললুম, 'এখন আমার সুমুখে যে এসে দাঁড়াবে নিতান্তই তাকে যমে টেনেছে!'

'জাহাজের কোন ঘরে খাবার জল থাকে, তা আমি জানতুম। রাতও হয়েছে, শত্রুরও ভয় নেই। সুতরাং বোম্বেটেরা হয়তো এখন যে যার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে, এমনি একটা আন্দাজও আমি করে নিলুম।

'পা টিপে টিপে গুড়ি মেরে এগুতে লাগলুম,—জীবনে এত নিঃশব্দে আর কখনও আমি অগ্রসর হইনি! চোখের উপরে ভেসে উঠছে বারংবার তোমাদের কাতর মুখ এবং বারংবার মনে হচ্ছে, তোমাদের মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে আমার সফলতার উপরেই। ...আজ যদি খাবার আর জল জোগাড় করতে পারি, তাহলে আমাদের সকলেরই প্রাণ বাঁচবে। তারপর জাহাজ কোনও বন্দরে গিয়ে লাগলেই আমরা ডাঙায় উঠে সরে পড়তে পারব।

'জাহাজের ভাঁড়ার ঘরের কাছে এসে পড়লুম, কেউ আমাকে দেখতে পেলে না। আসতে আসতে অনেক কামরার ভিতর থেকেই শুনতে পেলুম, মানুষের নাকডাকার আওয়াজ!

'কিন্তু ভাঁড়ার ঘরের সামনে গিয়েই দেখলুম, একটা লোক দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে ঘুমোচ্ছে না বটে, কিন্তু ঢুলছে। নিশ্চয়ই প্রহরী!

'জাহাজের মেঝের উপর শুয়ে পড়লুম। তারপর ধীরে ধীরে এগুতে লাগলুম, সাপের মতন বুকে হেঁটে।

'প্রায় যখন তার কাছে গিয়ে পড়েছি, হঠাৎ সে অকারণেই মুখ তুললে; এবং চোখ খুললে; এবং বলা বাহুল্য, আমাকে দেখতেও পেলে!

'একলাফে সে দাঁড়িয়ে উঠল—একলাফে আমিও দাঁড়িয়ে উঠলুম। সে নিজেকে সামলাবার আগেই দুই হাতে প্রাণপণে তাকে জড়িয়ে ধরলুম। লোকটা বিকট আর্তনাদ করে উঠল—সেই তার শেষ আর্তনাদ। কারণ পর-মুহূর্তেই আমি নিজেই শুনতে পেলুম, আমার হাতের

চাপে তার ঘাড়ের, পাঁজরার আর হাতের হাড় মড়মড় করে ভাঙতে শুরু করল। তার গলা দিয়ে আর একটি টুঁ শব্দও বেরুল না! লোকটাকে এমন ভাবে খুন করতে আমার মনে একটুও দরদ জাগল না—এ সেই বোম্বেটেদেরই একজন, যারা কাল রাতে জাহাজের সমস্ত নিরীহ যাত্রীকে হত্যা করে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছে। না পালালে আমরাও এতক্ষণ বেঁচে থাকতুম না।

'চারিদিকে অনেক লোকের পায়ের শব্দ শুনে সেই হাড়গোড়-ভাঙা মড়াটাকে ছুড়ে ফেলে দিলুম। তখন পালাবার উপায়ও ছিল না, পালাবার ইচ্ছাও রইল না। যে উদ্দেশ্যে এসেছি, তাও বিফল হল,—মৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবী, তা এদের হাতেই হোক, আর অনাহারে বা জলে ডুবেই হোক!

'আমি বক্সিং জানি, যুযুৎসু জানি। আর আমার গায়ে কী-রকম জোর আছে, কলকাতার পথে একদিন এক খ্যাপা মোষের সঙ্গে লড়বার সময়েই তোমরা স্বচক্ষে দেখেছ। তার উপরে বলেছি তো আজ আমি মরিয়া আর বেপরোয়া! সুতরাং তারপরেই জাহাজে যে ব্যাপারটা ঘটল, আমার মুখে শুনলে তোমরা ছাড়া আর কেউ বোধ হয় তা বিশ্বাস করতে চাইবে না। তবে মুষ্টি যোদ্ধা আর যুযুৎসু-র পালোয়ানরা হয়তো আমার কথা অত্যুক্তি বলে মনে করবেন না।*

'একসঙ্গে কত লোক যে আমাকে আক্রমণ করলে, তা আমি বুঝতে পারলুম না। তবে বিশ-পঁচিশ জনের কম নয় নিশ্চয়ই!

'কিন্তু তারা আমাকে ধরতে পারলে না—আমি তাদের সে সুযোগ দিলুম না। বিদ্যুতের মতন বেগে আমি একবার বাঁয়ে, একবার ডাইনে,—একবার সুমুখে, আর-একবার পিছনে লাফিয়ে বা গুড়ি মেরে সরে সরে যেতে লাগলুম এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত চলতে লাগল ক্ষিপ্রগতিতে এমন কৌশলে যে, খানিকক্ষণ পর্যন্ত তারা তো আমাকে ধরতে পারলে না বটেই, উলটে তাদের দলের আট-দশ জন লোক আহত বা অজ্ঞান হয়ে মেঝের উপরে লুটিয়ে পড়ল এবং অনেকেই মার খেয়ে আর্তনাদ করতে করতে পিছিয়ে গেল!

'ক্রমেই তাদের দলে লোক বাড়তে লাগল এবং আমিও হাঁপিয়ে পড়লুম। আর বেশিক্ষণ এমন অসমান লড়াই নিশ্চয়ই আমি চালাতে পারতুম না,—কিন্তু বোম্বেটেরা আমার শক্তি দেখে অবাক হয়ে নিজেরাই দূরে সরে গিয়ে হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে পড়ল!

'এবং সেই অবসরে আমি পিঠ থেকে বন্দুকটা খুলে নিয়ে ডান হাতে লাঠির মতো বাগিয়ে ধরে, আর বাঁ-হাতে রিভলভারটা বার করে বোম্বেটেদের দিকে তুলে ইংরেজিতে

---

*বীরেনদার এ অনুমান সত্য। কারণ বছর পঁয়ত্রিশ আগে কলকাতায় চৌরঙ্গির উপরে, একবার এক যুযুৎসু-র পালোয়ান খালি হাতে একাকী উনিশ-বিশ জন লোককে হারিয়ে দিয়েছিল। সে সময়ে 'ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজে' ওই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। যাঁদের সন্দেহ হবে, তাঁরা উক্ত ইংরেজি সংবাদপত্রের পুরানো ফাইল খুলে দেখতে পারেন। ইতি—লেখক।

চেঁচিয়ে বললুম, 'দেখছ, গায়ের জোরেও আমি শিশু নই, আর আমার হাতে অস্ত্রেরও অভাব নেই! যদি মরবার সাধ থাকে, তবে এগিয়ে এসো!'

'বোম্বেটেদরে মধ্য হতে একটা ভয়ের কানাকানি উঠল,—এগুবে কী, তারা আরও পিছনে হটে গেল!

'আচম্বিতে একটা লোক ভিড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বাংলা ভাষায় আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কি বীরুবাবু?'

'এমন জায়গায় একটা চিনে-বোম্বেটের মুখে হঠাৎ বাংলা কথা আর—তার চেয়েও যা অসম্ভব—আমার নাম শুনে আমি তো একেবারে থ হয়ে গেলুম!

'তখন জাহাজের চারিদিকে অনেক আলো জ্বলে উঠেছিল। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা সামলে, ভালো করে চেয়ে দেখেই লোকটাকে চিনতে পারলুম। তার নাম কং হিং, কলকাতায় অনেক দিন ধরে একটা জুতোর দোকান চালিয়েছিল। সর্বদাই সে হাসত—তার মুখের হাসি কখনও শুকোতে দেখিনি। ছেলেবেলা থেকেই ফি বছরে তার দোকানে গিয়ে আমি অনেক জুতো কিনেছি। তার দোকানের জুতো নইলে আমার পছন্দ হত না। সে বেশ বাংলা জানত আর আমার সঙ্গে তার খুব জানাশোনাও ছিল। কিন্তু আজ থেকে বছর-দুই আগে সে দোকান-পাট তুলে কলকাতা থেকে অদৃশ্য হয়েছিল। তারপর আজ হঠাৎ তার দেখা পেলুম অপার সাগরের ভিতরে, এই বোম্বেটেদের দলে।

'আমি বললুম, 'আরে, কং হিং সায়েব যে! তাহলে আজকাল দেখছি জুতোসেলাই ছেড়ে তুমি মানুষের গলাকাটা ব্যাবসা শুরু করেছ? বেশ, বেশ! কিন্তু দেখছ, আমার গলা কাটা কত শক্ত?'

'কং হিং হা হা করে হেসে উঠল এবং তার হাসি নীরব হবার আগেই ভিড় ঠেলতে ঠেলতে আর-একজন লম্বা-চওড়া জোয়ান বাইরে এসে দাঁড়াল। এতক্ষণ তাকে দলের ভিতরে দেখিনি, সে বোধ হয় কামরার ভিতরেই ছিল। পরে শুনলুম তার নাম চ্যাং-চুং-চ্যাং—বোম্বেটেদের সর্দার।

'যে-লোকগুলো জখম হয়ে চারিদিকে গড়াগড়ি দিচ্ছিল তাদের উপরে এক চক্ষু বুলিয়ে, চ্যাং বিস্মিত ভাবে অল্পক্ষণ আমার পানে মিটির মিটির করে চেয়ে রইল। তারপর কং হিংয়ের দিকে ফিরে খোনা গোলায় কী যেন জিজ্ঞাসা করলে।

'কং হিং চিনে ভাষায় তাকে কী বলতে লাগল আর চ্যাংও তাই শুনতে শুনতে বার বার প্রশংসা-ভরা চক্ষে আমার দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে আর নিজের বুক-পর্যন্ত-ঝুলে-পড়া লম্বা গোঁফের উপরে হাত বুলোতে লাগল। কং হিংয়ের কথা শেষ হবার পর চ্যাং গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ কী ভাবলে। তারপর কং হিংকে আবার কী বললে।

'কং হিং আমার দিকে ফিরে বললে, 'বীরুবাবু, তুমি অস্ত্র নামাও। আমাদের সর্দার তোমার বীরত্ব দেখে ভারী খুশি হয়েছেন।'

'আমি বললুম, 'কিন্তু তোমাদের কথায় বিশ্বাস কী? আমি অস্ত্র নামালে তোমরা যদি আবার আমাকে আক্রমণ করো?'

'কং হিং হেসে বললে, 'বীরুবাবু, আমরা ইচ্ছে করলে কি তোমাকে এখনও মেরে ফেলতে পারি না? আমাদের লোকেরা তাড়াতাড়িতে শুধু হাতে বেরিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু তারা যদি এখন সবাই মিলে বন্দুক নিয়ে এসে ফের তোমাকে আক্রমণ করে—'

'বাধা দিয়ে বললুম, 'কিন্তু তার আগেই আমিও যে এখনই তোমাদের সর্দারকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারি!...তবে ঝগড়ার কথা থাক। আমি অস্ত্র রাখছি, তুমি কী বলতে চাও, বলো।'

'কং হিং আমার কাছে এসে বললে, 'বীরুবাবু, খালি বীরত্বের জন্যে নয়, আমার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব ছিল বলেই এ যাত্রা তুমি বেঁচে গেলে! আমি হচ্ছি চ্যাংয়ের দাদা। চ্যাং সর্দার হলেও আমাকে মান্য করে। আজ থেকে তুমিও আমাদের দলের একজন হলে—তোমার মতন লোক পেলে আমাদের অনেক উপকার হবে। কেমন, তুমি রাজি আছ তো?'

'ভাবলুম, বলি, না!—ভদ্রলোকের ছেলে, বোম্বেটে হব?—কিন্তু তারপরেই মনে হল শঠের সঙ্গে শঠতা করতে দোষ কী? আপাতত তাদের কথায় রাজি হয়ে প্রাণ বাঁচাই তো, তারপর সুবিধা পেলেই চম্পট দেওয়া যাবে।

'চালাক কং হিং হাসতে হাসতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের ভাব লক্ষ করছিল। আমার মনের কথা সে বোধ হয় কতকটা আন্দাজ করতে পারলে। কারণ সে বললে, 'হ্যাঁ বীরুবাবু, আর এক কথা। আমাদের দলে এলে তোমাকে নীলগোলাপের ছাপ নিতে হবে।'

'আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'সে আবার কী?'

—'আমাদের দলের চিহ্ন। এ চিহ্ন তোমার হাত থেকে কখনও উঠবে না। এ চিহ্ন হাতে থাকলে আমাদের দলের লোক আর বিশ্বাসঘাতকতা করে ফাঁকি দিতে পারে না। কারণ দল ছাড়লেই তারা পুলিশের হাতে গিয়ে পড়ে—অর্থাৎ আমরাই তাকে ধরিয়ে দিই। পুলিশও যার হাতে ওই চিহ্ন দেখে, তার কোনও কথা বিশ্বাস করে না।'

'কিন্তু তখন আমি মন স্থির করে ফেলেছি, কং হিংয়ের এই ভীষণ কথা শুনেও নিশ্চিন্ত ভাবে বললুম, 'আমি তোমাদের কথায় রাজি আছি—যদি আমার আরও দুজন সঙ্গীকেও তোমাদের দলে নাও।'

'কং হিং বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললে, 'তোমার আরও দুজন সঙ্গী! কোথায় তারা?'

'আমি তাকে আমাদের সকলকার সব কথা সংক্ষেপে জানিয়ে দিলুম।

'কং হিং চিন্তিত ভাবে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললে, 'তবেই তো! সর্দার বোধ হয় রাজি হবে না।'

'আমি বললুম, 'কং হিং সায়েব, আমার বন্ধুদেরও পেলে তোমাদের দলের জোর

বাড়বে! তাদের গায়েও জোর বড়ো কম নয়! আর তাদের যদি দলে না নাও, আমাকেও তোমরা পাবে না। তাহলে আমরা তিনজনেই তোমাদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে মরব, মরতে আমরা কেউ ভয় পাই না। বলো, তাহলে আমার বন্ধুদের ডাকি, আর ফের অস্ত্র ধরি?'

'মাথার উপরে পাকানো টিকি-খোঁপার উপরে হাত বুলোতে বুলোতে কং হিং আবার চ্যাঙের কাছে ফিরে গেল, আবার তাদের দুজনের ভিতরে কী পরামর্শ হল। তারপর কং হিং আবার আমার কাছে হাসিমুখে ফিরে এসে বললে, 'আমার এই পয়মন্ত টিকির জয় হোক! আজ দেখছি তোমাদের অদৃষ্ট খুব ভালো। সর্দারকে রাজি করেছি!'

সরল, অমিয়, তারপরের কথা সব তোমরা জানো!'

বীরেনদার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে বিষম একটা হইচই উঠল! চমকে চেয়ে দেখি, ইতিমধ্যে কখন রাত পুইয়ে গেছে আমরা কেউ তা খেয়ালে আনিনি—জানালা দিয়ে নীলাকাশ-থেকে-ঝরে-পড়া সকালের সাদা আলো কামরার ভিতরটা পর্যন্ত উজ্জ্বল করে তুলেছে এবং বাইরে বোম্বেটেরা ব্যস্তভাবে চিৎকার আর ছুটোছুটি করছে।

ব্যাপার কী জানবার জন্যে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলুম।

দেখলুম, চ্যাং আর কং হিং দূরবিন চোখে দিয়ে যেদিক থেকে সূর্যোদয় হচ্ছে সেইদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কাঠের পুতুলের মতো নিস্পন্দ হয়ে।

বীরেনদা শুধোলে, 'এত সকালে দূরবিন চোখে দিয়ে কী দেখছ কং হিং সায়েব?'

দূরবিনটা চোখ থেকে নামিয়ে কং হিং হাসিমুখেই বললে, 'মানোয়ারি জাহাজ!'

—'মানোয়ারি জাহাজ?'

—'হ্যাঁ বীরুবাবু! ও জাহাজে গোরা আছে, কামান আছে। ওরা আমাদেরই ধরতে আসছে!'

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

তিন-পাহাড়ি দ্বীপ

মানোয়ারি জাহাজ আসছে আমাদের আক্রমণ করতে?

কথাটা শুনে সুখী হব, কি দুঃখিত হব, আমি তা বুঝতে পারলুম না—অবাক হয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলুম, হুস হুস করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে একখানা জাহাজ ক্রমেই দেখতে বড়ো হয়ে উঠছে!

অমিয় খুশিমুখে বললে, 'এইবার আমরা মুক্তি পাব।'

আমি বললুম, 'আমরা মুক্তি পাব না অমিয়! আমাদের বিপদ বরং আরও বেড়ে উঠল!'

—'কেন সরলদা, আমাদের আবার বিপদ কীসের? আমরা তো আর বোম্বেটে নই!'

—'কিন্তু আমাদের হাতে যে নীলগোলাপের মার্কা মারা আছে! আমরা যে বোম্বেটে নই, ওরা তা বিশ্বাস করবে কেন?'

—'আমরা সব কথা খুলে বলব, আমরা—'

বাধা দিয়ে বললুম, 'সে আর হয় না অমিয়! এই বোম্বেটেদের সঙ্গে ধরা পড়লে আমাদের আর কিছুতেই বাঁচোয়া নেই!'

অমিয়ের খুশিমুখ আবার ম্লান হয়ে পড়ল। সে বোম্বেটের মতন মরতে চায় না।

এমন সময়ে চ্যাং চোখ থেকে দূরবিন নামিয়ে চিনে-ভাষায় চেঁচিয়ে কী-একটা হুকুম দিলে।

ডেকের উপর কলরব তুলে বোম্বেটেরা চারিদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল। এবং দেখতে দেখতে আমাদের জাহাজের গতি বেড়ে উঠল!

কং হিং আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল। মাথার টিকির কুণ্ডলীর উপরে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'বীরুবাবু, তোমার মনে বোধ হয় খুব ভয় হয়েছে?'

বীরেনদা বললে, 'হ্যাঁ, ভয় হচ্ছে বটে,—তবে প্রাণের ভয় নয়, অপমানের ভয়!'

—'তার মানে?'

—'আমরা বোম্বেটে না হয়েও বোম্বেটে বলে ধরা পড়ব, এটা কি আমাদের পক্ষে অপমানের কথা নয় কং হিং?'

—'আমরা ধরা পড়ব কেন বীরুবাবু?'

—'আমরা যে ধরা পড়ব না কেন, তারও তো কোনও কারণ দেখছি না। আমাদের পিছু নিয়েছে মানোয়ারি জাহাজ—আমাদের জাহাজের চেয়ে সে ঢের বেশি তাড়াতাড়ি এগুতে পারে। সুতরাং তাকে এড়িয়ে আমরা পালাতে পারব না। তারপর মানোয়ারি জাহাজে আছে দলে দলে গোরা, অগুনতি বন্দুক আর কামান! সুতরাং লড়াই করেও তার সঙ্গে আমরা এঁটে উঠতে পারব না।'

কং হিং হেসে বললে, 'তোমাদের কথা ঠিক বীরুবাবু। মানোয়ারি জাহাজ আমাদের পক্ষে যমের মতোই বটে। কিন্তু তবু আমরা তাকে কলা দেখিয়ে পালাতে পারব। এদিকে এসে দেখে যাও'—এই বলে সে বীরেনদাকে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল, আমরা দুজনেও তাদের পিছনে পিছনে অগ্রসর হলুম।

এতক্ষণ আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম, সেখান থেকে জাহাজের অন্য পাশের সমুদ্রের দৃশ্য কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এখন এপাশে এসে দাঁড়িয়ে দেখি, এ কী অভাবিত ব্যাপার!

আমাদের চোখের সামনে, মাইল-কয়েক দূরে জেগে উঠেছে একটি পরমসুন্দর অরণ্যশ্যামল দ্বীপের ছবি—তার মাথার উপরে আকাশের নীলপটে আঁকা রয়েছে পাশাপাশি তিনটি পাহাড়ের ধূসর চূড়া!

দেখে চোখ যেন জুড়িয়ে গেল—মনে হল এই বিপদসঙ্কুল পাথারে সেই-ই যেন আমাদের একমাত্র মুক্তির নীড়!

কং হিং হাসতে হাসতে বললে, 'এখন বুঝছ তো বীরুবাবু, কেন আমরা ধরা পড়ব না? একবার ওই দ্বীপে গিয়ে উঠতে পারলে আর আমাদের হাতে পায় কে?'

আমি বললুম, 'কিন্তু কং হিং সায়েব, জাহাজি গোরারাও যে দ্বীপে উঠে আমাদের আক্রমণ করবে না, এতটা ভরসা তুমি করছ কেন?'

—'কী, দ্বীপে উঠে আমাদের আক্রমণ করবে? অসম্ভব, অসম্ভব! ওখানকার এমন সব লুকোবার জায়গা আমরা জানি যে, কেউ আমাদের টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পাবে না।...জানো বীরুবাবু, ওই দ্বীপে আসবার জন্যেই আমরা এই জাহাজ লুট করেছি?'

বীরেনদা একটু আশ্চর্য হয়ে বললে, 'কেন, ওই দ্বীপে আসবার জন্যে তোমাদের এতটা আগ্রহের কারণ কী?'

কং হিঙের দুই চোখ কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে বললে, 'কারণ কী? কারণ—না, না, কোনোই কারণ নেই—দেখিগে, ওদিককার ব্যাপারখানা!'—বলেই দ্রুতপদে প্রস্থান করলে।

কং হিঙের কথায় কেমন যেন রহস্যের আভাস পাওয়া গেল। ওই দ্বীপেই ওরা যেতে চায়? ওইখানে যাবার জন্যেই ওরা এই জাহাজ লুট করেছে? এর একটা গুপ্ত কারণ আছে নিশ্চয়ই, অথচ সে কারণটা যে কী কং হিং তা আমাদের কাছে প্রকাশ করতে রাজি নয়!

আমাদের জাহাজ ঊর্ধ্বশ্বাসে দ্বীপের দিকে ছুটতে লাগল, দ্বীপের গাছপালা হয়ে উঠল ক্রমেই স্পষ্ট।

ওধারে গিয়ে দেখি, মানোয়ারি জাহাজখানা আরও কাছে এসে পড়েছে—দু-পাশে সমুদ্রের জল ফেনিয়ে তুলে।

ওধারে চেয়ে দেখলুম, চ্যাং, কং হিং আর জনকয়েক চিনেম্যান একখানা কাগজের উপরে ঝুঁকে পড়ে ব্যস্তভাবে কী দেখছে আর পরামর্শ করছে। কাছে এগিয়ে গিয়ে বুঝতে পারলুম, কাগজখানা হচ্ছে দ্বীপের ম্যাপ!

জাহাজেরও চারিদিকে মহা হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। পঁচিশ-ত্রিশ জন লোক ক্রমাগত চিৎকার আর ছুটোছুটি করছে, কেবিন থেকে জিনিসপত্তর বাইরে টেনে আনছে, মোটমাট বাঁধছে। এসব যে জাহাজ ছেড়ে পালাবার উদ্যোগ, তা আর বুঝতে বিলম্ব হল না।

আচম্বিতে গুড়ুম করে একটা শব্দ হল! চমকে চেয়ে দেখি, মানোয়ারি জাহাজ থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে এবং একটা অগ্নিময় পিণ্ড আমাদের মাথার উপর দিয়ে হু হু করে চলে যাচ্ছে! গোরারা তোপ দাগছে! তারা বুঝতে পেরেছে যে, আমরা দ্বীপের দিকে পালাচ্ছি।

দ্বীপ তখন আমাদের কাছ থেকে মাইল-দুয়েক তফাতে।

বোম্বেটেরা এদিকে-ওদিকে লুকিয়ে পড়ল, জাহাজের ডেকের উপরে দাঁড়িয়ে রইলুম খালি আমরা তিন বন্ধু, আর রইল চ্যাং, কং হিং আর তিনজন চিনেম্যান।

আবার গুড়ুম করে আওয়াজ, কিন্তু এবারের গোলাটাও লক্ষচ্যুত হয়ে আমাদের জাহাজের পাশ ঘেঁষে চলে গেল।

বীরেনদা বললে, 'গতিক বড়ো সুবিধের নয়! চলো, এই বেলা কেবিনে গিয়ে জিনিসপত্তরগুলো বেঁধে-ছেঁদে নি। বিপদ দেখলে আবার সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হবে।'

কেবিনের ভিতরে যখন ঢুকছি, তখন মানোয়ারি জাহাজ থেকে একসঙ্গে দুটো কামান গর্জে উঠল! তারপরেই আমাদের জাহাজখানা কেঁপে উঠল এবং শব্দ শুনেই বুঝলুম, এবারের গোলা আর লক্ষ্যচ্যুত হয়নি!

তারপর ভিতর থেকে ক্রমাগত কামানের আওয়াজ, আমাদের জাহাজ ভাঙার শব্দ, মানুষের চেঁচামেচি আর কাতরানি শুনেই বোঝা যেতে লাগল, মরণের আসন্ন আলিঙ্গন আমাদের চারপাশ ঘিরে এগিয়ে আসছে!

মোটমাট নিয়ে উপরে এসে দেখলুম, ভীষণ দৃশ্য! আমাদের জাহাজ আর চলছে না, গোলার চোটে তার ধোঁয়া ছাড়বার চোঙাদুটো উড়ে গেছে, তার ইঞ্জিন বন্ধ, তার সর্বাঙ্গ ভগ্নচূর্ণ এবং ডেকের উপরে রক্তের ঢেউ বইয়ে কয়েকটা মানুষের মৃতদেহ নিশ্চেষ্ট হয়ে আছে—কোথাও জ্যান্ত মানুষের চিহ্ন নেই।

মানোয়ারি জাহাজের তোপ তখনও ধোঁয়া আর আগুন উদগার করছে।

জাহাজের ওপাশে ছুটে গেলুম—কেউ কোথাও নেই!

হঠাৎ অমিয় সমুদ্রের দিকে আঙুল তুলে বললে, 'দ্যাখো, দ্যাখো!'

সমুদ্রের বুকে দু-খানা বড়ো বড়ো বোট ভাসছে—তার ভিতরে ঠেসাঠেসি করে বসে আছে অনেকগুলো লোক! বোট দু-খানা ছুটেছে দ্বীপের দিকেই।

বীরেনদা বললে, 'বোম্বেটেরা পালাচ্ছে!'

আমি বললুম, 'কিন্তু আমাদের উপায় কী? আসল বোম্বেটেরা তো পালাল, শেষটা ধরা পড়ে ফাঁসিকাঠে চড়ব আমরাই নাকি?'—আমার কথা শেষ হতে-না-হতেই মানোয়ারি জাহাজের একটা গোলা আমাদের জাহাজ ডিঙিয়ে পড়ল গিয়ে বোম্বেটেদের একখানা বোটের উপরে!

বোটখানা তখনই ভেঙে দু-খানা হয়ে গেল—মানুষগুলোও কে কোথায় ছিটকে পড়ল, কিছুই বুঝতে পারলুম না—কেবল শুনতে পেলুম একটা মর্মভেদী হাহাকারের একতান হা হা করে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে সেই সীমাহারা সাগরের মাঝখানে কোথায় হারিয়ে গেল—অসহায়ের মতো!—তেমন ভয়ানক কান্না আমি আর কখনও শুনিনি, আমার সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল!...হয়তো ও-নৌকোর জনপ্রাণীও আর বেঁচে নেই!

অন্য বোটের বোম্বেটেরা প্রাণপণে দাঁড় টানতে লাগল।

অমিয় বললে, 'যেমন কর্ম তেমনি ফল! চ্যাঙের গোঁফ আর কং হিংঙের টিকি কোন বোটে উঠেছে, তাই ভাবছি।'

ইতিমধ্যে বীরেনদা কোথা থেকে তিনটে জীবন-রক্ষক-জামা সংগ্রহ করে আনলে! এই জামা পরলে মানুষ জলে ডোবে না।

তাড়াতাড়ি পরামর্শ করে আমরা তিনটে পিপে এনে তার ভিতরে আমাদের দরকারি জিনিসপত্তর পুরে, পিপেগুলোর মুখ এমন ভাবে বন্ধ করে দিলুম, যাতে ভিতরে জল ঢুকবার পথ না থাকে। তারপর পিপে তিনটেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললুম। স্থির হল, এই পিপেগুলোকে সমুদ্রে ফেলে আমরাও জলে ঝাঁপ দেব। তারপর ভাসতে ভাসতে দড়ি ধরে পিপেগুলোকে টানতে টানতে দ্বীপে গিয়ে উঠব।

দ্বীপ এখন মাইলখানেক তফাতে রয়েছে। তার তিন পাহাড়ের তলায় এমন নিবিড় অরণ্য স্থির হয়ে আছে যে, ভিতরের আর কোনও দৃশ্য দেখবার উপায় নেই।

বীরেনদা গম্ভীর ভাবে বললে, 'কেন জানি না, আমার মনে হচ্ছে যেন ওই রহস্যময় অজানা দ্বীপের ভিতরে হাজার হাজার বিপদ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে! চ্যাঙের দল ওই দ্বীপে যাবার জন্যেই এই জাহাজখানা দখল করেছিল। দুনিয়ার এত জায়গা থাকতে ওখানেই যাবার জন্যে তাদের যখন এমন আগ্রহ, তখন ভিতরে নিশ্চয় কিছু রহস্য আছে। কিন্তু তাদের গুপ্তকথা তো জানা গেল না।'

অমিয় বললে, 'বীরেনদা! সরলদা! আমাদের জাহাজ বোধ হয় ডুবে যাচ্ছে!'

সত্যিই তাই! জাহাজখানা ক্রমেই কাত হয়ে পড়ছে এবং তার লম্বালম্বি একটা দিক জলের ভিতর অনেকখানি নেমে গিয়েছে!

ওদিকে মানোয়ারি জাহাজখানা জল কাটতে কাটতে খুব কাছে এসে পড়েছে। তার ডেকের উপরে দলে দলে গোরা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাও দেখতে পেলুম।

আর দেরি না! আমরা পিপে তিনটেকে দড়িতে ঝুলিয়ে জলে নামিয়ে দিলুম এবং নিজেরাও নেমে আবার সেই সমুদ্রকেই আশ্রয় করলুম। ভরসা শুধু এই, এবারে আর অকূল পাথারে ভাসছি না—কূল রয়েছে আমাদের চোখের সামনেই জেগে স্বপ্নমায়ার মতন!

কিন্তু পিছনে রয়েছে জাহাজি গোরাদের সতর্ক দৃষ্টি! বন্দুকের গুলি এড়িয়ে তীরে গিয়ে উঠতে পারব কি?

সে সময়ে আমাদের মনে যে ভাব লীলায়িত হচ্ছিল, কবিতার আকারে তা এই ভাবে বলা যায়—

ডাকছে মরণ, ডাকছে কামান,
ডাকছে সাগর পাগল-পারা!
ছুটছে গোলা, ছুটছে সাগর,
ছুটছে দেহের রক্তধারা!

বাংলা দেশের শ্যামলা ছেলে
চলছে আকাশ-বাতাস ঠেলে,
অবাক হয়ে দেখছে চেয়ে
সূর্য এবং চন্দ্র-তারা—
ডাকছে মরণ, ডাকছে কামান,
ডাকছে সাগর পাগল-পারা!

বাংলা দেশের শ্যামলা ছেলে
মরণ-খেলায় হয় না সারা,
মৃত্যু তাদের বক্ষে নাচে,
চক্ষে তাদের অগ্নি-ঝরা।
মরিই যদি মরব জেগে,
বাজের মতন ভীষণ বেগে!
শিশুর মতন মরছে তারা
ফুল-বিছানায় ঘুমোয় যারা—
ডাকছে মরণ, ডাকছে কামান,
ডাকছে সাগর পাগল-পারা।

আমরা যে চাই বৃহৎ মরণ!
—তা ছাড়া আর নেইকো চারা
কেঁচোর মতন কে হবে রে,
জুতোর চাপে জীবনহারা!
টবের গোলাপ হয়ে মোরা,
রইব না রে ঘরে পোরা,
ছোট্ট ঝড়ে মরব না তো
জড়িয়ে ধরে মাটির কারা—
ডাকছে মরণ, ডাকছে কামান,
ডাকছে সাগর পাগল-পারা।

॥ নবম পরিচ্ছেদ ॥

অমানুষী দৃষ্টি

দ্বীপের দিকে ভাসতে ভাসতে চলেছি।

গায়ে জীবনরক্ষক সেই জামা ছিল, কাজেই জলের উপরে ভেসে থাকবার জন্যে আমাদের কোনওরকম কষ্টই স্বীকার করতে হল না। প্রত্যেকেই এক-একটা পিপে পিছনে টানতে টানতে খুব সহজেই জল কেটে দ্বীপের দিকে এগিয়ে চললুম!

বোম্বেটেদের নৌকোখানা দ্বীপের খুব কাছেই গিয়ে পড়েছে। মানোয়ারি জাহাজের গোলা, এখনও তাদের পিছু ছাড়েনি বটে, কিন্তু এ যাত্রা আর তাদের ধরতে পারবে না বোধ হয়।

মানোয়ারি জাহাজের দিকে চেয়ে দেখলুম, তার উপর থেকেও একখানা বোট নামানো হচ্ছে। তাহলে গোরারাও সহজে ছাড়বে না দেখছি—তারাও বোধ হয় দ্বীপে আসবার বন্দোবস্ত করছে।

আমি বললুম, 'আরও শিগগির—আরও শিগগির সাঁতরে চলো, নইলে আমরাই আগে ধরা পড়ব!'

বীরেনদা বললে, 'ওঃ, এই নীলগোলাপের ছাপ! এর জন্যেই তো এত ভয়! নইলে কি এমন ভীরুর মতন আমরা পালাতুম?'

অমিয় বললে, 'হ্যাঁ বীরেনদা, এমন করে পালাতে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে!'

আমি বললুম, 'কিন্তু লজ্জা কীসের অমিয়? আমরা তো আজ প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছি না, আমরা পালাচ্ছি মানের দায়ে!'

অমিয় বললে, 'আচ্ছা, গোরারা যদি আগে আমাদেরই ধরতে আসে!'

আমি বললুম, 'আমরা ধরা দেব না। আমরা লড়াই করব—'

বীরেনদা বললে, 'হ্যাঁ, পৃথিবী থেকে অন্তত গোটাকয় কটাচামড়ার মানুষ কমিয়ে তবে আমরা মরব, আমাদের এই কালোচামড়ার মর্যাদা আমরা নষ্ট করব না—কিছুতেই না!'

আমি বললুম, 'কিন্তু বীরেনদা, ওরা যদি আমাদের বন্দি করে,—ওরা যদি আমাদের মরতে না দেয়?'

বীরেনদা অট্টহাস্য করে বলে উঠল, 'মরতে দেবে না? যে মরতে চায়, তাকে মরতে দেবে না? যে বাঁচতে চায়, মৃত্যু তাকেও জোর করে টেনে নিয়ে যায়—'

বাধা দিয়ে আমি বললুম, 'কিন্তু যে মরতে চায় মৃত্যু তাকে সহজে গ্রহণ করে না, এইটেই তো আমি নিত্যি দেখতে পাই!'

—'মৃত্যু তো কাপুরুষকে গ্রহণ করে না সরল! দুনিয়ার সব আশা হারিয়ে, জীবনের দুঃখ এড়াবার জন্যে মরণকে যারা চায়, মৃত্যু যে তাদের ঘৃণা করে!...ওই দ্যাখো, মৃত্যু আমাদের দিকে ছুটে আসছে!'

অনেকগুলো বন্দুকের শব্দ—সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চারপাশ দিয়ে সোঁ সোঁ করে হাওয়া কেটে অনেকগুলো গুলি চলে গেল! গোরারা আমাদেরও দেখতে পেয়েছে!

অমিয় চিৎকার করে গেয়ে উঠল,

'মরব, মরব, মরব মোরা,
মরতে মোরা ভালোবাসি!
মরণ-খেলা খেলতে সুখে
আমরা যে ভাই ধরায় আসি!
আয় রে ছুটে মাটির ছেলে,
কাপুরুষের ভাবনা ফেলে,
জীবন তোদের পোকার জীবন—
কাঁদন-ভরা তোদের হাসি—
মরণ নিয়ে তাই তো খেলি,
মরতে মোরা ভালোবাসি!'

বীরেনদা বললে, 'কিন্তু এ ভাবে মরা তো হবে না ভাই! পিপেগুলোকে ঢালের মতন রেখে পিপের আড়ালে আড়ালে চলো। পশুপক্ষীর মতন দূর থেকে শিকারির গুলিতে প্রাণ দিতে আমরা রাজি নই! ওরাও আমাদের কাছে আসুক—আমরা মানুষ, আমরা মরব বটে, কিন্তু মেরে মরব—চারিদিকে মরণকে দু-হাতে ছড়িয়ে দিয়ে মরব—ওদের জানিয়ে দিয়ে মরব যে, আমরা মানুষ!'

সমুদ্রের মহা-গর্জনের সঙ্গে আবার অনেকগুলো বন্দুক গর্জন করে উঠল!

অমিয় আবার গাইলে—

'জীবন-মরণ একসাথে আজ
নৃত্য-লীলায় মত্ত থাকে,
জীবন চাহে মরণকে ওই,
মরণ চাহে জীবনটাকে!
মরণ বলে—'জীবন রে ভাই,
বল তো আজ কোন সুরে গাই?'
জীবন বলে—'মরণ, এসো,
তোমার সুরেই বাজাই বাঁশি!'
বুকের ভিতর জীবন নিয়ে
মরতে মোরা ভালোবাসি!'

ফিরে দেখলুম, আমাদের জাহাজখানা একেবারে জলের তলায় ডুব মারলে—সমুদ্রের উপরে চক্রাকারে বিরাট একটা বুদ্বুদ তুলে।

এবং ওদিক থেকে একখানা বোট তিরবেগে এগিয়ে আসছে, তার ভিতরে সব মানোয়ারি গোরা!

বীরেনদা বললে, 'ওই ওরা আসছে! তোমরা প্রস্তুত হও—মারতে আর মরতে!'

আমি বললুম, 'আমি প্রস্তুত!'

অমিয় কিছু বললে না, হাসতে হাসতে আবার গান ধরলে—

'জীবন নিয়ে জীবন দেব,
অমনি মোরা দেব না গো!
জাগো মরণ জীবন-হরণ!
মরণ-হরণ জীবন জাগো!
আজকে দেহের রক্ত মাঝে
ভীষণ-মধুর ছন্দ বাজে,
ক্ষুদ্র মনে রুদ্র নাচে—
মৃত্যু নিল শঙ্কা গ্রাসি!
এই জীবনের বাসর-ঘরে
মরতে মোরা ভালোবাসি!'

আবার একঝাঁক গুলি এসে আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। মরণ যেন আজ আমাদের জেগে-ওঠা জীবনকে দংশন করতে রাজি নয়,—যেন আমাদের জীবনের সঙ্গে সত্যসত্যই মরণ আজ সন্ধি স্থাপন করেছে।

তারপর আরও এক অভাবিত ব্যাপার! গোরার দল বোট নিয়ে আমাদের পেরিয়ে চলে গেল—বোম্বেটেদের নৌকো যেদিকে গিয়েছে সেই দিকে। মাত্র আমাদের এই তিনজনকে ধরতে এসে ওরা বোধ হয় নৌকা-বোঝাই বোম্বেটের দলকে পালাবার সুযোগ দিতে রাজি নয়।

বীরেনদা সহাস্যে বললে, 'যাক, এ যাত্রাও মারবার আর মরবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়া গেল!'

আমি বললুম, 'সেজন্যে খুশি হবে কি না বুঝতে পারছি না। এই তো দ্বীপ আমাদের সামনে। এখন এর ভিতরে আবার যে কী নাটকের অভিনয় শুরু হবে, কোনখানে যে তার যবনিকা পড়বে, কিছুই তো আন্দাজ করতে পারছি না!'

খানিক পরেই দ্বীপে এসে উঠলুম—আবার পৃথিবীর মাটির উপরে পা দিলুম—মনে হল, বিদেশ থেকে আবার যেন মায়ের কোলে এসে উঠলুম।

সমুদ্রতটের বালির বিছানার পরেই কী ভীষণ অরণ্য! লতায়-পাতায় জড়ানো বড়ো বড়ো নানাজাতির গাছ পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে সাগর-গর্জনের সঙ্গে মর্মর-গর্জন মিশিয়ে দিচ্ছে! তাদের পায়ের তলাতেও এমন নিবিড় জঙ্গল যে, পথ খুঁজে পাওয়া তো

দূরের কথা, দুই হাত পরে কী আছে তাও দেখবার কি বোঝবার উপায় নেই! বনজঙ্গল যে এমন দুর্গম হতে পারে আগে তা জানতুম না! এ অরণ্য যেন নিষ্ঠুর প্রহরীর মতন পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে, বাইরের জনপ্রাণীকেও ভিতরে প্রবেশ করতে দেবে না!

অমিয় হতাশভাবে বললে, 'এ যে আর এক বিপদ! এ জঙ্গলের ভিতরে ঢুকলে কি আর বেরুতে পারব?'

বীরেনদা বললে, 'ঢুকতে পারলে বেরুতেও পারব! কিন্তু কথা হচ্ছে, ঢুকি কেমন করে? বোধ হয় আমাদের পথ কেটেই ঢুকতে হবে। সরল, পিপের মুখ খুলে তিনখানা কুড়ুল বার করো তো!'

কিন্তু বীরেনদার কথা আমি শুনেও শুনলুম না,—আমার চোখদুটো তখন জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে আছে—আমার গায়ের রোমগুলো তখন খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে!

জঙ্গলের ঘন লতা-পাতার আড়ালে লুকিয়ে দু-দুটো অদ্ভুত চক্ষু জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে আমাদের গতিবিধি লক্ষ করছে। সে চক্ষু কোনও পশুর চক্ষু নয়, কিন্তু মানুষের দৃষ্টিও তার মধ্যে নেই! একটা জ্বলন্ত হিংসার ভাব, একটা ভূতুড়ে ক্ষুধার আগ্রহ যেন তাদের ভিতর থেকে ফুটে-ফুটে উঠছে!

বীরেনদা বললে, 'সরল, ও সরল! শুনতে পাচ্ছ? অমন করে ওদিকে তাকিয়ে আছ কেন?'

আমি কাঠের পুতুলের মতন আঙুল তুলে জঙ্গলের সেইখানটা দেখিয়ে দিলুম।

বীরেনদাও সেইদিকে চোখ ফিরিয়ে চমকে উঠল!—অস্ফুট স্বরে বললে, 'আশ্চর্য! আশ্চর্য!'

অমিয়ও দেখলে—সবিস্ময়ে বললে, 'কী ওটা! জন্তু না ভূত?'

বীরেনদা তিরের মতো সেইদিক পানে ছুটে গেল—নিজের বিপদের কথা একবারও ভেবে দেখলে না।

॥ দশম পরিচ্ছেদ ॥

মৃত্যু-গহ্বর ও অস্থিসার হাত

আমি পিছু ডাকলুম, 'বীরেনদা, বীরেনদা! যেয়ো না—ওদিকে যেয়ো না!'

কিন্তু বীরেনদা থামলেও না—ফিরেও তাকালে না, অকুতোভয়ে সেই হিংস্র ও প্রদীপ্ত চক্ষু-দুটোর দিকে অগ্রসর হল।

চোখদুটো আরও-জ্বলন্ত আরও-বিস্ফারিত হয়ে উঠল—ক্ষণিকের জন্যে। তারপর বিদ্যুতের মতন সাঁৎ করে আড়ালে সরে গেল।

বীরেনদাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল...শুনতে পেলুম, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে মড় মড় করে শুকনো পাতা মাড়িয়ে কে চলে যাচ্ছে—দ্রুতপদে, দূর হতে আরও দূরে।

অমিয় আবার বললে, 'কী ওটা? জন্তু না ভূত, না মানুষ?'

যে-ঝোপে চোখদুটো আবির্ভূত হয়েছিল তার উপরে বার-কয়েক লাথি মেরে বীরেনদা বললে, 'কিছুই বোঝা গেল না। কিন্তু—আরে এ কী? অমিয়! সরল! পথ পাওয়া গেছে—পথ পাওয়া গেছে!'

এগিয়ে গিয়ে দেখলুম সেই ঝোপটার পাশ দিয়েই খুব সরু একটা পথ জঙ্গল ভেদ করে ভিতরদিকে চলে গিয়েছে।

বীরেনদা বললে, 'এতক্ষণ লুকিয়ে লুকিয়ে যে আমাদের দেখছিল, এই পথ দিয়েই সে এসেছে আর এই পথ দিয়েই সে পালিয়েছে।'

আমি বললুম, 'হয়তো সে পালায়নি। খানিক তফাতে গিয়ে আমাদের অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে বসে আছে।'

বীরেনদা বললে, 'তার কথা পরে ভাবা যাবে অখন! আপাতত এই পথের মুখে দাঁড়িয়ে আমি পাহারা দিচ্ছি। ততক্ষণে তোমরা দুজনে মিলে এক কাজ করো। ওই পিপে তিনটের ভিতর থেকে কতকগুলো নেহাত দরকারি জিনিস বার করে নিয়ে, ওগুলোকে বালির ভিতরে পুঁতে রেখে এসো। শিগগির যাও—দেরি কোরো না।'

আমরা তাই করলুম। আগে পিপেগুলোর মুখ খুলে আমাদের দরকার হতে পারে এমন কতকগুলো জিনিস বার করে নিয়ে পোঁটলা বাঁধলুম। তারপর সমুদ্রতটের বালি সরিয়ে পিপে তিনটেকে একে একে পুঁতে ফেললুম। পাছে জায়গাটা আবার খুঁজে না পাই, সেই ভয়ে সেখানটায় নিশানা রাখতেও ভুললুম না।

বীরেনদা বললে, 'বোধ হয় তোমাদের কেউ দেখতে পায়নি। একটা বন্দুক আর একটা কুড়ুল আমাকে দাও। এখন এসো, আমরা জঙ্গলের ভিতরে ঢুকি। কিন্তু খুব সাবধানে পথে চলতে হবে—এ অজানা জঙ্গল, বিপদের সম্ভাবনা চারিদিকেই।'

আগে বীরেনদা, তারপর আমি, তারপর অমিয়—এই ভাবে আমরা অগ্রসর হলুম। ভারী সরু পথ—একসঙ্গে দুজনে পাশাপাশি এগুনো যায় না। বাঁ দিকে ঘন জঙ্গল, ডান দিকে ঘন জঙ্গল, মাথার উপরে অগুন্তি গাছের পাতা-ভরা ডালপালার চাঁদোয়া আকাশ ঢেকে আছে আর গাছের তলায় খালি শুকনো পাতার মড়মড়ানি। চার হাত সামনেও নজর চলে না—চার হাত পিছনেও নজর চলে না।

বন ক্রমে আরও নিবিড় হয়ে উঠল—এত নিবিড় যে সেই দিন-দুপুরেই মনে হতে লাগল, আমরা যেন রাতের উথলে ওঠা আঁধার-সায়রের ভিতর দিয়ে কোন অপারে দিগ্বিদিক হারিয়ে সাঁতরে চলেছি।

বীরেনদা বললে, 'ইলেকট্রিক-টর্চটা আমার হাতে দাও তো, আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!'

সেই অতি-নির্জন ও অতি-নিস্তব্ধ অরণ্য বীরেনদার গলার আওয়াজ শুনে যেন শিউরে শিউরে উঠল,—এ বন যেন মানুষের গলা কখনও শোনেনি, মানুষের ছায়া কোনওদিন গায়ে মাখেনি—নিজের নিসাড়তায় ও নিজের অন্ধকারে এ যেন নিজেই স্তম্ভিত হয়ে আছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'কিন্তু বীরেনদা, এমন গহন বনের ভিতরে এমন পথ বানালে কে? এ পথ তো আপনি তৈরি হয়নি!'

বীরেনদা কেবল বললে, 'হ্যাঁ, এ পথ মানুষেরই হাতে তৈরি বটে।'

আবার সবাই চুপ। বীরেনদার হাতের বৈদ্যুতিক মশালের আলোটা থেকে থেকে পথহারা পাখির মতন সেই অরণ্য-কারাগারের চারিদিকে ছুটোছুটি করছে, তাই দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চললুম।

মাঝে মাঝে বীরেনদা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, আর কান পেতে কী শোনে, তারপর আবার চলতে থাকে। আমাদের সকলেরই মনে হতে লাগল, আমাদের আগে আগে পথের শুকনো পাতার উপরে আরও কারুর পায়ের শব্দ হচ্ছে। ও কে যাচ্ছে আমাদের আগে আগে?—সেই যার জ্বলন্ত চোখ?.....নানা দিকে বার বার বিজলি-মশালের আলো ফেলেও কারুকে আবিষ্কার করা গেল না। কিন্তু সেই অজানা পায়ের শব্দ আমাদের আগে আগে সমানেই এগিয়ে চলল—আমরা তাড়াতাড়ি এগুতে গেলেই সে-শব্দও তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়।

বন যে অন্ধকার, এখন সেটা সৌভাগ্যের কথাই বলে মনে হতে লাগল। কারণ এর গর্ভের ভিতরে হয়তো এমন আরও অনেক বিভীষিকা লুকানো আছে, যা দেখলে আমাদের আবার মানে মানে সমুদ্রের ধারে ফিরে যেতে হবে। একবার এক জায়গায় বিজলি-মশালের আলো পড়তেই দেখতে পেলুম, প্রকাণ্ড একটা অজগর সাপ দুই চক্ষে অগ্নিবৃষ্টি করে আস্তে আস্তে গাছপালার ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। আর এক জায়গায় বাঘের মতন বড়ো কী একটা জানোয়ার জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরেই আবার অদৃশ্য হয়ে গেল! প্রতি পদেই মনে হতে লাগল, এই নিরেট অন্ধকারের রাজ্যে, চারিদিকে অদৃশ্য সব বিপদ লোলুপ চোখে আমাদের পানে তাকিয়ে আছে, একবার কেউ একটু অন্যমনস্ক হলেই তারা সবাই মিলে হুড়মুড় করে আমাদের ঘাড়ের উপরে লাফিয়ে পড়বে।

হঠাৎ আমাদের সামনে অন্ধকারের ভিতরে কীরকম একটা শব্দ হল—কার হাত থেকে কী যেন পড়ে গেল! দু-পা এগুতেই পায়ে কী ঠেকল। তুলে দেখি, বিজলি-মশাল—যা ছিল বীরেনদার হাতে।

কল টিপে আলো জ্বেলে যা দেখলুম, প্রাণ যেন উড়ে গেল। ঠিক দু-পা পরেই মাঠের মতন প্রকাণ্ড একটা গহ্বর হাঁ করে আছে। আর আমার সামনে বীরেনদা নেই।

খুব নীচে থেকে—যেন পাতালের বুক ভেদ করে বীরেনদার গলার আওয়াজ পেলুম—'সরল! অমিয়! দড়ি ঝুলিয়ে দাও—দড়ি ঝুলিয়ে দাও—শিগগির।'

সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে একটা কান-ফাটানো প্রাণ-দমানো অট্টহাসি জেগে উঠল—হাহাঃ, হা হা হা হা—

সে হাসি মানুষের, না প্রেতের?

কিন্তু আমাদের তখন এমন অবসরও ছিল না যে, সে হাসি শুনে ভয় পাই! তাড়াতাড়ি আমি পথের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লুম, তারপর গহ্বরের ভিতরে মুখ বাড়িয়ে আলো ফেলে দেখলুম—প্রায় পনেরো-বিশ হাত নীচে কালো জল থই থই করছে! জলের চারিধারেই পাথুরে পাড় খাড়া ভাবে উপরে উঠেছে। কাজেই এর ভিতরে একবার পড়লে সাঁতার জানলেও বাঁচোয়া নেই। এই পনেরো-বিশ হাত দেওয়াল বেয়ে মানুষের পক্ষে উপরে ওঠা অসম্ভব।

এদিকে-ওদিকে বার-কয়েক বিজলি-মশালের আলো ফেলে বীরেনদাকে আবিষ্কার করলুম। পাড়ের ঠিক তলাতেই সাঁতার দিতে দিতে সে উপরে ওঠবার জন্যে নিষ্ফল চেষ্টা করছিল।

বীরেনদা আবার চেঁচিয়ে বললে, 'শিগগির দড়ি ফেলে দাও—জলের ভেতরে কুমির আছে!'

কুমির!' বিজলি-মশালটা তাড়াতাড়ি অমিয়ের হাতে দিয়ে, থলে থেকে দড়ি বার করে জলের ভিতরে ফেলে দিলুম। বীরেনদা সেই মুহূর্তেই হাত বাড়িয়ে দড়িটা ধরলে এবং পরমুহূর্তেই একটা প্রকাণ্ড কুৎসিত মাথা বীরেনদার ঠিক পিছনে জলের উপরে জেগে উঠল।

অমিয় চিৎকার করে বললে, 'বীরেনদা! তোমার পিছনে কুমির!'

কিন্তু অমিয়ের কথা শেষ হবার আগেই জোরালো হাতের এক ঝাঁকানি দিয়ে বীরেনদা দড়ি ধরে জল ছেড়ে খানিকটা উপরে উঠে পড়ল। কুমিরটা ফলার মুখছাড়া হয় দেখে তার লম্বা-চওড়া ল্যাজ দিয়ে বীরেনদাকে লক্ষ করে প্রচণ্ড এক ঝাপটা মারলে! সে ভীষণ ল্যাজ যদি বীরেনদার গায়ে লাগত, তাহলে তার হাড়গোড় নিশ্চয়ই গুঁড়ো হয়ে যেত—কিন্তু বীরেনদা আবার এমন এক ঝাঁকানি দিয়ে কুমিরের নাগালের বাইরে চলে এল যে, সেই বিষম টানের চোটে আমিও আর একটু হলেই জলের ভিতরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলুম।

ওদিকে সেই ভয়ানক অট্টহাস্যের বিরাম নেই। সেই হাসির উচ্ছ্বাসের পর উচ্ছ্বাসে চারিদিককার রন্ধ্রহীন অন্ধকার যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে ঝরে ঝরে পড়তে লাগল!—অমিয় নানাদিকে বারবার আলো ফেলেও বার করতে পারলে না যে, কোথা থেকে কে অমন করে ওই ভূতুড়ে হাসি হাসছে...তারপর, বীরেনদা যখন নিরাপদে দড়ি বেয়ে আবার ডাঙার উপরে এসে উঠল, সেই হাসি তখন হঠাৎ থেমে গেল। চারিদিক আবার স্তব্ধ।

উপরে উঠেই বীরেনদার সর্বপ্রথম কথা হল—'টর্চটা তো পেয়েছ দেখছি। কিন্তু পড়বার সময়ে আমি আমার বন্দুকটাও হারিয়েছি। দ্যাখো তো, বন্দুকটা ওপরেই আছে, না জলে পড়ে গেছে?'

সৌভাগ্যক্রমে বন্দুকটাও উপরেই খুঁজে পাওয়া গেল! বীরেনদা খুশি হয়ে বললে, 'যে-জায়গায় এসেছি, এখানে বন্দুকই হচ্ছে আমাদের প্রাণের মতো। বন্দুক হারালে প্রাণও হয়তো হারাতে হবে। ...অমিয়, মশালটা আমার হাতে দাও। এখন আবার পথ খুঁজে বার করতে হবে।'

পথ সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল। গহ্বরের সামনে এসেই পথটা বাঁ দিকে বেঁকে পাড়ের উপর দিয়ে চলে গেছে। অন্ধকারে তা দেখতে না পেয়েই বীরেনদা গহ্বরে পড়ে গিয়েছিল।

আমরা আবার অগ্রসর হলুম—এবারে আরও সাবধানে। কারণ, একে তো এই সরু পথ,—তার উপরে বাঁ দিকে ঘন জঙ্গল আর ডান দিকে সেই মৃত্যু-গহ্বর, একবার পা পিছলোলে কি হোঁচট খেলে আর রক্ষা নেই।

প্রায় মাইলখানেক হাঁটবার পর গহ্বর শেষ হল, কিন্তু তখনও সেই ঘুটঘুটে অন্ধকার আর আঁকাবাঁকা পথের শেষ পেলুম না। দুইধারে ঘন-বিন্যস্ত অরণ্য নিয়ে পথ আবার কোনও অজানার দিকে চলে গেছে।

আরও ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ সেই বিষম পথ শেষ হল—আমরা আবার খোলা আকাশের তলায় এসে দাঁড়ালুম—উজ্জ্বল আলোকের আঘাতে আমাদের অন্ধকার-মাখানো চোখগুলো যেন কানা হয়ে গেল!

চোখ যখন পরিষ্কার হল, দেখলুম সে এক অপূর্ব দৃশ্য!

মস্ত এক মাঠ—তার বুকে ছোটো ছোটো চারাগাছ আর ঘাসের মধুর শ্যামলিমা আর রকম-বেরকম বনফুলের রামধনু-রঙের লীলা! মাঠের পরেই প্রকাণ্ড এক পাহাড় আকাশকে ধরবার জন্যে যেন উপরে—আরও উপরে উঠে গেছে। তার কোলে লাখো লাখো গাছ সমুদ্র-স্নান থেকে ফিরে-আসা হাওয়ার ঠান্ডা ছোঁয়া পেয়ে পরমোল্লাসে দুলে দুলে নেচে উঠছে! পাহাড়ের মাঝখান থেকে একটি ঝরনা গলানো রুপোর ধারার মতন পাথরে পাথরে লাফাতে লাফাতে কৌতুক-হাসি হাসতে হাসতে নীচে নেমে এসে, মাঠের সবুজ বুক আদরে ভিজিয়ে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, আর সেই রূপের হাটে নানা-জাতের পাখিরা গানের আসর বসিয়ে প্রাণ মাত করে দিচ্ছে!

অমিয় আহ্লাদে মেতে গান শুরু করলে—

স্বরগের বুক থেকে আলো-মেয়ে দুলে দুলে—
নেমে আসে বনে বনে, নেমে আসে ফুলে ফুলে।
কাননের বুক থেকে, আদরের ডাক ডেকে
নাচে পাখি, গানে তার মরমের দ্বার খুলে!
নীলিমার বুক থেকে, সুষমার মুখ দেখে,
ছুটে চলে সমীরণ তটিনীর কূলে কূলে!

কুসুমের বুক থেকে, লাল-নীল রং মেখে,
ওড়ে কত প্রজাপতি ছোটো পাখা খুলে খুলে!
ধরণীর বুক থেকে, আয় তোরা যাবি কে কে,—
স্বপনের তপোবনে তপনের তাপ ভুলে!

বীরেনদা একদিকে আঙুল তুলে ধরে বলে উঠল, 'থামো অমিয়, ওদিকে একবার চেয়ে দ্যাখো!'

ফিরে দেখি, সেই চোখদুটো! সেই ক্ষুধা-ভরা হিংসামাখা অগ্নিউজ্জ্বল চোখদুটো আবার একটা জঙ্গলের ঝোপের ফাঁক দিয়ে আমাদের পানে তাকিয়ে পলক-হারা হয়ে আছে! আর কিছু দেখা যাচ্ছে না, কেবল সেই চোখদুটো! তার চাউনি দেখলে খুব সাহসীরও বুকের কাছটা হিম হয়ে যায়!

অমিয় রবিবাবুর গান ধরলে—

'ওই আঁখি রে
ফিরে ফিরে চেও না চেও না, ফিরে যাও,
কী আর রেখেচ বাকি রে!'

বীরেনদা আর আমি দুজনেই একসঙ্গে বন্দুক তুললুম।

কিন্তু চোখ দুটো আবার সাঁৎ করে সরে গেল—জঙ্গলের পথে আবার শুকনো পাতার মড়মড়ানি উঠল, বুঝলুম যার চোখ সে দৌড়ে পালাচ্ছে!

বীরেনদা উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'কার ওই চোখ? ও কেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে? ও চোখে তো মানুষের চাউনি নেই! তবে কি সত্যি সত্যি ভূত-প্রেত বলে—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'ও-কথা যেতে দাও বীরেনদা! এখন আমরা কী করব বলো।'

বীরেনদা বললে, 'আমরা? আমরা আপাতত ওই পাহাড়ের উপরে গিয়ে উঠব। ওইখানে ঝরনার ধারে বসে আজকের রাতটা তো কাটিয়ে দি, কালকের কথা কালকে ভাবা যাবে অখন।'

পাহাড়ের ওপরে এসে যে জায়গাটি আমাদের পছন্দ হল, তার একধারে ঝরনা, একধারে গভীর খাদ আর একধারে পাহাড়ের গা খাড়া ওপরে উঠে গিয়েছে। পাহাড়ের গায়েই—গুহা নয়, অথচ গুহার মতনই একটা জায়গা ছিল, আমরা স্থির করলুম, তার ভিতরে বসেই আজকের রাতটা কাটিয়ে দেব।

সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার আগে জাহাজের ভাঁড়ার ঘর থেকে আমরা অনেকগুলো বিস্কুট, জ্যাম-জেলি ও রক্ষিত মাছ-মাংসের টিন সংগ্রহ করে এনেছিলুম। ঝরনার ধারে বসে মুখ-হাত ধুয়ে সেই টিনের খাবারেই পেট ভরালুম—খাবারগুলো লাগল যেন অমৃতের মতো। আর ঝরনার জল? সে যে কী মিষ্টি, তা আর কী বলব!

তারপর সেই আধা-গুহার ভিতরে গিয়ে বসলুম। তখন বেলা যায় যায়। সন্ধ্যা তার ছায়া-আঁচল দুলিয়ে তখন ডুবে-যাওয়া সূর্যের শেষ আলোটুকু নিবিয়ে দিয়েছে। দু-একটা বাসা-ভোলা পাখি মাঝে মাঝে তখনও এদিকে-ওদিকে উড়ছে ও আসন্ন আঁধারকে দেখে ভীতচকিত স্বরে ডেকে ডেকে উঠছে।

স্থির হল, প্রথম রাতে বীরেনদাকে, মাঝ-রাতে আমাকে আর শেষরাতে অমিয়কে জেগে পাহারা দিতে হবে। কারণ তিনজনে একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লে এই বিপদ-ভরা বন-জঙ্গলে কাল সকালে হয়তো কারুকেই আর জেগে উঠতে হবে না।

আমি আর অমিয় শুয়ে পড়লুম! সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি আর দুশ্চিন্তায় দেহ আর মন যেন এলিয়ে পড়েছিল, শুতে না শুতেই ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে গেলুম।

...মাঝ-রাতে আমাকে জাগিয়ে দিয়ে বীরেনদা শুয়ে পড়ে চোখ মুদলে।

এককোণ ঘেঁষে পাহাড়ের গায়ে ঠেসান দিয়ে বসলুম।

রাত তখন থমথম করছে—বাইরে অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় চকমকিয়ে উঠে ঝরনা তার অশ্রান্ত সংগীতকে যেন নিশীথিনীর নিসাড় বুকের ভিতরে দুলিয়ে দুলিয়ে দিচ্ছে!

রাতের একটি বাঁধা সুর আছে! সে সুর গাছের পাতার নয়, ঝিঁঝিপোকার নয়, বাতাসের নয়, বা আর কোনও জীবের নয়—সে হচ্ছে রাতের একেবারে নিজস্ব সুর! বিজন স্তব্ধতার ভিতরে তা শোনা যায়, বোবা আকাশকে স্তম্ভিত করে, সারা ধরণীকে আকুল করে সে বিচিত্র সুর ঝিমঝিম করে বাজতে থাকে আর বাজাতে থাকে, সে অদ্ভুত সুর শুনলে ভাবুকের মনের ভিতরটা যেন কেমন কেমন করে ওঠে—রাতের বীণায় সে যেন ভগবানের নিজের হাতে গাঁথা রাগিণী, যার অস্ফুট ঝঙ্কারের ভিতরে পৃথিবীর জন্ম-মৃত্যুর রহস্য লুকানো আছে!

রাতের সেই একটানা সুর কান পেতে শুনতে শুনতে হঠাৎ মনে হল বাইরের আবছায়ার ভিতর থেকে চমকে উঠল আবার দুটো জ্বলজ্বলে তীব্র চোখ। সেই দুটো চোখ—যা আজ সারা দিন আমাদের পিছু ছাড়েনি। ভালো করে চেয়ে কিন্তু আর কিছুই দেখতে পেলুম না। ভাবলুম, আমারই মনের ভুল।

আচম্বিতে কী একটা জীবের কাতর আর্তনাদে ও বাঘের ভীষণ গর্জনে চারিদিক কাঁপতে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে ঘুম-ভাঙা পাখিদের ব্যস্ত চিৎকার! খানিক পরেই সব আবার চুপচাপ!

তারপরেই দেখি, একখানা কালো-কুৎসিত অস্থিসার হাত পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে, ধীরে ধীরে গুহার ভিতরে ঢুকছে। দেহ নয়, শুধু একখানা হাত! তার বাঁকা বাঁকা লম্বা আঙুলগুলো আকুল হয়ে খুঁজছে যেন কাকে!

ধড়মড়িয়ে সোজা হয়ে উঠে বসলুম—একী, এ কী ব্যাপার?

আড়ষ্ট চোখে দেখলুম, হাতখানা বীরেনদার ঘুমন্ত দেহের উপরে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল, তারপর হঠাৎ খপ করে তার গলা চেপে ধরলে।

॥ একাদশ পরিচ্ছেদ ॥

অজানা দ্বীপের রানি

বীরেনদার বিপদ দেখে এক পলকেই আমার সমস্ত অসাড়তা ছুটে গেল—বিদ্যুতের মতন সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, বন্দুকের নলটা সেই অস্থিসার হাতখানার উপরে রেখে ঘোড়া টিপলুম।

গুড়ুম করে বন্দুক গর্জন করে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ এক আর্তনাদ,—হাতখানাও সোঁ করে সরে গেল!

বীরেনদা ধড়মড় করে উঠে বসে গলায় হাত বুলোতে বুলোতে যাতনাভরে বললে, 'সরল, সরল!'

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'বীরেনদা, বীরেনদা, তোমার কি বড়ো বেশি লেগেছে?'

অমিয়ও উঠে বসে চোখ কচলাতে কচলাতে বললে, 'হয়েছে কী বীরেনদা? হয়েছে কী সরলদা?'

আমি ব্যাপারটা সব খুলে বললুম।

বীরেনদা তখনই বিজলি-মশাল আর বন্দুকটা তুলে নিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু গুহার মুখে খানিকটা রক্ত ছাড়া বাইরে আর কারুকে দেখতে পাওয়া গেল না।

অমিয় আবার রবিবাবুর গান ধরলে ঃ—

'সে যে, পাশে এসে বসেছিল,
তবু জাগি-নি,
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল,
হতভাগিনী!'

আমি বললুম, 'কিন্তু এই ভূতুড়ে শত্রুটা তো ভারী ভাবিয়ে তুললে দেখছি! এ ধরাও পড়ে না, আমাদের ছেড়েও যায় না!'

বীরেনদা বললে, 'কিন্তু বাছাধন আপাতত বোধ হয় আর শিগগির এমুখো হচ্ছেন না। সরলের গুলি খেয়ে এখন হাত নিয়ে কিছুদিন কাত হয়ে থাকুন তো!'

এমনি সব কথা কইতে কইতে আকাশ ধীরে ধীরে ফরসা হয়ে এল।

বনের পাখিরা অগ্রদূত হয়ে খবর দিলে—আর ভয় নেই, এখনই আসবে আনন্দের সাথী প্রভাত।

ভোর হল। বনের সবুজের ওপরে কচি রোদ এসে কাঁচা সোনার জলের ছবি এঁকে দিলে! মৌমাছি আর প্রজাপতিদের ভিতরে আবার মৌ-চয়নের সাড়া পড়ে গেল।

বীরেনদা বললে, 'এসো, আমরা এখন পাহাড় থেকে নেমে পড়ি। পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে নাও।'

অমিয় বললে, 'কিন্তু বীরেনদা, এখন যে আমাদের শালগ্রামের ওঠা-বসা। এখানে থাকাও যা, নীচে নামাও তা।'

বীরেনদা বললে, 'না না, তুমি বুঝছ না অমিয়! একবার চারিদিকটা ঘুরে দেখে আসা ভালো! নইলে কোনদিক দিয়ে কখন যে বিপদ ঘাড়ে এসে পড়বে, তা জানবার আগেই মারা পড়ব।'...

ঝরনার জলে প্রাতঃস্নান সেরে, কিছু জলখাবার খেয়ে আবার আমরা পাহাড় ছেড়ে নীচে নেমে গেলুম।

মাঠ পেরিয়ে একটা বনে গিয়ে পড়লুম। এবারের বনেও জঙ্গল আর বড়ো বড়ো গাছের অভাব নেই বটে, কিন্তু আগেকার মতন এ বনটা তেমন অন্ধকার নয়।

আমি বললুম, 'তোমরা একটু সাবধান হয়ে চলো। কারণ কাল রাতে আমি বাঘের ডাক শুনেছি।'

অমিয় বললে, 'বাঘ-টাঘের সঙ্গে এখন দেখা করতে চাই না বটে, কিন্তু একটা হরিণ-টরিণ পেলে আজকের দিনটা নেহাত মন্দ কাটে না—কী বলো বীরেনদা?'

বীরেনদা বললে, 'পৃথিবীর চারিদিকেই হিংসার খেলা। বাঘ খুঁজছে আমাদের, আমরা খুঁজছি হরিণদের। আমরা ভাবি বাঘকে হিংসুক আর আমাদের হিংসুক ভাবে হরিণরা। অদ্ভুত এই দুনিয়া!'

আমি কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তার আগেই মাথার উপরকার মস্তবড়ো গাছ থেকে ঝুপ ঝুপ করে কারা লাফিয়ে পড়ল এবং কিছু দেখবার বা বোঝবার আগেই এমন অতর্কিতে তারা আমাদের আক্রমণ আর কাবু করে হাত-পা বেঁধে ফেললে যে, আমরা একেবারে অবাক হয়ে গেলুম!

তারা দেখতে খুব জোয়ান, যেন মিশমিশে কালো আবলুশ কাঠ থেকে কুঁদে তাদের দেহগুলো গড়া হয়েছে। কারুর হাতে ধনুক-বাণ, কারুর হাতে বর্শা। গলায়, কানে, বাহুতে হাড়ের গয়না আর পরনে এক এক টুকরো নেংটি ছাড়া আর কিছুই নেই। দলে তারা বেশ পুরু—অন্তত পঁচিশ-ত্রিশ জন।

আমাদের হাত-পা আচ্ছা করে বেঁধে তিনজনকেই তারা মাটির ওপরে শুইয়ে রাখলে। তারপর আমাদের চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে অজানা ভাষায় হাত-মুখ নেড়ে তারা কী বলাবলি করতে লাগল।

অমিয় বললে, 'ও বীরেনদা! এখন বোধ হয় আমাদের আর হরিণের মাংস খাবার কোনোই আশা নেই। এই কেলে স্যাঙাতরাই আমাদের হয়তো আগুনে পুড়িয়ে কাবাব বানিয়ে উদরসাৎ করবে।'

বীরেনদা বললে, 'চোখে বড়ো ধুলো দিয়েছে হে। বোম্বেটে, মানোয়ারি গোরা, হাঙর, কুমির আর সমুদ্রকে এড়িয়ে শেষটা যে এই বুনোদের পাল্লায় এমন বোকার মতো ধরা পড়ে যাব, আগে কে তা জানত?'

আমি বললুম, 'ধরা-পড়া বলে ধরা-পড়া! একেবারে নট নড়ন-চড়ন, নট কিচ্ছু! ছাড়ান পাবার কোনোই উপায় নেই, দয়াও পাব না বোধ হয়। ওদের গলায় কী ঝুলছে দেখছ তো? মড়ার মাথার খুলি।'

আচম্বিতে কাছেই শিঙার মতন কী একটা বেজে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল কোথা থেকে অনেক ঢোলের আওয়াজ এবং অসভ্য মানুষগুলো সসম্ভ্রমে নুয়ে পড়ে আমাদের কাছ থেকে খানিকটা তফাতে সরে দাঁড়াল।

দেখলুম, বনের চারিদিক থেকে পিলপিল করে অসভ্যের পর অসভ্য যোদ্ধা বেরিয়ে আসছে নাচতে নাচতে, বর্শা নাচাতে নাচাতে বা ঢোল বাজাতে বাজাতে।

অমিয় বললে, 'ও বীরেনদা—আরও আসে যে! কী করা যায় বলো দেখি? কেলে ভূতগুলো দূরে সরে গেছে, বন্দুকগুলোও হাতের কাছে পড়ে রয়েছে, আর আমার মনও বলছে, এই বাঁধন-দড়িগুলো অল্প চেষ্টা করলেই আমরা ছিঁড়ে ফেলতে পারি।'

বীরেনদা বললে, 'দড়ি ছেঁড়বার সময় এখনও আসেনি। ওদের হাতেও তির-ধনুক রয়েছে, বলা তো যায় না—যদি ওদের তিরে বিষ মাখানো থাকে? তার চেয়ে এখন চুপ করে থাকাই ভালো, দ্যাখো না কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়?'

দেখতে দেখতে বনের আশপাশ লোকে লোকে ভরে গেল—সকলেরই কৌতূহলী চোখ আমাদের দিকে আকৃষ্ট।

হঠাৎ আবার শিঙা বাজল—সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নাচ-বাজনা থেমে গেল। সকলে একেবারে পাথরের মূর্তির মতন স্থির ও স্তব্ধ।

একদিককার ভিড় সরে গেল। সেইদিকে তাকিয়ে যা দেখলুম সে এক অকল্পিত দৃশ্য!

অপূর্ব এক তরুণীর মূর্তি—রং তার ফুটন্ত শ্বেতপদ্মের মতো!

তরুণীর মেঘের মতন কালো চুল পিছনে, কাঁধে, বুকে গোছায় গোছায় এলিয়ে পড়েছে এবং তার বুক থেকে উরু পর্যন্ত বাঘের ছালে ঢাকা!

সমস্ত মন বিস্ময়ে ভরে উঠল—কে এই নবযৌবনা, মানবী না বনদেবী?

মূর্তিময়ী স্বপ্ন-সুষমার মতন আমাদের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে তরুণী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর দয়াভরা দুটি সুন্দর ডাগর চোখে আমাদের মুখের পানে চেয়ে রইল নীরবে।

বীরেনদা মোহিত স্বরে বললে, 'সরল, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, এ মূর্তি এখানে কী করে এল?'

আমাদের সকলকে অধিকতর বিস্মিত করে তরুণী খুব নরম মিষ্টি গলায় পরিষ্কার বাংলায় বললে, 'আপনারা কি বাঙালি?'

প্রথমটা নিজেদের কানকে বিশ্বাস করতে না পেরে আমরা অবাক হয়ে রইলুম। তারপর আবার সেই জিজ্ঞাসা শুনে আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

তরুণী অভিভূত কণ্ঠে বললে, 'কত দিন পরে দেশের কথা শুনলুম, কত দিন পরে বাঙালিকে দেখলুম!'

বীরেনদা বললে, 'আপনার কথা শুনে আপনাকেও তো বাঙালি বলেই মনে হচ্ছে।'

—'হ্যাঁ, আমি বাঙালির মেয়ে।'

—'বাঙালির মেয়ে! এইখানে—এই অজানা দ্বীপে—এই অসভ্যদের মাঝখানে!'

তরুণী করুণ স্বরে বললে, 'সে অনেক কথা, পরে বলব! ...আপাতত শুনে রাখুন, আমি এই দ্বীপের রানি, আর আপনারা আমার বন্দি। আপনাদের সঙ্গে এখন আমি আর কথা কইতে পারব না, তাতে আপনাদেরই অমঙ্গল হবে। তবে এইটুকু বলতে পারি, আমি থাকতে আপনাদের কোনও ভয় নেই।'

—এই বলেই তরুণী ফিরে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে আমাদের অবোধ্য ভাষায় সঙ্গের লোকদের ডেকে কী বললে।

অমনি আবার শিঙা বেজে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে আবার ঢোল বাজানো, নাচ ও হইচই শুরু হল। তারপর কয়েকজন লোক এসে আমাদের পায়ের বাঁধন খুলে দিলে এবং উঠে তাদের সঙ্গে যাবার জন্যে ইঙ্গিত করলে।

তরুণী রানিকে নিয়ে অসভ্য লোকগুলো নাচতে নাচতে এগিয়ে চলল—চারিদিকে কড়া পাহারা নিয়ে আমরাও অগ্রসর হলুম।

অমিয় বললে, 'সরলদা, হাত বাঁধা, কাজেই হাততালি দিতে পারব না, কিন্তু গলা যখন খোলা আছে তখন গান গাইব না কেন? বলেই শুরু করলে :—

ওগো অজানা দেশের রানি!
তোমার মুখেতে শুনি আমাদের
আপন প্রাণের বাণী।

কোন অমরার তুমি সে জোছনা,
বলো বীণা-স্বরে কমললোচনা!
পূজিব তোমাকে মধুরবচনা,
জীবন ভরিয়া জানি—
শোনো, অজানা, অচেনা রানি।

ফোটে রাঙা ফুল চুমিয়া চরণে,
দেখে গায় মন নতুন ধরনে,
হব তব দাস জীবনে-মরণে,
রহিব অবাক মানি—
তুমি তরুণী অরুণী রানি!

॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ॥

বীরেনদার দার্শনিকতা

কখনও ছায়া-দোলানো বনপথ দিয়ে, কখনও রোদ-মাখানো সবুজ মাঠের উপর দিয়ে, এবং কখনও বা চোখ-ভোলানো ছোটো ছোটো পাহাড়ের কোল দিয়ে প্রায় মাইল-চারেক পার হয়ে আমরা একটি বড়ো গ্রামে এসে হাজির হলুম।

গ্রাম বলতে আমরা যা বুঝি, এ গ্রাম যেন তার মূর্তিমান প্রতিবাদ! কতকগুলো পাতা-ছাওয়া হেলে-পড়া ভাঙা-চোরা কুঁড়েঘর—এক-একটা গর্তের মতো ঢোকবার পথ ছাড়া সে ঘরগুলোতে আলো-হাওয়া আসবার কোনও উপায়ই নেই। পথঘাটকে আঁস্তাকুড় বললেও বেশি বলা হয় না।

এক-একটা ঘরের সামনে আবার অনেকগুলো করে রোদে-শুকনো মানুষের মুণ্ড ঝুলছে! পরে শুনেছিলুম, এগুলো নাকি বড়ো বড়ো সর্দারের বাড়ি। ছলে-বলে-কৌশলে যে যত বেশি শত্রুকে স্বহস্তে বধ করে তাদের মুণ্ড সংগ্রহ করতে পারে, এ দেশে নাকি সেইই তত বড়ো সর্দার বলে সম্মান পায় এবং আপনার বড়োত্বের প্রমাণস্বরূপ মুণ্ডগুলোকে রোদে শুকিয়ে বাড়ির সামনে এই ভাবে প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখে। এই কথা শোনবার পর যতদিন এ দেশে ছিলুম, কাঁধের উপরে নিজেদের মুণ্ডগুলোকে ঠিকঠাক বজায় রাখবার জন্যে সর্বদাই অত্যন্ত সাবধানে থাকতুম।

এরই মধ্যে একখানা বাড়ি দেখলুম—যার দিকে সহজেই সকলের নজর পড়ে। এ বাড়িখানাও পাতা দিয়ে ছাওয়া হলেও আর সব ঘর বা বাড়ির চেয়ে বড়ো তো বটেই, তার উপরে ঝকঝকে-তকতকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বাড়ির সুমুখে দুজন লম্বাচওড়া লোক বর্শা হাতে করে পাহারা দিচ্ছে। এইখানা রানির বাড়ি বলে আন্দাজ করলুম এবং একটু পরেই দেখলুম আমাদের আন্দাজ ভুল নয়।

আমাদের দেখবার জন্যে গাঁয়ের মেয়েরা পর্যন্ত আজ রাস্তায় এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে! পুরুষদের মতন এখানকার স্ত্রীলোকদেরও লজ্জা রক্ষা পেয়েছে কেবলমাত্র এক এক খণ্ড সরু লেংটির দ্বারা। তবে মানুষের হাড়ের বদলে তারা পাথরের বা প্রবালের গয়না ব্যবহার করে নিজেদের জাতিসুলভ কোমলতার মর্যাদা রেখেছে দেখে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলুম।

রাজবাড়ির সামনে এসে দেখি, রানি সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন।

রানি আমাদের দিকে ফিরেও তাকালেন না, কেবল প্রভুত্বের স্বরে কী একটা হুকুম দিয়েই বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন।

রাজবাড়ির কাছেই একখানা কুঁড়েঘরের দিকে তারা আমাদের নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালে। তারপর আমাদের হাতেরও বাঁধন খুলে দিয়ে ইঙ্গিতে জানালে, আমরা যেন ওই ঘরের

ভিতরে প্রবেশ করি। আমরাও আর কালবিলম্ব না করেই ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম। একটা লোক এসে আমাদের পোঁটলাপুঁটলি আর বন্দুক-তিনটে ঘরের মেঝের উপরে রেখে দিয়ে চলে গেল। উঁকি মেরে দেখলুম, দরজা বা গর্তের বাইরেই প্রায় বিশ-বাইশ জন লোক পাহারা দিচ্ছে।

আমি বললুম, 'বীরেনদা, এরা বোধ হয় জানে না যে বন্দুক কী চিজ। তা জানলে কি আর এগুলো আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে যেত?'

বীরেনদা অন্যমনস্কের মতো শুধু বললে, 'হুঁ।'

অমিয় বললে, 'আচ্ছা বীরেনদা, আজ হঠাৎ তুমি এত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন বলো দেখি? এমন অ্যাডভেঞ্চারে কোথায় তুমি খুশি হয়ে নাচবে, না, কেবল 'হুঁ, হাঁ' দিয়েই কথা সারছ। তোমার হল কী বীরেনদা? কী ভাবছ তুমি?'

বীরেনদা একটু কেঠো হাসি হেসে বললে, 'আকাশ আর পাতালের কথা ভাবছি ভাই।'

—'আকাশ আর পাতাল চিরদিনই আছে আর চিরদিন থাকবেও। তা নিয়ে আবার চিন্তা-জ্বরে আক্রান্ত হওয়া কেন?'

—'ঈশ্বরও চিরদিন আছেন আর চিরদিন থাকেন। তবু কি মানুষ দিন-রাত তাঁরই কথা ভাবতে চেষ্টা করে না?'

আমি বললুম, 'বীরেনদা, তুমি যে আবার হঠাৎ দার্শনিক হয়ে পড়লে দেখছি। ব্যাপার কী?'

—'দার্শনিক হওয়াটা কি নিন্দের কথা?'

—'উঁহু, মোটেই না। কিন্তু আমরা জানতে চাই বীরেনদা, তুমি কি আজ রূপসী রানিকে দর্শন করেই দার্শনিক হয়ে উঠেছ?'

বীরেনদা রেগে কটমট করে আমার দিকে চাইলে, কিন্তু মুখে কিছু বললে না।

অমিয় ফিক করে হেসে ফেলে, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে গাইলে—

'কে জানে কী চোখে দেখেছি তোমায়,
প্রাণ আজ খালি ওই নাম গায়,
সুষমা-কুসুম দেখে শুধু চায়
হতে তার ফুলদানি—
ওগো না-জানা দ্বীপের রানি!'

বীরেনদা খপ করে অমিয়ের চুল ধরে এক টান মেরে বললে, 'তোমার ওই রাবিশ গান থামাও অমিয়! তোমার গান শোনবার জন্যে আমার কোনোই আগ্রহ নেই!'

॥ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ॥

‘বাংলা দেশের ছেলে’

আজ দু-দিন এই ঘরে বন্দি হয়ে আছি। বাইরে দিন-রাত পাহারা, আমরা বেরুবার চেষ্টা করলেই জানোয়ারের শামিল এই বুনো মানুষগুলো বর্শা উঁচিয়ে তেড়ে আসে।

এরা এর মধ্যে যে-সব খাবার পাঠিয়েছে তা স্পর্শ করবার ভরসা আমাদের হয়নি—কে জানে বাবা তার ভিতরে সাপ-ব্যাং কী আছে। আমাদের মতন সভ্য মানুষের পেটে ঢুকে তারা যদি উলটোরকম উৎপাত শুরু করে তাহলে এই অমানুষের দেশে তার ঠ্যালা সামলাবে কে?...কাজেই পোঁটলার ভিতরে যে সব চেনা খাবার ছিল তাই খেয়েই উদরস্থ অগ্নিদেবকে ঠান্ডা রাখবার চেষ্টা করলুম।

তিন দিনের দিন সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ রাজবাড়ি থেকে আমাদের ডাক পড়ল।

রাজবাড়ির গায়ে লাগানো খানিকটা জমির উপরে অনেক ফুলগাছ বসানো হয়েছে। এই অসভ্যের মুল্লুকে বাগান রচনার চেষ্টা দেখে প্রথমটা আশ্চর্য হয়েছিলুম! কিন্তু তার পরেই বুঝলুম, নিশ্চয়ই রানির ইচ্ছাতেই এই বাগানের উৎপত্তি হয়েছে।

বাগানের মাঝখানে একখানা বেদির উপরে রানি বসেছিলেন—তাঁর পরনে ঠিক বাঙালির মেয়েরই মতন কাপড়, কেবল গায়ে কোনও জামা ছিল না। পরে শুনেছিলুম, জামা আর কাপড় পরা নাকি এদেশে সমাজবিরোধী কাজ, তাই অনেক চেষ্টার পর রানি শুধু কাপড় পরবার অধিকার পেয়েছিলেন।

রানিকে দেখে আমরা নমস্কার করলুম। তিনিও প্রতি-নমস্কার করে বললেন, ‘বসুন। কিন্তু আপনাদের ওই ঘাসের ওপরেই বসতে হবে। এ দেশে রাজা কি রানির সামনে কেউ আসনে বসতে পায় না!’

বীরেনদা ব্যস্ত কণ্ঠে শুধোলে, ‘এদেশের রাজা কে?’

রানি বললেন, ‘রাজা কেউ নেই। আমি যে কুমারী।’

বীরেনদা যেন কতকটা আশ্বস্ত হয়ে মাটির উপরে বসে পড়ল।

আমি বললুম, ‘কিন্তু রানিজি, আপনি কী করে এখানে এলেন?’

—‘অদৃষ্টের বিড়ম্বনায়। কতদিন আগে জানি না—বোধ হয় দশ-বারো বছর হল, আমি প্রথম এখানে এসেছি। আমার বাবা সায়েবদের ফৌজে কী কাজ করতেন। বাবা আর মায়ের সঙ্গে বাংলা দেশ থেকে জাহাজে চড়ে আমি চিনদেশে যাচ্ছিলুম। আমার বয়স তখন নয় বছর। সমুদ্রে হঠাৎ ঝড় উঠে আমাদের জাহাজকে বিপথে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দেয়। বাবা আর মা কোথায় ভেসে গেলেন জানি না, কিন্তু আমি আর চ্যাং বলে এক চিনেম্যান ভাসতে ভাসতে এই দ্বীপে এসে পড়ি।

—'আপনার সঙ্গে চ্যাং বলে এক চিনেম্যান ছিল?'

—'হ্যাঁ!'

—'সে কি এখনও এখানেই আছে?'

—'না, শুনুন সব বলছি। দ্বীপের এই অসভ্যরা আমাদের দেখতে পেয়ে নিয়ে আসে। ঠিক সেই দিনই এদের রাজা কোনও ছেলে-মেয়ে না রেখেই মারা যান। আমাকে পেয়ে তারা ভাবলে যে, সাগরদেবতা আমাকে তাদের কাছে উপহার পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাই পুরুতরা খুব খুশি হয়ে ঘটা করে আমাকে তাদের সিংহাসনে বসালে।'

—'আর সেই চ্যাং?'

—'চ্যাংকে তারা প্রথমে জুজু-ঠাকুরের সামনে বলি দিতে চেয়েছিল।'

—'জুজু-ঠাকুর?'

—'হ্যাঁ, জুজু হচ্ছে এদের প্রধান দেবতা। জুজুর পুরুতরাই এখানকার সর্বেসর্বা—আমাকেও তাদের হুকুম মেনে চলতে হয়।...তারপর, যে কথা হচ্ছিল। চ্যাংকে তারা বলি দিতে চাইলে। কিন্তু আমি অনেক কষ্টে চ্যাংকে বাঁচাই। চ্যাং কিছুদিন আমার সঙ্গে-সঙ্গেই রইল। কিন্তু তারপর হঠাৎ একদিন জুজুর মন্দির থেকে একখানা হিরে চুরি করে কোথায় যে পালাল, আর তার কোনোই খোঁজ পাওয়া গেল না।'

অমিয় বললে, 'বোধ হয় সেই চ্যাঙের সঙ্গে আমাদেরও দেখা হয়েছে!'

রানি বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায়?'

আমরা সব কথা খুলে বললুম।

রানি চিন্তিত ভাবে বললেন, 'চ্যাং তাহলে নিশ্চয়ই জুজুর মন্দির লুঠতে চায়! এই জুজুর মন্দিরে যত হিরে-মানিক আছে পৃথিবীর কোনও রাজার ঘরেও তা নেই!'

বীরেনদা বললে, 'ভয় নেই, আমরা আপনাদের রক্ষা করব!'

রানি মাথা নেড়ে বিষণ্ণ স্বরে বললেন, 'চ্যাঙের হাত থেকে তো আপনারা আমাদের রক্ষা করবেন, কিন্তু তার আগে পুরুতদের হাত থেকে আপনাদের রক্ষা করবে কে?'

—'সে আবার কী?'

—'পুরুতরা যে জুজুর সামনে আপনাদেরও বলি দিতে চায়!'

আমরা সবাই চমকে উঠলুম।

রানি বললেন, 'অবশ্য আপনাদের হয়ে আমি পুরুতদের কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করেছি! আর আমার কথা শুনে তাদের মনও অনেকটা নরম হয়ে এসেছিল। কিন্তু কেবল একজন পুরুতের শত্রুতায় আমার চেষ্টা সফল হয়নি। আপনাদের ওপরে তার বিষম রাগ!'

—'কেন?'

—'আপনারা যে এই দ্বীপে এসেছেন, তার কাছ থেকেই সে-খবর আমরা প্রথমে পাই। তার একখানা হাত ভয়ানক জখম হয়েছে, আপনারাই নাকি তার সেই দুর্দশা করেছেন!'

অন্ধকার বনে সেই জ্বলন্ত চোখ আর পাহাড়ের গুহায় সেই সাংঘাতিক হাতের আবির্ভাবের সকল রহস্য এতক্ষণে বুঝতে পারলুম!

আমি বললুম, 'কিন্তু রানিজি, সে যে গায়ে পড়ে আমাদের আক্রমণ করেছিল! আর একটু হলেই সে যে আমাদের একজনকে খুন করত!'

রানি বললেন, 'বুঝেছি, ওই পুরুতগুলো যে কী-রকম নিষ্ঠুর আর শয়তান আমি তা জানি,—তাদের প্রধান আনন্দ হচ্ছে নরহত্যা করা, বলি দিয়ে তারা মানুষের মাংস খায়। পুরুতরা এখন বলছে, একবার আমার কথায় চ্যাংকে ছেড়ে দিয়ে তারা ঠকেছে, এবারে আর তারা ঠকতে রাজি নয়। এ রাজ্যে তারা কোনও বিদেশিকে থাকতে দেবে না, তারা আপনাদের ধরে বলি দেবেই দেবে!'

বীরেনদা বললে, 'বেশ, তারা চেষ্টা করে দেখুক না! আজ থেকেই তাহলে আমরা নিজমূর্তি ধরব—বাহুবলেই আমরা আত্মরক্ষা করব!'

রানি ম্লান হাসি হেসে বললেন, 'হাজার হাজার লোকের ভিতরে আপনাদের তিনজনের বাহুবলের দাম কতটুকু?'

—'আমাদের বুদ্ধি আছে, আমাদের বাহুবল আছে, আমাদের বন্দুক আছে—বন্দুকের শক্তি ওরা না জানুক, আপনি জানেন তো?'

—'জানি। কিন্তু অকারণে বিপদকে ডেকে এনে রক্তপাত করে লাভ কী? তার চেয়ে কৌশলে কার্যোদ্ধার করবার চেষ্টা করুন।'

—'কী কৌশল, আপনি বলুন।'

—'এই অসভ্যরা যেমন হিংসুক, তেমনি আবার ছেলেমানুষের মতন সরল আর ভিতু। যা অসম্ভব—অর্থাৎ এদের কাছে যা অসম্ভব, তা যদি কেউ সম্ভবপর করে তুলতে পারে, তার কাছে এরা কুকুরের মতন পোষ মানে।'

—'কিন্তু আমাদের কী করতে হবে?'

—'এখানে সবচেয়ে আদর পায় যাদুকররা। যাদুকরদের এরা ভয়ও করে, পূজাও করে। আপনারা কেউ কি কোনওরকম ছোটোখাটো ম্যাজিক-ট্যাজিক জানেন না?'

বীরেনদা বললে, 'দাঁড়ান, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এখানে কি বাইরের সভ্যদেশ থেকে মাঝে মাঝে লোকজন আসে?'

—'কই, আমি তো দেখিনি। এই দ্বীপের বাইরে যে দেশ আছে, তাও এরা জানে না। তবে আমি এখানে থাকতে থাকতেই অনেক বছর আগে বোধ হয় একখানা জাহাজ এখানে এসে এক দিনের জন্যে নোঙর করেছিল। অসভ্যরা তাকে দেখে ভারী ভয় পেয়েছিল, আমার কাছে এসে সেই জাহাজকে সাগরদানব বলে বর্ণনা করেছিল। আমার বিশ্বাস, চ্যাং পালিয়েছিল সেই জাহাজে চড়েই।'

বীরেনদা বললে, 'বেশ, তাহলে আমি এদের গোটাকয়েক ম্যাজিক দেখাতে রাজি আছি।'

রানী বললেন, 'তাহলে আর কিছু ভাবতে হবে না। আপনাকে এরা ঠিক জ্যান্ত জুজু-ঠাকুরেরই মতন পূজা করবে। তাহলে আজকেই আমি ঘোষণা করে দেব যে, যে-স্বর্গে জুজু-ঠাকুর থাকেন, আপনারা সেই স্বর্গ থেকেই জুজুর ভক্তদের সঙ্গে দেখাশুনো করতে এসেছেন। কাল সকালে রাজবাড়ির সামনের মাঠে আপনারা সকলকে আশীর্বাদ করবেন, আর নিজেদের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাবেন। কেমন, আপনারা মান রাখতে পারবেন তো? কারণ এর ওপরেই আপনাদের জীবন-মরণ নির্ভর করছে।'

বীরেনদা বললে, 'এরা যখন বাইরের জগতের কিছুই জানে না, তখন আমি নিশ্চয়ই এদের ভড়কে দিতে পারব।'

রানি আর কিছু না বলে হাততালি দিলেন, তখনই একজন লোক এসে হাজির হল। রানি খানিকক্ষণ ধরে তার সঙ্গে কথাবার্তা কইতে লাগলেন। কথা কইতে কইতে লোকটা সভয়ে ও বিস্ময়ে বার বার আমাদের পানে তাকিয়ে দেখতে লাগল—আমরা বুঝলুম, এর মধ্যেই তার চোখে আমরা অনেকটা উঁচু হয়ে উঠেছি!

কথাবার্তা শেষ হলে পর লোকটা রানিকে আর আমাদের মাটিতে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে চলে গেল।

রানি আমাদের দিকে ফিরে হাসতে হাসতে বললেন, 'এতক্ষণে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। তাহলে কাল সকালেই সময় ঠিক রইল। ...আসুন, এইবারে আমরা গল্প করি!'

অমিয় বললে, 'রানিজি, আপনার নামটি তো এখনও আমাদের বলেননি?'

—'আমার নাম? বিজয়া। আমি বিজয়ার দিনে জন্মেছিলুম বলে বাবা আমার ওই নাম রেখেছিলেন?' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আবার বললেন, 'আপনাদের পেয়ে যে আমার কী আহ্লাদ হয়েছে, মুখ ফুটে আমি তা বলতে পারব না! দেশের কথা আজ আমার কাছে স্বপ্নের মতন হয়ে গেছে, এ জীবনে হয়তো আর দেশে ফিরতেও পারব না। আর ফিরবই বা কার কাছে, আমার মাও নেই—বাবাও নেই।'

বীরেনদা বললে, 'আমাদের দশা আরও খারাপ। দেশে আমাদের সব আছে, আমরা কিন্তু কোনওদিন আর সেখানে ফিরতে পারব না!'

আমি মুখে আর কিছু বললুম না, কিন্তু আমার বুক ঠেলে কান্না জেগে উঠল।

অমিয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'আজ এই দূর বিদেশে বনের মাথায় যে চাঁদ উঠেছে, তার আলো আজ আমাদের বাংলা দেশেরও বুককে ভরিয়ে তুলছে। চাঁদের চোখে আজ বাংলা দেশের ছবি লেখা, কিন্তু আমাদের চোখে আঁকা শুধু অন্ধকার।'

রানি মমতা-মাখানো গলায় বললেন, 'মিছে ভেবে মন খারাপ করবেন না। তার চেয়ে আপনাদের কারুর গান জানা থাকলে আমাকে বাংলা দেশের একটি গান শোনান।'

বীরেনদা বললে, 'অমিয় হচ্ছে আমাদের ছোট্ট দলের বাঁধা গাইয়ে। গাও অমিয়!'

অমিয় গাইলে—

আমরা সবাই বাংলা দেশের ছেলে রে ভাই,
বাংলা দেশের ছেলে!
দিবস-রাতে মোদের আঁতে যাচ্ছে কতই
চন্দ্র-তপন খেলে।
মা-বোন-বধূ আদর বিলায় ঘরে,
বাইরে বাতাস ঝঙ্কারে কান ভরে,
ফুল-রাগিনী শোনায় চাঁপা, অশোক, বকুল
গহন-বনেও গেলে।
চাঁদনি-মাখা নদীর ধারে ধারে,
ধানের খেতে কনক ভারে ভারে,
তেপান্তরেও মাঠ-ভরা ঘাস দ্যায় যে বুকে
শ্যামলা হাসি ঢেলে।
কোকিল, শ্যামা আর পাপিয়ার সুরে
গানের স্বপন জাগে মানসপুরে,
নামলে আঁধার পল্লিবালা তুলসি-তলায়,
দেয় গো পিদিম জ্বেলে
গাঙের জলে ভাটিয়ালির স্বরে
মাঝিরা সব দেবতাদের নাম করে,
অনন্তেরি নিত্যপূজা মন্দিরে হয়—
সন্ধেবেলা এলে।
গঙ্গাতীরের মিষ্টি-নরম মাটি,
তার ওপরেই আমরা সবাই হাঁটি,
সেই মাটিতেই মানুষ মোরা, চাই না স্বরগ
মাটির বাংলা ফেলে।

সামনেই খানিক-স্পষ্ট, খানিক-অস্পষ্ট পাহাড়ের পর পাহাড়ের শিখর ক্রমাতিউচ্চ হয়ে নীলাকাশের সোপানশ্রেণির মতন উপর-পানে উঠে গিয়েছে এবং তারই সবচেয়ে উঁচু শিখরের উপরে মুকুটের মতন জেগে রয়েছে, জ্বলন্ত চাঁদ। এই সুদূর বিদেশের বাগান থেকে অজানা সব ফুলের গন্ধ জেগে উঠে মনের ভিতরের মাদকতার আবেশ এনে দিচ্ছিল এবং রানি বিজয়াকে দেখাচ্ছিল, যেন এক জ্যোৎস্না-গড়া দেবী প্রতিমার মতো।

এরই ভিতরে অমিয়র গান আজ বাংলার কোকিল-পাপিয়ার অভাব পূরণ করলে—

আমাদের মনে হতে লাগল, আমরা যেন আবার সেই বাংলা দেশের সবুজ কোলের ভিতরেই আপনজনের কাছে বসে আছি।

বীরেনদার স্তব্ধতা ক্রমেই বিস্ময়কর ও সন্দেহজনক হয়ে উঠছে। সে নির্বিকারে ঘাসের উপরে গা বিছিয়ে দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে ছিল, নিষ্পলক নেত্রে।

অমিয়র গান থেমে গেল। রানি কিছুক্ষণ মৌন থাকবার পর ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে বললেন, 'অমিয়বাবু, আজ আপনার গান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে যে, আমি বিদেশে আছি। অনেক—অনেক বছর পরে আমার মনের ভিতর থেকে আজ এই প্রবাসের দুঃখ মুছে গেল। এই আনন্দের জন্যে আমি আপনাদের সকলকেই প্রণাম করি।'

॥ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ॥

'ভানুমতীর খেল'

পরের দিন খুব সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেই দেখি, আমাদের ঘরখানা জনতা পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে!

ঘরের ভিতরে লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ জন। সকলেরই মুখ অত্যন্ত গম্ভীর এবং সকলেরই দেহ কাঠের পুতুলের মতন অত্যন্ত আড়ষ্ট।

প্রথমটা আমার বুক যেন ছাঁৎ করে উঠল! কে এরা? সেই হতভাগা জুজুর কাছে এরা কি আমাদের মুণ্ডগুলোকে ধড় থেকে আলাদা করবার জন্যে নিয়ে যেতে এসেছে? ধড়মড়িয়ে উঠে বসে পাশ থেকে বন্দুকটা তুলে নিলুম। কিন্তু তার পরেই দেখলুম, বিছানার উপরে বীরেনদা আর অমিয় অত্যন্ত প্রশান্ত মুখে গদিয়ানি চালে বসে রয়েছে।

বীরেনদা শান্তভাবে হেসে বললে, 'ভয় নেই সরলভায়া! তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এদের দেখে তুমিও কি বুঝতে পারছ না যে, এরা হচ্ছে সেই জুজুর ত্যাঁদড় পুরুতের দল? এরা বোধ হয় ভানুমতীর খেল দেখবার জন্যে আমাদের নিয়ে যেতে এসেছে।'

ঘরের লোকগুলোর দিকে ফিরে দেখলুম, তাদের সাজগোজ এখানকার সাধারণ লোকগুলোর মতন নয়। তাদের মাথায় রয়েছে পাখির পালকের মুকুট, সর্বাঙ্গে আঁকা নানান-রকম অদ্ভুত উলকি, হাতে বর্শা বা ধনুকের বদলে এক-একটা কালো রঙের লাঠি এবং কোমরে লেংটির বদলে বাঘের ছাল।

লোকগুলোর চোখে কোনওরকম বন্ধুত্বের ভাব না মাখানো থাকলেও ভয়, সম্ভ্রম অথচ অবিশ্বাসের আভাস যেন রীতিমতোই পাওয়া গেল।

আমাদের সকলকে জেগে উঠতে দেখে তারা হাত তুলে দরজার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলে।

বীরেনদা বললে, 'সরল! অমিয়! তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ো। মুখ-হাত-পা ধুয়ে নাও। তারপর আমাদের কার্দানি দেখিয়ে এই ব্যাটাদের চক্ষু স্থির করে দেব!'

রাজবাড়ির সামনের মাঠে গিয়ে দেখি, লোকে লোকারণ্য! মস্ত মাঠ, প্রায় মাইল-খানেক লম্বা। চওড়াতেও সেইরকম। কিন্তু অতবড়ো মাঠেও আজ তিলধারণের ঠাঁই নেই। এ রাজ্যের ছেলে-বুড়ো-মেয়ে যেখানে যে ছিল, সবাই আজ এইখানে এসে জুটেছে। মাঠ ভরে কিলবিল করছে কালো কালো সব ভূত-পেতনির মতন অগুনতি চেহারা! নজরে যতখানি পড়ল—প্রত্যেকেরই মুখ ভয়, সম্ভ্রম আর কৌতূহলে ভরা!

মাঠের মাঝখানে একটা উঁচু মাচার মতন করা হয়েছে, সেইখানেই আমাদের নির্দিষ্ট স্থান। রানি বিজয়াও সেই মাচার উপরে বসে আছেন, তিনি আজ আমাদের মধ্যস্থ হবেন,—অর্থাৎ সকলকে বুঝিয়ে দেবেন আমাদের কথা।

মাচার তলাতেই প্রায় চার-পাঁচশো লোক রয়েছে, তাদের সকলেরই সাজগোজ আমাদের ঘরে আজ সকালে যাদের দেখেছি, তাদেরই মতন। বুঝলুম, এরা হচ্ছে এই রাজ্যের পুরোহিতের দল। ভালো করে চেয়ে দেখলুম, প্রত্যেক মুখেই ঘৃণা ও অবিশ্বাসের আভাস! ভেলকিবাজি যদি তাদের মনের মতন না হয়, তাহলে আমাদের অবস্থাও যে আরামদায়ক হবে না তাও বেশ বোঝা গেল।

আচম্বিতে শিঙা ও দামামা বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে রানি বিজয়া উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বীরেনবাবু, এইবার আপনার ম্যাজিক শুরু করুন—যদিও সে ম্যাজিক দেখে আমি ভুলব না!'

বীরেনদা উঠে দাঁড়াল। একবার লোক ভুলোবার জন্যে আকাশ-পানে মুখ ও হাত তুলে চোখ মুদে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর মুখে গাম্ভীর্যের বোঝা নামিয়ে প্রাণপণে চক্ষু বিস্ফারিত করে চেঁচিয়ে, হাত-পা ছুড়ে বললে, 'ওরে অসভ্য বনমানুষের দল! তোরা নাকি আমাদের বলি দেবার মতলব করেছিস? তোরা কি জানিস না যে আমরা একটা কড়ে আঙুল তুললে তোরা সবাই এখনই ভগবান জুজুর অভিশাপে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবি! তোরা আমাদের ক্ষমতা দেখতে চাস? বেশ, তবে তাই দেখ! এই চেয়ে দেখ, আমার হাতে একটা জিনিস রয়েছে। এই জিনিসের গুণে চন্দ্র-সূর্য পাহাড় আর সুদূরের সমস্ত দৃশ্য আমাদের কাছে এসে ধরা দেবে। যদি বিশ্বাস না হয়, জুজুর প্রধান পুরোহিত আমার কাছে আসুক, স্বচক্ষে সে আমার ক্ষমতা দেখে যাক।'

বীরেনদার হাতের জিনিসটা আর কিছুই নয়, দূরবিন।

রানি বীরেনদার কথাগুলো সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন! জুজুর প্রধান পুরোহিতের মুখে

বিস্ময় আর সন্দেহের ভাব ফুটে উঠল। পায়ে পায়ে থতমত খেয়ে সে আমাদের কাছে এগিয়ে এল। বীরেনদা দূরবিনটা তার চোখের সামনে ধরলে। দূরবিনের ভিতর দিয়ে মিনিটখানেক বাইরের জগৎ দেখেই বড়ো পুরুতের গা ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল—তাড়াতাড়ি দূরবিন থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে সে আগে হতভম্বের মতন আমাদের মুখের পানে তাকিয়ে দেখলে, তারপর দুর্বোধ্য ভাষায় কী একটা চিৎকার করতে করতে দ্রুতপদে পুরুতদের দলের ভিতরে গিয়ে ঢুকে পড়ে গা ঢাকা দিলে কোথায় কে জানে!

জনতার ভিতরে জাগল বহুকণ্ঠের চিৎকার!

রানি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'ওরা বলছে আপনারা সবাই স্বর্গীয় যাদুকরের বাচ্ছা!'

তারপর দ্বিতীয় ম্যাজিক-এর পালা হচ্ছে আমার। একখানা আতশিকাচ সকলের চোখের সামনে উঁচু করে তুলে ধরে আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'হে জুজুর ভক্তবৃন্দ! তোমরা সবাই শোনো। আমার হাতে এই যে পবিত্র জিনিসটি দেখচ, বহু পুণ্যফলে এটি আমি লাভ করেছি। এর মহিমায় স্বয়ং সূর্যদেব আমাদের বশীভূত হয়েছেন। এখন আমি আদেশ করলেই তিনি আমার সমস্ত শত্রুকে ভস্মীভূত করে ফেলবেন। তোমাদের কেউ যদি পরীক্ষা করতে চাও তাহলে এগিয়ে এসো,—আমি তার শরীরের যে-কোনও স্থানে ভয়ানক আগুন জ্বেলে দেব!'

রানি আমার কথার পুনরাবৃত্তি করলেন, কিন্তু বিপুল জনতা আতঙ্কে একেবারে স্থির হয়েই রইল, একজন লোকও সাহস করে অগ্রসর হল না!

তখন আমি আর কিছু না বলে একখানা শুকনো পাতা কুড়িয়ে নিয়ে তারই উপরে আতশিকাচ ধরে সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত করলুম। পাতাখানা যেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল, সমস্ত মাঠের লোক একসঙ্গে চিৎকার করতে লাগল—সে ভীষণ চিৎকারে কান যেন ফেটে যাবার মতন হল!

চিৎকার থামলে পর তৃতীয় ম্যাজিক দেখালে অমিয়। প্রথমে সে একটা দেশলাইয়ের বাক্স সকলকে দেখালে। তারপর বললে, 'এই যে পবিত্র দ্রব্য, এটি ভগবান জুজু নিজে আমাকে দান করেছেন। এর সঙ্গে সর্বগ্রাসী অগ্নিদেব আমার কাছে বন্দি হয়ে আছেন। এই দ্যাখো তার প্রমাণ'—বলেই সে ফস করে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ফেললে।

তারপর আবার সেই আকাশ-কাঁপানো চিৎকার!

পুরুতদের পানে তাকিয়ে দেখলুম, তারাও চিৎকার করছে না বটে, কিন্তু তাদের সকলকার চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত, মুখ ভয়ে বিবর্ণ!

তারপর আমরা তিনজনেই নিজের নিজের বন্দুক তুলে নিলুম।

বীরেনদা বললে, 'এইবারে তোমরা আমাদের আর এক শক্তি দ্যাখো! আমাদের হাতে এই যে তিনটি জিনিস দেখছ, এগুলি হচ্ছে আকাশের বজ্র। ভগবান জুজু এই বজ্রের দ্বারা

শত্রু বধ করে থাকেন। এরই দ্বারা আমরা সেদিন জুজুর এক অবাধ্য পুরুতের হাত ভেঙে দিয়েছি—দয়া করে কেবল তার প্রাণটা আর নিইনি!'

সামনের একটা গাছের উঁচু ডালে এক ঝাঁক শকুনি বসেছিল। আমরা প্রত্যেকেই তাদের এক-একটাকে লক্ষ্য করে বন্দুক তুললুম! ঘোড়া টেপার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনটে বন্দুক গর্জন করে উঠল এবং পরমুহূর্তে তিনটে শকুনি শূন্যে ঘুরতে ঘুরতে নেমে মাটির উপরে পড়ে গেল।

বিপুল জনতার ভিতর থেকে এবারে যে ভয়ার্ত চিৎকার উঠল, তার আর তুলনা নেই। তারপরেই সেই হাজার হাজার লোক মাঠের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে ভক্তিভরে বার বার প্রণাম করতে লাগল আমাদের উদ্দেশে।

বীরেনদা বললেন, 'হে জুজুর প্রিয় সন্তানগণ! তোমাদের কোনও আশঙ্কা নেই। তোমরা যদি অনুগত থাকো, তাহলে আমরা তোমাদের মঙ্গল করব। কিন্তু আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করলে আমাদের এই বজ্র তোমাদের কারুকেই ক্ষমা করবে না, অতএব সাবধান, সাবধান, সাবধান!'

তারপরেই জুজুর পুরুতদের দল এগিয়ে এসে মঞ্চের সামনে দুই হাত তুলে, মাথা হেঁট করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

রানি বললেন, 'পুরুতরা স্বীকার করছে, আজ থেকে ওরা আপনাদের দাস হয়ে রইল। আপনারা হাত তুলে ওদের অভয় দিন!'

আমরা অভয় দিলুম মনে মনে হাসতে হাসতে!

॥ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ॥

মৃত্যু-যুদ্ধ

এই যে বিজয়া মেয়েটি, আমাদের সকলেরই চোখে একে বড়ো মিষ্টি লাগল!

দেশে যে-সব আমাদের চেনা মেয়ে ছিল তাদের সঙ্গে বিজয়ার কিছুই মেলে না—সে বাঙালির মেয়ে, ওই পর্যন্ত! আর তার কারণও বোঝা শক্ত নয়। বাল্যবয়স থেকেই সে এই অসভ্যদের দলের ভিতরে বন্য প্রকৃতির মাঝখানে মানুষ হয়েছে—আদব-কায়দা বা সামাজিকতা, কিছুই সে শেখেনি এবং যেটুকু শিখেছিল তাও বোধহয় ভুলে গিয়েছে। তাই বাঙালি পুরুষদেরও চেয়ে সে বেশি সপ্রতিভ এবং বেশি স্বাধীন—পাঁচজন সভ্য মানুষের সঙ্গে মিশতে গেলে মানুষের যেটুকু আত্মগোপন করার দরকার হয়, সেটুকু খল-কপটতাও তার কথায় বা ব্যবহারে বা ভাব-ভঙ্গিতে ছিল না!

ফলে দিন-দশেকের ভিতরেই বিজয়া আমাদের সঙ্গে একেবারে আমাদেরই মতন হয়ে মিলে-মিশে গেল—আমরা যে যুবক এবং সে যে রূপসী যুবতী, তার ভাব দেখলে মনে হত, এ সংকোচ তার মনের ভিতরে যেন একবারও উঁকি দেয়নি।

সে আমাদের নাম ধরে 'তুমি' বলে ডাকতে শুরু করেছিল এবং আমাদেরও মানা করে দিয়েছে, আমরাও যেন তার 'রানি' উপাধি বাদ দিয়ে নাম ধরে তাকে ডাকি!

এমন এক কল্পনাতীত অবস্থায় তিন যুবকের ভিতরে একটিমাত্র যুবতী এসে পড়লে ঔপন্যাসিকরা কত-রকম মেলোড্রামাটিক ঘটনার সরস কল্পনা করতে পারতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের এই মেলামেশার ভিতরে এখনও পর্যন্ত কোনও বিচিত্র রোমান্স বা ওই জাতীয় আর কোনও-কিছুর দেখা পাওয়া যায়নি।

তবে রোমান্সের একটা সন্দেহজনক ছায়া বোধ হয় বীরেনদা আর বিজয়ার মাথার উপরে দুলছে—যদিও সে ছায়াকে এখনও কায়া বলে ভ্রম হয় না।

বীরেনদাকে কোনও প্রশ্ন করলেই সে ভারী খাপ্পা হয়ে ওঠে। আজকাল আবার বলতে শুরু করেছে যে, 'দ্যাখো, তোমরা যদি এমন ফাজলামি করো, তাহলে এবার আমি গায়ের জোরে তোমাদের মুখ বন্ধ করব!'

অমিয় বলে, 'বীরেনদা! ইংরেজরা বছরে বছরে এত লোককে ফাঁসি দিয়েও আর জেলখানায় পাঠিয়েও দুর্বল ভারতবাসীর মুখ গায়ের জোরে বন্ধ করতে পারেনি। গায়ের জোরে তুমিই বা কেমন করে আমাদের মুখ বন্ধ করবে?...সত্যি বীরেনদা, তোমার পায়ে পড়ি, বলো না, তুমি কাকে ভালোবাসো?'

বীরেনদা রেগে তিনটে হয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'কারুকে না, কারুকে না,—আমি ভালোবাসি খালি নিজেকে!'

সমুদ্রে চাঁদ উঠছে। মনে হচ্ছে, ওই সমুজ্জ্বল রত্ন-গোলকই যেন সমস্ত আকাশ আর পৃথিবীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র, নিখিল মানবের চিত্ত তাই নিত্য ওরই মধ্যে গিয়ে আলোকশয্যায় শুয়ে থাকতে আর অনন্ত আনন্দের স্বপ্ন রচনা করতে চায়।

সমুদ্রে চাঁদ উঠছে। আর বিপুল সমারোহ ভরা সেই অসীম নীলজলের জগৎ গলিত হীরকস্রোতে পরিণত হচ্ছে।

সমুদ্রে চাঁদ উঠছে। আর জ্যোৎস্না-নির্ঝরে আমাদের মনের ভিতরটা পর্যন্ত রূপে অপরূপ হয়ে যাচ্ছে। এবং প্রাণ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে চাইছে, মাটি-মায়ের উদার কোলে, এই সুন্দর পৃথিবীতে আমরা যে বেঁচে আছি, আমরা যে খেলা করছি, এর চেয়ে বড়ো কথা কিছু নেই, আর কিছু নেই!

বালির নরম বিছানায় আমরা তিনজনে বসে আছি আর বিজয়া ছিল উপুড় হয়ে শুয়ে—দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে দেহের উপরার্ধ তুলে!

অজানা দ্বীপের নাম-না-জানা পাখি নিজের ভাষায় কী গান গাইছিল এবং বাতাস করছিল তীরের সবুজ বনের সঙ্গে প্রেমালাপ।

বীরেনদার চোখের দৃষ্টি আজ অনন্ত সাগরের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছে!

বিজয়া খানিকক্ষণ অবাক হয়ে বীরেনদার মুখের পানে তাকিয়ে রইল; তারপর পাতলা ফুলের পাপড়ির মতন ঠোঁট দু-খানি মধুর হাসিতে রঙিন করে তুলে বললে, 'বীরেন, কী ভাবচ ভাই?'

বীরেনদা চমকে মুখ ফেরালে; একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'দেশের কথা।'

—'কেন ভাই তোমরা খালি দেশের কথা ভাব? আমার কাছে থাকতে কি তোমাদের ভালো লাগে না?'

—'কেন ভালো লাগবে না বিজয়া! খুব ভালো লাগে। কিন্তু সোনার খাঁচায় বসে বনের পাখি মনের সুখে গান গাইলেও সে কি বনের স্মৃতি মনের ভিতর থেকে মুছে ফেলতে পারে?'

বিজয়া আর কোনও জবাব দিলে না।

অমিয় আনমনে গুনগুন করে গাইতে লাগল—

আজ আকাশের রূপ-সায়রে
যায় ভেসে যায় আঁখি,
মনকে কে আজ দেয় পরিয়ে
রাঙা ফুলের রাখি!

কোন রূপসী দৃষ্টি-বীণায়
নীরব গানের ছন্দ শোনায়,
চিত্ত আমার নৃত্য করে
স্বপ্নপুলক মাখি!

তারার মালা পরবে বলে
ছুটল চাঁদের ঘুম,
বনের ছায়ায় উঠল বেজে
ঝিল্লির ঝুমঝুম!

শ্যামল ধরায় আলোয় আলো!
কে আজ আমায় বাসবে ভালো!

তাই তো আমি মনে মনে
নাম ধরে তার ডাকি!

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল! তারপর বিজয়া আবার বীরেনদাকে শুধোলে, 'আচ্ছা ভাই, আজ যদি এখানে হঠাৎ কোনও জাহাজ এসে পড়ে, তাহলে তোমরা কী করো?'

—'দেশে চলে যাই।'

—'আমাকে এখানে ফেলে?'

—'তোমাকে ফেলে যাব কেন? তোমাকেও নিয়ে যাব!'

বিজয়া দুঃখিত ভাবে মাথা নেড়ে বললে, 'বলেছি তো ভাই, দেশের দরজা আমার সামনে বন্ধ। সেখানে আপন বলতে আমার আর কেউ নেই!'

—'কেন, আমরা তো আছি বিজয়া! আমাদের কাছে তুমি থাকবে!'

—'তোমাদের সমাজ আর আমাকে চাইবে কেন? এই বুনোদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমার যে জাত গিয়েছে।'

—'মানুষের জাত কখনও যায় না বিজয়া! মানুষ—'

বীরেনদার মুখের কথা মুখেই রইল—হঠাৎ চারিদিক কাঁপিয়ে একসঙ্গে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটা বন্দুক গর্জন করে উঠল!—তারপরেই অসংখ্য লোকের চিৎকার ও আর্তনাদ এবং তারপর আবার বন্দুকের পর বন্দুকের আওয়াজ!

আমরা সকলেই একলাফে দাঁড়িয়ে উঠলুম!

বিজয়া ভয়ে আঁতকে বলে উঠল, 'ও কীসের গোলমাল? অত বন্দুক কে ছোড়ে?'

গ্রাম থেকে আমরা খানিক তফাতে এসেছি। সমুদ্রতীর আর গ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাঁচিলের মতন গাছের সারি। কিন্তু গাছগুলোর পাতার ফাঁক দিয়ে দাউ-দাউ-দাউ আগুনের রক্তহাসি ফুটে উঠল আচম্বিতে। বেশ বোঝা গেল, গ্রামের ভিতরে একটা বিপুল অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়েছে। ...বন্দুকের শব্দ সমান চলছে—মানুষের আর্তনাদ ক্রমেই বেড়ে উঠছে!

বিজয়া বললে, 'গাঁয়ে আগুন লেগেছে! আমার প্রজারা কাঁদছে!' সে ছুটে গাঁয়ের দিকে যেতে গেল!

বীরেনদা এগিয়ে তার একখানা হাত চেপে ধরে বললে, 'কোথা যাও? দাঁড়াও!'

বিজয়া আকুল স্বরে বললে, 'ছাড়ো বীরেন, হাত ছাড়ো। দেখছ না, আমার প্রজারা বিপদে পড়েছে? তোমরাও চলো!'

বীরেনদা মাথা নেড়ে বললে, 'তুমিও যাবে না, আমরাও যাব না। যেচে মরণের মুখে গিয়ে লাভ কী! বুঝছ না, বোম্বেটে চ্যাঙের দল জুজুর মন্দির আক্রমণ করেছে? ওরাই বন্দুক ছুড়ছে আর সকলের ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে।'

বিজয়ার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। একটু থেমে বললে, 'তুমি ঠিক বলেছ। এতক্ষণে ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু উপায় কী? চ্যাং আমার নিরীহ প্রজাদের খুন করবে, আর আমরা এখানে হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব? তা তো হয় না। তার চেয়ে আমি চ্যাঙের কাছে মিনতি করে বলিগে, 'একবার আমি তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলুম, আজ তুমি আমার প্রজাদের ক্ষমা করো।' সে আমার কথা শুনবে বোধ হয়।'

—'সে তোমার প্রজাদের ক্ষমা করবার জন্যে এতদূরে আসেনি বিজয়া! চ্যাংকে এখনও তুমি চেনোনি—মানুষের আকারে সে রাক্ষস। তার কাছে গেলে তুমি নিজেও বিপদে পড়বে!'

বিজয়া দৃপ্তকণ্ঠে বললে, 'তাহলে চলো, আমরাও তাকে বাধা দেব!'

বীরেনদা অনুশোচনার স্বরে বললে, 'তাকে বাধা দেবার উপায় থাকলে আমরাই কি এতক্ষণ এখানে থাকতুম? দেখছ না, আমরা বন্দুক আনিনি যে! এখন বন্দুক আনতে গেলেই বন্দি হব!'

বিজয়া হতাশ ভাবে বসে পড়ল। অগ্নিশিখায় তখন আকাশের একদিক লাল হয়ে উঠেছে, কিন্তু বন্দুকের শব্দ কমে এল। গোলমালও অনেকটা থেমে এসেছে—কেবল শোনা যেতে লাগল, কতকগুলো লোক চিৎকার করে কাঁদছে।

আমি বললুম, 'বিজয়া, তোমার সমস্ত প্রজা এতক্ষণে নিশ্চয়ই পালিয়ে গিয়েছে। কাঁদছে খালি আহতেরা।'

অমিয় বললে, 'আঃ, হাত দু-খানা যে নিশপিশ করছে! বন্দুক না এনে কী বোকামিই করেছি, চিনে-বাঁদরগুলোকে দেখিয়ে দিতুম মজাটা!'

বীরেনদা বললে, 'ভুল আর শোধরাবার উপায় নেই। ...কিন্তু আমাদের পক্ষে আর এখানে থাকাও নিরাপদ নয়।'

বিজয়া বললে, 'চ্যাং ভাবছে জুজুর মন্দির লুট করে রাজার ঐশ্বর্য পাবে। কিন্তু তার সে আশায় আমি ছাই দিয়ে এসেছি!'

—'কী রকম?'

—'তোমাদের মুখে যখনই শুনলুম দলবল নিয়ে চ্যাং আবার এই দ্বীপে এসেছে, তখনই আমি সাবধান হয়েছি। জুজুর সমস্ত ধনরত্ন আমরা এক লুকনো জায়গায় পুঁতে রেখেছি—চ্যাং সারাজীবন ধরে খুঁজলেও তা পাবে না!'

বীরেনদা বললে, 'তাহলে চলো চলো, আমাদের আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা উচিত নয়! জুজুর মন্দির খালি দেখে চ্যাং এতক্ষণে নিশ্চয়ই তোমাকে ধরবার জন্যে চারিদিকে লোক পাঠিয়েছে। এখানে থাকলে তুমি বিপদে পড়বে!'

অমিয় বললে, 'আর পালানো মিছে! ওই দ্যাখো, কারা এদিকে আসছে।'

সর্বনাশ! সত্যিই তো, গাছের তলার পথ দিয়ে জন দশ-বারো লোক হন হন করে এগিয়ে আসছে—আমাদের দিকেই!

আমরা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

আগন্তুকদের সকলের আগে আগে আসছে কং হিং এবং তার পিছনেই বিপুলবপু চ্যাং,—সমুদ্রের প্রবল বাতাসে তার সেই লম্বা গোঁফ-জোড়া ফরফর করে দু-দিকে উড়ছে!

কং হিং তার সদাহাস্যময় মুখে আরও বেশি হাসি ফুটিয়ে বললে, 'আরে আরে, বীরুবাবু যে! আরে আরে, সরুবাবু—অমিবাবুও যে! তাহলে তোমরা বেঁচে-বর্তে মনের সুখে আছ? বেশ, বেশ! আমি ভেবেছিলুম এতদিনে তোমরা পাতালের ভূত হয়ে পেট ভরে জলপান করছ!'

বীরেনদা বললে, 'আমরাও ভেবেছিলুম তোমাদের ওই সুচেহারা এ জন্মে আর দেখতে পাব না। তাহলে মানোয়ারি জাহাজের গোলা তোমাদের হজম করতে পারেনি?'

—'না। বড়োজোর চণ্ডু কি গুলি খাওয়ার অভ্যাস আছে, ও গোলা-টোলা আমাদের ধাতে সহ্য হয় না।....আরে, তোমাদের সঙ্গে ওটি কে? এই দ্বীপের রানি বুঝি? আমরা যে ওঁকেই খুঁজতে এখানে এসেছি—সেলাম, রানিসাহেবা!'

বীরেনদা বললে, 'কেন, রানির কাছে তোমাদের কী দরকার?

—'বিশেষ কিছুই নয়। ওঁর কাছে খালি জানতে এসেছি, জুজুর ধনরত্ন উনি কোথায় সরিয়ে ফেলেছেন?'

বিজয়া সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে তেজ-ভরা গলায় বললে, 'সে খোঁজে তোমাদের দরকার কী?'

কং হিং খিল খিল করে হেসে বললে, 'দরকার একটু আছে বই কি!'

—'আমি বলব না।'

—'রানিসাহেবা, একটু বুঝে-সুঝে কথা বলবেন। এই যে চ্যাং ভায়াকে দেখছেন, একে চেনেন তো? এর মেজাজ বড়ো ভালো নয়। আস্তে আস্তে আমাদের সঙ্গে আসুন, ধনরত্নের জায়গাটা কোথায় দেখিয়ে দিন। নইলে—'

—'নইলে?'

—'নইলে আমরা আদর করে আপনাকে ধরে নিয়ে যাব।'

—'আমি যাব না!'

চ্যাঙের দিকে ফিরে কং হিং মিনিটখানেক চিনে ভাষায় কী কথা কইলে।

চ্যাঙের কুৎসিত মুখের একটামাত্র চক্ষু দপ করে হঠাৎ জ্বলে উঠল!—তাড়াতাড়ি সে বিজয়ার দিকে এগিয়ে এল।

কিন্তু বীরেনদাও তৈরি হয়ে ছিল—সে তখনই চ্যাং আর বিজয়ার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল এবং অত্যন্ত শান্তভাবে বললে, 'আমাকে বধ না করে তুমি বিজয়ার গা ছুঁতে পারবে না!

কং হিং বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'ও কী বীরুবাবু, ও কী! আমাদের দলেরই লোক হয়ে তুমি সর্দারকে বাধা দিতে চাও?'

অমিয় খাপ্পা হয়ে বললে, 'কে তোমাদের দলের লোক? জোর করে আমাদের হাতে নীলগোলাপের ছাপ মেরে দিয়েছ বলেই কি ভাবছ, আমরা তোমাদের গোলাম হয়ে থাকব?'

কং হিং হাসিমুখে বললে, 'তোমরা বিদ্রোহী হলেও আমাদের কিছু ভয় নেই। এইখানেই আমাদের দলের আরও কত লোক আছে, তা দেখছ তো? দরকার হলে আরও লোক আসবে। তার ওপরে তোমরা নিরস্ত্র। আমাদের সঙ্গে গোলমাল বাধালে বেশি সুবিধে করে উঠতে পারবে কি?'

বীরেনদা দৃঢ়স্বরে বললে, 'আমাকে বধ না করে কেউ বিজয়ার একগাছি চুলও ছুঁতে পারবে না!'

কাপড়ের ভিতর থেকে ফস করে একখানা চকচকে ছোরা বার করে বিজয়া বললে, 'আমাকে কেউ ছোঁবার আগে এই ছোরার কথা যেন ভুলে না যায়।' এই বলে সে ছোরাখানাকে বাগিয়ে ধরে এমনভাবে রুখে দাঁড়াল যে, তার সেই মহিমময়ী তেজস্বিনী মূর্তি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলুম। সে মূর্তি যেন বাঙালির মেয়ে নয়,—বাংলা দেশের মানুষ হলে বিজয়া হয়তো এমন বুকের-রক্ত-তাতানো অপূর্ব মূর্তি ধারণ করতে পারত না! হ্যাঁ, এই বিজয়া সিংহবাহিনীরই জাত বটে!

অমিয় নিজের বিপদের কথা ভুলে উল্লসিত কণ্ঠে গেয়ে উঠল—

তুমি বিজয়িনী নারী!
কখনও মধুর, কখনও ভীষণ—
তোমায় চিনিতে নারি!
নয়নে প্রলয়-মেলা,
মরণ খেলিছে খেলা,
ও-রূপ দেখিলে চরণের তলে
হাসিয়া মরিতে পারি!

কং হিংয়ের হাসি আরও মিষ্ট হয়ে উঠল। সে বললে, 'ছোকরা, তুমি গান থামাও। এখন গান শোনবার সময় নয়। ...বীরুবাবু, চ্যাং বলছে যে, তুমি দলের লোক বলেই সে এখনও সহ্য করে আছে, নইলে এতক্ষণে আছাড় মেরে তোমার দেহকে গুঁড়ো করে দিত!'

বীরেনদা সহজ ভাবেই বললে, 'বেশ তো, চ্যাং একবার সেই চেষ্টাই করে দেখুক না!'

—'বলো কী বীরুবাবু! তুমি কি শোনোনি, চ্যাঙের গায়ে জোর কত? চিনদেশে সে একজন বিখ্যাত পালোয়ান ব্যক্তি—জীবনে সে কখনও কোনওদিন কারুর কাছে হারেনি!'

বীরেনদা হেসে বললে, 'জীবনে আমার সঙ্গেও চ্যাং কোনওদিন লড়াই করেনি।'

—'তাহলে মরো।' —বলেই কং হিং চিনে-কথায় চ্যাংকে কী বললে।

বোধ হয় বীরেনদা তার সঙ্গে লড়তে চায় শুনেই চ্যাং আকাশের দিকে মুখ তুলে বিশ্রী ঝাঁঝরা গলায় তীব্র অট্টহাস্য করতে লাগল—তেমন ভয়ানক হাসি আমি আর কখনও শুনিনি!

বীরেনদা ঠাস করে চ্যাঙের গালে এক চড় মেরে বললে, 'তোমার ওই বেসুরো হাসি আমার ভালো লাগছে না, শিগগির চুপ করো!'

চড় খেয়ে চ্যাঙের মুখের ভাব যে-রকম হল, দেখলেই বুকের কাছটা শিউরে ওঠে! তার সেই প্রায় সাত ফুট লম্বা দেহ যেন আরও উঁচু হয়ে উঠল এবং ভীষণ এক গর্জন করে সিংহের মতন সে বীরেনদার উপর লাফিয়ে পড়ল!

স্যাঁৎ করে একপাশে সরে যেতে যেতে বীরেনদা দুম করে চ্যাঙের পাছায় এক লাথি বসিয়ে দিলে এবং টাল সামলাতে না পেরে চ্যাং তখনই দড়াম করে মাটির উপরে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বীরেনদা তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলে।

চ্যাং-ও প্রাণপণে জড়িয়ে ধরলে বীরেনদাকে! তারপরে সেই আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থাতেই দুজনে গড়াতে গড়াতে খানিক দূর চলে গেল।

বিজয়া কৌতুকভরে বলে উঠল, 'বা বীরেন, চমৎকার, চমৎকার!'

তারপর সে যে বিষম মরণ-যুদ্ধ শুরু হল, আমি তা ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না! চ্যাঙের গায়ে যে এমন আশ্চর্য শক্তি, আমিও তা কল্পনা করিনি। এতক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম, কিন্তু এখন আমার ভয় হতে লাগল, আজ বুঝি বীরেনদার মান ও প্রাণ দুইই একসঙ্গে নষ্ট হয়!

কখনও বীরেনদা চ্যাঙের উপরে, কখনও চ্যাং বীরেনদার উপরে এবং ধাক্কাধাক্কি ও আছড়া-আছড়ির সঙ্গে ঘুসি ও চড় সমান চলতে লাগল! বুঝলুম, চ্যাংও কুস্তি, যুযুৎসু ও বক্সিং জানে! তার উপরে তার দেহও বীরেনদার চেয়ে লম্বায়-চওড়ায় দুয়েই বড়ো। হয়তো বীরেনদার গায়ের জোর বেশি, এতক্ষণ ধরে তাই সে গুরুভার চ্যাঙের সঙ্গে যুঝতে পারছে! আর বীরেনদার বয়সও চ্যাঙের চেয়ে অনেক কম, তাই তার দমও বোধ হয় বেশি!

রক্তে দুজনের সারা অঙ্গ ভেসে যাচ্ছে এবং দাপাদাপিতে সমুদ্রতটের বালিগুলো উড়ছে যেন দমকা ঝড়ের মুখে—আর ঘুসোঘুসি ও পরস্পরের গা-ঠোকাঠুকিতে শব্দ হচ্ছে যেন কাঠের উপরে কে খট খট করে কাঠ ঠুকছে!

অমিয় অশ্রান্তভাবে বলে চলছে—'এইবার বীরেনদা! মারো এক ধোবি প্যাঁচ! না, না,—কাঁচি মারো! চ্যাং কাঁধ নামিয়েছে—এইবেলা ওর চোয়ালে একটা নক-আউট ব্লো ঝাড়ো! সাবধান বীরেনদা, পিছিয়ে যেয়ো না—পিছনে একটা গর্ত! আর ভয় নেই বীরেনদা, চ্যাং খুব হাঁপাচ্ছে—তুমি ওকে দমে মেরে দেবে' প্রভৃতি।

বিজয়া বলছে, 'শাবাশ, বীরেন, শাবাশ! চ্যাং এইবারে ব্যাং হল বলে।'

ফিরে দেখলুম, চিনে-বোম্বেটেগুলো অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে মল্লযুদ্ধ দেখছে, কিন্তু কং হিং দাঁড়িয়ে আছে পাথরের পুতুলের মতন নিশ্চল হয়ে এবং তার ঠোঁটে তখনও সেই সদাপ্রস্তুত হাসির লীলা!

এতক্ষণে আমার মনে আশা এল। সত্যি, চ্যাং বেজায় হাঁপাচ্ছে!

হঠাৎ চ্যাং আর্তনাদ করে উঠল! তার সেই একটামাত্র চোখের উপরে গিয়ে পড়ল বীরেনদার এক বজ্রমুষ্টি! ডান হাতে চোখটা চেপে ধরে সে তাড়াতাড়ি পিছন দিকে সরে গেল!

কিন্তু বীরেনদা তাকে ছাড়লে না, এগিয়ে গিয়ে বিদ্যুৎবেগে সে উপরি উপরি আরও গোটাকয়েক ঘুসি বৃষ্টি করলে—অন্ধ চ্যাং প্রথমে হাঁটু গেড়ে বসে, তারপর শুয়ে পড়ে অত্যন্ত অসহায়ভাবে বিষম যন্ত্রণায় কুঁকড়ে কুঁকড়ে ছটফট করতে লাগল!

বীরেনদা মাতালের মতন টলতে টলতে ফিরে দাঁড়াল, হয়তো সে-ও পড়ে যেত—কিন্তু বিজয়া ছুটে গিয়ে দুই হাতে তাকে আকুলভাবে জড়িয়ে ধরলে!

কং হিং তিক্ত স্বরে হেসে উঠে চিনে ভাষায় চেঁচিয়ে কী বললে—সঙ্গে সঙ্গে আট-দশ জন বোম্বেটের আট-দশটা বন্দুকের মুখ ফিরল আমাদেরই দিকে!

—সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো বন্দুকের আওয়াজ হল এবং মনের ভিতর দিয়ে যেন মরণের একটা ঝড় বয়ে গেল!

—কিন্তু আমরা মরলুম না, মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল চার-পাঁচ জন চিনে-বোম্বেটেই!

বিস্মিতভাবে ফিরে দেখি, গাছের তলা থেকে পরে পরে মানোয়ারি গোরার দল বেরিয়ে, বেগে আমাদের দিকে ছুটে আসছে!

আবার কতগুলো বন্দুকের আওয়াজ! কং হিং আর বাকি বোম্বেটেগুলো হতাহত হয়ে মাটির উপরে আছড়ে পড়ল।

জাহাজি কাপ্তেনের পোশাক-পরা এক সাহেব ছুটে এসে বীরেনদার দুই হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে প্রশংসা-ভরা গলায় বললে, 'আমরা লুকিয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি! তুমি বীর!'

বীরেনদা শ্রান্ত হয়ে বালির উপরে বসে পড়ে বললে, 'তোমরা আমাদের প্রাণ আর এই বীর-মহিলার মান বাঁচালে! ভগবান তোমাদের পাঠিয়েছেন। ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ! এখন এর বেশি আর কিছু বলবার শক্তি আমার নেই!'

সাহেব বললে, 'এই ভীষণ একচোখো বোম্বেটের জন্যে চিন-সমুদ্রে বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছে। তাই সরকার এর দলকে দমন করার জন্যে এই মানোয়ারি জাহাজ পাঠিয়েছেন। আজ ক-দিন ধরে আমরা পিছনে পিছনে আছি, কিন্তু কিছুতেই এদের ধরতে পারিনি। আজও হয়তো এই হলদে শয়তানের বাচ্চারা আমাদের চোখে ধুলো দিত, কেবল তোমাদের জন্যেই আজ একে বন্দি করতে পারলুম। তোমরাও আমার ধন্যবাদ নাও।'

ওদিকে চ্যাং আর-একবার অনেক কষ্টে উঠে বসবার প্রাণপণ চেষ্টা করলে, কিন্তু একটু

উঠেই আবার বালির উপরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

কং হিং দুই হাতে ভর দিয়ে রক্তাক্ত দেহ নিয়ে উঠে বসল—তখনও তার সারা মুখ হাসছে আর হাসছে! তেমনি হাসতে-হাসতেই সে বললে, 'বীরুবাবু! তোমাদেরই জিৎ! তোমাদের বাঙালি জাতকে লোকে কাপুরুষ আর দুর্বল বলে কেন? তোমরা বীর, তোমরা মরণের সামনে দাঁড়িয়ে আমার মতন হাসতে পারো, তোমরা দুর্দান্ত চ্যাং আর তার দলকে কুপোকাত করলে! মরবার সময়ে আমি তোমাদের নমস্কার করছি—নমস্কার, নমস্কার!'—বলেই দু-হাত জোড় করে কপালে ছুঁইয়ে সে আবার এলিয়ে পড়ে গেল—আর একটুও নড়ল না!

কং হিংয়ের রহস্যময় হাস্য এ পৃথিবীতে আর কেউ দেখতে পাবে না!

॥ ষোড়শ পরিচ্ছেদ ॥

সব ভালো যার শেষ ভালো

আজ সকালের প্রথম সূর্যের আলোয় আকাশ আর পৃথিবী যখন অগাধ শান্তির হাসি হেসে উঠল, আমাদের নৌকাও তখন ডাঙা ছেড়ে সেই মানোয়ারি জাহাজের দিকে এগিয়ে চলল—কিছু দিন আগে যার ভয়ে আমরা এই অজানা দ্বীপে পালিয়ে এসেছিলুম!

পালিয়ে এসেছিলুম তিনজনে, কিন্তু ফেরবার সময়ে দলে একজন লোক বাড়ল। বোধ হয় বলতে হবে না যে, সে বিজয়া।

আমরা ছাড়া মানোয়ারি জাহাজেও আরও লোক বাড়ল। তারা সেই বোম্বেটের দল—গোরাদের বন্দুকের মুখ থেকে বেঁচে তারা চলেছে আজ ফাঁসিকাঠে ঝুলে মরবার জন্যে।

তারাও জুজুর ধনরত্ন পেলে না, আমরাও হাতে পেয়ে তা ছেড়ে দিলুম। কারণ বীরেনদা বললে, 'জুজুকে মানি আর না মানি, তিনি এই দ্বীপের দেবতা। এই দেবতার জন্যে বোম্বেটেদের হাতে অনেক সরল, নিরীহ অসভ্য মানুষ প্রাণ দিয়েছে। তাদের রানিকেও আমরা হরণ করে নিয়ে চলেছি, এখন বেচারিদের দেবতারও গয়না চুরি করলে আমাদের পক্ষে মহাপাপ হবে!'

আমরাও বীরেনদার কথায় সায় দিলুম।

জাহাজ ছাড়ল।

ডেকের উপরে রেলিং ধরে বিজয়া দাঁড়িয়ে আছে—ছবির মতন স্তব্ধ হয়ে।...

নীলাকাশের তলায় সেই সবুজ দ্বীপটি যখন ক্রমেই ছোটো হয়ে স্বপ্নের মতো মিলিয়ে

গেল, তখন বিজয়ার চোখ দিয়ে ঝরতে লাগল অশ্রুবিন্দুর পর অশ্রুবিন্দু!

বীরেনদা সমবেদনা-ভরা কণ্ঠে বললে, 'বিজয়া, তুমি কাঁদছ!'

হাত দিয়ে চোখের জল মুছে বিজয়া বললে, 'একদিন দেশ ছেড়ে এখানে এসে অনেক কেঁদেছিলুম। কিন্তু আজ আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন স্বদেশ ছেড়ে আবার বিদেশের দিকে চলেছি।'

আমি বললুম, 'না বিজয়া, তুমি তো বিদেশে যাচ্ছ না! তোমার মনের স্বদেশ যে এখন ওই বীরেনদার বুকের ভিতরেই!'

অমিয় বললে, 'হায় রে হায়! এক যাত্রায় পৃথক ফল! বীরেনদা তো অ্যাডভেঞ্চার করতে এসে নিজের কাজ দিব্যি গুছোলেন, কিন্তু আমাদের বুকের ভিতরটাকেও স্বদেশ বলে মনে করবার লোক তো পাওয়া গেল না! অদৃষ্ট!'

বিজয়া ফিক করে হেসে ফেলে বললে, 'কেন, তোমাদের হিংসে হচ্ছে নাকি? তাহলে আগে বললেই তো হত, আমার প্রজাদের ভিতরে কুমারী কন্যার অভাব ছিল না!'

অমিয় বললে, 'মন্দ কথা নয়! বীরেনদা দেখবেন রানির চাঁদমুখ, আর আমাদের দগ্ধ ভাগ্যে জুটবে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারের মতন দুঃস্বপ্ন! তোমার দয়াকে ধন্যবাদ দিচ্ছি বিজয়া!'

বিজয়া বললে, 'কেন ভাই অমিয়। আমি তো চিরদিনই তোমাদের বন্ধু হয়ে থাকব! আমার মতো বন্ধুর প্রেম কি তোমাদের কাছে একেবারেই নগণ্য?'

আমি বললুম, 'বাপ রে, সে কথা কি মুখে উচ্চারণ করতে পারি। তোমার চকচকে ছোরার কথা এখনও ভুলে যাইনি বন্ধু! তোমার প্রেম নগণ্য, এতবড়ো কথা বলবার মতন বুকের পাটা আমাদের নেই!'

অমিয় গাইলে—

বন্ধু! তোমায় বরণ করি!
কোন গগনের চাঁদ ছিলে ভাই,
    পড়লে ধরার ধুলোয় ঝরি।

সাত-সাগরে দিয়ে পাড়ি
এসেছিলেম তোমার বাড়ি,
আর কি গো সই, তোমায় ছাড়ি,
    রইব এখন চরণ ধরি—
বন্ধু! তোমায় আপন করি!

চক্ষে তোমার রূপের স্বপন,
    বক্ষে আদর-নীড়,

কণ্ঠ তোমার ছন্দ-গানের
চলছে টেনে মীড়!

তোমার সাথে মেলা-মেশা,
এ যেন এক কীসের নেশা!
আমার যে ভাই প্রেমের পেশা,
তুমি যে ভাই প্রেমের পরি,—
বন্ধু! তোমায় প্রণাম করি!

বাঘরাজের অভিযান

প্রথম

সবচেয়ে আশ্চর্য মেয়ে

সমুদ্রের সঙ্গে বাংলা দেশের সম্পর্কের কথা সহজে কারুর মনে জাগে না। অথচ বাংলা দেশের অনেক জায়গাতেই সমুদ্রের ধারে আছে কয়েকটি ছোটো-বড়ো গ্রাম, এমনকি শহর পর্যন্ত। আমাদের কাহিনি শুরু হবে সমুদ্রতীরবর্তী এই রকম কোনও একটা জায়গা থেকেই।

ধরুন, জায়গাটির নাম কমলপুর। সেটি ঠিক গ্রামও নয়, ঠিক শহরও নয়। অথচ কয়েকজন সম্পন্ন গৃহস্থ ও ধনী ব্যক্তি শখ করে সেখানে কয়েকখানি মাঝারি ও বড়ো আকারের বাড়ি তৈরি করেছেন।

কমলপুর থেকে খানিক তফাত দিয়ে বয়ে যায় সমুদ্রের তরলিত নীলিমা। দূরে দূরে এধারে ওধারে তাকালে নজরে পড়ে, পাহাড়ের মতো বালিয়াড়ির স্তূপ। কমলপুরে বাসিন্দার সংখ্যা খুব অল্প বলে এখানে সর্বদাই বিরাজ করে বেশ একটি নিরালা শান্তিময় ভাব।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন জাপানিদের আক্রমণের আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেছিল, তখন সমুদ্রের উপরে পাহারা দেবার জন্যে সৈন্যবিভাগ থেকে এখানে একখানা বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে বাস করত কয়েকজন সেপাই। কিন্তু সমুদ্রপথে জাপানিদের দৌড় থেমে যায় আন্দামানে এসেই। তার কিছুকাল পরেই যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায় এবং বাড়িখানা ছেড়ে চলে যায় সৈনিকরাও। বাড়িখানা কিছুকাল খালি পড়ে থাকে। সাধারণ গৃহস্থদের বাসোপযোগী নয় বলে বাড়িখানা ভাড়া নেবার জন্যে কেউ আগ্রহ প্রকাশ করেনি।

তারপর হঠাৎ একদিন কমলপুরের সকলে বেশ বিস্মিত ভাবেই শ্রবণ করলে, কে একজন বাইরেকার লোক সেই পোড়ো বাড়িখানা ভাড়া নিয়ে বাস করতে এসেছে। পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে এমন একটা অজানা জায়গায় একজন বাইরেকার লোক বাস করতে এল কেন, এটা জানবার জন্যে সকলের মনেই জাগল বিশেষ কৌতূহল। লোকটির নাম অরিন্দম মজুমদার। কানাঘুষায় তার সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা শোনা গেল। কোনও কোনও কথা রীতিমতো রহস্যময়।

অরিন্দম বয়সে যুবক। সুন্দর তার আকৃতি ও সুগঠিত তার দেহ। তার সঙ্গে বাস করত আর একজন মধ্যবয়সি লোক, সে-ই ছিল তার একাধারে ভৃত্য, পাচক ও বন্ধু। জাতে সে বিহারি এবং অনেক বিহারির মতো সে-ও বাংলায় বেশ কথা কইতে পারত। যুদ্ধের সময় সে ফৌজে ছিল, কিন্তু গুলিতে আহত হয়ে ফৌজ থেকে তাকে বিদায় নিতে হয়। দেহ তার প্রকাণ্ড ও বলিষ্ঠ হলেও তাকে অল্প অল্প খুঁড়িয়ে হাঁটতে হত, তার নাম রামফল।

কমলপুর আসবার হপ্তাখানেক পরে একদিন সকাল নয়টার সময় অরিন্দমের নিদ্রা ভঙ্গ হল। সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে চোখ খুলে দেখল, ভেন্টিলেটরের ভিতর দিয়ে ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে সূর্যকরের উজ্জ্বল রেখা। একটা হাই তুলে বিছানা ছেড়ে নেমে পাশের ঘরের ভিতরে গেল। তারপর খানিকক্ষণ মুগুর ভেঁজে, অনেকগুলো ডনবৈঠক দিলে। একা-একাই কিছুক্ষণ ধরে কল্পিত শত্রুকে লক্ষ্য করে মুষ্টিযুদ্ধের কতকগুলো কৌশল অভ্যাস করলে। তারপর ঘরের দরজা খুলে একেবারে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

সামনেই তরঙ্গায়িত অনন্ত সাগর, তার উপরে ঝলমল করে উঠছে সূর্যের স্বর্ণকিরণ। অরিন্দম বালকের মতন উচ্ছল আনন্দে দৌড়োতে দৌড়োতে ও লাফাতে লাফাতে সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়াল এবং তারপর জলের ভিতরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুই বলিষ্ঠ হাতে জল কেটে সাঁতার দিতে দিতে চলে গেল প্রায় আধ মাইল দূর পর্যন্ত। আবার ফিরে এসে ডাঙায় উঠে রৌদ্রতপ্ত বালুকার উপরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

দম নিতে নিতে মিনিটখানেক কাটল, এবং তার পরেই ঘটল এক অভাবিত ঘটনা। তার মাথা ঘেঁষে সোঁ করে বাতাস কেটে কী একটা জিনিস খানিক তফাতে সমুদ্রতীরের উপরে গিয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠিকরে উঠে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ল একরাশি বালি।

অরিন্দম নিজের মনেই বললে, 'বৎস, তোমার টিপ ঠিক হয়নি। বুলেটটা আমার মাথার ইঞ্চি দুয়েক উপর দিয়ে চলে গেছে।'

অরিন্দম তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল এবং এদিকে ওদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল। কিন্তু সমুদ্রতীর একেবারে জনশূন্য। খানিক তফাতে রয়েছে একটা ছোটো বালিয়াড়ির স্তূপ। তার বিশ্বাস হল ওরই উপর থেকে কেউ তার দিকে গুলি নিক্ষেপ করেছে। সে তখনই দ্রুত পদচালনা করলে বালিয়াড়ির দিকে। তারপর তাড়াতাড়ি বালিয়াড়ির উপরে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সেখানেও দেখতে পেলে না জনপ্রাণীকে।

সে অবাক হয়ে ভাবছে, এমন সময় তার কাছে এসে দাঁড়াল রামফল। বললে, 'বন্দুকের শব্দ শুনে আমি ছুটে আসছি কর্তা! আপনার কিছু হয়নি তো?'

অরিন্দম বললে, 'না রামফল, আমার কিছু হয়নি বটে, কিন্তু কেবল দু-ইঞ্চির জন্যে এ যাত্রা আর পরলোকের পথে পা বাড়াতে হল না। আর কেউ নয়, এ হচ্ছে বাঘরাজের কীর্তি!'

রামফল ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'কর্তা, তুমি বড়োই অসাবধান। এত করে বলি, তবু আমার কথায় কান পাতবার নামই নেই! দ্যাখো দেখি, আজই গুলি খেয়ে তোমাকে পটল তুলতে হত!'

অরিন্দম বললে, 'প্রিয় রামফল, স্তব্ধ হও। আমি গুলিখোর নই, সুতরাং গুলি খেয়ে মরবও না। এখন চলো আমাদের প্রাসাদের দিকে।'

'প্রাসাদ' হচ্ছে একখানা একতলা বাড়ি, তার মধ্যে ছোটো ছোটো ঘর আছে খানকয়েক। বসবার ঘরে গিয়ে একখানা ইজিচেয়ারের উপরে আড় হয়ে পড়ে অরিন্দম বললে, 'রামফল হে, নিদ্রাভঙ্গের পরেই উত্তেজনার সৃষ্টি! কাপড় ছাড়বার আগেই চাই অন্তত দু-পেয়ালা চা।'

—'আর তার সঙ্গে আসবে চারখানা গরম টোস্ট, দুটো এগপোচ আর চারখানা চিকেন স্যান্ডউইচ। কর্তা, তাইতেই তোমার পেটের আগুন নিববে তো? না আরও কিছু দরকার?' রামফলকে কেউ কখনও হাসতে দেখেনি! সে হাসির কথাও বলত একান্ত গম্ভীর বদনে।

অরিন্দম বললে, 'রামফল, একজন গুলি ছুড়ে আমার প্রাণ বধ করতে চায়। আর তুমি চাও খাবার খাইয়ে আমাকে খাবি খাওয়াতে, না? আমার অত কিছুর দরকার নেই। আমার জন্যে নিয়ে এসো কেবল দু-পেয়ালা চা, আর পুরু করে মাখন দেওয়া দু-খানা গরম গরম টোস্ট।'

—'কিন্তু কর্তা—'

—'বাস, আর কোনও কথা নয়। যা বললুম, তাই করো।'

অরিন্দম চা পান করতে করতে খবরের কাগজের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। তারপর

একটা সিগারেট ধরিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে কী ভাবতে লাগল! তারপর উঠে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল এবং যখন আবার বাইরে বেরিয়ে এল, তখন তার পরনে কোট ও পেন্টুলুন। ঘরের কোণ থেকে একগাছা মোটা লাঠি তুলে নিয়ে সে ডাকলে, 'রামফল!'

রামফল তার সামনে এসে বললে, 'বলুন কর্তা!'

—'আমি একবার চারিদিকটা ঘুরে আসতে চললুম। ঠিক দুপুরবেলা খাবারের সময় ফিরে আসব।'

রামফল একটা টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে বার করলে মস্ত বড়ো একটা সেকেলে রিভলভার। তারপর বললে, 'এটা দেখতে সেকেলে বটে, কিন্তু ভারী কাজের জিনিস। এর কাছে একেলে 'অটোমেটিক'গুলো খেলনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা নিয়ে যান কর্তা!'

—'ধন্যবাদ। কিন্তু ওটা বেজায় আওয়াজ করে। আমার পক্ষে শ্রীমতীই ভালো। শ্রীমতী আমার লজ্জাবতী, এত চুপিচুপি কাজ সারে, কাকপক্ষীও টের পায় না।' সে বাঁ হাতের আস্তিন গুটিয়ে ফেললে। দেখা গেল, হাতের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে একখানা ছোরার খাপ! অরিন্দম ছোরাখানা টেনে বার করলে। হাতির দাঁতের তিন ইঞ্চি লম্বা হাতলের উপরে রয়েছে প্রায় ছ-ইঞ্চি লম্বা চকচকে ফলা। চমৎকার অস্ত্র, নিখুঁত তার গড়ন। আর তার ধার এত সূক্ষ্ম যে, অনায়াসেই গোঁফ-দাড়ি কামানো যায়। সে খেলাচ্ছলে ছোরাখানা ছাদের দিকে ছুড়ে দিলে এবং তা মাটি স্পর্শ করবার আগেই তার বাঁটখানা খপ করে ধরে ফেললে। তারপর এমন চোখের নিমেষে ছোরাখানা আবার খাপের ভিতর গুঁজে দিলে যে, মনে হল যেন তা শূন্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল। এই ছোরারই নাম হচ্ছে শ্রীমতী।

অরিন্দম বললে, 'আমার শ্রীমতীকে তুমি হেনস্থা কোরো না রামফল। পকেটের ভিতর থেকে কেউ রিভলভারের আধখানা বার করবার আগেই শ্রীমতী তার হাতের বুড়ো আঙুল কেটে দু-খানা করে দেবে।'

রামফল বিরক্তমুখে দাঁড়িয়ে রইল এবং অরিন্দম হাসতে হাসতে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গেল।

বাতাসে পাওয়া যাচ্ছে বসন্তের আমেজ। শীতের প্রকোপে অনেক গাছ ন্যাড়া হয়ে পড়েছিল, এখন তাদের ডালে ডালে কাঁচা সবুজ রঙের ছোটো ছোটো পাতা দেখা দিয়েছে। দু-তিনটে কোকিলেরও সাড়া পাওয়া গেল।

কিন্তু এসব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে অরিন্দম সামনের সেই বালিয়াড়ির দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হল। কেউ যে ওইখান থেকেই তার উপরে একটু আগে গুলিবৃষ্টি করেছে সে-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। বালিয়াড়ির ওধারটা ভালো করে পরীক্ষা করা হয়নি বলে সেই- দিকটাই এখন সে দেখতে চায়। যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে নীচের দিকটা সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে লাগল। দেখা গেল বালির উপর সারি সারি জুতো পরা পায়ের ছাপ। সেই ছাপ ধরে আরও খানিকটা এগিয়ে সে কুড়িয়ে পেলে একটা গুলিশূন্য কার্তুজ।

নিজের মনেই বললে, 'যা ভেবেছি তাই! বাঘরাজের আবির্ভাব হয়েছিল এইখানেই।'

পায়ের ছাপগুলো চলে গিয়েছে বাঁধা রাস্তা পর্যন্ত। অরিন্দম রাস্তার উপরে উঠে আর কোনও পায়ের দাগ দেখতে পেলে না। কিন্তু সহজেই অনুমান করতে পারলে যে, এই পদচিহ্নের অধিকারী গিয়েছে কমলপুরের দিকেই। সে-ও সেইদিকে অগ্রসর হতে লাগল এবং মাইলখানেক পার হয়েই গন্তব্যস্থলে গিয়ে উপস্থিত হল।

সেটা হচ্ছে একটা চায়ের দোকান। কী শহর আর কী মফস্‌সল সর্বত্রই চায়ের দোকানই হচ্ছে যত কিছু খবরাখবর আদান প্রদানের কেন্দ্র। এইজন্যেই প্রতিদিনই সে একবার না একবার এই চায়ের দোকানে এসে খানিকটা সময় কাটিয়ে দিত। এর মধ্যেই এসে সে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছে, মোটামুটি তা হচ্ছে এই

এখানকার সবচেয়ে ধনী বাসিন্দা হচ্ছেন মদনলালবাবু। তিনি এখন পুরোপুরি বাঙালি হয়ে পড়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর পূর্বপুরুষ এসেছিলেন পশ্চিম থেকে। টাকা তাঁর অনেক, কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি অত্যন্ত নিম্নশ্রেণির। সকলেই তাঁকে ঘৃণা করে। মদনলালের কাছে মাঝে মাঝে এসে বাস করে মোহনলাল, সে তাঁর খুড়তুতো ভাই। মোহনলাল খুব আমুদে মানুষ, যদিও তেমন চালাক-চতুর নয়। সবাই তাকে ভালোবাসে। তাদের বাড়ি কলকাতায়।

কমলপুরের আর একজন বাসিন্দা হচ্ছেন স্যার বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরি। আগে তিনি ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট, এখন অবসর নিয়ে এখানে বাস করেন।

আর একজনও এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে পড়েছেন। তাঁর নাম রায়বাহাদুর বিজনকুমার রায়। কলকাতার নানা রাস্তায় তাঁর অনেকগুলো বড়ো বড়ো বাড়ি আছে। সেগুলো থেকে মাসিক ভাড়া আদায় হয় কয়েক হাজার টাকা। কিন্তু কলকাতার জলহাওয়া নাকি তাঁর স্বাস্থ্যের অনুকূল নয় বলে তিনি বৎসরের অধিকাংশ সময়ই কাটিয়ে দেন কমলপুরে। এখানে প্রাসাদের মতন তাঁর একখানা মস্ত বড়ো বাড়ি আছে।

এখানকার জমিদারবাড়ি আছে বটে, কিন্তু জমিদার নেই। মহেন্দ্রনারায়ণ রায় স্বর্গীয় হয়েছেন অনেকদিন আগেই এবং তাঁর সহধর্মিণীও পরলোকে। তাঁরা রেখে গিয়েছেন একমাত্র কন্যা, নাম তাঁর সন্ধ্যা। মহেন্দ্রনারায়ণের সম্পত্তির অছি হচ্ছেন তাঁর সন্তানহীনা বিধবা সহোদরা দেবিকাদেবী। তাঁরও যথেষ্ট দুর্নাম। তাঁর চেহারা ও কথাবার্তার মধ্যে পাওয়া যায় অশোভন পুরুষালি ভাব এবং তাঁর প্রকৃতিও রীতিমতো কর্কশ বলে কারুর সঙ্গেই তিনি মিষ্ট ব্যবহার করতে পারতেন না। কিন্তু জমিদারকন্যা সন্ধ্যাকে সকলেই এখানে পছন্দ করে এবং ভালোবাসে।

সন্ধ্যার প্রথম জীবনটা—অর্থাৎ প্রায় ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত কেটে গিয়েছে কলকাতায়। সেখানে থেকে সে কেবল লেখাপড়াই করত না, আরও নানাদিকেই ছিল তার আকর্ষণ। তার বাবা ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেছিলেন এবং তাঁর মতামতও ছিল দস্তুরমতো আধুনিক। বাড়িতে মেম গভর্নেস রেখে মেয়েকে তিনি মানুষ করে তুলেছিলেন অতি আধুনিক যুগের উপযোগী করে। সন্ধ্যা খুব ভালো টেনিস খেলতে পারে এবং 'স্পোর্টস' এর নানা বিভাগে ও সন্তরণ প্রতিযোগিতায় কয়েকবার অর্জন করেছে প্রথম পুরস্কার। কিন্তু মহেন্দ্রনারায়ণের পরলোকগমনের পর তার পক্ষে একা আর কলকাতায় থাকা সম্ভবপর হয়নি। তাই সে এখন কমলপুরেই স্থায়ীভাবে বাস করে।

জমিদারবাড়ির কাছেই একখানা বাংলো ভাড়া নিয়ে বাস করেন ডক্টর সেন। সকলেই জানে, তিনি একজন পণ্ডিত লোক।

আপাতত কমলপুরের আর কোনও বাসিন্দার পরিচয় দেবার দরকার নেই।

এক পেয়ালা চায়ের সামনে বসে অরিন্দম ভাবছিল কমলপুরের ওই বাসিন্দাদেরই কথা। তারপর পেয়ালায় গোটা দুয়েক চুমুক দিয়ে উঠে পড়ে সে বাইরে এসে দাঁড়াল। মনে মনে বললে, 'এখানকার কারুকেই তো চিত্তাকর্ষক বলে মনে হচ্ছে না—কেবল ওই সন্ধ্যাদেবী ছাড়া। তাঁকে দেখতে কেমন

ধারা? উপন্যাসের নায়িকার মতন কি? একবার জমিদারবাড়ির দিকেই পা চালিয়ে দেওয়া যাক।'

হন হন করে সে এগিয়ে চলল—কোনওদিকে না তাকিয়ে। যখন সে ডাকঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ ডাকঘরের দরজার ভিতর দিয়ে একটি মূর্তি একেবারে তার গায়ের উপর এসে পড়ল। টাল সামলাতে না পেরে সে পড়ে যাচ্ছিল, অরিন্দম তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেললে। তারপর তার দিকে ভালো করে তাকিয়েই তার চক্ষু হয়ে গেল চমৎকৃত! অপূর্বসুন্দরী এক তরুণী!

অরিন্দম অনুতপ্ত স্বরে বললে, 'দয়া করে আমাকে মাপ করবেন।'

তরুণী মধুর স্বরে বললে, 'মাপ চাইছেন কেন? দোষ তো আপনার নয়। আমিই বোকার মতন হুড়মুড় করে আপনার গায়ের উপর এসে পড়েছিলুম।'

অরিন্দম দুই-তিন মুহূর্তের মধ্যেই তরুণীকে খুঁটিয়ে দেখে নিলে। ভুরু, চোখ, নাক, ঠোঁট আঁকা যেন শিল্পীর তুলিতে। ছিপছিপে অথচ নিটোল দেহের গঠন, যে-কোনও ভাস্করের আদর্শ হতে পারে। অনন্যসাধারণ! কমলপুরে এমন কারুকে দেখবে বলে অরিন্দম একেবারেই প্রত্যাশা করেনি। সে ধীরে ধীরে বলল, 'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনার নাম সন্ধ্যাদেবী।'

তরুণী সকৌতুকে হেসে উঠল। সে তরল হাস্যধ্বনিও সংগীতময়। হাসতে-হাসতেই সে বললে, 'হ্যাঁ, আমার নাম সন্ধ্যাই বটে! আপনাকে দেখেও আমার কী মনে হচ্ছে জানেন? আপনিই হচ্ছেন কমলপুরের রহস্যময় আগন্তুক।'

অরিন্দম উপর দিকে দুই ভুরু তুলে বললে, 'বলেন কী, এর মধ্যেই রহস্যময় হয়ে উঠেছি নাকি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। এখানে সবাই আপনাকে করে তুলেছে একটি রোমান্সের নায়ক। আপনার সম্বন্ধে কত-না বিচিত্র কথা শুনতে পাই।'

দু-জনেই তখন আবার পথ দিয়ে চলতে শুরু করেছে। সন্ধ্যার সঙ্গে পাশাপাশি চলতে চলতে অরিন্দম শুধোলে, 'আমার সম্বন্ধে আপনারা কী শুনতে পান, তা কি আমাকে বলবেন না?'

সন্ধ্যা বললে, 'ক্রমে বলব বই কি, কিন্তু আজকে নয়। তবে এখানকার সবাই এই কথা নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছে যে, আপনি সামাজিক কি অসামাজিক জীব। যদিও কমলপুরের আমরা নিজেরা মোটেই সামাজিক জীব নই।'

অরিন্দম বললে, 'আপনাদের কৌতূহল জাগ্রত করতে পেরেছি বলে নিজেকে আমি ভাগ্যবান বলেই মনে করছি। আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে, আমিও আজ নিজের বাসায় গিয়ে ভাবব, কমলপুরের আপনারা আমার চেয়েও অসামাজিক কি না?'

সন্ধ্যা বললে, 'তাই ভাববেন, সারা রাত ধরে ভাববেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি হঠাৎ আপনি এই পাণ্ডববর্জিত দেশে এলেন কেন?'

—'উত্তেজনার আর অ্যাডভেঞ্চারের আর ধনকুবের হবার জন্যে।'

সন্ধ্যা সচকিত চক্ষে তাকালে অরিন্দমের মুখের দিকে। কিন্তু তার মুখের ভাব দেখে বোঝা গেল না যে, সে ঠাট্টা করে এই কথাগুলো বললে কি না। তিন-চার মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে বললে, 'পৃথিবীর কেউ যে ওই-সব কারণের জন্যে কমলপুরে আসতে পারে, এটা আমি কল্পনাতেই আনতে পারি না।'

অরিন্দম সহাস্যে বললে, 'আমি বলতে চাই ঠিক উলটো কথাই। দু-দিন পরেই দেখতে পাবেন, সমস্ত বাংলা দেশের মধ্যে এইখানেই হবে এমন রোমাঞ্চকর ঘটনার পর ঘটনা, যুদ্ধ আর হত্যাকাণ্ড, স্বপ্নেও যা কল্পনা করা যায় না।'

—'আমার বয়স হল প্রায় আঠারো বৎসর। এই আঠারো বৎসরের মধ্যে আমি কমলপুরে একটা অগ্নিকাণ্ড ছাড়া আর কোনওই রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা শুনিনি।'

অরিন্দম বললে, 'তাহলে ঘটনাগুলো যখন ঘটতে আরম্ভ করবে, আপনি নিশ্চয়ই তা উপভোগ করতে পারবেন।'

কথাবার্তা কইতে কইতে তারা জমিদারবাড়ির সামনে এসে পড়ল। বাড়িখানা বড়ো হলেও তার মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই।

ফটকের সামনে এসে সন্ধ্যা বললে, 'আপনি কি দয়া করে একবার বাড়ির ভিতরে আসবেন না?'

—'সে তো আমার সৌভাগ্য। চলুন।'

অরিন্দমকে নিয়ে সন্ধ্যা নিজেদের বৈঠকখানার ভিতরে গিয়ে ঢুকল। প্রকাণ্ড ঘর, সোনালি ফ্রেমওয়ালা বড়ো বড়ো তৈলচিত্র, দামি দামি আয়না ও আসবাবপত্র এবং মার্বেলের টেবিল, কৌচ, সোফা ও নানা আকারের চেয়ার। কিন্তু অরিন্দম সে-সবের দিকে ফিরেও তাকালে না, নিজের মনে একখানা গদিমোড়া চেয়ারের উপর গিয়ে বসে পড়ল।

সন্ধ্যা বললে, 'আমার পিসিমাকে ডেকে আনব কি? আপনাকে দেখলে তিনি খুশি হবেন।'

—'নিশ্চয়।'

অনতিবিলম্বেই ঘরের ভিতরে দেবিকাদেবীর প্রবেশ। একবার তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করেই অরিন্দম বুঝতে পারলে, লোকের মুখে তাঁর যে বর্ণনা শুনেছে তার মধ্যে নেই একটুও অত্যুক্তি। দেবিকাদেবীর দেহ পুরুষেরই মতন চওড়া এবং তাঁকে দেখলেই নপুংসক বলেই মনে হয়। গলার আওয়াজও কর্কশ ও অস্বাভাবিক। বয়স তাঁর চল্লিশ পার হয়েছে বলেই মনে হয়, কিন্তু এই বয়সেও তাঁর মাথায় রয়েছে 'বব' করা চুল। এরকম অভাবিত ও অদ্ভুতদর্শন আধুনিক মহিলা অরিন্দমের চক্ষে আর কখনও পড়েনি।

নমস্কারের আদান-প্রদানের পর দেবিকা বললেন, 'আপনি কমলপুরে এসেছেন শুনেই আমি আন্দাজ করে নিয়েছিলুম যে, একদিন না একদিন আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। আজ রাত্রে এখানে আপনাকে ডিনারের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আরও কারুর কারুর সঙ্গে আপনার দেখা হবে, যদিও আমরা বেশি লোকের সঙ্গে মিশি না।'

—'ক্ষমা করবেন, দেবিকাদেবী, আজ রাত্রে এখানে 'ডিনারে'র আমন্ত্রণ গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হবে না।'

—'তাহলে আজকেই এখানে 'লাঞ্চ' খেয়ে যেতে আপনার আপত্তি আছে কি? আরও কিছুক্ষণ থেকে যান না!'

—'আর-একবার ক্ষমা ভিক্ষা করছি। মনে করবেন না, আমি অভব্য বা অসভ্য। আমার লোককে বলে এসেছি, আজ বাড়িতেই আমি দুপুরবেলায় আহার করব। আমার লোকটি কিছু অদ্ভুত প্রকৃতির। আমি যদি ঠিক সময়ে বাড়িতে গিয়ে হাজির না হই, তাহলে সে মনে করবে নিশ্চয়ই আমি কোনও বিপদে পড়েছি। ফল হবে কী জানেন? তার কাছে প্রকাণ্ড একটা রিভলভার আছে। সেইটে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়বে আমাকে খুঁজতে। তারপর কারুর না কারুর আহত হবার সম্ভাবনা।'

চমকে উঠলেন দেবিকা ও সন্ধ্যা দু-জনেই। কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই অরিন্দমের, সে একদৃষ্টিতে একটি ছোটো টেবিলের উপরে আধারে রক্ষিত একটি জাপানি বামন গাছের দিকে চুপ

করে তাকিয়ে রইল। তার ভাব দেখলে মনে হয় না, সে বলেছে কোনও অসাধারণ কথা।

তারপর সন্ধ্যা স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললে, 'পিসিমা, অরিন্দমবাবু কমলপুরে এসেছেন অ্যাডভেঞ্চারের লোভে!'

দেবিকার দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল। তিনি থেমে থেমে বললেন, 'উত্তম, ওঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে আমি খুব খুশি হব। কিন্তু অরিন্দমবাবু, আজকের জন্যে আপনাকে মুক্তি দিলুম। তবে শুক্রবারে আসতে পারবেন তো? আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে সেদিন আমি আরও কোনও কোনও লোককে নিমন্ত্রণ করব।'

—'বেশ কথা, সেদিন আমি নিশ্চয়ই আপনার দরবারে এসে হাজিরা দেব।'

তারপর দেবিকাদেবীর প্রস্থান। অরিন্দম এবং সন্ধ্যা আরও কিছুক্ষণ বসে বসে গল্প করলে। অরিন্দম একজন সংলাপী লোক, আসর জমিয়ে তুলতে পারে অল্পক্ষণের মধ্যেই। কথা কইতে কইতে সে এটাও উপলব্ধি করতে পারলে, সন্ধ্যা তার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু তার মুখে চোখে বারংবার ফুটে উঠছে কেমন একটা দ্বিধার ভাব। তবে সন্ধ্যা যে তার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে, এটা বুঝতে পেরে সে মনে মনে হল অত্যন্ত আনন্দিত।

অবশেষে অরিন্দম উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'সন্ধ্যাদেবী, এবার আমার বিদায় নেবার সময় হয়েছে।'

সন্ধ্যা তার সঙ্গে বাড়ির ফটক পর্যন্ত এগিয়ে এল। তারপর সে বললে, 'অরিন্দমবাবু, আপনাকে দেখলে তো পাগল বলে মনে হয় না। তবে ওইসব বাজে আবোল-তাবোল বকে আমাদের সঙ্গে মজা করছিলেন কেন?'

অরিন্দম হেঁট হয়ে সন্ধ্যার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে, তার দুই চক্ষু তখন নৃত্যশীল। বললে, 'সারা জীবন ধরে আমি সত্য কথাই বলে আসছি। সত্য কথা বলার মধ্যে একটা কী মস্ত মজা আছে জানেন? কেউ আমার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করবে না।'

—'কিন্তু ওইসব খুন-খারাপি আর রিভলভার—'

বিদ্রূপ ভরা হাসি হেসে অরিন্দম বললে, 'সন্ধ্যাদেবী, এখন থেকে আপনার চিন্তা-জগতে আমি যে-ভূমিকায় অভিনয় করব, তা হবে সত্য-সত্যই অনন্যসাধারণ। জেনে রাখুন, আজ থেকে আমাকে হত্যা করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টার অভাব হবে না। কিন্তু এটাও জেনে রাখুন, কেউ হত্যা করতে পারবে না আমাকে। সুতরাং আপনি বিচলিত হবেন না, কিংবা সারারাত্রি আমার কথা ভেবে বিনিদ্র হয়েও থাকবেন না।'

সন্ধ্যা হালকা হাসি হেসে বললে, 'বেশ, আমি সেই চেষ্টাই করব।'

অরিন্দম গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'বুঝতে পারছি, আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করছেন না।'

সন্ধ্যা বাধো বাধো গলায় বললে, 'কিন্তু কেমন করে বিশ্বাস করি বলুন?'

কঠিন হয়ে উঠল অরিন্দমের কণ্ঠস্বর। সে বললে, 'জেনে রাখুন এই অবিশ্বাসের জন্যে আপনি একদিন অনুতপ্ত হবেন।' তারপরেই তাকে নমস্কার করে অরিন্দম এত তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল যে, সন্ধ্যা সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল হতভম্বের মতো।

বাসায় ফিরে এসে অরিন্দম দেখলে, মুখের উপরে বিরক্তিকর বোঝা চাপিয়ে রামফল দাঁড়িয়ে রয়েছে সদর দরজার সামনে। তার বিরক্তিকে একটুও আমল না দিয়ে অরিন্দম তরলকণ্ঠে বলে উঠল, 'ওহে রামফল, আজ আমি পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য মেয়ের সঙ্গে আলাপ করে এলুম। এখন থেকে

শুরু হবে অ্যাডভেঞ্চারের পর অ্যাডভেঞ্চার! আর অ্যাডভেঞ্চারের নিয়ম কী জানো তো? দুবার কি তিনবার ওই তরুণীর জীবন রক্ষা করতে হবে আমাকেই। তারপর শেষ দৃশ্যে দেখা যাবে, আমি তাকে আবেগভরে চুম্বন করছি। তারপর তার সঙ্গে হবে আমার শুভ বিবাহ! বুঝতে পারলে?'

রামফল কিছু বুঝতে পারলে কি না তা কিছুমাত্র বোঝা গেল না। 'খাবার তৈরি আছে, খাবেন চলুন।' এই বলেই সে বাড়ির ভিতরে অদৃশ্য হল।

দ্বিতীয়

প্রজাপতি শিকারি

শুক্রবার দিন জমিদারবাড়ির মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রণ হয়েছিল মোহনলালেরও। সে বয়সে যুবক। তার রং ফরসা ও মুখশ্রী সুন্দর। সে সর্বদাই সেজেগুজে ফিটফাট হয়ে থাকে এবং বাঁ চোখে পরে একখানা 'মোনোক্‌ল'। তার হাব ভাব যেন প্রকাশ করতে চায়, তার মতো আধুনিক কেতাদুরস্ত লোক বাজারে দুর্লভ।

সন্ধ্যার মুখে মোহনলাল যখন শুনলে, আজ এখানে মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে কমলপুরের সেই নবাগত রহস্যময় মানুষটি, তখন সে সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'বলো কী, বলো কী! তাই নাকি?'

সন্ধ্যা বললে, 'হ্যাঁ মোহনবাবু। অরিন্দমবাবুকে দেখে তো মনে হল, সহজেই তিনি পোষ মানতে পারেন। আর সত্যি বলতে কী, আমার সঙ্গে তিনি খুব অমায়িক ব্যবহারই করেছেন। কিন্তু তাঁর একটি বদ অভ্যাস আছে বলে মনে হল। শীঘ্রই এখানে কী কী ঘটবে তাই নিয়ে সব ভয়াবহ ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে ভালোবাসেন। তাঁর ধারণা, এখানে কেউ নাকি তাঁকে হত্যা করতে চায়।'

—'বলো কী বলো কী? মাথা খারাপ নাকি?'

—'তাঁর মাথা খারাপ বলে তো মনে হল না!'

—'তাহলে তোমাকে নিয়ে তিনি একটু মজা করতে চেয়েছেন। হা হা হা হা—কী মজা!'

—'কিন্তু কেন জানি না, তাঁর কথায় আমি না-বিশ্বাস করেও পারিনি।'

—'কমলপুর হচ্ছে বদ্ধ জলাশয়ের মতো। মাসের তিরিশ দিনই কেটে যায় একই ভাবে। অরিন্দমবাবু যদি এই বদ্ধ জলের মধ্যে তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারেন, তাহলে আমি তাঁকে ধন্যবাদ দেব।'

খানিক পরেই দেখা গেল, ফটকের কাছে অরিন্দমকে। সন্ধ্যা তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল।

অরিন্দম মুখ টিপে একটুখানি হেসে বললে, 'দেখতে পাচ্ছেন সন্ধ্যাদেবী, এখনও আমি সশরীরে বর্তমান। কোনও দুরাত্মা কাল রাত্রে আমার বাড়ির কাছে হাওয়া খেতে গিয়েছিল, কিন্তু আমি উপর থেকে তার মাথায় এক বালতি জল ঢেলে দিয়েছি। ব্যস, সে বাড়ি ফিরে গেল বিনাবাক্যব্যয়ে। এত সহজে হত্যাকারীর উৎসাহ যে ঠান্ডা করে দেওয়া যায়, এটা কি একটা আশ্চর্য ব্যাপার নয়?'

সন্ধ্যা বললে, 'কিন্তু একই গল্প বারবার বললে কি একঘেয়ে হয়ে যায় না?'

অরিন্দম কী জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ সেখানে হল মোহনলালের আবির্ভাব। এসেই সে বলে উঠল, 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই আমি আপনাকে নমস্কার করছি অরিন্দমবাবু! বড়োই আনন্দ—বড়োই আনন্দ—দীর্ঘকাল ধরে এই আনন্দের জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম।'

অরিন্দম বললে, 'সত্য নাকি?'

মোহনলাল তার বাঁ চোখে 'মোনোক্‌ল'খানা লাগিয়ে সভয়ে অরিন্দমের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললে, 'বটে, বটে! তাহলে আপনি হচ্ছেন তথাকথিত রহস্যময় মানুষ?'

সন্ধ্যা বললে, 'মোহনবাবু, অভদ্র হবেন না।'

—'তাই নাকি, তাই নাকি? বটে, বটে, বটে? অরিন্দমবাবু, আশা করি আপনি কোনও অপরাধ নেবেন না।'

সন্ধ্যা বললে, 'মোহনবাবু, এখানে দাঁড়িয়ে বকবক না করে, লক্ষ্মীছেলের মতন পিসিমার কাছে যান। তাঁকে গিয়ে জানান যে, অতিথি উপস্থিত।'

মোহনলাল প্রস্থান করলে। অরিন্দম ধীরে ধীরে বললে, 'উনি হচ্ছেন মদনলালবাবুর খুড়তুতো ভাই মোহনলালবাবু। ওঁর বয়স চৌত্রিশ বৎসর। কিছুদিনের জন্যে বিলাতে গিয়েছিলেন। হাজারিবাগের কয়লার খনির মালিক।'

সন্ধ্যা সবিস্ময়ে বললে, 'দেখছি ওঁর সম্বন্ধে আমার চেয়েও আপনি বেশি কথা জানেন!'

অরিন্দম সহজ স্বরেই বললে, 'যেখানে বাস করব, আমি সেখানকার প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে খবরাখবর রাখতে চাই।'

সন্ধ্যা বললে, 'তাহলে আমার সম্বন্ধেও সব খোঁজ আপনি নিয়েছেন বোধহয়?'

—'নিয়েছি, কিন্তু খবরগুলো বিশেষ দরকারি নয়। আপনার প্রথম জীবনটা কেটেছে কলকাতায়! আপনি বাড়িতে বসে লেখাপড়া শিখেছেন। দেবিকাদেবী আপনার পিতার সহোদরা নন—দূর সম্পর্কীয়া ভগ্নী। আপনি কখনও বাংলা দেশের বাইরে যাননি। এতদিন আপনাকে দেবিকাদেবীর উপরই নির্ভর করে থাকতে হয়েছে; কারণ, তিনিই আপনার সম্পত্তির অছি। সাবালিকা হলেই সমস্ত সম্পত্তি আপনারই হাতে আসবে। কিন্তু সেজন্যে আপনাকে আরও এক বৎসর অপেক্ষা করতে হবে; কারণ, আপনার বয়স এখন সতেরো বৎসর।'

সন্ধ্যা বললে, 'না, আমার বয়স এখন আঠারো।'

—'আপনি সবে আঠারোয় পা দিয়েছেন।'

সন্ধ্যা ঝাঁঝালো গলায় বললে, 'আমার খবর রাখবার জন্যে আপনার এত মাথাব্যথা কেন?'

—'ঠিক ধরেছেন সন্ধ্যাদেবী! তবে কী জানেন মাথার উপরে যার খাঁড়া ঝোলে, মস্তককে ব্যথিত করতে সে বাধ্য হয়।'

সন্ধ্যা আর কিছু বললে না। অরিন্দমকে নিয়ে সে তাদের বৈঠকখানার ভিতরে প্রবেশ করলে। এবং ঠিক সেই সময়ই আর একটা দরজা দিয়ে সেইখানে এসে দাঁড়ালেন দেবিকাদেবী এবং এক শীর্ণ কিন্তু দীর্ঘদেহ শুকনো চেহারার ভদ্রলোক, যাঁর নাম শোনা গেল মদনলালবাবু।

অরিন্দম মৃদুকণ্ঠে বললে, 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বড়োই খুশি হলুম মদনলালবাবু। কিন্তু বড়োই দুঃখের কথা, কলকাতার 'শেয়ার মার্কেট' নিয়ে আপনি এখন অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় আছেন। তাই নয় কি?'

মদনলাল সচমকে অরিন্দমের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে। দুই-তিন মুহূর্ত নীরব থেকে সে বললে, 'অরিন্দমবাবু, দেখছি কলকাতার 'শেয়ার মার্কেটে'র খবর আপনার নখদর্পণে!'

অত্যন্ত সরল ভাবে হাসতে হাসতে অরিন্দম বললে, 'বড়োই আশ্চর্য কথা, কী বলেন?'

তারপরই সেখানে আবার আর-একজনের আবির্ভাব। সন্ধ্যা তাঁর সঙ্গে অরিন্দমের পরিচয় করিয়ে দিলে। তিনি হচ্ছেন প্রাক্তন ম্যাজিস্ট্রেট স্যার বীরেন্দ্রনাথ।

স্যার বীরেন্দ্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অরিন্দমের মুখের পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আপনাকে কোথায় দেখেছি অরিন্দমবাবু? আমি মানুষের মুখ ভুলি না। আমার বেশ মনে হচ্ছে যে, কোনও একটা মামলায় আমি আপনাকে কয়েকদিন আদালতে দেখেছিলুম।'

অরিন্দম বললে, 'ঠিক। বটব্যালের মামলা আপনি ভোলেননি দেখছি, সবাই তাকে 'রাজা' বলে ডাকত। তাকে আপনি সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিলেন। কিন্তু সে কিছুকাল পরে জেল ভেঙে পালিয়ে যায়, তারপর আজ পর্যন্ত ধরা পড়েনি। শুনেছি, সে এই বাংলা দেশের ভিতরেই আছে। সুতরাং সাবধান, অন্ধকার হলে বাড়ির বাইরে আর পা বাড়াবেন না।'

সন্ধ্যা দূর থেকে অরিন্দমকে ডাকলে চোখের ইশারায়। তারপর চুপি চুপি বললে, 'অরিন্দমবাবু, সবাইকে চমকে দেবার প্রলোভন আপনি ত্যাগ করুন। অনেকেরই এটা ভালো না লাগতে পারে।'

অরিন্দম হাসিমুখে বললে, 'আমি নিজের দিকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। আমার সে-উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, অতএব আর কারুকে চমকে দেবার চেষ্টা করব না।'

আহারের আগে শুরু হল গল্পের পালা। এবং তার মধ্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করলে অরিন্দমই। সে সকলকে নিজের ভ্রমণ কাহিনি বলতে লাগল। সে-কাহিনি সত্যই বিচিত্র। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার অধিকাংশ দেশেই সে ঘুরে এসেছে এবং নানা দেশেই নরচরিত্র সম্বন্ধে সঞ্চয় করেছে প্রভূত অভিজ্ঞতা। সে নিজের দুঃসাহসিকতার এমন সব দৃষ্টান্ত দিতে লাগল, যা অত্যন্ত রোমাঞ্চকর।

দেবিকা বললেন, 'এত দেখেশুনেও আপনি কমলপুরে এসেছেন কীসের লোভে? এখানে কোনও উত্তেজনাই নেই!'

—'উত্তেজনা না থাকতে পারে, কিন্তু এখানকার হাওয়া আমার ভালো লাগছে।'

মদনলাল শুধোলে, 'কিন্তু এই নির্জন জায়গায় কী নিয়ে আপনি সময় কাটাবেন?'

—'লক্ষ লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখে! আমি আশা করছি, এখানেই আমার সে স্বপ্ন সফল হবে।'

সকৌতুকে অট্টহাস্য করে মোহনলাল বলে উঠল, 'হা হা হা হা! তাই নাকি, তাই নাকি? বটে?'

স্যার বীরেন্দ্রনাথ বললেন, 'কমলপুরে বসে কোনও পাগলেরও লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখার সাধ হয় না।'

অরিন্দম বললে, 'আমাকে হতাশ করবেন না স্যার। একজন লোক অন্তিমকালে আমাকে বলে গিয়েছে, কমলপুরে এলে লক্ষ লক্ষ টাকার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। নানা কারণে তার কথায় আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু থাক, এ-প্রসঙ্গ যখন আপনাদের ভালো লাগছে না, তখন অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করি আসুন।'

মোহনলাল সাগ্রহে বললে, 'সে কী কথা, সে কী কথা? এ-প্রসঙ্গ আমার ভারী ভালো লাগছে! বলো কী, বলো কী—কমলপুরে লাখো লাখো টাকার স্বপ্ন?'

অন্যান্য সকলেও ব্যাপারটা ভালো করে শোনবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠল।

কিন্তু অরিন্দম মাথা নেড়ে বললে, 'আজ্ঞে না, আর একদিন সব শুনবেন, আজ এই পর্যন্ত।'

তারপরই আহারের জন্যে ডাক এল এবং সবাই গাত্রোত্থান করলে।

সকলের পিছনে যেতে যেতে সন্ধ্যা বললে, 'অরিন্দমবাবু আবার?'

—'সন্ধ্যাদেবী, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় যখন আরও ঘনিষ্ঠ হবে, তখন আমার দুর্বলতা নিশ্চয়ই আপনি মার্জনা করতে পারবেন।'

—'আপনার ওই প্রলাপগুলো কেবল লোকের চমক লাগাবার জন্যে তো?'

—'মোটেই নয়। যথাসময়েই সব কথা জানতে পারবেন।'

সেইদিন বৈকালে রামফলের আপত্তিতে কর্ণপাত না করেই অরিন্দম বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। তারপর মাঠে মাঠে অপথে-বিপথে আপন মনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তাকে দেখলে লক্ষ্যহীন বলে ভ্রম হয়, কিন্তু আসলে সে কমলপুরের চারিদিকটা রাখতে চায় নখদর্পণে।

ঘণ্টাদেড়েক এখানে-সেখানে ঘোরাঘুরি করে ফেরবার পথে একজন লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। লোকটির দেহ বেশ বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট। বয়স তার চল্লিশের কম হবে না এবং পরনে তার খাকি কোট ও হাফপ্যান্ট। তার কাঁধে ঝুলছে একটা ব্যাগ এবং হাতে রয়েছে লাঠির ডগায় প্রজাপতি ধরবার একটা জাল। কখনও সে এ-ঝোপ থেকে যাচ্ছে ও-ঝোপে, কখনও দ্রুতপদে অগ্রসর হচ্ছে, আবার কখনও মাটির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে।

আচম্বিতে সামনের দিকে লাফ মেরে এক জায়গায় সে বসে পড়ল এবং হাতের প্রজাপতি ধরার জালটা মাটির উপরে চেপে ধরে সানন্দে চিৎকার করে উঠল।

অরিন্দম তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'ব্যাপার কী?'

লোকটি বললে, 'পেয়েছি মশাই, পেয়েছি। একটা দুর্লভ প্রজাপতি ধরতে পেরেছি।'

—'তাই তো দেখছি।'

—'এইভাবেই আমি অবসর যাপন করতে ভালোবাসি। সমুদ্রের তাজা হাওয়া, আর মাঠে মাঠে ভ্রমণ করে বেড়ানো, স্বাস্থ্যলাভের এমন চমৎকার উপায় আর নেই।'

—'আপনিই তো হচ্ছেন ডক্টর সেন?'

লোকটি চকিত স্বরে বললে, 'কেমন করে আপনি জানলেন?'

—'আমার প্রশ্ন শুনে আপনি বিস্মিত হচ্ছেন? দেখছি আমার কথা শুনে এখানকার সকলেরই মনে জাগে বিস্ময়। আপনাকে দেখলেই ডাক্তার বলে মনে হয়, আর কমলপুরে আছেন একজন মাত্র ডাক্তার—মিস্টার সেন। যাক সে কথা। ব্যাবসার খবর কী?'

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে ডাঃ সেন বললেন, 'আমার ব্যাবসা? আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারলুম না।'

—'আমার কথা এখানকার সকলেরই কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। ডাঃ সেন, আমি আপনার এই নতুন নেশার কথা জানতে চাই না, আমি শুনতে চাই আপনার পুরাতন পেশার কথা।'

ডাঃ সেন খুব মনোযোগের সঙ্গে অরিন্দমের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করলেন, কিন্তু সে তখন নির্বিকারভাবে তাকিয়ে ছিল সমুদ্রের দিকে। মুখের ভাব দেখে তার মনের কথা কিছুই বোঝা যায় না।

ডাঃ সেন অবশেষে ধীরে ধীরে বললেন, 'অরিন্দমবাবু, আপনি যে সুচতুর ব্যক্তি একথা আমি স্বীকার করছি।'

অরিন্দম বললে, 'আমি সুচতুর বলেই এখনও বেঁচে আছি। কোনও মুখ একবার দেখলে জীবনে আর আমি ভুলি না। আপনার মুখ আগে আমি দেখেছি।'

—'অরিন্দমবাবু, আপনি সুচতুর বটে, কিন্তু এবারে সত্যসত্যই আপনি ভুল করেছেন।'

অরিন্দম মুখ টিপে একটু হাসলে, তারপর বললে, 'আপনার কথা আমি মানি। মানুষ মাত্রই ভুল

করে। কিন্তু ডাঃ সেন, বাইরে থেকে বেশ দেখা যাচ্ছে, আপনার কোর্টের পকেটে রয়েছে বেশ একটা ভারী জিনিস। কী ওটা? অটোমেটিক? কিন্তু অটোমেটিক রিভলভার নিয়ে কেউ কি বায়ুসেবন করতে বাইরে বেরোয়?'

ডাঃ সেন ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'মশাই, আপনাকে আমি একটা—'

অরিন্দম বাধা দিয়ে বললে, 'ওসব বাজে কথা ছেড়ে দিন। দেখা যখন হল, আপনাকে আমি স্বাগত সম্ভাষণ করছি। আমার সঙ্গে চলুন আমার বাসায়। সেখানে তৈরি আছে 'চিকেন স্যান্ডউইচ' আর—ইচ্ছা যদি করেন তো 'জনি ওয়াকারে'র ব্ল্যাক লেবেল মার্কা হুইস্কি। আপত্তি করলে শুনব না, চলুন।' সে এগিয়ে গিয়ে নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করলে ডাঃ সেনের হাত। অরিন্দম যা ধরে, আর ছাড়ে না। ডাঃ সেনের কোনও আপত্তিই গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে তাঁকে টেনে নিয়ে চলল নিজের বাসার দিকে।

সূর্য তখন ডুবে যাচ্ছে আকাশ ও সাগরের মিলন রেখায়।

রামফল এসে তাদের টেবিলের সামনে সাজিয়ে দিয়ে গেল দুই প্লেট স্যান্ডউইচ।

অরিন্দম শুধোলে, 'কিছু পানীয় গ্রহণ করবেন তো?'

—'হ্যাঁ। এক পেয়ালা চা।' তারপর একখণ্ড স্যান্ডউইচে একটা কামড় দিয়ে ডাঃ সেন বললেন, 'তারপর অরিন্দমবাবু, এইবারে কাজের কথা আরম্ভ করা যাক, কী বলেন?'

—'অনায়াসেই।'

—'কমলপুরে আপনি যে হাওয়া খেতে আসেননি, এটা আমার পক্ষে অনুমান করা কঠিন নয়। আপনি যে গোয়েন্দা নন, সেটাও আমি জানি। আপনার সম্বন্ধে আরও কিছু কিছু কথাও আমার অজানা নেই।'

অরিন্দম সিগারেটে একটা টান মেরে অন্যমনস্কের মতন বললে, 'তারপর?'

ডাঃ সেন বললেন, 'শুনেছি, আপনি হচ্ছেন চতুর ব্যক্তি। কিন্তু আপনি যেন আন্দাজে ধরে নেবেন না আমি হচ্ছি নির্বোধ ব্যক্তি। আপনি যে কেন এখানে এসেছেন, সে-সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব স্পষ্ট। আপনি যদি আমার সপক্ষে থেকে কাজ করেন, তাহলে আমার কোনও আপত্তি নেই। নইলে আমি আপনাকে প্রাণপণে বাধা দেবারই চেষ্টা করব। তবে এটাও বলে রাখি, আপনাকে আমার বিপক্ষে নয়, সপক্ষে যদি পাই, তাহলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব। অরিন্দমবাবু, এখন আমি আপনার মত জানতে চাই।'

অরিন্দম সামনের দিকে দুই পা ছড়িয়ে দিয়ে চেয়ারের আরও ভিতরে ঢুকে বসে বললে, 'আপনার পথ আর আমার পথ এক হতে পারে না ডাঃ সেন। বোম্বাইয়ের এক ব্যাংক থেকে বহু লক্ষ টাকা উধাও হয়েছে। তার উপরে আমি লোভ করব না; কারণ, সেটা হবে বেআইনি। কিন্তু যারা ব্যাংক লুট করেছিল, তাদেরই কাছে আছে দেশান্তর থেকে বিনা মাশুলে লুকিয়ে আনা বহু লক্ষ টাকার সোনার থান। তার মালিক নিরুদ্দেশ। আমি সেই বেওয়ারিস সম্পত্তির মালিক হতে চাই।'

—'সেসব সোনার থান নিয়ে যে নিরাপদে সরে পড়তে পারবেন, আপনি কি মনে মনে তা বিশ্বাস করেন?'

—'নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি।' অরিন্দম হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে সাঁৎ করে দেওয়ালের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর বললে, 'আপনার সঙ্গে আমি হাত মেলাব কি না, এ আলোচনা এখন বন্ধ করুন। কোনও বাঘের বাচ্চাকে আমি এই আলোচনা শুনতে দিতে প্রস্তুত নই।'

ডাঃ সেন বললেন, 'তার মানে?'

অরিন্দম উচ্চকণ্ঠে বললে, 'তার মানে কী জানেন? কোনও এক অতি কৌতূহলী লোক জানলার বাইরে ওই ঝোপটার পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছে। সন্ধার আবছায়াতেও আমি তাকে দেখতে পেয়েছি। আমার রিভলভার প্রস্তুত, সে একচুল নড়লেই আমি গুলি করব।'

তৃতীয়

একটুখানি মেলোড্রামা

ডাঃ সেন এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ডান হাত ঢুকল ডান পকেটের ভিতর।

অরিন্দম বললে, 'আপনাকে আর রিভলভার বার করতে হবে না। আমি দাঁড়িয়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই অতি কৌতূহলী লোকটা বিদ্যুতের মতো সরে পড়েছে। হয়তো সে আমাকে হত্যা করতে এসেছিল। অন্ধকারে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে নরহত্যা করা খুবই সহজ বটে, কিন্তু আমাকে হত্যা করতে গেলে পোড়াতে হবে আরও বেশি কাঠ-খড়। অরিন্দম সহজলভ্য জীব নয়। একটু অপেক্ষা করুন, আমি বাইরেটা একবার ভালো করে দেখে আসি।'

অরিন্দম তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল রামফল—তার হাতে একটা প্রকাণ্ড রিভলভার।

ডাঃ সেন হেসে উঠে বললেন, 'দেখছি বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়! কিন্তু রিভলভারটা কি এখানে না আনলে হত না?'

রামফল মুখে কিছু বললে না, কেবল রিভলভারের নলটা ঘুরিয়ে রাখলে ডাঃ সেনের দেহের দিকে।

মিনিট-দশেক পরে ফিরে এল অরিন্দম। বললে, 'শিকার সফল হল না। বাইরে ঘনিয়ে উঠেছে কয়লার মতো কালো অন্ধকার। আর বাঘের বাচ্চা নিশ্চয়ই ছুটে পালিয়েছে খরগোশের মতো দ্রুতবেগে। আরে আরে রামফল, এখানে তোমার রিভলভারটা হচ্ছে 'অধিকন্তু'! চটপট দু-গ্লাস বিয়ার নিয়ে এসো।'

—'হ্যাঁ কর্তা', বলতে বলতে রামফল বেরিয়ে গেল ঘরের বাইরে।

ডাঃ সেন বললেন, 'বিশ্বাস করুন অরিন্দমবাবু, আমি আপনাকে আমার সপক্ষেই পেতে চাই।'

—'আপনার উপরওয়ালাদের মত নিয়েই কি এই কথা আমাকে বলছেন?'

—'নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সেদিক দিয়েও একটা সন্তোষজনক ব্যবস্থা করা অসম্ভব হবে না।'

—'ধন্যবাদ। আপনার প্রস্তাবে আমি আশান্বিত হলুম না। তার চেয়ে আমার একটা কথা শুনুন। আপনি আমার সপক্ষে আসুন, তারপর আমি যা লাভ করব তার তিনভাগের একভাগ আপনার হাতেই তুলে দেব। আমার এই প্রস্তাবটা আপনার কাছে কি লোভনীয় বলে মনে হচ্ছে না? ভেবে দেখুন, ডিটেকটিভ ইনস্পেকটার মিঃ সেন!'

—'আমার নাম ডাঃ সেন!'

মুখ টিপে একটু হেসে অরিন্দম বললে, 'ডাঃ সেন, আমরা কি এখনও পরস্পরের চোখে ধুলো ছুড়ব?'

ডাঃ সেন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনি হচ্ছেন বিচিত্র মানুষ। কিন্তু আজ আমি বিদায় হলুম, নমস্কার!'

অরিন্দম এগিয়ে গিয়ে ডাঃ সেনের একখানা হাত ধরে বললে, 'চলুন, আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি। নইলে আমার দুশ্চিন্তা হবে।'

ডাঃ সেন কিঞ্চিৎ উত্তপ্তকণ্ঠে বললেন, 'আপনি কি আমাকে নাবালক বলে মনে করেন?'

—'মোটেই নয়। এটা আমার ওজর মাত্র। নৈশবায়ু সেবন করতে আমার ভালো লাগে।'

পথ দিয়ে চলতে চলতে ডাঃ সেন বললেন, 'আপনি একদিকে, আর আমি একদিকে। এই দ্বৈতযুদ্ধ বোধহয় চিত্তাকর্ষক হবে, কী বলেন?'

অরিন্দম বিনীতভাবে বললে, 'আশা করি তাই।'

—'সত্যি বলছি, আপনার মতন প্রথম শ্রেণির অপরাধীর সঙ্গে এর আগে আমার দেখা হয়নি।'

অরিন্দম গম্ভীর স্বরে বললে, 'আপনি আগে থাকতে অনেক কিছুই কল্পনা করছেন। আমি অপরাধী? আমি আজ পর্যন্ত এমন কিছু করিনি, আইনে যা অপরাধ বলে প্রমাণিত হয়।'

বাসার কাছে পৌঁছে ডাঃ সেন বললেন, 'আসুন অরিন্দমবাবু, একটা স্যাম্পেনের বোতল খুলে দুজনে আরও কিছু কথা-কাটাকাটি করি।'

অরিন্দম বললে, 'সে চেষ্টা আর একদিন করা যাবে। আজকে আমায় মাপ করুন, নমস্কার।'

অরিন্দম নিজের বাসার দিকে অগ্রসর হল। রাত তখন দশটার কাছাকাছি। আকাশে চাঁদ নেই, দিকে দিকে অন্ধকারের মধ্যে ঝিঁঝির চিৎকার ছাড়া আর কোনও শব্দই কানে আসে না। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরেই কমলপুরের বাসিন্দাদের কলরব নীরব হয়ে যায়। সামনেই অন্ধকারের মধ্যে আরও জমাট অন্ধকারের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে রায়বাহাদুর বিজনকুমারের প্রকাণ্ড অট্টালিকাখানা। বাড়িখানার উপর তলায় কোনও জানলা দিয়েই আলো দেখা যাচ্ছিল না। তার নীচের তলাটা দেখবার উপায় নেই; কারণ বাড়িখানার চতুর্দিকেই দাঁড়িয়ে আছে খুব উঁচু প্রাচীর।

অরিন্দম মনে মনে বললে, 'বাড়ি তো নয়, যেন জেলখানা। এ-বাড়ির মালিক বোধহয় বাইরেকার লোকদের দৃষ্টিকে ভয় করে।' সে স্থির করলে, আজকে চুপিচুপি এই বাড়ির ভিতর ঢুকে কিছু কিছু তদারক করে আসবে।

সে বাড়ির চারিদিকে একবার পদচালনা করে এল। বাড়ির ফটকটাও মস্ত কাঠের দরজা দিয়ে ঢাকা। পশ্চিম দিকের দেওয়ালের কাছে এক জায়গায় রয়েছে একটা পেয়ারাগাছ। তারই একটা ডাল দেওয়ালের উপরদিক দিয়ে চলে গিয়েছে। অরিন্দম আস্তে আস্তে সেই ডাল ধরে বাড়ির পাঁচিলের কাছে গিয়ে পড়ল। পাঁচিলের উপরে যে বোতল ভাঙা কাচ আছে, এটা সে আগে থাকতেই জানত। নিজের কোটটা গা থেকে খুলে পাট করে দেওয়ালের কাচের উপরে রাখলে। তারপর নিজের সেই জামার উপরে গিয়ে বসে দেওয়ালের ভিতরদিকে ঝুলে পড়ল। তারপর নিঃশব্দে অবতীর্ণ হল ভূমিতলে।

অরিন্দম মাটির উপরে বিড়ালের মতো আলতো ভাবে পা ফেলে অগ্রসর হল। বাড়ির এদিকে নীচের তলাতেও সব জানলা অন্ধকার। সে ঘুরে বাড়ির অন্যদিকে গিয়ে উপস্থিত হল। সঙ্গে সঙ্গে একদিকে তার দৃষ্টি হল আকৃষ্ট। একটা জানলা দিয়ে ভিতরের আলো বাইরের ঘাস-জমির উপরে এসে পড়েছে। উঁচু ফ্লোরের উপর রয়েছে বাড়িখানা। অরিন্দম খুব সাবধানে ফ্লোরের উপর উঠে

বসল। জানলার গরাদে নেই দেখে আশ্বস্ত হয়ে একবার পর্দা ফাঁক করে সে ঘরের ভিতর দিকে উঁকি মেরে দেখলে।

এক দৃষ্টিতেই সে দেখে নিলে, দামি দামি আসবাবপত্র, তৈলচিত্র ও পাথরের মূর্তি প্রভৃতি দিয়ে ভালো করে সাজানো একখানা হল্‌ঘর এবং একটা টেবিলের ধারে বসে দুই মূর্তি—একজন পুরুষ ও একজন নারী। তাদের একজন হচ্ছেন রায়বাহাদুর এবং আর একজন সন্ধ্যাদেবী ছাড়া আর কেউ নয়।

বিজন বলছিল, 'প্রিয় সন্ধ্যা, এখন আসল অবস্থাটা বুঝতে পারলে তো?'

সন্ধ্যা বললে, 'আমি এসব কথা বিশ্বাস করি না।'

বিজন কর্কশকণ্ঠে হেসে উঠল। তারপর বললে, 'এইসব দলিল আর কাগজপত্র দেখেও, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?' নিজের পকেটের ভিতর থেকে আরও কতকগুলো কাগজ বার করে সন্ধ্যার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'ধৈর্য ধরে এতক্ষণ তোমার কথা শুনছিলুম বটে, কিন্তু আর পারলুম না। তোমাকে দেখলেই আমার মনে জাগে মিষ্ট ভাব, কিন্তু এটা তুমি নিশ্চয়ই জেনো, কোনও রকম ভাবের আবেগেই আমি নিজের কর্তব্য ভুলি না। আমি নির্বোধ নই। তোমাদের বাড়ি আবার বন্ধক রেখে আমি আর এক পয়সাও দিতে পারব না। এর মধ্যেই তোমার পিসিকে আমি যত টাকা ধার দিয়েছি, তোমাদের বাড়িখানা বিক্রি করলেও তার অর্ধেক উসুল হবে না। আবার আমি টাকা দেব? অসম্ভব!'

সন্ধ্যা আর্তকণ্ঠে বললে, 'তাহলে আমার পিসিমা একেবারেই ভেঙে পড়বেন।'

—'তোমার পিসিকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি কি আমার ঘাড় ভাঙতে চাও?'

কাগজগুলো তুলে নিয়ে সন্ধ্যা উত্তপ্তস্বরে বললে, 'আপনি দুরাত্মার মতন কথা বলছেন! আপনার মতন লোকের কাছে হাজার কয়েক টাকার মূল্য কতটুকু?'

বিজন শান্তভাবে বললে, 'মূল্য আছে সন্ধ্যা, মূল্য আছে বই কি! টাকা আমি দিতে পারি, কিন্তু এক শর্তে।'

—'শর্ত? কী শর্ত?'

—'আসল কথা কী জানো সন্ধ্যা? আমি তোমাকে বিবাহ করতে চাই।'

সন্ধ্যা স্তম্ভিতের মতন বসে রইল দুই-তিন মুহূর্ত। তারপরই সে হঠাৎ দুই হাতে সেই কাগজগুলো মাথার উপর তুলে ধরে সশব্দে ছিঁড়ে ফেলে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'শয়তান, এই হচ্ছে আমার জবাব!'

অরিন্দম মনে মনে বললে, 'চমৎকার সন্ধ্যাদেবী! আপনার বন্দনা-গান গাইছে আমার মন।'

বিজন একটুও চাঞ্চল্য প্রকাশ করলে না। হাসতে হাসতে বললে, 'সন্ধ্যা, ওগুলো হচ্ছে নকল। আসল দলিল আছে আমার লোহার সিন্দুকে। নির্বোধ মেয়ে (বলতে বলতে তার স্বর হয়ে উঠল উগ্র), যে-বুদ্ধির জোরে নিজের চেষ্টায় আমি অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়েছি, ঢের ঢের ধড়িবাজ সেয়ানা লোককে আমি যে টিট করতে পেরেছি, সেই বুদ্ধিকে কি তোমার মতন একটা গেঁয়ো মেয়ে ব্যর্থ করে দিতে পারে? রাবিশ! আমার ধৈর্যের বাঁধ তুমি এইবারে ভেঙে দিলে। আমার কাছে আর কোনও বাজে আবদার চলবে না। আমার স্পষ্ট কথা হচ্ছে এই: তুমি যদি আমাকে বিবাহ না করো, তাহলে আমি আমার পাওনা টাকার জন্যে তোমার পিসির নামে নিশ্চয়ই নালিশ করব। হয় রাজি হও, নয় চলে যাও। আর কোনও হিস্টিরিয়ার অভিনয় আমি দেখতে চাই না।'

অরিন্দম একলাফে একেবারে ঘরের ভিতর গিয়ে পড়ে বললে, 'ঠিক! আর হিস্টিরিয়া নয়!'

সন্ধ্যা চমকে উঠে অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে রইল বিস্ফারিত নেত্রে। বিজনও লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'কে রে?' তার মোটা মুখখানার দুটো কুচকুচে চোখের উপরে বিভ্রান্ত দৃষ্টি! অরিন্দম বক্ষের উপরে দুই বাহু নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল হাস্যমুখে।

বিজন গর্জন করে বললে, 'কে তুমি?'

অরিন্দম প্রশান্ত কণ্ঠে বললে, 'নমস্কার রায়বাহাদুর, নমস্কার! দয়া করে আমাকে একটা উপসর্গ বলে মনে করবেন না।'

তার সেই ছয় ফুট দুই ইঞ্চি দেহের মধ্যে এতটুকু দ্বিধার ভাব নেই। সন্ধ্যা পায়ে পায়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অরিন্দম তার হাত ধরে তাকে নিজের পাশে টেনে নিলে।

কোনওক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে প্রায় সহজ স্বরেই বিজন বললে, 'বোধ হচ্ছে আপনার নামই অরিন্দমবাবু। কিন্তু আমি যে আজ আপনাকে এখানে নিমন্ত্রণ করেছি, আমার তো তা মনে হচ্ছে না?'

অরিন্দম সায় দিয়ে বললে, 'ঠিক বলেছেন। আমারও তা মনে হচ্ছে না।'

বিজনের দম যেন বন্ধ হয়ে এল রুদ্ধ ক্রোধে। তাদের কথাবার্তা অরিন্দম অন্তরালে থেকে কতখানি শুনেছে, সেটাও সে আন্দাজ করতে পারলে না। ক্রুদ্ধ হলেও তার মনে খানিকটা ভয় সঞ্চারও হল। অরিন্দমের দেহ চওড়ায় দোহারা না হলেও মাথায় সে ছয় ফুট দুই ইঞ্চি উঁচু এবং শরীরও তার রীতিমতো বলিষ্ঠ ও সুগঠিত। তার উপরে তার মুখের বেপরোয়া হাসি দেখলে মন ভীত না হয়ে পারে না। অবশেষে বিজন ধীরে ধীরে বললে, 'অরিন্দমবাবু, স্পষ্ট কথাই বলা ভালো। আপনার এই আকস্মিক আবির্ভাবটা সন্তোষজনক কি?'

অরিন্দম হাসতে হাসতে বললে, 'আমি ওকথা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না।'

পাশের একটা ছোটো টেবিলের উপরে সাজানো ছিল 'ডিকান্টার', সোডার বোতল ও কাচের গেলাস। সেইদিকে অগ্রসর হয়ে বিজন বললে, 'বেশ, যখন এসেছেনই, আমার অতিথি সৎকার করা উচিত। কিঞ্চিৎ হুইস্কি পান করবেন কি? আমি দেখাতে চাই, আপনাকে আমি শত্রু বলে মনে করি না।'

—'ধন্যবাদ। কিন্তু ও-হুইস্কির ভিতরে কী আছে, কে জানে? অপরিচিত জায়গায় কিছু পান করা আমি নিরাপদ বলে মনে করি না।'

—'বড়োই দুঃখের কথা অরিন্দমবাবু, আপনার এই সন্দেহ ভদ্রজনোচিত নয়।'

—'না। ভগবানকে ধন্যবাদ, আমি তথাকথিত ভদ্রলোক নই। তথাকথিত ভদ্রলোকরা হচ্ছেন অসহনীয় জীব। আমি শুনেছি, এখানে যে-কয়জন ভদ্রলোক থাকেন, তাঁরা আপনার মতো ভদ্রলোকের দিকে 'রায়বাহাদুর' উপাধি দেখেও আকৃষ্ট হতে চান না। কিন্তু আমি তাঁদের দলের লোক নই। আপনার সঙ্গে মেলামেলা করতে আমি একটুও আপত্তি করব না। আশা করি, ভবিষ্যতে আপনার সঙ্গে অনেকবার দেখাসাক্ষাৎ হবে। আমরা দু-জনেই পরস্পরের সঙ্গ অত্যন্ত উপভোগ করব। ইতি—শ্রীঅরিন্দম।'

—'তাহলে আমার আর কিছু বলবার নেই।' এই বলেই বিজন টেবিলের উপরের ঘণ্টাটা টিপে দিলে।

অরিন্দম যেখানে ছিল সেইখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মিনিটখানেক পরেই দরজা ঠেলে ঘরের ভিতর যে-লোকটা প্রবেশ করলে, তাকে দেখতে পেশাদার পালোয়ানের মতো।

বিজন বললে, 'অরিন্দমবাবুকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার দরজাটা দেখিয়ে দাও।'

অরিন্দম বললে, 'আপনার অতিথিসৎকারের পদ্ধতিটা চমৎকার বটে!' তারপর সকলের মনে বিস্ময় জাগিয়ে সে অত্যন্ত প্রশান্ত মুখেই সুড়সুড় করে আগন্তুকের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গেল।

এত সহজে যে অরিন্দমের কবল থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে, বিজন এটা ধারণাতেও আনতে পারেনি। অবহেলার হাসি হেসে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে সে বললে, 'এইসব ধাপ্পাবাজ কাপুরুষকে আমি খুব চিনি। নরম মাটি দেখলেই এদের মেজাজ গরম হয়ে ওঠে। হেঃ!'

সন্ধ্যা কিছু বললে না।

কিন্তু বিজনের আনন্দ স্থায়ী হল না। বাইরে থেকে এল যেন একটা ধস্তাধস্তির শব্দ। বিজন উৎকর্ণ হয়ে যখন দরজার দিকে তাকিয়ে আছে, সেই সময়ে অরিন্দম আবার বাগানের জানলার মধ্য দিয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করলে। বললে, 'আবার আমি নিজের বাসাতেই ফিরে এলুম বিজনবাবু।'

বিজন তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল হতভম্বের মতো।

তারপরেই ঘরের ভিতর আবার প্রবেশ করলে সেই পালোয়ানের মতন লোকটা। তখন তার চেহারার অল্প বিস্তর রূপান্তর ঘটেছে। তার রক্তাক্ত মুখ দেখলে মনে হয়, নাক-মুখ থুবড়ে সে পড়ে গিয়েছে কোনও কঠিন জায়গার উপরে এবং তার চোখ দুটোকেও তখন মনে হচ্ছিল না প্রেমিকের চোখ।

অরিন্দমের দিকে একটা বিষাক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিজনের দিকে ফিরে সে বললে, 'শুনুন হুজুর!'

অরিন্দম বললে, 'বিশেষ কোনও শ্রোতব্য কথা নেই বিজনবাবু! ওই লোকটা বাইরে গিয়ে আমাকে লাথি মারবার চেষ্টা করেছিল। সুখের বিষয়, না দুঃখের বিষয় বলব? সফল হয়নি তার চেষ্টা। পা তোলার সঙ্গে-সঙ্গেই নাকের উপর আমার একমাত্র ঘুসি খেয়ে তাকে হতে হয়েছে প্রপাত ধরণীতলে!'

অরিন্দমের শক্তি ও সাহস দেখে চমকিত হয়ে উঠল বিজনের মন। তার এই পালোয়ান-অনুচরের দেহ আয়তনে অরিন্দমের দ্বিগুণ। অথচ এত সহজে তাকে হার মানতে হয়েছে তার কাছে! সে ধীরে ধীরে বললে, 'তারপর অরিন্দমবাবু! আপনি এখানে আর কী কী কর্তব্যসাধন করতে এসেছেন?'

অরিন্দম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, 'কিছু না, কিছু না! আপনার অতিথিসৎকার উল্লেখযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। রাত ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। আমি এইবারে সন্ধ্যাদেবীকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিতে চাই।' সে সন্ধ্যাকে নিয়ে আবার বাগানের জানলার দিকে অগ্রসর হল! তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ফিরে বললে, 'বিজনবাবু, দেবিকাদেবী আপনার কাছ থেকে বাড়ি বাঁধা রেখে কিছু টাকা ধার করেছেন। কিন্তু কত টাকা!'

—'সে-কথায় আপনার দরকার কী?'

—'আপনি দলিল ফেরত দিন, আমি এখনই আপনাকে চেক লিখে দিচ্ছি।'

—'আমি নারাজ।'

—'উত্তম। আইন সম্বন্ধে আমার বেশি জ্ঞান নেই বটে, কিন্তু সহজ জ্ঞানে বলে, টাকা ফেরত পেলে আপনি কিছুই করতে পারেন না। আচ্ছা, আমার অ্যাটর্নির সঙ্গে পরামর্শ করে, আপনার কাছে একখানা চেক পাঠিয়ে দেব, তারপর কী হয় দেখা যাবে।'

অরিন্দম জানলার কাছে গিয়ে সন্ধ্যাকে ঠিক শিশুর মতো দুই বাহু ধরে তুলে নিয়ে বাগানের ভিতরে নামিয়ে দিলে। তারপর মুহূর্তে নিজেও লাফিয়ে পড়ল বাগানের ভিতরে—

—পরমুহূর্তেই শোনা গেল কয়েকটা প্রকাণ্ড কুকুরের বিকট চিৎকার!

সন্ধ্যা শিউরে উঠে বললে, 'সর্বনাশ! বিজনবাবুর কয়েকটা হিংস্র 'হাউন্ড' আছে! একবার তারা দু-জন চোরকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলেছিল! আজও আমাদের পেছনে তাদেরই লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে!'

চোখের পলক ফেলবার আগেই দুই হাতে সন্ধ্যাকে তুলে ধরে অরিন্দম আবার তাকে ঘরের ভিতরে স্থাপন করলে! তারপর নিজেও একলাফে ঘরের ভিতরে এসে জানলাটা সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে বললে, 'সন্ধ্যা, তুমি কি মেক্সিকোর ছোরা ছোড়ার খেলা দেখতে চাও? তাহলে আমার 'শ্রীমতী'কে বার করি!'

বিজনের হাতে তখন রয়েছে একটা ছোটো অটোমেটিক রিভলভার।

অরিন্দমের ডান হাত বিদ্যুৎবেগে স্পর্শ করলে বাম হাতকে। তারপরেই ঝকমক করে উঠল খাঁটি ইস্পাতে গড়া জ্বলন্ত 'শ্রীমতী'।

চতুর্থ

ঘটনার পর ঘটনা

বিজন তার রিভলভারটা তুলে ধরেনি। তার ডান হাতখানা ঝুলছিল জানুর পাশে এবং রিভলভারের মুখ ছিল কার্পেটের দিকে। অরিন্দমের মুখ দেখলে বোধ হয়, যেন সে একেবারেই অন্যমনস্ক। কিন্তু বিজন বেশ বুঝতে পারলে যে, এই অন্যমনস্কতা তার ভান ছাড়া আর কিছুই নয়। তার হাত এতটুকু নড়লেই ওই তীক্ষ্ণ ছোরাখানা তিরবেগে এসে পড়বে তার দেহের উপরে!

অরিন্দম বললে, 'রায়বাহাদুরের আর কি গল্প করবার সাধ নেই?'

বিজন নীরস কণ্ঠে বললে, 'আপনার হাতে ওই ছোরাখানা দেখবার পর কার গল্প করবার সাধ হয়?'

—'উত্তম, তাহলে একটা রফা করা যাক, আসুন। ডান হাতের আঙুলগুলো আলগা করে আপনি যদি রিভলভারটাকে কার্পেটের উপরে ফেলে দেন, তাহলে আমার 'শ্রীমতী'ও যথাস্থানে প্রবেশ করতে বিলম্ব করবে না!'

বিজন রিভলভারটাকে ত্যাগ করলে কক্ষতলে। অরিন্দম হেঁট হয়ে পড়ে ক্ষিপ্রহাতে সেটাকে তুলে নিয়ে নিজের পায়ের তলায় রেখে তার উপরে একটা পদ স্থাপন করলে এবং সঙ্গে সঙ্গে তারও ছোরাখানা যথাস্থানে খাপের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

তারপর সে ফিরে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে বললে, 'এখানকার দৃশ্যটা আপনার কাছে নিশ্চয়ই একঘেয়ে লাগছে? আপনি কি বাড়ি যেতে চান?'

সন্ধ্যা মাথা নেড়ে সায় দিলে।

—'বিজনবাবু সন্ধ্যাদেবী বাড়িতে যেতে চান।'

বিজন টেবিলের উপর থেকে সিগারের বাক্সটা তুলে নিয়ে বেছে বেছে একটা সিগার বার করলে। তারপর বাক্সটা আবার টেবিলের উপরে রেখে দিয়ে বললে, 'সন্ধ্যার এখন যাওয়া হতে পারে না। ওর সঙ্গে আমার কিছু পরামর্শ আছে।'

—'পরামর্শটা কালকের জন্যে অপেক্ষা করতে পারে তো?'

—'না, তা পারে না।'

দুই ভুরু সঙ্কুচিত করে বিজনের মুখের দিকে অরিন্দম তাকিয়ে রইল নীরবে কয়েক মুহূর্ত।

তারপর বিজনের রিভলভারটা পকেট থেকে বার করে এগিয়ে গিয়ে জানলাটা একটুখানি খুলে বললে, 'তাহলে রায়বাহাদুর, কাল সকালটা আপনাকে কাটাতে হবে তিন-চারটে দামি কুকুরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে করতে।'

বিজন অর্ধমুদ্রিত নেত্রে অল্পক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তার মুখ দেখলে মনে হয়, সে যেন কিছু শোনবার চেষ্টা করছে। তারপর সে ধীরে ধীরে বললে, 'অরিন্দমবাবু, আপনি একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই লক্ষ করেননি। ওই টেবিলের উপরে আছে একটা ইলেকট্রিক ঘণ্টার বোতাম। সিগারের বাক্সটা তার উপরে রেখে আমি এমনভাবে চাপ দিয়েছি যে, বাইরে যথাস্থানে হয়েছে ঘণ্টাধ্বনি। ওটা হচ্ছে আমার একটা সাংকেতিক আদেশ। এতক্ষণে আমার তিনজন লোক চারটে 'ব্লাড হাউন্ড' নিয়ে ওই বাগানের ভিতরে গিয়ে অপেক্ষা করছে। আর আরও দুজন লোক অপেক্ষা করছে এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পথে। কাল সকালে হয়তো আমাকে কোনও নির্বোধ অনাহুত অতিথির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।'

অরিন্দম বললে, 'উত্তম, উত্তম, উত্তম, উত্তম!'

রায়বাহাদুর বিজনকুমার এইবারে প্রফুল্লমুখে নিজের চেয়ারের উপরে গিয়ে জাঁকিয়ে বসে পড়ল। তারপর আর কোনওদিকে না তাকিয়ে নিজের মনেই সিগারের ধূম্র উদ্‌গিরণ করতে লাগল।

অরিন্দম মনে মনে বুঝলে, সমস্যা ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠছে। কিন্তু মুখে সে সহজ স্বরেই বললে, 'ধরুন রায়বাহাদুর, আমি যদি ভ্রমক্রমে এই রিভলভারের ঘোড়াটা হঠাৎ টিপে দি, আর সঙ্গে সঙ্গে আপনার হৃৎপিণ্ড যদি বিদীর্ণ হয়ে যায়, তাহলে সে অবস্থাটা আপনি কি অত্যন্ত উপভোগ করবেন?'

—'মোটেই নয়! কিন্তু আমার সে অবস্থা হলে আপনার কী দুরবস্থা হবে সেটা বুঝতে পারছেন কি? রিভলভারের আওয়াজ শুনলেই বাড়ির যত লোক কি হুড়মুড় করে এই ঘরে ঢুকে পড়বে না? তারপর?'

অরিন্দম মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললে, 'ঠিক কথা, তারপর? হুঁ, তারপরের অবস্থাটা আমার পক্ষে নিশ্চয়ই সন্তোষজনক হবে না?'

বিজন বললে, 'আরও একটা কথা জেনে রাখুন। আপনি যদি আমাকে খুন করে কোনওগতিকে এখান থেকে পালাতেও পারেন, তাহলেও আত্মরক্ষা করতে পারবেন না। আপনিই যে এখানে এসেছেন, সে-কথা বাড়ির আরও কোনও লোকও জানে। সুতরাং পুলিশকে আর ফাঁসিকাঠকে ফাঁকি দেবেন কেমন করে?'

—'রায়বাহাদুর, আপনার যুক্তি অকাট্য। অতএব আপাতত আমাকে নরহত্যার চেষ্টা ত্যাগ করতে হল। তবে আমাকে একটা কিছু করতে হবে তো, জানেন তো কাজ না থাকলে লোকে করে খুড়োর গঙ্গাযাত্রা। কিন্তু কী করি বলুন দেখি? আপনার এখানে রয়েছে অনেক ভালো ভালো ছবি, মূর্তি আর শিল্প নিদর্শন। আশা করি, কিছুক্ষণ ওইগুলোর উপরে দৃষ্টি চালনা করলে আপনি আমার উপরে ক্রুদ্ধ হবেন না?'

বিজন কোনও জবাব দিলে না, গুম হয়ে বসে সিগার টানতে লাগল।

অরিন্দম কিছুমাত্র ত্বরান্বিত না হয়ে ঘরের এদিকে-ওদিকে-সেদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কখনও

দেওয়ালের গায়ে টাঙানো কোনও ছবি দেখে। কখনও টেবিলের উপর থেকে একখানা মিনে করা থালা তুলে নেয়। কখনও পরীক্ষা করে এটা-ওটা-সেটা। এমনি ভাবে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সে বিজনের খুব কাছে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু বিজন তার দিকে ফিরেও তাকাল না। নিজের সম্বন্ধে সে এখন নিশ্চিন্ত। সে জানে, শত্রু এখন তার হাতের মুঠোর ভিতরে। শিকারি বিড়াল যখন ধৃত ইঁদুরকে নিয়ে খেলা করে, তার অবস্থা এখন তারই মতন। অরিন্দমকে সে হস্তগত করেছে, কিন্তু নিজে আছে তার নাগালের বাইরে। সে মাঝে মাঝে সিগার টানে এবং মাঝে মাঝে সিগারটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে।

বিজনের চেয়ারের উপরে হাত রেখে অরিন্দম বললে, 'বাঃ, এখানে এই ব্রোঞ্জের নারীমূর্তিটি তো খুব চমৎকার!' সে মুখে এই কথা বললে বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবছে কেবল মুক্তির উপায়! কেমন করে অভিমন্যুর মতন ধরা না পড়ে এই ব্যূহ ভেদ করে বাইরে চলে যাওয়া যায়? নানা পথের কথা তার মনে হচ্ছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখছে, সব পথই রুদ্ধ!

বিজন মুখ তুললে না। যেন অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে বাঁ হাতের নখগুলো পরীক্ষা করতে করতে বললে, 'অরিন্দমবাবু, ভাববেন না আপনাকে আমি তাড়া দিচ্ছি। কিন্তু রাত কি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে না? আপনাকে এখন কিছুদিন আমারই অতিথি হয়ে থাকতে হবে। এ-বিষয়ে আমি দৃঢ়সংকল্প। সুতরাং আজকের পালা আপাতত কি শেষ করে দেওয়াই উচিত নয়?'

অরিন্দম বললে, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! কিন্তু এই ব্রোঞ্জের মূর্তিটা আমার বড়ো পছন্দ হয়েছে। গরিব মানুষ, এমন-সব শিল্পের ঐশ্বর্য চোখেও দেখতে পাই না। এটিকে হাতে নিয়ে আমি যদি একটু পরীক্ষা করি, আপনার আপত্তি আছে কি?'

জামার হাতার উপরে খানিকটা সিগারের ছাই পড়ে গিয়েছিল, বিজন হেঁটমুখে ফুঁ দিয়ে ছাইগুলোকে উড়িয়ে দিতে দিতে বললে, 'আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু মনে রাখবেন, আমার এইবারে ঘুমোবার সময় হয়েছে।'

মূর্তিটা দেড় ফুটের বেশি নয়। সেটাকে ডান হাত দিয়ে তুলে নিয়ে অরিন্দম বললে, 'বেশ, আপনি ইচ্ছা করলে এখনই শুয়ে পড়তে পারেন!' সে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে ইশারা করলে জানলার দিকে যাবার জন্যে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রোঞ্জের সেই মূর্তিটা তুলে—সজোরে নয়—মারলে বিজনের মাথার উপরে। এবং সঙ্গে সঙ্গে একখানা চেয়ার তুলে মাথার উপরকার বৈদ্যুতিক বাতির ঝাড়ের উপরে এমনভাবে আঘাত করলে যে, সমস্ত ঘর পরিপূর্ণ হয়ে গেল নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে।

অরিন্দম অন্ধকারে নিম্নস্বরে ডাকলে, 'সন্ধ্যা!'

সন্ধ্যা একেবারে তার গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর চোখের নিমেষে জানলাটা খুলে সন্ধ্যাকে সে শিশুর মতোই কোলে তুলে নিলে এবং পরমুহূর্তে সেই অবস্থাতেই এক লাফ মেরে উদ্যানের ভিতরে অবতীর্ণ হয়েই তিরবেগে দৌড়তে লাগল।

খুব কাছেই বাগানের ভিতরে অপেক্ষা করছিল দু-জন লোক। কিন্তু এত অকস্মাৎ এবং এমন অস্বাভাবিক ভাবেই ঘটল এই ঘটনাটা যে, অরিন্দমকে তারা কোনওই বাধা দিতে পারলে না। তারা হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল চার-পাঁচ মুহূর্ত। তারপর বেগে ধাবমান হল অরিন্দমের পিছনে।

অরিন্দম প্রথমটা বাগানের পথ ধরেই ছুটছিল! তারপর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে সে হঠাৎ পথ ছেড়ে একটা ঝোপের ভিতরে গিয়ে ঢুকে পড়ল। সন্ধ্যাকে নামিয়ে দিয়ে চুপি চুপি বললে, 'একটুও নড়বেন না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন।'

চারিদিকে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার, চোখে বিশেষ কিছুই দেখা যায় না। তারপর দ্রুত পদশব্দ শুনে বোঝা গেল, অনুসরণকারীরা ঝোপ ছাড়িয়ে পথের উপর দিয়ে ছুটে গেল অন্যদিকে।

অরিন্দম ফিসফিস করে বললে, 'সন্ধ্যাদেবী, যেখান দিয়ে আমি বাগানের ভিতরে ঢুকেছি, ঠিক সামনেই আছে ওই জায়গাটা। আমি এখনই আপনাকে পাঁচিলের উপরে তুলে দিচ্ছি।'

—'কিন্তু পাঁচিলের উপরে আছে যে ভাঙা কাচ!'

—'কোনও ভয় নেই। পাঁচিলের উপরে আমার পুরু কোটটা পাট করে পেতে রেখেছি। কিন্তু উপরে উঠে আপনাকে গাছের ডাল ধরে নীচের দিকে ঝুলে পড়তে হবে, তারপর ডাল ছেড়ে লাফিয়ে পড়তে হবে মাটির উপরে। পারবেন?'

—'খুব পারব! কিন্তু আপনিও আসছেন তো?'

—'না। এখনও আমার কিছু কাজ বাকি আছে!'

—'আপনাকে এই ভয়ানক জায়গায় একলা ফেলে আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।'

—'এখন নির্বোধের মতন কথা কইবার সময় নয়। যে-কোনও মুহূর্তে ওরা এসে পড়তে পারে। আপনি এখানে থেকেও আমার কোনওই উপকার করতে পারবেন না। আর শুনুন। আপনার পিসিমাকে এসব কথা বলবার দরকার নেই। তবে এক ঘণ্টার মধ্যেও আমি যদি আপনার সঙ্গে দেখা না করি, তাহলে ডাঃ সেনের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে ঠিক এক ঘণ্টা। চলুন।'

অরিন্দম যথাস্থানে গিয়ে সন্ধ্যাকে আবার পুতুলের মতোই উপর দিকে তুলে ধরলে, সন্ধ্যা পাঁচিলের উপরে গিয়ে উবু হয়ে বসে পড়ল।

ঠিক সেই সময়েই খানিক দূরে শোনা গেল আবার কাদের পায়ের শব্দ।

অরিন্দম বললে, 'ঝুলে পড়ুন, ডাল ধরে ঝুলে পড়ুন, ওই ওরা আবার আসছে।'

সন্ধ্যাকে নিরাপদে পালাবার অবসর দেবার জন্যে, নিজের দিকে শত্রুদের মনোযোগ আকর্ষণ করে চিৎকার করে উঠল, 'চলে আয় বদমাইশরা, চলে আয়!'

প্রাচীরের উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সন্ধ্যার ছায়ামূর্তি।

অরিন্দম প্রাণপণে আর একদিকে দৌড়তে আরম্ভ করলে। তারপর আবার আর একটা ঝোপের ভিতর ঢুকে পড়ে নিজের মনেই সে বললে, 'আজ আমার বন্ধু হচ্ছে এই অন্ধকার আর ঝোপগুলো।'

আবার একাধিক দ্রুত পদধ্বনি সেই ঝোপটা পার হয়ে গেল। অরিন্দম বাইরে বেরিয়ে বাগানের ফটকের দিকে ছুটতে লাগল। এখানে আর তার কোনও কাজ নেই, বিপদ এখন নিশ্চয়ই সন্ধ্যার নাগাল ধরতে পারবে না। সে নিরাপদ।

অতর্কিতে তার দেহের সঙ্গে হল বিপরীত দিক থেকে ধাবমান আর একটা মূর্তির সংঘর্ষ। ধাক্কা খেয়ে লোকটা হল ভূতলশায়ী। সে সামলে ওঠবার আগেই অরিন্দম তার নাক মুখ চোঁখের উপর করল প্রচণ্ড গোটাকয়েক মুষ্ট্যাঘাত। তারপর তাকে দুই হাতে তুলে ধরে পথ থেকে সরিয়ে নিক্ষেপ করলে আর একদিকে। সেখানে ছিল বিলাতি 'ক্যাকটাস' জাতীয় কাঁটাগাছের ঝোপ, লোকটা হুড়মুড় করে তার উপরে গিয়ে পড়ে বিকট স্বরে আর্তনাদ করে উঠল।

এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর থেকে শোনা গেল রক্তপায়ী ভীষণ 'হাউন্ডে'র চিৎকার।

অরিন্দম বললে, 'জায়গাটা আমার পক্ষে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, আর এখানে থাকা নয়!' সে দৌড় মারলে বাগানের ফটকের দিকে।

ফটকের কাছে গিয়ে একটানে খুলে ফেললে অর্গল।

ফটকের দরজা টেনে খুলে ফেলতেই একটা শক্তিশালী টর্চের আলোকে তার চোখ যেন অন্ধ হয়ে গেল। দুই পা পিছিয়ে এসে সে দেখলে, তার দিকে রিভলভারের লক্ষ্য স্থির করে বাগানের ভিতরে প্রবেশ করলে আর এক মূর্তি!

সে হচ্ছে মদনলাল!

পঞ্চম

দেবিকা, মোহনলাল, ডাঃ সেন

প্রাচীরের উপর থেকে গাছের ডাল ধরে সন্ধ্যা খানিকটা নীচে ঝুলে পড়ল, তারপর নিজের 'হাই জাম্পে' অভ্যস্ত দেহ নিয়ে ভূমিতলে অবতীর্ণ হল অত্যন্ত অনায়াসেই। দ্রুতপদে দৌড়ে নিজের বাড়ির কাছাকাছি এসে আবার সে থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিজে নিরাপদ হয়ে আবার সে ভাবতে লাগল অরিন্দমের কথা। নির্বান্ধব শত্রুপুরী। নির্দয়, হিংস্র দুরাত্মার দল। রক্তপায়ী 'হাউন্ড'। এদের মধ্যে পড়ে অরিন্দমবাবুর অবস্থা না জানি এখন কতখানি অসহায় হয়ে উঠেছে! শিউরে শিউরে উঠতে লাগল তার মন।

কিন্তু এই অরিন্দমবাবুর আসল পরিচয়টা কী? তাঁর সম্বন্ধে নানা লোক বলে নানা কথা। সেসব কথা শুনলে বিপজ্জনক লোক বলে মনে হয় অরিন্দমবাবুকেও। কিন্তু তিনি শান্তশিষ্ট লোক না হতে পারেন, তবে তার পক্ষে যে উপকারী-বন্ধুর মতো, এ-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। তার সঙ্গে তিনি কোনওই আপত্তিকর ব্যবহার করেননি, বরং সমূহ বিপদ থেকে আজ তাকে উদ্ধার করেছেন। তাঁর কাছে তাকে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকতেই হবে।

চলতে চলতে এবং এইসব কথা ভাবতে ভাবতে সে নিজের বাড়ির সামনে এসে দেখে, ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেবিকা।

দেবিকা শুধোলেন, 'কে?'

সন্ধ্যা বললে, 'আমি পিসিমা!'

—'এসব কীসের গোলমাল শুনছি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি কিছু জানো?'

—'কী একটা ব্যাপার হয়েছে বটে।' বলতে বলতে সে বাগানের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। সেখানে একটা আলো জ্বলছিল। সেই আলোতে তার দিকে তাকিয়ে দেবিকা দেখলেন, সন্ধ্যার কাপড় গিয়েছে ছিঁড়ে এবং তার হাতের স্থানে স্থানে রয়েছে রক্তাক্ত আঁচড়ের দাগ।

সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেবিকা বললেন, 'এসব কী সন্ধ্যা? তুমি কি কারুর সঙ্গে মারামারি করে আসছ?'

সন্ধ্যা বাড়ির দিকে পদচারণা করতে করতে বললে, 'আপাতত আমি কিছুই বলতে পারব না। আমাকে খানিকক্ষণ ভাবতে দিন।'

সে বৈঠকখানাঘরে গিয়ে একখানা সোফার উপরে বসে পড়ল।

দেবিকা সন্দেহপূর্ণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজ তুমি রায়বাহাদুরের বাড়িতে গিয়েছিলে! রায়বাহাদুর আজ কি তোমার সঙ্গে কোনওরকম বাহাদুরি করেছেন?'

অধীর স্বরে সন্ধ্যা বললে, 'দোহাই পিসিমা, সেসব কিছুই নয়। দয়া করে আমাকে অল্পক্ষণ একটু একলা থাকতে দিন।'

দেবিকা কিন্তু নাছোড়বান্দা। সন্ধ্যার ঠিক সামনেই একখানা চেয়ারের উপরে নিজের অঙ্গভার ন্যস্ত করে স্তব্ধভাবেই তিনি তার দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন।

সন্ধ্যা বসে বসে ভাবতে লাগল, তার পিসি তো আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আসল কথা না শুনে কিছুতেই ছাড়বেন না। কিন্তু অরিন্দম যে তার মুখ বন্ধ করে রেখেছেন। পিসির কাছে তাঁর সম্বন্ধে কোনও কথাই বলতে মানা। সে তার পিসিকে খুব চেনে। সওয়াল জবাবে তার পিসি হচ্ছেন যে-কোনও উকিল ব্যারিস্টারের মতো। অরিন্দমের নাম লুকিয়ে কোনও কোনও সত্য কথা না বলে আর উপায় নেই।

দেবিকা গম্ভীর স্বরে শুধোলেন, 'তারপর?'

অবশেষে সন্ধ্যা বললে, 'তারপর ব্যাপার হচ্ছে এই! আজ বৈকালে বিজনবাবুর কাছ থেকে আমি একখানা চিঠি পাই। তাঁর ইচ্ছা, রাত্রেই সাড়ে আটটা নাগাদ কারুকে কিছু না বলে আমি যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। কৌতূহলী হয়ে আমি গিয়েছিলুম তাঁর কাছে। অনেকক্ষণ একথা-সেকথার পর তিনি বললেন, এ-বাড়ির 'মর্টগেজ' নাকি তাঁর হাতে। তাঁর কাছ থেকে আপনি নাকি অনেক টাকা ধার করেছেন, আবার আরও টাকা ধার করতে চান। কিন্তু তিনি আর এক টাকাও ধার দেবেন না, উলটে আগেকার টাকার জন্যে আপনার নামে নালিশ করবেন। পিসিমা, এসব কথা কি সত্য?'

কঠিন কণ্ঠে দেবিকা বললেন, 'হ্যাঁ, এসব সত্য কথা।'

সন্ধ্যা বললে, 'সে কী পিসিমা? বিজনবাবুর কাছ থেকে আপনার টাকা ধার করবার দরকার কী? আমি তো বরাবরই জানি, আমার বাবা আমার জন্যে প্রচুর সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন। তবুও আমার বাড়ি বাঁধা পড়ে কেন?'

ম্রিয়মাণ মুখে দেবিকা বললেন, 'বাছা, সে টাকায় আমাকে হাত দিতে হয়েছে।'

সন্ধ্যা বিপুল বিস্ময়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

ভাবহীন মুখে দেবিকা বললেন, 'আজ ছয় বছর ধরে ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করা হচ্ছে।'

—'কে এই কাজ করছে?'

—'সেটা জেনে তোমার কী হবে? তার চেয়ে আজ কী ঘটেছে তাই আমাকে বলো।'

এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে সন্ধ্যা বিপদসূচক কণ্ঠে বললে, 'সে-ক্ষেত্রে আপাতত আমি তোমাকে যা বলতে চাই, তাই শোনো। আমার কোনও কথা তোমাকে বলবার আগে তোমার কথা আমি শুনতে চাই। আমার বাবার যে-টাকা তোমার কাছে গচ্ছিত ছিল, তা নিয়ে তুমি কী করেছ? মাঝে মাঝে তুমি এখান থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে চলে যাও—কলকাতায় কি অন্য কোথায়, আমি তা জানি না।'

দেবিকা কর্কশ কণ্ঠে বললেন, 'থামো, থামো, আর কিছু বলতে হবে না।'

—'তাই নাকি?'

দেবিকা যদি তার কথা শুনে ভয় পেতেন কিংবা কেঁদে ফেলতেন, সন্ধ্যা নিশ্চয়ই তাহলে তাঁকে শান্ত করবার চেষ্টা করত। কিন্তু দেবিকা সেরকম দুর্বলতা কোনওদিন প্রকাশ করেননি, আজও করলেন না। অপরাধী হয়েও তাঁর এই বেপরোয়া ভাব অসহনীয়। তখনই নিশ্চয় একটা ঝড় উঠত,

কিন্তু বাধা পড়ল অকস্মাৎ। ঘরের বাইরে শোনা গেল মোহনলালের কণ্ঠস্বর, তারপরেই ঘরের ভিতরে সশরীরে তার আবির্ভাব।

মোহনলাল বললে, 'বটে, বটে, বটে! তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধের দুই যোদ্ধার মতো। হল কী, হল কী?'

সন্ধ্যা জোর করে মুখে হাসি এনে বললে, 'আধুনিক গোপাল ভাঁড়মশাই, কিছুই হয়নি, কিছুই হয়নি! কেবল আমাকে দেখে পিসিমার দুই চোখ ছানাবড়ার মতো হয়ে উঠেছে।'

মোহনলাল বললে, 'হতেই পারে, হতেই পারে! তোমাকে দেখে আমারও দুই চোখ রসগোল্লার আকার ধারণ করতে চাইছে!'

সন্ধ্যা বললে, 'ছানাবড়া আর রসগোল্লার কথা এখন থাক। কিন্তু এই অসময়ে আপনি এখানে এমন হন্তদন্তের মতন এসে হাজির হয়েছেন কেন?'

মস্ত একটা হাঁ করে সন্ধ্যার মুখের দিকে দু-তিন মুহূর্ত তাকিয়ে রইল মোহনলাল, তারপর বললে, 'তোমরা বুঝি কিছু শোনোনি? তা শুনবে কেমন করে? এখনও তো আসল কথা আমি তোমাদের বলিনি! তোমাদের ওই প্রতিবেশী রায়বাহাদুর বিজনকুমার গো! আমি খাওয়া-দাওয়ার পর একটু নৈশবায়ু ভক্ষণ করবার জন্যে বাইরে এসে পায়চারি করছিলুম, হঠাৎ রায়বাহাদুরের বাগানের ভিতরে উঠল মহা হই-চই। সশব্দে কারা ছুটোছুটি করছে আর গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠছে! আর সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো 'হাউন্ডে'র বিকট গর্জন! ব্যাপারখানা যে কী, কিছুই বুঝতে পারলুম না! হয়তো তোমরাও এইসব বেয়াড়া আর বেসুরো চ্যাঁচামেচি শুনতে পেয়েছ, এই ভেবে আমি তোমাদের এখানে ছুটে এসেছি। কিন্তু সন্ধ্যা, তোমার অবস্থা দেখে এখন আমার মনে হচ্ছে, তুমিও যেন আজকে কোনও চিত্তোত্তেজক নাটকে অভিনয় করে এসেছ। তাই নয় কি, তাই নয় কি?'

মোহনলালের এই আকস্মিক আবির্ভাবে সন্ধ্যা নিজেকে খানিকটা সামলে নেবার সুযোগ পেলে! মোহনলাল এক নির্বোধ ব্যক্তি, ভাঁড়ামি ছাড়া আর কিছুই জানে না, কিন্তু সে যে তাদের বন্ধু, এ-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। যে-কোনও একটা কথা বলে তার কৌতূহল চরিতার্থ করা খুবই সহজ। কিন্তু তার উপস্থিতিতে আজ সে আত্মসংবরণ করবার সুযোগ পেয়েছে, নইলে এখনই এখানে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারত।

সে বললে, 'বসুন মোহনলালবাবু। ভগবানের দোহাই, আমার দিকে এমন ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকবেন না। আজ এখানে কোনও অঘটনই ঘটেনি।'

মোহনলাল বললে, 'তাই নাকি, তাই নাকি? রায়বাহাদুরের ওখানে আজ যে-নাটকের অভিনয় হচ্ছে, তার কিছুই তুমি জানো না?'

সন্ধ্যা মাথা নেড়ে বললে, 'কিছুই জানি না! আমি সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলুম, হঠাৎ খেয়াল হল, একটা বালিয়াড়ির উপরে উঠতে হবে। কিন্তু খানিকটা ওঠবার পরই হঠাৎ পা ফসকে আমি পড়ে গেলুম, তারপর গড়াতে গড়াতে নীচে এসে পড়লুম। আমার বিশেষ কিছুই হয়নি, কেবল জামা কাপড় ছিঁড়ে আর হাত পা ছড়ে গিয়েছে।'

ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গিয়ে মোহনলাল পা ছড়িয়ে একটা সোফার উপরে হেলে পড়ল। তারপর বললে, 'বটে, বটে, বটে! তাহলে কোনও পাগলা আজ তোমার প্রেমে পড়েনি, তোমাকে হরণ করবার চেষ্টা করেনি?'

সন্ধ্যা বললে, 'নিশ্চয়ই নয়!'

মোহনলাল ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'তাই নাকি, তাই নাকি, তাই নাকি? বড়োই হতাশ হলুম, বড়োই হতাশ হলুম!'

দেবিকা এতক্ষণ গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে খানিক তফাতে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ তিনি সজাগ হয়ে বললেন, 'হয়েছে কী? এত গোলমাল কীসের?'

মোহনলাল তার চোখ থেকে 'মনক্‌ল'খানা খুলে রুমাল দিয়ে মার্জনা করতে করতে বললে, 'গোলমাল? গোলমাল নয় দেবিকাদেবী, হাটের হট্টগেল! রায়বাহাদুরের বাড়িতে। ঠিক বাড়িতে নয়, বাগানে। সেখানে বোধহয় আজকে একদল গুন্ডার 'গার্ডেন পার্টি'র আয়োজন হয়েছে। আপনি কি সে-খবর পাননি?'

তিক্তস্বরে দেবিকা বললেন, 'তোমাদের নির্বুদ্ধিতা আর আমি সহ্য করতে পারছি না! তোমাদের আজকের আচরণটা আমার কাছে বড়োই অদ্ভুত লাগছে। এতটা উত্তেজনার কারণ কী?'

—'কারণ কী, কারণ কী? শুনুন তাহলে—'

তপ্তকণ্ঠে দেবিকা বললেন, 'চুপ করো। তোমার কোনও কথাই আমি আর শুনতে চাই না। রাবিশ!'

—'বড়োই দুঃখিত হলুম, বড়োই দুঃখিত হলুম। আমি জানি, দেবিকাদেবী, আমার মগজে বুদ্ধিসুদ্ধি কিঞ্চিৎ অল্প, কাজেই রাবিশ ছাড়া আমি আর কিছুই বিতরণ করতে পারি না। আচ্ছা, আজ তাহলে বিদায় হই।' এই বলে ঘরের বাইরে চলে গেল মোহনলাল।

সন্ধ্যা মুখ ভার করে বললে, 'মোহনলালবাবুর সঙ্গে আজ তুমি বড়োই কর্কশ ব্যবহার করলে পিসিমা।'

দেবিকা বললেন, 'ভাঁড়ামি আমার ভালো লাগে না। তোমার বালিয়াড়ির উপর থেকে পড়ে যাওয়ার আজব গল্পটা কত সহজেই ও হজম করলে। ওর মাথায় যদি একটুও বুদ্ধি থাকত, তাহলে কাল তোমার কথা নিয়ে এখানে টিটিকার পড়ে যেত। এখন আসল ব্যাপারটা কী বলো তো!'

সন্ধ্যা নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে। একঘণ্টা পূর্ণ হতে এখন তিরিশ মিনিট দেরি। তারপর সে মুখ তুলে ধীরে ধীরে বললে, 'ব্যাপার এমন বিশেষ কিছুই নয়। বিজনবাবু আমাকে জানিয়েছেন, আমি তাঁকে বিবাহ না করলে টাকার জন্যে তিনি তোমার নামে নালিশ করবেন!'

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে দেবিকা বললেন, 'এই কথা সে বলেছে? শুয়োরের বাচ্চা!'

সন্ধ্যা সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'পিসিমা!'

—'থামো, থামো! শুয়োরের বাচ্চাকে অন্য কোনও নামে ডাকা যায়? তুমিও তাকে ওই কথাই বললে না কেন? তুমি কী বলেছ শুনি?'

—'বিজনবাবুর কথা শুনে আমার মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল! আমি তাঁকে কী বলব ভেবে ঠিক করতে পারিনি।'

—'তারপর?'

তারপর যা হয়েছিল তা বলতে গেলে অরিন্দমের কথা প্রকাশ করতে হয়। সন্ধ্যা বললে, 'পিসিমা, ওসব কথা এখন যেতে দাও। বিজনবাবুর কাছ থেকে তুমি টাকা ধার করেছ কেন, সেই কথাই আমি শুনতে চাই।'

বিরক্ত কণ্ঠে দেবিকা বললেন, 'সে কথা শুনে তোমার কী হবে?'

সন্ধ্যা দাঁত দিয়ে ওষ্ঠ দংশন করে বললে, 'কী রকম? তুমি আমার টাকা নষ্ট করেছ। তারপর আমার বাড়ি বাঁধা দিয়ে টাকা ধার করেছ। এর পরেও সমস্ত কথা শোনবার অধিকার কি আমার নেই?'

—'সেসব কথা শুনে তোমার কোনও লাভ হবে না।'

—'এখন বিজনবাবু, যদি বাড়িখানা কেড়ে নেন, তাহলে আমাদের কী অবস্থা হবে সেটা বুঝতে পারছ কি?'

পুরুষের মতো বক্ষে দুই হস্ত আবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে দেবিকা বললেন, 'অবস্থা বুঝে একটা কোনও ব্যবস্থা আমি করতে পারবই। তা নিয়ে তোমাকে বেশি মাথা ঘামাতে হবে না।'

রাগে ফুলতে ফুলতে সন্ধ্যা উঠে পড়ল এবং কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে ঘরের আর একদিকে গিয়ে দাঁড়াল।

দেবিকার সান্নিধ্য এখন তার কাছে আর প্রীতিকর নয়। মনে মনে সে অরিন্দমের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। নীরবতার ভিতর দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কাটল। তারপর সে আবার হাতঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করলে। একঘণ্টা পূর্ণ হতে এখনও পনেরো মিনিট বাকি।

এতক্ষণ পরে দেবিকা আবার কথা কইলেন। বললেন, 'আজ তোমার কী হয়েছে সন্ধ্যা? খালি খালি ঘড়ি দেখছ কেন?'

—'সময় দেখবার জন্যে!' সংক্ষিপ্ত জবাব দিলে সন্ধ্যা।

—'সময় দেখবার জন্যে তোমার এত আগ্রহ তো আর কখনও দেখিনি?'

—'এত ঘ্যানঘ্যানানি আমার আর ভালো লাগছে না পিসিমা, আমি নিজের ঘরে চললুম।' সে বাইরে বেরিয়ে গেল।

নিজের শোবার ঘরে ঢুকে সে অধীর ভাবে এদিকে-ওদিকে পায়চারি করতে লাগল এবং মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখতে লাগল জানলা দিয়ে বাইরের দিকে। খানিক তফাতে দেখা যাচ্ছে যেন কালি দিয়ে আঁকা বিজনবাবুর বাড়িখানা। কিন্তু সেদিক থেকে এখন আর কোনওই সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। আর-একটা জানলা দিয়ে দেখা যায়, ডাঃ সেনের বাংলোর কালো ছায়া। অন্ধকার ভেদ করে কিন্তু দেখা যাচ্ছে একটা আলোকোজ্জ্বল জানলা। তাহলে ডাঃ সেন এখনও জেগে আছেন। সন্ধ্যা স্থির করলে, বাকি সময়টা সে তাঁর সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে দেবে। ঠিক এক ঘণ্টা পরে অরিন্দমবাবু যদি এখানে এসে তাকে খুঁজে না পান, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আগে ডাঃ সেনের বাসাতে গিয়ে হাজির হবেন।

কিন্তু সে একটু ইতস্তত করতে লাগল। ডাঃ সেন অপরিচিত ব্যক্তি নন বটে, কিন্তু তাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ নয়! এত রাত্রে হঠাৎ তাকে দেখে তিনি কী মনে করবেন?

ঠিক সেই সময়েই সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শুনে সন্ধ্যা বুঝতে পারলে, তার পিসিমা উপরে উঠে আসছেন। পাছে আবার তাঁর পাল্লায় পড়তে হয়, সেই ভয়ে তার সমস্ত ইতস্তত ভাব ঘুচে গেল! বাড়ির পিছন দিকে আর একটা সিঁড়ি ছিল, সে পা টিপে টিপে এগিয়ে সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর নীচে নেমে বাগানের খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাত্রের ঠান্ডা হাওয়া তার উত্তপ্ত মস্তিষ্ককে খানিকটা স্নিগ্ধ করে তুললে। কিছুদূর অগ্রসর হয়েই পাওয়া গেল ডাঃ সেনের বাংলো। কড়া নাড়তেই ডাঃ সেন নিজে এসে দরজা খুলে দিলেন।

ঘরের ভিতর থেকে আলোকরেখা এসে পড়ল সন্ধ্যার মুখের উপরে। ডাঃ সেন সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'একী, সন্ধ্যাদেবী!'

সন্ধ্যা হেসে বললে, 'আমাকে দেখে আপনি বিরক্ত হলেন না তো? আমার মনটা আজ কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়েছে, তাই আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলুম। আমার উপস্থিতি আপনি সহ্য করতে পারবেন তো?'

ডাঃ সেন বললেন, 'আপনি এসেছেন, এটা তো আমার সৌভাগ্য! কিন্তু—কিন্তু, বাড়িতে আমি একেবারেই একলা।'

সকৌতুকে হেসে উঠে সন্ধ্যা বললে, 'ডাক্তাররা সকল সন্দেহের অতীত, নয় কি মিঃ সেন? আমি অঙ্গীকার করছি, আপনার সঙ্গে কোনও বাচালতাই করব না!'

ডাঃ সেন দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এখন যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালেন। সন্ধ্যা বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকল। তাকে নিয়ে একটা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে ডাঃ সেন একখানা চেয়ার টেনে এনে তার সামনে স্থাপন করলেন।

এ-কথা সে-কথার পর সন্ধ্যা হঠাৎ বললে, 'মিঃ সেন, শুনেছি আপনি একজন জীবতত্ত্ববিদ। মানুষদেরও নিয়ে আপনি তো গবেষণা করেন?'

—'মানুষও জীব। মানুষের কথা নিয়েও আমাকে মাথা ঘামাতে হয় বই কি!'

—'তাহলে বলুন দেখি, কমলপুরের এই নতুন আগন্তুক অরিন্দমবাবুর সম্বন্ধে আপনার ধারণা কী রকম?'

ডাঃ সেনের মুখে-চোখে একটা বিস্ময়ের ভাব জেগে উঠেই মিলিয়ে গেল। তারপর তিনি সহজ স্বরেই বললেন, 'অরিন্দমবাবু? জীবরাজ্যের একটি চিত্তাকর্ষক নমুনা। এখনও তাঁর সম্বন্ধে আমার মতামত নিশ্চিত ভাবে বলতে পারব না, কারণ তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে মাত্র একবার। তবে তিনি যে একজন অসাধারণ যুবক, আর তাঁর সঙ্গে আলাপ করে যে আনন্দ পাওয়া যায়, এ বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই।' বলতে বলতে হঠাৎ সে-প্রসঙ্গ থামিয়ে ডাঃ সেন বললেন, 'সন্ধ্যাদেবী, যদি ইচ্ছা করেন তো, আপনার জন্যে এখনই স্বহস্তে এক পেয়ালা চা তৈরি করে দিতে পারি।'

—'ধন্যবাদ! কিন্তু এত রাত্রে আর চায়ের দরকার নেই।... হ্যাঁ, মিঃ সেন—বলতে পারেন, এখানে অরিন্দমবাবুর কোনও বিপদের সম্ভাবনা আছে কি?'

ডাঃ সেন স্থির, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সন্ধ্যার মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর ধীরে ধীরে শুধোলেন, 'সন্ধ্যাদেবী, হঠাৎ ও-কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন বলুন দেখি!'

—'অরিন্দমবাবু নিজেই বারংবার ওই বিপদের কথা বলেন। এখানে নাকি তাঁর কোনও শত্রু আছে। আপনাকেও তিনি সে-কথা বলেননি কি?'

এইবারে ডাঃ সেন জাগ্রত হয়ে উঠলেন। তিনি কথা কইতে লাগলেন যেন অত্যন্ত সাবধানে! বললেন, 'হ্যাঁ, অরিন্দমবাবু মাঝে মাঝে কী সব বিপদের কথা বলেন বটে, কিন্তু তাঁর বিপদের কথা নিয়ে এখনও আমি মাথা ঘামাবার চেষ্টা করিনি, তবে একটা কথা আমার জিজ্ঞাস্য আছে। অরিন্দমবাবুর বিপদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী? তিনি কি আপনার বিশেষ বন্ধু?'

এইবারে সন্ধ্যাও কথা কইতে লাগল সাবধানে! বললে, 'অরিন্দমবাবুর সঙ্গে আমার নতুন পরিচয়। কিন্তু তাঁকে আমার ভালো লাগে।'

ডাঃ সেনের মুখের উপরে ফুটে উঠল একটা মৌন হাসির আভাস। তিনি দুইপদ এগিয়ে এসে সন্ধ্যার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সন্ধ্যাদেবী, রাগ করবেন না। আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, অরিন্দমবাবুকে আপনি কি ভালোবাসেন?'

সলজ্জভাবে মাথা নামিয়ে ফেললে সন্ধ্যা।

ডাঃ সেন বললেন, 'হয়তো আপনি তাঁকে সত্যিই ভালোবাসেন। হয়তো অরিন্দমবাবুও আপনার দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন। আপনি যদি তাঁর সত্যিকার বন্ধুই হন, তাহলে তাঁকে মানা করে দেবেন, তিনি যেন আর আগুন নিয়ে খেলা না করেন।'

সন্ধ্যা বললে, 'তাহলে তাঁর বিপদের সম্ভাবনা আছে!'

—'বিপদকে তিনি নিজেই ডেকে আনতে চান। আগুন নিয়ে খেলাই হচ্ছে বিপজ্জনক। আমি এর চেয়ে আর বেশি কিছু বলতে পারব না।'

সন্ধ্যা আবার তার হাতঘড়ির দিকে তাকালে। এক ঘণ্টা পূর্ণ হতে এখনও ছয় মিনিট দেরি।

ষষ্ঠ

কুকুর এবং মুগুর

আগে অরিন্দম এবং তার পিছনে পিছনে রিভলভারধারী মদনলাল। এইভাবে তারা আবার প্রবেশ করলে রায়বাহাদুর বিজনকুমারের বসবার ঘরে।

বিজন চেয়ারের উপরে বসে ছিল, তাদের দেখে উঠে দাঁড়াল।

অরিন্দম একগাল হেসে বললে, 'একরাত্রেই দুই-দুইবার রায়বাহাদুরের দর্শনলাভ? এ সৌভাগ্য অভাবিত! মাথাটা কেমন আছে মশাই? চিকিৎসার অতীত নয় তো?'

বিজন বললে, 'চিকিৎসার কথা পরে ভাবা যাবে। প্রবাদে আছে জানো তো?—চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত! এইবার তোমার পালা।'

অরিন্দম বললে, 'চমৎকার!' তারপর পিছনদিকে ফিরে দেখলে, মদনলাল তখনও রিভলভার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মতো। বললে, 'প্রিয় মদনলালবাবু, আমি অবশ্য আগেই জানতুম, রহস্য গভীরতর হয়ে উঠলেই আপনার দেখা পেতে বিলম্ব হবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, রহস্যটা কি এর মধ্যেই চরমে উঠেছে? না, আরও—'

বিজন বাধা দিয়ে বললে, 'তুমি মুখ বন্ধ করো অরিন্দম। তোমার মুখরতা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।'

অরিন্দম বললে, 'মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে কী মশাই? ধরতে গেলে আমি তো এখন শুরুই করিনি। এইবারে আমি একটি গল্প বলতে চাই। গল্পটা রায়বাহাদুরের কানে নতুন শোনাবে না বোধ হয়। আর মদনলালবাবুও আগেই তা শুনে ফেলেছেন। এক যে ছিল লোক, নাম তার সুখনলাল। সে ছিল এমন একজন লোকের দলভুক্ত, যাঁকে আমি বলি মহাত্মা কিন্তু লোকে বলে দুরাত্মা। সেই সুখনলাল বিশ্বাসঘাতক হয়ে পুলিশের কাছে দলপতিকে ধরিয়ে দিতে চায়। থানায় যাবার জন্যে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু থানায় না গিয়ে তাকে যেতে হল স্বর্গে বা নরকে। তার পরদিনেই রাজপথের উপর পাওয়া গেল তার মৃতদেহ, আর তার বক্ষে বিদ্ধ ছিল একখানা ছোরা। পুলিশ সেই দলপতির

নাম জানতে পারেনি বটে, কিন্তু আমি জানতে পেরেছি। গল্পটা কেমন লাগল মদনলালবাবু? যদি 'এঙ্কোর' দেন, তাহলে গল্পটা আমি আরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে পারি।'

বিজনের মুখখানা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ঘরের ভিতরে তখন সেই পালোয়ান এবং আরও দু-জন গুন্ডার মতন দেখতে লোক চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অরিন্দমের কথা শুনছিল।

মদনলাল বললে, 'রায়বাহাদুর, লোকটা হাঁড়ির খবর জানে। খুব সাবধান, আবার যেন ও হাত ফসকে চম্পট দিতে না পারে।'

—'আমাকে হাঁড়ির খবর পরিবেশন করেছে কে, জানেন মদনলালবাবু? সুখনলালের অন্তিমকালে আমি দৈবগতিকে ঘটনাস্থলে গিয়ে পড়ি। মরবার আগে সে আরও কী কী কথা আমাকে বলেছিল, এখানে তা জাহির করে লাভ নেই। কিন্তু তার শেষ কথা কী জানেন?— 'বাঘরাজ আছে কাঁথি জেলার কমলপুরে। সমুদ্রের কাছে সেই পুরোনো বাড়িতে—' এই পর্যন্ত বলেই সে মারা যায়। এখানে তো চার-পাঁচখানা পুরোনো বাড়ি আছে দেখছি। সুখন কোন বাড়িখানার কথা বলেছিল মদনলালবাবু?'

মদনলাল রিভলভার ভালো করে তুলে ধরে দাঁতে দাঁতে ঘষে বললে, 'এইবারে তোমার সব লীলাখেলা সাঙ্গ হোক।'

—'না!'

বিজন চিৎকার করে উঠে সামনের দিকে লাফিয়ে পড়ে মদনলালের রিভলভারসুদ্ধ হাত চেপে ধরে বললে, 'নির্বোধ! সন্ধ্যা এখানে এসেছিল, অরিন্দম তাকে এখান থেকে বাইরে নিয়ে গিয়েছে। একে যদি এখানে মেরে ফেলা হয়, তাহলে সে কি চুপ করে থাকবে? তুমি আমাদের সকলকার গলায় ফাঁসির দড়ি পরাতে চাও নাকি?'

প্রশংসাভরা কণ্ঠে অরিন্দম বললে, 'প্রিয় রায়বাহাদুর, আপনার যুক্তি অত্যন্ত অকাট্য।' প্রশান্তমুখে সে পিছনের টেবিলের উপরে বসে পড়ে নিশ্চিন্তভাবে নিজের পা দুটো দোলাতে লাগল।

বিজন বললে, 'এ আপদটাকে এমন উপায়ে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে, যাতে লোকে মনে করে দৈব-দুর্ঘটনা। মেয়েটার জন্যেই যত মুশকিল।'

মদনলাল বললে, 'মেয়েটারও মুখ বন্ধ করতে কতক্ষণ লাগবে?'

বিজন প্রায় গর্জন করে বললে, 'খবরদার, সন্ধ্যাকে নিয়ে তুমি মাথা ঘামিয়ো না। বড়োকর্তা এখন কোথায়?'

—'খানিক পরেই তাঁর আসবার কথা।'

অরিন্দম বললে, 'এ একটা সুসংবাদ! তাহলে এখানেই বাঘরাজের সঙ্গে দেখা করবার সৌভাগ্য আমার হবে? আপনারা জানেন না, মহামহিম বাঘরাজের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি কতখানি লালায়িত হয়ে আছি। কিন্তু তিনি পারদের মতো হাতের মুঠোর ভিতরে এসেও ধরা দেন না। তিনি থাকেন চোখের সামনে, কিন্তু তাঁকে চেনা যায় না।'

বিজন বললে, 'একেবারেই অত বেশি আশা কোরো না অরিন্দম। তবে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে হয়তো তুমি বাঘরাজের দেখা পেলেও পেতে পারো।'

অরিন্দম বললে, 'আপনার আশাকেও বেশি উচ্চগামী করবেন না রায়বাহাদুর! এ জীবনে বিপদকে নিয়ে আমি অনেক খেলা করেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে মারতে পারেনি। বাঘরাজকে দেখেও আমি বোধহয় এ বাড়ি থেকে সসম্মানে বিদায় নিতে পারব।'

বিজন ফিরে তার লোকজনদের হুকুম দিলে, 'এর জামাকাপড়ের ভিতরে অস্ত্রশস্ত্র কী পাওয়া যায় খুঁজে দেখ।'

অস্ত্রের মধ্যে পাওয়া গেল কেবল সেই ছোরাখানা এবং পকেটের ভিতরে পাওয়া গেল কেবল একটা দেশলাই ও একটা বড়ো সিগারেট কেস।

বিজন বললে, 'সিগারেট কেসটা অরিন্দমকে ফিরিয়ে দাও। অন্তিমকালে ধূমপানের আনন্দ থেকে ওকে বঞ্চিত করতে চাই না।'

অরিন্দম বললে, 'রায়বাহাদুরের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক!' এই সিগারেট কেসের ভিতরদিকে রীতিমতো একটু নুতনত্ব আছে। তার একটা দিক ক্ষুরের মতো ধারালো। কিন্তু সিগারেটের নীচে চাপা থাকে বলে সে অংশটা বাইরের কারুর চোখে পড়ে না।

বিজন ও মদনলাল খানিক তফাতে সরে গিয়ে ফিসফিস করে কী পরামর্শ করতে লাগল। তারা দুজনেই সশস্ত্র। পালোয়ান-অনুচরটা দাঁড়িয়ে আছে ঘর থেকে বেরুবার দরজার সামনে। সহজে তাকে আর দ্বিতীয়বার ফাঁকি দেওয়া চলবে না। আরও দুজন লোক পাহারা দিচ্ছে বাগানের দিকে বেরুবার জানলাগুলোর নিকটে। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে অরিন্দম বুঝলে আপাতত ঘর থেকে অদৃশ্য হবার সব পথই বন্ধ। কাজে-কাজেই সে নিশ্চেষ্টভাবে টেবিলের উপরে বসে নিজের মনে ধূমপান করতে লাগল।

এবং মাঝে মাঝে চেয়ে দেখতে লাগল নিজের হাতঘড়ির দিকে, সেটাও তার কাছ থেকে কেউ কেড়ে নেয়নি। সন্ধ্যা চলে যাবার পর আধঘণ্টা কেটে গিয়েছে। তাকে ডাঃ সেনের কাছে খবর দিতে বলে অরিন্দম খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। ডাঃ সেন হচ্ছেন একজন বিখ্যাত ডিটেকটিভ, বাঘরাজকে আবিষ্কার করবার জন্যে ছদ্মবেশে এখানে অবস্থান করছেন। তাঁর কাছে ঋণী হবার ইচ্ছা তার মোটেই নেই, তবে বিশেষ দায়ে পড়লে তাঁর সাহায্য ছাড়া উপায় কী? আর আধঘণ্টা! আর আধঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারলে সন্ধ্যা যাবে ডাঃ সেনের কাছে এবং ডাঃ সেন আসবেন বিজনের কাছে। আরও একজন এতক্ষণে নিশ্চয়ই তাকে চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে হচ্ছে রামফল, হাতে আছে যার প্রকাণ্ড পিস্তল!

হঠাৎ অরিন্দমের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। বাড়ির ভিতর দিকে কোথা থেকে আসছে যেন অতি মৃদু ঘণ্টাধ্বনি। তার একটু পরেই ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল একজন লোক। সে বিজনের কাছে গিয়ে তার কানে কানে কী বললে এবং বিজনও শশব্যস্ত হয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

মদনলাল পায়ে পায়ে অরিন্দমের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অরিন্দম হাসতে হাসতে বললে, 'বুঝতে পারছি মদনলালবাবু, এক এবং অদ্বিতীয় বাঘরাজ এইবারে এই বাড়ির ভিতরে পদার্পণ করেছেন।'

অরিন্দমের আপাদমস্তকের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মদনলাল বললে, 'তুমি যে আমাদের কী জ্বালাতন করেছ, তুমি তা নিজেই বোধহয় জানো না। তোমার ভাগ্য খুব ভালো বটে, কিন্তু মনে রেখো, সৌভাগ্য চিরদিন স্থায়ী হয় না!'

—'ঠিক বলেছেন মদনলালবাবু। সৌভাগ্য অস্থায়ী। আপনার সৌভাগ্যক্রমে ব্যাংক এখনও আপনাদের নাগাল পায়নি। কিন্তু এ সৌভাগ্য আরও কতদিন স্থায়ী হবে বলে মনে করেন? শেষ পর্যন্ত ব্যাংকই কি জিততে পারবে না?'

মদনলাল স্থিরভাবেই দাঁড়িয়ে রইল বটে, কিন্তু অরিন্দমের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তার চক্ষে দেখলে ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎ চমক! অর্ধ-স্বগত স্বরে মদনলাল বললে, 'ব্যাংকের কথাও সুখনই বলেছে নিশ্চয়?'

—'নিশ্চয়, নিশ্চয়! আমি সব কথাই জানি! জানি না কেবল দুটি প্রশ্নের উত্তর। কে বাঘরাজ? তার লুটপাট, রাহাজানির টাকা কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে? তবে এ-দুটো প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাকে আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না বোধহয়।'

মদনলাল বললে, 'ওঃ, নিজের উপরে তোমার দেখছি অটল বিশ্বাস!'

স্বপ্নালসচক্ষে যেন নিজের মনেই অরিন্দম বললে, 'কোনও কালে, কোনও জায়গায় কোনও একখানা স্টিমার বহু লক্ষ টাকার সোনার বার নিয়ে মাশুল ফাঁকি দেবার জন্যে গোপনে ঘাটের কাছে এসে আর-একখানা স্টিমারের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ডুবে যায় কোনও ঝড়ের রাতে নির্জন সমুদ্রতীরে। দুর্ঘটনার কথা জানাজানি হবার আগেই রাতারাতি কয়েক ব্যক্তি একদল ডুবুরির সাহায্যে সেই সোনার বারগুলো উদ্ধার করে। কে তারা? বাঘরাজ, রায়বাহাদুর, না মদনলালবাবু? সেই সোনার থানগুলো গোপন করে রাখা হয়েছে কোথায়?'

মদনলাল বললে, 'এত সব দুশ্চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে এখনও তুমি যে বুড়িয়ে যাওনি, এইটেই হচ্ছে আশ্চর্য।' এই বলে সে বিরক্তমুখে খানিক তফাতে গিয়ে একখানা সোফার উপরে বসে পড়ল।

তারপরেই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে বিজনকুমার। সে মদনলালের পাশের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ে অত্যন্ত নিম্নস্বরে কী বলতে লাগল, তার কিছুই শোনা গেল না! কেবল তার শেষ কথাটা অরিন্দমের কানে এল—'বাঘরাজের হুকুম, ওকে মুক্তি দিতে হবে।' সঙ্গে-সঙ্গেই মদনলাল চিৎকার করে উঠল ক্রুদ্ধস্বরে।

অরিন্দম সবিস্ময়ে ভাবলে, এ আবার কী কথা? এত খবর সে রাখে, এত উপদ্রব সে করেছে, আর এত কাঠখড় পুড়িয়ে ওরা তাকে শেষকালে ছেড়ে দিতে চায়? কিন্তু কেন, কেন, কেন? এখানে লুকিয়ে আছে কী আশ্চর্য রহস্য? কিছুই আন্দাজ করতে না পেরে অরিন্দমের মাথা যেন ঘুরতে লাগল।

বিজন অরিন্দমের সামনে এসে বললে, 'অরিন্দম, রাত ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। আর উৎসব করা চলে না। এখন তুমি বাসায় ফিরে যেতে পারো।'

—'তার মানে?'

—'তার মানে হচ্ছে, তুমি এখন স্বাধীন, যেখানে খুশি যেতে পারো।'

বিজন খুব শান্ত ও সহজ স্বরেই কথা কইছিল বটে, কিন্তু অরিন্দম লক্ষ করলে, তার চক্ষে জ্বলছে নিষ্ঠুর হিংসার আগুন! বেশ বোঝা যায়, বাধ্য হয়ে সে আর কারও হুকুম তামিল করছে বটে, কিন্তু তার মনের ইচ্ছা সম্পূর্ণ অন্যরকম। আর কিছু বোঝবার চেষ্টা না করে অরিন্দম বললে, 'বেশ, আপনারা যখন আমাকে তাড়িয়ে দিতে চান, তখন আমার 'শ্রীমতী'কেও ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।'

বিজন হতভম্বের মতন বললে, ''শ্রীমতী' আবার কে?'

অরিন্দম এগিয়ে গিয়ে একটা টেবিলের উপর থেকে তার প্রিয় ছোরাখানা তুলে নিয়ে বললে, 'এরই নাম রেখেছি আমি 'শ্রীমতী'।' বলতে বলতে ছোরাখানা আবার হাতে বাঁধা খাপের ভিতর পুরে ফেললে। তারপর আবার বললে, 'রায়বাহাদুর, আপনার আতিথেয়তাকে ধন্যবাদ! আজ খানিকটা সময় এখানে এসে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে কাটিয়ে দেওয়া গেল।'

বিজন চেষ্টা করে সহজ স্বরে বললে, 'অরিন্দম, আর এখানে দাঁড়িয়ে বকবক কোরো না। তোমার সৌভাগ্য এবারও তোমাকে ত্যাগ করলে না, কিন্তু এর পরে হয়তো ভাগ্যবিপর্যয় হতে পারে। অতএব তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে পড়ো, নইলে, হয়তো আমরা মত পরিবর্তন করব।'

অরিন্দম বললে, 'মত? কোনও মত নেই আপনাদের! তবলচি যে তালে তবলা বাজায় আপনারা নাচেন সেই তালেই। আপনারা নাচছেন বাঘরাজের কথায়, তা কি আমি বুঝতে পারিনি? অথবা এও হতে পারে আপনারা আমার রামফলের কথা ভেবে সাবধান হয়েছেন। সে হচ্ছে ভয়াবহ মানুষ। জাগ্রত হলে শয়তানও তাকে দেখে ভয় পাবে।'

মদনলাল বললে, 'কিন্তু আমরা শয়তান নই।'

—'হ্যাঁ, আপনারা অভিনয় করছেন ভগবানের ভূমিকায়! যাক, সে কথা। কিন্তু আমি যদি এখন থানায় গিয়ে খবর দিই?'

বিজন একটা চুরুট ধরিয়ে বললে, 'অরিন্দম, তুমি—'

অরিন্দম মেঝের উপরে সশব্দে পদাঘাত করে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'অরিন্দম কী, বলুন অরিন্দমবাবু! আমি তো আপনাদের অসম্মান দেখাচ্ছি না! ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রলোকের মতো কথা বলুন!'

—'বেশ অরিন্দমবাবু, আপনি যে পুলিশে খবর দেবেন না, আমি তা জানি। আমরা সবাই হচ্ছি খেলোয়াড়। খেলোয়াড়ের মনোবৃত্তি যে আপনার ভিতর আছে, এটা জেনেই আপনাকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে! তার উপরে বহু লক্ষ টাকার লোভ! এর মধ্যে পুলিশ এলে আপনারও বিপদ, আমাদেরও বিপদ।'

অরিন্দম বললে, 'হুঁ! দেখছি আপনার ভিতরে পাকা খেলোয়াড়ের লক্ষণ আছে।'

—'আশা করি খেলাটা হবে আপনার মনের মতো।'

—'নিশ্চয়, নিশ্চয়! আলবত! আপাতত আপনি নির্ভাবনায় ঘুমোতে যেতে পারেন। আর বাঘরাজকে আমার নমস্কার জানিয়ে বলবেন, তাঁর দেখা না পেয়ে আমি বড়োই দুঃখিত হলুম।' অরিন্দম কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে থেমে দাঁড়িয়ে পড়ে আবার বললে, 'হ্যাঁ, ভালো কথা! আমি সুখনলালের কথা ভাবছি। তার মৃত্যুর জন্যে একজন কারুকে ফাঁসি যেতে তো হবেই। যত দোষ বাঘরাজের ঘাড়ে চাপাতে চেষ্টা করবেন, নইলে তাঁর বদলে আপনাকেই হয়তো ফাঁসিকাঠে দোল খেতে হবে।'

বিজন বললে, 'আপনার ভয় নেই, আমরা খুব সাবধানেই থাকব।'

অরিন্দম বললে, 'চমৎকার, চমৎকার! আচ্ছা, বিদায় হলুম বন্ধু! ভালো করে ঘুমোবেন, আর ভালো ভালো স্বপ্ন দেখবেন। আমি কিন্তু ওই জানলা দিয়েই বাইরে যাব।'

বাড়ির ভিতর দিকে আনাচে-কানাচে কোনও উৎপাত লুকিয়ে থাকতে পারে, হঠাৎ আলো নিবে যেতে পারে, তারপর আরও যে কী হতে পারে, বলা তো যায় না।

বিজন বললে, 'দাঁড়ান, অরিন্দমবাবু। যাবার আগে একটা কথা শুনে যান।'

—'আজ্ঞা হোক।'

—'বাগানের ভিতরে গিয়ে ঝোপে ঝোপে লুকিয়ে আর অপেক্ষা করবেন না। ঠান্ডা লাগবার ভয় আছে। নিউমোনিয়া হবার সম্ভাবনা আছে। অপেক্ষা করা বৃথা। বাঘরাজ সত্যি- সত্যিই এখান থেকে চলে গিয়েছে।'

—'ধন্যবাদ। তাহলে নিশ্চয়ই আমি আর অপেক্ষা করব না। আর এখানকারও কেউ যেন

অকারণে পায়ে ব্যথা করে আমার বাড়ির কাছে বেড়াতে না যায়। কারণ আমি আর রামফল, রামফল আর আমি সারারাতেই পালা করে পাহারা দিই। সুতরাং সেখানে অতর্কিত আক্রমণের চেষ্টা বৃথা। নমস্কার।' জানলার ভিতর দিয়ে একটা লাফ মেরে সে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। যে উপায়ে বাগানের ভিতরে ঢুকেছিল, অরিন্দম সেই উপায়েই আবার বাগানের বাইরে গিয়ে পড়ল। বলা বাহুল্য, প্রাচীরের উপর থেকে সে নিজের কোটটাও সংগ্রহ করতে ভুলল না। তারপর সে একবার এগিয়ে যায়, আবার দাঁড়িয়ে পড়ে এবং অন্ধকারের মধ্যে সামনে ও পিছনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সঞ্চালন করে দেখবার চেষ্টা করে, এদিকে-ওদিকে কোনও শত্রুর অস্তিত্ব আছে কি না। এমন কোনও ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয়, যার ফলে কাল-সকালে এখানে পড়ে থাকতে পারে তার আড়ষ্ট মৃতদেহটা এবং যে দেহ দর্শন করে করোনার মত প্রকাশ করবেন যে, অরিন্দমের মৃত্যু হয়েছে কোনও দৈব-দুর্ঘটনায়।

কিন্তু কোনও বিপজ্জনক ঘটনা ঘটবার লক্ষণ দেখা গেল না। শান্তিপূর্ণ স্তব্ধ রাত্রি, কোথাও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ বা চিহ্নমাত্র নেই।

অবশেষে সে বিজনের বাড়ি থেকে নিরাপদ ব্যবধানে গিয়ে পড়ল।

অরিন্দম নিজের মনেই সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'আজব কাণ্ড, অভাবিত ব্যাপার! ওরা হাতে পেয়েও আমাকে ছেড়ে দিলে কেন? বিজনের বাড়ির ভিতরে আমাকে হত্যা করলে ওদের কুড়ুল মারতে হত নিজেদের পায়েই। কিন্তু বাড়ির বাইরেও অন্ধকার রাত্রে আমাকে একলা পেয়েও আমার প্রতি শত্রুদের এই আশ্চর্য উদাসীনতার কারণ কী? এর মধ্যে কি নতুন কোনও শয়তানি থাকতে পারে?'

আরও কিছুদূর এগিয়ে গিয়েই অরিন্দম দেখতে পেলে, ডাঃ সেনের বাংলোয় একটা ঘরে জ্বলছে উজ্জ্বল আলো। সে বাংলোর দরজার কাছে গিয়ে সজোরে কড়া নাড়তে লাগল।

সপ্তম

নূতন শয়তানি

ডাঃ সেন দরজা খুলে দিতেই অরিন্দম ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল বিনাবাক্যব্যয়ে।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে ডাঃ সেনের চক্ষে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল একটা বিস্ময়ের চমক। তিনি বললেন, 'অরিন্দমবাবু, আপনাকে এখানে দেখবার প্রত্যাশা আমি করিনি। আজ যা প্রত্যাশা করা যায় না, বারবার ঘটছে সেই রকম ঘটনাই। ইতিমধ্যেই এখানে এসেছেন আর-একজন অপ্রত্যাশিত অতিথি।'

অরিন্দম বললে, 'বড়োই তেষ্টা পেয়েছে মিঃ সেন! আপনার এখানে লেমনেড কি আইসক্রিম সোডা পাওয়া যেতে পারে?'

—'নিশ্চয়। আরও বেশি কিছু পাওয়া যেতে পারে। বিয়ার, হুইস্কি, ব্র্যান্ডি চাইলেও আমি জোগান দিতে পারি। কার কখন কী দরকার হয় বলা তো যায় না।'

ডাঃ সেনের কথা শুনতে শুনতে অরিন্দম এগিয়ে গিয়ে তাঁর বৈঠকখানা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে। তারপর বলে উঠল, 'একী, সন্ধ্যাদেবী? আপনিও এখানে? আপনার কোনও অসুখ করেছে নাকি, তাই ডাঃ সেনের কাছে 'প্রেসক্রিপশান' লিখে নিয়ে যেতে এসেছেন?'

সন্ধ্যা কিছু বলবার আগেই ডাঃ সেন বললেন, 'সন্ধ্যাদেবীর অসুখ-বিসুখ কিছুই করেনি। উনি আমার সঙ্গে খানিকক্ষণ আলাপ করবার জন্যে এসেছেন।'

—'না, না! সন্ধ্যাদেবী, আপনি কি—'

ডাঃ সেন উচ্চকণ্ঠে জোর দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ। উনি খানিকটা গল্প-স্বল্প করতে এসেছেন।'

—'উত্তম, উত্তম! সন্ধ্যাদেবী, এর পরেও আমার আর-কিছু জিজ্ঞাস্য থাকতে পারে না, কী বলেন?'

সন্ধ্যা তার মুখের দিকে তাকিয়েই বেশ বুঝতে পারলে, অরিন্দম জানতে চাইছে যে, হাঁড়ির খবর কতখানি সে প্রকাশ করে ফেলেছে? অল্প একটু মাথা নেড়ে সে বললে, 'আপনার আসতে যদি আর দু-এক মিনিট দেরি হত—'

বাধা দিয়ে অরিন্দম বলে উঠল, 'হ্যাঁ, বুঝেছি, বুঝেছি! থাক, আর কিছু বলতে হবে না।'

ডাঃ সেন অরিন্দমের পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি কোনও যুদ্ধের পরে ভগ্নদূতের ভূমিকায় অভিনয় করতে এসেছেন। খালি আপনি নন, সন্ধ্যাদেবীকে দেখেও আমার সেই কথাই মনে হচ্ছে।'

অরিন্দম দুই ভুরু তুলে বললে, 'সন্ধ্যাদেবীর মুখে কি আপনি কিছুই শোনেননি?'

ডাঃ সেন বললেন, 'না, ওঁকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা আমার হয়নি। উনি যখন এখানে এলেন, আমি ভেবেছিলুম, আমাকে কোনও রোগের নিদান দেখতে হবে। কিন্তু সন্ধ্যাদেবী বললেন, উনি এসেছেন আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে। আমাকে সেই কথাই বিশ্বাস করতে হল। যদিও সন্ধ্যাদেবীর মুখ দেখে আমার সন্দেহ হল যে, সাধারণ গল্পের চেয়েও উনি যেন আমাকে আরও বেশি কিছু বলতে চান। তারপরেই আপনার এই অভাবিত আবির্ভাব।'

অরিন্দম আশ্বস্ত হয়ে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'তারপর সন্ধ্যাদেবী, আপনি এখানে গল্প করতে এসেছেন? আপনার শ্রোতার সংখ্যা আর-একজন বাড়ল। নিন, এখন যত খুশি গল্প করুন।'

সন্ধ্যা তখন একটু ধাঁধায় পড়ে গেল। সে ভেবেছিল, ডাঃ সেন আর অরিন্দমবাবু হচ্ছেন দুজনেই দুজনের বন্ধু। কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে, এঁরা দুজনেই যেন দুজনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে চান। ডাঃ সেনের দিকে সে তাকিয়ে দেখলে। তাঁর মুখের ভাব বিশেষ প্রসন্ন নয়।

অরিন্দম ডাঃ সেনকে যেন অধিকতর উত্ত্যক্ত করবার জন্যেই বললে, 'মিঃ সেন, আপনার কি কৌতূহল হচ্ছে? আমি কি সব কথা বলব?'

—'বলুন।'

দুষ্টামি-ভরা চোখে ডাঃ সেনের দিকে তাকিয়ে অরিন্দম বললে, 'ব্যাপারটা কী জানেন? ব্যাপারটা হচ্ছে এই—'

কৌতূহলী ডাঃ সেন আরও কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন।

হঠাৎ শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজের মাথা চুলকোতে চুলকোতে অরিন্দম বললে, 'ব্যাপার হচ্ছে— ধেৎ। প্রিয় মিঃ সেন, বিশ্বাস করবেন কি? সমস্ত ব্যাপারটাই আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছি! মজার কথা, নয়?'

ডাঃ সেনের মুখ দেখে বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল যে অরিন্দমের এই কৌতুকাভিনয়ের মধ্যে তিনি মজা খুঁজে পাননি কিছুমাত্র।

সন্ধ্যা এইবার মুখ খুললে। বললে, 'ব্যাপারটা কী জানেন মিঃ সেন? অরিন্দমবাবুর সঙ্গে আজ প্রায় সারা সন্ধ্যাটাই কাটিয়ে দিয়েছি। সমুদ্রের ধারে বালিয়াড়ির উপরে গিয়ে উঠে—'

অরিন্দম বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'করেন কী, করেন কী সন্ধ্যাদেবী? শেষটা কি হাটের মাঝে হাঁড়ি ভেঙে ফেলবেন?'

ডাঃ সেন ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'ধেৎ, আমি আর কোনও কথাই শুনতে চাই না।'

অরিন্দম বললে, 'মিঃ সেন, আমি বোধহয় আপনাকে বড়ো বেশি জ্বালাতন করছি? কিন্তু এজন্যে আপনিই তো দায়ী। আপনি যেভাবে সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে আমার দিকে বারবার তাকাচ্ছেন, তাতে মনে হয় আপনি যেন ভাবছেন যে, হয় আমি কারুকে খুন, নয় ডাকঘরের টাকা লুট করে আসছি। কিন্তু সেসব কিছুই নয়। সন্ধ্যাদেবী আর আমি বালিয়াড়ির উপরে গিয়ে উঠেছিলুম, তারপর—'

সন্ধ্যা বললে, 'তারপর? আমি হঠাৎ পা ফসকে গড়িয়ে নীচে পড়ে যাই। আমার বেশি কিছু লাগেনি। কিন্তু একটা বেয়াড়া গর্তের ভিতর থেকে আমাকে উপরে টেনে তোলবার সময়ে অরিন্দমবাবুকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে।'

দুই ভুরু সঙ্কুচিত করে ডাঃ সেন কেবল বললেন, 'হুঁ।' তিনি শিশু নন, এত সহজে এই আজব কাহিনিটা তিনি যে হজম করতে পারবেন না, এটা তাঁর মুখ দেখেই বেশ বোঝা গেল।

আচম্বিতে সদর দরজার উপরে দুমদুম করে করাঘাত হতে লাগল।

অরিন্দম বললে, 'মিঃ সেন, আপনি দেখছি অত্যন্ত জনপ্রিয়। এত রাত্রে আবার কোন অতিথি এসেছে? কারুর কি অন্তিমকাল উপস্থিত হয়েছে? কেউ কি সন্তান প্রসব করবে?'

—'আমি কেমন করে জানব?' বলতে বলতে ডাঃ সেন বেরিয়ে গেলেন।

দরজা খোলার শব্দ হল। উচ্চকণ্ঠে কে শুধোলে, 'অরিন্দমবাবু এখানে আছেন কি?'

তারপরই শোনা গেল ভারী ভারী পায়ের শব্দ। তারপর ঘরের দরজার কাছে যে-মূর্তিকে দেখা গেল, তাকে চৌকিদার বলে চিনতে একটুও বিলম্ব হয় না।

অরিন্দমের মুখের দিকে তাকিয়ে চৌকিদার বলে উঠল, 'হ্যাঁ, এই তো আসামি! আমি ওকে চিনি।'

বলতে বলতে সে ঘরের ভিতর ঢুকে অরিন্দমের কাছে গিয়ে তার একটা কাঁধ চেপে ধরে বললে, 'আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করলুম।'

কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে অরিন্দম শান্তভাবেই জিজ্ঞাসা করলে, 'কী কারণে?'

—'চুরি আর মারপিটের জন্যে।'

—'বাপু চৌকিদার, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমার নামে নালিশ করেছে কে?'

ঘরের ভিতরে আবির্ভূত হয়ে মদনলাল বললে, 'আমি। মিঃ সেন, এই আকস্মিক উপস্থিতির জন্যে আপনি আমাদের ক্ষমা করবেন।'

ডাঃ সেন বললেন, 'কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।'

মদনলাল বললে, 'ব্যাপারটা হচ্ছে ওই। আজ রাত প্রায় এগারোটার সময় নীচের ঘরে বসে আমি বই পড়ছিলুম। হঠাৎ ঘরের ভিতরে দেখতে পেলুম অরিন্দম নামে এই লোকটাকে, ওর হাতে ছিল একটা রিভলভার। সে আমাকে শাসিয়ে কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই আমি ওর উপরে লাফিয়ে পড়লুম। অরিন্দম বলবান ব্যক্তি, সহজেই সে আমাকে কাবু করে ফেলে আমার মাথার উপরে রিভলভারের হাতল দিয়ে জোরে আঘাত করলে। আমি অজ্ঞান হয়ে মেঝের উপরে পড়ে

যাই। জ্ঞান হবার পর দেখি অরিন্দম ঘরের চারিদিকে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। রিভলভারের ভয়ে আমি অজ্ঞান হয়ে থাকবার ভান করি। তারপর অরিন্দমের ভাব দেখে মনে হল, যার লোভে আমার বাড়িতে এসেছিল, তা সে খুঁজে পায়নি। অবশেষে সে যখন বাইরে বেরিয়ে গেল, আমি চুপিচুপি তার পিছু নিই। তারপর তাকে এই বাড়িতে ঢুকতে দেখে আমি থানায় গিয়ে খবর দিয়েছি। এই হল প্রকৃত ঘটনা।'

লাঠিটা মেঝের উপরে ঠুকে এবং অরিন্দমের কাঁধ ধরে আরও জোরে চেপে ধরে চৌকিদার বললে, 'লক্ষ্মীছেলের মতন থানায় চলো, নইলে মজাটা টের পাবে এখনই।'

অরিন্দম মৃদুকণ্ঠে বললে, 'বাহবা, কী বাহবা! এইবারে আমার জামাকাপড় খুঁজে দেখা হোক, আমার কাছে কোনও রিভলভার আছে কি না।'

মদনলাল হেসে উঠে বললে, 'তুমি ভুলে সেটা আমার ঘরেই ফেলে এসেছিলে। এই দ্যাখো, আমি সেটাকে নিয়ে এসেছি।'

ডাঃ সেন রিভলভারটা মদনলালের হাত থেকে নিয়ে পরীক্ষা করে বললেন, 'দেখছি এটা বেলজিয়ামে তৈরি। অরিন্দমবাবু, এটা কি আপনার?'

অরিন্দম মাথা নেড়ে বললে, 'পাগল! আগ্নেয়াস্ত্রকে আমি ঘৃণা করি। দুড়ুম-দড়াম আওয়াজ আমি পছন্দ করি না।'

—'শিগগির চলে এসো বলছি!' অরিন্দমের পিঠের উপরে চৌকিদার সজোরে একটা ধাক্কা মারলে।

অরিন্দমের গায়ে কেউ হাত তুললে সে আর নিজেকে সামলাতে পারে না। সে তৎক্ষণাৎ ফিরে দুই হাতে চৌকিদারের দু-খানা হাত ধরে প্রবল এক মোচড় দিলে এবং একটান মেরে তাকে নিক্ষেপ করলে ঘরের আর এক প্রান্তে। চৌকিদার চিৎকার করে মেঝের উপরে আছাড় খেয়ে পড়ল সশব্দে।

অরিন্দম শান্তভাবেই বললে, 'যে শান্তিতে থাকতে চায়, সে কখনও যেন আমার গায়ে হাত না তোলে। আর কখনও এমন কাজ কোরো না, বুঝেছ বাপু?'

চৌকিদার বিকৃতমুখে দাঁড়িয়ে উঠতে উঠতে বললে, 'পুলিশকে আক্রমণ! তুমি গুরুতর সাজা পাবে।'

অরিন্দম তাকে ধমক দিয়ে বললে, 'চুপ করে থাকো। যখন আমরা কোনও কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করব, তখন তুমি কথা কোয়ো। হ্যাঁ মদনলাল, এইবারে তোমার আজব রূপকথাটা নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, আমি যখন তোমার ওখানে যাই, তখন কি তুমি একলা ছিলে?'

—'হ্যাঁ।'

—'তোমার খুড়তুতো ভাই মোহনলালবাবু তখন কোথায় ছিলেন?'

—'সন্ধ্যাদেবীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।'

—'সন্ধ্যাদেবী, একথা কি সত্যি?'

—সন্ধ্যা বললে, 'হ্যাঁ, ওই সময়ে মোহনলালবাবু আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন বটে।'

—'উত্তম! তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন আমার পিছনে পিছনে তোমার সঙ্গে আর কোনও লোক এসেছিল কী?'

—'আমি তোমার ওই সব বাজে প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই না। বলছি তো, বাড়িতে আমি একলা ছিলুম।'

—'বেশ, এখন পথে এসো। নিজের মুখেই বলছ, বাড়িতে তুমি একলা ছিলে। তাহলে তোমার সাক্ষী কে? আমি যদি বলি, তুমি আমাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলে, তারপর কথা কইতে কইতে হঠাৎ উঠে রিভলভারের হাতল দিয়ে আমাকে প্রহার করে আমার হাত- ঘড়িটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলে, তাহলে তুমি কী উত্তর দেবে? আর তোমার হয়ে সাক্ষ্যই বা দেবে কে? অতএব আমার বদলে এই চৌকিদারটা তোমাকেই বা ধরে নিয়ে যাবে না কেন?'

চৌকিদার বললে, 'আদালতে গিয়ে ওই সব কথা বোলো।'

মদনলাল বললে, 'আমার সুনামই এই অভিযোগ থেকে আমাকে রক্ষা করবে।'

অরিন্দম বললে, 'আমরা দু-জনে ধস্তাধস্তি করেছিলুম, নয়? আমার নিজের কাপড়-চোপড় দেখলে সকলেই সেই কথা বিশ্বাস করবে। কিন্তু তোমার দেহে ধস্তাধস্তির চিহ্ন কোথায়?'

মদনলাল মুখ টিপে হাসতে হাসতে নিজের কোটের বোতামগুলো খুলে ফেললে। দেখা গেল, কোটের নীচে তার শার্টটা ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে গেছে।

অরিন্দম বুঝলে, মদনলাল প্রস্তুত না হয়ে এখানে আসেনি। তবু সে শুধোলে, 'আমি রিভলভারের হাতল দিয়ে তোমার দেহে কোথায় আঘাত করেছিলুম?'

—'মাথায়।'

ডাঃ সেন এগিয়ে গিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনার মাথার একটা জায়গা উঁচু হয়ে ফুলে উঠেছে বটে। ওটা নিশ্চয়ই কোনও আঘাতের চিহ্ন।'

মদনলাল বিজয়ী বীরের মতো বুক ফুলিয়ে বললে, 'এই অপ্রীতিকর কথা-কাটাকাটি আমার আর ভালো লাগছে না। চৌকিদার, তোমার কর্তব্য পালন করো। কোনও ভয় নেই, আমার কাছে রিভলভার আছে। আসামি বাগ না মানলে আমি তা ব্যবহার করতে ইতস্তত করব না। যাও, ওর হাতে পরিয়ে দাও হাতকড়ি।'

হঠাৎ অন্ধকারের ভিতর থেকে ঘরের দরজার সামনে হল অভাবিত একটা মূর্তির আবির্ভাব—তার হাতে একটা প্রকাণ্ড রিভলভার!

মূর্তি সুগম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'আরে, আরে, এসব কী কাণ্ড!'

সে হচ্ছে রামফল।

অষ্টম

সন্ধ্যা চায় অ্যাডভেঞ্চার

মদনলাল পিছন ফিরে দাঁড়াল সচমকে, তার মুখ দিয়ে বেরুল কেবল একটা অস্ফুট শব্দ। রামফল তার সেই মস্ত বড়ো রিভলভারটা একেবারে মদনলালের বুকের উপর ধরে বললে, 'চুপ করে দাঁড়াও। একটু নড়েছ কী গুলি করেছি! তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি একটা জাঁহাবাজ লোক!'

মদনলালের হাতে রিভলভার ছিল বটে, কিন্তু রামফলের উদ্যত রিভলভারের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের অস্ত্রটা সে উপরে তুলে ধরতে ভরসা করলে না। মৃদুস্বরে-বললে, 'শোনো বাপু—'

রামফল বাধা দিয়ে কর্কশ স্বরে বললে, 'ও বাপু-টাপু বলে আমাকে ভোলাতে পারবে না! ঠিক সময়ে এসে আমি তোমাকে হাতে-নাতে ধরে ফেলেছি। তোমার ওই খেলাঘরের পিস্তলটা এখনই মাটির ওপরে ফেলে দাও, নইলে—'

মদনলালের শিথিল মুষ্টি থেকে অটোমেটিকটা মাটির উপরে গিয়ে পড়ল সশব্দে এবং সাবধানের মার নাই ভেবে অরিন্দম হেঁট হয়ে তৎক্ষণাৎ সেটা তুলে নিলে।

রামফল হুকুমের স্বরে বললে, 'এই চৌকিদার! সঙের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এখনই পরিয়ে দাও তোমার লোহার বালা এই লোকটার হাতে।'

মদনলাল বললে, 'আগে আমার কথাই শোনো।'

নাক শিকেয় তুলে রামফল বললে, 'চোরের কথা আবার ভদ্দরলোক শোনে নাকি?'

অরিন্দম বললে, 'রামফল হে, তোমার ওই কামানটা নিয়ে তুমি অত নাড়াচাড়া কোরো না। এখন ভিতরে এসে দাঁড়াও। এই একটু আগেই আমি ভাবছিলুম, কেমন করে তোমার কাছে খবর পাঠানো যায়।'

—'যে আজ্ঞে হুজুর!' বলেই রামফল খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অরিন্দম বললে, 'আমাকে ভ্রমক্রমে শনাক্ত করা হয়েছে, কিন্তু মদনলালবাবু কিছুতেই আমার কথা মানবেন না। যাক, এখন এই অনাহূত অতিথির পরিচয় শুনুন। এর নাম হচ্ছে শ্রীরামফল। আগে ছিল ফৌজে, এখন গুলি খেয়ে পা খোঁড়া করে আমার কাছে কাজ করছে। আপনারা এই রামফলকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন যে, আজ রাত এগারোটা পাঁচ মিনিটের সময় আমি বাসাতেই ফিরে এসেছিলুম। তারপর ঠিক যখন বারোটা বাজতে কুড়ি মিনিট, সেই সময় আবার আমি বাইরে বেরিয়ে আসি।'

অরিন্দম রামফলের মুখে ফিরেও দেখলে না, কারণ সে যে কী বলবে তা সে জানে। কিন্তু ডাঃ সেন তাকিয়ে দেখলেন, রামফলের মুখের উপরে একটা বিস্ময়ের আভাস ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

রামফল বললে, 'হ্যাঁ, আপনি তো ঠিক কথাই বলছেন। কে বলে আপনি বাসায় যাননি?'

অরিন্দম বললে, 'মদনলালবাবুকে আজ রাত্রে কে আক্রমণ করেছিল? ওঁর বিশ্বাস, আমিই সেই ব্যক্তি।'

রামফল অবহেলাভরে বললে, 'এ হচ্ছে ডাহা আজগুবি কথা!'

মদনলালের দিকে ফিরে অরিন্দম বললে, 'আশা করি এইবারে আমার কাছে আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। প্রিয় মদনলালবাবু, এখন আপনি স্বীকার করবেন তো, আপনাকে যে আক্রমণ করেছিল, আপনি তার মুখ পর্যন্ত দেখতে পাননি? আপনি মিথ্যা সন্দেহে আমাকে এই ব্যাপারের মধ্যে জড়াতে চান। তাই নয় কি?'

তারা পরস্পরের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলে। অরিন্দমের মনের কথা বোঝা কঠিন নয়। সে বলতে চায়, কোনও রকমে মুখরক্ষা করে মদনলাল এখন এখান থেকে সরে পড়লেই ভালো হয়। মদনলালও বুঝতে পারলে যে, ঘটনাক্ষেত্রে সে একলা ছাড়া অন্য কেউ ছিল না বলে নিজের মামলাকে যথেষ্ট দুর্বল করে ফেলেছে। তার উপরে রামফল যদি আদালতে গিয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, তার মনিব ঘটনার সময় বাসাতেই ছিল তাহলে তার কথা কেউই বিশ্বাস করবে না। বাঘরাজ যেই-ই হোক, মামলাটা যে সেই-ই সাজিয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিজনকুমারের বাড়িতে অরিন্দমের কোনও বিপদ হলে তারা নিজেরাই বিপদে পড়তে পারত। সেইজন্যে এই উপায়েই অরিন্দমকে এখন কিছুকালের জন্যে ঘটনাক্ষেত্র থেকে সরিয়ে ফেলবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু অরিন্দম বন্দি হল না; ব্যর্থ হল বাঘরাজেরই ফন্দি।

মদনলাল মনে মনে সব বুঝলে বটে, কিন্তু বাইরে তার মুখের কোনও মাংসপেশি একটুও সংকুচিত হল না। তবে তার দুটো চোখের দৃষ্টি হচ্ছে রীতিমতো বিষাক্ত।

সে প্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'স্বীকার করছি, আমারই ভ্রম হয়েছে। কী জানেন, যে- ডাকাতটা আজ আমাকে আক্রমণ করেছিল, চোখের তলা থেকে তার আধখানা মুখ ছিল রুমাল দিয়ে ঢাকা। তার একটু আগেই অরিন্দমবাবুকে সেইখানে আমি বাড়ির বাইরে ঘোরাফেরা করতে দেখেছিলুম, তাই সন্দেহ জেগেছিল তাঁরই উপরে। আসল অপরাধী কে, আমি তা জানি না। আমি ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।'

একটা কৃত্রিম ভারিক্কে চালে অরিন্দম বললে, 'উত্তম। আপনার ক্ষমাপ্রার্থনা মঞ্জুর হল।'

মদনলাল শ্রান্তস্বরে বললে, 'মিঃ সেন, সন্ধ্যাদেবী, এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য আপনারাও আমাকে মার্জনা করবেন। এখন আমি বিদায় হচ্ছি।'

সকৌতুকে অরিন্দম বললে, 'সে কী! সে কী! অন্ধকারে আড়ালে-আবডালে হয়তো সেই পাষণ্ড দস্যুটা এখনও আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। অতএব আপনার এই অটোমেটিকও সঙ্গে রাখুন।'

সর্পের মতো ক্রুর দৃষ্টিতে অরিন্দমের মুখের দিকে তাকিয়ে মদনলাল ব্যঙ্গভরে বললে, 'ধন্যবাদ। আমার জন্যে আপনাকে আর অত বেশি মাথা ঘামাতে হবে না। ও রিভলভারটা না পেলেও আমার চলবে।'

মদনলালকে প্রস্থানোদ্যত দেখে চৌকিদার ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'এসব কী ব্যাপার? আপনি যে চলে যাচ্ছেন, কিন্তু এখানে পুলিশকে আক্রমণ করা হয়েছে, তার কী হবে?'

অরিন্দম গম্ভীর স্বরে বললে, 'কোনও নির্দোষ লোককে অপরাধী বলে গ্রেপ্তার করতে এলে তার মাথা কি তখন ঠিক থাকে? মদনলালবাবু নিশ্চয়ই আমার কথায় সায় দেবেন? আর দ্যাখো চৌকিদার, মদনলালবাবুর ওপর তুমি নির্ভর করতে পারো। এখানে বাজে গোলমাল না করে তুমি সুড়সুড় করে মদনলালবাবুজির সঙ্গে সঙ্গে যাও। উনি নিশ্চয়ই তোমাকে খুশি করে তোমার ক্ষতিপূরণ করে দেবেন। দেবেন নাকি মদনলালবাবু?'

মদনলাল আবার অরিন্দমের মুখের উপর একটা বিষাক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অত্যন্ত অমায়িকভাবে বললে, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়ই! আজকের এই ভ্রমের জন্যে আমিই দায়ী। চৌকিদার, তুমি আমার সঙ্গে এসো।'

—'একেই বলে আদর্শ ভদ্রতা। হে চৌকিদার, তুমি যদি এখনও এখানে অপেক্ষা করো, তাহলে মদনলালবাবু তোমার হাতছাড়া হয়ে যাবেন।'

তারা দুজনেই ঘরের ভিতর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। অরিন্দম তাদের পিছনে পিছনে গিয়ে বাড়ির সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আবার ঘরের ভিতর ফিরে এসে উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, 'মিঃ সেন, দারুণ তৃষ্ণা! কিঞ্চিৎ চা, অথবা একটা লেমনেড—অর্থাৎ যে-কোনও পানীয়! আমার আবদার শুনে আপনার রাগ হবে না তো?'

ডাঃ সেন অরিন্দমের মুখের দিকে তাকিয়ে নীরব হয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'আজ যেভাবে আপনি শত্রুদের বিষদাঁত ভেঙে দিলেন, সেটা স্মরণীয় হওয়া উচিত। অতএব আজ আপনি চা, লেমনেড, বিয়ার, হুইস্কি, কি ব্র্যান্ডি—যে-কোনও পানীয়ের উপরে দাবি করতে পারেন। বলুন কী চান?'

অরিন্দম দুই ভুরু কপালের উপর দিকে তুলে কৃত্রিম বিরক্তির স্বরে বললে, 'এসব কী বলছেন? হুইস্কি, ব্র্যান্ডি! দেখছেন না এখানে সগৌরবে বিরাজমান জনৈক মহিলা?'

খিলখিল করে হেসে উঠে এতক্ষণ পরে সন্ধ্যা তার মুখ খুললে, 'ঠিক কথা! এখানে একজন মহিলা উপস্থিত আছেন বটে। কিন্তু অরিন্দমবাবু, আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, এটা হচ্ছে 'ককটেলে'র যুগ। আর এখানে যিনি উপস্থিত আছেন, তিনি হচ্ছেন অতি আধুনিক মহিলা।'

অরিন্দম মুচকি হেসে বললে, 'তাহলে মিঃ সেন, আপনি এক 'ট্যাঙ্কার্ড' বিয়ার এনে দিলেই আজকের মতো আমার তৃষ্ণা মিটে যেতে পারে।'

ডাঃ সেন বললেন, 'উত্তম। কিন্তু তার আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। আপনাদের এই রামফলটি যথাসময়ে যথাস্থানে এসে হাজির হলেন কোন ইন্দ্রজালে?'

অরিন্দম বললে, 'ইন্দ্রজাল-টাল কিছুই নয়। রামফল হে, এই ভদ্রলোককে বলো তো, হঠাৎ অত্যন্ত অভদ্রের মতো তুমি একটা কামান হাতে করে এখানে এসে হাজির হয়েছ কেন?'

রামফল বললে, 'আপনি তো জানেন কর্তা, রাত্রি হলে খাওয়া-দাওয়ার পর বাসার বাইরে এসে খানিকটা ঘোরা-ফেরা না করলে আমার ঘুম হয় না। ঘুরতে ঘুরতে আজ আমি খানিকটা বেশি এগিয়ে এসেছিলুম। অন্ধকারের ভেতরে এই বাড়ির আলো দেখে কেন জানি না, এইদিকেই আমি এগিয়ে এলুম। এখানে এসেই শুনলুম গরম গরম কথাবার্তা। তারপর জানালা দিয়ে উঁকি মেরেই দেখতে পেলুম আমাদের কর্তাকে। তারপর—আরও কিছু বলতে হবে কি?'

ডাঃ সেন বললেন, 'কিছু না, কিছু না! তোমার কথা আমি বিশ্বাস করছি। তোমার কথা বিশ্বাস করাই উচিত। অতএব তুমি ওইদিক দিয়ে এগিয়ে রান্নাঘরের কাছে গিয়ে বোসো। ওখানে তোমার জন্যেও হাজির হবে যে-কোনও রকম পানীয়।'

রামফল রিভলভারটা বুকের কাছে চেপে ধরে সোজা হয়ে সৈনিকের মতো পদবিক্ষেপ করে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

খুশি-ভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে অরিন্দম বললে, 'আমার রামফলের তুলনা নেই।'

ডাঃ সেন বললেন, 'খালি রামফল কেন, আজ আরও কোনও কোনও অতুলনীয় লোকের সঙ্গে আলাপ করে আমি যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করলুম!'

অরিন্দম বিয়ারের গেলাসে ধীরে ধীরে চুমুক দিতে লাগল, কোনও কথা বললে না। অল্পক্ষণ পরে সে আর সন্ধ্যা সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করলে।

বাইরে এসে দুজনে নীরবে পাশাপাশি এগিয়ে চলল, রাত তখন ঝাঁ ঝাঁ করছে, চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ।

সন্ধ্যাদের বাড়ির ফটকের কাছে এসে অরিন্দম বললে, 'নমস্কার সন্ধ্যাদেবী। আজ তবে আসি। কিন্তু কাল সকালে একবার আপনার দেখা পাব কি?'

—'নিশ্চয়!'

—'তাহলে সকালের প্রাতরাশ সেরেই আমি আপনাদের এখান চলে আসব।'

হঠাৎ সন্ধ্যার মনে পড়ে গেল দেবিকাদেবীর কথা। তার পিসি হয়তো কৌতূহলী হয়ে অরিন্দমকেও একথা-সেকথা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। সে বললে, 'আচ্ছা অরিন্দমবাবু, কাল সকালে আমিই যদি আপনার ওখানে যাই, আপনি তাহলে কিছু মনে করবেন না তো?'

—'কিছু মনে করব মানে? তাহলে তো আমি আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাব। সেই কথাই ভালো, কালকের দুপুরের আহারটাও দয়া করে আমার ওখানেই সেরে আসবেন। আপনি কখন বাড়ি থেকে বেরুতে পারবেন বলুন, আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে আমি রামফলকে পাঠিয়ে দেব!'

একটু বিস্মিত হয়ে সন্ধ্যা বললে, 'রামফলকে পাঠাবার দরকার আছে?'

অরিন্দম গম্ভীরভাবে বললে, 'অত্যন্ত দরকার। বাঘরাজের মন ভীষণ সন্দিগ্ধ। হয়তো সে এখন আপনাকেও বিপজ্জনক বলে ধরে নিয়েছে। রামফল আপনার সঙ্গে থাকলে আমি কতকটা আশ্বস্ত হব।'

—'বেশ, সাড়ে দশটা নাগাদ আমি বাড়ি থেকে বেরুতে চাই।'

—'সন্ধ্যাদেবী, আমার আর একটি অনুরোধ আছে।'

—'বলুন।'

—'রাত্রে ঘরের ভিতর থেকে দরজায় খিল দিয়ে শোবেন। কেউ ডাকলে খিল খুলে দেবেন না—এমনকি আপনার পিসিমা ডাকলেও নয়! অবশ্য এত তাড়াতাড়ি কিছু ঘটবে বলে আমি মনে করি না, তবু বলা তো যায় না। কেমন, আমার কথা রাখবেন তো?'

—'তা রাখব, কিন্তু আপনি আমাকে বড়োই ভয় দেখাচ্ছেন।'

—'আমি বাঘরাজের কথা ভাবছি। হয়তো বাঘরাজও আমার কথাই ভাবছে। কিন্তু অরিন্দমকে কেউ কোনও দিন একই পদ্ধতিতে দুইবার আক্রমণ করতে পারেনি। রামফল ছাড়া আর কেউ কোনও চিঠি আনলেও বিশ্বাস করবেন না। বিশ্বাস করবেন কেবল আমাকে, রামফলকে আর হয়তো ডাঃ সেনকেও। আপনি ভাবছেন হয়তো আমি খুব লম্বা হুকুম দিচ্ছি, কিন্তু জেনে রাখুন, অদূর ভবিষ্যতেই সমূহ দুর্যোগের সম্ভাবনা। এতক্ষণ পর্যন্ত আপনি রীতিমতো সাহসিনীর মতো কাজ করেছেন। আবার কোনও বিপদ হলে মাথা ঠিক রাখতে পারবেন তো?'

—'আমি চেষ্টা করব।'

সন্ধ্যা ফটকের ভিতরে ঢুকল এবং অরিন্দম তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলে নিজের বাসার দিকে। খানিক দূর অগ্রসর হয়েই সে দেখতে পেলে, একটা ঝোপের পাশে আগুনের ফিনিক। আরও একটু এগিয়ে দেখা গেল একটা ছায়ামূর্তি। আরও কয়েক পা এগিয়ে বোঝা গেল যে রামফল সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে।

অরিন্দম বললে, 'বাঘরাজ কী চায়, কে জানে? কাল সকালে যদি দেখা যায়, কোনও খানাডোবার ভিতরে পড়ে আছে আমাদের দুজনের মৃতদেহ, তাহলে বাঘরাজ অ্যান্ড কোম্পানিকে কেউই ধরতে-ছুঁতে পারবে না। অতএব খুব সাবধান রামফল, খুব সাবধান!'

কিন্তু পথের মধ্যে কোনও অঘটনই ঘটল না, নিরাপদেই তারা বাসায় গিয়ে পৌঁছুতে পারল এবং সে-রাত্রেও কেউ তাদের শান্তিভঙ্গ করবার চেষ্টা করলে না।

পরদিনের প্রভাত। অরিন্দম তার প্রাতঃকৃত্য—অর্থাৎ ব্যায়াম প্রভৃতি সেরে খাবার ঘরে ঢুকে দেখলে, টেবিলের উপরে প্রাতরাশের সরঞ্জাম রেখে রামফল চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

অরিন্দম বললে, 'রামফল, আর এক ঘণ্টা পরেই তুমি জমিদারবাড়ির দিকে যাত্রা কোরো। তোমার সঙ্গে আসবেন সন্ধ্যাদেবী!'

যথাসময়েই সন্ধ্যার আবির্ভাব। অরিন্দম হাস্যমুখে বললে, 'সন্ধ্যাদেবী, মনে হচ্ছে আপনাকে যেন একযুগ দেখতে পাইনি। খবর কী?'

—'খবর শুভ। রাত্রে কিছুই ঘটেনি।'

—'কিন্তু কিছু ঘটলেও ঘটতে পারত। আমি যখন বয়েজ স্কাউট ছিলুম তখন এই শিক্ষাই পেয়েছিলুম যে, সর্বদাই প্রস্তুত থাকা উচিত। কিন্তু সন্ধ্যাদেবী, আপনাকে আজ কী সুন্দরই দেখাচ্ছে!'

লজ্জিতভাবে দৃষ্টি নত করে সন্ধ্যা বললে, 'আমি এখানে আত্মপ্রশংসা শুনতে আসিনি।'

—'তাহলে শুনুন অন্য কোনও কোনও কথা—' অরিন্দম তার কাছে ধীরে ধীরে বর্ণনা করতে লাগল, বাঘরাজের বিচিত্র অবদান। কোথায় সে ব্যাংক থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা লুঠ করেছে, কোথায় সে প্রায় অর্ধকোটি টাকার সোনার থান হস্তগত করেছে এবং কোথায় সে তার পাপকর্মের অন্যতম সঙ্গী সুখনলালের বুকে ছোরা বসিয়ে দিয়েছে। সুখনলাল যতটুকু আভাস দিয়ে যেতে পেরেছে তা যদি সত্য হয়, তাহলে এই কমলপুরেই বাঘরাজের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে। এ-ব্যাপারটা নিয়ে সে নিজেও যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েছে এবং এখান-ওখান থেকে অল্পবিস্তর তথ্যও সংগ্রহ করেছে। তার ধ্রুব বিশ্বাস, বাঘরাজের গুপ্তধন আছে এই কমলপুরের মধ্যেই। কিন্তু কোনখানে গেলে যে তার সন্ধান পাওয়া যাবে, এ-কথা সে জানে না। তবে এটুকু অনায়াসেই অনুমান করা যায়, গুপ্তধনের কথা সে যখন জানতে পেরেছে, আর তার সন্ধানেই এখানে হাজির হয়েছে, তখন গুপ্তধন নিয়ে বাঘরাজ নিশ্চয়ই খুব শীঘ্রই এখান থেকে আবার অদৃশ্য হবার চেষ্টা করবে। বাঘরাজকে প্রতিভাবান বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। পুলিশের ও আর-সকলের চোখে ধুলো দিয়ে অত টাকার একটি বৃহৎ স্তূপ নিয়ে কেমন করে যে সে এখানে নিয়ে আসতে পেরেছে, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। আবার এত টাকা নিয়ে সে অন্য কোথাও নিরাপদ ব্যবধানে সরে পড়তে চায়! বাঘরাজ অরিন্দমকে চেনে এবং তাকে একজন অত্যন্ত চতুর ও দুঃসাহসিক ব্যক্তি বলে মনে করে। কালই অরিন্দমকে মৃত্যুমুখে পড়তে হত, কেবল সন্ধ্যার উপস্থিতির জন্যেই সে রক্ষা পেয়েছে। তারপরেও সে তাকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করে পথ থেকে কিছুদিনের জন্যে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল, এ-কথা সন্ধ্যা জানে! কিন্তু কেন? বেশ বোঝা যায়, অরিন্দম পুলিশের হেফাজতে থাকলে সে অনায়াসেই সেই অবসরে গুপ্তধন নিয়ে এখান থেকে সরে পড়তে পারবে। বাঘরাজের বাম হাত আর ডান হাত হচ্ছে বিজন আর মদনলাল। এদের দুজনের দিকেই এখন তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে হবে।

সন্ধ্যা বললে, 'মদনলালবাবু তলে তলে এতসব কাণ্ড করেন, মোহনলালবাবু তার কিছুই খবর রাখেন না। আর খবর রাখবেনই বা কেমন করে? তিনি হচ্ছেন একটি ফোতোবাবু, সর্বদাই নিজের সাজপোশাক নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। সরল, কিন্তু নিরেট বোকা। এত আবোল-তাবোল বকেন যে, পিসিমা পর্যন্ত কাল রাত্রে তাঁর উপর দারুণ চটে গিয়েছিলেন। কাল বিজনবাবুর বাড়িতে আপনার প্রাণ নিয়ে যখন টানাটানি হচ্ছিল, তিনি তখন আমাদের বাড়িতে আড্ডা জমিয়ে আবোল-তাবোল বকতে এসেছিলেন।'

অরিন্দম চিন্তিত মুখে বললে, 'চুলোয় যাক মোহনলালবাবুর কথা। এখন আপনাকে আমি আর যা বলতে চাই মন দিয়ে শুনুন। বিজন আর মদনলাল এখন বেশ বুঝতে পেরেছে যে, আপনার সঙ্গে আমার যথেষ্ট বন্ধুত্ব হয়েছে। তারা জানে, আমি নিজের জীবন বিপন্ন করেও আপনাকে উদ্ধার করতে গিয়েছিলুম। বিশেষ বন্ধু না হলে কেউ তা করে না। সুতরাং আমি যে তাদের গুপ্তকথা আপনার কাছে এতক্ষণে প্রকাশ করে দিয়েছি, এটাও নিশ্চয়ই তারা অনুমান করেছে। অতএব এই নাট্যাভিনয়ে তারা

আপনাকেও একজন প্রধান অভিনেত্রী বলেই মনে করবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই, এর পরে আমাদের কী করা উচিত?'

সন্ধ্যার দিকে অরিন্দম এমন ভাবে ঝুঁকে পড়ল যে, যাতে করে তার মুখ সে আরও ভালো করে দেখতে পায়। তার কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য সন্ধ্যাকে বুঝিয়ে দিলে, সে যা বলছে তা হচ্ছে গুরুতর কথা।

সন্ধ্যা কোনও জবাব দিলে না দেখে অরিন্দম আবার বললে, 'আচ্ছা, আমিই না হয় ওই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। আপনার এখন কমলপুর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত।'

সন্ধ্যা সবিস্ময়ে বললে, 'কেন?'

—'অবিলম্বেই বাঘরাজ অ্যান্ড কোম্পানির সঙ্গে আমার একটা ভয়াবহ সংঘর্ষ অনিবার্য। কাজেই তারা কেবল আমাকে নয়, আপনাকেও পথ থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। বাঘরাজদের গুপ্তকথা যারা জানে, তাদের কারুকেই তারা ক্ষমা করবে না। আপনার বিপদ হতে পারে সন্ধ্যাদেবী, সমূহ বিপদ হতে পারে?'

সন্ধ্যা দুই ভুরু কুঁচকে কঠিন স্বরে বললে, 'তাদের ভয়ে আমাকে ভয় পেয়ে নিজের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে হবে, আপনি কি এই কথাই বলতে চান?'

অরিন্দম বললে, 'না সন্ধ্যাদেবী, আমি আপনাকে ভয় পেতে বলছি না। তবে আমার কী মনে হয় জানেন? এইসব রক্তারক্তি আর হানাহানির মাঝখানে নারীদের থাকা উচিত নয়।'

সন্ধ্যা সোজা হয়ে বসে বললে, 'কেন উচিত নয়? নারীরা দুর্বল, না, অরিন্দমবাবু? নারীরা দুর্বল, নারীরা ভয় পায়, নারীদের সাহস নেই! গতযুগ পর্যন্ত নারীরা এইসব অপবাদ বোবার মতো সহ্য করে এসেছে। বর্তমান কালের নারীরা এসব অপবাদ সত্য বলে মানতে প্রস্তুত নয়—আর আমি হচ্ছি বর্তমান যুগেরই মেয়ে।'

অরিন্দম বললে, 'দেখছি আপনার ঘটে বুদ্ধির অস্তিত্ব নেই।'

সন্ধ্যা শ্লেষভরা কণ্ঠে বললে, 'প্রিয় মহাশয়, আমাকে বোকা বানাতে চাইলেও আমি ধৈর্য হারাব না। আপনি ভাবছেন আমাকে বোকা বলে গালাগালি দিলে আপনার সঙ্গে আমি সমস্ত সম্পর্ক তুলে দেব? আপনার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলে বাঘরাজদেরও শুভদৃষ্টি আমার ওপর পড়বে না। কিন্তু আমাকে এর চেয়ে ঢের বেশি কড়া গালাগাল দিলেও আপনার সঙ্গ আমি ত্যাগ করব না। যারা মাইল-কয়েক দূরে বাগানে বা পাড়াগাঁয়ে চড়িভাতি করতে গিয়ে ভাবে, মস্ত একটা অ্যাডভেঞ্চার করা হল, আমি সে-দলের মেয়ে নই অরিন্দমবাবু। আমি চাই বিপদ, আমি চাই উত্তেজনা, আমি চাই ঘটনার পর ঘটনার তরঙ্গ! ছেলেবেলা থেকে কত স্পোর্টসে যোগ দিয়েছি, দশ মাইল সাঁতারে দু-বার প্রথম স্থান অধিকার করেছি, শিখেছি ছোরা আর লাঠিখেলা, এখনও করি নিয়মিত ব্যায়াম। রাশি রাশি অ্যাডভেঞ্চারের কেতাব পড়েছি, আর পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছে আমি যেন দুঃসাহসী সব নায়কদের সঙ্গে-সঙ্গেই বর্তমান আছি। আজ আমার সামনে অপেক্ষা করছে সেই রকমই কোনও অ্যাডভেঞ্চার। অরিন্দমবাবু, আপনি ভাবছেন এমন সুযোগ আমি ত্যাগ করব? কখনও না, কখনও না!'

অরিন্দম মুগ্ধনেত্রে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে রইল নীরবে। মনে মনে তার ইচ্ছা হল, এখনই নিজের বাহুবেষ্টনের মধ্যে সন্ধ্যার ওই সুকুমার তনুলতা গ্রহণ করে এবং তার গোলাপরঙিন ওষ্ঠাধরে চুম্বন করে তাকে দেয় অভিনন্দন। কিন্তু আপাতত সেই মহৎ ইচ্ছাটা কোনওক্রমে দমন করে সে বললে,

'জীবনে আমি অনেক বোকা মেয়ে দেখেছি! তাদের বোকামি অসহনীয়। কিন্তু আপনার বোকামি কেবল সহনীয় নয়, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক—অত্যন্ত আনন্দদায়ক।'

সন্ধ্যা ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, 'বুঝলুম। কিন্তু তার পরের কথাটা কী?'

সন্ধ্যার দুই কাঁধের উপরে দুই হাত রেখে মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে অরিন্দম বললে, 'বন্ধু, পরে আর কোনও কথা নেই, আছে কেবল কাজ। অতঃপর কমলপুরে যে-নাটকের অভিনয় চলবে, তাতে নায়ক হব আমি আর নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করবেন আপনিই। কিন্তু মাভৈঃ! নায়িকা বিপদে পড়লে নায়ক নিশ্চয়ই তাকে উদ্ধার না করে ছাড়বে না।'

অরিন্দমের গণ্ডদেশে একটি মৃদু চপেটাঘাত করে সন্ধ্যা বললে, 'ধন্যবাদ।'

নবম

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে

অরিন্দম শুধোলে, 'তারপর?'

সন্ধ্যা বললে, 'আমিও একটি গল্প বলতে পারি। গল্পটা শুনেছি আমি কাল রাত্রে।' তারপর কাল রাত্রে দেবিকাদেবী তার কাছে যেসব কথা স্বীকার করেছিলেন, সে তা ধীরে ধীরে খুলে বললে।

অরিন্দম খুব মন দিয়ে তার কাহিনি শ্রবণ করলে। তারপর দুই ভুরু উপরে তুলে বললে, 'আশ্চর্য ব্যাপার! দেবিকাদেবীকে কীসের জন্যে ভয় দেখিয়ে বিজন টাকা আদার করেছে? তিনি ভয় পাবেন কেন? অতীতে তিনি কি কোনও লজ্জাকর কাজ করেছেন? যৌবনেও তিনি যে সুন্দরী ছিলেন না, এটুকু অনায়াসেই অনুমান করা যায়। সুতরাং তাঁর জীবনে গুপ্ত 'রোমান্স' থাকবার কথা নয়। সন্ধ্যাদেবী, আপনি তাঁর সম্বন্ধে আরও কী জানেন?'

সন্ধ্যা বললে, 'বিশেষ কিছুই নয়। এইটুকু কেবল জানি, বিধবা হবার পর তিনি নানাদেশি হয়ে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন! বাবার মৃত্যুর আগে আমি তাঁর নামমাত্র জানতুম, কখনও তাঁকে চোখে দেখবার সুযোগও পাইনি। আমার বাবা মৃত্যুর কিছুদিন আগে উইলে অভিভাবিকারূপে তাঁরই নাম করে যান। পিসিমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় বাবা মারা যাবার পরে।'

—'তাহলে হয়তো তিনি যখন নানা দেশে প্রবাস যাপন করতেন, তখনই তাঁর জীবনে কোনও না কোনও 'রোমান্সে'র ব্যাপার ঘটেছিল। আর বিজন তাকেই অস্ত্ররূপে ব্যবহার করছে আপনার পিসিমার বিরুদ্ধে!'

সন্ধ্যা সকৌতুকে হেসে উঠে বললে, 'পিসিমার জীবনে 'রোমান্স'—মরুভূমিতে গোলাপফুল! কী যে বলেন অরিন্দমবাবু!'

একটা সিগারেট ধরিয়ে অরিন্দম বললে, 'রোমান্সের কথা থাক, এখন বাস্তব জগতে ফিরে আসা যাক। আচ্ছা সন্ধ্যাদেবী, কমলপুরে কোন কোন বাড়ি খুব বেশি পুরাতন? আমি আগে সবচেয়ে পুরাতন বাড়ির কথাই জানতে চাই। সুখনলাল মরবার আগে সংক্ষেপে বাঘরাজের ঠিকানা জানাবার জন্যে কোনও পুরোনো বাড়ির উল্লেখ করেছিল। এমন কোনও বাড়ি এখানে আছে কি?'

কিছুমাত্র চিন্তা না করেই সন্ধ্যা বললে, 'আছে অরিন্দমবাবু। একেবারে সমুদ্রের ধারে। অনেকদিন আগে ওখানে এক সরকারি কর্মচারীর আস্তানা ছিল। তাঁকে আমি কখনও দেখিনি, কারণ আমার জন্মাবারও অনেক আগে তিনি ওখানে বাস করতেন। শুনেছি লোকে তাঁকে নিম্‌কিকা দারোগা বলেই ডাকত। তিনি কাজ করতেন লবণ বিভাগে। সমুদ্রের জল এক জায়গায় ডাঙার ভিতর দিকে খানিকটা এগিয়ে এসে যেখানে শেষ হয়েছে, ঠিক সেইখানেই সেই বাড়িখানা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। আমার জন্মাবারও আগে থেকে বাড়িখানা খালি পড়ে আছে। কেউ সেখানে থাকতে চায় না, কারণ সেখানা হানাবাড়ি বলে বিখ্যাত। তার চেয়ে পুরোনো বাড়ি এখানে আর নেই।'

অরিন্দম ভাবতে ভাবতে বললে, 'হানাবাড়ি? অনেকদিন খালি পড়ে আছে! নির্জন সমুদ্রতট! নিশ্চয়ই রাত্রে ভয়ে জনপ্রাণী সেদিকে যায় না। এ হচ্ছে দুরাত্মাদের পক্ষে আদর্শ বাড়ি। সন্ধ্যাদেবী, বাড়িখানা কোন দিকে?'

সন্ধ্যা বললে, 'এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে উত্তর-পশ্চিম দিকে।'

একলাফে অরিন্দম দাঁড়িয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি জানলার কাছে গিয়ে সাগ্রহে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওই তো উত্তর-পশ্চিম দিক। এখান থেকে সমুদ্রতীর পর্যন্ত সমস্তটা দেখা যায়, মাঝখানে কোনও বালিয়াড়ি বা বনজঙ্গল নেই। উত্তম!' তারপর সে টেবিলের টানার ভিতর থেকে একটা দূরবিন বার করলে—অত্যন্ত শক্তিশালী দূরবিন। জানলার ধারে গিয়ে দূরবিনটা চোখে লাগিয়ে খানিকক্ষণ সে উত্তর-পশ্চিম দিকটা ভালো করে পরীক্ষা করতে করতে বললে, 'সন্ধ্যাদেবী, একখানা বড়ো বাড়ি আমার চোখের উপরে ভাসছে। আসলে দোতলা বাড়ি, কিন্তু ছাতের উপরে তেতলায় একখানা ছোটো ঘর আছে। বাড়িখানা যে খুব পুরাতন, দেখলেই তা বোঝা যায়। নিশ্চয়ই বহুকাল তার সংস্কার হয়নি। বাড়ির দেওয়ালের গায়ে জায়গায় জায়গায় রয়েছে অশথ কি বটগাছ। বাড়ির চারিদিকে আছে দেওয়াল, কিন্তু স্থানে স্থানে তাও ভেঙে পড়েছে।'

সন্ধ্যা বললে, 'হ্যাঁ। ওই বাড়ির কথাই আমি বলছি।'

তারপর দূরবিনের মুখ সমুদ্রের দিকে ঘুরিয়েই চমকে উঠল অরিন্দম। মিনিট খানেক নীরবে কী লক্ষ করলে, তারপর দূরবিন নামিয়ে সন্ধ্যার কাছে ফিরে এসে উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'সন্ধ্যাদেবী, দূরবিনটা নিয়ে আপনিও একবার সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখুন। তীর থেকে খানিক দূরে সমুদ্রের উপরে একখানা জাহাজ এসে নোঙর ফেলেছে!'

সন্ধ্যা সবিস্ময়ে বললে, 'জাহাজ! আজ ভোরবেলায় নিজেদের বাড়ির ছাদের উপরে আমি পায়চারি করছিলুম। কিন্তু ওদিকে চেয়ে আমি জাহাজ-টাহাজ কিছুই দেখতে পাইনি।'

সে-ও দূরবিন দিয়ে যথাস্থানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে, 'হ্যাঁ, জাহাজই বটে। অর্থাৎ মস্ত বড়ো একখানা মোটর লঞ্চ। ওখানা নিশ্চয়ই ভোরবেলায় ওখানে ছিল না, পরে এসেছে।'

অরিন্দম বললে, 'কিন্তু কেন এসেছে? এখানে কি নিয়মিতভাবে জাহাজ-টাহাজ আনাগোনা করে?'

—'না। সমুদ্রের উপরে কালেভদ্রে দেখা যায় কোনও জাহাজ।'

অরিন্দম বললে, 'এর মানে কী? সন্ধ্যাদেবী, আপনি কি আর একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন? মোটর লঞ্চখানা ঠিক সরাসরি ওই পোড়ো বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে আছে? গভীর রাত্রে জাহাজ থেকে বোটে নেমে কেউ বা কারা যদি ওই পোড়ো বাড়ির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে চায়, তাহলে

কোনওই অসুবিধা হবে না, এমনকি বাইরের লোকের চর্মচক্ষুও সে-দৃশ্য দেখতে পাবে না।'

সন্ধ্যা বিস্মিত ভাবে বললে, 'আপনি কী বলতে চান অরিন্দমবাবু?'

হাতের সিগারেটের দগ্ধাবশেষটা ছাইদানে নিক্ষেপ করে অরিন্দম বললে, 'আচম্বিতে ওখানে একখানা মোটর লঞ্চের উপস্থিতি অত্যন্ত সন্দেহজনক। আমার বিশ্বাস, বাঘরাজ অ্যান্ড কোম্পানি পরিপূর্ণমাত্রায় জাগ্রত হয়ে উঠেছে। অরিন্দম হচ্ছে তাদের কাছে দুরাত্মার চেয়েও নিম্নশ্রেণির জীব। সেই রাবিশ অরিন্দমই আজ এখানে তাদের গুপ্তকথা জানতে পেরে সশরীরে এসে হাজির হয়েছে। ওদের পক্ষে এটা মোটেই সুসংবাদ নয়। অতএব যথাসময়ে সাবধান হয়ে ওরা নিরাপদ ব্যবধানে সরে পড়তে চায়। ওই মোটর লঞ্চের আবির্ভাবের কারণ কী জানেন সন্ধ্যাদেবী? গভীর রাত্রের অন্ধকারে আজ এখানে মহাপ্রস্থানের পালা অভিনীত হবে। বাঘরাজ অ্যান্ড কোম্পানির গুপ্তধন আজ ওই পোড়ো বাড়ি থেকে ওই মোটর লঞ্চের ভিতরে সরিয়ে ফেলা হবে। ব্যর্থ হয়ে যাবে পাপাত্মা অরিন্দমের সমস্ত বাহাদুরি!'

সন্ধ্যা অবাকমুখে কিছুক্ষণ অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, 'অরিন্দমবাবু, আপনার পেশা কী? আপনি কি গোয়েন্দা?'

অরিন্দম সকৌতুকে খিল খিল করে হেসে উঠে বললে, 'নিশ্চয়ই আমি গোয়েন্দা নই! গোয়েন্দা হচ্ছেন ডাঃ সেন! তিনিও বাঘরাজ অ্যান্ড কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনও কোনও সূত্র খুঁজে পেয়ে ছদ্মবেশে এখানে এসে হাজির হয়েছেন। তিনি বাঘরাজদের গ্রেপ্তার করে সমস্ত গুপ্তধন উদ্ধার করতে চান। আমিও তাই চাই, তবে আইনের মর্যাদা রাখবার জন্যে সমগ্র গুপ্তধনের উপরে আমি কোনও দাবি করব না। কিন্তু অতঃপর দ্রষ্টব্য হবে এই,—আমি জিতব না ডাঃ সেন জিতবেন?'

সন্ধ্যা বললে, 'কিন্তু আপনি তো বললেন না অরিন্দমবাবু, আপনার পেশা কী?'

এইবারে অরিন্দম সমুচ্চ কণ্ঠে হাস্য করে বললে, 'আমার পেশা কী? আমার হচ্ছে এক অদ্ভুত পেশা! এই পেশা অবলম্বন করে কেউ যে বিশেষ লাভবান হতে পারে এখন পর্যন্ত লোকে তা জানে না।'

—'কিন্তু সে পেশাটা কী অরিন্দমবাবু?'

—'চোরের উপর বাটপাড়ি করা। আমিই প্রথমে আবিষ্কার করেছি এই পেশা। অপরাধীদের পেশা চুরি, ডাকাতি, খুন করা। পুলিশের পেশা চোর, খুনি, ডাকাতদের গ্রেপ্তার করা। আর আমার পেশা হচ্ছে, অপরাধী বা পুলিশ কারুকেই আমি সাহায্য করব না। আমি পুলিশের বিরুদ্ধে যাই না, কিন্তু অপরাধীরা আমাকে পরম শত্রু বলে মনে করে। কেন জানেন? কে কোথায় অপরাধ করছে বা করবে আমি আগে থাকতে তলে তলে সেই খবর নেবার চেষ্টা করি, আর আমার সেই চেষ্টা বিফল হয় না। যথাসময়ে অপরাধীদের সামনে হাজির হয়ে আমার প্রাপ্য আমি আদায় করতে চাই। তাদের বলি, হয় তোমাদের লুঠের মালের অর্ধাংশ আমাকে দাও, নয়তো পুলিশের কাছে খবর পাঠিয়ে ষোলোআনা থেকেই তোমাদের বঞ্চিত করব,—আর সেই সঙ্গে তোমরা সবাই যাবে জেলখানায় নয়তো দুলবে ফাঁসিকাঠে। বন্ধু, সাধারণ লোকের কল্পনাতীত হলেও এ হচ্ছে চমৎকার একটি পেশা। অপরাধী না হয়েও অন্যের অপরাধের সাহায্যে নিজে লাভবান হওয়া। তারপর এর মধ্যে আছে চমৎকার 'রোমান্স'! একদিকে আছে পুলিশ, আর-একদিকে আছে অপরাধীর দল। এই দুই দলেরই মাঝখানে হঠাৎ আমি আবির্ভূত হয়ে নিজের প্রাপ্য আদায় করে

সরে পড়ি। হিতোপদেশ হয়তো এই নীতি সমর্থন করবে না, কিন্তু আপনার মত কী সন্ধ্যাদেবী?'

সন্ধ্যা বললে, 'এক্ষেত্রে আমার মতামত কিছুই নেই। তবে যেখানে 'রোমান্স', সেইখানেই আমি থাকতে চাই। ওই মোটর লঞ্চখানা দেখেই আপনি যথেষ্ট উত্তেজিত হয়েছেন। এইবারে আপনি কী করবেন বলুন দেখি?'

অরিন্দম টেবিলের একটা প্রান্তের উপরে বসে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে, 'আমি কী করব? শুনুন তবে। আমি অনুমান করছি, আজ রাত্রে ওই পোড়ো বাড়িতে এবং মোটর লঞ্চে অসাধারণ কোনও অভিনয় হবে। বারে বারে নৌকোয় করে ওই পোড়ো বাড়ি থেকে খেপে খেপে গুপ্তধন যাবে মোটর লঞ্চের ভিতরে। ওই গুপ্তধনের খানিক অংশ আমি নিজেই অধিকার করতে চাই। কোনও বিপদকেই আজ আমি গ্রাহ্য করব না। আমি জানি ওই পোড়ো বাড়ির কাছাকাছি ডাঙার উপরে বহু সাবধানী চক্ষু আজ কোনও অনাহূত অতিথির জন্যে অপেক্ষা করবে। কিন্তু আজ রাত্রে আমি স্থলচর হব না, হব জলচর। সাঁতারের পোশাক পরে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে আমি যাব ওই পোড়ো বাড়ির দিকে। সমুদ্রের ভিতর থেকে কোনও বিপদ আসতে পারে, বাঘরাজদের দল এটা নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারবে না। তারপর? তারপর কী হবে, আমি জানি না। তবে চিরদিনই অবস্থা বুঝে আমি ব্যবস্থা করে আসতে পেরেছি। এবারও পারব বলেই মনে করি।'

অরিন্দম টানতে লাগল সিগারেট। সন্ধ্যা মৌনমুখে খানিকক্ষণ টেবিলের উপর থেকে এটা-ওটা-সেটা তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করলে। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'অরিন্দমবাবু, আজকের রাত্রের অভিযানে আমি হব আপনার সঙ্গিনী!'

অরিন্দম মুখের সিগারেটটা হাতে করে নিয়ে বিস্ফারিত চক্ষে বললে, 'তার মানে? আপনি হবেন আমার সঙ্গিনী? আজ রাত্রে ঘটতে পারে অনেক কাণ্ডই, হানাহানি, খুনোখুনি এবং আরও অনেক কিছুই! আর আমি যাব জলপথে, সাঁতার কেটে!'

সন্ধ্যা হেসে উঠে বললে, 'অরিন্দমবাবু, আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমি দশ মাইল সাঁতার কেটে দুইবার প্রথম পুরস্কার পেয়েছি। এখান থেকে দেড় মাইল সাঁতার কাটা আমি অত্যন্ত সহজ বলেই মনে করি। আমিও আজকে আপনার সঙ্গে সমুদ্রে জলে ঝাঁপ দিতে চাই।'

অরিন্দম সবিস্ময়ে বললে, 'তুমি—না, না, আপনি! আমার সঙ্গে সাঁতার কেটে যাবেন আপনি?'

মধুর হাস্য করে সন্ধ্যা বললে, 'কেন যাব না? আমি যদি আপনার সঙ্গে যাই, তাহলে আপনি কি আমাকে বাধা দেবেন?'

—'নিশ্চয় দেব!'

সন্ধ্যা এগিয়ে এসে অরিন্দমের সামনে দাঁড়িয়ে পরিপূর্ণ কণ্ঠে বললে, 'কিন্তু কেন, কেন, কেন? আপনি বাধা দিতে চান, এর কারণ কী?'

অরিন্দম টেবিলের উপর থেকে গাত্রোত্থান করে কোনও কথা না বলে আবার জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর বাইরের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার ফিরে সন্ধ্যার সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়ে বললে, 'এর কারণ কী জানতে চাও সন্ধ্যা? আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি ইচ্ছা করি না তোমাকে কোনও বিপদের মাঝখানে দেখতে। আমি তোমাকে ভালোবাসি বন্ধু, আমি তোমাকে ভালোবাসি!'

সন্ধ্যা কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে বসে রইল নীরবে। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'অরিন্দমবাবু, ঠিক ওই কারণেই আপনার সঙ্গে থাকতে চাই আমি!'

অরিন্দম বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'ঠিক ওই কারণেই? কী কারণে?'

সন্ধ্যা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, 'কারণ? কারণ, আমিও আপনাকে ভালোবাসি। এটা কি আপনি বুঝতে পারছেন না? আজ থেকে আমিও আপনার সহগামিনী হতে চাই। আপনার বিপদ হবে আমারও বিপদ। হে অদ্বিতীয় নির্বোধ ব্যক্তি, আপনি যদি বুঝেও কিছু না বুঝতে চান, তাহলে আমি কী করতে পারি বলুন?'

সন্ধ্যার দুইখানি হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে গ্রহণ করে অরিন্দম অভিভূত কণ্ঠে বললে, 'তবে তাই হোক সন্ধ্যা। সুখে আর দুঃখে তোমাকে যদি চিরসঙ্গিনীরূপে পাই, তাহলে আমি সমস্ত পৃথিবীরও সম্রাট হতে চাই না।'

দশম

বাঘরাজের থাবার চিহ্ন

আহারাদির পর দুজনে আবার বসবার ঘরে এসে আসন গ্রহণ করলে।

অরিন্দম বললে, 'এখনও ভেবে দ্যাখো সন্ধ্যা, সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার আগে ভালো করে ভেবে দ্যাখো, সাঁতার দিতে তুমি পারবে তো? এখনও বলছি; আমার অনুরোধ, এ গোলমেলে ব্যাপারের মধ্যে তুমি নিজেকে জড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা কোরো না! আমার এই একটিমাত্র অনুরোধও কি তুমি রক্ষা করবে না?'

সন্ধ্যা জোরে মাথা নেড়ে দৃঢ়স্বরে বললে, 'ওই একটিমাত্র অনুরোধ ছাড়া আপনার সব অনুরোধই আমি রক্ষা করব।'

অরিন্দম হাল ছেড়ে দিয়ে বললে, 'পাহাড় যদি নড়তে না চায়, মহম্মদও তাকে নাড়াতে পারবেন না। বেশ, তারপর কাজের কথাই হোক। অন্তত দুটি বিষয়ে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারো। প্রথমটি হচ্ছে এই : দেবিকাদেবীর সম্বন্ধে রহস্যটা এখনও পরিষ্কার হয়নি। আমি বাইরের লোক, তার উপরে পুরুষমানুষ। আমার পক্ষে তাঁকে নিয়ে নাড়াচাড়া করা অসম্ভব। এ ভার তোমাকেই গ্রহণ করতে হবে।'

সন্ধ্যা বললে, 'আচ্ছা, আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করে দেখব।'

অরিন্দম বললে, 'লক্ষ্মীমেয়ে! তারপর আর-একজনের কথা নিয়েও মাথা না ঘামালে চলবে না। আমি ভূতপূর্ব-বিচারক স্যার বীরেন্দ্রনাথের কথা বলছি। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় খুব সামান্য। তিনি এখন অবসর নিয়েছেন বটে, কিন্তু এখানকার নাট্যাভিনয়ের মধ্যে তিনি কোনও প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন কি না! সেটা না জানলে আমাদের চলবে না। এখানে এসে আজ পর্যন্ত বাঘরাজের দেখাই তো পেলুম না। অনেককেই তো দেখছি, কিন্তু তার মধ্যে বাঘরাজ কোন জন? 'রাজার' কথাও মাঝে মাঝে মনে হয়।'

—' 'রাজা' আবার কে?'

—'উপাধি তার বটব্যাল। 'রাজা' তার ডাকনাম। স্যার বীরেন্দ্রনাথ যখন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তখন তাঁরই হুকুমে রাজার সাত বছর জেল হয়। রাজা হচ্ছে ভয়ানক লোক। কিছুদিন পরে সে জেল

ভেঙে পালায়, আর পালাবার আগে কয়েদিদের কাছে শাসিয়ে যায়, স্যার বীরেন্দ্রনাথের রক্ত দর্শন না করে ছাড়বে না। স্যার বীরেন্দ্রনাথ এখন কমলপুরের বাসিন্দা, কিন্তু রাজা এখন কোথায় আছে? ধরো রাজাই যদি হয় বাঘরাজ?'

সন্ধ্যা বললে, 'রাজা হচ্ছে দাগি অপরাধী। কমলপুরে থাকলে লোক কি তাকে চিনতে পারত না? অন্তত স্যার বীরেন্দ্রনাথ তার অস্তিত্বের কথা জানতে পারতেন।'

—'তুমি জানো না সন্ধ্যা, 'রাজা'র মেক আপ করবার শক্তি এমন অদ্ভুত যে, তার কাছে যে কোনও বিখ্যাত অভিনেতাও এ বিষয়ে নিজেকে শিশু বলে মনে করবে। আর মস্তিষ্ক তার এমন শক্তিশালী যে, অনায়াসেই সে বাঘরাজের আসন গ্রহণ করতে পারে। ...প্রসঙ্গক্রমে হঠাৎ রাজার কথা এসে পড়ল, কিন্তু এখন স্যার বীরেন্দ্রনাথের কথাই হোক। তিনি তোমাকে কী রকম চোখে দেখেন?'

সন্ধ্যা বললে, 'আমি তাঁকে 'দাদু' বলে ডাকি, আর তিনিও ডাকেন আমায় 'দিদি' বলে।'

—'সুসংবাদ! স্যার বীরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে তোমার কী কর্তব্য হবে, সেকথা পরে বলব। অতঃপর আজকের রাত্রের কর্তব্যের কথা শোনো। তুমি আমার সঙ্গে যখন অগাধ জলে না ভেসে ছাড়বে না, আর আজকে যখন আমাদের যাত্রা করতে হবে জলপথেই, তখন উপরকার জামাকাপড়ের তলায় একটা সাঁতারের পোশাক পরে তোমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে যথাসময়েই। আর এই জিনিসটা তোমার কোমরবন্ধে বেঁধে রেখো।' অরিন্দম টেবিলের কাছে গিয়ে একটা টানার ভিতর থেকে বার করলে একটি ছোটো রিভলভার আর একটা ছোট্ট থলি বা ব্যাগ। তারপর থলির ভিতরে রিভলভারটা পুরে বললে, 'এই থলিটা হচ্ছে 'ওয়াটার প্রুফ'। তুমি জলে ঝাঁপ খেলেও রিভলভার ভিজবে না। নাও। হ্যাঁ, ভালো কথা, তুমি কখনও রিভলভার ছুড়েছ?'

সন্ধ্যা হেসে বললে, 'অরিন্দমবাবু, শুনেছেন তো আমি একটা গেছো মেয়ে! লাঠি খেলা, ছোরা খেলা শিখেছি, অল্পস্বল্প রিভলভার ছুড়তেও কি শিখিনি বলে মনে করেন?'

সন্ধ্যার দুই কাঁধের উপরে দুই হাত রেখে স্থির দৃষ্টিতে তার চোখের পানে চেয়ে অরিন্দম বললে, 'বীরনারী, মার্জনা করো আমার সন্দেহকে।'

সন্ধ্যা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'এইবার আমার বিদায় নেবার সময় হয়েছে। তাহলে আজ রাত্রে কখন এসে আপনার সঙ্গে দেখা করব?'

—'আটটা নাগাদ। ততক্ষণ পর্যন্ত খুব সাবধান! বাঘরাজ আর বাঘের বাচ্চাদের তুমি চেনো না। যে-কোনও মুহূর্তে তারা যে-কোনও অভাবিত কাণ্ড করতে পারে। আমার এই কথাগুলো তুমি ভালো করে মনে রেখো। চেনা আর অচেনা কোনও মানুষকেই এতটুকুও বিশ্বাস কোরো না। কোনও ছোটোখাটো ঘটনাকেও তুচ্ছ বলে মনে কোরো না। তোমার চারিদিকেই অজানা সব ফাঁদ থাকতে পারে, কিন্তু নভেলের নির্বোধ নায়িকার মতো যেন প্রথম ফাঁদের ভিতরই পদার্পণ কোরো না।'

বাড়ির সদর দরজার কাছে এসে দুজনে আবার সামনাসামনি হয়ে দাঁড়াল। দুজনেই দুজনের হাত ধরে চেয়ে রইল পরস্পরের মুখের দিকে।

তারপর সন্ধ্যা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'প্রিয়তম, আমার কেমন ভয় করছে। নিজের জন্যে নয়, তোমার জন্যে। বোধহয় প্রেমের ধরনই এই। বিপদের এই বেড়াজালের ভিতরে রাত আটটা পর্যন্ত তোমাকে আমি না দেখে কেমন করে থাকব?'

অরিন্দম গাঢ় দৃষ্টিতে সন্ধ্যার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললে, 'আমি হচ্ছি দুর্ভেদ্য দুর্গের

চেয়েও নিরাপদ। ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী আমার কোষ্ঠী বিচার করে বলেছেন, নব্বই বৎসর বয়সে নিজের দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করে আমি ত্যাগ করব অন্তিম নিশ্বাস। তারপর তুমি কি মনে করো, তোমার মতন বন্ধুকে লাভ করবার আগে আমি গিয়ে পড়ব বাঘরাজের মালের ভিতরে? নয়, নয়, কখনও নয়!'

তারপর সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তারা আরও কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিলে। এই সময়ের মধ্যে তারা যে কী করলে আর কী যে করলে না, সে সংবাদ বাইরে প্রচার করবার দরকার নেই। যাঁরা প্রেমিক, যাঁরা হৃদয় হারিয়ে ফেলেছেন, তাঁরা অনায়াসেই না বললেও আসল ব্যাপার উপলব্ধি করতে পারবেন। আর যাঁরা তা পারবেন না, তাঁদের ব্যাখ্যা করে কিছু বলবারও আবশ্যক নেই।

সন্ধ্যা পা চালিয়ে দিলে নিজের বাড়ির দিকে এবং চলতে চলতে ভাবতে লাগল নানাকথা।

তার পিসিমার সম্বন্ধে অরিন্দমবাবুর এতখানি কৌতূহল কেন? তাঁকে কি তিনি সন্দেহ করেন? কিন্তু কী রকম সন্দেহ? তিনি কি মনে করেন তার পিসিমাও এই চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত আছেন? বাঘরাজ কমলপুরে বিদ্যমান, সে নিজেও কমলপুরের সকলকে চেনে, কিন্তু তাদের মধ্যে বাঘরাজের মতো কোনও লোক থাকতে পারে বলে তার মনে হয় না। তার পিসিমার প্রকৃতিও যথেষ্ট সন্দেহজনক ও রহস্যময়! অতীত জীবনে দেশে দেশে তিনি কেন যে ঘুরে বেড়াতেন, তারও কোনও কারণ আবিষ্কার করা যায় না। নিজের অতীত জীবনের কোনও কথাই তিনি তার কাছে খুলে বলেননি। এক বাড়িতে বাস করেও সে যেন তার পিসিমার কাছ থেকে অনেক তফাতে পড়ে আছে। হয়তো অরিন্দমবাবুর বিশ্বাস, 'বাঘরাজ'—এই ছদ্মনামের আড়ালে আত্মগোপন করে আছেন তার পিসিমা দেবিকাদেবীই।

এই পর্যন্ত ভেবেই সন্ধ্যার বুকের কাছটা কেমন যেন শিউরে উঠল! তবে কি সে বাস করছে বাঘরাজের সঙ্গে এক বাড়িতেই! বিজনবাবু খুব সম্ভব দেবিকাদেবীর আসল গুপ্তকথা জানেন। আর সেই কথা প্রকাশ করে দেবেন বলে ভয় দেখিয়েই তার পিসিমার কাছ থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আদায় করেন।

এইসব ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যা যখন নিজের বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকল, তখন তার মন রীতিমতো বিচলিত হয়ে উঠেছে।

বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে সে বৈঠকখানার দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু দরজা ঠেলে বুঝলে, ভিতর দিক থেকে তা বন্ধ। সন্ধ্যা দরজার উপরে করাঘাত করলে।

ভিতর থেকে দেবিকাদেবীর কর্কশ কণ্ঠে শোনা গেল, 'কে?'

—'আমি সন্ধ্যা।'

দেবিকাদেবী বললেন, 'আমি এখন অত্যন্ত ব্যস্ত। তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারব না।'

—'পিসিমা তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।'

—'এখন আমার কোনও কথা শোনবার সময় নেই। তুমি উপরে নিজের ঘরে যাও। আমার কাজ শেষ হলে পর আমি নিজে তোমার সঙ্গে দেখা করব।'

সন্ধ্যা অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, এই লুকোচুরির কারণটা কী? কী নিয়ে পিসিমা এতটা ব্যস্ত হয়ে আছেন? তার মন অত্যন্ত কৌতূহলে পূর্ণ হয়ে উঠল, সে পা টিপে টিপে বাড়ির বাইরেকার বাগান দিয়ে বৈঠকখানার জানলাগুলোর দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু 'ফ্লোরে'র উপর বৈঠকখানাঘর,

বাগানে দাঁড়িয়ে উঁচু জানলা পর্যন্ত মুখ পৌঁছোয় না। সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে শুনতে পেলে, দেবিকাদেবী ও আর-একজন পুরুষমানুষ নিম্নস্বরে কথাবার্তা কইছে।

পুরুষের কণ্ঠস্বর বলছে, 'এই মোড়কের ভিতরে যে গুঁড়ো আছে, তা হচ্ছে নিরাপদ। আজ বৈকালে এই গুঁড়োটা লুকিয়ে তুমি সন্ধ্যার চায়ের পেয়ালায় ফেলে দিয়ো। চা পান করবার পর সে এমন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে যে, কাল সূর্যোদয়ের আগে আর চোখ খুলতে পারবে না। তুমি তাকে এই ঘরের কোনও সোফার উপরে শুইয়ে রেখো, সন্ধ্যার পর সন্ধ্যাকে নিয়ে আমি স্থানান্তরে চলে যাব।'

দেবিকাদেবী বললেন, 'ওসব খুনোখুনির ব্যাপারে আমি নেই।'

—'বিশ্বাস করো, সন্ধ্যার মতো সুন্দরী মেয়েকে আমি খুন করব না। কাল সকালে জাগবার পরে কেবল তার মাথাটা খানিকক্ষণ ধরে থাকবে।'

দেবিকাদেবী বললেন, 'শয়তান!'

—'বেশ আমি না হয় শয়তান, কিন্তু তুমি এতটা সাধু হলে কবে থেকে? আমার কাছে তোমার সাধুতার অভিনয় ফলপ্রদ হবে না। এখন যা বলছি, মন দিয়ে শোনো। সন্ধ্যাকে আমি বিবাহ করতে চাই।'

—'অসম্ভব।'

—'কেন অসম্ভব? পাত্র হিসাবে আমি কি অযোগ্য? আমি সুচতুর, বিদ্বান, স্বাস্থ্যবান—আর সবচেয়ে যা লোভনীয়, আমি হচ্ছি ধনবান। আমি যৌবনের সীমা পার হয়ে এসেছি বটে, কিন্তু লোকে এখনও আমাকে দেখে যুবক বলেই মনে করে। সন্ধ্যাকে আমি ভালোবাসি, তাই বৃদ্ধ হবার আগে তাকে বিবাহ করতে চাই।'

—'পাগল!'

—'আমাকে পাগল বলছ কেন?'

—'হাঁ, আমি তোমাকে আবার পাগল বলেই ডাকব। এই যে তুমি টাকার এত জাঁক দেখাচ্ছ, তবে তুচ্ছ বিশ হাজার টাকা আমাকে দিতে হবে বলে এত ইতস্তত করছ কেন?'

—'একটুও ইতস্তত আমি করব না, যদি সন্ধ্যাকে আমার হাতে তুলে দাও। সে সজ্ঞানে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে যাবে না, তাই তাকে আমি অজ্ঞান করেই এখান থেকে নিয়ে যেতে চাই।'

—'ও কথা রাখো। তোমরা খেপে খেপে আমার কাছ থেকে কত টাকা আদায় করেছ, তা কি তোমার মনে আছে?'

—'মনে আছে, সব মনে আছে। যখন টাকার দরকার হয়েছিল, তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছি। এখন সন্ধ্যাকে আমার দরকার হয়েছে, তাই তোমার কাছ থেকে তাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি। আপত্তি করবার সাহস তোমার আছে? জানো, আমি যদি মুখ খুলি, তাহলে তোমার অবস্থাটা হবে কী রকম?'

দেবিকা ধীরে ধীরে বললেন, 'জানি না। তবে একথা জানি যে, আজ কয়েক বৎসর ধরে তুমি আমার জীবনকে করে তুলেছ বিষময়। এ জীবন আর আমার সহ্য হচ্ছে না। পুলিশের কাছে তোমার কথা যদি ফাঁস করে দিই, তাহলে তারা নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করবে।'

লোকটা চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বললে, 'তোমার প্রলাপ শোনবার সময় আমার নেই, এখন আমি উঠলুম। কিন্তু যাবার সময় শেষবারের মতো বলে যাই,—আমার সঙ্গে

বিশ্বাসঘাতকতা করলে কিছুতেই তুমি নিস্তার পাবে না। আমি যা আদেশ দিলুম, অক্ষরে অক্ষরে তা পালন কোরো।' তারপরই ঘরের দরজা খোলার শব্দ হল।

কে এই আগন্তুক? সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি বাড়ির সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল এবং তারপর দেখলে, আগন্তুক এর মধ্যেই দ্রুতপদে বাগানের ফটকের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে।

তাকে ভালো করে দেখবার বা চেনবার অবসর সে পেলে না, কারণ সেই মুহূর্তেই দেবিকাদেবীও বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সে স্যাঁৎ করে সরে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। এবং সেইখান থেকেই উঁকি মেরে বিপুল বিস্ময়ে দেখলে, দেবিকার হাতে রয়েছে একটা বন্দুক।

দেবিকা বন্দুকটা তুলে ধরলেন এবং স্থির হস্তে টিপে দিলেন বন্দুকের ঘোড়া।

বন্দুকের গর্জনে সাড়া পড়ে গেল পাখিদের ভিতরে। সন্ধ্যা সভয়ে দেখলে, আগন্তুক টলটলায়মান অবস্থায় ফটক পেরিয়ে কয়েকপদ অগ্রসর হয়ে লুটিয়ে পড়ল ভূমিতলে।

সমস্ত লুকোচুরি ভুলে সন্ধ্যা ছুটে গিয়ে দাঁড়াল দেবিকাদেবীর পাশে। তারপর আর্তস্বরে শুধোলে, 'ও কে পিসিমা? তুমি কী করলে?'

অত্যন্ত সহজ স্বরে দেবিকা বললেন, 'বোধহয় আমি ওকে খুন করতে পেরেছি। তুমি চুপ করে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকো, আমি দেখে আসি।' তিনি হন হন করে ফটকের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর দেখলেন, মাটির উপরে লম্বমান একটা মূর্তি, আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে তার দুটো আড়ষ্ট চোখ!

দেবিকা বন্দুকটা মাটির উপরে স্থাপন করে হেঁট হয়ে মূর্তির বুকের উপরে হাত দিয়ে অনুভব করলেন, তার হৃৎপিণ্ডের গতি বন্ধ হয়ে গিয়েছে কি না।

তারপরেই সন্ধ্যা শুনতে পেল নারীকণ্ঠে তীব্র এক আর্তনাদ এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলে, দেবিকাদেবী দাঁড়িয়ে উঠে দুই হাতে নিজের মুখ চেপে ধরলেন। সন্ধ্যা বেগে ছুটে গেল ফটকের কাছে—তারপর ভীত চক্ষে দেখতে পেলে, দেবিকার দুই হাতের আঙুলগুলোর ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়ছে রক্তের ধারা! সেখানে নেই তৃতীয় ব্যক্তির চিহ্নমাত্র!

দেবিকা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'ও ভান করে মড়ার মতো পড়েছিল। আমি বোকার মতো বন্দুকটা মাটির উপরে রাখতেই সে আমাকে ধরে ফেললে—তার হাতে ছিল একখানা ছোরা!'

রুদ্ধশ্বাসে সন্ধ্যা বললে, 'তারপর?'

দেবিকা মুখের উপর থেকে হাত নামিয়ে বললেন, 'এই দ্যাখো!'

সন্ধ্যার সর্বাঙ্গের উপর দিয়ে খেলে গেল একটা শিহরন! দেবিকার কপালের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত রয়েছে রক্তে পরিপূর্ণ একটা ভয়াবহ ক্ষতচিহ্ন!

সন্ধ্যা প্রচণ্ড ক্রোধে অভিভূত হয়ে বললে, 'কোন দিকে গেছে সেই পাষণ্ডটা? আমি তাকে দেখতে চাই।'

কিন্তু সে অগ্রসর হবার চেষ্টা করতেই দেবিকা দৃঢ়মুষ্টিতে তার একখানা হাত চেপে ধরে বললেন, 'বোকামি কোরো না বাছা! ওর পিছন পিছন যাওয়া মানেই হচ্ছে আত্মহত্যা করা। 'আর কখনও এমন কাজ করবে না'—এই কথা বলতে বলতে সে বেগে ছুটে চলে গিয়েছে।'

—'কে সে?'

—'সবাই তাকে 'বাঘরাজ' বলে জানে! আমার মুখের উপরে রেখে গিয়েছে সে তার থাবার

চিহ্ন! আমি ভগবানের নামে শপথ করছি, দেখে নেব—তাকে আমি দেখে নেবই নেব! তাকে লুটিয়ে পড়তে হবে আমার পায়ের তলায়! ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে, তাকে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে আমার কাছে—তাকে—'

—'পিসিমা, পিসিমা—'

ক্রুদ্ধ ও রক্তাক্ত কোনও বন্য জীবের মতো সন্ধ্যার দিকে ফিরে দেবিকা গর্জন করে বলে উঠলেন, 'চলে যাও।'

—'পিসিমা, ওই লোকটাই কি ভয় দেখিয়ে তোমার কাছ থেকে টাকা আদায় করে?'

—'চলে যাও!'

—'ওরই নাম কি বাঘরাজ?'

তীব্রস্বরে দেবিকা বললেন, 'আর আমাকে জ্বালাতন কোরো না! এখান থেকে চলে যাও, চলে যাও, চলে যাও!'

সন্ধ্যা আর কোনও কথা কইতে ভরসা করলে না।

একাদশ

বাঘের বাচ্চাদের কাণ্ড

সে-রাত্রে আকাশে ছিল সপ্তমীর আধখানা চাঁদ।

ঘরের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত করে অরিন্দম বললে, 'সমুদ্রের ধারে খোলা জায়গায় সপ্তমীর চাঁদের আলোতেও খানিকটা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। সন্ধ্যা, আজ চন্দ্রকেও বন্ধু বলে মনে হচ্ছে না। অন্তত তার মুখে মেঘের ঘোমটা থাকলেও খানিকটা আশ্বস্ত হতুম।'

সন্ধ্যা বললে, 'সাঁতার কেটে আমরা যখন হানাবাড়ির সামনেকার ওই মোটর লঞ্চের কাছে গিয়ে পৌঁছোব, ততক্ষণে চাঁদ বোধহয় মিলিয়ে যাবে।'

তাদের দুজনেরই পরনে তখন কালো রঙের সাঁতারের পোশাক এবং দুজনেরই কোমরবন্ধের সঙ্গে বাঁধা আছে দুটো 'ওয়াটারপ্রুফ' ব্যাগ।

অরিন্দম বললে, 'ঘড়ির কাঁটা রাত নয়টার কাছাকাছি গিয়েছে। আজ দিনের বেলায় দূরবিন দিয়ে আমি দেখেছি, হানাবাড়ির কাছ থেকে একটা মোটর বোট বারবার ওই মোটর লঞ্চখানার দিকে আনাগোনা করেছে। এর মানে কী জানো সন্ধ্যা? ওরা গুদাম সাবাড় করছে।'

—'গুদাম সাবাড় করছে?'

—'হ্যাঁ, অর্থাৎ বাঘরাজের গুপ্তধন গিয়ে উঠছে মোটর লঞ্চের ভিতরে। আজ রাতেই ওরা বোধ হয় কমলপুরের মায়া ত্যাগ করবে। চলো, আর দেরি করা নয়। রামফল?'

রামফল দরজার কাছেই ছিল, ডাক শুনে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল।

—'রামফল! রাত বারোটার ভিতরে আমি যদি বাসায় ফিরে না আসি, তাহলে তুমি ডাঃ সেনের কাছে গিয়ে সব খবর দিয়ো!'

—'যে আজ্ঞে।'

অরিন্দম ও সন্ধ্যা বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল। বাড়ি থেকে সমুদ্রের জলের কাছে যেতে গেলে বেশ খানিকটা পথ পার হতে হয়। তারা দুজনে পরস্পরের হাত ধরাধরি করে চলতে লাগল। কিন্তু বেশিক্ষণ তাদের চলতে হল না। আচম্বিতে একটা আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন এবং আর্তকণ্ঠের চিৎকার শুনে দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সন্ধ্যা সচমকে বললে, 'কে গুলি ছুড়লে, আর কেই-বা আর্তনাদ করলে অরিন্দমবাবু?'

—'আমিও সেই কথাই ভাবছি সন্ধ্যা! মনে হচ্ছে, শব্দ দুটো এসেছে যেন দূরের ওই বালিয়াড়ির কাছ থেকে। এখানে বাঘরাজের শত্রু আছে মাত্র দুজন—আমি আর ডাঃ সেন। তবে কী—' বলতে বলতে অরিন্দম থেমে গিয়ে খানিকক্ষণ নীরব হয়ে রইল। তারপর আবার বললে, 'সন্ধ্যা, তুমি এখানে একটু দাঁড়াও। আমি চুপিচুপি গিয়ে ব্যাপারটা কী দেখে আসি।'

সন্ধ্যা বললে, 'একযাত্রায় পৃথক ফল হয় না বন্ধু! আমিও সঙ্গে যাব।'

অরিন্দম এর মধ্যে বুঝে নিয়েছে সন্ধ্যার আসল প্রকৃতি। যখন গোঁ ধরেছে তখন নিশ্চয়ই সে তার সঙ্গ আজ ছাড়বে না। অতএব তর্কাতর্কি করে সময় না কাটিয়ে সে বললে, 'বেশ, তাহলে এসো। কিন্তু ব্যাগের ভিতর থেকে রিভলভারটা বার করে নাও। আর তোমাকে আসতে হবে আমার পিছনে পিছনে।'

চতুর্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে করতে অরিন্দম অগ্রসর হল দ্রুতপদে। কিছুক্ষণ পরেই তারা সেই বালির ঢিপিটার কাছে এসে পড়ল। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় ভালো করে নজর চলে না বটে, কিন্তু বেশ বোঝা গেল সেখানে নেই জনপ্রাণীর অস্তিত্ব।

কিন্তু সেখানে ছিল একটা সন্দেহজনক ঝোপ। অরিন্দম নিজের রিভলভার প্রস্তুত রেখে সেই ঝোপের ভিতরটা একবার পর্যবেক্ষণ করতে গেল।

সে যখন ঝোপের খুব কাছে এসে পড়েছে, তখন হঠাৎ ঝোপটা দুলে দুলে উঠল! অরিন্দম কর্কশ কণ্ঠে বললে, 'কে আছ ঝোপের ভিতরে? বেরিয়ে এসো। নইলে এখনই আমি গুলি ছুড়ব।'

হঠাৎ একটা পরিচিত কণ্ঠস্বরে শোনা গেল, 'বটে, বটে, বটে! আর গুলি ছুড়ো না বাবা, আমি গুলিখোর নই—আমার পক্ষে একটা গুলিই যথেষ্ট!' বলতে বলতে ঝোপের ভিতর থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এল এক মূর্তি।

সন্ধ্যা বলে উঠল, 'কে আপনি? গলা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি আমাদের মোহনলালবাবু।'

মূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে আসতে বললে, 'ঠিক ধরেছ, ঠিক ধরেছ! মনে হচ্ছে আমি যেন সন্ধ্যার সঙ্গেই কথা কইছি।'

সন্ধ্যা বললে, 'মোহনলালবাবু, এখানে গুলি ছুড়লে কে? আর চেঁচিয়েই বা উঠল কে?'

মোহনলাল একেবারে তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে, 'গুলি ছুড়েছিল কে, তা আমি শপথ করে বলতে পারব না। তবে চেঁচিয়ে উঠেছিলুম যে আমি, একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে পারি।'

—'চেঁচিয়ে উঠেছিলেন আপনি?'

—'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ! গুলি খেলে মানুষ ইচ্ছার বিরুদ্ধেও চেঁচিয়ে উঠতে বাধ্য হয়।'

—'আপনি কি আহত?'

—'কতকটা তাই বটে। গুলি খেয়ে প্রথমটা আমি আচ্ছন্নের মতন হয়ে গিয়েছিলুম, কিন্তু এখন সে-ভাবটা সামলে নিতে পেরেছি।'

—'কিন্তু এ কীর্তি কার? বাঘরাজের?'

—'তাই নাকি, তাই নাকি? তাহলে বাঘরাজের নাম তুমিও শুনেছ? বেশ, বেশ, বেশ! তবে হলপ করে বলতে পারি, বাঘরাজ আমাকে মারবার জন্যে রিভলভার ছোড়েনি। নিশ্চয়ই এ তার চ্যালা-চামুণ্ডার কাজ! তাদের আমি দেখতেও পেয়েছি—দুজন লোক। কিন্তু অস্পষ্ট আলোয় তাদের চিনতে পারিনি।'

অরিন্দম শুধোলে, 'লোকদুটো গেল কোন দিকে?'

—'লম্বা দৌড় মারলে ওই হানাবাড়ির দিকে।'

সন্ধ্যা বললে, 'মোহনলালবাবু, দেখি আপনার কোথায় লেগেছে? এ কী! ঝাপসা আলোয় এতক্ষণ দেখতে পাইনি, আপনার মাথার উপর থেকে মুখ বেয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে যে!'

মোহনলাল বললে, 'এ নিয়ে তুমি বেশি মাথা ঘামিয়ো না সন্ধ্যা। গুলিটা আমার মাথার ওপরটা অল্প একটু ছুঁয়ে চলে গিয়েছে। প্রথমে ভেবেছিলুম, আমার খুলিটাই বুঝি ফট করে ফেটে গেল, কিন্তু এখন বেশ বুঝতে পারছি আমার খুলির সঙ্গে গুলির সম্পর্ক বেশি ঘনিষ্ঠ হতে পারেনি।'

অরিন্দম বললে, 'মোহনলালবাবু, এইখানে বসে পড়ুন। আপনার মাথায় একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিই।'

মোহনলালের কোনও আপত্তিই সে শুনলে না, জোর করে তাকে সেখানে বসিয়ে তার মাথায় বেঁধে দিলে ব্যান্ডেজ। যে কাজে সে আজ বেরিয়েছে, যে-কোনও মুহূর্তে অনেক কিছুরই দরকার হতে পারে। তার ব্যাগের ভিতরে ছিল দরকারি সব সরঞ্জামই।

মোহনলাল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'বড়োই মজার কথা, বড়োই মজার কথা!'

সন্ধ্যা বললে, 'এই আবার আপনি ভাঁড়ের মতো কথা কইতে শুরু করলেন। মজার কথা আবার কী?'

মোহনলাল সকৌতুকে হেসে উঠে বললে, 'বলো কী, বলো কী? মজার কথা নয়? চোখের সামনে আমি কী দেখছি! বাবু অরিন্দম আর বিবি সন্ধ্যা অঙ্গে ধারণ করেছেন সাঁতারের পোশাক! আজব ব্যাপার আজব ব্যাপার! বাংলা দেশের শ্রীমান আর শ্রীমতীরা আজকাল কি বিলাতের সায়েব-মেমের মতো সাঁতারের পোশাক পরে জলবিহার করতে যায়! আমি তো বিলাতেও গিয়েছি। কিন্তু সেখানেও সায়েব-মেমদের তো এমন অসময়ে সমুদ্রযাত্রা করতে দেখিনি! বেশ, যান অরিন্দমবাবু। কিন্তু খুব সাবধান, ওই হানাবাড়ির সামনেকার সমুদ্রের জল বিভীষিকাময়! লোকে বলে, রাত্রে ওখানে শ্রীযুক্ত প্রেত আর শ্রীযুক্তা প্রেতিনির দল জলকেলি করে বেড়ায়। কিন্তু সবই হচ্ছে আজব ব্যাপার, আজব ব্যাপার! অতঃপর আমি নিজের বাড়ির দিকে ধাবমান হলুম—নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার!' বলতে বলতে সেখান থেকে সে হন হন করে চলে গেল।

সন্ধ্যা বললে, 'মোহনলালবাবু ভাঁড়ামি করেন বটে, তবে মানুষ হিসাবে উনি মন্দ লোক নন। কিন্তু এই অসময়ে উনি এখানে এসেছিলেন কেন? আর কেনই বা উনি আক্রান্ত হলেন?'

অরিন্দম বললে, 'বাঘরাজের জন্যে ওঁর মনেও কৌতূহল জেগেছে বোধহয়। কানাঘুষোয় সম্ভবত উনি কোনও কোনও কথা শুনেছেন। উনি মদনলালের নিজের ভাই না হলেও তাঁর সঙ্গে এক-বাড়িতেই থাকেন। হয়তো দৈবগতিকে উনি কোনও গোপনীয় খবর জানতে পেরেছেন। এখানে ওই রহস্যময় মোটর লঞ্চখানার আকস্মিক উপস্থিতির কারণও উনি জেনে ফেলেছেন দৈবগতিকে। তাই নির্বোধের

মতো শখের গোয়েন্দাগিরি করবার জন্যে হানাবাড়ির দিকে যাত্রা করেছিলেন। বাঘরাজ যে এখানে আনাচে-কানাচে প্রহরী মোতায়েন করে রেখেছে এতটা উনি আন্দাজ করতে পারেননি। ফলে রহস্যের চাবি খোঁজবার জন্যে সন্তর্পণে মোহনলালবাবুর এদিকে আগমন, আর সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারের উত্তপ্ত গুলি-ভক্ষণ! আমি এইটুকু পর্যন্ত অনুমান করতে পেরেছি, কিন্তু এসব ভেবে এখন আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। তাড়াতাড়ি পদচালনা করো, আমাদের এখন অগাধ জলে সাঁতার কাটতে হবে।'

দ্বাদশ

কে বাঘরাজ?

সমুদ্রের ঢেউরা তখন আধা-চাঁদের আলোয় রচনা করছিল মানিকমালা। জল-জগতে বসেছে গানের জলসা, জলতরঙ্গ সংগীতে মুখরিত হয়ে উঠছে ছন্দে ছন্দে মধুর আনন্দ। মানুষের পৃথিবী তখন ঘুমিয়ে পড়েছে পরম শান্তির কোলে। সেইসব দেখতে দেখতে এবং শুনতে শুনতে সমুদ্রের তরঙ্গবহুল আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করলে অরিন্দম ও সন্ধ্যা।

প্রথম খানিকক্ষণ তারা কেউ কারুর সঙ্গে বাক্যবিনিময় করলে না। তারপর অরিন্দম শুধোলে, 'সন্ধ্যা, কোনও কষ্ট হচ্ছে না তো?'

সন্ধ্যা বললে, 'কষ্ট নয় অরিন্দমবাবু, আপনার প্রশ্ন শুনে আমার রাগ হচ্ছে। আগেই তো বলেছি, আমি হচ্ছি জলের পোকা, সাঁতার দিয়ে দশ-বারো মাইল অনায়াসে পার হয়ে যেতে পারি। ওরকম বাজে প্রশ্ন আর করবেন না।'

অরিন্দম হেসে বললে, 'বেশ, তা আর করব না। তবে তোমাকে আমি জলের পোকা বলে ভাবতে পারব না। বরং আমি তোমাকে 'মার-মেড' অর্থাৎ মৎস্যনারী বলে ডাকতে পারি। তাতে তোমার আপত্তি নেই তো?'

সন্ধ্যা কোনও উত্তর না দিয়ে হঠাৎ ডুব মেরে জলের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরে অরিন্দমকে ছাড়িয়ে খানিক তফাতে গিয়ে আবার ভেসে উঠল জলের উপরে।

অরিন্দম বললে, 'সন্ধ্যা, নিরস্ত হও। আজ আমরা সাঁতার প্রতিযোগিতায় আসিনি। তুমি একলা বেশি দূর এগিয়ে গেলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। আমাদের যেতে হবে একসঙ্গেই, দরকার হলে আমরা পরস্পরকে সাহায্য করতে পারব।'

আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল নীরবতার ভিতর দিয়ে। তাদের চারিদিকে তখন তরঙ্গ-দলের কলরব ছাড়া শোনা যাচ্ছে না আর কোনও রকম ধ্বনি।

পাশাপাশি ভেসে যেতে যেতে অরিন্দম বললে, 'আমরা মোটর লঞ্চের খুব কাছে এসে পড়েছি। লঞ্চের ভিতরে আলো জ্বলছে, দেখতে পাচ্ছ তো?'

—'হ্যাঁ অরিন্দমবাবু। কিন্তু হানাবাড়ির দিকে চেয়ে দেখুন। বাড়িখানা খুব অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তার কোথাও আলো জ্বলছে না।'

—'তার মানে, বাড়ির সবাই এখন লঞ্চের উপরে এসে উঠেছে। ওদের তোড়জোড় সব বোধহয় শেষ হয়ে গিয়েছে। আর কোনও কথা নয়।'

দুজনে সাঁতার কাটতে লাগল আবার মৌনমুখে। সন্তরণে সন্ধ্যার নিপুণতা দেখে অরিন্দম মনে

মনে বিস্ময় অনুভব করলে। সে যেন বিনা চেষ্টায় জলচর প্রাণীর মতো স্বাভাবিকভাবেই জল কেটে নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে!

অরিন্দম সন্ধ্যার কানে কানে বললে, 'বন্ধু, তুমি আমার চেয়েও ভালো সাঁতারু।'

সন্ধ্যা বললে, 'অভিনন্দনের জন্যে ধন্যবাদ! কিন্তু আমরা লঞ্চের খুব কাছেই এসে পড়েছি। একটা আলোর সামনে দিয়ে একটা মূর্তি এদিক থেকে ওদিকে চলে গেল। হয়তো লঞ্চের উপরে পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে।'

—'হতেও পারে। আর-একটু এগিয়েই আমাদের আরও হুঁশিয়ার হতে হবে। তারপর গোটা-কয়েক ডুব সাঁতার দিয়ে আমাদের পৌঁছোতে হবে একেবারে লঞ্চের পাশে।'

আর কিছুক্ষণ পরেই তারা গিয়ে হাজির হল যথাস্থানে।

চাঁদ তখন বিদায় নিয়েছে। চারিদিকে দুলছে অন্ধকারের যবনিকা। এবং সেই যবনিকা ফুটো করে বাইরে বেরিয়ে আসছে লঞ্চের কয়েকটা আলোর শিখা। সেখানেও জলকল্লোল ছাড়া পাওয়া যায় না জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ।

সন্ধ্যার কানে কানে অরিন্দম বললে, 'এরকম স্তব্ধতা অস্বাভাবিক। বাঘরাজ অ্যান্ড কোম্পানি এর মধ্যেই কি নিদ্রাদেবীর আশ্রয়গ্রহণ করেছে? মোটর লঞ্চখানা আজ রাত্রে কি এইখানেই অবস্থান করবে? এই দুটো প্রশ্নেরই কোনও সঙ্গত উত্তর মনে আসছে না।'

অরিন্দমের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সন্ধ্যা বললে, 'হয়তো তারা এখানে আসেনি, কমলপুরেই আছে।'

—'কিন্তু তুমি মোহনলালবাবুর মুখেই শুনলে তো তাঁর উপরে গুলিবৃষ্টি করে দুটো লোক এইদিকেই ছুটে এসেছে। আর লঞ্চের ভিতরে কেউ যে এখনও জেগে চলাফেরা করছে এটাও তো একটু আগে তুমি নিজের চোখেই দেখেছ।'

—'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না অরিন্দমবাবু।'

—'আর কিছুই বোঝবার দরকার নেই। আমরা যে-কোনও বিপদের জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছি। এখন লঞ্চের উপরে ওঠা নিয়েই কথা। কিন্তু এখানে উপরে ওঠবার কোনও অবলম্বনই খুঁজে পাচ্ছি না। লঞ্চের পিছন দিকে চলো, সেখানে একখানা 'জলিবোট' বাঁধা থাকলেও থাকতে পারে।'

অরিন্দমের অনুমান মিথ্যা নয়। লঞ্চের পিছন দিকে বাঁধা ছিল একখানা 'জলিবোট'। দুজনেই তার উপরে উঠে বসল। তারপর সেখান থেকে লঞ্চের উপরে গিয়ে উঠতে তাদের কোনওই বেগ পেতে হল না। সেখানে একটা আলো জ্বলছিল। দুজনেই এদিকে-ওদিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বুঝলে, তাদের সাদরে বা অনাদরে অভ্যর্থনা করতে পারে এমন কোনও লোকই সেখানে হাজির নেই। এ যেন জনশূন্য জলযান! এই বিজনতা সন্দেহজনক বলে মনে হয়।

তারা আপন আপন রিভলভার বাগিয়ে ধরে পা টিপে টিপে অগ্রসর হল। ডান দিকের রেলিং ও বাঁ দিকের কেবিনের মাঝখানের পথ দিয়ে তারা খুব ধীরে ধীরে এগুতে লাগল। সেখানে কোনও আলো নেই, এবং আকাশের আবছায়ামাখা আলোতে যেটুকু দেখা গেল, সেখানেও কোনও মানুষ আছে বলে মনে হয় না।

প্রথমেই বাঁ দিকে যে-ঘরটা পাওয়া গেল, তার দরজাটা খোলা। বাহির থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালনা করেও অরিন্দম ঘুটঘুটে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলে না। একটু পরেই আর একটা ঘরের

* তখনও বাজারে হাজার টাকার নোট চলতি ছিল।

ভিতর থেকে উজ্জ্বল আলোর একটা আভাস এসে পড়েছে বাইরের দিকে। হয়তো ওই ঘরে কারুর দেখা পাওয়া যাবে মনে করে সন্ধ্যার হাত ধরে অরিন্দম আবার অগ্রসর হল।

কিন্তু দুই পা এগুতে না এগুতেই অত্যন্ত অতর্কিতে কারা এসে তাদের উপরে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাধা দেবার জন্যে অরিন্দম কোনও চেষ্টা করবার আগেই তারা কঠিন হস্তে তাকে মাটির উপরে পেড়ে ফেললে। সন্ধ্যাকেও দুই দিক থেকে চেপে ধরলে দুজন লোক। পরমুহূর্তে সেখানটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সমুজ্জ্বল আলোকে।

ভূপতিত অবস্থাতেই অরিন্দম দেখলে, অন্ধকার ঘরের ভিতর থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছে দুজন লোক। তারা হচ্ছে বিজনকুমার এবং মদনলাল।

অরিন্দমের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বিজন হুকুম দিলে, 'ওর হাত পা সব ভালো করে বেঁধে ফ্যালো, যেন একটুও নড়তে না পারে। ওদের অস্ত্র শস্ত্র সব কেড়ে নাও। সন্ধ্যাকে বাঁধতে হবে না, দুজনে ওর দু-হাত চেপে ধরে থাকো। তারপর ওদের নিয়ে এসো আমার কামরায়। এসো মদনলাল।' তারা দুজনে সেখান থেকে চলে গেল।

অরিন্দমের সর্বাঙ্গ বেঁধে ফেলে চারজন লোক তাকে কাঁধে করে তুলে ধরে এগিয়ে চলল। তার পিছনে পিছনে সন্ধ্যা, তারও দুই দিকে দুজন লোক।

তারপর একটা ঘরের ভিতরে ঢুকে তারা অরিন্দমকে মেঝের উপরে শুইয়ে দিলে, এবং সন্ধ্যাকেও দাঁড় করিয়ে দিলে ঘরের এক কোণে।

একটা বেতের টেবিলের সামনে দু-খানা চেয়ারের উপরে বসেছিল বিজন ও মদনলাল।

টেবিলের উপরে রক্ষিত চুরোটের বাক্স থেকে সযত্নে একটা সিগার বেছে নিয়ে বিজন মহা-কৌতুকে হঠাৎ অট্টহাস্য করে উঠল। তারপর সে হাসি থামিয়ে বললে, 'ওহে অরিন্দম, তুমি হচ্ছ বেলেখেলার খেলোয়াড়। তুমি যে আজ রাত্রে এখানে হানা দিতে আসবে, সেটা আমরা অনায়াসেই অনুমান করতে পেরেছিলুম। এই যে আজকে এখানে মোটর লঞ্চের আবির্ভাব, আর হানাবাড়ি থেকে এখানে বারবার মোটর বোটের আনাগোনা, এসব হচ্ছে টোপ। আমরা জানতুম, এই দৃশ্য তোমার নজর এড়াবে না, আর তারপরেই তুমি আবার হবে আমাদের অনাহূত অতিথি। একটু আন্দাজ করবার মতন বুদ্ধি আমাদের আছে। আর আমাদের আন্দাজ যে মিথ্যে নয়, এখনই তো হাতেনাতে তা প্রমাণিত হয়ে গেল।'

অরিন্দম একটুও দমলে না, বেশ প্রফুল্লভাবেই বললে, 'তারপর রায়বাহাদুর, তারপর? তোমার আর কিছু বক্তব্য আছে?'

বিজন বললে, 'কিন্তু সন্ধ্যা যে তোমার সঙ্গিনী হয়ে এত সহজে আমার হাতের মুঠোর ভেতরে আসবে, এটা অবশ্য আমি অনুমান করতে পারিনি। আজ দেখছি আমার বরাত খুব ভালো। একসঙ্গে শত্রুনিপাত আর পত্নীলাভ।'

সকৌতুকে হেসে উঠে অরিন্দম বললে, 'তুমি কি ভাবো রায়বাহাদুর, তোমার আজকের এই বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে সন্ধ্যা তোমার গলায় সাগ্রহে পরিয়ে দেবে বরমাল্য?'

—'সে-কথা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না, এখন তুমি নিজের চরকায় তেল দেবার চেষ্টা করো। এখানে এসেছে তোমার জীবন্ত দেহ। কিন্তু একটু পরেই এখান থেকে সমুদ্রের ভিতরে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হবে তোমার মৃতদেহটাকেই।'

কামরার দেওয়ালে একটা ঘড়ি ছিল, অরিন্দম সেইদিকে দৃষ্টিপাত করলে। রাত বারোটা বাজতে

এখনও আধঘণ্টা দেরি। কথা আছে, রাত বারোটার সময় সে বাসায় গিয়ে হাজির না হলে রামফল যাবে ডাঃ সেনকে সব খবর জানাতে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে ডাঃ সেন এখানে যে রাত একটার আগে হাজির হতে পারবেন, এমন মনে হয় না। সুতরাং এখনও বেশ কিছুক্ষণ ধরে বাজে কথা কয়ে সময় কাটানো ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

সে বললে, 'আমাকে এমন করে শুইয়ে না রেখে বসিয়ে দিতে আপত্তি আছে কী?'

বিজন তাচ্ছিল্যভরে বললে, 'কোনও আপত্তিই নেই, তুমি এখন একটি নির্বিষ সর্প ছাড়া আর কিছুই নও।' তার ইঙ্গিতে দুজন লোক এগিয়ে এসে অরিন্দমকে দেওয়ালের কাছে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলে।

দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে অরিন্দম বললে, 'সবই তো বুঝলুম। বাঘের বাচ্চাদেরও দেখছি। কিন্তু চোখের সুমুখ থেকে স্বয়ং বাঘরাজ এখনও অদৃশ্য হয়ে আছেন কেন?'

আবার হা হা করে হেসে উঠে বিজন বললে, 'বাঘরাজ, বাঘরাজ! তুমি বাঘরাজকে দেখতে চাও? বাঘরাজ হচ্ছি আমিই!'

অরিন্দম মুখ টিপে হেসে বললে, 'রায়বাহাদুর, তোমার সঙ্গে যেদিন আমার প্রথম প্রেমালাপ হয়, সেদিন তুমি যে বাঘরাজের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলে, সে কথা আমি এর মধ্যেই ভুলে যাইনি।'

বিজন বললে, 'ওহে নির্বোধ, তোমার কাছে যে অত সহজে ধরা দেব, তেমন গাড়ল আমি নই। তোমার চোখে ধুলো দেবার জন্যেই আমি গিয়েছিলুম ঘরের বাইরে। আমিই হচ্ছি বাঘরাজ।'

সন্ধ্যা বললে, 'যাকে দেখলে নেংটি ইদুর বলে মনে হয়, সেইই নিজের নাম রেখেছে বাঘরাজ? একথা শুনলে বনের যে-কোনও বাঘ লজ্জায় ঘৃণায় আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবে।'

বিজন মুখভঙ্গি করে বললে, 'সবুর করো সন্ধ্যা, সবুর করো। তোমাকে শায়েস্তা করবার মন্ত্র আমার জানা আছে।'

সন্ধ্যা বললে, 'আমাকে শায়েস্তা করবে তুমি, একথা শুনেও আমার হাসি পাচ্ছে!'

বিজন উত্তরে কী বলতে যাচ্ছিল, মদনলাল বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'তোমাদের এই প্রেমের কলহ এখন বন্ধ করো। রাত ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের সম্পত্তি এখন লঞ্চের ভিতরে এসেছে। আমাদের গুপ্তকথা যারা জানে, তারাও আমাদের বন্দি হয়েছে। অতঃপর আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, অরিন্দমের মুখ চিরদিনের জন্য বন্ধ করা। কিন্তু—'

অরিন্দম বললে, 'প্রিয় মদনলাল, আমার মুখ বন্ধ করলেও তোমরা নিষ্কৃতি পাবে না। তোমাদের অধিকাংশ গুপ্তকথা যে জানে, এমন আর-একজন লোকও কমলপুরে বাস করে।'

মদনলাল চমকে উঠে বললে, 'তার মানে?'

বিজন হঠাৎ চেয়ারের উপরে সোজা হয়ে উঠে বসে বললে, 'তুমি কার কথা বলছ? দেবিকাদেবী? মোটেই নয়! আমাদের আসল গুপ্তকথা দেবিকাদেবী কিছুই জানেন না।'

ঘড়ির দিকে চেয়ে অরিন্দম বললে, 'ওটা তোমার কথার কথা। দেবিকাদেবী তোমাদের অনেক খবরই রাখেন। কিন্তু আমি দেবিকাদেবীর কথা বলছি না।'

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বিজন ও মদনলাল একসঙ্গে বলে উঠল, 'তবে?'

—'আমি বলছি ডাঃ সেনের কথা।'

মদনলাল অট্টহাসি হেসে উঠল এবং বিজনকুমারও হাসতে হাসতে প্রায় চেয়ারের উপরে গড়িয়ে পড়ল।

মদনলাল বললে, 'সেই মাথাপাগলা ডাঃ সেন? যে ঝোপে-ঝাপে প্রজাপতি খুঁজে খুঁজে বেড়ায়?'

অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বিজন বললে, 'অরিন্দম, আমি ভেবেছিলুম আজ গুলি করে তোমার খুলি উড়িয়ে দেব, কিন্তু এখন দেখছি তোমার কথা শুনে হেসে হেসে নিজেই আমি খুন হব।'

অরিন্দম বললে, 'তুমি যদি বাঘরাজ হও, তাহলে তোমার বুদ্ধির ঘটে মা ভবানী বিরাজ করছেন কেন? ডাঃ সেন কে, তাও তুমি জানো না?'

বিজন বললে, 'নিশ্চয়ই জানি। সে হচ্ছে একটা কেঁচোর মতো নিরাপদ প্রাণী!'

অরিন্দম হাসতে হাসতে বললে, 'আজ পর্যন্ত তোমাদের এই অজ্ঞতা দেখে বেশ বুঝতে পারছি, ডাঃ সেন নিজের ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করেছেন। ডাঃ সেন যে কে, তা জানো? তাঁর আসল নাম আমি প্রকাশ করতে চাই না, কিন্তু তিনি হচ্ছেন সুবিখ্যাত ডিটেকটিভ।'

দুই চক্ষু ছানাবড়ার মতন করে তুলে বিজন বললে, 'ডাঃ সেন ডিটেকটিভ!'

—'হ্যাঁ, তিনি হচ্ছেন পুলিশের একজন করিৎকর্মা অফিসার। তিনি ছদ্মবেশে কমলপুরে এসে বাস করছেন তোমাদের জন্যেই। আমি এখানে আসবার আগেই তাঁর কাছে তোমাদের সব খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। আমাকে হত্যা করলেও তোমরা তাঁর হতে থেকে নিস্তার পাবে না। এতক্ষণে বোধহয় পুলিশবাহিনী তৈরি হচ্ছে, জলপথে এখান দিয়ে পালালেও তোমরা আর পুলিশের হাত থেকে নিস্তার পাবে না। কারণ, বেশিদূর যেতে না যেতেই এই জলপথেই তোমরা ধরা পড়বে সদলবলে।'

বিজন এবং মদনলালের মুখ একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। তারা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্তের মতো।

তারপর হাতের অর্ধদগ্ধ সিগারটা ভস্মাধারের মধ্যে নিক্ষেপ করে হঠাৎ বিজন বললে, 'মদন, বাইরে চলো, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।' বাইরে বেরিয়ে গেল তারা দুজনে।

অরিন্দম একবার ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে নিলে। সে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে, এই অসহায় অবস্থায় তার কিছুই করবার শক্তি নেই, তার উপরে চারজন লোক তার পাশে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করছে তার প্রত্যেক ভাব ও ভঙ্গি।

ঘরের আর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে সন্ধ্যা। যদিও এরা তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেনি, কিন্তু তার এক একখানা হাত ধরে দুইপাশে দাঁড়িয়ে আছে দুইজন লোক।

সন্ধ্যা বললে, 'অরিন্দমবাবু আপনি—'

একজন লোক বাধা দিয়ে কর্কশ স্বরে বললে, 'চুপ! রায়বাহাদুরবাবু যতক্ষণ বাইরে থাকবেন, ততক্ষণ তোমরা কেউ একটাও কথা কইতে পারবে না।'

খানিকক্ষণ পরে বিজন ও তার পিছনে পিছনে মদনলাল ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল।

বিজন বললে, 'অরিন্দম, আমরা পরামর্শ করে বুঝলুম, তোমার আর এক মুহূর্তও বেঁচে থাকা উচিত নয়।'

অরিন্দম হাসিমুখে বললে, 'সাধু, সাধু!'

—'এখন কী ভাবে তুমি মরতে চাও বলো দেখি? ছোরার আঘাতে, না রিভলভারের গুলিতে, না ওই হাত পা বাঁধা অবস্থায় তোমাকে সমুদ্রের ভিতরে নিক্ষেপ করা হবে?'

সন্ধ্যা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে, 'কাপুরুষ!'

বিজন একবার হা হা করে হেসে উঠল। তারপর বললে, 'সুন্দরী সন্ধ্যা, তুমি যদি আমাকে আরও দু-চারটে বাছা বাছা গালাগাল দিতে চাও, তাহলেও আমি আপত্তি করব না। ফাঁসির আগেও

অপরাধীর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করা হয়। তুমি ফাঁসি যাবে না বটে, কিন্তু তুমিও আর বাঁচবে না। তোমাকে বিবাহ করবার সুযোগও আমাকে বাধ্য হয়ে ত্যাগ করতে হচ্ছে। পুলিশ যখন খবর পেয়েছে, তখন আমাদের নিজেদের মাথার উপরেও যে খাঁড়া ঝুলছে, এটা বেশ বুঝতে পারছি। মঞ্চের উপরে তোমার উপস্থিতি হবে আমাদের পক্ষে একেবারেই মারাত্মক।'

সন্ধ্যা দীপ্তচক্ষে বললে, 'নরকের কীট, আমি তোদের ভয় করি না।'

বিজন তার লোকজনদের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'অরিন্দমকে এখান থেকে নিয়ে যাও। ওর গায়ে খুব একটা ভারী জিনিস বেঁধে ওকে সমুদ্রের ভিতরে ফেলে দাও। সন্ধ্যাকেও ভালো করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঠিক ওই ভাবেই সমুদ্রের তলায় ডুবিয়ে দাও। বাইরের কোনও লোক লঞ্চে উঠেও যেন ওদের কোনও চিহ্নই দেখতে না পায়।'

মদনলাল বললে, 'তাহলে আমি গিয়ে লঞ্চখানার নোঙর তুলে নিতে বলি? আর এখানে থাকবার দরকার কী?'

বিজন ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। মদনলাল দরজার দিকে অগ্রসর হল। চারজন লোক ধরাধরি করে অরিন্দমকে মেঝের উপর থেকে টেনে তুললে।

ঠিক সেই সময়ে জোরে জোরে পা ফেলে, সকলকে অবাক করে দিয়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে মোহনলাল। তার দুই হাতে দুটো রিভলভার!

মোহনলাল বললে, 'হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছ কী? রায়বাহাদুর, তোমার গুপ্তঘাতকের গুলিতে বাঘরাজ মরেনি। আমি তার প্রেতাত্মা নই, আমি হচ্ছি জীবন্ত বাঘরাজ!'

ত্রয়োদশ

তারপর?

বাঘরাজ বললে, 'অরিন্দমবাবু, শেষ পর্যন্ত আপনারই জয়! হয়তো ভগবানের ইচ্ছাই তাই। আপনার উপরে আমার আর কোনও রাগ নেই। হয়তো আমি জিতলেও জিততে পারতুম, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকদের জন্যে আমাকে আজ পরাজয় স্বীকার করতে হল! আর আমার যুদ্ধ করবার ক্ষমতা নেই—অদৃষ্ট আমার বিরুদ্ধে। এখন আমি শ্রান্ত, বড়োই শ্রান্ত!'

অরিন্দম বললে, 'মোহনলালবাবু, আমাকে কি এইরকম হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেই আপনার কথা শুনতে হবে?'

বাঘরাজ অনুতপ্ত কণ্ঠে বললে, 'উত্তেজিত হয়ে আমি ভুলে গিয়েছিলুম, আমাকে মার্জনা করবেন।' তারপর গলা তুলে বললে, 'অরিন্দমবাবুর হাত-পায়ের দড়ি এখনই কেটে দেওয়া হোক। এ ঘরে থাকব খালি আমরা চারজন—অরিন্দমবাবু, সন্ধ্যা, বিজন আর আমার স্নেহশীল দাদা মদনলাল। বাকি সবাই এখনই এখান থেকে বেরিয়ে যাও।'

নীরবে তার আজ্ঞা পালন করে, অরিন্দমের বন্ধনরজ্জু কেটে দিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলে বাকি লোকগুলো।

বাঘরাজ বললে, 'অরিন্দমবাবু, এ জীবনে সাধুতার জন্যে গর্ব করবার সৌভাগ্য আমার হবে না। কিন্তু এই যে বিজন আর মদন, এরা হচ্ছে আমার চেয়েও পাপাত্মা। নরকেও ওদের স্থান নেই! ওরা

ছিল আমার হাতের খেলার পুতুল। কিন্তু খেলার পুতুলরাও আজ খেলোয়াড়ের চেয়ে প্রধান হয়ে উঠতে চায়। আমার সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করবার জন্যে, ওরা আজ আমাকেও দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ওদের বধ করবার জন্যেই ভগবান আজ আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। খুব সংক্ষেপে এই হল আমার কাহিনি। সন্ধ্যা, আমি তোমাকে ভালোবাসতুম। কিন্তু এখন বুঝছি তোমার যোগ্য পাত্র হচ্ছেন অরিন্দমবাবুই। আশা করি ওঁকে নিয়ে তুমি জীবনে সুখী হতে পারবে। আমি জানি, ওঁর লোভ আছে জলের ভিতর থেকে কুড়িয়ে পাওয়া আমার সোনার থানগুলোর উপরে। ওঁকে আমি হতাশ করব না। তোমার বিবাহের যৌতুক স্বরূপ সেই সোনার থানগুলো আমি পাঠিয়ে দেব যথাস্থানে যথাসময়ে। অরিন্দমবাবু, আপনার বাগদত্তা বধূকে নিয়ে আপনি অনায়াসেই বাইরে যেতে পারেন। তারপর 'জলিবোটে' করে তীরে গিয়ে পৌঁছোতে আপনার বেশি দেরি লাগবে না। এখন শেষ হিসাব-নিকাশ করবার জন্যে আমাকে এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। নমস্কার অরিন্দমবাবু! আর সন্ধ্যা, তোমাকে আমি আশীর্বাদ করছি! হ্যাঁ, আর একটা কথাও জেনে যাও, বাড়িতে গিয়ে তোমার পিসিমাকে আর দেখতে পাবে না। যাকে তুমি পিসি বলে জানো, সে নারী নয়, পুরুষ! তার উপাধি বটব্যাল, আর ডাকনাম হচ্ছে 'রাজা'! যখন কাশীধামে সত্যিকার দেবিকাদেবী হঠাৎ মারা যান, তখন এই 'রাজা' বা বটব্যাল তাঁর বাসাতেই ছদ্মবেশে আশ্রয় নিয়েছিল। তোমার পিসি যে দিন মারা যান, ঠিক তার পরদিনেই তোমার বাবাও পরলোকে গমন করেন। দেবিকাদেবীকে তোমার সম্পত্তির 'অছি' করা হয়েছে শুনে এই 'রাজা' নারীর ছদ্মবেশ গ্রহণ করে তোমার পিসি সেজে কমলপুরে এসে হাজির হয়! 'রাজা'র কেবল অদ্ভুত ছদ্মবেশ গ্রহণ করার শক্তিই ছিল না, জাল জালিয়াতিতেও তার জুড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে দেবিকাদেবীর হাতের লেখা পর্যন্ত অবিকল নকল করতে পারে। 'রাজা'র গুপ্তকথা জানতুম আমি আর বিজন। সেই গুপ্তকথা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে দেবিকার বেশধারী 'রাজা'র কাছ থেকে আমরা অনেক টাকা আদায় করেছি। আসলে আমরা নিয়েছি তোমার টাকাই। সে জন্যেও তোমার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তোমার বিবাহে যে যৌতুক দিতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্তের মতো।'

সন্ধ্যা অত্যন্ত অভিভূতের মতো বললে, 'আমার পিসিমাকে—না সেই 'রাজা'কে আর দেখতে পাব না কেন?'

বাঘরাজ বললে, 'এখানে আসবার আগে 'রাজা'কে জানিয়ে দিয়ে এসেছি, আজ আমি হাটের মাঝখানে হাঁড়ি ভেঙে দেব। কিন্তু এখন তোমরা এখান থেকে যাও, আমার হাতে অনেক কাজ।'

অরিন্দম বললে, 'মোহনলালবাবু, এর পরে আমার আর কোনওই বক্তব্য নেই। এখন 'শ্রীমতী'কে উদ্ধার করেই আমি এখান থেকে বিদায় গ্রহণ করছি।' সে ঘরের কামরার এক কোণে ছুটে গেল। সেইখানেই মেঝের উপরে পড়ে ছিল কোষবদ্ধ 'শ্রীমতী'। তাকে তুলে নিয়ে সে আবার সন্ধ্যার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে জোড়হাত করে বললে, 'নমস্কার, মোহনলালবাবু।'

ললাটের উপরে দুই হাত তুলে বাঘরাজও বললে, 'নমস্কার, অরিন্দমবাবু!'

ধ্রুম, ধ্রুম!

দুই হাত শূন্যে ছড়িয়ে বাঘরাজ চিত হয়ে পড়ে গেল মেঝের উপরে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বক্ষ ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে এল রাঙা রক্তের ধারা! যে সময়ে বাঘরাজ দুই হাত কপালে ছুঁইয়ে অরিন্দমকে নমস্কার করছিল, সেই সুযোগ গ্রহণ করে বিজন তাকে গুলি করেছে।

চোখের পলক ফেলবার আগেই অরিন্দম ফিরে দাঁড়িয়ে দেখলে, বিজন আবার রিভলভার

তোলবার উপক্রম করছে। কিন্তু ক্ষিপ্রগতিতে কোষ থেকে নির্গত হল 'শ্রীমতী' এবং চকমকিয়ে বিদ্যুতের মতো ছুটে গিয়ে বিদ্ধ হল বিজনের দক্ষিণ বাহুর মধ্যে! বিজন আর্তনাদ করে উঠল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে মেঝের উপরে পড়ে গেল রিভলভারটা। অরিন্দম একলাফে এগিয়ে গিয়ে রিভলভারটাকে মাটির উপর থেকে তুলে নিয়ে আবার বিজনের দিকে লক্ষ্যস্থির করলে।

ঠিক পরমুহূর্তেই, কেউ কোনও কথা কইবার আগেই বাইরে শোনা গেল তুমুল কোলাহল! চিৎকার উঠল—'পুলিশ! পুলিশ!' চারিদিকে শোনা গেল অনেক লোকের দ্রুত পদশব্দ।

দরজার কাছে আবির্ভূত হল একটা মূর্তি। আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললে, 'পুলিশের অনেকগুলো নৌকো এসে চারিদিক থেকে আমাদের ঘিরে ফেলেছে।'

তারপরেই সবাই শুনতে পেলে, একদল লোকের জুতোপরা ভারী ভারী পায়ের শব্দ এইদিকেই এগিয়ে আসছে।

দরজার কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল প্রথম মূর্তিটা। সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে এসে আবির্ভূত হল একজোড়া লোক—ডাঃ সেন এবং রামফল!

মেঝের দিকে তাকিয়ে মহা বিস্ময়ে ডাঃ সেন বলে উঠলেন, 'এ কার মৃতদেহ? মোহনলালবাবুর?'

—'মোহনলালবাবু নয় মিঃ সেন, বাঘরাজ! কিন্তু বাঘরাজের আগে যাদের মরা উচিত ছিল, তারা এখনও এই পৃথিবীতে সশরীরেই বর্তমান!' অরিন্দম অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখিয়ে দিলে বিজন আর মদনলালকে।

তারা সশরীরে বর্তমান বটে, কিন্তু তাদের মুখ হচ্ছে মড়ার মতো সাদা!

তার পরের দৃশ্য বর্ণনা করবার দরকার নেই; বুদ্ধিমান পাঠকরা তা অনুমান করে নিতে পারবেন অনায়াসেই।*

---

*আংশিক ভাবে পাশ্চাত্য আখ্যান অবলম্বনে।

বিমানের নতুন দাদা

প্রথম

হারাধন ভদ্রলোক হতে চায়

ছিদাম চাষার কথা বলছি।

ছিদামকে চাষা বললুম বটে, কিন্তু সে সাধারণ চাষা নয়। একদিক দিয়ে তাকে ধনী বললেও অত্যুক্তি হবে না।

ছিদামের বাপ ছকড়ি আমরণ জমিতে লাঙল চালনা করেছিল, এবং ছিদামকেও তার বাপের মৃত্যু পর্যন্ত যে লাঙল চালাতে হয়েছিল, একথা সকলেই জানে।

কিন্তু বাপ মারা যাওয়ার পর ছিদাম যখন দেখলে, সে কয়েক-শত-বিঘা-ব্যাপী চাষ-জমির মালিক, আর তার অধীনে কাজ করছে অগুনতি লোক, তখন সে নিজে হাতে-নাতে কাজ করা ছেড়ে দিলে। অবশ্য তার নিজের চাল-চলন কিছুই বদলাল না। প্রতিদিন সে নিজের চাষ-জমিতে হাজির থেকে সমস্ত কাজকর্ম তদারক করত—এমনকী রোদে পুড়তে, জলে ভিজতে ও শীতে কাঁপতেও তার কিছুমাত্র আপত্তি হত না।

কিন্তু যে-শ্রেণীর লোকই হোক, লক্ষ্মীলাভ করলে মানুষের মন অল্প-বিস্তর না বদলে পারে না। ছিদামের তিন ছেলে। সে নিজে হাঁটুর উপরে মোটা কাপড় পরে বটে, কিন্তু কলকাতায় লোক পাঠিয়ে ছেলেদের জন্যে 'চাঁদনি-চক' থেকে নানানরকম রংচঙে জামা-কাপড় কিনে আনায়। ছিদামের নিজের কখনও হাতে-খড়িও হয়নি, কিন্তু ছেলেদের সে ভর্তি করে দিয়েছে গাঁয়ের স্কুলে। নিজে লেখাপড়া জানে না বলে লক্ষ্মীলাভ করে নানাদিকে আজ তার অসুবিধা হচ্ছে নানানরকম। দেনা-পাওনার ব্যাপার নিয়ে দু-লাইন চিঠি লেখবার জন্যেও তাকে পরের দ্বারস্থ হতে হয়। তার মূর্খতার সুযোগ নিয়ে ধূর্ত লোকেরা মাঝে মাঝে তাকে বেশ দু-পয়সা ঠকিয়েও যায়। এইসব বিপদ থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছেলেদের সে স্কুলে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

ছিদামের বাড়ি বড়ো না হলেও সেখানা হচ্ছে কোঠাবাড়ি এবং ছিদামদের গাঁয়ে কোঠাবাড়ি আছে কেবল গাঁয়ের জমিদারদের। এই হিসেবে মদনপুর গাঁয়ের মধ্যে লোকে জমিদারদের পরেই নাম করত ছিদাম চাষার।

ছিদাম সেদিন সকালে বাড়ির সদর দরজার কাছে একখানা টুলের উপরে বসে হুঁকোয় টান মারছে, এমন সময় তার বড়োছেলে হারু সেখানে এসে হাজির হল।

এখানে হারুর একটুখানি পরিচয়ের দরকার, কারণ আমাদের কাহিনির নায়ক হচ্ছে এই হারু বা হারাধনই।

হারাধনের বয়স হবে পনেরো কী ষোলো। কিন্তু এই বয়সেই দেখতে সে হয়ে উঠেছে মস্ত জোয়ান এক পুরুষ মানুষের মতন। 'এখনই সে মাথায় পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা এবং তিন-চার বছরের ভিতরেই মাথায় যে ছয় ফুটকেও ছাড়িয়ে যাবে, এ-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। তার বুকের ছাতি রীতিমতো চওড়া, আর তার সর্বাঙ্গ দিয়ে সর্বদাই চামড়ার তলা থেকে

ঠেলে ঠেলে উঠছে সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট মাংসপেশি। প্রতিদিন নিয়মিত ডন-বৈঠক দিয়ে ও কুস্তি লড়ে দেহখানিকে সে রীতিমতো তৈরি করে তুলেছে। তার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ও সুন্দর মুখশ্রী দেখলে কেউ তাকে চাষার ছেলে বলে ধরতে পারবে না।

হারাধন এই বছরেই গাঁয়ের স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় সফল হয়েছে। যে-কোনও চাষার ছেলের পক্ষে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় সফল হওয়া অল্প গৌরবের কথা নয়, এবং এ-বিষয়ে সে নিজে এবং তার বাপ ছিদাম দুজনেই দস্তুরমতো সচেতন।

হারাধন চাষার ছেলের মতনও লালিত-পালিত হয়নি। কেমন করে লাঙল ধরতে হয়, তাও বোধহয় সে জানে না। স্কুলের সমস্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে সে সমানভাবেই মেলামেশা করে এবং তার বাপের কাঞ্চন-কৌলিন্যের প্রসাদে গাঁয়ের ভদ্রলোকের ছেলেদের তরফ থেকেও কোনওরকম আপত্তি ওঠে না।

আর আপত্তি উঠবেই বা কেমন করে? মদনপুর হচ্ছে একখানি ছোটোখাটো গ্রাম। এখানকার অধিকাংশ তথাকথিত ভদ্রলোকই হচ্ছে গরিব গৃহস্থ। তাদের সংসারে অভাব অনটন লেগেই আছে এবং যখন-তখন অনেক ভদ্রলোককেই টাকা ধার করবার জন্যে ছিদামের দ্বারস্থ হতে হয়। ভদ্রলোকদের এই অক্ষমতা দেখে এবং নিজের ক্ষমতার পরিমাণ বুঝে ছিদাম মনে মনে অনুভব করে বিশেষ একটা গর্ব।

কিন্তু মাঝে মাঝে বেসুরো সুর বেরিয়ে পড়ে। হয়তো কোনওদিন হারাধন শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে না, অমনি তাঁর মুখ থেকে টিটকারি শোনা গেল, 'ব্যাটা চাষার ছেলে, কত আর বুদ্ধি হবে!'

গাঁয়ের জমিদাররা যে বিশেষ সম্পত্তিশালী, তা নয়; হয়তো দরকার পড়লে হারাধনের বাপ এককথায় তাদের চেয়ে বেশি টাকা ঘর থেকে বার করে দিতে পারে। কলকাতা শহর হলে তাঁদের মতন জমিদারদের দিকে সাধারণ গৃহস্থরাও ফিরে চাইত না। কিন্তু তাহলে কী হয়, তবু তাঁরা জমিদার! এই বনগাঁয়ের শিয়াল-রাজা!

অতএব জমিদার-বাড়ির যে ছেলেটি হারাধনের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে, সে স্পষ্টাস্পষ্টিই চাষার ছেলে বলে তাকে ঘৃণা ও উপেক্ষা করত। হারাধন একদিন তাকে 'ভাই' বলে ডেকে কথা কইতে গিয়েছিল, কিন্তু জমিদার-নন্দন উত্তরে তার সঙ্গে একটা কথাও কয়নি বা তার দিকে একবার ফিরেও তাকায়নি। এমনকী ক্লাসের ভিতরে চাষার ছেলে হারাধনের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসতেও সে নারাজ ছিল। জমিদারের ছেলে প্রায়ই কলকাতায় যায় এবং শহরের সমস্ত হালচাল তার নখদর্পণে। যখন-তখন কলকাতা থেকে সে হাল-ফ্যাশানের কাপড়-চোপড় পরবার কায়দা শিখে আসে এবং হারাধনের 'চাঁদনি-চক' থেকে সস্তায় কেনা 'রেডিমেড' ও রংচঙে পোশাকের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুখ টিপে-টিপে হাসে এবং অন্য কোনও ছেলেকে ডেকে চাপা-গলায় অথচ হারাধন যাতে শুনতে পায় এমন স্বরে বলে, 'চাষার ছেলে, ভদ্রলোক হয়েছেন! আহা, কী পোশাক! হতভাগা, পাড়াগেঁয়ে ভূত!'

এইসব অপমান হারাধনকে মুখ বুজে সহ্য করতে হত। যদিও সে জানে ইচ্ছা করলে এক ঘুষি মেরেই জমিদারপুত্রকে এখনি ভূমিসাৎ করতে পারে, তবু মনের রাগ তাকে মনেই

পুষতে হত নীরবে। কারণ তার বাপ বলে দিয়েছিল, জমিদারের সঙ্গে ঝগড়া করলে তাদের নিজেদেরই বিপদের সম্ভাবনা বেশি।

একদিন এমনিতরো কী-একটা ব্যাপারের পর হারাধন মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলে, সে আর এ-গ্রামে থাকবে না। সে কলকাতায় চলে যাবে—যেখানে কেউ তাকে চাষার ছেলে বলে চেনে না। কলকাতা থেকে যদি সে কখনও ফিরে আসে, তবে ভদ্রলোক নাম কিনেই ফিরে আসবে। কয়েকদিন ধরে মনে মনে এই কথা ভেবে তার প্রতিজ্ঞা হয়ে উঠল ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার মতন অটল ও সুদৃঢ়। এবং হারাধনকে যারা চেনে তারাই জানে যে সে হচ্ছে অত্যন্ত একরোখা ছেলে, যা ধরবে তা করবেই।

এইবার সেদিন সকালের কথা বলি।

টুলের উপরে উবু হয়ে বসে তামাক টানতে টানতে ছিদাম যখন অর্ধ-নিমীলিত চোখে দেখলে হারাধন তার সামনে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, তখন একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে আস্তে আস্তে বললে, 'কীরে হারু, কিছু বলতে চাস নাকি? নতুন জামা-কাপড় চাই, না আর কিছু?' সে জানত বিশেষ দরকার না হলে শ্রীমান হারু কোনওদিনই তার সামনে এসে হাজির হয় না।

হারাধন মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'একটু দরকার আছে বাপি!'

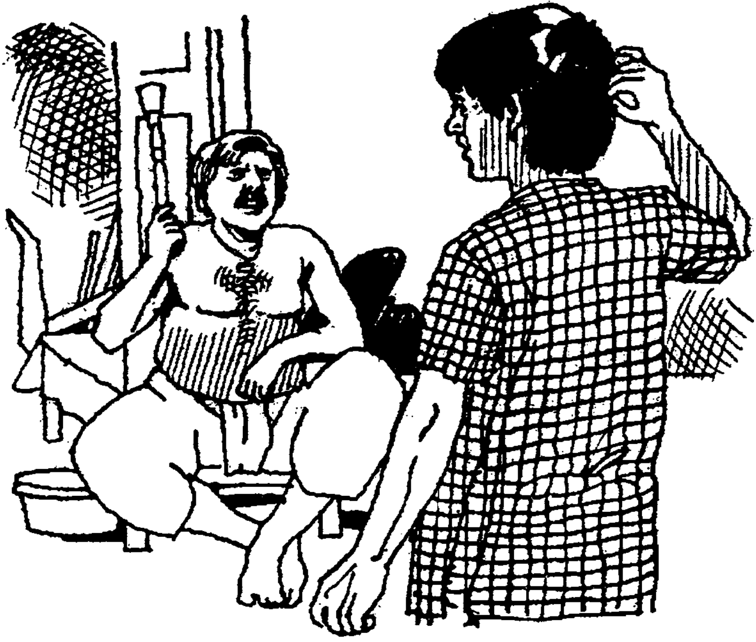

—'দরকারটা কী শুনি?'

অল্প ইতস্তত করে হারাধন মনের বাসনা একেবারেই প্রকাশ করে ফেললে। বললে, 'বাপি, আমি কলকাতায় যেতে চাই!'

ছিদাম দুই ভুরু তুলে সবিস্ময়ে বললে, 'বলিস কী রে! কলকাতায় যাবি? কার সঙ্গে রে?'

—'কারুর সঙ্গে নয়।'

এবারে আর ছিদামের বিস্ময়ে সীমা রইল না। সে বললে, 'কারুর সঙ্গে নয়? তুই একলা কলকাতা যাবি?'

—'হ্যাঁ বাপি।'

ছিদাম গম্ভীর মুখে হুঁকোয় দু-চারটে টান মেরে বললে, 'তোর মাথায় এ কুবুদ্ধি কে দিলে শুনি?'

—'কেউ দেয়নি। আমি নিজেই অনেক ভেবে-চিন্তে স্থির করলুম যে কলকাতায় না গেলে কোনওদিনই আমি ভদ্রলোক হতে পারব না।'

ছিদাম এইবারে রীতিমতো হতভম্ব হয়ে তামাক-টানা ছেড়ে হুঁকোটা নীচে নামিয়ে রাখলে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললে, 'কলকাতায় না গেলে তুই ভদ্রলোক হতে পারবি না, বটে? তোর কথার মানে কী রে ব্যাটা? তুই যে চাষার ছেলে, কলকাতায় গিয়ে সেটা ভুলতে চাস নাকি?'

হারাধন পণ্ডিত না হলেও একালের লেখাপড়া কিছু কিছু শিখেছে। সে বললে, 'কে যে চাষার ছেলে, আর কে যে মুটের ছেলে, একথা কারুর গায়ে চিরদিন লেখা থাকে না! শুনেছি আমাদের গাঁয়ের জমিদারদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন খুনে, ঠগি, ডাকাত। কিন্তু আজও কি তাদের কেউ ওইসব নামে ডাকে? ডাকাতের বংশধররা যদি হতে পারে বড়ো বড়ো বাবু, ভদ্রলোক, তাহলে চাষার ছেলেরাই বা কী দোষটা করলে? ডাকাত হওয়ার চেয়ে কি চাষা হওয়া ভালো নয়? স্বর্গে যেতে পারে কারা, ডাকাতরা না চাষারা? তুমি তো জমিদারদের চেয়েও বড়োলোক, তবে তোমার ছেলে আমিই বা ভদ্রলোক হতে পারব না কেন?'

ছিদাম জানে চাষ-বাস করতে, কুলি মজুর খাটাতে, শস্য বেচে টাকা জমাতে আর সেই টাকা সুদে খাটাতে; ক-য়ের পাশে খ-কে দেখলে সে চিনতে পারে না, কেতাবি বুলিও কোনওদিন শিখতে পারেনি। হারাধন স্কুলে পড়লেও যে এমন সব আশ্চর্য কথা বলতে শিখেছে, এটা সে কোনওদিন ধারণাতেও আনতে পারেনি। তার মতন এক চাষার ছেলে হারাধনের মুখে এই সব বড়ো বড়ো কথা শুনে সে কেবল ভড়কেই গেল না, মনে মনে খুশিও হল খানিকটা। ছেলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ছিদাম বললে, 'কলকাতা কত বড়ো শহর জানিস?'

হারাধন বললে, 'কী করে জানব বাপি? তুমি তো কোনওদিন আমায় কলকাতায় নিয়ে যাওনি?'

ছিদাম বললে, 'হেঃ, তোর বাপই কলকাতায় গেছে কবার রে ব্যাটা। মোটে তিনবার! একবার খুব ছেলেবেলায়, একবার দশ বছর আগে, আর একবার বছর-পাঁচেক আগে। যতবারই গিয়েছি, ততবারই দেখেছি, ওই রাক্ষুসে শহরটা দিনে দিনে যেন আরও ডাগর হয়ে

উঠছে! সেখানে বাইরে বেরুলে লাখো লাখো মানুষের ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয়, সেখানে পথে পা বাড়ালেই মস্ত মস্ত হাওয়া-গাড়িরা বাঘ-ভাল্লুকের মতো মারমুখো হয়ে তেড়ে আসে, সেখানে হাওয়া-গাড়িদের ফাঁকি দিলেও চোর-জোচ্চোর-গুণ্ডাদের ফাঁকি দেবার জো নেই, সেখানে লাল-পাগড়ি-পরা চৌকিদাররা চোরদের কিছু বলে না, কিন্তু সাধুদের ধরে নিয়ে যায় হাতে দড়ির বাঁধন দিয়ে! এমন শহরে যে তুই যেতে চাস, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবি কেমন করে?'

হারাধন বললে, 'বুদ্ধির জোরে।'

ছিদাম হা হা করে হেসে উঠে বললে, 'দু-পাতা পড়তে শিখলেই কারুর বুদ্ধির জোর বাড়ে না রে গাধা! আর খালি বুদ্ধির জোরই সব নয়, বুঝেছিস?'

হারাধন বুক ফুলিয়ে বললে, 'আমার গায়ের জোরও আছে।'

ছিদাম নীরবে আর একবার ছেলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিলে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আয়, দেখি তোর গায়ের জোরের একটু নমুনা।' বলেই নিজের রৌদ্রদগ্ধ, পেশিবহুল সবল ও স্থূল ডান হাতখানা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলে, হাতের পাঁচ আঙুল ফাঁক করে।

হারাধন বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু আশ্চর্য হয়ে বললে, 'আমায় কী করতে বলো বাপি?'

ছিদাম বললে, 'আমার এই হাতখানা দেখছিস? ভারী লাঙল ঠেলে ঠেলে আমার এই হাত হয়েছে লোহার মতন শক্ত! এই হাতের এক ঘুষি মেরে আমি ডাব ভেঙে তার জল খেতে পারি! আর এই হাতের এক এক টানে বড়ো বড়ো বলদ শান্ত-শিষ্ট ভেড়ার মতন সুড়সুড় করে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে! পারবি আমার এই হাতখানা ভাঙতে? পারবি আমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে?'

হারাধন প্রথমটা ইতস্তত করতে লাগল। ভাবতে লাগল, ছেলে হয়ে বাপের সঙ্গে পাঞ্জা-লড়া উচিত কি না? সে আজ পর্যন্ত যত বই পড়েছে তার কোনওখানার ভিতরেই দেখেনি, বাপের সঙ্গে ছেলের পাঞ্জা-লড়ার কোনও কথাই। বাধো বাধো গলায় বললে, 'তোমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ব কী বাপি?'

ছিদাম বললে, 'কী রে হেরো, তোর ভয় করছে নাকি? পাঞ্জা লড়তে যে ভয় পায়, সে যেতে চায় কলকাতায়? আরে ধ্যাত!'

হারাধনের সমস্ত ইতস্ততভাব কেটে গেল। সে তখনই দৃঢ়পদে এগিয়ে এসে বাপের হাতের সঙ্গে নিজের হাত মেলালে।

ছিদাম অবহেলা-ভরে বললে, 'ভাঙ দেখি আমার হাতখানা!' সে নিজের হাতে বিশেষ কোনও জোর না দিয়েই কথাগুলো বলছিল, কিন্তু তার মুখের কথা ফুরুতে না ফুরুতেই হারাধন তার হাতখানা ভেঙে দিয়েছিল আর কী! ছিদাম তাড়াতাড়ি নিজের হাতখানা শক্ত করে নিজেকে সামলে নিলে এবং বুঝলে যে তার ছেলের সঙ্গে ছেলেখেলা করলে চলবে না!

তারপর মিনিট-দুয়েক ধরে চলল তাদের পাঞ্জার লড়াই। তখন ছিদামের কাছে এই

সত্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, তার ছেলেকে আর ছেলেমানুষ বলে অস্বীকার করা চলে না। আজ এখনও হারাধন তার পাঞ্জা ভাঙতে পারেনি বটে, কিন্তু সেও প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করেও ছেলের পাঞ্জাকে একটুও হেলাতে পারলে না। আর বছর-দুয়েক পরে হারাধনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়লে তার পরাজয় যে সুনিশ্চিত এ-বিষয়েও কোনওই সন্দেহ নাই। নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছিদাম হাঁপাতে হাঁপাতে দেখলে তার ছেলের শ্বাস-প্রশ্বাস এখনও স্বাভাবিকই আছে।

সে খুশি হয়ে ছেলের পিঠ চাপড়ে বললে, 'শাবাশ মরদের বাচ্চা, শাবাশ! তোকে আর আমার কিছুই বলবার নেই, তুই যেখানে ইচ্ছে যেতে পারিস।'

হারাধন তাড়াতাড়ি বাপের পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, 'বাপি, তোমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছি বলে আমাকে মাপ করো!'

ছিদাম তাকে নিজের প্রশস্ত বুকের ভিতরে টেনে নিয়ে অভিভূত স্বরে বললে, 'তোকে মাপ করব কী রে ব্যাটা? তোর মতন ছেলেই যে আমি চাই—বাপকো বেটা, সিপাইকা ঘোড়া!'

হারাধন বললে, 'তাহলে আমি কলকাতায় যাব বাপি?'

—'আলবত যাবি!'

—'কিন্তু কলকাতায় গিয়ে আমি কোথায় থাকব বলতে পারো?'

ছিদাম হেসে উঠে বললে, 'কানা কখনও কানাকে পথ দেখাতে পারে রে? কলকাতায় গিয়ে তুই কোথায় থাকবি, তা আমি কেমন করে বলব? কলকাতায় আমি গিয়েছি বটে, কিন্তু তাকে শুধু চোখে দেখেছি; বুঝেছিস? ও-শহরটাকে দেখলে আমার ভয় হয়, নিতান্ত দায়ে না পড়লে ওখানে আর আমি যাব না! তোর যদি বুকের পাটা থাকে, কলকাতায় নিজের বাসা নিজেই বেঁধে নিস। পারবি?'

—'খুব পারব।'

—'বেশ, তাহলে যাবার সময় আমার কাছ থেকে শদুয়েক টাকা নিয়ে যাস। পরে আরও টাকার দরকার হলে আমাকে চিঠি লিখিস।'

হারাধন মহা আনন্দে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'আমার মতন বাপি আর কারুর নেই।'

দ্বিতীয়

মেয়েটির নাম খুকি নয়

মার্টিনের রেলগাড়িতে চড়ে হারাধন চলেছে কলকাতায়।

গাড়ির দুই ধারের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে খালি দেখা যায় আকাশ, মাঠ, বন, নদী, ধানখেত, পানায়-ভরা পুকুর আর ছোটো-বড়ো গ্রাম। এসব দেখতে তার একটুও ভালো

লাগল না। সে মানুষ হয়েছে পল্লি-প্রকৃতির কোলে, এইসব দেখতে দেখতেই আজ তার বয়স হ'ল প্রায় ষোলো।

আকাশ আর মাঠ আর গ্রাম, যেদিকেই তাকায় সে কলকাতার বিচিত্র সব স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। সারাপথ এমনি স্বপ্ন দেখতে দেখতে শেষটা সন্ধ্যার কিছু আগে সে মার্টিনের ডেরা কদমতলা ইস্টিশানে গিয়ে পৌঁছোল।

যেখানে গিয়ে নামল হারাধন সেইখানটা দেখেই অবাক হয়ে গেল। একখানা গণ্ডগ্রামের বাসিন্দা সে, এক জায়গায় এত বাড়ির পর বাড়ি, এত গাড়ির পর গাড়ি আর এত লোকজনের ছুটোছুটি তার চোখে আর কখনও পড়েনি। কিছুক্ষণ সে হতভম্বের মতন এদিকে-ওদিকে ঘোরাঘুরি করতে করতে ভাবতে লাগল, এই কদমতলার চেয়েও কি কলকাতা আরও বড়ো, আরও জমকালো?

সামনে এক ভদ্রলোককে দেখে হারাধন জিজ্ঞাসা করলে, 'মশাই, আমি কোন পথ দিয়ে কলকাতা যেতে পারব, বলতে পারেন?'

ভদ্রলোক একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার পোশাক ও মুখের ভাব লক্ষ করে দেখলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কলকাতায় কখনও আসনি বুঝি?'

হারাধন মনে মনে বুঝলে তার চেহারায় এখনও পাড়াগেঁয়ে ভাব মাখা আছে বলেই বাবুটি তাকে এমন প্রশ্ন করলেন। একটু লজ্জিত হয়ে বললে, 'আজ্ঞে না।'

—'তবে একলা কলকাতায় এসেছ কেন? বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ বুঝি?'

—'আজ্ঞে না। বাবাকে বলে এসেছি।'

—'তোমার বাবা তোমাকে আসতে দিলেন? দেখছি তোমার বাপের বুদ্ধিও তোমার চেয়ে বেশি নয়। কলকাতায় এসে কী করবে? চাকরি?'

হারাধন গর্বিত স্বরে বললে, 'আজ্ঞে না, চাকরি করতে আসিনি। আমি কলকাতায় বেড়াতে এসেছি।'

ভদ্রলোক দুই ভুরু কপালে তুলে বললেন, 'ও, তাই নাকি? বেশ, তবে ওই পথ ধরে চলে যাও!' বলে তিনি হাত তুলে একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

হারাধন পায়ে পায়ে এগুতে লাগল। সে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছে, এবং তার কৌতূহলী মুখ দেখলেই কারুর বুঝতে দেরি লাগবে না যে, সে হচ্ছে কোনও অজ পাড়াগাঁয়ের বাসিন্দা।

আধঘণ্টা চলবার পর পথের ধারে একখানা খাবারের দোকান দেখে হারাধন-এর মনে পড়ল, আজ বৈকালে তার খাবার খাওয়া হয়নি। একটি টিনের বাক্সে ভরে তার মা দিয়েছিলেন খানকয় পরোটা, কিছু তরকারি ও গোটা-চারেক নারিকেল নাড়ু। খাবার তো সঙ্গে রয়েছে, কিন্তু জল তো নেই!

এধারে ওধারে চোখ রেখে আরও খানিক এগিয়ে পথের ধারে সে দেখলে একটি গাছপালায় ও ঝোপে ঝোপে ভরা জায়গা এবং তার পাশেই রয়েছে একটি পুষ্করিণী।

পুকুরের ধারে গিয়ে সে একটি বড়ো গাছের গুঁড়িতে পিঠ রেখে বসে পড়ল। তারপর খুললে খাবারের বাক্সের ডালা।

চারিদিক তখন সন্ধ্যার আবছা আলোয় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। মায়ের হাতের তৈরি খাবার খেতে খেতে বাড়ির কথা মনে করে হারাধনের মনটা একটু হা-হা করে উঠল। এর আগে সে কখনও নিজের গাঁয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে বাইরে আসেনি, তাই তার কলকাতা আসবার কথা শুনেই তার মা যে কেঁদে-কেটে কতখানি কাতরতা প্রকাশ করেছিলেন, এটাও তার মনে পড়ল।

কেবল মা আর তার ছোটো ভাইগুলির কথা নয়, মনে হতে লাগল তার সমবয়সী খেলুড়েদেরও কথা—যাদের সঙ্গে ছুটির সময় সে হাটে-মাঠে-বাটে ছুটোছুটি করে বেড়াত, নদীর জলে সাঁতার কাটত, নৌকো বাইত, পরের আম-জাম-কাঁঠাল বনে লুকিয়ে ঢুকে নিষিদ্ধ ফল চুরি করত এবং গাঁয়ের পথে পথে হা-ডু-ডু ও ডাণ্ডা-গুলি খেলত। আরও কারুর কারুর কথা স্মরণ করে তার মন হু-হু করতে লাগল; সেই ভুলো কুকুরটা, তার সঙ্গে খেতে না বসলে সে কেঁউ কেঁউ করে কেঁদে সারা হত, আর সেই পোষা মেনি বিড়ালটা, যার তিনটে ধবধবে সাদা বাচ্চার সবে ফুটেছে চোখ, আর তাদের সেই উঠোনের বকুলগাছের ডালে ঝোলানো খাঁচার সেই টিয়াপাখিটা, যে তাকে দেখলেই 'হেরো, হেরো' বলে ডেকে উঠত!

এইসব ভাবতে ভাবতে তার মায়ের দেওয়া খাবার যখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে হঠাৎ সে পিছনে কাদের সাড়া পেলে। ফিরে দেখে দুজন লোকের সঙ্গে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে রংচঙে ভালো পোশাক পরা একটি সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে, বয়স তার দশ-এগারোর বেশি নয়।

মেয়েটি বলছে, 'এই তো একটা পুকুর রয়েছে! এইখানেই কি লাল মাছ পাওয়া যায়?'

একটা লোক বললে, 'না খুকি, ওই যে জঙ্গলটা দেখছ, ঠিক ওর ওপাশেই যে পুকুরটা আছে, সেইখানেই পাওয়া যায় রুইমাছের মতন বড়ো বড়ো লাল মাছ।'

মেয়েটি ভয় পেয়ে বললে, 'মাগো! রুইমাছের মতন বড়ো বড়ো লাল মাছ নিয়ে খেলব কেমন করে? আমি চাই বাটামাছের মতন ছোটো ছোটো লাল মাছ, যাদের চৌবাচ্চায় রাখা যায়!'

লোকটা বললে, 'বেশ খুকি, তাই হবে। সেইরকম লাল মাছই আমরা তোমাকে ধরে দেব।'

মেয়েটিকে নিয়ে লোক-দুটো পাশের ঝোপের ভিতরে প্রবেশ করলে।

হারাধন ভাবতে লাগল, মেয়েটিকে দেখলেই তো খুব বড়োঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়, কিন্তু ওই লোক-দুজনের চেহারা তো সুবিধের বলে বোধ হচ্ছে না! ওদের মুখ দেখলেই মনে হয়, ওরা যেন পাকা বদমাইশ। ও-রকম লোকের সঙ্গে অমন সুশ্রী মেয়ে কেন?

হঠাৎ ঝোপের ওপাশ থেকে উচ্চস্বরে কান্না জাগল, 'ওগো মাগো—'

কান্নাটা হঠাৎ জেগেই হঠাৎ থেমে গেল—যেন যে কাঁদছে, জোর করে কেউ তার মুখ চেপে ধরেছে!

হারাধন একলাফে দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর মাটির উপর থেকে তার মোটা লাঠিগাছা চট করে তুলে নিয়ে দৌড়ে সেই ঝোপের ভিতর গিয়ে ঢুকল। তারপর সেখানকার দৃশ্য দেখেই তার চোখ আর মন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

মেয়েটিকে মাটির উপরে লম্বা করে ফেলে একটা লোক হাঁটু দিয়ে তার দুই পা ও দুই হাত দিয়ে তার মুখ প্রাণপণে চেপে আছে, এবং আর একটা লোক তার গলা থেকে একছড়া সোনার হার টেনে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছে!

হারাধন স্তম্ভিত হয়ে রইল এক মুহূর্তের বেশি নয়। ব্যাপারটা বুঝতে তার একটু দেরি হল না। তখনই সে বাঘের মতো লোক-দুটোর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং যে হার ছিনিয়ে নিচ্ছিল তার পিঠের উপরে মারলে প্রচণ্ড এক লাঠি, আর মেয়েটিকে যে চেপে ধরেছিল তাকে মারলে প্রচণ্ড এক লাথি!

এই লাঠি আর লাথি খেয়েই লোক-দুটো প্রথমে সশব্দে মাটির উপরে পড়ে গেল, তারপর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই উঠে চোঁ-চা চম্পট দিলে। হারাধন লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে তাদের পিছনে পিছনে ছুটল, কিন্তু ঝোপের বাইরে এসে দেখলে, এর মধ্যেই তারা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। তারপর আসন্ন সন্ধ্যার আবছায়ার ভিতরে তারা কোথায় একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাদের ধরবার চেষ্টা করে আর কোনওই লাভ নেই বুঝে সে আবার ঝোপের ভিতরে ফিরে এল।

মেয়েটি তখন মাটির উপরে পা ছড়িয়ে বসে চেঁচিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। হারাধনও তার পাশে গিয়ে বসে পড়ে মিষ্টিগলায় বললে, 'আর কেঁদো না খুকি, আর কোনও ভয় নেই! হতভাগারা পালিয়ে গিয়েছে।'

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'আমি বাড়ি যাব।'

হারাধন জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার বাড়ি কোথায় খুকি?'

মেয়েটি হাত তুলে একদিক দেখিয়ে দিয়ে বললে, 'ওই দিকে।'

—'তুমি বাড়ি যাবার পথ চিনতে পারবে?'

—'হুঁ।'

—'ওরা তোমার কোনও গয়না কেড়ে নিয়ে যায়নি তো?'

—'না।'

হারাধন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'চলো খুকি, তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাই, চলো।'

মেয়েটি তবু উঠল না, সভয়ে ও সন্দিগ্ধ চোখে হারাধনের মুখের পানে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

তার মনের ভাব বুঝে হেসে ফেলে হারাধন বললে, 'খুকি, তুমি বুঝি ভাবছ, এক পাপের পাল্লা থেকে তুমি আর এক পাপের পাল্লায় এসে পড়েছ? ভয় নেই, আমিও তোমার গয়না কেড়ে নেব না।'

মেয়েটি লজ্জিত মুখে বললে, 'না। তোমাকে আমার ভয় করছে না। তুমি লক্ষ্মীছেলে, না?'

হারাধন হাসতে হাসতে বললে, 'তুমি যখন বলছ, তখন লক্ষ্মীছেলে হতে আমি বাধ্য! তোমার অমন সুন্দর মুখের মিষ্টি হুকুম মানবে না, দুনিয়ায় এমন পাষণ্ড কে আছে?'

মেয়েটিও এতক্ষণ পরে হেসে ফেলে বললে, 'তুমিও সুন্দর নও নাকি? তাহলে তোমাকে আমার ভালো লাগছে কেন?'

—'বেশ, তাহলে আমরা দুজনেই সুন্দর! সন্ধে হতে আর দেরি নেই, এখন ওঠো খুকি!'

মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমার নাম খুকি নয়!'

—'তবে তোমার নাম কী?'

—'প্রীতি।'

হারাধন মেয়েটিকে নিয়ে এগুতে এগুতে বললে, 'আচ্ছা প্রীতি, ও লোক-দুটো কে? ওদের সঙ্গে তুমি এখানে এসেছিলে কেন?'

প্রীতি বললে, 'পথের ধারে একটা গাছের ডালে বসে একটি রঙিন পাখি খাসা গান গাইছিল। তাকে ভালো করে দেখবার জন্যে আমাদের বাগান থেকে বেরিয়ে এসেছিলুম। কিন্তু গাছের কাছে যেতেই দুষ্ট পাখিটা গান থামিয়ে উড়ে গেল আর ওই লোক-দুটো কোথা থেকে বেরিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। যে-লোকটা আমার হার কেড়ে নিচ্ছিল, সে বললে, 'লাল পাখিটা উড়ে গেল খুকি?' আমি 'যাক গে' বলে চলে আসছি, সে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে, 'লাল পাখি উড়ে গেল তো কী হয়েছে? তুমি বড়ো বড়ো লাল মাছ ভালোবাস তো?' আমি বললুম, 'খুব ভালোবাসি।' সে বললে, 'কাছেই একটা পুকুরে খুব বড়ো বড়ো লাল মাছ আছে। দেখে যদি তোমার পছন্দ হয়, আমি তোমাকে অনেকগুলো মাছ ধরে দিতে পারি।' তারপর সে আমার হাত ধরে বললে, 'তাহলে আমার সঙ্গে চলো, তারপর যত চাও, তত মাছ ধরে দেব।' সেই কথা শুনেই আমি বোকার মতন ওদের সঙ্গে এসেছিলুম। আমাকে তুমি তাড়াতাড়ি বাড়িতে নিয়ে চলো। আমাকে দেখতে না পেয়ে সবাই হয়তো ভেবেই সারা হচ্ছে।'

—'তোমাকে আমি কেমন করে নিয়ে যাব প্রীতি? তোমার বাড়ির পথ তো তুমিই জানো! বড়ো-জোর আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যেতে পারি!'

—'তাই এসো। তুমি সঙ্গে থাকলে আমার আর ভয় করবে না।'

হারাধনের একখানি হাত নিজের নরম-তুলতুলে ছোট্ট মুঠোর ভিতরে নিয়ে প্রীতি একদিকে অগ্রসর হল।

হারাধন জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমাদের বাড়িতে কে কে আছেন?'

—'বাবা আছেন। মা আছেন, আমার ছোটো ভাই আছে আর ঝি-চাকর-বামুনরা আছে। কিন্তু যেখানে যাচ্ছি সেটা আমাদের বাড়ি নয়।'

—'তবে?'

—'আমাদের বাড়ি কলকাতায়। এখানে আমাদের বাগানবাড়ি। মাঝে মাঝে এই বাগানে আমরা বেড়াতে আসি।'

—'তোমার বাবা কী করেন?'

—'তিনি ব্যারিস্টার।'

এই-রকম সব কথা কইতে কইতে মিনিট-দশেকের পরে প্রীতি যখন তাদের বাগানবাড়ির কাছে গিয়ে হাজির হল তখন সন্ধ্যার প্রথম অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে।

প্রীতির বাবার নাম মিস্টার রতন রায় ও তার মায়ের নাম প্রতিমা দেবী। ইতিমধ্যেই প্রীতিকে বাড়ির ভিতরে দেখতে না পেয়ে তাঁরা দুজনেই ব্যস্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে বাগানের

ফটকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং মেয়ের খোঁজে চারিদিকে পাঠিয়েছেন বেয়ারা ও দারোয়ানদের। মা আর বাবাকে দেখতে পেয়েই প্রীতি দৌড়ে তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল এবং প্রতিমা সানন্দে প্রীতিকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন, 'এতক্ষণ তুই কোথায় ছিলি প্রীতি?'

প্রীতি কোনও জবাব না দিয়ে মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে আবার কেঁদে উঠল। হারাধন ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছিল, মিস্টার রায় হঠাৎ কঠোর স্বরে তাকে ডেকে বলে উঠলেন, 'এই ছোকরা! দাঁড়াও!'

মিস্টার রায়ের কণ্ঠস্বর শুনে বিস্মিত হয়ে হারাধন ঘুরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মিস্টার রায় বললেন, 'আমার মেয়ে কাঁদছে কেন? তুমি একে ধরে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে?'

প্রীতি তাড়াতাড়ি মায়ের কোল ছেড়ে বাবার কাছে এসে বললে, 'ওকে তুমি বোকো না বাবা! ওকে আমার ভালো লেগেছে।'

মিস্টার রায় আরও বেশি বিস্মিত ভাবে বললেন, 'ওকে তোর ভালো লেগেছে তো, কাঁদছিস কেন? তোর কী হয়েছে! তুই কোথায় গিয়েছিলি?'

প্রীতি তখন একে একে সব কথা খুলে বললে। শুনতে শুনতে মিস্টার রায় ও প্রতিমা দেবীর সর্বাঙ্গ ভয়ে আর বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগল।

প্রীতির কথা শেষ হলে পর প্রতিমা আবার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে শিউরে উঠে বললেন, 'আর তোকে কখনও বাইরে ছেড়ে দেব না, আজ ভগবান তোকে বাঁচিয়েছেন!'

মিঃ রায় এগিয়ে গিয়ে হারাধনের একখানি হাত ধরে অনুতপ্ত স্বরে বললেন, 'ভগবান আমার প্রীতিকে বাঁচিয়েছেন বটে, কিন্তু তুমি হচ্ছ ভগবানেরই দূত! তোমাকে সন্দেহ করেছি বলে তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো।'

হারাধন লজ্জিত মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, কোনও জবাব দিতে পারলে না।

প্রতিমা সুমধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কী বাবা?'

—'আজ্ঞে, হারাধন পাল।'

মিস্টার রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'হারাধন, তোমাকে দেখে তো এখানকার লোক বলে মনে হচ্ছে না? তুমি কোথায় থাকো?'

—'আজ্ঞে, আমার দেশ মদনপুরে। আমি কলকাতা দেখতে এসেছি।'

—'তুমি এর আগে কলকাতায় কখনও এসেছিলে?'

—'আজ্ঞে না?'

—'তুমি কার সঙ্গে এসেছ?'

—'আজ্ঞে, একলা এসেছি।'

মিস্টার রায় বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'তুমি এর আগে কলকাতায় কখনও আসনি, অথচ একলাই কলকাতা দেখবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'এখানেও আমি ভগবানের হাত দেখতে পাচ্ছি! ভাগ্যে তোমার মাথায় এই দুর্বুদ্ধি

হয়েছিল, তাই আজ আমার মেয়ে প্রাণে বেঁচে বাড়িতে ফিরে এসেছে! হারাধন, তুমিই প্রীতির জীবন-রক্ষা করেছ! তোমাকে কী বলে আদর করব বুঝতে পারছি না।'

হারাধন আবার লজ্জিত হয়ে একটা নমস্কার করে পায়ে পায়ে এগুতে এগুতে বললে, 'আজ্ঞে, আমি তবে আসি।'

মিস্টার রায় তাড়াতাড়ি তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তা হয় না বাপু, আজ তোমাকে আমার এখানে থেকে যেতেই হবে। কাল আমি তোমাকে নিয়ে নিজেই কলকাতায় যাব।'

হারাধন মাথা নেড়ে বললে, 'আজ্ঞে না! আমার সঙ্গে কারুকে যেতে হবে না! আমি একলাই কলকাতা যেতে পারব!'

তার কথা কইবার ধরন-ধারণ দেখে মিস্টার রায় হো হো করে হেসে উঠলেন। প্রতিমাও হাসতে হাসতে বললেন, 'বেশ বাবা, তাই যেয়ো। কিন্তু আজ নয়, কাল সকালে। আজ আমি তোমাকে এখানে নিমন্ত্রণ করছি, আমার কথা রাখবে না বাবা?'

হারাধন কী জবাব দেবে বুঝতে না পেরে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল বোবার মতন।

মিস্টার রায় বললেন, 'প্রীতি, আমাদের এই হারাধনবাবুটি হচ্ছেন তোর বড়োদাদা। ওকে ধরে বাড়ির ভিতরে নিয়ে আয় তো।'

প্রীতি ভারী খুশি হয়ে খিলখিল করে হেসে উঠে হারাধনের কাছে ছুটে এল, তারপর তার দুই হাত ধরে টানতে টানতে বাগানের ফটকের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

দুই পাশে দেশি-বিলাতি ফুলগাছের সারি, তারই মাঝখান দিয়ে কাঁকর-বিছানো পথখানি বাংলোর ধাঁচায় তৈরি একতলা বাড়ির দিকে চলে গিয়েছে।

পথের শেষে পাঁচ-ছয়টি সিঁড়ির ধাপ পার হয়েই বাংলোর বারান্দা। সেইখানে দাঁড়িয়েছিল ছোট্ট একটি টুকটুকে খোকা, বয়স তার ছয়-সাত বছরের বেশি নয়। তার টানা টানা জোড়া ভুরু, ডাগর-ডাগর চোখ, টিকলো নাক, রাঙা ফুলের পাপড়ির মতন পাতলা ঠোঁট আর কোঁকড়ানো চিকন-কালো চুলের গোছা দেখলেই বুঝতে দেরি লাগে না যে সে হচ্ছে প্রীতির ছোটোভাই। দুজনের চেহারায় আশ্চর্য মিল!

হঠাৎ অপরিচিত হারাধনের আবির্ভাবে খোকাবাবু যথেষ্ট দমে গিয়ে পায়ে পায়ে পিছোবার চেষ্টা করলেন।

প্রীতি তাকে অভয় দিয়ে বলে উঠল, 'ও বিমান, ভয় কী রে বোকা? এ যে আমাদের নতুন দাদা!'

বিমান দাঁড়িয়ে পড়ে তার ডাগর চোখ-দুটিকে আরও বিস্ফারিত করে তুলে হারাধনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল অল্পক্ষণ। তারপরেই সকৌতুকে নেচে উঠে হাততালি দিয়ে বললে, 'আমাদের নতুন দাদা? ও হো, কী মজা!'

মিস্টার রায়, প্রতিমা দেবী, প্রীতি ও বিমান সবাই মিলে তাদের নতুন অতিথিকে এমন স্নেহ-মায়ার মধুর বাঁধনে বেঁধে ফেললেন যে, হারাধন তিনদিনের আগে সে পরিবারের কাছ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারলে না।

তিনদিনের পরেও মিস্টার রায় ও প্রতিমা তাকে ছাড়তে রাজি হচ্ছিলেন না, কিন্তু হারাধনের বিশেষ জেদ দেখে তাঁরা আর আপত্তি করতে পারলেন না।

ইতিমধ্যে হারাধনের মুখে মিস্টার রায় তার সমস্ত কাহিনি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা শ্রবণ করেছেন। হারাধন যখন নিজের ব্যাগ ও মোটা লাঠিগাছটি নিয়ে বাংলোর ভিতর থেকে বেরিয়ে পথের উপর গিয়ে দাঁড়াল, মিস্টার রায় তার দুই কাঁধের উপরে তাঁর দুই হাত রেখে বললেন, 'হারাধন, তোমাকে আমি বিদায় দিচ্ছি না, আমি বলতে চাই—আবার এসো! তোমাকে আমার এত ভালো লেগেছে যে, ছেড়ে দিতে মন কেমন করছে। তুমি নিজের উপরে নির্ভর করে একলাই যখন কলকাতায় যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন আমি আর বাধা দিতে চাই না। বাঙালির ছেলেরা সহজে স্বাবলম্বি হতে শেখে না, এটা হচ্ছে আমাদের জাতের একটা মস্ত কলঙ্ক। আমি ইউরোপে গিয়ে দেখেছি, সেখানকার মানুষেরা শিশু-বয়স থেকে স্বাবলম্বন-মন্ত্রের সাধনা করে; সেইজন্যে যে-বয়সে বাঙালির ছেলেরা পৃথিবীর কিছুই বোঝে না, ইউরোপের প্রায়-বালকরাও সেই বয়সেই অনায়াসেই নিজের পায়ের উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। তোমার এই অসাধারণতা দেখে আমি যে কত খুশি হয়েছি, প্রকাশ করতে পারছি না। বেশ, তুমি একলাই কলকাতায় যাও। কিন্তু শুনে রাখো, আমাদের কলকাতাকে আমিই বিশ্বাস করি না। তোমার বাবা পাড়াগেঁয়ে হলেও ঠিক কথাই বলেছেন। এই রাক্ষুসে শহরকে ভয় করাই উচিত। অতএব আমার কাছে তোমাকে একটি প্রতিজ্ঞা করতে হবে।'

হারাধন বললে, 'আজ্ঞা করুন।'

নিজের জামার পকেট থেকে একখানি 'কার্ড' বার করে মিস্টার রায় বললেন, 'এই 'কার্ড'খানি তুমি নিজের কাছে রাখো। এতে আমার নাম, আমার কলকাতার বাড়ির ফোন-নম্বর আর ঠিকানা লেখা আছে। তুমি যদি কোনও বিপদে পড়ো, তোমার যদি কখনও সাহায্যের দরকার হয়, তাহলে আমাকে খবর দিতে বা আমার সঙ্গে দেখা করতে ভুলবে না। কেমন, আমার এই অনুরোধটি রাখবে তো?'

হারাধন 'কার্ড'খানি নিয়ে ঘাড় নেড়ে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ', তারপরেই মিস্টার রায়কে প্রণাম করে তাড়াতাড়ি ফিরে যখন হন হন করে এগিয়ে চলল, তখন মিস্টার রায় দেখতে পেলেন না যে তার দুটি চোখ ভরে উঠেছে অশ্রুজলে!

তৃতীয়

হারাধন ভালো চাকরি করতে নারাজ নয়

কলকাতা।

হ্যারিসন রোডের ফুটপাথ ধরে হারাধন যখন চিৎপুর রোডের চৌমাথায় এসে দাঁড়াল, তখন তার অবস্থা হয়ে উঠেছে রীতিমতো কাহিল। তার দুই চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত, তার

বুক করছে ধুকপুক, তার মন উঠছে ক্রমাগত চমকে চমকে! এতখানি পথ সে পায়ে হেঁটে এসেছে, না জনতার শত শত লোক ধাক্কা মেরে এই পর্যন্ত তাকে পৌঁছে দিয়েছে, হারাধন নিজেই এটা বুঝতে পারলে না। এর মধ্যেই সে বার-কয়েক গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছে এবং নিজের বোকামির জন্যে গাড়ির চালক ও পথের পথিকদের কাছ থেকে বারংবার ধমক খেয়ে খেয়ে একেবারে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। এবং কলকাতায় এসে সে প্রথম জ্ঞান অর্জন করলে যে, এই শহরে পথে বেরুলে ফুটপাত ছেড়ে নীচে নামতে নেই!

এখানকার যা-কিছু চোখে পড়ছে সমস্তই তার ধারণাতীত। নানা-দেশি স্ত্রী-পুরুষের বিচিত্র জনতা, রাস্তার দু-ধারকার আকাশ-ছোঁয়া অট্টালিকাগুলো, বাস, ট্রাম, ট্যাক্সি, জলের কল, হরেক-রকম দোকানের সারি, হাওড়ার পোল, গাড়ি আর জনতার কান-ফাটানো কোলাহল, মাথার উপর দিয়ে উড়ে-যাওয়া এরোপ্লেনের পর এরোপ্লেন এসব যে সম্ভবপর, স্বপ্নেও সে কোনওদিন ভাবতে পারেনি।

পথ চলতে চলতে বারবার সে দাঁড়িয়ে পড়ছে এবং মূর্তির মতন স্থির হয়ে দেখছে এক-একটি অভাবিত দৃশ্য। এইভাবে থেমে থেমে পথ চলার দরুন অবশেষে সে যখন কোনওরকমে কলেজ স্ট্রিটের কাছ বরাবর এসে পৌঁছোল, কলকাতার আকাশ থেকে সূর্য তখন বিদায় নেবার উপক্রম করছে।

ডানদিকে ফিরে খানিকটা এগিয়েই হারাধন কলেজ স্কোয়ারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এতক্ষণ পরে এই মানব-অরণ্য এবং ইট-পাথরের মরুভূমির মধ্যে গাছপালার সুপরিচিত শ্যামলতা ও দিঘির জল দেখে সে যেন অনেকটা আশ্বস্ত হল এবং তাড়াতাড়ি বাগানের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

বাগানের ভিতরে আবার পথের চেয়েও বেশি ভিড়—শিশু, যুবক ও বৃদ্ধরা তখন সেখানে বায়ুসেবন করতে এসেছে। ভয়ে ভয়ে, অত্যন্ত সন্তর্পণে সেই ভিড় ঠেলে সে গোলদিঘির একটি ঘাটের সামনে গিয়ে উপস্থিত হল। ঘাটের সিঁড়িগুলোর উপরে বেশি লোকজন নেই দেখে হারাধন আস্তে আস্তে জলের কাছে নেমে গেল এবং দুই অঞ্জলি ভরে অনেকটা জলপান করে ফেললে। এতক্ষণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে সে ক্ষুধাতৃষ্ণার কথাও একেবারে ভুলে গিয়েছিল, সারাদিনের পর এই তার প্রথম জলপান।

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হারাধন পৈঠার উপরে ধুপ করে বসে পড়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে বাগানের দৃশ্য দেখতে লাগল। কিন্তু খানিকক্ষণ পরে বাগানের দৃশ্যও ঝাপসা হয়ে এল সন্ধ্যার অন্ধকারে।

হারাধন তখন ভাবতে লাগল, এইবারে সে কী করবে? পেটের ভিতরে ক্ষুধার আগুন জ্বলে উঠেছে বটে, কিন্তু তার জন্যে বিশেষ ভাবনা নেই; কারণ সে দেখেছে কলকাতার পথের দু-ধারেই আছে খাবারের দোকানের পর দোকান, পয়সা ফেললেই খাবার পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সন্ধ্যার পরে যখন রাত আসবে, তখন সে কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে? কলকাতায় হাজার হাজার বাড়ি থাকতে পারে, এবং তার ভিতরে থাকতে পারে লক্ষ লক্ষ মানুষ, কিন্তু সেসব বাড়ির কোনওখানারই ভিতরে তার জন্যে একটুখানি ঠাঁই নেই, কারণ সে কারুকেই চেনে না। আজকের রাতটা না হয় এই বাগানের বেঞ্চিতে শুয়েই কাটতে পারে,

কিন্তু আজকের পরে আছে কাল, কালকের পরে আছে পরশু এবং তারপরেও আছে দিনের পর দিন। নিজের গর্বের খাতিরে মিস্টার রায়ের কাছ থেকে এ-সম্বন্ধে কোনও উপদেশ নেয়নি বলে তার মনে অত্যন্ত অনুতাপ হতে লাগল।

ক্রমে অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে গেল। হারাধন নিজের চিন্তায় নিমগ্ন ছিল বলে দেখতে পায়নি যে, এতক্ষণ ধরে তার পিছনে একটু তফাতে বসে একটি লোক চুপ করে তার ভাবভঙ্গি নিরীক্ষণ করছিল। লোকটিকে দেখে ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। অন্ধকার গাঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটি আরও নীচে নেমে এসে ঠিক হারাধনের পাশেই বসে পড়ল। তারপর তার কাঁধে একখানা হাত রেখে সে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী হে জনার্দন, কেমন আছ?'

হারাধন বিস্মিত হয়ে লোকটির মুখ দেখবার চেষ্টা করে বললে, 'আমার নাম তো জনার্দন নয়!'

লোকটি তাড়াতাড়ি তার কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নিয়ে অপ্রস্তুত স্বরে বললে, 'মাপ করবেন মশায়, অন্ধকারে আমি বুঝতে পারিনি! ভেবেছিলুম আপনি বুঝি আমাদের জনার্দন।'

—'আজ্ঞে না, আমার নাম শ্রীহারাধন পাল!'

—'আপনার নাম হারাধনবাবু? আপনার মতো আমারও উপাধি পাল! আমার নাম শ্রীতারাপদ পাল। বেশ, বেশ, এককথায় আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল।'

এই নতুন লোকটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে হারাধন কতকটা আশ্বস্ত হল। সে ভাবলে, এর কাছ থেকেই আজকের রাতের আশ্রয়-লাভের সমস্যাটা পূরণ করে নিতে পারবে।

কীভাবে কথাটা পাড়া যায় এই নিয়ে সে যখন মাথা ঘামাচ্ছে, তারাপদ তখন জিজ্ঞাসা করলে, 'হারাধনবাবু, আপনার কোথায় থাকা হয়?'

হারাধন বললে, 'আপাতত আমি এইখানেই আছি।'

লোকটি বিস্মিত স্বরে বললে, 'এইখানে মানে?'

—'আমি আজই প্রথম কলকাতায় এসে এইখানে বসেছি। কলকাতার কারুকে আমি চিনি না। এরপর কোথায় যাব, কোথায় ঠাঁই পাব, কিছুই জানি না।'

—'এর আগে আপনি কখনও কলকাতায় আসেননি?'

—'না।'

—'তবে এখানে কী করতে এসেছেন?'

—'বেড়াতে।'

—'খালি বেড়াতে? চাকরি-টাকরি করতে নয়?'

হারাধন চুপ করে ভাবতে লাগল, এ-কথার কী জবাব দেওয়া উচিত। সে পাড়াগেঁয়ে লোক হলেও এইটুকু বুঝলে যে, নিজের কলকাতায় আসার আসল ইতিহাসটা যার-তার কাছে প্রকাশ করলে অত্যন্ত বোকামি আর ছেলেমানুষি করা হবে। তার চেয়ে একে যদি বলি—হ্যাঁ, একটা চাকরি পেলেও আমি করতে রাজি আছি, তাহলে সেটা নিতান্ত মন্দ শোনাবে না! আর সত্যি কথা বলতে কী, যদি কোনও ভালো, মনের মতো চাকরি অবলম্বন করেই কিছুদিন কলকাতায় কাটানো যায়, তাতেও তো আপত্তি করবার বিশেষ কারণ নেই!

অতএব হারাধন বললে, 'তারাপদবাবু, কলকাতায় আমি বেড়াতে এসেছি বটে, তবে মনের মতন কোনও কাজ পেলে চাকরি করতেও নারাজ নই।'

তারাপদ হা হা করে হেসে তার পিঠে আস্তে একটা করাঘাত করে বললে, 'ও, আপনি রথও দেখতে আর কলাও বেচতে চান? তা আমি আপনার একটা উপায় করে দিতে পারি!'

হারাধন উৎসাহিত হয়ে বললে, 'পারেন? কিন্তু কী রকম চাকরি?'

—'আমার হাতে চাকরি আছে অনেক রকম। কিন্তু আপনি তো দেখছি বিশেষ ভদ্রলোক, চাকরি যদি করেন আপনাকে ভদ্রলোকের মতন চাকরি করতে হবে।'

হারাধন জীবনে এই প্রথম শুনলে, তাকে কেউ ভদ্রলোক বলে সম্বোধন করছে। সে মনে মনে খুশি হয়ে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ভদ্রলোকেরই মতন চাকরি করতে চাই।'

তারাপদ একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, 'আপনি লেখাপড়া কতদূর শিখেছেন?'

—'এই বছরে ছাত্রবৃত্তি পাস করেছি।'

তারাপদ উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, 'বহুৎ আচ্ছা, তাহলেই হবে! আমাদের জমিদারবাবুর একজন সহকারি ম্যানেজার দরকার। আজকেই আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে চাই। আপনি রাজি আছেন?'

হারাধন খুব খুশি হয়ে বললে, 'নিশ্চয়ই আমি রাজি আছি। কিন্তু তার আগে আমাকে একটি বাসা ঠিক করে দিতে পারবেন?'

তারাপদ বললে, 'আগে থাকতেই ও-ভাবনার দরকার নেই। জমিদারবাবু আপনাকে চাকরি দিতে যদি রাজি হন, তাহলে আজ থেকেই তো আপনি তাঁর বাড়িতে থাকবার ঠাঁই পাবেন! কিন্তু আর একটি কথা আছে।'

—'বলুন।'

—'জমিদার-বাড়ির কাজে অনেক টাকা-পয়সা নিয়ে নাড়ানাড়ি করতে হয়। এখানে আপনাকে কেউ চেনে না, সুতরাং কেউ আপনার জন্যে জামিনও হতে পারবে না। কাজেই জমিদারবাবুর কাছে আপনাকে বোধহয় কিছু টাকা জমা রাখতে হবে।'

হারাধন সরলভাবেই বললে, 'বাবাকে চিঠি লিখলে পরে আমি আরও টাকা পেতে পারি বটে, কিন্তু আপাতত আমার কাছে দুশো টাকার বেশি নেই।'

তারাপদ বললে, 'আমার বোধহয় জমিদারবাবু আপনার মতন ভদ্রলোকের কাছ থেকে খুব বেশি টাকা দাবি করবেন না। তাহলে উঠুন, আর দেরি করে কাজ নেই, আপনাকে একেবারে যথাস্থানেই নিয়ে যাই।'

চতুর্থ

গোঁফের মধ্যে ভাবের অভিব্যক্তি

তারাপদর সঙ্গে ট্রামে উঠে হারাধন উত্তর-কলিকাতার একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে নামল। তারপর পায়ে হেঁটে এ-গলি সে-গলি দিয়ে তারা মস্ত একখানা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

দরজায় বসেছিল দারোয়ান, তারাপদকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে একটা সেলাম ঠুকলে।

তারাপদর সঙ্গে সঙ্গে হারাধন বাড়ির ভিতরে ঢুকে খুব চওড়া এক কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দোতলার একখানা প্রশস্ত ও আলোকিত হলঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে।

ঘরে ঢুকেই হারাধন হতভম্বের মতন হয়ে গেল। এতবড়ো হল এবং ঘরের এমন জমকালো সাজসজ্জা সে জীবনে আর কখনও দেখেনি।

উপরে বনবন করে ঘুরছে বৈদ্যুতিক পাখা এবং বৈদ্যুতিক আলোর ঝাড়। দেওয়ালের গায়ে টাঙানো বড়ো বড়ো আয়না ও ছবি। ঘরের মেঝে কার্পেটে মোড়া। কার্পেটের উপরে আবার চাদর-ঢাকা নরম বিছানা পাতা। একদিকে ছোট্ট একখানি পালঙ্কের উপরে তাকিয়া ঠেস দিয়ে একটি হোমরাচোমরা গৌরবর্ণ ও মোটাসোটা লোক কোঁচকানো কাপড় ও সিল্কের পাঞ্জাবি পরে বসে আছেন। তাঁর হাতে আলবোলার রুপো বাঁধানো নল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তাঁর গোঁফজোড়া। গোঁফের দুই প্রান্ত ঝুলে এসে পড়েছে প্রায় তাঁর কাঁধের কাছাকাছি। এত বড়ো গোঁফ হারাধন কখনও স্বপ্নেও দেখেনি। হলের কার্পেটের উপরে বিছানো বিছানায় বসে আছে আরও পনেরো-ষোলো জন লোক। তারাও কয়েকটি দলে বিভক্ত। কোনও দল খেলছে তাস, কোনও দল বসে বসে কৌতূহল ভরে খেলা দেখছে এবং কোনও দল তাকিয়ে আছে পালঙ্কের উপরকার বাবুটির দিকে তীর্থের কাকের মতন।

একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে হারাধন তার দৃষ্টিকে আবার নিবদ্ধ করলে পালঙ্কের উপরকার সেই আশ্চর্য গোঁফজোড়ার দিকে।

তারাপদ তার কানে কানে চুপি চুপি বললে, 'উনিই জমিদারবাবু, ওঁকে প্রণাম করো।'

হারাধন তার কথামতো কাজ করলে বটে, কিন্তু জমিদারবাবু না তাঁর গোঁফজোড়া, কাকে নমস্কার করলে সেটা সে নিজেই বুঝতে পারলে না।

জমিদারবাবু গম্ভীর স্বরে বললেন, 'কী হে তারাপদ, এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে?'

তারাপদ এগিয়ে গিয়ে বললে, 'আজ্ঞে, গোলদিঘিতে একটু হাওয়া খেতে গিয়েছিলুম।'

—'বেশ, বেশ! কিন্তু তোমার সঙ্গে ওই ছোকরাটি কে?'

তারাপদ পালঙ্কের কাছে গিয়ে জমিদারবাবুর সঙ্গে অস্পষ্ট স্বরে কী কথা কইতে লাগল। হারাধন যেখানে ছিল সেইখানেই দাঁড়িয়ে মুগ্ধ চোখে সেই অদ্বিতীয় গোঁফজোড়াকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। সে দেখলে, তারাপদর কথা শুনতে শুনতে গোঁফজোড়া মাঝে মাঝে ফুলে ফুলে এবং মাঝে মাঝে দুলে দুলে উঠছে। গোঁফ যে ফোলে আর গোঁফ যে দোলে, এটাও সে আগে জানত না।

তারপর হঠাৎ সে শুনলে ও দেখলে যে জমিদারবাবু তার দিকে তাকিয়ে দুই হাতে গোঁফের দুই প্রান্ত ধরে পাকাতে পাকাতে বললেন, 'ওহে ছোকরা, এদিকে এগিয়ে এসো তো।'

গোঁফ থেকে চোখ না ফিরিয়েই হারাধন ভয়ে ভয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে পালঙ্কের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। গুম্ফাধিকারী বললেন, 'তোমার নাম হারাধন পাল?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'তুমি ছাত্রবৃত্তি পাশ করেছ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'তুমি এখানে চাকরি করতে চাও?'

হারাধনের সেই একই উত্তর—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—তোমার কত মাইনে হবে জানো?'

—'আজ্ঞে না।'

—'মাসে দেড়শো টাকা। এক বছর কাজ করলে আরও পঞ্চাশ টাকা বাড়বে।'

হারাধন এতটা আশা করেনি। এবারে সে একেবারে বোবা হয়ে রইল।

গুম্ফধারী বললেন, 'কিন্তু এ-বড়ো দায়িত্বপূর্ণ কাজ। তোমার হাত দিয়ে অনেক টাকা যাবে আর অনেক টাকা আসবে। তোমাকে বিশ্বাস কী? কেউ তোমার জামিন হবে?'

হারাধন মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'আজ্ঞে, কাজটি পেলে আমি দুশো টাকা জমা রাখতে রাজি আছি।'

গোঁফ ফুলিয়ে জমিদারবাবু বললেন, 'ফুঃ! দুশো টাকা আবার টাকা নাকি? এক-একদিন তোমার কাছে থাকবে আমার তিন-চার হাজার টাকা। তোমার দুশো টাকা জমা রেখে আমি কী করব?'

হারাধন বললে, 'আজ্ঞে—'

গোঁফের দুই প্রান্তে আঙুল বুলোতে বুলোতে জমিদারবাবু তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'ও আজ্ঞে-টাজ্ঞে চলবে না বাপু! তারাপদর অনুরোধে আমি তোমাকে চাকরি দিতে রাজি আছি বটে, কিন্তু তোমাকে জমা রাখতে হবে অন্তত এক হাজার টাকা।'

হারাধন হতাশভাবে বললে, 'আজ্ঞে, অত টাকা তো আমার কাছে নেই!'

এইবারে এক পায়ের উপর আর এক পা দিয়ে নিজে দুলতে দুলতে এবং গোঁফ-

জোড়াকেও দোলাতে দোলাতে জমিদারবাবু বললেন, 'তাহলে পথ দ্যাখো বাপু, এখান থেকে সরে পড়ো।'

হারাধন ফিরে নিরাশ চোখে তারাপদর দিকে তাকালে। তারাপদ তাকে হাত ধরে একটু তফাতে নিয়ে গিয়ে তার কানে কানে বললে, 'হারাধনবাবু, আপনি এত বোকা কেন?' এই না খানিক আগে আপনি আমাকে বললেন, 'বাড়িতে চিঠি লিখলেই আপনার বাবা টাকা পাঠিয়ে দেবেন?'

হারাধন ম্রিয়মাণভাবেই বললে, 'কিন্তু এক হাজার টাকা?'

তারাপদ বললে, 'শুনলেন তো, এক বছর পরেই আপনার দুশো টাকা মাইনে হবে! আজকাল বড়ো বড়ো এম-এ, বি-এ পাস-করা ভদ্রলোকেরও একশো টাকার চাকরি জোগাড় করতে জিব বেরিয়ে পড়ে। জমিদারবাবু আপনাকে চাকরি দিতে রাজি হয়েছেন খালি আমার কথাতেই তো? এমন চাকরির জন্যেও আপনার বাবা হাজার টাকা জমা রাখতে পারবেন না?'

হারাধন ভাবতে ভাবতে বললে, 'তা পাঠালেও পাঠাতে পারেন। কিন্তু বাবার মত না জেনে কেমন করে আমি কথা দিই?'

তারাপদ বললে, 'আমি বলছি আপনার বাবার মত হবেই। তাহলে আপনি এইখানেই দাঁড়ান, আমি জমিদারবাবুকে বলে আসি, আপনি হাজার টাকা দিতেই রাজি আছেন।'

তারাপদ আবার এগিয়ে গিয়ে জমিদারবাবুর কানে কানে ফিসফিস করে কী বললে হারাধন তা শুনতে পেলে না বটে, কিন্তু এটা দেখতে পেলে যে তাঁর গোঁফ-জোড়া আবার ফুলে এবং দুলে উঠল। সে আন্দাজ করলে জমিদারবাবুর যত ভাবের অভিব্যক্তি হয় ওই গোঁফ-জোড়ার দ্বারাই।

তারাপদ ফিরে হাসতে হাসতে বললে, 'হারাধনবাবু, আপনাকে চাকরিতে গ্রহণ করা হল। আসুন, এগিয়ে আসুন, আপাতত দুশো টাকা এইখানে জমা রাখুন।'

হারাধন পালঙ্কের কাছে গিয়ে জমিদারবাবুর সামনে কুড়িখানি দশ টাকার নোট স্থাপন করলে।

জমিদারবাবু সেদিকে ফিরেও না তাকিয়ে ডাকলেন, 'নিমাই!'

কার্পেটের উপর উপবিষ্ট লোকদের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আজ্ঞে হুজুর!'

জমিদারবাবু বললেন, 'আজ থেকে এইখানেই হারাধনবাবুর শোবার ও খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি এঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও।'

নিমাইয়ের পিছনে পিছনে হারাধন সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জমিদারবাবু বললেন, 'এ-জীবটিকে কোথায় জোগাড় করলে তারাপদ?'

তারাপদ একগাল হেসে বললে, 'ঠিক জোগাড় করতে হয়নি বাবু! ধরতে গেলে ও এক-রকম যেচেই আমাদের জালে এসে ধরা দিয়েছে। মনে হল ওর ভেতরে কিছু শাঁস আছে, তাই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।'

বাবু বললেন, 'দেখলে তো মনে হয় না শাঁসালো মাল। দুশো টাকা দিয়েছে বটে, কিন্তু হাজার টাকা কি ছাড়তে পারবে?'

—'সে খোঁজ না নিয়ে কি ওকে সঙ্গে এনেছি?' ব্যাটা পাড়াগেঁয়ে ভূত, শহরে এসেছে বাবুগিরি শেখবার জন্যে! পথে আসতে আসতে ঠারে-ঠোরে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি, ছোঁড়ার বাপের হাতে কিছু টাকা আছে। খালি হাজার টাকা কেন, আমার বিশ্বাস, নানা অছিলায় ওর কাছ থেকে আরও বেশ কিছু আদায় করতে পারব।

বাবু তখন প্রসঙ্গ বদলে বললেন, 'কিন্তু তারাপদ, ওদিকের খবর শুনেছ কি?'

—'কোন খবর?'

—'রতন রায়ের মেয়ের? তুমি জানো, রতন রায়ের মেয়ে কী ছেলেকে ধরে আনবার জন্যে শম্ভু আর পঞ্চুকে পাঠিয়েছিলুম? হতভাগারা সব-কাজ পণ্ড করে ফিরে এসেছে।'

—'পণ্ড করে ফিরে এসেছে?'

—'হ্যাঁ। শুনলুম মেয়েটাকে ওরা ভুলিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছিল। কিন্তু পথে আসতে আসতে গাধারা লোভ সামলাতে না পেরে মেয়েটার গা থেকে গয়না খুলে নিতে গিয়েছিল, মেয়েটা চ্যাঁচামেচি করে, আর তার চিৎকার শুনে কোথা থেকে কে একটা লোক এসে শম্ভুকে আর পঞ্চুকে এমন উত্তম-মধ্যম দিয়েছে যে, উল্লুকরা পালিয়ে আসবার পথ পায়নি! নচ্ছাররা ঘাটে এনে নৌকো ডুবিয়েছে, ওদের আর কোনও কাজে পাঠানো হবে না।'

তারাপদ সখেদে বললে, 'হায় হায়, এমন দাঁও ফসকে গেল! রতন রায় মস্ত বড়োলোক, মেয়েটাকে কিছুদিন ধরে রাখতে পারলে তার কাছ থেকে বেশ মোটা টাকা আদায় করা চলত!'

বাবু বললেন, 'কিন্তু আমি এখনও হাল ছাড়িনি তারাপদ! রতন রায়ের পেছনে আবার লোক লাগিয়েছি, হয় তার মেয়ে, নয় তার ছেলেকে আমার চাইই চাই।'

তারাপদ বললে, 'কিন্তু বাবু, মাছ একবার ছিপের সুতো ছিঁড়ে পালালে আর কি টোপ গেলে? রতন রায় নিশ্চয় খুব সাবধান হয়েই থাকবে।'

—'তবু দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।'

পঞ্চম

হারাধন বাবাকে চিঠি লিখলে

হারাধন তার বাবাকে এই পত্রখানি লিখলে

শ্রীশ্রীদুর্গামাতা সহায়

পরম পূজনীয় পিতৃদেব শ্রীচরণকমলেষু,

বাবা,

আপনাকে প্রণাম করিয়া জানাইতেছি যে, আমি নিরাপদে কলিকাতা নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আপনি শুনিলে হয়তো বিশ্বাস করিবেন না যে, পথে আসিতে আসিতেই এক বিখ্যাত ব্যারিস্টার সাহেবের সহিত আমার অত্যন্ত আলাপ হইয়াছে। তাঁহার বাড়িতে

আমি তিন দিবস জামাই-আদরে বাস করিয়াছিলাম। পরে যথাসময়ে সেই বিবরণ আপনাকে জ্ঞাত করিব।

আপনাকে আর-একটি সুসংবাদ প্রদান করিতে চাহি। আপনি শুনিলে নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবেন যে, কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া প্রথম দিবসেই আমি এক অতিশয় অর্থশালী জমিদারের বাড়িতে ম্যানেজারের পদ লাভ করিয়াছি। বেতন এখন মাসিক দেড়শত মুদ্রা, এক বৎসর পরে মাহিনা বাড়িয়া দুইশত মুদ্রা হইবে।

আমি যে-জমিদারের আশ্রয়ে এখন বাস করিতেছি, তাঁহার তুলনায় আমাদের দেশের জমিদার অতিশয় ক্ষুদ্র। কিন্তু আমাদের সেই জমিদারের ম্যানেজার তো দূরের কথা, গোমস্তা ও বাজার-সরকারদেরও তো আপনি অবগত আছেন? তাহারাও আমাদের কীটপতঙ্গের মতো বলিয়া বিবেচনা করে এবং সর্বদাই চাষার ছেলে বলিয়া অপমান করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। আমি রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে এ-হেন বৃহৎ জমিদারের আলয়ে এত টাকা মাহিনায় ম্যানেজারের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছি শুনিয়া এইবারে তাহারা কী বলে তাহা অবগত হইবার জন্য আমার অতিশয় আগ্রহ হইতেছে। মনস্থ করিয়াছি, কিছুকাল পরে তিন-চারি দিবসের ছুটি লইয়া দেশে গমন করিয়া আমি আপনার পদ-বন্দনা করিব এবং আমাদের দেশস্থ জমিদারবাটির কুকুর ও টিকটিকিদের পর্যন্ত বুঝাইয়া দিয়া আসিব যে, আমি আর চাষার ছেলের মতো তুচ্ছ নহি, আমি এখন রীতিমতো শহুরে বাবু হইয়া উঠিয়াছি, এমনকী কলিকাতার বড়ো বড়ো ভদ্রলোকরা অবধি আমাকে এখন বাবু বলিয়া সম্বোধন করে।

কিন্তু আপনার নিকটে আমার আর একটি প্রার্থনা আছে। কলিকাতায় আমার জামিন হইবার মতো লোক কেহ নাই। অথচ জমিদারবাবুর হাজার হাজার মুদ্রা লইয়া আমাকে নাড়াচাড়া করিতে হইবে। আমার চাকুরি হইয়াছে এবং আমি জমিদারবাবুর আশ্রয়েও বাস করিতেছি বটে, কিন্তু এক সহস্র মুদ্রা জমা না রাখিলে আমার ভাগ্যে এ-চাকুরিটি টিকিবে না। ইতিমধ্যেই আপনার নিকট হইতে প্রাপ্ত সেই দুইশত মুদ্রা আমি জমিদারবাবুর নিকট জমা রাখিয়াছি। অতঃপর আপনার শ্রীচরণে নিবেদন এই যে, পত্রপ্রাপ্তিমাত্র আপনি বক্রী আটশত মুদ্রা আমার নিকটে ডাকযোগে পাঠাইয়া দিবেন।

ভুলো কুকুরটাকে প্রতি দিবস যেন পাতের ভাত খাইতে দেওয়া হয়। ভুলো কি আমার অদর্শনে বড়োই ক্রন্দন করিতেছে? মেনির বাচ্চাগুলো আরও কত বড়ো হইয়াছে? আমার বোমা লাটাইটা ভুলিয়া ছাদের উপরে ফেলিয়া আসিয়াছি, মাতাঠাকুরানি তাহা যেন তুলিয়া রাখিয়া দেন। আমার ভ্রাতৃগণ যেন আমার মার্বেল ও লাট্টু প্রভৃতিতে হস্তার্পণ না করে। এ-সব বিষয়ের উপরে আপনিও অনুগ্রহ করিয়া কিছু কিছু দৃষ্টিপাত করিবেন।

এখানকার সমস্ত কুশল। আপনাদের কুশল-সংবাদ দিয়া সুখি করিবেন। আপনি এবং মাতাঠাকুরানি আমার শত শত প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ভ্রাতৃগণকে আমার আশীর্বাদ জানাইবেন। আজ তবে আসি। ইতি—

সেবক
শ্রীহারাধন পাল

চিঠিখানি দেশের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়ে শ্রীমান হারাধন দিনকয়েক নিশ্চিন্ত হয়ে জমিদারবাবুর বাড়ির অন্ন ধ্বংস করে কলকাতার পথে পথে বেড়িয়ে বেড়াতে লাগল। হপ্তা-খানেকের মধ্যেই কলকাতার অনেক বিশেষত্বের সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গেল। একদিন থিয়েটার ও দুদিন বায়োস্কোপ পর্যন্ত সে দেখে ফেললে। জাদুঘর ও চিড়িয়াখানাতেও ঘুরে আসতে ভুললে না। এমনকী মোটরগাড়ির মারাত্মক আক্রমণ হতে কেমন করে আত্মরক্ষা করতে হয় সে-কায়দাটাও শিখে ফেললে খুব চটপট।

আমাদের হারাধন বোকা না হলেও একে অজ পাড়াগেঁয়ে ছেলে, তার উপরে বয়সে বালক এবং পৃথিবী ও সংসারের কোনও অভিজ্ঞতাই তার নেই। সে আন্দাজ করতে পারেনি যে, তার মতন একজন অল্পশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ বালককে কলকাতার কোনও অতি নির্বোধ জমিদারও দেড়শো দুইশো টাকা মাহিনায় কোনও কাজে নিযুক্ত করতে পারে না। তাই সে রীতিমতো মূর্খের স্বর্গে বসে দিবা-স্বপ্ন দেখতে দেখতে আকাশে প্রাসাদ নির্মাণ করতে লাগল।

কিন্তু কোনও কোনও ব্যাপার তার চোখেও ঠেকল কেমন যেন বিসদৃশ।

এমন মস্ত অট্টালিকা, কিন্তু এ যেন একটা প্রকাণ্ড মেসবাড়ির মতো। এর মধ্যে চল্লিশ-পঞ্চাশজন লোক বাস করে, কিন্তু তারা সবাই পুরুষমানুষ। এ-বাড়ির ভিতরে অন্তঃপুর বলে কোনও জায়গা নেই। বাসিন্দাদের অনেকেরই চেহারা, কথাবার্তা ও ব্যবহারও ঠিক ভদ্রলোকের মতো নয়, বরং তার উলটো। অনেকে আবার প্রকাশ্যেই মদ বা গাঁজা খায়, জমিদারবাবু স্বচক্ষে দেখেও কিছু বলেন না। অনেকেরই পকেটে সর্বদাই ছোরা বা বড়ো বড়ো ছুরি থাকে।

হারাধন ভাবলে, হয়তো কলকাতার জমিদারদের হালচালই এইরকম।

দিন-সাতেক পরে হারাধন একদিন সিঁড়ির সামনে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ সিঁড়ির উপরে চার-পাঁচজন লোকের পায়ের শব্দ হল।

কচি কচি গলায় কোনও শিশু কেঁদে বললে, 'কই, আমার বাবা কই? আমি বাবার কাছে যাব।'

কে একজন বললে, 'তোমার বাবা ওপরে আছেন, দেখবে চলো।'

তারপরেই জন-চারেক লোক দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়াল, তাদের একজনের কোলে একটি শিশু। লোকটা শিশুকে নিয়ে দ্রুতপদে তেতলার সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল।

কিন্তু হারাধন এর মধ্যেই শিশুর মুখ দেখতে পেয়েছিল। কী আশ্চর্য, তাকে দেখতে যে অবিকল মিঃ রায়ের ছেলে বিমানকুমারের মতো!

তারাপদ সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার মুখের ভাব লক্ষ করছিল।

সে শুধোলে, 'কী হে হারাধন, তুমি অমন চমকে উঠলে কেন?'

হারাধন বললে, 'ওই খোকাটিকে আমি চিনি।'

তারাপদ সবিস্ময়ে বললে, 'ওই খোকাকে তুমি চেনো?'

—'হ্যাঁ।'

—'ও কে বলো দেখি?'

—'মিঃ রতন রায়ের ছেলে বিমান।'

—'রতন রায়কে তুমি চিনলে কেমন করে?'

—'কলকাতায় আসবার আগে আমি তাঁর বাড়িতে তিনদিন ছিলুম।'

—'আর সেইখানেই তুমি-ওই খোকাকে দেখেছ?'

—'হ্যাঁ। বিমান আমাকে নতুন দাদা বলে ডাকে।'

—'হারাধন, তুমি আস্ত পাগল।'

—'কেন?'

—'সহজ মানুষের কখনও এমন চোখের ভুল হয় না।'

—'আমার কি ভুল হয়েছে?'

—'ওই খোকাটি হচ্ছে আমাদের বাবুর নিজের ছেলে। অসুখ হয়েছে বলে চিকিৎসার জন্যে ওকে কলকাতায় আনা হয়েছে।'

হারাধন হতভম্ব হয়ে গেল। এমন অদ্ভুত চেহারার মিল কি হয়? সেই চুল, সেই কোঁকড়া চুল, সেই জোড়া ভুরু, সেই নাক, সেই ঠোঁট—এমনকী সেই গায়ের রং! একেবারে বিমানের প্রতিমূর্তি!

সে বললে, 'এ যে অবাক কাণ্ড! আমাকে একবার খোকার কাছে নিয়ে চলুন, আমি আর একবার ভালো করে দেখব।'

—'কী ভালো করে দেখবে?'

—'ওই খোকাটি বিমান কি না!'

তারাপদ ক্রুদ্ধ, কর্কশ কণ্ঠে বললে, 'আবার ওই কথা! আমাদের বাবুর ছেলেকে আমি চিনি না? না, ওর সঙ্গে তোমার দেখা হবে না, বাবু রাগ করবেন!'

—'রাগ করবেন! কেন?'

—'অচেনা লোক দেখলে ভয় পেয়ে খোকার অসুখ বাড়তে পারে।'

—'আমি কি রাক্ষস যে আমাকে দেখে খোকা ভয় পাবে?'

—'দ্যাখো বাপু, তোমার অত কথার জবাব দিতে আমি বাধ্য নই। তুমি হচ্ছ কর্মচারী, মনিবদের ঘরোয়া কথা নিয়ে তুমি যদি এখন থেকেই মাথা ঘামাতে শুরু করো, তাহলে এ-বাড়িতে আর তোমার ঠাঁই হবে না!' বলতে বলতে তার মুখের উপরে এমন একটা কঠিন ও কুৎসিত ভাব ফুটে উঠল, এর আগে হারাধন যা আর কখনও লক্ষ করেনি!

সে আস্তে-আস্তে সরে পড়ল এবং যেতে যেতে শুনতে পেলে তারাপদ আবার বললে, 'যারা নিজের চরকায় তেল দেয় না, তাদের সঙ্গে আমরা কোনও সম্পর্ক রাখি না!'

হারাধন কিছুতেই বুঝতে পারলে না, তার অপরাধ হয়েছে কোনখানে! অবাক হয়ে ব্যাপারটা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগল ক্রমাগত।

ওদিকে জমিদারবাবু তখন বৈঠকখানায় বসে আছেন আলবোলার নলটি হাতে করে। হঠাৎ শম্ভু এসে ঘরে ঢুকল, তার মুখের ভাব উদ্বিগ্ন।

বাবু শুধোলেন, 'কিরে শম্ভা, এতদিন তুই কোথায় ছিলি? আর তোর মুখখানাই বা এমন জাম্বুবানের মতন হয়েছে কেন?'

জাম্বুবান যে কী জীব এবং তার মুখের ভাব যে কী-রকম, অত খবর শম্ভু রাখত না।

সে-সব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সে বললে, 'বাবু, যে-ছোকরাটাকে আপনি এখানে ঠাঁই দিয়েছেন, সে কে?'

—'অত খবরে তোর দরকার কী?'

—'আমি আজ এখানে এসেই ওকে চিনতে পেরেছি!'

—'কী চিনতে পেরেছিস? ও তোর মামা, না শ্বশুর।'

—'না বাবু, ঠাট্টা নয়! ওই ছোঁড়াই লাঠি চালিয়ে রতন রায়ের মেয়েকে আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল!'

বাবু ভয়ানক চমকে উঠলেন। তাঁর হাত থেকে তামাকের নলটা খসে পড়ে গেল। একটু ভাববার পর একটু হেসে তিনি মাথা নেড়ে বললেন, 'দূর, তাও কখনও হয়? ওই তো একফোঁটা পাড়াগেঁয়ে ভূত, এখনও ওর গাল টিপলে দুধ বেরোয়, ও কখনও একলা লাঠি চালিয়ে তোদের মতন দু-দুটো হাড়-পাকা পুরোনো পাপীকে খেদিয়ে দিতে পারে। তোর রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়েছে!'

—'কক্ষনো নয়! আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি ও হচ্ছে সেই ছোকরাই!'

—'কেন বাজে বকচিস!'

—'আমি খাঁটি কথাই বলছি।'

এমন সময়ে তারাপদর প্রবেশ।

বাবু বললেন, 'ওহে তারাপদ, শম্ভা আবার কী বলে শোনো।'

—'তুই আবার কী সমাচার এনেছিস রে?'

শম্ভু সব বললে। তারাপদ অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ভাবতে লাগল।

বাবু বললেন, 'কী তারাপদ, তুমি আবার চিন্তা-নদে ঝাঁপ দিলে কেন?'

—'আজ্ঞে বাবু, শম্ভুর চোখ বোধহয় ভুল দেখেনি।'

—'বলো কী হে?'

—'হারাধনই বোধহয় শম্ভু আর পঞ্চুকে ধনঞ্জয় দান করেছে। রতন রায়কে সে চেনে। আজ এখানে রতন রায়ের ছেলেকে দেখেও সে চিনে ফেলেছে!'

—'কী সর্বনাশ!'

—'আমাকে সে অনেক কথা জিজ্ঞাসাও করছিল।'

—'তবেই তো! হারাধন বেটা নিশ্চয়ই পুলিশের চর!'

—'বোধহয় নয়। আমার বিশ্বাস, রতন রায়ের সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছে দৈবগতিকে।'

দুই হাতে নিজের সুদীর্ঘ গোঁফের দুই প্রান্ত ধারণ করে বাবু বললেন, 'এই গুরুতর ব্যাপারটাকে তুমি এত সহজে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা কোরো না তারাপদ! হারাধন পুলিশের চর হোক আর না হোক, সে যখন এত খবর রাখে তখন তার মুখবন্ধ করতেই হবে!'

—'কেমন করে?'

—'যেমন করে আমরা লোকের মুখবন্ধ করি।'

—'ওকে খুন করবেন?'

—'নিশ্চয়!'

—'তাহলে ওর কাছ থেকে আর টাকা আদায় হবে না।'

—'বয়ে গেল! তুমি কি বলতে চাও ওর কাছ থেকে দু-চার হাজার টাকা পাওয়ার লোভে আমরা রতন রায়ের মতন এত বড়ো শিকারকে হাত-ছাড়া করব? তারপর তুমি আর একটা কথা ভেবে দেখছ না, ওই ছোঁড়া পুলিশের চর না হলেও যদি কিছু সন্দেহ করে পুলিশে খবর দেয় তাহলে আমাদের প্রত্যেকেরই হাতে দড়ি পড়বে তা জানো?'

—'বাবু, আমার বিশ্বাস আপাতত হারাধনের সন্দেহ আমি দূর করতে পেরেছি। আমি কী বলি জানেন? আগে ওকে ভালো করে নিংড়ে সব রস বার করে নিই, তারপর যা-হয় একটা ব্যবস্থা করলেই চলবে।'

—'বেশ, যা ভালো বোঝো করো। তবে এক বিষয়ে খুব সাবধানে থেকো। হারাধনকে নজরবন্দি করে রেখো, ও বাড়ি থেকে বেরুলেই যেন সঙ্গে সঙ্গে লোক থাকে—কোথায় যায়, কী করে দেখবার জন্যে। কেন জানি না তারাপদ, আমার মেজাজটা কেমন যেন খারাপ হয়ে গেল।' বলতে বলতে বাবুর গোঁফজোড়া মুখের দুই দিকে ঝুলে পড়ল। অন্যমনস্কের মতন তিনি আবার তামাকের নলটা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে টানতে লাগলেন।

ষষ্ঠ

জনার্দন সিঁড়ি জুড়ে বসে থাকে

কলকাতায় এসে হারাধনের নতুন একটি শখ হয়েছিল।

সে দেখলে, কলকাতার লোকেরা লাইব্রেরিতে, চায়ের দোকানে বা বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পাঠ করে। এটা শহুরে ভদ্রলোকের অন্যতম প্রধান লক্ষণ স্থির করে সেও প্রত্যহ একখানি করে বাংলা দৈনিকপত্র কিনতে আরম্ভ করেছে। আজও সে বাসায় যাবার সময় একখানি বাংলা খবরের কাগজ কিনে নিয়ে গেল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে চৌকির উপরে শুয়ে সে খবরের কাগজখানি খুললে। প্রথমে অন্যান্য খবর এবং সম্পাদকীয় টীকা-টিপ্পনী খানিক বুঝে এবং খানিক না বুঝে পাঠ করলে। তারপর দৃষ্টিপাত করলে বিজ্ঞাপন বিভাগের উপরে।

সংবাদপত্রের মধ্যে তাকে সব-চেয়ে বেশি আকর্ষণ করত এই বিজ্ঞাপন-বিভাগটি। খবরগুলো তো প্রায়ই হয় একঘেয়ে—কোথায় কোন সভা হয়েছে তারই বিবরণ ও বড়ো বড়ো নামের ফর্দ, কোথায় কে মোটর বা লরি চাপা পড়ে পটল তুলেছে, কোথায় কে দশ পয়সার জিনিস চার আনায় বেচে আদালতে গিয়ে জরিমানা দিয়ে এসেছে, যুদ্ধক্ষেত্রের কোথায় জার্মানি পঞ্চাশ পা এগিয়ে এসেছে এবং মিত্রশক্তিরা প্রবল আক্রমণ করেও সাড়ে-বত্রিশ পা পিছিয়ে পড়েছে, এই তো হচ্ছে প্রতিদিনকার এক-রকম পচা পুরাতন 'টাটকা খবর।'

কিন্তু বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো! তার সর্বত্রই অফুরন্ত বৈচিত্র্য! কেউ দিতে

রাজি তিন টাকায় চূড়ান্ত বাবুয়ানার পুরো সাজসজ্জা! কোনও পরম উদার ব্যক্তি মাত্র চার আনা পাঠিয়ে দিলেই এক-ভরি সুবর্ণ বিতরণ করবেন! বরেরা অন্বেষণ করছেন গানে-নাচে-বিদ্যায় ও রূপে শ্রেষ্ঠ কন্যাদের! জ্যোতিষীরা সগর্বে প্রচার করছেন, তাঁদের একখানি মাত্র কবচ কিনলেই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সমস্তই একসঙ্গে লাভ করা যেতে পারবে! তথাকথিত চিকিৎসকরা ভরসা দিচ্ছেন তাঁদের 'পেটেন্ট' ঔষধ একমাত্রা সেবন করলেই পূর্বজন্মেরও সমস্ত ব্যাধি থেকে রোগীরা আরোগ্যলাভ করবেন! কেউ কেউ অশীতিপর বৃদ্ধদেরও জানিয়ে দিচ্ছেন, সন্ন্যাসীদের কাছে প্রাপ্ত দ্রব্যবিশেষের গুণে তাঁরা প্রত্যেকেই আবার দেখতে হবেন নব-যুবকের মতো। এমনি আরও কত ব্যাপার।

হারাধন বিস্ফারিত নেত্রে বিপুল আগ্রহভরে প্রায় শ্বাস রোধ করেই এইসব বিজ্ঞাপন পড়তে ভালোবাসত।

সেদিন বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠার দিকে চেয়ে সর্ব-প্রথমে এই বিষয়টি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল:

পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার

'আমার একমাত্র পুত্র শ্রীমান বিমানকুমার রায়কে গত শনিবার হইতে আর পাওয়া যাইতেছে না। হয় সে হারাইয়া গিয়াছে, নয় কেহ তাহাকে মন্দ অভিপ্রায়ে চুরি করিয়াছে। শ্রীমান বিমানের বয়স সাত বৎসর। তাহার বর্ণ গৌর, মাথায় দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশদাম, জোড়া ভুরু, মুখশ্রী সুন্দর। তাহার পরিধানে ছিল লাল রঙের পোশাক। যে-কোনও ব্যক্তি তাহার সন্ধান আনিতে পারিবেন, তাঁহাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।'

বিজ্ঞাপনের নীচে মিস্টার রায়ের নাম ও ঠিকানা।

হারাধন বিছানার উপর ধড়মড় করে উঠে বসল। গতকল্য সে এখানেই হুবহু বিমানের মতন দেখতে একটি শিশুর দেখা পেয়েছে—তারাপদ যাকে জমিদারবাবুর ছেলে বলে পরিচয় দিলে। আজ মিস্টার রায়ের নামে এই বিজ্ঞাপনটি পাঠ করেই তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, কাল সে যাকে দেখেছে সে বিমান ছাড়া আর কেউ নয়! তার কিছুমাত্র ভুল হয়নি, পুরো তিনদিন যাকে নিয়ে সে এত খেলেছে, এর মধ্যেই তার চেহারা কি ভুলে যেতে পারে? হ্যাঁ, ওই খোকাটিই হচ্ছে বিমানকুমার।

কিন্তু বিমান এখানে এসেছে কেন? কিংবা মিস্টার রায় বিজ্ঞাপনে যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, সেইটেই কি সত্য? বিমানকে কেউ কি চুরি করে এখানে নিয়ে এসেছে? কিন্তু কেন?

হারাধন কিছুতেই মনের ভিতর থেকে এই 'কেন'র জবাব পেলে না। তার মনের ভিতরে আরও অনেক 'কেন' জাগতে লাগল। তারাপদ তার কাছে মিছে কথা বললে কেন? বিমানকে সে জমিদারবাবুর ছেলে বললে কেন? আর জমিদারবাবুই বা পরের ছেলে বিমানকে চুরি করে নিজের বাড়িতে এনে রাখবেন কেন?

এইসব 'কেন'র কোনও উত্তরই পাওয়া যায় না! ভেবে হারাধনের মাথা ক্রমেই গুলিয়ে যেতে লাগল, সে হতাশভাবে শেষটা কার্য ও কারণের সম্পর্ক আবিষ্কার করবার চেষ্টা ছেড়ে দিলে।

ঘরের ভিতরে ঢুকে তারাপদ বললে, 'কী হে হারাধন, তুমি যে পাকা কলকাতার বাবু হয়ে উঠলে দেখছি!'

পাছে বিজ্ঞাপনটা তার চোখে পড়ে সেই ভয়ে হারাধন খবরের কাগজখানা মুড়ে ফেলে জোর করে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, 'কেন বলুন দেখি?'

—'আজকাল রোজ খবরের কাগজ না পড়লে তোমার পেটের ভাত হজম হয় না বুঝি?'

—'আজ্ঞে না তারাপদবাবু, আপনারা তো এখনও আমাকে কোনও কাজে বহাল করলেন না, সময় কাটাবার জন্যে একলা বসে বসে কী আর করি বলুন?'

—'তাই বুঝি যত-সব বাজে ঝুটো খবর পড়বার জন্যে মিছে পয়সা খরচ করে মরছ?'

—'নাটক-নভেলেও সত্যিকথা তো থাকে না তারাপদবাবু, তবু তো লোকে নাটক-নভেল কেনবার জন্যে পয়সা খরচ করে!'

তারাপদ তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললে, 'বা-বা, আমাদের হারাধন যে বচন আওড়াতেও শিখেছে! এটা কি কলকাতার হাওয়ার গুণ?'

হারাধন জবাব না দিয়ে একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'আচ্ছা তারাপদবাবু, আমাকে আপনারা এমন অলসভাবে বসিয়ে রেখেছেন কেন? আমার চাকরি হয়েছে, মাসে মাসে আপনারা মাইনে দেবেন, তবু আমার হাতে আপনারা কোনও কাজ দিচ্ছেন না কেন?'

তারাপদ গম্ভীর হয়ে বললে, 'আমি সেই কথাই বলতে এসেছি। তোমার বাবা চিঠির কোনও জবাব দিয়েছেন?'

—'না এখনও কোনও জবাব পাইনি।'

—'আমার বোধহয় তোমার বাবা টাকা পাঠাতে রাজি নন।'

হারাধন হেসে মাথা নেড়ে বললে, 'আপনি আমার বাবাকে জানেন না বলেই এই কথা বলছেন। বাবা আমাকে এত ভালোবাসেন যে আমার উন্নতির জন্যে সব করতে রাজি হবেন। দেখুন না, দু-একদিনের মধ্যেই একেবারে মনিঅর্ডারে বাবার টাকা এসে পড়বে।'

—'হ্যাঁ, এসে পড়াই ভালো। কারণ বাবু বলছিলেন, এই হপ্তার ভেতরেই যদি তোমার টাকা না আসে, তাহলে তাঁকে নতুন লোক দেখতে হবে। টাকা না পাওয়া পর্যন্ত তিনি তোমাকে চাকরি দিতে পারবেন না, আর এদিকে লোকের অভাবে তাঁর জমিদারির কাজে বড়োই ক্ষতি হচ্ছে। আমি কী বলি জানো হারাধন? তুমি আজই বাবাকে একখানা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দাও।'

—'আচ্ছা, কালকের দিনটা পর্যন্ত দেখে বাবাকে টেলিগ্রামই করব।'

—'বেশ, তাই কোরো। তবে কাজটা আজ করলেই ভালো হত।' বলতে বলতে তারাপদ আবার ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

এরা টাকার জন্যে হঠাৎ এতটা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কেন, হারাধন সে-রহস্যও বুঝতে পারলে না। এই জমিদারবাবুটি যে পৃথিবীর দশ হাত মাটিরও অধিকারী নন, তিনি যে কলকাতার একজন গুন্ডা, খুনি ও ডাকাতদের বড়ো সর্দার, হারাধন এ-সত্যটা এখনও আন্দাজ করতে পারেনি। আপাতত ওই-হাজার টাকা হস্তগত করতে পারলেই সর্দারজি যে নিরাপদ হবার জন্যে দুনিয়ার খাতা থেকে তার নাম একেবারে লুপ্ত করে দিতে চান, এটা ধরতে পারলে হারাধনের পিলে যে কতখানি চমকে যেত, আমরা তা বলতে পারি না। কিন্তু

এখন তার মন সমাচ্ছন্ন হয়ে আছে বিমানের চিন্তায়। কারণ অন্তত এইটুকু সে বুঝতে পেরেছে যে, কোনও মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে বিমানকে এইখানে নিয়ে আসা হয়নি। মফস্বলে সে ধনীদের মধ্যে পারিবারিক শত্রুতার অনেক কাহিনি শ্রবণ করেছে। সেখানে প্রতিহিংসার খাতিরে অনেক খুন-খারাপি পর্যন্ত হয়ে গেছে। মিস্টার রায়ের সঙ্গে জমিদারবাবুর নিশ্চয়ই কোনও শত্রুতার সম্পর্ক আছে। বোধহয় মিস্টার রায়ের একমাত্র পুত্র বিমানকে হরণ করে তিনি প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চান। হারাধন নিজের বুদ্ধিতে এইটুকু পর্যন্ত অনুমান করতে পারলে।

তখন সে ভাবতে লাগল, এখন আমার কর্তব্য কী? চাকরির মায়া ছাড়ব? বিমানকে উদ্ধার করব? বিমান হচ্ছে মিস্টার ও মিসেস রায়ের বড়ো আদরের নিধি, তাঁরা কিছুক্ষণের জন্যেও তাকে চোখের আড়ালে রেখে নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। ছেলের অভাবে না জানি এতক্ষণে তাঁরা কতই কষ্ট পাচ্ছেন। মিসেস রায় হয়তো আহার-নিদ্রা ছেড়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছেন! তাঁদের কাছ থেকে এই অল্প-পরিচয়েই সে কতখানি আদর, স্নেহ ও ভালোবাসা লাভ করেছে। সব জেনেশুনেও সে কি এখনও হাত গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকবে? তাহলে সে কি ভগবানের অভিশাপ কুড়োবে না?

হারাধন উঠে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর দোতলার বারান্দার যেখান থেকে তেতলার সিঁড়ি আরম্ভ হয়েছে, পায়ে পায়ে সেইদিকে হল অগ্রসর।

তেতলার সিঁড়ির নীচের ধাপেই যে-লোকটা বসেছিল তার নাম হচ্ছে জনার্দন। লোকটার চেহারাই কেবল যমদূতের মতন নয়, তার কথাবার্তাগুলোও রীতিমতো কাটখোট্টার মতো।

হারাধন হাসিমুখে বললে, 'কী জনার্দনবাবু, কখন থেকে দেখছি আপনি এই সিঁড়ি জুড়েই বসে আছেন, বাড়িতে এত ভালো ভালো ঘর থাকতে সিঁড়ির ওপর ধুলোয় বসে কেন?'

অকারণেই তেলে-বেগুনের মতন জ্বলে উঠে জনার্দন মুখ খিঁচিয়ে বললে, 'সে-খবরে তোমার দরকার কী হে ছোকরা?'

হারাধন বললে, 'না ভাই, দরকার কিছু নেই, কথার কথা জিজ্ঞাসা করছি আর কী! সিঁড়ির ওপর এমনভাবে বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে তো?'

জনার্দন হুমকি দিয়ে বললে, 'হেঁঃ, কষ্ট হচ্ছে! না, আমার কিচ্ছু কষ্ট হচ্ছে না! ভালো চাও তো এখান থেকে মানে মানে সরে পড়ো!'

—'কেন ভাই, তুমি যে দেখছি একেবারে মারমুখো হয়ে আছ! এখানে এসে আমি কী দোষ করলুম? দুটো গল্প করছি বই তো নয়?'

—'না, না, এটা তোমার গল্প করবার বা বেড়াবার জায়গা নয়! বাবুর হুকুম পেয়েছি, এদিকে কেউ এলেই তাকে গলাধাক্কা দিতে হবে! এখান থেকে যাবে, না গলাধাক্কা খাবে?'

হারাধন আর-কিছু বললে না। বিস্মিত হয়ে এই ভাবতে ভাবতে ফিরে এল, জমিদারবাবু হঠাৎ এমন কড়া হুকুম দিলেন কেন? পাছে বিমানকে কেউ দেখতে পায়, সেইজন্যেই কি এই সাবধানতা? তাহলে জনার্দনকে ওখানে পাহারায় নিযুক্ত করা হয়েছে? নাঃ, ব্যাপারটা ক্রমেই বেশি রহস্যময় হয়ে উঠছে—এইবারে দেখা দরকার এই রহস্যের শেষ কোথায়?

সপ্তম

রেড়ির তেল ভারী ভালো জিনিস

ঢং!......রাত্রি একটা।

সারা কলকাতা ঘুমিয়ে পড়েছে। খালি মানুষরা নয়, ঘুমোচ্ছে যেন বাড়িগুলোও! কোনও বাড়ির ভিতর থেকে একটাও শব্দ নির্গত হচ্ছে না। ঘুমোচ্ছে যেন রাজপথগুলোও।

ষষ্ঠীর চাঁদের তিলকও মুছে গিয়েছে আকাশের কপাল থেকে! তারাগুলো যেন উর্ধ্বলোকের স্থির জোনাকির আলো। বিশ্বের সবাই যখন নিদালী-মন্ত্রে অচেতন, তখন তাদের আসে রাত জাগবার পালা।

দুনিয়ার এত লোকের মধ্যে আমাদের দরকার এখন হারাধনকে। সে এখন কী করছে? স্বপ্নদর্শন? দেখা যাক।

দরজায় কান পাতলে বুঝবে, তার নাসিকা এখন গর্জন করছে না! আর দরজার ফাঁকে উঁকি মারলে দেখবে, সে এখনও ঘুমিয়ে পড়েনি।

তবে এত রাত্রে কী করছে সে? দিচ্ছে ডন, দিচ্ছে বৈঠক। কেন? দেহটাকে সে একটু তাতিয়ে নিতে চায়! তার পরনে কেবল একটা কপনি!

হারাধনের ডন-বৈঠক দেওয়া শেষ হল। তারপর ঘরের কোণে গিয়ে সে একটা বোতল তুলে নিলে। তার ভিতরে ছিল রেড়ির তেল। সে বোতল কাত করে হাতে রেড়ির তেল ঢেলে সর্বাঙ্গে ভালো করে মাখতে লাগল! সে কি পাগলা হয়ে গিয়েছে? রাত একটার সময়ে কেউ কি গায়ে দুর্গন্ধ রেড়ির তেল মর্দন করে?

তেল-মাখা শেষ হল। এইবারে হারাধন আর দুটো জিনিস তুলে নিলে। মালার মতন জড়ানো একগাছা লম্বা নারিকেল-দড়ি এবং তার তৈলপক্ক মোটা বাঁশের খাটো লাঠিটা!

সে ধীরে ধীরে ঘরের দরজা খুললে। বাইরে একবার উঁকি মেরে দেখলে। বাড়ি স্তব্ধ। কিন্তু তেতলায় ওঠবার সিঁড়িতে আলো জ্বলছে।

বারান্দায় বেরিয়ে সে এগিয়ে গেল পা টিপে টিপে। তেতলার সিঁড়ির কাছে এসে দেখলে, সিঁড়িতে ওঠবার পথ জুড়ে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে জনার্দন। সে হাসছে! জেগে নয়, ঘুমিয়ে। বোধহয় সুখস্বপ্ন দেখছে!

হারাধন দড়ি আর লাঠি মাটির উপরে রাখলে। তারপর ঝাঁপ খেলে জনার্দনের বক্ষদেশে। তারপর দুই হাতে তার গলাটা সজোরে চেপে ধরলে।

জনার্দনের হাসি মিলিয়ে গেল এবং সুখস্বপ্ন গেল ছুটে। সে জাগল দুই চোখ কপালে তুলে! বার-দুয়েক গোঁ গোঁ শব্দ করলে। তারপর অজ্ঞান হয়ে গেল।

হারাধন দড়ি দিয়ে জনার্দনের হাত-পা আচ্ছা করে বেঁধে ফেললে। একবার এদিকে-ওদিকে তাকালে। না, গোঁ-গোঁ শব্দে কারুর নিদ্রাভঙ্গ হয়নি। সে দ্রুতপদে তেতলায় উঠে গেল।

মস্ত-বড়ো ছাদ—একসঙ্গে বসে তিনশো লোক পাত পাততে পারে। একেবারে ওদিকে,

ছাদের শেষ-প্রান্তে আছে একখানা মাত্র ঘর। হারাধন নিঃশব্দে সেইদিকে ছুটল। বাহির থেকেই বোঝা গেল, সে ঘরের আলোও নেবানো হয়নি।

ঘরের দরজায় বাহির থেকে শিকল তোলা ছিল। দরজা তালাবন্ধ নেই দেখে সে একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। শিকল নামিয়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে।

এককোণে বিছানা পাতা। বিছানায় ঘুমিয়ে রয়েছে সুন্দর একটি শিশু। তার দুই গালে শুকনো অশ্রুর চিহ্ন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তার ওষ্ঠাধর এখনও ফুলে ফুলে উঠছে। হ্যাঁ, এই তো বিমানকুমার!

শিশুকে ধরে দুই-একবার নাড়া দিতেই সে ভয়ে শিউরে জেগে উঠল, কাঁদবার উপক্রম করলে।

হারাধন তাড়াতাড়ি তার মুখে হাত-চাপা দিয়ে নিম্নস্বরে বললে, 'চুপ, চুপ, কেঁদো না! বিমান, কোনও ভয় নেই, এই দ্যাখো আমি এসেছি!'

বিমানের দুই চোখে ফুটে উঠল গভীর বিস্ময়ের আভাস! সে বললে, 'নতুন দাদা!'

—'হ্যাঁ ভাই, আমি তোমার নতুন দাদা!'

—'নতুন দাদা, আমাকে বাবার কাছে নিয়ে চলো!'

—'তোমাকে নিয়ে যেতেই তো এসেছি ভাই! কিন্তু শোনো। তুমি আর একটিও কথা বোলো না, তাহলে আর তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারব না। এসো, আমার কোলে ওঠো।'

বিমানকে কোলে তুলে নিয়ে হারাধন ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ছাদ পেরিয়ে সিঁড়ি বয়ে আবার নামল দোতলার বারান্দায়। জনার্দন তখনও পড়ে রয়েছে মড়ার মতো। তার ভির্মি ভাঙেনি।

দোতলা থেকে একতলায়। সেখানটায় ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। হারাধন আন্দাজে সদর দরজার দিকে অগ্রসর হল।

অন্ধকারে হঠাৎ বাজখাঁই আওয়াজ জাগল—'কোন হ্যায় রে?'

দারোয়ান! এও বোঝা গেল, সে ছুটে আসছে! ছায়ামূর্তিটা অল্প অল্প দেখাও গেল। হারাধন তাড়াতাড়ি বিমানকে কোল থেকে নামিয়ে দিলে।

দারোয়ান লাফিয়ে পড়ে হারাধনকে দুইহাতে জড়িয়ে ধরলে। কিন্তু তার গা এখন রেড়ির তেলের মহিমায় মাছের চেয়েও পিচ্ছল! হারাধন এক ঝটকান মেরে দ্বারবানের বাহুবেষ্টন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলে অত্যন্ত সহজেই। তারপর অন্ধকারেই চালালে দমাদম লাঠি!

মারোয়াড়-নন্দন ষাঁড়ের মতন চেঁচিয়ে উঠল, 'বাপ রে বাপ, জান গিয়া!' তারপরেই একটা ভারী দেহ-পতনের শব্দ!

দারোয়ান পপাত ধরণীতলে, কিন্তু চারিদিকে শোনা গেল দরজার পর দরজা খোলার দুম-দাম শব্দ! চারিদিকে দ্রুত-পদধ্বনি! চারিদিকে জ্বলে উঠল আলোর পর আলো!

দলে দলে লোক নীচে ছুটে এসে দেখলে, দারোয়ান রক্তাক্ত মস্তকে উঠানে পড়ে ছটফট করছে এবং সদর দরজা খোলা!

বাবু দারোয়ানকে শুধোলেন, কী হয়েছে? কিন্তু দারোয়ান বিশেষ কিছুই বলতে পারলে না।

এমন সময়ে তারাপদ ঝোড়ো কাকের মতো নীচে নেমে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'বাবু, বাবু! জনার্দনের হাত-পা বাঁধা, তেতলায় রতন রায়ের ছেলে নেই, দোতলায় হারাধনও নেই!'

বাবুর গোঁফ ঝুলে পড়ল। তিনি বললেন, 'কেয়াবাৎ! 'তব বাক্য শুনি ইচ্ছি মরিবারে'!'

—'হারামজাদাকে আমি দেখে নেব!' তারাপদ সদরের দিকে পদচালনার চেষ্টা করলে।

বাবু খপ করে তার হাত ধরে ফেলে বললেন, 'কোথা যাও?'

—'হারাধনকে ধরতে।'

—'অর্থাৎ নিজেও ধরা দিতে? বাপু, তুমি কি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির? রাস্তায় গোলমাল হলেই লাল-পাগড়ির আবির্ভাব হবে, তা কি জানো না? তারপর কেঁচো খুড়তে বেরুবে সাপ, এ বুদ্ধিটুকুও কি তোমার নেই?'

তারাপদ পদচালনার ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ দমন করে বললে, 'আমার যে নিজের হাত-পা কামড়াবার সাধ হচ্ছে!'

বাবু গোঁফের উপরে আঙুল বুলিয়ে বললে, 'নিজের হাত-পা যত-খুশি কামড়াও, আমরা কেউ তোমাকে বাধা দেব না। কিন্তু ও-কাজটাও তোমাকে চটপট সংক্ষেপে সারতে হবে, কারণ আমাদের হাতে আর বেশি সময় নেই! এখনই পুলিশের টনক নড়বে, সকাল হবার আগেই আমাদের তল্পি-তল্পা গুছোতে হবে। বুঝেছ?

—'হায় হায় হায় হায়! একটা পাড়াগেঁয়ে ভূতের হাতে শেষটা কিনা ঠকে মরতে হল!'

—'উঁহু, আমি বলি হারাধন হচ্ছে পাড়াগেঁয়ে মানুষ, আর তুমি হচ্ছ শহুরে ভূত! এই বেনো-জলকে এখানে ঢুকিয়েছিল কে?'

—'আমিই বটে!'

—'প্রথম সন্দেহ হতেই ওর ভবলীলার পালা সঙ্গে সঙ্গে সাঙ্গ করে দিতে বলেছিলুম। তখন আপত্তি করেছিল কে?'

—'আমিই বটে।'

—'অতএব বাবাজি, এরপর থেকে আমি যা বলি কান পেতে শুনো।'

—'বলুন, কী বলতে চান?'

—'তোমার চেয়ে আমার বুদ্ধি বেশি। আমার বুদ্ধি কম হলে তোমার গোঁফও আমার চেয়ে লম্বা হত। বুঝেছ? এখন চলো, নেপথ্যে গিয়ে যবনিকাপাত করি!'

হারাধনের ফাঁড়া এইখানেই কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু নিমরাজি হয়েও শেষটা কী ভেবে তারাপদ বেঁকে দাঁড়াল, হঠাৎ মাথা-ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠল, 'না, না, এ হতেই পারে না, হতেই পারে না!'

—'কী হতে পারে না?'

—'হারাধনকে ছেড়ে দেওয়া!'

—'কেন হতে পারে না বাপু?'

—'বাবু, আমি ভেবে দেখলুম, হারাধনকে যদি ছেড়ে দি, তাহলে কেবল আমাদের দলই ভেঙে যাবে না, সেইসঙ্গে আমাদেরও চিরদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে!'

—'কিন্তু হারাধনকে ধরবে কেমন করে? সে কোন পথ দিয়ে চোঁচা দৌড় মেরেছে, আমরা কেউ তা জানি না!'

তারাপদ বললে, 'বাবু, আপনি এত বড়ো বুদ্ধিমান হয়েও, বুঝতে পারছেন না যে, মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্তই!'

এইবারে বাবুরও বুঝতে বিলম্ব হল না। মাথা নেড়ে ও গোঁফে তা দিয়ে তিনি বললেন, 'হুঁ, ঠিক! ছেলেটাকে নিয়ে হারাধন এখন সোজা ছুটবে রতন রায়ের বাড়ির দিকেই!'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। রতন রায়ের বাড়িতে পৌঁছোতে গেলে টালিগঞ্জের রিজেন্ট পার্কের ভিতর দিয়ে যেতেই হবে। সেখানে আনাচে-কানাচে আমরা লুকিয়ে থাকব, তারপর হারাধন এলেই—হুঁহুঁ, বুঝতে পারছেন? এত রাতে সেখানে জনমানব থাকবে না, সুতরাং—'

সমূহ উত্তেজনায় বাবুর গোঁফজোড়া ফুলে উঠল। বাবুর গ্যারাজ বা গুদামে ছিল একখানা চোরাই মোটর, তৎক্ষণাৎ সেখানা বার করে আনা হল এবং তার উপর টপাটপ উঠে বসল কয়েকজন গুণ্ডার মতো লোক।

তারাপদ মুখে মুরুব্বিয়ানার ভাব ফুটিয়ে তুলে বললে, 'ঘুঘু, দেখি ধান খেয়ে তুমি কেমন করে পালাও! আমরা বাসা আগলে বসে থাকব। কেমন বাবু, ফন্দিটা কি মন্দ?'

—'না, মন্দ নয়। কিন্তু—'

—'আবার কিন্তু কেন বাবু?'

হঠাৎ বাবুর মুখে ফুটল উদ্বেগের চিহ্ন। তাঁর গোঁফজোড়া নেতিয়ে পড়তে চাইলে। কেমন যেন মনমরার মতো তিনি বললেন, 'তারাপদ, তারাপদ, আমার চোখ এমন নাচতে শুরু করলে কেন? এটা তো ভালো লক্ষণ নয়!'

তারাপদ উৎসাহ দিয়ে বললে, 'কুছ পরোয়া নেহি! চোখ নাচছে শিকার ধরবার আনন্দে! এই, চালাও গাড়ি! জয় মা কালী—কলকাত্তাওয়ালী!'

অষ্টম

দুমুখো ভূতের কাঁচা-পাকা হাসি

সেই ভয়াবহ বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিমানকে কাঁধে করে হারাধন রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগল প্রাণপণে।

অন্ধকার রাস্তা, জনপ্রাণীর সাড়া নেই। সে কোথায় যাচ্ছে তা জানে না, হারাধন ছুটছে দিগ্বিদিক-জ্ঞানহারার মতো। তার মনে জাগছে কেবল এক কথাই—পিশাচদের কবল থেকে যেমন করে হোক বিমানকে রক্ষা করতেই হবে, নিজের প্রাণ যায় তাও স্বীকার!

এইভাবে বেশ খানিকটা পথ পার হয়ে সে যখন চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে, কোথাও কোনও বিভীষিকার ছায়া পর্যন্ত নেই, তখন বিমানকে কাঁধ থেকে নামিয়ে একটিবার দাঁড়িয়ে পড়ল হাঁপ ছাড়বার জন্যে।

তখন তারা এসে পড়েছে চৌরঙ্গিতে গড়ের মাঠের ধারে। দপদপে আলোগুলো তখন চোখ মুদে অন্ধকারকে পথ ছেড়ে দেয়নি বটে, কিন্তু কোথাও নেই বিপুল জনতার চিহ্ন, মোটর ট্রাম বাসের ধুমধড়াক্কা ও হরেক রকম হট্টগোলের শব্দ—এ যেন এক অবিশ্বাস্য নতুন চৌরঙ্গি!

একদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা সার বেঁধে আকাশের দিকে মাথা তুলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে যেন প্রেতপুরীর পর প্রেতপুরী; এবং আর একদিকে দূরবিস্তৃত গড়ের মাঠ তার গাছপালা ঝোপঝাপ নিয়ে আলোকরাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে হারিয়ে গিয়েছে প্রথমে আবছায়া ও তারপর অন্ধকারের অন্তরালে। কোনওখানেই নেই জনপ্রাণীর সাড়া, চারিদিক এত স্তব্ধ যে শোনা যায় নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ! হারাধনের মনে হতে লাগল সে যেন কোনও মৃত শহরের মাঝখানে এসে পড়েছে!

পাহারাওয়ালাদের লালপাগড়িগুলোও তখন রাস্তার উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, নইলে এমন অসময়ে হারাধনের তেল-চকচকে কপনি-পরা দেহ দেখলে নিশ্চয়ই লাঠি ঘুরিয়ে তেড়ে আসত! কিন্তু এখন তার পাহারাওয়ালার হাতে গ্রেপ্তার হতে কোনও ভয়ই নেই—কারণ সেটা হবে শাপে বরের মতো! লালপাগড়ির পাল্লায় পড়লে জমিদারবাবুর চ্যালা-চামুণ্ডারা আর তাকে ধরতে পারবে না! মারাত্মক রোগযন্ত্রণায় কাতর রোগীরা যেমন যমকেও স্মরণ করে, হারাধনও তখন মনে মনে ডাকতে লাগল—হে লালপাগড়ি, দয়া করে একটিবার তুমি দেখা দাও! কিন্তু মিছেই ডাকাডাকি, হারাধন তো খাস কলকাতার ছেলে নয়, কাজেই সে জানে না যে, দরকারের সময়ে লালপাগড়িরা কোনওদিনই খবরদারি করতে আসে না!

হারাধন জানত, চৌরঙ্গির রাস্তা ধরে সিধে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হলে টালিগঞ্জে গিয়ে পড়া যায়। তারপর 'ট্রামওয়ে টার্মিনাস' পার হয়ে বাঁয়ে মোড় ফিরে মাইল দেড়েক গেলেই রতন রায়ের বাড়ি পাওয়া যাবে।

সে বললে, 'বিমান, এইবারে তুমি পিঠে চড়ে দুইহাত দিয়ে আমাকে ভালো করে জড়িয়ে থাকো! কিন্তু দেখো, যদি কোনও হাঙ্গাম হয়, তুমি যেন ভয় পেয়ে হাত ছেড়ে দিয়ো না।'

বিমান হাসিমুখে বললে, 'আচ্ছা।'

—'হ্যাঁ, কিছুতেই হাত ছেড়ে পিঠ থেকে নেমে পড়বে না! যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, ততক্ষণ তোমার কোনও ভয় নেই।'

বিমানের হাসিমুখ দেখেই বোঝা গেল, নতুনদাদাকে পেয়ে সেসব ভয়ভাবনাই ভুলে গিয়েছে! নিস্তব্ধ রাত্রে চৌরঙ্গির এমন আশ্চর্য নির্জনতাও সে কখনও চোখে দেখেনি এবং মানুষ ঘোড়ার পিঠে চড়ে এমন ছুটোছুটি খেলাও আর কোনওদিন খেলেনি, কাজেই তার কাছে সমস্তটাই খুব মজার ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছিল।

বিমানকে পিঠে তুলে নিয়ে হারাধন আবার ছুটতে শুরু করলে জোরকদমে। তারা যখন গড়ের মাঠের শেষ প্রান্তে বড়ো গির্জার কাছে এসে পড়েছে তখন আবার আর এক কাণ্ড!

একটা লালমুখো গোরা বেধড়ক মদ খেয়ে ফুটপাতে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে ঝিমোতে ঝিমোতে নেশার স্বপন দেখছিল। আচমকা দ্রুতপদশব্দ শুনে চোখ মেলে দেখে, একটা তেল-চকচকে ন্যাংটা কালা আদমি ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসছে—কী আশ্চর্য, তার দেহের উপর দুই-দুইটা মুণ্ড! নিশ্চয়ই ভূত দেখেছে ভেবে সে আর্তনাদ করে দুই হাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেললে!

মাতাল গোরাটার রকম-সকম দেখে এত বিপদেও হারাধন হো হো করে না হেসে থাকতে পারলে না এবং তার সঙ্গে কচি গলায় খিলখিলিয়ে হাসতে লাগল বিমানও!

এইবারে গোরাটার নাড়ি ছেড়ে যাবার জো আর কী! বাপ রে, এই দুমুখো ভূতটা আবার একসঙ্গে দু-রকম গলায় হাসতেও পারে! পাছে সেই অসম্ভব চেহারাটা আবার স্বচক্ষে দেখতে হয় সেই ভয়ে আরও জোরে প্রাণপণে চোখ মুদে গোরাটা কান্নার সুরে ইংরেজিতে যা বললে, বাংলায় তার মানে দাঁড়ায় এই ঃ 'হে আমার ভগবান, এই দুমুখো ভূতের খপ্পর থেকে আমাকে রক্ষা করো।'

হারাধন হাসতে হাসতে আবার নিজের পথ ধরলে। যদিও ব্যাপারটা আরও কতদূর গড়ায় সেটা দেখবার তার খুবই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এখন তো মজা দেখবার সময় নেই!

এল ভবানীপুর, এল কালীঘাট, এল রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের মোড়! তারপর টালিগঞ্জের পোল পেরিয়ে, ট্রামওয়ে টার্মিনাস পিছনে রেখে রিজেন্ট পার্কে যাবার রাস্তা।

শেষরাতে মানুষদের ঘুম আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে, মাথার উপরে জেগে আছে খালি উড়ন্ত প্যাঁচা আর বাদুড়রা। এখানে চৌরঙ্গির মতো বিদ্যুৎবাতির মালা নেই, মাঝে মাঝে ঘুটঘুটে অন্ধকারকে ছ্যাঁদা করে জ্বলছে এক একটা মিটমিটে আলো। অন্ধকার দূর হয় না, আলো দেখা যায় নামমাত্র। পথের এপাশে-ওপাশে আবছায়া মেখে দাঁড়িয়ে আছে গাছের পর গাছ, তাদের পাতায় পাতায় থেকে থেকে বাতাসের শিউরে ওঠার শব্দ।

সেইখানে পথের একধারে রাত-আঁধারে কালো গা মিলিয়ে অপেক্ষা করছে একখানা মোটরগাড়ি। তার ভিতরে কোনও আরোহি নেই, কিন্তু তার আড়ালে রাস্তার উপরে হুমড়ি খেয়ে রয়েছে কতকগুলো ছায়ামূর্তি। শিকারী হিংস্র জন্তুর মতো তাদের হাবভাব।

সিগারেট ধরাবার জন্যে ফস করে কে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে, অল্পক্ষণের জন্যে দেখা গেল জাল জমিদারবাবু কাঁকড়াদাড়া গোঁফ।

তারাপদ ফিসফিস করে বলে উঠল, 'ও বাবু, করেন কী, করেন কী?'

শুয়োরের মতো ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বাবু বললেন, 'কী আবার করব, সিগারেট ধরালুম দেখতে পাচ্ছ না?'

—'আমি তো দেখছি, যদি আরও কেউ দেখে ফেলে?'

—'এখানে আর কে দেখবে? ঝিঁঝিপোকা? কোলাব্যাঙ? না বুনো মশা?'

—'না বাবু, সাবধানের মার নেই।'

মহা ক্রোধে আর উত্তেজনায় বাবুর মস্তবড়ো ভুঁড়িটা একবার ফুলে উঠতে ও আর একবার চুপসে যেতে লাগল। জ্বলন্ত চক্ষে তিনি বললেন, 'চুপ করে থাকো! কাকে সাবধান হতে বলছ? এতদিন তোমরা কতটা সাবধান হয়ে ছিলে? তোমরা যদি সাবধান হতে

পারতে তাহলে আজ—উঃ, বাপ রে বাপ!' কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন!

—'কী হল বাবু, কী হল?'

—'যা হবার তাই হল! একটা বোম্বাই মশা আমার নাকের ডগায় কামড়ে দিয়েছে! খালি কি নাক? আমার গোটা মুখখানা ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে দেখতে পাচ্ছ কি?'

আর একটা লোক অভিযোগ করে বললে, 'বাবু, এখানটা হচ্ছে মশার ডিপো, আমরা আর সহ্য করতে পারছি না!'

রাগে গসগস করতে করতে ও নাকের ডগায় হাত বুলোতে বুলোতে বাবু বললেন, 'তারাপদর অসাবধানতার জন্যেই সকলের আজ এই দুর্দশা। তারাপদ আবার আমাদের সাবধান হতে বলছে! না, আমরা আর সাবধান হব না! বেশ বোঝা যাচ্ছে, হারাধন-বেটা ছোঁড়াটাকে নিয়ে অন্য কোনওদিকে পিঠটান দিয়েছে—ইস, ইস, ইস।' বাবু লম্ফ ত্যাগ করে ঘন ঘন পা ঝাড়তে লাগলেন!

—'আবার কিছু হল নাকি বাবু?'

—'হল না তো কী? নিশ্চয় বিছে কী সাপের বাচ্চা! পা বেয়ে সড়সড় করে উপরে উঠছিল! চলো হে, এখান থেকে সবাই মানে মানে সরে পড়া যাক—আজ আর কেউ আসবে না!'

তারাপদ বললে, 'বাবু, আর একটু সবুর করুন!'

বাবু নাচারভাবে বসে পড়ে বললেন, 'আমি বেশ বুঝতে পারছি তারাপদ, আজকের গতিক সুবিধের নয়!'

—'চুপ, চুপ! চেয়ে দেখুন!'

বাবু সচমকে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দৃষ্টিচালনা করলেন। দূরে 'ল্যাম্পপোস্টে'র তলায় চকিতের জন্যে দেখা গেল একটা ছুটন্ত মূর্তি। তারপরই শোনা গেল কার দ্রুত পায়ের শব্দ। কে দৌড়তে দৌড়তে এদিকেই আসছে!

তারাপদ বললে, 'নিশ্চয় হারাধন!'

বাবু বললেন, 'খুব হুঁশিয়ার! বেটা অনেক কষ্ট দিয়েছে, আবার যেন চোখে ধুলো না দেয়! চারিদিক থেকে ওর উপরে লাফিয়ে পড়ো—ওকে একেবারে শেষ করে ফ্যালো, তারপর রতন রায়ের ব্যাটাকে গাড়িতে এনে তোলো!'

যমদূতের মতো লোকগুলো ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল এবং প্রত্যেকেরই হাতে চকচকিয়ে উঠল এক-একখানা শাণিত ছোরা!

সকলের আগে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল তারাপদ—তার চোখে-মুখে বীভৎস হিংস্রার ছাপ!

দৌড়ে আসছিল হারাধনই বটে! কিন্তু তারাপদ তার তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারলে না—সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর নিজের পৃষ্ঠদেশে লম্বমান বিমানের কানে ফিসফিস করে বললে, 'খোকন, তোমার কোনও ভয় নেই! তুমি চোখ মুদে ফ্যালো, তারপর আরও জোরে আমাকে জড়িয়ে ধরো!'

তারাপদ তখন তার উপরে লাফিয়ে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল।

মোটা বাঁশের লোহাবাঁধানো খাটো লাঠিটা তখনও হারাধনের হাতে ছিল। তড়িৎবেগে তার হাত উঠল শূন্যে এবং ভারী লাঠিগাছা সবেগে ও সজোরে নিক্ষিপ্ত হল তারাপদর দিকে। অব্যর্থ তার লক্ষ্য! বিকট আর্তনাদে আকাশ ফাটিয়ে তারাপদ তৎক্ষণাৎ মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ে মাথাকাটা পাঁঠার মতো ছটফট করতে লাগল—লৌহমণ্ডিত লাঠির অগ্রভাগটা প্রচণ্ড বেগে গিয়ে পড়েছে তার চোখের উপরে!

এই আকস্মিক ও অভাবিত বিপর্যয়ে আততায়ীরা দাঁড়িয়ে পড়ল স্তম্ভিতের মতো এবং হারাধনও ত্যাগ করলে না তাদের সেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার সুযোগ—পরমুহূর্তেই পাশের দিকে লাফিয়ে পড়ে তড়বড় করে একটা উঁচু গাছের উপরে উঠতে লাগল! পাড়াগেঁয়ে ছেলে, শিশুকাল থেকেই গাছে চড়তে ওস্তাদ, সকলের নাগালের বাইরে গিয়ে পড়ল অবিলম্বেই।

তারাপদর ষণ্ডকণ্ঠের গণ্ডগোলে ভেঙে গেল দুই পাহারাওয়ালার চটকা! আর্তনাদের উৎপত্তি কোথায় জানবার জন্যে তারা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলে।

কিন্তু বাবু সে সম্ভাবনা আমলেই আনলেন না, চণ্ডালে-রাগে আত্মহারা হয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'তোরাও গাছে চড়, পাড়াগেঁয়ে শয়তানটাকে ধরে মাটির উপরে ছুড়ে ফেলে দে—কেটে কুটি-কুটি করে ফ্যাল—আজ এসপার কী ওসপার!'

গাছের টঙে উঠে হারাধনও গলা ছেড়ে চ্যাঁচাতে লাগল—'খুন, খুন! ডাকাত! কে কোথায় আছ দৌড়ে এসো! খুন! ডাকাত!'

তারাপদর ভয়ঙ্কর আর্তনাদেই সেখানকার অনেকের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, এখন আবার হারাধনের বলিষ্ঠ কণ্ঠের গোলমাল জাগিয়ে তুললে গোটা অঞ্চলটাকেই!

এই হট্টগোলের নিশ্চিত পরিণাম বুঝে বাবুর সাঙ্গপাঙ্গরা হারাধনকে বধ করবার জন্যে গাছে চড়বার প্রস্তাব কানেই তুললে না। তারা মোটরকারের দিকে দৌড়ে গেল হন্তদন্তের মতো। কিন্তু বিপদকালে গাড়িখানাও ত্যাগ করলে তাদের পক্ষ—সে 'স্টার্ট' নিতে রাজি হল না!'

প্রথমেই শোনা গেল ধাবমান পাহারাওলাদের পায়ের শব্দ।

ষণ্ডামার্কার দল তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারলে দৌড় মারলে।

কিন্তু ফল হল না, তাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললে জাগ্রত বাসিন্দাদের বেড়াজাল। সর্বাগ্রে পেটমোটা কাঁকড়া-গুঁফো জাল জমিদার, তারপর একে একে প্রত্যেক বদমাইশ ধরা পড়তে বিলম্ব হল না।

তখন বৃক্ষশাখা ত্যাগ করে মাটির উপরে অবতীর্ণ হল একসঙ্গে ডবল মূর্তি।

প্রশ্ন হল, 'কে তোমরা, কে তোমরা?'

—'আমি হারাধন।'

—'আমি বিমান।'

হারাধন বললে, 'ওরা আমাদের খুন করতে এসেছিল।'

বিমান বললে, 'আমি বাড়িতে যাব!'

পাহারাওয়ালা বললে, 'না, তোমরা এখন থানায় যাবে।'

নবম

বিমান চকোলেট খেতে দেবে

তারা থানায় গিয়ে হাজির হল। ভোর না হওয়া পর্যন্ত হারাধন ও বিমানকে বসিয়ে রাখা হল একটা ঘরে। নতুন দাদার তৈলাক্ত কোলের উপরে শুয়ে বিমানও বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিতে আপত্তি করলে না।

সকালবেলায় হারাধনের কপনি-পরা তৈলাক্ত চেহারা দেখে ইন্‌স্পেকটারবাবুর বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে বাপু?'

—'আজ্ঞে, হারাধন পাল।'

—'তোমার সঙ্গের ও-খোকাটি কে?'

—'ব্যারিস্টার মিঃ রতন রায়ের ছেলে।'

—'কী বললে? মিঃ রতন রায়ের ছেলে? ওকে তুমি কোথায় পেলে?'

—'জমিদারবাবুর বাড়িতে।'

—'কে জমিদারবাবু?'

—'তাহলে সব কথা খুলে বলি শুনুন।'

হারাধন গোড়া থেকে আরম্ভ করে নিজের সমস্ত কাহিনি বর্ণনা করে গেল, কিছুই লুকোলে না। শুনতে শুনতে ইন্‌স্পেকটারবাবুর মুখের উপরে নানাভাবের রেখা ফুটে উঠতে লাগল।

হারাধনের আত্মকাহিনি সমাপ্ত হলে পর ইন্‌স্পেকটারবাবু উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন, 'হারাধন, কী বলে তোমার প্রশংসা করব জানি না, যেখানে তোমার মতন ছেলে থাকে, সে পাড়াগাঁ হচ্ছে কলকাতার চেয়েও শ্রেষ্ঠ! তুমি হচ্ছ দেশের সুসন্তান! একটু অপেক্ষা করো, আমি ফোনে মিঃ রায়কে সুখবরটা দিয়ে আসছি।'

ইন্‌স্পেকটারবাবু পাশের ঘরে চলে গেলেন।

হারাধন ডাকলে, 'বিমান!'

—'কী নতুন দাদা?'

—'তোমার ভয় করছে?'

—'উঁহু!'

—'কেন ভয় করছে না?'

—'তুমি যে কাছে রয়েছ!'

—'তুমি আমাকে এত ভালোবাসো?'

—'হুঁ, খুব—খুব ভালোবাসি!'

—'তোমার খিদে পেয়েছে?'

—'না।'

—'কেন খিদে পায়নি?'

—'বাবা আর মাকে না দেখলে আমার খিদে পাবে না!'

—'তোমার বাবা এখনই এসে তোমাকে নিয়ে যাবেন।'

—'তুমিও আমার সঙ্গে যাবে তো?'

—'না ভাই, আমি যাব অন্য জায়গায়।'

—'ইস, তাই বইকী! আমি তোমাকে ধরে নিয়ে যাব।'

—'ছিঃ ভাই, কারুকে কি ধরে নিয়ে যেতে আছে? এই দ্যাখো না, তোমাকে দুষ্টু লোকেরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল বলে তোমার কত কষ্ট হচ্ছে!'

—'দূর, আমি কি তোমাকে ওই-রকম ধরে নিয়ে যাব?'

—'তবে?'

—'আমি তোমাকে আদর করে ধরে নিয়ে যাব।'

—'ধরে নিয়ে গিয়ে কী করবে?'

—'তোমার সঙ্গে খেলা করব।'

—'আমার যখন খিদে পাবে?'

—'চকোলেট, টফি, লজেঞ্জুস, বিস্কুট খেতে দেব।'

—'তাহলে তো দেখছি আর আমার কোনও ভাবনাই নেই!'

এমন সময়ে ইন্‌স্পেকটারবাবু ফোন করে ফিরে এসে বললেন, 'মিঃ রায় এখনই থানায় আসছেন।'

হারাধন ব্যস্ত হয়ে বললে, 'এই কপনি পরে তেলমাখা গায়ে কেমন করে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব?'

ইন্‌স্পেকটারবাবু হেসে বললেন, 'ভয় নেই হারাধন, এখনই তোমাকে সাবান, তোয়ালে আর শুকনো কাপড় দেবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

হারাধন তাড়াতাড়ি সাবান মেখে স্নান করে শুকনো কাপড় পরে নিলে।

তারপর মিঃ রায় এলেন। গাড়িতে কেবল তিনি নন, তাঁর স্ত্রী প্রতিমা ও তাঁর মেয়ে প্রীতিকেও সঙ্গে করে এনেছিলেন।

বিমান দৌড়ে গিয়ে একেবারে বাবার কোল অধিকার করলে।

মিঃ রায় হারাধনের মাথার উপরে একখানি হাত রেখে অভিভূত কণ্ঠে বললেন, 'বাবা হারাধন, তুমি গেল-জন্মে আমার কে ছিলে জানি না, কিন্তু যে উপকারটা করলে এ-জীবনে আর তা ভুলব না।'

প্রতিমা তার দুটি হাত ধরে বললেন, 'প্রীতিকেও তুমি বাঁচিয়েছ, বিমানকেও তুমি বাঁচালে। এবার থেকে ওদের আমি তোমার হাতেই সমর্পণ করলুম। কেমন বাবা, এ ভারটি নিতে পারবে তো?'

হারাধন বললে, 'মা, পারলে এ ভারটি নিশ্চয়ই নিতুম। কিন্তু আমি যে আজকেই দেশে চলে যাচ্ছি!'

মিঃ রায় সবিস্ময়ে বললেন, 'সে কী, এর মধ্যেই তোমার কলকাতা দেখার শখ মিটে গেল?'

—'হ্যাঁ বাবা। আমাদের মতো পাড়াগেঁয়েদের জন্যে কলকাতা শহর তৈরি হয়নি। কলকাতার যেটুকু পরিচয় পেয়েছি তাইতেই বুঝে নিয়েছি যে, আমাদের পক্ষে পাড়াগাঁই ভালো। কলকাতা যতই সুন্দর হোক, তাকে আমার সহ্য হবে না।'

প্রীতি এগিয়ে এসে হারাধনের হাত চেপে ধরে বললে, 'ইস, তোমাকে যেতে দিলে তো যাবে!'

হারাধন বললে, 'না বোন, আমাকে যেতে হবেই। কলকাতায় থাকতে আমার ভয় হচ্ছে, এখানকার মানুষরা ভয়ানক।'

মিঃ রায় বললেন, 'না হারাধন, যতটা ভাবছ কলকাতা ততটা খারাপ নয়। এখানকার অন্ধকারটাই আগে তোমার চোখে পড়েছে বটে, কিন্তু কিছুদিন এখানে থাকলে কলকাতার আলোও তোমার চোখে পড়বে। আমাদের কলকাতা হচ্ছে বহুরূপী, যে যেমন চায় সে তার কাছে সেই রূপেই ধরা দেয়। কলকাতাকে দেখবার জন্যে তুমি ভুল পথ বেছে নিয়েছিলে, তাই বিপদেও পড়েছ। আমার কাছে থাকলে তুমি দেখবে এক নতুন কলকাতাকে।'

হারাধন বললে, 'বাবা, আপনি আমাকে ভালোবাসেন বটে, কিন্তু আমি আপনার গলগ্রহ হতে চাই না।'

—'না, না হারাধন, এ তোমার ভুল বিশ্বাস। আমি তোমাকে নিজের ছেলের মতোই দেখব। আমি দেখেছি তোমার ভিতরে আগুন আছে। ভালো করে লেখাপড়া শিখিয়ে আমি

তোমার ভিতরকার আগুন আরও উজ্জ্বল করে তুলতে চাই—তুমি হবে দেশের এক উজ্জ্বল রত্ন!'

—'কিন্তু আমার বাবা মত দেবেন কি?'

—'তোমার বাবাকে রাজি করবার ভার নিলুম আমি নিজেই।......হ্যাঁ, ভালো কথা। আমার কাছে তোমার একটি পাওনা আছে।'

—'আমার পাওনা আছে?'

—হ্যাঁ, একখানি পাঁচ হাজার টাকার চেক, বিমানকে উদ্ধার করবার জন্যে পুরস্কার। চেক আমি লিখেই নিয়ে এসেছি। এই নাও।' মিঃ রায় পকেট-বুকের ভিতর থেকে চেকখানি বার করলেন।

জোরে মাথা-নাড়া দিয়ে হারাধন বললে, 'না, না! পুরস্কারের লোভে আমি বিমানকে উদ্ধার করিনি!'

—'এ কথা আমি জানি হারাধন, এ কথা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু চেকখানি তোমাকে নিতেই হবে, আমারও অঙ্গীকারের একটা মূল্য আছে তো?'

—'ও টাকা আমি কিছুতেই নেব না! আপনি বরং ওই টাকাটা আমার নামে কোনও হাসপাতালে দান করবেন।'

মিঃ রায় প্রগাঢ় স্বরে বললেন, 'হারাধন, তোমাকে যতই দেখছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি! বেশ, আমি এই পাঁচ হাজার টাকা তোমার নামে কোনও হাসপাতালেই পাঠিয়ে দেব। কিন্তু তোমার একটা কথা আমি কোনওমতেই শুনব না। তোমাকে এখনই আমার সঙ্গেই যেতে হবে।'

প্রীতি ও বিমান দুই দিক থেকে হারাধনের দুই হাত ধরে টানতে টানতে বললে, 'আমাদের সঙ্গে চলো নতুন দাদা, আমাদের সঙ্গে চলো!'

হারাধন বিব্রত হয়ে বললে, 'ও দিদি, ও দাদা, আর টানাটানি কোরো না, আমি তোমাদেরই সঙ্গে যাব!'

বিমান নৃত্য শুরু করে দিয়ে বললে, 'নতুন দাদা সঙ্গে যাবে—নতুন দাদা সঙ্গে যাবে! কী মজা ভাই, কী মজা!'

ইন্‌স্পেকটারবাবু এতক্ষণ চুপ করে সব দেখছিলেন ও শুনছিলেন। এখন তিনি বললেন, 'হারাধন, তোমার গুণ দেখে আমিও মুগ্ধ হয়েছি। তুমিও মাঝে মাঝে আমার কাছে এলে খুব খুশি হব।'

বিমান সভয়ে বললে, 'না, আমার নতুন দাদা আর এখানে আসবে না। এখানে একটা ঘরে সেই রাক্কসের মতো লোকটা আছে!'

ইন্‌স্পেকটার হেসে বললেন, 'ও, তুমি বুঝি সেই জাল জমিদারের কথা বলছ? না খোকা, সে আর কোনও নষ্টামিই করতে পারবে না! এখন তাকে হাজতে পোরা হয়েছে, এরপর যাবে জেলখানায়।'

হারাধন শুধোলে, 'তারাপদবাবু কোথায়?'

—'তোমার ডাণ্ডা খেয়ে এখন হাসপাতালে। তার একটা চোখ একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেরে উঠলে একটিমাত্র চোখ নিয়ে তাকেও বেড়াতে যেতে হবে জেলখানায়।'

কাঁচুমাচু মুখে হারাধন বললে, 'লাঠিটা যে চোখে গিয়ে পড়বে তা আমি জানতুম না!'

মিঃ রায় বললেন, 'লাঠিটা তার চোখে গিয়ে পড়েছে ভগবানের ইচ্ছায়। শয়তানির শাস্তি! এখন আর কথায় কথায় সময় কাটানো নয়, সবাই বাড়ির দিকে চলো,—এসো বিমান, তোমার নতুন দাদাকে সঙ্গে নিয়ে এসো।'

ছোট্ট পমির অভিযান

॥ প্রথম ॥

ছোট্ট পমি জানলে তার ভালোবাসার কেউ নেই

আসল নাম প্রমোদ। কিন্তু তার ডাকনাম ছিল পমি।

পমির বয়স বড়ো কম নয়।—পুরো ছয় বছর! এবং এর মধ্যেই সে জেনে ফেলেছে দুনিয়ার অনেক কিছুই।

ধরো, সে জানে যে শীতে হাত কনকন করলে পকেটের ভিতরে পুরলেই হাত গরম হয়ে যায়। সে আরও জানে কোনটা সাদা আর কোনটা কালো রং। এবং এক থেকে পঁচিশ পর্যন্ত অনায়াসেই সে গুনে ফেলতে পারে; কিন্তু আরও বেশি এগুতে পারে না, কারণ তার পরেই মাথাটা কেমন যেন গুলিয়ে আসে। কেবল তাই নয়, সে নিজের জামাকাপড় নিজেই পরতে পারে। এসব শিখতে তাকে কম বেগ পেতে হয়নি; কিন্তু উপায় কী, জন্মেই কেউ তো আর প্রফেসরের মতন জ্ঞানের জাহাজ হতে পারে না।

পমি আরও কত কী জানে। সে জানে, বড়োদের দেখলেই নমস্কার করা উচিত; কেমন করে স্নান করতে হয়; কেমন করে খাবার খেতে হয় আর কেমন করে হেঁচে ফেলতে হয়। বাড়িতে অতিথি এলে যে, ভিজে বেড়ালটির মতন শান্ত হয়ে থাকতে হয়, এটাও তার জানতে বাকি নেই। অবশ্য তাদের বাড়িতে অতিথিদের দেখা পাওয়া যেত খুবই কম; কারণ খুড়িমা মোক্ষদা হচ্ছেন একটি গজগজে ও ঝগড়াটে স্ত্রীলোক। তাঁর বয়স গেছে ষাট পেরিয়ে, আর তিনি মুখ করে থাকেন সর্বদা তেলো-হাঁড়ির মতন।

মোক্ষদা বাড়িতে বেশি লোকজনের আনাগোনা পছন্দ করতেন না। তাঁর নিজের মনের মতন লোক ছিল কেবল দু-তিন জন বুড়ি এবং তারও কারণ তিনি যা বলতেন, তারা তাই বেদবাক্য বলে মেনে নিত! মোক্ষদা কারুর প্রতিবাদ সহ্য করতে পারতেন না। যখন কোনও অসভ্য ও বোকা লোক তাঁর কথায় সায় দিতে রাজি হত না, তখন ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াত বিষম গোলমেলে।

হ্যাঁ, পমির বয়স পুরো ছয় বছর, এইবারে সাতে পড়বে সে।—এটা বড়ো যে-সে কথা নয়। কিন্তু কথাটা যত বড়োই হোক, পমি যখন তার খুড়ির মুখের পানে তাকিয়ে দেখত, তখন এত বড়ো কথাটাও মনে হত যেন নিতান্তই ছোটো। এবং মনে মনে পমির দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই গোটা পৃথিবীর সমস্ত লোকই হচ্ছে তার খুড়িরই মতন।

মোক্ষদা কখনও কখনও সারাদিন ধরেই পমিকে এমন খাটান খাটাতেন যে, সে বেচারা এক মিনিটের জন্যেও হাঁপ ছাড়তে পারত না। অথচ পমি হচ্ছে নাকি তাঁর প্রাণের নিধি! তাকে ভালোবাসতেন বলেই তিনি নাকি তার সমস্ত দোষ আবিষ্কার করতে চাইতেন—

অন্তত মোক্ষদার মনের মতন লোকেরা প্রায়ই এই কথা বলত। (যদুবাবুও এইরকম মত প্রকাশ করতেন। যদুবাবু ভদ্রলোক হলে কী হয়, তিনি ছিলেন পমির চোখের বালি।)

অতএব সবাই যখন বলে যে খুড়ি ভালোবাসতেন বলেই তাকে এত কষ্ট দেন, পমিও তখন কথাটা বিশ্বাস করতে বাধ্য হল। কিন্তু এটা পছন্দ করবার মতন কথা নয়। আর একটা ব্যাপার সে পছন্দ করতে পারত না। তার আদরের মা গিয়েছেন স্বর্গে, অথচ মোক্ষদা সুযোগ পেলেই তাঁর নামে যা তা কথা বলতে কসুর করতেন না।

লোকে বলে বটে তার খুড়ি তাকে ভালোবাসেন। কিন্তু পমির সন্দেহ হয় যে, তার ভালো-মন্দ নিয়ে খুড়ি কোনওদিনই মাথা ঘামাননি। তাদের দুজনেরই মতিগতি একেবারেই আলাদা। যখন তার মেজাজ খুশি থাকে তখনও সে ভয়ে প্রাণ খুলে হাসতে পারত না। তার হাসির শব্দ নাকি একটা গোলমেলে ব্যাপার, শুনলেই মোক্ষদার মাথা ধরে যায়! যখন তার মন চাইত দৌড়তে আর লাফাতে আর ঘাসের উপরে শুয়ে গড়াগড়ি দিতে, তখনও মনের ইচ্ছা তাকে মনেই দমন করে ফেলতে হত, কারণ এসব করা নাকি অসভ্যতা! অসভ্যতা সম্বন্ধে তার খুড়ির ধারণা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট ও নিশ্চিত।

বিন্দু ছিল সে বাড়ির পুরাতন দাসী। আজ কুড়ি বছরের অভ্যাসের পর সে হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন জ্যান্ত পাথরের দেওয়াল, মোক্ষদার সমস্ত বাক্যবাণই তার গায়ে লেগে ফিরে যায়, কোনও আঁচড়ই কাটতে পারে না!

ছোট্ট পমিকে নিয়ে বিন্দু বেশি মাথা ঘামাবার সময় পেত না। ভোর আর রাত ছাড়া পমির সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাৎ হত খুবই কম, কারণ সারাদিনটাই তাকে ঘরের কাজকর্ম নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হত।

কাজেই পমির সামনে সর্বদাই হাজির থাকতেন খুড়ি মোক্ষদাই। তাঁর কাছ থেকে সে কখনও একটি মিষ্টি কথা, বা একটুখানি আদর বা একটিমাত্র চুম্বন উপহার লাভ করেনি। তাই পমির মনে হত, এ দুনিয়ায় তার এমন একটি লোকের দরকার যাকে সে ভালোবাসতে পারে এবং যার কাছ থেকে সে ফিরে পেতে পারে ভালোবাসা।

তার মনের কথা বলবার একটিমাত্র লোক ছিল, সে হচ্ছে বিন্দু। একদিন সকালে বিন্দু বঁটির সামনে বটে কুটনো কুটছে, হঠাৎ সে বলে উঠল, 'কেউ আমাকে ভালোবাসে না।'

কুটনো কুটতে কুটতে বিন্দু মুখ তুলে বললে, 'তুমি ভালোবাসা চাও পমিবাবু? তাহলে যাও, বিয়ে করে একটি বউ নিয়ে এসো।'

পমি ঘাড় হেঁট করে বললে, 'আমি তো বউ আনতে পারব না!'

—'কেন?'

—'আমি যে ভারী ছোট্ট!'

—'বেশ তো, একটি ছোট্ট দেখেই বউ আনো না।'

—'ছোট্ট বউ!' পমি ভাবলে, বিন্দুর বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছুই নেই।

বিন্দু বললে, 'হ্যাঁ, ছোট্ট বউ।'

—'ছোট্ট বউ আবার কোথায় পাব?'

—'কোথায় আবার? রাস্তায়?'

পমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে একবার রান্নাঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে। তারপর বললে, 'কিন্তু একথা শুনলে খুড়িমা কী বলবেন?'

বিন্দু খিলখিল করে হেসে একেবারে লুটিয়ে পড়ল। পমি ভাবলে, নিশ্চয় সে খুব বোকার মতন কথা বলেছে।

বিন্দুও হচ্ছে মোক্ষদার মতন বিষম মোটা, কিন্তু তার মনটি ছিল স্নেহে-মায়ায় পরিপূর্ণ। পমিকে সে বড়ো ভালোবাসত। এই মা-হারা ছোটো ছেলেটিকে সে নিজের ছেলের মতোই আদর-যত্ন করত, বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেত এবং তার মনের দুঃখ ভোলাবার জন্যে চেষ্টারও ত্রুটি করত না। সে যে তাকে ভালোবাসে পমিও একথা বুঝত। কিন্তু সে হচ্ছে কত ছোটো, আর বিন্দু হচ্ছে তার চেয়ে কত বড়ো! তারা দুজনে যেন দুই জগতের জীব। এইজন্যেই পমি খুঁজছে তারই সমবয়সি কোনও মনের দোসরকে।

সেদিন ঘুম ভাঙবার পর থেকেই মোক্ষদার মেজাজটা হয়েছিল বিষম ঝাঁঝালো। দুর্ভাগ্যক্রমে সেইদিনই খুড়ির সামনে দিয়ে একখানি নতুন রঙিন রুমাল নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে কোথায় যাচ্ছিল পমি।

যেই তাকে দেখা মোক্ষদা অমনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'কে তোকে ওটা দিলে?'

পমি ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'কীসের কথা বলছ খুড়িমা?'

—'ওই যেটা তোর হাতে রয়েছে?'

—'এই রুমালের কথা বলছ?'

—'হ্যাঁ, রুমালের কথাই বলছি! তুই কি বুঝতে পারছিস না? আমি কি সংস্কৃত ভাষায় কথা বলছি?'

পমি নতমুখে বললে, 'খুড়িমা, এ রুমালখানা তো তুমিই আমাকে দিয়েছ!'

মোক্ষদা আরও জোরে চিৎকার করে বললেন, 'আমি? তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? আমি তোকে কিছুই দিইনি! কোত্থেকে ওখানা চুরি করলি?'

—'খুড়িমা, আমি তো চুরি করিনি।'

—'যা, এখনই রুমালখানা রেখে আয়! তোর মতন নোংরা ছেলের হাতে সব সময়ে ও রকম রুমাল শোভা পায় না! আজ যদি রবিবার হত তাহলে কোনও কথা ছিল না বটে!'

—'খুড়িমা, আজ তো রবিবার!'

—'না, কখনোই নয়।' গর্জন করে বললেন মোক্ষদা। 'হতভাগা, বাঁদর ছেলে, আজ রবিবার নয়! আমি যদি বলি, আজ রবিবার হলেও রবিবার হবে না!'

পমি মৃদুস্বরে বললে, 'খুড়িমা, আজ তাহলে শনিবার!'

—'না, আজ হচ্ছে সোমবার। আজ যদি সোমবার না হয়, তাহলে আজ মঙ্গলবার হতেও পারে! কিন্তু শনিবার? আজ শনিবার হওয়া অসম্ভব। শনিবার ছিল কাল।'

কাল গিয়েছে শনিবার, আজ তবু রবিবার নয়! ছোট্ট হলেও পমি বুঝলে, এর উপরে আর কোনও কথা বলা চলে না। সে একেবারে চুপ মেরে গেল। কিন্তু সে কথা না বললেও মোক্ষদা ঠান্ডা হলেন না, তখন তাঁর মাথায় চড়েছে রাগ।

ঠিক সেই সময়ে পাশের ঘর থেকে যদুবাবুর গলা পাওয়া গেল।

মোক্ষদা রাগে ফুলতে ফুলতে বললেন, 'ওই হাড়-জ্বালানো লোকটা আবার কী করতে এসেছে?'

পমি বললে, 'খুড়িমা, উনি যে যদুবাবু!'

—'যদুবাবু তো হয়েছে কী! হাড়-জ্বালানো লোক!'

পাশের ঘর থেকে যদুবাবু শুধোলেন, 'আমি কি ভেতরে যাব? আমি কি ভেতরে যাবার হুকুম পাব?'

মোক্ষদা বললেন, 'ভেতরে আসুন।'

যদুবাবু লোকটি যুবক নন, তাঁর দাঁত বাঁধানো, গোঁফে ও মাথার চুলে তিনি কলপ দেন—যদিও তাঁর মাথায় চুল আছে ঠিক গোনা দশগাছি। তাঁর জামাকাপড়ও ধোপদস্ত, ফিটফাট। চোখে সোনার চশমা, হাতে সোনা বাঁধানো লাঠি। যদুবাবু দরজা একটুখানি খুলে ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি কি যেতে পারি? আমি কি ভেতরে যাবার হুকুম পাব?'

মোক্ষদা উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'কী আশ্চর্য! আসুন, ভেতরে আসুন! কতবার এক কথা বলব?'

যদুবাবু বাহির থেকেই বললেন, 'আমার ভয় হচ্ছে, আমি বোধহয় অসময়ে এসে পড়েছি। হয়তো আপনি বিরক্ত হবেন!'

—'হলুমই বা বিরক্ত! আসুন।'

যদুবাবু ভিতরে এসে দাঁড়িয়ে দরজাটি আবার সযত্নে ভেজিয়ে দিলেন!

মোক্ষদা বললেন, 'পাড়ার কোনও নতুন খবর-টবর আছে বুঝি?'

—'তা আছে বইকি! আমি এইমাত্র শুনলুম, ঘোষেদের বাড়ি—' এই পর্যন্ত বলেই পমিকে দেখতে পেয়ে যদুবাবু মুখ বন্ধ করলেন।

মোক্ষদা বললেন, 'ওই খুদে বাঁদরটাকে দেখে আপনি কথা বন্ধ করলেন কেন?'

যদুবাবু বললেন, 'না, ওর এখানে থাকা উচিত নয়।'

মোক্ষদা বললেন, 'পমি, এদিকে আয়।'

পমি কাছে এসে বললে, 'কী খুড়িমা?'

মোক্ষদা আঁচলের বাঁধন খুলে একটি সিকি বার করে বললেন, 'পমি, এখনই চার আনা দিয়ে এক কৌটো জর্দা কিনে নিয়ে আয়। আমি কী জর্দা খাই জানিস তো?'

—'জানি খুড়িমা! পাতি জর্দা।'

—'আচ্ছা, যা। দেখিস, সিকিটা হারিয়ে ফেলিস না যেন!'

পমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে সরে পড়ল। পাছে মোক্ষদা আবার তাকে ডাকেন, সেই ভয়ে সে একবারও আর ফিরে তাকালে না। সিঁড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে নীচের দিকে নেমে গেল, তারপরেই গিয়ে পড়ল একেবারে রাস্তায়। তখন সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল—স্বাধীন, সে স্বাধীন!

॥ দ্বিতীয় ॥

পমি বনমালার নাম শুনলে

মোক্ষদা বলতেন, 'ভদ্রলোকের ছেলের উচিত নয় রাস্তার মাঝখান দিয়ে যাওয়া।' পমি তাই রাস্তায় না নেমে ফুটপাথ ধরে চলতে লাগল। মোক্ষদার উপদেশ সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করত—আহারে-বিহারে সর্বদাই তিনি তার ঘাড়ে চেপে থাকতেন ভূতের মতন। আড়ালে গিয়ে পমি সর্বদাই দেখতে পেত মোক্ষদা যেন তার মুখের পানে কটমট করে তাকিয়ে আছেন!

তাদের বাড়ি থেকে মনিহারির দোকান খুব কাছে ছিল না। গোটা রাস্তাটা আর একখানা সরকারি বাগান পেরিয়ে তবে সেখানে গিয়ে হাজির হওয়া যায়। রাস্তাটা লম্বা বলে পমি খুব খুশি হল। এই ফাঁকে খানিকটা ছুটি পাওয়া যাবে তো।

খুশি হয়ে পমি একবার শিস দিলে, কিন্তু তারপরেই থেমে গেল। মোক্ষদার উপদেশ-বাণী মনে পড়ল—'শিস দেয় খালি ছোটোলোকের ছেলেরা।'

শিস দেওয়া বন্ধ করে সে গান গাইতে শুরু করলে, কিন্তু তখনই তাকে গান থামাতে হল। কারণ মোক্ষদা বলেন—'সভ্য ছেলেরা রাস্তায় কখনও গান গায় না।'

রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে যেন রোদের সোনার জল এবং আকাশ নীলপদ্মের মতন নীল। মন্দিরের চুড়োর উপর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে উড়ে যাচ্ছে চিলের পর চিল। এবং এখানে ওখানে চড়াই পাখিরা ধরেছে চটুল গান।

পমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ এইসব দেখতে লাগল। তারপর রাস্তা থেকে একখণ্ড কাঠ-কয়লা কুড়িয়ে নিয়ে পথের ধারের বাড়ির দেওয়ালগুলোর উপরে লম্বা একটা রেখা টানতে টানতে অগ্রসর হল। হঠাৎ আবার সে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মনে হল, সে যে লিখতে পারে এটা সকলকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। তখন সে আঙুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে একটি পরিষ্কার সাদা দেওয়ালের উপর বড়ো বড়ো হরপে লিখলে—'পমি'। এক বার নয়, দুই বার নয়, অনেক বারই সে লিখলে নিজের নাম।

হঠাৎ তার গালের উপর পড়ল একটা বিষম চড় এবং সঙ্গে সঙ্গে শুনলে, 'হতভাগা ছেলে, ইস্কুলে গিয়ে এই বুঝি তোমার বিদ্যে হয়েছে?'

চমকে পিছন ফিরে পমি যে মূর্তিটাকে দেখলে, তার মনে হল বুঝি মনুমেন্টের মতন লম্বা! পর মুহূর্তে সে আর পিছন দিকে না তাকিয়ে হনহন করে সেখান থেকে সরে পড়ল।

কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতেই ভুলে গেল এই তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। আলো-মাখা আকাশ বড়োই সুন্দর, তার তলায় এমন স্বাধীনভাবে বেড়াবার সুযোগ পাওয়া বড়োই আনন্দকর। এখানে খুড়িমার ধমকও নেই, চোখরাঙানিও নেই।

মনিহারির দোকানে ঢুকে সে বললে, 'খুড়িমার জন্যে চার আনার পাতি জর্দা দিন।'

কেউ জবাব দিলে না। দোকানের কোণে একটি বুড়ো ভদ্রলোক বসেছিলেন, দোকানদার এক মনে তাঁর সঙ্গে কথা কইছিল। পমি চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শুনতে লাগল।

দোকানদার বলছিল, 'সেই ছোট্ট মেয়েটির নাম কী?'

ভদ্রলোক বললেন, 'বনমালা।'

—'মেয়েটি এখন কোথায়?'

—'নিশ্চয়ই পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে।'

—'কেউ কি তাকে আশ্রয় দেয় না?'

—'না।'

—'তার কি আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই?'

—'আছে। কিন্তু তারা তার বোঝা ঘাড়ে চাপাতে চায় না।'

—'কী দুরাত্মা!'

—'তাকে কোনও অনাথ-আশ্রমে পাঠাতে হবে।'

—'কিন্তু কে পাঠাবে?'

—'কে আবার? আমাদেরই ও ভার নিতে হবে।'

—'এখন রাত হলে সে কোথায় ঘুমোয়?'

—'রাস্তার ধারের রোয়াকে।'

দোকানদার মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'আমি তাকে আশ্রয় দিতে পারতুম, কিন্তু আমার যে ছাই বাড়তি ঘর নেই!'

পমি স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে একবার দোকানদারের, আর একবার সেই বুড়োর মুখের পানে তাকাতে লাগল।

এতক্ষণ পরে দোকানদার জিজ্ঞাসা করলে, 'খোকাবাবু, তোমার কী চাই?'

পমি বললে, 'খুড়িমার জন্যে চার আনার পাতি জর্দা দিন।'

—'চার আনার?'

—'হ্যাঁ।'

—'তোমার খুড়িমা কে?'

—'তিনি আমার খুড়িমা।'

—'তিনি কী করেন?'

—'তিনি যদুবাবুর সঙ্গে কথা কইছেন।'

—'না, না, আমি ও কথা জিজ্ঞাসা করছি না! তিনি কী কাজ করেন?'

—'তিনি কোনও কাজ করেন না।'

—'তাহলে তোমার খুড়িমার অনেক টাকা আছে বুঝি?'

—'আমি জানি না।'

দোকানদার আর সেই বুড়ো লোকটি একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল।

—'তোমার নাম কী?'

—'আমার নাম পমি।'

—'তোমার বয়স কত?'

—'ছয়, কিন্তু এইবারে সাত বছরে পড়লুম বলে।'

—'তুমি পড়াশুনো করো তো?'

—'হ্যাঁ। আমি পাঠশালায় পড়তে যাই।'

দোকানদার বললে, 'বেশ, বেশ! আমাকে চার আনা পয়সা দাও। এই নাও তোমার জর্দা।'

পমি দাম দিয়ে ও জর্দা নিয়ে দোকানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে ভাবতে লাগল

'এই বনমালা মেয়েটি কে? সে এখন কোথায় আছে?...বোধহয় তার ভারী খিদে পেয়েছে? তাহলে একথা সত্যি যে দুনিয়ায় এমন সব ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েও আছে যাদের কেউ নেই, না বাবা, না মা,—এমনকি, না খুড়িমা।'

'তাহলে এমন সব গরিব ছেলে-মেয়েও আছে যারা পরে থাকে ছেঁড়া ন্যাকড়া, শুয়ে থাকে পথের ধারে আর মাথার উপর দিয়ে তাদের বয়ে যায় শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা!'

ফুটপাথের পাথরের দিকে তাকিয়ে সে পায়ে পায়ে এগুতে লাগল ধীরে ধীরে। তার সারা মনটি জুড়ে জাগতে লাগল কেবল সেই একটি নাম—বনমালা, বনমালা, বনমালা!

'বনমালা? ও-নামের কোনও ছোট্ট মেয়েকে তো আমি চিনি না! আহা বেচারি, না জানি সে কতই অসুখী! হয়তো সে সারাদিনই ঝরঝর করে কাঁদে, কিন্তু কেউ তাকে কখনও একটি মিষ্টি কথাও বলে না—এমনকি তার খুড়িমাও নেই।'

পমি অনুভব করলে তার বুকের ভিতর থেকে ঠেলে ঠেলে উঠছে একটা দারুণ দুঃখের

ভাব! পমি প্রতিজ্ঞা করলে, সে নিশ্চয় বনমালাকে সাহায্য করবে, নিশ্চয় তাকে খুঁজে বার করবে! কিন্তু সে কোথায় আছে! কোথায় গেলে তার দেখা পাওয়া যাবে?

সে ভাবতে আর ভাবতে লাগল। সোনালি রোদ আর আকাশের নীলিমা আর পাখিদের গান আর তার চোখ-কানের ভিতরে ধরা দিলে না।

কিন্তু যখন সে নিজের বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকল, হঠাৎ বনমালাকে খুঁজে বার করবার একটা উপায় সে আবিষ্কার করে ফেললে। তখন তার মন আনন্দের আবেগে এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল যে, সে একবারও শুনতে পেলে না মোক্ষদা চোখ রাঙিয়ে চিৎকার করে বলছেন, 'জর্দা কিনতে এত দেরি? ওরে, তুই কী বিষম হারামজাদা ছেলে রে, ওরে গতর-খেকো, পাজি, নচ্ছার! তোর মতন হতভাগাকে কেন যে বাড়ি থেকে বিদেয় করে দিইনি সেটা আমি নিজেই বুঝতে পারছি না!'

॥ তৃতীয় ॥

পমি বেরুল বনমালার সন্ধানে

না, মোক্ষদার একটা কথাও সে শুনতে পায়নি। সে জর্দার কৌটোটা খুড়িমার হাতে গুঁজে দিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ে হাজির হল গিয়ে একেবারে রান্নাঘরে।

বিন্দু তখন এক মনে ইলিশ মাছের আঁশ ছাড়াচ্ছিল, পমিকে দেখতে পেলে না।

পমি খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বিন্দু তাকে দেখতে পেয়ে বললে, 'কী গো ফুলবাবুটি, কী মনে করে? খিদে-টিদে পেয়েছে বুঝি?'

পমি ঘাড় নেড়ে বললে, 'না।'

—'তোমার খিদে পায়নি কেন?'

পমি কাঁচুমাচু মুখে বললে, 'আমার দুঃখু হয়েছে।'

—'দুঃখু! কেন?'

—'একটি গরিব মেয়ে উপোস করে আছে।'

—'একটি গরিব মেয়ে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কে সে?'

—'তার নাম বনমালা।'

—'তুমি তাকে চেনো?'

—'না।'

—'তবে তুমি কেমন করে জানলে সে উপোস করে আছে?'

—'কেউ আমাকে বলেছে!'

—'শোনো একবার ছেলের কথা!' পমির দুঃখ বিন্দু আর গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না, হেঁট মুখে ইলিশ মাছটা দুই হাতে বঁটির উপরে তুলে ধরে তার মুণ্ডচ্ছেদ করে ফেললে।

পমি সাহস সঞ্চয় করে আবার বললে, 'আচ্ছা, আমি তাকে খুঁজতে বেরুই।'

—'কাকে?'

—'বনমালাকে।'

—'কোথায় তাকে খুঁজতে যাবে? স্বর্গে?'

—'না, রাস্তায়।'

—'যদি তাকে খুঁজে পাও, তাহলে তুমি কী করবে?'

—'তাকে আমাদের বাড়িতে আনব।'

—'তারপর বোধহয় তাকে উপহার দেবে তোমার খুড়িমার হাতে?'

—'হ্যাঁ।'

—'খাসা বুদ্ধি!' বিন্দু হি হি করে হেসে এমন বেসামাল হয়ে পড়ল যে, তার হাত থেকে মুণ্ডহীন ইলিশ মাছটা খসে পড়ে গেল।

বিন্দুর ব্যবহারে পমি একটু থতমত খেয়ে গেল, বুঝতে পারলে না তার এত হাসির ঘটা কেন? কিন্তু সে এখন বনমালাকে খুঁজে বার করবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাই কিছুমাত্র দমে না গিয়ে বললে, 'এখন চললুম।'

বিন্দু বললে 'আচ্ছা।'

—'খুড়িমা যদি আমাকে খোঁজেন তাহলে তাঁকে বলো যে, তুমি আমাকে বাইরে পাঠিয়েছ।'

—'আচ্ছা।'

—'আসি তাহলে।'

—'এসো।'

পমি জামার দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে শান্ত গম্ভীরভাবে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল!

পথ ধরে খানিক এগিয়ে আবার সেই বাগান। তারপর এ-রাস্তা ও-রাস্তা, এ-গলি ও-গলি, কিন্তু বৃথা! কোথায় বনমালা?

মাঝে মাঝে ভাবে, পথের লোকজনদের ডেকে জিজ্ঞাসা করে, 'মশাই, আপনি কি বনমালাকে দেখেছেন?' কিন্তু তার ভরসা হয় না।

একটা বস্তির ভিতরে ঢুকে দেখা গেল, একখানা চালাঘরের সামনে একটি ছোট্ট মেয়ে মাটির উপরে চুপ করে বসে আছে। পমি তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল এবং তীক্ষ্ণ চোখে

কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার নাম কী?'

ছোট্ট মেয়েটা মুখ তুলে খাপ্পা হয়ে বললে 'আমার নামে তোর কী দরকার?'

—'তোমার নাম কি বনমালা?'

—'বাঁদরমুখো ছেলে, চলে যা এখান থেকে!'

পমি সুড়সুড় করে আবার এগিয়ে চলল। একটু এগিয়ে দেখলে, পথের ধারের একটা জলের কলের সামনে তিনটি ছেলে খেলা করছে। সে তফাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনতে শুনতে ভাবতে লাগল, তারা যা বলছে, খুড়িমা একবার যদি শুনতে পান তাহলে কী ভয়ানক ব্যাপারই হবে!

তারপর সে আস্তে আস্তে যেই অগ্রসর হল অমনি একটি ছেলে তাকে ডেকে বললে, 'ওহে খুদ-কুড়োবাবু, নতুন দেশ দেখতে চাও?'

পমি দাঁড়িয়ে পড়ল। তারা যে তাকেই ডাকছে সেটা সে বুঝতে পারলে না, কারণ তার নাম খুদ-কুড়োবাবু নয়। খানিকক্ষণ বিস্ফারিত চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে সে আবার এগুবার উপক্রম করলে।

কিন্তু ছেলেটি আবার বললে, 'ওহে, তুমি কি একবার উঁকি মেরে নতুন দেশ দেখবে?'

—'সে আবার কী?'

—'বলি, দেখতে চাও? বলো হ্যাঁ, কি না।'

—'আমি কী দেখব?'

—'তুমি দেখবে দিল্লি আর মক্কা, যমরাজার দরবার, ইন্দ্রপুরীর ম্যাপ, দ্যাখনহাসি ডাইনি বুড়ি, মৎস্যরানির নাচ আর ক্রিস্টোফার কলম্বাসের ফটো!'

পমি আগেও বুঝতে পারেনি, এখনও কিছু বুঝতে পারলে না।

ছেলে তিনটে হেসে গড়িয়ে পড়ল। সবচেয়ে বড়ো ছেলেটা বললে, 'এদিকে এসো। ব্যাপার কী? তুমি কি ভয় পেয়েছ?'

—'না, ভয় পাইনি।'

—'তবে তুমি কাছে আসছ না কেন?'

—'এই তো আমি এসেছি।'

ছেলে তিনটে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। একজন বললে, 'তাহলে তুমি নতুন দেশ দেখতে চাও?'

পমি খানিকক্ষণ চুপ মেরে দাঁড়িয়ে থেকে কী ভাবলে, তারপর বললে, 'আমায় কী দিতে হবে?'

—'একটা বোতাম।'

—'আমার কাছে তো বোতাম নেই!'

—'তার মানে?'

—'আমার পকেটে বোতাম নেই।'

—'তোমার সার্ট আর কোটের উপর ওগুলো কী রয়েছে?'

—'তুমি কি এই বোতামই নেবে?'

—'হ্যাঁ, নেবই তো!'

—'তারপর আমায় কী করতে হবে?'

—'কিছুই করতে হবে না। কেবল চোখ চেয়ে নতুন দেশ দেখবে আর কী?'

পমি আর কিছু না বলে নিজের জামার উপর থেকে একটা বোতাম ছিঁড়ে নিয়ে সবচেয়ে বড়ো ছেলেটার হাতে সমর্পণ করলে।

ছেলে তিনটে হাতের আর চোখের ইশারায় নিজেদের ভিতরে কী একটা পরামর্শ করে নিলে। তারপর বড়ো ছেলেটা বললে, 'পাইপটা কোথায় গেল?'

—'এই যে', বলে আর একটা ছেলে একটা টিনের মোটা হাত তিনেক লম্বা নল নিয়ে তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে এল।

বড়ো ছেলেটা বললে, 'এই যন্ত্রটা আমরা আবিষ্কার করেছি কিন্তু কী করে এই যন্ত্রটা চালাতে হয়, তা আমরা কারুকে দেখাই না। ওহে খুদ-কুড়োবাবু, এই নলটা থাকবে তোমার ঠিক নাক আর মুখের উপর। তোমাকে আপাতত চোখ বুজে থাকতে হবে। তারপর আমি ডাকলেই তুমি আবার চোখ খুলবে আর সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাবে নতুন দেশ। বুঝেছ?'

পমি ঘাড় নেড়ে বললে, 'হুঁ। তুমি যা যা বলেছ, সব দেখতে পাব তো?'

—'আলবত! তার চেয়ে আরও অনেক বেশি কিছু দেখবে। তুমি কখনও সমুদ্র দেখেছ?'

—'না।'

—'আচ্ছা, তোমাকে আমরা তাও দেখাব। এখন ফিরে দাঁড়াও, চোখ বন্ধ করো।'

—'চোখ বন্ধ করেছি।'

—'কথা কোয়ো না!'

—'আমি তো কথা কইনি।'

—'নিশ্বাস ফেলো না।'

দুই চোখ মুদে, শ্বাস বন্ধ করে পমি বোবার মতন দাঁড়িয়ে রইল। সেই অবস্থায় আশেপাশে শুনতে পেলে ফিসফিস করে কথা আর চাপা হাসির শব্দ। আর শুনতে পেলে, কাছেই কোথায় ডাকছে চার-পাঁচটা চড়াই পাখি কিচির-মিচির করে। খানিক দূরে কোথায় যেন একটা দরজা বা জানালা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল।

তার কানের কাছে কে বললে, 'এইবারে নতুন দেশের খেলা শুরু হবে।' তারপরেই সে শুনতে পেলে যেন একটা ঘড়ার ভিতর থেকে ভকভক করে জল বেরিয়ে আসছে।

আবার কে বললে, 'দ্যাখো, দ্যাখো, নলের ভেতরে এসেছেন যমরাজা নিজে।'

এমন কাণ্ড যে হতে পারে, পমি কখনও তা ধারণায় আনতে পারেনি। তার সারা গায়ে

কাঁটা দিলে। হঠাৎ নলের একটা মুখ কে তার মুখের উপরে চেপে ধরে বললে, 'এই দ্যাখো নতুন দেশ! চেয়ে দ্যাখো।'

কিন্তু পমি চোখ খোলবার আগেই তার নাক-মুখের ভিতরে হুড় হুড় করে জলের ধারা এসে পড়ল বিষম তোড়ে! তার নাক মুখ চোখ সমস্ত জলে জলে ভরে উঠল এবং জামা-কাপড় পর্যন্ত একেবারে ভিজে গেল।

তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এসে দুই হাতে চোখ মুছে সে চারিদিকে হতভম্বের মতো তাকিয়ে দেখলে, কিন্তু তিনটে ছেলের একটাও সেখানে নেই।

খানিকক্ষণ সে কাঁদো কাঁদো মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বুঝল ছেলেগুলো তাকে নিষ্ঠুরভাবে ঠকিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। তারপর আবার গুটি গুটি এগুতে লাগল। তার জামার একটা বোতাম কমে গেল বটে, কিন্তু তার বুদ্ধি আর একটু বাড়ল।

॥ চতুর্থ ॥

পমি জামা-কাপড় হারালে

পমি নিজের মনেই এগিয়ে চলেছে! আর তার চোখ দিয়ে তখনও ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা জল।

হঠাৎ শুনলে কে বলছে, 'তুমি কাঁদছ কেন খোকাবাবু?'

পমি ফিরে দেখলে, একখানা বাড়ির দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে বারো-তেরো বছরের একটি সুন্দর মেয়ে। পমি তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ভালো করে তার দিকে তাকিয়ে দেখলে।

'তোমার কী হয়েছে খোকাবাবু? তুমি কি পথ হারিয়েছ?'

—'না।'

—'তুমি কোথায় থাকো?'

পমি নিজের ঠিকানা বললে।

—'তুমি একলা পথে বেরিয়েছ কেন?'

—'আমি বনমালাকে খুঁজছি।'

—'বনমালা কে? তোমার বোন?'

—'না। একটি ছোট্ট মেয়ে। সে যে কে তা আমি জানি না।'

—'তুমি একটি ছোট্ট মেয়েকে খুঁজছ, কিন্তু তাকে চেনো না?'

—'না।'

—'তবে তুমি তাকে কেমন করে খুঁজে বার করবে?'

—'আমি জানি না।'

—'খোকাবাবু, তুমি তো ভারী মজার ছেলে দেখছি! তা তুমি বনমালাকে খুঁজছ কেন?'

—'তার যে মা নেই, বাবা নেই, আর সে যে উপোস করে থাকে।'

—'তোমার বাবা-মা কেমন করে তোমাকে একলা পথে ছেড়ে দিলেন?'

—'আমি বিন্দুকে বলে এসেছি।'

—'বিন্দু কে?'

—'আমাদের ঝি।'

—'কিন্তু তোমার মা শুনলে কী বলবেন?'

—'আমার মা নেই! আমার খালি খুড়িমা আছেন!'

—'আহা!'

—'আমার নাম পমি।'

—'আহা, বেচারা পমিবাবু!' মেয়েটি মমতা-ভরা চোখে পমির দিকে তাকিয়ে রইল।

পমি বললে, 'আজ তবে আসি?'

—'তুমি কোথায় যাবে?'

—'কোথায় যাব, জানি না!'

—'সন্ধের আগে বাড়ি ফিরে যেয়ো। তোমার জামা-কাপড় ভিজে কেন? তুমি কী করছিলে?'

—'নতুন দেশ দেখছিলুম।' বলেই পমি আবার কেঁদে ফেললে। তার কথা কিছুই বুঝতে না পেরে মেয়েটি হেসে ফেললে। পমি আর সেখানে দাঁড়াল না।

পমি আবার ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল। হাওয়ায় আর রোদের তাতে তার জামা-কাপড় আবার শুকিয়ে এল এবং খানিকক্ষণ পরে সে-ও ভুলে গেল তার নতুন দেশ দেখার দুঃস্বপ্ন।

সাত-আট বছরের তিনটি মেয়ে বোধহয় ইস্কুল থেকে ফিরে আসছে! তাদের এক হাতে বইয়ের গোছা, আর এক হাতে লজেঞ্জুসের লাঠি। তারা আসছে হাসতে হাসতে, নাচতে নাচতে আর গাইতে গাইতে—ঠিক যেন তিনটি চলন্ত আনন্দের ফোয়ারা। তারা যে বড়োলোকের মেয়ে নয়, এটা তাদের জামা-কাপড় আর জুতো দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু সেজন্যে তাদের দুঃখ নেই কারণ তারা গলা ছেড়ে গান গাইছিল—

চু রে রাং চাং! সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে ঠ্যাং,
কাঁপিয়ে মাটি পুকুর পাড়ের, ধরব খালি কোলা-ব্যাং!
দেখব কে আর তাদের বাঁচায়,
রাখব পুরে লোহার খাঁচায়,

সন্ধে হলে কণ্ঠ ছেড়ে গাইবে তারা গ্যাঙর-গ্যাং?

পমি দাঁড়িয়ে পড়ে গান শুনতে লাগল। মেয়ে তিনটি গাইতে গাইতে আরও কাছে এগিয়ে এল—

উনুন, কড়া দরকার ভারী,
রাঁধব ব্যাঙের কোর্মা-কারি,—
খবর পেয়ে আসবে যখন চিন-মুলুকের চুচুং-চ্যাং!

গান ফুরুতেই তারা সকৌতুকে এত জোরে হেসে উঠল যে, শুনলে পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃখী, হতভাগ্যের মুখেও ফুটে উঠবে অট্টহাসির হইহই। এমনকি, পমিও না হেসে পারলে না। এবং সে-ও এইমাত্র শোনা গানের দুটো লাইন আবৃত্তি করে গেল—

চু রে রাং চাং! সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে ঠ্যাং,
কাঁপিয়ে মাটি পুকুর পাড়ের, ধরব খালি কোলা ব্যাং!

তার উচিত ছিল গানের লাইন দুটি উচ্চারণ না করা। কারণ তার মুখে সেই গান শুনেই মেয়ে তিনটি থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল, এবং তার দিকে তাকিয়ে রইল ঘৃণাভরা চোখে।

একটি মেয়ে বললে, 'আমাদের গান গাইছিস, তুই কে রে ছোঁড়া? আমরা তোকে চিনি না! যা, নিজেদের দলে গিয়ে ভিড়গে যা।'

পমি অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করলে। নিজের জন্য নয়, সে লজ্জা পেলে ওইটুকু মেয়ের মুখে অমনধারা কথা শুনে। জিজ্ঞাসা করলে, 'আমি কী দোষ করেছি?'

—'যা, যা! নিজের চরকায় তেল দিগে যা, আমাদের আর জ্বালাতে হবে না!'

মেয়ে তিনটি রেগে কটমট করে তার পানে তাকালে। একটি মেয়ে বললে, 'ভারী যে কথা শিখেছিস দেখছি! অত কথা কে তোকে শেখালে?'

এইবারে পমির মনে একটু একটু করে রাগ বাড়তে লাগল। সে বললে, 'তোমরা কার কাছ থেকে কথা কইতে শিখেছ?'

—'যে সব ছোঁড়াকে চিনি না, তাদের সঙ্গে আমি কথা কই না।'

পমি উপদেশ দিলে, 'বেশ, তাদের সঙ্গে কথা কোয়ো না।'

—'আমার যা খুশি তাই করব, তুই হচ্ছিস পাজির পা-ঝাড়া ছেলে!'

—'আর তুমি হচ্ছ একটি মস্ত বোকা মেয়ে!'

—'আর তুই হচ্ছিস একটা ল্যাজ-কাটা গাধা!'

পমি মুখ রাঙা করে বললে, 'ভালো চাও তো এখান থেকে সরে পড়ো। আমি মেয়েদের সঙ্গে লড়াই করতে চাই না।'

একটি মেয়ে বললে, 'আ হা হা, দুধের খোকা, উনি মেয়েদের সঙ্গে লড়বেন না!'

আর একটি মেয়ে বললে, 'সরে পড়ো খোকা, চটপট সরে পড়ো!'

পমি মাথা নেড়ে দৃঢ়স্বরে বললে, 'না, আমি এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকব।'

মেয়ে তিনটি তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে পমির উপরে বাঘের বাচ্চার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। পমিও হটবার পাত্র নয়, সে-ও প্রাণপণে ঘুসি বাগিয়ে যুঝতে লাগল। হঠাৎ এই হইচই দেখে একটা পেয়ারা গাছের উপরে তিন-চারটে কাক 'কা' 'কা' রবে চিৎকার জুড়ে দিলে।

পমির অবস্থা যখন রীতিমতো কাহিল হয়ে এসেছে, সেই সময়ে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হল একটি বৃদ্ধা নারী। তার ধমক খেয়েই দুর্দান্ত মেয়ে তিনটে পাঁই পাঁই করে পালিয়ে গেল। এবং তার কাছ থেকে আর এক ধমক খেয়ে পমিও তাড়াতাড়ি নিজের পথ ধরলে।

পমির তখন অতিশয় দুরবস্থা। তার মুখে গলায় ও হাতে লম্বা লম্বা আঁচড়ের রক্তাক্ত দাগ এবং তার নাক দিয়েও পড়ছে রক্ত। কিন্তু এসব সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না, যে কাজে বেরিয়েছে সে কাজ আগে শেষ করা চাই! হাজার বিপদ এলেও সে আর পিছপাও হতে রাজি নয়। দু-একটা রাস্তা পেরিয়েই সে আবার ভুলে গেল সমস্ত দুর্ঘটনার স্মৃতি।

আর কিছুক্ষণ পরেই পৃথিবীর বুকের উপরে ঘনিয়ে আসবে সন্ধ্যার ছায়া। কিন্তু তবু বাড়ি ফেরবার কথা তার মনে হল না।

বনমালা! বনমালাকে না নিয়ে সে আর ঘরে ফিরবে না। যদি সন্ধ্যা নামে, রাত হয়, রাত পুইয়ে যায়, তবু বনমালাকে না পেলে সে বাড়ির কথা ভাববে না।

পমি অনেক রূপকথা শুনেছে। সে জানে রাজার ছেলে চোখে না দেখেই অজানা রাজকুমারীর সন্ধানে ঘোড়ায় চড়ে পথে বেরিয়ে পড়ে, কত পথ, কত তেপান্তর, কত গহন বন আর নদী পাহাড় পেরিয়ে চলে রাজার ছেলে, এগিয়ে চলে। তারপর ঘুমন্ত রাজকন্যাকে খুঁজে পায় কোনও রক্ষোপুরীর অন্তঃপুরে।

পমির মনে হল, রাজার ছেলে যদি অজানা রাজকুমারীর খোঁজে দিনের পর মাস, মাসের পর বছর কাটিয়ে দিতে পারে, তবে অভাগিনী বনমালার জন্যে সে কী আর একটা রাতও বাইরে কাটাতে পারবে না?

পমি চলেছে তো চলেছেই। মাঝে মাঝে দু-একটি ছোটো মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু তাদের কারুর নাম বনমালা কি না, একথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস আর তার হয় না। তাদের কেউ বনমালা কি না জানবার জন্যে সে বুদ্ধি খাটিয়ে আর এক উপায় অবলম্বন করলে। নতুন কোনও মেয়ে দেখলেই খানিকক্ষণ তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে, তারপর তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে যেন কোনও অদৃশ্য মেয়ের উদ্দেশ্যেই সে চেঁচিয়ে ডাকে—'বনমালা! ও বনমালা!'

কিন্তু এই নতুন উপায়ও কাজে লাগল না। কারণ কোনও মেয়েই স্বীকার করলে না যে, তার নাম বনমালা। বার দশেক এই নতুন উপায়টি অবলম্বন করে শেষটা সে হতাশ হয়ে পড়ল।

এখন সে শহরের বাইরে এসে পড়েছে। আরও কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখলে, ছোট্ট একটি আঁকাবাঁকা নদী বয়ে যাচ্ছে কুল কুল গান গাইতে গাইতে। দুই পাশে তার সবজে

ঘাসের সতরঞ্চ পাতা, মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়, আর মাঝে মাঝে মস্ত মস্ত সবুজ ছাতার মতন বড়ো বড়ো গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে, পায়ের তলায় মিষ্টি ছায়া ফেলে। নীল আকাশের ভাঙা ভাঙা মেঘে আগুন জ্বালিয়ে সূর্য তখন পাটে বসছে।

জায়গাটি পমির ভারী ভালো লাগল। অন্তত পাঁচ ঘণ্টা ধরে সে টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে পথে। তার উপরে সারাদিন খাওয়া-দাওয়া হয়নি, তার শরীর ক্রমে এলিয়ে আসছে, পা আর চলতে চাইছে না! নদীর ধারে গাছের তলায় নরম ঘাসের উপরে বসে সে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করবে বলে মনে করলে। বসবার পর তার মনে হল একটুখানি শুয়ে নিলেও মন্দ হয় না। শুয়ে শুয়ে তাকিয়ে সে দেখতে লাগল, গাছের সবুজ পাতার ফাঁকগুলো দিয়ে দেখা যাচ্ছে আলো-মাখানো টুকরো টুকরো নীল আকাশ। তার কানের কাছে বাজছে কোনও এক গানের পাখির বেলা শেষের সুর।...আর শোনা যাচ্ছে, পাতাদের সঙ্গে বাতাসের কানাকানি আর নদীর একটানা ছলাৎ ছলাৎ ছন্দ। নিজের অজান্তে কখন সে ঘুমিয়ে পড়ল।

যখন ঘুম ভাঙল পমি চোখ চেয়ে দেখলে খালি অন্ধকার। সে চমকে তাড়াতাড়ি উঠে বসল, কিন্তু তখনও অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলে না, যদিও অনুভব করলে আর একটা ব্যাপার। সভয়ে সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে সে বুঝতে পারলে, তার পায়ে জুতো নেই, পরনে কাপড় নেই, গায়ে সার্টের উপরে কোটটাও নেই! আঁধারে চারিদিক হাতড়েও সে হারানো জিনিসগুলো খুঁজে পেলে না। যখন ঘুমোচ্ছিল তখন নিশ্চয়ই কোনও চোর এসে তার সব জিনিস চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে।

রাত হয়েছে। কিন্তু কত রাত? তাও আন্দাজ করা গেল না। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল, কেন সে বোকার মতন ঘুমিয়ে পড়েছিল? ভয়ে পমি বনমালার কথাও একেবারে ভুলে গেল, নিজের কী হবে তাই ভেবেই অস্থির হয়ে উঠল। এই রাতে, এই নদীর ধারে, এই গাছের তলায়, এই অন্ধকারে সে তো সকাল পর্যন্ত বসে থাকতেও পারবে না, আর এমন ল্যাংটো হয়ে তার পক্ষে এখন লোকালয়ে মুখ দেখানোও অসম্ভব। পমি দেখেছে, ল্যাংটো হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায় খালি পাগলরা। লোকে কি তাকেও শেষটা পাগল বলেই মনে করবে?

তা করে করুক! এখানে সকাল পর্যন্ত বসে থাকার কথা মনে হতেই তার বুকটা দুদ্দুড় করে উঠল। না, যেমন করে হোক, এখান থেকে বেরিয়ে পড়তেই হবে! যত রাত বাড়ছে তত শীত বাড়ছে! পমি ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল—যেন তার হাড়ের ভিতর পর্যন্ত ঢুকে পড়েছে ঠান্ডা কনকনে হাওয়া! সে মনে মনে বললে, 'বাইরে বেরুলে যদি কেউ আমাকে ল্যাংটো দেখে অবাক হয় তাহলে আমি বলব—'মশাই, আমি পাগল নই। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করবেন, কারণ চোরে আমার এই অবস্থা করেছে, আমি নিরুপায়।'

সে আস্তে আস্তে কয়েক পদ অগ্রসর হল। কিন্তু কোন দিকে যাবে? অন্ধকারে পথ যে দেখা যায় না! তার বাড়ি ফেরবার পথ কোথায়? পমির মনে হল, এই তারার চুমকি বসানো

কালো আকাশের তলায় সে যেন একটি ছোট্ট ঝিঁঝি-পোকা! তফাত খালি এই, ঝোপে-ঝাপে ঝিঁঝিপোকাদেরও বাসা থাকে, তার কিছুই নেই!

তার নরম খালি পায়ে পট পট করে কাঁকর ও কাঁটা বিঁধতে লাগল, কিন্তু তাও সে খেয়ালে আনলে না।

আচম্বিতে সে সভয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকারেরও চেয়ে কালো মস্ত-একটা চলন্ত ছায়া! কী ওটা? গোরু, না মোষ, না বাঘ, না ভালুক? এই শীতেও সে ঘেমে উঠল। জানোয়ারটা কি তাকে দেখতে পেয়েছে! এখনই হালুম করে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে?

সে জুল জুল করে চারিদিকে তাকাতে লাগল। আকাশে কালো, পৃথিবীতে কালো, নদীর বুকেও কালো—সমস্তই অদৃশ্য হয়ে গেছে কালিমার জঠরে। তার উপরে কালিমারও চেয়ে কালো এই চলন্ত ছায়াটা! বাঁচবার আর কোনও উপায় নেই।

পমির কণ্ঠের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা করুণ কান্না। এই বয়সেই সুমুখে দেখলে সে মৃত্যুকে।

॥ পঞ্চম ॥

পমি একজনের দেখা পেলে

কিন্তু চলন্ত ছায়াটা পমির দিকে না এসে অন্যদিকে চলে গেল।

আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে আবার অগ্রসর হল। দূর থেকে ভেসে এল একখানা রেলগাড়ির শব্দ। তাই শুনে বাড়ল তার সাহস।

একটা আলো দেখা গেল—সরকারি ল্যাম্পের আলো। তাহলে নিশ্চয় ওখানে পথ আছে! পমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দেখলে যে, তার অনুমান সত্য। পথের ধারে জ্বলছে সেই আলোটা। এতক্ষণ সে ছিল অন্ধ, এইবারে দৃষ্টি ফিরিয়ে পেয়ে তার মন হল কতকটা শান্ত।

কিন্তু পথটা চিনতে পারলে না। এ পথ যদি তার বাড়ির দিকে না গিয়ে থাকে? এ পথ যদি তাকে নিয়ে যায় আরও অজানা, আরও ভয়াবহ কোন দেশে?

এ আবার নতুন দুর্ভাবনা! শীতে কাঁপতে কাঁপতে অত্যন্ত দুঃখিতভাবে পমি দাঁড়িয়ে রইল নাচারের মতো। আবার সে কেঁদে ফেললে।

হঠাৎ অত্যন্ত মিষ্টি ও মিহি-গলায় কে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী হয়েছে খোকন!'

জবাব না দিয়ে পমি কাঁদতে লাগল।

—'খোকন, এই শীতে ল্যাংটো হয়ে তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন?'

পমির কান্না থামে না, আরও বাড়ে।

—'কেউ কি তোমাকে মেরেছে?'

—'না।'

—'তোমার কি শীত করছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'বড্ড শীত করছে, না?

—'হ্যাঁ, বড্ড!'

—'তোমার জামাকাপড় কোথায় গেল?'

—'চোরে চুরি করেছে।'

—'কেমন করে?'

—'আমি নদীর ধারে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। সেই সময়ে জামাকাপড় চুরি গিয়েছে।'

—'চোরেরা কী নির্দয়! তোমার ঠিকানা কী?'

পমি নিজের ঠিকানা বললে।

—'চলো, তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি। দাঁড়াও, আগে আমার এই র‍্যাপারখানি গায়ে জড়িয়ে নাও। এই র‍্যাপারখানি ছাড়া আমার আর কোনও সম্বল নেই।'

নিজেকে ল্যাংটো জেনে পমি এতক্ষণ লজ্জায় তার দিকে তাকায়নি। এখন সে দেখলে, তার গায়ে নিজের র‍্যাপার খুলে জড়িয়ে দিচ্ছে একটি মেয়ে। পমির চেয়ে মেয়েটি একটু বড়ো। তার গায়ে একটি ছেঁড়া ও মলিন জামা। তার মুখ ও দেহ ক্ষীণ। কিন্তু তার ডাগর চোখ দুটি দয়া-মায়া-মমতায় ভরা। মেয়েটির এলানো চুলগুলি তার বুক-কাঁধ-মুখের উপরে এসে পড়েছে।

তারা আস্তে আস্তে এগুতে লাগল। ক্রমে তারা শহরের ভিতরে প্রবেশ করলে।

পমির মন এখন নিশ্চিন্ত। সে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

—'তোমার বাড়িতে।'

—'তারপর তুমি কোথায় যাবে?'

—মেয়েটি জবাব দিলে না।

—'তুমি কোথায় থাকো?'

—'সব জায়গায়।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেয়েটি বললে।

পমি এ কথার মানে বুঝতে পারলে না। মেয়েটির মুখের পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'সব জায়গায় কি কারুর বাড়ি থাকতে পারে?'

মেয়েটি হেসে বললে, 'আমার বাড়ি হচ্ছে এই পৃথিবী।'

এ কথারও মানে হয় না। কিন্তু পাছে মেয়েটি তাকে বকে সেই ভয়ে সে আর মানে

জিজ্ঞাসা করলে না। সে বললে, 'তুমি কি সেখানে একলা থাকো?'

—'না। আমার অনেক সাথি আছে।'

—'কে তারা?'

—'যেসব ছেলেমেয়ে আমার মতন একলা।'

পমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'দুনিয়ায় তুমি একলা?'

—'হ্যাঁ ভাই।'

—'তোমার কেউ নেই—একেবারে কেউ নেই?'

—'না, আমার কেউ নেই।'

পমি গম্ভীর মুখে ভাবতে লাগল। তারপর হঠাৎ শুধোলে, তাহলে তুমি কী করো?'

—'কী করি মানে?'

—'তুমি কেমন করে খাবার পাও?'

—'আমি ভিক্ষে করি।'

—'অ্যাঁ!' পমি পয়সা বার করবার জন্যে পকেটে হাত দিতে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার হুঁস হল যে, সে এখন উলঙ্গ। বললে, 'আহা, বেচারি!' এবং সঙ্গে সঙ্গে তার স্মরণ হল যে, কার খোঁজে আজ বেরিয়েছে সে। বললে, 'আচ্ছা, তুমি তাহলে নিশ্চয়ই বনমালাকে চেনো?'

আবার একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেয়েটি বললে, 'বোধহয় চিনি।'

—'সে কোথায় থাকে? আমি আজ সারাদিন তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

—'কেন?'

—'আমি তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাই। বিন্দু সব জানে।'

—'তোমার বাড়িতে? কেন?'

—'আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকব।'

মেয়েটি পমির হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে চাপ দিলে, কিন্তু মুখে কিছু বললে না। তারা আবার চলতে লাগল, এবার আরও তাড়াতাড়ি।

পমি বললে, 'আজ আমি সারাদিন কিছু খাইনি।'

—'সে কী! কেন?'

—'কেন জানো? আমি যে বনমালার জন্যে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু তবু তার দেখা পেলুম না!'

মেয়েটি অতি মৃদুস্বরে বললে, 'না ভাই, তুমি তাকে দেখতে পেয়েছ।'

—'দেখতে পেয়েছি? কোথায়?'

—'নদীর ধারে।'

—'কই, আমি দেখিনি তো!'

—'হ্যাঁ দেখেছ। তুমি তাকে দেখেছ, তুমি তার সঙ্গে কথা কয়েছ।'

—'না আমি দেখিনি।'

—'হ্যাঁ তুমি দেখেছ! তুমি তাকে দেখেছ, তুমি তার সঙ্গে কথা কয়েছ আর বনমালাও তোমাকে ভারী ভালোবাসে!'

পমি একটা পা এগিয়ে ফেলতে গিয়ে বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'সে আমাকে ভালোবাসে?'

—'হ্যাঁ। সে তোমাকে ভালোবাসে, তুমি যে বড়ো ভালো ছেলে!'

—'কে তোমাকে বললে সে আমাকে ভালোবাসে?'

—'সে নিজে বলেছে।'

তারপর মেয়েটি হেঁট হয়ে দুই হাতে পমিকে ধরে অতি কষ্টে মাটি থেকে উপরে তুললে; এবং পমির মুখের সামনে নিজের মুখ এবং তার চোখের সামনে নিজের চোখ রেখে বললে, 'তুমি কী বুঝতে পারছ না, আমারই নাম বনমালা?'

—'তুমি?' বলেই পমি ভাবলে, সে বোধহয় স্বপ্ন দেখছে!

কিন্তু তারপর যখন দেখলে যে, অভাগিনী বনমালার ডাগর দুটি চোখ ভরে উঠেছে অশ্রুজলে, তখন সে নিজের মুখ বাড়িয়ে তার মুখে দিলে চুমু। বনমালা তাকে আবার নামিয়ে দিলে। তারপর তারা আবার পথ চলতে লাগল, কিন্তু কারুর মুখে কোনও কথা নেই। তাদের গতি ক্রমেই দ্রুত হয়ে উঠতে লাগল এবং অবশেষে তারা একটি অন্ধকার রাস্তার ভিতর এসে ঢুকল; তারপর তারা একখানি নিস্তব্ধ বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বনমালা জিজ্ঞাসা করলে, 'এই কি তোমাদের বাড়ি?'

পমি বললে, 'হ্যাঁ।'

বনমালা দরজার কড়া ধরে নাড়া দিলে।

॥ ষষ্ঠ ॥

মোক্ষদার হাত থেকে পমিকে বাঁচাবার জন্যে বিন্দুর প্রচেষ্টা

মৌন-রাত্রির মাঝখানে কড়ার শব্দ যেই বেজে উঠল, অমনি বাড়ির ভিতর থেকে জেগে উঠল একটা অত্যন্ত কর্কশ চিৎকার—সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট পমির দেহ হয়ে গেল যেন আরও ছোট্ট।

সে ফিসফিস করে বললে, 'আমার খুড়িমার গলা!'

বনমালা জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার খুড়িমার কী হয়েছে?

—'তার মেজাজ ভালো নেই।'

—'তুমি এত রাতে বাড়ি ফিরছ বলে বুঝি?'

—'না, তিনি সব সময়েই ওই রকম।' বলেই পমি যেখানটায় অন্ধকার সবচেয়ে বেশি ঘন সেইখানে পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল।

বাড়ির ভিতর থেকে দরজা খুলেই বিন্দু জিজ্ঞাসা করলে, 'কে ডাকে।'

পমি গলা নামিয়ে বললে, 'আমি পমি।'

—'পমি?'

—'হ্যাঁ।'

—'ওমা, অবাক!' বিন্দু বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল। হাতের লণ্ঠনটা উপরে তুলে পমিকে দেখতে পেয়ে বললে, 'হুঁ, এতক্ষণ কোথায় থাকা হয়েছিল?'

—'আমি বনমালাকে খুঁজছিলুম।'

—'ও! বেশ, এখন তোমার খুড়ির কাছে জবাবদিহি করবে এসো। মজাটা আজ টের পাবে!'

—'কিন্তু আমি কী দোষ করেছি?'

—'তুমি কী দোষ করেছ? সেই কোন সকালে বেরিয়েছ, আর ফিরে এলে এই রাতে? এটা দোষ নয়? সবাইকে যে এত ভাবিয়ে মারলে, এটাও দোষ নয়?'

—'কিন্তু তুমিই তো আমাকে যেতে বললে!'

—'বা রে ছেলে বা! শেষটা আমার ঘাড়েই সব দোষ চাপাবার চেষ্টায় আছ!'

—'সত্যি বলছি বিন্দু, আমি বনমালাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম!'

—'বনমালা, বনমালা, বনমালা! শুনে শুনে কানঝালাপালা হয়ে গেল বাছা! এখন ভেতরে এসো, সারাদিন অন্ন জোটেনি তো?'

বাড়ির ভিতর থেকে মোক্ষদার ক্রুদ্ধ কণ্ঠে শোনা গেল—'বিন্দি! সদরে দাঁড়িয়ে অতক্ষণ কী করছিস তুই? কে এসেছে?'

বিন্দু চেঁচিয়ে বললে, 'এই যে মা, যাচ্ছি!' তারপর গলা নামিয়ে ফিরে বললে, 'শুনছ তো পমিবাবু, তোমার খুড়িটিকে চেনো তো? এখন চটপট ভেতরে ঢুকে পড়ো!'

কিন্তু পমি তবু নড়ল না। এইবারে বিন্দু ধৈর্য হারিয়ে বলে উঠল, 'বলি, তুমি ভেতরে আসবে কি আসবে না?'

এতক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করে পমি বললে, 'আমি যাচ্ছি। কিন্তু বনমালা এসেছে যে।'

বিন্দু সচমকে বললে, 'কে?'

—'বনমালা।'

বিন্দু লণ্ঠনটা আবার তার মাথার উপরে তুলে ধরে এদিকে-ওদিকে তাকাতে লাগল, তারপর দেখতে পেলে এককোণে দেওয়ালে পিঠ রেখে একটি ছোট্ট মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—ঠিক যেন কলে-পড়া একটি ভীত নেংটি ইঁদুরের মতো। সে বললে, 'ও কে?'

—'ওই তো বনমালা!'

—'ওমা, অবাক!'

—'আমি ওকে খুঁজে পেয়ে তোমার কাছে এনেছি। ও আমাকে ভালোবাসে কিনা!'

বিন্দু গলা চড়িয়ে বললে, 'তুমি খেপে গিয়েছ।'

—'কেন?'

—'তুমি ভেবেছ কি? তুমি কি ভেবেছ পথ থেকে যাকে পাবে, তাকেই কুড়িয়ে নিয়ে আসবে?'

এই কথা শুনেই অভাগিনী বনমালা দেওয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে পায়ে পায়ে এগিয়ে অন্ধকারের ভিতরে আবার মিলিয়ে যাবার চেষ্টা করলে। সে একবারও আর পিছন ফিরে তাকালে না, কিন্তু পমি আর বিন্দু দুজনেই শুনতে পেলে তার চাপা-কান্নার অস্ফুট শব্দ!

বিন্দু তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেল এবং যেভাবে সে দৌড়ে গেল তা দেখলেই বোঝা যায় তার সমস্ত বুকের ভিতরটা উথলে উঠেছে গভীর সমবেদনায়।

বিন্দু বললে, 'কেন তুমি কাঁদছ বাছা? তোমার মতন এক-ফোঁটা ননির পুতুলকে এই অন্ধকারে আমি কি পথে বিসর্জন দিতে পারি। পমিবাবু, তোমার বন্ধুকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে চলো।' বনমালা ফিরে দাঁড়াল।

বিন্দু জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার কি মা-বাপ নেই এই রাতে পথে পথে কেন তুমি একলা বেড়াচ্ছ?'

—বনমালা মাথা হেঁট করে বললে, 'আমার কেউ নেই!'

বিন্দু তাকে কোলে তুলে নিয়ে বললে, 'চলো বাছা বাড়ির ভেতরে, আমি তোমাকে আমার ঘরে লুকিয়ে রাখব।'

সদর বন্ধ করে বিন্দু তাদের নিয়ে বাড়ির ভিতরে গেল। বনমালাকে আগে নিজের ঘরে শুইয়ে রেখে সে বললে, 'এইখানে থাকো, আমি একটু পরেই আবার ফিরে আসছি। গিন্নি ঘুমোলেই তোমার জন্যে খাবার আনব।'

পমি বললে, 'আর আমার কী হবে?'

—'সবুর করো, সবুর করো! তুমি রান্নাঘরে যাও। আমি ঠাকরুণকে ঠান্ডা করে আসি।'

পমি বললে, 'শিগগির এসো বিন্দু, আমার পেট খিদেয় জ্বলে যাচ্ছে!'

বিন্দু চলে গেল। কিন্তু পমি রান্নাঘরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। খুড়ির মতামত জানবার জন্যে তার মন অধীর হয়ে উঠল। অদৃষ্টে কী আছে আগে থাকতে তা জেনে সে প্রস্তুত হয়ে থাকতে চায়। পমি পা টিপে টিপে উপরে মোক্ষদার বসবার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

পাড়ায় কী কী নতুন ঘটনা ঘটছে, যদুবাবুর মুখ থেকে মোক্ষদা তখন সেইসব সবিস্তারে শ্রবণ করছিলেন। বিন্দুকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ লা বিন্দি, সদরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ধরে কী হচ্ছিল?'

—'আমি তো রান্নাঘরে ছিলুম!'

—'রান্নাঘরে ছিলে? সেখানে আর কে আছে?'

—'আর কেউ নেই।'

—'দেখ বিন্দু, বাজে কথায় তুই আমায় ভুলোতে পারবিনি। সেই অকালকুষ্মাণ্ডটা ফিরে এসেছে, আমি বুঝেছি!'

—বিন্দু চুপ।

—'তুই জবাব দিচ্ছিস না কেন?'

—'কী জবাব দেব?'

—'সে ছোঁড়া এসেছে কি না? সত্যি বল। এসেছে তো?'

বিন্দু এমন মৃদুস্বরে বললে, 'হু' যেন, তা শোনাল ঠিক একটি দীর্ঘশ্বাসের মতো।

—'তাকে এখুনি আমার কাছে নিয়ে আয়!'

—'বেচারি ভয়ে কেঁপে সারা হচ্ছে, মা!'

—'যাতে তার সত্যিই ভয় হয়, আজ আমি তাই করব! নিয়ে আয় তাকে!'

বিন্দু বললে, 'মা, পমির দোষ নেই। পমিকে আমিই বাইরে যেতে বলেছিলুম। আমি যে ঠাট্টা করে বলেছিলুম, পমি তা বুঝতে পারেনি।'

মোক্ষদা সোজা হয়ে খনখনে গলায় বললেন, 'চুপ! তোর কোনও কথা শুনতে চাই না আমি! তাকে নিয়ে আয় আমার কাছে!'

মোক্ষদার ধমক থেকে বিন্দুকে বাঁচাবার জন্যে পমি হঠাৎ দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল। তারপর বললে, 'খুড়িমা, এই যে আমি।'

॥ সপ্তম ॥

পমি নির্বাসনে গেল

ঘরের ভিতরে পমির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষদা আশ্চর্যরকম চুপ হয়ে গেলেন।

যদুবাবুও এমনভাবে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন যেন এ ঘরের কোনও কিছুর সঙ্গে তাঁর কোনওই সম্পর্ক নেই।

দীর্ঘস্থায়ী স্তব্ধতা! বিন্দু যেন একটা কিছু করবার জন্যেই হাতের হারিকেন লণ্ঠনটা একবার এখানে একবার ওখানে সরিয়ে সরিয়ে রাখতে লাগল।

তারপর মোক্ষদা গাত্রোত্থান করলেন। পমি তাকিয়ে রইল মাটির দিকে। মোক্ষদা তার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

হঠাৎ পমির র‍্যাপারের একটা কোণ ধরে মোক্ষদা বললেন, 'কী এটা?'

পমি চোখ না তুলেই বিড়বিড় করে বললে, 'র‍্যাপার।'

—'কে দিল তোকে?'

—'একটি মেয়ে।'

—'এখুনি এটা খুলে ফেল!'

—'আমার বড্ড শীত করছে!'

—'খোল বলছি!'

পমি তবু স্থির।

মোক্ষদা র‍্যাপার ধরে মারলেন এক টান! পমি যা ভয় করছিল, তাই হল। র‍্যাপার গেল উড়ে, বেরিয়ে পড়ল তার নগ্ন দেহ!

প্রথমটা মোক্ষদার চক্ষুস্থির! তারপর তাঁর দুই চোখ হল ছানাবড়ার মতো। ভীষণ স্বরে তিনি বলে উঠলেন, 'অ্যাঃ! তুই ল্যাংটো!'

পমি বোবা।

—'তোর পোশাক কোথায় গেল?'

পমি তবু কথা কয় না।

—'তুই যদি কথা না বলিস তাহলে মারের চোটে আজ তোর ভূত ভাগিয়ে দেব!' সঙ্গে সঙ্গে মারের প্রথম নমুনা পড়ল চটাস করে পমির গণ্ডদেশের উপরে।

পমি গালে হাত বুলোতে বুলোতে কাতরস্বরে বললে, 'আমার পোশাক চুরি গিয়েছে!'

—'ডাহা মিথ্যে কথা!'

—'সত্যি বলছি খুড়িমা, চোরে আমার সব নিয়ে পালিয়েছে!'

—'চুপ কর মিথ্যুক! আমি আর তোর খুড়িমা নই! যে কুলাঙ্গার ছেলে আমার মুখে চুনকালি মাখাতে চায়, তার সঙ্গে আর আমার কোনও সম্পর্ক নেই!'

বিন্দু বললে, 'আহা, চোরে যদি চুরি করে, ও-বেচারির দোষ কী?'

চোখ পাকিয়ে বিন্দুর দিকে তাকিয়ে মোক্ষদা কাঁক কাঁক করে বললেন, 'থাম, থাম! তুই আর মুখনাড়া দিসনে বিন্দি!' তারপর আবার পমির দিকে ফিরে বললেন, 'আমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে! ভেবেছিলুম জীবনের শেষ ক-টা দিন শান্তিতে কাটাব, তা তোর মতন হতচ্ছাড়া এ সংসারে থাকলে আমার সে আশাতেও পড়বে ছাই! তোকে যে শাস্তি দেওয়া উচিত দয়া করে তা আর দিলুম না, কিন্তু এ বাড়িতে আর তোর ঠাঁই নেই। আজ রাতটা তুই কয়লার ঘরে বন্ধ থাকবি, তারপর কাল সকালে তোকে একেবারে শহর থেকে দূর করে দেব!'

বিন্দু প্রতিবাদ জানিয়ে বলতে গেল, 'সে কী মা—'

মুখ ঝামটা দিয়ে মোক্ষদা বলে উঠলেন, 'বিন্দি, ফের কথা কইছিস? কী করলে ও ছোঁড়ার স্বভাব শুধরোবে তোর চেয়ে তা আমি ভালো জানি! আমার বাপের বাড়ির দেশ থেকে নিমাই এসেছে। দেশে নিমাইয়ের অনেক খেত-খামার আছে, পমি তারই সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। যেমন ওর চাষাড়ে-বুদ্ধি, ও চাষ-বাসই করতে শিখুক! শহরে থাকলে ও একেবারে গোল্লায় যাবে। নিমাই কাল সকালেই দেশে ফিরবে, পমিও যাবে তার সঙ্গে।'

পমি ম্রিয়মান মুখে বললে, 'কিন্তু—'

মোক্ষদা বাধা দিয়ে বললেন, 'চোপরাও! তোর কোনও মিছে কথাই আর শুনতে চাই না! চল তুই আমার সঙ্গে।' বলেই তিনি পমির কান চেপে ধরলেন।

বিন্দু বললে, 'ওকে তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ মা? বেচারা আজ সকাল থেকে একটা কুটো পর্যন্ত মুখে দেয়নি!'

মোক্ষদা বিন্দুর কথার কোনও জবাব দেওয়ারও দরকার মনে করলেন না! তিনি পমির কান ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে তাকে নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

কয়লার ঘরটা হচ্ছে চওড়ায় আড়াই হাত আর লম্বায় তিন হাত। সেখানে বাড়ির কয়লা জমা করে রাখা হত। তার জানলা ছিল না, একটা মাত্র দরজা ছিল। কয়লার গাদার ভিতরে পমিকে নিক্ষেপ করে মোক্ষদা দরজাটা বন্ধ করে দিলেন সশব্দে।

সকালবেলা। নিমাইয়ের সঙ্গে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে পমি বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াল।

মোক্ষদার পায়ের ধুলো নিয়ে পমি কাঁদো কাঁদো মুখে বললে, 'তাহলে আসি খুড়িমা?'

মোক্ষদা প্রথমটা কঠিন মুখে চুপ করে রইলেন। তারপর নীরস স্বরে বললেন, 'এসো। ......যেদিন আবার ভালো ছেলে হবে, সেদিন আবার তোমাকে এখানে ঠাঁই দেব, কিন্তু তার আগে নয়। বংশের গৌরব হবার জন্যে প্রত্যেক ছেলের চেষ্টা করা উচিত। মন দিয়ে কাজকর্ম শেখো, মানুষের মতন মানুষ হও।'

বারবার এক কথা শুনে শুনে এতক্ষণে পমিরও বিশ্বাস হল নিশ্চয়ই সে ভালো ছেলে নয়, নিশ্চয়ই সে বংশের কলঙ্ক! তার প্রতি কঠোর হয়ে খুড়িমা কিছুই অন্যায় করেননি।

সে কাঁচুমাচু মুখে বললে, 'খুড়িমা, আমায় মাপ করো!'

—'কাজকর্ম শিখে মানুষ না হলে তোমাকে আমি মাপ করব না!'

—'খুড়িমা, তুমি যদি আমায় মাপ করো, তাহলে আজ থেকেই আমি ভালো ছেলে হব।'

—'ও! তুমি ভেবেছ খোসামোদ করে আমার মন ফেরাবে? না, আমার যে কথা সেই কাজ! শাস্তি না দিলে তুমি মানুষ হবে না! নিমাই, একে নিয়ে যাও।'

পমি আবার মোক্ষদার পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, 'খুড়িমা তুমি কি আমাকে একটা চুমুও খাবে না?'

—'চুমু! বুড়ো ছেলেকে চুমু খাব কী রে! যা, যা, আর জ্বালাস নে!'

নিমাই এদিকে এসে পমির হাত ধরে অগ্রসর হল। পমি যেতে যেতে ফিরে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'বিন্দু আমি তাহলে আসি? বিন্দু, তুমি আমাকে চিঠি লিখো।'

বিন্দুর মুখ দিয়ে কোনও কথা ফুটল না, তার গলা দিয়ে বেরুল খালি একটা ঘড় ঘড় শব্দ। তারপর সে আঁচলের খুঁট দিয়ে মুছতে লাগল নিজের চোখের জল।

যেতে যেতে পমি করুণ চোখে চারিদিকে তাকাতে লাগল। বাড়ির সমস্ত দরজা-জানলা, উঠোনের বকুলগাছটি, রান্নাঘরের সামনে বসে মেনি বিড়ালটি, ছাদের কার্নিশে বসে গোলাপায়রাগুলি, সবাই যেন একসঙ্গে বলতে লাগল, 'বিদায় পমি! বিদায় পমি! বিদায় পমি!' বুকের ভিতর থেকে পমির প্রাণও যেন উত্তরে বললে, 'বিদায় ভাই, বিদায়, বিদায়!'

পথে বেরিয়ে স্টেশনের দিকে যেতে নিমাই শুধোল, 'পমি তোমার বয়স কত?'

—'ছয় কি সাত।'

—'তুমি কার ছেলে?'

—'আমি আমার মায়ের ছেলে।'

দুই ভুরু কপালে তুলে নিমাই বললে, 'সত্যি নাকি! তুমি কতদূর গুনতে জানো?'

—'এক হাজার পর্যন্ত।'

—'খাসা! আমাকে একবার গুনে শোনাও দিকি।'

—'এক, দুই, তিন, চার, আট, দশ, পঁচিশ, আটত্রিশ—'

নিমাই বাধা দিয়ে বললে, 'থাক, বুঝেছি! তুমি ইস্কুলে গিয়েছিলে!'

—'হুঁ!'

—'বলো দেখি মোহরের সঙ্গে গিনির তফাত কী?'

পমি খানিক ভাবলে, তারপর বললে, 'মোহর হচ্ছে মোহর, আর যা দিয়ে গয়না গড়া হয় গিনি হচ্ছে তাই!'

নিমাই চমকে বললে, 'বাঃ! আচ্ছা, বলো দেখি, তরমুজ ফলে কীসে?'

এ রকম সব প্রশ্ন পমিকে আগে কেউ কখনও করেনি। সে থতমত খেয়ে প্রকাশ্যেই ভাবতে লাগল, 'আমগাছে ফলে আম, জামগাছে ফলে জাম, আলুগাছে ফলে আলু, আর তরমুজগাছে ফলে তরমুজ!'

নিমাই হতাশভাবে বললে, 'হে ভগবান, মোক্ষদা ঠাকুরুণ এ কাকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন? ওহে ছোকরা, তুমি যে গাধার বাচ্চার চেয়েও বোকা! তুমি বলছ, তরমুজগাছে ফলে তরমুজ, না? তরমুজ যে ঘাসের ডগায় ফলে না, এটা তুমি ঠিক জানো তো?'

পমি বললে, 'ঘাসের ডগায় ফোটে, ঘেসো ফুল। সেখানে তরমুজ ফলবে কেন?'

—'সেই কথাই তো তোমায় আমি জিজ্ঞাসা করছি?'

—'তরমুজগাছ হচ্ছে এক রকম গাছ।'

—'বাহবা কী বাহবা! তরমুজগাছ হচ্ছে একরকম গাছ! বেশ, এবার রোদ উঠলে তুমি তার ছায়ায় গিয়ে বসে থেকো। হ্যাঁ, তোমার বিশ্বাস, আলুগাছে ফলে আলু? ঠিক বলেছ! কিন্তু কী করে আলুগুলো পাড়তে হয় বলো দেখি?'

—'কেন, গাছের ওপরে চড়ে।'

নিমাই হা হা হা হা করে হেসে গড়িয়ে পড়ল। তারপর অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বললে, 'যাক, তোমাকে আর প্রশ্ন করা মিছে! গাড়ির সময় উৎরে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি পা চালাও।'

স্টেশনের কাছে এসে পমি বললে, 'আমাকে কি কাল থেকেই খেতের কাজ শিখতে হবে?'

নিমাই নাক বেঁকিয়ে বললে, 'খেতের কাজ? বিষ্ণু, বিষ্ণু! তুমি হচ্ছ একটি আস্ত গোরু! তোমাকে দেব গোরু চরাবার ভার!'

॥ অষ্টম ॥

পমির কপাল খারাপ

দিন কয় পরে পমি গোরু চরাবারই ভার পেলে।

পমি বললে, 'নিমাইবাবু, আপনি আমাকে জুতো দিলেন না, আমি খালি পায়ে হাঁটব কেমন করে?'

নিমাই বললে, 'এটা শহর নয়, পাড়া গাঁ। রাখাল ছেলেরা জুতো পরে-না।'

পমির উপরে পড়ল দশটা গোরুর ভার। তাদের শিংগুলোর দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে সে বললে, 'ওরা যদি আমাকে গুঁতিয়ে দেয়!'

—'ওদের কাছে গেলেই ওরা তোমাকেও গোরু বলে চিনতে পারবে। গুঁতিয়ে দেবে না।'

নাচারভাবে পমি পাচন বাড়ি হাতে নিয়ে গোরুদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। গোরুরা চিরদিনই রাখাল বালকদের দ্বারা চালিত হয়। কাজেই পমিকে দেখে বিস্ময় বা বিরাগ প্রকাশ করলে না।

নিমাই বললে, 'সাবধান, আমার গোরু যেন হারায় না। একটা গোরু হারালেই এখানে আর তোমার ঠাই নেই। এখন যাও।'

পমি গোরুর পাল নিয়ে অগ্রসর হল।

শহুরে ছেলে সে, পল্লিগ্রাম লাগল তার নতুন। কী চমৎকার রৌদ্র-রঞ্জিত দৃশ্য! নীলাকাশ

মিলিয়ে গিয়েছে তেপান্তরের শেষে, ধু ধু প্রান্তর মিলিয়ে গিয়েছে নীলাকাশের কোলে। এখানে কূলে কূলে ভরা দিঘি, ওখানে রোদে চিকমিকে নদী, কোথাও সবুজ মুকুট-পরা বড়ো বড়ো গাছের সভা, কোথাও অজানা বনফুলে ভরা ছোটো ছোটো ঝোপঝাড়! দিকে দিকে নব নব রূপ, গাছে গাছে অচেনা পাখিদের গান, পদে পদে কত যে বিস্ময়!

পমির চোখ জুড়িয়ে গেল, মন হল মুগ্ধ। পল্লিগ্রাম যে এত সুন্দর তা সে জানত না।

এক জায়গায় প্রায় একশো ফুট উঁচু পাহাড়ের মতন প্রকাণ্ড একটা ঢিপি। স্থানীয় লোকেরা সেটাকে 'রাজারগড়' বলে ডাকত। হয়তো সুদূর অতীতে সেটা সত্যসত্যই ছিল কোনও রাজার কেল্লা। এখন সেটা মৃত্তিকা স্তূপে পরিণত হয়েছে এবং তার উপরে গজিয়েছে ঘাস ও জঙ্গল।

স্তূপের ঢালু গা বেয়ে গোরুগুলো উপরে উঠছে দেখে পমিও তাদের সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠতে লাগল। ছোট্ট মানুষ, ছোট্ট ছোট্ট হাত-পা! শেষ পর্যন্ত পমি যখন টঙে উঠে দাঁড়াল, তখন রীতিমতো হাঁপাচ্ছে।

আরে গেল, গোরুগুলো যে আবার স্তূপের ওধারকার ঢালু বেয়ে নীচের দিকে নামতে শুরু করলে।

পমির আর দম নেই। সে দু-পা ছড়িয়ে বসে পড়ে হাঁপ ছাড়তে ছাড়তে দেখতে লাগল, স্তূপের নীচে ওধারে রয়েছে গভীর জঙ্গল। তার মনে হল, ওইরকম কোনও গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়েই রূপকথার রাজকুমার ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়েছিল রক্ষোপুরীর বন্দিনী রাজকন্যার খোঁজে।

গোরুগুলো যখন স্তূপের মাঝ-বরাবর নেমে গিয়েছে, পমি আবার উঠে দাঁড়াতে বাধ্য হল। তারপর সে-ও যেই নীচের দিকে পা বাড়িয়েছে অমনি তার পায়ে পট করে কী ফুঁটে গেল! আর্তনাদ করার সঙ্গে সঙ্গেই টাল সামলাতে না পেরে সে খেলে এক আছাড় এবং তারপর গড়াতে গড়াতে নামতে লাগল নীচের দিকে!

গোরুগুলো সচমকে ঊর্ধ্বমুখে তাকিয়ে দেখলে, তাদের রাখাল এক অদ্ভুত উপায়ে উপর থেকে নেমে আসছে! এমনভাবে আর কোনও রাখালকে তারা স্তূপ থেকে নামতে দেখেনি। মহা ভয়ে গোরুগুলো ল্যাজ তুলে যে যেদিকে পারলে চম্পট দিলে।

গড়াতে গড়াতে পমি যখন ভাবছে তার জীবনের শেষ দিন উপস্থিত, হঠাৎ সে ঝুপ করে পড়ে স্থির হয়ে রইল এক জায়গায় গিয়ে। তার একটুও চোট লাগল না।

স্তূপের নীচে ছিল প্রায় জলশূন্য কাদায়-ভরা একটা ডোবা। সৌভাগ্যক্রমে পমির দেহ গিয়ে পড়েছে তারই ভিতরে, নইলে তার গতর নিশ্চয় চূর্ণ হয়ে যেত।

পমি প্রথমটা চোখ মেলে দেখতে লাগল খালি হাজার হাজার সর্ষে ফুল। তারপর সে অনেক কষ্টে ডোবার ভিতর থেকে উপরে শুকনো মাটিতে উঠে এসে বসল। তারপর চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে, কোথাও একটা গোরুর চিহ্ন পর্যন্ত নেই! ভয়ে তার বুক ঢিপ

করে উঠল। একটা-দুটো নয়, দশ-দশটা গোরু যদি হারিয়ে যায়, তাহলে নিমাইয়ের হাতে তার যে নাকালের আর শেষ থাকবে না।

তাড়াতাড়ি গায়ের কাদা ঝেড়ে ও চেঁছে ফেলে সে উঠে পড়ে আবার গোরুর সন্ধানে ছুটল।

কিন্তু কোথায় পথ? এ জায়গাটা একেবারে পোড়ো, এদিকে কোনও লোক আসে না। তবে কি গোরুগুলো ওই জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে? ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে পমি নিজের মনেই বললে, 'দেখা যাক!'

সে অরণ্যের ভিতর গিয়ে ঢুকল। প্রথম খানিকটা বনের ঝোপঝাপ ও গাছপালা পরস্পরের কাছ থেকে তফাতে তফাতে ছিল, কিন্তু পমি যতই ভিতরে ঢোকে, জঙ্গল ততই নিবিড় হয়ে ওঠে। খানিকক্ষণ পরে সে মুখ তুলে দেখলে অরণ্য এমন ঘন হয়ে উঠেছে যে, মাথার উপরে আকাশও দেখা যায় না। তখন ভয় পেয়ে আবার ফেরবার চেষ্টা করলে। কিন্তু কোন দিক দিয়ে যে এসেছে, সেটা আর আন্দাজ করতে পারলে না। সেদিকেই যায়, সামনে পায় কাঁটাভরা ঝোপঝাপ আর মাথার উপরে নিবিড় সবুজ পাতার জগৎ। সেখানে আলোও নেই অন্ধকারও নেই, সেখানে বাস করে যেন চিরস্থায়ী সন্ধ্যা!

ঠিক যেন গোলকধাঁধায় পড়ে পমি চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল—সে বাইরের দিকে যাচ্ছে, না, জঙ্গলের আরও ভিতর দিকে যাচ্ছে তাও বুঝতে পারলে না। কাঁটাঝোপে তার জামাকাপড় গেল ছিঁড়েখুড়ে ও সর্বাঙ্গ গেল ক্ষতবিক্ষত হয়ে। এইভাবে পমি যে কতক্ষণ পাগলের মতন ঘুরে বেড়ালে, তা সে নিজেই আন্দাজ করতে পারলে না। কেবল এইটুকু বুঝলে যে, জঙ্গলের ভিতরে সন্ধ্যার আবছায়া ক্রমেই অন্ধকারে পরিণত হচ্ছে।

তারপরেই শুনতে পেলে অনেক—অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে চার-পাঁচটা শাঁখের আওয়াজ! কোনও গ্রামে শাঁখ বাজছে। তাহলে জঙ্গলের বাইরেও নেমে এসেছে সন্ধ্যা?

পমির বুকটা ছাঁৎ করে উঠল! সর্বনাশ, আজ রাত্রে তাকে জঙ্গলের মধ্যেই বন্দি হয়ে থাকতে হবে নাকি? এই গহন বন, দিনেও যেখানে অন্ধকারের বাসা, রাত্রে না জানি সেখানে জেগে উঠবে আরও কতই বিভীষিকা! হয়তো এখানে বাঘ আছে, সাপ আছে, আর আছে না জানি কত ভূত-পেত্নীর দল, রাত্রে এইখানে থাকলে সে কি আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে? এরই মধ্যে দিকে দিকে বেজে উঠেছে ঝিঁঝিদের কণ্ঠস্বর—যেন আঁধার দানবেরা শিস দিচ্ছে! গাছের পাতায় পাতায় শোনা যাচ্ছে যেন কাদের ফিসফিস করে কথা! হঠাৎ আচম্বিতে পমির দেহে রোমাঞ্চ জাগিয়ে কোন গাছের টং থেকে ককিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিলে অনেকগুলো খোকাখুকি! পমির দৃঢ়বিশ্বাস হল, রাত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভূত-পেতনিদের খোকাখুকি জেগে উঠে খাবারের জন্যে কান্না জুড়ে দিয়েছে! পমি এর আগে কখনও পাড়াগাঁয়ে আসেনি, সে জানে না, বকেদের ছানাগুলো যখন চ্যাঁচায় তখন মনে হয় যেন মানুষের শিশুরা কেঁদে কেঁদে উঠছে।

পমি সেইখানেই কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল, তার চোখ দিয়ে পড়তে লাগল ঝর ঝর করে জল। কাঁদতে কাঁদতে দুই হাত জোড় করে কাতরকণ্ঠে বললে, 'হে ভগবান, হে ভগবান, আমি তোমার পমি। আমার মা নেই, বাপ নেই, আমার খুড়িমাও কাছে নেই! এখন তুমি ছাড়া আমাকে কে দেখবে, হে ভগবান? আমাকে দয়া করো, আমাকে পথ দেখাও, আমাকে ভূত-পেতনির হাত থেকে তুমি উদ্ধার করো।'

এইভাবে ভগবানকে ডাকতে ডাকতে হঠাৎ পমির চোখে পড়ল অনেক দূরে টিম টিম করে একটা আলো জ্বলছে। সেই আলোটা দেখেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে আর কোনও দিকে না তাকিয়ে পমি সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। তার মনে হল, ভগবানের দয়ায় বন-জঙ্গল যেন দুই দিকে সরে গিয়ে তার জন্যে পথ করে দিলে।

অন্ধকারে পমি এতক্ষণ বুঝতে পারেনি, যেখানে বসে সে ভগবানের কাছে আবেদন জানাচ্ছিল সেটা হচ্ছে অরণ্যের একটা প্রান্ত। বনের একটা দিক সেইখানে শেষ হয়েছে, তারপরেই একটা মাঝারি আকারের মাঠ এবং সেই মাঠের ওপারে কোনও গৃহস্থের ঘরে জ্বলছে একটি দীপের শিখা। সেই দীপশিখাই আজ পমির প্রাণ বাঁচালে, কারণ বনের ভিতরে রাত কাটাতে হলে নিশ্চয় সে আজ ভয়েই মারা পড়ত।

আলোটা লক্ষ্য করে পমি মাঠের উপর দিয়ে যতটা তাড়াতাড়ি পারে হাঁটতে লাগল।

কিন্তু যেখানে আলো জ্বলছে সেখান পর্যন্ত তাকে আর যেতে হল না। হঠাৎ মাঝপথেই ঘটল আর এক আশ্চর্য ঘটনা!

॥ নবম ॥

মধুমতী রাজার মেয়ে

সেদিন ছিল প্রতিপদ। মাঠ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ আলোর আভাস অনুভব করে, পূর্ব দিকে মুখ ফিরিয়ে পমি দেখলে একটা গাছের ফাঁক দিয়ে চাঁদ উঁকিঝুঁকি মারছে। চাঁদকে দেখে সে আরও আশ্বস্ত হল।

কিন্তু তখনই আর-একটা শব্দ তার কানে গেল। কোথা থেকে খুব কচি শিশুর গলায় কে যেন করুণ সুরে কাঁদছে!

পমির বুক আবার ঢিপ ঢিপ করে উঠল! এখানেও শিশুর কান্না? ভূত-পেতনিদের ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়েগুলো কি গাছ থেকে নেমে এসে তার পিছু ধরতে চায়? সে থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে কান পেতে শুনতে লাগল।

কিন্তু না, এ কান্না শুনে তো ভয় হয় না, এ যে সত্য সত্যই মানুষ-শিশুর গলা! অন্ধকারে তার মতন পথ ভুলে আরও কোনও শিশু কি এইখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

পমি আবার শুনলে, কে যেন আধো আধো ভাষায় কাঁদতে কাঁদতে বলছে, 'চাঁদেল বুলি, চাঁদেল বুলি, আমাকে বালিতে নিয়ে দাও।'

পমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আন্দাজ করবার চেষ্টা করলে, আওয়াজটা আসছে কোনখান থেকে? চাঁদের মুখ ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে এবং অন্ধকার হয়ে আসছে ক্রমেই পাতলা। মাঠের মাঝে মাঝে রয়েছে গাছপালা এবং মাঝে মাঝে রয়েছে ছোটো-বড়ো ঝোপ।

আবার কচি গলায় কেঁদে বললে, 'চাঁদেল বুলি, আমায় বালি নিয়ে দাও!'

পমি বুঝলে, শিশু বলছে—'চাঁদের বুড়ি, আমায় বাড়ি নিয়ে যাও!' এবার আন্দাজে ধরলে, শব্দটা আসছে কোন দিক থেকে। সে পূর্ব দিকের একটা ঝোপ লক্ষ্য করে পায়ে পায়ে এগুতে লাগল।

ঝোপের ওপাশে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখলে, একটি এতটুকু ফুটফুটে মেয়ে ঘাসজমির উপরে বসে সামনের দিকে দুই হাতে ভর দিয়ে চাঁদের দিকে চেয়ে আছে! যেন বনদেবীর কন্যা! এ এক অপ্রত্যাশিত বিস্ময়! এই রাতে এই গহনবনের ছায়ায়, নিরালা মাঠের বিজনতার মধ্যে যে এমন একটি খুকির দেখা পাওয়া যেতে পারে, এটা কল্পনাতেও আনা যায় না। পমি মিনিট দশেক অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ছয়-সাত বছর বয়সের ছেলের পক্ষে পমির দেহ ছিল মাথায় বেশ খাটো। কিন্তু তারও তুলনায় এ মেয়েটিকে দেখতে ছোটো, কত ছোটো! যেন জুঁইফুলের একটি পাপড়ি! একটি টুকটুকে লাল জামা প্রায় তার পা পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে, এলানো চুলগুলির উপরে একটি লাল ফিতার 'বো', দুই পায়েও ছোট্ট দু-পাটি লাল জুতো। গলায় ও হাতে চাঁদের আলোয় চক চক করছে সোনার হার, সোনার চুড়ি।

তাকে দেখলেই বুঝতে দেরি লাগে না যে, সে বড়োঘরের মেয়ে। তার বয়স কত হবে? চার? না, তিন? কিন্তু সে একলা এমন অসময়ে এ জায়গায় এল কেমন করে?

মেয়েটি হঠাৎ পমিকে দেখতে পেলে। সঙ্গে সঙ্গে সে তখনই উঠে দাঁড়িয়ে তার কাছে ছুটে এল—উড়ে এল যেন একটি রঙিন প্রজাপতি! সে পমির পানে তাকালে এবং পমি তাকালে তার মুখের পানে। নীরবতার মধ্যে কেটে গেল এক মিনিট। দুজনের চোখে মধুর বিস্ময়ের আভাস!

মেয়েটি শুধোলে, 'তুমি কি চাঁদেল বুলিল থেলে?'

প্রথমটা পমি বুঝতে পারলে না। তারপর একটু ভেবে বুঝলে, মেয়েটি জানতে চাইছে সে চাঁদের বুড়ির ছেলে কি না?

মুখ টিপে হেসে বললে, 'না, আমি চাঁদের বুড়ির ছেলে নই। তুমি কে?'

মেয়েটি টেনে টেনে বললে, 'আমি ম-ওদুমতী!'

—'তুমি মধুমতী? বাঃ, বেশ নাম!'

—'আমাল বাবা লাজা।'

—'তোমার বাবা, রাজা?'

—'হুঁ।'

—'তুমি এখানে কেন?'

—'পালিয়ে এথেথি।'

—'পালিয়ে এসেছ? একলা?'

—'হুঁ।'

—'কেন?'

—'চাঁদেল বুলিকে দেকতে।'

—'কাঁদছিলে কেন?'

—'চাঁদেল বুলি নেই। আমি বালি দাবো।'

—'তোমার বাড়ি কোথায়?'

খুব জোরে মাথা-নাড়া দিয়ে মধুমতী বললে, 'দানি না!'

—'জানো না তো বাড়ি ফিরবে কেমন করে?'

ননির মতন নরম হাতে পমির একখানি হাত ধরে মধুমতী গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বললে, 'তুমি নিয়ে দাবে!'

পমি মনে মনে হেসে ভাবলে, আমি নিজেই পথ ভুলে বাসার খোঁজ পাচ্ছি না, আর তুমি আমাকেই বলছ কিনা তোমার বাড়ি খুঁজে দিতে!

এতক্ষণ পরে মধুমতীর খেয়াল হল, পমিরও নামটা জিজ্ঞাসা করা উচিত! সে শুধোলে, 'তোমাল নাম কী?'

—'পমি।'

এ নাম মধুমতীর পছন্দ হল না। সে ঘাড় নেড়ে বললে, 'না, তুমি থুপী!'

—'আমার নাম পমি।'

—'উঁ, তুমি থুপী!'

পমি বুঝলে, প্রতিবাদ এখানে অচল। বললে, 'বেশ, তাই সই। চলো, তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যাই।'

দুজনে হাত ধরাধরি করে অগ্রসর হল!

মধুমতী হঠাৎ বললে, 'দান দাও!'

—'কী?'

—'দান দাও!'

—'বুঝতে পারছি না!'

মধুমতী এ কথাকে ওজর বলেই গ্রাহ্য করলে না। মাটিতে পা ঠুকে অধীর স্বরে সে আবার বললে, 'দান দাও?'

—'ও, গান গাইতে বলছ বুঝি! কিন্তু আমি গান জানি না যে!'

মধুমতী এবারে রেগে ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, 'দান দাও, দান দাও।'

ফাঁপরে পড়ে ভাবতে ভাবতে পমির হঠাৎ মনে পড়ে গেল বিন্দুর মুখে শোনা একটি গান। সে গাইলে,

এক যে ছিল কেলে বেড়াল
মুখখানা তার হাঁড়িপানা,
রান্নাঘরে লুকিয়ে ঢুকে
চুরি করে খায় সে খানা।
ম্যাও-তান তার শুনে হঠাৎ
কুত্তা জিমির মেজাজ চটাৎ,
ক্যাঁক করে সে কামড়ে দিলে,
অমনি হুলোর চোখটা কানা।'

মধুমতীর পছন্দ হল না। বললে, 'থাই দান!'

—'ছাই গান? কিন্তু আমি যে আর গান জানি না!'

কিন্তু সেজন্যে মধুমতীর আর মাথাব্যথা নেই, তার মন ছুটেছে অন্যদিকে। সে হঠাৎ বললে, 'পুল, পুল!'

—'অ্যাঁঃ?'

পুতুলের মতন একরত্তি হাতখানি তুলে একদিকে বাড়িয়ে সে বললে, 'ওই পুল পুতেচে। আমায় পুল দাও!'

ধবধবে জ্যোৎস্নায় একদিকে চেয়ে পমি দেখলে, বাতাসে দুলছে নয়নতারা ফুলের ঝোপ। মধুমতীর মন রাখবার জন্যে সে অনেকগুলো ফুল তুলে এনে তার হাতে সমর্পণ করলে।

ঘ্রাণ নিয়ে ভুরু কুঁচকে মধুমতী মতপ্রকাশ করলে, 'দন্দ নেই!'

—'নয়নতারা ফুলে তো গন্ধ থাকে না!'

—'দ্যেৎ!' বলে মধুমতী ফুলগুলো ছুড়ে ফেলে দিলে, তারপরেই আবার বললে, 'থুপী!'

—'বলো!'

—'আমি খাবাল খাব!'

মনে মনে প্রমাদ গুনে পমি বললে, 'খাবার? এখানে তো খাবার পাওয়া যায় না দিদি!'

কিন্তু কে বোঝে সে কথা? 'খাবাল খাব, খাবাল খাব' বলে বায়না ধরে মধুমতী প্রথমে বসে, তারপর মাঠের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর ক্রমাগত দুই পা ছোড়ে আর বলে, 'খাবাল খাব, খাবাল খাব!'

পমি বললে, 'লক্ষ্মী মেয়ে, ওঠো তো! বাড়ি গিয়ে খাবার খাবে!'

—'উঁ-উঁ-উঁ-উঁ, আমি বালি দাব না, আমি খাবাল খাব!' তারপর সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না ধরলে।

নাচারের মতন মধুমতীর পাশে বসে পড়ে পমি তার কান্না শুনতে লাগল। আর ভাবতে লাগল, রাজার মেয়ে মধুমতীকেও খাবারের জন্যে কাঁদতে হয়! তারও খুব ক্ষুধা পেয়েছিল, কিন্তু মধুমতীর কাতরতা দেখে সে নিজের কথা ভুলে গেল।

কেঁদে কেঁদে শেষটা মধুমতী ঘুমিয়ে পড়ল।

উপরে, নীচে চারিদিকে বয়ে যাচ্ছে তখন জ্যোৎস্নার হিরার ধারা। কিন্তু সে সৌন্দর্য দেখবার ও বোঝবার মতন অবস্থা পমির ছিল না। কারণ রাত যত বাড়ছে, তত ঠান্ডা হচ্ছে শীতের হাওয়া।

কন্-কন্-কন্-কন্! শীত ছুড়ছে বরফের তির!

থর্-থর্-থর্-থর্! কেঁপে কেঁপে উঠছে পমির বুকের ভিতরটা পর্যন্ত! তার হাত-পা ক্রমে অসাড় হয়ে এল।

পমি বুঝলে, এমন চুপ করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে শীত বাড়বে বই কমবে না। চাঙ্গা হবার জন্যে সে তখন উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে খুব খানিকটা ছুটোছুটি করে নিলে।

হ্যাঁ, এতক্ষণ পরে দেহের রক্ত যেন কতকটা গরম হয়ে উঠল। পমি আবার একটু ধাতস্থ হয়ে মধুমতীর পাশে এসে বসল।

মধুমতী ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও আবার উঁ-উঁ-উঁ-উঁ করে কাঁদতে কাঁদতে ঠক ঠক করে কাঁপছে! তারও খুব শীত করছে নিশ্চয়!

পমির মন ভরে উঠল সমবেদনায়। নিজের মনে-মনেই সে বললে, 'আহা রে, রাজার মেয়ে, শোয়া অভ্যাস সোনার খাটে, পালকের বিছানায় দামি শাল-দোশালা গায়ে দিয়ে, এই হাড়-কাঁপানো শীতে, এই কনকনে ঠান্ডা হাওয়ায়, এই শিশিরে স্যাঁৎসেঁতে মাটিতে একটিমাত্র জামা পরে সে ঘুমোতে পারবে কেন? কিন্তু উপায় কী, উপায় কী?'

মধুমতীর ঘুম ভেঙে গেল, সে আবার উঠে বসে কাঁপতে কাঁপতে কান্না-ভরা গলায় ডাকলে, 'থুপী, অ থুপী!'

—'কী মধুমতী?'

—'আমাল, থিত করতে!'

—'শীত করছে? ঘুমিয়ে পড়ো, আর শীত করবে না!'

—'ওগো মাগো, ওগো মাগো!' মধুমতীর কান্না ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল।

কী যে করবে কিছুই ভেবে না পেয়ে পমি হতাশ ভাবে ফ্যালফ্যাল করে চারিদিকে তাকাতে লাগল। কোনওদিনই সে পড়েনি এমন বিপদে!

চাঁদ উঠেছে আরও উঁচুতে। শিশিরে স্নান করে বাতাস হয়ে উঠেছে আরও ঠান্ডা। গানের পাখিরা এখন গান ভুলে যায়। জেগে জেগে চ্যাঁচায় প্যাঁচার দল, ডানা ঝটপটিয়ে সাড়া দেয় বাদুড়েরা, আর মাঝে মাঝে ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া বলে খবরদারি করে শেয়ালের পাল!

ওখানে ওই মস্তবড়ো স্তূপটা কীসের?

ধবধবে চাঁদের আলোয় খানিকক্ষণ ধরে ভালো করে দেখে পমি বুঝতে পারলে, ও হচ্ছে খড়ের গাদা, চাষিরা ওখানে রাশি রাশি খড় সাজিয়ে রেখে গিয়েছে।

লোকে বলে, ডুবন্ত লোক ভাসন্ত খড়কুটো পেলেও সাগ্রহে চেপে ধরে। বিপদগ্রস্ত পমি খড়কুটোর বদলে পেলে একেবারে মস্ত খড়ের গাদা! এ যেন হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পাওয়া!

সে পরম আহ্লাদে বলে উঠল, 'ওঠো মধুমতী, আমার সঙ্গে চলো!'

মধুমতী ওঠে না, খালি কাঁদে।

পমি তখন হাত ধরে তাকে দাঁড় করিয়ে দিলে। তারপর সে মধুমতীর হাত ধরেই সেই স্তূপীকৃত খড়ের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল।

সে যখন খড়ের স্তূপের খুব কাছে এসে পড়েছে, হঠাৎ গাদার ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল একটা মূর্তি!

চাঁদের আলোতেও স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছিল না মূর্তিটাকে কিন্তু মনে হল, মানুষেরই মূর্তি বটে, তবু ঠিক যেন মানুষের মতন নয়! এই জঙ্গলভরা মাঠে, এই শীতার্ত নিঝুম রাতে কোনও মানুষের আবির্ভাব কি সম্ভবপর?

মূর্তির মুখখানা কাফ্রির মুখের চেয়েও কালো! আর সেই মিশকালো মুখে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে দুটো ক্রুদ্ধ ও বিশ্রী চক্ষু এবং সার বাঁধা বিকট, ভয়াবহ ও হিংস্র দাঁতগুলো!

পমি গল্পে ভূতের কথা শুনেছে এবং রাত্রিবেলায় নিজেদের ঘরেই সে খাটের ধারে পা ঝুলিয়ে বসতে পারে না—পাছে খাটের তলা থেকে কোনও মাংসহীন কঙ্কাল অস্থি-বাহু বাড়িয়ে তার পা দুটো ধরে হিড়হিড় করে টেনে নেয়!

এই কি সেই ভূত?

পমির সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, তার হাড়ে হাড়ে জাগল বিষম ঠকঠকানি—এবারে শীতে নয়, আতঙ্কে! মধুমতীও তীক্ষ্ণ স্বরে কেঁদে উঠে তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলে প্রাণপণে!

মূর্তিটা মস্ত মস্ত গোটাকয় লাফ মেরে খড়ের স্তূপের উপরে উঠে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল তার সুদীর্ঘ এক লাঙ্গুল!

ওটা একটা হনুমান। শীতে বোধহয় খানিকটা গরম হবার জন্যেই খড়ের গাদার ভিতরে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, এখন মনুষ্য-জাতীয় খোকা-খুকির অভাবিত আবির্ভাব দেখে বিরক্ত হয়ে দিলে লম্বা।

পমি আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল! সে মধুমতীকে নিয়ে খড়ের স্তূপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কতকগুলো খড়ের আঁটি টেনে টেনে বার করে তৈরি করলে বেশ একটি গুহার মতন জায়গা। তারপর সে মধুমতীকে নিয়ে তার ভিতরে গিয়ে ঢুকল এবং একটু পরেই দেহ তপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে গেল দুষ্ট শীতের রক্ত জল করা বিষ দাঁত!

দেখতে দেখতে আবার ঘুমিয়ে পড়ল মধুমতী।

সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর পমিরও চোখের পাতা ঘুমে ভরে এল। গুটিসুটি মেরে সে-ও মধুমতীর পাশে শুয়ে পড়ল, তারপর ধীরে ধীরে মুদে গেল তার চোখ দুটি।

বাহির থেকে তাদের উপরে পাহারা দিতে লাগল নীলাকাশের চাঁদ এবং তাদের কাছে-কাছেই জেগে দুলতে লাগল ছোটো-ছোটো ঘাসের ফুল।

॥ দশম ॥

মুড়ি খেতে বড়ো ভালো লাগে

প্রখর আলোকে পমির ঘুম গেল ভেঙে। চোখ মেলে দেখে, আকাশে চাঁদ নেই, পূর্ব দিকে সূর্যের রাঙা মুখ।

তাড়াতাড়ি সে উঠে বসতে গেল, কিন্তু দেখলে মধুমতী তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে এখনও ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। মধুমতীর ফোটা ফুলের মতন তাজা, মিষ্টি মুখখানি দেখে তার প্রাণের ভিতরটা স্নেহে আর মায়ায় দুলে দুলে উঠল!

পাছে তার ঘুম ভেঙে যায় সেই ভয়ে পমি আর উঠতে পারলে না, একেবারে স্থির ও আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে রইল। কাছেই একটি গাছের ডালে বসে বুলবুলি গাইছিল কোন তেপান্তরের, কোন বন-বনান্তের কোন ফুলন্ত গোলাপি স্বপ্নের গান! পমি চুপ করে শুয়ে তাই শুনতে শুনতে শীতকে ভোলবার চেষ্টা করতে লাগল।

তারপর ভাঙল রাজকন্যার ঘুম! পমি তাকে নিয়ে খড়ের গাদার বাইরে এসে বসল।

মোমের মতন নরম খুদে খুদে হাত দুখানি মুঠো করে নিজের চোখের পাতা রগড়ে দৃষ্টি মেলে সে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল বিপুল বিস্ময়ে। মাথার উপর প্রাসাদের ছাদ নেই, তার বদলে রয়েছে এই নীলাম্বর, এটা বোধহয় ছিল তার ধারণাতীত। মিহি সুরে হতভম্বের মতন সে ডাকলে, 'মা, ও-মা, মা!'

পমি আস্তে আস্তে ডাকলে, 'মধুমতী, এখানে তোমার তো মা নেই!'

ধড়মড় করে উঠে বসে মধুমতী কেঁদে ফেলে বললে, 'মা কোথায়?'

—'মা আছেন বাড়িতে।'

—'আমি বালি দাবো!'

পমি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'চলো মধুমতী, তোমাকে বাড়িতে দিয়ে আসি।'

মধুমতীও উঠে দাঁড়াতে গেল, কিন্তু পারলে না। কখনও তো তার অপথে-বিপথে এমন ভাবে হাঁটাহাঁটির অভ্যাস নেই, কালকের পরিশ্রমেই তার কচি কচি পা-দুখানি একেবারে টাটিয়ে উঠেছে। সে করুণ স্বরে বললে, 'আমি তলতে পারব না!'

—'চলতে পারবে না? তবে এসো দিদি, আমি তোমাকে কোলে করে নিয়ে যাই।'

পমির কোলে উঠে মধুমতী দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরলে। পমি তাকে কোলে করে নিয়ে যাবে বললে বটে, কিন্তু মধুমতীর চেয়ে বড়ো হলেও সে-ও একরত্তি শিশু বই তো নয়! মধুমতীর ভারে একদিকে হেলে পড়ে টলমল পায়ে খানিক দূর এগিয়ে গিয়েই পমি বুঝতে পারলে যে, সে কী দুর্বহ ভার গ্রহণ করেছে। তার জোরে জোরে নিশ্বাস পড়তে লাগল, দম বেরিয়ে যায় আর কী!

সে নিশ্চয়ই আর বেশিদূর যেতে পারত না। এমন সময় দৈব হল তার সহায়।

মাঠের উপর দিয়ে এক-কোঁচড় মুড়ি নিয়ে খেতে খেতে যাচ্ছিল একটি চাষার মতন লোক।

তাকে দেখে পমি দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'হ্যাঁ মশাই, এখানে রাজবাড়িতে যাবার পথ আছে কোথায় দেখিয়ে দিতে পারেন?'

লোকটি প্রথমে অবাক হয়ে দুই শিশুর মুখের পানে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। এই বিজন মাঠে এমন দুটি সুকুমার দেবশিশু দেখবার আশা বোধহয় সে করেনি। তারপর জানালে, পথ খুব কাছেই আছে, সে দেখিয়ে দিতে পারে।

মধুমতী কান্নাভরা গলায় বলে উঠল, 'আমি খাবাল খাব! আমি মুলি খাব!'

লোকটি একগাল হেসে বললে, 'খুকুরানি, তুমি মুড়ি খাবে? এই নাও! খোকাবাবু, তুমিও দু-মুঠো মুড়ি নাও! তোমরা বসে বসে খাও, আমি এইখানেই দাঁড়িয়ে আছি।'

পমির কোল থেকে নেমে পড়ে মধুমতী আঁচলের বদলে জামা পেতেই মুড়িগুলো নিলে। তারপর খুব তাড়াতাড়ি সব মুড়ি খেয়ে ফেলে সে বলে উঠল, 'আলো মুলি খাব!'

পমি বললে, 'ছি মধুমতী, চেয়ে খেতে নেই!'

লোকটি হাসতে হাসতে বললে, 'না খুকুরানি, তুমি যত পারো খাও। এই নাও। খোকাবাবু, তুমিও আর দুটো মুড়ি নেবে নাকি?'

কালকের অনাহারের পর এই মুড়িগুলোকে বোধ হচ্ছিল অমৃতের মতন। আর কখনও মুড়িকে এত মিষ্টি লাগেনি। পমির মন তখন আরও কাঁড়ি কাঁড়ি মুড়ি চাইছে, কিন্তু লজ্জায় মুখ ফুটে সে কিছু বলতে পারলে না।

লোকটি বললে, 'ও, লজ্জা হচ্ছে বুঝি? লজ্জা কী, এই নাও।'

তাদের আহার-পর্ব সমাপ্ত হল। পমি বললে, 'এইবারে আমাদের পথটা দেখিয়ে দেবেন?'

লোকটি বললে, 'দেব বইকি! এসো খুকুরানি, তোমাকে কোলে করে নিয়ে যাই।'

মিনিট ছয়-সাত পরেই তারা একটা পথের ধারে এসে পড়ল। তারপর মধুমতীকে কোল থেকে নামিয়ে লোকটি বললে, 'কেমন খোকাবাবু, এইবারে বাড়ি যেতে পারবে তো?'

পমি বললে, 'পারব।'

লোকটি চলে গেল। সে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর পমির মনে হল, মস্ত ভুল করে

ফেলেছে। ওই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো জানতে পারা যেত, মধুমতীদের রাজবাড়ি কোন দিক দিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু আর সে ভুল শোধরাবার কোনও উপায় নেই। মধুমতীকে নিয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পমি ভাবতে লাগল, এখন তারা কোনদিকে যাবে? ডান দিকে না বাঁ দিকে? এমন সময়ে দেখা গেল, একখানি ছাউনি-দেওয়া খালি গোরুর গাড়ি বাঁ দিক থেকে এসে ডান দিকে যাচ্ছে।

পমি চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ও গাড়োয়ানভাই, ও গাড়োয়ানভাই! রাজবাড়ি কোন দিকে বলতে পারো ভাই?'

গাড়োয়ান বললে, 'আমি তো সেইদিকেই যাচ্ছি খোকাবাবু!'

পমি মিনতি ভরা কণ্ঠে বললে, 'গাড়োয়ানভাই, আমাদের পায়ে বড়ো ব্যথা হয়েছে, আমরা আর হাঁটতে পারছি না! তোমার গাড়িতে আমাদের তুলে নেবে?'

মধুমতী ও পমির সুন্দর দু-খানি কচি মুখ দেখে গাড়োয়ানের প্রাণে বোধহয় দয়ার সঞ্চার হল। সে গাড়ি থামিয়ে নীচে নেমে পড়ে বললে, 'এসো খুকি, এসো খোকা, তোমাদের গাড়িতে উঠিয়ে দি।'

তাদের গাড়িতে তুলে নিয়ে নিজেও যথাস্থানে বসে গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমরা কোথায় যাবে?'

পমি বললে, 'রাজবাড়িতে।'

গাড়োয়ানের চোখে-মুখে ফুটল বিস্ময়ের চিহ্ন। কিন্তু মুখে কিছু না বলে সে আবার গাড়ি চালাতে শুরু করলে।

গোরুর গাড়ি যখন রাজবাড়ির দেউড়ির ভিতরে ঢুকছে, তখন চারিদিকে উঠল বিপুল বিস্ময়ের কোলাহল! চারিদিক থেকে ছুটে এল দাসদাসী, দারোয়ান এবং আরও কত লোক। সকলেরই মুখে এক কথা, 'রাজকুমারী এসেছে। রাজকুমারী এসেছে! রাজকুমারী এসেছে!'

তারই জন্যে যে এই গোলমালের উৎপত্তি, এটা বুঝতে পেরে মধুমতীর আনন্দের আর সীমা রইল না। নিজের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভুলে গোরুর গাড়ির উপরেই সে নাচতে নাচতে খিলখিল করে হাসতে শুরু করলে।

ইতিমধ্যে খবর পেয়ে স্বয়ং রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ রায় ও রানি ললিতাসুন্দরী প্রাসাদের ভিতর থেকে দ্রুতপদে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

রানি দু-খানি ব্যগ্র বাহু বাড়াতেই মধুমতী মায়ের বুকের ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আনন্দের আবেগে রানির চোখ দিয়ে দর দর ধারায় অশ্রু ঝরতে লাগল!

রাজা বললেন, 'চলো রানি, আগে ভিতরে চলো, তারপর মধুর মুখে সব কথা শুনব।'

ছাউনির ভিতরে চুপ করে বসে বসে পমি সব দেখতে ও শুনতে লাগল, কিন্তু তার দিকে কেউ ফিরেও চাইলে না। আর কোনওদিন মধুমতীর দেখা পাবে না বুঝে তার প্রাণটা কেমন হু হু করে উঠল।

মেয়েকে কোলে নিয়ে রানি কয়েক পদ অগ্রসর হয়েছেন, এমন সময় মধুমতী ব্যাকুল স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'থুপী! থুপী। আমাল থুপী কোতায়?'

রাজা আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'থুপী? থুপী আবার কে মধু?'

মধুমতী আঙুল তুলে গোরুর গাড়িটা দেখিয়ে দিলে, তারপর আবার চিৎকার করে ডাকলে, 'থুপী!'

ছাউনির ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে পমি বললে, 'কী মধুমতী?'

মধুমতী তার আধো আধো ভাষায় যা বললে তার অর্থ হচ্ছে এই, থুপীকে তার চাইই চাই! থুপীকে এখনই গাড়ি থেকে নেমে তার সঙ্গে বাড়ির ভিতরে আসতে হবে! নইলে সে-ও বাড়িতে যাবে না।

এই একটিমাত্র মেয়ে ছাড়া রাজার আর কোনও সন্তান নেই। কাজেই মধুমতীর সমস্ত আবদার ও হুকুম সর্বদাই তাঁকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে হত।

রাজা গোরুর গাড়ির কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'তুমিই থুপী?'

পমি গম্ভীর ভাবে বললে, 'না, আমার নাম পমি।'

—'তবে থুপী কে?'

—'আমাকে ও-নাম দিয়েছে মধুমতী।'

রাজা হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'মধুমতীর থুপী, তাহলে তুমিও গাড়ি থেকে নেমে আমাদের সঙ্গে বাড়ির ভিতরে চলো!'

পমির মুখে সমস্ত কথা শুনে রাজা বললেন, 'পমিবাবু, তুমি না থাকলে হয়তো আমার মধুকে আর ফিরিয়ে পেতুম না। মধুমতীকে হয়তো চোরে চুরি করে নিয়ে যেত, নয়তো কোনও পাষণ্ড গয়নার লোভে তাকে খুন করে ফেলত। তুমিই তাকে রক্ষা করেছ। তোমার এ উপকার আমি জীবনে ভুলব না। কিন্তু তুমি কে বলো দেখি?'

পমি তখন নিজের জীবন-কাহিনী রাজার কাছে বর্ণনা করলে—একেবারে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। সে কাহিনির ভিতর থেকে মোক্ষদা, যদুবাবু, বিন্দু, বনমালা—এমনকি নিমাই পর্যন্ত কেউ বাদ পড়ল না।

পমির দুর্ভাগ্যের ইতিহাস শুনে দয়ালু রাজার বুকটা ভরে উঠল দরদে। একটু ভেবে তিনি বললেন, 'পমিবাবু, আমার ইচ্ছা, মধুর খেলার সাথি হয়ে তুমি রাজবাড়িতেই থাকো। আমিও তোমাকে ছেলের মতন দেখব। কিন্তু মোক্ষদাদেবী হচ্ছেন তোমার অভিভাবিকা। তাঁর মত না নিয়ে আমি কিছুই করতে পারি না। আপাতত দিন-কয় তুমি এখানেই থাকো। তারপর তোমাকে নিয়ে আমি নিজে মোক্ষদাদেবীর কাছে যাব। দেখি, তিনি আমার মতে মত দেন কি না।'

॥ একাদশ ॥

মোক্ষদার মন এই প্রথম নরম হল

সেদিন সকালে উপরের ছাদের ধারে দাঁড়িয়ে বিন্দু যখন ফুলগাছে জল দিচ্ছিল, হঠাৎ দেখতে পেলে একখানা মস্ত বড়ো মোটরগাড়ি—এতবড়ো গাড়ি সে আর কখনও দেখেনি—তাদেরই সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিন্দু তো দস্তুরমতন হতভম্ব! মোক্ষদার বাড়ির সামনে মোটরগাড়ি কেউ কোনওদিন দেখেনি।

তারপরই শোনা গেল জোরে কড়া নাড়ার শব্দ। মোক্ষদা নিজের ঘর থেকে বাজের মতন চেঁচিয়ে বললেন, 'বিন্দি! ওলো অ বিন্দি! বলি, কানের মাথা খেয়েছিস নাকি? কে কড়া নাড়ছে শুনতে পাচ্ছিস না?'

মোক্ষদার মধুর কণ্ঠস্বর শুনে বিন্দুর ভাবটা কেটে গেল। সে নেমে তার ঘরে ঢুকে বললে, 'আমাদের বাড়িতে মস্ত একখানা হাওয়া গাড়িতে চড়ে কে এসেছে! সেইই কড়া নাড়ছে।'

মোক্ষদা অবিশ্বাসের স্বরে বললেন, 'বাজে বকিস নে, পাগল হয়েছিস নাকি?'

—'আচ্ছা, কে পাগল, তা এখন বোঝা যাবে।' এই বলে বিন্দু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মোক্ষদা উঠে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন, সত্যিই তাঁর সদরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড একখানা মোটরগাড়ি। এ যে অভাবিত ব্যাপার! মোক্ষদা অত্যন্ত বিপদগ্রস্তের মতন উত্তেজিত হয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

বিন্দু ফিরে এসে বললে, 'একটি ভদ্রলোক এসেছেন। তিনি তোমাকে এই কাগজখানা দিলেন।'

বিন্দুর হাত থেকে ছোটো একখানা কাগজ নিয়ে মোক্ষদা পড়ে দেখলেন।

'রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ রায় একটি বিশেষ দরকারে শ্রীমতী মোক্ষদাদেবীর সঙ্গে দেখা করতে চান।'

কাগজখানা পাঠ করে মোক্ষদার মাথা বন বন করে ঘুরতে লাগল। মোক্ষদা বুঝতে পারলেন না যে, তিনি পায়ের উপর না মাথার উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ রায়! কী সৌভাগ্য, কী সর্বনাশ! আমার বাড়িতে রাজা-রাজড়া! আমার সঙ্গে দেখা করতে চান রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ রায়?

মোক্ষদা ধপাস করে মাটির উপরে বসে পড়ে হাপরের মতন হাঁপাতে লাগলেন। বিন্দু ভয়ে চমকে বলে উঠল, 'কী হল গিন্নীমা, কী হল?'

মোক্ষদা বললেন, 'ওরে বিন্দি, আমার বাড়িতে এসেছেন কোনও দেশের রাজা! আমি কি করব রে বিন্দি! কী পরে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াব? যা, যা, দৌড়ে চিরুনি আরশি

সাবান নিয়ে আয়! শিগগির একখানা ভালো দেখে কাপড় এনে দে! বেশিক্ষণ বসে থাকলে রাজা বাহাদুর আবার চটে যাবেন। ওরে বিন্দি, এ আমার কী হল রে, আমি হাসব কি কাঁদব বুঝতে পারছি না যে রে—যা, যা, শিগগির যা রে বিন্দি পোড়ামুখী!'

মিনিট পাঁচ-সাত পরে পোশাক বদলে মোক্ষদা কাঁপতে কাঁপতে নীচের বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকে ভূমিষ্ঠ হয়ে রাজা বাহাদুরকে প্রণাম করলেন।

রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ অল্প কথার মানুষ। তিনি প্রথমেই বললেন, 'মোক্ষদাদেবী, আপনিই তো পমির খুড়িমা?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, রাজামশাই।'

—'আমি যদি পমিকে মানুষ করবার ভার নি, তাহলে আপনার কিছু আপত্তি আছে কি?'

মোক্ষদা অতিশয় বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আপনি নেবেন পমির ভার!'

—'হ্যাঁ মোক্ষদাদেবী, তাকে আমি নিজের ছেলের মতন দেখব!'

মোক্ষদার দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। তাঁর মাথা আবার ঘুরতে আরম্ভ করলে। তিনি কথা কইতে পারলেন না।

—'বলুন মোক্ষদাদেবী, আপনার মত কী?'

—'আমার আবার মত কী রাজামশাই? এ যে আমার মস্ত সৌভাগ্য!'

—'ধন্যবাদ মোক্ষদাদেবী, আপনার মত পেয়ে সুখী হলুম। হ্যাঁ, আর এক কথা, পমিবাবুর ইচ্ছা, বনমালাও তার সঙ্গে থাকে। আপনি কী বলেন?'

ঠিক যেন আকাশ থেকে পড়ে মোক্ষদা বললেন, 'বনমালা!'

—'হ্যাঁ, সেই ছোট্ট মেয়েটি!'

বিন্দু এতক্ষণ দরজার কাছে মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে ছিল।

সেইখান থেকেই সে বললে, 'রাজাবাবু, বনমালাকে আমার বোনের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। হুকুম পেলেই তাকে আমি নিয়ে আসব। আমার বোন এই পাড়াতেই থাকে।'

রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'হ্যাঁ, তাকে এখনই নিয়ে এসো। বনমালা আমার সঙ্গেই যাবে।'

বিন্দু অদৃশ্য হল। কিন্তু মোক্ষদার মনে হতে লাগল, তিনি যেন এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখছেন। বনমালা কে? রাজা বাহাদুর তাকে নিয়ে যেতে চান কেন? আর বিন্দুই বা তাকে চিনলে কেমন করে? এসব কী!

কিন্তু এসবের কোনও উত্তর পাবার আগেই রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ আবার বললেন, 'মোক্ষদাদেবী, পমি আমার গাড়িতেই আছে। আপনি কি তাকে দেখবেন?'

মোক্ষদা বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ রাজামশাই!'

একটু পরেই পমি এসে মোক্ষদাকে প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো নিলে।

মোক্ষদা বললেন, 'দ্যাখো পমি, আমি তোমাকে বাইরে পাঠিয়েছিলুম বলেই আজ তোমার অদৃষ্ট ফিরে গেল।'

—'এবার থেকে ভালো হবার জন্য চেষ্টা কোরো। রাজামশাইকে দেবতার মতন ভক্তি কোরো।'

—'হ্যাঁ, খুড়িমা।'

রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলো পমিবাবু, এইবারে আমরা গাড়িতে গিয়ে বসিগে।'

রাজার সঙ্গে পমি সদর পর্যন্ত গিয়েছে, এমন সময় বনমালাকে নিয়ে বিন্দু এসে হাজির। বনমালার দেহখানি এখনও তেমনি ছিপছিপে আছে বটে, কিন্তু সে ফিরে পেয়েছে তার শ্রী। তার মাথার চুলগুলি হয়েছে চিকন, ডাগর চোখ দুটি হয়েছে উজ্জ্বল, গায়ের রং হয়েছে তাজা ও সুন্দর। তাকে দেখলেই ভালোবাসতে আর আদর করতে সাধ হয়।

আনন্দ ভরে তার হাত ধরে পমি বললে, 'বনমালা।'

বনমালা লাজুক হাসি হেসে বললে, 'পমি!'

গাড়ির ভিতরে বসেছিল মধুমতী। সে ঝরনার মতন কলস্বরে হেসে উঠে দুটি হাত নেড়ে নেড়ে ডাকতে লাগল পমি আর বনমালাকে।

রাজা বললেন, 'চলো পমিবাবু, চলো বনমালা, মধু তোমাদের ডাকছে।'

পমি আবার মোক্ষদার পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'বিন্দু, তাহলে আমি আসি?'

চোখের জল ঢাকবার জন্যে বিন্দু নিজের মুখে আঁচল চাপা দিলে।

পমি ও বনমালা গাড়িতে উঠে মধুমতীর দুই পাশে গিয়ে বসল। মোক্ষদা বললেন, 'মনে রেখো পমি, ভদ্রলোকের ছেলের উচিত—'

ভদ্রলোকের ছেলের পক্ষে যে উচিত কী, পমি তা শোনবার আগেই গাড়ি ছেড়ে দিলে।

গাড়ি যখন একটু এগিয়েছে পমি তখন ফিরে দেখলে, মোক্ষদা কাঠের মূর্তির মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাঁর পিছনে দেখা যাচ্ছে বিন্দুকে। সে তখনও মুখ ঢেকে কাঁদছে।

দেড়শো
খোকার কাণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলকাতা যাত্রার আয়োজন

মা কমলা ডাকলেন, 'খোকন—'

বাধা দিয়ে ভারিক্কে চালে গোবিন্দ বললে, 'আমাকে আর তুমি খোকন বলে ডেকো না মা। মনে রেখো, পরশুদিন আমি দশ বছরে পড়েছি!'

কমলা হেসে বললেন, 'ওরে বাছা, আমার কাছে তুই খোকন থাকবি চিরদিনই।...এখন যা বলি শোন। শিগগির সাবান মেখে চান করে আয়।'

সাবানকে গোবিন্দ বরাবরই ভয় করত—পৃথিবীর অন্যান্য খোকাদের মতো। ক্ষীণ প্রতিবাদ জানিয়ে বললে, 'চান যেন করছি। কিন্তু সাবান কি না মাখলেই নয়?'

কমলা বললেন, 'সাবান না মাখলে তোর মাসি তোকে নোংরা ছেলে বলে ঘেন্না করবেন।'

অগত্যা মাথা চুলকোতে চুলকোতে গোবিন্দের প্রস্থান।

কমলা আবার সেলাইয়ের কল চালাতে লাগলেন।

একটু পরেই ঘরে ঢুকে পাশে এসে বসলেন, পাড়ার নিস্তারিণী ঠাকরুন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'গোবিন্দ তাহলে আজকেই কলকাতায় যাচ্ছে?'

কমলা একটি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'হ্যাঁ দিদি। আমাকে ছেড়ে খোকনের যেতে ইচ্ছে ছিল না, ওকে একরকম জোর করেই পাঠাতে হচ্ছে। পুজোর ছুটিতে এখানে থেকে করবে কী? আমার ছোটবোন বিমলা আমাদের কলকাতায় নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু আমি কী করে যাই বলো? পুজোর সময়ে যা কাজের ভিড়! দিন রাত খাটি, তবু কাজ ফুরোয় না!'

নিস্তারিণী বললেন, 'কিন্তু গোবিন্দ কি একলা কলকাতায় যেতে পারবে?'

কমলা বললেন, 'তা পারবে না কেন? গোবিন্দ আমার যা চালাক ছেলে! আমি নিজে গিয়ে ওকে ইস্টিশানে তুলে দিয়ে আসব। হাওড়ায় ওর মাসির বাড়ি থেকে লোক এসে ওকে নিয়ে যাবে।'

নিস্তারিণী বললেন, 'গোবিন্দ কখনও তো কলকাতায় যায়নি, কলকাতা ওর খুবই ভালো লাগবে! কলকাতা হচ্ছে ছেলে-মেয়েদেরই দেখবার শহর! রাত হলেও সেখানে অন্ধকার হয় না! আর মোটরগাড়িগুলো দিন-রাত কী চ্যাঁচায়—মা, মা, মা! কান বলে কালা হয়ে যাই!'

এমন সময় গোবিন্দ কোনওরকমে স্নানের কঠিন কর্তব্য সেরে এসে বললে, 'কলকাতায় কতগুলো মোটর আছে?'

—'তা কী করে জানব বাছা? তবে দেখলে তো মনে হয় যত মানুষ তত মোটর! বাব্বাঃ! সিধে যমের বাড়ি যাবার গাড়ি!'

কমলা বললেন, 'খোকন, এইবার শোবার ঘরে যাও! সেখানে তোমার সব পোশাক বার করে রেখে এসেছি। ভালো করে মোজা পোরো, জুতার ফিতে বাঁধতে ভুলো না।'

—'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, অত আর বুঝিয়ে বলতে হবে না, আমি কচি খোকা নই'—এই বলেই গোবিন্দ এক ছুটে অদৃশ্য হল।

নিস্তারিণী বিদায় নিলেন। কমলাও সেলাই ছেড়ে উঠে ভাত বাড়তে গেলেন।

খানিক পরে পোশাক পরে এসে গোবিন্দ বললে, 'আচ্ছা মা, বলতে পারো আমার এই নীল রঙের প্যান্ট-কোট তৈরি করেছে কোন দর্জি?'

—'কেন বল দেখি?'

—'তাহলে আমার এয়ার গান ছুড়ে তাকে গুলি করে মেরে ফেলি!'

—'উঃ, খোকন আমার মস্ত বীর!'

—'ভদ্রলোকেরা কখনও নীল রঙের পোশাক পরে? আমি কি খালাসি?'

—'নীল রঙের পোশাক পরবার জন্যে কত ছেলে কেঁদে সারা হয়, তোর কি সব তাতেই বাড়াবাড়ি বাছা? নে, এখন খেতে বোস।'

আজ রান্নার কিছু ঘটা ছিল। মাছের 'ফ্রাই', মুড়ো দিয়ে ডাল, গলদা চিংড়ি দিয়ে ফুলকপির তরকারি, আমের চাটনি, পায়স, সন্দেশ, রসগোল্লা। গোবিন্দবাবুর দেহটি ছোট্ট হলেও পেটটি বড়ো সামান্য নয়, দেখতে দেখতে সমস্ত খাবার স্বপ্নের মতো অদৃশ্য হয়ে গেল, অথচ তখনও তার খিদে কমেনি। অন্তত আরও তিন-চারটে রসগোল্লা চাওয়া উচিত কি না, সে যখন মনে মনে এই কথা চিন্তা করছে, তখন হঠাৎ তার নজরে পড়ল, নীল প্যান্টের ওপরে পায়সের সাদা দাগ! পাছে মা দেখে ফেলেন, সেই ভয়ে চটপট উঠে পড়ল।

মা তখন অন্য কথা ভাবছেন। বললেন, 'খোকন, কলকাতায় পৌঁছেই আমাকে চিঠি লিখতে ভুলো না।'

হাত দিয়ে টুক করে পায়সের দাগটা মুছে ফেলে গোবিন্দ বললে, 'হ্যাঁ, চিঠি লিখব বইকী মা।'

—'খুব সাবধানে থেকো বাছা! কলকাতা আমাদের কালীপুরের মতন ঠাঁই নয়। তারপর সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার কোরো, আমাকে যেমন জ্বালাও তেমন যেন জ্বালিয়ো না।'

গম্ভীর স্বরে গোবিন্দ বললে, 'স্বীকার করছি, আমি খুব ভালো ছেলের মতন থাকব।'

ছেলেকে নিয়ে কমলা আবার শোবার ঘরে ফিরে এলেন। বাক্স খুলে কখানা নোট বার করে গুনে বললেন, 'খোকন, এই একখানা একশো টাকার আর দুখানা দশ টাকার নোট তোমার দিদিমাকে দিয়ো। মাকে বোলো, এ-বছর পুজোর সময়ে এর বেশি আর কিছু দিতে পারলুম না। আর এই পাঁচ টাকার নোটখানা হচ্ছে তোমার জন্যে। কিছু নিজে খরচ কোরো, বাকি আসবার সময়ে রেলভাড়া দিয়ো। এই দ্যাখো, নোটগুলো আমি খামের ভেতরে পুরে দিলুম। নাও, সাবধানে রাখো।'

গোবিন্দ অল্পক্ষণ ভাবলে। তারপর খামখানা নিয়ে কোটের ভিতরকার পকেটে রেখে বললে, 'ব্যাস! নোটের পা নেই, পকেট থেকে আর বেরিয়ে পড়তে পারবে না!'

কমলা বললেন, 'দ্যাখো, রেলগাড়িতে কারুর কাছে বোলো না যেন, তোমার পকেটে এত টাকা আছে!'

গোবিন্দ আহত স্বরে বললে, 'তুমি কি ভাবো মা, আমি এতই বোকা? জানো, আমি দশ বছরে পড়েছি?'

কমলা বললেন, 'তবু সাবধানের মার নেই!'

তোমাদের মধ্যে যারা বড়োলোকের ছেলে, তারা হয়তো ভাবতে পারো, মোটে একশো পঁচিশ টাকার জন্যে কমলা এতবেশি মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? যাদের পাঁচ-সাত লাখ টাকা আছে তাদের কাছে হয়তো একশো-দেড়শো টাকা এমন কিছুই নয়, কিন্তু গোবিন্দের মা যে বড়ো গরিব!

গোবিন্দের বয়স যখন তিন বছর, তখনই তার বাবা মারা যান। সেইদিন থেকেই ছেলে মানুষ করবার ভার পড়ে এই অসহায়া বিধবার উপরে। কালীপুর গ্রামে নিজের বসতবাড়ির একতলায় কমলা একটি ছোটো ইশকুল খুলেছেন, পাড়ার ছোটো ছোটো মেয়েরা সেখানে লেখাপড়া করতে আসে। তাদের কাছ থেকে সামান্য যে মাহিনা পান, তাতে তাঁর সংসার চলে না। কাজেই পাড়ার লোকের জামা প্রভৃতি তৈরি করে দিয়ে তাঁকে আরও-কিছু রোজগার করতে হয়। এই আয় থেকেই তিনি কোনওরকমে সংসারের খাই-খরচ চালান, গোবিন্দের ইশকুলের মাহিনা ও পুথিপত্র কেনবার খরচ দেন, নিজের বুড়ি মাকেও বছরে বছরে কিছু সাহায্য করেন।

গোবিন্দও বড়ো ভালো ছেলে। মাকে সে যেমন ভক্তি করে, তেমনি ভালোবাসে। মায়ের খাটুনি কমাবার জন্যে সে খেলাধুলো ফেলে সংসারের নানান কাজ করে নিজের হাতে। তোমরা শুনলে অবাক হবে যে, গোবিন্দ তরি-তরকারি কোটা থেকে রান্নাবান্না পর্যন্ত অনেক কাজই শিখে ফেলেছে।...

কমলা বললেন, 'এই ব্যাগটার ভেতরে তোমার জামা-কাপড় রইল। ব্যাগটা যদি বেশি ভারী মনে হয়, তাহলে মুটে ডেকো।'

ব্যাগটা হাতে নিয়ে গোবিন্দ বললে, 'না, আমি মুটে ডাকব না! তোমার গোবিন্দ আর খোকা নয়!'

কমলা বললেন, 'তোমার মাসি ভারী ফুল ভালবাসেন! বাগান থেকে তাই আমি গোলাপ আর রজনীগন্ধা কাগজে মুড়ে রেখেছি। এগুলো মাসিকে দিয়ো।'

ফুলগুলি আর-একহাতে নিয়ে গোবিন্দ বললে, 'ঘড়িতে কটা বাজল দ্যাখো।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়েই কমলা ব্যস্ত স্বরে বলে উঠলেন, 'ওমা, নটা বাজে যে! গাড়ি ছাড়বে সাড়ে নটায়! চলো চলো, আমরা বেরিয়ে পড়ি!'

—'মা, এই আমি 'কুইক মার্চ' আরম্ভ করলুম!'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যাত্রা

মায়ের সঙ্গে পালকিতে চড়ে গোবিন্দ স্টেশনে গিয়ে নামল।

দেখা গেল, স্টেশনের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে নটবর ওঝা। এয়া ভুঁড়ি, এয়া গোঁফ-দাড়ি, হাতে এয়া মস্ত লাঠি! সে হচ্ছে গাঁয়ের একজন চৌকিদার।

নটবর বললে, 'কী গো মা-ঠাকরোন, ছেলেকে সাহেব সাজিয়ে কোথায় নিয়ে চলেছ? বিলেতে নাকি?'

কমলা বললেন, 'না গো নটবর, খোকন যাচ্ছে কলকাতায় বেড়াতে।'

কিন্তু গোবিন্দ তখন নটবরকে দেখছিল না, দেখছিল রাশি রাশি সর্ষেফুল! এই কাল বৈকালেই সে যখন হেবো, ভুতো, মোনার সঙ্গে মুখুয্যেদের বাগানে পেয়ারাগাছে উঠে পাকা পেয়ারা লুণ্ঠনে ব্যস্ত ছিল, তখন নটবর হঠাৎ এসে পড়েছিল সেখানে। অবশ্য তারা সবাই এক এক লাফে বানরের মতো ভূতলে অবতীর্ণ হয়ে, হরিণের মতো বেগে ছুটে লম্বা দিতে দেরি করেনি বটে, কিন্তু তবু তার বিশ্বাস, নটবর তাকে ঠিক চিনে ফেলেছিল! এখন কী হবে? নটবর যদি তাকে ধরে ফাঁড়িতে নিয়ে যায়?

ভাগ্যে নটবর তখন আর কিছু না বলে সেখান থেকে চলে গেল!

গোবিন্দ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে বললে, 'নটবর এখন কিছু করলে না বটে, কিন্তু আমি ফিরে এলেই নিশ্চয় আমাকে গ্রেপ্তার করবে।'

স্টেশনে ঢুকে কমলা বললেন, 'খোকন, তুমি ততক্ষণ গাড়িতে গিয়ে উঠে বসো, আমি টিকিট কিনে আনি। ব্যাগটা যদি গাড়িতে নিজে না তুলতে পারো, আর কারুকে তুলে দিতে বোলো!'

—'ভারী তো ব্যাগ! আমি খোকা নই। তুমি টিকিট কিনে আনো, আমি এইখানেই দাঁড়িয়ে আছি।'

টিকিট কিনে এনে কমলা বললেন, 'দ্যাখো খোকন, হাওড়ার ইস্টিশানে যেন হারিয়ে যেয়ো না!'

এইবারে গোবিন্দের রাগ হল। বললে, 'মা, তুমি বড্ড বেশি গিন্নিপনা করছ! একশোবার

বলছি, আমি খোকাও নই বোকাও নই! হারাব কি বলো? আমি কি সিকি পয়সার মতো ছোটো?'

'আর টাকা সাবধান?'

গোবিন্দ পকেটের উপরে হাত রেখে অনুভবে বুঝলে, টাকা আছে যথাস্থানেই। বললে, 'মা, তোমার টাকা সুখে নিদ্রা দিচ্ছে। এখন গাড়ির দিকে চলো।'

দুজনে পায়ে পায়ে এগুলো। গোবিন্দ বললে, 'মা, পুজোর সময়ে সারা দিন তুমি অত খেটো না। আমি চললুম, বাড়িতে তোমাকে দেখবার লোক কেউ রইল না। দ্যাখো, অসুখ করে না যেন। ভয় নেই, দরকার হলে আমি 'এরোপ্লেনে' চড়ে হুস করে তোমার কাছে এসে পড়ব।' সে আদর করে মাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলে।

দূরে ট্রেনের শব্দ পাওয়া গেল।

কমলা বললেন, 'তোর মাসতুতো বোন নমিতা বোধহয় তার সাইকেলে চড়ে তোকে ইস্টিশান থেকে নিয়ে যেতে আসবে।'

গোবিন্দ আশ্চর্য হয়ে বললে, 'মেয়ে আবার সাইকেলে চড়ে নাকি?'

কমলা বললেন, 'তোর মেশোমশাইয়ের ছেলে হয়নি কিনা, তাই মেয়ের কোনও আবদারেই 'না' বলতে পারেন না। নমুর আবার ভারী গোঁ, যা ধরে ছাড়ে না। তোর মেশো তাকে ঠিক বেটাছেলের মতনই মানুষ করেছেন।'

—'নমিতার বয়স কত?'

—'তোর চেয়ে এক বছরের ছোটো। খুব ছেলেবেলায় তোরা একসঙ্গে খেলা করেছিস। এখন বোধহয় তোরা কেউ কারুকে দেখলে চিনতে পারবি না।'

ট্রেন প্লাটফর্মে এসে দাঁড়াল।

—'খোকন, দেখো বাছা যেন ভুল করে কোনও আগের ইস্টিশানে নেমে পোড়ো না!'

—'আচ্ছা।'

—'হাওড়ায় তোমাকে নিতে লোক আসবে।'

—'আচ্ছা গো আচ্ছা।'

—'কারুর সঙ্গে ঝগড়া কোরো না।'

—'না।'

—'রোজ সাবান মেখে চান কোরো!'

—'হুঁ।'

—'হারিয়ে যেয়ো না।'

—'না।'

—'চিঠি লিখো।'

—'তুমিও লিখো।'

এইভাবে কথাবার্তা চলত বোধহয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কিন্তু স্টেশনের ঘণ্টা আর সময় দিলে না। ঢং ঢং ঢং করে সে বেজে উঠল, গোবিন্দও গাড়িতে উঠে পড়ল।

—'দুর্গা, দুর্গা।....... খোকনমণি!'

—'মা!'

গোবিন্দ জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মায়ের গালে চুমু খেলে।

মা চুপিচুপি বললেন, 'টাকা সাবধান!'

—'ভয় নেই মা, টাকা ঘুমুচ্ছে!'

গার্ড নিশান নাড়তে লাগল। ইঞ্জিন বাঁশি বাজালে। গাড়ি চলতে শুরু করলে।

গাড়ির জানলায় গোবিন্দের এবং প্লাটফর্মে কমলার চোখ করছে ছল ছল। দেখতে দেখতে গোবিন্দকে নিয়ে ট্রেনখানা যেন দৌড়ে পালিয়ে গেল! কমলার চোখ উপচে দুই গাল বয়ে তখন জল পড়ছে। গোবিন্দ ছাড়া তাঁর যে নিজের বলতে আর কেউ নেই!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কামরার ভিতরে

জানলার দিকে পিছন ফিরে গোবিন্দ সকলের উদ্দেশে নমস্কার করলে।

কামরার এক ভদ্রলোক আর সবাইকে বললেন, বাঃ, ছেলেটি তো খাসা দেখছি! আজকালকার ছেলেরা এমন নম্র হয় না। আমার নিজের ছেলেগুলো তো পাজির পা ঝাড়া।'

কালীপুরের বিষ্ণু চক্রবর্তী সেই ট্রেনেই যাচ্ছিলেন, তিনি নামবেন পরের স্টেশনে। চক্রবর্তী বললেন, 'গোবিন্দ হচ্ছে আমাদের গাঁয়ের সেরা ছেলে।'

গোবিন্দ বুকের কাছে জামার উপরে হাত দিলে। পকেটের ভিতরে নোটগুলো খড়মড় করে উঠল। তখন সে খুশি হয়ে আসনের উপরে ভালো করে জাঁকিয়ে বসল।

একবার প্রত্যেক আরোহীর মুখের পানে তাকিয়ে দেখলে। কারুকেই দেখে চোর, গাঁট-কাটা বা হত্যাকারী বলে মনে হল না। এক কোণে একটি মহিলা বসে কোলের ছেলের কান্না থামাবার চেষ্টা করছেন। একজন ছোট্টখাট্ট রোগা ভদ্রলোক মস্তবড়ো ও মোটা বর্মা চুরট টানছেন। আর একটি লোক অন্য কোণে বসে নিজের মনে খবরের কাগজ পড়ছে। তার মাথায় গান্ধি-টুপি।

হঠাৎ সে খবরের কাগজখানা নামিয়ে পাশে রাখলে। পকেট থেকে গুটি-চারেক চকোলেট বার করে গোবিন্দের হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, 'এই নাও খোকাবাবু, চকোলেট খাও।'

গোবিন্দ গম্ভীর স্বরে বললে, 'থ্যাঙ্ক ইউ। কিন্তু আমার নাম খোকাবাবু নয়—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়।'

কামরার সবাই হেসে উঠল। লোকটাও হেসে বললে, 'নমস্কার গোবিন্দবাবু। পরিচয় পেয়ে খুশি হলুম। আমার নাম জটাধর। —কোথা থেকে আসা হচ্ছে?'

—'দেখলেন তো, কালীপুর থেকে।'

—'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

—'কলকাতায়।' বলেই গোবিন্দ আর একবার টাকার পকেটে হাত দিলে। নোট বললে, 'খড়মড় খড়মড়!' গোবিন্দ মনে মনে বললে —'বহুৎ আচ্ছা।'

—'এর আগে কলকাতায় গিয়েছ?'

—'না!'

জটাধর আরও এগিয়ে তার পাশে বসে বললে, 'তাহলে কলকাতা দেখে তোমার পেটের পিলে চমকে যাবে। কলকাতার এক-একখানা বাড়ি একশো তলা উঁচু। পাছে তারা ঝড়ে হেলে পড়ে যায়, সেই ভয়ে তাদের আকাশের সঙ্গে শিকলি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়।......ওখানে কারুর যদি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় খুব তাড়াতাড়ি যাবার দরকার থাকে, তাহলে তাকে প্যাক করে ডাকবাক্সে ফেলে দেওয়া হয়.....ওখানে কারুর যদি এক হাজার টাকা ধার করবার ইচ্ছা হয়, তাহলে সে ব্যাংকে গিয়ে নিজের মস্তিষ্ক ব্যাংকের জিম্মায় বাঁধা রেখে টাকা নিয়ে আসে.....ওখানে—'

যিনি বর্মা চুরট টানছিলেন তিনি হঠাৎ বাধা দিয়ে বললেন, 'মশাইয়ের মস্তিষ্ক বোধহয় এখন ব্যাংকের জিম্মায় বাঁধা আছে? আজগুবি যা তা বলে ছেলেমানুষকে এমন ভয় দেখাচ্ছেন কেন?'

তখন বর্মা চুরটের সঙ্গে গান্ধি-টুপির এমন জোর তর্ক লেগে গেল যে, ও-কোণ থেকে কাঁদুনে খোকাটাও ভয়ে কান্না থামিয়ে ফেললে।

গোবিন্দ কিন্তু কিছুই গ্রাহ্য করলে না! এই খানিকক্ষণ সে একপেট খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে বটে, কিন্তু আবার তার খিদে পেল। মায়ের দেওয়া খাবারের কৌটা বার করে সে খেতে বসল লুচি ও আলুর দম।

ইতিমধ্যে ট্রেনখানা একটা বড়ো স্টেশনে এসে থামল। গোবিন্দ কিন্তু সেদিকে চেয়েও দেখল না; কারণ সে তখন সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছে, লুচির থাকের তলায় রয়েছে দুটো বড়ো বড়ো সিদ্ধ হাঁসের ডিম!

দশখানা লুচি, আটটা আলুর দম এবং দুটো ডিম সাবাড় করবার পর গোবিন্দ আবার মুখ তুলে চারিদিকে তাকাবার সময় পেলে। একী, কামরার ভিতরে গান্ধি-টুপি ছাড়া আর কারুকেই দেখা যাচ্ছে না যে! ওই বড়ো স্টেশনে সবাই নেমে গিয়েছে নাকি?

ট্রেন ফের চলতে শুরু করলে। কামরায় আছে খালি সে আর জটাধর। গোবিন্দের এটা ভালো লাগল না। সে অজানা লোক অচেনা ছেলেকে চকোলেট খেতে দেয় আর অদ্ভুত গল্প বলে, আর যার নাম জটাধর, তাকে তার পছন্দ হয় না।

গোবিন্দ ভাবলে, আর একবার পকেটে হাত নিয়ে দেখব নাকি? ......না বাবা, খালি-খালি পকেটে হাত দিচ্ছি দেখে জটাধর যদি কোনও সন্দেহ করে? তার চেয়ে মুখ ধোবার ঘরে যাই।

তাই গেল। পকেট থেকে খামখানা বার করলে এবং খাম থেকে বার করলে নোটগুলো। গুনে দেখলে, ঠিক আছে। ভাবলে, নোটগুলো কি আরও ভালো করে রাখা যায় না?

হঠাৎ গোবিন্দের মনে পড়ল, স্টেশনের প্লাটফর্মে সে একটা সবচেয়ে বড়ো আলপিন কুড়িয়ে পেয়েছে। সেই আলপিনে নোটের সঙ্গে খামখানা গেঁথে সে জামার সঙ্গে আটকে রাখলে। 'হুঁ, এখন আর কিছু ভয় নেই!' গোবিন্দ নিশ্চিন্ত হয়ে আবার কামরায় ফিরে গেল।

জটাধর তখন মুখের উপরে খবরের কাগজখানা চাপা দিয়ে হেলে পড়েছে এবং তার নাক ডাকছে ঘড়-ঘড় ঘড়-ঘড় করে। 'আঃ বাঁচা গেল বাবা, লোকটার সঙ্গে আর আজে-বাজে বকে মরতে হল না—এই ভেবে সে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালে।

বাহবা, কী মজা! মস্ত মস্ত গাছ, বড়ো বড়ো ঝোপ, পানা-ভরা পুকুর, হেলে-পড়া কুঁড়েঘর, লাঙল-ঠেলা চাষা,—সব আসছে আর যাচ্ছে যেন বেগে ঘুরন্ত গ্রামোফোনের রেকর্ডের উপর চড়ে! মাটি ছুটছে, গ্রাম ছুটছে, অরণ্য ছুটছে—ছুটছে না খালি আকাশ, আর তাদের গাড়িখানা!

কিন্তু এসব ছুটোছুটি আর কতক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা যায়? গোবিন্দ চোখ ফিরিয়ে নিলে।

ওরে বাবা-রে বাবা, জটাধরের ওই মোটা নাকের ভিতরে কি ঝোড়ো-হাওয়া বাসা বেঁধেছে, না ওখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে বাজের বাচ্ছা! অত বেশি নাক ডাকাই বা কতক্ষণ ধরে শোনা যায়?

গোবিন্দের ইচ্ছে হল, কামরার মধ্যেই খানিক চলে-ফিরে বেড়াতে। তারপরেই সে ভাবল, তার পায়ের শব্দে যদি জটাধরের ঘুম ভেঙে যায়! বেড়ানো হল না। সে বসে বসে জটাধরের মুখখানা ভালো করে দেখতে লাগল।

লম্বাটে ঘোড়ার মতন মুখ,—বিচ্ছিরি! কান দুটো যেন তেড়ে-মেড়ে মুখ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে! আ মরি মরি, ওই মুখে আবার শখ করে রাখা হয়েছে প্রজাপতি-গোঁফ! ঠোঁট-দুখানা কি পুরু-রে বাবা! ও মুখে গান্ধি-টুপি মানায় না। জটাধর গান্ধি-টুপি পরেছে কেন?

ইস! গোবিন্দ ভারী চমকে উঠল! সে যে আর একটু হলেই ঘুমিয়ে পড়েছিল! ...না, কিছুতেই ঘুমনো-টুমনো চলবে না! আহা, গাড়িতে এখন যদি আর কোনও যাত্রী আসে তাহলে বড়ো ভালো হয়। ট্রেন আরও কয়েকটা স্টেশনে থামল, কিন্তু গোবিন্দের দুর্ভাগ্যক্রমে আর কোনও নতুন যাত্রী সেই কামরায় উঠল না।

আরে মোলো, আবার যে ঘুম পায়! গোবিন্দ নিজের পায়ে চিমটি কাটতে লাগল। তাদের কেলাসে যখন আঁকের মাস্টার কৈলাসবাবু সবিস্তারে অঙ্কশাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে বসতেন, তখন এই উপায়েই গোবিন্দ ঘুমের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করত।

উপায়টা এখানেও কিছুক্ষণ কাজে লাগল। যেমন ঢুলুনি আসে, অমনি পায়ে চিমটি কাটা! ঘুম তো ঘুম, চিমটির কাছে ঘুমের বাবাও এগুতে রাজি নন! গোবিন্দ অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, আচ্ছা, ঘুমেরও কি বাবা আছে? তার নাম কী?...

...আচ্ছা, তার মাসতুতো বোন নমিতাকে দেখতে কেমন? মোটা, না ছিপছিপে? বেঁটে, না ঢ্যাঙা? মা বললেন, তার সঙ্গে আমি নাকি ছেলেবেলায় খেলা করেছি! কিন্তু তার মুখ আমার মনে হচ্ছে না তো। তবে একটা কথা আমি ভুলিনি। নমিতা আমার সঙ্গে কুস্তি লড়তে চেয়েছিল! এক ফোঁট্টা একটা মেয়ে, ব্যাটাছেলের সঙ্গে কুস্তি লড়তে চায়! একটা ল্যাং মারলে কোথায় ঠিকরে পড়ত তার ঠিক নেই। ধ্যাত? আমি লড়তে রাজি হইনি।

ইস! এবারে যে ঢুলে বেঞ্চি থেকে নীচে পড়ে যাচ্ছিলুম! চিমটি কেটে কেটে পায়ে কালশিরে পড়ে গেল, তবু ঘুম ছাড়ে না যে!......না, আর এক কাজ করি। জামার বোতামগুলো গুনে দেখা যাক!—কী আশ্চর্য! ওপর থেকে নীচের দিকে গুনে দেখছি, চারটে বোতাম। কিন্তু নীচে থেকে ওপর দিকে গুনলে হচ্ছে পাঁচটা। এর মানে কী?

মানে বোঝা হল না। এবারে গোবিন্দের দুই চোখের উপরে ভেঙে পড়ল যেন ঘুমের পাহাড়! গোবিন্দ একেবারে কাত!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দের স্বপ্নদর্শন

আচম্বিতে গোবিন্দ দেখলে, ছেলেবেলাকার খেলাঘরের রেলগাড়ির মতন এ ট্রেনখানাও চাকার মতন গোল হয়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছুটে চলেছে।

সে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলে, সবাই যেন গিয়েছে উলটেপালটে। মণ্ডলটা ক্রমেই ছোটো হয়ে আসছে, ইঞ্জিনটা ওদিক দিয়ে ফিরে ক্রমেই গার্ডসায়েবের শেষ-গাড়ির কাছে এগিয়ে আসছে! কুকুর যেমন গোল হয়ে নিজের ল্যাজ কামড়াবার চেষ্টা করে, এ ট্রেনখানাও যেন তাই করতে চায়। আর এই মণ্ডলের মধ্যে রয়েছে নানান জাতের গাছ আর মস্ত একটা কাচের ঘর আর হাজার হাজার জানলাওয়ালা একখানা দুশো তলা বাড়ি।

গোবিন্দের জানতে সাধ হল, এখন ঘড়িতে কটা বেজেছে। সে পকেটে হাত ঢুকিয়ে টেনে বার করলে প্রকাণ্ড এক ঘড়ি, যেটা টাঙানো থাকে তাদের বৈঠকখানার দেওয়ালে। ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলে, লেখা রয়েছে, 'গাড়ি দৌড়াচ্ছে ঘণ্টায় দুশো পাঁচ মাইল। কামরার মেঝেয় থুতু ফেললে তোমার প্রাণদণ্ড হবে।'

সে আবার বাইরের দিকে তাকালে। ইঞ্জিন ট্রেনের শেষ-গাড়িখানা ধরে ফেললে বলে। গোবিন্দের বেজায় ভয় হল। ইঞ্জিনে আর শেষগাড়িতে যদি ঠোকাঠুকি হয়, তাহলে মস্ত একটা রেল-দুর্ঘটনা হবে। হ্যাঁ, এ-বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই। তার আগেই সাবধান হওয়া ভালো।

গোবিন্দ আস্তে আস্তে নিজের কামরার দরজা খুলে বেরিয়ে এল। তারপর ট্রেনের পা-দানিতে নেমে সন্তর্পণে এগুতে লাগল। হয়তো গাড়ির ড্রাইভার ঘুমিয়ে পড়েছে! এগুতে এগুতে প্রত্যেক কামরায় উঁকি মেরে দেখলে, সারা গাড়ির ভিতরে সেই গান্ধি-টুপি-পরা জটাধর ছাড়া আর একজনও আরোহী নেই।

জটাধরের টুপিটাও ভারী মজার তো! ওটা যে দস্তুরমতো চকোলেট দিয়ে গড়া!

জটাধর টুপির খানিকটা ভেঙে নিয়ে মুখে পুরে দিলে। তারপর একগাল হেসে বললেন, 'গোবিন্দবাবু, আপনিও একটু খাবেন নাকি?'

গোবিন্দ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, টুপি-চকোলেট আমি খাই না!.........ওদিকে চেয়ে দেখুন ইঞ্জিনের কাণ্ড-কারখানা।'

জটাধর হো হো করে হেসে উঠে টুপির আরও খানিকটা ভেঙে খেয়ে ফেললে। তারপর নিজের ভুঁড়ির উপরে চাপড় মেরে বললে, 'গোবিন্দবাবু, খাসা খেতে!'

গোবিন্দের গা বমি বমি করতে লাগল। সে পাদানি ধরে বরাবর এগিয়ে ইঞ্জিনের কাছে গিয়ে দেখলে, না ড্রাইভার ঘুমোয়নি— ঘোড়ার গাড়ির কোচম্যানের সিটে পা ঝুলিয়ে বসে বসে টপ্পা গান গাইছে।

গোবিন্দকে দেখেই সে চাবুক তুলে এমনভাবে লাগাম টেনে ধরলে, যেন এই রেলগাড়িখানা টানছে ঘোড়ারাই!

হ্যাঁ, তাই তো! রেলগাড়িখানা টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটা-দুটো নয়, এগারোটা ঘোড়া। তাদের পায়ে পায়ে বাঁধা রয়েছে রুপোর স্কেট, আর ছুটতে ছুটতে তারা গানের সুরে বলছে— 'যাব নাকি আমরা— যাব নাকি আমরা, এই সোনার দেশ ছেড়ে ওগো, সোনার দেশ ছেড়ে?'

গোবিন্দ কোচম্যানের গা ধরে জোরে নাড়া দিয়ে চেঁচিয়ে বললে, 'শিগগির তোমার ঘোড়াগুলোকে থামাও, নইলে এখুনি রেল-দুর্ঘটনা হবে।' তারপরেই সে চিনতে পারলে, ও বাবা, এ কোচম্যান তো যে-সে লোক নয়, এ যে চৌকিদার নটবর ওঝা!

নটবর কটমট করে গোবিন্দের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মুখুয্যেদের পেয়ারা চুরি করেছিল কে?'

গোবিন্দ বললে, 'আমি।'

—'সঙ্গে আর কে কে ছিল?'

—'বলব না।'

—'বলবে না! বটে? তাহলে আমরা এমনি চাকার মতন গোল হয়ে ঘুরবই!' বলেই চৌকিদার নটবর ওঝা চাবুক তুলে ছপাৎ-ছপাৎ করে ঘোড়াগুলোকে মারতে শুরু করে দিলে এবং তারাও চমকে উঠে পাঁই পাঁই করে এমন দৌড় মারলে যে, ইঞ্জিনখানা আরও তাড়াতাড়ি এগিয়ে গার্ডের গাড়িকে ধরবার চেষ্টা করতে লাগল।...... আরে আরে, শেষ-গাড়ির ছাদে বসে আছে ও কে? ও-যে আমাদের নিস্তারিণী ঠাকরুণ! ঘোড়াগুলো তাঁকে দেখে বড়ো বড়ো দাঁত কিড়-মিড় করছে, আর ঘোড়ার কামড় খাবার ভয়ে কেঁপে কেঁপেই নিস্তারিণী ঠাকরুণের প্রাণটা যায় বুঝি!

গোবিন্দ বললে, 'নটবর, আমাকে ছেড়ে দাও, তোমাকে দশ টাকা বকশিশ দেব!'

পাগলের মতো ঘোড়াদের চাবকাতে চাবকাতে নটবর হুমকি দিয়ে বললে, 'চুপ কর ছোকরা, অত বাজে বকতে হবে না!'

গোবিন্দ আর সইতে পারলে না, ট্রেন থেকে মারলে এক লাফ! গোনা কুড়িটা ডিগবাজি খেয়ে সে লাইনের ঢালু জমি দিয়ে গড়াতে গড়াতে নীচে নেমে গেল। তারপর উঠে ফিরে দেখে, রেলগাড়িখানা দাঁড়িয়ে পড়েছে, আর এগারোটা ঘোড়া মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকেই।

আবার চলল চৌকিদার নটবরের চাবুক এবং সঙ্গে সঙ্গে হেঁড়ে গলার হাঁক— 'ধর, ধর, ছোঁড়াকে ধর!'

ঘোড়াগুলো অমনি রেলগাড়ি নিয়ে লাইন ছেড়ে নীচে লাফিয়ে পড়ে গোবিন্দকে ধরতে এল। রেলগাড়িখানাও ক্রমাগত লাফ মারতে লাগল রবারের বলের মতো।

এর পর কী করা উচিত তা নিয়ে গোবিন্দ মাথা ঘামালে না মোটেই। দৌড়তে লাগল সে যত-জোরে পারে,— পেরিয়ে গেল একটা ময়দান, পেরিয়ে গেল একটা জঙ্গল, পেরিয়ে গেল একটা নদী। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকায় আর দেখে, ঘোড়ায়-টানা ট্রেনও তেড়ে আসছে হুড়মুড় করে! সামনে তার যত গাছ-টাছ পড়ছে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে— মাঠের উপরে দাঁড়িয়ে রইল খালি একটা প্রকাণ্ড বটগাছ, আর তার একটা ডালে ঝুলতে ঝুলতে আর কাঁদতে কাঁদতে ক্রমাগত দুই পা ছুড়ছেন আমাদের নিস্তারিণী ঠাকরুন।

সামনেই সেই দুশো তলা বাড়ি। জানলা যার হাজার হাজার। গোবিন্দ সুমুখের একটা দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকল আর পিছনের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল বাইরে। ট্রেনও তাই করলে! তখন গোবিন্দের কী ঘুমই যে পেয়েছে! কিন্তু এখন হাত-পা আরামে ছড়িয়ে একটু চোখ বোজবার জো কি আছে, ট্রেন যে নাছোড়বান্দা! বাড়ির ভিতর দিয়ে এগারোটা ঘোড়া আর রেলগাড়িগুলো ছুটে আসছে টগ বগ টগ বগ ঝম ঝম ঝম ঝম!

মস্ত বাড়ির গা বয়ে একখানা লোহার মই উঠে গেছে একেবারে সোজা ছাদ পর্যন্ত। গোবিন্দ তড় তড় করে মই বয়ে উপরে উঠতে লাগল। ভাগ্যে সে জিমনাস্টিকে পাকা। নইলে এই বেয়াড়া মই বয়ে কি ওঠা যায়! এক, দুই, দিন, চার করে গুনতে গুনতে সে উপরে উঠছে! পঞ্চাশ তলা পর্যন্ত উঠে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখে, মাঠ-নদী পড়ে রয়েছে কত নীচে— গাছপালাগুলো দেখাচ্ছে কত ছোটো ছোটো! ও বাবা, দফা সারলে বুঝি! ঘোড়ায়-টানা রেলগাড়িখানাও যে মই বয়ে উপরে উঠছে! খটাখট খটাখট বেজে বেজে উঠছে মইয়ের ধাপগুলো! ট্রেনের কোনও অসুবিধাই হচ্ছে না, মইখানা যেন তারই নিজস্ব রেললাইন!

গোবিন্দও উপরে উঠেছে—আরও, আরও উপরে! এই তো একশো তলা......এই তো একশো কুড়ি তলা!.....একশো চল্লিশ তলা.......একশো ষাট.....একশো আশি......একশো নব্বই.....দুশো তলা! যাঃ, মই ফুরুল। ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে গোবিন্দ ভাবছে, এখন উপায়? ঘোড়াদের খুরের, রেলগাড়ির চাকার শব্দ ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে যে!

গোবিন্দ ছাদের ধারে গেল। পকেট থেকে রুমালখানা বার করে মাথার উপরে দুই হাত বিছিয়ে ধরলে। তারপর সেই রুমাল-প্যারাসুট ধরে দিল এক লম্ফ। ট্রেন ছাদে উঠেও তাকে ধরতে না পেরে দাঁড়িয়ে পড়ল থমকে। আর বিষম হুড়মুড়ুনি শুনতে শুনতে গোবিন্দ নামছে পৃথিবীর মাটির দিকে— তারপর আর কিছু শোনা কি দেখা যায় না।

তারপর—দড়াম! গোবিন্দ মাঠের উপরে এসে পড়ল। খানিকক্ষণ ধরে হাঁফ ছাড়লে দুই চোখ বুজে। তার মনে হল, সে যেন ভারী একটা মিষ্টি স্বপন দেখছে।

তারপর চোখ খুললে। এবং সেইখানেই চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে দেখতে পেলে দুশো তলা বাড়ির ছাদ পর্যন্ত।

দেখলে, ছাদের ধারে দাঁড়িয়ে এগারোটা ঘোড়া নিজেদের মাথার উপরে খুলে ধরলে এক-একটা ছাতা। চৌকিদার নটবরও ছাতার বাঁট নেড়ে ঘোড়াদের গোঁজা দিতে লাগল। ঘোড়ারা আর ইতস্তত না করে ছাতা ধরে ট্রেন টেনে লাফিয়ে পড়ল নীচে দিকের। ট্রেন যত নীচে নামছে দেখতে হয়ে উঠছে তত বড়ো।

গোবিন্দ হাঁক-পাঁক করে উঠে পড়ল। আবার দৌড়, দৌড়, দৌড়। এবারে সে ছুটছে সেই কাচের ঘরখানার দিকে। কাচের দেওয়ালের ভিতর দিয়ে বাহির থেকেই দেখা গেল, ঘরের মধ্যে বসে সেলাইয়ের কল চালাতে চালাতে তার মা গল্প করছেন নিস্তারিণী ঠাকরুনের সঙ্গে। আঃ, বাঁচা গেল! মা রয়েছেন আর ভয় কি?

এক ছুটে ভিতরে গিয়ে বললে, 'মা, মা, এখন আমি কী করব?'

কমলা বললেন, 'কেন, কী হয়েছে?'

—'দেওয়ালের ভেতর দিয়ে চেয়ে দ্যাখো!'

কমলা দেখলেন, একখানা ঘোড়ায়-টানা রেলগাড়ি বোঁ বোঁ করে তেড়ে আসছে কাচের ঘরের দিকে।

তিনি সবিস্ময়ে বললেন, 'ওমা, কি হবে! নটবর চৌকিদার চালাচ্ছে রেলের গাড়ি!'

গোবিন্দ বলল, 'নটবর অনেকক্ষণ ধরে আমাকে তাড়া করছে!'

—'কেন?'

—'মুখুয্যেদের পেয়ারা গাছে উঠে আমি পেয়ারা পেড়েছিলুম বলে।'

—'বেশ করেছিলে। পেয়ারা গাছে না উঠলে কেউ কখনও পেয়ারা পাড়তে পারে?'

—'কেবল তাই নয় মা। নটবর জানতে চায়, আমার সঙ্গে আরও কে কে ছিল? তা আমি বলব কেন? সেটা নীচতা হবে যে!'

নিস্তারিণী বললেন, 'নটবর হচ্ছে বদমাইসের ধাড়ি। কমলা, সেলাইয়ের কলটা ভালো করে টিপে দাও তো, দেখি নোটো-মুখপোড়া কেমন করে আমাদের ধরে।'

কমলা ভালো করে কল টিপলেন। অমনি সেই কাচের ঘরখানা বন বন করে ঘুরতে শুরু করলে। তার দেওয়ালে দেওয়ালে সূর্যের কিরণ ঠিকরে পড়ে সৃষ্টি করলে যেন লক্ষ লক্ষ বিদ্যুতের ফুলঝুরি! এখন তার দিকে তাকালেও চোখ ঝলসে অন্ধ হয়ে যায়!

এগারোটা ঘোড়া চমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ডাক ছাড়লে— চিঁহি চিঁহি, চিঁহি, চিঁহি, চিঁহি, চিঁহি, চিঁহি! ভয়ে তাদের সর্বাঙ্গ কাঁপছে। তারা আর এক পা এগুতে নারাজ।

নটবর রেগে চাবুক চালাতে চালাতে চ্যাঁচালে, 'ড্যাম, রাসকেল, গাধা, ঘোড়া! ছোট বলছি!'

এবারও ঘোড়া ছুটল না।

নিস্তারিণী একগাল হেসে মিশি-মাখা কালো দাঁত বার করে বললেন, 'এইবার ঠিক হয়েছে। কেমন জব্দ!'

গোবিন্দ ফুর্তি-ভরে হাততালি দিয়ে বললে, 'কী মজা রে, কী মজা! মা, তুমি এখানে আছ জানলে আমি কি আর ওই কিম্ভূতকিমাকার ঢ্যাঙা বাড়িখানার ছাদে গিয়ে উঠতুম?'

ঘোড়ারা এবারে আর রাশ মানলে না, ফিরে নটবরকে নিয়ে আবার রেল-লাইনের দিকে দিলে চম্পট! নিস্ফল আক্রোশে নটবর-চৌকিদারের চাবুক আছড়াতে আছড়াতে ভেঙে দুখানা হয়ে গেল।

গোবিন্দ চেঁচিয়ে বললে, 'ও নটবর! তোমার বড্ড খাটুনি হল। খিদে পেয়ে থাকে তো একটা পেয়ারা খেয়ে যাও।'

কমলা বললেন, 'খোকন, তোমার জামা-টামা ছিঁড়ে যায়নি তো?'

'না, মা।'

—'আর সেই নোটগুলো? সেগুলো সাবধানে রেখেছ তো?'

গোবিন্দের বুকের কাছটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মাথা ঘুরে সে পড়ে গেল এবং—

এবং তারপর জেগে উঠল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গোবিন্দের লিলুয়ায় অবতরণ

গোবিন্দ জেগে উঠে দেখলে, ট্রেন একটা নতুন স্টেশন ছেড়ে আবার চলতে শুরু করলে।

সে বেঞ্চির উপর থেকে নীচে পড়ে গিয়েছে। আর তার বুকটা করছে ভয়ে ধুকপুক! তার এতটা ভয় হবার কারণ সে আন্দাজ করতে পারলে না। এতক্ষণ সে কোথায় ছিল?

তারপর ধীরে ধীরে সব মনে পড়ল। সে যাচ্ছে কলকাতায়। এতক্ষণ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল। আর তার সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছিল সেই গান্ধি-টুপি-পরা ঘোড়ামুখ।

মনে পড়তেই টপ করে সে উঠে বসল। কামরায় কেউ নেই। ঘোড়ামুখ অদৃশ্য।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দেখে, তার পা-কাঁপছে। আগে পোশাকের ধুলো ঝেড়ে ফেললে। তারপর মনে মনে প্রশ্ন করলে, নোটগুলো যথাস্থানে আছে তো?

আবার শুনতে পেলে নিজের বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল যেন থ!

জটাধর ছিল তো ওই কোণে— চকোলেট খাচ্ছিল, ঘুমোচ্ছিল, নাক ডাকাচ্ছিল! কখন জাগল? কখন গেল?.....তা সকলেই তো তার মতো কলকাতার যাত্রী নয়! জটাধর নিজের স্টেশনে নেমে গেছে।

নোট তার পকেটেই আছে নিশ্চয়— ভালো করে আলপিনে গাঁথা। তবু একবার হাত দিয়ে দেখা যাক!

ওরে বাপ রে, এ কী! পকেট যে একেবারে খালি! নোট নেই, খাম নেই, কিছুই নেই!

গোবিন্দ পাগলের মতো সব পকেট হাতড়ে দেখলে। নোট নেই।...এটা কী? ও, সেই বড়ো আলপিনটা! ওমাঃ! আলপিনটা যে আঙুলে ফুটে গেল! রক্ত পড়ে যে!

আঙুলে রুমাল জড়িয়ে গোবিন্দ কাঁদতে লাগল। আলপিন ফুটেছে বলে সে কাঁদছে না, তার কান্না এসেছে টাকার শোকে। তার কান্না এসেছে মায়ের মুখ মনে করে। কত খেটে, কত কষ্টে, মা এই টাকাগুলি জমিয়েছেন। আর সে কিনা রেলগাড়িতে চড়েই মজা করে একটা লম্বা ঘুম দিলে, একটা পাগলা স্বপ্ন দেখলে, আর একটা বিচ্ছিরি ঘোড়ামুখো চোরের হাতে তুলে দিলে অতগুলো টাকা!

এখন কী করবে সে? কোন মুখে হাওড়ায় নেমে মাসির বাড়ি গিয়ে দিদিমাকে বলবে, 'আমি এসেছি বটে, কিন্তু তোমার টাকা আনিনি। হ্যাঁ, আরও শুনে রাখো দিদিমা, বাড়ি ফেরবার সময়ে আমার রেলভাড়া দিতে হবে তোমাকেই!

অসম্ভব, অসম্ভব! মার টাকা জমানোই মিছে হল। দিদিমা কাণাকড়ি পাবেন না! তার কলকাতা দেখাও হবে না, সে বাড়িতে ফিরে যেতেও পারবে না। ওরে ঘোড়ামুখ, সর্বনাশ করবি বলেই তুই কি আমাকে চকোলেট খেতে দিয়েছিলি, আর মিথ্যে নাক ডাকিয়ে পড়েছিলি মটকা মেরে? হায় রে হায়, পৃথিবীটা কী খারাপ জায়গা! গোবিন্দের চোখ ছাপিয়ে ঝরতে লাগল ঝর ঝর করে জল।

খানিকটা লোনা চোখের জল তার মুখের ভিতরে ঢুকে গেল। তারপর সে ভাবলে, কামরার 'কমিউনিকেশন কর্ড' ধরে টান মেরে গাড়িখানা থামিয়ে ফেলি।

তারপর? গার্ডসায়েব আসবে। জিজ্ঞাসা করবে, 'কী হয়েছে? গাড়ি থামালে কেন?'

সে বলবে, 'আমার টাকা চুরি গিয়েছে।'

গার্ড হয়তো বলবে, 'হুঁশিয়ার না হলে তো টাকা চুরি যাবেই! তোমার নাম কী ছোকরা? তোমার ঠিকানা কী? মিছামিছি গাড়ি থামিয়েছ, তোমার পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হবে।'

এখন ক'টা বেজেছে? কলকাতা আর কত দূরে? ঘোড়ামুখো জটাধর এখন কোথায়? সে অন্য কোনও কামরায় ঘুপটি মেরে লুকিয়ে নেই তো? আশ্চর্য নয়। হয়তো পরের স্টেশনে ট্রেন থামলেই সে গাড়ি থেকে নেমে লম্বা দেবে!

গোবিন্দ কামরার জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। সামনে দিয়ে ছুটতে ছুটতে পিছিয়ে যাচ্ছে সবুজ গাছের ছায়া-মাখা গ্রাম, বড়ো বড়ো জমকালো অট্টালিকা, লাল-সাদা-হলদে রঙের বাগানবাড়ি! কালীপুরে তো এমনধারা একখানা বাড়িও নেই! বোধহয় গাড়ি কলকাতা শহরের কাছেই এসে পড়েছে!

পরের স্টেশনেই গার্ডসায়েবকে ডেকে সব কথা খুলে বলতে হবে। গার্ড নিশ্চয়ই তখনই পুলিশে খবর দেবে।

কিন্তু তাহলে হবে আবার বিপদের উপর বিপদ! আবার আসবে নটবরচৌকিদার। এবারে সে আর চুপ করে থাকবে না। পুলিশের বড়োসায়েবকে ডেকে হয়তো বলবে, 'হুজুর, কেন জানি না, ও ছোকরাকে আমি মোটেই পছন্দ করি না। মুখুয্যেদের গাছ থেকে গোবিন্দ পেয়ারা চুরি করে খায়। ও বলছে, ওর একশো পঁচিশ টাকা চুরি গিয়েছে। আমার বিশ্বাস, ওর টাকা চুরি যায়নি টাকাগুলো ও নিজেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। যে পেয়ারা চুরি করে, সে কি না করতে পারে? মিথ্যা চোরের খোঁজ করে লাভ নেই। চোর হচ্ছে গোবিন্দ নিজেই। টাকাগুলো নিয়ে ও বাড়ি থেকে পালাবার মতলব করেছে। হুজুর, গোবিন্দকে গ্রেপ্তার করবার হুকুম দিন!'

কী ভয়ানক, পুলিশে খবর দেওয়াও তো চলবে না দেখছি।

গাড়ি গতি কমে আসছে ধীরে ধীরে। বোধহয় পরের স্টেশন এল।

গোবিন্দ নিজের ব্যাগটা তুলে নিয়ে প্রস্তুত হতে লাগল। পরে যা হবার তা হবে, কিন্তু এ গাড়িতে সে আর একদণ্ড থাকতে পারবে না। এখানে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

এই তো স্টেশন। লোকজন গম গম করছে। গোবিন্দ স্টেশনের নামটা পড়ে দেখল—লিলুয়া। এটাও তাহলে কলকাতা নয়?

গাড়ির নানা কামরা থেকে যাত্রীরা নামছে। অনেকে আবার উঠছেও। চারিদিকে তাড়াহুড়ো আর চ্যাঁচামেচি।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গোবিন্দ গার্ডকে খুঁজছে, হঠাৎ ভিড়ের ভিতরে দেখা গেল এক গান্ধি-টুপি! কে ও! সেই ঘোড়ামুখো জটাধর নয় তো? গাড়ি থেকে নেমে সরে পড়বার চেষ্টা করছে?

একটি লম্বা লম্ফ, পরমুহূর্তে গোবিন্দ একেবারে প্লাটফর্মের উপরে। তার ডান হাতে ব্যাগ, বাঁ হাতে কাগজে মোড়া ফুল। তারপর দৌড়।

কোথায় লুকাল সেই গান্ধি-টুপি? গোবিন্দ কখনও হোঁচট খায়, কখনও অন্য লোকের পায়ের উপরে গিয়ে পড়ে। ভিড় ক্রমেই বেড়ে উঠছে—প্রতি পদেই বাধা।

ওই যে সেই গান্ধি-টুপি! আরে, ওখানে যে আরও একটা গান্ধি-টুপি রয়েছে। ওর মধ্যে কে চোর আর কে সাধু?

তিন চারজন লোককে ধাক্কা মেরে গোবিন্দ এগিয়ে গেল।

প্রথম গান্ধি-টুপিটার তলায় সে দৃষ্টিপাত করলে। ওখানে ঘোড়ামুখ নেই।

দ্বিতীয় টুপিটা কার? উঁহু, ও-লোকটা বেজায় বেঁটে।

তবে সে কোথায়? সে কোথায়? ব্যূহের মধ্যে বন্দী অভিমন্যুর মতো গোবিন্দ জনতার ভিতর থেকে বেরুবার পথ খুঁজতে লাগল।

ওহো, ওই যে— ওই যে! ওরে জটাধর, এইবার পেয়েছি তোকে। আর তোর নিস্তার নেই।

জটাধর গেটের কাছে টিকিট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। গোবিন্দও তাই করলে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হ্যারিসন রোডের ট্রামগাড়ি

গোবিন্দ প্রথমে ভাবলে, একদৌড়ে চোখের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলি, 'কী হে জটাধর, আমাকে চিনতে পারছ? টাকাগুলো কোথায় রেখেছ, বার করো দেখি?'

কিন্তু লোকটার ধরন-ধারণ দেখলে মনে হয় না যে বলবে, 'তোমাকে চিনেছি বইকী! এই নাও ভাই তোমার টাকা। আর কখনও আমি চুরি করব না।'

উঁহু, ব্যাপারটা এত সোজা নয়। পরের কথা পরে ভাবা যাবে, আপাতত ওকে চোখের আড়ালে যেতে দেওয়া হবে না।

জটাধর চারিধারে তাকাতে তাকাতে চলেছে। একটা খুব মোটাসোটা মেমের দেহের আড়ালে আড়ালে থেকে গোবিন্দও অগ্রসর হচ্ছে।

আচ্ছা, মেমটাকে সব কথা খুলে বলব নাকি? বলব জটাধরকে ধরিয়ে দিতে?

কিন্তু জটাধর যদি বলে—'সে কী মেমসাহেব, আমি কি এতই পাষণ্ড যে, অতটুকু ছেলের টাকা চুরি করব?'

আর মেম যদি তার কথায় বিশ্বাস করে বলে—'হ্যাঁ, তোমাকে পাষণ্ড বলে মনে হচ্ছে না তো! কালে কালে হল কী? একরত্তি ছেলেরাও মিছে কথা বলতে শিখেছে!'

হঠাৎ মেমসাহেব পাশের একটা গলির ভিতরে ঢুকল। পাছে ধরা পড়ে যায় সেই ভয়ে গোবিন্দ আরও পিছিয়ে পড়ল।

জটাধর চলেছে তো চলেছেই। সে কোথায় যাচ্ছে!

গোবিন্দের হাতের ব্যাগটা যে দু-মন ভারী হয়ে উঠেছে! তার পা দুটোও আর চলতে চাইছে না। প্রতি পদেই তার মন বলছে, ওহে গোবিন্দ, ব্যাগটা মাটিতে রেখে বসে বসে একটু জিরিয়ে নাও। কিন্তু হায় রে, জিরিয়ে নেবার কি সময় আছে? জটাধর যতক্ষণ হাঁটবে, ততক্ষণ তাকেও হাঁটতে হবে। হাঁটতে হাঁটতে গোবিন্দের গোঁফ-দাড়ি গজিয়ে গেলেও উপায় নেই!

রাস্তা ক্রমেই চওড়া হয়ে উঠেছে! ভিড় বাড়ছে, গাড়ি-ঘোড়া বাড়ছে, বড়ো বড়ো বাড়ির সংখ্যা বাড়ছে! তবে কি তারা কলকাতার কাছে এসে পড়েছে?

বাবা, পৃথিবীতে বড়ো বড়ো শহরের এক-একটা পথে এত রকম গাড়ি একসঙ্গে চলে নাকি?

না, আর যে পোষায় না! হেঁটে হেঁটে আমার পা বোধহয় ক্ষয়ে ছোটো হয়ে গেছে।

কী আশ্চর্য, ওটা আবার কীরকম বাড়ি? এত মস্ত! ওর ভিতরে কত লোক ব্যস্ত হয়ে ঢুকছে— কত লোক আবার ওখানে থেকে বেরিয়েও আসছে! হ্যাঁ মশাই, ওটা কার বাড়ি বলতে পারেন? কী বললেন? হাওড়া স্টেশন?

হুঁ, তাহলে হাওড়ায় এসেছি! তার মানেই কলকাতায়! ওই হচ্ছে গঙ্গা, আর ওই হচ্ছে হাওড়ার পোল? জটাধর যে পোলের উপর দিয়েই চলল। বোধহয় ও কিছু সন্দেহ করেছে। খালি খালি চারিদিকে তাকাচ্ছে। আমাকে একবার দেখতে পেলেই ভোঁ-দৌড় মারবে!

এই তো পোল শেষ হয়ে গেল। এইবার বোধহয় কলকাতায় পা দিলুম? আর কত চলব, ব্যাগের ভারে হাত যে ছিঁড়ে যাচ্ছে!

কী ভিড় বাবা, কী ভিড়! কত গাড়ি! মনে হচ্ছে সব গাড়ি যেন আমাকে চাপা দিয়ে মারবার জন্যে রেগে-মেগে তেড়ে আসছে!

ওগুলো আবার কী গাড়ি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি লোকের মুখে ওর কথা শুনেছি, ওর ছবিও দেখেছি। ওর নাম ট্রামগাড়ি।

আরে, জটাধর যে ট্রামগাড়িতেই উঠে পড়ল! তাহলে—

গোবিন্দ প্রাণপণে দৌড়ে ট্রামগাড়ির উপর আগে নিজের ব্যাগটা ছুড়ে ফেলে দিলে। তারপর নিজেও উঠে পড়ল।

জটাধর সামনের দিকের একটা 'সিটে' গিয়ে বসল। গোবিন্দ রইল পিছন দিকে। গাড়ির দরজার কাছে এবং ভিতরেও জায়গার অভাবে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। ভিড়ের ভিতর তার ছোটো দেহ একরকম অদৃশ্য হয়েই গেল।

এর পর কী হবে? জটাধর একবার যদি তাকে দেখতে পায়, তাহলে আর রক্ষে নেই। সে একলাফ মেরে নীচে নেমে কোথায় পালিয়ে যাবে, এই ভারী ব্যাগটা নিয়ে গোবিন্দ তার পিছনে পিছনে ছুটতে পারবে না কিছুতেই!

ওঃ, রাস্তায় মোটরগাড়ি যে আরও বেড়ে উঠল। দু-ধারের ঢ্যাঙা বাড়িগুলো যে শূন্যে উঠে আকাশকে ঢেকে ফেলবার জোগাড় করেছে। রাস্তার দুদিকেই সারি সারি কত সাজানো-গুছানো দোকান! খাবারের দোকান, ফলের দোকান, জামা-কাপড়ের দোকান, মণিহারী দোকান! আর লোকের ভিড়ের তো কথাই নেই! এত লোকও শহরে ধরে? এই ভিড়ের মধ্যে গিয়ে জটাধর একবার যদি ভিড়তে পারে, তাহলে আর কে পাবে তার পাত্তা?

গাড়িতে আরও লোক উঠছে। আর তিল ধারণের ঠাঁই নেই, নিঃশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হয়। ভিড়ের মধ্যে জটাধর পাছে আবার ফাঁকি দেয়, সেই ভয়ে গোবিন্দ বারবার এর হাতের তলা, ওর পায়ের পাশ দিয়ে মাথা গলিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল।

একজন লোক বিরক্ত হয়ে বললে, 'ছোকরা তো ভারী ছটফটে দেখছি। টুঁ মেরে মেরে জ্বালাতন করে তুললে যে!'

নমিতা নিশ্চয়ই স্টেশনে আসত, কিন্তু দিদিমার আসবার কথা নয়।

কিন্তু গোবিন্দের মেসো চন্দ্রবাবুর হঠাৎ কাল রাত থেকে পেটের অসুখ হয়েছে, কাজেই তাঁর পক্ষে আজ স্টেশনে আসা অসম্ভব! অন্য কোনও লোক পাঠালেও চলবে না। কারণ, গোবিন্দকে কেউ চেনে না।

অতএব দিদিমা বললেন, 'আমার নাতি এই প্রথম কলকাতায় আসছে, সে এখানকার কিছুই জানে না। যদি সে বিপদে পড়ে?... উঁহু, আমি এসব পছন্দ করি না—আমি এসব পছন্দ করি না। চাকরকে নিয়ে আমিই ইস্টিশানে যাব। রামফল, শিগগির একখানা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে আন।'

চাকর রামফল গাড়ি ডাকতে ছুটল।

নমিতা বললে, 'দিদিমা, মিছে ঘোড়ার গাড়ি ডেকে কী হবে? আমার তো সাইকেল আছে, আমি চালাব আর তুমি দিব্যি আরামে আমার সামনে উঠে বসে থাকবে!'

দিদিমা শিউরে উঠে বললেন, 'বাপ রে, বলিস কী রে সর্বনাশী!'

—'কেন দিদ্‌মা, পাড়ার বঙ্কু তো আমার সঙ্গে এক সাইকেলে চড়ে। তুমি কি বঙ্কুর চেয়েও ভারী?'

—'ও কথা শুনলে তোমার বাবা এখুনি সাইকেল কেড়ে নেবেন।'

নমিতা চোখ মুখ ঘুরিয়ে বললে, 'মা গো মা! দিদ্‌মার কাছে কোনও মনের কথাই বলবার জো নেই। এর মধ্যে আবার বাবার নাম ওঠে কেন?'

হাওড়ায় স্টেশনে গিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে! কত গাড়ি এল, বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে কত লোকই নামল! নাকে চশমা লাগিয়ে দিদিমা ভালো করে দেখলেন, কিন্তু গোবিন্দের দেখা পান না।

নমিতা বললে, 'গোবিনদা বোধহয় দেখতে খুব বড়ো হয়ে উঠেছে, আমরা কেউ আর তাকে চিনতে পারছি না।'

দিদিমার বিশ্বাস হয় না! নমিতা হতাশভাবে টুং-টাং করে সাইকেলের ঘণ্টা বাজায়।

দিদিমার ইচ্ছা ছিল না যে, তাঁর নাতনি সাইকেল ঘাড়ে করে স্টেশনে আসে। কিন্তু শেষটা সে এমন আবদার ধরে বসল যে, তিনি বলতে বাধ্য হলেন, 'নাতনি না পেতনি! বেশ, তাই নিয়ে চলো! কিন্তু রাস্তায় চড়তে পাবে না, গাড়িতে তুলে নিয়ে যেতে হবে!'

নমিতা খুশি হয়ে বললে, 'তুমি কিচ্ছু বোঝো না দিদ্‌মা! আমার সাইকেল দেখে গোবিনদা যে কী অবাকটাই হবে!' মানসচক্ষে ব্যাপারটা আর একবার দেখে নিয়ে সে বলে উঠল, 'ও হো, বড়ো মজা।'...

...দিদিমার দুর্ভাবনা ক্রমেই বাড়ছে। বললেন, 'নমু, কটা বাজল দেখ তো!'

নমিতা হাত তুলে নিজের হাতঘড়িটা দেখে বললে, 'বেলা একটা বাজতে বিশ মিনিট।'

দিদিমা বললেন, 'এতক্ষণে তো গাড়ি এসে পড়বার কথা!'

নমিতা বললে, 'আচ্ছা একটু দাঁড়াও, আমি খবর নিয়ে আসছি।'

একটু তফাতেই একজন রেল-কর্মচারী দাঁড়িয়ে ছিল, নমিতা সেখানে গিয়ে বললে, 'কালীপুরের গাড়ির খবর কি বলতে পারেন?'

—'কালীপুর, কালীপুর? ওঃ, হ্যাঁ, সে গাড়ি তো বারোটার আগে এসে গিয়েছে!'

—'এসে গিয়েছে? কাণ্ডটা দ্যাখো একবার! বুঝছেন মশাই, সেগাড়িতে আমার গোবিনদার আসবার কথা।'

—'তাই নাকি ঠাকরুন! শুনে খুশি হলুম—শুনে খুশি হলুম, হা হা হা হা!'

—'অত হাসির ঘটা কেন শুনি? যেন একটি আস্ত জন্তু!' বলেই নমিতা সাইকেল টানতে টানতে দিদিমার দিকে ছুটল।

সেখানে আর আর যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা হাসতে লাগল। রেলকর্মচারী চটে লাল!

নমিতা গিয়ে বললে, 'গাড়ি অনেকক্ষণ এসে গিয়েছে দিদ্‌মা!'

দিদিমা আরও বেশি চিন্তিত হয়ে বললেন, 'তাহলে কী হল বল দেখি? আজ না এলে তার মা নিশ্চয় টেলিগ্রাম করত। তবে কি গোবিন্দ কোনও ভুল স্টেশনে নেমে পড়েছে?'

খুব ভারিক্কের মতো মুখের ভাব করে নমিতা বললে, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। গোবিনদা ভুল স্টেশনে নামতে পারে। ব্যাটাছেলেরা যা বোকা হয়! কোথায় যেতে কোথায় যায়! কিছু জানে না!'

আরও খানিকক্ষণ কাটল।

নমিতা বললে, 'আর তো এখানে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। আমার টিফিন খাবার সময় হল।'

দিদিমা বললেন, 'কালীপুর থেকে পরের গাড়ি কখন আসবে?'

—'রোসো, খবর আনছি।' বলেই নমিতা আবার সেই রেলকর্মচারীর কাছে গিয়ে হাজির।

কর্মচারী তাকে দেখেই তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল।

নমিতা সাইকেলের ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে বললে, 'ও মশাই, শুনছেন? আপনি কি আমার ওপরে ভারী রেগে গিয়েছেন?'

কর্মচারী না ফিরেই বললে, 'আবার তোমার কী দরকার?'

—'আপনার সঙ্গে ভাব করতে এসেছি। এর পরে কালীপুরের গাড়ি আবার কখন আসবে, দয়া করে বলবেন কি?'

কর্মচারী এবার হেসে ফেলে ফিরে বললে, 'রাত সাড়ে আটটায়।'

দিদিমার কাছে গিয়ে সেই খবর নিয়ে নমিতা বললে, 'গোবিনদা বোধহয় সেই গাড়িতেই আসবে। এখন বাড়ি চলো।'

দিদিমা মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'আমি এসব পছন্দ করি না—আমি এসব পছন্দ করি না।'

খবর শুনে বাড়ির সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠল। গোবিন্দ নিরুদ্দেশ!

নমিতার বাবা চন্দ্রবাবু বললেন, 'কালীপুরে আমি একখানা টেলিগ্রাম করে দি।'

নমিতার মা বিমলা বললেন, 'সর্বনাশ! অমন কথা মুখেও এনো না গো! দিদি তাহলে ভয়েই মারা পড়বেন। তার চেয়ে রাতের ট্রেনটা পর্যন্ত সবুর করো।'

নমিতা বললে, 'গোবিনদার বুদ্ধি-সুদ্ধি বড়ো কম। সাড়ে আটটার সময়ে আমার ঘুম পাবে। সাইকেল নিয়ে ইস্টিশানে যেতে পারব না। আমার রাগ হচ্ছে। আমার খিদে পেয়েছে। মা, খাবার দাও।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'আমার অসুখ কমে এসেছে। রাতে আমি স্টেশনে যেতে পারব। গোবিন্দ হয়তো সকালে ট্রেন ফেল করেছে।'

দিদিমা বললেন, 'আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু সত্যিকথা বলতে কি, আমি এসব পছন্দ করি না—আমি এসব পছন্দ করি না।'

দুখানা শিঙাড়া আর দুটো সন্দেশ খেয়ে নমিতা তার ছোট্ট মাথাটি দিদিমার অনুকরণে নাড়তে নাড়তে বললে, 'আমিও এসব পছন্দ করি না।'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ঘণ্টু ও তার মোটর-হর্ন

ট্রাম যখন হ্যারিসন রোড ও আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড়ে এসে থামল, তখন গান্ধি-টুপি-পরা জটাধর হঠাৎ উঠে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

এবারে গোবিন্দ ছিল অত্যন্ত সজাগ। সে-ও নেমে পড়ল যথাসময়ে।

জটাধর আমহার্স্ট স্ট্রিটের ভিতরে ঢুকল। খানিক পরেই দেখা গেল, একখানা ছোট্ট ঘর এবং তার বাইরে একখানা মস্ত সাইন-বোর্ডে লেখা—'দি গ্রেট নর্দান রেস্তোরাঁ।'

জটাধর মুখ তুলে নামটা পড়লে। তারপর রেস্তোরাঁর বাইরে পাতা একখানা বেঞ্চির উপরে বসে বললে, 'চারখানা টোস্ট, দুখানা মামলেট, এক কাপ চা।'

এদিকের ফুটপাথে একটু এগিয়েই গোবিন্দ পেলে একটা ছোট্ট গলি। সে সাঁত করে তার ভিতরে ঢুকে গেল। তারপর সেইখান থেকে জটাধরকে নজরে নজরে রাখলে।

জটাধর বসে বসে টানতে লাগল সিগারেট। তার মুখখানা খুশিখুশি! আজকের রোজগারটা ভালোই হয়েছে—খুশি হবে না কেন?

গোবিন্দ এখন ভবিষ্যতের কর্তব্য কিছুই জানে না। আপাতত খালি এইটুকুই জানে যে, জটাধরকে সে কিছুতেই আর অদৃশ্য হতে দেবে না!

জটাধরের হাসিমুখ দেখে তার গা জ্বালা করতে লাগল। হতভাগা চোর পরের টাকা চুরি করে কেমন নিশ্চিন্ত প্রাণে সকলের সুমুখে বসে আরাম করছে, আর চোরের মতো লুকিয়ে থাকতে হয়েছে তাকেই—চুরি গিয়েছে যার অতগুলো টাকা! ভগবান কি এসব দেখেও দেখছেন না? এর পর ও মজা করে খাবার খেয়ে ভরা পেটে কোথায় চলে যাবে, আর খিদেয় ধুঁকতে ধুঁকতে আবার তাকে কুকুরের মতো যেতে হবে তার পিছনে পিছনে! কী অবিচার!

এখন যদি কোনও পাহারাওয়ালা তাকে দেখতে পায়, তাহলেই হয় চূড়ান্ত। পাহারাওয়ালা নিশ্চয় তার কাছে এসে বলবে, 'ওহে, তোমাকে দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে। তোমার ভাবভঙ্গি চোরের মতন! ভালোমানুষটির মতো আমার সঙ্গে থানায় চলো, নইলে বের করো হাত—পরো হাতকড়ি!'

হঠাৎ একেবারে গোবিন্দের পিছনেই ভোঁপ ভোঁপ ভোঁপ করে মোটর-হর্নের বেজায়

আওয়াজ হল। সে আঁতকে উঠে মস্ত এক লাফ মেরে পিছন ফিরেই দেখে, সার্ট ও প্যান্ট পরা একটা তারই সমবয়সী ছেলে হাসতে হাসতে যেন গড়িয়ে পড়ছে!

সে বললে, 'সেলাম বাবু-সায়েব, অত বেশি ভয় পাবার দরকার নেই।'

গোবিন্দ এদিকে ওদিকে তাকিয়ে আশ্চর্য স্বরে বললে, 'মোটরের হর্ন বাজল, মোটরগাড়ি নেই তো!'

ছোকরা বললে, 'ধ্যাত, তুমি ভারী বোকা! মোটর আবার কোথায়? হর্ন তো আমি বাজিয়েছি!...ও, বুঝেছি! তুমি এই অঞ্চলে থাকো না! এখানকার সবাই জানে, আমার কাছে সর্বদাই হর্ন থাকে!'

—'না, আমি তোমাকে চিনি না। আমার দেশ কালীপুরে, আমি সবে কলকাতায় এসেছি।'

—'ও. পাড়াগেঁয়ে ছেলে, বটে! তাই তুমি অমন বেয়াড়া খালাসিরঙের পোশাক পরেছ!'

এই পোশাকটার সম্বন্ধে গোবিন্দেরও দুর্বলতা ছিল যথেষ্ট। কিন্তু পরের মুখ থেকে সে মায়ের দেওয়া পোশাকের নিন্দা শুনতে রাজি নয়। খাপ্পা হয়ে বললে, 'ফের ও-কথা বললে আমি তোমাকে ঘুষি মারব!'

বালক খুশি-মুখেই বললে, 'আরে আরে—চটলে নাকি ভায়া? প্রথম আলাপেই কি এতটা রাগারাগি করতে আছে? তবে নিতান্তই যদি চাও, আমি তাহলে ঘুষি লড়তে রাজি আছি।'

গোবিন্দ বললে, 'বেশ, আজ ওসব থাক। আমার এখন সময় নেই।' —বলেই উঁকি মেরে একবার দেখে নিলে, জটাধরের গান্ধি-টুপি রাস্তার ওধার থেকে অদৃশ্য হয়েছে কি না!

বালক বললে, 'আমি তো দেখছি তোমার হাতে এখন অনেক সময় আছে! তুমি তো এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছ! তুমি যখন খেলতে পারো, তখন লড়তেই বা পারবে না কেন?'

—'আমি লুকোচুরি খেলছি না, একটা ধাড়ি চোরের ওপরে নজর রাখছি।'

বালক দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললে, 'কী বললে? চোর? কোথায়? কী চুরি করেছে?'

গোবিন্দ গর্বিত স্বরে বললে, 'সে আমার টাকা চুরি করেছে। রেলগাড়িতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দিদিমাকে দেবার জন্য আমার পকেটে অনেক টাকা ছিল। ওই লোকটা সেই টাকা চুরি করে অন্য কামরায় লুকিয়ে ছিল। তারপর ট্রেন থেকে নেমে ট্রামে চড়ে এইখানে পালিয়ে এসেছে, কিন্তু আমি তার সঙ্গ ছাড়িনি। দ্যাখো না, এখন ও কেমন পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে টোস্ট আর মামলেট খাচ্ছে!'

বালক উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, 'অ্যাঃ! বলো কী হে! এ যেন বায়োস্কোপের গল্প! ...তারপর? এইবার তুমি কী করবে?'

—'কিছুই জানি না ভাই! তবে ওর পিছু আমি কিছুতেই ছাড়ব না।'

'ওই তো একটা পাহারাওয়ালা আসছে। ওকে ধরিয়ে দাও না।'

—'না ভাই, না! কালীপুরে আমি একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছি, হয়তো সেখানকার পুলিশ আমাকেও খুঁজছে। পুলিশ ডেকে শেষটা কি নিজেই বিপদে পড়ব?'

—'ও, বুঝেছি।'

—'হাওড়া স্টেশনে মেসোর বাড়ির সবাই আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা কী ভাবছেন, জানি না।'

বালক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভাবলে। তারপর বললে, 'ব্যাপারটা খুব জবর বটে! আচ্ছা ভাই, তুমি যদি নারাজ না হও, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।'

—'তা যদি পারো, তাহলে তো আমি বর্তে যাই!'

—'বহুৎ আচ্ছা! আমার নাম কি জানো? ঘণ্টু।'

—'আমার নাম গোবিন্দ।'

তারা পরস্পরের সঙ্গে 'শেক হ্যান্ড' করলে। এতক্ষণ পরে তাদের দুজনেরই দুজনকে খুব ভালো লাগল!

ঘণ্টু বললে, 'তাহলে কাজ শুরু করা যাক। এখানে আর বেশিক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে চোর বেটা আবার ফাঁকি দেবে। ...হ্যাঁ, এখন প্রথম কথা হচ্ছে, তোমার কাছে টাকা-পয়সা কিছু আছে?'

—'রামচন্দ্র! আমার হাত একেবারে ফোক্কা!'

ঘণ্টু হতাশভাবে তার মোটর-হর্নে বার-তিনেক খুব আস্তে আস্তে ফুঁ দিলে। কিন্তু তবু তার বুদ্ধি খুলল না।

গোবিন্দ বললে, 'আচ্ছা ভাই ঘণ্টু, কিছু ধার-টার দিতে পারে তোমার কি এমন বন্ধুবান্ধব নেই?'

ঘণ্টু উৎসাহিত স্বরে বললে, 'খাসা বুদ্ধি দিয়েছ! হ্যাঁ, সেই চেষ্টাই আমি করব। এর জন্যে আমাকে বেশি বেগ পেতে হবে না! আমি যদি আমার হর্ন বাজাতে বাজাতে এ-পাড়ার অলি-গলিতে এক-চক্কর ঘুরে আসি, তাহলেই আমার বন্ধুবান্ধবরা ছুটে আসবে চারিদিক থেকে!'

—'তাহলে চটপট সেই চেষ্টাই করো গে যাও। কিন্তু মনে রেখো, তোমার দেরি হলে জটাধর সরে পড়বে। তখন আমাকেও যেতে হবে তার পিছনে পিছনে। তুমি ফিরে এসে আমাদের কারুকেই আর দেখতে পাবে না।'

ঘণ্টু বললে, 'হ্যাঁ, তা আমি জানি। কিন্তু তোমার কোনও ভয় নেই। দেখছ না জটাবেটা তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে, এখনও তার চা খাওয়া হয়নি, তার ডিশেও রয়েছে পুরো একখানা মামলেট! আমি যাব আর আসব। এটা হবে জবর ব্যাপার গোবিন্দ, জবর ব্যাপার, অবাক কাণ্ড!' বলেই সে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতন চালিয়ে দিলে পা!

এতক্ষণ পরে গোবিন্দের মনটা হল খানিকটা ঠান্ডা। দুর্ভাগ্যকে আর কিছু বলা যায় না, দুর্ভাগ্য ছাড়া। কিন্তু দুর্ভাগ্যের সময় কাছে বন্ধু থাকলে সেটাও একটা সান্ত্বনা বইকী!

জটাধর মামলেটে আবার এক কামড় বসিয়ে আক্রমণ করলে চায়ের পেয়ালাকে।

গোবিন্দ মনে মনে বললে, 'হতভাগা হয়তো আমার মায়ের টাকা ভাঙিয়েই খাবারের দাম দেবে। তারপর ও যদি একখানা রিকশা ভাড়া করে চম্পট দেয়, তাহলে ঘণ্টু তার হর্ন বাজিয়েও আমার আর কোনও উপকারই করতে পারবে না!'

কিন্তু জটাধর তখনও ওঠবার নাম পর্যন্ত করলে না। মামলেট আর টোস্ট খেতে তার ভারী ভালো লাগছে বোধহয়! সে একটুও সন্দেহ করতে পারেনি যে, ট্রেনের সেই পাড়াগেঁয়ে

ছোকরা তার পিছনে পিছনে এতদূর এসে হাজির হয়েছে এবং তার চারিধারে এমন এক ষড়যন্ত্রের জাল ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা চলছে, যার ভিতরে পড়লে চুনো পুঁটি নয়, বড়ো বড়ো রুই-কাতলারও ছাড়ান পাবার কোনও উপায়ই থাকবে না!

মিনিট-কয় পরেই শোনা গেল ঘণ্টুর মোটর হর্ন বাজছে—ভোঁপ ভোঁপ ভোঁপ!

তাড়াতাড়ি ফিরে দেখে, গলি দিয়ে আসছে প্রায় দুই ডজন ছোকরার পলটন! দলের সব-আগে রয়েছে ঘণ্টু—মুখে মোটর-হর্ন গর্বিত তার ভঙ্গি!

ঘণ্টু হঠাৎ হর্ন নামিয়ে একখানা হাত মাথার উপরে তুলে বললে, 'সৈন্যগণ, দাঁড়িয়ে পড়ো!'

সৈন্যদের 'মার্চ,' বন্ধ হল তৎক্ষণাৎ।

গোবিন্দ দুই হাতে ঘণ্টুকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'ভাই, আমার যে কী আহ্লাদ হচ্ছে!'

ঘণ্টু বললে, 'বন্ধুগণ, কালীপুরের গোবিন্দবাবুকে দ্যাখো! এর বিপদের কথা তোমাদের কাছে এর আগেই খুলে বলেছি। যে দুরাত্মা এর সর্বনাশ করেছে, ওই দ্যাখো সে আরামে বসে চায়ে চুমুক মারছে! ওকে যদি আমরা পালাতে দি, তাহলে আমাদের অপমানের আর সীমা থাকবে না!'

চশমাপরা একটি ছেলে বললে, 'ইনি নাকি, ওকে আর আমরা পালাতে দিলে তো?'

ঘণ্টু বললে, 'গোবিন্দ, একে আমরা প্রফেসর বলে ডাকি।'

প্রফেসরের সঙ্গে গোবিন্দ 'শেক হ্যান্ড' করলে। তারপর ঘণ্টু একে একে আর-সব ছেলের সঙ্গে গোবিন্দকে পরিচিত করে দিলে।

প্রফেসর গম্ভীর মুখে বললে, 'এইবার কাজের কথা হোক...বন্ধুগণ, তোমাদের কাছে যা আছে, আমাকে দাও।'

গোবিন্দ তার রুমাল বিছিয়ে ধরলে! প্রত্যেক বালক কিছু-না-কিছু চাঁদা দিলে। কেউ এক আনা, কেউ দু আনা, কেউ দশ পয়সা, কেউ পাঁচ আনা, কেউ আট আনা, একজন একটা টাকাও দিলে।

ঘণ্টু বললে, 'মঙ্গলবার, আমাদের মূলধন কত হল দ্যাখো তো।

যার নাম মঙ্গল, বয়স তার সাত-আট বছরের ভিতরেই। দলের সবাই তাকে মঙ্গলবার বলে ডাকে। টাকা-পয়সা গোনবার ভার পেয়ে আনন্দে সে নাচতে লাগল চড়াইপাখির মতো!

গণনা শেষ করে মঙ্গল বললে, 'পাঁচ টাকা দশ আনা দু পয়সা। আমার মত হচ্ছে, আমাদের মূলধন তিন ভাগে ভাগ করা উচিত। কারণ যদি আমাদের আলাদা আলাদা কাজ করতে হয়, তাহলে একজনের কাছে টাকা থাকলে চলবে না।'

প্রফেসর বললে, 'সাধু প্রস্তাব! মঙ্গলবারের পুঁচকে মাথাতে একটুও বাজে মাল নেই, সবটাই বুদ্ধিতে ভরা!'

গোবিন্দের হাতে দেওয়া হল দুই টাকা, প্রফেসর ও ঘণ্টু পেল যথাক্রমে দুই টাকা ও এক টাকা সাড়ে দশ আনা।

গোবিন্দ বললে, 'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ! চোর ধরা পড়লেই তোমাদের টাকা ফিরিয়ে দেব। এখন আমরা কি করব? হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়েছে। আমার এই ব্যাগটা আর ফুলগুলো কোথায় রাখি বলো তো? যদি আমাকে ছুটোছুটি করতে হয়—'

ঘণ্টু বললে, 'ব্যাগ আর ফুল আমাকে দাও। দি গ্রেট নর্দান রেস্তোরাঁর মালিকের সঙ্গে আমার খুব ভাব আছে, ও-দুটো ওইখানেই জিম্মা রেখে দেব আর সেই সঙ্গে জটাবেটাকে আরও ভালো করে দেখে আসব।'

প্রফেসর বললে, 'কিন্তু খুব সাবধান! জটাবেটা একবার যদি সন্দেহ করে তার পিছনে লেগেছে ডিটেকটিভরা, তাহলে যথেষ্ট বেগ দিতে পারে।'

ঘণ্টু যেতে যেতে বিরক্ত স্বরে বললে, 'তুমি কি আমাকে এতটা হাঁদা-গঙ্গারাম ভেবেছ হে?'

খানিক পরেই সে ফিরে এসে বললে, 'জটাবেটার মুখ ফোটোয় তুলে রাখবার মতো। গোবিন্দ, তোমার মালের জন্যে কিচ্ছু ভেবো না।'

গোবিন্দ বললে, 'এইবারে আমাদের পরামর্শ করতে হবে। কিন্তু এ-জায়গায় দাঁড়িয়ে গোপন কথা কওয়া তো চলবে না।'

প্রফেসর বললে, 'বেশ তো, চলো না আমার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে যাই। আমাদের দু জন এখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দিক। পাঁচ-ছ জন থাক পথের মাঝে মাঝে। কিছু ঘটলেই তারা একদৌড়ে আমাদের খবর দিয়ে আসবে।'

ঘণ্টু বললে, 'তোমরা যাও, বাকি সব ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। তোমার কোনও ভাবনা নেই গোবিন্দ, আমি নিজে এখানে হাজির থাকব।'

নবম পরিচ্ছেদ

ডিটেকটিভদের পরামর্শ-সভা

পার্কের এক কোণে ডিটেকটিভদের সভার অধিবেশন।

সকলে গোল হয়ে ঘাস-জমির উপরে গিয়ে বসে পড়ল—কেউ উবু হয়ে, কেউ হাঁটু গেড়ে, কেউ দু পা ছড়িয়ে।

প্রফেসর দাঁড়িয়ে মাঝখানে। তার বাবা হচ্ছেন আদালতের জজ। গভীর কোনও বিষয়ে আলোচনা করতে হলে তার বাবা যেমন চোখ থেকে চশমাখানা খুলে নাড়াচাড়া করতে থাকেন, ঠিক সেই ভাবেই চশমাখানা হাতে নিয়ে নাড়তে নাড়তে প্রফেসর বললে, 'খুব সম্ভব, আমরা সকলে একসঙ্গে কাজ করবার সুযোগ পাব না। কাজেই খবর লেনদেনের জন্যে আমাদের একটা টেলিফোন দরকার। কার কার বাড়িতে টেলিফোন আছে?'

সাত-আটজন বালক হাত তুললে।

—'উত্তম। এখন দেখতে হবে তোমাদের মধ্যে কার মা-বাপের মেজাজ সবচেয়ে ঠান্ডা।'

মঙ্গল বললে, 'আমার মা-বাবা ভারী ঠান্ডা। কখনও আমি বকুনি খাইনি।'

—'উত্তম, মঙ্গলবার! তোমাদের টেলিফোনের নম্বর কী?'

মঙ্গল নম্বর বললে।

—'বুদ্ধু, কাগজ-পেনসিল বার করো। এক এক টুকরো কাগজে মঙ্গলবারের টেলিফোন নম্বর লিখে সকলের হাতে বিলি করে দাও। যার কোনও খবর দেবার বা জানবার দরকার হবে, মঙ্গলবারের কাছে গেলেই চলবে।'

মঙ্গল বললে, 'কিন্তু আমি তো থাকব বাইরে।'

প্রফেসর দৃঢ়স্বরে বললে, 'না। সভাভঙ্গ হলেই তোমাকে বাড়িতে ফিরে যেতে হবে।'

মঙ্গল প্রতিবাদ করে বললে, 'বা রে! তোমরা চোর ধরবে আর আমি দেখতে পাব না, তাও কি হয় দাদা? বয়সে ছোটো হলেও আমি তোমাদের অনেক কাজেই তো লাগতে পারি!'

—'তুমি বাড়িতে টেলিফোনের কাছে থাকবে। এটা হচ্ছে মস্ত-বড়ো কাজ!'

একটু নিরাশ স্বরে মঙ্গল বললে, ' বেশ।'

বুদ্ধু নম্বরের কাগজ বিলি করে দিলে। অনেকে যত্ন করে পকেটে রাখলে, অনেকে আবার তখনই তখনই নম্বরটা মুখস্থ করে ফেললে।

গোবিন্দ বললে, 'জনকয় বাড়তি লোক আমাদের হাতের কাছে রাখা উচিত।'

প্রফেসর বললে, 'নিশ্চয়। আপাতত যাদের দরকার হবে না তারা এই পার্কেই অপেক্ষা করুক। আগে সকলকেই বাড়িতে খবর দিতে হবে যে, আমরা আজ একটু বেশি-রাতেই বাড়ি ফিরব। যাদের মা-বাবা অবুঝ, তারা যেন বলে যে, বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাবে। আচ্ছা, তাহলে আমাদের ডিটেকটিভ বিভাগ, বাড়তি বিভাগ টেলিফোন আপিস—এ-সবের ব্যবস্থা একরকম হল।'

গোবিন্দ বললে, 'আমাদের কাজ কখন শেষ হবে, বলা যায় না! এর মধ্যে কিছু খাবারের দরকার হবে না কি?'

—'হবে বইকী! খাঁদু, গাবু, নন্দ, মধু, কালু! তোমাদের বাড়ি খুব কাছেই! চট করে কিছু খাবার জোগাড় করতে পারো কি না দ্যাখো না।'

পাঁচটা ছেলে উঠে দৌড় মারলে।

মানকে বললে 'প্রফেসর, তোমার বুদ্ধি বড়ো কম! টেলিফোন, খাবার আর যত বাজে ব্যাপার নিয়ে তো এতটা সময় কাটালে; কিন্তু আমরা চোর ধরব কেমন করে, তা নিয়ে কেউ তো মাথা ঘামালে না দেখছি! যত-সব ইশকুল-মাস্টার, খালি বক-বক করে বকতেই জানে।'

ঝণ্টু সিনেমায় অসংখ্য গোয়েন্দা-কাহিনীর ছবি দেখে গভীর জ্ঞান সঞ্চয় করেছে। সে বললে, 'আমাদের কাছে চোরের আঙুলের ছাপ নেবার কোনও মেশিন নেই, আমরা কি করে প্রমাণ করব যে, সেই-ই হচ্ছে চোর?'

মানকে বললে, 'আঙুলের ছাপের নিকুচি করেছে! আমরা সুবিধা পেলেই জটাবেটাকে ধরে টাকাগুলো কেড়ে নেব!'

প্রফেসর বললে, 'গাঁজাখুরি কথা শোনো একবার! কেউ যদি আমার টাকা চুরি করে, আর তার কাছ থেকে সেই টাকাই আমি আবার চুরি করি, তাহলে আমিই হব চোর!'

—'হ্যাঁ!'

—'বাজে বোকো না।'

গোবিন্দ মধ্যস্থ হয়ে বললে, 'প্রফেসর ঠিকই বলেছেন। টাকা আমার হোক আর না হোক, কারুর কাছ থেকে লুকিয়ে নিলেই চুরি করা হয়।'

প্রফেসর বললে, 'এখন বুঝলে তো? সুতরাং মুরুব্বির মতন লেকচার দিয়ে আর সময় নষ্ট কোরো না। জানি না চোরকে ধরবার জন্যে আমরা কোন উপায় অবলম্বন করব, কিন্তু একটা কথা মনে রেখো। চোরকে আমরা বাধ্য করব চুরির টাকা ফিরিয়ে দিতে। আমরা চুরি-টুরি করতে পারব না।'

খুদে মঙ্গলবার বললে, 'এসব কথার মানে আমি বুঝতে পারছি না। যে টাকা আমার, চোরের পকেটে গেলেও সে টাকা আমারই থাকবে। তবে আমার টাকা লুকিয়ে ফিরিয়ে নিলে চুরি করা হবে কেন?'

প্রফেসর বললে, 'এসব ব্যাপার সহজে বোঝানো যায় না। হয়তো আসলে তুমি অন্যায় করছ না, কিন্তু আইনে তুমি হবে অপরাধী।'

মানকে বললে, 'হেঁয়ালি-টেঁয়ালি নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাতে চাই না।'

ঝণ্টু বললে, 'ডিটেকটিভ হতে গেলে রিভলভার চাই।'

মঙ্গল বললে, 'খেলা করবার জন্যে বাবা আমাকে একটা রিভলভার কিনে দিয়েছেন। সেটা আনব নাকি?'

আর একজন বললে, 'ধ্যাত, সে রিভলভারে একটা মশা পর্যন্ত মারা যায় না। আমাদের চাই সত্যিকার রিভলভার!'

প্রফেসর বললে, 'না!'

মানকে বললে, 'আমি বাজি রেখে বলতে পারি, চোরের কাছে, রিভলভার আছে।'

গোবিন্দ বললে, 'চোর ধরতে গেলে বিপদ তো হতেই পারে। যার ভয় হচ্ছে, সে বাড়িতে গিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকুক।'

মানকে উঠে দাঁড়িয়ে ঘুষি পাকিয়ে বললে, 'তুমি কি আমাকে কাপুরুষ বলতে চাও?'

প্রফেসর দুই হাত তুলে বললে, 'শান্ত হও—শান্ত হও! আজ নয়, কাল লড়াই কোরো! এসব কী ব্যাপার! ছি, ছি, আমরা কি শিশু?'

খুদে মঙ্গল বললে, 'নিশ্চয়! আমরা শিশু নই তো বুড়ো-মানুষ নাকি?'

সবাই হেসে উঠল।

গোবিন্দ বললে, 'দ্যাখো, আমার মাসির বাড়িতেও একটা খবর দেওয়া দরকার, সেখানে আমার জন্যে সবাই বড়ো ভাবছে। আমার মাসির বাড়ির ঠিকানা হচ্ছে দশ নম্বর হরেন্ ঘোষ লেন। কেউ কি সেখানে আমার একখানা চিঠি দিয়ে আসতে পারবে?'

ছট্টু বলে একটি ছেলে বললে, 'হ্যাঁ, আমি দিয়ে আসব।'

কাগজ পেনসিল চেয়ে নিয়ে গোবিন্দ লিখলে,

'শ্রীচরণেষু

দিদিমা, তোমরা সবাই বোধহয় ভাবছ, আমি এখন কোথায়? আমি কলকাতায়। তাড়াতাড়ি তোমাদের কাছে যেতে পারছি না, কারণ আগে আমাকে একটা ভারী-দরকারি কাজ সারতে হবে। কাজ ফুরুলে আমি আর একটুও দেরি করব না—এক দৌড়ে তোমার কাছে গিয়ে হাজির হব। আমার কাজটা কী জানতে চেয়ো না। যে ছেলেটি চিঠি নিয়ে যাচ্ছে, আমি কোথায় আছি সে তা জানে। কিন্তু সে-ও আমার সন্ধান হয়তো দেবে না, কারণ এটা হচ্ছে ভয়ানক গুপ্তকথা। মেসোমশাইকে, মাসিমাকে আমার প্রণাম আর নমিতাকে আমার ভালোবাসা জানিয়ো।

সেবক—

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়

পুঃ—মা তোমাকে ভালোবাসা জানিয়েছে! মাসিমাকে বোলো, মা তাঁর জন্যে ফুল পাঠিয়েছেন, আমি গিয়ে দিয়ে আসব।'

গোবিন্দ চিঠিখানা ছট্টুর হাতে দিয়ে বললে, 'কিন্তু সাবধান, টাকাচুরির কথা আর আমার ঠিকানা কারুকে জানিয়ো না। তাহলে আমি ভারী বিপদে পড়ব।'

ছট্টু চলে গেল। তারপরই পাঁচটি ছেলে ফিরে এল খাবারের পাঁচটা কৌটো হাতে করে। কেউ এনেছে লুচি, কেউ আলুর দম, কেউ সিদ্ধ ডিম, কেউ কচুরি-ডালপুরি।

নন্দ বললে, 'আমার মা এই বিস্কুটের টিনটা দিলেন।'

কতক খাবার তারা তখনই খেয়ে ফেললে, কতক তুলে রাখলে রাত্রের জন্য। খেয়ে-দেয়ে সবচেয়ে খুশি হল গোবিন্দই, কারণ দলের মধ্যে তার চেয়ে ক্ষুধার্ত ছিল না আর কেউ।

পাঁচটি ছেলে আবার বাড়িতে ফিরে গেল—ছুটি চাইবার জন্যে। তাদের মধ্যে দুজন আর এল না—তাঁদের মা-বাবা ছুটি দেননি। মঙ্গলও বাড়িতে ফিরে গেল।

প্রফেসর বললে, 'মানকে, আমার বাড়িতে একটা ফোন করে দিস যে, আমার ফিরতে রাত হবে। বাবা তাহলে আমি বাইরে আছি বলে আর কিছু বলবেন না।'

গোবিন্দ বললে, 'কলকাতার বাপ-মায়েরা তো খুব ভালো দেখছি!'

আজ সকালেই বাপের হাতের কান-মলা খেয়ে মানকের কান তখনও টাটিয়ে ছিল। সে গজ গজ করে বললে, 'সব বাপ-মাই যদি এত সহজে বুঝতেন, তাহলে আর ভাবনা ছিল কী!'

প্রফেসর বললে, 'মানকে, বাপ-মাকে ভুল বুঝিসনে। বাবার কাছে আমি অঙ্গীকার করেছি, তাঁর চোখের সামনে যে-কাজ করতে পারব না, তা আমি কখনও করবও না! বাবা জানেন, আমি মিথ্যা বলি না, তাই আমাকে বিশ্বাস করেন। যাক এসব কথা। এখন যাবার আগে শুনে রাখো প্রত্যেকে নিজের কর্তব্য পালন করবে, নইলে গোয়েন্দাগিরি করতে পারবে না। আজ রাতের মতো খাবার আমাদের সঙ্গেই আছে। পাঁচজন ডিটেকটিভ সর্বদাই এখানে হাজির থাকবে। কারুর কিছু জানবার দরকার হলেই টেলিফোন আপিসে গিয়ে খবর নেবে হ্যাঁ, আর একটা কথা। আজ আমাদের দলের সঙ্কেত-বাক্য হবে—'গোবিন্দ'। যে এই সঙ্কেত-বাক্য বলতে পারবে না, নিশ্চয় জেনো, সে আমাদের দলের লোক নয়! মনে থাকবে তো? আমাদের সঙ্কেত-বাক্য 'গোবিন্দ'!'

—'আমাদের সঙ্কেত-বাক্য 'গোবিন্দ'!' —প্রত্যেক ছেলে একস্বরে এই কথা বলে এত জোরে চেঁচিয়ে উঠল যে, সারা পাড়ায় ছুটে গেল তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি!

গোবিন্দ ভাবলে, টাকা চুরি না গেলে তো আমি আজ এমন সব বন্ধুর দেখা পেতুম না! কী মিষ্টি এই ছেলেগুলি!

দশম পরিচ্ছেদ

কুমারী নমিতা সেনের সাইকেল

আচম্বিতে দেখা গেল, গুপ্তচর তিনজন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে আসছে এবং তাদের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে মাথার উপরে হাতগুলো নাড়ছে ঠিক পাগলের মতই।

প্রফেসর বললে, 'এই রে, জটাবেটা বোধহয় ঘণ্টার চোখে ধুলো দিয়েছে!'

প্রফেসর, গোবিন্দ ও মানকে এমন বেগে দৌড় মারলে, যে, তাদের দেখলে মনে হয়, দৌড়-প্রতিযোগিতায় তারা পৃথিবীর 'রেকর্ড' ভাঙবার চেষ্টা করছে!

কিন্তু খানিক দূর এগিয়েই তারা দেখলে, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘণ্টু তাদের আস্তে আসবার জন্যে ইশারা করছে। তখন তারা গতি কমিয়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

প্রফেসর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ব্যাপার কী? জটাবেটা সরে পড়েছে নাকি?'

ঘণ্টু বললে, 'তাহলে আমি কি এখানে বসে ঘাস কাটছি? ওই দ্যাখো?'

রেস্তোরাঁর সুমুখে দাঁড়িয়ে জটাধর তখন এমন পরিতৃপ্তভাবে প্রশান্ত মুখে এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করছে, যেন তার চোখের সামনে রয়েছে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের দৃশ্যাবলী! সেখান দিয়ে একটা বাংলা খবরের কাগজওয়ালা যাচ্ছিল, সে একখানা কাগজ কিনলে।

মানকে বললে, 'নচ্ছারের আবার কাগজ পড়ার শখ আছে!'

বুদ্ধু বললে, 'ও যদি এ ফুটপাতে এসে আমাদের আক্রমণ করে তাহলেই মুশকিল।'

সকলে মুখ লুকোবার জন্যে চোরের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইল এবং ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল তাদের বুকগুলো।

কিন্তু চোর তাদের দিকে ফিরেও তাকালে না, একমনে নিযুক্ত হয়ে রইল খবরের কাগজ নিয়ে।

মানকে বললে, 'আমার বিশ্বাস, খবরের কাগজের আশপাশ দিয়ে ও উঁকি মেরে দেখছে, আমরা ওকে লক্ষ করছি কি না!'

প্রফেসর জিজ্ঞাসা করলে, 'ঘণ্টু, তোমরা যে এখানে পাহারা দিচ্ছ এটা ও ধরে ফেলেনি তো?'

—'উঁহু। ও আমাদের দিকে একবারও ফিরে তাকায়নি। এমন গোগ্রাসে কেবল খাবার গিলেছে, যেন ও বহুকালের উপবাসী!'

গোবিন্দ চেঁচিয়ে উঠল, 'দ্যাখো, দ্যাখো!'

একখানা খালি ট্যাক্সিগাড়ি যাচ্ছিল, চোর হঠাৎ তাকে ডাকলে। ট্যাক্সি থামল। চোর এক লাফে উপরে উঠল। গাড়ি বোঁ করে চলে গেল।

কিন্তু সে গাড়ির ভিতরে চোর ওঠবার আগেই সদা-সতর্ক ঘণ্টু রাস্তার মোড়ের দিকে দৌড় দিয়েছিল—সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও। মোড়ের মাথায় তিনখানা ট্যাক্সি ভাড়ার জন্যে অপেক্ষা করছিল। ঘণ্টু লাফ মেরে তার উপরে উঠে ড্রাইভারকে ডেকে বললে, 'ওই যে সামনের ট্যাক্সি দেখছ, ওর পেছনে পেছনে চলো। কিন্তু সাবধান, ওরা যেন জানতে না পারে, আমরা ওদের পেছনে যাচ্ছি!

খানিক এগিয়েই ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করলে, 'ব্যাপারখানা কী?'

ঘণ্টু বললে, 'ব্যাপার গুরুতর। ও যদি নরকেও যায়, আমরা ওর সঙ্গ ছাড়ব না।'

ড্রাইভার বললে, 'ভাড়া পেলে আমি নরকেও যেতে রাজি আছি। কিন্তু কথা হচ্ছে, তোমাদের কাছে ভাড়া আছে কি?'

প্রফেসর রাগ করে বললে, 'তুমি আমাদের কী মনে করো?'

ড্রাইভার বললে, 'বললুম একটা কথার কথা।'

গোবিন্দ বললে, 'আগের ট্যাক্সিখানার নম্বর হচ্ছে ৪৪৪।'

প্রফেসর নম্বরটা টুকে নিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, এটা খুব দরকারি।'

মানকে বললে, 'ড্রাইভার, তুমি ওদের অত কাছে যেয়ো না।'

পরে পরে গাড়ি দুখানা ছুটছে। রাস্তার লোকেরা দ্বিতীয় গাড়িখানার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়—গাড়ি-ভরতি রকম-বেরকম খোকা, সকলের মুখ উত্তেজিত!

হঠাৎ ঘণ্টু বললে, 'নীচে শুয়ে পড়ো—নীচে শুয়ে পড়ো!'

সকলেই গাড়ির নীচের দিকে ঝাঁপ খেলে বিনা বাক্যব্যয়ে।

প্রফেসর জিজ্ঞাসা করলে, 'হল কী?'

ঘণ্টু বললে, 'এটা রাস্তার চৌমাথা, ট্রাফিক-পুলিশ হাত তুলেছে, সামনের গাড়ির সঙ্গে আমাদেরও এখানে থামতে হবে। চোর একবার ফিরে তাকালেই সর্বনাশ।'

দুখানা গাড়িই দাঁড়িয়ে পড়ল মোড়ের মাথায়। এবং চোর সত্য সত্যই ফিরে তাকালে। কিন্তু তার পিছনের গাড়িতে কারুকেই দেখতে পেলে না। সেখানা ঠিক যেন খালি গাড়ি! দেখলে কে বলবে যে, তার মধ্যে একগাড়ি ছেলে আছে!

দ্বিতীয় গাড়ির ড্রাইভারও পিছন ফিরে দেখে বুঝলে, ব্যাপারখানা কী! সে হো-হা করে হেসে উঠল!

পথ খোলা পেয়ে আবার সব গাড়ি ছুটতে শুরু করলে। ছেলেরা আবার যথাস্থানে।

প্রফেসর 'মিটারে'র দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, 'ভাড়া উঠল আট আনা। ও বাবা, আরও কত দূরে যেতে হবে?'

কিন্তু আর বেশিদূর যেতে হল না। চোরের ট্যাক্সিখানা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল আপার সার্কুলার রোডের 'আদর্শ ভোজনালয়ে'র সামনে।

ছেলেদের গাড়িখানাও দাঁড়িয়ে পড়ল খানিক তফাতে।

জটাধর গাড়ি থেকে নামল। তারপর ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ভোজনালয়ের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

প্রফেসর বললে, 'ঘণ্টু, তুমিও হোটেলের ভেতরে যাও। ও বাড়িখানার খিড়কির দরজা থাকে তো নজর রেখো। সামনের দিকে আমরা আছি।'

তাদের ভাড়া উঠল বারো আনা।

ওদিকে ফুটপাতের পরেই রয়েছে একটা ছোটো বাজার।

প্রফেসর বললে, 'আমাদের বরাত ভালো। এই বাজারের ভেতর আশ্রয় নিলে কেউ আমাদের বাধা দেবে না। এখানে লুকিয়ে আমরা অনায়াসেই হোটেলের ওপরে পাহারা দিতে পারব। বুদ্ধু, তুমি ঘণ্টুর খোঁজে যাও।'

সকলে বাজারের দিকে গেল।

মানকে বললে, 'বাঃ, এখানে একটা 'পাবলিক টেলিফোনও আছে যে!'

গোবিন্দ বললে, ঘণ্টুর মাথা বেশ সাফ হলেই মঙ্গল।'

ঝণ্টু বললে, 'ঘণ্টুকে তুমি চেনো না গোবিন্দ! দেখতে তাকে গাধার মতো বটে, কিন্তু বুদ্ধিতে সে চতুর শৃগাল!'

প্রফেসর বুকের উপরে দুই হাত রেখে বললে, 'এখন ঘণ্টু ফিরলে বাঁচি যে!' তাকে তখন দেখাচ্ছিল পলাশির যুদ্ধক্ষেত্রে লর্ড ক্লাইভের মতো।

ঘণ্টু একমুখ হাসি নিয়ে ফিরে এল। বললে, 'মা ভৈঃ! জটাবেটাকে এইবারে হাতের মুঠোয় পেয়েছি! সে হোটেলের একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে। ও-বাড়ির খিড়কি-দরজা নেই। আমি তন্ন তন্ন করে সব জায়গা খুঁজে এসেছি! ফুড়ুক করে উড়ে পালাবার জন্যে জটার যদি ডানা না থাকে, তাহলে সে ফাঁদে পড়েছে!'

প্রফেসর বললে, 'বুদ্ধু পাহারায় আছে তো?'

ঘণ্টু বললে, 'তুমি আচ্ছা নিরেট তো! সে কথা আবার বলতে?'

প্রফেসর বললে, 'মানকে, এইবার আমাদের টেলিফোন আপিসে খবর দিতে হবে। পাবলিক ফোন থেকে কথা কইলেই চলবে। ফোনের দাম এই দু-আনা নিয়ে যা!'

মানকে তখনই 'ফোনে' নম্বর বলে ডাকলে, 'হ্যালো, মঙ্গলবার!'

সাড়া এল—'হাজির!' —সঙ্কেত-বাক্য 'গোবিন্দ'! জটাবেটা আপার সার্কুলার রোডের 'আদর্শ ভোজনালয়ে'র ঘর ভাড়া করেছে। আমাদের 'হেড-কোয়ার্টার' হয়েছে ভোজনালয়ের সামনের বাজারে।

খুদে মঙ্গলবার সমস্ত খবর একখানা কাগজে লিখে রাখলে। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, 'আমাদের কি আরও লোকের দরকার?'

—'না।'

—'জটাবেটা হোটেলে কত নম্বরের ঘর ভাড়া নিয়েছে?'

—'সে খবর পরে দেব।'

—'তোমরা কি করে তার সঙ্গে সঙ্গে গেলে?'

মানকে সংক্ষেপে বর্ণনা করলে।

—'চোর এখন কী করছে?'

—'হয় খাটের তলায় উঁকি মেরে দেখছে সেখানে কেউ লুকিয়ে আছে কি না, নয় একলা বসে তাস খেলছে!'

—'আহা, আমি যদি তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারতুম! এবারে ইশকুলের রচনা-প্রতিযোগিতায় আমি এই ঘটনাটাই বর্ণনা করব।'

—'এর মধ্যে আর কেউ তোমাকে ডেকেছে?'

—'না, ভারী একঘেয়ে লাগছে। একলা বসে খালি কড়িকাঠ গুনছি। ও হো হো, আমি যে সঙ্কেত-বাক্যটা বলতে ভুলে গিয়েছি—'গোবিন্দ'!'

—'সঙ্কেত-বাক্য 'গোবিন্দ'! আচ্ছা, আসি!'

মানকে আবার 'হেডকোয়ার্টারে' ফিরে এসে 'রিপোর্ট' দিলে।

প্রফেসর বললে, 'উত্তম!'

ঘণ্টু বললে, 'সন্ধে হল। জটাবেটাকে আজ বোধহয় ধরা যাবে না।'

গোবিন্দ বললে, 'সে এখন খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়লেই বাঁচি। নইলে সে যদি আমার মায়ের টাকায় আবার ট্যাক্সি নিয়ে নবাবি করতে বেরোয়, কি থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখতে যায়, তাহলে আমাদের মূলধনে আর কুলোবে না!'

ইতিমধ্যে প্রফেসর একবার বাইরে টহল মেরে এসে বললে, 'কী উপায়ে আরও কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা যায়, তোমরা একবার গভীর চিন্তা করে দ্যাখো দেখি।'

তারা একটা রোয়াকে বসে খানিকক্ষণ নীরবে গভীর চিন্তায় নিযুক্ত হয়ে রইল।

আচম্বিতে শোনা গেল—ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং!

প্রফেসর চমকে বললে, 'ও কি ও?'

মানকে বললে, 'একখানা চকচকে নতুন সাইকেলে চড়ে একটি টুকটুকে মেয়ে বাজারের উঠোনে ঢুকছে!'

ঝণ্টু আশ্চর্য স্বরে বললে, 'আরে সাইকেলে আমাদের ছটুও বসে আছে যে!'

ছটু মাথার উপরে হাত নাড়তে নাড়তে বললে, 'হিপ হিপ হুর রে!'

গোবিন্দ আনন্দে নৃত্য করে বললে, 'সাইকেলে মেয়ে? নিশ্চয় নমিতা!'

টুক করে সাইকেল থেকে নেমে পড়ে নমিতা বললে, 'হ্যাঁ, আমি কুমারী নমিতা সেন। আর তুমি নিশ্চয় পলাতক গোবিনদা?'

গোবিন্দ দৌড়ে গিয়ে নমিতার হাত ধরে ফিরে বললে, 'বন্ধুগণ, আমার মাসতুতো বোন কুমারী নমিতা সেন!' নমস্কারের আদানপ্রদান হল।

প্রফেসর নাক থেকে চশমা নামিয়ে নাড়তে নাড়তে গম্ভীর স্বরে বললে, 'কুমারী নমিতা সেনের পরিচয় পেয়ে আমরা ধন্য হলুম। কিন্তু ছট্টু, আমি বলতে বাধ্য যে, তুমি অতি অন্যায় করেছ!'

—'আমি আবার কী অন্যায় করলুম?'

—'মূর্খ! কী অন্যায় করেছ তাও বুঝতে পারছ না? তোমাকে কি আমাদের গুপ্তকথা প্রকাশ করতে মানা করা হয়নি?'

—'কে বলে আমি গুপ্তকথা প্রকাশ করেছি? আমি তো কেবল নমিতা সেনকে এখানে নিয়ে এসেছি।'

নমিতা সাইকেলের ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে বললে, 'নিয়েও তুমি আসোনি বাপু, আমি জোর করে নিজের সাইকেলে তোমাকেই তুলে নিয়ে এখানে এসেছি। খালি তাই নয়, আমি বাড়ির লোককে লুকিয়ে এখানে এসেছি। আবার এখুনি আমাকে পালাতে হবে।'

প্রফেসর বললে, কুমারী নমিতা সেন, এ-ব্যাপারের মধ্যে নারীর থাকা উচিত নয়।'

কিন্তু নমিতা তাকে আর আমলে না এনে গোবিন্দের দিকে ফিরে বললে, 'হ্যাঁ গোবিনদা, আমরা মরছি তোমার জন্যে ভেবে ভেবে, আর তুমি এখানে দিব্যি অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে মেতে আছ! ভাগ্যে ছট্টু গেল, নইলে আবার আমাদের হাওড়া স্টেশনে ছুটতে হত। কিন্তু ছট্টু ছেলেটি বেশ, তোমার বন্ধু-ভাগ্য ভালো গোবিনদা!'

ছট্টু অতিশয় বিনয়ে মাথা নত করলে।

নমিতা বললে, 'কিন্তু ব্যাপারটা কী বলো দেখি গোবিনদা? ভয় নেই, আমি কারুকে কিছু বলব না।'

গোবিন্দ অল্প কথায় সব বললে।

নমিতা বললে, 'ওহো, এ যে সত্যিকার সিনেমা! বেটা-ছেলেদের যতটা বোকা ভাবি, তাহলে তারা ততটা বোকা নয়! হ্যাঁ গোবিনদা, তোমার বন্ধুগুলিও বেশ! আমার সবচেয়ে ভালো লাগছে ওই প্রফেসরটিকে। চমৎকার চশমা! খাসা গম্ভীর মুখ! তুমিই বুঝি গোয়েন্দা-সর্দার?'

এইবারে প্রফেসরের গাম্ভীর্যের আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে পড়ল খিল খিল করে কৌতুক-হাসি! তারপর অনেক চেষ্টায় হাসি থামিয়ে প্রফেসর আবার গাম্ভীর্যের কেল্লার ভিতরে আশ্রয় নিয়ে বললে, 'কুমারী নমিতা সেন, আমি তোমার কাছে হার মানলুম। তুমি ধন্যি মেয়ে।

নমিতা বললে, 'গোবিনদা, আমার হাতে আর সময় নেই। দিদ্‌মা, বাবা, মা, নিশ্চয়ই এতক্ষণে আমাকে খুঁজতে শুরু করে দিয়েছেন। আমি ছট্টুকে সদর খুলে রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দেব বলে পালিয়ে এসেছি! আমাকে খুঁজে না পেলে এখনই পুলিশে খবর দেবে। একদিনে ছেলে আর মেয়ে দুইই হারানো তারা সইতে পারবে না।'

গোবিন্দ বললে, 'বাড়ির সবাই আমার ওপরে খুব চটে গিয়েছেন তো?'

—'ধ্যাত, চটবে কেন? তোমার চিঠি পেয়েই দিদ্‌মা আহ্লাদে পাগলের মতো হয়ে ঘরময় ঘুরতে ঘুরতে বলতে লাগলেন— 'আমরা নাতি কলকাতায় এসেই লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে!' বাবা আর মা অনেক কষ্টে দিদ্‌মাকে ঠান্ডা করে বসালেন। আচ্ছা গোবিনদা, আমি পালাই। নমস্কার প্রফেসর! এতদিন পরে একজন জ্যান্ত ডিটেকটিভ দেখবার সৌভাগ্য হল, ধন্য আমি!' সে দু পা এগিয়ে আবার ফিরে এসে বললে, 'গোবিনদা, এই একটা টাকা রেখে দাও, তোমাদের দরকার হতে পারে। একখানা অ্যাডভেঞ্চারের উপন্যাস কিনব বলে জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে এই টাকাটা আমি জমিয়েছিলুম। কিন্তু আজ তুমি যে আসল অ্যাডভেঞ্চার দেখালে, তারপর আর কেতাবের বানানো গল্প না পড়লেও চলবে। আমি আবার কাল সকালে পালিয়ে আসবার চেষ্টা করব। রাতে কোথায় শোবে গোবিনদা? আমি এখানে থাকলে তোমাদের জন্য চা তৈরি করে দিতে পারতুম, কিন্তু উপায় কি—লক্ষ্মী-মেয়েদের বাড়িতেই থাকা উচিত, না প্রফেসর? আচ্ছা, সবাইকে নমস্কার!' দুচারবার আদর করে গোবিন্দের পিঠ চাপড়ে নামিতা ছোট্ট একটি লাফ মেরে সাইকেলের উপরে উঠল এবং হাসিমুখে ঘন ঘন ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মানকে বললে, 'বাবা, মেয়ে যেন কথার ফুলঝুরি! আমাদের কারুকে আর মুখ খুলতে দিলে না!'

ঘণ্টু বললে, 'এক্কেবারে পাকা গিন্নি!'

প্রফেসর অভিভূতের মতো বললে, 'ধন্য, ধন্য, ধন্য!'

একাদশ পরিচ্ছেদ

কালীপুরের পাখির গান

মিনিটের পর মিনিট এগিয়ে যাচ্ছে।

গোবিন্দ একবার সন্তর্পণে বাজারের ভিতর থেকে বেরুল। তারপর 'আদর্শ ভোজনালয়ে'র এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে দেখলে, বুদ্ধু ও আরও দুটি ছেলে রীতিমতো পাহারায় মোতায়েন আছে।

তারপর ফিরে এসে বললে, 'দ্যাখো, আমাদের আরও কিছু করা দরকার! হোটেলের ভেতরও একজন গুপ্তচর না রাখলে চলবে না। বুদ্ধু ঠিক হোটেলের সদর-দরজার সামনেই আছে বটে, কিন্তু সে একবার যদি অন্যমনস্ক হয়ে মুখ ফেরায়, তাহলে জটাধরের টিকি কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না!'

ঘণ্টু বললে, 'তুমি তো ফস করে খুব সহজেই কথাটা বলে ফেললে, কিন্তু হোটেলের ভেতর আমাদের কারুকে থাকতে দেবে কেন? আর ভেতরে থাকলে বিপদেরও ভয় তো আছে! জটাবেটা যদি আমাদের কারুকে চিনে ফেলে?'

—'না, না, হোটেলের ভেতরে আমাদের কেউ থাকবে কেন?'

প্রফেসর বললে, 'তবে তুমি কী বলতে চাও?'

গোবিন্দ বললে, 'আমি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করেছি, হোটেলে একটা ছোকরা-চাকর আছে আর সে বার বার ওঠা-নামা করছে। সে-ও তো আমাদেরই বয়সী, তাকে কি আমাদের দলে টেনে নেওয়া যায় না?'

—'সৎ পরামর্শ!' প্রফেসর বললে, 'হ্যাঁ, গুড আইডিয়া!' প্রফেসর ঠিক ইশকুলের শিক্ষকের মতোই মুরুব্বিয়ানা করে কথা কয়, সেই জন্যেই সবাই তার নাম রেখেছে প্রফেসর। 'সত্যি; গোবিন্দ ভারী বুদ্ধিমান। এ-রকম আর একটা ভালো পরামর্শ দিলেই গোবিন্দকে আমরা একটা উপাধি দিতে বাধ্য হব। কে বলে গোবিন্দ পাড়াগেঁয়ে ছেলে!'

ঘণ্টু বললে, 'কলকাতায় থাকলে গোবিন্দের বুদ্ধি আরও খুলত!'

পল্লিগ্রামের ছেলে গোবিন্দ আহত স্বরে বললে, 'পৃথিবীর সাড়ে পনেরো আনা বুদ্ধির জন্ম কলকাতার বাইরেই। সাড়ে পনেরো আনা কেন, প্রায় ষোলো আনাই। হ্যাঁ, মনে থাকে যেন, তোমার সঙ্গে এখনও আমার ঘুষির লড়াই বাকি আছে।'

প্রফেসর বললে, 'ঘুষির লড়াই!'

—হ্যাঁ, বক্সিং। ঘণ্টু আমার নীলরঙের পোশাককে অপমান করেছে।'

প্রফেসর বললে, 'উত্তম। কাল চোর ধরা পড়বার পর তোমাদের মুষ্টিযুদ্ধের ব্যবস্থা করব।'

ঘণ্টু হাসতে হাসতে বললে, 'গোবিন্দ, এতক্ষণ ধরে দেখে দেখে আমার এখন মনে হচ্ছে যে, আসলে তোমার নীলরঙের পোশাকটি দেখতে বিশেষ মন্দ নয়। অবিশ্যি তোমার সঙ্গে ঘুষি লড়তে আমি সর্বদাই প্রস্তুত। কেবল এইটুকু মনে রেখো ভায়া, কলকাতার এ-অঞ্চলে ঘুষির লড়াইয়ে কেউ আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না!'

গোবিন্দ বললে, 'কালীপুরের ইশকুলেও আমার ঘুষি খেয়ে কোনও ছেলেই দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না!'

প্রফেসর বললে, 'ঘণ্টু! গোবিন্দ! এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর বাক্য-নবাবি করে সময় কাটিয়ো না, প্রত্যেক মুহূর্তই মূল্যবান! আমি এখন হোটেলের দিকে যেতে চাই। কিন্তু তোমাদের দুজনকে এখানে রেখে যেতেও আমার ভয় হচ্ছে! কারণ আমি গেলেই তোমরা হয়তো মারামারি শুরু করে দেবে!'

ঘণ্টু বললে, 'বেশ, আমিই না হয় যাচ্ছি!'

প্রফেসর বললে, 'উত্তম! সেই ছোকরা-চাকরকে দলে টানবার চেষ্টা করো। কিন্তু খুব সাবধান! জটাবেটার ঘরের নম্বরটাও জেনে নিয়ো। একঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসে রিপোর্ট দেবে!'

ঘণ্টু অদৃশ্য!

বাজারের প্রবেশপথের রোয়াকের উপর বসে গোবিন্দ ও প্রফেসর নিজের নিজের ইশকুলের মাস্টারদের আচরণ নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

গোবিন্দ বললে, 'আমি আঁক শিখেছি বেতের ভয়ে। আমাদের আঁকের মাস্টার কোনও ভুল করলেই পিঠে তার বেতের ডোরা-দাগ কেটে দেন।'

প্রফেসর বললে, 'আমিও বাধ্য হয়ে খুব ভালো আঁক কষতে শিখেছি। কারণ, আঁকে যে-ছেলের মাথা খোলে না তার মাথায় গাধার টুপির ঢাকনা বসিয়ে দেন আমাদের আঁকের মাস্টার।'

গোবিন্দ বললে, 'বেতের চেয়ে গাধার টুপি ভালো।'

প্রফেসর বললে, 'ভালো নয়, ভদ্র বলতে পারো। বেতে জখম হয় দেহের উপরটা। গাধার টুপি আহত করে দেহের ভিতরে মনকে। মফঃস্বলের মাস্টার বেশি-বর্বর, আর শহরের মাস্টার বেশি-নিষ্ঠুর। কারণ দেহের ঘা সারে দুদিনে, আর মনের ঘা সারতে লাগে অনেক দিন।'

গোবিন্দ বললে, 'তুমি অমন জ্ঞানীর মতন কথা কইতে শিখলে কেমন করে?'

—'বাবার কাছ থেকে। বাবা যা বলেন, আমি মন দিয়ে শুনি!'

গোবিন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'আমার বাবা স্বর্গে। তিনি বেঁচে থাকলে আমিও তোমার মতো কথা কইতে পারতুম।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললে, 'আমার খিদে পেয়েছে।'

প্রফেসর বললে, 'আমারও।'

তারা দুজনে কৌটোর ভিতর থেকে দুখানা করে লুচি ও একটা করে আলুর দম বার করে ক্ষুধার অত্যাচার দমন করলে।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে রাস্তার আলোর থামগুলো জ্বলে উঠেছে। দূর থেকে শিয়ালদহ স্টেশনের কোলাহল ও রেলগাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে কিছু কিছু। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে রাজপথের ট্রাম, লরি, মোটর, সাইকেল ও রিকশা প্রভৃতির আওয়াজ এবং জনতার হট্টগোল। এ যেন একটা বন্য কনসার্ট।

গোবিন্দ বললে, 'দ্যাখো প্রফেসর, শহরের এই গাড়ির, বাড়ির আর মানুষের ভিড়ে মাঝে মাঝে এক-একটা সবুজ গাছ দেখে আমার কি মনে হচ্ছে জানো? ওরা যেন ঠিক আমারই মতো। মফস্বল থেকে এখানে এসে পড়ে ওরা যেন ভুল করে পথ হারিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে!'

প্রফেসর বললে, 'কিন্তু ওসব গাছেও পাখিরা ডাকে ঠিক তোমাদের পাড়াগাঁয়েরই মতো।'

গোবিন্দ বললে, 'স্বীকার করি। কিন্তু ওসব গাছে তো খালি পাখির ডাকই শুনলুম,—গান তো গাইলে না কোনও পাখি! পাখির গান বলতে আমি কাক-চিল-চড়াইয়ের চিৎকার বুঝি না, প্রফেসর!'

প্রফেসর এত সহজে কলকাতার দীনতা মানতে রাজি নয়। বললে, 'গানের পাখিদের আমরা আদর করে ভালো খাঁচায় আশ্রয় দি, আর তাদের গান শুনি সারাদিন।'

গোবিন্দ মাথা নেড়ে বললে, 'না ভাই প্রফেসর! পাখির গান বলতে কী বোঝায় তা যদি শুনতে চাও, তাহলে আমাদের কালীপুরে যেয়ো। সেখানে সকালে তুমি প্রথমেই জেগে উঠবে যেন পাখির গানের স্বপনপুরে। সে তোমার দু-চারটে খাঁচার পাখির কান্না-গান নয়, হাজার হাজার পাখির আনন্দ-গান—যেন অন্ধকারকে হারিয়ে দিয়েছে বলে আলোর উদ্দেশে বিজয় গান! ঘর থেকে বেরিয়ে এলে দেখবে, রোদ-হাসি-মাখা সবুজে-ছাওয়া নাচঘরে কোকিল গাইছে, দোয়েল-শ্যামা শিস দিচ্ছে, খঞ্জন নাচছে, বউ-কথা-কও বউকে সাধাসাধি করছে আর তিতির ধরেছে যেন টিটকারির সুর! আরও কত-রকম পাখির কত গানের কথা। সেখানে

দুপুরে ডাকে, গান গায় অন্য রকম নানা পাখি, আবার রাতে চাঁদের আলোর আসর রাখতে আসে নতুন নতুন দলের পাখিরা। পাখির গানের কথা তুলো না প্রফেসর, তাহলে আমাদের কালীপুরের পাশে বসে তোমাদের কলকাতা কিছুতেই একজামিনে পাস করতে পারবে না।'

প্রফেসর বললে, 'হার মানলুম গোবিন্দ! দেখছি তুমিও তো কম কথা জানো না! তুমি বুঝি কবিতা-টবিতা লিখতে পারো!'

গোবিন্দ লজ্জিত হয়ে বললে, 'কবিতা পড়েছি বটে, কিন্তু লিখিনি তো কখনও!'

—'এইবার থেকে লিখো। তুমি কবি হতে পারবে। কিন্তু আঁক না কষে কবিতা লিখলে তোমার মা বোধহয় বকবেন?'

—'আমার মা? আমার মা কখনও আমাকে বকেন না। আমার যা-খুশি করতে পারি। কিন্তু আমি যা-খুশি করতে চাই না। বুঝলে?'

—'উঁহু, বুঝলুম না।'

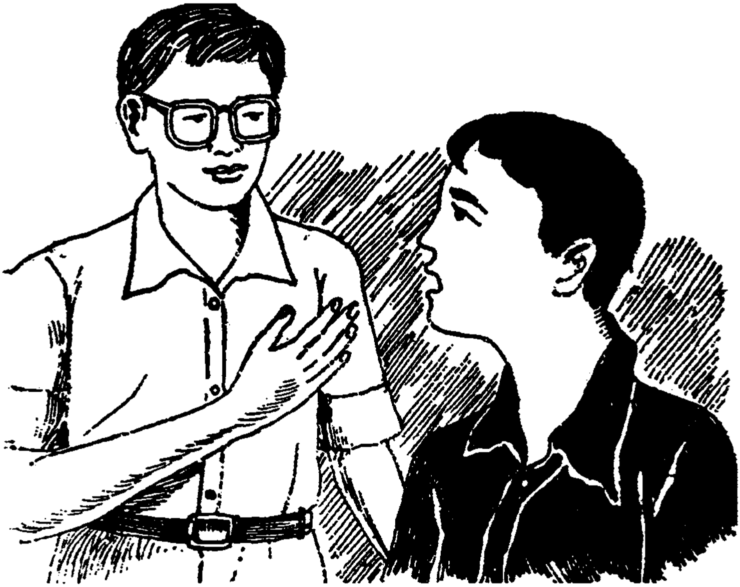

—'বুঝলে না? তবে শোনো। তোমরা কি খুব ধনী?'

—'জানি না গোবিন্দ! আমার বাড়িতে টাকার কথা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।'

—'টাকার কথা নিয়ে কেউ মাথা যখন ঘামায় না তখন নিশ্চয়ই তোমাদের অনেক টাকা আছে।'

প্রফেসর কিছুক্ষণ ভেবে বললে, 'হতে পারে।'

—'কিন্তু মায়ের সঙ্গে আমাকে টাকাকড়ির অনেক কথাই কইতে হয়। কারণ আমাদের

টাকাকড়ি বড়ো কম। এত কম যে, মাকে টাকা রোজগারের জন্যে দিন-রাত খাটতে হয়। তবু মা আমাকে রোজ এত পয়সা দেন যে, বড়োলোকের ছেলেরাও তার চেয়ে বেশি পায় না।'

—'কী করে তোমার মা দেন?'

—'তা জানি না। তবে দেন। কিন্তু তবু সব পয়সা খরচ না করে মায়ের কাছে কিছু কিছু আমি ফিরিয়ে আনি।'

—'তোমার মা কি তাই চান?'

—'তিনি চান না, কিন্তু আমি চাই।'

—'ও, তাই নাকি?'

—'হ্যাঁ। তেমনি, মা যদি আমাকে খেলবার জন্যে দু ঘণ্টা ছুটি দেন, আমি এক ঘণ্টা খেলা করেই ফিরে আসি। মা ঘরকন্নার কাজ নিয়ে একলাই ব্যস্ত হয়ে থাকবেন আর আমি খেলে খেলে বেড়াব, তা কি হয় ভাই? মা আমাকে খেলতে ছুটি দেন বটে, কিন্তু আমি জানি ছেলে তাঁর কাছে কাছে থাকলে তিনি ভারী খুশি হন। তাই আমি যা-খুশি করতে চাই না। এইবারে বুঝলে?'

রাত হয়েছে। তারা উঠেছে। শহরের গ্যাসের আলোর সঙ্গে মিলেছে অল্প-অল্প চাঁদের আলো। পথের গোলমাল কমে আসছে ধীরে ধীরে।

এই পাড়াগেঁয়ে ছেলেটির ভিতরে প্রফেসর একটি নতুন রূপ দেখতে পেলে। তার হাতখানি স্নেহভরে নিজের হাতের ভিতরে নিয়ে মৃদুস্বরে বললে, 'মাকে বুঝি তুমি খুব ভালোবাসো?'

গোবিন্দ বললে, 'হ্যাঁ! খুব, খুব, খুব ভালোবাসি।'

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ঘণ্টুর বকশিশ লাভ

রাত যখন দশটা বাজে বাজে, একদল ছোকরা বাজারের ভিতরে এসে হাজির। সঙ্গে করে এনেছে তারা এত মাখন আর পাউরুটি যে, তার দ্বারা মস্ত এক সৈন্যদলের খোরাকের কাজ চলতে পারে।

প্রফেসর বিরক্ত হয়ে বললে, 'তোমাদের থাকবার কথা পার্কে। দরকার হলে আমি 'ফোনে' তোমাদের ডাকতুম। তবু কেন তোমরা এখানে এসেছ—যখন কেউ তোমাদের ডাকেনি?'

ঝণ্টু বললে, 'মুখ-নাড়া দিয়ো না প্রফেসর! এখানে কী কাণ্ড চলছে জানতে না পেরে আমরা সবাই পেট ফুলে মারা যাবার মতো হয়েছি।'

নন্দ বললে, 'আমাদের দুর্ভাবনাও হয়েছিল! অনেকক্ষণ খবর না পেয়ে ভেবেছিলুম, হয়তো তোমরা কোনও বিপদে পড়েছ।'

—'পার্কে এখন কজন আছে?'

খাঁদু বললে, 'তিন কী চারজন।'

প্রফেসর বললে, 'অন্যায় করেছ—তোমরা অন্যায় করেছ।'

ঝন্টু খাপ্পা হয়ে চেঁচিয়ে বললে, 'প্রফেসর, তোমার মোড়লগিরি আর সহ্য হয় না! তোমার হুকুম কেন আমরা শুনব?'

প্রফেসর মাটিতে লাথি মেরে বললে, 'আমাদের তালিকা থেকে এখনই ঝন্টুর নাম কেটে দেওয়া হোক!'

গোবিন্দ বললে, 'আমার উপকার করতে এসে তোমরা কি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধাতে চাও? ঝন্টুর নাম কেটে না দিয়ে এবারে তাকে খালি সাবধান করে দেওয়া হোক। সবাই যদি নিজের নিজের মতো চলে, তাহলে মিলে-মিশে কোনও কাজই করবার উপায় থাকে না যে!'

ঝন্টু বললে, 'চুলোয় যাক তোমাদের কাজ! আমি আর তোমাদের মধ্যে নেই!' বলেই হন হন করে চলে গেল।

নন্দ বললে, 'আমরা প্রথমে আসতে চাইনি প্রফেসর! ঝন্টুই আমাদের নিয়ে এল।'

প্রফেসর ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'আর ঝন্টুর নাম কোরো না। তাকে ভুলে যাও।'

খাঁদু বললে, 'আমরা এখন কী করব?'

গোবিন্দ বললে, 'ঘণ্টু ফিরে না আসা পর্যন্ত এইখানেই তোমরা থাকো।'

প্রফেসর বললে, 'সেই কথাই ভালো। ......গোবিন্দ, হোটেলের সেই ছোকরা-চাকরটা এইদিকেই আসছে না?'

—'হ্যাঁ, তাই তো দেখছি।'

নন্দ তারিফ করে বললে, 'ওর পরনে কী চমৎকার উর্দি!'

উর্দি-পরা বাচ্চা-চাকরটা ভিতরে এসে দাঁড়াল। আধা-অন্ধকারে তার মুখখানা ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না।

প্রফেসর বললে, 'ঘণ্টু কি তোমাকে পাঠিয়েছে?'

—'হ্যাঁ?'

—'সঙ্কেত-বাক্য?'

—'গোবিন্দ বলো মন, গোবিন্দ!'

গোবিন্দ হেসে ফেলে বললে, 'হুঁ, তুমি তো খুব রসিক দেখছি! এখন খবর কী বলো।'

হঠাৎ বেজে উঠল এক মোটর-হর্ন—ভোঁপ ভোঁপ ভোঁপ! সঙ্গে সঙ্গে সেই উর্দি পরা ছোকরা হো হো হাসি হাসতে হাসতে এমন এক তাণ্ডব-নাচ শুরু করে দিলে, যেন খেপে গিয়েছে একেবারে!

তারপর সে হাসি-নাচ থামিয়ে বললে, 'গোবিন্দভায়া, তুমি ডাহা অন্ধ!'

গোবিন্দ সবিস্ময়ে বললে, 'আরে, তুমি যে আমাদের ঘণ্টু!'

আর সব ছেলেও হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কী!

প্রফেসর বললে, 'অতুল! অপূর্ব! সাধু! কিন্তু হাসির ঘটা থামাও। ঘণ্টুও এদিকে এই রোয়াকে এসে বসো। রিপোর্ট দাও।'

ঘণ্টু বললে, 'এ একেবারে রীতিমতো নাটক! শোনো : আমি হোটেলের ভেতরে গেলুম!

সিঁড়ির ওপরে হোটেলের সেই ছোকরা দাঁড়িয়েছিল। আমি চোখ মটকে ইসারা করলুম। সে কাছে এল। বললুম সব কথা—A থেকে Z পর্যন্ত। বললুম গোবিন্দের কথা, চোরের কথা, আমাদের কথা। এও জানালুম, কাল সকালেই আমরা তাকে জব্দ করব। আজ রাতটা আমি খালি হোটেলের ভেতরে থেকে চোরের ওপরে পাহারা দিতে চাই।

সব শুনে ছোকরার উৎসাহ, আগ্রহ আর আনন্দ দেখে কে? বললে, 'আমার আর একটা উর্দি আছে। সেইটে পরে তুমি পাহারা দাও।'

আমি বললুম, 'হোটেলের যদি কেউ আপত্তি করে?'

সে বললে, 'কর্তারা রাতে এদিকে আসে না! চোর যে ঘরে আছে তার পাশেই আমার ঘর। আমি তোমাকে সেইখানেই লুকিয়ে রাখব।'

বুঝেছ প্রফেসর, আজ থাকো তোমরা বাজারে পড়ে, কিন্তু আমার অদৃষ্টে আছে হোটেল বাস!'

প্রফেসর বললে, 'তুমি যদি হোটেলে থাকো, তাহলে আমাদের রাত কাটাতে হবে কেন? আমরাও বাড়ি গিয়ে ঘুমোতে পারি। চোর যে ঘরে আছে তার নম্বর কত?'

—'পনেরো। শোনো, এখনও, আমার সব কথা বলা হয়নি। জটাবেটার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে।'

গোবিন্দ উত্তেজিত স্বরে বললে, 'অ্যাঁঃ!'

—'হ্যাঁ। উর্দি পরে হোটেলের দোতলায় দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ পনেরো নম্বর ঘরের দরজা খুলে গেল। তারপর বেরিয়ে এল জটাবেটা নিজে। দেখেই চিনলুম। গান্ধি-টুপি-পরা সেই ঘোড়ামুখ, একবার দেখলে কি এ-জীবনে ভোলা যায়?'

আমি তাকে সেলাম ঠুকে বললুম, 'আপনার কি কিছু দরকার আছে বাবু?'

সে বললে, 'না।......হ্যাঁ, একটা কথা শুনে রাখো। কাল ঠিক বেলা আটটার সময়ে আমাকে তুলে দিয়ো। এই নাও বকশিশ!' বলেই সে আমাকে একটা দুয়ানি উপহার দিলে।

আমি আবার সেলাম করে বললুম, 'যে আজ্ঞে হুজুর! আমি ভুলব না।'

তারপর সে আবার নিজের ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজায় খিল তুলে দিলে।

প্রফেসর বললে, 'উত্তম! মহারাজ কাল সকালে জেগে উঠে দেখবেন, আমার সৈন্যদল তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে।'

নন্দ বললে, 'মাছ তাহলে জালে পড়েছে। এখন জাল তুলতেই যা দেরি।'

ঘণ্টু বললে, 'আমি তাহলে এখন আসি। কাল সকালে চোরকে জাগিয়ে দিয়েই আমি আবার এইখানে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করব।'

গোবিন্দ কৃতজ্ঞ স্বরে বললে, 'ভাই ঘণ্টু, তুমি আজ আমার যে উপকারটা—'

ঘণ্টু বাধা দিয়ে বললে, 'ওসব কথা যেতে দাও ভাই গোবিন্দ? এরা তো শুনছি আজ রাতের মতো বাড়ি যাচ্ছে, তুমি কোথায় যাবে? মাসির বাড়ি?'

গোবিন্দ শিউরে উঠে বললে, 'বাপ রে, টাকার ব্যবস্থা না করেই? উঁহু!'

ঘণ্টু বললে, 'তাহলে তুমিও আমার সঙ্গে এসো। বলে-কয়ে তোমাকেও আজকের রাতটা হোটেলে রাখতে পারব।'

গোবিন্দ বললে, 'রাজি!'

প্রফেসর বললে, 'বন্ধুগণ, তাহলে আজ আর কারুর এখানে থাকার দরকার নেই। আমিও এখন মঙ্গলবারকে 'ফোন' করে বাড়িতে যাব। কিন্তু সবাই স্মরণ রেখো, কাল সকাল সাড়ে-সাতটার ভেতরে সকলকেই আবার এখানে আসতে হবে। ঠিক এখানে নয়, কারণ এটা হচ্ছে বাজার, সকালে ভিড়ে দাঁড়াবার ঠাঁই থাকবে না। বাজারের পাশেই যে মাঠটা রয়েছে, কাল ওইখানেই হবে আমাদের 'হেড-কোয়ার্টার'। মনে থাকে যেন, কাল সকাল সাড়ে সাতটা, পাশের মাঠ।'

ঘণ্টু হেসে বললে, 'হ্যাঁ সর্দার!'

—'পারো তো সঙ্গে করে কিছু কিছু পয়সা এনো। বিদায়!'

একঘণ্টা পরেই ডিটেকটিভদের দল যে-যার বাড়িতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

তারা ঘুমুল বিছানায়, কিন্তু খুদে মঙ্গলের অদৃষ্টে সে-রাতে তখনও বিছানা জোটেনি।

মাঝ-রাতে তার বাবা আর মা থিয়েটার থেকে বাড়িতে ফিরে সবিস্ময়ে দেখলেন টেলিফোনের টেবিলের সামনে, চেয়ারের কুশনের উপর হেলে তাঁদের ছোটো ছেলে মঙ্গল ঘুমিয়ে রয়েছে।

মা তাকে কোলে তুলে যখন বিছানায় শোয়াতে নিয়ে যাচ্ছেন, ঘুমের ঘোরে বিড়-বিড় করে সে-বললে, 'সঙ্কেত-বাক্য, গোবিন্দ...সঙ্কেত-বাক্য, গোবিন্দ!'

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

জটাধরের রক্ষী সৈন্য

'আদর্শ ভোজনালয়ে'র পনেরো নম্বর ঘরটি ছিল একেবারে বড়ো রাস্তার উপরে।

পরদিন সকালে জটাধর যখন জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আরশিচিরুনি নিয়ে চুল আঁচড়াতে ব্যস্ত, তার কানে ঢুকল অনেক ছোটো ছোটো ছেলের চিৎকার।

জটাধর জানলার কাছে এসে দেখলে, রাস্তার ওধারকার মাঠে অন্তত: দুই ডজন ছেলে খেলছে ফুটবল।

আর একদল ছেলে বাজারের সামনের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছে।

হোটেলের ঠিক তলা থেকে এল আর একদল ছেলের চিৎকার।

জটাধর মনে মনে ভাবলে, পুজোর ছুটিতে ইশকুল বন্ধ কিনা, ছেলেদের আনন্দের আর সীমা নেই।

মাঠের এক প্রান্তে গোয়েন্দা ও গুপ্তচরদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রফেসর চোখ থেকে চশমা খুলে নাড়াতে নাড়াতে বলছিল, 'না, এত অসম্ভব সব মূর্খ নিয়ে কাজ করা অসম্ভব! চোর ধরবার উপায় আবিষ্কার করবার জন্যে দিন-রাত আমি মাথা ঘামিয়ে মরছি, আর তোমরা কিনা সব পণ্ড করবার চেষ্টায় আছ! খবর দিয়ে সারা কলকাতাকে এখানে

ডেকে এনেছ! আমরা যাত্রা করছি না থিয়েটার করছি যে, আমাদের দর্শক দরকার হবে? তোমাদের পেটে কি একটাও গুপ্তকথা থাকে না? এখন চোর যদি চম্পট দেয়, দায়ী হবে তোমরা, হে মূর্খের দল!'

প্রফেসরের এই প্রাঞ্জল বক্তৃতার ফলে, কেউ কিছুমাত্র অনুতপ্ত হয়েছে বলে বোধ হল না।

নন্দ বলল, 'ভয় নেই প্রফেসর, জটাবেটাকে আমরা কিছুতেই পালাতে দেব না!'

প্রফেসর বললে, 'এখন শোনো গাধার দল। যা করেছ তা করেছ, কেবল এইটুকু দেখো, ছোকরারা যেন আর হোটেলের সামনে না যায়। বুঝেছ? অগ্রসর হও!'

গুপ্তচরেরা প্রস্থান করল। রইল শুধু ডিটেকটিভরা।

মানকে বললে, 'বে-পাড়ার ছেলেগুলোকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেব নাকি?'

প্রফেসর বললে, 'তাড়ালে ওরা যদি যেত তাহলে আর ভাবনা ছিল কী! পৃথিবী উলটে গেলেও ওরা আর এখান থেকে এক পা নড়বে না!'

গোবিন্দ বললে, 'তাহলে আমাদের একটা নতুন ফন্দি আঁটতে হবে! লুকোচুরি যখন আর চলবে না, তখন এসো, চোরকে আমরা চারিদিক থেকে একেবারে ঘিরে ফেলি! সে স্বচক্ষে দেখুক, আমরা কী করতে চাই!'

প্রফেসর বললে, 'ও-কথা আমিও যে ভাবিনি তা নয়। হ্যাঁ, তা ছাড়া আর উপায়ও নেই।'

নন্দ উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, 'গ্রান্ড আইডিয়া!'

গোবিন্দ বললে, 'চোরের পেছনে দেড়শো ছেলে যদি চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে যেতে থাকে, তাহলে পুলিশের নজরে পড়বার ভয়ে টাকাগুলো সে আবার ফিরিয়ে না দিয়ে পারবে না!'

আর সবাই মহা বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং! সাইকেলের ঘণ্টা! কুমারী নমিতা সেন!

'গুড মর্নিং! বলেই নমিতা মাঠের উপরে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল।

সাইকেলের 'হ্যান্ডেল-বারে' ঝুলছিল একটি 'বাস্কেট'। সেটি খুলে নিয়ে নমিতা বললে, 'আমি দুটো 'ফ্লাস্কে' করে চা, মাখন-মাখানো টোস্ট আর একটা 'কাপ' এনেছি। নাও, তোমরা 'ব্রেকফাস্ট সেরে নাও!'

ডিটেকটিভরা সানন্দে পান-ভোজনে নিযুক্ত হল। চায়ের পেয়ালার হাতল ছিল না বটে, কিন্তু তার জন্যে অসুবিধা হল না কিছুমাত্র।

মানকে বললে, 'চমৎকার লাগল!'

প্রফেসর বললে, 'টোস্টগুলি কি মুড়মুড়ে।'

নমিতা বললে, 'বাড়িতে মেয়ে না থাকলে কি লক্ষ্মীশ্রী আসে?'

ছট্টু শুধরে দিয়ে বললে, 'বাড়িতে অর্থাৎ মাঠে?'

গোবিন্দ বললে, 'বাড়ির খবর ভালো তো?'

নমিতা বললে, 'হ্যাঁ গোবিনদা। কিন্তু দিদ্‌মা বলেছেন তুমি যদি শিগগির বাড়িতে না ফেরো, তাহলে রোজ তোমাকে নিরামিষ খেতে হবে।'

গোবিন্দ বললে, 'নিরামিষের নিকুচি করেছে।'

বুদ্ধু বললে, 'কেন নিকুচি করেছে? নিরামিষ খাবার খারাপ নাকি?'

নমিতা বললে, 'না খারাপ নয়। তবে শুনেছি, মাছ না পেলে গোবিনদা পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে। ছেলেমানুষ কিনা!'

তারা ভারী খুশি হয়ে গল্প করতে লাগল। সবাই নমিতার মন রাখতে ব্যস্ত। প্রফেসর নিয়েছে তার সাইকেলের ভার। মানকে রাস্তার কলে গেল ফ্লাস্ক আর পেয়ালা ধোবার জন্যে। ছট্টু বাস্কেটটা যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিলে। বুদ্ধু সাইকেলের 'টায়ার'গুলো পরীক্ষা করে দেখলে, তাদের মধ্যে যথেষ্ট হাওয়া আছে কি না! এবং নমিতা সর্বক্ষণ চঞ্চলা হরিণীর মতো নাচতে নাচতে গল্প বলে যাচ্ছে অনর্গল!

হঠাৎ সে একপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। রাজ্যের ছেলে আজ এখানে এসে জুটেছে কেন? এ-পাড়ায় আজ কিসের তামাশা?'

প্রফেসর বললে, 'কেমন করে খবর পেয়ে ওরা আমাদের চোরধরা দেখতে এসেছে!'

আচম্বিতে মোটর-হর্ন বাজাতে বাজাতে ছুটে এল ঘণ্টু! হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'চলো, চলো—জলদি! চোর আসছে!'

প্রফেসর চিৎকার করে বললে, 'সবাই মিলে ওকে ঘিরে ফ্যালো! ওর সামনে থাকুক ছেলের পাল, ওর পিছনে থাকুক ছেলের পাল, ওর ডাইনে আর বাঁয়ে থাকুক ছেলের পাল! অগ্রসর হও—অগ্রসর হও!'

মুহূর্তের মধ্যে মাঠ খালি! নমিতা একেবারে একলা! সবাই তাকে এভাবে ফেলে গেল বলে অভিমানে তার ঠোঁট ফুলে উঠতে চাইলে। তারপর সে সাইকেলের উপরে উঠে পড়ে দিদিমার মতো মাথা নেড়ে নেড়ে বললে, 'আমি এসব পছন্দ করি না—আমি এসব পছন্দ করি না!' তারপর সে ছেলেদের পিছনে পিছনে চালিয়ে দিলে সাইকেল।

গান্ধি-টুপি পরে জটাধর হোটেলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। ডান দিকে ফিরে একটু এগিয়েই বউবাজারের রাস্তা ধরলে।

প্রফেসর, ঘণ্টু ও গোবিন্দ ছেলেদের বিভিন্ন দলের ভিতরে চর পাঠিয়ে দিলে। মিনিট-কয়েক পরেই দেখা গেল জটাধরকে চারিধার থেকে ঘিরে ফেলে মহা হট্টগোল করতে করতে অগ্রসর হচ্ছে শিশুপলটনের পর শিশু-পলটন!

জটাধর চারিদিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল দস্তুরমতো! ছেলেরা নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি ও বকাবকি করতে করতে চলেছে তার সঙ্গে-সঙ্গেই। অনেক ছেলে তার মুখের দিকে এমন কটমট করে তাকাচ্ছে যে, মহাবিব্রত হয়ে সে বুঝতেই পারলে না যে, কোন দিকে মুখ ফেরালে এইসব দৃষ্টিবাণ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারবে!

হঠাৎ সোঁ করে একটা ঢিল জটাধরের মাথার পাশ দিয়ে ছুটে গেল।

ভয়ানক চমকে উঠে সে আরও তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করলে। কিন্তু ছেলেরাও বাড়িয়ে দিলে তাদের পায়ের গতি। ধাঁ করে সে পাশের একটা গলির ভিতরে ঢুকতে উদ্যত হয়েই হতাশভাবে দেখলে, সেখান থেকেও তেড়ে আসছে নতুন শিশুপাল!

ঘণ্টু বললে, 'জটাবেটার মুখখানা দেখ! ও যেন ক্রমাগত হাঁচতে চাইছে, কিন্তু পারছে না!'

গোবিন্দ বললে, 'ঘণ্টু, আমাকে তোমার আড়ালে আড়ালে নিয়ে চলো! চোর যেন এখুনি আমাকে না চিনে ফেলে! এখনও দেখা দেবার সময় হয়নি!'

এই অপূর্ব শোভাযাত্রার পিছনে চঞ্চল-কৌতুকে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে আসছে সাইকেল-বাহিনী নমিতা সেন!

এইবারে জটাধরের বুক ধুকপুক করতে লাগল। সে সকল দিক থেকেই পেলে যেন একটা অদৃশ্য বিপদের গন্ধ! পা ফেলতে লাগল সে লম্বা লম্বা! কিন্তু শিশুপালকে এড়ানো অসম্ভব!

হঠাৎ সে ফিরে দৌড় মারবার চেষ্টা করলে—সঙ্গে সঙ্গে মানকে ঠিক তার সামনেই চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল এবং অমনি জটাধরও দড়াম করে পপাত ধরণীতলে!

জটাধর ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল, 'ওরে খুদে বিচ্ছুর দল, মতলবখানা কী তোদের? এখান থেকে বিদায় হ, বিদায় হ, বলছি! নইলে এখুনি আমি পুলিশ ডাকব।'

মানকে মুখ ভেংচে বললে, 'তাই ডাকো—লক্ষ্মী সোনা আমার। তুমি পুলিশ ডাকলেই আমরা খুশি হই!'

পুলিশ ডাকবার ইচ্ছা জটাধরের মোটেই নেই। ভয়ে তার প্রাণ ক্রমেই কুঁকড়ে পড়ছে। সে যে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। রাস্তার লোক অবাক হয়ে গেছে—এত শিশু একসঙ্গে কেউ দেখেনি। পথের দু পাশের বাড়িগুলোর জানলায় জানলায় দলে দলে কৌতূহলী মুখ! দোকানদাররা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করছে, 'ব্যাপার কী?—ব্যাপার কী?' পথের মোড়ে মোড়ে সার্জেন্ট-পাহারাওয়ালারা বিস্ময়-বিস্ফারিত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে তার মুখের পানে। তারপরই একদল ছেলে এক সঙ্গে হাততালি দিয়ে গান ধরলে

'জটাবেটা, জটাবেটা!
ঘোড়ামুখো, নাদা-পেটা
মাথায় গান্ধি-টুপি,
ঘরে ঢুকে চুপি-চুপি,
চুরি করে এটা-সেটা—
জটাবেটা, জটাবেটা!'

ও বাবা, বলে কীগো! হতভাগারা তার নাম পর্যন্ত আদায় করেছে—তার নামে পদ্য পর্যন্ত লিখে ফেলেছে! এ যে সঙিন ব্যাপার!

তখন তারা ডালহাউসি স্কোয়ারের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে এসে পড়েছে।

জটাধর বাঁ দিকে মুখ ফিরিয়েই দেখলে 'কারেন্সির' বাড়ি। চট করে তার মাথায় একটা নতুন বুদ্ধির উদয় হল। বেগে শিশু-ব্যূহ ভেদ করে একেবারে সে কারেন্সি-বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল।

এক মুহূর্তে প্রফেসরও কারেন্সির দরজার কাছে হাজির। সেইখানে দাঁড়িয়ে সে চেঁচিয়ে বললে, 'আমি আর ঘণ্টু আগে ভেতরে যাই। আর সকলে দরজার কাছে অপেক্ষা করুক! তারপর ঘণ্টু হর্ন বাজালেই গোবিন্দ যেন বাছা বাছা দশজন ছেলে নিয়ে ভেতরে যায়!'

প্রফেসর ও ঘণ্টু ভেতরে ঢুকে গেল।

বিপুল উত্তেজনায় গোবিন্দের সর্বাঙ্গ তখন কাঁপছে থর থর করে। এতক্ষণ পরে একটা-না-একটা কিছু হবেই! সে বুদ্ধু, ছট্টু, মানকে ও নন্দ প্রভৃতি দলের কয়েকজন মাতব্বরকে কাছে ডাকলে। বাকি সবাইকে বললে, সেখান থেকে চলে যেতে।

বাকি ছেলের দল সেখান থেকে একটু তফাতে সরে গেল মাত্র, বিদায় হবার নামও কেউ করলে না। পরিণাম না দেখে কেউ নড়তে রাজি নয়।

একটি ছেলের হাতে সাইকেলের ভার দিয়ে নমিতা এসে দাঁড়াল গোবিন্দের কাছে। বললে, 'গোবিনদা, এই আমি তোমার কাছে এসে দাঁড়ালুম। ভয় পেয়ো না, ব্যাপার বড়ো বিষম। আমার বুকের ভেতরটা লাফাচ্ছে ঠিক ব্যাঙের মতো!'

গোবিন্দ বললে, 'আমারও তাই!'

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

আলপিনের মহিমা

প্রফেসর ও ঘণ্টু ভিতরে ঢুকে দেখলে, জটাধর একেবারে 'কাউন্টারে'র ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানকার কর্মচারী তখন টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত।

প্রফেসর চোরের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে শিকারির মতো তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

চোরের পিছনে দাঁড়াল ঘণ্টু, মোটর-হর্ন বাজাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে।

কর্মচারী ফোন ছেড়ে এসে প্রফেসরকে জিজ্ঞাসা করলে, তার কী দরকার?

চোরকে দেখিয়ে দিয়ে প্রফেসর বললে, 'এই ভদ্রলোক আমার আগে এসেছেন।'

—'আপনি কী চান মশাই?'

জটাধর বললে, 'একশো টাকার নোটের বদলে দশখানা দশ টাকার নোট চাই।'

কর্মচারী নোটখানা নিলে।

প্রফেসর বললে, 'মশাই, একটু অপেক্ষা করুন। ওখানা চোরাই নোট।'

কর্মচারী চমকে বললে, 'কী?'

অন্যান্য কেরানি কাজ করতে করতে সবিস্ময়ে মুখ তুলে দেখলে।

প্রফেসর বললে, 'এই ভদ্রলোক আমার এক বন্ধুর পকেট থেকে ওই নোটখানা চুরি করেছে।'

—'কী! এত বড়ো আস্পর্ধা! আমি চোর? তবে রে ছুঁচো!' বলেই জটাধর প্রফেসরের গালে সশব্দে মারলে প্রচণ্ড এক চড়!

প্রফেসর বললে, 'চড় মেরে তোমার কোনওই লাভ হবে না!' বলেই এমন তেজে জটাধরকে আক্রমণ করলে যে, সে কোনওরকমে 'কাউন্টার' ধরে পতন থেকে করলে আত্মরক্ষা!

কেরানিরা কাজ ফেলে ছুটে এল ঘটনাস্থলে। কারেন্সির একজন বড়োকর্তা বা অফিসারও এসে হাজির!

ঘণ্টু বাজালে মোটর-হর্ন। গোবিন্দের পিছনে পিছনে হল আরও দশ শিশুমূর্তির আবির্ভাব।

অফিসার ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'এখানে এত গোলমাল কেন? এত ছেলে কেন? ব্যাপার কী?'

জটাধর রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'স্যার, আমি যে একশো টাকার নোটখানা ভাঙাতে দিয়েছি, এরা বলে সেখানা নাকি চোরাই নোট!'

জটাধরের সুমুখে এসে গোবিন্দ বললে, 'এরা কেউ মিথ্যে বলছে না। কাল কালীপুর থেকে কলকাতায় আসবার সময়ে ট্রেনে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। সেই ফাঁকে তুমি আমার পকেট থেকে একশো পঁচিশ টাকা চুরি করেছিলে!'

অফিসার বললেন, 'ছোকরা, তোমার কথার কোনও প্রমাণ আছে?'

চোর গোবিন্দকে দেখে প্রথমটা দমে গিয়েছিল। এখন নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'কিছু প্রমাণ নেই স্যার! আমি আজ এক হপ্তার ভেতরে কলকাতার বাইরে পা বাড়াইনি।'

রাগে প্রায় কেঁদে ফেলে গোবিন্দ বললে, 'মিথ্যে কথা, ডাহা মিথ্যে কথা!'

জটাধর হাসতে হাসতে বললে, 'ট্রেনে তোমার কেউ সাক্ষী আছে?'

—'আছে। কালীপুরের বিষ্ণু চক্রবর্তী সাক্ষ্য দিতে পারেন যে, এই লোকটি কাল ট্রেনে করে আমার সঙ্গে এসেছে।'

অফিসার জটাধরকে বললেন, 'এ-কথার উত্তরে তোমার কী বলবার আছে?'

জটাধর বললে, 'স্যার, আমি আদর্শ ভোজনালয়ে থাকি। আমি—'

ঘণ্টু বাধা দিয়ে বললে, 'আদর্শ ভোজনালয়ে তুমি ঘর ভাড়া নিয়েছ কাল বৈকালে। হোটেলের চাকরের উর্দি পরে আমি কাল সারারাত তোমার ওপরে পাহারা দিয়েছি।'

অফিসার ও কেরানিরা সবিস্ময়ে ও সকৌতুকে হাসতে লাগল।

অফিসার বললেন, 'আপাতত এই একশো টাকার নোট ভাঙানো হতে পারে না'—বলেই তিনি নাম ও ঠিকানা নেবার জন্যে কাগজ ও কলম হাতে করলেন।

গোবিন্দ বললে, 'এর নাম জটাধর।'

চোর বললে, 'এরা দেখছি আমার নাম পর্যন্ত বদলে দিতে চায়। স্যার, আমার নাম শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।'

গোবিন্দ বললে, 'উঃ কী মিথ্যাবাদী! ট্রেনে তুমি আমাকে নিজে বলেছ, তোমার নাম জটাধর!'

অফিসার বললেন, 'আপনার নাম যে অবিনাশ, তার কোনও প্রমাণ দিতে পারেন?'

জটাধর বললে, 'তাহলে আপনাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। আমার কাগজ-পত্তর আছে হোটেলেই।'

গোবিন্দ বললে, 'স্যার, ও পালাতে চায়! আপনি আমার টাকাগুলো আদায় করে দিন—আমার একশো পঁচিশ টাকা।'

অফিসার গোবিন্দের পিঠ চাপড়ে বললেন, 'খোকাবাবু, ব্যাপারটা তুমি যতটা সহজ মনে করছ ততটা সহজ নয়! নোট যে তোমার, তার প্রমাণ কী? নোটের পিছনে তোমার নাম লেখা আছে? নোটের নম্বর তুমি বলতে পারো?'

—'না, তা পারি না বটে। তবু নোটগুলো আমারই। মা আমার হাত দিয়ে নোটগুলো পাঠিয়েছিলেন দিদিমার কাছে।'

জটাধর বললে, 'স্যার, ভগবানের নাম নিয়ে বলতে পারি, ও নোট আমার। ছোটো ছোটো খোকার টাকা চুরি করা আমার ব্যাবসা নয়।'

হঠাৎ গোবিন্দের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উৎসাহভরে বললে, 'স্যার, একটা কথা আমার মনে পড়েছে। আমি আলপিন দিয়ে নোটসুদ্ধ একখানা খাম পকেটের সঙ্গে গেঁথে রেখেছিলুম। এই দেখুন সেই আলপিন!'

জটাধর দুই পা পিছিয়ে দাঁড়াল।

অফিসার একশো টাকার নোটখানা চেয়ে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ছেলেটি ঠিক বলেছে! নোটের পিছনে একটা বড়ো আলপিন বেঁধার দাগ রয়েছে তো বটে!'

ঠিক সেই মুহূর্তেই জটাধর ফিরে দাঁড়িয়ে দুই হাত দিয়ে ছেলের দলকে দুদিকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে প্রাণপণে মারলে দৌড়! বিদ্যুতের মতো সে একেবারে বাড়ির বাইরে!

অফিসার চিৎকার করলেন, 'পাকড়ো—পাকড়ো! এই সেপাই!'

সকলেই বাইরে ছুটে গেল। না, চোর পালাতে পারেনি—ছেলের দল আবার তাকে ঘিরে ফেলেছে! সে মাটির উপরে পড়ে আছে চিৎপাত হয়ে এবং প্রায় কুড়িজন শিশু-যোদ্ধা তার দুই হাত, দুই পা, জামা ও মাথা ধরে করছে টানাটানি! জটাধর পাগলের মতো ছটফট করছে, কিন্তু ছেলেরা তার সর্বাঙ্গে লেগে আছে ছিনে-জোঁকের মতো।

ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং! কেউ জানে না, ইতিমধ্যে নমিতা সেন কখন গিয়েছিল পুলিশ ডাকতে। এখন দেখা গেল নমিতার সাইকেলের পিছনে পিছনে ছুটে আসছে একজন সার্জেন্ট ও একজন পাহারাওয়ালা।

কারেন্সির অফিসার বললেন, 'সার্জেন্ট, এর নাম অবিনাশ কী জটাধর আমি তা জানি না! কিন্তু এ যে চোর, তাতে আর সন্দেহ নেই!'

চোর-গ্রেপ্তার করে সার্জেন্ট চলল থানার দিকে। সে এক বিচিত্র শোভাযাত্রা!

সর্বপ্রথম সার্জেন্ট ও কারেন্সির অফিসার এবং তাদের মাঝখানে জটাধর বা অবিনাশ। তারপর প্রায় দেড়শো ছেলে গাইতে গাইতে চলেছে—

'জটাবেটা, জটাবেটা!
ঘোড়ামুখো, নাদা-পেটা!'

এবং শোভাযাত্রার পাশে পাশে আসছে সাইকেল-বাহিনী কুমারী নমিতা সেন, তার ছোটো হাতের চাপে মিষ্টি ঘণ্টা বাজছে ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং!

থানার সামনে এসে নমিতা বললে, 'গোবিন্দ, ভাই! আমি তাড়াতাড়ি বাড়ির সবাইকে সিনেমার এই গল্পটা বলতে চললুম!'

গোবিন্দ বললে, 'আমিও একটু পরে যাচ্ছি। আমার খাবার যেন তৈরি থাকে—কিন্তু নিরামিষ নয়, খবরদার!'

নমিতা সেনের সাইকেল আবার ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনি করতে লাগল!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

চুপ! চুপ!

থানার ইন্‌স্পেকটার গোবিন্দকে তার নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করলে।

তারপর চোরকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার নাম কী?'

চোর বললে, 'সুদর্শন বিশ্বাস।'

গোবিন্দ, প্রফেসর ও ঘণ্টু হো হো করে হেসে উঠল—এমনকী কারেন্সির সুগম্ভীর অফিসার পর্যন্ত না হেসে থাকতে পারলেন না।

ঘণ্টু বললে, 'অদ্ভুত! প্রথমে ওর নাম হল জটাধর। তারপর শোনা গেল—অবিনাশ দাস। এখন আবার শুনছি সুদর্শন বিশ্বাস! তাহলে ওর আসল নাম কী?'

ইন্‌স্পেকটার বিরক্ত স্বরে বললে, 'চুপ! ওর আসল নাম বার করতে আমাদের দেরি লাগবে না! ওরে জটাধর-অবিনাশ-সুদর্শন! থাকা হয় কোথায়?'

—'আপার সার্কুলার রোডের আদর্শ ভোজনালয়ে।'

—'ওখানে আসবার আগে তুমি কোথায় ছিলে?'

—'চন্দননগরে?'

প্রফেসর বললে, 'আর-একটা নতুন মিথ্যে কথা!'

ইন্‌স্পেকটার গর্জন করে বললে, 'চুপ! মিথ্যে কী সত্যি, জানতে আমাদের বাকি থাকবে না।'

এই সময়ে কারেন্সির অফিসার বিদায় নিলেন এবং যাবার সময়ে গোবিন্দের পিঠ চাপড়ে গেলেন আদর করে।

—তারপর বাপু সুদর্শন, তুমি কি গোবিন্দের একশো পঁচিশ টাকা চুরি করেছ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর!'

—'তাহলে বাকি পঁচিশ টাকা কোথায় গেল?'

পকেট থেকে একখানা খাম বের করে চোর বললে, 'হুজুর, বাকি টাকা ওই খামের ভিতরেই আছে।'

—'ওইটুকু ছেলের টাকা চুরি করতে তোমার মায়া হল না?'

—'মনের ভুল হুজুর, গ্রহের ফের! ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছিল আর ওর পকেট থেকে টাকাগুলো বেরিয়ে গাড়ির ভিতরে পড়ে গিয়েছিল। আমার পকেটে একটা আধলাও ছিল না, কাজেই আমি লোভ সামলাতে পারিনি!'

প্রফেসর বললে, 'আবার মিথ্যে কথা স্যার! গোবিন্দের সব টাকা ও ফিরিয়ে দিয়েছে। ও বলছে ওর পকেটে আর একটা আধলাও ছিল না। অথচ হোটেল ভাড়া ও খাবারের টাকা দিয়েছে, তারপর ট্যাক্সির ভাড়া দিয়েছে—'

ইন্‌স্পেকটার চিৎকার করলে, 'চুপ! ওসব জানাও আমাদের পক্ষে শক্ত হবে না!' বলেই এতক্ষণ যে যা বলেছে সমস্তই একে একে লিখে নিলে।

চোর বললে, 'হুজুর, আমি তো অপরাধ স্বীকার করেছি, এ যাত্রা আমাকে ছেড়ে দিতে হুকুম হোক।'

ইন্‌স্পেকটার বললে, 'চুপ! এটা তোমার মামার বাড়ি নয়, এখানে কেউ তোমার আবদার শুনবে না! সার্জেন্ট, আসামিকে 'লক-আপে' রাখবার ব্যবস্থা করো।'

গোবিন্দ বললে, 'স্যার আমার টাকাগুলো কখন ফেরত পাব?'

—'পুলিশ হেড-কোয়ার্টার থেকে শীঘ্রই তোমার ডাক আসবে খোকাবাবু, টাকা ফেরত পাবে সেখান থেকেই।'

গোবিন্দ বললে, 'স্যার, আমার নাম খোকাবাবু নয়, শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়!'

এতক্ষণ পরে ইন্‌স্পেকটারের মুখে হাসি ফুটল। বললে, 'হ্যাঁ, গোবিন্দবাবু, তোমাকে খোকাবাবু বলে ডাকা আমার উচিত হয়নি। কারণ, তুমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে যেভাবে চোর ধরেছ, তার ভেতরে একটুও খোকাবাবুত্ব নেই। তোমরা হচ্ছ পাকা ডিটেকটিভ, তোমরা হচ্ছ বাহাদুর! আচ্ছা, পরে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে, আজ তোমরা বাড়ি যাও।'

গোবিন্দ থানার বাইরে এসে দেখলে, ছেলের দল—সেই শ-দেড়েক পঙ্গপালের মতো শিশুপাল তখনও রাস্তা থেকে অদৃশ্য হয়নি। গাড়ি-ঘোড়া ও লোক-চলাচলের বাধা হচ্ছে বলে পাহারাওয়ালারা তাদের তাড়াবার চেষ্টা করছে যথাসাধ্য! কিন্তু তাড়া খেয়ে তারা বড়োজোর হাত দশ-পনেরো সরে গিয়ে দাঁড়ায় মাত্র! গোবিন্দের একটা হেস্তো-নেস্তো না হলে রাস্তা থেকে তারা কিছুতেই অদৃশ্য হবে না।

গোবিন্দ তাদের সম্বোধন করে হাসতে হাসতে বললে, 'ভাইসব! চোর ধরা পড়েছে, আমার টাকা ফিরিয়ে দিয়েছে, আর কেন তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে খেলার সময় নষ্ট করছ? তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ, কারণ, তোমরা না থাকলে জটা আজ ধরা পড়ত না। এইবার যে-যার কাজে যাও, নমস্কার!'

তখন ছেলেরা দল বেঁধে আবার গাইতে গাইতে চলে গেল—

'জটাবেটা, জটাবেটা!
ঘোড়ামুখো, নাদা-পেটা!'

সেখানে গোবিন্দের সঙ্গে তখন রইল কেবল গোয়েন্দারা।

গোবিন্দ বললে, 'এর পর আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে, টেলিফোনে মঙ্গলবারকে সব খবর জানানো। কারণ, খবর না পেয়ে সে হয়তো এতক্ষণ ছটফট করে সারা হচ্ছে!'

নন্দ ফোন করতে ছুটল।

গোবিন্দ আর সকলের দিকে ফিরে বললে, 'ভাই, তোমরা আমার জন্যে অনেক ভেবেছ, অনেক খেটেছ! তার ঋণ আর এ-জীবনে শোধ হবে না! কিন্তু আমার জন্যে তোমরা যে টাকা-পয়সা খরচ করেছ, সেটা আমি যত শীঘ্র পারি শোধ করে দেব।'

ঘণ্টু বললে, 'কী! ও-খরচটাকে যদি তুমি ধার বলে মনে করো তাহলে আমরা সবাই রেগে হব টং! তারপর তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন গোবিন্দ, আর-এক বিষয়ে এখনও আমাদের হিসেব-নিকেশ হয়নি? সেই তোমার অদ্ভুত খালাসি-রঙের জামার জন্যে মুষ্টিযুদ্ধের কথা এখুনি তুমি ভুলে গেলে নাকি?'

নিজের দু হাতে প্রফেসর ও ঘণ্টুর হাত ধরে গোবিন্দ বললে, 'ভুলিনি ভাই, কিছুই ভুলিনি! আজ আমার আনন্দের দিনে তোমার মুষ্টিযুদ্ধের কথা ভুলে যাও ঘণ্টু! আজ কৃতজ্ঞতায় মন যখন ভরে উঠেছে, তখন ঘুষি মেরে তোমাকে মাটিতে ফেলে দেব কেমন করে।'

ঘণ্টু বললে, 'কৃতজ্ঞ হও, আর না হও, ঘুষি মেরে আমাকে মাটিতে ফেলে দেবার ক্ষমতা কিন্তু তোমার নেই, বুঝলে ভায়া?'

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

খোকা-খুকিদের বন্ধু হেমেন রায়

চোর ধরা পড়ল বটে, কিন্তু এখনও আমাদের গল্প শেষ হয়নি। আর গল্পের আসল মজাটুকুই আছে শেষের দিকে।

সেদিন প্রফেসর ও ঘণ্টুকে নিয়ে গোবিন্দ আবার রাস্তায় বেরিয়েছে সেজেগুজে। কারণ, উত্তরাঞ্চলের পুলিশের ডেপুটিকমিশনার তাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

ঘণ্টু আড়-চোখে লক্ষ করলে, গোবিন্দ আজ নীল রঙের পোশাক পরেনি!

জোড়াবাগানে ডেপুটিকমিশনারের আস্তানা। চারিদিকে সাদামুখো সার্জেন্ট, লালপাগড়ি চৌকিদার, ব্যস্তমুখ উকিল, গম্ভীর ইন্‌স্পেকটার আর শুকনো-চেহারা চোর-জুয়াচোর প্রভৃতির ভিড়। গোবিন্দ হতভম্ব হয়ে গেল—তার ভয়ও যে হচ্ছিল না, তা নয়!

গোবিন্দ আশ্চর্য হয়ে বললে, 'কলকাতায় এত চোর-বদমাইশ আছে!'

প্রফেসর বললে, 'এর চেয়ে ঢের—ঢের বেশি আছে গোবিন্দ! কলকাতার পথ দিয়ে

রোজ যারা হাঁটে, তাদের মধ্যে সাধুর চেয়ে, পাপীই আছে বেশি। সব পাপী ধরা পড়ে না তাই তারা সাধু! আমরা না থাকলে জটাবেটাকে আজ কে চোর বলে চিনতে পারত?'

গোবিন্দ বললে, 'ও ভাই, জটাবেটাও যে চোরদের সঙ্গে বারান্দায় বসে আছে—দ্যাখো, দ্যাখো!'

জটাধর উবু হয়ে বসে আছে, তার মাথায় আজ গান্ধি-টুপি নেই!

ঘণ্টু বললে, 'কী গো জটাধর-অবিনাশ-সুদর্শন বাবু! তোমার সাধের গান্ধি-টুপি কে কেড়ে নিলে?'

জটাধর কথা কইলে না—ঘোড়ামুখ ফিরিয়ে নিলে অন্যদিকে। বোধহয় রাজার অতিথি হতে পেরেছে বলে জাঁক হয়েছে তার মনে মনে।

এমন সময়ে গোবিন্দের ডাক এল।

সে ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখলে, ডেপুটিকমিশনার ও আরও কয়েকজন পোশাক-পরা ভদ্রলোক সেখানে বসে রয়েছেন।

ডেপুটিকমিশনার তাকে দেখেই একগাল হেসে বললেন, 'এসো এসো,—কলকাতার সবচেয়ে বয়সে ছোটো, কিন্তু সবচেয়ে বুদ্ধিতে বড়ো ডিটেকটিভ এসো। বোসো জটাধর, বোসো!'

সে বললে, 'আজ্ঞে, আমার নাম গোবিন্দ!'

—'হ্যাঁ, গোবিন্দই বটে। চেয়ারে উঠে বোসো। তোমার আর তোমার বন্ধুদের আশ্চর্য কাহিনী আমি শুনেছি। বাহাদুর, বাহাদুর! হ্যাঁ, তুমি তোমার টাকাগুলো ফেরত চাও? মামলা শেষ হবার আগে আমরা টাকা ফেরত দিই না, তবে তোমার সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করা হল। এই নাও তোমার টাকা। দ্যাখো, আবার যেন হারিয়ে বোসো না।'

—'আজ্ঞে, না স্যার! এ টাকা এখুনি গিয়ে আমার দিদিমার হাতে দেব!'

—'হ্যাঁ, তাই দিয়ো।'...ঠিক সেই সময়ে তাঁর টেবিলের উপরে টেলিফোন-যন্ত্র বেজে উঠল। ডেপুটিকমিশনার 'রিসিভার'টা তুলে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ...বেশ তো, আপনারা এখানে এলেই তার দেখা পাবেন। এখুনি আসবেন? আচ্ছা।...হ্যাঁ, শোনো জটাধরবাবু—'

—'আজ্ঞে, আমার নাম গোবিন্দ।'

—'হ্যাঁ, গোবিন্দই বটে। শোনো : তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে খবরের কাগজের এক সম্পাদক আর রিপোর্টাররা এখনই এখানে আসবে!'

—'কেন স্যার? আমি কি কোনও অন্যায় করে ফেলেছি?'

ডেপুটিকমিশনার হেসে উঠে বললেন, 'না, না, অন্যায় করবে কেন? রিপোর্টাররা পাহারাওয়ালা নয়, তারা তোমাকে ধরতে আসছে না, তোমাকে কেবল গোটাকয়েক প্রশ্ন করতে আসছে! বোধহয় খবরের কাগজে তোমার নাম বেরুবে!'

গোবিন্দ সবিস্ময়ে বললে, 'খবরের কাগজে আমার নাম ছাপা হবে? কেন স্যার?'

—'গোয়েন্দাগিরিতে তুমি আমাদের— অর্থাৎ পুলিশের ওপরেও টেক্কা মেরেছ বলে।'

—'কিন্তু এ বাহাদুরি তো খালি আমার একলার নয়! আমাদের চশমা-পরা প্রফেসর, ছোকরা চাকরের উর্দি-পরা ঘণ্টু ছিল, আরও ছিল মানকে, বুদ্ধু, ছট্টু, মঙ্গলবার—'

ডেপুটিকমিশনার আবার হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাদেরও নাম যাতে বাদ না যায় সে-চেষ্টা আমি করব জটাধর—'

—'আজ্ঞে, আমার নাম গোবিন্দ!'

—'হ্যাঁ, গোবিন্দই বটে! জটাধর বুঝি সেই পাজি চোরটার নাম? বটে? ও-নাম ধরে তোমাকে ডাকা নিশ্চয়ই উচিত নয়। আচ্ছা, আর আমি ভুলব না। ওই দ্যাখো গোবিন্দ, রিপোর্টাররা আসছে।'

চারজন ভদ্রলোক ঘরের ভিতরে এসে ঢুকলেন। গোবিন্দের মনে হল, তাদের মধ্যে একটি রোগা রোগা লম্বা-চুল, চশমা-পরা লোকের মুখ যেন সে আগে কোথায় দেখেছে!

তাদের অনুরোধে গোবিন্দ একে একে নিজে সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করলে।

একজন রিপোর্টার বললেন, 'এ যেন কেতাবী গল্প! পাড়াগেঁয়ে ছেলে একদিনে হয়ে দাঁড়াল শহরের ডিটেকটিভ। অদ্ভুত, অভাবিত!'

আর-একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'গোবিন্দ, এত কাণ্ড না করে তুমি পাহারাওয়ালা ডেকে চোরকে ধরিয়ে দিলে না কেন?'

গোবিন্দের মুখে হঠাৎ ভয়ের ছায়া পড়ল। তার চোখের সামনে জেগে উঠল, কালীপুরের নটবর-চৌকিদারের মুখ!

ডেপুটিকমিশনার বললেন, 'জবাব না দিয়ে, চুপ করে রইলে কেন গোবিন্দ?'

—'আজ্ঞে, ভয়ে আমি পাহারাওয়ালা ডাকিনি। কালীপুরের মুখুয্যেদের পেয়ারা গাছ থেকে আমি যখন পেয়ারা পাড়ছিলুম, তখন নটবর-চৌকিদার আমাকে দেখে ফেলেছিল!'

ঘরসুদ্ধ সবাই হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরিয়ে ফেলে আর কি!

অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে ডেপুটিকমিশনার বললেন, 'না গোবিন্দ, না। তোমার মতন এতবড়ো ডিটেকটিভকে নটবর-চৌকিদারের কথায় আমরা গ্রেপ্তার করতে পারি কি? না, তোমার কোনও ভয় নেই!'

আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গোবিন্দ বললে, 'গ্রেপ্তার করবেন না? আঃ, বাঁচলুম!'

—'তবে, ভবিষ্যতে পরের বাগানের পেয়ারা গাছের দিকে আর নজর দিয়ো না! হ্যাঁ, নজর অবশ্যি দিতে পারো, কিন্তু পেড়ে খেতে যেয়ো না।'

গোবিন্দ ধীরে ধীরে সেই চশমা-পরা ভদ্রলোকের কাছে এগিয়ে গেল। এতক্ষণ পরে তার মনে পড়েছে! বললে, 'স্যার, আপনি কী আমাকে চিনতে পারছেন না?'

—'না গোবিন্দবাবু, পারছি না তো!'

—'আমার কাছে পয়সা ছিল না, হ্যারিসন রোডের ট্রামে আপনি আমার ট্রাম-ভাড়া দিয়েছিলেন।'

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি গোবিন্দের সঙ্গে সেক হ্যান্ড করে বললেন, 'ওহো তাহলে আমরা দেখছি পুরানো বন্ধু? হ্যাঁ, ঠিক কথা! আমার পয়সা ফিরিয়ে দেবে বলেছিলে—'

—'কিন্তু আপনি নাম-ঠিকানা বললেন না!'

—'আজ বলতে পারি। আমার নাম—হেমেন রায়, আমি কাগজের সম্পাদক, থাকি আমি বাগবাজারের গঙ্গাতীরে!'

—'আজ কি ট্রাম-ভাড়ার পয়সাগুলো আমি ফিরিয়ে দিতে পারি?'

—'না গোবিন্দ, তা পারো না! কারণ তোমাদের পয়সাতেই তো আমি করে খাচ্ছি! আমি তো খালি খবরের কাগজে লিখি না, ছেলেদের উপন্যাসও যে লিখি। ছেলেরা আমার বই কেনে আর আমাকে ভালোবাসে বলেই তো আজ আমি বেঁচে আছি।' তারপর ডেপুটিকমিশনারের দিকে ফিরে হেমেন রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্যার, এইটেই কি চোর জটাধরের প্রথম চুরি?'

—'না হেমেনবাবু, আমার তা মনে হয় না। জটাধরের সম্বন্ধে ক্রমেই অনেক গুপ্তকথা প্রকাশ পাচ্ছে। ঘণ্টাখানেক পরে আমাকে ফোন করলেই পাকা খবর দিতে পারব।'

হেমেন রায় বললেন, 'গোবিন্দ, চলো আজ আমার সঙ্গে হোটেলে চলো। কিছু খাবার আর চা খেতে তোমার আপত্তি আছে কি?'

—'না স্যার, আপত্তি নেই। কিন্তু—'

—'কিন্তু, কি?'

—'প্রফেসর আর ঘণ্টু বাইরে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

—'বেশ তো, তাদেরও নিমন্ত্রণ করছি। এখানে তোমার আর কোনও কাজ নেই তো? তবে চলো।'

হেমেন রায়ের সঙ্গে গোবিন্দ, প্রফেসর ও ঘণ্টু রাস্তায় গিয়ে পড়ল। ট্যাক্সি ডাকা হল। তারপর সিধে চৌরঙ্গির এক হোটেলে। (এখানে বলে রাখি, ইতিমধ্যে ট্যাক্সিতে হেমেন রায়ের পাশে বসেই ঘণ্টু তাঁর কানের কাছে এত-জোরে ভোঁপ ভোঁপ করে মোটর-হর্ন বাজিয়ে দিয়েছিল যে, ভদ্রলোক চমকে ও লাফিয়ে উঠে গাড়ি থেকে পড়ে যান আর কী! তাঁর ভয় দেখে ঘণ্টুর খিল খিল করে কী হাসির ধুম।)

চৌরঙ্গির সব অট্টালিকা, মনুমেন্ট, গড়ের মাঠ ও বিলাতি হোটেলের সাজসজ্জা প্রভৃতি দেখে বিস্মিত গোবিন্দের চোখ যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল!

হেমেন রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কে কী খাবে বলো!'

প্রফেসর চশমা খুলে নাড়তে নাড়তে বললে, 'চপ, ফাউল-কাটলেট আর চা!'

ঘণ্টু বললে, 'ফাউল স্যান্ডউইচ, ওমলেট আর চা!'— বাড়ি থেকে পেট ভরে খেয়ে বেরিয়েছে বলে তার অত্যন্ত অনুতাপ হতে লাগল। ক্ষুধা থাকলে তার অর্ডারের ফর্দ এর চেয়ে ঢের বড়ো হত নিশ্চয়ই!

গোবিন্দ বললে, 'আমি তো সব খাবারের নাম জানি না, হোটেলে কখনও খাইনি। আমার যে-কোনও খাবার হলেই চলবে— কেবল ফাউল আর গোরুর মাংস খাব না স্যার!'

হেমেন রায় খাবারের অর্ডার দিয়েই দেখলেন, ঘণ্টু তার মোটর-হর্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। তিনি হর্নটি তার হাত থেকে নিজের হস্তগত করে বললেন, 'এটা আপাতত আমার কাছে থাক, ঘণ্টু! হোটেল থেকে বেরিয়ে আবার তোমার জিনিস তোমাকে ফিরিয়ে দেব!'

....খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে পর হেমেন রায় হোটেলের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এক ঘণ্টা হয়ে গেছে। এইবার ডেপুটিকমিশনারকে ফোন করি!' ফোনের কাছে গিয়ে বললেন, 'হ্যালো! হ্যাঁ আমি, হেমেন রায়!.... কী বললেন? তাও কি সম্ভব, বলেন কী? .....এখন তার কাছে এ-খবর ভাঙব না, আচ্ছা! কাগজে এ গল্প বেরুলে আমাদের পাঠকরা যে স্তম্ভিত হয়ে যাবে!'

ফোন ছেড়ে ফিরে এসে হেমেন রায় এমনভাবে গোবিন্দের দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেন সে এক অপূর্ব চিত্তাকর্ষক জীব! জীবনে এর আগে তিনি তাকে আর যেন কখনও দেখেননি!

বললেন, 'চলো গোবিন্দ, ফটোগ্রাফারের কাছে চলো। আমরা তোমার একখানা ছবি তুলব!'

অত্যন্ত বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গোবিন্দ বললে, 'ছবি? আমার? কেন?'

—'পরে জানতে পারবে। এখন চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে!'

যথাসময়ে গোবিন্দের ছবি তুলে নিয়ে হেমেন রায় তাকে আর তার দুই বন্ধুকে বাড়িতে পৌঁছে দিলেন।

গোবিন্দ গাড়ি থেকে নেমে নমস্কার করলে।

হেমেন রায় বললেন, 'গোবিন্দ, তোমার মাকে আমার নমস্কার জানিয়ো। আর, কাল সকালে উঠে আগে খবরের কাগজ পড়তে ভুলো না।'

গোবিন্দ বুঝলে, কাগজে তার নাম বেরুবে বলেই হেমেন রায় তাকে কাগজ পড়তে বলছেন। লজ্জায় মুখ নামিয়ে সে বললে, 'আচ্ছা স্যার।'

হেমেন রায় রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, 'শীঘ্রই তুমি আরও একটা মস্ত সুখবর পাবে! যে-সে খবর নয়, একেবারে অবাক হয়ে যাবে গোবিন্দ! আজ আসি তা হলে—'

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নমিতার 'ওরিয়েন্টাল ডান্স'

গোবিন্দ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দেখলে, নমিতা চায়ের সরঞ্জাম-সাজানো একখানা 'ট্রে' হাতে নিয়ে নীচে নামবে বলে দাঁড়িয়ে আছে।

গোবিন্দ উৎফুল্ল-স্বরে বললে, 'নমু, নমু! টাকা পেয়েছি! কী মজা!

নমিতা তাড়াতাড়ি পিছনে সরে গিয়ে বললে, 'এখন আমাকে নিয়ে টানাটানি কোরো না গোবিনদা, এখুনি হাত থেকে 'ট্রে' পড়ে যাবে! তুমি দিদিমার কাছে যাও, এখুনি আমি আসছি! কী করব বলো, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি, সংসার নিয়ে খাটতে খাটতেই জীবনটা বয়ে গেল।' বলেই খিল খিল করে কৌতুকহাসি।

দোতলার বড়ো ঘরে ঢুকেই গোবিন্দ দেখলে, তার সাড়া পেয়ে দিদিমা উৎকণ্ঠিতভাবে দরজার দিকে তাকিয়ে আছেন।

সে এক ছুটে দিদিমার কাছে গিয়ে তার হাতে নোটগুলো দিলে। দিদিমা নোটগুলো আঁচলে বেঁধে রেখে, নাতির ডান-গালে মারলেন চড় এবং বাঁ-গালে খেলেন চুমো!.....তারপর কি মনে করে আঁচল খুলে একখানা নোট বার করে নিয়ে বললেন, 'গোবু!'

—'দিদিমা!'

—'এ নোটখানা তোর।'

—'আমি নেব না।'

—'ইস, নিবি না বইকী! নিতেই হবে, এটা হচ্ছে তোর বকশিশ, তুই মস্ত-বড়ো টিকটিকি হয়েছিস কিনা।' (দিদিমা ডিটেকটিভকে বলেন, টিকটিকি।)

এমন সময় নমিতা এসে বললে, 'নিয়ে নাও গোবিনদা। ব্যাটাছেলেরা ভারী হাঁদা! আমি হলে কারুকে দুবার সাধতে হত না!'

—'না, নেব না।'

দিদিমা বললেন, 'তোকে নিতেই হবে! না নিলে দেখবি আমি এমন রেগে যাব যে, এখুনি হি হি করে বাত-জ্বর তেড়ে আসবে।'

নমিতা বললে, 'চটপট নাও গোবিনদা, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না।'

—'বেশ দিদিমা, তাহলে দাও।'

গোবিন্দের মাসিমা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন। তিনি বললেন, 'নোটখানা নিয়ে কী করবে গোবিন্দ?'

—'তুমিই বলো না মাসিমা, আমার কী করা উচিত?'

—'আমি তো বলি বাছা, তোমার যেসব নতুন বন্ধুর জন্যে টাকাগুলো ফিরে পেয়েছ, তাদের একদিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়াও-দাওয়াও!'

গোবিন্দ মাসিকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বললে, 'তুমি আমার মনের কথা টেনে বলেছ মাসিমা! আমিও ঠিক ওই কথাই ভাবছিলুম।'

নমিতা আহ্লাদে এক-পায়ে নাচতে নাচতে গানের সুরে বললে, 'চা তৈরি করব কিন্তু আমি— চা তৈরি করব কিন্তু আমি।'

দিদিমা বললেন, 'আহা। সব সোনার চাঁদ ছেলে! বেঁচে থাক, সুখে থাক, রাঙা বউ হোক।'

সেইদিন বিকালবেলায় বাড়ির সুমুখের পথে নমিতা গাছ-কোমর বেঁধে গোবিন্দকে শিখিয়ে দিচ্ছিল, কেমন করে সাইকেল চড়তে হয়।

সাইকেল চালাতে গিয়ে গোবিন্দ যখন উপরি উপরি তিনবার আছাড় খেলে, নমিতা তখন বললে, 'নামো মশাই, নামো। তুমি যে পারবে না তা আমি আগে থাকতেই জানি! ব্যাটাছেলেরা যা বোকা।'

এমন সময়ে পাহারাওয়ালার সঙ্গে একজন ইন্‌স্পেকটারের ইউনিফর্ম-পরা ভদ্রলোক নমিতাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই তো দেখছি ১০ নম্বর বাড়ি! হ্যাঁ খুকি, এইটে কি চন্দ্রমোহন সেনের বাড়ি?'

নমিতা তাঁর কাছে গিয়ে বললে, 'আমাকে দেখতেই পাচ্ছেন আমি আর খুকিটি নই? আমার নাম কুমারী নমিতা সেন, চন্দ্রবাবু আমার বাবা হন।'

ইন্‌স্পেকটার হেসে ফেলে বললেন, 'ঠিক ঠিক! কুমারী নমিতা সেনকে খুকি বলে ডাকা আমার পক্ষে অন্যায় হয়ে গেছে! কিন্তু, তোমার বাবা কি বাড়িতে আছেন?'

—'হুঁ-উ-উ।'

—'তাঁকে একবার ডেকে দাও। তাঁর সঙ্গে আমার দরকারি কথা আছে।'

নমিতা তখনই ছুটে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু ইন্‌স্পেকটার আবার তাকে ডেকে বললেন, 'গোবিন্দচন্দ্র রায় নামে যে ছেলেটি এ-বাড়িতে থাকে, তাকেও একবার ডেকে আনো।'

পুলিশ দেখে গোবিন্দ তখন পায়ে পায়ে পিছিয়ে পড়ছিল—নটবর-চৌকিদারের বিভীষিকা তখনও তার মন থেকে বিলুপ্ত হয়নি! তার উপরে পুলিশের মুখে আবার নিজের নাম শুনে, ভয়ে তার প্রাণ যেন উড়ে গেল।

নমিতা বললে, 'ও গোবিনদা, তোমায় যে ইনি ডাকছেন শুনতে পাচ্ছ না?'

গোবিন্দ আমতা আমতা করে বললে, 'হ্যাঁ স্যার,— আমি কি কোনও ....দোষ করেছি?'

ইন্‌স্পেকটার আশ্বাস দিয়ে তার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'না গোবিন্দ, কোনও ভয় নেই! তোমার কপাল খুব ভালো।'

গোবিন্দ তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলে।

চন্দ্রবাবু নেমে এসে ইন্‌স্পেকটারকে নিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকলেন।

পাহারাওয়ালার হাত থেকে 'ব্রিফ-কেস'টা নিয়ে ইন্‌স্পেকটার বললেন, 'চন্দ্রবাবু, আপনাদের গোবিন্দ যে চোরটাকে ধরেছে, সে হচ্ছে একজন সাংঘাতিক লোক। ছ মাস আগে কলকাতার একটি বিখ্যাত ব্যাংক থেকে সে প্রায় পঞ্চান্ন হাজার টাকা চুরি করে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। পুলিশ কিছুতেই তার খোঁজ পাচ্ছিল না। এতদিন পরে সে ধরা পড়ল। তার জিনিসপত্র খানাতল্লাশ করে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি।'

নমিতা গালে হাত দিয়ে বললে, 'ওমা!'

—'তিন মাস আগে ব্যাংকের কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছিলেন, যে এই চোরকে ধরে দিতে পারবে তাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। গোবিন্দ, চোর ধরেছ তুমি, সুতরাং ব্যাংক থেকে তোমার নামেই পাঁচ হাজার টাকার একখানা 'চেক' এসেছিল। ডেপুটিকমিশনারের হুকুমে সেই 'চেক'-ভাঙানি টাকা আমি তোমাকে দিতে এসেছি। চন্দ্রবাবু, আপনি গোবিন্দের হয়ে অনুগ্রহ করে আমাকে একখানা রসিদ লিখে দিন।'

দিদিমা মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'আমার এ-কথা বিশ্বাস হচ্ছে না— আমার এ-কথা বিশ্বাস হচ্ছে না।'

দিদিমা নোট ফেলে দুই হাত দিয়ে গোবিন্দকে নিজের কোলের ভিতরে টেনে নিলেন— গোবিন্দ তখন একবারে নির্বাক, তার দুই চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে ঝরছে আনন্দের অশ্রু।

নমিতা তখন দুই হাতে ঢেউ খেলিয়ে ও পায়ের তালে ঘর কাঁপিয়ে রীতিমতো 'ওরিয়েন্টাল ডান্স' শুরু করে দিয়েছে!

হঠাৎ গোবিন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'দিদিমা! মাসিমা! কালীপুরে টেলিগ্রাম করে দাও, মা যেন নিশ্চয়ই কাল কলকাতায় চলে আসেন!'

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

খোকনের ছবি

পরের দিন দুপুরবেলা। চলো, আমরা কালীপুরে যাই।

গোবিন্দেরই মুখে শুনেছ, সেখানে বড়ো বড়ো বাড়িও নেই, রকমারি গাড়িও নেই, হট্টগোল বা ভিড়ের হুড়োহুড়িও নেই।

আছে সেখানে ছায়ামাখা জলে-ভরা টলমলে সরোবর; বাতাস-ছোঁয়ায় শিউরে-উঠা। আম-জাম-কাঁটাল বন, নরম সবুজ-পাতার কোলজোড়া দোয়েল শ্যামাদের চপল হাসির তান আর ঘুঘুদের মধুর অশ্রুগান; এবং বালি-মাটির বিছানায় প্রায়-ঘুমিয়ে-পড়া ছোটো নদী খঞ্জনার তন্দ্রামাখা স্বপ্নসুর!

আজ সদ্যগত বর্ষাজলে স্নান সেরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শ্যামলতা পোয়াচ্ছে শরতের সোনালি রোদ। ও-পাড়ার চৌধুরিবাড়ি থেকে ভেসে আসছে মহালয়ার প্রথম সানাইয়ের মূর্ছনায় মা-দুর্গার আগমনি গীতি।

প্রতিদিনকার মতো আজও কমলা সেলাইয়ের কল চালাতে চালাতে সেই গান শুনছেন আর তাঁর প্রাণের ভিতরটা করে উঠছে হুহু হুহু। আনন্দের দিনেই আমাদের সানাই বাজে বটে, কিন্তু যাদের ভালোবাসি, তারা কাছে না থাকলে তার সুর যেন জাগিয়ে তোলে বুক-চাপা কান্নার স্মৃতি!

বিধবা কমলা, তাঁর একমাত্র সন্তান গোবিন্দ। পুজোর দিনে আমোদে থাকবে বলে তাকে তিনি নিজেই একরকম জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছেন বটে কলকাতায়, মাসির বাড়িতে; কিন্তু আজ সানাইয়ের সুর শুনে মনটা তাঁর কেমন ছমছম করতে লাগল। তিনি জানেন, সে পরম সুখেই আছে, তবু আজ শারদীয় উৎসবের দিনে তাকে কাছে না পেয়ে তাঁর বুকের ভেতরটা যেন খালি খালি মনে হচ্ছে; কমলার দুই চোখ ভরে এল অশ্রুর উচ্ছ্বাস, তাঁর সেলাইয়ের কল হয়ে গেল বন্ধ!

ঠিক সেই সময়েই ঘরের ভিতরে এসে ঢুকলেন নিস্তারিণী ঠাকরুন! রোজই এই সময়ে একবার করে কমলার কাছে না এলে তাঁর পেটের ভাত হজম হয় না। সকালে-বিকালে ও মাঝে মাঝে আসেন কিংবা আসেন না, কিন্তু দুপুরবেলায় তাঁর নিয়মিত আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী! কারণ দুজনে বড়ো ভাব।

নিস্তারিণী বললেন, 'ও বোন, সেলাইয়ের কলের সামনে বসে জানলার দিকে অমন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছ কেন? অসুখ করেছে নাকি?'

কমলা মৃদু হেসে বললেন, 'না দিদি, অসুখ করেনি। খোকনকে অত করে বলে দিলুম, কলকাতায় গিয়ে চিঠি লিখে একটা খবর দিতে, কিন্তু সে তার গরিব মাকে একেবারেই ভুলে গেছে। বসে বসে তার কথাই ভাবছিলুম।'

নিস্তরিণী মেঝের উপর ধুপ করে বসে পড়ে বললেন, 'কিচ্ছু ভাবিসনে বোন, কিচ্ছু ভাবিসনে! আমি তোর গোবিন্দের খবর দিতে পারি।'

কমলা চমকে উঠে বললেন, 'খোকনের খবর তুমি দিতে পারো! সে কী? কেমন করে জানলে দিদি?

—'আমার নব (নব হচ্ছে নিস্তারিণীর বড়োছেলে) আজ কলকাতা থেকে পুজোর ছুটিতে বাড়িতে এসেছে কিনা, তার মুখেই তোর গোবিন্দের খবর পেলুম।'

—'নবর সঙ্গে কি খোকনের দেখা হয়েছে?'

—'না বোন, খবরের কাগজে সে গোবিন্দের কথা পড়েছে!'

কমলা উদ্‌ভ্রান্তের মত দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'খবরের কাগজে! খবরের কাগজে খোকনের কথা! দিদি, দিদি, শিগগির বলো খোকনের কী হয়েছে? কোথায় সে? তুমি জানো? কী তুমি শুনেছ?'

নিস্তারিণী হেসে বললেন, 'ঠান্ডা হয়ে বোস কমলা! খবরের কাগজ কেবল খারাপ খবরই দেয় না, আর খারাপ খবর হলে আমি তোর কাছে বলতে আসতুম না! আমি তো তোর শত্রু নই বোন! গোবিন ভালোই আছে।'

কমলা কতকটা আশ্বস্ত হয়ে আবার বসে পড়লেন। কিন্তু তবু তাঁর বুকের ধুকপুকুনি ঘুচল না। বললেন, 'খবরের কাগজে খোকনের কথা কী লিখেছে দিদি?'

—'গোবিন নাকি একটা মস্ত-বড়ো চোরকে ধরেছে। সে চোরটা রেলগাড়িতে কেবল গোবিনেরই পকেট থেকে একশো পঁচিশ টাকা চুরি করেনি, কোন ব্যাংক থেকে নাকি পাঁচ লাখ টাকা চুরি করে পালিয়ে গিয়েছিল (তোমরা বুঝতেই পারছ, পঞ্চান্ন হাজার লোকের মুখে মুখে দাঁড়িয়েছে পাঁচ লক্ষে!), তোমার গোবিন বুদ্ধি খেলিয়ে তাকে ধরে ফেলেছে! তাই পুলিশের কাছ থেকে গোবিন বকশিশ পেয়েছে পাঁচ হাজার টাকা! বুঝলে বোন? এ কি খারাপ খবর?'

কমলা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'না দিদি, এটা খুব ভালো খবরও নয়! একটা চোর ধরে খোকন পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছে? কে তাকে মাথার দিব্যি দিয়ে চোর ধরতে বলেছিল? এই রকম সব বোকামি করাই তার স্বভাব, সেই জন্যেই তো তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারছি না!'

—'কিন্তু ভেবে দেখ বোন, একটা চোর ধরে পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া কি চারটি-খানিক কথা! পাঁচ হাজার টা—কা!'

কমলা এইবারে একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'দিদি আমার কাছে বার-বার তুমি ওই পাঁচ হাজার টাকার কথা তুলো না। আমার খোকনের দাম তার চেয়ে ঢের বেশি!'

—'পাঁচ হাজার টাকা তো খুব বেশি টাকা বোন, লোকে এক হাজার টাকা পাবার জন্যেই মাথা খুঁড়ে মরে!'

—'যারা মরে তারা মরুক! আমার কাছে টাকা আগে, না খোকন আগে? চোর যদি খোকনের বুকে ছুরি বসিয়ে দিত? চোর কী না পারে? মাগো, ভাবতেও প্রাণ আমার কেঁপে উঠছে!'

—'ছি ছি, অমন অলক্ষুণে কথা ভাবিসনে বোন, ভাবিসনে! গোবিন মস্ত বাহাদুরি করেছে বলেই ছাপার হরফে তার নাম উঠেছে!'

কমলা মাথা নেড়ে বললেন, 'খোকন আমার কোলেই লুকিয়ে থাকুক দিদি, ছাপার হরপে আমি তার নাম দেখতে চাই না। আজকেই আমি কলকাতায় যাব, খোকনের কাছে না গেলে প্রাণে আমি আর শান্তি পাব না!'

ঠিক সেই সময়েই বাইরে সদর-দরজার কাছ থেকে শোনা গেল—'টেলিগ্রাম। কমলাদেবীর নামে টেলিগ্রাম।'

তোমরা বুঝতেই পারছ, এ টেলিগ্রাম কলকাতা থেকে, কমলাকে যাবার জন্যে জরুরি অনুরোধ বহন করে এনেছে।

সেই দিনেই কমলা কলিকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কিন্তু রেলগাড়িতে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল আরও বড়ো বিস্ময়।

কলকাতায় গিয়ে না পৌঁছানো পর্যন্ত কমলার বুক ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করা বন্ধ হবে বলে মনে হয় না। থেকে থেকে তাঁর মনে হচ্ছিল, রেলগাড়িগুলো তাঁকে জব্দ করবার জন্যে যেন ষড়যন্ত্র করেই যথেষ্ট তাড়াতাড়ি অগ্রসর হচ্ছে না—যেন তিনি নীচে নামলে গাড়িকে ঠেলে এর-চেয়ে শীঘ্র দৌড়ে নিয়ে যেতে পারেন।

গাড়ির দু-পাশ দিয়ে টেলিগ্রাফের যেসব থাম বোঁ বোঁ করে ছুটে চলে যাচ্ছে, কমলা খানিকক্ষণ ধরে সেইগুলো গুনতে লাগলেন। তারপর গুনতে আর ভালো লাগল না, তিনি গাড়ির ভিতর দিকে ফিরে বসলেন।

ঠিক সুমুখের বেঞ্চিতে একটি বুড়ো ভদ্রলোক একখানা খবরের কাগজ দু-হাতে বিছিয়ে ধরে আগ্রহভরে কী পাঠ করছিলেন!

হঠাৎ কমলার চোখ পড়ল কাগজের উপরে। তার পরেই স্যাঁৎ করে হাত চালিয়ে ফস করে, তিনি কাগজখানা কেড়ে নিলেন ভদ্রলোকের হাত থেকে!

বৃদ্ধ ভাবলেন নিশ্চয়ই তিনি কোনও পাগলির খপ্পরে পড়েছেন—তাঁর চোখে-মুখে ফুটে উঠল বিষম আতঙ্কের চিহ্ন। চলন্ত ট্রেনে পাগল বা পাগলির সঙ্গে এক কামরায় থাকা বড়ো সোজা কথা নয়।

তোতলার মতন থেমে থেমে তিনি বললেন, 'কী কী কী বাছা? কী চাও?'

খবরের কাগজের মাঝখানে একখানা ছবির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কমলা উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'এ যে আমার খোকনের ছবি!'

—'খোকন? ও, বুঝেছি।' ভদ্রলোক আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। 'তাহলে আপনিই হচ্ছেন মাস্টার গোবিন্দচন্দ্র রায়ের মা? সোনার টুকরো ছেলে! অমন ছেলের মা হওয়াও ভাগ্যের কথা!'

কমলা বললেন, 'আপনার মতো আর সকলেও খোকনকে বোধহয় আকাশে তুলছে! ভাগ্য! অমন ভাগ্য আমি চাই না!' গজ গজ করতে করতে তিনি খবরের কাগজখানা পড়তে শুরু করে দিলেন।

গোড়াতেই বড়ো বড়ো হরফে শিরোনামা

খোকা-ডিটেকটিভের কীর্তি!!!

দেড়শো খোকার কাণ্ড!!

তারপর গোবিন্দ কালীপুর থেকে কলকাতা পর্যন্ত যেসব ঘটনার পর ঘটনার সৃষ্টি করেছে, তারই উজ্জ্বল বর্ণনা!

কমলার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। তাঁর হাতের কাগজখানা কাঁপতে লাগল থর থর করে!

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'সঙ্গে কেউ না থাকলেই খোকন এমনি সব কাণ্ড করে বসে! আমি এমন পই পই করে বলে দিলুম টাকাগুলো সাবধানে রাখতে! তা সে কিনা অম্লানবদনে ঘুমিয়ে পড়ল। অত টাকা হারালে আমার কী দশা হত।'

বৃদ্ধ বললেন, 'মা, আপনি মিছেই ছেলেকে দোষ দিচ্ছেন। কে বলতে পারে, চোর তাকে চকোলেটের সঙ্গে ঘুমপাড়ানি ওষুধ খেতে দিয়েছিল কি না! এমন তো হামেশাই হয়। কিন্তু ওই খোকার দল চোর ধরবার যে কায়দা দেখিয়েছে আশ্চর্য, তা আশ্চর্য!'

ছেলের গৌরবে গর্বিত স্বরে কমলা বললেন, 'হ্যাঁ এ-কথা মানি। চালাক ছেলে বটে আমার খোকন। ইশকুলে কী লেখাপড়ায়, কী খেলাধুলোয় তার চেয়ে ভালো ছেলে আর নেই। কিন্তু কী দরকার বাপু চোর-ধরায়? ভেবে দেখুন তো, যদি কোনও বিপদ আপদ হত? আমার খোকন যে বেঁচেছে, এই ঢের! সে যদি আবার কখনও একলা রেলগাড়িতে চড়ে, তাহলে ভয়েই আমি মারা পড়ব। আর কখনও তাকে একলা ছাড়ব না!'

বৃদ্ধ বললেন, 'কাগজে তার ছবি কি ঠিক উঠেছে?'

—'হ্যাঁ, খোকনকে ঠিক এমনটি দেখতে। সে কি বেশ সুশ্রী নয়!'

—'সুন্দর চেহারা।'

—'কিন্তু তার জামার ছিরি দেখুন একবার! লণ্ডভণ্ড, ভাঁজ-পড়া! জামা-কাপড়ের দিকে তার একেবারেই নজর নেই!'

—'এই যদি তার একমাত্র দোষ হয়—'

বাধা দিয়ে কমলা বললেন, 'না, না! তা যদি বলেন তবে সত্যি কথা বলতে কী, খোকনের কোনও দোষই আমি দেখতে পাই না! এমন ছেলে কি হয়!'

কাগজখানি কমলাকেই সমর্পণ করে বুড়ো ভদ্রলোকটি পরের স্টেশনে নেমে গেলেন।

কমলা বার বার পড়তে লাগলেন তাঁর খোকনের কীর্তি-কাহিনী। যত বার পড়েন, আবার পড়তে সাধ হয়। ট্রেন যখন হাওড়া স্টেশনে গিয়ে থামল কাগজখানি তখন তিনি পড়ে ফেলেছেন এগারো বার!

স্টেশনে মায়ের জন্যে অপেক্ষা করছিল গোবিন্দ। সে দৌড়ে গিয়ে দু-হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে সগর্বে বললে, 'মা, তোমার হাতেও যে কাগজ দেখছি! তাহলে জেনেছ?'

দুই হাতে গোবিন্দের দুই গাল টিপে ধরে কমলা বললেন, 'ওঃ দেমাক যে আর ধরছে না!'

—'মাগো, মা! তোমাকে পেয়ে আমার যে কী আহ্লাদ হচ্ছে!'

—'চোর ধরতে গিয়ে পোশাকের যা দশা করেছ!'

মা খুশি হবেন বলে গোবিন্দ তার নীলরঙের পোশাক পরেই স্টেশনে গিয়েছিল। এ পোশাকটি কমলার ভারী পছন্দসই।

সে বললে, 'ভাবছ কেন মা, আমি না হয় এবার আনকোরা নতুন পোশাক পরব।'

—'কে দেবে শুনি?'

—'একজন দোকানদার।'

—'হ্যাঁ মা, দোকানদার। তার পোশাকের দোকান। সে আমাকে, প্রফেসরকে আর ঘণ্টুকে এক এক সুট পোশাক উপহার দিতে চায়। তারপর নাকি কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে—'বালক-গোয়েন্দারা কেবল আমাদের দোকান থেকেই পোশাক কেনে।' তার বিশ্বাস তাহলে দেশের সব ছেলেই ওই দোকানের পোশাক কেনবার জন্যে আবদার ধরবে। আজকাল আমরা খুব বিখ্যাত হয়ে উঠেছি কিনা! বুঝেছ মা?'

—'বুঝেছি বাছা, বুঝেছি।'

—'কিন্তু আমরা স্থির করেছি, ও-উপহার নেব না। আমাদের নাম নিয়ে এত হই-চই আমরা পছন্দ করি না। বুড়ো বুড়ো লোকেরা এসব ব্যাপারে বোকামি করতে পারে, কিন্তু আমরা ছেলেমানুষ হলেও তাদের মতন বোকা নই!'

—'বাপ রে, কী বুদ্ধিমান!'

—'এইবারে আমার নতুন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবে চলো।'

—'তারা আবার কোথায় রে?'

—'আজ তুমি আসবে বলে মাসির বাড়িতে তাদের নেমন্তন্ন করেছি। চলো।'

বোনের বাড়িতে ঢুকে কমলার মনে হল, সেখানে যেন হুলুস্থূল কাণ্ড উপস্থিত।

খাবার ঘরটার ভিতরে পিল পিল করছে ছেলের পাল। কেউ হো হো করে হাসছে, কেউ চোঁ চোঁ শব্দে চায়ে চুমুক মারছে, কেউ সশব্দে ডিস ভেঙে ফেলছে, কেউ টেবিল চাপড়ে, কেউ হাততালি দিয়ে এবং কেউ বা পিরিচে পেয়ালা ঠুকে বাদ্যধ্বনি সৃষ্টি করবার চেষ্টা

করছে! কেউ ধুপ-ধাপ লাফাচ্ছে—সে নাকি নৃত্য। কেউ প্রাণপণে চ্যাঁচাচ্ছে—সে নাকি গান! কেউ ক্রমাগত ডিগবাজি খাচ্ছে—সে নাকি আনন্দের চূড়ান্ত!

এবং তারই ভিতর দিয়ে নাচের ভঙ্গিতে ছুটোছুটি করছে কুমারী নমিতা সেন, হাতে নিয়ে টাটকা কেকের ডালা।

নমিতার মা হাসিমুখে টেবিলের উপরে সাজিয়ে দিচ্ছেন ফলের থালা।

এক কোণে সোফায় বসে দিদিমা—তাঁর ফোকলা মুখে হাসির বাহার। কিন্তু ফোকলা হলে কী হয়, দিদিমার বয়স যেন আজ দশ বছর কমে গেছে।

আর ঘণ্টুর মোটর-হর্ন! তোমরা কেউ যেন ভেব না, আজকের দিনে সে বোবা হয়ে আছে।

নমস্কার, কুশল প্রশ্ন, আলাপ-অভ্যর্থনা এবং তারপর ভোজ ও গোলমালের পালা শেষ হল।

তারপর দিদিমা তাঁর সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। ডান হাতের তর্জনী তুলে বললেন, 'শোনো নাতির দল! এইবারে আমি দুটো কথা বলব। ভেব না, তোমরা ভারী চালাক। সবাই আহা-মরি করে তোমাদের মাথা গুলিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আমি তোমাদের বাহবা দেব না—আমি তোমাদের বাহবা দেব না।'

ছেলের দল একেবারে চুপ। এমনকী ঘণ্টু পর্যন্ত তার মোটর-হর্ন লুকিয়ে ফেললে।

'শোনো। দেড়শো ছেলে মিলে একটা চোরকে তাড়া করে ধরতে পারা আমি মস্ত কীর্তি বলে মনে করি না। শুনে কি নাতিদের রাগ হচ্ছে? কিন্তু তোমাদের দলে এমন একজন আছে, যে অনায়াসেই এই মজার চোর-ধরা খেলায় যোগ দিয়ে তোমাদের মতোই নাম কিনতে পারত। চাকরের উর্দি পরে সে-ও নিতে পারত বাহাদুরি। কিন্তু সে তা না করে বাড়ির ভিতর চুপ করে বসেছিল—তোমাদের কাছে অঙ্গীকার করেছিল বলে।'

সবাই খুদে মঙ্গলের দিকে ফিরে তাকালে—লজ্জায় সঙ্কোচে লাল হয়ে উঠল তার ছোট্ট মুখখানি।

—'হ্যাঁ, আমি মঙ্গলের কথাই বলছি। পুরো দুদিন ঘরের কোণে টেলিফোন ছেড়ে সে নড়তে পারেনি। কারণ সে জানত, তার কর্তব্য কী? এ কর্তব্যে মজা নেই, তবু কর্তব্য হচ্ছে কর্তব্য! আশ্চর্য তার কর্তব্যপরায়ণতা, আশ্চর্য। মঙ্গল তোমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। সেই-ই হচ্ছে আসল বাহাদুর।'

ছেলের দল লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, নমিতা ছুটে গিয়ে মঙ্গলের হাত ধরলে।

সবাই চিৎকার করে বলে উঠল, 'জয় মঙ্গলবারের জয়! হুররে! হুররে! হুররে!'

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

এ গল্পের আসল কথা কী

রাত্রিবেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর সকলে মাঝের-ঘরে এসে বসেছে। প্রফেসর ও তার দলবল তখন বিদায় নিয়েছে।

গোবিন্দের মেসো চন্দবাবু লোহার সিন্দুকের ভিতর থেকে পাঁচ হাজার টাকার নোট বার করে কমলার হাতে দিয়ে বললেন, 'টাকাগুলো গোবিন্দের নামে ব্যাংকে জমা রেখো।'

কমলা বললেন, 'তাই রাখব।'

গোবিন্দ বললে, 'উঁহু, আগে মায়ের জন্যে একটি ভালো সেলাইয়ের কল আর একখানি দামি কাশ্মীরি শাল কিনতে হবে। টাকা যখন আমার, তখন টাকা নিয়ে আমি যা খুশি করব।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'না, তা তুমি পারো না। তুমি ছেলেমানুষ। তোমার মা যা বলবেন তাই হবে।'

বাবার দিকে চোখ রাঙিয়ে চেয়ে নমিতা বললে, 'বা-রে! মাকে উপহার দিতে পারলে গোবিনদা কত খুশি হবে এটা তুমি বুঝতে পারছ না কেন বাবা? বড়োরা ভারী অবুঝ তো।'

দিদিমা বললেন, 'ঠিক কথা। কমলাকে নতুন সেলাইয়ের কল আর শাল কিনে দেওয়া মন্দ নয়। কিন্তু বাকি সব টাকা ব্যাংকে জমা থাকবে, না গোবিন্দ?'

—'তা থাক। কী বলো মা?'

কমলা বললেন, 'হ্যাঁ গো আমার বড়োলোক ছেলে! যা ধরেছ, ছাড়বে না তো।'

গোবিন্দ বললে, 'তাহলে কাল সকালেই আমরা বাজারে বেরুব। নমু, তুমিও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ তো?'

নমিতা বললে, 'তুমি কি ভাবছ তোমরা বাজারে বেড়াতে বেরুবে, আমি একলা ঘরে বসে বসে মশা মারব কি মাছি ধরব? হ্যাঁ, আমিও যাব। আর শোনো গো মাসি, গোবিনদাকে একখানা সাইকেলও কিনে দিয়ো, নইলে ও আমার সাইকেলখানা ভেঙে গুঁড়ো না করে ছাড়বে না!'

কমলা ব্যস্তভাবে বললেন, 'খোকন, তুমি কি নমুর সাইকেলের কোনও ক্ষতি করেছ?'

গোবিন্দ বললে, 'না মা, ও বাঁদরির বাজে কথা শোনো কেন?'

নমিতা ভুরু কুঁচকে বললে, 'আমি বাঁদরি, না তুমি বাঁদর? ফের যদি আমার সাইকেলে হাত দাও, তাহলে তোমার সঙ্গে আমার দস্তুরমতো আড়ি! এ-জন্মের মতো তোমাতে-আমাতে ছাড়াছাড়ি হবে, বুঝলে।'

গোবিন্দ উঠে দাঁড়িয়ে দু দিকের পকেটে দুই হাত পুরে দিয়ে গম্ভীর স্বরে বললে, 'কী বলব নমি, একে তুই মেয়েমানুষ-তায় রোগা-টিকটিকি! নইলে তোর সঙ্গে আজ আমি ঘুষি লড়তুম! যাক, আজকের দিনে আমি কারুর সঙ্গে ঝগড়া করতে রাজি নই। টাকা আমার, আমি সাইকেল কিনি আর না কিনি তা নিয়ে অন্য কারুর মাথা ঘামাবার দরকার নেই।'

দিদিমা বললেন, 'ঝগড়া করিসনে—ঝগড়া করিসনে, তার চেয়ে দুজনেই দুজনের চোখ খুবলে নে।'

তারপর আবার এ-কয়দিনের ঘটনা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হল।

মাসি বিমলা বললেন, 'দিদি, তুমি তো কেবল মন্দ দিকটাই দেখছ। এ-ব্যাপারে ভালো দিকও কি নেই?'

গোবিন্দ বললে, 'অবশ্যই আছে মাসিমা। আমি কি শিক্ষা পেয়েছি জানো?—কখনও কারুকে বিশ্বাস কোরো না।'

কমলা বললেন, 'আমিও একটা শিক্ষা পেয়েছি। শিশুদের একলা বেড়াতে যেতে দেওয়া উচিত নয়।'

দিদিমা ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, 'বাজে কথা আমি পছন্দ করি না—বাজে কথা আমি পছন্দ করি না।'

চেয়ারের উপর ঘোড়ার মতো বসে চেয়ারখানা টেনে নিয়ে ঘরময় ঘুরতে ঘুরতে নমিতা গানের সুরে বললে, 'বাজে কথা—বাজে কথা—বাজে কথা।'

বিমলা বললেন, 'হ্যাঁ মা, তুমি কি বলতে চাও, এ-ব্যাপারে শেখবার কিছুই নেই?'

—'নিশ্চয়ই আছে, নিশ্চয়ই আছে।'

সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী, কী?'

দিদিমা ডান হাতের তর্জনী তুলে বললেন, 'টাকা সর্বদাই পাঠাবে মনি-অর্ডার করে।'

চেয়ার-ঘোড়ায় চেপে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে নমিতা বলে উঠল, 'জয় মনি-অর্ডারের জয়।'

হারাধনের দ্বীপ

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

ক

শ্রীচন্দ্রকান্ত চৌধুরি। আগে ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের জজসাহেব, এখন অবসর গ্রহণ করেছেন। একখানি উচ্চ-শ্রেণির কামরায় চেপে ট্রেনে করে তিনি যাচ্ছিলেন পোর্ট ক্যানিং-এর দিকে। সিগার টানতে টানতে পড়ছিলেন একখানি খবরের কাগজ।

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে কামরার জানলা দিয়ে তিনি বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। সূর্যকরদীপ্ত নির্মেঘ আকাশ, তার তলায় মাঠের পর মাঠ, বনের পর বন, তালীকুঞ্জ, বাঁশঝাড়, ঝোপঝাপ, ঝিল-খাল-পুকুর। তারপর তিনি হাতের ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌঁছতে এখনও বিলম্ব আছে।

খবরের কাগজে অদ্ভুত এই 'হারাধনের দ্বীপ' সম্বন্ধে যে-সব কথা বেরিয়েছে, তিনি মনে মনে তাই নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। 'হারাধনের দ্বীপ!' এমন দ্বীপের নাম কেউ কখনো শোনেনি। অথচ এই অশ্রুত দ্বীপের কথা নিয়ে আজকাল কাগজওয়ালারা ক্রমাগত মাথা না ঘামিয়ে পারছে না।

সুন্দরবনের শেষ প্রান্তে গঙ্গাসাগরের কাছে ছোটো-বড়ো-মাঝারি দ্বীপ আছে অনেকগুলি। কোনো কোনো বড়ো দ্বীপের নাম আছে, আবার অনেক দ্বীপই হচ্ছে একেবারেই অনামা। গত মহাযুদ্ধের সময় কে-এক সাধারণ ব্যক্তি ধনকুবের রূপে অসাধারণ হয়ে ওঠে। হঠাৎ কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার মালিক হয়ে সে আবু হোসেনের মতো টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে শুরু করে দেয়। সেই সময়ে কী-এক আজব খেয়ালের দ্বারা চালিত হয়ে সে গঙ্গাসাগরের কাছে ছোটো একটি নামহীন দ্বীপ ক্রয় করে ফেলে, তারপর নিজের মর্জি অনুসারে সেই দ্বীপের নাম দেয়—'হারাধনের দ্বীপ'। এবং অজস্র টাকা ঢেলে সেই বিজন দ্বীপের উপরে প্রাসাদের মতো মস্ত একখানা বাড়ি তৈরি করায়।

হাতে টাকা থাকলে মানুষ খেয়ালের বশে সব কিছুই করতে পারে। দিবাস্বপ্নে অনেক কিছুই চমৎকার বলে মনে হয়, কিন্তু কঠিন বাস্তবের সামনে এসে দাঁড়ালে সুখের স্বপ্ন ছুটে যেতে বিলম্ব হয় না। এই আধুনিক আবু হোসেনও সেই

সত্য হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলে। দ্বীপে যাতায়াত করবার জন্য নিয়মিত কোনো জলযানের ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই কলকাতা থেকে আবশ্যক জিনিসপত্তর—বিশেষ করে আহার্য্যসামগ্রী—যথাসময়ে সরবরাহ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে ওঠে। তার উপরে বর্ষাকালে সামুদ্রিক ঝড় যখন দুর্বার বেগে দ্বীপকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে এবং দিন-রাত ধরে অশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় দ্বীপ হয়ে পড়ে জলে জলে জলময়, তখন দ্বীপের নবাগত বাসিন্দাদের জীবন হয়ে ওঠে অত্যন্ত অসহায় এবং দুর্বহ। সুতরাং সেই হঠাৎ নবাবের খেয়াল ছুটে যেতে বেশি দেরি লাগল না।

মাস কয়েক যেতে না যেতেই সে আবার কলকাতায় পালিয়ে এসে, বাড়ি সমেত সেই দ্বীপটাকে জলের দরে বেচে ফেলবার জন্যে খবরের কাগজে উজ্জ্বল ভাষায় বড়ো বড়ো হরফে বিজ্ঞাপন দিতে লাগল। কিছুদিন পরেই শোনা গেল, আবার কে এক নির্বোধ ব্যক্তি পরে পস্তাবে বলে সস্তায় সেই দ্বীপটা কিনে নিয়েছে।

চন্দ্রবাবু নিজের পকেটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে বার করলেন একখানা চিঠি। পত্রলেখকের হাতের লেখা যার-পর-নাই খারাপ, কিন্তু জায়গায় জায়গায় তা আবার এমন স্পষ্ট যে পড়তে কোনোই কষ্ট হয় না ঃ—

'প্রিয় চন্দ্রবাবু...অনেক কাল আপনার কোনো খবর পাইনি। ...কিন্তু আপনাকে এই 'হারাধনের দ্বীপে' আসতেই হবে...পরিস্থানের মতো সুন্দর দ্বীপ...কত কথাই বলবার আছে...সেই পুরনো-দিনের কথা...প্রকৃতির কোলে বসে উপভোগ করব সূর্যের সোনার কিরণ...আসতেই হবে, নিশ্চয়ই আসবেন। ...আসচে বারোই তারিখে পোর্ট ক্যানিংয়ে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে, আর প্রস্তুত থাকবে আমাদের একখানা 'লাঞ্চ'।'

তলায় নাম সই করা হয়েছে—শ্রীমতী চারুশীলা দেবী।

চন্দ্রবাবু ভাবতে লাগলেন। আট-দশ বছর আগে দেওঘরে বেড়াতে গিয়ে এক চারুশীলা দেবীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল। তিনি ছিলেন এক অত্যন্ত ধনী জমিদারের বিধবা সহধর্মিণী। তখন তাঁর বয়স ছিল বোধ হয় ত্রিশ-বত্রিশ। তিনিও ছিলেন অতিশয় খামখেয়ালি।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লেন ভূতপূর্ব জজ চন্দ্রকান্ত চৌধুরি।

খ

শ্রীমতী স্বপ্না সেন। সেই ট্রেনেই একখানি তৃতীয় শ্রেণির কামরায় চড়ে যাত্রা করছে 'পোর্ট ক্যানিং'-এর দিকেই। কামরায় আরও কয়েকজন যাত্রী রয়েছে। সকলেই পরিচিত। স্বপ্না মনে মনে ভাবছিল, ভাগ্যে সে কর্মপ্রার্থী হয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, তাই এতদিন পরে অস্থায়ী হলেও একটা ভালো কাজ পাওয়া গেল। তাকে হতে হবে একজন মহিলার সঙ্গিনী।

পকেট থেকে একখানি পত্র বার করে সে পড়তে লাগল :—

'সংবাদপত্রে আপনার বিজ্ঞাপন দেখেছি। আপনি যে মাহিনা চেয়েছেন তা দিতে আমার আপত্তি নেই। বারোই তারিখে বৈকালবেলায় আমি 'পোর্ট ক্যানিং'-এ হাজির থাকব। সেই সময়েই আমার সঙ্গে দেখা করলে আনন্দিত হব। রাহা খরচের জন্যে ২০/- টাকা পাঠালুম। ইতি—শ্রীমতী কাননকুন্তলা দেবী।'

কাননকুন্তলা! বাবা, কী কষ্টকল্পিত নাম? ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই অনেক টাকার মালিক, নইলে একটা দ্বীপকে-দ্বীপই কিনে ফেলতে পারেন? দ্বীপের নামটাও কী বেয়াড়া! 'হারাধনের দ্বীপ'! কে কবে শুনেছে এমন নাম?

স্বপ্নার মন হঠাৎ ফিরে গেল পিছনের দিকে! মনে পড়ল তার কুমার নরেন্দ্রনারায়ণের কথা। তাঁর কাছে সে কাজ করেছে প্রায় দুই বৎসর। কাজ কিছু কঠিন নয়, বিপত্নীক নরেন্দ্রনারায়ণের একমাত্র শিশুপুত্রকে দেখাশুনা করবার ভার ছিল তারই উপরে। নরেন্দ্রনারায়ণের একমাত্র বংশধর নীরেন্দ্রনারায়ণ। সেই হত তাঁর অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

স্বপ্না শিউরে উঠল। নরেন্দ্রনারায়ণ—নরেন্দ্রনারায়ণ—না, না, নরেন্দ্রনারায়ণের কথা মন থেকে তার একেবারেই মুছে ফেলা উচিত!

কিন্তু—কিন্তু আর একটা করুণ দৃশ্য যে সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না! পুরীর সেই সমুদ্রতীর! নীরেন্দ্রনারায়ণের ছোট্ট মুখখানি একবার ভাসছে, একবার ডুবছে—ভেসে যাচ্ছে উত্তাল তরঙ্গমালার দিকে। সে-ও তাকে বাঁচাবার জন্যে জলে ঝাঁপ দিলে বটে, কিন্তু মনে মনে নিশ্চিত ভাবেই জানত সে, কিছুতেই বাঁচাতে পারবে না তাকে।

না, না, কেন সে আবার ভেবে মরছে এইসব দুঃস্বপ্নের কথা?

নিজের মনকে শক্ত করে স্বপ্না কামরার জানলার দিকে ফিরে বসল। চেয়ে দেখতে লাগল প্রকৃতির নাচঘরে চলচ্চিত্রের পর চলচ্চিত্র—এক ছবি সুমুখে আসে, আর এক ছবি মিলিয়ে যায়!

গ

স্বপ্নার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ঠিক তার সামনের বেঞ্চিতেই বসেছিল অমলেন্দু সেন।

নিজের মনে মনেই সে বললে, 'মেয়েটি সুন্দরী বটে। বেশ বুদ্ধিমতী বলেও মনে হয়। আচ্ছা পরে এর সঙ্গে একটু ভালো করে আলাপ করতে হবে।'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার মন আবার বলে উঠল, ধ্যেৎ, এসব আলাপ-পরিচয়ের কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এখন নেই। এখন কাজের সময়, সে এসেছে জরুরি কাজের ভার নিয়ে।

হুঁ। অ্যাটর্নি বিজন বোস। লোকটা হচ্ছে অত্যন্ত রহস্যময়। বলে কিনা, 'বেশি কথার দরকার নেই অমলেন্দুবাবু। আপনার মত কী বলুন? হ্যাঁ, কি না?'

অমলেন্দু বলে, 'আপনি পাঁচ হাজার দিতে চান?' এমন অবহেলাভরে কথাগুলো সে বলেছিল, যেন পাঁচ হাজার টাকা তার কাছে ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়। অথচ সে সময়ে পরের দিনের খাবার কেনবার সামর্থ্যও তার ছিল না। সে সময়ে এটুকুও সে বুঝতে পেরেছিল যে, বিজন বোস তার অবহেলার ভাবটা মোটেই আমলে আনেনি। অ্যাটর্নিদের চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়। বিজন বোস চুপ করে আছে দেখে সে আবার শুধোয়, 'তাহলে এ বিষয়ে আপনি আর কোনো খবর দিতে রাজি নন?' বিজন বোস নিশ্চিতভাবে মাথা নেড়ে বলে, 'না অমলেন্দুবাবু! আমার মক্কেল ভালো করেই খবর নিয়ে জেনেছেন যে, আপনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হলেও আপনার বর্তমান আর্থিক অবস্থা এখন সচ্ছল নয়। তাঁরই কথামতো আপনাকে আমি পাঁচ হাজার টাকা দেব এই শর্তে যে, আসছে ১২ই তারিখে বৈকালবেলায় আপনি 'পোর্ট ক্যানিং'-এ গিয়ে হাজির থাকবেন। সেখান থেকে একখানা মোটর-লাঞ্চ আপনাকে নিয়ে হারাধনের দ্বীপে যাত্রা করবে। তারপর দ্বীপে উপস্থিত হয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে আমার মক্কেলের ইচ্ছা অনুসারে।'

অমলেন্দু বলে, 'সেই দ্বীপে আমাকে থাকতে হবে কতদিন?'

—'এক সপ্তাহের বেশি নয়।'

অমলেন্দু অল্পক্ষণ চিন্তা করে বলে, 'কিন্তু জেনে রাখবেন, আমি কোনো বে-আইনি কাজ করতে প্রস্তুত নই।'

মুখ টিপে মৃদু হাসি হেসে বিজন বোস বলে, 'কেউ আপনাকে বে-আইনি কাজ করতে বললে দ্বীপ থেকে অনায়াসেই আপনি চলে আসতে পারবেন, কেউ বাধা দেবে না।'

নিকুচি করেছে! এতক্ষণ পরে লোকটা আবার মুখ টিপে হাসলে। আইনবিরুদ্ধ কাজ করা অমলেন্দুর স্বভাববিরুদ্ধ নয়, ও-হাসি যেন ইঙ্গিতে সেই কথাই প্রকাশ করতে চায়! হ্যাঁ, দু-এক বার নিজেকে সামলাবার জন্যে তাকে এমন কিছু করতে হয়েছে, তা মুখ ফুটে বলা যায় না দশ জনের সামনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে সে সামলে নিতে পেরেছে, কোনো বাধা না মেনেই। —হ্যাঁ, কোনো বাধা না মেনেই।

তা হারাধনের দ্বীপটা তার কাছে বোধহয় নিতান্ত মন্দ লাগবে না। একসঙ্গে ভ্রমণ ও অর্থোপার্জন!

ঘ

গাড়ির একটা কোণ নিয়ে সিধে হয়ে চুপ করে বসেছিলেন সৌদামিনী দেবী। বয়স তাঁর পঁয়ষট্টির কম হবে না। একহারা দেহ, ব্রাহ্মসমাজের মেয়ে। মাঝে মাঝে বিরক্ত চোখে কামরার অন্যান্য লোকগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। কামরার ভিতরে ভিড় আর গ্রীষ্মের আতিশয্যে অস্থির হয়ে উঠেছে সবাই। একটু অসুবিধা কেউ সইতে পারে না, সবতাতেই বাড়াবাড়ি! এই তো আমি কেমন স্থির ও শান্তভাবে বসে আছি! আমাকে দেখেও কি ওদের বুদ্ধি হয় না?

কামরার ভিতরে ছিল জন-চারেক তরুণী। তাদের হাবভাব ও সাজপোশাক একেবারে বেহদ্দ বেহায়ার মতো। আমাদেরও বয়সকালে মেয়েরা সাজপোশাক ভালোবসত। কিন্তু তখন তো এমন নির্লজ্জতা কখনো দেখিনি! কালে কালে হল কী? এদের কঠিন শিক্ষা দেওয়া উচিত।

সকলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সৌদামিনী তাকালেন জানলার বাইরের দিকে। কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট করলে না, মনে মনে ভাবছিলেন তিনি গত বৎসরের কথা।

হ্যাঁ, গত বৎসরে এই সময়ে তিনি ছিলেন গিরিডিতে। এবারে চলছেন গঙ্গাসাগর সঙ্গমে, হারাধানের দ্বীপে।

'ভ্যানিটি কেস' থেকে একখানা আগে-পড়া চিঠি বার করে আবার পড়তে লাগলেন :—

'প্রিয় সৌদামিনী দেবী, আশা করি আমাকে আপনি ভুলে যাননি। কয়েক বৎসর আগে আমরা দুজনে পশ্চিমে একসঙ্গে কিছুকাল কাটিয়েছিলুম, এ কথা

আপনার মনে আছে তো? সেদিনের মিলন-স্মৃতি আজও আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে আছে।

গঙ্গাসাগরের সঙ্গমে আমি একটি ছোটো দ্বীপ কিনেছি। সেখানে মনের মতো একখানি বাড়িও পেয়েছি। তার ভিতরে গিয়ে বসলে আপনি ভুলে যাবেন সব একেলে ঝঞ্ঝাটের কথা—অর্থাৎ এরোপ্লেন, ট্রাম-বাস-মোটর, গ্রামোফোন, রেডিয়ো-সিনেমা আর মেয়েদের আধ-ফুট-উঁচু হাই-হিল জুতোর কথা। আপনি যদি মাসখানেক এখানে এসে যাপন করেন, তাহলে অত্যন্ত আনন্দিত হব। জায়গাটির একটি নামও দিয়েছি—'হারাধনের দ্বীপ'। নামটা সেকেলে, নয়? তা আমরা দুজনেই তো সেকেলে যা-কিছু পছন্দ করি। আসবেন। আসছে ১২ই তারিখে বৈকালবেলায় 'পোর্ট ক্যানিং'-এ আমি আপনার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকব। ইতি—

আপনার কাঃ কুঃ'

আবার কাঃ কুঃ? মানুষটি কে? সাটে নাম লিখেছে কেন? ফি বছরেই তো একবার করে এখানে-ওখানে বেড়াতে যাওয়ার অভ্যাস তাঁর আছে। কবে, কোথায় এই মানুষটির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল, মনে পড়ে না তো! তিনি মেয়ে না পুরুষ? লেখার ছাঁদ দেখে তো মনে হয় মেয়েমানুষ। তা যিনিই হোন, বিনা পয়সায় এমন বেড়িয়ে আসবার লোভ তো ছাড়া যায় না! শেষ পর্যন্ত দেখাই যাক না কেন?

৬

ট্রেন একটা স্টেশনে এসে থামল। বিরক্ত মুখে বাইরের দিকে তাকালেন মেজর সেন। একে তো এইসব পাড়াগেঁয়ে ট্রেনগুলো গোরুর গাড়ির সঙ্গে তাল রেখে চলবার চেষ্টা করে, তার উপরে ঘড়িঘড়ি যখন-তখন যে কোনো স্টেশনে এসে অচল হয়ে থাকা। জ্বালাতন!

কিন্তু এই 'কাঃ কুঃ' লোকটা কে? লিখেছে : 'আমাদের এই হারাধনের দ্বীপে এলে আপনার দুইজন পুরাতন বন্ধুর দেখা পাবেন। আমিও আপনার কাছে নতুন মানুষ নই। সবাই মিলে কিছুদিন আবার পুরাতন স্মৃতির জগতে বাস করা যাবে।'

পুরাতন স্মৃতির জগতে? সেখানে বাস করার জন্যে তাঁর মনে কোনোই আগ্রহ নেই। সেখানে মনকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ভালো লাগে না তাঁর। অতীত

কালের কথা ভাবলেই মনে জাগে তাঁর বিশেষ এক ঘটনার স্মৃতি। সে ঘটনা তিনি লুকিয়ে রাখতে চান সন্তর্পণে।

কিন্তু চুলোয় যাক সেসব কথা। এই হারাধনের দ্বীপের রহস্যটা কী? আজকাল খবরের কাগজে প্রায়ই এই অজানা দ্বীপটার সম্বন্ধে অদ্ভুত-সব কাহিনি পাঠ করা যায়। হঠাৎ সেখানে তাঁর আমন্ত্রণ হল কেন?

ভেবেচিন্তে কোনোই সুরাহা হল না। ট্রেন আবার চলতে শুরু করলে। তিনি আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

চ

ডাক্তার বোস গম্ভীরভাবে তাঁর রিজার্ভ করা কামরার ভিতরে বসে আছেন।

আজ জীবনের পথ হয়েছে তাঁর কুসুমাস্তৃত! অনেক বাধাবিঘ্ন, অনেক কাঁটাঝোপ পার হয়ে আজ তিনি যে পথে এসে দাঁড়িয়েছেন, তা নিয়ে যাবে তাঁকে উচ্চতম, সৌভাগ্যের দিকে। আজ তাঁর হাতযশের কথা ছড়িয়ে পড়েছে দেশ-বিদেশে। তাঁকে ঘিরে থাকে রোগীদের জনতা, না-চাইতে তাঁর ঘরে এসে পড়ে কাঁড়িকাঁড়ি টাকা। কয়েক বৎসর আগেও এটা ছিল স্বপ্নাতীত ব্যাপার। তাঁর বর্তমান উপভোগ্য, তাঁর ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল।

কেবল অতীতে থেকে গিয়েছে একটি খুঁত। তখনও তিনি আরোহণ করেছেন খ্যাতির সোপানে, কিন্তু একটি মাত্র ঘটনা তাঁর জীবনকে করে তুলেছিল অপ্রীতিকর। কেবল অপ্রীতিকরই নয়। আর-একটু হলেই ভেঙে পড়তে পারত তাঁর যশের ভিত্তি। থাক সে কথা, নতুন করে আর ভাবার দরকার নেই। কিন্তু এই লোকটা কে? এমন করে নিজের নাম সই করেছে, ভালো করে পড়াই যায় না। কিন্তু সে যে তাঁকে চেনে, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। হারাধনের দ্বীপে গিয়ে কিছুদিন অবকাশ যাপন করার জন্যে আমন্ত্রিত হয়েছেন তিনি।

অবকাশ! যেন অবকাশের সুযোগ তাঁর আছে। রোগী আর রোগী, টাকা আর টাকা! রোগী দেখা বন্ধ করলে টাকা আসাও বন্ধ হয়। কিন্তু রোগী আর টাকা নিয়েই তো প্রতিদিন কাটিয়ে দেওয়া চলে না। মাঝে মাঝে হাঁপ ছাড়তে না পারলে জীবন যে হয়ে উঠবে বিষাক্ত। হ্যাঁ, ইতিমধ্যেই তাঁর জীবন হয়ে উঠেছে ভারবহ। কিছুদিনের ছুটি না নিলে এ ভার আর নামবে না। তাই তিনি গ্রহণ করেছেন এই আমন্ত্রণ।

ছ

ট্রেনের আর-একটি কামরায় বসে মহেন্দ্র নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে তারপর মনে মনেই বললে, 'পোর্ট ক্যানিং-এ পৌঁছতে আর বেশি দেরি নেই।' বুকপকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সে বার করলে একখানা পকেটবুক। তারই খানকয় পাতা উলটে এক জায়গায় থেমে সে কতকগুলো নামের ফর্দ পাঠ করতে লাগল: চন্দ্রকান্ত চৌধুরি, স্বপ্না সেন, অমলেন্দু সেন, সৌদামিনী, মেজর সেন, ডাক্তার বোস, মনোতোষ চৌধুরি এবং নিত্যানন্দ দাস ও সত্যবালা—স্বামী আর স্ত্রী। বাড়িখানা তদারক করার ভার আছে শেষ দুজনেরই উপরে।

মহেন্দ্র নিজের মনেই বললে, 'তাহলে এই ক-জনকে নিয়েই আমার কারবার। তা এদের নিয়ে বেশি বেগ পেতে হবে না বলেই মনে হচ্ছে।'

পকেটবুকখানা আবার বুকপকেটের ভিতরে স্থাপন করে জানলা দিয়ে সে একবার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দিলে। পাশের কামরার আর এক ভদ্রলোকও জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আছেন। তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মহেন্দ্র জানলার কাছ থেকে সরে এসে বসল। আপন মনে বললে, 'গোঁফ দেখেই চিনেছি! সেই মিলিটারি ভদ্রলোক! উনি আমাকে চিনতে পারলেন কি না জানি না। কিন্তু যদি পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, আমি কী বলব? বললেই হবে, আমি সিংহল-প্রবাসী বাঙালি, স্বদেশে বেড়াবার শখ হয়েছে, তাই এদিকে এসেছি।'

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

ক

পোর্ট ক্যানিং!

যাত্রীরা সব দাঁড়িয়ে আছেন—পরস্পরের কাছ থেকে খানিক খানিক তফাতে। প্রত্যেকের দৃষ্টি কৌতূহলী ও অনুসন্ধিৎসু। প্রত্যেকেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে। সেই সব দৃষ্টি দেখলে তারা কেউ কারুকে চেনে বলে মনে হয় না।

চন্দ্রবাবু আস্তে আস্তে এগিয়ে সৌদামিনী দেবীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে বললেন, 'আজকের আকাশটা বেশ পরিষ্কার দেখছি।'

সৌদামিনী কাঠের পুতুলের মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, চন্দ্রবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'এটা ভালো লক্ষণ। জলপথে যেতে হবে, জলঝড়ের ভয় নেই।'

সৌদামিনীর মনে হল, এঁকে দেখলে বোধ হয়, বিশিষ্ট কোনো ভদ্রলোক। চেহারায় আভিজাত্য আছে। যিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি উচ্চশ্রেণিতে ওঠা-বসা করেন।

চন্দ্রবাবু শুধোলেন, 'আপনি এ-অঞ্চলে আগে কখনো এসেছেন কি?'

সৌদামিনী বললেন, 'আজ্ঞে না।'

—'চারুশীলার সঙ্গে আপনার কত দিনের আলাপ?'

সৌদামিনী বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'চারুশীলা দেবী কে?'

—'যিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন।'

—'আমাকে তো চারুশীলা দেবী নিমন্ত্রণ করেননি!'

—'তবে?'

—'পুরো নামটাও আমি বলতে পারব না। আমি যে নিমন্ত্রণপত্র পেয়েছি, তার তলায় আছে একটা নামের দুটো আদ্য অক্ষর—কাঃ কুঃ।'

—'বটে? বটে!' চন্দ্রবাবু আর কিছু বললেন না, একেবারে গুম হয়ে রইলেন। তিনি ভূতপূর্ব জজসাহেব বটে, কিন্তু এখনও তাঁর বুকের ভিতরে সজাগ হয়ে আছে বিচারকের মন।

অমলেন্দু অগ্রসর হয়ে স্বপ্নার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বললে, 'আপনিও কি আমাদের সঙ্গে হারাধনের দ্বীপে যাবেন?'

স্বপ্না বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

অমলেন্দু বললে, 'আমরা কেউ কারুকে চিনি না, কিন্তু মনে হচ্ছে আমাদের বাস করতে হবে এক বাড়িতেই! আমার নাম অমলেন্দু সেন।'

স্বপ্না বললে, 'আমার নাম স্বপ্না সেন।'

অমলেন্দু বললে, 'আপনি কি এই দ্বীপে আগে কখনো এসেছিলেন?'

—'জীবনে নয়। এমনকি যিনি আমাকে কাজে নিযুক্ত করেছেন, তাঁকেও কখনো চোখে দেখিনি।'

—'ভারী আশ্চর্য কথা তো! কে আপনাকে কাজে নিযুক্ত করেছেন?'

—'কাননকুন্তলা দেবী।'

অমলেন্দু মনে মনে ভাবতে লাগল, তবু একটা হদিস পাওয়া গেল। সেই সেয়ানা অ্যাটর্নি বিজন বোস আমার কাছে তার মক্কেলের নামও করেনি। এই মহিলা আর আমার অবস্থা দেখছি একই রকম—যাঁর কাছে কাজ করতে যাচ্ছি তাঁকে আমরা কেউই চিনি না। এতক্ষণে বোঝা গেল তিনি হচ্ছেন স্ত্রীলোক।

মেজর সেনের ভাব দেখলে মনে হয় যেন তিনি কিঞ্চিৎ অধীর হয়ে উঠেছেন। হাতের ছড়ি দিয়ে সামনের একটা ঝোপের উপর বারকয়েক আঘাত করে তিনি অমলেন্দু ও স্বপ্নার কাছে এসে বললেন, 'আপনারাও কি হারাধনের দ্বীপেই যাবেন?'

অমলেন্দু বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'বলতে পারেন, কার জন্যে আমরা এখানে অপেক্ষা করছি?'

—'কাননকুন্তলা দেবীর জন্যে। তিনিই সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছেন। কিন্তু তিনি এখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছোননি।'

এমন সময়ে একটি নূতন লোক এলে সকলকে শুনিয়ে বললে, 'আপনারা এখন মোটরলাঞ্চে গিয়ে উঠতে পারেন।'

লোকটির মাথায় ফেজটুপি, গায়ে কোট, পরনে ইজের।

ডাক্তার বোস এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। এখন তিনি বললেন, 'তুমি কে?'

—'আমার নাম মহম্মদ ইব্রাহিম। আমি মোটরলাঞ্চের চালক।'

মহেন্দ্র বললেন, 'মনোতোষ চৌধুরিরও আমাদের সঙ্গে যাবার কথা। তিনি এখনও আসেননি।'

ইব্রাহিম বললে, 'তাঁর জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে না। তিনি নিজের মোটরবোটে করেই দ্বীপে উঠবেন।'

ডাক্তার বোস বললেন, 'কিন্তু যিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন তিনি কোথা?'

ইব্রাহিম বললে, 'খবর পেলুম তিনি ট্রেন ফেল করেছেন। বোধ হয় পরের ট্রেনেই আসবেন।'

চন্দ্রবাবু বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বললেন, 'গৃহকর্তা অনুপস্থিত। আমরা অতিথি হয়ে কার কাছে যাব?'

ইব্রাহিম বললে, 'সেজন্য আপনাদের কারুকে কিছু ভাবতে হবে না। দ্বীপের বাড়িতে নিত্যানন্দবাবু আর তাঁর স্ত্রী আছেন, তিনিই আপনাদের দেখাশুনা করার

ভার নেবেন। কিন্তু আমাদের আর এখানে অপেক্ষা করা চলবে না। সন্ধে হবার আগেই আমি মোটরলাঞ্চে স্টার্ট দিতে চাই।'

মহেন্দ্র নিজের মনে মনেই বলল, 'ব্যাপারটা যেন রহস্যময় হয়ে উঠছে! দেখছি আমার দৃষ্টিকে রীতিমতো সজাগ রাখতে হবে।'

সৌদামিনী বললেন, 'আমরা দ্বীপে কখন গিয়ে পৌঁছোব?'

ইব্রাহিম বললে, 'কাল সকালে।'

মেজর সেন শুধোলেন, 'রাত্রে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কী হবে?'

ইব্রাহিম বললে, 'খাবার-দাবার এর মধ্যেই লাঞ্চে এসে গিয়েছে।'

অমলেন্দু ভাবলে, 'গৃহকর্তা নেই, কিন্তু আর সব ঠিক আছে! এ যে কৃষ্ণ নেই, কৃষ্ণলীলার ব্যাপার! আমার কেমন খটকা লাগছে! একজন স্ত্রীলোকের কাছে চাকরি নিয়েছি, তাঁর নাম নাকি কাননকুন্তলা। পেয়েছি পাঁচ হাজার টাকা! কিন্তু কেন? আমায় কী করতে হবে?'

খ

রাত্রের ব্যবস্থা ভালোই হয়েছিল। আহার ও শয়নের জন্যে কারুকেই কিছুমাত্র অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি।

রাত্রে আকাশে চাঁদ ওঠেনি, চারিদিক ঢাকা ছিল অন্ধকারের আবরণে। চাঁদের আলো ফুটলে যাত্রীরা হয়তো নদীর দুই তীরে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার জন্যে জেগে থাকতেন কিছুক্ষণ। স্তব্ধ রাত্রে নদীর জলকল্লোল শুনলেও মাধুর্য উপভোগ করা যায়। কিন্তু চলন্ত মোটরলাঞ্চের কর্কশ শব্দ তারও মিষ্টতাটুকু নষ্ট করে দিয়েছিল। কাজেই আহারাদির পরেই সকলে যে-যার শয্যায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

খুব ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠে স্বপ্না ভাবলে, আর-সবাই এখনও বোধ হয় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলে তার ধারণা ভ্রান্ত। লাঞ্চের ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে আছে দুই মূর্তি—অমলেন্দু আর মহেন্দ্র।

অমলেন্দু হেসে বললে, 'সুপ্রভাত, স্বপ্না দেবী! এত সকালে উঠেছেন? রাত্রে বুঝি ভালো ঘুম হয়নি?'

স্বপ্না বললে, 'না, আমি খুব ঘুমিয়েছি। একটা স্বপ্ন পর্যন্ত দেখিনি। বাঃ, পূর্ব দিকে কী রামধনু-রঙের বাহার, চমৎকার!'

অমলেন্দু বললে, 'চমৎকার বলেই তো এত ভোরে বিছানার মায়া ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছি। এখনও চারিদিক রহস্যময় হয়ে আছে। কিন্তু এখনই সূর্য উঠবে, সমস্ত রহস্য মিলিয়ে যাবে তার স্পষ্ট আলোয়।'

স্বপ্না বললে, 'রহস্য আমি ভালোবাসি, অমলেন্দুবাবু! এই অল্প আলোছায়ামাখা পৃথিবীকে মনে হয় কেমন একটা মায়ালোকের মতো! সর্বত্র জেগে থাকে কেমন যেন কল্পনার খেলা—কেমন যেন সম্ভাবনার ইঙ্গিত!'

মহেন্দ্র মৃদু হাস্য করে বললে, 'তাহলে স্বপ্না দেবী, এই জলযাত্রা নিশ্চয়ই আপনার ভালো লেগেছে?'

স্বপ্না বললে, 'আপনি একথা বলছেন কেন?'

মহেন্দ্র বললে, 'এও তো একটা রহস্যময় ব্যাপার—'

—'রহস্যময়?'

—'নিশ্চয়। যে দ্বীপের দিকে যাচ্ছি, তার কথা আমরা কেউ কিছু জানি না। আমরা যাঁর আতিথ্য গ্রহণ করব, তিনিও উপস্থিত নেই। আমরা এখানে আছি সাত জন। আরও একজন নতুন অতিথি নাকি আসবেন, কিন্তু আমরা কেউ কারুকেই চিনি না। সমগ্র ব্যাপারটাই কি রহস্যময় নয় স্বপ্না দেবী?'

স্বপ্না কোনো জবাব দিলে না।

কিছুক্ষণ সবাই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, দৃষ্টি রেখে পূর্ব আকাশের দিকে। প্রাতঃসূর্যের রক্তমুখ দেখা গেল ধীরে ধীরে। তার দীপ্তির তপ্ততায় গলে মিলিয়ে যাচ্ছে ইন্দ্রধনুর বর্ণ-বৈচিত্র্য!

গ

প্রভাত-সূর্যের কিরণ-হার নদীর জলে যখন চকমকিয়ে দুলে দুলে উঠছে, খানিক তফাত থেকে ভেসে এল একটা ধ্বনি। সকলেই উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল।

মহেন্দ্র বললে, 'মোটরবোটের আওয়াজ! ওই যে, এইবারে দেখা যাচ্ছে বোটখানা। উঃ, ওখানা ছুটে আসছে কী ভীষণ বেগে!'

অমলেন্দু বললে, 'মনোতোষ চৌধুরি নামে এক ভদ্রলোকের মোটরবোটে আসবার কথা ছিল না? বোধহয় তিনি আসছেন।'

মহেন্দ্র বললেন, 'খুব সম্ভব তাই।'

সকলে সেই দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কৌতূহলী চোখে। বাস্তবিক, বোটখানা ছুটে আসছিল একেবারে চরম বেগে। নদী এখানে অত্যন্ত বেগবতী, যে-কোনো মুহূর্তে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, চালক যেন সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করতে রাজি নয়। দেখতে দেখতে দুই দিকে ক্রুদ্ধ ও শুভ্র ফেনায়িত তরঙ্গমালাকে উদ্বেলিত করে তুলে মোটর-বোটখানা কাছে এসে পড়ল। চালকের আসনে আসীন যে যুবকের মূর্তি, দেখলে মনে হয় সে মূর্তি যেন পার্থিব নয়, স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ যেন কোনো তরুণ দেবতা সারথি হয়ে বিদ্যুৎগতিতে চালনা করে নিয়ে যাচ্ছেন এই জলযানকে! দীর্ঘ, ঋজু, বলিষ্ঠ দেহ, তপ্ত-কাঞ্চননিভ বর্ণ, মাথার চুলগুলো পিছনে বিক্ষিপ্ত হয়ে উড়ছে প্রবল বাতাসে।

বোটের হর্ন বেজে উঠল সজোরে, তারপর সেখানা লাঞ্চের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল তীব্র বেগে।

লাঞ্চ চালাতে চালাতে বোটের দিকে তাকিয়ে মহম্মদ ইব্রাহিম নিজেকে শুনিয়ে নিজেই বললে, 'এতক্ষণ পরে একটা মানুষের মতো মানুষের দেখা পাওয়া গেল! ওই ভদ্রলোকই বোধহয় মনোতোষ চৌধুরি? চমৎকার চেহারা, চমৎকার বোট আর চমৎকার ওঁর চালাবার কায়দা! ভদ্রলোক নিশ্চয়ই অনেক টাকার মালিক। লাঞ্চের উপরে যতগুলো মূর্তি আছে, ওদের কারুকেই আমার পছন্দ হয় না। কারুর কারুর চেহারা অমনি এক-রকম ভব্যিযুক্ত বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে থুত্থুড়ো বুড়ো আর বুড়ি, কারুকে দেখতে কেরানির মতো, আর কেউ যেন-বা মাস্টারনি। এমন একটা দ্বীপ যিনি কিনে ফেলেছেন, নিশ্চয়ই তিনি খুব বড়োলোক আর বনেদী ঘরের ছেলে! কিন্তু যাদের তিনি নিমন্ত্রণ করেছেন, তাদের চেহারা দেখলে ভক্তি হয় না কেন?

'কিন্তু ও-সবের চেয়েও মস্ত একটা আজব কথা এই যে, ওঁদের যিনি নিমন্ত্রণ করেছেন আর আমার হাতে দিয়েছেন এই লাঞ্চ চালাবার ভার, আমি এখনও পর্যন্ত তাঁকে একবার চোখেও দেখতে পেলুম না। এরকম কথা কে কবে শুনেছে! কলকাতার সেই অ্যাটর্নিবাবু মধ্যস্থ হয়ে আমাকে নিযুক্ত করেছেন, আমার উপরে হুকুম আছে যে অতিথিদের দ্বীপে নামিয়ে দিয়েই আমি যেন আবার ফিরে যাই। ভিতরের ব্যাপারটা যে কী, কিছুই বুঝতে পারছি না। তা বড়োলোকদের কথা বড়োলোকরাই জানে, খামোকা আমার মাথা ঘামাবার দরকার কী? আমার দরকার টাকা নিয়ে। আমি পাব দ্বিগুণ টাকাই!'

সামনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। উচ্চকণ্ঠে সে বলে উঠল, 'হারাধনের দ্বীপ, হারাধনের দ্বীপ! দূরে ওই দেখা যাচ্ছে হারাধনের দ্বীপ!'

ঘ

মোটরলাঞ্চ দ্বীপের কাছে তীর পর্যন্ত গেল না, কারণ জল সেখানে অগভীর। সকলে ছোটো একখানি নৌকোয় চড়ে একে একে দ্বীপের উপরে গিয়ে নামলেন।

সামনেই অনেকখানি খোলা জমি, তার আশেপাশে জঙ্গল আর বন্য গাছপালার ভিড়। দেখলেই বোঝা যায়, জঙ্গল সাফ করে এই খোলা জমিটা প্রস্তুত করা হয়েছে। সবুজ ঘাসের আস্তরণে মোড়া জমি, কোথাও আগাছার চিহ্নটুকুও দেখা যায় না। তারই মাঝখান দিয়ে ছোটো একটি পাকা রাস্তা সিধে চলে গিয়েছে এবং রাস্তার শেষে দেখা যাচ্ছে বেশ একখানা বড়োসড়ো লাল রঙের দোতলা বাড়ি—তাকে অনায়াসেই অট্টালিকা বলে গণ্য করা চলে। একেবারে হালফ্যাশনের বাড়ি, এমন জায়গায় এরকম বাড়ি দেখলে মনে জাগে রীতিমতো বিস্ময়!

স্বপ্না খুব খুশিমুখে বলে উঠল, 'বাঃ, কী সুন্দর বাড়িখানি! ঠিক যেন ছবির মতো!'

ডাক্তার বোসের মনে হল বাড়িখানা সুন্দর হলেও কেমন যেন রহস্যময়। অসাধারণ স্থানে অসাধারণ বাড়ি এবং অসাধারণ কোনো-কিছুই ডাক্তার বোস পছন্দ করেন না।

সৌদামিনী মনে মনে বললেন, 'এই নির্জন দ্বীপে লোকালয় থেকে বহুদূরে এসে বাড়িখানাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন হানাবাড়ি! কোথাও জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই! এখানে কি মানুষ থাকতে পারে?'

সকলে রাস্তা ধরে খোলা জমি পার হয়ে বাড়ির সামনে এসে পড়ল। তারপর গাড়িবারান্দার তলা দিয়ে বাড়ির সদরের কাছে আসতেই দেখা গেল, সেখানে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মূর্তি। বয়স তার ষাটের কাছাকাছি, মুখ সম্পূর্ণ ভাবহীন। জামাকাপড় অত্যন্ত সাদাসিধে।

চন্দ্রবাবু এগিয়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে শুধোলেন, 'কে তুমি?'

লোকটি বললে, 'আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীনিত্যানন্দ দাস। আমার উপরে হুকুম আছে, আপনাদের সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে।'

—'কে তোমাকে হুকুম দিয়েছে?'

—'আমাদের মনিব।'

—'তাঁর নাম কী?'

—'জানি না।'

মহেন্দ্র তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিত্যানন্দের দিকে তাকিয়ে বললে, 'মনিবের নাম জানো না।'

স্বপ্না বললে, 'তাঁর নাম বোধহয় কাননকুন্তলা দেবী?'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'কিন্তু আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন চারুশীলা দেবী।'

নিত্যানন্দ বললে, 'আপনারা যাঁদের কথা বলছেন, তাঁদের নাম আমি শুনিনি। খালি এইটুকুই জানি যে, আমার মনিবের কথামতো অ্যাটর্নি বিজনবাবু আমাকে আর আমার স্ত্রীকে এখানকার কাজে নিযুক্ত করেছেন। আর এটাও আমাকে জানানো হয়েছিল, আজ সকালে আপনারা সবাই এখানে এসে পৌঁছবেন।'

মেজর সেন বললেন, 'তোমাদের মনিব ট্রেন ফেল করে আজ আমাদের সঙ্গে আসতে পারেননি। খুব সম্ভব তিনি কালকেই এসে পড়বেন। কিন্তু আপাতত আমরা কী করব? কে কোথায় থাকব? আহারাদির ব্যবস্থা কী হবে?'

ঠিক সেই সময়ে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে একটি যুবক বললে, 'কারুকে কোনোই দুশ্চিন্তা করতে হবে না! এর মধ্যেই বাড়ির সব জায়গায় আমি টহল দিয়ে এসেছি। মস্ত বাড়ি—একসঙ্গে পঞ্চাশ-ষাট জন মানুষ এখানে বাস করতে পারে।

প্রকাণ্ড ভাঁড়ার ঘর, রাশি রাশি খাবার জিনিস জমা করা আছে। রান্নাঘরে নিত্যানন্দের স্ত্রী সত্যবালা আগুন দিয়েছে তিনটে উনুনে। সুতরাং মাভৈঃ!'

সকলেই যুবককে দেখেই চিনতে পারলে, ভোরবেলায় মোটরবোটের চালকের আসনে বসে ছিল এই মূর্তিই।

মহেন্দ্র শুধোলে, 'আপনিই কি মনোতোষবাবু?'

যুবক দুই ভুরু নাচিয়ে বললে, 'আরে, বাহবা কী বাহবা! এই মধ্যেই আমার নাম পর্যন্ত আদায় করে ফেলেছেন দেখছি! আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই, পিতৃদেব ওই নামই রেখেছিলেন বটে!'

সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে সব কথা নীরবে শুনছিল অমলেন্দু। এইবারে সে অগ্রসর হয়ে বললে, 'নিত্যানন্দ, তোমার মনিবের বদলে তুমিই যখন আছ, আগে

আমাদের সকলের মাথা গোঁজবার জায়গা ঠিক করে দাও দেখি! তারপর হাতমুখ ধুয়ে আমরা সকলেই চা-পান করতে চাই। কোনো অসুবিধা হবে না তো?'

নিত্যানন্দ বললে, 'কিছু না, পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা প্রস্তুত হয়ে যাবে। আসুন আমার সঙ্গে আসুন।'

সকলে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে।

নিত্যানন্দ গলা তুলে বললে, 'সত্যবালা, মেয়েদের ঘর-দুটো দেখিয়ে দাও।' তারপর ফিরে সৌদামিনী ও স্বপ্নার উদ্দেশ্যে বললে, 'আপনারা আগে অনুগ্রহ করে উপরে যান। ওইদিকে গেলেই সিঁড়ি পাবেন।' বলে একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

স্বপ্না কার্পেটপাতা সুদৃশ্য পালিশ করা কাঠের সোপানশ্রেণি দিয়ে উপরে উঠে দেখতে পেলে, একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

সে বললে, 'আমার সঙ্গে আসুন।'

—'তোমার নামই সত্যবালা?'

—'হ্যাঁ। বাছা।'

তার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে স্বপ্না একটি ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকল। চমৎকার সাজানো-গুছানো ঘর। ধবধপে বিছানা-পাতা খাট, ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার, কৌচ ও সোফা প্রভৃতি কোনো আসবাবেরই অভাব নেই। মার্বেলপাথরের মেঝে, মাঝখানে নরম কার্পেট বিছানো।

সত্যবালা বললে, 'ওই দরজা খুললে স্নানের ঘর পাবেন। আর যখনই আমাকে দরকার হবে, ঘণ্টা বাজালেই আমি শুনতে পাব। আপনার আর কিছু দরকার আছে?'

—'আমার সুটকেস এই ঘরে পাঠিয়ে দিতে হবে।'

—'এখনই দিচ্ছি', বলেই সত্যবালা প্রস্থানোদ্যত হল।

স্বপ্না বললে, 'দাঁড়াও, তোমরা স্বামী-স্ত্রী ছাড়া বাড়িতে আর-কেউ আছে?'

—'না।'

—'আমরা আট জন লোক। তোমরা দুজনে আমাদের সামলাতে পারব কি?'

—'বোধহয় পারব। আর আমাদের মনিব তো দু-এক দিনের মধ্যেই এসে পড়বেন। শুনলুম, তাঁরও সঙ্গে নিশ্চয়ই দাস-দাসীরা আসবে।' এই বলে সত্যবালা ঘরের ভিতর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

স্বপ্না একবার জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ঘন অরণ্যে আচ্ছন্ন দ্বীপ, তার ওপারে দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের অসীমতা। চারিদিকে একান্ত স্তব্ধতার বীণায় বেজে উঠছে মাঝে মাঝে গানের পাখিদের সুর। তারপরে ঘরের ভিতরে কিছুক্ষণ ধরে সে পায়চারি করলে, মুখে তার কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন ভাব। সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে কেমন খাপছাড়া বলে মনে হল। গৃহকর্তা অনুপস্থিত, অতিথিদেরও যেন কেমন ছাড়া ছাড়া ভাব! সবই অদ্ভুত!

হঠাৎ তার চোখ পড়ল দেওয়ালের এক জায়গায়। ড্রেসিং টেবিলের উপরে একখানি আয়না, ঠিক তার উপরেই কাচ ও ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো একখানা কাগজের উপরে লেখা রয়েছে এই পদ্যটি—

'হারাধনের দশটি ছেলে ঘোরে পাড়াময়,
একটি কোথা হারিয়ে গেল, রইল বাকি নয়।
হারাধনের নয়টি ছেলে কাটতে গেল কাঠ,
একটি কেটে দুখান হল, রইল বাকি আট।
হারাধনের আটটি ছেলে বসল খেতে ভাত,
একটির পেট ফেটে গেল, রইল বাকি সাত।
হারাধনের সাতটি ছেলে গেল জলাশয়,
একটি সেথা ডুবে মল, রইল বাকি ছয়।
হারাধনের ছয়টি ছেলে চড়তে গেল গাছ,
একটি মল পিছলে পড়ে, রইল বাকি পাঁচ।
হারাধনের পাঁচটি ছেলে গেল বনের ধার,
একটি গেল বাঘের পেটে, রইল বাকি চার।
হারাধনের চারটি ছেলে নাচে ধিন ধিন,
একটি মল আছাড় খেয়ে রইল বাকি তিন।
হারাধনের তিনটি ছেলে ধরতে গেল রুই,
একটি খেলে বোয়াল মাছে, রইল বাকি দুই।
হারাধনের দুইটি ছেলে মারতে গেল ভেক,
একটি মল সাপের বিষে, রইল বাকি এক।
হারাধনের একটি ছেলে কাঁদে ভেউ ভেউ,
মনের দুঃখে বনে গেল, রইল না আর কেউ!'

স্বপ্না বললে, 'আরে, এ-ছড়াটা আমি তো ছেলেবেলায় পড়েছি! কিন্তু এই ছেলেভুলানো ছড়াটা এখানে ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে কেন?'

জিজ্ঞাসার কোনো জবাব পাওয়া গেল না। স্বপ্না আবার জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, সামনে দেখা যাচ্ছে ওই সমুদ্র—অসীম সমুদ্র! ওদিকে তাকালেই তার মনের পটে ফুটে ওঠে একটা দুঃস্বপ্নের দৃশ্য! সমুদ্রকে এখন দেখাচ্ছে বেশ শান্ত, কিন্তু সময়ে সে কী অধীর আর নিষ্ঠুর হয়েও ওঠে! সে তোমাকে টেনে নিয়ে যায় অতলে, তারপর মৃত্যুঘুমে ঘুমিয়ে পড়ে তরুণ ও জীবন্ত দেহ। মানুষ ডুবে যায়, তলিয়ে যায়, হারিয়ে যায় চিরকালের মতো।

স্বপ্না শিউরে উঠে বললে, 'না, না, আর সে কথা স্মরণ করব না, মুছে যাক অতীতের স্মৃতি—জেগে থাক বর্তমান।'

৬

ডাক্তার বোস বাড়ি থেকে বেরিয়ে আবার গিয়ে দাঁড়ালেন জলের ধারে।

লাঞ্চখানা তখন একটু তফাতে নোঙর করা ছিল। ইব্রাহিম ডাঙা থেকে আবার নৌকোয় উঠতে যাচ্ছে, ডাক্তার বোস জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি বাড়ির ভেতরে আসবে না?'

ইব্রাহিম বললে, 'না হুজুর, আমাকে আবার এখনই ফিরে যেতে হবে।'

—'কেন?'

—'মনিব যদি পোর্ট ক্যানিং-এ এসে পৌঁছোন, তাঁকে তো আবার এখানে নিয়ে আসতে হবে?'

—'মনোতোষবাবুর মোটরবোটখানা কোথায় গেল?'

—'তাঁর ড্রাইভার সেখানা নিয়ে চলে গেছে। সে ফিরে আসবে আবার এক মাস পরে।'

—'এক মাস পরে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। এই রকম হুকুমই সে পেয়েছে।'

ডাক্তার বোস অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, তাহলে মনোতোষবাবু এই দ্বীপে কিছুকালের জন্যে কায়েমি হয়ে বাস করতে চান? ভালো! কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব হবে না। তাহলে কলকাতায় রোগীমহলে হাহাকার পড়ে যাবে, আর আমারও ব্যাঙ্কের খাতায় জমার ঘরে বিরাজ করবে দারিদ্র্য। পায়ে পায়ে তিনি

আবার বাড়ির দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। খানিক পরেই শব্দ শুনেই বুঝতে পারলেন, মোটরলাঞ্চ আবার ছেড়ে দিলে। ডাক্তার বোসের মনে হল দেশের মাটির সঙ্গে যে শৃঙ্খলের যোগ ছিল, আবার তা ছিন্ন হয়ে গেল। এখন এই দ্বীপময় জগতে তাঁরা ছাড়া আর কোনো প্রাণীর সাড়াশব্দ পাওয়া যাবে না।

বাড়ির সামনের চাতালে ইজিচেয়ারের উপরে অর্ধশয়ান হয়ে আছেন চন্দ্রকান্ত চৌধুরি। ওই মিশরের মমির মতো শুষ্ক শীর্ণ দেহ, ওই কচ্ছপের মতো গলদেশ, ওই ব্যাঙের মতো মুখ, ওই কুঁজোর মতো সামনে দুমড়ে-পড়া দেহ আগে তিনি কোথায় দেখেছিলেন, এতক্ষণ স্মরণে আসছিল না। এইবারে মনে পড়েছে! উনি হচ্ছেন হাইকোর্টের জজ চন্দ্রকান্ত। তাঁকে একবার ওর কোর্টে গিয়ে সাক্ষ্য দিতে হয়েছিল। অতিশয় হৃদয়হীন—লোকে ওঁর নাম রেখেছিল ফাঁসুড়ে জজ। প্রায় পৃথিবীর বাইরে এসে এমন জায়গায় আজ তাঁর সঙ্গে দেখা!

চ

চন্দ্রবাবু আপন মনে বললেন, 'ডাক্তার বোসকে দেখেই চিনেছি। লোকটা একবার আমার কোর্টে সাক্ষ্য দিতে এসেছিল। খুব সচেতন সাক্ষী, নির্ভুল উত্তর দিতে পারে। কিন্তু রাবিশ, ডাক্তার মাত্রই হচ্ছে নির্বোধ।

এ বাড়িতে আমরা সবাই পুরুষ, মেয়ে আছে কেবল দুজন। তাদের একজন হচ্ছে স্বল্পবাক, প্রাচীনা; আর-একজন একালের হাল-ফ্যাশনের মেয়ে। না, আরও একটি স্ত্রীলোক আছে, ওই সত্যবালা। অদ্ভুত জীব, সর্বদাই যেন ভয়ে তটস্থ।'

ছ

গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে স্নানঘরে বসে স্নান করছে মনোতোষ। স্নান করতে ভারী ভালো লাগছিল তার। ধনীর ছেলে, যাপন করছে উৎসবময় জীবন, চন্দ্রালোক ছাড়া অন্ধকারের কোনো ধারই ধারে না!

হঠাৎ সে বলে উঠল, 'অবশেষে সামুদ্রিক দ্বীপে! এর মধ্যেই পৃথিবীকে আমি সব দিক দিয়ে উপভোগ করে নিয়েছি, কিন্তু এ অভিজ্ঞতা আমার পক্ষে নূতন! মোটরবোটকে আসতে বলে দিয়েছি এক মাস পরে। তার আগে এখান থেকে আমি ফেরবার নামও মুখে আনব না।'

জ

মহেন্দ্র নিজের ঘরে একখানা চেয়ারে বসে ভাবছে, 'আমার অভিনয়টা ঠিক হচ্ছে তো? মনে হয়, কেউই যেন আমাকে দেখে পছন্দ করছে না। কিন্তু কেবল আমি কেন, সকলেই সন্দেহ-ভরা চোখে তাকাচ্ছে সকলের দিকে। তবে আমি যে আসলে কে, সেটা বোধহয় কেউ ঠাহর করতে পারেনি। যাহোক আমার কাজ করতে হবে খুব সাবধানে।'

তারও ঘরের দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে সেই ছেলেভুলানো ছড়াটি। সেই দিকে তাকিয়ে তার চোখ উঠল চমকে!

এর মানে কী?

ঝ

চেয়ারের উপর উপবিষ্ট মেজর সেনের দুই ভুরু সঙ্কুচিত।

—'রাবিশ! সবটাই যেন আজব কারখানা! অস্বাভাবিক! অনুপস্থিত গৃহকর্তার বাড়িতে উপস্থিত হয়েছে অতিথিরা! গৃহকর্তা যে কে, তারও হদিস কেউ দিতে পারছে না।

এ-রকমটা আমি আশা করিনি। যে-কোনো একটা ছুতো তুলে এখান থেকে সরে পড়তে হবে কোনোরকমে। কিন্তু এই ঘরে বসেই তো দেখতে পেয়েছি, মোটরবোট আর মোটরলাঞ্চ দ্বীপ ছেড়ে আবার চলে গিয়েছে। এখন ইচ্ছা করলেও আর পালাবার জো নেই। চারিদিকে সমুদ্র! আমরা বন্দি!

আর ওই অমলেন্দু লোকটা কে? নিশ্চয়ই ভালো লোক নয়। দেখলেই সন্দেহ হয়!'

ঞ

অমলেন্দু ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল পা টিপে টিপে। তাকে দেখলেই মনে হয়, শিকারের সন্ধান পেয়ে একটা চিতে বাঘ যেন চলছে-ফিরছে অত্যন্ত সন্তর্পণে!

হঠাৎ মৃদু হেসে মনে মনে সে বললে, 'অ্যাটর্নি বিজন বোসের মুখে শুনলুম, আমার মেয়াদ এখানে এক সপ্তাহের বেশি নয়।

উত্তম! আমি পরিপূর্ণমাত্রায় উপভোগ করব সেই এক সপ্তাহ!'

ট

সৌদামিনী সোজা হয়ে মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে আছেন ঘরের মাঝখানে। তাঁর মুখে বিরক্তির চিহ্ন, তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ঘরের দেওয়ালে টাঙানো সেই ছেলে-ভুলানো ছড়ার দিকে।

শুষ্ক কণ্ঠে ধীরে ধীরে তিনি বললেন, 'বোধহয় আমি কোনো পাগলাগারদে এসে পড়েছি!'

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

ক

রাত্রের আহারের জায়গা হল বৈঠকখানার পাশের ঘরে।

খাবারের আয়োজন হয়েছিল প্রায় ভূরিভোজনের মতো। নিত্যানন্দ যেন একাই অনেকজন। তার পরিবেশনে সবাই পরিতুষ্ট।

আহারাদির পর সকলেই আবার বৈঠকখানায় এসে বসল।

ভোজনের পর চন্দ্রবাবুর খিটখিটে মেজাজ কতকটা যেন প্রসন্ন হয়ে উঠল। তিনি কোনো কোনো প্রসঙ্গ তুললেন, ডাক্তার বোস ও মেজর সেন তাঁর কথা শুনতে লাগলেন।

স্বপ্না বললে, 'মহেন্দ্রবাবু, আপনি তো সিংহলপ্রবাসী শুনলুম। ওখানকার গল্প বলুন।'

মহেন্দ্র তার কৌতূহল নিবারণের চেষ্টায় নিযুক্ত হল।

অমলেন্দু তার চেয়ারখানা টেনে নিয়ে গিয়ে দেওয়াল ঘেঁষে বসল। তারপর তার সতর্ক দৃষ্টি ফিরতে লাগল এর-ওর-তার মুখের উপর।

সৌদামিনী চেয়ারের উপরে কাঠের পুতুলের মতো স্থির। তিনি সকলের কথা শুনতে লাগলেন, কিন্তু নিজে একটিও বাক্য উচ্চারণ করলেন না।

মনোতোষ চেঁচিয়ে বললে, 'নিত্যানন্দ, এখানে আইসক্রিম সোডা থাকে তো আমায় একটা এনে দাও।'

এখানকার কথাবার্তা তার ভালো লাগছিল না। সে উঠে জানলার কাছে একটা টেবিলের সামনে গিয়ে বসে পড়ল।

নিত্যানন্দ একটা গেলাসে আইসক্রিম সোডা ভরে তার সামনে এনে রাখলে।

মনোতোষ বললে, 'আইসক্রিমের আর-একটা বোতল আর চাবি টেবিলের উপর রেখে দাও। দু-গ্লাস না খেলে আমার তেষ্টা মিটবে না।'

গেলাসে বার-দুয়েক চুমুক দিয়ে টেবিলের দিকে তাকিয়ে মনোতোষ সচমকে বলে উঠল, 'আরে এ কী ব্যাপার!'

মনোতোষের কথা শুনে সকলেই মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে দেখলে।

অমলেন্দু সবিস্ময়ে বললে, 'টেবিলের উপরে সাজানো ওই মূর্তিগুলো কীসের? দশ দশটা মূর্তি!'

চন্দ্রবাবু ও সৌদামিনী ছাড়া আর সবাই উঠে সেই টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

মহেন্দ্র কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললে, 'এগুলো হচ্ছে সেই ছেলেভুলোনো ছড়ার মূর্তি। হারাধনের দশটি ছেলে!'

স্বপ্না বললে, 'এ তো ভারী মজার ব্যাপার দেখছি! ওই বাঁধানো ছড়াটা আমার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আছে!'

তারপর অন্য সকলেও বললে সেই একই কথা। সকলেরই ঘরে টাঙানো আছে ওই ছড়াটা।

চন্দ্রবাবু মুখ বিকৃত করে বললেন, 'একেবারে ছেলেমানুষি ব্যাপার।'

সকলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। নিস্তব্ধ রাত্রে বাহির থেকে ভেসে আসতে লাগল সমুদ্রের তরঙ্গ-কোলাহল।

সৌদামিনী বললেন, 'সমুদ্রের সাড়া রাত্রে শোনায় চমৎকার।'

স্বপ্না তিক্তকণ্ঠে বললে, 'সমুদ্রের শব্দকে আমি ঘৃণা করি!'

সৌদামিনী একটু বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

তারপর আবার স্তব্ধতা। তারপর সমুদ্রের কোলাহল ডুবিয়ে ঘরের ভিতরে আচম্বিতে জাগ্রত হল আর-এক অদ্ভুত কণ্ঠস্বর! সে যেন অমানুষিক কণ্ঠস্বর

—'ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ! সকলে চুপ করে আমার কথা শুনুন!'

প্রত্যেকেই অত্যন্ত চমকে উঠল। সকলে চারিদিকে তাকাতে লাগল—চার

দেওয়ালের দিকে, পরস্পরের মুখের দিকে। কে কথা কইলে, কোথা থেকে আসছে এই আশ্চর্য কণ্ঠস্বর?

সেই অজানা কণ্ঠে স্পষ্ট, উচ্চস্বরে শোনা গেল

'তোমাদের বিরুদ্ধে এই হচ্ছে অভিযোগ

'ডাক্তার ভবনাথ বসু। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ১৪ই মার্চ তারিখে তুমি লতিকা রায়চৌধুরিকে হত্যা করেছ।

'সৌদামিনী দেবী, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ৫ই নভেম্বর তারিখে তোমার জন্যে অমলাদেবী মারা পড়েছেন।

'মহেন্দ্রকুমার মিত্র, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ১০ই অক্টোবর তারিখে জ্যোতির্ময় বসুর মৃত্যু হয়েছে তোমার জন্যেই।

'স্বপ্না দেবী, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ১১ই আগস্ট তারিখে কুমার নরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র নীরেন্দ্রনারায়ণকে তুমি হত্যা করেছ।

'অমলেন্দু মল্লিক, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসের কোনো এক তারিখে সিংহলের বিজন অরণ্যে ২১ জন মানুষের মৃত্যুর জন্যে তুমিই দায়ী।

'মেজর মন্মথমোহন সেন, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি তারিখে তুমি তোমার স্ত্রীর বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ পালকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিয়েছ।

'মনোতোষ চৌধুরি, গত বৎসরের নভেম্বর মাসের ১৫ই তারিখে তুমি সুকুমার ও তার ভগ্নী অতসীর মৃত্যুর জন্যে দায়ী।

'নিত্যানন্দ দাস ও সত্যবালা দাসী, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ই মে তারিখে নিস্তারিণী দেবী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন তোমাদের জন্যেই।

'চন্দ্রকান্ত চৌধুরি, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জুন তারিখে বরেন্দ্রনাথ বসুকে তুমি মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিয়েছ।

'আজ তোমরা এখানে বন্দি। নিজেদের স্বপক্ষে তোমাদের কিছু বলবার আছে?'

খ

স্তব্ধ হল কণ্ঠস্বর।

কিছুক্ষণ সবাই স্তম্ভিত ও নির্বাক। তারপরই হুড়মুড় করে কতকগুলো কাচের জিনিস ভাঙার শব্দ হল।

নিত্যানন্দ একখানা ট্রের উপরে কয়েকটা ভরতি কফির পেয়ালা সাজিয়ে নিয়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেছিল, হঠাৎ তার হাত ফসকে ট্রেখানা সশব্দে পড়ে গেল মেঝের উপরে।

এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘরের বাহির থেকে শোনা গেল একটু উচ্চ আর্তনাদ ও ধপাস করে একটা দেহ পতনের শব্দ।

সর্বপ্রথম সাড়া হল অমলেন্দুর। সে এক লাফে এগিয়ে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বাহিরে দরজার ঠিক সামনেই অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে সত্যবালার দেহ।

অমলেন্দু ডাকলে, 'মনোতোষবাবু!'

মনোতোষ তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটে গেল এবং দুইজনে ধরাধরি করে সত্যবালার দেহ বৈঠকখানায় নিয়ে এসে একখানা সোফার উপর শুইয়ে দিলে।

ডাক্তার বোস সত্যবালাকে খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে বললেন, 'কোনো ভয় নেই, অজ্ঞান হয়ে গেছে, এখুনি জ্ঞান হবে।'

স্বপ্না চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ও কে কথা কইলে? কোথায় সে?'

মেজর সেন বললেন, 'এ সব কী ব্যাপার? কেউ কি আমাদের সঙ্গে কৌতুক করতে চায়?' তাঁর হাত ঠকঠক করে কাঁপছে। তাঁকে দেখলে মনে হয়, তাঁর বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গিয়েছে!

মহেন্দ্রর সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠেছিল, রুমাল বার করে সে মুখ মুছতে লাগল।

কেবল চন্দ্রবাবু ও সৌদামিনী এমন স্থির ভাবে বসেছিলেন, যেন এখানে অসাধারণ কোনো কিছুই ঘটেনি।

অমলেন্দু বললে, 'মনে হচ্ছে, এই ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়েই এইমাত্র ওই কথাগুলো কেউ উচ্চারণ করেছে।'

স্বপ্না বললে, 'কিন্তু কে সে? নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে কেউ নয়?'

অমলেন্দুর চোখ একবার ঘরের খোলা জানালার দিকে আকৃষ্ট হল। তারপর সে মাথা নাড়লে নিশ্চিতভাবে, 'না—ওখান থেকে কেউ কথা বলেনি।'

ঘরের আর-একদিকে আর-একটা দরজা দিয়ে পাশের অন্য-একটা ঘরের ভিতরে যাওয়া যায়। অমলেন্দু ধাক্কা মেরে সেই দরজাটা খুলে ফেলে ভিতরে ঢুকেই বলে উঠল, 'ও, এইবারে বোঝা গেছে।'

সকলে তাড়াতাড়ি উঠে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কেবল সৌদামিনী সিধে

হয়ে স্থিরভাবে বসে রইলেন নিজের চেয়ারের উপরে। ও-ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড় করানো আছে একটা টেবিল এবং সেই টেবিলের উপরে রয়েছে প্রকাণ্ড একটা চোঙায়ালা সেকেলে গ্রামোফোন। চোঙার মুখটা স্পর্শ করে আছে বৈঠকখানা ঘরের দেওয়ালকে।

অমলেন্দু চোঙাটা ঠেলে সরিয়ে দিতেই দেখা গেল, দেওয়ালের উপরে রয়েছে ছোটো ছোটো তিন-চারটে ছিদ্র।

অমলেন্দু গ্রামোফোনের 'সাউন্ড বক্স'টা রেকর্ডের যথাস্থানে স্থাপন করে আবার কল চালিয়ে দিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার শোনা গেল—'ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ! সকলে চুপ করে আমার কথা শুনুন!'

স্বপ্না চেঁচিয়ে উঠল, 'বন্ধ করে দিন—মেশিন বন্ধ করে দিন! এ হচ্ছে ভয়ানক!'

অমলেন্দু মেশিন বন্ধ করে দিল।

ডাক্তার বোস আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'এ হচ্ছে একটা যাচ্ছেতাই নির্দয় ঠাট্টা! অত্যন্ত অপমানকর!'

পরিষ্কার স্বরে চন্দ্রবাবু, 'আপনি তাহলে একে ঠাট্টা বলেই মনে করছেন!'

ডাক্তার ফ্যালফ্যাল করে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তা ছাড়া আর কী মনে করতে পারি?'

চিবুক চুলকোতে চুলকোতে চন্দ্রবাবু শান্তকণ্ঠে বললেন, 'আপাতত আমি কোনো মতামত প্রকাশ করতে চাই না।'

মনোতোষ বললে, 'কিন্তু আপনারা একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন। এই মেশিনটা চালিয়ে দিয়েছে কে?'

চন্দ্রবাবু বললে, 'হ্যাঁ, এইবারে সেই কথা নিয়েই আলোচনা করতে হবে। চলুন, আবার বৈঠকখানায় গিয়ে বসি।'

সত্যবালার তখন জ্ঞান হয়েছে। সে ক্রন্দন করছিল অস্ফুট স্বরে। তার পাশে গিয়ে একখানা চেয়ারের উপরে বসেছিলেন সৌদামিনী।

নিত্যানন্দ কাছে গিয়ে সৌদামিনীকে সম্বোধন করে বললে, 'আপনি দয়া করে সরে বসুন। আমাকে ওর সঙ্গে কথা কইতে দিন। সত্য, তুমি কাঁদছ কেন? চুপ করো, শান্ত হও।'

সত্যবালা উদ্‌ভ্রান্ত চোখে সকলকার দিকে তাকাতে লাগল। ডাক্তার সান্ত্বনাকণ্ঠে বললেন, 'কেঁদো না সত্যবালা, তোমার আর কোনো ভয় নেই।'

সত্যবালা বললে, 'আমি কি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম?'

—'হ্যাঁ।'

পাণ্ডুমুখে কম্পিতস্বরে সে বললে, 'ওই কণ্ঠস্বর—ওই ভয়ানক কণ্ঠস্বর—ঠিক যেন বিচারক রায় দিচ্ছেন আসামিদের প্রতি—'

নিত্যানন্দ বললে, 'হ্যাঁ, আমিও এমন চমকে গিয়েছিলুম যে আমার হাত থেকে ট্রেখানা পড়ে গেল। ওসব হচ্ছে মিথ্যাকথা—একেবারে বাজে মিথ্যাকথা!'

চন্দ্রবাবু দু-এক বার কেশে নিজের গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, 'গ্রামোফোনের মেশিনটা চালিয়ে দিয়েছিল কে? তুমিই কি?'

নিত্যানন্দ চিৎকার করে বলে উঠল, 'ও রেকর্ডে কী আছে আমি তা জানতুম না! ভগবানের দিব্য, আমি কিছুই জানতুম না! জানলে পরে আমি কিছুতেই এ-কাজ করতুম না!'

চন্দ্রবাবু শুষ্ককণ্ঠে বললেন, 'তোমার কথা আমি সত্য বলেই মেনে নিচ্ছি। কিন্তু মেশিনটা তুমি চালিয়ে দিয়েছিলে কেন?'

—'আমি মনিবের হুকুম তামিল করতে বাধ্য।'

—'কে তোমার মনিব?'

—'কে যে আমার মনিব তাও আমি জানি না। তবে অ্যাটর্নি বিজনবাবুর মুখেই আমি তাঁর হুকুম শুনেছি।'

—'হুকুমটা কী, নিত্যানন্দ?'

—'আমাকে ওই রেকর্ডখানা মেশিনের উপরে রাখতে হবে। তারপর রাত্রের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে আমি যখন কফির ট্রে হাতে করে বৈঠকখানায় আসব, আমার স্ত্রী তখন মেশিনটা চালিয়ে দেবে।'

অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে চন্দ্রবাবু বললেন, 'আশ্চর্য কথা!'

নিত্যানন্দ আবার চেঁচিয়ে বললে, 'কিন্তু আশ্চর্য হলেও আমি সত্য কথাই বলছি। ওই রেকর্ডের উপরে একটা নামও লেখা আছে। আমি ভেবেছিলুম, ওখানা কোনো গানের রেকর্ড।'

অমলেন্দুর দিকে তাকিয়ে চন্দ্রবাবু বললেন, 'ওই রেকর্ডের উপরে কোনো নাম লেখা আছে নাকি?'

অমলেন্দু ম্লান হাসি হেসে বললে, 'আছে, মশাই, আছে। রেকর্ডের উপরে লেখা আছে—'সর্বশেষের গান'!'

গ

মেজর সেন উত্ত্যক্ত কণ্ঠে বললেন, 'সমস্ত ব্যাপারটাই হচ্ছে রাবিশ! সকলের নামেই এইরকম বাজে অভিযোগ করা! কে এই বাড়ির মালিক? অ্যাটর্নি বিজন বোসের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?'

সৌদামিনী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, কে এই বাড়ির মালিক?'

জজ চন্দ্রকান্তবাবু, চিরকালই হুকুম দেওয়া ছিল তাঁর পেশা। সেই রকম হুকুমের স্বরেই তিনি বললেন, 'হুঁ, এইবারে ওই কথাটাই জানা দরকার। নিত্যানন্দ, তুমি আগে তোমার স্ত্রীকে এ ঘর থেকে নিয়ে যাও। তারপর আবার ফিরে এসো।'

নিত্যানন্দ বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' তারপর তার কাঁধে ভর করে সত্যবালা সেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সকলেরই কণ্ঠস্বর শুকিয়ে গিয়েছিল। মনোতোষ বললে, 'আমার তেষ্টা পেয়েছে। আপনারাও কিছু পান করবেন নাকি?'

সবাই বললে, 'হ্যাঁ।'

মনোতোষ বললে, 'পাশের ঘরে একটা সেলফের উপরে আমি অনেকগুলো সোডা-লেমোনেডের সাজানো বোতল দেখে এসেছি। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনই নিয়ে আসছি।'

নিত্যানন্দ আবার ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল।

চন্দ্রবাবু বললেন, 'তা হলে নিত্যানন্দ, এ বাড়ির মালিক কে, তুমি তা জানো না?'

—'আজ্ঞে না। আমি তাঁকে দেখিওনি, তাঁর নামও শুনিনি। আমাকে নিযুক্ত করেছেন অ্যাটর্নি বিজনবাবু।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'অ্যাটর্নি বিজন বসু? হুঁ, ও নাম আমার পরিচিত। তারপর নিত্যানন্দ, তোমার আর কী বক্তব্য আছে?'

—'আপনারা আসবার দু-দিন আগে আমরা দুজনে এখানে এসেছি। দেখলুম, সাজানো-গুছানো বাড়ি, ভাঁড়ার ঘর খাবারে ভরতি। কোথাও কিছুরই অভাব নেই।'

—'তারপর?'

—'তারপর আর বলবার কথা বিশেষ কিছুই নেই। তারপর আমি একখানা চিঠি পাই। তাতেই লেখা ছিল, আমাকে কী কী করতে হবে।'

—'সে চিঠিখানা তোমার কাছে আছে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। এই নিন।' নিত্যানন্দ পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে চন্দ্রবাবুর হাতে দিলে।

চন্দ্রবাবু চিঠিখানার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চিঠিখানা দেখছি টাইপ করা। লেখকের ঠিকানা হচ্ছে কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেল।'

মহেন্দ্র টপ করে এগিয়ে এসে চিঠিখানা টেনে নিয়ে বললে, 'আমাকে একবার চিঠিখানা দেখতে দিন।' তারপর কাগজখানার উপরে দৃষ্টি নিবন্ধ করে মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে বললে, 'আন্ডারউড টাইপরাইটার! নতুন যন্ত্র—কোনো টাইপ ক্ষয়ে যায়নি। সাধারণ টাইপ করার কাগজ। এর ভিতর থেকে বিশেষ কিছু আবিষ্কার করা চলবে না। হয়তো আঙুলের ছাপ পাওয়া যেতে পারে কিন্তু পাওয়া যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

চন্দ্রবাবু হঠাৎ অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে মহেন্দ্রের দিকে করলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'আশ্চর্য, আপনার নাম তো এখনও আমরা জানতে পারিনি?'

মহেন্দ্র থতমত খেয়ে একটু থেমে বললে, 'আমার নাম? আমার নাম নরেন্দ্রনাথ লাহিড়ি।'

চন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন, 'এইমাত্র গ্রামোফোনের রেকর্ডের সাহায্যে আমাদের সকলকার নামে কোনো ব্যক্তি গুরুতর অভিযোগ করেছে। নরেনবাবু, আপনি ছাড়া অভিযোগ হয়েছে আর-সকলের বিরুদ্ধেই। না, ঠিক সকলের বিরুদ্ধে নয়, অভিযুক্তদের মধ্যে আছেন মহেন্দ্রকুমার মিত্র নামে জনৈক ব্যক্তি। তিনি কে? তিনি তো এখানে উপস্থিত নেই!'

মহেন্দ্র নাচারভাবে বললে, 'দেখছি, আত্মপ্রকাশ করা ছাড়া আমার পক্ষে আর কোনো উপায় নেই। চন্দ্রবাবু, আমার নাম নরেন্দ্রনাথ লাহিড়ি নয়।'

—'তা হলে আপনারই নাম কি মহেন্দ্রকুমার মিত্র?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

অমলেন্দু তপ্তকণ্ঠে বললে, 'আপনি কেবল নাম লুকিয়ে এখানে আসেননি।

মিথ্যা কথা বলতেও আপনার বাধে না। আপনি নিজেকে সিংহলপ্রবাসী বলে জানাতে চান। সিংহলে আমি অনেকবার গিয়েছি। একটু আগেই আপনার মুখে সিংহলের যে-সব গল্প শুনছিলুম, সেখানে গেলে নিশ্চয়ই আপনি ওরকম বাজে গল্প বলতে পারতেন না। কে আপনি?'

সকলের দৃষ্টি গেল মহেন্দ্রর দিকে—ক্রুদ্ধ, সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি।

মনোতোষ এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল তার সামনে, তার দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ। খাপ্পা হয়ে সে বললে, 'কে তুমি, নাম আর পরিচয় লুকিয়ে আমাদের দলে এসে যোগ দিয়েছ?'

মহেন্দ্র কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হল না, শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'আপনারা সকলেই আমাকে ভুল বুঝেছেন দেখছি। আমার পরিচয়ও আমি দিতে পারি আর তার প্রমাণও আমি দেখাতে পারি। আমি আগে ছিলুম পুলিশের গোয়েন্দা-বিভাগে, এখনও 'প্রাইভেট ডিটেকটিভে'র কাজ করি। কোনো ব্যক্তি এই দ্বীপে আসবার জন্যে আমাকে নিযুক্ত করেছেন।

চন্দ্রবাবু বললেন, 'কোনো ব্যক্তি মানে? কে সে?'

—'পিছনে কে আছেন আমি তা জানি না, কিন্তু আমাকে নিযুক্ত করেছেন অ্যাটর্নি বিজন বোস। তাঁরই কথামতো আমিও একজন অতিথিরূপে এখানে এসেছি। আমার কর্তব্য হচ্ছে, আপনাদের সকলেরই উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। এজন্য আমি যথেষ্ট পারিশ্রমিকও পেয়েছি।'

—'আমাদের উপরে দৃষ্টি রাখবার কারণ?'

—'কাননকুন্তলা দেবী বলে কোনো মহিলার এখানে আসবার কথা। তাঁর গায়ে নাকি থাকবে লক্ষাধিক টাকার জড়োয়া গয়না। আসলে আমাকে পাহারা দিতে হবে তাঁর জন্যেই। কিন্তু আমার কী বিশ্বাস জানেন? কাননকুন্তলা দেবী হচ্ছেন কাল্পনিক মহিলা, সুতরাং কোনোদিনই তিনি এখানে আসবেন না।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'আপনার বিশ্বাস বোধহয় ভুল নয়।'

স্বপ্না বলে উঠল, 'কিন্তু ব্যাপারটা মনে হচ্ছে যেন ডাহা পাগলামি!'

চন্দ্রবাবু ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, 'আমারও তাই মনে হয়। আমরা কোনো বিপজ্জনক পাগলের পাল্লায় পড়েছি।'

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

ক

কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা কইলে না।

তারপর চন্দ্রবাবু আবার ঘটনার সূত্র ধরে বললেন, 'এইবারে এর পরের কথা। আগে আমার নিজের বক্তব্যই বলি। প্রায় একযুগ আগে চারুশীলা দেবী নামে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার কিছু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাঁরই কাছ থেকে এক আমন্ত্রণলিপি পেয়ে আমি এখানে এসেছি। এখন আমি বেশ আন্দাজ করতে পারছি যে ওই রকম কোনো আমন্ত্রণ-লিপি বা কোনো ওজর দেখিয়ে আপনাদেরও সবাইকে এই দ্বীপে ভুলিয়ে আনা হয়েছে। যার কথায় আজ আমরা এই ফাঁদে পা দিয়েছি, নিশ্চয়ই সে আমাদের পূর্ব-জীবনের সঙ্গে পরিচিত। সেই জন্যেই সে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে সাহস করেছে।'

মেজর সেন ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'মিথ্যা অভিযোগ—যাকে বলে একেবারে বাজে ধাপ্পা!'

স্বপ্না বললে, 'এসব অভিযোগের কোনো মানেই হয় না।'

নিত্যানন্দ প্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'মিথ্যা কথা—রাবিশ মিথ্যা কথা! আমরা কেউই নিশ্চয়ই কোনো অপকর্ম করিনি।'

মনোতোষ গজরাতে গজরাতে বললে, 'যে এইসব অভিযোগ করেছে, সেই মিথ্যুকটা কী বলতে চায় আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

চন্দ্রবাবু হাত তুলে সবাইকে শান্ত হবার জন্যে ইঙ্গিত করলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, 'আমি যা বলতে চাই, তা হচ্ছে এই। আমাদের অজানা বন্ধু আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, আমি নাকি বরেন্দ্রনাথ বসুর মৃত্যুর জন্যে দায়ী। আমি তখন হাইকোর্টের জজ ছিলুম। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আমার কোর্টে বরেন্দ্রনাথ বসুকে বিচারের জন্যে আনা হয়—সে অভিযুক্ত হয়েছিল কোনো স্ত্রীলোককে হত্যা করার জন্যে। তার পক্ষে ছিলেন একজন বিখ্যাত ব্যারিস্টার, তিনি এমন সুকৌশলে তার পক্ষ সমর্থন করলেন যে জুরিরা প্রথমটা সায় দিলেন তাঁর কথাতেই। কিন্তু প্রমাণাদি দেখে আমি বেশ বুঝতে পারলুম, বরেনই হচ্ছে অপরাধী। জুরিদের শুনিয়ে সেই সব কথা আমি যখন বললুম, তাঁরা তখন আমার কথারই সমর্থন করলেন, দোষী বলেই সাব্যস্ত হল বরেন

বসু। আমি দিলুম তাকে মৃত্যুদণ্ড। সে পরে আপিল করেছিল, কিন্তু তা বাতিল হয়ে যায়। বরেন বসুর ফাঁসি হয়। আমার সম্বন্ধে এইটুকুই বলতে পারি— আমার পক্ষে গোপন করবার কিছুই নেই। আমি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি এক হত্যাকারীকেই।'

ডাক্তার বোসেরও মনে পড়ে গেল আগেকার কথা। বরেন বসুর মামলা। বিচারকের রায় শুনে সকলেই অবাক হয়ে গিয়েছিল। রায় দেবার আগে বরেনের পক্ষের ব্যারিস্টার তাঁর কাছে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিল, 'আসামি নিশ্চয়ই খালাস পাবে।' কিন্তু তার প্রাণদণ্ডের হুকুম হবার পর সে বলে, 'আসামির উপরে জজের কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে। আইনে জজ চন্দ্রকান্ত একজন পাকা লোক, এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। তিনি অবিচার করেননি বটে, কিন্তু বিচার করেছিলেন নিতান্ত নির্দয়ভাবে, সেইজন্যেই আসামি মুক্তি পেলে না।'

ডাক্তার বোস জিজ্ঞাসা করলেন, 'চন্দ্রবাবু, ওই মামলার আগে আপনি বরেন বসুকে চিনতেন?'

চন্দ্রবাবুর সরীসৃপের মতো ক্রুর দৃষ্টি ডাক্তারের মুখের উপর স্থির হয়ে রইল এক কি দুই সেকেন্ডের জন্যে। তারপর তিনি বললেন, 'না, আগে আমি তাকে চিনতুম না।'

ডাক্তার নিজের মনে মনে বললেন, লোকটা যে মিছে কথা বলছে, ওর মুখ দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে।

খ

স্বপ্না কম্পিত স্বরে বললে, 'আমারও কিছু বক্তব্য আছে। নীরেন্দ্রনারায়ণ নামে একটি নয়-দশ বছরের বালককে লালন-পালন করবার ভার ছিল আমার উপরে। একদিন তাকে নিয়ে পুরীর সমুদ্রে আমি স্নান করতে নেমেছিলুম। সেই সময়ে আমার অজান্তেই হঠাৎই সে সাঁতার কাটতে কাটতে খানিক দূর এগিয়ে যায়। পরে তাকে দেখতে পেয়ে আমিও সাঁতার কেটে তাকে ধরবার চেষ্টা করেছিলুম বটে, কিন্তু তার নাগাল ধরতে পারিনি। নীরেন ডুবে যায়। আমার কোনোই দোষ ছিল না। করোনারও তা স্বীকার করেছিলেন। তার বাবা কুমার নরেন্দ্রনারায়ণও আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেননি। তবে এতদিন পরে আমার বিরুদ্ধে এই ভয়ানক অভিযোগ আনা হয়েছে কেন? এ অন্যায়—

অত্যন্ত অন্যায়!' বলতে বলতে তার দুই চক্ষু পূর্ণ হয়ে উঠল অশ্রুজলে।

মেজর সেন তার পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে বললেন, 'কাতর হবেন না স্বপ্না দেবী! নিশ্চয় এ অভিযোগ মিথ্যা। পাগল ছাড়া আর কেউ এমন কথা বলতে পারে না। সোজা ব্যাপারকে উলটে সে দেখবার চেষ্টা করেছে বিকৃতভাবে।'

তারপরই তিনি সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, 'আমি নাকি সুরেন্দ্রনাথ পালকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিয়েছি! আমাদের পরিবারের সঙ্গে সুরেনের আলাপ ছিল বটে। সে ছিল আমার স্ত্রীর দূর-সম্পর্কীয় ভাই। কিন্তু কেন জানি না, আমাকে সে দু-চক্ষে দেখতে পারত না—অবশ্য এটা আমি জানতে পেরেছিলুম পরে। আমার স্ত্রীকে সে দীর্ঘকাল ধরে গোপনে আমার বিরুদ্ধে এমন উত্তেজিত করে তুলেছিল যে, অবশেষে স্ত্রীর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তার কিছুদিন পরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়, আমাকেও যেতে হয় উত্তর-আফ্রিকার রণক্ষেত্রে। সুরেন ছিল আমার অধীনে এক লেফটেন্যান্ট। একদিন খবর পাই, একদল ইতালীয় সৈন্য অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ করবার জন্যে কোনো এক জায়গায় লুকিয়ে আছে। কয়েকজন সেপাইয়ের সঙ্গে সুরেনকে সেই খোঁজ নেবার জন্যে পাঠিয়ে দিই। তারপর সে মারা পড়ে। এ হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রের সাধারণ ঘটনা, এর জন্যে আমার কোনো দায়িত্ব নেই।'

এইবারে কথা কইলে অমলেন্দু। তার চক্ষে কৌতুকের ইঙ্গিত। সে বললে, 'যে তামিল লোকগুলোর মৃত্যুর জন্যে আমাকে দায়ী করা হয়েছে—'

মনোতোষ শুধোলে, 'তামিল লোকগুলো মানে?'

অমলেন্দু হাসিমুখেই বললে, 'আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ একেবারে মিথ্যা নয়। সিংহলের বিজন অরণ্যে একবার আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। সর্বসমেত দলে আমরা ছিলুম বাইশ জন লোক—আমি ছাড়া আর সবাই জাতে তামিল। হয়তো সেই নিবিড় অরণ্যে পথ হারিয়ে আমিও মারা পড়তুম, কারণ আমাদের সঙ্গে যে খাবার ছিল, বাইশ জন লোক মিলে খেলে তা ফুরিয়ে যেত তিন দিনেই। কাজেই লুকিয়ে সেই খাবারগুলো নিয়ে এক রাত্রে আমি সেখান থেকে সরে পড়লুম।'

মেজর সেন কঠোর কণ্ঠে বললেন, 'একুশ জন লোককে অনাহারে মৃত্যুমুখে ফেলে রেখে একলা আপনি পালিয়ে এলেন?'

অমলেন্দু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়েই বললে, 'লোকালয়ে বসে আমার এই আচরণকে খুব সঙ্গত বলে মনে হবে না বটে। কিন্তু উপায় কী? আত্মরক্ষার চেষ্টা হচ্ছে জীবের স্বাভাবিক ধর্ম। পথ হারিয়ে সেই অপ্রচুর খোরাক নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে থাকলে আমাদের সকলকেই মারা পড়তে হত নিশ্চয়ই! কিন্তু পালিয়ে এসেছি বলে বেঁচে গিয়েছি আমি—বাকি সবাই হয়তো সত্য সত্যই মারা পড়েছে।'

মনোতোষ বললে, 'তাহলে আমার কথাও শুনুন। সুকুমার আর তার বোন অতসীকে দুর্ভাগ্যক্রমে একদিন আমার মোটরগাড়ির তলায় পড়ে মারা পড়তে হয়েছিল।'

চন্দ্রবাবু নীরস কণ্ঠে বললেন, 'দুর্ভাগ্যটা কার—আপনার, না তাদের?'

—'আমারও, তাদেরও; কিন্তু এ হচ্ছে আকস্মিক দুর্ঘটনা। অবশ্য এই দুর্ঘটনার ফলে আমার গাড়ি চালাবার লাইসেন্স এক বছরের জন্য বাতিল করা হয়েছিল বটে।'

গ

নিত্যানন্দ বাধো বাধো গলায় বললে, 'আমি কি দু-একটা কথা বলতে পারি?'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই বলতে পারো।'

নিত্যানন্দ বললে, 'আমাকে আর আমার স্ত্রীকে দায়ী করা হয়েছে নিস্তারিণী দেবীর মৃত্যুর জন্যে। নিস্তরিণী দেবীর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর, আত্মীয়স্বজন বলতে তাঁর কেউ ছিল না। তাঁর পরিচর্যার ভার ছিল আমাদের দুজনেরই উপরে। তাঁর স্বাস্থ্য একেবারেই ভালো ছিল না, তিনি বাস করতেন তাঁর মফস্‌সলের বাড়িতে। এক রাত্রে হঠাৎ তাঁর ভীষণ জ্বর হয়—জ্বরের মাত্রা ১০৪ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যায়। সে-এক বিষম দুর্যোগের রাত, প্রবল ঝড়ের সঙ্গে এসেছিল প্রচণ্ড বন্যা। সে গ্রামে ডাক্তার ছিল না, ডাক্তার থাকতেন ভিন্ন গ্রামে, প্রায় আট মাইল দূরে। তবুও আমি সেই ঝড়-বৃষ্টি-বন্যার ভিতরেই পায়ে হেঁটে ডাক্তারের বাড়ি যাবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করি, কিন্তু আমার চেষ্টা সফল হয়নি। নিস্তারিণী দেবী মারা যান শেষ রাত্রে।'

মহেন্দ্র কতকটা ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বলল, 'নিস্তারিণী দেবী পরলোকে যান, ইহলোকে ফেলে অল্পবিস্তর সম্পত্তি, কী বলো নিত্যানন্দ?'

নিত্যানন্দ বললে, 'নিস্তারিণী দেবী বেঁচে থাকতেই আমাদের তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে গিয়েছিলেন। এ জন্যে কেউ কোনোই অভিযোগ করতে পারে না। পুলিশও অভিযোগ করেনি।'

অমলেন্দু বললে, 'মহেন্দ্রবাবু, অভিযুক্তদের তালিকায় আপনার নামও আছে।'

মহেন্দ্র বললেন, 'হ্যাঁ, জানি, আমার জন্যেই নাকি জ্যোতির্ময় মারা পড়েছে। জ্যোতির্ময় ছিল একদল ডাকাতের দলপতি। সদলবলে সে এক ব্যাঙ্কের ওপর গিয়ে হানা দেয়। তারই রিভলভারের গুলিতে মারা পড়ে ব্যাঙ্কের দারোয়ান, কিন্তু পালাবার আগেই পুলিশের হাতে সে ধরা পড়ে। তখন আমি গোয়েন্দা-বিভাগে, এই মামলাটা পড়ে আমার হাতেই। তদন্ত করে আমি যে রিপোর্ট দিই, সেই অনুসারেই জ্যোতির্ময়ের হয় মৃত্যুদণ্ড। আমি নিজের কর্তব্যপালন ছাড়া আর কিছুই করিনি।'

অমলেন্দু খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, 'ওঃ, এখানে আমি ছাড়া আর সকলেই কী কর্তব্যপরায়ণ! তারপর ডাক্তারবাবু, এখনও আপনার কথা শোনা হয়নি। কর্তব্যপালন করতে গিয়ে আপনিও কি কোনোদিন বেহিসেবি কাজ করে ফেলেননি? লতিকা রায়চৌধুরি মারা পড়েছেন কেন?'

ডাক্তার কিছুমাত্র অপ্রস্তুত হলেন না, বেশ শান্তস্বরেই বললেন, 'ভালো করে আমার কিছুই মনে পড়ছে না। অভিযোক্তার মতে, ঘটনাটা ঘটেছিল বিশ বৎসর আগে। লতিকা দেবী কে? জীবনে শতশত রোগী দেখেছি, এতদিন পরে লতিকা দেবীকে আমি স্মরণ করতে পারছি না। আমি হচ্ছি সার্জন, খুব সম্ভব অস্ত্রোপচারের ফলে লতিকা নামে কোনো নারী মারা পড়ে। এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসককে দায়ী করাই হচ্ছে সাধারণ লোকের স্বভাব। এ ছাড়া আমার আর কিছুই বলবার নেই।'

কিন্তু তিনি নিজের মনে মনে বললেন, লতিকার নাম এ জীবনে আমি ভুলতে পারব না। তখন মদ্যপান করতুম। সেদিন অস্ত্রোপচারের সময়ে আমি ছিলুম বেহেড মাতাল। আমার হাত এত কাঁপছিল যে, ভালো করে ছুরিই ধরতে পারছিলুম না। হয়তো আমার দোষেই লতিকা মারা পড়েছে। কিন্তু বিশ বৎসর আগেকার সেই দুঃস্বপ্ন, আজ এতদিন পরে আবার আমার সামনে টেনে আনতে চেয়েছে কে?

ঘ

প্রত্যেকেরই বক্তব্য শেষ হল, কেবল সৌদামিনী দেবী ছাড়া। সকলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে লাগল তাঁর মুখের দিকে।

সৌদামিনী দুই ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আপনারা কি আমার মুখ থেকেও কিছু শুনতে চাইছেন? আমার কোনো বক্তব্যই নেই।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'কোনো বক্তব্যই নেই?'

—'কিছু না।'

—'আপনি কি এর পরে আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন?'

—'আমি কোনো পক্ষই সমর্থন করব না। আমি যখনই যা করেছি, নিজের বিবেক-বুদ্ধি অনুসারেই করেছি। আমার মনে কোনো পাপ নেই।' সৌদামিনীর ওষ্ঠ ও অধর দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হল পরস্পরের সঙ্গে।

চন্দ্রবাবু দু-তিন বার কেশে নিজের কণ্ঠকে আবার পরিষ্কার করে নিলেন। তারপর বলেন, 'আপাতত, আমাদের তদন্ত এইখানেই শেষ হল। নিত্যানন্দ, এই দ্বীপে আমরা ছাড়া আর কেউ আছে?'

—'কেউ না, একেবারেই কেউ না।'

চন্দ্রবাবু গলা আর-একটু তুলে বলেন, 'কোনো এক অজ্ঞাত ব্যক্তি কী জন্যে আমাদের এখানে আমন্ত্রণ করে এনেছে, তা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবে তার মস্তিষ্ক যে বিকৃত, এ-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই! হয়তো সে হচ্ছে অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যক্তি। আমার মত হচ্ছে, অবিলম্বেই এই দ্বীপ ত্যাগ করা উচিত। আজ রাত্রেই।'

নিত্যানন্দ বললে, 'কিন্তু হুজুর, কীসে করে যাবেন? সেই মোটরলাঞ্চ আর বোট দুখানাই এখান থেকে চলে গিয়েছে। শুনেছি, ইব্রাহিম কালকেই আবার এই দ্বীপের মালিককে নিয়ে ফিরে আসবে।'

—'তাহলে আমাদের কাল পর্যন্তই অপেক্ষা করতে হবে।'

মনোতোষ ছাড়া আর-সকলেই সায় দিলে এই প্রস্তাবে।

মনোতোষ বললে, 'সেটা হবে কাপুরুষের কাজ। এখান থেকে চলে যাবার আগে সমস্ত রহস্যটা আমি তলিয়ে বুঝতে চাই। ব্যাপারটা হয়ে উঠেছে ঠিক যেন ডিটেকটিভ গল্পের মতো। অত্যন্ত রোমাঞ্চকর!'

চন্দ্রবাবু তিক্তস্বরে বললেন, 'আমার এই বয়সে রোমাঞ্চকর কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে আমি রাজি নই।'

মনোতোষ উঠে দাঁড়িয়ে উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, 'আপনি হচ্ছেন বৃদ্ধ, আমি হচ্ছি যুবক, আমি চাই জীবন—রোমাঞ্চকর ঘটনাচঞ্চল বেগবান জীবন!'

তারপর সে এগিয়ে গেল জানালার সামনের টেবিলটার দিকে। একটি গেলাসে ঢালা ছিল খানিকটা লেমোনেড। মনোতোষ গেলাসটা তুলে নিয়ে ঊর্ধ্বমুখে এক নিশ্বাসে সমস্ত জলটাই পান করে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে আচম্বিতে তার দম যেন বন্ধ হয়ে গেল, সমস্ত মুখখানা হয়ে উঠল রক্তবর্ণ। সে জোর করে নিশ্বাস টানবার চেষ্টা করলে এবং পরমুহূর্তেই তার দেহ আর হাতের গেলাসটা মাটির উপরে আছড়ে পড়ল সশব্দে।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

ক

ঘটনাটা ঘটে গেল অত্যন্ত আচমকা। সকলেই শ্বাস রোধ করে নির্বোধের মতো মনোতোষের ভূপতিত দেহটার দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল!

তারপর ডাক্তার বোস তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে নিশ্চেষ্ট দেহটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। মনোতোষের বুকের উপরে একবার হাত রেখে বিভ্রান্ত চোখে সভয়ে প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে বলে উঠলেন, 'ভগবান! এ দেহে যে জীবনের কোনো লক্ষণই নেই!'

কেউ যেন সে কথা বিশ্বাসই করতে পারলে না। জীবনের কোনো লক্ষণই নেই? মৃত? মূর্তিমন্ত তরুণ যৌবনের মতো মনোতোষ, অমন স্বাস্থ্য-সবল আদর্শ দেহ, এমন আচম্বিতে এত স্বল্প সময়ের মধ্যে তার মৃত্যু হতে পারে কখনো?

না, বিশ্বাস করা অসম্ভব। ডাক্তার বোস মৃতের উপরে করলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত। তারপর তার হাতের আধভাঙা গেলাসটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

মেজর সেন শুধোলেন, 'মৃত? আপনি কি বলতে চান মনোতোষবাবুর দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে?'

ডাক্তার বললেন, 'শ্বাস রোধ হওয়ার ফলে মনোতোষবাবু মারা পড়েছেন।'

তিনি খুব সাবধানে গেলাসের ভিতরে যে কয়েক ফোঁটা পানীয় ছিল, আঙুলে করে তা তুলে নিয়ে একবার দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল তাঁর মুখের ভাব!

মেজর সেন বললেন, 'কোনো মানুষ যে এমনভাবে মারা পড়তে পারে আমার তা জানা ছিল না।'

সৌদামিনী বললেন, 'জীবনের মধ্যেই আমরা পাই মৃত্যুর আলিঙ্গন।'

ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'না, এমনভাবে বিষম লেগে হঠাৎ মানুষ মারা পড়তে পারে না। মনোতোষবাবুর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি।'

স্বপ্না প্রায় চুপি চুপি বললে, 'তাহলে ওই গেলাসের ভিতরে কি বিষটিষ কিছু ছিল?'

ডাক্তার মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তবে নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারি না। মনে হচ্ছে 'সায়ানাইড'। প্রুসিক অ্যাসিডের স্পষ্ট গন্ধ নেই, সম্ভব পোটাসিয়াম সায়ানাইড। মুহূর্তের মধ্যে কাজ করে।'

চন্দ্রবাবু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'বিষ কি গেলাসের ভিতরে ছিল?'

—'হ্যাঁ।'

অমলেন্দু বললে, 'আপনি কি বলতে চান, গেলাসের ভিতরে বিষ রেখেছিলেন মনোতোষবাবু নিজেই?'

—'তা ছাড়া আর কী বলব?'

মহেন্দ্র বললে, 'আত্মহত্যা? আশ্চর্য!'

স্বপ্না থেমে থেমে বললে, 'মনোতোষবাবু যে আত্মহত্যা করেছেন, এ কথা ভাবতেই পারা যায় না। তাঁর কথাবার্তা, ভাবভঙ্গির ভিতরে ছিল জীবনের প্রবল উচ্ছ্বাস। পৃথিবী ছিল তাঁর কাছে পরম উপভোগ্য।'

ডাক্তার বললেন, 'কিন্তু এখানে আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনো কিছুর কথা মনে ওঠে কি?'

সকলেই মাথা নাড়লে। ঘরের ভিতরে বাইরের কোনো লোকই আসেনি, সকলেই স্বচক্ষে দেখেছে যে, মনোতোষ নিজেই গেলাসটা তুলে নিয়ে লেমোনেডটা পান করেছে। গেলাসের মধ্যে যদি 'সায়ানাইডের' অস্তিত্ব থাকে, তাহলে তার জন্যে মনোতোষ ছাড়া আর কেউই দায়ী হতে পারে না।

কিন্তু—কিন্তু মনোতোষ আত্মহত্যা করবে কেন?

মহেন্দ্র বললে—চিন্তিতভাবেই বললে, 'ডাক্তার আপনার কথা কিন্তু আমার মনে ঠিক লাগছে না। আত্মহত্যা করার দিকে যে শ্রেণির লোকের ঝোঁক থাকে, মনোতোষবাবুকে দেখলে সে শ্রেণির লোক বলে মনে হয় না।'

ডাক্তার বললেন, 'আমিও আপনার কথাই মানি। এ হচ্ছে অদ্ভুত রহস্য!'

খ

ডাক্তারের সঙ্গে অমলেন্দু মনোতোষের অসাড় দেহটাকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে গিয়ে রেখে এল তার শয়নগৃহে।

তারা যখন ফিরে এল, প্রত্যেকেই তখন দাঁড়িয়ে উঠেছে। রাত্রি ঠান্ডা নয়, কিন্তু দেখলে মনে হয় প্রত্যেকেরই দেহ যেন শীতার্তের মতোই কম্পমান।

সৌদামিনী বললেন, 'রাত হল, এখন আমাদের ঘুমুতে যাওয়া উচিত।' বড়ো ঘড়িটার দিকে সবাই তাকিয়ে দেখলে। বেজে গেছে রাত বারোটা। সৌদামিনীর কথায় সবাই মনে মনে সায় দিল বটে, কিন্তু কেউই যেন দল ছাড়া হতে প্রস্তুত নয়। তারা কেউ যেন শয়নগৃহে গিয়ে একলা হতে চায় না। কিন্তু চন্দ্রবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'আমাদের সকলেরই এখন খানিকটা ঘুমের দরকার।' বলে তিনি নিজেই অগ্রসর হলেন।

আর-সকলে তখন তাঁর পিছনে পিছনে অগ্রসর হতে লাগল।

নিঝুম রাত্রি। দূর থেকে সমুদ্রের তরঙ্গ-কোলাহল ছাড়া আর কোনো শব্দই ভেসে আসছে না। প্রত্যেকের পায়ের চাপে কাঠের সিঁড়িটা যেন আর্তনাদ করে ভেঙে দিতে লাগল বাড়ির ভিতরকার স্তব্ধতা। কোণে কোণে দেখা যাচ্ছে কালো কালো ছায়া, দেখলেই ছাঁৎ ছাঁৎ করে ওঠে মন। কিন্তু এ হচ্ছে একেবারে আধুনিক বাড়ি—শক্তিশালী পেট্রোলের ল্যাম্পের আলোকপ্রবাহে সমুজ্জ্বল। কোথাও লুকোচুরির কোনো জায়গাই নেই। তবু একটা অপার্থিব ভাব মনকে দিতে চায় আচ্ছন্ন করে এবং এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে ভয়াবহ!

গ

ভূতপূর্ব জজ নিজের শয়নগৃহে প্রবেশ করে আগে করলেন জামাকাপড় পরিবর্তন।

সোফার উপরে তিনি তাঁর পাইপে তামাক ভরে অগ্নিসংযোগ করলেন।

তাঁর চোখের সামনে জেগে উঠল আসামি বরেন বসুর মূর্তি—যার ফাঁসি হয়েছিল তাঁরই হুকুমে।

তাঁর স্পষ্ট মনে আছে বরেন বসুর চেহারা। দেখতে ছিল সে সুপুরুষ। আর তার সেই সপ্রতিভ, অকপট দুটি চোখ। অত্যন্ত সরলভাবে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে সে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল একটুও সঙ্কুচিত না হয়ে। সেই জন্যেই জুরিরা তার পক্ষপাতী হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তিনি পুরাতন ব্যবহারজীবী—আগে ছিলেন বিখ্যাত ব্যারিস্টার, তারপর হয়েছিলেন জজ। জীবনে অসংখ্য অপরাধীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তাঁর, সুন্দর সরল মুখ দেখে ভোলবার পাত্র নন তিনি।

তিনি দিয়েছিলেন তাকে প্রাণদণ্ড, আইনের দিক দিয়ে তা কিছুমাত্র অসঙ্গত হয়নি।

মনে মনে তিনি মৃদুহাস্য করলেন। তারপর জলভরা গেলাসের ভিতরে নিজের বাঁধানো দাঁতের পাটি খুলে রেখে দিলেন। তাঁর মুখের নীচের দিকটা চুপসে গেল। অতিশয় নিষ্ঠুর দেখাতে লাগল তাঁর মুখের নীচের দিকটা। আবার হাসতে হাসতে মৃদুস্বরে তিনি বললেন, 'বরেনের প্রাণদণ্ড দিয়েছি, বেশ করেছি!' তারপর সোফা থেকে উঠে আলো নিবিয়ে শয্যায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

ঘ

নীচেকার হলঘরে তখনও দাঁড়িয়ে ছিল মহেন্দ্র। তাকে দেখাচ্ছিল হতভম্বের মতো।

এক কোণে টেবিলের উপরে যেখানে তথাকথিত হারাধনের ছেলের মূর্তিগুলো ছিল, সেইদিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে তার চোখ দুটো হয়ে উঠেছে বিস্ফারিত।

সে অস্ফুট স্বরে বললে, 'এ আবার কী কাণ্ড! আমি হলপ করে বলতে পারি, এখানে একটু আগে ছিল ঠিক দশটা পুতুল!'

ঙ

মেজর সেনের চোখে ঘুম নেই—বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছিলেন তিনি।

আলোকহীন অন্ধকার ঘর—কিন্তু সেই অন্ধকারেও তাঁর চোখের সামনে জেগে উঠেছে সুরেন্দ্রনাথ পালের মূর্তি।

প্রথমটা তিনি সুরেনকে পছন্দ করতেন। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর যখন তিনি জানতে পারলেন যে, এই পারিবারিক দুর্ঘটনার মূলে ছিল সুরেনেরই চক্রান্ত, তখন তার নাম মনে করলেও তাঁর মন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত দারুণ ক্রোধে।

তারপর উত্তর-আফ্রিকার সেই যুদ্ধক্ষেত্রের কথা। হ্যাঁ, সুরেন যে আর জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারবে না, সেটা ভালো করে জেনেই তিনি তাকে পাঠিয়েছিলেন শত্রুদের বিরুদ্ধে। কেন পাঠাবেন না? তার জঘন্য চক্রান্তের ফলেই ছারখার হয়ে গিয়েছে তাঁর সংসার, বিষময় হয়ে উঠেছে তাঁর জীবন। সে-রকম নিকৃষ্ট জীবকে পৃথিবী থেকে লুপ্ত করে দিলে মানুষের উপকার করাই হয়।

সেই সময়ে ফৌজের কোনো কোনো লোক তাঁকে সন্দেহ করেছিল। কানা-ঘুষায় তিনি শুনলেন, সুরেনের মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হয়েছে তাঁকেই। কিন্তু সে-খবর তো ফৌজের বাইরের আর কারুর জানবার কথা নয়। সুদীর্ঘ দশ বৎসর আগেকার কথা, আজ আবার নতুন করে ওঠে কেন?

চ

বিনিদ্র স্বপ্নাও বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে আছে কড়িকাঠের দিকে।

ঘরের আলো জ্বলছে। অন্ধকারে থাকতে তার ভয় করে।

সে ভাবছে : নীরেন্দ্রনারায়ণ, নীরেন্দ্রনারায়ণ! আজ রাত্রে কেন আমার মনে হচ্ছে, তুমি আবার আমার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছ? সাগর-সমাধি ছেড়ে কেন তুমি আবার উঠে এসেছ?

সেদিন চোখের সামনে দেখলুম, তলিয়ে গেলে তুমি অতল জলে! ভেবেছিলুম তোমার স্মৃতিটুকু পর্যন্ত আর আমার মনকে পীড়া দিতে পারবে না।

আবার—তুমি কে? কুমার নরেন্দ্রনারায়ণ? তুমিও কি তোমার হারা ছেলেকে খুঁজতে এসেছ এখানে?

লোকে কী বলে শুনেছিলে তো? আমার কাছে তুমি করেছিলে বিবাহের প্রস্তাব। আমিও রাজি হয়েছিলুম। তার অল্পদিন পরেই নীরেন্দ্রনারায়ণ জলে ডুবে মারা যায়। শুনেছি কেউ কেউ সন্দেহ করেছিল যে, যাতে সে তোমার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়, সেই উদ্দেশ্যেই আমি ইচ্ছা করেই সমুদ্রের কবল থেকে উদ্ধার করিনি তাকে।

তুমিও কি এইসব কথা শুনেছিলে? শুনে কি বিশ্বাস করেছিলে? জানি না।

জানবার অবসরও আর পাইনি। তোমার সঙ্গে আমার বিবাহও হয়নি। কারণ পুত্রশোকে তুমি যে শয্যা নিলে, সেই শয্যাই হল তোমার মৃত্যুশয্যা।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

ক

পরদিনের প্রভাত। জানলা দিয়ে ঘরের ভিতরে এসে পড়েছে খানিকটা সূর্যালোক।

ডাক্তার বোস বিছানার উপর উঠে বসেই শুনতে পেলেন, বাইরের থেকে সজোরে দরজা ঠেলতে ঠেলতে নিত্যানন্দ ডাকছে, 'ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু!'

তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে দরজা খুলে দিয়ে তিনি বললেন, 'ব্যাপার কী নিত্যানন্দ?'

নিত্যানন্দ কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'ডাক্তারবাবু, আমার স্ত্রীর কী হয়েছে! আমি তাকে জাগাতে পারছি না। আমি তাকে কিছুতেই জাগাতে পারছি না!'

শীঘ্রহস্তে একটা জামা পরে নিয়ে নিত্যানন্দের সঙ্গে ডাক্তার তার ঘরে গিয়ে হাজির হলেন।

বিছানায় শুয়ে আছে সত্যবালা। ডাক্তার তার মাথার উপরে হাত রাখলেন। অস্বাভাবিক কনকনে ঠান্ডা! মিনিটখানেক পরীক্ষার পর ডাক্তার ফিরে দাঁড়ালেন।

সন্দিগ্ধস্বরে নিত্যানন্দ থেমে থেমে বললেন, 'তবে কি—তবে কি—'

ডাক্তার ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ। তোমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে!'

—'তাহলে কি ওর হার্টফেল করেছে?'

—'তোমার স্ত্রীর কি বুকের কোনো অসুখ ছিল?'

—'কই, আমি তো কখনো শুনিনি।'

—'কাল রাত্রে ঘুমোবার আগে তোমার স্ত্রী কী খেয়েছিল?'

—'কিছু না। আপনি যে ওষুধ দিয়েছিলেন, তারপরে আর কিছুই খায়নি।'

খ

বৈঠকখানায় আসন গ্রহণ করে চন্দ্রবাবু ও মেজর সেন দেশের বর্তমান

রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। অমলেন্দু, মহেন্দ্র ও স্বপ্না সকলেই উঠে গিয়েছিল বাড়ির বাইরে। ফিরে এসে তারা তিন জনেও গিয়ে বসল, বৈঠকখানায়।

সৌদামিনী এতক্ষণ পরে উপরে থেকে নেমে এসে শুধোলেন, 'মোটরলাঞ্চখানা ফিরে এসেছে কি?'

স্বপ্না বললে, 'না।'

ডাক্তার ঘরের ভিতরে ঢুকে বললেন, 'চা আর খাবার তৈরি করে নিত্যানন্দ এখনই আপনাদের ডাকবে। আজ তার কাজে কিছু গলদ হলে আপনারা যেন কিছু মনে করবেন না।'

সৌদামিনী বললেন, 'তার মানে?'

—'আগে আমাদের চা-টা খাওয়া হয়ে যাক, তারপর কারণ কী শুনবেন।'

কেউ আর কিছু বললে না। এমন সময়ে নিত্যানন্দ একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনাদের চা প্রস্তুত। অনুগ্রহ করে খাবার ঘরে চলুন।' তার মুখ সম্পূর্ণ ভাবহীন।

চা-পানের পর সবাই আবার বৈঠকখানায় এসে আসন গ্রহণ করলে।

ডাক্তার বললেন, 'এইবারে আপনাদের একটা কথা বলা দরকার। সত্যবালা কাল রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই মারা পড়েছে।'

সকলেই চমকে অস্ফুট শব্দ করে উঠল।

স্বপ্না আর্তকণ্ঠে বললে, 'কী ভয়ানক! আবার মৃত্যু? এক দিনে দুই জনের মৃত্যু?'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'অসাধারণ ব্যাপার বটে। সত্যবালার মৃত্যুর কারণ কী?'

ডাক্তার বললেন, 'শবব্যবচ্ছেদ না করলে তা বলা সহজ নয়।'

স্বপ্না বললে, 'সত্যবালাকে দেখেই আমি বুঝেছিলুম, তার স্বাস্থ্য ভালো নয়। কালকেই সেই দুর্ঘটনার জন্যে হয়তো তার হার্টফেল করেছে।'

ডাক্তার বললেন, 'তার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়েছে, কিন্তু কী জন্য তা বন্ধ হয়েছে সেইটেই এখন বিবেচ্য।'

সৌদামিনী বললেন, 'বিবেক!'

ডাক্তার তাঁর দিকে ফিরে বললেন, 'আপনার কথার অর্থ কী সৌদামিনী দেবী?'

সৌদামিনী বললেন, 'আপনারা সবাই তো শুনেছেন! নিস্তরিণী দেবীর মৃত্যুর জন্যে দায়ী সে আর তার স্বামী।'

—'আপনিও তাই মনে করেন নাকি?'

—'হ্যাঁ। আমি এই অভিযোগ সত্য বলেই মনে করি। অভিযোগের কথা শুনেই সে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। সেই ভয় সামলাতে না পেরেই তার হার্ট ফেল করেছে। এ হচ্ছে ভগবানের বিচার।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'ভগবান বিচার করেন মানুষের সাহায্যেই। কিন্তু এখানে এমন কে মানুষ থাকতে পারে?'

মহেন্দ্র বললেন, 'ঘুমোবার আগে সত্যবালা কী খেয়েছে, আর কী পান করেছে?'

ডাক্তার বললেন, 'কিছু না।'

—'কিছু না? এক পেয়ালা চা? এক গেলাস জল? নিশ্চয়ই সে কিছু না কিছু খেয়েছে?'

'নিত্যানন্দ বলে, ঘুমোবার আগে কাল সে কিছুই খায়নি বা পান করেনি।'

কতকটা ব্যঙ্গের স্বরে মহেন্দ্র বললে, 'ওঃ নিত্যানন্দ! সে তো বলবেই এ কথা!'

অমলেন্দু বললে, 'মহেন্দ্রবাবু, আপনি কি নিত্যানন্দকেই সন্দেহ করেন?'

—'কেন করব না? কাল আমরা সবাই শুনেছি সেই অভিযোগের কথা। হতে পারে তা অমূলক, হতে পারে তা পাগলের প্রলাপ! কিন্তু, হতেও পারে তা সত্য কথা। সত্যবালা স্ত্রীলোক, অভিযোগ শুনেই মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। নিত্যানন্দের মনে এই ভয় হওয়া স্বাভাবিক যে, শেষ পর্যন্ত সত্যবালা হয়তো সব কথা ফাঁস করে দেবে। তারপর—বুঝতেই পারছেন তো? নিজের গলা বাঁচাবার জন্যে সে তার স্ত্রীর মুখ চিরদিনের জন্যে বন্ধ করে দিয়েছে।'

এমন সময় ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল নিত্যানন্দ।

মেজর সেন বললেন, 'তোমার স্ত্রী মৃত্যুর কথা শুনে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি!'

নিত্যানন্দ কেবল নিজের কপালে হাত দিয়ে বললে, 'অদৃষ্ট!'

আর সবাই চুপ করে রইল!

গ

বাড়ির বাইরেকার চত্বরে দাঁড়িয়েছিল অমলেন্দু ও মহেন্দ্র।

অমলেন্দু বললে, 'এই মোটরলাঞ্চ—' বলতে বলতে সে থেমে গেল।

মহেন্দ্র বললে, 'আপনি কী ভাবছেন, আমি বুঝতে পেরেছি। আমারও মনে জেগেছে ওই প্রশ্ন। এতক্ষণে লাঞ্চখানার এখানে আসা উচিত ছিল। কিন্তু তা আসেনি। কেন?'

অমলেন্দু বললে, 'ওই প্রশ্নের কোনো উত্তর পেয়েছেন?'

—'আমার মতে লাঞ্চখানা না-আসা কোনো দৈব ঘটনা নয়।'

—'অর্থাৎ আপনি বলতে চান, লাঞ্চখানা আর আসবে না?'

পিছন থেকে অধীর কণ্ঠে শোন গেল—'না, না। মোটরলাঞ্চ আর ফিরে আসবে না!'

দুজনেই একসঙ্গে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখলে, মেজর সেন।

মহেন্দ্র বললে, 'মেজরসাহেব, আপনারও তাই বিশ্বাস?'

মেজর সেন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'নিশ্চয়ই তা আসবে না। আমরা সেখানাকে চাই এই দ্বীপ থেকে প্রস্থান করবার জন্যে। কেমন? কিন্তু এই দ্বীপ থেকে আর কোনোদিনই আমরা চলে যেতে পারব না। যতক্ষণ বেঁচে আছি, এই দ্বীপেই আমাদের থাকতে হবে।' বলতে বলতে তিনি হনহন করে এগিয়ে চললেন একদিকে। সেই দিকে সিধে এগিয়ে গেলে পাওয়া যাবে সমুদ্রতীর।

তাঁর এলোমেলো গতি দেখলে মনে হয়, তিনি যেন অগ্রসর হচ্ছেন অর্ধ-জাগ্রত অবস্থায়।

মহেন্দ্র খানিকক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে থেকে চিন্তিতমুখে বললে, 'আর-একজনেরও মাথা খারাপ হবার উপক্রম হয়েছে। শেষ পর্যন্ত হয়তো আমাদের সকলেরই অবস্থা হবে ওই রকম।'

অমলেন্দু বললে, 'কিন্তু আপনার মাথা ঠিকই থাকবে বলে মনে হচ্ছে।'

গোয়েন্দা বিভাগের ভূতপূর্ব কর্মচারী মহেন্দ্র আনন্দহীন হাস্য করে বললে, 'প্রচুর কাঠ-খড় না পুড়লে আমার মাথা খারাপ হবে না। আর আমার মনে হচ্ছে, আপনার সম্বন্ধেও যেন ওই-কথাই বলা যায়।'

অমলেন্দু বললে, 'অন্তত এখনও পর্যন্ত আমি পাগল হইনি।'

চত্বরে এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার বোস—তাঁর পিছনে পিছনে নতমস্তকে চন্দ্রবাবু।

মহেন্দ্র ও অমলেন্দুর দিকে এগিয়ে ডাক্তার কী বলতে উদ্যত হয়েছেন, এমন সময়ে দ্রুতপদে সেখানে এসে নিত্যানন্দ বললেন, 'আমার একটা কথা শুনবেন কি?'

ডাক্তার ফিরে দাঁড়ালেন। কিন্তু নিত্যানন্দের মুখ দেখেই তাঁর দৃষ্টি হয়ে উঠল সচকিত। সে মুখ মড়ার মতো সাদা, থরথর করে কাঁপছে আর সর্বাঙ্গ! নিত্যানন্দ বললে, 'আপনারা দয়া করে একবার বৈঠকখানায় চলুন। আপনাদের একটা ব্যাপার দেখাতে চাই।'

সকলে আবার বৈঠকখানায় গিয়ে দাঁড়াল।

ডাক্তার বললেন, 'নিত্যানন্দ, তুমি অত কাঁপছ কেন? হয়েছে কী?'

নিত্যানন্দ ভয়ার্তস্বরে বললে, 'এই বাড়ির ভিতরে এমন সব ব্যাপার হচ্ছে, যার মানে আমি বুঝতে পারছি না!'

—'ব্যাপার? কী ব্যাপার?'

—'আপনারা হয়তো আমাকে পাগল বলে ভাববেন! কিন্তু এই ব্যাপারের কোনো অর্থই আমি খুঁজে পাচ্ছি না!'

—'আরে বাপু, আসল কথা কী, তাই বলো?'

নিত্যানন্দ বললে, 'ওই টেবিলের মাঝখানে কালকে দশটা পুতুল দাঁড় করানো ছিল। আমি স্বচক্ষে দেখেছি। ঠিক দশটা!'

ডাক্তার বললেন, 'হ্যাঁ, দশটা পুতুলই ছিল বটে। কাল আমরাও তা গুনে দেখেছিলুম।'

নিত্যানন্দ বললেন, 'তাহলে শুনুন। কাল রাত্রে আপনারা উপরে যাবার পর আমি যখন ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ করছিলুম, টেবিলের উপরে তখন দেখছিলুম মোটে নয়টা পুতুল। কিন্তু আবার এখন কী দেখছি জানেন? যদি বিশ্বাস না করেন, নিজেরাই গুনে দেখুন।'

—'এখানে রয়েছে মাত্র আটটা পুতুল! মাত্র আটটা! এর কি কোনো মানে হয়? মাত্র আটটা?'

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

ক

সৌদামিনী বললেন, 'স্বপ্না, চলো আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।'

স্বপ্না আপত্তি করলে না। তারা দুজনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দ্বীপের একদিকে অগ্রসর হল। খানিক পরেই তারা একেবারে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

সৌদামিনী বললেন, 'মোটরলাঞ্চ এখনও আসেনি দেখছি।'

স্বপ্না বললে, 'এলে আমি বাঁচতুম। আমি—আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।'

সৌদামিনী বললেন, 'আমরা সকলেই যে এখান থেকে চলে যেতে চাই, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।' একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'যে চিঠিখানা লিখে আমাকে এখানে আসবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল, এখন মনে হচ্ছে তার কোনো কোনো জায়গায় গলদ ছিল। তখন বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতে পারছি। আমার এখানে আসা উচিত হয়নি।'

স্বপ্না বললে, 'সকালে আপনি যা বলেছিলেন, সেটা কি আপনার মনের কথা?'

—'কোন কথা?'

—'আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে, সত্যবালার মৃত্যুর জন্য নিত্যানন্দই দায়ী?'

—'হ্যাঁ, আমি তাই বিশ্বাস করি। তোমার কী মত?'

—'আমার মতামত কিছুই নেই।'

সৌদামিনী সমুদ্রের উপর দিয়ে দৃষ্টিচালনা করে বললেন, 'মনে করে দ্যাখো, অভিযোগ শুনেই সত্যবালা কীভাবে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। নিত্যানন্দের হাত থেকেও কফির ট্রে পড়ে গিয়েছিল, এটাও ভুলো না। ওরা যে অপরাধী, এ-কথা অনুমান করা যায় খুব সহজেই। নিস্তারিণী দেবীর সম্পত্তির লোভেই ওরা সেই অপরাধ করেছিল।'

—'কিন্তু আর-সকলের সম্বন্ধে আপনার মত কী?'

—'মানে?'

—'আর-সকলের বিরুদ্ধেও যেসব অভিযোগ করা হয়েছে তা যদি মিথ্যা হয়, তাহলে নিত্যানন্দের বেলাতেই বা তা সত্য হবে কেন?'

সৌদামিনী বললেন, 'ওঃ, তুমি যা বলতে চাও বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, প্রথমে অমলেন্দুবাবুর কথাই ধরো। সিংহলের গহন বনে একুশ জন লোকের মৃত্যুর জন্যে তিনিই যে দায়ী, অমলেন্দুবাবু তো নিজের মুখেই একথা স্বীকার করেছেন। অবশ্য কোনো কোনো অভিযোগ হচ্ছে হাস্যকর। চন্দ্রবাবুর কথাই ধরো। আগে তিনি ছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি। প্রমাণ পেলে অপরাধীকে তিনি দণ্ড দিতে বাধ্য। তারপর মহেন্দ্রবাবু, তিনি ছিলেন ডিটেকটিভ। তিনি যদি সত্য সাক্ষ্য দিয়ে থাকেন, আর তার জন্যে কারুর প্রাণদণ্ড হয়, তবে তাঁকেও দোষী বলা চলে না। আমার নিজের সম্বন্ধেও আমি অনেকটা ওই রকম কথাই বলতে পারি।'

স্বপ্না জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল সৌদামিনীর মুখের পানে।

সৌদামিনী বললেন, 'অমলা নামে একটি গরিবের মেয়ে আমার কাছে থাকত। আমি তাকে যথেষ্টই স্নেহ-যত্ন করতুম। হঠাৎ একদিন আমার বাক্স থেকে একশো টাকার একখানা নোট চুরি গেল। তারপর সেই নোট পাওয়া গেল অমলারই কাছে। সে কেঁদেকেটে আমার পায়ে ধরে বললে, 'আমার দাদার অত্যন্ত অসুখ হয়েছে, পয়সার অভাবে তাঁর চিকিৎসা হচ্ছে না, সেইজন্যে দায়ে পড়ে আমি ওই নোটখানা নিয়েছিলুম।' তারপর আমি রাগ করে তাকে আমার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিই। মনের দুঃখে সে করে আত্মহত্যা। তুমিই বলো স্বপ্না, অমলার মৃত্যুর জন্যে কি আমি দায়ী?'

স্বপ্না বললে, 'অমলার মৃত্যুর পরে আপনি কি অনুতপ্ত হননি?'

সৌদামিনী কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'অনুতপ্ত হব? কোনো অন্যায় করিনি, অনুতপ্ত হব কেন?'

খ

চত্বরের উপরে ইজিচেয়ারে বসে চন্দ্রবাবু চুপ করে তাকিয়ে ছিলেন সমুদ্রের দিকে। খানিক তফাতে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে নীরবে সিগারেটের ধূমপান করছিল অমলেন্দু ও মহেন্দ্র।

ডাক্তার বোস বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, 'অমলেন্দুবাবু, আপনার সঙ্গে আমি দু-চারটে কথা কইতে পারি কি?'

—'নিশ্চয়।'

অমলেন্দুকে নিয়ে ডাক্তার বোস খানিক দূর অগ্রসর হয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে

বললেন, 'অমলেন্দুবাবু, আমি আপনার সঙ্গে কিছু পরামর্শ করতে চাই।'

—'কী বিষয় নিয়ে?'

—'আমাদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে। মহেন্দ্রবাবুর বিশ্বাস, সত্যবালার মৃত্যুতে নিত্যানন্দের হাত আছে। আপনি কী বলেন?'

অমলেন্দু একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'কিছুই অসম্ভব নয়। তাদের জন্যেই যদি নিস্তারিণী দেবী মারা পড়ে থাকেন, তাহলে পাছে তার স্ত্রী ভয়ে সেই কথা প্রকাশ করে ফেলে, তাই ভেবেই নিত্যানন্দ হয়তো সত্যবালাকে ইহলোক থেকে সরিয়ে দিয়েছে। সত্যবালার যে স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, একথা আমি বিশ্বাস করি না। তার মৃত্যু হতে পারে দুটি কারণে। হয় নিত্যানন্দ বিষ-টিষ খাইয়ে তাকে মেরে ফেলেছে, নয় সত্যবালা নিজেই ভয়ে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু এক দিনেই এক বাড়িতেই দু-দুটো আত্মহত্যা কেমন যেন খাপ খায় না। তার একটু আগেই মনোতোষবাবুর মৃত্যু হয়েছে, আর সেটাও নাকি আত্মহত্যা! কিন্তু—'

—'থামলেন কেন? কী বলছিলেন বলুন।'

—'কিন্তু আমার বিশ্বাস, মনোতোষবাবু আত্মহত্যা করেননি, কেউ তাঁকে হত্যা করেছে। সত্য করে বলুন দেখি, আপনিও কি মনে মনে এই কথাই বিশ্বাস করেন না?'

ডাক্তার বোস স্তব্ধ হয়ে রইলেন গম্ভীর মুখ। খানিকক্ষণ পরে তিনি ধীরে ধীরে বললেন, 'আর ওই টেবিলের উপরে যে হারাধনের দশটি ছেলের মূর্তি রাখা হয়েছে, তারই বা রহস্য কী? প্রত্যেক ঘরের দেওয়ালে একটা বাজে ছেলে-ভুলানো ছড়াই বা টাঙিয়ে রাখা হয়েছে কেন? আজ নিত্যানন্দ আমাকে আরও কী দেখিয়েছে জানেন? টেবিলের উপর থেকে দুটো মূর্তিই কোথায় অদৃশ্য হয়েছে, সেখানে এখন আছে কেবল আটটা পুতুল।'

অমলেন্দু বিস্মিত স্বরে বললে, 'কিন্তু কাল আমি স্বচক্ষেই দেখেছি, টেবিলের উপরে দশটা পুতুল ছিল।'

ডাক্তার গড়গড় করে বলে গেলেন

'হারাধনের দশটি ছেলে
ঘোরে পাড়াময়,
একটি কোথা হারিয়ে গেল

রইল বাকি নয়।
হারাধনের নয়টি ছেলে
কাটতে গেল কাঠ,
একটি কেটে দুখান হল
রইল বাকি আট।'

—রইল বাকি আট। আমাদের দলের দুজন লোকের মৃত্যু হয়েছে, টেবিলের উপর থেকেও অদৃশ্য হয়েছে দুটো পুতুল। এ থেকে ভবিষ্যতের কোনো সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাচ্ছেন কি?'

অমলেন্দু বললে, 'পাচ্ছি বই কি! ভয়াবহ ইঙ্গিত! কিন্তু মূর্তি দুটো সরালে কে?'

—'নিত্যানন্দ বলে, আমরা কয়জন ছাড়া এই দ্বীপে আর জনপ্রাণী নেই।'

—'নিত্যানন্দ ভুল বলেছে। কিংবা সে মিথ্যা কথা বলেছে!'

—'কিন্তু সে মিথ্যা বলেছে বলে আমার মনে হয় না। তার মুখ ভয়ে একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে।'

অমলেন্দু বললে, 'দেখুন, মোটরলাঞ্চও আর ফিরল না। সবই সন্দেহজনক!! বাতাস কোনদিকে বইছে, বেশ বোঝা যাচ্ছে না কি? এখানে কীভাবে অতিথি সৎকার হবে, সেটাও ভাববার সময় এসেছে। শেষ পর্যন্ত হয়তো আমাদের মৃতদেহ সৎকারের লোকই খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

ডাক্তার বোস বললেন, 'অথচ আমরা ছাড়া দ্বীপে আর কেউ নেই!'

অমলেন্দু দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'নিশ্চয়ই কেউ আছে! নইলে একে একে দুটো পুতুল সরিয়ে রাখলে কে? ছোটো দ্বীপ, এটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে বেশি বেগ পেতে হবে না।'

—'কিন্তু সত্যই যদি কারুকে খুঁজে পাওয়া যায়, সে হবে বিপজ্জনক মারাত্মক শত্রু। আমাদের সে ক্ষমা করবে না।'

অমলেন্দু বললে, 'কারুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হলে তার চেয়ে আমরাই হব বেশি মারাত্মক। মহেন্দ্রবাবুকেও আমাদের সঙ্গে নিতে হবে। এরকম কাজের পক্ষে তিনি হচ্ছেন যোগ্য ব্যক্তি। এসব কথা আর কারুর কাছে বলবার দরকার নেই, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়।'

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

ক

দ্বীপটা খুঁজে দেখবার প্রস্তাব শুনে মহেন্দ্র সায় দিলে সানন্দে। বললে, 'পুতুল দুটো অদৃশ্য হওয়া অত্যন্ত সন্দেহজনক ব্যাপার। ধরলুম, নিত্যানন্দই তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে। কিন্তু মনোতোষবাবুর মৃত্যুকে আপনারা কি আত্মহত্যা বলে মনে করেন?'

ডাক্তার বোস বললেন, 'না। আত্মহত্যা করবার জন্যে কেউ এই বিজন দ্বীপে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসে না। মনোতোষবাবু ছিলেন জীবন্ত যৌবনের প্রতিমূর্তি, একেবারে আনন্দময় পুরুষ। তিনি যে পকেটে করে 'সায়ানাইড' বিষ নিয়ে এখানে এসেছিলেন, একথা কল্পনা করাও অসম্ভব।'

মহেন্দ্র বললে, 'হ্যাঁ আমি সে-কথা মানি। মনোতোষবাবুর মতো মানুষ পকেটে বিষ নিয়ে আমোদ করে বেড়াতে আসতে পারে না। কিন্তু তাঁর গেলাসে বিষ গেল কী করে?'

অমলেন্দু বললে, 'সেটাও আমি ভেবে দেখেছি। মনোতোষবাবু খানিকটা লেমোনেড পান করে গেলাসটা টেবিলের উপরে রেখে আমাদের কাছে এসেছিলেন। টেবিলটা ছিল খোলা জানলার সামনে। সেই সময়ে বাইরের কোনো লোক নিশ্চয়ই জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে 'সায়নাইড' ফেলে দিয়েছিল গেলাসের ভিতরে। তারপর মনোতোষবাবু আবার গেলাসে চুমুক দিতে যান আর মারা পড়েন সঙ্গে সঙ্গেই।'

অবিশ্বাসের স্বরে মহেন্দ্র বললে, 'জানলা দিয়ে কেউ গেলাসে বিষ ফেলে দিলে আর আমরা তাকে দেখতে পেলুম না?'

অমলেন্দু বললে, 'আমরা সকলেই তখন দ্বীপের ব্যাপার নিয়ে যথেষ্ট অন্যমনস্ক হয়ে ছিলুম।'

ডাক্তার বললেন, 'সে কথা সত্য। আমাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ শুনে আমরা তখন সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। সে সময়ে আমাদের কারুরই দৃষ্টি ছিল না জানলার দিকে।'

মহেন্দ্র বললে, 'আমার যা বিশ্বাস তাই বললুম। আচ্ছা, এইবারে আমাদের অন্বেষণা শুরু করা যাক। আমাদের কারুর কাছে অন্তত একটা 'রিভলভার' থাকলে ভালো হত। কিন্তু সে আশা করা বৃথা।'

অমলেন্দু নিজের পকেটের উপরে হাত রেখে বললে, 'আমার কাছে একটা রিভলভার আছে।'

দুই চক্ষু অত্যন্ত বিস্ফারিত করে মহেন্দ্র বললে, 'আপনি সর্বদাই সঙ্গে রিভলভার রাখেন?'

অমলেন্দু বললে, 'সাধারণত তাই রাখি বটে। জীবনে বারবার আমাকে বিপদ-আপদের মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়েছে। কাজেই এটা অভ্যাসের মধ্যেই দাঁড়িয়ে গেছে।'

মহেন্দ্র বললে, 'তাই নাকি? তা এখানকার মতো ভয়াবহ বিপদের মাঝখানে আমরা বোধহয় আর কখনো পড়িনি। যদি এই দ্বীপের কোথাও কোনো উন্মাদগ্রস্ত হত্যাকারী লুকিয়ে থাকে, তাহলে সে দু-একটা রিভলভার কি ছোরাছুরি নয়, দস্তুরমতো একটা অস্ত্রশালার অধিকারী হতে পারে।'

ডাক্তার বললেন, 'আপনার এ-অনুমান হয়তো ঠিক নয়। আমি দেখেছি এ শ্রেণির হত্যা-ব্যাধিগ্রস্ত পাগলকে চোখে দেখলে চেনা যায় না। মনে হয়, তারা বেশ নিরীহ ব্যক্তি।

মহেন্দ্র বললে, 'কিন্তু এই দ্বীপবাসী উন্মত্ত যে নিরীহ ব্যক্তি, আমার তা মনে হয় না।'

খ

তারা তিন জনে দ্বীপটা ভালো করে খুঁজে দেখবার জন্যে বেরিয়ে পড়ল। ছোটো দ্বীপ। মাঝে মাঝে বনজঙ্গল থাকলেও তা খুব গভীর ও দুর্ভেদ্য নয়। চারিদিকটা ঘুরে আসতে গেলে খুব দীর্ঘকালের দরকার হবে না।

খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় তারা জলের ধারে এসে পড়ল। সেইখানে প্রায় সমুদ্রের মতো বিশাল নদীর মোহনার দিকে মুখ করে মূর্তির মতো বসে আছেন মেজর সেন। তাঁর দৃষ্টি দিকচক্রবালরেখার দিকে বিস্তৃত। আগন্তুকদের পদশব্দেও তিনি একবারও ফিরে তাকালেন না। সেখানে তিনি ছাড়া যে আর কারও অস্তিত্ব আছে, এ সম্বন্ধেও যেন তাঁর কোনো চেতনাও নেই!

মহেন্দ্র ভাবলে, এটা যেন কেমন অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। মেজর সেন কি সমাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন? গলা তুলে সে বললে, 'বাঃ আপনি তো বেশ শান্তিপূর্ণ জায়গাটি বেছে নিয়েছেন!'

দুই ভুরু সঙ্কুচিত করে মেজর কাঁধের উপর দিয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। বললেন, 'আর সময় নেই, হাতে আর বেশি সময় নেই। এখন আমাকে কেউ যেন বিরক্ত না করে।'

মৃদুকণ্ঠে মহেন্দ্র বললে, 'আমরা আপনাকে বিরক্ত করতে আসিনি। দ্বীপটা খুঁজে দেখছি; হয়তো ঝোপঝাপের ভিতরে কোনো শত্রু লুকিয়ে থাকতে পারে।'

মেজর সেন আবার ভুরু সঙ্কুচিত করে বললেন, 'আপনারা বুঝতে পারবেন না—আপনারা কিছুই বুঝতে পারবেন না। দয়া করে আমাকে একলা থাকতে দিন।'

মহেন্দ্র তাঁর কাছ থেকে ফিরে আসতে আসতে বললে, 'ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ওঁর সঙ্গে কথা কয়ে লাভ নেই।'

অমলেন্দু কৌতূহলী হয়ে শুধোলে, 'উনি কী বললেন?'

—'ওঁর হাতে আর সময় নেই। আমরা যেন ওঁকে আর বিরক্ত না করি।'

ডাক্তার চিন্তিত মুখে বলেন, 'আশ্চর্য! এ আবার কী কথা?'

গ

সারা দ্বীপটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কারুর পাত্তা পাওয়া গেল না।

তারা তিন জনে নদীর অতিদূরবর্তী অস্পষ্ট সীমারেখার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কোথাও একখানা নৌকা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। বাতাস ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে।

অমলেন্দু বললে, 'বোধ হচ্ছে ঝড় উঠবে। নিকুচি করেছে, এখান থেকে ওপারের কোনো গ্রাম পর্যন্ত দেখা যায় না। অথচ তীরের কাছাকাছি খাজুরী আর নন্দীগ্রাম বলে দুটো পল্লি আছে। আমরা কি আগুন-টাগুন জ্বেলে গ্রামবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি না?'

মহেন্দ্র বললে, 'শুকনো বনে আগুন লাগিয়ে দেখলে হয়।'

অমলেন্দু বললে, 'কিন্তু আমার মনে হয় সে গুড়েও বালি। যে শয়তান এমন আটঘাট বেঁধে আমাদের এই দ্বীপে এনে ফেলেছে, সে কি ও কথাও ভেবে দেখেনি?'

মহেন্দ্র বললে, 'আপনার কথার মানে?'

—'ঠিক মানে যে কী তাও বলা কঠিন। হয়তো গ্রামবাসীদের আগে থাকতেই

জানিয়ে রাখা হয়েছে, দ্বীপ থেকে আমরা কেউ নিশানা বা সংকেত করলেও তারা যেন কিছুই গ্রাহ্যের মধ্যে না আনে।'

—'আর গ্রামবাসীরা সুবোধ বালকের মতো এই প্রস্তাবে সায় দেবে?'

—'হয়তো তাদের বলা হয়েছে, জয়কয়েক লোককে ঠাট্টা করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এই দ্বীপের মধ্যে, একটা বাজি জেতবার জন্যে।'

ঘ

স্বপ্নার আর ভালো লাগছিল না সৌদামিনীকে। কী কঠিন স্ত্রীলোক। তাঁর দ্বারা অপমানিত হয়ে এক অভাগি আত্মহত্যা করলে, তবু তিনি অনুতপ্ত নন? তাঁর মনে দুঃখের লেশ নেই?

সৌদামিনী তার সামনে সিধে হয়ে বসে নির্বাক মুখে বুনে যাচ্ছিলেন পশমের কী একটা জিনিস। তাঁর সান্নিধ্য স্বপ্নার আর সহ্য হল না। সে উঠে পড়ে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর লক্ষ্যহীনের মতো বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে পড়ল দ্বীপের কিনারায়। সেখানে তেমনি নিশ্চল হয়ে বসেছিলেন মেজর সেন।

স্বপ্না যখন তাঁর কাছে দিয়ে দাঁড়াল, তিনি মুখ তুলে কী রকম একটা উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। কেন সে জানে না, তার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল।

মেজর বললেন, 'ও তুমি! তুমি এখানে এসেছ?'

স্বপ্না তাঁর পাশে গিয়ে বসে বললে, 'এখানে চুপ করে বসে জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে আপনার বুঝি ভালো লাগছে?'

মাথা নেড়ে শান্তভাবে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। বেশ জায়গা। এখানে বসে অপেক্ষা করতে ভালো লাগে।'

স্বপ্না একটু সচকিত ভাবে বললেন, 'অপেক্ষা? কার জন্যে আপনি অপেক্ষা করছেন?'

মেজর তেমনি শান্তভাবেই বললেন, 'আমি অপেক্ষা করছি শেষ পরিণামের জন্যে। একথা কি তুমি জানো না? আমরা সকলেই তো অপেক্ষা করছি শেষ পরিণামের জন্যে।'

স্বপ্নার প্রাণটা ধড়ফড় করে উঠল। সে তাড়াতাড়ি বললে, 'আপনি কী বলতে চান?'

মেজর সেন গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, 'আমরা কেউ আর এই দ্বীপ থেকে ফিরে যাব না। শীঘ্রই আমাদের মুক্তির দিন আসছে।'

স্বপ্না উঠে দাঁড়াল। সভয়ে বললে, 'আপনি কী বলতে চান, আমি বুঝতে পারছি না।'

মেজর বললেন, 'আমি বুঝতে পেরেছি বাছা, আমি বুঝতে পেরেছি।'

স্বপ্না উদ্বিগ্ন বললে, 'না, না, আপনি কিছুই বুঝতে পারেননি।'

মেজর আবার জলের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, কোনো জবাব দিলেন না। সেখানে যে আর কেউ হাজির আছে, একথাও তিনি যেন ভুলে গেলেন।

স্বপ্না আর সেখানে দাঁড়াল না, দ্রুতপদে বাড়ির দিকে আসতে আসতে শুনতে পেলে, মেজর সেন আপন মনেই শান্তকণ্ঠে বলছেন, 'মুক্তি মুক্তি! মুক্তির আর বিলম্ব নেই।'

৬

নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই মহেন্দ্র দেখলে, দোতলার বারান্দার রেলিং ধরে ডাক্তার বোস চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন, সমুদ্রের দিকে প্রসারিত তাঁর দৃষ্টি।

মহেন্দ্রের সাড়া পেয়েই চমক ভাঙল ডাক্তারের। তিনি বললেন, 'মহেন্দ্রবাবু, আমার মনে জেগেছে এক দুর্ভাবনা।'

মহেন্দ্র বললে, 'দুর্ভাবনা নিয়ে আমরা সকলেই তো এখানে ব্যস্ত হয়ে আছি।'

অধীরভাবে হাত নেড়ে ডাক্তার বললেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু আমি সকলকার কথা বলছি না। আমি ভাবছি মেজর সেনের কথা।'

—'মেজর সেনের কথা?'

অত্যন্ত নীরসকণ্ঠে ডাক্তার বললেন, 'হ্যাঁ, আমাদের সকলেরই বিশ্বাস, আমরা পড়েছি কোনো উন্মাদগ্রস্ত হত্যাকারীর পাল্লায়। মেজর সেনকে দেখলে আপনার কী মনে হয়?'

সচমকে মহেন্দ্র বলল, 'আপনি কি তাঁকে উন্মাদগ্রস্ত বলে মনে করেন?'

ডাক্তার দ্বিধাভরা কণ্ঠে বললেন, 'হয়তো এ-রকম কথা বলা আমার উচিত হয়নি। আমি ডাক্তার হলেও উন্মাদ রোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নই। মেজরের সঙ্গে এদিক নিয়ে আমরা কোনো কথা হয়নি, সুতরাং আমি নিশ্চিত ভাবে কিছুই বলতে পারি না।'

সেই সময়ে দুজনেই দেখলেন, নীচেকার চত্বর পার হয়ে অমলেন্দু ডান দিকে ফিরে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। ভূতপূর্ব ডিটেকটিভ মহেন্দ্র বললে, 'ডাক্তারবাবু, আমার কী মনে হয় জানেন?'

—'কী?'

—'ওই লোকটি ভালো নয়।'

—'অমলেন্দুবাবু? কেন?'

—'কেন তা আমি ঠিক জানি না। কিন্তু অমলেন্দুবাবুকে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারব না।'

ডাক্তার বললেন, 'শুনেছি জীবনে উনি অনেক দুঃসাহসিক কাজ করেছেন।'

—'হ্যাঁ, কিন্তু তাঁর কোনো কোনো দুঃসাহসিক কাজের কথা দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করা চলে না।' সে একটু চুপ করে থেকে আবার বললে, 'ডাক্তারবাবু, আপনার সঙ্গে কি সর্বদাই 'রিভলভার' থাকে?'

ডাক্তার চমকিত হয়ে বিস্ফারিত চক্ষে বললেন, 'আমার সঙ্গে—কী আশ্চর্য, নিশ্চয়ই নয়! আমি কেন রিভলভার সঙ্গে রাখব?'

মহেন্দ্র বললে, 'কিন্তু অমলেন্দুবাবু সর্বদাই রিভলভার পকেটে রাখেন কেন?'

ডাক্তার বললেন, 'হয়তো এটা হচ্ছে কু-অভ্যাস। যাক ও কথা। সারা দ্বীপ খুঁজেও আপনারা যখন জনপ্রাণীকেও আবিষ্কার করতে পারলেন না, তখন আমার মনে হয়, হয়তো কেউ এই বাড়ির ভিতরেই লুকিয়ে আছে। মস্ত বাড়ি, ঘর। এখানটা তো এখনও খুঁজে দেখা হয়নি।'

মহেন্দ্র বললে, 'বেশ, এইবারে বাড়িটাই খুঁজে দেখা যাক। হয় এখানে কারুকে খুঁজে পাব, নয়তো এই দ্বীপের ভিতরে বাইরের জনপ্রাণী নেই।'

॥ নবম পরিচ্ছেদ ॥

ক

সারা বাড়িখানা তারা পাঁতিপাঁতি করে খুঁজতে বাকি রাখলে না, কিন্তু কোথাও কোনো অচেনা মানুষ তো দূরের কথা, একটা কুকুর-বিড়ালেরও সাড়া পাওয়া গেল না।

অমলেন্দু ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 'তাহলে আমাদেরই ধারণা

ভ্রান্ত দেখছি। এখানে উপর উপরি দুটো আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে বলে আমরা যতসব আজব কল্পনা আর কুসংস্কারের দুঃস্বপ্ন নিয়ে ভেবে সারা হচ্ছি।'

ডাক্তার বোস গম্ভীর স্বরে বললেন, 'কিন্তু আমাদের এই ভয় যুক্তিসঙ্গত। আমি হচ্ছি ডাক্তার, অনেক আত্মঘাতীকে আমি দেখেছি। মনোতোষবাবুর চেহারা আর প্রকৃতি আত্মঘাতীদের মতো ছিল না।'

অমলেন্দু সন্দেহজড়িত কণ্ঠে বললে, 'সেটা দৈব-দুর্ঘটনাও তো হতে পারে।'

মহেন্দ্র সে-কথা আমলে না এনে বলে উঠল, 'আরে রাখুন মশাই আপনার দৈব-দুর্ঘটনা! তাহলে সত্যবালার মৃত্যুও তো একটা দৈবদুর্ঘটনা হতে পারে?'

অমলেন্দু বললে, 'কেমন করে, শুনি?'

মহেন্দ্র কেমন যেন কিন্তু কিন্তু করতে লাগল। একটু চুপ করে থেকে সে হঠাৎ বললে, 'ডাক্তার, সত্যবালাকে আপনি একটা ঘুমোবার ওষুধ দিয়েছিলেন না?'

ডাক্তার বোস তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'হ্যাঁ, দিয়েছিলুম বটে।'

—'ওষুধটা কী?'

—'আমি তাকে এক মাত্রা Trional দিয়েছিলুম। অত্যন্ত নির্দোষ জিনিস।'

মহেন্দ্র বললে, 'কিন্তু মাত্রাটা একটু অতিরিক্ত হয়ে যায়নি তো?'

ডাক্তার ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'আপনি কী বলতে চান আমি বুঝতে পারছি না।'

—'আমি বলতে চাই যে, ভুল করে মাত্রা আপনি খানিকটা বাড়িয়ে ফেলেছিলেন। এমন ব্যাপারও তো মাঝে মাঝে হয়?'

ডাক্তার তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, 'আমি কিছুমাত্র ভুল করিনি। আপনার ইঙ্গিত হচ্ছে হাস্যকর।' বলেই একটু থেমে তিনি আবার কণ্ঠস্বরকে রীতিমতো কর্কশ করে তুলে বললেন, 'আপনি কি বলতে চান যে সত্যবালাকে আমি ইচ্ছা করেই বেশি মাত্রায় ওষুধ দিয়েছি?'

অমলেন্দু তাড়াতাড়ি বললে, 'দেখছি আপনারা দুজনেই উত্তেজিত হয়েছেন। এমন অশোভন বাদ-প্রতিবাদের দরকার কী?'

মহেন্দ্র বললে, 'ডাক্তার বোস হঠাৎ ভুল করে ফেলেছেন, এইটুকুই আমি বলতে চাইছি।'

ডাক্তার জোর করে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'বন্ধু, ডাক্তারদের এমন ভুল করলে চলে না।'

কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে মহেন্দ্র বললে, 'ওই গ্রামোফোন রেকর্ডের কথা

বিশ্বাস করলে বলতে হয়, আগেও আপনি এইরকম ভুল করে ফেলেছেন।'

ডাক্তার মুখ হয়ে গেল রক্তহীন। অমলেন্দু উত্তপ্ত কণ্ঠে বললে, 'মহেন্দ্রবাবু এ আপনি কী করছেন? আমরা সকলেই একই ফুটো-নৌকোর যাত্রী। ভুলে যাবেন না, গ্রামোফোন রেকর্ড জ্যোতির্ময় বসুর মৃত্যুর জন্যে দায়ী করেছে আপনাকেই।'

মহেন্দ্র দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে এক-পা এগিয়ে গেল। বিকৃত মুখে সে বললে, 'চুলোয় যাক, জ্যোতির্ময় বসু! রাবিশ, মিছে কথা! অমলেন্দুবাবু, আমাকে নিয়ে টানাটানি করবেন না, নিজের কথাটাও ভেবে দেখুন!'

দুই ভুরু উপর দিকে তুলে অমলেন্দু বললে, 'আমার কথা!'

—'হ্যাঁ। আপনি হচ্ছেন এখানকার এক আমন্ত্রিত অতিথি। সামাজিক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলে কেউ কখনো সঙ্গে নিয়ে যায় 'রিভলভার'? আমি এই প্রশ্নের উত্তর চাই।'

মহেন্দ্রের দিকে একটা অত্যন্ত বিতৃষ্ণা-ভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অমলেন্দু বললে, 'তাই নাকি? এই প্রশ্নের উত্তর চান আপনি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই!'

অমলেন্দু অপ্রত্যাশিতভাবে বললে, 'দেখুন মহেন্দ্রবাবু, আপনাকে যতটা বোকা দেখায় আপনি ততটা বোকা নন।'

—'হতে পারে। কিন্তু 'রিভলভার' সম্বন্ধে আপনি কী বলতে চান?'

এইবার অমলেন্দুর মুখে ফুটল হাসি, সে বললে, 'একটা বিপজ্জনক স্থানে আসতে হবে বলেই সঙ্গে আমি 'রিভলভার' এনেছি।'

অত্যন্ত সন্দিগ্ধস্বরে মহেন্দ্র বললে, 'আপনি এ কথা তো আগে আমাদের বলেননি?'

—'না।'

—'তাহলে আপনি আমাদের উপরে পাহারা দিতে এসেছেন?'

—'ধরুন তাই।'

—'আসল ব্যাপারটা কী, খুলে বলুন দেখি?'

অমলেন্দু আস্তে আস্তে বললে, 'বাইরে আমি সকলকে জানাতে চেয়েছি যে, আর-সকলের মতো আমিও এখানে এসেছি আমন্ত্রিত অতিথির মতো। সেটা ঠিক সত্য কথা নয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে এই : অ্যাটর্নি বিজন বোস ডেকে পাঠিয়েছিল

আমাকে। সে বললে, যথেষ্ট বিপদ-আপদেও আমি মাথা ঠিক রেখে কাজ করতে পারি, আমার নাকি এই-রকম খ্যাতি আছে। অতএব আমি যদি এখানে এসে সকলের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারি, তাহলে আমার লভ্য হবে পাঁচ হাজার টাকা। আমি ধনী নই, লোভে পড়ে রাজি হয়ে গেলুম।'

কিন্তু অমলেন্দুর কথা মহেন্দ্রের মনে লাগল না। সে বললে, 'এসব কথা তো আপনি কালকেই আমাদের জানাতে পারতেন?'

অমলেন্দু শেষটা নাচারের মতন বললে, 'প্রিয় মহেন্দ্রবাবু, এখানে যে কী-রকম অভাবিত কাণ্ড-কারখানা হবে, কাল তা আমি জানব কেমন করে?'

ডাক্তার বোস বললেন, 'তাহলে কালকের ব্যাপার দেখেশুনে আজ আপনার মত বদলে গেছে?'

একটা কালো ছায়া এসে পড়ল অমলেন্দুর মুখের উপর। সে নীরস স্বরে থেমে থেমে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আজ জেনেছি আমরা সবাই হচ্ছি একই ফুটো-নৌকোর যাত্রী। ওই পাঁচ হাজার টাকা হচ্ছে একটা বাজে টোপ, আর সেই টোপ গিলেছি আমি নির্বোধ মাছের মতো। আমরা ফাঁদে পা দিয়েছি মশাই, সকলেই একসঙ্গে একই ফাঁদে পা দিয়েছি। মনোতোষবাবুর মৃত্যু! সত্যবালার মৃত্যু! টেবিলের উপর থেকে দু-দুটো পুত্তলিকার অন্তর্ধান। এসবই হচ্ছে ভয়াবহ দুর্লক্ষণ! কিন্তু কে যে এই বিষম ফাঁদ পেতেছে তা আমরা কেউই জানি না, কারণ সেই শয়তান আমাদের সামনে এসে এখনও হয়নি মূর্তিমান!'

খ

দুপুরের আহারের জন্য ডাক এল। সকলে খাবার ঘরে গিয়ে দেখলে, টেবিলের উপরে সারি সারি সাজানো রয়েছে বিবিধ আহার্যের পাত্র।

একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল নিত্যানন্দ। তার স্থির মুখের পানে তাকালে তার মনের ভাব কিছুই ধরবার জো নেই।

অমলেন্দু বললে, 'লাঞ্চ-ও ফিরে আসেনি, দ্বীপেও হাট-বাজার নেই। লাঞ্চ যদি না আসে, আর এই দ্বীপে যদি আমাদের কিছুদিন বন্দি থাকতে হয়, তাহলে আমাদের খোরাক জুটবে কেমন করে নিত্যানন্দ?'

—'আজ্ঞে, ভাঁড়ার ঘরে অনেক চাল, ডাল, আটা আর অন্যান্য জিনিস মজুত আছে। বিলিতি টিনের খাবারও এনে রাখা হয়েছে যথেষ্ট। বাহির থেকে খাবার না এলেও আমরা বেশ কিছুকাল চালিয়ে নিতে পারব।'

জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে মহেন্দ্র বললে, 'আকাশে মেঘ তো ক্রমেই পুরু হয়ে জমে উঠছে দেখছি। যদি দু-চার দিন ধরে দুর্যোগ চলে আর বাইরের কেউ এই দ্বীপের নাগাল না ধরতে পারে, তাহলে আমাদের অনাহার করতে হবে না শুনে নিশ্চিন্ত হলুম।'

সৌদামিনী বললেন, 'আমরা তো সবাই হাজির আছি, কিন্তু মেজর সেন কোথা?'

স্বপ্না বললে, 'মেজর সেন সমুদ্রের ধারে বসে আছেন। তাঁকে কেমন অন্যমনস্ক দেখলুম! তাঁর কথাও যেন খাপছাড়া বলে মনে হল।'

ডাক্তার বোস উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনারা ডান হাতের ব্যাপার শুরু করে দিন, আমি মেজর সেনকে ডেকে আনছি।'

বাহির থেকে হঠাৎ একটা ঠান্ডা দমকা হাওয়া ঘরের ভিতরে এসে পড়ল।

স্বপ্না বললে, 'ঝড় উঠতে আর দেরি নেই বোধ হয়।'

সকলে খাওয়ার কথা ভুলে উদ্বিগ্ন মুখে দৃষ্টিপাত করলে বাইরের দিকে। বাতাস ক্রমেই ঝোড়ো হয়ে উঠছে, সমুদ্রের কোলাহলও ক্রমেই হয়ে উঠছে উচ্চতর।

নিত্যানন্দ হঠাৎ সচমকে বললে, 'বাইরে কার পায়ের শব্দ হচ্ছে। কে যেন ছুটতে ছুটতে এদিকে আসছে।'

সকলেই শুনতে পেলে চত্বরের উপরে দ্রুত পদশব্দ। সকলেই একসঙ্গে উঠে পড়ে দরজার দিকে ফিরে দাঁড়াল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন ডাক্তার বোস।

হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি বলেন, 'মেজর সেন—'

—'মারা পড়েছেন!' কথাগুলো ফস করে বেরিয়ে পড়ল মহেন্দ্রের মুখ থেকে।

ডাক্তার বললেন, 'হ্যাঁ, মেজর সেন মারা পড়েছেন।'

সাত জন লোক তাকিয়ে দেখলে পরস্পরের মুখের দিকে।

গ

মহেন্দ্র ও অমলেন্দু ধরাধরি করে মেজর সেনের দেহ নিয়ে যখন ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে, ঠিক সেই সময়ে সারা দ্বীপের উপরে জেগে উঠল হু হু করে একটা দুর্দান্ত ঝড়ের দুরন্ত নিশ্বাস।

স্বপ্না খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে বৈঠকখানার ভিতরে গিয়ে ঢুকল। তারপর একটা টেবিলের দিকে তাকিয়ে সে তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় সেইখানে এসে হাজির নিত্যানন্দ।

সচকিত নেত্রে স্বপ্নার দিকে তাকিয়ে সে বললে, 'আমি এখানে দেখতে এসেছি—'

কেন যে চিৎকার করলে তা সে জানে না, কিন্তু স্বপ্না সচিৎকারেই বলে উঠল, 'বুঝেছি নিত্যানন্দ, আমার মতো তুমিও কী দেখতে এসেছ! দ্যাখো, টেবিলের উপরে আছে এখন মোটে সাতটা পুতুল!'

মেজর সেনের দেহ তাঁর শয়নকক্ষে স্থাপন করে অমলেন্দু ও মহেন্দ্র ফিরে এসে দেখলে সকলেই এসে হাজির হয়েছে বৈঠকখানার ভিতরে। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নেমেছে তুমুল বৃষ্টি। জানলার বন্ধ শার্সির উপরে দরদর করে ঝরে পড়ছে জল, সেইদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্বপ্না। চেয়ারের উপরে সিধে হয়ে সৌদামিনী বসে আছেন নিষ্কম্প দীপশিখার মতো।

ডাক্তার বোস ঘরের ভিতরে তাড়াতাড়ি পায়চারি করছেন। চন্দ্রবাবু কৌচের উপরে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট, তাঁর দুই চক্ষু অর্ধমুদ্রিত।

তারপর সোজা হয়ে বসে চোখ খুলে চন্দ্রবাবু বললেন, 'তারপর, ডাক্তার!'

ডাক্তার পায়চারি বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বিবর্ণমুখে বললেন, 'এবারে আর মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কিছুই নেই। মেজর সেনের মাথার পিছন দিকে কোনো কঠিন জিনিস দিয়ে কে প্রচণ্ড আঘাত করেছে!' ঘরের ভিতরে শোনা গেল কয়েকজনের অস্ফুট কণ্ঠস্বর।

চন্দ্রবাবু শান্তভাবেই বললেন, 'যা দিয়ে আঘাত করা হয়েছে, সেটা কি আপনি দেখেছেন?'

—'না।'

—'কিন্তু মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত?'

—'হ্যাঁ।'

চন্দ্রবাবু নিজের কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, 'আজ সকালে আমি যখন চত্বরের পরে ইজিচেয়ারে বসেছিলুম, তখন একটা বিষয় লক্ষ করেছি। আপনারা কেউ কেউ আনাগোনা করছিলেন দ্বীপের এদিকে-ওদিকে। কারণটা বুঝতে আমার দেরি হয়নি। আপনারা দ্বীপটা খুঁজে দেখছিলেন, কোনো হত্যাকারী ওইখানে লুকিয়ে আছে কি না?'

অমলেন্দু বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি ঠিক আন্দাজ করেছেন।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'তাহলে আমার মতো আপনারাও বুঝতে পেরেছেন যে, মনোতোষবাবুর আর সত্যবালার মৃত্যু দৈব-দুর্ঘটনা কি আত্মহত্যা নয়। আর এতক্ষণে আপনারা নিশ্চয় এটাও ধারণা করতে পেরেছেন যে, কোন উদ্দেশ্যে আমাদের সকলকে ভুলিয়ে এই দ্বীপে নিয়ে আসা হয়েছে।'

মহেন্দ্র গর্জন করে বললে, 'আমরা কোনো পাগল খুনির পাল্লায় পড়েছি।'

খক খক করে খানিকটা কেশে নিয়ে চন্দ্রবাবু বললেন, 'হয়তো তাই, কিন্তু এখন তা নিয়ে মাথা ঘামানো বৃথা। আপাতত আমাদের ভেবে দেখা উচিত, সবাই কী করে নিজের প্রাণ রক্ষা করতে পারি।'

ডাক্তার বোস কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু দ্বীপে বাইরের আর কেউ নেই! নিশ্চয়ই কেউ নেই!'

নিজের চিবুকের উপরে অঙ্গুলি দ্বারা আঘাত করতে করতে চন্দ্রবাবু বললেন, 'এক হিসাবে আপনার মত ভ্রান্ত নয়। আমিও আজ সকলে ওই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছিলুম। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেই আমি আপনাদের বলতে পারতুম, এই দ্বীপের মধ্যে কোনো অজানা খুনিকেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ সেই হত্যাকারী আছে এই দ্বীপের মধ্যেই। আইন যাদের স্পর্শ করতে পারে না, তার নিজের মনগড়া এমন কয়েকজন অপরাধীকেই দিতে চায় সে প্রাণদণ্ড। তার ফলে একে একে তিন জন লোক মারা পড়ল। অতএব আমাদের এই দণ্ডদাতা আছে এই দ্বীপের মধ্যেই—'

—'কিন্তু এই দ্বীপের ভিতরে কেমন করে সে লুকিয়ে আছে? খুব সহজেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। সে হচ্ছে আমাদেরই একজন।'

ঘ

—'না, না না না!'

চিৎকার করে উঠল স্বপ্না—প্রায় ক্রন্দিত কণ্ঠেই।

কয়েকমুহূর্ত তার মুখের দিকে চুপ করে তাকিয়ে থেকে চন্দ্রবাবু বললেন, 'প্রিয় স্বপ্না দেবী, সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে সত্যকে অবহেলা করা চলে না। আমরা ভীষণ বিপদের মাঝখানে এসে পড়েছি। আমাদেরই মধ্যে একজন হচ্ছে হত্যাকারী। কিন্তু সে যে কে, তা আমরা জানি না। আমরা যে দশ জন লোক এই দ্বীপে এসেছি, তাদের ভিতর থেকে মৃত তিন জনকে এখন বলা চলে সন্দেহের অতীত। বাকি আছি আমরা সাত জন।'

চন্দ্রবাবু একে একে প্রত্যেকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে আবার বললেন, 'আমি যা বললুম, আপনারা কি তা সত্য বলে মানতে রাজি আছেন?'

ডাক্তার বোস বললেন, 'অদ্ভুত কথা! অথচ আপনার কথা সত্য বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

মহেন্দ্র বললে, 'হ্যাঁ, ওঁর কথাই ঠিক। আর আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহলে আমার সন্দেহের কথা আমি বলতে পারি—'

চন্দ্রবাবু হাত তুলে মহেন্দ্রকে স্তব্ধ হবার জন্যে ইঙ্গিত করে বললেন, 'আপনার সন্দেহের কথা নিয়ে পরে আলোচনা করলেও চলবে। আপাতত আমার মতে সকলে সায় দিচ্ছেন তো?'

সৌদামিনী একটুও এপাশে-ওপাশে হেললেন না, ঠিক সিধে হয়ে বসেই বললেন, 'চন্দ্রবাবু, আপনার কথা যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হচ্ছে। আমাদের এক জনের ঘাড়ে চেপেছে শয়তান।'

স্বপ্না অস্ফুটকণ্ঠে বললে, 'আমি একথা বিশ্বাস করতে পারি না। না, এ হচ্ছে অসম্ভব!'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'আপনার কী মত অমলেন্দুবাবু?'

—'আমিও আপনার কথায় সায় দিচ্ছি।'

চন্দ্রবাবুর মুখে ফুটল ক্ষীণ হাসির রেখা। তারপর তিনি বললেন, 'এখন প্রমাণগুলো পরীক্ষা করা যাক। আমাদের মধ্যে কোনো এক ব্যক্তিকে বিশেষ সন্দেহ করবার কারণ আছে কি? মহেন্দ্রবাবু, আমার মনে হয় এ-সম্বন্ধে আপনি যেন কিছু বলতে চান?'

মহেন্দ্র জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললে, 'অমলেন্দুবাবু পকেটে রিভলভার নিয়ে এখানে এসেছেন। কাল এ-কথা তিনি কারুকে জানাননি। কিন্তু আজ স্বীকার করেছেন।'

অমলেন্দু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, 'কাল কিছু না বলার কারণ ওঁদের জানিয়েছি, চন্দ্রবাবু। আপনিও কারণটা শুনুন।' চন্দ্রবাবুর কাছে সব কথা সে আবার খুলে বললে।

মহেন্দ্র তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে, 'আপনার কথা যে সত্য তার প্রমাণ কোথায়?'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সকলেরই অবস্থা এক-রকম। একমাত্র প্রমাণ আমাদের মুখের কথাই।' তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে তিনি আবার বললেন, 'আমরা যে কী রকম অদ্ভুত অবস্থায় এসে পড়েছি, কেউ বোধহয় সেটা এখনও ভালো করে বুঝতে পারছেন না। এখন কাজ করতে হবে মাত্র এক উপায়ে। আমাদের মধ্যে এমন লোক কে কে আছেন, যাঁদের মনে করা যেতে পারে সকল সন্দেহের অতীত?'

ডাক্তার বোস তাড়াতাড়ি বললেন, 'ডাক্তারি পেশায় আমি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। আমার উপরে এমন সন্দেহ কেউই করতে পারবেন না যে—'

চন্দ্রবাবু হাত তুলে তাঁকে স্তব্ধ হতে ইঙ্গিত করে বললেন, 'আমিও একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। কিন্তু মশাই, তার দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না। ডাক্তাররাও পাগল হয়ে যেতে পারে, বিচারকরাও পাগল হতে পারে। এই হিসাবে—' মহেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'পুলিশের পক্ষেও পাগল হওয়া অসম্ভব নয়।'

অমলেন্দু বললে, 'আমাদের দলে দুই জন মহিলা আছেন, আশা করি তাঁরা হচ্ছেন সকল সন্দেহের অতীত।'

নীরস কণ্ঠে চন্দ্রবাবু বললেন, 'আপনি কি বলতে চান, মেয়েরা কোনোদিন খুন-খারাপি করেনি?'

অমলেন্দু বিরক্তভাবে বললেন, 'নিশ্চয়ই তা মনে করি না। কিন্তু এক্ষেত্রে এটা বোধহয় অসম্ভব যে—'

চন্দ্রবাবু তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই ডাক্তারের দিকে ফিরে বললেন, 'প্রিয় ডাক্তার, মেজর সেনের মাথায় আপনি যে ক্ষতচিহ্ন দেখেছেন, কোনো স্ত্রীলোক কি তাঁকে সে-ভাবে আঘাত করতে পারে?'

ডাক্তার শান্তকণ্ঠে বললেন, 'নিশ্চয়ই পারে, অবশ্য উপযোগী অস্ত্র হতে পেলে।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'এখানকার আর দুটো মৃত্যুর কারণ হচ্ছে, বিষ। পুরুষের মতো বিষ ব্যবহার করতে পারে যে-কোনো স্ত্রীলোকও।'

স্বপ্না ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'চন্দ্রবাবু, আপনিও পাগলের মতো কথা বলছেন!'

তার মুখের দিকে স্থির নেত্রে তাকিয়ে চন্দ্রবাবু ওজন-করা স্বরে বললেন, 'প্রিয় স্বপ্না দেবী, শান্ত হোন। আমি আপনার বিরুদ্ধে কোনোই অভিযোগ করছি না। আর সৌদামিনী দেবী, আমরা প্রত্যেকেই যে সন্দেহভাজন হতে পারি, আমার এ-কথায় আপনিও বোধহয় রাগ করেননি?'

সৌদামিনী বসে বসে শুনছিলেন। মুখ না তুলেই স্থির কণ্ঠে তিনি বলেন, 'আমি যে তিন-তিন জন মানুষকে হত্যা করতে পারি, আমাকে যিনি চেনেন নিশ্চয়ই তিনি এমন অসম্ভব কথা ভাবতে পারবেন না। তবে এটাও ঠিক যে, আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে অপরিচিত, সুতরাং কেউ কারুকেই বিশ্বাস করতে পারিনি। অতএব আমি আগে যা বলেছি এখনও তাই বলছি : আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কেউ আছে, যে হচ্ছে সত্যিকার শয়তান।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই। আমরা কেউই সন্দেহের অতীত নই।'

অমলেন্দু বললে, 'কিন্তু নিত্যানন্দের সম্বন্ধে কী বলতে চান?'

—'তার মানে?'

—'আমার তো মনে হয় নিত্যানন্দের উপরে কোনো সন্দেহ করা যেতে পারে না।'

—'কী হিসাবে শুনি?'

—'প্রথমত, এমন ভয়ানক কাজ করবার মতো বুদ্ধি তার আছে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, তার স্ত্রীও হয়েছে নিহত।'

চন্দ্রবাবু দুই ভুরু কপালের উপরে তুলে বললেন, 'যুবক, আমার সামনে এমন কয়েকজন আসামিকে নিয়ে আসা হয়েছে, যাদের সম্বন্ধে অভিযোগ ছিল স্ত্রীকে হত্যা করা। বিচারে তারাও দোষী সাব্যস্ত হয়েছে।'

—'হতে পারে। পৃথিবীতে, পত্নীকে হত্যা করেছে এমন লোকের অভাব নেই। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সে যুক্তি প্রয়োগ করা চলে না। পাছে তার স্ত্রী সব কথা

ফাঁস করে দেয় সেই ভয়ে, অথবা স্ত্রী তার চোখের বালি হয়েছিল বলে নিত্যানন্দ তাকে হত্যা করতে পারে বটে। কিন্তু যে অপরাধ তারা দুজনে মিলেই করেছে, তারই জন্যে সে হত্যা করতে পারে না তার স্ত্রী সত্যবালাকে।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'আপনি শোনা-কথাকে প্রমাণ বলে ধরে নিচ্ছেন। নিত্যানন্দ আর তার স্ত্রী দুজনে মিলে কারুকে যে হত্যা করেছে, এ কথা সত্য না হতেও পারে। হয়তো এটা হচ্ছে মিথ্যা অভিযোগ। সুতরাং—'

—'সুতরাং আপনার কথাই অভ্রান্ত বলে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। হত্যাকারী হচ্ছে আমাদেরই একজন। আমরা যে-কেউ হত্যাকারী হতে পারি।'

॥ দশম পরিচ্ছেদ ॥

ক

স্বপ্না জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি কি একথা বিশ্বাস করেন?'

অমলেন্দু ও স্বপ্না জানলার ধারে বসেছিল একখানা কৌচের উপরে। জানলার শার্সি বন্ধ। বাইরে অশ্রান্তভাবে ঝরছিল বৃষ্টিধারা। ঝোড়ো হাওয়া উন্মত্তের মতো গর্জন করতে করতে আছড়ে পড়ে জানলার শার্সির উপরে মারছিল ধাক্কার পর ধাক্কা। দূরে দেখা যাচ্ছিল উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গের উত্তেজিত নৃত্য।

অমলেন্দু বললে, 'সমস্তই হচ্ছে অসম্ভব কাণ্ড! মেজর সেনের শোচনীয় মৃত্যুর পর একটা বিষয়ে নেই কোনোই সন্দেহ। দৈব-ঘটনা বা আত্মহত্যা, এসব হচ্ছে বাজে কথা। খুন, খুন! এখানে তিন-তিনটে লোককে নিশ্চয়ই খুন করা হয়েছে।'

স্বপ্না শিউরে উঠে বললে, 'ওঃ এ হচ্ছে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন!'

অমলেন্দু গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'হ্যাঁ। আমরা সকলেই বাস করছি দুঃস্বপ্নের রাজ্যে। এর পরে অত্যন্ত সাবধান হয়ে আমাদের এখানে থাকতে হবে।'

স্বপ্না তার কণ্ঠস্বর আরও নামিয়ে বললে, 'ওদের মধ্যে হত্যাকারী কে, আপনি কি তা অনুমান করতে পারেন?'

অমলেন্দুর ওষ্ঠাধরে ফুটল মৃদু হাস্য। সে বললে, 'ওদের মধ্যে? দেখছি ওদের দল থেকে আপনি আমাদের দুজনকেই বাদ দিতে চান। অবশ্য, সেটা মন্দ কথা নয়। নিশ্চিতরূপেই বলতে পারি আমি নই হত্যাকারী। আর মানুষ খুন

করবার মতো পাগলামি যে আপনার ভিতরেও আছে, একথাও আমি মনে করি না।'

স্বপ্না হাসতে হাসতে বললে, 'আপনাকে ধন্যবাদ।'

অমলেন্দু বললে, 'ঠিক ওই কারণেই আপনিও কি আমাকে ধন্যবাদ দিতে পারেন না?'

স্বপ্না একটু ইতস্তত করে বললে, 'আপনার মুখেই আমরা শুনেছি যে, সমস্যায় পড়লে আপনি একুশ জন মানুষের মৃত্যুর জন্যেও দায়ী হতে পারেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রামোফোন রেকর্ডে যে ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, আপনাকে সেরকম লোক বলে আমার বিশ্বাস হয় না।'

অমলেন্দু বললে, 'যথার্থ কথা। ধরুন, এক জন কি দুই জন লোককে আমি হয়তো হত্যা করতে পারি। কিন্তু তারও একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই। কেন আমি একটা কি দুটো নরহত্যা করব? নিশ্চয়ই কোনো লাভের লোভে। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে আমার বা আপনার কোনোই লাভের আশা নেই। সুতরাং ধরে নেওয়া যাক, আপনি বা আমি এইসব খুনের জন্যে মোটেই দায়ী নই। তাহলে বাকি রইল আর পাঁচ জন মাত্র লোক। তাদের মধ্যে হত্যাকারী কে? আমি যদি চন্দ্রবাবুকে সন্দেহ করি, তাহলে আপনি কি অত্যন্তই অবাক হবেন?'

স্বপ্না সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'চন্দ্রবাবুকে সন্দেহ! কেন?'

—'কেন, তা ঠিক বলতে পারি না। তবে ভেবে দেখুন, তিনি হচ্ছেন এক বৃদ্ধ ব্যক্তি, আর বৎসরের পর বৎসর ধরে সর্বশক্তিমান বিচারকের ভূমিকায় অভিনয় করে আসছেন। নিজেকে মনে করেছেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাঁর একটিমাত্র ইঙ্গিতেই যে-কোনো মানুষ ত্যাগ করতে পারে অন্তিম নিশ্বাস। বিচারকের আসন ছেড়ে আজ তিনি নেমে এসেছেন বটে, কিন্তু নিজের শক্তির দম্ভ আজও ভুলতে পারেননি, কোনো মানুষকে আর প্রাণদণ্ড দেবার সুযোগ না পেয়েই হয়তো আজ তিনি পাগল হয়ে গেছেন!'

স্বপ্না আস্তে আস্তে বললে, 'হয়তো সেটা অসম্ভব নয়।'

অমলেন্দু বললে, 'আপনি কাকে সন্দেহ করেন?'

—'ডাক্তার বোসকে।'

—'ডাক্তারকে কেন?'

—'প্রথম দুই মৃত্যুর কারণ হচ্ছে, বিষ। বিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়

ডাক্তারদেরই। এটাও মনে রাখবেন, ডাক্তার বোস ঘুমোবার ওষুধ বলে সত্যবালাকে কী একটা পান করতে দিয়েছিলেন।'

—'হ্যাঁ, সে কথা সত্য।'

—'তারপর ডাক্তার যখন মেজর সেনকে ডাকতে যাবার নাম করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে কেউ ছিল না।'

—'হয়তো আপনার এ অনুমান যুক্তিহীন নয়।'

খ

ডাক্তার বোস অধীর কণ্ঠে বললেন, 'আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে পড়তেই হবে—যেমন করে হোক বেরিয়ে পড়তেই হবে।'

চন্দ্রবাবু জানলার শার্সির ভিতর দিয়ে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও বৃষ্টিস্নাত অরণ্যের দিকে তাকিয়ে চিন্তিতমুখে বললেন, 'আবহাওয়া সম্বন্ধে আমার বিশেষ জ্ঞান নেই, তবে আমার মনে হচ্ছে এই জল-ঝড় সম্ভবত আরও চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরে থামবে না। এমন দুর্যোগে কোনো নৌকোই এই দ্বীপের কাছে আসতে পারবে না।'

ডাক্তার প্রায় আর্তস্বরে বললেন, 'আর ইতিমধ্যে আমাদের সকলকেই একে একে প্রাণ দিতে হবে?'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'প্রাণ যে দিতেই হবে তার কোনো স্থিরতা নেই। যে কোনো বিপদকে এড়াবার জন্যে আমি যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেছি।'

ডাক্তার বললেন, 'কিন্তু মনে রাখবেন, এর মধ্যেই তিন জন হতভাগ্যকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।'

—'হ্যাঁ, আমি তা ভুলিনি। কিন্তু তারা কোনো বিপদের জন্য প্রস্তুত ছিল না। আমরা আগে থাকতেই সাবধান হয়ে আছি।'

ডাক্তার অসহায়ভাবে বললেন, 'কিন্তু কী আমরা করতে পারি? আজই হোক আর কালই হোক—' বলতে বলতে তিনি থেমে গেলেন। তারপর আবার বললেন, 'এসব যে কোন পাষণ্ডের কীর্তি, সেকথা পর্যন্ত আমরা জানি না।'

—'জানি না নাকি?'

—'আপনি কি কারুকে সন্দেহ করেছেন?'

—'অবশ্য আমার হাতে আসল প্রমাণ বলে কিছুই নেই। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা

তলিয়ে বুঝে একটা সিদ্ধান্তে আমি উপস্থিত হয়েছি। একজনের কথা আমার বারবার মনে পড়ছে।'

ডাক্তার হতভম্বের মতো তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি কার কথা বলছেন?'

কিন্তু চন্দ্রবাবু কোনো জবাব দেবার আগেই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে অমলেন্দু ও মহেন্দ্র। এবং তারা আসন গ্রহণ করবার পরেই ঘরের ভিতরে হন্তদন্তের মতো এসে দাঁড়াল নিত্যানন্দ।

সে বাধো বাধো গলায় বললে, 'আপনারা কিছু মনে করবেন না, কিন্তু কেউ কি বলতে পারেন, স্নানঘরের দরজার পর্দাখানা কোথায় গেল?'

অমলেন্দু বললে, 'স্নানঘরের দরজার পর্দা? তুমি কী বলতে চাও?'

—'পর্দাখানা আর খুঁজে পাচ্ছি না।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'আজ সকালে সেখানা কি যথাস্থানেই ছিল?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

মহেন্দ্র বললেন, 'কী রকম পর্দা?'

—'স্নানঘরের দেওয়াল আর মেজের রং লাল। তার সঙ্গে মিলিয়ে দরজায় ঝোলানো ছিল একখানা লাল রঙের পর্দা।'

অমলেন্দু বললে, 'পর্দাখানা তুমি আর খুঁজে পাচ্ছ না?'

—'আজ্ঞে না।'

মহেন্দ্র শুকনো হাসি হেসে বললে, 'পর্দাখানা তাহলে আপনা আপনিই অদৃশ্য হয়েছে? কথাটা পাগলের মতন শোনাচ্ছে বটে, কিন্তু এ হচ্ছে পাগলেরই বাড়ি। পর্দাখানা নেই বলে কোনো দরকার নেই আর মাথা ঘামাবার। তার কথা ভুলে যাও। একখানা লাল রঙের পর্দা দিয়ে কেউ কারুকে খুন করতে পারে না।'

আর কিছু না বলে নিত্যানন্দ ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল। ঘরের ভিতরে বসে প্রত্যেকেই তাকাতে লাগল প্রত্যেকের মুখের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে।

রাত্রে সবাই মৌনমুখে আহার করতে বসল।

বাইরের অন্ধকার থেকে ভেসে আসছে মেঘের আর ঝড়ের গর্জন। ঘরের

ভিতরে জ্বলছে বটে পেট্রলের সমুজ্জ্বল আলো, কিন্তু তবু চারিদিকে যেন ঘনিয়ে আছে একটা থমথমে ভয় ভয় ভাব!

অমলেন্দু হঠাৎ স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললে, 'উপরে তিনটে ঘরে রয়েছে তিনটে মৃতদেহ। সৎকারের কোনো ব্যবস্থাই হল না।'

চন্দ্রবাবু বললেন, এই দুর্যোগে সৎকারের কোনো ব্যবস্থাই হতে পারে না। উপরন্তু যতক্ষণ আমরা বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করতে পারি ততক্ষণই ওই দেহগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করা যুক্তিসঙ্গত নয়। আগে পুলিশে খবর দিতে হবে তারপর অন্য কথা।'

সৌদামিনীর সঙ্গে স্বপ্নাও চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বললে, 'রাত বাড়ছে, আমরা এখন ঘুমোতে যাই।'

মহেন্দ্র বললে, 'কিন্তু ঘুমোবার আগে কেউ যেন ঘরের দরজা বন্ধ করতে ভুলবেন না।'

চন্দ্রবাবুও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমাদেরও ঘুমোবার সময় হয়েছে। চলুন সবাই, আশা করি কাল সকালেই 'সুপ্রভাত' বলে পরস্পরকে সম্বোধন করতে পারব।'

সকলের শেষে গাত্রোত্থান করে মহেন্দ্র সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে। একবার ঘরের চারিদিকে বুলিয়ে নিলে তার অতি সতর্ক দৃষ্টি। তারপর নিজের মনে বিড়বিড় করে বললে, 'আজ আর কেউ বোধ হয় হারাধনের ছেলেদের নিয়ে টানাটানি করবে না।'

॥ একাদশ পরিচ্ছেদ ॥

ক

পরদিনের প্রভাতকাল। জলঝড়ের মাত্রা খানিক কমে এসেছে বটে, কিন্তু এখনও সূর্যহীন আকাশ হয়ে আছে মেঘে মেঘময়।

বিছানা থেকে ধড়মড় করে উঠে বসে মহেন্দ্র ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে, বেলা তখন সাড়ে সাতটা।

বাহির থেকে দরজায় করাঘাত হল। সঙ্গে সঙ্গে অমলেন্দুর গলায় শোনা গেল, 'মহেন্দ্রবাবু, মহেন্দ্রবাবু, এখনও ঘুমোচ্ছেন নাকি?'

মহেন্দ্র ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বললে, ‘ব্যাপার কী, এত ডাকাডাকি কেন?’

অমলেন্দু বললে, ‘নিত্যানন্দ রোজ সকালে সাড়ে ছ-টার সময় আমাদের চা প্রস্তুত করে। কিন্তু আজ এখনও তার কোনো সাড়া বা পাত্তাই নেই। তার ঘরে গিয়েছিলুম, সেখানেও দেখতে পেলুম না তাকে।’

ইতিমধ্যে আর-সকলেও নিজের নিজের ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

চন্দ্রবাবু বললেন, ‘নিত্যানন্দ রান্নাঘরে গিয়ে বোধ হয় আমাদের প্রাতরাশের আয়োজনে ব্যস্ত আছে। চলুন, দেখে আসি।’

সকলে নীচে নেমে এসে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। সেখানে টেবিলের উপরে চায়ের কেটলি, পেয়ালা ও খাবারের প্লেটগুলো সাজানো রয়েছে বটে, কিন্তু নিত্যানন্দ অদৃশ্য! এমনকি উনুনে আগুন পর্যন্ত জ্বলছে না। তারপর সকলে প্রবেশ করলে বৈঠকখানার মধ্যে। সে-ঘরও শূন্য।

আচম্বিতে স্বপ্নার মুখে ফুটল অস্ফুট এক আর্তস্বর! বিহ্বলের মতো সে চন্দ্রবাবুর একখানা হাত সজোরে চেপে বলে উঠল, ‘দেখুন, দেখুন! টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখুন!’

টেবিলের উপর থেকে অদৃশ্য হয়েছে আর-একটা হারাধনের ছেলে। সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাত্র ছয়টা পুতুল!

অল্পক্ষণ পরেই নিত্যানন্দের সন্ধান পাওয়া গেল। উঠানে নেমে উনুনে আগুন জ্বালাবার জন্যে সে জ্বালানি কাঠ কাটতে গিয়েছিল। সেইখানেই তার দেহটা মাটির উপরে পড়ে রয়েছে, হাতের মুঠোর ভিতরে তখনও সে চেপে ধরে আছে একখানা কাটারি!

তার কণ্ঠের উপরে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাত এবং একটু তফাতে পড়ে রয়েছে একখানা রক্তাক্ত ভোজালি!

খ

ডাক্তার বললেন, ‘গলার পিছন দিকে আঘাতের চিহ্ন। নিত্যানন্দ যখন হেঁট হয়ে কাঠ কাটছিল, ঠিক সেই সময় নিশ্চয়ই কেউ এসে তাকে আক্রমণ করেছে।’

চন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এভাবে অস্ত্রাঘাত করবার সময় কি খুব বেশি শক্তির দরকার হয়?’

ডাক্তার গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'আপনি যা বলতে চান, বুঝেছি। হ্যাঁ, এ কাজ কোনো স্ত্রীলোকের দ্বারাও হতে পারে।' বলেই তিনি পিছন দিকে ফিরে তাকালেন। সৌদামিনী ও স্বপ্না সেখানে নেই। তারা তখন গিয়েছিল রান্নাঘরের ভিতরে।

ভোজালির হাতলটা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে মহেন্দ্র বললে, 'উঁহু, আঙুলের দাগ নেই। হাতলটা যেন ভালো করে মুছে ফেলা হয়েছে।'

হঠাৎ শোনা গেল খিলখিল করে হাসির শব্দ; সবাই ফিরে দাঁড়াল সচকিতে। উঠানের উপরে এসে দাঁড়িয়েছে স্বপ্না। খিলখিল করে হাসতে হাসতে থেমে থেমে সে বললে, 'হারাধনের ছেলে, হারাধনের ছেলে! বলতে পারো হারাধনের ছেলেগুলো যায় কোথায়? হা হা হা!'

স্বপ্না কি হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়েছে? সবাই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

স্বপ্না বলে উঠল অস্বাভাবিক উচ্চ কণ্ঠে

'অমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকো না। তোমরা কি ভাবছ আমি পাগল? আমি ঠিক কথাই বলছি। হারাধনের ছেলে, হারাধনের ছেলে! ও, তোমরা কি সেই ছেলে-ভুলানো ছড়াটা শোনোনি?—

'হারাধনের নয়টি ছেলে কাটতে গেল কাঠ,
একটি মল দুখান হয়ে—' হা হা হা!

সে উদ্ভ্রান্তের মতো হাসতেই লাগল।

ডাক্তার বললেন, 'হিস্টিরিয়া, এ যে স্পষ্ট হিস্টিরিয়ার লক্ষণ! সবুর করুন।'

তিনি স্বপ্নার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তার গণ্ডদেশে করলেন সজোরে এক চপেটাঘাত। সে চমকে উঠল, দু-এক বার হেঁচকি তুললে এবং ঢোঁক গিললে। নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মিনিট খানেক। তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললে, 'আপনাকে ধন্যবাদ। এইবারে আমি সামলে নিয়েছি।'

তারপর সে আবার রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বললে, 'সৌদামিনী দেবী আর আমি চা-টা তৈরি করব। আমাদের দয়া করে উনুনে আগুন দেবার জন্যে কিছু কাঠ এনে দিন।'

মহেন্দ্র বললে, 'ডাক্তারবাবু, আপনার চিকিৎসা ফলপ্রদ হয়েছে।'

ডাক্তার কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'বাধ্য হয়েই আমাকে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা

করতে হল। এত বিপদের ভিতরে আবার হিস্টিরিয়া নিয়ে জড়িয়ে পড়া চলে না।'

অমলেন্দু বললে, 'স্বপ্না দেবীকে দেখলে তো মনে হয় না ওঁর হিস্টিরিয়া আছে।'

ডাক্তার বললেন, 'না, না, স্বপ্না দেবী হচ্ছেন বুদ্ধিমতী আর স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। কিন্তু এই আচমকা বিপদের ধাক্কা উনি সামলাতে পারেননি।'

॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ॥

ক

সকলের চা-পান ও জলখাবার খাওয়া হয়ে গেল।

চন্দ্রবাবু বললেন, 'আবার কিছু আলোচনা করা দরকার হয়ে পড়েছে। চলুন, এইবারে এইঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বসা যাক।'

সকলেই তাঁর কথায় সায় দিলে।

স্বপ্না বললে, 'আমি তাড়াতাড়ি প্লেটগুলো সাফ করে নিয়েই যাচ্ছি।'

সৌদামিনী চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েই আবার ধপাস করে বসে পড়ে বললেন, 'উঃ মাগো!'

চন্দ্রবাবু চমকে শুধোলেন, 'ব্যাপার কী সৌদামিনী দেবী?'

সৌদামিনী বললেন, 'আমার মাথাটা কেমন ঘুরছে।'

ডাক্তার বোস তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'মাথা ঘুরছে? খুবই স্বাভাবিক! এখানে বিপদের উপরে বিপদ। দাঁড়ান, আমি আপনাকে একটা ওষুধ তৈরি করে দিচ্ছি।'

—'না!' সৌদামিনী এমন চিৎকার করে শব্দটা বলে উঠলেন যে, সকলেই সবিস্ময়ে তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলে। তাঁর মুখের উপরে সন্দেহের স্পষ্ট চিহ্ন।

ডাক্তার আহত কণ্ঠে বললেন, 'বেশ, আপনার যা অভিরুচি।'

সৌদামিনী বললেন, 'আমি কিছুই খাব না—আমি কিছুই খেতে চাই না। কিছুক্ষণ এখানে চুপ করে বসে থাকলেই আমার মাথা ঘোরা আপনিই সেরে যাবে।'

খ

আর-সকলেই বৈঠকখানায় বসে সৌদামিনীর জন্যে অপেক্ষা করছিল।

মহেন্দ্র বললেন, 'আমি সৌদামিনী দেবীকে সন্দেহ করি।'

ডাক্তার বললেন, 'কেন?'

—'উনি আমাদের কাছে থেকেও কেমন ছাড়া ছাড়া হয়ে থাকেন।'

স্বপ্না বললে, 'আমরা দুজনে যখন চা তৈরি করছিলুম, তখন সৌদামিনী দেবীর কথাগুলো কেমন যেন অসংলগ্ন বলে মনে হচ্ছিল।'

অমলেন্দু বললে, 'তার দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না। আপাতত আমাদের সকলেরই মাথা অল্প-বিস্তর খারাপ হয়ে গিয়েছে।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'প্রায় পনেরো মিনিট সময় কেটে গেল। এইবারে সৌদামিনী দেবীকে ডেকে আনা দরকার।'

স্বপ্না উঠে পাশে খাবার ঘরে ঢুকেই তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল। সকলে সেখানে ছুটে গিয়ে দেখলে, সৌদামিনী চেয়ারের উপরে বসে আছেন বটে, কিন্তু ওঁর ওষ্ঠাধর নীলাভ এবং তাঁর বিস্ফারিত দুই চক্ষে নেই জীবন্ত দৃষ্টি।

মহেন্দ্র সচকিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'এ কী ব্যাপার? সৌদামিনী দেবী যে বেঁচে নেই!'

চন্দ্রবাবু ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে বললেন, 'আমাদের ভিতর থেকে আর-একজনও সকল সন্দেহ থেকে মুক্তিলাভ করলেন—কিন্তু অত্যন্ত অসময়ে।'

ডাক্তার মৃতদেহের উপরে হেঁট হয়ে তার ওষ্ঠাধরের আঘ্রাণ নিলেন এবং দুই চোখের পাতা পরীক্ষা করতে লাগলেন।

অমলেন্দু বললে, 'মৃত্যুর কারণ কী ডাক্তার? আমরা তো একটু আগেই সৌদামিনী দেবীকে জীবন্ত অবস্থায় দেখে গিয়েছিলুম।'

মৃতদেহের কণ্ঠের দক্ষিণ দিকে একটি চিহ্নের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে ডাক্তার বললেন, 'ওটা হচ্ছে 'হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জের চিহ্ন।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'কোনো বিষের জন্যে কি ওঁর মৃত্যু হয়েছে?'

ডাক্তার বললে, 'মনে তো হচ্ছে সায়ানাইড। খুব সম্ভব পোটাসিয়াম সায়ানাইড। সৌদামিনী দেবীর মৃত্যু হয়েছে মুহূর্তের মধ্যে।'

অমলেন্দু চিৎকার করে বললে, 'এ কোনো উন্মাদগ্রস্তের কীর্তি! পাগল হয়ে গিয়েছি আমরা সকলেই!'

চন্দ্রবাবু প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, 'না, আমরা এখনও বিবেচনা করবার শক্তি হারাইনি। এই বাড়িতে কেউ কি সঙ্গে করে 'হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ' এনেছে?'

ডাক্তার যেন কিছু বিচলিত কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি এনেছি।'

চারজোড়া চক্ষু আকৃষ্ট হল ডাক্তারের দিকে। চারজোড়া বিজাতীয় সন্দেহপূর্ণ চক্ষু!

ডাক্তার বোস বললেন, 'ডাক্তারদের সঙ্গে সর্বদাই থাকে হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'ঠিক কথা। কিন্তু ডাক্তার, সেটা এখন কোথায় আছে বলতে পারেন কি?'

—'আমার ঘরে সুটকেসের ভিতরে।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'চলুন—সেটা এখন সেখানে আছে কি না দেখে আসা যাক।'

পাঁচ জন একসঙ্গে নীরবে দোতলায় গিয়ে উঠল।

ডাক্তারের সুটকেসের ভিতরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা হল।

'হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ' পাওয়া গেল না।

গ

ডাক্তার ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'জিনিসটা কেউ তাহলে চুরি করেছে।'

আবার চারজোড়া চক্ষু দারুণ সন্দেহে বিষাক্ত হয়ে উঠল!

চন্দ্রবাবু বললেন, 'এ-ঘরে আছি আমরা পাঁচ জন। এই পাঁচ জনের মধ্যে নিশ্চয়ই এক জন হচ্ছে হত্যাকারী! ডাক্তার আপনার সঙ্গে আছে কী ওষুধ?'

ডাক্তার উত্তর দিলেন, 'আপনারা নিজেরাই অনায়াসে খুঁজে দেখতে পারেন।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'অমলেন্দুবাবু, আপনার কাছে আছে একটা রিভলভার?'

অমলেন্দু তপ্তস্বরে বললে, 'হ্যাঁ আছে, তাতে হয়েছে কী?'

—'বর্তমান অবস্থায় আমাদের কারুর কাছেই কোনো বিপজ্জনক জিনিস থাকা উচিত নয়। ওই রিভলভারটা এখন আমাদের জিম্মায় জমা রাখলেই ভালো হয়। আমরা ওটা কোনো নিরাপদ জায়গায় রেখে দেব।'

অমলেন্দু বেগে মাথা নেড়ে বললে, 'মোটেই নয়! রিভলভারটা কিছুতেই আমি কাছছাড়া করব না।'

বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে চন্দ্রবাবু বললেন, 'অমলেন্দুবাবু, আমাদের এই ভূতপূর্ব

ডিটেকটিভ মহেন্দ্রবাবুকে দেখলে মনে হয়ে, উনি আপনার চেয়ে বলবান ব্যক্তি। তার উপরে ওঁর সঙ্গে আছি আমরা আরও তিন জন। বুঝতেই পারছেন, আপনি এখন আমাদের বাধা দেবার চেষ্টা করলেও বিফল হবেন।'

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে অমলেন্দু বললে, 'বেশ, এ-কথার উপরে আমার আর কিছু বলবার নেই।'

চন্দ্রবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'এইবারে আপনি বুদ্ধিমানের মতন কথা বলছেন। রিভলভারটা কোথায় আছে?'

—'আমার ঘরে একটা টেবিলের দেরাজের ভিতরে।'

—'উত্তম!'

—'আমি সেটা এখুনি এনে দিচ্ছি।'

—'আপনি একলা কেন, আমরা সকলেই একসঙ্গে আপনার ঘরে যাব।'

ভ্রূকুটি করে অমলেন্দু বললে, 'আপনি হচ্ছেন এক বিষম সন্দিগ্ধ ব্যক্তি। কারুর কথাতেই বিশ্বাস করেন না।'

কিন্তু অমলেন্দুর ঘরে গিয়ে দেখা গেল তার টেবিলের দেরাজের ভিতরে রিভলভার নেই।

ঘ

অমলেন্দু বললে, 'তারপর?'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'এখন আমাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে, অমলেন্দুবাবুর রিভলভারটা গেল কোথায়?'

মহেন্দ্র বললে, 'এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন একমাত্র রিভলভারের মালিকই?'

অমলেন্দু উগ্রকণ্ঠে বললেন, 'নির্বোধ! রিভলভার কোথায় গেছে আমি তার কী জানি? নিশ্চয়ই কেউ সেটা চুরি করেছে।'

চন্দ্রবাবু শুধোলেন, 'রিভলভারটা শেষ কখন আপনি দেরাজের ভিতরে দেখেছেন?'

—'কাল রাত্রে, শোবার আগে।'

—'তাহলে নিশ্চয়ই সেটা চুরি গিয়েছে আজ সকালে। হয়তো যখন আমরা নিত্যানন্দের মৃতদেহ নিয়ে ব্যস্ত হয়েছিলুম। সেই সময়েই।'

॥ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ॥

—'আমাদের মধ্যে একজন,' আমাদের মধ্যে একজন, আমাদের মধ্যে একজন!'

প্রত্যেকেরই মস্তিষ্কের মধ্যে এই তিনটি শব্দই বারংবার ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

পাঁচ জন লোক—পাঁচ জন আতঙ্কগ্রস্ত লোক! পাঁচ জনের প্রত্যেকেই অত্যন্ত সতর্ক হয়ে লক্ষ করছে পরস্পরের প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গি। তাদের মনের বিষম সন্দেহ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাদের মুখে-চোখে, তা গোপন করার চেষ্টাও কেউ করছে না।

পাঁচ জন লোক—প্রত্যেকেই পরস্পরের শত্রু! কেবল কোনো রকমে আত্মরক্ষা করবার জন্যেই পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েও তারা পরস্পরের সঙ্গে বাস করছে এক জায়গায়।

সেদিন রান্নাবান্নার কথা কারুরই মনে জাগল না। ভাঁড়ার ঘরে কয়েকরকম বিস্কুটের টিন এবং 'এয়ার টাইট' টিনের পাত্রে বিলাতি ফল ও দেশি রসগোল্লা ছিল। তাই খেয়েই সকলে নির্বাপিত করলে জঠরাগ্নি।

ডাক্তার বোস বললেন, 'এই ভয়াবহ বাড়ির ভিতরে এমন করে বন্দি হয়ে থাকতে আর ইচ্ছে করছে না।'

মহেন্দ্র বললে, 'কিন্তু বাইরে যাবারও কোনো উপায় নেই। তাকিয়ে দেখুন।'

হ্যাঁ, বাইরে আবার নেমেছে ঝরঝরে বৃষ্টি-ধারা এবং আবার প্রবল হয়ে উঠেছে প্রচণ্ড ঝোড়ো-হাওয়া! উচ্চতর হয়ে আবার ভেসে আসছে সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত কোলাহল।

ডাক্তার বললেন, 'চলুন আমরা দোতলার হলঘরে বসিগে যাই। নীচেটা আর আমার ভালো লাগছে না। সত্যবালা ছাড়া আর সকলেরই মৃত্যু হয়েছে একতলাতেই।'

মহেন্দ্র, অমলেন্দু ও স্বপ্নাও এই প্রস্তাবে সায় দিলে। তারা একসঙ্গে উপরে উঠে গেল।

দোতলার হলঘর থেকে আরও ভালো করে দেখা যেতে লাগল দ্বীপের প্রাকৃতিক দৃশ্য।

সারা আকাশ ভরে জমে উঠেছে মেঘের পর মেঘের অশ্রান্ত মিছিল। মাঝে মাঝে লক লক করে জ্বলে উঠছে বিদ্যুতের অগ্নিসর্প! ধারাপাত-ধ্বনিতে চারিদিক

পরিপূর্ণ। অরণ্যের বড়ো বড়ো গাছগুলো আর্তনাদ করে হেলে হেলে পড়ছে উন্মত্ত ঝড়ের ধাক্কার পর ধাক্কায়। সমুদ্রকে দেখাচ্ছে এক ক্রুদ্ধ ও অনন্ত জলদানবের মতো, উদ্দাম বেগে উৎকট স্বরে চিৎকার করতে করতে অগণ্য তরঙ্গবাহু তুলে বারংবার সে দ্বীপের উপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর ফিরে যাচ্ছে—ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর ফিরে যাচ্ছে।

কারুর মুখেই একটি কথা নেই। কিন্তু ওই বিশাল সমুদ্রের মতোই যে তাদের বুকের ভিতরটা তোলপাড় করছিল, এটা বোঝা যায় তাদের বিভ্রান্ত মুখের উপরে দৃষ্টিপাত করলেই।

স্বপ্নার দেহের ভিতরটা কেমন শীত শীত করতে লাগল, একটা কোনো গরম গাত্রবস্ত্র আনবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে বললে, 'চন্দ্রবাবু কোথায়? তিনি তো এখানে নেই! আমি ভেবেছিলুম তিনিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে উপরে এসেছেন।'

ডাক্তার বললেন, 'না, তিনি বৈঠকখানাতেই বসে আছেন।'

প্রত্যেকেই আবার প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে ত্রস্ত দৃষ্টিতে।

অমলেন্দু বললেন, 'এই বিপজ্জনক বাড়িতে তিনি বুড়োমানুষ একলা বসে আছেন!'

মহেন্দ্র তৎক্ষণাৎ একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'ভালো কথা নয়, এ ভালো কথা নয়! চলুন, আমরা সকলে গিয়ে তাঁকে উপরে ডেকে আনি।'

সকলে একসঙ্গে আবার নেমে গেল একতলায়। সর্বাগ্রে যাচ্ছিলেন ডাক্তার বোস। বৈঠকখানার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভিতরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তিনি যেন আড়ষ্ট হয়ে গেলেন! বাকি তিন জনে তাঁর দেহের এপাশ-ওপাশ থেকে দৃষ্টিপাত করলে বৈঠকখানার ভিতর দিকে।

দেখা গেল, একখানা সোফার উপরে চন্দ্রবাবু চুপ করে বসে আছেন। কিন্তু তাঁর গায়ে জড়ানো আছে একখানা টকটকে লাল রঙের গাত্রাবরন এবং তাঁর মাথায় আছে পরচুলা—হাইকোর্টের বিচার-কক্ষে জজেরা যে-রকম পরচুলা মাথায় পরে থাকেন।

এই একান্ত অভাবিত ও অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখে সকলেরই বুক ছাঁৎ ছাঁৎ করে উঠল।

ডাক্তার বোস মাতালের মতন টলতে টলতে অগ্রসর হয়ে চন্দ্রবাবুর সেই স্থির

মূর্তির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। একবার তাঁর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিপাত করেই তিনি শীঘ্র হস্তে তাঁর পরচুলা ধরে একটা টানা মারলেন। পরচুলাটা ঘরের মেঝের উপরে পড়ে গেল; দেখা গেল, চন্দ্রবাবুর মাথার সামনেকার কেশহীন অংশটা। ঠিক সেইখানেই রয়েছে একটা রক্তাক্ত ছিদ্র!

ফিরে দাঁড়িয়ে ডাক্তার বোস বললেন, 'চন্দ্রবাবুকে গুলি করা হয়েছে।'

মহেন্দ্র বলে উঠল, 'রিভলভার! সেই রিভলভারটা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।'

জীবনহীন স্বরে ডাক্তার বোস বললেন, 'রিভলভার দিয়ে কেউ গুলি ছুড়েছে—চন্দ্রবাবুর মৃত্যু হয়েছে মুহূর্তের মধ্যেই।'

স্বপ্না হেঁট হয়ে পড়ে মাটির উপর থেকে পরচুলাটা তুলে নিলে। তারপর সভয়ে বলে উঠল, 'এ যে দেখছি পশমে তৈরি! কালকেই সৌদামিনী দেবী বলেছিলেন, তাঁর এক বান্ডিল পশম তিনি আর খুঁজে পাচ্ছেন না!'

মহেন্দ্র বললে, 'চন্দ্রবাবু ওই লাল রঙের গায়ের কাপড়! ওটা হচ্ছে সেই স্নানঘরের হারিয়ে যাওয়া পর্দা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

স্বপ্না ভয়ার্ত অস্ফুট কণ্ঠে বললে, 'এই বীভৎস দৃশ্য দেখাবার জন্যেই কি হত্যাকারী ওই পর্দা আর পশমের বান্ডিল চুরি করেছে?'

আচম্বিতে অমলেন্দু হা হা করে অট্টহাস্য করে বলে উঠল, 'এইখানেই হল কঠোর নির্দয় বিচারপতি চন্দ্রকান্ত চৌধুরির জীবন-নাট্যের বিয়োগান্ত সমাপ্তি! বিচারগৃহে বসে জজের পরচুলা মাথায় পরে তিনি আর কারুর উপরেই প্রাণদণ্ড দিতে পারবেন না, কারণ আজই তিনি কোনো অজ্ঞাত হত্যাকারীর আদেশে নিজেই লাভ করেছেন প্রাণদণ্ড!'

॥ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ॥

ক

তারা চন্দ্রবাবুর দেহকে তুলে নিয়ে তাঁর ঘরের ভিতরে গিয়ে রেখে এল।

বৈঠকখানায় ফিরে এসে মহেন্দ্র সোজা গিয়ে দাঁড়াল সেই টেবিলের সামনে, যার উপরে আগে ছিল দশটা হারাধনের ছেলের মূর্তি, কিন্তু এখন তাদের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র চার।

মহেন্দ্র গম্ভীর স্বরে বললে, 'আমরা হচ্ছি গুনতিতে চার জন মানুষ, আর

আমাদের সামনেও রয়েছে চারটে পুতুল। চার জন মানুষ আর চারটে পুতুল। একটা করে মানুষ মরবে আর একটা করে পুতুল অদৃশ্য হবে। কিন্তু শেষ পুতুলটা নিশ্চয়ই অদৃশ্য হবে না। আমাদের মধ্যে যে হত্যাকারী, শেষ পুতুলটা ভেঙে ফেলে নিশ্চয়ই সে আত্মহত্যা করবে না। অতএব—'

ডাক্তার বললেন, 'অতএব?'

মহেন্দ্র বললে, 'অতএব শেষ পুতুলটা নয় জন লোকের মৃত্যুর পরও ওই টেবিলের উপরেই দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু তখন যে তার দিকে তাকিয়ে থাকবে, সে ব্যক্তির নাম কী?'

সবাই সচমকে দৃষ্টিপাত করলে পরস্পরের মুখের দিকে। সে দৃষ্টিতে ছিল না কেবল বিভীষিকার ভাব, ছিল বিষম এক বিরাগভরা সন্দেহ।

মহেন্দ্র বললে, 'চন্দ্রবাবুকে মারবার জন্যে হত্যাকারী ছুড়েছিল রিভলভার।' আমরা সকলেই তখন এই বাড়িতেই উপস্থিত ছিলুম। কিন্তু আমরা কেউ শুনতে পাইনি রিভলভারের শব্দ। এর কারণ কী?'

অমলেন্দু বললে, 'এর কারণ হচ্ছে ঝড়ের আর সমুদ্রের গর্জন। মাঝে মাঝে বাজও ডাকছিল। এত গোলমালের ভিতরে ডুবে গিয়েছিল সেই রিভলভারের শব্দ।'

সে রাত্রে তারা সকাল সকালই শয়নগৃহের দিকে অগ্রসর হল।

মহেন্দ্র বললে, 'আজ রাত্রে নিশ্চয়ই আমাদের কারুরই ঘুম হবে না। জেগে থাকবে হত্যাকারী, আর একটা শিকারের সন্ধানে। আর জেগে থাকবে বাকি তিন জনও দারুণ আতঙ্কে। হত্যাকারী এখন সশস্ত্র, 'রিভলভার' এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

খ

প্রত্যেকেই নিজের নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল এবং সশব্দে দরজা করলে অর্গলবদ্ধ! চার জন আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ, প্রত্যেকেই যে-কোনোরকমে আত্মরক্ষা করবার জন্যে প্রস্তুত।

অমলেন্দু ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আয়নাতে নিজের মুখ দেখে মনে মনেই বললে—অমলেন্দু, তোমার মুখের ভাব অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। সাবধান, শেষটা তুমিও যেন পাগল হয়ে যেয়ো না।

হঠাৎ অকারণেই টেবিলের একটা দেরাজ টেনে তার ভিতরে সে করলে দৃষ্টিনিক্ষেপ।

দেরাজের ভিতরে আবার ফিরে এসেছে তার রিভলভারটা।

সে দাঁড়িয়ে রইল স্তম্ভিত ভাবে।

গ

প্রাক্তন গোয়েন্দা মহেন্দ্র এগিয়ে গিয়ে বসল বিছানার একপাশে। তার চক্ষের ভাব হিংস্র, কোনো শিকারি জন্তুর মতো সে যেন যে-কোনো শিকারের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। বিছানায় শয়ন করবার জন্যে তার একটুও ইচ্ছা হল না। বিপদ এখন খুব কাছেই ঘনিয়ে এসেছে—দশ জনের মধ্যে বাকি আছে মাত্র চার জন। অতি শীঘ্রই নিশ্চয় আর-একজনকেও বিদায় নিতে হবে। কিন্তু এবারে যে তার পালা নয়, সে বিষয়ে তার কোনোই সন্দেহ নেই।

হঠাৎ সে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

বাইরে তার দরজার সামনেই জাগল কার পদশব্দ। পা টিপে টিপে কেউ চলছে বটে, কিন্তু মহেন্দ্রর সতর্ক কর্ণকে সে ফাঁকি দিতে পারেনি।

তাড়াতাড়ি সে ছুটে গিয়ে দরজার উপরে কান পেতে শুনতে লাগল। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কারুর পদশব্দ। সিঁড়ির উপর দিয়ে শব্দটা নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে।

মহেন্দ্র হঠাৎ দরজাটা খুলে ফেলে বাঘের মতো লাফিয়ে বাইরে গিয়ে পড়ল। কিন্তু কোথাও কারুকেই দেখতে পেলে না, একটা ছায়া পর্যন্ত না। সে সর্বাগ্রে ছুটে গেল স্বপ্নার ঘরের দিকে। দরজার উপরে সজোরে করাঘাত করতেই ভিতর থেকে স্বপ্না সভয়ে বলে উঠল, 'কে, কে, কে?'

স্বপ্না তাহলে বাইরে বেরিয়ে আসেনি!

তারপর সে গেল ডাক্তারের ঘরের দিকে। সে ঘরে দরজা ছিল ভেজানো, ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। ঘরের ভিতরে কেউ নেই। ডাক্তারের শয্যা শূন্য।

সে চেঁচিয়ে ডাকলে, 'ডাক্তার বোস, ডাক্তার বোস!'

মহেন্দ্র দৌড়ে গেল অমলেন্দুর ঘরের দিকে। দরজায় করাঘাত করতেই ভিতর থেকে অমলেন্দু দিলে সাড়া।

মহেন্দ্র চিৎকার করে ডাকলে, 'অমলেন্দুবাবু, অমলেন্দুবাবু! শীঘ্র বাইরে বেরিয়ে আসুন।'

মিনিটখানেক পরেই খুলে গেল ঘরের দরজা। অত্যন্ত সন্তর্পণে বাইরে বেরিয়ে এল অমলেন্দু। তার ডান হাতটা আছে পকেটের ভিতরে।

সে উগ্রকণ্ঠে বললে, 'রাত দুপুরে এ-সব কী কাণ্ড?'

ততক্ষণে স্বপ্নাও বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

মহেন্দ্র বললে, 'আমি বাইরে শুনতে পেয়েছি কার পায়ের শব্দ। বেরিয়ে এসে দেখি ডাক্তারের ঘরের দরজা খোলা আর ডাক্তার নেই ঘরের ভিতরে!'

অমলেন্দু বললে, 'বটে, বটে, তাই নাকি? এই নিশুতি রাতে, এই ভয়াবহ বাড়িতে ডাক্তার নেই তার ঘরে? তাহলে সেই কি যত নষ্টের গোড়া?'

মহেন্দ্র বললে, 'এখন আমাদের ওই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে।'

অমলেন্দু বললে, 'স্বপ্না দেবী, আপনি আবার নিজের ঘরের ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিন। এরপর আমরা দুজনেই যদি একসঙ্গে এসে আপনাকে ডাকি, তবেই আপনি দরজা খুলে দেবেন। আর কেউ ডাকলে দরজা খুলবেন না। বুঝেছেন?'

স্বপ্না বললে, 'বুঝেছি! আমি নারী বটে, কিন্তু নির্বোধ নই।' সে আবার চলে গেল তার ঘরের দিকে।

মহেন্দ্র বললে, 'কিন্তু ডাক্তারকে খুঁজতে হবে অত্যন্ত সাবধানে। ভুলে যাবেন না, তার হাতে আছে একটা গুলিভরা রিভলভার।'

নীরস হাস্য করে অমলেন্দু বললে, 'ভুল মহেন্দ্রবাবু, ভুল! রিভলভারটা এখন আছে আমার পকেটেই! এই দেখুন!' সে পকেটের ভিতর থেকে বার করে দেখালে রিভলভারের অর্ধেকটা।

মহেন্দ্রর মুখ রক্তহীন হয়ে গেল এক মুহূর্তে, সে আঁতকে উঠে দুই পা পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল।

অমলেন্দু হা হা করে হেসে উঠে বললে, 'মহেন্দ্রবাবু, নির্বোধের মতন ব্যবহার করবেন না। আমি যদি গুলি করে আপনাকে মারতে চাইতুম তাহলে রিভলভারের কথা আপনার কাছে প্রকাশ করতুম না। এখন চলুন, ডাক্তার কোথায় লুকিয়ে আছে, খুঁজে দেখা যাক।'

আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে অভাবিতভাবে। দমকা হাওয়া এখনও থেকে থেকে কেঁদে উঠছে বটে, কিন্তু নির্মেঘ আকাশে দেখা দিয়েছে চাঁদের জ্যোতির্ময়

মুখ। চারিদিকে জ্যোৎস্নার দুগ্ধধবল স্বচ্ছ প্রলেপ। সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে ঝলকে ঝলকে উঠছে লক্ষ লক্ষ হীরার কণা।

কিন্তু মহেন্দ্র ও অমলেন্দুর সমস্ত অন্বেষণই ব্যর্থ হল। কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না ডাক্তারকে।

ঘ

প্রায় শেষ রাত্রি।

ঘুম নেই স্বপ্নার চোখে। বিছানার উপরে চুপ করে সে বসে আছে অত্যন্ত ছন্নছাড়ার মতো।

হঠাৎ ঘরের দরজায় হল দুমদুম করে করাঘাত। স্বপ্না চমকে বলে উঠল, 'কে, কে?'

একসঙ্গে মহেন্দ্র ও অমলেন্দুর কণ্ঠে শোনা গেল, 'আমরা, দরজা খুলে দিন।'

দরজা খুলে দিতেই তারা দুজনে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল।

অমলেন্দু বললে, 'স্বপ্না দেবী, কোনো নতুন খবর আছে?'

—'না, কিন্তু আপনাদের খবর কী?'

—'ডাক্তার অদৃশ্য হয়েছে।'

স্বপ্না চিৎকার করে বলে উঠল, 'কী?'

—'ডাক্তার এই দ্বীপের ভিতরে কোথাও নেই।'

স্বপ্না অবিশ্বাসের স্বরে বললে, 'হতেই পারে না। নিশ্চয় সে কোথাও লুকিয়ে আছে! কখন হঠাৎ এসে আমাদের কারুকে আক্রমণ করবে।'

মহেন্দ্র বললে, 'ঝড় নেই, মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই। চারিদিকে ফুটফুটে চাঁদের আলো। আমরা ঈগলপাখির মতো তীক্ষ্ণ চোখে সারা দ্বীপটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি। তবু ডাক্তারের কোনোই পাত্তা পাওয়া গেল না। সে অদৃশ্য হয়েছে—হাওয়া হয়ে যেন মিশিয়ে গিয়েছে হাওয়ার ভিতরে!'

অমলেন্দু ভারিক্কে গলায় বললে, 'আমরা আর-একটা জিনিস লক্ষ করেছি। বৈঠকখানার টেবিলের উপরে দাঁড়িয়ে আছে এখন মাত্র তিনটে মাটির পুতুল।'

॥ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ॥

ক

পরদিনের সকালবেলা।

প্রায় রাত চারটের সময় স্বপ্নার চোখে এসেছিল ঘুম, আজ সকালবেলা আটটার আগে সে আর বিছানা থেকে উঠতে পারলে না।

কিন্তু বিছানা থেকে নামতে না নামতেই ঘরের বাহির থেকে শুনতে পেলে অমলেন্দু ও মহেন্দ্রর কণ্ঠস্বর। তারা তার নাম ধরে ডাকাডাকি করছে।

দরজা খুলে দিতেই অমলেন্দু উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'সমুদ্র আবার ডাক্তারকে ফিরিয়ে দিয়েছে।'

কথার অর্থ ধরতে না পেরে জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইল স্বপ্না।

মহেন্দ্র বললে, 'বুঝতে পারছেন না? ডাক্তারকে সমুদ্র গ্রাস করেছিল কাল রাত্রে। আজ আবার ডাঙার দিকে পাঠিয়ে দিয়েছে তার মৃতদেহকে। আমরা দুজনে খুব ভোরবেলা উঠে সমুদ্রের ধারে গিয়েছিলুম, ডাক্তারের দেহ দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে এসেছি।'

স্বপ্না শিউরে উঠে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'কোথায়, কোথায় সে দেহ?'

অমলেন্দু বললে, 'আমরা ডাক্তারের দেহটাকে তাঁর ঘরের ভিতরেই রেখে এসেছি। আপনার আর সে দৃশ্য দেখে কাজ নেই।'

স্বপ্না খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'আচ্ছা, আপনারা এখন নীচে যান। আমি জামাকাপড় বদলে এখনই গিয়ে চা আর খাবার তৈরি করে দিচ্ছি। যতই বিপদ হোক, আমরা তো উপোস করে থাকতে পারব না!'

অমলেন্দু বললে, 'স্বপ্না দেবী, আপনি জামাকাপড় বদলে নিশ্চিন্ত হয়ে নীচে আসুন। ততক্ষণে আমরা নিজেরাই উনুনে আগুন দিয়ে চায়ের কেটলি চড়িয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকব।'

সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিকে নামতে নামতে মহেন্দ্র বললে, 'অমলেন্দুবাবু, আপনার রিভলভারটা যদি সমুদ্রের জলে বিসর্জন দিতে পারেন, তাহলে আমি অত্যন্ত খুশি হই।'

—'কেন বলুন দেখি?'

—'ওই রিভলভারটা যতক্ষণ আপনার কাছে থাকবে, আমি নিজেকে নিরাপদ বলে ভাবতে পারব না।'

অমলেন্দু বললে, 'প্রাণ থাকতে এ রিভলভারটা আমি কাছছাড়া করতে পারব না। এইসব বাজে কথা না ভেবে আপনি এখন কতকগুলো কাঠ কেটে আনুন দেখি! আমি রান্নাঘরে গিয়ে চায়ের তোড়জোড় শুরু করে দিই।'

খ

তার পরের ঘটনা ঘটল অত্যন্ত তাড়াতাড়ি।

অমলেন্দু টেবিলের উপরে প্লেটগুলো সাজাতে সাজাতেই স্বপ্না এসে তার সঙ্গে যোগদান করলে।

অমলেন্দু বললে, 'সবই প্রস্তুত, মহেন্দ্রবাবু এখন কাঠ নিয়ে এলেই হয়।'

তার মুখের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই উঠানের দিক থেকে শোনা গেল একটা প্রচণ্ড আর্তনাদ ও কোনো গুরুভার জিনিস পড়ে যাওয়ার শব্দ।

স্বপ্না সচকিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'ও কার আর্তনাদ অমলেন্দুবাবু, ও কীসের শব্দ?'

অমলেন্দু বেগে বেরিয়ে গেল রান্নাঘরের ভিতর থেকে।

স্বপ্না আড়ষ্ট হয়ে মিনিট দুই দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল একখানা চেয়ারের উপর।

উঠানের দিকে থেকে শোনা গেল অমলেন্দুর ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর—'স্বপ্না দেবী, স্বপ্না দেবী! শীঘ্র এদিকে আসুন!'

স্বপ্নার দেহ তখন অবশ হয়ে এসেছিল। কোনোক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে সে উঠানের দিকে গেল দ্রুতপদে। তারপর সেখানে গিয়ে বিস্ফারিত নেত্রে দেখলে, অমলেন্দু হাঁটু গেড়ে মাটির উপরে বসে আছে এবং তার সামনেই পড়ে রয়েছে মহেন্দ্রের রক্তাক্ত ও নিশ্চেষ্ট দেহ।

ভয়ে সে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারলে না একটা শব্দও।

অমলেন্দু বললে, 'মহেন্দ্রবাবুর মাথা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ওই পাথরের ভাঙা আবক্ষ মূর্তিটা দেখতে পাচ্ছেন? ওটা ছিল দোতলার বসবার ঘরে! দোতলা থেকে কেউ ওটা মহেন্দ্রবাবুর মাথার উপরে ছুড়ে মেরেছে।'

স্বপ্না থেমে থেমে বললে, 'কিন্তু দোতলায় তো জনপ্রাণী নেই!'

গ

দুজনে মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বৈঠকখানার ভিতরে—অমলেন্দু ও স্বপ্না।

সর্বপ্রথমে কথা কইলে অমলেন্দু। টেবিলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সে আস্তে আস্তে বললে, 'ওখানে দাঁড়িয়ে আছে আর দুটো পুতুল। ও-দুটো হচ্ছে আমাদের দুজনেরই প্রতীক। এখন কার পালা আগে আসবে—আমার, না আপনার?'

স্বপ্না সচিৎকারে বললে, 'এ বাড়ি অভিশপ্ত অমলেন্দুবাবু! এখানে দাঁড়িয়ে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে! আসুন, আমরা বাইরে পালিয়ে যাই!'

অমলেন্দু বললে, 'তাই চলুন। কিন্তু বাইরে গিয়ে আমরা সান্ত্বনা পাব না—এ দ্বীপটাই হচ্ছে অভিশপ্ত!'

দুজনে বাড়ির বাইরে গিয়ে দ্রুতপদে অগ্রসর হতে লাগল সমুদ্রের দিকে। যেতে যেতে এসে পড়ল একটা জঙ্গলের কাছে। সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনটে বড়ো বড়ো গাছ।

স্বপ্না হঠাৎ চলা বন্ধ করলে সেই গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে। তারপর বললে, 'অমলেন্দুবাবু, এক কাজ করতে পারেন?'

—'কী কাজ স্বপ্না দেবী?'

—'এই গাছটা খুব উঁচু, এর উপরে আপনি উঠতে পারেন?'

অমলেন্দু বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'কেন?'

—'এর উপরে উঠলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাবে। হয়তো জলের উপরে কোনো নৌকা কি ওপারের কোনো গাঁয়ের চিহ্ন আপনার নজরে পড়তে পারে। দেখাই যাক না, যদি আমরা বাইরের কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি।'

অমলেন্দু একটু ভেবে বললে, 'আপনার এ প্রস্তাব মন্দ নয়। আচ্ছা, আপনি নীচে দাঁড়ান, আমি গাছের উপরে উঠে দেখি কোথাও কিছু দেখতে পাওয়া যায় কি না?'

অমলেন্দু পায়ের জুতো জোড়া খুলে ফেললে। তারপর দু-হাতে গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে উপর দিকে উঠতে লাগল। এবং উঠতে উঠতে অনুভব করলে, তার

পকেটের ভিতরে ফস করে হাত চালিয়ে রিভলভারটা কে টেনে বার করে নিলে!

—'স্বপ্না দেবী, স্বপ্না দেবী!'

স্বপ্না খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, 'এইবারে আমি নিজেকে নিরাপদ বলে মনে করতে পারব!'

অমলেন্দু লাফিয়ে পড়ল ভূমিতলের উপরে। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'স্বপ্না দেবী, এরকম কৌতুক আমি পছন্দ করি না। আমার রিভলভার এখনই ফিরিয়ে দিন।'

স্বপ্না দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'এ রিভলভার এখন আমার কাছেই থাকবে। আমি আপনাকে হত্যা করব না, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

অমলেন্দু তার দিকে এগিয়ে গেল, স্বপ্নাও গেল পিছিয়ে। বললে, 'কিছুতেই এ রিভলভার আপনাকে আমি ফিরিয়ে দেব না। আপনি আরও এগিয়ে এলে নিজেই বিপদে পড়বেন।'

অমলেন্দুর মুখ তখন আরক্ত হয়ে উঠেছে প্রচণ্ড ক্রোধে। আত্মহারার মতন গর্জন করে সে বললে, 'স্বপ্না ফিরিয়ে দাও আমার রিভলভার!'

—'কখনো না, কখনো না। ওইখানে দাঁড়িয়ে থাকুন! নারী হলেই কেউ অবলা হয় না। চরম বিপদের সময় ভেড়াও ফিরে রুখে দাঁড়ায়। আপনি আর এক পা এগুলেই আমি রিভলভার ছুড়তে বাধ্য হব।'

অমলেন্দু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, কিন্তু তার মুখ-চোখ উদ্‌ভ্রান্তের মতো। ডান হাতে রিভলভার তুলে স্বপ্নাও নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—তার মুখে-চোখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব।

আচম্বিতে অমলেন্দু বন্য জীবের মতো সামনের দিকে লম্ফত্যাগ করলে এবং সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠল স্বপ্নার হাতের রিভলভার।

তীব্র এক আর্তনাদ করে অমলেন্দু মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল। দু-এক বার ছটফট করেই তার দেহ হয়ে গেল একেবারে নিস্পন্দ।

স্বপ্না হা হা করে অট্টহাসি হেসে উঠল, তারপর দ্রুতপদে ছুটতে লাগল বাড়ির দিকে।

চত্বর পেরিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে সে উঠে গেল দোতলায়, তারপর নিজের ঘরে ঢুকে ধপাস করে একখানা চেয়ারে বসে পড়ে হাঁপাতে

হাঁপাতে বললে, 'আর কোনো ভয় নেই, আর কোনো ভয় নেই! দ্বীপে এখন আমি একলা! হ্যাঁ, নয়টা মৃতদেহের মাঝখানে একলা বেঁচে আছি খালি আমি! আমার হাতে আছে রিভলভার—এখন আমি আর কারুকেই ভয় করি না! সাক্ষাৎ মৃত্যুও যদি আমার সামনে আসে, তাকে দেখেও আমি রিভলভার ছুড়তে ইতস্তত করব না! হা হা হা হা, আমি একলা—আমি একলা!'

আচমকা পিছনে শোনা গেল যেন কার পদশব্দ। স্বপ্না ফিরে দেখবারও অবসর পেলে না, হঠাৎ সবলে কে চেপে ধরলে তার কণ্ঠদেশ!

তার হাত থেকে রিভলভারটা খসে মেঝের উপরে পড়ে গেল সশব্দে এবং ক্রমে ক্রমে তার চোখের সামনে পৃথিবী হয়ে এল অন্ধকার!

॥ অবশেষ ॥

'জলপরি' জাহাজের কাপ্তেন সমুদ্রে ভাসমান এক বোতলের ভিতরে এই বিবরণী পেয়ে পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

ক

'অ্যাডভেঞ্চারে'র গল্পে প্রায়ই পাঠ করা যায়, একটা বোতলে কেউ কেউ দরকারি চিঠিপত্র ভরে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে, এবং অবশেষে সে বোতলটা হয়েছে অন্য কারুর হস্তগত। তারপর জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে অদ্ভুত কোনো রহস্যের কাহিনি।

এই পদ্ধতিটা বরাবরই আকৃষ্ট করেছে আমাকে। আমিও এই পদ্ধতি অবলম্বন করলুম। যখন এই ভাসমান বোতলটা জল থেকে কেউ উদ্ধার করবে, আমি তখন নিশ্চয়ই ইহলোকে বিদ্যমান থাকব না।

এক বিষয়ে আমি নিশ্চিত আছি। হারাধনের দ্বীপে দশ-দশটা হত্যাকাহিনি নিয়ে নিশ্চয়ই চারিদিকে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হবে। এবং পুলিশও যে প্রাণপণে চেষ্টা করবে, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু তদন্তের যে কোনোই ফল হবে না এবং আসল হত্যাকারীকে কেউ যে আবিষ্কার করতে পারবে না, সেটাও আমি আগে থাকতেই অনুমান করতে পারছি। নিখুঁত অপরাধ করবার জন্যে উচ্চশ্রেণির অপরাধীরা প্রায়ই আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। হারাধনের দ্বীপের

হত্যাকাণ্ড হচ্ছে সেইরকম এক নিখুঁত অপরাধ; পুলিশের সাধ্য নেই যে, এই মামলার রহস্য ভেদ করে। পুলিশের এই অসহায় অবস্থা কল্পনা করেই অতঃপর আমি নিজেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে চাই।

আমি হচ্ছি চন্দ্রকান্ত চৌধুরি। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারক।

অত্যন্ত কঠোর বিচারক বলে আমার একটা কুখ্যাতি ছিল। সকলে আমার নাম দিয়েছিল, ফাঁসুড়ে জজ! সেটা নিতান্ত অমূলক নয়। অপরাধীদের চরম দণ্ড দেবার সুযোগ পেলে, আমি একটা নিষ্ঠুর আনন্দ উপভোগ করতুম। জীবনে বহু আসামিকেই প্রাণদণ্ড দিয়েছি, ক্ষমা করিনি কারুকেই।

অপরাধীর পর অপরাধীর বিচার করতে করতে আমার মনের ভিতরে আসে এক বিশেষ পরিবর্তন। দিনে দিনে ভালো করেই অনুভব করতে পারলুম যে, আমার চরিত্রও বদলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। অন্য লোকে খুন করে ধরা পড়েছে এবং আমিও করেছি তার শাস্তিবিধান। ক্রমে ব্যাপারটা এমনি একঘেয়ে হয়ে উঠল যে, সেটাতে আমার মনে জাগত না আর কোনো উত্তেজনা।

মনে মনে ভাবতে লাগলুম, হত্যাকারীর বিচারক না হয়ে আমি নিজেই যদি হই হত্যাকারী? সাধারণ নয়, অসাধারণ হত্যাকারী—যে হত্যা করবে, অথচ ধরা পড়ে আসামি হয়ে বিচারকের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে না। কেউ তাকে কোনোই সন্দেহ করতে পারবে না। অর্থাৎ সেই হত্যা হবে নিখুঁত অপরাধ।

বিচারকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর থেকে মনে মনে প্রায় নিখুঁত অপরাধের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করতুম।

এই সময়ে পেলুম পরলোকের আমন্ত্রণ। আমি হৃদরোগের দ্বারা আক্রান্ত হলুম। তার উপরে আমার হল সন্ন্যাস রোগও। রক্তের চাপ বেড়ে যাওয়ায় দুই-দুই বার অজ্ঞান হয়ে গেলুম। বড়ো বড়ো ডাক্তারেরা মত প্রকাশ করলে, তৃতীয় আক্রমণই হবে আমার পক্ষে মারাত্মক। অর্থাৎ হয় হৃদরোগে, নয় সন্ন্যাসরোগে অদূর-ভবিষ্যতেই আমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

তখনই মনে মনে সংকল্প করলুম, আমার উচ্চাকাঙক্ষাকে সফল না করে পৃথিবী থেকে আমি বিদায় গ্রহণ করব না। নিখুঁত অপরাধ! হ্যাঁ, আমাকে করতে হবে একটা চিরস্মরণীয় অপরাধের অনুষ্ঠান!

লোকে যেমন বেছে বেছে বলির পশু সংগ্রহ করে, আমিও তেমনি বেছে বেছে এমন কয়েক ব্যক্তির নাম সংগ্রহ করলুম, আইন যাদের দণ্ড দিতে

পারেনি, কিন্তু অপরাধী বলে যাদের কুখ্যাতি আছে। তাদের বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহ করবার জন্যে আমাকে চর নিযুক্ত করে বড়ো অল্প অর্থ ব্যয় করতে হয়নি।

অ্যাটর্নি বিজন বোসকে মধ্যস্থ রেখে আমি কাজ শুরু করে দিলুম। যদিও তার কাছে আমি কোনো কথাই ভাঙিনি, তবু অ্যাটর্নিরা তো নির্বোধ জীব নয়, সে বোধহয় একটা কিছু সন্দেহ করেছিল। সেই সন্দেহই হল তার কাল। সমস্ত বন্দোবস্ত যখন পাকা হয়ে গেল, তাকেও দিলুম আমি প্রাণদণ্ড। কেমন করে, এখানে তা নিয়ে আর আলোচনা করতে চাই না। তবে হারাধনের দ্বীপে আসবার আগেই তার মুখ আমি চিরকালের জন্যে বন্ধ করে দিয়েছি। আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার লোক আর কেউ নেই।

হারাধনের দ্বীপ হচ্ছে আমার নিখুঁত অপরাধের পক্ষে আদর্শ স্থান। বাড়িঘর সবই সাজানো-গুছানো ছিল, সেই অবস্থাতেই তিন মাসের জন্যে দ্বীপটা আমি বেনামে ভাড়া নিয়েছি। বিজন বোসের সাহায্যেই অতিথি অভ্যর্থনা করবার জন্যে যা কিছু ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেছিলুম।

নিজেকেও অতিথি সেজে এখানে আসতে হবে, অতএব সকলের চোখে ধুলো দেবার জন্যে মাঝখানে খাড়া করলুম চারুশীলা দেবীকে। তিনি কাল্পনিক লোক নন। সত্য সত্যই আট-দশ বছর আগে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, কিন্তু এখন তিনি পরলোকে! তাঁর নামে একখানা চিঠি লিখে নিজের সঙ্গে রাখলুম—যেন এই দ্বীপটা কিনে তিনিই আমাকে এখানে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন। এই মিথ্যাটাকে সত্যের মতো সহজ করে আনবার জন্যে মনে মনে বারবার এই কথা নিয়েই আলোচনা করতে লাগলুম এবং দ্বীপের অন্যান্য আগন্তুকদেরও কাছে সেই চিঠিখানা বার করে দেখাতে ছাড়লুম না। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকেই বিশ্বাস করেছিল আমার কথা।

অতঃপর আমার এই নিখুঁত অপরাধের কাহিনি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা বলবার দরকার নেই। মনোতোষের গেলাসে সকলের অগোচরে সায়ানাইড মিশিয়ে দিয়েছিলুম আমিই। আমার কাছে আর-একটা জিনিসও ছিল—যা অল্পমাত্রায় ঔষধ আর বেশিমাত্রায় বিষ। 'ক্লোর্যাল হাইড্রেট'। ঘুমোবার ঔষধরূপে এটা ব্যবহার করা যায়, কিন্তু মাত্রাধিক্য হলেই মারাত্মক হয়ে ওঠে। ডাক্তারও সত্যবালাকে একটা ঘুমোবার ওষুধ দিয়েছিলেন। সেটা কি তা আমি জানি না,

কিন্তু সত্যবালার ওষুধের গেলাসে সেই সঙ্গে ক্লোর‍্যাল হাইড্রেট মিশিয়ে দেওয়াও আমার পক্ষে কঠিন হয়নি। মেজর সেন মারা পড়েছেন বিনা যন্ত্রণায়। আমি যখন পা টিপে টিপে তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়াই তখন তিনি কিছুই টের পাননি। আমার হাতে ছিল একটা লোহার ডান্ডা। এক আঘাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এমন সাবধানে আমি কাজ করে গিয়েছি, কেউ আমরা উপরে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারেনি। ডাক্তার বোস বরাবরই সন্দেহ করে এসেছেন অমলেন্দুকে। তাঁর সেই সন্দেহকে দৃঢ়মূল করে তোলবার জন্যে আমিও কোনো যুক্তির আশ্রয় নিতে ছাড়িনি।

সর্বশেষ

'জলপরি' জাহাজের কাপ্তেন সমুদ্রে ভাসমান এক বোতলের ভিতরে যে বিবরণী পেয়ে পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তারই বাকি অংশ।

অবশেষে কৌশলে ডাক্তারকেও আমি আমার পক্ষে টেনে নিলুম। তাঁকে বললুম, 'এইবার আমি নিজের মৃত্যুর ভান করে আসল হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করতে চাই।'

প্রথমে তিনি আমার কথার অর্থ ধরতে পারেননি। তারপর আমি তাঁকে ভালো করে সব কথা বুঝিয়ে দিলুম। সকলে জানবে যে কেউ গুলি করে আমাকে মেরে ফেলেছে, কিন্তু আসলে আমি বেঁচে থেকেই প্রকৃত হত্যাকারীর কার্যকলাপের উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখব।

তারপর ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াল যথেষ্ট থিয়েটারি—যদিও সেটা হচ্ছে আমার খামখেয়াল মাত্র। লাল পর্দাটা মুড়ি দিয়ে আমি সোফার উপরে গিয়ে বসলুম। ডাক্তার আমার কপালের উপরে এঁকে দিলেন একটা রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন। আমার মাথায় পরানো রইল একটা সাদা রঙের পশমি পরচুলা।

আর সকলের মতো ডাক্তারও প্রাণের ভয়ে অত্যন্ত অশান্তি ভোগ করছিলেন। আমার প্রস্তাবটা তাঁর খুব মনে লেগে গেল। আমার কথামতো কাজ করতে তিনি একটুও নারাজ হলেন না।

আমার তথাকথিত 'মৃত্যু'-র পরে আমার দেহটাকে উপরের ঘরে তুলে রেখে আসা হল। আমি বেশ জানতুম, মানুষ মৃতদেহকে—বিশেষত নিহত মানুষের দেহকে যথেষ্ট অপার্থিব বলে মনে করে। আমার মৃত্যুর পরেও আমার দেহকে

আবার পরীক্ষা করবার জন্যে কেউ যে আর উপরকার ঘরে ঢুকতে চাইবে না, এটাও আমি বেশ বুঝে নিয়েছিলুম।

কিন্তু মৃত্যুর আগেই আমি নিত্যানন্দ ও সৌদামিনীকেও পরলোকে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলুম। নিত্যানন্দ মারা পড়ে মেজর সেনেরই মতন। সে কাঠ কাটছিল, আমি পিছন দিক থেকে ভোজালি দিয়ে তাকে আঘাত করি। কিন্তু সৌদামিনীকে হত্যা করবার জন্যে আমাকে কিঞ্চিৎ বেগ পেতে হয়েছিল। প্রথমে খাবার ঘরে তাঁরও চায়ের পেয়ালায় আমি মিশিয়ে দিই 'ক্লোর‍্যাল হাইড্রেট'। চা-পানের পরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে চেয়ারের উপরে বসিয়ে রেখে সকলে যখন বৈঠকখানায় গেল, তখন সর্বশেষে ছিলুম আমি। তারপর তিনি যখন কতকটা চেতনা হারিয়ে ফেলেছেন, সেই সময়ে এক মুহূর্তের মধ্যেই 'হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জে'র সাহায্যে তাঁর দেহের মধ্যে সায়ানাইডের বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে সে ঘর থেকে আমি চলে আসি।

মৃত্যুর পরেই আমি স্থির করলুম, এইবার ডাক্তারকেও পথ থেকে সরাবার সময় এসেছে। ডাক্তারকে বললুম, রাত্রে চুপি চুপি তাঁর সঙ্গে আমার পরামর্শ আছে। দ্বীপের যেদিকে নদীর মোহনা, তিনি যেন সেইদিকে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করেন। কিছু সন্দেহ না করেই তিনি রাজি হয়ে গেলেন। যথাসময়ে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হল। তাঁকে নিয়ে আমি জলের ধারে একটা উচ্চভূমির উপরে গিয়ে উঠলুম।

আমি জানতুম, জল সেখানে খুব গভীর। কথা কইতে কইতে হঠাৎ আমি তাঁকে বললুম, 'দেখুন ডাক্তার বোস, নীচে একখানা নৌকো বাঁধা রয়েছে না?' শুনেই তিনি আগ্রহভরে জলের ধারে ঝুঁকে পড়লেন। তারপর আমার হাত থেকে আচমকা একটা ধাক্কা খেয়ে ঝুপ করে তিনি পড়ে গেলেন একেবারে জলের ভিতরে। আমি জানতুম তিনি সাঁতার কাটতে পারেন না।

মহেন্দ্রকে কীভাবে হত্যা করেছি সেটা বোধহয় আর ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না। তারপর মারা পড়ে অমলেন্দু—যদিও আমার হাতে তাকে মরতে হয়নি। স্বপ্নার রিভলভারের গুলিতে কেমন করে সে মারা পড়ে, উপরের ঘর থেকেই সে দৃশ্যটা আমি দেখতে পেয়েছিলুম।

স্বপ্না উত্তেজিতভাবে ছুটতে ছুটতে বাড়ির দিকে আসে। তারপর উপরে উঠে

নিজের ঘরে ঢুকে বসে পড়ে। সেই সময় পিছন দিক থেকে গিয়ে আমি তার গলা টিপে ধরি।

তারপর নিজের ঘরে ফিরে এসেই আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে থাকি। বেশ বুঝতে পারলুম, আমার রক্তের চাপ ক্রমশ বেড়ে উঠেছে। মনে অত্যন্ত দুশ্চিন্তা হল, পাছে এই বিয়োগান্ত নাটকের চরম দৃশ্যটা যথেষ্ট রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠবার আগেই মারা পড়ি, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি লিখে ফেললুম আমার এই কাহিনি।

কাগজখানাকে বোতলে পুরে ছিপি এঁটে জলে ফেলে দিতেও দেরি করলুম না। কিন্তু তার আগেও আরও যা করেছিলুম, আমার কাহিনির মধ্যে সে কথাও বলে রাখতে আমি ভুলিনি। নিখুঁত অপরাধের পালা চুকিয়ে, শয্যায় আশ্রয় নিয়ে আমিও পান করব 'পোটাসিয়াম সায়ানাইড'। হৃদরোগে নয়, রক্তের চাপে নয়, ইহলোক ত্যাগ করবার পথ খুঁজে নিই আমিই স্বয়ং!'

হিমাচলের স্বপ্ন

এক

পথের নেশা

একদিন এক খোকাবাবু তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলে, 'হাঁ বাবা, এ কে?

খোকার বাবা বললেন, 'ভাল্লুক'।

খোকার মুখ দিয়ে বোধহয় 'ক' বেরুল না। সে নিজের ভাষায় সংশোধন করে নিয়ে বললে 'ভাল্লু!'

সেইদিন থেকে সবাই তাকে 'ভাল্লু' বলে ডাকতে আরম্ভ করলে।

ভাল্লু জন্মেছিল হিমালয়ের জঙ্গলে, সুতরাং বুঝতেই পারছ, সে হচ্ছে রীতিমতো বড়োঘরের ছেলে। ভাল্লুকবংশে যারা কুলীন বলে মর্যাদা পায়, তাদের সকলেরই জন্ম গিরিরাজ হিমালয়ের কোলে।

ভাল্লু যখন মায়ের দুধ ছাড়েনি, সেই সময়ে হঠাৎ সে এক শিকারীর হাতে ধরা পড়ে। তারপর শিকারী তাকে যার কাছে বেচে ফেলে, তার ব্যবসা ছিল ভাল্লুক আর বাঁদরের খেলা দেখানো। তার কাছ থেকে ভাল্লুক নানানরকম খেলা শিখলে—এমন কি ওরিয়েন্টাল ডান্স পর্যন্ত। লোকে তার বুদ্ধি আর খেলার কায়দা দেখে বাহবা দিত ঘন ঘন।

তা ভাল্লু যে বিশেষ বুদ্ধিমান হবে, এটা আশ্চর্য কথা নয়। তার অমর ও ভারতবিখ্যাত পূর্বপুরুষ ভল্লুকরাজ জাম্ববানের নাম কে না জানে? জাম্ববান ছিলেন বানররাজ সুগ্রীবের প্রধানমন্ত্রী এবং অযোধ্যার রাজা শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধসভার একজন প্রধান সভ্য। জাম্ববানের বীরত্ব, সূক্ষ্ম বুদ্ধি এবং কুস্তি লড়বার ও চপেটাঘাত করবার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত তাঁর জামাই না হয়ে পারেননি।

যে লোকটা ভাল্লুক নিয়ে দেশে দেশে খেলা দেখিয়ে বেড়াত হঠাৎ সে মারা পড়ল। চার বছর বয়সে ভাল্লু বেচারি হল আবার অনাথ। সেই সময়ে কে তাকে নিয়ে গিয়ে আলিপুরের চিড়িখানায় ভর্তি করে দেয়। আজ এক বছর সে চিড়িয়াখানায় বাস করছে।

কিন্তু চিড়িয়াখানা তার মোটেই পছন্দ হত না। বারবার দেশে দেশে বেড়িয়ে বেড়ানো তার অভ্যাস, এইটুকু একটা লোহার রেলিংঘেরা কুঠুরির ভিতরে দিনরাত অলসের মতন বসে থাকতে তার ভালো লাগবে কেন? বিশেষ, ভাল্লু হচ্ছে একটি বড়োদরের আর্টিস্ট। কত কষ্ট করে সে দুর্লভ নৃত্যবিদ্যা শিখেছে—অথচ এখানে কেউ তাকে ডুগডুগি বাজিয়ে নাচ দেখাতে বলে না। মাঝে মাঝে নাচবার জন্যে তার পা দুটো নিশপিশ করে উঠত, কিন্তু সঙ্গতের অভাবে তার ইচ্ছা হত না পূর্ণ।

রোজই খোকাখুকির দল তার ঘরের সামনে এসে কৌতূহলে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকত। ভাল্লু রেলিংয়ের কাছে গিয়ে নিজের ভাষায় বলত, 'ঘোঁত ঘোঁত ঘোঁত ঘোঁত! অর্থাৎ—'হে খোকাখুকিগণ, তোমরা কেউ একটা ডুগডুগি নিয়ে আসতে পার?'

কিন্তু মানুষের ছেলেমেয়েরা ভল্লুকভাষা বুঝতে পারত না, তারা ভাবত সে বোধহয় খাবার-টাবার কিছু চাইছে। রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে খাঁচার ভিতরে এসে পড়ত কলা বা ছোলা বা অন্য কোনওরকম শস্তা দামের ফলমুল।

ভাল্লু দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবত, মানুষদের ছেলেপুলেরা আর্ট বোঝে না, ললিতকলার চেয়ে চাঁপাকলার দিকেই তাদের বেশি টান।

মাঝে মাঝে তার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ত। সেই বিরাট হিমালয়! তুষারমুকুট উঠেছে তার নীলাকাশের অসীমতায়, শিখরের পর শিখরের আশপাশ দিয়ে সাদা সাদা মেঘেরা ভেসে যাচ্ছে তাকে প্রণাম করে। নিচের দিকে দুলছে তার গভীর অরণ্যের সবুজ অঞ্চল—সেখানে মিষ্টি গান গাইছে কত পাখি, আতরের ভুরভুরে গন্ধ বিলিয়ে দিচ্ছে কত ফুল, রঙচঙে টুকরো উড়ন্ত ছবির মতন ঘোরাফেরা করছে কত প্রজাপতি। জঙ্গলের বুকের ভিতরে আলো-আঁধার-মাখা রহস্যময় স্বপ্নপুর, তারই মধ্যে ছিল তার সুখের বাসা।

ভাল্লু একদিন খাঁচার এক কোণে উপুড় হয়ে শুয়ে এইসব কথা ভাবছে, এমন সময়ে তার রক্ষক এসে খাঁচার দরজা খুললে।

ভাল্লু মানুষদের অত্যন্ত পোষ মেনেছিল। তার চেহারা ছিল প্রকাণ্ড এবং তার লম্বা দাঁত-নখ দেখলে সকলেই ভয় পেত বটে, কিন্তু যারা তাকে চিনত তারা বলত, ভাল্লুর মেজাজ খরগোশের চেয়েও ঠাণ্ডা। সে কোনওদিন পালাবার চেষ্টা করেনি, কারুকে তেড়ে যায়নি, বা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ধমক দেয়নি। কাজেই রক্ষক প্রায় খাঁচার দরজা বন্ধ না করেই নিজের কাজকর্ম সারত।

ভাল্লুর বাসা ছিল দুই ভাগে বিভক্ত। একদিকে উপরে ছাদ ছিল না—তিন পাশে ছিল কেবল লোহার রেলিং। যেদিকে রেলিং ছিল না সেইদিকে ছিল একটি ছোটোঘর। রাতের বেলায় ভাল্লু এই ঘরে ঢুকে শুয়ে শুয়ে দেখত হরেকরকম স্বপ্ন।

ভাল্লু যে রেলিংয়ের পাশে উপুড় হয়ে ছেলেবেলার স্বাধীনতার কথা ভাবছে, রক্ষক সেটা আন্দাজ করতে পারলে না। সে ভিতরের ঘরটা ঝাঁট দিতে গেল।

খানিক পরে ঘর ঝাঁট দিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে দেখে, খাঁচার ভিতরে ভাল্লু নেই। তাড়াতাড়ি খাঁচার খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়েও সে ভাল্লুকে দেখতে পেলে না।

খিদিরপুরের দিকে চিড়িয়াখানায় ঢোকবার যে ছোটো দরজা আছে, ভাল্লু ততক্ষণে সেইখানে গিয়ে হাজির হয়েছে।

চিড়িয়াখানার দুইজন কর্মচারি দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, হঠাৎ তাঁরা দেখলেন একটা মস্ত বড়ো ভীষণ ভাল্লুক ছুটতে ছুটতে তাঁদের দিকেই আসছে।

সে অবস্থায় প্রত্যেক ভদ্রলোকের যা করা উচিত, তাঁরা তাই-ই করলেন—অর্থাৎ বিনা বাক্যব্যয়ে এক এক লাফ মেরে দরজার বাইরে গিয়ে পড়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পথ খোলা পেয়ে ভাল্লু একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়ল। আজ এক বছর পর রাস্তায় বেরিয়ে ভাল্লুর মনে আনন্দ আর ধরে না। এমনি কত রাস্তায় সে কত না খেলা দেখিয়েছে—আহা, রাস্তা চমৎকার জায়গা! সে আবার ধুলোয় শুয়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

একটি ফিটফাট মেম নাক শিকেয় তুলে চিড়িয়াখানার দিকে আসছিল। হঠাৎ মেমের সন্দেহ হল, তার নাকের ডগায় ধুলো লেগেছে। সে তখনই দাঁড়িয়ে পড়ে ভ্যানিটি ব্যাগের ভিতর থেকে বার করলে পুঁচকি আরশি ও পাউডারের তুলি। তারপর একহাতে আরশি ও আর একহাতে তুলি ধরে নাকের ডগায় পাউডার মেখে সে চোখ নামিয়ে দেখলে এক অসম্ভব দুঃস্বপ্ন।

ভাল্লু আজ পর্যন্ত কোনও মানুষকে নাকের ডগায় পাউডার ঘষতে দেখেনি। সে মেমের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে তার মুখের পানে তাকিয়েছিল।

ঠিকরে পড়ল মেমের হাত থেকে ভ্যানিটি ব্যাগ, পাউডারের তুলি ও শৌখিন আয়না। বিকট এক আর্তনাদ, এবং মূর্ছিত মেমসাহেব পপাত ধরণীতলে।

এদিকে এক মিনিটের মধ্যে রাস্তা জনশূন্য। একদল পথের কুকুর ঘেউ ঘেউ করে এগিয়ে এল। কিন্তু ভাল্লু একবার মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই তারা ল্যাজ গুটিয়ে চম্পট দিলে।

আগেই বলেছি, ভাল্লু হচ্ছে বুদ্ধিমান জাম্ববানের বংশধর। হনুমানের বংশধর হয় হনুমান, জাম্ববানের বংশধরই বা জাম্ববান হবে না কেন? কাজেই তার বুঝতে বিলম্ব হল না যে, চিড়িয়াখানার লোকেরা এখনই তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য ছুটে আসবে।

কিন্তু সে আর চিড়িয়াখানায় ফিরে যেতে রাজি নয়। আজ সে হিমালয়ের স্বাধীন জীবনের স্বপ্ন দেখেছে। আজ পেয়ে বসেছে তাকে পথের নেশা—পথের পর পথ, তারপর আবার পথ, নূতন নূতন দেশ আর পথ, পথ আর দেশ। তারপর সে হয়তো আবার খুঁজে পাবে তার সেই দূর-দূরান্তরে হারিয়ে যাওয়া কত সাধের হিমালয়কে।

এখন, কেমন করে মানুষদের চোখে ধুলো দেওয়া যায়?

ভাল্লু এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলে, কেউ কোথাও নেই। মেমসায়েব শুয়ে শুয়ে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে তাকে দেখেই আবার প্রাণপণে চোখ মুদে ফেললে।

সামনেই ছিল একটা মস্তবড়ো ঝুপসি গাছ। ভাল্লু চটপট গাছে চড়ে ঘন পাতার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দুই

সাহসিনী মিসেস দস্তিদার

দিব্য ব্ল্যাকআউটের রাত। আকাশে একফালি চাঁদ আছে বটে, কিন্তু নামে মাত্র। চারিদিকের গাছপালা ও ঘরবাড়ি প্রভৃতিকে দেখাচ্ছে কালো পটে আরও কালো কালি দিয়ে আঁকা ঝাপসা ছবির রেখার মতো।

কনেস্টবল হনুমানপ্রসাদ পাঁড়ে রাস্তার ধারে একটি ভালো রোয়াক পেয়ে শুয়ে পড়ে মস্ত মস্ত মর্তমান কদলী কিংবা ছাতু নুন ও কাঁচালঙ্কার স্বপ্ন দেখছিল নির্বিঘ্নে

হঠাৎ তার মুখের উপর লাগল যেন একটা ঝড়ের ঝাপটা। স্বপ্ন হল অদৃশ্য, নাসাগর্জন হল বন্ধ এবং তার বদলে দেখা গেল অন্ধকারেরও চেয়ে অন্ধকার ও প্রকাণ্ড কি যেন একটা বিদঘুটে ব্যাপার। তারই মধ্যে জ্বলছে আবার দু-দুটো আগুনের গুলি।

এও স্বপ্ন নাকি? কিন্তু এ রকম স্বপ্ন হনুমানপ্রসাদ পছন্দ করত না। সে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে চোখ পাকিয়ে দেখলে, একটা রীতিমতো সচল অন্ধকার তার সামনে হেলছে এবং দুলছে। আর সে অন্ধকারটা যেন কেমন একরকম বোটকা গন্ধের এসেন্স মেখে এসেছে।

ব্যাপরটা তোমরা বুঝতে পেরেছ কি? চতুর্দিক নিঃসাড় ও নিরাপদ দেখে আমাদের ভাল্লু

বৃক্ষের আশ্রয় ছেড়ে মৃত্তিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং হনুমানের নাসিকার হুঙ্কার শুনে সাগ্রহে ঘ্রাণ নিয়ে জানতে এসেছে এ আবার কোন দুষ্ট জানোয়ার, তাকে দেখে কি টিটকারি দিচ্ছে!

ম্লান আলোয় হনুমান সঠিক রহস্য উপলব্ধি করতে পারলে না বটে, কিন্তু আন্দাজে এটুকু বেশ বুঝতে পারলে যে, তার সামনে যে আবির্ভূত হয়েছে সে একটা মূর্তিমান বিভীষিকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

হনুমান যখন ঠকঠক করে কাঁপতে আরম্ভ করলে তখন তাকে আশ্বাস দেবার জন্যে ভাল্লু একবার ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল।

পরমুহূর্তে হনুমান পাঁড়ে রোয়াকের উপর থেকে এমন এক সুদীর্ঘ লম্ফ ত্যাগ করলে যে আসল হনুমানরা পর্যন্ত তা দেখলে দস্তুরমতো অবাক হয়ে যেত। তারপরই একমাইলব্যাপী বিকট চিৎকার—'বাপরে বাপ, জান গিয়া রে জান গিয়া!'

ভাল্লু মাথা খাটিয়ে বুঝলে, এই চিৎকারের ফল ভালো হবে না এখনই এ মুল্লুকের যত মানুষ ঘটনাস্থলে তদারক করতে আসবে এবং তারপর আবার গলায় পড়বে দড়ি। ভাল্লু তার চারখানা পা যতটা পারে চালিয়ে একদিকে ছুটতে শুরু করলে।

দৌড়, দৌড়, দৌড়! উত্তর দিকে দৌড়তে দৌড়তে হনুমান পাঁড়ে বারংবার পিছনপানে তাকিয়ে দেখছে সেই অগ্নিচক্ষু অন্ধকারটা তাকে গ্রাস করবার জন্য এখনও পিছনে পিছনে আসছে কি না এবং দক্ষিণ দিকে দৌড়তে দৌড়তে ভাল্লু বারংবার পিছনপানে তাকিয়ে দেখছে, তার হিমালয়ের স্বপ্নে বাদ সাধবার জন্যে মানুষেরা দড়ি নিয়ে বোঁ-বোঁ করে ছুটে আসছে কি না। তাদের দুজনেরই দৌড় দেখে বোঝা শক্ত, কে বেশি ভয় পেয়েছে।

পাহারাওয়ালা কত দূর গিয়ে দৌড় থামালে জানি না, কিন্তু ভাল্লু আধঘণ্টার পর একটি নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁপ ছাড়তে লাগল।

তখন রাত এসেছে ফুরিয়ে। পূর্ব আকাশে কে যেন কালোর সঙ্গে গুলে দিচ্ছে আলোর রঙ। ভোর হতে আর দেরি নেই দেখে ভাল্লু আবার একটা খুব উঁচু ও ঝাঁকড়া গাছ বেছে নিয়ে তড়বড় করে তার উপরে উঠে ঘন পাতার আড়ালে মিলিয়ে গেল। একদল কাক আর শালিক পাখি তখন সবে জেগে উঠে প্রভাতী রাগিনী ভাঁজবার আয়োজন করছিল, আচমকা দুঃস্বপ্নের মতন তাদের মধ্যিখানে ভাল্লুর আবির্ভাব দেখেই তারা বেসুরো চিৎকার করে যে যেদিকে পারলে উড়ে পালাল।

ভাল্লু মনে মনে বললে, পাখিগুলো কেন যে আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ওরে কাক, ওরে শালিকের দল, তোরা আবার বাসায় ফিরে আয়। আমি যে পরম বৈষ্ণব, মাছ-মাংস স্পর্শ করি না! তার উপরে আমি দেখেছি হিমাচলের সুন্দর স্বপন—আমার মন ছুটছে এখন অনন্ত হিমারণ্যের শীতল স্তব্ধতার দিকে, সেই যেখানে ঝরে তুষারের ঝরনা, বুনো বাতাস আনে অজানা ফুলের গন্ধ, গাছে গাছে ফলে থাকে পাকা পাকা মিষ্টি ফল। আজ আমি স্বাধীন, আজ আমি দেশে চলেছি, আজ কি আমি জীবহিংসা করতে পারি?....ভাল্লু ঠিক এই কথাগুলোই ভাবছিল কি না হলপ করে আমি বলতে পারি না, এসব আন্দাজ মাত্র। তবে সে কিছু-না-কিছু ভাবছিল নিশ্চয়ই, এবং চার পা দিয়ে গাছের একটা মোটা ডাল জড়িয়ে ভাবতে ভাবতে ভোরের ফুরফুরে হাওয়ায় কখন সে ঘুমিয়ে পড়ল।

বেশ খানিকক্ষণ পরে তার ঘুম গেল ভেঙে। পিটপিট করে চোখ মেলে নিচের দিকে তাকিয়ে সে দেখলে একটা দৃশ্য।

একটি বাগান। ভাল্লুর গাছটা বাগানের পাঁচিলের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু তার আধাআধি ডালপালা শূন্যে বাগানের ভিতরদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ভাল্লু যে মোটা ডালটাকে অবলম্বন করেছে সেটা আবার বেঁকে নেমে গিয়েছে বাগানের জমির কাছাকাছি।

সেদিন রবিবার। কলকাতার কোনও মেয়েস্কুলের একদল ছাত্রী সেই বাগানে এসেছে বনভোজনে।

দশটি মেয়ে—বয়স তাদের বারো-তেরো থেকে পনেরো-ষোলোর মধ্যে। সঙ্গে চার জন শিক্ষয়িত্রীও আছেন।

প্রধান শিক্ষয়িত্রী হচ্ছেন মিসেস দস্তিদার। শুকনো ও লিকলিকে সরল কাঠের মতন তাঁর দেহ—মাথায় উঁচু সাড়ে-পাঁচ ফুটেরও বেশি। পুরুষই হোক আর মেয়েই হোক, এ রকম রোগা চেহারায় যা সুলভ নয়, মিসেস দস্তিদার ছিলেন সেই বেজায় ভারিক্কে ভাবের অধিকারিণী। চশমাপরা চোখে কড়া চাহনি, এবং একজোড়া পুরু ঠোঁটের উপরে উল্লেখযোগ্য একটি গোঁফের রেখা। মেয়েদের ভেতরে একবার প্রশ্ন উঠেছিল, জীবনে হাসেনি এমন কোনও মানুষের অস্তিত্ব আছে কি না? উত্তরে একটি মেয়ে বলেছিল, 'আছে। তাঁর নাম মিসেস দস্তিদার।'

তা মিসেস দস্তিদারের মুখে হাসির অভাব হলেও বাক্যের অভাব হয়নি কোনওদিন। তাঁর মুখে সর্বদাই ফোটে কথার তুবড়ি এবং এ তুবড়ি মৌন হয় না এক মিনিটও। তাঁর বাক্যের স্রোত বন্যার মতো ভেঙে পড়ে শ্রোতাদের কর্ণকুহরকে অভিভূত করে দেয় এবং খানিকক্ষণ তাঁর কাছে থাকতে বাধ্য হলে প্রত্যেক শ্রোতাই মনে মনে বলতে থাকে—ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি! মিসেস দস্তিদারও সঙ্গে থাকবেন শুনে ইস্কুলের অধিকাংশ মেয়েই চাঁদা দিয়েও আজ বনভোজনে আসতে রাজি হয়নি।

গলা দিয়ে ফাটা কাঁসির মতন আওয়াজ বার করে মিসেস দস্তিদার দস্তরমতন ভারিক্কে-চালে বলেছিলেন, 'ইন্দু, অমন করে আলুর দমের আলু কাটে না।—কী বললে? তোমার মা ওইরকম করেই আলু কাটেন? তোমার মা তাহলে রান্নাবান্নার কিছুই বোঝেন না।...শীলা, তুমি হার্মোনিয়াম নিয়ে টানাটানি করছ কেন? গান গাইবে? কি গান? মনে রেখ, আমার সামনে তোমাদের একেলে ন্যাকা-ন্যাকা গজল কি ঠুংরি গাওয়া চলবে না। গান বলতে আমি কেবল বুঝি ব্রহ্মসঙ্গীত।....(গলা চড়িয়ে) নমিতা, ঢালু পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে তোমার ও কী হচ্ছে শুনি? যদি গড়িয়ে জলে পড়ে যাও? কী বললে? তুমি সাঁতার জানো? ও সাঁতার জানলে মানুষ বুঝি জলে ডোবে না? অত আর সাহস দেখিয়ে কাজ নেই, শিগগির এখানে চলে এসো! দুঃসাহস আর সাহস এক কথা নয়। সাহস কাকে বলে আমার কাছ থেকে শুনে যাও! মিঃ দস্তিদার—অর্থাৎ আমার স্বামী ফরেস্ট অফিসারের পদ পেয়ে প্রথম-প্রথম বড়ো ভয় পেতেন। তাঁকে সাহস দেবার জন্যে শেষটা আমাকেও বনে গিয়ে কিছুকাল বাস করতে হয়েছিল। যে-সে বন নয়—যাকে বলে একেবারে গহন অরণ্য, দিনেদুপুরে সেখানে বেড়িয়ে বেড়ায় গণ্ডার, বরাহ, বাঘ, ভাল্লুক। কিন্তু আমার কিছুতেই ভয় হত না, বাঘ-ভাল্লুককে আমি গ্রাহ্যের মধ্যেই

আনতুম না! বাঘ-ভাল্লুক—' বলতে বলতে হঠাৎ চমকে থেমে গিয়ে তিনি মাথার উপরকার গাছের দিকে বিস্ফারিত চক্ষে তাকিয়ে রইলেন।

ভাল্লু তখন পাতার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অত্যন্ত লুব্ধ চোখে আহারের সরঞ্জামগুলোর দিকে তাকিয়েছিল।

তিন

ভাল্লু ও মিসেস দস্তিদার

ফরেস্ট অফিসারের সাহসিনী গৃহিণী মিসেস দস্তিদার স্বামীর মনে সাহস সঞ্চার করবার জন্যে অরণ্যে গিয়ে বাস করেছিলেন এবং গণ্ডার, বরাহ, বাঘ ও ভাল্লুককে তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেও আনতেন না, এ তথ্য তাঁর নিজের মুখেই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তাঁর মাথার উপরকার গাছের দিকে তাকিয়ে আমাদের ভাল্লুর দাঁত-বার-করা মুখখানা দেখেই তিনি যে ব্যবহারটা করলেন তা অত্যন্ত অদ্ভুত ও কল্পনাতীত।

মিসেস দস্তিদার প্রথমটা ভাবলেন, তিনি একটা অত্যন্ত অসম্ভব দুঃস্বপ্ন দর্শন করছেন। এটা সুন্দরবন বা হিমলায় বা সাঁওতাল পরগনার দুর্গম জঙ্গল নয়, এ হচ্ছে খাস কলকাতার কাছাকাছি সাজানো বাগান, এখানে স্বাধীন বাঘ-ভাল্লুকের আবির্ভাব হতে পারে না—কখনই হতে পারে না!

এই বলে মিসেস দস্তিদার নিজের মনকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু তাঁর চেষ্টা সফল হল না। কারণ গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ওই যে ভয়ঙ্কর মুখখানা বেরিয়ে আছে, ওটা একটা রীতিমতো জ্যান্ত ভাল্লুকের মুখ ছাড়া আর কী বস্তু হতে পারে? মিসেস দস্তিদারের লেকচার বন্ধ হয়ে গেল, সাতিশয় হতভম্ব হয়ে তিনি পায়ে পায়ে পিছু হটতে লাগলেন।

ভাল্লু কিন্তু তখনও পর্যন্ত মিসেস দস্তিদারকে নিয়ে একটুও মাথা ঘামায়নি। কাল থেকে তার পেটে এক টুকরো খাবার বা একফোঁটা পর্যন্ত জল পড়েনি, কাজেই নিষ্পলক চোখে সে কেবল চড়িভাতির খাবারগুলোর দিকেই তাকিয়েছিল।

একটু পরেই ভাল্লু আর লোভ সামলাতে পারলে না, হঠাৎ তড়বড় করে গাছের উপর থেকে নেমে এল।

গাছের উপর থেকে যে একটা প্রকাণ্ড ভাল্লুক নেমে এল, এ সম্বন্ধে মিসেস দস্তিদারের আর কোনও সন্দেহ রইল না।

মিসেস দস্তিদারের মুখের পানে তাকিয়ে ভাল্লু বললে, 'ঘোঁত ঘোঁত ঘোঁত!'—অর্থাৎ 'কিছু খাবার দেবে গা?'

কিন্তু মিসেস দস্তিদার ভাল্লুকের ভাষা শেখেননি, কাজেই কিছু বুঝতেও পারলেন না। তবে ভাল্লুর 'ঘোঁত' শুনে সাধারণ ভীরু নারীর মতন তিনি যে তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন না, এইটুকুই তাঁর পক্ষে বিশেষ বাহাদুরির কথা। এমন কি তিনি উপস্থিত বুদ্ধিও হারিয়ে ফেললেন না। ভাল্লুর প্রথম 'ঘোঁত' শুনেই তিনি চমকে একবার চারিদিকে তাকিয়ে নিলেন। বাগানের বাংলো অনেক দূরে এবং কাছাকাছি একটা গাছ ছাড়া অন্য কোনও আশ্রয়ও নেই। অতএব মিসেস দস্তিদার কালবিলম্ব না করে গাছের উপরেই চড়তে আরম্ভ করলেন।

নমিতা ছিল পুকুরপাড়ে, সে ঝাঁপ খেয়ে ঝপাং করে জলে গিয়ে পড়ল।

শীলা দেখালে আশ্চর্য তৎপরতা। কাছেই ছিল মালির কুঁড়েঘর। সে যে কেমন করে বেড়া বেয়ে মালির ঘরের চালের উপরে গিয়ে উঠল, কেউ এটা দেখবার সময় পেল না।

আর আর মেয়েরাও 'ওগো-মাগো' বলে চেঁচিয়ে যে যেদিকে পারলে সরে পড়ল। কেবল ইন্দু আর নিভা পালাতে পারলে না, সেইখানেই ভয়ে কাবু হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল।

ভাল্লু মেয়ে দুটির দিকে তাকিয়ে প্রথমটা ভাবলে, আচ্ছা, এদের কাছে খাবার চাইলে পাওয়া যাবে কি? তারপরেই তার মনে পড়ল, সে যখন পথে পথে নাচ দেখিয়ে বেড়াত, দর্শকেরা তখন খুশি হয়ে তাকে ফলমূল বখশিশ দিত। হয়তো তার নাচের কায়দা দেখে এরাও তাকে কিছু খাবার উপহার দিতে পারে। এই ভেবে ভাল্লু তখন পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং ধেই-ধেই করে ঘুরে ফিরে নাচতে আরম্ভ করলে।

তার নৃত্য দেখেই ইন্দু আর নিভার স্তম্ভিত ভাবটা কেটে গেল—তারাও প্রাণপণে দৌড় মারলে।

ওদিকে মেয়েদের চিৎকার শুনে কয়েকজন উড়ে মালি ছুটে এসে দেখে, চড়িভাতির খাবারগুলো নিয়ে একটা মস্তবড়ো ভাল্লুক যার-পর-নাই ব্যস্ত হয়ে আছে। তারাও অদৃশ্য হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

ভাল্লু তখন মনে মনে ভাবছে, তার নাচে মোহিত হয়েই মেয়েরা এত ভালো ভালো খাবার ছেড়ে দিয়ে গেল।

মিনিট চারেকের মধ্যেই পায়েস, সন্দেশ ও রসগোল্লার হাঁড়ি খালি করে ভাল্লু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। থাবা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে সে একবার উপরপানে তাকিয়ে দেখলে।

মালির ঘরের চালের উপরে বসে শীলা চেঁচিয়ে মিসেস দস্তিদারকে ডেকে বললে, 'দেখুন দিদিমণি, ভাল্লুকটা আপনার দিকে তাকিয়ে আছে।'

মিসেস দস্তিদার আরও বেশি উঁচু একটা ডালে গিয়ে উঠে বসে ভারিক্কে চালে বললেন, 'তাকিয়ে থাকুক গে! আমি ওকে ভয় করি না।'

শীলা বলে, 'দিদিমণি, ভাল্লুটা বোধহয় আপনার সঙ্গে ভাব করতে চায়!'

মিসেস দস্তিদার আরও বেশি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'শীলা, তুমি কি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ?'

শীলা সকৌতুকে বললে, 'না দিদিমণি, বলেন কী! আপনি যখন বনের গণ্ডার-বাঘ চরিয়ে এসেছেন, তখন এই সামান্য পোষা ভাল্লুকটা দেখে আপনি কি ভয় পেতে পারেন? কার সাধ্য এ কথা বলে!'

মিসেস দস্তিদার বলেন, 'শীলা, আমি তোমার ঠাট্টার পাত্রী নই। কে তোমাকে বললে এ ভাল্লুকটা পোষা? ওর বড়ো বড়ো দাঁত আর নখ দেখেছ? ওর শয়তানি-মাখা চোখ দুটোও দেখ! এ হচ্ছে দস্তুরমতো বন্য ভাল্লুক, পথ ভুলে এখানে এসে পড়েছে।'

শীলা বললে, 'ভাল্লুকটা শহুরেই হোক আর বন্যই হোক ওকে দেখে আমার একটুও ভয় হচ্ছে না।'

চশমার ভিতর থেকে মিসেস দস্তিদারের গোল গোল চোখ আরও ড্যাবডেবে হয়ে উঠল। বিস্মিত স্বরে তিনি বললেন, 'ভয় হচ্ছে না মানে?'

শীলা বললে, 'ভাল্লুকটার ভাব দেখে মনে হচ্ছে না যে ও এই খোলার চালটার উপরে উঠতে চাইবে। ওরা গাছে চড়তেই ভালোবাসে।'

মিসেস দস্তিদার বললেন, 'শীলা, তোমার চেয়ে দুষ্টু মেয়ে আমি দেখিনি! তুমি আবার আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ!'

শীলা খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, 'ওই দেখুন দিদিমণি, ভাল্লুকটা আবার গাছের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে!'

সত্যিই তাই। একপেট খাবার খেয়ে ভাল্লুর মনে খুব ফুর্তির উদয় হল। তার সাধ হল মিসেস দস্তিদারের সঙ্গে একটু খেলাধুলো করবে। সে আবার গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে ধরে উপরপানে উঠতে আরম্ভ করলে।

ঘোড়ার উপরে লোকে যেমন করে বসে, মিসেস দস্তিদার সেইভাবে একটা ডালের উপরে বসে ধীরে ধীরে ডগার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে ভাল্লুর ভারি আমোদ হল। সে মিসেস দস্তিদারের ডালের কাছে গিয়ে বললে, 'ঘোঁত!'

সড়াত করে মিসেস দস্তিদার আরও এক হাত সরে গিয়ে একেবারে প্রান্তে গিয়ে হাজির হলেন।

ভাল্লুও জিভ দিয়ে নিজের নাক চাটতে চাটতে সেই ডাল ধরে এগুতে লাগল। আর কোনও উপায় না দেখে মিসেস দস্তিদার ডাল ধরে ঝুলে পড়লেন। তিনি স্থির করলেন, যা থাকে কপালে—এইবারে তিনি লাফ মারবেন। ভাল্লুকের ফলার হওয়ার চেয়ে হাত-পা ভাঙা ভালো।

ঠিক সেই সময়ে ভাল্লু দেখতে পেলে, দূর থেকে একদল লোক লাঠি-সোঁটা নিয়ে হই হই করতে করতে ছুটে আসছে। সে বুঝলে, গতিক বড়ো ভালো নয়।

ভাল্লু তাড়াতাড়ি গাছের অন্যদিকে গিয়ে বাগানের পাঁচিলের উপরে লাফিয়ে পড়ল। তারপর সেখান থেকে একেবারে রাস্তার উপরে।

চার

নতুন রকম লাঠি

ভাল্লু যে বিদায় নিয়েছে, মিসেস দস্তিদার তা দেখতে পেলেন না, কারণ পাছে তার কিম্ভূতকিমাকার হেঁড়ে মুখখানা আবার নজরে পড়ে যায়, সেই ভয়ে তিনি প্রাণপণে দুই চোখ মুদে ফেলে গাছের ডালে ঝুলতে ঝুলতে দুই পা ছুড়ছিলেন ক্রমাগত।

কিন্তু ভাল্লুর পলায়ন আর কারুর নজর এড়াল না। নমিতা সাঁতার কাটা বন্ধ করে ঘাটে এসে উঠল। শীলা মালির ঘরের চাল থেকে চট করে নেমে পড়ল। নিভা, ইন্দু প্রভৃতি অন্যান্য মেয়েরাও কেউ গাছের গুঁড়ির আড়াল আর কেউবা ঝোপঝাপ থেকে বেরিয়ে এল। সবাই ডালে দোদুল্যমান মিসেস দস্তিদারের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতন দাঁড়িয়ে রইল।

শীলা বললে, 'আর দোল খাবেন না দিদিমণি! চোখ খুলে দেখুন, সেই পথভোলা ভাল্লুকটা আর নেই।'

মিসেস দস্তিদার তখনও চোখ খুললেন না। তাঁর সন্দেহ হল, দুষ্টু শীলা এখনও তাঁকে ভয় দেখাবার চেষ্টায় আছে।

ইতিমধ্যে লাঠি-সোঁটা নিয়ে পনেরো-ষোলো জন লোক ঘটনাস্থলে এসে হাজির হল। তারাও যখন অভয় দিলে, মিসেস দস্তিদার তখন অতি সন্তর্পণে চোখ খুলে সেই অবস্থায় যতটা সম্ভব মাথা ঘুরিয়ে চারিদিক দেখে নিলেন।

শীলা বললে, 'দিদিমণি, আপনি যে গভীর জঙ্গলে গিয়ে এমন চমৎকার গাছে চড়তে আর এমন মজার দোলা খেতে শিখেছেন, আমরা কেউ তা জানতুম না। কী বলিস, না রে নমিতা?'

কিন্তু নমিতা হচ্ছে মুখচোরা মেয়ে, মনে মনে হেসেও মুখে কিছু বলতে সাহস করলে না।

মিসেস দস্তিদার বেশ বুঝতে পারলেন, আজ যে অভাবনীয় কাণ্ডটা হয়ে গেল, এর পরে আর প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা দেওয়া সম্ভবপর নয়। তবু অনেক কষ্টে নিজের কঠিন গাম্ভীর্য কতকটা বজায় রাখার চেষ্টা করে তিনি বললেন, 'আমার হাত দুটো ছিঁড়ে যাচ্ছে। আর আমি ঝুলতে পারছি না। শিগগির আমাকে নামিয়ে নাও, নইলে আমি ধপাস করে পড়ে যাব।'

সকলে মহা সমস্যায় পড়ে গেল, কেমন করে মিসেস দস্তিদারকে গাছ থেকে আবার মাটির উপরে ফিরিয়ে আনা যায়? খানিকক্ষণ পরামর্শের পর দুজন লোক লম্বা দড়ি নিয়ে গাছের উপরে গিয়ে উঠল। আরও খানিকক্ষণ চেষ্টার পর তারা মিসেস দস্তিদারকে দুই বাহুমূলে দড়ির বাঁধন লাগিয়ে তাঁকে আবার পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে পাঠিয়ে দিলে।

আমরা খবর পেয়েছি, সেইদিনই বাগান থেকে ফিরে এসে মিসেস দস্তিদার তিন মাসের ছুটির জন্যে দরখাস্ত করেছিলেন। অন্তত কিছুকালের জন্যে তিনি আর কারুর কাছে মুখ দেখাতে রাজি নন।

যারা লাঠি-সোঁটা নিয়ে এসেছিল ভাল্লুর খোঁজে, তারা বাগান থেকে বেরিয়ে পড়ল।

এদিকে ভাল্লুবেচারি একটু বিপদে পড়েছে। সে মনসা গাছ চিনত না। পাঁচিলের উপর থেকে সে যেখানে লাফিয়ে পড়েছিল সেখানে ছিল মস্তবড়ো একটা মনসার ঝোপ। সুতরাং তার অবস্থা বুঝতেই পারছ! যদিও বড়ো বড়ো ঘন লোম থাকার দরুন তার দেহের অনেক জায়গাই মনসা-কাঁটার খোঁচা থেকে বেঁচে গেল, তবু তার নাকের ডগায় এবং চার পায়ের তলায় বিঁধে গেল অনেকগুলো মনসাকাঁটা।

ভাল্লু রক্তাক্ত নাকের ডগায় থাবা ঘষছে, জিভ দিয়ে পায়ের তলা চাটছে আর মনে মনে বলছে, 'এ কি রকম গাছ রে বাবা! একসঙ্গে এতগুলো কামড় মারে! হুঁ এ গাছটাকে ভালো করে চিনে রাখা দরকার—ভবিষ্যতে যেখানে এমন সর্বনেশে গাছ থাকবে সেদিকে আর মাড়াব না!'

হঠাৎ গোলমাল শুনে ভাল্লু চমকে মুখ তুলে দেখে, বাগানের লাঠিধারী লোকগুলো আবার তার দিকে ছুটে আসছে।

ভাল্লু তখন মরছে কাঁটার জ্বালায়, তার উপরে আবার এই নূতন বিপদ দেখে তার মেজাজ গেল চটে। সে বুঝলে এরা তাকে ধরতে পারলেই ফের সেই চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে

দেবে—হিমালয়ে যাবার পথ যেখানে লোহার দরজা দিয়ে বন্ধ। সে তখনই পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল এবং শূন্যে সামনের দুই থাবা নেড়ে নিজের ভাষায় আস্ফালন করে বললে, 'আয় না মানুষের বাচ্চারা,—বুকের পাটা থাকে তো এগিয়ে আয়!'

কিন্তু তার চমকপ্রদ হুঙ্কার শুনে এবং রোমাঞ্চকর মুখভঙ্গি দেখে বুদ্ধিমান মানুষের বাচ্চারা আর অগ্রসর হল না। কয়েকজন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং কয়েকজন দৌড় মেরে আবার বাগানের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

ভাল্লু বুঝলে এই কাপুরুষদের দেখে তার কোনওরকম ভয় পাবার দরকার নেই। সে তখন আবার বসে পড়ে আড় চোখে তাদের দিকে দৃষ্টি রেখেই নিজের আহত থাবাগুলো চাটতে লাগল। তার দুটো পায়ের ভিতরে দুটো মনসাকাঁটা ঢুকে বসে গিয়েছিল।

এমন সময়ে অন্য কোন বাগান থেকে খবর পেয়ে একজন বন্দুকধারী লোক সেখানে ছুটে এল। কিন্তু তাকে দেখেও ভাল্লুর ভাবান্তর হল না, তার কারণ সে বন্দুককে চেনবার সুযোগ পায়নি। সে ভাবলে, ও লোকটার হাতে যা রয়েছে তা একটা নতুন রকম লাঠি ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু সেই নতুন রকম লাঠিটা যখন দপ করে জ্বলে উঠে বেয়াড়া এক গর্জন করলে ভাল্লুককে তখনই চার পা তুলে তড়াক করে লাফ মেরে রীতিমতো আর্তনাদ করতে হল।

ভাগ্যে বন্দুকটা ছিল পাখিমারা, তার ভিতরে বুলেটের বদলে ছিল ছররার কার্তুজ! কতকগুলো ছররা মাটির উপরে ছড়িয়ে পড়ে ধুলো ওড়ালে, কতকগুলো তার লোমের আবরণ ভেদ করতে পারলে না এবং একটা তার বাঁ কানকে ফুটো করে দিল।

ভাল্লুর পক্ষে তাই যথেষ্ট হল! বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে সে বেগে পলায়ন করলে। পিছন থেকে আবার সেই নতুন রকম লাঠির গর্জন শোনা গেল, তার কানের কাছ দিয়ে কতকগুলো কি সোঁ-সোঁ করে চলে গেল এবং সেও নিজের গতি আরও বাড়িয়ে দিলে।

ছুটতে ছুটতে সে ভাবতে লাগল, 'বাপ রে বাপ, এ কোন আজব দেশে এসে পড়লুম? মানুষের মেয়ে এখানে গাছে উঠে ডাল ধরে দোল খায়, গাছ এখানে কামড় মারে, লাঠি এখানে বিদ্যুৎ জ্বেলে ধমকে ওঠে, আর কী যে ছুড়ে কান ফুটো করে দেয়, কিছুই বোঝা যায় না! হিমালয়ের পথে যে এত বাধা, সেটা তো জানা ছিল না, এখন মানে মানে দেশে গিয়ে পৌঁছতে পারলেই যে বাঁচি।'

ভাল্লু দৌড়চ্ছে আর দৌড়চ্ছেই—বিশেষ করে নতুন রকম লাঠি দেখে তার পেটের পিলে চমকে গেছে দস্তুরমতো। অনেক পথ, অনেক গ্রাম পার হয়ে গেল, তবুও সে থামতে রাজি নয়। যেখান দিয়ে সে যাচ্ছে সেখানেই উঠছে হই-হই রব। একজন সাইকেলের আরোহী বেশি ব্যস্ত হয়ে পালাতে গিয়ে মাটির উপরে মুখ থুবড়ে খেলে প্রচণ্ড আছাড়, একখানা গরুর গাড়ির গরু দুটো মহাভয়ে দৌড়তে লাগল রেসের ঘোড়ার মতো, ছেলেরা কেঁদে ককিয়ে ওঠে, মেয়েরা আঁতকে মূর্ছা যায়, অথর্ব বৃদ্ধরাও দৌড়বাজিতে হারিয়ে দেয় জোয়ান যুবকদের। এমন কি একটা একঠেঙো খোঁড়াও অদ্ভুত তৎপরতা দেখিয়ে একটা খুব উঁচু বটগাছের মগডালে না ওঠা পর্যন্ত থামল না।

ছুটতে ছুটতে ভাল্লুর দম বেরিয়ে যাবার মতো হল। হঠাৎ সামনে একখানা বাড়ি দেখে সে স্থির করলে, তার ভিতরই আশ্রয় নেবে।

বাড়ির ভিতরে ঢুকেই উঠোন। উঠোনের এক কোণের এক ঘরে বসে একটা উড়িয়া বামুন উনুনে কি তরকারি রাঁধছিল। আচমকা স্তম্ভিত চক্ষে সে দেখলে, ঘরের দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিপুলদেহ এক ভাল্লুক। পরমুহূর্তেই সে 'হা জগড়নাথঅ' বলে দাঁতকপাটি লেগে চিৎপাত হয়ে একেবারে অজ্ঞান!

খাবার দেখেই ভাল্লুর পেটে ক্ষিদে আবার চোঁ-চোঁ করে উঠল। সে গুটিগুটি এগিয়ে একখানা থালা থেকে কি একটা তরকারি একগ্রাস তুলে নিলে।—ওরে বাবা রে, কী ভয়ঙ্কর ঝাল রে! মনসার কাঁটা এবং বন্দুকের ছররাও যা পারেনি, তরকারির লঙ্কা করলে তার সেই দুর্দশা। সে ঘরের মেঝেয় পড়ে ছটফট করতে ও গড়াগড়ি দিতে লাগল।

হঠাৎ দুম করে একখানা প্রকাণ্ড থান-ইট এসে পড়ল তার পিঠের উপরে। 'ঘোঁত-ঘুঁত' (অর্থাৎ 'কে রে') বলে চেঁচিয়ে ভাল্লু একলাফে দাঁড়িয়ে উঠল, কিন্তু কেউ কোথাও নেই। মেঝের উপরে কেবল উড়িয়া বামুনটার অচেতন দেহ ছাড়া।

আসল কথা হচ্ছে, বাড়িরই একজন লোক জানলা দিয়ে ইট ছুড়েই লম্বা দিয়েছে।

কিন্তু ভাল্লু ভাবলে, এও একটা আজগুবি কাণ্ড! কেউ কোথাও নেই—ইট ছোড়ে ঘর! কে কবে এমন কথা শুনেছে? আরে ছোঃ, এমন জায়গায় কোনও ভদ্র ভাল্লুকের থাকা উচিত নয়!

ভারি বিরক্ত হয়ে ভাল্লু আবার পথে বেরিয়ে পড়ল।

পাঁচ

ভোট বিভ্রাট

কলকাতা থেকে কিছু দূরে ছিল একটি শহর, তার নাম আমি বলব না।

সেইখানে আজ মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার না চেয়ারম্যান কিংবা জেলাবোর্ডের প্রেসিডেন্ট বা অন্য কিছু নির্বাচনের জন্যে মহাধূমধাম পড়ে গিয়েছে। ধূমধামের কারণটা বলি।

শহরে বাস করতেন মুকুন্দপুরের জমিদারের দুই তরফ—বড়ো এবং ছোটো। বড়ো তরফের নাম আনন্দ চৌধুরী। জ্ঞানে, চরিত্রে ও সহৃদয়তায় তাঁর মতন লোক ও-তল্লাটে আর কেউ ছিল না। লোকের উপকার করবার সুযোগ পেলে আনন্দবাবু নিজেকে ধন্য বলে মনে করতেন। আর লোকের উপকার করবার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি দাঁড়িয়েছিলেন এই নির্বাচন ব্যাপারে।

ছোটো তরফের সাধুচরণ চৌধুরী ছিলেন ঠিক উল্টো রকম মানুষ। 'সাধু' নামের এমন অপব্যবহার আর কখনও হয়নি। সাধু তামাক খেতে শিখেছিলেন গোঁফ গজাবার অনেক আগেই—অর্থাৎ এগারো উৎরে বারোতে পা দিয়েই। জীবনে তিনি কখনও একটিমাত্র আধলাও দান করেননি—অথচ নানারকম বদখেয়ালিতে উড়িয়ে দিয়েছেন কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা। শোনা যায় একবার এক বিড়ালের বিয়েতে তিনি নাকি পনেরো হাজার টাকা খরচ করেছিলেন। নিষ্ঠুরতায়ও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর মা ছেলের অসৎ ব্যবহারের প্রতিবাদ করতেন বলে নিজের মাকেও তিনি তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বাড়ি থেকে। তাঁর লেখাপড়ার কথা না বলাই ভালো—কোনওরকমে তিনি নিজের নামটি সই করতে পারতেন মাত্র।

আনন্দ ছিলেন সাধুর খুড়তুতো ভাই। আনন্দকে সবাই শ্রদ্ধা করত বলে সাধুর মন জ্বলত দারুণ হিংসার আগুনে। আনন্দকে জব্দ ও লোকের চোখে খাটো করবার জন্যে সর্বদাই তিনি হরেকরকম ফন্দি আঁটতেন। সেইজন্যেই নির্বাচন ব্যাপারে তিনি হয়েছেন আনন্দের প্রতিদ্বন্দ্বী।

যেমন বিদ্যা-বুদ্ধি, সাধুর চেহারাও তেমনি। তাঁর ঘাড়ে-গর্দানে, বিশাল ভুঁড়িওয়ালা বেঁটে-

ড্রাইভার মোটর থামিয়ে, দিলে চোঁ-চাঁ চম্পট!

সেটে কালো কুচকুচে মূর্তিখানি দেখলেই চোখ বুজে ফেলবার ইচ্ছা হয়। তাঁর কেশহীন মাথাটি কুমড়োর মতন তেলা, ঠোঁট দুখানা কাফ্রির মতন পুরু, নাক এত বেশি চ্যাপ্টা যে দেখলে মনে পড়ে ওরাং-ওটাংকে, এবং গর্তে বসা চোখ দুটো হচ্ছে রীতিমতো কুৎকুতে।

তা বলে তোমরা কেউ যেন সাধুকে বোকা ঠাউরে বোসো না। তাঁর ঘটে এটুকু বুদ্ধি ছিল যাতে করে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর পক্ষে বৈধ সৎ-উপায়ে আনন্দের বিরুদ্ধে ভোট সংগ্রহ করা অসম্ভব। লোকে আনন্দকে ভালোবাসে এবং তাঁকে ঘৃণা করে।

দেশের একদল ওঁচা লোক করত সাধুর মোসাহেবি। ভোটারদের কাছে গিয়ে তারা রটিয়ে বেড়াতে লাগল, যারা সাধুর পক্ষে ভোট দেবে তারা প্রত্যেকেই ভোটের এক হপ্তা আগে থেকে রোজ এক টাকার মণ্ডা-মিঠাই-রসগোল্লা উপহার পাবে এবং ভোটের দিন সকালে সাধুর বাড়িতে তাদের জন্যে হবে যে বিরাট ভোজের আয়োজন, তার মধ্যে থাকবে পুরো একশো রকম চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়।

আনন্দের কানেও এ খবর উঠতে দেরি লাগল না। তিনি আরও শুনলেন, অধিকাংশ ভোটারই সাধুর পাঠানো দৈনিক মুণ্ডা-মিঠাই-রসগোল্লার সদ্ব্যবহার করছে এবং অনেকে আবার খাবারের বদলে নিচ্ছে একটি করে নগদ টাকা।

আনন্দ মনে মনে দুঃখিত হলেন মানুষের অকৃতজ্ঞতা দেখে। দেশের ভালোর জন্যে কতকাল ধরে তিনি কত কাজ করেছেন, আজ সামান্য জলখাবারের লোভেই লোকে তা ভুলে গেল! বুঝলেন, এ যাত্রায় তাঁর পরাজয় অনিবার্য।

ভোটের দিন দুপুরবেলায় সাধুর বাড়িতে পড়ল শত শত পাত। একশোরকম খাবারকে হস্তগত করার জন্যে প্রত্যেক লোককে আসন থেকে হাত বাড়িয়ে রীতিমতো হামাগুড়ি দিতে হল। খাওয়া-দাওয়ার পর প্রত্যেক ভোটারের ভুঁড়ি এত ভারি আর ডাগর হয়ে উঠল যে, সাধুর প্রশস্ত বৈঠকখানার ঢালা-বিছানার উপরে ঘণ্টা-দুই চিৎপাত হয়ে বিশ্রাম না-করে কেউ আর খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারলে না।

ওদিকে আনন্দের বাড়ি দেখে মনে হচ্ছে, সে যেন নীরবে কাঁদছে। সেখানে না আছে ভিড়, না আছে গোলমাল।

ভোটের পরিণাম সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে সাধু খুব জমকালো গরদের জামা-কাপড়-চাদর পরে মোসাহেবদের সঙ্গে পান চিবোতে চিবোতে মোটরে গিয়ে উঠলেন। মোটরখানা লতা-পাতা-ফুল দিয়ে সাজানো, তাঁর হাতেও জড়ানো বেলের গোড়ে এবং তিনি কপালে পরেছিলেন মা-কালীকে পুজো দিয়ে মস্ত একটি সিঁদুরের ফোঁটা।

যেখানে ভোট নেওয়া হচ্ছিল মোটর সেই মণ্ডপের দিকে চলল। সাধুর দলের কর্মীরা তাঁকে দেখে জয়নাদ করে উঠল।

ঠিক সেই সময় দেখা গেল মোটরে চড়ে আনন্দবাবুও ঘটনাক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করেছেন। তিনি একলা। তাঁকে দেখে কেউ জয়ধ্বনিও করলে না।

একগাল হেসে নিজের মোটর থেকে সাধু চেঁচিয়ে বললেন, 'আনন্দদাদা, খামোকা মন খারাপ করবার জন্যে কেন তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছ বলো দেখি? এবারে তোমার কোনও আশাই নেই!'

আনন্দ বলেন, 'জানি ভাই, জানি। ধরে নাও আমি বেরিয়েছি তোমাকেই অভিনন্দন দেবার জন্যে।'

আনন্দের গাড়ি এগিয়ে গেল।

সাধুর এক মোসাহেব বললে, 'দেখছেন কর্তা! আনন্দবাবু ভাঙবেন তবু মচকাবেন না! আবার আপনাকে ঘুরিয়ে ঠাট্টা করে যাওয়া হল।'

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সাধু বললেন, 'রোসো না, আগে ভোটাভুটির হাঙ্গামাটা চুকে যাক, তারপর—ওরে বাপরে বাপ! ও.আবার কে রে?'

মোসাহেবদের চক্ষু ছানাবড়া!

ব্যাপারটা হচ্ছে এই। ভোটের মণ্ডপের খানিক আগেই পথের পাশে ছিল একটা ছোটোখাটো জঙ্গল। হিমালয়ের যাত্রী শ্রীমান ভাল্লু এই পথ দিয়ে যেতে যেতে রাস্তায় হই-চই আর অসম্ভব লোকের ভিড় দেখে ওই জঙ্গলের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু একে বহুক্ষণ আহারাদির অভাবে তার পথশ্রান্ত দেহ এলিয়ে পড়েছে, তার উপরে তার সূক্ষ্ম ভাল্লুকনাসা তাকে খবর দিলে যে, খুব কাছেই কোথায় হরেকরকম খাবার-দাবার অপেক্ষা করছে ক্ষুধার্ত উদরের জন্যে;—কাজেই ব্যাপারটা তদারক করবার জন্যে জঙ্গল ছেড়ে তাকে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হয়েছে।

পরমুহূর্তে সাধুর মোটরখানা বোঁ-বোঁ করে একেবারে তার উপরে এসে পড়ল—তাকে চাপা দেয় আর কি!

কিন্তু হিমাচলের ভাল্লুক এত সহজে মোটর চাপা পড়বার জন্যে জন্মায়নি। এক লাফ মেরে সে মোটরের সামনের দিকে উঠে পড়ল—কিন্তু ইস! এখানটা যে আগুনের মতন গরম! তড়াক করে আর এক লাফ—ভাল্লু হাজির হল মোটরের ছাদে। গাড়ির ছাদে একটা স্বাধীন ও বন্য ভাল্লুক নিয়ে কোনও অতিসাহসী লোকও মোটর চালাতে পারে না। কাজেই ড্রাইভার মোটর থামিয়ে, দিলে চোঁ-চোঁ চম্পট। সাধুর তিন মোসাহেবও বিনা বাক্যব্যয়ে মোটরের দরজা খুলে হুড়মুড় করে রাস্তার উপরে ঝাঁপ খেলে এবং দেখতে দেখতে তারাও অদৃশ্য। সাধুর আর্তনাদ তারা আমলেও আনলে না।

সাধুও এই বিপজ্জনক গাড়িখানা ত্যাগ করার জন্যে চটপট গাত্রোত্থান করেই সভয়ে চোখ পাকিয়ে দেখলেন, ছাদের উপর থেকে মুখ বাড়িয়ে ভাল্লু তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে। অমনি তিনি ধপাস করে আবার বসে পড়ে কেঁদে উঠলেন, 'ওগো, মাগো!'

তারপরেই হল একটা আরও ভয়ানক কাণ্ড। ভাল্লুর বিপুল ভর সইতে না পেরে সাধুর মাথার উপরে ছাদ ভেঙে পড়ল।

ভাল্লুও ভয়ে আঁতকে উঠে দুই হাত—অর্থাৎ সামনের দুই পা বাড়িয়ে একটা কিছু ধরতে গিয়ে জড়িয়ে ধরলে সাধুচরণকে এবং তারপর সেই অবস্থাতেই টলে গাড়ির বাইরে গিয়ে পড়ল।

পায়ের তলায় শক্ত মাটি পেয়ে ভাল্লু নিজের আলিঙ্গন থেকে সাধুকে মুক্তি দিলে সাধু ভয়ে আর পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠবার সময় পেলেন না, নিজের গোলগাল বপুখানি নিয়ে পথের ধুলোর উপর দিয়ে ক্রমাগত গড়াতে আর গড়াতে শুরু করলেন, তারপর অদৃশ্য হলেন পথের পাশে পচা জলের খানায়।

ভাল্লু চমকে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তার একটুও লাগেনি। তার নাসিকা তখন খাবারের সুগন্ধ পেয়ে আবার উৎসাহিত হয়ে উঠেছে।

ভোটমণ্ডপের একপ্রান্তে সাধুচরণ নিজের পক্ষের ভোটারদের লোভ দেখাবার জন্যে বৈকালী জলযোগের যে বিপুল আয়োজন করেছিলেন সুগন্ধ আসছিল এইখান থেকেই। ভাল্লুর সুচতুর নাসিকা পথনির্দেশ করলে, সে অগ্রসর হল দ্রুতপদে। ভোটমণ্ডপ দৃষ্টিগোচর হবামাত্র সে একবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকের ভিড় দেখে। কিন্তু তীক্ষ্ণ নেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেও সে যখন কারুর হাতে সেই নতুন রকম লাঠি দেখতে পেলে না, তখন আশ্বস্ত হয়ে এগিয়ে চলল দ্বিগুণ বেগে!

ওদিকে একটা বিরাট ভাল্লুককে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসতে দেখেই দিকে দিকে রব উঠল—'মা রে, বাবা রে, পালা রে, খেলে রে!' এক মিনিটের মধ্যে ভোটমণ্ডপ জনশূন্য হয়ে গেল। তারপর সাধুর খাবারগুলো যে কার বিপুল উদরগহ্বরে স্থানলাভ করলে, সেটা বোধহয় আর বলে দিতে হবে না।

সাধু ভাল্লুকের ভয়ে কিছুকাল আর বাড়ির বাইরে পা বাড়াননি। ভোটের ফলাফল যখন বেরুল তখন তিনি জানলেন যে, ভোটাররা তাঁর খাবার খেয়ে পেট ভরিয়েছে বটে, কিন্তু ভোট দিয়েছে আনন্দ চৌধুরীকেই সুতরাং এ যাত্রা সাধুচরণের হল 'লাভে ব্যাং, অপচয়ে ঠ্যাং।'

ছয়

অতি-বুদ্ধিমান সোনা মোনা

দিনেরবেলায় যেখান দিয়ে যায় সেইখানেই নতুন নতুন গোলযোগের সৃষ্টি হয় দেখে ভাল্লু স্থির করেছে, এবার থেকে রাত না এলে সে আর পথের উপরে পদার্পণ করবে না।

অতএব যতক্ষণ দিনের আলো জ্বলত সে কোনও ঝোপঝাপের ভিতরে গিয়ে আড্ডা গাড়ত। কখনও কুণ্ডলী পাকিয়ে পিছনের পা-দুটোর মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখত, কখনও চুপচাপ শুয়ে শুয়ে ভাবত তার সাধের হিমালয়ের কথা।

রাতের অন্ধকারে আরম্ভ হত তার যাত্রা। ক্ষুধা পেলে ফলমূল সংগ্রহ করত, তেষ্টা পেলে পাওয়া যেত নদী বা পুকুরের জল। চিড়িয়াখানায় বন্দী অবস্থায় তার খাওয়া-দাওয়ার ভাবনা একটুও ছিল না বটে, কিন্তু কোনও-কোনওদিন পেটভরা খাবার না জুটলেও চিড়িয়াখানায় ফিরে যাবার কথা ভুলেও সে ভাবতে পারত না। স্বাধীনতা যে কত মিষ্টি, ভাল্লু তা ভালো করেই অনুভব করতে পেরেছে।

একরাতে ভাল্লু হেলে-দুলে মনের সুখে পথ চলছে, হঠাৎ এল ঝমঝম করে জল। সে তখন একটা নিঃসাড় গ্রামের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। ভাল্লু অন্ধকারেও চোখ চালাতে পারত, চারিদিকে তাকিয়ে একটা মাথা গোঁজাবার জায়গা খুঁজতে লাগল। তারপর একখানা বাড়ির দেওয়ালের তলার দিকে একটা গর্ত দেখে সুড়সুড় করে সে তার ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

ঢুকে দেখে, বাঃ, দিব্যি একটি শুকনো খটখটে ঘর। সে ভাবতে লাগল, 'মানুষেরা তাদের বাড়ির চারিদিকের দেওয়ালেই বড়ো বড়ো গর্ত কাটে বটে, কিন্তু গর্তগুলো আবার লোহার ডাণ্ডা বসিয়ে এমনভাবে আগলে রাখে যে মাথা গলাবার ফাঁকটুকুও পাওয়া যায় না। খামোকা এ রকম

গর্ত কেটে বোকামি করবার কারণ কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু এ-গর্তটা তো সে রকম নয়! এতে লোহার ডাণ্ডা বসানো নেই, এর ভিতর দিয়ে মুণ্ডুর সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসেই ধড়টাও গলিয়ে ফেলা গেল। নিশ্চয় এ হচ্ছে কোনও বুদ্ধিমান মানুষের কীর্তি।'

ভাল্লুর আন্দাজ মিথ্যা নয়। এ গর্তটা কেটেছে দুজন অতি বুদ্ধিমান মানুষ, তাদের নাম সোনা ও মোনা। এ অঞ্চলের চোরেদের সর্দার হচ্ছে সোনা আর মোনা, দেওয়ালে সিঁধ কেটে তারা ঢুকেছে গৃহস্থের বাড়িতে।

নিশুত রাত, তার উপরে বাদলার ঠাণ্ডা পেয়ে বাড়ির লোকরা আরামে ঘুম দিচ্ছে, ঘরে ঘরে শোনা যাচ্ছে নাসাযন্ত্রে নিদ্রাদেবীর পূজামন্ত্র। সোনা মোনা নির্বিবাদে কাজ সারলে। সোনার হাতে টাকা ও গহনার বাক্স এবং মোনার হাতে একখানা কাপড়ে বাঁধা এককাঁড়ি রুপোর গেলাস-বাটি-থালা।

তারা যে ঘরে সিঁধ কেটেছিল সেই ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

মোনা চুপিচুপি বললে, 'দাদা, আজ মার দিয়া কেল্লা!'

সোনা বললে, 'চুপ! আগে বাইরে যাই, তারপর কথা!'

পা টিপে টিপে তারা ঘরের ভিতরে ঢুকল।

অমনি ভাল্লু বললে, 'ঘোঁত-ঘোঁত-ঘোঁত'—অর্থাৎ, 'তোমরা আবার কে বটে হে?'

এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার করে বলা দরকার। তোমরা বোধহয় ভাবছ, ভাল্লুর এক 'ঘোঁত-ঘোঁত' শব্দের রকম রকম মানে হয় কেন? তার কারণ হচ্ছে, বাঘ-ভাল্লুক-শৃগাল-কুকুর-বিড়াল প্রভৃতির, এবং পক্ষীদেরও শব্দভাণ্ডারে আমাদের মতন বেশি শব্দ নেই। অধিকাংশ সময়েই তারা একই রকম শব্দ করে বটে, কিন্তু উচ্চারণের তারতম্য অনুসারে সেই একই রকম শব্দের অর্থ হয় ভিন্ন ভিন্ন রকম। যেমন, কুকুর ডাকে ঘেউ ঘেউ করে, কিন্তু শত্রুকে দেখলে সে ঘেউ ঘেউ করে বলে—'ভাগো হিঁয়াসে, নইলে কামড়ে দেব!' আর মনিবকে দেখলেও ওই এক ঘেউ ঘেউ রবেই জানায়—'এসো প্রভু, আমি তোমার পা চেটে দি'!

অন্ধকারে ভাল্লুর সম্ভাষণ শুনেই সোনা মোনা ভয়ানক চমকে গেল।

মোনা টর্চ জ্বেলেই 'ই-হি-হি-হি-হি' বলে চিৎকার করে চিৎপটাং! তারপর একেবারে অজ্ঞান। তার হাতের রুপোর বাসনগুলো মেঝের উপরে ছড়িয়ে পড়ে বেজে উঠল ঝন-ঝনা-ঝন!

সোনাও ভাল্লুর বিপুল মুখখানা দেখতে পেলে। সে অজ্ঞান হয়ে গেল না বটে, কিন্তু এইখানেই দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল।

তোমরা ভাল্লুকের জ্বর দেখেছ? যখন তখন ভাল্লুকদের দেহে একরকম কাঁপুনি আসে এবং খানিক পরেই আবার তা থেমে যায়;—একেই বলে ভাল্লুকের জ্বর। সে সময় তাদের অবস্থা দেখলে মনে হয়, তারা ভারি কষ্ট পাচ্ছে।

সোনার কাঁপুনি দেখে ভাল্লুও ভাবলে লোকটার দেখছি আমারই মতন জ্বর এসেছে! সহানুভূতিমাখা স্বরে ঘোঁত-ঘোঁত করে সে বলতে চাইলে, 'ভয় নেই ভায়া, ও রকম জ্বর বেশিক্ষণ থাকে না।'

কিন্তু তার কথা শুনে সোনার কাঁপুনি দ্বিগুণ বেড়ে উঠল।

তাকে ভালো করে সান্ত্বনা দেবার জন্যে ভাল্লু কয় পা এগিয়ে গেল।

অমনি ছুটে গেল সোনার আচ্ছন্ন ভাবটা। সে বিকট স্বরে 'ওরে বাবা রে, গেছি রে', বলে চেঁচিয়ে উঠে ঘরের বাইরে মারলে এক লাফ।

ইতিমধ্যে চিৎকারে ও বাসন ফেলে দেওয়ার শব্দে বাড়িসুদ্ধ সবাই জেগে উঠেছে এবং চারিদিকে ছুটোছুটি করছে লোকজন—বাড়ির উপরে-নিচে জ্বলে উঠেছে অনেকগুলো লণ্ঠন।

সোনা ভারি হুঁশিয়ার চোর। ভাল্লুককে দেখেও সে গহনার বাক্স ছাড়েনি। তার আবির্ভাবে 'চোর', 'চোর' রব জাগল। এবং উঠানে লোকের ভিড় দেখে সে তড়বড় করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

সিঁড়ির মুখে দোতলায় দাঁড়িয়েছিলেন বাড়ির কর্তা স্বয়ং। তিনি বামাল সমেত সোনাকে গ্রেপ্তার করলেন।

সোনা কর্তার দুই পা জড়িয়ে ধরে কাকুতি-মিনতি করে বললে, 'হুজুর! আমাকে মারুন ধরুন, থানায় দিন—কিন্তু আর ভাল্লুক লেলিয়ে দেবেন না। চোর ধরার জন্য আপনারা ভাল্লুক পুষেছেন জানলে আমরা কি আর এ বাড়িতে পা বাড়াতুম!'

কর্তা মহা বিস্ময়ে বললেন, 'ভাল্লুক'? আচম্বিতে উঠানে আবার রব উঠল—'ভাল্লুক, ভাল্লুক!' চোখের পলক পড়তেই সকলে যে যার ঘরে ঢুকে দরজায় খিল এঁটে দিলে।

লোকেরা জ্বলন্ত লণ্ঠনগুলো উঠানেই ফেলে রেখে গেল। উঠানের উপরে দাঁড়িয়েছিল কেবল কর্তার ছোটো ছেলে খোকাবাবু—বয়স দেড় বৎসর।

কর্তা স্তম্ভিত চোখে দেখলেন, একটা প্রকাণ্ড ভাল্লুক খোকার কাছে এসে দাঁড়াল। নিজের চোখকে তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না বটে, কিন্তু ভয়ে তাঁর প্রাণ উড়ে গেল!

এদিকে খোকার কিন্তু ভয় ডর কিচ্ছু নেই। সে কুকুর ভারি ভালোবাসত এবং ভাল্লুকে ঠাউরে নিলে বোধহয় বড়োজাতের কোনও কুকুর বলেই। সে রাঙা রাঙা ঠোঁটে ফিকফিক করে হেসে, নধর নধর হাত দুখানি নেড়ে ভাল্লুকে ডাকতে লাগল—'আয়, আয়, আয়!'

ভাল্লু যখন পথে পথে নর্তকজীবন ও চিড়িয়াখানায় বন্দীজীবন যাপন করত, তখনই সে আবিষ্কার করেছিল একটি মস্তবড়ো সত্য। মানুষের খোকাখুকিরা তাকে যত ভালোবাসে ও আদর করে, এত আর কেউ নয়। আজ পর্যন্ত সে যত খাবার বখশিশ পেয়েছে তার বেশির ভাগই এসেছে খোকাখুকিদের নরম নরম হাত থেকে। তাই সে খোকাখুকি দেখলেই নিজের বিশেষ বন্ধু বলে মনে করত।

আজও সবাই যখন ভয় পেয়ে লম্বা দিলে, তখন এই নির্ভীক ছোট্ট খোকাটির সাদর আহ্বান শুনে ভাল্লুর মন বড়ো খুশি হয়ে উঠল। সে তখনই খোকার পায়ের তলায় চার পা ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়ে আনন্দে গদগদ হয়ে একবার এপাশে, আর একবার ওপাশে ফিরতে লাগল।

খোকাও তার পাশে বসে একবার ফিক করে হাসে এবং একবার কচি কচি হাত বাড়িয়ে ভাল্লুর বড়োবড়ো লোম গুছি করে টান মারে।

ওদিকে খোকার মা প্রথমটা ভয়ে পালিয়ে গেলেও ছেলেকে উদ্ধার করবার জন্যে আবার উঠানের উপরে ছুটে এসে, ব্যাপার দেখে অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

ভাল্লু তখন তাঁর পায়ের কাছেও গিয়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

খোকার মা ভরসা পেয়ে বললেন, 'কী ভালোমানুষ ভাল্লুক গো!'

সিঁড়ির উপরে কর্তাও তখন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন। ভয় ও বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে তিনি বললেন, 'কিন্তু আমার বাড়িতে ভাল্লুক এল কোথা থেকে?'

সিঁধেল সোনা তখন আসল ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে। সে বললে, 'হুজুর, ওই ঘরে আমরা সিঁধ কেটেছি। সিঁধের গর্ত দিয়ে ওই বনের ভাল্লুকটা নিশ্চয় বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছে।'

ভাল্লুক কারুকে আক্রমণ করে না, উল্টে পোষা কুকুরের মতন খেলা করে দেখে বাড়ির লোকেরা আবার উঠানের আনাচ-কানাচ থেকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। খোকার মা ছেলেকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে ভয়ে ভয়ে ভাল্লুর গায়ে একবার হাত বুলিয়ে নিলেন।

কর্তা সোনাকে চাকরদের হাতে সমর্পণ করে নিচে নেমে সিঁধের ঘরে ঢুকলেন। তখনও মোনার ভির্মি ভাঙেনি। সেও ধরা পড়ল। সিঁধের গর্তটা পরীক্ষা করে তিনি ঘরের বাইরে এসে সানন্দে বললেন, 'আমার সর্বস্ব যেতে বসেছিল, ভাগ্যে ওই কাদের পোষা ভাল্লুক এসে চোর ধরেছে, তাই আবার সব ফিরে পেলুম।'

খোকা মায়ের কোল থেকে ভাল্লুর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার খিলখিল করে হেসে উঠল।

কর্তা বললেন, 'এই ভাল্লুকটিকে আমি পুষব, ও আমার খোকার খেলার সাথী হবে।'

সাত

গাঁটছড়ার টাগ অব ওয়ার

বড়োই বিপদ! যে বাঁধন ছিঁড়ে পালাতে চাই আবার সেই বন্ধন? ভাল্লুর মুখ শুকিয়ে গেল মনের অসুখে।

ভাল্লুকে পুষেছেন খোকার বাবা। তাঁর কুকুর ছিল, এখন মরে গেছে, তারই শিকল দিয়ে ভাল্লুকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

যদিও ভাল্লুর আদর-যত্নের অভাব নেই, তার জন্যে আসে ভালো ভালো খাবার, খোকার মা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেন, খোকন এসে তার সঙ্গে প্রায় সারাদিনই কথা কয়, খেলা করে, সে পাড়ার যত ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েও তার চারিপাশ ঘিরে খেলাধুলো করে, তবু ভাল্লু খুশি হতে পারে না। মুখখানি বিমর্ষ করে চুপ মেরে বসে থাকে। আর খেলাধুলো করবে কি, দু-পা এগুতে গেলেই শিকলে পড়ে টান। গলায় দড়ি দিয়ে কার খেলার সাধ হয় বলো?

হপ্তাখানেক গেল। সন্ধ্যাবেলা আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। খোকা ঘুমোতে গিয়েছে। ভাল্লু একলা।

উঠানের চারিধারে ঘর—কোনওদিকেই চোখ ছোটবার উপায় নেই। ভাল্লু যেদিকে তাকায় দৃষ্টি বাধা পেয়ে ফিরে আসে। এই দুঃখ ভাল্লুকে আরও কাতর করে তোলে।

কেবল উপর দিকটা খোলা। মুখ তুললে দেখা যায় তারার চুমকি বসানো নীলাকাশের খানিকটা, আর একখানি বড়ো চাঁদ।

ভাল্লু দীর্ঘশ্বাস ফেললে কি না জানি না, কিন্তু আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ।

চাঁদ দেখলে জীবজন্তুদের মনে কি রকম ভাবের উদয় হয়, আমার পক্ষে তা বলা অসম্ভব। তবে একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি। চাঁদনি রাতে পথের কুকুরগুলোর চিৎকার বড়ো বেড়ে ওঠে। কিন্তু কেন? কুকুরেরা চেঁচিয়ে চাঁদকে কী বলতে চায়?

ভাল্লু কী ভাবছিল? হয়তো সে ভাবছিল যে, হিমালয়ের দিকে গিয়েছে যে পথ, এই চাঁদ তার উপরেও ফেলেছে রুপোলি আলো। পথের ধারে ধারে হাওয়ার দোলায় দুলছে নীল বন, চন্দ্রকিরণ জ্বলছে তার পাতায় পাতায়। সেখানে চোখ ছোটে দিকে দিকে সুদূরে, নড়লে চড়লে বাজে না শিকলের বেসুরো সঙ্গীত। সেখানে যত খুশি ছুটোছুটি করো, কোনও পাঁচিল, কোনও

বরের দুই কাঁধে দুই পা দিয়ে উঠে উঁচু কুলুঙ্গিটার ভিতরে ঢুকে বসল।

বন্ধ দরজা, কোনও বাঁধন বাধা দেয় না। ভাবতে ভাবতে ভাল্লুর মনটা কাঁদোকাঁদো হয়ে এল। তার ভাবটা তখন বোধহয় এইরকম—

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে,
কে বাঁচিতে চায়?'

ওই তো সদর দরজাটা এখনও খোলা রয়েছে! ওই দরজার ওপারেই তো স্বাধীনতার পথ! একবার যদি শৃঙ্খল ছিঁড়তে পারি তাহলে আর আমাকে পায় কে? কুকুরবাঁধা শিকল যে ভাল্লুকের পক্ষে নগণ্য, বাড়ির কর্তা সেটা খেয়ালে আনেননি।

ভাল্লুর এক টানে ঝনাৎ করে ছিঁড়ে গেল শিকল। ভাল্লু মারলে দৌড়। যে-সে দৌড় নয়—যাকে বলে ভোঁ-দৌড়।

গ্রাম পার হয়ে মাঠ, মাঠ পার হয়ে বন, বন পার হয়ে একটা নদী।

ভাল্লু মনের সুখে খানিকক্ষণ নদীতে সাঁতার কাটতে লাগল। তার সাড়া পেয়ে একটা কুমির ভেসে উঠে তদারক করতে এল। ভাল্লু মুখ খিঁচিয়ে তাকে দিলে এক জোর ধমক। শিকারটা সুবিধাজনক নয় বুঝে কুমির আবার ডুব মারলে। এবং ভাল্লুও বুঝলে, যেখানে জলে বেড়ায় প্রকাণ্ড টিকটিকি সে-ঠাঁই মোটেই নিরাপদ নয়। সে তাড়াতাড়ি নদীর ওপারে গিয়ে উঠল।

তারপরে ভাল্লুর নাকে এল একটা মিষ্টি সুগন্ধ—অর্থাৎ খাবারের গন্ধ।

এখানেই তার দুর্বলতা। তাকে অনায়াসেই পেটুকচূড়ামণি উপাধি দেওয়া যেতে পারে। নাকে খাবারের গন্ধ এলে সে আর স্থির থাকতে পারে না—তার ভরা পেটেও জেগে ওঠে নতুন ক্ষুধার তাড়না।

শূন্যে নাক তুলে সে অগ্রসর হতে লাগল। একটা গ্রামে ঢুকল। গ্রামের এক বাড়িতে আজ বিয়ের ঘটা। সাজানো আলোর মালা। লোকজনের ছুটোছুটি ও হাঁকডাক। লুচি-তরকারির গন্ধ।

বাইরের উঠানে বরযাত্রীরা আসর জাঁকিয়ে বসে আছে। পান-তামাক নিয়ে চাকররা আনাগোনা করছে। বালকরা ফুলের মালা ও প্রীতি-উপহারের কবিতা বিতরণ করছে। একজন বড়ো ওস্তাদ তানপুরা কাঁধে নিয়ে, কানে এক হাত চেপে মস্ত বড়ো হাঁ করে পিলে-চমকানো তান ছাড়ছেন আর সমঝদাররা তারিফ করে বলছেন, বাহবা-কি-বাহবা। এবং একদল ফাজিল ছেলে মাঝে মাঝে আড়াল থেকে চ্যাঁচাচ্ছে—বাহবা-কি-ছ্যা-ছ্যা!

ভাল্লু কোনওদিনই মানুষকে ভয় করত না; কারণ বরাবরই সে দেখে আসছে মানুষরাই তাকে যমের মতন ভয় করে। সুতরাং সে অম্লানবদনে গদাই-লস্করি চালে আসরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

পরমুহূর্তেই কী যে দক্ষযজ্ঞ ছত্রভঙ্গ কাণ্ড বাধল, সেটা তোমরা অনায়াসেই অনুমান করতে পারবে। বরযাত্রীরা পালাল পায়ের জুতো ফেলে, তানপুরাহীন ওস্তাদজী লম্বা দিলেন ওস্তাদি তান ভুলে, বরকর্তা পালাতে গিয়ে খেলেন ভীষণ আছাড় এবং সেই অবস্থাতেই তাঁর মনে পড়ল ভাল্লুকরা মরা মানুষ ছোঁয় না, সুতরাং দুই চোখ বুজে ফেলে আড়ষ্ট হয়ে এমন ভাব দেখালেন যেন তিনি মরে কাঠ হয়ে গিয়েছেন—যদিও মস্ত ভুঁড়ির হাপরের মতন হাঁপানি তিনি বন্ধ করতে পারলেন না। আধ মিনিটের মধ্যেই আসর জনশূন্য ও শব্দহীন।

ভাল্লু দু-একগাছা ফুলের মালা শুঁকে বুঝলে, সেগুলো খাবার জিনিস নয়। একটা ভরতি চায়ের পেয়ালায় জিভ ডুবিয়ে চাখলে, তাও অখাদ্য বলে মনে হল। তার পরেই তাকে আহ্বান করলে ভিয়ান ঘরের লুচি-তরকারির গন্ধ। সেই গন্ধের উৎপত্তি কোথায় জানবার জন্যে ভাল্লু আবার দ্রুতপদে অগ্রসর হল।

অন্দরমহলে উঠান। দালানে ঠিক যেন একটি লাল চেলির পুঁটলির পাশে টোপর মাথায়

বরবাবাজী ঘাড় হেঁট করে বসে আছে, পুরোহিত করছে মন্ত্র উচ্চারণ এবং তাদের ঘিরে গয়না ও রঙচঙে কাপড়পরা মেয়েদের ভিড়।

কনের মা বিন্দিদাসীকে ডেকে বললেন, 'ওরে, সদরে গিয়ে দেখে আয় তো, ওখানে অত হই-চই কিসের?'

বিন্দি সদরের দিকে গেল এবং তারপরেই মাটিতে আঁচল লোটাতে লোটাতে দুই চোখ কপালে তুলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ফিরে এল এবং দুম-দাম শব্দে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

কনের মা সবিস্ময়ে বললেন, 'ওরে বিন্দি, কী হল রে, হঠাৎ তুই ক্ষেপে গেলি নাকি?'

বিন্দির জবাব পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু ভাল্লুর দেখা পাওয়া গেল।

পুরুতঠাকুর বুড়ো থুত্থুড়ো হলেও অতি চটপটে, তিড়িং করে লাফ মেরে তখনই চম্পট দিলেন। বর রীতিমতো হতভম্ব! তার পাশের পুঁটলিটা আশ্চর্যরকম জ্যান্ত হয়ে উঠল।

বর-কনের পিছনকার দেওয়ালের গায়ে ছিল একটা মস্ত কুলুঙ্গি। কনের বুঝতে দেরি লাগল না যে, এখন লজ্জা করবার সময় নয়। সে টপ করে গাত্রোত্থান করলে এবং ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া বরের দুই কাঁধে দুই পা দিয়ে উঠে উঁচু কুলুঙ্গিটার ভিতরে ঢুকে বসল। অন্যান্য মেয়েরাও যখন কলরব তুলে উধাও হল, বরও তখন বুঝতে পারলে যঃ পলায়তি স জীবতি।'

কিন্তু পালাতে গিয়ে পড়ল গাঁটছড়ায় টান। বর গাঁটছড়া ধরে প্রাণপণে টেনে রইল। বরও ছাড়বে না, কনেও ছাড়বে না—সে এক অপূর্ব টাগ-অব-ওয়ার।

ভাল্লুর ভাব দেখলে বোধ হয়, এখানে উল্লেখযোগ্য কিছুই যেন হয়নি। খাবারের গন্ধ তাকে ডাক দিয়েছে, কোনওদিকে তাকিয়ে সময় নষ্ট করবার সময় তার নেই। ভিয়েনঘর খুঁজে বার করতে বিলম্ব হল না।

সেখানেও হল আর এক দফা হাঁউমাউ, হুটোহুটি, ছুটোছুটি, লুটোপুটির পালা। তারপর সব ঠাণ্ডা।

ভাল্লু তখন মনের সাধে বেছে বেছে খাবার খেতে বসল।

খেতে খেতে যখন শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, তখন বাড়ির ভিতরে কোথায় উপরি-উপরি দুইবার গুড়ুম গুড়ুম করে বেজায় আওয়াজ হল। ভাল্লু চমকে উঠল। ওরে বাবা, এখানেও নতুন রকম লাঠির গোলমাল? মানুষগুলো কি পাজি, খেয়ে-দেয়ে যে একটু জিরিয়ে নেব তারও জো নেই।

ভাল্লু হন্তদন্তের মতো সেখান থেকে সরে পড়ল।

আট

বনের বাঘ

জ্বালালে রে, ভারি জ্বালালে! যেখানে যাব, সেখানেই ওই নতুন রকম লাঠি গুড়ুম-গুড়ুম করে আক্কেল গুড়ুম করে দেবে?

ভাল্লু পাঁই পাঁই করে ছুটতে লাগল। অত বড়ো আর ভারী দেহ নিয়ে কী করে যে সে অত তাড়াতাড়ি দৌড়তে পারে, ভাবলেও অবাক হতে হয়।

আবার গ্রামের পর গ্রাম, বনের পর বন, মাঠের পর মাঠ, নদীর পর নদী। মাথার উপরে সোনার চাঁদ খালি হাসে আর হাসে, পরীদের উড়ন্ত ফানুসের মতন জোনাকিরা টিপটিপ করে জ্বলতে জ্বলতে উড়ে যায়, মাঝে মাঝে 'কা-হুয়া, কা-হুয়া' বলে চেঁচিয়ে শেয়ালেরা খবরদারি করতে আসে।

স্বাধীনভাবে পথ চলার আনন্দে ভাল্লুর মন যখন রীতিমতো মেতে উঠেছে, বনের ঝোপ নেড়ে হঠাৎ বেরিয়ে এল হামদোমুখো বাঘা।

ভাল্লু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাঘা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকে দেখতে লাগল। ভাল্লুও আড়চোখে তাকে দেখে নিয়ে বুঝে ফেললে, এ জীবটিকে বৈষ্ণব বলে সন্দেহ হয় না।

বাঘা দু-পা এগিয়ে এল। ভাল্লু বললে, 'ঘোঁত?' ('কে তুমি?')

বাঘা মাটিতে ল্যাজ আছড়ে বললে, 'গররর গররর গরর।' ('আমি বাঘা! তোমার ঘাড় মটকাতে চাই।')

মাটিতে আছড়াবার মতন ল্যাজ ভাল্লুর ছিল না। তবু বাঘাকে ভড়কে দেবার জন্যে একটা কিছু করা উচিত বুঝে সে পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সামনের দুই থাবা নেড়ে নেড়ে বললে, 'ঘোঁত-ঘোঁত-ঘোঁত-ঘোঁত!' ('মট করে মটকাবার মতন ঘাড় আমার নয়। তফাতে সরে যা হতভাগা!')

বাঘা মনে মনে তারিফ করে বললে,—এই কুকুরমুখো ধিঙ্গিটা আমার ওপরে বেশ এক হাত নিলে দেখছি। আমি ল্যাজটা আছড়াতে পারি বটে, কিন্তু আমার পক্ষে এমন মানুষের মতন পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো অসম্ভব।—প্রকাশ্যে বললে, 'হালুম হুলুম, হালুম হুলুম।'

ভাল্লু বললে, 'ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক!'

বাঘা বললে, 'রক্ত খাব!'

ভাল্লু বললে, 'থাবড়ে বদন বিগড়ে দেব!'

—'আও, আও!'

—'নিকালো হিঁয়াসে!'

—'হোঁদল-কুৎকুতে!'

—'থ্যাবড়ানাকী চেরণদাঁতী!'

তারপর বাক্যযুদ্ধের পালা সাঙ্গ। ভাল্লুর ঘাড়ে পড়বার জন্যে বাঘা মারলে লাফ—ভাল্লু গেল চট করে একপাশে সরে। বাঘা মাটিতে পড়েই ফিরে ঘাঁক করে ভাল্লুর পিছনে কামড়ে দিলে। ভাল্লুও ফিরে বাঘার মুখে মারলে ধাঁ করে এক থাবড়া।

ভাল্লুর পিছনে ছিল পুরু লোম, বাঘার কামড়ে তার কিছুই হল না। কিন্তু ভাল্লুর থাবড়ায় বাঘার বাহারি মুখের যে দুর্দশা হল তা আর বলবার নয়।

তখন অরণ্যরাজ্যের প্রজারা চারিপাশে এসে জড়ো হয়েছে মজা দেখবার জন্যে। শিয়াল, বনবিড়াল, শজারু এবং গাছের ডালে লাঙুল ঝুলিয়ে তিনটে হনুমান। এমন কি একটা ভীতু খরগোশও গর্তের ফাঁক দিয়ে একবার উঁকি না মেরে থাকতে পারলে না। মজা দেখতে এল না কেবল হরিণরা।

এর আগে বাঘা কোনওদিন ভাল্লুক দেখেনি, কারণ ভাল্লুকরা এ বনে বসবাস করত না। আজ প্রথম ভাল্লুকের পরিচয় পেয়ে সে দস্তুরমতো হতভম্ব হয়ে গেল।

ভাল্লু বললে, 'ভায়া, আর একহাত লড়াই করবে নাকি?'

বাঘার গা যেন জ্বলে গেল। কিন্তু কোনও জবাব না দিয়ে সে আবার ঝোপের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

শেয়ালরা শুধোলে, 'কা-হুয়া, কা-হুয়া?'

'কুছ নেহি হুয়া' বলে ভাল্লু আবার চলতে শুরু করলে।

চাঁদের আলোয় ধবধব করছে বনের পথ। পাপিয়ারা মেতেছে গানের জলসায়। নিঝুম রাতের কানে কানে বাতাস বাজাচ্ছে সবুজ পাতার বীণা। পথের শেষে ঘাস-বিছানায় শুয়ে একটি নদী কলতানের ছন্দে গাঁথছিল হিরার মালা।

ভাল্লুর তেষ্টা পেয়েছে। সে নদীর ধারে গিয়ে চুকচুক করে জলপান করছে, এমন সময় এখানেও একটা কুমির তার সঙ্গে আলাপ করতে এল। কিন্তু ভাল্লু জলে নামলে না। সে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, আলিপুরের চিড়িয়াখানায়, মানুষদের ঘরের দেওয়ালে আমি তো অনেক টিকটিকি দেখেছি, কিন্তু জলের টিকটিকিগুলো এত বড়ো হয় কেন?

কুমিরটা প্রায় তীরের কাছে এসে বললে, 'ভাল্লুক ভায়া, একবার, জলে নামো না হে! তোমার সঙ্গে দুটো মনের কথা কই!'

ভাল্লু বললে, 'না হে ধুমসো টিকটিকি, আমার সময় নেই।'

—'এত ব্যস্ত কেন? কোথা যাও?'

—'ক্ষিদে পেয়েছে। বটতলায় চললুম বটফল কুড়িয়ে খেতে।'

নয়

কালুয়াসুন্দরী

বটগাছের ঝিলমিলে পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদ হাসিমুখে উঁকি মেরে দেখলে, ভাল্লু মনের সাধে কুড়িয়ে খাচ্ছে মাটির উপর ঝরেপড়া বটের ফল।

তারপর চাঁদ নিলে ছুটি। সমস্ত পৃথিবী পড়ল অন্ধকারের ঢাকনা চাপা,—শূন্যে জেগে রইল খালি তারাছড়ানো আকাশের মায়াময় আবছায়া।

ভাল্লুর ঘুম পেলে। নরম বিছানার খোঁজে সে একটা ঝোপের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। সেখানে তার আগেই ঢুকে ঘুমোচ্ছিল একটা মস্ত গোখরা সাপ, ভাল্লুর সাড়া পেয়ে সে কালো বিদ্যুতের মতো মাথা তুলে বলে উঠল, 'ফোঁস ফোঁস! রোস তো, রোস তো,—দেখবি মজা—রোস তো, রোস তো! ফোঁস!' সাপ মারল ছোবল, কিন্তু তার আগেই চটপটে ভাল্লু চালালে থাবা, গোখরোর বিষদাঁতসুদ্ধ মুণ্ডু গেল কোথায় উড়ে। ভাল্লু একটু তফাতে গিয়ে থেবড়ি খেয়ে বসে দেখতে লাগল, গোখরোর মুণ্ডহীন লটপটে ধড়টা ক্রমাগত পাকসাট মারছে আর পাক খাচ্ছে। ভাল্লু অবাক হয়ে ভাবলে, এ কি রকম জানোয়ার রে বাবা। মাথা না থাকলেও মরবার নাম

করে না। আবার তেড়ে কামড়াতে আসবে নাকি? দরকার নেই এখানে ঘুমিয়ে, অন্য ঝোপে যাওয়া যাক।......

পুব আকাশে রামধনুরঙের খেলা দেখে পাখিরা খুশি হয়ে ঘুম ভাঙানিয়া তান সাধতে লাগল, কিন্তু ভাল্লুর ঘুম তবু ভাঙল না। গেল রাতে তার কম খাটুনি হয়নি তো, স্বপ্নলোক থেকে সহজে ফিরে আসতে রাজি হল না।

বিকট চীৎকার করে সেও দিলে চোঁ-চা চম্পট।

বেলা বাড়ছে, চাষারা মাঠে মাঠে লাঙল চষছে, ক্ষেতের আশপাশ দিয়ে হাটের লোক আনাগোনা করছে।

হটাৎ কোত্থেকে বাজল কার ডুগডুগির ডিমি ডিমি। ভাল্লু চমকে জেগে উঠল। কান খাড়া করে শুনলে ডুগডুগির বাজনা। ভাবলে, কে বাজায় এখানে এ বাজনা?

ডুগডুগির সঙ্গে সঙ্গে শোনা যাচ্ছে মানুষদের উল্লাস ধ্বনি ও হাততালির শব্দ। এই উল্লাস

ধ্বনি ও ডুগডুগির ভাষা যে ভাল্লুর কাছে অত্যন্ত পরিচিত। পথে পথে ডুগডুগির তালে তালে কত নাচের আসর সে যে মাত করে দিয়েছে, তা কি ভোলবার কথা? ভাল্লুর মনটা আনচান করতে লাগল। কথায় বলে, 'চড়কেপিঠ ঢাকে কাটি পড়লেই সড় সড় করে ওঠে,' ভাল্লুর অবস্থাও হল তাই। নিজেকে সে একজন উঁচুদরের নৃত্যশিল্পী বলে জানে, সুতরাং ডুগডুগির ছন্দ শুনে আর স্থির থাকতে পারলে না। ধড়মড় করে উঠে বসে ঝোপের ফাঁক দিয়ে সাবধানে একটুখানি মুখ বাড়ালে।

খানিক তফাতেই নদীর ধার দিয়ে নদীরই মতন এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে হাটের পথের রেখা। পথের পাশে প্রকাণ্ড একটা অশথগাছ এবং তারই ছায়ায় নিচে জমেছে লোকের ভিড়। সেইখানে ডুগডুগি বাজিয়ে একটা লোক দেখাচ্ছে ভাল্লুক-নাচ। যে ভাল্লুকটা নাচছে সে ভাল্লুর মতন জোয়ান মস্তবড়ো নয় বটে, কিন্তু দেখলেই বোঝা যায়, তারা দুজনেই হচ্ছে এক জাতের জীব।

চাঙ্গা হয়ে উঠল ভাল্লুর শিল্পীপ্রাণ। সে মাথা তুলে, মাথা নামিয়ে, এপাশে ওপাশে মাথা কাত করে—নানানভাবে দস্তুরমতো সমালোচকের দৃষ্টিতে নতুন ভাল্লুকটার নাচ খানিকক্ষণ ধরে দেখে বেশ বুঝে ফেললে, এ এখনও নৃত্যকলার ছাত্র মাত্র—তার মতন উচ্চশ্রেণীতে উঠতে, এর এখনও অনেক দিন লাগবে।

ভাল্লু মনে মনে ভাবলে, বোকা মানুষগুলো এই বাজে নাচ দেখেই এত হাততালি আর বাহবা দিচ্ছে, সেরা আর্ট কাকে বলে নিশ্চয় এরা তার খবর রাখে না! ঝোপ থেকে বেরিয়ে একবার দেখিয়ে দেব নাকি আমার পায়ের কায়দা?.....ধেই-ধেই করে নাচবার জন্যে তার দুই পা যেন নিশপিশ করতে লাগল।

নাচ দেখতে দেখতে ভাল্লু হঠাৎ আর একটা ব্যাপার আবিষ্কার করে ফেললে। যে নাচছে, সে তার মতন পুরুষ নয়—সে হচ্ছে ভল্লুকী।

সঙ্গে সঙ্গে ভাল্লুর মত গেল বদলে। মনে মনে সে বললে, 'আহা মরি মরি ভল্লুকীর কী সুন্দর দেহের গড়নটি! মাঝে মাঝে নাচের তাল কেটে যাচ্ছে বটে—তা একটু-আধটু তাল অমন কেটেই থাকে, কিন্তু কী চমৎকার ওর নাচের ধরনটি! ওগো ভাল্লুকমেয়ে, তুমি হিমালয়ের কোন বনের ঋক্ষরাজকুমারী? কোন পামর মানুষ তোমাকে বাপ মায়ের আদরভরা কোল থেকে ছিনিয়ে এনে এমন পথের ধুলোয় নামিয়েছে? হায় হায়, কত কষ্টই পাচ্ছ না জানি!'

হঠাৎ বোধহয় নাচের তাল বেশিরকমই কেটে গেল, ভাল্লুকওয়ালা লাঠি তুলে ভল্লুকীর উপরে ঠকাস করে এক ঘা বসিয়ে দিলে। ভল্লুকী কেঁদে উঠল, তার কান্নার আওয়াজ শাঁখের ডাকের মতো!

ভাল্লুকমেয়ের গায়ে হাত তোলা? এ নিদারুণ দৃশ্য ভাল্লু সহ্য করতে পারলে না, ভয়ঙ্কর এক গর্জন করে সে একবারে ঝোপের ভিতরে থেকে বেরিয়ে পড়ল। যারা একমনে নাচ দেখবার আমোদে মেতেছিল, সেই ভয়ঙ্কর গর্জন শুনে বেজায় চমকে তারা ফিরে দেখে, ঝোপ ভেদ করে ছুটন্ত বিভীষিকার মতো আবির্ভূত হয়ে একটা সুবৃহৎ ভাল্লুক বেগে তেড়ে আসছে তাদের দিকেই। গ্রামের প্রান্তে প্রকাশ্য দিবালোকে এমন অসম্ভব ব্যাপার কল্পনাতীত বলে প্রথমটা নিজেদের চোখকেও বিশ্বাস করতে না পেরে দু-এক মুহূর্ত সকলে দাঁড়িয়ে রইল হতভম্বের মতো; এবং তারপরেই হাঁউ মাঁউ করে চেঁচিয়ে যে যেদিকে পারলে টেনে লম্বা দিলে।

ভাল্লুকওয়ালাদের ব্যবসা ভাল্লুক নিয়ে, কাজেই প্রথমটা সে ভয় পেয়ে সেখান থেকে নড়তে রাজি হল না।

কিন্তু ভাল্লু যখন কাছে এসে মানুষের মতন দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে, সামনের দুই পায়ের নখ বার করা থাবা বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হল তখন ভল্লুকীর বাঁধন-দড়ি ছেড়ে বিকট চীৎকার করে সেও দিলে চোঁ-চা চম্পট।

ভাল্লু খানিক দূর পর্যন্ত ভাল্লুকওয়ালার পিছনে পিছনে তাড়া করে গেল। তারপর ফিরে আবার গদাইলস্করী চালে ভল্লুকীর দিকে আসতে লাগল।

ইতিমধ্যে ভল্লুকী মাটিতে চার থাবা পেতে বসে চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে ভাল্লুকে ভালো করে দেখে নিয়েছে এবং বলতে কি—তাকে তার পছন্দও হয়েছে।

ভাল্লু কাছে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে আবার কিছুক্ষণ ধরে ভল্লুকীকে মুগ্ধ চোখে নিরীক্ষণ করলে। তারপর এগিয়ে ভল্লুকীর ঠাণ্ডা নাকে নিজের ঠাণ্ডা নাক ঘষে মধুর স্বরে বললে, 'ঘোঁত ঘোঁত।'

ভল্লুকীও লজ্জিত চোখ নামিয়ে মেয়েলি মিহি গলায় বললে, 'ঘোঁত ঘোঁত!'

তারপর তাদের দুজনের মধ্যে যেসব কথাবার্তা হল, আমার বিশ্বাস তা হচ্ছে এইরকম ঃ

ভাল্লু বললে, 'ওগো রাজকন্যে, তোমার নাম কী, তোমার বাস কোন বনে?'

কী মাছি তাড়াবার জন্যে গা ঝাড়া দিয়ে বললে, 'জানি না। জ্ঞান হবার আগেই উনুনমুখো মানুষরা আমাকে ধরে এনেছে।'

—'মানুষরা তোমার নাম রাখেনি?'

—'ওমা, তা আবার রাখেনি! মানুষরা আমাকে কালুয়া বলে ডাকে।'

—'কালুয়া? আ মরি মরি, কী মিষ্টি নাম!' ভাল্লু দুই চোখ মুদে একেবারে অভিভূত হয়ে গেল।

ভল্লুকী খুশি হয়ে শুধোলে, 'বীরবর, তোমার নামটি তো শোনা হল না!'

ভাল্লু ভরাট গলায় বললে, 'আমার নাম ভাল্লু।'

—'ভাল্লু? হুঁ, যোদ্ধার মতন নামই বটে!.......ঘ্যাঁক, ঘ্যাঁক—ঘোঁক!'

—'ওকি?'

—'একঝাঁক মাছি গো! তিনটেকে খেয়ে ফেলেছি। বাকিগুলো ভারি জ্বালাচ্ছে!'

ভল্লুকীর মন রাখবার জন্যে ভাল্লু তখন মক্ষিকাদের সঙ্গে তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হল। খানিকক্ষণ চেষ্টার পর বললে, 'নাঃ, অসম্ভব! কাল আমি বনের বাঘের সঙ্গেও যুদ্ধে জিতেছি কিন্তু পাজির পা-ঝাড়া এই উড়ন্ত শত্রুগুলো ধরাই দেয় না, যুদ্ধ করব কী? এক বেটা আবার আমার কানে ঢুকে 'বোঁ বোঁ' বলে গান গাইছে! রাজকন্যে, এখান থেকে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।'

দুজনে হনহন করে এগিয়ে চলল। যেতে যেতে ভল্লুকী বললে, 'ক্ষিদের চোটে আমার নাড়ী চোঁ চোঁ করছে।'

ভাল্লু বললে, 'বটফল খেতে চাও তো ওই বটতলায় চলো।'

বটফল খেতে খেতে ভল্লুকী বললে, 'হ্যাঁগো, তুমি অমন ছটফট করছ কেন?'

—'বললুম তো কানে ঢুকেছে মাছি।'

—'কই, দেখি!'

ভাল্লু শুয়ে পড়ে মুখ কাত করে রইল। ভল্লুকী তার কানের কাছে নিজের নাক নিয়ে গিয়ে হুসহুস করে ছাড়তে লাগল প্রচণ্ড নিঃশ্বাস। মাছিটা টুপ করে বেরিয়েই ভল্লুকীর বদনবিবরে ঢুকে পড়ল।

ভাল্লু কৃতজ্ঞ স্বরে বললে, 'কালুয়াসুন্দরী, তুমি আম্মকে বিয়ে করতে রাজি আছ?'

ভল্লুকী আনন্দে গদগদ হয়ে হেলেদুলে বললে, 'রাজি।'

ব্যাস, তাদের বিয়ে হয়ে গেল। মানুষের বিয়ের মতন জানোয়ারদের বিবাহ ব্যাপারে লক্ষ কথা, পুরুত, মন্ত্র, বরপণ ও আরও হাজার ঝঞ্ঝাটের দরকার হয় না—এ একটা মস্ত সুবিধা।

ঠিক এমনি সময়ে দূরে উঠল একটা গোলমাল। নতুন বর-বউ চমকে ফিরে দেখে, শত শত লোক আকাশ ফাটানো চিৎকার করতে করতে মাঠ দিয়ে ঝড়ের মতন ছুটে আসছে এবং সকলের আগে আগে আসছে সেই ভাল্লুকওয়ালা।

ভল্লুকী ভাল্লুর পেটের তলায় মুখ গুঁজে সভয়ে বললে, 'ওমা, কী হবে গো!'

ভাল্লু পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সদম্ভে বললে, 'কুছ পরোয়া নেহি। মাছির মতন কানের মধ্যে ঢুকে ওরা বোঁ-ও-ও বলে গান গাইতেও পারে না। যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি।'

ভল্লুকী সাহস পেয়ে বললে, 'বীরবর তুমিই ধন্য!'

গুডুম গুডুম করে বন্দুকের শব্দ হল।

ভাল্লু বিনা বাক্যব্যয়ে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে চার পায়ে দৌড়তে আরম্ভ করলে।

ভল্লুকী বললে, 'তুমি কি ওদের আক্রমণ করতে যাচ্ছ?'

—'পাগল, আমি পালাচ্ছি!'

—'সে কী গো, আমাকে ফেলে?'

—'উপায় কী গিন্নি, আপনি বাঁচলে বাপের নাম! আমি নতুন রকম লাঠির শব্দ শুনেছি, আর কি এখানে থাকি?'

নদীর ধারে গিয়ে ভাল্লু ফিরে দেখলে, ভল্লুকী তার সঙ্গ ছাড়েনি। খুশি হয়ে বললে, 'এই যে, তুমিও এসেছ, ভালোই হয়েছে। এখন জলে ঝাঁপ দাও তো দেখি! কিন্তু সাবধান, ধুমসো টিকটিকিকে কাছে ঘেঁষতে দিয়ো না!'

—'ধুমসো টিকটিকি আবার কে?'

জলে ঝাঁপ খেয়ে ভাল্লু বললে, 'ওই দেখো!'

কিন্তু কুমিরভায়া হাঁদাগঙ্গারাম নয়। একসঙ্গে ডবল ভাল্লুক দেখে সে ডুব মেরে অন্যদিকে চলে গেল।

দশ

কালুসর্দার ও টুনু ঝুনু

ভাল্লু সাঁতার কেটে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ফিরে দেখলে, ভল্লুকী তার পিছনে নেই, কখন জল থেকে উঠে গিয়ে চুপ করে ডাঙার উপরে দাঁড়িয়ে আছে।

ভাল্লু চিৎকার করে তাকে ডাকলে।

কিন্তু ভল্লুকী তবু সাড়া দিলে না।

ভাল্লু বুঝলে, নদীর জলে ধুমসো টিকটিকিকে দেখে ভল্লুকী ভয়ে ভড়কে গিয়েছে। বউকে অভয় দেবার জন্যে ভাল্লু যখন ফিরব ফিরব করছে, তখন আবার গুড়ুম করে বন্দুকের আওয়াজ, এবং সোঁ করে কি একটা জিনিস এসে ভাল্লুর ঠিক পাশ দিয়ে জলের উপরে ছোঁ মেরে চলে গেল।

ভাল্লু বোকা নয়। নতুন রকম লাঠির চিৎকার শুনেই কালুয়াসুন্দরীর কথা ভুলে সে বেগে সাঁতার কাটতে শুরু করলে। মিনিট কয় পরে ওপারে গিয়ে উঠে ফিরে দেখলে, ভাল্লুকওয়ালা এসে আবার কালুয়াকে গ্রেপ্তার করেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাল্লু ধরলে বনের পথ।

নয়নপুরের জমিদারের নাম প্রশান্ত চৌধুরী। তাঁর এক ছেলে এক মেয়ে। তাদের ডাকনাম টুনু ও ঝুনু।

ঝুনু হচ্ছে দিদি, বয়স ছয় বৎসর। টুনুর বয়স চারের বেশি নয়।

ঝুনু একেবারে পাকা গিন্নিটি, এই বয়সেই তার নাকি কিছুই জানতে বাকি নেই। সে জানে আকাশের তারারা হচ্ছে চাঁদামামার খোকাখুকি। ফুলপরীরা রাত্রে যেসব ফানুস উড়িয়ে দেয়, মানুষরা যে তাদেরই জোনাকি বলে ডাকে এ বিষয়েও ঝুনুর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। ঝুনু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে বনগাঁবাসী মাসি-পিসির বাড়িতে গিয়ে নিমন্ত্রণ খেয়ে আসে, তারপর সকালে সেখানকার গল্প বলে টুনুকে অবাক করে দেয়।

আজ সে হঠাৎ বললে, 'টুনু, হরিণ দেখেছিস?'

—'না।'

—'হরিণরা কোথায় থাকে জানিস?'

—'উহুঁ।'

—'বনে।'

—'কোন বনে?'

—'মাঠের ওপারে যে বনটা দেখা যাচ্ছে, ওই বনে।'

টুনু বললে, 'আমি হরিণ দেখব।'

ঝুনু বললে, 'হাঁটতে পারবি?'

—'হুঁ-উ-উ!'

—'তবে আয় আমার সঙ্গে।'

তেপান্তর মাঠ। যেখানে বনরেখা দেখা যাচ্ছে সেখানে যেতে মাইল তিনেক পথ পেরুতে হয়। পায়ে হাঁটা মেঠো পথ ধরে এগিয়ে চলল ঝুনু আর টুনু।

মাইল খানেক পথ চলতে না চলতেই টুনু বসে পড়ে বলল, 'দিদি, আমায় কোলে নে।'

ঝুনু কী আর করে, টুনুকে কোলে তুলে নিলে। কিন্তু চার বছরের খোকাকে কোলে নিয়ে ছয় বছরের খুকি আর কতক্ষণ পথ চলতে পারে? খানিক পরেই হাঁপিয়ে পড়ে ঝুনুও পথের উপরে বসে পড়ল।

এমন সময়ে ঘটনাস্থলে প্রবেশ করল কালাচাঁদ মণ্ডল বা কালুসর্দার। সে হচ্ছে এ অঞ্চলের চোর-ডাকাতদের দলপতি। প্রথমেই তার শিকারী চোখ পড়ল ঝুনুর গলার সোনার হার ও হাতের সোনার চুড়ির উপরে।

কালু গলার আওয়াজ যথাসাধ্য নরম করে শুধোলে, 'তোমরা কাদের খোকাখুকি গো?'

ঝুনু বললে, 'আমার বাবা জমিদারবাবু।'

—'এখানে কেন?'

—'ওই বনে যাব।'

—'বনে গিয়ে কী করবে খুকুমণি?'

—'হরিণ দেখব।'

—'ও, তাই নাকি? তা হরিণ তো ও বনে থাকে না!'

—'হরিণ তবে কোথায় থাকে শুনি?'

খানিক দূরের একটা জঙ্গল দেখিয়ে কালু বললে, 'ওখানে অনেক হরিণ আছে। দেখবে?'

—'দেখব বলেই তো এসেছি।'

—'এসো, তবে আমার কোলে ওঠো।'

ঝুনু আর টুনুকে নিয়ে কালু জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হল।

এখন, সেই জঙ্গলের ভিতরে আশ্রয় নিয়েছিল আমাদের ভাল্লু। একটা ঝুপসি ঝোপের তলায় ঢুকে সে তখন ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করছিল, হঠাৎ তার কানে গেল শিশুর কান্না।

ব্যাপারটা তদারক করবার জন্যে ভাল্লু ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে ঝোপের ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে দিলে।

কালু তখন এক হাতে ঝুনুকে মাটির উপরে চেপে ধরে আর এক হাতে তার গলা থেকে সোনার হার ছিনিয়ে নিচ্ছে।

আগেই বলেছি আমাদের ভাল্লু প্রত্যেক খোকাখুকিকে বন্ধু বলে মনে করত। এতটুকু একটি খুকির উপরে এমন বিষম অত্যাচার সে সহ্য করতে পারলে না। ভয়ানক গর্জন করে তেড়ে গিয়ে কালুকে মারলে প্রচণ্ড এক চড়। কালু আর্তনাদ করে ঠিকরে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

কালুর কবল থেকে মুক্তি পেয়েও ঝুনু ও টুনুর পিলে গেল চমকে। সামনে তাদের প্রকাণ্ড এক ভাল্লুক! সে আবার চড় মেরে মানুষকে রক্তাক্ত করে দেয়! তারা দুজনেই কেঁদে উঠল।

ভাল্লু বুঝলে, তাকে দেখে শিশুরা ভয় পেয়েছে। সে তখন দুই পায়ে ভর দিয়ে ধেই-ধেই করে নাচতে আরম্ভ করলে—কারণ বরাবরই সে দেখে আসছে, তাকে নাচতে দেখলেই শিশুরা হেসে উঠে খুশি হয়ে হাততালি দেয়।

যা ভেবেছে তাই! ভাল্লুকনাচ দেখেই ঝুনু আর টুনু কান্না ভুলে গেল।

খানিকক্ষণ নাচানাচি করে ভাল্লু মাটির উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিতে দিতে ঝুনু আর টুনুর পায়ের কাছে গিয়ে, চার থাবা তুলে একেবারে স্থির হয়ে রইল।

টুনুর মনে হল, ভাল্লু মিটমিট করে তাদের পানে তাকিয়ে হাসছে। সে ভয়ে ভয়ে ভাল্লুর গায়ে হাত দিলে ভাল্লু তবু নড়ল না। ঝুনু তখন সাহস সঞ্চয় করে তার গায়ে একবার হাত বুলিয়ে নিলে, ভাল্লু তখনও আড়ষ্ট।

হেলে-দুলে পায়চারি করছে বিরাট এক ভাল্লুক, পিঠে তার বসে রয়েছে ঝুনু ও টুনু।

ঝুনু বললে, 'ভাল্লুকটা ভারি ভালোমানুষ রে!'
টুনু বললে, 'একে আমি পুষব।'

জমিদার বাড়িতে তখন হুলুস্থূল পড়ে গিয়েছে—ঝুনু ও টুনুর অন্তর্ধানে চারিদিকে উঠেছে খোঁজ খোঁজ রব।

জমিদার প্রশান্ত চৌধুরী অনেক লোকজন নিয়ে নিজেই বেরিয়ে পড়েছেন। সঙ্গে আছে তাঁর বাল্যবন্ধু নবীনবাবু। তিনি আলিপুর চিড়িয়াখানার একজন পদস্থ কর্মচারী, ছুটি পেলে মাঝেমাঝে এখানে বেড়াতে আসেন।

একজন লোকের মুখে শোনা গেল, ঝুনু ও টুনুকে দেখা গিয়েছে মাঠের ধারে।

তারপর মাঠের এক চাষী খবর দিলে, কালুসর্দার দুটি শিশুকে কোলে করে নিয়ে গিয়েছে জঙ্গলের দিকে।

ডাকাত কালুসর্দার! প্রশান্তবাবুর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল! দলবল নিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটলেন তিনি পাগলের মতো।

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে দেখা গেল এক দৃশ্য—যেমন ভয়াবহ, তেমনি অদ্ভুত!

একদিকে মাটির উপরে পড়ে রয়েছে কালুর রক্তাক্ত ও অচেতন দেহ, হাতে তার ঝুনুর সোনার হার। আর একদিকে হেলে-দুলে পায়চারি করছে বিরাট এক ভাল্লুক, পিঠে তার বসে রয়েছে ঝুনু ও টুনু।

টুনু সকৌতুকে বলেছে, 'হট হট ঘোড়া, হট হট! জোরসে চল, জোরসে চল!'

নবীনবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'আরে, এ যে আমাদের চিড়িয়াখানার সেই ভাল্লুকটা! আজ কদিন হল পালিয়ে এসেছে!'

ভাল্লু বেগতিক দেখে ঝুনু ও টুনুকে পিঠে করেই চম্পট দেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু এবার সে আর ফাঁকি দিতে পারলে না, মানুষের উপকার করতে গিয়ে আবার মানুষের হাতেই বন্দী হল।

ঝুনুর মুখে সমস্ত শুনে প্রশান্তবাবু কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললেন, 'এই ভাল্লুকটি আমার ছেলে মেয়ের প্রাণরক্ষা করেছে। একে আমি যত্ন করে বাড়িতে রেখে দেব।'

নবীনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'অসম্ভব! এই ভাল্লুকটি হচ্ছে সরকারের সম্পত্তি। ওকে আবার যেতে হবে চিড়িয়াখানায়।'

হায় ভাল্লু! হায় রে হিমাচলের স্বপ্ন!

কিং কঙ

কিং কঙ

এক

চীন-সমুদ্রের টাইফুন

জাহাজের নাম "ইন্ডিয়া"। আমেরিকা থেকে জাপান হয়ে আসছিল ভারতবর্ষের দিকে।

হঠাৎ চীনা সমুদ্রে 'টাইফুন' জেগে উঠল! চীনা সমুদ্রে ভীষণ এক ঝড় ওঠে, তার নাম হচ্ছে 'টাইফুন'। খুব সাহসী নাবিকরাও এই 'টাইফুন'কে ভয় করে যমের মত। 'টাইফুনে'র পাল্লায় পড়ে আজ পর্যন্ত কত হাজার হাজার জাহাজ যে অতল পাতালে তলিয়ে গিয়েছে, সে হিসাব কেউ রাখতে পারেনি।

ঝড় গোঁ গোঁ করে গর্জন করছে—চারিদিক অন্ধকার! ঝড়ের আঘাতে সমুদ্র প্রচণ্ড যাতনায় আর্তনাদ করতে লাগল—পৃথিবীতে এখন ঝড়ের হুঙ্কার আর সমুদ্রের কান্না ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না! যেন ঝড়ের কবল থেকে মুক্তিলাভ করবার জন্যেই বিরাট এক ভীত জন্তুর মত সমুদ্র বারংবার আকাশে লাফ মারতে লাগল।

ঝড়ের তোড়ে "ইন্ডিয়া" জাহাজ অন্ধকারে কোথায় যে বেগে ছুটে চলেছে, কেউ তা জানে না! জাহাজের ইঞ্জিন যখন 'ইন্ডিয়া''কে আর সামলাতে পারলে না, কাপ্তেন ঈঙ্গলহর্ন তখন হাল ছেড়ে দিয়ে হতাশ ভাবে বললেন, "ভগবান আমাদের রক্ষা করুন!"

আকাশে চাঁদ নেই, তারা নেই—পৃথিবীর কোথাও এতটুকু আলোর আভাস নেই! জাহাজ ছুটে চলেছে যেন মৃত্যুর মুখে!

'টাইফুনে' প্রতিবৎসরে চীনা সমুদ্রে কত জাহাজই ডোবে, হয়ত "ইন্ডিয়া" জাহাজও আজ ডুববে, কিন্তু কেবল সেই কথা বলবার জন্যেই আজ আমরা এই গল্প লিখতে বসিনি।

"ইন্ডিয়া" জাহাজের দুটি যাত্রীর জন্যেই আমাদের যত দুর্ভাবনা!...কারণ তাঁরা বাঙালি। একজনের নাম শ্রীযুক্ত শোভনলাল সেন, আর একজন হচ্ছেন তাঁরই ভগ্নী কুমারী মালবিকা দেবী। ভাই-বোনে আমেরিকা বেড়িয়ে দেশে ফিরছেন।

শেষ রাতে ঝড় থামল, সমুদ্রও শান্ত হল।

কাপ্তেন ঈঙ্গলহর্ন বললেন, "ভগবানকে ধন্যবাদ! এ যাত্রা আমরা রক্ষা পেলুম!"

তাঁর সহকারী কর্মচারী বললেন, "কিন্তু জাহাজ যে কোথায় এসে পড়েছে, সেটা তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।"

কাপ্তেন বললেন, "না। তবে আমরা যে এখনও পৃথিবীতেই টিকে আছি, এইটুকুই হচ্ছে ভাগ্যের কথা। বেঁচে যখন আছি, তখন জাহাজ নিয়ে আবার ডাঙায় গিয়ে উঠতে পারব।"

কর্মচারী বললেন, "ও কিসের শব্দ?"

কাপ্তেন খানিকক্ষণ কান পেতে শুনে বললেন, "অনেকগুলো জয়ঢাক বাজছে! বোধহয় আমরা কোন দ্বীপের কাছে এসে পড়েছি। চারিদিকে যে অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হয়তো ওখানে কোন উৎসব হচ্ছে ...আচ্ছা, আগে রাতটা পুইয়ে যাক সকালে সবই বুঝতে পারব!"

দুম দুম দুম, দুম দুম দুম, দুম দুম দুম! জয়ঢাকগুলো অশান্ত স্বরে বেজেই চলেছে। শোভনলাল আর মালবিকা 'ডেকে' দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে সেই রহস্যময় বাজনা শুনতে লাগল।

খানিক পরে মালবিকা বললে, "দেখ দাদা, কেন জানি না, আমার মনে হচ্ছে যেন ও বাজনা আমাকেই ডাকছে!"

শোভনলাল হেসে ঠাট্টা করে বললে, "দূর পাগলী!"

দুই
খুলি-পাহাড়ের দ্বীপ

ঢাকঢোল একটানা বেজে চলেছে—এ ঢাক-ঢোল যেন থামতে শেখেনি!

পূর্বদিকে আলো-নদীর একটি উজ্জ্বল ধারা বয়ে যাচ্ছে—কিন্তু এখনও তার নিচেই দুলছে অন্ধকারের পর্দা।

আলো-নদীর দুই তীরে ধীরে ধীরে রক্তরাঙা রঙের রেখা ফুটে উঠেছে।

ক্রমে অন্ধকারের পর্দা পাতলা হয়ে এল এবং তারই ভিতর থেকে অস্পষ্ট ও ছায়াময় সব দৃশ্য দেখা যেতে লাগল।

ভোর। সূর্যের কিরণ-ছটা দেখা গেল।

শোভন ও মালবিকা বিস্মিত চক্ষে দেখলে, তাদের সামনেই একটি অর্ধচন্দ্রাকার দ্বীপ আত্মপ্রকাশ করেছে। দ্বীপের মাঝ থেকে মস্তবড় একটা পাহাড় মাথা তুলে আকাশের অনেকখানি ঢেকে ফেলেছে। সে পাহাড়ের উপরটা দেখতে ঠিক মড়ার মাথার খুলির মত—সেখানে গাছপালা বা সবুজ রঙের চিহ্নমাত্র নেই।

কিন্তু পাহাড়ের নিচেই গভীর জঙ্গল। আর সেই জঙ্গলের ভিতর থেকে তখনও কারা মহা-উৎসাহে ঢাকঢোল বাজাচ্ছে!

কাপ্তেনসাহেব তাঁর প্রধান কর্মচারী ডেনহামকে ডেকে বললেন, "মিঃ ডেনহাম! এ কোন দ্বীপ? আমরা কোথায় এসেছি?"

ডেনহাম বললে, "আমারও জ্ঞান আপনার চেয়ে বেশি নয়! এখানে মড়ার মাথার খুলির মতন একটা আশ্চর্য পাহাড় রয়েছে। এ দ্বীপের কথা কখনও শুনেছি বলে মনে হচ্ছে না।"

জাহাজের ইঞ্জিনচালক এসে খবর দিলে, ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে। সারাতে সময় লাগবে।

কাপ্তেন বললেন, "হয়ত আজ আমাদের এইখানেই থাকতে হবে। ডেনহাম, সময়ই যখন পাওয়া গেল, এই অজানা দ্বীপটা একবার তদারক করে আসতে দোষ কি?"

—"দোষ কিছুই নেই। কিন্তু কাল রাত থেকে শুনছি ওখানে কারা ঢাকঢোল বাজাচ্ছে, এ রহস্যময় দ্বীপে কারা বাস করে, তা জানি না। ওরা যদি অসভ্য নরখাদক হয়? যদি আমাদের আক্রমণ করে?"

—"ঠিকই বলেছ ডেনহাম। বেশ, আমরা দলে ভারি আর সশস্ত্র হয়েই যাব! দুখানা বোট নামাতে বল। ত্রিশজন নাবিক আমাদের সঙ্গে যাবে। সকলেই যেন বন্দুক নেয়।"

শোভন আর মালবিকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাপ্তেনের হুকুম শুনলে।

মালবিকা বললে, "আমি কখনও অসভ্য মানুষ দেখিনি! দাদা, আমারও ওই দ্বীপে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে!"

শোভন বললে, "এ প্রস্তাব মন্দ নয়, মালবিকা! ফাঁকতালে একটা নতুন দেশ দেখার সুযোগ ছাড়ি কেন? রসো, কাপ্তেনসাহেব কি বলেন শুনে আসি।"

কাপ্তেন প্রথমটা নারাজ হলেন। তারপর শোভনের অত্যন্ত উৎসাহ দেখে বললেন, "আচ্ছা, আমাদের সঙ্গে আপনারা যেতে পারেন,—কিন্তু না গেলেই ভাল হত।"

মালবিকাকে বোটে উঠতে দেখে চার-পাঁচজন মেমও দ্বীপে যাবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলে। কিন্তু দ্বীপে অসভ্য নরখাদক থাকতে পারে শুনেই তাদের সমস্ত আগ্রহই ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

দুখানা বোট দ্বীপের দিকে অগ্রসর হল।

ঢাকঢোল তখনও বাজছে।

বোট দুখানা খানিক দূর অগ্রসর হতেই দেখা গেল, দ্বীপের জঙ্গল আর সমুদ্রতীরের মাঝখানে প্রকাণ্ড উঁচু একটা পাঁচিল এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে।

শোভন সেইদিকে কাপ্তেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।

কাপ্তেন বিস্মিত স্বরে বললেন, "অতবড় পাঁচিল দিয়ে জঙ্গলটা আড়াল করে রাখা হয়েছে কেন? এ কী ব্যাপার!"

ডেনহাম বললে, "এ যে চীনের প্রাচীরের মতন ব্যাপার। চীনারা পাঁচিল তুলেছিল তাতার-দস্যুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে। কিন্তু এখানে কাদের আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে এমন পাঁচিল তোলা হয়েছে?"

শোভন বললে, "আমরা দ্বীপের এত কাছে এসে পড়েছি, তবুও তো ওখানে জনপ্রাণীকে দেখতে পাচ্ছি না!"

মালবিকা বললে, "কিন্তু ঢাকের বাদ্যির তো বিরাম নেই।"

কাপ্তেন বললেন, "আর একটা দুটো নয়, শত শত ঢাক বাজছে! আমার বোধহয়, দ্বীপে আজ কোন মহোৎসব হচ্ছে, বাসিন্দারা সবাই সেখানে গিয়ে জুটেছে!"

বোট দুখানা দ্বীপের যত কাছে আসে, সেই আশ্চর্য প্রাচীরের উচ্চতা ততই বেড়ে ওঠে!

শোভন বললে, "পাঁচিলটা দেড়শ ফুটের চেয়ে কম উঁচু হবে না! দেখুন, বড় বড় গাছগুলো পর্যন্ত পাঁচিলের কত নিচে রয়েছে।"

কাপ্তেন বললেন, "যাদের ভয়ে অত উঁচু পাঁচিল দেওয়া হয়, তাদের প্রকৃতি নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর! মিঃ সেন, আপনার ভগ্নীকে আমাদের সঙ্গে না আনলেই ভাল করতুম!"

মালবিকা হেসে বললে, "আমার কিন্তু একটুও ভয় করছে না। মিঃ ঈঙ্গলহর্ন!"

কাপ্তেন বললেন, "আপনার ভয় না করতে পারে, কিন্তু আমি ভাবছি আমার দায়িত্বের জন্যে!"

বোট ডাঙায় এসে লাগল। কিন্তু তখনও দ্বীপের কোন মানুষকে দেখা গেল না—কেবল সেই শত শত অশান্ত ঢাকের আওয়াজই জানিয়ে দিচ্ছিল যে, এখানে মানুষ বাস করে!

কাপ্তেন বোট থেকে নেমে নাবিকদের ডেকে বললেন, "বন্দুকে টোটা পুরে তোমরা দুজন দুজন করে সার বেঁধে অগ্রসর হও। মিঃ সেন, আপনার ভগ্নীকে নিয়ে আপনি আমাদের সঙ্গে মাঝখানে থাকুন!"

যেদিক থেকে ঢাকঢোলের আওয়াজ আসছিল, সকলে পায়ে পায়ে সেইদিকে এগুতে লাগল।

শোভন বললে, "দেখুন মিঃ ঈঙ্গলহর্ন! পাঁচিলটা এখন আরও কত বড় দেখাচ্ছে! আর এ পাঁচিল যে একেলে নয়, অনেক শত বৎসরের পুরনো, তাও বেশ বোঝা যাচ্ছে!"

কাপ্তেন বললেন, "পাঁচিলের গায়ে ওখানে যে একটা মস্তবড় ফটকও রয়েছে! তালগাছের সমান উঁচু ঐ ফটকটা কি রকম মজবুত দেখেছেন!"

এইবারে সকলে একটা বড় গ্রামের কাছে এসে পড়ল। সারি সারি কুঁড়েঘর, মাঝে মাঝে অলিগলি ও রাস্তা। গ্রামের আকার দেখে আন্দাজে বোঝা গেল, এখানে অন্তত চার-পাঁচ হাজার লোক বাস করে! কিন্তু কোথায় তারা? সারা গ্রাম নিস্তব্ধ ও জনশূন্য, কোথাও জীবনের কোন লক্ষণই নেই।

ঢাকঢোলের আওয়াজ তখন ভয়ানক বেড়ে উঠেছে—সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে বহু কণ্ঠের গম্ভীর একতানও শোনা যাচ্ছে—যেন কারা অজানা ভাষায় স্তোত্র পাঠ করছে!

ডেনহাম বললেন, "এতক্ষণে মানুষের গলার সাড়া পাওয়া গেল। গাঁ-শুদ্ধ লোক এখানে এসে জুটেছে। দেখা যাক এরা কারা?"

গাছপালার ভিতর থেকে প্রায় সত্তর-আশি ফুট উঁচু একটা কাঠের বাড়ি জেগে উঠল।

শোভন বললে, "গোলমালটা ওইদিক থেকেই আসছে। ওই কাঠের উঁচু বাড়িটা বোধহয় মন্দির, নয়ত রাজপ্রাসাদ!"

সামনেই একটা জঙ্গল। সেটা পার হতেই সকলের চোখের সুমুখে যে দৃশ্য জেগে উঠল, তা যেমন অদ্ভুত, তেমনই বিচিত্র!

মালবিকা এতক্ষণ খুব স্ফূর্তির সঙ্গে পথ চলছিল, এখন সে আঁতকে উঠে পিছিয়ে পড়ে শোভনের গা ঘেঁসে দাঁড়াল।

কাপ্তেনসাহেব হাত তুলে ইশারা করে নাবিকদের হুঁশিয়ার হতে বললেন। নাবিকেরাও তখনই বন্দুক প্রস্তুত করে সাবধান হয়ে দাঁড়াল!

তিন

বেড়ো! বেড়ো!

মস্ত একটা কাঠের উঁচু মাচা! তার চারিদিকে কাঠের সিঁড়ি—নানান রকম জীবজন্তুর চামড়ায় ঢাকা!

সেই মাচার টঙে একটি বালিকা ভয়ে জড়সড় হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আছে—কষ্টিপাথরের কালো মূর্তির মত! মেয়েটির মাথায় ফুলের মুকুট, সর্বাঙ্গে ফুলের গহনা!

কাঠের সিঁড়ির ধাপে ধাপে দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলো কালো কালো পুরুষ মূর্তি, তারা সমস্বরে যেন কি মন্ত্র পড়ছে!

মাচার ডানদিকে আর একটা কাঠের বেদী, তার উপরেও ভূতের মতন কালো একটা লম্বা-চওড়া

মূর্তি, তার মাথায় পালকের টুপি, পরনে জন্তুর চামড়া, গলায় মড়ার মাথার মালা। সেও দু-হাত ঊর্ধ্বে তুলে চেঁচিয়ে কি মন্ত্র পড়ছে! বোধহয় সে প্রধান পুরোহিত।

মাচার বাঁ দিকেও একটা বেদী এবং তার উপরেও জমকাল পোশাকপরা আর একটা মূর্তি! তার মাথায় মুকুট, হাতে দণ্ড! বোধহয় সে এখানকার রাজা।

নিচের চারিদিকে কাতারে কাতারে লোক—স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ! দলে দলে যোদ্ধা,—হাতে বর্শা, কোমরে তরবারি, পিঠে তীরধনুক! শত শত বাজনদার, বড় বড় ঢাকে কাঠি পিটছে! প্রত্যেক মূর্তিই প্রায় উলঙ্গ, কোমরে কেবল কপনির মত এক এক টুকরো ন্যাকড়া ঝুলছে!

হঠাৎ পুরুত মন্ত্রপড়া বন্ধ করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল অমনই ভিড়ের ভিতর থেকে জন-বার মূর্তি বেরিয়ে এসে যে মাচাটার উপরে সেই ভীত মেয়েটি বসে আছে, তারই চারপাশ ঘিরে লাফাতে লাফাতে তাণ্ডব নাচ শুরু করে দিলে! সে মূর্তিগুলোর প্রত্যেকের মুখেই ভীষণ মুখোশ, গায়ে বড় বড় লোমওয়ালা চামড়া।

ডেনহাম বললে, "গরিলা! ওরা গরিলা সেজে নাচছে! এত জীব থাকতে ওরা গরিলা সাজল কেন?"

এতক্ষণ ওরা এমন ব্যস্ত হয়েছিল যে, কাপ্তেনসাহেবের অস্তিত্বের কথা কেউ জানতেও পারেনি। কিন্তু এখন রাজদণ্ডধারী মূর্তিটার দৃষ্টি আচম্বিতে নূতন আগন্তুকদের উপর গিয়ে পড়ল! সঙ্গে সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে উঠল—"বেড়ো! বেড়ো! ড্যামা পেটি ভেগো!"

অমনই সমস্ত ঢাকঢোল, মন্ত্রপড়া, চিৎকার ও নৃত্য যেন কোন মায়ামন্ত্রেই একসঙ্গে থেমে গেল! চারিদিক এমনি স্তব্ধ হল যে, একটা আলপিন পড়ার শব্দও শোনা যায়!

সমস্ত লোক হতভম্বের মত কাপ্তেনসাহেবের দলের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল! এবং শিশু ও স্ত্রীলোকেরা একে একে ভিড়ের ভিতর থেকে নিরবে সরে পড়তে লাগল।

ডেনহাম ত্রস্তকণ্ঠে বললে, "দেখ, দেখ! স্ত্রীলোক আর শিশুরা পালিয়ে যাচ্ছে। গতিক সুবিধার নয়, আমাদেরও এখান থেকে অদৃশ্য হওয়া উচিত।"

কাপ্তেন বললেন, "আর পালানো চলে না। ওরা আমাদের দেখে ফেলেছে। বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও, আমরা যে ভয় পেয়েছি সেটা ওদের জানতে দেওয়া হবে না।"

রাজা ও পুরুত বেদীর উপর থেকে নেমে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল, তাদের পিছনে পিছনে আসছে একদল যোদ্ধা। ভিড়ের ভিতরে এখন আর একজনও শিশু কি স্ত্রীলোক নেই!

ডেনহাম বললে, "এই বনমানুষগুলো এগিয়ে আসছে কেন?"

রাজার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে কাপ্তেন বললেন, "জানি না।"

মালবিকা বললে, "হ্যাঁ দাদা, ওরা কি আমাদের আক্রমণ করবে?"

শোভন বললে, "কেমন করে বলব? কিন্তু আমাদের আক্রমণ করলে ওদেরই বেশি বিপদ হবে। আমাদের বন্দুক আছে।"

রাজা ও পুরুত সদলবলে এগিয়ে নাবিকদের সামনে এসে দাঁড়াল।"

হঠাৎ পুরুতের চোখ পড়ল মালবিকার উপরে! অত্যন্ত বিস্ময়ে খানিকক্ষণ নীরব থেকে আচম্বিতে শূন্যে এক লাফ মেরে সে কি বিকট স্বরে চিৎকার করে উঠল, "ড্যামা সি ভেগো! ড্যামা সি ভেগো! কং! কং! কং! টাস্কো!"

রাজাও মালবিকাকে দেখে সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল, "কং! কং! কং! টাস্কো!"

তারপর চোখের পলক পড়তে না পড়তে যোদ্ধার দল ছুটে এসে মালবিকাকে ধরবার উপক্রম করলে।

মালবিকা সভয়ে আর্তনাদ করে উঠল—"দাদা! দাদা!"

কাপ্তেন বললেন, "বন্দুক ছোড়!"

একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুক গর্জন করে উঠল—পরমুহূর্তে সাত-আটজন যোদ্ধার দেহ মাটির উপর পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

এরা নিশ্চয়ই বন্দুকের নামও কখনও শোনেনি! কারণ ব্যাপারটা দেখে তারা সবাই বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করে অল্পক্ষণ সেখানে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, এবং তারপরেই মহাভয়ে তীরবেগে পলায়ন করতে লাগল। তারপর কেবল তারা নয়, সেখানকার সেই বিপুল জনতাও যেন কোন যাদুমন্ত্রের মহিমায় কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল!

মালবিকা হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "দাদা, ওই কেলে ভূতগুলো আমাকে ধরতে এসেছিল কেন?"

মালবিকাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে শোভন বললে, "কি করে জানব বল? ওদের ভাষা তো বুঝি না!"

কাপ্তেন হত ও আহত যোদ্ধাগুলোর দেহের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "আর দ্বীপ দেখে কাজ নেই—যথেষ্ট হয়েছে! শিগগির জাহাজে চল, হতভাগারা যদি আবার দল বেঁধে আক্রমণ করে, তা হলে মুশকিলে পড়তে হবে।"

চার

বিপদ

ইঞ্জিন মেরামত করবার জন্যে জাহাজখানা সেদিন সেইখানেই থেকে গেল।

সন্ধ্যার সময়ে জাহাজের 'ডেকে' বসে কাপ্তেন, ডেনহাম, শোভন, মালবিকা ও আরও কয়েকজন আরোহী আজকের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছিল।

ডেনহাম বললে, "ওরা কং কং করে অত চেঁচাচ্ছিল কেন?"

শোভন বললে, "হয়তো কং ওখানকার কোন দেবতার নাম।"

ডেনহাম বললে, "উঁচু মাচার ওপরে সেই মেয়েটির কথা মনে কর। আমি বেশ দেখেছি, তার মুখ মড়ার মত ফ্যাকাশে, আর পুরুতরা যখন মন্ত্র পড়ছিল, সে তখন ভয়ে থর থর করে কাঁপছিল!—আর গরিলাবেশে সেই লোকগুলোর কথাও মনে কর! নাচতে নাচতে হাত বাড়িয়ে তারা যেন সেই মেয়েটাকেই পেতে চাইছিল!"

মালবিকা বললে, "মিঃ ডেনহাম! আমার কিন্তু সেই মেয়েটিকে দেখে বলির পশুর কথাই মনে হচ্ছিল।"

শোভন বললে, "আর সেই অদ্ভুত প্রাচীর! আমি দেখেছি, প্রাচীরের সেই প্রকাণ্ড ফটকটা এদিক থেকেই বন্ধ করা আছে। তার মানে, ফটকের ওদিকে এমন কোন আতঙ্ক আছে, যাকে ওরা এদিকে ঢুকতে দিতে রাজি নয়। সে আতঙ্ক এমন ভয়ঙ্কর যে, দেড়শো ফুট উঁচু প্রাচীর তুলতে হয়েছে।

ওখানকার বাসিন্দারা সবাই প্রাচীরের এদিকে থাকে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, প্রাচীরের এদিকটাকেই ওরা নিরাপদ ঠাঁই বলে মনে করে।"

কাপ্তেন ঈঙ্গলহর্ন এতক্ষণ দুই চক্ষু মুদে পাইপ টানতে টানতে সমস্ত কথাবার্তা শুনছিলেন। এখন তিনি চোখ খুলে পাইপটা হাতে নিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, "আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, তবে আপনাদের আমি বিশ্বাস করতেও বলি না, কারণ অনেক দিন আগে আমি এমন একটা গল্প শুনেছিলুম, যা বিশ্বাস করবার মত নয়! গল্পটা শুনেছিলুম আমি এক বুড়ো নাবিকের মুখে। তাদেরও জাহাজ নাকি চীন-সমুদ্রে 'টাইফুনে' পথ হারিয়ে এক অজানা দ্বীপে গিয়ে পড়েছিল। সে দ্বীপের বাসিন্দারা অসভ্য। তাদের রাজা নাকি এক দানবের মত প্রকাণ্ড গরিলা। সে গরিলা এমন প্রকাণ্ড যে, কুকুর নিয়ে আমরা যেমন খেলা করি, বড় বড় হাতি নিয়ে তেমনই অবহেলায় সে খেলা করতে পারে! দ্বীপের বাসিন্দারা নাকি প্রতি বৎসর তাদের গরিলা-রাজাকে একটি করে বালিকা উপহার দেয়—সেই বালিকাকে তারা 'রাজার বউ' বলে।"

শোভন বললে, "শুনেছি, আদিম কালে যখন মানুষের জন্ম হয়নি, তখন পৃথিবীতে সত্তর-আশি ফুট উঁচু অতিকায় সব জীবজন্তু ছিল। পণ্ডিতরা মাটির ভিতর থেকে তাদের অনেক কঙ্কাল আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু সে সব জন্তু এখন পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং হাতি নিয়ে ছোট কুকুরের মতন খেলা করতে পারে, এমন প্রকাণ্ড গরিলার কথা বিশ্বাস করি কেমন করে?"

কাপ্তেন আবার তাঁর দুই চক্ষু মুদে ফেলে বললেন, "আপনাকেও বিশ্বাস করতে বলি না, আমি নিজেও বিশ্বাস করি না! আমি একটা গল্প শুনেছিলুম, আজ কেবল সেইটেই আপনাদের কাছে বললুম।"

ডেনহাম বলল, "ও দানব-গরিলাটার কথাটা নিশ্চয়ই আজগুবি কথা। কিন্তু পৃথিবীর কোন কোন জায়গায় এখনও যে আদিম কালের অতিকায় জীবজন্তু জ্যান্ত অবস্থায় বিচরণ করছে, মাঝে মাঝে তাও শোনা যায়, আর অনেক পণ্ডিত সেকথা বিশ্বাসও করেন।"

শোভন বললে, "আমারও কিন্তু ওইরকম অতিকায় জন্তুদের স্বচক্ষে দেখতে সাধ হয়।"

মালবিকা বললে, "আমারও।"

হঠাৎ দুই চোখ খুলে ধড়মড় করে উঠে বসে কাপ্তেন বললেন, "ডেনহাম! শুনছ?"

—"কি?"

—"হতভাগা বনমানুষগুলো আবার ঢাকঢোল বাজাতে শুরু করেছে।"

—"হুঁ। দেখ—দেখ; কাল দ্বীপ ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার, আজ কিন্তু ওখানে শত শত মশাল জ্বলছে। ব্যাপার কি, অত আলো জ্বেলে ওরা কি করছে?"

কৌতুক-হাস্য করে মালবিকা বললে, "বোধহয় গরিলা-রাজার বৌকে সাজানো হচ্ছে!"

শোভন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "মালবিকা, বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় আর থেকো না,—চল, ভেতরে চল!"

পরের দিন সকালে কাপ্তেন ঈঙ্গলহর্ন জাহাজের ডেকে পায়চারি করছেন, এমন সময়ে শোভন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসে বললে, "মিঃ ঈঙ্গলহর্ন! আমার ভগ্নীকে আপনি দেখেছেন? তাকে কেবিনের ভেতরে পাওয়া যাচ্ছে না!"

কাপ্তেন বললেন, "মিস সেন এদিকে তো আসেননি! বোধহয় জাহাজের অন্য কোথাও আছেন।"

শোভন আকুল স্বরে বললে, "আমি সমস্ত জাহাজ খুঁজে দেখেছি—আমার বোন কোথাও নেই।"

কাপ্তেন হঠাৎ চকিত দৃষ্টিতে শোভনের হাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মিঃ সেন! আপনার হাতে ওটা কি?"

শোভন বললে, "আমার বোন যে কেবিনে ছিল, তারই দরজার কাছে আমি এই বর্শার ফলাটা কুড়িয়ে পেয়েছি।"

বর্শার ফলাটা হাতে করে কাপ্তেন বললেন, "দ্বীপের যোদ্ধাদেরও বর্শার ফলা এইরকম। মিঃ সেন, চলুন—চলুন, জাহাজটা আমরা আর একবার খুঁজে আসি। মিস সেনকে পাওয়া যাচ্ছে না—তাও কি হতে পারে?"

কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মালবিকার সন্ধান মিলল না!

কাপ্তেন ঈগলহর্ন হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, "কি! আমার জাহাজ থেকে মহিলা চুরি! এর পরে সভ্য সমাজে আমি মুখ দেখাব কেমন করে? ডেনহাম—ডেনহাম। বোট নামাও,—এখনই আমরা দ্বীপে যাব। সবাই অস্ত্র ধর! বন্দুক, রিভলবার, বোমা, ডিনামাইট—সব নিয়ে চল। চীন সমুদ্রের চীনে বোম্বেটেদের ভয়ে সবরকম অস্ত্রই আমি জাহাজে রেখেছি। সে সবই নিয়ে বোটে ওঠ—এক মুহূর্তও দেরি নয়। এই বনমানুষের দেশ আজ আমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শ্মশান করে দিয়ে যাব।"

পাঁচ

কঙ

রাতের নিবিড় অন্ধকারে অসভ্যদের ছিপ তীরের মত দ্বীপের দিকে ছুটে চলল।

তখনও তারা তাকে সজোরে চেপে আছে, মালবিকা অনেক চেষ্টা করেও সে সব কঠিন হাতের নিষ্ঠুর বাঁধন একটুও আলগা করতে পারলে না! তার মুখও বাঁধা, চিৎকার করাও অসম্ভব!

সে কি দুঃস্বপ্ন দেখছে? এও কি সম্ভব—সে কি সত্য সত্যই অসভ্যদের হাতে বন্দিনী? এত বড় বিপদ যে তার কল্পনাতেও আসে না!

হঠাৎ একটা ধাক্কা লেগে নৌকাখানা থেমে গেল—সঙ্গে সঙ্গে যারা তাকে চেপে ধরেছিল, তারা হাতের বাঁধন খুলে দিলে।

কিন্তু তারপরেই অন্ধকারে কে তাকে পিঠের উপরে তুলে নিলে! অনুভবে সে বুঝলে, তাকে নিয়ে লোকটা নৌকা থেকে ডাঙায় লাফিয়ে পড়ল!

অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু শব্দ শুনে সে বুঝতে পারলে, তার আশেপাশে অনেক লোক আছে। এরা তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?...আর সে ভাবতে পারলে না, তার মাথা ঘুরতে লাগল, সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

মালবিকার যখন জ্ঞান হল, তখন সে দেখলে, তার চারদিকে আলোয় আলো! সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল!

এ যে সকালের সেই দৃশ্যটাই আবার তার চোখের সামনে জেগে উঠল। সেই দুই বেদীর উপরে

রাজা আর পুরুত বসে আছে, চারদিকে সেই জনতা, গরিলা বেশে নর্তকদের নৃত্য, মন্ত্রপাঠ, ঢাকঢোলের আওয়াজ! কেবল সকালে মশাল ছিল না, এখন শত শত মশাল জ্বলছে।

তার দিকে করুণ মমতা-ভরা চোখে একটি কালো মেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, মালবিকা তাকেও চিনতে পারলে! এই মেয়েটি সকালে ফুলের মুকুট ফুলের গয়না পরে মাচার উপরে বসে ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল! এখন তার আর সে মুকুট ও গয়না নেই, এখন তার সাজগোজ এখানকার অন্য অন্য মেয়েদেরই মত!

একটু পরেই তার কারণও বুঝতে পারলে। তাকে উঠে বসতে দেখেই জনকয় লোক এসে তার মাথায় ফুলের মুকুট, গলায় ও হাতে ফুলের গয়না পরিয়ে দিলে।

পুরুত চিৎকার করে উঠল—"হেডো মেডো গেডো!"

অমনি কয়েকজন লোক এসে মালবিকাকে ধরে শূন্যে তুলে সেই উঁচু মাচার উপরে গিয়ে উঠল। তারপর তাকে মাচার উপরে বসিয়ে দিয়ে নিচে নেমে গেল। মাচার সিঁড়ির ধাপে ধাপে অন্যান্য পুরোহিতেরা দাঁড়িয়ে উচ্চ স্বরে মন্ত্রপাঠ শুরু করে দিলে—গরিলাবেশে বারজন লোক ঢাকের তালে তালে তাণ্ডব নাচ নাচতে লাগল!...আজ সকালেও সে এইরকম দৃশ্য দেখে গিয়েছিল!

মালবিকার এখন আর কোন ভয় হচ্ছে না—তার মন এখন দুঃখ-ভয়-ভাবনার বাইরে গিয়ে পড়েছে, মন্ত্রমুগ্ধ ও স্বপ্নাচ্ছন্ন জীবের মতন মাচার উপরে সে বসে রইল—সামনে মূর্তিমান যমকে দেখলেও বোধহয় এখন সে চমকে উঠবে না!

সেইখানে বসে বসে সে নির্বিকারভাবে দেখতে লাগল, খানিক তফাতে একদল লোক গিয়ে উচ্চ প্রাচীরের প্রকাণ্ড ফটকটা খুলে ফেললে—সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় কাঁসর ও ঝাঁঝের আওয়াজে আকাশবাতাস পরিপূর্ণ হয়ে উঠল—ঢং, ঢং, ঢং, ঢং, ঢং।

কোন পথ দিয়ে নিচেকার সমস্ত জনতা হৈ-চৈ তুলে সেই দেড়শ ফুট উঁচু পাঁচিলের উপরে গিয়ে উঠল—প্রত্যেকের হাতে এক একটা মশাল—চারিদিকের দৃশ্য দিনের বেলার মত স্পষ্ট!

রাজা হঠাৎ চেঁচিয়ে বললেন—"কং! কং! কং! টাস্কো!"

অমনি কয়েকজন যোদ্ধা এসে আবার মালবিকাকে মাচা থেকে তুলে নামিয়ে নিয়ে গেল এবং তারপর সেই প্রকাণ্ড ফটকের ভিতরে প্রবেশ করল।

ফটকের ভিতর ঢুকলে প্রথমেই নজরে পড়ে ছোটখাট একটা প্রান্তর,—তারপরেই যেদিকে তাকানো যায়—নিবিড় অরণ্য ও ভয়াবহ অন্ধকার এবং তারই ভিতর থেকে আকাশের দিকে উঠে গেছে সেই মড়ার মাথার খুলির মত অদ্ভুত পাহাড়ের চূড়াটা।

প্রাচীরের উপর থেকে বিপুল জনতা সমস্বরে মন্ত্রপাঠ করছে!—ঢাক বাজছে দুম দুম দুম দুম,—কাঁসর-ঝাঁঝর গর্জন করছে ঘং ঘং ঘং ঘং!

প্রান্তরের উপরেও একটা উঁচু পাথরের বেদী—তার দুধারে বড় বড় থাম। যোদ্ধারা মালবিকাকে নিয়ে সেই বেদীর উপর গিয়ে উঠল এবং দুই থামের মাঝখানে তাকে দাঁড় করিয়ে থামের সঙ্গে তার দুই হাত বেঁধে দিলে। তারপর ভূতের ভয়ে লোকে যেমন করে পালায়, তেমনিভাবে সবাই আবার প্রাচীরের ওপারে পলায়ন করলে এবং সেইসঙ্গে সেই সুবৃহৎ ফটকটাও তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে গেল।

পাহাড় ও অরণ্যের ভিতর থেকে একটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও অপার্থিব মেঘগর্জনের মতন গম্ভীর আওয়াজ জেগে উঠল!

প্রাচীরের উপরে হাজার হাজার মশাল নাচিয়ে হাজার হাজার কণ্ঠে চিৎকার উঠল— "কং! কং! কং! কং! কং! কং!"

মালবিকার প্রায়-মূর্ছিত দেহ তখন এলিয়ে পড়েছে—নির্বাক ভাবে, বিস্ফারিত নেত্রে সে দেখলে, জঙ্গলের গর্ভ থেকে অন্ধকারের চেয়ে কালো একটা ভয়ঙ্কর ছায়াদানব দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে। কী বৃহৎ তার দেহ! যেন একটা চলন্ত পর্বত!

দানবটা পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে প্রাচীরের উপরের জনতার দিকে চেয়ে কয়েকবার ক্রুদ্ধ হুঙ্কার দান করলে! তারপর নিচু ও হেঁট হয়ে বেদীর দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

তার চোখ দুটো ফুটবলের মতন বড় এবং তাদের ভিতর থেকে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। তার এক একটা দাঁত হাতির দাঁতের মতন লম্বা। তার এক একখানা বাহু বটগাছের গুঁড়ির মতন মোটা। সেই বিভীষণ মূর্তি দেখে মালবিকা আর পারলে না—পরিত্রাহি চিৎকার করতে করতে একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেল।

এই তা হলে কঙ,—রাজা কঙ! এখানকার সমস্ত লোক এই বিরাট গরিলারাজার প্রজা! মালবিকা হবে আজ এই গরিলাদানবের মানুষ-বউ!

কঙ যেন মালবিকাকে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হল। বৎসরে বৎসরে সে অনেক বধূ উপহার পেয়েছে, কিন্তু তাদের গায়ের রং তো এই নূতন বউয়ের মতন ধবধবে সাদা নয়!

কঙ হাত বাড়িয়ে পট পট করে দড়ি ছিঁড়ে মালবিকাকে তুলে নিলে। মানুষের হাতে চড়ুইপাখিকে যেমন দেখায়, কঙয়ের হাতের মুঠোর ভিতরে মালবিকাকেও দেখাতে লাগল তেমনই ছোট্টটি।

হাতের মুঠোয় মালবিকাকে নিয়ে কঙ আবার পর্বত ও অরণ্যের দিকে অগ্রসর হল—তখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে।

এমন সময়ে প্রাচীরের ওপার থেকে "গুড়ুম গুড়ুম" করে বন্দুকের আওয়াজ ও বহু কণ্ঠের আর্তনাদ জেগে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সুবৃহৎ ফটক আবার খুলে গেল।

কঙ কিন্তু একবারও পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে না, মস্ত এক লাফ মেরে পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল!

ছয়
দানব

সুবৃহৎ ফটকের ভিতর দিয়ে তীরের মতন বেগে প্রথমে শোভন, তারপর কাপ্তেনসাহেব, ডেনহাম ও নাবিকেরা সেই প্রান্তরের উপরে এসে দাঁড়াল।

তাদের বন্দুকের গুলি খেয়ে প্রাচীরের উপর থেকে ততক্ষণে মশালধারী অসভ্যগুলো কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে!

শোভন সর্বপ্রথমে এসেছিল বলে কেবল সেই-ই কঙয়ের বিরাট দেহটা দেখতে পেয়েছিল—মাত্র এক পলকের জন্যে।

শোভন চেঁচিয়ে বলে উঠল, "দানবটা ওই পথে গেছে। আমি তাকে দেখেছি। এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করলে আমার বোনকে আর পাওয়া যাবে না। তোমরা কে কে আমার সঙ্গে যাবে, এস।"

কাপ্তেন বললেন, "এক মিনিট অপেক্ষা করুন মিঃ সেন!...ডেনহাম, তুমি বিশ জন লোক নিয়ে মিঃ সেনের সঙ্গে যাও। বাকি লোকদের নিয়ে জাহাজ আর অসভ্যদের উপরে পাহারা দেবার জন্যে আমি এখানে থাকি। সকলে এইটুকু মনে রেখ ঃ মিস সেনকে উদ্ধার করা আমাদের কর্তব্য—তাঁকে উদ্ধার করা চাই-ই।"

সকলে একসঙ্গে বলে উঠল, "হ্যাঁ, তাঁকে উদ্ধার করবার জন্য আমরা প্রাণ দিতেও ভয় পাব না।"

কাপ্তেন বললেন, "ভগবান তোমাদের সহায় হোন!"

শোভন, ডেনহাম ও বিশজন নাবিক সেই দুর্গম অরণ্য ও দুরারোহ পর্বতের দিকে ঝড়ের মত ছুটে চলল!

পাহাড়ের যেখান থেকে সেই দানবগরিলার মূর্তিটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, সেইখানে উপস্থিত হয়ে দেখা গেল, পাহাড়ের গা সেখানে ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গিয়েছে—যেন জঙ্গলময় পাতালের অন্ধকারের মধ্যে।

ডেনহাম বললে, "সকলে একসার হয়ে চল—একজনের পিছনে আর একজন। প্রত্যেকে তার আগের লোকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে অগ্রসর হও!"

একে পাহাড়ের ঢালু গা, তার উপরে জঙ্গল ক্রমেই ঘন হয়ে উঠছে।

ডেনহাম বললে, "মিঃ সেন, জাহাজে চাকরি নিয়ে আমি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছি, সব দেশের গাছপালাই আমি চিনি। কিন্তু এখানকার জঙ্গলের একটা গাছও আমি চিনতে পারছি না। এ সব গাছপালা দেখলে মনে হয়, এরা যেন এ পৃথিবীর নয়!"

শোভন বললে, "কেতাবে আমি সেকেলে পৃথিবীর গাছপালার ছবি দেখেছি। এখানকার গাছপালা দেখে সেই ছবির কথা আমার স্মরণ হচ্ছে। এখানকার সঙ্গে বোধহয় আধুনিক জগতের কোন সম্পর্ক নেই—হয়ত এখানকার জীবজন্তুরাও সেকেলে জীবজন্তুদের মতন ভয়ঙ্কর আর কিম্ভুতকিমাকার!"

—"আপনি তো বলছেন, সেই গরিলা দানবটাকে আপনি দেখতে পেয়েছেন। মাথায় সে কত উঁচু হবে?"

শোভন বললে, "আমি অনেক দূর থেকে চকিতের মত তাকে একবার মাত্র দেখেছি! ঠিক করে কিছু বলতে পারব না, তবে আমার মনে হল, মাটি থেকে তার মাথা বোধহয় পঞ্চাশ-ষাট ফুটের চেয়ে কম উঁচু হবে না।"

ডেনহাম চমকে উঠে বললে, "কি সর্বনাশ! বলেন কি?"

পাহাড়ের ঢালু গা একটা উপত্যকার ভিতরে এসে শেষ হয়েছে। উপত্যকার ভিতর দিয়ে একটা পাহাড়ে নদী কলকল স্বরে বয়ে যাচ্ছে এবং নদীর ওপারে পাহাড়ের গা আবার উপর দিকে উঠে গিয়েছে। আরও একটা লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, নদীর ওপারে যে জঙ্গল রয়েছে তা আরও ঘন এবং দুর্ভেদ্য। সেখানকার এক একটা গাছই একশ-দেড়শ ফুট বা তার চেয়েও বেশি উঁচু! সেই সব গাছের উপরে কত রকমের পরগাছা ভিড় করে আছে এবং অসংখ্য লতাপাতার জালে প্রত্যেক গাছের সঙ্গে প্রত্যেক গাছ বাঁধা। এখন আকাশে সূর্যালোকের জোয়ার বইছে, কিন্তু সেই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে কোন কালেই বোধহয় সূর্যালোক প্রবেশ করবার পথ পায়নি!

শোভন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, "দেখুন মিঃ ডেনহাম! নদীর তীরে ভিজে মাটির দিকে চেয়ে দেখুন!"

ডেনহাম ও নাবিকরা আশ্চর্য হয়ে দেখলে, ভিজে মাটির উপরে সারি সারি পায়ের দাগ রয়েছে! সে সব পায়ের দাগ মানুষের পায়ের দাগের মতন দেখতে বটে, কিন্তু মানুষের পায়ের দাগের চেয়ে তা অনেক—অনেক গুণ বড়, কারণ তার প্রত্যেকটি পদচিহ্ন পাঁচ-ছয় ফুটের চেয়ে কম লম্বা হবে না!

শোভন বললে, "এতক্ষণে সবাই বুঝতে পারলেন তো, আমরা কি ভীষণ দানবের পিছু নিয়েছি! সেই দানব এইখান দিয়ে নদী পার হয়ে গেছে! নদীটা ছোট, জলও বোধহয় বেশি নেই,—আসুন, আমরাও পার হয়ে যাই।"

বাস্তবিক, নদীতে এক কোমরের বেশি জল হলো না—সকলেই একে একে নিরাপদে পার হয়ে গেল।

ওপারে গিয়ে পায়ের দাগ দেখে বোঝা গেল, সেই দানবটা পাহাড়ের গা বয়ে আর উপরে ওঠেনি, ডানদিকে ফিরে নদীর ধার ধরেই চলে গেছে। সকলে সেই পথেই অগ্রসর হল। কিন্তু খানিক দূর গিয়ে পায়ের দাগও আর পাওয়া গেল না।

ডেনহাম বললে, "এই যে, জঙ্গল সরিয়ে এখান দিয়ে মস্ত বড় কোন জানোয়ার ভিতরে ঢুকেছে। এই পথেই এস।"

আরও খানিকটা এগিয়েই ডেনহাম থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল!

শোভন বললে, "ব্যাপার কি?"

ডেনহাম বললে, "সামনের দিকে চেয়ে দেখুন!"

জঙ্গলের ভিতরে ছোট্ট একটা জমি। সেখানে এক ভীষণাকার জীব বিচরণ করছে! তার দেহটা চার-চারটে হাতির চেয়ে বড়, ল্যাজটা কুমিরের মতন দেখতে—কিন্তু লম্বায় তা চব্বিশ-পঁচিশ ফুট হবে এবং তার উপরে শত শত তীক্ষ্ণ গজাল! তার গলদেশও দীর্ঘতায় চব্বিশ পঁচিশ ফুটের চেয়ে কম হবে না এবং মুখটা দেখতে অজগর সাপের মত। এই হস্তী কুমির-অজগর আকৃতির কিম্ভুতকিমাকার অতিকায় দানবটা আপন মনে পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে এবং তার পদভরে পৃথিবীর বুক থর থর করে কেঁপে উঠছে।

হঠাৎ সেও শোভনদের দূর থেকে দেখে ফেললে এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন বিকট ও কর্কশ স্বরে গর্জন করে উঠল যে, আকাশ বাতাস পর্যন্ত যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল!

ডেনহাম চেঁচিয়ে বললে, "সবাই সাবধান! ও আমাদের দেখতে পেয়েছে। ও আমাদের দিকে আসছে!"

ডেনহাম ও শোভন একসঙ্গে বন্দুক ছুড়লে, গুলি তার গায়েও লাগল, কিন্তু তার অত বড় দেহের ভিতরে দুটো ক্ষুদে ক্ষুদে গুলি ঢুকে কিছুই করতে পারলে না, সে এক এক লম্বা লাফ মেরে তেমনই বিকট স্বরে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে শোভনদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল!

ডেনহাম আবার গলা তুলে বললে, "সবাই মাটির উপর শুয়ে পড়! আমি বোমা ছুড়ছি!"

বোমা ফাটবার সময়ে কাছে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে তারও আহত হওয়ার সম্ভাবনা। সবাই শুয়ে পড়ল—সেই হিংস্র দানবটার দিকে সজোরে বোমা ছুড়ে ডেনহামও ধরণীতলকে আশ্রয় করলে!

গড়াম করে কান ফাটানো শব্দের সঙ্গে বোমা ফেটে গেল—চারিদিকে ধুলো ধোঁয়া কাঠ-পাথর মাংস ও হাড়ের টুকরো ঠিকরে পড়তে লাগল এবং সকলেই শুনতে পেলে বিরাট এক দেহ মাটির উপরে এক প্রচণ্ড আছাড় খেলে।

সকলে আবার উঠে দাঁড়াল। প্রায় ডেনহামের পায়ের কাছে এসে সেই জীবটার অজগরের মতন

ভয়ানক মুখটা ছটফট করছে এবং তার দেহটা স্থির ও উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে ছোটখাট একটা পাহাড়ের মত!

আরো গোটাকয়েক গুলিবৃষ্টি করবার পর তার শেষ প্রাণটুকুও বেরিয়ে গেল।

শোভন বললে, "কি ভয়ানক! বোমা ছোড়বার পরেও এই জীবটা অন্তত পঞ্চাশ ফুট জমি পার হয়ে এসেছে!"

ডেনহাম আনন্দ ও গর্বের স্বরে বললে, "কিন্তু এই রাক্ষসকে আমি কাত করেছি। একি যে-সে বোমা!"

শোভন বললে, "আমি যা ভেবেছিলুম, তাই। যে কোন কারণেই হোক, এই দ্বীপে সেকেলে পৃথিবীর রাক্ষুসে জীবগুলো এখনও বেঁচে আছে!...কিন্তু এখন আমাদের এসব কথা ভাববার সময় নেই। এবার কোনদিকে যাব?"

একজন নাবিক আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, "এই তো আমাদের পথ। দেখছেন না, জঙ্গল ভেঙে এখান দিয়ে যেন একটা পাগলা হাতি চলে গিয়েছে!"

নাবিক ঠিকই বলেছে। সকলে আবার সেই পথে পা চালিয়ে দিলে। বেশিদূর যেতে হল না! আবার সুমুখে এক মস্ত বাধা!

জঙ্গলের একপাশে নদীর জল প্রায় একটা হ্রদের মত জলাশয় সৃষ্টি করেছে। গরিলা দানবের পায়ের দাগ সেই জলের ভিতরে নেমে গিয়েছে; —দেখলে বুঝতে দেরি লাগে না যে, সে হ্রদ পার হয়ে ওপারে গিয়ে উঠেছে।

হ্রদের গভীরতা পরীক্ষা করে সকলেই বুঝলে এবারে আর পায়ে হেঁটে ওপারে যাওয়া চলবে না। এখন উপায়?

ডেনহাম দমবার পাত্র নয়। সে বললে, "এস, সবাই মিলে গাছ কেটে ভেলা তৈরি করি। আমরা ভেলায় চড়ে হ্রদ পার হয়।"

তা ছাড়া উপায়ও ছিল না। সবাই গাছ কাটতে আরম্ভ করলে।

শোভন বললে, "আমার ভগ্নীর উদ্ধারের জন্যে আমাকে যদি পৃথিবীর এদিক থেকে ওদিকে যেতে হয়, যদি মরণের সম্মুখীনও হতে হয়, তাতেও আমার ভাববার কিছু থাকবে না। এইমাত্র আমরা যে অদ্ভুত জীবের কবলে গিয়ে পড়েছিলুম, এই দ্বীপে হয়তো তার চেয়েও সব ভয়ঙ্কর জীবজন্তু আছে। হয়ত তাদের আক্রমণে আমাদের অনেকেরই প্রাণ যাবে। আমার ভগ্নীর জন্যে আপনারা নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করবেন কিনা, এইবেলা সেই কথাটা ভেবে দেখুন। আমি নিশ্চয়ই মরণের দুয়ার পর্যন্ত এগিয়ে যাব, কিন্তু আপনারা ইচ্ছা করলে এখনও ফিরে যেতে পারেন।"

সকলে একস্বরে বলে উঠল, "আমরা কাপুরুষ নই—মরতে ভয় পাই না।"

সাত

ডাইনোসর

কতকগুলো মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি কেটে শক্ত লতার বাঁধনে তাদের একসঙ্গে বেঁধে ভেলা তৈরি করা হল। লম্বা লম্বা গাছের ডালের সাহায্যে ভেলা চালাবারও ব্যবস্থা হল।

বাইশজন লোক সেই ভেলার পক্ষে গুরুভার হলেও ভেলা সে ভার কোনরকমে সহ্য করলে। তারপর ভেলাকে অন্য তীরের দিকে সাবধানে চালনা করা হল।

খানিক দূরে গিয়ে গাছের লম্বা ডাল যতটা পারা যায় জলে ডুবিয়েও থই পাওয়া গেল না।

ডেনহাম বললে, "আচ্ছা, ডালগুলোকে দাঁড়ের মত ব্যবহার কর। অবশ্য, আমরা আর ততটা তাড়াতাড়ি যেতে পারব না, কিন্তু এ ছাড়া উপায়ও নেই!"

হঠাৎ সমস্ত ভেলাটা একপাশে কাত হয়ে পড়ল—যেন জলের ভিতরে কিসের সঙ্গে তার ধাক্কা লেগেছে।

সেই সঙ্গেই একসঙ্গে যেন পঞ্চাশটা ষাঁড় ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল!

একজন নাবিক সভয়ে বললে, "হে ভগবান! ও আবার কি?"

জলের মধ্যে থেকে ভেলার ঠিক পাশেই প্রকাণ্ড একখানা বীভৎস মুখ এবং বিরাট একটা দেহের কতক অংশ জেগে উঠল। সে মুখখানা এত বড় যে, এক গ্রাসে পাঁচ-ছয়জন মানুষকে গিলে ফেলতে পারে!

শোভন বলে উঠল, "ডাইনোসর! ডাইনোসর! ছবিতে আমি এ মূর্তি দেখেছি।"

ভীষণ আতঙ্কে সকলে এ ওর ঘাড়ে গিয়ে পড়ল! ভেলা উল্টে যায় আর কি!

হঠাৎ সেই ভয়াবহ ডাইনোসর জলের ভিতরে আবার ডুব মারলে। নাবিকরা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেললে; কিন্তু শোভন ও ডেনহাম দেখলে জলের ভিতর দিয়ে মস্ত একটা ছায়া ভেলার দিকে এগিয়ে আসছে।

ডেনহাম তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "ভেলা সামলাও—ভেলা সামলাও! কিন্তু তার মুখের কথা ফুরোতে না ফুরোতে সেই ক্রুদ্ধ জীবটা ভেলার তলায় বিষম এক ঢু মারলে। পর মুহূর্তে ভেলাখানা টুকরো টুকরো হয়ে শূন্যে ঠিক করে উঠে আবার জলের ভেতরে গিয়ে পড়ল।

শোভন, ডেনহাম ও অন্যান্য নাবিকরা পাগলের মত ওপারের দিকে সাঁতরে চলল। ভাগ্যে তীর আর বেশি দূরে ছিল না, সবাই কোনরকমে ডাঙায় গিয়েই উঠে পড়ল—কেবল একজন ছাড়া। ডাঙায় উঠে শোভন ও ডেনহাম তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে দেখলে, ডাইনোসরটা আবার জলের উপর মাথা তুলছে এবং তার চোয়ালের একপাশ দিয়ে এক হতভাগ্যের পা দুটো বেরিয়ে তখনও ছটফট করছে।

ডেনহাম শিউরে বলে উঠল, "বোমা! একটা বোমা দাও।"

একজন নাবিক বললে, "বোমা জলে তলিয়ে গেছে।"

—"বন্দুক, বন্দুক, একটা বন্দুক!"

—"তাও জলের ভেতরে।"

—"মূর্খ! তোমার নিজের বন্দুকটাও রক্ষা করতে পরোনি?"

—"আপনিও তো নিজের বন্দুকটা জলে ফেলে এসেছেন!"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ—যাক গে, আর কিছু বলতে চাই না। কিন্তু চোখের সামনে ও বেচারার প্রাণ গেল, আর আমরা কিছু করতে পারলুম না।"

শোভন বললে, "আর এখানে থাকলে এইবার আমাদেরও প্রাণ যাবে! ঐ দেখ ডাইনোসরটা ডাঙার দিকেই আসছে। জলেস্থলে ওর অবাধ গতি।"

সবাই আবার প্রাণপণে ছুটল—হ্রদের ধার ছেড়ে, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, ঢালু পাহাড়ের গা বয়ে!

পিছনে আর কোন শব্দ নেই শুনে সবাই আবার দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

কিন্তু ভগবান সেদিন তাদের কপালে বিশ্রাম লেখেননি। এক মিনিট জিরুতে না জিরুতে নিচের দিকে জঙ্গল ভাঙার শব্দ হল।

ডেনহাম আঁতকে উঠে বললে, "আবার সেই ডাইনোসর আসছে নাকি?"

শোভন বললে, "চুপ! নিচের ওইদিকটায় চেয়ে দেখ!"

সেই গরিলা-দানব—রাজা কঙ! তার ডানহাতের মুঠোয় তখনও মালবিকা অজ্ঞান হয়ে আছে।

কী বৃহৎ তার দেহ—বড় বড় গাছের উপরেও তার মাথা জেগে আছে। অতি যত্নে মালবিকাকে নিয়ে ঢালু পাহাড়ের গা বয়ে সে উপরে উঠে আসছে এবং মাঝে মাঝে মালবিকার দেহের দিকে যেন সস্নেহেই তাকিয়ে দেখছে।

আচম্বিতে পাশের জঙ্গল ভেদ করে আরও দুটো বেয়াড়া, ভীষণ-দর্শন জানোয়ার কঙয়ের সামনে এসে পথ জুড়ে দাঁড়াল। দেখতে কতকটা গণ্ডারের মত, কিন্তু মাথায় তারা প্রায় হাতির সমান উঁচু এবং তাদের প্রত্যেকের মাথার উপরে তিন-তিনটে করে ধারাল শৃঙ্গ।

ডেনহাম চুপি চুপি সভয়ে বললে, "ও আবার কি সৃষ্টিছাড়া জীব?"

শোভন বললে "ট্রাইসেরোটপ! ওরাও সেকেলে পৃথিবীর জীব।"

ট্রাইসেরোটপদের দেখেই কঙ যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল! সে তখনই একটা উঁচু ঢিপির উপরে মালবিকার দেহকে নিরাপদ করবার জন্যে তুলে রাখলে এবং তারপর প্রকাণ্ড একখানা পাথর তুলে গর্জে উঠে সজোরে একটা ট্রাইসেরোটপের দিকে নিক্ষেপ করলে। কঙয়ের হাতের জোরে ও পাথরের ভারে ট্রাইসেরোটপের একটা শৃঙ্গ তখনই ভেঙে গেল!

ডেনহাম সবিস্ময়ে বললে, "ও দানবের দেহের শক্তি স্বচক্ষে দেখেও যে বিশ্বাস হচ্ছে না। ও পাথর ছুড়লে না, একটা পাহাড় তুলে ছুড়লে? অতবড় পাথর কোন জ্যান্ত জীব তুলতে পারে?"

এদিকে সঙ্গীর দুর্দশা দেখে দ্বিতীয় ট্রাইসেরোটপটা ভয়ে পিছিয়ে আসতে লাগল। প্রথমটাও পালাই পালাই করছে, কিন্তু তার আগেই আর একখানা আরও বড় প্রস্তর তুলে কঙ আবার তার দিকে সজোরে ছুড়ল—সঙ্গে সঙ্গে সেও মাটির উপর লুটিয়ে পড়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে রইল! বিজয়গৌরবে ফুলে উঠে কঙ সগর্বে দুই হাতে ঘন ঘন নিজের বুক চাপড়াতে লাগল!

শোভন বললে, "আর এখানে নয়। ঐ দেখুন, দ্বিতীয় ট্রাইসেরোটপটা এদিকেই ছুটে আসছে। ওর আগেই আমাদের পালাতে হবে।"

সকলে দ্রুতপদে পলায়ন করলে! কিন্তু ট্রাইসেরোটপটা তাদের চেয়েও বেশি তাড়াতাড়ি ছুটে আসছিল— সে তাদের দেখতে পেলে এবং এরা আর একদল নূতন শত্রু ভেবে ভীষণ আক্রোশে তাদের আক্রমণ করলে।

সকলের পিছনে ছিল যে বেচারা, সে ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা গাছের উপরে চড়তে লাগল। কিন্তু ট্রাইসেরোটপের মাথার এক আঘাতে গাছটা মড় মড় করে ভেঙে পড়ল।

তারপরেই বুক-ফাটা এক আর্তনাদ এবং তারপরেই ট্রাইসেরোটপের নিষ্ঠুর শৃঙ্গ আর একজন অসহায় মানুষের কণ্ঠ চিরকালের জন্যে নীরব করে দিলে।

আট

মানুষ-পোকা

সকলে একান্ত শ্রান্তভাবে টলতে টলতে একটা বড় ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসে পড়ল।

মানুষের শরীরে আর কত সয়? সাহস ও বীরত্বেরও একটা সীমা আছে! এই খানিক আগেই যারা বলেছিল, 'আমরা মরতে ভয় পাই না' এখন তারাই আর সে কথা বলতে পারবে কিনা সন্দেহ। ভেলা ডোবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমস্ত আশা ফুরিয়ে গিয়েছে। তারা এতক্ষণে বুঝলে, যেখানে পদে পদে এমন সব মারাত্মক বিপদ, সেখানে নিরস্ত্র ক্ষুদ্র মানুষ কোন কাজই করতে পারবে না।

তখনো হাল ছাড়েনি খালি শোভন ও ডেনহাম।

ডেনহাম বললে, "মিঃ সেন, আমার এক প্রস্তাব আছে। আমার বিশ্বাস, খালিহাতে ওই দানবের কাছ থেকে মিস সেনকে আমরা কখনোই উদ্ধার করতে পারব না। তার চেয়ে আর এক কাজ করলে কেমন হয়?"

—"কি কাজ?"

—"আমাদের একজন এখানে থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে ওই গরিলাদানবের গতিবিধির উপরে দৃষ্টি রাখুক। দলের বাকি লোকেরা কোনরকমে ফিরে গিয়ে আবার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসুক।"

—"এ পরামর্শ মন্দ নয়। আপনারা ফিরে যান, আমি এখানে থেকে ওই দানবের উপরে পাহারা দিই।"

—"কিন্তু ওই দেখুন মিঃ সেন, দানবটা আবার এই দিকেই আসছে। ও কি আমাদের দেখতে পেয়েছে?"

মালবিকার অচেতন দেহ সেইভাবে করতলে নিয়ে কঙ আবার এই দিকেই আসছে বটে! কিন্তু তার ভাব দেখে মনে হয় না, সে সন্দেহজনক কিছু দেখছে। কারণ, সে বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে।

খানিকটা এগিয়ে এসেই সে আবার থেমে দাঁড়াল। একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে দেখে নিলে। তারপর পাহাড়ের গা বয়ে একদিকে নামতে লাগল।

অত্যন্ত সন্তর্পণে সবাই উপর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখলে, অল্প নিচেই আর একটা পাহাড়ে নদী বয়ে যাচ্ছে। সেই নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত রয়েছে সুদীর্ঘ একটা গাছের গুঁড়ি। হয়তো কবে কোন ঝড়ে পড়ে গিয়ে গাছটা এই স্বাভাবিক সেতুর সৃষ্টি করেছে।

কঙ সেই সেতু পার হয়ে ওপারের জঙ্গলের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শোভন বললে, "আমিও সেতু পার হয়ে ওর পিছনে পিছনে চললুম। আপনারা ফিরে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসুন। আমি আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করব!" এই বলে সেও পাহাড়ের গা বয়ে সেতুর দিকে নামতে লাগল।

নামতে নামতে সে দেখলে, সেতুর প্রায় পঞ্চাশ ফুট নিচে, নদীর তীরে তীরে শত শত অজানা ও ভয়ানক জীব বিচরণ করছে। কোনটা মাকড়সার মত দেখতে, কিন্তু আকারে বড় জাতের কচ্ছপকেও হার মানায়। কোন কোন জীব অনেকগুলো শুঁড় নেড়ে বেড়াচ্ছে, অক্টোপাসের মত। কোন কোনটা গিরিগিটির মত—কিন্তু কুমিরের মত মস্ত গিরগিটি। তারা সবাই পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করছে! শোভন শিউরে উঠে ভাবলে, নরকও বোধ করি এই দ্বীপের চেয়ে ভয়ানক নয়।

এদিকে ডেনহামও তার দলবল নিয়ে উঠে দাঁড়াল। অস্ত্র হাতে নিয়েও মানুষ এখানে নিরাপদ নয়, এখন আবার সকলকে নিরস্ত্র অবস্থায় এই সুদীর্ঘ পথ পার হতে হবে। হয়ত ফেরবার পথে আরও কত লোকের প্রাণ নষ্ট হবে। সেই বিষম হ্রদ! তার জলের তলা দিয়ে ক্ষুধার্ত সব কালো ছায়া আনাগোনা করে—মানুষ সেখানে অসহায় কীট মাত্র, তার জীবনের কোন মূল্যই নেই!

সকলে অত্যন্ত নাচারের মত অগ্রসর হতে লাগল—সকলেই বোবা ও বিমর্ষ, জাহাজে ফিরে যাবার জন্যেও কারুর মনে কিছুমাত্র উৎসাহ নেই!

কিন্তু সর্বনাশ! সেই শয়তান ট্রাইসেরোটপ তখনও যে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে রাগে ঘোঁত ঘোঁত করছে! সামনে এতগুলো মানুষকে দেখেই প্রবল পরাক্রমে সে আবার তিনটে শিং নেড়ে তেড়ে এল।

ডেনহাম বললে, "নদীর ধারে—নদীর ধারে চল! সাঁকোর মত সেই গাছের ওপরে।

সকলে ঊর্ধ্বশ্বাসে সেই পাহাড়ে নদীর তীরে,—সাঁকোর সামনে এসে দাঁড়াল।

শোভন ততক্ষণে ওপারে গিয়ে হাজির হয়েছে। পিছনে গোলমাল শুনে ফিরে দাঁড়িয়েই দেখলে, তার সঙ্গীরাও সাঁকোর উপরে ছুটে আসছে এবং তাদের পিছনে পিছনে আসছে মূর্তিমান বিভীষিকার মত সেই ট্রাইসেরোটপ! ব্যাপারটা বুঝতে তার দেরি লাগল না।

এদিকে উপর থেকে কার এক বিপুল ছায়া তার গায়ের উপর এসে পড়ল।

মাথা তুলতেই নজরে পড়ল, কঙয়ের প্রচণ্ড মুখ পাহাড়ের পাশ থেকে উঁকি মারছে! পর মুহূর্তেই কঙয়ের মুখ আবার অদৃশ্য হয়ে গেল—শোভন বুঝলে, কঙ তাদের আক্রমণ করতে আসছে।

সে চিৎকার করে বললে, "পালাও—পালাও—মাথার ওপরে সাক্ষাৎ যম!"

দেখা গেল, আবার পাহাড়ের গা বয়ে কঙ লাফাতে লাফাতে নেমে আসছে।

শোভন হেঁট হয়ে দেখলে, নদীর ধার থেকে পাহাড়ের যে অংশটা খাড়া উপরে উঠেছে; তার ভিতরে মাঝে মাঝে ছোট ছোট গুহার মতন রয়েছে অনেকগুলো গর্ত। পাহাড়ের উপর থেকে অগুন্তি আঙুরলতা সেই সব গর্তের মুখ পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে! আঙুরলতা যে কিরকম শক্ত, শোভনের সেটা অজানা ছিল না। সে চট করে একটা আঙুর-লতা ধরে ঝুলে পড়ল এবং একটা গুহার ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

ডেনহামও তখন সাঁকো পেরিয়ে নদীর এপারে এসে পড়েছিল, শোভনের দেখাদেখি সেও আর-একটা আঙুরলতাকে অবলম্বন করে আর একটা গুহায় গিয়ে ঢুকল।

কঙ সাঁকোর মুখে এসে হাজির হল। যে নারকীয় দেশে সে বাস করে, সেখানকার মূলমন্ত্র হচ্ছে—'হয় মার, নয় মর।' হিংসাই সেখানকার ধর্ম! প্রত্যেক জীবই সেখানে অন্য জীবকে হিংসা করে। কাজেই জীবিত যা কিছু, কঙ তাকেই শত্রু বলে ভাবে—তা সে আকারে ছোটই হোক আর বড়ই হোক!

এতগুলো মানুষ-পোকাকে দেখে তাই কঙয়ের আজ রাগের সীমা নেই! একটা বজ্রদগ্ধ চুড়ো-ভাঙা গাছের গুঁড়ির উপরে মালবিকার জ্ঞানহারা দেহকে সকলের নাগালের বাইরে রেখে, কঙ সশব্দে তার বুক চাপড়াতে লাগল—যেন সে সবাইকে যুদ্ধে আহ্বান করছে!

কঙয়ের কাছে পোকার মতোই ক্ষুদে ক্ষুদে সেই মানুষগুলো তার সঙ্গে যুদ্ধ করবে কি, উভয় সঙ্কটে পড়ে তাদের অবস্থা তখন অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়েছে। সাঁকোর এদিকে দাঁড়িয়ে কঙ করছে 'যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি', সাঁকোর ওদিকে দাঁড়িয়ে তিন তিনটে শিং উঁচিয়ে তড়পাচ্ছে সেই বিশ্রী ট্রাইসেরোটপ! তুচ্ছ এক গাছের গুঁড়ির সাঁকো, তার উপরে আঠার জন অসহায় মানুষ—একবার পা ফস্কালেই আর রক্ষা নেই।

কঙ গাছের গুঁড়িটা ধরে একবার একটা ঝাঁকানি দিয়ে দেখলে। মানুষগুলো অমনি গুঁড়ি জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করে উঠল শুনে কঙ নিজের ভাষায় কচর কচর করে কি যেন বলতে লাগল!

শোভন গুহা থেকে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বললে, "হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার!"

কঙ শোভনকে দেখে তার দিকেই দুপা এগিয়ে এল—কিন্তু তারপরেই কী ভেবে আবার সাঁকোর মুখে গিয়ে দাঁড়াল।

ডেনহাম নিজের গুহার ভিতর থেকে একখানা বড় পাথর দুহাতে তুলে কঙকে সজোরে ছুঁড়ে মারলে। সে পাথরখানা কোন মানুষের উপরে গিয়ে পড়লে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু ঘটত; কিন্তু তার আঘাত কঙ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না! সে দুই হাতে কাঠের গুঁড়ির একমুখ তুলে ধরে ক্রমাগত ডাইনে-বাঁয়ে নাড়া দিতে লাগল!

দুইজন হতভাগ্য লোক গাছের গুঁড়ি থেকে ফসকে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠে নিচে পড়ে গেল। সেখানে নদীর জল ছিল না। প্রথম লোকটা নিচে পড়ে একটুও নড়ল না। কিন্তু সে পড়বামাত্রই কুমীরের মত মস্ত একটা গিরগিটি এসে তার দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দ্বিতীয় লোকটা পড়ল নিচের দিকে পা করে—তার কোমর পর্যন্ত কাদায় ডুবে গেল। হয়ত সে বেঁচে যেত, কিন্তু সে যখন কাদা থেকে ওঠবার চেষ্টা করছে, তখন কোথা থেকে দলে দলে প্রকাণ্ড কাছিমের মত মাকড়সা এসে তাকে আক্রমণ করলে। সে পরিত্রাহি ডাক ছাড়তে লাগল এবং সেই হিংস্র মাকড়সাগুলো তার গা থেকে ডুমো ডুমো মাংস খুবলে খেতে লাগল।

কঙ আবার গুঁড়ি ধরে নাড়া দিলে, আবার কয়েকজন লোক নিচে গিয়ে পড়ল। আবার গুঁড়ি ধরে নাড়া, আবার মনুষ্য-বৃষ্টি।

আর একজন মাত্র মানুষ সাঁকোর উপরে আছে। সে এমন প্রাণপণে গুঁড়িটা জড়িয়ে রইল যে, কঙ অনেক নাড়া দিয়েও তাকে স্থানচ্যুত করতে পারলে না। তখন সে একটানে গুঁড়িশুদ্ধ মানুষকে শূন্যে তুলে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করলে। নদীগর্ভ তখন হরেক-রকম বীভৎস জানোয়ারে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে; আসন্ন ভোজের সম্ভাবনায় তারা পরস্পরের সঙ্গে লড়তে লাগল এবং আহত মানুষদের মর্মান্তিক আর্তনাদে আকাশ, বাতাস, পর্বত ও অরণ্য ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

নিজের গুহায় নিরুপায় হয়ে বসে মহা আতঙ্কে ও স্তম্ভিত নেত্রে শোভন এইসব হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা দেখতে লাগল। ইতিমধ্যে হয়ত মানুষের গন্ধ পেয়েই এক বিরাট মাকড়সা দ্রাক্ষালতা বেয়ে কখন যে উপরে উঠতে শুরু করেছে, শোভন প্রথমটা তা টের পায়নি। যখন দেখতে পেলে, মাকড়সাটা তখন প্রায় গুহার মুখে এসে পড়েছে—দুটো ক্ষুধার্ত ড্যাবডেবে ভীষণ চক্ষু শোভনের দিকে তাকিয়ে আছে! শোভন তাড়াতাড়ি ছোরাখানা বার করলে—এই ছোরাখানাই তখন তার একমাত্র সহায়। সে ছোরার আঘাতে দ্রাক্ষালতা কেটে দিলে—লতাসুদ্ধ মাকড়সাটা নিচে পড়ে গেল।

ডেনহামের চিৎকার শোনা গেল—"মিঃ সেন! মিঃ সেন!"

আবার কি ব্যাপার, দেখবার জন্যে শোভন গুহার ভিতর থেকে মুখ বাড়ালে। একখানা লোমশ, কৃষ্ণবর্ণ গাছের গুঁড়ির মতন প্রকাণ্ড বাহু পাহাড়ের উপর থেকে গুহার দিকে নেমে আসছে। পাহাড়ের উপর থেকে হাত বাড়িয়ে কঙ তাকে ধরবার চেষ্টা করেছে। শোভন সাঁৎ করে গুহার ভিতরে সরে গেল। তারপর হাতখানা যেই গুহার মুখে এল, শোভন অমনি তার উপরে বসিয়ে দিলে ছোরার এক ঘা। হাঁউ-মাউ করে চেঁচিয়ে কঙ তখনি হাত সরিয়ে নিলে! নিজের রক্তমাখা হাতের দিকে তাকিয়ে সে

সবিস্ময়ে ভাবতে লাগল—'মানুষ-পোকাগুলো তাহলে কামড়াতেও জানে!' ওদিকের গুহা থেকে ডেনহাম একখানা বড় পাথর ছুড়লে,—পাথরখানা সিধে এসে ঠক করে তার নাকের ডগায় লাগল। চোট খেয়ে কঙ আরও চটে গেল—"অ্যাঃ, আমার নাকের ডগায় পাথর ছুড়ে মারা! রোস তো, মজাটা দেখাচ্ছি তবে!" বোধহয় এইরকম একটা কিছু ভেবেই কঙ আবার পাহাড়ের ধারে ঝুঁকে পড়ে গুহার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে শোভনকে খুঁজতে লাগল—ছেলেরা যেমন করে দেওয়ালের গর্তে হাত ঢুকিয়ে পাখির বাচ্চা খোঁজে। শোভন আড়ষ্ট হয়ে সেই গুহার পিছনের দেয়ালে গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

নয়

কুমির-কাঙ্গারু

বাজপোড়া গাছের উপরে এতক্ষণ পরে মালবিকার জ্ঞান ফিরে এল।

প্রথমটা কিছুই তার মনে পড়ল না। একবার এপাশ, আর একবার ওপাশ করে ব্যথা বোধ হল—আবার চিৎ হয়ে দেখলে, উপরে রোদের সোনার জলে ধোয়া নীল আকাশ!

পিঠে কেন লাগে? কোথায় সে? ধড় মড় করে উঠে বসে দেখে, চারিদিকে পাহাড়, বন, নদী। এখানে সে কেমন করে এল?

আচম্বিতে তার মনের মধ্যে জেগে উঠল, অসভ্যদের ঢাক-ঢোলের আওয়াজ, গরিলারূপে নর্তকদের নাচ হাজার হাজার মশালের আলো, আকাশছোঁয়া পাঁচিলের প্রকাণ্ড ফটক, প্রান্তরের দুই থামওয়ালা পাথরের বেদী, সহস্র কণ্ঠের চিৎকার—এবং তারপর, সেই বিভীষণ গরিলাদানব—রাজা কঙ! তখন তার সকল কথা মনে পড়ল।

খানিক তফাতেই দেখলে, পাহাড়ের ধারে বসে কঙ নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে কি করছে! তাহলে এখনও সে তাকে ছাড়েনি। এই উঁচু গাছের গুঁড়ির উপরে এখনও সে কঙয়েরই বন্দিনী?

আর একটা ভয়ানক ও কী জীব এদিকে আসছে? একি স্বপ্ন? একি সত্য? এমন জীব কি দুনিয়ায় থাকতে পারে? আকারে এ কঙয়েরই মতন বিরাট, কিন্তু এর চেহারা যে কঙয়েরও চেয়ে ভয়ঙ্কর! মাথায় পাঁচ-ছয়তলা বাড়ির চেয়েও উঁচু, যেন একটা বিশালদেহ কুমির-কাঙ্গারুর মতন পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে লাফাতে লাফাতে আসছে।

মূর্তিটা আরও কাছে এলে পর মালবিকা দেখলে, তার সামনেও দুটো পা আছে বটে, কিন্তু সে পা দুটো এত পলকা যে, মুখে খাবার তুলে খাওয়া ছাড়া তার দ্বারা বোধহয় আর কোন কাজ করাই চলে না। কিন্তু তার মুখ! কী ভীষণ, কী বীভৎস সে মুখ, দেখলেই যেন আর জ্ঞান থাকে না।

মূর্তিটা ক্ষুধিতভাবে রক্তরাঙা চক্ষে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখছিল। হঠাৎ মালবিকা তার নজরে পড়ে গেল। আর কোথায় যায়? পৃথিবী কাঁপানো এক হুঙ্কার দিয়ে মালবিকার দিকে সে মস্ত এক লাফ মারলে। মালবিকাও মহা ভয়ে আর্তনাদ করে দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেললে।

সেই হুঙ্কার আর এই আর্তনাদ কঙয়ের কানে গেল—বিদ্যুতের মতন ফিরেই সে সেই নরখাদক জীবটাকে দেখতে পেলে। গুহার ভিতরকার তুচ্ছ মানুষ-পোকার কথা ভুলে তখনই সে উঠে দাঁড়াল এবং বিষম আক্রোশে দুই হাতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ঝড়ের মতন বেগে ধেয়ে এসে সেই ভয়াবহ দানবকে অকুতোভয়ে আক্রমণ করলে!

দানবটার গজালের মতন বড় বড় দাঁতে যেন আগুন খেলে গেল—মস্ত এক হাঁ করে সে কঙকে কামড়ে দিতে এল—তারপরেই পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি করে দুই বিরাট দেহই 'পপাত ধরণীতলে' হল। কঙ পড়ল তার উপরদিকে। প্রথমটা মনে হল, এই দানবটাকে কায়দায় আনতে কঙয়ের বেশি সময় লাগবে না,—কিন্তু ভুল। সেও বড় সামান্য রাক্ষসে জীব নয়! কঙ দুই হাতে তার গলা টিপে ধরেছিল বটে, কিন্তু তার পিছনের বিষম মোটা বলবান পা দুটো দিয়ে সে শত্রুর বুকে এমন প্রচণ্ড লাথি মারলে যে, অদ্ভুত শক্তির অধিকারী হয়েও কঙ কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারলে না—বেজায় একটা ডিগবাজি খেয়ে সে বহুদূরে ছিটকে নিচে নদীর গর্ভে পড়ে যায় আর কি।

অতি উৎকণ্ঠার সঙ্গে মালবিকা বলে উঠল—"না, না, না!"

মালবিকা চায়, কঙ জয়লাভ করুক। কঙ বড় কম ভয়ানক নয়, তার হাতে বন্দিনী হওয়াও মরণেরই সামিল,—কিন্তু এই ভুতুড়ে দানবের মুখগহ্বরে যাওয়ার চেয়ে কঙয়ের কবলগত হওয়া অনেক ভাল।

কঙ কোনরকমে সে যাত্রা বেঁচে গিয়ে আবার উঠে দানবটার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুজনের চিৎকারে পাহাড়ের পাথরও যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে! দানব আবার তার সাংঘাতিক পা ছুঁড়লে—কঙ আবার দূরে ছিটকে গিয়ে ভূতলশায়ী হল।

কঙ আবার উঠে দাঁড়াল। সে আর গর্জনও করলে না, বুকও চাপড়ালে না। বোধহয় সে বুঝলে, এ রকম বলিষ্ঠ ও প্রচণ্ড শত্রুকে চেঁচিয়ে বা বুক চাপড়ে ভয় দেখাবার চেষ্টা করা মিথ্যা! এবারে সে খুব সাবধানে এগিয়ে এল এবং তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টিতে একটা ফাঁক খোঁজবার চেষ্টা করতে লাগল। এমন সব শত্রু তার কাছে নতুন নয়। এদের কাবু করবার ফিকির সে জানে।

কঙ হঠাৎ এক লাফে দানবের সুমুখে এল এবং তার উপরকার একখানা পা ধরে একেবারে ভেঙে মুচড়ে দিলে! দানবটাও তার কাঁধ কামড়ে ধরলে—কঙও আবার তফাতে সরে গেল!

কঙ আবার এল—আবার এক লাফে দানবের গলা চেপে ধরলে—আবার দুইজনে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল—এবং দানবটা আবার তাকে লাথি মারলে।

কিন্তু এবারের লাথিতে আর আগেকার জোর ছিল না—তাই লাথি খেয়ে মাটিতে পড়বার আগেই কঙ যা চাচ্ছিল সেই সুযোগটা পেলে,—সে দানবের পিছনের একখানা পা খপ করে ধরে ফেললে এবং সঙ্গে সঙ্গে এক মোচড় দিতেই দানবটা একেবারে হুড়মুড়িয়ে মাটির উপরে লম্বা হয়ে পড়ল! চোখের পলক ফেলবার আগেই কঙ একেবারে তার পিঠে চড়ে বসল এবং নিজের দুই পায়ে তার কাঁধ চেপে ধরে দুই হাতে তার দুই চোয়াল বাগিয়ে ধরে প্রাণপণ শক্তিতে দিলে এক বিষম হ্যাঁচকা টান। কী হাতের জোর কঙয়ের! দানবের সেই বৃহৎ চোয়াল চড় চড় করে চিরে গেল! সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে কঙ আবার দাঁড়িয়ে উঠল! দানবটা মৃত্যু-যন্ত্রণায় পাকসাট খেতে খেতে যতই ছটফট করে, বিজয়-উল্লাসে অধীর হয়ে কঙ তত হুঙ্কার দিয়ে ওঠে! তারপর দানবটার দেহ যখন একেবারে স্থির ও আড়ষ্ট হয়ে গেল, কঙ তখন খুব খুশি হয়ে কচর কচর করে নিজের ভাষায় কি বলতে বলতে বারংবার মালবিকার পানে তাকাতে লাগল,—যেন সে তার মুখে নিজের বীরত্বের জন্যে দু-চারটে বাহবা শুনতে চায়!

কিন্তু মালবিকার তখন কোন শক্তিই ছিল না—বিপুল উত্তেজনায় আবার তার জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কঙ অত্যন্ত যত্ন ও মমতার সঙ্গে তার দেহকে তুলে নিলে।

এই বিশ্রী জানোয়ারটা নোংরা হাতে আবার তার ভগ্নীর দেহ স্পর্শ করছে দেখে, শোভন রাগে যেন

ক্ষেপে গেল! সে গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবার উপক্রম করলে। কিন্তু তারপর এই ভেবে আত্মসংবরণ করলে যে, কঙকে বাধা দেবার মিছে চেষ্টা করে যেচে নিজের মরণকে ডেকে এনে লাভ কি? তাতে তো মালবিকা মুক্তি পাবে না! তার পক্ষে এখন একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে, লুকিয়ে কঙয়ের পিছনে পিছনে থাকা। তা হলেই যথাসময়ে ডেনহাম লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ফিরে এলে মালবিকাকে উদ্ধার করা খুবই সহজ হবে।

ওদিকে কঙয়ের ব্যবহার দেখে বেশ বোঝা গেল যে, গুহার ভিতরকার দুষ্ট মানুষ পোকার কথা তার আর কিছুই মনে নেই! সে পুতুলের মতন মালবিকাকে নিজের হাতের চেটোয় নিয়ে আবার পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শোভন ও ডেনহাম তখন নিশ্চিন্ত হয়ে গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে দ্রাক্ষালতা বেয়ে পাহাড়ের উপরে উঠল।

শোভন বললে, "পোল তো আর নেই! আপনি ওপারে যাবেন কেমন করে?"

ডেনহাম বললে, "যেমন করে হোক, নদী পার হবই। কিন্তু মিঃ সেন, এই নরকে আপনাকে একলা ফেলে যেতে আমার মন সরছে না!"

শোভন বললে, "আমার সঙ্গে থেকেই বা আপনি কি করবেন? খালি হাতে আমরা দুজনে কিন্তু কঙয়ের সঙ্গে লড়তে পারব না। বন্দুক চাই, বোমা চাই, লোকবল চাই। আপনি তাই আনতে যান। কঙয়ের পিছনে কোন দিকে আমি গেছি, পথে সে চিহ্ন রেখে যাব।"

ডেনহাম বললে, "হ্যাঁ, এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই! বেশ, তাই হোক।"

শোভন বললে, "আর এখানে সময় নষ্ট করলে কঙকে হয়তো শেষটা হারিয়ে ফেলব। বিদায় বন্ধু, বিদায়!"

—"বিদায়! ভগবান আপনাকে সাহায্য করুন।"

দূরে বনের ভিতরে মড় মড় করে গাছভাঙার শব্দ হচ্ছে। কঙ তার পথ সাফ করতে করতে বাসায় ফিরে চলছে। বাজ-পোড়া গাছের পাশে দানবটার বিশাল দেহ পড়ে রয়েছে। মরা জন্তুর মাংসের গন্ধ যে নিচে নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছেছে, সেই প্রমাণ দেবার জন্যে দলে দলে কাছিমের মত বড় মাকড়সা ও কুমিরের মত বড় গিরগিটি এবং আরও সব কত বিটকেল জন্তু দানবের সেই আড়ষ্ট দেহের দিকে এগিয়ে আসছে!

শোভন শিউরে উঠে কঙয়ের সন্ধানে ছুটল।

দশ

জলচর অজগর

কঙ কোন দিকে গেছে, তা খোঁজবার জন্যে শোভনকে বিশেষ বেগ পেতে হল না। কোথাও ধুলোর উপরে প্রকাণ্ড পায়ের দাগ, কোথাও বা গাছের ভাঙা ডাল পড়ে রয়েছে; —সেইসব চিহ্ন দেখে সে অনায়াসেই ঠিক পথে এগিয়ে চলল। সমস্ত শত্রু বধ করে কঙও এখন নিশ্চিন্ত হয়েছিল, তাই এখন সে পরম আরামে ধীরে ধীরে হেলতে হেলতে দুলতে দুলতে অগ্রসর হচ্ছিল,—কাজেই শোভন শীঘ্রই তার নাগাল ধরে ফেললে। কিন্তু সে খুব সাবধানে লুকিয়ে লুকিয়ে পথ চলতে লাগল,—কেননা

একবার কঙয়ের চোখে পড়ে গেলে তার যে কি দুর্দশাটাই হবে, সেটা সে ভাল করেই জানে! পথের উপরে নানা আকারের আরও সব পায়ের দাগ দেখে এও সে বুঝতে পারলে যে, এখান দিয়ে কঙয়ের মত প্রকাণ্ড বহু রাক্ষুসে জীবই আনাগোনা করে থাকে, তারাও তাকে দেখতে পেলে জামাই আদর করবে না! এখানে পদে পদে বিপদ, একটু অন্যমনস্ক হলেই প্রাণটা বাজে খরচ হতে বিলম্ব হবে না!

মাঝে মাঝে ভরসা করে দুপা বেশি এগিয়ে সে উঁকি মেরে দেখে নিচ্ছে মালবিকার অবস্থাটা। কিন্তু কঙয়ের হাতের চেটোয় সে বরাবর ঠিক এক ভাবেই স্থির হয়ে পড়ে রয়েছে—বোধহয় এখনও তার মূর্চ্ছা ভাঙেনি।

জঙ্গল ক্রমেই পাতলা হয়ে আসছে—ঝোপঝাপ, লতাপাতা আর বড় দেখা যায় না। খানিক তফাতে তফাতে বড় গাছগুলো কেবল দাঁড়িয়ে রয়েছে!

পাহাড়ের ঢালু গা ক্রমেই উপরে উঠে গিয়েছে—শোভনের চোখের সমুখে এখন স্পষ্ট জেগে উঠল মড়ার মাথার খুলির মত সেই পাহাড়টার ন্যাড়া শিখর। কঙ সেই দিকেই যাচ্ছে।

শোভন বুঝলে, এইসব উঁচু শিখরের উপরেই কঙয়ের বাসা আছে। এখানে গাছপালা ঝোপঝাপ জঙ্গল নেই। কাজেই এখানকার সাংঘাতিক জীবজন্তুরা খুব-সম্ভব এদিকে বড় একটা বেড়াতে বা শিকার খুঁজতে আসে না এবং কখনও সখনও এলেও কঙয়ের তীক্ষ্ণ চোখের সামনে সহজেই তাদের ধরা পড়বার সম্ভাবনা! এইসব বুঝেসুঝেই বুদ্ধিমান কঙ হয়ত এখানে তার আস্তানা গেড়ে বসেছে!

শোভনের শরীর আর তার মনের বশে থাকতে চাইছে না। এখন বৈকাল। আজ খুব ভোর থেকেই তার শরীরের উপর দিয়ে যেসব ধাক্কা চলে যাচ্ছে, অন্য কেউ হলে এতক্ষণ হয়ত এ সব সহ্য করতে পারত না। অন্য কেউ কেন, অন্য সময়ে সে নিজেই কি এতটা সইতে পারত; কেবল তার আদরের বোনের মায়ামাখা মুখখানিই এতক্ষণ তাকে দু-পায়ের উপরে সোজা দাঁড় করিয়ে রেখেছে! তার বোনের জন্যে আজ কত বিদেশি পর হয়েও প্রাণ দিলে, হয়ত আবার আরও কত লোক প্রাণ দিতে আসছে! আর রক্তের টান ভুলে এখন কি সে অমানুষের মত বিশ্রাম করতে পারে? নিজের শরীরকে নিজে নিজেই ধমক দিয়ে সে ফের চাঙ্গা করে তুললে—দ্বিগুণ উৎসাহে বেগে কয় পা এগিয়েই সে আবার চমকে ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল—কী সর্বনাশ, তার খুব কাছেই ওই যে কঙ! অতিরিক্ত উৎসাহকে দমন করে আবার সে পিছিয়ে এল।

এমন সময়ে একটি দৃশ্য তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। পাহাড়ের উপর মস্ত বড় একটা সুড়ঙ্গ রয়েছে এবং তার ভিতর দিয়ে হুড় হুড় করে জল বেরিয়ে আসছে! পাহাড়ের গর্ভে নদী! শোভন মুখ ফিরিয়ে দেখলে, ঢালু পাহাড়ের গা বয়ে খানিক দূর গিয়ে নদীর জলধারা একটা জঙ্গলের কাছে মোড় ফিরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।...এই দৃশ্য দেখে তখন আর কোন কথা মনে হল না বটে, কিন্তু খানিক পরেই সে এক অদ্ভুত আবিষ্কার করলে!

ধীরে ধীরে সে ক্রমেই উপরে উঠছে। তারপর সূর্যের শেষ আলোকরেখা যখন আকাশের গায়ে মিলিয়ে যাই যাই হয়েছে, কঙ তখন পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরের তলায় এসে দাঁড়াল। সেখানে পাহাড়ের গা ঢালু হয়ে চারিদিক থেকে খানিকটা নেমে গিয়েছে—মাঝখানে খানিকটা সমতল জায়গা—ঠিক যেমন সার্কাসের গ্যালারির মাঝখানে থাকে খেলা দেখাবার খোলা জমি।

সেই সমতল জায়গাটার একপাশে রয়েছে পুকুরের মত একটা জলাশয়। সেই পুকুরের দিকে কঙ সন্দেহপূর্ণ নেত্রে তাকিয়ে খানিকক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। কী দেখছে কঙ? পুকুরের কালো জল

তো স্থির হয়ে আছে—ওখানে জীবনের কোনও লক্ষণই নেই! খানিকক্ষণ জলের দিকে তাকিয়ে থেকে কঙ আবার এগিয়ে গেল। পুকুরের উপরেই খাড়া পাহাড়, এবং জল থেকে বিশ-পঁচিশ ফুট উপরেই সেই খাড়া পাহাড়ের গায়ে একটা বড় গুহা।

কঙয়ের দেখাদেখি শোভনও পুকুরের দিকে তাকিয়ে রইল! অল্পক্ষণ পরে সে লক্ষ্য করলে, পুকুরের যেদিকে খাড়া পাহাড় নেই, কেবল সেই দিকে জল যেন চক্রাকারে ঘুরছে। এর মানে কি? তবে কি পুকুরের তলায় জল বেরুবার কোন পথ আছে?

ধাঁ করে শোভনের মনে পড়ে গেল সেই সুড়ঙ্গ-নদীর কথা! পুকুরের জল যেদিকে ঘুরছে, সেইদিকেই খানিক আগে সে যে সেই সুড়ঙ্গ-নদী দেখে এসেছে! এ এক মস্ত আবিষ্কার!

শোভন ভাবতে লাগল, আজ সকালে প্রান্তরের কাছে সে প্রথম যে নদী দেখেছে, তারপর থেকে সারা পথেই জমি ধীরে ধীরে ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠেছে। এই পাহাড়ের শিখরের কাছে এসে চড়াই শেষ হয়েছে।

এই পাহাড়ে পুকুরের জল যখন এক জায়গায় চক্রাকারে ঘুরছে, তখন পুকুরের নিচে নিশ্চয়ই জল বেরুবার একটা পথ আছে। সে পথ কোথায় গেছে? নিশ্চয়ই খানিক আগে দেখা সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে!

এবং জল যখন বেরুচ্ছে, অথচ পুকুর শুকিয়ে যাচ্ছে না, তখন জলের যোগান আসছে কোথা থেকে? পাতাল থেকে? নিশ্চয়ই পুকুরের তলায় গুপ্ত উৎস আছে—পাহাড়ের উপরকার অধিকাংশ সরোবর বা হ্রদের তলাতেই যা থাকে।

প্রান্তরের কাছে সেই যে নদী, এই পাহাড়ের শিখরেই তার উৎস! পাহাড়ের গা ক্রমেই ঢালু হয়ে যখন প্রান্তরের প্রায় কাছে গিয়ে নেমেছে, তখন জলের ধারাও এঁকে-বেঁকে ভীষণ ডাইনোসরের হ্রদ হয়ে নিশ্চয়ই একেবারে সেই প্রান্তরের নদীর ভিতর দিয়েই বয়ে গেছে! শোভনের এই অদ্ভুত আবিষ্কারের কি আশ্চর্য ফল হয় একটু পরেই সেটা ভাল করে বোঝা যাবে! তার হিসাব খুব ঠিক। কেউ একটা ছোট নৈবেদ্যের আকারে মাটির পাহাড় বানিয়ে তার মাথায় জল ঢেলে পরীক্ষা করলেই দেখবে, সে জল একেবারে নিচে না গিয়ে পারবে না!

ওদিকে কঙ তখনও কেন যে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পুকুরের পানে তাকিয়ে আছে, শোভন তার কারণ বুঝতে পারলে না! সেও বারকয়েক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পুকুরের দিকে তাকাতে লাগল। একটু পরেই সে রহস্যও স্পষ্ট হল। পুকুরের কালো জলের তলায় আরও বেশি কালো কি একটা যেন এঁকে বেঁকে উপরে উঠে আসছে! মোষের পেটের মতন মোটা একটা অজগর সাপ! কঙয়ের সাবধানী চোখ আগেই তাকে দেখে ফেলেছে এবং সেও কঙকে দেখেছে। সে ভয়ানক সাপটা যে কত লম্বা, ভগবানই তা জানেন—কিন্তু সে যখন জলের ভিতর থেকে বেরিয়ে কঙকে তেড়ে এল, তখনও তার দেহের নিচের দিকটা জলের ভিতরেই রইল।

ক্রুদ্ধ কঙ টপ করে এক হাত বাড়িয়ে পুকুরের উপরকার খাড়া পাহাড়ের গুহার ভিতরে মালবিকার দেহকে রেখে দিলে, তারপর মহাগর্জন করে প্রতি-আক্রমণ করলে! তারপর সে কী ঝটাপটি। অজগরটা পাকে পাকে কঙয়ের সর্বাঙ্গকে নাগপাশে বেঁধে ফেললে, তারপর চেষ্টা করতে লাগল তাকে পুকুরের কালো জলে টেনে আনবার জন্যে! কঙ এবার খালি তার বজ্র-বাহু দিয়ে নয়, তার বড় বড় ধারালো দাঁত দিয়েও লড়ছে! সেই রুদ্রমূর্তি কুমির দানব যা পারেনি, এই আশ্চর্য জলচর অজগর সেই অসাধ্যই সাধন করলে—নাগপাশের বাঁধনে কঙয়ের দুই চক্ষু যেন ঠিকরে কপালে উঠল! সে তবু দুই হাতে

অজগরের গলা টিপে রইল এবং বার বার কামড় দিয়ে অজগরের ভীষণ বন্ধন ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল।

দেহের সমস্ত শেষ শক্তি এক করে এবং দেহের প্রত্যেক মাংসপেশী ফুলিয়ে কঙ অজগরের মাথাটা দুই হাতে আপনার বুকে চেপে ধরে একেবারে থেঁতলে ফেললে। অজগরের ল্যাজের দিকটা তখন ছটফট করতে করতে জলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল—কঙ এক পায়ে তাকে মাড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার চূর্ণ-বিচূর্ণ মাথাটা সজোরে পাহাড়ের উপরে আছড়ে ফেললে! আবার দ্বীপের রাজা কঙয়ের জয়। কিন্তু এবারে তার আর বিজয়-আনন্দ প্রকাশ করবারও শক্তি ছিল না—অজগরের নাগপাশ তার সেই বিরাট দেহকেও এমনই অবশ করে দিয়েছিল যে, সে টলতে টলতে মাটির উপরে ধপাস করে বসে পড়ল! এমনকি, সেই বিশাল অজগরের যে বিপুল কুণ্ডলী তখনও তার চারিপাশে পাকিয়ে আছে, তার বাহিরে গিয়ে বসবার শক্তিটুকুও কঙয়ের তখন ছিল না! দুই চোখ মুদে পাহাড়ের গায়ে মাথা কাত করে রেখে ভোঁস ভোঁস শব্দে সে হাঁপাতে লাগল।

শোভন দেখলে, এ এক সোনার সুযোগ! এমন সুযোগ সে হারালে না—পা টিপে টিপে কঙয়ের পিছনদিক দিয়ে উপরে উঠে শোভন সেই খাড়া পাহাড়ের গুহার পাশে গিয়ে হাজির হল।

বাইরে যখন দুই মত্ত দানবের বিষম লড়াই বেধে গেছে, গুহার ভিতরে মালবিকার তখন আবার জ্ঞানোদয় হয়েছে। পাথরের ঠাণ্ডা, আদুড় গা ছুঁয়ে সে ভাবলে, এ আবার আমি এলুম কোথায়? কঙ কোথায় গেল? বাইরেও মাতামাতি আর দাপাদাপি করছে কারা? আবার কি কোন নতুন দানবের আবির্ভাব হয়েছে,—না ভূমিকম্প হচ্ছে?

গুহার মুখ খোলাই রয়েছে! বাইরে কি কাণ্ডকারখানা চলছে, সেটা একবার উঁকি মেরে দেখে আসবার জন্যে মালবিকার অত্যন্ত কৌতূহল হল, কিন্তু তার ভরসায় কুলালো না!

হঠাৎ গুহার মুখে কার ছায়া এসে পড়ল! মালবিকার বুকটা ধড়াস করে উঠল! পা টিপে টিপে চুপি চুপি এ আবার কোন নতুন শত্রু গুহার ভিতরে তাকে আক্রমণ করতে এল? মালবিকা ভয়ে সেদিকে তাকাতে পারলে না।

—"মালবি, মালবি—শিগগির ওঠ!"

এ যে তার দাদার গলা! কঙয়ের গুহায় তার দাদা? অসম্ভব! সে কি ভুল শুনছে! সে স্বপ্ন দেখছে! সে পাগল হয়ে গেছে!

—"শিগগির শিগগির! মালবি, আমি এসেছি! যদি বাঁচতে চাস, এখান থেকে পালাতে চাস, তবে উঠে পড়—দেরি করিস নে!"

—"দাদা, দাদা! আমার দাদা এসেছ?"

—"চুপ! পরে দাদা বলে ডাকবার আর কথা কইবার অনেক সময় পাওয়া যাবে, কঙ এখনই আসবে, আর তাহলেই আমি মারা পড়ব। উঠে আয়!"

—"কোথায় যাব?"

—"গুহার ধারে আয়। ঠিক তলাতেই একটা পুকুর দেখতে পাচ্ছিস?"

—"হ্যাঁ।"

—"তুই তো খুব ভাল সাঁতার আর 'ডাইভ' করতে জানিস। এখান থেকে লাফিয়ে পুকুরে পড়তে পারবি?"

—"পারব। কিন্তু তারপর? পুকুর তো ওইটুকু! আর ঐখানেই যে কঙ বসে আছে! আমরা পালাব কেমন করে?"

—"সে কথা পরে বলব। এখন কঙকে পুকুরের ধার থেকে সরাতে হবে। নইলে বলা যায় না তো, পুকুরের ভিতরে হাত বাড়িয়েই হয়ত সে আমাদের ধরে ফেলবে! তুই তৈরি হয়ে থাক। আমি বললেই লাফিয়ে পড়বি! আমি কঙকে রাগিয়ে দিই!

গুহার ধার থেকে বড় বড় পাথর তুলে নিয়ে শোভন ছুড়তে লাগল, কঙকে টিপ করে! সঙ্গে সঙ্গে সে যা মনে আসে তাই বলে চ্যাঁচাতে লাগল—"ওরে ছুঁচো কঙ! ওরে নেংটি ইঁদুর! ওরে ক্ষুদে খোকা! ওরে ধেড়ে পোকা! আয় এখানে, আমি তোর সঙ্গে আজ কুস্তি লড়ব!"

দৈত্য কঙ তখনও কাতরভাবে হাঁপাচ্ছিল। দু একটা পাথর গায়ে লাগতেই সে চমকে চোখ খুলে দেখে—অ্যাঁঃ, ও কী ব্যাপার? তারই গুহার মুখে একটা মানুষ-পোকা দাঁড়িয়ে চ্যাঁচাচ্ছে, আর লাফাচ্ছে, আর তাল ঠুকছে! যেখানে যমও ভয়ে ঢোকে না, সেখানে একটা বাজে মানুষ-পোকা তিড়িং মিড়িং করছে! এও কি সহ্য হয়?

হুঙ্কার দিয়ে লাফ মেরে কঙ দাঁড়িয়ে উঠল! নিজের সমস্ত কষ্ট ভুলে কালবোশেখীর কালো মেঘের মত কঙ রুদ্রমূর্তিতে গুহার পথে উঠতে লাগল!

আরে গেল! মানুষ-পোকাটা এখনও যে নাচে, ঢিল ছোড়ে, তাল ঠোকে! ওটা কি জানে না আমি হচ্ছি বিশ্বজয়ী রাজা কঙ আর ও গুহা হচ্ছে আমারই রাজবাড়ি, আর ওখান দিয়ে পালাবার কোন পথ নেই?

একটা ঢিল তার হাঁ-করা মুখের মস্ত গর্তে ঢুকে তার গলায় গেল আটকে। মুস্কিলে পড়ে সে খক-খক করে খানিক কেশে ঢিলটাকে গলা থেকে বার করে দিলে। ক্ষুদে মানুষপোকার নষ্টামি দেখে কঙ রেগে টং হয়ে উঠল! দুই হাতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে সে প্রায় গুহার কাছে এসে পড়ল।

আরে—আরে—ও কী? মানুষ-পোকা আর সেই জ্যান্ত পুতুল-মেয়েটা যে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল! ওদের ভরসা তো কম নয়—এখনই ডুবে মরবে যে!

গুহার ধারে মুখ বাড়িয়ে কঙ অবাক হয়ে দেখতে লাগল! সেও ওদের মত জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলে না, ওইখানেই তার হার! তার তালগাছ-সমান দেহ নিয়ে সাধারণ নদী বা হ্রদ সে অনায়াসেই হেঁটে পার হয়ে যেতে পারে;—কিন্তু সে জানে, পুকুরের গভীর জলে তার বিশাল দেহও থই পাবে না! পায়ের তলায় মাটি থাকলে কঙ অসম্ভবও সম্ভব করতে পারে, কিন্তু অথই জলে সে সাঁতার কাটতে পারে না।

কিন্তু মানুষপোকা আর পুতুল মেয়েটা তো ডুবল না! মাছের মত সাঁতার কেটে ওরা যে পুকুরের ওপারের দিকে ভেসে যাচ্ছে! বটে! ওইদিকে গিয়ে ডাঙায় উঠে তোমরা আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে চাও? হুঁঃ, কঙ-এর হাত ছাড়িয়ে পালানো এত সোজা নয়,—দাঁড়াও মজাটা টের পাইয়ে দিচ্ছি!

কঙ আবার লাফিয়ে লাফিয়ে পুকুরের দিকে নেমে আসতে লাগল।

সাঁতার কাটতে কাটতে শোভন ও মালবিকা কঙ-এর উপরে দৃষ্টি রাখতে ভোলেনি।

শোভন বললে, "মালবি! তাড়াতাড়ি! কঙ নিচে আসবার আগেই আমাদের ওপারের কাছে যেতে হবে!"

মালবিকা বললে, "কিন্তু ওপারে গিয়ে ডাঙায় উঠলেই তো কঙ আবার আমাদের ধরে ফেলবে!"

—"আঃ, যা বলি শোন না! কঙ আমাদের কিছুই করতে পারবে না!"

কঙ যখন পুকুরের পাড়ে এসে নামল, শোভন ও মালবিকা তখন পুকুরের ওপারের কাছে এসে পড়েছে!

বড় বড় কয়েকটা লাফ মেরে কঙ ওপারে ডাঙার উপরে গিয়ে হাজির হল। পুকুরের দুই দিকে তার দুই সুদীর্ঘ বাহু বাড়িয়ে কঙ শোভন ও মালবিকার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল—তার তখনকার ক্রুদ্ধ চেহারা দেখলে বুকের রক্ত জল হয়ে যায়!

মালবিকা সভয়ে বলে উঠল, "দাদা, এইবারেই আমরা গেলুম!"

শোভন বললে, "কোন ভয় নেই। শোন, যতটা পার নিশ্বাস নাও। একেবারে পুকুরের তলায় ডুব দাও। এইখানে একটা বড় সুড়ঙ্গ আছে। নিচে গিয়ে সাঁতার কেটো না। হাত দুটো দিয়ে মাথা চেপে রাখ। এস!"

খুব জোরে একটা নিশ্বাস টেনে নিয়ে শোভন ডুব দিলে। মালবিকাও তাই করলে।

খানিকটা নিচে নামতেই জলের ভিতরে তারা একটা প্রবল টান অনুভব করলে—এবং সেই টানে তাদের দেহ তীরবেগে ছুটে চলল—হয়ত কোন অজানা মরণের দিকেই! তারা বেশ বুঝলে, জলের গতি যেদিকে, এখন হাজার বাধা দিলেও সেদিকে ছাড়া আর কোনদিকে তাদের যাবার উপায় নেই! তাদের দেহ ঘুরতে ঘুরতে জলের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, এখন সামনে যদি কোন বাধা থাকে, তাদের দেহ তাহলে কাচের পেয়ালার মতই ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে!

এইবারে মালবিকার কষ্ট হতে লাগল। নিশ্বাস বন্ধ করে মানুষ কতক্ষণ থাকতে পারে? এ ভেসে-যাওয়ার শেষ কোথায়?—জলের টান কখন তাদের মুক্তি দেবে? আর বেশিক্ষণ এভাবে থাকলে দম বন্ধ হয়েই সে যে মারা পড়বে!

আচম্বিতে জলের টান খুব কমে গেল—মালবিকা দেখলে, আলোয় জলের ভিতরটা ধব ধব করছে! তাড়াতাড়ি সে হাত দিয়ে জল কেটে পায়ের ঠেলায় নিজের দেহটাকে উপরপানে তুলে দিলে।

কী আনন্দ! ওই তো আকাশ—পূর্ণিমার রুপোর মতন উজ্জ্বল! তার সামনেই ভেসে চলেছে শোভন। তারা এখন এক নদীর ভিতরে এবং নদীর দুধারে খালি পাহাড় আর বন!

মালবিকা খুব খুশি হয়ে বলে উঠল, "দাদা, দাদা! এ আমরা কোথায় এলুম—কেমন করে এলুম?"

শোভন বললে, "পুকুরের তলায় সুড়ঙ্গ দিয়ে আমরা এই নদীতে এসেছি। এই নদীর জন্ম ওই পুকুরে। আর এই নদী গিয়ে পড়েছে একেবারে সেই প্রান্তরের কাছে। জলের যে রকম টান দেখছি, আমাদের খালি ভেসে থাকলেই চলবে! এখানে এসেছি স্থলপথে, কিন্তু এখন জলপথে তার চেয়ে ঢের সহজেই আমরা প্রান্তরের কাছে গিয়ে পড়ব।"

মালবিকা বললে, "ওহো, কি মজা! কিন্তু দাদা, দৈত্য কঙ আমাদের পিছনে পিছনে তেড়ে আসছে না তো?"

শোভন বললে, "কঙ যাই-ই হোক, সে পশু ছাড়া আর কিছুই নয়! কী কৌশলে আমরা তাকে ফাঁকি দিলুম, হয়ত সে সেটা বুঝতেই পারবে না। আর, যদিও বা পারে, তবে তাকে আসতে হবে স্থলপথে, অনেক ঘুরে। সে সাঁতার জানে না; নদীর জল যেখানে খুব গভীর, সেখানে সে আসতে পারবে না। আমাদের আর ভয় নেই। কঙয়ের ঢের আগেই আমরা প্রান্তরের কাছে গিয়ে পড়ব।"

এগার

কঙয়ের প্রত্যাগমন

প্রান্তরের উপর দিয়ে আবার নতুন একদল নাবিক খুলি পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। তাদের সঙ্গে একখানা বোট, ঝুলনো সাঁকো তৈরি করবার জন্যে রাশিকৃত দড়িদড়া, এবং আরও নানান রকম জিনিসপত্তর রয়েছে।

দলের আগে আগে দেখা যাচ্ছে কাপ্তেন ঈঙ্গলহর্ন ও ডেনহামকে। এরা সবাই চলেছে মালবিকা ও শোভনকে উদ্ধার করতে।

কাপ্তেন বললেন, "আমি খালি মিস সেন আর মিঃ সেনকে উদ্ধার করব না। আমি কঙকেও বন্দী করবার চেষ্টা করব।"

ডেনহাম বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললে, "কেন? কঙকে বন্দী করে কি হবে?"

কাপ্তেন বললেন, "আমাদের মুখের কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমি সভ্য জগতকে দেখাতে চাই, কি ভীষণ দৈত্য এখনও এই পৃথিবীতে বাস করছে! আমাদের এই অদ্ভুত আবিষ্কারে সারা দুনিয়ায় হৈ-চৈ উঠবে,—আর লোকের মুখে মুখে আমাদের নাম ফিরতে থাকবে, আমরা অমর হয়ে যাব!"

ডেনহাম বললে, "কঙ হবে মানুষের হাতে বন্দী! অসম্ভব! পাগলের প্রলাপ।"

কাপ্তেন খাপ্পা হয়ে বললেন, "পাগলের প্রলাপ! কেন?"

ডেনহাম বললে, "আপনি কঙকে এখনও দেখেননি বলেই এই কথা বলছেন! সে এক সজীব পাহাড়! পিঁপড়েরা যদি বলে 'মানুষকে বন্দী করব,'—তা হলে সেটা কি তাদের পাগলামি হবে না? কঙয়ের কাছে আমরা কীটপতঙ্গ পিঁপড়ের মতই তুচ্ছ!"

কাপ্তেন বললেন, "কিন্তু সে পশু, আর আমরা হচ্ছি মানুষ! মানুষের বুদ্ধির কাছে পশুকে হার মানতেই হবে। কাঙকে বন্দী করব বলে আমি অনেক বোমা এনেছি।"

ডেনহাম বললে, "বোমা আমাদেরও কাছে ছিল। তবু এতগুলো লোকের প্রাণ গেল!"

—"সেটা তোমাদেরই বুদ্ধির দোষে!"

—"মানলুম! কিন্তু বোমা ছুঁড়ে কঙকে বড় জোর আমরা হত্যা করতে পারি। তাকে হত্যা করা এক কথা, আর জ্যান্ত অবস্থায় বন্দী করা অন্য কথা।"

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বোমার সাহায্যেই কঙকে বন্দী করব! এ যে-সে বোমা নয়,—গ্যাসের বোমা—বিষাক্ত গ্যাসের বোমা।"

ডেনহাম চমৎকৃত হয়ে মহা উৎসাহে একটা লম্ফ ত্যাগ করে বললে, "কি আশ্চর্য! এই সোজা কথাটা তো এতক্ষণ আমার মাথায় ঢোকেনি! ধন্য আপনার বুদ্ধি! হ্যাঁ, বিষাক্ত বোমার উপরে আর কোন কথা নেই বটে!"

কাপ্তেন হঠাৎ প্রান্তরের দিকে সচকিত চোখে তাকিয়ে বলেন, "ওরা কারা? ওরা কারা এদিকে আসে? মানুষ! একটি মেয়ে, একটি ছেলে।"

ডেনহাম আহ্লাদে আর এক লাফ মেরে বললে, "আরে—আরে! ও যে মিস আর মিস্টার সেন! অ্যাঁ! এ কি অবাক অবাক কাণ্ড!"

শোভন ও মালবিকা প্রান্তরের উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে!

ডেনহামও তাদের দিকে ছুটে গিয়ে বললে, "মিঃ সেন—"

ছুটতে ছুটতেই বাধা দিয়ে শোভন হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "সব কথা পরে শুনবেন! এখন পালিয়ে আসুন—ফটক বন্ধ করুন! কঙ আমাদের পিছনে পিছনে আসছে!"

—"কঙ?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, পালিয়ে আসুন—পালিয়ে আসুন!"

কঙ আসছে শুনে সকলেরই পিলে চমকে গেল। লাম্পি বলে একজন লম্বা-চওড়া নাবিক এতক্ষণ সঙ্গীদের কাছে বড়াই করতে করতে আসছিল যে, বোমা ছুড়ে কেমন করে সে কঙয়ের মোটা ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবে। এখন কঙয়ের নাম শুনেই সকলের আগে সে ফটকের দিকে এমন লম্বা দৌড় মারলে যে, একবারও আর পিছন ফিরে চাইবার সময় পেলে না!

কেবল কাপ্তেন একবার বললেন, "আসুক না কঙ! আমরা এইখানে দাঁড়িয়েই তার সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করব!"

ডেনহামই বললে, "না, না, পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে; শিগগির পালিয়ে আসুন!" বলেই ডেনহাম দৌড় মারলে! কঙ যে কি চীজ সেটা আর বুঝতে বাকি নেই!

দেখতে দেখতে প্রান্তর জনশূন্য হয়ে গেল!

ওদিকে উচ্চ প্রাচীরের উপর থেকে অসভ্যরা আশ্চর্য দৃষ্টিতে দেখলে, তাদের রাজা কঙয়ের বউ আবার ফিরে এসেছে। নিজেদের চোখকেই তারা যেন বিশ্বাস করতে পারলে না! রাজা কঙয়ের বউ ফিরে এসেছে, এমন অসম্ভব ব্যাপার সে দেশে আর কখনও কেউ দেখেনি!

প্রান্তরের অরণ্যের ভিতর থেকে আচম্বিতে এক ভয়াবহ, বুক দমানো গুরুগম্ভীর গর্জন জেগে উঠল—সে গর্জন শুনলে পাহাড়ের চূড়াও যেন খসে পড়ে!

বার

কঙয়ের বউ-খোঁজা

"কঙ! কঙ! কঙ!"—প্রাচীরের উপর থেকে হাজার হাজার কণ্ঠে চিৎকার উঠল—"কঙ! কঙ! কঙ!"

প্রান্তরের উপর দিয়ে পাঁচ-ছয়-তলা অট্টালিকার চেয়ে উঁচু কী একটা মহাদানব বন্যার বেগে ধেয়ে আসছে—চারিদিকে ধোঁয়ার মতন ধূলারাশি উড়িয়ে। প্রান্তরের বড় বড় গাছগুলোও তার বুক পর্যন্ত পৌঁছায় না।

চিৎকার সমানে চলল—"কঙ! কঙ! কঙ! কঙ! কঙ! কঙ! কঙ!"

অসভ্যদের রাজার কি হুকুম হল—দলে দলে লোক ছুটে গিয়ে প্রাচীরের মস্ত-বড় ফটকটা সশব্দে বন্ধ করে দিলে!

—"কঙ! কঙ! কঙ!—রাজা কঙ তার বউকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসছে!"

কিন্তু ফটক বন্ধ হয়েও বন্ধ হল না! তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হবার আগেই কঙ তার হাতির দেহের চেয়েও মোটা একখানা প্রকাণ্ড পা ফটকের ফাঁকের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছে—আর হুড়কো লাগানো অসম্ভব।

পাছে সে ভিতরে ঢুকে পড়ে, সেই ভয়ে শত শত মানুষ ফটকের দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। কঙ ভিতরে ঢুকলে কী অমঙ্গল যে ঘটবে, সকলেই তা জানে!

শোভন কাপ্তেনের দিকে ফিরে বললে, "মিঃ ঈঙ্গলহর্ন, এই বিপদের ভিতরে আমার ভগ্নীর আর থাকা উচিত নয়। ওকে আগে জাহাজে পাঠিয়ে দিন!"

কাপ্তেন সায় দিয়ে বললেন, "ঠিক বলেছেন মিঃ সেন! আচ্ছা, আমি এখনই সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

তখন ফটকের ওদিকে কঙ, আর এদিকে শত শত অসভ্য মহা ঠেলাঠেলি ও ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দিয়েছে! কয়েকজন জাহাজী-গোরাও অসভ্যদের সঙ্গে যোগদান করলে।

আগেই বলেছি, কঙ তার পা দিয়ে ফটকটা ফাঁক করে রেখেছিল। হঠাৎ সেই ফাঁকের ভিতর হাত চালিয়ে সে একসঙ্গে দুজন অসভ্য ও একজন গোরাকে খপ করে মুঠোর ভিতরে চেপে ধরলে এবং পরমুহূর্তেই সেই তিনজনের দেহ আকারহীন মাংসপিণ্ডে পরিণত হল।

কঙ ফটকের উপরে আবার এক প্রচণ্ড চাপ দিলে—সঙ্গে সঙ্গে ফটকের উপরদিকের একটা অংশ সশব্দে ভেঙে পড়ল। তারপর সে এমন ধাক্কার পর ধাক্কা মারতে লাগল যে, ফটকের বাকি অংশও হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে দেরি লাগল না।

সমুদ্র তীরে এসে দাঁড়াল যে প্রলয়য়ঙ্কর কালভৈরবের মূর্তি, তাকে দেখেই হাজার হাজার অসভ্য পঙ্গপালের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল! দুর্জয় ক্রোধে কঙ আজ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে; সে প্রত্যেকবার পা ফেলছে আর তার বৃহৎ পায়ের চাপে প্রতিবারেই তিন-চারজন করে লোকের দেহ ভেঙে চটকে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে কী সে গর্জন। সেই গর্জন শুনেই অনেকে মূর্ছিত হয়ে পড়ছে!

মানুষগুলো কে মরল, কে পালাল, আর কেই-বা বাঁচল সে সব দিকে কঙয়ের আজ কোন লক্ষ্যই নেই,—তার মুণ্ড চারিদিকে ঘুরছে, তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চারিদিকে ফিরছে,—কিন্তু যাকে অন্বেষণ করছে, তাকে যেন পাচ্ছে না!

কঙ খুঁজছে মালবিকাকে! সে সেই পুতুল-মেয়েকে আবার নিজের বাসায় নিয়ে যেতে চায়! কিন্তু মালবিকা তখন জাহাজে।

এইবারে কঙ অসভ্যদের গ্রামের দিকে ছুটল! সারি সারি কুঁড়েঘর। কঙ এক একবার হাত ছোড়ে আর এক একখানা ঘরের চাল উড়ে যায়—দেয়াল পড়ে যায়। কঙ অমনই সেই ঘরের ভিতরে হাত চালিয়ে যারা তার ভয়ে সেখানে গিয়ে লুকিয়েছিল, সেই ক্ষুদে ক্ষুদে ঘৃণ্য মানুষ-পোকাগুলোকে টেনে টেনে বার করে আনে, শূন্যে তুলে তাদের ভাল করে লক্ষ্য করে দেখে—তারপর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাদের ছুড়ে ফেলে দেয় এবং কাতর আর্তনাদ করে সে অভাগারা মাটিতে পড়ে ছটফট করতে করতে মরে যায়! কান্নায় আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ হয়ে গেল!

দেখতে দেখতে অত বড় গ্রামের সমস্ত ঘর তাসের বাড়ির মত ধুলায় লুটিয়ে পড়ল— তবু কঙ যাকে খুঁজছে, তাকে পেলে না! নিষ্ফল আক্রোশে সেই প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপের নিহত ও আহত দেহগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে কঙ তখন ভয়ঙ্কর চিৎকার করতে করতে বুক চাপড়াতে লাগল! সে চিৎকার জাহাজে মালবিকার কানেও পৌঁছল। শুনে সে ভয়ে শিউরে উঠল,—তবু কঙ আর তার মাঝখানে আছে সমুদ্রের তরঙ্গ, যার কাছে কঙয়ের শক্তি ব্যর্থ!

গ্রামের বাকি সমস্ত লোক তখন উচ্চ প্রাচীরের উপরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। প্রধান পুরোহিত ও তার চ্যালারা তখন কঙয়ের মেজাজ ঠাণ্ডা করবার জন্যে সমস্বরে স্তোত্রপাঠ আরম্ভ করলে! কিন্তু কঙ

শান্ত হবে কি, মানুষ-পোকাগুলো অমন একতানে ঘ্যানর ঘ্যানর করছে শুনে সে আরও রেগে যেন তিনটে হয়ে উঠল! রেগে দৌড়ে গিয়ে সে পাঁচিলের উপরে বার বার ধাক্কা মারতে লাগল। যখন দেখলে পাঁচিল একটু টললও না, তখন সুদীর্ঘ লাফ মেরে উপরে উঠবার চেষ্টা করলে। কিন্তু কঙয়ের দেহ বিশাল হলেও দেড়শ ফুট উঁচু পাঁচিলে লাফিয়ে উঠবার শক্তি তার ছিল না। তখন সে বড় বড় পাথর ছুড়তে শুরু করলে! সেই পাথরের ঘায়েও অনেক লোক হত ও আহত হল।

ওদিকে একেবারে সমুদ্রের জলের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল কাপ্তেন, শোভন, ডেনহাম ও নাবিকের দল। বেগতিক দেখলেই সমুদ্রে পাড়ি দেবার জন্যে তারা সবাই প্রস্তুত হয়েই আছে।

কঙ-এর কাণ্ড দেখে শোভন বললে, "মিঃ ঈঙ্গলহর্ন! আর তো এ দৃশ্য সহ্য হয় না! যত গণ্ডগোলের জন্যে অসভ্যরাই দায়ি বটে, কিন্তু তাদের যথেষ্ট শাস্তিই হয়েছে। ওরা অসভ্য হলেও মানুষ। আর কতক্ষণ হাত-পা গুটিয়ে চোখের সামনে এমন নরহত্যা দেখব?"

কাপ্তেন বললেন, "কিন্তু আমরা কি করব বলুন! কঙ যেখানে আছে তার চারিদিকেই গাছপালা আর জঙ্গল। সে খোলা জায়গায় না এলে আমাদের বোমা ব্যর্থ হতে পারে। ওই অসভ্য বনমানুষগুলোকে বাঁচাতে গিয়ে শেষটা কি নিজেরাই বিপদে পড়ব?"

কাপ্তেনের কথা ঠিক। শোভন আর কিছু বললে না।

এমন সময়ে হঠাৎ কঙ তাদের দেখতে পেলে। মালবিকার গায়ের রংয়ের মতন এদেরও গায়ের রং সাদা। তাহলে পুতুল মেয়েটা নিশ্চয় ওদেরই দলে আছে। বোধহয়, এমনিধারাই কিছু ভেবে কঙ আবার গজরাতে গজরাতে শোভনদের দিকে বেগে ছুটে এল!

কাপ্তেন তো তাই চান। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "সবাই হাতে এক একটা বিষাক্ত বোমা নাও। অতগুলো বোমা হয়ত দরকার হবে না, তবুও বলা তো যায় না—সাবধানের মার নেই!"

মূর্তিমান বিভীষিকার মত কঙ তেড়ে আসছে—তার হাঁ-করা মুখের ভিতর থেকে দাঁতগুলো ঠিক ইস্পাতের ছোরার মতন চকচক করছে, তার হাত দুখানা বড় বড় থামের মতন আকাশের দিকে উঠে গেছে, তার সমস্ত দেহখানা রাগের আবেগে ফুলে ফুলে উঠছে!

কাপ্তেন বীরবিক্রমে কঙের দিকে ছুটে এগিয়ে গেলেন। একটা নগণ্য মানুষ পোকাকে দম্ভভরে এগিয়ে আসতে দেখে কঙ আরও বেশি খাপ্পা হয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। পায়ের কড়ে আঙুলের টিপুনিতে যার নাড়ি-ভুঁড়ি বেরিয়ে পড়ে, সে চায় তার সঙ্গে লড়াই করতে! কী আস্পর্ধা!

কাপ্তেন তার দিকে টিপ করে বিষাক্ত গ্যাসের বোমা ছুড়লেন। বোমাটা কঙের আসবার পথের উপরে পড়ে গর্জে উঠল। কঙ অবাক হয়ে ভাবলে, ঐ একরত্তি জিনিস এতজোরে চ্যাঁচাতে পারে!

বোমার ধোঁয়ায় কঙের বিরাট দেহও ঢেকে গেল! সেই ধোঁয়ার বিশ্রী গন্ধটা তার মোটেই পছন্দ হল না—সে ভয়ানক কাশতে লাগল। তারপর শোভন এবং তারপর ডেনহামও তার দিকে এক একটা বোমা নিক্ষেপ করলে! ধোঁয়া যেন পুরু মেঘের মতন কঙকে গ্রাস করে ফেললে!

কাপ্তেন বললেন, 'ব্যস! দেখ, কি হয়! আর বোধহয় বোমা ছুড়তে হবে না!"

বোমার ধোঁয়ার ভিতর থেকে কঙ যখন বেরিয়ে এল, তখন তার আগেকার তেজ আর নেই। তার পা দুটো তখন মাতালের মতন টলমল করছে, মুণ্ডটা থেকে থেকে কাঁধের উপর কাৎ হয়ে পড়ছে এবং ক্রমাগত কাশির ধমকে তার দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে! কিন্তু সমুদ্রের তীরে সুদীর্ঘ কালো ছায়া ফেলে প্রচণ্ড কুম্ভকর্ণের মত কঙ আসছে— আসছে তবু আসছে! ভয় কাকে বলে তা সে জানে না!

কাপ্তেন বিপুল বিস্ময়ে বললেন, "এই একটা বোমা একদল মানুষকে অজ্ঞান করে দিতে পারে, কিন্তু ঐ আশ্চর্য দৈত্যটা তিন-তিনটে বোমা হজম করে ফেললে। আচ্ছা বন্ধু, আমরা এখনও ফতুর হইনি,—এই নাও, তোমাকে আর একটা বোমা উপহার দিলুম! আশা করি, এইবারে তুমি লক্ষ্মীছেলের মত ঘুমিয়ে পড়বে?"

চতুর্থ বোমাটা কঙয়ের বুকের উপরে দড়াম করে ফেটে আবার রাশি রাশি ধোঁয়া বমন করলে—সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতর থেকে খানিকটা জলীয় বিষ তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল! কঙ আর এক পাও চলতে পারলে না, তার চোখ তখন অন্ধ এবং দমও যেন বন্ধ হয়ে গেল,—তবু কোনরকমে একটা মানুষ-পোকাকে ধরবার জন্যে সামনের দিকে দুটো হাত বাড়িয়ে সমুদ্র তীরের বালির উপরে ধপাস করে সটান সে পড়ে গেল।

শোভনের মনে হল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে হিড়িম্বা-পুত্র রাক্ষস ঘটোৎকচও বোধহয় এমনই করেই ধরাশায়ী হয়েছিল!

ডেনহামের মনে হল, তার সামনে যেন বিশ-পঁচিশটা হাতি পাশাপাশি মরে পড়ে রয়েছে।

কাপ্তেন হাঁক দিলেন, "শিগগির মোটা লোহার শিকল দিয়ে ওর সর্বাঙ্গ বেঁধে ফেল। ভয় হচ্ছে? আর কোন ভয় নেই—কঙ এখন অন্তত তিন-চার ঘণ্টা খুব আরাম করে ঘুমোবে—একটা আঙুলও নাড়তে পারবে না। আমার বোমার গুণ কত!...তাড়াতাড়ি একটা বড় ভেলা তৈরি করে ফেল! কঙয়ের ওই ছোট্ট খোকার মত দেহখানি তো জাহাজে তোলা চলবে না, জাহাজের সঙ্গে ভেলায় করে ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে হবে! যাও, যাও, ভ্যাবাকান্তের মত হাঁ করে দেখছ কি?"

শোভন বললে, "কঙয়ের কাছে লোহার শিকল হয়ত ফুলের মালার মতন পলকা!—ও কি বাঁধা থাকতে রাজি হবে?"

কাপ্তেন বললেন, "রাজি হয় কি না হয়, সেটা পরে বোঝা যাবে! কঙ, কঙ, কঙ! রাজা কঙ! সবাই কঙ কঙ করে ভয়েই সারা! এই দ্বীপেই সে রাজা, সভ্য দেশে সে পশু মাত্র! যে কোন পশুকে মানুষ একটা মস্ত বড় শিক্ষা দিতে পারে। সেটা হচ্ছে, ভয়! মানুষ—হাতি, বাঘ, সিংহকে বশে রেখেছে এই ভয় দেখিয়েই। কঙকেও আমরা শিখিয়ে দেব, ভয় কাকে বলে! তারপর সে বশ মানে কিনা দেখা যাবে। লোহার শিকলে নয়, ভয়ে এই পশু কঙ আমাদের গোলাম হয়ে থাকবে!"

ওদিকে পাঁচিলের উপর থেকে বিস্ময়ে চোখ ছানাবড়ার মতন ডাগর করে অসভ্যরা অবাক হয়ে দেখতে লাগল, তাদের বিশ্ববিজয়ী রাজা কঙকে ওই বিদেশিরা লোহার শিকলে বেঁধে ভেলায় করে নিয়ে যাচ্ছে।

প্রধান পুরোহিত ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "ভেটো খোটো হোটো ধোটো ঘংচা!"

রাজাও চোখের জল মুছতে মুছতে বললে, "হাভা ডাভা খাভা তাভা খোংখু!"

এ সব কথার মানে কি জানি না। বোধহয় খুবই দুঃখ-শোকের কথা!

কাপ্তেন শোভনের পিঠ চাপড়ে বললেন, "মিঃ সেন! আপনি বীর বটে! রূপকথার রাজপুত্রের মত আপনি এই দৈত্যটার হাত থেকে আপনার ভগ্নীকে উদ্ধার করে এনেছেন!...এই কঙকে নিয়ে আমি পৃথিবীর বড় বড় সব শহরে ঘুরে বেড়াব, আর আপনার সম্মানের জন্যে সর্বপ্রথমে যাব কলকাতা শহরেই!"

তের

"পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য"

সারা কলকাতার লোক আজ সেন্ট্রাল এভিনিউয়ের এক মাঠের দিকে সমুদ্রের তরঙ্গের পর তরঙ্গের মতন ছুটে চলেছে!

সারা কলকাতার ছোটবড় বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে সচিত্র বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে একটা গগনস্পর্শী গরিলার ছবি এবং তার তলায় মস্ত বড় হরফে লেখা রয়েছে—"**রাজা কঙ, পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময়!**"

সারা কলকাতায় সমস্ত ছেলেমেয়ে আজ প্রতিজ্ঞা করেছে, রাজা কঙকে স্বচক্ষে না দেখে, কেউ আর ইস্কুলের কোন কিতাব স্পর্শ করবে না।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে যেসব 'ট্রাফিক-কনস্টেবল' পাহারা দেয়, মানুষের ভিড়ের চোটে আর গাড়ির ঠেলায় অস্থির হয়ে তারা রাজা কঙয়ের উদ্দেশে অভিশাপ বৃষ্টি করছে!

রাজা কঙকে আজ তিনবার দেখানো হবে! কলকাতার কোন বায়স্কোপ ও থিয়েটারে আজ একখানাও টিকিট বিক্রি হয়নি। ক্যালকাটা-মোহনবাগানের খেলার মাঠে চেঁচিয়ে গলা ভাঙবার, হাততালি দেবার ও রেফারিকে গালাগালি দিয়ে খুশি হবার জন্যে একজন লোকও যায়নি!

খবরের কাগজওয়ালাদের মুখে আজ হাসি আর ধরছে না। মালবিকার বিপদের ও শোভনের বীরত্বের কাহিনী ছাপিয়ে কাগজওয়ালারা আজ যত কাগজ বিক্রি করেছে, সারা বছরেও তত বিক্রি হয় না!

মাঠে আজ মস্ত তাঁবু পড়েছে এবং তাঁবুর ভিতরে-বাইরে জনতার মধ্যে কেবল হাজার হাজার কালো মাথা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। তিনবারের প্রদর্শনীর সমস্ত টিকিটই বিক্রি হয়ে গেছে। ধুমধামপুরের জমিদার দুমদাম দে এবং প্যান-প্যানগড়ের মহারাজ ভ্যান ভ্যান সিং নাকি এক একখানি টিকিটের জন্যে যথাক্রমে পাঁচশ ও হাজার টাকা দিতে চেয়েও একটুখানি দাঁড়াবার ঠাঁই পর্যন্ত পাননি!

ফুলস্টপ কোম্পানির বড় সাহেব মিঃ সেমিকোলন ও তাঁর স্ত্রী মিসেস কমা রাজা কঙকে দেখবার আগ্রহে চল্লিশ টাকার একখানি 'বক্স' অতি কষ্টে কিনতে পেরেছিলেন। তাঁবুর ভিতরে এসে দূর থেকে রাজা কঙয়ের গর্জন শুনেই তাঁদের কান নাকি কালা হয়ে গিয়েছে! এবং পাছে রাজা কঙকে দেখলে চোখ তাঁদের কানা হয়ে যায়, সেই ভয়ে নাকি তাঁরা চোখে ঠুলি পরবার জন্যে আবার বেরিয়ে গেছেন!

ভিড়ের জন্যে চৌরঙ্গির মোড় পার হতে না পেরে তিতুরাম তাঁতি সেইখানেই পঁচিশ-ত্রিশ জন শ্রোতার কাছে রীতিমত আসর জমিয়ে বলছে—"ভায়ারা, রাজা কঙ সোজা লোক নন! তিনি তাঁর দেশে শুয়ে যখন ঘুমোতেন,—বুঝলে কিনা—তাঁর ঠ্যাং থাকত পাতালে, ধড় থাকত পৃথিবীতে, আর বুঝলে কিনা মুণ্ডটা থাকত আকাশের চাঁদের পাশে!"

একজন অবিশ্বাসী শ্রোতা বললে, "তাহলে ঐটুকু তাঁবুতে তিনি কেমন করে মাথা গুঁজে আছেন?"

তিতুরাম তাঁতি একগাল হেসে বললে, "আরে মুখ্যু, তাও জান না! রাজা কঙ যে —বুঝলে কিনা—ত্রেতার বীর হনুমানের ভায়রাভাই! হিঁদুর বেটা হয়ে তুমি কি এও শোন নি যে, হনুমানজী ইচ্ছে করলেই কড়ে আঙুলটির মতন ছোট্টটি হতে পারতেন? রাজা কঙও সেই বিদ্যে জানেন, ছোট তাঁবুতে ছোটটি হয়ে আছেন।"

একজন মাড়োয়ারি ভুঁড়ি চুলকোচ্ছিল, হনুমানজীর নাম শুনেই ভুঁড়ি চুলকানো ভুলে, উদ্দেশ্যে প্রণাম করে বললে, "হাঁ বাবু সাব, ও বাত ঠিক হ্যায়!"

আর একজন তিতুরামকে শুধোল, "এত খবর তুমি কোথা থেকে পেলে?

তিতুরাম তাঁতি ফিক করে আবার একটু হেসে বললে, "খবর কি অমনি পাওয়া যায় ভায়া, খবর রাখতে হয়! আমি খবর পাব না তো খবর পাবে কে? আমার শাশুড়ির বোনঝির মামীশাশুড়ির বোনঝি যে—বুঝলে কিনা—ওই শোভন ছোকরার পিসেমশাইয়ের মামাশ্বশুর বাড়িতে—বুঝলে কিনা—কাপড় বেচতে যান!"

এত বড় প্রমাণের পরে আর কথা চলে না। অতএব সবাই তিতুরাম তাঁতিকে একজন সত্যবাদী লোক বলেই মেনে নিলে।

শহরের হাটে-মাঠে-বাটে এমনই নানান রকম গুজবের অন্ত নেই! সকলের ভাগ্যে রাজা কঙয়ের সঙ্গে দেখা করবার সুবিধা তো ঘটল না, কাজেই আজ কঙ সম্বন্ধে যে যেমন কথাই বলুক না কেন, সকলেই তা বিশ্বাস করে খুশি হচ্ছে!

কিন্তু আজ কাপ্তেন ঈঙ্গলহর্নের চেয়ে বেশি খুশি কেউ নয়! তিনি ব্যাপার দেখে স্থির করেছেন, এইবারে জাহাজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীর শহরে শহরে কঙকে দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করবেন!

ডেনহামকে ডেকে তিনি বললেন, "আর তুমি ছোকরা হবে আমার ম্যানেজার। আমার যা লাভ হবে, তা থেকে তুমি দু-আনা অংশ পাবে। আমি একলাই সব টাকা হজম করতে চাই না।"

ডেনহাম হেসে বললে, "বেশ, ও সব কথা নিয়ে পরে আলোচনা করব! কিন্তু আপাতত যে ভারি বিপদ উপস্থিত!"

কাপ্তেন ব্যস্ত হয়ে বললেন, "বিপদ! কিসের বিপদ? কঙ কি খাঁচার দরজা ভেঙে ফেলেছে?"

ডেনহাম বললে, "না, আজ সে দরজা ভাঙেনি—তবে পরে একদিন হয়ত ভাঙবে।"

—"তবে আবার বিপদ কিসের?"

—"মিঃ সেন আর মিস সেন দর্শকদের সামনে আসতে রাজি হচ্ছে না!"

—"কেন? আমি তো স্বীকার করেছি, তাঁদের বীরত্বের পুরস্কারের জন্যে আজকের টিকিট বিক্রির সব টাকা তাঁদেরই আমি উপহার দেব!"

—ডেনহাম ঘাড় নেড়ে বললে, "না, না সেজন্যে তাদের আপত্তি নয়! টিকিট বিক্রির টাকা তাঁরা চান না! তাঁরা বলছেন, এমন ভাবে সকলের সামনে আসতে তাঁদের লজ্জা করছে!"

ডেনহামের পিঠে এক আদরের চড় মেরে কাপ্তেন বললেন, "ওঃ, এইজন্যে তুমি এত ভাবছ? কোন ভাবনা নেই,—তাঁদের এখানে নিয়ে এস, আমি ঠিক রাজি করাব!"

ডেনহাম বেরিয়ে গেল এবং শোভন ও মালবিকাকে নিয়ে আবার ফিরে এল।

কাপ্তেন বললেন, "আপনারা দর্শকদের সামনে আসতে রাজি নন কেন?"

শোভন বললে, "কারণ তো মিঃ ডেনহামকে আগেই বলেছি।"

কাপ্তেন বললেন, "তাহলে আমার মান কোথায় থাকবে? সমস্ত কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি, আজকের প্রদর্শনীতে এলে সবাই আপনাদেরও দেখতে পাবে! আপনাদের একবার চোখের দেখা দেখবার জন্যে আজ কত লোক টিকিট কিনেছে, আপনারা কি সে খবরটা রাখেন? কঙয়ের সামনে

দাঁড়িয়ে, কেমন করে তাকে ধরা হল যখন সেই গল্প বল হবে, তখন লোকে আপনাদের খুঁজবে। কিন্তু তখন আমি কি বলব?"

শোভন বললে, "আপনি টিকিট বিক্রি করছেন বলেই তো আমাদের আপত্তি।"

—"কেন? আজকের টাকা তো আমি নিজের পকেটে পু্ছি না। এ সবই তো আপনাদের!"

শোভন একটু বিরক্ত স্বরে বললে, আমাদের আসল আপত্তি তো সেইজন্যেই! আমরা কি থিয়েটারের অভিনেতা, না সার্কাসের খেলোয়াড় যে, টাকার লোভে লোকের কৌতূহল মেটাতে আসব? না, মিঃ ঈঙ্গলহর্ন, আমাদের দিয়ে এ কাজ হবে না!"

কাপ্তেন মুশকিলে পড়ে হতাশভাবে বললেন, "তা হলে আমার কি উপায় হবে? লোকে যে আমাকে মারতে আসবে!"

কাপ্তেনের মুখ দেখে মালবিকার মায়া হল! খানিকক্ষণ ভেবে সে বললে, "আচ্ছা, যখন অন্য উপায় নেই, তখন কি আর করা যাবে? তবে আমরা এক শর্তে রাজি হতে পারি। আজকের টিকিট বিক্রির এক পয়সাও আমরা নেব না। কি বল দাদা?"

শোভন বললে, "এ প্রস্তাব তবু মন্দের ভাল!"

কাপ্তেন বললেন, "খামখা এতগুলো টাকা ছেড়ে দেবেন?"

শোভন বললে, 'টাকার লোভে আমরা মনুষ্যত্ব বিক্রি করতে পারব না।"

কাপ্তেন উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন, "সাধু! সাধু! আপনাদের যতই দেখছি, আপনাদের ওপরে আমার শ্রদ্ধা ততই বেড়ে উঠছে। এইবার চলুন—প্রথম প্রদর্শনীর সময় হয়েছে।"

চৌদ্দ

কঙয়ের জাগরণ

কঙ বসে আছে। কিন্তু আজ আর সে রাজা কঙ নয়! বেজায় মজবুত ইস্পাতের খাঁচার ভিতরে, সর্বাঙ্গে ইস্পাতের শিকলের বাঁধন নিয়ে পর্বতের ভেঙে পড়া শিখরের মতো স্তব্ধ হয়ে, হেঁট মাথায়, ম্রিয়মাণ মুখে সে বসে আছে। মোটা লোহার চেনে তার প্রকাণ্ড হাত ও পা বাঁধা। সমস্ত দেহের মধ্যে মাঝে মাঝে নড়ছে কেবল তার চোখ দুটো।

তাকে দেখলে দুঃখ হয় সত্য সত্যই। কী অধঃপতন! আকাশ ছোঁয়া সেই খুলি-পাহাড়ের শিখর। সে ছাড়া আর কোন জীবজন্তুর ছায়া সেখানে পড়েনি! তার উপর দিয়ে বয়ে যেত মেঘের সার আর ঝোড়ো হাওয়া এবং নিচে দিয়ে বয়ে যেত অনন্ত মহাসাগর! সেইখানে বসে বসে কঙ তার দ্বীপ-রাজ্য শাসন করত। অরণ্যবাসী ভয়ঙ্কর সব দানব জন্তু—যাদের লাঙ্গুলের আঘাত লাগলে বড় বড় শাল, তাল, দেবদারু গাছ ধুলো হয়ে উড়ে যায়, যাদের পায়ের ভারে মেদিনী টলমল করে, —কঙয়ের বলিষ্ঠ বাহু তাদেরও দর্পচূর্ণ করেছে! যেসব পুঁচকে মানুষ-পোকাগুলো তাকে খুশি রাখবার জন্য পূজা করত, বৎসরে বৎসরে বউ যোগাত, কঙ একটা নিশ্বাস ফেললে, হয়ত যারা ঝড়ের তোড়ে শুকনো পাতার মত হুস করে কোথায় উড়ে যায়, দৈব-বিড়ম্বনায় আজ কিনা সেই ঘৃণ্য কীটগুলোই তাকে কুকুর-বিড়ালের মত বেঁধে রেখে দিয়েছে, পরম অবহেলাভরে তার সমুখ দিয়ে আনাগোনা করছে! যদিও এই পোকাগুলোর ভাষা সে জানে না, তবু এটুকু তার বুঝতে বাকি থাকছে না, প্রায়ই তাকে একটা তুচ্ছ

জীব ভেবে তারা নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-তামাসা করে, তাকে টিটকিরি দেয়! হাতি পাঁকে পড়লে ব্যাঙও তাই নিয়ে কৌতুক-বিদ্রূপ করতে ছাড়ে না! হায় রে অদৃষ্ট!...

কয়েকজন খবরের কাগজের 'রিপোর্টার'কে নিয়ে কাপ্তেন এলেন,—তাঁর পিছনে পিছনে ডেনহাম, শোভন ও মালবিকা!

মালবিকা সহজে সেখানে আসতে রাজি হচ্ছে না, বলছে, "না মিঃ ডেনহাম, আপনি জানেন না, কঙকে দেখলেই আমার বুক ধুক ধুক করে, ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে যায়!"

ডেনহাম বললে, "মিস সেন, আপনি মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন! এর মধ্যে ইস্পাতের খাঁচা, শিকল আর চাবুকের মহিমায় কঙয়ের সব জারিজুরি আর জাঁক আমরা ভেঙে দিয়েছি। এখন সে পোষা খরগোসের মত শান্ত হয়ে পড়েছে!"

মালবিকা ভয়ে ভয়ে তার দাদার পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল।

"দেশবন্ধু" পত্রের রিপোর্টার অনেক তফাতে দাঁড়িয়ে বললেন, "বাঁদরটার শিকল বেশ শক্ত তো!"

"বঙ্গবীর" পত্রের রিপোর্টার ক্যামেরা নিয়ে এসেছেন কঙয়ের একখানা ফটো তুলতে। কিন্তু তিনি ফটো তুলবেন কি, কঙয়ের চেহারা দেখে তাঁরই দাঁতে দাঁত লেগে গেল!

"যুবক ভারত"-এর রিপোর্টার খাঁচার ভিতরে একবার উঁকি মেরেই তুষ্ট হয়ে কাঁপতে কাঁপতে চলে গেলেন।

হঠাৎ বাইরে ঘণ্টা বেজে উঠল। কাপ্তেন বললেন, "আর সময় নেই। কঙকে দর্শকদের সামনে নিয়ে চল।"

খাঁচার তলায় ছিল চাকা। প্রায় দুশ কুলি এসে দড়ি দিয়ে "হেঁইও জোয়ান হো" বলে খাঁচাটাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল।

তাঁবুর ভিতরে দর্শকদের আসনে তখন আর তিলধারণের ঠাঁই নেই।

এতক্ষণ সেখানে বাজে গোলমালে ও তর্ক-বিতর্কে কান পাতবার যো ছিল না—কিন্তু এখন রাজা কঙ সশরীরে আসছেন শুনে, "পৃথিবীর এই অষ্টম বিস্ময়"কে স্বচক্ষে দেখবে বলে, সকলে রুদ্ধশ্বাসে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল।

তারপর কঙয়ের মূর্তি দেখে চারিদিকে বিস্ময়ের যে বিপুল চিৎকার উঠল, তা বর্ণনা করা যায় না। প্রথম কয়েক সারে বেশি দামি আসনে যে সব ধনী বাঙালি ও সাহেব-মেম বসে ছিল, তারা তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে পিছনে সরে গেল। অনেক মেম মূর্ছিত হয়ে পড়ল, এবং সমস্ত বালক-বালিকা একতানে কান্নার কন্সার্ট শোনাতে শুরু করলে!

তবু কঙয়ের দাঁড়ানো মূর্তির ভয়ানক ভাবটা কেউ দেখতে পেলে না, —কারণ খাঁচার ভিতরে কঙ জড়সড় হয়ে মাথা হেঁট করে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছিল!

এমন সময়ে দর্শকদের আগ্রহে ও অনুরোধে কাপ্তেন সাহেব শোভন ও মালবিকাকে এনে খাঁচার পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

এতক্ষণ কঙ টুঁ-শব্দটিও করেনি। তার অত্যন্ত নির্বিকার ভাব দেখে কাপ্তেন সাহেব স্থির করেছিলেন যে, সে ভয়েই এমন চুপ মেরে আছে।

কিন্তু এখন, মালবিকা যেমনি খাঁচার পাশে এসে দাঁড়াল, কঙ অমনি চমকে মুখ তুলে বাজের মতন চেঁচিয়ে উঠল!

পরমুহূর্তে সেই মস্ত তাঁবুর আধখানা খালি হয়ে গেল—দর্শকরা আঁতকে উঠে এ ওর ঘাড়ে পড়ে তীরের মতন বেগে পালাতে লাগল! যারা অত্যন্ত সাহসী তারাও আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—এবং তাদেরও ভাব দেখলে বোঝা যায়, আর একটু বাড়াবাড়ি হলে তারাও পলায়ন করবার জন্যে রীতিমত প্রস্তুত হয়েই আছে।

কাপ্তেন গলা তুলে বললেন, "ভদ্রমহোদয়গণ ও মহোদয়াগণ! আপনারা মিথ্যা ভয় পাবেন না। কারণ, কঙয়ের শিকল 'ক্রোম স্টিলে' প্রস্তুত—এ শিকল ছেড়া অসম্ভব!"

মালবিকার মুখও তখন ভয়ে সাদা হয়ে গেছে! একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে সেও কয়েক পা পিছিয়ে এল।

শোভন তার কানে কানে বললে, "সবাই জানে আমরাই কঙকে বন্দী করে এনেছি। মালবি, এত লোকের সামনে ভয় পেও না, সবাই ঠাট্টা করবে!"

কঙয়ের হাত-পায়ের শিকলগুলো হঠাৎ ঝনঝনিয়ে বেজে উঠল!

মালবিকা বললে, "দাদা, কঙয়ের চোখ দেখ! ও কি রকম ভাবে আমার পানে তাকিয়ে আছে! কাপ্তেনকে বল,—ওঁর যা বলবার, তাড়াতাড়ি সেরে নিন; নইলে হয়ত আমি অজ্ঞান হয়ে যাব!"

শোভন বললে, "মিঃ ঈঙ্গলহর্ন, আর দেরি করবেন না, যা বলতে হয় চট করে বলে ফেলুন। আমার ভগ্নী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন!"

কাপ্তেন আবার গলা তুলে বললেন, "ভদ্রমহোদয়গণ ও মহোদয়াগণ—"

শিকলগুলো এবার বড় জোরে বেজে উঠল,—কাপ্তেন স্তম্ভিত নেত্রে দেখলেন, কঙয়ের হাত ও পা থেকে শিকলের বাঁধন খুলে পড়েছে। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—"ডেনহাম! ডেনহাম! শিগগির কুলিদের ডাক!"

কিন্তু তাঁর মুখের কথা মুখেই রইল—শূন্যে মুখ তুলে কঙ আর একবার বিকট গর্জন করে আচম্বিতে উঠে দাঁড়াল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই মজবুত ইস্পাতে তৈরি ছাদ ঝনঝনিয়ে বেজে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কঙয়ের মাথা তখন প্রায় তাঁবুর ছাদে গিয়ে ঠেকল।

তাঁবুর দরজার কাছে দর্শকদের ভিতরে তখন রীতিমত যুদ্ধ বেধে গেছে—কে আগে পালাবে তাই নিয়ে। অনেক ভিড়ে ধাক্কা সইতে না পেরে মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল—পিছনের লোকেরা তাদেরই দেহ মায়ে থেঁতলে এগিয়ে যেতে লাগল! ভীত চিৎকারে, আহতদের আর্তনাদে চারিদিক পরিপূর্ণ হয়ে গেল!

ইতিমধ্যে শোভনও তাড়াতাড়ি মালবিকার মূর্ছিত দেহকে কাঁধে তুলে নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ডেনহাম একটা গ্যালারির তলায় আশ্রয় নিলে, কাপ্তেনও তার পিছনে পিছনে গ্যালারির ফাঁক দিয়ে দিয়ে ভিতরে ঢুকতে গেলেন—কিন্তু গ্যালারির দুই তক্তার মাঝখানে গেল তাঁর হৃষ্টপুষ্ট ভুঁড়িটা আটকে। অসহায় ভাবে দুই পা শূন্যে ছুড়তে ছুড়তে তিনি বললেন, "ডেনহাম। আমাকে বাঁচাও—কঙ আমাকে ধরলে বুঝি!"

ডেনহাম প্রাণপণ শক্তিতে তাঁর দুই হাত ধরে টেনে-হিঁচড়ে কোনরকমে তাঁকে ভিতরে টেনে নিলে!

দুই পদাঘাতে সমস্ত খাঁচা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে দৈত্য কঙ বাইরে এসে দাঁড়াল!

একজন সার্জেন্ট তাকে লক্ষ্য করে পাঁচ-ছয়বার রিভলবার ছুড়লে, কিন্তু কঙ সেসব গ্রাহ্যও করলে

না। সে একটানে সমস্ত তাঁবুটা ছিঁড়ে উপড়ে আকাশের দিকে এক টুকরো ন্যাকড়ার মতন উড়িয়ে দিলে এবং তারপর পায়ের তলায় কলকাতা শহরের দিকে সক্রোধে তাকিয়ে হুঙ্কারের পর হুঙ্কার দিতে লাগল!

পনের

কঙয়ের কথা ফুরুলো

নিজের বাড়িতে ফিরে বিছানায় শুয়ে মালবিকা তখন কাঁদছিল।

শোভন বললে, "মালবি, তুই এত ভিতু, আমি তা জানতুম না!"

মালবিকা বললে, "দাদা, দাদা! আর আমি সইতে পারছি না! কঙ ছাড়া পেয়েছে! সে আবার আমাকে সেই দ্বীপে ধরে নিয়ে যাবে!"

তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে শোভন বললে, "দূর পাগলি। সে তোর খোঁজ পেলে তো।"

মালবিকা বললে, "না দাদা, আমার মন বলছে, সে আবার আসবে।"

—"হুঁ, আসবে, না আরও কিছু। এটা অসভ্যদের দ্বীপ নয়, এ হচ্ছে কলকাতা শহর। এতক্ষণে কঙ হয়ত আবার গ্রেপ্তার হয়েছে।"

তবুও মালবিকা প্রবোধ মানলে না, উঁ-উঁ করে কাঁদতে লাগল।

শোভন বললে, "ভারি মুস্কিলে পড়লুম দেখছি। কোথাও কিছু নেই, নিজের ঘরের বিছানায় শুয়ে আছে, তবু কচি খুকির মত কান্না। আচ্ছা বাপু, একটু সবুর কর, আমি লালবাজারের থানায় টেলিফোন করে খবর এনে দিচ্ছি। কেমন, তাহলে ঠাণ্ডা হবি তো?"

মালবিকা সজল চোখে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না দাদা, তুমি যেয়ো না—তোমার পায়ে পড়ি। আমি একলা থাকতে পারব না।"

—"যত বাজে ভয়! চুপ করে শুয়ে থাক ফোন করে আমি এখনই আসছি"—বলতে বলতে শোভন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

লালবাজারের সঙ্গে ফোনের যোগ করে শোভন বললে, "হ্যাঁ, আমি হচ্ছি শোভন সেন। হ্যাঁ, আমারই ভগ্নীকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল! আমার ভগ্নী বড় ভয় পেয়েছেন, পাছে কঙ আবার তাঁকে ধরে...কঙ আবার বন্দি হয়েছে তো? কি বললেন? বন্দি হয়নি? তবে সে এখন কোথায়? পাগলের মত চৌরঙ্গীর বাড়িতে বাড়িতে ঘরে ঘরে উঁকি দিয়ে দেখছে? কারুকে আক্রমণ করেছে কি? করেনি? তার পায়ের চাপে অনেক লোক মারা পড়েছে? সে থিয়েটার রোডের ভেতরে ঢুকেছে?...আচ্ছা, ধন্যবাদ!"

রিসিভারটা যখন রেখে দিলে, শোভনের হাত তখন ঠক ঠক করে কাঁপছে! কঙ থিয়েটার রোডে ঢুকছে! তাদের বাড়িও যে থিয়েটার রোডেই।

মালবিকাকে সাবধান করে দেবার জন্যে শোভন তাড়াতাড়ি তার ঘরে ছুটে এল। দরজা খুলে ঘরে ঢুকেই দেখলে, মালবিকার বিছানা খালি, জানলার গরাদে ভাঙা এবং থামের মতন মোটা মোটা দুখানা কালো রোমশ পা, জানলার সামনে দিয়ে উপর দিকে উঠে যাচ্ছে।

বেগে ছাদের উপরে গিয়ে সে দেখলে, তার বাড়ির ছাদ থেকে কঙ খুব সহজেই লাফ মেরে থিয়েটার রোড পার হয়ে ওপাশের এক বাড়ির উপরে গিয়ে পড়ল এবং তার হাতের চেটোয় রয়েছে মালবিকার অচেতন দেহ! পর মুহূর্তে আর এক লাফে কঙ একেবারে অদৃশ্য।

পাগলের মতন ছুটে রাস্তায় এসে শোভন দেখলে, সেখানে জনতার সীমা নেই। লরির পরে লরি ছুটে আসছে, তাদের উপরে দলে দলে পাহারাওয়ালা, ...সার্জেন্ট ও মিলিটারি পুলিসের লোক!

পুলিসের একজন বড় কর্তা উত্তেজিত স্বরে বলছে, "ও জানোয়ারটা অমন শক্ত চেন ছিঁড়লে কেমন করে? অমন ইস্পাতের চেন দিয়ে যুদ্ধের 'ট্যাঙ্ক' পর্যন্ত আটকে রাখা যায়!...ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন কর! শিগগির লম্বা মই নিয়ে তাদের লোকজনকে আসতে বল! বদমাইসটা ছাদে ছাদে লাফিয়ে যাচ্ছে; আমাদেরও দেখছি ছাদে ছাদে তার সঙ্গে যেতে হবে!"

আরও অনেক পুলিসের লোকের সঙ্গে মোটরে করে কাপ্তেনসাহেব ও ডেনহাম এসে হাজির।

শোভন বললে, "মিঃ ঈঙ্গলহর্ন! কঙ আমার বোনকে নিয়ে পালিয়েছে!"

দূরের একটা বাড়ির ছাদে কঙয়ের বিশাল দেহ একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

—"পশুটা আবার চৌরঙ্গীর দিকে যাচ্ছে! ওদিকে চল, পথ সাফ কর!"

মিলিটারি-পুলিসের অনেকগুলো বন্দুক একসঙ্গে গর্জন করে উঠল!

ডেনহাম তাড়াতাড়ি তাদের কাছে গিয়ে বললে, "সাবধানে বন্দুক ছোড়! কঙয়ের হাতে এক মহিলা আছেন!"

কিন্তু কোথায় কঙ? পুলিসের লরিগুলো বেগে পশ্চিম দিকে ছুটেছে!

একজন ট্যাক্সি চালক পশ্চিম দিক থেকে গাড়ি ছুটিয়ে আসছিল বা পালাচ্ছিল। একজন সার্জেন্ট তাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কঙকে দেখেছ?"

সে বিস্ময়ে প্রায়-রুদ্ধ স্বরে বললে, "কে কঙ, তা আমি জানি না। কিন্তু আমি একটা তালগাছের মত উঁচু ভূতকে পার্ক স্ট্রিটের এপাশের ছাদ থেকে ওপাশের ছাদে লাফিয়ে যেতে দেখেছি।" বলেই সে আবার গাড়ি চালিয়ে পলায়ন করলে।

—"সবাই পার্ক স্ট্রিটের দিকে চল—পার্ক স্ট্রিটের দিকে।"

পুলিস-কমিশনার কাপ্তেনকে ডেকে শুধোলোন, "মেশিনগানের বুলেট কি তোমার এই পোষা দৈত্যকে বধ করতে পারবে?"

কাপ্তেন বললেন, "অনেকগুলো মেসিনগান ছুঁড়লে ফল হলেও হতে পারে।"

—"আচ্ছা, আগে তাকে কোণঠাসা করা যাক!"

একজন সার্জেন্ট বললে, "কিন্তু আমরা যে তার নাগালই ধরতে পারছি না।"

দূর থেকে আবার অনেকগুলো বন্দুকের শব্দ শোনা গেল।

—"ওরা বোধহয় তাকে দেখেছে। ওইদিকে গাড়ি চালাও।"

গাড়ি পার্ক স্ট্রিট পার হতেই একজন পাহারাওয়ালা খবর দিলে, কঙ যাদুঘরের ছাদে গিয়ে চড়েছে!

যাদুঘরের কাছে গিয়ে দেখা গেল, কঙ সেখানেও নেই।

কমিশনার বললেন, "হতভাগাটা আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মারবে দেখছি। ও যে কোথায় যেতে চায়, কিছুই যে বোঝা যাচ্ছে না!"

ডেনহাম বললে, "আমার বোধহয় সে খুব একটা উঁচু জায়গা খুঁজছে! কঙ পাহাড়ের জীব। উঁচুতে উঠতে পারলেই সে বোধহয় মনে করে, শত্রুরা তার কোনই অনিষ্ট করতে পারবে না!"

কমিশনার বললেন, "খুব সম্ভব তাই। কঙ বোধহয় উঁচু জায়গাই খুঁজছে! তাহলে অক্টারলনি মনুমেন্টই হচ্ছে তার যোগ্য জায়গা!"

একজন ইনস্পেক্টর বললে, "রাস্তার ভিড় কর্পোরেশন স্ট্রিটের কাছে গিয়ে জমেছে! কঙ বোধহয় ওইখানেই আছে।"

মোটরগুলো আবার ছুটল।

একটু গিয়েই এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল!

হোয়াইটওয়ে লেডল-র উঁচু গম্বুজের উপর থেকে হাত পা দিয়ে দেওয়াল জড়িয়ে বিরাট ও কৃষ্ণবর্ণ এক দৈত্যমূর্তি নিচের দিকে নেমে আসছে।

ডেনহাম বললে, "কি আশ্চর্য! কঙ যে টিকটিকির মত দেওয়াল বেয়ে নেমে আসছে!

কঙ খানিকটা নেমে এসেই পথের উপর লাফিয়ে পড়ল। একবার চারদিকে চেয়ে দেখে মেঘগর্জনের মত চিৎকার করলে। রাজপথের জনতা চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল!

কঙ এক লাফে চৌরঙ্গী রোড পার হল। পথের পাশে একখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল, বিষম আক্রোশে কঙ সেখানা একহাতে তুলে নিয়ে ছোট্ট একটা দেশলাইয়ের বাক্সের মতই ছুড়ে ফেলে দিলে—গাড়িখানা শূন্যে ঘুরতে ঘুরতে শোভাবাজারের খেলার মাঠের উপরে গিয়ে পড়ে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল!

ততক্ষণে মেশিনগান এসে পড়েছিল। জনকয় লোক সেই কলের কামান চালাবার উপক্রম করাতে কমিশনার বাধা দিয়ে বললেন, "কামান ছুড়ো না। ওর হাতে একটি মহিলা রয়েছেন!"

কঙয়ের হাতের চেটোয় মালবিকাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। বাড়ির দেওয়াল বেয়ে নামবার সময়েও কঙ তার এ হাতখানা ব্যবহার করেনি।

আরও গোটাকয়েক লাফ—কঙ একেবারে মনুমেন্টের কাছে গিয়ে হাজির!

কমিশনার বললেন, "যা ভেবেছি তাই! দেখ, দেখ, জানোয়ারটা মনুমেন্ট জড়িয়ে কত তাড়াতাড়ি ওপরে উঠছে!"

একজন ইনস্পেক্টর বললে, "এখন উপায়? ওকে কেমন করে আমরা ধরব? সবচেয়ে মুস্কিল হচ্ছে, ওকে গুলি করেও মারতে পারব না। তাহলে গুলি ওই মেয়েটির গায়ে লাগতে পারে!"

কাপ্তেন বললেন, "এরোপ্লেন আনলে কেমন হয়?"

কমিশনার বললেন, "ঠিক বলেছ। আমরা সেই ব্যবস্থাই করব। ওর কাছে যাবার আর কোন উপায় নেই!"

শোভন বললে, "মিঃ ডেনহাম, আমাকে আর একবার কঙয়ের কাছে যেতে হবে!"

—"কেমন করে যাবেন?"

—"আমি মনুমেন্টের ভিতর দিয়ে উপরে উঠব। তাহলে হয়ত মালবিকাকে আবার বাঁচালেও বাঁচাতে পারি।"

—"আচ্ছা, চলুন,—আমি আপনার সঙ্গে যাব।"

কঙ তখন মনুমেন্টের আধাআধি পার হয়ে গেছে। সে এক একবার নিচের দিকে তাকায়, গর্জন করে, আবার উপরে ওঠে। তার চেহারা ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে,—উচ্চতার জন্যে!

শোভন ও ডেনহাম মনুমেন্টের নোংরা ও অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি উপরে উঠতে লাগল। তাদের খালি ভয় হতে লাগল যে, কঙয়ের প্রকাণ্ড দেহের ভার সইতে না পেরে মনুমেন্টের এই পুরানো ইটের গাঁথুনি যদি হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে! তাহলেই তো সব শেষ। কঙ মরবে,—মরুকগে। কিন্তু

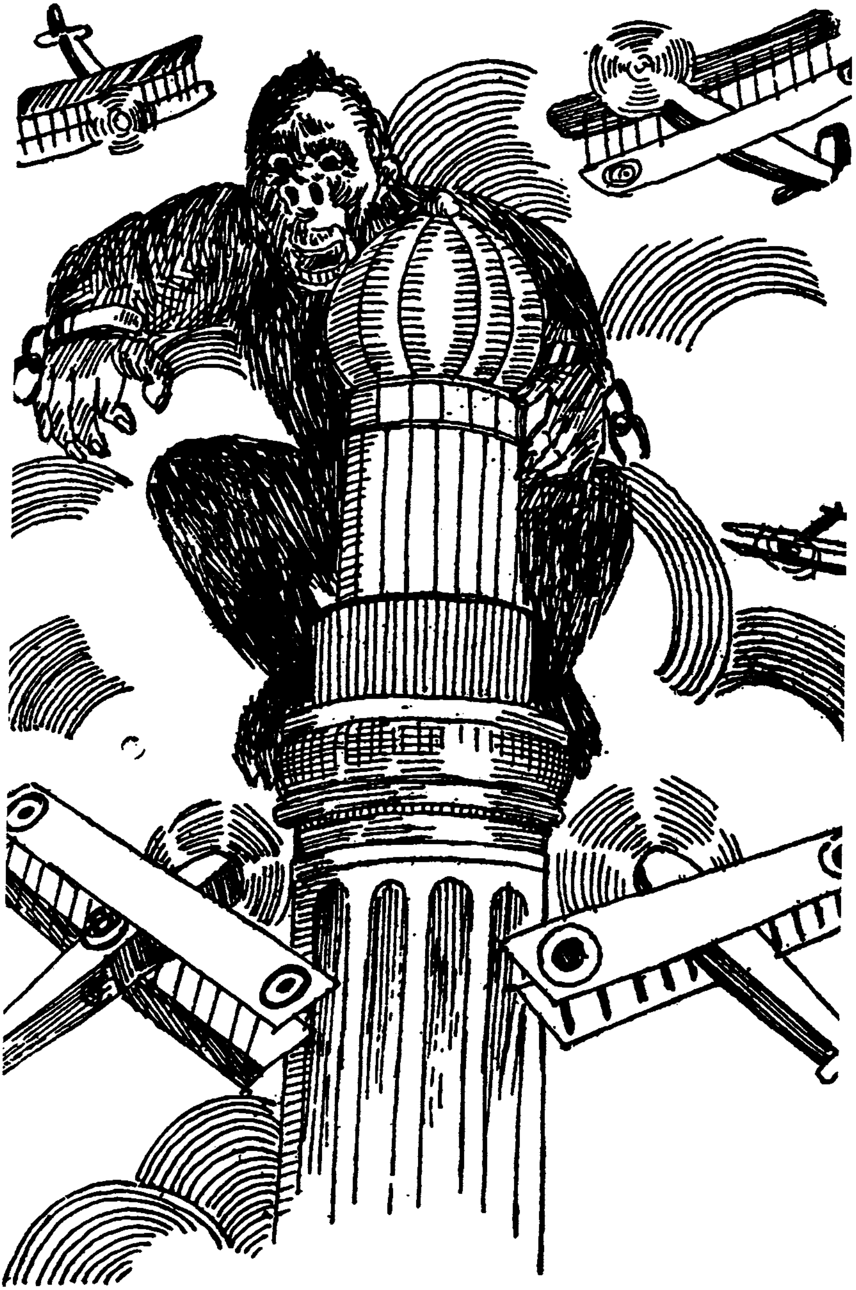

সেই সঙ্গে মালবিকাও মরবে, তারাও বাঁচবে না! কঙয়ের দেহের দাপট সইতে না পেরে মনুমেন্ট যেন ভয়ে থর থর করে কাঁপছে, এটা তারা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই অনুভব করতে পারছিল।

মনুমেন্টের নিচেকার বারান্দায় এসেই তারা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কঙয়ের বিপুল উদর তাদের দৃষ্টিসীমা একেবারে রোধ করে দিয়েছে! কঙয়ের এত কাছে তারা আর কখনও আসেনি।

কঙ তার মস্ত বড় দুই উরু ও পা দিয়ে মনুমেন্টের উপর দিকটা জড়িয়ে বসে আছে—তার দেহের উপর অংশ তারাও দেখতে পেলে না, এবং তার কোলের কাছে যে দুটো মানুষ-পোকা এসে দাঁড়িয়ে আছে, কঙও সেটা মোটেই টের পেলে না!

বাইরে তিন চারখানা এরোপ্লেনের গর্জন শোনা গেল! এবং এটাও বোঝা গেল যে, উড়োজাহাজগুলো কঙয়ের খুব কাছে এসেই উড়ছে।

বোধহয় এই নূতন শত্রুর আবির্ভাবে কঙ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে! আচম্বিতে তার একখানা মস্ত হাত নিচে নেমে এল, তার মুঠোয় দেখা গেল মালবিকাকে! শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময়ে কঙ বরাবরই মালবিকাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে রাখে! এবারেও বোধহয় সেই কারণেই সে মনুমেন্টের নিচেকার বারান্দায় মালবিকার অচেতন দেহকে শুইয়ে রেখে দিলে!

কিন্তু কঙ জানতেও পারলে না যে, দুটো মানুষ-পোকা বারান্দা থেকে আবার তার পুতুল-মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গেল! শোভন আবার কঙয়ের চোখে ধুলো দিয়ে মালবিকাকে উদ্ধার করলে!

চৌরঙ্গীর মোড়ে তখন সারা কলকাতা শহর ভেঙে পড়েছে!

পা দিয়ে মনুমেন্ট জড়িয়ে বসে আছে রাজা কঙ, সগর্বে তার মাথাটা শূন্যে তুলে! তার চারিপাশ দিয়ে চারখানা উড়োজাহাজ ক্রমাগত ঘোরাঘুরি করছে—আসছে আর চলে যাচ্ছে, আসছে আর চলে যাচ্ছে! কঙ ভাবলে, নিশ্চয় এগুলো কোন অজানা উড়ো জন্তু,—গর্জন করে তাকে লড়াই করতে ডাকছে! বেশ তো, লড়াই করতে সে কোনদিনই পিছপাও হয়নি! এতক্ষণ হাতের সেই পুতুল-মেয়েটার জন্যেই তার যা কিছু ভাবনা ছিল, এখন সে তাকে সরিয়ে রেখে হাত খালি করেছে! এইবার সে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত! উড়োজাহাজের গর্জনের উত্তরে কঙও দুইহাতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে হুঙ্কার দিয়ে উঠল!

কঙ দেখলে একটা উড়ো জন্তু তার খুব কাছ দিয়ে যাচ্ছে! বিদ্যুতের মত তার একখানা হাত তার দিকে এগিয়ে গেল এবং পরমুহূর্তে উড়োজাহাজখানা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পৃথিবীর দিকে গোঁৎ খেয়ে পড়ে গেল।

কঙয়ের শক্তি ও বাহাদুরি দেখে সারা কলকাতা থ!

মাটিতে পড়বার আগে উড়োজাহাজের ভিতর থেকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। মানুষের চোখ যেমন কঙয়ের মতন দানব দেখেনি, কঙয়ের চোখও তেমনি এমন কোন উড়ো জন্তু দেখেনি, যার মুখ দিয়ে এরকম হু হু করে আগুন বেরোয়! সে কিছু ভড়কে গেল! বোধহয় ভাবলে, ভাগ্যিস—ও আগুন তার হাত কামড়ে দেয়নি! আগুন যে কি ভয়ানক কামড়ে দেয়, কঙ তা জানে!

আরে মোলো! একটা সঙ্গীর দুর্দশা দেখেও ও-তিনটে উড়ো জন্তু ভয় পেলে না! আবার তাকে জ্বালিয়ে মারতে আসছে! কঙ চটে-মটে তাদের ধরবার জন্যে একবার এদিকে, আর একবার ওদিকে লম্বা লম্বা হাত বাড়াতে লাগল।

উড়োজাহাজগুলো এবারে সাবধান হয়েছে—তারা আর কঙয়ের নাগালের ভিতর এল না!

কিন্তু নাগালের বাইরে থেকেই এবারে তারা অব্যর্থ মৃত্যুবাণ ছাড়তে লাগল! একখানা করে উড়োজাহাজ কঙয়ের কাছে আসে, এক সেকেন্ডের জন্যে থামে, সাংঘাতিক কলের কামান ছোড়ে, আর চোখের পলক পড়তে-না-পড়তেই সাঁৎ করে সরে যায়!

কঙ চেয়ে দেখলে, তার সারা দেহ বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে এবং তার দেহের রক্তস্রোত মনুমেন্টের মাথা রাঙা করে গড়িয়ে পড়ছে।

মেশিনগান, কঙ ও উড়োজাহাজের গর্জনে আকাশের বুক যেন ফেটে যাবার মত হল।

কঙয়ের দৈত্যদেহ মনুমেন্টের উপর টলতে লাগল—রক্তধারার সঙ্গে তার সমস্ত শক্তি যেন শরীর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল!

কিন্তু উড়ো জন্তুগুলোর দয়া নেই—তাদের মৃত্যু-ভরা তপ্ত দংশন অদৃশ্য ভাবে কঙয়ের দেহের উপরে এসে পড়ছে।

ক্রোধোন্মত্ত কঙ শেষটা আর সহ্য করতে পারলে না—হঠাৎ একখানা উড়োজাহাজকে ধরবার জন্যে সে শূন্যে এক মস্ত লম্ফ ত্যাগ করলে—উড়োজাহাজ আবার সাঁৎ করে তার হাতের সীমানার বাইরে বেরিয়ে গেল এবং মূর্তিমান একটা ধূমকেতুর মতন কঙয়ের বিপুল দেহটা এসে ভীষণ শব্দে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল!

রাজা কঙ আর তার পুতুল-মেয়েকে দেখবার জন্যে চোখ মেলে তাকায়নি!

মানুষের প্রথম অ্যাডভেঞ্চার

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

হাঁহাঁর ছেলে ধাঁধাঁর কাণ্ড

ঐতিহাসিকের জ্ঞান কত ক্ষুদ্র? পৃথিবীর জীবন-কাহিনি কত বৃহৎ!

অগ্নিময় পৃথিবী কবে অপর গ্রহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শূন্যপথে ছুটতে শুরু করলে, কোনও ঐতিহাসিকই তার সঠিক তারিখ জানেন না। আন্দাজে হিসাব দেন ৩,০০০,০০০,০০০ বৎসর! সেই পৃথিবীর আগুন ধীরে ধীরে নিবে গেল শত শত যুগান্তরের পরে। পৃথিবীর বুকে হল সাগর সৃষ্টি এবং সেই সাগরে হল কোটি কোটি জীবাণুর সৃষ্টি! জীবাণুরা ক্রমেই বৃহত্তর আকার ধরতে লাগল, কেউ উঠল জল থেকে ডাঙায়, কেউ উড়ল ডাঙা থেকে শূন্যে! জীবেরা বাড়তে বাড়তে প্রায় চলন্ত পাহাড়ের মতো হয়ে উঠল—যেমন ডাইনোসর! কিন্তু কোনও ঐতিহাসিকই সেদিন জন্মগ্রহণ করেননি।

প্রকৃতি বারংবার পরীক্ষার পর বুঝলেন, মস্ত মস্ত জীব গড়া মিথ্যা পণ্ডশ্রম, তারা পৃথিবীর উপযোগী নয়। তিনি একে একে অতিকায়, নির্বোধ ও হিংসুক জীবগুলোকে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে লুপ্ত করে দিতে লাগলেন। এবং নতুন গড়নের এক জীব তৈরি করে নিযুক্ত হলেন পরীক্ষায়। এই নতুন জীবেরা ডাইনোসরদের দেহের তুলনায় নগণ্য, কিন্তু মস্তিষ্ক হল তাদের অসাধারণ। তারা নিজেরাই নিজেদের নাম রাখলে, 'মানুষ'।

কবে যে তাদের প্রথম সৃষ্টি, মানুষরাই তা ঠিক জানে না! কেবল কেউ কেউ আন্দাজি হিসাবে বলে, দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার বছর ধরে মানুষ পৃথিবীতে বাস করছে। এ হিসাব মানলেও দেখি, আধুনিক মানুষের ইতিহাস অতি কষ্টে মাত্র ছয় হাজার বৎসর আগে গিয়ে পৌঁছুতে পেরেছে। বাকি দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার বৎসরের কোনও হিসাবই নেই! অন্যান্য পণ্ডিতের মতে, মানুষ জন্মেছে আরও অনেক—অনেক কাল আগে। যাঁর যা খুশি বলছেন, কারণ ভুল ধরবার মতো নির্ভুল স্পষ্ট প্রমাণ কারুর হাতেই নেই!

কিন্তু পৃথিবী নিজে তার দেহের মাটি ও পাথরের স্তরে স্তরে লিখে রেখেছে মানুষের চমৎকার গল্প। মানুষ এতদিন পরে সেইসব গল্প আবিষ্কার করে ফেলেছে। আমি তারই কতক-কতক তোমাদের শোনাব।

মিশর, ব্যাবিলন, ভারত, চিন ও পারস্য প্রভৃতি দেশের সভ্যতা সব চেয়ে পুরানো, এ-কথা তোমরা জানো। কিন্তু আমি যে-সময়ের কথা বলছি, তখন কোনও সভ্যতারই জন্ম হয়নি। সে যে কত হাজার বৎসর আগেকার কথা, তাও আমি বলতে পারব না।

ভারতবর্ষের তখন কোনও নাম ছিল না। মানুষও তখন কোনও দেশকে স্বদেশ বলে ভাবত না। তাদের সমাজও ছিল না। এক এক পরিবারভুক্ত মানুষরা কিছুদিন ধরে এক এক জায়গায় বাস করত। তখনও তারা চাষবাস করতে শেখেনি। বন থেকে ফলমূল কুড়িয়ে বা শিকার ধরে এনে তারা পেটের ক্ষুধাকে শান্ত করত। তারপর সেখানে ফলমূলের বা শিকারের অভাব হলেই অন্য কোনও দেশে গিয়ে হাজির হত। পৃথিবীতে তখন হিন্দু বা অন্য কোনও ধর্ম বা জাতি বা ভাষারও সৃষ্টি হয়নি। মানুয কথা কইত বটে, কিন্তু তার কথার ভাণ্ডারে বেশি শব্দ ছিল না, তাই বেশি কথাও সে বলতে পারত না, ঠারে-ঠোরে ইশারাতেই অনেক কথার কাজ সারত। কেউ লিখতে জানত না। তখন শহর বা গ্রামের স্বপ্নও কেউ দেখেনি। যখন কেউ কোথাও স্থায়ী হয়ে বাস করে না তখন শহর বা গ্রাম বসাবার দরকারই বা কী? ওই কারণেই আজও বেদুইন প্রভৃতি জাতির দেশে শহর বা গ্রামের বিশেষ অভাব।

উত্তর-পূর্ব ভারতে হিমালয়ের নিকটবর্তী এক দেশ।

এইখানেই উঁচু পাহাড়ের গুহায় একটি পরিবার বাস করে।

পরিবারের কর্তার নাম হাঁহাঁ। গিন্নির নাম হুয়া। তাদের তিন ছেলে, দুই মেয়ে। ছেলে তিনটির বয়স যথাক্রমে চব্বিশ, কুড়ি ও আট বৎসর। বড়ো মেয়ের বয়স ষোলো ও ছোটো মেয়ের এক বৎসর। তাদের আরও ছেলে-মেয়ে হয়েছিল, কিন্তু তারা বেঁচে নেই।

গুহার ধারে একখানা বড়ো পাথরের উপরে বসে হাঁহাঁ সবিস্ময়ে দূর-অরণ্যের দিকে তাকিয়েছিল।

হাঁহাঁ মানুষ বটে, কিন্তু তাকে দেখলে ভয়ে তোমাদের বুক কেঁপে উঠবে। তার মাথায় বড়ো বড়ো রুক্ষ চুল—তেল ও জলের অভাবে কটা। কেবল মাথায় নয় সর্বাঙ্গেই রাশি রাশি বড়ো বড়ো চুল বা লোম। রং কালো কুচকুচে। কপাল ভয়ানক ছোটো, ভুরুর উপরকার অংশটা আবার সামনের দিকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। দুই চোখে তীব্র বন্য ভাব। নাক থ্যাবড়া। শিকারি জানোয়ারের মতো বা ছবির রাক্ষসের মতো ধারালো ও ভীষণ দাঁত। চিবুক নেই বললেই চলে। বিষম চওড়া বুক। হাতে এবং বুকের পাশে ও তলায় লোহার মতন কঠিন পেশিগুলো ঠেলে ঠেলে উঠছে। আজানুলম্বিত বাহু দেহের তুলনায় ছোটো, মোটা মোটা পা-দুখানা বাঁকা, তাই তাকে হেলে-দুলে হাঁটতে হয় এবং হাঁটবার সময়ে সে পায়ের চেটো সমানভাবে মাটির উপরে ফেলতে পারে না। হাঁহাঁকে হঠাৎ দেখলে তোমরা গরিলা বলে মনে করবে, কিন্তু সে গরিলা নয়। কারণ লক্ষ করলেই দেখবে, সে কাপড় পরতে জানে—যদিও তার কাপড় হচ্ছে চামড়ার! আমরা যেমন করে গামছা পরি, হাঁহাঁও কাপড় পরে সেই ধরনে। হাঁহাঁ হাসতে জানে, কথা কইতে পারে। কাপড় পরা এবং হাসতে ও কথা কইতে পারা হচ্ছে মনুষ্যত্বের লক্ষণ। ইউরোপের পণ্ডিতরা তখনকার মানুষদের নাম দিয়েছেন 'নিয়ানডের্টাল মানুষ।'

হাঁহাঁ সবিস্ময়ে যে দূর-অরণ্যের দিকে তাকিয়ে ছিল, সেখানে দাউ দাউ করে জ্বলছে ভীষণ দাবানল—আকাশের একটা দিক জুড়ে! লক্ষ লক্ষ শিখা-বাহু বাড়িয়ে দাবানল যেন আকাশকেও গ্রাস করতে চায়!

ওই দাবানল জ্বলছে যে-বনে, ওইখানেই হাঁহাঁ বউ আর তার সন্তানদের নিয়ে একটি গুহায় বাস করত। কিন্তু দাবানলের কবল থেকে নিস্তার পাবার জন্যে সে এই নতুন বাসায় পালিয়ে এসেছে।

হাঁহাঁ মাঝে মাঝে এইরকম দাবানল দেখে বটে, কিন্তু তার রহস্য বুঝতে পারে না। সে তাকে জীবন্ত ক্ষুধার্ত ও ভয়াবহ কোনও দেবতা বলে মনে করে। তার ভয়ও হয়, ভক্তিও হয়। দাবানলের অপূর্ব শক্তিও সে দেখেছে। যে-রাতের অন্ধকার তার জীবনের অভিশাপের মতো, যে তার চোখ অন্ধ করে, বুকে বিভীষিকা জাগায়, একমাত্র দাবানলকে দেখলেই সে দূরে পালিয়ে যায়। অন্ধকারকে তাড়াবার কোনও উপায়ই জানা নেই, কারণ সে আগুন সৃষ্টি করতে পারে না। তারপর ম্যামথ-হাতি, রোমশ গণ্ডার ও গুহা-ভাল্লুক প্রভৃতি হিংস্র ভয়ঙ্কর জন্তুরা ওই দাবানলের কোপে পড়লে কত সহজে ছটফটিয়ে মারা যায়, সেটাও সে স্বচক্ষে দেখেছে।

হাঁহাঁ তাই দাবানলকে দেখতে দেখতে ভাবছিল, ওর খানিকটা যদি আমার হাতে পাই, তাহলে রাতের অন্ধকারকে আর সমস্ত জীবজন্তুকে আমি জব্দ করতে পারি!

হাঁহাঁ নীচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলে, পাহাড়ের তলা দিয়ে দলে দলে ম্যামথ-হাতি, রোমশ গণ্ডার, বন্য বৃষ, বুনো কুকুর, নেকড়ে বাঘ ও হরিণ দাবানলের ভয়ে প্রাণপণে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে! সে চেঁচিয়ে বউকে ডাকলে, 'হুয়া! হুয়া!'

হুয়া গুহার ভিতরে বসে রাতের খাবার তৈরি করছিল। কতকগুলো বুনো গাছের থেঁতো করা শিকড়, গোটাকয়েক ফল আর পাঁচটা ইঁদুর। নতুন জায়গায় এসে হাঁহাঁ এখনও শিকারের সন্ধান পায়নি, তাই আজ আর এর চেয়ে ভালো খাবার হয়তো জুটবে না। ইঁদুরগুলোকে হুয়া নিজেই গুহার ভিতরে ধরেছে।

স্বামীর ডাক শুনে সে গুহার ভিতর থেকে ছোটো মেয়েকে কোলে করে বেরিয়ে এল। তারও চেহারা অনেকটা হাঁহাঁর মতোই দেখতে বটে, কিন্তু আকারে আরও ছোটো এবং তার মুখের ভাবও ততটা কঠোর নয়।

হাঁহাঁ শুধোলে, 'টুটু আর ঘটু কোথায়?'

টুটু আর ঘটু হচ্ছে হাঁহাঁর বড়ো ও মেজো ছেলের নাম।

হুয়া কোনও উত্তর না দিয়ে বনের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলে। হাঁহাঁ বুঝলে, তারা বনে শিকার খুঁজতে গিয়েছে। তার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল, কারণ বনে আজ দাবানলের ভয়ে অগুনতি জন্তুর আমদানি হয়েছে, শিকারের পক্ষে সে-স্থান নিরাপদ নয়।

হুয়া হঠাৎ অস্ফুট কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল। হাঁহাঁ চমকে ফিরে দেখলে, হুয়া সভয়ে পাহাড়ের উপর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সেইদিকে তাকাতেই তার চোখে পড়ল, একটা প্রকাণ্ড গুহাভাল্লুক পাহাড়ের অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে তাদের দিকেই কটমট করে চেয়ে আছে!

হাঁহাঁ তাড়াতাড়ি পায়ের তলা থেকে বর্শাটা তুলে নিলে। একটা বাঁশের ডগায় চকমকি-পাথরের ফলা বসিয়ে বর্শাটা তৈরি করা হয়েছে। তখনও পৃথিবীতে কেউ লোহা আবিষ্কার করতে পারেনি, কাজেই চকমকি-পাথর কেটেই অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করা হত।

ওই গুহাভাল্লুকই ছিল তখনকার মানুষদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু। তখনকার মানুষের মতো সেকালের গুহাভাল্লুকরাও এখনকার ভাল্লুকের চেয়ে আকারে ঢের বেশি বড়ো হত এবং মানুষের মাংস তারা ভালোবাসত। হাঁহাঁর দুটি সন্তান ও একটি বউ তাদেরই পেটে গিয়েছে।

হাঁহাঁ উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, 'ধাঁধাঁ কোথায়?' ধাঁধাঁ তার ছোটো খোকার নাম।

হুয়া বললে, 'ঝরনায়।'

হাঁহাঁ ইশারায় হুয়াকে গুহার ভিতরে যেতে বলে নিজে চলল ধাঁধাঁর খোঁজে। ঝরনা বেশি দূরে নয়, ঝরনার কাছে বলেই হাঁহাঁ এই গুহাটিকে পছন্দ করেছিল।

হাঁহাঁ কিছুদূর অগ্রসর হয়েই শুনতে পেলে, তার ছোটোছেলে খিল-খিল করে সকৌতুকে হাসছে!

হাঁহাঁ অবাক হয়ে ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলল, ধাঁধাঁর এত হাসির ঘটা কেন?

কিন্তু পাহাড়ে-পথের মোড় ফিরতেই হাঁহাঁ যা দেখলে, তা কেবল আশ্চর্য নয়—কল্পনাতীত! তার পা আর চলল না, সে থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল!

ঝর-ঝর করে ঝরে পড়ছে ঝরনার রুপোলি ধারা। তার পাশেই পাহাড়ের উপরে হাঁটু গেড়ে বসে আছে ধাঁধাঁ এবং তারও ওষ্ঠাধর দিয়ে ঝরে পড়ছে খুশিভরা কলহাস্যের ধারা!

কিন্তু তার সামনেই ওটা কী, ওটা কী?

হাঁহাঁ খুশি হবে, কী ভয় পাবে, বুঝতে পারলে না এবং নিজের চোখকেও সে বিশ্বাস করতে পারলে না,—হঠাৎ প্রচণ্ড স্বরে চেঁচিয়ে উঠে প্রকাণ্ড এক লম্ফ ত্যাগ করলে!

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

খোকা-আগুনের আগমন

হাঁহাঁ যা দেখলে তা হচ্ছে এই

পাহাড়ের এক অংশ সিঁড়ির মতন ধাপে ধাপে উপরে উঠে গিয়েছে। এবং সেই সব ধাপ দিয়ে লাফাতে লাফাতে ও ঝর্ঝর-গীত গাইতে গাইতে নেমে আসছে ছোট্ট একটি ঝরনা,—শিশুর মতন সকৌতুকে! অস্তোন্মুখ সূর্যের রঙিন আলো তার নাচের ভঙ্গির সঙ্গে ঝলমল করে উঠছে।

ডান পাশে পাহাড়ের কতক-সমতল একটা জায়গায় বসে আছে ধাঁধাঁ, তার সামনেই একরাশ শুকনো ঘাস ও লতাপাতা—ঝোড়ো বাতাসে উড়ে এসে সেখানে জড়ো হয়েছে।

সর্বপ্রথমে হাঁহাঁ দেখলে, সেই শুকনো ঘাস লতাপাতাগুলোর উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আশ্চর্য একটা আগুনের ঢেউ! হাঁহাঁর মনে হল, দূর-অরণ্যের দিকে তাকিয়ে এতক্ষণ সে আকাশের কোল-জোড়া যে বিরাট দাবানল দেখছিল, এই ছোট্ট আগুনটা যেন তারই নিজের খোকা! ছুটোছুটি-খেলা খেলতে খেলতে সে যেন বাপের কাছ থেকে এখানে পালিয়ে এসেছে!

কিন্তু সে দাবানলকেই দেখেছে—বিরাট রূপ ধরে যে আকাশকে গিলে ফেলতে চায়, বাতাসকে তাতিয়ে তোলে, ফলমূলের লোভে বড়ো বড়ো অরণ্যকেই গ্রাস করে ফেলে, বনের জীবজন্তুদের পিছনে পিছনে বিষম ধমক দিতে দিতে তাড়া করে আসে! একটু-খানিক জায়গায় এমন খোকা-আগুনকে হাঁহাঁ কোনও দিন নাচতে দেখেনি!

একটু আগেই সে দাবানলকে দেখে ভেবেছিল, 'ওর খানিকটা যদি আমার হাতে পাই, তাহলে রাতের অন্ধকারকে আর সমস্ত জীবজন্তুকে আমি জব্দ করে দিতে পারি!'

এখন ভাবলে, এই তো আগুন-খোকাকে হাতে পেয়েছি! এখন আমি যদি একে ধরে ফেলি?

কিন্তু পরমুহূর্তেই আর এক স্বপ্নাতীত দৃশ্য দেখে সে ভয়ানক চমকে উঠল।

তাঁর ছেলে ধাঁধাঁ ওখানে দুই হাঁটু গেড়ে বসে ও কী করছে?

ধাঁধাঁর দুই হাতে দুটো ছোটো ছোটো গাছের ডাল। সে মহা আনন্দে খিলখিল করে হাসতে হাসতে ডালের উপরে ডাল রেখে ঘষছে, আর যে লতা-পাতা-ঘাসগুলো তখনও জ্বলেনি, সেগুলোও দপ-দপ করে জ্বলে উঠছে!

হাঁহাঁর চোখ কি ভুল দেখছে? না, তা তো নয়? সত্যসত্যই ধাঁধাঁ নতুন নতুন খোকা-আগুন সৃষ্টি করছে যে! তার ছেলের এত শক্তি!

এই দেখেই হাঁহাঁ বিপুল উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠে লম্ফত্যাগ করেছিল!

তার পরেই সে তিরবেগে দৌড়ে সেইখানে গিয়ে ধুপ করে বসে পড়ল এবং তাড়াতাড়ি আগ্রহ-ভরে আগুনকে দুইহাতে ধরতে গেল—

এবং সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে সেখানে থেকে ছিটকে দূরে সরে এল।

অ্যাঃ! এই খোকা-আগুনও এত জোরে কামড়ে দেয়!

হাঁহাঁ খানিকক্ষণ সভয়ে জ্বলন্ত আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর দুই হাত ঝাড়তে ঝাড়তে ডাকলে, 'ধাঁধাঁ!'

—'বাবা!'

—'খোকা-আগুনকে কোথায় পেলি?'

ধাঁধাঁ তার হাতের ডাল দুটো তুলে দেখালে। হাঁহাঁ তার কাছে গিয়ে অতি-কৌতূহলে ডাল দুটো নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। সে আগে যে দেশে ছিল সেখানে এ-জাতের গাছের ডাল দেখেনি। বুঝলে, এ হচ্ছে কোনও নতুন গাছের ডাল।

শুধোলে, 'এ ডাল কোথায় পেলি?'

ধাঁধাঁ আঙুল দিয়ে পাহাড়ের একটা গাছ দেখিয়ে দিলে।

সেইদিকে এগিয়ে গিয়ে দেখে হাঁহাঁ বুঝলে, হ্যাঁ, এ নতুন গাছই বটে!

তারপর ছেলের কাছ থেকে যে আশ্চর্য বিবরণ সংগ্রহ করলে সংক্ষেপে তা হচ্ছে এই

ধাঁধাঁ নিজের মনে এখানে খেলা করছিল। হঠাৎ তার কী খেয়াল হয়, ওই গাছের দুটো ডাল ভেঙে পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি ও ঘষাঘষি করতে থাকে, আর হঠাৎ অমনি আগুনের ফিনকি দেখা দেয়।

হাঁহাঁ ছেলের কথা শুনতে শুনতে ফিরে তাকিয়ে দেখে, ঝরনার পাশে আর খোকা-আগুনের কোনও চিহ্নই নেই! কোথায় পালাল সে?

দ্রুতপদে ছুটে এসে দেখে, সেখানে আগুনের বদলে পড়ে রয়েছে খালি একরাশ ছাই!

হাতে পেয়েও আবার যাকে হারালে, তার শোকে হাঁহাঁ মাটির উপরে হতাশভাবে বসে পড়ল, কাঁদো-কাঁদো মুখে!

ধাঁধাঁ বাপের দুঃখের কারণ বুঝলে। সে তখনই হাঁহাঁর হাত থেকে ডালদুটো নিয়ে মাটির উপরে বসে আবার ঠুকতে ও ঘষতে লাগল। খানিক পরেই আগুনের ফিনকি দেখা দিলে, কিন্তু পলাতক খোকা-আগুন আর ফিরে এল না! ধাঁধাঁ এর রহস্য ধরতে পারলে না। সে জানে না যে একটু আগে দৈবগতিকে এখানে কতকগুলো শুকনো ঘাস ও লতাপাতা ছিল বলেই ফিনকির ছোঁয়ায় আগুন সৃষ্টি করেছিল!

কিন্তু ধাঁধাঁর চেয়ে তার বাপ হাঁহাঁর বুদ্ধি বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। দুঃখিতভাবে বসে বসে ছেলের বিফল চেষ্টা দেখতে দেখতে ধাঁ করে তার মাথায় এক বুদ্ধি জাগল। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে এদিক-ওদিক থেকে সে এক রাশ শুকনো লতাপাতা ও ঘাস কুড়িয়ে আনলে। তারপর যেখানে তার ছেলে আগুনের ফিনকি জাগাচ্ছে সেইখানেই সেইগুলি নিয়ে রেখে দিলে। অল্পক্ষণ পরেই হল আবার খোকা-আগুনের আবির্ভাব!*

আজ বিশ-শতাব্দীর তোমরা হয়তো ভাবছ, আগুনের ফিনকির মুখে শুকনো লতা-পাতা রাখলে যে জ্বলে উঠবে, এ সোজা বুদ্ধি তো খুব সহজেই সকলের মনে আসে! হাঁহাঁ তো আর মায়ের কোলের খোকা নয়, এটুকু সে আন্দাজ করতে পারবে না কেন?

কিন্তু এই উপন্যাস পড়তে পড়তে তোমরা সর্বদাই মনে রেখো, আমি অজানা অনেক হাজার বৎসর আগেকার গল্প বলছি। আজকের পাঁচ বৎসর বয়সের শিশুরা যা জানে, তখনকার বুড়োমানুষদেরও সে জ্ঞান ছিল না। বিশেষ এ জাতের গাছের ডালে ডালে ঘষাঘষির ফলে আগুনের জাগরণ হয়, এবং তার সাহায্যে শুকনো লতা-পাতা-ঘাসে স্থায়ী আগুনের উৎপত্তি হয়, এ জ্ঞান এখনকারও বনমানুষ বা গরিলা প্রভৃতির নেই। বেশি কথা কী, তারা আজও আগুন ব্যবহার করতে শেখেনি। তারা আজও পৃথিবীর আদিম অন্ধকারেই বাস করছে।

আমাদের সুদূর অতীত যুগের পূর্বপুরুষদের জন্ম, সেই আদিম অন্ধকারের গর্ভেই বটে, কিন্তু তারা মানুষ বলেই মস্তিষ্ক চালনা করে বুঝতে পেরেছিল যে, আগুনের ফিনকি শুকনো লতা-পাতাকে প্রজ্জ্বলিত করতে পারে! সেই অন্ধকার-যুগের এই আবিষ্কার একালের যে কোনও বড়ো আবিষ্কারেরও চেয়ে বড়ো! মানুষের মাথায় ওই-শ্রেণীর মস্তিষ্ক যদি না থাকত, তাহলে আজ তোমাকে আমাকে গরিলা, ওরাং ও শিম্পাঞ্জির মতো গাছের ডালে-ডালেই নগ্নদেহে লাফালাফি করে বেড়াতে হত!...

শুকনো লতা-পাতা-ঘাসে আবার সেই আগুনের শিখা নেচে নেচে উঠল, হাঁহাঁ অমনি প্রচণ্ড আনন্দে ধাঁধাঁকে কাঁধে তুলে নিয়ে নৃত্য করতে করতে চেঁচিয়ে উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, 'ধাঁধাঁ, ধাঁধাঁ, ধাঁধাঁ! তুই দেবতা, আমার ঘরে শিশু হয়ে এসেছিস! তোর মন্ত্রেই খুশি হয়ে আগুন-ভগবান আজ আমাকে দয়া করলেন!'

অনেকক্ষণ নৃত্য করে হাঁহাঁর সাধ যখন মিটল, তখন সে ধাঁধাঁকে কোল থেকে নামিয়ে আগে সেই গাছের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর দেখে দেখে খুব ভালো দেখে গাছকয়েক ডাল ভেঙে নিয়ে বললে, 'ধাঁধাঁ রে, এগুলো নিয়ে কি হবে বুঝেছিস?'

ধাঁধাঁ বললে, 'উঁহু!'

—'এরা খোকা-আগুনকে ডেকে আনবে। খোকা-আগুন অন্ধকারকে বধ করবে।'

আলো দিয়ে যে মানুষ অন্ধকার জয় করতে পারবে, সে-যুগে এও একটা মস্তবড়ো কল্পনা! আজ বিদ্যুৎকে বন্দি করে রাতকে তোমরা দিন করে ফেলেছ, সেকালের রাত্রি-বিভীষিকা তোমরা কিছুতেই আন্দাজ করতে পারবে না! শহর নেই, ঘরবাড়ি নেই, পাড়া-প্রতিবেশীর সাড়া নেই, কোথাও কোনওরকম আলোর চিহ্ন নেই, হু-হু করে কাঁদছে ভীরু বাতাস, মর-মর-মর-মর করে কঁকিয়ে উঠছে মহা-অরণ্য, হুঙ্কার তুলে বিজন বনের পথে বিপথে হানা দিচ্ছে রক্তলোভী ভয়াবহ জন্তুরা—এবং তাদের সকলকে ঢেকে শব্দমাত্র সার করে রেখে চোখের সামনে বিরাজ করছে অনন্তরহস্যময় মৃত্যুর মতন ভীষণ, চিরমৌন, দয়ামায়াহীন পৃথিবীব্যাপী অন্ধকার—অন্ধকার—অন্ধকার। তারই মধ্যে শীতার্ত রাতে কাঁপতে কাঁপতে ও দুশ্চিন্তায় কুঁকড়ে পড়ে প্রতি মুহূর্তে সাক্ষাৎ-মরণের স্বপ্ন দেখছে একটি অসহায় মানুষপরিবার! নিরেট আঁধারের কষ্টিপাথর ফুঁড়ে থেকে থেকে জ্বলে উঠছে আর নিবে যাচ্ছে কী ওগুলো? রোমশ গণ্ডার, গুহাভাল্লুক, নেকড়ে-বাঘের চোখ! শুকনো ঝরা-পাতার বিছানার উপর দিয়ে ক্রমাগত খড়মড় খড়মড় খড়মড় শব্দ জাগিয়ে যেন এগিয়ে আর এগিয়েই আসছে, কী ওটা রে? সর্পরাজ অজগর।

তখন বন্দুক জন্মায়নি, কোনওরকম ধাতুতে গড়া অস্ত্রের কথাও কেউ জানে না, মানুষের দুর্বল হাতের সম্বল কেবল লাঠি, পাথরের বর্শা, ছোরা-ছুরি! অন্ধকারের জন্যে তাও ছুড়ে আত্মরক্ষা করবার উপায় নেই, কারণ কারুকেই চোখে দেখা যায় না! কেবল জ্বলন্ত চক্ষু, স্পষ্ট পদশব্দ—এবং প্রায়ই অতর্কিতে ভয়ঙ্কর দন্তনখরের সাংঘাতিক স্পর্শ।......তারপরেই হয়তো শোনা গেল, কোলের খোকার কাতর চিৎকার! মা আকুল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আঁধার-সমুদ্রের মধ্যে, কিন্তু খোকার বদলে হাতে পেলে শক্ত মাটির বুক! তার অন্ধকারে অন্ধ দৃষ্টি কিছুই খুঁজে পেলে না—নীরব অন্ধকারের গর্ভে খোকার কণ্ঠ চিরদিনের মতো নীরব হয়ে গেল!...

আজকের আসন্ন সন্ধ্যায় পাহাড়ের উপরে সেই ভয়াল অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। বহুদূরের তাণ্ডব নৃত্যশালা ছেড়ে অরণ্যচারী দাবানলের শিখা যে এখানে এসে অন্ধকারদৈত্যকে হত্যা করতে পারবে না, হাঁহাঁ তা জানত। কাজেই সে সময় থাকতে সাবধান হয়ে ছেলের হাত ধরে গুহার দিকে ফিরতে লাগল।

হাঁহাঁ আকাশের দিকে তাকিয়ে এই ভাবতে ভাবতে অগ্রসর হচ্ছিল, ওই সূর্য নিশ্চয়ই খুব ভালো ঠাকুর! মানুষকে তিনি ভালোবাসেন! তার অন্ধকার-শত্রুকে নিপাত করবার জন্যে তিনি রোজ সকালে পৃথিবীতে আসেন। কিন্তু সন্ধে হলেই আবার পালিয়ে যান কেন?...

ঝরনার ঝির-ঝিরে গান ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দূরে। বাতাসও ধীরে ধীরে যেন ঝিমিয়ে পড়ছে। অরণ্যও যেন মৌনব্রত অবলম্বন করবার চেষ্টা করছে।

পশ্চিমে রংমহলের আলো ক্রমে ক্রমে নিভে যাচ্ছে। পাহাড়ের আনাচ-কানাচ থেকে নিশাচর পাখিদের নিদ্রাভঙ্গের সাড়া!

আচম্বিতে তীব্র এক আর্তরবে আকাশ যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল ক্রুদ্ধ গুহাভাল্লুকের ঘন ঘন গর্জন!

হাঁহাঁ তখনই বুঝতে পারলে, এ হচ্ছে তার বউ হুয়ার কান্না। গুহাভাল্লুক গর্জন করছে আর হুয়া কাঁদছে!

ধাঁধাঁ সভয়ে লাফ মেরে বাপের কাঁধের উপরে চড়ে বসল। চকমকি-পাথরের বর্শাটা প্রাণপণে চেপে ধরে হাঁহাঁ গুহার দিকে ছুটল, ঝড়ের মতো।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

ভাল্লুক আর ভাল্লুক-বউ

কাঁধে খোকা-ধাঁধাঁ, এক হাতে চকমকি-পাথরের বর্শা এবং আর এক হাতে আগুন-গাছের ডালের গোছা,—হাঁহাঁ ধেয়ে চলেছে গুহার দিকে!

কী তার রুদ্র মূর্তি, কালভৈরবের কল্পনাও হার মানে! মাথার রুক্ষ কটা চুলগুলো ফণা-তোলা সাপের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে ছিটকে উঠছে, গায়ের বড়ো বড়ো লোমগুলো উত্তেজনায় সজারু-কাঁটার মতন থেকে থেকে খাড়া হয়ে উঠছে এবং স্বভাবত বন্য ড্যাবডেবে চোখদুটো আর বিকশিত হিংস্র দাঁতগুলো সাংঘাতিক ক্রোধে চকচকিয়ে উঠছে—পুরাণে যেসব ভীষণ দৈত্য-দানবের গল্প পড়া যায়, হাঁহাঁ যেন তাদেরই একজন! দারুণ আক্রোশে হাঁহাঁ ফুলে ফুলে যেন দ্বিগুন হয়ে উঠেছে!

হাঁহাঁ প্রাণপণে ছুটছে বটে, কিন্তু আধুনিক মানুষের মতো দ্রুত ছোটা তার পক্ষে সম্ভব নয়! কারণ তার পায়ের চেটো সমানভাবে মাটিতে পড়ে না, তাই হেলে-দুলে টলে টলে ছুটতে হচ্ছে তাকে।

সূর্যহারা অস্তাচলে মস্ত একখানা ব্যস্ত মেঘ এসে সমুজ্জ্বল রক্তাক্ত আকাশকে যেন কোঁত করে গিলে ফেললে। পৃথিবীর শেষ আলোর আভাটুকুও যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। দূরে বহুদূরে অরণ্যব্যাপী দাবানলের লক্ষ লক্ষ ক্রুদ্ধশিখা তখনও তাথই-তাথই নৃত্য করছে বটে, কিন্তু সে আলো এখানকার অন্ধকারকে তাড়াতে পারে না।

গুহার কাছ বরাবর এসেই হাঁহাঁ দেখতে পেলে, পাহাড়ের নীচের দিকে থেকে তার বড়ো ও মেজো ছেলে টুটু আর ঘটু চিৎকার করতে করতে বর্শা উঁচিয়ে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে আসছে। হাঁহাঁ কতকটা নিশ্চিন্ত হল তা'লে গুহাভাল্লুকের সঙ্গে তাকে একা লড়াই করতে হবে না।

তারপরেই সে বিস্ফারিত চোখে দেখলে, গুহার ঠিক সামনেই ভয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে হুয়া হাঁটু গেড়ে বসে ঠক ঠক করে কাঁপছে, এবং তার গলা দুইহাতে জড়িয়ে ধরে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে আছে ছোটোখুকি।......ওদিকে বেগে ছুটতে ছুটতে তাদের দিকে তেড়ে আসছে ভয়াবহ গুহাভাল্লুক—তার মস্ত-বড়ো দেহটা যেন পুরু অন্ধকার দিয়ে গড়া, আর তার অতি-তীব্র চক্ষু দুটো যেন অগ্নি দিয়ে তৈরি! তীক্ষ্ণ লম্বা লম্বা দাঁত খিঁচিয়ে মাঝে মাঝে হেঁড়ে মুখ তুলে সে চিৎকার করে উঠছে, যেন কালো মেঘে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাজ ডাকছে! ভাল্লুক তখন হুয়ার কাছ থেকে মাত্র চৌদ্দ পনেরো হাত দূরে।

হঠাৎ হাঁহাঁর আবির্ভাবে ভাল্লুক থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আরও তেড়ে গর্জন করে উঠল এবং তার উত্তরে হাঁহাঁর কণ্ঠেও জাগল আর এক বিষম গর্জন! হিংস্র জন্তুর সঙ্গে হিংস্র মানুষের গর্জনের পাল্লা! এবং সে-যুগে মানুষের গর্জনও জন্তুদের গর্জনের চেয়ে কম-ভয়ানক ছিল না!

তুচ্ছ মানুষ তাকে চেঁচিয়ে ধমক দিতে চায় দেখে ভাল্লুক ভারী খাপ্পা হয়ে উঠল। সে হুয়াকে ছেড়ে হাঁহাঁর দিকে এগুতে লাগল মনে-মনে এই ভাবতে ভাবতে—'রোস হতভাগা, আগে মট করে তোর ঘাড় ভাঙি, তারপর তোর বউ আর মেয়েকে ধরে পেটে পুরে হজম করতে কতক্ষণ?'

হাঁহাঁ চট করে ধাঁধাঁকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে বললে, 'যা, আমার পিছনে লুকিয়ে থাক! তারপর সে ভাল্লুকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে, হাতের বর্শা মাথার উপরে জোর-মুঠোয় চেপে ধরে খুব সাবধানে পাঁয়তাড়া কষতে লাগল।

সেকালকার সেই অতিকায় গুহা-ভাল্লুকের সুমুখে হাঁহাঁকে কী নগণ্যই দেখাচ্ছে! একালের

ভাল্লুকেরও সামনে কোনও আধুনিক মানুষই তুচ্ছ একটা চকমকি-পাথরের ভঙ্গুর বর্শা নিয়ে এমন বুক ফুলিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াতে সাহস করত না। কিন্তু সে-যুগের মানুষকে বনে বনে সর্বদাই ঘুরে বেড়াতে হত বিশালকায় রোমশ হাতি, রোমশ গণ্ডার, ভাল্লুক ও ভয়ানক সব বন্য জন্তুর সঙ্গে। তাদের অধিকাংশই ছিল মানুষের চেয়ে আকারে ও বলবিক্রমে অনেক বড়ো, কিন্তু ওইসব হিংস্র বন্যজন্তুও ছিল তার খাদ্য। মানুষ তখন চাষবাষ করতে শেখেনি, মাংস না খেতে পেলে তার জীবনধারণ করাই চলত না। যদিও শিকার করতে গিয়ে মানুষদের প্রায়ই বন্যজন্তুদের উদরে সশরীরে প্রবেশ করতে হত, তবু ভাল্লুক প্রভৃতিকে দেখলে আজ নগরবাসী আমরা যতটা ভয় পাই, সেকালকার বনবাসী মানুষরা ততটা পেত না। জানোয়ারদের তারা মনে করত, বিপজ্জনক খাবার মাত্র!

ভাল্লুক পায়ে পায়ে এগুচ্ছে, হাঁহাঁর হাতের বর্শার দিকেই তার উদ্বিগ্ন তীক্ষ্নদৃষ্টি! একবার আর একটা দুষ্ট মানুষ ওই-রকম একটা জিনিস ছুড়ে তাকে মেরেছিল এবং পায়ে চোট খেয়ে তাকে যে দুই-তিন মাস খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে ভাল্লুক-সমাজে হাস্যাস্পদ হতে হয়েছিল, সে-গভীর লজ্জার কথা আজও সে ভুলতে পারেনি। ভাল্লুক বুঝে নিলে, ওই জিনিসটাকে সামলাতে পারলেই যুদ্ধে জয় অনিবার্য। নইলে মানুষ তো ছার, এক চড়েই কুপোকাত হয়!

হাঁহাঁ বর্শা তুলে ভাবছে, ভাল্লুকটা আরও কাছে এলে তার কোনখানটায় আঘাত করা উচিত, এমন সময়ে হঠাৎ তার দুই পাশে এসে দাঁড়াল টুটু আর ঘটু! বয়স চব্বিশ ও বিশ—বিরাট-স্কন্ধ, কবাট-বক্ষ, সিংহ-কটি, দীর্ঘ-বাহু, লৌহ পেশি! শক্তিচঞ্চল যৌবনের নিখুঁত প্রতিমূর্তি। তারাও সুমুখের দিকে বাঁ পা বাড়িয়ে বুক চিতিয়ে চকমকি-বর্শা শূন্যে তুলল! পাহাড় ভেঙে এতখানি পথ ঊর্ধ্বশ্বাসে পার হয়ে এল, তবু তারা একটুও হাঁপাচ্ছে না—এমনি তাদের দম!

ভাল্লুক থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে গোঁয়ারও নয়, নির্বোধও নয়। ভাবতে লাগল, শত্রুর সংখ্যা তিনজন, আর কি অগ্রসর হওয়া উচিত?

আচম্বিতে তার নাকের ডগায় এসে পড়ল ঠকাস করে একটা বড়ো পাথর! সে আর দাঁড়াল না, কোনওদিকে তাকালেও না, বিশ্রী একটা গর্জন করেই চটপট দৌড়ে পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগল এই ভাবতে ভাবতে, পাথরটা ছুড়লে কোন বদমাইশ? ইস, নাকটা থেবড়ে গেল নাকি?

পাথরটা ছুড়েছিল হুয়া। স্বামী আর ছেলেদের দেখে তার সাহস ফিরে এসেছে।

হাঁহাঁ হাঁপ ছেড়ে দেখলে, ভাল্লুকটা ক্রমেই অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

অকস্মাৎ আরও উপর থেকে আর একটা গর্জন শোনা গেল। অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে যেন আর-একটা চলন্ত অন্ধকার নীচে নেমে আসছে! ভাল্লুকি?

হাঁহাঁ সবাইকে ইশারা করলে, গুহার ভিতরে গিয়ে ঢুকতে। পৃথিবীতে তখন আলোকের মৃত্যু হয়েছে। গাছে গাছে ভীত বাতাসের কান্না। বনে বনে কোনও জন্তুর নির্দয় শিকার-সংগীত, কোনও জন্তুর কাতর আর্তনাদ। ঝোপে ঝোপে জ্বলন্ত চক্ষু—দিকে দিকে আতঙ্কের আবছায়া।

হাঁহাঁ এধারে-ওধারে তাকাতে তাকাতে নিজেও গুহার ভিতরে প্রবেশ করল। এত বিপদেও বাঁ হাতে সে আগুন-কাঠের গোছা ঠিক চেপে ধরে আছে!

ওদিকে গুহার খানিক উপরে ভাল্লুকের সঙ্গে দেখা হল ভাল্লুকির।

ভাল্লুকি নিজের নাক দিয়ে ভাল্লুকের আহত রক্তাক্ত নাক একবার শুঁকলে। তার মুখ দিয়ে কী-একটা শব্দ বেরুল—ভাল্লুক-ভাষায় বোধহয় জিজ্ঞাসা করলে, 'এ কী কাণ্ড?'

ভাল্লুকও যেন লজ্জিতভাবে কী-একটা শব্দ করলে! বোধহয় বললে, 'গিন্নি, মানুষের হাতে মার খেয়েছি।'

ভাল্লুকি স্বামীর নাকের রক্ত চেটে দিতে লাগল, সস্নেহে।

খানিকক্ষণ কাটাল। ভাল্লুক অস্ফুট গর্জন করে যেন বললে, 'চল গিন্নি, আবার আমরা গুহার দিকে যাই। পাজি মানুষগুলো অন্ধকারে দেখতে পায় না। এই ফাঁকে প্রতিশোধ নিয়ে আসি।' তারা আবার নীচে নামতে লাগল।

হাঁহাঁদের উপরে তাদের রাগের আর একটা কারণ ছিল। দিন-তিনেক আগে হাঁহাঁদের গুহা ছিল ভাল্লুকদেরই গুহা। ভাল্লুকেরা দিন-দুয়েকের জন্যে দূর-বনে শিকার করতে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে, তাদের বাসা ঘৃণ্য মানুষদের হস্তগত হয়েছে! এমন অত্যাচার কে সইতে পারে?

আকাশ যখন কষ্টিপাথরের মতন কালো-কুচকুচে, সন্ধ্যাবেলাকার সেই মেঘখানা যখন আরও নিবিড় হয়ে পাহাড়ের উপর ছুটে আসছে এবং সমস্ত অরণ্য যখন জানোয়ারদের বীভৎস চ্যাঁচামেচি ও হানাহানিতে পরিপূর্ণ, ভাল্লুক ও ভাল্লুকি তখন পা টিপে টিপে গুহার দরজার কাছে এসে হাজির হল। চন্দ্রহীন রাত্রি বনজঙ্গল পাহাড়কে নিজের কৃষ্ণাম্বরীর অঞ্চলে একেবারে ঢেকে ফেলেছিল বটে, কিন্তু জানোয়ারি চোখ আঁধার ফুঁড়েও দেখতে পায়।

ভাল্লুক দু পা এগিয়ে কান পেতে শুনলে, মানুষগুলো কী করছে?

গুহা স্তব্ধ। সবাই নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

আরও দু পা এগিয়ে গিয়েই সে কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এবারে যেন কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ শোনা যাচ্ছে—যেন কাঠে কাঠে ঘষাঘষির শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে গুহার অন্ধকার যেন থেকে থেকে আলোহাসি হাসছে।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ! এমনি শব্দ করতে করতে গুহাভাল্লুক বিপুল বিস্ময়ে আবার দু পা পিছিয়ে এল! এতকাল ভাল্লুকিকে নিয়ে সে এই গুহায় বাস করেছে, কিন্তু ওখানকার অন্ধকার তো কখনও এমন বেয়াড়া বেমক্কা হাসি হাসেনি!

স্বামীর রকম-সকম দেখে ভাল্লুকিও এগিয়ে এসে থ হয়ে গেল। এসব কী!

আচম্বিতে অন্ধকার অত্যন্ত অসম্ভব-রকম আলো-হাসি শুরু করে দিলে—এ হাসি আর যেন থামতেই চায় না! গুহার দেওয়ালে দেওয়ালে, ছাদের তলায়, মেঝের উপরে হাসি খালি নেচে নেচে খেলে বেড়াতে লাগল। এবং ভাল্লুক শাস্ত্র-বহির্ভূত এমন আজগুবি ব্যাপার দেখে হতভম্ব স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। কী যে তারা করবে, ভেবেই পায় না!

তারপরেই চকিতে একরাশি আলো-হাসি শূন্যে অজস্র আগুন-ফুল ঝরিয়ে ফুলঝুরির মতো ভাল্লুক ও ভাল্লুকির সর্বাঙ্গে এসে পড়ল! এ হাসি যে শত শত বিছার মতো কামড়ে দেয়—গা, হাত, পা, মুখ জ্বলিয়ে দেয়! বিকট চিৎকারে চতুর্দিকে কাঁপিয়ে তারা বিষম ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল!

গুহার ভিতরে তখন হাঁহাঁ বউ-ছেলে-মেয়েদের হাত-ধরাধরি করে মহা উল্লাসে তাণ্ডব-নৃত্য আরম্ভ করে দিয়েছে!

মানুষের সঙ্গে আজ থেকে হল আগুনের মিতালি। আগুন বন্ধুর মতো মানুষের হাতের খেলনা হয়ে তাকে বিশ্বজয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে চলল।

কেবল কি বন্ধু? অগ্নি আজ থেকে হল মানুষের দেবতা।

হিন্দু ও পারসিরা আজও অগ্নিদেবের পূজার মন্ত্র ভোলেনি।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

আদিম কালের বরযাত্রী

খোকা-আগুনকে ঘরে পেয়ে হাঁহাঁর আনন্দের আর সীমা নেই! আজ তার মনে হচ্ছে, সমস্ত পৃথিবীকে সে শাসন করতে পারবে। গুহাভাল্লুক শায়েস্তা হয়েছে, এইবারে খোকা-আগুনকে নিয়ে অন্যান্য শত্রুদেরও জব্দ করতে হবে।

কিছুদিন যেতে-না-যেতেই খোকা-আগুনকে বরাবর বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে হাঁহাঁ বুদ্ধি খাটিয়ে একটা ফন্দি বার করে ফেললে।

তাদের গুহার মুখেই ছিল একটা দু হাত গভীর ও ছ-সাত হাত চওড়া গর্ত। হাঁহাঁ চারিদিক থেকে শুকনো ঘাস পাতা ও কাঠ কুটো এনে গর্তের অনেকখানি ভরিয়ে ফেললে এবং তার ভিতরেই করলে আবার খোকা-আগুনের সৃষ্টি। দেখতে দেখতে খোকা-আগুন মস্ত-বড়ো হয়ে উঠল!

হাঁহাঁ ছেলে-মেয়ে-বউকে হুকুম দিলে, যে যখন গুহার ভিতরে থাকবে, মাঝে মাঝে যেন গর্তে দু-একখানা কাঠ ফেলে দিতে ভুলে না যায়। এই উপায়ে গর্তের মধ্যে অগ্নি-দেবতাকে সে সর্বদাই বন্দী করে রেখে দিলে।

সন্ধ্যার পরে গুহার ভিতরে-বাহিরে জাগে আঁধার-দানব, তবু হাঁহাঁর আর ভয় হয় না। কারণ গুহার মধ্যে কুণ্ডে যখন অগ্নি-দেবতা নাচতে নাচতে রাঙা হাসি হাসতে থাকেন, আঁধার-দানব তখন বাইরে পালিয়ে যেতে পথ পায় না।

কেবল আঁধার-দানব নয়, দুষ্টু শীতও দস্তুরমতো টিট হয়ে গেছে! একবার গুহায় ঢুকে কুণ্ডের পাশে এসে বসতে পারলেই হল,—ব্যাস, শীতের কাঁপুনি অমনি বন্ধ! কী মজা! কী আরাম!

গুহাবাসী ভাল্লুক-ভাল্লুকি সেদিনকার অপমান সহজে হজম করতে রাজি হয়নি। ক্ষুদ্র মানুষের এতবড়ো স্পর্ধার কথা ভাল্লুক-সমাজে কে কবে শুনেছে? এর প্রতিশোধ না নিলেই নয়! বিশেষত সেইদিন থেকে ভাল্লুকিও যেন তার স্বামীর প্রতি কতকটা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতে শুরু করেছে! ভীষণ ভাল্লুক-বংশে জন্মগ্রহণ করেও যে দুর্বল মানুষের কাছ থেকে তাড়া খেয়ে লম্বা দেয়, সে স্বামী নামেরই যোগ্য নয়, ভাল্লুকির মনে বোধহয় এই ধরনের একটা ধারণা জন্মেছে; কারণ ভাল্লুক ধমক দিলে ভাল্লুকিও আজকাল দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উলটো-ধমক দিতে ছাড়ে না। এমন অবাধ্য বউ নিয়ে কি ঘর-সংসার করা চলে? চটপট এর একটা প্রতিবিধান না করলেই নয়!

গুহাভাল্লুক খুব-একটা ঘুটঘুটে রাতে পা টিপে টিপে গুহার কাছে খবরাখবর নিতে এল। মনে মনে এঁচে এসেছিল, একটু যদি ফাঁক পায়, তাহলে গুটিকয় চপেটাঘাত করে একটা মানুষেরও মুণ্ড আর আস্ত রেখে আসবে না—হুঁ!

কিন্তু সেদিনও গুহার কাছে গিয়ে দেখলে, ভিতরকার অন্ধকার ঠিক সেদিনকার মতোই বিদঘুটে হাসি হাসছে! খুব-উঁচু হয়ে উঁকি-ঝুঁকি মেরে ভাল্লুক মহাবিস্মিতের মতো দেখলে, গুহার মুখেই দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে! বনের দাবানলের সঙ্গে তার পরিচয় আছে, গুহার দরজায় এসে প্রহরী হয়েছে সেইই! ও-পাহারা ভেদ করে ভিতরে ঢোকা অসম্ভব বুঝে ভাল্লুক আবার সরে পড়ল মানে মানে। কী জানি বাবা, সেদিনকার মতো মানুষগুলো আবার যদি আগুনকে লেলিয়ে দেয়!

আরও কয়েকবার গুহার কাছে গিয়ে সে দেখে এল সেই একই অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপার! ভাল্লুক লুপ্ত গৌরবকে আর উদ্ধার করতে পারলে না। ভাল্লুকির ধমক খেয়েও মুখ বুজে থাকে।

মানুষের কাছে বনের পশু সেই যে জব্দ হতে আরম্ভ করলে আজও তার সমাপ্তি হয়নি। তবে তখন জ্বলত কেবল কাঠের আগুন, আর এখনকার আগুন জ্বলে বন্দুকের মুখে।

আরও কিছুদিন যেতে-যেতেই আর এক অপূর্ব আবিষ্কার। এবং এবারকার আবিষ্কারের জন্যে বাহাদুরি নিতে পারে, ধরতে গেলে হাঁহাঁর বউ হুয়াই। ব্যাপারটা একটু খুলেই বলি।

প্রথম পরিচ্ছেদেই বলেছি, হাঁহাঁ হচ্ছে 'নিয়ানডের্টাল' জাতের মানুষ এবং এজাতের মানুষরা চাষবাস করতে শেখেনি। তারা জীবনধারণ করত প্রধানত শিকার করে এবং যেদিন শিকার জুটত না, ক্ষুধা মেটাত ফলমূল খেয়ে।

একদিন হাঁহাঁর বরাত খুব ভালো। টুটু আর ঘটু দুই ছেলের সঙ্গে বনে বেরিয়ে শিকার করে আনলে মোটাসোটা মস্ত এক বুনো মহিষ। মহিষটাকে দেখেই হুয়া, তার বড়োমেয়ে নিনি ও ছোটোখোকা ধাঁধাঁ আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। কারণ এমন একটা প্রকাণ্ড মহিষের মাংস তাদের পেটের ভাবনা ভুলিয়ে দেবে অন্তত দিন-কয়েকের জন্যে। সেই আদিম যুগের মানুষরা মাংস কোন জন্তুর এবং তা পচা কী টাটকা, এসব বাছ-বিচার করত না একটুও। বহুত দুঃখে, বহু দিনের পর এক-একটা বড়ো শিকার মেলে। মাংস টাটকা রাখবার উপায় তখন কেউ জানত না এবং এমন দুর্লভ জিনিস পচা বলে ফেলে দেওয়াও ছিল অসম্ভব। সাত-আটদিনের পচা মাংসও তখন যে কেউ খেত না, এ-কথাও জোর করে বলা যায় না!

হুয়া আর নিনি মায়ে-ঝিয়ে চকমকি পাথরের ছুরি নিয়ে মাংস কাটতে বসে গেল মহা-উৎসাহে এবং খোকা ধাঁধাঁ করতে লাগল তাদের সাহায্য। তখন থেকেই মেয়েরা গৃহস্থালির এসব কাজ করে নিয়েছিল নিজস্ব।

সেদিন একটু শীত পড়েছিল। হাঁহাঁ অগ্নিকুণ্ডের কাছে গিয়ে মেঝের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে কিঞ্চিৎ আরামের চেষ্টা করতে লাগল।

টুটু আর ঘটুর জোয়ান বয়স, তাদের এখনই বিশ্রামের দরকার হল না। তারা গুহার বাহিরে গিয়ে চকমকি পাথরের অস্ত্র তৈরি করতে বসল। তখন লোহা বা অন্য কোনও ধাতুর অস্তিত্বও কেউ জানত না। চকমকি পাথরের সাহায্যেই চকমকি পাথর কেটে বা ঘষে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা হত। আজ কত হাজার বৎসর পরে পৃথিবীর মাটি খুঁড়ে সেইসব অস্ত্রশস্ত্র আবার খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। যাদুঘরে গিয়ে তোমরা সেসব দেখে আসতে পারো স্বচক্ষে।

সংসারের কর্তাকে সবচেয়ে ভালো খাবার দেবার রীতি প্রচলিত হয়েছিল তখন থেকেই। নইলে সে-যুগের অসভ্য কর্তারা স্ত্রীর মাথায় মারত ডান্ডা, আর এ-যুগের কর্তারা মনের রাগ জানিয়ে দেন কেবল মুখভার করেই, নিতান্ত সভ্যতার অনুরোধেই!

খুব-বড়ো ও খুব-ভালো একখণ্ড মাংস নিয়ে হুয়া চলল স্বামীকে খেতে দিতে। মাংস না রেঁধেই খেতে দেওয়ার কথা শুনে তোমরা কেউ অবাক হয়ো না। মনে রেখো, গৃহস্থালিতে বশীভূত আগুনের সৃষ্টি হয়েছে তখন সবে। আগুন দিয়ে যে আবার রান্না হয়, এটা ছিল তখন কল্পনাতীত।

গুহামুখে অগ্নিকুণ্ডের পাশ দিয়ে যাতায়াতের পথ ছিল অতিশয় সংকীর্ণ। সেইখান দিয়ে যেতে গিয়ে হুয়া হঠাৎ পড়ে গেল। নিজেকে কোনও রকমে আগুনের কবল থেকে সামলে নিলে বটে, কিন্তু তার হাত ফসকে মাংসটা পড়ল গিয়ে একেবারে জ্বলন্ত কুণ্ডের মধ্যে।

হাঁহাঁ ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

—'করলি কী বউ! অমন মাংসটা নষ্ট করলি?'

হুয়া তাড়াতাড়ি উঠে বসে ভয়ে-ভয়ে অপ্রতিভভাবে বললে, 'আমাকে মাফ করো!' তারপর দুই খণ্ড কাঠ দিয়ে মাংসটা অগ্নিকুণ্ডের গর্ভ থেকে তোলবার চেষ্টা করতে লাগল।

হাঁহাঁ বললে, 'থাক, আর তুলে কাজ নেই। ও মাংস নষ্ট হয়ে গেছে, আমি খাব না।'

হুয়া বললে, 'হোক-গে নষ্ট! ও-মাংস আমিই খাব, তোমাকে ভালো মাংস এনে দিচ্ছি।'

হাঁহাঁ আবার শুয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ চেষ্টার পর হুয়া মাংসটাকে আগুনের ভিতর থেকে উদ্ধার করলে। তারপর সেটাকে সেইখানে রেখে স্বামীর জন্যে নতুন মাংস আনতে ছুটল।

অল্পক্ষণ পরেই হাঁহাঁ তার খাবার পেল। এবং হুয়াও স্বামীর পাশে বসে সেই আধ-পোড়া মাংসের উপরে মারলে এক কামড়।

দাঁত দিয়ে খানিকটা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে চিবোতে চিবোতে হুয়া বিস্মিত স্বরে বললে, 'ওগো!'

হাঁহাঁর বড়ো বড়ো দাঁতগুলো তখন মড়-মড় শব্দে হাড় চিবোচ্ছিল। জড়িত স্বরে সে বললে, 'কী?'

—'এই মাংসটা একটু খাবে?'

—'ধ্যাত!'

—'না, একটু খেয়ে দ্যাখো! কী চমৎকার লাগছে!'

—'বাজে কথা!'

—'এক টুকরো চিবিয়ে দ্যাখো! এমন মাংস কখনও খাওনি!'

'হাঁহাঁও খাবে না, হুয়াও ছাড়বে না! স্ত্রীর আবদারে বাধ্য হয়ে শেষটা সে অত্যন্ত নারাজের মতো এক টুকরো আধ-পোড়া মাংস নিয়ে চেখে দেখলে। সঙ্গে-সঙ্গে তার মুখ-চোখের ভাব হয়ে গেল অন্যরকম!

হুয়া বললে, 'কী?'

—'আশ্চর্য!'

—'চমৎকার নয়?'

—'আর-একটু দে!'

হুয়া দাঁত দিয়ে আর এক টুকরো মাংস ছিঁড়ে নিজের হাতে স্বামীর মুখে পুরে দিলে। হাঁহাঁ তারিয়ে তারিয়ে চিবোতে চিবোতে অভিভূত স্বরে বললে 'খাসা!'

হুয়া বললে, 'কাল থেকে আমি এইরকম মাংসই খাব!'

হাঁহাঁ বললে, 'কাল থেকে কেন? আমার এই মাংসটা আজকেই ওইখানে ফেলে দে দেখি!'

হুয়া আবার অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে হাঁহাঁর মাংস ফেলে দিলে। কিছুক্ষণ পরে দুই খণ্ড কাঠের সাহায্যে সেটাকে তুলে নিয়ে হাঁহাঁর হাতে দিয়ে বললে, 'চেখে দ্যাখো!'

হাঁহাঁ সেই মাংসের খানিকটা মুখে পুরে উত্তেজিত স্বরে বললে, 'চমৎকার, চমৎকার! আগুন-ঠাকুরের জয় হোক! হুয়া, আয় আমরা দেবতাকে গড় করি!'

হাঁহাঁ এবং হুয়া সেই অগ্নিকুণ্ডের সামনে মাটিতে মাথা রেখে সানন্দে প্রণাম করলে! অগ্নিদেবতা কেবল শত্রুর কবল থেকে ভক্তকে রক্ষা করেন না, কেবল আঁধার-দানবকে দূরে তাড়িয়ে দেন না, সেইসঙ্গে উদরের খোরাককেও সুধার মতন মধুর করে তোলেন। না-জানি দেবতার আরও কত গুণ আছে!

হাঁহাঁ সানন্দে চিৎকার করে ডাকলে, 'ওরে টুটু, ঘটু, নিনি, ধাঁধাঁ! আয় রে তোরা সবাই! নতুন খাবার খাবি আয়!'

সেইদিন থেকে হল মানুষের গৃহস্থালিতে রন্ধন-শিল্পের আবিষ্কার! সাধারণ জানোয়ারদের শ্রেণী ছেড়ে মানুষ উঠল আর-এক ধাপ উঁচুতে।

হাঁহাঁ আর হুয়ার আদরের বড়ো মেয়ে নিনি, বয়স তার ষোলো বৎসর। বাপ-মা বলে, নিনির চেয়ে সুন্দর মেয়ে দুনিয়ায় আর জন্মায়নি। কিন্তু তোমরা তাকে দেখলে ও-কথা মানতে রাজি হতে না নিশ্চয়ই। প্রথম পরিচ্ছেদেই হাঁহাঁর চেহারার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। নিনি সেই বাপেরই মেয়ে তো, বাপের চেহারার বর্ণনা পড়লেই মেয়ের চেহারা খানিকটা আন্দাজ করতে পারবে।

নিনি হচ্ছে আদিম যুগের বনের মেয়ে, তার সর্বাঙ্গ দিয়ে দুর্দান্ত বলিষ্ঠতা ও বন্য স্বাস্থ্যের ভাব ফুটে উঠছে। তোমাদের একালের দুই-তিনজন যুবা একসঙ্গে চেষ্টা করেও গায়ের জোরে নিনিকে বশ মানাতে পারত না।

বনবালা নিনি আজকাল ভারী বিপদে পড়েছে। ঝরনার ধারে যখন জল আনতে যায় রোজই দেখতে পায়, পাথরের উপরে পা ছড়িয়ে বসে থাকে এক ছোকরা। বনে-জঙ্গলে যখন কাঠ বা ফলমূল কুড়োতে যায়, আনাচে-কানাচে দেখা যায় সেই ছোকরাকেই।

ছোকরাকে দেখতে তার ভালোই লাগে। সে যে তাকে বিয়ে করতে চায়, এটাও নিনি বুঝতে পারে। তবু বিয়ের নামেই তার ভয় হয়। সেকালের বিয়ে, বর তাকে জোর করে ধরে কোথায় নিয়ে যাবে, বাপ-মাকে দেখতে পাবে না আর জন্মের মতো। বাপ-মা ভাই-বোনকে ছেড়ে সে থাকবে কেমন করে? তাই ছোকরাকে দেখলেই ভীরু হরিণীর মতো ছুটে পালিয়ে আসে।

তোমরা জানো না বোধহয়, সেকালের বিয়েতে বাপ-মা বা ঘটকঠাকুরের হাত থাকত না প্রায়ই। কোনও মেয়েকে পছন্দ হলে বর জোর করে তাকে ধরে বা চুরি করে নিয়ে সরে পড়ত। আজও কোনও কোনও অসভ্য সমাজে এই নিয়ম বজায় আছে। মহাভারত প্রভৃতি কাব্য পড়লে দেখবে, ভারতবর্ষ যখন সভ্য তখনও বিবাহের জন্যে কন্যাহরণ নিষিদ্ধ ছিল না। মহাবীর অর্জুনও করেছিলেন সুভদ্রাকে হরণ এবং রুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

সেদিন বৈকালে হাঁহাঁ সকলকে নিয়ে কুণ্ডের চারিপাশে বসে আগুন পোয়াচ্ছে, কেবল নিনি গেছে ঝরনায় জল আনতে।

হঠাৎ নিনি একরাশ এলোচুল হাওয়ায় উড়িয়ে বেগে ছুটতে ছুটতে গুহার ভিতরে ঢুকে পড়ল এবং বাপের পায়ের কাছে বসে পড়ে অত্যন্ত হাঁপাতে লাগল।

হাঁহাঁ সবিস্ময়ে বললে, 'কী রে নিনি?'

—'তারা আমাকে ধরতে আসছে!'

—'তারা? কারা?'

—'যারা আমাকে বিয়ে করবে।'

হাঁহাঁর দুই চোখ জ্বলে উঠল। সগর্জনে বললে, 'কী করবে? বিয়ে?'

—'হ্যাঁ বাবা! সে রোজ একলা আসে। আজ অনেক লোক নিয়ে এসেছে।'

—'কোথায় তারা?'

—'বাইরে। বোধহয় এইখানেই আসছে।'

হাঁহাঁ, টুটু, ঘটু একসঙ্গে এক এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠল, এক একটা পাথরের ফলাপরানো বর্শা হাতে করে। যদিও এইভাবেই তখনকার অধিকাংশ বরই বউ সংগ্রহ করত, তবু কোনও বাপই সহজে নিজের মেয়েকে পরের হাতে বিলিয়ে দিতে রাজি হত না। এইজন্যে আদিম যুগের বিবাহের সময়ে প্রায়ই রক্তারক্তি ও খুনোখুনি কাণ্ডের অবতারণা হত, অনেক সময়ে বরও মারা পড়ত এবং কন্যাপক্ষের আক্রমণে বরযাত্রীরা করত প্রাণপণে পলায়ন।

হাঁহাঁ তার দুই ছেলেকে নিয়ে প্রচণ্ড স্বরে চিৎকার করতে করতে মাথার উপরে বর্শা নাচাতে নাচাতে এবং বড়ো বড়ো লাফ মারতে মারতে বাইরে বেরিয়ে গেল। হুয়া তার মেয়েকে বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরে ভয়ে-দুঃখে কান্না শুরু করে দিলে। মেয়ের বিয়েতে মায়ের

প্রাণ আজও কাঁদে—কত-যুগ-যুগান্তরের বেদনা সেখানে সঞ্চিত আছে।

গুহার বাইরে গিয়ে হাঁহাঁ দেখে, ব্যাপার বড়ো গুরুতর। আঠারো-বিশজন লোক কেউ লাঠি কেউ বর্শা আস্ফালন করতে করতে হই-হই রবে পাহাড়ের উপরে তাদের দিকে উঠে আসছে!

তারা তিনজনে, এই দলে-ভারী বরযাত্রীদের ঠেকাবে কেমন করে?

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

ফুসমন্তর

সব-আগে আসছে সেই ছোকরা, নিনিকে যে বিয়ে করতে চায়!

আগেই বলেছি, নিনিরও পছন্দ হয়েছে এই ছোকরাকে।

কিন্তু কী দেখে যে পছন্দ হয়েছে, আমরা একালের লোক তা বুঝতে বা বলতে পারব না। নিনির পছন্দসই এই বরটির প্রায় গরিলার মতো মুখ, জঙ্গলের ক্ষুদ্র সংস্করণের মতো রাশীকৃত গোঁফ-দাড়ি এবং সর্বাঙ্গে বন্য জন্তুর মতো বড়ো বড়ো লোম দেখলে একালের যে-কোনও মহা-কুৎসিত মেয়েও 'মাগো' বলে লম্বা দৌড় মেরে দেশছাড়া হয়ে পালাবে।

তবে এইটুকু মনে রেখো, নিনি জীবনে যত মানুষ দেখেছে তাদের সকলেরই চেহারা ওই-রকম। একালেও ভারতের কোনও বউই আফ্রিকার কাফ্রি বা হটেনটট বরকে বিয়ে করতে চাইবে না। কী কাফ্রি বা হটেনটটদের মুল্লুকে সেই বরকেই হয়তো অপরূপ কার্তিক বলে মনে করা হয়।

নিনির বরের নামটিও বেশ। টুঁটুঁ।

রূপের কথা ছেড়ে দিই, কিন্তু টুঁটুঁর দেহের দিকে তাকালে তারিফ করে বলতে হয়—হ্যাঁ, সত্যিকার পুরুষের চেহারা বটে! ইয়া চওড়া বুকের পাটা, তার উপরে পড়লে পাথরও যেন ভেঙে যায়! ইয়া দুই আজানুলম্বিত বাহু, তাদের লোহার মতো কঠিন পেশিগুলো থেকে থেকে ফুলে ফুলে উঠছে!

বরযাত্রীদের পলটন দেখে রীতিমতো ভড়কে গিয়ে হাঁহাঁ, টুটু আর ঘটু পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তারা সবাই বুঝলে, ওদের বাধা দিতে যাওয়া আর আত্মহত্যা করা একই কথা। শেষ পর্যন্ত নিনিকে ওরা ধরে নিয়ে যাবেই।

কিন্তু বিনাবাক্যব্যয়ে এতদিনের পালন-করা মেয়েকে কি হাতছাড়া করা যায়? অতএব হাঁহাঁ মুখশাবাশি দেখিয়ে খুব চিৎকার করে বলে উঠল, 'হো! কে রে তোরা?'

টুঁটুঁ বললে, 'আমরা আসছি বাঘ-বন থেকে, সেই যেখানে খাঁড়াদেঁতোরা থাকে।'

—'কী চাস রে?'

—'তোর জামাই হব রে!'

—'আমার জামাই হবি? হা-হা-হা-হা!'

—'অত হাসছিস যে?'

—'তুই হবি নিনির বর? ও হো হো হো হো!'

—'কেন হব না রে? আমার হাতের এই ডান্ডাটা দেখছিস তো?'

—'কী রে, ভয় দেখাচ্ছিস নাকি? ডান্ডা বুঝি আমাদের নেই?'

ততক্ষণে বরযাত্রীরা আরও কাছে এসে পড়েছে। হঠাৎ তাদের ভিতর থেকে একজন খুব লম্বা-চওড়া লোক সবচেয়ে বেশি এগিয়ে এল। তার কাঁচা-পাকা মাথার চুলের উপরে রঙিন

পালকের চুড়ো; তার গলায় দুলছে সাদা ধব-ধবে হাড়ের মালা; তার একহাতে পাথরের বর্শা, আর এক হাতে পাথরের কুঠার; ভাবভঙ্গি ভারিক্কি,—দলের সর্দারের মতো।

হাঁহাঁ শুধোলে, 'তুই আবার কে রে বুড়ো?'

—'আমি টুঁটুঁর বাপ হুঁহুঁ রে!'

—'তোর মতলব কী?'

—'আমি ব্যাটার বউকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

—'আবদার নাকি?'

—আবদার নয় রে, দাবি। দে বউকে শিগগির বার করে।'

হাঁহাঁ রাগ সামলাতে না পেরে ধাঁ করে একখানা পাথর ছুড়লে! কিন্তু টুঁটুঁর বাপ হুঁহুঁ সাঁত করে একপাশে সরে গিয়ে পাথরখানা ব্যর্থ করে দিলে।

বরযাত্রীরা হই-হই করে উঠল, তারপর খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে লাগল এবং এগিয়ে আসতে-আসতেই পাহাড় থেকে পাথর কুড়িয়ে ছুড়তে লাগল ক্রমাগত।

হঠাৎ কী একটা কথা মনে করে হাঁহাঁ হো-হো রবে চ্যাচাতে ও তড়াক তড়াক করে লাফাতে লাগল। এক-একটা লাফ তিন-তিন ফুট উঁচু! একখানা বড়োসড়ো পাথর তার পায়ে এসে লাগল, তবু তার চ্যাচানি আর নাচ বন্ধ হয় না!

টুটু আর ঘটু বুঝলে, তাদের বাপ হঠাৎ পাগল হয়ে গেছে!

টুঁটুঁর বাপ হুঁহুঁ আশ্চর্য হয়ে বললে, 'ওটা অত চ্যাচায় আর লাফায় কেন রে?'

টুঁটুঁ বললে, 'বোধহয় তুকতাক করছে!'

হুঁহুঁ বললে, 'ডান্ডার চোটে সব তুকতাক ঠান্ডা করে দেব! এগিয়ে চল, এগিয়ে চল!'

টুটু বাপের বাঁ হাত জোরে চেপে ধরে বললে, 'ও বাবা, তোর ঘাড়ে কি ভূত চাপল?'

ঘটু বাপের ডান হাত পাকড়ে বললে, 'আর নাচিসনে রে বাবা!'

হাঁহাঁর দুই হাত ধরে ঝুলছে দুই ছেলে, সে কিন্তু সেই অবস্থাতেও লাফাবার চেষ্টা করতে লাগল!

—'বাবা, বাবা, ওরা যে এসে পড়ল!'

—'আসুক রে, আসুক!'

—'সে কী বাবা, তুই এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাচবি, আর ওরা এসে আমাদের মেরে ফেলবে?'

—'তারপর নিনিকে নিয়ে পালাবে?'

হঠাৎ হাঁহাঁ নাচ থামিয়ে গম্ভীর-স্বরে বললে, 'চল, আমরা নিনির কাছে যাই।'

—'লড়াই করবি না?'

—'না?'

—'নিনিকে ওদের হাতে তুলে দিবি?'

—'না।'

—'তবে?'

—'আমার সঙ্গে আয়।'

হাঁহাঁ গুহার দিকে দৌড় মারলে।

বাপের কাপুরুষতায় বিস্মিত ও মর্মাহত হয়ে টুটু বললে, 'ঘটু!'

—'কী রে টুটু?'

—'স্ত্রীলোকের মতো গর্তে গিয়ে ঢুকবি, না এইখানে দাঁড়িয়ে মরদের মতো লড়বি?'

—'মরদের মতো লড়ব।'

—'হ্যাঁ, মরব—তবু নড়ব না।'

—'আমার হাতে বর্শা—'

—'আমার হাতে কুড়ুল।'

তার বর্শা আর কুঠার নিয়ে পাঁয়তাড়া শুরু করলে, এমন সময়ে গুহার ভিতর থেকে হাঁহাঁর ডাক এল—টুটু! ঘটু!'

—'বাবা!'

—'শিগগির এখানে আয়!'

—'যাব না!'

বজ্রকঠোর কণ্ঠে হাঁহাঁ বললে, 'আমার হুকুম। এদিকে আয়!'

মান্ধাতার আমলেরও আগেকার কথা। তখনও ছেলেরা বাপের কথার অবাধ্য হতে শেখেনি হয়তো।

টুটু বললে, 'ঘটু!'

—'কী রে টুটু?'

—'বাপ ডাকে।'

—'হুঁ। না গেলে মারবে।'

আবার হাঁহাঁর স্বর—'টুটু! ঘটু! এখনও এলি না?'

—'যাই বাবা!'

—'দৌড়ে আয়!'

টুটু আর ঘটু গুহার দিকে দৌড়তে লাগল।

বরযাত্রীরা এসে পড়ল।

টুঁটুঁ বললে, 'ভিতুগুলো লড়বে না। পালাল।'

হুঁহুঁ বললে, 'কিন্তু পালিয়েই কি বাঁচবে?'

—'এখন আমরা কী করব রে?'

—'গুহায় ঢুকব।'

—'যদি সেখানে ওরা লড়ে?'

—'ওরা তিনজন, আমরা আঠারোজন। টিপে মেরে ফেলব।'

—'চল তবে।'

মহা হট্টগোল তুলে সবাই গুহার দিকে ছুটল। টুঁটুঁ আর হুঁহুঁ সকলের আগে গুহার মুখে গিয়ে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে নিজেদের লোকজনদের ডেকে বললে, 'আয় রে তোরা ছুটে আয়!'

তারপর গুহার দিকে ফিরে টুঁটুঁ বললে, 'ওরে বুড়ো শ্বশুর! আমার বউ দে!'

হুঁহুঁ বললে, 'বউ দে রে, আমার ব্যাটার বউ দে!'

গুহার ভিতর থেকে হাঁহাঁ জবাব দিলে, 'এই নে রে, এই নে!'

পরমুহূর্তে, দুখানা জ্বলন্ত চ্যালাকাঠ গুহার ভিতর থেকে সাঁ সাঁ করে উড়ে এল—একখানা পড়ল টুঁটুঁর চ্যাটালো বুকের উপরে এবং আর একখানা লাগল গিয়ে হুঁহুঁর মস্ত মুখের উপরে!

এবং তার পরমুহূর্তে গুহামধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল ক্রমাগত জ্বলন্ত কাঠের পর জ্বলন্ত কাঠ! হাঁহাঁ, টুটু, ঘটু, ধাঁধাঁ, হুয়া আর নিনি,—এই আগুনখেলায় যোগ দিয়েছে প্রত্যেকেই। নিনির বিশেষ লক্ষ্য, টুঁটুঁর দিকেই! তার ছোড়া একখানা কাঠের আগুনে টুঁটুঁর গোঁফ-দাড়ির ভিতরে সৃষ্টি করলে ফিনকির ফুলঝুরি!

খিল-খিল করে হেসে সকৌতুকে হাততালি দিয়ে নিনি বলে উঠল, 'পালিয়ে যা রে বর, পালিয়ে যা!'

পালিয়েই গেল! খালি নিনির বর নয়, সবাই। আর সে কী যে-সে পালানো? এত চটপট মানুষ যে পালাতে পারে, নিনি তা জানত না। তাদের কান্নায় আর সভয় চিৎকারে উপর-পাহাড়ে গুহাভাল্লুকের ঘুম গেল ভেঙে। ব্যাপার কী দেখবার জন্যে সে পাহাড়ের ধারে এসে মুখ বাড়ালে।

দেখলে একদল মানুষ পাগলের মতো দৌড় মারছে এবং তাদের পিছনে পিছনে ছুটছে হাঁহাঁ, টুটু আর ঘটু—প্রত্যেকেরই দুহাতে দুখানা করে জ্বলন্ত কাঠ!

বুদ্ধিমান ভাল্লুক ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিলে। হাঁহাঁদের কেউ পাছে তাকেও দেখে ফেলে, সেই ভয়ে সে চট করে পাহাড়ের ধার থেকে সরে এল। সুমুখের দুই পায়ে ভর দিয়ে থেবড়ি খেয়ে বসে ভাবতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। ভেবে ভেবে শেষটা স্থির করলে, এই অভিশপ্ত পাহাড় যে-কোনও ভদ্র ভাল্লুকের বাসের অযোগ্য! এখানে যেসব কাণ্ড ঘটতে শুরু হয়েছে, তার একটুও মানে হয় না। কালই অন্য দেশে যাত্রা করতে হবে।

একটা পাহাড়ে-গাছের ছায়ায় বসে ভাল্লুকি তখন চোখ বুজে থাবা দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল পরম আরামে। স্বামীর পায়ের শব্দে কুঁতকুঁতে চোখদুটি খুললে।

ভাল্লুকির নাকে নিজের নাক লাগিয়ে ভাল্লুক ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল। আমরা—অর্থাৎ মানুষরা বড়োজোর অন্যের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কথা বলি। কিন্তু ভাল্লুক বউয়ের নাসিকায় নিজের নাসিকা সংলগ্ন করে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলে কেন, বলতে পারি না। হয়তো এই উপায়ে তাদের কথা কইবার সুবিধা হয়।

স্বামীর ঘোঁৎঘোঁতানি শুনে ভাল্লুকিও করলে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ। বোধহয়, বললে 'ওমা, তাই নাকি?'

এবার ভাল্লুকের ঘোঁৎ-ঘোঁৎ। বোধহয় বললে, 'হ্যাঁ, গিন্নি। এ পাহাড় আর নিরাপদ নয়। মানুষের সঙ্গে আগুনের ভাব হয়েছে। এসো, লম্বা দি।'

ভাল্লুকির আপত্তি হল না। এ-পাহাড়ে যত মৌচাক লুঠে সব মধু সে শেষ করেছে। এখন নতুন দেশের খবর নেওয়াই ভালো।

গুহাভাল্লুক বউ আর দুটি বাচ্চা নিয়ে যখন দেশত্যাগী হল, ঠিক সেই সময়ে টুঁটুঁর বাপ হুঁহুঁ দলবল নিয়ে একটা মস্তবড়ো বুড়ো বটগাছের তলায় গিয়ে বসে পড়ল। তাদের কারুরই হাতে আর একটা অস্ত্রও নেই। সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র তারা হাঁহাঁদের গুহার সুমুখে ফেলে পালিয়ে এসেছে।

হুঁহুঁ মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে ভাবতে বললে, 'ওরে টুঁটুঁ!'

—'কী রে বাবা?'

—'আমরা কি স্বপ্ন দেখলুম?'

—'স্বপ্ন নয়, সত্যি। স্বপ্ন কামড়ে দিলে কি গোঁফ-দাড়ি পুড়ে যায়? গায়ে ফোসকা হয়?'

—'কেন তোর বউ আনতে এলুম রে টুঁটুঁ, জ্বলে-পুড়ে মলুম যে!'

—'আগুন-দেবতা যার হাতের মুঠোয়, সে যে এইবারে পৃথিবী জয় করবে! আর আমাদের রক্ষে নেই।'

—'টুঁটুঁ, তুই তখন ঠিকই বলেছিলি রে! তখন ও-বেটা পাগলার মতন লাফিয়ে সত্যি সত্যিই তুক করছিল।'

—'ওর ফুসমন্তরে আগুনঠাকুর বশ মেনেছে।'

—'হুঁ। কিন্তু ও-মন্তরটা আমরাও কি শিখতে পারি না?'

—'কেমন করে শিখবি বাবা? ফুসমন্তর কি কেউ কারুকে শেখায়?'

—'ওর বেটিকে তুই যেমন করে পারিস বিয়ে করে ফেল। ওর বেটিও নিশ্চয় বাপের কাছ থেকে মন্তর-তন্তর শিখেছে।'

—'গড় করি বাবা, আর আমি ও-মুখো হই?...ওই দ্যাখোরে বাপ, আবার ওরা এসেছে!'

ছেলের দৃষ্টি অনুসরণ করে হুঁহুঁ সচমকে দেখলে, তাদের খুব কাছেই এসে দাঁড়িয়েছে হাঁহাঁ, দুই পাশে টুটু আর ঘটুকে নিয়ে। কখন যে তারা নীল অরণ্যের যবনিকা ভেদ করে এত কাছে এসে আবির্ভূত হয়েছে, হুঁহুঁর দলের কেউই তা টের পায়নি। কেবল তাই নয়, তাদের তিনজনেরই বাঁ হাতে একখানা করে জ্বলন্ত কাঠ এবং ডান হাতে একগাছা করে বর্শা। প্রত্যেকের কোমরেও ঝুলছে কুঠার।

একে হুঁহুঁদের সবাই অস্ত্রহীন, তার উপরে আবার এই অগ্নিবিভীষিকা! তারা সবাই প্রাণের আশা ছেড়ে দিলে, কারণ পালাবার আগেই ওরা আক্রমণ করবে!

হাঁহাঁ মুখ টিপে টিপে বিজয়-হাসি হাসছিল। হাসতে-হাসতেই বললে, 'কী রে টুঁটুঁর বাপ হুঁহুঁ! আমার মেয়েকে কেড়ে নিয়ে যাবি তো এগিয়ে আয়!'

টুঁটুঁ বললে, 'রক্ষে করো, আমার বিয়ের শখ নেই!'

হুঁহুঁ হাত জোড় করে বললে, 'আমি মাফ চাইছি রে!'

—'কী শর্তে মাফ করব, বল।'

—'আজ থেকে তুই হলি আমাদের প্রভু রে, আর আমরা হলুম তোর দাস।'

—'আজ থেকে আমি যা বলব, শুনবি?'

—'শুনব।'

—'আমি যদি মরতে বলি?'

—'মরব।'

—'সূর্যিঠাকুরের নাম নিয়ে দিব্যি গাল।'

পশ্চিম গগনের প্রদীপ্ত রক্ত-গোলকের দিকে দৃষ্টিপাত করে হুঁহুঁ বললে, 'ওই সূর্যিঠাকুর সাক্ষী রইল, তুই প্রভু—আমরা দাস। আমরা বিপদে পড়লে তোকে কিন্তু আগুন-মন্তরে রক্ষা করতে হবে!'

—'রক্ষা করব।'

—'বিপদ আমাদের শিয়রে জেগেই আছে। আমাদের বাঘ-বনে খাঁড়াদেঁতোদের বিষম উপদ্রব। তুই তাদের তাড়াতে পারবি?'

—'পারব।'

—'আমাদের পাশের বনে অনেক-রকম ভয় আছে। তুই তাদের দূর করতে পারবি?'

—'কেন পারব না রে? গুহাভাল্লুক খাঁড়াদেঁতো বাঘ, ভূতপ্রেত সকল রকম ভয় দূর হয়ে যায় আমার এই আগুন-মন্তরে! এই মন্তরে অন্ধকারকে মেরে রাতকে আমি দিন করতে পারি! আজ থেকে আমি রইলুম তোদের শিয়রে দাঁড়িয়ে, কোনও শত্রুই আর তোদের কাছে আসবে না!'

এই কথা শুনেই হুঁহুঁর দলবল গায়ের সব জ্বালা ভুলে গেল, তারা এক এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে সমস্বরে চিৎকার করে উঠল, 'জয়, জয়! হাঁহাঁ সর্দারের জয়!' তারপর তেমনি চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে হাঁহাঁকে বেষ্টন করে সবাই মণ্ডলাকারে তাণ্ডব-নৃত্য করতে লাগল, বিপুল উল্লাসে!

সেই আদিম যুগের আদিম মানুষদের আদিম আনন্দের নৃত্যছন্দ আজকের আমাদের বুকে আর বাজে না, সুতরাং তার গভীরতাও আমরা আর বুঝতে পারব না।

সেই উচ্ছ্বসিত আনন্দের শিহরণ গিয়ে লাগল গহন-বনের গাছে গাছে পাতায় পাতায় এবং সেই আনন্দের অনাহত ভাষা মুখে নিয়ে আদিম প্রতিধ্বনি কৌতুকলীলায় ছুটে গেল পাহাড়ের শিখরে শিখরে, দূরে দূরান্তরে!

পশ্চিম আকাশের রঙিন প্রাসাদের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন আলোক-সম্রাট সূর্যদেব। সন্ধ্যা আসন্ন। এখনই জাগবে অন্ধকার এবং সঙ্গে সঙ্গে জাগবে তার শত শত অনুচর—শত শত বিভীষিকা, শরীরী দুঃস্বপ্ন!

কিন্তু ওদের নাচ তবু থামল না, তার মত্ততা ক্রমে ক্রমে আরও বেড়ে উঠল!

আজ আর অন্ধকার ও বনবাসী শত্রুর ভয় নেই। মানুষ যে বিশ্বজয়ের প্রধান অস্ত্র অগ্নিকে লাভ করেছে! হো হো! চালাও নাচ! জোরে চালাও—আরও, আরও দূন-তালে!

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

বুড়ো-খাঁড়াদেঁতো

হাঁহাঁদের পাহাড় থেকে মাইল-খানেক তফাতে আর-একটা ছোটো পাহাড়, তারই উপরে দুটো বড়ো বড়ো গুহার মধ্যে হুঁহুঁদের আস্তানা।

সেই পাহাড়ের পর থেকেই আরম্ভ হয়েছে বাঘবন! দুর্গম ও নির্জন বন, কেবল মানুষ নয়, সমস্ত জীবজন্তুর পক্ষেই ভয়াবহ। সে বনের ভিতরে অন্য কোনও জীব ঢোকে না, এবং আলোও ঢোকবার পথ খুঁজে পায় না। আমাদের সেই মধুলোভী গুহাভাল্লুকি একবার সেই বনে মৌচাক খুঁজতে গিয়ে বাঘের এমন বিষম চড় খেয়ে পালিয়ে এসেছিল যে, আর কোনও দিন ওমুখো হবার ভরসা করেনি!

আলোর অভাবে বাঘবনের ভিতরে সর্বদাই বিরাজ করে সন্ধ্যার কালো ছায়া। দেহে লতা-গুল্মের জাল জড়িয়ে অনেক বড়ো-বড়ো বনস্পতি আকাশ-ছোঁয়া ঝাঁকড়া মাথাগুলো শূন্যে দুলিয়ে মর্মর-চিৎকারে সবাইকে যেন সর্বদাই সাবধান করে দিচ্ছে—সাবধান, সাবধান! এ বনে ভুলেও কেউ এসো না!

সেখানকার চিরস্থায়ী কালো ছায়ার উপরে ভীষণা রাত্রি এসে যখন আরও-পুরু কালিমা মাখিয়ে দেয়, বিশ্বব্যাপী নিশীথিনীর লক্ষ লক্ষ জোনাকি-চক্ষুগুলো যখন পিট-পিট করতে থাকে অশ্রান্তভাবে, বাঘবনের ঝোপে ঝোপে জাগে তখন শুকনো পাতার উপরে অদৃশ্য মৃত্যুর পদধ্বনি এবং হিংস্র, রক্তলোভী কণ্ঠের গভীর গর্জনের পর গর্জন।

আমরা একেলে বাঘ দেখি, আর তাকেই ভয় করি যমের মতো! কিন্তু তাদের যেসব পূর্বপুরুষ এই বাঘবনের ছায়ায় ও অন্ধকারে বিচরণ করত, তারা যে কেবল আকারেই আরও বড়ো ছিল তা নয়, চেহারায় ও স্বভাবেও ছিল আরও ভয়ঙ্কর! সবচেয়ে করাল ছিল তাদের চোয়ালের দুই পাশে ঝুলে-পড়া বাঁকা তলোয়ারের মতো দুটো সুদীর্ঘ দন্ত! তারা মুখ বন্ধ করলেও দাঁত দুটো হাতির দাঁতের মতো বাইরে বেরিয়েই থাকত। এই জন্যেই তাদের খাঁড়াদেঁতো বাঘ বলে ডাকা হয়। আধুনিক মানুষের পরম সৌভাগ্য যে, খাঁড়াদেঁতোদের বংশ লোপ পেয়েছে অনেককাল আগেই। নইলে কেবল মানুষ প্রভৃতি জীব নয়, আজকের সুন্দরবনের প্রসিদ্ধি 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' ও আফ্রিকার বিখ্যাত সিংহ পর্যন্ত খাঁড়াদেঁতোদের জলখাবারে পরিণত হত।

খাঁড়াদেঁতোদের ভয়ে বাঘবন থেকে অতিকায় ম্যামথহাতিরাও দল বেঁধে সরে পড়েছিল।

বাঘবনে বাস করত কেবল হায়না প্রভৃতি দু-চারটে ছোটো ছোটো জীব, খুব-সাবধানী ও অতি দ্রুতগামী বলে খাঁড়াদেঁতোদের দন্ত-নখরকে ফাঁকি দিয়ে তারা নিরাপদ ব্যবধানে সরে পড়তে পারত।

বাঘবনে রাজার মতো ছিল একটা বাঘ, হুঁহুঁ যার নাম রেখেছিল 'বুড়ো-খাঁড়াদেঁতো।' অন্যান্য বাঘরা নিজেদের বন ছেড়ে রোজ রাতে বেরিয়ে নানা দিকে যেত, নানা জীব শিকার করবার জন্যে। কিন্তু ওই বুড়ো-খাঁড়াদেঁতোর ভারী শখের খাবার ছিল, মানুষ। সে প্রায়ই এসে হানা দিত হুঁহুঁদের আস্তানায়, আর বাগে পেলে প্রায়ই এক-একজন মানুষকে ধরে মুখে তুলে নিয়ে ফিরে যেত নিজের আড্ডায়। হুঁহুঁ আগে অনেক লোকের উপরে সর্দারি করত, কিন্তু খাঁড়াদেঁতোর শখ মিটিয়ে মিটিয়ে তার দল এখন যথেষ্ট হালকা হয়ে পড়েছে। তাদের চকমকি-পাথরের বর্শা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ওই বুড়োকে মোটেই ব্যতিব্যস্ত করতে পারত না, কারণ একে সে এত চটপটে যে কেউ অস্ত্র তোলবার সময় পর্যন্ত পেত না, তার উপরে পাথরের বর্শার পক্ষে বুড়োর চামড়া ছিল যথেষ্ট পুরু। তবে হ্যাঁ, একবার হুঁহুঁর ছেলে টুঁটুঁ এমন একটা মস্ত পাথর তার হেঁড়ে মাথায় ধাড়াস করে ছুড়ে মেরেছিল, যার ফলে বুড়োকে বেশকিছুদিন ভুগতে হয়েছিল দারুণ মাথা-ধরা রোগে।

সেই সময়ে তার সুয়োরানি বাঘ-বউ (বুড়োর দুই বিয়ে কিনা) বলেছিল, 'ওগো কর্তা, বুড়ো বয়সে রোগে ধরল, এখন কাচ্চা-বাচ্চাদের মানুষ করি কী করে বলো দেখি?'

বুড়ো রেগে কটমটিয়ে তাকিয়ে খাঁড়াদাঁত উঁচিয়ে বললে, 'হালুম! কে বলে রে আমি বুড়ো? পাজি মানুষ-জন্তুগুলো আমাকে বুড়ো বলে ডাকে বলে তুই বুড়িও আমাকে বুড়ো বলে ডাকতে চাস নাকি? আমার মতন জোয়ান এ-তল্লাটে কে আছে রে?'

চালাক দুয়োরানি বাঘ-বউ তাড়াতাড়ি এগিয়ে বুড়োর গায়ে গা ঘষতে ঘষতে আদর-মাখানো স্বরে বললে, 'হুম-হুম ঘ্যাঁক-ঘ্যাঁক গোঁ-গোঁ-গাঁ-গাঁ! অর্থাৎ—'কে বলে গা তোমাকে বুড়ো! বড়ো গিন্নি যেন কী! কিন্তু তোমার মাথাটা অমন ফুলল কেন কর্তা?'

বুড়ো বললে, 'মাথা ধরলেই মাথা ফোলে!' তুচ্ছ মানুষের হাতে মার খেয়ে যে মাথার অমন দুরবস্থা, এ-কথাটা চেপে গেল।

কিন্তু সেইদিন থেকে বুড়ো হল আরও বেশি সাবধান। এমন চুপিসাড়ে সে মানুষ চুরি করে যে, হুঁহুঁর দল তার টিকি পর্যন্ত দেখতে পায় না। (তোমার হয়তো ভাবছ, বাঘের আবার টিকি কী? কিন্তু বাঘের টিকি হচ্ছে, ল্যাজ। বিশেষত সেকালের খাঁড়াদেঁতোদের ল্যাজ ছিল এত খাটো যে, টিকি ছাড়া অন্য কোনও নামে তাকে না ডাকাই উচিত।)

হুঁহুঁ এই বুড়ো-খাঁড়াদেঁতোকে টিট করবার জন্যেই হাঁহাঁর কাছে ধরনা দিয়ে পড়েছে।

কিন্তু হাঁহাঁর কিঞ্চিৎ অসুবিধা হচ্ছে।

সে বিলক্ষণ জানে, একমাত্র অগ্নিদেবের মহিমাই তার মান-সম্ভ্রম বাড়িয়ে তুলেছে এতখানি। এরা বশ মেনেছে ভালোবেসে নয়, ভয়ে। এই ভয় যেদিন দূর হবে, এরা তাকে কীটপতঙ্গের মতো টিপে মেরে ফেলতে ইতস্তত করবে না।

সুতরাং এদের এই ভয়কে জাগিয়ে রাখা দরকার অষ্টপ্রহর।

তাকে সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে, হুঁহুঁরা যাতে কিছুতেই আগুন সৃষ্টি করবার গুপ্তরহস্য জানতে না পারে।

আসল গুপ্তকথা হাঁহাঁ কারুকে বলেনি—ছেলেদেরও না, বউকেও না। সে যে শুকনো পাতার গাদায় ডালে ডালে ঘষে আগুন তৈরি করে, তার পরিবারবর্গ বড়ো-জোর এইটুকুই দেখেছে। কিন্তু বিশেষ একজাতের গাছের ডাল না হলে যে অগ্নি উৎপাদন করা অসম্ভব, এটুকু বুদ্ধি নেই তাদের কারুর ঘটেই, তারা অবাক হয়ে ভাবে, এসব ফুসমন্তরের লীলাখেলা!

হাঁহাঁও সব কথা চেপে গিয়েছে চালাকের মতো। প্রতিজ্ঞা করেছে, আসল ব্যাপার কারুর কাছেই ভাঙবে না। যতদিন সবাই থাকবে অন্ধকারে, ততদিনই তার জয়-জয়কার!

কিন্তু সকলের সঙ্গে বাঘবনে গিয়ে প্রকাশ্যে আগুন জ্বালবে সে কেমন করে? সেইটেই হয়েছে তখন তার সমস্যা!

অবশেষে ভেবে ভেবে একটা উপায় বার করলে। ছেলেদের ডেকে বললে, 'ওরে টুটু, ওরে ঘটু! বাঘবনে তোরা আমার সঙ্গে যাবি রে! শোন, কেমন করে আমার কাছে খোকা-আগুন আসে, সে কথা কারুকে বলিসনে!'

তারা বললে, 'বলব না রে বাপ!'

অবশ্য বললেও খুব বেশি ক্ষতি ছিল না। কারণ টুটু-ঘটু তো জানে না, তাদের বাপের হাতের ডালদুটো কোন গাছের! এমনকী তারা নিজেরাও যা তা গাছের ডাল নিয়ে চেষ্টা করে দেখেছে, আগুন জ্বলে না।

তবু হাঁহাঁ সব ব্যাপারটাই রহস্যের মতো রাখতে চায়। কারণ সাবধানের মার নেই।

পরদিন দুপুরেই হুঁহুঁ আর টুঁটুঁ তাদের দলবল নিয়ে এসে হাজির।

হুঁহুঁ এগিয়ে এসে হাঁহাঁর সুমুখে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললে, 'চল রে সর্দার! বাঘবন জয় করবি চল!'

হাঁহাঁ তার বর্শাটা মাটিতে ঠুকে সদম্ভে বললে, 'যাবই তো! বাঘবন জয় করে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে আসব রে!'

—'বুড়ো-খাঁড়াদেঁতো ভারী ধড়িবাজ! মানুষ দেখলেই ঘাড়ে ঝাঁপ খায়!'

—'রাখ রে রাখ! বুড়ো ঝাঁপ খায় তোদের ঘাড়ে! তাকে দেখলে আমারই ফুস-মন্তর ঝাঁপ খাবে তার ঘাড়ে। চল দেখবি চল!'

দেবতার পানে লোকে যেমনভাবে তাকায়, হাঁহাঁর গর্বিত মুখের দিকে সদলবলে হুঁহুঁ তাকিয়ে রইল তেমনি ভক্তিভরে—না, শুধু ভক্তি নয় তার মধ্যে ভয়ের ভাবও ছিল বইকী!

চলল সবাই বাঘবনের দিকে। যেপথ ধরে তারা অগ্রসর হল তোমরা যদি সেখানে থাকতে, তাহলে নিশ্চয়ই বলতে, 'আহা, আহা, কী চমৎকার!'

সত্যি, চমৎকারই বটে! অতুল! সেকালকার জীবজন্তুদের চেয়ে একালের জীবজন্তুদের আকৃতি প্রকৃতি হয়তো উন্নত হয়েছে, কিন্তু তখনকার নিসর্গ-দৃশ্য এখনকার তুলনায় শ্রেষ্ঠতার দাবি করতে পারে নিশ্চয়ই! আকাশের নিবিড় নীলিমাকে তখন শহর আর কলকারখানার কালো ধোঁয়া ময়লা করে দিতে পারত না, নদীর বুকে ছুটত না তখন কর্কশ পোঁ বাজিয়ে বিশ্রী ইস্টিমার এবং ঘনশ্যামল খেতের বুক চিরে ভীষণ চিৎকারে কান ফাটিয়ে ও বিষম শব্দে মাটির প্রাণ কাঁপিয়ে ধেয়ে চলত না ভয়াবহ লৌহ-অজগরের মতো সুদীর্ঘ রেলের গাড়ি!

চারিদিকে সুন্দর শান্তির রাজ্য! সোনা-রোদের আলোয় নীলাম্বর করছে ঝলমল-ঝলমল এবং গাঢ়-সবুজ বনে বনে ফলফুল লতাপাতার সভায় গিয়ে আলো আর ছায়ায় মিলে খেলছে মনোরম ঝিলমিল-ঝিলমিল খেলা! কোথাও মেঘের সঙ্গে ভাব করবার জন্যে বিপুল শূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বিরাট পর্বত এবং তার কালো বুকে দুলছে কলকৌতুকহাসিতে ভরা ঝরনার রুপোলি হার, কোথাও ঘাসের সবুজ সাটিনে নরম বিছানা পেতেও ঘুমোতে না চেয়ে ছুটে চলেছে দুষ্টু নদী-মেয়ে কুলকুল গান গেয়ে! হরিণ চরছে, পাখি ডাকছে, নামহীন ফুলেরা মৌমাছি-প্রজাপতিদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে মন-মাতানো গন্ধদূতদের!

কিন্তু হাঁহাঁ ও হুঁহুঁ প্রভৃতি সেকালকার আদি মানুষরা এসবের মাধুর্য নিজেদের অজান্তেই প্রাণে-প্রাণে অনুভব করলেও, এদের সৌন্দর্য নিয়ে হয়তো আজকালকার কবিদের মতো

ভাষায় আলোচনা করতে শেখেনি। শিখলেও সে আলোচনার সময় সেদিন ছিল না।

কারণ পথ চলতে চলতে টুঁটুঁর বাপ হুঁহুঁ সেদিন কেবলই ভাবছে, হাঁহাঁ-সর্দারের ফুস-মন্তর যদি ফসকে যায়, বুড়ো-খাঁড়াদেঁতো তাহলে আগে তার দিকেই নজর দেবে, না, আগে আমাকেই গপ করে গিলে ফেলতে আসবে?

আর হাঁহাঁ ভাবছে ক্রমাগত, বাঘবনে বাঘ আছে অগুনতি, একা খোকা-আগুন যদি তাদের সবাইকে সামলাতে না পারে, তাহলে ফিরে এসে আর সর্দারি করতে পারব কি?

আরও খানিকটা এগিয়ে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়ে হুঁহুঁ বললে, 'ওই দেখ রে সর্দার, ওই বাঘবন!'

হাঁহাঁ এদিকে ওদিকে তাকিয়ে, পাশের একটা জঙ্গলের ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, 'খবরদার, তোরা কেউ আমার সঙ্গে আসিসনে!'

—'কেন সর্দার?'

—'আমি ফুসমন্তর ঝাড়তে যাচ্ছি।'

—'তা আমরা যাব না কেন?'

—'আমি এখন মন্তর পড়ে অগ্নিদেবকে ডাকব। সে-সময়ে অন্য কেউ কাছে থাকলে দেবতার কোপে মারা পড়বে!'

এমন বিষম যুক্তির উপরে কথা চলে না। হুঁহুঁ তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এল!......

হাঁহাঁ সেই যে বনের ভিতরে গিয়ে ঢুকল, আর বেরুবার নাম নেই। এই আসে এই আসে করে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুঁহুঁদের পা করতে লাগল টন টন।

হুঁহুঁ শেষটা হাঁড়িপানা মুখ করে টুটুকে ডেকে বললে, 'এই! তোর বাপটা লম্বা দিলে নাকি?'

টুটু বুক ফুলিয়ে বললে, 'কী যে বলিস টুঁটুঁর বাপ! তোদের মতো আমাদের বাপ পালায় না রে!'

—'তবে সে গেল কোথা?'

—'বাবা ফুসমন্তর আউড়ে পুজো করছে!'

—'ছাই করছে!'

হঠাৎ টুঁটুঁ উত্তেজিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবা, বাবা!'

—'কী রে, কী রে?'

—'অগ্নিদেব! টুঁটুঁ জঙ্গলের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

হুঁহুঁ চমৎকৃত হয়ে দেখলে, জঙ্গলের উপরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী এবং ভিতরে পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে দাউ-দাউ আগুন!

সে সভয়ে অথচ সানন্দে চেঁচিয়ে বললে, 'জয় অগ্নিদেব! জয় অগ্নিদেব! জয় অগ্নিদেব! জয়, জয়, জয়!'

তারপরেই দেখা গেল, জঙ্গলের ভিতর থেকে সদর্পে পা ফেলতে ফেলতে বেরিয়ে আসছে হাসিমুখে হাঁহাঁ-সর্দার, তার দুই হাতে দুইখানা জ্বলন্ত কাঠ!

হাঁহাঁ কাছে এসেই বললে, 'যা রে তোরা সবাই, ওই জঙ্গলে যা! ওখানে এমনি আগুন-কাঠ আরও অনেক আছে, তোরা সবাই-দুখানা করে কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে বাঘবনে ছুটে চল! যা, যা, দেরি করিসনে, অগ্নিদেব তাহলে পালিয়ে যাবেন!'

হাঁহাঁর ফুস-মন্তরের প্রভাব দেখে টুটু-ঘটু ছাড়া বাকি সকলেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। অগ্নিদেবের পালাবার সম্ভাবনা আছে শুনে তাদের চমক ভাঙল এবং সবাই একছুটে জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

দুয়োরানি বাঘ-বউয়ের দুই খোকা আর এক খুকি হয়েছিল, সে তাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে। খুকিকে দুই থাবা দিয়ে চেপে ধরে গা চেটে দিচ্ছে এবং টিকির মতো ছোট্ট ল্যাজটা নেড়ে নেড়ে খোকাবাচ্চা দুটোর সঙ্গে খেলা করছে।

সুয়োরানি প্রতিদিন যা করে, সেদিনও তাই করছিল, অর্থাৎ বরের সঙ্গে ঝগড়া।

—'দুদিন আজ শিকারে যাওনি, সংসারে যে খাবার বাড়ন্ত সে হুঁস আছে?'

ছায়া যেখানে প্রায় অন্ধকারেরই মতো ঘন, সেইখানে একরাশ শুকনো পাতার বিছানায় কুঁকড়ে-সুকড়ে পরম আরামে শুয়ে বুড়ো-খাঁড়াদেঁতো একটি দীর্ঘ নিদ্রা দেবার আয়োজন করছিল। সেই অবস্থাতেই অস্পষ্ট স্বরে সে বললে, 'ঘ্যানর ঘ্যানর করিসনে বলছি! কেন থাবা খেয়ে মরবি?'

দুয়োরানি খুকির গা-চাটা থামিয়ে স্বামীর পক্ষ নিয়ে বলল, 'খিদে যদি পেয়ে থাকে দিদি, নিজেই গিয়ে পাহাড় থেকে একটা মানুষ ধরে নিয়ে এসো না! কর্তাকে আর জ্বালাও কেন?'

বুড়ো-খাঁড়াদেঁতো হঠাৎ মাথাটা একটু তুলে বললে, 'ছোটোগিন্নি, তুই মানুষের নাম করতেই নাকে যেন মানুষের গন্ধ পাই!'

সুয়োরানি খাঁড়াদাঁত খিঁচিয়ে বললে, 'বুড়োর ভীমরতি হয়েছে! বাঘবনে মানুষের গন্ধ! কী যে বলে!'

সে কথা কানে না তুলে বুড়ো তাড়াতাড়ি চার পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। একদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, 'বনের ওখানটা নড়ছে কেন?'

সুয়োরানি চটপট বরের একপাশে এসে দাঁড়িয়ে বললে, 'শুকনো পাতার ওপরে খড়-মড় শব্দ হচ্ছে কেন?'

দুয়োরানি চটপট স্বামীর আর এক পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললে, 'বনের ভেতর ধোঁয়া উঠছে কেন?'

বুড়ো-খাঁড়াদেঁতো হা হা হা হা করে হেসে উঠে বললে, 'দেখতে পেয়েছি। বড়ো গিন্নির ভারী বরাত-জোর, বাঘবনে খাবার নিজেই এসে হাজির হয়েছে! আরে, আরে, একটা নয়—দুটো নয়, অনেকগুলো খাবার যে! হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ!' ভীষণ গর্জনে বাঘবনের গাছ-পাতা কাঁপিয়ে সে প্রকাণ্ড এক লম্ফত্যাগ করলে!

প্রথম লাফের পর দ্বিতীয় লাফ, তারপর সে যখন তৃতীয় লাফ মারবার উপক্রম করছে, জঙ্গল ভেদ করে হল হাঁহাঁর আবির্ভাব এবং পরমুহূর্তেই সে বুড়োকে একে একে দুখানা জ্বলন্ত কাঠ ছুড়ে মারলে!

বুড়ো চট করে সরে প্রথম কাঠখানা এড়িয়ে গেল। দ্বিতীয় কাঠখানা ফটাং করে তার পিঠের উপরে এসে পড়ল বটে, কিন্তু তার গতি রোধ করতে পারলে না, অগ্নিদাহের যন্ত্রণায় বিকট চিৎকার করে মহাক্রোধে সে তৃতীয় লাফ মেরে একেবারে হাঁহাঁর সামনে গিয়ে পড়ে তুললে তার প্রচণ্ড থাবা!

হাঁহাঁর সর্দারি সেইখানেই ফুরিয়ে যেত, কিন্তু চকিতে হুঁহুঁর বেটা টুঁটুঁ পিছন থেকে সুমুখে এসে, বুড়োর মুখের উপরে ভয়ানক জোরে বসিয়ে দিলে জ্বলন্ত কাঠের আর এক ঘা—আবার এক ঘা!

অসহ যাতনায় পাগলের মতো বুড়ো চারিদিকে ছুটোছুটি করে গাঁ-গাঁ রবে, আর থেকে থেকে নিজের মুখ-চোখের উপরে দুই থাবা ঘষে। তার এলোমেলো দৌড় দেখে কারুরই আর বুঝতে বাকি রইল না যে, টুঁটুঁর কাঠের আগুনে পুড়ে খাঁড়াদেঁতোর দুই চক্ষুই হয়েছে অন্ধ!

তখন চারিদিক থেকে তার উপরে জ্বলন্ত কাঠি বৃষ্টি হতে লাগল—সেই সঙ্গে বড়ো বড়ো পাথরও! দেখতে দেখতে তার ছটফটানি স্থির হয়ে এল এবং ক্ষীণ হয়ে এল তার গর্জন ও আর্তনাদ। তারপর খাঁড়াদেঁতোর দেহ একেবারে নিশ্চেষ্ট।

সুয়োরানি ও দুয়োরানি প্রভৃতি এই কল্পনাতীত অগ্নিকাণ্ড দেখে ভড়কে গিয়ে, অনেকক্ষণ আগেই টিকির মতো ছোটো ল্যাজ তুলে দিয়েছে লম্বা ভোঁ-দৌড়!

হুঁহুঁ আহ্লাদে আটখানা হয়ে হাঁহাঁকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বুকে তুলে নিয়ে নাচতে নাচতে বললে, 'ওরে আমাদের হাঁহাঁ-সর্দার! তোকে আমরা পুজো করব রে!'

হাঁহাঁ বললে, 'আরে ছাড় ছাড়, এখনও আমার কাজ বাকি আছে!'

হাঁহাঁকে নামিয়ে দিয়ে হুঁহুঁ বললে, 'বুড়ো তো অক্কা পেয়েছে রে, আবার কী কাজ বাকি?'

—'বুড়ো মরেছে বটে, কিন্তু বাঘবনে কি আর বাঘ নেই?'

হুঁহুঁ মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'তা আছে বইকী!'

—'আজ তাদের সবাইকে হয় মারব, নয় তাড়াব!'

—'দূর সর্দার, অসম্ভব!'

—'অগ্নিদেবতার দয়া হলে কিছুই অসম্ভব নয়!.......ভাইসব, বনের তলটা শুকনো পাতায় ছেয়ে আছে, কাঠের আগুনে ধরিয়ে দে পাতাগুলো!'

হাঁহাঁর ফন্দি ব্যর্থ হল না! ঘণ্টা চার পরে দেখা গেল, বাঘবনের মধ্যে বহুদূরব্যাপী দাবানলের তাণ্ডব-নাচ শুরু হয়েছে এবং তার লক্ষ লক্ষ লকলকে রক্তশিখা যেন মহাক্ষুধায় অস্থির হয়ে দিকবিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে চিৎকার করতে করতে!

এবং বনের মধ্যে সর্বত্র জেগে উঠেছে খড়্গদন্ত ব্যাঘ্রদের আর্তধ্বনি! আগুনের বেড়াজালে ধরা পড়ে কত বাঘ যে মাটিতে আছড়ে-পিছড়ে মারা পড়ল তার আর সংখ্যা নেই। বাকি বাঘগুলো সে বন ছেড়ে কোথায় সরে পড়ল, তা কেউ বলতে পারে না! তখন থেকে ব্যাঘ্র-বনে হল ব্যাঘ্রের অভাব। মানুষরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

হাঁহাঁ একগাল হেসে বললে, 'কী রে হুঁহুঁ! আমার বাহাদুরিটা দেখলি তো!'

হুঁহুঁ কৃতজ্ঞ স্বরে বললে, 'কী আর বলব সর্দার! দে, তোর পায়ের ধুলো নিই!'

হুঁহুঁর দলবল একসঙ্গে চিৎকার করে বললে, 'জয়, জয় হাঁহাঁ-সর্দারের জয়!'

হাঁহাঁ নিজের নামে জয়ধ্বনি শুনতে শুনতে খানিকক্ষণ কী ভাবলে। তারপর ফিরে ডাকলে, 'টুঁটুঁ।'

—'সর্দার!'

—'আজ তুই না থাকলে আমি মারা পড়তুম। না রে?'

টুঁটুঁ চুপ করে রইল।

—'শাবাশ জোয়ান তুই।'

—'সর্দার, আমি তোর ছেলের মতো।'

—'তুই আমার নিনিকে বিয়ে করতে চাস?'

টুঁটুঁ ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। গুরুজনদের সামনে সেকালের বর বা বউ কারুরই সঙ্কোচ ছিল না।

—'শোন হুঁহুঁ! তোর বেটা আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। তাই নিনিকে আমি তার হাতে দেব। আজ রাতেই এদের বিয়ে হবে।'

'আজ রাতে? অন্ধকারে?'

—'দূর বোকা! আমার ঘরে আছেন যে অগ্নিদেব! গুহাভাল্লুক আর খাঁড়াদেঁতোর মতো অন্ধকারকেও আমি যে দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি! নে, এখন চল! বুড়ো-খাঁড়াদেঁতোর লাশটাকেও নিয়ে চল, বিয়ের ভোজে কাজে লাগবে!'

—'ঠিক বলেছিস সর্দার! খাঁড়াদেঁতো রোজ আমাদের খেত, আজ আমরা ওকেই খাব। ওহো, কী মজা!'

বাঘবনের বিরাট অগ্নি-উৎসবের লাল আভায় রঞ্জিত পথ দিয়ে সকলে হাসিমুখে ফিরল, বিয়ের ভোজের কথা ভাবতে ভাবতে!

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

আদিম মানুষদের কথা

মানুষের পুরানো কাহিনি বলতে বলতে এইবারে গল্প থামিয়ে ছোট্ট একটি আলোচনা করব।

তোমরা হয়তো ভাবছ, এতক্ষণ ধরে মানুষের যে ইতিহাস বললুম তা কাল্পনিক কথা। মোটেই নয়। নৃতত্ত্ববিদ অর্থাৎ নরবিদ্যায় যাঁরা পণ্ডিত, তাঁরা ঠিক সুচতুর ডিটেকটিভের মতোই নানা প্রমাণ দেখে মানুষের সত্যিকার ইতিহাস আবিষ্কার করেছেন। এসব বিষয় নিয়ে আজীবন নাড়াচাড়া করে তাঁরা এতটা পাকা হয়ে উঠেছেন যে, প্রাচীন মানুষদের মাথার খুলির বা চোয়ালের ভগ্নাংশ দেখেই বলে দিতে পারেন, সম্পূর্ণ অবস্থায় তাদের মুখের গড়ন ছিল কীরকম।

তাদের আচার-ব্যবহারও নানা উপায়ে জানা গিয়েছে। একটা উপায়ের কথা বলছি। ধরো, আদিম মানুষদের দ্বারা ব্যবহৃত একটা গুহা আবিষ্কৃত হল। সে গুহায় ঢুকে প্রথমটা কিছুই হয়তো দেখা যাবে না; কারণ দশ-পনেরো-বিশ হাজার বৎসরের পুঞ্জীভূত ধুলা-জঞ্জাল কঠিন মাটিতে পরিণত হয়ে গুহার ভিতরকার সমস্ত দ্রষ্টব্যকেই কবর দিয়েছে। পণ্ডিতরা তখন গুহার মেঝে খুঁড়তে আরম্ভ করলেন। মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেল মানুষের খুলি বা কঙ্কালের সঙ্গে ম্যামথ হাতির দাঁত। কঙ্কালাবশেষ এবং বল্গা হরিণ (rein deer), রোমশ গণ্ডার, ভাল্লুক ও ষাঁড় প্রভৃতি জন্তুর হাড়, চকমকি পাথরের অস্ত্রশস্ত্র আর অন্যান্য জিনিস।

পণ্ডিতরা মানুষের খুলি বা কঙ্কালের কাঠামোর উপরে প্লাস্টার চাপিয়ে আগে তার চেহারা আবিষ্কার করলেন। তারপর চিন্তা করে বুঝলেন, ওইসব অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিসপত্তর তারা ব্যবহার করত এবং যেসব জন্তুর মাংস তারা ভক্ষণ করত ওই হাড়গুলো তাদেরই। মাংস খাবার পর হাড়গুলো তারা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। হাড়গুলো দেখে আরও বোঝা গেল, ওই জাতের মানুষদের যুগে কোন কোন জীব পৃথিবীতে বিচরণ করত।

নর-বিদ্যায় এখনকার সবচেয়ে বড়ো পণ্ডিত Sir Arthur Keith বলেন, মানুষের পূর্বপুরুষ হচ্ছে বানর। কিন্তু অন্যান্য অনেক পণ্ডিতের মতে, মানুষের পূর্বপুরুষ হচ্ছে এমন কোনও জীব, যে ঠিক বানরও নয়, ঠিক মানুষও নয়। কিন্তু সে যে কীরকম জীব তা কেউ জানে না, কারণ তার কোনও কঙ্কাল আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাস লেখা আছে পৃথিবীর বুকের ভিতরেই। আজ পর্যন্ত যত জীবজন্তু ও উদ্ভিদ জন্মে আবার চিরবিদায় নিয়েছে, পৃথিবীর মাটির স্তরে স্তরে তাদের অধিকাংশেরই চিহ্ন লুকোনো আছে। এক-একটি বিশেষ স্তরে পাওয়া যায় এক-একটি বিশেষ জাতের জীবজন্তু বা উদ্ভিদের চিহ্ন। সকলের আগে যারা জীবজগৎ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে, পৃথিবীর সর্বনিম্ন স্তরে পাওয়া যায় তাদের চিহ্ন। এইরকম এক-একটি স্তরকে এক-একটি বিশেষ যুগ বলে ধরা হয়। এক-একটি স্তর পড়তে কত কাল লাগে, ভূতত্ত্ববিদরা তারও একটা মোটামুটি হিসাব করে ফেলেছেন। এই হিসাবের ওপর নির্ভর করেই বলা হয়, কত হাজার বৎসর আগে হয়েছে কোন কোন জীবের আবির্ভাব।

পৃথিবীতে এক সময়ে ছিল তুষারযুগ। খুব সম্ভব সেই সময়েই হয় প্রথম মানুষের আবির্ভাব। মানুষের সবচেয়ে-পুরানো কঙ্কালাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশ যবদ্বীপে বা জাভায়। কঙ্কাল পরীক্ষা করবার পর তার আকৃতি-প্রকৃতির অনেক কথাই জানা গিয়েছে। তাকে বানর-মানুষ বলে ডাকা হয়। তার মাথার খুলির গড়ন গিবন-বানরের মতো। কিন্তু সে মানুষের মতো দুই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটত, ছুটত এবং মুঠোয় লাঠি ধরতে পারত, তবে কাপড়-চোপড় পরত না। খুব সম্ভব, সে কথাবার্তা কইতেও জানত না। আর তার মস্তিষ্কের শক্তি বনমানুষের তুলনায় উন্নত হলেও আধুনিক মানুষের তুলনায় বিশেষ উন্নত ছিল না। পণ্ডিতদের মতে, এই সময়েই অন্যান্য জন্তুদের সঙ্গে ভয়াবহ খাঁড়াদেঁতো বাঘরা ছিল মানুষের সহচর। আমরা যে-যুগে খাঁড়াদেঁতোদের সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষ দেখিয়েছি, সেযুগে হয়তো তাদের অস্তিত্ব ছিল না। তবে কোনও একটা জন্তু একযুগেই নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যেতে পারে না। খাঁড়াদেঁতোদের শেষ বংশধররা দলে হালকা হলেও পরবর্তী যুগেও যে পৃথিবীর দু-এক জায়গায় বিচরণ করত না, একথা কে জোর করে বলতে পারে? যেমন ভারতীয় সিংহদের যুগ আর নেই, তবু তাদের কয়েকটি জীবন্ত নমুনা আজও দক্ষিণ ভারতে বিদ্যমান।

সেই নির্দয় তুষারযুগে পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে, উত্তর আফ্রিকায় ও উত্তর ভারতে যে মানুষের অস্তিত্ব ছিল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। অনেকের মতে, মানুষের প্রথম জন্ম হয় মধ্য এশিয়ায়। কিন্তু অন্যান্য পণ্ডিতরা বলেন, আদিম যুগেও জায়গার উপরে প্রকৃতির দৃষ্টি ছিল এমন কঠোর যে, মানুষ সেখানে টিকতেই পারত না। এঁদের মতে উত্তর আফ্রিকা থেকে পারস্যের মধ্যবর্তী কোনও স্থান মানুষের আদি জন্মভূমি।

মানুষের আদি জন্মভূমি যেখানেই হোক, আদিম মানুষদের আত্মরক্ষার জন্যে যে কঠিন জীবন যুদ্ধে নিযুক্ত হতে হয়েছিল, আজকের আমাদের কাছে তা অমানুষিক বলে মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। ভীষণ ভীষণ জানোয়ারের ও তুষারযুগের কল্পনাতীত শীতের সঙ্গে দুর্বল বানর-মানুষরা অবিরাম যুদ্ধ করেছে—দেহ তাদের ক্ষুদ্র ও নগ্ন এবং তারা অগ্নির ব্যবহারও জানত না! আর পাথরের অস্ত্র পর্যন্ত তখনও তৈরি করতে শেখেনি!

তখনকার শীত এমন ভয়ানক ছিল যে, বহু অতিকায় ও মহাবলিষ্ঠ জীবও তা সহ্য করতে পারেনি বলে তাদের বংশ একেবারে লোপ পেয়েছে। কিন্তু সেই তুষারমরু পার হয়ে ক্ষুদ্র হয়েও মানুষ বর্তমানের দিকে বিজয়ীর বেশে এগিয়ে আসতে পেরেছে কেবলমাত্র মস্তিষ্কের জোরে। এই মস্তিষ্কেরই অভাবে মানুষের আগে আর কোনও জীব বস্ত্র ও অগ্নি ব্যবহার করতে শেখেনি।

বানর-মানুষদের পরে আমাদের যেসব পূর্বপুরুষ পৃথিবীতে বিচরণ করেছে, তাদের Peking, Rhodesian, Piltdown, Heidelberg, Pre-Chellean ও Chellean মানুষ প্রভৃতি বলে ডাকা হয়। এরই মধ্যে খুব সম্ভব আরও নানা জাতের মানুষ পৃথিবীতে এসে স্বজাতিকে ক্রমোন্নতির দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু এখনও তাদের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়নি।

পূর্বোক্ত Keith সাহেবের মত হচ্ছে, পৃথিবীতে মানুষের প্রথম আবির্ভাব হয়, আনুমানিক দশ লক্ষ বৎসর আগে। কিন্তু নিশ্চয়ই প্রথম যুগে এবং তারও কয়েক লক্ষ বৎসর পরেও মানুষ ছিল বানরের নামান্তর মাত্র। কারণ জাভায় প্রাপ্ত মানুষের কঙ্কালাবশেষের বয়স হচ্ছে পাঁচ লক্ষ বৎসর, অথচ তখনও সে বানরের চেয়ে বিশেষ উন্নত হতে পারেনি। পিকিং মানুষের বয়স ধরা হয়েছে আড়াই লক্ষ বৎসর,—Rhodesian মানুষেদেরও ওই বয়স। Heidelberg মানুষরা দেড় লক্ষ থেকে দুই লক্ষ বৎসর আগে পৃথিবীতে বিচরণ করত। কিন্তু এদেরও মস্তিষ্ক

অপরিণত। সুতরাং বুঝতেই পারছ, মানুষের মস্তিষ্ক বর্তমান আকার লাভ করেছে কল্পনাতীত কত যুগব্যাপী চর্চার পর।

তারপর 'নিয়ানডের্টাল' মানুষের আগমন— এতক্ষণ ধরে যাদের গল্প তোমাদের কাছে বলেছি। ওই 'নিয়ানডের্টাল'দের দেহাবশেষ ইউরোপেই পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু ও-জাতের বা ওদের মতন মানুষ যে তখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ছিল, এবিষয়ে সন্দেহ করবার কারণ নেই। কেউ কেউ হিসাব করে বলেছেন, 'নিয়ানডের্টাল'রা পৃথিবীতে এসেছে পঞ্চাশ হাজার বৎসর আগে। এদের যুগের চিরস্মরণীয় ঘটনা হচ্ছে মানুষের অগ্নিলাভ। এই এক আবিষ্কারই মানুষ যে কী করে অপরাজেয় ও সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে উঠল, গল্পের মধ্যেই তার অল্পবিস্তর আভাস তোমরা পেয়েছ।

আমরা যে সময়ে হাঁহাঁর অগ্নিলাভ করার কথা উল্লেখ করেছি, অন্যান্য জায়গাকার মানুষদের সঙ্গে অগ্নির বন্ধুত্ব হয়েছে, তার ঢের আগেই। কিন্তু এতে আমাদের ভুল হয়নি। কারণ আদিমকালে নানা দেশের মানুষদের মধ্যে কোনও বিষয় নিয়েই আদান-প্রদানের সুযোগ ছিল না। কাজেই অগ্নি ব্যবহার করতে শিখেছে কোনও দেশের মানুষ অনেক আগে, কোনও দেশের মানুষ অনেক পরে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কোনও কোনও আদিম জাতি আজও আগুন জ্বালাতে জানে না!

কিন্তু পণ্ডিতদের মতে, 'নিয়ানডের্টাল'রাও আমাদের মতন মানুষ নয়, কারণ তাদের দেহেও এমন সব লক্ষণ ছিল, যা বানর বা বনমানুষদের দেহেই দেখা যায়।

আনুমানিক পনেরো হাজার বছর আগে থেকে 'নিয়ানডের্টাল'রা বিলুপ্ত হতে শুরু করে। তারা একেবারে লুপ্ত হবার আগে আবার যেসব নতুন জাতির আবির্ভাব হল তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও বিখ্যাত হচ্ছে 'ক্রো-ম্যাগনন' মানুষরা। এদেরই আধুনিক মানুষ বলে ডাকা হয় এবং কোন দেশে এদের প্রথম জন্ম বা আবির্ভাব তার কোনও নিশ্চিত প্রমাণ নেই। তবে ইউরোপে গিয়েছিল তারা বোধহয় উত্তরআফ্রিকা থেকে। তাদের মুখে-চোখে ছিল কিছু কিছু মঙ্গোলীয় ও আমেরিকার 'রেড-ইন্ডিয়ান' ছাপ।

আমরা অনায়াসেই অনুমান করতে পারি, এই রকম আধুনিক মানুষরা ভারতবর্ষেও আবির্ভূত হয়েছিল, কেননা ভারতীয় সভ্যতার বয়স ইউরোপের চেয়ে অনেক বেশি। পরের পরিচ্ছেদে এই নতুন আধুনিক মানুষদের আকৃতি-প্রকৃতি ও আচার-ব্যবহারের কথা তোমরা জানতে পারবে।

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

নতুন মানুষ

ভারী চমৎকার ফুরফুরে হাওয়া উঠেছে! শখ করে বেড়াতে বেরিয়েছে নতুন বর ঢুঁঢুঁর সঙ্গে নতুন বউ নিনি।

বনে বনে গাছের দোল, সেইসঙ্গে সবুজ ঘাসের বিছানার উপরে দুলছে আলো, দুলছে ছায়া।

সেদিনও কোকিল ডাকত, শ্যামলতার অন্তঃপুর থেকে। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের ভাষা অনেক বদলেছে, কিন্তু কোকিলের ভাষা ছিল ওই একই রকম। অর্থাৎ—কুহু, কুহু, কুহু!

কোকিলের গান শুনতে শুনতে তারা নদীর ধারে গিয়ে হাজির হল। মস্ত নদী,—তার দুধারে সারি সারি দাঁড়িয়ে পাহাড়রা দিচ্ছে পাহারা। নদী যে কত দূর গিয়েছে কেউ তা জানে না।

টুঁটুঁ হঠাৎ বললে, 'হ্যাঁ রে বউ, তোর বাপ আমাকে তোদের ঘরে ঢুকতে দেয় না কেন রে?'

ঘর, অর্থাৎ গুহা। তার মধ্যে আছে অগ্নিদেবকে জাগিয়ে রাখবার গুপ্তরহস্য এবং হাঁহাঁ তার জামাইকেও বিশ্বাস করে না। তার পক্ষে এটা অবশ্য অন্যায় নয়। কারণ সেই আদিমযুগের জামাইরা শ্বশুরদেরও খাতির রাখত না।

নিনি তা জানে। আর এটাও তার অজানা নেই যে একবার অগ্নিরহস্য আবিষ্কার করতে পারলেই টুঁটুঁর হাতে হাঁহাঁর প্রাণ যাওয়াও আশ্চর্য নয়। বাপের বিপদ কোন মেয়ে চায়?

অতএব টুঁটুঁর প্রশ্ন চাপা দেবার জন্যে সে বললে, 'বাপের মনের কথা আমি কী জানি? ও কথা চুলোয় যাক, তুই ওই ফুলগুলো তাড়াতাড়ি পেড়ে দে দেখি!' বলে সে সামনের একটা ছোটো পাহাড়ের উপরকার একটা গাছের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

—'ফুল নিয়ে কী করবি?'

—'গন্ধ শুঁকব রে বর!' ফুল দিয়ে যে মালা গাঁথা যায় নিনিদের সমাজের মেয়েরা তা জানত না।

টুঁটুঁ হাতের প্রচণ্ড পাথুরে মুগুরটার উপরে ভর দিয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগল। নিনি ঘাসের উপরে দুই পা ছড়িয়ে বসে পড়ল।

উঁচু গাছের ডালের উপরে উঠে টুঁটুঁ কিন্তু ফুল পাড়বার নামও করলে না, নদীর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বসে রইল চিত্রার্পিতের মতো।

নিনি নীচে থেকে ধমক দিয়ে বলে, 'এই কুঁড়ে বর, ফুল পাড় না!'

তবু টুঁটুঁর মুখে নেই রা!

নিনি বললে, 'হাঁ করে ওদিকে কী দেখছিস রে বর? কখনও কি নদী দেখিসনি?'

—'নদী ঢের দেখেছি রে বউ, কিন্তু নদীতে অমন সব জানোয়ারকে কখনও সাঁতার কাটতে দেখিনি তো।'

—'জানোয়ার? কী জানোয়ার? হাতি-টাতি?'

—'উঁহু। বেয়াড়া জানোয়ার। দুদিকে ঝপাং ঝপাং করে হাত ফেলে সাঁতার কাটছে। আর ওদের পিঠের ওপরে বসে পাঁচ-ছ জন করে মানুষ।'

—'দূর বোকা বর। জলে জানোয়ারের পিঠে চড়ে মানুষ কখনও বেড়াতে পারে?'

—'বেড়াতে পারে কী, বেড়াচ্ছে। বিশ্বাস না হয়, পাহাড়ে উঠে দেখ।'

বিষম কৌতূহলে নিনি চঞ্চল হরিণীর মতন দ্রুত চরণে পাহাড়ের উপরে গিয়ে উঠল। সবিস্ময়ে দেখলে, টুঁটুঁর কথা তো মিথ্যা নয়। একটা নয়, দুটো নয়, পরে পরে বিশ-পঁচিশটা অদ্ভুত জানোয়ার। তাদের প্রত্যেকের পিঠে রয়েছে পাঁচ-সাত জন করে মানুষ।

নিনি সভয়ে বললে, 'ওরে বর, জানোয়ারগুলো যে একে একে আমাদের কাছেই তীরে এসে দাঁড়াচ্ছে। ওই দেখ, মানুষগুলোও ওদের পিঠ থেকে ডাঙায় লাফিয়ে পড়ছে। চল, পালাই চল।'

টুঁটুঁ বললে, 'না রে, ওরা আমাদের দেখতে পায়নি। এইখানে লুকিয়ে থেকে ওরা কী করে দেখ না।'

সে-যুগে মানুষের মন ছিল অনেকটা জন্তুর মতো। পথে একটা কুকুরের সঙ্গে আর একটা অচেনা কুকুরের দেখা হলেই মারামারি কামড়া-কামড়ি হয়। তখনও চেনাশুনা না থাকলেই

এক মানুষ করত আর এক মানুষকে আক্রমণ বিনাবাক্যব্যয়ে। আজ হাজার হাজার বৎসরে পরেও মানুষ-শিশুর মনে এই ভাবেরই প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। অচেনা লোক দেখলেই শিশু ভয়ে কেঁদে ফেলে। কাজেই অন্তত পনেরো হাজার বছর আগেকার বুনো মেয়ে নিনির মনে অপরিচিতকে দেখে ভয়ের সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক।

হঠাৎ টুটুঁ, সচকিত কণ্ঠে বললে, 'ও বউ, দেখ দেখ। কুকুর। ওদের সঙ্গে বড়ো বড়ো কুকুর রয়েছে। কুকুরগুলো আবার ওদের সঙ্গে ল্যাজ নেড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করছে। মানুষের সঙ্গে কুকুরের ভাব। আজব কাণ্ড।'

হাঁহাঁ, হুঁহুঁ, টুটুঁ প্রভৃতি যে সমাজে মানুষ হয়ে জন্মেছে, সে সমাজের কেউ কখনও গৃহপালিত জন্তুর কথা শোনেনি। জন্তু দেখলেই মাংস খাবার জন্যে তারা বধ করত, তাদের পোষ মানিয়ে কাজে লাগাবার চেষ্টা কেউ করত না।

নিনি বললে, 'দেখ বর, দেখ। একটা মানুষ আমাদের খুব কাছে এসেছে। এ কোনও দেশের নতুন মানুষ?'

—'হ্যাঁ রে বউ, তাই তো! ওর গায়ের রং আমাদের মতো কালো কুচকুচে নয়, সাদা সাদা বিচ্ছিরি! ওর মাথার চুলগুলো আমাদের মতো উশকোখুশকো নয়—সাজানো-গোছানো চকচকে!'

নিনি দুই চোখ পাকিয়ে দেখতে দেখতে বললে, 'ছি ছি ও কী কুচ্ছিৎ চেহারা! তোর নাকটি কেমন খাসা থ্যাবড়া, আর ওর নাকটা উঁচু, লম্বা! লোকটার গায়ে বড়ো বড়ো লোম পর্যন্ত নেই। গড়নও ছিপছিপে, তোর মতন বুক ওর চওড়া নয়। মাথাতেও বেমানান লম্বা। তুই কেমন বেঁটে-সেটে।'

টুটুঁ বললে, 'আমরা চলি হেলেদুলে, আর ওরা চলছে সিধে হয়ে গট গট করে! আবার দেখ, ওরা আমাদের মতো চামড়ার কাপড় পরতে জানে না! ওরা কী দিয়ে কাপড় তৈরি করেছে বল দেখি!'

নিনি তাচ্ছিল্যভরে বললে, 'কে জানে! আরে ছ্যাঃ, ওগুলো কি মানুষ, না টিকটিকি? তুই একলা এক চড়ে ওদের পাঁচ-সাতজনকে মেরে ফেলতে পারিস।'

—'চুপ বউ, কথা কোসনে। লোকটা পাহাড়ের ওপরে উঠছে। দাঁড়া, ওকে একটু মজা দেখাই!'

লোকটা চারিদিকে তাকাতে তাকাতে পাহাড়ের উপরে উঠছে ধীরে ধীরে, শিয়রে যে কত-বড়ো বিপদ ওঁত পেতে আছে সেটা টেরও পেলে না।

টুটুঁ পাহাড়ের গা থেকে বেছে বেছে মস্ত একখানা পাথর তুলে নিলে। তারপর বেশ টিপ করে পাথরখানা ছুড়লে।

লোকটা বেজায় জোরে আর্তনাদ করে একেবারে ঠিকরে সটান পড়ে গেল, তারপর পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে গড়াতে গড়াতে নেমে গেল নীচের দিকে!

তার চিৎকার শোনবামাত্র নদীর ধার থেকে দলে দলে লোক ছুটে আসতে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো প্রকাণ্ড কুকুরও!

নিনি নিজেদের গুহার পথে ছুটতে ছুটতে বললে, 'ও বর, পালিয়ে আয় রে!'

কিন্তু তার কথা শোনবার আগেই টুটুঁ পালাতে শুরু করেছে!

বনজঙ্গল ভেঙে, খানা-ডোবা ডিঙিয়ে, পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই পার হয়ে টুটুঁ ও নিনি যখন গুহার কাছে গিয়ে পড়ল, হাঁহাঁ তখন সপরিবারে গুহার সামনে ভোজে বসেছে। ভোজ তো ভারী! কতগুলো গাছের শিকড় ও বন্য কুকুরের আধপোড়া মাংস।

হাঁহাঁ কুকুরের একখানা আস্ত ঠ্যাং তুলে নিয়ে, তার রান-এ মস্ত কামড় মেরে খুব-খানিকটা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে বললে, 'আরে আরে, জামাইটার সঙ্গে আমার বেটি অমন ছুটে আসছে কেন রে?'

হুয়া বললে, 'তাই তো কর্তা! তোর প্রতাপে দেশ তো এখন ঠান্ডা, তবু ওরা ভয় পেয়েছে কেন?'

সত্যি, আশ্চর্য হবার কথাই বটে! হাঁহাঁর খোকা-আগুনের গুণ দেখে কেবল যে গুহা-ভাল্লুকরা ও খাঁড়াদেঁতোরাই সেখান থেকে চম্পট দিয়েছে, তা নয়; হুঁহুঁ-সর্দারের মতো আরও কয়েকজন ছোটো-বড়ো সর্দার ভক্তের মতন এসে তার দল খুব ভারী করে তুলেছে। সে

অঞ্চলে হাঁহাঁর শত্রু কেউ নেই, সকলেরই মুখে তার জয়ধ্বনি! সকলেই জানে এখন হাঁহাঁ-সর্দারের আশ্রয়ে থাকার মানেই হচ্ছে, পর্বতের আড়ালে থাকা। এদেশে তার মেয়ে-জামাইকে ভয় দেখাবে, এতবড়ো বুকের পাটা কার?

টুটুঁ কাছে এসেই বললে, 'ওরে শ্বশুর, নতুন মানুষ এসেছে!'

হাঁহাঁ আশ্চর্য হয়ে বললে, 'আমি জানি না, আমার মুল্লুকে নতুন মানুষ!'

নিনি বললে, 'হ্যাঁ রে বাপ! তারা জানোয়ারের পিঠে চড়ে নদীর জলে বেড়ায়, তাদের রং সাদা, গায়ে লোম নেই, নাক খ্যাঁদা নয়! হাড়-কুচ্ছিৎ!'

টুটুঁ বললে, 'গতরেও তারা আমাদের আধখানা! আমাদের চেয়ে মাথায় তারা লম্বা হতে পারে, কিন্তু চওড়ায় তারা একদম বাজে! তুই ফুঁ দিলে তারা উড়ে যায় রে সর্দার!'

—'ফুঁ দেব না রে হুঁহুঁর বেটা, খোকা-আগুনকে লেলিয়ে দেব! আমার মুল্লুকে নতুন মানুষ! দলে তারা পুরু নাকি রে?'

—'হ্যাঁ সর্দার!'

—'আমাদের চেয়েও?'

—'তা হবে না বোধহয়।'

—'কোথায় তারা?'

—'কল-কল নদীর ধারে।'

হাঁহাঁ একবার আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালে। চারিদিকে গোধূলির আলো জ্বলছে, পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরে আসছে বাসার পানে।

টুটু বললে, 'কল-কল নদীর ধারে এখন যেতে-যেতেই আঁধার নামবে রে বাপ!'

হাঁহাঁ বললে, 'হ্যাঁ। আচ্ছা, আজকের রাতটা চুপচাপ থাকা যাক, কী বলিস রে?'

—'সেই ভালো।'

—'তারপর কাল সকালে দলবল নিয়ে নতুন মানুষদের ঘাড় ভাঙতে যাব।' বলেই হাঁহাঁ আবার কুকুরের আধপোড়া ঠ্যাংখানা হাতে করে তুলে নিলে।

॥ নবম পরিচ্ছেদ ॥

হারা আলো

কল-কল নদীর অশ্রান্ত কল্লোলে সেখানে সংগীতের অভাব হয়নি কোনওদিন, একমুহূর্তের জন্যে।

কোকিল আছে, পাপিয়া আছে, ময়ূর আছে—আরও কত রংবেরঙের পাখি আছে, সকলকার নাম কে করে? চুটকি সুর শোনাবার জন্যে আছে ভোমর, আছে মৌমাছি। তারা সবাই হচ্ছে বনভূমির বাঁধা গাইয়ে। মাইনে পায় যত খুশি পাকা ফল, ফুলের মউ।

অরসিক পাখিগুলোও ছিল তখন। কাক, চিল, চড়াই, প্যাঁচা। কা-কা-কা-কা, চিঁহি-চিঁহি, কিচির-মিচির, চ্যাঁ-চ্যাঁ-চ্যাঁ-চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে যারা ভাবে জবর-ওস্তাদি গান গাইছি।

মর্মরিত বনভূমি রাগ করে বলে—মর মর মর মর কিন্তু অরসিকরা মরতে কিংবা চুপ করতে রাজি নয়। তারা আজও মরেনি বা চুপ করেনি। অসাধারণ তাদের ধৈর্য।

এই সংগীতের সুরে-বেসুরে মুখরিত নদীর ধারে একটা উঁচু জমির উপরে নতুন মানুষদের তাঁবু পড়েছে সারে সারে।

হাঁহাঁদের সঙ্গে এদের চেহারার কত তফাত! হাঁহাঁদের কপাল, নাক, চিবুক, গলা ও চলবার কায়দা ছিল বনমানুষের মতো, কিন্তু এদের দেখলে তোমরা মনে করতে, 'হ্যাঁ, এরা আমাদেরই জাত বটে।' এই নতুন মানুষদের বংশধররা আজও ভারতের নানা স্থানে বাস করে বলে বিশ্বাস হয়। হয়তো অন্য জাতির সঙ্গে মিশে এরাই পরে দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত দ্রাবিড়ি সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। মহেন-জো-দাড়ো ও হরপ্পায় যে পাঁচ হাজার বৎসর আগেকার রাজ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সঙ্গেও নতুন মানুষদের সম্পর্ক ছিল, এমন অনুমানও করা যেতে পারে।

ইতিহাস বলে, আর্যরা যখন মধ্য এশিয়া থেকে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন উত্তর ভারতে যারা বাস করত তাঁদের সঙ্গে তারা অনেককাল ধরে যুদ্ধ করেছিল।

তারা কারা? আমরা যাদের কথা এখন বলছি তারাই যে বিদেশি আর্যদের কবল থেকে স্বদেশকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল, এমন অনুমানের যথেষ্ট কারণ আছে। বহুযুগব্যাপী সেই যুদ্ধে বার বার হেরে তারা ক্রমশ বিন্ধ্যাচল পার হয়ে ভারতের দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করে। আর্যরা তাদের নিয়ে আর বেশি মাথা ঘামাননি এবং মাঝে মাঝে মাথা ঘামিয়েও আর তাদের স্বাধীনতা হরণ করতে পারেননি। এমনকী মুসলমান-প্রভাব স্বীকার করে সমগ্র আর্যাবর্তের আর্যরা যখন ম্রিয়মান, দক্ষিণ ভারত তখন এবং তারপরেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত আপন স্বাধীনতা রেখেছিল অক্ষুণ্ণ।

আর্যরা তাদের 'অমানুষ' বলতেন না বটে, কিন্তু তারা আর্য জাতীয় নয় বলে ঘৃণাভরে তাদের 'অনার্য' নামে ডাকতেন। 'অনার্য' বলতে অসভ্য বোঝায় না। কারণ তারাই জ্বেলেছিল ভারতবর্ষে প্রথম সভ্যতার প্রদীপ। আর্যরা যখন প্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন সেই সভ্যতার প্রদীপশিখা বড়ো অল্প-উজ্জ্বল ছিল না।

আর্যদের মতন এই নতুন মানুষরাও বাহির থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। পৃথিবী তখন আজকের মতন জনবহুল ছিল না, তার অধিকাংশই ছিল নির্জন। কোথাও যখন খাবারের অভাব হত বা অধিকতর পরাক্রান্ত জাতির কাছে আর এক জাতি পরাজিত হত, তখন এক দেশের লোক চলে যেত দলে দলে অন্য দেশে।

এইরকম সব কারণে একদল নতুন (বা 'ক্রো-ম্যাগনন' জাতীয়) মানুষ ইউরোপে প্রবেশ করে। কারুর মতে তারা এসেছিল উত্তর আফ্রিকা থেকে, কেউ বলেন, এশিয়া থেকে। তারপর সেখানে হাঁহাঁদের জাতভাইদের হারিয়ে আস্তানা স্থাপন করে। এবং মেসোপটেমিয়া বা পারস্য অঞ্চল বা অন্য কোথাও থেকে আর একদল ঢোকে ভারতবর্ষে। হাঁহাঁদের জাতের চেয়ে সভ্যতায় ও চেহারায় তারা ছিল অনেক উন্নত। পণ্ডিতরা তাদের পৃথিবীর প্রথম সত্যিকার মানুষ বলেন। এবং তারাও হাঁহাঁদের জাতকে মানুষের জাত বলে মনে করত না। অনেকের মত হচ্ছে, পৃথিবীর সব দেশেরই পুরাতন রূপকথায় যেসব ভীষণদর্শন রাক্ষস-খোক্কসের বর্ণনা পাওয়া যায়, হাঁহাঁদের জাতের মানুষ থেকেই তাদের উৎপত্তি।

হাঁহাঁদের জাতের কোনও মানুষ আজ আর পৃথিবীতে বেঁচে নেই। প্রাচীন মিশরি ও ইতালির আদিম বাসিন্দা ইত্রাস্কান প্রভৃতি জাতিদের মতো তারা লুপ্ত হয়ে গেছে। সম্ভবত একালের কোনও কোনও অসভ্য জাতিদের মধ্যে খুঁজলে তাদের রক্ত পাওয়া যাবে।

আর্যদেরও নানা দল পরে নানা কারণে তাঁদের প্রথম স্বদেশ মধ্য এশিয়া ছাড়তে বাধ্য হন। একদল আসে ভারতবর্ষে, আর একদল যায় পারস্যে, আর একদল ঢোকে ইউরোপে। এই তিন দেশেই তখন প্রথম সত্যিকার মানুষরা বাস করত। তিন দেশেই যুদ্ধে তারা আর্যদের কাছে হেরে যায়। হেরে কতক এদিক-ওদিক সরে পড়ে এবং কতক মিলেমিশে যায় আর্যদেরই

সঙ্গে। ইউরোপে যেমন আর্যদের সঙ্গে মিশেছে অনার্যদের রক্ত, ভারতেও তেমনি মারাঠি, বাঙালি, বিহারি ও যুক্ত প্রদেশের হিন্দুস্থানি প্রভৃতি জাতিদের মধ্যে অনার্য রক্ত আছে।

গল্প শুনতে শুনতে এসব কথা হয়তো তোমাদের শুকনো বলে মনে হচ্ছে! বেশ, তবে গল্পই শোনো।

বলছিলুম কী, কল-কল নদীর ধারে একটা উঁচু জমির উপরে পড়েছে নতুন মানুষদের তাঁবু। তাঁবুগুলো জানোয়ারদের শুকনো চামড়া সেলাই করে তৈরি।

কিন্তু হাঁহাঁদের মতন তারা চামড়া পরে না। তারা পরে গাছের ছালে তৈরি পোশাক—ভারতে যা বল্কল বা বাকল নামে বিখ্যাত।

নিনির মত শুনেছ তো? তারা নাকি ফরসা! হ্যাঁ, তারা নিনিদের চেয়ে ফরসা নিশ্চয়ই, কিন্তু তাদের বর্ণ গৌর বলা যায় না। আর্যদের চোখে তারা কালোই ছিল। যেমন কাফ্রিদের চোখে আমরা ফরসা হলেও সাহেবদের চোখে কালো।

নতুন মানুষদের অনেকগুলো দল উত্তর ভারতের নানা দিকে গিয়েছে। একটা দল এসেছে এইখানে। ছেলে বুড়ো মেয়ে বাদ দিলেও দলে সক্ষম যোদ্ধা আছে তিনশোর কম নয়।

সেদিন সকালে আলোর সঙ্গে পাখিরা জেগে উঠেই দেখলে, নতুন মানুষদের দলে রীতিমতো সাড়া পড়ে গেছে।

তাঁবুর ভিতরে বসে মেয়েরা জিনিসপত্তর গুছিয়ে রাখছে, কেউ শিকারে মারা জানোয়ারের রোমশ ছালে তৈরি বিছানা তুলে নিয়ে রোদে শুকোতে দিতে যাচ্ছে, কেউ নদী থেকে মাটির কলসি ভরে জল নিয়ে আসছে, কেউ মাটির বাসন কোসন মাজছে, কেউ উনুন ধরাচ্ছে। পৃথিবীর কোথাও তখন কোনও ধাতু আবিষ্কৃত হয়নি, মাটির বাসনই ছিল অতি বড়ো সভ্যের ব্যবহার্য। দলের সর্দার ও হোমরা-চোমরারা বড়োজোর পাথরের ঘটি, বাটি, থালা ব্যবহার করে বিলাসিতার পরিচয় দিতে পারতেন।

এ দলের সর্দারের নাম সূর্য। দলের মধ্যে সবচেয়ে তেজি, বলী ও বুদ্ধিমান বলেই তিনি সর্দারির পদ পেয়েছেন। সেযুগে সর্দারের ছেলে বা ভাই হলেই কেউ সর্দারি পেত না। দলের লোকরা যাকে যোগ্য ও বুদ্ধিমান মনে করত সর্দারি দিত তাকেই।

সূর্য-সর্দারের দুই ছেলে—অগ্নি ও বায়ু! এক মেয়ে, নাম আলো।

প্রথম যুগের মানুষরা সকলেই ছিল প্রকৃতির ভক্ত। সূর্য-চন্দ্রের উদয়াস্ত লীলা, ঝঞ্ঝা-পবনের বিরাট শক্তি, মহাসাগরের নৃত্যশীল অসীম উচ্ছ্বাস, অনাহত আকাশের অনন্ত নীলিমা প্রভৃতি দেখে তাদের মন হত বিস্মিত, অভিভূত। ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষরা প্রাকৃতিক প্রত্যেক বিশেষত্বের এক-একটা নাম রাখলে এবং সেইসব নামেই নিজেদেরও ডাকতে শুরু করলে। এ প্রথা আজও লুপ্ত হয়নি।

সূর্য-সর্দার বলছিলেন, 'ওরে অগ্নি, নতুন দেশে এসেছি, কোথায় কী পাওয়া যায় জানি না তো! খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কী হবে?

অগ্নির বয়স বছর চব্বিশ, বায়ুর চেয়ে তিন বছরের বড়ো। ছিপছিপে অথচ বলিষ্ঠ দেহ, তার চোখ, হাত, পা সর্বক্ষণই চাঞ্চল্য প্রকাশ করছে! সে বললে, 'কেন বাবা, কাল আসতে আসতে বনে তো অনেক হরিণ দেখেছি! বায়ুকে নিয়ে আমি শিকারে চললুম।'

—'কিন্তু শিকার যদি না পাস?'

শিকার না পাওয়া তখন বড়ো ভাবনার বিষয় ছিল। কারণ মানুষ তখনও চাষ করতে শেখেনি, ভাত, ডাল, রুটি প্রভৃতি দিয়ে উদর পূরণ করবার উপায় ছিল না। শাক-সবজির ব্যবহারও ছিল না। বড়োজোর বনে কোনও কোনওরকম ফলমূল পাওয়া যেত। কিন্তু মাংসই ছিল প্রায় একমাত্র আহার্য।

এমন সময়ে এক কোণ থেকে কোঁকড়ানো চুল দুলিয়ে আলো ছুটে এল। বয়স ষোলো। দাদা অগ্নির মতোই চঞ্চল। মুখে-চোখে উছলে উঠছে কৌতুকহাসি। এসেই বললে, 'বাবা, বাবা! দাদা বনে হরিণ দেখেছে, আর আমি দেখেছি ওই নদীতে বড়ো বড়ো মাছ!'

সূর্য-সর্দার সস্নেহে মেয়ের মাথায় হাত রেখে বললেন, 'ভালো খবর দিলি। চল, তোকে নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে যাই। আমার আজ শিকারে যাবার বা এখান থেকে নড়বার উপায় নেই—নতুন জায়গায় এসেছি, সবাই কথায় কথায় পরামর্শ করতে আর উপদেশ নিতে আসছে।......বায়ু, নিয়ে আয় তো আমার হাত-সুতো।'

বায়ু এনে দিলে। তখনও ছিপের বা জালের আবিষ্কার হয়নি, বেশি-সভ্য মানুষরা চামড়ার তন্ত্র দিয়ে তৈরি হাত-সুতোর পাথর বা হাড় দিয়ে প্রস্তুত বঁড়শি পরিয়ে মাছ ধরত। কিন্তু মাছ ধরবার এ কৌশলও তখন হাঁহাঁ-হুঁহুঁদের জগতে ছিল স্বপ্নেরও অগোচর।

বাবার সঙ্গে প্রায় নাচতে নাচতে আলো বেরিয়ে গেল তাঁবুর ভিতর থেকে।

অগ্নি তখন নিজের ও ভাইয়ের জন্যে অস্ত্রশস্ত্র বার করছে। চকমকি পাথরের কুঠার, ছুরি, বর্শা। আরও দুটি অস্ত্র বার করলে—সে যুগের যা অশ্রুতপূর্ব মহাআবিষ্কার! ধনুক! বাঁশের ধনুক, কঞ্চির বাণ। বাণের ফলা পাথরের। তখনও তূণ গড়তে কেউ শেখেনি, তাই বাণগুলোকে গোছা করে দড়িতে বেঁধে দেহের পাশে ঝুলিয়ে রাখা হত।

অগ্নি ব্যবহার করতে শিখে জীবরাজ্যে মানুষ প্রথমে হয়েছিল সবচেয়ে বেশি শক্তিধর। তার পরের প্রধান আবিষ্কাররূপে ধনুকবাণের নাম করলে ভুল হবে না। শিকারি মানুষদের পক্ষে এর চেয়ে বড়ো অস্ত্র আদিম পৃথিবীতে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। কেবল আদিম পৃথিবীতে কেন, মধ্যযুগের সভ্য পৃথিবীও যুদ্ধক্ষেত্রে ধনুকবাণকেই মনে করত সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র। আধুনিক যুগেও যেসব পশ্চাৎপদ জাতি বনে-জঙ্গলে বসতি বাঁধে, ধনুকবাণই হচ্ছে তাদের আত্মরক্ষার ও শিকার সংগ্রহের প্রথম উপায়। এই সেদিনও তিব্বতিরা ধনুকবাণ নিয়ে পাল্লা দিতে চেয়েছিল ইংরাজদের বন্দুকের সঙ্গে। একশো বছর আগে জাপানিরাও ব্যবহার করত ধনুক ও বাণ।

অগ্নি ও বায়ু তাঁবুর ভিতর থেকে বেরিয়ে দেখলে, দলের অন্যান্য লোকরা এখানে-ওখানে নানা কাজে ব্যস্ত। কেউ পাথরের ছেনি মুগুর দিয়ে চকমকি কেটে অস্ত্র তৈরি করছে, কেউ ভোঁতা অস্ত্র ঘষে ঘষে ধারালো করে তুলছে, কেউ ফলগাছে উঠে ফললাভের চেষ্টায় নিযুক্ত হয়ে আছে।

অগ্নি চেঁচিয়ে বললে, 'আমার সঙ্গে কে শিকারে যাবে এসো।'

জন-ছয়েক লোক তাদের সঙ্গী হল। গোটাচারেক কুকুরও পিছু নিলে।

বায়ু বললে, 'বাঃ, আর কেউ যে এল না? ওরা কি আজ উপোস করবে?'

উত্তরে সঙ্গীদের একজন বললে, 'হুঃ, ওরা উপোস করবার পাত্রই বটে!'

—'তবে? ওরা কি হাওয়া খেয়েই উপবাস ভঙ্গ করবে?'

—'কদিন সমানে পথ হেঁটে হেঁটে ওরা ভারী শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। এখানকার নদীতে অনেক মাছ আর গাছে অনেক পাখি দেখে ওরা স্থির করেছে আজ আর বনে-জঙ্গলে ঢুকবে না। মারবে গাছের পাখি, ধরবে নদীর মাছ।'

অগ্নি বললে, 'আমাদের দল বড়ো অল্পেই কাবু হয়ে পড়তে শুরু করেছে। পনেরো দিনে একশো ক্রোশ পথ হেঁটে যাদের পায়ে ব্যথা হয়, তাদের আমি পুরুষ বলে গণ্য করি না!'

এমনি সব কথা কইতে কইতে আটজন শিকারি প্রথমে অনিবিড় জঙ্গল ও তারপর গভীর অরণ্যের ভিতরে গিয়ে পড়ল। সে জঙ্গল এমন নিরেট, স্তব্ধ ও স্থির যে তার বহুস্থানেই যেন

বায়ু-চলাচল পর্যন্ত নেই! পাখিরা পর্যন্ত সেসব জায়গায় ঢুকতে বোধহয় ভয় পায়, কারণ গান না গেয়ে যারা থাকতে পারে না সেখানে তারা একেবারেই নীরব। মাঝে মাঝে পথ ও একটু-আধটু খোলা জমি, বাকি সর্বত্রই মস্ত মস্ত গাছ পরস্পরকে জড়াজড়ি করে লতাগুল্মে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাদের তলায় অন্ধকারের সঙ্গে যেন সন্ধ্যার ম্লান আলো আলাপ করছে মৌন ভাষায়। চারিদিকেই কী যেন একটা বুকচাপা ভয় দম বন্ধ করে বসে আছে, চারিদিকেই কারা যেন অদৃশ্য পা ফেলে জীবনকে হত্যা করবার পরামর্শ করছে নির্বাক মুখে, অজানা ইঙ্গিতে!

পাছে কোনও পশু মানুষের পায়ের শব্দ শুনে সাবধান হয়ে পালিয়ে যায়, সেই ভয়ে শিকারিরা পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল। নতুন মানুষরা প্রথম সভ্যতার আস্বাদ পেলেও তখনও তারা বন্য প্রকৃতিরই আদিম সন্তান। তারা যেমন নিঃশব্দে অরণ্যের সঙ্গে মিশিয়ে থাকতে পারত, একালের কোনও অর্ধ-সভ্য মানুষও তা পারে না।

এমন সময়ে এক কাণ্ড হল। কথাটা খুলেই বলি।

তোমরা সেই গুহাবাসী ভাল্লুক ও ভাল্লুকিকে নিশ্চয়ই ভোলোনি। তারা পুরানো বাসা ছেড়ে এই অরণ্যেরই নিকটবর্তী এক গিরিগুহায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। ভেবেছিল মানুষের মুখ আর দেখবে না। অপয়া মুখ!

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে ভাল্লুকি জানালে যে, মৌচাকের সন্ধানে সে বনের ভিতরে একবার টহল মেরে আসতে চায়। ভাল্লুকও মতপ্রকাশ করলে, এ প্রস্তাব মন্দ নয়। সে-ও যাবে।

দুজনেই ঊর্ধ্বমুখে এগিয়ে আসতে আসতে দেখছিল, কোন গাছের ডালে আছে মৌমাছিদের বাসা!

হঠাৎ একটা জঙ্গলের ভিতর থেকে প্রথম বেরিয়ে ভাল্লুক চমকে ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল! হাত বিশ তফাতেই কজন মানুষ!

মানুষরাও তাকে দেখেছিল, তারাও বড়ো কম চমকে উঠল না। জঙ্গলের ভিতর থেকে ভাল্লুক-জায়ার আওয়াজ এল—'ঘুক ঘুক?' অর্থাৎ 'ব্যাপার কী?'

দারুণ ঘৃণায় ও ক্রোধে ভাল্লুক বললে, 'ঘোঁৎ ঘোঁৎ, ঘোঁৎউম, ঘোঁৎউম!'— অর্থাৎ 'দু-চোখের বালি গিন্নি, মানুষ—মানুষ!'

গিন্নি বললে, 'ঘোঁৎকু, ঘোঁৎকু'—অর্থাৎ 'বলো কী, বলো কী' বলতে বলতে সেই ঝোপ থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল।

ওদিকে অগ্নি বললে, 'হুঁশিয়ার! চটপট সবাই ধনুকে বাণ লাগাও!'

সকলেই চোখের নিমেষে ধনুকে জুড়লে বাণ!

কিন্তু ভাল্লুক ভয় পেলে না, ভাল্লুকিও নয়। কারণ তারা এরইমধ্যে চট করে দেখে নিয়েছিল যে, এই ধড়িবাজ মানুষগুলোর হাতে সেই দাউদাউ, জ্বলজ্বল-করা ভয়ানক জিনিসগুলো নেই।

উঁচু হয়ে, হেঁট হয়ে, ঘাড় কাত করে, একটু এপাশে একটু ওপাশে গিয়ে ধনুকবাণগুলো ভালো করে দেখে নিয়ে ভাল্লুক বললে, 'গিন্নি, হেসেই মরি। এই মানুষগুলো গোটাকয় কাঠি নিয়ে আমাদের ভয় দেখাতে এসেছে!'

ভাল্লুকি বললে, 'কর্তা, মধু নয়, অনেকদিন পরে আজ আবার মানুষ খাব। চলো, ওদের ঘাড় ভাঙি।'

ভাল্লুক ও ভাল্লুকি তেড়ে এল।

অগ্নি বললে, 'ছাড়ো বাণ!'

বন-বন করে এক ঝাঁক তির ছুটে এল। পাথরের তির হলেও ঘষে ঘষে তাদের ফলাগুলো

এমন সূচালো করে তোলা হয়েছে যে, গণ্ডার ছাড়া আর সব জীবের চামড়া ভেদ করতে পারে অনায়াসেই। ভাল্লুকের পিঠের উপরে ও সামনের ডান পায়ের উপরে এসে বিঁধল দুটো বাণ। ভাল্লুকির বিশেষ কিছু হল না বটে কিন্তু একটা বাণে তার এক কান হয়ে গেল এ-ফোঁড় ও ফোঁড়।

ভাল্লুক গাঁক-গাঁক করে চেঁচিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে বললে, 'পালাও গিন্নি, পালাও! আমি পালালুম!'

ভাল্লুকি কর্তার উপদেশ শোনবার জন্যে অপেক্ষা করেনি, আগেই অদৃশ্য হয়েছে।

বন পেরিয়ে, পাহাড়ে উঠে, গুহায় ঢুকে জিভ বার করে শুয়ে পড়ে ভাল্লুক দেখলে, ভাল্লুকি আগেই সেখানে হাজির হয়ে ফোঁড়া কানটা ক্রমাগত নাড়ছে!

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে ভাল্লুক বললে, 'কী দেখলুম! কাঠি ছুড়ে কাবু করলে।'

ভাল্লুকি ছটফট করতে করতে বললে, 'জ্বলে মরি গো, জ্বলে মরি! এ কানে আর শুনতে পাব না!'

ভাল্লুক বললে, 'এ বনও ছাড়তে হল গিন্নি। চলো, আমরা হিমালয়ে গিয়ে উঠি। মানুষ সেখানে যাবে না।'

ভাল্লুকি সায় দিয়ে বললে, 'তাই ভালো কর্তা! মানুষগুলো কাপুরুষ। তারা আমাদের কাছে আসে না। দূর থেকে কী সব ছোড়ে, কিচ্ছু মানে হয় না। ওদের দেখলে ঘেন্না হয়। ওদের কাছে থাকা অসম্ভব।'

তারা হিমালয়ে প্রস্থান করলে। আজও তাদের বংশধররা হিমালয়ে বাস করছে।

........ওদিকে সূর্য-সর্দার কল-কল নদীর ধারে বসে মাছ ধরছেন। এরই মধ্যে মস্ত একটা মহাশের মাছ ধরে আবার তিনি জলে হাতসুতো ফেলেছেন।

মাছ ধরতে ধরতে মাঝে মাঝে তিনি মুখ তুলে দেখছেন, নদীর ওপারে অনেক দূরে নীলাকাশের তলায় সাদা নিরেট মেঘের মতো স্থির হয়ে আছে চির-তুষারের চাদর গায়ে দিয়ে মহাগিরি হিমালয়। তার পায়ের তলায় পড়ে রয়েছে অগণ্য শিখর-কন্টকিত বহুদূরব্যাপী ধূসর পর্বত-সাম্রাজ্য। তারও নীচে রয়েছে ক্রোশের পর ক্রোশ জুড়ে সীমাহীন নীল-অরণ্যের দেশ। বন যেখানে আরও কাছে নদীর ওপারের দিকে এগিয়ে এসেছে সেখানে তার রং হয়ে উঠেছে গাঢ়-শ্যামল থেকে ক্রমেই কচি-সবুজ। বনের আগেই এবং নদীর বালুরেখার পরেই দেখা যাচ্ছে দূর্বাঘাসে-মোড়া প্রান্তর, তার বুকে চরছে হরিণ ও বন্য মহিষের দল। মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড ম্যামথ হাতিরা দল বেঁধে নদীর ধারে আসছে জলপান করবার জন্যে। তাদের আগা বাঁকানো লম্বা লম্বা দাঁতগুলোর উপরে জ্বলে জ্বলে উঠছে সূর্যকর।

সূর্য-সর্দার নিজের মনেই বললেন, 'থাকবার জন্যে খুব ভালো জায়গাই নির্বাচন করা হয়েছে। এখানে জলাভাব হবে না, নদীতে আছে মাছ, গাছে আছে ফল আর পাখি, বনে আছে অগুনতি শিকারের পশু। দীর্ঘকালের জন্যে নিশ্চিন্ত হতে পারব!'

আলো খানিকক্ষণ নদীর ধারে বসে বালি দিয়ে ছোটো একটা কিম্ভুতকিমাকার জন্তুর মূর্তি গড়বার চেষ্টা করলে। তারপর কিছুক্ষণ ধরে একটা মুখর কোকিলের ডাক নকল করতে লাগল। তারপর সুন্দর একটি প্রজাপতি দেখে ছুটল তারই পিছনে পিছনে। প্রজাপতিও ধরা দেবে না, সে-ও ছাড়বে না। ছুটতে ছুটতে সেই পাহাড়ের কাছে গিয়ে পড়ল, যার উপরে ফুলগাছ দেখে নিনি কাল আবদার ধরেছিল।

সূর্য-সর্দারের হাতসুতোয় তখন আর একটা মাছ টান মেরেছে, তিনি সুতো গুটিয়ে তাকে ডাঙায় আনতে ব্যস্ত।

আচম্বিতে দূর থেকে আলোর ভীত, আর্তস্বর জাগল, 'বাবা, বাবা! রাক্ষস, রাক্ষস!'

সচমকে ফিরে দেখেই সূর্য-সদারের চক্ষু স্থির!

বিকটদর্শন বিপুলবপু এক ভয়াবহ মূর্তির কবলে পড়ে আলো ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে প্রাণপণে এবং পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসছে সেই রকম দেখতে আরও চার-চারটে মূর্তি! তারা হচ্ছে হুঁহুঁ, টুঁটুঁ, টুটু, ঘটু।

প্রথমটা সূর্য-সর্দার স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এইমাত্র তিনি ভাবছিলেন এখানে এসে নিশ্চিন্ত হবেন, তা হলে এখানেও রাক্ষসের দল আছে? অবশ্য এরা তাঁর অপরিচিত নয়, কারণ যেদেশ থেকে নতুন মানুষরা এসেছে সেখানেও এই রকম রাক্ষসরা তাঁদের উপরে অত্যাচার করে! এরা মানুষদের মেয়ে ধরে নিয়ে যায় এবং পুরুষদের নিয়ে গিয়ে মেরে মাংস খায়। তাহলে কাল তার দলের একজন লোককে পাথর ছুড়ে মেরেছিল এরাই?

আলো কাতর স্বরে আবার ডাকলে, 'বাবা, বাবা, বাবা!'

কী বিপদ! তিনি যে নির্বোধের মতো কোনও অস্ত্র না নিয়েই মাছ ধরতে এসেছেন! তবু শুধু হাতেই মেয়ের দিকে ছুটলেন।

ওদিকে দলের অন্যান্য লোকরাও আলোর আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল। চারিদিক থেকে হই-হই রব তুলে তারাও বেগে ছুটে আসতে লাগল।

কিন্তু কেউ কাছে আসবার আগেই রাক্ষসরা আলোকে নিয়ে পাহাড় ও জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সূর্য-সর্দার দলবল নিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠলেন। কিন্তু কোথাও কেউ নেই। আলোর কান্নাও আর শোনা যায় না।

সূর্য-সর্দার পাগলের মতন চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'ওরে, আলো যে মা-মরা মেয়ে! আমিই যে তাকে নিজের হাতে মানুষ করেছি! খোঁজ, খোঁজ, চারিদিকে খোঁজ, সারা পৃথিবী খোঁজ! রাক্ষসদের হত্যা কর, যেখান থেকে হোক আলোকে আমার কোলে ফিরিয়ে আন!' বলতে বলতে শোকে ভেঙে তিনি সেখানেই বসে পড়লেন।

আলোর খোঁজে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল দলে দলে নতুন মানুষ।

সূর্য-সর্দার ভূমিতলে জানু পেতে বসে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে সাশ্রুনেত্রে ভগ্নস্বরে বললেন, 'সৃষ্টির প্রথম দেবতা, হে সূর্যদেব! অন্ধকার পৃথিবীতে আলো আনাই তোমার একমাত্র কর্তব্য। আমার অন্ধকার মনে আমার হারা আলোকে আবার ফিরিয়ে আনো প্রভু! হে সূর্যদেব! হে মানুষের প্রথম দেবতা'.....

॥ দশম পরিচ্ছেদ ॥

হুয়া আজও বেঁচে আছে

হাঁহাঁর বিপুল স্কন্ধের উপরে আলোর অজ্ঞান দেহ। তার পিছনে পিছনে আসছে হুঁহুঁ, টুঁটুঁ, টুটু ও ঘটু।

প্রথম অনেকখানি পথ তারা দ্রুতবেগে ঊর্ধ্বশ্বাসে পার হয়ে এল। এখানকার প্রকাশ্য ও গুপ্ত সমস্ত পথই তাদের নখদর্পণে এবং কোন পথ দিয়ে সরে পড়লে এ প্রদেশে নব আগন্তুক অনুসরণকারীদের ফাঁকি দেওয়া সহজ হবে একথা তারা ভালোরকমই জানত।

কখনও নিবিড় জঙ্গলের মধ্যবর্তী ঘুটঘুটে শুঁড়িপথ দিয়ে, কখনও পাহাড়ের মাঝখানকার

খাদ লাফ মেরে পার হয়ে এবং কাঁটা তাদের রোমশ দেহের বিশেষ ক্ষতি করতে পারত না বলে কখনও কণ্টকবনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে তারা অবশেষে এসে পড়ল নিজেদের গুহার অনতিদূরে এক সবুজ রং-মাখানো উপত্যকায়।

তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁহাঁ কথা কইবার ফাঁক পেলে। হুঁহুঁকে ডেকে বলল, 'হ্যাঁ রে, ও লোকগুলো কোন মুল্লুক থেকে এল, জানিস কিছু?'

হুঁহুঁ বললে, 'উহুঁ! ওগুলো কি মানুষ, না খুদে পোকার বাচ্ছা! কে ওদের নিয়ে মাথা ঘামায়?'

—'হ্যাঁ, আমাদের এক এক চড়ে ওদের মাথা গুঁড়ো হয়ে যাবে! ওরা দলে ভারী না হলে আমরা কখনওই পালাতুম না।'

—'কিন্তু ওদের মাংস ভারী নরম বলেই মনে হল!'

—'যা বলেছিস, ওদের দেখে আমার জিভে জল আসছিল রে!'

টুঁটুঁ বললে, 'চল না রে শ্বশুর, আমরাও একদিন দল বেঁধে গিয়ে ওদের সবকটাকে ধরে নিয়ে আসি!'

হাঁহাঁ সায় দিয়ে বললে, 'তাই যাব একদিন। অমন কচি মাংস হাতছাড়া করা হবে না।'

হুঁহুঁ বললে, 'কিন্তু ওদের গায়ে জোর কম হলেও হাতে অস্তর আছে, এটা ভুলিস না রে সর্দার!'

হাঁহাঁ বড়াই করে বললে, আমার কাছেও খোকা-আগুন আছে, এটা ভুলিস না রে হুঁহুঁ!'

টুটু বললে, 'যাতে ভাল্লুক পালায়—'

ঘটু বললে, 'আর খাঁড়াদেঁতো মরে!'

হাঁহাঁ বললে, 'ওই আগুনে পুড়িয়ে আমি ওদের মাংস খাব!'

হুঁহুঁ বললে, 'হয়তো ওরাও অন্য কোনও ফুসমন্তর জানে। নইলে এখানে আসতে সাহস করে?'

টুঁটুঁ বাপের কথায় সায় দিয়ে বললে, হ্যাঁ রে শ্বশুর, আমি নিজের চোখে ওদের তিনটে ফুসমন্তর দেখেছি।'

—'কী কী শুনি।'

—'কাল দেখেছি ওরা অনেকগুলো হাতওয়ালা জানোয়ারের পিঠে চড়ে জলে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।'

নতুন মানুষরা এসেছিল নৌকো ভাসিয়ে, দাঁড় ফেলে! এমুল্লুকে নৌকো কেউ দেখেনি, তাই টুঁটুঁ সেই দাঁড়সুদ্ধ নৌকোগুলোকেই হাতওয়ালা জানোয়ার বলে মনে করেছে। বড়ো বড়ো গাছের গুঁড়ি কেটে, তাদের মাঝখানকার অংশ বার করে ফেলে নতুন মানুষরা সেকেলে নৌকো তৈরি করত। বাংলাদেশের পল্লিগ্রামে এখনও এই উপায়েই কোনও কোনও শ্রেণীর নৌকো প্রস্তুত করা হয়।

হাঁহাঁ বললে, 'তুই আর কী দেখেছিস রে জামাই?'

—'আজ দেখলুম ওদের তিন-চার জন কল-কল নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে ভেসে ওপারে গিয়ে উঠল।'

বানরদের মতন হাঁহাঁদের জাতের মানুষরাও নদীকে বড়ো ভয় করত, কারণ তারা সাঁতার কাটতে জানত না, বানর ও মানুষ জাতীয় কোনও জীবই অন্যান্য অধিকাংশ পশুর মতো সাঁতার কাটবার শক্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করে না। সাঁতার তাদের শিখতে হয়। নতুন মানুষরা মাথা খাটিয়ে সাঁতার কাটবার কায়দা আবিষ্কার করেছিল।

এইবারে হাঁহাঁ ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গিয়ে বললে, 'অ্যাঁ, বলিস কী রে, বলিস কী রে? মানুষ জলে চলে! বলিস কী রে?

টুঁটুঁ বললে, 'জলে গেলে তোর খোকা-আগুনও তো মরে যায়! ওরা জলে ঝাঁপ খেলে কী করবি তুই?'

—'ওদের ঝাঁপ খেতে দেব কেন রে বোকা? সে কথা যাক, আর কী দেখেছিস তুই?'

—'ওরা কী-একটা ছুড়ে জলে ফেলে দেয়, আর জলের মাছ ওঠে ডাঙায়। ওদের খাবারের ভাবনা নেই রে!'

হুঁহুঁ সভয়ে বললে, 'কে জানে ওদের আরও কত ফুসমন্তর আছে! ওরা যে আগুন-মন্তর জানে না তাই বা কে বলতে পারে!'

আসলে নতুন মানুষরা আগুনকে আরও বেশি বশ করতে পেরেছিল। তারা কেবল অগ্নিকুণ্ডেই আগুন রাখত না, অন্ধকার দূর করবার জন্যে প্রদীপ গড়ে তার গর্ভে চর্বি ও সলিতা রেখে আলো জ্বালাতে পারত এবং মশালের ব্যবহারও তাদের অজানা ছিল না।

কিন্তু টুঁটুঁর এসব দেখবার সুযোগ হয়নি। কাজেই হুঁহুঁর কথা শুনে বললে, 'ইস, আগুন-মন্তর জানবে ওই মানুষ-পোকাগুলো? আরে ছ্যাঃ, অসম্ভব!'

এমন সময় আলোর জ্ঞান ফিরে এল। প্রথমটা সে কিছুই মনে করতে পারেনি। তারপর অনুভব করলে তার সর্বাঙ্গে রাশি রাশি কর্কশ লোমের মতন কী ফুটছে! তার নাকেও লাগল কেমন একটা বোঁটকা গন্ধ, আলিপুরের পশুশালায় গেলে এখন আমরা যেরকম দুর্গন্ধ পেয়ে নাকে কাপড়-চাপা দিই।—তখন তার সব মনে পড়ল। নিজের অবস্থা বুঝেই আবার সে চেঁচিয়ে কাঁদতে ও হাত-পা ছুড়তে শুরু করে দিলে!

হাঁহাঁ তাকে এক ঝাঁকানি দিয়ে গজরে উঠতেই ভয়ে তার চিৎকার ও হাত-পা ছোড়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেল!

সবাই তখন হাঁহাঁদের গুহার সামনে এসে পড়েছে।

ছেলেমেয়ে নিয়ে হুয়া গুহাপথের মুখে দাঁড়িয়েছিল। অত্যন্ত অবাক হয়ে দেখলে, তাঁর স্বামীর কাঁধে ঝুলছে এক অদ্ভুত মেয়ের দেহ! তার মাথায় বাঁধা খোঁপা (হুয়া খোঁপা কখনও দেখেনি), গলায় দুলছে কড়ির মালা, দেহে বল্কলের বস্ত্র; তার রং কালো নয়, নাক থ্যাবড়া নয়, গলা খাটো নয়; তার মুখে দীর্ঘ দীর্ঘ দন্ত নেই, গায়ে লম্বা লম্বা লোম নেই, আঙুলে বড়ো বড়ো ধারালো নখ নেই! ওমা, এ আবার কেমন মেয়ে।

হুঁহুঁ আর টুঁটুঁ গুহার বাইরে ফর্দা জায়গায় থেবড়ি খেয়ে বসে পড়ল, কারণ ভিতরে যে তাদের প্রবেশ নিষেধ এ কথা আগেই বলা হয়েছে।

হাঁহাঁ গম্ভীর বদনে গুহার ভিতরে প্রবেশ করলে, কৌতূহলী হুয়াও চলল পিছনে পিছনে।

হাঁহাঁ ভিতরে গিয়ে আগে আলোকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিলে। একে বাপের কোল থেকে তাকে ছিনিয়ে আনা হয়েছে, তার উপরে যারা তাকে কেড়ে এনেছে, তাদের সে মানুষ বলেও ভাবতে পারছে না, তার চোখে এরা রাক্ষস ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এরা যে তাকে কুচি কুচি করে কেটে খেয়ে ফেলবে এই ভেবেই সে প্রায় মরো-মরো হয়ে পড়েছে, কাজেই আলো দু-পায়ে ভর দিয়ে মাটির উপরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না, ধপাস করে বসে পড়ে নতমুখে অশ্রুপাত করতে লাগল, নীরবে।

হাঁহাঁ বললে, 'হুয়া, দেখিস এ যেন পালায় না।'

হুয়া বললে, 'কোথাকার একটা ছুঁড়িকে ধরে আনলি রে?'

—'যেখানকারই হোক, কিন্তু এটা যেন পালাতে না পারে!'

—'কেন, তুই একে নিয়ে করবি কী? মেরে খাবি?'

—'না।'

—'তবে? সংসারে আবার একটা পেট বাড়াবি কেন?'

—'সে কথা এখুনি নেই বা শুনলি?'

—'না, আমি শুনবই।'

—'আমি একে বিয়ে করব।'

হাঁহাঁদের মুল্লুকে পুরুষরা দুটো কেন, সময়ে সময়ে পাঁচটা-দশটাও বিয়ে করত। খালি হাঁহাঁদের মুল্লুকে কেন, সে সময়ে পৃথিবীর সব দেশেই পুরুষরা মোটে একটা বউ নিয়ে খুশি হতে পারত না। এ প্রথা আজও পৃথিবীর বহু দেশেই—এমনকী বাংলাদেশেও বর্তমান আছে। খালি সেকালে পুরুষরা নয় সেকালের মেয়েরাও সময়ে সময়ে একাধিক পুরুষকে বিবাহ করত। দ্যাখো না, পরে ভারতবর্ষ যখন সভ্যতার উচ্চস্তরে উঠেছে, তখনও দ্রৌপদীর ছিল একটি-দুটি নয়, পাঁচ-পাঁচটি বর!

কিন্তু কোনও যুগেই কোনও স্বামী যেমন চাইত না যে, তার বউ একসঙ্গে অনেকগুলো বিয়ে করুক, তেমনি সতীন নিয়ে ঘর করতে হবে শুনলে কোনও স্ত্রীও কোনওদিনই খুশি হতে পারেনি। হুয়াও খুশি হল না।

আলোর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে হুয়া বললে, 'এই এক ফোঁটা মেয়েকে তুই বউ করতে চাস নাকি রে?'

—'চাই।'

—'কেন, আমি কি মরেছি?'

—'তুই এখনও মরিসনি বটে, কিন্তু বেশি কথা কইলে এইবারে মরবি।' হাঁহাঁ হাতের মুগুরটা কাঁধের উপরে তুললে। আবার নামিয়ে মাটির উপরে সশব্দে রাখলে।

হুয়া বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক। বুঝলে, অত মোটা মুগুরের উপরে যুক্তি বা প্রতিবাদ চলে না। তার মুখ বোবা হয়ে গেল।

হঠাৎ বাহির থেকে টুটুর ব্যস্ত ডাক শোনা গেল—'বাবা, বাবা!'

—'কী রে টুটু!'

—'হাতি, হাতি!'

—'কোথায় রে, কোথায়।'

—'বনের গর্তে! হুঁহুঁদের লোক খবর এনেছে!'

হাঁহাঁ তাড়াতাড়ি গুহার কোণ থেকে কতকগুলো বর্শা তুলে নিয়ে বেগে পা চালিয়ে ভিতর থেকে অদৃশ্য হল।

তা ব্যাপারটা হচ্ছে এই। সেকালের রোমশ ম্যামথ হাতি ও রোমশ গণ্ডার প্রভৃতি ছিল বিরাট জীব, একালের হাতি গণ্ডারের চেয়ে আকারে অনেক বড়ো। কিন্তু আদিম মানুষদের অস্ত্রশস্ত্র বলতে বোঝাত কেবল পাথরের বর্শা, কুঠার বা ছুরি-ছোরা এবং লাঠি। এসব দিয়ে তো আর হাতি, গণ্ডার বধ করা চলত না, কাজেই মানুষরা হাতি ও গণ্ডারদের চলাচলের পথে মস্ত মস্ত গর্ত খুঁড়ে তাদের মুখগুলো লতা-পাতা-ঘাস দিয়ে ঢেকে রাখত। হাতি বা গণ্ডার বুঝতে না পেরে লতা-পাতার আচ্ছাদনের উপরে পা দিলেই হুড়মুড় করে গর্তের ভিতরে পড়ে যেত। তারপর মানুষরা এসে অস্ত্র ও বড়ো বড়ো পাথর ছুড়ে পাঠিয়ে দিত তাদের যমালয়ে। এখনও এই উপায়ে জন্তু শিকারের পদ্ধতি আফ্রিকায় ও ভারতবর্ষে লুপ্ত হয়নি।

শিকারের পশু চিরদিনই দুর্লভ—বিশেষত সেই প্রস্তরযুগে। কত কষ্ট করে, কত খোঁজাখুজির

পর পাঁচ-সাতদিন অন্তর একটা হরিণ কী শূকর কী ভাল্লুক কী গোরু পাওয়া যায়, একদল লোকের রাক্ষুসে ক্ষুধার মুখে তা উড়ে যেতে বেশিক্ষণ লাগে না। তারপর হয়তো দিনকয়েক পুরো বা আধা উপবাস! কারণ আগেই বলেছি, তখন চাষবাস ছিল না, মানুষ আসল খাবার বলতে বুঝত কেবল মাংসই। কাজেই সেকালের জীবন্ত পাহাড়ের মতো একটা ম্যামথ হাতিকে বধ করতে পারলে মানুষ জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আনন্দ লাভ করত। অঢেল মাংস, আকণ্ঠ খেলেও দিন-কয়েকের আগে ফুরোয় না। এবং একথাও আগে বলা হয়েছে, আদিম মানুষদের পচা মাংসেও বিরাগ ছিল না। বরং পচামাংসই তারা বেশি ভালোবাসত। কারণ সদ্য বধ করা পশুর মাংস হত অত্যন্ত শক্ত, খেতে কষ্ট হত। এ যুগের শিকারিরাও হরিণ প্রভৃতি বধ করলে অন্তত একদিন বাসি না করে মাংস খায় না। অতএব বুঝতেই পারছ, সেকালের ম্যামথের মতো প্রকাণ্ড জীবের দেহ অনেক দিন ধরেই তুলে রেখে দেওয়া হত।

কাজেই হাঁহাঁ আলোর কথা ভুলে বেগে বেরিয়ে গেল। বউ যতখুশি পাওয়া যায়, কিন্তু একটা ম্যামথের দাম দশ-বিশটা বউয়ের চেয়ে বেশি। প্রস্তরযুগের যুক্তি ছিল এইরকম।

হুয়া খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলোকে দেখলে। তারপর এগিয়ে গিয়ে আলোর খোঁপাটা একবার টেনে কৌতূহলী স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, 'এটা কী রে?'

আলো তাদের ভাষা জানে না, কিছু বুঝতে পারলে না। একবার মুখ তুলে হুয়াকে দেখেই অস্ফুট আর্তনাদ করে আবার মুখ নামিয়ে ফেললে। হুয়া নারী হলেও তার কোনও সান্ত্বনার কারণ নেই। রাক্ষসের বদলে রাক্ষসী, এইমাত্র!

হুয়া আরও অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করলে, 'তোর গায়ে লোম নেই কেন?' 'তুই এত রোগা কেন?' 'তুই কাঁদছিস কেন?' প্রভৃতি......

কিন্তু আলো কথা কয় না।

তারপর হুয়া অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে কী ভাবলে। খুব সম্ভব, সতীনের সঙ্গে ঘর করতে গেলে ভবিষ্যতে তাদের সংসার কী আকার ধারণ করবে, সেইটেই কল্পনায় দেখবার চেষ্টা করলে। দৃশ্যটা বোধকরি খুব উজ্জ্বল বলে মনে হল না। একবার উঠে বাইরে গেল। সেখানে কেউ নেই, তার ছোটো খোকাটা পর্যন্ত ম্যামথ বধের ঘটা দেখতে গেছে।

পাহাড়ের উপরে পড়ন্ত রোদে গাছের ছায়াগুলো সুদীর্ঘ হয়ে উঠছে। হুয়া বুঝলে, আলো নেবাবার আগেই সকলে আবার গুহায় ফিরে আসবে।

সে আবার ভিতরে এল। আলোর কাছে এসে বললে, 'এই ছুঁড়িটা!'

সাড়া নেই।

আলোর হাত ধরে এক টানে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে হুয়া বললে, 'আ মর! তুই বোবা নাকি রে?'

আলো শুধু কাঁদে।

আবার তার হাত ধরে হিড়-হিড় করে টানতে টানতে হুয়া গুহার বাইরে এল। তারপর তাকে একটা বিষম ধাক্কা মেরে পথের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে রুক্ষ স্বরে বললে, 'দূর হ বোবা আপদটা! বেরো!'

আলো তার ইঙ্গিত বুঝতে পারলে, কিন্তু নিজের এই কল্পনাতীত সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারলে না। ভাবলে, এ হচ্ছে রাক্ষসীর ছলনা! সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে থর-থর করে কাঁপতে লাগল।

পাহাড়ের উপর থেকে একটা লম্বা গাছের ডাল কুড়িয়ে নিয়ে মাথার উপরে তুলে নাড়তে নাড়তে হুয়া দু-চোখ পাকিয়ে বললে, 'আমার বরকে ভারী পছন্দ হয়েছে, না? মেরে না তাড়ালে বিদায় হবি না?'

যদিও আলো এখান থেকে পালাতে পারলেই হাতে স্বর্গ পায়, তবু পালাবার জন্যে নয়, হুয়ার লাঠি এড়াবার জন্যেই ভয়ে দৌড়তে আরম্ভ করলে।

হুয়া চেঁচিয়ে বললে, 'দূর হ্ রে সতীন, দূর হ্! তোকে আমার বর দেব না রে!' সে জানে, হাঁহাঁ যখন আজ হাতি পেয়েছে, খুশিতে মশগুল হয়ে ফিরে আসবে! মেয়েটা পালিয়েছে শুনলেও বেশি গোলমাল করবে না, খাওয়াদাওয়া নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থাকবে। পেট আগে না বউ আগে? বড়োজোর হুয়ার পিঠে পড়বে লাঠির দু-চার ঘা, তা সতীনকে বিদায় করতে পারলে লাঠির গুঁতোও সে হজম করতে রাজি! লাঠির ব্যথা সারতে লাগে দুদিন, কিন্তু সতীন ঘাড়ে চেপে থাকে চিরদিন!

আলো যখন তার চোখের আড়ালে গেল, হুয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সেইখানেই বসে পড়ল দুই পা ছড়িয়ে। তার সারা মন আনন্দে পরিপূর্ণ। সে গান জানলে নিশ্চয়ই এখন একটা গান ধরত। কিন্তু দুঃখের বিষয় হুয়াদের সময়ে গান-বাঁধিয়ে কবিরা ছিল না।

হুয়াকে তোমরা একবার ভালো করে দেখে নাও। তার সঙ্গে এই আমাদের শেষ দেখা।

কিন্তু সত্যিকথা বলতে কী, সেই প্রস্তরযুগ থেকে এই বৈজ্ঞানিক যুগ পর্যন্ত প্রত্যেক মেয়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে ওই হুয়া। আজ সে ব্লাউজ, রেশমি শাড়ি, গহনা, 'হাই হিল' জুতো পরে, রকমারি কায়দায় সুবাসিত চিকন চুল বাঁধে ও হাতে-গলায় মুখে-ঠোঁটে 'স্নো' আর 'পাউডার' আর রং মাখে এবং মিহি সুরে মাজা ভাষায় কথা কয় বলে তোমরা আর হাঁহাঁর বউ হুয়াকে চিনতে পারো না। হুয়ার প্রস্তরযুগে লীলাখেলার ইতিহাস সাঙ্গ করলুম বটে, কিন্তু আজও সে আমাদের মধ্যে বেঁচে আছে। খালি হুয়া নয়, হাঁহাঁও। একটু তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেই সবাই তাদের চিনতে পারবে।

॥ একাদশ পরিচ্ছেদ ॥

ফুসমন্তরের চিৎকার

এইবার আলোর কাছে যাই।

হুয়ার লাঠি এড়াবার জন্যে প্রথমে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল, তারপর একেবারে পাহাড়ের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে দেখলে।

অনেক দূরে গুহামুখে হুয়া পা ছড়িয়ে বসে আছে,—এত দূরে যে, তাকে দেখাচ্ছে খুব ছোট্টটি। সে তার পিছনে তেড়ে আসেনি দেখে আলো ভারী অবাক হয়ে গেল। তাহলে রাক্ষসীর মনেও দয়া-মায়া আছে।

কী বিষম বিপদ যে সে এড়িয়ে এসেছে এবং হুয়া যে কেন তাকে এত সহজে মুক্তি দিলে তা জানতে পারলে আলো নিশ্চয়ই মত-পরিবর্তন করত।

কিন্তু আলোর তখন রাক্ষসীর দয়া-মায়ার কথাও ভাববার সময় ছিল না। সূর্য পালিয়ে গেছে পশ্চিম আকাশে। এরই মধ্যে অরণ্যের তলায় বিরাট অন্ধকার-সভায় আয়োজন হচ্ছে। নীচে সুদূর প্রান্তরে মোষ ও গোরুর দল রাত্রের আশ্রয়ের সন্ধানে দলে দলে ফিরে আসছে। পাখিরা সাঁঝের গান শুরু করলে বলে। আদিমযুগের ভয়াবহ রাত্রে মানুষের পক্ষে বাইরে থাকা অসম্ভব।

কিন্তু আলো কোনদিকে যাবে? কোথায় সেই নদীর তীর, যেখানে তার বাবা তাঁবুর ভিতর বসে মেয়ের শোকে হাহাকার করছেন?

হ্যাঁ, বাবা যে তার জন্যে কাঁদছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই,—বাবা তাকে কত ভালোবাসেন! কিন্তু আলো কেমন করে তাঁর কাছে গিয়ে বলবে—'বাবা, এই তো আমি ফিরে এসেছি, আর কেঁদো না!' সে যে পথ চেনে না! এ দেশ যে নতুন।

কিন্তু পথ চিনুক আর না চিনুক আলোকে আগে এই রাক্ষসপুরীর কাছ থেকে দূরে—অনেক দূরে পালাতে হবে! বাবার কাছে ফিরতে না পারা খুব দুঃখের কথা, কিন্তু অসম্ভব দুঃখের কথা হচ্ছে, আবার রাক্ষসের হাতে পড়া! অতএব আলো তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে নামতে লাগল। এ অভিশপ্ত মুল্লুক থেকে যত তফাতে যাওয়া যায় ততই ভালো।

পাহাড় থেকে নেমে সে দেখলে, বাঁ দিকে খানিক দূরে আর একটা পাহাড় আরম্ভ

হয়েছে, ডান দিকে একটা নোড়া-নুড়ি-ছড়ানো শুকনো নদীর গর্ভ, শীতকালে যা পরিণত হয়েছে চলন-পথে এবং সামনের দিকে বনজঙ্গল ও ছোটো ছোটো ঢিবি-ঢাবা ও বাচ্ছা পাহাড়। কিন্তু কোনদিকে তাদের আস্তানা? তার পক্ষে যে সবদিকই সমান!

হঠাৎ তার নজরে পড়ল, ডান দিকের মরা নদীর সাদা বালির পটে মূর্তিমান অভিশাপের মতন একটা কালো ছায়া! মস্ত এক নেকড়ে বাঘ ক্ষুধিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তারই পানে!

আলো আর দাঁড়াল না, দ্রুতপদে ছুটল সুমুখের পথ বা বিপথ ধরে। কিন্তু সেখান দিয়ে কী তাড়াতাড়ি চলবার উপায় আছে? পায়ে কাঁটা বেঁধে, চারিদিকে ছড়ানো নুড়ি-নোড়াতে ঠোক্কর খেতে হয়, এখানে ঝোপ, ওখানে নালা, পথের উপরে ওই ঝুপসি গাছটা কেমন সন্দেহজনক, ওর একটা ডাল জড়িয়ে কালোপানা কী একটা যেন দেখা যাচ্ছে, প্রকাণ্ড অজগর হওয়াই সম্ভব, ওর তলা দিয়ে এগুনো হবে না, আবার ঘুরে যেতে হবে!

হাঁহাঁদের চেয়ে সবদিকেই ঢের বেশি সভ্য হলেও, আলোরাও হচ্ছে বনের মানুষ। সেদিনের মানুষ একটু একটু করে সমাজবদ্ধ জীবে বা জাতিতে পরিণত হচ্ছে বটে, কিন্তু তখনও পৃথিবীতে প্রথম নগরের প্রতিষ্ঠা হয়নি। অনেক তফাতে তফাতে দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে জনকয় করে মানুষ নদীর ধারে একটুখানি খোলা জায়গা বেছে নিয়ে বাস করত এবং তাদের সেইসব বসতিকে যদি 'গ্রাম' নাম দেওয়া যায় তাহলে তাদেরও ডাকতে হয় চলন্ত গ্রাম বলে। কারণ শিকারের পশুর সঙ্গে সঙ্গে সেইসব গ্রামকে চলাফেরা করতে হত ইতস্তত! অর্থাৎ এক বনে শিকারের অভাব হলেই মানুষদের বাসা তুলে নিয়ে যেতে হত অন্য বনে। যেদিন থেকে সে চাষবাস করতে শিখলে মানুষ স্থায়ী বাসা গড়লে সেই দিন থেকেই। কারণ খেতের ফসল ফলে তার নিজের পরিশ্রমে এবং খেত এক জায়গা ছেড়ে আর এক জায়গায় পালায় না। তাই নগর পত্তনের মূল হচ্ছে কৃষিকার্যই। কিন্তু সেদিন আসতে তখনও অনেক দেরি।

আলো জ্ঞান হয়েই দেখেছিল, নিজেদের চারিপাশে গহনবনের শ্যামল রহস্য,—নদীর মতো, ঝরনার মতো, জন্ম তার নিসর্গ দৃশ্যের মধ্যেই। কাজেই জলের মাছের ডাঙায় উঠে যে দুর্দশা হয়, কিংবা আধুনিক কলকাতা শহরের মিস ইভা বসুকে সুন্দরবনে ছেড়ে দিয়ে এলে তার যে দুরবস্থা হয়, আলোর সেরকম কোনও মুশকিল হবার কারণ ছিল না।

কিন্তু অরণ্যের মধ্যে যে স্বাভাবিক বিভীষিকা তাকে এড়াতে পারে কে? সে বিভীষিকা বনবালা বলে তো আলোকেও ক্ষমা করবে না! বরং বনবালা বলেই আলো ভালো করেই জানে যে, এই বন্ধুহীন নিবিড় অরণ্যে রাত্রি কী ভয়ঙ্করী! চামুণ্ডার যদি কোনও রূপ থাকে তবে সে হচ্ছে আদিমযুগের বনবাসিনী ঘোরা নিশীথিনী!

এখনও রাত আসেনি, বেলাশেষের ম্লান আলোমাখা আকাশের দিকে দিকে ছায়াময়ী সন্ধ্যা সবে তার ধূসর অঞ্চল ছড়িয়ে দিচ্ছে, এরইমধ্যে দেখা গেল, একটা জঙ্গলের গর্ভ ভেদ করে হেলে দুলে বেরিয়ে এল জ্যান্ত কেল্লার মতো সেকালের বিরাটদেহ রোমশ গণ্ডার! আলো তিরের মতো একটা বড়ো গাছতলায় দৌড় দিলে, দরকার হলে গাছে উঠে গণ্ডারকে ফাঁকি দেবে বলে। কিন্তু সে আলোকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না, নিজের মনে সেইখানেই বেড়িয়ে বেড়াতে লাগল।

গণ্ডারকে পিছনে রেখে আলো অন্য দিকে এগুতে লাগল। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং তার সর্বশরীর গেল যেন হিম হয়ে! এ যে গণ্ডারের চেয়েও সাংঘাতিক!

খানিক দূরে একটা সবুজ গাছপালার প্রাচীর ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একদল রাক্ষস!

হাঁহাঁরা ম্যামথের মাংস নিয়ে ফিরে আসছে! তাদের দলে প্রায় পনেরো-ষোলোজন লোক

এবং প্রত্যেকেই বহন করে আনছে ম্যামথের খণ্ডবিখণ্ড দেহের এক একটা অংশ। আলোর চোখে একেই তো তারা মূর্তিমান রাক্ষস ছাড়া আর কিছুই নয়, তার উপরে তাদের সর্বাঙ্গ ম্যামথের রক্তে হয়ে উঠেছে বীভৎস! মুখে-মাথায়-গায়ে লম্বা লম্বা ছেঁড়া লোম, মাংস ও হাড়ের কুচি! দেখলে শিউরে উঠতে হয়!

হাঁহাঁও আলোকে দেখতে পেয়েছিল। এখানে তাকে দেখবার আশা মোটেই সে করেনি, তাই প্রথমে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মহাক্রোধে হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

আলো পালাবে কী, সেই প্রচণ্ড হুঙ্কার শুনেই কাঁপতে কাঁপতে জ্ঞান হারিয়ে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল।

হাঁহাঁ দাঁত কিড়মিড় করে বললে, 'টুটু, তোর মায়ের আক্কেল দেখছিস রে?'

—'কেন, মা কী করলে রে বাপ?'

—'ছুঁড়িটাকে পালাতে দিয়েছে!'

—'যে পালাতে চায়, তাকে ধরে রাখে কে রে?'

—'আচ্ছা, ধরে রাখা যায় কি না বাসায় গিয়ে বুঝিয়ে দেব। এখন শোন।'

—'বলো বাপ!'

—'ছুঁড়িটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে চল! তোর হাতির ঠ্যাংখানা আমার কাঁধে চাপিয়ে দে।'

টুটু যেরকমভাবে হাতির পা বাপের জিম্মায় দিয়ে আলোর দেহের দিকে এগিয়ে চলল তা দেখলে মনে হয়, এই আপদটাকে ঘাড়ে করে বয়ে গুহায় নিয়ে যাবার ইচ্ছা তার মোটেই নেই। কিন্তু এ হচ্ছে প্রস্তরযুগের কথা। অবাধ্য হলে বাপ তখন ডান্ডা মেরে পুত্রবধ করতেও পিছপা হত না। আবার বুড়ো ও অথর্ব হলে ছেলেও বাপকে দেখত অকেজো উপদ্রবের মতো—যে ছেলের পরিশ্রমে আনা খোরাকে পুরো ভাগ নেবে, অথচ পরিবর্তে কিছু দেবে না। ছেলে তখন অলস ও সংসারের পক্ষে অনাবশ্যক বুড়ো বাপকে খুন করে পিতৃদায় থেকে নিস্তার পেত সহজেই। এযুগে তোমাদের হয়তো এসব কথা শুনলে চমক লাগবে। ভাববে, সেকালে বুঝি পিতৃস্নেহ বা পুত্রস্নেহ বা মায়া-দয়া কিছুই ছিল না! ছিল। কিন্তু তখনকার স্নেহ-দয়া-মায়া ছিল সেযুগেরই উপযোগী। কারণ সকলের উপরে কাজ করত তখন জঙ্গলের পাশবিক আইন-কানুন। জীবতত্ত্ববিদদের মতে, মানুষও পশুশ্রেণীভুক্ত। তবে সে অসাধারণ পশু—কারণ উচ্চস্তরের মস্তিষ্কের অধিকারী। বহুযুগব্যাপী মস্তিষ্ক চর্চার ফলে আজ সে যদি সাধারণ পশুর চেয়ে দশধাপ উঁচুতে উঠে থাকে, তবে আদিমযুগে ছিল মাত্র এক ধাপ উঁচুতে। কাজেই প্রায়ই পশুধর্মপালন করত। আজও জঙ্গলের আইন একটুও বদলায়নি। হাতি, গণ্ডার, সিংহ ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি বৃদ্ধ ও অক্ষম হলে আজও দল থেকে পরিত্যক্ত বা জোয়ান পশুদের দ্বারা নিহত হয়। এবং আধুনিক যুগেও কোনও কোনও বন্য মানুষদের সমাজে বৃদ্ধদের হত্যা করবার প্রথাও প্রচলিত আছে।......

বাপের হুকুম টুটু অমান্য করতে সাহস করলে না— হাঁহাঁ জোরসে লাঠি হাঁকড়াবার শক্তি আজও হারায়নি এবং তার শক্তির উপরে টুটুর শ্রদ্ধার মাত্রা আজও কমেনি!

এমন সময়ে এক কাণ্ড ঘটল।

খোলা জমির মাঝখানে পড়েছিল আলোর অচেতন দেহ। তার চারিধারেই অরণ্যের প্রাচীর, তারও পরে দূরে ও কাছে এখানে-ওখানে-সেখানে দেখা যাচ্ছে ছোটো-বড়ো ধূসর বা শ্যামল শৈল—তাদের শিখরে শিখরে মাখানো মরন্ত দিবসের নিবন্ত দীপ্তি।

পশ্চিম দিকে ছিল হাঁহাঁর দল। টুটু সেইদিক থেকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে, এমন সময়ে পূর্ব দিকের অরণ্যের ভিতর থেকে বেগে বেরিয়ে আসতে লাগল লোকের পর লোক।

তারা নতুন মানুষ! সবাই যখন আত্মপ্রকাশ করলে তখন দেখা গেল, দলটি বড়ো মন্দ নয়। কারণ সংখ্যায় তারা ত্রিশ-বত্রিশ জনের কম হবে না। প্রত্যেকেই সশস্ত্র।

টুটু আর অগ্রসর হল না, সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

হাঁহাঁও চমকে উঠে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

হুঁহুঁ বললে, 'সর্দার, পালাই চল রে!'

হাঁহাঁর চমক ভাঙল। বললে, 'পালাব কেন?'

—'দেখছিস না, দলে ওরা ভারী?'

—'কিন্তু ওগুলো তো পোকার মতো! আমাদের চড় খেলে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে।'

—'কিন্তু আমরা চড় মারবার আগেই ওরা যে অস্তর ছুড়বে রে!'

হঠাৎ নতুন মানুষদের একজন শিঙা বার করে ফুঁয়ের পরে ফুঁ দিয়ে বন-পাহাড়ের চতুর্দিক করে তুললে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত! পরমুহূর্তে সেই মহারণ্যের চারিদিক আরও বহু শিঙার ভোঁ-ভোঁ রবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল! সূর্যসর্দারের লোকেরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে অরণ্যের নানাদিকে আলোকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কথা ছিল, যে দল আলোকে প্রথম খুঁজে পাবে শিঙার সঙ্কেতে আর সবাইকে সে খবর জানিয়ে দেবে এবং তাহলেই সকলে একত্রে এসে মিলবে।

শিঙা যে কী চিজ, হাঁহাঁরা কেউ তা জানে না! হাঁহাঁ চকিত স্বরে বললে, 'অমন ভয়ানক চ্যাঁচায় কোন জানোয়ার রে?'

হুঁহুঁ ভয়ে ভয়ে বললে, 'জানোয়ার নয় রে সর্দার, জানোয়ার নয়— ফুসমন্তর! বনের চারিধারেই ফুসমন্তর চ্যাঁচাচ্ছে! ওই শোন, আবার কাদের পায়ের শব্দ!'

সত্যই তাই! মাটির উপরে পায়ের শব্দ জাগিয়ে দলে দলে কারা যেন বেগে ছুটে আসছে!

হুঁহুঁ বললে, 'আমি লম্বা দিলুম রে সর্দার! ফুসমন্তরের সঙ্গে লড়তে পারব না!'

কেবল হুঁহুঁ নয়, টুঁটুঁ, টুটু ও ঘটুর সঙ্গে আর আর সকলেও যখন পৃষ্ঠভঙ্গ দিলে, হাঁহাঁরও তখন পালানো ছাড়া উপায়ান্তর রইল না।

॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ॥

যুদ্ধের আয়োজন

পরদিনের প্রথম সূর্যকরের সোনালি ছোঁয়া পেয়ে জেগে উঠল আদিম প্রভাত, জেগে উঠল বনবিহঙ্গের দল।

আর জেগে উঠল ম্যামথ হাতি, রোমশ গণ্ডার, বল্গা হরিণ, দেঁতো বরাহ, বুনো ঘোড়া, শৃঙ্গী মোষ ও গোরু এবং বুনো ঘোড়া প্রভৃতির দল। আলো দেখে ঘুমোতে গেল কেবল খাঁড়াদেঁতো, গুহা-ভাল্লুক, হায়েনা ও নেকড়ে প্রভৃতি, রাতের আঁধার না জমলে যাদের শিকারের সুবিধা হয় না।

মানুষরাও জাগল বটে, কিন্তু তারা জাগল কি না তা দেখবার জন্যে কারুরই ছিল না আগ্রহ। বিপুলা পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ আজ জেগে উঠে এত বেশি গোলমাল করে যে, লোকালয়ের অনেক দূরে থেকে অরণ্যও তা শুনতে পায়। সুন্দরবনেও আজ বাঘের চেয়ে মানুষের সংখ্যাই বেশি বোধহয়।

কিন্তু সেদিনকার অন্যান্য জীবজন্তুর তুলনায় মানুষের সংখ্যা ছিল কত কম! যে দেশে জন্তু থাকত একলক্ষ, সেখানে একশো জন মানুষও থাকত কি না সন্দেহ! কাজেই মানুষরা জেগে

উঠলেও অন্যান্য জীবরা এমন চিৎকার করত যে মানুষের জাগ্রত কণ্ঠস্বর শোনাই যেত না— যেমন ছোটো নদীর কলধ্বনি ডুবে যায় সাগরগর্জনের মধ্যে!

কিন্তু কী করে যে ছোটো নদী শেষটা অনন্ত সাগরকেও হার মানলে, সে এক বিচিত্র ইতিহাস! জীবজন্তুর সংখ্যাধিক্য দেখেই হয়তো মানুষ প্রথমে দলবদ্ধ হতে আরম্ভ করে। অধিকাংশ হিংস্র জন্তুই ছিল মানুষের চেয়ে বলবান। একা মানুষ তাদের কারুর সামনেই দাঁড়াতে পারত না। হিসাব করে দেখা গেছে, 'নিয়ানডের্টাল' অর্থাৎ হাঁহাদের জাতের অধিকাংশ মানুষই তখন বিশ বছর বয়স হবার আগেই মারা পড়ত। শতকরা পাঁচ-ছয়জনের বেশি মানুষ পঞ্চাশ বছরে গিয়ে পৌঁছোতে পারত না! মানুষ দীর্ঘজীবী হতে পেরেছে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ আধুনিক যুগেই। আদিমকালে মানুষরা কেবল নিজেদের মধ্যেই সর্বদা মারামারি করে মরত না, তাদের অধিকাংশকেই খাদ্যরূপে বা শত্রুরূপে গ্রহণ করত হিংস্র পশুর দল! কাজেই মানুষ তখন আত্মরক্ষার জন্যে অন্যান্য মানুষদের সঙ্গে ভাব করে দল বাঁধতে লাগল। বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, ভাল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জীবদের মগজে আজও এ বুদ্ধি ঢোকেনি, একা (বা বড়োজোর আরও দু-একটা জীব মিলে) দলবদ্ধ মানুষদের আক্রমণ করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়ে বসে। দল বেঁধে মানুষ তার উচ্চতর মস্তিষ্কের পরিচয় দিয়েছে। পরে এই দল থেকেই হল সমাজের সৃষ্টি।

আমরা যে নতুন মানুষদের দেখিয়েছি, তাদের ভিতরে ধীরে ধীরে সমাজ গড়ে উঠেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু হাঁহাঁদের জাতের বা 'নিয়ানডের্টাল'-শ্রেণীভুক্ত মানুষদের মধ্যে সমাজের অস্তিত্বই ছিল না। সাধারণ স্বার্থের বা আত্মরক্ষার জন্যে বা ভয়ের দায়ে মাঝে মাঝে বড়োজোর তারা দলবদ্ধ হতে পারত। ধরো, হাঁহাঁ অগ্নি আবিষ্কার করলে দৈব-গতিকে, কিন্তু তার গুপ্তকথা নিজের ছেলেকেও জানাতে রাজি নয়। কিন্তু সমাজবদ্ধ জীব হলে হয়তো সে এমন লুকোচুরি করত না, ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে সামাজিক স্বার্থকেই বেশি বড়ো বলে মনে করত।

নতুন মানুষরা ব্যক্তির উপরে স্থান দিত সমাজকে। একজন নতুন কিছু আবিষ্কার করলে সেটা সমস্ত সমাজেরই নিজস্ব হত। নতুন কোনও সমস্যায় পড়লে সমাজের সকলে মিলে করত তার সমাধান। তাই একতায় ও সমষ্টিগত শক্তিতে তারা ছিল হাঁহাঁদের চেয়ে ঢের বেশি উন্নত। হাঁহাঁরা ব্যক্তিগত শক্তিতে নতুন মানুষদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হলেও প্রতি পদেই তাই তাদের কাছে ঠকে যেতে লাগল।

পরদিনের প্রভাতের কথা বলছিলুম। তোমরা সবাই দেখেছ, প্রভাত হয় কেমন শান্ত ও সুন্দর। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে জাগে পাখিরা, কিন্তু তারা জাগলেও সৌম্য প্রভাতের শান্তি ও সৌন্দর্যকে করে তোলেনা কদর্য। প্রভাতকালের মধ্যে তপোবনের একটি যে ভাব আছে, মানুষ জেগে উঠেই তা নষ্ট করে দেয়।

প্রস্তরযুগের সেই প্রভাতকেও আদিম মানুষ আজ বিশ্রী করে তুলেছে।

আকাশের নীলসায়রে সোনার পদ্মের মতন চমৎকার সূর্য জেগে উঠেই দেখলে, কতদিনকার বিজন বন ধ্বনিত হয়ে উঠছে মানুষদের বিকট চিৎকারে! মার্জিত, দুর্বল কণ্ঠের অধিকারী আধুনিক শহুরে মানুষ আমরা, ম্যামথ-বিজয়ী আদিম বন্য মানবতার সেই গগনভেদী কোলাহলের বিকটতা বোঝা আমাদের পক্ষে সহজ নয়।

সকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে, বনের অলিগলি দিয়ে, মাঠ প্রান্তরের উপর দিয়ে, পাহাড়ের পর পাহাড়ের উপত্যকা ও চড়াই-উৎরাই পার হয়ে দলে দলে বিরাটবক্ষ, হৃষ্টপুষ্ট, মসিকৃষ্ণ মানুষ চলেছে, পশু-শক্তির উচ্ছ্বাসে লাফাতে লাফাতে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে! অরণ্যের জীবরা যেদিকে পারলে ছুটে পালাতে লাগল— এ অঞ্চলে এমন বিষম চিৎকারপাগল বৃহৎ জনতা আর কখনও দেখেনি তারা! মানুষদের কোনওদিনই তারা বন্ধুর মতো দেখেনি, তাই তারা

সহজে ভেবে নিলে যে, এরা ছুটে আসছে তাদেরই জব্দ করতে বা বিপদে ফেলতে!

হাঁহাঁ-সর্দার এ অঞ্চলে তার যত জাতভাই আছে সবাইকে জোরে ডাক দিয়েছে! কিছুদিন আগে হলে হাঁহাঁ-সর্দার এমন বেপরোয়া হুকুম জারি করতে সাহস করত না, কারণ সে জানত কেউ তার হুকুম মানবে না, উলটে হয়তো তাকেই তেড়ে মারতে আসবে! কিন্তু আজ সে যে সর্দার—যে সে সর্দার নয়, অগ্নিবিজয়ী হাঁহাঁ-সর্দার! হাতে যার দপদপে খোকা-আগুন, খাঁড়াদেঁতো আর গুহাভাল্লুকের দল যার প্রতাপে দেশছাড়া, তার কথা আজ শুনবে না কে? তাকে আজ ভয় করবে না কে?

অতএব জনতার পর জনতার স্রোত বয়েছে বনে বনে,—যেন সুন্দর শ্যামলতার উপরে কুৎসিত কালির ধারা! কিন্তু সব স্রোতের গতি এক মুখেই! সবাই চলেছে হাঁহাঁ-সর্দারের গুহার দিকেই। অসভ্যের জনতা, তারা মৌনব্রত কাকে বলে জানে না, তাদের চিৎকারে পৃথিবী তাই বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।

হাঁহাঁ-সর্দার বড়ো চালাক। সে জানে, আজ এই বিপুল জনতার প্রত্যেক্যের হাতেই দিতে হবে অমোঘ অগ্নি-অস্ত্র এবং তাকে অগ্নি সৃষ্টি করতে হবে গোপনে, সকলের অগোচরেই। তাই আজ সে খুব ভোরে উঠে টুটু আর ঘটুকে নিয়ে নতুন মানুষদের আস্তানার অনতিদূরে, কল-কল নদীর তীরবর্তী এক পাহাড়ের উপরে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড সৃষ্টি করে এসেছে। এর পর তার সঙ্গীরা শুকনো গাছের ডাল ভেঙে কুণ্ডের আগুনে জ্বালিয়ে অনায়াসেই শত্রুবধ করতে পারবে!

তোমরা বুঝতেই পারছ, হাঁহাঁ-সর্দারের শত্রু কে? তারা কেবল আলোকেই কেড়ে নিয়ে যায়নি, ভোঁ-ভোঁ ফুসমন্তর শুনিয়ে সকলের সামনে তার মহিমাকে করে দিয়েছে অত্যন্ত খর্ব। যে ফুসমন্তরের জন্যে আজ তার এমন দেশজোড়া মানসম্ভ্রম, ওদের ভোঁ-ভোঁ ফুসমন্তর তার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠলে তাকে কি এখানে কেউ মানবে? অতএব সে সকলকে দেখাতে চায়, দুনিয়ায় তার নিজস্ব ফুসমন্তরের তুলনা নেই!

সেই সুবৃহৎ জনতা যখন তার পাহাড়ের তলায় এসে জমল, হাঁহাঁ-সর্দার তখন একটা উঁচু পাথুরে ঢিপির উপরে দাঁড়াল বিচিত্র ভঙ্গিতে!

হ্যাঁ, তাকে আজ খুব জমকালো দেখাচ্ছে বটে! সে কোমরে পরেছে গুহাভাল্লুকের একখানা ছাল এবং গায়ে জড়িয়েছে খাঁড়াদেঁতোর ছাল। সর্দার গৌরব প্রকাশ করবার জন্যে তার মাথায় রয়েছে রঙিন পাখির পালকের টুপি! কটিদেশে গোঁজা পাথরের ছোরা, পিঠে বাঁধা দুটো বর্শা এবং তার দুই হাতে আছে দুখানা দাউ-দাউ করে জ্বলন্ত কাঠ! কেবল গায়ের জোরে বা ভয় দেখিয়ে কেউ সর্দার বা দলপতির পুরো সম্মান আদায় করতে পারে না। প্রস্তরযুগের আদিম মানুষ হলেও হাঁহাঁ বুঝে নিয়েছিল, সর্দারির সম্মান অটুট রাখবার জন্যে অভিনয়েরও খানিকটা দরকার হয়—নইলে লোকে উচিত মতো অভিভূত হয় না। আর অভিনয় করতে গেলে 'মেকআপ'-এর সাহায্য না নিলে চলবে কেন?

মাথা তুলে বুক ফুলিয়ে হাঁহাঁ-সর্দার গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'ওরে, তোদের কেন ডাক পড়েছে, সবাই তা জানিস তো?'

জনতা সমস্বরে বললে, 'জানি রে সর্দার!'

অগ্নিময় কাঠ দুখানা শূন্যে তুলে বারংবার নড়তে নাড়তে হাঁহাঁ বললে, 'আমাদের মুল্লুকে উড়ে এসে জুড়ে বসতে চায় কোথাকার একদল পোকার মতন মানুষ। আমরা হচ্ছি আগুন-ঠাকুরের চ্যালা, দুনিয়ার কাউকে ভয় করা কি আমাদের উচিত?'

জনতা একস্বরে বললে, 'না রে সর্দার, না!'

হুঁহুঁর দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টিনিক্ষেপ করে হাঁহাঁ বললে, 'কিন্তু কী এক বাজে ভোঁ-ভোঁ ফুসমন্তর শুনে আমাদের ওই হামবড়া হোঁদল-কুতকুতে হুঁহুঁটা ভয়ে একেবারে খাবি খাচ্ছে রে!'

সবাই কটমট করে হুঁহুঁর দিকে তাকালে। সে মুষড়ে পড়ে ঘাড় হেঁট করে বললে, 'আমি আজ দেখাতে চাই আমার খোকা-আগুনের সামনে পৃথিবীর কোনও ফুসমন্তরই টিকতে পারে না। চল রে তোরা আমার সঙ্গে সেই মানুষ-পোকাগুলোর আড্ডায়! আমরা তাদের ধরব আর মারব!'

জনতা বললে 'আর পুড়িয়ে খেয়ে ফেলব!'

হাঁহাঁ ফিরে বললে, 'হুঁহুঁ রে, তুই আমাদের সঙ্গে যাবি কি যাবি না!'

হুঁহুঁ বুদ্ধিমানের মতো বললে, 'তোকে যখন সর্দার বলে মানি, তোর হুকুমে প্রাণ দিতেও রাজি আছি রে।' কিন্তু মনে মনে এই অভিযানে যাবার ইচ্ছা তার মোটেই ছিল না।

হাঁহাঁ আবার চেঁচিয়ে সবাইকে সম্বোধন করে বললে, 'তোদের জন্যে কল-কল নদীর ধারে পাহাড়ের ওপর আমি আগুন-দেবতাকে জাগিয়ে এসেছি রে! আর দেরি নয়, আয় তোরা!'

নরহত্যা ও রক্তনদীতে স্নান করবার এমন মহাসুযোগ পেয়ে সেই বিরাট জনতা ভীষণ আনন্দে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলল এবং বারংবার চিৎকার করে বলতে লাগল, 'জয় জয়, হাঁহাঁ-সর্দারের জয়!'

এই সভ্য যুগেও মানুষ নরহত্যার সেই বিকট আনন্দ ভুলতে রাজি নয়, নব নব কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি করে পৃথিবীর সবুজ বুক সাদা করে দেয় লক্ষ লক্ষ নরকঙ্কালের শয্যা পেতে! হাঁহাঁদের তাণ্ডব-নাচ আর জয়জয়কার আজও জেগে আছে মানুষের কর্মক্ষেত্রে।

কল-কল নদীর সুদীর্ঘ আঁকাবাঁকা তটরেখার পাশ দিয়ে অগ্রসর হল সেই উন্মত্ত জনস্রোত। সর্বাগ্রে চলেছে হাঁহাঁ-সর্দার। দুই হস্তে তার অগ্নির নৃত্য!

॥ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ॥

যুদ্ধ

কল-কল নদীর তীরে আজ প্রভাতের রবিকর নতুন মানুষদের সভাকেও করে তুলেছে সমুজ্জ্বল।

নদীতটের বালুরেখার উপরেই যে উচ্চভূমিতে খাটানো হয়েছিল তাদের তাঁবু, তারই একটা অংশ ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ফেলা হয়েছে। এবং সেইখানে মণ্ডলাকারে আসন গ্রহণ করেছে আদিম পৃথিবীর নবযুগের শিকারি যোদ্ধারা। প্রত্যেকেরই সাজ-পোশাকে আজ একটু বিশেষ মনোযোগের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

সে ছিল এমন যুগ, তখন সশস্ত্র থাকতে হত প্রত্যেককেই। যোদ্ধাদের সকলেরই কাছে রয়েছে ধনুক-বাণ, মুগুর, ছোরা, বর্শা কিংবা কুঠার। অরণ্যে তাদের বাস, কখন কোনও দিক থেকে মানুষ-শত্রু বা হিংস্রজন্তু আক্রমণ করে বলা যায় না, তাদের অভ্যর্থনার জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হয়। আহারে বিহারে শয়নে সর্বদাই অজ্ঞাত সব বিপদের হঠাৎ আবির্ভাবের সম্ভাবনা! এরও ঢের পরের যুগেও এই প্রথা লুপ্ত হয়নি, তখনও জামাই যেত শ্বশুরবাড়িতে তরোয়াল হাতে নিয়ে! আজও শিখ আর গুর্খারা সবসময়েই অস্ত্র কাছে রাখে।

যোদ্ধারা যেখানে মণ্ডলাকারে বসে আছে, তার একদিকে রয়েছে একখানা উঁচু পাথর,— সর্দারের আসনরূপে যা ব্যবহৃত হবে। সর্দারের জন্যে উচ্চাসনের ব্যবস্থা হয়েছিল প্রাচীন যুগ

থেকেই। সেই উচ্চাসনই পরে পরিণত হয় রত্নখচিত স্বর্ণ বা রৌপ্য সিংহাসনে।

প্রত্যেক যোদ্ধার মুখ দেখলেই বুঝতে দেরি লাগে না, আজ তারা এখানে সমবেত হয়েছে যুদ্ধবিগ্রহ বা শিকারের জন্যে নয়, কোনও বিশেষ উৎসবের জন্যে। কারণ প্রত্যেকেরই হাসি হাসি মুখ—কেউ গল্প করছে, কেউ গান গাইছে, কেউ তালে তালে করতালি দিচ্ছে।

এমন সময়ে দেখা গেল, ডান হাতে আলোর কোমর জড়িয়ে তাঁবুর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছেন সূর্য-সর্দার—প্রশান্ত মুখে শান্ত হাসির লীলা। আলোর মুখও হাসি-খুশিতে মনোরম।

সূর্য-সর্দার এসে উঁচু পাথরখানির উপরে বসলেন। আলো বসল বাপের পাশে মাটির উপরে, তাঁর জানুর উপরে হেলে মাথা রেখে। একালে রাজকুমারী বা সর্দার-কন্যার জন্যেও বিশেষ আসনের ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু তখন সর্দারের ছেলেমেয়েদের জন্যে কেউ মাথা ঘামাত না।

সূর্য-সর্দার ধীরে ধীরে বললেন, 'বন্ধুগণ, তোমরা জানো, রাক্ষসদের কবল থেকে আমার আদরের মেয়ে আলো উদ্ধার পেয়েছে বলে আজ আমি দেবতাদের কাছে জীব বলি দেব। শুভকার্যে দেরি করা উচিত নয়, তোমরা বলির পশু নিয়ে এসো।'

তখনই একজন লোক উঠে প্রকাণ্ড দামামা বাজিয়ে বলির পশু আনবার জন্যে সঙ্কেত করলে।

তারপরেই দেখা গেল, কয়েকজন লোক মস্তবড়ো একটা ভাল্লুককে টেনে হিঁচড়ে সভার দিকে আনছে। ভাল্লুকের চার পায়ে চারগাছা চামড়ার দড়ি বাঁধা, চারজন লোক চারদিক থেকে দড়িগুলো টেনে আছে! তার কোমরে ও গলাতেও চামড়ার দড়ি বেঁধে ধরে আছে আরও দুজন লোক। ভাল্লুক ভীষণ গর্জন করছে, দাঁত খিঁচোচ্ছে, নখ-বার-করা থাবা ছুড়ছে এবং অগ্রসর হতে চাইছে না, কিন্তু তার সমস্ত আপত্তি ও ভয় দেখাবার চেষ্টাই নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছে। ঘৃণ্য ও তুচ্ছ মানুষের হাতে জাতভাইয়ের এই অবস্থা দেখলে তোমাদের পূর্ব-পরিচিত গুহাভাল্লুক তার কান-কাটা বউয়ের কাছে কী মত প্রকাশ করত বলো দেখি?

তোমরা মোষ, ছাগল বলি দেওয়ার কথা শুনেছ, হয়তো সাঁওতালদের মুরগি বলি দেওয়ারও কথা তোমাদের অজানা নেই এবং এও জানো, আগে নরবলিও দেওয়া হত। কিন্তু ভাল্লুক-বলির কথা এই বোধকরি প্রথম শুনলে? কিন্তু আদিম যুগে পৃথিবীর নানা দেশেই যে ভাল্লুক বলি দেওয়া হত, এর বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে। আজও জাপানের আদিম বাসিন্দা আইনু এবং অন্যান্য জাতিদেরও মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে।

আদিম মানুষদের প্রধান শত্রু ছিল ওই গুহাভাল্লুকরা! তাদের বলবিক্রমের উপরে মানুষদের শ্রদ্ধা ছিল যথেষ্ট। পণ্ডিতরা অনুমান করেন, খুব সম্ভব সেইজন্যেই অন্যান্য বাজে বা দুর্বল পশুর বদলে দেবতাদের উদ্দেশ্যে ভাল্লুক বলি দিয়ে প্রার্থনা করা হত, যারা বলি দিচ্ছে তারা যেন ভাল্লুকেরই মতো মহাবলী হতে পারে।

আফ্রিকার অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে কারুকে বীর ও যথার্থ পুরুষ বলে গণ্য করা হয় না, যদি একা একটি সিংহ বধ করতে না পারে। রাজপুতদের পুরুষত্বের বিচার হয় বন্য বরাহ শিকারে। আদিমকালে যে গুহাভাল্লুক বধ করতে পারত তাকে মানা হত মহাবীর বলে। সে যুগে ভাল্লকদের কেবল বলিই দেওয়া হত না। বলির পর ভাল্লুকদের মাথার হাড় আগে খুব যত্ন করে সাজিয়ে তুলে রেখে দেওয়া হত সারে সারে। খুব সম্ভব সেগুলোকে অত্যন্ত পবিত্র জিনিস বলে ভাবা হত। অনেক হাজার বছর পরে সেই হাড়গুলোকে ঠিক তেমনিভাবে সাজানো অবস্থাতেই আবার পাওয়া গিয়েছে।

ভাল্লুককে সবাই মিলে সভাস্থলের মাঝখানে এনে হাজির করলে, অমনি সভার সমস্ত লোক একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠল—সূর্য-সর্দার পর্যন্ত।

সূর্য-সর্দার হচ্ছেন দলের প্রধান ব্যক্তি, অতএব বলির কার্যারম্ভের ভার তাঁরই উপরে। তিনি বাঁ হাতে ধনুক ও ডান হাতে বাণ নিয়ে ভাল্লুকের দিকে লক্ষ্য স্থির করে জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, 'আলোকস্রষ্টা হে সূর্যদেবতা! তৃষ্ণার বারিদাতা হে নদীদেবতা! নিঃশ্বাসবায়ুদাতা হে পবনদেবতা! অন্ধকারে চক্ষুদাতা হে অগ্নিদেবতা! তোমাদের সকলের কাছে এই বলির পশু নিবেদন করছি, তোমরা আমাদের উপর প্রসন্ন হও, আমাদিগকে এই ভাল্লুকের মতো শক্তিমান করে তোলো!'—তাঁর প্রার্থনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো দামামা সমস্বরে বেজে উঠল তালে তালে এবং তারপরেই সূর্য-সর্দার ধনুক থেকে বাণ ত্যাগ করলেন!

বাণ গিয়ে বিঁধল ভাল্লুকের বুকের কাছে এবং পরমুহূর্তেই সভাস্থ সমস্ত শিকারি যোদ্ধা একসঙ্গে জয়ধ্বনি তুলে ভাল্লুককে লক্ষ্য করে বর্শা বা বাণ ছুড়তে লাগল!

সর্দারের বাণ খেয়ে ভাল্লুকটা একবার মাত্র গর্জন করবার সময় পেয়েছিল, তারপরেই একসঙ্গে অতগুলো অস্ত্রের আঘাতে তার মৃতদেহ মাটির উপরে ধড়াস করে পড়ে গেল, আর নড়ল না!

তারপরে চারিদিকের উত্তেজনা, দামামা-নিনাদ, জয়ধ্বনি ও কোলাহলের মধ্যে সূর্য-সর্দার আবার পাথরের উপরে উঠে দাঁড়িয়ে দেবতাদের উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে প্রণাম করতে লাগলেন বারংবার।

ওদিকে জনতার সমস্ত লোক এগিয়ে এসে ভাল্লুকের চারিধারে চক্রাকারে বেড়ে দাঁড়াল এবং দামামার তালে তালে বিজয় বা যুদ্ধ নৃত্য আরম্ভ করলে। কলকাতায় আধুনিক ছেলে মেয়েদের যে তরল ও চুটকি নাচ দেখা যায়, এ নাচ নয় তেমনধারা! এর প্রতি ছন্দে বীর্যের ব্যঞ্জনা, প্রতি পদক্ষেপে প্রলয়ের তাল, প্রতি ভঙ্গিতে আদিম দরাজ প্রাণের উচ্ছ্বাস! একালের কোনও নিজিনিস্কি বা উদয়শঙ্করই সেই বন্য, স্বাধীন নৃত্যের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি দেখাতে পারবে না।

নর্তকরা যখন শ্রান্ত হয়ে থামল, দামামা যখন মৌন হল, সূর্য-সর্দার বললেন, 'বন্ধুগণ, দেবতারা নিশ্চয়ই বলি পেয়ে আর তোমাদের নাচ দেখে তুষ্ট হয়েছেন। এইবার চলো, আমরা সকলে মিলে বনের ভিতরে গিয়ে ঢুকি। আজ চাই গোটাকয় বল্গা-হরিণ আর বরাহ। তারপর ফিরে এসে বিরাট ভোজের আয়োজন হবে!'

সর্দারের মুখের কথা শেষ হতে-না-হতেই আচম্বিতে কোথা থেকে তীব্র স্বরে শিঙা বললে তিনবার—'ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ! ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ! ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ!

সূর্য-সর্দার সচমকে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলেন, 'এ যে আমাদের প্রহরীর সঙ্কেত! শত্রুরা আমাদের আক্রমণ করতে আসছে!'

চারিধারে অমনি রব উঠল—'শত্রু! শত্রু!' 'অস্ত্র ধরো! অস্ত্র ধরো!' 'মেয়েরা তাঁবুর ভেতরে যাক!'

দেখতে দেখতে ভিড়ের ভিতরে যত মেয়ে ছিল সবাই তাঁবুর দিকে দৌড় দিলে এবং যোদ্ধারা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ঠিক করতে লাগল ব্যস্তভাবে।

শিঙা আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'ভোঁ! ভোঁ! ভোঁ! ভোঁ!'

অগ্নি বললে, 'বাবা, প্রহরী এবারে শিঙায় চারটে ফুঁ দিলে। তার মানে শত্রুদের সংখ্যা হচ্ছে চার শত!'

সূর্য-সর্দার জবাব দিলেন না, শত্রুদের আবিষ্কার করবার জন্যে তীক্ষ্ণ নেত্রে দূরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বায়ু উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, 'আমাদের দলে তিনশোর বেশি লোক নেই!'

ছেলেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে সূর্য-সর্দার চোখ না ফিরিয়েই বললেন, 'বাছা, শত্রুদের

সংখ্যা বেশি হলেই হতাশ হবার কারণ নেই। আগে দেখা যাক, শত্রুরা কোন জাতের মানুষ! প্রহরী সঙ্কেতে সে কথা জানাচ্ছে না কেন?'

কয়েক মুহূর্ত পরেই শিঙা টানা সুরে বললে, 'ভোঁ-ও-ও-ও-ও।'

সূর্য-সর্দার তখন সহাস্যে উচ্চস্বরে বললেন, 'বন্ধুগণ, সঙ্কেতে জানা গেল, রাক্ষসরা আমাদের আক্রমণ করতে আসছে! আমরাও তো তাই চাই! ওরা না এলে আমরাই ওদের আক্রমণ করতে যেতুম, কিন্তু ওরা নিজেরাই এসে আমাদের অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিলে! দলে ওরা ভারী বলে আমাদের ভাবনার কারণ নেই। কারণ আমরা সকলেই জানি, রাক্ষসরা তির-ধনুক ব্যবহার করতে জানে না! অতএব দাঁড়াও সবাই সারি সারি, বাজাও দামামায় যুদ্ধসংগীত!'

উঠল বেজে দামামার পর দামামা, শিঙার পর শিঙা! যোদ্ধারা শ্রেণীবদ্ধ হতে লাগল।

তারপরেই দেখা গেল, শত্রুরা দলে দলে বিশৃঙ্খলভাবে লাফাতে লাফাতে, নাচতে নাচতে পাহাড়ের তলদেশের সুদীর্ঘ অরণ্যের নানা দিক থেকে বেরিয়ে এল! অতর্কিতে আক্রমণ করবে বলে এতক্ষণ তারা চ্যাঁচায়নি, এইবারে শুরু করলে বিকট চিৎকারের পর চিৎকার!

সূর্য-সর্দার অল্পক্ষণ তাদের ভাবভঙ্গি ও অস্ত্রশস্ত্র লক্ষ্য করে বললেন, 'ওরা মূর্খ! দেখছি ওরা ঠাউরেছে যে, জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে! যেন আমরা বন্য জন্তু, কাঠের আগুন দেখলে ভয় পাব!'

অগ্নি বললে, 'বাবা, ওরা ক্রমেই এগিয়ে আসছে। আমাদের কর্তব্য কী? আমরা কি আগেই ওঁদের আক্রমণ করব?'

সূর্য-সর্দার বললেন, 'না। দেখছ না, আমরা উচ্চভূমির উপরে আছি? এখান থেকে নামলে আমাদের সুবিধা কমে যাবে! বিশেষ, আমরা যদি ওদের কাছে গিয়ে পড়ি তাহলে বাণ ছোড়বারও সুবিধা হবে না। হাতাহাতি যুদ্ধে আমাদেরই হারতে হবে। কারণ একে ওরা সংখ্যায় বেশি, তার উপরে গায়ের জোরেও আমরা ওদের কাছে দাঁড়াতে পারব না।'

অগ্নি বললে, 'তবে কি আমরা এইখানেই দাঁড়িয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করব?'

—'হ্যাঁ। সবাই এক জায়গায় দলবদ্ধ হয়ে থেকো না। তাঁবুগুলো পিছনে রেখে, অর্ধ-চন্দ্রাকারে ফাঁক ফাঁক হয়ে দাঁড়াও। যতক্ষণ না ওরা আমাদের বাণের সীমানার মধ্যে আসে ততক্ষণ অপেক্ষা করো।'

শিঙা নিয়ে সঙ্কেত-ধ্বনি করে অগ্নি পিতার আদেশ প্রচার করে দিলে। তিনশত যোদ্ধা তৎক্ষণাৎ অর্ধচন্দ্র ব্যূহ রচনা করে ফেললে। যোদ্ধাদের পিছনে রইল তাঁবুর ভিতরে মেয়েরা—শত্রুদের নাগালের বাইরে। অর্দ্ধচন্দ্রের মাঝখানে দুই পাশে দুই ছেলেকে নিয়ে এসে দাঁড়লেন সূর্য-সর্দার স্বয়ং।

ওদিক থেকে হই-চই তুলে, মুখ ভেংচে ও লাফালাফি করে যারা আক্রমণ করতে আসছে, তাদের মধ্যে ব্যূহ, শ্রেণী, শৃঙ্খলা কোনওরকম পদ্ধতিরই বালাই ছিল না। তাদের নির্ভরতা কেবল নিজেদের পশুশক্তির উপরে। আর আছে তাদের খোকা-আগুন!—খাঁড়াদেঁতো ও গুহাভাল্লুক যার সামনে দাঁড়াতে পারে না, তার সামনে মানুষপোকাগুলো তো তুচ্ছ! সেই হল তাদের যুক্তি।

কেবল হুঁহুঁ কিছুতেই আশ্বস্ত হতে পারছে না। সে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ চোখে নতুন মানুষদের সবকিছু পর্যবেক্ষণ করতে করতে সাবধানে অগ্রসর হচ্ছে।

হাঁহাঁ বিরক্ত স্বরে বললে, হ্যাঁ রে হুঁহুঁ, তুই আবার পিছিয়ে পড়লি যে রে! দেরি করলে খোকা-আগুন তোর হাত থেকে পালিয়ে যাবে, জানিস না?'

হুঁহুঁ বিস্ফারিত নেত্রে একদিকে তাকিয়ে বললে, 'দেখ রে সর্দার, দেখ!'

—'কী?'

কোনও কোনও তাঁবুর ভিতর থেকে ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছিল—বোধহয় উনুনের জ্বালানি কাঠের ধোঁয়া। সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে হুঁহুঁ বললে, 'দেখ, ওদেরও কাছে খোকা-আগুন আছে রে!'

হাঁহাঁ দেখে প্রথমে দস্তুরমতো ভড়কে গেল। কিন্তু তারপরেই সে ভাবটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হেসে বললে, 'ও বাজে খোকা-আগুন রে! ওদের যদি আগুন-মন্তর জানা থাকত, তাহলে ওরা হাতে কতগুলো কাঠি নিয়ে নাড়ানাড়ি করত না!'

—'হয়তো ওইগুলোই ওদের নতুন ফুসমন্তর!'

—'ফুসমন্তর ফুসমন্তর করেই কবে তুই ফুস করে পটল তুলবি রে!..........এগিয়ে চল। ওরা আমাদের খোকা-আগুনকে দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এগুতে চাইছে না।'

টুটু বললে, 'দাঁড়িয়ে থাকলেই প্রাণ বাঁচবে কিনা! আমরা আর একটু কাছে গেলেই মজাটা টের পাবে!'

ঘটু বললে, 'যেমন টের পেয়েছিল ভাল্লুক আর খাঁড়াদেঁতো—'

হুঁহুঁর দিকে আড়-চোখে চেয়ে হা-হা করে হেসে হাঁহাঁ বললে, 'আর টুঁটুঁর বাপ হুঁহুঁ!'

টুটু বললে, 'হ্যাঁ।'

সেকথা যেন শুনতেই পায়নি এমনি ভাব দেখিয়ে হুঁহুঁ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালে।

প্রস্তরযুগ হলেও বাপের এমন অপমান টুঁটুঁরও ভালো লাগবে না। সে-ও মুখ ফেরালে অন্যদিকে।

হাঁহাঁ দামামা-ধ্বনি শুনতে শুনতে বললে, 'অমন দুম-দাম শব্দ করে কানের পোকা বার করছে কারা বলদিকি?'

হুঁহুঁ ফুসমন্তর সম্বন্ধে আবার কী মত প্রকাশ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু টুঁটুঁ রাগ-ভরা চোখে বাপের দিকে তাকাতেই সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিলে!

টুটু বললে, 'বোধহয় যে জানোয়ারগুলোর পিঠে চড়ে ওরা নদীতে বেড়ায়, তারাই খিদের চোটে চেঁচিয়ে মরছে!'

—'তাই হবে।'

ঘটু বললে, 'লড়ায়ে জিতে ফেরবার সময়ে জানোয়ারগুলোকে আমরা ধরে নিয়ে যাব।'

হাঁহাঁ মাথা নেড়ে বললে, 'না, না! বড্ড চ্যাঁচায়। ঘুমোতে দেবে না।'

এমনি সব আজে-বাজে কথা কইতে কইতে তারা যে অজানা মৃত্যুর সীমানার মধ্যে এসে পড়েছে, সেটা আন্দাজও করতে পারলে না! নতুন মানুষরা অকস্মাৎ ধনুকের ছিলা টেনে বাণ ছাড়লে। এবং পরমুহূর্তে যা ঘটল, সেটা সম্পূর্ণরূপে তাদের ধারণাতীত! ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ উড়ে এসে হাঁহাঁদের দলের ভিতরে গোঁত খেয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে পনেরো-ষোলো জন লোক নিহত বা আহত হয়ে পপাত ধরণীতলে! পরমুহূর্তে তেড়ে এল আবার অসংখ্য মৃত্যুদূত এবং আবার কয়েকটা মূর্তি করলে পৃথিবীকে আলিঙ্গন!

তারপর নতুন মানুষরা বাণ ছোড়া থামিয়ে ধনুক নামিয়ে ফলাফল দেখতে লাগল।

অসভ্যদের লাফালাফি ও জয়ধ্বনি থেমে গেল একেবারে, তার বদলে জেগে উঠল আকাশভেদী আর্তনাদ!

হাঁহাঁ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলে না, হতভম্বের মতো রক্তাক্ত মূর্তিগুলোর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ! তারপর বিস্মিত স্বরে ঠিক গুহাভাল্লুকের মতোই বললে, 'অ্যাঃ! কাঠি ছুড়ে কাবু করলে!'

হুঁহুঁ ত্রস্তভাবে পিছোতে পিছোতে বললে, 'বাপ রে বাপ, কী ফুসমন্তর!'

এমন সময়ে এল আবার এক ঝাঁক বাণ! এবারে প্রথমেই বাণ খেয়ে বাপের পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ল ঘটু। বাণ বিঁধেছে তার বুকে!

হাঁহাঁ স্তম্ভিত নেত্রে ছেলের মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

মৃত্যু-কাতর কণ্ঠে ঘটু ডাকলে, 'বাবা!'

হাঁহাঁ মাটির উপরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললে, 'ঘটু রে!'

দুইহাতে নিজের বুক চেপে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘটু বললে, 'আমাকে যে মেরেছে তাকে তুই মারিস রে বাপ! তাকে তুই খুঁজে বার করিস, তাকে তুই ছাড়িসনে, তাকে তুই—' আর কিছু বলবার আগেই তার মৃত্যু হল।

ছেলের দেহ কোলের উপর টেনে নিয়ে হাঁহাঁ অশ্রু-অস্পষ্ট চোখে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলে, উচ্চভূমির উপরে নতুন মানুষরা ঠিক পাথরের মতোই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের একজনও হত বা আহত হয়নি! হাঁহাঁর অনুচররা তাদের লক্ষ্য করে কতগুলো জ্বলন্ত কাঠ ছুড়েছে বটে, কিন্তু একগাছা কাঠও তাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছোয়নি।

কিন্তু হাঁহাঁদের দলে মরেছে বা জখম হয়েছে প্রায় চল্লিশজন লোক। দলের অনেকেরই যুদ্ধ করবার শখ এখন মিটে গেছে, তারা পায়ে পায়ে ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে এবং যারা এখনও পালায়নি তারাও পালাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, কিংবা অগ্রসর না হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। তাদের অনেকের হাতেই আর জ্বলন্ত কাঠ নেই, যাদের হাতে আছে তাদের কাঠে আগুন নেই।

হাঁহাঁ হঠাৎ প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকানি দিলে, তার তৈলহীন জটার মতন লম্বা রুক্ষ চুলগুলো ঠিক যেন একদল ক্রুদ্ধ সর্পের মতো চতুর্দিকে ঠিকরে পড়ল লটপট করে! তারপরেই ছেলের মৃতদেহ মাটিতে নামিয়ে রেখে তড়াক করে লাফ মেরে সে দাঁড়িয়ে উঠল এবং পিঠে বাঁধা বর্শা ও কোমরে ঝোলানো মুগুর এক এক টানে খুলে নিয়ে দুই হাতে ধরে বজ্রকঠিন স্বরে হেঁকে বললে, 'কী রে ভিতুর পাল, তোরা পালাবি নাকি রে? চেয়ে দেখ মাটির দিকে, তোদের বন্ধুদের রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে! পোকার মতন দেখতে ওই বিদেশিগুলো এসে তাদের বধ করলে, আর প্রতিশোধ না নিয়ে তোরা পালাবি নাকি রে?'

একজন বললে, 'আমাদের খোকা-আগুন পালিয়ে গেছে রে সর্দার!'

দপ দপ করে হাঁহাঁর দুই ভীষণ চক্ষু জ্বলে উঠল! বিপুল ক্রোধে তার বিষম চওড়া বক্ষ ফুলে আরও চওড়া হয়েছে এবং বিকট দন্তগুলো কালো মুখের ভিতর থেকে দেখাচ্ছে যেন বিদ্যুৎ দীপ্তির মতো চকচকে! সত্যই এখন তার দানব মূর্তি! কর্কশ কণ্ঠে সে আবার চিৎকার করে বললে, 'তোদের মতো ভিতুর হাতে খোকা-আগুন থাকবে কেন? এতক্ষণে তোরা একটা শত্রু মারতে পারলি না, তাই তো আগুন তোদের ত্যাগ করেছে! আগুন গেছে, তোদের কাছে বর্শা নেই কুঠার নেই মুগুর নেই? এতদিন তোরা কী নিয়ে লড়াই করে এসেছিস রে?'

যুদ্ধপাগল আদিম মানুষ, হাঁহাঁর দৃপ্ত উৎসাহবাণীতে জেগে উঠল আবার তাদের রণোন্মাদনা!—নেচে উঠল ধমনীর তপ্ত পশুরক্ত! তারা রুখে দাঁড়িয়ে বললে, 'হ্যাঁ রে হাঁহাঁ-সর্দার! আমরা ভিতু নই—আমরা হয় মারব, নয় মরব! হারে রে রে রে রে!'

হাঁহাঁ এক হাতে বর্শা ও আর এক হাতে মুগুর উঁচিয়ে মূর্তিমান বিভীষিকার মতো তীরবেগে ছুটতে ছুটতে বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ! হয় মারব, নয় মরব! কে আসবি আমার সঙ্গে, ছুটে আয় রে মরদ-বাচ্ছা, ছুটে আয়!'

তার সঙ্গে সঙ্গে ধেয়ে চলল ভয়াবহ হুঙ্কার তুলে প্রায় দুইশত আদিম যোদ্ধা।

হুঁহুঁ গেল না। টুঁটুঁও গেল না।

হুঁহুঁ বললে, 'ওরা মরণের মুখে ছুটেছে। আমরাও কেন ওদের সঙ্গে মরব রে?'

টুঁটুঁ বললে, 'ঠিক বলেছিস রে বাপ! চল ফিরে যাই!'

উচ্চভূমি থেকে আবার ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ ছুটে আসছে! আবার অনেকে মরল, আবার অনেকে পালাল। কিন্তু জন-পঞ্চাশের গতিরোধ করতে পারলে না কেউ!

পদে পদে লোক মরছে, তবু তারা থামল না। হাতে কাঁধে উরুতে বাণ বিঁধছে, তবু তারা থামল না। তিনশো শত্রু চারিদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলবার জন্যে ছুটে আসছে, তবু তারা থামল না। তারা মরিয়া! তারা প্রাণের মায়া রাখে না। তাদের অগ্রগতি রোধ করতে পারে কেবল মৃত্যু।

হাঁহাঁ ভয়ানক স্বরে অট্টহাস্য করে বললে, 'চলে আয় রে মরদবাচ্ছা, চলে আয়! ওই ওদের সর্দার—আমি মারব ওকে, তোরা যে যাকে পারিস মার। হয় মার, নয় মর!'

হাঁহাঁরা তখন নতুন মানুষদের দলের ভিতরে ঢুকে পড়েছে মত্ত হস্তীদলের মতো। তারা যেদিকে তাকায়, সেই দিকেই দলে দলে শত্রু। এত কাছে ধনুক-বাণ অচল দেখে শত্রুরাও ধরলে বর্শা বা কুঠার বা মুগুর। আরম্ভ হল তখন বিষম হাতাহাতি লড়াই। হাঁহাঁর চোখের সামনে বর্শা আঘাতে টুটু ভূতলশায়ী হল, তবু তার ভ্রূক্ষেপও নেই। তার নিজের বর্শা ভেঙে দু-টুকরো হয়ে গেল, হাঁহাঁ খেয়ালেও আনলে না। দুই হাতে মুগুর ধরে ডাইনে বামে সমানে আঘাত করতে করতে সূর্য-সর্দারের দিকে অটল পদে এগিয়ে চলল, সে শরীরী বজ্রকে ঠেকায় কার সাধ্য! তার সুমুখে দাঁড়ায় কার সাধ্য! অবশেষে হাঁহাঁ তার লক্ষ্যস্থলে এসে হাজির হয়ে হো হো রবে হেসে উঠে উন্মত্তের মতন বলে উঠল, 'এইবারে তোকে পেয়েছি রে পালের গোদা!' বলেই দুই হাতে মুগুর তুলে প্রাণপণে আঘাত করলে সূর্য-সর্দারকে!

সূর্য-সর্দারও নিজের মুগুর তুলে হাঁহাঁর মুগুরকে ঠেকাতে গেলেন, কিন্তু হাঁহাঁ বুঝেছিল তখন তার অন্তিমকাল উপস্থিত, তাই সে তার মহা-বলিষ্ঠ বিরাট দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে এই চরম আঘাত করেছিল, কাজেই সূর্য-সর্দারের মুগুর হাঁহাঁর মুগুরকে ঠেকিয়েও তাকে থামাতে পারলে না, দুই যোদ্ধার দেহই একসঙ্গে জড়াজড়ি করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেল।

তখন চারিদিক থেকে অনেক লোক ছুটে এসে হাঁহাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, কেউ মারলে কুঠারের ঘা—কেউ দিলে বর্শার খোঁচা! কিন্তু তার আর দরকার ছিল না, কারণ এই চরম আঘাত করবার জন্যেই সে ছিল এতক্ষণ বেঁচে। মুগুরের দ্বারা শত্রুকে শেষ আঘাত করেই সে শক্তিহারা হয়ে মৃত্যুর মুখে করেছে আত্মদান!.......

সূর্য-সর্দার কেবল মূর্চ্ছিত হয়েছিলেন। জ্ঞান হবার পর রক্তাক্ত দেহে উঠে বসে দেখলেন, শত্রুদের কেউ আর বেঁচে নেই! কিন্তু মাত্র পঞ্চাশ জন শত্রুর শেষ আক্রমণে তাঁর দলে হত বা আহত হয়েছে একশো কুড়ি জন!

অভিভূত স্বরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, রাক্ষসরা যথার্থ যোদ্ধা বটে! কিন্তু এদের সম্বল শুধু পশুশক্তি। ওর সঙ্গে ওদের মনের শক্তি থাকলে পৃথিবীতে আমরা কেউ বেঁচে থাকতুম না!'

সূর্য-সর্দার যাকে মনের শক্তি বললেন, এখনকার পণ্ডিতরা তাকে বলেন মস্তিষ্কের শক্তি।

কেবল উত্তর ভারতের নানা স্থানে নয়, গোটা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই সে-যুগের আদিম মানুষদের সঙ্গে যুদ্ধ বেঁধেছিল নতুন মানুষদের। কিন্তু শুধু দেহের শক্তির উপরে নির্ভর করেছিল বলে আদিম মানুষরা কোথাও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারেনি।

প্রথম মনুষ্য সৃষ্টির পর দশ লক্ষ বৎসর কেটে গেছে। এই সুদীর্ঘকালব্যাপী মস্তিষ্ক-চর্চার ফল হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর মানুষ। মস্তিষ্কের মহিমায় মানুষ যে উন্নতির পথে আরও কতখানি অগ্রসর হবে, সে কথা জানে কেবল সুদূর ভবিষ্যৎ।

পরিশিষ্ট

গল্প তো ফুরাল, কিন্তু আমার শেষ কথা এখনও বাকি। বোধ হচ্ছে, কোনও কোনও বিষয় নিয়ে কারুর মনে প্রশ্ন উঠতে পারে। আন্দাজে দু-একটা উত্তর দিয়ে রাখি।

'মানুষের প্রথম অ্যাডভেঞ্চার' উপন্যাসের আকারে লেখা হল আবালবৃদ্ধবনিতার চিত্তরঞ্জনের জন্যে। কিন্তু কেবল উপন্যাসরূপে পাঠ করলে এ রচনাটির আসল উদ্দেশ্য হবে ব্যর্থ। কারণ গল্পের ভিতর দিয়ে আমি প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম মানুষ ও তার জীবনযাত্রাপদ্ধতির যে

ছবি ফোটাবার চেষ্টা করেছি, তা কাল্পনিক হলেও কল্পনার মূলে আছে প্রধানত বিশেষজ্ঞদের মতামত।

আদিম মানুষদের নিয়ে পণ্ডিতদের অনুসন্ধান-কার্য এখনও সমাপ্ত হয়নি—অদূর ভবিষ্যতেও সমাপ্ত হবার সম্ভাবনা নেই। যতটুকু আবিষ্কৃত হয়েছে, আবিষ্কৃত হতে বাকি তার চেয়ে ঢের বেশি! সমস্তটা কখনও আবিষ্কৃত হবে কি না সন্দেহ! মহাকাল অনেক প্রমাণ নিঃশেষে ধ্বংস করেছেন—আধুনিক নৃতত্ত্ববিদদের মুখ তাকাননি।

যতটা জানা গিয়েছে, তার দ্বারাও কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবার উপায় নেই। কারণ বিশেষজ্ঞদেরও মধ্যে মতভেদ দেখা যায় সর্বত্র। Sir Arthur Keith, Dr. Davidson Black, H. J. Fleure, Dr. E. Dubois, Professor H. F. Osborn, R. R. Marret, Sir G. E. Smith ও Darwin প্রভৃতির মতামত পাঠ করেও নির্দিষ্ট কোনও পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। Keith সাহেবের মতন বিশেষজ্ঞও স্পষ্ট ভাষায় বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'আমাদের অনুসন্ধান সবে আরম্ভ হয়েছে। এমন অনেক কিছুই আছে যা আমরা এখনও বুঝতে পারি না।' এক্ষেত্রে আমাদের মতন সাধারণ লোকের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

মানুষ যে গোড়ায় কী ছিল, এখনও সেইটেই জানা যায়নি। Darwin ও Lamark সাহেব বলেন, মানুষের উৎপত্তি শিম্পাঞ্জির মতো কোনও লাঙ্গুলহীন বানর থেকে। Keith সাহেবেরও ওই মত।

আবার Professor H. F. Osborn-এর মত হচ্ছে, 'আমি মানুষের ক্রমোন্নতিতে বিশ্বাস করি, কিন্তু লাঙ্গুলহীন বানর থেকে যে তার উৎপত্তি, এ কথায় বিশ্বাস করি না। মানুষ তার নিজের পথ ধরেই বরাবর এগিয়ে এসেছে, কখনও তাকে বানর অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়নি।' আবার Professor Westenhofer সম্পূর্ণ উলটো কথা বলেন। তাঁর মতে, মানুষ থেকেই লাঙ্গুলহীন বানরের উৎপত্তি। এই অদ্ভুত মতানৈক্যের জঙ্গলে আমাদের মতন সাধারণ পাঠককে পথ হারাতে হয় পদে পদে। আমরা কোন দিকে যাবে? কার কথায় বিশ্বাস করব?

কোন দেশে মানুষের প্রথম আবির্ভাব, তা নিয়েও তর্কাতর্কির অন্ত নেই। Darwin, Smith ও Broom প্রভৃতি পণ্ডিতরা বলেন, মানুষের প্রথম জন্মভূমি হচ্ছে আফ্রিকা। তাঁদের মতে, আফ্রিকায় যখন গরিলা ও শিম্পাঞ্জির মতো লাঙ্গুলহীন বানরের জন্ম হয়েছে তখন ওইখানেই মানুষের প্রথম আবির্ভাবের সম্ভাবনা বেশি।

কিন্তু যুক্তির দিক দিয়ে ওই মতই যথেষ্ট নয়। ভারতের কাছেই জাভা দ্বীপে মানুষের সবচেয়ে পুরানো কঙ্কালাবশেষ পাওয়া গিয়েছে এবং তার পাশাপাশি দ্বীপে—সুমাত্রায় ও বোর্নিয়োয়—যখন লাঙ্গুলহীন বানর জাতীয় বৃহৎ ওরাং উটানের বাস, তখন পূর্ব-মত অনুসারে ওই অঞ্চলেও মানুষের প্রথম জন্ম হতে পারে। *

আধুনিক বহু পণ্ডিত বলেন, মধ্য এশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলেই মানুষ প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। হিমালয়ের পাদপ্রদেশে (অর্থাৎ শিবলিক শৈলশ্রেণীর মধ্যে) সম্প্রতি নানা জাতের লাঙ্গুলহীন বানরের শিলীভূত কঙ্কাল (fossil) আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের Dryopithecus নামে ডাকা হয়। আদিম বানরদের মধ্যে তারা ছিল অতিকায়। নিউ ইয়র্কের W. K. Gregory সাহেবের মতে,

* দক্ষিণ আমেরিকার গভীর জঙ্গলে টারা নদীর ধারেও সম্প্রতি লাঙ্গুলহীন এক বৃহৎ বানরিকে গুলি করে মারা হয়েছে—মাথায় সে পাঁচ ফুট উঁচু। ও-জাতের পুরুষদের মাথার উচ্চতা নিশ্চয়ই তার চেয়ে বেশি। গরিলা, ওরাং-উটান বা শিম্পাঞ্জির সঙ্গে উক্ত বানরির দেহ মেলে না, অর্থাৎ সে ভিন্নজাতের। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আফ্রিকা, সুমাত্রা ও বোর্নিয়োর মতন দক্ষিণ আমেরিকাতেও বড়ো জাতের লাঙ্গুলহীন বানর আছে। কিন্তু তাই বলে কেউ মতপ্রকাশ করেন না যে, দক্ষিণ আমেরিকাই মানুষের প্রথম জন্মভূমি।

দাঁতের গড়নে তারা ছিল বানর ও মানুষের পূর্বপুরুষদের মতো। চিনদেশেও যে আদিম মানুষের (Peking man নামে বিখ্যাত) কঙ্কালাবশেষ পাওয়া গিয়েছে, প্রাচীনতায় তা স্থান পেয়েছে জাভার মানুষের পরেই। এইসব কারণে আধুনিক অনেক বিশেষজ্ঞ প্রাচ্য দেশকেই প্রথম মানুষের জন্মক্ষেত্র বলে বিশ্বাস করেন।

পণ্ডিতদের বহুবর্ষব্যাপী পরিশ্রমের ও মস্তিষ্কচালনার ফলে জানাও গিয়েছে অনেক কিছু। প্রাগৈতিহাসিক রঙ্গমঞ্চের যবনিকার অংশবিশেষ তুলে তাঁরা নানা বিচিত্র দৃশ্য দেখতে পেয়েছেন যেসব বিষয় সম্বন্ধে তাঁরা প্রায় নিঃসন্দেহ, বর্তমান ক্ষেত্রে সেইগুলিই হয়েছে আমার প্রধান অবলম্বন।

আমরা এই গল্পে যে 'নিয়ানডের্টাল' মানুষদের কথা বলেছি, তারা ছিল কতকটা বানরধর্মী মানুষের শেষ বংশধর। (তারা অগ্নি, বস্ত্র ও অস্ত্র ব্যবহার করত এবং কথা কইত বলে ধরা যায়, যথার্থ মানুষি চিন্তাশক্তি তাদের ছিল। মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও বোধহয় তাদের অস্পষ্ট ধারণা ছিল, কারণ মৃতদেহকে তারা সযত্নে গোর দিত।) ১৮৫৭ শতকে জার্মানির ডুসেলডর্ফ নামক স্থানে নিয়ানডের্টাল গুহায় সর্বপ্রথমে তাদের কঙ্কালাবশেষ আবিষ্কৃত হয়, তাই ওই নাম। মাথায় তারা পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চির বেশি উঁচু হত না, কারুর কারুর মতে আফ্রিকার আধুনিক অসভ্য মানুষ হটেনটটদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আবিষ্কার করা যায়। কেবল ইউরোপের নানা স্থানে নয়, আফ্রিকায় এবং এশিয়াতেও (ককেসসে ও প্যালেস্টাইনেও) তাদের দেহাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। ভারতে এখনও তাদের কঙ্কাল পাওয়া যায়নি বটে, কিন্তু আমরা অনায়াসেই ধরে নিতে পারি, আদিমকালে এখানেও তারা কিংবা তাদের কোনও নিকট আত্মীয় বা প্রায় ওই-জাতীয় মানুষ বিচরণ করত। কিন্তু তর্কের খাতিরে কেউ যদি জোর করে বলেন যে, 'নিয়ানডের্টাল'দের কঙ্কাল যখন ভারতে পাওয়া যায়নি, তখন এদেশে তাদের আবির্ভাব দেখানো মস্ত ভুল, তাহলে আমি প্রতিবাদ করব না। তবে এক্ষেত্রে আর একটি কথাও স্মরণ রাখতে হবে। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে জাভাদ্বীপেও 'নিয়ানডের্টাল' লক্ষণ-বিশিষ্ট মানুষের কঙ্কালাবশেষ পাওয়া গিয়েছে, তার নাম রাখা হয়েছে 'সোলো'-মানুষ।

বহু পণ্ডিতের মতে, 'ক্রো-ম্যাগনন' জাতের মানুষও এশিয়া থেকে ইউরোপে প্রবেশ করে। সুতরাং ভারতেও তারা কিংবা প্রায় ওই-জাতের মানুষদের আবির্ভাব স্বাভাবিক। 'নিয়ানডের্টাল'রা সিধে হয়ে হাঁটতে পারত না, এরা পারত। এবং এদের মধ্যে বানরকে মনে পড়ে, এমন কোনও লক্ষণই ছিল না। কিন্তু ইউরোপ থেকে এদের জাতও আজ অদৃশ্য হয়ে গেছে, (Fleure-এর মতে) আধুনিক বহু মানুষের উপরে নিজেদের অল্পবিস্তর ছাপ রেখে।

'নিয়ানডের্টাল' মানুষদের শেষ-জীবন থেকেই আমাদের গল্প আরম্ভ করেছি। তাদের প্রথম আবির্ভাবের সময়ে 'ক্রো ম্যাগনন' মানুষরা পৃথিবীতে বর্তমান ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

যদি কোনও বিশেষজ্ঞ এই কাহিনির মধ্যে ভুলভ্রান্তি পান, তাহলে তা গল্পলেখকের অজ্ঞতা বুঝে মার্জনা করবেন। আমি নৃতত্ত্ববিদ নই, নৃতত্ত্বের অল্পস্বল্প উপাদান নিয়েছি গল্পের ভিতর দিয়ে মানুষের আদিম জীবনের মোটামুটি একটি পরিচয় প্রদান করব বলে। পাঠকদের মধ্যে হয়তো আমারও চেয়ে কম অগ্রসর লোক আছেন, সেই ভরসাতেই এমন কঠিন আখ্যানবস্তু গ্রহণ করেছি। পণ্ডিতদের জন্যে নয়, তাঁদের জন্যেই এই কাহিনি। তাঁদের ভালো লাগলেই আমরা শ্রম সার্থক।

—ইতি

মানুষের গন্ধ পাই

॥ এক ॥

রেলপথের কাজে কোনও বাধা-বিঘ্ন ছিল না—বেশ শান্তিতে দিন কাটছিল।

কিন্তু এ আরাম বেশিদিন আর ভোগ করতে হল না। হঠাৎ একদিন অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাদের সুখের ঘুম গেল চমকে।

দুটো মানুষখেকো সিংহ এসে আচম্বিতে বিপুল-বিক্রমে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে। এই যুদ্ধ শেষ করতে সুদীর্ঘ নয় মাস কাল কেটে গিয়েছিল। মাঝে তাদের অত্যাচার এমন বেড়ে ওঠে যে, প্রায় তিন হপ্তা ধরে হাজার হাজার লোক রেলপথের কাজ বন্ধ করে অলস ভাবে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছিল।

দেখতে দেখতে সিংহরা মানুষ-ধরা কাজে এমনি পাকা হয়ে উঠল যে, কোনও বাধাকেই আর বাধা বলে, কোনও বিপদকেই আর বিপদ বলে মানত না। প্রতি রাত্রেই তাঁবুর ভিতর থেকে মানুষের পর মানুষ অদৃশ্য হতে লাগল—আমাদের সমস্ত সাবধানতাই তাদের অদ্ভুত চালাকির কাছে ব্যর্থ হয়ে গেল।

কুলিরা বলতে লাগল, জঙ্গল থেকে রোজ রাত্রে যারা এখানে হানা দিতে আসে আসলে তারা সাধারণ জানোয়ার নয়, তারা হচ্ছে আফ্রিকার বুনো মানুষদের প্রেতাত্মা, তাদের দেশের বুকে বিলিতি রেলের লাইন বসেছে দেখে তারা চটে গেছে, তাই সিংহের মূর্তি ধারণ করে রোজ আমাদের ঘাড় ভাঙতে আসে। তারা অবধ্য,—বন্দুকের গুলি তাদের গায়ে লাগে না। তারা অমর, গুলি খেয়েও তারা মরে না। ইত্যাদি।

পরে পরে কয়েকজন কুলি অদৃশ্য হল। প্রথম প্রথম আমি ভাবতুম যে, কুলিদের দলে নিশ্চয়ই কোনও দুষ্ট লোক আছে। তারাই টাকার লোভে তাদের খুন করে জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে লাশ ফেলে দিয়ে আসে। কিন্তু আমার এ সন্দেহ যে ভুল, শীঘ্রই তার প্রমাণ পেলুম।

সাভোয় পৌঁছোবার প্রায় হপ্তা-তিনেক পরে, একদিন সকালে বিছানা ছেড়ে উঠেই শুনলুম, কাল রাতে সিংহরা এসে তাঁবুর ভিতর থেকে জমাদার অঙ্গন সিংকে ধরে নিয়ে গিয়ে ফলার করেছে।

অঙ্গন সিং হচ্ছে একজন লম্বা-চওড়া জোয়ান শিখ। গতিক তো বড়ো সুবিধের নয়! তাড়াতাড়ি উঠে অঙ্গন সিং-এর তাঁবুর দিকে অগ্রসর হলুম।

তাঁবুর আশেপাশে বালির উপরে রয়েছে স্পষ্ট সিংহের পায়ের দাগ! সে দাগ বরাবর বনের ভিতরে চলে গিয়েছে। বুঝলুম, কুলিরা মিথ্যা বলে না। সিংহরাই তাদের সঙ্গে শয়তানি করছে বটে।

অঙ্গন সিং-এর তাঁবুতে আরও বারোজন কুলি বাস করত। রাত্রের ভীষণ কাণ্ড তারা স্বচক্ষে দেখেছে। তাদেরই মুখে সমস্ত শুনলুম।

জমাদার অঙ্গন সিং তাঁবুর খোলা দরজার কাছেই শুয়ে ঠান্ডা হাওয়ায় খুব আরাম করে ঘুমোচ্ছিল। মাঝ-রাতে হঠাৎ আমরা দেখলুম, একটা মস্ত সিংহ তাঁবুর ভিতরে মুখ বাড়িয়ে জমাদারের গলাটা হাঁ করে দাঁতে চেপে ধরলে।

জমাদার বলে উঠল, 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—' বলেই সে দুই হাতে সিংহের গলা জড়িয়ে ধরলে।

—পরমুহূর্তেই জমাদারকে নিয়ে সিংহটা অন্তর্হিত হল। ভয়ে তখন আমাদের হাত-পা হিম হয়ে গেছে! কাঁপতে কাঁপতে শুনলুম, সিংহের সঙ্গে জমাদারের বিষম লড়াইয়ের ঝটাপটি শব্দ! জমাদার সহজে কাবু হয়নি। কিন্তু কী করবে সে? সিংহের সঙ্গে মানুষ কখনও যুঝতে পারে?'

এই ভয়ানক গল্প শুনে কাপ্তেন হ্যাসলেমকে নিয়ে আমি সিংহের পায়ের দাগ ধরে জঙ্গলের ভিতরে অগ্রসর হলুম। সিংহটা যেখানে যেখানে দাঁড়িয়েছে, সেইখানেই রক্তের স্রোতে জমি তখনও ভিজে রাঙা হয়ে আছে।

তারপরেই বনের ভিতরে এক জায়গায় গিয়ে দেখলুম, সে কী দৃশ্য! দুঃস্বপ্নেও তা কল্পনা করা যায় না! চারিপাশকার জমি রক্তে আরক্ত এবং মাংস আর হাড়ের টুকরোয় ভরা। জমাদারের দেহ আর নেই বটে, কিন্তু হতভাগ্যের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন মুণ্ডটা তখনও আস্ত অবস্থায় মাটির উপরে বসানো রয়েছে! মুণ্ডের চোখ দুটো বিস্ফারিত—তার মধ্যে সচকিত আতঙ্ক-ভরা দৃষ্টি তখনও স্তম্ভিত হয়ে আছে।

জমির চারিদিকেই ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন দেখলেই বেশ বোঝা যায়, জমাদার-বেচারার দেহ নিয়ে দু-দুটো সিংহ পরস্পরের সঙ্গে কামড়া-কামড়ি ও টানা-হ্যাঁচড়া করেছে।

এমন বীভৎস দৃশ্য আমি আর কখনও দেখিনি।......জমাদারের দেহের টুকরো-টাকরা যা পাওয়া গেল, আমরা তখনই তা সংগ্রহ করে মাটির ভিতরে গোর দিলুম—এবং যতক্ষণ আমরা এই কার্যে নিযুক্ত ছিলুম, ততক্ষণই সেই বুক-চমকানো কাটামুণ্ডটা তার স্থির, ভীত দৃষ্টি দিয়ে যেন আমাদের প্রত্যেক গতিবিধি লক্ষ করতে লাগল। সে-মুণ্ডকে গোর দিতে পারলুম না—কারণ শনাক্ত করবার জন্যে ডাক্তারের কাছে তাকে হাজির করতে আমরা বাধ্য।

মানুষখেকো সিংহের নিষ্ঠুরতার সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। .....এবং সেইখানে দাঁড়িয়ে তখনই আমি প্রতিজ্ঞা করলুম যে, অতঃপর এই শয়তানদের শাস্তি দেওয়াই হবে আমার জীবনের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু তখনও আমি জানতুম না যে, আমার কর্তব্য কত কঠিন ও বিপজ্জনক এবং কতবার আমার অবস্থা হবে অভাগা অঙ্গন সিং-এরই মতন ভয়ানক!

জমাদার অঙ্গন সিং-এর তাঁবুর কাছাকাছি একটু গাছের উপর বন্দুক নিয়ে উঠে সেই রাত্রেই আমি বাসা বাঁধলুম। সিংহেরা যে-তাঁবুর ভিতর থেকে খোরাক পেয়েছে, রাতে হয়তো খিদের চোটে আবার সেইখানেই এসে হানা দেবে, এই হচ্ছে আমার আশা। যে-সব কুলি খুব বেশি ভয় পেয়েছে, তারাও আমার সঙ্গে গাছের ডালে বসে রাত কাটাবে বলে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। আমিও সম্মতি দিলুম।......

নিশুতি রাত। আচম্বিতে ঘন ঘন সিংহগর্জনে সমস্ত অরণ্য থর থর করে কাঁপতে লাগল। আমিও বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলুম—অন্তত আজ ওদের একটারও মানুষ

খাবার সাধ যে চিরদিনের জন্যে মিটিয়ে দিতে পারব, এ-বিষয়ে আমার মনের বিশ্বাস প্রবল হয়ে উঠল।

সিংহের গর্জন ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে—কাছে, আরও কাছে! তারপর হঠাৎ সব চুপচাপ। ঘণ্টাদুয়েক আর তাদের কোনও সাড়া নেই।

আমার জানা ছিল, সিংহেরা যখন শিকার করতে উদ্যত হয়, তখন তারা আর কোনও শব্দই করে না।

কোথাও কিছু নেই, অকস্মাৎ আধ-মাইল দূর থেকে বিষম এক গোলমাল জেগে উঠে রাতের অন্ধকার আকাশকে যেন অস্থির করে তুললে।...

...সিংহ যে আবার আজ নতুন শিকার সংগ্রহ করেছে সে বিষয়ে আর আমার কোনও সন্দেহই রইল না। আজকের মতো গাছে বসে রাত্রিবাসই ব্যর্থ হল—কারণ শত্রু আমার নাগালের বাইরে!

পরদিন প্রভাতেই খবর এল, আমার আর-একজন কর্মচারীর দেহ সিংহের উদরে সমাধিলাভ করেছে।

কাল সারা রাত ঘুম হয়নি—আজকের রাতটা বিশ্রাম করলুম।

তারপরের রাতে আবার নতুন ঘটনাস্থলের কাছেই আর একটা গাছের উপরে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। গাছের তলায় একটা জ্যান্ত ছাগলকে বেঁধে রাখলুম—লোভে পড়ে সিংহটা নিশ্চয়ই তার ঘাড় মটকাতে আসবে।

গাছে চড়ে ভালো করে বসতে না বসতেই টিপ টিপ বৃষ্টি শুরু হল। আমার কাপড়-চোপড় ও দেহ ভিজে ন্যাতনেতে হয়ে গেল, তবু আমি সতর্ক হয়ে রইলুম।

কিন্তু বৃথা! গভীর রাতে দূর থেকে আবার এক মর্মান্তিক আর্তনাদ জেগে উঠল,—আমি বুঝলুম, পশুরাজ আবার আজ নতুন নরবলি দিলে! গাছের ডালে বসে নিরুপায় হয়ে নিজের হাত আমি নিজেই কামড়াতে লাগলুম।

কুলিদের তাঁবুগুলো প্রায় আট মাইল জায়গা জুড়ে ছড়ানো ছিল। কাজেই কবে, কখন, কোথায় যে সিংহেরা এসে হানা দেবে, এটা স্থির করা সম্ভবপর ছিল না। তাদের চালাকি দেখে অবাক মানতে হয়। তারা উপর-উপরি দু-রাত্রি কখনও একই তাঁবুকে আক্রমণ করত না।

প্রথম প্রথম তারা সব-সময়েই যে সফল হত, তাও নয়। এক রাতে একজন ভারতীয় ব্যাপারী কুলিদের তাঁবুতে আসছিল, একটা গাধার পিঠে মোটমাট চাপিয়ে। অন্ধকারের ভিতর থেকে—বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো—হঠাৎ এক সিংহ তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার বিপুল দেহের ধাক্কায় গাধা আর মানুষ দুই-ই হল কুপোকাত!

কিন্তু একগাছা মোটা দড়িতে বাঁধা ছিল দুটো টিনের খালি কানাস্তারা এবং সিংহের থাবাতে গেল আটকে সেই দড়িগাছা। খালি কানাস্তারা মাটির উপরে আছড়ালে কী বেজায় আওয়াজ হয়, তোমরা তা শুনেছ বটে, কিন্তু সিংহ তা কখনও শোনেনি। দড়ি থেকে থাবা ছাড়াবার জন্যে সিংহ যতই টানাটানি করে, কানাস্তারা ততই ঝনঝনিয়ে বেজে ওঠে! সিংহ

ভাবলে, বাপরে, এ আবার কী নতুন জানোয়ারের চিৎকার! পেটের খিদে তার মাথায় চড়ে গেল, প্রাণের ভয়ে তখনই ল্যাজ গুটিয়ে সে দিলে চটপট চম্পট! ইতিমধ্যে সেই ব্যাপরী খুব ঢ্যাঙা এক গাছের মগডালে উঠে গিয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল। বলা বাহুল্য, পরের দিন সকালের আগে সে আর মাটির উপরে পা দেয়নি।

এমনি মজার ঘটনা আরও দু-একটা ঘটেছিল। আর একবার সিংহরা একটা তাঁবুতে মানুষ ধরতে এসে ভুল করে চালের একটা বস্তা টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আর এক রাতে তারা তোশক-সুদ্ধ একজন গ্রিক কন্ট্রাক্টরকে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু বনের ভিতরে গিয়ে দেখলে, দুষ্টু মানুষটা কোনও ফাঁকে তোষক থেকে উঠে চুপিচুপি লম্বা দিয়েছে।

কিন্তু পরে তারা আর ভুল করত না। তাঁবুর দরজা বন্ধ করে চারিদিকে কাঁটাঝোপ দিয়ে এবং আগুন জ্বালিয়ে—কোনওরকমেই আর তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারা যেত না; শত শত লোক আকাশ-ফাটানো চিৎকার এবং বন্দুকের আওয়াজ করেও বা জ্বলন্ত কাঠ ছুড়েও তাদের আর হটাতে পারত না,—কোনও কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করেই তারা আমাদের দল থেকে মানুষের পর মানুষ ধরে নিয়ে যেতে লাগল।

॥ দুই ॥

এই মানুষ-শিকারের সময়ে আমি কিন্তু বিশেষ কোনও সাবধানতা অবলম্বন করিনি। আমার তাঁবু ছিল একেবারে খোলা জায়গায় এবং তার চারদিকে সিংহদের বাধা দিতে পারে, এমন কোনও কাঁটাঝোপের বেড়া পর্যন্ত ছিল না।

ও-অঞ্চলের ডাক্তার রস একদিন আমার আতিথ্য গ্রহণ করলেন। ......রাত্রে ঘুমোতে ঘুমোতে হঠাৎ আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল, বাইরে তাঁবুর দড়ির সঙ্গে কে যেন ঝটাপটি করছে। কিন্তু লণ্ঠন জ্বেলে বাইরে গিয়ে কিছুই দেখতে পেলুম না। ......সকালে উঠে ভালো করে পরীক্ষা করবার সময়ে দেখা গেল, জমির উপরে সিংহের থাবার দাগ। বুঝলুম, ভাগ্যের জোরে কাল রাত্রে এ যাত্রা কোনওরকমে বেঁচে যাওয়া গেছে!

তখনই সেখান থেকে তাঁবু তুলে ফেললুম। এবং নদীর ধারে একখানা কুঁড়েঘর বানিয়ে সেইখানেই আড্ডা গাড়লুম। এবং ঘরের চারিদিকে খুব উঁচু ও পুরু কাঁটাঝোপের বেড়া লাগিয়ে দিলুম। আমার চাকর-বাকররা এই বেড়ার ভিতরে আশ্রয় নিলে। এবং সারারাত যাতে উজ্জ্বল আগুন জ্বলে, সে ব্যবস্থাও করা হল।

সন্ধ্যার সময়ে দিনের কাজ সাঙ্গ করে আমি কুঁড়ের বারান্দায় এসে বসতুম। কিন্তু সেখানে বসে কোনওরকম লেখাপড়া করবার জো ছিল না, কারণ সর্বদাই বুকটা ধুকপুক করত! কী জানি, সিংহমশাই কখন একলাফে পাঁচিল টপকে 'হালুম, তোমায় খেলুম' বলে ভিতরে এসে পড়েন, বলা তো যায় না! কাজে কাজেই বন্দুকটা সর্বদাই রাখতুম কাছে কাছেই। এবং থেকে থেকে ভয়ে ভয়ে বেড়ার ওপারে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতুম, যেখানে স্থির ও

স্তব্ধ হয়ে আছে কালির মতো কালো ভয় ভরা ঘন অন্ধকার! এক-একদিন সকালে উঠে দেখতুম, বেড়ার ওপারে মাটির উপরে সিংহরা পদচিহ্ন রেখে গেছে! সৌভাগ্যক্রমে কোনওদিন তারা বেড়া ডিঙোবার চেষ্টা করেনি।

এর মধ্যে কুলিরাও তাদের তাঁবুর চারিদিকে কাঁটাঝোপের বেড়া তৈরি করে ফেলেছিল। কিন্তু তবু প্রতি দুই-তিন দিন অন্তরেই শোনা যেত, অমুক তাঁবু থেকে অমুক কুলিকে সিংহরা ধরে নিয়ে গেছে! দুই-তিন হাজার কুলি অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাস করত, কাজেই এই দুর্ঘটনাও তাদের খুব বেশি বিচলিত করতে পারত না। কারণ তারা প্রত্যেকেই মনে করত, এত খোরাকের ভিতর থেকে সিংহের লোভ হয়তো তার উপরে পড়বে না। কিন্তু তারপর অধিকাংশ কুলি যখন অন্যত্র কাজ করতে চলে গেল অবং আমার সঙ্গে রইল মাত্র কয়েক শত কুলি, তখন সিংহের অত্যাচার হয়ে উঠল অত্যন্ত স্পষ্ট। কুলিরা এত ভয় পেলে যে, অনেক কষ্টে আমি তাদের কাজ করাতে পারতুম। তাদের তাঁবুর বেড়া আরও উঁচু করে দিলুম—এবং চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে রাখবারও ব্যবস্থা হল। জনকয়েক লোক বড়ো বড়ো গাছে চড়ে সারা-রাত অনেকগুলো কানাস্তারা নিয়ে এমন জোরে বাজাত যে, কান যেন কালা হয়ে যাবার মতো হত। কিন্তু তবু বেপরোয়া সিংহরা কিছুমাত্র গ্রাহ্য করত না—তাঁবুর ভিতর থেকে লোকের পর লোক অদৃশ্য হতে লাগল!

আমার কুঁড়েঘরের কাছ থেকে খানিক তফাতে ছিল হাসপাতাল-তাঁবু। তার চারিধারের বেড়া ছিল খুবই উঁচু আর মজবুত। কিন্তু তাতেও কোনও ফল হল না, সিংহরা সেই বেড়ার ভিতরেও একটা পথ তৈরি করে ফেললে।...এক রাত্রে সন্দেহজনক শব্দ শুনে হাসপাতালের সহকারী ডাক্তার বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন, মস্ত বড়ো একটা সিংহ তাঁর দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে! তাঁকে দেখেই সিংহ মারলে এক লাফ! ডাক্তার ভয়ে আঁতকে পিছনপানে একলাফে মেরে একেবারে পড়লেন গিয়ে একরাশ ডাক্তারি ওষুধ-পত্তরের মধ্যে! হুড়মুড় করে সমস্ত ভেঙে পড়ল এবং সেই বিষম শব্দে ভড়কে গিয়ে সিংহটা অন্যদিকে সরে পড়ল।

ডাক্তার সেবারের মতো বেঁচে গেলেন বটে কিন্তু সিংহটা খালি পেটে ফিরে যেতে রাজি হল না। সে হাসপাতালের আর একটা ঘরের ভিতরে গিয়ে হানা দিলে, সেখানে নয়জন রোগী শয্যাশায়ী ছিল। দুজন রোগীকে আহত করে, তৃতীয় রোগীর দেহকে সে কাঁটাঝোপের ভিতর দিয়ে হিড়হিড় করে টেনে বাইরে নিয়ে গেল। পরদিন সকালে গিয়ে দেখলুম, একটা তাঁবু ছিঁড়ে ভূমিসাৎ হয়েছে এবং তার তলায় পড়ে কাতরাচ্ছে দুই বেচারি আহত কুলি। সেইদিনই সেখান থেকে হাসপাতাল তুলে আর-একটা সুরক্ষিত জায়গায় স্থানান্তরিত করা হল।

শুনেছিলুম, সিংহরা প্রায়ই খালি-তাঁবুর ভিতরে বেড়াতে আসে। তাই রাত্রে তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে আমি বন্দুক নিয়ে তৈরি হয়ে পরিত্যক্ত হাসপাতালের ভিতর বসে সিংহদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম। কিন্তু গভীর রাত্রে স্তম্ভিত প্রাণে শুনলুম, নতুন হাসপাতালের ভিতর থেকে মর্মভেদী আর্তনাদ জেগে উঠল! বুঝলুম, শয়তানরা এবারেও আমাকে ফাঁকি দিলে।

সকাল হতে না হতেই ছুটলুম নতুন হাসপাতালের দিকে। সিংহটা কাল রাতে বেড়া টপকে ভিতরে এসেছে এবং এক বেচারি ভিস্তিকে নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে! যে-সব কুলি স্বচক্ষে সমস্ত ঘটনা দেখেছে, তারা যা বললে তা হচ্ছে এই:

তাঁবুর ক্যাম্বিসের দেওয়ালের দিকে পা ছড়িয়ে ভিস্তি পরম আরামে ঘুমোচ্ছিল। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ একটা সিংহ এসে তাঁবুর তলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভিস্তির পা কামড়ে ধরে তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল। হতভাগ্য ভিস্তি সিংহের কবল থেকে বাঁচবার জন্যে প্রথমে একটা সিন্দুক, তারপর তাঁবুর একগাছা দড়ি দুই হাতে প্রাণপণে চেপে ধরলে, কিন্তু মিথ্যা চেষ্টা! ভিস্তিকে তাঁবুর বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে সিংহটা তার পা ছেড়ে টুঁটি কামড়ে ধরে বারকয়েক ঝটকান দিতেই বেচারার সমস্ত আর্তনাদ চিরদিনের জন্যে থেমে গেল। তারপর বিড়াল যেমন ইঁদুরকে মুখে করে, তেমনিভাবে ভিস্তির দেহ মুখে করে সিংহটা কাঁটাঝোপের বেড়া ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে গেল।

যেখান দিয়ে সিংহটা বাইরে বেরিয়ে গেছে, সেইখানে গিয়ে দেখলুম, কাঁটাঝোপের গায়ে ছেঁড়া কাপড়ের ও রক্তাক্ত মাংসের টুকরো লেগে রয়েছে। বাইরে খানিক তফাতেই ভিস্তির দেহাবশেষ পাওয়া গেল। দেহাবশেষ তো ভারী! মাথার খুলি, দু-খানা চোয়ালের ও দেহের খানকয় বড়ো বড়ো হাড়, হাতের খানিকটা অংশ—তাতে তখনও দুটো আঙুল সংলগ্ন রয়েছে এবং একটা আঙুলে একটা রুপোর আংটি! আংটিটা ভারতবর্ষে অভাগা ভিস্তির বিধবার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

সেইদিন বৈকালেই খবর পাওয়া গেল, মাইল-তিনেক তফাতে দুটো সিংহের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে! প্রথমে তারা একজন কুলিকে ধরবার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই কুলি ছিল তাদের চেয়েও চটপটে। সিংহদের দেখেই সে বিনাবাক্যব্যয়ে একটা মস্ত-লম্বা গাছের উপরে তড়বড় করে উঠে পড়ে। মানুষের দুষ্টুমিতে বেজা বিরক্ত হয়ে সিংহ দুটো প্রস্থান করে বটে, কিন্তু কুলি-বেচারা ভয়ে আর গাছ থেকে নামতে পারে না। এমন সময়ে সেখান দিয়ে একখানা রেলগাড়ি যায়, তার এক কামরায় ছিলেন ট্রাফিক ম্যানেজার। তিনি জানলা থেকে সেই ভয়ে মরো মরো কুলিকে দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করেন।

তারপরেই দেখা যায়, সিংহ দুটো সাভো ইস্টিশানের কাছে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

তারপর রেলের ডাক্তার ব্রক সাহেব সন্ধ্যার অল্প আগে হাসপাতাল থেকে যখন ফিরছিলেন, তখন একজন কুলি দেখতে পায় যে, সিংহটা গুড়ি মেরে চুপিচুপি ব্রক সাহেবের পিছনে পিছনে আসছে।

সিংহেরা পাড়া-ছাড়া হয়নি শুনে আমি দ্বিতীয় হাসপাতালের সামনেই একখানা ঢাকা মালগাড়ি এনে রাখলুম এবং আশেপাশে গোটাকয় গোরুকেও বেঁধে রাখা হল—সিংহদের লোভ জাগাবার জন্যে। রাত্রে বন্দুক নিয়ে আমি সেই মালগাড়ির ভিতরে এসে ঢুকলুম এবং আমার সঙ্গে এলেন ব্রক সাহেব। তাঁকে ফলার করবার চেষ্টা করেছিল বলে ব্রক সাহেব যে সিংহের উপরে যার পর নাই খাপ্পা হয়েছিলেন, এ-কথা আর বলা বাহুল্য।

আবার সেই কালির মতো কালো, ঘন অন্ধকার! অরণ্যের নির্জনতা কী একঘেয়ে!

হাসপাতালের দিকে তাকিয়ে আছি বটে, কিন্তু চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না,—অন্ধকার আমাদের অন্ধ করে দিয়েছে। এমনি ভাবে ঘণ্টাদুয়েক কেটে গেল।

আচম্বিতে ডানদিক থেকে শুকনো পাতার মড়মড়ানি শব্দ এল—বুঝলুম, কাছেই কোনও জানোয়ারের আবির্ভাব হয়েছে! তারপরেই ধুপ করে একটা অস্পষ্ট শব্দ, যেন হাসপাতালের কাঁটাঝোপের উপর দিয়ে একটা ভারী দেহ লাফিয়ে পড়ল। গোরুগুলো যে ব্যস্ত হয়ে ছটফট করছে, আওয়াজ শুনে তাও বোঝা গেল। তারপর আবার সব চুপচাপ—যেন পরিত্যক্ত শ্মশান!

আমি বললুম, 'মালগাড়ি থেকে নেমে আমি এবার মাটির ওপরে শুয়ে থাকি। তাহলে সিংহ এদিকে এলে তাকে দেখবার আমার সুবিধা হবে।'

কিন্তু ডাক্তার ব্রক মানা করলেন বলে আমি আর গাড়ি ছেড়ে নামলুম না। ভাগ্যে আমি নামিনি! কারণ পরেই টের পেলুম যে একটা নরখাদক সিংহ কাছেই আমাদের জন্যে ওত পেতে বসে আছে। নামলেই তারা আমাকে গপ করে গিলে ফেলত! আমরা যখন চোখ মেলে দেখছি খালি অন্ধকার, সে-বদমাইস তখন অন্ধকারের ভিতরে চোখ চালিয়ে বসে বসে ভাবছিল যে, কোনও কায়দায় আমাদের একজনকে সে গ্রেপ্তার করে পেটে পুরবে!

মনে হল, কেউ যেন চোরের মতো পা টিপে টিপে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে! তার দেহ যেন অন্ধকারের চেয়েও কালো।

এ কি আমার মনের ভুল? যে জমাট অন্ধকারটা এগিয়ে আসছে, তার দিকে বন্দুকের মুখ রেখে শুধালুম, 'মি. ব্রক! আপনি কি কিছু দেখতে পাচ্ছেন?'

ব্রক সাহেব কোনও জবাব দিলেন না।

আবার ক্ষণিকের জন্যে সমস্ত স্তব্ধ! এবং তারপরেই অন্ধকারের ভিতর থেকে প্রকাণ্ড একটা দেহ আমাদের দিকে লাফিয়ে পড়ল!

আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, 'সিংহ!'—সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুজনেই বন্দুকের ঘোড়া টিপলুম!

আর-একটু দেরি হলেই আর রক্ষে ছিল না—সে শয়তান তাহলে নিশ্চয়ই মালগাড়ির ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়ত! কিন্তু একসঙ্গে ডবল বন্দুকের আওয়াজে এবং বারুদের দপ করে জ্বলে ওঠা আগুনে ভয় পেয়ে সিংহটা তখনই সে-মুল্লুক ছেড়ে চম্পট দিলে!

পরদিন সকালে দেখা গেল, ব্রক সাহেবের বন্দুকের গুলি সিংহের একটা পদচিহ্নের পাশেই বালির ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করেছে—আর এক ইঞ্চি এদিক দিয়ে এলেই গুলিটা ঠিক তার গায়ে লাগত। আমার বন্দুকের গুলির কোনওই খোঁজ পাওয়া গেল না।

নরখাদকের সঙ্গে এই আমার প্রথম মুখোমুখি পরিচয়!

॥ তিন ॥

মালগাড়ির সামনে বন্দুকের আগুনে আর আওয়াজে বোধহয় সিংহদের চোখ ঝলসে ও পিলে চমকে গিয়েছিল! কারণ অনেকদিন আর তাদের কোনওই খোঁজখবর পাওয়া গেল না। আমরা সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। ব্রক সাহেবের আর প্রতিশোধ নেওয়া হল না, তিনি অন্য দেশে চলে গেলেন।

কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হল যে, সিংহদের এ সুবুদ্ধি বেশিদিন স্থায়ী হবে না। সুতরাং যদি তারা আবার এদিকে বেড়াতে আসে, তাহলে তাদের ভালো করে আদর করবার জন্যে আমি একটা মস্ত ফাঁদ বানিয়ে রাখলুম।

ফাঁদটা হল অনেকটা ইঁদুর-কলের মতো, তবে আকারে তার চেয়ে অনেক বড়ো। ফাঁদের ভিতরে রইল দুটো কামরা। একটা কামরায় থাকবে মানুষ, তাকে খাবার জন্যে সিংহ ভিতরে ঢুকলেই ফাঁদের দরজাটা যাবে দুম করে পড়ে। সিংহ অন্য কামরায় বন্দি হবে, মানুষের কোনওই ক্ষতি করতে পারবে না, কারণ দুটো কামরার মাঝে মোটা লোহার রেলিংয়ের পাঁচিল দেওয়া আছে।

মাস-কয় সিংহরা সাভোর কাছে আর এল না বটে, কিন্তু তাদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের নিত্যনতুন কাহিনি আমাদের কানে আসতে লাগল। দশ-বারো মাইল তফাতে গিয়ে, রেললাইনের অন্যত্র, আবার তারা কুলিদের উপরে আক্রমণ শুরু করেছে। এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাদের কবলে আবার কয়েকজন মানুষের প্রাণ গেল।

সাভোর কুলিরা কিন্তু নিরাপদ শান্তিতে কাল কাটাতে লাগল। তারা ধরে নিলে, শয়তানরা তাদের কথা ভুলে গেছে। নির্ভয়ে সবাই আবার কাজকর্মের যোগ দিলে।

তারপর অকস্মাৎ এক ঘুটঘুটে রাত-আঁধারে আমাদের সমস্ত আশা-ভরসা ফরসা হয়ে গেল! বিষম এক সোরগোলে আমাদের সকলকার ঘুম গেল ছুটে এবং সেই পরিচিত আর্তনাদে যখন রাতের আকাশ কেঁপে উঠল, তখন বুঝতে দেরি লাগল না যে, পশুরাজ আবার আজ নতুন পূজার বলি গ্রহণ করলে!

বেজায় গরম পড়েছে, তাঁবুর ভিতরে দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। আর তো শয়তানের উপদ্রব নেই, অতএব তাঁবুর বাইরে গিয়ে একটু আরাম করে শুতে আর বাধা কী? বিশেষ, তাঁবুর বাইরে যখন শক্ত ও উঁচু বেড়া রয়েছে! এই ভেবে কুলির দল তাঁবুর বাইরে গিয়ে শুয়েছিল।

হঠাৎ একজন কুলি জেগে সভয়ে দেখে, বেড়া ফুঁড়ে ভিতরে ঢুকছে ভীষণ এক সিংহ! তখনই শুরু হল হই-চই, হুড়োহুড়ি, লাফালাফি, ছুটোছুটি—সিংহকে টিপ করে ওরই মধ্যে যারা সাহসী তারা কেউ ছুড়লে লাঠি-সোটা, কেউ ছুড়লে ইট-পাটকেল, কেউ ছুড়লে জ্বলন্ত কাঠ! কিন্তু পশুরাজ সেসব তুচ্ছ ব্যাপার গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না এবং একটুও ইতস্তত না করে এক হতভাগ্যকে ধরে কাঁটাঝোপের ভিতর দিয়ে টানতে টানতে বাহিরে নিয়ে গেল। সেখানে আর একটা সিংহ এসে তার সঙ্গে যোগ দিলে। এবং এমনি তাদের বুকের পাটা

যে, মানুষের দেহ নিয়ে এবারে তারা আর বনের ভিতরে গেল না, কাঁটাঝোপের বেড়ার পাশেই বসে তারা আহার আরম্ভ করলে। কুলিদের জমাদার অন্ধকারে তাদের দিকে কয়েকবার বন্দুক ছুড়লে, কিন্তু তাও তারা আমলে আনলে না! নিশ্চিন্ত ভাবে তাদের ভয়ানক ভোজ সমাপ্ত করে তবে তারা সে স্থান ছেড়ে প্রস্থান করলে!

রাত পোয়ালে পর দেখলুম, কুলির দেহের খুব সামান্য অংশই সিংহরা ফেলে গেছে। অন্যান্য কুলিদের মানা করলুম, আজকেই তারা যেন সেই দেহাবশেষ গোর না দেয়।

রাত্রে সেইখানেই বন্দুক নিয়ে আমি জেগে রইলুম—ভাবলুম, দেহের বাকি অংশটা শেষ করবার লোভে সিংহরা আবার যদি ফিরে আসে!

কিন্তু তারা আর ফিরে এল না—এল খালি একটা হায়না।

সকালেই খবর এল, মাইল-দুয়েক দূরের এক তাঁবু থেকে সিংহরা আর একজন কুলিকে ধরে নিয়ে গেছে এবং এক্ষেত্রেও তাঁবুর পাশেই নির্ভয়ে বসে তাদের খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়েছে!......সিংহরা যে কী করে এমন নিঃশব্দে এই পুরু কাঁটাঝোপের বেড়া ভেদ করে ভিতরে ঢোকে, আমি কিছুতেই সেটা বুঝে উঠতে পারলুম না। আমার তো বিশ্বাস, শব্দ হোক আর নাই-ই হোক, এর ভিতরে দিয়ে ঢোকাই অসম্ভব! ব্যাপারটা আজ পর্যন্ত আমার কাছে রহস্যের মতোই মনে হয়।

এই ঘটনার পর আমি উপরি উপরি আট-দশ রাত্রি নানা স্থানে সেই দুর্দান্ত পশুদের জন্যে অপেক্ষা করলুম। কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হল। হয় আমাকে দেখতে পেয়ে তারা অদৃশ্য হয়, নয় আমার কাছ থেকে অনেক দূরের তাঁবুতে গিয়ে মানুষ বধ করে! একদিনও তাদের বন্দুকের সীমানার মধ্যে পেলুম না—এদিকে রাতের পর রাত জেগে আমার শরীর রীতিমতো কাহিল হয়ে পড়ল। তবু আমি হাল ছাড়লুম না, কারণ এতগুলো নিরীহ মানুষ যখন একমাত্র আমাকেই তাদের রক্ষাকর্তা বলে জানে, তখন তাদের রক্ষা করা ছাড়া আমার আর কোনও কর্তব্য নেই।

বনে-জঙ্গলে বহুকাল কাটিয়েছি, অনেক বিপজ্জনক হিংস্র পশুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। কিন্তু আমার জীবনে এমন ভয়াবহ সময় আর কখনও আসেনি! রাত্রের পর রাত্রে শুনছি ভয়ংকর নরখাদকের মেঘগর্জনের মতো চিৎকার এগিয়ে আসছে—ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝতে পারছি যে, ভোর হবার আগেই আমাদের ভিতর থেকে একজন না একজনকে ইহলোকের সমস্ত আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হবে! সিংহরা যেই তাঁবুর কাছে আসত, অমনি তাদের চিৎকার থেমে যেত। আর তাদের চিৎকার থামলে আমরা বুঝতুম, তারা শিকারের সন্ধান পেয়েছে, কারণ শিকারের সময়ে সিংহরা একেবারে চুপচাপ হয়ে যায়!......তারপরেই সমস্ত স্তব্ধতা চঞ্চল হয়ে উঠত—তাঁবুতে তাঁবুতে মানুষের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা যেত—'খবরদার! ভেইয়া, শয়তান আতা!' কিন্তু সে সাবধানতায় কোনওই ফল হত না, আবার জেগে উঠত সেই পরিচিত আর্তনাদ এবং পরদিন সকালে নাম ডাকবার সময়ে একজন কুলিকে আর পাওয়া যেত না!

রাত্রের পর রাত্রে বারংবার বিফল হয়ে ক্রমেই আমি হতাশ হয়ে পড়লুম। এ সিংহরা

নিশ্চয়ই মায়া সিংহ, নিশ্চয়ই তারা সিংহ-মূর্তিতে সাক্ষাৎ শয়তান! জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে তাদের খুঁজে বার করবার চেষ্টা বৃথা, তাদের কোনও পাত্তাই পাওয়া যাবে না; কিন্তু কুলিদের সান্ত্বনা ও ভরসা দেবার জন্যে একটা কিছু তো করতে হবেই! কাজেই প্রতিদিন আমি দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে কখনও হুমড়ি খেয়ে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে সিংহদের খুঁজতে লাগলুম। এই অন্বেষণের সময়ে যদি কোনওদিন তাদের সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হয়ে যেত, তাহলে তাদের চেয়ে আমারই ছিল বিপদের ভয় বেশি,—আমি তাদের কোনও ক্ষতি করবার আগেই তারা হয়তো আমারই ঘাড় ভেঙে সব আপদ চুকিয়ে দিত। এতদিনে সাভোর নরখাদকের ভীষণ কাহিনি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং অনেক শিকারি ও সৈনিক আমাকে সাহায্য করবার জন্যে সাভোয় এসে হাজির হয়েছিলেন। প্রতি রাতে সবাই বন্দুক নিয়ে পাহারায় বসতেন। কিন্তু ফল হত একই, সিংহরা এমনি চালাক হয়ে উঠেছিল যে, যেদিকে বিপদ সেদিকে কিছুতেই ঘেঁষত না। আমরা যদি পূর্ব দিকে পাহারা দি, তারা তবে মানুষ ধরে পশ্চিম দিকে গিয়ে!

এক রাত্রের কথা স্পষ্ট আমার মনে আছে। রেলস্টেশন থেকে একজন কুলিকে ধরে এনে সিংহরা, আমার তাঁবুর কাছে এসেই আড্ডা গেড়ে বসল। খেতে খেতে তাদের গজরানি ও সেই সঙ্গে মড়মড় করে হাড় ভাঙার শব্দ এখনও আমি যেন কানে শুনতে পাই! এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক হচ্ছে আমাদের অসহায়তা! বাইরে যাওয়া বৃথা, কারণ যাকে তারা ধরেছে সে-বেচারা আর বেঁচে নেই এবং চতুর্দিকের অন্ধকার এমন গাঢ় যে, বন্দুক ছুড়েও লাভ নেই! আমার তাঁবুর কাছেই যেসব কুলি থাকত, সিংহদের আহারের শব্দে তারা এমনি ভয় পেলে যে, চেঁচিয়ে আমার তাঁবুতে আসবার জন্যে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। আমি সম্মতি দিলুম। তারা এক ছুটে আমার তাঁবুতে এসে হাজির! তখন আমার মনে পড়ল, তাদের দলে এক শয্যাশায়ী রোগী ছিল, তার কথা। তাদের জিজ্ঞাসা করে শুনলুম যে, এমনি তারা হৃদয়হীন, সে-হতভাগ্যকে তাঁবুতে একলা ফেলে রেখে এসেছে! আমি তৎক্ষণাৎ তাকে আনবার জন্যে একদল লোক নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু কুলিদের তাঁবুতে গিয়ে দেখলুম, তাকে আর আমার তাঁবুতে আনবার কোনওই দরকার নেই! কারণ সঙ্গীরা তাকে একলা সেইখানে ফেলে পালাল দেখে ভয়েই তার প্রাণ বেরিয়ে গেছে!

ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠল। এতদিন কেবল একটা নরখাদকই তাঁবুর ভিতরে ঢুকে মানুষ ধরে নিয়ে যেত, তার সঙ্গী অপেক্ষা করত বাইরেই। এখন তারা দুজনে মিলেই তাঁবুতে এসে ঢুকছে এবং প্রত্যেকেই এক-একজন মানুষকে না নিয়ে বাইরে যায় না। মানুষ শিকার খুব সহজ দেখে তাদের বুক বলে গেছে! এইভাবে এক রাত্রে তারা দুজন স্থানীয় লোককে ধরে নিয়ে গেল। একজনকে তারা তখনই উদরসাৎ করে ফেললে, কিন্তু আর একজনের কাতর ক্রন্দনে চারিদিক পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ পরে তার ভয়ে আধমরা সঙ্গীরা কোনওরকমে কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে গিয়ে দেখলে, 'বোমা' জঙ্গলের বেড়ার ভিতরে তার রক্তাক্ত দেহ আটকে রয়েছে। সিংহরা সেই জঙ্গল ভেদ করে তার দেহকে টেনে নিয়ে যেতে পারেনি! হতভাগ্যকে উদ্ধার করে আনা হল বটে, কিন্তু সে বাঁচল না।

এরই দু-চার দিন পরে সিংহরা এক রাত্রে সবচেয়ে বড়ো তাঁবুর ভিতরে গিয়ে হানা দিলে। দূর থেকে আমি কুলিদের করুণ আর্তনাদ শুনতে পেলুম কিন্তু কিছুই করতে পারলুম না। ইনস্পেকটার মি. ডলগ্রেন বন্দুক নিয়ে বাইরে এলেন, এবং অন্ধকারে যেখানে বসে সিংহরা সশব্দে নরমাংস ভক্ষণ করছিল, সেই দিকে উপরি উপরি পঞ্চাশবার বন্দুক ছুড়লেন। কিন্তু দুঃসাহসী সিংহরা সে গুলি-বৃষ্টিতেও ভয় পেলে না।

ডলগ্রেন সাহেবের সন্দেহ হল, তিনি একটা সিংহকে আহত করেছেন। পরদিন সকালে তাই তাঁর সঙ্গে আমি আহত সিংহটার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লুম। বালির উপরে সিংহের পদচিহ্ন অনুসরণ করে খানিকদূর অগ্রসর হয়েই একটা জঙ্গলের ভিতর থেকে বারংবার সিংহের ক্রুদ্ধ গর্জন শুনতে পেলুম। খুব সাবধানে জঙ্গল সরিয়ে দেখা গেল, মাটির উপরে একটা কুলির আধ-খাওয়া দেহ পড়ে রয়েছে, কিন্তু সিংহরা সেখান থেকে সরে পড়েছে!

সত্যিকথা বলতে কী, এরকম ভয়াবহ ব্যাপারে অশিক্ষিত কুলিরা তো দূরের কথা, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ব্যক্তিও স্তম্ভিত না হয়ে পারবে না। সাভোর চারিদিকে তখন পালাও পালাও রব উঠল! কুলিরা দল বেঁধে কাজে কামাই করলে এবং আমার কাছে এসে জানালে যে, 'আমরা আর কিছুতেই এদেশে থাকব না। ভারতবর্ষ থেকে আমরা এখানে সিংহের ফলার হবার জন্যে আসিনি, আমরা এসেছি সরকার-বাহাদুরের চাকরি করতে।'

তারপরেই সাভোতে প্রথম যে-রেলগাড়ি এল, দলে দলে কুলি লাইনের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে সে গাড়িখানাকে থামিয়ে ফেললে। এবং তারপরে সকলে মিলে গাড়িতে উঠে কয়েক শত কুলি সেইদিনই এই অভিশপ্ত দেশ ছেড়ে চম্পট দিলে।

লাইনের কাজ একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। বাকি যারা রইল তারা কাজকর্ম করবে কী, সিংহের কবল থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে নানা উপায়ের কথা ভাবতে ভাবতেই তাদের সময় কাটতে লাগল। কেউ ছাদের উপরে, কেউ উঁচু জলের 'ট্যাঙ্কে'র উপরে গিয়ে আশ্রয় নিলে। কেউ বা তাঁবুর মাটির ভিতরে গভীর গর্ত খুঁড়ে, গর্তের মুখে ভারী কাঠ চাপা দিয়ে সেইখানেই রাত্রিবাস করে। সন্ধ্যা হলেই দেখা যায়, বড়ো বড়ো গাছের ডালে ডালে বানরের মতো দলে দলে মানুষ বসে আছে। এক-একটা গাছের ডালে এত লোক বসে থাকত যে, একরাত্রে একটা গাছের ডাল ভেঙে অনেকগুলো লোক সিংহের মুখে গিয়ে পড়ল। ভাগ্যক্রমে সিংহরা তখন অন্য একজন মানুষকে ধরেছিল বলে তাদের দিকে আর ফিরে তাকায়নি; কিংবা গাছ থেকে মানুষ বৃষ্টি দেখে তারা বিস্ময়ে অত্যন্ত চমকে গিয়েছিল!

॥ চার ॥

ওখানকার ডিস্ট্রিক্ট অফিসার ছিলেন মি. হোয়াইটহেড। কুলিদের ধর্মঘটের কিছু আগে আমি তাঁকে সাভোয় এসে সিংহ-শিকারে আমাকে সাহায্য করবার জন্যে চিঠি লিখেছিলুম। উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, 'অমুক তারিখে আমি যাত্রা করব।'

তাঁকে ও তাঁর মোটমাট আনবার জন্যে নির্দিষ্ট তারিখে আমি আমার ভৃত্যকে স্টেশনে পাঠিয়ে দিলুম।

খানিকক্ষণ পরেই আমার ভৃত্য ছুটতে ছুটতে ও ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'ব্যাপার কী?'

সে জানালে যে, স্টেশনে ট্রেনও নেই, রেলের কোনও লোকও নেই, কেবল মস্তবড়ো একটা সিংহ প্ল্যাটফর্মের উপরে নিজের মনে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে!

অসম্ভব কথা! আমি হেসেই উড়িয়ে দিলুম। আজকাল এখানকার লোকেরা ভয়ে এতটা ভেবড়ে গেছে যে, জঙ্গলে একটা বেবুন কি হায়না কি কুকুর দেখলেও সিংহ দেখেছে বলে চিৎকার করে ওঠে!

কিন্তু পরদিনই জানা গেল, আমার চাকরের কথা মিথ্যা নয়। সত্য-সত্যই একটা মানুষখেকো সিংহ এসে স্টেশনে হানা দিয়েছিল এবং স্টেশনমাস্টার তাঁর লোকজন নিয়ে ঘরের ভিতরে খিল দিয়ে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কিন্তু তখনও মি. হোয়াইটহেডের দেখা নেই। আমি ভাবলুম, তাহলে এবারে তাঁর আসা আর হল না।

সন্ধ্যার পর আহারে বসেছি, এমন সময়ে দু-বার বন্দুকের আওয়াজ শুনলুম। কিন্তু তাতে আমি ভ্রূক্ষেপ করলুম না, কারণ আজকাল এখানে যখন-তখন বন্দুকের শব্দ শোনা যায়।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে পর প্রতি রাত্রের মতো আজকেও আমি রাত জাগতে বেরুলুম। একটি গোপন জায়গায় গিয়ে বন্দুক বাগিয়ে বসে রইলুম। একটু পরেই খুব কাছেই শুনলুম, সিংহরা গজরাতে গজরাতে মড়মড় করে হাড় ভেঙে খাচ্ছে! তাঁবুর ভিতরে কোনও গোলমাল নেই, কেউ আর্তনাদও করছে না, তবে এখানে তারা আর কী খাবার জিনিস পেয়েছে? মনে মনে আন্দাজ করলুম, হয়তো তারা কোনও হতভাগ্য পথিককেই আজ বধ করেছে।

হঠাৎ দেখলুম, অন্ধকারের ভিতরে তাদের অগ্নিময় চোখগুলো জ্বলে উঠল! বেশ টিপ করে বন্দুক ছুড়লুম। তার পরেই সব চুপচাপ। নিশ্চয়ই তারা শিকার নিয়ে সেখান থেকে সরে পড়েছে!

সকালবেলায় তাঁবুতে ফেরবার পথে মি. হোয়াইটহেডের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল! তাঁর মুখ বিবর্ণ, চুল উসকো-খুসকো, পোশাক এলোমেলো, যেন তিনি অত্যন্ত পীড়িত।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এ কী ব্যাপার? তুমি এলে কোত্থেকে? কাল তুমি আসোনি কেন?'

তিনি মুখভার করে বললেন, 'ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করে তুমি তাঁর অভ্যর্থনার জন্যে চমৎকার ব্যবস্থা করে রেখেছ।'

—'সে কী? হয়েছে কী?'

—'তোমার সেই হতচ্ছাড়া সিংহ কাল রাতে আর একটু হলেই আমার দফা রফা করে দিয়েছিল!'

—'কী বাজে বকছ, নিশ্চয়ই তুমি কোনও দুঃস্বপন দেখেছ!'

হোয়াইটহেড আমার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার পিঠের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। এটাও কি স্বপ্ন?'

তাঁর জামা গলার কাছ থেকে নীচে পর্যন্ত ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে গেছে এবং আদুড় পিঠের উপরে চার-চারটে ধারালো নখের রক্তাক্ত দাগ দেখা যাচ্ছে। নির্বাক হয়ে তাঁকে নিয়ে আমি তাঁবুতে ফিরে এলুম। তাঁর ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলুম। তারপর তাঁর মুখ থেকে যা শুনলুম, তা হচ্ছে এই :—

'কাল আমি যখন সাভো স্টেশনে এসে হাজির হলুম, তখন রাত হয়ে গেছে। সঙ্গে ছিল আমার চাকরদের সর্দার আবদুল্লা। আমি তোমার তাঁবুতে আসবার পথ ধরলুম—পিছনে পিছনে লণ্ঠন নিয়ে আসতে লাগল আবদুল্লা। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড সিংহ কোত্থেকে এক লাফে আমার ঘাড়ের উপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল, বিষম ধাক্কায় আমি ছিটকে মাটির উপরে দড়াম করে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলুম।

সৌভাগ্যক্রমে বন্দুকটা তখনও আমার হাতেই ছিল, আমি তখনই সিংহকে লক্ষ্য করে বন্দুক ছুড়লুম।

গুলি সিংহের গায়ে লাগল না বটে, কিন্তু বন্দুকের আগুন ও আওয়াজ দেখে-শুনে সিংহটা হতভম্ব হয়ে গেল! সেই সুযোগে আমি একলাফে সরে দাঁড়ালুম।

কিন্তু সিংহ তখন আবদুল্লাকে আক্রমণ করলে। সে বেচারা চিৎকার করে উঠল, 'হুজুর, সিংহ!' তারপরে সে আর কিছু বলবার সময় পেলে না, কারণ সিংহ তাকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি আবার বন্দুক ছুড়লুম, কিন্তু কোনওই ফল হল না!'

এতক্ষণে আমি বুঝতে পারলুম যে, কাল রাত্রে সিংহরা কোন হতভাগ্যের মাংস ভক্ষণ করছিল!

সেইদিনেই ওখানকার পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্ট কার্কুহার সাহেবও একদল সেপাই নিয়ে সিংহ-শিকারে আমাকে সাহায্য করতে এলেন। এবং আরও কয়েকজন সাহেব নানা স্থান থেকে সাভোয় এসে হাজির হলেন। সিংহদের কুখ্যাতি তখন দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সিংহের বিরুদ্ধে মানুষের এই বিপুল যুদ্ধ ঘোষণার কথা সিংহরা টের পেয়েছিল কি না জানি না,—জানলে দুরাত্মাদের পেটের পিলে নিশ্চয়ই চমকে যেত!

এবারে আমরা আট-ঘাট বেঁধে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলুম।

আমি যে একটি সিংহ ধরবার ফাঁদ তৈরি করেছি, পূর্বেই সে কথা বলা হয়েছে। সেই ফাঁদটি একটি যুৎসই জায়গায় এনে রাখলুম। তার ভিতরের একটি কামরায় রইল দুজন সশস্ত্র সেপাই! মানুষ খাবার লোভে সিংহরা ভিতরে ঢুকলেই ফাঁদের অন্য ঘরে বন্দি হবে, অথচ মানুষের ঘরে আসতে পারবে না।

গাছে গাছে বন্দুক নিয়ে অন্যান্য সেপাইরা পাহারায় রইল। সাহেবরাও প্রস্তুত হয়ে ঝোপেঝাপে লুকিয়ে রইলেন।

রাত নটা বাজল। এখন পর্যন্ত চারিদিক একেবারে নিসাড় হয়ে আছে।

আচম্বিতে একটা শব্দ হল। বুঝলুম, আমার ফাঁদের ভারী দরজা ঝপাং করে পড়ে গেল। আনন্দে প্রাণ নেচে উঠল!

'উঃ এতদিনে! এতদিনে অন্তত একটা শয়তানকেও বাগে পাওয়া গেল।'

কিন্তু শেষে দেখা গেল, সবই ফক্কিকার!

সিংহ এসেছিল, ধরা পড়েছিল, কিন্তু তবু তাকে খাঁচার ভেতরে পাওয়া গেল না! বুঝুন, এ কত বড়ো দুর্ভাগ্য!

খাঁচার ভিন্ন কামরায় যে দুজন সেপাই ছিল, তাদের উপরে হুকুম ছিল যে, সিংহ ধরা পড়লেই তারা তাকে বধ করবে।

কিন্তু ভীষণ সিংহ যখন পিঞ্জরে বন্দি হয়ে গর্জন ও লম্ফত্যাগ করতে লাগল, তখন সেপাইরা আতঙ্কে এমনি আড়ষ্ট হয়ে গেল যে, বন্দুক ছোড়ার কথা আর তাদের মনেই রইল না।

কাছেই এক জায়গায় ছিলেন ফার্কুহার সাহেব, ব্যাপার বুঝে সেইখানে থেকেই তিনি চেঁচিয়ে তাদের উৎসাহিত করতে লাগলেন।

তখন তারা মরিয়া হয়ে বিপুল-বিক্রমে বন্দুক ছুড়তে শুরু করলে!

সে কি যে সে বন্দুক ছোড়া, অন্ধ বা পাগলরাও তেমন ভাবে বন্দুক ছোড়ে না! আকাশে, বাতাসে, আমাদের আশে পাশে, মাথার উপরে গুলির ঝড় বইতে লাগল—প্রাণ যায় আর কী! বন্দুকের গুলির চোটে ফাঁদের দরজার খিল গেল উড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সিংগি দিলে দে-চম্পট! একেবারে পাশ থেকে এমন রাশি রাশি গুলি ছুড়লে যে কোনও দুর্দান্ত একবার নয়, দশ-বারো বার মরতে পারত! তবু যে সেপাইরা কেন তাকে বধ করতে পারলে না, এটা একটা অসম্ভব রহস্যের ব্যাপার! খাঁচার ভিতরে রক্ত দেখে বোঝা গেল, সিংহটা আহত হয়েছে বটে! কিন্তু এ তুচ্ছ সান্ত্বনার ব্যাপার, কারণ তার মৃত্যু ছিল নিশ্চিত!

তবু আমরা একেবারে হাল ছাড়লুম না, সকালবেলায় দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে, বনে বনে সিংহের খোঁজ করতে লাগলুম। মাঝে মাঝে জঙ্গলের ভিতর থেকে পশুরাজের ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল,—কিন্তু ওই পর্যন্ত! তার দেখা পাওয়ার সৌভাগ্য আর হল না, কেবল ফার্কুহার সাহেব একটা সিংহকে একবার বিদ্যুতের মতো এ-জঙ্গল থেকে ও-জঙ্গলে চলে যেতে দেখেছিলেন।

এইভাবে দু-দিন কাটল। সিংহ কিন্তু দেখা দিতে রাজি হল না। ফার্কুহার সাহেব তখন হতাশ হয়ে তাঁর সেপাইদের নিয়ে চলে গেলেন। মি. হোয়াইটহেড ও অন্যান্য সাহেবরাও একে একে বিদায় গ্রহণ করলেন।

আবার আমি একলা! বুঝলুম, এখন থেকে আমাকে আবার একা-একাই নরখাদক সিংহদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে!

॥ পাঁচ ॥

দিন-দুই পরের কথা। সকালবেলায় বাইরে বেরিয়েই দেখি, একজন 'সোয়াহিলি' (স্থানীয় অসভ্য বাসিন্দা) মহাভয়ে ছুটতে ছুটতে চ্যাচাচ্ছে 'সিম্বা! সিম্বা!' ('সিংহ! সিংহ!') এবং বারংবার পিছনপানে তাকিয়ে দেখছে!

তাকে প্রশ্ন করে জানলুম যে, নদীর ধারের তাঁবুর ভিতর থেকে সিংহরা একজন মানুষ ধরতে গিয়ে ধরতে পারেনি; তখন তারা একটা গাধাকে বধ করে সেইখানেই বসে বসে ভোজন করছে!

হুঁ, এই হল আমার সুযোগ! এ সুযোগ কি আর ছাড়ি?

একছুটে তাঁবুতে ফিরে, ফার্কুহার সাহেব যে বৃহৎ বন্দুকটা রেখে গিয়েছিলেন সেটা তুলে নিয়েই বেরিয়ে পড়লুম। সোয়াহিলি আগে আগে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। খুব সন্তর্পণে এগুতে লাগলুম—এবারে এসপার কি ওসপার!

খানিক পরেই ঘন ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল একটা সিংহকে।

দুর্ভাগ্যক্রমে সোয়াহিলির পা পড়ল একটা খড়মড়ে শুকনো ডালের উপরে গিয়ে। সুচতুর পশুরাজ তখনই সে-শব্দটা শুনতে পেলে এবং একবার গজরে উঠেই আরও ঘন জঙ্গলের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পাছে বাগে পেয়েও আবার তাকে হারাই, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি আমি তাঁবুতে ফিরে এলুম। সেখানে যত কুলি ছিল সবাইকে ডেকে এনে এক জায়গায় জড়ো করলুম এবং বললুম, 'যত ঢাক-ঢোল আর টিনের কানাস্তারা আছে, সব নিয়ে তোমরা আমার সঙ্গে এসো।'

যে-জঙ্গলে সিংহটা অদৃশ্য হয়েছিল, দল বেঁধে আবার সেখানে গিয়ে দাঁড়ালুম। কুলিদের জমাদারকে বললুম, 'জঙ্গলের ওপাশে যাচ্ছি আমি। তোমার লোকজনকে এই জঙ্গলের এপাশ থেকে তিন দিক ঘিরে অর্ধচন্দ্রাকারে দাঁড় করাও। আমি ওপাশে গিয়ে পৌঁছোলেই তোমরা সবাই মিলে ঢাক-ঢোল আর কানাস্তারা বাজিয়ে বিষম গোলমাল শুরু করে দেবে!'

গুড়ি মেরে আমি জঙ্গলের ওপাশে গিয়ে হাজির হলুম। জঙ্গলের ভিতর থেকে একটা পথ বেরিয়ে এসেছে, তারই সামনে একটা ঢিপির পিছনে গিয়ে আমি গা-ঢাকা দিলুম।

একটু পরেই একসঙ্গে অসংখ্য ঢাক-ঢোল আর কানাস্তারার আকাশ-ফাটানো ও বন-কাঁপানো বাজনা আরম্ভ হল, সেই সঙ্গে আবার ভৈরব চিৎকার করতে করতে সমস্ত কুলি যখন পায়ে পায়ে এগুতে সুরু করলে, তখন সেই হই-হই রবে আমারই কান যেন কালা হয়ে যাবার জোগাড় হল! কোনও ভদ্র সিংহই এ গোলমাল সইতে পারবে না বুঝে আমি প্রস্তুত হয়ে রইলুম।

যা ভেবেছি তাই! মহা আনন্দে দেখলুম, একটা মস্তবড়ো, বলবান ও কেশরহীন সিংহ দ্রুতপদে জঙ্গল ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। আজ কয়েক মাস ধরে এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম

ও এত নরহত্যার পরে অন্তত একটা শয়তান এই প্রথম আমার কবলে এসে পড়ল! আর ওর রক্ষা নাই!

ধীরে ধীরে সিংহটা এগুচ্ছে এবং বারবার অবাক হয়ে চারিদিক তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছে, তার রাজত্বে হঠাৎ এ অশান্তির কারণ কী? এই গোলমালেই সে অন্যমনস্ক হয়ে আছে, নইলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই সে আমাকে দেখে ফেলত, কারণ ঢিপির আড়ালে আমার সব দেহটা ঢাকা পড়েনি। সে যখন আমার কাছ থেকে মাত্র পনেরো গজ তফাতে, আমি তখন বন্দুক তুলে লক্ষ্য স্থির করে ফেললুম—

এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ পড়ে গেল আমার উপরে—

আচম্বিতে আমাকে যেন মাটি ফুঁড়ে জেগে উঠতে দেখে অত্যন্ত হতভম্ব হয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং গরর-গরর করতে লাগল।

আর কোথায় পালাবে যাদু? এই না ভেবে তার মাথা টিপ করে দিলুম আমার বন্দুকের ঘোড়া টিপে!

কী সর্বনাশ! টোটার বারুদ যে জ্বলে গেল—গুলি যে ছুটল না—পরের বন্দুক নিয়ে এ কী বিপদ!

এই অভাবিত দুর্ঘটায় আমি এমন স্তম্ভিত হয়ে পড়লুম যে, বন্দুকের দ্বিতীয় নলচের ঘোড়া টেপার কথা ভুলেই গেলুম! বন্দুকটা কাঁধ থেকে নামালুম, যদি সময় পাই, আবার তাতে টোটা ভরে ফেলব।

সৌভাগ্যক্রমে ঢাক-ঢোল কানাস্তারার আওয়াজে ও কুলিদের চিৎকারে সিংহটা এমনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, আমার দিকে সে আর নজর দেবার সময় পেলে না। নইলে এ-যাত্রায় আমার প্রাণ নিশ্চয়ই বাঁচত না! সে আমাকে আক্রমণ না করে একলাফে আবার জঙ্গলের ভিতর গিয়ে পড়ল! এবং এতক্ষণে আমার আবার হুঁস হল, আমি আবার বন্দুক তুলে দ্বিতীয় নলচের গুলি ছুড়লুম! সঙ্গে সঙ্গে সিংহের গজরানি শুনেই বুঝলুম, আমি লক্ষ্যভেদ করেছি!

কিন্তু আসলে কোনও সুফলই ফলল না। আহত সিংহ আবার পালাল, তার পিছনে ছুটেও আর তাকে ধরতে পারলুম না।

বিষম খাপ্পা হয়ে আমি বন্দুককে, যার বন্দুক এবং যে এই বন্দুক তৈরি করেছে তাদের যা-মুখে আসে তাই বলে গালাগালি দিতে লাগলুম। এরপর আর কোনও দিন আমি এই বন্দুকটা ব্যবহার করিনি।

তখনকার মতো আবার তাঁবুর দিকে ফেরা ছাড়া আর উপায় রইল না। বার বার দুর্ভাগ্যে ও অসাফল্যে মন আমার ভেঙে পড়ল। এবং কুলিদেরও কুসংস্কার আরও দৃঢ় হয়ে উঠল—এখানকার সিংহরা মায়াসিংহ না হয়ে যায় না! সত্যি; অনেকটা সেই রকমই বটে, এ সিংহদের উপরে কে যেন মন্ত্র পড়ে দিয়েছে, বন্দুকের গুলি এদের কিছুই করতে পারে না!

॥ ছয় ॥

সিংহরা যে-গাধাটাকে বধ করেছে, তাকে খেয়ে ফেলবার আগেই আমরা যে গিয়ে পড়েছিলুম, এটা আমি ভুলিনি। এবং তারা যে গাধার মাংস খাবার লোভে আবার ফিরে এলেও আসতে পারে, এটাও আমার অজানা ছিল না।

গাধার দেহটা যেখানে পড়ে আছে, তার কাছে কোনও গাছটাছ ছিল না। তাই সেখানে আমি চারটে বড়ো বড়ো ডান্ডা পুঁতে তার উপরে তক্তা পেতে একটা বারো ফিট উঁচু মাচা বানিয়ে ফেললুম। এবং একটা খোঁটা পুঁতে তার সঙ্গে একগাছা মোটা দড়ি জড়িয়ে গাধার দেহটা এমন ভাবে বেঁধে রাখলুম যে সিংহরা সহজে সে দেহটা টেনে নিয়ে যেতে পারবে না।

সূর্য যেই আস্তে গেল, আমিও অমনি মাচার টঙে চড়ে বসলুম এই আশায় যে, যদি সিংহরা আবার ভুল করে আমার ফাঁদে পা দেয়!

অন্ধকার নেমে এল, সঙ্গে সঙ্গে অসীম স্তব্ধতা! আফ্রিকার অরণ্যে অন্ধকার নিশীথের স্তব্ধতা যে কী রকম, লিখে তা বুঝানো যায় না, প্রাণ দিয়ে তাকে অনুভব করতে হয়। বিশেষ, আমার মতন অবস্থায়,—একাকী ও সঙ্গীরা আছে কত দূরে!

নির্জনতা, নীরবতা ও যে-জন্যে আমি এখানে বসে আছি তার ভাবনা, এই সমস্তরই প্রভাব আমার চিত্তকে কেমন যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন করে তুললে! উপরে আকাশ, অন্ধকার সেখানে খুব জমাট নয়, চারপাশে বন-জঙ্গল, অন্ধকারের উপরে সেখানে যেন অন্ধকারের আর একটা প্রলেপ পড়েছে এবং সামনে খোলা জমি, অন্ধকার সেখানে যেন একলাটি শুয়ে আছে। কোথাও একটা পাখি ডাকছে না, বাতাসের দোলায় পাতা শিউরে উঠছে না!

ঢুলতে ঢুলতে চমকে উঠলুম! যেন শুকনো পাতা মড় মড় করে উঠল না? কান পেতে রইলুম—বনের ভিতরে কোনও দানবের পায়ের শব্দ শোনবার জন্যে! ও শব্দটা কীসের? নরখাদক সিংহের? নিশ্চয়ই আজ আমার ভাগ্য ফিরবে?

আবার সেই গম্ভীর স্তব্ধতা! প্রাণপণে অন্ধকারের ভিতরে দৃষ্টিকে চালিয়ে বন্দুক ধরে আমি বসে রইলুম একটা পাথরের মূর্তির মতো!

একটু পরেই সকল সন্দেহ ঘুচে গেল! হ্যাঁ, পশুরাজেরই আবির্ভাব হয়েছে! ওই গভীর দীর্ঘশ্বাস, ওটা হচ্ছে ক্ষুধার চিহ্ন! ওই তো! জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সাবধানে সে এগিয়ে আসছে, তারই শব্দ হচ্ছে!

এক মুহূর্তের জন্যে সমস্ত স্থির, তার পরেই ক্রুদ্ধ গর্জন! পশুরাজের চোখে ধুলো দেওয়া অসম্ভব, সে টের পেয়েছে যে আমি এখানে সশরীরে উপস্থিত!......তাই তো, সে কি আবার আমাকে ফাঁকি দেবে?

না! চাকা ঘুরে গেল, ব্যাপারটা হঠাৎ অন্য রকম হয়ে দাঁড়াল! আমি এসেছি সিংহ শিকার করতে, কিন্তু সিংহই এখন আমাকে শিকার করতে চায়! সে কি বুঝতে পেরেছে যে, আমিই হচ্ছি প্রধান শত্রু?

সিংহটা গাধার দিকও মাড়াল না, সে চোরের মতো আমার মাচার চারিপাশে ওত পেতে ঘুরে বেড়াতে লাগল! প্রায় ঘণ্টা দুই ধরে এই ব্যাপার চলল—ধীরে ধীরে সে মাচার কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। অন্ধকারে তাকে আমি দেখতে পাচ্ছিলুম না বটে, কিন্তু তার পায়ের শব্দে সমস্তই আন্দাজ করতে পারছিলুম! আমার এই নড়বোড়ে মাচা, এমন কাণ্ড হতে পারে সেটা না ভেবেই এটা তৈরি করা হয়েছে, বলিষ্ঠ সিংহের প্রথমই আক্রমণেই মাচাসুদ্ধ আমাকে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে হবে—এবং তারপর?

আর এই তো মোটে বারো ফিট উঁচু মাচা, সিংহ যদি একলাফে এর উপরে উঠে পড়ে, তা হলেই বা আমার দশা কী হবে?

...আমার বুক দুর্ভাবনায় ধড়ফড় করতে লাগল, বোকার মতো নিজের মৃত্যুকে নিজেই ডেকে এনেছি ভেবে মনে মনে অনুতাপ করতে লাগলুম।

যতই ভয় পাই, আমি কিন্তু একেবারে স্থির হয়ে বসে রইলুম! দৃষ্টি আমার নিষ্পলক!

আচম্বিতে আমার মাথার পিছনে ঝপাং করে কে আঘাত করলে!

পরমুহূর্তে ভীষণ আতঙ্কে অবশ হয়ে মাচার উপর থেকে আমি পড়ে যাচ্ছিলুম—সিংহটা নিশ্চয়ই পিছন দিক থেকে লাফ মেরে আমার মাচার উপরে উঠে এসেছে!

কোনও রকমে সামলে গেলুম! না, সিংহ নয়,—একটা প্যাঁচা! আমার স্থির দেহকে গাছের ডাল বা অমনি কিছু বলে ভুল করেছে! অতি সাধারণ ব্যাপার! উল্লেখযোগ্যই নয়! কিন্তু সময় বিশেষে সাধারণ ব্যাপারও কতখানি ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে!

প্যাঁচার ডানার ঝাপটায় যেই আমি চমকে উঠলুম, নীচে থেকে দুরন্ত সিংহটাও অমনি রেগে গোঁ গোঁ করে উঠল!

আবার আমি স্থির হয়ে বসলুম—যদিও মনের ভিতর দিয়ে আমার উত্তেজনার স্রোত বয়ে চলেছে! সিংহটা আবার চোরের মতো আমার দিকে এগিয়ে আসছে! তার পায়ের শব্দ শুনলুম এবং অন্ধকারের ভিতরেও নিবিড়তর অন্ধকারের মতো তার দেহটা আমার সামনে জেগে উঠল!

আর তাকে এগুতে দেওয়া উচিত নয়। যেটুকু দেখেছি সেইটুকুই যথেষ্ট।

আমি বন্দুকের ঘোড়া টিপলুম।

বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সিংহের সে কী ভয়ঙ্কর চিৎকার! একটা অন্ধকারের চেয়েও কালো ছায়া বিপুল এক লম্ফে দূরের ঝোঁপের উপরে ঠিকরে গিয়ে পড়ল—তারপর চারিদিকে লাফালাফি করতে লাগল—আমি আর কিছু আন্দাজ করতে পারলুম না—কেবল গুলির পর গুলি বৃষ্টি করতে লাগলুম!......তারপর ঘন ঘন আর্তনাদ, তারপর বার বার গভীর শ্বাস, তারপর আবার সব চুপচাপ! আমি বেশ বুঝলুম অন্তত একটা নরহন্তা শয়তানের লীলাখেলা জন্মের মতো ফুরিয়ে গেল!

কিন্তু একসঙ্গে এই বন্দুকের ও সিংহের গর্জন স্তব্ধ রাত্রে আমাদের তাঁবুর ভিতরে গিয়ে পৌঁছতে দেরি লাগল না! সারা অরণ্য শত শত মানুষের কণ্ঠস্বরে জাগ্রত হয়ে উঠল! দূর থেকে প্রশ্ন আসতে লাগল—ব্যাপার কী, আমার কি কোনও বিপদ হয়েছে?

চিৎকার করে আমি জানালুম,—না, আমার কোনও বিপদ হয়নি, কিন্তু একটা মানুষখেকো দানব মারা পড়েছে!

সঙ্গে সঙ্গে শত শত মানুষ এমন সমস্বরে গগনভেদী জয়ধ্বনি করে উঠল যে, সেই বিরাট অরণ্যের সমস্ত পশু বোধহয় অত্যন্ত বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে পড়ল!

জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে দেখা গেল, শত শত আলো ছুটোছুটি করতে করতে এগিয়ে আসছে, অনেকে ঢোল বাজাচ্ছে এবং অনেকে বাজাচ্ছে শিঙা—তাঁবু খালি করে এক বিরাট জনতা আমার কাছে এসে পড়ল!

আমি সবিস্ময়ে দেখলুম, দলে দলে লোক এসে আমার সামনে নীচু হয়ে মাথা নামিয়ে অভিভূত স্বরে বলছে, 'হুজুর, আপনি গরিবের মা-বাপ!'—'আপনি ঈশ্বর-প্রেরিত!'—'আপনিই আমাদের রক্ষাকর্তা!'

তারা তখনই মরা সিংহটাকে ঝোঁপের ভিতর থেকে টেনে বার করতে চায়!

কিন্তু আমি বাধা দিলুম! কী জানি, হয়তো সিংহটা কেবল আহত হয়েছে, হয়তো এখনও সে মরেনি, কেউ কাছে এগুলে হয়তো এখনও সে লাফ মেরে তার ঘাড় ভাঙতে পারে! আহত সিংহ অত্যন্ত সাংঘাতিক জীব!

অতএব সে-রাত্রের মতো সকলকে নিয়ে আমি খুশি মনে আবার তাঁবুতে ফিরে এলুম। ছাউনির ভিতরে সারারাত ধরে মহা উৎসব, জয়ধ্বনি ও নাচ-গান চলল।

প্রভাতের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে আমি বসে রইলুম। এবং ভালো করে ফরসা হতে না হতেই আমি সদলবলে আহত বা নিহত সিংহটার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লুম।

মাটির উপরে রক্তের দাগ দেখে সেই দাগ ধরে আমরা একটা ঘন ঝোপের ভিতরে প্রবেশ করলুম। কিন্তু কয়েক পা এগুতে না-এগুতেই আমাদের সামনে ও কী ও!—একটা প্রকাণ্ড সিংহ আমাদের উপরে লাফিয়ে পড়বার জন্যে গুড়ি মেরে আছে!

বুকটা ছাঁৎ করে উঠল! কিন্তু তারপরেই বুঝলুম,—না, সিংহটা জ্যান্ত নয়, ওই অবস্থাতেই তার প্রাণ বেরিয়ে গেছে!

কুলিদের আনন্দ দেখে কে! আমাকে তাদের কাঁধে তুলে নিয়ে, তারা হাসতে হাসতে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে মৃত সিংহটার চারপাশ ঘিরে নাচতে আরম্ভ করলে!

আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাস একটু শান্ত হবার পরেই সিংহের দেহটাকে আমি পরীক্ষা করে দেখলুম। হ্যাঁ, এরকম সিংহ বধ করতে পারা ভাগ্যের কথা বটে! মাথায় সে তিন ফুট নয় ইঞ্চি উঁচু ও লম্বায় হচ্ছে নয় ফুট আট ইঞ্চি! এবং তার দেহটাকে তাঁবুতে বয়ে আনবার জন্যে আট-আট জন বলবান কুলির দরকার হয়েছিল!

এই প্রথম নরখাদকের মৃত্যু-সংবাদ দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়তে দেরি লাগল না। স্বচক্ষে তার গা থেকে ছাড়ানো চামড়াটা দেখাবার জন্যে বহুদূর থেকে অসংখ্য কৌতূহলী লোক আমার তাঁবুর কাছে এসে ভিড় করতে লাগল।

॥ সাত ॥

প্রথম নরখাদকের মৃত্যুর পরই আমরা যে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম, এ-কথা কেউ যেন মনের কোণেও ঠাঁই না দেন।

দ্বিতীয় নরখাদক যে এখনও বেঁচে আছে, এ সত্য আমরা ভুলিনি। ভোলবার উপায়ও ছিল না। কারণ কিছুদিন যেতে না যেতেই সে নিজেই এসে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে তুললে।

রেলপথের ইনস্পেকটার এক রাত্রে নিজের বাংলোর ভিতরে বসে আছেন, হঠাৎ বাইরের বারান্দা থেকে একটা শব্দ এল—কে যেন সেখানে দুম দুম করে পা ফেলে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে! ইনস্পেকটার ভাবলেন, বোধ হয় কোনও কুলি অতিরিক্ত মাতাল হয়ে বারান্দায় এসে গোলমাল করছে! তিনি রেগে-মেগে ধমক দিলেন, 'ভাগো হিঁয়াসে!'

ভাগ্যে তিনি দরজা খুলে বাইরে আসেননি! কারণ বারান্দার উপরে ওঁত পেতে বসেছিল, একটা সিংহ! মানুষ ধরতে না পেরে সিংহটা তখন নাচার হয়ে ইনস্পেকটারের দুটো পোষা ছাগলকে বধ করলে। এবং সেইখানে বসে-বসেই ছাগলদুটোকে পেটে পুরে তবে বিদায় হল।

খবর পেয়ে তখনই আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হলুম।

সমস্ত দেখে-শুনে স্থির করলুম, সিংহের শুভাগমনের জন্যে আজকের রাতটা আমি এইখানেই কাটিয়ে দেব।

কাছেই একটা খালি লোহার ঘর ছিল এবং তার দেওয়ালে ছিল একটা গর্ত—যেখান দিয়ে বন্দুক ছোড়বার খুব সুবিধা! সন্ধ্যার আগেই ঘরের বাইরে বেঁধে রাখা হল তিনটে ছাগল এবং ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিলুম আমি! ছাগলগুলো বাঁধা রইল একটা আড়াই মন ভারী রেলের সঙ্গে।

প্রায় সারা রাত কেটে গেল অত্যন্ত নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়ে। ভোর যখন হয়-হয়, তখন হঠাৎ শুনতে পেলুম, ছাগল তিনটের সঙ্গে সেই ভারী রেলটা কে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে! এ সিংহ না হয়ে যায় না! গর্তের ভিতরে বন্দুকের নল চালিয়ে তখনই তার উদ্দেশে ঘন ঘন গুলিবৃষ্টি করলুম—কিন্তু অন্ধকারে আমার সমস্ত গুলিই ব্যর্থ হল।

সকাল হলে পর দলবল নিয়ে আমি সিংহের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লুম। মাটির উপরে ছাগল ও রেল টেনে নিয়ে যাবার স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে, সুতরাং সিংহটা কোন দিকে গেছে তা বুঝতে আমাদের কোনওই কষ্ট হল না।

প্রায় একপোয়া পথ পার হয়েই শোনা গেল, একটা ঝোপের আড়াল থেকে সিংহের গর্জন!

আমরা সেই ঝোপটার দিকে এগুতে লাগলুম। সিংহটা তখন খাপ্পা হয়ে আমাদের দিকে ছুটে এল—কিন্তু জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরুল না। তাকে ছুটে আসতে দেখেই আমার সঙ্গের লোকজন যে যেদিকে পারলে চম্পট দিলে, কেবল মি. উইঙ্কলার ছাড়া।

খানিক পরে সিংহের আর কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে ঝোপের ভিতরে আমরা ইট-

পাটকেল ছুড়তে লাগলুম। তবু সব চুপচাপ। তারপর উঁকিঝুকি মেরেই বেশ বোঝা গেল, সিংহ আর সে-অঞ্চলে নেই, আমাদের ভয় দেখিয়েই সে সরে পড়েছে। তিনটে ছাগলের ভিতরে মাত্র একটাকে সে সাবাড় করতে পেরেছে।

অসমাপ্ত ফলারের লোভে সিংহটা হয়তো আবার ফিরে আসবে।—এই ভেবে আমি সেইখানেই খুব উঁচু একটা মাচান খাড়া করালুম এবং রাতের অন্ধকার নামবার আগেই তার উপরে চড়ে বসলুম। কিন্তু আবার আজকের রাতটা একেবারে অনিদ্রায় কাটাবার শক্তি আমার ছিল না। তাই আমার বন্দুক-বাহক মহিনাকেও সঙ্গে রাখলুম—পালা করে রাত জাগবার জন্যে।

মাচানের উপরে শুয়ে আমি ঢুলছিলুম। হঠাৎ মহিনা আমার হাত টেনে ধরে চুপিচুপি বললে, 'সিংহ!'

এক লহমায় আমার তন্দ্রা গেল ছুটে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বন্দুকটা চেপে ধরে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটা ঝোপ সশব্দে দুলে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা সিংহ খুব সন্তর্পণে ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে মরা ছাগলদুটোর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

সিংহটা যখন প্রায় আমার মাচানের নীচে এসে পড়ল, তখনই আমি একসঙ্গে বন্দুকের দুটো নলের গুলিই ত্যাগ করলুম। সানন্দে আমি দেখলুম, দু-দুটো গুলির চোটে সিংহটা তখনই মাটির উপরে আছড়ে পড়ল। একেবারে তাকে সাবাড় করবার জন্যে তাড়াতাড়ি আমি আর একটা বন্দুক নেবার জন্যে ফিরলুম—কিন্তু সেই ফাঁকে সিংহটা চটপট উঠে পড়ে সাঁৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল—তার দিকে বারংবার গুলি ছুড়েও কোনও ফল হল না।

কিন্তু সিংহটা যখন রীতিমতো জখম হয়েছে, তখন কাল সকালে তাকে যে আবার খুঁজে বার করতে পারব, এ বিশ্বাস আমার ছিল,—তাই হতাশ হয়ে পড়লুম না।

সকালের আলো যেই পদ্মের মতো পবিত্র শুভ্রতা নিয়ে পূর্বাকাশে ফুটে উঠল, অমনি আমাদেরও খোঁজা শুরু হল। আধ-ক্রোশ পর্যন্ত মাটির উপরে রক্তের দাগ পাওয়া গেল। কিন্তু তারপরেই এল শুকনো পাহাড়ে-জমি, রক্তের দাগ সেখানে এরই মধ্যে শুকিয়ে মিলিয়ে গিয়েছে।

মিছেই হল আমাদের সমস্ত খোঁজাখুঁজি, পলাতক সিংহের আর কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না।

এর পর একে একে দশ দিন কাটল, পশুরাজের কোনওই সন্ধান নেই। আমরা মনে মনে এই ভেবে আশ্বস্ত হলুম যে, আহত সিংহটা হয়তো বনের ভিতরেই অক্কা লাভ করেছে! তবু বলা তো যায় না, কুলিদের বলে দিলুম রাত্রিবেলায় খুব সাবধানে থাকতে।

কথায় বলে, সাবধানের মার নেই! ভাগ্যিস কুলিরা আমার উপদেশ শুনেছিল!

কারণ এক রাত্রে তাঁবুর ভিতর থেকে হঠাৎ শুনলুম, বাইরের গাছের উপর থেকে একদল কুলি মহা আতঙ্কে চিৎকার করছে!

চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ব্যাপার কী?'

উত্তরে শুনলুম, একটা সিংহ তাদের ধরবার জন্যে গাছের উপরে চড়বার চেষ্টা করছে!

চাঁদ তখন মেঘে ঢাকা পড়েছে—চারিদিকে পিচের মতো কালো অন্ধকার। এ সময়ে তাঁবুর বাইরে যাওয়া আর আত্মহত্যা করা, একই কথা! কাজেই সিংহটাকে ভয় দেখাবার জন্যে তাঁবুর ভিতর থেকেই বারকয়েক বন্দুক ছুড়লুম। ফলে, সে আহত না হলেও আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। সে আর গাছে চড়বার চেষ্টা না করে পালিয়ে গেল!

পরদিন প্রভাতে শুনলুম, কেবল গাছ নয়, সিংহটা প্রত্যেক তাঁবুর ভিতরেই মাথা গলাবার চেষ্টা করেছিল! বিষম তার আস্পর্ধা!

আবার যদি পশুরাজ ক্ষুধার চোটে এদিকে আসে, এই আশায় আমি সেই কুলিদের গাছে উঠে আজকের রাতটা কাটাব বলে ঠিক করলুম।

সন্ধ্যার সময়ে গাছে উঠছি, হঠাৎ একটা ডাল থেকে একটা বিষধর সর্প ফোঁশ করে উঠল—আমিও তড়াক করে মাটিতে এসে অবতীর্ণ হলুম।

একজন কুলি একটা লম্বা ডান্ডার চোটে সাপটার কামড়াবার সাধ তখনই মিটিয়ে দিলে।

সে রাত্রি ছিল খুবই সুন্দর—আকাশে মেঘ নেই, চাঁদের আলোয় চারিদিক ধবধব করছে—সমস্ত বনটাকে দেখাচ্ছে একখানি চমৎকার ছবির মতো।

রাত দুটো পর্যন্ত আমি জেগে রইলুম। তারপর মহিনার হাতে বন্দুক দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করলুম।

গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দিব্য আরামে ঘুমোচ্ছি, আচম্বিতে কেন জানি না, আমার ঘুম গেল ভেঙে!

মহিনাকে শুধোলুম, সে সন্দেহজনক কিছু দেখেছে কি না!

মহিনা বললে, না।

চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে আমিও কিছু আবিষ্কার করতে পারলুম না।

আশ্বস্ত হয়ে আবার নিদ্রাদেবীকে ডাকবার উপক্রম করছি, হঠাৎ মনে হল, দূরের ওই নীচু ঝোঁপের কাছে কী যেন একটা নড়ে উঠল!

ভালো করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকেই বুঝলুম, না—আমার ভুল হয়নি! সিংহই বটে। সে-ও আমাদের লক্ষ করছে!

হতভাগার সাধ, আমাদের ধরে পেটের ভিতরে পোরে। সেই আশায় সে চোরের মতো এ-ঝোপ থেকে টপ করে ও-ঝোপে গিয়ে ধীরে ধীরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে! পরিষ্কার চাঁদনি রাত। তার সমস্ত লুকোচুরিই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটুকু তার মাথায় ঢুকল না! তার ভাবভঙ্গি দেখেই স্পষ্ট বোঝা গেল যে, মানুষ-শিকারের ভীষণ খেলায় সে খুবই ওস্তাদ।

আমি আর ইতস্তত করলুম না, কী-জানি দেরি করলে সে যদি আবার আমাদের ফাঁকি দেয়! যখন সে আমাদের কাছ থেকে মাত্র বিশ গজ দূরে আছে, তার বুক টিপ করে তখনই

আমি বন্দুকের ঘোড়া টিপলুম। গুলি যে তার বুকে গিয়ে লাগল, এও আমি বুঝতে পারলুম, কিন্তু গুলি খেয়েই সে লাফাতে লাফাতে পালাতে লাগল। উপরি উপরি আরও তিনবার বন্দুক ছুড়লুম, এবং আবার তার আর্ত গর্জন শুনে বুঝতে পারলুম যে, আমার শেষ গুলি ঠিক তার গায়ে লেগেছে! কিন্তু তবু সে মাটিতে কুপোকাত হল না,—জঙ্গলের ভিতরে কোথায় মিলিয়ে গেল!

অধীর ভাবে অপেক্ষা করতে লাগলুম—কখন ভোর হয়, কখন ভোর হয়!

রাত কাটল। আমিও গাছ থেকে নামলুম। মহিনা এবং আর একজন লোককে নিয়ে আমি চললুম আহত সিংহের খোঁজে।

মাটির উপরে রক্তের রেখা! পথ ভোলবার সম্ভাবনা নেই।

বেশিদূর এগুতে হল না। জঙ্গলের ভিতরে খুব কাছেই ওই তো সিংহের গর্জন! ঝোপঝাপের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলুম, সিংহটা আমাদের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করে গরর গরর করছে—তার ভয়ানক দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে!

সাবধানে লক্ষ্য স্থির করে গুলি ছুড়লুম—পরমুহূর্তে কান-ফাটানো ও প্রাণ-কাঁপানো চিৎকার করে আমাদের উপরে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল!

আবার আমি বন্দুক ছুড়লুম—গুলির চোটে মাটিতে ঠিকরে পড়েই আবার সে দাঁড়িয়ে উঠল এবং প্রচণ্ড বেগে হাঁ করে আমাদের দিকে ধেয়ে এল—মূর্তিমান মৃত্যুর মতো!

ফের গুলি ছুড়লুম—কিন্তু তবু সে দুর্দান্ত সিংহের গতিরোধ হল না। এ সিংহ কি অমর?

আমার পাশেই ছিল মহিনা, তার হাত থেকে অন্য বন্দুকটা নেবার জন্যে পাশের দিকে হাত বাড়ালুম—কিন্তু বন্দুক পেলুম না। চমকে চেয়ে দেখি, মহিনা আমার পাশে নেই! কী সর্বনাশ!

সিংহের সেই ভয়াবহ মূর্তি দেখে মহিনা ও তার সঙ্গী পিঠটান দিয়েছে এবং এতক্ষণে তারা আমার বন্দুক ও তাদের পৈত্রিক প্রাণ নিয়ে খুব ঢ্যাঙা একটা গাছের টঙে গিয়ে উঠেছে!

আমার সামনে রুদ্রমূর্তি সিংহ এবং আমার হাতে একটা শূন্য বন্দুক! অবস্থাটা খুব আরামের নয়।

সে-অবস্থায় কী আর করি,—আমিও মহিনার পথ অনুসরণ করে দৌড়ে গিয়ে একটা গাছের উপরে চড়বার চেষ্টা করতে লাগলুম।

কিন্তু আমার সে-চেষ্টা ব্যর্থ হত নিশ্চয়ই,—যদি-না আমার একটা গুলি লেগে তার পিছনের একখানা পা ভেঙে না যেত। কিন্তু সেই অবস্থাতেই, খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে আর একটু হলেই আমাকে ধরে ফেলেছিল!

বদমাইশ মানুষখেকো সিংহটা যখন দেখলে আমিও তার নাগালের বাইরে এসে পড়েছি, তখন সে আবার খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঝোপের দিকে ফিরে চলল।

কিন্তু ততক্ষণে মহিনা হাত বাড়িয়ে আমাকে আমার বন্দুকটা ফিরিয়ে দিয়েছে এবং আমিও কালবিলম্ব করলুম না, আর এক গুলিতে দুরাত্মাকে একেবারে মাটির উপরে পেড়ে ফেললুম।

সিংহটা আর নড়েও না, চড়েও না—আপদ একেবারে চুকে গেছে!

বিপুল আনন্দে ও উৎসাহে আমি গাছের আশ্রয় ছেড়ে আবার মাটির উপরে অবতীর্ণ হলুম। কিন্তু কী ভয়ানক ব্যাপার, সিংহটা তো মরেনি, আমাকে দেখেই এক লাফে সে উঠে দাঁড়াল, এবং জ্বলন্ত চক্ষে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল!

কিন্তু এবারে আমার হাতে ছিল ভরতি বন্দুক—একটা গুলি তার বুকে ও আর একটা তার মাথায় ছুড়তেই সিংহটা হল পপাত ধরণীতলে! কিন্তু তখনও সে কাবু হয়ে পড়ল না, বিষম বিক্রমে মাটির উপর থেকে একটা গাছের ডাল তুলে নিয়ে কামড়াতে কামড়াতে সে প্রাণত্যাগ করল—সত্যসত্যই বীরের মতো!

ক্রমাগত বন্দুকের আওয়াজ শুনে ছাউনির কুলিরা ততক্ষণে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয়েছে! তাদের শেষশত্রুর পতন দেখে তারা যেন আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠল!

সিংহের উপরে তাদের এমন আক্রোশ যে, আমি যদি বাধা না দিতুম, তাহলে মৃত পশুরাজের দেহটা তারা নিশ্চয়ই তখনই টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলত!

মাপজোক নিয়ে দেখা গেল, দ্বিতীয় সিংহটা মাথায় তিন ফিট সাড়ে এগারো ইঞ্চি উঁচু এবং লম্বায় নয় ফিট ছয় ইঞ্চি। তার দেহের ভিতর থেকে পাওয়া গেল সাত-সাতটা গুলি!

দ্বিতীয় নরখাদকের মৃত্যু-সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আবার আমার তাঁবুর কাছে দেশ-বিদেশের লোক এসে জমায়েত হল—শয়তানের দেহ এবং শয়তানকে যে বধ করেছে তাকে দেখবার জন্যে সকলের আগ্রহের আর সীমাপরিসীমা নেই!

সবচেয়ে আনন্দিত হলুম আমি,—যখন পলাতক কুলিরা আবার ফিরে এসে কাজে যোগ দিলে। একটি সুন্দর রৌপ্যপাত্রে তাদের কাছ থেকে আমি যে অভিনন্দন-লিপি পেলুম, তা হচ্ছে এই;

'মহাশয়,

আমরা—আপনার কর্মচারীরা,—এই রৌপ্যপাত্রটি স্মৃতিচিহ্ন-রূপে আপনাকে উপহার দান করছি। কারণ আপনার সাহসের জন্যেই আমরা দুটো মানুষখেকো সিংহের কবল থেকে উদ্ধার পেয়েছি। আপনার নিজের প্রাণকে বিপদগ্রস্ত করেও আপনি আমাদের রক্ষা করেছেন। আপনি দীর্ঘজীবন, সুখ ও শান্তি লাভ করুন।

আপনার অনুগত ও কৃতজ্ঞ ভৃত্য
(বাবু) পুরুষোত্তম হুরজি পুরমার
(রেলপথের ওভারসিয়ার)

তারিখ—সাভো, ৩০ জানুয়ারি, ১৮৯৯

এই রৌপ্যপাত্রটি আমি আমার গৌরবজনক ও বহুশ্রমলব্ধ উপহার বলে সযত্নে রক্ষা করছি।

॥ আট ॥

রেল-রাস্তা তখন আঠি নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছেছে।

আমার বন্ধু ডাক্তার ব্রক হঠাৎ একদিন এসে হাজির হয়ে বললেন, 'তোমার সঙ্গে কাল শিকার করতে যাব। আর, আমাকে একটা সিংহ খুঁজে দিতে হবে।'

আমি বললুম, 'তথাস্তু।'

পরদিন সকালে উঠেই আমরা খাবার, পানীয়, বন্দুক ও লোকজন নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

ছাউনিতে রোশন খাঁ নামে আমার এক চাকর ছিল, সে হঠাৎ বায়না ধরে বসল, তার শিকার দেখবার শখ হয়েছে, সে-ও আমাদের সঙ্গে যাবে।

রোশন খাঁ জাতে পাঠান, বয়সে যুবক, দেখতে সুন্দর, কাজে খুব চটপটে, আর তার স্বভাবটিও সৎ।

মনে মনে ভাবলুম, রোশন খাঁ যখন শিকারে গেলে আমাদের লাভও নেই লোকসানও নেই, তখন তার সাধ আর অপূর্ণ রাখি কেন? চলুক সে আমাদের সঙ্গে!

কিন্তু তখন ভাবতে পারিনি যে, রোশন খাঁ আমাদের সঙ্গে না গেলে এ যাত্রা শিকার থেকে আমাকে আর ফিরে আসতে হত না! দুনিয়ায় কিছুই তুচ্ছ নয়!

মাইল কয়েক এগিয়েও শিকার করবার মতো কিছুই পাওয়া গেল না।

তবু আমাদের উৎসাহের অবধি নেই! কারণ এ হচ্ছে এমন ঠাঁই যে, ঝোপঝাপের ভিতর থেকে যে-কোনও মুহূর্তে একটা প্রকাণ্ড সিংহ ঝাঁকড়া চুলে ঝাঁকানি দিয়ে লাফিয়ে পড়তে পারে! সাক্ষাৎ মৃত্যু লুকিয়ে আছে এখানে যেখানে-সেখানেই। একটু অসাবধান হয়েছ কী, যমের বাড়ির ফটক খুলে গেছে তোমার সামনে!

জঙ্গলের ভিতরে দূর থেকেই দেখা গেল, খানিকটা খোলা সবুজ জমি। সেইখানে ষাঁড়ের মতন বড়ো কৃষ্ণসার জাতীয় একদল হরিণ চরে বেড়াচ্ছে।

আমি শিস দিয়ে সেইদিকে ডাক্তার ব্রকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম।

ব্রক তখনই পরম উৎসাহে তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন, আমি সেইখানে বসে বসে দেখতে লাগলুম, ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!

ডাক্তার ব্রকের মূর্তি যখন বনপথের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল, রোশন খাঁ তখন পিছন থেকে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, 'সায়েব দ্যাখো, বুনো-আদমিরা আসছে।'

আমি কিন্তু তা শুনে উত্তেজিত হলুম না, কারণ ভারতবাসীরা আফ্রিকার লোকদের বুনো-আদমি বলেই ডাকে।

পাঁচজন সুদীর্ঘ ও বলিষ্ঠ মাসাই-জাতীয় পুরুষ আমার সামনে এসে দাঁড়াল—তাদের প্রত্যেকেরই হাতে লম্বা এক-একটা বর্শা।

একজন আমাকে শুধোলে, 'হুজুরের কী ইচ্ছা?'

আমি বললুম, 'সিংহ।'

সে বললে, 'আমার সঙ্গে আসুন। আমি আপনাকে অনেক সিংহ দেখাব।'

তখনই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কতদূরে আমাকে যেতে হবে?'

—'খুব কাছেই।'

চারিদিকে চেয়ে ব্রকের খোঁজ করলুম, কিন্তু তাঁর টিকিটি পর্যন্ত দেখা গেল না। কিন্তু পাছে এমন সুযোগ হাতছাড়া হয়, সেই ভয়ে ব্রককে ফেলেই আমি মাসাইদের সঙ্গে অগ্রসর হলুম।

দু-মাইল পথ হাঁটবার পর মনে হল, সিংহ তো 'খুব কাছেই' নেই। আমি অধীর ভাবে মাসাইদের দিকে ফিরে বললুম, 'এই কি তোমাদের খুব কাছে? কোথায় তোমাদের অনেক সিংহ?'

কিন্তু জবাব পেলুম না। আরও খানিকটা এগিয়ে আমি আবার জিজ্ঞাসা করলুম, 'কই, সিংহ কোথায়?'

একজন মাসাই থিয়েটারি ঢঙে সুমুখের দিকে বর্শাটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'দেখুন প্রভু, ওই দেখুন সিংহ!'

তাই তো, একটা সিংহী দূরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে তো বটে!

একটা গাছের তলাতেও সন্দেহজনক কী যেন একটা দেখা যাচ্ছে! ভালো করে দেখে মনে হল, না বিশেষ-কিছু নয়, বোধহয় গাছের গুঁড়িতে ডালপালা দুলছে।

আমি তাড়াতাড়ি ছুটলুম—পাছে সিংহীটা আমার চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়ে! আচম্বিতে আমার পাশের দিক থেকে কে হুঙ্কার দিয়ে উঠল! চমকে ফিরে দাঁড়ালুম। যে-গাছটা দেখে প্রথমেই আমার সন্দেহ জেগেছিল, তার গুঁড়ির পাশ থেকে মুখ বাড়িয়ে আছে কালো-কেশর-ওয়ালা মস্ত এক সিংহ!

আমার আর তার মাঝখানকার ব্যবধান সত্তর গজের বেশি হবে না।

খানিকক্ষণ আমরা দুজনেই দুজনের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলুম। সে একবার প্রকাণ্ড হাঁ করে মুখ খিঁচিয়ে আমাকে রীতিমতো এক ধমক দিলে, তারপর সিংহীটার দিকে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

ওই সিংহীটা হচ্ছে নিশ্চয়ই এর বউ! এ গাছের তলা দেখে দেখতে পেয়েছিল, অসভ্য এক মানুষ তার বউয়ের পিছু পিছু ছুটছে! সে পশুরাজ, মানুষের এত বড়ো আস্পর্ধা সহ্য করবে কেন? কাজেই খাপ্পা হয়ে ধমক দিয়ে বোধ হয় বলে উঠেছিল—খবরদার, বেয়াদপ!

যেখানে আমি দাঁড়িয়েছিলুম, সেখান থেকে বন্দুক ছোড়ার সুবিধা ছিল না। কাছেই একটা ভালো জায়গা বেছে নেবার জন্যে আমিও তার উপরে চোখ রেখে দৌড়োতে শুরু করলুম। কিন্তু আরে, এ আবার কী?

পশুরাজ যে-গাছের পিছন থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এল, তারই পিছন থেকে আবার লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল আরও চার-চারটে সিংহী! পশুরাজের অন্তঃপুরে কত সিংহী আছে? মহা বিস্ময়ে আমি যেন থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম!

চোখের পলক পড়তে না পড়তে তিনটে সিংহী জঙ্গলের ভিতরে মিলিয়ে গেল, কিন্তু

চতুর্থ সিংহীটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—আমাকে নয়—আমার দলের লোকজনদের উত্তেজিত ভাবভঙ্গি অবাক হয়ে দেখতে লাগল।

এমন সুযোগ কি ছাড়া যায়? খুব টিপ করে আমি বন্দুক ছুড়লুম এবং পরমুহূর্তে সিংহীটা লাফ মেরে পাশের ঝোপের ভিতরে গিয়ে পড়ল।

উঁচু হয়ে উঁকি দিয়ে দেখলুম, আমার গুলি ঠিক তার গায়ে লেগেছে, কারণ সে মাটিতে চিত হয়ে পড়ে ছটফট করছে এবং গজরাতে গজরাতে শূন্যে থাবা মারছে!

সে আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না বুঝে আমার পিছনের লোকদের ডেকে বললুম, 'তোমরা এখানে পাহারা দাও!'—বলেই আমি সেই কালো-কেশরওয়ালা সিংহের উদ্দেশ্যে ছুটলুম।

সিংহটা বেশিদূরে যায়নি। সে মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বোঝবার চেষ্টা করছিল, আমার আসল মতলবখানা কী? পরে আমার লোকজনদের মুখে শুনেছিলুম আমার গুলি খেয়ে সিংহীটা যখন আর্তনাদ করে ওঠে, তখন সে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে বোধহয় ভাবছিল যে, এগিয়ে এসে সিংহীকে উদ্ধার করবে কি না! তারপরে বোধ করি 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' এই ভেবে আবার সে দৌড়োতে শুরু করে।

সিংহটা যখন বুঝলে আমি এখন তারই পিছু নিয়েছি, তখন সে দৌড় বন্ধ করে আবার আর-একটা গাছের তলায় গিয়ে ঝোপের ভিতরে সর্বাঙ্গ ঢেকে দাঁড়াল—দেখা যেতে লাগল কেবল তার মাথাটা।

সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুব সতর্ক দৃষ্টিতে সে আমার প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গি নিরীক্ষণ ও মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ গর্জন করতে লাগল—যেন সে বলতে চায়, 'দ্যাখো, ভালো হচ্ছে না কিন্তু! বার বার আমার পেছনে লাগলে মজাটা টের পাইয়ে দেব—হ্যাঁ!'

তার চাউনিটা আমারও মোটেই ভালো লাগছিল না,—কাছে কোনও গাছ-টাছ থাকলে আমি নিশ্চয়ই আগে তার উপরে গিয়ে চড়তুম, তবে বন্দুক ছুড়তুম!

সে আমার কাছ থেকে তখন মোটে পঞ্চাশ গজ তফাতে আছে।

যা থাকে কপালে—এই ভেবে আমি হাঁটু গেড়ে বসে পড়লুম এবং তার মাথা টিপ করে বন্দুক তুললুম। আমি বেশ বুঝলুম যে, যদি প্রথম গুলি ঠিক জায়গায় না লাগে, তাহলে আর আমার বাঁচোয়া নেই,—বিদ্যুতের ঝড়ের মতো সে একেবারে আমার ঘাড়ের উপরে এসে পড়বে!

টিপলুম আমার বন্দুকের ঘোড়া! গ্রুম করে আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গেই সেই মস্ত বড়ো ঝাঁকড়াচুলো কালো মাথাটা গেল অদৃশ্য হয়ে! এবং পরমুহূর্তে ঝোপের ভিতর থেকে ঘন ঘন এমন হুঙ্কার ও গর্জন উঠল যে, আমার বুক সন্ত্রস্ত হয়ে ধড়ফড় করতে লাগল! এবং পাছে সে সামলে উঠে ঝোপ থেকে বেরিয়ে আমাকে আক্রমণ করতে আসে এই ভয়ে ঝোপের ভিতরে আন্দাজে আন্দাজেই আমি আধ-ডজন গুলি বৃষ্টি করলুম। খানিক পরেই সব চুপচাপ।

পশুরাজের লীলাখেলা নিশ্চয়ই সাঙ্গ হয়ে গেছে!

একজন লোককে সেইখানে পাহারায় রেখে আমি আবার ঝোপঝাপ, পাথর ও ঢিপি

প্রভৃতি টপকে সেই সর্বপ্রথম সিংহীর সন্ধানে ছুটলুম। আমার আশার যেন শেষ নেই।

এতক্ষণে আমার পিছনে লোক জড়ো হয়েছে প্রায় ত্রিশজন! আফ্রিকার জঙ্গলে সবই আজব কাণ্ড। তুমি শিকারে বেরুলে পর দেখবে, জনমানবহীন গভীর অরণ্যের যেখান-সেখান থেকে যেন মাটি ফুঁড়ে মানুষ আবির্ভূত হচ্ছে! এরা আছে মৃত শিকারের পশুর মাংসের লোভে।

আমি ইশারায় তাদের বললুম, যে জঙ্গলের ভিতরে সর্বপ্রথম সিংহীটা আশ্রয় নিয়েছিল, সার বেঁধে সেইদিকে অগ্রসর হতে।

তারা সার বেঁধে বর্শা উঁচিয়ে বিকট চিৎকার করতে করতে যেই জঙ্গলের কাছে গিয়ে হাজির হল, সিংহীটাও অমনি ভয় পেয়ে খোলা জমির উপরে বেরিয়ে এল।

আমি বন্দুক ছুড়লুম। গুলি সিংহীর গায়ে লাগল কি না জানি না, সে কিন্তু আবার ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কী আর করি, ব্রক ফিরে না আসা পর্যন্ত ওকে রেহাই দেওয়া যাক,—এই ভেবে আমি যে-সিংহটাকে গুলি করেছিলুম, আবার তারই খোঁজ করতে লাগলুম।

কিন্তু যে-লোকটাকে সেখানে পাহারায় রেখে গিয়েছিলুম, একলা থাকতে ভয় পেয়ে সে কোথায় লম্বা দিয়েছে! বনের সব ঝোপই প্রায় একরকম দেখতে, কোন ঝোপে সিংহটা আছে তা কে জানে!

কিন্তু এত বড়ো শিকার হাতছাড়া করতে আমার মন সরল না। তাই সবাই মিলে আমরা প্রত্যেক ঝোপঝাপ তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলুম।

অবশেষে একজন সানন্দে চিৎকার করে বললে, 'ওই যে, ওইখানে সিংহটা রয়েছে।'—কিন্তু বলেই সে লম্বা লম্বা লাফ মেরে ঝোপের কাছ থেকে পালিয়ে গেল।

ঝোপের কাছে এগিয়ে গিয়ে আমি দেখলুম—সত্য, এমন সিংহ শিকার করতে পারা ভাগ্যের কথাই বটে!

কিন্তু তখনও সে মরেনি। সে সটান মাটির উপরে পড়ে আছে বটে, কিন্তু প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের দুই পাশ উঠছে ও নামছে! তার চারপাশ ঘিরে এতগুলো লোক উত্তেজিত ভাষায় গোলমাল করছে, তবু সে উঠে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছে না দেখে আমার দৃঢ়বিশ্বাস হল, তার অন্তিম মুহূর্তের আর দেরি নাই। কাজেই আমি তাকে আরও ভালো করে দেখবার জন্যে তার মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

কিন্তু যেমন আমার সঙ্গে চোখোচোখি হওয়া, সিংহটা অমনি তার সমস্ত মৃত্যু-যন্ত্রণা ভুলে গেল! ভয়ংকর হুঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এক লম্ফে সে খাড়া হয়ে উঠল—তাকে দেখলে কে বলবে যে, সে আহত?—দুই চক্ষে তার দপ দপ করে জ্বলছে প্রচণ্ড ক্রোধের অগ্নি, তার হাঁ করা মুখ যেন নরকের গহ্বর এবং বড়ো বড়ো নিষ্ঠুর দাঁতগুলো চক চক করছে ধারালো অস্ত্রের মতো! তেমন বিভীষণ মূর্তি আমি কখনও দেখিনি এবং আর কখনও দেখতেও চাই না! নিতান্ত নির্বোধের মতোই আজ আমি সাক্ষাৎ যমের খপ্পরে এসে পড়েছি,—তার আর আমার মাঝখানে তফাত আছে মাত্র তিন হাত!

সিংহের গাত্রোত্থানের সঙ্গে-সঙ্গেই, যারা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল তারা সবাই

ঠিক এক সঙ্গেই ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মতো এদিকে-ওদিকে ঠিকরে পড়ল এবং বানরের মতো ক্ষিপ্র গতিতে এক-একটা গাছের উপরে উঠতে লাগল।

রোশন খাঁ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, পিছনে হটে আসতে গিয়ে আমি একেবারে তারই উপরে গিয়ে পড়লুম। বন্দুক আমার হাতে তৈরি ছিল, দিলুম তার ঘোড়া টিপে। সিংহটা তখন আমার মাথার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে হুমড়ি খেয়ে বসেছিল, গুলির চোটে তৎক্ষণাৎ সে চিতপাত হয়ে পড়ল—কিন্তু তারপরেই সে এক লাফে আবার দাঁড়িয়ে উঠল এবং এমন বিদ্যুতের মতো আমার দিকে ধেয়ে এল যে আমি আর বন্দুক তোলবারও সময় পেলুম না—তবু সেই অবস্থাতেই আর একবার গুলিবৃষ্টি করলুম! সে আবার আছড়ে পড়ল—এবং তখনই আবার লাফিয়ে উঠে আমার উপরে এসে পড়ল! তখন চক্ষে আমার অন্ধকার—জীবনের শেষমুহূর্ত উপস্থিত!

কেউ আমাকে বাঁচাতে পারত না, কিন্তু তবু আমি বেঁচে গেলুম দৈবগতিকে!

এতক্ষণে রোশন খাঁর হুঁশ হল—সে বুঝতে পারলে যে, মৃত্যু তার সামনে এসেছে। অকস্মাৎ প্রাণপণে চিৎকার ও আর্তনাদ করতে করতে সে তিরবেগে পালাতে লাগল!

রোশন খাঁর পলায়নই আমার প্রাণরক্ষার কারণ! সে পালাতে গিয়ে ক্রোধে-উন্মত্ত সিংহের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে এবং পশুরাজ তখন আমাকে ছেড়ে রোশন খাঁর পিছনেই ছুটে গেল!

রোশন খাঁ পালিয়ে আমার প্রাণ তো বাঁচালে, এখন তার প্রাণ বাঁচাতে হবে আমাকে। পলক ফেলবার আগেই ফিরে দাঁড়িয়ে আমি আবার বন্দুক ছুড়লুম—কিন্তু সর্বনাশ! গুলি সিংহের গায়ে লাগল না! আমি ক্ষিপ্র হাতে বন্দুকে আবার টোটা ভরলুম বটে, কিন্তু সিংহ তখন একেবারে হতভাগ্য রোশন খাঁর উপরে গিয়ে পড়েছে, আর তাকে বাধা দেওয়া অসম্ভব!

ঠিক এই সময়ে ছুটতে ছুটতে রোশন খাঁ আড়চোখে ফিরে তাকিয়ে নিজের ভয়ানক অবস্থাটা আন্দাজ করতে পারলে এবং সঙ্গে সঙ্গে দিলে ডান দিকে এক লাফ! সিংহও ফিরে দাঁড়িয়ে তাকে আবার আক্রমণ করতে গেল, এবং এই সময়টুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট হল!

সিংহ তখন মুখ ব্যাদান করে রোশন খাঁকে ধরতে উদ্যত হয়েছে—এমন সময়ে আমার গুলির চোটে সে ডিগবাজি খেয়ে ধরাশায়ী হল। সে আবার উঠে দাঁড়াবার আগেই আমি বন্দুক ছুড়লুম—আর একবার বিপুল গর্জন করে সে স্তব্ধ হল। তার সব লীলাখেলা শেষ।

তখন রোশন খাঁর দিকে ফিরে আমি যা দেখলুম, সে এক মজার দৃশ্য! হাসতে হাসতে আমার পেটে গেল খিল ধরে, আমি মাটির উপরে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলুম!

একটা কাঁটাগাছ জড়িয়ে রোশন খাঁ তখন তড়বড় করে উপরে উঠছে, সিংহটা জীবিত কি মৃত তা দেখবার সময় তার নেই, তার দৃষ্টি একেবারে কাঁটাগাছটার টঙের দিকে! কাঁটায় লেগে তার পাগড়ি গেছে উড়ে, তার বাহারি ফতুয়াটা কাঁটাগাছের আর একটা ডালে ঝুলে হাওয়ায় দোল খাচ্ছে এবং তার লম্বা জামাটাও ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে গেছে! সে তবু গাছের উপরে উঠছে আর উঠছে আর উঠছেই—সিংহের কাছ থেকে সে যতটা সম্ভব দূরে থাকতে

চায়! আমি তাকে নীচে নেমে আসবার জন্যে বারবার ডাকাডাকি করতে লাগলুম, কিন্তু তখন তাকে থামায় কার সাধ্য,—একেবারে মগডালে গিয়ে যখন দেখল আর উপরে ওঠবার উপায় নেই, তখন সে থামল! কিন্তু নীচে সিংহটা মরে পড়ে আছে দেখেও সে আর নামতে রাজি হল না! বেচারা ভারী ভয় পেয়েছে, আর পাবেই তো—এ যে তার পুনর্জন্ম!

এইবারে চারিদিককার গাছ থেকে মনুষ্য-বৃষ্টি শুরু হল—এ যাত্রা অনেক কষ্টে তারাও পৈতৃক প্রাণরক্ষা করেছে! মরা পশুরাজকে ঘিরে সবাই মহা স্ফূর্তিতে তাণ্ডব নাচ শুরু করলে। তারপর অভিনয়ও আরম্ভ হল—একজন সাজলে সিংহ, আর একজন আমার অংশ নিলে! মানুষ-সিংহ গজরাতে গজরাতে লাফ-ঝাঁপ মারছে, আর একজন আমার মতো পিছু হটতে হটতে বন্দুকের অনুকরণে আঙুলে তুড়ি দিতে দিতে চ্যাঁচাতে লাগল, 'টা, টা, টা!' তারপর আর একজন রোশন খাঁ হয়ে সেই কাঁটাগাছের দিকে পালাতে লাগল—তার পিছনে পিছনে নকল সিংহ! সেই দৃশ্য দেখে আর-সবাই অট্টহাস্য করে উঠল!

এমন সময়ে ব্রক এসে হাজির। প্রথমেই মৃত সিংহটাকে দেখে তিনি বলে উঠলেন, 'তোমার বরাত খুব ভালো দেখছি!'

আমি তখন সব ঘটনা বর্ণনা করলুম।

তাঁবুতে ফেরবার পথে একটা বুড়ো গন্ডার ভারী গোল বাধালে!

আমরা যেখান দিয়ে যাচ্ছি, সেখানকার জমি বেজায় উঁচু-নীচু। আমি যাচ্ছিলুম আগে আগে।

একটা উঁচু ঢিপির উপরে উঠে সামনেই দেখি, বিতিকিচ্ছি চেহারা নিয়ে মূর্তিমান এক গন্ডার!

হতভাগা জানোয়ারটার মেজাজ এমনি রুক্ষ যে, আমাকে দেখেই সে তড়বড়িয়ে এল তেড়ে।

তাকে বধ করবার সাধ আমার ছিল না, তাই আমি তাড়াতাড়ি সরে পড়লুম। কিন্তু আমি সরে পড়লে কী হবে, পিছনেই আমার সঙ্গীদের দেখে গন্ডারটা তাদের দিকেই ছুটে গেল!

ব্রক খুব দৌড়াতে পারতেন, গন্ডারকে দেখেই তিনি তাঁর সেই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করতে একটুও দেরি করলেন না। আমি তখন সেইখানেই বসে বসে ব্রক আর গন্ডারের দৌড় দেখতে লাগলুম। আমি বেশ জানতুম যে গন্ডারটা সহজে ব্রককে ছাড়বে না—কিন্তু দৌড়ের জন্যে বিখ্যাত ব্রক যে অনায়াসেই গন্ডারকে কলা দেখাতে পারবেন, এ-বিষয়েও আমার সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু হঠাৎ এক দুর্ঘটনা! একটা গাছ লক্ষ্য করে দৌড়োতে দৌড়োতে ব্রক একবার পিছনে ফিরে দেখে নিতে গেলেন, শত্রু কত দূরে আছে! আচম্বিতে একটা গর্তে তাঁর পা ঢুকে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি আছাড় খেয়ে মাটির উপরে সটান লম্বা হয়ে পড়ে গেলেন ও তাঁর হাত থেকে বন্দুকটা ছিটকে অনেক দূরে গিয়ে পড়ল!

আতঙ্কে নিশ্বাস বন্ধ করে আমি উঠে দাঁড়ালুম,—গন্ডারটা এই বুঝি ব্রকের উপরে গিয়ে পড়ল!

কিন্তু একটা আস্ত ও ছুটন্ত মানুষকে এমন অকারণে হঠাৎ মাটির উপরে শুয়ে পড়তে দেখে গন্ডারটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মনে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হল। বোধহয় সে ঠাওরালে এ হচ্ছে তাকে মুশকিলে ফেলবার কোনও নতুন ফিকির। সে আর এগুল না, চটপট ফিরে দাঁড়িয়ে বোঁ বোঁ করে ছুটে পালাল! ওদিকে ব্রকও গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে অন্যদিকে ফিরে না তাকিয়ে সামনের গাছের দিকে দিলেন বন বন করে পা দুটোকে চালিয়ে! কী কৌতুক! হাসতে হাসতে আবার আমার পেটে খিল ধরে গেল!

যা হোক, সমস্ত বিপদ এড়িয়ে শেষটা আমরা তাঁবুতে ফিরে এলুম। বোধহয় রোশন খাঁ ছাড়া আজ আমাদের সকলেরই মেজাজ খুব খুশি!

এর পরেও আমি মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতুম, 'হ্যাঁ রোশন খাঁ, আর-একবার তুমি শিকার দেখতে যাবে?'

অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে ও সজোরে ঘন ঘন মাথা নেড়ে সে সাফ জবাব দিত, 'কভি নেহি, কভি নেহি!'

॥ নয় ॥

এখানে সিংহের অত্যাচারের এমন একটি গল্প বলব,—যার নায়ক আমি নই!

পূর্ব আফ্রিকার কিমা নামে জায়গায় ছোট্ট একটি রেলস্টেশন আছে। সে-অঞ্চলের এক সিংহের মনে একদিন হঠাৎ রেলকর্মচারীদের মাংস খাবার জন্যে যারপরনাই লোভের সঞ্চার হল!

দু-দিন পরেই দেখা গেল, স্টেশনের ভিতরে সিংহ-মহাশয় যখন-তখন যাতায়াত শুরু করেছেন। তার ভাব দেখে এটাও বেশ বোঝা গেল যে, কুলি-মজুর থেকে স্টেশন-মাস্টার পর্যন্ত কারুর তোয়াক্কাই সে রাখতে রাজি নয় এবং যাকে বাগে পাবে তাকেই ফলার করে ফেলতেও সে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করবে না!

এক রাত্রে ফলারের লোভে সে স্টেশনঘরের ছাদের উপরে লাফিয়ে উঠল এবং দাঁত ও থাবা দিয়ে ছাদের করগেটের লোহার তক্তাগুলোকে ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল।

ব্যাপার দেখে টেলিগ্রাফবাবুর পিলে গেল চমকে। তিনি ভারতবাসী ছিলেন,—পেটের দায়ে চাকরি করতে সুদূর আফ্রিকায় গিয়েছেন—সিংহ-টিংহের কোনওই ধার ধারেন না! ছাদের উপরে সিংহের আস্ফালনে ভয় পেয়ে ট্রাফিক ম্যানেজারকে তাড়াতাড়ি 'তার' করে দিলেন—'সিংহ স্টেশনের সঙ্গে লড়াই করছে (Lion fighting with station)! শীঘ্র সাহায্য পাঠান!' যদিও স্টেশনের সঙ্গে লড়াই করে সিংহ সে-রাত্রে বিজয়ী হতে পারলে না, কিন্তু তারপরেই দিন-কয়েকের মধ্যে একে একে সে অনেকগুলো লোককে পেটের ভিতরে অনায়াসে পূরে ফেললে!

কিমা স্টেশনের কর্মচারী ও কুলি-মজুরদের মধ্যে অনেকেই ছিল ভারতবাসী। সিংহের ভয়ে তারা কাজকর্ম প্রায় বন্ধ করে দিলে!

ব্যাপার গুরুতর দেখে সেখানকার পুলিশের সুপারিন্টেন্ডেন্ট রিয়াল সাহেব, দুই বন্ধুর সঙ্গে সিংগিমামাকে একেবারে নিশ্চিন্তপুরে পাঠিয়ে দিতে এলেন।

স্টেশনে নেমেই তিনি শুনলেন, এইমাত্র সিংহ-মহাশয় স্টেশনের চারিদিকে সান্ধ্যভ্রমণ করে গেছেন।

সিংহটা কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছে বুঝে রিয়াল সাহেব স্থির করলেন, আজ স্টেশন থেকে এক পা নড়বেন না! তিনি হুকুম দিলেন, তাঁর কামরাটি যেন রেলগাড়ি থেকে আলাদা করে, লাইনের উপরে বন-জঙ্গলের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়!

সাহেবের হুকুমমতো কাজ করা হল। কিন্তু লাইন তখন মেরামত করা হচ্ছিল বলে কামরার গাড়িখানা ঠিক সমান ভাবে দাঁড় করানো গেল না।

রিয়াল সাহেবের দুই সঙ্গীর একজনের নাম মি. হুবনার, আর একজনের নাম মি. পেরেন্টি। তাঁরা তিনজনে বন্দুক হাতে করে চারিদিকে একটা চক্র দিয়ে এলেন। কিন্তু সিংহের নাম-গন্ধও না দেখে 'ডিনার' খাবার জন্যে আবার গাড়ির ভিতরে ফিরে এসে বসলেন।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হল! তারপর তিনজনেই কামরার জানলার কাছে বসে পশুরাজের যথোচিত অভ্যর্থনার জন্যে রীতিমতো প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

অন্ধকার রাত্রি, চারিদিকে জঙ্গল আর ঝোপঝাপ। কিন্তু সিংহের কোনও পাত্তাই নেই! কেবল এক জায়গায় দেখা গেল, দুটো অত্যন্ত-উজ্জ্বল জোনাকি সমানভাবে দপদপ করে জ্বলছে!

পরের ঘটনার প্রকাশ পেয়েছিল, সাহেবরা যা জোনাকি ভেবে অবহেলা করলেন, তা হচ্ছে স্বয়ং পশুরাজেরই দুটো জ্বলন্ত চোখ। কারণ বিড়ালের মতো বাঘ ও সিংহের চোখও অন্ধকারে জ্বলজ্বল করতে থাকে!

সাহেবরা যখন সিংহের অপেক্ষায় বসে ছিলেন, সে নিজেই তখন অন্ধকারে থাবা পেতে বসে সাহেবদের সমস্ত গতিবিধি লক্ষ করছিল এবং বোধহয় মনে মনে মানুষের নির্বুদ্ধিতা দেখে হাসছিল! এই ব্যাপারেই বোঝা যায়, মানুষ-শিকারে সিংহটা কতবড়ো পাকা।

সিংহের সাড়া না পেয়ে রিয়াল সাহেব তাঁর বন্ধুদের বললেন, 'ওহে, সবাই মিলে রাত জেগে কী হবে? ততক্ষণ তোমরা ঘুমিয়ে নাও, আমিই এখানে পাহারায় বসে আছি!'

কথাটা সঙ্গত বুঝে বন্ধুরাও বললেন, 'সেই ঠিক!'

কামরার ভিতরে শয্যাস্থান ছিল দুটি,—একটি টঙের উপরে আর একটি জানলার ধারে। উপরের বিছানায় শুলেন হুবনার। পেরেন্টি বললেন, 'রিয়াল, তুমি নীচের বিছানাটা দখল কোরো। আমি কামরার মেঝেতেই আজকের রাতটা বেশ কাটিয়ে দিতে পারব।'—এই বলে তিনি মেঝের উপরেই বিছানা ছড়িয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। তাঁর পা দুটো রইল কামরার ভিতরে আসা-যাওয়া করবার পাশে-ঠেলা দরজার দিকে।

রিয়াল একলাটি বসে বসে পাহারা দিলেন—অনেক রাত পর্যন্ত, কিন্তু কোথায় সিংহ? শেষটা হতাশ ও বিরক্ত হয়ে তিনিও জানলার ধারের বিছানায় শুয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনা

করতে লাগলেন। রেললাইন থেকে কামরার জানালা ছিল অনেক উঁচুতে, কাজেই তাঁর মনে কোনওরকম বিপদের ভয়ও হল না।

যে-মুহূর্তে রিয়াল ঘুমিয়ে পড়লেন, বাইরের অন্ধকার থেকে সিংহটাও যে তখনই গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছিল, পরে তার প্রমাণের অভাব হয়নি। সে সোজা দুটো উঁচু সিঁড়ির ধাপ দিয়ে গাড়ির উপরে উঠল। পাশে ঠেলা দরজাটা খুব সম্ভব একটুখানি খোলা ছিল, সিংহটা থাবা দিয়ে দরজাটা সন্তর্পণে সম্পূর্ণরূপে খুলে ফেলে একেবারে কামরার ভিতরে ঢুকে পড়ল। কিন্তু আগেই বলেছি, লাইনের দোষে গাড়িখানা ঠিক সমানভাবে দাঁড় করানো ছিল না। সিংহের বিপুল দেহ কামরার ভিতরে ঢুকবামাত্র তার ভারে সমস্ত গাড়িখানা আর একদিকে কাত হয়ে পড়ল, ফলে পাশে-ঠেলা দরজাটা আবার আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেল। তখন একই কামরার ভিতরে বন্ধ হয়ে রইল বিশালাকার সেই সিংহটা এবং তিন-জন ঘুমন্ত মানুষ! ভাবতেও কি তোমাদের গা শিউরে উঠছে না?

সিংহ কামরায় ঢুকে সর্বাগ্রে রিয়ালকেই লক্ষ করলে। সে বোধহয় অন্ধকারে বসে বসে এতক্ষণে বুঝতে পেরেছিল যে, রিয়ালই তার সবচেয়ে বড়ো শত্রু। কারণ তার পায়ের তলাতে মুখের কাছেই শুয়ে ছিলেন পেরেন্টি, সুতরাং সে খুব সহজেই তাঁকে আক্রমণ করতে পারত, কিন্তু তা না করে সে ঘুমন্ত পেরেন্টির উপরে পা তুলে দাঁড়িয়ে রিয়ালের উপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

তীব্র এক আর্তনাদে উপরের বিছানায় হুবনারের ঘুম গেল ভেঙে। তড়াক করে উঠে বসে তিনি স্তম্ভিত নেত্রে দেখলেন, প্রকাণ্ড এক সিংহ পিছনের দুই পা রিয়ালের দেহের উপরে স্থাপন করে দাঁড়িয়ে আছে!

হঠাৎ ঘুম ভেঙে এমন দৃশ্য দেখলে হুবনারের মনের ভাব কী রকম হওয়া উচিত, তা বোধহয় তোমরা বুঝতেই পারছ? হুবনার আতঙ্কে একেবারে পাগলের মতন হয়ে গেলেন! তিনি সভয়ে আরও দেখলেন, তাঁরও পালাবার কোনও উপায়ই নেই! একমাত্র যে পথ আছে তা হচ্ছে দ্বিতীয় একটা পাশে ঠেলা দরজা—যা দিয়ে চাকরদের মহলে যাওয়া যায়। কিন্তু সে পথ তো সিংহের নাগালের মধ্যেই! সে পথে পালাতে গেলে এক থাবায় সে তো তাঁর মাথাটাই উড়িয়ে দেবে!

পেরেন্টির অবস্থা আরও শোচনীয়। ঘুম ভেঙেই তিনি দেখলেন তাঁর বুকের উপরে কয়েক মন ওজনের এক ভীষণ সিংহ, তাঁর আর নড়বার চড়বার উপায় পর্যন্ত নেই! চোখ কপালে তুলে তিনি আড়ষ্ট হয়ে রইলেন।

রিয়াল তখন সিংহের কবলে ইঁদুরের মতন ছটফট ও বিষম যাতনায় পরিত্রাহি চিৎকার করছেন!

হুবনার দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে উপর থেকে পালাবার জন্যে লাফ মারলেন। কিন্তু পড়লেন গিয়ে একেবারে সিংহের পিঠের উপরে। তা ভিন্ন আর উপায়ও ছিল না, কারণ তার বিপুল দেহ সমস্ত পালাবার পথটা জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ভয়ে পাগলের মতন না হলে হুবনার কখনই এমন বোকার মতন সাক্ষাৎ-মৃত্যুর কবলে ঝাঁপ দিতে পারতেন না!

সৌভাগ্যক্রমে সিংহটা তখন রিয়ালকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল, তার পিঠের উপরে যে একটা তুচ্ছ মানুষ লাফিয়ে পড়ল এটা সে খেয়ালের মধ্যেই আনলে না!

হুবনার সিংহের পিঠ থেকে নেমে ওদিককার পাশে ঠেলা দরজার কাছে নিরাপদে গিয়ে পৌঁছলেন বটে, কিন্তু হতাশ ভাবে দেখলেন যে, স্টেশনের ভয়বিহ্বল ভারতীয় কুলিরা বাহির থেকে দরজাটা প্রাণপণে চেপে আছে—পাছে সিংহটা কোনও গতিকে বেরিয়ে পড়ে তাদের ঘাড় ভাঙতে চায়! কিন্তু হুবনার দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে দরজাটা কোনওরকমে একটুখানি খুলে সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কুলিরা দরজা তৎক্ষণাৎ আবার বন্ধ করে পাগড়ির কাপড় দিয়ে খুব শক্ত করে বেঁধে ফেললে!

পরমুহূর্তে ভয়ানক একটা শব্দ হল এবং গাড়িখানা আবার আর একদিকে হেলে পড়ল! সবাই বুঝলে, হতভাগ্য রিয়ালকে মুখে করে সিংহ জানলা গলে বাইরে বেরিয়ে গেল!

পেরেন্টি তখন টপ করে উঠেই অন্য পাশের জানালা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়লেন এবং এক দৌড়ে স্টেশনের ভিতর গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন! মরণের মুখ থেকে যে-ভাবে এ-যাত্রা তিনি পার পেয়ে গেলেন, বাস্তবিকই তা অসম্ভবের মতই আশ্চর্য!

পরদিন সকালে দেখা গেল, গাড়ির ভিতরটা, ও যে জানলা দিয়ে সিংহ বেরিয়ে গেছে, তার চারপাশের কাঠের তক্তা ভেঙে-চুরে তছনচ হয়ে আছে এবং সমস্ত কামরাটা রক্তে যেন ভেসে যাচ্ছে।

গাড়ি থেকে খানিক তফাতেই, জঙ্গলের ভিতরে অভাগা রিয়ালের দেহের খানিক অংশ পাওয়া গেল।

কিন্তু এই দুর্দান্ত পশুরাজকেও বনের ভিতরে আর বেশি দিন রাজত্ব করতে হয়নি। কারণ এ ঘটনার অল্পদিন পরেই রেল কর্মচারীরা ফাঁদ পেতে তাকে বন্দি করে। দিন কয়েক খাঁচার ভিতরে পুরে তাকে জীবন্ত অবস্থায় সকলের সামনে রেখে দেখানো হয়। তারপর তার পশুলীলা সাঙ্গ হয় বন্দুকের গুলিতে।

॥ দশ ॥

এক রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি শুনছিলুম, গভীর অরণ্যের ভিতরে সিংহরা কীরকম গর্জনের পর গর্জন করছে! যেন তারা নিজেদের ভাষায় কথাবার্তা কইছে! যেই একটা সিংহ গর্জন করে, অমনি আর একটা যেন উত্তর দেয়!

বুঝলুম, আপাতত যেখানে তাঁবু গেড়েছি, সে-জায়গাটা হচ্ছে সিংহদের মস্ত বড়ো এক আস্তানা!

চিড়িয়াখানায় লোহার খাঁচার বাইরে নির্ভাবনায় দাঁড়িয়ে সিংহের গর্জন শোনা এককথা, আর জঙ্গলের ভিতরে নড়বোড়ে, পাতলা তাঁবুর ভিতরে শুয়ে নিশুত রাতে আশপাশ থেকে অনেকগুলো সিংহের গর্জন শোনা আর এক ব্যাপার! তাঁবু তো ভারী জিনিস! সিংহের এক থাবার চোটে তা ছিঁড়েখুঁড়ে হুড়মুড় করে পড়ে যেতে পারে!

সিংহদের চিৎকার শুনে মনের যে-অবস্থাই হোক, এটা বেশ আন্দাজ করলুম যে, কালকের শিকারটা আমাদের জমবে ভালো!......হ্যাঁ, পরদিনের শিকারটা খুবই জমেছিল বটে! জীবনে সেদিনের কথা ভুলতে পারব না,—ব্যাপারটা এমনি ভয়ানক!

যথাসময়ে শিকারে যাত্রা করা গেল। এবারে আমার সঙ্গী হলেন বন্ধু স্পুনার এবং তাঁর সঙ্গে চলল, তাঁর ভারতীয় ভৃত্য ইমামদীন ও আর একজন ভারতীয় শিকারি, নাম ভূতা। এবারের শিকারের নূতনত্ব হচ্ছে, আমরা ঘোড়ায় টানা টোঙ্গা গাড়িতে চড়ে চলেছি সিংহ শিকারে। আঠি নদীর ধারের ধু ধু প্রান্তর প্রায় সমতল, সেখানে গাড়িতে চড়ে যাওয়া যখন যায়, তখন এমন সুযোগ ছাড়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

পথে যেতে যেতে আমরা গোটাকয়েক হরিণ শিকার করলুম। সবুজ ঘাসজমির উপরে চরতে চরতে তারা নিশ্চিন্ত প্রাণে নিজেদের খোরাক জোগাড় করছিল, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় এখন আমাদের খোরাকে পরিণত হল!

আঠি নদীর এই ময়দানময় খুব লম্বা লম্বা ঘাসের জঙ্গল আছে। সিংহরা লুকিয়ে থাকে তারই ভিতরে।

কিছুদূর এগিয়েই দেখা গেল, অল্প তফাতেই ঘাসজঙ্গলের মধ্যে একটা সিংহের দুটো কানের ডগা বেরিয়ে আছে! ভালো করে দেখে বুঝলুম, সেটা সিংহী।

পরমুহূর্তেই তার পাশ থেকে মাথা তুলে দাঁড়াল, সুন্দর কেশরওয়ালা বলিষ্ঠ এক সিংহ! তারা একদৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। বোধহয় আমাদের উদ্দেশ্য বোঝবার চেষ্টা করছিল।

আমাদের গাড়ি তাদের দিকে অগ্রসর হতেই তারা ধীরকদমে চলে যেতে এবং যেতে যেতে সিংহটা বারংবার থেমে আমাদের দিকে তাকাতে লাগল—যেন বলতে চায়, 'কে বাপু তোমরা? আমরা দুজনে এখানে খেলা করছি, হঠাৎ তোমরা আমাদের পিছু-পিছু আসছ কেন?'

আমাদের গাড়ি যত এগোয়, তারা তত দূরে চলে যায়। আমরা যে লক্ষ্মীছেলের মতো তাদের সঙ্গে আলাপ করতে আসিনি, এটা তারা বুঝতে পেরেছিল।

তারা পাছে হাতছাড়া হয়, এই ভয়ে আমি দূর থেকেই বন্দুক ছুড়লুম। সিংহীটা গুলি খেয়েই মাটিতে চিতপাত হয়ে পড়ে শূন্যে চার পা ছুড়তে লাগল। আমি ভাবলুম, এখনই তার দফা রফা হয়ে যাবে,—কিন্তু না, মিনিট কয় পরেই সামলে উঠে সিংহীটা পাশের ঘাস জঙ্গলে ঢুকে পড়ল, সিংহটা তার আগেই সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে নিজের সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল।

তখন দিনের আলো ধীরে ধীরে কমে আসছিল এবং সাধ করে গরম গুলি খাবার জন্যে সিংহরা যে তাড়াতাড়ি জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে রাজি হবে, এমন কোনও সম্ভাবনা দেখলুম না। কাজেই হতাশ হয়ে সেদিনকার মতো তাদের রেহাই দিয়ে আমরা আবার তাঁবুর দিকে গাড়ির মুখ ফেরালুম। বলতে ভুলেছি যে, আমরা সঙ্গে একটি ঘোড়াও এনেছিলুম এবং টোঙ্গার আগে আগে ঘোড়ায় চড়ে আসছিলুম আমি।

হঠাৎ আমার ঘোড়া আঁতকে উঠল! চেয়ে দেখি, তার পায়ের তলা থেকে একটা হায়েনা ঠিক যেন মাটি ফুঁড়ে উঠেই চম্পট দিলে! তারপরেই দেখি, আমার ঘোড়ার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে! ব্যাপার কী?

এদিকে-ওদিকে তাকিয়েই দেখা গেল, বৃহৎ একজোড়া সিংহ প্রায় একশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের পথ আগলে আছে!

তারা আস্তে আস্তে হাত-কুড়ি এগিয়ে এসে, মাটির উপরে থাবা পেতে কায়েমি হয়ে বসে স্থির-দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে যেন বলতে চাইলে—এখানে এসেছ চালাকি করতে? 'যেতে আমি দিব না তোমারে'!

আচ্ছা মুশকিল তো! আমি চেঁচিয়ে স্পুনারকে ডাকলুম। তিনি টোঙ্গা চালিয়ে পাশে এসে হাজির হলেন।

স্থির করলুম, পথ আগলানোর কত মজা, পশুরাজদের সেটা ভালো করে টের পাইয়ে দিতে হবে! স্পুনারকে বললুম, 'ডাইনের সিংহটা তোমার, বাঁয়েরটা আমার।'

দুজনে বন্দুক-হাতে পদব্রজে সিংহদের দিকে এগিয়ে যেতেই তাদের সব সাহস গেল কর্পূরের মতন উবে! কারণ তারা উঠেই টেনে দৌড় মারলে। সঙ্গে সঙ্গে আমার অগ্নিমুখী বন্দুক গুলিবৃষ্টি করলে—একটা সিংহ মাটির উপরে পড়ে শূন্যে থাবা মারতে লাগল। তারপরেই সে উঠে আবার পালাতে শুরু করলে।

আমিও নাছোড়বান্দা। ঘোড়ায় চড়ে আমিও তাদের পিছনে ছুটলুম।

তারা যখন দেখলে, আমি তাদের সঙ্গ ছাড়তে রাজি নই, তখন তারা দুজনে একসঙ্গেই আমাকে আক্রমণ করলে এবং আহত সিংহটাই আসতে লাগল আগে আগে।

ইতিমধ্যে স্পুনার ও অন্যান্য সকলেও আমার কাছে এসে পড়লেন।

যে-সিংহটা এখনও অক্ষত আছে, আগে আমি তাকেই লক্ষ্য করে বন্দুক ছুড়লুম—সে-ও শূন্যে এক সুদীর্ঘ লম্ফ ত্যাগ করে দুম করে সশব্দে পড়ল মাটির উপরে এসে! আহত সিংহটা তখন আমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করছিল, কিন্তু স্পুনারের অব্যর্থ গুলি তখনই ছুটে গিয়ে তার লাফ-ঝাঁপ এ-জন্মের মতো বন্ধ করে দিলে।

আমি যাকে গুলি করেছিলুম, এখনও সে মরেনি, মাটির উপরে চার পা ছড়িয়ে বসে ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

আমরা অতি সন্তর্পণে তাঁর দিকে অগ্রসর হতে লাগলুম। কিন্তু আমরা যেদিক দিয়েই অগ্রসর হই, সে-ও অমনি সেই দিকে ফিরে বসে। তার ভাবভঙ্গি তখন এমন ভয়ংকর যে, এক গুলিতে তাকে সাবাড় করতে না পারলে আমাদের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা!

আমি ক্রোধোন্মত্ত পশুরাজের আরও কাছে এগিয়ে গেলুম—আমার পিছনে পিছনে স্পুনার, তারপরে শিকারি ভূতা ও ইমামদীন। পশুরাজ এখন আমাদের কাছ থেকে প্রায় আশি গজ দূরে। রাগের চোটে সে মাটির উপরে ল্যাজ আছড়ে রাশি রাশি ধুলো ওড়াচ্ছে। স্পুনারকে আগে বন্দুক ছুড়তে বলে আমি হাঁটু গেড়ে বসে প্রস্তুত হয়ে রইলুম।

বেশিক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করতে হল না। যেমনি স্পুনারের বন্দুক গর্জে উঠল,

সিংহটাও অমনি একলাফে উঠে পড়ে মেল-ট্রেনের মতন বেগে আমার দিকে ছুটে এল। আমি বন্দুক ছুড়লুম, সে গুলি তার গায়ে লাগল না। আবার বন্দুক ছুড়লুম, সে গুলি তার গায়ে লাগল না। আবার বন্দুক ছুড়লুম, কিন্তু সিংহ তা গ্রাহ্যও করলে না! বন্দুকে আর টোটা ভরবারও সময় নেই—চোখের সামনে দেখলুম, মৃত্যু-বিভীষিকা!

মরণের অপেক্ষায় স্থির হয়ে বসে রইলুম, সিংহটাও প্রায় আমার উপরে এসে পড়ল, পরমুহূর্তেই ডান দিকে বেঁকে আমাকে পেরিয়ে চলে গেল—স্পুনারের দিকে! না, সে স্পুনারকেও ছেড়ে দিলে এবং একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভূতার উপরে! ভূতার পা ধরে সে একটানে তাকে ধরাশায়ী করলে। ভূতা ও সিংহ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে খানিকদূর গড়িয়ে চলে গেল। তারপরই সিংহটা ভূতার দেহের উপরে দাঁড়িয়ে তার গলা কামড়ে ধরতে গেল, কিন্তু সাহসী ভূতা সিংহকে বাধা দেবার জন্যে নিজের বাঁ হাতখানা দিলে তার প্রকাণ্ড হাঁয়ের ভিতরে ঢুকিয়ে। অভাগা ভূতা! নিশ্চয়ই সে নড়ে উঠেছিল, সিংহ তাই আমাকে ছেড়ে আক্রমণ করলে তাকেই!

সমস্ত ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল দুই-এক মুহূর্তের মধ্যেই। কিন্তু এই সময়টুকুর ভিতরে নিজেকে আমি সামলে নিলুম। স্পুনারের চাকর ইমামদীন বন্দুক নিয়ে সারা দিনই আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে ছায়ার মতো। দুর্দান্ত সিংহের আক্রমণেও সে একটুও ভয় পায়নি বা থতোমতো খায়নি। এই বিপদের সময় বন্দুকটা সে আমার হাতে গুঁজে দিলে। ভূতাকে উদ্ধার করবার জন্যে আমি ঝড়ের মতো ছুটে গেলুম। ইতিমধ্যে আমার আগেই স্পুনার সেইখানে গিয়ে হাজির হয়েছেন। ভূতা মাটির উপরে সটান পড়ে ছটফট করছে এবং তার উপরে রয়েছে সিংহটা। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে স্পুনার তখন সিংহের বিপুল দেহটা ভূতার গায়ের উপর থেকে ধাক্কার পর ধাক্কা মেরে ঠেলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। স্পুনারের বুকের পাটা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলুম। ভাগ্যে সিংহটা তার ধাক্কা গ্রাহ্য করলে না। সে তখন অভাগা ভূতার হাতখানা এমন এক মনে চর্বণ করছিল যে অন্য কোনওদিকে ফিরে তাকাবার অবসর পেলে না।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমি পড়ে গেলুম ঠিক তার সামনেই! অমনি সে হস্ত চর্বণ বন্ধ করলে। যদিও সে ভূতার হাতখানা ছেড়ে দিলে না, তবু সেই অবস্থাতেই বড়ো বড়ো ধারালো দাঁতগুলো বার করে মুখ খিঁচিয়ে আমার ঘাড়ের উপরে লাফ মারবার উপক্রম করলে। বুঝলুম এক পলক দেরি করলেই সর্বনাশ! টপ করে বন্দুকটা কাঁধে তুলে নিয়েই দিলুম আমি ঘোড়া টিপে। কিন্তু, কী ভয়ানক! ঘোড়া টিপলুম, তবু বন্দুকে আওয়াজ হল না! আমার প্রাণ স্তম্ভিত হয়ে গেল। আর রক্ষে নেই! বন্দুকে আবার নতুন টোটা পুরবার আগেই সিংহটা নিশ্চয় আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে! দারুণ ক্রোধে সিংহের চোখ দুটো তখন আগুনের ভাঁটার মতন দপ দপ করে জ্বলে জ্বলে উঠছিল! তার চোখে চোখ রেখে পায়ে পায়ে দু-পা পিছিয়ে এলুম। আচমকা আমার মনে পড়ে গেল বন্দুকটা ছোড়বার আগে তার চাবি তো আমি টিপে দিইনি। যাঁহাতক এই কথা মনে হওয়া, তাঁহাতক চাবিটা টিপে বন্দুক ছুড়তে

আমার আর এক মুহূর্তও দেরি হল না। গুলি খেয়ে সিংহটা দড়াম করে আছড়ে পড়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে রইল।

সিংহের মৃতদেহের তলা থেকে আমরা তখন ভূতার দেহ টেনে বার করে ফেললুম। তার হাতখানা কামড়ে ধরেই সিংহটা পটল তুলেছিল, কাজেই ভূতার সেই ছিন্ন-বিছিন্ন হাতখানাকে বার করবার জন্যে সিংহের চোয়াল দুটো টেনে ফাঁক করে ধরতে হল। ভূতার জ্ঞান তখন প্রায় ছিল না বললেই চলে। ছুটে গিয়ে টোঙ্গা থেকে ব্রান্ডি এনে ভূতাকে খানিকটা খাইয়ে দিলুম। তার বাঁ হাত আর ডান পা-কে তখন হাত পা বলেই চেনা যাচ্ছিল না। সেদিকে তাকিয়ে গা আমার শিউরে উঠল। যা হোক, কোনওক্রমে ধরাধরি করে ভূতার দেহকে টোঙ্গায় তুলে নিয়ে আমরা বাসার দিকে ফিরলুম।

ভূতার চিকিৎসার কোনওই ত্রুটি হল না। ভালো ডাক্তার ঔষধপত্র সবই পাওয়া গেল। প্রথম প্রথম আমাদের খুবই আশা ছিল যে ভূতা এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে যাবে। তার হাতের ক্ষত সেরে এল বটে, কিন্তু তার পায়ের অবস্থা ক্রমেই—শোচনীয় হয়ে উঠল। তবু সেই অবস্থাতেই সাহসী ভূতা বার বার বলতে লাগল, 'হুজুর, সবুর করুন—আগে সেরে উঠি, তারপর আমি দেখে নেব! আফ্রিকার সমস্ত সিংহকেই আমি নিজের হাতে বধ করব।'

কিন্তু হায়, হতভাগ্য ভূতার শিকারের দিন শেষ হয়ে গেছে! তার পায়ে এমন পচ ধরল যে, পা-খানাকে কেটে দেহ থেকে বাদ দিতে হল। পা-কাটার সমস্ত কষ্টই ভূতা মুখ বুজে সহ্য করলে! কেবল এক ভাবনাতেই সে মুষড়ে পড়ল। সে বললে, 'হুজুর এক পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমি স্বর্গে যাব কেমন করে?'

ভাই যেমন ভাইকে সেবা করে, তেমনি ভাবেই আমরা ভূতার সেবা করলুম বটে কিন্তু তবু তাকে বাঁচাতে পারলুম না। পা কাটার দিন-কয়েক পরেই ভূতার মৃত্যু হল।

॥ এগারো ॥

মেজর রবার্ট ফোর‍্যান হচ্ছেন একজন বিখ্যাত শিকারি। আফ্রিকায় ও ভারতবর্ষে ইনি যে কত সিংহ, বাঘ, হাতি, গন্ডার, হিপো ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু বধ করেছেন, তার আর সংখ্যা নেই। নীচের গল্পটি তাঁরই নিজের মুখে শোনো।

'তখন বুয়োর-যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। সৈনিকের কাজ নিয়ে আমি ভারতবর্ষে এসেছি।

যে জেলায় আমি ছিলুম, তার চারিধারে গভীর বন-জঙ্গল আর সেখানে বাঘের উপদ্রবও বড়ো বেশি। একটা বাঘের বদমায়েশি আবার এত বেড়ে উঠেছিল যে তাকে আর শাস্তি না দিলে চলে না।

একদিন খবর পাওয়া গেল, কাছে এক জঙ্গলে বাঘটা একটা মোষকে বধ করে খানিকটা

খেয়ে ফেলে রেখে দিয়ে গেছে। বাঘেদের স্বভাবই হচ্ছে, যেসব জানোয়ার তারা বধ করে, এক দিনেই তারা খেয়ে সাবাড় করে দেয় না। খানিকটা এক দিন খায়, তার পরের দিন এসে আরও খানিকটা খায়। কাজেই মোষটাকে খাওয়ার জন্যে বাঘটা যে আবার ফিরে আসবে, এটুকু বেশ জেনেই আমি ঘটনাস্থানে গিয়ে হাজির হলুম।

মস্ত একটা গাছের উঁচু ডালে মাচান বেঁধে, আমি তার উপরে গিয়ে উঠে বসলাম। তখনও সন্ধে হয়নি। আজকের রাত এই মাচানে বসে কাটাতে হবে।

চারিধারে একবার চোখ বুলিয়ে নিলুম। আমার সামনে খানিকটা খোলা জমি আর জলাভূমি।

তারপরেই দুর্ভেদ্য বন জঙ্গলের প্রাচীর, তার ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চলে না। চারিদিক স্তব্ধ। আমি একলা।

খানিকটা পরেই বুঝলুম, আমি আর একলা নই, একটা শেয়ালও মোষের গন্ধ পেয়েছে। সে লক্ষ্যহীন ভাবে মোষটার চারিধারে দূরে দূরে ঘোরাঘুরি করছে, কিন্তু মোষটার মৃতদেহের দিকে ভুলেও ফিরে তাকাচ্ছে না। চালাক শেয়ালটার মনের ভাব বোঝা একটুও শক্ত নয়। মোষের মাংসে তার প্রাণ নিশ্চয়ই আনচান করছে, কিন্তু তার মনের কথা সে মনেই লুকিয়ে রাখতে চায়। কী জানি, যে বাঘের এই মোষ, গাছের কোনও ঝোপেঝাপে যদি সে লুকিয়ে থাকে, আর বুঝতে পারে যে তার মোষের উপরে আমার নজর আছে, তাহলে আর কি সে আমাকে ছেড়ে কথা বলবে?

তার সেই মজার রকম সকম দেখে আমার ভারী আমোদ লাগল।

হঠাৎ শিয়ালটা একবার ক্যা-হুয়া—ক্যা-হুয়া করে চেঁচিয়ে উঠল! তারপরেই সাঁৎ করে আবার সে জঙ্গলের ভিতর মিলিয়ে গেল। মাংস খাওয়ার এমন সুবিধা সে ছাড়ল কেন, অবাক হয়ে তাই ভাবছি, এমন সময়ে দেখি না, সে পালায়নি। সে নিশ্চয়ই জঙ্গলের ভিতর গিয়ে দেখে এল, বাঘটা কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে কি না? খানিকক্ষণ খুব সতর্কভাবে কান খাড়া করে সে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর পায়ে পায়ে মোষের কাছে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ আবার পিছন দিকে এক লাফ মেরে পিছিয়ে এল। খুব ভয়ে ভয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল—দরকার হলেই যেন সে পালাবার জন্যে প্রস্তুত! কিছুক্ষণ ধরে এই একই বিচিত্র অভিনয় চলল—পায়ে পায়ে মোষের দেহের দিকে সে এগিয়ে যায়, হঠাৎ লাফ মেরে পিছিয়ে আসে এবং পালাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে!

অবশেষে শিয়ালটা গলাটা খুব লম্বা করে বাড়িয়ে নাক দিয়ে মোষের দেহ স্পর্শ করলে। তাতেও কোনও বিপদ হল না দেখে মোষের পেটের উপর দিলে সে বসিয়ে এক কামড়। উঃ, সঙ্গে সঙ্গে সে যে কী বিশ্রী দুর্গন্ধ আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল, কেউ তা ধারণায়ও আনতে পারবে না। অস্থির হয়ে তাড়াতাড়ি রুমাল বার করে আমি নাকের উপর চেপে ধরলুম। সেই সময় মাচানটা একটু মচমচ করে নড়ে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে চোখ তুলে আমাকে একবার দেখেই শেয়ালটা একেবারে দে ছুট তো দে ছুট!

প্রহসন শেষ হয়ে গেল। বনের বড়ো বড়ো গাছপালার পিছনে আকাশে সূর্য তখন মুখ

রাঙা করে নেমে যাচ্ছে। লতাগুল্মের আড়াল থেকে একটি চমৎকার সারস পাখি লম্বা পা ফেলে বাইরে বেরিয়ে এল। ঝাঁকে ঝাঁকে রংবেরঙের আরও নানান পাখি এসে বড়ো বড়ো গাছের ডালপালার ভিতরে আশ্রয় নিতে লাগল। দিন ফুরুল, সন্ধে হল,—শান্ত জীবদের ঘুমোবার সময় এল, এখন জেগে উঠবে খালি—দুর্দান্ত হিংস্র জন্তুরা।

এই সব গভীর অরণ্যে দয়া বলে কোনও জিনিস নেই। এক জীবের সঙ্গে অন্য জীবের দেখা হলেই আর কোনও কথা নেই—যুদ্ধ, যুদ্ধ, কেবল যুদ্ধ! জোর যার মুল্লুক তার! হয় মরো, নয় মারো।

এই সব ভাবছি, আচম্বিতে কেমন একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনলুম। চেয়ে দেখি, ওদিককার একটা ঝোপ দুলে দুলে উঠছে। মড় মড় করে শুকনো পাতার শব্দ—যেন একটা মস্ত ভারী জন্তু বনের ভিতর দিয়ে আসছে। তারপরই বেরিয়ে এল প্রকাণ্ড একটা মাদি মোষ। তার শিং দুটো কী লম্বা আর মোটা, মোষের এত বড়ো শিং আমি আর দেখিনি। আমার অত্যন্ত লোভ হল, বন্দুকটা একবার তুললুম, কিন্তু তার পরেই মনে পড়ল, এখানে আমি এসেছি বাঘ শিকারে, কোনওরকম উৎপাত হলে আজ আর বাঘের দেখা পাব না। বন্দুকটা আবার নামিয়ে রাখলুম!

খুব দূরের জঙ্গল থেকে আর একটা মোষের ডাক শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার সামনে মোষটাও শূন্যে মুখ তুলে চিৎকার করে সাড়া দিলে। বোঝা গেল মদ্দা মোষটা তার বউকে কাছে আসবার জন্যে ডাকাডাকি করছে।

মাদি মোষটা আস্তে আস্তে এগিয়ে মরা মোষের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর মৃতদেহটা বার কয়েক শুঁকে দেখলে। তারপর শূন্যে মুখ তুলে আবার একবার ক্রুদ্ধ-গর্জন করলে। বোধহয় সে আন্দাজ করতে পারলে, বিপদ বেশি দূরে নেই।

হঠাৎ সে কেমন যেন আঁতকে উঠল। তারপরই টপ করে ঘুরে দাঁড়াল—মাথা নামিয়ে জঙ্গলের একদিকে তাকিয়ে রইল তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে।

তার দেখা দেখি আমিও সেই দিকে ফিরে তাকালুম। সত্য-সত্যই বাঘের আবির্ভাব হয়েছে। একমনে সে এগিয়ে আসছে, আর তার সাদা পেট লেগে লম্বা লম্বা ঘাসগুলো দুমড়ে পড়ছে।

তারপর মোষের সঙ্গে চোখোচোখি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার দেহ মূর্তির মতো স্থির, কেবল তার লেজটা ঝটপট করে মাটির উপর আছড়ে পড়ছে। মোষটা তার সামনের পা দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল—কিন্তু তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রইল বাঘের উপরে। মোষ আর বাঘ দুজনেই এখন প্রস্তুত। দুজনারই চোখ দুজনের দিকে তাকিয়ে—তাদের সমস্ত দেহের উপরেই যেন পরস্পরের প্রতি দারুণ ঘৃণার ভাব সেখানে রয়েছে।

আমি বাঘকে আর গুলি করব না, জঙ্গলের এই অদ্ভুত অভিনয়ের পরিণাম কি দাঁড়ায়, আজ আমি সেইটাই ভালো করে দেখতে চাই।

ধীরে ধীরে ঘাসের উপরে লেজ আছড়াতে আছড়াতে বাঘটা মোষের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল, তার দুই চোখ দিয়ে তখন যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে।

মোষটা এগিয়েও এল না, পিছিয়েও গেল না, কেবল বাঘটা যেদিকে যাচ্ছে সেইদিকে মুখ করে সে ফিরে ফিরে দাঁড়াতে লাগল। সে একটুও ভয় পায়নি, বরং তাকে দেখলেই ভয় হয়।

বাঘ মোষের চারিদিকে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল। চক্র ক্রমে ছোটো হয়ে আসছে। বাঘ কেবল সুযোগ খুঁজছে, একবার মোষের পিছন দিকে যেতে পারলেই এক লাফে সে তার ঘাড়ের উপর এসে পড়বে। মোষ কিন্তু বাঘের চেয়ে বোকা নয়। বাঘের মতলব সে জানে। জঙ্গলে তার বাসা, এখানকার লড়ায়ের কোনও কায়দাই শিখতে তার বাকি নেই।

হঠাৎ বাঘটা ধনুকের মতো কুঁকড়ে বেঁকে পড়ল এবং পরমুহূর্তেই তার দেহটা রকেটের মতো বেগে শূন্যের দিকে উঠে গেল। এবং সেই সঙ্গেই মোষটাও গর্জন করে শিং নামিয়ে বাঘকে আক্রমণ করলে।

বাঘের দেহের সঙ্গে মোষের শিং-এর মিলন হল শূন্য পথেই! তারপরেই দুজনেই মাটির উপর পড়ে গেল এবং চোখের পলক পড়তে না পড়তেই দুজনেই আবার দাঁড়িয়ে উঠল। তারপরে দুজনে আবার দুজনকে আক্রমণ করলে এবং বাঘটা এসে পড়ল মোষের পিঠের উপর।

কিন্তু বাঘের দাঁত আর নখ তার পিঠের মাংসে বসবার আগেই মোষটা এক লাফ মেরে চিত হয়ে মাটির উপর শুয়ে পড়ল—নিজের দেহের বিপুল ভারে বাঘের দেহকে পিষে ফেলবার জন্যে। মোষের যুদ্ধের প্যাঁচ দেখে আমি তো অবাক!

মোষের দেহের চাপে চেপটে মরবার ইচ্ছা বাঘের মোটেই ছিল না। সে টপ করে মাটিতে নেমে পড়ল। মোষ আবার উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বাঘ আবার তার ডান কাঁধের উপর লাফিয়ে উঠল। মোষ এক ঝটকান মেরে বাঘকে আবার মাটিতে ফেলেই শিং দিয়ে তার দেহকে শূন্যে তুলে নিয়ে একটা ঝাউগাছের গুঁড়ির উপরে তাকে চেপে ধরলে। মোষের পিঠ ও কাঁধের উপরে বড়ো বড়ো ক্ষত দিয়ে রক্তস্রোত বেরুচ্ছে এবং তার মুখ দিয়েও ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে। সে তাড়াতাড়ি কয়েক পা পিছিয়ে এল, তেড়ে গিয়ে বাঘকে আর একবার গুঁতিয়ে দেওয়ার জন্যে।

বাঘ তখনও কাবু হয়নি—যদিও তার দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে থেঁতলে গিয়েছিল। আবার সে লাফ মারলে এবং এবারে মোষের বড়ো বড়ো দুটো শিং-এর ঠিক মাঝখানে এসে পড়ল। বাঘের দেহের আড়ালে মোষের মুখ তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং বাঘের ধারাল নখে ও তীক্ষ্ণ দাঁতে মোষের দেহ তখন ছিন্ন ভিন্ন ও রক্তময় হয়ে উঠেছে! দারুণ যাতনায় মোষটা তখন আর্তনাদ করে উঠল।

তারপরে সেই অবস্থাতেই বাঘের দেহ নিয়ে সে একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ির উপরে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল। ধপাস করে ভীষণ একটা শব্দ হল,—বাঘের ক্ষীণ আর্তনাদ শোনা গেল! টাল সামলাতে না পেরে মোষটা প্রথমে মাটির উপর বসে পড়ল, কিন্তু তার পরেই আবার চার পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। বাঘের দেহ তার পিঠের উপর থেকে গড়িয়ে মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল।

মোষ তাড়াতাড়ি আবার পিছিয়ে এল—তারপর তার নিষ্ঠুর শিং দুটোকে নামিয়ে চমৎকার ভাবে লক্ষ স্থির করে বেগে বাঘের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে ক্রমাগত গুঁতিয়ে দিতে লাগল। বাঘ তখন একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে এবং তার লড়ায়ের সাধও একেবারে মিটে গেছে। হামাগুড়ি দিয়ে বার বার সে জঙ্গলের ভিতরে পিঠটান দেওয়ার চেষ্টা করলে—কিন্তু জঙ্গলের যুদ্ধের আইনে ক্ষমা বলে কোনও কথাই নেই—হয় মরো, নয় মারো!

মোষ আবার তেড়ে এল, তারপর মাথা নামিয়ে বাঘের অবশ দেহটাকে আবার দুই শিং-এ করে তুলে নিয়ে বেগে মাথা ঘুরিয়ে ঠিক যেন একটা খড়কুটোর মতো অনায়াসে সেটাকে অনেকটা দূরে ছুড়ে ফেলে দিলে!

মাটির উপরে পড়ে বাঘ আর নড়ল না। মোষ আর তার দিকে এগুলও না, ফিরে তাকালেও না। সে জানে এর পরে তার শত্রু আর বাঁচতে পারে না।

চমৎকৃত হয়ে মাচানের উপরে আমি বসে রইলুম। বাঘকে বধ করে মোষ যে আমার শিকার কেড়ে নিলে এজন্যে আমি কোনও দুঃখই অনুভব করলুম না! যে দৃশ্য আজ চোখের সামনে দেখলুম, শিকারের আনন্দ তার কাছে তুচ্ছ!

রাতের কালো পর্দা সারা বনের উপরে তখন নেমে এসেছে—যে হেরেছে আর যে জিতেছে, তাদের কারুকেই আর দেখা যায় না। ছোট্ট এক টুকরো চাঁদ আকাশের কপালে তিলকের মতো আঁকা রয়েছে, আঁধারের মুখ তাতে ঢাকা পড়ে না।

সেই নিবিড় অন্ধকারে মোষের বিজয়-গৌরব ভরা চিৎকার শোনা গেল—সঙ্গে সঙ্গে খুব কাছের জঙ্গল থেকেই মদ্দা মোষটা তার সঙ্গিনীকে সাড়া দিলে। তারপরই আবার জঙ্গল ভাঙার শব্দ, মাদি মোষটা বোধহয় তার সঙ্গীর কাছে মনের আনন্দে ছুটে চলে গেল।

বাঘের দেহটা আমি আর নিয়ে গেলুম না, ও দেহের উপরে আমার কোনও দাবি নেই।

॥ বারো ॥

এ গল্পটিও মেজর রবার্ট ফোর‍্যান বলছেন :—নানা দেশের নানা বনে আজ ত্রিশ বৎসর ধরে শিকার করছি। এতকালের এই অভিজ্ঞতার ফলে, আমি জোর করেই বলতে পারি, হাতি শিকারে যত বিপদ আর উত্তেজনা আছে, অন্য কোনও শিকারেই তা নেই।

দেহের যে-জায়গায় গুলি লাগলে হাতি সহজেই মারা পড়ে, হাতির খুব কাছে গিয়েও সেটা জানতে পারা সহজ নয়!

খানিক তফাত থেকে হাতিকে গুলি করলে বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্ট। হাতির একটা বদ-অভ্যাস আছে, আহত হলেই, সে ফিরে দেখে নেয়, ঢিল ছুড়লে কে? সে-সময় শিকারির মনের অবস্থা যে-রকম হয়, তা আর বলবার নয়। একদল সিংহের মাঝখানে গিয়ে পড়লেও শিকারির মনের অবস্থা এমনধারা শোচনীয় হয় না। আহত হলেই হাতি

ফিরে দাঁড়ায়, তার কুলোর মতো বড়ো বড়ো কান দুটো দু-দিকে ছড়িয়ে দেয়, যতটা উঁচু হতে পারে দেহটা ততখানি উঁচু করে তোমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত ক্রোধে এমন ভীষণ গর্জন করে ওঠে, যে দেহের সমস্ত রক্ত যেন বরফের মতো জমাট হয়ে যায়।

আফ্রিকার হাতি তার স্বদেশে এক অতিকায় দানবের মতন। সামনে তাকে দেখলেই বুক যেন কুঁকড়ে আসে, আর নিজের হাতের বন্দুককে মনে হয়, তুচ্ছ একটা খড়কের মতো নগণ্য! যতই চেষ্টা করো, তার সামনে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় একটা অসম্ভব ব্যাপার! তখন পাগলের মতো তার সুমুখ থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে, তোমার মনের ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠবে। কতকাল ধরে শিকার করেছি, তবু আক্রমণোদ্যত হাতিকে দেখলেই আমার সমস্ত মন যেন ভয়ে এলিয়ে পড়ে।

কিন্তু এখন এসব কথা থাক। আজকে আমার শেষ শিকারের গল্প বলব। এই ঘটনার পরেও বার কয়েক আমি বনে-জঙ্গলে গিয়েছি,—কিন্তু হাতে বন্দুক নিয়ে নয়, ক্যামেরা নিয়ে,—জীবজন্তুদের ফটো তুলে নির্দোষ হিংসাহীন আনন্দ এবং উত্তেজনা লাভের জন্যে।

হামিজি ছিল আমার বিশ্বাসী চাকর। আফ্রিকাতেই তার জন্ম, গায়ের রং তার কালো, কিন্তু তার মনটা ছিল যে-কোনও শ্বেতাঙ্গের চেয়ে সাদা।

হামিজি আর আমি সেদিন শিকারে বেরিয়েছিলুম। মস্ত একটা মদ্দ মোষের পিছনে পিছনে বনের শুরু পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছি। হামিজি আমাকে অনুসরণ করছিল আমার বড়ো বন্দুকটা হাতে নিয়ে। বনপথে তখন কোনও বিপদের ভয় ছিল না। নির্জনতার শান্তিভঙ্গ করতে পারে, বনের ভিতরে এমন কোনও হিংস্র জন্তুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবারও সম্ভাবনা ছিল না। একটা গাছের ডালের উপরে দুটো পায়রা কেবল পরস্পরের সঙ্গে বাক্য-যুদ্ধ করছিল। তাদের বকবকানি শুনতে শুনতে এগিয়ে গিয়ে পেলুম, আবার স্তব্ধ-শান্তির রাজ্য! রামধনুকের রং মাখা প্রজাপতিরা সবুজ শ্রী নাচঘরে পাখনা কাঁপিয়ে আনাগোনা করছিল।

সুন্দর একটি পাখি ডানা নাচিয়ে সামনে দিয়ে বিদ্যুতের মতো উড়ে গেল। তারপরই গাছের ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়ালে এক জোড়া বাঁদর, তারপর মুখ ভেংচে আরও উঁচু ডালে তড়বড় করে গিয়ে উঠে পড়ল।

যে-বিজন বন দিয়ে চলেছি, বোধহয় সেখানে আর কোনও মানুষের পায়ের দাগ পড়েনি। এখানে একটু এদিক-ওদিক হলেই পথ হারাবার ভয়! সে বিপথে উপরে-নীচে কেবল সবুজ রঙের তরঙ্গ, ছায়ার-মায়ার চারিদিক অপূর্ব। স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট অজানা সব ধ্বনি সেখানে কানের কাছে বেজে ওঠে। সূর্যের আলো সেখানে প্রবেশ করতে ভয় পায়, অচেনা কীট-পতঙ্গ সব চারিদিকে আনাগোনা করে, অদেখা সব সাপ আর গিরগিটি এধারে-ওধারে ছুটে চলে যায়, প্রেতলোকের কালো কালো পাখির ডানার ঝটপটানি শোনা যায়, এবং মনে হয় আমার আশেপাশে সাক্ষাৎ মৃত্যু যেন অপেক্ষা করে আছে।

আমাদের ঘিরে আছে কী রহস্যময় নিস্তব্ধতা! এ নিস্তব্ধতাকে অনুভব করলে বুক যেন

ভয়ে শিউরে ওঠে। অথচ এই নিস্তব্ধতার ধ্যান ভেঙে যাচ্ছে মাঝে মাঝে অজ্ঞাত দু-একটা পাখির ডাকে এবং মাঝে মাঝে, কে জানে কী বন্যজন্তু, শুকনো পাতায় আর্তনাদ জাগিয়ে, বিপুল সব গাছের তলা দিয়ে চলে যায়, কোথায় তা কেউ জানে না। বিজন বন বটে, কিন্তু প্রতিপদেই মনে হয়, কোনও সব বনবাসী জীবের দৃষ্টি তোমার দিকে স্থির হয়ে আছে। যতই চুপি চুপি আর সাবধানে তুমি এগিয়ে চলো, কিন্তু নিশ্চয় জেনো তোমার পায়ের শব্দ কারা শুনতে পাচ্ছে। তারা তোমার অপেক্ষায় ছিল না। কিন্তু তুমি যে এসেছ তারা তা টের পেয়েছে। তোমার সাড়ায় তারা হয় আক্রমণ নয় পলায়ন করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

আমরা দুজনে এগিয়ে যাচ্ছি, হামিজি আর আমি। কিন্তু আমরা কেউ ভাবতে পারিনি যে মৃত্যু আমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। এর জন্যে আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলুম না।

কারণ, হঠাৎ আমি মুখ তুলে দেখি, বিরাট এক হস্তী প্রকাণ্ড দুটো দন্ত নিয়ে আমার সামনেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি চমকে আর থমকে তখনই দাঁড়িয়ে পড়লুম, সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকটা তুললুম কাঁধের উপরে। পথের একটা বাঁকে হাতিটা পায়ে পায়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল, আচম্বিতে আমাদের সাড়া পেয়েই ফিরে দাঁড়িয়েছে! সে কিছুমাত্র ইতস্তত করলে না, একেবারেই একটা চলন্ত-পাহাড়ের মতো আমাদের আক্রমণ করলে। বিকট চিৎকার করে শুঁড় তুলে সে ছুটে এগিয়ে আসছে। আমাদের দু-ধারে গভীর জঙ্গল, পালাবার কোনও পথ নেই। চোখের পলক না পড়তেই নাচার হয়ে তার বুক লক্ষ্য করে আমি বন্দুক ছুড়লুম। তা ছাড়া আর কোনও উপায়ও ছিল না—আমরা যেখানে এসে পড়েছি সেখানকার একমাত্র নিয়ম হচ্ছে,—হয় মারো, নয় মরো!

গুলি খেয়েই সে তার বিরাট দেহ নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল এবং আবার উঠবার আগেই তার দুই চক্ষুর মাঝখানে টিপ করে ফের আমি বন্দুক ছুড়লুম। বড়ো বন্দুকটা আমার হাতে ছিল না—কাজেই আমার পক্ষে উচিত ছিল এ সময় তার হাঁটু টিপ করে গুলি ছোড়া, হয়তো তা হলে সেখানেই তাকে অচল হয়ে বসে পড়তে হত। কিন্তু আমার এই ছোটো বন্দুকের গুলি খেয়ে একটুও কাবু হল না,—এবং হামিজির হাত থেকে বড়ো বন্দুকটা নেওয়ার আগেই সে আবার উঠে দাঁড়াল এবং মূর্তিমান বিভীষিকার মতো আমাদের দিকে ছুটে এল। আমার আর কোনও উপায় নেই, কারণ আমি দু-দুবার বন্দুক ছুড়েছি, এখন আমার বন্দুক একেবারে খালি। ভাবলুম হামিজির হাতে আমার বড়ো বন্দুকটা আছে, নিশ্চয় সে সেটাকে ছুড়বে। কিন্তু কোনও বন্দুকেরই আওয়াজ শুনতে পেলুম না। তার বদলে দেখলুম, বিপুল একটা কালো দেহ আমার উপর এসে পড়েছে, তার মস্ত বড়ো মুখখানা হাঁ করে আছে এবং প্রচণ্ড ক্রোধে চিৎকার করতে করতে সে আমার দিকে ছুটে আসছে! পরমুহূর্তে কী যে হল জানতে পারলুম না, কিন্তু এইটুকু অনুভব করলুম অজগর সাপের চেয়েও মোটা কী যে কী একটা, সজোরে আমাকে জড়িয়ে ধরে শূন্যে তুলে ছুড়ে ফেলে দিলে! অনেক তফাতে গিয়ে আমি পড়লুম এক বাবলাগাছের খুব উঁচু কাঁটা-ভরা ডালের উপরে!

আমার গায়ের কোনও হাড় ভেঙে গেল না বটে, কিন্তু একটা তীক্ষ্ণ কাঁটাগাছের উপরে গিয়ে পড়লে প্রত্যেক ভদ্রলোকের যেমন চ্যাঁচানো উচিত, তেমনি করে চ্যাঁচাতে আমি যে কোনও কসুর করলুম না সেটা তো তোমরা বুঝতেই পাচ্ছ! সেই কাঁটাগাছের ডালের উপরেই অসহায়ভাবে আমি ঝুলতে লাগলুম।

সর্বাঙ্গে কাঁটার বিষম আদর যে কোনও ভদ্রলোকেরই ভালো লাগে না, সে কথা বলা বাহুল্য। সেই যন্ত্রণাময় অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করছি, এমন সময় হঠাৎ শুনলুম হামিজির ভয়ংকর আর্তনাদ! হামিজির গায়ে ছিল টকটকে-রাঙা এক পোশাক,—শিকারের সময় যে-পোশাক পরে আসা কারুরই উচিত নয়। সেই কণ্টক-শয্যায় প্রায় শূন্যের উপরে শুয়েও আমি দেখতে পেলুম হাতিটা আমার জন্যে আর একটুও মাথা না ঘামিয়ে হামিজির দিকেই ছুটে গেল। হাতি, গন্ডার, মোষ প্রভৃতি রাঙা-পোশাক দেখলে খেপে যায়। হামিজি প্রাণপণে ছুটছে, আর সেই মত্ত হস্তীটা রাঙা রং দেখে পাগলের মতো রেগে উঠে তার দিকে তিরের মতো বেগে এগিয়ে চলেছে! হামিজির জন্যে আমি বেঁচে গেলুম—হাতিটা আমার দিকে আর ফিরেও তাকাল না।

কোনও রকমে যখন আমি মাটিতে গিয়ে নামলুম, সেই মত্ত হস্তীটা তখন তার বিরাট দেহ নিয়ে—বেচারা হামিজির ক্ষুদ্র দেহের উপরে গিয়ে পা ফেলে দাঁড়িয়েছে! সে শূন্যে শুঁড় আস্ফালন করছে, দাঁত দিয়ে হামিজির দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করছে আর বড়ো বড়ো থামের মতো পা দিয়ে তাকে দলন করছে!

সামনেই আমার বন্দুকটা পড়েছিল। তাড়াতাড়ি আমি সেটা তুলে নিলুম। তারপর আমার সেই সাহসী ও বিশ্বস্ত ভৃত্যকে উদ্ধার করবার জন্য ছুটে গেলুম।

আমি হাতিটার খুব কাছেই গিয়ে তার বিরাট দেহ লক্ষ্য করে এক সঙ্গেই বন্দুকের দুটো নলের দুটো গুলি ছুড়লুম! দু-দুটো গুলি খেয়ে হাতিটার সমস্ত বীরত্ব উবে গেল—ল্যাজ পেটের তলায় ঢুকিয়ে তীক্ষ্ণস্বরে আর্তনাদ করতে করতে সামনের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে সে অদৃশ্য হয়ে গেল!

হাতিটা চলে যাওয়ার পর আমি হামিজির দিকে ছুটে গেলুম। কিন্তু তার দেহের দিকে একবার চেয়েই বুঝতে পারলুম, হামিজির বাঁচবার আর কোনও আশা নেই! তার দেহ দেখে মনে হয় না যে সেটা মানুষের দেহ! চার পা দিয়ে মাড়িয়ে আর শুঁড় ও দাঁতের আঘাতে হামিজির দেহটাকে হাতিটা এক মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছে! হামিজির কোমর থেকে গলা পর্যন্ত দেখলে সর্বাঙ্গ যেন শিউরে ওঠে! খালি রক্ত আর মাংসের পিণ্ড, আর কিছু নয়! তার পা দুটোর আর হাত দুটোর কোনও চিহ্ন নেই বললেই হয়। হামিজির হাতে আমার যে-ভারী বন্দুকটা ছিল সেটাও বেঁকে দুমড়ে এরকম হয়ে গেছে যে তাকে আর বন্দুক বলে চেনাই যায় না!

মানুষের পক্ষে যা করা সম্ভব, হামিজির জন্যে তা করতে আমি ত্রুটি করিনি। যখন আমি তার মুখে জল ঢেলে দিচ্ছিলুম, হামিজি তখনই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলে। সে দুই চোখ খুলে নীরবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল এবং আমার মনে হল, আমার কাছ থেকে

বাধ্য হয়ে চলে যাচ্ছে বলে তার দুই চোখে ফুটে উঠল গভীর কী দুঃখের ভাব! তারপরেই সব শেষ হয়ে গেল!

হতভাগ্য হামিজি! বীর, সাহসী, বিশ্বাসী হামিজি! বছরের পর বছর আমার পাশে পাশে ছায়ার মতো থেকেছে, কিন্তু অতি বড়ো বিপদেও কখনও সে আমায় ত্যাগ করেনি। তার মৃত্যুর জন্যে আমি দায়ী নই, কিন্তু তার জন্যে আজ আমার প্রাণ কাঁদতে লাগল।

মনে আছে, সে রাত্রে আমি কোনও খাবার খেতে পারিনি; সমস্ত রাত ঘুমুতে পারিনি,— আমার সেই প্রিয়তম ভৃত্যের সেই ভয়ানক মৃত্যু এ জীবনে কখনও ভুলতে পারব না! সেইদিন থেকে আমি শিকার ছেড়ে দিয়েছি।

কিন্তু একটা কথা এখানে বলে রাখি। যে-হাতিটা হামিজির মৃত্যুর কারণ, দু-দিন পরেই তার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেল! আমার গুলির আঘাতে খানিকক্ষণ পরেই তার প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল। তার দাঁত দুটো ছিল খুব মস্ত আর সে-দুটোর দামও ছিল অনেক হাজার টাকার।

কিন্তু সেই দাঁত দুটো পাওয়ার জন্যে আমার মনে কোনওই আগ্রহ ছিল না। এর বদলে যদি আমার হামিজিকে পেতুম!

সেইদিন থেকে আমি শিকার ছেড়ে দিয়েছি।

রুনু-টুনুর অ্যাডভেঞ্চার

॥ প্রথম ॥

টুনু

সে হচ্ছে অরণ্যের স্বদেশ। এবং যারা সেখানে বাস করে, সাধারণত জীব হলেও তারা মানুষ নয়।

সেখানে বনে বনে ঘুরে বেড়ায় হাতির পাল, নদীর তীরে তীরে জলপান করতে আসে হরিণের দল এবং এখানে-সেখানে তাদের উপরে হানা দিতে চায় বড়ো বড়ো বাঘ। প্রকাণ্ড বন্য বরাহ ও তারও চেয়ে বড়ো আর হিংস্র বয়ার, নেকড়ে এবং বিষধর সর্প প্রভৃতি এসব কিছুরই অভাব নেই সেখানে।

সে যেন সবুজের সাম্রাজ্য। বন আর বন আর বন এবং মাঝে মাঝে জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের পর পাহাড়। কতরকম বড়ো বড়ো গাছ, কতরকম ফুলন্ত লতা এবং মাঝে মাঝে ঘাসের মখমলে ঢাকা শ্যামল মাঠ। কত রঙের কতরকম বনফুল, আদর করে কেউ তাদের নাম রাখেনি আজ পর্যন্ত। এখান থেকে বহু দূরে নির্বাসিত হয়ে আছে নাগরিক সভ্যতা। স্নিগ্ধ শ্যামলতায় চোখ জুড়িয়ে যায়, বিহঙ্গরাগিণীর ঝঙ্কারে শ্রবণ পূর্ণ হয়ে যায়, কলনাদিনী তটিনীর নৃত্যলীলা দেখে পরিতৃপ্ত হয়ে যায় নয়ন মন।

সারা বনভূমি জুড়ে দিনের বেলায় গাছের উপরে বা গাছের নীচে খেলা করে ময়ূর-ময়ূরী, হিমালয়ের পারাবত, বন্য হংস ও আর আর নানান জাতের রংবেরঙের পাখি। যতক্ষণ আকাশের পটে মাখানো থাকে রোদের সোনালি, ততক্ষণ তাদের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ছন্দ রেখে জেগে থাকে অরণ্যের অশ্রান্ত মর্মরধ্বনির কাব্যসংগীত।

কিন্তু সন্ধ্যা এসে যেই আলো মুছে চারিদিকে মাখিয়ে দেয় অন্ধকারের কালো রং, তখনই থেমে যায় মর্মর সংগীতের সঙ্গে গীতকারী বিহঙ্গদের সঙ্গত। তারপরে সেখানে জাগ্রত হয় যেসব ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি, তা শ্রবণ করলে মনের মধ্যে পাওয়া যায় না কিছুমাত্র আশ্বস্তির ইঙ্গিত। গাছে গাছে পেচকদের চিৎকার আনে অমঙ্গলের সম্ভাবনা এবং বনে বনে ব্যাঘ্র ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুদের ভৈরব গর্জনে সর্বাঙ্গ হয়ে ওঠে রোমাঞ্চিত। থেকে থেকে শোনা যায় আসন্ন মৃত্যুর কবলগত আহত জীবদের আর্তনাদ। কখনও হুড়মুড় করে ঝোপঝাপ দুলিয়ে ও পদশব্দে পৃথিবীর মাটি কাঁপিয়ে ছুটে চলে যায় বন্য বরাহের দল। আবার কখনও বা শোনা যায় হস্তীজননীর কাতর আহ্বান-ধ্বনি—হয়তো জঙ্গলের কোথায় হারিয়ে গিয়েছে তার শাবক। কখনও অন্য কোথাও জাগে বিষম এক ঝটপটানির শব্দ—হয়তো অজগরের মৃত্যুপাকে জড়িয়ে পড়েছে কোনও হতভাগ্য হরিণ।

যতক্ষণ থাকে রাত্রি, যতক্ষণ থাকে অন্ধকার, যতক্ষণ আকাশে ওড়ে বাদুড় আর পেচকরা, ততক্ষণ কিছুতেই নিঃশব্দ হতে পারে না অরণ্যের নির্জনতা। ধ্বনি আর ধ্বনি এবং প্রত্যেক ধ্বনি দিচ্ছে কেবল মৃত্যুর আর হত্যার আর রক্তপাতের সাঙ্ঘাতিক ইঙ্গিত।

এমনকি, দিনের বেলায় বনস্পতিদের যে-মর্মরধ্বনির মধ্যে পাওয়া যায় কাব্যের আনন্দ, রাত্রে ভয়াল অন্ধকারের ছোঁয়াচ পেয়ে সে-ধ্বনিও হয়ে ওঠে ভয়াবহ। বাতাসে গাছের পরে গাছ নড়ে নড়ে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় পৃথিবীর উপরে যেন বিষাক্ত নিশ্বাস ফেলছে অপার্থিব অভিশপ্ত আত্মারা। বনের আনাচে কানাচে যেদিকে চলে দৃষ্টি, সেই দিকেই যেন ওত পেতে অপেক্ষা করে থাকে কোনও না কোনও মূর্তিমান ও মারাত্মক বিপদ। এখানকার একমাত্র নীতি হচ্ছে—হয় মারো, নয় মরো। দয়ামায়া আসতে পারে না এখানকার ত্রিসীমানায়।

কিন্তু এই ভয়ংকর স্থানেও মানুষের আনাগোনা বন্ধ নেই। কাঠ কাটবার বা মধু সংগ্রহের জন্যে এখানে আসে অনেক লোক। ব্যাধরা বেড়ায় জঙ্গলে জঙ্গলে পশুপক্ষী বধ বা বন্দি করবার জন্যে। আরও নানা কাজে আসে আরও নানান রকম লোক। তারা অনেকেই হিংস্র পশুর পাল্লায় পড়ে প্রাণ দেয়, কিন্তু নাগরিক মানুষের তাগিদ মেটাবার জন্যে তবু তাদের এখানে আসতে হয় বারংবার। তারা সবাই যে প্রত্যহ বনে এসে আবার বন ছেড়ে বাইরে চলে যায়, তা নয়; তাদের অনেকেই বনের এখানে-সেখানে দল বেঁধে বসতি স্থাপন করে। এবং সেইসব বসতির ভিতরে তাদের সঙ্গে থাকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যারাও।

যেখান থেকে সবে আরম্ভ হয়েছে বনের রেখা, সেইখানেই এক জায়গায় আছে একখানি বাংলো। সেই বাংলোর ভিতরে বাস করেন অরণ্যপাল বা বনরক্ষক। জাতে তিনি বাঙালি, নাম তাঁর অসিতকুমার রায়। আমাদের কাহিনি শুরু হবে এই বাংলোখানি থেকেই।

ছোটোখাটো বাংলো। খান-তিনেক ঘর। তারপরেই একটুখানি উঠোনের মতো জায়গা, তার পরেই আরও তিনখানি ছোটো ছোটো মেটে ঘর। রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর ও দাসদাসীদের থাকবার ঘর। বাংলোর চারিপাশেই আছে খানিকটা করে খোলা জমি। তার মধ্যে আছে শাক-সবজি ও ফুল গাছ দিয়ে বাগান রচনার চেষ্টা। জমির চারিদিকেই বাঁশ ও লতাপাতার সাহায্যে বেড়া দেওয়া হয়েছে।

সকাল। ঝিলমিলে গাছের সবুজের উপরে চিকন রোদের স্বচ্ছ সোনার পাত। চারিদিকে গানের আসর জমিয়েছে কোকিল, শ্যামা ও অন্যান্য পাখির দল এবং তারই মধ্যে থেকে থেকে ছন্দপাত করছে বেসুরো কাকের দল।

বাংলোর বারান্দায় একটি গোলটেবিলের ধারে বসে অসিত ও তার স্ত্রী সুরমা প্রভাতি চা পান করছিল। অসিতের বয়স তিরিশের বেশি নয় এবং সুরমা তারও চেয়ে দশ বছরের ছোটো। টেবিলের আর এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে তাদের মেয়ে রেণুকা, ডাক নাম টুনু। এই মেয়েটি ছাড়া তাদের আর কোনও সন্তান হয়নি।

টুনুর বয়স বছর পাঁচ। ফুটফুটে গায়ের রং, মুখখানি সুন্দর। ঠিক যেন একটি জ্যান্ত মোমের পুতুল।

টুনু এখনও চা খেতে শেখেনি, কিন্তু তার লোভ চায়ের সঙ্গের খাবারগুলোর দিকে। দু-খানি বিস্কুট ও একখানি জেলি-মাখানো খণ্ডরুটি পেয়ে টুনু যখন বুঝলে আপাতত আর কোনও খাবার পাবার আশা নেই, তখন মাথার কোঁকড়ানো চুলগুলি দুলিয়ে নাচতে নাচতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল বাংলোর বাগানে।

রোজ সকালে-বিকালে টুনুর খেলার জায়গা ছিল এই বাগানটি। এরই মধ্যে বসে বসে সে ধুলো-মাটি দিয়ে ঘর বানায়, লতাপাতা ছিঁড়ে রান্না করে খেলাঘরের তরকারি। তার আরও অনেক রকম খেলা আছে, সে-সবের কথা এখানে না বললেও চলবে। সেদিন টুনু বাগানের এদিকে-ওদিকে একটু ছুটোছুটি করেই দেখতে পেলে, একটা ফুলগাছের উপরে বসে আছে মস্ত একটি প্রজাপতি। কী চমৎকার তার ডানা দুটির রং! রামধনুকেও অত রকম রঙের বাহার থাকে না! অতএব টুনুর আজকের খেলা হল ওই প্রজাপতিটিকে বন্দি করবার চেষ্টা।

কিন্তু প্রজাপতি ধরা দেয় না। টুনু যেই তার কাছে যায়, অমনি সে ফুস করে এ গাছ থেকে উড়ে অন্য গাছে গিয়ে বসে। টুনুর রোখ চেপে গেল, আজ সে ওই প্রজাপতিটিকে ধরবেই ধরবে। প্রজাপতি ডানা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে যত ওড়ে, টুনুও তার পিছনে পিছনে তত ছোটে। সে যেন এক নতুন রকম মজার চোর চোর খেলা।

প্রজাপতি উড়ছে, টুনুও হাত বাড়িয়ে ছুটছে। প্রজাপতি উড়তে উড়তে বাগানের ফটক পেরিয়ে বাইরে গিয়ে পড়ল, টুনুও তার পিছু ছাড়লে না। তার দৃষ্টি আর কোনওদিকেই নেই এবং তার চোখের সুমুখ থেকে যেন মুছে গিয়েছে ওই প্রজাপতি ছাড়া পৃথিবীর আর সব দৃশ্যই। সে কোনওদিনই বাগানের ফটকের বাইরে যায় না, বাপ-মায়ের মানা আছে। কিন্তু আজ সে যে ফটকের বাইরে চলে গিয়েছে, এ খেয়ালও তার ছিল না।

প্রজাপতি উড়ে পালায়, টুনুও ছোটে পিছনে পিছনে। প্রায় মিনিট-দশ ধরে চলল এই ছুটোছুটি। রোদের তাপ লেগে টুনুর কচি মুখখানি রাঙা হয়ে উঠল, কপালে দেখা দিলে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। তার ছোটো ছোটো পা দু-খানি শ্রান্ত হয়ে এল, তবু প্রজাপতির সঙ্গ ছাড়তে পারলে না।

অবশেষে একটা ঝোপের কাছে এসে প্রজাপতি হঠাৎ আকাশের দিকে উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায়। টুনু খানিকক্ষণ আকাশের দিকে চোখ তুলে হতাশ ভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল এবং দুষ্ট প্রজাপতির এই অন্যায় ও অসঙ্গত ব্যবহার দেখে তার নরম ঠোঁট দু-খানি ফুলে ফুলে উঠতে লাগল দারুণ অভিমানে।

এতক্ষণ পরে তার হুঁস হল, সে বাগানের ফটক পেরিয়ে এসেছে। চারদিকে তাকিয়েও সে তাদের বাড়ি বা বাগান দেখতে পেল না। এখানে চারদিকেই রয়েছে জঙ্গল আর ঝোপঝাড়। কোনও দিকে তাদের বাড়ি আছে, তাও সে বুঝতে পারলে না। শেষটা আন্দাজে, একটা দিক ধরে আবার ছুটতে শুরু করলে।

কতকক্ষণ ধরে সে ছুটলে, তা সে জানে না। তবে এটুকু বুঝলে, যতই সে ছুটছে, জঙ্গল হয়ে উঠছে ততই নিবিড়। এদিকে নিশ্চয়ই তাদের বাড়ি নেই।

তখন বনের কাঁটাঝোপে লেগে তার ঘাগরার নানা জায়গা গেছে ছিঁড়ে এবং পায়ে কাঁটা ফুটে বেরুচ্ছে রক্ত। টুনু আর ছুটতে পারলে না, সেইখানেই বসে পড়ে সভয়ে করুণ স্বরে কেঁদে উঠল—'মামণি, বাবা গো!'

কিন্তু মা বা বাবার কোনওই সাড়া পাওয়া গেল না।

ওদিকে চা-পানের পর খানিকক্ষণ বসে বসে গল্প করলে অসিত ও সুরমা। টুনু এমন সময় রোজই বাগানের ভিতরে গিয়ে খেলা করে, সুতরাং তার জন্যে তাদের কোনওই ভাবনা হল না।

তারপর সুরমা বললে, 'টুনু বাগানে গিয়ে কী করছে বলো তো? কালকের মতো আজও আবার ফুলগাছ ছিঁড়ছে না তো?'

অসিত বললে, 'টুনু দিনে দিনে ভারী দুষ্টু হয়ে উঠছে। তুমি একবার গিয়ে দ্যাখো তো, সে কী করছে!'

সুরমা নিশ্চিন্ত ভাবেই বাগানের দিকে নেমে গেল। তার খানিক পরেই তাড়াতাড়ি ব্যস্ত ভাবে ফিরে এসে বললে, 'ওগো, টুনু তো বাগানের ভিতরে নেই!'

অসিত বললে, 'বাগানের ভিতরে নেই! সে কী?—টুনু! টুনু! ও টুনু!'

ডাকাডাকির পরেও টুনুর কোনওই সাড়া পাওয়া গেল না। অসিত তখন উদ্বিগ্ন মুখে বাগানের বাইরে চলে গেল দ্রুতপদে।

সুরমা সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনতে পেলে, অসিত খুব চেঁচিয়ে, 'টুনু, টুনু' বলে বারবার ডাকাডাকি করছে। স্বামীর কণ্ঠস্বর ক্রমেই দূরে, আরও দূরে চলে গেল, তারপর ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আর তা শোনা গেল না।

সুরমার মায়ের প্রাণ ভয়ে তখন সারা হয়ে উঠেছে। সে তো জানে, বাগানের বাইরে এই বনের ভিতরেই আছে কত রকম বিপদ-আপদ। কাঠের পুতুলের মতন আড়ষ্ট হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল।

একঘণ্টা কেটে গেল, তখনও অসিত বা টুনুর দেখা নেই। নিশ্চয়ই এখনও টুনুকে পাওয়া যায়নি, নইলে এতক্ষণে তার স্বামী নিশ্চয়ই ফিরে আসত। নানারকম অমঙ্গলের দুঃস্বপ্ন দেখতে দেখতে কেটে গেল আরও অনেকক্ষণ। সুরমার দু-চোখ দিয়েই ঝরছে তখন অশ্রুজল।

আরও কতক্ষণ পরে অসিত ফিরে এল মাতালের মতো টলতে টলতে। স্বামীর ভাবভঙ্গি দেখেই সুরমার বুঝতে বিলম্ব হল না যে খুঁজে পাওয়া যায়নি তার বুকের নিধিকে। অসিত বারান্দায় উঠে ধুপ করে একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ল, কিন্তু কোনও কথাই কইতে পারলে না।

আশার বিরুদ্ধেও আশা করে সুরমা থেমে থেমে প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, 'টুনুকে খুঁজে পেলে না?'

'না। সে বনের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছে।'

তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে সুরমা অজ্ঞান হয়ে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল।

॥ দ্বিতীয় ॥

বৎসহারা

সেটি হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড সরোবর। মানুষের হাতে কাটা নয়, স্বাভাবিক সরোবর। গ্রীষ্মকালে জল হয় অগভীর, কিন্তু বর্ষাকালে জল ওঠে তার কূল ছাপিয়ে।

জায়গাটি মনোরম। অনেক দূরে উত্তর দিকে আকাশের গায়ে আঁকা নীল মেঘের মতো দেখা যাচ্ছে একটি পাহাড়। সরোবরের পূর্ব আর পশ্চিম দিকে দাঁড়িয়ে আছে ঘনশ্যাম অরণ্যের প্রাচীর। দক্ষিণ দিকে মস্ত একটা নতোন্নত প্রান্তর করছে ধু ধু। সরোবরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অনেকগুলো গাছ যেন সকৌতূহলে জলের উপরে ঝুঁকে পড়েছে নিজেদের চেহারা দেখবার জন্যে। সেখানে খানিকটা জায়গা জুড়ে বাতাসের দোলায় হিন্দোলিত সরোবরের জলের সঙ্গে দুলে দুলে উঠছে স্নিগ্ধ ছায়ার মিষ্ট মায়া।

রোজ দুপুরবেলা রোদের ঝাঁঝে যখন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পৃথিবী, তখন একদল হাতি সরোবরের এই ছায়া-ঢাকা অংশটাতে জলের ভিতরে গা ডুবিয়ে আরাম উপভোগ করতে আসে। কতকাল থেকে তারা যে এই জায়গাটিতে অবগাহন-স্নান করে আসছে, সে-খবর কেউ রাখে না। কিন্তু গ্রীষ্মের যে-কোনও দুপুরে এখানে এলেই তাদের দেখা পাওয়া যায়। এবং প্রতিদিনই সেই সময় এখানকার আকাশ বাতাস ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে জেগে ওঠে তাদের ঘন ঘন বৃংহিতধ্বনি। সেই ধ্বনি শুনতে পেলে কেঁদো বাঘগুলো পর্যন্ত দূর থেকেই সরে পড়ে মানে মানে।

এই সরোবরে দুপুরে স্নান করতে আসে বয়ার বা বন্য মহিষরাও। কিন্তু তারা থাকে সরোবরের অন্য দিকে, হাতিদের কাছ থেকে নিরাপদ ব্যবধানে। হরিণরাও এখানে আসে অনেক দূর থেকে জল পান করবার জন্যে। আবার সাঁতার কাটবার জন্যে আসে পালে পালে বালিহাঁসরাও। পক্ষীরাজ্যের ধীবর জাতীয় মাছরাঙারাও থেকে থেকে গাছের ডাল ছেড়ে হঠাৎ জলের উপরে ছোঁ মেরে আবার উড়ে যায় এক-একটা রঙিন বিদ্যুতের মতো। ভণ্ড বকেরাও জলের ধারে চিত্রার্পিতের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে লোক-দেখানো ও মাছ ভোলানো তপস্যা করে। জলতেষ্টা পেলে বন্য বরাহদেরও মনে পড়ে এই সরোবরটি। আরও আসে কত জাতের জানোয়ার, সকলকার নাম বলতে গেলে বেড়ে যাবে পুথি। মোট কথা, এই সরোবরের চারিদিকটা হচ্ছে যেন বনবাসী জানোয়ারদের মিলনের ক্ষেত্র। তারা কেউ কারুর সঙ্গে কথা কয় না বটে, কিন্তু তাদের বিভিন্ন কণ্ঠস্বরগুলো সারাদিনই মুখর করে তোলে এই স্থানটিকে। তাদের অনেকেরই গলার আওয়াজ শুনে ও গায়ের গন্ধ পেয়ে কেঁদো বাঘ এবং আমিষের ভক্ত অন্যান্য জীবদের রসনা রীতিমতো সরস হয়ে ওঠে। কিন্তু ও অঞ্চলে দিনের বেলায় তাদের প্রবেশ নিষেধ। কারণ তাদের দেখলেই শিং উঁচিয়ে আর শুঁড় তুলে বয়ার এবং হাতিরা অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার করতে উদ্যত হয়। মোষ আর হাতিদের বাচ্চাদের বাগে পেলে কেঁদো বাঘেরা ছেড়ে কথা কয় না। সেইজন্যেই বাঘেদের উপরে এদের এত রাগ।

বাঘদের আমরা হিংস্র জীব বলি, কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র জীব কে? এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে, মানুষ। সিংহ ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি মাংসাশী জানোয়ার জীবহত্যা করে নিজেরা বাঁচবে বলে। মাংস না খেলে তাদের চলে না। কিন্তু মানুষ বনবাসী জন্তুদের বধ করে প্রায় অকারণ পুলকেই। যেসব জন্তু তাদের কোনওই অপকার করে না এবং যেসব জন্তুর মাংসও তারা খায় না, মানুষরা বধ করে তাদেরও। কিন্তু জানোয়ারদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু মানুষও এই সরোবরের সন্ধান পায়নি, তাই রক্ষা! মানুষরা যদি একবার খবর পেত যে এই জায়গাটি হচ্ছে বনবাসী জন্তুদের মিলন ক্ষেত্র, তাহলে দু-দিনেই এখান থেকে লুপ্ত হয়ে যেত জানোয়ারদের এই বিপুল 'জনতা'। না, এখানে মানুষের গন্ধ পায় না কেউ।

সেদিন দুপুরেও বসেছে হাতিদের জলের আসর এবং পুরোদমে চলছে তাদের জলকেলি। জলের ভিতরে কোনও কোনও হাতি প্রায় সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে শুঁড় দিয়ে জল তুলে চারিদিকে ছিটিয়ে দিচ্ছে সকৌতুকে। কোনও কোনও হাতি জলের ভিতরে স্থির হয়ে বসে এক মনে উপভোগ করছে অবগাহন-স্নানের আরাম। কোনও কোনও হাতি সাঁতার কেটে সরোবরের মাঝখান পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসছে গা ভাসিয়ে। কয়েকটা বাচ্চা হাতি জলে নেমে অত্যন্ত দাপাদাপি করছে। কোনও কোনও হাতি থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠছে অতিরিক্ত আনন্দে। আমরা বলি তাকে বৃংহিত, কিন্তু হাতিদের সভায় বোধহয় সেটা সংগীত বলেই গণ্য হয়।

কেবল একটি হাতি জলে নামেনি, চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল একটা বাঁশঝাড়ের পাশেই। হাতি না বলে তাকে হস্তিনী বলাই উচিত। বাঁশের কচি পাতা হাতিদের অত্যন্ত আদরের খাবার। কিন্তু এই হস্তিনীটির লক্ষ বাঁশের পাতার দিকেও নেই। দেখলেই মনে হয়, সে যেন অতিশয় মনমরা ও বিমর্ষ হয়ে আছে। তার ছোটো ছোটো চোখদুটিও কেমন ক্লান্তি মাখানো।

তা, হস্তিনীর বিমর্ষ হবার কারণও আছে। আজ দু-দিন হল, তার ছোটো বাচ্চাটি বনের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছে। বাচ্চাটির বয়স দু-মাসের বেশি নয়। খুব সম্ভব সে হয়েছে কেঁদো বাঘের খোরাক। সেই বাচ্চার শোকেই হস্তিনী হয়ে আছে আচ্ছন্নের মতো। তার স্তন দুধের ভারে টনটন করছে, কিন্তু দুধ পান করবার কেউ নেই। হঠাৎ কী-একটা শব্দ শুনে সচমকে হস্তিনীর দুই কান খাড়া হয়ে উঠল।

বনের ভিতরে দূর থেকে ভেসে এল একটা ক্রন্দনধ্বনি। শিশুকণ্ঠে শোনা গেল, 'ওগো মামণি, মামণি গো!'

বছর তিনেক আগে একবার মানুষের হাতে বন্দিনী হয়েছিল এই হস্তিনী। কিন্তু বছর দুই বন্দি অবস্থায় কাটিয়ে আবার সে পেয়েছিল পালিয়ে আসবার সুযোগ। সেই দুই বৎসরেই মানুষের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে সে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাই লাভ করেছিল। ওই কান্না আর কথা শুনেই হস্তিনীর বুঝতে দেরি লাগল না যে, বনের ভিতরে এসেছে একটি মানুষের শিশু।

শিশু কণ্ঠস্বর আবার সক্রন্দনে বললে, 'ওগো মামণি, তুমি এসে আমাকে নিয়ে যাও, আমার যে বড্ড ভয় করছে! আমার যে বড্ড খিদে পেয়েছে!'

হস্তিনীর আচ্ছন্ন ভাবটা একেবারে কেটে গেল। যেদিক থেকে কান্নার আওয়াজ আসছিল, সে বেগে ছুটে গেল সেইদিকেই।

জঙ্গল ভেঙে খানিকটা এগিয়ে গিয়েই সে দেখলে, একটি ঝোপের ধারে মাটির উপরে বসে হাপুস চোখে কাঁদছে মানুষদের একটি ছোট্ট মেয়ে। বলা বাহুল্য, মেয়েটি হচ্ছে আমাদের টুনু।

জঙ্গলের ভিতর থেকে মস্ত বড়ো একটা হাতিকে বেরিয়ে আসতে দেখেই টুনুর তো চক্ষুস্থির! ভয়ে তার কান্না হয়ে গেল বন্ধ।

তারপর বিস্ফারিত চোখে টুনু দেখলে, হাতিটা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে তারই দিকে। সে তাড়াতাড়ি পাশের ঝোপের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

কিন্তু হস্তিনী তাকে ছাড়লে না। ঝোপের কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে শুঁড় বাড়িয়ে খুব আলতো ভাবে তার দেহটি জড়িয়ে ধরলে—সঙ্গে সঙ্গে টুনুর কী পরিত্রাহি চিৎকার!

হস্তিনী টুনুকে শুঁড়ে করে তুলে ধরে নিজের মাথার উপরে বসিয়ে দিলে। দারুণ আতঙ্কে টুনু প্রাণপণে চিৎকার করছিল বটে, কিন্তু তখনও সে নিজের বুদ্ধিটুকু হারিয়ে ফেলেনি। হাতির শুঁড় তাকে ছেড়ে দিতেই সে বুঝে ফেললে যে এখনই দুম করে তার মাটির উপরে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। সে তাড়াতাড়ি দুই হাত দিয়ে হাতির দু-খানা কুলোর মতো কান চেপে ধরলে খুব জোরে। তারপরে আবার সে জুড়ে দিলে কান্না।

আমরা বোকা লোককে 'হস্তীমূর্খ' বলে ডাকি বটে, কিন্তু আমাদের এই হস্তিনীটি তার হাতি-বুদ্ধিতে বুঝে নিলে যে, মানুষের এতটুকু শিশু কখনও মা ছাড়া থাকে না। তার নিজের বাচ্চার মতো এই শিশুটিও নিশ্চয় বনের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছে এবং এখন এত কাঁদছে তার মায়ের কাছে ফিরে যাবার জন্যেই। অবশ্য তাকে দেখে মেয়েটির ভয়ও হয়েছে। মানুষদের দেশে সে যখন থাকত, তখন বরাবরই দেখে এসেছে, বয়স্ক মানুষরাও তাকে দেখে পেত রীতিমতো ভয়।

হস্তিনীর মনে পড়ল নিজের বাচ্চার কথা। হয়তো এখনও সে বেঁচে আছে, হয়তো সে-ও এখন তারই জন্যে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে বনে বনে।

হস্তিনীর মায়ের প্রাণ এই মাতৃহারা মনুষ্য-শিশুটির জন্যে সমবেদনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু কী করে যে তাকে সান্ত্বনা দেবে, এট কিছুতেই সে আন্দাজ করতে পারলে না।

হস্তিনী আবার ভাবলে, হয়তো এই শিশুটির খুব খিদে পেয়েছে। হয়তো খাবার পেলে সে একটু শান্ত হতে পারে।

কিন্তু বড়ো ফাঁপরে পড়ল সে। এ হচ্ছে মানুষের শিশু, তার নিজের বাচ্চার মতো এ তো আর হাতির স্তনের দুধ বা বাঁশগাছের পাতা খেতে পারবে না! আর এই গহন বনে মানুষের খোরাকই বা পাওয়া যাবে কোথায়?

কিছুদূরে কী একটা বুনো ফলের গাছ ছিল, হঠাৎ হস্তিনীর চোখ পড়ল তার দিকে। তখনই তার মনে পড়ল, মানুষের বাচ্চাদের সে ফল খেতে দেখেছে। সে তখন মাথার উপরে টুনুকে নিয়ে ধীরে ধীরে সেই ফলগাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর শুঁড় দিয়ে

একটি ফল ছিঁড়ে দিলে টুনুর কাছে। কিন্তু টুনু ফলের দিকে চেয়েও দেখলে না, সামনে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল।

হস্তিনী বোধহয় ভাবলে, আচ্ছা মুশকিল তো বাপু! মানুষের এই বাচ্চাটা ফলও খাবে না, কান্নাও থামাবে না! এখন একে নিয়ে কী করা যায়? এর কি জলতেষ্টা পেয়েছে? দেখি একবার সরোবরের কাছে গিয়ে!

হেলতে-হেলতে দুলতে-দুলতে টুনুকে মাথায় করে হস্তিনী চলল সরোবরের দিকে।

ওদিকে সরোবরের হাতিরা হস্তিনীর মাথায় টুনুকে দেখে বিপুল বিস্ময়ে একেবারে অবাক হয়ে গেল। সাঁতার কাটা, খেলা, জল ছোড়াছুড়ি ভুলে একদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে হাতির দল টুনুর দিকে তাকিয়ে রইল নিষ্পলক চোখে।

হস্তিনীর কোনওদিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই, সোজা সরোবরের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে আবার শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে টুনুকে মাথার উপর থেকে নীচে নামাবার চেষ্টা করলে।

কিন্তু টুনু তখন নীচে নামবে কী! একটার উপরে আবার এতগুলো হাতি দেখে সে আরও বেশি ভয় পেয়ে গেল। হাতির কানদুটো আরও জোরে চেপে ধরে সে আরও চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

পাছে টুনুর কচি গায়ে লাগে, সেই ভয়ে হস্তিনী টুনুকে নিয়ে বেশি টানাটানি করতে সাহস করলে না। তার উপরে এটাও সে বুঝলে, হাতির দল দেখে টুনু আরও বেশি ভয় পেয়েছে। কাজেই টুনুকে নিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সে সরে পড়ল।

হস্তিনী অনেকক্ষণ জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো। এই বিপজ্জনক বনে মানুষের বাচ্চাটিকে ছেড়ে দেওয়াও যায় না, আবার নিজের কাছে রাখাও চলে না। তার কাছে থাকলে এই মানুষের বাচ্চাটি হয়তো অনাহারেই মারা পড়বে।

আমি হাতি নই, সুতরাং হস্তিনী ঠিক কোন কথা ভাবছিল তা আন্দাজ করতে পারছি না বটে, তবে সে অনেকটা ওই রকম কিছুই যে ভাবছিল, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। তারপর ভাবতে ভাবতে বোধহয় সে একটা উপায় আবিষ্কার করে ফেললে এবং তখনই দ্রুতপদে অগ্রসর হল অরণ্যের একদিকে।

টুনু এখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে বটে, কিন্তু আর চিৎকার করছে না। এতক্ষণ পরে বোধহয় তার কিছু সাহস হয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে, এই হাতিটা তার কোনও অপকার করবে না।

বনের ভিতর দিয়ে হাতি পার হয়ে গেল মাইলের পর মাইল। বনের পর বনের ভিতর দিয়ে, প্রান্তরের উপর দিয়ে এবং পাহাড়ের গা ঘেঁষে নদীর তীরে দিয়ে সমানে এগিয়ে চলল হস্তিনী।

টুনু ভাবতে লাগল, হাতিটা তাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে? তার মায়ের কাছে নাকি? এই কথা মনে হতেই টুনু হল অনেকটা আশ্বস্ত। সে কান্না থামিয়ে ফেললে। কচি কচি গলায় বললে, 'লক্ষ্মী হাতি, সোনার হাতি, আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে চলো তো ভাই! তোমাকে আমি একঠোঙা লজেঞ্চুস খেতে দেব।'

হস্তিনী টুনুর কথার মানে বুঝতে না পারুক, কিন্তু সে যে কান্না থামিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে, এইটুকু বুঝেই ভারী খুশি হয়ে উঠল। তাই চলতে চলতে মাঝে মাঝে টুনুর গায়ে আদর করে শুঁড় বুলিয়ে দিতে লাগল।

বৈকালের মুখে হস্তিনী যেখানে গিয়ে দাঁড়াল, সেটি হচ্ছে কাঠুরেদের একটি ছোট্ট গ্রামের মতো। কাঠুরেরা তখনও বন থেকে ফেরেনি। কাঠুরে-বউরা নিজের নিজের ঘরকন্নার কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

একখানি ঘরের দাওয়ায় বসে খুন্তি নেড়ে রান্না করছিল একটি কাঠুরে-বউ। নাম তার পার্বতী।

বাইরের দিকে পিছন করে খুন্তি নাড়তে নাড়তে পার্বতী হঠাৎ সচমকে দেখলে, ঠিক তার পাশেই চাল থেকে যেন মাটির উপরে খসে পড়ল ছোট্ট একটি রাঙা টুকটুকে মেয়ে। তারপরেই ফিরে বসে দেখলে, দাওয়ার নীচে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট একটা হাতি। দেখেই সে খুন্তি ফেলে দাঁড়িয়ে উঠে হাউ-মাউ করে ঘরের ভিতরে দিলে ছুট।

টুনু মাটির উপর বসে বসে দেখলে, হাতিটা আস্তে আস্তে আবার বনের দিকে ফিরে যাচ্ছে এবং যেতে যেতে মাঝে মাঝে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখছে। তারপরে বনের ভিতরে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জানোয়ারের পিঠ ছেড়ে মানুষের ঘরে এসে টুনু কতকটা আশ্বস্ত হল বটে, কিন্তু এখনও মায়ের দেখা না পেয়ে তার ভারী মন কেমন করতে লাগল।

ইতিমধ্যে পার্বতী জানলার উপর থেকে উঁকি মেরে দেখে নিয়েছে, সে মস্ত হাতিটা আর সেখানে নেই। তখন সে আস্তে আস্তে বাইরে এসে কৌতূহলী চোখে টুনুর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। সে এত সুন্দর মেয়ে আর কখনও দেখেনি! যেমন তুলি দিয়ে আঁকা নাক মুখ চোখ, তেমনি দুধে-আলতায় গায়ের রং। আর গড়নটিও সুডৌল। দেখলেই আদর করতে আর ভালোবাসতে সাধ হয়। হাতির মাথায় চড়ে এল যখন, তখন নিশ্চয়ই কোনও রাজা-মহারাজার মেয়ে হবে।

পার্বতী জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কে, খুকুরানি?'

টুনু বললে, 'আমি টুনু।'

'তুমি কোথায় থাকো?'

'বাড়িতে।'

'তোমার বাবা বুঝি রাজা?'

'না, তিনি বাবা।'

'তোমার মা আছেন?'

'হুঁ-উ-উ-উ।'

'তোমার সঙ্গে লোকজনরা কোথায়?'

টুনু এ প্রশ্নের অর্থ বুঝতে পারলে না। সে এগিয়ে গিয়ে নিজের ছোটো ছোটো হাত দু-খানি দিয়ে পার্বতীর কাপড় ধরে টানতে টানতে বললে, 'আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে চলো। নইলে আমি কেঁদে ফেলব!'

পার্বতী বললে, 'তোমার মা কোথায় থাকেন, খুকুমণি?'

'বাড়িতে।'

'তোমার বাড়ি কোথায়?'

'জানি না।'

'তবে আমি কেমন করে তোমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাব?'

টুনু বললে, 'প্রজাপতিটা ধরা দিলে না। ছাই প্রজাপতি, দুষ্টু প্রজাপতি! সে পালিয়ে গেল, আমি হারিয়ে গেলুম। ওই লক্ষ্মী হাতিটা আমাকে মাথায় করে এখানে নিয়ে এসেছে। ভারী লক্ষ্মী, আমাকে একবারও বকেনি।'

এতক্ষণে পার্বতী ব্যাপারটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারলে এ কোনও অভাগীর চোখের মণি, হারিয়ে গিয়েছে বনের কোথায়, একে কুড়িয়ে পেয়েছে বনের হাতি। এমন আশ্চর্য কথা পার্বতী আর কখনও শোনেনি।

টুনু ছলছলে চোখে বললে, 'আমার খিদে পেয়েছে। আমাকে খাবার দাও, নইলে আমি কাঁদব!'

সত্য, টুনু যে ক্ষুধার্ত, সেটা তার শুকনো মুখ দেখেই বেশ বোঝা যায়। কিন্তু এ কোনও বড়ো ঘরের মেয়ে, বাড়িতে কত ভালো ভালো খাবার খায়, গরিব কাঠুরে-বাড়ির খাবারে তার রুচি হবে কি? এই ভাবতে ভাবতে পার্বতী বললে, 'টুনু, তুমি কী কী খাবার খাও?'

উত্তরে টুনু এক নিশ্বাসে খুব লম্বা একটা খাবারের ফর্দ দাখিল করলে।

পার্বতী হেসে বললে, 'আমাদের তো ওসব খাবার নেই!'

টুনু ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, 'তবে আমি কাঁদি?'

পার্বতী ব্যস্ত হয়ে বললে, 'না খুকু, কেঁদো না। তুমি রুটি খাবে? রুটি আর গুড়?'

টুনু তক্ষুনি উৎসাহিত হয়ে বললে, 'পাটালিগুড় তো?'

দৈবক্রমে পার্বতীর ঘরে সেদিন পাটালিগুড় ছিল। সে তখনই একখানি সানকিতে দু-খানি রুটি আর পাটালিগুড় টুনুর সামনে ধরলে।

টুনু সেই কোন সকালে খেয়ে বেরিয়েছে, আর এখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। এতটুকু মেয়ে কি এতক্ষণ উপোস করে থাকতে পারে? দারুণ শোকে, ভয়ে আর দুর্ভাবনায় তার মন এতক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে ছিল বলেই ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা সে ভুলে গিয়েছিল। সানকির উপর থেকে দু-খানি মাত্র রুটি আর একখণ্ড পাটালি অদৃশ্য হতে আর দেরি লাগল না। তারপর টুনু বললে, 'আরও রুটি খাব, আরও গুড় খাব।'

পার্বতী তাকে আরও দু-খানি রুটি আর একখানি পাটালি এনে দিলে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে টুনু হাই তুলে বললে, 'আমার ঘুম পেয়েছে, আমি ঘুমোব।'

পার্বতী তাকে নিজের কোলের উপরে তুলে নিলে। দেখতে দেখতে ঘুমের ঘোরে টুনুর দুই চোখ গেল মিলিয়ে।

সন্ধ্যার সময় দুখিরাম ফিরে এল। সে হচ্ছে পার্বতীর স্বামী।

বিছানার উপরে শুয়ে টুনু ঘুমোচ্ছিল। তার দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে দুখিরাম বললে, 'এ আবার কে রে পার্বতী?'

পার্বতী হাসতে হাসতে বললে, 'আমাদের তো ছেলেপুলে নেই, ভগবান তাই দয়া করে এই মেয়েটিকে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

দুখিরাম আরও আশ্চর্য হয়ে বললে, 'ভগবান মেয়ে পাঠিয়েছে কী রে? ও কার মেয়ে? কে ওকে এখানে নিয়ে এল?'

'ও কার মেয়ে তা জানি না, তবে ওকে এখানে নিয়ে এসেছে একটা হাতি।'

দুই চক্ষু ছানাবড়ার মতো করে দুখিরাম বললে, 'হাতি!'

'হ্যাঁ, একটা বনের হাতি।'

'বনের হাতি নিয়ে এল মানুষের মেয়ে? তা কখনও হয়?'

'তা হয় না বলেই তো বলছি, এসব ভগবানেরই লীলে।'

এইবারে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে দুখিরাম ঘাড় নেড়ে বললে, 'তোর কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তুই কি আমার সঙ্গে মস্করা করছিস?'

'মশকরা নয় গো, মশকরা নয়। তবে শোনো।' পার্বতী তখন একে একে সব কথা স্বামীর কাছে খুলে বললে।

সব শুনে দুখিরাম খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল চিন্তিত মুখে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'এ যে বড়ো ভাবনার কথা হল রে!'

পার্বতী বললে, 'কেন?'

'কেন তা বুঝতে পারছিস না? শেষটা কি মেয়ে চুরি করেছি বলে জেল খাটতে যাব? আমাদের কথা কে বিশ্বাস করবে? যদি বলি মেয়ে পেয়েছি হাতির কাছ থেকে, তাহলে জজ কি সে কথা মানবে? এ বড়ো বিপদের কথা রে পার্বতী, ভারী বিপদের কথা!'

পার্বতী বললে, 'দ্যাখো, তুমি এক কাজ করো। মেয়ে আপাতত আমাদের কাছেই থাক। তুমি বরং থানায় গিয়ে একটি খবর দিয়ে এসো। তাহলেই তোমার উপর আর কোনও ঝুঁকি পড়বে না। তারপর মেয়ের বাপ মেয়ে ফিরিয়ে নিতে আসে, ফিরিয়ে দেব। না আসে, মেয়ে আমাদের কাছেই থাকবে। মা দুগ্‌গা করুন, মেয়ের মা-বাপ যেন কোনও খবর না পায়!'

দুখিরাম বিরক্ত স্বরে বললে, 'ছি পার্বতী, অমন কথা মুখেও আনিসনি। একবার ভেবে দেখ দেখি, মেয়ের মা-বাপের কথা। তাদের বুকের ভিতরটা এখন কী করছে, তা কি বুঝতে পারছিস না? হে মা দুগ্‌গা, পার্বতীর কোনও অপরাধ নিয়ো না মা, ও না বুঝে অমন পাপ-কথা বলে ফেলেছে।'

পরের দিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই টুনু কাঁদতে কাঁদতে বায়না ধরলে, তাকে এখনই মায়ের কাছে নিয়ে যেতে হবেই হবে।

পার্বতী অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে খাবার-দাবার দিয়ে কোনওরকমে তার মুখ বন্ধ করলে। টুনু খাবার খেতে লাগল ফুলে ফুলে কাঁদতে কাঁদতেই।

ছোট্ট গাঁ, টুনুর কথা রাষ্ট্র হতে দেরি লাগেনি। সকালে গাঁয়ের যে যেখানে ছিল, সবাই ছুটে এল টুনুকে দেখতে।

বেশ একটি ছোটোখাটো জনতা। খোকাখুকি থেকে বুড়োবুড়ি পর্যন্ত সবাই এসে চারিদিক

থেকে টুনুকে ঘিরে দাঁড়াল। সকলে মিলে সবিস্ময়ে টুনু সম্বন্ধে যখন মতামত প্রকাশ করছে, তখন বনের ওদিক থেকে কারা যেন চেঁচিয়ে বললে, 'পালাও—পালাও—পাগলা হাতি, পাগলা হাতি!'

সবাই সভয়ে ফিরে দেখে, বনের ভিতর থেকে বিরাট দেহ নিয়ে হেলতে হেলতে ও দুলতে দুলতে বেরিয়ে আসছে কালকের সেই হস্তিনী। তৎক্ষণাৎ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল জনতা। এমনকি, পার্বতী ও দুখিরাম পর্যন্ত ভয়ে প্রায় বেহুঁস হয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে খিল লাগিয়ে দিলে দরজায়।

সেখানে একলাটি দাঁড়িয়ে রইল কেবল টুনু।

ঘরের ভিতরে ঢুকে পার্বতীর হুঁস হল। সে বলে উঠল, 'ওই যাঃ, টুনু যে বাইরে!'

দুখিরাম বললে, 'কী করব বল পার্বতী? পাগলা হাতির সামনে বেরুব কেমন করে?'

পার্বতী তাড়াতাড়ি আবার দরজার খিল খুলতে গেল, কিন্তু দুখিরাম তার হাতদুটো চেপে ধরে বললে, 'করিস কী, শেষটা কি অপঘাতে মারা পড়বি? আচ্ছা দাঁড়া, জানলা একটু ফাঁক করে দেখি, বাইরে কী ব্যাপার হচ্ছে!'

দুখিরাম জানলার কাছে গেল। একখানা পাল্লা একটু খুলে ভয়ে ভয়ে উঁকি মারলে, কিন্তু বাইরে কারুকেই দেখতে পেলে না। না টুনু, না হাতি। সে সবিস্ময়ে বললে, 'ওরে পার্বতী, সর্বনাশ হয়েছে যে, পাগলা হাতিটা টুনুকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে!'

পার্বতী দরজা খুলে বেগে বাইরে ছুটে গেল। কিন্তু সে-ও টুনু বা হাতি কারুকেই দেখতে পেলে না। 'টুনু, টুনু' বলে চেঁচিয়ে অনেক ডাকাডাকি করলে, কিন্তু টুনুর কোনও সাড়াই পাওয়া গেল না। সে তখন কাঁদো কাঁদো মুখে ধপ করে মাটির উপরে বসে পড়ল। দুখিরাম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'ভগবান দিয়েছিল, ভগবানই কেড়ে নিলে। আমাদের ঘরে কি ও মেয়ে মানায়? কী আর করবি পার্বতী, দুখ্যু করে আর কোনও লাভ নেই। নে, এখন ওঠ, দুটো পান্তাভাত দে, আমাকে আবার কাজে যেতে হবে।'

পার্বতী চোখের জল মুছে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে উঠে স্বামী-আদেশ পালন করতে গেল।

খেয়ে-দেয়ে কুড়ুল নিয়ে বেরিয়ে গেল দুখিরাম। পার্বতীও কলশি নিয়ে নদীতে জল আনতে গেল।

তারপর ঘণ্টা-দুই কেটে গেছে। পার্বতী যন্ত্রে-চলা পুতুলের মতন ঘরকন্নার কাজ করছে বটে, কিন্তু মুখ তার ম্রিয়মাণ। মনে মনে খালি সে ভাবছে, এক দিন টুনুকে পেয়ে মায়ার টানে তার জন্যে মন কাঁদছে, আর যারা টুনুর বাপ-মা, এমন মেয়ে হারিয়ে না-জানি তাদের কী হালই হয়েছে!

হঠাৎ বাইরে শোনা গেল কচি শিশুকণ্ঠের কৌতুক হাস্য। পাবতী চমকে উঠল। এক ছুটে সে দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়াল। দেখলে, সেই হাতিটা আবার দুলতে দুলতে তাদের ঘরের দিকেই আসছে, আর—তার মাথার উপরে দুই হাতে হাতির দুই কান চেপে ধরে সকৌতুকে হেসে হেসে উঠছে টুনু।

পার্বতী ভয়ে ভয়ে পিছিয়ে আবার ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল। হাতি দাওয়ার সামনে এসে শুঁড় তুলে টুনুকে ধরে আবার মাটির উপরে নামিয়ে দিলে। তারপর ফিরে চলল বনের দিকে।

টুনু চেঁচিয়ে বললে, 'রুনু, রুনু!'

হাতি দাঁড়িয়ে পড়ে তার দিকে তাকালে। টুনু বললে, 'রুনু! কাল আবার এসো, আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে।' হাতি চলে গেল।

পার্বতী তখন ছুটে এসে টুনুকে কোলে তুলে নিয়ে বললে, 'তুমি কোথায় গিয়েছিলে টুনু?'

টুনু গম্ভীর ভাবে বললে, 'বেড়াতে।'

'ওই হাতিটার নাম কি রুনু?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কেমন করে জানলে?'

টুনু বললে, 'বা রে, আমি আবার জানব না? আমি তো আজকেই ওর নাম রেখেছি রুনু!'

'ও! তাই নাকি? কিন্তু টুনু, অত বড়ো একটা পাগলা হাতির সঙ্গে যেতে তোমার ভয় করল না?'

'কে বললে আমার রুনু পাগলা? রুনু ভারী লক্ষ্মী। ওর সঙ্গে যেতে আমার ভয় করবে কেন? ও যে আমাকে ভালোবাসে। আমি এখন রোজ ওর সঙ্গে বেড়াতে যাব।'

পার্বতী বললে, 'ওর সঙ্গে রোজ বেড়াতে যাবে? বাপ-মার কাছে যাবে না?'

টুনু ভুরু কুঁচকে বললে, 'হ্যাট, তুমি ভারী বোকা, কিচ্ছু বোঝো না। আমি মায়ের কাছে গেলে, রুনুও তো আমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে। আমার মা তাকে কত আদর করবেন, কত খাবার খেতে দেবেন! রুনুকে আমি সেসব কথা বলেছি।'

'সে তোমার কথা বুঝতে পারলে?'

'কেন পারবে না? তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ, আর আমার রুনু পারবে না?'

পার্বতী হাসতে হাসতে টুনুর গালে একটি চুমু খেলে।

টুনু বললে, 'খিদে পেয়েছে, খাবার দাও!'

পার্বতী হাঁড়ির ভিতর থেকে দু-মুঠো মুড়কি বার করে টুনুকে খেতে দিয়ে বললে, 'এখন এই খাও, একটু পরে ভাত খেতে দেব।'

॥ তৃতীয় ॥

রুনু আর টুনু

টুনুর দেখাদেখি হস্তিনীকে আমরাও এবার থেকে রুনু বলেই ডাকব। অমন মস্ত জীবের এমন ছোট্ট নাম যদিও মানায় না, তবু কী আর করি বলো, ওকে অন্য নামে ডাকলে হয়তো খুব রাগ করবে টুনু।

তারপর থেকে দিনে অন্তত একবার করেও টুনুকে না দেখলে রুনুর চলত না। টুনুকে পেয়ে সে বোধহয় নিজের হারিয়ে-যাওয়া বাচ্চার দুঃখ কতকটা ভুলতে পারলে।

টুনু এখন হাতির মাথায় চড়তে খুব ওস্তাদ হয়ে পড়েছে। রুনু যখন শুঁড় দিয়ে তাকে টেনে তোলে, তার মনে ভয় হয় না একটুও। ঘোড়সওয়ার লাগাম ধরে ঘোড়াকে যেমন চালনা করে, টুনুও যেন তেমনি ভাবেই হাতির কান ধরে তাকে এদিকে-ওদিকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াত। রুনু যেদিকে যাচ্ছে টুনুর সেদিকে যাবার ইচ্ছে না হলে সে দুই কানে জোরে টান মেরে চেঁচিয়ে উঠত, 'এই দুষ্টু রুনু, কে তোমাকে ওদিকে যেতে বলেছে? এইদিকে চলো।' রুনুও অমনি পরম শান্ত ভাবেই অন্য দিকে ফিরে টুনুর মন রাখবার চেষ্টা করত।

যাঁরা হাতি পুষেছেন তাঁরাই জানেন, হাতিদের মতো বুদ্ধিমান জীব জানোয়ারদের ভিতরে খুব কম আছে। এমনকি, মানুষের অনেক কথাই তারা বেশ বুঝতে পারে। যাঁরা কুকুর ভালোবাসেন, তাঁরা জানেন যে মানুষের ভাষা কুকুরের পক্ষে খুব দুর্বোধ নয়। মানুষের ছোটো ছোটো অনেক কথার মানে তারা অনায়াসেই বুঝতে পারে। হাতি আবার কুকুরের চেয়েও বুদ্ধিমান জীব। আগেই বলেছি, রুনু কিছুকাল মনুষ্যসমাজে বন্দি জীবন যাপন করেছিল। সেই সময়েই মানুষের ভাষা ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে হয়েছিল তার অল্প-স্বল্প অভিজ্ঞতা।

বনের স্থানে স্থানে নানা ফলের গাছে ফলে থাকত রকমারি ফল। টুনু যখন কোনও পছন্দসই ফল খাবার আবদার ধরত রুনুর তা বুঝতে বিলম্ব হত না একটুও। সে তখনই শুঁড় দিয়ে ফল পেড়ে এগিয়ে দিত টুনুর কাছে।

একদিন একটা বেলগাছের তলা দিয়ে যেতে যেতে টুনুর বেল খাবার সাধ হল। কিন্তু রুনু জানত, বেলের উপরে থাকে শক্ত আবরণ, বেল পেড়ে দিলেই টুনু খেতে পারবে না। তাই সে বেলটা পেড়ে শুঁড় দিয়েই মাটির উপরে আছাড় মেরে আগে ভেঙে ফেললে, তারপর তুলে দিলে টুনুর হাতে।

কেবল ফল নয়, টুনুর জন্যে তাকে রোজ নিয়মিত ভাবেই ফুল পর্যন্ত সংগ্রহ করতে হত। এইসব ফরমাস যে সে খুব খুশি মনেই খাটত, তার শান্ত ও উজ্জ্বল চোখদুটো দেখলেই সেটা অনায়াসে উপলব্ধি করা যেত। সবাই জানে, জানোয়ারেরা হাসতে পারে না। কিন্তু জানোয়ারেরা যে খুশি হলে মনে মনে হাসে না, জোর করে বলা যায় না এমন কথাও। হয়তো তারা হাসে অন্য রকম উপায়ে। ওই যে খুশি হলে কুকুরেরা ল্যাজ নাড়ে, হয়তো ওইটেই তাদের হাসবার ধরন। হাতিদের হাসবার ধরনটা কী রকম, আমরা তা জানি না।

কিন্তু টুনুর নানান রকম ছেলেমানুষি দেখে রুনু যে খুব হাসত, এটুকু আমরা অনুমান করে নিতে পারি।

রুনুর সঙ্গে বেড়াতে যেতে টুনুর ভারী ভালো লাগত। ভালো লাগবারই কথা। এখানকার দৃশ্য যে চমৎকার! পাহাড়, উপত্যকা, ঝরনা, নদী, সরোবর, তেপান্তরের মাঠ ও ফুল-ফোটা সবুজ বন—এখানে কিছুরই অভাব নেই।

একদিন পাহাড়ের কাছ দিয়ে যেতে যেতে টুনুর শখ হল, সে পাহাড়ে চড়বে। বললে, 'রুনু, আমি পাহাড়ের উপরে উঠব।'

প্রথমটা রুনু তার কথা বুঝতে পারলে না; যেমন চলছিল, মাঠ দিয়ে তেমনি ভাবেই চলতে লাগল।

টুনু তখন রাগ করে তার ছোট্ট ডান হাতখানি দিয়ে রুনুর মাথায় একটি চড় মেরে বললে, 'তুমি হচ্ছ ভারী হাঁদারাম! বুঝতে পারছ না, আমি ওই পাহাড়টার উপরে উঠব?' বলেই সে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আঙুল দিয়ে পাহাড়টাকে দেখিয়ে দিলে।

তখন রুনু তার মনের ভাবটা ধরতে পারলে। কিন্তু বুঝেও সে এমন ভাব দেখালে যেন কিছুই বুঝতে পারেনি। কারণ সে জানে, টুনুকে নিয়ে ওই পাহাড়ে ওঠা নিরাপদ নয়। অতএব টুনুর রাগ আর অভিমানের কোনওই ফল হল না, রুনু নিজের মনেই চলতে লাগল মাঠের উপর দিয়ে।

টুনুকে নিয়ে রুনু একদিন হাজির হল আবার সেই সরোবরের ধারে। সেদিনও সরোবরের হাতিরা প্রথমটা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, তারপর কয়েকটি হাতি ডাঙার উপরে উঠে আসল,—রহস্যটা কী, বোধহয় সেই তদারকই করতে এল।

তাদের দেখে আজ কিন্তু টুনুর একটুও ভয় হল না। বোধহয় তার ধারণা হয়েছে, সব হাতিই রুনুর মতই শান্ত।

দু-তিনটে ফচকে বাচ্চা-হাতি ছুটে এসে রুনুর চারিদিক বেড়ে দৌড়োদৌড়ি করতে লাগল। তাদের ভাব দেখলে মনে হয়, তারাও যেন টুনুর সঙ্গে খেলা করতে চায়।

টুনুও সকৌতুকে বলে উঠল, 'ও রুনু, আমাকে একটু নামিয়ে দাও না!'

রুনু কিন্তু তার কথা শুনলে না। উলটে এমন চিৎকার করে উঠল যে, বাচ্চা হাতিগুলো ভয় পেয়ে আবার নিজের নিজের মায়ের গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল। বোধহয় সে তাদের ধমক দিলে।

বড়ো বড়ো যে হাতিগুলো তাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল তারাও বুঝতে পারলে, রুনুর ইচ্ছে নয় আর কেউ তাদের কাছে যায়। তখন তারাও ফিরে গিয়ে আস্তে আস্তে আবার জলের ভিতরে নামতে লাগল।

কাঠুরেদের গ্রামে এখন আর সকলেও রুনুকে দেখে একটুও ভয় পায় না; সে যেন তাদেরও পোষ-মানা জীব হয়ে পড়েছে। রোজই কেউ না কেউ তাকে এটা-ওটা-সেটা খেতে দেয়। বিশেষ করে পার্বতী। রুনুর জন্যে প্রতিদিনই রেখে দিত কিছু না কিছু খাবার। টুনুর হুকুমে রুনুও প্রায়ই তাদের সংসারের জন্যে নানান রকম ফলমূল সংগ্রহ করে আনত।

আর রুনুর দেখা পেলে গাঁয়ের শিশুমহলে উঠত আনন্দের কলকোলাহল। তারাও সবাই কাছে ছুটে এসে আনন্দে খুব লাফালাফি আর চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিত। এবং টুনুর মন রাখবার জন্যে তাদের অনেককে মাথায় নিয়ে রুনুকে খানিকটা ঘোরাঘুরি করে আসতে হত।

এইভাবে কেটে যাচ্ছে দিনের পর দিন। পার্বতীর মনে সর্বদাই দুশ্চিন্তা, কখন টুনুর বাপ-মা খবর পেয়ে এসে তাদের কাছ থেকে তাকে কেড়ে নিয়ে যায়। টুনুকে দেখতে পাবে না, এ কথা মনে হতেও পার্বতীর বুকটা ধড়াস করে ওঠে। সে যেন একেবারে তাদেরই মেয়ে হয়ে পড়েছে।

কিন্তু পার্বতীর সৌভাগ্যক্রমে টুনুর বাপ-মায়ের কোনও খোঁজই পাওয়া গেল না।

॥ চতুর্থ ॥
হস্তী-কাহিনি

দিনর পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর। পার্বতীর সকল দুশ্চিন্তা অমূলক, কারণ টুনুর বাপ-মা কেউ এল না তাকে নিজের মেয়ে বলে দাবি করতে। তাদের ঘরেই টুনু বেড়ে উঠতে লাগল দিনে দিনে। সে-ও দেখতে লাগল দুখিরাম ও পার্বতীকে বাপ-মায়ের মতোই। নিজের বাপ-মায়ের কথাও মাঝে মাঝে তার স্মরণ হয়, কিন্তু সে যেন অনেকদিন আগে দেখা স্বপ্নের মতো।

রুনুরও নিয়মিত আনাগোনা বন্ধ হল না।

রুনু আর টুনু, দুখিরাম আর পার্বতী, নিজেদের সুখ-দুখ নিয়ে বাস করতে থাকুক এই বনগ্রামে, ইতিমধ্যে আমি তোমাদের কাছে হাতিদের কয়েকটি গল্প বলে নিই। কিন্তু মনে রেখো, এগুলি বানানো গল্প নয়, এর প্রত্যেকটি হচ্ছে একেবারে সত্য কাহিনি। এগুলি শুনলে হাতিদের সূক্ষ্ম বুদ্ধি সম্বন্ধে তোমরা একটা ধারণা করতে পারবে।

সিংহকে সবাই আমরা পশুরাজ বলে ডাকি বটে, কিন্তু সত্য কথা বলতে কী, ওই উপাধিটি হাতিরই প্রাপ্য হওয়া উচিত। বনের আর সব পশুর চেয়ে হাতিরা আকারে ঢের বেশি বড়ো বলেই আমি এ কথা বলছি না; তার চাল-চলন সবই রাজকীয়। এবং এইজন্যেই বোধহয় স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতীয় রাজা-রাজড়ারা হাতির সঙ্গে সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রেখে এসেছেন। হাতি কেবল হিন্দুদের স্বর্গেই দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন হয়নি, মর্তেও আজ পর্যন্ত প্রত্যেক রাজাই হাতিকে রাজৈশ্বর্যের একটি প্রধান সম্পদ বলেই মনে করেন। হাতি বুদ্ধিমান জীব বলেই গণেশ-ঠাকুরের মুখের আকার হয়েছে হাতির মতো। হাতিরা মানুষের ভাষা (অর্থাৎ মানুষ তাদের জন্যে যে-ভাষা সৃষ্টি করেছে) বেশ বুঝতে পারে। অবশ্য সেই ভাষার শব্দসংখ্যা বেশি নয়—আঠারো-উনিশটি মাত্র।

ভারতে, ব্রহ্মদেশে ও সিংহলে বড়ো বড়ো কাঠের গুঁড়ি তোলবার জন্যে হাতিদের

নিযুক্ত করা হয়। সে-সব জায়গায় হাতিদের কার্যকলাপ লক্ষ করলেই বোঝা যায় তাদের বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ। মাহুত না থাকলেও খুব ভারী ভারী কাঠের গুঁড়ি তোলবার সময় তারা নিজেদের স্বাধীন বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় দিতে পারে। কোনও গাছের গুঁড়ি যদি খুব বেশি ভারী হয়, তাহলে একসঙ্গে তিন-চারটে হাতি মিলে সেই গুঁড়ি তুলে বহন করে যথাস্থানে গিয়ে রেখে আসে।

গভীর অরণ্যে দেখা গিয়েছে, দরকার হলে অশিক্ষিত বন্য হস্তীরাও এই রকম মিলে মিশে কাজ করতে পারে। হয়তো একটা গাছের কচি ডালপালা দেখে তাদের লোভ হল। কিন্তু সে-গাছটা এত বড়ো আর উঁচু যে, তাকে উপরে ফেলা একটা হাতির কর্ম নয়। তখন সেই গাছ উৎপাটন করবার জন্যে একসঙ্গে কাজ করে কয়েকটা হাতি। তাদের কেউ কেউ শুঁড় দিয়ে গুঁড়ির ডাল জড়িয়ে ধরে টানাটানি করতে থাকে এবং কেউ কেউ বড়ো বড়ো দাঁত দিয়ে মাটি খুঁড়ে গাছের মূলদেশে আঘাত করতে থাকে।

দক্ষিণ ভারতের মাদুরার বিখ্যাত মন্দির দেখবার জন্যে গিয়েছিলেন এক সাহেব। সেখানে মন্দিরের নিজস্ব কতকগুলি হাতি আছে, তাদের শেখানো হয়েছে ভিক্ষা করতে। সাহেবকে দেখেই তারা একসঙ্গে হাঁটু গেড়ে মাটির উপরে বসে পড়ে শুঁড় তুলে সেলাম করলে।

সাহেব কারণ বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে গেলেন।

মাহুত কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে বললে, 'হুজুর, হাতিরা আপনাকে সেলাম করছে। ওরা কিছু বকশিশ চায়।'

সাহেব হাসতে হাসতে হাতিদের সামনে একটা দু-আনি ফেলে দিলেন।

কী! এতগুলো হাতির জন্যে এই তুচ্ছ একটা দু-আনি? হাতিরা গেল খেপে। তারা তখনই সাহেবের মাথার উপরে শুণ্ড আস্ফালন করতে করতে একসঙ্গে চিৎকার করতে লাগল।

বিপদ দেখে সাহেব তাড়াতাড়ি সেখানে আরও কয়েকটা দু-আনি ছড়িয়ে দিয়ে তবেই মুক্তিলাভ করেন।

রেঙ্গুনে খুব প্রকাণ্ড একটি কাঠের গোলায় আর একটি হাতির অদ্ভুত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। সেখানেও একটি মাহুতের অধীনে হাতিরা বড়ো বড়ো গাছের গুঁড়ি গোলার ভিতরে এনে রাখছিল। সব গুঁড়ি তোলা হয়ে গিয়েছে, বাকি আছে কেবল একটি। একটি হাতি সেই গুঁড়িটা তোলবার জন্যে এগিয়ে গেল। ঠিক সেই সময় ঘণ্টা বেজে উঠল, এটা হচ্ছে ছুটির ঘণ্টা। এই ঘণ্টাধ্বনি হবার পরেই গোলার কাজ শেষ হয়ে যায়। মাহুত শেষ যে গাছের গুঁড়িটা পড়ে ছিল, সেটা তাড়াতাড়ি তুলে আনবার জন্যে হাতিকে ইঙ্গিত করলে। কিন্তু হাতির ভাব দেখে মনে হল, গুঁড়িটা অত্যন্ত ভারী বলে সে অনেক চেষ্টা করেও সেটা তুলতে পারছে না। মাহুত তখন বাধ্য হয়ে তাকে নিয়ে গোলার বাইরে চলে গেল।

পরদিন যথাসময়ে আবার গোলার কাজ আরম্ভ হল। মাহুত সেই হাতিটাকে ভিতরে

নিয়ে এসে আবার কালকের ফেলে যাওয়া গুঁড়িটা তুলে নিয়ে যেতে বললে। হাতি এগিয়ে গিয়ে খুব সহজেই দুই দন্তের সাহায্যে গাছের গুড়িটা মাটি থেকে তুলে অনায়াসেই যথাস্থানে গিয়ে রেখে এল।

এখন ব্যাপার হচ্ছে এই। হাতি কালকে ইচ্ছা করেই গুঁড়িটা তোলেনি, কারণ তখন বেজে গিয়েছে ছুটির ঘণ্টা। তবু সে যে বার বার গুঁড়িটা তোলবার চেষ্টা করেও অক্ষম হয়েছিল, আসলে তা হচ্ছে লোক দেখানো অভিনয় মাত্র।

চার্লস মেয়ার সাহেব একটি হাতির গল্প বলেছেন

মালয় দেশে সাহেবের একটি পশুশালা ছিল। সেই পশুশালার একটা হাতি একদিন গেল খেপে। হাতিরা মাঝে মাঝে এই রকম খ্যাপামি অসুখে ভোগে। সাত-আট দিন বাদে আবার তাদের মাথা ঠান্ডা হয়।

মেয়ার সাহেব তাকে শায়েস্তা করবার জন্যে তখনই একটা লম্বা হুক নিয়ে তার কাছে ছুটে গেলেন। তারপর হুক দিয়ে বার বার তার পেটের এক জায়গায় মারতে লাগলেন খোঁচা। বেগতিক দেখে হাতিটা তার ক্ষতস্থানটা ঢেকে ফেলবার জন্যে তাড়াতাড়ি মাটির উপরে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। সে আর কোনও গোলমাল করলে না। তারই কিছুদিন পরে অস্ট্রেলিয়ার এক পশুশালার অধ্যক্ষ সেই হাতিটাকে কিনে নিয়ে গেলেন।

কয়েক বৎসর পরে মেয়ার সাহেবও অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে হাজির হন। তাঁর সেই হাতিটা সিডনি শহরের পশুশালায় আছে শুনে একদিন কৌতূহলী হয়ে তিনি তাকে দেখতে গেলেন।

হাতির ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল না সে তাঁকে চিনতে পেরেছে। কিন্তু তার পেটের উপরে সেই পুরাতন ক্ষতের শুষ্ক চিহ্নটা তখনও বর্তমান ছিল। মেয়ার সাহেব আস্তে আস্তে সেই চিহ্নটার উপরে হাত দিলেন। হাতিটা অমনি একটা গম্ভীর শব্দ করে সেই জায়গাটা তাড়াতাড়ি ঢেকে ফেলবার জন্যে ধপাস করে মাটির উপরে শুয়ে পড়ল। সাহেবকে সে চিনতে পেরেছিল। তিনি তার পেটে হাত দিতেই তার ভয় হয়েছিল, আবার বুঝি সেখানে হুকের নতুন খোঁচা খেতে হয়।

মেয়ার সাহেব তারপর তাকে মিষ্টি খাইয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে অনেক আদর করলেন। তখন সে আশ্বস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

সার্কাসে হাতিরা কতরকম মজার খেলা দেখায়, সেটা তোমরা সকলেই জানো। কিন্তু বিলাতে হাতির দ্বারা গৃহস্থালির অনেক কাজও করিয়ে নেওয়া হয়। একটা হাতি শুঁড় দিয়ে ঝাঁটা ধরে বাড়ির নানান জায়গা প্রতিদিন সাফ করে দিত। আফ্রিকার এক জায়গায় একরকম বামন হাতি পাওয়া যায়। সেখানে কেউ কেউ ঘোড়ার বদলে ঘোড়ার গাড়িতে বামন হাতিদের ব্যবহার করে থাকে।

লন্ডনের পশুশালার একটা হাতির গল্প শোনো।

একদিন সে নিজের রেলিং-ঘেরা জায়গাটির ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় এল দুইজন সৈনিক। পশুশালার অনেক দর্শক জীবদের খাবার খেতে দেয়, এই সৈনিকদুটিরও হাতে ছিল খাবার। তারা রেলিঙের ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে খাবার ধরলে হাতির সামনে।

কিন্তু হাতি যেই মুখ বাড়িয়ে খাবার খেতে গেল, অমনি তারা চট করে হাত সরিয়ে নিলে। এই ব্যাপার চলল কয়েক মিনিট ধরে।

হাতি তখন বুঝলে, তাকে বোকা বানাবার চেষ্টা হচ্ছে। সে তখন সৈনিকদের দিকে পিছন ফিরে চলে গেল, যেখানে তার পানীয় জল থাকে সেইখানে। তারপর শুঁড় দিয়ে অনেকটা জল শোষণ করে আবার সে ফিরে রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল। সৈনিকরা তখনও অপেক্ষা করছিল, হাতি কাছে আসতেই আবার তাকে খাবারের লোভ দেখালে। হঠাৎ হাতির শুঁড়টা উঠল উপর দিকে, এবং পরমুহূর্তেই শুঁড়ের ভিতর থেকে হুড় হুড় করে জল বেরিয়ে এসে সৈনিকদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত একেবারে ভিজিয়ে দিলে।

সেখানে আরও যেসব দর্শক দাঁড়িয়ে ছিল, তারা সকলেই বিদ্রুপের হাসি হেসে উঠল এবং সৈনিকরাও চম্পট দিতে দেরি করলে না। সেই সময় হাতিটার ভাব দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল, প্রতিশোধ নিয়ে সে হয়েছে বেজায় খুশি।

বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ দিয়ে আমি একবার দাঁতন স্টেশনে নেমে আমার এক ধনী বন্ধুর অতিথি হয়েছিলুম। তারও একটি হাতি ছিল, সে পুকুরের জলে নেমে অনেকক্ষণ ধরে গা ভাসিয়ে থাকতে ভালোবাসত। সে-সময়টায় সে কারুরই তোয়াক্কা রাখতে চাইত না, এমনকি সে থোড়াই কেয়ার করত তার মাহুতকেও। সে হয়তো মাঝ-পুকুরে গিয়ে আপন মনে অবগাহন-সুখ উপভোগ করছে, এমন সময় ঘাটে দাঁড়িয়ে মাহুত করতে লাগল ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি। প্রথমটা সে কিছু বলত না, কিন্তু বারংবার ডেকে তাকে বেশি বিরক্ত করলেই সে হঠাৎ শুঁড় তুলে পিচকিরির মতো জল ছুড়ে মাহুতকেও একেবারে স্নান করিয়ে দিত। ছোটো ছোটো ছেলেরা যেমন দুষ্টুমি করে অন্য ছেলের গায়ে কুলকুচো করে জল দেয়, এও ঠিক তেমনি। হাতিটার লক্ষ্যও ছিল অব্যর্থ, মাহুত পালাবার পথ খুঁজে পেত না।

একাধিক শিকারি বন্য হস্তীদের একটি আশ্চর্য স্বভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। শিকারির গুলিতে আহত হয়ে যদি কোনও হাতি মাটিতে পড়ে গিয়ে আর উঠতে না পারে, তখন আরও তিন-চারটে হাতি নানা দিক থেকে তার কাছে ছুটে এসে দাঁড়ায়। তারপরে সকলে মিলে তাকে টেনে দাঁড় করিয়ে দেয় এবং দু-দিক থেকে নিজেদের গা দিয়ে সেই আহত জীবটিকে এমন ভাবে চেপে দাঁড়ায় যে, সে আর অবশ হয়ে মাটির উপরে পড়ে যেতে পারে না। তারপর সেই অবস্থায় তারা তাকে ঠেলতে ঠেলতে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে নিরাপদ জায়গায় উপস্থিত হয়।

মস্ত দেহের তুলনায় হাতিদের চোখ খুব ছোটো এবং তাদের দৃষ্টিশক্তিও বেশ দুর্বল। বেশিদূর পর্যন্ত তাদের নজর চলে না। কিন্তু এই অভাবটা তারা পূরণ করে নিয়েছে আপন আপন ঘ্রাণশক্তি ও শ্রবণশক্তির দ্বারা। যেদিক দিয়ে বাতাস আসছে সেইদিকে অনেক দূরেও যদি কোনও মানুষ দাঁড়ায়, হাতিরা তার গায়ের গন্ধ পায়। পরমুহূর্তেই তারা হয় সেখান থেকে সরে পড়ে, নয় তেড়ে এসে মানুষকে করে আক্রমণ।

বনের ভিতরে জলাশয়ে রাত্রেও তারা জলপান করতে যায়। কাছাকাছি কোথাও মানুষ আছে সন্দেহ হলে হাতিরাও হয়ে ওঠে অত্যন্ত সাবধানী। হাতির দল তখন জঙ্গলের ভিতর

লুকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে এবং তাদের অগ্রদূতের মতো এগিয়ে আসে একটা হাতি। অন্ধকারে নীরবে ঠিক ছায়ার মতো সেই হাতিটা খানিকটা এগিয়ে এসে চুপ করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। আস্তে আস্তে এদিকে-ওদিকে শুঁড়ের ডগা ফিরিয়ে সে পরীক্ষা করে, বাতাসে কোনও মানুষের গন্ধ পাওয়া যায় কি না। তারপর নিকটে কোথাও মানুষ নেই এটা বুঝতে পারলেই নিজের শুঁড়টাকে সে ভেঁপুতে পরিণত করে আওয়াজ করতে থাকে। সেই আওয়াজ শুনলেই দূর থেকে অন্যান্য আওয়াজ করে উত্তর দেয়। প্রথম হাতিটা আবার আওয়াজ করে, যেন জানিয়ে দেয় যে মা ভৈঃ! তখন দলের অন্যান্য হাতিরা নিশ্চিন্ত হয়ে এগিয়ে এসে জলপান করে, বা জলের ভিতরে লাফিয়ে পড়ে খেলা করতে থাকে। হাতির এই শুঁড়ের আওয়াজের আরও অনেক অর্থ আছে। দল থেকে বিচ্ছিন্ন কোনও হাতি বনের ভিতরে হারিয়ে গেলেও তারা বিশেষ এক সুরে এই শুঁড়ের ভেঁপুই বাজাতে থাকে। হারা হাতিটাও দূর থেকে সেই আহ্বান-ধ্বনি বুঝতে পেরে তেমনি করেই উত্তর দেয় এবং ঠিক নির্দিষ্ট স্থানে দলের ভিতরে ফিরে আসতে ভুল করে না।

একবার একটি হাতির বাচ্চাকে বালতি করে ইঁদারা থেকে জল তুলে আনতে শেখানো হয়েছিল। ইঁদারাটা আকারে খুব বড়ো। বাচ্চা হাতিটা শুঁড় দিয়ে বালতি ধরে ইঁদারার ধারে গিয়ে জল তুলে আনত।

একদিন একটা বড়ো হাতি তার সঙ্গেই ইঁদারার কাছে গিয়ে হাজির হয়। বড়ো হাতিটা তার জল তোলা দেখে বোধহয় ভাবলে,—বাঃ, জল তোলার এই উপায়টা তো ভারী সহজ! তারপর বাচ্চা হাতিটা যেই একটু অন্যমনস্ক হয়েছে সে অমনি তার বালতিটাকে চুরি করে ইঁদারার ভিতরে নামিয়ে দিলে।

বাচ্চা হাতিটা মনে মনে রীতিমতো খেপে গেল, কিন্তু বাইরে প্রকাশ করলে না মনের ভাব। সে করলে কী জানো? বড়ো হাতিটা যখন ইঁদারার ভিতর হুমড়ি খেয়ে জল তুলছে, সে তখন আস্তে আস্তে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল এবং মারলে তাকে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা। বড়ো হাতিটা নীচের দিকে মুখ করে ঝপাং করে গিয়ে পড়ল ইঁদারার ভিতরে।

চারিদিক থেকে হই-চই করে মানুষরা সব ছুটে এল। কিন্তু কী করবে তারা! ইঁদারার ভিতর থেকে একটা প্রকাণ্ড হাতিকে উপরে টেনে তোলা বড়ো যে সে ব্যাপার নয়। অনেক ভেবে-চিন্তে সকলে মিলে ইঁদারার ভিতরে কতগুলো গাছের গুঁড়ি ফেলে দিলে।

তখন হাতিটা করলে কী, কতকগুলো গাছের গুড়ি নিয়ে শুঁড় দিয়ে নিজের দেহের তলায় পাঠিয়ে দিয়ে তৈরি করে ফেললে একটা পাটাতন এবং আরও কতগুলো গুঁড়ি নিয়ে সাজিয়ে ফেললে নিজের চারপাশে। তারপর বেশ সহজেই সে আবার পৃথিবীর উপরে উঠে এসে দাঁড়াল।

অবশ্য এটি হচ্ছে মানুষের দ্বারা শিক্ষিত হস্তীর গল্প। কিন্তু একেবারে বুনো হাতিও বুদ্ধিতে কম যায় না। সে সম্বন্ধেও একটা গল্প শোনো।

সিংহল দ্বীপে স্যর এডওয়ার্ড টেনান্ট দলবল নিয়ে বনের ভিতরে শিকার করতে গিয়েছিলেন। সেই সময় একটা খ্যাপা হাতি তাঁর পিছনে তাড়া করে। স্যর এডওয়ার্ড এবং

তাঁর দলের অন্যান্য লোকেরা প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তাড়াতাড়ি একটা বড়ো গাছের উপরে উঠে পড়লেন। শিকার হাত ফসকায় দেখে হাতিটা তখন গাছের গুঁড়িতে শুঁড় জড়িয়ে গোটা গাছটাকেই উপড়ে ফেলবার চেষ্টা করলে। কিন্তু মস্ত গাছ, কিছুতেই ওপড়াতে পারলে না।

সেইখানে মাটির উপরে পড়ে ছিল অনেকগুলো কাটা গাছের গুঁড়ি। হাতিটা সেইখানে গিয়ে একে একে গাছের গুঁড়িগুলোকে সেই বড়ো গাছটার তলায় এনে স্তূপাকারে সাজিয়ে ফেলল। তারপর সে গুঁড়িগুলোর উপরে উঠে পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে শুঁড়ের সাহায্যে স্যর এডওয়ার্ড ও তাঁর লোকজনকে মাটির উপরে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল। হয়তো তার চেষ্টা সফলও হত, কিন্তু গাছের উপর থেকে ক্রমাগত গুলি-বৃষ্টি হওয়াতে হাতিটা বিরক্ত হয়ে গুঁড়ির স্তূপ থেকে নেমে বনের ভিতরে চলে গেল।

শুঁড় দিয়ে হাতির মা বাচ্চাকে আদর করে, শাসন করে এবং তার জন্যে ভালোমন্দ ব্যবস্থাও করে। একবার একটা পোষা হাতির বাচ্চা কেমন করে অত্যন্ত আহত হয়। তখনই ডাক্তার ডেকে আনা হল। উনি তার ক্ষতের উপরে ব্যান্ডেজ বেঁধে নিতে গেলেন, কিন্তু বাচ্চাটি কিছুতেই রাজি হল না। এমন একটা মূল্যবান জন্তু বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে ভেবে ডাক্তার হতাশ ভাবে তার মায়ের দিকে চেয়ে ব্যাপারটা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

হাতির মা বুঝতে একটুও দেরি করলে না। শুঁড় দিয়ে সে তখনই বাচ্চাটিকে জড়িয়ে ফেললে এবং নিজের দুই পা দিয়ে চেপে ধরলে তাকে মাটির উপরে। ডাক্তার তখন ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ওষুধ দিয়ে অনায়াসেই ব্যান্ডেজ বাঁধতে পারলেন। কেবল সেই এক দিন নয়, তারপর যতদিন না তার ঘা সারল, ততদিন পর্যন্ত হাতির মা ডাক্তারকে এইভাবে সাহায্য করতে নারাজ হল না।

হাতিদের স্নেহ ও ভালোবাসা অত্যন্ত গভীর। মানুষকেও তারা প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে পারে। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের কথা। বিলাতের চিড়িয়াখানায় একটা হাতি ছিল, তার নাম জিঙ্গো। সে তার রক্ষী বা মাহুতকে অত্যন্ত পছন্দ করত। তাকে বিলাত থেকে পরে আমেরিকার চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিলাত থেকে সমুদ্র পার হয়ে আমেরিকায় যেতে তখন বেশ কিছুদিন লাগত। জিঙ্গো কিন্তু আমেরিকা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল না। মাহুতকে দেখতে না পেয়ে, মনের দুঃখে সে পানাহার ছেড়ে দিলে। তারপর ভগ্নপ্রাণে মারা গেল সমুদ্রপথেই।

হাতি হচ্ছে বর্তমান পৃথিবীতে ডাঙার সবচেয়ে প্রকাণ্ড জীব। তোমরা ভারতের হাতি দেখেছ, কিন্তু আফ্রিকার হাতি তার চেয়েও আকারে বড়ো। আবার ওই আফ্রিকাতেই আর এক জাতের বামন হাতি আছে, মাথায় তারা ছ-ফুটের চেয়ে উঁচু হয় না।

পৃথিবীতে মানুষরা যখন একটু একটু করে সবে সভ্য হয়ে উঠছে, সবচেয়ে বড়ো হাতি পাওয়া যেত সেই সময়ে। তার নাম হচ্ছে ম্যামথ। তারা ছিল রোমশ।

॥ পঞ্চম ॥

শিকার ও শিকারি

ইতিমধ্যে কেটে গিয়েছে দশ বৎসর।

দশ বৎসর বড়ো অল্প কাল নয়। এই সময়টুকুর মধ্যে সারা পৃথিবীতে ঘটেছে অনেক বড়ো বড়ো ঘটনা। কিন্তু এই দশ বৎসরের মধ্যে বনের ভিতরে কোনওই অসাধারণ ঘটনা ঘটেনি। প্রতিবৎসরই এক ঋতুর পর এসেছে আর এক ঋতু এবং ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে বনভূমিকেও দেখতে হয়েছে নিয়মিতভাবেই এক এক রকম। কিন্তু এসব কথা গল্পে উল্লেখ করবার মতো বিষয় নয়। কাজেই, ঠিক দশ বৎসর পরেই আমরা আবার অবলম্বন করব আমাদের গল্পের সূত্র।

এই দশ বৎসরে টুনুর চেহারা যে একেবারেই বদলে গিয়েছে, এটুকু তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারবে। সে ছিল পাঁচ বৎসরের শিশু, এখন হয়েছে পনেরো বৎসরের বালিকা। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে রূপ যেন ফেটে পড়ছে। তাকে দেখলেই মনে হয়, বনবাসিনী রাজকন্যা।

সে বড়ো হয়েছে বন রাজ্যের অবাধ স্বাধীনতার ভিতর দিয়ে। এখানে সমাজের কোনওই বন্ধন নেই। সমাজে যে-আচরণে নিন্দা হয়, এখানে কেউ তা আমলেই আনে না। শহরে পনেরো বৎসরের মেয়ে থাকে গুরুজনদের চোখে চোখে, কিন্তু এখানে টুনু সেই শিশুর মতোই চপল আনন্দে বনে বনে ছুটে বেড়ায় চঞ্চল হরিণীর মতো, কখনও গাছ-কোমর বেঁধে বালকদের মতোই অসঙ্কোচে গাছে গিয়ে ওঠে, ফল পাড়ে, ফুল তোলে, ডাল ধরে ঝুলে দোল খায় এবং দুলতে দুলতে হঠাৎ রুনুর পিঠের উপর লাফিয়ে পড়ে উচ্ছলিত হয়ে ওঠে তরল কৌতুক-হাস্যে।

দূর থেকে দুখিরাম ও পার্বতী তার এমনি সব লীলাখেলা দেখে মুখ টিপে হাসতে থাকে, কিন্তু টুনুকে মানা করবার কথা কোনওদিন তাদের মনেও ওঠে না। বনবাসী তারা, শহরের আদপ-কায়দার কী ধার ধারে? আর টুনু তো তাদেরই মেয়ে!

টুনু যে সত্য সত্যই তাদের নিজের মেয়ে নয়, এ কথা তারাও যেন আজ ভুলে গিয়েছে। টুনুর বাপ-মা যে আর মেয়ের খোঁজ নিতে আসবে না, এ বিষয়ে আর তাদের কোনওই সন্দেহ নেই। আজকে টুনুকে তাদের সামনে নিয়ে গেলেও তারা নিশ্চয় তাকে চিনতে পারবে না। সুতরাং পার্বতী এখন টুনুকে নিজের মেয়ে বলে অনায়াসেই দাবি করতে পারে।

কিন্তু টুনু ভোলেনি। আজও অবোধ শৈশবের আনন্দ-স্বপ্ন তার মনের মধ্যে রঙিন ছবির মতো জেগে ওঠে মাঝে মাঝে। আজও কোনও কোনও দিন রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে সে দেখে বাপের মুখ, মায়ের মুখ। টুনু কেমন করে ভুলবে? রক্তের টান ভোলা যায় না।

বাপ-মায়ের একটিমাত্র স্মৃতিচিহ্ন এখনও সে সযত্নে রক্ষা করে। দশ বৎসর আগে যে পোশাক পরে সে বাড়ির বাইরে এসেছিল প্রজাপতি ধরতে, আজ আর তা বর্তমান নেই

বটে, কিন্তু তার গলায় ঝুলত যে সোনার পদকখানি, এখনও সেখানিকে গলায় পরে থাকে সে সর্বদাই। পদকের উপরে লেখা একটি নাম, রেণুকা। টুনু জানে, এইটিই তার আসল নাম।

পার্বতী এক-একদিন স্বামীকে ডেকে বলে, 'হ্যাঁ গো, একটা কথা ভেবে দেখেছ কি?'

দুখিরাম উবু হয়ে মাটির উপরে বসে থেলো হুঁকোয় তামাক টানতে টানতে বলে, 'কী?'

'টুনু বড়ো হয়েছে, সে আর ছোট্টটি নেই।'

হুস করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে দুখিরাম বলে, 'তুই তো ভারী আশ্চর্য কথা বললি রে পার্বতী! টুনু যে আর ছোট্টটি নেই, সেটা কি আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না?'

পার্বতী বলে, 'দেখতে তো পাচ্ছ, কিন্তু মেয়ের উপায় করছ কী?'

'উপায় মানে?'

'এইবারে টুনুর জন্যে একটি বর খুঁজতে হবে তো?'

দাওয়ার কোণে হুঁকোটা রেখে দুখিরাম অবহেলা-ভরে বলে, 'যা যা, বাজে বকিসনি! টুনু এখন এত বড়ো হয়নি যে এখুনি ওর বর খোঁজবার জন্যে আমাকে ছুটোছুটি করতে হবে।'

ফিক করে হেসে ফেলে পার্বতী বলে, 'হ্যাঁ গো, তোমার সঙ্গে আমার যখন বিয়ে হয়েছিল, তখন আমার বয়স ছিল কত? আমি কি টুনুরও চেয়ে ছোটো ছিলুম না?'

দুখিরাম চটে গিয়ে বলে ওঠে, 'তুই আর টুনু কি এক কথা? তুই হলি একটা জংলি কাঠুরের বেটি, আর আমার টুনু হচ্ছে হয়তো কোনও রাজার মেয়ে। তোর সঙ্গে টুনুর তুলনা! বলেই সে থুঃ করে মাটির উপরে থুথু ফেললে।

পার্বতী বলে, 'ও আমার বুদ্ধিমান কাঠুরেমশাই, তুমি কি ভাবছ টুনুকে এখন বিয়ে করতে আসবে কোনও রাজার ছেলে? সবাই তো জানে, ও হচ্ছে আমাদেরই মেয়ে।'

দুখিরাম বলে, 'রাজার ছেলে আসুক আর না আসুক, টুনুকে আমি কোনও কাঠুরে ছেলের হাতে সঁপে দিতে পারব না। ফুল দিতে হয় দেবতার পায়ে, কেউ কি তা নর্দমায় ফেলে দেয় রে? দেখ দেখি আমাদের ওই টুনুর দিকে তাকিয়ে, ও কি ঠিক ফুলের মতোই সোন্দর নয়?'

তারা দুজনেই বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত করলে।

সবুজ ঘাসে ঢাকা, বনফুল-ফোটা খানিকটা জমি, তারই উপরে কানামাছি খেলছে টুনু আর তার সমবয়সি সাত-আটটি কাঠুরেদের মেয়ে। ওখানকার আকাশ-বাতাস থেকে থেকে ছন্দিত হয়ে উঠছে তাদের কৌতুক-হাস্যরোলে। আরও খানিক তফাতে একটি গাছতলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রুনু খুশি মনে দেখছে টুনু আর তার বন্ধুদের লীলাখেলা।

স্নেহমমতায় বিগলিত প্রাণে সেইদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে পার্বতী ধীরে ধীরে বললে, 'টুনু আমার ছোট্ট খুকিটির মতন এখনও খেলা বই আর কিচ্ছু জানে না। আহা, খেলাই করুক, যতদিন পারে খেলাই করুক!'

ওদিকে টুনুদের তখন শেষ হয়ে গিয়েছে কানামাছি খেলা। তারা সবাই মিলে গোল হয়ে হাত ধরাধরি করে শুরু করে দিয়েছে নাচ আর গান। কাঠুরেদের মেয়েগুলির রং কালো

হলেও গড়ন খুব চমৎকার। খোলা হাওয়ায়, মুক্ত আকাশের তলায়, দিনে দিনে গড়ে উঠেছে তাদের স্বাধীন জীবন। যেন বনদেবীর বরে তারা পেয়েছে অটুট স্বাস্থ্যের আশীর্বাদ। তাদের প্রত্যেকেরই খোঁপায় গোঁজা বনফুল, তাদের গলাতেও ফুলের মালা, আর দুই হাতেও ফুলের গয়না। তাদের কালো কালো গায়ে রঙিন ফুলগুলিকে দেখাচ্ছিল বড়ো সুন্দর। এবং তাদের মাঝখানে টুনুকেও দেখাচ্ছিল যেন কোনও গোলাপকুঞ্জের মূর্তিমতী ফুলকন্যার মতো।

তারপর নাচ-গান থামিয়ে টুনু বলে উঠল, 'চল ভাই, আর এখানে নয়। এইবার পাহাড়তলির সেই পুকুরে গিয়ে সাঁতার কাটি গে চল!'

বাতাসে আঁচল উড়িয়ে নাচের ভঙ্গিতে লাফাতে লাফাতে টুনু ছুটল একদিকে, এবং অন্য মেয়েরাও ছুটল তার পিছনে পিছনে। রুনুও গজেন্দ্রগমনে চলল তাদের সঙ্গে সঙ্গে।

বনের এইখান থেকে মাইল-দশেক তফাতে আছে একটি বড়ো গ্রাম। তাকে ছোটো একটি শহর বললেও বলা যায়। সেই গ্রামে বাস করে জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ, উপাধি তার কুমার।

নরেন্দ্রনারায়ণের পিতা ভূপেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়েছে গত বৎসরে। কুমার নরেন্দ্রনারায়ণ এখনও সাবালক হয়নি, বয়স তার বিশ বৎসরের বেশি নয়। জমিদারির তদারক করে দেওয়ান, আর নরেন্দ্রনারায়ণ বনে বনে ঘুরে বেড়ায় শিকারের সন্ধানে। এটা হচ্ছে তার একটি বাতিকের মতো।

আজকেও নরেন্দ্র শিকার করতে বেরিয়েছে, সঙ্গে আছে তার জনকয়েক বন্ধু।

আজ কিন্তু ভাগ্য তাদের প্রতি বিরূপ। সকাল থেকে তারা এ-বনে ও-বনে তল্লাশ করে বেড়াচ্ছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনও দয়ালু পশুই প্রাণ দিয়ে তাদের কৃতার্থ করতে এল না। সূর্য প্রায় মাথার উপরে, রোদের তাপ ক্রমেই বেড়ে উঠছে, এবং তাদের উৎসাহ ক্রমেই শান্ত হয়ে আসছে।

হঠাৎ নরেন্দ্র দেখলে, ডান পাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল একটি হরিণ, তারপরেই চকিত দৃষ্টিতে শিকারিদের দিকে একবার তাকিয়েই আবার ঝোপের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল যেন বিদ্যুতের মতো।

নরেন্দ্র উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'এতক্ষণ পরে শিকারের যখন দেখা পেয়েছি, তখন আর ওকে ছাড়া নয়। আমি এইদিক দিয়ে একলা ওর পিছনে ছুটি, আর তোমরা সকলেও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ওই জঙ্গলে ভিতরে গিয়ে ঢোক। দ্যাখো, কোনও দিক দিয়েই ও যেন পালাতে না পারে।'

নরেন্দ্র নিজের বন্দুকটা একবার পরীক্ষা করে বেগে জঙ্গলের ভিতরে ছুটে গেল। খানিক তফাতে একটা ঝোপ তখনও দুলছিল। বোঝা গেল, হরিণটা ওই দিকে গিয়েছে। নরেন্দ্র সেই ঝোপ ভেদ করে অগ্রসর হল দ্রুতপদে। এইভাবে শিকার খুঁজতে খুঁজতে সে অনেকখানি পথ এগিয়ে গেল, কিন্তু হরিণের আর কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না।

বনের এক জায়গায় খোলা জমির উপরে হতাশভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র ভাবছে, শিকার দেখা দিয়েও ধরা দিলে না, আজকের দিনটা বোধহয় বৃথাই গেল।

হঠাৎ দূরে একটা বন্দুকের শব্দ শুনে সে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। হরিণটা নিশ্চয়ই তার সঙ্গীদের কারুর পাল্লায় গিয়ে পড়েছে! সে খুশিও হল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু ক্ষুণ্ণও হল এই ভেবে, আজকের শিকারের বাহাদুরিটা তাহলে গ্রহণ করবে অন্য কেউ।

সঙ্গীদের অপেক্ষায় নরেন্দ্র সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় একটু তফাতে একটা ঝোপ দুলে দুলে উঠল। তারপরেই ঝোপের ভিতর থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এল একটা হরিণ। তার ভাব দেখেই বোঝা গেল, সে আহত হয়েছে এবং আর বেশি দূর অগ্রসর হতেও পারবে না।

হরিণটাকে একেবারে শেষ করে দেবার জন্যে নরেন্দ্র বন্দুকটা তুলে ধরল।

কিন্তু বন্দুকের ঘোড়া টিপতে আর হল না। আচম্বিতে কোথা থেকে একটি মেয়ে বেগে ছুটে এসে হরিণটার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'খবরদার বলছি, আর এখানে বন্দুক ছুড়ো না!'

সেইভাবেই আড়ষ্ট হাতে বন্দুক ধরে নরেন্দ্র থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তার দুই চক্ষু বিস্ফারিত। এই গভীর অরণ্যে এমন সুন্দরীর আকস্মিক আবির্ভাব একেবারেই অপ্রত্যাশিত। স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস হয় না। এ কি বনদেবী, না চোখের মায়া?

আহত হরিণটা তখন টুনুর আলিঙ্গনের ভিতরে একেবারে এলিয়ে পড়েছে, পালাবার চেষ্টাটুকু করবার শক্তিটুকুও তার নেই।

মেয়েটি করুণ স্বরে বললে, 'ওরে আমার হরিণ রে, কোন নিষ্ঠুর তোকে মেরেছে? আহা হা, তোর গা দিয়ে যে রক্ত ঝরে পড়ছে!'

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে নরেন্দ্র পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল মেয়েটির কাছে। মেয়েটি হঠাৎ চোখ তুলে ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'কে তুমি? কেন আমার হরিণকে মেরেছ?'

নরেন্দ্র বিস্মিত স্বরে বললে, 'তোমার হরিণ!'

মেয়েটি বললে, 'হ্যাঁ, আমার হরিণ। এ বনে যত হরিণ আছে সব আমার। কেন তুমি এর গায়ে গুলি মেরেছ?'

নরেন্দ্র অপরাধীর মতো আস্তে আস্তে বললে, 'আমি তো একে মারিনি!'

'তবে কে একে মারলে?'

'বোধহয় আমার কোনও বন্ধু।'

পিছন থেকে কর্কশ হেঁড়ে গলায় কে বললে, 'আমি মেরেছি এই হরিণটাকে।'

দুজনেই সচমকে ফিরে দেখলে, একটা নতুন লোক সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। ভীষণ তার চেহারা। প্রকাণ্ড, সুদীর্ঘ ও বলিষ্ঠ দেহ, গায়ের রং কালো কুচকুচে। আদুড় গা, কোমর বেঁধে মালকোঁচা মেরে কাপড় পরা, ডান হাতে একটা বন্দুক।

এই পরমা সুন্দরী কন্যাটির মতো এখানে ওই বীভৎস ও বিভীষণ মূর্তিটার আবির্ভাবও অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। মেয়েটি তাকে দেখে ভয় পেয়ে নরেন্দ্রের মুখের পানে তাকিয়ে বললে, 'এই কি তোমার বন্ধু?'

নরেন্দ্র মাথা নেড়ে বললে, 'না, আমার কোনও বন্ধুরই চেহারা এমন উলটো-কার্তিকের মতো নয়।'

লোকটা হুমকি দিয়ে বলে উঠল, 'মুখ সামলে কথা কও হে ছোকরা, সাক্ষাৎ যমকে ঠাট্টা করবার চেষ্টা কোরো না! জানো, আমি কে?'

নরেন্দ্র বললে, 'জানি না। জানবার ইচ্ছেও নেই।'

লোকটা শুকনো হাসি হেসে বললে, 'আমারও গায়ে পড়ে পরিচয় দেবার ইচ্ছে নেই। এখন বাজে কথা থাক। এই ছুঁড়ি, দে, হরিণটাকে ছেড়ে দে!'

হরিণটাকে আরও ভালো করে জড়িয়ে ধরে মেয়েটি বললে, 'না, একে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।'

লোকটা বললে, 'কিছুতেই ছাড়বি না? আচ্ছা, ছাড়িস কি না দেখা যাক! আমার শিকার, আমি নিয়ে যাবই।' বলতে বলতে সে এগিয়ে এল।

মেয়েটি প্রাণপণে চিৎকার করলে, 'রুনু! রুনু! শিগগির এসো, এই যমদূতটাকে তুলে আছাড় মারো! রুনু! রুনু!'

লোকটা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

নরেন্দ্র অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, রুনু আবার কে? নামটি তো মেয়েলি, তার গায়ে এমন কী শক্তি আছে যে তুলে আছাড় মারবে এই যমদূতটাকে!

প্রশ্নের উত্তর পেতে বিলম্ব হল না। দেখা গেল, বন ভেঙে, মাটি কাঁপিয়ে, শুঁড় তুলে ধেয়ে আসছে প্রকাণ্ড এক ক্রুদ্ধ মাতঙ্গ।

ষণ্ডা লোকটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে টুনু হুকুম দিলে, 'রুনু! এই লোকটা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে! ওকে তুমি শাস্তি দাও!'

সক্রোধে গর্জন করে উঠল রুনু।

নরেন্দ্র সভয়ে নিজের হাতের বন্দুকটার দিকে তাকালে। এ হাতি-মারা বন্দুক নয়, এর গুলিতে ওই মত্ত মাতঙ্গের কিছুই হবে না। সে তখনই বুদ্ধিমানের মতো সেখান থেকে দৌড় মেরে সরে পড়ল।

ষণ্ডা লোকটাও ত্রস্তভাবে বেগে পাশের জঙ্গলের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং রুনুও ছুটল তার পিছনে পিছনে।

টুনু দুই হাতে হরিণটাকে ধরে দাঁড়িয়ে উঠল। ছোট্ট হরিণ, তাকে তুলতে তার কিছুই কষ্ট হল না। তারপর সে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে বললে, 'চল তো ভাই হরিণ, এইবারে আমরা দুজনে বাড়ি ফিরে যাই।'

॥ ষষ্ঠ ॥

বনদেবীর ঠিকানা

জমিদারবাড়িখানি বেশ বড়োসড়ো। চারিদিকে ঘেরা জমির ভিতরে সাজানো ফল-ফুলের বাগান, তারপর একটি বড়ো পুষ্করিণী, তার চারধারের চারটি ঘাট মার্বেল পাথরে বাঁধানো। সেই পুষ্করিণীর উত্তর দিকে দাঁড়িয়ে টুকটুকে লাল রঙের প্রাসাদখানি যেন কালো জলের ভিতরে নিজের ছায়া দেখবার চেষ্টা করছে। বাগানের ফটকে বন্দুকধারী দ্বারী এবং বাড়ির প্রধান দরজার পাশে একখানি টুলের উপরে বসে একটা ভোজপুরী দ্বারবান বাঁ হাতের চেটোতে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে খৈনি পিষতে পিষতে ভোরের ভজন ভাঁজছে—

'মনোয়া, ভজ লে সীতারাম!
ভজ লে সীতারাম, মনোয়া,
কাহে না জপতে নাম।'

গাড়ি-বারান্দার উপরে একখানি চেয়ারের উপরে বসে নরেন্দ্র নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে পুষ্করিণীর দিকে।

পুকুরে বাতাসে দোলানো ও ছোটো ছোটো ঢেউ-খেলানো স্নিগ্ধ জলের উপরে এসে পড়েছে প্রাতঃসূর্যের সোনালি আলোর ছায়া। ওখানে পদ্মকুঞ্জের উপরে গুঞ্জন করে উড়ছে মধুকরপুঞ্জ। এখানে সন্তরণ-পুলকে মেতে উঠেছে মরাল আর মরালীরা। কোথাও বা টুপটুপ করে জলের ভিতরে ডুব দিচ্ছে ডাহুক পাখিরা।

কিন্তু পুকুরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেও নরেন্দ্র এসব কিছুই লক্ষ করছিল না। তার দৃষ্টি চলে গিয়েছে তখন গহন বনের অন্তপুরে।

সেই অপূর্ব রূপবতী মেয়ে! কে সে? বনের আনাচে-কানাচে কয়েক ঘর বাসিন্দা আছে বটে, কিন্তু তারা তো, আমরা যাকে বলি ছোটোলোক! তাদের ঘরে অমন অদ্ভুত রূপের জন্ম হওয়া কি সম্ভব? না, কখনওই নয়। কিন্তু—

কিন্তু ও যে বনের মেয়ে, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। তার ভাবভঙ্গি, তার কথাবার্তা ও তার সাজ-পোশাকে কোথাও নেই নাগরিকতার ছাপ। এ এক আশ্চর্য সমস্যা!

বলে কিনা, বনে যত হরিণ আছে সব আমার! আবার ও ডাক দিলে সাহায্য করতে ছুটে আসে মত্ত মাতঙ্গ! এমন ব্যাপার কেউ কখনও দেখেছে, না এসব কথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে? হয়তো বনের বাঘগুলো পর্যন্ত ওই মায়াবিনীর পোষ মেনেছে!

হোক মায়াবিনী, হোক কুহকিনী, কিন্তু কী সুন্দরী!

যেমন করে হোক, তার সঙ্গে পরিচয় করতেই হবে। আজকেই আবার যাব আমি বনের ভিতরে।

সংকল্প স্থির করে নরেন্দ্র চেয়ার ছেড়ে বাড়ির ভিতরে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে পোশাক

বদলে বেরিয়ে এল আবার বাড়ির ভিতর থেকে। সেদিন আর কোনও বন্ধু-বান্ধবকে সঙ্গে নিলে না সে।

আজ নরেন্দ্র একখানি সাইকেলের আরোহী। মাইল-দশেক পথ পায়ে হেঁটে পার হতে কম সময় লাগে না। তাড়াতাড়ি কালকের ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছবার জন্যে আজ সে সাইকেলের সাহায্য গ্রহণ করেছে। অবশ্য আজও সে নিরস্ত্র নয়, তার পিঠে বাঁধা একটি বন্দুক।

ঘণ্টা দুই পরে সে বনের প্রান্তদেশে এসে পড়ল। আরও খানিকটা এগুবার পর পায়ে-চলা পথের রেখাটি হয়ে গেল লুপ্ত এবং অত্যন্ত ঘন হয়ে উঠল বনজঙ্গল। নরেন্দ্র তখন বাধ্য হয়ে নেমে পড়ে সাইকেলখানি একটা ঝোপের ভিতরে রেখে দিয়ে পদযুগলেরই সাহায্য গ্রহণ করলে।

প্রায় আধঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া গেল আবার সেই কালকের ঘটনাস্থলটি। কিন্তু আজ সেখানে জনপ্রাণী নেই। নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরে এদিকে-ওদিকে ঘোরাঘুরি করলে, কিন্তু কোথায় সেই আশ্চর্য মেয়ে?

এক জায়গা দিয়ে ঘোঁতঘোঁত করতে করতে ছুটে চলে গেল একপাল বন্য বরাহ। মাঝে মাঝে দু-একটা শৃগাল জঙ্গলের ভিতর থেকে একবার দেখা দিয়ে উঁকি মেরেই আবার মিলিয়ে গেল অন্ধকারেই। শুকনো পাতার ভিতরে এক জায়গায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল মস্ত একটা কাল সাপ, নরেন্দ্রের পায়ের শব্দে চমকে উঠে ফণা তুলে তীব্র দুই চক্ষে জ্বলন্ত ঘৃণা বৃষ্টি করে সাঁৎ করে ঢুকে গেল কোনও অন্তরালে। এক জায়গায় গাছের উপরে মুখ খিঁচিয়ে কিচির-মিচির করে গালাগাল দিয়ে উঠল একদল বাঁদর, এখানে নরেন্দ্রের মতো চেহারা দেখতে তারা অভ্যস্ত নয়।

একটা গাছের গোড়ায় পা ছড়িয়ে বসে পড়ে নরেন্দ্র শুনতে লাগল এখানে-ওখানে বুনো কপোতদের ক্লান্ত-কাতর ঘু ঘু ঘু ঘু সুর। গাছের তলায় ঝিলমিল করছে আলো আর ছায়া। ওদিকের স্নিগ্ধ-সবুজ মাঠটির উপরে সচল ছবির মতো পট-পরিবর্তন করছে আলো আর ছায়া, ছায়া আর আলো। চারিদিকে বেশ একটি নিশ্চিন্ত শান্তির ভাব। নরেন্দ্রের দুই চোখে লাগল ঘুমের আমেজ। কিন্তু হিংস্র জন্তুদের এই স্বদেশে ঘুমিয়ে পড়বার ভরসা হল না তার। জোর করে দাঁড়িয়ে উঠে দুই হাত তুলে আলস্যি ভেঙে নরেন্দ্র নিজের মনেই বললে, নাঃ, বনদেবী দেখছি আজ আমার উপরে সদয় হবেন না! বেলাও হয়েছে, খিদেও পেয়েছে। আজকের মতো এইখানেই বনবাসের ইতি করা যাক......

তার পরদিন, আবার তার পরদিন, আবার তার পরদিন নরেন্দ্র আবার এল বনভ্রমণে। এই বন তাকে যেন একেবারে পেয়ে বসেছে। দূর থেকে কোনও এক অজানা টানে বন যেন তাকে এখানে টেনে আনে। সে আশায় এখানে আসে তা সফল হয় না, তবু কোনও এক সম্ভাবনার ইঙ্গিতে রোজ তাকে এখানে ছুটে আসতে হয়। ছুটে আসে অসীম আগ্রহে, কিন্তু ফিরে যায় নিস্তেজ দেহে, ম্রিয়মাণের মতো। কেবল সেই ঘটনাস্থলে নয়, বনের নানা জায়গায় সে ঘুরে বেড়িয়েছে।

চতুর্থ দিন বনের ভিতরে এসে নরেন্দ্র দূর থেকে দেখলে একটা হাতিকে। সে বাঁশঝাড়ের তলায় দাঁড়িয়ে শুঁড় দিয়ে কচি কচি বাঁশপাতা ছিঁড়ে ভক্ষণ করছিল। নরেন্দ্র তাকে দেখেই চিনলে। এ হচ্ছে সেই হাতি—বনদেবীর যে প্রহরী, নাম যার রুনু।

নরেন্দ্র আন্দাজ করতে পারলে, হাতির দেখা যখন পাওয়া গিয়েছে, মেয়েটিও নিশ্চয় আছে কাছাকাছি কোনও জায়গায়। কিন্তু মেয়েটি সত্যি-সত্যিই যদি এখানে আসে, তাহলে তাকে কেমন করে অভ্যর্থনা করবে তা আগে থাকতে বলা যায় না। কে জানে, আজকেও সে আবার এই হাতিটাকে তার পিছনে লেলিয়ে দেবে কি না!

হাতির কাছ থেকে নিজেকে নিরাপদ ব্যবধানে রাখবার জন্যে নরেন্দ্র একটা প্রকাণ্ড বনস্পতির উপরে আরোহণ করলে। তারপর ডালপালার আড়ালে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

যা ভেবেছে তাই! বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, মেয়েটি বোধহয় কোঁচড়-ভরা ফুল নিয়ে চঞ্চল পায়ে ছুটতে ছুটতে হাতিটার কাছে দাঁড়াল। তারপর বললে, 'রুনু, আমার ফুল তোলা শেষ হয়েছে, এইবারে আমাকে বাড়িতে নিয়ে চলো।'

নরেন্দ্র অবাক হয়ে দেখলে, হাতিটা তার শুঁড় খানিকটা নীচে নামিয়ে দিলে, আর মেয়েটি সেই শুঁড় ধরে অনায়াসেই হাতির মাথার উপরে উঠে এসে বসল। তারপর হাতিও ধীরে ধীরে তাকে নিয়ে এগিয়ে চলল।

নরেন্দ্র নিজের মনেই বললে, 'হুঁ, তাহলে এই বনেই মেয়েটির বাড়ি আছে। আচ্ছা, চুপিচুপি ওদের পিছনে গিয়ে বাড়িটা দেখে আসা যাক।'

নরেন্দ্র গাছের উপর হতে আবার হল ভূমিষ্ঠ। তারপর হাতিকে অনুসরণ করলে অত্যন্ত সন্তর্পণে।

প্রায় মাইল দুই পথ অতিক্রম করে হাতি যেখানে এসে থামল, তার কাছেই রয়েছে কতকগুলো কুঁড়েঘর। হাতি আস্তে আস্তে মাটির উপরে থেবড়ি খেয়ে বসে পড়ল, এবং মেয়েটিও লাফিয়ে পড়ল তার দেহের উপর থেকে। হাতির দিকে ফিরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে খুব নরম গলায় বললে, 'রুনু ভাই, আজ তবে আসি!' বলেই ছুটতে ছুটতে সে কুঁড়েঘরগুলোর দিকে চলে গেল। কোনও ঘরে সে ঢোকে, সেটাও দেখবার ইচ্ছা ছিল নরেন্দ্রের। কিন্তু হাতিটা আবার এই পথেই ফিরে আসছে দেখে তার সে ইচ্ছা পূর্ণ হল না। সে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল সেখান থেকে।

সেদিনের ব্যাপার এই পর্যন্ত। কিন্তু এইটুকুতেই তার মনে মনে নেচে বেড়াতে লাগল হাসিখুশি। বনদেবীকে আবার আবিষ্কার করতে পেরেছে, এ হচ্ছে মস্ত সৌভাগ্যের কথা। নরেন্দ্র সেদিন পরিপূর্ণ প্রাণ নিয়ে বন ছেড়ে নিজের বাড়ির দিকে চলল।

তার পরদিন বনের ভিতরে নরেন্দ্রর দেখা পাওয়া গেল খুব সকাল সকাল। আজ ভোরের পাখি ডাকবার আগেই সে করেছে গৃহত্যাগ এবং যথাস্থানে গিয়ে যখন পৌঁছল তার হাতঘড়িতে বেজেছে তখন বেলা সাতটা। বনের পাখিদের কণ্ঠে তখনও স্তব্ধ হয়নি প্রভাত-সংগীত। নরেন্দ্র একটা ঝোপের ভিতরে গা-ঢাকা দিয়ে চুপ করে বসে রইল।

একটু পরেই একটি ছোটো ডালা হাতে করে সেই মেয়েটি একখানি কুঁড়েঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

দুখিরাম তখন বনে যাবার আগে পান্তা ভাত খেয়ে দাওয়ায় বসে হুঁকোয় দিচ্ছিল শেষ টান। টুনুকে দেখে বললে, 'কী গো টুনটুনি, এত সকালে কোথায় চলেছ?'

টুনু বললে, 'বাবা, পুণ্যিপুকুর ব্রত নিয়েছি কিনা, তাই বন থেকে গোটাকয় ফুল আর বেলপাতা তুলে আনতে যাচ্ছি।'

এ-গাছ ও-গাছ থেকে ফুল তুলতে তুলতে টুনু এগিয়ে চলল তারপর একটি বেলগাছের তলায় দাঁড়িয়ে উপর দিকে তাকিয়ে বললে, 'পাতাগুলো যে বড্ড উঁচুতে রয়েছে, কেমন করে পাড়ি? বাব্বাঃ, বেলগাছে যা কাঁটা! ও গাছে কে চড়বে! দুষ্টু রুনু তো আজ এখনও এল না, আমায় বেলপাতা পেড়ে দেবে কে!'

পাশের ঝোপের ভিতর থেকে কে বললে, 'বনদেবী, আমি যদি তোমার রুনুর হয়ে বেলপাতা পেড়ে দি, তাহলে কি তুমি রাগ করবে?'

টুনু চমকে উঠে পাশের ঝোপটার দিকে তাকালে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'তুমি আবার কে? তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি এখানকার কেউ নও। ওই ঝোপে বসে কী করছ তুমি?'

'তোমার কথাই ভাবছি।' এই বলতে বলতে ঝোপের ভিতর থেকে আত্মপ্রকাশ করলে নরেন্দ্র।

টুনু সবিস্ময়ে দুই পা পিছিয়ে গেল। তারপর নীরবে অবাক হয়ে খানিকক্ষণ নরেন্দ্রের মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

নরেন্দ্র হেসে বললে, 'আমাকে দেখে কি তোমার ভয় হচ্ছে?'

টুনু বললে, 'ভয়? ভয় আমি কারুকেই করি না। তুমি তো দেখছি সেদিনকার সেই শিকারি!'

নরেন্দ্র বললে, 'আমাকে তাহলে চিনতে পেরেছ?'

টুনু বললে, 'চিনতে পারব না কেন? কিন্তু আজও দেখছি তোমার পিঠে বাঁধা বন্দুক। এখানে আবার কী করতে এসেছ?'

'শিকার করতে নয়।'

'তবে?'

'তোমার সঙ্গে আলাপ করতে।'

টুনু খিলখিল করে হেসে উঠল। এবং হাসতে হাসতেই দুই চোখ নাচিয়ে বললে, 'ওহো, কী মজার কথা! আমার সঙ্গে আবার কেউ আলাপ করতে আসে নাকি? আমি কি খুব একটা মস্ত লোক?'

'তুমি বনদেবী।'

টুনু প্রাণপণে আরও জোরে হেসে নিলে খুব খানিকটা। তারপর বললে, 'না গো শিকারি মশাই, আমি বনদেবী-টেবি কিচ্ছু নই। আমি হচ্ছি টুনু।'

'টুনু? বাঃ, দিব্যি নামটি তো! আমিও শিকারি নই।'

'তবে তুমি কী?'

'আমার নাম নরেন।'

'তোমার নামটিও ভালো লাগল। তোমার বাড়ি কোথায়?'

'এই বনের বাইরে।'

'সেখানে তুমি কী করো?'

'খাই দাই, আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি।'

'বটে? তবে তো তুমি খুব কাজের মানুষ! এত কাজ করো কী করে, কষ্ট হয় না?'

'কষ্ট হয় বই কি! বড়ো একঘেয়ে লাগে। তাই তো সে সব কাজ ছেড়ে আজকাল আমি বনের ভিতরে বেড়াতে আসি।'

টুনু মুখ গম্ভীর করে বললে, 'বেড়াতে আসো, না হরিণ মারতে আসো?'

নরেন্দ্র কাঁচুমাচু মুখে বললে, 'তুমি তো জানো টুনু, সেদিনকার সেই হরিণটাকে আমি মারিনি।'

'মারোনি, মারতে পারতে তো?'

'তা হয়তো পারতুম।'

'তোমার মতো নিষ্ঠুর লোকের সঙ্গে আমার আর কথা কইতে ইচ্ছে হচ্ছে না।' টুনু সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হল।

নরেন্দ্র কাতর ভাবে তাড়াতাড়ি বললে, 'না টুনু, যেয়ো না। তুমি যখন মানা করেছ, আমি আর কখনও হরিণ মারব না।'

'হরিণ মারবে না, কিন্তু পাখিটাখি মারবে তো?'

'বেশ, তাও মারব না।'

'সত্যি বলছ?'

'সত্যি বলছি।'

'তবে তিন-সত্যি গালো!'

মনে মনে হাসতে হাসতে নরেন্দ্রকে তিন-সত্যি গালতে হল গম্ভীর মুখে।

টুনু এগিয়ে এসে অসঙ্কোচে নরেন্দ্রের একখানা হাত ধরে বললে, 'তাহলে নরেন, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল।'

'তাহলে রোজ আমি এখানে আসব?'

'এসো।'

'তোমার সেই হরিণটি বেঁচে আছে?'

'অনেক কষ্টে তাকে বাঁচিয়েছি। কিন্তু এখনও সে উঠতে পারে না। ঘাসের বিছানা পেতে আমি তাকে শুইয়ে রেখেছি।'

'তোমার মা-বাবা কোথায়?'

হাত দিয়ে নিজেদের কুঁড়েঘরটা দেখিয়ে টুনু বললে, 'ওইখানে।'

'তোমার বাবা কী করেন?'

'বনে বনে কাঠ কাটেন।'

'বনে বনে কাঠ কাটেন!'

'হ্যাঁ। তিনি কাঠুরে।'

বিস্মিত ভাবে নরেন্দ্র একটুখানি চুপ করে রইল। তারপর একটি নিশ্বাস ফেলে বললে, 'টুনু, কথায় কথায় আমরা আসল কথাই ভুলে গিয়েছি। একটু দাঁড়াও, তোমার জন্যে বেলপাতা পেড়ে দিই।'

টুনু বললে, 'না নরেন, আর তোমাকে গাছে চড়তে হবে না। বেলপাতা যে পেড়ে দেবে, ওই দ্যাখো সে আসছে।'

টুনুর দৃষ্টি অনুসরণ করে নরেন ফিরে দেখলে, ধীরে ধীরে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে সেই প্রকাণ্ড হাতিটা।

সঙ্কুচিত ভাবে সে বললে, 'ওই হাতিটা আমাকে দেখে রেগে যাবে না তো?'

'না, না, আমার রুনু ভারী ভালো মানুষ। আমার যাকে ভালো লাগে তাকে সে কিছুই বলে না।'

রুনু তাদের কাছে এসে দাঁড়াল। নরেন্দ্র সন্দিগ্ধ ভাবে আড়ষ্ট হয়ে রইল। রুনু শুঁড়টা নরেন্দ্রের দেহের কাছে নিয়ে গিয়ে একবার আঘ্রাণ নিলে, পরীক্ষার ফল বোধহয় হল সন্তোষজনক। রুনু বুঝতে পারলে, এই নতুন মানুষটা তার টুনুরই বন্ধু।

টুনু বললে, 'নরেন, আমার পুজোর সময় হল। আজ তুমি বাড়ি যাও।'

'কিন্তু কাল আবার আসব তো?'

টুনু হাসতে হাসতে বললে, 'বলেছি তো, এসো। রুনু! আমার পুজোর বেলপাতা পেড়ে দাও।' সে বেলগাছের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করল।

॥ সপ্তম ॥

খাসা বন্দুক, লক্ষ্মী বন্দুক

তারপর থেকে বনের ভিতরে নরেন্দ্রর আগমন হতে লাগল প্রতিদিনই।

রোজ সকালে সে বেলগাছের পাশে সেই ঝোপের কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকত, এবং টুনুও তাকে দেখলেই এলোচুল উড়িয়ে ছুটে আসত হাসতে হাসতে।

সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা নরম ঘাস-বিছানায় বসে তারা দুজনে গল্প করত। টুনু বলত বনের গল্প, আর শহরের গল্প সে শুনত নরেন্দ্রর মুখে। নরেন্দ্র টুনুর মতো বনকে ভালো করে চেনে না, আর টুনু তো জানে না শহরের কোনও কথাই। কাজেই দুজনেরই গল্প দুজনেরই খুব ভালো লাগত।

নরেন্দ্র কলকাতা শহর দেখেছে, এবং যখন সেখানকার গল্প বলত, তখন টুনুর দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠত উচ্ছ্বসিত বিস্ময়ে।

নরেন্দ্র বলত, 'কলকাতা শহরটি তোমাদের এই বনের মতোই প্রকাণ্ড। এই বনে যেমন বড়ো বড়ো গাছ গুনে ওঠা যায় না, তেমনি কলকাতা শহরে এত বড়ো বড়ো বাড়ি আছে যে তার হিসাব কেউ রাখতে পারে না। তোমাদের এই কাঠুরে গ্রামটাকে কলকাতার এক একটি মাঝারি বাড়ির ভিতরে পুরে ফেলা যায়।'

টুনু বলত, 'বলো কী নরেন!'

নরেন্দ্র বলত, 'হ্যাঁ। আর সেখানে এমন সব বড়ো বড়ো বাড়িও আছে, তোমাদের এই বনের সবচেয়ে বড়ো গাছগুলোকেও তাদের তলায় পুঁতে দিলেও দেখাবে যেন ছোটো ছোটো ফুলগাছের চারা।'

টুনুর মুখে বিস্ময়ে আর কথা ফোটে না।

নরেন্দ্র বলে, 'কলকাতার এক একটা বড়ো রাস্তা তোমাদের এই বনের ছোটো ছোটো মাঠের মতো চওড়া। সেসব রাস্তা আগাগোড়া পাথর দিয়ে বাঁধানো। আর তার উপর দিয়ে রোজ চলাফেরা করে লক্ষ লক্ষ লোক।'

টুনু রুদ্ধশ্বাসে অস্ফুটস্বরে বলে, 'লক্ষ লক্ষ লোক! সে কত, নরেন? আমি হাজার পর্যন্ত গুনতে পারি।'

নরেন হেসে বলে, 'একশো হাজারে হয় এক লক্ষ। কলকাতায় চল্লিশ লক্ষ লোক আছে। কলকাতার রাস্তায় খালি লক্ষ লক্ষ লোক নয়, তার উপরে তিরের মতো ছোটাছুটি করে ট্যাক্সি, বাস, ট্রাম!'

'সে আবার কী?'

'ওগুলো হচ্ছে এক এক রকম গাড়ির নাম।'

'আমি একবার ঘোড়ার গাড়ি দেখেছি। ওগুলো কি সেই রকম দেখতে?'

'না। কলকাতায় ঘোড়ার গাড়ি আছে, মানুষে-টানা রিকশা গাড়ি আছে, আবার গোরুর গাড়িও আছে বটে, কিন্তু ট্যাক্সি বাস আর ট্রাম, মানুষ বা জন্তু টানে না। ওগুলো কলের গাড়ি, আপনিই চলে। আর এত জোরে ছোটে যে, প্রতিদিনই দলে দলে লোক তার তলায় পড়ে মারা যায়।'

টুনু শিউরে উঠে বলে, 'ওগো মা গো, আমি কোনওদিন কলকাতায় যাব না! তার চেয়ে আমার এই বনই ভালো!'

'তোমাদের এই বনেও তো মানুষখেকো জন্তু আছে!'

'তা আছে। কিন্তু তারা তো রোজ মানুষ মারে না! আমাদের এই গাঁয়ের কেউ কোনওদিন তাদের খপ্পরে পড়ে মারা যায়নি।'

তারা এমনি সব গল্প করে, আর ইতিমধ্যে রুনু তাদের কাছটিতে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে। প্রথম প্রথম রুনুর খুব হিংসে হয়েছিল। সে ছাড়া টুনুর সঙ্গে আর কেউ যে এত বেশি মেলামেশা করে, এটা তার ভালো লাগেনি। তখন মাঝে মাঝে বোধহয় তার

মনে হত, লোকটার পিঠে শুঁড়ের বাড়ি এক ঘা দেব নাকি? কিন্তু তারপর সে যখন দেখলে, টুনু এই ছেলেটিকে খুব পছন্দ করে আর ভালোও বাসে, তখন তার মনের রাগ ধীরে ধীরে মুছে ফেললে, মনে মনেই।

একদিল সকালে এসে টুনু বললে, 'হ্যাঁ নরেন, তুমি তো খালি খালি শহরের গল্পই বলো। কিন্তু এই বনের ভিতরটা কোনওদিন ভালো করে দেখেছ কি?'

নরেন্দ্র বললে, 'না।'

'তাহলে চলো, আজ আমরা রুনুর সঙ্গে বনের চারদিকটা একবার ঘুরে আসি।'

নরেন্দ্র বললে, 'রুনুর সঙ্গে মানে?'

'রুনু আমাদের পিঠে করে বেড়িয়ে নিয়ে আসবে।'

নরেন্দ্র সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললে, 'তোমার রুনু কি আমাকে তার পিঠে চড়তে দেবে?'

'কেন দেবে না? আমি বললেই দেবে।' এই বলে টুনু গেল রুনুর কাছে। তারপর বাঁ হাত দিয়ে তার শুঁড়ের উপর হাত বুলোতে বুলোতে ডান হাত দিয়ে নরেন্দ্রকে দেখিয়ে বললে, 'হ্যাঁ রুনু, আমার সঙ্গে নরেনকেও তোমার পিঠে করে বেড়িয়ে আনবে কি?'

রুনু মুখ ফিরিয়ে নরেন্দ্রের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলে। তারপর চার পা মুড়ে মাটির উপরে বসে পড়ল। টুনু তার মাথার কাছে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল এবং নরেন্দ্র উঠে বসল তার পিঠের উপরে। তারপর রুনু আবার উঠে দাঁড়াল এবং হেলে-দুলে বনের ভিতর দিকে অগ্রসর হল।

দুই হাতে রুনুর দুই কান চেপে ধরে টুনু বসে ছিল দিব্যি জাঁকিয়ে। নরেনেরও হাতিতে চড়ার অভ্যাস আছে, কিন্তু সে হাওদাতে বসে। হাওদা-ছাড়া হাতির এই তেলা পিঠের উপরে বসে ধরবার কোনও অবলম্বন না পেয়ে নরেন্দ্র পড়ল বড়োই অসুবিধায়। প্রতিক্ষণেই তার মনে হতে লাগল, এই বুঝি গড়গড়িয়ে গড়িয়ে হাতির পিঠের উপর থেকে হয় পপাত ধরণীতলে!

তার অসুবিধা বুঝে টুনু খিলখিল করে হেসে উঠল। বললে, 'ও নরেন, যদি আছাড় খেতে না চাও তাহলে পিছন থেকে দু-হাতে আমার দু-কাঁধ চেপে ধরো।'

চলল রুনু গজেন্দ্রগমনে। কখনও বনে বনে, কখনও মাঠে মাঠে, কখনও নদীর তীরে তীরে—চারিদিককার নিবিড় ও তরুণ শ্যামল উৎসবের মাঝখান দিয়ে। দূরে দূরে নীল পাহাড়গুলো যেন তাদের মুখের পানেই তাকিয়ে আছে অবাক বিস্ময়ে। বনের ভিতরে ঘন পাতার আড়ালে লুকিয়ে পাখিরা সব ডেকে ডেকে ওঠে—তাদের মুখে মুখে ফোটে কত রাগ রাগিনী, কত রকম সুর ও ছন্দ! পাহাড়ের বুক থেকে সূর্যকিরণে বিদ্যুৎবালিকার মতো ঝরনা নাচতে নাচতে আসে পৃথিবীর সবুজ প্রাণের উপরে আসর পাতবে বলে।

নরেন্দ্রের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। এতদিন সে বনের এখানে-ওখানে আসত শিকারির হিংস্র চক্ষু নিয়ে। অরণ্যের অন্তঃপুরে এমন বিপুল সৌন্দর্যের ভাণ্ডার আছে, এটা দেখবারও অবকাশ কোনওদিনই তার হয়নি। রুনুর পিঠের উপরে টুনুর কাঁধ ধরে বসে আজ সে প্রথম উপলব্ধি করতে পারলে, প্রকৃতি কত সুন্দরী!

টুনু বললে, 'দেখছ নরেন, তোমাদের কলকাতার রাস্তার মতো এখানে বিপদের কোনও ভয় নেই?'

এদিকে ওদিকে তৃপ্ত চোখে তাকাতে তাকাতে নরেন্দ্র অভিভূত কণ্ঠে বললে, 'দেখছি! তোমার মতো আমারও এই বনের ভিতরেই বাসা বাঁধতে সাধ হচ্ছে।'

ঠিক তার দিন-তিনেক পরের ঘটনা।

রুনুর পিঠে চেপে সেদিনও বনের ভিতরে গিয়েছিল তারা দুজনে। সেদিন একটু বেশি দূরেই গিয়ে পড়েছিল। সেখানটা এত নির্জন যে, দুনিয়ায় পাখি ছাড়া আর কোনও জীব আছে বলে সন্দেহ হয় না।

খানিকটা তফাতে রয়েছে একটি ঝরনা তলা। নির্ঝরের স্বচ্ছ শুভ্র জল সেখানে পাথরের উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে মাটির উপর এসে সৃষ্টি করেছে ছোট্ট একটি নদী।

টুনু হঠাৎ বললে, 'রুনু, আমাকে নামিয়ে দাও। আমার জলতেষ্টা পেয়েছে।'

রুনু মাটির উপরে বসে পড়ল।

নরেন্দ্র বললে, 'আমারও তেষ্টা পেয়েছে।'

রুনুর পিঠ ছেড়ে দুজনে নীচে নেমে ঝরনা-তলায় গিয়ে অঞ্জলি ভরে জলপান করতে লাগল।

রুনু আসতে আসতেই দেখে নিয়েছিল, একটা গাছে ফলে আছে অনেকগুলো পাকা ফল। এই অবসরে সে-ও চলল ফলাহার করতে।

জলপানের পর টুনু দাঁড়িয়ে উঠে উপর দিকে মুখ তুলে সশব্দে ঘ্রাণ নিতে নিতে বললে, 'নরেন, কী চমৎকার ফুলের গন্ধ আসছে! তুমি এইখানে বোসো, ফুলগুলো কোথায় ফুটেছে দেখে আসি।' বলেই নরেনকে জবাব দেবার কোনও ফাঁক না দিয়েই একদিকে চলে গেল সে চুল আর আঁচল উড়িয়ে।

নরেন্দ্র জানে, বনের ভিতরে টুনুর খবরদারি করে রুনু। কাজেই সে আর কোনও মাথা না ঘামিয়ে একখানা পাথরের উপরে বসে বসে একমনে দেখতে লাগল ঝরনার নাচ। খালি নাচ নয়, শুনতে লাগল তার গানও।

খানিক পরেই সে সচমকে শুনতে পেলে বনের ভিতর থেকে টুনুর আর্তস্বর।

এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে সে টুনু যেদিকে গিয়েছিল সেইদিকে বেগে দৌড়তে লাগল।

টুনু সকাতরে চিৎকার করে বলছে, 'নরেন! নরেন! রুনু, রুনু, রুনু!'

ফল-খাওয়া ফেলে রুনুও দুই কান উপর দিকে তুলে দ্রুতপদে উত্তেজিত ভাবে ছুটে এল।

পাগলের মতন বনের ভিতর থেকে দৌড়তে দৌড়তে বেরিয়ে এল টুনু, তার দুই চক্ষে বিষম আতঙ্কের ভাব! আরও কয়েক পা এগিয়েই হঠাৎ সে হোঁচট খেয়ে মাটির উপরে পড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, তার কাছ থেকে হাত দশেক দূরে একখানা উঁচু বড়ো পাথরের

উপরে জঙ্গল ভেদ করে আবির্ভূত হল মস্ত একটা বাঘ! পাথরের উপরে এসে লাঙ্গুল আছড়াতে লাগল সশব্দে। তার পরেই নীচে টুনুর উপরে লাফ মারবার জন্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

রুনু শূন্যে শুঁড় তুলে বন কাঁপানো ভীষণ গর্জন করে উঠল—কিন্তু টুনুর কাছ থেকে সে এখনও খানিকটা দূরে রয়েছে, টুনুর কাছে যাবার আগেই বাঘ লাফিয়ে পড়ে শিকার নিয়ে আবার বনের ভিতরে পালিয়ে যাবে। রুনু তার গতি আরও বাড়িয়ে দিল বটে, কিন্তু বেশ বুঝতে পারলে, আর সে তার টুনুকে বাঁচাতে পারবে না।

হঠাৎ গুড়ুম করে গর্জে উঠল নরেন্দ্রের হাতের বন্দুক এবং পরমুহূর্তেই বাঘটা ধপাস করে নীচেকার মাটির উপরে পড়ে চিত হয়ে চার পা তুলে যেন শূন্যকেই থাবা মারতে লাগল।

টুনু তাড়াতাড়ি মাটির উপর থেকে উঠে পড়ে আবার এদিকে ছুটে এল।

কিন্তু বাঘটা তখনও মরেনি। মুখের শিকার পালায় দেখে সে আবার চার পায়ে ভর দিয়ে উঠে গর্জন করে উঠল দুর্জয় আক্রোশে। আবার সে সামনের দিকে লাফ মারবার চেষ্টা করছে, কিন্তু রুনু এবারে আর তাকে কোনও সুযোগই দিলে না। সে লাফ মারবার আগেই রুনু তার কাছে গিয়ে পড়ল এবং তারপর চোখের নিমেষে নিজের অজগরের মতো মোটা শুঁড় দিয়ে বাঘের দেহকে জড়িয়ে ধরে মাটির উপরে সক্রোধে আছাড় মারতে লাগল বারংবার। যতক্ষণ না বাঘের দেহটা রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডে পরিণত হল ততক্ষণ তাকে ছাড়লে না।

টুনু ছুটতে ছুটতে এসে নরেন্দ্রর পায়ের কাছে বসে পড়ে সভয়ে দুই চক্ষু দুই হাতে ঢেকে ফেলে কাঁদতে লাগল আকুল ভাবে। নরেন্দ্র তার পাশে বসে পড়ে সস্নেহে বললে, 'না টুনু, কেঁদো না। আর কোনও ভয় নেই, বাঘকে রুনু একেবারে মেরে ফেলেছে।'

টুনু দুটি সজল চোখ তুলে বললে, 'বাঘটাকে রুনু মেরেছে, না তুমি মেরেছ? তুমি না থাকলে আজ কি আমি বাঁচতুম?'

নরেন্দ্র বললে, 'দেখছ তো টুনু, তুমি আমাকে বন্দুক আনতে মানা করেছিলে! এই বন্দুকটা সঙ্গে না থাকলে আজ তোমার কী হত বলো দেখি?'

আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে টুনু হঠাৎ ফিক করে হেসে বললে, 'খাসা বন্দুক, লক্ষ্মী বন্দুক বন্ধু! এবার থেকে রোজ বন্দুক সঙ্গে এনো! কিন্তু দেখো, যেন হরিণ আর পাখি মেরো না।'

নরেন্দ্র অবাক হয়ে ভাবতে লাগল। বনের মেয়ে টুনু, তাই এত শীঘ্র এত বড়ো বন্য বিপদটাকে ভুলে হাসতে পারলে।

ইতিমধ্যে রুনুও তাদের কাছে এসে দাঁড়াল—তার শুঁড়টা তখনও রক্তমাখা। একবার নরেন্দ্রের দিকে তাকালে, সে দৃষ্টিতে মাখানো ছিল যেন কৃতজ্ঞতার ভাব। হয়তো সে বুঝতে পেরেছে, নরেন্দ্র না থাকলে তার টুনু আজ কিছুতেই বাঁচত না।

রুনু আর সেখানে থাকতে রাজি নয়। মাটির উপরে তাড়াতাড়ি বসে পড়ে সে তাকালে

টুনুর মুখের দিকে। তার মনের ভাবটা এই, 'ওহে টুনু, এই সাঙ্ঘাতিক জায়গায় আর থাকা উচিত নয়। চটপট আমার পিঠে উঠে পড়ো!'

॥ অষ্টম ॥

বন্ধুদের মাথাব্যথা

এদিকে কাঠুরেপাড়ায় পড়ে গেছে সাড়া।

টুনুর বনের সঙ্গিনীরা খেলা করতে এসে তাকে খুঁজে না পেয়ে প্রথম দিন-কয়েক ভারী অবাক হয়ে গেল। তারা আসবার আগেই টুনু রোজ সকালে খেলা করবার জন্যে তাদের অপেক্ষায় দাওয়ায় বসে থাকত। কিন্তু এখন সেই টুনুর টিকি দেখবার জো নেই! ব্যাপার কী?

তাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে পার্বতী বলে, 'টুনু কোথায় গেছে, জানি না তো! বোধহয় রুনুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছে।'

তারা বলে, 'বা রে, আমাদের সঙ্গে দেখা না করেই?'

পার্বতী বলে, 'টুনু এখন ধেড়ে মেয়ে হল, আর কতদিন তোদের সঙ্গে খেলা করবে রে? যা, পালা!'

কিন্তু টুনুর ঠিকানা আবিষ্কার করতে সঙ্গিনীদের বেশি দেরি লাগেনি। একদিন তারা দূর থেকে উঁকি মেরে দেখে নিলে, টুনু গল্প করছে একটি চমৎকার-দেখতে ছেলের সঙ্গে।

সেদিন যখন টুনু ফিরে এল, তার কাছে তার সঙ্গিনীরা ধরনা দিয়ে পড়ল। কেউ বললে, 'ও টুনু, ওই সোন্দর ছেলেটি কে ভাই?'

কেউ বললে, 'এবার থেকে আমাদের ছেড়ে তুই কি ওরই সঙ্গে খেলা করবি?'

কেউ বললে, 'ও কি তোর বর হবে, ভাই?'

শেষ কথাগুলো যে বললে, টুনু ধাঁ করে তার গালে বসিয়ে দিলে এক চড়।

সে গালে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'মারলি কেন ভাই?'

টুনু চোখে রাগ ফুটিয়ে বললে, 'তুই নরেনকে আমার বর বললি কেন? ও তো আমার বন্ধু!'

'তোর বন্ধুর নাম বুঝি নরেন?'

'হ্যাঁ।'

'তা বন্ধু যখন হয়েছে বর হতে আর কতক্ষণ!'

টুনু আবার রেগে চড় তুললে, কিন্তু সে চড় কারুর গালে পড়বার আগেই তার সঙ্গিনীরা দৌড় মেরে খিলখিল করে হাসতে হাসতে সরে পড়ল।

কথাটা পার্বতীরও কানে উঠল। সে-ও একদিন কৌতূহলী হয়ে দূর থেকে উঁকি মেরে দেখে এল নরেনকে। মনে মনে বললে, বাঃ, কী মিষ্টি ছেলেটি!

শহরের ব্যাপার নয়, বনের ব্যাপার। টুনু শহুরে মেয়ে হলে, পরের ছেলের সঙ্গে ভাব করেছে বলে আজ তাকে মায়ের কাছ থেকে অনেক বকুনি খেতে হত। কিন্তু পার্বতী টুনুকে কিছু না বলে সন্ধ্যার সময় স্বামীর কাছে সব কথা জানালে। সঙ্গে সঙ্গে টীকা করলে, 'ওই রকম একটি ছেলের সঙ্গে যদি টুনুর বিয়ে হয়, তাহলে দেখতে-শুনতে কেমন চমৎকার হয় বলো দেখি?'

দুখিরাম খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইল। তারপর বললে, 'ও ছেলেটির সঙ্গে টুনুর ভাব হল কেমন করে?'

পার্বতী বললে, 'সে কথা আমি জানিনে, তোমার মেয়েই জানে। তাকে জিজ্ঞেস করব নাকি?'

দুখিরাম বললে, 'না, আজ আর কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না। কাল সকালে আগে আমি ছেলেটিকে দেখি।'

পরদিন সকালে দুখিরামও দূর থেকে লুকিয়ে দেখে নিলে নরেন্দ্রকে দেখেই তার দুই চোখ উঠল চমকে। সে একরকম ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতেই এসে ডাকলে, 'পার্বতী, অ-পার্বতী!'

পার্বতী ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, 'কী গা?'

দুই চোখ কপালে তুলে দুখিরাম বললে, 'ওরে পার্বতী, ও রাজার ছেলে যে রে!'

পার্বতী প্রথমটা বুঝতে না পেরে বললে, 'কে রাজার ছেলে?'

'আমাদের টুনুর সঙ্গে যার ভাব হয়েছে!'

'বলো কী?'

'হ্যাঁ রে, হ্যাঁ! ওরা এখানকার মস্ত বড়ো জমিদার। ওর বাপের নাম রাজা ভূপেননারান! রাজা যখন বেঁচে ছিল, তখন তার নামে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খেত। কী রে পার্বতী, আমি তোকে বলেছিলুম না, যার-তার সঙ্গে কোনওদিনই টুনুর বিয়ে হবে না? দেখলি, আমার কথা ফলল কি না?'

পার্বতী হেসে ফেলে বললে, 'যাও যাও, বাজে বক বক কোরো না! কোথায় বিয়ে তার ঠিক নেই, উনি এখনই ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করেছেন! তোমার ভীমরতি ধরেছে গো, ভীমরতি ধরেছে!'

ওদিকে নরেন্দ্রের বন্ধু-বান্ধবেরা রোজ সকালে জমিদারবাড়িতে এসে দেখে, বাসা ছেড়ে উড়ে গেছে পাখি।

দ্বারবানের মুখে খবর পায়, নরেন্দ্র বন্দুক নিয়ে শিকারির সাজ পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

তারা মাথা চুলকোতে চুলকোতে ভাবে, ব্যাপারটা তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না! কুমার বাহাদুর বন্দুক নিয়ে রোজ শিকার করতে বেরিয়ে যান একলা? কেন? আগে তো তাদের সঙ্গে না হলে তাঁর চলত না! আজকাল আবার হঠাৎ এই একলা শিকারে যাবার বেয়াড়া শখ হল কেন?

কেউ কেউ মাথা নেড়ে বলে, 'এ যেন কেমন কেমন লাগছে, না?'

কেউ সায় দিয়ে বলে, 'একেবারে অভিনব আর কী!'

কেউ বা বলে, 'কুমার বাহাদুর কি হঠাৎ কোনও কারণে আমাদের উপরে চটে গেলেন?'

অন্য সকলে বলে, 'চটবেন কেন? আমরা তো কেউ কোনও দোষ করিনি!'

অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় তারা সকলে মিলে নরেন্দ্রকে গিয়ে গ্রেপ্তার করলে। মুখের পর মুখ থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন বৃষ্টি হতে লাগল।

'হ্যাঁ কুমার বাহাদুর, রোজ সকালে আপনি কোথায় যান বলুন দেখি?'

'শিকার করতে।'

'তা, আমাদের সঙ্গে নিয়ে যান না কেন?'

বন্ধুরা সবাই জানত, নরেন্দ্রের কবিতা রচনা করবার বাতিক আছে। সে সেই বাতিকের আশ্রয় গ্রহণ করলে। বললে, 'বনের ভিতরে যাই কেন জানো? কবিতা লিখতে।'

'জঙ্গল আবার কবিতা লেখবার জায়গা নাকি!'

'না হে অসীম, বন হচ্ছে অতি নির্জন স্থান। সেকালের মুনি-ঋষিরা সাধনার জন্যে বনে যেতেন, তা কি শোনোনি? কবিতাও হচ্ছে দস্তুরমতো সাধনার জিনিস। বেশ নিরিবিলি জায়গা না হলে কি কবিতা লেখা যায় হে?'

উত্তরটা কারুরই মনের মতো হয় না।

অসীম বলে, 'কবিতা লেখার জন্যে তো দরকার হয় কলম। রোজ তুমি বন্দুক নিয়ে যাও কেন?'

নরেন্দ্র বলে, 'বনের বাঘ যদি হালুম করে তেড়ে আসে, তখন কি আমি কবিতা পাঠ করে তার মাথা ঠান্ডা করব? তখন যে মসির বদলে দরকার হয় অসির। আমি না হয় অসির আর এক ধাপ উপরে উঠে ব্যবহার করি বন্দুক। তা, এজন্যে তোমাদের এত মাথাব্যথা কেন বাপু?'

কিন্তু নরেন্দ্রের এত কথা শুনেও বন্ধুদের মাথাব্যথা একটুও কমল না। নরেন্দ্রের অজ্ঞাতসারে তার পিছু পিছু গিয়ে বনের রহস্য ভেদ করবার সাধ তাদের হয়, কিন্তু সাধ্য হয় না। কারণ শেষরাত্রে কাকপক্ষী ডাকবার আগেই নরেন্দ্র যখন বনে গমন করে, তখন তার প্রত্যেক বন্ধুই থাকে গভীর নিদ্রায় অচেতন।

॥ নবম ॥

টুনুর পদক আর ভৈরবীর আঁশবটি

বাহন রুনু সেদিনও তাদের নিয়ে গিয়েছে বনের ভিতরে। একটি মস্ত কণ্টকিত কুলের ঝোপের সামনে নরেন্দ্র দাঁড়িয়ে ছিল এবং টুনু খুব খুশিমুখে কোঁচড় ভরে পাড়ছিল টোপা কুল। রুনু একটু দূরে দাঁড়িয়ে যেন কিঞ্চিৎ চিন্তিতভাবেই দেখছিল টুনুর কুল পাড়া। সে ওই

কুলগাছের গুণ জানে। শুঁড়ের ডগায় কাঁটা ফুটলে যে কত আরাম হয়, সেটাও তার অজানা নয়। তাই মোটেই তার কুল খাবার লোভ হয় না।

রুনু যা ভয় করছিল তাই হল। হঠাৎ 'উঃ' বলে মৃদু আর্তনাদ করে টুনু মাটির উপরে বসে পড়ল, তার হাতের আঙুলে বিঁধেছে কুলের কাঁটা। আঙুল দিয়ে রক্তও পড়ছে।

'দেখি, দেখি, কী হল!' বলে নরেন্দ্র তার কাছে ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এল।

টুনু হাসিমুখ উপর দিক তুলে বললে, 'কিচ্ছু হয়নি। একটা কাঁটা বিঁধেছিল। তুলে ফেলেছি।'

হঠাৎ টুনুর গলার কাছে নরেন্দ্রের নজর পড়ল। খুব সরু একগাছা সোনার হারে গাঁথা একটি পদক কেমন করে জামার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

নরেন্দ্র কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার গলায় ঝুলছে ওটা কী, টুনু? আরে, ওতে যে আবার কী একটা নাম লেখা রয়েছে! কই, দেখি, দেখি!'

তাকে না বলে জামার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে বলে টুনু পদকখানাকে গালাগাল দিতে লাগল। এটা আর কারুকে দেখাবার ইচ্ছা তার ছিল না। তবে, নরেন্দ্র যখন নেহাত দেখেই ফেলেছে, তখন লুকোবার আর কোনওই উপায় নেই।

নরেন্দ্র হেঁট হয়ে পড়ে সেই সোনার হার আর পদকখানা বেশ খানিকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'এই গহন বনে এরকম হার আর সোনার পদক গড়ে এরকম স্যাকরা তো কেউ নেই! কাঠুরেদের কোনও মেয়ের গায়েই কখনও আমি এক টুকরো সোনার গয়নাও দেখিনি।'

ধরা পড়ে গিয়েছে বুঝে টুনু চুপটি করে রইল।

নরেন্দ্র আবার বললে, 'পদকের উপরে একটি নাম লেখা দেখছি—'রেণুকা'। তোমার নাম তো টুনু। তোমার পোশাকি নাম কি রেণুকা?'

মৃদুস্বরে টুনু শুধু বললে, 'হুঁ।'

নরেন্দ্র বললে, 'রেণুকা খুব পুরোনো নাম, আবার খুব আধুনিকও। নামটি ভারী মিষ্টি। ও নাম তোমার কে রাখলে?'

'আমার মা-বাবা।'

'দুখিরাম আর পার্বতী?'

'উঁহু!'

'তবে?'

'আমার সত্যিকার মা-বাবা।'

নরেন্দ্র মহা বিস্ময়ে বললে, 'তোমার সত্যিকার মা-বাবা! সে আবার কারা?'

'আমি তাঁদের নাম জানি না।'

'নিজের মা-বাবার নাম জানো না!'

'খুব ছোটোবেলায় আমি বনের ভিতর হারিয়ে গিয়েছিলুম। সেই সময় রুনু আমাকে দেখতে পেয়ে ওই কাঠুরেপাড়ায় গিয়ে দিয়ে আসে। তারপর থেকে ওইখানেই আমি মানুষ হয়েছি।

কতদিন পরে নরেন্দ্রর একটা মস্ত সমস্যার পূরণ হল। টুনুকে সে কোনওদিনই কাঠুরেদের মেয়ে বলে বিশ্বাস করতে পারেনি। কাঠুরেদের ঘরে মানুষ হলেও তার সর্বাঙ্গে রয়েছে আভিজাত্যের ছাপ।

আজ টুনুর মুখে আসল রহস্য জানতে পেরে নরেন্দ্রর সারা মন ভরে উঠল আনন্দে। টুনুর সত্যিকার পিতামাতারা নিশ্চয়ই ভদ্রসমাজের লোক!

সে আবার জিজ্ঞাসা করলে, 'মা আর বাবার কথা তোমার মনে পড়ে?'

'একটু একটু পড়ে বই কি!'

'দেখতে তাঁরা কীরকম ছিলেন?'

'খুব ফরসা।'

'তাঁরা কীরকম পোশাক পরতেন?'

'পোশাক আবার কীরকম পরতেন! মা পরতেন মেয়েদের মতো কাপড়। আর বাবাকে সব সময়েই দেখতুম, সায়েবদের মতন পোশাক পরে আছেন।'

'তুমি সাহেব দেখেছ?'

'হুঁ, এই বনে মাঝে মাঝে শিকার করতে আসে।'

'তোমার বাবা সেইরকম পোশাক পরতেন?'

'হ্যাঁ। বাবাকে মাঝে মাঝে তোমার মতো পোশাক পরতেও দেখতুম।'

নরেন্দ্র বুঝলে, টুনু বলছে তার বাবা পরতেন তারই মতন খাকি রঙের প্যান্ট শার্ট।

তাহলে বেশ বোঝা যাচ্ছে, টুনুর বাবা সাধারণ হেটো লোকের মতো নয়।

সে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি যখন হারিয়ে গিয়েছিলে, তখন তোমার বয়স কত?'

'এই, পাঁচ-ছ-বছর হবে আর কী!'

'তাহলে তোমার বাড়ির ঠিকানাও নিশ্চয়ই তুমি জানো না?'

'না। তবে এইটুকু আমার মনে আছে, এই বনের ধারেই কোথাও আমাদের বাড়ি। কারণ, আমি তো তখন খুব ছোট্টটি, হারিয়ে গেলেও বাড়ি থেকে নিশ্চয়ই খুব বেশি দূরে হেঁটে যেতে পারিনি।'

নরেন্দ্র ভাবতে ভাবতে বললে, 'তোমরা কি পাকাবাড়িতে থাকতে?'

'হ্যাঁ, সেটা আমার মনে আছে। আরও মনে আছে যে, আমাদের বাড়ির চারিধারে ছিল চমৎকার একটি বেড়া দেওয়া বাগান। সেই বাগানটিতে রোজ আমি খেলা করতুম। আর খেলা করতে করতে একদিন প্রজাপতি ধরতে গিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেই তো আমার এই সর্বনাশ! আমাকে হারিয়ে ফেলে আমার মা-বাবা নিশ্চয় কতদিন ধরে কত কেঁদেছেন।' বলতে বলতে টুনুর দুটি ডাগর ডাগর চোখ ভরে উঠল অশ্রুজলে।

নরেন্দ্র তাকে সান্ত্বনা দিয়ে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'কেঁদো না টুনু। এই বনের ধারে ধারে চারিদিকে আমি খুঁজে দেখব। আমি নিশ্চয়ই তোমার আসল বাপ-মায়ের সন্ধান পাব।'

টুনু বললে, 'তখনও হবে আমার আর এক জ্বালা! এই বনের মা-বাপকেও আমি যে

ভালোবেসে ফেলেছি গো! এদের ছেড়ে যেতে দুঃখে আমারও বুক ফেটে যাবে, আর আমাকে ছেড়ে এরাও প্রাণে বাঁচবে না। কী করি বলো তো নরেন?'

নরেন বললে, 'তোমার বাপ-মায়ের যেটুকু বর্ণনা শুনলুম, তাতে বোধ হয় তাঁরা গরিব নন। দুখিরাম গরিব মানুষ, বনের কাঠ কেটে খায়। ওকে আর পার্বতীকে তুমি তো অনায়াসেই সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারো। তোমাকে ফিরে পেলে খুশি হয়ে তোমার বাপ-মা নিশ্চয়ই ওদের আশ্রয় দেবেন।'

এত সহজে এত বড়ো সমস্যার সমাধান হয়ে গেল দেখে টুনু দাঁড়িয়ে উঠে নাচতে নাচতে বললে, 'ওহো, কী মজা, কী মজা! ওরে রুনু, কী মজা! নরেন আমাকে বাবা-মার কাছে নিয়ে যাবে রে!'

হঠাৎ নরেন মুখ তুলে দেখলে, কুল-ঝোপের ওপাশ থেকে সাঁৎ করে একদিকে সরে গেল একখানা কালো মুখ, আর চকচকে দুটো চোখ। ভালো করে মুখখানা দেখা গেল না বটে, কিন্তু সেটা যে মানুষেরই মুখ, তাতে আর কোনওই সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই লোকটার অভিপ্রায় ভালো নয়, নইলে অমন করে চোরের মতো গা-ঢাকা দেবে কেন? সে তখনই পিঠ থেকে বন্দুক নামিয়ে দ্রুতপদে সেইদিকে ছুটে গেল। কারুকেই দেখতে পেলে না। কেবল লক্ষ করলে, খানিক তফাতে একটা ঝোপ দুলতে দুলতে আবার স্থির হয়ে গেল। তাকে ভয় দেখাবার জন্যে সে একবার বন্দুক ছুড়লে। তারপর আবার টুনুর কাছে ফিরে এল।

টুনু বিস্ময়-ভরে বললে, 'নরেন, ওদিকে তুমি ছুটে গেলে কেন? আর বন্দুকই বা ছুড়লে কেন?'

নরেন্দ্র বললে, 'কে একটা লোক এখানে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখেই পালিয়ে গেল।'

যে পালিয়ে গেল সে আর কেউ নয়, সে হচ্ছে রাঘব সর্দার। সে একজন বিখ্যাত ডাকাত। বনের বাইরে চারিদিকে ডাকাতি করে আবার সে ডুব মারে বনের ভিতরে। এই বনেই তার আস্তানা, পুলিশ এখানে এসে কোনওমতেই তাকে খুঁজে বার করতে পারে না। রাঘব আজ পর্যন্ত কত লোককে যে খুন-জখম করেছে, তার আর কোনও হিসাব নেই। তার নাম শুনলেই এ-অঞ্চলে সকলেরই বুক মহা ভয়ে কেঁপে ওঠে। তোমরাও রাঘবকে দেখেছ—সেই যেদিন নরেন্দ্র এসেছিল হরিণ শিকার করতে। টুনুর হুকুমে রুনু করেছিল তারই পিছনে তাড়া।

বনের ভিতর দিয়ে এ-পথ সে-পথ মাড়িয়ে রাঘব সর্দার এগিয়ে চলেছে হন হন করে। হিংস্র জন্তু-সংকুল এই বন্য দৃশ্যের মাঝখানে তার বন্য ও হিংস্র মূর্তিও মানিয়ে গিয়েছিল দস্তুরমতো। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে হাঁটবার পর সে অরণ্যের একটা অতিশয় নিবিড় ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন অংশের ভিতরে প্রবেশ করলে। বাহির থেকে এখানে প্রবেশ করবার পথ আবিষ্কার করা অসম্ভব। এখান দিয়ে আনাগোনা করবার গুপ্ত পথ জানে কেবল রাঘব সর্দার ও তার চেলা-চামুণ্ডারা।

খানিকক্ষণ পরে বন আবার পাতলা হয়ে এল এবং সামনে দেখা গেল গাছ আর

আগাছায় ভরা খানিকটা খোলা জমি। সেই জমির উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু ছোটো একটা পাহাড় বা ঢিপি। তারই তলায় কতকগুলো গোলপাতার ছাউনি দেওয়া ঘর। সেইখানেই বাস করে দলবল নিয়ে রাঘব সর্দার।

একখানা বড়ো ঘরের দাওয়ার উপরে গিয়ে বসে পড়ে রাঘব তার হেঁড়ে গলায় ডাক দিলে, 'ওরে ভৈরবী!'

ভিতর থেকে ঠিক ভাঙা কাঁশির মতো খনখনে ও নাকি আওয়াজ বেরিয়ে এল, 'কী বলছিস রে কর্তা?'

রাঘব বললে, 'একছিলিম তামুক সেজে আন রে!'

ভিতর থেকে আবার সেই আওয়াজ এল, 'আমার এখন হাত জোড়া। তামুক খেতে সাধ যায় তো নিজের হাতে সেজে খা!'

রাঘব হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, 'তবে রে গতরখাকি মুটকি! দেখবি একবার মজাটা? জোড়া হাত খালাস করে এক্ষুনি তামুক সেজে নিয়ে আয়!'

ভিতর থেকে আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। রাঘব নিজের কোমর থেকে রাঙা গামছাখানা খুলে মুখের সামনে ঘোরাতে ঘোরাতে বাতাস সৃষ্টি করবার চেষ্টা করতে লাগল। এবং তার গলা পেয়ে এদিক-ওদিক থেকে আরও কয়েকজন গুণ্ডার মতন দেখতে লোক একে একে এসে দাওয়ার উপরে আসন গ্রহণ করলে।

একটা মাথায় খুব খাটো কিন্তু আড়ে খুব চওড়া লোক জিজ্ঞাসা করলে, 'কী খবর, সর্দার?'

রাঘব গামছা ঘোরানো বন্ধ করে হলদে হলদে দাঁতগুলো বার করে বললে, 'বেঁটকু, খবর ভালো। কিন্তু আমাদের আর বোধহয় সবুর করা চলবে না।'

বেঁটকু বললে, 'কেন?'

'আজ বনের ভিতরে দেখলুম, রাজা ভূপেনের ছেলে সেই নরেন ছোকরা আর দুখিরামের মেয়ে টুনুকে। তাদের ভাবগতিক দেখে মনে হল নরেনের সঙ্গে টুনুর বোধহয় বিয়ে হতে আর দেরি নেই।'

আর একটা লোক বললে, 'কাঠুরের মেয়ের সঙ্গে রাজার ছেলের কখনও বিয়ে হয়? তাহলে নরেন কি সমাজে আর কল্কে পাবে?'

রাঘব বললে, 'মটকু, যা জানিসনে তা নিয়ে আর তুই মাথা ঘামাসনে। আজকালকার সমাজের কী খবর রাখিস তুই? কখনও কলকেতায় গিয়েছিস? সেখানে আর কোনও জাত-বিচার নেই। বামুন বাবুসায়েবরা হাড়ি-বিবিসায়েবদের বিয়ে করলেও এখন সেখানে একঘরে হয় না। নরেন তো কলকেতার কলেজে পড়া ছেলে! তার টাকার ভাবনা নেই। সে যদি টুনুকে বিয়ে করে কলকেতায় চলে যায়, তাহলে এখানকার কেউ কিছুই করতে পারবে না।'

বেঁটকু মাথা নাড়তে নাড়তে সায় দিয়ে বললে, 'হ্যাঁ সর্দার, এ কথা জজে মানে বটে।'

মটকু বললে, 'তুমি এখন কী করতে চাও সর্দার?'

'দুখিরামের বেটি টুনটুনিকে ধরে আনতে চাই।'

'ধরতে চাও তো তাকে আজকেই ধরে আনলে না কেন?'

'তুই ব্যাটা হচ্ছিস হস্তীমুখ্যু! তার সঙ্গে নরেন ছিল বললুম না!'

'আরে, কী যে বলো সর্দার! নরেন কি আবার একটা মানুষ? তোমার এক চড়ে তার ঘাড় থেকে মাথা যাবে উড়ে!'

'কিন্তু আমি চড় মারবার আগেই সে যদি বন্দুক ছুড়ত!'

দুই চক্ষু রসগোল্লার মতো গোল করে মটকু বললে, 'ও বাবা! তার হাতে আবার বন্দুক ছিল নাকি!'

'ছিল বলে ছিল! একটা গুলি চালিয়েও ছিল!'

'ছোঁড়া ভারী ধড়িবাজ তো!'

'কিন্তু কেবল কি বন্দুক? সেখানে ছিল সেই মস্ত হাতিটাও, টুনুর কথায় যেটা ওঠে বসে। বন্দুক এড়ালেও আমি সেই হাতিটাকে এড়াতে পারতুম না। তার সামনে টুনুকে ধরতে যাওয়া আর সোজা যমের বাড়ি যাওয়া একই কথা।'

বেঁটকু বললে, 'তবেই আর তুমি টুনুকে ধরেছ!'

'আলবত ধরব! আমি ক-দিন ধরে তাদের উপর নজর রেখে দেখেছি, টুনু আর নরেন হাতিটাকে নিয়ে বনে বেড়াতে আসে কেবল সকালবেলাতে। তারপর হাতি, নরেন আর টুনু, যে যার নিজের বাসায় ফিরে যায়। আজই সাঁঝেরবেলাতে কাঠুরেদের গাঁয়ে গিয়ে আমি টুনুকে ধরে আনব।'

ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কলকের আগুনে ফুঁ দিতে দিতে এই কথা শুনছিল আর এক বীভৎস মূর্তি। সে হচ্ছে রাঘবের বউ ভৈরবী। অত মোটা স্ত্রীলোক চোখে পড়ে না বললেও চলে। ঠিক যেন একটা বটগাছের গুঁড়ির মতো তার দেহ। গায়ের রং অমাবস্যার ঘুটঘুটে রাত্রিকেও হার মানায়। বাঁদরের মতো থ্যাবড়া নাক, কাফ্রিদের মতো পুরু ঠোঁট, একটা ঠোঁট আবার কাটা। আর সেই কাটার ফাঁক দিয়ে গজদন্তের মতো বাইরে বেরিয়ে পড়েছে একটা বিবর্ণ দাঁত। সেই কালো মুখের থেকে খুব কুতকুতে চোখদুটো তার জ্বলে জ্বলে উঠছে সাপের চোখের মতো। যেমন দ্যাবা, তেমনি দেবী!

বাইরে বেরিয়ে এসেই সেই পেত্নির মতো নাকি খনখনে গলায় ভৈরবী বলে উঠল, 'দুখিরামের মেয়েকে নিয়ে তুই কী করবি রে কর্তা?'

হলদে দাঁতের পাটি বার করে রাঘব করল একটা বিকট মুখভঙ্গি। এখানকার সকলে সেই ভঙ্গিটাকে হাসি বলেই ধরে নেয়। অতএব আমরাও তাকে হাস্য বলেই গ্রহণ করব।

হাসতে হাসতে চোখ মটকে রাঘব বললে, 'বিয়ে করব।'

যাঁহাতক এই কথা বলা, ভৈরবী অমনি হুঁকোর উপর থেকে আগুন-ভরা কলকেটা তুলে নিয়ে সজোরে প্রেরণ করলে রাঘবের মস্তকদেশের দিকে। তার রায়বাঘিনী গৃহিণীর কাছ থেকে এই রকম ব্যবহারের প্রত্যাশা করত সর্বদাই রাঘব। কাজেই আজও সে প্রস্তুত হয়েই ছিল, ধাঁ করে মাথা নামিয়ে ফেলে কলকেটাকে সে কোনওমতে এড়ালে। কিন্তু জ্বলন্ত

টিকেগুলোর প্রত্যেকটিকে সে এড়াতে পারলে না; কোনও-কোনওটা গিয়ে পড়ল তার গায়ের উপরে। আঁতকে গা আর কাপড় ঝাড়তে ঝাড়তে দাঁড়িয়ে উঠে মারমুখো হয়ে সে বললে, 'কী করলি রে হতচ্ছাড়ি!'

ডান হাতে হুঁকোর নলচেটা ধরে নীচের দিকটা গদার মতন উপর দিকে তুলে রাঘবের মুখের সামনে গোদা বাঁ হাতখানা নাড়তে নাড়তে হুমকি দিয়ে ভৈরবী বললে, 'বেশি কথা কয়েছিস কী, এই হুঁকোটা ভেঙেছি তোর মাথার ওপর!'

গিন্নিকে আরও ঘাঁটিয়ে এই হুঁকোটা থেকে বঞ্চিত হবার ইচ্ছা রাঘবের হল না। মনের আক্রোশ মনেই চেপে সে বললে, 'তোর এতটা রাগের কারণ কী রে হতভাগী?'

'কারণ নেই? কেন তুই বললি, দুখিরামের বেটিকে বিয়ে করবি?'

'কেন, বিয়ে করতে দোষটা কী!'

'তোর জলজ্যান্ত বউ আমি না এখনও বেঁচে আছি!'

রাঘব অট্টাহাস্য করে বললে, 'আমাকেও তুই হাসালি ভৈরবী!'

'তা, হাস না, একটু হাস না! ও পোড়ার মুখে একটু তবু হাসি দেখলেও এই বেঁটকু আর মটকুদের মনটা কিছু ঠান্ডা হবে।'

রাঘব বললে, 'হিঁদুদের শাস্তরে আছে, পুরুষমানুষ যত খুশি বিয়ে করতে পারে। আমি হিঁদু, আমিও একটার ওপরে দুটো বিয়ে কেনই বা করব না!'

'আমার ঘরে সতীন এনে মজাটা একবার দেখ না!'

রাঘব তখন যুক্তির আশ্রয় নিলে। বললে, 'ভৈরবী, খামকা মাথা গরম করিসনি, যা বলি, মন দিয়ে শোন। তোর মনে আছে কি, নরেনের বাপ রাজা ভূপেন একবার পাইক পাঠিয়ে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পুলিশের হাতে দিয়েছিল, আর আমার জেল খাটবার হুকুম হয়েছিল পনেরো বছর! ভাগ্যে আমি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এক বছর জেল খেটেই লম্বা দিতে পেরেছি, নইলে আজও আমাকে সেইখানে পচে মরতে হত। রাজা ব্যাটা পটল তুলেছে, কাজেই আমি ছেলের ওপরেই প্রতিশোধ নিতে চাই। তার ওপরে ওই নরেন ছোকরার সঙ্গে প্রথম যেদিন আমার দেখা হয়েছিল, সেইদিনই আমাকে অপমান করতে ছাড়েনি। তারপর আজকেও সে আমাকে মারবার জন্যে বন্দুক ছুড়েছিল। তবে নরেনকে আমি মাপ করব কেন রে?'

'দুখিরামের বেটিকে বিয়ে করলে নরেনের ওপরে কী প্রতিশোধ তোলা হবে?'

রাঘব বললে, 'মুটকি, তোর কী মোটা বুদ্ধি রে! এটাও বুঝতে পারছিস না, নরেন ওই মেয়েটিকে বিয়ে করতে চায়! কিন্তু আমি যদি তাকে ছিনিয়ে এনে বিয়ে করে ফেলি, তাহলে নরেন কী জব্দটাই না হবে!'

কিন্তু ভৈরবী বোঝ মানবার পাত্রী নয়। সে এই বলে গজরাতে গজরাতে ঘরে ঢুকল—'সতীন আনবি? আন না দেখি! ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব না!'

সেই সন্ধ্যায়।

সূর্যদেব অস্তচলে নেমে গিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর পরিত্যক্ত কিরণ-তিরের অগ্রভাগগুলি যেন ভেঙে তখনো আবছায়ায়-ঝাপসা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে এখনও জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে দিবসের সমুজ্জ্বল স্মৃতিটুকু। আকাশের অন্তরালে তারকাবালারা বোধহয় সাজসজ্জায় ব্যস্ত ছিল, কারণ এখনও তারা ঘোমটা খুলে দেয়নি। বিহঙ্গেরা সব কুলায়ে ফিরে গিয়ে সভয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে, কারণ রাত্রি এখন যাত্রী হয়েছে এই গহন অরণ্যে। শৃগাল-সভায় শোনা গেল একবার হুক্কাহুয়ার লেকচার। তখনও দুয়েকটা পথ-ভোলা বাছুর হাম্বা হাম্বা চিৎকার করে অদৃশ্য মাতাদের সন্ধানে জানাচ্ছে কাতর প্রার্থনা।

দুখিরাম বললে, 'পার্বতী, আমাদের বাছুরটা পাশের মাঠে এখনও বাঁধা রয়েছে।'

পার্বতী তখন সবে সন্ধ্যাদীপ জ্বেলে তুলসীগাছের তলায় গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে উঠেছে। সে ব্যস্ত হয়ে বললে, 'একটু পরেই তো হুমড়োরা বেরিয়ে পড়বে! দাঁড়াও তাকে আমি নিয়ে আসি।'

টুনু বললে, 'না মা, তুমি রান্নাঘরে যাও, উনুন জ্বলে যাচ্ছে। বাছুরটাকে আমিই নিয়ে আসি।'

বনের মেয়ে টুনু, ধীরে ধীরে চলতে শেখেনি। ছোট্ট বালিকার মতো সকৌতুকে ছুটতে ছুটতে ঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়ায় এবং দাওয়া থেকে লাফিয়ে মাঠের উপরে গিয়ে পড়ল। তারপর তেমনি ছুটতে ছুটতেই সন্ধ্যার অন্ধকারে সে মিলিয়ে গেল একদিকে।

বাড়ির পিছনকার মাঠে একটা গাছের গোড়ায় বাছুরটা ছিল বাঁধা। সে মায়ের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেবার জন্যে কাতর স্বরে ডেকে উঠছিল ঘন ঘন।

বাছুরটার নাম ছিল মধু। গাছের গোড়া থেকে দড়ির বাঁধন খুলতে খুলতে আদর-মাখা মিষ্টি গলায় টুনু বললে, 'হ্যাঁরে মধু, মায়ের কাছে গিয়ে দুধ খেতে চাস বুঝি?'

মধু তার হেঁড়ে গলায় চিৎকার করে যা বলতে চাইলে টুনু তার কিছুই বুঝতে পারলে না। সে বললে, 'বাবারে বাবা, একফোঁটা বাছুর, তার গলার আওয়াজে কানের পোকা বেরিয়ে যেতে চায় যে! হ্যাঁরে মধু—'

কিন্তু এর বেশি আর সে কিছু বলতে পারলে না। কারণ পিছন দিক থেকে হঠাৎ দু-খানা বলিষ্ঠ ও কর্কশ হাত এসে তার মুখ করে দিলে একেবারে বোবা! অন্ধকারের ভিতর থেকে আরও চার-পাঁচটা যেন অন্ধকার-মাখা মূর্তি আকস্মিক শরীরী বিস্ময়ের মতো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেউ চেপে ধরলে তার হাতদুটো, কেউ ধরলে তার দুটো পা। পরমুহূর্তে টুনু অনুভব করলে, সে এখন অবস্থান করছে শূন্যে। তারপর তারা তাকে নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে এগিয়ে চলল কোনও একদিকে। সে এখন একান্ত অসহায়, এমনকি, তার চিৎকার করবারও উপায় নেই।

তারা ছুটে চলেছে বন-বাদাড় ভেঙে, অত্যন্ত সহজে অন্ধকারের নিবিড়তা ভেদ করে। টুনু এইটুকু বুঝতে পারলে, অন্ধকারের ভিতরেও যারা অনায়াসে দুর্ভেদ্য বনের মধ্যেও

নিজেদের পথ করে নিতে পারে, তারা নিশ্চয়ই এখানকারই লোক। পথঘাট দেখবার জন্যে তাদের দরকার হয় না চোখ। অবাধে তারা এগিয়ে চলেছে তো এগিয়ে চলেছেই। কিন্তু কে এরা? তাকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে বন্দিনী করতে পারে, এই বনে এমন কোনও লোকেরই কথা তার মনে পড়ল না। কিন্তু তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে কেন তারা?

তারা অনেকখানি পথ পার হয়ে গেল। রাত্রি ক্রমে অগ্রসর হচ্ছে গভীরতার দিকে। অন্ধকার ক্রমে হয়ে উঠছে নীরন্ধ্র। আকাশে উড়ছে ডানার শব্দে চারিদিক শব্দিত করে রাত্রির দূত বাদুড়েরা। গাছে গাছে শোনা যাচ্ছে পেচক ভাষায় কর্কশ আবৃত্তি। বনের সমস্ত গাছপালা যেন নিমগ্ন হয়ে গেছে কালিমার মহাসাগরে। কাছে-দূরে, বনে বনে জাগ্রত হয়ে উঠেছে রক্তলোভী, বুভুক্ষু হিংস্র নিশাচরেরা। চারিদিক ভয় ভয়। চারিদিকে যেন মূর্তি ধারণ করতে চেষ্টা করছে অদৃশ্য ছায়াচরেরা। চারিদিকে বিরাজ করছে একটা থমথমে ভাব। কারা যেন কাদের হত্যা করতে চায়, কারা যেন চায় কাদের অস্তিত্ব লুপ্ত করতে। বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে গাছের পাতায় পাতায় জাগছে যেন মৃত্যু-প্রলাপ। টুনুর সর্বাঙ্গ শিউরে শিউরে উঠতে লাগল। ভোরের আলোয় অরণ্যের মধ্যে দিয়ে দেখেছে সে হাস্যময়ী উজ্জ্বলা প্রকৃতিকে। কিন্তু রাত্রে যে অরণ্যের অন্তপুর এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, বনবাসিনী হয়েও এ ধারণা সে কোনওদিনই করতে পারেনি।

থেকে থেকে এখানে-ওখানে জেগে উঠছে ব্যাঘ্রদের হিংসার হুঙ্কার। খুব কাছেই হঠাৎ একবার ডেকে উঠল ফেউ।

কিন্তু টুনুকে যারা নিয়ে যাচ্ছে তারা যেন এ সব বিভীষিকাকে একেবারে গ্রাহ্যের ভিতরে আনতে চায় না। তারা তবু ছুটছে আর ছুটছে আর ছুটছেই।

কেবল ফেউ ডাকবার পর একজন ছুটতে ছুটতেই বললে, 'কাছেই ফেউ ডাকছে। বোধহয় কোনও ব্যাটা বাঘের নজর পড়েছে আমাদের দিকেই। একসঙ্গে এতগুলো খাবারের লোভ বোধহয় সে সামলাতে পারেনি। 'হ্যাঁরে বেঁটকু, সর্দারের বন্দুকটা সঙ্গে এনেছিস তো?'

আর একজন বললে, 'মটকু তোর চোখদুটো কি কানা? তোর সঙ্গেই এসেছি, আমার হাতে এত বড়ো একটা বন্দুক রয়েছে তাও দেখতে পাসনে? দূর ব্যাটা, বোকারাম কোথাকার।'

মটকু খাপ্পা হয়ে বললে, 'ধরলুম, আমার চোখ না হয় কানা, কিন্তু কানা হলেই কেউ আবার রোকারাম হয় নাকি? তুই রাসকেল হচ্ছিস গাধার চেয়েও মুখ্যু।'

আর একজন কে বললে, 'হ্যাঁরে মটকু, ছুঁড়ির মুখটা এখনও ভালো করে চেপে আছিস তো? সর্দার কী বলে দিয়েছে মনে আছে? যতক্ষণ না আড্ডায় গিয়ে পৌঁছতে পারো, ছুঁড়ি যেন একবারও চেঁচাবার ফাঁক না পায়। এই বনের কোনও বুনো হাতি নাকি একেবারে ওর পোষা কুকুরের মতন হয়েছে। ওর চিৎকার একবার শুনতে পেলেই সে এক্ষুনি ছুটে এসে আমাদের সকলকার ঘাড় মট মট করে মটকে দিতে পারে।'

মটকু রেগে বললে, 'যা যাঃ, ভ্যাবাগঙ্গারাম কোথাকার! তোকে আর শেখাতে হবে না!'

খানিকক্ষণ আর কেউ কোনও কথা কইলে না। ক্রমে ধীরে ধীরে তাদের গতি হয়ে এল মন্থর, তারা হাঁটতে লাগল সাধারণ ভাবেই। অল্পকাল পরেই হঠাৎ তারা একটা ফরসা জায়গার উপর এসে দাঁড়াল। টুনুর চোখ খোলা ছিল, উপর দিকে তাকিয়ে দেখলে, আর সেখানে গাছের ডাল নেই, রয়েছে কেবল হাজার হাজার চুমকি বসানো মুক্ত কালো আকাশ। একটু তফাতে রয়েছে কীসের একটা উঁচু ছায়া, বোধহয় সেটা কোনও ছোটো পাহাড়। এই পাহাড়ের নীচের দিকে টিমটিম করে জ্বলছে গোটা-তিনেক আলো, বোধহয় ওখানে মানুষের ঘর-টর কী আছে।

যারা টুনুকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তারা সেই আলোর দিকে খানিকটা অগ্রসর হতেই কে বিশ্রী গলায় চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'কী রে মটকু, কেল্লা ফতে তো?'

মটকু উত্তর দিলে, 'সর্দার, শিকার ধরে এনেছি!'

'জয় মা কালী!' বলে রাঘব সর্দার আহ্লাদে চিৎকার করে উঠল—কিন্তু টুনু শুনলে সে যেন একটা হিংস্র জানোয়ারের গর্জন।

একটু পরেই লোকগুলো টুনুকে নামিয়ে একটা ঘরের দাওয়ার উপরে বসিয়ে দিলে। দাওয়ার এক কোণে জ্বলছিল একটা হ্যারিকেনের ম্লান আলো, তার দুর্বল শিখা অন্ধকারকে দূর করতে পারছিল না। টুনু মুখ তুলেই সামনেই যে বিপুল যমদূতের মতো মূর্তিটা দেখলে, সে তার অপরিচিত নয়। তার বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠল। তবু সে বাইরে মনের ভাব প্রকাশ না করে স্থিরভাবে বসে রইল মৌন মূর্তির মতো।

রাঘব কড়া গলায় চড়া স্বরে বলল, 'কী গো দুখিরামের মেয়ে, আমাকে চিনতে পেরেছ?'

'পেরেছি।'

'তাহলে সেদিনের কথা তোমার মনে আছে?'

'হ্যাঁ আছে।'

'আমার পিছনে সেদিন তুমি একটা বুনো হাতি লেলিয়ে দিয়েছিলে, তাও ভোলনি তো!'

'এত শিগগির ভুলে যাব কেন? রুনু এখানে থাকলে তোমার পেছনে আজও তাকে লেলিয়ে দিতুম।'

রাঘব হো হো করে অট্টহাস্য করে উঠল। তারপর হাসি না থামিয়েই বললে, 'দিতিস নাকি? তাহলে একবার সেই চেষ্টাই করে দেখ না!'

'রুনু যখন আমাকে এখানে এসে খুঁজে বের করবে তখন নিশ্চয়ই সেই চেষ্টা করব।'

রাঘব চকিত স্বরে বললে, 'সেই হাতিটা এখানে তোকে খুঁজতে আসবে!'

'নিশ্চয়ই আসবে। আমার জন্যে রুনু সারা বন তোলপাড় না করে ছাড়বে না, এ আমি ভালো করেই জানি।'

রাঘব মুখে কিছু বললে না বটে, কিন্তু তার উৎফুল্ল ভাবটা যেন বেশ খানিকটা জখম হল।

তার মনের ভাব বুঝে মটকু বললে, 'সর্দার, মেয়েটার বাজে কথায় তুমি কান দিয়ো

না। হাতিটা আমাদের আড্ডার খোঁজ পাবে কী করে? এদিকে কখনও আমরা কোনও হাতি-টাতি আসতে দেখিনি। হাতিরা এদিকটা চেনেই না।'

রাঘব খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে বললে, 'যা বলেছিস! দুখিরামের মেয়েটা আমাকে ভয় দেখাতে চায়। দাঁড়া না, ওর জাঁক আমি ভেঙে দিচ্ছি। বেঁটকু, কালকেই তুই কাছাকাছি কোনও গাঁয়ে গিয়ে একটা পুরুত ডেকে আনিস তো!'

সঙ্গে সঙ্গেই সকলকার কানে ধাক্কা মেরে সেখানে যেন বেজে উঠল একখানা ভাঙা কাঁসি।

টুনু সচকিত চোখ ফিরিয়ে দেখে, ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল যেন দশমহাবিদ্যার মাতঙ্গীর মতো এক চেহারা। মেয়েমানুষের চেহারা যে এমন হয়, সে তা জানত না।

সে এসেই চোখ পাকিয়ে বললে, 'কেন, পুরুত ডেকে এনে হবে কী? তোর শ্রাদ্ধ?'

রাঘব একটু যেন দমে গেল। দুই পা পিছনে হটে গিয়ে কেবল বললে, 'ধর, তাই।'

'তাই নাকি! তাহলে শুনে রাখ, শ্রাদ্ধ যদি হয় তাহলে সে শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াবে, এ-ও আমি বলে রাখছি কিন্তু, হুঁ!'

রাঘব অবহেলার ভাব দেখিয়ে বললে, 'আচ্ছা আচ্ছা, পরে তা দেখা যাবে।'

ভৈরবী ফিরে হুমকি দিয়ে ডাকলে, 'বেঁটকু!'

বেঁটকু ভয়ে ভয়ে বললে, 'এঁজ্ঞে!'

'তুই যদি পুরুত ডাকতে যাস, তাহলে তোর নাকটা আর মুখের ওপর থাকবে না। আমার আঁশবঁটিতে খুব ধার আছে, তা জানিস তো!'

বেঁটকু চোখ নামিয়ে নিজের নাকের ডগাটা দেখবার চেষ্টা করে বললে, 'এঁজ্ঞে!'

॥ দশম ॥

রাঘব ও রুনু

পরদিনের প্রভাত।

সূর্যের কচি আলো দুখিরামের দাওয়ায় প্রবেশ করে দেখলে, মাটির উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পার্বতী থেকে থেকে ডুকরে কেঁদে উঠছে এবং দাওয়ার এক কোণে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে দুখিরাম বসে আছে জড়ভরতের মতো।

কাল সারা রাত ধরে কেঁদে কেঁদে কেঁদে পার্বতীর চোখের পাতা উঠেছে ফুলে ও চোখদুটো হয়ে উঠেছে রাঙা টকটকে। দুখিরাম কাঁদছে না বটে, কিন্তু তার বুকের ভিতরটা যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে। বেলা ক্রমে বাড়তে লাগল, কিন্তু তারা দুজনে শুয়ে আর বসে ঠিক সেই একভাবেই। কাল রাত্রেও অন্ন তাদের উদরস্থ হয়নি, আজও যে রান্নাবান্না হবে এমন কোনও লক্ষণ দেখা গেল না।

নির্দিষ্ট সময়ে রুনু এসে দাঁড়াল তাদের ঘরের দাওয়ার সামনে।

তাকে দেখেই ধড়মড় করে উঠে বসে পার্বতী চেঁচিয়ে কেঁদে বলে উঠল, 'ওরে রুনু, ওরে রুনু, তোর টুনু আর নেই রে, তাকে বাঘে নিয়ে গিয়েছে!'

রুনু কী বুঝলে জানি না, কিন্তু পার্বতীর এই কান্না শুনে তার চোখদুটো উঠল চমকে। পার্বতীকে সে কোনওদিন কাঁদতে দেখেনি, আর এখানে টুনুর অনুপস্থিতিও তার কাছে বোধহয় অস্বাভাবিক বলেই বোধ হল। হয়তো সে স্থির করতে পারলে, টুনুর অনুপস্থিতির সঙ্গে পার্বতীর এই কান্নার একটা সম্পর্ক আছে। সে একবার শুঁড় তুলে চিৎকার করে উঠল—সম্ভবত সে ডাকলে টুনুকেই। কিন্তু তবু টুনুর সাড়া বা দেখা পাওয়া গেল না।

পার্বতী আরও জোরে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'কাকে ডাকছিস রুনু! আমার টুনু কি আর এই দুনিয়ায় আছে! ওগো, আমার কী হবে গো! টুনুকে ছেড়ে আমি কেমন করে বেঁচে থাকব গো!'

হঠাৎ ভেঙে গেল দুখিরামেরও স্তব্ধতার বাঁধ। মাটির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সে-ও ভগ্নস্বরে হাহাকার না করে আর থাকতে পারলে না।

রুনু অধীর ভাবে একবার ওদিকে ছুটে যায়, আবার এদিকে ছুটে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে কী-একরকম চোখে দুখিরাম আর পার্বতীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

এমন সময় বেলগাছের পাশের সেই ঝোপটার কাছে হল নরেন্দ্রর আবির্ভাব।

টুনুর বদলে সে কেবল দেখতে পেলে রুনুকে, আর শুনতে পেলে দুখিরাম ও পার্বতীর চিৎকার করে কান্না। সে কেমন থতোমতো খেয়ে গেল, অজানা একটা আতঙ্কে তার বুকের কাছটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। রুনু একলা কেন! টুনু কোথায় গেল! দুখিরাম আর পার্বতী অমন করে কাঁদছে কেন! তার মনের ভিতরে ক্রমাগত আনাগোনা করতে লাগল এই তিনটে প্রশ্নই। শেষটা কিছুই বুঝতে না পেরে সে পায়ে পায়ে টুনুদের ঘরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এমন সময় পিছন থেকে খনখনে গলায় কে ডেকে উঠল, 'ওগো বাবু, শুনছ!'

বিস্মিত হয়ে ফিরে দাঁড়াল নরেন্দ্র। এবং অধিকতর বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দেখলে, ভয়াল চেহারার একটা স্ত্রীলোক খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নরেন্দ্র বললে, 'তুমি কি আমাকে ডাকছ?'

মুখে কিছু না বলে স্ত্রীলোকটা তাকে হাতছানি দিয়ে কাছে আসতে বললে।

অবাক হয়ে তাকে দেখতে দেখতে নরেন্দ্র তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

স্ত্রীলোকটা বললে, 'তুমি কে গা বাবু?'

নরেন্দ্র একটু বিরক্ত হয়ে বললে, 'তা জেনে তোমার দরকার?'

'দরকার আছে বাবু, খুব বেশি দরকার আছে! তা নইলে কি শুধু শুধুই জিজ্ঞেস কচ্ছি?'

'আমার নাম নরেন।'

'ও, তুমিই বুঝি রাজাবাবুর ব্যাটা?'

নরেন খালি ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

'তোমাকেই তো আমার বেশি দরকার!'

অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে নরেন্দ্র বললে, 'তোমার দরকার আমাকে!'

'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, তোমাকেই!'

'কেন?'

স্ত্রীলোকটা অল্প একটু ইতস্তত করলে। তারপর বললে, 'তুমি দুখিরামের বেটিকে দেখতে চাও?'

'টুনুকে!'

'তা হবে, বোধহয় তারা নাম তাই।'

'হ্যাঁ, তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই তো আমি এখানে এসেছি!'

'কিন্তু তার দেখা তুমি এখানে পাবে না।'

'পাব না মানে?'

'দুখিরাম আর তার বউয়ের মড়াকান্না শুনেও কি তুমি বুঝতে পারছ না যে টুনু এখানে নেই?'

নরেন্দ্র যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। একটু নীরব থেকে বললে, 'টুনুর কোনও অনিষ্ট হয়নি তো?'

'এখনও হয়নি, কিন্তু হতে আর কতক্ষণ?'

'সে আবার কী?'

'টুনু এখন পড়েছে রাঘব-বোয়ালের পাল্লায়।'

নরেন্দ্র হতভম্বের মতো বললে, 'তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। রাঘব-বোয়ালটা কে শুনি?'

'রাঘব সর্দারের নাম শুনেছ?'

'শুনেছি। একদিন বনের ভিতরে তার সঙ্গে দেখাও হয়েছে বলে সন্দেহ হয়। তুমি রাঘব ডাকাতের কথা বলছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'সে কী! টুনু রাঘব ডাকাতের পাল্লায় গিয়ে পড়ল কেমন করে?'

'কাল রাতে টুনুকে তারা এখান থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।'

ব্যস্ত ভাবে নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায় ধরে নিয়ে গিয়েছে?'

'তাদের নিজেদের আস্তানায়।'

'কোথায় তাদের আস্তানা?'

'এই বনেই।'

'তুমি তার ঠিকানা জানো?'

'জানি।'

'আমাকে এখনই সেখানে নিয়ে যেতে পারবে?'

'পারব। তোমাকে নিয়ে যেতেই তো আমি এসেছি!'

'তাহলে এখনই আমাকে সেখানে নিয়ে চলো।'

স্ত্রীলোকটা নড়ল না। বললে, 'তুমি একলা সেখানে গিয়ে কিছুই করতে পারবে না। রাঘবের দলে আট-দশ জন লোক আছে।'

'বেশ, সে ব্যবস্থাও করছি। কিন্তু তুমি কে? তোমার নাম কী?'

স্ত্রীলোকটা একগাল হেসে বললে, 'আমি? আমি রাঘবের বউ গো! আমার নাম ভৈরবী।'

চমকে উঠে বিস্ফারিত চক্ষে ভৈরবীর মুখের পানে তাকিয়ে নরেন্দ্র স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুই মুহূর্ত। তারপর তাড়াতাড়ি বললে, 'তুমি এখানে একটু দাঁড়াও, আমি এখনই আসছি।' বলেই সে দুখিরামের ঘরের দিকে 'রুনু, রুনু, রুনু!' বলে ডাকতে ডাকতে দৌড়ে এগিয়ে গেল। তার ডাক শুনে রুনু তখনই কান খাড়া করে ফিরে দাঁড়াল।

তাকে দেখে দুখিরাম দাঁড়িয়ে উঠে করুণ স্বরে বললে, 'রাজাবাবু, আমাদের সর্বনাশ হয়েছে গো! টুনু আর বেঁচে নেই!'

নরেন্দ্র বললে, 'কোনও সর্বনাশ হয়নি, টুনু বেঁচে আছে। তার খবর আমি পেয়েছি। তোমরা আর কেঁদো না। আমি এখনই টুনুকে আনতে চললুম।'

তারপর সে রুনুর গা চাপড়াতে চাপড়াতে সস্নেহে বললে, 'রুনু, আমি টুনুকে আনতে যাচ্ছি, বুঝেছিস? টুনু রে, তোর টুনু! শিগগির আমার সঙ্গে আয়, তুই না গেলে আমি টুনুকে আনতে পারব না। আয়—'

রুনু ঠিক বুঝতে পারলে। আর কোনও রকম ইতস্তত না করেই সে এগিয়ে চলল নরেন্দ্রর পিছনে পিছনে।

নরেন্দ্রের সঙ্গে অত বড়ো একটা হাতিকে আসতে দেখে ভৈরবী অত্যন্ত ভয় পেয়ে ঝোপের ভিতরে লুকোবার চেষ্টা করলে।

নরেন্দ্র বললে, 'তোমার কোনও ভয় নেই। এ তোমাকে কিছু বলবে না। আমি আর টুনু যা বলি, এই হাতি তা শোনে। তুমি নির্ভয়ে আমাদের আগে আগে এগিয়ে পথ দেখিয়ে চলো।'

ভৈরবী নরেন্দ্রের কথা মতো অগ্রসর হল বটে, কিন্তু যেতে যেতে বারবার সন্দিগ্ধ ও সঙ্কুচিত ভাবে পিছনে মুখ ফিরিয়ে তাকাতে লাগল।

চলল আবার তারা বনের পর বনের ভিতর দিয়ে, মাঠের পর মাঠ পার হয়ে। সূর্যের আলোতে অরণ্য এখন জ্যোতির্ময়, দুঃস্বপ্ন-মাখা রাত্রির কালো অভিশাপ কোনওখানেই আর জেগে নেই। পেচক আর বাদুড়দের কথা পৃথিবী এখন ভুলে গিয়েছে, তাদের বদলে দিকে দিকে বসেছে গানের পাখিদের সভা।

রাত্রে যাদের আনন্দ, দিনে তাদের প্রাণে জাগে আতঙ্ক। কাল রাত্রে বিপুল বিক্রমে যারা গাইছিল মৃত্যুর সংগীত, দিনের আলোয় এখন আর তারা বাইরে মুখ বাড়াবার ভরসা করছে না।

রুনুর মনের ভিতরে এখন কোনও ভাবের প্রভাব তা আমরা জানি না, কিন্তু নরেন্দ্রের মনের মধ্যে ক্রমেই অধিকতর পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল ভীষণ আক্রোশ ও দারুণ ক্রোধ।

সে বেশ বুঝলে, টুনু সেদিন রুনুকে রাঘবের পিছনে লেলিয়ে দিয়েছিল বলেই আজ সে তাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। ছেলেবেলা থেকেই রাঘবের নাম শুনে আসছে সে লোকের মুখে মুখে। তার অমানুষিক অত্যাচারে এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের মনে দুর্ভাবনার অন্ত নেই। সে নাকি একবার জ্বলন্ত আগুনের ভিতরে এক পরিবারের দশজন লোককে জীবন্ত অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল। তাদের অপরাধ, তারা গুপ্তধনের সন্ধান দেয়নি। ছেলেবেলা থেকেই নরেন্দ্রের মন বিদ্রোহী হয়ে আছে রাঘবের বিরুদ্ধে। তার উপরে রাঘবের আজকের এই অপরাধ! এর আর মার্জনা নেই। নরেন্দ্র দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলে, টুনুকে তো উদ্ধার করবেই, সেই সঙ্গে রাঘবকেও সে দিয়ে আসবে চরম শিক্ষা। রাঘবকে আজ হত্যা—অন্তত বন্দি করতে পারলেও এ অঞ্চলের গৃহস্থেরা মস্ত একটা দুঃস্বপ্নের কবল থেকে নিস্তার লাভ করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।

অনেকক্ষণ পথ চলবার পর তারা একটা মাঠের উপরে এসে দাঁড়াল। দূরে একটু তফাতে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট একটা পাহাড়, আর তার তলায় রয়েছে সারি সারি ছাউনি-বাঁধা ঘর। ভৈরবী হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'বাবু, আমি আর যেতে পারব না।'

'কেন?'

'আমিই যে তোমাকে দুখিরামের মেয়ের কথা বলে দিয়েছি, এটা জানতে পারলে ওরা আমাকেও মেরে ফেলবে।'

'কী মুশকিল! অন্তত রাঘবের আস্তানাটাও দেখিয়ে দেবে তো?'

সামনের দিকে হস্ত বিস্তার করে ভৈরবী বললে, 'ওই ঘরগুলোর ভিতরে ওরা থাকে।'

'আয় রুনু!' বনে নরেন্দ্র আবার এগুতে উদ্যত হল, কিন্তু ভৈরবী হঠাৎ আবার কাতর স্বরে বললে, 'আর একটা কথা, বাবু!'

'কী কথা?'

'আর যা করো বাবু, তাকে প্রাণে মেরো না। হাজার হোক সে তো আমার সোয়ামি। সে মরলে আমার সিঁথের সিঁদুর ঘুচবে, আর হাতের নোয়াও থাকবে না।'

ভৈরবী যে দানবের যোগ্য দানবী সে-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই; কিন্তু তারও মনে এখনও যে পতিভক্তির অঙ্কুর আছে, এটুকু বুঝে নরেন্দ্র হল বিস্মিত। কণ্ঠস্বরে স্নিগ্ধতা এনে সে বললে, 'দ্যাখো ভৈরবী, তোমাকে আমি জোর করে এখন কোনও কথা দিতে পারব না। রাঘব যদি টুনুর কোনও অনিষ্ট না করে থাকে আর আমার কাছে ভালো মানুষের মতো ধরা দেয়, তাহলে তার কোনওই প্রাণের ভয় নেই। তাকে বন্দি করব বটে, তবে প্রাণে মারব না। কিন্তু আমার সঙ্গে আজ ও কোনও শয়তানি করলে রাঘবের অদৃষ্টে কী আছে কেবল ভগবানই জানেন।—আয় রুনু!'

পিঠের বন্দুক হাতের উপরে নিয়ে নরেন্দ্র অগ্রসর হতে লাগল দৃঢ়পদে। তার ভাবভঙ্গি দেখেই রুনু বোধহয় বুঝতে পারলে, আজ এখানে তাদের অভিনয় করতে হবে বিশেষ কোনও নাটকীয় দৃশ্যে। হঠাৎ সে খুব জোরে একবার চিৎকার করে উঠল।

তারা তখন মাঠের তিন ভাগ পার হয়ে এসেছে, আর একভাগ মাত্র বাকি। পাহাড়ের

তলাকার ঘরগুলোয় যারা বাস করে, হাতির ডাক শুনেই তারা বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উঠল একটা হই হই রব। কালো কালো কয়েকটা মূর্তি এদিকে-ওদিকে ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল। তারপরেই হল একটা বন্দুকের শব্দ।

রুনু বেচারির একটা কান ছ্যাঁদা করে বেরিয়ে গেল একটা তপ্ত গুলি। সে চেঁচিয়ে উঠল রাগে আর যাতনায়। নরেন্দ্রও বন্দুক ছুড়তে দেরি করলে না—উপর উপরি দু-দু-বার। ওদিকে জেগে উঠল মনুষ্য-কণ্ঠস্বরে একটা বিকট আর্তনাদ। পরমুহূর্তেই ঘরের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল কালো মূর্তিগুলো।

তারপরেই শোনা গেল একটা অতি কাতর তীক্ষ্ণ কান্নার শব্দ। রুনু ও নরেন্দ্র দুজনেই বুঝলে, এ কান্নার শব্দ আসছে টুনুর কণ্ঠ থেকে।

রুনু নিজের সমস্ত যন্ত্রণার কথা তৎক্ষণাৎ ভুলে গেল। দুই কর্ণ দুইদিকে বিস্তৃত ও শুণ্ড ঊর্ধ্বে উত্তোলিত করে সে ঝড়ের মতো বেগে মাটি কাঁপিয়ে ছুটে চলল সেই ঘরগুলোর দিকে। তার দিকে তাকালেও প্রাণ এখন শিউরে ওঠে, সে যেন এখন সাক্ষাৎ এক সংহার-মূর্তির মতো! বন্দুকে টোটা ভরে নিয়ে নরেন্দ্রও ছুটতে লাগল প্রাণপণে।

তারা যখন ঘরগুলোর খুব কাছে এসে পড়েছে তখন আবার শোনা গেল টুনুর উচ্চ কণ্ঠস্বর: 'রুনু, রুনু! এরা আবার আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, তুমি শিগগির এসো রুনু!' সেইখান থেকেই দেখা গেল, একদল লোক সার বেঁধে উঠে যাচ্ছে পাহাড়ের উপরের দিকে।

নরেন্দ্র আবার দু-বার বন্দুক ছুড়লে। একটা লোক পাহাড়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ শূন্যে দুই হাত ছড়িয়ে নীচের দিকে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। পাহাড়ের উপর থেকেও বন্দুকের আওয়াজ হল, কিন্তু রুনু বা নরেন্দ্রের গায়ে কোনও গুলিই লাগল না।

রুনু আরও জোরে ছুটে চলল—যাকে বলে উল্কা-বেগে! হাতি যে অত বড়ো দেহ নিয়ে এত বেগে ছুটতে পারে, নরেন কোনও দিনও তা কল্পনা করতে পারেনি। সে খুব তাড়াতাড়ি পা চালাতে লাগল, কিন্তু রুনুর নাগাল ধরতে পারলে না কিছুতেই। তাকে অনেক পিছনে ফেলে বৃংহিতধ্বনি করতে করতে সুমুখের ঘরগুলোর কাছে মোড় ফিরে রুনু চলে গেল চোখের আড়ালে এবং কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখা গেল, সে-ও উঠে যাচ্ছে পাহাড়ের উপর দিকে।

পাহাড়ের তলায় এসে পড়ে নরেন মানুষ কি টুনু, কারুকেই আর দেখতে পেলে না। কেবল সামনে পেলে উপরে উঠবার একটা পথ। তাড়াতাড়ি বন্দুকে আবার টোটা ভরে নিয়ে সে-ও অবলম্বন করলে পাহাড়ে পথটা।

আগেই যথা সময়ে বলা হয়েছে, এটা একটা ঢিপির মতো পাহাড়। তিনতলা বাড়ির চেয়ে বেশি উঁচু হবে না। তার উপরে কতকগুলো বড়ো বড়ো ঢ্যাঙা গাছ ছিল বলে দূর থেকে পাহাড়টাকে আরও কিছু বেশি উঁচু দেখায়।

নরেন যখন প্রায় পাহাড়ের টঙে গিয়ে পৌঁছেছে তখন হঠাৎ সে রোমাঞ্চিত দেহে শুনতে পেলে নানা মানুষের কণ্ঠস্বরে আকাশ-ফাটানো চিৎকারের পর চিৎকার, এবং সেইসঙ্গে একবার বন্দুকের গর্জনও। রুদ্ধশ্বাসে সে পাহাড়ের চূড়ার উপরে গিয়ে দাঁড়াল। দৌড়ে সামনে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখলে, পাহাড়ের গা আবার ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে

গিয়েছে। সেইখানে দাঁড়িয়ে বিস্ময়স্তম্ভিত নেত্রে যা দর্শন করলে তা হচ্ছে এই: তার দিকে পিছন ফিরে পাহাড়ের মাঝ-বরাবর দাঁড়িয়ে আছে রুনুর ক্রোধস্ফীত বিশাল দেহ, এবং তার পিঠের উপরে সুন্দর একটি জীবন্ত পুতুলের মতন বসে আছে টুনু।

রুনুর দেহের এপাশে-ওপাশে পড়ে রয়েছে কয়েকটা রক্তাক্ত মনুষ্যদেহ। কোনও কোনও দেহ তখনও ছটফট করছে, এবং কোনও-কোনওটা একেবারে আড়ষ্ট।

নরেন্দ্র আবার ছুটে নীচের দিকে নেমে গেল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হতে তার আধ মিনিটও লাগল না।

রুনুর কাছে গিয়েই নরেন্দ্র সানন্দে ডাকলে, 'টুনু! আমার টুনু!'

টুনু মুখ ফিরিয়ে মধুর হাসি হেসে বললে, 'কী, নরেন?'

'তোমার গায়ে কোথাও লাগেনি তো?'

'কিচ্ছু লাগেনি। রুনু এসে প্রথমেই আমাকে শুঁড় দিয়ে পিঠের উপরে তুলে নিয়েছিল। তারপর যা কাণ্ড! দেখতেই পাচ্ছ তো!'

নরেন্দ্র কৃতজ্ঞ কণ্ঠে ডাকলে, 'রুনু!'

রুনু ধীরে ধীরে তার দিকে ফিরে দাঁড়াল। টুনুকে পেয়ে তার মূর্তি এখন শান্ত হয়েছে বটে, কিন্তু তার শুঁড়ে জড়ানো কী ওটা? ভালো করে সেদিকে তাকিয়েই ভয়ার্ত বিস্ময়ে নরেন্দ্র তাড়াতাড়ি পিছিয়ে দাঁড়াল।

রুনুর শুঁড়ের কুণ্ডলীর ভিতরে একদিকে দুই বাহু ও আর এক দিকে দুই পা ঝুলিয়ে খুব-বাঁকানো ধনুকের মতো ছটফট ছটফট করছে মস্ত একটা মানুষের দেহ। তার সর্বাঙ্গ রক্তে আরক্ত। তার নাক-মুখ-চোখের ভিতর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে রক্তের ফিনিক। চিনতে বিলম্ব হল না, সে হচ্ছে রাঘব ডাকাত।

রাঘব তখনও দৃষ্টিশক্তি হারায়নি, নরেন্দ্রকে চিনতে পারলে। প্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'পায়ে পড়ি, ক্ষমা করো! আমাকে বাঁচাও!'

নরেন্দ্রের মনে পড়ল ভৈরবীর শেষ কাতর মিনতি। বললে, 'রুনু, ও লোকটাকে তুমি দয়া করে ছেড়ে দাও।'

রুনু হয়তো তার কথা বুঝতে পারলে না, কিংবা হয়তো বুঝেও গ্রাহ্যের মধ্যে আনলে না। আচম্বিতে সে শুঁড়ের সঙ্গে রাঘবের দেহ তুলে ফেললে শূন্যে এবং তারপর মারলে তাকে পাহাড়ের উপরে এক আছাড়। রাঘব একবার আর্তনাদ করবার সময় পেলে না, তার দেহ একবার নড়ে উঠেই একেবারে স্থির হয়ে গেল। কিন্তু রুনুর আক্রোশ তখনও কম-জোরি হবার নাম করলে না। সে গর্জন করতে করতে নিজের সামনের দুই পা দিয়ে রাঘবের দেহের উপরে উঠে তাকে ক্রমাগত থেঁতলে ফেলতে লাগল—সে যেন মত্ত মাতঙ্গের তাণ্ডব নৃত্য! দেখতে দেখতে রাঘবের দেহ হয়ে গেল একটা রক্তমাখা মাংসের তাল; তখন সেটাকে দেখলে তা যে মানুষের দেহ, মনে জাগে না এমন সন্দেহও।

সে দৃশ্য টুনু আর দেখতে পারলে না, দুই হাতে দুই চোখ ঢেকে ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, 'ওকে ছেড়ে দে রুনু, ওকে ছেড়ে দে! চল, আবার আমার ঘরে ফিরে যাই।'

॥ একাদশ ॥

টুনুর রাজকুমার

তোমরা কেউ আলো-বীণার সুর শুনেছ? এ সুর বাইরের কানে শোনা যায় না, শুনতে হয় প্রাণের কানে। ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে বীণা বাজতে থাকে আকাশে আকাশে, বিহঙ্গদের কণ্ঠে নয়, মনের আসরে, বিন্দুর মতো ছোটো তৃণকুসুমের আনন্দের ছন্দে। এই বীণার আহ্বান-তান শুনেই তো বাসা থেকে দলে দলে পুঞ্জে পুঞ্জে বেরিয়ে পড়ে মধুকর আর রঙিন প্রজাপতি। এতটুকু যে শামুক, যার কান নেই, সে-ও এই বীণার রাগিণী নিজের ছোট্ট হৃদয়ের মাঝখানে অনুভব করে অন্ধকার থেকে এসে উপস্থিত হয় মুক্ত অসীমের ছায়ায়। সকালে মানুষ যে ভৈরবী রাগিণী গায় সে তো এই আলো-বীণার ছন্দধ্বনি অনুসরণ করেই।

আজও সকালে বনে বনে স্নিগ্ধঘন শ্যামলতার উপরে যেখানেই ছড়িয়ে পড়েছে কাঁচা সোনামাখা রোদটুকু, সেইখানেই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে এই আলো-বীণার সুর, এই আলো-বীণার ছন্দ, এই আলো-বীণার আনন্দ। তারাও মনে-প্রাণে অনুভব করছিল এই অপূর্ব আলোক-বীণার বিচিত্র আশীর্বাদটুকু—টুনু ও নরেন্দ্র।

বেলগাছের পাশের সেই ঝোপ। এই নিরিবিলি জায়গাটি তাদের বড়ো মিষ্টি লাগে। এখান থেকে একদিকে তাকালে দেখা যায় কতকগুলো বড়ো বড়ো গাছের ছায়ায় ঘুমন্ত, শান্ত সেই কাঠুরে পল্লিটি। আর একদিকে দেখা যায়, মস্ত একটা তেপান্তর দিকচক্রবাল রেখা পর্যন্ত করছে ধু-ধু-ধু-ধু,—রূপকথার রাজার ছেলে, মন্ত্রীর ছেলে আর সওদাগরের ছেলে সেখান দিয়েই ঘোড়া ছুটিয়ে কোন সেকালে যাত্রা করত হয়তো কোনও বিপদগ্রস্তা অজানা রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে। আর একদিকে দেখি, অনন্তের পূজা-মন্দিরের মতো একটা উচ্চ শৈলশিখর উঠে গিয়েছে নীলাকাশকে চুম্বন করতে। এবং এখান থেকে দেখা না গেলেও কানে শোনা যায় একটি স্রোতস্বিনীর ছন্দসুন্দর নৃত্যসংগীত।

'টুনু!'

'কেন নরেন?'

'আজ আমি তোমাকে একটি আশ্চর্য খবর দেব।'

'আশ্চর্য খবর?'

'হ্যাঁ টুনু।'

'কিন্তু আমি যদি আশ্চর্য না হই?'

'তুমি যদি আশ্চর্য না হও, তাহলে পৃথিবীতে আমার মতন আশ্চর্য আর কেউ হবে না!'

'তুমি এমন কী আশ্চর্য খবর আমাকে দিতে পারো, নরেন?'

'আমি তোমার বাবা আর মায়ের সন্ধান পেয়েছি।'

টুনুর দুই চোখ হয়ে উঠল বিস্ফারিত। সে নিজের কানকে নিজেই যেন বিশ্বাস করতে

পারল না। সচমকে প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে সে বললে, 'আমার বাবা আর মায়ের খবর! আমি ভুল শুনছি না তো? তুমি কী বললে নরেন আর-একবার বলো তো?'

'তোমার বাবা আর মায়ের খবর আমি পেয়েছি। তাঁরা কোথায় থাকেন তাও আমি জেনেছি।'

গভীর আবেগে ও উত্তেজনায় ফুলে ফুলে উঠতে লাগল টুনুর বুক। নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে সে বললে, 'নরেন, সত্যি করে বলো, তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ না তো?'

নরেন্দ্র বললে, 'ছি টুনু, এমন কথা নিয়ে কেউ কখনও ঠাট্টা করতে পারে?'

নিজের দুই হাতে নরেন্দ্রের হাত চেপে ধরে টুনু হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'আমার মাকে, আমার বাবাকে তাহলে তুমি দেখেছ? আমি কাঠুরের মেয়ে হয়ে বনবাসে আছি, তাঁরা তা জানতে পেরেছেন? তাঁরা আবার আমাকে ফিরিয়ে নেবেন?' বলতে বলতে টুনুর দুই চোখ ভরে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুজল গাল বেয়ে ঝরতে লাগল।

নরেন্দ্র বললে, 'শান্ত হও টুনু, শান্ত হও। আমি এখনও তাঁদের চোখে দেখিনি। আমি এখনও তাঁদের তোমার খবর দিতে পারিনি। তবে, তাঁরাই যে তোমার মা আর বাবা, সে বিষয়ে আমার কোনওই সন্দেহ নেই।'

টুনু বললে, 'তাহলে তুমি এখুনি আমাকে তাঁদের কাছে নিয়ে চলো।'

'তা হয় না টুনু, সে এখান থেকে অনেক দূর। অন্তত পঁচিশ মাইলের কম নয়।'

টুনু দৃঢ়স্বরে বললে, 'হোক গে পঁচিশ মাইল, আমি ঠিক হেঁটে যেতে পারব। তুমি জানো না নরেন, এখনও আমি রোজই স্বপ্নে আমার বাবাকে আর মাকে দেখতে পাই। দেখি আর কাঁদি, দেখি আর কাঁদি।' তার চোখ দিয়ে বেরিয়ে এল আবার নতুন কান্নার ধারা। কাঁদতে কাঁদতে এবং সেইসঙ্গে আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে সে আবার বললে, 'নিজের বাবা আর মাকে কখনও কি ভোলা যায় নরেন! কখনও ভোলা যায় না।'

নরেন্দ্র কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'তোমাকে আজ আমি আর একটা কথা বলতে এসেছি।'

টুনু বললে, 'এত বড়ো খবরের পর তুমি আবার আরও কী কথা বলতে চাও?'

নরেন্দ্র একটুও ইতস্তত করলে না। সহজ স্বরে, স্পষ্ট ভাষায় বললে, 'টুনু, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'

টুনু সবিস্ময়ে খানিকটা পিছনে সরে গেল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, 'এ কী কথা বলছ নরেন?'

নরেন্দ্র বললে, 'আমি তোমাকে সোজা জিজ্ঞাসা করছি, তুমি সোজা জবাব দাও। তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছ?'

'তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে কেমন করে?'

'কেন?'

'তুমি কী জাত আর আমি কী জাত? তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে কেমন করে?'

নরেন্দ্র হেসে ফেলে বললে, 'বনে থাকো কাঠুরের ঘরে। লেখাপড়া নিশ্চয়ই জানো না।

সমাজের কথাও কিছুই শোনোনি। আমি ভাবছি না, তবু তুমি জাতের ভাবনা ভাবছ? শোনো টুনু! ও কথা নিয়েও তোমাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। এটাও আমি জেনেছি যে তোমরা আর আমরা হচ্ছি একই জাতের। তোমরাও বামুন, আমরাও বামুন।'

টুনু কী ভাবতে লাগল নতমুখে। তারপর মুখ তুলে ধীরে ধীরে বললে, 'আমি শুনেছি, তুমি রাজার ছেলে। তুমিও হয়তো একদিন রাজা হবে। তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতে আমার মা-বাবাও নিশ্চয়ই নারাজ হবেন না; কিন্তু—'

'আবার একটা কিন্তু কেন টুনু? এখন তুমি রাজি আছ কি না, সেই কথাই বলো।'

টুনুর মুখে ফুটে উঠল লজ্জার রাঙা রং এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট একটি হাসির ভাব। তারপর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'নরেন, তোমাকে কি আমি না বলতে পারি!'

বিপুল আনন্দে নরেন্দ্রে মুখ চোখ আর সর্বাঙ্গ হয়ে উঠল প্রফুল্ল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বললে, 'টুনু, টুনু! তাহলে এখনই তুমি চলো আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে।'

'তোমার বাড়িতে!'

'হ্যাঁ টুনু! তুমি যখন আমার কথায় রাজি হয়েছ, তখন এখানে তোমাকে আর আমি এক মিনিটও থাকতে দেব না। রাঘব ডাকাত মারা গিয়েছে, কিন্তু তার প্রকাণ্ড দলবলের অনেকেই এখনও বেঁচে আছে। তারা যখন তাদের সর্দারের পরিণামের কথা শুনবে, তখন নিশ্চয়ই আবার এসে তোমাদের উপরে হানা দেবে। তখন তাদের প্রতিহিংসা থেকে তুমিও বাঁচবে না, দুখিরাম আর পার্বতীও বাঁচবে না। আমি এখনই তোমাদের এখান থেকে নিয়ে যেতে চাই। ভয় নেই, খালি তোমাকে নয়, দুখিরাম আর পার্বতীকেও। আমি তাদের আশ্রয় দেব। তারা বড়ো ভালো লোক। আমি তাদের সারা জীবনের ভাবনা ভুলিয়ে দেব। এর পরেও তোমার আর কোনও আপত্তি থাকতে পারে টুনু?'

টুনু শোনা যায় কি না-যায় এমন স্বরে বললে, 'না নরেন, আমার আর কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু বিয়ের আগে আমার হারিয়ে যাওয়া মা-বাবাকে কি দেখতে পাব না?'

নরেন্দ্র বললে, 'নিশ্চয়ই! আমার বাড়িতেই তুমি তাঁদের দেখা পাবে। তোমার বাবাই তো তোমাকে সম্প্রদান করবেন।'

ঠিক সেই সময় গদাই-লশকরি চালে রুনু এসে হাজির। সে একবার টুনুর মুখের দিকে তাকালে। তারপর শুঁড় দিয়ে তার একটা হাত ধরে টান মারতে লাগল। তার মনের ভাবটা বোধ হচ্ছে এইরকম: 'কই গো খুকুমণি, আজ তিন-চার দিন তুমি আমার সঙ্গে বেড়াতে যাওনি! আজও বেলা বাড়ছে, তুমি কি আজও বেড়াতে যাবে না?'

টুনু তার মনের ভাব বুঝে হেসে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, 'না রে রুনু, বনের ভিতরে আর আমি বেড়াতে যাব না। বনের ভিতরে বড়ো ভয়! জন্তুর ভয় না, মানুষের ভয়। নরেন আমাকে বেড়াতে যেতে বারণ করেছে।'

রুনু তবু ছাড়ে না, আবার তাকে ধরে টানাটানি করে। বনের ভিতরে টুনুর সঙ্গ তার ভারী ভালো লাগে। যতক্ষণ টুনু তার সঙ্গে থাকে, সারা দিন-রাতের ভিতরে সেই সময়টুকুই সে সবচেয়ে উপভোগ করে।

বেগতিক দেখে শেষটা টুনু ছুটে পালিয়ে গেল নাছোড়বান্দা রুনুর কাছ থেকে।

রুনু ম্রিয়মাণ ভাবে টুনুর পলাতক মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর টুনুকে যখন দেখা গেল না তখন ধীরে ধীরে একলাই ধরলে বনের পথ।

নরেন সকৌতুকে বললে, 'কী রে রুনু, তোর অভিমান হল নাকি রে?'

রুনু তার দিকে ফিরেও তাকালে না। তার কথার মানে বুঝতে পারলে কি না তাও বোঝা গেল না। খানিক এগিয়ে একটা মোড় ফিরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

॥ দ্বাদশ ॥

রুনুর গোয়েন্দাগিরি

সত্যই রুনুর মনে হয়েছিল অভিমান। দারুণ অভিমান। টুনু আর তার সঙ্গে বেড়াতে আসে না, টানাটানি করলেও ছুটে পালিয়ে যায়, এতে গাধারই অভিমান হবার কথা, আর সে হচ্ছে বুদ্ধিমান জীব, হাতি। আমরা মানুষ, আমরা যুক্তি দিয়ে মনকে বোঝাতে পারি। কিন্তু যাকে ভালোবাসি সে কথা না শুনলে আমাদেরও মনে কম অভিমান হয় না। হয়তো তার কথা না শোনার, সে অবাধ্য হওয়ার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে, কিন্তু সব সময় আমরাও সেটা বুঝতে পারি না, এবং মনে মনে আহত না হয়েও থাকতে পারি না।

রুনু আজ সাত দিন টুনুকে দেখতে যায়নি। সারাদিন সরোবরের ধারে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, সেই রোজ যেখানে বসে হাতিদের সভা। রুনু কিন্তু তাদের সঙ্গেও মেশে না। অন্য দিকে তাকিয়ে একলাটি মনে মনে কী যে ভাবে তা সেই জানে। যখন বেশি গরম বোধ হয়, মাঝে মাঝে জলে নেমে তিন-চারটি ডুব দিয়ে আবার উপরে উঠে আসে।

রুনুর হাবভাব দেখে অন্য হাতিরা বিস্মিত হয়। বাচ্চা হারালে হস্তিনীরা যে-রকম ব্যবহার করে, রুনুও সেই রকম ব্যবহার করছে দেখে অন্যান্য হাতিরা তার কারণ বুঝতে পারে না।

মাঝে মাঝে এক একটা কমবয়সি হাতি কৌতূহলী হয়ে রুনুর কাছে এসে দাঁড়ায়, বোধহয় তার দুঃখের কারণ জানবার জন্যে। কিন্তু রুনু তাদের মোটেই আমল দেয় না, উলটে খাপ্পা হয়ে তেড়ে মারতে যায়। কমবয়সি হাতিগুলো চটপট সরে পড়ে নিরাপদ ব্যবধানে।

তখন সরোবরের পূর্ব তীরে তার জল-জগতে দেখা যাচ্ছিল উদীয়মান সূর্যের রক্তমুখ। পৃথিবীর মাটির উপরে সূর্য উঠছে যত উপর দিকে, জলের ছায়াসূর্য নেমে যাচ্ছে ততই পাতালের দিকে। সরোবরের দিকে দিকে নানা জাতের জীব একে একে বা দলে দলে দেখা দিতে লাগল। বন্য বরাহ, বন্য মহিষ, ছোটো ও বড়ো জাতের হরিণ, শূকর, কুকুর

এবং হরেক রকম শিকারি ও নিরীহ পাখিরা। তারপর দল বেঁধে হাতিরাও এল খেলা করতে। একদিকে ডাঙার উপরকার ঝোপের ভিতর বসে একটা লোভী চিতাবাঘ উঁকিঝুঁকি মেরে বার বার তাকিয়ে দেখছে, জলপান করতে এসেছে কেমন নধর নধর হরিণগুলি। চিতাবাঘটা তাই দেখছে, আর বার বার জিভ দিয়ে চেটে নিচ্ছে নাক আর উপর-ঠোঁটটা। কিন্তু বাইরে বেরুবার ভরসা তার কিছুতেই হচ্ছে না, কারণ ওখানে দলে দলে চরছে মহিষ আর বরাহের দল। হতভাগাদের শিঙে আর দাঁতে যে কত ধার সেটা তার জানতে বাকি নেই।

আর একদিকের জঙ্গলের ধারে কেবল কান আর চোখ বার করে তাকিয়ে তাকিয়ে এদিকটা দেখছে গোটা-চারেক শেয়াল। তাদের দৃষ্টি চকাচকি ও অন্যান্য হাঁসদের দিকে। কিন্তু তাদেরও বুকের পাটা এত বড়ো নয় যে এমন সব বদমেজাজি জানোয়ারদের এড়িয়ে পেট ভরাবার চেষ্টা করবে।

এখানে মনের আনন্দে নির্বিবাদে শিকার করছে কেবল বক, আর মাছরাঙারা।

আমাদের পূর্বপুরুষদের অনেকগুলি দূরসম্পর্কীয় ভাই নানা গাছের ডালের উপরে এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল। হঠাৎ তারা চিতাবাঘটাকে আবিষ্কার করে ফেললে। তারপরেই গাছে গাছে জাগল সে কী বিষম উত্তেজনা ও দাপাদাপি, লাফালাফি! প্রায় শতাধিক বানরের কিচিরমিচির চিৎকারে পরিপূর্ণ হয়ে গেল সেখানকার আকাশ-বাতাস। সেখানে যত জানোয়ার ছিল সকলেরই দৃষ্টি এই বিশেষ ঝোপটার দিকে আকৃষ্ট হতে বিলম্ব হল না। একটা বাচ্চা হাতি কৌতূহলী হয়ে সেই ঝোপটা তদারক করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার সাবধানি মা তাড়াতাড়ি জল থেকে উপরে উঠে শুঁড়ের বাড়ি দিয়ে বাচ্চাটাকে দিলে রীতিমতো এক ঘা। বন্য মহিষরা জোট বাঁধতে লাগল ঝোপটার দিকে সদলবলে যাত্রা করবে বলে। ব্যাপারটা মারাত্মক হয়ে উঠবার উপক্রম করছে দেখে চিতাবাঘটা এক লাফ মেরে ঝোপ থেকে বেরিয়ে পড়ে সাঁৎ করে জঙ্গলের ভিতরে মিলিয়ে গেল হলদে একটা বিদ্যুৎ-রেখার মতো। তারপর ধীরে ধীরে সেখানকার স্বাভাবিক অবস্থা আবার ফিরে এল। সেই স্তব্ধ সুনীল আকাশ, সেই শান্ত হরিৎ বনভূমি, সেই ঢলঢলে সরোবরের রোদমাখা সোনার জল।

কিন্তু এইসব শান্তি ও অশান্তির দৃশ্য দেখবার জন্যে রুনু আজ এখানে হাজির ছিল না। রাগ করে সাত দিন সে টুনুর সঙ্গে দেখা করেনি, কিন্তু আজ আর তার মন মানা মানল না কিছুতেই। সেই স্নেহের পুতলি আজ তাকে আবার টেনে নিয়ে চলল কঠিন আকর্ষণের টানে। বিষের মতো লাগছে তার চিরদিনের চেনা এই বনটাকে। কালো রাত্রির নিকষে ভোরের আলোর প্রথম সোনার আঁচল পড়বার আগেই রুনু আবার যাত্রা করলে টুনুদের সেই কাঠুরেপাড়ার দিকে। যেতে যেতে তার মনে হতে লাগল, আজ যেন অতিরিক্ত দীর্ঘ হয়ে উঠেছে এই বনের পথটা, যেন কিছুতেই আর শেষ হতে চায় না। পথে এক জায়গায় একটা বড়ো গাছ ভেঙে পড়ে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। বাধা দেখে অত্যন্ত অধীরভাবে সেই ভারী গাছটাকে সে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে তুলে একটানে পথ

থেকে সরিয়ে দিলে। গাছের তলায় নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা দিচ্ছিল মস্ত একটা গোখরো জাতীয় সাপ। সে তৎক্ষণাৎ ফণা তুলে ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল, কিন্তু পরমুহূর্তেই শুঁড়ের এক ঘা খেয়ে কোথায় যে ছিটকে গিয়ে পড়ল কিছুই বোঝা গেল না। উপর-উপরি এই দুই বিঘ্নের জন্য রুনুর মন আরও বেশি বিগড়ে গেল। তারপর সে ছুটতে আরম্ভ করল।

ওই দূর থেকে দেখা যাচ্ছে সেই বনটা, যার স্বচ্ছ ছায়ার তলায় আছে সেই ঘুমন্ত কাঠুরে গ্রামটি। বনের উপরে দেখা যাচ্ছে তিন-চারটে ধোঁয়ার রেখা। তারা প্রমাণ দিচ্ছে, রান্নার কাজে নিযুক্ত হয়েছে কাঠুরেদের গিন্নিরা। রুনু ভাবলে, এতক্ষণে টুনুর ঘুম নিশ্চয় ভেঙে গিয়েছে, খুব সম্ভব এখন সে ঘরের দাওয়ায় এসে বসে আমারই জন্যে অপেক্ষা করছে। টুনু হয়তো রাগ করে আজ আমাকে ধমক দেবে। কিংবা সে হয়তো অভিমান করে আমার সঙ্গে আজ কথাই কইবে না। নরেন বোধহয় এখনও আসেনি। এত সকাল সকাল সে এখানে এসে পৌঁছতে পারে না।

বেলগাছের পাশে সেই ঝোপটা। এইখানে বসেই টুনু আর নরেন রোজ গল্পসল্প করে। ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে রুনু কাঠুরেপল্লির দিকে দৃষ্টিপাত করলে। কিন্তু কই, টুনু তো ওখানে নেই! তার মা আর বাবাকেও দেখা যাচ্ছে না। পার্বতী তো এমন সময় রোজ দাওয়ায় বসে দুখিরামকে কাঁচালঙ্কা, তেঁতুল আর নুন দিয়ে পান্তাভাত খেতে দেয়। আরে, টুনুদের ঘরের সব দরজা-জানলা যে একেবারে বন্ধ! এমন ব্যাপার তো সে আর কোনওদিন দেখেনি! এ আবার কী হল?

রুনু তাড়াতাড়ি টুনুদের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বার-কয়েক চিৎকারও করলে, কিন্তু কারুর সাড়া পাওয়া গেল না। টুনুরা যদি কাঠুরেপাড়ার অন্য কারুর বাড়িতে গিয়ে থাকে এই আশায় সে একে একে প্রত্যেক ঘরটাই ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে এল। তাকে দেখে কাঠুরেপাড়ার কেউ আর ভয় করে না। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা 'রুনু, রুনু' করে ডেকে তার কাছে ছুটে এল। কাঠুরেদের কোনও কোনও বউ তাকে আদর করে খাবার জন্যে এটা ওটা সেটা এগিয়ে দিলে। কিন্তু আজ আর জাগ্রত হল না রুনুর ক্ষুধা। সকলে তাকে কী সব বলতে লাগল। তাদের কথায় বার বার টুনুর নাম শুনে রুনু বুঝলে, তারা তাকে টুনুর কথাই বলতে চায়। এইটুকু সে বুঝলে বটে, কিন্তু তার বেশি আর কিছুই বুঝতে পারলে না। তবে এই সত্যটা উপলব্ধি করতে তার বাকি রইল না যে টুনুদের কেউ আজ আর এখানে নেই।

কিন্তু নেই তো গেল কোথায়? অনেকক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রুনু এই প্রশ্নের উত্তর পাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনওই ফল হল না। আস্তে আস্তে আবার সে ফিরে চলল। ফিরতে নারাজ পা গুলোকে কোনও রকমে টেনে টেনে সে অগ্রসর হতে লাগল। তখন তার শ্রান্ত, ক্লান্ত ও হতাশ মূর্তি দেখলে সত্য-সত্যই দুঃখ হয়।

রুনু বনের ভিতরে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে, এমন সময় পিছনে একটা শব্দ শুনে আবার সে ফিরে দাঁড়াল। দেখলে, বনের পথ ধরে আসছে টুনুর বাবা দুখিরাম। কিন্তু সে

একলা। তবে দুখিরাম যখন এসেছে একটু পরে টুনুও নিশ্চয় এসে দেখা দেবে। দুখিরাম যখন হাসতে হাসতে আসছে, টুনুর তখন বিপদ-আপদ কিছু হয়নি। রুনু হাসতে পারে না বটে, কিন্তু সুখ বা আনন্দ না হলে মানুষ যে হাসে না এ জ্ঞানটুকু তার বেশ আছে।

দুখিরাম রুনুকে দেখতে পেলে না। নিজের মনেই হাসতে হাসতে সে ঘরের দিকে এগিয়ে চলল। রুনু সেইখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

ওদিকে দুখিরামকে দেখে কাঠুরেদের এক মোড়ল শুধোলে, 'কী গো দুখিরাম, হঠাৎ তুমি যে ফিরে এলে?'

দুখিরাম হেসে জবাব দিলে, 'ভায়া, পার্বতী ভুলে তার পায়জোড়জোড়া ফেলে গিয়েছে। সেইটে নিয়ে যেতে এলুম আর কী!'

দুখিরাম নিজের ঘরের দরজা খুলে ভিতরে গিয়ে ঢুকল। খানিক পরে বাইরে এসে দরজায় কুলুপ লাগিয়ে আবার অবলম্বন করলে বনের পথ।

দুখিরাম এলই বা কেন, আবার চলেই বা যাচ্ছে কেন? এর কারণ ধরতে না পারলেও একটা কথা রুনু অনুমান করতে পারলে। দুখিরামের পিছনে পিছনে গেলে নিশ্চয়ই সে আবার পাবে টুনুর দেখা। সে-ও তখন তাকে অনুসরণ করতে লাগল। তার মনে জাগল একটা অদ্ভুত সন্দেহ। হয়তো দুখিরাম চায় না যে টুনুকে নিয়ে সে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। হয়তো ইচ্ছা করেই তারা টুনুকে তার কাছ থেকে লুকিয়ে ফেলেছে। পিছনে পিছনে সে যাচ্ছে, হয়তো এটা জানতে পারলে দুখিরামও তাকে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়বার চেষ্টা করবে। অতএব, সে যে পিছু নিয়েছে, দুখিরামকে কিছুতেই এটা জানতে দেওয়া হবে না।

॥ ত্রয়োদশ ॥

রুনু-টুনুর শেষ অ্যাডভেঞ্চার

জমিদারবাড়িতে আজ ভারী ধূমধাম।

বাড়ির দিকে দিকে উড়ছে রঙিন নিশান, নহবতখানায় সানাই ধরেছে সাহানা রাগিণী, অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যাচ্ছে বহুজনের কণ্ঠে আনন্দ-কলরব।

বাড়ির পাশের ময়দানে খাটানো হয়েছে মস্ত বড়ো শামিয়ানা, এবং সর্বাঙ্গে তার পুষ্পপল্লবের অলঙ্কার। শামিয়ানার তলায় ধবধবে সাদা বিছানার উপরে বসে আছে ভালো ভালো পোশাক পরে দলে দলে লোক। লাল রঙে ছোপানো কাপড় পরে চাকর ও দরোয়ানরা ব্যস্তভাবে আনাগোনা করছে এখানে ওখানে সেখানে। ভারে ভারে দই, ক্ষীর এবং খাবারের থালা নিয়ে লোকের পর লোক জমিদারের বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকছে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা রংচঙে জামা ও ইজের পরে ঘোরাফেরা করছে সগর্বে। খানিক তফাতে আস্তাকুঁড়ের উপরেও পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে হরেক রকম খাবারের ফেলে-দেওয়া অংশ।

সেখানে বসেছে কুকুরদের ভোজন-সভা। কিন্তু সেখানে কেবল ভোজনই চলছে না, তর্জন-গর্জন ও কামড়া-কামড়িও চলছে দস্তুরমতো। চালাক কাকগুলো কিছু তফাতে বসে আছে রীতিমতো সতর্ক হয়ে, এবং একটু ফাঁক পেলেই টপ টপ করে খাবারের টুকরো তুলে নিয়ে উড়ে গিয়ে বসছে গাছের ডালে। কোনও কোনও কাক খাবার ফাঁক না পেয়ে বিষম চটে যাচ্ছে এবং কম-সতর্ক কুকুরগুলোর ল্যাজ কামড়ে দিয়ে অথবা মাথায় ঠোকর মেরে নিরাপদ ব্যবধানে চলে যাচ্ছে।

কাল রাত্রে নরেনের সঙ্গে টুনুর বিবাহ হয়ে গেছে। আজ তাদের বাসি বিয়ে।

উঠানের উপরে ছাঁদনাতলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে চেলির কাপড় পরা ও গাঁট-ছড়া-বাঁধা বর ও বধূ। দুজনকে কী চমৎকারই মানিয়েছে! আর সবচেয়ে দেখতে মিষ্টি লাগছে টুনুর হাসি হাসি মুখে লজ্জার গোলাপি রংটুকু। এয়োরা উলুরব তুলে বর ও বধূকে বেষ্টন করে বরণ করছেন এবং তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে খুশিমুখ হচ্ছে টুনুর গর্ভধারিণী সুরমার। কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন আর-একটি ভদ্রলোক। তাঁরও মুখে আনন্দের হাসি থাকলেও তাঁর চোখেও দেখা যাচ্ছে দুয়েক ফোঁটা অশ্রুজল। তিনি আর কেউ নন, টুনুর পিতা অসিত। কত কাল পরে হারা-মেয়েকে ফিরে পেয়েছেন, তাই অতি আনন্দে মনের আবেগে মাঝে মাঝে পাচ্ছে তাঁর কান্না।

আচম্বিতে বাইরে উঠল একটা ভয়ানক গোলমাল। চারিদিকে শোনা গেল ছুটোছুটি হুটোপুটির শব্দ। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা আতঙ্কগ্রস্ত মুখে বাহির থেকে বাড়ির ভিতরে পালিয়ে আসতে লাগল দলে দলে।

তারপরেই শোনা গেল আরও কতগুলো চিৎকার—

'পালাও, পালাও!'

'খ্যাপা হাতি, খ্যাপা হাতি!'

'ওরে, পালিয়ে আয় রে, পালিয়ে আয়! হাতিটা যে রাজবাড়ির দিকে ছুটে আসছে রে!'

সচমকে নরেন চাইলে টুনুর মুখের পানে, এবং টুনু চাইলে নরেনের মুখের দিকে। ব্যাপারটা বুঝতে তাদের একটুও দেরি হল না। এ নিশ্চয়ই রুনুর কীর্তি! কিন্তু সে রাজবাড়ির ঠিকানা জানলে কেমন করে?

বাইরে হঠাৎ গুড়ুম গুড়ুম করে পাঁচ-পাঁচ বার বন্দুকের আওয়াজ হল।

আর একজন কে চেঁচিয়ে উঠল, 'আর ভয় নেই! পাগলা হাতিটা গুলি খেয়ে মাটির উপরে পড়ে গিয়েছে!'

টুনুর সারা মুখখানা মড়ার মতো সাদা হয়ে গেল এক মুহূর্তে। প্রাণপণে চিৎকার করে সে কেঁদে উঠল। তারপর ক্ষিপ্রহস্তে গাঁটছড়া খুলে ফেলে পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ির বাইরের দিকে। এবং তার পিছনে পিছনে ছুটল নরেন্দ্রও। সবাই আড়ষ্ট, বিস্মিত, হতভম্ব!

শামিয়ানার পাশে রক্তাক্ত মাটির উপরে চার পা ছড়িয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে আছে রুনু। তার দেহের নানা জায়গা দিয়ে হু হু করে বেরিয়ে আসছে রক্তের ধারা। দেখলে মনে হয়,

দেহে তার প্রাণ নেই। 'রুনু! রুনু! আমার রুনু! ওরে রুনু রে!' কাঁদতে কাঁদতে এই বলে চেঁচিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে টুনু ছুটে গিয়ে রুনুর গায়ের উপর আছড়ে লুটিয়ে পড়ল।

কিন্তু তখনও রুনু মরতে পারেনি—বোধহয় টুনুকে একবার শেষ দেখা দেখবার জন্যে।

টুনুর কণ্ঠস্বর পেয়েই তার কানদুটো নড়ে নড়ে উঠল। ধীরে ধীরে একটুখানি মুখ তুলে চোখ খুলে একবার সে টুনুর মুখের পানে তাকিয়ে দেখলে। ধীরে ধীরে শুঁড় তুলে টুনুর কণ্ঠদেশ একবার জড়িয়ে ধরলে। পরমুহূর্তেই তার মাথাটা অবশ হয়ে ধপাস করে মাটির উপর পড়ে গেল। তার দেহ একেবারে আড়ষ্ট। টুনুকে দেখতে দেখতে রুনুর মৃত্যু হল।

সকলে যখন রুনুর রক্তাক্ত মৃতদেহের উপর থেকে টুনুকে টেনে তুললে তখন সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে।

তারা তিন বন্ধু

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

কুকুর-কাহিনি

অটল, পটল ও নকুল সেদিন সন্ধ্যাবেলায় চায়ের দোকানে বসে আছে। হঠাৎ রাস্তা থেকে একটা মিশকালো বিলাতি কুকুর এসে চায়ের দোকানের ভিতরে ঢুকল।

নকুল খাচ্ছিল একখানা কেক। কুকুরটা লুব্ধ চোখে তার মুখের পানে তাকিয়ে আছে দেখে নকুল এক টুকরো কেক তার দিকে নিক্ষেপ করলে। সেটুকু খেয়ে ফেলেই কুকুরটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার জন্যে টপ করে নকুলের কোলের উপরে লাফিয়ে উঠে দিলে তার গাল চেটে।

নকুল খাপ্পা হয়ে এক ধাক্কা মেরে তাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে কোঁচার খুঁটে নিজের মুখ মুছতে লাগল।

চায়ের দোকানের কোণে বসেছিলেন এক ভদ্রলোক। কুকুরটা তাঁর কাছে গিয়ে ল্যাজ নাড়তে শুরু করে দিলে। তার দিকে এক টুকরো রুটি ফেলে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'কুকুরটা দেখছি খুব দামি!'

অটল এক মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠে বললে, 'দামি? এর কত দাম হবে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'তা বলতে পারি না। তবে এর যদি 'পেডিগ্রি' থাকে তাহলে হাজার টাকা দামও হতে পারে। এটা কার কুকুর?'

অটল অম্লানবদনে বললে, 'আমাদের। এর নাম টম। আয় রে টম, আয়! টম, টম!'

পটল ডাকলে, 'জ্যাক!'

নকুল ডাকলে, 'জিমি!'

কিন্তু কুকুরটা কোনও ডাকই গ্রাহ্যের মধ্যে আনলে না। অটল তখন বকলস ধরে তাকে হিড় হিড় করে কাছে টেনে আনলে। ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে একবার সন্দিগ্ধ-চোখে তিন বন্ধুর পানে তাকিয়ে চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পটল বললে, 'কী হে, কুকুরটাকে তুমি ধরে রাখলে কেন? বেচে ফেলবে নাকি?'

অটল বললে, 'উঁহু! বেচতে গিয়ে বিপদে পড়ব নাকি? শুনছি কুকুরটা দামি। নিশ্চয় কোনও বড়োলোকের কুকুর, পথ হারিয়ে এখানে এসে পড়েছে। ওকে ফিরে পাবার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা হতে পারে।'

নকুল বললে, 'ও আমার কুকুর।'

—'কী রকম?'

—'আমি ওকে কেক খেতে দিয়েছি। ও আমার গাল চেটে দিয়েছে।'

'বেশ, আমিও তাহলে ওকে ওমলেট খেতে দিচ্ছি।'

পটল বললে, 'আমিও বিস্কুট দিচ্ছি।'

কুকুরটা বুদ্ধিমান। ওমলেট ও বিস্কুট কিছুই ছাড়লে না।

অটল বললে, 'কুকুরটা এখন আমাদের তিনজনেরই হল। পুরস্কারের টাকাও আমরা তিনজনে ভাগ করে নেব। চলো, একে নিয়ে বাসায় যাই।'

কিন্তু রাস্তায় নেমে কুকুরটা তাদের সঙ্গে যেতে রাজি হল না। তিনজনে তাকে নিয়ে ঠেলাঠেলি টানাহ্যাঁচড়া করছে, এমন সময়ে দেখা গেল একটা পাহারাওয়ালা তাদের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে।

তারা ভয় পেয়ে কুকুরের জন্যে তখনই একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করে ফেললে।

বাসার সামনে নেমে নকুল বললে, 'কিন্তু মেসের লোকেরা কুকুর দেখলে কী বলবে?'

অটল বললে, 'তারা দেখতে পেলে, তবে তো? আজ রাতটা ওকে আমাদের ঘরের ভেতরে লুকিয়ে রাখতে পারব।'

রাত যখন নিশুতি তখন বিকট চিৎকারে অটলের ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে আলো জ্বেলে সে দেখলে, কড়িকাঠের দিকে মুখ তুলে কুকুরটা শেয়ালের মতন গলায় প্রচণ্ড চিৎকার জুড়ে দিয়েছে—ও-ও-ও-ও, ও-ও-ও-ও, ও-ও-ও-ও।

পটল ও নকুল আঁতকে জেগে উঠল। তারপরই ঘরের বাইরে দ্রুত পায়ের শব্দ ও দরজায় দুম-দাম ধাক্কা শোনা গেল।

বাইরে থেকে কে বললে, 'ব্যাপার কী? ব্যাপার কী?'

বিপদে নকুলের মাথা খুব খেলে, সে বললে, 'আমাদের অটল দাঁত-কটকট করছে বলে কেঁদে সারা হচ্ছে।'

বাহির থেকে আর-একজন বললে, 'বাপ রে, দাঁত-কটকট করলে মানুষ যে অমন করে চ্যাঁচাতে পারে, তা এই প্রথম জানলুম।'

আর-একজন বললে, 'আমার মনে হচ্ছে যেন, কুকুরের কান্না।'

আর-একজন বললে, 'অটলবাবুর দাঁত ফের কটকট করলে আমরা পুলিশ ডাকব।'

অটল চাপা-গলায় মুখ খিঁচিয়ে এবং নকুলকে ঘুসি দেখিয়ে বললে, 'পাজি ছুঁচো কোথাকার! কাল আমি মুখ দেখাব কেমন করে? আমাকে কুকুর বানিয়ে ছাড়লে!'

পটল আর নকুল হি হি করে হাসতে লাগল।

পরের দিন ভোরবেলায়, মেসের লোক জাগবার আগেই তিন বন্ধু কুকুর নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল।

কুকুরটা ক্রমাগত লম্বা দেবার চেষ্টা করছে দেখে তার জন্যে একগাছা শিকল কেনবারও দরকার হল। অটল একটা লাইব্রেরিতে ঢুকে খবরের কাগজগুলো উলটেপালটে দেখে এসে বললে, 'না, পুরস্কার ঘোষণা করে এখনও কেউ বিজ্ঞাপন দেয়নি।'

পটল বললে 'কুকুর নিয়ে এমন টো টো করে পথে পথে ঘুরে বেড়ানো অসম্ভব!'

নকুল বললে, 'আজ রাত্রে অটলের আবার দাঁত-কটকট করলে মেসের লোক বিশ্বাস করবে না।'

অটল বললে, 'চৌধুরিদের বাগানের মালি বনমালীকে আমি চিনি। যতদিন না পুরস্কার ঘোষণা হয়, এ আপদকে তার জিম্মায় রেখে আসি চলো।'

পটল বললে, 'তার চেয়ে ও-আপদকে এখুনি বিদায় করে দাও না ভায়া!'

অটল মাথা নেড়ে বললে, 'ইল্লি নাকি? ওর জন্যে আমাদের ট্যাঁকের পয়সা খরচ হয়নি?'

চৌধুরিদের বাগানের বনমালী বললে, 'কুকুরটাকে আমি হপ্তা-খানেকের জন্যে বাগানে বেঁধে রাখতে পারি, কিন্তু ওর খোরাকি জোগাবে কে?'

অটল ঠং করে একটা টাকা ফেলে দিলে।

দিন-দুয়েক পরে বনমালী বাগানে বসে কতকগুলো ফুলগাছের শুকনো ডাল কেটে দিচ্ছিল। হঠাৎ মুখ তুলে দেখে, একজন এয়া গালপাট্টা-গোঁফওয়ালা বেঁটে পেটমোটা লোক তার পাশে দাঁড়িয়ে বাবুদের কুকুরটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। তারও হাতের শিকলিতে বাঁধা আর একটা মিশকালো কুকুর।

বনমালী বললে, 'কাকে খুঁজছেন মশাই?'

লোকটা বললে, 'কারুকে খুঁজছি না, তোমাদের কুকুরকে দেখছি। ও বোধহয় আমার কুকুরের যমজ ভাই!'

দুটো কুকুরই তখন পরস্পরকে দেখে ভয়ানক তর্জন-গর্জন ও লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে—দুজনেই যেন দুজনকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলতে চায়?'

—'না মশাই, ও কারুকে কামড়ায় না।'

—'আমার কুকুরও আগে কামড়াত না, কিন্তু পরশু খুকিকে আর কাল গিন্নিকে কামড়েছে। দু-চার দিনের মধ্যেই ওকে বিদায় করে দিতে হবে দেখছি, নইলে গিন্নি নাকি বাপের বাড়ি চলে যাবেন।'

বনমালী বললে, 'কিন্তু দুটো কুকুরই তো দেখতে অবিকল একরকম! একবার চোখের আড়াল হলে আমি চিনতেই পারব না কোনটা কার কুকুর!'

—'চিনতেই পারবে না? বটে!'

লোকটা খানিকক্ষণ ভেবে বললে, 'এ দুটো কুকুরের গলার মাপও একরকম কি না দেখি!' সে নিজের কুকুরের বকলস খুলে অন্য কুকুরটার গলায় পরালে এবং তার বকলসটা নিজের কুকুরের গলায় পরিয়ে দিয়ে বললে, 'আরে, এদের গলার মাপও যে একরকম! নিশ্চয় এরা যমজ ভাই!'

বনমালীর তখন বাজে কথা কইবার অবসর ছিল না, সে আবার নিজের কাজে মন দিলে।

পরের দিন সকালে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে এসেই বিপুল উৎসাহে অটল বললে, 'কেল্লা মার দিয়া! পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে।'

তিন বন্ধু ঊর্ধ্বশ্বাসে বনমালীর সন্ধানে ছুটল। বনমালীর কাছ থেকে কুকুর নিয়ে তারা

তাড়াতাড়ি চলে গেল বটে, কিন্তু মিনিট-পনেরো পরেই আবার হন্তদন্তের মতন ফিরে এল। তখন বাগানের মাটি কোপাচ্ছিল বনমালী।

অটল মারমুখো হয়ে বলে উঠল, 'হতভাগা, বদমাইশ! এ কার কুকুর?'

—'না, না! এ আমাদের কুকুর নয়! বকলসটা আমাদের বটে, কিন্তু কুকুরটা একেবারে নতুন! যে পুরস্কার ঘোষণা করেছিল, সে দেখেই চিনে ফেলেছে! হায়, হায় পঞ্চাশ টাকা!'

বনমালীর তখনই মনে পড়ে গেল, কালকের সেই গোঁফ-গালপাট্টার কথা। সে মনে মনে সমস্তই বুঝতে পারলে, কিন্তু মুখে এমন ভাব দেখালে, যেন কিছুই বুঝতে পারেনি।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

নকুলের দাঁও-মারা

অটল ও পটল বিমর্ষ মুখে বাড়ির সামনেকার রোয়াকে চুপ করে বসে আছে।

আজ সকালে উঠে তারা পকেট ঝেড়ে দেখেছে—তাদের দুজনের কাছে মোট সাড়ে-উনিশটি পয়সা আছে। তা ছাড়া আর কিছুই নেই।

প্রায় যাকে বলে, ভাঁড়ে-মা-ভবানী আর কী? এমন অবস্থায় কাষ্ঠহাসি ছাড়া আর কোনওরকম হাসিই হাসা যায় না।

কিন্তু অটল ও পটল কাষ্ঠহাসি হাসতে নারাজ। তাই তাদের মুখ বিমর্ষ।

তাদের একমাত্র আশা এখন নকুল।

দেশে একমাত্র জমি-জমা আছে। সেই জমি-ভাড়ার টাকা সে অনেক দিন পরে আদায় করতে গিয়েছে।

আজ নকুলের আসবার কথা। তারই পথ চেয়ে অটল ও পটল রোয়াকে বসে আছে তীর্থের কাকের মতন।

খানিক পরে দেখা গেল, একখানা গোরুর গাড়ির আগে আগে নকুল আসছে বাসার দিকে।

পটল বললে, 'নকুলের মুখ হাসি হাসি, নিশ্চয় খবর ভালো।'

অটল তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বললে, 'কী হে ভায়া, টাকা দিয়েছে?'

নকুল বললে, 'দিয়েছে বটে, কিন্তু অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে। আজ তিন বছর পরে গেলুম, মোটে আড়াই শো টাকা।'

অটল বললে, 'হিপ হিপ হুর রে!'

পটল জিজ্ঞাসা করলে, 'কিন্তু নকুল, তোমার সঙ্গে গোরুর গাড়ি কেন? গাড়ির ওপরে অতবড়ো বাক্সে করে কী এনেছ হে? আমাদের জন্যে ফল-ফসল নাকি?'

নকুল রহস্যময় হাসি হেসে বললে, 'ওটা বাক্স নয়। ওর ওপর-দিকটা খোলা, অর্থাৎ লোহার ডান্ডা দিয়ে ঘেরা আছে। একবার উঁকি মেরে দেখেই এসো না।'

কৌতূহলী অটল গোরুর গাড়ির উপরে গিয়ে উঠল। বাক্সটা তার চিবুক পর্যন্ত উঁচু। ডিঙি মেরে বাক্সের ভিতরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেই সে 'বাপ।' বলে চেঁচিয়ে রাস্তার দিকে লম্ফত্যাগ করলে।

পটল বললে, 'কী হল, কী হল?'

অটল বললে, 'বাঘ!'

—'তুমি কী বলছ হে? বাপ, না বাঘ?'

—'দুই-ই। ওটা বাক্স নয়, খাঁচা। ওর ভেতরে আছে একটা মস্ত বাঘ!'

—'বাঘ?'

নকুল বললে, 'হ্যাঁ। কিন্তু ভারী পোষ-মানা বাঘ!'

অটল বললে, 'বাঘ যে পোষ মানে, এ কথা মানতে আমি রাজি নই। পটল, এখান থেকে সরে পড়ি এসো, নকুলের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

নকুল বললে, 'তোমরা হচ্ছ কাপুরুষের অবতার। একটা পোষা বাঘকে এত ভয়। আগে সব কথা শোনো। আমাদের গাঁয়ের জমিদার বাঘটাকে পুষেছিলেন। সম্প্রতি তিনি মারা গিয়েছেন। দেশে গিয়ে শুনলুম, জমিদারবাড়ির লোকেরা বাঘটাকে পুষতে রাজি নন। বিলিয়ে দিতে চান। এতবড়ো দাঁও মারবার সুযোগ আমি ছাড়তে পারলুম না। তাই বাঘটাকে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এসেছি।'

অটল মুখভঙ্গি করে বললে, 'মরে যাই! বুদ্ধির গলায় দড়ি! বাঘ নিয়ে তুমি কী করবে শুনি?'

—'সস্তায় বাঘ বিক্রি আছে বলে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেব।'

—'মরা বাঘের চামড়া বিক্রি হতে পারে, কিন্তু একটা ধেড়ে জ্যান্তবাঘকে কেউ কিনবে না।'

—'ও-বাঘটা ধেড়ে নয়। নিতান্ত ছোকরা, বয়স মোটে চার বছর তিন মাস। সার্কাস-ওয়ালারা খবর পেলে এখনই কিনে ফেলবে।'

পটল বললে, 'কিন্তু যতদিন না তারা খবর পায়, বাঘটাকে কোথায় রাখবে? আমাদের এটা হচ্ছে ফ্ল্যাটবাড়ি। বাড়ির ভেতরে অতবড়ো একটা বাঘ দেখলে ভাড়াটেরা কী-রকম গোলমাল করবে তা বুঝতে পারছ?'

নকুল বললে, 'বাঘের খাঁচাটা থাকবে বাড়ির পাশের ওই জমিতে।'

পরদিন নকুল বাঘের জন্যে বেশ-খানিকটা মাংস ও হাড়ের ছাঁট নিয়ে এল।

বাঘের খাওয়া দেখবার জন্যে অটল ও পটল কৌতূহলী হয়ে নকুলের সঙ্গে সঙ্গে খাঁচার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

বাঘ কিন্তু মাংসের ছাঁট দু-একবার শুঁকেই ব্যাঘ্র-ভাষায় একটি ছোট্ট গর্জন করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে ল্যাজ আছড়াতে লাগল।

অটল বললে, 'জমিদারের বাঘ কিনা! আভিজাত্য আছে। মাংসের ছাঁটে মন ওঠে না—গোটা পাঁঠা খেতে চায়।'

নকুল বললে, 'আমার মনে হয়, জমিদারবাড়ির জন্যে ওর মন কেমন করছে। সেখানে ও খাঁচার মধ্যে থাকত না—ওর জন্যে ছিল একটা বড়ো ঘর, আর খানিকটা রেলিং-ঘেরা জমি।'

অটল সন্দিগ্ধ ভাবে বললে, 'খাঁচাটা তেমন মজবুত নয় দেখছি। এখানেও ওকে বেশিদিন খাঁচার ভেতরে থাকতে হবে না বলেই মনে হচ্ছে।'

নকুল একটা লাঠি দিয়ে মাংসের ছাঁটগুলো বাঘের মুখের দিকে এগিয়ে দেবার চেষ্টা করলে।

বাঘ মহা-বিরক্ত হয়ে বিষম ধমক দিয়ে খাঁচার দরজার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা সশব্দে খুলে গেল।

অটল, পটল ও নকুল—তিনজনেই একসঙ্গে সুদীর্ঘ লম্ফ-ত্যাগ করলে।

তারপর—দৌড়, দৌড়, দৌড়।

দোতলায় উঠে নিজেদের ফ্ল্যাটে ঢুকে অটল দরজা বন্ধ করবার জন্যে ফিরেই দেখে, বাঘও দোতলায় এসে হাজির হয়েছে।

দরজা বন্ধ করা আর হল না। তিনজনেই একটা ঘরে ঢুকে পড়ল।

নকুল একটা টেবিলের উপর উঠে সেখান থেকে লাফ মেরে ঘরের লোহার কড়ি ধরে ঝুলতে লাগল।

অটল ও পটল একটা সেকেলে খুব-উঁচু ও প্রকাণ্ড আলমারির উপরে কোনওরকমে উঠে পড়ে হুমড়ি খেয়ে বসে রইল।

বাঘও ঘর ভুল করলে না। সে-ও ভিতরে ঢুকে, প্রথমে কড়ি-ধরে দোদুল্যমান নকুলের দিকে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর মুখ ফিরিয়ে অটল ও পটলকে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

অটলের মনে হল, আগে কাকে ভক্ষণ করবে বাঘ সেই কথাই চিন্তা করছে।

সে কম্পিত স্বরে চুপি চুপি বললে, 'বাঘটা খালি খালি আমার দিকেই তাকাচ্ছে। ভাই পটল, তুমি আমার সামনে এসো। আমি তোমার পিছনে গা ঢাকা দিই।'

পটল দস্তুর মতন দৃঢ় প্রতিজ্ঞের মতন বললে, 'না। তুমি হচ্ছ নরহস্তী, তোমাকে দেখে বাঘের জিভে জল আসা অসম্ভব নয়।'

অটল বললে, 'মানলুম। সেইজন্যেই তো আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছে। আর আমি যদি নরহস্তীই হই, তুমি হচ্ছ মানুষ-হাড়গিলে। তোমাকে দেখে বাঘের লোভ উপে যেতে পারে, অতএব তুমি সামনে এসো।'

পটল জোরে মাথা নেড়ে বললে, 'পাগল! এমন সাংঘাতিক পরীক্ষায় আমি রাজি নই। তোমার আড়ালে আমি নিরাপদে আছি। বাঘ মোটেই আমাকে দেখতে পাচ্ছে না।'

কিন্তু অটল নাছোড়বান্দা, সে পটলের পিছনে যাবার জন্যে গুঁতোগুঁতি শুরু করলে—পটল যত বাধা দেয়, তার গোঁ তত বেড়ে ওঠে।

একে অটল-পটলের দেহের ভারে আলমারিটার মাথা রীতিমতো ভারী হয়ে উঠেছিল, তার উপরে আবার এই প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি!

হঠাৎ আলমারিটা হেলে দড়াম করে মাটির উপর পড়ে গেল।

নকুল এতক্ষণ দুই চোখ মুদে কড়ি ধরে ঝুলছিল। আলমারি পতনের শব্দে এবং অটল ও পটলের আর্তনাদে দারুণ ভয়ে তার দেহ হিম ও দুই হাত অবশ হয়ে গেল এবং পরমুহূর্তে আঙুল আলগা হয়ে গিয়ে কড়ি থেকে সে অবতীর্ণ হল একেবারে বাঘের পিঠের উপরে।

ওদিকে ভূপতিত আলমারির মাথা থেকে দুই-দুইজন মানুষকে দুই দিকে ছিটকে পড়তে দেখে, বাঘ বিপুল বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেল।

তারপরেই যখন হাউমাউ করে চেঁচিয়ে তার পিঠে এসে পড়ল নকুল, তখন এমন অভাবনীয় হুলুস্থুলু কাণ্ড সে আর সহ্য করতে পারলে না। ভয়ে ও রাগে গাঁ গাঁ করে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে বাঘ তৎক্ষণাৎ সেই বিপজ্জনক ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তিনজন মানুষের সঙ্গে বাঘের চিৎকার এবং আলমারি ও নকুলের দেহের পতনশব্দ শুনে ফ্ল্যাটবাড়ির সমস্ত ভাড়াটিয়া হইচই তুলে ছুটে এল।

কিন্তু তার পরই মূর্তিমান ব্যাঘ্রের আবির্ভাব দেখে তাদের পিলে গেল চমকে। বলা বহুল্য, তৎক্ষণাৎ যে যেদিকে পারলে দৌড় মেরে দমাদম শব্দে দরজাগুলো বন্ধ করে দিলে।

এদিকে বাঘের পিঠ থেকে মেঝের ওপরে আছড়ে গড়িয়ে পড়ে নকুলের ধারণা হল সে আর বেঁচে নেই।

সে আর টুঁ-শব্দ উচ্চারণ করলে না, বোধহয় মরা মানুষের কথা কওয়া উচিত নয় বলেই।

অটল ও পটল অল্প-বিস্তর চোট খেয়েছিল বটে, কিন্তু তারা সেই অবস্থাতেই আত্মরক্ষার চেষ্টা ভুললে না।

অটল হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলায় গিয়ে ঢুকল, এবং পটল চটপট উঠে ঘরের দরজায় দিলে খিল তুলে।

বাড়ির কে থানায় ফোন করে দিয়েছিল, থানা থেকে বন্দুকধারী পাহারাওয়ালার সঙ্গে ইনস্পেকটার এসে দেখেন—বাঘটি খাঁচায় ঢুকে ঘুমিয়ে পড়েছে।

খাঁচার দরজা বন্ধ করার শব্দে বাঘ মুখ তুলে একবার তাকিয়ে দেখলে—তারপরই আবার মুখ নামিয়ে চোখ মুদে ফেললে। বাঘের ভাব দেখে বেশ বোঝা যায়, খাঁচার বাইরে আসবার জন্যে তার মনে আর কোনও আগ্রহই নেই।

ইনস্পেকটার বললেন, 'বাঘটা দেখছি পোষা। একে বধ করে লাভ নেই।'

ইনস্পেকটার বললেন, 'তা হলে বাঘটাকে অলিপুরের চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হোক।'

নকুল সাগ্রহে বললে, 'উত্তম প্রস্তাব'।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

মহারাজা চোর-চূড়ামণি বাহাদুর

অপূর্ব বাগচী স্ট্রিটে আজকাল বড়োই চোরের উপদ্রব হয়েছে।

এ চোর হচ্ছে বিষম চোর। উপর-উপরি বারো-চৌদ্দ খানা বাড়িতে চুরি হয়ে গেল, কিন্তু পুলিশ কোনও চুরিরই কিনারা করতে পারলে না।

গোয়েন্দা বিভাগের মস্ত মস্ত মাথাওয়ালারা মাথা ঘর্মাক্ত করে অবশেষে আবিষ্কার করে ফেললেন, এসব চুরি মাত্র একজন চোরের কীর্তি নয়।

কিন্তু এই অভূতপূর্ব আবিষ্কারের ফলেও চুরি বন্ধ হল না। বুদ্ধিমান চোরেরা বেছে বেছে ঘটনাস্থল নির্বাচন করেছিল চমৎকার। কারণ অপূর্ব বাগচী স্ট্রিটে যাঁরা বাস করেন, তাঁদের অধিকাংশই ধনবান বলে বিখ্যাত। এমনকি তাঁদের মধ্যে একজন 'রাজাবাহাদুর' ও একজন 'স্যার' উপাধিধারীরও অভাব নেই।

অটল-পটল-নকুল লক্ষ্মীপ্যাঁচার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হলেও আজকাল ওই রাস্তাতেই বাস করত।

পাড়ায় একটি শখের থিয়েটার-ক্লাব ছিল, তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন রাজা দুর্গাপ্রসাদ ও স্যার গঙ্গারাম!

গেল দুই রাত্রে তাঁদের দুজনেরই অট্টালিকার মধ্যে বিনা সমারোহে চোরের শুভাগমন হয়েছিল।

রাজাবাহাদুর ও স্যার গঙ্গারাম চোরেদের উপরে হয়েছেন অগ্নিশর্মা এবং পুলিশের উপরে হারিয়েছেন বিশ্বাস। তাঁরা দুজনে ঘোষণা করলেন, যে চোর ধরতে পারবে তাকে তাঁরা হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করবেন।

অটল বললে, 'হে মা কালী, যদি দশ টাকার পুজো পেতে চাও, তাহলে চোরকে একটিবার মাত্র আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও।'

পটল দীর্ঘশ্বাস ফেলে গানের সুরে বললে, 'হায় রে, এমন দিন কি হবে মা তারা?'

নকুল বললে, 'আমাদের বাড়িতে এলেও চোর তো আর ঢোল বাজাতে বাজাতে আসবে না। সে এখন এসে কখন পালাবে কেমন করে আমরা জানব?'

অটল বললে, 'তবু প্রস্তুত হতে দোষ নেই। হাজার টাকা কম টাকা নয়। এসো, খানিকক্ষণ পরামর্শ করা যাক।'

মা কালী অটলের প্রার্থনা শুনলেন।

দিন-তিনেক পরেই গভীর রাত্রে অটল নাক-ডাকা থামিয়ে ফেলে ঘরের ইলেকট্রিক বাতি জ্বেলে দেখলে, একটা মহা লম্বা-চওড়া যমের মতন দেখতে চোর তার আলমারির পাল্লা ধরে টানাটানি করছে।

অটল এক গাল হেসে বললে, 'অবশেষে তুমি এসেছ বন্ধু? আমি যে তোমার পথ চেয়েই জেগে জেগে নাক ডাকাচ্ছিলুম।'

চোর গর্জন করে একখানা চকচকে ছোরা বার করলে।

ফস করে একটা রিভলভার বার করে অটল বললে, 'শান্ত হও ভায়া, শান্ত হও। ছোরার চেয়ে রিভলভার বড়ো জিনিস, এ কথা জানো তো? চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো।'

চোর আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অটল বললে, 'পাছে তোমার ঢুকতে কষ্ট হয়, সেই ভয়ে আজ তিন দিন ধরে আমাদের বাড়ির সব দরজাই খোলা রেখেছি। আর দেওয়ালের উপরে ওই যে ইলেকট্রিক-ঘণ্টার বোতাম দেখছ, তোমার পায়ের শব্দ পেয়েই ওটি আমি টিপে দিয়েছি। কেন জানো? ওই বোতাম টিপলেই বাড়ির আর-দুটো ঘণ্টা বাজবে, আর আমার দুই বন্ধু জেগে উঠে পাড়ার লোককে খবর দিতে ছুটবে!....

দরজার দিকে অত ঘন ঘন তাকাচ্ছ কেন? ভাবছ, হঠাৎ এক লাফে পগার পার হবে? আর সময় নেই ভায়া, আর সময় নেই। ওই শোনো, সিঁড়ির ওপরে পায়ের শব্দ। পাড়ার লোকেরা খবর পেয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে!'

তিন-চার মুহূর্ত পরেই ঘরের মধ্যে পটল ও নকুলের সঙ্গে প্রবেশ করলেন রাজাবাহাদুর, স্যার, গঙ্গারাম ও আরও বারো-তেরো জন লোক।

সকলেরই হাতে মোটা মোটা লাঠি।

অটল খাট থেকে নেমে এসে বললে, 'প্রিয় চোর, এইবারে ছোরাখানা পরিত্যাগ করো দেখি।'

চোর ছোরাখানা ছুড়ে ফেলে দিলে।

সেখানা কুড়িয়ে নিয়ে অটল বললে, 'যদি চাও তো এই রিভলভারটা এখন তোমাকে দান করতে পারি। এটি হচ্ছে আমাদের ক্লাবের থিয়েটারি-রিভলভার—একেবারে কাঠ দিয়ে তৈরি!'

চোর কটমট করে চেয়ে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল।

রাজাবাহাদুর দুই পা পিছিয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন, 'রাসকেলকে এখনই পুলিশের হাতে সঁপে দেওয়া হোক।'

স্যার গঙ্গারাম বললেন, 'এ চোরটা হচ্ছে এখন অটলবাবুর সম্পত্তি। উনি যা বলেন তাই হবে।'

অটল বললে, 'পটল। নকুল! চোরকে নিয়ে যা যা করতে হবে, তোমাদের সব মনে আছে তো?'

পটল ও নকুল ঘাড় নাড়লে। অটল বললে, 'চলুন এইবারে সবাই মিলে ক্লাবের দিকে যাত্রা করা যাক।'

রাজাবাহাদুর ও স্যার গঙ্গারামও কৌতূহল দমন করতে পারলেন না, সকলের সঙ্গে তাঁরাও ক্লাবে গিয়ে হাজির হলেন।

চোরকে একখানা টুলের উপর বসিয়ে সবাই তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে রইল।

নকুল একখানা পকেটবুক ও পেনসিল নিয়ে এগিয়ে এসে বললে, 'হে চোর, তোমার নাম কী?'

চোর জবাব দিলে না।

পটল বললে, 'ওর নাম ছিঁচকে।'

নকুল তাই লিখে নিয়ে বললে, 'ছিঁচকে, তোমার বয়স কত?'

জবাব নেই।

পটল বললে, 'ছিঁচকে এখনও কথা কইতে শেখেনি। লেখো, ওর বয়স এক বছর দু-মাস দেড় দিন।'

নকুল বললে, 'ছিঁচকে, তোমার ঠিকানা কী?'

পটল বললে, 'নিশ্চয়ই চোরা-বাজারে।'

অটল বললে, 'ছিঁচকে, তোমার গা দিয়ে বড়োই দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। তোমাকে এখন স্নান করতে হবে।'

পটল বললে, 'এ বাড়ির পিছনেই একটা ছোটো পুকুর আছে। ছিঁচকেকে সেইখানে নিয়ে চলো।'

তখন পৌষ মাসের শেষ, কনকনে শীত। বাড়ির পিছনে ছিল একটা পানায় ভরা পচা পুকুর। পুকুরের দিকে তাকিয়েই চোর বলে উঠলে, 'আমি সাঁতার জানি না।'

পটল ও নকুল একসঙ্গে বলে উঠল, 'ছিঁচকে কথা কইতে শিখেছে—ছিঁচকে কথা কইতে শিখেছে!'

অটল বললে, 'ছিঁচকে আজ যখন কথা কইতে শিখেছে, তখন সাঁতারই বা শিখবে না কেন? নকুল, একগাছা মোটা দড়ি নিয়ে এসো তো!'

দড়ি বাঁধা হল চোরের কোমরে। পটল ও নকুল তাকে ধরে ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দিলে।

'বাবা রে, মা রে' বলে বিকট আর্তনাদ করে চোর জলের ভিতরে ডুবে গেল নিরেট পাথরের মতন। অটল তখন দড়ি ধরে তাকে আবার ডাঙার উপরে টেনে তুললে।

পটল ও নকুল আবার তাকে ধাক্কা মারলে—আবার সে জলের ভিতরে পড়ে ডুবে গেল।—অটল আবার তাকে উপরে টেনে আনলে। এমনি ব্যাপার চলল খানিকক্ষণ ধরে।

অটল বললে, 'মনে হচ্ছে পাঁক আর জল খেয়ে খেয়ে ছিঁচকের ভুঁড়ি রীতিমতো ফুলে উঠেছে। আরও জল খেলে ওর ভুঁড়ি ফেটে যেতে পারে।'

রাজাবাহাদুর বললেন, 'ওর ভুঁড়ি ফাটবার আগে শীতের চোটে কেঁপে কেঁপে আমি মারা পড়ব যে! এইবারে ওকে থানায় পাঠিয়ে দাও।'

অটল বললে, 'আমার সম্পত্তি পুলিশের হাতে সমর্পণ করব না। পটল! নকুল! ছিঁচকেকে নিয়ে এইবারে কী করতে হবে মনে আছে তো? যাও, ওকে নিয়ে যাও!'

পটল ও নকুল চোরকে নিয়ে ক্লাবের একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বাকি সবাই ক্লাবের রিহার্সাল-রুমে এসে দাঁড়ালেন। মিনিট-দশ পরেই পটল ও নকুল চোরকে সেখানে নিয়ে এল—তার মাথায় টিনের মুকুট, পায়ে জরির জুতো, পরনে রাজার পোশাক এবং একগালে চুন ও একগালে কালি।

সকলেই বুঝলেন এ পোশাক এসেছে থিয়েটারেরই ভাণ্ডার থেকে।

অটল বললে, 'পটল, একখানা বড়ো কাগজে মোটা মোটা অক্ষরে কালি দিয়ে লেখো—

'মহারাজা চোর-চূড়ামণি বাহাদুর!' নকুল কাগজখানা তুমি গঁদ দিয়ে ছিঁচকের পিঠের ওপরে মেরে দাও!'

চোরের দুই গাল বয়ে গড়িয়ে পড়ছিল তখন ঝর ঝর করে চোখের জল।

স্যার গঙ্গারাম বললেন, 'তোমাদের থিয়েটারের অভিনয়ের চেয়ে আজকের পালাটা আমি বেশি উপভোগ করছি।'

চোরের দিকে তাকিয়ে অটল বললে, 'হে মহারাজ, আপনি ক্রন্দন করছেন কেন?'

পটল বললে, 'আমাদের চড় খেয়ে। মহারাজ কিছুতেই রাজবেশ পরতে রাজি হচ্ছিলেন না।'

চোর বললে, 'না হুজুর, সেজন্যে আমি কাঁদছি না। ও-রকম চড়-চাপড় খাওয়ার অভ্যাস আমাদের আছে। কিন্তু এর পরেও আমাকে নিয়ে আরও কী করতে চান, তাই ভেবেই আমার কান্না পাচ্ছে।'

অটল বললে, 'মহারাজ, নির্ভয় হোন। আর আমাদের কোনও কর্তব্য নেই। আপনি এখন অনায়াসেই স্বরাজ্যে প্রস্থান করতে পারেন।'

চোর বললে, 'তাহলে আমার কাপড়-চোপড়গুলো ফিরিয়ে দিন।'

অটল বললে, 'উঁহু! জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দ্যাখো। সকালের আলো ফুটেছে। রাজবেশে রাস্তায় তোমাকে দিব্যি মানাবে।'

চোর চমকে উঠে বললে, 'বাপ রে, এ পোশাকে আমাকে পথে দেখলে লোকে যে আমার পিছনে ঢিল ছুড়তে ছুড়তে তাড়া করবে!'

—'তা করবে। তোমার জন্যে আমি তিন রাত ঘুমোইনি। আমার ঘুম পেয়েছে। শিগগির বেরোও এখান থেকে।'

চোর ধপাস করে বসে পড়ে আবার কেঁদে ফেলে বললে, 'আমি যাব না। তার চেয়ে আমাকে পুলিশে দিন।'

অটল, পটল ও নকুল তিনজনেই চোরের পিঠে মারলে তিন লাথি।

চোর তখন তাড়াতাড়ি পলায়ন করতে বাধ্য হল।

রাজাবাহাদুর বললে, 'হাতে পেয়ে চোরটাকে ছেড়ে দেওয়া ভালো হল না।'

অটল বললে, 'ভেবে দেখুন রাজাবাহাদুর, ওর মুখে আজকের গল্প শুনলে আর কোনও চোরই কি এ পাড়ায় উঁকি মারতে সাহস করবে?'

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

কেমন করে তোতলামি সারে

নতুন বেহারাটি তোতলা—অসম্ভব রকম তোতলা। সেদিন সকালে অটল তাকে বললে, 'বনমালী—বনমালী!'

বনমালী বলতে চায় 'হুজুর', কিন্তু তার মুখ দিয়ে বেরুল খালি 'হু-হু-হু-হু-হু-হু-হু—!'

পটল বললে, 'থাক বনমালী, থাক। তুমি যা বলতে চাও বুঝেছি। কথা থামিয়ে কাজ করো দেখি। বিশু ময়রার খাবারের দোকান চিনতে পারবে তো?'

বনমালী বলতে চায়, 'পারব', কিন্তু বার-দশেক 'পা' শব্দটি উচ্চারণ করতে গিয়ে অক্ষম হয়ে হতাশ ভাবে কেবল মাথা নেড়েই জানালে—হ্যাঁ।

অটল ও পটল তো হেসেই অস্থির, কিন্তু নকুল একবারও হাসবার চেষ্টা করলে না। বরং তার মুখ দেখলে মনে হয় সে যেন অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছে।

অটল বললে, 'কী হে বনমালী, আবৃত্তি শুনেও তোমার মুখে হাসির চিহ্ন নেই কেন?'

নকুল গম্ভীরভাবে বললে, 'আমি হাসব কেমন করে ভাই? আমি যে ভুক্তভোগী।'

পটল বললে, 'তার মানে?'

নকুল বললে, 'তখন তোমাদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি ছিলুম ভয়ানক তোতলা,—হয়তো বনমালীরও চেয়ে।'

পটল আশ্চর্য হয়ে বললে, 'তোমার তোতলামি সারল কেমন করে হে?'

নকুল বললে, 'সে এক ইতিহাস। শুনতে চাও তো বলতে পারি।'

অটল বললে, 'নিশ্চয়ই শুনতে চাই।'

নকুল আরম্ভ করলে,—

তোতলামির জন্যে জীবনটা আমার ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। বন্ধুদের হাসি-কৌতুক, অপরিচিতদের বিদ্রূপ, এসব ছিল আমার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, কোনও নতুন লোক আমার সঙ্গে কথা কইতে এলেই, আমার মাথায় যেন ভেঙে পড়ত আকাশ।

অবশেষে এক বড়ো ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিতে গেলুম!

ডাক্তার আমাকে শুধোলেন, 'আপনার কী দরকার?'

আমি বললুম, 'আ-আ-আ-আ-আ-আ-আ-আ'

ডাক্তার বললেন, 'কী বলতে চান, বলুন।'

—'আ-আ-আ-আ-আ-আ-আ-আ'

ডাক্তার বললেন, 'বুঝেছি। গান গেয়ে বলুন।'

'গা-গা-গা-গা-গা-গা-গান....?

—'হ্যাঁ, গান গেয়ে।'

আমি হতভম্বের মতন তাকিয়ে রইলুম।

ডাক্তার বললেন, 'প্রায়ই দেখা যায়, যেসব তোতলা মানুষ সাধারণভাবে কোনও কথাই বলতে পারে না, গানের সুরে কথা বলতে তাদের আর বাধা হয় না। আপনি যা বলতে চান, গান গেয়ে আমাকে বলুন।'

আমি গানের সুরে বললুম—

'আমার বিয়ের কথা হচ্ছে, কিন্তু তোতলা বলে কেউ আমাকে পছন্দ করছে না। বড়োই বিপদে পড়েছি ডাক্তারবাবু। আপনি যদি একটা উপায় বাতলে দেন।'

ডাক্তার বললেন, 'বিশেষভাবে কোন কোন কথা আপনার আটকে যায়?'

আমি আবার গান গাইবার উপক্রম করতেই ডাক্তার বাধা দিয়ে বললেন, 'না, আর গান নয়। আপনার বক্তব্য লিখে জানান।'

একখানা কাগজ নিয়ে পেনসিলের সাহায্যে আমি আমার তোতলামির কথা বর্ণনা করলুম।

কাগজখানা পাঠ করে ডাক্তার খানিকক্ষণ গম্ভীরভাবে চিন্তা করলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'বিশেষ শক্ত 'কেস' নয়। এ রকম 'কেস' আমি আরোগ্য করেছি। আপনাকে একটা উপায় বলে দিতে পারি।'

আমি গান গেয়ে বললুম, 'বলুন ডাক্তারবাবু, আমি আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব।'

ডাক্তার বললেন, 'তোতলামি হচ্ছে একটা মানসিক ব্যাধি মাত্র। তোতলারা প্রায়ই মুখচোরা হয়। কথা কইতে গিয়ে ভয় পেয়ে থতোমতো খেয়ে তাদের কথা আটকে যায়। আপনাকে কী করতে হবে শুনুন। প্রতিদিনই আপনি অন্তত তিনজন অচেনা মানুষের কাছে কথা কইবার চেষ্টা করবেন, তা হলেই দেখবেন, দিনে দিনে আপনার কথা কইবার ভয় কমে যাচ্ছে, আর আপনার তোতলামিও কমে যাচ্ছে একটু একটু করে।'

ডাক্তারবাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর হাতে আটটি টাকা গুঁজে দিয়ে, এই নতুন জ্ঞান নিয়ে আমি বাইরে বেরিয়ে পড়লুম।

তখন আমি দেশে থাকতুম। দেশে ফেরবার জন্যে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ট্রেনের কামরায় উঠে বসলুম। ডাক্তার যে উপায় বাতলে দিলেন, সেটা ঠিক আমার মনের মতন হল না। স্বভাবতই আমার প্রকৃতি হচ্ছে লাজুক। চেনা লোকের সঙ্গেই আমি কথা কইতুম খুব কম, আর অচেনা লোক দেখলেই হয়ে যেতুম ঠিক বোবা।

ডাক্তারের উপদেশ মানতে গেলে এই স্বভাবটি আমাকে বদলাতে হবে দেখছি। কঠিন কর্তব্য!

কামরায় আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। কিন্তু গাড়ি যখন ছাড়ে ছাড়ে, হঠাৎ এক মহা লম্বা ও বেজায় ষণ্ডা ভদ্রলোক কামরার ভিতরে এসে উঠলেন। ভাবলুম, এঁকে নিয়েই পরীক্ষা শুরু করা যাক।

কিন্তু মনের ভিতর থেকে কোনও ভরসাই পেলুন না। লোকটির যে-রকম গুন্ডার মতন চেহারা, যদি চটে যায়!

কিন্তু আমার আগেই, ভদ্রলোক বেঞ্চের উপরে বসেই কথা শুরু করলেন, 'কী-কী-কী-কী-কী-রকম মেঘলা দেখছেন! আজ-জ-জ-জ-জ-জল না হয়ে ছা-ছা-ছা-ছা-ছাড়বে না দেখছি।'

বিষম দমে গেলুম, এই তোতলা ভদ্রলোকের কথার উত্তরে যদি আমিও তোতলামি প্রকাশ করি, তাহলে নিশ্চয়ই উনি ভেবে নেবেন আমি ওঁকে ব্যঙ্গ করছি। দরকার নেই বাবা কথা কয়ে! শেষটা কি ঘুসি খেয়ে প্রাণে মারা পড়ব?

কিন্তু আমি জবাব দিলুম না দেখে, ভদ্রলোক বেজায় খাপ্পা হয়ে উঠলেন। ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'কী-কী-কী-কী-কী-রকম লোক আপনি? জ-জ-জ-জ-জবাব দিচ্ছেন না যে ব-ব-ব-ব-বড়ো। কা-কা-কা-কা-কালা? না বো-বো-বো-বাবা?'

বুদ্ধিমানের মতন তখনই ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলুম, সত্যিই আমি কালা ও বোবা।

ভদ্রলোক তখন ঠান্ডা হয়ে দরদ জানিয়ে বললেন, 'আ-আ-আ-আ-হা, কা-কা-কা-কালা বো-বো-বো-বো-বাদের কী-কী-কী-কী-ক-ক-ক-ক-কষ্ট।'

আমাদের দেশে যেতে হলে মাঝে একবার গাড়ি বদলাতে হয়।

যে-স্টেশনে গাড়ি বদল করতে হবে, সেখানে নেমে দেখলুম ট্রেন আসতে তখনও দেরি আছে। প্ল্যাটফর্মের উপরে পায়চারি করতে লাগলুম। তখন মেঘ কেটে গিয়েছে।

আকাশ সুনীল। পায়চারি করতে করতে স্টেশনের বাইরে গিয়ে পড়লুম। রাস্তায় কোনও লোকের সঙ্গে দেখা হল না। জায়গাটি বড়ো নির্জন। কোনও অচেনা লোকেরা সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ না পেয়ে একটু হতাশ হয়ে পড়লুম।

একজায়গায় একখানা বাড়ি দেখলুম। তার ফটকের উপরে লেখা রয়েছে—'পাগলা গারদ'।

আচম্বিতে কোথা থেকে একটি মূর্তির আবির্ভাব হল।

মাথায় তার কোনও প্রতিমা থেকে খুলে নেওয়া পুরোনো একটা মটুক। গায়ে জড়ানো লাল রঙের একখানা গামছা। পরনে হাফপ্যান্ট, পায়ে জরির জুতো। সে মাঝে মাঝে হ্যাফপ্যান্টের পকেটে হাত পুরে দিয়ে আবার বার করে নিয়ে শূন্য হাতেই যেন কী ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে চলেছে। আমাকে দেখেই হাসিমুখে একবার ঘাড় নাড়লে।

যদিও লোকটির সাজপোশাক যুৎসই নয়, তবু আমি স্থির করলুম এর সঙ্গে খানিক আলাপ করলে মন্দ হবে না।

বললুম, 'চ-চ-চ-চ-চমৎকার নীল আকাশ।'

সে বললে, 'আপনার ভালো লেগেছে শুনে সুখী হলুম। আমিই আজ আকাশকে চমৎকার হবার হুকুম দিয়েছি।'

একটু ভড়কে গেলুম। তবু জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনি কী-কী-কী-কী ছ-ছ-ছ-ছ-ছড়াতে ছ-ছ-ছ-ছ ছড়াতে যাচ্ছেন?'

লোকটি একগাল হেসে বললে, 'মোহর। গরিবদের দেখলে আমার দুঃখ হয়, তাই তাদের মুঠো মুঠো মোহর দান করছি।'

আরও বেশি ভড়কে গেলুম। বললুম, 'ও।'

শূন্য হাত মুঠো করে লোকটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'তুমিও একমুঠো মোহর চাও নাকি? এই নাও।'

বললুম, 'ধ-ধ-ধ-ধন্যবাদ। আ-আ-আ-আপতত আ-আ-আ-আমার মোহর দ-দ-দ-দরকার নেই।'

লোকটি এগিয়ে এসে তার হাতের ভিতর আমার হাত নিয়ে বললে, 'আমি হচ্ছি—চিনদেশের সম্রাট। ওই হচ্ছে আমার প্রাসাদ।' বলেই ইঙ্গিতে পাগলা-গারদের বাড়িটা দেখিয়ে দিলে।

বুকটা ধড়াস করে উঠল। বুঝলুম—খুব লোকের পাল্লায় পড়েছি!

চিনসম্রাট আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে স্টেশনের একটা গুদামঘরের সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, 'ঘরটি বেশ নির্জন, না?'

মাথা নেড়ে সায় দিলুম একান্ত নাচারের মতন! এই নির্জনতা ভয়াবহ।

চিনসম্রাট বললেন, 'আমি এখন তোমার সঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে চাই।'

আমি বললুম 'তা-তা-তা-তা-তাই নাকি?'

চিনসম্রাট বললেন, 'হ্যাঁ। নরবলি সম্বন্ধে তোমার মত কী?'

ভয়ে ভয়ে জানালুম, নরবলি আমি মোটেই পছন্দ করি না।

চিনসম্রাট বললেন, 'তোমার পছন্দে-অপছন্দে কিছুই এসে যায় না। কারণ আমি নরবলি পছন্দ করি। আমার রাজ্যে রোজই নরবলি হয়। আজও হবে। এখন ঘরের ভেতরে ঢোকো দেখি।'

নরবলি সম্বন্ধে সম্রাটের উদারতা দেখে আমার সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠল। মনে হল আমার শরীর যেন রোমাঞ্চিত হবার চেষ্টা করছে।

ঘরের ভিতরে গিয়ে সম্রাট বললেন, 'তোমার কাছে একখানা বড়ো ছুরি আছে?'

জানালুম বড়ো বা ছোটো কোনওরকম ছুরিই আমার কাছে নেই।

সম্রাট এতক্ষণের পরে আমার হস্ত ত্যাগ করে বললেন, 'ওইখানে চুপ করে একটু দাঁড়াও, আমি একবার ঘরটা খুঁজে দেখি ছুরি কি কাটারি পাওয়া যায় কি না।'

পরমুহূর্তেই আমি মস্ত এক লাফ মেরে—সম্রাটের অগোচরেই ঘরের বাইরে এসে পড়লুম। তারপর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের দিকে পাঁই পাঁই করে ছুটতে লাগলুম।

তখন ট্রেন এসে পড়েছে। আর-এক লাফে একখানা কামরার ভিতর গিয়ে পড়ে একেবারে বেঞ্চির তলায় ঢুকে অদৃশ্য হবার ব্যবস্থা করলুম।

সেই অবস্থায় বেঞ্চির তলায় উবু হয়ে শুয়ে হাঁফ ছাড়তে ছাড়তে দেখি, কামরার ভিতর এসে ঢুকলেন একটি আধা-বয়সি মহিলা। হাতে ছাতা, খবরের কাগজ ও খানকয়েক কেতাব।

মহিলাটি ডাকলেন, 'কুলি, কুলি, স্টেশনে অত গোলমাল কীসের?'

কুলি বললে, 'গারদ থেকে একটা পাগলা পালিয়েছে।'

'সর্বনাশ!' বলে শিউরে উঠেই মহিলা গাড়ির দরজা দড়াম করে বন্ধ করে দিলেন।

ট্রেন চলতে লাগল, খানিক পরে মহিলাটির দেহের উপরার্ধ একখানা খোলা খবরের কাগজের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এ সুযোগ আমি ছাড়লুম না। অতিশয় নিঃশব্দে একটু একটু করে দেহ সরিয়ে বেঞ্চির তলা থেকে আমি আত্মপ্রকাশ করলুম।

তারপর বেঞ্চির উপর উঠে বসে একটা সুদীর্ঘ আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে 'আঃ' শব্দটি উচ্চারণ করলুম।

যে-কামরাতে এতক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল না, সেখানে হঠাৎ এই মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনেই মহিলাটি এমন ভয়ানক চমকে উঠলেন যে, খবরের কাগজখানা তাঁর হাত থেকে খসে পড়ে গেল। তাঁর মুখ একটা দেখবার মতন অপূর্ব জিনিস।

কিন্তু তিনি একটিও কথা উচ্চারণ করলেন না। যেন একেবারে থ হয়ে গিয়েছেন।

যদিও মেয়েদের সামনে আমি আরও বেশি মুখচোরা হয়ে পড়তুম, তবু স্থির করলুম এঁর সঙ্গে দুই-চারিটা বাক্য-বিনিময় করা উচিত।

কারণ, ডাক্তার ব্যবস্থা দিয়েছেন, প্রতিদিন আমাকে অন্তত তিনজন সম্পূর্ণ-অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা কইতে হবে।

কিন্তু বাক্যালাপ করতে গিয়েই তোতলামির বিপুল বন্যায় আমার কথা বলবার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল।

আমার ভাবভঙ্গি লক্ষ করে, মহিলাটিরও দুই চোখ ক্রমেই বিস্ফারিত হয়ে উঠতে লাগল।

তখন চট করে মনে পড়ে গেল ডাক্তারবাবুর আর একটি উপদেশ। সাধারণ ভাবে কথা কইতে না পারলে গানের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।

আমি গানের খুব মধুর সুরে বললুম, 'দেখছেন আজকের আকাশ কী চমৎকার সুনীল। আজ আর বৃষ্টির ভয় নেই, কী বলেন?'

মহিলাটি কিছুই বললেন না।

কিন্তু তার মুখ হয়ে গেল নীল নদের মতোই নীল। গদির উপরে হেলে পড়ে তিনি সভয়ে দুই চোখ মুদে ফেলে একেবারে যেন আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। বুঝলুম সুরে বা বেসুরে কোনও রকমেই এঁর সঙ্গে কথা চলবে না।

তখন কী আর করি, পকেট থেকে 'থার্মোফ্লাস্ক' বার করে নিয়ে চা পান করতে নিযুক্ত হলুম।

হঠাৎ একটা মোড় ফিরতে গিয়ে ট্রেনখানি বেজায় দুলে উঠল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত থেকে ফ্লাস্কটা নীচে পড়ে গিয়ে ফেটে গেল সশব্দে।

মহিলাটি বিকট চিৎকার করে রবারের মতন উপরদিকে লাফিয়ে উঠলেন। এবং দুই হাতে 'অ্যালার্ম চেন' ধরে দোদুল্যমান হলেন।

প্রথমটা আমি অতিশয় অবাক হয়ে গেলুম, কারণ বসে বসে কোনও মানুষ যে এমন উঁচু লাফ মারতে পারে আগে আমার সে ধারণাই ছিল না।

কিন্তু তারপরই যখন দেখলুম যে চলতি ট্রেন থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং চারিদিকে জাগল অনেক লোকের দ্রুত পায়ের শব্দ, তখন বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ির জানালা দিয়ে করলুম লম্ফ ত্যাগ।

এক পলকেই দেখে নিলুম গাড়ি থেমেছে একটা ময়দানের মাঝখানে, এবং মাইল-খানেক দূরে দেখা যাচ্ছে একটা রীতিমতো বড়ো জঙ্গল। আমি সেই জঙ্গল লক্ষ্য করে দৌড় মারলুম।

দৌড়ের প্রতিযোগিতায় আমার সঙ্গে কেউ পাল্লা দিতে পারত না। স্থির করলুম সেই শক্তির দৌলতেই আজ আমাকে দেহের হাড় ও পিঠের চামড়া রক্ষা করতে হবে।

দৌড়তে দৌড়তে মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখতে পেলুম, দলে দলে লোক আমাকে ধরবার জন্যে নানা দিক থেকে ছুটে আসছে।

তাদের কেউ রেলের কর্মচারী, কেউ গাঁয়ের লোক, কেউ বা চাষা কি রাখাল। অনেকেরই হাতে লাঠি দেখতেও ভুললুম না।

গুনতিতে তারা বোধহয় পঞ্চাশ-ষাট জনের কম হবে না। এত তাড়াতাড়ি কী করে যে এত লোকের টনক নড়ল, সবিস্ময়ে সেই কথা ভাবতে ভাবতে আমি নিজের পায়ের গতি দ্বিগুণ কি ত্রিগুণ বাড়িয়ে দিলুম।

জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়েও বুঝলুম, এই নাছোড়বান্দা জনতা এখনও আমাকে গ্রেপ্তার করবার আশা ছাড়েনি।

একটা বেজায় ঝুপসি বটগাছের উপরে গিয়ে আত্মগোপন করলুম খুব সাবধানে। তারপর রাত যখন দশটা বাজল তখন আবার আমি ভূমিষ্ঠ হলুম।

অটল, এই হচ্ছে আমার ইতিহাস।

অটল বললে, 'কিন্তু তোমার তোতলামি সারল কী করে সে কথা তো বললে না!'

নকুল বললে, 'ঠিক কোন মুহূর্তে আমার এই কণ্ঠদেশের ভিতর থেকে তোতলামির শিকড় নষ্ট হয়ে গেল, তা আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু গভীর রাত্রে বাড়িতে ফিরে এসে সেদিন যখন লোকের কাছে আমার কথা জাহির করলুম— তখন আশ্চর্য হয়ে অনুভব করলুম, আর আমি তোতলা নই। মহা বিপদের এক ধাক্কাতেই তোতলামি আমার গলদেশ ছেড়ে পলায়ন করেছে।

বিশ্বাস করো আর না করো এটা সত্যি কথা।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

কার্তিকপুজোর ভূত

নতুন মেসবাড়ি। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে এখনও ব্যবসাদারির গন্ধ বিকট ভাবে প্রকট হয়ে ওঠেনি। এখনও মাছের ঝোলে আঁশ বা কাঁটার বদলে সত্যিকার মৎস্য পাওয়া যায়, এখনও ডাল বলতে বোঝায় না কেবল ঘোলাটে জল এবং এখনও আলুর দম বা কালিয়ায় তৈলের ব্যবস্থা হয়নি ঘৃতাভাবে।

তেতলায় পাশাপাশি তিনখানা ঘর ভাড়া নিয়ে তিন বন্ধুতে দিব্য আরামে হাত-পা ছড়িয়ে বাস করছিল। তিন বন্ধু অর্থাৎ অটল, পটল ও নকুলের কথা বলছি। কিন্তু একটু গোলমাল বাধল। চাঁদের আলো এবং ফুলের গন্ধের মতন মানুষের সুখ-শান্তিও বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। ভগবানের সৃষ্টি এইসব অসঙ্গতি ও অপূর্ণতা নিয়ে অটল, পটল ও নকুল একসঙ্গে বিলক্ষণ মাথা ঘামিয়েছে, কিন্তু সঙ্গত কারণ খুঁজে পায়নি।—ব্যাপারটা এই।

সেদিন সকালবেলায় মেসের কর্তার ঘরে বসে অটল, পটল ও নকুল চা-পান ও হালুয়া ভক্ষণ করছে, এমন সময়ে একটি নতুন লোকের আবির্ভাব।

লোকটির মাথায় বাবরি-কাটা চকচকে চুল, গোঁফটির দুই প্রান্ত সুচারুরূপে পাকানো, গায়ের পাতলা ফিনফিনে পাঞ্জাবির তলা থেকে রাঙা গেঞ্জির রং ফুটে বেরুচ্ছে, পায়েও রঙিন মোজা ও বাহারি জুতো। কিন্তু বেচারার শৌখিনতা প্রকাশের এত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে একটিমাত্র কারণে। তার ডান চোখটি কানা!

কিন্তু তার সেই একটিমাত্র চক্ষু যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি চটুল ও চটপটে। ঘরে ঢুকেই বোধহয় আধ-সেকেন্ডের মধ্যেই সেখানে বিরাজমান চার মূর্তির আপাদমস্তক সে ভালো করে দেখে নিলে।

মেসের কর্তা শুধোলে, 'মশাই কী চান?'

—'আমার নাম ননিনাথ নাগ। এই মেসে বাসা বাঁধতে চাই। এখানে আগেও একবার বাসা বেঁধেছিলুম।'

—'তা কী করে হবে? আমার এ মেসের জন্ম হয়েছে মোটে এক মাস।'

—'তা হতে পারে। কিন্তু এখানে আগেও একটি মেস ছিল, তার মৃত্যু হয়েছে তিন বৎসর।'

—'ও, বটে, বটে? এ খবরটা আমি জানতুম না।'

—'মশাই তাহলে নতুন মালিক? বেশ, বেশ! বলি, এখানে একখানা ঘর-টর খালি পাওয়া যাবে?'

—'দোতলার সব ঘর ভরতি। তেতলায় একখানা ঘর খালি আছে—'

ননি একেবারে আঁতকে উঠে একটিমাত্র চক্ষুকে দুইগুণ বাড়িয়ে তুলে বললে, 'ওরে বাপ রে, তেতলায়? অসম্ভব!'

—'অসম্ভব? কী অসম্ভব?'

—'তেতলায় থাকা।'

—'কেন?'

—'আগে এখানকার তেতলায় কেউ থাকত না। অর্থাৎ থাকতে চাইত না।'

—'কেন?'

—'আগে তেতলায় ওঠবার সিঁড়ির দরজায় লাগানো থাকত তালা-চাবি।'

—'কেন মশাই, কেন?'

—'আগে সন্ধের পর কেউ এখানে তেতলার নাম পর্যন্ত মুখে আনত না।'

—'আরে মশাই,—কেন, কেন কেন? নিজের মনে খালি বক-বকই করে যাচ্ছেন, আসল কথা বলবার নাম নেই।'

ননি মালিকের মুখের খুব কাছে মুখ নিয়ে এসে একটিমাত্র চক্ষু মুদে বললে, 'নিতান্তই শুনবেন তাহলে?'

—'নিশ্চয় শুনব। আলবত শুনব। না শুনে আপনাকে ছাড়ব না। এমন খাসা তেতলার চারিদিক-খোলা ঘর, কেন এখানে কেউ থাকত না?'

ননি কণ্ঠস্বর নামিয়ে, অদ্বিতীয় চক্ষুটিকে প্রাণপণে বিস্ফারিত করে বললে, 'আজ্ঞে, তেতলায় যে একজন আছেন।'

অটল চায়ের পেয়ালা নামিয়ে এতক্ষণ পরে বললে, 'একজন আছেন মানে?'

পটল বললে, 'কে বলে একজন? আমরা হচ্ছি তিনজন।'

নকুল বললে, 'হ্যাঁ, তিনখানা ঘরে আছি আমরা তিনজন।'

ননি হতাশভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 'ভালো কাজ করেননি।'

মালিক খাপ্পা হয়ে বললে, 'এসব কথার মানে? আপনি কি আমার মেসের লোক ভাঙাতে এসেছেন?'

—'তাতে আমার লাভ?'

—'তবে এত বাজে বকছেন কেন?'

—'বেশ মশাই, আমি আর কিছু বলতে চাই না। একতলার কোনও ঘর যদি খালি থাকে তো বলুন। না থাকে, পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে ধুলো-পায়েই প্রস্থান করব।'

—'একতলার তিনখানা ঘর খালি আছে, আপনি যেটা খুশি নিতে পারেন।'

অটল বললে, 'কিন্তু মহাশয়, আপনি আমাদের কৌতূহল জাগ্রত করেছেন। আমাদের কৌতূহল আবার যতক্ষণ না নিদ্রিত হয়, ততক্ষণ আপনাকে এইখানেই বন্দি হয়ে থাকতে হবে।'

পটল বললে, 'তেতলা আপাতত আমাদের অধিকারে। সুতরাং আসল কথা জানবার অধিকার আমাদের আছে।'

নকুল মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 'তেতলায় একজন আছেন মানে কী?'

ননি একখানা 'মোড়া' টেনে নিয়ে বসে পড়ে নাচার ভাবে বললে, 'তবে সব কথাই শুনুন মশাই। এই মেসবাড়ির তেতলায় বাস করেন গদাধর গাঙ্গুলি।'

মালিক বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'আপনি কি পাগল?'

অটলও বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'গদাধর গাঙ্গুলি! তিনি থাকেন তেতলায়, অথচ আমরা কেউ জানি না। আমাদের তিন জোড়া চোখ কি অন্ধ?'

ননি বললে, 'লক্ষ জোড়া চর্মচক্ষু থাকলে গদাধর গাঙ্গুলিকে দেখা যায় না। তিনি অশরীরী।'

পটল ও নকুল চমকে উঠে বললে, 'কী বললেন?'

—'তিনি অশরীরী। আহা, একদা তিনিও শরীরী ছিলেন। তিন বছর আগে আমি যখন এই মেসে ছিলুম, তার কিছু আগেই তিনি শরীর ত্যাগ করেছেন।'

অটল, পটল ও নকুলের দেহ রীতিমতো রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

মালিক হতভম্বের মতন কেবল বললে, 'মানে?'

ননি বললে, 'মানে হচ্ছে এই। আমি এই মেসে আসবার কিছুকাল আগে, তেতলার একটি ঘরে দাঁড়িয়ে বা বসে বা শুয়ে গদাধর গাঙ্গুলি নামে একটি ভদ্রলোক আফিম খেয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন।'

মালিক বললে, 'এতক্ষণ পরে তবু কিছু হদিস পাওয়া গেল। তারপর?'

—'তারপর কিন্তু দেহত্যাগ করেও গদাধরবাবু এই মেসের তেতলার ঘরের মায়া ত্যাগ করতে পারেননি। অনেকেই তাঁকে তেতলার ছাদে বেড়িয়ে বেড়াতে দেখেছে—এমনকি তাঁর শখের গান গাইতে শুনেছে।'

—'শখের গান?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আমিও দোতলা থেকে তাঁর শখের গানটি শুনেছি।'

—'সেই শখের গানটি কী?'

ননি সুরে বললে—

'বাজে তালি, বাজে ধামা।
ওরে যদু! আরে মধু!
শোন গাই সা-রে-গা-মা!

ধেড়ে-কেটে, তেড়ে-কেটে—লেগে যায় তাক।
মোর গীতে ভেঙে যায় দুনিয়ার জাঁক।
দীপকের তা-না-না-না,
শুনে যাও মামি-মামা!
গিটকিরি শুনে ডেকে ওড়ে কাক-চিল,
উৎসাহে নিধু মারে যাকে-তাকে কিল।
ছোটে গাধা, ছোটে ধোপা,
ছোটে খোকা দিয়ে হামা।'

মালিক অভিভূতের মতন বললে, 'আহা, কী গান! শুনলে অশ্রুবর্ষণ করা অনিবার্য।'

অটল করুণভাবে বললে, 'নিশ্চয়। আমারও পাষণ্ড চক্ষু সজল হবার চেষ্টা করছে। কারণ আমি ওই তেতলাতেই থাকি।'

পটল সায় দিয়ে বললে, 'আমারও ওই অবস্থা—যদিও এখনও গদাধরবাবুর নিজের মুখের গান শোনবার সৌভাগ্য হয়নি।'

নকুল ম্রিয়মান ভাবে বললে, 'বোধহয় তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, আমরা রাত দশটা বাজবার আগেই ঘুমিয়ে পড়ি।'

ননি বললে, 'ঠিক আন্দাজ করেছেন। যাঁরা পৃথিবীর দেহ ত্যাগ করেও পৃথিবীতে বাস করেন, রাত বারোটা বাজবার আগে তাঁদের দেখা পাওয়া অসম্ভব।'

অটল বললে, 'তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি কিছুমাত্র ব্যাকুল নই।'

ননি বললে, 'ব্যাকুল না হতে পারেন, কিন্তু আমি শুনেছি, গদাধরবাবু প্রতি বৎসরে এক দিন পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে জোর করে আলাপ করবার চেষ্টা করেন। সেদিন নাকি ইচ্ছা করলেই সবাই তাঁকে দেখতে পায়।'

মালিক বললে, 'মানে?'

—'গদাধরবাবু প্রতি বৎসরে এক রাত্রে তাঁর বাৎসরিক কর্তব্যপালন করতে আসে।'

—'মানে?'

—'যে তারিখে তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন, প্রতি বৎসরে ঠিক সেই তারিখেই গদাধরবাবু আবার চর্মচক্ষুগোচর দেহ ধারণ করেন। আবার আফিম খান। আবার আর্তনাদ করেন। এবং তারপর আবার মরেও মারা পড়েন।'

মালিক বললেন, 'রাত বারোটার পরে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'রাত বারোটার পরে কলকাতার কোনও আফিমের দোকান খোলা থাকে না।'

—'মশাই, এসব হচ্ছে পরলোকের কথা। পরলোকে কোন দোকান কখন বন্ধ হয়, আমি তা কেমন করে বলব? ইহলোকের সমস্ত আমার নখদর্পণে— কোন পাড়ায় ক-টা গাঁজা-আফিমের দোকান আছে তাও বলে দিতে পারি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরলোক সম্বন্ধে আমার কোনও অভিজ্ঞতাই নেই।'

মালিক ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, 'এইসব গাঁজাখুরি গল্প বলে আপনি কি আমার মেসবাড়ির দরজা বন্ধ করতে এসেছেন?'

ননিও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'গাঁজা? আমি ভদ্রলোক। গাঁজার দোকানের ঠিকানা জানি বটে, কিন্তু গাঁজা কাকে বলে জানি না। আমি এসেছি মেসের একখানি ঘর নিতে। একতলায় একখানি ঘর পেলেই আমি খুশি হব।'

মালিক উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'চলুন। কিন্তু আপনাকে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আমি আগাম টাকা চাই।'

ননি বললে, 'তাই নিন না। এ বাড়ির তেতলার ঘর ছাড়া আর সব ঘরেই যেতে আমি প্রস্তুত। বিশেষ আজকের রাত্রে।'

মালিক বললেন, 'আজকের রাত্রে? মানে?'

ননি বললে, 'গদাধরবাবু মরদেহ ত্যাগ করেন নাকি কার্তিকপুজোর রাত্রে। তিনি বাৎসরিক ব্রত পালন—অর্থাৎ আবার আফিম খেয়ে দেহত্যাগ করতে আসেন ঠিক সেই রাত্রেই। এটা তাঁর কী খেয়াল জানি না, কিন্তু শুনেছি, কার্তিকপুজোর রাত্রে তিনি আবার একবার দেহত্যাগ করবার অভিনয় না করে থাকতে পারেন না। অনেকটা সাপের খোলস ত্যাগের মতনই আর কী! ‑চলুন মশাই, এসব বাজে কথা থাক। একতলায় আমাকে একখানা ঘর দেখিয়ে দিয়ে আসবেন চলুন।'

ননিকে নিয়ে মালিক প্রস্থান করলে।

অটল কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে শিস দিতে দিতে হঠাৎ থেমে বললে, 'আজই কার্তিক-পুজো।'

পটল দুঃস্বপ্নাভিভূতের মতন বললে, 'কিন্তু গদাধরবাবু যে কোন ঘরে দাঁড়িয়ে বা বসে বা শুয়ে আফিম খেয়ে তাঁর বাৎসরিক ব্রত পালন করেন সে কথা তো জিজ্ঞাসা করা হল না।'

অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে নকুল বললে, 'জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই। যতটুকু শুনেছি, তাই-ই যথেষ্ট। আজ যদি সৌভাগ্যক্রমে গদাধরবাবুর সঙ্গে দেখা না হয়, তাহলে কালকেই এ বাসাকে নমস্কার করে সরে পড়ব।'

অটল ও পটল একসঙ্গে দৃঢ় প্রতিজ্ঞের মতন বললে, 'হ্যাঁ।'

সে-রাত্রে অটল, পটল ও নকুল এক-এক খানা ঘরে একলা থাকা যুক্তিসঙ্গত বা নিরাপদ বলে মনে করলে না। পটল ও নকুল আপন আপন ঘর ত্যাগ করে এসে অটলের বিছানার ডান বা বাম পাশে নিজেদের বিছানা পেতে নিলে!

গদাধরবাবুকে বাধা দেবার জন্যে অটল ঘরের সমস্ত দরজা-জানলা ভালো করে বন্ধ করে দিতে লাগল।

পটল বললে, 'অটল, ননির কাহিনি বিশ্বাস করলে বলতে হয়, গদাধরবাবু হচ্ছেন সূক্ষ্মদেহধারী। সূক্ষ্মদেহের একটা মস্ত সুবিধা এই যে, ইট-কাঠ-পাথরও ভেদ করে আনাগোনা করা যায়।'

নকুল বললে, 'পটল, স্তব্ধ হও। সাবধানের মার নেই।'

নিজের বিছানার উপরে এসে বসে অটল বললে, 'ঘড়িতে দেখছি রাত দশটা বাজে। ঘুমোবার সময় হল। কিন্তু আজ আমরা কী করব? ঘুমব? না গদাধরের আগমন-প্রতীক্ষা করব?'

নকুল হাই তুলে বললে, 'রাত বারোটা পর্যন্ত জেগে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। মারাত্মক বললেও চলে।'

পটল লেপের ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, 'আমারও ওই মত। গদাধরবাবুর বাৎসরিক অভিনয় দেখবার ইচ্ছা আমার নেই। আমি ঘুমিয়ে তাঁকে ফাঁকি দিতে চাই।'

অটল বললে, 'আমার বিশ্বাস, গদাধরবাবুর কথা হচ্ছে রীতিমতো উপকথা। উপদেবতার কথা মাত্রই উপকথা। সুতরাং অকারণে জেগে থেকে আত্মাকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। আলো নেবাও—ঘুমিয়ে পড়ো।'

...মিনিট-পাঁচেক পরেই তিনটি তন্দ্রা-পুলকিত নাসা-যন্ত্রের প্রচণ্ড ঘড়র-ঘড়র-মন্ত্রে একান্ত সন্ত্রস্ত হয়ে দেওয়ালবাসী টিকটিকিরা পর্যন্ত 'ভেন্টিলেটারে'র ভিতর দিয়ে বাইরে পলায়ন করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তারা এতদিন এক অটলের নাসিকা-ধ্বনিকে কোনওক্রমে সহ্য করে ছিল। কিন্তু একসঙ্গে অটল-পটল-নকুলের তর্জনগর্জনময় নাসা-ভাষা! এ হচ্ছে দস্তুরমতন মেছোহাটার কোলাহল! যে-কোনও জীবের পক্ষেই সহ্য করা অসম্ভব।

কার্তিক মাসের শেষ তারিখের ভিজে হিমেল হাওয়া। কনকন কনকন! অটলের ঘুম গেল ছুটে। ধড়মড় করে উঠে বসে সে বলে উঠল, 'ওরে বাপ রে বাপ! কী ঠান্ডা!'

সবচেয়ে-বেশি শীত-কাতুরে নকুল এর আগেই জেগে উঠেছিল। সে লেপের মাঝখানে ঢুকে গিয়ে ঘুম-জড়ানো স্বরে বললে, 'আমার মনে হচ্ছে, আমি 'এভারেস্টে'র সর্বোচ্চ শিখরের উপরে আরোহণ করে আছাড় খেয়েছি।'

পটল বাক্যব্যয় করলে না। এপাশ থেকে ওপাশে ফিরে শুল।

অটল বললে,—বিস্মিত, হতভম্ব স্বরেই বললে, 'কিন্তু হাওয়া আসে কোত্থেকে? আমি নিজের হাতেই সব জানলা বন্ধ করে দিয়েছি।'

নকুল একটিমাত্র চক্ষু উন্মোচন করে বললে, 'শার্সিহীন পুরনো জানলা, আলগা ছিটকিনি—হয়তো জোর-হাওয়া লাগলেই খুলে যায়।'

—'হতে পারে। কিন্তু এর আগে ওই উত্তুরে জানলাটা এমন অসময়ে আর কখনও খুলে যায়নি'—এমনি গজ গজ করতে করতে উঠে দাঁড়িয়ে অটল সশব্দে আবার জানালাটা বন্ধ করে দিল।...

তারপর পুনর্বার ত্রিনাসিকা মুখর হয়ে উঠল... এবং খানিক পরে আবার ভালো করে ঘুমোতে না ঘুমোতেই ভেঙে গেল তাদের ঘুম। সেই ঠান্ডা হাড়-কাঁপানো বাতাস। উত্তরের জানলাটা আবার খুলে গিয়েছে।

অটল চিন্তিত ভাবে বললে, 'ব্যাপারটা ভালো বলে বোধ হচ্ছে না।'

পটল বললে, 'রীতিমতো সন্দেহজনক। জানলার এমন ব্যবহারের কল্পনা করা যায় না। ...নকুল, উঠে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে এসো তো?'

নকুল দৃঢ় কণ্ঠে বললে, 'লেপের বাইরে যাবার ইচ্ছে আমার নেই।'

অটল বললে, 'নকুল, তুমি দেখছি মহা কাপুরুষ! একটা জানলা বন্ধ করবার সাহসও তোমার নেই? রাবিস।' সে শয্যাত্যাগ করবার উপক্রম করছে, এমন সময়ে গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে রাত বারোটা বাজল।

নকুল শীতার্ত কণ্ঠে বললে, 'বারোটা!'

পটল ম্রিয়মান স্বরে বললে, 'প্রেত-নগরের সিংহদ্বার এইবারে খুলে গেল।'

অটল জানলা বন্ধ করবার জন্যে আর শয্যাত্যাগ করবার চেষ্টা করলে না। ঝাঁ ঝাঁ রাতে ডাকছে খালি ঝিঁঝি পোকারা। শহরের আর সব শব্দই যে ভয়ে চুপ মেরে গিয়েছে। কিন্তু নীরবতার বক্ষ ভেদ করে একটা সুর শোনা যাচ্ছে না?'

সুরটা আরও একটু স্পষ্ট হয়ে উঠল। কে যেন বাইরে ছাদের কোণ থেকে গুন গুন করে গাইছে—

'বাজে তালি, বাজে ধামা!
ওরে যদু! আরে মধু!
শোন গাই সা-রে-গা-মা!'

অটল আড়ষ্ট ভাবে বললে, 'ইস, এ-যে গদাধরবাবুর গান!'

পটল বললে, 'নকুল, ভাই আমার। চটপট জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে এসো তো।'

নকুল বললে, 'পাগল! গদাধরবাবু এসে আমাকে টানাটানি করলেও আমি আর লেপের ভেতর থেকে বেরুব না।'

গান থামল। ছাদের উপরে শোনা গেল কার পায়ের শব্দ।

অটল ক্ষীণ স্বরে বললে, 'আমার মনে হচ্ছে, গদাধরবাবু এই ঘরে এসেই আফিম খেতে চান।'

পটল আর নকুল একেবারে বোবা হয়ে গেল,—বোধহয় তারা ভাবলে, বোবার শত্রু নেই।

পায়ের শব্দ থেমে গেল। খানিকক্ষণ সব নিঃসাড়। তারপরই একটা নতুন-রকম ভয়াবহ শব্দ—ঠক ঠক, ঠক! শব্দ হচ্ছে ঘরের ভিতরেই—পূর্ব দিকে! এ যেন মাংসহীন অস্থিসার পায়ের শব্দ!

অটলের মাথার চুলগুলো তখন খাড়া হয়ে উঠেছে এবং দেহ হয়েছে অসম্ভব-রকম রোমাঞ্চিত। তবু সে বালিশের তলা থেকে দেশলাই বার করে একটা কাঠি না জ্বেলে থাকতে পারলে না।

ঘরের কোথাও কেউ নেই। পটল আর নকুল দুজনেই লেপের তলায় অদৃশ্য।

দেশলাইয়ের কাঠি নিবে গেল। তারপর আবার ঘরের ভিতরে শব্দ হল—ঠক, ঠক ঠক! ঠক ঠকাঠক, ঠকাঠক, ঠকাঠক!

শীতেও ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে অটল ভাবতে লাগল, অতঃপর কী করা উচিত?....হঠাৎ তার মনে পড়ল প্রেততত্ত্ববিদদের কথা। প্রেতেরা নাকি প্রায়ই শব্দের সাহায্যে মনের ভাব ব্যক্ত করে। গদাধরবাবুও কি শব্দ করে কোনও কথা বলতে চাইছেন?

অত্যন্ত কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে অটল বললে, 'এ ঘরে যদি কেউ এসে থাকেন, তাহলে দয়া করে শুনুন। আমি প্রশ্ন করি, আপনি উত্তর দিন। আমার প্রশ্নের উত্তরে একবার শব্দ হলে বুঝব—'হ্যাঁ', আর দু-বার শব্দ হলে বুঝব—'না'।'

ঠক, ঠক, ঠক, ঠক, ঠক, ঠক!

—'মশাই, অতবেশি শব্দ করে ভয় দেখালে মারা পড়ব। শুনুন। আপনি গদাধরবাবু?'

একবার শব্দ হল—ঠক! অর্থাৎ—'হ্যাঁ'।

—'আপনি কি বেঁচে আছেন?'

দু-বার শব্দ হল—ঠক, ঠক! অর্থাৎ—'না'।

দুই হাতে চেপে নিজের হৃৎকম্প থামবার চেষ্টা করে অটল বললে, 'আপনি কি এখানে আফিম খেতে এসেছেন?'

—ঠক। 'হ্যাঁ'।

—'আপনি কি আজ আফিম না খেয়ে থাকতে পারবেন না?'

—ঠক, ঠক। 'না'।

—'আমরা এখানে থাকলে আপনি কি রাগ করবেন?'

—ঠক। 'হ্যাঁ'।

—'আপনি নিশ্চয় আমাদের আক্রমণ করতে চান না?'

—ঠক। 'হ্যাঁ'।

পরমুহূর্তেই অটলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল হাতা-পা-ওয়ালা মস্ত একটা দেহ। অটল বিছানা থেকে ছিটকে মেঝেয় গিয়ে পড়ে হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল! এবং তার পর-মুহূর্তেই পটল বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে বাপ রে, গদাধর আমার ঘাড়ে চেপেছে রে!'

তারপরেই দড়াম করে খুলে গেল ঘরের দরজা এবং সেই অবস্থাতেই অটল বেশ বুঝতে পারলে যে, পটল ও নকুল চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে দুম-দাম শব্দে ছাদের উপর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, সে-ও তৎক্ষণাৎ গদাধরবাবুকে ফাঁকি দিয়ে শুয়ে-শুয়েই সরীসৃপের মতন সড়াৎ করে দরজার কাছে সরে গেল, তারপর উঠেই বাইরের ছাদের দিকে মারলে এক লম্বা লাফ!

অটল, পটল আর নকুল হুড়মুড় করে সিঁড়ি ভেঙে দোতলার বারান্দার উপর নেমে দেখলে, এত রাতে সাত-পাড়া কাঁপানো গোলমাল শুনে মেসের সমস্ত লোক এসে জড়ো হয়েছে। সকলেরই ব্যস্ত কণ্ঠে একই জিজ্ঞাসা—ব্যাপার কী, ব্যাপার কী?

বারান্দার উপরে তিন জোড়া পা ছড়িয়ে বসে পড়ে তিন মূর্তি হাঁপাতে লাগল তিনটে হাপরের মতন। মেসের মালিক শুধোলেন, 'ও অটলবাবু, কী হয়েছে বলুন না!'

অটল বাধো বাধো গলায় বললে, 'গদাধরবাবু আমার ওপরে লাফিয়ে পড়েছিলেন।'

পটল বললে, 'না অটল। ভয়ের চোটে তোমার ওপরে ঝাঁপ খেয়েছিলুম আমিই। আর গদাধরবাবু লাফ মেরেছিলেন আমার পিঠের উপরেই। আমার প্রতি তাঁর এই অন্যায় পক্ষপাতিত্বর মানে হয় না।'

নকুল বললে, 'না পটল। পালাতে গিয়ে তোমার ওপরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলুম আমিই। অন্ধকারে তুমি বুঝতে পারোনি।'

মালিক অস্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হা হা করে হেসে বললে, 'এরই নাম রজ্জুতে সর্পভ্রম! গদাধরবাবু হচ্ছেন গাঁজাখুরি গল্পের নায়ক। যান মশাই, যে-যার ঘরে যান। মিথ্যেই আমাদের ঘুম ভাঙালেন।'

অটল প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বললে, 'মাপ করতে হল মাশাই! কে ঘরে যাবে? সেখানে গদাধরবাবু এতক্ষণে হয়তো আফিম গুলতে শুরু করেছেন।'

মালিক বিপুল বিস্ময়ে বললে, 'মানে?'

অটল বললে, 'হতে পারে দুরাত্মা পটল নির্বোধের মতন আমার ওপর ঝাঁপ খেয়েছিল, কিন্তু—'

পটল বললে, 'হতে পারে কাপুরুষ নকুল ভয়ে দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে আমার ওপরে হোঁচট খেয়েছিল, কিন্তু—'

নকুল বললে, 'কিন্তু আমাদের এই ভ্রমের দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, তেতলায় গদাধরবাবু নেই। কারণ আমরা সবাই স্বকর্ণে তাঁর মার্কা-মারা গান, তাঁর পায়ের শব্দ আর ঠকঠক ভাষায় তাঁর কথা শুনেছি।'

মালিক মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'তাই তো, শুনেছেন নাকি?'

অটল বললে, 'নিশ্চয়! শুনেছি বলেই তো ভয় পেয়েছি।'

মেসের আর কেউ ননির গল্প শোনেনি। সকলের কণ্ঠে একই প্রশ্ন জাগল—গদাধরবাবু কে?

মালিকের ইচ্ছা নয় যে, গদাধরবাবুর কাহিনি আর কারুর কর্ণগোচর হয়। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'গদাধরবাবু হচ্ছেন আমার পিসেমশাই, তাঁকে নিয়ে আপনাদের কারুর মাথা ঘামাবার দরকার নেই। অটলবাবু, পটলবাবু, নকুলবাবু! আপনারা আমার ঘরেই আসুন। পিসেমশাই এত রাতে আপনাদের ঘরে অনধিকার প্রবেশ করেছিলেন বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আফিমের মৌতাত মাথায় চড়লে পিসেমশাইয়ের আর কোনও জ্ঞান থাকে না,—আরে ছোঃ!'

সকালের আলো দেখে তাদের পলাতক সাহস আবার প্রত্যাগমন করলে। মেসের মালিককে নিয়ে অটল নিজের ঘরে এসে ঢুকল, পটল এবং নকুলও গেল নিজের নিজের ঘরে! বলা বাহুল্য, বাৎসরিক ব্রত পালন করে গদাধরও তখন অদৃশ্য হয়েছে।

অটল কৌতূহলী ভাবে ঘরের এদিকে-ওদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করছে, এমন সময়ে পটল ঝড়ের মতন ছুটে এসে বললে, 'সর্বনাশ হয়েছে! আমার দরজার তালা ভাঙা, ট্রাঙ্কের তালা ভাঙা! আমার দশখানা দশ টাকার নোট চুরি গিয়েছে।'

তারপরে—প্রায় তার পিছনে-পিছনেই ছুটে এসে নকুলও সমাচার দিলে, তার বাক্সের ভিতর থেকে উধাও হয়েছে একশো পনেরো টাকা আট আনা।

অটল চমকে উঠে তাড়াতাড়ি বিছানার উপরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তার চাবির

তোড়া থাকত মাথার বালিশের নীচে। বালিশ তুলে দেখা গেল, চাবি নেই—কিন্তু একখানা চিঠি আছে।

চিঠিখানা এই:

'অটল-পটল-নকুলবাবু,—

কাল সকালে গদাধর-কাহিনি বলে আমি বেশ একটি ভৌতিক আবহ সৃষ্টি করেছিলুম—নয়? তারপর সেই আবহ রাত্রে ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল দুই-দুই বার খোলা জানলা দেখে,—কী বলেন?

কিন্তু একটু কম-ভিতু হলে আপনারা অনায়াসেই অনুমান করতে পারতেন যে, বাহির থেকে অনায়াসেই খড়খড়ির পাখি তুলে হাত দিয়ে ছিটকিনি সরিয়ে জানলা খোলা যায়।

এ ঘরের 'ভেন্টিলেটারে'র ছ্যাঁদা বড়ো হওয়াতে আমার ভারী সুবিধা হয়েছে। ওই পূর্ব দিকের মাঝের জানলার উপরকার 'ভেন্টিলেটারে'র ফাঁক দিয়ে 'টোন-সুতোর ডগায় একখণ্ড নুড়ি বেঁধে বাহির থেকে আমি ঘরের ভিতরে ঝুলিয়ে দিয়েছিলুম, আর সুতোর অন্য প্রান্ত ছিল আমার হাতে। এই হচ্ছে ঠক ঠক আওয়াজের গুপ্ত কারণ! বাহির থেকে কান পেতে আমিই সুতোয় টান মেরে অটলবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি।

গদাধরবাবুর গানটি এই অধীনেরই রচনা। ওটি কোনও মাসিকপত্রে ছাপিয়ে দিতে পারবেন?

আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আপনাদের তেতলা থেকে তাড়ানো। কেন, তা বলা বাহুল্য।

আর বোধহয় মহাশয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না--বিদায়।

ইতি—

আপনাদের শ্রীননি

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

দেড়-ডজন জাহাজি-গোরা

কার্তিকপুজোর ভূতের ব্যাপারের পর কিছুকাল কেটে গেল বেশ নির্বিঘ্নে।

মেসবাড়ির অন্যান্য লোকগুলি ছিল অত্যন্ত নিরীহ, গোবেচারি। কেউ সরকারি আপিসে, কেউ সওদাগরি আপিসে, কেউ-বা রেল আপিসে ছোটোখাটো চাকরি করে। সকালে উঠে তাড়াতাড়ি নাকে-মুখে দু-চারটে ভাত গুঁজে ছুটে আপিসে বেরিয়ে যায়, তারপর সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর সন্ধ্যা বা সন্ধ্যার পরে বাড়ি ফিরে এসে বেশ খানিকক্ষণ ধুঁকতে থাকে; তখন তারা আর দুনিয়ার কোনও খবর নিয়েই বিশেষ মাথা ঘামাতে চায় না বা পারে না।

হঠাৎ একদিন এই ভেড়ার দলে সিংহের মতন এসে পড়ল একটি নতুন লোক। নাম তার নন্দলাল। মাথায় সে সাড়ে-ছয় ফুট উঁচু এবং চওড়াতেও তার বপুখানি রীতিমতো

দেখবার মতন। সে কথা কয় জোরে জোরে, দুই হাত নাড়ে জোরে জোরে, মাটির উপর পা ফেলে জোরে জোরে। তাকে দেখলে প্রথমেই মনে জাগে কেমন-একটা আতঙ্ক! কালো রঙের উপরে তার মুখে ঝাঁটার মতন গোঁফ, আর দরোয়ানের মতন গালপাট্টা দেখলে মনের আতঙ্ক আরও বাড়ে বই কমে না। তার মাথার চুলগুলো বুরুশ-চিরুনির সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে সর্বদাই হয়ে থাকত বিশৃঙ্খল এবং শজারুর পৃষ্ঠদেশের মতন কণ্টকিত।

হপ্তা-খানেকের মধ্যেই তার স্বভাবেরও যেটুকু নমুনা পাওয়া গেল তা বড়ো সুবিধাজনক নয়। বিপজ্জনকই বলা উচিত।

মেসের খাবারঘরে বসে অটল, পটল আর নকুল দক্ষিণ-হস্তের কর্তব্য সম্পাদন করছে, এমন সময় নন্দ সেই ঘরে ঢুকে বললে, 'ঠাকুর, আমাকে খাবার দাও।'

ঠাকুর বললে, 'আজ্ঞে, বসুন।'

নন্দ অনেকখানি জায়গা জুড়ে ভালো করে জাঁকিয়ে বসে বললে, 'ঠাকুর, আজ দেখলুম না তোমাদের মস্তবড়ো একটা রুইমাছ এসেছে?'

ঠাকুর বললে, 'হ্যাঁ বাবু, আজকের মাছটা খুব বড়ো।'

নন্দ বললে, 'মাছের মুড়ো দিয়ে কী রাঁধছ বাপু?'

ঠাকুর বললে, 'আজ্ঞে, মুড়োটা কালিয়ায় দিয়েছি। পটলবাবু বেশি দাম দিয়ে খেতে চান।'

নন্দ বললে, 'পটলবাবু আবার কে?'

পাচক পটলকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, 'ওই যে, পটলবাবু বসে আছেন।'

পটলের দিকে তাকিয়েই নন্দ হা হা হা হা করে, ঘর-ফাটানো অট্টহাসি হেসে উঠল। তারপর অত্যন্ত অবহেলা-ভরে বললে, 'আরে রাম, রাম, ওই তো তালপাতার সেপাই, অতবড়ো মুড়ো ও-দেহে সহ্য হবে কেন? আমি বেশি দামও দিতে পারি, একটা সের-তিনেক মাছ হজমও করতে পারি, মুড়োটা আমায় দিয়ো।'

পাচক দ্বিধাভরে পটলের মুখের পানে তাকালে।

পটলের মুখ তখন রাগে লাল হয়ে উঠেছে। ক্রুদ্ধস্বরে সে বললে, 'ঠাকুর, ও মুড়ো আমার। এখনই আমার পাতে দিয়ে যাও।'

নন্দ চিৎকার করে বললে, 'কী মশাই, মুড়োটা কি আপনি গায়ের জোড়ে কেড়ে নিতে চান? তাহলে জেনে রাখুন, এর আগেও কেউ কেউ আমার সামনে দাঁড়িয়ে গায়ের জোরের বড়াই করেছে! কিন্তু তার ফলে তাদের কোথায় যেতে হয়েছে জানেন? হাসপাতালে মশাই, হাসপাতালে।'

নকুল নন্দের দেহের দিকে তাকিয়ে পটলের কানে কানে বললে, 'চেপে যাও ভাই, চেপে যাও! ও মুড়ো চুলোয় যাক।'

পটল চেপেই গেল।

এমনি ব্যাপার হামেশাই হতে লাগল। রান্নাঘরের যা-কিছু ভালো খাবার সবই গিয়ে হাজির হয় নন্দের থালায়। মেসবাড়ির মালিকও নন্দকে ভয় করতে লাগলেন যমদূতের মতন। আপিসের কেরানি-বেচারা তো নন্দের দিকে ভয়ে মুখ তুলে তাকাতেই পারে না। সমস্ত মেসবাড়ির ভিতরে একমাত্র প্রভু ও ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য হয়ে উঠল নন্দলালই।

একদিন সন্ধেবেলায় অটল বাজাচ্ছে হারমোনিয়ম, পটল নিয়েছে তবলার ভার এবং নকুল গাইছে থিয়েটারি আবু হোসেনের একটি গান। সেদিন অটল ও পটল ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়ে কিছু টাকা হস্তগত করেছিল, গান-বাজনার দ্বারা সেই আনন্দকেই তারা স্মরণীয় করে তুলতে চায়। তাদের দলে একমাত্র গায়ক ছিল নকুল, বাংলা থিয়েটারের সব গানই তার প্রায় মুখস্থ।

নকুল গানের মধ্যে প্রাণের সমস্ত দরদ ঢেলে দিয়ে দুই চোখ মুদে গাইছে—

'আমার সরল প্রাণে ব্যথা লেগেছে,
বুঝেছি শিখেছি ঠেকে,
সোনার ছবি ভেঙে গেছে।'

এমন সময় ঘরের দরজার কাছে জাগল একটা হুঙ্কার। অটলের হারমোনিয়ম, পটলের তবলা থেমে গেল, নকুলও চমকে গান থামিয়ে চোখ চেয়ে দেখলে, দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে নন্দলালের বিপুল বপু!

নন্দলাল ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'এসব কী হচ্ছে শুনি?'

অটল বললে, 'কী হচ্ছে বুঝতে পারছেন না? গান-বাজনা হচ্ছে।'

নন্দ বললে, 'বাজনা যে বাজছে তা তো বুঝতে পারছি, কিন্তু নকুলবাবু করছিলেন কী?'

পটল বললে, 'নকুলবাবু গান গাইছিলেন।'

নন্দ তার ভাঁটার মতন চোখ আরও বিস্ফারিত করে বললে, 'গান! নিমতলার মড়াকান্নাকে আপনারা গান বলে চালাতে চান? ওসব এখানে চলবে না মশাই। যতদিন আমি এখানে আছি, ততদিন ওসব চলবে না। মনে রাখবেন, সাবধান করে দিয়ে গেলুম।'

নন্দের পায়ের শব্দ যখন তেতলা থেকে দোতলার সিঁড়ির উপরে নেমে মিলিয়ে গেল, অটল হারমোনিয়মটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললে, 'জীবন যে ভারবহ হয়ে উঠল হে।'

নকুল বললে, 'যেখানে আমার গানকে মড়াকান্না বলে সন্দেহ করা হয়, সেখানে আর আমি থাকতে চাই না।'

পটল বললে, 'পাগল নাকি, আমার যাব কেন? ওই ভুঁইফোড়টাকেই এখান থেকে বিদায় করতে হবে।'

অটল বললে, 'কেমন করে বিদেয় করবে? মেসের কর্তাও ওকে ভয় করেন। ওটা হচ্ছে গুন্ডা।'

পটল বললে, 'গুন্ডা-ফুন্ডা আমি মানব না। আমি রুইমাছের মুড়ো খেতে ভালোবাসি, ওর জন্যে আমার পাতে আর মুড়ো পড়ে না। এসো, ভেবে-চিন্তে ঠিক করা যাক কী ব্রহ্মাস্ত্র ঝাড়লে নন্দের দর্প চূর্ণ হয়।'

দিন-তিনেক ধরে অটল, পটল ও নকুল রীতিমতো মাথা ঘামাতে লাগল।

অবশেষে প্রথম মাথা খুলে গেল নকুলের। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'হয়েছে হয়েছে, উপায় হয়েছে!'

অটল ও পটল সাগ্রহে বলে উঠল, 'কী উপায় ভাই, কী উপায়?'

নকুল বললে, 'আমার চেয়ে তোমাদের দুজনের গায়ে ঢের-বেশি জোর আছে। তোমরা দুজনে নন্দকে একদিন রাস্তায় ধরে আচ্ছা করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে আসবে।

অটল বললে, 'ধ্যেৎ! ভারী উপায়ই বাতলালেন!'

পটল বললে, 'তারপর ও যখন আমাদের নামে থানায় গিয়ে নালিশ করবে?'

নকুল বললে, 'নালিশ করবে কার নামে? তোমাদের চিনতে পারলে তো? তোমরা যে ছদ্মবেশ ধারণ করবে।'

অটল বললে, 'ছদ্মবেশ!'

নকুল বললে, 'হ্যাঁ। কলকাতায় এখন কত কাফ্রি সেপাই এসেছে দেখেছ তো? তোমাদের খাকি পোশাক আছে। আর আমি তোমাদের জন্যে এক-রকম বিলিতি কালো রং নিয়ে আসব। হাতে আর মুখে তোমরা সেই রং মাখবে। তারপর মাথার টুপি আর খাকি পোশাক পরে সন্ধ্যার পরে রাস্তায় গিয়ে লুকিয়ে থাকবে। তারপর নন্দ যখন একলা পথ দিয়ে ফিরে আসবে, সেই সময় তোমরা দুজনে মিলে তাকে ধরে—বুঝেছ? এই 'ব্ল্যাক আউটে'র রাত্রে তোমাদের ছদ্মবেশ ধরা পড়া অসম্ভব!'

অনেক আলোচনার পর সেই ব্যবস্থাই ঠিক হল।

তিন দিন পরে। নন্দ বলে গেল, 'ঠাকুর, আজ আমি থিয়েটার দেখতে যাচ্ছি। ফিরতে রাত হবে। আমার জন্যে খাবার চাপা দিয়ে রাখবে।'

রাত বারোটার সময় নন্দ যখন পাগলা ষাঁড়ের মতন চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে মেসের ভিতরে এসে ঢুকল, তখন সারা বাড়ির সকলেরই ঘুম গেল ভেঙে। মেসের মালিক থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক ভাড়াটিয়া ও ঝি-চাকর পর্যন্ত হই হই করে ছুটে নীচে নেমে এসে দেখলে, উঠানের উপরে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে হাপরের মতন হাঁপাচ্ছে নন্দলাল। তার ডান চোখটা আগের মতন ফুলে উঠেছে, তার জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফর্দা-ফাঁই এবং তার এক পায়ে জুতো নেই।

মেসের মালিক সবিস্ময়ে বললে, 'একী ব্যাপার নন্দবাবু, একী ব্যাপার!'

নন্দ গর্জন করে বললে, 'War! War! রীতিমতো যুদ্ধ! আজ আমি যুদ্ধ করে এসেছি!'

মালিক আরও বেশি বিস্মিত স্বরে বললেন, 'যুদ্ধ করে এসেছেন! বলেন কী মশাই? কার সঙ্গে?'

নন্দ বললে, 'কার সঙ্গে আবার? দেড়-ডজন জাহাজি গোরার সঙ্গে! ব্যাটারা মদ খেয়ে আমার সঙ্গে লাগতে এসেছিল। হুঁ হুঁ, ব্যাটারা ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ দেখেনি। আমি একলাই তাদের এমন হাল করে ছেড়েছি যে, আর তারা কখনও বাঙালিপাড়ায় মুখ বাড়াতে ভরসা করবে না।'

মালিক তারিফ করে বললে, 'বাহাদুর নন্দবাবু, বাহাদুর! কিন্তু তারা যে আপনার গোঁফের আধখানা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে, এইটেই হচ্ছে পরিতাপের বিষয়।'

নন্দ বললে, 'আধখানা গোঁফ তো তুচ্ছ ব্যাপার মশাই, বাঙালির মান রাখবার জন্যে আমি গোটা প্রাণ পর্যন্ত দিতে রাজি ছিলুম।

....আরও বেশি রাতে কালো র‍্যাপারে দেহ ও মুখের প্রায় সবটাই ঢেকে অটল ও পটল কখন যে তেতলায় গিয়ে উঠল, কেউ তা টের পেলে না।

পরের দিন তেতলায় আর-এক বিচিত্র নাটকীয় দৃশ্যের অভিনয় হচ্ছিল।

অটল বলছে, 'নকুল, আমি তোমায় হত্যা করব।'

পটল বলছে, 'তুমি এ কী সর্বনেশে কালো রং কিনে এনেছ? একবাক্স সাবান খরচ করে ফেললুম, তবু এ-রং একটুও ফিকে হবার নাম করছে না!'

নকুল বললে, 'ও-রং যে এত পাকা, আমি কেমন করে জানব ভাই? তবে আমার বিশ্বাস মাস-খানেক ধরে সাবান, সোডা আর সাজিমাটি ব্যবহার করলে রংটা পাকা হলেও ধীরে ধীরে উঠে যেতে পারে।'

অটল চাপা-গলায় গর্জন করে বললে, 'মাস-খানেক ধরে? এই মাস খানেক ধরে আমরা আর কারুকে মুখ দেখাব না?'

নকুল বললে, 'তবে শিরীষ কাগজ ঘসে দেখবে কি? একটু একটু ছালের সঙ্গে সব রংই উঠে যাবে—' বলেই সে ফস করে দূরে সরে গেল, কারণ পটল তাকে লক্ষ্য করে বিষম এক ঘুসি ছুড়েছিল।

পটল মাথার হাত দিয়ে বললে, 'হায় হায়, এখন উপায়! নকুলই আমাদের ডোবালে!'

নকুল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'ভেবো না ভাই, রোসো। ঘরে টারপিন তেল আছে, ওই রঙের ওপরে খানিক ঘষে দ্যাখো দেখি।' এই বলেই সে ছুটে গিয়ে ছোটো এক টিন টারপিন তেল নিয়ে এল।

পটল তাড়াতাড়ি সাগ্রহে এক-আঁচলা তেল নিয়ে নিজের মুখময় মাখিয়ে ফেললে। কিন্তু সেই বিলিতি কালো রঙের মধ্যে কী দ্রব্যগুণ ছিল জানি না, টারপিন তেলের সঙ্গে তার মিলন হওয়া মাত্রই পটল বিকট চিৎকার করে তিন হাত উঁচু একটি 'হাই জাম্প' মারলে। তারপর পাগলের মতন নকুলের গা থেকে সাদা ধপধপে আলোয়ানখানা কেড়ে নিয়ে তাই দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ভীষণ ছটফট ও বিষম ছুটোছুটি করতে লাগল। এবং সেই অবস্থাতেই মহা চিৎকার করে বললে, 'অটল, খবরদার! ও-তেল তুমি মুখে মেখো না! নকুল আমাদের খুন করতে চায়।'

অটল গম্ভীর স্বরে বললে, 'পাগল? আর আমি ও-তেল মাখি? নকুল যে তোমার ওপরেই প্রথম পরীক্ষা করেছে, এইটেই আমার সৌভাগ্য।'

ঠিক এমনি সময়েই দরজার কাছটা অন্ধকার হয়ে গেল।

নকুল ফিরে দেখলে, দরজার সামনে বিস্ফারিত চক্ষে দাঁড়িয়ে রয়েছে নন্দলাল।

মিনিটখানেক ধরে অটল ও পটলকে নীরব গাম্ভীর্যের সঙ্গে অবলোকন করে নন্দলাল বললে, 'চিৎকার শুনে দেখতে এলুম। আপনার দুই বন্ধু হঠাৎ একসঙ্গে আলিবাবার আবদালা সেজেছেন কেন?'

নকুলও অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বললে, 'অটল আর পটল আবদালা সাজেনি। কাল একটু বেশি রাতে ওরা বাসায় ফিরে আসছে, এমন সময়ে দেড় ডজন জাহাজি-গোরা ওদের আক্রমণ করে—'

ইতিমধ্যে মেসের মালিকও সেখানে এসে হাজির হয়েছে। নকুলের কথা শেষ হবার আগেই বলে উঠল, 'দেড় ডজন জাহাজি-গোরা? নিশ্চয় তারাই আমাদের নন্দবাবুর ওপরে অত্যাচার করতে এসেছিল! কিন্তু অটল আর পটলবাবুর মুখ অমন কাফ্রির মতন হল কেন?'

নকুল বললে, 'মাতাল গোরাদের খেয়াল মশাই, খেয়াল! অটল আর পটল তো নন্দবাবুর মতন মহাবীর নয়, মার খেয়ে তারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তারপর জ্ঞান হলে পর দেখে যে, ওদের এই পোড়া-হাঁড়ির হাল হয়েছে।'

নন্দ খানিকক্ষণ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর চলে যেতে যেতে বলে, 'আমি এই-সব গাঁজাখুরি কথা বিশ্বাস করি না।'

.......সেই হল অটল, পটল ও নকুলের সঙ্গে নন্দলালের শেষ চোখের দেখা। নন্দ সেইদিনই বাসা ছেড়ে উঠে গেল। অটল ও পটলের মৌখিক বর্ণান্তরের রহস্য সে যে বুঝে ফেলেছিল, তাতে আর সন্দেহ নেই।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

মধুরেণ সমাপয়েৎ

হঠাৎ কলকাতার রাত্রি হয়ে উঠল বিভীষিকা!

'ব্ল্যাক আউটের' অন্ধকার যে ভয়াবহ, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু এ কেবল ভয়াবহ নয়, মারাত্মক!

তৃতীয় শ্রেণির মাসিক পত্রিকায় পদ্য প্রেরণ করা যাঁদের একমাত্র পেশা, তাঁরা যখন কলকাতার আকাশে অর্ধচন্দ্র দেখে শিবনেত্র হয়ে কবিত্বের স্বপ্নচয়নের চেষ্টা করছিলেন, তখন শূন্যে হল জাপানি উড্ডীয়মান নৌকার উদয় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী উপহার লাভ করলে কতিপয় মুখর বোমা। এক দিন নয়, পরে পরে তিন দিন।

নবাব মিরকাসিমের যুগে বাংলা দেখেছিল শেষযুদ্ধ। তারপর থেকে কিছু-কম দুই শতাব্দী ধরে বাঙালির সঙ্গে যুদ্ধের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে কেবল পুথিপত্র বা সংবাদপত্রের ভিতর দিয়ে। চায়ের সঙ্গে যুদ্ধের তর্ক যেমন মুখরোচক, তেমনি নিরাপদ। অনভ্যাসের ফলে বাঙালিরা ভুলে গিয়েছিল, একদা তারাও আবার যুদ্ধে মরতে পারে!

কলকাতার উপরে শেষ অগ্নিবৃষ্টি করেছিল নবাব সিরাজদৌল্লার সেকেলে কামান। তারপর সেদিন আচম্বিতে যখন আকাশচারী খ্যাঁদা জাপানিরা কলকাতার বুকে আবার নতুন অগ্নিবাদল সৃষ্টি করে গেল এবং কয়েকজন বাংলার মানুষ যখন বিনা নোটিশে হাজির হল গিয়ে পরলোকে, তখন সারা কলকাতা হয়ে গেল ভীত চকিত হতভম্ব! ভাবলে, এ আবার কী-রকম যুদ্ধ বাবা? অগেকার লড়ায়ে লোক মরত রণক্ষেত্রে গিয়ে। কিন্তু এ যুদ্ধে শয়নগৃহে ঢুকে স্ত্রীর আঁচল ধরে শয্যায় শুয়েও দস্তুরমতো খাবি খেতে হয়! এমন যুদ্ধের কথা তো রামায়ণ-মহাভারতেও লেখে না!

তা লেখে না। সুতরাং সুখশয্যাও নিরাপদ নয় এবং বাইরের রাস্তা নাকি ততোধিক বিপজ্জনক! যুদ্ধ এসেছে কলকাতার মাথার উপরে। অনভ্যস্ত বাঙালির পিলে গিয়েছে চমকে। শহরবাসীরা 'ব্ল্যাক আউট'কে তুচ্ছ করে রাতে পথে পথে করত বায়ু সেবন। কিন্তু তিন দিন জাপানি-বোমার চমকদার ধমক খেয়ে সন্ধ্যার সঙ্গে-সঙ্গেই রাজপথকে করলে প্রায় 'বয়কট'।

'গ্যাস পোস্টের' আলোগুলো জ্বলে না, 'জ্বলছি' বলে মিথ্যা ভান করে। দোকানদাররা তাড়াতাড়ি ঝাঁপ তুলে দিয়ে সরে পড়ে। থিয়েটার, সিনেমা ও হোটেল বা রেস্তোরাঁরও সামনে নিবিড় অন্ধকার যেন দানা পাকিয়ে থাকে। বাদুড় ও প্যাঁচারা কলকাতার উপর দিয়ে ওড়বার সময় মনে করে,—এমন খাসা শহর দুনিয়ার আর কোথাও নেই! এবং গুন্ডা, চোর ও পকেটমারের দল মনে-প্রাণে জাপানের খ্যাঁদা-নাকগুলোর মঙ্গল-কামনা করে বেরিয়ে পড়ে পথে-বিপথে।

এমনি সময়ে—অর্থাৎ জাপানিরা শেষ যে-রাতে কলকাতায় বোমা ছুড়ে গেল ঠিক তার পরদিনেই, আমাদের তিনবন্ধু হঠাৎ এই বিচিত্র ঘটনার আবর্তে গিয়ে পড়তে বাধ্য হল। অতঃপর সেই ইতিহাসই বলব।

আহিরীটোলা অঞ্চল। ঘুটঘুটে কালো রাত—জুতোর কালির চেয়ে কালো। চারিদিক সার্কুলার রোডের গোরস্থানের মতো নিস্তব্ধ। শহরের সমস্ত লোক যেন মরে গিয়েছে। কিংবা এ যেন কোনও পরিত্যক্ত ও অভিশপ্ত নগরের মৃত পথ। গত রাত্রে ঠিক এই অঞ্চলেই একটি বোমা পথের উপরে এসে পড়ে পক্ক দাড়িম্বের মতন বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তাই এদিককার গৃহস্থের কেউ আর দরজার বাইরে পা বাড়াতে রাজি নয়। পাড়ার বাহিরফটকা ডানপিটে ছেলেরাও বাইরের নাম মুখে আনছে না আজ।

কিন্তু এমন রাতেও পরস্পরের গলা-ধরাধরি করে, তিন জোড়া জুতোর শব্দে রাজপথকে চমকিত করে এগিয়ে আসছে অটল, পটল ও নকুল—জনৈক রসিক যাদের নাম দিয়েছে 'গৌড়-বাংলার থ্রি মাস্কটিয়ার্স'! ব্যাপার কী? তাদের কি প্রাণের ভয় নেই?

না!

আজকাল আহারের নিমন্ত্রণ পেলে শেয়ালের মতন কাপুরুষ হয়ে ওঠে সিংহের মতন সাহসী।

বাজার যা আক্রা! আগেকার সস্তার দিনে বাড়িতে দুই শত লোককে খেতে ডাকলে অন্তত শতকরা পঁচিশজনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করত না। কিন্তু এখন? দুই শত জনকে আহ্বান করলে সাড়া দেয় চারশো জন! মাছ-মাংস, তরি-তরকারি, দুধ-ঘি-তেল সমস্তই অগ্নিমূল্য! যাদের আয় মাসিক একশো টাকার মধ্যে (এবং এই শ্রেণির লোকই বাংলা দেশে বেশি), তারা তো মাছ-মাংস, লুচি বা সন্দেশ-রসগোল্লা প্রভৃতির স্বাদ ভুলে যেতেই বসেছে! এমন অবস্থায় বিনামূল্যে চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সদ্ব্যবহার করবার নিমন্ত্রণ পেলে সে সুযোগ ত্যাগ করে না কোনও নির্বোধই।

আহিরীটোলা অঞ্চলের কোনও উদার বন্ধু পোলাও কালিয়া, কোপ্তা, কাবাব ও ফাউল

কারি প্রভৃতি খাওয়াবার লোভ দেখিয়েছিলেন। সে-লোভ ত্যাগ করা অসম্ভব। তাই উদরের সম্মান রক্ষার জন্যে হাতে করে বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল আজ অটল, পটল আর নকুল।

অবশ্য কেউ যেন মনে না ভাবেন যে, আমরা অটল, পটল, নকুলকে উদর-পিশাচ বলে পরিচিত করতে চাইছি। মোটেই নয় মশাই, মোটেই নয়।

বন্ধুবর কেবল ভুঁড়ি-ভরা ভূরিভোজনেরই লোভ দেখাননি, সেইসঙ্গে এ লোভও দেখিয়েছিলেন, তাঁর বাড়িতে আজ রীতিমতো জলসার আয়োজন। আসর অলংকৃত করবেন দুম-তানানানা খাঁ, সা-গা-রে-মা সাহেব ও গিটকিরি মিয়া প্রমুখ গাইয়েরা এবং ধেড়ে-কেটে-তাক সিং ও দি-রি-দা-রা-দা-রা আলি প্রমুখ বাজিয়েরা। যাকে বলে আকর্ষণের উপরে আকর্ষণ—নৈবেদ্যের উপরে চূড়াসন্দেশ!

আপনারা আগেই পরিচয় পেয়েছেন যে, আমাদের অটল, পটল, নকুল সংগীতকলার একান্ত ভক্ত। দু-চারটে বোমার ভয়ে এমন বিমল আনন্দকে ত্যাগ করবার ছেলে তারা নয়।

অটল বললে, 'দুম-তানানানা খাঁ যখন তান ধরে তাল ঠোকেন, তখন পেশাদার পালোয়ানরা পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে যায়, এমন গাইয়ে আর হবে না!'

পটল সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললে, 'আমরা পালোয়ান নই। তাঁকে সহ্য করতে পারব তো?

নকুল বললে, 'দি-রি-দা-রা-দা-রা আলি যখন প্রিং প্রিং করে সেতার বাজান তখন সন্দেহ হয়, ঠিক যেন তিনি পট পট করে রাগ-রাগিনীর পাকাচুল উৎপাটন করছেন।'

পটল অভিভূত হয়ে বললে, 'এর ওপরে আর কথা চলে না।'

অতএব তিন বন্ধু যথাসময়ে হাজির হল যথাস্থানে। গানের আসর ভাঙল রাত বারোটায়। আহারের আসর দেড়টায়। তারা পথে যখন বেরুল ঘড়িতে বাজল রাত দুটো।

হোক গে অন্ধকার—তৃপ্ত উদর, চিত্তে আনন্দ। নকুল খানিক আগে-শোনা একটি গান গাইতে গাইতে পথ চলছিল—

'কানহা রে মেরে নাহি রে চুন্‌হরিয়াঁ!'

হঠাৎ 'টর্চের' একটা তীব্র আলোকরেখা তাদের তিনজনেরই মুখের উপর দিয়ে খেলে গেল এবং তারপরেই জাগল ফিরিঙ্গি কণ্ঠে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন!

সর্বাগ্রে ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারলে নকুল। সে ভীত স্বরে বললে, 'মারো দৌড়!'

তিন ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তিন তিরের মতন তিন মূর্তি ছুটে চলল এক দিকে।

সেখানে দাঁড়িয়েছিল এক সার্জেন্ট এবং একটা পাহারাওয়ালা।

সার্জেন্ট চিৎকার করলে, 'পাকড়ো, পাকড়ো! আসামি ভাগতা হায়!'

পাহারাওয়ালা ছুটল। সার্জেন্টও।

ব্যাপারটা এই। দিন-দশ আগেকার কথা। কলকাতার রাস্তার এক দেওয়ালের গায়ে লেখা ছিল—'Commit no nuisance!'

অটল বেকায়দায় পড়ে বাধ্য হয়ে সেই নিষেধ-বাক্য মানতে পারেনি। ঠিক সময়েই সার্জেন্টের আবির্ভাব। সে তাকে থানায় নিয়ে যেতে উদ্যত হয়। অটল বাধা দেয়, কারণ

থানায় যাওয়া তার পক্ষে ছিল আপত্তিকর। সার্জেন্ট তাকে একটা ঘুসি মারে। অটল মারে তাকে দুটো ঘুসি। সার্জেন্ট পপাত ধরণীতলে। তিন বন্ধুর অন্তর্ধান।

সার্জেন্ট এর মধ্যেই তাদের মুখ ভুলতে পারেনি। মণিহারা ফণীর মতন তার দুই চক্ষু ছিল সতর্ক। এমন বোমা-ভয়-ভরা আঁধার রাতেও কার গান গাইবার শখ হয়েছে, কৌতূহলী হয়ে তাই দেখবার জন্যে সে হাতের 'টর্চ' ব্যবহার করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত তিন মূর্তিকে পুনরাবিষ্কার করে ফেলেছে।

হিংস্র জন্তুর চেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে যম। এবং যমের চেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে বাংলা দেশের পুলিশ। এই হচ্ছে তিন বন্ধুর মত। অতএব পুলিশের কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে যাবার জন্যে তিন বন্ধু কিছুমাত্র চেষ্টার ত্রুটি করলে না।

নকুল জানে, প্রথম জীবনে 'স্পোর্টে'র দৌড় প্রতিযোগিতায় বরাবরই সে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সুতরাং একটা গোরুখোর সার্জেন্ট ও একটা ছাতুখোর পাহারাওয়ালা যে দৌড়ে তাকে হারাতে পারবে না, এ বিষয়ে ছিল নিশ্চিত।

পটল সম্বন্ধেও সে হতাশ নয়। কারণ পটল হচ্ছে বাঁখারির মতন রোগা লিকলিকে। তাই তার নাম হয়েছে মানুষ-হাড়গিলে।

ভয় তার কেবল অটলকে নিয়ে। অটলকে তারা ডাকত 'নরহস্তী' বলে এবং ওজনে সে দুই মন সাড়ে আটত্রিশ সের। একবার তেতলার সিঁড়ি ভাঙলেই সে হুস হুস করে হাঁপ ছাড়ত পাঁচ মিনিট ধরে এবং আধ মাইল রাস্তা হাঁটতে হবে শুনলেই ট্যাক্সি ডাকতে বলত।

কিন্তু নকুলের দুশ্চিন্তা অমূলক। ভয় পেলে মহা মোটা হিপোপটেমাসও তার খুদে খুদে পা চালিয়ে দৌড়ে যে-কোনও মানুষকে হারিয়ে দিতে পারে। এবং ভয় পেয়ে পালাবার দরকার হলে যে-কোনও গুরুভার বাঙালিরও দেহ হয়ে যায় যে তুলোর মতন হালকা, আজ তার একটা চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গেল।

ছুটতে ছুটতে নকুল বললে, 'অটল, পিছিয়ে পড়লে বাঁচবে না।'

ছুটতে ছুটতে পটল বললে, 'অটল, তোমাকে নিয়েই ভাবনা!'

অটল কিছু বললে না, কিন্তু এক দৌড়ে বন্দুকের বুলেটের মতন বেগে পটল ও নকুলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল!

পটল ও নকুল এখন পুলিশের কথা ভুলে প্রাণপণে অটলের নাগাল ধরবার চেষ্টা করতে লাগল—কিন্তু অসম্ভব, সে মাটি কাঁপিয়ে ধেয়ে চলেছে যেন ঝোড়ো হাতির মতন। পটল ও নকুল চমৎকৃত!

অটল ছুটছে, ছুটছে, ছুটছে। সে খালি ছুটছে না, নিজের দৃষ্টিকেও করে তুলেছে বিড়ালের মতন অন্ধকারভেদী! নইলে এই 'ব্ল্যাক আউটে'র রাতে কলকাতার শতবাধাময় পথে দৌড় প্রতিযোগিতায় সফল-মনোরথ হবার সম্ভাবনা অল্পই।

পিছনে ধাবমান পুলিশের দ্রুতপদশব্দ শুনতে শুনতে তারা ঢুকে পড়ল একটা গলির ভিতরে—প্রথমে অটল, তারপর নকুল, তারপর পটল।

ছুটতে ছুটতে অটল দেখলে, একেবারে ঠিক তার সামনেই পথ জুড়ে শুয়ে আছে একটা

বিরাট সাদা ষাঁড়ের দীর্ঘ ছায়া। তখন তাকে আর পাশ কাটাবার সময় নেই, অতএব অটল বিনা দ্বিধায় অমন বিপুল বপু নিয়েও একটি চমৎকার 'লং জাম্প' মেরে ষাঁড়টাকে পার হয়ে গেল অনায়াসেই। তারপর লাফালে নকুল। তারপর পটল।

সচমকে ঘুম ভেঙে গেল ষাঁড়ের। বিপুল বিস্ময়ে মুখ তুলে সে দেখলে, তার দেহ ও মাথার উপর দিয়ে তিড়িং তিড়িং করে লাফ মেরে চলে গেল তিন-তিনটে মূর্তি! এমন কাণ্ড সে আর কখনও দেখেনি।

নিজের ষণ্ড-বুদ্ধিতে ব্যাপারটা সে তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছে, এমন সময়ে তার সুদীর্ঘ কর্ণে প্রবেশ করল আবার কাদের নতুন পায়ের শব্দ! সে আন্দাজ করলে, এ দুরাত্মারাও হয়তো তার পবিত্র দেহের উপর দিয়ে লম্ফত্যাগ করবে। সে এমন অন্যায় আবদারকে আর প্রশ্রয় দিতে রাজি নয়। ঘৃণ্য ও তুচ্ছ মনুষ্য-জাতীয় জীববৃন্দকে 'হার্ডল রেসে' সাহায্য করবার জন্যে সে ষণ্ড-জীবন ধারণ করেনি। অতএব ভীষণ এক গর্জন করে ধড়মড়িয়ে দণ্ডায়মান হল বৃষবর। এবং পরমুহূর্তেই ফিরে শিংওয়ালা মাথা নেড়ে, পতাকার মতন লাঙ্গুল ঊর্ধ্বে তুলে নতুন পদশব্দের উদ্দেশে হল সতেজ ও সবেগে ধাবমান। মুখে তার ঘন ঘন ঘোঁৎ ঘোঁৎ হুঙ্কার।

সেই বিভীষণ মূর্তি দেখেই পাহারাওয়ালা ও ফিরিঙ্গিপুঙ্গবের চক্ষুস্থির। তারাও ফিরে অদৃশ্য হতে দেরি করলে না।

পিছনের পাপ যে বিদায় হয়েছে, তিন বন্ধু তখনও তা টের পায়নি। তারা তখনও ছুটছে উল্কাবেগে।

হঠাৎ সামনে জাগল প্রায় ছয়-সাত হাত উঁচু প্রাচীর। কিন্তু কী ছার সেই বাধা, পুলিশকে ফাঁকি দেবার জন্যে তারা চিনের প্রাচীরও পার হতে প্রস্তুত।

অটল আজ যেন ইচ্ছা করলে পাখির মতন শূন্যে উড়তে পারে। লাফ মেরে সে উঠল প্রাচীরের টঙে এবং আর একলাফে অদৃশ্য হল প্রাচীরের ওপারে। তারপর একে একে পটল নকুল করলে তার অনুসরণ।

সেই বোমাভীত, অস্বাভাবিক স্তব্ধ রাতে যখন একটা সূচ পড়লেও দূর থেকে শোনা যায়, তখন নকুল, পটলও বিশেষ করে অটলের মতন সুবৃহৎ দেহের ধুপ ধুপ ধুপ করে লম্ফত্যাগের শব্দ অন্য লোকের শ্রুতিগোচর হবে, তাতে আর সন্দেহ কী?

প্রাচীরের উপর থেকে তিন বন্ধু লাফ মেরে অবতীর্ণ হল একটা অজানা বাড়ির অন্ধকার উঠানের উপরে।

কিঞ্চিৎ হাঁপ ছাড়বার চেষ্টা করছে, হঠাৎ বিকট স্বরে চিৎকার হল, 'চোর! চোর! ডাকাত!' সঙ্গে সঙ্গে বহু কণ্ঠের গোলমাল ও ছুটোছুটির শব্দ! সর্বনাশ, এ যে তপ্ত কড়া থেকে জলন্ত উনুনে!

তিন বন্ধু আঁতকে আবার উঠল, আবার ছুটল। সামনেই একটা দরজা। ঠেলা মারতেই খুলে গেল। তারা একটা ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

ওরে বাপ রে বাপ, সেখানে আবার একটিমাত্র মেয়ে-গলায় ঘর-ফাটানো কী বিকট চিৎকার!

—'খুন করলে, খুন করলে—ডাকাতে খুন খুন করলে গো!' অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, শোনা যায় কেবল চিৎকারের পর চিৎকার!

তিন বন্ধু সিকি-সেকেন্ড থমকে দাঁড়াবারও অবসর পেলে না, টাল খেতে খেতে আবার ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল.......

ওদিকে চারিদিক থেকে ছুটে এল বাড়ির পুরুষরা চাকর-বাকর দারোয়ান! তাড়াতাড়িতে হাতের কাছে যে যা পেয়েছে সংগ্রহ করে এনেছে—বঁটি, কাটারি, লাঠি!

বাড়ির কর্তা হন্তদন্তের মতন ঘটনাস্থলে এসে বললেন, 'কই রে প্রমদা, কোথায় ডাকাত?'

একটি আধাবয়সি মেয়ে ঘরের কোণ ছেড়ে এগিয়ে এসে বললে, 'ওই যে দাদা, ওই যে আবার বেরিয়ে গেল গো!'

—'ক-জন?'

—'এক কাঁড়ি লোক গো, এক কাঁড়ি লোক! কী সব রাক্ষুসে চেহারা, এয়া গালপাট্টা, এয়া গোঁফ—আর রং যেন কালিমাখানো হাঁড়ি!

একটি যুবক বিরক্ত স্বরে বললে, 'কী যে বলো পিসিমা, তোমার কথার কোনও মানে হয় না।'

প্রমদা কপালে দুই চোখ তুলে বললে, 'ছেলের কথা শোনো একবার! দেখলুম এক কাঁড়ি আস্ত ডাকাত, তবু বলে মানে হয় না!'

যুবক বললে, 'সত্যি কথাই বলেছি পিসিমা! এই ঘুট ঘুট করছে অন্ধকার, এর মধ্যেও তুমি দেখতে পেলে, ডাকাতদের গায়ের রং কালো হাঁড়ির মতন, আর তাদের মুখে এয়া গোঁফ, এয়া গালপাট্টা!'

প্রমদা বললে, 'নিমে, তুই তো সেদিনকার ছেলে, তুই কী জানবি বল? আগুনের আঁচ কি চোখে দেখে বুঝতে হয়, গায়ে লাগলেই টের পাওয়া যায় যে! ডাকাতদের চেহারা অন্ধকারেও আন্দাজ করা যায় রে, অন্ধকারেও আন্দাজ করা যায়!'

কর্তা অধীর স্বরে বললেন, 'চুলোয় যাক যত বাজে কথা। বলি, ডাকাতগুলো গেল কোন দিকে?'

প্রমদা বললে, 'ওই দিকে দাদা, ওই দিকে!'

কিন্তু সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোনওদিকেই ডাকাতদের আর পাত্তা পাওয়া গেল না।

কর্তা আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'যাক গে, আপদ গেছে। বেটারা পালিয়েছে বলে আমি দুঃখিত নই।'

কর্তা আবার নিজের শয়নগৃহে এসে ঢুকলেন। তিনি বিপত্নীক। একলাই শয়ন করেন।

আলো নিবিয়ে তিনি খাটের উপরে গিয়ে উঠলেন। তারপর শুয়ে করতে লাগলেন নিদ্রাদেবীর আরাধনা। কিন্তু মন যখন উত্তেজিত, ঘুম সহজে আসে না।

—'হ্যাঁচ্চো!'

কর্তা সবিস্ময়ে ধড়মড় করে উঠে বসলেন। তাঁর ঘরে হেঁচে ফেললে কে?

আবার—'হ্যাঁচ্চো!'

হাঁচির জন্ম খাটের তলায়, এটা বোঝা গেল। কিন্তু খাটের তলায় হাঁচি কেন বাবা? কর্তা তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে পড়ে আলোর 'সুইচ' টিপতে গেলেন।

এবার আর হাঁচি নয়, খাটের তলা থেকে নির্গত হল মনুষ্যের কণ্ঠস্বর!

কে বললে, 'খবরদার!'

কর্তা ম্রিয়মান কণ্ঠে বললেন, 'খবরদার বলছ কে বাবা?'

—'আমি!'

—'তুমি কে বাবা?'

—'মনুষ্য।'

—'অর্থাৎ ডাকাত?'

—'আমরা ডাকাত নই।'

—'ও, তাহলে তোমরা যিশু খ্রিস্ট?'

—'আমরা যিশু খ্রিস্ট নই।'

—'উত্তম। তোমাদের পরিচয় জানতে চাই না। কিন্তু দুনিয়ার এত জায়গা থাকতে এখানে কেন?'

—'পথ ভুলে।'

—'ভুলটা বিস্ময়কর।'

—'কিন্তু অসম্ভব নয়।'

—'পথ ভুলে আমার খাটের তলায়? না বাপু, এ কথা জজে মানবে না।'

—'খাটের তলা হচ্ছে অতি নিরাপদ ঠাঁই। খাসা আছি মশাই!'

—'বুঝলুম। কিন্তু আমাকে কী করতে বলো?'

—'চ্যাঁচাবেন না। আলো জ্বালবেন না। আবার বিছানায় গিয়ে উঠে বসুন।'

—'কথা যদি না শুনি?'

—'আমার কাছে ভোজালি আছে।'

আর একটা কণ্ঠস্বর বললে, 'আমার কাছে রিভলভার আছে।'

আর একটা কণ্ঠস্বর বললে, 'আমার কাছে বন্দুক আছে।'

—'দেখছি দলে তোমরা ভারী। কিন্তু আর কিছু সঙ্গে করে আনোনি? কামান-টামান?'

—'বিছানায় উঠলেন না? আবার ঠাট্টা হচ্ছে? আচ্ছা!'

খাটের তলায় একাধিক ব্যক্তির হামাগুড়ি দেওয়ার শব্দ শোনা গেল।

ডাকাতরা বাইরে বেরিয়ে আসছে। কর্তা সুড় সুড় করে আবার খাটের উপরে গিয়ে উঠলেন বিনাবাক্যব্যয়ে।

—'এইবারে আমরা কী করব জানেন?'

—'আমার গলায় ছুরি দেবে?'

—'না। আপনার হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেলব।'

—'এত দয়া কেন?'

—'আমরা চাই না যে আপনি চ্যাঁচান বা আমাদের তাড়া করেন।'

—'আমি কিছুই করব না, তোমরা নির্ভয়ে প্রস্থান করো।'
—'আপনার কথায় বিশ্বাস নেই।'
—'জয় গুরু!'
—'কী বললেন?'
—'জয় গুরু। বিপদে বা সমস্যায় পড়লেই 'জয় গুরু' বলা আমার স্বভাব।'
—'আশ্চর্য! আমার মেসোমশাইয়েরও ঠিক ওই স্বভাব।'
—'কার?'
—'আমার মেসোমশাইয়ের। আপনার গলার আওয়াজও তাঁর মতন।'
—'আমার ভায়রা-ভাইয়ের ছেলের গলাও তোমার মতন। কিন্তু সে তোমার মতন ডাকাত নয়।'
—'আপনিও আমার মেসোমশাই নন। কারণ তাঁর বাসা বউবাজারে।'
—'কী বললে?'
—'এটা বউবাজার হলে আপনাকেই আমার মেসো বলে সন্দেহ হত।'
—'তোমার মেসোর নাম কী?'
—'চন্দ্রনাথ সেন।'
—'আমারও নাম ওই। আমিও বউবাজারে থাকতুম, আজ দশ দিন হল, এই নতুন বাসায় উঠে এসেছি।'
অটল ফস করে আলো জ্বাললে।
কর্তা বললেন, 'অটলা!'
অটল বললে, 'মেসোমশাই!'
অল্পক্ষণের স্তব্ধতা। কর্তা কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'অটল, এ ব্যবসা কতদিন ধরেছ?'
অটল কর্তার দুই পা জড়িয়ে ধরে বললে, 'আমি ডাকাত নই মেসোমশাই, আগে আমার কথা শুনুন।'
অটল একে একে সব কথা খুলে বললে।
কর্তার অট্টহাস্যে খালি বাড়ি নয়, রাত্রির বুক পর্যন্ত যেন কাঁপতে লাগল—
'হো হো হো হো, হা হা হা হা! ওরে অটলা, আজ আমি হেসে-হেসেই খাবি খাব রে! হি হি হি হি! ওরে প্রমদা, তোর গালপাট্টাঅলা কেলে-হাঁড়ির মতন ডাকাতের মুখগুলো একবার দেখে যা রে! হো হো হো হো, হা হা হা হা হা হা হা হা............

সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র

গাছ হঠাৎ জন্মায় না। জন্মের পরেও গাছের বাড় ও স্বাস্থ্য নির্ভর করে সারালো জমির উপরে।

শরৎচন্দ্রও হঠাৎ বড়ো সাহিত্যিকরূপে জন্মগ্রহণ করেননি। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের জন্যে আগেকার সাহিত্যিকরা জমি তৈরি ও বীজ বপন করে গেছেন। আগে তারই একটু পরিচয় দি।

পৃথিবীর সব দেশেই একশ্রেণীর সাহিত্য দেখা দিয়েছে যাকে বলে 'রোমান্টিক' সাহিত্য। বিলাতের স্যার ওয়াল্টার স্কটের, ফরাসি দেশের ভিক্টর হুগো ও আলেকজান্দার ডুমাসের এবং বাংলাদেশের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অধিকাংশ উপন্যাস ওই 'রোমান্টিক'-সাহিত্যের অন্তর্গত। ওঁদের উপন্যাসে অসাধারণ ঘটনার উপরেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। ওঁরা যেসব চরিত্রের ছবি এঁকেছেন, সাধারণত সেগুলি অতিরিক্ত রংচঙে। ওঁরা যে অস্বাভাবিক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, তা নয়; কিন্তু ওঁরা প্রায়ই রঙিন কাচের ভিতর দিয়ে চরিত্রগুলিকে দেখেছেন। তাই চরিত্রগুলির উপরে যে-রং পড়েছে তা তাদের স্বাভাবিক রং নয়।

পৃথিবীতে এখন যে-শ্রেণীর সাহিত্যের বেশি চলন তাকে বলে বাস্তব-সাহিত্য। বাংলাদেশে বিশেষভাবে এই সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন সর্বপ্রথমে রবীন্দ্রনাথ। যদিও বঙ্কিম-যুগে—অর্থাৎ বাংলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণ-প্রভাবের সময়ে 'রাজর্ষি' ও 'বউঠাকুরানির হাট' রচনাকালে তিনিও 'রোমান্টিক' সাহিত্যকে অবলম্বন করেছিলেন।

বাস্তব-সাহিত্যের লেখকরা মানুষকে যেমন দেখেন তেমনি আঁকেন। তাঁরা অতিরঞ্জনের পক্ষপাতী নন এবং অসাধারণ ঘোরালো ঘটনারও উপরে বেশি ঝোঁক দেন না। রোজ আমরা যে-সংসারকে দেখি, তারই ছোটোখাটো সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না নিয়ে সোজা ভাষায় সহজভাবে তাঁরা বড়ো বড়ো উপন্যাস লিখতে পারেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথেরও আগে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'রোমান্টিক' সাহিত্যের পূর্ণ-প্রতিপত্তির দিনেই, আর একজন বাঙালি লেখক বাস্তব-সাহিত্য রচনা করে নাম কিনেছিলেন। তাঁর নাম স্বর্গীয় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর 'স্বর্ণলতা' হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের একখানি বিখ্যাত উপন্যাস।

ঘরোয়া সুখ-দুঃখের হুবহু ছবি আঁকার দরুন তারকনাথের যশ শরৎচন্দ্রের মতোই হঠাৎ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং 'স্বর্ণলতা'র সংস্করণের পর সংস্করণ হতে থাকে। বঙ্কিম-যুগে আর কোনও লেখকের বই এত কাটেনি।

'স্বর্ণলতা'র কাটতি দেখে বহু লেখক তারকনাথের নকল করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁদের অনুকরণ 'স্বর্ণলতা'র মতন সফল হয়নি, কারণ নকলকে কেউ আসলের দাম দেয় না।

তারকনাথ আরও কিছু লিখে গেছেন। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্র বিস্তৃত ও শক্তি বড়ো ছিল না। বঙ্কিম-যুগে তাঁর প্রতিভা স্ফুলিঙ্গের মতোই আমাদের চক্ষে পড়ে।

সেইজন্যেই আমরা বলেছি, বাংলাদেশে বিশেষভাবে বাস্তব-সাহিত্য এনেছেন রবীন্দ্রনাথই। ভিন্ন ভিন্ন উপন্যাসে তাঁর বিষয়বস্তু ও চরিত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। বাস্তব-

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দৃষ্টিশক্তি তিনি বিস্তৃত করে তুলেছেন। কেবল নিত্য-দেখা সংসারকেই তিনি তুলে এনে আবার সাহিত্যের ভিতরে দেখাননি, তার সাহায্যে নব নব ভাব ও আদর্শকে খুঁজেছেন। তারকনাথ এসব পারেননি।

শরৎচন্দ্র যখন আত্মপ্রকাশ করেন, তখন রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাংলাদেশে সত্যিকার বড়ো আর কোনও ঔপন্যাসিককেই দেখা যেত না। রবীন্দ্রনাথও কেবল উপন্যাস নিয়ে কোনওদিনই নিযুক্ত থাকেননি। কারণ তিনি কেবল ঔপন্যাসিক নন, একাধারে তিনি মহাকবি, নাট্যকার, গীতিকার, ছোটোগল্প লেখক, সন্দর্ভকার ও সমালোচক এবং প্রত্যেক বিভাগেই নব নব রসের স্রষ্টা। হিসাব করলে দেখা যাবে, তাঁর নানাশ্রেণীর রচনার মধ্যে উপন্যাস খুব বেশি জায়গা জুড়ে নেই।

কাজেই বাস্তব-সাহিত্যের ভিতর দিয়ে বাংলার ঘরোয়া আলোছায়ার ছবি আঁকতে পারেন এবং কথাসাহিত্যের সাধনাই হবে যাঁর জীবনের প্রধান সাধনা, দেশের তখন এমন একজন লোকের দরকার হয়েছিল। দেশের সেই প্রয়োজন মিটিয়েছেন শরৎচন্দ্র। তিনি একান্তভাবেই ঔপন্যাসিক।

শরৎচন্দ্রের উপরে রবীন্দ্রনাথের বাস্তব-সাহিত্যের প্রভাব পড়েছিল কতটা 'ভারতী'তে তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশের সময়েই সেটা জানা গিয়েছিল। গোড়ার দিকে 'বড়দিদি' বেরুবার সময়ে লেখকের নাম প্রকাশ করা হয়নি। কিন্তু পাঠকেরা লেখা পড়ে ধরে নেন যে, রবীন্দ্রনাথই নাম লুকিয়ে ওই উপন্যাস লিখছেন। কেউ কেউ নাকি রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েও জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের কোনও কোনও গল্প ও উপন্যাসের বিষববস্তু দেখলে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে মনে পড়বেই। কিন্তু বলেছি, রবীন্দ্রনাথ বাস্তব-সাহিত্যের ক্ষেত্রসীমা ও দৃষ্টিশক্তি বিস্তৃততর করে তুলেছিলেন, তাই পরবর্তী যুগের লেখক শরৎচন্দ্রও তারকনাথকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন ঢের বেশিদূর।

এখানে আর একটা কথাও বলে রাখা দরকার। শরৎ-সাহিত্যের খানিক অংশ রবীন্দ্রনাথ প্রভাবগ্রস্ত বটে, কোনও কোনও স্থলে তার বিষয়বস্তু তারকনাথকেও স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু তার অনেকটা অংশই একেবারে আনকোরা। সেখানে শরৎচন্দ্র নিজস্ব মহিমায় বিরাজ করছেন এবং সেটা হচ্ছে তাঁর প্রতিভার সম্পূর্ণ নূতন দান। এই নূতনত্বের জন্যেই শরৎচন্দ্রের নাম অমর হয়ে রইল।

এইবারে আর একটি বিষয় নিয়ে কিছু বলব। 'স্টাইল' বা রচনাভঙ্গির কথা। যে লেখকের নিজের রচনাভঙ্গি আছে, লেখার তলায় তাঁর নাম না থাকলেও লোকে কেবল লেখা দেখেই তাঁকে চিনে নিতে পারে।

আজ পর্যন্ত এমন বড়ো বা ভালো লেখক জন্মাননি, যাঁর নিজস্ব রচনাভঙ্গি নেই। ফরাসি দেশে ফ্লবেয়ার নামে একজন লেখক ছিলেন, তিনি অমর হয়ে আছেন প্রধানত তাঁর রচনাভঙ্গির গুণেই।

এক-একজন বড়ো লেখকের রচনাভঙ্গি আবার এতটা বিশিষ্ট ও শক্তিশালী যে, তা সাহিত্যের এক-একটা বিশেষ যুগকে প্রকাশ করে। কারণ সেই যুগের অন্যান্য লেখকদেরও উপরে তাঁদের রচনাভঙ্গির প্রভাব দেখা যায় অল্পবিস্তর।

বাংলাদেশে দুইজন প্রধান লেখকের রচনাভঙ্গি সাহিত্যের দুইটি বিশেষ যুগকে চিনিয়ে দেয়। তাঁরা হচ্ছেন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যের আলোচনায় প্রায়ই 'বঙ্কিম-যুগ'ও 'রবীন্দ্র-যুগে'র কথা শোনা যায়, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রের বিশিষ্ট রচনাভঙ্গির প্রাধান্যের জন্যেই ওই দুই যুগের নামকরণ হয়েছে। বঙ্কিম-যুগের অধিকাংশ লেখকের রচনাভঙ্গির উপরেই বঙ্কিমচন্দ্রের কম-বেশি ছাপ পাওয়া যায়। রবীন্দ্র-যুগ সম্বন্ধেও ওই কথা। এখনকার কোনও লেখকই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে রবীন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গির প্রভাবের ভিতরে না গিয়ে পারেন না। কেউ কেউ পুরোদস্তুর নকলিয়া। সাহিত্যে তাঁদের ঠাঁই নেই।

কোনও লেখকই গোড়া থেকে সম্পূর্ণ নিজস্ব রচনাভঙ্গির অধিকারী হতে পারেন না, কারণ বহু সাধনার ফলে ধীরে ধীরে নিজস্ব রচনাভঙ্গি গড়ে ওঠে। এমনকী রবীন্দ্রনাথেরও প্রথম বয়সের কবিতায় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনাভঙ্গি আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু অদ্বিতীয় প্রতিভার অধিকারী বলে রবীন্দ্রনাথ খুব শীঘ্রই বিহারীলালের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। বিহারীলালের সব শিষ্য এটা পারেননি। কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের লেখায় শেষ পর্যন্ত বিহারীলালের রচনাভঙ্গি বিদ্যমান ছিল।

শরৎচন্দ্রের রচনাভঙ্গি কী-রকম? তাঁর রচনাভঙ্গি বঙ্কিমচন্দ্র কি রবীন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গির মতন অতুলনীয় ছিল না; সমসাময়িক যুগের অধিকাংশ লেখকের রচনাকে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যেমন আপন আপন রচনাভঙ্গির দ্বারা আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন, শরৎচন্দ্র সেভাবে বহু লেখককে আকৃষ্ট করে কোনও নূতন যুগসৃষ্টি করতে পারেননি। তবু তাঁর লেখবার ধরনের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা সম্পূর্ণরূপে তাঁরই নিজের জিনিস।

শরৎচন্দ্রকে দুই যুগপ্রবর্তক বিরাট প্রতিভার আওতায় কলম ধরতে হয়েছিল। প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র, তারপর রবীন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্রের প্রথম বয়সের রচনাভঙ্গির উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব বেশ স্পষ্ট। পরে বঙ্কিমের প্রভাব কমে যায় এবং রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বেড়ে ওঠে। কিন্তু কী বঙ্কিমচন্দ্র আর কী রবীন্দ্রনাথ, কেহই শরৎচন্দ্রকে বিশেষ বা সমগ্রভাবে অভিভূত করতে পারেননি। যারা রঙের কারখানায় কাজ করে তারা গায়ে মুখে জামা-কাপড়ে নানা রঙের প্রলেপ মেখে বেরিয়ে আসে বটে, কিন্তু তাই বলে কেউ তাদের চিনতে ভুল করে না—কারণ তাদের আসল চেহারা অবিকৃতই থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের কারখানায় গিয়ে শরৎচন্দ্র যে প্রথমে শিক্ষানবিসি করেছিলেন, তাঁর রচনাভঙ্গির ভিতরে কেবল সেই চিহ্নই আছে—জগতে এমন কোনও লেখক নেই, পূর্ববর্তী ওস্তাদ-লেখকের কাছ থেকে যিনি শিক্ষা গ্রহণ করেননি; আসলে শরৎচন্দ্রের সংলাপ, চরিত্র-চিত্রণ ও বর্ণনা-পদ্ধতির ভিতরে তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রভাবই বেশি। রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে শরৎচন্দ্রের যে কোনও রচনা না জানিয়ে রেখে দেওয়া হোক; যার তীক্ষ্ণদৃষ্টি আছে সে শরৎচন্দ্রের রচনাকে বেছে নিতে ভুল করবে না।

শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' 'ভারতী' পত্রিকায় বেরিয়েছিল লেখকের অজ্ঞাতসারেই। কিন্তু তিনি নিজে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তারও কয়েক বছর পরে, ১৩১৩ অব্দে।

সে সময়ে মাসিক-সাহিত্যের মধ্যে প্রধান ছিল 'ভারতী' 'সাহিত্য' 'প্রবাসী' 'নব্যভারত' ও 'মানসী'। কথাসাহিত্যে তখন রবীন্দ্রনাথের বাস্তব-উপন্যাসগুলির বিপুল প্রভাব। নাট্যসাহিত্যে

তখন গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনী চলেছে; বিশেষ করে দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলি নিয়ে তখন যথেষ্ট আলোচনা হচ্ছে। কাব্যসাহিত্যে প্রধানদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল ও গোবিন্দচন্দ্র দাস এবং নবীনদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী ও করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করা যায়। নানা শ্রেণীর অন্যান্য লেখকদের মধ্যে লিপিকুশলতা, রচনাভঙ্গি ও চিন্তাশীলতার জন্যে তখন খ্যাতি অর্জন করেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরি বা বীরবল, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ লেখকের মতো শরৎচন্দ্রেরও আবির্ভাব মাসিক সাহিত্যক্ষেত্রে এবং ও-ক্ষেত্রে সম্পাদকরূপে তখন সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নাম খুব বেশি। সুরেশচন্দ্র মিষ্ট ভাষা ও বিশিষ্ট রচনাভঙ্গির জন্যেও বিখ্যাত ছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্থায়ী সাহিত্যের জন্যে তিনি বিশেষ কিছু রেখে যাননি।

খুব সংক্ষেপেই তখনকার সাহিত্যের অবস্থার ও তার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্পর্কের কথা নিয়ে আলোচনা করা হল। আমাদের স্থান অল্প, তাই এখানে বিস্তৃতভাবে কিছু বলা শোভনও হবে না। তবে আমাদের ইঙ্গিতগুলি মনে রাখলে শরৎচন্দ্রকে বোঝা হয়তো সহজ হবে।

শৈশব-জীবন (১৮৭৬-১৮৮৬)

হুগলি জেলার একটি গ্রামের নাম হচ্ছে দেবানন্দপুর। যদিও এক সময়ে দেবানন্দপুরের রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের নামের সঙ্গে জড়িত থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল, তবু একালে এ গ্রামটির নাম কিছুকাল আগে খুব কম লোকেরই জানা ছিল। কিন্তু এখন শরৎচন্দ্রের নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে দেবানন্দপুর আবার বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর সব দেশ, নগর ও গ্রাম বড়ো হয় মানুষেরই মহিমায়। কোনও বিশেষ দেশে জন্মেছে বলে কোনও মানুষ বড়ো হতে পারে না। অনেকে বড়ো হবার জন্যে বড়ো বড়ো দেশে যান। কিন্তু সত্যিকার প্রতিভাবান মানুষ নিজেই বড়ো হয়ে নিজের দেশকে বড়ো করে তোলেন।

এই দেবানন্দপুরে মতিলাল চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। মতিলাল ধনী ছিলেন না, ছিলেন তার উলটোই;—অর্থাৎ গরিব। মতিলাল ছিলেন সেকালকার অনেক ব্রাহ্মণেরই মতন নিষ্ঠাবান, কারণ বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব বেশি বিস্তৃত হতে পারেনি। এখন বিলাতি শিক্ষায় অনেকেই ব্রাহ্মণোচিত কর্তব্যের কথা ভুলে যান, কিন্তু মতিলাল নাকি এ-দলের লোক ছিলেন না। শরৎচন্দ্রের কথায় জানতে পারি, মতিলালের আর একটি গুণ ছিল তা হচ্ছে সাহিত্যপ্রীতি।

মতিলালের সহধর্মিণীর নাম ভুবনমোহিনী দেবী। এঁর কথা ভালো করে এখনও জানা যায়নি, শরৎচন্দ্রের উক্তি থেকেও তাঁর কথা জানা যায় না। তবে তাঁর সম্পর্কে-ভাই শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন

'তিনি বড়ো সাদা-মাঠা লোক ছিলেন। কিন্তু এই নিতান্ত সাদাসিধা মানুষটির অন্তরে একটি স্নেহের সমুদ্র নিহিত ছিল। তিনি কোনওদিন কাহারও সহিত সম্বন্ধের দাবির দিক দিয়া ব্যবহার করিতেন না। কর্তারা তাঁহার সেবা-ভক্তিতে মুগ্ধ ছিলেন এবং আমরা ছিলাম সেই বিশুদ্ধ স্নেহের উপাসক। আজও তাঁর কথা মনে করিতে বুকের মধ্যে চাপা ব্যথার মতো বোধ হয়—চক্ষু সরস হইয়া উঠে!'

১২৮৩ সালের ভাদ্র মাসের ৩১শে (ইংরেজি ১৮৭৬ অব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর) তারিখে মতিলালের প্রথম পুত্রলাভ হয়। এই ছেলেটিই বাংলার আদরের নিধি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গরিব হলেও প্রথম পুত্রসন্তান লাভ করে মতিলাল ও ভুবনমোহিনী যে আনন্দের আতিশয্যে খানিকটা ঘটা করে ফেলেছিলেন, এইটুকু আমরা অনায়াসেই ধরে নিতে পারি। কিন্তু শিশুর ললাটে সেদিন বিধাতা-পুরুষ গোপনে যে অক্ষয় যশের তিলক এঁকে দিয়েছিলেন, পিতা বা মাতা কেউ সেটা আবিষ্কার করতে পারেননি। এবং এই শিশু বড়ো হয়ে যখন পিতৃকুল ও মাতৃকুল ধন্য করলেন আপন প্রতিভায়, দুর্ভাগ্যক্রমে মতিলাল বা ভুবনমোহিনী সেদিন বিপুল আনন্দে পুত্রকে আশীর্বাদ করবার জন্যে সংসার-নাট্যশালায় উপস্থিত ছিলেন না!

শরৎচন্দ্রের আরও ছয়টি ভাই জন্মেছিলেন।

মধ্যমভ্রাতার নাম প্রভাসচন্দ্র। অল্প বয়সেই সন্ন্যাস-ব্রত নিয়ে রামকৃষ্ণ মঠে গিয়ে তিনি নরনারায়ণের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। সন্ন্যাসী প্রভাসচন্দ্রের নাম হয় স্বামী বেদানন্দ। ভারত, সিংহল ও ব্রহ্মের দেশে দেশে ছিল তাঁর কার্যক্ষেত্র। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন দেশে ফিরে আসেন, শরৎচন্দ্র তখন পাণিত্রাসে বাস করছেন। রুগ্নদেহ নিয়ে বেদানন্দ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আবাসে গিয়ে উঠলেন এবং শরৎচন্দ্রেরই কোলে মাথা রেখে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন। রূপনারায়ণের তীরে শরৎচন্দ্র স্বামী বেদানন্দের স্মৃতিরক্ষার জন্যে একটি সমাধিমন্দির রচনা করে দিয়েছেন এবং পাণিত্রাসে অবস্থানকালে প্রতিদিন সন্ন্যাসী-ভ্রাতার স্মৃতির তীর্থে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করতেন।

বর্তমান আছেন শরৎচন্দ্রের একমাত্র সহোদর শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্রের আগ্রহে বিবাহ করে তিনি গৃহী হয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁরও প্রথম জীবনের কিছুকাল কেটেছে ভবঘুরের মতো।

এবং শরৎচন্দ্রও প্রথম যৌবনে ছিলেন ভবঘুরের মতো। মাঝে মাঝে গৈরিক বস্ত্র পরে বেড়াতেন, সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ মতিলালের বংশে সন্ন্যাসের বীজ গুপ্ত হয়ে ছিল, তাঁর পুত্রদের সংসারের বাঁধন সহ্য হত না। এ-সবের উপরে হয়তো মতিলালের কতকটা প্রভাব ছিল।

শরৎচন্দ্রের দুই বোন—শ্রীমতী অনিলা দেবী ও শ্রীমতী মণিয়া দেবী। বড়ো বোন অনিলা দেবীর নাম নিয়েই শরৎচন্দ্র 'যমুনা' পত্রিকায় 'নারীর মূল্য' নামে বিখ্যাত রচনা প্রকাশ করেছিলেন। শরৎচন্দ্র এই বোনটির কাছে থাকতে ভালোবাসতেন। তাই অনিলা দেবীর শ্বশুরবাড়িরই অনতিদূরে পাণিত্রাসে এসে নিজের সাধের পল্লি-ভবন স্থাপন করেছিলেন। ছোটো বোন মণিয়া দেবীর শ্বশুরালয় হচ্ছে আসানসোলে।

শরৎচন্দ্রের মাতামহের নাম স্বর্গীয় কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি হালিশহরের বাসিন্দা

ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র, বিপ্রদাস ও ঠাকুরদাস। তাঁরা ভাগলপুরে প্রবাসী হয়েছিলেন। ঠাকুরদাস স্বর্গে। শরৎচন্দ্রের একমাত্র নিজের মামা বিপ্রদাস এখন পাটনায় থাকেন।

হালিশহর ও কাঁচড়াপাড়া একই জায়গার দুটি নাম। নৈহাটিও এর পাশেই। একসময় এ-অঞ্চল সাহিত্যচর্চার জন্যে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল। রামপ্রসাদ, ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি বহু বিখ্যাত সাহিত্যসেবকেরই জন্মভূমি হচ্ছে এই অঞ্চলে। শরৎচন্দ্রের মাতামহ-পরিবারেও যে সাহিত্যচর্চার বীজ ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং ওদিক থেকেও তাঁর কিছু কিছু সাহিত্যানুরাগের প্রেরণা আসা অসম্ভব নয়। প্রেরণা যে-কোনও দিক থেকে কখন কেমন করে আসে তা বলা বড়ো শক্ত। সকলের অগোচরে স্ফুলিঙ্গের মতো সে মানুষের মনে ঢোকে। তারপর যখন অগ্নিতে পরিণত হয়, সকলের চোখ পড়ে তার উপরে। তবে শরৎচন্দ্রের নিজের বিশ্বাস, তিনি পিতারই সাহিত্যানুরাগের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন।

ঠাকুরমা নাকি শরৎচন্দ্রকে অত্যন্ত আদর দিতেন, নাতির হরেকরকম দুষ্টামি দেখেও তাঁর হাসিখুশি একটুও ম্লান হত না। এবং শোনা যায় বালক শরৎচন্দ্রের দুষ্টামির কিছু কিছু পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে 'দেবদাস'-এর প্রথমাংশে। নিজের বাল্যজীবনের প্রথমাংশের কথা শরৎচন্দ্র এইভাবে বলেছেন

'ছেলেবেলার কথা মনে আছে। পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরে, ডোঙা ঠেলে, নৌকা বয়ে দিন কাটে, বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাগরেদি করি, তার আনন্দ ও আরাম যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন গামছা কাঁধে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বার হই, ঠিক বিশ্বকবির কাব্যের নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়, একটু আলাদা। সেটা শেষ হলে আবার একদিন ক্ষতবিক্ষত পায়ে নির্জীব দেহে ঘরে ফিরে আসি। আদর-অভ্যর্থনার পালা শেষ হলে অভিভাবকেরা পুনরায় বিদ্যালয়ে চালান করে দেন, সেখানে আর একদফা সংবর্ধনা লাভের পর আবার 'বোধোদয়' 'পদ্যপাঠে' মনোনিবেশ করি। আবার একদিন প্রতিজ্ঞা ভুলি, আবার দুষ্টু সরস্বতী কাঁধে চাপে। আবার সাগরেদি শুরু করি, আবার নিরুদ্দেশ যাত্রা, আবার ফিরে আসা, আবার আদর-আপ্যায়ন সংবর্ধনার ঘটা। এমনি 'বোধোদয়', 'পদ্যপাঠে'ও বাল্যজীবনের এক অধ্যায় সাঙ্গ হল।'*

এইটুকুর ভিতর থেকেই বালক শরৎচন্দ্রের অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে! তিনি সুবোধ বা শান্ত বালক ছিলেন না। লেখাপড়ায় তাঁর মন বসত না। যখন পাঠশালায় যাবার কথা, শরৎচন্দ্র তখন পাড়ার আরও কতকগুলি তাঁরই মতন 'শিষ্ট' ছেলের সঙ্গে দুপুরের রোদে হাটে-বাটে-মাঠে টো-টো করে ঘুরে বেড়াতেন, কখনও ঘাটে বাঁধা নৌকো নিয়ে নদীর জলে ভেসে যেতেন, কখনও খালে-বিলে ছিপ ফেলে মাছ ধরতেন, কখনও যাত্রার দলে গিয়ে গলা সাধতেন, আবার কখনও বা নিরুদ্দেশ হয়ে কোথায় বেরিয়ে পড়তেন এবং গুরুজনরা দিনের পর দিন তাঁর কোনও খোঁজ না পেয়ে ভেবে সারা হতেন। তারপর হঠাৎ একদিন দেখা যেত, ক্ষতবিক্ষত পায়ে, ধুলো-কাদা-মাখা গায়ে, উস্কখুস্ক চুলে দীনবেশে অপরাধীর মতো ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে! গুরুজনরা 'আদর-আপ্যায়নের পালা' শুরু করলেন—অর্থাৎ ধমক,

---

*শরৎচন্দ্রের ইংরেজিতে লেখা 'আত্মজীবনী'র অনুবাদ একাধিক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে 'বাতায়নে'র অনুবাদ গৃহীত হল।

—লেখক

গালাগালি, উপদেশ, ঘুষি চড় কানমলা—হয়তো বেত্রাঘাতও! তারপর বিদ্যালয়ে গিয়ে অনুপস্থিতির জন্যে গুরুমশাইয়ের কাছ থেকে আর একদফা 'আদর-আপ্যায়ন' লাভ! অভ্যর্থনার গুরুত্ব দেখে শরৎচন্দ্র ভয়ে ভয়ে আবার কিছুদিনের জন্যে লক্ষ্মীছেলের মতন 'বোধোদয়' খুলে বসতেন! কিন্তু মাথায় যার 'অ্যাডভেঞ্চার'-এর ঘূর্ণি ঘুরছে, ডানপিটের উদ্দাম স্বাধীনতা একবার যে উপভোগ করেছে, এত সহজে সে-ছেলের বোধোদয় হবার নয়—ঝড়কে কেউ বাক্সবন্দি করে রাখতে পারে না! গায়ের ব্যথা মরার সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মন আবার উড়ু-উড়ু করে, তখন কোথায় পড়ে থাকে 'পদ্যপাঠ'-এর শুকনো কালো অক্ষরগুলো, আর কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় গুরুজনের রক্তচক্ষুর বিভীষিকা! ইস্কুলের ঘণ্টা বাজলে পর দেখা যায়, শরৎচন্দ্র তাঁর জায়গায় হাজির নেই! শরৎচন্দ্রের প্রথম বাল্যজীবনের এই স্মৃতি থেকেই হয়তো তাঁর অতুলনীয় কথাসাহিত্যের কোনও কোনও অংশের উৎপত্তি! একটি বালিকাও নাকি দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের শৈশব লীলাসঙ্গিনী ছিল এবং তার কাহিনি তিনি পরে কোনও কোনও বন্ধুর কাছে কিছু কিছু বলেছিলেন। কিন্তু এই বালিকাটির নাম কেউ তাঁর মুখে শোনেনি। সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে পুতুলের সংসার নিয়ে এই অনামা মেয়েটির খেলা করতে ভালো লাগত না, সেও গুরুজনদের শাসন না মেনে যাত্রা করত দুর্দান্ত ছেলে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বেপরোয়া খেলার জগতে,—যেখানে প্রচণ্ড রৌদ্রে বিপুল প্রান্তর দগ্ধ হয়ে যায়, যেখানে নিবিড় অরণ্যের ভয়ভরা অন্ধকারে দিনের আলো মূর্ছিত হয়ে পড়ে, যেখানে বর্ষার ধারায় স্ফীত নদীর প্রবাহে শরৎচন্দ্রের নৌকা ঝোড়ো-হাওয়ার পাগলামির আবর্তে পড়ে দুলে দুলে ওঠে! মেয়েটির মন ছিল মেঘ-রৌদ্রে বিচিত্র,—মুখ-চোখ ঘুরিয়ে ঝগড়া করতেও জানত, আবার হেসে গায়ে পড়ে ভাব করতেও পারত। শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যেও কোনও কোনও নারী-চরিত্রের মধ্যে নাকি এই মেয়েটির ছবি আঁকা আছে, কিন্তু কোন কোন চরিত্রে তা কেউ জানে না।

এমনি বারকয়েক পলায়ন ও প্রত্যাগমনের পর মতিলাল ছেলেকে নিয়ে গ্রাম ছাড়লেন। ভাগলপুরে ছিল শরৎচন্দ্রের দূরসম্পর্কীয় মাতুলালয়। এর পরে সেইখানেই শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। তাঁর সঙ্গে আমরাও দেবানন্দপুরের কাছ থেকে বিদায়গ্রহণ করছি। দেবানন্দপুরের জল-মাটি শরৎচন্দ্রের দেহকে যেভাবে গঠিত ও পরিপুষ্ট করে তুলেছিল, তার ভিতর থেকেই ভবিষ্যতে আত্মপ্রকাশ করেন বঙ্গসাহিত্যের শরৎচন্দ্র! শিশু-শরৎচন্দ্রের কথা আরও ভালো করে জানা থাকলে তাঁর সাহিত্যজীবনের ভিত্তির কথাও আরও ভালো করে বলতে পারা যেত। কিন্তু শিশু-শরৎচন্দ্রকে সজ্ঞানে দেখেছে এমন কোনও লোকও আজ বর্তমান নেই এবং গরিব বামুনের এক দুরন্ত ছেলের ভাবপ্রবণতার ভিতর থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু আবিষ্কার করবার আগ্রহও কারুর তখন হয়নি। দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন।

দেবানন্দপুর থেকে বিদায় নিচ্ছি বটে, কিন্তু কিছুকাল পরে শরৎচন্দ্রকে আবার কিছুদিনের জন্যে দেবানন্দপুরে ফিরতে হয়েছিল। তখন ভাগলপুর থেকে তিনি বালকের পক্ষে অপাঠ্য পুস্তক পাঠের ঝোঁক নিয়ে এসেছেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলছেন

'কিন্তু এবারে আর 'বোধোদয়' নয়, বাবার ভাঙা দেরাজ খুলে বার করলাম 'হরিদাসের গুপ্তকথা'। আর বেরোল 'ভবানী পাঠক'। গুরুজনদিগের দোষ দিতে পারিনে, স্কুলের পাঠ্য

তো নয়, ওগুলো বদছেলের অপাঠ্য পুস্তক। তাই পড়বার ঠাঁই করে নিতে হল আমাকে বাড়ির গোয়ালঘরে। সেখানে আমি পড়ি, তারা শোনে। এখন আর পড়িনে, লিখি। সেগুলো কারা পড়ে, জানিনে। একই স্কুলে বেশি দিন পড়লে বিদ্যা হয় না, মাস্টারমশাই একদিন স্নেহবশে এই ইঙ্গিতটুকু দিলেন। অতএব আবার ফিরতে হল শহরে। বলা ভালো, এর পরে আর স্কুল বদলাবার প্রয়োজন হয়নি।'

এইখানে প্রকাশ পাচ্ছে, দ্বিতীয়বার দেবানন্দপুরে এসে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ফিরেছে সাহিত্যের দিকে। তখন দেশে শিশুপাঠ্য সাহিত্য ছিল না। তাই শরৎচন্দ্রের মতো আরও বহু বিখ্যাত সাহিত্যিককেই প্রথম মনের খোরাক যুগিয়েছে ওই 'হরিদাসের গুপ্তকথা' বা ওই-শ্রেণীরই পুস্তকাবলী। আরও দেখা যাচ্ছে, তখন কলম না ধরলেও নিষিদ্ধ পুস্তকের পাঠক বা কথক শরৎচন্দ্র গোয়ালঘরে কতকগুলি শ্রোতা জুটিয়েছেন। তারা কারা? হয়তো যারা স্কুলে বন্দি হওয়ার চেয়ে শরৎচন্দ্রের 'টো-টো কোম্পানি'তেই ঢুকে হাটে-মাঠে পথে-অপথে বেড়াবার জন্যে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করত। সে-দলের কারুর পাকা মাথার সন্ধান যদি আজ পাওয়া যায়, তাহলে শরৎচন্দ্রের দুর্লভ বাল্যজীবনের বহু উপকরণই সংগৃহীত হতে পারে। আশা করি, শরৎচন্দ্রের বৃহত্তর জীবনীর লেখক এ-চেষ্টা করতে ভুলবেন না।

দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের পৈতৃক বাস্তুভিটা এখন অন্য লোকের হস্তগত। সে ভিটার সঙ্গে তাঁর শৈশব-স্মৃতির অনেক মধুর সুখ-দুঃখ জড়িত আছে বলে পরিণত বয়সে শরৎচন্দ্র বাড়িখানি আবার কেনবার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু চেষ্টা সফল হয়নি।

বাল্যজীবন ও প্রথম যৌবন (১৮৮৬-১৮৯৬)

'এলাম শহরে। একমাত্র 'বোধোদয়'-এর নজিরে গুরুজনেরা ভর্তি করে দিলেন ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে। তার পাঠ্য—'সীতার বনবাস', 'চারুপাঠ', 'সদ্ভাব-সদগুরু' ও মস্ত মোটা ব্যাকরণ। এ শুধু পড়ে যাওয়া নয়, মাসিকে সাপ্তাহিকে সমালোচনা লেখা নয়, এ পণ্ডিতের কাছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিদিন পরীক্ষা দেওয়া। সুতরাং অসঙ্কোচে বলা চলে যে, সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটল চোখের জলে। তারপরে বহু দুঃখে আর একদিন সে মিয়াদও কাটল। তখন ধারণাও ছিল না যে মানুষকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোনও উদ্দেশ্য আছে।'

ভাগলপুরের বাংলা ইশকুলে ঢুকে শরৎচন্দ্রের মনের ভাব হয়েছিল কী রকম, তাঁর উপর-উদ্ধৃত উক্তি থেকেই সেটা বোঝা যাবে। ছাত্রবৃত্তি কেলাসে ভর্তি হয়ে শরৎচন্দ্র আবিষ্কার করলেন তাঁর সহপাঠীরা তাঁর চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর। কিন্তু জীবনে বা সাহিত্যে কারুর পিছনে পড়ে থাকবেন, এটা বোধহয় তাঁর ধাতে ছিল অসহনীয়। লেখাপড়ায় তখনই তাঁর ঝোঁক হল। একাগ্র মনে বিদ্যাচর্চা করে অল্পদিনের ভিতরেই তিনি তাঁর সহপাঠীদের নাগাল ধরে ফেললেন।

স্বগ্রাম ছেড়ে এত দূরে দূরসম্পর্কীয় মামার বাড়িতে থেকে বিদ্যাশিক্ষা করার একটা প্রধান কারণও বোধহয় শরৎচন্দ্রের দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্যের ভিতর দিয়েই শরৎচন্দ্রের যৌবনের

অনেকখানি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং পরে আমরা দেখব যে, শরৎচন্দ্রের ওই দারিদ্র্যের জন্যে বাংলা সাহিত্যও কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ছাত্রবৃত্তি কেলাসে শরৎচন্দ্র ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের দুষ্টবুদ্ধি সম্বন্ধে একটি মজার গল্প আছে। ইশকুলের যে ঘড়ি দেখে ছুটি দেওয়া হত, শরৎচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীরা রোজ কাঁধাকাঁধি করে দেওয়ালের উপরে উঠে সেই বড়ো ঘড়িটার কাঁটা এত এগিয়ে দিতেন যে, অনেক সময়ে প্রধান শিক্ষক সেই বেঠিক ঘড়িকে বিশ্বাস করে এক ঘণ্টা আগেই ইশকুল বন্ধ করতে বাধ্য হতেন। শেষে যেদিন ছেলেরা ধরা পড়ল, সেদিন কিন্তু দোষীদের দলে শরৎচন্দ্রকে আবিষ্কার করা যায়নি। তিনি অভিমন্যু-জাতীয় বালক ছিলেন না, বিপদের মুহূর্তে ব্যূহভেদ করে সরে পড়তে পারতেন যথা সময়ে!

শরৎচন্দ্র ভাগলপুরের যে বাংলা ইশকুলে ঢুকে ১৮৮৭ অব্দে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, সেটি নাকি এখনও বিদ্যমান। এর পর তিনি ওখানকারই তেজনারায়ণ জুবিলি কলিজিয়েট ইশকুলে ভর্তি হন। ওখানে গিয়ে নাকি তাঁর পড়াশুনায় মতি হয়েছিল, কারণ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' খবর দিয়েছেন, 'তিনি অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষকগণের প্রিয় হইয়া উঠেন। মনোযোগী ছাত্র হিসাবে তাঁহার বেশ সুনাম ছিল।' 'ভারতবর্ষ'-এর সংক্ষিপ্ত জীবনীতে প্রকাশ

'এনট্রান্স পাস করিয়া সেই ইশকুলেরই সংযুক্ত কলেজে এফ-এ পড়িতে থাকেন। কিন্তু পরীক্ষার পূর্বে মাত্র ২০ টাকা ফি দিতে না পারিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া তিনি প্রতিদিন চৌদ্দ ঘণ্টা করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিবেন। সেই প্রতিজ্ঞা তিনি পালন করিয়াছিলেন।'

কুড়ি টাকার অভাবে তাঁর লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়ার কথা আরও অনেকেই লিখেছেন। কিন্তু এ-কথার প্রতিবাদও বেরিয়েছে। তিনি নাকি চাকরি করে পিতার অর্থকষ্ট দূর করবার জন্যেই কলেজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন ১৮৯৪ অব্দে, সতেরো বৎসর বয়সে। কলেজ ছাড়বার কিছু পরেই (১৮৯৬) তিনি মাতৃহীনা হন।

ইশকুলের কেলাসে শরৎচন্দ্রের পাঠ্যপুস্তকভীতি হয়তো দূর হয়ে গিয়েছিল, হয়তো তিনি 'গুড বয়' খেতাবও পেয়েছিলেন। কিন্তু ইশকুলের বাইরে খেলাধূলার উৎসাহ তাঁর কিছুমাত্র কমেনি এবং এ-বিভাগে তাঁর দক্ষতাও ছিল নাকি যথেষ্ট। দল গড়ে নিজে দলপতি হবার শক্তিও যে তাঁর হয়েছিল, সে পরিচয়ও আছে। তাঁর মাতুল-সম্পর্কীয় বন্ধু ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন

'শৈশবে আমরা শরৎকে আমাদের খেলার দলের দলপতিরূপে পাইয়াছিলাম। ডাকাতের দলের সর্দারের দোষগুণ বিবৃতিতে সিক্ত হৃদয় যেমন যুগপৎ আনন্দে বিষাদে মথিত হইয়া ওঠে,—আজও আমাদের দলপতির কথা স্মরণ করিলে অন্তরের মধ্যে তেমনি হয়, ব্যথার সুর বাজিতে থাকে। একদিকে ইস্পাতের মতন কঠিন—অন্যদিকে নবনীকোমল। অন্যায়কে পদদলিত করিবার দুর্ধর্ষ সংকল্প, আবার দুর্বলের পরম কারুণিক আশ্রয়দাতা। বালক শরৎ রুদ্রতায় বজ্রের মতোই কঠোর ছিল। সময় সময় মনে হইত সে হৃদয়হীন। যাহারা সেই দিকের পরিচয় পাইল তাহারা তাহার শত্রুই রহিয়া গেল; কিন্তু অশেষ স্নেহভাজনের দলের তো অভাব নাই।'

পরের জীবনেও তাঁর এই স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। কোনওদিনই তিনি কোনও দলে মিশে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানে অবস্থান করাটা পছন্দ করতেন না। এমনকী যে দলে তাঁর সমবয়সীর সংখ্যাই বেশি, সেখানেও যৌবন উত্তীর্ণ হবার আগেই শরৎচন্দ্র নিজেকে 'বুড়ো' বলে মুরুব্বিয়ানা করতে ভালোবাসতেন এবং দলপতি হবার কোনও কোনও গুণও তাঁর ছিল।

ভাগলপুরে গিয়েও অন্যান্য খেলাধূলার সঙ্গে থিয়েটারের আকর্ষণও তিনি এড়াতে পারেননি। কেউ কেউ লিখেছেন, তিনি নিজেও নাকি ভালো থিয়েটারি অভিনয় করতে পারতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী'তে তিনি নাকি একটি নারী-ভূমিকায় গানে ও অভিনয়ে সুনাম কিনেছিলেন! থিয়েটারে শখের অভিনয় করবার জন্যে হয়তো শরৎচন্দ্রের আগ্রহের অভাব ছিল না, হয়তো কোনও কোনও দলে গিয়ে ছোটোখাটো ভূমিকায় তিনি মহলাও দিয়েছেন, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে রঙ্গমঞ্চে নেমে অভিনয় করে তিনি অতুলনীয় নাম কেনেননি নিশ্চয়ই। কারণ ও-বিভাগে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন 'রাজু'! তার কথা পরে বলব।

তাঁর নিজের মুখে আমরা এই গল্পটি শুনেছি 'শখের থিয়েটারে স্টেজে উঠে যেদিন প্রথম কথা কইবার সুযোগ পেলুম, সেদিন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারিনি। আমার পার্টে কথা ছিল মোটে এক লাইন! আর-একটি ছেলের সঙ্গে আমি স্টেজে নামলুম। আগে তারই পার্ট বলবার কথা। কিন্তু সে তো নিজের পার্ট বললেই, তার উপরে আমি মুখ খোলবার আগেই আমার জন্যে নির্দিষ্ট এক লাইন কথাও অম্লানবদনে বলে গেল। আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলুম।'

দুঃসাহসী ডানপিটে ছেলের যেসব খেলা, ভাগলপুরে গিয়ে বিদ্যাচর্চার অবকাশে সর্দার শরৎচন্দ্র তাঁর দুরন্ত ছেলের দলটি নিয়ে সেই সব খেলাতেও যে মেতে উঠতেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। এই খেলার জগতে তিনি এক নূতন সঙ্গী ও বড়ো বন্ধুও লাভ করলেন। ছেলেটির নাম রাজু বা রাজেন্দ্র এবং সর্দারিতে তার আসন বোধ হয় শরৎচন্দ্রেরও উপরে ছিল। শরৎ ও রাজুর নায়কতায় যে দুষ্ট ছেলের দলটি ভাগলপুরের আকাশ বাতাস ও গঙ্গাতটকে মুখর করে তুলত, তখনকার বয়োবৃদ্ধদের পক্ষে তারা যে যথেষ্ট দুর্ভাবনার কারণ হয়ে উঠেছিল, এটুকু বুঝতে বেশি কল্পনাশক্তির দরকার হয় না। এই রাজু হচ্ছে একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক চরিত্র। গুণ্ডামি, ফুটবল-খেলা, ঘুড়ি-উড়ানো, সাঁতার, জিমনাস্টিক, হাতের লেখা, ছবি-আঁকা, পড়াশুনো, বাঁশি হারমোনিয়াম বাজানো, গান-গাওয়া ও অভিনয় প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ে রাজু ছিল অদ্বিতীয় প্রতিভার অধিকারী। বাল্যবয়সেই তার সাহস ও তেজের অসাধারণতা ছিল বিস্ময়কর! ভাগলপুরের এক সাহেবের শখের আমোদ ছিল, কালা-আদমির পৃষ্ঠদেশে চাবুক চালনা! ইশকুলের জনৈক মাস্টার বারংবার তাঁর বিলাতি চাবুকের আদরে কাতর হয়ে শেষটা রাজুর আশ্রয় গ্রহণ করলেন। রাজু তখনই তার দলবল নিয়ে ছুটে গিয়ে সাহেবের টমটম-সুদ্ধ ঘোড়াকে দড়ির ফাঁদে বন্দি করে সেই শ্বেতাঙ্গ অবতারকে এমন শিক্ষা দিয়ে এল যে, তারপর থেকে শখের চাবুক-চালনা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। পরিণত বয়সে শরৎচন্দ্র নাকি তাঁর 'শ্রীকান্ত'-এর ইন্দ্রনাথ চরিত্রে বাল্যবন্ধু রাজুকে অমর করে রাখবার চেষ্টা করেছেন। এ কথা সত্য হলে মানতে হয়, রাজুর ভিতরে অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অভাব ছিল না। এবং সে রাজু আজ কোথায়? ইহলোকে, না পরলোকে? তবে এইটুকু মাত্র জানা গিয়েছে যে,

রাজুর মনে তরুণ বয়সেই বৈরাগ্যের উদয় হয়েছিল। গঙ্গার তীরে নির্জন শ্মশানে গিয়ে সে ধ্যানস্থ হত, উপবাস করত, শিশু ছাড়া আর কারুর সঙ্গে কথাবার্তা কইত না এবং স্বচক্ষে 'ঈশ্বরের জ্যোতি' দেখে খাতায় তা এঁকে রাখত! তারপর একদিন সে ভাগলপুর থেকে অদৃশ্য হল এবং আজও তার সন্ধান কেউ জানে না। হয়তো রাজু আজ সন্ন্যাসী।

এই সময়েই বোধহয় শরৎচন্দ্র নিজের অজ্ঞাতসারেই ললিতকলার নানা বিভাগের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। জড় লোহা নিশ্চয়ই জানে না, চুম্বক তাকে আকর্ষণ করে। ভবিষ্যতে যে শিল্পী হবে, তরুণ বয়সে সেও নিশ্চয় শিল্পী বলে নিজেকে চিনতে পারে না। তবু তার মনের গড়ন হয় এমনধারা যে, আর্ট তার মনকে টানবেই। এমনকী আর্টের যেসব বিভাগ পরে তার নিজের বিভাগ হবে না, সেসব ক্ষেত্রেও সে প্রাণের সাড়া পায়; কারণ সব আর্টেরই মূলরস হচ্ছে এক।

যাত্রা-থিয়েটারের দিকে শরৎচন্দ্রের ঝোঁক ছিল, কারণ ওটা হচ্ছে আর্টেরই আসর। তিনি নিজে বিখ্যাত অভিনেতা না হলেও পরে বাংলাদেশের নাট্যকলা তাঁরই কথাসাহিত্যকে বিশেষ ভাবে অবলম্বন করে অল্প পুষ্টিলাভ করেনি। এবং সে-হিসাবে তাঁকে অনায়াসেই নাট্যজগতের একজন বলে ধরে নেওয়া যায়। তারপর ভাগলপুরেই হয়তো শরৎচন্দ্রের সঙ্গীতকলার প্রতি অনুরাগ হয়। তিনি নিয়মিতভাবে কণ্ঠসাধনা করেছিলেন বলে প্রকাশ নেই; কিন্তু আমরা স্বকর্ণে শুনে জেনেছি যে, শরৎচন্দ্র ঈশ্বরদত্ত সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তিনি নিজের চেষ্টায় শুনে এমন গান শিখেছিলেন এবং সে গান এমন কৌশলে গাইতে পারতেন যে, শ্রোতারা তন্ময় হয়ে শুনত। যন্ত্রসঙ্গীতেও তাঁর হাত ছিল বলেই শুনেছি। এবং কিছু কিছু ছবি আঁকতেও পারতেন। (পাঠকরা লক্ষ করলে দেখবেন, রাজুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মিল ছিল কতখানি!) সাহিত্যক্ষেত্রে না এলে শরৎচন্দ্র পরে হয়তো শ্রেষ্ঠ গায়ক, বাদক বা চিত্রকররূপে আত্মপ্রকাশ করতেন; কারণ যথার্থ কলাবিদের স্বভাব নয় চিরদিন আত্মগোপন করে থাকা; আর্টের কোনও-না-কোনও পথ বেছে নিয়ে একদিন-না-একদিন তিনি বাইরে বেরিয়ে পড়বেনই। ব্রাহ্মণের গায়ত্রী মন্ত্রের মতো লুকিয়ে রাখবার জিনিস নয় আর্ট।

এবং ইতিমধ্যে অতি গোপনে চলছিল সাহিত্যচর্চা। মাতুলালয়ে থেকে শরৎচন্দ্র কেবল নিজেই লেখাপড়া করতেন না, বাড়ির ছেলেমেয়েদের পড়ানোরও ভার ছিল তাঁর উপরে। এ-সবের পালা চুকিয়ে গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলত তাঁর সাহিত্যের অনুশীলন।

শরৎচন্দ্র পরে একাধিক বন্ধুর কাছে বলেছেন : 'আমি অনেক দলে গিয়ে মিশেছি, অনেক ভালো-মন্দ সাধারণ লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, কিন্তু কোথাও আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলিনি। সর্বদাই আমার মনে হয়েছে, আমি ওদের কেউ নই!'...এই যে মনে মনে নিজেকে আলাদা করে রাখা, এটা হচ্ছে বড়ো কলাবিদের লক্ষণ। দেবানন্দপুরের গরিবের ঘরের দামাল ছেলে শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে এসে উচ্চতর কর্তব্যসাধনের জন্য নিজেকে যদি আলাদা করে না রাখতে পারতেন, তাহলে তাঁকেও আজ যবনিকার অন্তরালে বাস করতে হত। যে নদী সমুদ্রের ডাক শুনেছে, মাঝপথে নিজের শাখা-প্রশাখাকে অবলম্বন করে সমস্ত জলধারা সে নিঃশেষিত করে ফেলে না, তার প্রধান গতি হবে সমুদ্রের দিকেই। লোকে যাকে কবিতা বলে শরৎচন্দ্র তেমন কবিতা কখনও লেখেননি বটে, কিন্তু তাঁর গদ্যরচনার মধ্যে

কাব্যসৌন্দর্যের অভাব নেই কিছুমাত্র। অতি তরুণ বয়সেই—ভাগলপুরে থাকতেই—তাঁর চিত্ত যে কাব্যরসে স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছিল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবন বর্ণনা করতে গিয়ে তার সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন :

'ঘোষেদের পোড়োবাড়ির একধারে উত্তরদিকে গঙ্গার উপরেই একটা ঘরের পিছনে কয়েকটা নিম আর দাঁতরাঙ্গা গাছে একটুখানি ছোটো জায়গাকে অন্ধকারে নিবিড় করিয়া রাখিয়াছিল। নিমের গোলঞ্চ মদনের কাঁটা-লতা চারিদিক হইতে এই স্থানটিকে এমনভাবে বেড়িয়া থাকিত যে, তাহার মধ্যে মানুষ প্রবেশ করিতে পারে এ বিশ্বাস বড়ো কেহ করিতে পারিত না। এক একদিন দলপতি কোথাও উধাও হইয়া যাইত; জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, 'তপোবনে ছিলাম।'

'হঠাৎ একদিন আমার সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল বোধ করি। আমাকে 'তপোবন' দেখানো হইবে জানিতে পারিয়া আমার হৃদয় আনন্দে গুরগুর করিতে লাগিল। কিন্তু অবশেষে শরৎ বলিল, 'তুই যদি আর কাউকে বলে দিস?' পূর্বদিকে ফিরিয়া সূর্য সাক্ষ্য করিয়া বলিলাম, 'কাউকে বলব না।' কিন্তু তাহাতে সে নিরস্ত হইল না, বলিল 'উত্তরদিকে ফের, ফিরে গঙ্গা আর হিমালয়কে সাক্ষ্য করে বল।' তাহাও করিলাম। তখন সে আমাকে সঙ্গে করিয়া অতি সন্তর্পণে লতার পর্দা সরাইয়া একটি সুপরিচ্ছন্ন জায়গায় লইয়া গেল। সবুজ পাতার মধ্যে দিয়া সূর্যের কিরণ প্রবেশ করার জন্য একটা স্নিগ্ধ হরিতাভ আলোয় সেই জায়গা চক্ষু ও মনকে নিমেষে শান্ত করিয়া স্বপ্নলোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। প্রকাণ্ড একখানা পাথরের উপর উঠিয়া বসিয়া সে স্নেহভরে ডাক দিল—'আয়।' তাহার পাশে বসিয়া নীচে চাহিয়া দেখিলাম—খরস্রোতা গঙ্গা বহিয়া চলিয়াছে। দূরে—গঙ্গার ও-পারে—নীলাভ গাছপালার ধোঁয়াটে ছবি পাতার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায়। শীতল বাতাস ঝিরঝির করিয়া বহিতেছিল। সে বলিল, 'এইখানে বসে বসে আমি সব বড়ো বড়ো কথা ভাবি।' উত্তরে বলিলাম,—'তাইতে বুঝি তুমি অঙ্কেতে একশোর মধ্যে একশোই পাও?' সে অবজ্ঞাভরে বলিল,—'দূৎ।'

ফিরিবার সময় সে বলিল, 'কোনওদিন এখানে একলা আসিসনে—'

'কেন?'—

'ভয় আছে।'—

'ভূত?'—

সে গম্ভীর স্বরে বলিল, 'ভূত-টুত কিছু নেই।'

'তবে?'—

'এখেনে সাপ থাকে।'

এর আগেই আমরা দেখিয়েছি, ইতিমধ্যে একবার দেবানন্দপুরে গিয়ে শরৎচন্দ্র ইশকুলের বই ফেলে লুকিয়ে 'হরিদাসের গুপ্তকথা' ও 'ভবানী পাঠক' (ওদের লেখক ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় এক সময়ে বাঙালি পাঠকের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক ছিলেন এবং তাঁর একটি নিজস্ব 'স্টাইল'ও ছিল) প্রভৃতি পড়তে শুরু করে সাহিত্যচর্চার একটি পিচ্ছল সোপানের উপরে উঠেছেন। তারপরের কথাও শরৎচন্দ্রের নিজের মুখেই শুনুন

'এইবার খবর পেলুম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাস সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে তখন ভাবতেও পারতাম না! পড়ে পড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল। বোধ হয় এ আমার

একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি তা নয়। লেখার দিক দিয়ে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু চেষ্টার দিক দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।'

দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর মহিমায় শরৎচন্দ্রের নিজেরও লেখনী ধারণের লোভ হয়েছে! এইভাবে তরুণ বয়সে বঙ্কিমের কত পাঠক যে লেখকে পরিণত হয়েছে, তার খবর কেউ রাখে না! বঙ্কিমের লেখায় যে-যাদু আছে, শরৎচন্দ্র যে তার দ্বারা কতখানি অভিভূত হয়েছিলেন সেটাও লক্ষ করবার ও স্মরণ রাখবার বিষয়। শেষ-জীবন পর্যন্ত বঙ্কিমের প্রভাব যে তিনি ভুলতে পারেননি, সে ইঙ্গিতও আছে। অতঃপর শুনুন

'তারপরে এল 'বঙ্গদর্শন'-এর নব-পর্যায়ের যুগ। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' তখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির যেন একটা নূতন আলো এসে চোখে পড়ল। সেদিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ স্মৃতি আমি কোনওদিন ভুলব না। কোনও কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে পায়, এর পূর্বে কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিন শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম। অনেক পড়লেই যে তবে অনেক পাওয়া যায়, এ-কথা সত্য নয়। ওই তো খানকয়েক পাতা, তার মধ্য দিয়ে যিনি এত বড়ো সম্পদ আমার হাতে পৌঁছে দিলেন, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়?'

শরৎচন্দ্র ভাষা ও রচনা পদ্ধতির জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী বটে, কিন্তু নিজের লেখনীধারণের গুপ্তকথা এইভাবে তিনি ব্যক্ত করেছেন

'আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটেনি। পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকারসূত্রে আর কিছুই পাইনি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল—আমি অল্প বয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলাম। আর পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভরে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম। আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনওটাই তিনি শেষ করতে পারতেন না। তাঁর লেখাগুলি আজ আমার কাছে নেই—কবে কেমন করে হারিয়ে গেছে সেকথা আজ মনে পড়ে না। কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে, ছোটোবেলায় কতবার তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। কেন তিনি এগুলি শেষ করে যাননি এই বলে কত দুঃখই না করেছি। অসমাপ্ত অংশগুলি কী হতে পারে ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। এই কারণেই বোধহয় সতেরো বৎসর বয়সের সময় আমি লিখতে শুরু করি।'

যদি শরৎচন্দ্রের স্মৃতির উপরে নির্ভর করি তাহলে বলতে হয় ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কোনও সময়ে, পিতার অসমাপ্ত রচনাগুলি শেষ করবার আগ্রহে সর্বপ্রথমে তিনি কলম ধরেন এবং সম্ভবত তখন তিনি ইশকুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়েন, কারণ শরৎচন্দ্র ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন বলে প্রকাশ। শরৎচন্দ্র প্রকাশ্য সাহিত্যক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর প্রথম লেখনীধারণ ও আত্মপ্রকাশের মাঝখানে কেটে গিয়েছে প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসর।

যাঁরা বলেন শরৎচন্দ্র ধূমকেতুর মতো জেগে একেবারে সাহিত্যগগনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলেন, তাঁরা ভ্রান্ত। দীর্ঘকাল ধরে প্রস্তুত না হলে ও সাধনা না করলে সাহিত্যিক-শ্রেষ্ঠতা লাভ করা যায় না। শরৎচন্দ্র সকলের চোখের সামনে ধীরে ধীরে পরিপূর্ণতা লাভ করেননি, অধিকাংশ সাহিত্যিকের—এমনকী বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথেরও সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পার্থক্য হচ্ছে এইখানে। এই সুদীর্ঘ-কালের মধ্যে শরৎচন্দ্র কখনও ভেবেছেন, কখনও কলম ধরেছেন এবং কখনও কলম ছেড়ে পড়েছেন—অর্থাৎ সাহিত্যের ও আর্টের অনুশীলন করেছেন এবং সেটাও চরম আত্মপ্রকাশের জন্যে প্রস্তুত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়! হেটো আর বোকা লোকেই বলবে, শরৎচন্দ্র কলম ধরেই সাহিত্য-রাজ্য জয় করে ফেললেন। আসলে যা বাইরের নয়, যা অন্তরের সত্য, শরৎচন্দ্র নিজেই তা এইভাবেই প্রকাশ করেছেন

'এর পরই সাহিত্যের সঙ্গে হল আমার ছাড়াছাড়ি, ভুলেই গেলাম যে জীবনে একটা ছত্রও কোনওদিন লিখেছি। দীর্ঘকাল কাটল প্রবাসে—ইতিমধ্যে কবিকে কেন্দ্র করে কী করে যে নবীন বাংলা সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভরে উঠল আমি তার কোনও খবরই জানিনে। কবির সঙ্গে কোনওদিন ঘনিষ্ঠ হবারও সৌভাগ্য ঘটেনি, তাঁর কাছে বসে সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণেরও সুযোগ পাইনি, আমি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন। এইটা হল বাইরের সত্য, কিন্তু অন্তরের সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল, কবির খানকয়েক বই—কাব্য ও কথাসাহিত্য। এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ওই কখানা বইই বারবার করে পড়েছি; —কী তার ছন্দ, কটা তার অক্ষর, কাকে বলে Art, কী তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোথায়ও কোনও ত্রুটি ঘটেছে কি না—এসব বড়ো কথা কখনও চিন্তাও করিনি—ওসব ছিল আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হতেই পারে না। কী কাব্যে, কী কথাসাহিত্যে, আমার এই ছিল পুঁজি।'

এইটুকুর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শরৎচন্দ্র কেবল নিজের অপরিশোধ্য ঋণস্বীকারই করেননি, প্রকাশ করেছেন যে, দীর্ঘকাল প্রবাসে থেকেও এবং লেখনী ত্যাগ করেও 'পূর্ণতর সৃষ্টি'র জন্যে মনে মনে তিনি প্রস্তুত হয়ে উঠছিলেন। ১৩১৯ সালে কেউ কেউ দৈবগতিকে তাঁর আত্মপ্রকাশের উপলক্ষ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা না থাকলেও শরৎচন্দ্র আর বেশি দিন আত্মগোপন করতে পারতেন না। বড়ো নদীর স্রোতকে কেউ চারিদিকে পাথরের পাঁচিল তুলে একেবারে রুদ্ধ করতে পারে না। যত উঁচু পাঁচিলই তোলো, দুদিন পরে নদী বাধা ছাপিয়ে উপচে পড়বেই।

রবীন্দ্র-প্রতিভাকেই আদর্শরূপে সামনে রেখে শরৎচন্দ্র স্বদেশে ও প্রবাসে সাহিত্যসাধনা করেছিলেন। এ আদর্শ তাঁর সুমুখ থেকে কখনও সরে গিয়েছিল বলে মনে হয় না, শরৎচন্দ্রের পরিণত বয়সেও তাঁর রচনার ভাষা ও চরিত্রসৃষ্টির উপরে রবি-করের লীলা দেখা যায়। যখন বাংলার জনসাধারণের মাঝখানে তাঁর আসন সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে, যখন তাঁর অনেক শ্রেষ্ঠ রচনা বাইরের আলোকে এসেছে, তখনও (১৫-১১-১৯১৫) একখানি পত্রে তিনি তাঁর কোনও বন্ধুকে লিখেছিলেন

'আমি আবার একটা গল্প (উপন্যাস?) লিখছি। ...এ গল্পটা গোরার 'পরেশবাবু'র ভাব নেওয়া। অর্থাৎ নিজেদের কাছে বলতে 'অনুকরণ' তবে ধরবার জো নেই।'

সুতরাং একথা স্বীকার করতেই হবে, সমগ্রভাবে না হোক, আংশিক ভাবেও শরৎ-সাহিত্যের উৎস খুঁজলে রবীন্দ্র-সাহিত্যকেই দেখা যাবে।

শরৎচন্দ্র যৌবনের প্রথমেই লেখকের আসনে এসে বসলেন। সেই সময়ে বা তার কিছু আগে-পরে শরৎচন্দ্র নিজের চারিপাশে কয়েকটি তরুণকে নিয়ে একটি লেখকগোষ্ঠী গঠন করে নিয়েছিলেন এবং তাঁদের দলপতির আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন নিজেকেই। তাঁদের অধিকাংশই এখন বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত হয়েছেন, যেমন—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী, শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, স্বর্গীয় গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যোগেশ মজুমদার, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট প্রভৃতি। (যদিও সৌরীন্দ্রমোহন ও উপেন্দ্রনাথকে ভাগলপুরের 'সাহিত্য সভা'র নিয়মিত সভ্য না বলে 'ভবানীপুর সাহিত্য সমিতি'র সভ্য বলাই উচিত। সৌরীন ছিলেন কলকাতার ছেলে।)

তখনকার দিনের ওই তরুণের দল নিয়মিতভাবে যে-আসরে এসে সমবেত হতেন তার নাম ছিল নাকি 'সাহিত্য সভা'। যাঁরা প্রথম সাহিত্য-সেবাকেই জীবনের ব্রত করে তুলতে চান, তাঁদের পক্ষে এরকম আসরের দরকার হয় সত্য-সত্যই। এসব আসরে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনার ফলে পাওয়া যায় সাহিত্যসৃষ্টির জন্যে নব নব প্রেরণা। উক্ত সভার মুখপত্রের মতন ছিল একখানি হাতে-লেখা মাসিকপত্র, নাম 'ছায়া'। শ্রীমতী অনুরূপা দেবী আর একখানি পত্রিকার নাম করেছেন—'তরণী'। কিন্তু এই 'তরণী' আত্মপ্রকাশ করে কলকাতার ভবানীপুরে। এবং তার নিয়মিত লেখক ছিলেন শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সেন (সেন ব্রাদার্স), ও শ্রীযুক্ত শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। 'ছায়া' ও 'তরণী' ছিল পরস্পরের প্রতিযোগী। ডাকযোগে তারা কলকাতা থেকে ভাগলপুরে কিংবা ভাগলপুর থেকে কলকাতায় আনাগোনা করত এবং 'ছায়া' করত 'তরণী'র লেখার উত্তপ্ত ও সুতিক্ত সমালোচনা এবং 'তরণী'তে 'ছায়া'র লেখা সম্বন্ধে যেসব মতামত থাকত তারও তীব্রতা কম ধারালো ছিল বলে মনে করবার কারণ নেই। 'ছায়া'র সযত্নে বাঁধানো খাতা পরে 'যমুনা'র খোরাক জোগাবার জন্যে নিঃশেষে আত্মদান করেছিল। প্রতিযোগী 'তরণী' এখন আর কল্পনাসায়রে ভাসে না বটে, কিন্তু তার কিছু-কিছু নমুনা নাকি আজও পাওয়া যায়।

হাতে-লেখা পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের প্রথম বয়সের অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। 'বাগান' নামে অন্য খাতায় অন্যান্য রচনাও তোলা ছিল। কী কী রচনা, তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায়নি, নানা জনে নানা লেখার নাম উল্লেখ করেছেন, হয়তো নামের তালিকা নির্ভুল নয়। বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে আমরা এতগুলি লেখার নাম পেয়েছি : 'কাক-বাসা', 'অভিমান', ('ইস্টলিনে'র ছায়ানুসরণ), 'পাষাণ', (Mighty Atom-এর অনুসরণ), 'বোঝা', 'কাশীনাথ', 'অনুপমার প্রেম', 'কোরেল', 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস', 'শুভদা', 'বালা', 'শিশু', 'সুকুমারের বাল্যকথা', 'ছায়ার প্রেম', 'ব্রহ্মদৈত্য', ও 'বামন ঠাকুর' প্রভৃতি। হয়তো এদের কোনও-কোনওটি ওই হাতে-লেখা কাগজের সম্পত্তি নয়, স্বাধীন উপন্যাস বা গল্পের আকারেই আত্মপ্রকাশ করেছে। কোনও-কোনওটি হয়তো শরৎচন্দ্রের ভাগলপুর ত্যাগের পর লিখিত। দেখছি, শরৎচন্দ্রের তখনকার রচনার মধ্যে একাধিক অনুবাদও ছিল। কিন্তু পরের বয়সে

অনুবাদ-সাহিত্য সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মত পরিবর্তিত হয়েছিল। কারণ তাঁকে বলতে শোনা গেছে—'অনুবাদ করা আর পণ্ডশ্রম করা একই কথা। ও আমার ভালো লাগে না।' শরৎচন্দ্রের পূর্বোক্ত রচনাগুলির কয়েকটি পরে 'যমুনা' ও 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কোনও-কোনওটি হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে গেছে। সৌরীন্দ্রমোহন বলেন, শরৎচন্দ্র তখন নাকি এই নাম ব্যবহার করতেন—St. C. Lara অর্থাৎ St—শরৎ; C—চন্দ্র; এবং Lara অর্থে শরৎচন্দ্রের ডাকনাম 'ন্যাড়া'!—অপূর্ব ছদ্মনাম!

'কাক-বাসা' সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন

'উপন্যাস লেখার এই বোধ করি আদি চেষ্টা। এখানি পড়িবার সুযোগ ঘটে নাই, কিন্তু সে-সময় এখানি লিখিতে তাহাকে বহু সময় ব্যয় করিতে দেখিয়াছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথা দিয়া কাটিয়া যাইত—সে মহানিবিষ্ট মনে লিখিয়াই চলিয়াছে!...লেখা পছন্দ হয় নাই বলিয়া সে এই বইখানি ফেলিয়া দিয়াছিল।'

সুরেনবাবুর শেষ কথাগুলি পড়লে অধিকাংশ সাধারণ নূতন লেখকের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পার্থক্য বোঝা যায়। সাধারণত নিম্নশ্রেণীর লেখকরা নিজেদের লেখার সম্বন্ধে হন অন্ধ, তাঁদের বিশ্বাস তাঁরা যা লেখেন সবই অমূল্য রত্ন, সমজদার সুখ্যাতি না করলে তাঁদের দ্বিতীয় রিপু হয় প্রবল! কিন্তু প্রথম বয়স থেকেই নিজের রচনার ভালো-মন্দ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র ছিলেন সচেতন, যা লিখতেন তাইই তাঁর মনের মতো হত না এবং পছন্দ না হলে নির্মমভাবে তাকে ত্যাগ করতেও পারতেন! এটা হচ্ছে প্রতিভাধরের লক্ষণ, তাঁর বিচারনিপুণ মন নিজের কাজেও তৃপ্ত নয়!

আজকালকার নূতন লেখকদেরও দেখি, প্রথম লিখতে শিখেই মাসিক সাহিত্যের আসরে আত্মপ্রকাশ করবার জন্যে তাঁরা মহাব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু সব আর্টের মতন সাহিত্যের আসরেও যে শিক্ষাকাল আছে, এটা হয়তো তাঁরা বিশ্বাস করতে রাজি নন। গত-যুগের অধিকাংশ সাহিত্যিকই কোনও সদগুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ বা কোনও বড়ো আদর্শকে সামনে রেখে হাতমকশো করতেন, কাগজে কালির আঁচড় কাটতে শিখেই মাসিকপত্রের আফিসের দিকে ছুটতেন না। শরৎচন্দ্রও এই নীতি মেনে চলতেন। তাই তাঁর প্রথম জীবনের প্রত্যেক রচনার দৌড় ছিল হাতে-লেখা পত্রিকার আসর পর্যন্ত। সে-সময় তিনি যে বাতিল হবার মতন লেখা লিখতেন না তার প্রমাণ, তাঁর তখনকার অনেক লেখাই বহুকাল পরে প্রকাশ্য সাহিত্যের দরবারে এসে অসাধারণ সম্মান ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা দেখেই যে পরে তাঁর প্রথম বয়সের রচনা 'সাহিত্যে'র মতো বিখ্যাত পত্র প্রকাশ করতে রাজি হয়েছিল, তা নয়; তার মধ্যে বাস্তবিকই বস্তু ছিল। এরও প্রমাণ আছে। 'ভারতী'ও ছিল একখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা। 'ভারতী' যখন লেখকের অজ্ঞাতসারে বেছে 'বড়দিদি'কে গ্রহণ করেছিল, তখন শরৎচন্দ্র নামক সাহিত্যিকের অস্তিত্বও জনসাধারণের জানা ছিল না এবং প্রথমে শরৎচন্দ্রের নাম পর্যন্ত 'ভারতী'তে প্রকাশ করা হয়নি! তবু সাধারণ পাঠকদের উপভোগের পক্ষে 'বড়দিদি'ই হয়েছিল আশাতীতরূপে যথেষ্ট!

কিন্তু শরৎচন্দ্রের নিজের বিচারে 'বড়দিদি' প্রভৃতি তাঁর আদর্শের কাছে গিয়ে পৌঁছোতে পারেনি, তাই তখনকার মতো তারা হস্তলিখিত পত্রিকার মধ্যেই বন্দি হয়ে রইল, বন্ধুরা বহু

অনুরোধ করেও তাদের কোনওটিকে প্রকাশ্য সাহিত্যক্ষেত্রে হাজির করবার অনুমতি পেলেন না! এবং আত্মরচনা বিচার করতে বসে শরৎচন্দ্রের ভুল হয়েছিল বলেও মনে করি না। কারণ তাঁর আত্মপ্রকাশের যুগের রচনাগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই বেশ বোঝা যায় যে, প্রকাশভঙ্গি, রচনারীতি ও চরিত্র-চিত্রণের দিক দিয়ে পূর্ববর্তী গল্প বা উপন্যাসগুলি সত্য-সত্যই অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর! এ থেকেই প্রমাণিত হয়, জনসাধারণের বিচার আর শিল্পীর বিচার এক নয়।

আসল কথা, শিল্পী শরৎচন্দ্রের মনের ভিতরে সাহিত্যের সৌন্দর্য তখন পরিপূর্ণ মহিমায় বিকশিত হয়ে উঠেছে; সে আর অল্পে তুষ্ট হতে পারছে না। তিনি এমন কিছু সৃষ্টি করতে চাইছেন, তাঁর প্রাথমিক শক্তি যাকে প্রকাশ করতে অক্ষম। তাঁর সাহিত্য-সাধনার ধারা তখন যদি অব্যাহত থাকতে পারত, তাহলে অনতিকাল পরেই হয়তো বাংলাদেশে আমরা শরৎচন্দ্রের প্রকাশ্য আবির্ভাব দেখবার সুযোগলাভ করতুম। কিন্তু শরৎচন্দ্রের যে দারিদ্র্যের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, সেই দারিদ্র্যের দুর্ভাগ্যের জন্যেই তাঁকে ভাগলপুর পরিত্যাগ করতে হল। তারও পরে কিছুকাল তিনি লেখনীকে একেবারে তুলে রাখেননি বটে, কিন্তু নানাস্থানী হয়ে তাঁর নিয়মিত সাহিত্যচর্চার সুবিধা বোধহয় হত না। দারিদ্র্য বহু শিল্পীর সর্বনাশ করেছে এবং শরৎচন্দ্রের দান থেকেও দীর্ঘকাল বাংলাদেশকে বঞ্চিত রেখেছে। নইলে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর আকার আরও কত বড়ো হত কে তা বলতে পারে?

এই অধ্যায় শেষ করবার আগে মানুষ-শরৎচন্দ্রের চরিত্রের আর একদিকে একবার দৃষ্টিপাত করতে চাই। দেখি, ছেলেবেলা থেকেই তিনি কোনও একটা নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির হয়ে বেশিদিন থাকতে পারেন না। এমনকী যে-বয়সে মায়ের কোলই ছেলেদের সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়, তখনও তিনি মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়েছেন! শোনা যায়, তিনি নাকি একবার পায়ে হেঁটে পুরীতেও গিয়েছিলেন! রেঙ্গুনে পালাবার আগে তিনি যে কতবার কত জায়গায় ঘোরাঘুরি করেছেন, কারুর কাছে তার সঠিক হিসাব আছে বলে জানা নেই। এমনকী মাঝে মাঝে তিনি দস্তুরমতো সন্ন্যাসী সেজেও ডুব মেরেছেন! রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসেও তিনি তাঁর সাহিত্যিক যশের লীলাক্ষেত্র কলকাতায় দীর্ঘকাল ধরে বাস করতে পারেননি। কখনও থেকেছেন পানিত্রাসে, কখনও থেকেছেন বেনারসে, কখনও ছুটেছেন উত্তর-পশ্চিম ভারতে, শেষ-জীবনে কালাপানি লঙ্ঘন করবারও চেষ্টায় ছিলেন—বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর ঘর-পালানো মন তাঁকে 'অচলায়তনে'র মধ্যে বাঁধা পড়তে দেয়নি। এটা ঠিক প্রতিভার অস্থিরতা নয়, কারণ পৃথিবীর অনেক প্রতিভাই স্বদেশের সীমা ছাড়িয়ে বাইরে বেরুতে রাজি হয়নি। যদিও বাংলাদেশের আর এক বিরাট প্রতিভার মধ্যে বিচিত্র অস্থিরতা দেখা যায় এবং তিনি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ।

মধ্যকাল (১৮৯৭—১৯১৩)

আমরা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকেই অল্পের মধ্যে যতটা সম্ভব ভালো করে দেখতে চাই। কিন্তু এখন আমরা শরৎচন্দ্রের জীবননাট্যের যে-অংশে এসে উপস্থিত হয়েছি, সেখানে দারিদ্র্যের বেদনা, মানসিক অস্থিরতা, পিতৃশোক ও জীবনের লক্ষ্যহীনতা প্রভৃতির জন্যে কাতর এমন একটি মানুষকেই বেশি করে দেখতে পাই, যাঁর মধ্যে সাহিত্যপ্রতিভা ছাইচাপা

আগুনের মতো প্রায়-নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে। এর প্রথম দিকটায় মাঝে মাঝে অনুকূল হওয়ায় ছাই উড়ে আগুনের দীপ্তি বেরিয়ে পড়েছে, কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্যে। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র কলমের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে তুলে দেননি বটে, কিন্তু তারপরেই তাঁর লেখা-টেখা বহুকালের জন্যে ধামাচাপা পড়ে। এই সময়টায়—তাঁর নিজের কথায়—শরৎচন্দ্র ভুলে গিয়েছিলেন যে, কোনওকালে তিনি সাহিত্যসৃষ্টি করেছিলেন।

বাংলাদেশের আর কোনও সাহিত্যিক এমন দীর্ঘকাল সাহিত্যকে ভুলে থেকে আবার সহসা আত্মপ্রকাশ করে পরিপূর্ণ মহিমায় সকলকে অবাক করে দিতে পারেননি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এর তুলনা দুর্লভ। এমন সাহিত্যিকের অভাব নেই, যাঁরা প্রথম জীবনে অপূর্ব সাহিত্য-সৃষ্টির দ্বারা বিদগ্ধমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও জনতার অভিনন্দন পেয়ে আচম্বিতে সাহিত্যধর্ম ত্যাগ করে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছেন, আর দেখা দেননি। যেমন ফরাসি কবি Arthur Rimband; তাঁর সতেরো বছর বয়সের সময়ে সারা ফ্রান্স তাঁকে অতুলনীয় প্রতিভাবান বলে অভ্যর্থনা করেছিল, কিন্তু সাহিত্যসমাজের দলাদলিতে বিরক্ত হয়ে কলম ছুড়ে ফেলে দিয়ে হঠাৎ একদিন তিনি সরে পড়লেন; চলে গেলেন একেবারে আবিসিনিয়ায়; এবং বাকি জীবন ব্যবসায়ে মেতে আর কবিত্বের স্বপ্ন দেখেননি।

কিন্তু আমরা একজন কবিকে জানি, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁর তুলনা করা চলে। তিনিও জাতে ফরাসি, নাম Paul Valery। বিশ বৎসর বয়সে কবিযশোপ্রার্থী হয়ে পারি শহরে এলেন। তাঁর অসাধারণ কবিত্ব দেখে জনকয়েক রসিক সাহিত্যিক তাঁকে খুব আদর করতে লাগলেন। কিন্তু Valery কিছুদিন পরেই আবিষ্কার করলেন যে, শরীরী মানুষের পক্ষে কবিত্বের চেয়ে অভাবের তাড়না ও পেটের দায় হচ্ছে বড়ো জিনিস। তিনি ছিলেন Stephane Mallarme-র মতন সেই শ্রেণীর কবি, কবিতা পড়ে লোকে সহজে বুঝতে পেরে সুখ্যাতি করলে যাঁরা খুশি হতেন না! সুতরাং কবিতা লিখে অন্নসংগ্রহের উপায় নেই দেখে Valery হঠাৎ একদিন ডুব মারলেন!...বছরের পর বছর যায়, Valery-র কোনও পাত্তা নেই। যে দু-চারজন কবিবন্ধু তাঁকে ভোলেননি তাঁরা অবাক হয়ে ভাবেন, কবি নিরুদ্দেশ হলেন কোথায়? অদৃশ্য না হলে এতদিনে না জানি তাঁর কত যশই হত! কিন্তু কেউ খবর পেলে না যে, Valery তখন কোনও ব্যবসায়ীর সেক্রেটারিরূপে অজ্ঞাতবাস করছেন এবং অবসরকালে করছেন কাব্যের বদলে গণিতবিজ্ঞানের চর্চা!

সুদীর্ঘ বিশ বৎসর কেটে গেল! তারপর আচম্বিতে একদিন ফরাসি সাহিত্যক্ষেত্রে কবি Valery-র পুনরাবির্ভাব! এখন তিনি আধুনিক ফরাসি সাহিত্যে একজন অমর কবিরূপে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তাঁর এক টুকরো কবিতার নমুনা হচ্ছে এই

'The Universe is a blemish
In the purity of Non-being.

শরৎচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে অতটা না মিললেও, ফরাসি গল্প ও উপন্যাস লেখক গী দে মোপাসাঁর কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য। ফ্লবেয়ারের অধীনে অপূর্ব ধৈর্যের সঙ্গে দীর্ঘকাল অপ্রকাশ্যে শিক্ষানবিসি করে মোপাসাঁ একটিমাত্র গল্প নিয়ে প্রথম যেদিন আত্মপ্রকাশ করলেন, বিখ্যাত হয়ে গেলেন সেই দিনই। তারপর মাত্র দশ-বারো বৎসর লেখনী চালনা করেই

মোপাসাঁ নিজের বিভাগে বিশ্বসাহিত্যে আজও অমর এবং অদ্বিতীয় হয়ে আছেন!

সাধারণত যেসব উদীয়মান সুলেখক হঠাৎ লেখা ছেড়ে দিয়ে কার্যান্তরে মন দেন, দীর্ঘকাল পরে কলম ধরলেও অনভ্যাসের দরুন আর তাঁরা ভালো লিখতে পারেন না। সেই জন্যেই সাহিত্যক্ষেত্রে এসব লেখকের পুনরাগমন ব্যর্থ হয়ে যায়। এই শ্রেণীর একজন লেখককে আমরা বহুকাল পরে উৎসাহিত করে কলম ধরিয়েছিলুম। যে-বৎসরে 'যমুনা' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে' প্রকাশিত হয়, সেই বৎসরেই এবং ওই কাগজেই আমরা প্রকাশ করেছিলুম তাঁর একাধিক রচনা। কিন্তু ওই পর্যন্ত। তাঁর পুনরাগমন সফল হল না। অথচ পুরাতন 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি যখন সাহিত্যসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তখন সকলেই জানত, তিনি একজন খুব বড়ো লেখক হবেন। আমরা তাঁর নাম করলুম না, কারণ তিনি হয়তো এখনও ইহলোকেই বিদ্যমান।

কিন্তু আগেই দেখিয়েছি, শরৎচন্দ্র ওই-শ্রেণীর লেখকদের দলে গণ্য হতে পারেন না। সমসাময়িক সাহিত্যসমাজ থেকে নির্বাসিত ও জীবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে তিনি লেখনীত্যাগ করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর চিন্তাশীল মন নিশ্চিন্ত হয়ে থাকেনি। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের—বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের—রচনা বরাবরই তাঁর বুভুক্ষু মস্তিষ্কের খোরাক যুগিয়েছে। অর্থাৎ তিনি কলমই ছেড়েছিলেন, সাহিত্যকে ছাড়েননি। মন ছিল তাঁর সক্রিয়। এবং মনই করে সাহিত্যসৃষ্টি।

সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র যখন থেকে মানুষ শরৎচন্দ্রে পরিণত হতে বাধ্য হলেন, তাঁর তখনকার কার্যকলাপ খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হবে। বেশি কথা বলবার মালমশলাও আমাদের হাতে নেই।

নানাকারণে তাঁদের আত্মসম্মানে বারংবার আঘাত লাগায় পিতার সঙ্গে ভাগলপুর ছেড়ে শরৎচন্দ্র খঞ্জরপুর, তারপর অন্যান্য জায়গায় যান—চাকরির সন্ধানে। শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলালের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড়ো নালিশ ছিল, তিনি সাহিত্য ও শিল্পের অনুরাগী! বই পড়তে ভালোবাসেন, লেখার অভ্যাস আছে, নকশা আঁকেন, ফুলের মালা গাঁথেন, অথচ টাকা রোজগার করতে পারেন না! শ্বশুরবাড়িতে তাই গরিব ও বেকার জামাইয়ের আর ঠাঁই হল না। এবং সংসারে এইটেই স্বাভাবিক। ভাগলপুরের আত্মীয়-আলয়ে মতিলাল ও শরৎচন্দ্রের অনেক নির্যাতনের কাহিনি আমরা শুনেছি, কিন্তু এখানে তার উল্লেখ করে কাজ নেই। তার পরের কথা শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর ভাষাতেই শুনুন। তখন হাতে-লেখা খাতায় বা মাসিকপত্রে শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি রচনা পড়ে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন

'হঠাৎ একদিন আমার স্বামীর মুখে শুনিলাম, সেই অপ্রকাশিত লেখার লেখক মজঃফরপুরে আমাদের বাসায় অতিথি। আমি সে সময় ভাগলপুরে। আমার স্বামী আমার মুখেই ইতিপূর্বে শরৎবাবুর লেখার প্রশংসা শুনিয়াছিলেন, তাই নাম জানিতেন। মজঃফরপুরে আমার সম্পর্কিত একটি দেবর ছিলেন। গান-বাজনায় তাঁর খুব শখ ছিল। তিনি একদিন আসিয়া বলেন, 'একটি বাঙালি ছেলে অনেক রাত্রে ধর্মশালার ছাদে বসিয়া গান গায়, বেশ গায়; অবশ্য পরিচয় নিতে যাওয়ায় নিজেকে বেহারি বলেই পরিচয় দিলেন; কিন্তু লোকটি বাঙালিই, একদিন গান শুনবে? নিয়ে আসব তাকে?'

'বাড়িতে সন্ধ্যাবেলা এক একদিন গান-বাজনার আসর বসিত। নিশানাথ শরৎবাবুকে লইয়া আসে, ইহার পর মাস দুই শরৎবাবু আমাদের বাড়িতে অতিথিরূপে এখানেই ছিলেন। কি জন্য তিনি গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন বলিতে পারি না; কিন্তু তখন তাঁহার অবস্থা একেবারে নিঃস্বের মতোই ছিল। সে সময় তিনি কিছু নূতন রচনা না করিলেও তাঁহার যে স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভা তাঁহার মধ্যে অপেক্ষা করিয়াছিল তাহা তাঁহার ব্যবহারকেও অনেকখানি সৌজন্যমণ্ডিত এবং আকর্ষণীয় করিয়া রাখিত। শ্রীযুক্ত শিখরনাথবাবু এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহার সহিত কথাবার্তায় বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিতেন। শরৎবাবুর মধ্যে কতকগুলি বিশেষ গুণ ছিল যাহার পরিচয় এখনকার লেখক শরৎচন্দ্রের সহিত বিশেষ পরিচিত লোকও অবগত নন। অসহায় রোগীর পরিচর্যা, মৃতের সৎকার এমনি সব কঠিন কার্যের মধ্যে তিনি একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন। এই সব কারণে মজঃফরপুরে শরৎবাবু শীঘ্রই একটা স্থান করিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শিখরবাবুর বাড়ি থাকিতে থাকিতে মজঃফরপুরের একজন জমিদার মহাদেব সাহুর সহিত শরৎচন্দ্রের পরিচয় ঘটে। কিছুদিন পরে শরৎচন্দ্র তাঁহার নিকট চলিয়া যান। এই মহাদেব সাহুই 'শ্রীকান্তে'র কুমার সাহেব তাহাতে সন্দেহ নাই। মজঃফরপুর হইতে চলিয়া যাওয়ার পরও শরৎচন্দ্র শিখরনাথবাবুকে বার কয়েক পত্র দিয়াছিলেন। তাহার পর আর বহুদিন তাঁহার সংবাদ জানা যায় নাই। পরে শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট প্রমুখাৎ শুনি তিনি বর্মা চলিয়া গিয়াছেন। মধ্যে সেখানে তাঁহার মৃত্যুসংবাদও রটিয়াছিল।'

অসাধারণ মানুষ শরৎচন্দ্রের তখনকার যে-ছবিটি কল্পনায় আসছে, তা হচ্ছে এই রকম। একটি রোগাসোগা কালো যুবক, চোখে শ্রান্ত স্বপ্নবিলাসের ছাপ আছে, চেহারায় ও কাপড়ে-চোপড়ে পারিপাট্য নেই, লাজুক অথচ মিষ্টভাষী, মাঝে মাঝে সাহিত্য-আলোচনায় উৎসাহিত হয়ে ওঠেন, খোসগল্পেও সুপটু, কিন্তু ব্যক্তিত্বে আঘাত লাগলে হন বজ্রের মতন কঠিন, আত্মপরিচয় দিতে নারাজ, সর্বাঙ্গে ফোটে আলাভোলা বৈরাগ্যের ভাব, পরদুঃখে কাতর, পর-সেবায় তৎপর, সুকণ্ঠ, বাঁশি ও তবলায় দক্ষ! এমন একজন মানুষ যে সকলের প্রিয় হয়ে উঠবেন, এটা আশ্চর্য কথা নয়। কিন্তু এঁকে অপমান করতে গেলে সাহসীকেও আগে ভাবতে হয়!

মহাদেব সাহুর কাছে কাজ করবার সময়ে শরৎচন্দ্রের শিকারেরও শখ হয়। অবসরকালে প্রায়ই তিনি বন্দুক হাতে করে বনে বনে ঘুরে বেড়াতেন। ব্রাহ্মণ শরৎচন্দ্রের মনের কোথায় খানিকটা যে ক্ষাত্রবীর্য ছিল, সেটা পরেও লক্ষ করা গেছে। যখন রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছেন, সেই পরিণত বয়সেও পকেটে তিনি ধারালো বড়ো ছোরা রেখে পথে বেরিয়েছেন। একথা সত্য কি না জানি না, তবে কেউ কেউ লিখেছেন শরৎচন্দ্র নাকি সাহেবের সঙ্গে হাতাহাতি করেই রেঙ্গুনের কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ কাহিনি আমরা শরৎচন্দ্রের মুখে শুনিনি। তবে সশস্ত্র থাকবার দিকে তাঁর একটা ঝোঁক ছিল বরাবরই। বৃদ্ধবয়সেও—ছোরা ত্যাগ করলেও—এমন এক ভীষণ মোটা লগুড় হাতে নিয়ে নিরীহ বন্ধুদের বৈঠকখানায় এসে বসতেন, যার আঘাতে বন্য মহিষও বধ করা যায়!

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে শরৎচন্দ্র একবার কলকাতায় আসেন। কলকাতার ভবানীপুরে থাকতেন তাঁর সম্পর্কে-মামা উকিল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, তিনি 'বিচিত্রা' সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ

গঙ্গোপাধ্যায়ের দাদা। হিন্দি কাগজপত্র অনুবাদ করবার জন্যে তাঁর একজন লোকের দরকার হয়েছিল। ভাগিনেয় শরৎচন্দ্র সেই কাজটি পেলেন। এই সময়ে শরৎচন্দ্রের পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেন। তখনও তাঁর পুত্রের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করবারও সময় আসেনি। চির-গরিব বাপ, ছেলেকেও দেখে গেলেন দারিদ্র্যের পঙ্কে নিমজ্জিত পরাশ্রিত অবস্থায়। অথচ এমন ছেলের জন্মদাতা তিনি!

এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প আছে। তাঁর চেয়ে বয়সে ছোটো সম্পর্কে-মামা, অথচ বন্ধুস্থানীয় কারুর কারুর শখ হয়েছিল তাঁরা একটি হারমোনিয়াম কিনবেন। অথচ সকলেরই ট্যাঁক গড়ের মাঠ! অতএব সকলে গিয়ে শরৎচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করলেন। বক্তব্যটা এই : তুমি আমাদের একটা গল্প লিখে দাও, আমরা সেটা কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় পাঠাব। পুরস্কার পেলে আমাদের হারমোনিয়াম কেনবার একটা উপায় হয়! দেখা যাচ্ছে, তখনই ওঁদের মনে ধারণা ছিল যে, শরৎচন্দ্র গল্প লিখলে সেটি পুরস্কৃত হবেই!

শরৎচন্দ্রের তখন নাম হয়নি। এবং তিনিও তখন নিজের লেখাকে প্রকাশযোগ্য বলে বিবেচনা করেন না। তবু নিজের নামে প্রতিযোগিতায় গল্প পাঠাতেও তাঁর আত্মসম্মানে বাধে। তাই সকলের সুদৃঢ় অনুরোধে সেইদিনই তাড়াতাড়ি 'মন্দির' নামে একটি গল্প লিখতে বাধ্য হলেন বটে, কিন্তু লেখকরূপে নাম রইল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের।

গল্পটি প্রতিযোগিতায় হল প্রথম এবং এই হল আত্মীয়-সভার বাইরে শরৎপ্রতিভার প্রথম সফল পরীক্ষা ও প্রথম গৌরবজনক আত্মপ্রকাশ! কিন্তু দীর্ঘকালের জন্যে সাহিত্যক্ষেত্র থেকে বিদায় নেবার আগে ওই 'মন্দির'ই হচ্ছে শরৎচন্দ্রের শেষ-রচনা!

শুনেছি, ভবানীপুরেও আত্মীয়-আলয়ে শরৎচন্দ্র নিজের মনুষ্যত্বকে অক্ষুণ্ণ বলে মনে করতে পারেননি—প্রায়ই প্রাণে তাঁর আঘাত লাগত। শেষটা নিতান্ত মনের দুঃখেই তিনি আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে সাগর পার হয়ে গেলেন একেবারে অজানা দেশ রেঙ্গুনে। এত দেশ থাকতে ওই সুদূর প্রবাসে গেলেন যে তিনি কোন ভরসায়, সেটা প্রথম দৃষ্টিতে রহস্যময় বলেই মনে হয়। তবে শুনেছি, তাঁর আত্মীয়-সম্পর্কীয় ও রেঙ্গুন-প্রবাসী স্বর্গীয় অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তিনি কিঞ্চিৎ ভরসা পেয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যু হঠাৎ এসে তাঁর পথ থেকে এ বান্ধবটিকেও সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আমাদের বিশ্বাস, এই দুঃসময়ে শরৎচন্দ্র কোনও আত্মীয়হীন দেশে গিয়ে নূতনভাবে জীবনযাত্রা শুরু করতে চেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের মনে যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভাব ছিল না, সেটা বলা বাহুল্য। তার উপরে তাঁর ভিতরে ছিল শিল্পীর ভাবপ্রবণতা। সাধারণ লোকের মতো আত্মীয়-বন্ধুদের অবহেলা অনায়াসে সহ্য করবার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে না থাকাই স্বাভাবিক। আগে তাঁর মতো অনেক বেকার দরিদ্রই যেতেন ব্রহ্মদেশে ভাগ্যান্বেষণে। নিজের দারিদ্র্যকে ধিক্কার দিয়ে তিনিও যখন সেই পথ অবলম্বন করে রেঙ্গুনে গিয়ে হাজির হন, তাঁর সম্বল ছিল নাকি মাত্র দুই টাকা! এবং ওই দুই টাকা ফুরিয়ে যেতেও দেরি লাগেনি। তখন রেঙ্গুনপ্রবাসী বাঙালিরা কিছুদিন শরৎচন্দ্রের অভাব মেটালেন, কারণ লোকের স্নেহ-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারতেন তিনি খুব সহজেই। তারপর সওদাগরি অফিসে তাঁর সামান্য মাহিনার একটি চাকরি জুটল। তাঁর তখনকার অসহায় অবস্থার পক্ষে সেই কাজটিও বোধ করি যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়েছিল।

কিছুদিন পরে তিনি ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্ট-জেনারেলের অফিসে একটি কাজ পেলেন। এখানে চাকরি ছাড়বার আগে তাঁর মাহিনা একশো টাকা পর্যন্ত উঠেছিল।

এই রেঙ্গুন-প্রবাসের সময়ে শরৎচন্দ্রের মনের বৈরাগ্য বোধহয় ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। কারণ তাঁর সংসারী হবার সাধ হল এবং তাঁর সে সাধ পূর্ণ করলেন শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী। কিন্তু এর আগেই তিনি একটি মেয়েকে কুপাত্রের কবল থেকে উদ্ধার করবার জন্যে বিবাহ করে নিজের মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং সেই বিবাহের ফলে লাভ করেছিলেন একটি পুত্রসন্তান। কিন্তু দুর্দান্ত প্লেগ এসে তাঁদের সেই সুখের সংসার ভেঙে দেয় এবং শরৎচন্দ্র হন আবার একাকী!

আমাদের এক নিকট-আত্মীয় রেঙ্গুনে ডাক্তারি করেন। তাঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাঁরই মুখে শুনেছি, রেঙ্গুন-প্রবাসী বাঙালি-সমাজে শরৎচন্দ্র খুব আসর জমিয়ে তুলেছিলেন। গানে-গল্পে তিনি সকলকেই মোহিত করতেন। সেখানে গান, গল্প, বই-পড়া, ছবি-আঁকা আর চাকরি ছাড়া তাঁর জীবনের যে আর কোনও উচ্চ লক্ষ্য আছে, বাহির থেকে দেখে সেটা কেউ বুঝতে পারত না। শরৎচন্দ্রের এই আর একটা বিশেষত্ব ছিল; মনে মনে নিজেকে তিনি যত আলাদা করেই রাখুন, বাহিরে আর দশজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে একেবারে এক হয়ে যেতে পারতেন। এ বিশেষত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না, সাধারণ মানুষ তাঁকে দূর থেকে নমস্কার করত। রবীন্দ্রনাথও সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশিয়ে যেতে পারেন না।

শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মপ্রবাসী বন্ধু শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার অধুনালুপ্ত 'বাঁশরী' পত্রিকায় একটি ধারাবাহিক স্মৃতিকথা প্রকাশ করেছিলেন, তার নাম 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র'। ওই লেখাটিতে ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্রের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক গল্প পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ গল্পের সঙ্গেই শিল্পী বা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের বিশেষ সম্পর্ক নেই বলে কেবল গল্পের খাতিরে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার ভিতরে তাদের আর টেনে আনা হল না।

তবে শরৎচন্দ্রের জীবনীকথা হিসাবে, ব্রহ্মদেশের দু-একটি ঘটনা উল্লেখ করা দরকার। যদিও শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে সাধ্যমতো আত্মগোপন করে চলতেন, তবু অবশেষে রসিক লোকেরা তাঁকে আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। তার ফলে 'বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবে'র সভ্যদের প্রবল অনুরোধে শরৎচন্দ্রকে আবার 'অস্ত্র ধরতে' হয়। তিনি 'নারীর ইতিহাস' নামে সুবৃহৎ এক প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রকাশ্য সভায় লেখাটি তাঁর পড়বার কথা ছিল এবং সভার মধ্যিখানে শরৎচন্দ্র ছিলেন চিরদিনই 'কাপুরুষ'—মসীবীর হলেই যে বাক্যবীর হওয়া যায় না তারই মূর্তিমান দৃষ্টান্ত। অতএব প্রবন্ধটি সভার জন্যে বাসায় রেখে, লেখক পড়লেন কোথায় সরে! যা-হোক প্রবন্ধটি সভায় পঠিত হয় এবং শরৎচন্দ্রের নামে ধন্য-ধন্য রব পড়ে যায়!

শরৎচন্দ্র বরাবরই উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন বলে তাঁর রেঙ্গুনের বাসাতেও ছোটোখাটো একটি মূল্যবান পুস্তকালয় স্থাপন করেছিলেন। হঠাৎ বাসায় আগুন লেগে সেই সযত্নে সংগৃহীত পুস্তকাবলীর সঙ্গে তাঁর রচিত একাধিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ও তাঁর অঙ্কিত চিত্রের প্রশংসিত নমুনা প্রভৃতি নষ্ট হয়ে যায়।

শরৎচন্দ্রের মুখে রবীন্দ্রনাথের নব নব গীত শুনে রেঙ্গুনের বাঙালিরা আনন্দে মেতে উঠতেন—বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতিতেও তাঁর দক্ষতা ছিল অপূর্ব। কবি নবীনচন্দ্র সেন নিজের

সংবর্ধনা-সভায় শরৎচন্দ্রের কণ্ঠে উদ্বোধন-সঙ্গীত শুনে তাঁকে নাকি 'রেঙ্গুন-রত্ন' বলে সম্বোধন করেছিলেন।

রেঙ্গুন-প্রবাসের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্য ঘটনা হচ্ছে এই : ওখানে গিয়েছিলেন তিনি অজ্ঞাতবাস করতে, কিন্তু ওখান থেকেই হল তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। সে কথা বলবার আগে আর একটি দিকেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি', 'পথনির্দেশ', 'বিন্দুর ছেলে', 'নারীর মূল্য', 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি আরও অনেক শ্রেষ্ঠ রচনার জন্ম ওই রেঙ্গুনেই। সেজন্যেও তাঁর সাহিত্যজীবনে রেঙ্গুনের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এবং রেঙ্গুন আশ্রয় না দিলে বাংলার শরৎচন্দ্রের দুর্ভাগ্যতাড়িত জীবন কোন পথে ছুটত, সেটাও মনে রাখবার কথা।

শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে, কলকাতায় তাঁর অজ্ঞাতে তখন এক কাণ্ড হল। শ্রীমতী সরলা দেবী তখন 'ভারতী'র সম্পাদিকা এবং শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় কলকাতায় থেকে তাঁর নামে কাগজ চালান। সৌরীন্দ্র জানতেন যে, শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে যাবার সময়ে তাঁর রচনাগুলি রেখে গেছেন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। সৌরীন্দ্রমোহন সুরেনবাবুর কাছ থেকে ছোটো উপন্যাস 'বড়দিদি' আনিয়ে তিন কিস্তিতে 'ভারতী' পত্রিকায় ছাপিয়ে দিলেন। শরৎচন্দ্রের মত নেওয়া হল না, কারণ তাঁদের হয়তো সন্দেহ ছিল যে, মত নিতে গেলে গল্প ছাপা হবে না। এটা ১৩১৪ সালের কথা।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন

'এই 'বড়দিদি' সম্পর্কে একটি বেশ কৌতুকপ্রদ কাহিনি আছে। 'বড়দিদি' যখন 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয় তখন নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' চলছিল এবং তার সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'ভারতী'তে 'বড়দিদি'র প্রথম কিস্তি পাঠ করে 'বঙ্গদর্শনে'র কার্যাধ্যক্ষ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার তৎক্ষণাৎ রবীন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হন এবং নিজের কাগজ বঙ্গদর্শনের দাবি অগ্রাহ্য করে 'ভারতী'তে লেখা দেওয়ার অপরাধে গুরুতরভাবে তাঁকে অভিযুক্ত করেন। অপরাধ মোচনের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'তা হয়েছে, কখনও হয়তো ওরা কবিতা-টবিতা সংগ্রহ করে রেখে থাকবে, প্রকাশ করেছে।' শৈলেশচন্দ্র চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, 'কবিতা-টবিতা কী বলছেন মশায়? উপন্যাস!' কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ তো অবাক! বললেন, 'উপন্যাস কী বলছ শৈলেশ? উপন্যাস লিখলামই বা কখন আর ভারতীতে প্রকাশিত হলই বা কেমন করে? তুমি নিশ্চয়ই কিছু ভুল করছ।' 'পকেটের মধ্যে প্রমাণ বর্তমান তবু বলবেন ভুল করছ!' বিরক্তি-গম্ভীর মুখে পকেট থেকে সদ্য প্রকাশিত 'ভারতী' বার করে 'বড়দিদি'র পাতাটি খুলে রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে স্থাপন করে শৈলেশবাবু বললেন, 'নাম না দিলেই কী এ আপনি লুকিয়ে রাখতে পারেন? এখনও কি অস্বীকার করছেন?' শৈলেশচন্দ্রের অভিযোগের প্রাবল্যে ঔৎসুক্যবশতই হোক অথবা বড়দিদির প্রথম দু-চার লাইন পড়ে আকৃষ্ট হয়েই হোক, রবীন্দ্রনাথ নিঃশব্দে সমস্ত লেখাটি আদ্যোপান্ত পড়ে শেষ করলেন, তারপর বললেন, 'লেখাটি সত্যিই ভারী চমৎকার—কিন্তু তবুও আমার বলে স্বীকার করবার উপায় নেই, কারণ লেখাটি সত্যই অন্য লোকের।' রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে শৈলেশচন্দ্র ক্ষণকাল নির্বাক বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর অস্ফুটস্বরে বললেন, 'আপনার নয়?' এ অবশ্য প্রশ্ন নয়, প্রশ্নের

আকারে বিস্ময় প্রকাশ করা, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ এই অনাবশ্যক প্রশ্নের মুখে কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু মাথা নাড়লেন।'

'বড়দিদি' প্রথম প্রকাশের সময়ে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পেরেছিল বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু যাঁরা লেখার পাকা কারবারি, তাঁরা এই নূতন লেখকটির মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা আছে দেখে, শরৎচন্দ্রের উদ্দেশে কৌতূহলী দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। সেসব দৃষ্টি শরৎচন্দ্রকে আবিষ্কার করতে পারলে না। এবং শরৎচন্দ্রও জানলেন না যে, তাঁর জন্যে কোথাও কোনও কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে! (এখানে আর একটি কথা বলা যেতে পারে। পরে শরৎচন্দ্রের নাম যখন দেশব্যাপী, তখন একমাত্র 'পরিণীতা' ছাড়া আর কোনও উপন্যাসেরই 'বড়দিদি'র মতন এত বেশি সংস্করণ হয়নি।)

তিনি তখন কেরানি। তিনি তখন সংসারী। এমনকী জীবনযাত্রার দিক দিয়েও তিনি তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত। দুর্লভ সরকারি চাকরি করেন, ক্রমেই মাহিনা বাড়বার সম্ভাবনা, আহারের ভয় আর নেই। 'গল্পরচনা অকেজোর কাজ', তা নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়?

শরৎচন্দ্রের প্রথম যৌবনে যে দু-চারজন নবীন সাহিত্যযশোপ্রার্থী তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরা মাঝে মাঝে প্রবাসী বন্ধুর কথা ভাবেন। যে দু-চারজন সাহিত্যিকের 'বড়দিদি' ভালো লেগেছিল, তাঁদের চোখে শরৎচন্দ্রের আর কোনও নূতন লেখা এসে পড়ল না, তাঁরা 'বড়দিদি'র কথাও ভুলে গেলেন। নব্য বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব প্রতিভা যে মগের মুল্লুকে অজ্ঞাতবাস করছে, এমন সন্দেহ তখন কেউ করতে পারেনি।

প্রকাশ্য সাহিত্যজীবন

'একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্যসেবার ডাক এল তখন যৌবনের দাবি শেষ করে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শ্রান্ত, উদ্যম সীমাবদ্ধ—শেখবার বয়স পার হয়ে গেছে। থাকি প্রবাসে, সব থেকে বিচ্ছিন্ন, সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিলাম, ভয়ের কথা মনেই হল না।

আঠারো বৎসর পরে হঠাৎ একদিন লিখতে আরম্ভ করলাম। কারণটা দৈব দুর্ঘটনারই মতো। আমার গুটিকয়েক পুরাতন বন্ধু একটি ছোটো মাসিক পত্র বের করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের কেউই এই সামান্য পত্রিকায় লেখা দিতে রাজি হলেন না। নিরুপায় হয়ে তাঁদের কেউ কেউ আমাকে স্মরণ করলেন। বিস্তর চেষ্টায় তাঁরা আমার নিকট থেকে লেখা পাঠাবার কথা আদায় করে নিলেন। এটা ১৯১৩ সনের কথা। আমি নিমরাজি হয়েছিলাম। কোনও রকমে তাঁদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যেই আমি লেখা দিতেও স্বীকার হয়েছিলাম। উদ্দেশ্য—কোনও রকমে একবার রেঙ্গুনে পৌঁছোতে পারলেই হয়। কিন্তু চিঠির পর চিঠি আর টেলিগ্রামের তাড়া আমাকে অবশেষে সত্য-সত্যই আবার কলম ধরতে প্ররোচিত করল। আমি তাঁদের নবপ্রকাশিত 'যমুনা'র জন্য একটি ছোটোগল্প পাঠালাম। এই গল্পটি প্রকাশ হতে না হতেই বাংলার পাঠক-সমাজে সমাদর লাভ করল। আমিও একদিনেই নাম করে

বসলাম। তারপর আমি অদ্যাবধি নিয়মিতভাবে লিখে আসছি। বাংলাদেশে বোধ হয় আমিই একমাত্র সৌভাগ্যবান লেখক যাকে কোনওদিন বাধার দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়নি।'

উপরের কথাগুলি শরৎচন্দ্রের। ওই হল তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে পুনরাগমনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কিন্তু ব্যাপারটা আমরা একটু খুলেই বলতে চাই। কারণ আমাদের চোখের সামনে ঘটেছে প্রায় সমস্ত ঘটনাই। এবং এখন থেকে শরৎচন্দ্রের জীবনী লেখবার জন্যে আমাদের আর জনশ্রুতির বা অন্য কোনও লেখকের উপরে নির্ভর করতে হবে না।

'যমুনা' একখানি ছোটো মাসিক কাগজ। 'লক্ষ্মীবিলাস তৈলে'র স্বত্বাধিকারীরা প্রথমে এই কাগজখানি বের করেন। তারপর এর ভার নেন শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল। সে হচ্ছে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের কথা। প্রথমে 'যমুনা'র গ্রাহক দুই শতও ছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু তখনকার উদীয়মান এবং কয়েকজন নাম-করা লেখক লেখা দিয়ে, 'যমুনা'কে সাহায্য করতেন। যেমন স্বর্গীয় কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন, স্বর্গীয় কবি রসময় লাহা, স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু, স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ পাল, স্বর্গীয় হেমেন্দ্রলাল রায়, স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র ঘটক, স্বর্গীয় ইন্দিরা দেবী, ডক্টর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বাগচী, শ্রীমতী নিরুপমা দেবী, শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আরও অনেকে। সুতরাং শরৎচন্দ্রের এই উক্তিটির মধ্যে অতিরঞ্জন আছে—'প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের কেহই এই সামান্য পত্রিকায় লেখা দিতে রাজি হলেন না।' উপরে যাঁদের নাম করা হল তাঁদের অনেকেই তখন জনসাধারণের কাছে শরৎচন্দ্রের চেয়ে ঢের বেশি বিখ্যাত এবং তাঁদের সাহায্যে অনেক বড়ো মাসিকপত্র চলছে।

তবু যে 'যমুনা'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল বিশেষভাবে শরৎচন্দ্রকে নিজের কাগজের প্রধান লেখক করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন, তার একমাত্র কারণ এই যে, শরৎচন্দ্রের মধ্যে তিনি প্রথম থেকেই বৃহৎ প্রতিভার অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন। ফণীন্দ্রনাথের অমন অতিরিক্ত আগ্রহ না থাকলে শরৎচন্দ্রকে পুনর্বার সাহিত্যের নেশা অত সহজে পেয়ে বসত না বোধহয়। একখানি বিখ্যাত মাসিকপত্রে সম্প্রতি বলা হয়েছে, শরৎচন্দ্রকে আবিষ্কার করার জন্যে 'স্বর্গীয় প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের দাবি সর্বাগ্রগণ্য'। একথা সম্পূর্ণ অমূলক। শরৎচন্দ্রের একখানি পত্রেও (২৮-৩-১৯১৬) দেখেছি, তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই ফণীবাবুকে লিখেছেন 'আপনার claim যে আমার উপর first তাহাতে আর সন্দেহ কী?' শরৎচন্দ্রকে পুনর্বার কলম ধরাবার জন্যে প্রমথবাবু প্রথমে কোনও চেষ্টাই করেছেন বলে জানি না। এ-সম্পর্কে প্রমথবাবুর কথা নিয়ে পরে আলোচনা করব। আপাতত কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, শরৎচন্দ্রকে আবার সাহিত্যক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে আনবার জন্যে যাঁরা বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

এ-সম্বন্ধে সৌরীন্দ্রমোহনের বিবৃতি উদ্ধারযোগ্য

'১৩১৯ সাল—পূজার সময় হঠাৎ শরৎচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। আমায় বলিলেন—বড়দিদি গল্পটা আমায় পড়িতে দাও—

'বেশ মনে আছে সেদিন কালীপূজা। বেলা প্রায় দুটার সময় আমার গৃহে বাহিরের ঘরে শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ ও আমি—বাঁধানো ভারতী খুলিয়া আমি 'বড়দিদি' পড়িতে লাগিলাম। শরৎচন্দ্র শুইয়া সে গল্প শুনিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে উঠিয়া বসেন। আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলেন—চুপ। তাঁর চোখ অশ্রু-সজল, স্বর বাষ্পার্দ্র। শরৎচন্দ্র মুগ্ধ বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে বলিলেন—এ আমার লেখা! এ গল্প আমি লিখিয়াছি!

তাঁর যেন বিশ্বাস হয় না। আমরা তাঁহাকে তিরস্কার করিলাম—লেখা ছাড়িয়া কী অপরাধ করিতেছ, বলো তো! শরৎচন্দ্র উদাস মনে বসিয়া রহিলেন—বহুক্ষণ পরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—লিখব। লেখা ছাড়া উচিত হয় নাই। লেখা ভালো—আমার নিজের বুকই কাঁপিয়া উঠিতেছিল! তিনি বলিলেন—চাকরিতে একশো টাকা মাহিনা পাই। অনেককে খরচ দিতে হয়। শরীর অসুস্থ—সে দেশে আর কিছুদিন থাকিলে যক্ষ্মারোগে পড়িবেন—এমন আশঙ্কাও জানাইলেন।

আমি বলিলাম—তিন মাসের ছুটি লইয়া আপাতত কলিকাতায় চলিয়া এসো। মাসে একশো টাকা উপার্জন হয়—সে ব্যবস্থা আমরা করিয়া দিব।

শরৎচন্দ্র কহিলেন—দেখি।

তার প্রায় তিন মাস পরে। শরৎচন্দ্র আবার কলিকাতায় আসিলেন।

'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্র পাল আমায় ধরিয়াছেন—ওই 'যমুনা'কে তিনি জীবন-সর্বস্ব করিতে চান, আমার সহযোগিতা চাহেন।

শরৎচন্দ্র আসিলে তাঁকে ধরিলাম—এই যমুনার জন্য লিখিতে হইবে।

শরৎচন্দ্র বলিলেন—একখানা উপন্যাস 'চরিত্রহীন' লিখিতেছি। পড়িয়া দ্যাখো চলে কী না।

প্রায় পাঁচ আনা অংশ লেখা 'চরিত্রহীনে'র কপি তিনি আমার হাতে দিলেন। পড়িলাম। শরৎচন্দ্র কহিলেন—নায়িকা কিরণময়ী। তার এখনও দেখা পাও নাই। খুব বড়ো বই হইবে।

চরিত্রহীন যমুনায় ছাপা হইবে স্থির হইয়া গেল।—তিনি অনিলা দেবী ছদ্মনামে 'নারীর মূল্য' আমায় দিয়া বলিলেন—আমার নাম প্রকাশ করিয়ো না। আপাতত যমুনায় ছাপাও।

তাই ছাপানো হইল। তারপর দিলেন গল্প—'রামের সুমতি।' যমুনায় ছাপা হইল। বৈশাখের যমুনার জন্য আবার গল্প দিলেন—'পথনির্দেশ।'

শরৎচন্দ্র এই সময়ে 'যমুনা'-সম্পাদককে রেঙ্গুন থেকে যেসব পত্র লিখেছিলেন, সেগুলি পড়লেই বেশ বুঝা যায় যে, পাথর-চাপা উৎসের মুখ থেকে কেউ পাথর সরিয়ে দিলে উৎস যেমন কিছুতেই আর নিজের উচ্ছ্বসিত গতি সংবরণ করতে পারে না, শরৎচন্দ্রের অবস্থা হয়েছিল অনেকটা সেই রকম। অনেক দিন চেপে-রাখা সাহিত্যের উন্মাদনা আবার নূতন মুক্তির পথ পেয়ে শরৎচন্দ্রকেও এমনি মাতিয়ে তুলেছিল যে 'যমুনা'র ভালোমন্দের জন্যে যেন সম্পাদকের চেয়ে তাঁরই দায়িত্ব ও মাথাব্যথা বেশি! একলাই প্রত্যেক সংখ্যার সমস্তটা লিখে ভরিয়ে দিতে চান এবং একাধিকবার তা দিয়েছেনও। এমনকী কেবল গল্প নয়, কবিতা

ছাড়া বাকি প্রত্যেক বিষয় নিয়ে কলম চালাবার ইচ্ছাও তাঁর হয়েছিল। মাঝে মাঝে ছদ্মনামে তিনি সমালোচনা পর্যন্ত লিখতে ছাড়েননি। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হচ্ছে 'নারীর লেখা' ও 'কানকাটা' নামে প্রবন্ধ দুটি; যুক্তিসঙ্গত মতামত, সতেজ ভাষা এবং হাস্য ও বিদ্রূপরসের জন্যে সমালোচক শরৎচন্দ্রকে মনে রাখবার মতো; কিন্তু তাঁর গ্রন্থাবলীতে ও-দুটি রচনা এখনও পুনর্মুদ্রিত হয়নি।

'যমুনা'য় প্রথমেই বেরুল শরৎচন্দ্রের নূতন গল্প 'রামের সুমতি'। এ গল্পটির ভিতরে ছিল জনপ্রিয়তার অপূর্ব উপাদান এবং শরৎচন্দ্রের পরিপক্ক হাতের লিপিকুশলতা। তার উপরে 'রামের সুমতি'র আর একটি মস্ত বিশেষত্ব হচ্ছে, সার্বজনীনতায় সে অতুলনীয়। কারণ 'রামের সুমতি' কেবল বয়স্ক পাঠকের উপযোগী নয়, তাকে অনায়াসেই শিশুসাহিত্যেরও সমুজ্জ্বল কোহিনুর বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রকাশ্য সাহিত্যক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আবির্ভাবের জন্যে এমন আবালবৃদ্ধবনিতার উপযোগী বিষয়বস্তু নির্বাচন করে শরৎচন্দ্র নিজের আশ্চর্য তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। কারণ সেই একটিমাত্র গল্প সর্বশ্রেণীর পাঠককে বুঝিয়ে দিলে যে, বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন এক অসাধারণ প্রতিভার উদয় হয়েছে।

সেদিনের কথা মনে আছে। তখন 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'মানসী' ও 'নবভারত' প্রভৃতি প্রধান পত্রিকায় লিখে অল্পবিস্তর নাম কিনেছি—অর্থাৎ সম্পাদকরা লেখা পেলে বাতিল করবার আগে কিঞ্চিৎ ইতস্তত করেন। কিন্তু 'রামের সুমতি' পড়ে নিজের ক্ষুদ্রত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে পারলুম না। একেবারে এত শক্তি নিয়ে কী করে তিনি দেখা দিলেন? সাহিত্যিক বন্ধুদের কাছ থেকে খোঁজ নেবার চেষ্টা করলুম—কে এই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়? কোথায় থাকেন, কী করেন? অনুসন্ধানে জানতে পারলুম, শরৎচন্দ্র অকস্মাৎ লেখক হননি, ১৩১৪ সালে তাঁরই লেখনীজাতা 'বড়দিদি' 'ভারতী'র আসরে গিয়ে হাজিরা দিয়েছে। মনে একটা বদ্ধমূল সংস্কার ছিল, কলম ধরেই কেউ পুরোদস্তুর লেখক হতে পারে না; 'রামের সুমতি'র শরৎচন্দ্র সেই সংস্কারের মূল আলগা করে দিয়েছিলেন। এখন আশ্বস্ত হয়ে বুঝলুম, শরৎচন্দ্র নূতন লেখক নন—'রামের সুমতি'র পিছনে আছে আত্মসমাহিত সাধকের বহুদিনের গভীর সাধনা! আর্টের আসর আর 'ম্যাজিকে'র আসর এক নয়—এক মিনিটে এখানে ফলন্ত আমগাছ মাথা চাগাড় দিয়ে ওঠে না।

১৩২০ সালের বৈশাখ থেকেই শরৎচন্দ্র 'যমুনা' তথা বঙ্গসাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হলেন পূর্ণ উদ্যমে। ওই প্রথম সংখ্যাতেই বেরুল তাঁর পুরাতন ক্রমপ্রকাশ্য উপন্যাস 'চন্দ্রনাথ', নবলিখিত ক্রমপ্রকাশ্য প্রবন্ধ 'নারীর মূল্য' ও সদ্যরচিত বড়ো গল্প 'পথনির্দেশ'। 'নারীর মূল্যে'র নূতন রকম নবযুগের উপযোগী জোরালো যুক্তি এবং 'পথনির্দেশে'র লিপিকুশলতা আবার সকলের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। (যদিও জনপ্রিয়তার হিসাবে এ গল্পটি 'রামের সুমতি'র মতন সাফল্য অর্জন করেনি)। শ্রাবণ সংখ্যায় আত্মপ্রকাশ করলে 'বিন্দুর ছেলে'। এ গল্পটি সাহিত্যক্ষেত্রে যে-উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল তার আর তুলনা নেই এবং এর পরে কথাসাহিত্যের আসরে শরৎচন্দ্রের স্থান কোথায়, সে-সম্বন্ধে কারুর মনে আর কোনও সন্দেহ রইল না।

১৩২০ সালের 'যমুনা'য় শরৎচন্দ্রের নিম্নলিখিত রচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল ১। 'নারীর মূল্য' সম্পর্কীয় পাঁচটি প্রবন্ধ, ২। কানকাটা (প্রতিবাদ বা সমালোচনা),

৩। গুরুশিষ্য-সংবাদ (প্রচ্ছন্ন হাস্যরসাত্মক নাট্য-চিত্র), ৪। পথনির্দেশ (বড়োগল্প), ৫। বিন্দুর ছেলে (বড়োগল্প), ৬। পরিণীতা (বড়োগল্প), ৭। চন্দ্রনাথ (উপন্যাস) ও ৮। চরিত্রহীন (উপন্যাস)।

ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটেছে। 'রামের সুমতি' বেরুবার অনতিকাল পরেই শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (বর্তমানে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক-মণ্ডলীভুক্ত) একদিন বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কাছে গিয়ে ওই গল্পটি পড়ে শুনিয়ে এসেছেন। বিজয়বাবু প্রশংসায় একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। এবং তাঁর মুখে শুনে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও 'রামের সুমতি' পাঠ করে অভিভূত হয়ে যান। তখন দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পাদকতায় মহাসমারোহে 'ভারতবর্ষ' প্রকাশের উদ্যোগ-পর্ব চলছে। দ্বিজেন্দ্রলাল শরৎচন্দ্রকে 'ভারতবর্ষে'র লেখকরূপে পাবার জন্যে আগ্রহবান হন। দ্বিজেন্দ্রলালের পৃষ্ঠপোষকতায় তখন একটি শৌখিন নাট্য-সম্প্রদায় চলছিল এবং সেখানকার সভ্য স্বর্গীয় প্রমথনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন শরৎচন্দ্রের পরিচিত ব্যক্তি। তিনি শরৎচন্দ্রকে দ্বিজেন্দ্রলালের আগ্রহের কথা জানালেন এবং তার ফলে লাভ করলেন শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের প্রথম অংশের পাণ্ডুলিপি। সকলেই জানেন, 'চরিত্রহীন' কোনওকালেই রুচিবাগীশদের মানসিক খাদ্যে পরিণত হতে পারবে না। রুচিবাগীশ বলতে যা বোঝায় দ্বিজেন্দ্রলাল তা ছিলেন না বটে, কিন্তু তার কিছু আগেই তিনি করেছিলেন 'কাব্যে দুর্নীতি'র বিরুদ্ধে বিষম যুদ্ধঘোষণা। কাজেই তাঁর নূতন কাগজে তিনি 'চরিত্রহীন' প্রকাশ করতে ভরসা পেলেন না। 'চরিত্রহীন' বাতিল হয়ে ফিরে আসে এবং পরে 'যমুনা'য় বেরুতে আরম্ভ করে। এই প্রত্যাখ্যানের জন্যে শরৎচন্দ্র মনে যে-আঘাত পেয়েছিলেন, সেটা তখনকার অনেক সাহিত্যিক বন্ধুর কাছে প্রকাশ না করে পারেননি। কিন্তু সেজন্যে আত্মশক্তির উপরে তাঁর নিজের বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হয়নি কিছুমাত্র। 'যমুনা'তে যখন 'চরিত্রহীন' প্রকাশিত হতে থাকে তখনও একশ্রেণীর লোক তাঁর বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করে। কিন্তু শরৎচন্দ্র ছিলেন—অটল।

১৩২০ সালে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। সে-সময়ে 'যমুনা'র আফিস উঠে এসেছে ২২।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে। শ্রীমানী মার্কেটের সামনে এখন যেখানে ডি. রতন কোম্পানির আলোক-চিত্রালয়, ওইখানে ছাদের উপরে সতরঞ্চ বিছিয়ে রোজ সন্ধ্যায় বসত 'যমুনা'র সাহিত্য-আসর। শরৎচন্দ্রকেও সেখানে দেখা যেত প্রত্যহ। ওখানকার কিছু কিছু বিবরণ পরিশিষ্টে মৎলিখিত 'শরতের ছবি'র মধ্যে পাওয়া যাবে।

এবারে শরৎচন্দ্র কলকাতায় এলেন বিজয়ীর বেশে! 'যমুনা'য় প্রকাশিত রচনাবলী তখন তাঁকে সাহিত্যিক ও পাঠকসমাজে সুপ্রসিদ্ধ করে তুলেছে এবং 'যমুনা'-কার্যালয় থেকেই গ্রন্থাকারে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বড়দিদি' মুদ্রিত হয়েছে। প্রতিদিনই নব নব অপরিচিত ভক্ত একান্ত সুপরিচিতের মতন আসেন তাঁর সঙ্গে আলাপ করে ধন্য হতে এবং আরও আসেন মধুলুব্ধ ভ্রমরের মতন প্রকাশকের দল। চারিদিক থেকে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণের অন্ত নেই! শরৎচন্দ্র এবারে এসে বাসা বেঁধেছিলেন মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের এক মোড়ে। সেই বাসা তুলে দিয়ে আবার যখন তিনি রেঙ্গুনে ফিরে গেলেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন যে, আর তাঁকে কেরানিগিরি করে সুদূর প্রবাসে জীবনযাপন করতে হবে না! মানুষের পক্ষে এই সফল উচ্চাকাঙ্ক্ষার অনুভূতি কী সুমধুর!

হলও তাই। পর-বৎসরেই কেরানি শরৎচন্দ্র হলেন পুরোপুরি সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র। এবং তখন তাঁর জনপ্রিয় গ্রন্থাবলী প্রকাশের ভার পেলেন সর্বপ্রথমে 'যমুনা'-আসরেরই অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার,—এখন 'রায় এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স' নামক সুবিখ্যাত পুস্তকালয়ের একমাত্র স্বত্বাধিকারী। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, শরৎচন্দ্রের শেষ পুস্তক 'ছেলেবেলার গল্প' প্রকাশেরও অধিকার পেয়েছেন ওই সুধীরবাবুই।

ওই সময়ে শরৎচন্দ্রের অদ্ভুত জনপ্রিয়তা কতখানি চরমে উঠেছিল, একটিমাত্র ঘটনাই তা প্রমাণিত করবে। 'এম. সি. সরকার' থেকে যখন 'চরিত্রহীন' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল, তখন সেই সাড়ে তিন টাকা দামের গ্রন্থ প্রথম দিনেই সাড়ে চার শত খণ্ড বিক্রি হয়ে যায়! আর কোনও বাঙালি লেখক বাংলাদেশের পাঠকসমাজের ভিতরে প্রথম দিনেই এত মোটা প্রণামী পেয়েছেন বলে শুনিনি! পরে তাঁর 'পথের দাবি' নাকি এর চেয়েও বেশি আদর পেয়েছিল!

গৌরবময় সাহিত্যজীবন

শরৎচন্দ্রের মতন বৃহৎ প্রতিভা 'যমুনা'র মতন ছোটো পত্রিকায় বেশিদিন বন্দি থাকবার জন্যে সৃষ্ট হয়নি। অবশ্য শরৎচন্দ্র যদি 'যমুনা'কে ত্যাগ না করতেন, তাহলে 'যমুনা' যে কেবল আজ পর্যন্ত বেঁচে থাকত তা নয়, আকারে ও প্রচারে আজ সে হয়তো বিপুল হয়ে উঠতে পারত; কারণ ১৩২০ সালেই তার গ্রাহক-সংখ্যা বেড়ে উঠেছিল আশাতীত। কিন্তু 'যমুনা' বেশিদিন আর শরৎচন্দ্রকে ধরে রাখতে পারলে না। 'যমুনা'র সম্পাদকরূপে পরে শরৎচন্দ্রের নাম বিজ্ঞাপিত হল বটে, কিন্তু 'ভারতবর্ষ' তার সবল বাহু বাড়িয়ে তখন শরৎচন্দ্রকে টেনে নিয়েছে। সম্পাদক শরৎচন্দ্রের চেয়ে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের পসার বেশি। তাঁর সমস্ত নূতন রচনা 'ভারতবর্ষে'ই প্রকাশিত হতে লাগল।

'যমুনা'র সর্বনাশ হল বটে, তবে শরৎচন্দ্রের দিক থেকে এটা হল একটা মঙ্গলময় ঘটনা। কারণ 'যমুনা' ধনীর কাগজ ছিল না, শরৎচন্দ্রকে সে কোনওরকম অর্থসাহায্য করতে পারত না। কিন্তু 'ভারতবর্ষে'র স্বত্বাধিকারীরা হচ্ছেন বাংলাদেশের সর্বপ্রধান প্রকাশক এবং তাঁদের নিয়মিত অর্থসাহায্যের উপরেই নির্ভর করে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে শরৎচন্দ্র দাসত্ব ত্যাগ করে সাহিত্যজীবনকেই গ্রহণ করলেন একান্তভাবে। শরৎচন্দ্রের মতন শিল্পীকে স্বাধীনতা দিয়ে 'ভারতবর্ষে'র স্বত্বাধিকারীরা যে বঙ্গসাহিত্যেরই উপকার করলেন, এ সত্য মানতেই হবে। এবং এইখানেই স্বর্গীয় প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের কৃতিত্বের কথা মনে ওঠে। কারণ শরৎচন্দ্রকে 'ভারতবর্ষে'র বড়ো আসরে হাজির করবার জন্যে তিনি যথেষ্ট—এমনকী প্রাণপণ চেষ্টাই করেছিলেন।

'যমুনা'য় কথাসাহিত্যের যে উৎসব আরম্ভ, 'ভারতবর্ষে'র মস্ত আসরে স্থানান্তরিত হয়ে তার সমারোহ বেড়ে উঠল। শরৎচন্দ্র তখন বাংলা সাহিত্যের জন্যে নিজের সমস্ত শক্তিপ্রয়োগ করলেন, তাঁর লেখনীর মসী-ধারা অকস্মাৎ যেন প্রপাতে পরিণত হতে চাইলে বিপুল আনন্দে! সে তো বেশিদিনের কথা নয়, আজও অধিকাংশ পাঠকের মনেই তখনকার সেই বিস্ময়কর মহোৎসবের স্মৃতি নিশ্চয়ই বিচিত্র রঙের রেখায় আঁকা আছে! মোপাসাঁর

সাহিত্যজীবনের মতো শরৎচন্দ্রের নবজাগ্রত সাহিত্যজীবনও প্রধানত একযুগের মধ্যেই মাতৃভাষার ঠাকুরঘরে অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করেছিল। প্রতি মাসে নব নব উপহার—নব নব বৈচিত্র্য—নব নব বিস্ময়! পরিচিতরা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, ওই তো এক রোগজীর্ণ, শীর্ণদেহ অতি সাধারণ ছটফটে মানুষ, যার মুখে ক্ষুদ্র সাহিত্যিকদেরও মতো বড়ো বড়ো বুলি শোনা যায় না, বিদ্বানদের সভায় গিয়ে যিনি দুটো লাইনও গুছিয়ে বলতে পারেন না, রাজপথের জনপ্রবাহের মধ্যে যিনি কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন না, তাঁর মধ্যে কেমন করে সম্ভব হল এই মহামানুষোচিত শক্তির প্রাবল্য, নরজীবন সম্বন্ধে এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, মানবতার আদর্শ সম্বন্ধে এই উদার উচ্চধারণা, সংকীর্ণ প্রচলিতের বিরুদ্ধে এই সগর্ব বিদ্রোহিতা এবং কল্পনাতীত সৌন্দর্যের এই অফুরন্ত ঐশ্বর্য!

কেবল 'ভারতবর্ষ' নয়, পরে মাঝে মাঝে 'বঙ্গবাণী' 'নারায়ণ' ও 'বিচিত্রা' প্রভৃতি আসরে গিয়েও শরৎচন্দ্র দেখা দিয়ে এসেছেন। তাঁর কোনও কোনও উপন্যাস একেবারে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে (যেমন 'বামুনের মেয়ে'), কোনও কোনও উপন্যাস সমাপ্ত হয়নি, কোনওখানির পাণ্ডুলিপি নষ্টও হয়ে গিয়েছে (যেমন 'মালিনী')। 'ভারতবর্ষে'র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পরে শরৎচন্দ্র এই উপন্যাস বা গল্পগুলি লিখেছিলেন : বিরাজ-বৌ, পণ্ডিতমশাই, বৈকুণ্ঠের উইল, স্বামী, মেজদিদি, দর্পচূর্ণ, আঁধারে আলো, শ্রীকান্ত (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্ব), দত্তা, পল্লীসমাজ, মালিনী, অরক্ষণীয়া, নিষ্কৃতি, গৃহদাহ, দেনাপাওনা, বামুনের মেয়ে, নববিধান, হরিলক্ষ্মী, মহেশ, পথের দাবি, শেষ-প্রশ্ন, বিপ্রদাস, জাগরণ (অসমাপ্ত), অনুরাধা, সতী ও পরেশ, আগামী কাল (অসমাপ্ত), শেষের পরিচয় (অসমাপ্ত), এবং ভালোমন্দ (১ম পরিচ্ছেদ)। মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধও লিখেছেন। শেষের দিকে শিশুসাহিত্যেরও প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল, কিন্তু এ-বিভাগে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য নূতন কিছু করবার আগেই তাঁকে মহাকালের আহ্বানে সাড়া দিতে হয়েছে। তিনি অনেক পত্র রেখে গেছেন, তারও অনেকগুলির মধ্যে শরৎ-প্রতিভার স্পষ্ট ছাপ আছে এবং একত্রে প্রকাশ করলে সেগুলিও সাহিত্যের অন্তর্গত হতে পারে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন শরৎচন্দ্রের প্রতি যে সম্মান দেখিয়েছিলেন, তার তুলনা নেই। 'নারায়ণ' পত্রিকার জন্যে গল্প নিয়ে শরৎচন্দ্রের কাছে একখানি সই-করা চেক পাঠিয়ে দিয়ে দেশবন্ধু লিখেছিলেন—আপনার মতন শিল্পীর অমূল্য লেখার মূল্য স্থির করবার স্পর্ধা আমার নেই, টাকার ঘর শূন্য রেখে চেক পাঠালুম, এতে নিজের খুশিমতো অঙ্ক বসিয়ে নিতে পারেন। ....সাধারণের দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রও হয়তো বোকার মতন কাজ করেছিলেন,—কারণ নিজের অসাধারণতার মূল্য নিরূপণ করেছিলেন তিনি মাত্র একশো টাকা!

বর্তমান ক্ষেত্রে শরৎসাহিত্য নিয়ে আমরা কোনও কথা বলতে চাই না, কারণ শরৎচন্দ্র পরলোকে গমন করলেও তাঁর অস্তিত্বের স্মৃতি এখনও আমাদের এত নিকটে আছে যে, সমালোচনা করতে বসলে আমরা হয়তো যথার্থ বিচার করতে পারব না; লেখনী দিয়ে হয়তো কেবল প্রশংসার উচ্ছ্বাসই নির্গত হতে থাকবে, কিন্তু তাকে সমালোচনা বলে না। এবং এখন উচিত কথা বলতে গেলেও অনেকের কাছে তা অন্যায়-রকম কঠোর বলে মনে হতে পারে। সুতরাং ও-বিপদের মধ্যে না যাওয়াই সঙ্গত।

অতঃপর বাংলা রঙ্গালয়ের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্পর্কের কথা সংক্ষিপ্তভাবে বলতে চাই।

তাঁর যে-উপন্যাস নাট্যাকারে সর্বপ্রথমে সাধারণ রঙ্গালয়ে উপস্থিত হয়েছিল, তার নাম হচ্ছে 'বিরাজ-বৌ'। নাট্যরূপদাতা ছিলেন শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নাট্যমঞ্চ ছিল 'স্টার থিয়েটার'। যশস্বী নট-নটীরাই এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় রঙ্গাবতরণ করেছিলেন বটে, কিন্তু নানা কারণে 'বিরাজ-বৌ'য়ের পরমায়ু সুদীর্ঘ হয়নি।

তারপর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী যখন 'মনোমোহন নাট্যমন্দিরে'র প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন 'ভারতী'-সম্প্রদায়ভুক্ত সাহিত্যিক বন্ধুদের বিশেষ অনুরোধে শরৎচন্দ্র পুরানো বাংলার ইতিহাস-সম্পর্কীয় একখানি নূতন নাটক লেখবার জন্যে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। শরৎচন্দ্রের অনুরোধে 'নাচঘর' সম্পাদক সেই সুখবর জনসাধারণেরও কাছে বিজ্ঞাপিত করেছিলেন। শিশিরকুমার সে-সময়ে 'ভারতী'র আসরে নিয়মিতরূপে হাজিরা দিতেন। নূতন নাটক নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তিনি জল্পনা-কল্পনা করেছিলেন বলেও স্মরণ হচ্ছে। শরৎচন্দ্রের নিজেরও দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, তিনি নাটক লিখতে পারেন। এবং তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুদেরও দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, যাঁর উপন্যাসে এত নাটকীয় ক্রিয়া, সংলাপ ও ঘটনা-সংস্থান আছে, তাঁর লেখনী নিশ্চয়ই নাট্য-সাহিত্যকে নূতন ঐশ্বর্য দান করতে পারবে। দুর্ভাগ্যক্রমে শেষ পর্যন্ত কারুর বিশ্বাসই সত্যে পরিণত হল না। যদিও এখনও আমাদের বিশ্বাস আছে যে, নাটক লিখলে শরৎচন্দ্রের লেখনী বিফল হত না।

শিশিরকুমার তখন 'নাট্যমন্দিরে' বসে নূতন নাটকের অভাব অনুভব করছেন এবং থিয়েটারি নাট্যকারদের তথাকথিত রচনা তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। ওদিকে 'ভারতী' ইতিমধ্যে আবার শ্রীমতী সরলা দেবীর হস্তগত হয়েছে। সেই সময়ে শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্তী 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় শরৎচন্দ্রের 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসকে 'ষোড়শী' নামে নাট্যাকারে প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে সাফল্যের সম্ভাবনা দেখে শিশিরকুমার তখনই শরৎচন্দ্রের আশ্রয় নিলেন। শরৎচন্দ্রের হস্তে পরিবর্জিত, পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত হয়ে 'ষোড়শী' নাট্যমন্দিরের পাদ-প্রদীপের আলোকে দেখা দিয়ে কেবল সফলই হল না, নাট্যজগতে যুগান্তর উপস্থিত করলে বললেও অত্যুক্তি হবে না। সেই সময়ে শরৎচন্দ্র আর একবার উৎসাহিত হয়ে বলেছিলেন, 'এইবারে আমি মৌলিক নাটক লিখব!' কিন্তু তাঁর সে উৎসাহও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

'ষোড়শী'র সাফল্য দেখে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস থেকে রূপান্তরিত আরও অনেকগুলি নাটক একাধিক সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্যে গ্রহণ ও অভিনয় করা হয়েছিল, যথা—'পল্লীসমাজ' বা 'রমা', 'চন্দ্রনাথ', 'চরিত্রহীন', 'অচলা' ও 'বিজয়া' প্রভৃতি। অভিনয়ের দিক দিয়ে কোনওখানিই ব্যর্থ হয়নি। যদিও নাটকত্বের দিক দিয়ে সবগুলি সফল হয়েছে বলা যায় না—বিশেষত 'চরিত্রহীন'। বলা বাহুল্য শরৎচন্দ্রের আর কোনও উপন্যাসের নাট্যরূপই 'ষোড়শী'র মতো জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি।

বাংলার চলচ্চিত্র প্রথম থেকেই শরৎচন্দ্রের প্রতিভাকে অবলম্বন করতে চেয়েছে। এ-বিভাগেও সর্বাগ্রে শরৎচন্দ্রকে পরিচিত করেন শিশিরকুমার, তাঁর 'আঁধারে আলো'র চিত্ররূপ দেখিয়ে। তারপর নানা চিত্র-প্রতিষ্ঠান শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যের সাহায্যে অনেকগুলি ছবি (সবাক বা নির্বাক) তৈরি করেছেন, যথা—'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস' (সবাক ও নির্বাক), 'স্বামী', 'শ্রীকান্ত', 'পল্লীসমাজ', 'দেনা পাওনা', 'বিজয়া', 'চরিত্রহীন' ও 'পণ্ডিতমশাই'। এদের মধ্যে

একেবারে ব্যর্থ হয়েছে 'চরিত্রহীন' ও 'শ্রীকান্ত'। অন্যগুলি অল্পবিস্তর জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছে। কিন্তু সকলকার উপরে টেক্কা দিয়েছে সবাক 'দেবদাস', কী চিত্রকথা হিসাবে আর কী চিত্রশিল্প হিসাবে সে অতুলনীয়! চলচ্চিত্র জগতে আনাড়ি পরিচালকের পাল্লায় পড়ে শরৎচন্দ্রের প্রতিভার দান কলঙ্কিত হয়েছে বারংবার, সাধারণ রঙ্গালয়ে তা এতটা দুর্দশাগ্রস্ত হয়নি কখনও। তার প্রধান কারণ, সাহিত্যশিক্ষাহীন বাঙালি পরিচালকদের দৃঢ় ধারণা, গল্প-লেখকদের চেয়ে তাঁরা ভালো করে গল্প বলতে পারেন। এই মূর্খোচিত ধারণার কবলে পড়ে বাংলাদেশে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের নাম বহুবার অপমানিত হয়েছে। যারা বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রকে মানে না, সেসব হতভাগ্যের কাছে অন্যান্য লেখকরা তো নগণ্য! কিন্তু শরৎচন্দ্রের নাম রেখেছে 'দেবদাস',—যদিও চলচ্চিত্রজগতে মনস্তত্ত্ব-প্রধান কোনও শ্রেষ্ঠ উপন্যাসেরই মর্যাদা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে বলে বিশ্বাস করি না। শরৎচন্দ্রের আরও কয়েকখানি উপন্যাস নাট্যরূপলাভের জন্যে অপেক্ষা করছে। তাঁর কোনও কোনও মানসসন্তান ইতিমধ্যেই ছবিতে হিন্দি কথা কয়েছে, ভবিষ্যতে আরও অনেকেই কইতে পারে।

শরৎচন্দ্রের বহু রচনা ইউরোপের ও ভারতের নানা ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রচুর সমাদর লাভ করেছে, এখানে তাদের নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করবার ঠাঁই নেই। আরও কিছুকাল জীবিত থাকলে তিনি হয়তো 'নোবেল-পুরস্কার' পেয়ে সমগ্র পৃথিবীর বিস্মিত চিত্ত আকর্ষণ করতে পারতেন।

একদৃষ্টিতে যতটা দেখা যায়, আমরা শরৎচন্দ্রের জীবন ততটা দেখে নিয়েছি বোধহয়। যৌবনে যে-শরৎচন্দ্রের দেশে মাথা রাখবার ছোট্টো একটুখানি ঠাঁই জোটেনি, ট্যাঁকে দুটি টাকা সম্বল করে যিনি মরিয়া হয়ে মগের মুল্লুকে গিয়ে পড়েছিলেন, প্রৌঢ় বয়সে তিনিই যে দেশে ফিরে এসে বালিগঞ্জে সুন্দর বাড়ি, রূপনারায়ণের তটে চমৎকার পল্লি-আবাস তৈরি করবেন, মোটরে চড়ে কলকাতার পথে বেড়াতে বেরুবেন, একদিন যাঁরা তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাননি, তাঁরাই এখন তাঁর কাছে ছুটে এসে বন্ধু বা আত্মীয় বলে পরিচয় দিতে ব্যস্ত হবেন, এটা কেহই কল্পনা করতে পারেননি বটে, কিন্তু এসব খুব আশ্চর্য ব্যাপার নয়, কারণ এমন ব্যাপার আরও বহু প্রতিভাহীন ও বিদ্যাহীন ব্যক্তির ভাগ্যেও ঘটতে দেখা গিয়েছে।

আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে এই : শরৎচন্দ্রের জীবনে আলাদীনের প্রদীপের মতন কাজ করেছে বাংলা সাহিত্য। বাংলা সাহিত্য গরিবকে দুদিনে ধনী করে তুলেছে এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ। বড়ো বড়ো বাঙালি সাহিত্যিকদের দিকে তাকিয়ে কী দেখি? দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন জমিদার। হেমচন্দ্র যত দিন ওকালতি করতেন, কবিতা লিখতেন নির্ভাবনায়; কিন্তু অন্ধত্বের জন্যে ওকালতি ছাড়বার পর তাঁকে পরের কাছে হাত পেতে বাকি জীবন কাটাতে হয়েছে। এবং সাহিত্য অত বড়ো প্রতিভাবান মাইকেলকে কোনও সাহায্যই করেনি—হাসপাতালে গিয়ে তিনি মারা পড়েছেন একান্ত অনাথের মতো। বাংলাদেশের বড়ো সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র শরৎচন্দ্রই কেবল সাহিত্যের জোরে দুই পায়ে ভর দিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পেরেছেন,—ভারতীর পুরোহিত হয়েও লক্ষ্মীর ঝাঁপিকে করেছেন হস্তগত!

নিজের বাড়ি, নিজের গাড়ি ও নিজের টাকার কাঁড়ির গর্বে শরৎচন্দ্র একদিনের জন্যেও

একটুও পরিবর্তিত হননি, তাঁর মুখে কেউ কোনওদিন দেমাকের ছায়া পর্যন্ত দেখেনি। সাদাসিধে পোশাকে, সরল হাসিমাখা মুখে, বিনা অভিমানে তিনি আগেকার মতোই আলাপী-লোকদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হতেন, যারা তাঁকে চিনত না তাঁর কথাবার্তা শুনেও তারা বুঝতে পারত না যে তিনি একজন পৃথিবীবিখ্যাত অমর সাহিত্যস্রষ্টা! ভানই যাদের সর্বস্ব সেই পুঁচকে লেখকরা শরৎচন্দ্রকে দেখে কত শিক্ষাই পেতে পারে!

রেঙ্গুন থেকে চাকরিতে জবাব দিয়ে দেশে ফিরে এসে শরৎচন্দ্র কয়েক বৎসর শিবপুরে ভাড়া করে বাস করেন। কিন্তু শহরের একটানা ভিড়ের ধাক্কা সইতে না পেরে শেষটা তিনি রূপনারায়ণের রূপের ধারায় ধোয়া পানিত্রাসে (সামতাবেড়) নিরালা পল্লি-আবাস বানিয়ে সেইখানেই বাস করতে থাকেন। বাগানে ঘেরা দোতলা বাড়ি, লেখবার ঘরে বসে নটিনী নদীর নৃত্যলীলা দেখা যায়; পল্লিকথার অপূর্ব কথকের পক্ষে এর চেয়ে মনোরম স্থান আর কোথায় আছে? কখনও লেখেন, কখনও পড়েন, কখনও ভাবেন; কখনও বাগানে গিয়ে ফুলের চারা আর ফলের গাছের সেবা করেন; কখনও পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে যত্নে পালিত মাছদের আদরে ডেকে খাবার খেতে দেন; কখনও গাঁয়ের ঘরে ঘরে গিয়ে পল্লিবাসীদের কুশল-সংবাদ নেন এবং পীড়িতদের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে আসেন। এই ছিল শরৎচন্দ্রের কাছে আদর্শ জীবন!

কিন্তু যাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিচিত্র জনতার শ্রেণী, বহুজনধাত্রী কলিকাতা নগরীও মাঝে মাঝে বোধহয় তাঁকে প্রাণের ডাকে ডাকত! তাই শেষ-জীবনে বালীগঞ্জেও তিনি একখানি বড়ো বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন। তারপর তাঁর স্নেহ শহর ও পল্লির মধ্যে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

এবং শহরেও ছিল তাঁর আবাসে সকলের অবারিত দ্বার। আগন্তুকদের ভয় দেখাবার জন্যে বড়োমানুষীর দিনেও তাঁর দেউড়িতে লাঠি-হাতে চাপদাড়ি দারোয়ান বসেনি কোনওদিন। তাই শরৎচন্দ্রের প্রশস্ত বৈঠকখানার ভিড়ের মধ্যে দেখা যেত দেশবিখ্যাত নেতা, সাহিত্যিক ও শিল্পীর পাশে নিতান্ত সাধারণ অখ্যাত লোকদের; হোমরা-চোমরা মোটরবিলাসী বাবুগণের পাশে কপর্দকহীন মলিনবাস দরিদ্রদের; পক্ককেশ গম্ভীরমুখ প্রাচীনবৃন্দের পাশে ইশকুলের অজাতশত্রু চপল ছোকরাদের! শরৎচন্দ্র ছিলেন সমগ্র মানবজীবনের চিত্রকর, তাই কোনওরকম মানুষকেই তিনি ত্যাগ করতে পারতেন না—তিনি ছিলেন প্রত্যেকেরই বন্ধু, তাই সবাই এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে যেত। সেইজন্যেই আজ তাঁর মৃত্যুর পরে অগুনতি মাসিকে, সাপ্তাহিকে ও দৈনিকে স্মৃতিকথার আর অন্ত নেই, যিনি তাঁকে একদিন দুদণ্ডের জন্যে দেখেছেন, তিনিও শরৎ-কাহিনি লিখতে বসে গেছেন প্রবল উৎসাহে এবং তিনিও এই ভাবটাই প্রকাশ করেছেন যে শরৎচন্দ্র তাঁকে, একান্ত স্বজনেরই মতন ভালোবাসতেন! হয়তো সেইটেই আসল সত্য, বিরাট বিশ্বের বৃহৎ আকাশ থেকে ছোট্ট তৃণকণার প্রেমে যিনি হাসতে-কাঁদতে নারাজ। সাহিত্যিক বা শিল্পী হওয়া তাঁর কাজ নয়!

তাঁর গোপন দান ছিল অনেক। নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল অভাব ও দীনতার হাহাকারে, তাই পরের দুঃখে তিনি অটল থাকতে পারতেন না। অনেক সময়ে ভিখারির হাতে একমুঠো সিকি দুআনি আনি ঢেলে দিয়েছেন! দেশের ডাকে হাসিমুখে যারা শাস্তিকে মাথা পেতে নিয়েছে, তাদের পরিবারের অসহায়তার কথা ভেবে সমবেদনায় তাঁর

প্রাণ ছটফট করত। তাই বহু রাজবন্দির পরিবারে গিয়ে পৌঁছোত তাঁর অযাচিত অর্থসাহায্য। শরৎচন্দ্র নিজেও ছিলেন দেশের কাজে অগ্রণী; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন ও সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে প্রায়ই কংগ্রেসের কাজে মেতে উঠতেন। শেষের দিকে শরীর ভেঙে পড়াতে এদিকে হাতেনাতে কাজ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু তাঁর মন পড়ে থাকত জাতীয় কর্মক্ষেত্রেই। এক সময়ে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য এবং হাওড়া জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি পর্যন্ত হয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের লেখবার ধারা ছিল একটু স্বতন্ত্র। বহু নবীন লেখককে জানি, যাঁরা বড়ো বড়ো লেখকের রচনাপ্রণালীর অনুসরণ করেন। এটা ভুল। কারণ প্রত্যেক লেখকেরই মনের গড়ন বিভিন্ন, তাই তাঁদের রচনাপ্রণালীও হয় ব্যক্তিগত। শরৎচন্দ্র আগে প্লট বা আখ্যানবস্তু স্থির করতেন না, আগে বিষয়বস্তু ও তার উপযোগী চরিত্রগুলিকে মনে মনে ভেবে রাখতেন, তারপর ঠিক করতেন তারা কী কী কাজ করবে। গতযুগের সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। বঙ্কিম-সহোদর স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছি, বঙ্কিমচন্দ্র আগে মনে-মনে করতেন ঘটনা-সংস্থান। শরৎচন্দ্রের আর এক নূতনত্ব ছিল। প্রায়ই তাঁর মুখে শুনেছি যে, মনে-মনে নূতন উপন্যাসের কল্পনা স্থির হয়ে গেলে তিনি নাকি গোড়ার দিক ছেড়ে শেষাংশের বা মধ্যাংশের দু-চারটে পরিচ্ছেদ আগে থাকতে কাগজে-কলমে লিখে রাখতে পারতেন। তাঁর 'চরিত্রহীনে'র একাধিক বিখ্যাত অংশ এইভাবে লেখা!

শরৎচন্দ্রের ঝরঝরে লেখা দেখলে মনে হয়, ভাষা যেন অনায়াসে তাঁর মনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু আসলে তিনি দ্রুত লেখকও ছিলেন না এবং খুব সহজে লিখতেও পারতেন না এবং লেখবার পরেও অনেক কাটাকুটি করতেন। বেশ ভেবে-চিন্তে বাক্যরচনা করতেন। বর্তমান জীবনী-লেখক 'যমুনা'র যুগে রচনায় নিযুক্ত শরৎচন্দ্রকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন একাধিকবার। তখন তাঁর মনে হয়েছিল, লিখতে লিখতে শরৎচন্দ্র যেন বিশেষ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছেন! এবং প্রত্যেক ভালো লেখকেরই পক্ষে এইটেই হয়তো স্বাভাবিক! রচনাও তো জননীর প্রসব-বেদনার মতো;—যন্ত্রণাময় অথচ আনন্দময়!

যশস্বী হয়ে শরৎচন্দ্র প্রায় প্রতিদিনই অসংখ্য সম্পাদকের লেখার জন্যে তাগাদা সহ্য করেছেন, অটলভাবে এবং অম্লানবদনে। কিন্তু অধিকাংশ লেখকের মতো তাগাদার চোটে সহসা যা তা একটা কিছু লিখে দিয়ে কারুকে কখনও তিনি খুশি করতেন না। সম্পাদকরা রাগ করবেন বলে তিনি সাহিত্যের অপমান করতে রাজি ছিলেন না—টাকার লোভেও নয়!

কথিত ভাষায় সাহিত্য রচনা করা ছিল শরৎচন্দ্রের মতবিরুদ্ধ। এ ভাষা তিনি ব্যবহার করতেন কদাচ। এ-বিষয়ে তিনি পুরাতনপন্থী ছিলেন। কথ্যভাষার সুদৃঢ় দুর্গ 'ভারতী' আসরেও গিয়ে তিনি বহুবার নিজের অভিযোগ জানিয়েছিলেন।

সাহিত্যসেবার জন্যে তাঁর ভাগ্যে প্রথম পুরস্কার লাভ হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে 'জগত্তারিণী পদক'। এ-সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের পুরাতন বন্ধু, পুস্তকের প্রকাশক ও 'মৌচাক'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার লিখেছেন ; 'সভা-সমিতিকে তিনি বর্জন করিয়া চলিতেন। আমার বেশ মনে আছে যে-বারে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে 'জগত্তারিণী' মেডেল দেওয়া হয়, সেইবারের কনভোকেশনের দিনে মেডেল দিবার সময়ে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল

না। হাজার হাজার লোকের সম্মুখে মেডেল পরিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। তাই সেইদিন তিনি আমাদের দোকানের নিভৃত কোণে আত্মগোপন করিয়াছিলেন।' আমরা জানি, সর্বপ্রথমে শরৎচন্দ্রকে যেদিন একটি সাহিত্য-সভার সভাপতি করা হয়, সেদিনও তিনি সুধীরচন্দ্রের পুস্তকালয়ে গিয়ে লুকিয়ে ছিলেন। কিন্তু এমন লুকোচুরি করে ছিনেজোঁক সভাওয়ালাদের কতদিন আর ফাঁকি দেওয়া যায়? শেষের দিকে শরৎচন্দ্রকে বাধ্য হয়ে সভার অত্যাচার সহ্য করতে হত, কিন্তু তাঁর লাজুক ভাব কোনওকালেই যায়নি। আর একজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের এই রকম সভা-ভীতি দেখেছি। তিনি হচ্ছেন স্বর্গীয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। সভার ব্যাপারে তিনি ছিলেন শরৎচন্দ্রেরও চেয়ে পশ্চাৎপদ!

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যজীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পুরস্কার পেয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে। মৃত্যুর অনতিকাল আগে এই 'ডক্টর' উপাধি লাভ করে হয়তো তিনি যথেষ্ট সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন—যদিও তাঁর প্রতিভার মূল্য ওই উপাধির চেয়ে ঢের বেশি। উপাধি মানুষকেই বড়ো করে, প্রতিভাকে নয়।

১৩৩৯ সালে দেশবাসীর পক্ষ থেকে কলকাতার টাউন-হলে 'শরৎ-জয়ন্তী'র আয়োজন হয়েছিল। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে একশ্রেণীর লোক এমন অশোভন কাণ্ড করেছিল যা ভাবলে আজও লজ্জা পেতে হয়! এর আগে ও পরে জীবনে আরও বহু বৃহৎ অনুষ্ঠানে শরৎচন্দ্র সম্মানলাভ করেছেন, কিন্তু এখানে তার ফর্দ দেওয়া অনাবশ্যক মনে করি, কারণ ওসব শোভা পায় সুবিস্তৃত পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিতে।

সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমাদের যা বলবার তা মোটামুটি বলা হয়ে গেছে। তবে সাধারণ পাঠক হয়তো তাঁর আরও কোনও কোনও পরিচয় পেতে চাইবেন। এখানে তাই আরও কিছু বলা হল। যাঁরা এর চেয়েও বেশি কিছু চাইবেন, পরিশিষ্ট অংশের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন।

জীবজন্তুদের প্রতি শরৎচন্দ্রের প্রাণের টান ছিল চিরদিনই। খুব ছেলেবেলাতেও তিনি বাক্সে করে নানারকম ফড়িং পুষতেন, পরিচর্যা করতেন নিজের হাতে। কোনও বাড়ির উঁচু আলিসা দিয়ে একটা মালিকহীন বিড়ালকে চলাফেরা করতে দেখলে তিনি দুর্ভাবনায় পড়তেন—যদি সে পড়ে যায়! পাখি, ছাগল ও বানর প্রভৃতি সব জীবকেই তিনি সমান যত্নাদর বিলিয়ে গেছেন। তাঁর পোষা দেশি কুকুর 'ভেলু' তো প্রায়-অমর হয়ে উঠেছে! 'যুবরাজ' 'বংশিবদন' প্রভৃতি আদরের ডাকে তিনি তাকে ডাকতেন! কেবল ভেলু নয়, যে-কোনও পথচারী কুকুর ছিল তাঁর স্নেহের পাত্র। নিজের মোটরচালককে বলা ছিল, পথে যদি কখনও সে কুকুর চাপা দেয়, তাহলেই তার চাকরি যাবে! তাঁর এই কুকুর-প্রীতি দেখলে কবি ঈশ্বর গুপ্তের লাইন মনে হয়

'কত রূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া!'

ভেলুর কয়েকটি গল্প পরিশিষ্টে 'শরতের ছবি'তে দেওয়া হল। পাণিত্রাসের বাগানে পুকুরের মাছরাও তাঁকে চিনত। দুটি মাছ আবার তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত। একবার বর্ষায়

রূপনারায়ণ ছাপিয়ে বাগানে জল ঢুকে সেই মাছ দুটিকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বলে তাঁর দুঃখ কত! তাঁর বাগানের একটি গর্তে দুটি বেজি তাদের বাচ্চা নিয়ে বাস করত। গাঁয়ের এক ছেলে সেই বাচ্চাটিকে চুরি করে পালায়। শুনেই শরৎচন্দ্র তার বাড়িতে গিয়ে হাজির। ছেলেটিকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, সন্তানের অভাবে মা বাপের মনে কত কষ্ট হয়। কিন্তু ছেলেটি তবু বুঝল না দেখে শরৎচন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে তখন জোর করে বাচ্চাটিকে কেড়ে এনে আবার নেউল-দম্পতিকে ফিরিয়ে দিলেন।

শরৎচন্দ্র যা তা খেলো কাগজে লিখতে পারতেন না। আর কোনও লেখককেই তাঁর মতন নিয়মিতভাবে দামি কাগজে লিখতে দেখিনি। লেখার সরঞ্জাম সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের এই শৌখিনতা রচনার প্রতি তাঁর পবিত্র নিষ্ঠাকেই প্রকাশ করে। তাঁর হাতে বরাবরই ফাউন্টেন পেন দেখেছি, যখন ও-'পেনে'র চলন হয়নি, তখনও। তিনি খুব বড়ো ও মোটা কলম ও সূক্ষ্ম নিব ব্যবহার করতেন। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের দামি ফাউন্টেন পেন উপহার দিতে তিনি ভালোবাসতেন। তাঁর হাতের লেখার ছাঁদ ছোটো হলেও চমৎকার ছিল। যেন মুক্তার সারি।

তামাক ছাড়া তাঁর একদণ্ড চলত না। লেখবার সময়েও গড়গড়ায় তামাক খেতেন। কেউ তাঁকে গড়গড়া উপহার দিলে খুশি হতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও অমৃতলাল বসুও ছিলেন গড়গড়ার এমনি ভক্ত। তিনি চায়েরও একান্ত অনুরাগী ছিলেন। অনেক দিনই তাঁকে আট-দশ পিয়ালা চা-পান করতেও দেখা গিয়েছে। তাঁর একটি বদ-অভ্যাস ছিল—আফিম খাওয়া।

তিনি স্থির হয়ে এক জায়গায় বসে থাকতে পারতেন না। কখনও চেয়ারের উপরে দু' পা তুলে ফেলতেন, কথা কইতে কইতে কখনও মাথার চুলের ভিতরে অঙ্গুলি সঞ্চালন করতেন, কখনও হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরে একবার পায়চারি করে আসতেন। সভাপতিরূপেও এ অস্থিরতা তিনি নিবারণ করতে পারতেন না।

মাঝে মাঝে গরদের জামা-কাপড়-চাদর পরতেন বটে, কিন্তু কোনওদিনই তিনি ফিটফাট পোশাকি বাবু হতে পারেননি। বেশির ভাগ সময়েই আটপৌরে জামা-কাপড়ে একছুটে বেরিয়ে পড়তেন। একসময়ে তালতলার চটি ছাড়া আর কোনও জুতো পরতেন না। বাড়িতে তাঁকে হাত-কাটা জামা পরে থাকতে দেখেছি।

যৌবন-সীমা পার হবার আগেই তিনি নিজেকে বুড়ো বলে প্রচার করতে ভালোবাসতেন। একবার হাওড়ার এক সভায় রবীন্দ্রনাথের পাশে দাঁড়িয়েই তিনি নিজের প্রাচীনতার গর্ব প্রকাশ করেন। তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো রবীন্দ্রনাথের বিস্মিত মুখে সেদিন মৃদু কৌতুকহাস্য লক্ষ করেছিলুম! তাঁর আগেকার অধিকাংশ পত্রেই এই কল্পিত বৃদ্ধত্বের দাবি দেখা যায়!

প্রকাশ্য সাহিত্যজীবনের প্রথম কয় বৎসর এই সব জায়গায় গিয়ে তিনি প্রাণ খুলে মেলামেশা করতেন ২২।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের 'যমুনা' কার্যালয়ে ও পরে 'মর্ম্মবাণী' কার্যালয়ে; সুকিয়া স্ট্রিটে 'ভারতী' কার্যালয়ে; গুরুদাস অ্যান্ড সন্সের দোকানে; রায় এম সি সরকার অ্যান্ড সন্সের দোকানে; ৩৮নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের বৈঠকখানায়, এবং শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের আলয়ে। শেষ-জীবনে তাঁকে আর কোনও সাহিত্য-বৈঠকে দেখা যেত না। মাঝে মাঝে তিনি একাধিক থিয়েটারি আসরে (প্রায়ই দর্শকরূপে নয়) উপরি-উপরি হাজিরা দিতেন।

পানিত্রাসে যেসব সাক্ষাৎপ্রার্থী গিয়ে উপস্থিত হতেন, তাঁরা ফিরে আসতেন শরৎচন্দ্রের অতিথি-সৎকারে অভিভূত হয়ে। তিনি পরমাত্মীয়ের মতো সকলকে ভালো করে না খাইয়ে-দাইয়ে ছেড়ে দিতেন না। বিংশ-শতাব্দীর অতি আধুনিক লেখক হলেও মানুষ-শরৎচন্দ্রের ভিতরে সেকেলে হিন্দু-স্বভাবটাই বেশি করে ফুটে উঠত।

আজকালকার অধিকাংশ সাহিত্যিকই নিজেদের কোনও বিশেষ দলভুক্ত বলে মনে করেন এবং এটা সগর্বে প্রচারও করেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র বরাবরই ছিলেন দলাদলির বাইরে। প্রাচীন ও আধুনিক সব দলেই তিনি দীর্ঘকাল ধরে মিশেছেন একান্ত অন্তরঙ্গের মতো, কিন্তু কোথাও গিয়ে আপনাকে হারিয়ে ফেলেননি, বা কোনও দলের বিশেষ মনোভাব তাঁর মনকে চাপা দিতে পারেনি। কেবল তাই নয়। তার চেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, আত্মাভিমানের বশবর্তী হয়ে তিনি নিজেও কোনও দলগঠন করেননি। সাহিত্যক্ষেত্রে 'শরৎচন্দ্রের দল' বলে কোনও দল নেই। অথচ এমন দলসৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে ছিল অত্যন্ত সহজ।

ভবিষ্যতের ইতিহাস সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আসন স্থাপন করবে কত উচ্চে, আজ তা কল্পনা করা কঠিন। তবে বর্তমান যুগের কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর মাঝখানে যে অন্য কারুর ঠাঁই হবে না, এটা নিশ্চিতরূপেই বলা যায়। এবং শরৎচন্দ্রের অতুলনীয় জনপ্রিয়তার কাহিনি যে সুদূর ভবিষ্যৎ যুগকেও বিস্মিত করবে সে-বিষয়েও সন্দেহ করবার কারণ নেই।

এখন বাকি রইল শরৎচন্দ্রের শেষ রোগশয্যার কথা। সেটা নিজে না বলে এখানে 'বাতায়নে'র বিবরণী উদ্ধার করে দিলুম

'মৃত্যুর বছর দুই পূর্বে থেকে শরৎচন্দ্রের শরীরে ব্যাধি প্রকট হয়। চিরদিন তিনি বলতেন, শরীরে আমার কোনও ব্যাধি নেই, শুধু অর্শটাই মাঝে মাঝে যা একটু কষ্ট দেয়। অর্শ যে আর সারবে তা আমার মনে হয় না, তা এতদিন ও আমাকে আশ্রয় করে আছে যে ওকে আশ্রয়হীন করাও কঠিন। কিন্তু কুমুদ (ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়) ওর পরম শত্রু। সে বলে, ওকে তাড়াতেই হবে। একথা ওকে আর জানতে দিইনে। জানলে ভয়ে ও এমনি সঙ্কুচিত হয়ে উঠবে যে প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত করে তুলবে। একেই তো ওকে খুশি রাখতে দিনে কয়েক ঘণ্টা আমার কাটে, ওর ওপর ও যদি অভিমান করে তাহলে বুঝতেই পারছ আমার অবস্থা কী হবে!...' অর্শর কথা উঠলে এমনি পরিহাসই তিনি করতেন।

দিন যায়—অর্শ ব্যাধিটি পুরাতন ভৃত্যের মতো তাঁর সঙ্গেই থাকে। একদিন ডাঃ কুমুদশঙ্কর নিষ্ঠুরভাবে তাকে তাঁর দেহ থেকে কেটে বার করে দিলেন। তিনি বললেন, বাঁচলুম! এতদিনে সত্যি ও আমায় ছেড়ে গেল। কিন্তু ভয় হয়, প্রতিশোধ নিতে ও কুমুদকে না ধরে।

হঠাৎ তাঁর শরীরে প্রতিদিন জ্বর হতে লাগল আর সঙ্গে কপাল থেকে মাথা পর্যন্ত এক রকম যন্ত্রণার সূত্রপাত হল। জ্বরও ছাড়তে চায় না—যন্ত্রণাও যেতে চায় না। একদিন জ্বর গেল, কিন্তু যন্ত্রণা রয়ে গেল। চিকিৎসকেরা বললেন, 'নিউরলজিক পেন'।......নানা চিকিৎসা চলতে লাগল,—শেষে যন্ত্রণারও উপশম হল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে পেটে এক রকম অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলেন। পরীক্ষায় বুঝা গেল পাকস্থলীতে 'ক্যানসার' হয়েছে। এ কথা তাঁর কাছে গোপন রাখা হল—ইতিমধ্যে রঞ্জনরশ্মির পরীক্ষার সাহায্যে চিকিৎসকেরা রোগ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেন। এদিকে শরীর তাঁর অত্যন্ত দুর্বল—অস্ত্রোপচার করা সম্পূর্ণ

অসম্ভব। চিকিৎসকেরা বড়ো মুশকিলে পড়লেন। শেষে স্থির হল বাড়ি থেকে (২৪নং অশ্বিনীকুমার দত্ত রোড) তাঁকে কোনও নার্সিংহোমে রেখে শরীরে যখন কিছু শক্তি সঞ্চয় হবে তখন অস্ত্রোপচার করা হবে। এই সিদ্ধান্তের পরই তাঁকে ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৩৭ তারিখে পার্ক স্ট্রিটের একটি ইউরোপিয়ান নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তাঁর বিশেষ অসুবিধা হওয়ায় ১লা জানুয়ারি ১৯৩৮ তারিখে তিনি চলে আসবার জন্যে এমনি জিদ ধরে বসেন যে তাঁকে অন্য নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা ব্যতীত আর উপায় রইল না। তিনি বলেছিলেন, আমাকে যদি এখান থেকে না নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে আমি মাথা ঠুকে মরব। এখানকার নার্সগুলো আমাকে বড়ো বিরক্ত করে। (মানে তাঁকে তামাক ও আফিম খেতে দেয় না।)

যেখানে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হল তার নাম হচ্ছে 'পার্ক নার্সিংহোম'। কাপ্তেন সুশীল চট্টোপাধ্যায়ের ভবানীপুরস্থ ৪নং ভিক্টোরিয়া টেরাসের ভবনের নীচের তলায় এটি অবস্থিত। এরই ১নং ঘরে তাঁকে রাখা হল।

এখানে কিছুদিন রাখবার পর বুধবার ১২ই জানুয়ারি তারিখে বেলা ২॥০ টার সময় অত্যন্ত গোপনে তাঁর পাকস্থলীতে অস্ত্রোপচার করা হয়। এটি ক্যানসারের উপর অস্ত্রোপচার নয়। মুখের মধ্যে দিয়ে কিছু খাবার শক্তি তাঁর আর ছিল না, অথচ দেহে রক্তের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে পাকস্থলীতে অস্ত্রোপচার করে তাঁকে খাওয়াবার ব্যবস্থা করা হয়। এই অস্ত্রোপচার ব্যাপারে শরৎচন্দ্র যে মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা থেকে বেশ বুঝা যায় মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি একটুও শঙ্কিত ছিলেন না। চিকিৎসকেরা তাঁর জীবনের কোনও আশাই রাখেননি, তাই তাঁরা অস্ত্রোপচারের পক্ষপাতী ছিলেন না। শরৎচন্দ্র কিন্তু নাছোড়বান্দা—অস্ত্রোপচার করতেই হবে। জোর করে বললেন, আমি বলছি তোমরা করো—তোমাদের কোনও দায়িত্ব নেই...ভয় কিসের!—I am not a woman.

তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হল। এর পর চার দিন মাত্র তিনি জীবিত ছিলেন। ১৬ই জানুয়ারি ২রা মাঘ, রবিবার, বেলা ১০টার সময় নার্সিংহোমেই তাঁর জীবনলীলার অবসান হয়। বেলা ১১টার সময় তাঁর নিজের মোটরগাড়িতে তাঁকে তাঁর বাড়িতে আনা হয়। বৈকালবেলায় ৪টের সময়, এক বিরাট শোভাযাত্রা সহ তাঁর শবদেহ কেওড়াতলার শ্মশানতীর্থে আনীত হয়। ৫-৪৫ মি. সময়ে তাঁর চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হয়।

শরৎচন্দ্র মহাপ্রস্থান করেন রবিবার, ২রা মাঘ, ১৩৪৪; তাঁর বয়স হয়েছিল একষট্টি বৎসর দুই মাস মাত্র।

মৃত্যুর পূর্বে শরৎচন্দ্রের শেষ কথা হচ্ছে, 'আমাকে দাও—আমাকে দাও—আমাকে দাও!'...কে তাঁকে কী দিতে এসেছিল, কিসের জন্য তাঁর এই অন্তিম আগ্রহ?...শরৎচন্দ্রের মুখ চিরমৌন, শরৎচন্দ্রের লেখনী চির-অচল। তাঁর প্রার্থিত সেই অজ্ঞাত নিধির কথা আর কেউ জানতে পারবে না।

পরিশিষ্ট

শরতের ছবি

পঁচিশ বছর আগেকার কথা। সাহিত্যের পাঠশালায় আমার হাতমকশো তখন শেষ হয়েছে বোধহয়। 'যমুনা'র সম্পাদকীয় বিভাগে অপ্রকাশ্যে সাহায্য করি এবং প্রতি মাসেই গল্প বা প্রবন্ধ বা কবিতা কিছু-না-কিছু লিখি। ...একদিন বৈকালবেলায় যমুনা অফিসে একলা বসে বসে রচনা নির্বাচন করছি। এমন সময় একটি লোকের আবির্ভাব। দেহ রোগা ও নাতিদীর্ঘ, শ্যামবর্ণ, উস্কখুস্ক চুল, একমুখ দাড়ি-গোঁফ, পরনে আধ-ময়লা জামা-কাপড়, পায়ে চটি জুতো। সঙ্গে একটি বাচ্চা লেড়ী কুকুর।

লেখা থেকে মুখ তুলে শুধোলুম, 'কাকে দরকার?'

—'যমুনার সম্পাদক ফণীবাবুকে।'

—'ফণীবাবু এখনও আসেননি।'

—'আচ্ছা, তাহলে আমি একটু বসব কি?'

চেহারা দেখে মনে হল লোকটি উল্লেখযোগ্য নয়। আগন্তুককে দূরের বেঞ্চি দেখিয়ে দিয়ে আবার নিজের কাজে মনোনিবেশ করলুম।

প্রায় আধ-ঘণ্টা পরে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পালের প্রবেশ। তিনি ঘরে ঢুকে আগন্তুককে দেখেই সসম্ভ্রমে ও সচকিত কণ্ঠে বললেন, 'এই যে শরৎবাবু! কলকাতায় এলেন কবে? ওই বেঞ্চিতে বসে আছেন কেন?'

আগন্তুক মুখ টিপে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'ওঁর হুকুমেই এখানে বসে আছি।'

ফণীবাবু আমার দিকে ফিরে বললেন, 'সে কী! হেমেন্দ্রবাবু, আপনি কি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে চিনতে পারেননি?'

অত্যন্ত অপ্রতিভভাবে স্বীকার করলুম, 'আমি ভেবেছিলুম উনি দপ্তরী!'

শরৎচন্দ্র সকৌতুকে হেসে উঠলেন।

এই হল কথাসাহিত্যের ঐন্দ্রজালিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়। কিন্তু তাঁর সঙ্গে অন্য পরিচয় হয়েছিল এর আগেই। কারণ 'যমুনা'য় আমার 'কেরানী' গল্প পড়ে তিনি রেঙ্গুন থেকে আমাকে উৎসাহ দিয়ে একখানি প্রশংসাপত্র লিখেছিলেন। তারপরেও আমাদের মধ্যে একাধিকবার পত্র-ব্যবহার হয়েছিল। তাঁর দু-একখানি পত্র এখনও সযত্নে রেখে দিয়েছি।

উপর-উক্ত ঘটনার সময়ে শরৎচন্দ্রের নাম জনসাধারণের মধ্যে বিখ্যাত না হলেও, 'যমুনা'য় 'রামের সুমতি', 'পথনির্দেশ' ও 'বিন্দুর ছেলে' প্রভৃতি গল্প লিখে তিনি প্রত্যেক সাহিত্য-সেবকেরই সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এরও বছর-ছয়েক আগে 'ভারতী'তে তাঁর 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয়ে সাহিত্যসমাজে অল্পবিস্তর আগ্রহ জাগিয়েছিল বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে

তাঁর যশের ভিত্তি পাকা করে তুলেছিল, ওই তিনটি সদ্য-প্রকাশিত গল্পই—বিশেষ করে 'বিন্দুর ছেলে।' তাঁর অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস 'চরিত্রহীনে'র পাণ্ডুলিপি তখন অশ্লীলতার অপরাধে বাংলাদেশের কোনও বিখ্যাত মাসিকপত্রের অফিস থেকে বাতিল হয়ে ফিরে এসে 'যমুনা'য় দেখা দিতে শুরু করেছে এবং তার প্রথমাংশ পাঠ করে আমাদের মধ্যে জেগে উঠেছে বিপুল আগ্রহ। তাঁর 'চন্দ্রনাথ' ও 'নারীর মূল্য'ও তখন 'যমুনা'য় সবে সমাপ্ত হয়েছে। তবে তখনও শরৎচন্দ্রের পরিচয় দেবার মতো আর বেশি কিছু ছিল না। রেঙ্গুনে সরকারি অফিসে নব্বই কী একশো টাকা মাহিনায় অস্থায়ী কাজ করতেন। অ্যাকাউন্টেন্টশিপ একজামিনে পাস করতে পারেননি বলে তাঁর চাকরি পাকা হয়নি। শুনেছি, বর্মায় গিয়ে তিনি উকিল হবারও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বর্মি ভাষায় অজ্ঞতার দরুন ওকালতি পরীক্ষাতেও বিফল হয়েছিলেন। এক হিসাবে জীবিকার ক্ষেত্রে এই অক্ষমতা তাঁর পক্ষে শাপে বর হয়েই দাঁড়িয়েছিল। কারণ সরকারি কাজে পাকা বা উকিল হলে তিনি হয়তো আর পুরোপুরি সাহিত্যিকজীবন গ্রহণ করতেন না।

শরৎচন্দ্র প্রত্যহ 'যমুনা'-অফিসে আসতে লাগলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই আমি তাঁর অকপট বন্ধুত্ব লাভ করে ধন্য হলুম। তাঁর সঙ্গে আমার বয়সের পার্থক্য ছিল যথেষ্ট, কিন্তু সে পার্থক্য আমাদের বন্ধুত্বের অন্তরায় হয়নি। সে সময়ে যমুনা-অফিসে প্রতিদিন বৈকালে বেশ একটি বড়ো সাহিত্য-বৈঠক বসত এবং তাতে যোগ দিতেন স্বর্গীয় কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বর্গীয় গল্পলেখক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্গীয় প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় কবি, গল্পলেখক ও 'সাধনা'-সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, কবি শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার, সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, মিউনিসিপাল গেজেটের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যরসিক শ্রীযুক্ত হরিহর গঙ্গোপাধ্যায়, 'মৌচাক'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার, ঔপন্যাসিক (অধুনা চলচ্চিত্র-পরিচালক) শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, 'আনন্দবাজারে'র সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্রকর ও চলচ্চিত্র-পরিচালক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়, ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বহুভাষাবিদ পণ্ডিত ও 'ভারতবর্ষে'র ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি আরও অনেকে, সকলের নাম মনে পড়ছে না। 'যমুনা'র কর্ণধার ফণীবাবুর কথা বলা বাহুল্য। পরে এই আসরেরই অধিকাংশ লোককে নিয়ে সাহিত্যসমাজে বিখ্যাত 'ভারতী'র দল গঠিত হয়। অবশ্য 'ভারতী'র দলের আভিজাত্য এ আসরে ছিল না—এখানে ছোটো-বড়ো সকল দলেরই সাহিত্যিক অবাধে পরস্পরের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেতেন। অসাহিত্যিকেরও অভাব ছিল না। এখানে প্রতিদিন আসরে আর্ট ও সাহিত্য নিয়ে যে আলোচনা আরম্ভ হত, শরৎচন্দ্রও মহা উৎসাহে তাতে যোগ দিতেন এবং আলোচনা যখন উত্তপ্ত তর্কাতর্কিতে পরিণত হত তখনও গলার জোরে তিনি কারুর কাছে খাটো হতে রাজি ছিলেন না—যদিও যুক্তির চেয়ে কণ্ঠের শক্তিতে সেখানে বরাবরই প্রথম স্থান অধিকার করতেন শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্য ও আর্ট সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত মতামত সেখানে যেমন অসঙ্কোচে

ও স্পষ্টভাষায় প্রকাশ পেত, তাঁর কোনও রচনার মধ্যেও তা পাওয়া যাবে না। সময়ে সময়ে আমরা সকলে মিলে শরৎচন্দ্রকে রীতিমতো কোণঠাসা করে ফেলেছি, কিন্তু তিনি চটা-মেজাজের লোক হলেও তর্কে হেরে গিয়ে কোনওদিন তাঁকে মুখভার করতে দেখিনি; পরদিন হাসিমুখে এসে আমাদেরই সমবয়সী ও সমকক্ষের মতন আবার তিনি নূতন তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছেন। উদীয়মান সাহিত্যিকরূপে অক্ষয় যশের প্রথম সোপানে দণ্ডায়মান সেদিনকার সেই শরৎচন্দ্রকে যিনি দেখেননি, আসল শরৎচন্দ্রকে চিনতে পারা তাঁর পক্ষে অসম্ভব বললেও চলে। কারণ গত বিশ বৎসরের মধ্যে তাঁর প্রকৃতি অনেকটা বদলে গিয়েছিল। সাহিত্যে বা আর্টে একটি অতুলনীয় স্থান অধিকার করলে প্রত্যেক মানুষকেই হয়তো প্রাণের দায়ে না হোক, মানের দায়ে ভাব-ভঙ্গি-ভাষায় সংযত হতে হয়।

শত শত দিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গলাভ করে তাঁর প্রকৃতির কতকগুলি বিশেষত্ব আমার কাছে ধরা পড়ছে। শরৎচন্দ্রের লেখায় যেসব মতবাদ আছে, তাঁর মৌখিক মতের সঙ্গে প্রায়ই তা মিলত না। তিনি প্রায়ই আমাদের উপদেশ দিতেন, 'সাহিত্যে দুরাত্মার ছবি কখনও এঁকো না। পৃথিবীতে দুরাত্মার অভাব নেই, সাহিত্যে তাদের টেনে না আনলেও চলবে।' আবার—'পুণ্যের জয় পাপের পরাজয় দেখবার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দলালের হাতে রোহিণীর মৃত্যু দেখিয়েছেন, এটা বড়ো লেখকের কাজ হয়নি।' উত্তরে আমরা বলতুম, 'কেন, আপনিও তো দুরাত্মার ছবি আঁকতে ত্রুটি করেননি। আবার আপনিও তো কোনও কোনও উপন্যাসে নায়িকাকে পাপের জন্যে মৃত্যুর চেয়েও বেশি শাস্তি দিয়েছেন?' কিন্তু এ প্রতিবাদ তিনি কানে তুলতেন না। উপবীতকে তিনি তুচ্ছ মনে করতেন না, কৌলীন্যগর্ব তাঁর যথেষ্ট ছিল। 'ভারতী'র আসরে একদিন শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় পইতা নেই দেখে তিনি খাপ্পা হয়ে বললেন, 'ও কী হে চারু, তোমার পইতে নেই!' চারুবাবু হেসে বললেন, 'শরৎ পইতের ওপরে ব্রাহ্মণত্ব নির্ভর করে না।' শরৎচন্দ্র আহত কণ্ঠে বললেন, 'না, না, বামুন হয়ে পইতা ফেলা অন্যায়।' রবীন্দ্রনাথের উপরে শরৎচন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধা ছিল, যখন-তখন বলতেন, 'ওঁর লেখা দেখে কত শিখেছি!' কিন্তু আত্মশক্তির উপরেও ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। 'যমুনা'র পরে ওই বাড়িতেই নাটোরের স্বর্গীয় মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় 'মর্মবাণী'র কার্যালয় স্থাপন করেন এবং আমি ছিলুম তখন 'মর্মবাণী'র সহকারী সম্পাদক। 'যমুনা'র আসরে আমার যেসব সাহিত্যিক বন্ধু আসতেন, এই নূতন আসরেও তাঁদের কারুরই অভাব হল না, উপরন্তু নূতন গুণীর সংখ্যা বাড়ল। যেমন স্বর্গীয় মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ। তিনি মাঝে মাঝে নিজের নূতন রচনা শোনাতে আসতেন। এবং 'মানসী'রও দলের একাধিক সাহিত্যিক এখানে এসে দেখা দিতেন। এই 'মর্মবাণী'র আসরে বসে শরৎচন্দ্র একদিন বললেন, 'সবুজপত্রে রবিবাবু 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস লিখছেন, তোমরা দেখে নিয়ো, আমি এইবার যে উপন্যাস লিখব, 'ঘরে-বাইরে'র চেয়েও ওজনে তা একতিলও কম হবে না।' প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় প্রবল প্রতিবাদ করে বললেন, 'যে উপন্যাস এখনও লেখেননি, তার সঙ্গে 'ঘরে-বাইরে'র তুলনা আপনি কী করে করছেন!' কিন্তু শরৎচন্দ্র আবার দৃঢ়স্বরে বললেন, 'তোমরা দেখে নিয়ো!' এই উক্তিতে কেবল শরৎচন্দ্রের আত্মশক্তিনির্ভরতাই প্রকাশ পাচ্ছে না, তাঁর সরলতারও পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে বলে

রাখি, খুব সম্ভব শরৎচন্দ্রের পরের উপন্যাসের নাম ছিল 'গৃহদাহ'—যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট কোনও একটি বিখ্যাত চরিত্রের স্পষ্ট ছায়া আছে। তিনি যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির নকলে চরিত্র অঙ্কন করেছেন, একখানি পত্রে সরল ভাষায় সে-কথা স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হননি। এই সরলতা ও অকপটতার জন্যে শরৎচন্দ্রের অনেক দুর্বলতাও মধুর হয়ে উঠত।

হয়তো এই সরলতার জন্যেই শরৎচন্দ্র যে-কোনও লোকের যে-কোনও কথায় বিশ্বাস করতেন। কারুর উপরে তাঁকে চটিয়ে দেওয়া ছিল খুবই সহজ। যদি তাঁকে বলা হত, 'শরৎদা, অমুক লোক আপনার নিন্দা করেছে', তাহলে এ-কথার সত্যাসত্য বিচার না করেই তিনি হয়তো কোনও বন্ধুর উপরেও কিছুকালের জন্যে চটে থাকতেন এবং নিজেও কষ্ট পেতেন। তারপর হয়তো নিজের ভুল বুঝে ভ্রম সংশোধন করতেন। মাঝে মাঝে কোনও কোনও দুষ্টু লোক এইভাবেই তাঁকে রবীন্দ্রনাথেরও বিরোধী করে তোলবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনওবারেই এই সব অসৎ চক্রান্ত সফল হয়নি।

আমি এখানে খালি ব্যক্তিগতভাবেই শরৎচন্দ্রকে দেখতে ও দেখাতে চাইছি, কারণ এই সদ্যগত বৃহৎ বন্ধুর কথা ভাবতে গিয়ে এখন ব্যক্তিগত কথা ছাড়া অন্য কথা মনে আসছে না, আসা স্বাভাবিকই নয়। তাই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টি বা সাহিত্যপ্রতিভা বিশ্লেষণ করবার কোনও ইচ্ছাই এখন হচ্ছে না। তবে একটি বিষয়ে ইঙ্গিত করলে মন্দ হবে না। আজকাল অনেক তথাকথিত সাহিত্যিক নিজেদের অভিজাত বলে প্রচার করে স্বতন্ত্র হয়ে থাকবার জন্যে হাস্যকর চেষ্টা করেন। তাঁরা লেখেন ও বলেন বড়ো বড়ো কথা। কিন্তু সাহিত্যের এক বিভাগে অসাধারণ হয়েও শরৎচন্দ্র কোনওদিন এই সব ময়ূরপুচ্ছধারীর ছায়া পর্যন্ত মাড়াননি। নিজেকে অতুলনীয় ভেবে গর্ব করবার অধিকার তাঁর যথেষ্টই ছিল, কিন্তু মুখের কথায় ও অসংখ্য পত্রে তিনি বারবার এই ভাবটাই প্রকাশ করে গেছেন যে—আমি লেখাপড়াও বেশি করিনি, আমার জ্ঞানও বেশি নয়, তবে আমার লেখা লোকের ভালো লাগে তার কারণ হচ্ছে, আমি স্বচক্ষে যা দেখি, নিজের প্রাণে যা অনুভব করি, লেখায় সেইটেই প্রকাশ করতে চাই। ইনটেলেকচুয়াল গল্প-টল্প কাকে বলে আমি তা জানি না!...এখনকার অভিজাত সাহিত্যিকরা লোককে ধাক্কা মেরে ধাপ্পা দিয়ে চমকে দিয়ে বড়ো হবার জন্যে মিথ্যা চেষ্টা করেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের মতো যাঁরা যথার্থই শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানী, তাঁরা বড়ো হন বিনা চেষ্টায় হাওয়ার মতো অগোচরে বিশ্বমানুষের প্রাণবস্তুতে পরিণত হয়ে। জোর করে প্রেমিক বা সাহিত্যিক হওয়া যায় না। পরের প্রাণে আশ্রয় খুঁজলে নিজের প্রাণকে আগে নিবেদন করা চাই। তুমি অভিজাত সাহিত্যিক, তুমি হচ্ছ সোনার পাথর-বাটির রূপান্তর! যশের কাঙাল হয়ে সাগ্রহে লেখা ছাপাবে, অথচ জনতাকে ঘৃণা করবে: অসম্ভব।

যমুনা-অফিসে শরৎ ও তাঁর ভেলু কুকুরকে নিয়ে আমাদের বহু সুখের দিন কেটে গিয়েছিল। ওই ভেলু কুকুরকে অনাদর করলে কেউ শরৎচন্দ্রের আদর পেত না—কারণ শরৎচন্দ্রের চোখে ভেলু মানুষের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর জীব ছিল না, বরং অনেক মানুষের চেয়ে ভেলুকে তিনি বড়ো

বলেই মনে করতেন। আর ভেলুও বোধ হয় সেটা জানত। সে কতবার যে আমাকে কামড়ে রক্তাক্ত করে দিয়ে আদর জানিয়েছে, তার আর সংখ্যা হয় না। এবং তার এই সাংঘাতিক আদর থেকে শরৎচন্দ্রও নিস্তার পেতেন না। আমাদের সুধীরচন্দ্র সরকারের ছিল ভীষণ কুকুরাতঙ্ক, ভেলু যদি ঘরে ঢুকল সুধীর অমনি এক লাফে উঠে বসল টেবিলের উপরে! ভেলুকে না বাঁধলে কারুর সাধ্য ছিল না সুধীরকে টেবিলের উপর থেকে নামায় এবং শরৎচন্দ্রেরও বিশেষ আপত্তি ছিল ভেলুকে বাঁধতে—আহা, অবোলা জীব, ওর যে দুঃখ হবে! হোটেল থেকে ভেলুর জন্যে আসত বড়ো বড়ো ঘৃতপক্ক চপ, ফাউল কাটলেট! ভেলুর অকালমৃত্যুর কারণ বোধহয় কুকুরের পক্ষে এই অসহনীয় আহার! এবং ভেলুর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্রের যে শোকাকুল অশ্রুস্নাত দৃষ্টি দেখেছিলুম, এ-জীবনে তা আর ভুলব বলে মনে হয় না।

যমুনা-অফিসে শরৎচন্দ্র অনেকদিন বেলা দুটো-তিনটের সময়ে এসে হাজিরা দিতেন, তারপর বাসায় ফিরতেন সান্ধ্য-আসর ভেঙে যাবারও অনেক পরে। কোনও কোনওদিন রাত্রি দুটো-তিনটেও বেজে যেত। সে সময়ে তাঁর সঙ্গে আমরা তিন-চারজন মাত্র লোক থাকতুম। বাইরের লোক চলে গেলে শরৎচন্দ্র শুরু করতেন নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নানা কাহিনি। বেশি লোকের সভায় আলোচনা (conversazione) ও তর্ক-বিতর্কের সময়ে শরৎচন্দ্র বেশ গুছিয়ে নিজের মতামত বলতে পারতেন না বটে, কিন্তু গল্পগুজব করবার শক্তি ছিল তাঁর অদ্ভুত ও বিচিত্র—শ্রোতাদের তাঁর সুমুখে বসে থাকতে হত মন্ত্রমুগ্ধের মতো। একদিন এমন কৌশলে একটি ভূতের গল্প বলেছিলেন যে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রাত্রে একলা বাড়ি ফিরতে ভয় পেয়েছিলেন। সেই গল্পটি পরে আমি আমার 'যকের ধন' উপন্যাসে নিজের ভাষায় প্রকাশ করেছিলুম বটে, কিন্তু তাঁর মুখের ভাষার অভাবে তার অর্ধেক সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে। প্রতি রাত্রেই আসর ভাঙবার পরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বাড়ি ফিরতুম আমি, কারণ তিনি তখন বাসা নিয়েছিলেন আমার বাড়ির অনতিদূরেই। সেই সময়ে পথ চলতে চলতে শরৎচন্দ্র নিজের হৃদয় একেবারে উন্মুক্ত করে দিতেন এবং তাঁর জীবনের কোনও গুপ্তকথাই বলতে বোধ হয় বাকি রাখেননি। এইভাবে খাঁটি শরৎচন্দ্রকে চেনবার সুযোগ খুব কম সাহিত্যিকই পেয়েছেন এবং আরও বছর-কয়েক পরে তাঁর সঙ্গে আলাপ হলে আমার ভাগ্যেও হয়তো এ সুযোগলাভ ঘটত না। এও বলে রাখি, শরৎচন্দ্রের সম্পূর্ণ পরিচয় পেয়ে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে উঠেছিল—Too much familiarity brings contempt, এ প্রবাদ সব সময়ে সত্য হয় না।

একদিন সকালবেলায় মা এসে বললেন, 'ওরে, তোর পড়বার ঘরে কে এক ভদ্রলোক এসে গান গাইছেন—কী মিষ্টি গলা!' কৌতূহলী হয়ে নীচে নেমে গিয়ে সবিস্ময়ে দেখি, শরৎচন্দ্র কখন এসে আমার পড়বার ঘরে ঢুকে গালিচার উপরে ঠেলান দিয়ে শুয়ে নিজের মনে গান ধরেছেন এবং সে গান শুনতে সত্যই চমৎকার! আমাকে দেখেই তিনি মৌন হলেন, কিছুতেই আর গাইতে চাইলেন না! তারপর আরও কয়েকবার আমার নীচের ঘরে তাঁর গানের সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে গিয়েছি, আড়ালে থেকেও শুনেছি, কিন্তু যেই আমাকে দেখা অমনি তাঁর ভীরু কণ্ঠ হয়েছে বোবা! অথচ তাঁর সঙ্কোচের কোনওই কারণ ছিল না,

তাঁর গানে ওস্তাদি না থাকলেও মাধুর্য ছিল যথেষ্ট এবং সঙ্গীত-সাধনা করলে তিনি নাম করতেও পারতেন রীতিমতো।

শরৎচন্দ্র যখন শিবপুরে বাস করতেন, তখন প্রতিদিন আর তাঁর দেখা পেতুম না বটে, কিন্তু আমাদের অন্যান্য আসরে তাঁর আবির্ভাব হত প্রায়ই। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সমস্ত গল্প বলতে গেলে এখানে কিছুতেই ধরবে না, অতএব সে চেষ্টা আর করলুম না। তিনি পানিত্রাসে যাবার পর থেকে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হত ন-মাসে ছ-মাসে, কিন্তু যখনই দেখা হত বুঝতে পারতুম যে, আমার কাছে তিনি সেই ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বছর বয়সের যুবক ও পুরাতন শরৎচন্দ্রই আছেন। অতঃপর তাঁর সম্বন্ধে দু-চারটে গল্প বলে এবারের কথা শেষ করব।

একদিন আমাদের এক আসরে বসে শরৎচন্দ্র গড়গড়ায় তামাক টানছেন, এমন সময়ে অধুনালুপ্ত 'বিদূষক' পত্রিকার সম্পাদক হাস্যরসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের আবির্ভাব। 'বিদূষক'-সম্পাদক এই শরৎচন্দ্রকে কথায় হারাতে কারুকে দেখিনি এবং খোঁচা খেলে তিনি নিরুত্তর থাকবার ছেলেও ছিলেন না। 'বিদূষক'-সম্পাদককে অপ্রস্তুত করবার কৌতুকের লোভে শরৎচন্দ্র বললেন, 'এসো বিদূষক শরৎচন্দ্র!' শরৎ পণ্ডিত সঙ্গে সঙ্গেই হাসিমুখে জবাব দিলেন, 'কী বলছ ভাই 'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্র?' এই কৌতুকময় ঘাত-প্রতিঘাতে নিরুত্তর হতে হল 'চরিত্রহীন' প্রণেতাকেই।

একদিন বিডন স্ট্রিটের মোড়ে এক মণিহারির দোকানে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কী কিনতে গিয়েছি। হঠাৎ তিনি বললেন, 'হেমেন্দ্র, তুমি কিছু খাও!' আমি বললুম, 'এই মণিহারির দোকানে আপনি আবার আমার জন্যে কী খাবার আবিষ্কার করলেন?'—'কেন, অনেক ভালো ভালো লজেনচুস রয়েছে তো!'—'বলেন কী দাদা, আপনার চেয়ে বয়সে আমি অনেক ছোটো বটে, কিন্তু আমাকে লজেনচুস-লোভী শিশু বলে ভ্রম করছেন কেন?' শরৎচন্দ্র মাথা নেড়ে বললেন, 'না হে না, তুমি বড়ো বেশি সিগারেট খাও! ও বদ-অভ্যাস ছাড়ো। হয় তামাক ধরো, নয় লজেনচুস খাও!' দুঃখের বিষয়, অদ্যাবধি শরৎচন্দ্রের এ আদেশ পালন করতে ইচ্ছা হয়নি।

শরৎচন্দ্র ভেলুকে কী রকম ভালোবাসতেন তারও একটা গল্প বলি। একদিন কোনও এক ভক্ত এক চাঙারি প্রথম শ্রেণীর সন্দেশ নিয়ে গিয়ে তাঁকে উপহার দিলেন। ভদ্রলোক শরৎচন্দ্রের সামনে সন্দেশগুলি রাখলেন, ভেলু ছিল তখন তাঁর পাশে বসে। সন্দেশ দেখে ভেলু রীতিমতো উৎসাহিত হয়ে উঠল। এবং শরৎচন্দ্রও ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করতে করতে ভেলুর উৎসাহিত মুখে এক-একটি সন্দেশ তুলে দিতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল, চাঙারি একেবারে খালি! যে ভদ্রলোক এত সাধে ভেট নিয়ে গিয়েছিলেন, সন্দেশের এই অপূর্ব পরিণাম দেখে তাঁর মনের অবস্থা কী রকম হল, সেকথা আমরা শুনিনি।

একদিন শরৎচন্দ্র এসে বিরক্তমুখে বললেন, 'নাঃ, শিবপুরের বাস ওঠাতে হল দেখছি!'—

'কেন শরৎদা, কী হল?'—'আর ভাই, বলো কেন, ভেলুর জন্যে আমার নামে আদালতে নালিশ হয়েছে, পাড়ার লোকগুলো পাজির পা-ঝাড়া!'—'সেকি, ভেলু কী করেছে?'—'কিছুই করেনি ভাই, কিছুই করেনি! একটা গয়লা যাচ্ছিল পাড়া দিয়ে, তাকে দেখে ভেলুর পছন্দ হয়নি। তাই সে ছুটে গিয়ে তার পায়ের ডিম থেকে শুধু ইঞ্চি-চারেক মাংস খুবলে তুলে নিয়েছে!'—'অ্যাঃ, বলেন কী, ইঞ্চি-চারেক মাংস?'—'হ্যাঁ, মোটে এক খাবল মাংস আর কী! এই সামান্য অপরাধেই আমার ওপরে হুকুম হয়েছে, ভেলুর মুখে 'মাজল্' পরিয়ে রাখতে হবে! ভেলুর কী যে কষ্ট হবে, ভেবে দ্যাখো দেখি!'

সারমেয়-অবতার ভেলুর এই গল্পটিও শরৎচন্দ্রের নিজের মুখে শুনেছি। শরৎচন্দ্র যখন শিবপুরের বাড়িতে, সেই সময়ে এক সকালে টেক্সোবাবু এলেন টেক্সোর টাকা আদায় করতে। বাইরের ঘরে টেক্সোবাবু তাঁর তল্পিতল্পা নিয়ে বসলেন। ভেলু এক কোণে আরাম করে শুয়ে আছে,—যদিও তার অসন্তুষ্ট দৃষ্টি রয়েছে টেক্সোবাবুর দিকেই। শরৎচন্দ্র টেক্সোর টাকা দিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। টেক্সোবাবুর কাজ শেষ হল—তিনিও নিজের টাকার তল্পির দিকে হাত বাড়ালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভেলু ভীষণ গর্জন করে তাঁর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, কারণ ভেলুর একটা স্বভাব ছিল এই, তার মনিবের বাড়িতে বাহির থেকে কেউ কোনও জিনিস এনে রাখলে সে কোনও আপত্তি করত না, কিন্তু বাড়ির জিনিসে হাত দিলেই তার 'কুকুরত্ব' জেগে উঠত বিষম বিক্রমে! সুতরাং টেক্সোবাবুর অবস্থা যা হল তা আর বলবার নয়! তিনি মহা-আতঙ্কে পিছিয়ে পড়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন। একেবারে চিত্রার্পিতের মতো,—কারণ একটু নড়লেই ভেলু করে গোঁ-গোঁ! দুই-তিন ঘণ্টা পরে স্নান-আহারাদি সেরে শরৎচন্দ্র আবার যখন সেখানে এলেন, টেক্সোবাবু তখনও দেওয়ালের ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছেন! বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্রের পুনরাবির্ভাবে টেক্সোবাবুর মুক্তিলাভের সৌভাগ্য হল!

মনোমোহন থিয়েটারে চলচ্চিত্রে শরৎচন্দ্রের প্রথম বই 'আঁধারে আলো' দেখানো হচ্ছে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমিও গিয়েছি। একখানা ঢালা বিছানা পাতা 'বক্সে' শরৎচন্দ্র ও শিশিরকুমার ভাদুড়ির সঙ্গে আমিও আশ্রয় পেলুম। ছবি দেখানো শেষ হলে দেখা গেল, শরৎচন্দ্রের এক পাটি তালতলার চটি অদৃশ্য হয়েছে! অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও পাটি পাওয়া গেল না। তখন শরৎচন্দ্র হতাশ হয়ে অন্য পাটি বগলদাবা করে উঠে দাঁড়ালেন। আমি বললুম, 'এক পাটি চটি নিয়ে আর কী করবেন, ওটাও এখানে রেখে যান।' শরৎচন্দ্র বললেন, 'ক্ষেপেছো? চোরবেটা এইখানেই কোথায় লুকিয়ে বসে সব দেখছে! আমি এ-পাটি রেখে গেলেই সে এসে তুলে নেবে। তার সে সাধে আমি বাদ সাধব,—শিবপুরে যাবার পথে হাওড়ার পুল থেকে চটির এই পাটি গঙ্গাজলে বিসর্জন দেব!' তিনি খালি পায়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

পরদিনই 'বক্সে'র তলা থেকে তালতলার হারানো চটির পাটি আবিষ্কৃত হল। কিন্তু শরৎচন্দ্রের হস্তগত অন্য পাটি তখন গঙ্গালাভ করেছে এবং সম্ভবত এখনও সলিল-সমাধির মধ্যেই নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তখন আর্ট ও সাহিত্যের আসর 'বিচিত্রা'র অধিবেশন

হচ্ছে প্রতি সপ্তাহেই এবং প্রতি অধিবেশনের পরেই খবর পাওয়া যাচ্ছে, অমুক অমুক লোকের জুতা চুরি গিয়েছে! আমরা সকলেই চিন্তিত, কারণ 'বিচিত্রা'র ঢালা আসরে জুতা খুলে বসতে হত। কবি সত্যেন্দ্রনাথ ছেঁড়া, পুরানো জুতার আশ্রয় নিলেন, কেউ কেউ জুতা না খুলে ও হলে না ঢুকে পাশের বারান্দায় পায়চারি আরম্ভ করলেন এবং আমরা অনেকেই জুতার দিকেই মন রেখে গান-বাজনা ও আলাপ-আলোচনা শুনতে লাগলুম। শরৎচন্দ্র এই দুঃসংবাদ শুনেই খবরের কাগজে নিজের জুতোজোড়া মুড়ে বগলে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সামনে গিয়ে বসলেন— সেদিন আসরে লোক আর ধরে না! ইতিমধ্যে কে গিয়ে চুপি চুপি বিশ্বকবির কাছে শরৎচন্দ্রের গুপ্তকথা ফাঁস করে দিয়েছে! রবীন্দ্রনাথ মুখ টিপে হেসে শুধোলেন, 'শরৎ, তোমার কোলে ওটা কী?' শরৎচন্দ্র মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'আজ্ঞে, বই!' রবীন্দ্রনাথ সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী বই শরৎ, পাদুকা-পুরাণ?' শরৎচন্দ্র লজ্জায় আর মুখ তুলতে পারেন না!

বছর-আড়াই আগেকার কথা। প্রায় বৎসরাবধি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই। তখন আমি আমার নতুন বাড়িতে এসেছি, শরৎচন্দ্র এ-বাড়ির ঠিকানা পর্যন্ত জানেন না। একদিন দুপুরে তিনতলার বারান্দার কোণে বসে রচনাকার্যে ব্যস্ত আছি, এমন সময়ে একতলায় পরিচিত কণ্ঠে আমার নাম ধরে ডাক শুনলুম। আমার দুই মেয়ে গিয়ে আগন্তুকের নাম জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর এল, 'ওগো বাছারা, তোমরা আমাকে চেনো না, তোমরা যখন জন্মাওনি তখন আমি তোমাদের পুরানো বাড়িতে আসতুম, তোমাদের বাবা আমাকে দেখলে হয়তো চিনতে পারবেন!' এ যে শরৎচন্দ্রের কণ্ঠস্বর—আজ কুড়ি-বাইশ বছর পরে শরৎচন্দ্র অযাচিতভাবে আবার আমার বাড়িতে! বিশ্বাস হল না—তিনি আমার এ-বাড়ি চিনবেন কেমন করে? কিন্তু তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে মুখ বাড়িয়েই দেখলুম, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছেন সত্য-সত্যই শরৎচন্দ্র—তাঁর পিছনে কবি-বন্ধু গিরিজাকুমার বসু! সবিস্ময়ে বললুম, 'শরৎদা, এতকাল পরে আমার বাড়িতে আবার আপনি!' শরৎচন্দ্র সহাস্যে বললেন, 'হ্যাঁ হেমেন্দ্র! গিরিজার সঙ্গে যাচ্ছিলুম বরানগরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ল, তাই তোমার কাছেই এসে হাজির হয়েছি!' আমি সানন্দে তাঁকে তিনতলার ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বললুম, 'এ যে আমার পরম সৌভাগ্য দাদা, এ যে বিনা মেঘে জল! কোথায় রবীন্দ্রনাথ, আর কোথায় আমি! এ যে হাসির কথা!' তারপর অবিকল সেই পুরাতন কালে অবিখ্যাত শরৎচন্দ্রের মতোই নানা আলাপ-আলোচনায় কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে তিনি আবার বিদায় গ্রহণ করলেন।

শরৎচন্দ্র শেষ যেদিন আমার বাড়িতে এসেছিলেন, আমার দুই মেয়ে শেফালিকা ও মুকুলিকার কাছে বলে গিয়েছিলেন, 'শোনো বাছা, এসব সিগারেট ফিগারেট আমার সহ্য হয় না। আমার জন্যে যদি গড়গড়া আনিয়ে রাখতে পারো, তাহলে আবার তোমাদের বাড়িতে আমি আসব!' তার কিছুদিন পরে রঙ্গালয়ে 'চরিত্রহীনে'র প্রথম অভিনয় রাত্রে আমার মেয়েরা তাঁর কাছে গিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিল, 'কই, আপনি তো আর এলেন না?' শরৎচন্দ্র বললেন, 'আমার জন্যে গড়গড়া আছে?'—'হ্যাঁ!' শুনে তিনি সহাস্যে অঙ্গীকার করলেন, 'আচ্ছা, এইবারে তবে যাব!' কিন্তু এখন আর তাঁর সে-অঙ্গীকারের মূল্য নেই। তবু শোকাতুর মনে ভাবছি, তাঁর গড়গড়া তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে, কিন্তু শরৎচন্দ্র তো আর এলেন না? হায়, স্বর্গ থেকে মর্ত্য কতদূর?

জলদস্যু কাহিনী

হন্তারক নরদানব

১
পটভূমিকা

ইতিহাস যখন লিখিত হয়নি, জলদস্যু বা বোম্বেটের অত্যাচার আরম্ভ হয়েছে তখন থেকেই। খ্রিস্টপূর্ব যুগেও দেখা যায় প্রাচীন মিশর, গ্রিস ও রোমের সমুদ্রযাত্রী জাহাজ বোম্বেটেদের পাল্লা থেকে রেহাই পায়নি। এমনকি, বিশ্ববিখ্যাত রোমান দিগ্বিজয়ী জুলিয়াস সিজারকে পর্যন্ত একবার বোম্বেটেরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল! ইংরেজিতে Pirate বলতে বুঝায় বোম্বেটে এবং গ্রিক Peirates থেকে ওই শব্দটির উৎপত্তি। উপরন্তু পর্তুগিজ Bombardier শব্দটি ভেঙে গড়া হয়েছে বাংলায় চলতি 'বোম্বেটে' শব্দটি।

প্রাচীন ভারতবাসীরাও সাগরযাত্রায় বেরিয়ে যখন-তখন ধরা পড়ত বোম্বেটেদের ফাঁদে। তারপর অষ্টম শতাব্দীতে ভারতের মাটিতে মুসলমানরা যে প্রথম ইসলামের পতাকা রোপণ করবার সুযোগ পায়, তারও মূলে ছিল ভারত সাগরের বোম্বেটেরাই। কিন্তু সে হচ্ছে ভিন্ন কাহিনি, এখানে বলবার জায়গা নেই।

তারপর মধ্যযুগের ইউরোপে ইংরেজ, ফরাসি, স্পেনীয়, পর্তুগিজ ও উত্তর-আফ্রিকার মুসলমান বোম্বেটেদের ভয়াবহ অত্যাচারে সমুদ্রযাত্রা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল এবং জলদস্যুতা পরিণত হয়েছিল একটি রীতিমতো লাভজনক ব্যবসায়ে। ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য বোম্বেটেদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর অন্যান্য সমুদ্রেও। আফ্রিকা ও আমেরিকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে বোম্বেটেদের প্রাধান্য এতটা বেড়ে ওঠে যে, তারা জল ছেড়ে ডাঙায় নেমেও দেশের পর দেশে হানা দিতে ভয় পেত না।

বোম্বেটেদের সাহস বাড়বে না কেন? বড়ো বড়ো ইংরেজ বোম্বেটে ইংল্যান্ডের রাজাদের কাছ থেকেও আশকারা পেয়েছে। অনেক বোম্বেটের জন্ম আবার সম্ভ্রান্ত পরিবারে। স্পেন বা ফ্রান্সের সঙ্গে যখন লড়াই চলত, ইংল্যান্ডের রাজারা তখন বোম্বেটেদেরও লেলিয়ে দিতে লজ্জিত হতেন না এবং তারাও প্রশ্রয় পেয়ে স্পেন বা ফ্রান্সের যে-কোনও জাহাজের উপরে হামলা দিয়ে অমানুষিক অত্যাচার করত। হেনরি মর্গ্যান ছিল সতেরো শতাব্দীর এক কুখ্যাত ইংরেজ বোম্বেটে। সে কেবল জলপথে নয়, স্থলপথেও শত শত নরহত্যা করেছে এবং নির্বিচার লুণ্ঠনের পর বহু জনপদকে করেছে অগ্নিমুখে সমর্পণ। তাকে বন্দি করে ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়। কিন্তু রাজা দ্বিতীয় চার্লস তার সঙ্গে আলাপ করে এমন মুগ্ধ হলেন যে, শাস্তি দেওয়া দূরের কথা, মর্গ্যানকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করে জামাইকা দ্বীপের শাসনকর্তার আসনে বসিয়ে দিলেন।

জনৈক ইংরেজ বোম্বেটে একবার ভারত সাগরে এসে মোগলদের জাহাজের উপরে চড়াও হয়ে বাদশাহ্ আলমগীরের পরিবারভুক্ত দুইজন রাজকন্যাকেও বন্দিনী করতে ভয় পায়নি।

সুন্দরবন ছিল আগে বর্ধিষ্ণু লোকালয়, পরে পরিণত হয়েছে বিজন জলা-জঙ্গলে। মানুষের বিচরণ-ভূমি দখল করেছে হিংস্র পশুর দল। কারণ? পর্তুগিজ ও মগ বোম্বেটেদের অত্যাচার।

দুইজন মেয়ে-বোম্বেটেরও নাম বিখ্যাত—আন বোনি ও মেরি রিড। জাতে ইংরেজ। তাদেরও গল্প অতিশয় চিত্তাকর্ষক, কিন্তু আমরা বোম্বেটেদের ইতিহাস লিখতে বসিনি। ভূমিকার জন্যে যতটুকু চাই, ততটুকু ইঙ্গিতই দিলুম, আপাতত এ সম্বন্ধে আর বেশি বাক্যব্যয় করবার দরকার নেই। এইবার মূল কাহিনি শুরু করা যাক।

যার কথা বলব তার আসল নাম হচ্ছে এডওয়ার্ড টিচ, কিন্তু 'কালোদেড়ে' ডাকনামেই সে সর্বত্র পরিচিত (যেমন কুখ্যাত মুসলমান বোম্বেটে উরুজ পরিচিত ছিল 'লালদেড়ে' ডাকনামে)। সে কেবল স্পেন ও ফ্রান্সের শত্রুই ছিল না, নিজের জাতভাই ইংরেজদেরও সুবিধা পেলে ছেড়ে দিত না এবং সমগ্র ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ তার নাম শুনলেই ভয়ে কেঁপে সারা হত। আঠারো শতাব্দীর প্রথম দিকেই তার উত্থান এবং পতন। আমেরিকায় তখন ইংরেজদেরই রাজত্ব।

২

নায়কের মঞ্চে প্রবেশ

উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ। তারই উত্তরে আছে সাতশো আশি মাইল লম্বা বাহামা দ্বীপপুঞ্জ—তাদেরও ওয়েস্ট ইন্ডিজের অন্তর্গত বলে মনে করা হয়। আমেরিকার দিকে যাত্রা করবার পর কলম্বসের চোখে পড়ে সর্বপ্রথমে বাহামা দ্বীপই।

বাহামার অন্যতম দ্বীপ নিউ প্রভিডেন্স এবং সেখানে ছিল বোম্বেটেদের জাহাজ ভিড়োবার এক মস্ত আড্ডা। আমাদের কাহিনির সূত্রপাত সেখানেই।

বোম্বেটেদের নিজস্ব এক কালো পতাকার নাম ছিল 'জলি রোজার'—তার উপরে সাদা রঙে আঁকা থাকত কোনাকুনি ভাবে রক্ষিত দুটো অস্থিখণ্ডের উপরে একটা মড়ার মাথা। সাগরপথের যাত্রীরা এই কৃষ্ণপতাকা বা 'জলি রোজার'কে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতো ভয় করত। সৌভাগ্যের বিষয়, 'জলি রোজারে'র অস্তিত্ব আজ লুপ্ত।

নিউ প্রভিডেন্স দ্বীপের বোম্বেটে-বহরের জাহাজ-ঘাটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন কাপ্তেন বেঞ্জামিন হর্নিগোল্ড। লোকের চোখ ভোলাবার জন্যে তাঁর জাহাজের উপরে উড়ছে এখন ইংল্যান্ডের রাজপতাকা বা 'ইউনিয়ন জ্যাক'। কিন্তু সমুদ্রে পাড়ি দিলেই সেখানে 'ইউনিয়ন জ্যাকে'র জায়গা জুড়ে বসবে সর্বনেশে 'জলি রোজার'—কারণ তিনি হচ্ছেন একজন নামজাদা জলদস্যু!

হর্নিগোল্ড আজ কয়েকদিন জাহাজ-ঘাটায় অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছেন একজন সহকারী অধ্যক্ষের জন্যে। সহকারী অধ্যক্ষের অভাবে জাহাজের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু শহরের বিভিন্ন শুঁড়িখানা ও গুন্ডাপাড়ায় ঘুরেও তিনি মনের মতো সহকারী খুঁজে পাননি এবং সেই অভাবের জন্যে তাঁর জাহাজ বন্দরের মধ্যেই বন্দি হয়ে আছে।

নিজের মনেই গজ গজ করে তিনি বললেন, 'এমন তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এক বেটা মনের মতো পাষণ্ড গুন্ডার পাত্তা পাওয়া গেল না! আমার জাহাজের খুনে বদমাইশগুলোকে শায়েস্তা করতে হলে যে খোদ শয়তানের মতো ধড়িবাজ লোক দরকার!'

আচম্বিতে কাছ থেকেই কে পাগলের মতো হো হো করে অট্টহাসি হেসে উঠল—দস্তুরমতো শয়তানি হাসি!

চমকে উঠে নিজের পিস্তলের উপরে হাত রেখে হর্নিগোল্ড রুখে ফিরে দাঁড়ালেন—সত্যসত্যই কি তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে এখানে এসে আবির্ভূত হয়েছে স্বয়ং শয়তান?

কিন্তু কিমাশ্চর্যমতঃপরম! এ যে কবির ভাষায়—'পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ!'

জাহাজ-ঘাটার অন্যান্য লোকদের মাথা ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে জেগে উঠেছে দৈত্যের মতো এক অসম্ভব মনুষ্যদেহ—যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া! যেন বামনদের মাঝখানে এক বিরাট পুরুষ! তার মহাবলিষ্ঠ

বিপুল বপুর সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে লৌহকঠিন পেশির পর পেশির তরঙ্গায়িত গতি। সেই রুক্ষ কেশকন্টকিত মুখে আগুনের ফিনকির মতো জ্বলছে দুটো কুচুটে কুতকুতে চক্ষু। মাথায় পুরু কালো চুল—এবং চোখ-নাকের পাশে ও তলায় সে কী কৃষ্ণ ও ঘন শ্মশ্রুর ঘটা! কয়েকটা যত্নরচিত বেণিতে বিভক্ত হয়ে সেই প্রকাণ্ড চাপদাড়ি ঝুলে পড়েছে একেবারে কোমর পর্যন্ত! কেবল বিউনি বেঁধেই দাড়ির পরিচর্যা শেষ করা হয়নি—তার উপরে তাকে আবার অলংকৃত করা হয়েছে রংচঙে সব রেশমি ফিতে দিয়ে! তার বক্ষ-বন্ধনীতে ঝুলছে তিনজোড়া পিস্তল এবং গলায় আছে সোনা ও রুপায় গড়া হার!

তারপর বিস্ময়ের উপরে বিস্ময়! মাথার টুপির তলা থেকে ঝুলে পড়ে কয়েকটা মৃদু-জ্বলনশীল পলিতা সেই ভীষণ মুখখানা অধিকতর ভয়াল ও বাতাসকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে গন্ধকের উগ্র গন্ধে!

যেন অপচ্ছায়ামূর্তি! থতমত খেয়ে দুই পা পিছিয়ে পড়লেন হর্নিগোল্ড! এমন ধারণাতীত দৃশ্য তিনি জীবনে আর দেখেননি।

পরমুহূর্তেই তাঁর সন্দেহ হল যে, মূর্তি তাঁকে দেখেই হাসছে যেন বিশ্রী ব্যঙ্গের হাসি!

এই কথা মনে হতেই কাপ্তেন হর্নিগোল্ড খেপে গিয়ে পিস্তল বাগিয়ে ধরে কুপিত কণ্ঠে বললেন, 'ওরে কালোদেড়ে শয়তান, আমাকে দেখে ঠাট্টা? মজাটা দেখবি নাকি?'

কিন্তু কোনও মজাই দেখানো হল না—ধাঁ করে তাঁর মনে পড়ে গেল একটা কথা। তাড়াতাড়ি গলার স্বর নামিয়ে তিনি বললেন, 'টিচ? তুমি কি এডওয়ার্ড টিচ?'

—'সঠিক আন্দাজ! আমি এডওয়ার্ড টিচই বটে, দেশ আমার ব্রিস্টলে।'

—'সবাই তোমাকে কালোদেড়ে বলে ডাকে তো?'

পলিতার আগুন তখন দাড়ির উপরে নেমে এসেছে এবং চারিদিক ভরে উঠেছে গন্ধকের গন্ধের সঙ্গে চুল-পোড়া দুর্গন্ধে! কালোদেড়ে তার শ্মশ্রুর বেণিগুলো তাড়াতাড়ি কাঁধের উপরে তুলে দিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, আমি কালোদেড়েই বটে! একটু আগেই আপনি যা বলেছিলেন আমি শুনতে পেয়েছি। জাহাজের বেয়াড়া বেহেড লোকগুলোকে শায়েস্তা করবার জন্যে আপনার বেপরোয়া সহকারী দরকার?'

কালোদেড়ে কথা কইতে কইতে মিট মিট করে আড়চোখে তার দিকে চেয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসছে দেখে তপ্ত হয়ে উঠল হর্নিগোল্ডের বুকের রক্ত! এমন দুঃসহ বেয়াদপি দেখলে যে-কোনও বোম্বেটে-জাহাজের মালিক তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু এই শ্রেণির একজন দুষ্ট ও ধৃষ্ট সহকারীর অভাবে তাঁর জাহাজ অচল হয়ে পড়েছে বলে মনের রাগ মনেই চেপে তিনি বললেন, 'তাহলে আমার জাহাজের অবাধ্য লোকগুলোর ভার আমি তোমার হাতেই সমর্পণ করলুম! কিন্তু তোমার ওই যাচ্ছেতাই জ্বলন্ত পলতেগুলো আর আমি সইতে পারছি না, ওগুলো নিবিয়ে ফ্যালো!'

৩

আগন্তুকের স্বরূপ

উপযোগী বাতাস পেয়ে জাহাজ বন্দর ছেড়ে ভেসে চলল আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। দু-দিন পরেই কাপ্তেন হর্নিগোল্ডের বুঝতে বাকি রইল না যে, সহকারীরূপে যাকে তিনি নিযুক্ত করেছেন, দুর্বৃত্ততায় সে শয়তানেরই জুড়িদার বটে! কাপ্তেনের ঘরের আওতাতেই দাঁড়িয়ে সে নোংরা, অশ্রাব্য ভাষায় চেঁচিয়ে, শপথ করে এবং টুপি থেকে ঝুলন্ত পলিতাগুলোতে আগুন লাগিয়ে যথেচ্ছ ভাবে যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই ছোড়ে ছয়-ছয়টা পিস্তল—কেউ হত বা আহত হল কি না তা নিয়ে

মোটেই মাথা ঘামায় না! একে তো সেই বিপুলবপু নরদানবের চেহারা দেখলেই পেটের পিলে চমকে যায়, তার উপরে তার পাশবিক গর্জন শুনে এবং পিস্তলগুলো নিয়ে মারাত্মক খেলা দেখে মহাপাষণ্ড বোম্বেটেগুলো পর্যন্ত আতঙ্কে থরহরি কম্পমান দেহে জাহাজের আনাচে-কানাচে গা ঢাকা দেয় এবং তাদের মুখের ভাব যেন জাহির করতে চায়—ছেড়ে দে বাবা, কেঁদে বাঁচি!

কালোদেড়ের সামনে গেলে সকলেরই অবস্থা হয় ভিরু ভেড়ার মতো।

একদিন সে হাঁক ছেড়ে ডাক দিলে, 'এই রাবিশের দল, আজ আমরা এক নিজস্ব নরক তৈরি করব! দেখব কতক্ষণ আমরা নরকযন্ত্রণা সহ্য করতে পারি! চল সবাই জাহাজের নীচের তলায়!'

গ্রুম, গ্রুম, গ্রুম! পিস্তলের পর পিস্তলের ধমক! ভয়ে কেঁচোর মতো বোম্বেটের দল নীচের তলায় গিয়ে হাজির হতে দেরি করলে না। তারপর দুম-দাম করে বন্ধ করে দেওয়া হল সব দরজা। অগ্নিসংযোগ করা হল বড়ো বড়ো গন্ধকের কুণ্ডে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলল না বটে, কিন্তু হু-হু করে গন্ধকের ধোঁয়া বেরিয়ে ক্রমেই কুণ্ডলিত ও পুঞ্জীভূত হয়ে সেই রন্ধ্রহীন বদ্ধ জায়গাটাকে করে তুললে ভয়ংকর দুঃসহ! দৃষ্টি হয়ে যায় অন্ধ, শ্বাস-প্রশ্বাস হয়ে আসে রুদ্ধ, অন্তিমকাল মনে হয় আসন্ন! অমন যে বেপরোয়া, নিষ্ঠুর, হিংস্র ও নরঘাতক বোম্বেটের দল, তারাও হাঁচতে হাঁচতে, কাশতে কাশতে, হাঁপাতে হাঁপাতে ও মৃত্যুভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাঁটু গেড়ে কালোদেড়ের সামনে বসে পড়ে আর্ত স্বরে চ্যাঁচাতে লাগল—'প্রাণ যায়, বাঁচাও! দরজা খুলে দাও, দরজা খুলে দাও, দরজা খুলে দাও!'

দুই হাতে দুটো করে পিস্তল ছুড়তে ছুড়তে কালোদেড়ে বিকট স্বরে অট্টহাস্য করে নেচে নেচে বলে উঠল, 'একবার নরকে ভরতি হলে আমার শয়তানদাদা আর তোদের ছুটি দেবে না—এই বেলা সময় থাকতে থাকতে নরকবাসের অভ্যাসটা করে নে রে!'

—'গেলুম, গেলুম,—আর নয়! বাবা রে, দম বন্ধ হয়ে এল!'

তখন দরজা খুলে দিয়ে কালোদেড়ে গর্জন করে বললে, 'কেমন, এখন বুঝলি তো, এ জাহাজের আসল কর্তা কে?'

জাহাজের উপর থেকে কালোদেড়ের আস্ফালন শুনতে শুনতে কাপ্তেন হর্নিগোল্ডের বুকটা কেঁপে উঠল। তিনি বুঝলেন, এমন সাংঘাতিক সহকারীর সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা করা অতিশয় বিপজ্জনক। ভাবতে লাগলেন, এখন কোন উপায়ে এই নারকীর পাল্লা থেকে ভালোয় ভালোয় ছাড়ান পাওয়া যায়?

৪

কালোদেড়ের বিদায়ী সেলাম

আরও কয়েকদিন যেতে না যেতেই কাপ্তেনের ভয় আরও বদ্ধমূল হয়ে উঠল।

একদিন সমুদ্রে আবির্ভূত হল দুই-দুইখানা জাহাজ—তারা আসছে যথাক্রমে হাভানা ও বারমুডা থেকে।

হর্নিগোল্ডের জাহাজে অমনি উড়িয়ে দেওয়া হল হাড় ও মড়ার মাথা আঁকা কালো 'জলি রোজার' পতাকা।

আগন্তুক দুই জাহাজই সেই অশুভ পতাকা দেখে শিউরে উঠে আত্মসমর্পণ করলে বিনা-বাক্যব্যয়ে।

হর্নিগোল্ড জাহাজ দুখানা নিঃশেষে লুণ্ঠন করলেন বটে, কিন্তু তাদের লোকজনদের অক্ষত দেহেই মুক্তি দিলেন। অকারণে তিনি রক্তপাতের পক্ষপাতী ছিলেন না।

কিন্তু কালোদেড়ে দারুণ ক্রোধে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে গর্জন করে উঠল, 'ওদের সবাইকে ফেলে দাও সমুদ্রে, ওরা মাছেদের খোরাক হোক!'

হর্নিগোল্ড দৃঢ়স্বরে বললেন, 'এ জাহাজের কাপ্তেন হচ্ছি আমি, তুমি হুকুম দেবার কেউ নও!'

কালোদেড়ে বললে, 'মরা মানুষ কথা কয় না, সাক্ষ্য দিতে পারে না। আমি কাপ্তেন হলে কখনও ওদের ছেড়ে দিতুম না।'

হর্নিগোল্ড বললেন, 'ভয় নেই, ভয় নেই। তুমি যাতে কাপ্তেন হতে পারো, শীঘ্রই আমি সে ব্যবস্থা করে দেব।'

কালোদেড়ের মুখে হাসি ফুটল বটে, কিন্তু সে হাসি হচ্ছে দস্তুরমতো বিষাক্ত।

বাসনা পূর্ণ হল না বলে মনের দুঃখ ভুলবার জন্যে সে সদ্যলুণ্ঠিত জাহাজ থেকে একটা মদের পিপে টেনে এনে নিজের দলের সবাইকে ডাক দিয়ে বললে, 'চলে আয় সব তৃষ্ণার্তের দল! পেট ভরে মদ খা আর প্রাণ-ভরে ফুর্তি কর!'

জাহাজের উপরে বইল যেন মদের ঢেউ! কালোদেড়ের টুপি থেকে লম্বমান জ্বলন্ত পলিতাগুলোও দেখাতে লাগল যেন অভিনব দেওয়ালির বাঁধা-রোশনাই! মদে চুমুকের পর চুমুক দিতে দিতে বলতে লাগল, 'জানিস তোরা আমার বাহাদুরি? এ অঞ্চলের বারোটা বন্দরে আছে আমার এক ডজন বউ—আমি কি যে-সে লোক রে? দু-দিন সবুর করলেই দেখবি আমি হয়েছি নিজস্ব জাহাজের মালিক আর তার নাবিকরা হয়েছে পুরোপুরি আমারই তাঁবেদার!'

তার সাধ পূর্ণ হল দিন কয়েক পরেই।

সমুদ্রে ঢেউ কেটে এগিয়ে আসছে একখানা বাণিজ্যপোত।

বোম্বেটে জাহাজের কৃষ্ণপতাকা দেখেও তার লোকজনরা দমল না, লড়াই করবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল।

কালোদেড়েও তো তাই চায়—মারামারি, রক্তারক্তি, খুনোখুনি! কাপ্তেন হর্নিগোল্ডকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সায় দিতে হল।

বোম্বেটে-জাহাজ থেকে হুঙ্কার দিয়ে উঠল কামানের সারি এবং সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে তপ্ত বুলেট প্রেরণ করতে লাগল বন্দুকগুলোও! মড় মড় করে ভেঙে পড়ল বাণিজ্যপোতের কয়েকখানা তক্তা এবং শোনা গেল আহতদের সকরুণ আর্তনাদ।

দুই জাহাজ পাশাপাশি হতেই কান-ফাটানো ভৈরব গর্জন করে মহাকায় কালোদেড়ে মূর্তিমান অভিশাপের মতো লাফ দিয়ে পড়ল বাণিজ্যপোতের উপরে এবং শূন্যে বন-বন করে ঘুরতে লাগল তার রক্তলোভী, শাণিত ও বৃহৎ তরবারি! যারা বাধা দিতে এল তাদের কেউ প্রাণে বাঁচল না।

নিজের জাহাজে দাঁড়িয়ে কাপ্তেন হর্নিগোল্ড আশা করেছিলেন শত্রুবেষ্টিত কালোদেড়ে এ-যাত্রা আর আত্মরক্ষা করতে পারবে না। একথাও ভেবেছিলেন, নিজেই পিস্তল ছুড়ে পথের কাঁটা দূর করবেন—কিন্তু হায়, পিস্তলের গুলি অতদূরে পৌঁছোবে বলে মনে হল না।

ব্যর্থ হল হর্নিগোল্ডের আশা! শোনা গেল কালোদেড়ের ষণ্ড-কণ্ঠের সঙ্গে অন্যান্য বোম্বেটেদের হই-হুল্লোড়, জয়ধ্বনি! বাণিজ্যপোত অধিকৃত এবং তার লোক-লশকর হত আহত বা বন্দি!

বন্দি যাত্রীদের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে কালোদেড়ে নির্দয় হুকুম দিলে, 'ওদের সমুদ্রে ফেলে দে, ওরা মাছেদের উপবাস ভঙ্গ করুক!'

যাত্রীদের কণ্ঠে কণ্ঠে জাগল গগনভেদী ক্রন্দনধ্বনি, কিন্তু সেদিকে কর্ণপাত না করে কালোদেড়ে

বললে, 'এইবারে বন্দি নাবিকদের ব্যবস্থা কর! যারা আমাদের দলে যোগ দিতে না চাইবে, তারাও হবে মাছেদের খোরাক! আহত শত্রুগুলোকেও ওই সঙ্গে জলে ফেলে দে!'

চিৎকার ও হাহাকার কোনও-কিছুতেই কান না পেতে বোম্বেটেরা কালোদেড়ের হুকুম তামিল করতে লাগল।

কালোদেড়ে চেঁচিয়ে হর্নিগোল্ডকে ডেকে বললে, 'শুনুন কাপ্তেন! এ জাহাজখানা এখন আমাদের!'

হর্নিগোল্ড বললেন, 'আমাদের নয় বাপু, খালি তোমার! আজ থেকে তুমি হলে কাপ্তেন টিচ!'

'কাপ্তেনে'র পদে উন্নীত হয়ে কালোদেড়ের ওষ্ঠাধরের উপর দিয়ে হাসির ঝিলিক খেলে গেল বটে, কিন্তু মনে মনে সে সন্তুষ্ট হল না। এখানা হচ্ছে মাত্র 'স্লুপ' (এক মাস্তুলের ছোটো জাহাজ), সে চায় বহু বড়ো বড়ো জাহাজের বহর চালনা করতে। হর্নিগোল্ডের জাহাজখানাও 'স্লুপ' শ্রেণিভুক্ত।

কয়েকদিনের বিশ্রাম। তারপর আবার নতুন শিকারের সন্ধানে সমুদ্রযাত্রা।

দুই দিনের মধ্যেই জুটল এক পরম লোভনীয় শিকার—একখানা মস্ত বড়ো ফরাসি জাহাজ!

চোখে-কানে ভালো করে কিছু দেখবার ও শোনবার আগেই বোম্বেটেদের জাহাজ দুখানা তিরবেগে তার দুই পাশে গিয়ে একসঙ্গে প্রচণ্ড গোলাগুলি বৃষ্টি করতে লাগল--ফরাসি জাহাজখানার অবস্থা হল টলোমলো, দলে দলে মাল্লা মৃত বা জখম হয়ে লুটিয়ে পড়ল এবং তারপরই দেখা গেল, এক রোমশ নরদানবের পিছনে পিছনে বোম্বেটেরা দলে দলে উঠছে আক্রান্ত জাহাজের পাটাতনের উপরে। তখনও যে-সব হতভাগ্য জীবন্ত ছিল তারাও জাহাজের পাটাতন থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে সশরীরে করলে পাতালপ্রবেশ!

কালোদেড়ে তৎক্ষণাৎ সেই নতুন ও প্রকাণ্ড জাহাজের নাম রাখলে—'প্রতিহিংসা!'

তারপর জলের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললে, 'ওহে নরকের খোকা হর্নিগোল্ড! তোমার ওই পুঁচকে খেলো জাহাজকে আমি এইখান থেকেই বিদায়ী সেলাম ঠুকছি! আমি নিজের পছন্দমাফিক জাহাজ পেয়েছি, তোমাকে এর মালপত্তরেরও ভাগ দেওয়া হবে না—হে হে হে হে, বুঝলে বাপু?'

কাপ্তেন হর্নিগোল্ড কোনও জবাব দিলেন না, নিজের জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে আবার ফিরে চললেন নিউ প্রভিডেন্সের দিকে। বোম্বেটেগিরিতে তাঁর ঘৃণা ধরে গিয়েছে, তিনি এই নিষ্ঠুর ও নিকৃষ্ট ব্যবসায় ছেড়ে দেবেন।

৫

পলাতক রণতরী

কালোদেড়ের নাম লোকের মুখে মুখে ফিরতে দেরি লাগল না।

প্রথমেই তার কবলগত হল একখানা ইংরেজ জাহাজ—'গ্রেট অ্যালেন'।

তারপরেই প্রমাণিত হল কালোদেড়ে যে-সে সাধারণ বোম্বেটে নয়! সে কেবল আত্মরক্ষায় অক্ষম সওদাগরি জাহাজ দেখলেই তেড়ে এসে হাতিয়ার হাঁকড়ায় না এবং রণতরীর সামনে পড়লেই চটপট চম্পট দিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করে না।

'স্কারবরো' হচ্ছে ইংরেজদের বৃহৎ যুদ্ধ জাহাজ, তার পাটাতনে সাজানো সারে সারে ভারী ভারী কামান এবং তার নৌসৈন্যদের প্রত্যেকেই বন্দুকের অধিকারী।

হঠাৎ 'স্কারবরো' গিয়ে হাজির বোম্বেটের 'প্রতিহিংসা'র সামনে।

যুদ্ধজাহাজের নায়ক বরাবরই দেখে এসেছেন, রণতরীর সম্মুখীন হলেই বোম্বেটেরা তাড়াতাড়ি জাহাজের সব পাল খাটিয়ে দিয়ে বাঘের সামনে ভীরু হরিণের মতো পালাবার চেষ্টা করে। সেই চেষ্টা ব্যর্থ করবার জন্যে তিনি আগে থাকতেই নিজের জাহাজের সব পাল তুলে দিয়ে কামান দাগতে দাগতে বেগে এগিয়ে গেলেন।

কিন্তু কী আশ্চর্য, 'প্রতিহিংসা' পালাবার কোনও চেষ্টাই করলে না!

মুখভরা হাসি নিয়ে নিজের জাহাজের পাটাতনের উপরে অচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কালোদেড়ে, তার বেণিবদ্ধ শ্মশ্রু দুইভাগে বিভক্ত হয়ে দুই স্কন্ধের উপরে নিক্ষিপ্ত, তার টুপিতে সংলগ্ন প্রজ্বলিত পলিতাগুলো অগ্নিসর্পশিশুর মতো জোর-হাওয়ায় দিকে দিকে ছিটকে পড়ে যেন ছড়িয়ে দিচ্ছে আগুনের হলকা!

বোম্বেটে গোলন্দাজরাও কামানে অগ্নিসংযোগ করতে উদ্যত হল।

কালোদেড়ে বললে, 'আর একটু সবুর করো, এখনও কামান দাগার সময় হয়নি। ওদের আরও কাছে আসতে দাও।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে দেখতে লাগল, দুই জাহাজের মাঝখানকার দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছে! তারা প্রায় সামনাসামনি এসে পড়ল অবশেষে।

আচম্বিতে শূন্যে তরবারি চালনা করে কালোদেড়ে হুংকার দিয়ে হুকুম দিলে, 'সময় হয়েছে! কামান ছোড়ো!'

'প্রতিহিংসা'র সমস্ত কামান একসঙ্গে গর্জন করে উঠল—গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম!

যুদ্ধজাহাজ 'স্কারবরো' প্রথম আক্রমণেই বেধড়ক মার খেয়ে একেবারে কাত হয়ে পড়ল! বিপুল বিস্ময়ে নৌসেনানায়ক কোনওরকমে নিজের রণতরী সামলে নিয়ে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়ে নিজেদের মানরক্ষা করতে না পারলেও রক্ষা করলেন পৈতৃক প্রাণগুলো!

বোম্বেটে-জাহাজের পিছনকার সব চেয়ে উঁচু পাটাতনের উপরে দেখা গেল—গগনভেদী চিৎকারে দিগবিদিক কাঁপিয়ে বিরাটবপু কালোদেড়ে ইংরেজ নৌসেনাদের উপরে গালাগালি ও অভিশাপ বর্ষণ করছে এবং মাথার উপরে বনবনিয়ে তরবারি ঘোরাতে ঘোরাতে কখনও লাফ মারছে শূন্যপথে ও কখনও মেতে উঠছে তাণ্ডব নৃত্যে।

৬

গৌরবের তুঙ্গশিখরে

ইংরেজ রণতরীকে হারিয়ে দেবার পর কালোদেড়ের খাতিরের সীমা রইল না। তার নাম শুনলেই দেহপিঞ্জর ছেড়ে ভয়ে উড়ে যেতে চায় লোকের প্রাণপাখি! বিশেষত মালবাহী জাহাজি কাপ্তেনদের দুর্ভাবনার অন্ত নেই। যার দেখা পেলে যুদ্ধে নিরস্ত হয়ে পিটটান দেয় ইংল্যান্ডরাজের সশস্ত্র ও সসজ্জ রণতরী, তার সঙ্গে মুখোমুখি হলে নিরস্ত্র ও নির্বল সওদাগরি জাহাজ কতটুকু বাধা দিতে পারে?

না, বাধা দিতে পারেনি সত্যসত্যই। আর এই সত্য বোঝা গেল কিছুদিন যেতে-না-যেতেই। কারণ উপরি-উপরি কয়েকখানা জাহাজ বন্দি করে কালোদেড়ে হয়ে দাঁড়াল রীতিমতো এক নৌবহরের অধিকারী। যেসব জাহাজ উল্লেখযোগ্য মনে হল না, সেগুলোকে সে বিনাবাক্যব্যয়ে ডুবিয়ে দিলে

মহাসাগরের অতল পাতালে। সফল হল কালোদেড়ের বহুদিনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা—তার তাঁবে এখন এসেছে সত্যসত্যই নৌবহর! কোনও সওদাগরি জাহাজ আজ অস্ত্রবলে বলীয়ান হলেও তার সঙ্গে আর পাল্লা দিতে পারবে না!

বন্দি বা ধৃত জাহাজের অসংখ্য লোক প্রাণ দিলে বোম্বেটেদের বন্দুক বা অন্যান্য অস্ত্রের মুখে। তুলনায় তাদের ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। কিন্তু যারা মরল না এবং যারা জখম হয়েও বেঁচে রইল তাদের পরিণাম হল মর্মবিদারক। কালোদেড়ের নিদারুণ নির্দেশে সাগরে ঝাঁপ খেতে বাধ্য হয়ে তাদের প্রত্যেকেই লাভ করলে সজ্ঞানে সলিলসমাধি! ভালোয় ভালোয় আত্মসমর্পণ করেও বাঁচোয়া নেই, কেঁদে-কেটে হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চাওয়াও ব্যর্থ—কালোদেড়ের পাষাণ-হৃদয়ে কেউ দেখেনি দয়া-মায়ার ছিটেফোঁটাও! তার মুখে শোনা যায় একই ধরনের উক্তি, 'ওদের জোর করে ছুড়ে ফেলে দে সমুদ্রে! হোক ওরা মাছেদের খোরাক—করুক ওরা হাঙরদের উদরপূরণ!'

সে সময় অসীম সাগরের আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে কত হাজার মানুষের তীব্র ক্রন্দনধ্বনি শুনে চমকিত হয়ে উঠেছিল প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি, কোথাও তার কোনও হিসাব লেখা নেই!

তার দুষ্কর্মের সাক্ষ্য হতে পারে এমন কোনও মানুষ বা জাহাজের অস্তিত্ব রক্ষা করা কালোদেড়ের কাছে ছিল দস্তুরমতো নির্বুদ্ধিতার কাজ।

৭

কালোদেড়ের নতুন বউ

এক জাহাজের অধ্যক্ষকে বলে 'কাপ্তেন' এবং একাধিক জাহাজের অধ্যক্ষ 'কমোডোর' নামে পরিচিত। কালোদেড়ে গ্রহণ করলে উচ্চতর 'কমোডোর' উপাধি।

সে বললে, 'আহা, আজ আমার মা বেঁচে থাকলে পুত্রের গৌরবে হতেন গৌরবিনী!'

কিন্তু মা পরলোকে গেলেও ইহলোকে বসে এতটা গৌরব চুপচাপ ধাতস্থ করাও যায় না। অতএব সে নির্দেশ দিলে—'উৎসব কর!'

কালোদেড়ের বোম্বেটে-শাস্ত্রে উৎসবের অর্থ হচ্ছে নারকীয় কাণ্ড। সাগরের দিকে দিকে তার নৌবহরের গোলন্দাজরা সমস্ত কামান থেকে ক্রমাগত অগ্নিবৃষ্টি করে দেখাতে লাগল বিরাট ও ভয়ংকর আগ্নেয় দৃশ্য!

দৈবগতিকে ও দুর্ভাগ্যক্রমে যারা তথাকথিত উৎসবের সেই অগ্ন্যুৎপাতের মধ্যে এসে পড়ল, তারা যে কেউ ধনে-প্রাণে রক্ষা পেলে না, সেকথা বলাই বাহুল্য। একে একে জলে ডুব মারলে চার-চারখানা লুণ্ঠিত জাহাজ।

তারপর নামে উৎসব শেষ হল বটে, কিন্তু জলপথে ছুটোছুটি করে জাহাজের পর জাহাজের উপরে হানা দিয়ে লুঠতরাজ, রক্তপাত ও নরহত্যা প্রভৃতি পৈশাচিক কাণ্ড চলল অবিশ্রান্ত।

কালোদেড়ে ধনী যাত্রীদের কিন্তু প্রাণে মারত না, বন্দি করত। বন্দরে পৌঁছে আত্মীয়দের কাছে খবর পাঠিয়ে প্রচুর টাকা মুক্তিমূল্য আদায় না করে তাদের ছেড়ে দেওয়া হত না। বলা বাহুল্য ইতিমধ্যে ধনী বন্দিদের জড়োয়া গহনা ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিস লুণ্ঠিত হয়ে উঠত গিয়ে কালোদেড়ের প্রশস্ত ভাণ্ডারে। এইভাবেও সে প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিল।

ওই অঞ্চলে সমুদ্রের চারিদিকে আছে অসংখ্য ছোটো ছোটো দ্বীপ। সেইসব নামহীন দ্বীপে কোনও

মানুষ বাস করে না, তাদের কোথায় কী আছে তাও কেউ জানে না। প্রবাদ, এমনি কোনও অজানা দ্বীপে কালোদেড়ে এডওয়ার্ড টিচ তার বিপুল ঐশ্বর্য লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু সেই গুপ্তধনের ঠিকানা কেউ আদায় করতে পারেনি।

কালোদেড়ে বলত, 'আমি আর শয়তান ছাড়া আমার গুপ্তধনের ঠিকানা আর কারুর জানা নেই।'

তার বসনভূষণও এখন জাহির করে প্রচুর জাঁকজমক। তার হাতের প্রত্যেক আঙুলে শোভা পায় হিরা-পান্না বসানো আংটি। তার গলায় দোলে অনেকগুলো সোনার হারের লহর। তার বুকের বন্ধনীতে ঝোলে এখন নতুন যে তিনজোড়া পিস্তল, তাদের নলচেগুলো রুপো দিয়ে গড়া এবং তাদের কুঁদোগুলো মূল্যবান প্রস্তর দিয়ে অলংকৃত।

কালোদেড়ের এক প্রধান সহকারী ও প্রিয়পাত্র ছিল ইস্রায়েল হ্যান্ডস। একদিন তাকে ডেকে সে চুপিচুপি বললে, 'আমাদের দল কি অতিরিক্ত ভারী হয়ে পড়েনি?'

—'নিশ্চয়! এত লোককে লাভের অংশ দিতে দিতে আমাদের নিজেদের আয়ের পরিমাণ কমে যাচ্ছে।'

—'ঠিক ধরেছ হ্যান্ডস! তাহলে কৌশলে অংশীদারের দল হালকা করে ফেলা যাক!'

বিভিন্ন ওজর দেখিয়ে দুইবারে দুইদল লোককে বিভিন্ন বিজন দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে বাছা বাছা লোক নিয়ে কালোদেড়ে দূর সমুদ্রে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল—একবারও ভেবে দেখলে না যে, এতদিন বিশ্বস্ত ভাবে যারা তার হুকুম মেনে এসেছে, জনহীন অজানা দ্বীপে পরিত্যক্ত হয়ে তাদের দুরবস্থা উঠবে কতখানি চরমে! পরে সে কেবল এইটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে হালকা দল নিয়ে কাজ করলে পকেট বেশি ভারী হয় বটে, কিন্তু আত্মরক্ষার দিক দিয়ে সৃষ্টি হয় গুরুতর সমস্যা!

বৎসরকালব্যাপী লুটতরাজ ও নরমেধযজ্ঞের পর আটলান্টিক মহাসাগর ও তার তীরবর্তী দেশগুলো যখন হয়ে উঠেছে প্রায় অরাজক ও হত্যা-হাহাকারে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত এবং সবাই যখন দুঃখে-শোকে-ক্রোধে একান্ত মরিয়া হয়ে কালোদেড়ের বিরুদ্ধে একবাক্যে করেছে বিদ্রোহ ঘোষণা, তখন সে একদিন অম্লানবদনে বললে, 'হ্যান্ডস, চলো নর্থ ক্যারোলিনার দিকে। দিন-রাত খালি জল আর জল দেখতে আমার আর ভালো লাগছে না!'

—'জল দেখা ছাড়া আর উপায় কী? স্থলে নামলেই তো আমাদের ধরা পড়ে ফাঁসিকাঠের দোলনায় দুলতে হবে!'

—'কুছ পরোয়া নেই। আমরা ফাঁসির দোলনায় দুলব না,—রাজার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করব।'

হ্যান্ডস সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'বলেন কী, কর্তা? মার্জনা ভিক্ষা? কে আমাদের মার্জনা করবে?'

—'গভর্নর চার্লস ইডেন আমাদের হাসিমুখে মার্জনা করবেন।'

—'বলেন কী, হাসিমুখে?'

—'হ্যাঁ। গভর্নর ইডেন বড়ো ভালো লোক হে। যুক্তি মানেন। আমার যুক্তি কী জানো ভায়া? উৎকোচ! ঘুষখোরকে বশ করা মোটেই কঠিন নয়।'

নর্থ ক্যারোলিনা হচ্ছে আমেরিকার আটলান্টিক সাগরতীরের একটি প্রদেশ। সেই প্রদেশের বাথ্ নগরে বাস করেন ইংল্যান্ডের রাজপ্রতিনিধি চার্লস ইডেন। কালোদেড়ের জাহাজ গিয়ে নোঙর ফেললে সেইখানেই।

মানুষ চিনতে ভুল করেনি কালোদেড়ে। গভর্নর ইডেন তার যুক্তি অকাট্য বলেই মেনে নিলেন। উচিতমতো উৎকোচ হজম করে তিনি কালোদেড়ের সমস্ত অপরাধ কেবল রাজার নামে ক্ষমাই

করলেন না, উপরন্তু তার সঙ্গে জমে উঠল তাঁর দস্তুরমতো দোস্তি—যাকে বলে দহরম-মহরম আর কী! সবাই অবাক! হতভম্ব!

বাথ্ শহরের একটি মেয়েকে দেখে কালোদেড়ের ভারী পছন্দ হল। তৎক্ষণাৎ সে করলে বিবাহের প্রস্তাব। কন্যাও নারাজ নয়। তখন সদাশয় গভর্নর বললেন; 'আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এই শুভকার্য সম্পন্ন করব।'

এটি কালোদেড়ের ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ বিবাহ তা ঠিক করে বলা যায় না। বিবাহে নিতবরের আসন গ্রহণ করলে গভর্নরের সেক্রেটারি টোরিয়াস নাইট! খুব ঘটা করে শুভকার্য সম্পন্ন হল বটে, তবে শহরের বনিয়াদি বংশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আমন্ত্রিত হয়েও উৎসবে যোগদান করলেন না।

কিন্তু কালোদেড়ে তাঁদের উপরেও নিলে একহাত! খুব জমকালো সাজপোশাক পরে সে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে একে একে বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয় আর দারোয়ান ও খানসামাদের ডেকে বলে, 'তোমাদের মনিবকে গিয়ে খবর দাও, স্বয়ং শ্রীমতী টিচ দ্বারদেশে অপেক্ষা করছেন।'

দারোয়ান ও খানসামাদের ইতস্তত করতে দেখলেই কালোদেড়ে তার রত্নখচিত ও রুপোয় বাঁধানো পিস্তলগুলো গুড়ুম গুড়ুম শব্দে ছুড়তে শুরু করে দেয়, দিকে দিকে বোঁ-বোঁ করে ছুটতে থাকে গরমা-গরম বুলেট এবং দারোয়ান ও খানসামারা হয় ভয়ে থরহরি কম্পমান! তারপরেই দরজা খুলতে ও গৃহস্বামীর আতিথ্যলাভ করতে বিলম্ব হয় না। কালোদেড়ে বারবার এইভাবে প্রমাণিত করলে সেই পুরাতন সত্যকথাটাই—জোর যার, মুল্লুক তার!

এখানে এসেও কিন্তু কালোদেড়ে নদী-পথে বোম্বেটেগিরি ছাড়ল না—বহু জাহাজ থেকে মালপত্তর ও ধনরত্ন লুণ্ঠিত হতে লাগল এবং বলা বাহুল্য যে, গোপনে তার লাভের অংশ থেকে বঞ্চিত হলেন না স্বয়ং গভর্নরও!

জাহাজের মালিকদের কাছ থেকে অভিযোগ এলে গভর্নর ইডেন মুখে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করলেও কাজে কিছুই করেন না। জাহাজের মালিকরা শেষটা এখানে হতাশ হয়ে পার্শ্ববর্তী প্রদেশ ভার্জিনিয়ার গভর্নর স্পট্‌স্‌উডের কাছে গিয়ে নিজেদের জরুরি নালিশ জানালেন।

ফল পাওয়া গেল হাতে হাতে। গভর্নর স্পট্‌স্‌উড তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করে দিলেন যে কালোদেড়েকে গ্রেপ্তার বা বধ করতে পারবে, তাকেই হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ডের নৌবহরের দক্ষ যোদ্ধা লেফটেনান্ট রবার্ট মেনার্ডের উপরে হুকুম জারি হল, তিনি যেন অবিলম্বে কালোদেড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন।

গভর্নর ইডেনের সেক্রেটারি টোরিয়াসও কালোদেড়ের কাছ থেকে অল্পবিস্তর ঘুষ খেয়ে তার ভক্ত হয়ে পড়েছিল। ইংরেজ নৌসেনাদের এই যুদ্ধ-প্রস্তুতির কথা শুনেই সে প্রমাদ গুনে বোম্বেটের কাছে তাড়াতাড়ি খবর পাঠিয়ে দিলে।

৮

শয়তানি ফুর্তি

কিন্তু খবর পেয়েও কালোদেড়ে কিছুমাত্র দমল না বা ভীত হল না। নিজের দলের সবাইকে ডেকে অবহেলা ভরে বললে, 'ওহে, শুনেছ? টোরিয়াস চিঠি লিখে জানিয়েছে যে, রাজার সৈন্যরা নাকি

আমাদের শাস্তি দিতে আসছে! জাহান্নমে যাক রাজা! যারা আসতে চায় আসুক তারা! আমি তো জাঁকিয়ে বসে আছি নিজের আড্ডায়—সিংহের গহ্বরে ঢুকে ফেরুপাল কী করতে পারে?'

তখন সন্ধ্যাকাল। হ্যান্ডস ও আরও দুইজন বোম্বেটেকে নিয়ে কালোদেড়ে নিজের কামরার ভিতরে প্রবেশ করে খুব খুশিমুখে বললে, 'আবার লড়াই হবে—কী মজা রে, কী মজা! ঢালো মদ, প্রাণ ভরে পান করো—আজ আমাদের আনন্দের দিন! দেখা যাক, কে কত বেশি মদ খেতে পারে!'

একটা টেবিলের চারিদিক ঘিরে বসে চারজনে মিলে মদ্যপান শুরু করে দিলে। বাতির আলোতে খালি কালোদেড়ের গলার হার ও আঙুলের আংটিগুলো নয়, মুখের দাড়ি-গোঁফের ঘন জঙ্গলের ভিতর থেকে তার খুদে খুদে চোখদুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল—এবং জাহির করছিল যেন কোনও নির্দয় কৌতুকের রহস্যময় ইশারা!

শয়তানের কাছে গিয়ে শয়তানি ছাড়া আর কী আশা করা যায়? বোধ করি সেই কারণেই প্রচুর মদ্যপান করেও জনৈক চালাক বোম্বেটে নেশায় ঝিমিয়ে পড়েনি—নিজের দৃষ্টিকে রেখেছিল অত্যন্ত জাগ্রত!

হঠাৎ সে দেখলে, কালোদেড়ের দুটো পিস্তলসুদ্ধ দুখানা হাত ধীরে ধীরে টেবিলের তলায় গিয়ে ঢুকল। সে চটপট উঠে দাঁড়িয়ে একটা ওজর দেখিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল উদ্‌ভ্রান্তের মতো।

অকস্মাৎ বিকট চিৎকার করে কালোদেড়ে এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিলে বাতিটা এবং অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে ছুড়লে তার পিস্তলদুটো! তারপরেই আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন ও ভয়াবহ আর্তনাদ এবং একটা ভারী দেহপতনের শব্দ!

তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে দেখা গেল, হ্যান্ডস দুই হাতে হাঁটু চেপে যন্ত্রণায় ছটফট করছে এবং তার আহত হাঁটু থেকে হু হু করে বেরুচ্ছে রক্তের ধারা!

একজন বোম্বেটে জিজ্ঞাসা করল, 'এর অর্থ কী?'

হা হা করে হাসতে হাসতে কালোদেড়ে বললে, 'এর অর্থ হচ্ছে, মাঝে মাঝে এক-একজনকে শাস্তি না দিলে সবাই ভুলে যাবে যে, এ জাহাজের আসল কর্তা কে?' তারপর সে হেঁট হয়ে পড়ে বললে, 'চলে এসো হ্যান্ডস, চলে এসো—তোমার বিশেষ কিছু হয়নি বাপু! হাঁটুর উপরে একটা ছোটো ছ্যাঁদা বই তো নয়, শহরে গিয়ে ডাক্তার দেখালেই দু-দিনে সেরে যাবে—কী বলো হ্যান্ডস?'

কিন্তু হ্যান্ডস কিছুই বললে না, পরদিন সকালেই তাকে দোলায় তুলে শহরে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

৯

কালোদেড়ের প্রভাতি ভোজ

ওদিকে তরুণ নৌসেনাপতি লেফটেনান্ট মেনার্ড প্রস্তুত হচ্ছিলেন যুদ্ধের জন্যে।

বোম্বেটেদের জাহাজ তখন বাহির-সমুদ্রে ছিল না, একটা খাঁড়ির (স্থলভাগে প্রবিষ্ট সমুদ্রের অপ্রশস্ত অংশ) ভিতরে গিয়ে নোঙর ফেলে যুদ্ধের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

মেনার্ড বুঝলেন, তাঁর অধীনে 'নাইম' ও 'পার্ল' নামে যে দুখানা প্রকাণ্ড রণতরী আছে, গভীর সাগরের আনাগোনার উপযোগী করে তারা গঠিত। একে তো খাঁড়ির জলপথ সংকীর্ণ, উপরন্তু চড়া পড়েছে তার যেখানে-সেখানে—বড়ো জাহাজ ঢুকলেই চড়ায় আটকে অচল ও অকেজো হয়ে পড়বে।

কালোদেড়ের চালাকি বুঝে নিয়ে রণকুশল মেনার্ড তার ফাঁদে ধরা পড়তে রাজি হলেন না। তিনি

'স্লুপ' বা এক-মাস্তুলের দুখানা অপেক্ষাকৃত ছোটো ও হালকা জাহাজ নির্বাচন করলেন—তারা অগভীর জলেও চলা-ফেরা করতে পারবে অনায়াসেই। তার উপরে তাদের আরও হালকা করবার জন্যে ভারী ভারী কামানগুলোও সরিয়ে ফেলা হল। পরিবর্তে আমদানি করা হল গাদি গাদি বন্দুক—বড়ো কামানের অভাব পূরণ করবে তাদের সংখ্যাধিক্যই।

খবর নিয়ে জানা গেল, বোম্বেটেদের দলে পঁচিশজনের বেশি লোক নেই, কারণ কালোদেড়ে অতিরিক্ত লাভের লোভে দল অতিশয় হালকা করে ফেলেছে। মেনার্ড সঙ্গে নিলেন প্রায় পঞ্চাশজন সৈন্য। পঞ্চাশজন বন্দুকধারীর সামনে দাঁড়ালে পঁচিশজনকে পড়তে হবে যার-পর-নাই বেকায়দায়—এই ছিল তাঁর ধ্রুবধারণা।

অপরাহ্ন কাল।

খাঁড়ির বাঁকের মুখে আচম্বিতে দেখা গেল, দুখানা জাহাজের মাস্তুলের চূড়া।

বোম্বেটে-জাহাজের প্রহরী চেঁচিয়ে উঠে বললে, 'হুঁশিয়ার! দুখানা জাহাজ আসছে!'

লাফ মেরে পাটাতনের উপরে উঠে কালোদেড়ে এক নজরে যা দেখবার সব দেখে নিয়ে বললে, 'হুঁ, রাজার অভিযান! কিন্তু আমার এখানে আসার মজাটা ওদের ভালো করেই টের পাইয়ে দেব! বাছারা ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ তো দেখেনি!' সে তখনও জানত না তার ফাঁদ আছে মেনার্ডের নখদর্পণে!

রাজার জাহাজ কাছে এসে পড়ল।

কালোদেড়ে হাঁকলে, 'কে তোমরা?'

মেনার্ড উত্তরে ধীর স্বরে বললেন, 'টের পাবে অবিলম্বেই।'

তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টি চালনা করে বুঝলেন যে, বোম্বেটেদের জাহাজখানা আকারে তাঁদের চেয়ে বিশেষ বড়ো না হলেও ওর মধ্যে নিশ্চয়ই গাদাগাদি করা আছে কামানের পর কামান। ওখানাও এমন হালকা ভাবে তৈরি যে এই বিপদসংকুল অগভীর জলেও অনায়াসেই আনাগোনা করতে পারে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন মেনার্ড। ওদের পোতপার্শ্বের কামানগুলোর দারুণ অগ্নিবৃষ্টিতে মুষড়ে পড়লে চলবে না, তাঁকে একেবারে বোম্বেটে-জাহাজের পাশাপাশি গিয়ে পড়ে মুষলধারে গুলিবৃষ্টি করে প্রথমেই শত্রুদের রীতিমতো অভিভূত করে ফেলতে হবে। সৈন্য ও বন্দুকের সংখ্যাধিক্যের উপরেই তাঁর প্রধান ভরসা।

কিন্তু জলে এখন ভাটার টান, সময়টা এখানকার যুদ্ধের পক্ষে উপযোগী নয়। জোয়ারের জন্যে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে—এই স্থির করে মেনার্ড আজকের মতো নোঙর ফেলবার হুকুম দিলেন।

সেদিন রাতে বারে বারে মাতাল কালোদেড়ে পাটাতনের উপরে ছুটে এসেছিল এবং ভয়ানক গলাবাজি করে জানিয়েছিল—'ওরে রাজার চাকরগুলো, কাল প্রভাতি খানার সময় তোদের সকলকেই হতে হবে আমার শখের জলখাবার!'

মেনার্ড একবার খেপে গিয়ে উত্তরে বলেছিলেন, 'ওরে শুয়োর, শোন! তোর ওই নোংরা উকুনভরা কালো দাড়িতে পেরেক মেরে তোকে আমার জাহাজের গায়ে লটকে দেব—এই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা!'

রাজার জাহাজে নোঙর ফেলা হচ্ছে দেখে কালোদেড়ে আন্দাজে বুঝে নিলে যে, আপাতত বোম্বেটেরা নিরাপদ, কারণ সুচতুর শত্রুরা ভাটার সময়ে অগভীর জলে জাহাজ চালিয়ে বিপদে পড়তে চায় না। সকালে জোয়ার আসার সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুপক্ষের আক্রমণ শুরু হবে।

সে একজন বোম্বেটেকে কাছে ডেকে এনে, একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে তার চোখের কাছে নাড়তে নাড়তে ফিস-ফিস করে বললে, 'ওরে মুখ্যু, ভালো করে শুনে রাখ! যদি দেখিস আমরা হেরে যাচ্ছি আর রাজার সেপাইরা আমাদের জাহাজের উপরে উঠে পড়েছে, তখনই দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে আমাদের বারুদখানায় আগুন লাগিয়ে দিবি! তারপর কী মজা হবে জানিস তো? দড়াম করে এক দুনিয়া-কাঁপানো ধুন্ধুমারের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সবাই মিলে সরাসরি গিয়ে নরক গুলজার করে তুলব! কী রে, পারবি তো?'

এই ভয়ানক প্রস্তাব শুনে বোম্বেটে-বাবাজির আত্মা শুকিয়ে যাবার উপক্রম! মুখরক্ষা করবার জন্যে তবু সে কোনওরকমে মাথা নেড়ে সায় দিলে।

কালোদেড়ে বললে, 'যা তবে! বারুদখানায় গিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাক! কাল এসপার কি ওসপার!'

বোম্বেটে দুরু-দুরু বুকে কাঁপতে কাঁপতে প্রস্থান করল।

চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্না ফুটল। মদে শুকনো গলা ভিজিয়ে নেবার জন্যে কালোদেড়ে নিজের কামরার দিকে ছুটল এবং যেতে যেতে আর-একবার গর্জিত কণ্ঠে জানিয়ে দিয়ে গেল যে—'ওরে রাজার দাসানুদাসের দল! শুনে রাখ তোরা! রাত পোয়ালেই আমি তোদের হাড় খাব, মাস খাব আর চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাব—হা হা হা হা হা হা!'

১০

যুদ্ধজাহাজের দুর্দশা

উষার সিঁদুরমাখা আকাশ ঢেকে রাখতে পারলে না পাতলা কুয়াশার পর্দা। খাঁড়ির বুকে এসেছে জোর জোয়ার। জলে জেগেছে কলকল করে কলহাস্য।

রাজার জাহাজ-জোড়া এগিয়ে আসছে ধীরে, ধীরে, ধীরে।

মেনার্ড নিজের লোকজনদের ভরসা দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলছিলেন, 'কোনও ভয় নেই—আগে চল, আগে চল ভাই! বোম্বেটেরা বড়ো জোরে একবার কি দুইবার কামান ছোড়বার ফুরসত পাবে, তার পরেই আমরা ছুটে গিয়ে হুড়মুড় করে তাদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব, দেখব তখন পঁচিশটা বন্দুক কেমন করে সামলায় পঞ্চাশটা বন্দুকের ঠেলা! আগে চল!'

এতক্ষণ পরে কালোদেড়ের মন দোলায়মান হল সন্দেহদোলায়। কুয়াশার ফিনফিনে পর্দা ফুঁড়ে দেখা যাচ্ছে, রাজার জাহাজ দুখানা এগিয়ে আসছে,—ক্রমেই এগিয়ে আসছে তার দিকে। ঘনায়মান বিপদ! একেবারে শেষ-মুহূর্তেই সে আন্দাজ করতে পারলে, শত্রুরা দলে তার চেয়ে দুগুণ বেশি ভারী! সে স্থির করলে, জাহাজ নিয়ে খাঁড়ির ভিতরে আরও দুর্গম অংশে গিয়ে আশ্রয় নেবে। সে চেঁচিয়ে হুকুম দিলে—'নোঙর তোলো, নোঙর তোলো!'

কিন্তু সময় নেই—সময় নেই! শত্রু যে শিয়রে! পালাবার পথ যে বন্ধ!

কালোদেড়ে কামান দেগে পথের বাধা দূর করতে চাইলে—হ্যাঁ, এই হচ্ছে বাঁচবার একমাত্র উপায়।

প্রচণ্ড চিৎকারে শোনা গেল তার চরম আদেশ—'কামান ছোড়ো, একসঙ্গে সব কামান ছোড়ো। আগুনের ঝড়ে উড়িয়ে দাও সামনের সব প্রতিবন্ধক!'

কর্ণভেদী বজ্রনাদ ধ্বনিত করে সোঁ সোঁ শব্দে বাতাস কেটে তীব্র বেগে ছুটে গেল সেই সর্বনাশা

অগ্নিপিণ্ডগুলো—কিন্তু হায় রে হায়, তারা রাজার জাহাজকে স্পর্শ করবার আগেই জলের ভিতরে ঝুপ ঝুপ করে পড়ে তলিয়ে গেল!

মেনার্ড বিপুল পুলকে বলে উঠলেন, 'গোলাগুলো গিয়েছে জলের জঠরে—আমরা অক্ষত! এইবারে গর্জন করুক আমাদের বন্দুকগুলো—তারা কেউ ব্যর্থ হবে না!'

গুড়ুম, গুড়ুম, গুম! গুড়ুম, গুড়ুম, গুম!

রাগে পাগলের মতো হয়ে কালোদেড়ে দেখলে, তার দুজন গোলন্দাজ হাত-পা ছড়িয়ে মৃত্যু-ঘুমে এলিয়ে পড়ল এবং তার জাহাজখানাও চড়ায় আটকে অচল হল! কণ্ঠে তার ফুটতে লাগল প্যাঁচার মতো কর্কশ চিৎকার।

আবার গুড়ুম, গুড়ুম, গুম! ওরে বাবা, গুলির ঝাঁক বনবনিয়ে ছুটছে কানের পাশ দিয়ে। কালোদেড়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তাড়াতাড়ি হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ল!

কিন্তু এ কী দৈব-বিড়ম্বনা! হঠাৎ স্রোতের টানে পড়ে রাজার জাহাজ দুখানার মুখ গেল ঘুরে এবং কালোদেড়েও ছাড়লে না এই দুর্লভ সুযোগ।

তৎক্ষণাৎ লাফ মেরে দাঁড়িয়ে বজ্র-কণ্ঠে সে গর্জে উঠল—'আবার কামান ছোড়ো, আবার কামান ছোড়ো!'

আবার জাগল কামানগুলোর ভৈরব হুংকার! এবারে তারা ব্যর্থ হল না এবং তাদের সঙ্গে যোগ দিতে ছাড়লে না বোম্বেটেদের বন্দুকও!

তারপর মনে হল সেখানে সৃষ্ট হয়েছে অভাবিত এক শব্দময় মহানরক! ফটাফট ফেটে গেল রাজার জাহাজ দুখানার নানা জায়গা, হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল তাদের মাস্তুল, মৃত্যুন্মুখ যোদ্ধাদের চিৎকার ছুটে গেল দিকে দিকে! নৌসেনাদের ঊনত্রিশজনের মৃতদেহ পড়ে রইল পাটাতনের যেখানে-সেখানে।

বিকট উল্লাসে চেঁচিয়ে কালোদেড়ে বলে উঠল, 'এবার ওদের পেয়েছি হাতের মুঠোর মধ্যে। আবার ছোড়ো কামান-বন্দুক! ডুবিয়ে দাও জাহাজ দুখানা! মড়াগুলোর সঙ্গে জীবন্তরা মেটাক মাছেদের ক্ষুধা!'

লেফটেনান্ট মেনার্ড দিকে দিকে ছুটোছুটি করে নিজের দলের হতভম্ব লোকদের উৎসাহিত করতে লাগলেন। এবং ইতিমধ্যে দুইপক্ষের জাহাজ পরস্পরের খুব কাছে এসে পড়ল।

মেনার্ড ভাবলেন একবার যদি সদলবলে ওদের জাহাজে লাফিয়ে উঠতে পারেন তাহলে আর কোনও ভাবনাই থাকে না! কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি বুঝে ফেললেন, ব্যাপারটা অত সহজ নয়!

দুই পক্ষের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই কমে আসছে দেখে কালোদেড়ে নতুন হুকুম জারি করলে—'নিয়ে এসো হাত-বোমা! সবাই হাত-বোমা ছোড়ো!'

নতুন বিপদের সম্ভাবনা দেখে মেনার্ড নিজের সৈন্যদের ডেকে বললেন, 'তাড়াতাড়ি পাটাতনের তলায় গিয়ে গাঢাকা দাও!'

দুই পক্ষের জাহাজে জাহাজে লেগে গেল বিষম ঠোকাঠুকি—শোনা যেতে লাগল মড়মড়িয়ে কাঠভাঙার শব্দ!

দুম, দুম, দুম! বোমার পর বোমা ফাটার বেজায় আওয়াজ, ধুমধড়াক্কা! রাজার জাহাজ দুখানার পাটাতন ভগ্ন-চূর্ণ, ধূমায়িত, অগ্ন্যুৎপাতে ভয়াবহ! চোখের সামনে যেন মারাত্মক আতশবাজির খেলা দেখতে দেখতে বিকট উল্লাসে কালোদেড়ে অট্টহাস্য করতে লাগল।

১১

কালোদেড়ে কালগ্রাসে

কালোদেড়ের রোমশ, মদমত্ত ও অমানুষিক দেহ তরবারি ঘোরাতে ঘোরাতে মেনার্ডের 'রেঞ্জার' নামক জাহাজের উপরে লাফিয়ে পড়ল এবং তার পিছনে পিছনে অনুসরণ করলে অন্যান্য বোম্বেটেরাও!

হুহুংকারে শোনা গেল তার হিংস্র কণ্ঠে—'সংহার! সংহার! হা রে রে রে! শুরু হোক প্রলয়কাণ্ড!'

আচম্বিতে পাটাতনের দরজা ঠেলে কৃপাণ তুলে মেনার্ড ও তাঁর সৈন্যদের আবির্ভাব! ব্যাপারটা এতটা অভাবিত যে বোম্বেটেরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত! কিন্তু পলকের মধ্যে নিজেদের হতভম্ব ভাব সামলে নিয়ে তারা সবেগে আক্রমণ করলে—লেগে গেল হাতাহাতি লড়াই! খড়্গো খড়্গো হত্যা-ঝঞ্ঝনা! আগ্নেয়াস্ত্রের ধ্রুম-ধ্রাম! যোদ্ধাদের গর্বিত বাক্যাড়ম্বর!

তারপরেই অন্য জাহাজ থেকেও মেনার্ডের আরও সৈন্য এসে যুদ্ধে যোগদান করে বোম্বেটেদের অবস্থা করে তুললে শোচনীয়। জাহাজের নীচে জলস্রোত, জাহাজের উপরে রক্তস্রোত!

কালোদেড়ে তখনও ভয় পেলে না—তার একহাতে তরবারি, আর-একহাতে পিস্তল! মৃতদের পায়ে মাড়িয়ে এবং জীবিতদের ঠেলে সে যেন প্রলয়ংকর মূর্তি ধারণ করে একেবারে মেনার্ডের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সিংহগর্জনে বলে উঠল, 'আরে রে ঘৃণ্য জীব! নরকে যাবার সময় তোকেও আমি ছেড়ে যাব না!' বৃহৎ তার রক্তস্নাত কৃপাণ, তাকে ঠেকাতে গিয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল মেনার্ডের তরবারি!

আর রক্ষা নেই! উন্মত্তের মতো অট্টহাসি হেসে ও দীপ্ত নেত্রে অগ্নিবর্ষণ করে কালোদেড়ের ভীমবাহু আবার তুললে তার সাংঘাতিক অস্ত্র—কিন্তু পরমুহূর্তে একজন নৌসৈন্য ছুটে এসে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তার মাথার উপরে করলে প্রচণ্ড আঘাত!

পাটাতনের উপরে ধড়াম করে আছড়ে পড়ল বোম্বেটে-সর্দার! মুহূর্তের মধ্যে চারিদিক থেকে তাকে ছেঁকে ধরলে নৌসৈন্যের দল এবং তরবারি, ছোরা ও বন্দুকের কুঁদো দিয়ে সবাই অশ্রান্ত ও নিষ্ঠুর ভাবে বিরাট দেহের উপরে করতে লাগল প্রবল আঘাতের পর আঘাত!

কিন্তু কী অসাধারণ তার সহ্যক্ষমতা ও প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি, সেইসব মারাত্মক আঘাতের পরেও সে কাবু হতে চাইলে না, উলটে দুই হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসল এবং তার শেষ পিস্তল তুলে লক্ষ্য স্থির করলে মেনার্ডের দিকে! ওই পর্যন্ত! তার জীবনীশক্তি তখন একেবারে ফুরিয়ে এসেছে, পিস্তল ছোড়বার আগেই সে আবার ধপাস করে পড়ে গেল এবং তার সর্বাঙ্গে জাগল অন্তিম শিহরন! সুদীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেলে সে প্রাণত্যাগ করলে।

তার কালো দাড়ি তখন রক্তরাঙা, সর্বাঙ্গও রক্তভীষণ। গুনে দেখা গেল, তার দেহের পঁচিশ জায়গায় রয়েছে পঁচিশটা প্রাণনাশক আঘাতের চিহ্ন!

যুবক যোদ্ধা মেনার্ড নিহত বোম্বেটে-সর্দারের প্রকাণ্ড মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলেন বিস্ময়-প্রশংসাপূর্ণ নেত্রে। তাঁকে অভিভূত করে ফেলেছে তার বন্য সাহস!

কিন্তু অভিভূত হলেও মেনার্ড নিজের প্রতিজ্ঞা ভুললেন না। একজন সৈনিককে ডেকে বললেন, 'বোম্বেটে-সর্দারের মুণ্ডটা কেটে জাহাজের গায়ে ঝুলিয়ে দাও।'

বলা বাহুল্য, সর্দারের পতনের পর হতাশ হয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল বাকি বোম্বেটেরাও।

এই ভয়ঙ্কর বোম্বেটে দলকে দমন করে লেফটেনান্ট মেনার্ড ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

রক্ত-বাদল ঝরে

প্রথম পরিচ্ছেদ

বোম্বেটে না বর্বর

বোম্বেটে কাকে বলে সবাই তা জানে। বোম্বেটে বা জলদস্যু পৃথিবীর সব দেশেই সব সময়ে ছিল। এখনও আছে।

তবে বোম্বেটে-জীবনের গৌরবময় যুগ আর নেই। আগেকার বোম্বেটেদের ক্ষমতা ছিল অবাধ ও খ্যাতি ছিল আশ্চর্য, এখনকার বোম্বেটেরা তাদের কাছে হচ্ছে তিমিমাছের কাছে পুঁটিমাছের মতো।

উড়োজাহাজ, বাষ্পীয় পোত ও বেতার টেলিগ্রাফের মহিমায় আজ আর কোনও বোম্বেটেই বেশি মাথা তুলতে বা বেশিদিন কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে না। চীনে বোম্বেটেরা আজও মাঝে মাঝে মাথা চাগাড় দেয় বটে, কিন্তু তাদের জারিজুরি ওই চীনা সমুদ্রের ভিতরেই। চীনদেশের ভিতরকার অবস্থা ভাল নয়, রাজ্যবিপ্লব নিয়েই সেখানকার গভর্নমেন্ট ব্যতিব্যস্ত, সেইজন্যেই চীনে বোম্বেটেরা মাঝে মাঝে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করবার সুযোগ পায়।

অন্যান্য দেশের আধুনিক বোম্বেটেরা উল্লেখযোগ্য জীব নয়। তারা আছে—এইমাত্র।

বাংলাদেশে 'বোম্বেটে' কথাটি বেশিদিনের নয়। বার ভুঁইয়ার সময়ে বাংলাদেশে পর্তুগিজ জলদস্যুদের বিষম উপদ্রব হয়েছিল। তখনকার রডা, গঞ্জালিস ও কার্ভালো প্রভৃতি জলদস্যুর নাম বাঙালি এখনও ভুলতে পারেনি, কারণ বর্গির অত্যাচার ও মগের অত্যাচারের মতো পর্তুগিজ জলদস্যুদের অত্যাচারও ছিল তখনকার বাংলাদেশের নিত্য-নৈমিত্তিক বিভীষিকা। ওই সময়েই 'বোম্বেটে' কথাটি বাংলাদেশে চলতে শুরু হয়। ইংরেজি Bombardier-এর বাংলা হচ্ছে 'গোলন্দাজ সৈন্য'। পর্তুগিজ জলদস্যুরা গোলন্দাজিতে অর্থাৎ কামান-বন্দুকের ব্যবহারে দক্ষ ছিল। তাই বোধহয়, ওই ইংরেজি কথাটা থেকে বাংলা 'বোম্বেটিয়া' বা 'বোম্বেটে' কথাটির সৃষ্টি হয়, আর সাধারণভাবে জলদস্যুদেরই প্রতি ব্যবহৃত হতে থাকে।

'বোম্বেটে' কথাটি খাঁটি বাংলা কথা না হলেও খাঁটি বাঙালি বোম্বেটের অভাব বাংলাদেশে ছিল না। তবে এখানে তো সমুদ্রতীরবর্তী নগর বেশি নেই, কাজেই বোম্বেটেদের ছোট ছোট নৌকা করে নদ-নদীর ভিতরে এসেই ব্যবসা চালাতে হত। বড় বড় জাহাজে চড়ে পৃথিবীর নামজাদা বোম্বেটেদের মতো সমুদ্রের উপর বড়রকমের ডাকাতি করার সুযোগ তাদের বেশি ছিল না।

সেকেলে বাংলার জল-ডাকাতদের সাধারণ নিয়ম ছিল এই রকম : কোনও যাত্রীনৌকো দেখলেই তারা নিজেদের নৌকো নিয়ে তার কাছে গিয়ে বলত, "আমাদের আগুন নিবে গেছে। একটু আগুন দেবে ভায়া?" যাত্রী নৌকোর লোকেরা কোনরকম সন্দেহ না করে আগুন দেবার জন্যে বোম্বেটে নৌকোর পাশে গিয়ে হাজির হত এবং অমনি সেই সুযোগে বোম্বেটেরা যাত্রী নৌকোর ভিতরে লাফিয়ে পড়ে সর্বনাশের সৃষ্টি করত। বারে বারে এমনি ঠকে শেষটা অচেনা নৌকো আগুন চাইলেই তারা তাড়াতাড়ি আরও তফাতে সরে পড়ে পলায়ন করত।

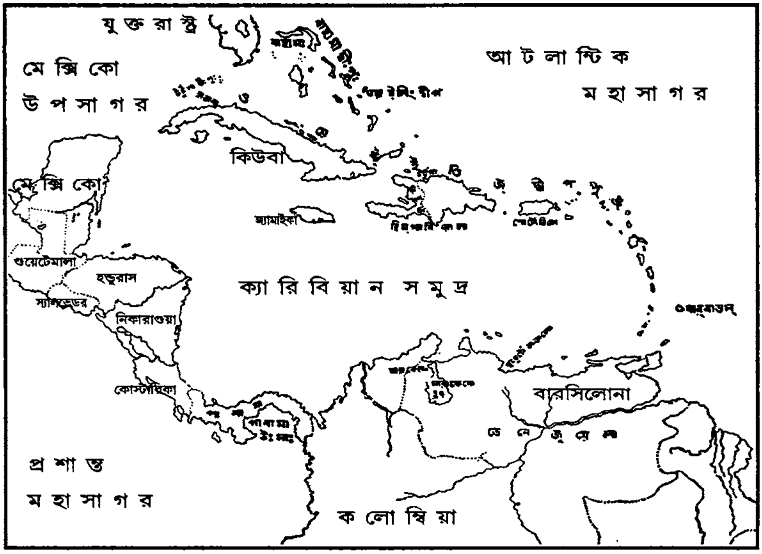

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও মধ্য আমেরিকা

বাংলাদেশে জল-ডাকাতরা প্রায়ই ছিপ নৌকো ব্যবহার করত। এখানকার ডাঙার ডাকাতরা তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে ব্যবহার করত 'রণপা'। রণপা হচ্ছে দু'টো লম্বা বাঁশের ডাণ্ডা—মানুষের মাথার চেয়ে অনেক উঁচু। সেই ডাণ্ডার মাঝখানে পা রাখবার জায়গা থাকে। (ইউরোপেরও অনেক দেশের চাষীরা শস্যক্ষেতে চলাফেরা করবার সময়ে এমনই রণপা ব্যবহার করে থাকে।) কিন্তু বাংলার ডাঙার ডাকাতরাও জলপথে তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে বোম্বেটেদেরই মতো ছিপ ব্যবহার করত।

আইনের চোখে অপরাধী হলেও সামাজিক হিসাবে, আগেকার বোম্বেটেরা বোধহয় সাধারণ খুনি বা ডাকাতের চেয়ে উচ্চশ্রেণীর জীব ছিল। কারণ, দেখা যায়, আগেকার এমন কয়েকজন লোক নৌ-যোদ্ধারূপে বিখ্যাত হয়ে প্রভূত যশ ও রাজসম্মান অর্জন করে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হয়ে রয়েছেন, যাঁদের বোম্বেটে বললে খুব ভুল করা হয় না।

যেমন ভাস্কো ডা গামা। পর্তুগালের এই নামজাদা যোদ্ধা-নাবিক পর্তুগিজ অধিকৃত 'ভারতবর্ষে'র বড়লাটরূপে কোচিতে প্রাণত্যাগ করেন (১৫২৪)। কিন্তু আফ্রিকার স্থানে স্থানে ও ভারতের কালিকটে তিনি যেসব কাজ করে গেছেন, তা বোম্বেটের পক্ষেই সাজে। পর্তুগালের আর এক নাবিক-নেতা ফার্ণান ম্যাগেল্যানও স্বদেশে যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রীতি লাভ করেছেন, কিন্তু তিনি সাধারণ ইতর বোম্বেটের চেয়ে ভাল লোক ছিলেন না।

ইংলন্ডকে স্পেনের 'আর্মাডা'র কবল থেকে বাঁচিয়ে এবং অনেক নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার ও ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত করে স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক আজ স্বদেশভক্ত বীর বলে সুপরিচিত। সে হিসাবে সত্যসত্যই তিনি এই সম্মানের অধিকারী। কিন্তু জলদস্যুরা যে কাজ করলে নিন্দিত হয়,

তাঁর অনেক অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যেই তা লক্ষ্য করা যায়। ড্রেক একালে জন্মালে, পৃথিবী বোধহয় তাঁকে ক্ষমা করত না। ওয়েস্ট ইন্ডিজে গিয়ে তিনি যথেচ্ছভাবে লুটতরাজ করেছেন, হাজার হাজার অসহায় মানুষকে হত্যা করেছেন, বড় বড় শহরকে আগুনের মুখে সমর্পণ করেছেন। সে দেশের লোকের কাছে তিনি নিশ্চয়ই বীর নামে পরিচিত হন নাই। যুদ্ধের নামগন্ধ নেই, নগর লুণ্ঠনও শেষ হয়ে গেছে, তবু হাইতি দ্বীপের রাজধানী স্যান্টো ডোমিঙ্গো শহরের নিরীহ বাসিন্দাদের উপর ড্রেক অনবরত গুলিগোলা বৃষ্টি করেছেন। নগরের চতুর্দিকে যখন ভীষণ অগ্নির তাণ্ডবলীলা, নিরপরাধ নর-নারী ও শিশুর আর্তনাদে যখন আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ এবং ড্রেকের সৈন্যরা যখন ক্রমাগত গুলিগোলা বৃষ্টি করে একেবারে নেতিয়ে কাবু হয়ে পড়েছে, তখনও লক্ষাধিক মুদ্রা ঘুষ না পাওয়া পর্যন্ত ইংলন্ডের এই মহাবীর তুষ্ট হতে পারেননি।

পনের, ষোল ও সতের শতাব্দীতে ইংলন্ডবাসীরা নৌ-যোদ্ধা ও বোম্বেটেকে যে প্রায় অভিন্ন বলে মনে করত, তার অসংখ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। তখন সমুদ্রে ও সাগর তীরবর্তী স্থানে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময়ে, ইংরেজরা অধিকাংশ সময়েই সাধারণ বোম্বেটেদের সাহায্য গ্রহণ করত। ইংলন্ডের রাজা, রানী ও শাসনকর্তারা পর্যন্ত বেতনভুক নিয়মিত নৌ-সৈন্যদের সঙ্গে বোম্বেটেদের পালন করতে লজ্জিত হতেন না—যেমন হতেন না বাংলা দেশের বার ভুঁইয়ারাও। রাজার সাহায্য পেয়ে বোম্বেটেদেরও বুক দশহাত হয়ে উঠত, তারা রাজশত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার অজুহাতে নিরীহ প্রজাদের ধন-প্রাণ নির্ভয়ে লুণ্ঠন করত।

এই শ্রেণীর বোম্বেটেদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে হেনরি মর্গ্যান। এই ভীষণ বোম্বেটেকে ইংলন্ডের রাজসরকার টাকা, জাহাজ ও লোকজন দিয়ে সাহায্য করেন। তার ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছাকাছি দ্বীপপুঞ্জে এবং দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাঞ্চলে কারুর পক্ষে ধন-প্রাণ বজায় রেখে বাস করাই অসম্ভব হয়ে ওঠে। পানামার মতো শহরেও হেনরি মর্গ্যান হানা দিতে ভয় পায় নি, তার কবলগত হয়ে পানামার অধিকাংশ অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয়ে যায় এবং যথাসর্বস্ব হারিয়েও এখানকার কত হাজার বাসিন্দা যে মৃত্যুমুখে পড়তে বাধ্য হয়, তার কোনও হিসাব নেই। ওই ওঁচা বোম্বেটেকে জলদস্যুরা পর্যন্ত ঘৃণা করত। কারণ সে কাক হয়েও কাকের মাংস খেত,—অর্থাৎ মর্গ্যান কেবল পরিচিত নির্দোষ ব্যক্তিরই ধন-প্রাণ কেড়ে নিত না, নিজের দলের লোকদেরও টাকা দু'হাতে চুরি করত। জলপথে ও স্থলপথে অসংখ্য অত্যাচার, নরহত্যা, লুণ্ঠন ও পাপকাজ এবং বোম্বেটেদেরও তহবিল তছরুপ করে, শেষটা সে সকলকে ফাঁকি দিয়ে হঠাৎ একদিন লুকিয়ে সরে পড়ে। তখন ইংলন্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের ধর্মভাব হঠাৎ জেগে উঠল। তাঁর হুকুমে মর্গ্যানকে ধরে দেশে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু বোম্বেটে সর্দারকে স্বচক্ষে দেখে রাজার মন এত খুশি হয়ে উঠল যে, শাস্তি দেওয়া দূরে থাক, 'স্যার' উপাধি ও 'কর্ণেল' পদ দিয়ে তিনি তাঁকে আবার জামাইকা দ্বীপের ছোটলাট করে পাঠালেন।

রেমব্রাণ্ডের মতো বিশ্ববিখ্যাত ও সর্বজনমান্য চিত্রকর আঁকলেন কর্ণেল স্যার হেনরি মর্গ্যানের ছবি এবং যার মরা উচিত ছিল ফাঁসিকাঠে, ছোটলাটের উঁচু, পুরু ও নরম গদিতে বসে সে সাধু-অসাধুর শাসনভার—অর্থাৎ মুণ্ডপাতের ভার পেয়ে চৌদ্দ বৎসর সুখে সম্মানে কাটিয়ে তিয়াত্তর বৎসর বয়সে পরম নিশ্চিন্তভাবে ইহলোক ত্যাগ করলে! পাপের এমন জয়ের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের ইতিহাসে দেখা যায় না! এমনকি আজও দেখি,

অনেক নামজাদা ইংরেজ লিখিয়ে এই বোম্বেটের কলঙ্ক ক্ষালনের জন্যে প্রাণপণে ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। আশ্চর্য!

অথচ ওই সময়কার ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা কানহোজি আংগ্রেকে জলদস্যু রূপে বর্ণনা করতে লজ্জিত হন নি। ভারতে যখন ঔরংজেবের রাজত্ব, মারাঠী নৌ-বীর কানহোজি আংগ্রের নামে তখন আরবসাগরগামী সমস্ত জাহাজ ভয়ে থরহরি কম্পমান হত। স্থলপথে ছত্রপতি শিবাজির মতন জলপথে কানহোজি আংগ্রেও ছিলেন সমান অজেয়। ইংলন্ডে জন্মালে তিনি ড্রেক বা নেলসনেরই মতো পৃথিবীজোড়া অমর নাম অর্জন করবার সুযোগ পেতেন। মোগল, ইংরেজ, ওলন্দাজ ও পর্তুগিজদের কোনও জাহাজই তাঁর কবল থেকে সহজে নিস্তার পেত না। ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিরা একসঙ্গে অনেক যুদ্ধজাহাজ নিয়ে বার বার তাঁকে আক্রমণ করেছে, কিন্তু প্রতিবারই একাকী লড়েও জলযুদ্ধে জয়ী হয়েছেন মহাবীর কানহোজি আংগ্রেই! অথচ তখন ইউরোপের পূর্বোক্ত জাতিরা স্থলযুদ্ধের চেয়ে জলযুদ্ধেই বেশি বিখ্যাত ছিলেন। বার বার পরাজিত শত্রুদের কলমে 'বোম্বেটে' বলে নিন্দিত এই অসাধারণ ভারতীয় নৌ-বীরের বীরত্বকাহিনী যে আজও এখানে ঘরে ঘরে পরিচিত হয়নি, আমাদের ঐতিহাসিকদের পক্ষে এটা অল্প কলঙ্কের কথা নয়। বাংলা ভাষায় প্রায় তিন যুগ আগে পুরাতন 'ভারতী'তে একবার কানহোজি আংগ্রে সম্বন্ধে একটি ছোট প্রবন্ধ দেখেছিলুম, তারপর আর কারুর তাঁকে মনে পড়েনি!

সাধারণ হত্যা বা দস্যুতার মধ্যে লুকোচুরি ও কাপুরুষতা আছে যতটা, বোম্বেটের কাজে যে ততটা নেই, সত্যের অনুরোধে এ কথা স্বীকার করা চলে অনায়াসেই। যে যুগে বোম্বেটেদের প্রাধান্য ছিল খুব বেশি, তখন সমুদ্রযাত্রার সময়ে প্রত্যেক জাহাজের আরোহীরাই তাদের দেখা পাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যেতেন ও সাবধান হয়ে থাকতেন এবং বোম্বেটেদের ভয়ে অধিকাংশ সওদাগরী জাহাজেও কামান-বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র রাখা হত। অনন্ত সমুদ্র,—সাধারণ খুনে বা ডাকাতের মতো বোম্বেটেরা অতর্কিতে হঠাৎ এসে আক্রমণ করতে পারত না, তাদের অনেক দূর থেকেই স্পষ্ট দেখা যেত এবং আক্রান্তরাও আত্মরক্ষা করবার সুযোগ পেত যথেষ্ট। কিন্তু তবু যে তারা বাঁচতে পারত না, তার প্রধান কারণ হচ্ছে বোম্বেটেদের সাহস ও বীরত্ব।

তবে জলদস্যুদের এত নিন্দা কেন? তাদের মূলমন্ত্র হচ্ছে, জোর যার মুল্লুক তার। এ মূলমন্ত্র সমাজের শান্তিরক্ষার পক্ষে অচল। তার উপরে সেকালকার বোম্বেটেদের নিষ্ঠুরতা ও হিংসুকতা ছিল অসম্ভব—দয়ামায়ার অস্তিত্ব পর্যন্ত তারা মানত না। অধিকাংশ সময়েই তারা কোনও জাহাজ দখল ও লুট করে সমস্ত আরোহীকেই নির্বিচারে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করত। প্রাণে মারবার আগে অনেক লোককে তারা অমানুষিক যন্ত্রণা দিতেও ছাড়ত না। তারা নরপশু ছিল বলেই তাদের সমস্ত সাহস ও বীরত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভস্মে ঘৃতাহুতির মতো। যে বীরত্বে ক্ষমা নেই, দয়া নেই, মনুষ্যত্ব নেই, তা একেবারেই উল্লেখযোগ্য নয়।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের ফরাসি জলদস্যু লোলোনজের পাশবিক বীরত্বের কাহিনী আমরা পরে বিবৃত করব। ব্রেজিলিয়ানো নামে আর এক বোম্বেটের গল্পও আমরা পরে বলব, যা পড়তে পড়তে পাঠককে শিউরে উঠতে হবে। এ শ্রেণীর লোকের সাহস ও বীরত্ব না থাকলেই ভাল ছিল।

জলদস্যু হচ্ছে প্রাচীন যুগেরই জীব। গ্রিকদের সময়েও জলদস্যুদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। সে সময়ে সমুদ্রে বেরিয়ে এক জাহাজ যদি আর এক জাহাজকে দেখতে পেত, তাহলে সর্বাগ্রে প্রশ্ন করত, "তোমরা বোম্বেটে, না সওদাগর?" রোমানদের সময়েও গ্রিক বোম্বেটেরা দলে এত ভারি ছিল যে, ভূমধ্যসাগর দিয়ে সাধারণ জাহাজ প্রায় চলাফেরা করতে পারত না বললেই চলে।

ভূমধ্যসাগরে বোম্বেটে জাহাজের সংখ্যা তখন এক হাজারের কম ছিল না। রোমানরা শেষটা বাধ্য হয়ে বিপুল এক রণতরীর বাহিনী পাঠিয়ে এই দস্যুতা দমন করেছিল। কিন্তু এর পরেও অনেকবার জলদস্যুদের অত্যাচারে রোমকে যারপরনাই কষ্টভোগ করতে হয়েছিল। সেকালকার ইংলন্ড, ফ্রান্স, পর্তুগাল ও স্পেনের সমুদ্রতীরবর্তী নগরগুলি নানাদেশি বোম্বেটেদের অত্যাচারে যখন তখন ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ত।

পঞ্চদশ শতাব্দীর আরম্ভে চীনারা সিংহলদেশের উপরে কি বিষম ডাকাতি করেছিল এইবারে সেই কথাই বলি। চেং হো নামে এক চীনা খোজা একবার জাহাজে চড়ে সিংহলদেশে গিয়েছিল। সেখানে বুদ্ধদেবের পবিত্র দাঁত আছে শুনে সে আব্দার ধরে বসল, তাকে ওই দাঁত উপহার দিতে হবে। বলাবাহুল্য, সিংহলের তখনকার রাজা অলগাক্কোনারা (?) তার সে অন্যায় আব্দার গ্রাহ্য করলেন না। চেং হো সেবারের মতো মুখ চুন করে খালি হাতেই চীনদেশে ফিরে গেল।

কিন্তু ১৪০৯ খ্রিস্টাব্দে বাষট্টিখানা জাহাজ নিয়ে সে আবার সিংহলদেশে আবির্ভূত হল। সিংহলের রাজার সৈন্যদের সঙ্গে চীনাদের তুমুল লড়াই লেগে গেল। সেই ফাঁকে চেং হো একদল সৈন্য নিয়ে সিংহলি সৈন্যদের চোখে ধুলো দিয়ে হঠাৎ রাজধানীতে এসে কৌশলে নগর দখল করলে এবং রাজা ও রাজপরিবারের ছেলেমেয়ে ও রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকদের বন্দি করে সটান আবার চীনদেশে গিয়ে হাজির হল। পরে রাজ্যচ্যুত রাজাকে চীনারা আবার সিংহলদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল বটে, কিন্তু তারপর, কিছুকাল পর্যন্ত সিংহল দেশকে চীন-সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করে কর পাঠাতে হত! এই বোম্বেটেগিরির পরে, ভারতসাগরে চীনাদের প্রভাব দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছিল।

চীনদেশেরও সমুদ্রতীরবর্তী স্থানগুলি নিরাপদ ছিল না—সেসব জায়গায় জাপানি বোম্বেটেরা সকলকে নাস্তানাবুদ করে তুলেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পর ইংরেজ ও ওলন্দাজ বোম্বেটেদের দৌরাত্ম্যেও চীনাদের বড় কম নাকাল হতে হয়নি।

আগেই বলেছি, ইংরেজরাও সেকালে বোম্বেটের ব্যবসায়ে যথেষ্ট বদনাম কিনেছিল। রানী এলিজাবেথ অনেক ইংরেজ বোম্বেটেকে নিজের নৌ-সেনাদলে ভর্তি করে নিয়েছিলেন। সে সময়ে জন স্মিথ নামে এক মহা ধড়িবাজ বোম্বেটের জ্বালায় ইংরেজরা পর্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছিল এবং তাকে বন্দি করে ফাঁসিকাঠে লটকে দেবার জন্যে চারিদিকে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু কেউ তাকে ধরতে পারেনি।

এমন যে শয়তান, তারও মনে ছিল প্রচুর দেশভক্তি। হঠাৎ সে একদিন নিজেই কর্তৃপক্ষের কাছে এসে হাজির—ধরা দিলে মুক্তি নেই জেনেও। সকলেই অবাক হয়ে গেল! কিন্তু বোম্বেটে জন স্মিথ বললে, "দেশের বিপদ দেখেই আমি ধরা দিচ্ছি। সবাই প্রস্তুত হও! আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি, ইংলন্ড ধ্বংস করবার জন্যে 'স্প্যানিস আর্মাডা' আসছে।" এ খবর তখনও দেশের কেউ পায়নি,—শুনেই সারা ইংলন্ডে 'সাজো সাজো' রব উঠল, সকলে যথাসময়ে

সাবধান হবার সুযোগ লাভ করলে। বলা বাহুল্য, বোম্বেটে জন স্মিথের নিঃস্বার্থ আত্মসমর্পণ ব্যর্থ হল না। কেবল শাস্তি থেকে মুক্তি নয়—সেই সঙ্গে সে যথেষ্ট পুরস্কারও লাভ করলে।

স্পেন থেকে মরক্কোয় বিতাড়িত হবার পর ষোড়শ শতাব্দীর মূররা ভয়ঙ্কর বোম্বেটে রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাদের ভয়ে ভূমধ্যসাগরের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার মতো হয়েছিল। সারা ইউরোপের শক্তি তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারেনি। প্রথমে উর্জ ও পরে তার ভাই খয়েরুদ্দিনের নামে তখনকার খ্রিস্টান নাবিকদের বুক ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যেত। কারণ মূর বোম্বেটেরা কেবল জাহাজ লুট করত না, উপরন্তু খ্রিস্টানদেরও ধরে নিয়ে গিয়ে আফ্রিকায় গোলাম করে রাখত এবং তাদের পথের কুকুরের মতো কষ্ট দিত। একবার আন্দ্রিয়া ডোরিয়া নামে এক নৌ-বীর বহু জাহাজ ও সৈন্য নিয়ে জলযুদ্ধে মূর বোম্বেটেদের হারিয়ে দেন এবং তাদের কবল থেকে বিশ হাজার খ্রিস্টান স্ত্রী-পুরুষকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন—তাদের মধ্যে ইউরোপের অনেক বড়ঘরের ছেলে-মেয়েও ছিল। কিন্তু তবু মূর বোম্বেটেরা কাবু হয়ে পড়ল না। অবশেষে কয়েক শত বৎসরের প্রাণপণ চেষ্টার পরে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, মূর জলদস্যুদের প্রতাপ দূর হয়। ইংরেজ নৌ-সেনাপতি লর্ড এক্সমাউথ ওলন্দাজদের সঙ্গে মিলে মূর বোম্বেটেদের আস্তানা ভেঙে দেন এবং তারপর ফরাসিরা আলজিয়ার্স দেশ অধিকার করলে মূররা আর মাথা তুলতে পারলে না। ইউরোপে এমন বোম্বেটের বিভীষিকা আর কখনও হয়নি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এরা কারা—কবেকার—কোথাকার?

আমরা পৃথিবীর বোম্বেটেদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছি। কিন্তু এখন আমরা কেবল ইউরোপীয় বোম্বেটেদেরই গল্প বলব। প্রথমেই বলে রাখি, এই গল্পগুলির ঘটনাস্থল ইউরোপ নয়—আমেরিকা।

ঘটনাগুলি পড়বার আগে দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার মানচিত্রের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে পানামা। তার বামে প্রশান্ত মহাসাগর ও ডাইনে আটলান্টিক মহাসাগর। এখন পানামায় খাল কেটে এই দুই মহাসাগরকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যখনকার কথা বলছি (সপ্তদশ শতাব্দী) তখন এই খাল ছিল না।*

আটলান্টিক মহাসাগরের এক অংশকে বলে ক্যারিবিয়ান সমুদ্র। তারই ভিতরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ—হাইতি, জামাইকা, কিউবা প্রভৃতি। কিউবার বামদিকে হচ্ছে মেক্সিকো উপসাগর।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে ক্যারিবিয়ান সমুদ্র দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা প্রদেশকে স্পর্শ করেছে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে, তার চারিপাশের সমুদ্রবক্ষে ও নিকটবর্তী ভূভাগে ষোড়শ থেকে সপ্তদশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে রোমাঞ্চকর রক্তাক্ত নাটকের একটানা অভিনয় হয়েছিল, কাল্পনিক উপন্যাসও তার কাছে হার মানে। কিন্তু সকলের কাছে আর একটু ধৈর্য প্রার্থনা করি, কারণ

* পানামা খাল ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে কাটা হয়।

মূল গল্প শুরু করবার আগে স্থান-কাল-পাত্রের কথা আরও কিছু না বললে আসল ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে না।

সর্বপ্রথমে কলম্বাস এই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন। কলম্বাস নিজে স্পানিয়ার্ড ছিলেন না, কিন্তু স্পেনদেশের রানী ইসাবেলার আনুকূল্য লাভ করে এই অসমসাহসিক নাবিক নূতন দেশ আবিষ্কারের জন্য সমুদ্রযাত্রা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। অজানা সমুদ্রের উপর ক্ষুদ্র পোতে ভাসমান হয়ে, শত বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে, নিদারুণ কষ্ট সহ্য করে, তিনি ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত কোনও এক অজ্ঞাতনামা দ্বীপে** উপস্থিত হয়েছিলেন; আর স্পেনদেশের রাজা ও রানির নামে দ্বীপটি দখল করে, সেখানে স্পেনের রাজপতাকা প্রোথিত করেছিলেন। কাজেই স্পানিয়ার্ডরাই সর্বপ্রথম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে দলে দলে এসে উপনিবেশ স্থাপন করবার সুবিধা পেয়েছিল। তারা কিন্তু অধিকৃত দ্বীপগুলি সব সময়ে শাসনে বা দখলে রাখতে পারত না। ফরাসি, ইংরেজ, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ প্রভৃতি জাতির দুঃসাহসিক লোকেরা মাঝে মাঝে দল বেঁধে জাহাজে চড়ে এসে ওই সকল দ্বীপে উৎপাত করত, আর এক একটা দ্বীপ বা তার খানিকটা, স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে দখল করে বসত। এই সব কাজে বোম্বেটেদের সাহায্য নিতে তারা কিছুমাত্র সঙ্কোচবোধ করত না।

১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে একদল দুঃসাহসিক ইংরেজ ও ফরাসি জল-ডাকাতি করে টাকা রোজগার করবার জন্যে সেন্ট ক্রিস্টোফার দ্বীপে এসে আড্ডা গাড়ে। তারা স্পানিয়ার্ডদের অধিকৃত হিস্পানিওলা বা হাইতি দ্বীপে* লুটতরাজ করত, আর লুট করা শূকরের মাংস শুকিয়ে চলতি সওদাগরি জাহাজে বিক্রি করত। ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে তারা টর্টুগা দ্বীপে চলে যায়। মেক্সিকোর উপসাগরের মুখে দশটি ছোট ছোট দ্বীপ আছে। সেগুলিকে টর্টুগা দ্বীপপুঞ্জ বলে। টর্টুগা দ্বীপ ও টর্টুগা দ্বীপপুঞ্জ যে এক নয়, তা মনে রাখা দরকার।

বোম্বেটেরা টর্টুগা দ্বীপে নূতন করে আড্ডা গাড়লে, ইউরোপের নানা দেশ থেকে ভিন্ন ভিন্ন জাতির দুঃসাহসিক দুর্বৃত্তেরা এসে তাদের দলে ভিড়ে যেতে লাগল। এইরূপে বোম্বেটেরা দলে বেশ ভারি হয়ে উঠল। স্পানিয়ার্ডদের জাহাজ লুট করা বা তাদের দখলি দ্বীপে বা ভূভাগে এসে হানা দেওয়া তাদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল। স্পানিয়ার্ডরা অস্থির হয়ে উঠল।

সমুদ্রে ডাকাতি করে ফিরে তারা টর্টুগা দ্বীপে অথবা জামাইকা বা অন্য কোনও দ্বীপে এসে আশ্রয় গ্রহণ করত। তারপর দু'এক মাসের মধ্যেই মদ খেয়ে, জুয়া খেলে ও অন্যান্য বদখেয়ালিতে সব টাকা ফুঁকে দিয়ে তারা আবার নতুন শিকারের খোঁজে জাহাজে চড়ে বেরিয়ে পড়ত। এই সব দ্বীপের শাসনকর্তারা প্রায়ই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মতো হতেন না। বোম্বেটেরা তাঁদের সঙ্গে একটা পাকা বন্দোবস্ত করে ফেলত, নিজেদের পাপের টাকার খানিক অংশ ঘুষ দিয়ে তাঁদের মুখ বন্ধ করে রাখত। দু'একজন কড়া শাসনকর্তা তাদের যদি শাসনে রাখবার চেষ্টা করতেন, তাহলে হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়াত। কারণ বোম্বেটের দল এতটা প্রবল ছিল যে, সকলে

** কলম্বাস এই দ্বীপটির নাম রেখেছিলেন 'স্যান স্যালভেডর', সম্ভবতঃ আধুনিক 'ওয়াটলিং দ্বীপ'।

* পূর্বে সমগ্র দ্বীপের নাম ছিল হাইতি বা হিস্পানিওলা। পরবর্তীকালে হাইতি দ্বীপের রাজধানী সান্টো ডোমিঙ্গোর নাম অনুসারে ওই দ্বীপের পূর্বখণ্ডের নামকরণ হয় 'সান্টো ডোমিঙ্গো' আর পশ্চিমখণ্ডের নাম 'হাইতি' থাকিয়া যায়। ম্যাপ দেখুন।

একসঙ্গে বিদ্রোহ প্রকাশ করে যেন-তেন-প্রকারেণ সাধু শাসনকর্তাকে সেখান থেকে না তাড়িয়ে ছাড়ত না। সময়ে সময়ে, শাসনকর্তা যেখানে শাসন করছেন, সেই দ্বীপ পর্যন্ত তারা কেড়ে নিত। কাজেই সাধুতা ছিল সেখানে ব্যর্থ।

ও সব দ্বীপে স্পানিয়ার্ডরাই সংখ্যায় ছিল বেশি। তাদের শূকরের ব্যবসাই ছিল প্রধান। তারা পাল পাল শূকর পুষত এবং এই সব শূকরের রক্ষিত মাংস তারা জাহাজে করে নানা দেশে চালান দিত। ওসব জায়গায় ফরাসি, ইংরেজ বা ওলন্দাজেরও অভাব ছিল না। তারা এখানে সেখানে আড্ডা গেড়ে বসবাস করত, অনেকে তামাক বা আখের চাষ করত, আবার অনেকের শিকারই ছিল ব্যবসা। স্পানিয়ার্ডরা ছিল ঘোর অত্যাচারী, তারা সুযোগ পেলে এদের উপরও অত্যাচার করতে ছাড়ত না; এরাও তাদের দু'চক্ষে দেখতে পারত না, অত্যাচারের নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিত। স্পানিয়ার্ড, ফরাসি, ইংরেজ, ওলন্দাজ—সবাই ওই সকল দ্বীপের আদিম অধিবাসী লাল মানুষদের বা আফ্রিকা থেকে চালানি নিগ্রোদের ক্রীতদাস করে রাখত।

অনেক শ্বেতাঙ্গকেও ইউরোপ থেকে লোভ দেখিয়ে, চুরি করে বা জোর-জবরদস্তি করে ধরে এনে ওসব দ্বীপে বিক্রি করা হত। শ্বেতাঙ্গরাই তাদের কিনত। কিন্তু মনিবদের অত্যাচার ছিল এত অমানুষিক যে, গোলামরা পালিয়ে গিয়ে বোম্বেটের দলে মিশে নিষ্ঠুর জঘন্য জীবন যাপন করাও বাঞ্ছনীয় বোধ করত।

তা হলেই অবস্থাটা কেমন দাঁড়িয়েছিল, দেখুন। স্পানিয়ার্ডরা অধিকাংশ দ্বীপের মালিক—তারা ঘোরতর অত্যাচারী; ক্ষেত-বাড়ির শ্বেতাঙ্গ মালিকরা অত্যাচারী, শিকারীরা অত্যাচারী; বোম্বেটেরা জলে অত্যাচারী, স্থলে অত্যাচারী; শ্বেতাঙ্গ কৃতদাসেরা প্রভুদের হুকুমে বা ব্যবহারে অত্যাচারী; লাল মানুষ বা নিগ্রো ক্রীতদাসেরা মনিবদের অত্যাচারে বা তাঁদের নিষ্ঠুর আদেশ পালনে অভ্যস্ত হয়ে অত্যাচারী। সর্বত্র অত্যাচার। শুধু অত্যাচার নয়, পাপের বীভৎস লীলা। সুরাপান, ব্যভিচার, জুয়াখেলা, লুটতরাজ, মারামারি, কাটাকাটি, খুন, জখম, অগ্নিকাণ্ড—পাপ যত মূর্তিতে প্রকাশ পেতে পারে তাই। সপ্তদশ শতাব্দীর সভ্যতার চমৎকার এক পৃষ্ঠা!

বোম্বেটেদের রীতিনীতি সম্বন্ধেও দু'চার কথা বলে নিই, কারণ পরে আর বলবার সময় হবে না।

বোম্বেটেদের কোনও নতুন দল গঠিত হলে, সমুদ্রযাত্রা করবার আগে দলের সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হত, কবে তাদের জাহাজ ছাড়বে এবং কাকে কত বারুদ ও বন্দুকের গুলি আনতে হবে। তারপর যাত্রাকালের খাবার জোগাড় করবার ব্যবস্থা হত। তাদের প্রধান খোরাক ছিল শূকর ও কচ্ছপের মাংস। বোম্বেটেরা প্রায়ই জাহাজ ছাড়বার আগে ছলে-বলে-কৌশলে শূকর সংগ্রহ করত—যথামূল্যে শূকর কেনবার জন্যে কোনওদিনই তারা আগ্রহ প্রকাশ করত না।

তারপর পরামর্শসভায় স্থির হত, শিকার জুটলে কার ভাগে কত অংশ পড়বে। অবশ্য সবচেয়ে বেশি অংশ পেত কাপ্তেন, তারপর জাহাজের ডাক্তার। ছুতারমিস্ত্রীও অন্য লোকের চেয়ে বেশি অংশ লাভ করত। কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও স্থির থাকত যে শিকার না জুটলে কারুর ভাগ্যে কিছুই জুটবে না।

যুদ্ধবিগ্রহে কেউ মারা পড়লে বা কারুর অঙ্গহানি হলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকত। সবচেয়ে বেশি দাম ছিল ডান হাতের। তারপর যথাক্রমে বাম হাত, ডান পা ও বাম পায়ের দাম। সর্বশেষে, একটা চোখ বা হাতের বা একটা আঙুলের দাম ছিল সমান!

নিজেদের ভিতরে তাদের রীতিমতো একটা বোঝাপড়া ছিল। তাদের প্রত্যেককেই শপথ করতে হত যে, দল ছেড়ে সে পালাবে না বা লুটতরাজের কোনও জিনিসও দলের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবে না। কেউ অবিশ্বাসী হলে তখনই তাকে দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হত।

এমন যে অমানুষ ও হিংস্র পশুর দল, কিন্তু দলের ভিতরে তাদেরও পরস্পরের সঙ্গে স্নেহ, প্রেম ও সদ্ভাব ছিল যথেষ্ট। একের দুঃখকষ্টে অন্যে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করত তো বটেই, উপরন্তু সেই দুঃখকষ্ট দূর করবার জন্য টাকা দিয়ে দেহ দিয়ে যে কোনরকম সাহায্য করতেও নারাজ হত না।

আমরা অতঃপর গল্প শুরু করব। কিন্তু এই গল্প প্রধানত যাঁর বই থেকে নেওয়া হয়েছে তাঁরও পরিচয় দেওয়া দরকার। তাঁর নাম হচ্ছে আলেক্স অলিভিয়ার এক্সকুইমেলিন, জাতে তিনি ওলন্দাজ। তিনি ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। এক্সকুইমেলিন সাহেব আগে নিজেও একজন বোম্বেটে ছিলেন এবং এই পুস্তকে বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনাই তাঁর চোখের সামনেই ঘটেছিল। কোনও কোনও ঘটনা, ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল এমন সব বোম্বেটের মুখে তিনি নিজের কাণে শ্রবণ করেছিলেন। তিনি যা দেখেছেন ও যা শুনেছেন সমস্তই হুবহু লিখে ১৬৮৪-৮৫ খ্রিস্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। সে পুস্তকের এত আদর হয়েছিল যে, ইউরোপের অধিকাংশ ভাষাতেই তার অনুবাদ দেখা যায় এবং এতকাল পরেও তাঁর পুস্তকের নূতন সংস্করণ হচ্ছে। বোম্বেটের নিজের মুখেই বোম্বেটের কাহিনী শুনতে কার না আগ্রহ হয়? আর এক্সকুইমেলিন সাহেবের পক্ষে বিশেষ প্রশংসার কথা হচ্ছে এই যে, কোনও অন্যায়কেই কোথাও তিনি গোপন করেননি বা ফেনানো ভাষার আড়ালে অস্পষ্ট করে তোলবার চেষ্টা করেননি। তাঁর ভাষা সহজ ও সরল। এইজন্যেই তাঁর কথিত কাহিনীগুলির ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য নয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

‘পিটার দি গ্রেট’—বোম্বেটের আদিপুরুষ

টর্টুগা দ্বীপে সর্বপ্রথমে যে জলদস্যু বিশেষ নামজাদা হয়, জাতে সে ফরাসি। তার নাম ছিল ইংরেজিতে ‘পিটার দি গ্রেট’। সে একলা নিজের বুদ্ধিতে জনকয় লোকের সাহায্যে যে অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল, তাইতেই তার ডাকনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

একদিন সে একখানা বড় নৌকোয় চড়ে হাইতি দ্বীপের কাছে সমুদ্রে শিকারের সন্ধানে ফিরছিল এবং তার সঙ্গে ছিল আটাশজন বোম্বেটে।

কয়েকদিন ধরে শিকারের অভাব, নৌকোয় খাবার ফুরিয়ে এল বলে। সকলকার মন বড় খারাপ,—পেট চলবে কেমন করে?

এমন সময়ে সমুদ্রের বুকে দেখা গেল, স্পেনের এক 'ফ্লোটা'। ফ্লোটা হচ্ছে অনেকগুলো বড় বড় জাহাজের সমষ্টি এবং তাদের কাজ হচ্ছে ইউরোপের জিনিস আমেরিকার বন্দরে আনা ও আমেরিকার মাল ইউরোপে নিয়ে যাওয়া।

দেখা গেল, মস্ত একখানা জাহাজ 'ফ্লোটা'র দলছাড়া হয়ে অনেক দূরে এগিয়ে পড়েছে।

পিটার তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। সে বললে, "ভাই সব! যা থাকে কপালে! ওই দলছাড়া জাহাজখানাকে আমরা আজ দখল করবই করব!"

পিটার অসম্ভব কথা বললে। একখানা নৌকো, ঊনত্রিশজন মাত্র তার আরোহী! এরই জোরে শত শত লোকের সঙ্গে লড়াই করে অতবড় জাহাজ দখল করা আর লতা দিয়ে হাতি বাঁধবার চেষ্টা করা একই কথা।

কিন্তু পিটারের দলের লোকেরাও আসন্ন অনাহারের সম্ভাবনায় তারই মতন মরিয়া। তারাও পিটারের কথায় সায় দিয়ে বললে, "তাই সই, সর্দার!"

নৌকো বেয়ে জাহাজের কাছে এসে বোম্বেটেরা বুঝলে, দিনের আলোয় এমন অসাধ্যসাধন করা একেবারেই অসম্ভব। জাহাজের লোকরা একবার দেখতে পেলে মরণের মুখ থেকে তাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না। অতএব তারা বুদ্ধিমানের মতো সন্ধ্যার অন্ধকারের অপেক্ষা করতে লাগল।

সন্ধ্যা এল।

পিটার বললে, "আমাদের নৌকোর তলায় ছ্যাঁদা করে দিই এস! সেই ছ্যাঁদা দিয়ে জল ঢুকে আমাদের নৌকোখানাকে ডুবিয়ে দিক। এই অকূল সমুদ্রে নৌকো ডুবে গেলে আমাদের আর বাঁচবার কি পালাবার কোনও উপায়ই থাকবে না। তাহলে আমরা আরও বেশি মরিয়া হয়ে লড়তে পারব আর আরও তাড়াতাড়ি জাহাজে ওঠবার জন্যে চেষ্টা করব। অত বড় জাহাজ আমাদের পক্ষে এখন ভয়ের কারণ বটে। কিন্তু তখন ওই জাহাজকেই মনে করব আমাদের একমাত্র আশ্রয়!"

তখনই এই অদ্ভুত প্রস্তাব অনুসারে কাজ করা হল, ছ্যাঁদা করা নৌকো ধীরে ধীরে অতলে তলিয়ে যেতে আরম্ভ করল।

কিন্তু তার আগেই সাঁঝের আবছায়ায় গা ঢেকে বোম্বেটেরা চুপিচুপি একে একে জাহাজের উপর উঠতে লাগল—ছায়ামূর্তির সারির মতো। তাদের প্রত্যেকেরই কাছে একটি করে পিস্তল ও একখানা করে তরবারি ছাড়া আর কোনও অস্ত্র নেই!

জাহাজের এক কামরায় বসে কাপ্তেন ও আরও কয়েকজন লোক নিশ্চিন্ত আরামে তাস খেলছিলেন।

আচম্বিতে একটা লোক কামরায় ঢুকে কাপ্তেনের বুকের উপরে পিস্তল ধরে বললে, "একটু নড়েচ কি গুলি করেচি!"

কাপ্তেন একেবারে থ। এ যে বিনামেঘে বজ্রাঘাত!

কাপ্তেনের অন্যান্য সঙ্গীরা সচকিতকণ্ঠে বলে উঠল, "যীশু আমাদের রক্ষা করুন! কে এরা! কোত্থেকে এল? এরা কি সাক্ষাৎ শয়তান!"

ততক্ষণে পিস্তল বাগিয়ে ও তরবারি উঁচিয়ে আরও কয়েকজন বোম্বেটে কামরায় এসে হাজির হয়েছে এবং দলের বাকি কয়েকজন লোক সর্বাগ্রে গিয়ে জাহাজের অস্ত্রশালা দখল করে

বসেছে! কেউই এই অতর্কিত আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল না, যারা বাধা দেবার চেষ্টা করলে তাদের প্রত্যেককেই মরতে হল!

তখন জাহাজের বাকি সকলেই ভয়ে ভয়ে বোম্বেটেদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে!

পরে শোনা গেল, সন্ধ্যার আগে কেউ কেউ নৌকোখানাকে দেখতে পেয়ে নাকি বলেছিল, "ওখানা বোম্বেটে-নৌকো!"

জবাবে কাপ্তেন বুক ফুলিয়ে বলেছিলেন, "বয়ে গেল! আমার এত বড় জাহাজ, এত লোকবল, আমি কি ওই ক্ষুদে পিঁপড়ের মতো নৌকোখানাকে দেখে ভয় পাব? আমার জাহাজের সমান জাহাজ এলেও আমি থোড়াই কেয়ার করি।"

জাহাজের জনকয় মাহিনা করা নাবিককে দলে রেখে, পিটার বাকি সবাইকে ডাঙায় নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দিলে। তারপর সেই মূল্যবান মালে বোঝাই সুবৃহৎ জাহাজ নিয়ে ফ্রান্সের দিকে যাত্রা করলে। পিটার আর কখনও আমেরিকায় ফিরে আসেনি।

টর্টুগার যে সব লোক স্পানিয়ার্ডদের অত্যাচারে অবিচারে কাবু হয়ে হাহাকার করছিল, তারা যখন পিটারের এই অদ্ভুত বিজয়কাহিনী ও অপূর্ব সম্পদ লাভের কথা শুনলে, তখন একবাক্যে বিপুল উৎসাহে বলে উঠল, "আমরাও তবে বোম্বেটে হব,—স্পানিয়ার্ডদের ওপরে প্রতিশোধ নেব!"

কিন্তু জল-ডাকাত হতে গেলে আগে দরকার অন্তত একখানা করে ছোট জাহাজ বা একখানা করে বড় নৌকো। তার মূল্য কে দেয়? ভেবেচিন্তে তারা উপায় আবিষ্কার করলে।

বন্দরে বন্দরে স্পানিয়ার্ডরা ছোট ছোট নৌকো করে চামড়া ও তামাক প্রভৃতি সংগ্রহ করত। তারপর তারা সেই সব মাল নিয়ে হাভানা শহরে গিয়ে হাজির হত। কারণ ইউরোপ থেকে স্পানিয়ার্ডরা সেইখানেই ব্যবসা করতে আসত।

নতুন বোম্বেটেরা দল পাকিয়ে সেই সব মালবোঝাই জাহাজ স্পানিয়ার্ডদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে আরম্ভ করলে। তারপর সেই লুটের মাল বেচে তারা বড় বোম্বেটে হবার মূলধন সংগ্রহ করে ফেললে। ব্যাপারটা শুনতে খুব সোজা বটে, কিন্তু এর জন্যে বড় কম মারামারি, রক্তপাত ও নরহত্যা হল না।

তার মাস খানেক পরেই স্পেনদেশিয় ব্যবসায়ীদের বড় বড় দু'খানা জাহাজ বোম্বেটেদের হাতে ধরা পড়ল—সে জাহাজ দু'খানার ভিতরে ছিল প্রচুর সোনা ও রুপো।

টর্টুগার যে সব লোক তখনও নতমাথায় অত্যাচার সহ্য করছিল, তারাও আর লোভ সামলাতে পারলে না, তারাও বোম্বেটেদের দলে যোগ দিলে! বছর দুইয়ের মধ্যেই লুটের ঐশ্বর্যে টর্টুগারও যেমন শ্রীবৃদ্ধি হল, ব্যাঙের ছাতার মতো বোম্বেটের দলও তেমনই বাড়তে লাগল! তখন এই দ্বীপটি একরকম বোম্বেটেদেরই স্বর্গ হয়ে দাঁড়াল—স্পানিয়ার্ডরা সেখান থেকে একেবারেই পিঠটান দিতে বাধ্য হল!

দেখতে দেখতে টর্টুগা দ্বীপে বোম্বেটে জাহাজের সংখ্যা হয়ে দাঁড়াল কুড়িখানারও বেশি।

বুকে বসে এই দাড়ি ওপড়ানো স্পানিয়ার্ডরা আর সইতে পারলে না, দেশে—অর্থাৎ স্পেনে খবর পাঠিয়ে আত্মরক্ষা ও বোম্বেটে দমন করবার জন্যে প্রকাণ্ড দু'খানা যুদ্ধজাহাজ আনাবার বন্দোবস্ত করলে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পর্তুগিজ ও ব্রেজিলিয়ানো

এ অঞ্চলে এক বোম্বেটে ছিল, তার নাম বার্থোলোমিউ পর্তুগিজ। নাম শুনেই বোঝা যায় তার জন্ম পর্তুগালে। সবাই তাকে পর্তুগিজ বলে ডাকত। এর কাহিনী 'পিটার দি গ্রেটে'র চেয়েও বিচিত্র।

জামাইকা দ্বীপের কাছে সে একখানা বজরা নিয়ে শিকার অন্বেষণ করছিল। তার সঙ্গে ছিল চারটে ছোট কামান ও ত্রিশজন লোক।

সমুদ্রের মাঝখানে একখানা প্রকাণ্ড জাহাজ দেখতে পেয়ে পর্তুগিজ তার কাছে বজরা নিয়ে গেল।

সে বড় যে-সে জাহাজ নয়। তার ওপরে আছে কুড়িটা মস্ত মস্ত কামান ও সত্তর জন যোদ্ধা। আর আছে অনেক যাত্রী ও নাবিক।

কিন্তু পর্তুগিজ জানত না ভয় কাকে বলে। চারটে পুঁচকে কামান, ত্রিশজন মাত্র লোক ও বজরা নিয়েই সে সেই জাহাজখানাকে আক্রমণ করলে। প্রথম আক্রমণ সফল হল না। পর্তুগিজকে পিছনে হটে আসতে হল।

তারপর খানিক বিশ্রাম করে সে আবার সতেজে আক্রমণ করলে। আবার বড় বড় কামানের গোলা হজম করতে না পেরে সে পিছিয়ে এল। তার খানিক পরে আবার আক্রমণ! এমনই বারবার আক্রমণ ও সুকৌশলে অথচ সতেজে যুদ্ধ করে অনেকক্ষণ পরে পর্তুগিজ সত্যসত্যই সেই প্রকাণ্ড জাহাজখানাকে দখল করে ফেললে!

কিন্তু তার এত বীরত্বও ব্যর্থ হল। কারণ সেই বিজিত জাহাজখানাকে নিয়ে খানিক দূর এগুতে না এগুতেই, আচম্বিতে দৈবগতিকে স্পানিয়ার্ডদের আরও তিনখানা প্রকাণ্ড জাহাজের আবির্ভাব হল। পর্তুগিজ এদের সঙ্গে আর পাল্লা দিতে পারলে না—জয়ের আনন্দ ভাল করে ভোগ করতে না করতেই সদলবলে তাকে বন্দি হতে হল!

একটু পরেই উঠল বেজায় ঝড়। যে বিরাট জাহাজে বোম্বেটেরা বন্দি হয়ে ছিল, সেখানা অন্য জাহাজগুলোর সঙ্গ হারিয়ে অনেক কষ্টে একটা বন্দরে গিয়ে আশ্রয় নিলে।

বন্দরের কয়েকজন বড় ব্যবসায়ী জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে দেখা করতে এসে বন্দি পর্তুগিজকে দেখেই ত্রস্তস্বরে বলে উঠল, "এ বদমাইশ বোম্বেটেকে আমরা চিনি! এ যে পর্তুগিজ! এ যে আমাদের অনেক সর্বনাশ করেছে, অনেক লোক খুন করেছে!"

যে শহরের বন্দরে জাহাজ থেমেছিল, সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট বোম্বেটেদের ডাঙায় পাঠাতে হুকুম দিলেন। কেবল পর্তুগিজকে পাঠাতে নিষেধ করলেন—পাছে সেই ফাঁকে কোনগতিকে সে পালিয়ে যায়, কারণ কিছুদিন আগে এই শহরেরই জেল ভেঙে সে লম্বা দিয়েছিল। তার জন্যে জাহাজের ওপরেই ফাঁসিকাঠ খাড়া করা হল। পরদিন সকালেই তাকে লটকে দেওয়া হবে।

এই চমৎকার সুখবরটি পর্তুগিজকে ঘটা করে শোনানো হল। শুনে সে যে খুশি হয়ে হাসেনি, সেটা আর না বললেও চলে।

জাহাজে তাকে যেখানে রাখা হয়েছিল, সেখানে বড় বড় দু'টো মাটির খালি জালা ছিল—এই জালায় স্পানিয়ার্ডরা মদ রাখত। পর্তুগিজ একটুও সাঁতার জানত না, কাজেই জলে লাফিয়ে পড়ে সে যে সাঁতরে পালাবে, তারও উপায় নেই। অথচ কাল পৃথিবীর সূর্যোদয়ের সঙ্গেই তার জীবনের সূর্যাস্ত! ফাঁসিকাঠে দোল খাবার শখ তার মোটেই ছিল না। কোনওরকমে সে মাটির জালা দু'টোর মুখ এঁটে বন্ধ করলে। তারপর চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে রইল নেহাৎ ভালমানুষটির মতো। তার আচরণের কারণ কেউ বুঝতে পারলে না।

রাত হল। সেপাই বন্দুক ঘাড়ে করে বসে বসে ঢুলছে।

হঠাৎ পর্তুগিজ বাঘের মতো তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেউ কিছু টের পাবার আগেই সেপাই ইহলোক থেকে বিদায় নিলে।

পর্তুগিজ জালাদুটো জলে নামিয়ে দিয়ে নিজেও জাহাজ ত্যাগ করলে। মুখবন্ধ করা জালা জলে ভাসতে লাগল। পর্তুগিজ তাদের উপরে ভর দিয়ে ভাসতে ভাসতে ডাঙায় গিয়ে উঠল। তারপর গভীর অরণ্যে ঢুকে একটা গাছের কোটরে লুকিয়ে বসে রইল—কারণ সকাল হতে দেরি ছিল না।

সকাল। কর্তৃপক্ষ জাহাজে এলেন—একটা জাঁহাবাজ বোম্বেটেকে নিশ্চিন্তপুরে পাঠাবার জন্য। কিন্তু দেখা গেল, ফাঁসিকাঠে যে দুলবে সে অদৃশ্য!

চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব উঠল। দলে দলে লোক বন তোলপাড় করে খুঁজে দেখলে, কিন্তু পর্তুগিজের দেখা না পেয়ে হতাশভাবে ফিরে এল।

পর্তুগিজ তখন জঙ্গল ভেঙে চলতে শুরু করেছে। সমুদ্রের ধারে পাথর উলটে 'সেল' মাছ কুড়িয়ে এনে কোনরকমে পেটের জ্বালা নিবারণ করে। কাছে ছিল শুকনো লাউয়ের খোল, আর তাতে একটুখানি জল,—তাতেই তেষ্টা মেটায়। এইভাবে একশ কুড়ি মাইল পথ পার হল!

পথের মাঝে মাঝে নদী পড়েছে—অথচ সে সাঁতার জানে না। কেমন করে সে বাধা দূর করলে, তাও বড় কম আশ্চর্য কথা নয়!

সমুদ্রের ধারে জাহাজ ভাঙা একখানা তক্তা পাওয়া গেল, তার গায়ে বেঁধানো ছিল গোটাকয়েক মস্তবড় পেরেক বা হুক। সে বসে বসে পাথরের উপরে ঘষে ঘষে পেরেকের গায়ে অনেকটা ছুরির মতো ধার করলে। তারপর সেই অদ্ভুত ছুরির সাহায্যে গাছের ডালপালা কেটে ছোটখাট ভেলার মতো একটা কিছু বানিয়ে গভীর নদী পার হল। আপনারা অবাক হচ্ছেন? ভাবছেন, এ রূপকথা? না, এ সম্পূর্ণ সত্য কথা!

একশ কুড়ি মাইল পথ পেরিয়ে পর্তুগিজ একদল চেনা বোম্বেটের দেখা পেলে। ইতিমধ্যে চোদ্দদিন কেটে গেছে।

বন্ধুদের কাছে নিজের বিপদের গল্প বললে। শুনে তারা যে তাকে খুব বাহাদুরি দিয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পর্তুগিজ বললে, "ভাই, আমাকে একখানা নৌকো আর কুড়িজন লোক দাও। আমি প্রতিশোধ নেব।"

তারা আপত্তি করলে না।

আট দিন পরে সেই আশ্চর্য সাহসী পর্তুগিজ কুড়িজন সঙ্গীর সঙ্গে যে জাহাজে বন্দি হয়েছিল, যার ওপরে এখনও তার জন্যে আনা ফাঁসিকাঠ দাঁড়িয়ে আছে, আবার তার কাছেই বুক ফুলিয়ে ফিরে এল এবং অতর্কিতে আক্রমণ করে সেই প্রকাণ্ড জাহাজখানাকে আবার বন্দি করে ফেললে! উপন্যাসেও এমন বিচিত্র কাহিনী পড়া যায় না!

কিন্তু নিয়তি আবার তাকে নিষ্ঠুর পরিহাস করলে! প্রাণের ভয় থেকে এখন সে মুক্ত এবং মাল বোঝাই জাহাজ পেয়ে এখন সে ধনবান! কিন্তু তার আনন্দ বেশি দিন স্থায়ী হল না। ভবিষ্যতের অনেক সুখ-সৌভাগ্যের কল্পনা করতে করতে দিনকয় মস্ত জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে সে ঘুরে বেড়ালে—কিন্তু তারপরেই দুর্ভাগ্য আবার ঝড়ের মূর্তিতে এসে পর্তুগিজের এই নতুন পাওয়া ঐশ্বর্যকে পাতালের অতল তলে তলিয়ে দিলে! সঙ্গীদের নিয়ে একখানা ডিঙিতে চড়ে সে প্রাণে বাঁচল বটে, কিন্তু আবার সে গরিব—নিছক গরিব!

সে জামাইকা দ্বীপে এসে উঠল। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী তার ওপরে আর কোনদিন প্রসন্ন হননি। তার এত বুদ্ধি, সাহস ও বীরত্বও আর কোনও কাজে লাগল না। অবশ্য এ সব দুষ্প্রাপ্য গুণ আজীবনই তার কাজে লাগত, যদি সে অসৎ পথ অবলম্বন না করত। পর্তুগিজ যদি সত্যিকার মানুষ হত, তাহলে মরণের পরেও সে আজ মরত না, হয়তো পৃথিবীতে দেশে দেশে চিরস্মরণীয় হয়েই থাকতে পারত।

আর একজন বোম্বেটেও ওই সময়ে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। অনেককাল ব্রেজিলে বাস করেছিল বলে তার নাম হয়েছিল ব্রেজিলিয়ানো।

জলদস্যুর দলে ঢুকে প্রথমে সে সাধারণ বোম্বেটেরই মতন নিম্নশ্রেণীতে কাজ করত। কিন্তু নিজের প্রকৃতি ও বুদ্ধির গুণে সে শীঘ্রই সকলের স্নেহের ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠল।

যে দলে সে ছিল তার কাপ্তেনের সঙ্গে একবার সেই দলের অনেকের মনোমালিন্য হয়। তারা তখন দল ছেড়ে চলে এল এবং সকলের সম্মতি অনুসারে ব্রেজিলিয়ানোই দলপতি বা কাপ্তেনের পদ লাভ করলে।

নতুন কাপ্তেন দিনকয়েক পরেই নিজের বুদ্ধি ও শক্তির পরিচয় দিলে। আমেরিকায় তখন অনেক সোনা, রুপো ও অন্যান্য দামী ধাতু পাওয়া যেত। স্পানিয়ার্ডরা সেই সব ধাতুর 'বার' বা তাল জাহাজে চাপিয়ে স্পেনে চালান দিত। এমনই সোনা-রুপোর তাল নিয়ে একখানা মস্ত জাহাজ স্পেনে বা অন্য কোথাও যাচ্ছিল, ব্রেজিলিয়ানো হঠাৎ তাকে ধরে ফেললে। স্পানিয়ার্ডরা যথাসাধ্য বাধা দিয়েও কিছু করে উঠতে পারলে না। ব্রেজিলিয়ানো বামাল সমেত সেই জাহাজখানাকে গ্রেপ্তার করে জামাইকা দ্বীপে এসে উঠল। তার নামে চারিদিকে 'ধন্য ধন্য' পড়ে গেল!

কিন্তু ব্রেজিলিয়ানো ছিল যেমন মাতাল, তেমনই গোঁয়ার ও নির্দয়। যখন সে ছুটি নিয়ে ডাঙায় এসে ফুর্তি করত, তখন কেউ তার সামনে দাঁড়াতে ভরসা করত না। মদ খেয়ে রাজপথে হুল্লোড় করে বেড়াবার সময়ে যাকে সমুখে পেত তাকেই মেরে-ধরে হাড় গুঁড়িয়ে দিত। তার গায়েও ছিল অসুরের মতো ক্ষমতা, তাই কেউ বাধা দিতে বা প্রতিবাদ করতেও সাহস করত না।

সময়ে সময়ে এক পিপে মদ নিয়ে রাস্তার ওপরে বসে থাকত। সামনে দিয়ে কোনও পথিক গেলেই ডেকে বলত—"এসো ভায়া, আমার সঙ্গ মদ খেয়ে ফুর্তি করে যাও!" পথিক

যদি বলত, "না, আমি মদ খাব না!"—তাহলেই আর রক্ষে নেই, ব্রেজিলিয়ানো অমনই পিস্তল বার করে বলত, "মদ খাবে, না খাবি খাবে?"

কখনও কখনও তার আর এক খেয়াল হত। রাস্তা দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ কেউ গেলেই সে তাদের জামাকাপড়ে সর্বাঙ্গে হুড়হুড় করে মদ ঢেলে দিত!

স্পানিয়ার্ডদের ওপরে ছিল তার বিষম আক্রোশ। একবার সে শূকর চুরি করতে যায়। কিন্তু চুরি করতে না পেরে কয়েকজন স্পানিয়ার্ডকে ধরে শুধোলে, "তোমরা কোথায় শূওর লুকিয়ে রেখেছ বলো।"

তারা বললে, "শূওরের সন্ধান আমরা জানি না।"

ব্রেজিলিয়ানো দু'চোখ পাকিয়ে বললে, "কী জান না? রোসো, দেখো তবে মজাটা! ওরে, এদের ধরে রোস্ট বানিয়ে ফ্যাল তো! শূওর যখন পেলুম না তখন মানুষেরই রোস্ট হোক!"

সাহেবরা মাংসের মধ্যে কাঠের শলাকা বিঁধিয়ে আগুনের আঁচে রেখে রোস্ট তৈরি করে। ব্রেজিলিয়ানোর চ্যালারা তখনই সেই হতভাগ্য স্পানিয়ার্ডদের জীবন্ত দেহের ভিতরে পড় পড় করে কাঠের শলা চালিয়ে দিলে এবং জীবন্ত অবস্থাতেই তাদের দেহগুলোকে আগুনের ওপর ঝুলিয়ে রাখলে। ধীরে ধীরে তাদের জ্যান্ত দেহগুলো আগুনের আঁচে সিদ্ধ হতে লাগল।

অভাগাদের পরিত্রাহি চিৎকারে আকাশ পর্যন্ত কেঁপে উঠল, কিন্তু ব্রেজিলিয়ানোর মন তাতে একটুও গলল না—সে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই আর্তনাদ শুনতে লাগল, যেন খুব মিষ্টি গানই শুনছে!

একদিন ঝড়ে তার জাহাজ ডুবে গেল—ঝড়ে জাহাজ ডুবে যাওয়া ছিল তখনকার কালে খুব সহজ ব্যাপার। ব্রেজিলিয়ানো সঙ্গীদের নিয়ে একখানা নৌকোয় চড়ে কোনওরকমে ডাঙায় এসে উঠল। কিন্তু সেখানেও আবার নূতন বিপদ! দেখা গেল, একশ জন বন্দুকধারী ঘোড়সওয়ার স্পানিয়ার্ড তাদের দিকে আবার এক নতুন ঝড়ের মতন বেগে তেড়ে আসছে! বোম্বেটেদের সংখ্যা ত্রিশজনের বেশি নয়! তিনগুণেরও বেশি লোকের সঙ্গে কেউ কখনও যুঝতে পারে? এবারে ব্রেজিলিয়ানোর লীলাখেলা বুঝি সাঙ্গ হয়!

অন্য কেউ হলে তখনই বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করত। কিন্তু ব্রেজিলিয়ানো দমবার পাত্র নয়। সে দলের লোকদের ডেকে নির্ভয়ে বললে, "ভাই সব! স্পানিয়ার্ড কুকুররা তেড়ে আসছে—আসুক! ওরা বাগে পেলে আমাদের ভীষণ যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করবে! আমরা হচ্ছি বীর সৈনিক,—এসো আমরা লড়াই করতে করতে বীরের মতন মরি!"

লড়াই শুরু হল—বোম্বেটেরা সবাই মরতে প্রস্তুত! এখন মরবার আগে যে যত শত্রু নিপাত করতে পারে, তারই তত বাহাদুরি! বোম্বেটেরা এমন আশ্চর্যভাবে লক্ষ্যস্থির করে বন্দুক ছুড়তে লাগল যে, প্রায় প্রত্যেক গুলিতেই এক একজন ঘোড়সওয়ারের পতন হয়! স্পানিয়ার্ডরা আর কাছে আসতে সাহস পেলে না, দূর থেকেই যুদ্ধ করতে লাগল।

এক ঘণ্টা লড়াই চলল। শেষটা বোম্বেটেদের গরমাগরম গুলি আর হজম করতে না পেরে স্পানিয়ার্ডরা ভয়ে পিট্টান দিলে। তাদের প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জন লোক হত বা আহত হয়ে মাটির ওপরে ছড়িয়ে পড়ে রইল। যারা তখনও বেঁচে ছিল, বোম্বেটেরা বন্দুকের কুঁদো

দিয়ে মাথার খুলি ফাটিয়ে তাদেরও ভবযন্ত্রণা শেষ করে দিলে। বোম্বেটেদের দলে হত হয়েছিল দু'জন ও আহত হয়েছিল দু'জন মাত্র লোক!

বোম্বেটেরা তখন স্পানিয়ার্ডদের সওয়ারহীন ঘোড়াগুলোর পিঠে চেপে জয় জয় নাদে নতুন শিকারের খোঁজে যাত্রা করলে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মারি তো গণ্ডার

এইবারে আমরা যে ভয়ঙ্কর ও অতুলনীয় বোম্বেটের কথা আরম্ভ করব, তার নাম হচ্ছে ফ্রান্সিস্ লোলোনেজ। জাতে ফরাসি। রোমাঞ্চকর তার কাহিনী।

ফ্রান্স থেকে নির্বাসিত হয়ে সে ওয়েস্ট ইন্ডিজে আসে। মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে পর ছাড়া পায়। কিন্তু তারপর সে আর স্বদেশে ফিরে না গিয়ে হাইতি দ্বীপে এসে আশ্রয় নেয়। প্রথমে হয় শিকারি, তারপর বোম্বেটে। তার ভবিষ্যৎ জীবন কি ভয়াবহ হবে এবং সে যে কত প্রলয়-কাণ্ডের অনুষ্ঠান করবে, কর্তৃপক্ষ যদি তা কল্পনাও করতে পারতেন, তাহলে কখনই তাকে মুক্তি ও স্বাধীনতা দিতেন না। বোম্বেটেরূপে সে হয়ে উঠেছিল মূর্তিমান নরপিশাচ! অথচ তার সাহস, বুদ্ধি, বীরত্ব, উৎসাহ ও উদ্যম ছিল অসাধারণ। মানুষ এইসব দুর্লভ গুণের জন্যে আজন্ম সাধনা করে। কিন্তু অপাত্রে এইসব গুণ যে কতটা সাংঘাতিক হতে পারে, লোলোনেজ হচ্ছে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

টর্টুগা দ্বীপ তখন ফরাসিদের অধিকারে এসেছে। সেখানকার লাটও ফরাসি। তখন স্পানিয়ার্ডদের সঙ্গে ফরাসিদের সম্পর্ক ছিল সাপ আর নেউলের সম্পর্ক।

আগেই বলেছি, এখানকার লাটেরা প্রায়ই সাধু মানুষ হতেন না, তাঁরা নিজেরাই বোম্বেটে পুষতেন। টর্টুগার ফরাসি লাট লোলোনেজকে বুদ্ধিমান ও সাহসী দেখে তার উপরে দয়া করলেন। অর্থাৎ তাকে একখানা জাহাজ ও লোকজন দিয়ে কাপ্তেন করে দিলেন। তারপর কাপ্তেন লোলোনেজ সমুদ্রের নীলজলে নিজের অদৃষ্ট পরীক্ষা করতে বেরুল। কিন্তু সে-ও যদি তখন নিজের ভবিষ্যৎ কল্পনা করতে পারত, তাহলে সভয়ে এ পথ ছেড়ে ফিরে আসত। অদৃষ্টকে আগে থাকতে দেখা গেলে পৃথিবীর অনেক দুঃখই ঘুচে যেত—মানুষ এমন অন্ধের মতো বিপথে ঘুরে মরত না।

প্রথম কিছুকাল বেশ সুখেই কাটল। লোলোনেজ উপর উপরি স্পানিয়ার্ডদের কয়েকখানা ধনরত্নে ও বাণিজ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ জাহাজ দখল করে ডাকসাইটে নাম কিনে ফেললে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্পানিয়ার্ডদের ওপরে তার ভীষণ নিষ্ঠুরতার কাহিনীও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল—তারা বুঝলে, আবার এক মারাত্মক আপদের আবির্ভাব হয়েছে। তখন তারাও মরিয়া হয়ে উঠল! লোলোনেজ তাদের আক্রমণ করলে তারা আর সহজে আত্মসমর্পণ করতে চাইত না—কারণ তারা বুঝে নিয়েছিল যে লোলোনেজের কাছে তাদের ক্ষমা নেই, সে তাদের কয়েদ করতে পারলে বিষম যন্ত্রণা দিয়ে প্রাণবধ না করে ছাড়বে না। তার চেয়ে লড়াই করে বা জলে ডুবে মরা ঢের ভাল!

তারপরই লোলোনেজ অদৃষ্টের কাছ থেকে প্রথম ধমক খেলে। আচম্বিতে একদিন নাবিকদের সবচেয়ে বড় শত্রু ঝড় এসে তার জাহাজ ডুবিয়ে দিলে। সে আর তার সঙ্গীরা সমুদ্রের কবল থেকে কোনগতিকে বাঁচল বটে, কিন্তু ব্রেজিলিয়ানোর মতো সেও তীরে উঠে স্তম্ভিত নেত্রে দেখলে, দলে দলে স্পানিয়ার্ড অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তেড়ে আসছে দলবদ্ধ যমের মতো!

যুদ্ধ হল। কিন্তু শত্রুরা দলে এত ভারি ছিল যে, লোলোনেজের সঙ্গীরা অধিকাংশই প্রাণ হারালে—যারা বাঁচল, বন্দি হল।

লোলোনেজও আহত হল, কিন্তু চালাকির জোরে শত্রুদের চোখে ধুলো দিলে। নিজের ক্ষতের রক্তের সঙ্গে তাড়াতাড়ি সমুদ্র তীরের বালি মিশিয়ে সে তার মুখে ও দেহের নানা জায়গায় মাখিয়ে ফেললে এবং বোম্বেটেদের মৃতদেহের সঙ্গে মিশিয়ে মড়ার মতো মাটিতে পড়ে রইল। শত্রুরা তাকে মৃত মনে করে চলে গেল।

লোলোনেজ তখন উঠে বনের ভিতর গিয়ে ঢুকল। আগে নিজের দেহের ক্ষতস্থানগুলো যেমন তেমন করে ব্যান্ডেজ করে ফেললে। তারপর এক শহরে গিয়ে স্পানিয়ার্ডের ছদ্মবেশ গ্রহণ করলে।

স্পানিয়ার্ডরা অনেক ক্রীতদাস রাখত। কয়েকজন ক্রীতদাসের সঙ্গে তার আলাপ হল এবং দিনকয়েকের ভিতরেই সে আলাপ জমিয়ে তুলল রীতিমতো।

সে তাদের বললে, "তোমরা যদি আমার কথা শোনো, তাহলে আমি তোমাদের স্বাধীন করে দেব। তোমাদের মনিবের একখানা নৌকো চুরি করে আমার সঙ্গে চলো,—আমি তোমাদের রক্ষা করব।"

অবশেষে তারা রাজি হয়ে গেল। এবং একখানা নৌকো চুরি করে লোলোনেজের সঙ্গে জলপথে বেরিয়ে পড়ল।

ওদিকে স্পানিয়ার্ডরা লোলোনেজের সঙ্গীদের খুব সাবধানে বন্দি করে রাখলে। এবং যখন শুনলে যে লোলোনেজ আর বেঁচে নেই, তখন তাদের আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা রইল না। এত বড় শত্রু নিপাত হয়েছে শুনে চারিদিকে আলোকমালা সাজিয়ে তারা উৎসবে মত্ত হয়ে উঠল।

লোলোনেজ ফিরে এসে সব দেখলে—সব শুনলে। তারপর সেখান থেকে সরে পড়ে একেবারে টর্টুগা দ্বীপে এসে হাজির!

ওয়েস্ট ইন্ডিজে যত শয়তান আছে, এই দ্বীপ হচ্ছে তাদের নিরাপদ স্বদেশ। তার উপরে লোলোনেজ হচ্ছে তখন একজন নামজাদা ব্যক্তি—তার কীর্তিকাহিনী লোকের মুখে মুখে। সুতরাং এখানে এসে একখানা ছোটখাট জাহাজ ও লোকজন জোগাড় করতে তার বেশিদিন লাগল না। একুশজন লোক ও দরকার মতো হাতিয়ার জোগাড় করে এবারে সে কিউবা দ্বীপের দিকে বেরিয়ে পড়ল। এই দ্বীপের দক্ষিণে এক শহর তখন তামাক, চিনি ও চামড়ার ব্যবসার জন্যে বিখ্যাত। লোলোনেজ আন্দাজ করলে যে, সেখানে নিশ্চয়ই কোনও বড়গোছের শিকার পাওয়া যাবে।

নিজেদের সৌভাগ্যক্রমে কয়েকজন জেলে মাছ ধরতে ধরতে তাকে দেখেই চিনে ফেললে এবং তখনই চটপট দ্বীপের লাটসাহেবের কাছে গিয়ে ধর্না দিয়ে পড়ে বললে, "হুজুর, রক্ষা করুন! লোলোনেজ আমাদের সর্বনাশ করতে এসেছে!"

লাটসাহেবের কাছে তখন খবর গিয়ে পৌঁচেছে যে, লোলোনেজ আর বেঁচে নেই। তাই তিনি জেলেদের কথায় নির্ভর করতে পারলেন না। তবু সাবধানের মার নেই ভেবে তিনি জেলেদের সঙ্গে একখানা বড় জাহাজ, নব্বইজন সৈনিক ও দশটা কামান পাঠিয়ে দিলেন। জাহাজের সেনাপতির ওপরে হুকুম রইল—"বোম্বেটে বিনাশ না করে তিনি যেন ফিরে না আসেন। প্রত্যেক বোম্বেটেকে ফাঁসিকাঠে লটকে আসতে হবে—কেবল দলের সর্দার লোলোনেজ ছাড়া। তাকে জ্যান্ত বন্দি করে হাভানা শহরে ধরে আনতে হবে।" জাহাজের সঙ্গে একজন জল্লাদও চলল।

জাহাজখানা ঘটনাস্থলে এল। বোম্বেটেদের গুপ্তচর সর্দারকে এসে খবর দিলে—"লাটসাহেবের জাহাজ তাদের ধরবার জন্যে বন্দরে গিয়ে হাজির হয়েছে।"

কিন্তু লোলোনাজ এত সহজে ভড়কে যাবার ছেলে নয়। সে বললে, "আমি পালাব না। ওই জাহাজখানাকেই আমরা বন্দি করব। আমাদের একখানা ভাল জাহাজ দরকার!"

বোম্বেটেরা জনকয় জেলেকে ধরে ফেললে। লোলোনেজ তাদের বললে, "আজ রাত্রে বন্দরে ঢোকবার পথ আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে। নইলে তোদের খুন করব।"

জেলেরা বাধ্য হয়ে সেই রাত্রে তাদের নিয়ে বন্দরে গিয়ে ঢুকল।

লাটের জাহাজের প্রহরী জিজ্ঞাসা করলে, "কে তোমরা?"

প্রাণের দায়ে জেলেরা বললে, "আমরা জেলে।"

—"বোম্বেটেরা এখন কোথায়?"

—"আমরা কোনও বোম্বেটে দেখিনি।"

জাহাজের লোকরা ভাবলে, তাদের দেখে কাপুরুষ বোম্বেটেরা নিশ্চয়ই ভয়ে লম্বা দিয়েছে।

ভোর যখন হয় হয় তাদের ভুল ভাঙল তখন। বোম্বেটের দল দুই পাশ থেকে জাহাজ আক্রমণ করেছে!

স্পানিয়ার্ডরা বীরের মতো লড়াই করলে, কিন্তু তবু হেরে গেল। এরা দুর্জয় শত্রু, আত্ম-সমর্পণ করা ছাড়া উপায় নেই।

জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে বিজয়ী লোলোনেজ বললে, "স্পানিয়ার্ডগুলোকে একে একে আমার সামনে নিয়ে এসো।"

বন্দীদের একে একে সর্দারের সামনে আনা হতে লাগল।

লোলোনেজ বললে, "একে একে এদের মাথা কেটে ফেলো।"

একে একে তাদের মাথা উড়ে গেল।

সবশেষে নিয়ে আসা হল সেই জল্লাদকে। জাতে সে কাফ্রি।

জল্লাদ সর্দারের হাতে পায়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "আমাকে মারবেন না হুজুর! আপনি যা জানতে চান সব কথা খুলে বলব—কিছু লুকোব না।"

লোলোনেজ তাকে গোটাকয়েক গুপ্তকথা জিজ্ঞাসা করলে। প্রাণরক্ষার আশায় সে সব কথার সঠিক জবাব দিলে।

লোলানেজ বললে, "আর কিছু জানিস না?"

—"না হুজুর!"

লোলোনেজ বললে, "এ কালামানিককে নিয়ে আর আমার দরকার নেই। এর মাথাটা কেটে ফেলো।"

জল্লাদেরও মাথা উড়ে গেল।

কেবল একজন লোককে বোম্বেটেরা বধ করলে না।

তাকে ডেকে লোলোনেজ বললে, "যা, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যা! তোদের লাটসাহেবকে আমার এই কথাগুলো জানিয়ে দিস : আজ থেকে কোনও স্পানিয়ার্ডকে আমি আর একফোঁটাও দয়া করব না। লাটসাহেব আমাদের ওপরে যে অসীম দয়া প্রকাশের চেষ্টা করেছিলেন তাও আমি কখনও ভুলব না। আমি খুব শীঘ্রই তাঁর ওপরেও ঠিক সেইরকম দয়া দেখাবার জন্যে ফিরে আসব।"

লাটসাহেব সব শুনে রাগে তিনটে হয়ে বললেন, "আচ্ছা, আমিও প্রতিজ্ঞা করছি, এবার থেকে কোনও বোম্বেটেকে হাতে পেলে আমিও ছেড়ে কথা কইব না—তার একমাত্র দণ্ড হবে প্রাণদণ্ড!"

হাভানার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বললেন, "কখনও অমন প্রতিজ্ঞা করা উচিত নয়! তাহলে বোম্বেটে ধরা পড়ুক আর না পড়ুক —আমাদেরই মারা পড়বার সম্ভাবনা বেশি!"

লাটসাহেব তখন মনের রাগ মনেই পুষে নিজের প্রতিজ্ঞাকে বাতিল করতে বাধ্য হলেন।

লোলোনেজ কিছুদিন ধরে সমুদ্রের এ বন্দর থেকে ও বন্দরে জাহাজ নিয়ে ঘুরে বেড়ালে এবং একখানা খুব মূল্যবান জাহাজকেও বন্দি করলে—তার ভিতরে অনেক সোনা-রুপোর তাল ছিল। তারপর রীতিমতো ধনীর মতো সে আবার বোম্বেটে দ্বীপে—অর্থাৎ টর্টুগায় ফিরে এল। সেখানকার বাসিন্দারা মহাসমারোহে তাকে সংবর্ধনা করলে!

লোলোনেজের মাথার ভিতরে তখন এমন এক বিরাট ফন্দির উদয় হয়েছে, এতদিন বোম্বেটে জগতে যা কল্পনাতীত ছিল। বোম্বেটে বলতে বোঝায়, জলপথে যারা ছোটখাট নৌকা বজরা বা বড়জোর জাহাজ লুট করে। সেই লুটের মাল নিয়েই তারা খুশি হয়ে গা-ঢাকা দেয়।

কিন্তু লোলোনেজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এইটুকুতেই তৃপ্ত হয়ে থাকতে পারলে না। সে দেখাতে চায়, ইচ্ছা করলে বোম্বেটেরাও কত অসামান্য কাজ করতে পারে!

তার ফন্দি হচ্ছে এই, লুটের মাল বেচে এবারে সে অনেকগুলো জাহাজ কিনে প্রকাণ্ড এক নৌবাহিনী গঠন করবে । তার অধীনে বোম্বেটে সৈন্যের সংখ্যা হবে অন্তত পাঁচশত! তারপর সে ওয়েস্ট ইন্ডিজের নানা স্পেনিয় রাজ্যে হানা দিয়ে গ্রাম ও ছোটবড় নগর লুণ্ঠন করবে!

তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত উচ্চ! স্পেনরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা! স্পেন সাম্রাজ্য সে সময়ে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল—ইউরোপের কোনও শক্তিই তার কাছে পাত্তা পেত না!

বোম্বেটে দ্বীপও লোলোনেজের এ অসম্ভব প্রস্তাব শুনে আনন্দে ও উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল! মারি তো গণ্ডার—লুটি তো ভাণ্ডার!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কালাপাহাড়ি কাণ্ড

বোম্বেটে দ্বীপের সমস্ত বোম্বেটের কাছে খবর গেল—স্পেনরাজ্য লুণ্ঠনে মহাবীর লোলোনেজ তোমাদের আহ্বান করছেন!

মড়ার খোঁজ পেলে দলে দলে শকুনি যেমন আকাশ ছেয়ে উড়ে আসে, অ্যাডমিরাল লোলোনেজের কালো পতাকার তলায় চারিদিক থেকে তেমনই করে ডাকাত. বোম্বেটে ও হত্যাকারীর দল ছুটে আসতে লাগল।

এখন, বোম্বেটে দ্বীপে আর একজন মস্ত মাতব্বর ব্যক্তি বাস করে, তার নাম মাইকেল ডি বাস্কো, আপাতত মেজরের পদে অধিষ্ঠিত। ইউরোপের সমুদ্রেও আগে সে বড় একজন বোম্বেটে বলে নাম কিনেছিল। আজকাল অনেক টাকা রোজগার করে বকধার্মিক সেজে পায়ের উপরে পা দিয়ে পরম আরামে বসে বসে খাচ্ছে।

কিন্তু লোলোনেজের বিপুল আয়োজনে প্রচুর লাভের সম্ভাবনা দেখে সে আবার ভালমানুষের মুখোশ খুলে রাখলে। লোলোনেজের কাছে গিয়ে বাস্কো বললে, "অ্যাডমিরাল, ওয়েস্ট ইন্ডিজের সমস্ত পথঘাট আমার নখদর্পণে। তুমি যদি আমাকে প্রধান কাপ্তেনের পদ দাও, আমি তাহলে তোমাকে সাহায্য করতে পারি।"

লোলোনেজ এতবড় একজন জাঁদরেল ও শক্তিশালী লোককে পেয়ে তখনই রাজি হয়ে গেল। বাস্কোকে সে কেবল প্রধান কাপ্তেন নয়, স্থলপথেও নিজের ফৌজের সেনাপতির পদে নিযুক্ত করলে।

এবারে আটখানা জাহাজ ও প্রায় সাতশজন লোক নিয়ে লোলোনেজ স্পানিয়ার্ডদের সর্বনাশ করতে বেরুল। সবচেয়ে বড় জাহাজখানা নিলে নিজে, তার ওপরে ছিল দশটা কামান।

হাইতি দ্বীপের উত্তরদিক দিয়ে যেতে যেতে প্রথমেই তাদের নজরে পড়ল একখানা প্রকাণ্ড জাহাজ। লোলোনেজের নিজের জাহাজেরও চেয়ে সে জাহাজখানা বড়।

সে ইচ্ছা করলেই আটখানা জাহাজ নিয়ে আক্রমণ করে খুব সহজেই জয়লাভ করতে পারত। কিন্তু এখানে সে যথেষ্ট বীরত্ব ও আত্মশক্তির ওপরে নির্ভরতার দৃষ্টান্ত দেখালে। সে কেবল নিজের জাহাজখানাকে রেখে বাকি সাতখানা জাহাজকে সাভোনা দ্বীপের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করতে বললে, তারপর শত্রু-তরীর দিকে অগ্রসর হল।

স্পানিয়ার্ডরা বোম্বেটে জাহাজকে আসতে দেখেও ভয় পেলে না। কারণ তাদের জাহাজে ষোলটা কামান ও পঞ্চাশজন সৈনিক ছিল। এই দুঃসাহসই হল তাদের কাল।

যুদ্ধ হল তিন ঘণ্টা ধরে। তারপর স্পানিয়ার্ডদের সমস্ত শক্তি উবে গেল। জাহাজ, ধনরত্ন ও মালপত্তর বোম্বেটেদের হস্তগত হল। বন্দীদের কি দশা হল, প্রকাশ পায়নি। খুব সম্ভব তাদের কারুর কাঁধের উপরে কেউ আর মাথা বলে কোনও জিনিস দেখতে পায়নি।

অধিকৃত জাহাজখানা নিয়ে লোলোনেজ সানন্দে সাভোনা দ্বীপের দিকে নিজের নৌবাহিনীর খোঁজ করতে গেল। আনন্দের উপরে আনন্দ! সেখানে গিয়ে শোনে, তারাও একখানা ধনরত্নে পরিপূর্ণ জাহাজ হস্তগত করছে! লোলোনেজ বললে, "আমাদের যাত্রা শুভ দেখছি! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি!"

সে আবার বোম্বেটে দ্বীপে ফিরে এল। আগে তাড়াতাড়ি ধনরত্ন, মালপত্তর বিলি করবার ও দ্বীপের লাটকে ঘুষ দেবার ব্যবস্থা করলে। আরও নতুন লোকজন নিলে। তারপর যে শত্রু-জাহাজ দখল করেছিল সেখানাকে নিজে নিয়ে আবার সদলবলে যাত্রা শুরু করলে। এবারে তার দৃষ্টি বিখ্যাত মারাকেবো নগরের দিকে।

মারাকেবো হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা প্রদেশের একটি বন্দর নগর। এখান থেকে এখন কফি, চিনি, রবার, কাঠ, চামড়া, নানা ধাতু ও কুইনিন প্রভৃতি চালান দেওয়া হয়। তখনও এ শহরটি প্রসিদ্ধ ব্যবসায়প্রধান স্থান ছিল। এর উত্তরে আছে পঁচাত্তর মাইল বিস্তৃত ভেনেজুয়েলা উপসাগর ও দক্ষিণে আছে বৃহৎ মারাকেবো হ্রদ। এর বর্তমান লোকসংখ্যা চুয়াত্তর হাজার, কিন্তু যখনকার কথা বলছি, তখন এই শহরের লোকসংখ্যা এত বেশি ছিল না।

লোলোনেজ এই শহরের কাছে এসে নঙ্গর ফেললে। তারপর সদলবলে ডাঙায় গিয়ে নামল। শহরে যাবার পথেই পড়ে এক কেল্লা। তাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় জেনে সে যুদ্ধ করবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল।

কিন্তু দ্বীপের লোকরাও অপ্রস্তুত ছিল না, লোলোনেজের শনির দৃষ্টি যে তাদের উপরে পড়েছে এ খবর তারা আগেই পেয়েছিল।

বোম্বেটের দল কেল্লার দিকে আসছে শুনে সেখানকার লাট একদল সৈন্যকে জঙ্গলের ভিতরে লুকিয়ে থাকবার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। তাদের উপরে হুকুম রইল, কেল্লার সৈন্যেরা যখন বোম্বেটেদের সমুখ থেকে আক্রমণ করবে, তখন তারা তাদের আক্রমণ করবে পিছনদিক থেকে। দু'দিক থেকে আক্রান্ত হলে পর বোম্বেটেদের জনপ্রাণীও আর প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না।

বন্দোবস্ত খুব ভাল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, লোলোনেজও ঘুমিয়ে ছিল না, সব খবরই সে জানতে পেরেছিল যথাসময়ে। সেও নিজের একদল লোককে জঙ্গলের ভিতরে পাঠিয়ে দিলে এবং তারা এমন বিক্রমে ও সবেগে শত্রুদের আক্রমণ করলে যে, একজন স্পানিয়ার্ডও আর কেল্লার ভিতরে ফিরে যেতে পারলে না!

তারপর তারা কেল্লার দিকে অগ্রসর হল। কেল্লার সৈন্যেরা পাঁচিলের ওপর বড় বড় ষোলটা কামান বসিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ছিল।

বোম্বেটেরা বার বার কেল্লার দিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু ষোলটা তোপের প্রতাপে বার বার ফিরে আসে। তাদের সঙ্গে তোপও ছিল না, বন্দুকও ছিল না—তাদের সম্বল খালি পিস্তল ও তরবারি!

কিন্তু অনেকবার ফিরে আসার পর তারা এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে দুর্গ আক্রমণ করলে যে, কামানের গোলা ও বন্দুকের অগ্নিবৃষ্টিও আর তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারলে না, প্রাণের সব মায়া ছেড়ে পাঁচিল টপকে তারা কেল্লার ভিতরে লাফিয়ে পড়ল। তিনঘণ্টা যুদ্ধের পর দুর্গ এল তাদের দখলে।

ইতিমধ্যে ভগ্নদূত গিয়ে শহরে খবর রটিয়ে দিয়েছে যে, হাজার হাজার বোম্বেটে কেল্লা ফতে করে শহর লুটতে ছুটে আসছে! ভয়ে সে কিছু বাড়িয়েই বললে!

এই মারাকেবো শহর এর আগেও আরও তিন-চারবার শত্রুদের হাতে পড়েছে। সে যে কী বিপদ, কী যন্ত্রণা, কী বিভীষিকা, বাসিন্দারা আজও তা ভুলতে পারেনি। তখনই চারিদিকে রব উঠল—ওই এল রে, ওই এল! পালা! পালা! পালা! টাকাকড়ি ও মালপত্তর নিয়ে সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে শহর ছেড়ে লম্বা দিলে—কেউ গেল বনের ভিতরে, কেউ গেল জিব্রালটারের দিকে! বলা বাহুল্য, এই জিব্রালটার হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার নতুন শহর। কিন্তু এই নতুন শহরের নামও আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

ওদিকে দুর্গপ্রাকারের উপর থেকে লোলোনেজ সঙ্কেত করে নিজের নৌ-বাহিনীকে জানিয়ে দিলে—পথ পরিষ্কার, তারা ভিতরে ঢুকে অনায়াসেই শহরের দিকে যাত্রা করতে পারে!

জলপথে মারাকেবো শহর সেখান থেকে আঠার মাইল। বোম্বেটেরা আগে দুর্গটাকে সমূলে ধ্বংস করলে এবং সেই কাজেই গেল পুরো একটি দিন। তারপর তারা নৌবাহিনী নিয়ে একেবারে শহরের কাছে গিয়ে নঙ্গর ফেললে।

একদল বোম্বেটে সমুদ্র থেকে শহরের উপরে গোলাবর্ষণ করতে লাগল, আর একদল নৌকো বেয়ে তীরে উঠে শহরের ভিতরে সার বেঁধে প্রবেশ করলে। কেউ বাধা দিলে না।

বাধা দেবে কে? সব লোক সে মুল্লুক ছেড়ে পিটটান দিয়েছে! বোম্বেটেরা শহরে ঢুকে দেখলে, চারিদিকে খাঁ খাঁ করছে! তখন তারা সেখানকার বড় বড় ও ভাল ভাল বাড়িগুলো দখল করে বসল—তেমন সব বাড়িতে তারা জীবনে কোনওদিন বাস করেনি। বাড়িগুলোর ভিতরে ময়দা, রুটি, শূকর ও মদ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পেলে, কিন্তু ধনরত্ন সব যেন অদৃশ্য হয়েছে ফুসমন্ত্রে! যা পেলে তাই নিয়েই তারা আপাতত আমোদ-আহ্লাদ করতে বসল বটে, তবে তাদের বড় আশায় ছাই পড়ল!

কিন্তু লোলোনেজ হাল ছাড়লে না। সে জনকয়েক বোম্বেটেকে পাঠিয়ে দিলে বনের ভিতরটা আঁতিপাতি করে খুঁজে দেখতে।

সেই রাত্রেই বোম্বেটেরা বনের ভিতর থেকে বিশজন স্ত্রী-পুরুষ, গাধার পিঠে চাপানো নানারকম মাল ও প্রায় নগদ লক্ষ টাকা নিয়ে ফিরে এল। কিন্তু একটা এত বড় শহরের পক্ষে লক্ষ টাকা তো তুচ্ছ জিনিস!

লোলোনেজ স্পানিয়ার্ডদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, "টাকাকড়ি কোথায় লুকিয়ে ফেলেছিস?"

তারা কোনও সন্ধান দিলে না।

তখন তাদের ভীষণ যন্ত্রণা দেওয়া হতে লাগল। তার ফলে কেবল জানা গেল যে টাকাকড়ি সব বনের ভিতরে লুকানো আছে। কিন্তু কোথায় আছে, সে ঠিকানা পাওয়া গেল না।

লোলোনেজ রাগে অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠল। সে হঠাৎ খাপ থেকে তলোয়ার খুলে একজন স্পানিয়ার্ডকে তখনই কেটে কুচি কুচি করে ফেললে। তারপর চোখ পাকিয়ে বললে, "কী! বলবিনি! তাহলে একে একে সকলকেই আমি মোরগের মতো জবাই করব!"

এই নরপশুর ভয়ঙ্কর স্বভাব দেখে বন্দীরা স্তম্ভিত হয়ে গেল! একজন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে. "বনে যারা লুকিয়ে আছে, চলুন তাদের দেখিয়ে দিচ্ছি!"

কিন্তু ডাকাতরা তাদের খুঁজতে আসছে, বনবাসী নাগরিকরা সে খবর পেয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে আবার নতুন এক জায়গায় গিয়ে গা ঢাকা দিলে। বোম্বেটেরা কারুর টিকি পর্যন্ত দেখতে পেলে না।

নিরুপায় হয়ে বোম্বেটেরা দিন পনের সেই শহরেই বাস করলে।

তারপর লোলোনেজ বললে, "বন্ধুগণ, এই শহরের ধড়িবাজ লোকগুলো আমাদের কলা দেখাতে চায়! এখানে অনেক খাবারদাবার আছে বটে, কিন্তু খাবার খেতে আমরা এখানে আসিনি। এখানকার ধনরত্ন ওরা সব জিব্রালটারে নিয়ে গেছে,—চলো, আমরা জিব্রালটার আক্রমণ করিগে!"

তার অভিপ্রায় হাওয়ার আগেই জিব্রালটারে গিয়ে পৌঁছল! সবাই আবার সে শহর ছেড়ে অন্য জায়গায় পালাবার জোগাড় করলে।

কিন্তু সেখানকার শাসনকর্তা বললেন, "তোমাদের কোনও ভয় নেই! আসুক না বোম্বেটেরা—এখানে এলে বাছারা মজাটা টের পাবেন! আমি তাদের সমূলে বিনাশ করব!"

শাসনকর্তা ছিলেন একজন পাকা যোদ্ধা, তিনি ইউরোপে অনেক লড়াই করেছেন। তিনি তখনই অসংখ্য কামান ও আটশজন সৈন্য নিয়ে বোম্বেটেদের অভ্যর্থনার আয়োজন করতে লাগলেন। সমুদ্রের দিকে কুড়িটি কামান বসানো হল। আর একদিকে বসানো হল আটটা বড় বড় কামান। শহরে যাবার একটি রাস্তা খুব শক্ত বেড়া দিয়ে বন্ধ করা হল। আর একটা রাস্তা খুলে রাখা হল—তাতে এমন পুরু পাঁক ও কাদা ছিল যে, সেখান দিয়ে পথ-চলাচল করা প্রায় অসম্ভব। সে পথে যারা আসবে সৈন্যদের অগ্নিবৃষ্টিতে তাদের অবস্থা হবে শোচনীয়।

বোম্বেটেরা যথাসময়ে নগর থেকে খানিক তফাতে এসে দেখলে, শহরের উপরে স্পেনরাজের পতাকা উড়ছে সগর্বে এবং স্পানিয়ার্ডরা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে তাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। এরা যে যুদ্ধের জন্যে এমন বিপুল আয়োজন করবে, লোলোনেজ তা কল্পনাও করতে পারেনি। কিন্তু এজন্যে সে ভীত হল না, দলের মাথাওয়ালা লোকদের ডেকে পরামর্শ করতে বসল। পরামর্শ হচ্ছে এই যে, স্পানিয়ার্ডরা যখন উচিতমতো আত্মরক্ষা করবার জন্যে এত বেশি সময় পেয়েছে এবং তাদের সৈন্যসংখ্যাও যখন এমন অসামান্য, তখন তাদের আর আক্রমণ করা উচিত কিনা!

লোলোনেজ বললে, "কিন্তু তবু আমি হতাশ হবার কারণ দেখি না। তোমরা অনায়াসেই বুক বেঁধে দাঁড়াতে পারো! বীরপুরুষের মতো আত্মরক্ষা করবার শক্তি আমাদের আছে। আমি তোমাদের সর্দার, আমি যা বলি তাই করো! এর আগেও আজকের চেয়ে কম লোক নিয়ে আমরা এর চেয়েও বড় বিপদকে এড়াতে পেরেছি। শত্রুরা দলে যত ভারি হবে, আমাদের গৌরবও তত বাড়বে!"

বোম্বেটেদের ধারণা ছিল যে মারাকেবোর সমস্ত ধনরত্নই এইখানে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। অতএব তারা একবাক্যে বললে, "সর্দার, তুমি যা বলবে আমরা তাই করব! তুমি যেখানে যাবে আমরা সেইখানেই যাব!"

লোলোনেজ বজ্রগম্ভীর স্বরে বললে, "সাবাস! কিন্তু শুনে রাখো, তোমাদের মধ্যে যে কেউ একটু ভয় পাবে, আমি তাকেই নিজের হাতে গুলি করে মেরে ফেলব!"

প্রায় চারশ বোম্বেটে যুদ্ধের আগে পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় নিলে—সে দিন যে কার জীবনের শেষদিন, তা কে জানে?

লোলোনেজ সকলকার আগে গিয়ে দাঁড়িয়ে নেতার স্থান অধিকার করলে। তারপর শূন্যে তরবারি তুলে দৃপ্তকণ্ঠে বললে, "ভাই সব! এসো আমার সঙ্গে—মাভৈঃ!" সকলে তার অনুসরণ করলে।

প্রথম পথে গিয়ে তারা দেখলে, তা এমন ভাবে বন্ধ যে এগুবার কোনও উপায় নেই।

দ্বিতীয় পথ হচ্ছে পাঁক ও কাদাভরা পথ—সেটা স্পানিয়ার্ডদের ফাঁদ!

তারা বনজঙ্গল থেকে ডালপালা-পাতা কেটে এনে পথের ওপরে পুরু করে ছড়িয়ে দিতে লাগল—যাতে করে পাঁকে-কাদায় পা বসে যাবে না। ইতিমধ্যে স্পানিয়ার্ডদের কামান ও

বন্দুক এমন ভীষণ গর্জন করতে লাগল যে, বোম্বেটেরা পরস্পরের গলার আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে পেলে না! কিন্তু সেই ভয়াবহ গুলিগোলা বৃষ্টির ভিতর দিয়েও তারা নির্ভয়ে ও অটল পদে সমান অগ্রসর হতে লাগল।

অবশেষে তারা শুকনো মাঠের উপরে এসে পড়ল। এখানে আরও ছয়টা বড় বড় নতুন কামান অগ্নি উদ্গার করতে আরম্ভ করলে! ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চারিদিক অমাবস্যার চেয়ে অন্ধকার! তার উপরে শত্রুরা আবার দুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে এসে সবেগে তাদের আক্রমণ করলে! সে এমন প্রবল আক্রমণ যে, বোম্বেটেরা পিছু না হটে পারলে না! তাদের দলের অনেক লোক হত ও আহত হয়ে রক্তাক্ত মাটির উপরে লুটোতে লাগল।

বোম্বেটেরা বনের ভিতরে অন্য কোনও নতুন রাস্তা আবিষ্কারের চেষ্টা করলে—কিন্তু রাস্তা কোথাও নেই! শত্রুরা আর কেল্লা ছেড়ে বেরুবার নামও করলে না—কিন্তু আড়াল থেকে সমান গোলাগুলি চালাতে লাগল।

লোলোনেজ তখন ভেবে চিন্তে পৃথিবীতে সব দেশেই সুপরিচিত একটি পুরনো উপায় অবলম্বন করলে—সকলকেই দিলে হঠাৎ একসঙ্গে পালিয়ে যেতে হুকুম!

তাদের ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে দেখে স্পানিয়ার্ডরা মহা উৎসাহে বলে উঠল—"ওরা পালাচ্ছে! ওরা পালাচ্ছে! এসো, পিছনে পিছনে গিয়ে ওদের আমরা বধ করি!"—তারা সার ভেঙে বিশৃঙ্খল হয়ে বোম্বেটেদের পিছনে পিছনে তেড়ে এল।

স্পানিয়ার্ডরা যখন অতিরিক্ত উৎসাহের ঝোঁকে কামানের গোলার সীমানা ছাড়িয়ে এগিয়ে এসেছে,—বোম্বেটেরা তখন সর্দারের হুকুমে আচম্বিতে আবার ফিরে দাঁড়াল এবং প্রচণ্ড বিক্রমে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল! বিষম হাতাহাতি লড়াই শুরু হল।

খানিক পরে দেখা গেল, দু'শ স্পানিয়ার্ডের দেহ পৃথিবীকে বুকের রক্তে রাঙা করে ছেয়ে আছে এবং বাকি সবাই কেল্লার দিকে আসতে না পেরে বনের দিকে প্রাণের ভয়ে পলায়ন করছে!

কেল্লার স্পানিয়ার্ডরা তাই দেখে হতাশ ভাবে কামান ছোড়া বন্ধ করে বলে উঠল—"আমরা আত্মসমর্পণ করছি। আমাদের বধ কোরো না।"

কেল্লার উপর থেকে তখনই স্পেনের রাজপতাকা নামিয়ে ফেলা হল—সেখানে উড়তে থাকল বোম্বেটেদের পতাকা! কেল্লা ফতে! শহর তাদের হাতের মুঠোয়!

কিন্তু সাবধানের মার নেই—বলা তো যায় না, বনের পলাতক শত্রুরা আবার যদি সাহস সঞ্চয় করে ফিরে আসে! বোম্বেটেরা কেল্লার কামানগুলো আবার নিজেদের সুবিধামতো সাজিয়ে রাখলে।

মিথ্যা ভয়! রাত্রি প্রভাত, যারা পালিয়েছে তারা আর ফিরল না।

তখন হিসাব নিকাশ করে দেখা গেল, শত্রুদের মৃতদেহের সংখ্যা পাঁচশত! শহরের ভিতরে আহত লোকও অসংখ্য এবং তাদের ভিতরেও অনেকে মারা পড়ছে ও মারা পড়বে। বন্দি শত্রুর সংখ্যা একশ পঞ্চাশ ও ক্রীতদাসেরা গুণতিতে পাঁচশত।

বোম্বেটেদের লোক মরেছে মাত্র চল্লিশ জন এবং জখম হয়েছে চল্লিশ জন—যদিও ক্ষত বিষিয়ে আহতদেরও অধিকাংশই মারা পড়ল।

বোম্বেটেরা শত্রুদের মৃতদেহ নিয়ে দু'খানা নৌকো বোঝাই করলে, তারপর সমুদ্রের ভিতরে গিয়ে নৌকো দু'খানা ডুবিয়ে দিলে।

তারপর আরম্ভ হল লুট! সোনার তাল, রুপোর তাল, হীরে-মুক্তো, ভাল ভাল দামী আসবাব ও নানারকম মাল—শহরের কোথাও আর কিছু বাকি রইল না! কিন্তু লোভ এমনই জিনিস, সারা শহর লুটেও বোম্বেটেদের আশ মিটল না, তাদের সন্দেহ হল আরও অনেক ধনরত্ন লুকিয়ে ফেলা হয়েছে! সুদীর্ঘ আঠার দিন ধরে চলল অবাধে এই পরস্বাপহরণের বীভৎস পালা!

এরই মধ্যে বন্দি স্পানিয়ার্ডদের অধিকাংশই ইহলোক ত্যাগ করলে—অনাহারে! শহরে খাবার জিনিস—বিশেষ করে তাদের প্রধান আহার্য মাংসের যারপরনাই অভাব! যা ছিল তা বোম্বেটেদেরই পক্ষে অপ্রচুর। তা থেকে বন্দীদের ভাগ কেউ দিলে না। বন্দীদের খেতে দেওয়া হত খচ্চর ও গাধার মাংস। অনেকে তা মুখেই তুলতে পারত না, ক্ষিধের চোটে যারা তাও খেতে বাধ্য হত, অনভ্যাসের দরুন তারা পেটের অসুখে ভুগে ভবলীলা সাঙ্গ করলে। অনেক বন্দীকে গুপ্তধন দেখিয়ে দেবার জন্যে এমন দুঃসহ ও পাশবিক যন্ত্রণা দেওয়া হল যে, সইতে না পেরে তারাও পরলোকে প্রস্থান করলে।

অল্প যে কয়েকজন বেঁচে ছিল, লোলোনেজ তাদের ডেকে বললে, "তোমাদের ছেড়ে দিচ্ছি। তোমরা বনের ভিতর গিয়ে তোমাদের সঙ্গীদের বলগে যাও যে, আমাকে আরও অনেক টাকা না দিলে আমি এই শহরে আগুন ধরিয়ে দেব। যাও, দু'দিন সময় দিলুম।"

দু'দিন কেটে গেল। বোম্বেটেরা তখন শহরে আগুন ধরাতে আরম্ভ করলে।

স্পানিয়ার্ডরা দূর থেকে তাই দেখতে পেয়ে তখনই দূত পাঠিয়ে দিলে। সে এসে জানালে,—টাকা এখনই নিয়ে আসা হবে, দয়া করে আপনারা আগুন নিবিয়ে দিন!

বোম্বেটেরা রাজি হল বটে, কিন্তু ততক্ষণে শহরের এক অংশ পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেছে!

তারপর তাদের টাকা এল। তবু চার হপ্তা সেই শহরে দৈত্যলীলা করে সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে তারা আবার জাহাজে গিয়ে উঠল।

আবার তারা মারাকেবো শহরে এসে হাজির! পাপ বিদায় হয়েছে ভেবে যারা ভরসা করে শহরে ফিরে এসেছিল, তারা ফের পালাতে লাগল!

বোম্বেটেরা তাদের খবর পাঠিয়ে দিলে যে, হয় আমাদের ধনরত্ন দিয়ে খুশি কর, নয় আমরা সারা শহর আবার লুট করে আগুন ধরিয়ে দেব!

অনেক টাকা পাঠিয়ে মারাকেবোর অধিবাসীরা এই আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধারলাভ করলে।

বিজয়গর্বে ফুলে উঠে লোলোনেজ আবার বোম্বেটে দ্বীপে ফিরে এল। তাদের অপূর্ব সৌভাগ্যের কাহিনী ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল—যারা তার সঙ্গী হয়নি তারা অনুতাপে হাহাকার করতে লাগল।

লোলোনেজ দলের প্রত্যেককে তার প্রাপ্য অংশ কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিলে—প্রত্যেকেরই রোগা পকেট মোটা হয়ে ফুলে উঠল। কিন্তু তারা এমনই লক্ষ্মীছাড়া যে, জুয়া খেলে আর মদ খেয়ে দু'হাতে টাকা ওড়াতে লাগল। সে পাপের ধন আর বেশিদিন রইল না—অল্পদিন পরেই

তারা যে গরিব ছিল সেই গরিবই হয়ে পড়ল! তখন তারা আবার নতুন শিকারের খোঁজে বেরিয়ে পড়বার জন্যে আগ্রহপ্রকাশ করতে লাগল!

সবাই বলে, "সর্দার! আবার সাগরে জাহাজ ভাসাও!"

সর্দার বলে, "তথাস্তু!"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মহাবিচারকের বিচার

বোম্বেটে দ্বীপে যদি ভাল গণৎকার থাকত তাহলে নিশ্চয়ই সে বলত, "লোলোনেজ, সাবধান! এবারের যাত্রা শুভ নয়!"

কিন্তু সে কথা সে কানে তুলত কিনা, সন্দেহ! নিয়তির সূত্র তাকে বাইরে টানছে! সে অনেক পাপ করেছে, এবারে প্রতিক্রিয়ার সময় এসেছে!

ভবিষ্যৎ ভাববার সময় তার ছিল না, বর্তমানের ঔজ্জ্বল্যে সে অন্ধ! বোম্বেটে দ্বীপে তার চেয়ে বড় নাম আজ আর কারুর নেই,—সবাই তাকে ভয় করে সম্মান করে শ্রদ্ধা করে, যেন সে নরদেবতা! যেমন তার শক্তি, তেমনই ঐশ্বর্য!

কিন্তু তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাকে স্থির থাকতে দিলে না। তাই আবার সে যেদিন সমুদ্রযাত্রা করবে বললে, সেদিন সারা দেশে আনন্দ ও উৎসাহের বন্যা বইল! এবারে আর লোকজনের জন্যে তাকে একটুও মাথা ঘামাতে হল না, লোলোনেজের সঙ্গী হয়ে বিপদে পড়তেও লোকের এত আগ্রহ যে, তার দরজার সামনে উমেদার আর ধরে না। যত লোক সে চায়, তার চেয়ে ঢের বেশি লোক এসে তার কাছে ধর্না দিয়ে পড়ল।

লোলোনেজ নতুন করে ছয়খানা জাহাজ সাজালে। এবারে তার সঙ্গীর সংখ্যা হল সাতশত, এর মধ্যে তিনশজন আগের বারেও তার সঙ্গে গিয়েছিল।

লোলোনেজ বললে, "এবারে আমি নিকারাগুয়া জয় করতে যাব।"

আবার সমুদ্র! বাংলায় সমুদ্রের আর এক নাম 'রত্নাকর' এবং এই বোম্বেটেদের পক্ষে সমুদ্র রত্নাকরই বটে!

কিন্তু এবারে রত্নের এখনও দেখা নেই! তার উপরে অনুকূল বায়ুর অভাব, বোম্বেটেদের জাহাজগুলো যেন অগ্রসর হতেই নারাজ! এইভাবে কিছুদিন কাটবার পরেই খাদ্যাভাব উপস্থিত হল। তখন বাধ্য হয়েই বোম্বেটেরা প্রথম যে বন্দর দেখতে পেলে সেইখানেই জাহাজ নঙ্গর করলে।

সমুদ্র থেকে একটা নদী ডাঙার মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে, নাম তার জাগুয়া। তার তীরে তীরে অসভ্য ও দরিদ্র লাল মানুষ বা রেড ইন্ডিয়ানের বাস। বোম্বেটেরা নৌকোয় চড়ে সেই নদীর ভিতরে গেল এবং রেড ইন্ডিয়ান বেচারাদের পালিত পশু ও অন্যান্য মালপত্তর নিঃশেষে কেড়ে নিলে—নিজেদের খাদ্যভাব দূর করবার জন্যে।

কেবল তাইতেই খুশি হল না। তারা স্থির করলে, যতদিন না অনুকূল বাতাস বয় ততদিন তারা আর বাহির সমুদ্রে যাবে না, এই দেশের যত শহর আর গ্রাম লুট করে সময় কাটাবে আর পকেট পূর্ণ করবে।

তারা গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর লুট করতে করতে পুয়ের্টো কাভাল্যো* নামে এক বন্দরে এসে হাজির হল। সেখানে স্পানিয়ার্ডদের একটা আস্তানা ও একখানা বড় জাহাজ ছিল। তারা তৎক্ষণাৎ জাহাজখানা দখল করে স্পানিয়ার্ডদের আস্তানা লুটে আগুন জ্বালিয়ে দিলে।

এর মধ্যে তারা কত লোককে বন্দি করেছে, কত বন্দীকে অকথ্য যন্ত্রণা দিয়েছে ও কত বন্দীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে, তার আর সংখ্যা হয় না। লোলোনেজের প্রকৃতি অতি ভয়ঙ্কর! কারুর জিভ সে নিজের হাতে টেনে বার করে ফেলে, কারুকে বা স্বহস্তে কেটে খণ্ড খণ্ড করে! যেখান দিয়ে তার দল পথ চলে সেখানটাই যেন ধু ধু শ্মশান হয়ে যায়! যেন সে নরদেহে প্রলয়কর্তা, যথেচ্ছভাবে ধ্বংস করাই তার একমাত্র কর্তব্য! স্পানিয়ার্ডদের কাছে সে যেন সাক্ষাৎ যম!

লোলোনেজের সঙ্গে আছে এখন তিনশ বোম্বেটে,—বাকি লোকজন ও জাহাজগুলি সে তার সহকারী মোসেস ফ্যান ফিন নামে এক ওলন্দাজের তত্ত্বাবধানে সমুদ্র উপকূলে রেখে এসেছে। প্রায় ছত্রিশ মাইল পথ হেঁটে লোলোনেজ সান পেড্রো বা সেন্ট পিটার শহরের কাছাকাছি একটা বনের ধারে এসে পড়ল।

তার অত্যাচারে পাগলের মতো হয়ে স্পানিয়ার্ডরা বনের মধ্যে অপেক্ষা করছিল। বোম্বেটেদের দেখেই তারা গুলিবৃষ্টি আরম্ভ করলে। এখানে রীতিমতো একটা লড়াই হয়ে গেল এবং দুই পক্ষেই অনেক লোক হত ও আহত হল। তারপর স্পানিয়ার্ডরা পৃষ্ঠভঙ্গ দিলে। শত্রুদের যারা জখম হয়েছিল তাদের কারুর উপরেই বোম্বেটেরা দয়া করলে না—একে একে সবাইকে পরলোকের পথে পাঠিয়ে দিলে।

যারা বন্দি হল তাদের ডেকে লোলোনেজ বললে, "এই বনের ভেতর দিয়ে শহরে যাবার আর কোনও ভাল রাস্তা আছে?"

তারা বললে, "না।"

লোলোনেজ আবার গর্জন করে বললে, "ভাল চাস তো এখনও বল!"

তারা বললে, "আর রাস্তা নেই।"

লোলোনেজের মগজে শয়তান জেগে উঠল। সামনেই যে স্পানিয়ার্ড দাঁড়িয়েছিল, ঘাড় ধরে তাকে কাছে টেনে আনলে—যেন সে তারই মতো মানুষ নয়, তুচ্ছ একটা বলির পশু মাত্র! ফস করে খাপ থেকে চকচকে তলোয়ারখানা বার করে ফেললে এবং সেই হতভাগ্য স্পানিয়ার্ডের বুকের ভিতরে তরোয়ালের ডগা ঢুকিয়ে দিয়ে মস্ত একটা ছিদ্রের সৃষ্টি করলে—তার মর্মভেদী আর্তনাদে কিছুমাত্র কান না পেতেই! তারপর সেই তখনও জীবন্ত

* মূল গ্রন্থের এই নামটি সম্ভবত ভুল। মধ্য আমেরিকার সমুদ্র উপকূলে পুয়ের্টো কাভাল্যো নামে কোনও বন্দরের সন্ধান পাওয়া যায় না। দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা প্রদেশের সমুদ্র উপকূলে ওই নামের একটা সমৃদ্ধিশালী বন্দর আছে। কিন্তু লোলোনেজ এবার এ অঞ্চলে আসেনি। খুব সম্ভব, সে হণ্ডুরাস উপসাগরের মুখে পুয়ের্টো কর্টেজ বন্দরে বাহিনী রেখে ভিতরে প্রবেশ করেছিল। কর্টেজ বন্দর থেকে প্রায় ৩৬ মাইল ভিতর দিকে সান পেড্রো বা সেন্ট পিটার শহর এখনও বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের পুস্তকের মানচিত্রে অনবধানতা বশত কর্টেজ বন্দর ও সেন্ট পিটার শহর দেখানো হয়নি। Everyman Encyclopaedia-র World Atlas ভলুমের ১৯৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

দেহের ছ্যাঁদা করা বুকের মধ্যে নিজের হাত ঢুকিয়ে দিলে এবং তার নৃত্যশীল, তপ্ত ও রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডটা সজোরে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের মুখে পুরে পরম উপাদেয় খাদ্যের মতো কচমচ করে চিবোতে চিবোতে বললে, "বল কোথায় রাস্তা আছে? নইলে তোদের হৃৎপিণ্ডও আমার খাবার হবে!"—

গল্পের রাক্ষস কি আজ মানুষ মূর্তিতে সমুখে দেখা দিয়েছে? না এ ভূত-প্রেত, পিশাচ? বন্দীদের হৃৎপিণ্ডও যেন মহা আতঙ্কে বুকের ভিতরেই মূর্ছিত হয়ে পড়ল। শিউরোতে শিউরোতে তারা প্রায় রুদ্ধস্বরে বললে,—"আমরা পথ দেখিয়ে দিচ্ছি, আমরা পথ দেখিয়ে দিচ্ছি!"

রক্তমাখা ওষ্ঠাধর ফাঁক করে হা হা হা হা করে অট্টহাসি হাসতে হাসতে লোলোনেজ বললে, "পথে এসো বাবা, পথে এসো! কোথায় পথ?"

কিন্তু কোথায় পথ? গভীর অরণ্য, গাছের পর গাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের পায়ের তলায় কাঁটা ঝোপ আর জঙ্গল,—অজগর সাপ ও জাগুয়ার বাঘ ছাড়া সেখান দিয়ে আর কেউ আনাগোনা করে না। বন্দীরা ভয়ে ভেবড়েই পথের নাম মুখে এনেছিল, আসলে সেখানে কোনও পথ ছিল না!

দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে লোলোনেজ বললে, "পথ নেই? আচ্ছা স্পানিয়ার্ড কুত্তারাই এজন্যে শাস্তিভোগ করবে!" লোলোনেজের শাস্তি—না জানি সে কী ভয়ানক!

এদিকে ও অঞ্চলের স্পানিয়ার্ডরা বুঝলে, এই দুর্ধর্ষ ও পাপিষ্ঠ বোম্বেটেদের জব্দ ও কাহিল করবার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে, বনের ভিতরে অতর্কিতে বার বার আক্রমণ করা! এমনই বারংবার আক্রমণের ফলে বোম্বেটেরা সত্যসত্যই মহা জ্বালাতন হয়ে উঠল এবং তাদের সংখ্যাও ক্রমেই কমে আসতে লাগল! কিন্তু বাধা পেয়েও শেষপর্যন্ত তারা সেন্ট পিটার শহরের কাছাকাছি এসে পড়ল।

এবার বিষম যুদ্ধ আরম্ভ হল। এ যুদ্ধে স্পানিয়ার্ডরা বড় বড় কামানও ব্যবহার করতে ছাড়লে না। কিন্তু যেই তারা কামান ছোড়ে, লোলোনেজের আদেশে বোম্বেটেরা অমনি মাটির উপরে শুয়ে পড়ে, তারপর গোলাগুলো তাদের পার হয়ে শূন্য দিয়ে চলে গেলেই, তারা চোখের নিমেষে উঠে পড়ে শহরের দিকে এগিয়ে যায় এবং হুই হুই রবে বোমার পর বোমা ছুড়তে থাকে! বোমা ছুড়ে বহু শত্রু নিপাত করেও একবার স্পানিয়ার্ডদের প্রবল আক্রমণে চোখে সর্ষেফুল দেখতে দেখতে বোম্বেটেরা উর্ধশ্বাসে পালিয়ে এল। কিন্তু লোলোনেজের দৃপ্ত বাক্যে উত্তেজিত হয়ে আবার তারা ফিরে দাঁড়িয়ে তেড়ে গেল!

তখন স্পানিয়ার্ডদের সব সাহস ও শক্তি ফুরিয়ে গিয়েছে!

সাদা নিশান হাতে করে শত্রুদূত এসে জানালে, "আমরা শহরের ফটক খুলে দিচ্ছি—কিন্তু এই শর্তে যে, দু'ঘণ্টার ভিতরে আমাদের উপরে কেউ কোনও অত্যাচার করতে পারবে না।"

আর বেশি লোকক্ষয় করতে না চেয়ে লোলোনেজ এই শর্তেই রাজি হয়ে গেল। শহরের ফটক খুলল। বোম্বেটেরা সার বেঁধে ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

লোলোনেজ আজ একটু ভদ্রতার পরিচয় দিলে। ঠিক দু'টি ঘণ্টা সে লক্ষ্মীছেলের মতো হাত গুটিয়ে চুপটি করে বসে রইল। শত্রুরা দামী জিনিসপত্তর নিয়ে দলে দলে সরে পড়ছে

দেখেও নিজের শয়তানীকে সে চেপে রাখলে! হঠাৎ তার এ সাধুতা, এ দুর্বলতা কেন? এ অনুতাপ কি অন্তিমকালের হরিনামের মতো?

ঠিক দু'ঘণ্টার জন্যে সৎপ্রবৃত্তির আনন্দ উপভোগ করে কুম্ভকর্ণ আবার ভীম হুঙ্কারে জেগে উঠল—"লুট করো! বন্দি করো! হত্যা করো! দু'ঘণ্টা কাবার!" যারা তখনও পালাতে পারেনি তারা এবং শহরে তখনও যা অবশিষ্ট ছিল সমস্তই বোম্বেটেদের হস্তগত হল। কিন্তু সে এমন বেশিকিছু নয়! স্পানিয়ার্ডরা সন্ধির দু'ঘণ্টার রীতিমতো সদ্ব্যবহার করেছে!

বোম্বেটেরা দিনকয় নগরেই বাস করলে, এবং এ কয়দিন তাদের স্বভাবগত নিষ্ঠুরতার, কদর্যতার ও ভীষণতার পরিচয় দিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করলে না। এখান থেকে যাত্রা করবার দিনে তারা শহরেও আগুন লাগিয়ে দিয়ে গেল। সেই সাঙ্ঘাতিক দেওয়ালি উৎসব শেষ হলে পর দেখা গেল, আগে যেখানে শহর ছিল এখন সেখানে পড়ে রয়েছে শুধু বিরাট একটা ভস্মের পাহাড়!

সেন্ট পিটার শহর ধ্বংস করে লোলোনেজ খোশমেজাজে সমুদ্রতীরে ফিরে এল। তার দলের যে সব লোক জাহাজ ও নৌকা নিয়ে সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছিল, তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সে আবার নতুন শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

দু'একদিন পরে গুয়াটেমালা নদীর মোহানায় এসে বোম্বেটেরা খবর পেলে যে, স্পানিয়ার্ডদের একখানা জাহাজ সেখানে এসে উপস্থিত হবে। তারা সেই জাহাজের অপেক্ষায় দলে দলে সেখানে পাহারা দিতে লাগল। কোনও দল সাগরের বুকে ছোট ছোট দ্বীপে কাছিম ধরতে গেল। কোনও দল গেল সেখানকার রেড ইন্ডিয়ান ধীবরদের উপরে অত্যাচার করতে।

সেখানকার রেড ইন্ডিয়ানরা তখন একশ বছর ধরে স্পানিয়ার্ডদের অধীনে বাস করে আসছে। স্পানিয়ার্ডদের চাকর বাকর দরকার হলে তারাই এসে কাজকর্ম করে দিয়ে যায়। স্পানিয়ার্ডরা তাদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দিয়েছিল।

কিছুকাল তারা খ্রিস্টধর্মের নিয়ম পালন করে। কিন্তু স্পানিয়ার্ড প্রভুদের অধার্মিকের মতো ব্যবহার ও হিংস্র আর পশু প্রকৃতি দেখে খ্রিস্টধর্মে বোধহয় তাদের ভক্তি চটে যায়। তখন আবার তারা পিতৃ-পিতামহের ধর্মকে ফিরে ফিরতি গ্রহণ করে।

হিন্দুদের নাকি তেত্রিশ কোটি দেবতা আছে। কিন্তু তাদের দেবতাদের 'সেনসাস' কখনও নেওয়া হয়েছিল কি না জানি না। তবে রেড ইন্ডিয়ান দেবতারাও দলে খুব হালকা হবেন বলে মনে হয় না। কেননা তাদের ঘরে ঘরে নূতন নূতন দেবতার রকম-বেরকম লীলাখেলা দেখা যায়।

তাদের দেবতা নির্বাচনের একটা পদ্ধতির কথা বলি।

পরিবারের মধ্যে যে মুহূর্তে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে, তারা তখনই তাকে নিয়ে বনের ভিতরে মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হয়।

মেঝের উপরে মণ্ডলাকারে খানিকটা জায়গা খুঁড়ে তার মধ্যে পুরু করে ছাই বিছিয়ে দেয়। তারপরে সেই ছাইয়ের উপরে নবজাত শিশুকে শুইয়ে রেখে চলে আসে। মন্দিরের চারিদিকের সব দরজা খোলা থাকে। তার কাছে আর জনপ্রাণীও যায় না। যে কোনও হিংস্র জন্তু মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু কোনও মানুষ আসবার হুকুম নেই। সারারাত এই ভাবে কেটে যায়।

সকালে শিশুর পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়েরা আবার মন্দিরের ভিতরে আসে। অনেক সময়ে দেখা যায়, হিংস্র জন্তুর আক্রমণে বা অন্য কারণে শিশুর মৃত্যু হয়েছে। অনেক সময়ে দেখা যায়, জীবন্ত ও অক্ষত শিশুকে। তখন সকলে ছাইয়ের উপরে কোনও জন্তুর পদচিহ্ন আছে কিনা পরীক্ষা করে। পদচিহ্ন যদি না থাকে, তবে সেই শিশুকে আবার সেখানে একলা রাত্রিবাস করতে হয়। আর পদচিহ্ন যদি থাকে তবে পরখ করে দেখা হয়, সেগুলো কোন জন্তুর পদচিহ্ন।

যে জন্তুর পদচিহ্ন সেখানে থাকবে, সেই জন্তুই হবে শিশুর দেবতা,—তার সারাজীবনের উপাস্য!

এখন আবার বোম্বেটেরা কি করছে দেখা যাক।

প্রায় তিনমাস পরে খবর এসেছে, স্পানিয়ার্ডদের জাহাজ বন্দরে দেখা দিয়েছে। সবাই সেইদিকে ছুটল।

বড় যে সে জাহাজ নয়, প্রকাণ্ড আকার, উপরে অনেক সৈন্যসামন্ত, বিয়াল্লিশটা কামান!

কিন্তু এ সবের দিকে লোলোনেজ একটুও ভ্রূক্ষেপ করলে না, সে ভয়ের ধার ধারে না।

বোম্বেটেরা একজোট হয়ে জাহাজখানাকে আক্রমণ করলে এবং জাহাজের একশ ত্রিশজন সৈন্যও তাদের বাধা দেবার জন্যে কম চেষ্টা করলে না, তবু শেষকালে জিত হল বোম্বেটেদেরই। কিন্তু এত পরিশ্রম ও লোকক্ষয়ের পরে জাহাজ দখল করেও বোম্বেটেরা হতাশ হয়ে পড়ল। তার ভিতরে লুট করবার মতো বিশেষ কিছুই নেই।

লোলোনেজ তখন পরামর্শসভা আহ্বান করলে। সে বললে, "এইবারে আমি গুয়াটেমালার দিকে যেতে চাই। তোমাদের মত কি?"

অনেকেই বললে, "আমরা এইবার এ দেশ ছেড়ে ফিরে যেতে চাই।"

লোলোনেজ বললে, "কিন্তু আমি ফিরব না।"

তারা বললে, "কিন্তু আমরা ফিরব।"

যারা এ কথা বললে তাদের অধিকাংশই হচ্ছে নূতন লোক—লোলোনেজের পূর্ব অভিযানে তারা তার সঙ্গে ছিল না। গত অভিযানের ফল দেখে তারা ভেবেছিল বোম্বেটের জীবন হচ্ছে অত্যন্ত রঙিন, গাছ নাড়া দিলে যেমন ফল ঝরে, রাশি রাশি মোহর ঝরাও বুঝি তেমনই সহজ! কিন্তু তাদের লাখটাকার স্বপ্নঘোর আজ ছুটে গেছে।

তারা দলে রইল না। লোলোনেজের দলকে একেবারে হালকা করে দিয়ে বেশিরভাগ বোম্বেটেই কয়েকখানা জাহাজ নিয়ে সরে পড়ল। বনে বনে কাঁটাঝোপে ঘুরে, অনাহারে অল্পাহারে অনিদ্রায় কষ্ট পেয়ে ও স্পানিয়ার্ডদের গরম গরম গুলি খেয়ে খেয়ে তাদের শখ ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল!

দল খুব ছোট হয়ে গেল, অন্য কেউ হলে এখানে আর থাকত না, কিন্তু একগুঁয়ে লোলোনেজ গ্রাহ্যও করলে না। সিংহের মতন তার মেজাজ—নিষ্ঠুর, গর্বিত, অদম্য! সমুদ্রের কিনারে কিনারে বনের ভিতর দিয়ে বোম্বেটের দল চলেছে। খাদ্যাভাব হওয়াতে তারা বানর মেরে তারই মাংস ভক্ষণ করতে লাগল—তবু অজানার নেশায় পথ চলা তাদের থামল না। কিন্তু তখনও লোলোনেজ আন্দাজ করতে পারেনি, তার পাপের পেয়ালা কানায় কানায় ভরে উঠেছে!

যেখানে দিয়ে তারা যাচ্ছে সেখানকার রেড ইন্ডিয়ানরাও যে শান্ত ছেলে নয়, একদিন তার প্রমাণ পাওয়া গেল। আগেই বলেছি, বোম্বেটেরা রেড ইন্ডিয়ানদেরও ওপরে কম নিষ্ঠুর ব্যবহার করেনি, সুতরাং তারাও তাদের বাগে পেলে ছেড়ে কথা কয় না।

বোম্বেটেদের দলে একজন ফরাসি ও একজন স্পানিয়ার্ড ছিল।

একদিন তারা দলছাড়া হয়ে খাদ্য বা অন্য কিছুর খোঁজে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন সময়ে দেখতে পেলে, একদল সশস্ত্র রেড ইন্ডিয়ান তাদের দিকে ছুটে আসছে!

ছুটে কাছে এসে তারা যে আদর করে তাদের কোলে টেনে নেবে না, বোম্বেটেরা এটুকু বেশ বুঝতে পারলে। তারাও তরোয়াল বার করলে, কিন্তু দু'খানা তরবারি দ্বারা এত লোককে ঠেকানো সোজা কথা নয়। তখন তারা পদযুগলের ওপরে নির্ভর করাই উচিত মনে করলে।

ফরাসি বোম্বেটের পদযুগল এমন সুপটু ছিল যে, তীরের মতন সে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু স্পানিয়ার্ড ভায়া পায়ের কাজ ভাল করে শেখেনি, রেড ইন্ডিয়ানরা তাকে ধরে ফেললে।

দু'চারদিন পরে অন্যান্য বোম্বেটেদের সঙ্গে সেই ফরাসি আবার সঙ্গীর খোঁজে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হল।

দেখা গেল, সেখানে একটা অগ্নিকুণ্ড রয়েছে, কিন্তু তার ভেতরে আগুন নেই। খানিক তফাতে পড়ে রয়েছে কতকগুলো হাড়। বোম্বেটেরা আন্দাজ করলে, স্পানিয়ার্ড ভায়ার দেহে 'রোস্ট' বানিয়ে রেড-ইন্ডিয়ানরা উদর পরিতৃপ্ত করেছে! অবশ্য এ অনুমান ভুল হতে পারে। কিন্তু স্পানিয়ার্ডকে আর পাওয়া যায়নি।

এদিকে লোলোনেজের অবস্থা কেমন দাঁড়িয়েছে দেখুন। দলের অনেকে তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ায় সে শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। বিপদের ওপর বিপদ! রেড ইন্ডিয়ানরা স্পানিয়ার্ডদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পিছনে লেগেছে। বোম্বেটেদের তারা বুঝেছে। এই হতচ্ছাড়া বোম্বেটেগুলো হচ্ছে, কলেরা বসন্ত ও প্লেগের মতো সমস্ত মানুষ জাতেরই শত্রু! এদের উচ্ছেদ না করতে পারলে শান্তি নেই!

দিনের পর দিন তাদের সঙ্গে লড়ে লড়ে বোম্বেটেদের অধিকাংশই মারা পড়ল। তবু লোলোনেজ ফেরবার নাম মুখে আনে না!

কিন্তু শেষটা ফিরতে হল। এবার ফিরে লোলোনেজ তার সত্যিকার স্বদেশে গেল—অর্থাৎ নরকে; এবং সেই মহাপ্রস্থানের দৃশ্য লোলোনেজেরই উপযোগী।

ডেরিয়েন প্রদেশের রেড ইন্ডিয়ানরা একদিন বোম্বেটেদের ক্ষুদ্র দলকে আক্রমণ করলে। তাদের বেশির ভাগ মারা পড়ল, কতক পালাল, কতক বন্দি হল। বন্দীদের ভিতরে ছিল লোলোনেজ স্বয়ং! হাজার হাজার বন্দীর রক্তে যার হাত এখনও ভিজে আছে, সেই লোলোনেজ আজ বন্দী!

এমন বন্দীকে যে ভাবে অভ্যর্থনা করতে হয়, রেড ইন্ডিয়ানরা তাই করলে। তারা আগে লোলোনেজকে একটা গাছের গুঁড়িতে বাঁধলে। তারপর তার সমুখে বড় অগ্নিকুণ্ড জ্বাললে।

কেউ হয়তো জীবন্ত লোলোনেজের নাক কেটে নিয়ে আগুনে ফেলে দিলে। কেউ কেটে নিলে কান। কেউ কাটলে জিভ। কেউ কাটলে হাত এবং কেউ বা পা। এইভাবে ক্রমে ক্রমে তার ভয়াবহ মৃত্যু ঘটল। তার দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যখন পুড়ে ছাই হয়ে গেল, রেড

ইন্ডিয়ানরা তখন সেই ছাইগুলো নিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দিলে—যাতে এই অমানুষিক মানুষের কোনও ঘৃণিত স্মৃতিই পৃথিবীকে আর কলঙ্কিত না করতে পারে!

তার পাপসঙ্গীদেরও ওই দুর্দশাই হল। কেবল একজন অনেক সাধ্যসাধনার পর কোনগতিকে শেষটা মুক্তি পেয়েছিল; বোম্বেটেদের এই শোচনীয় পরিণামের কথা প্রকাশ পায় তার মুখেই।

লোলোনেজের পরিণামই আভাস দেয় যে, জীবের শিয়রে হয়তো সত্যই কোনও অদৃশ্য মহাবিচারকের দৃষ্টি সর্বদাই সজাগ হয়ে আছে!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এ অঞ্চলের জানোয়ার

যে মুল্লুকের মানুষ-জানোয়ারের কথা নিয়ে এত আলোচনা করছি, সেখানে জলে-স্থলে আসল জানোয়ারও আছে অনেক রকম। মাঝখানে একটুখানি হাঁপ ছাড়বার জন্যে তাদের কারুর কারুর কথা এখানে কিছু বলতে চাই ।

এখানে স্থলে থাকে অজগর, জাগুয়ার, পুমা, বানর, টেপির, প্রবাল সাপ, অন্ধ সাপ, আর্মাডিলো, ভ্যাম্পায়ার বাদুড় প্রভৃতি এবং জলে থাকে কুমির, হাঙর, লণ্ঠন মাছ, ব্যাঙ মাছ, কাছিম, শুশুক, অক্টোপাস, খুনে তিমি, স্কুইড, উকো মাছ, ছিপধারী মাছ, পাইপ মাছ, সিল, উড়ন্ত মাছ, ফিতে মাছ, এবং অন্যান্য তিমি জাতীয় মাছ প্রভৃতি,—সব জীবজন্তুর ফর্দও এখানে দেওয়া অসম্ভব। এদের মধ্যে অনেক জন্তুই খোশমেজাজে ও বোম্বেটেদের চেয়ে কম হিংসকুটে নয়, একটু সুবিধা পেলেই মানুষকে ফলার করবার জন্যে তারা হাঁ করে ছুটে আসে!

দু'একটা জন্তুর ভীষণ প্রকৃতির কথা এখানে বলব।

এখানে যে জাতের কুমির পাওয়া যায়, তাদের 'কেম্যান' বলে ডাকা হয়। ভারতীয় কুমিরের সঙ্গে তাদের চেহারা ও প্রকৃতি ঠিক মেলে না। বোম্বেটেরা এইসব কুমিরের ভয়ে সর্বদাই তটস্থ হয়ে থাকত। একজন বোম্বেটে এই 'কেম্যান' সম্বন্ধে যা বলছে তা হচ্ছে এই।

"এই সব কেম্যান ভয়ঙ্কর জীব। সময়ে সময়ে এক একটা সত্তর ফুট লম্বা কেম্যানও দেখা গিয়েছে। নদীর ধার ঘেঁসে এমন নিশ্চেষ্ট হয়ে তারা ভাসতে থাকে যে দেখলেই মনে হয়, যেন একটা পুরনো গাঁছ পড়ে গিয়ে জলে ভাসছে। সেই সময়ে কোনও গরু কি মানুষ নদীর ধারে এলে আর তার বাঁচোয়া নেই!

এদের দুষ্টুবুদ্ধিও বড় কম নয়। শিকার ধরবার আগে তিন-চারদিন ধরে এরা উপোস করে। সেই সময়ে ডুব মেরে নদীর তলায় গিয়ে কয়েক মণ পাথর বা নুড়ি গিলে ফেলে এরা নিজেদের দেহ আরও বেশি ভারি করে তোলে। ফলে তাদের স্বাভাবিক শক্তি অধিকতর বেড়ে ওঠে।

কেম্যানরা শিকার ধরে টাটকা মাংস খায় না। আধ পচা না হওয়া পর্যন্ত তাদের জলের তলায় ডুবিয়ে রাখে। তাদের আরও অদ্ভুত রুচি আছে। এখানকার লোকেরা নদীর কাছাকাছি জায়গায় যদি মরা জন্তুর চামড়া শুকোবার জন্যে রেখে দেয়, তাহলে কেম্যানরা প্রায়ই ডাঙায় উঠে সেগুলো চুরি করে নিয়ে পালায়। সেই চামড়াগুলো কিছুদিন জলে ভিজলেই তাদের লোমগুলো ঝরে পড়ে যায়। তখন তারা সেগুলো খেয়ে ফেলে।

একদিন একজন লোক নদীর জলে তার তাঁবু কাচছিল। হঠাৎ একটা কেম্যান এসে সেই তাঁবু কামড়ে ধরে জলে ডুব মারবার চেষ্টা করলে। সে ব্যক্তি অত সহজে তাঁবু খোয়াতে নারাজ হল—তাঁবুর একদিক ধরে প্রাণপণে টানাটানি করতে লাগল। বাধা পেয়ে কেম্যানের মেজাজ গেল চটে। সে এক ডিগবাজি খেয়ে জল থেকে ডাঙায় উঠে তাঁবুর অধিকারীকেও নিয়ে নদীর মধ্যে ডুব মারবার ফিকির করলে।

ভাগ্যে লোকটির কাছে একখানা বড় কসাই ছুরি ছিল এবং ভাগ্যে সে কেম্যানের দেহের ঠিক জায়গায় ছুরিখানা দৈবগতিকে বসিয়ে দিতে পারলে, তাই লোকটিকে ছেড়ে দিয়ে সেই জলদানব তখনই খাবি খেতে বাধ্য হল! তার পেট ফেঁড়ে পাওয়া গেল রাশি রাশি বড় বড় নোড়ানুড়ি!

কেবল বড় বড় জীব নয়, কেম্যানরা পুঁচকে মাছি পেলেও টপ করে খেয়ে ফেলতে ছাড়ে না।

কেম্যানরা ডাঙায় উঠে ডিম ছাড়ে এবং ডিমগুলোর উপরে পা দিয়ে বালি ছড়িয়ে দেয়। রোদের আঁচে ডিম ফোটে, এবং বাচ্চাগুলো ডিম ছেড়ে বেরিয়েই জলের ভিতরে চলে যায়। পাখিরা অনেক সময়ে ডিম নষ্ট করে। মা কেম্যান সেদিকেও নজর রাখতে ভোলে না। পাখির ঝাঁক আসবার সম্ভাবনা দেখলে প্রায়ই তারা নিজেদের ডিম আবার কোঁৎ কোঁৎ করে গিলে ফেলে! তারপর বিপদ কেটে গেলে ডিমগুলোকে ফের হড়াৎ করে উগরে বার করে দেয়!

ডিম ফুটলে মা কেম্যান তার বাচ্চাদের নিয়ে জলে খেলা করে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, খেলা করতে করতে বাচ্চা কেম্যানরা তাদের মায়ের মুখের ভিতর দিয়ে পেটের ভিতরে গিয়ে ঢুকছে, আবার বেরিয়ে আসছে!

নদীপ্রধান জায়গায় আড্ডা গাড়তে হলে এই কেম্যানদের ভয়ে সব সময়েই আমরা ব্যস্ত থাকতুম। রাত্রে কারুকে পাহারায় না রেখে ঘুমোতে পারতুম না।

আমাদের দলের একজন লোক একবার তার কাফ্রি চাকরের সঙ্গে বনের ভিতরে ঢুকেছিল। কোথায় কোন ঝোপে একটা পাজি কেম্যান ঘুপটি মেরে ছিল, হঠাৎ সে বেরিয়ে এসে লোকটির একখানা পা কামড়ে ধরে মাটিতে পেড়ে ফেললে। তাই না দেখেই কাফ্রি চাকরটা—সাহায্য করা দূরে থাক—টেনে লম্বা দিলে।

আমাদের বন্ধু ভীরু ছিল না, বিপদে পড়ে ভেবড়ে গেল না। তার গায়ে জোরও ছিল যথেষ্ট, যদিও সে জোর কেম্যানের পাল্লায় পড়ে বেশি কাজে লাগল না। কিন্তু সে তার লম্বা ছুরিখানা নিয়ে কেম্যানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। এ যুদ্ধ ডাঙায় হচ্ছিল বলেই রক্ষা, তাই খানিকক্ষণ যোঝাযুঝির পরে অনেকগুলো ছুরির ঘা খেয়ে কেম্যানটা ছটফট করতে করতে মারা পড়ল। আমাদের বন্ধুর সর্বাঙ্গ তখন ক্ষতবিক্ষত। রক্তপাতে নেহাৎ দুর্বল হয়ে সেইখানেই মড়ার মতো পড়ে রইল।

এতক্ষণ পরে কাফ্রিবীরের মনে হল, তার মনিবের অবস্থাটা কিরকম, একবার উঁকি মেরে দেখে আসা উচিত! তার মনিবের দেহ কেম্যানের উদরে অদৃশ্য হয়ে যায়নি দেখে সে আশ্বস্ত হয়ে তাকে পিঠে তুলে নিয়ে প্রায় তিন মাইল পথ পেরিয়ে আমাদের কাছে এসে হাজির হল। আমরা তখনই তাকে জাহাজে নিয়ে এলুম।

এই বদমাইশ কেম্যানরা প্রায়ই আমাদের জাহাজের কাছে আসত এবং জাহাজের গায়ে আঁচড়াআচড়ি করত। একদিন দড়িতে লোহার হুক লাগিয়ে আমরা একটা মস্ত কেম্যান ধরলুম। ধরা পড়ে সে কিন্তু জলের দিকে গেল না, উল্টে জাহাজের মই বেয়ে উপর দিকেই উঠতে লাগল! তখন আমরা ব্যস্ত হয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তার দফা একেবারে রফা করে দিলুম!"

ও মুল্লুকে খোলা হাওয়ায় রাত্রে কি ঘুমিয়েও নিশ্চিন্ত হবার যো আছে? ওখানে রাত্রে পিশাচবাদুড়রা শিকার খোঁজে! তারা এমন চুপিসাড়ে এসে মানুষের গায়ে ক্ষুরধার দাঁত দিয়ে ছ্যাঁদা করে রক্ত টেনে নেয় যে, মানুষের ঘুম প্রায়ই ভাঙে না। আর না ভাঙাই ভাল! কারণ রক্তপানের পর ওই পিশাচবাদুড়েরা লালা দিয়ে ক্ষতস্থানের মুখ বন্ধ করে দিয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ বাধা পেয়ে তারা যদি উড়ে যেতে বাধ্য হয়, তাহলে ক্ষতের রক্তপড়া আর সহজে বন্ধ হতে চায় না। পিশাচবাদুড়ের লালা কেবল রক্ত বন্ধ করে না, ক্ষতস্থান বিষিয়ে উঠতেও দেয় না।

এ দেশে বাঘ জাতীয় জন্তুদের মধ্যে জাগুয়ার আর পুমাই প্রধান। জাগুয়ার পুমার চেয়ে আকারে বড় হয় এবং তার প্রকৃতিও বেশি হিংস্র। তারা প্রায়ই মানুষকে আক্রমণ করতে ছাড়ে না। তাদের আক্রমণ আরও বিপজ্জনক এইজন্যে যে, তারা গাছের ডালে পাতার আড়ালে লুকিয়ে বসে থাকে এবং তাদের কখন যে কার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার বিদকুটে শখ হবে, আগে থাকতে তা জানতে পারা যায় না।

পুমারাও গাছে চড়তে পারে। ব্রেজিলে তাদের 'কাউগার' বলে ডাকা হয়। উত্তর আমেরিকায় তাদের আর একটা নাম—'পেন্টার'। 'পুমা' হচ্ছে পেরু দেশিয় নাম—যদিও ওই নামই বেশি চলে। তারা ল্যাজসুদ্ধ লম্বা হয় ছয় থেকে নয়ফুট পর্যন্ত।

পুমারা সবচেয়ে খেতে ভালবাসে ঘোড়ার মাংস। অভাবে গরু, মোষ, শূকর, হরিণ, ভেড়া, খরগোশ—এমনকি ইঁদুর ও শামুক পর্যন্ত! বানরও তাদের মনের মতো। বানররা এ গাছ থেকে ও গাছে লাফিয়েও পার পায় না, কারণ গাছে গাছে লাফালাফি করতে বানরদের চেয়ে পুমারাও কম তৎপর নয়। মাটি থেকে বিশ ফুট উঁচুতে লাফিয়ে পুমারা গাছের ডালে চড়তে পারে! দীর্ঘ লম্ফে তারা প্রায় চল্লিশ ফুট জমি পার হয়ে যায়!

কিন্তু মানুষের পক্ষে পুমা মোটেই বিপজ্জনক নয়। কারণ তারা মানুষকে সহজেই কাত করে ফেলতে পারলেও সাধারণত মানুষকে তেড়ে আক্রমণ করে না। এমন কি, অনেক সময়ে মানুষ তাকে আক্রমণ করলেও সে আত্মরক্ষার চেষ্টা পর্যন্ত করে না! অথচ এই পুমা তার চেয়ে বড় ও হিংস্র জীব জাগুয়ারকেও আক্রমণ করে।

মধ্য আমেরিকার এক কাঠুরে একদিন জঙ্গলে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা পুমা ল্যাজ তুলে বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এবং আদুরে বিড়ালের মতো ঘড়র ঘড়র শব্দ করতে করতে সেই কাঠুরের পায়ের ফাঁক দিয়ে খেলাচ্ছলে আনাগোনা করতে লাগল! কিন্তু সেই পুমা বেচারার অদৃষ্ট ছিল নেহাৎ মন্দ। কারণ কাঠুরে এমন ভয় পেলে যে, তার কুড়ুলের বাড়ি পুমাকে দিলে এক ঘা বসিয়ে! পুমা তখন সেই বদরসিকের কাছ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হল।

হাডসন সাহেব বলেন, "আমি একবার একটা পুমাকে বধ করে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলুম। তাকে ধরেছিলুম আমি গলায় ফাঁসকল লাগিয়ে। সে একটা পাথরে ঠেসান দিয়ে চুপ করে বসে

রইল। আমি যখন ছোরা তুললুম সে পালাবার চেষ্টা পর্যন্ত করলে না। তাকে দেখে মনে হল, আমি যে তাকে বধ করব সে যেন তা বুঝতে পেরেছে! সে কাঁপতে লাগল, তার দু'চোখে জল ঝরতে লাগল, সে করুণস্বরে আর্তনাদ করতে লাগল। তাকে বধ করার পর আমার মনে হল আমি যেন হত্যাকারী!"

রেড ইন্ডিয়ানরা কিছুতেই পুমাকে মারতে চায় না। তাদের বিশ্বাস, পুমাকে বধ করলে সেই মুহূর্তেই মানুষের মৃত্যু হয়। রেড ইন্ডিয়ানরাই হচ্ছে আমেরিকার আদিম অধিবাসী। তারা পুমাকে মারে না বলেই বোধহয় পুমাও মানুষকে হিংসা করতে অভ্যস্ত হয়নি।

গরিলার মতো বড় জাতের বানর পৃথিবীতে আর নেই বলে শোনা যায়। কিন্তু হালে দক্ষিণ আমেরিকায় টাররা নদীর ধারে অদ্ভুত ও বৃহৎ এক অজানা জাতের বানরের সন্ধান পাওয়া গেছে।

একদল লোক নদীর ধার দিয়ে যাচ্ছিল, আচম্বিতে দু'টো প্রকাণ্ড বানর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে তাদের আক্রমণ করে। একটাকে তারা গুলি করে মেরে ফেললে এবং অন্যটা আবার জঙ্গলের আড়ালে পালিয়ে গেল। যেটা মারা পড়ল সেটা স্ত্রীজাতীয় বানর হলেও তার মাথার উচ্চতা পাঁচফুটেরও বেশি। এর থেকেই বোঝা যায়; এ জাতের নর-বানররা মাথায় আরও বেশি ঢ্যাঙা। এই অদ্ভুত জীব অনেকটা গরিলার মতো দেখতে হলেও গরিলা নয় মোটেই। পণ্ডিতরা বলছেন, এরা মানুষ ও বানরের মাঝামাঝি জীব! এই নূতন আবিষ্কার জীবতত্ত্ববিদদের মধ্যে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। পণ্ডিতরা বহুদিন ধরে মানুষ ও বানরের মাঝামাঝি জীবের সন্ধান করে আসছেন, হয়তো এরা তাঁদের চিন্তার খোরাক জোগাবে। এদের গায়ের জোর কত, আজও সে পরীক্ষার সুবিধা পাওয়া যায়নি, তবে শক্তিতে হয়তো এরাও গরিলার চেয়ে কম যায় না।

নবম পরিচ্ছেদ

মহাবীর গভর্নর!

এইবার কাপ্তেন মর্গ্যানের পালা শুরু করা যাক। প্রথম পরিচ্ছেদেই মর্গ্যানের মোটামুটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি দিয়েছি। এই চাষার ছেলে মর্গ্যান বোম্বেটের ব্যবসায় অবলম্বন করেও কেমন করে 'স্যার' পদবি পেয়ে লাটের গদিতে বসেছিল তারই বিচিত্র ইতিহাস বলব। এ সত্য ইতিহাস যে কোনও কাল্পনিক উপন্যাসেরও চেয়ে চিত্তাকর্ষক।

মর্গ্যানের আর একটা উপাধি হচ্ছে—"বোম্বেটের রাজা"! লোলোনেজের চেয়ে সে কম শক্তি পরিচয় তো দেয়নি বটেই, বরং সময়ে সময়ে তার কীর্তি লোলোনেজের যশগৌরবকেও ম্লান করে দিয়েছে!

হেনরি মর্গ্যানের জন্ম ইংলণ্ডের ওয়েলস প্রদেশে। তার বাবা ছিলেন এক সাধু ও ধনী চাষী—নিজের সমাজে তিনি ছিলেন এক মাননীয় ব্যক্তি। কিন্তু ছেলেবয়স থেকেই বাপের কাজে মর্গ্যানের একটুও রুচি ছিল না। অতএব পিতার আশ্রয় ছেড়ে সে সাগরগামী জাহাজে একটা নিচু কাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

সেই কাজের মেয়াদ ফুরোবার পর মর্গ্যান এল জামাইকা দ্বীপে। এটি ছিল বোম্বেটেদের আর একটি প্রিয় দ্বীপ। বেকার হয়ে বসে না থেকে মর্গ্যান বোম্বেটেদের এক জাহাজে চাকুরি গ্রহণ করলে। সমুদ্রে তিন-চারবার বোম্বেটেধর্ম পালন করে সে এ বিষম ব্যবসায়ের যা কিছু শেখবার সব শিখে ফেললে—এমন ভাল ছাত্র বোম্বেটেরা খুব কমই পেয়েছে!

তারপর কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে পরামর্শের পর মর্গ্যান স্থির করলে, তারাও সকলে মিলে রোজগারের পয়সা দিয়ে একখানা জাহাজ ক্রয় করবে। রত্নাকর বহু রত্নের আকর—একখানা জাহাজ কিনলেই তা আহরণ করা ভারি সহজ।

জাহাজ কেনা হল। দলের ভিতরে মর্গ্যানই ছিল সকলের চেয়ে সাহসী, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। কাজেই দলের বাকি সবাই একবাক্যে তাকেই দলপতি বা কাপ্তেন বলে মেনে নিলে। সেইদিন মর্গ্যানের ছেলেবেলাকার স্বপ্ন সফল হল।

লোলোনেজের পরিণাম দেখে যেমন ধারণা হয় যে, কোনও একজন মহাবিচারক সর্বদা সজাগ হয়ে আছেন, মর্গ্যানের জীবনকাহিনী পড়লে তেমনই সন্দেহ হয় যে, মাঝে মাঝে সেই মহাবিচারকও হয়তো ঘুমিয়ে পড়েন!

প্রথমবারের সমুদ্রযাত্রাতেই নতুন কাপ্তেনের উপরে অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হল। সে একে একে অনেকগুলো জাহাজ দখল করে আবার জামাইকায় ফিরে এল। এবং এই অভাবিত সাফল্যে বোম্বেটেদের ভিতরে তার মানসম্ভ্রম বেড়ে উঠল অত্যন্ত!

জামাইকা দ্বীপে ছিল এক বুড়ো বোম্বেটে, তার নাম ম্যানসভেল্ট। সে এই সময়ে খুব বড় এক নৌ-বাহিনী গঠন করে চারিদিকে লুটপাট করবার আয়োজনে ব্যস্ত ছিল। সে দেখলে, মর্গ্যান হচ্ছে একজন মস্ত কাজের লোক। অতএব তাকে সে নিজের ভাইস আডমিরালের পদে নির্বাচন করে নিলে। ভুল নির্বাচন হয়নি! এই হল মর্গ্যানের বোম্বেটে জীবনের দ্বিতীয় উন্নতি।

পনেরখানা জাহাজ ও পাঁচশ বোম্বেটে নিয়ে ম্যানসভেল্ট ও মর্গ্যান সমুদ্রে পাড়ি দিলে। তারা প্রথমেই স্পানিয়ার্ডদের দ্বারা অধিকৃত সেণ্ট কাথারাইন দ্বীপে গিয়ে নামল। তারপর লড়াই করে স্পানিয়ার্ডদের কাছ থেকে সেই দ্বীপটা কেড়ে নিলে।

কিন্তু তার অল্পদিন পরেই বুড়ো বোম্বেটে ম্যানসভেল্ট পৃথিবীর লীলাখেলা সাঙ্গ করে ভগবানের কাছে জবাবদিহি করতে চলে গেল।

তারপর কাপ্তেন মর্গ্যান নিজেই এক নৌ-বাহিনী গঠন করলে। বারখানা ছোট বড় জাহাজ ও সাতশ লোক নিয়ে আবার সে বেরিয়ে পড়ল। দু'একটা ছোটখাট শহর লুট করলে। কিন্তু লুটের মাল ভাগ করবার সময়ে বোম্বেটেদের মধ্যে এমন মন কষাকষি হল যে, কাপ্তেন মর্গ্যানের কাছ ছেড়ে একদল লোক রাগ করে চলে গেল। তাদের সন্দেহ হয়েছিল, মর্গ্যান জুয়াচুরি করে অনেক টাকা সরিয়ে ফেলেছে। খুব সম্ভব, তাদের সে সন্দেহ মিথ্যা নয়। যারা দল ছাড়ল তারা সবাই ফরাসি। মর্গ্যানের সঙ্গে রইল কেবল ইংরেজ বোম্বেটেরা।

কিন্তু দল ছোট হয়ে গেল বলে মর্গ্যান একটুও দমল না। আরও কিছু লোক ও জাহাজ সংগ্রহ করে মর্গ্যান আর একদিকে আবার পাড়ি দিলে। কোথায় যাওয়া হবে সেকথা কারুর কাছে প্রকাশ করলে না। খালি বললে, "আমি তোমাদের সর্দার, তোমাদের ভালমন্দের জন্যে আমিই দায়ী রইলুম। আমাকে বিশ্বাস করো, তাহলেই চটপট তোমরা ধনী হতে পারবে।"

বোম্বেটেরা মর্গ্যানের কথায় বিশ্বাস করলে!

দিন কয় পরে তারা কোস্টারিকা দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হল।

তখন মর্গ্যান বললে, "আমরা পোর্টো বেলো শহর লুট করতে যাচ্ছি। এ কথা আমি আর কারুকে বলিনি, সুতরাং চরের মুখে খবর পেয়ে শত্রুরা সাবধান হবার সময়ও পায়নি।"

দু'একজন প্রধান বোম্বেটে বললে, "পোর্টো বেলো হচ্ছে মস্ত শহর, সেখানে অনেক সৈন্য আছে। আমাদের লোকসংখ্যা মোটে সাড়ে চারশ। কেমন করে আমরা অতবড় শহর দখল করব?"

মর্গ্যান বললে, "আমাদের দল ছোট বটে, কিন্তু আমাদের জান খুব বড়। দল ছোট হলেই একতা আর লাভের সম্ভাবনা বেশি। কুছ পরোয়া নেই;—এগিয়ে চলো!"

অতঃপর পোর্টো বেলো নগরের একটু বর্ণনা দিতে হবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজে স্পেনিয় রাজ্যের মধ্যে পোর্টো বেলো তখন দুর্ভেদ্য নগর হিসাবে হাভানা ও কার্টেজেনার পরেই তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল। বন্দরের পিছনেই নগরকে রক্ষা করবার জন্যে দু'টি বড় বড় দুর্গ আছে। এই দুর্গ দু'টির অজ্ঞাতসারে বন্দরের মধ্যে কোনও জাহাজ বা নৌকো প্রবেশ করতে পারে না। দুর্গ দু'টিও এমন সুরক্ষিত যে, সকলে তাদের অজেয় বলে মনে করে। প্রথম দুর্গটির মধ্যে তিনশ সৈন্য থাকে। নগরের এখনকার জনসংখ্যা সাড়ে নয়হাজারের উপরে, তখন কম ছিল।

মর্গ্যান সরাসরি বন্দরে প্রবেশ না করে, সেখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে সমুদ্রকূলে চুপিসাড়ে জাহাজ লাগালে। তারপর স্থলে পদব্রজে ও নদীতে নৌকোয় চড়ে তারা প্রথম দুর্গটির কাছে এসে পড়ল। দুর্গের অধিবাসীদের বলে পাঠালে—হয় আত্মসমর্পণ কর, নয় মরবার জন্যে প্রস্তুত হও।

উত্তরে দুর্গের কামানগুলো ভৈরব হুঙ্কারে অগ্নিবর্ষণ করলে। কামানগর্জন শুনে দূর থেকে নগরের বাসিন্দারা সভয়ে বুঝতে পারলে যে, কাছেই কোনও মস্ত বিপদ এসে আবির্ভূত হয়েছে।

নিকটবর্তী অঞ্চলের স্পানিয়ার্ডরা বোম্বেটেদের বাধা দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করলে। কিন্তু কোনও ফল হল না, তারা হেরে গেল, অনেকে বন্দি হল। দুর্গের ভিতরের সৈন্যরাও শেষ পর্যন্ত দুর্গ রক্ষা করতে পারলে না। কোনওরকম পূর্বাভাস না দিয়ে শত্রু এমন অতর্কিত শিয়রে এসে পড়েছিল যে, তার কবল থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভবপর হল না। মর্গ্যান দুর্গ দখল করলে।

মর্গ্যান হুকুম দিলে, "প্রত্যেক বন্দীকে কেটে দু'খানা করে ফেল! শহরের লোকরা তাহলে বুঝতে পারবে, আমরা বড় লক্ষ্মীছেলে নই—আমাদের বাধা দিলে তাদেরও নিশ্চিত মরণ!"—বন্দীদের মাথাগুলো উড়ে গেল।

দুর্গের ভিতরের সে সকল সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষরা ধরা পড়েছিল, তাদের একটা ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। এইবার বারুদখানায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল, দুর্গসুদ্ধ সমস্ত প্রাণী শূন্যে উড়ে পঞ্চভূতে মিশিয়ে গেল। কেবল দুর্গের অধ্যক্ষ প্রাণ নিয়ে নগরে প্রস্থান করতে পারলেন।

বোম্বেটেরা নগর আক্রমণ করতে চলল। সেখানকার বাসিন্দারা তখনও আত্মরক্ষার সময় পায়নি—তারা আত্মরক্ষা করতে পারলেও না। পোর্টো বেলোর গভর্নর তাদের কোনওরকমে

উত্তেজিত করতে না পেরে, বাকি যে দুর্গটা তখনও শত্রুহস্তগত হয়নি, তার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

বোম্বেটেরা নগর দখল ও লুট করে অনেক পাদ্রীকে সপরিবারে বন্দি করলে। ওদিকে দুর্গ থেকে তাদের উপরে গোলাগুলি বৃষ্টি হচ্ছিল অজস্রধারে। ব্যতিব্যস্ত হয়ে বোম্বেটেরাও দুর্গ আক্রমণ করলে। তাদের এ আক্রমণের আর এক উদ্দেশ্য, শহর থেকে অনেক নাগরিক বহু ধনসম্পত্তি নিয়ে কেল্লার ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।

সারাদিন যুদ্ধ চলল—কোন পক্ষের জয় হবে তখনও তা অনিশ্চিত। অনেক বোম্বেটে মারা পড়ল—তবু তারা কেল্লার কাছ ঘেঁষতে পারলে না। তারা বোমা ছোড়বার সুযোগ পর্যন্ত পেলে না—কেল্লার পাঁচিলের কাছে গেলেই উপর থেকে হুড়মুড় করে ভারি ভারি পাথর ও জ্বলন্ত বারুদ এসে পড়ে তাদের যমালয়ে পাঠিয়ে দেয়।

মর্গ্যান প্রায় হতাশ হয়ে পড়ে শেষ উপায় অবলম্বন করলে।

সে আগে কেল্লার পাঁচিলে ওঠবার জন্যে খুব উঁচু দশ-বারখানা মই তৈরি করালে। তারপর বন্দি পাদ্রী ও তাঁদের স্ত্রী-কন্যাদের বললে, সেই মইগুলো পাঁচিলের গায়ে লাগিয়ে দিয়ে আসতে।

গভর্নরকে জানানো হল, "এখনও আত্মসমর্পণ কর।"

গভর্নর বললেন, "প্রাণ থাকতে নয়।"

তখন মই নিয়ে যাবার হুকুম হল। মর্গ্যান ভেবেছিল, সপরিবারে ধর্মযাজকেরা মই নিয়ে অগ্রসর হলে গভর্নর তাঁদের উপরে আর গুলিবৃষ্টি করতে পারবেন না।

বোম্বেটের দল পাদ্রীদের পিছনে পিছনে এগিয়ে পিস্তল উঁচিয়ে বললে, "শীঘ্র পাঁচিলে গিয়ে মই লাগাও। নইলে গুলি করে মেরে ফলব।"

কেল্লার পাঁচিলের উপরেও গভর্নর সৈন্য সাজিয়ে রেখেছিলেন, তারাও বন্দুক তুললে।

পাদ্রী ও তাঁদের পরিবারবর্গ করুণ চিৎকারে স্পানিয়ার্ডদের বললেন, "আমরা তোমাদেরই ধর্মযাজক বাবা, আমাদের মেরো না।"

কিন্তু মর্গ্যান এই বীর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গভর্নরকে ভুল বুঝেছিল—সৈনিকধর্ম পালনের জন্যে তিনি আর সব ধর্মকে বর্জন করতে প্রস্তুত।

সপরিবারে ধর্মযাজকেরা কাঁধে মই নিয়ে অগ্রসর হলেন, সঙ্গে সঙ্গে কেল্লার উপর থেকে শিলাবৃষ্টির মতো গোলাগুলি এসে তাঁদের ভূতলশায়ী করতে লাগল। বাইরে থেকে শত্রুই হোক আর মিত্রই হোক, কেল্লার ত্রিসীমানায় কারুকে আসতে দেওয়া হবে না—এই ছিল গভর্নরের প্রতিজ্ঞা।

পাদ্রী ও তাঁদের পরিবারবর্গের দেহ একে একে মাটির উপরে আছড়ে পড়তে লাগল। কিন্তু তবু তাঁরা কোনওরকমে পাঁচিলের গায়ে মই লাগিয়ে পালিয়ে এলেন। তখন বোম্বেটেরা বোমা ও বারুদের পাত্র হাতে করে পাঁচিলের উপরে গিয়ে দাঁড়াল এবং কেল্লার ভিতরে সেইসব নিক্ষেপ করতে লাগল।

স্পানিয়ার্ডরা তখন বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করলে।

কিন্তু সেই বীর গভর্নর! কোনও আশা নেই, তবু তিনি অটল! তখনও নিজের সৈন্যদের ডেকে তিনি বলছেন, "অস্ত্র নাও, অস্ত্র নাও! শত্রুবধ করো!"

কেউ তাঁর কথায় কান পাতলে না, তারা বোম্বেটেদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে জীবনভিক্ষা করতে লাগল।

—"তবে মর কাপুরুষ কুকুরের দল!"—এই বলে তাঁর যেসব সৈন্য কাছাকাছি ছিল, মুক্ত তরবারি নিয়ে তিনি তাদের উপরে গিয়ে পড়লেন এবং নিজের হাতেই নিজের সৈন্যদের বধ করতে লাগলেন।

বোম্বেটেদের নীচহৃদয় পর্যন্ত এই অসাধারণ বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে গেল। তারা সসম্ভ্রমে বললে, "এখন আপনি আত্মসমর্পণ করবেন তো?"

গভর্নর দৃঢ়হস্তে অসিধারণ করে সগর্বে মাথা তুলে বললেন, "নিশ্চয়ই নয়! কাপুরুষের মতো তোদের হাতে আমি ফাঁসিতে মরব না—আমি মরতে চাই লড়াই করতে করতে বীর সৈনিকের মতো।"—বলেই তিনি আবার তাদের আক্রমণ করলেন।

গভর্নরের সহধর্মিণী ও কন্যা কাঁদতে কাঁদতে কাকুতি-মিনতি করতে লাগলেন—"ওগো তুমি অস্ত্র ছাড়ো! আত্মহত্যা করে আমাদের পথে বসিও না!"

কিন্তু সেই বীরের পাথর-প্রাণ কোনও অশ্রুই নরম করতে পারলে না—সিংহের মতো একলাই তিনি অগুণতি শত্রুর সঙ্গে যুঝতে লাগলেন।

বোম্বেটেরা তাঁকে জীবন্ত অবস্থায় বন্দি করবার জন্যে অনেক চেষ্টা করলে—কিন্তু পারলে না। শেষ পর্যন্ত শত্রু মারতে মারতে নিজের শেষ রক্তপাত করে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। যে জাতির মধ্যে এমন বীরের জন্ম হয় সে জাতি ধন্য!

তারপর যা হবার তা হল। অত্যাচার, লুণ্ঠন, হত্যা। পোর্টো বেলোর যত ঐশ্বর্য দুর্গের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছিল, সমস্তই বোম্বেটেরা হস্তগত করলে। অত বড় বীর গভর্নরের হাত থেকে অমন অজেয় দুর্ভেদ্য দুর্গ এত কম সৈন্য নিয়ে মর্গ্যান যে কি করে কেড়ে নিলে, সকলেরই কাছে সেটা প্রহেলিকার মতো বোধ হল।

পানামা নগরের স্পানিয়ার্ড গভর্নর সবিস্ময়ে বোম্বেটেদের কাছে দূত পাঠিয়ে জানতে চাইলেন,—"কোন আশ্চর্য হাতিহার দিয়ে তোমরা দুর্গের অত বড় বড় কামান ব্যর্থ করে দিয়েছ?"

মর্গ্যান সহাস্যে দূতের হাতে একটা ছোট পিস্তল দিয়ে বলে পাঠালে, "কেবল এই আশ্চর্য হাতিয়ার দিয়ে আমি কেল্লা ফতে করেছি! এই অস্ত্র আমি এক বৎসরের জন্যে আপনাকে দান করলুম। তারপর নিজেই পানামায় গিয়ে আমার অস্ত্র আবার আমি ফিরিয়ে আনব।"

পানামার গভর্নর তখনই সেই পিস্তল ফেরৎ পাঠিয়ে বললেন, "এ অস্ত্রে আমার দরকার নেই। তোমাকে আর কষ্ট করে পানামায় আসতে হবে না। কারণ পোর্টো বেলোর মতো এত সহজে পানামা আত্মদান করবে না।"

পোর্টো বেলো* শহরে শরীরী মড়কের মতো এক পক্ষকাল বাস করে চারিদিকে হাহাকার তুলে মর্গ্যান সদলবলে আবার জাহাজে এসে উঠল। বিপুল ঐশ্বর্য নিয়ে তারা কিউবা দ্বীপে ফিরে এল। বোম্বেটেদের সবাই বুঝলে, লোলোনেজের অভাব পূরণ করতে পারে এখন কেবল এই কাপ্তেন মর্গ্যান! তার তারকা আজ উদীয়মান!

* পানামা প্রদেশের একটি নগর।

দশম পরিচ্ছেদ

অমানুষী অত্যাচার ও অগ্নিপোত

মর্গ্যান তারপর এল জামাইকা দ্বীপে—এখানকার গভর্নর হচ্ছেন তারই স্বজাতি, অর্থাৎ ইংরেজ।

মর্গ্যানের শক্তি ও খ্যাতি শুনে ফুলমধুলোভী ভ্রমরের মতো চারিদিক থেকে বোম্বেটের পর বোম্বেটে এসে তার দলে যোগ দিতে লাগল—তাদের বেশির ভাগই ইংরেজ। জামাইকার গভর্নর পর্যন্ত তাকে আর বোম্বেটের মতো অভ্যর্থনা করলেন না,—এমন কি তাকে একখানা মস্তবড় জাহাজও দান করলেন। এমন দান পেয়ে মর্গ্যানের আনন্দ আর ধরে না, কারণ এর উপরে ছিল ছত্রিশটা কামান! এতবড় জাহাজ কোনও বোম্বেটেরই ভাগ্যে জোটে না।

সেই সময়ে ওখানে এসে একখানা বড় ফরাসি জাহাজও নঙ্গর করেছিল, তার উপরে ছিল চব্বিশটা ইস্পাতের ও বারটা পিতলের কামান। এ জাহাজখানাকে পেলে তার শক্তি অত্যন্ত বেড়ে উঠবে বলে মর্গ্যান ফরাসিদের কাপ্তেনকে নিজের দলে যোগ দেবার জন্যে আহ্বান করলে। কিন্তু ফরাসিরা রাজি হল না—ইংরেজ বোম্বেটেদের তারা বিশ্বাস করে না।

মর্গ্যানের ভারি রাগ হল—ফরাসিদের সাজা দেবার জন্যে ছুতো খুঁজতে লাগল। ছুতো পাওয়াও গেল।

কিছুদিন আগে সমুদ্রে খাদ্যাভাব হওয়ার দরুন ফরাসিরা একখানা ইংরেজ জাহাজ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করেছিল এবং তখন জাহাজে টাকা ছিল না বলে ইংরেজদের সঙ্গে এই ব্যবস্থা করেছিল যে, জামাইকায় ফিরে এসে তারা খাবারের দাম কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দেবে।

ব্যাপারটা কিছু অন্যায় নয়। কিন্তু এই ছুতোই বিবেকবুদ্ধিহীন মর্গ্যানের পক্ষে যথেষ্ট হল। সে বাইরে কিছু না ভেঙে ফরাসি জাহাজের কাপ্তেন ও কয়েকজন পদস্থ কর্মচারীকে নিজের জাহাজে নিমন্ত্রণ করলে। তারা কোনওরকম সন্দেহ না করেই নিমন্ত্রণ রাখতে এল। তখন তাদের হাতে পেয়ে দুষ্ট মর্গ্যান বললে, "ইংরেজদের কাছ থেকে তোমরা খাবার কেড়ে নিয়েচ। সেই অপরাধে তোমাদের বন্দি করলুম।"—তারপর সে জামাইকার গভর্নরের দেওয়া বড় জাহাজখানায় বন্দীদের পাঠিয়ে দিলে।

আবার নতুন সমুদ্রযাত্রা করবার দিন স্থির হল। ইংরেজ বোম্বেটেরা আসন্ন লাভের আনন্দে জাহাজে জাহাজে উৎসবে মেতে উঠেছে! নাচ-গান-বাজনা চলছে—সবাই মদের নেশায় বেহুঁশ।

আচম্বিতে একসঙ্গে যেন অনেকগুলো বাজ ডেকে উঠল এবং সমুদ্রের বুকে যেন দপ করে জ্বলে উঠল একসঙ্গে শত শত বিদ্যুৎ!...চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল।

মর্গ্যানের সেই বড় সাধের বিরাট জাহাজ শূন্যে উড়ে গেল ভেঙে গুঁড়ো হয়ে। মাত্র ত্রিশজন লোক কোনওগতিকে রক্ষা পেলে এবং এক মুহূর্তেই মারা পড়ল তিনশ পঞ্চাশ জন ইংরেজ।

বোম্বেটেদের মতে, বন্দি ফরাসি কাপ্তেন ও তাঁর সঙ্গীরাই নিজেদের মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও জাহাজের বারুদখানায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

মর্গ্যানের সেই বিশ্বাসঘাতকতার ফল তাকে হাতে হাতেই পেতে হল।

অতবড় জাহাজ ও এত লোক হারিয়ে মর্গ্যান একেবারে ভেঙে পড়ল। কিন্তু সে বেশিক্ষণের জন্যে নয়। রাগে অজ্ঞান হয়ে বাকি বোম্বেটেদের নিয়ে আবার ফরাসিদের সেই বড় জাহাজখানা আক্রমণ ও অধিকার করলে।

তারপর তারা সমুদ্রের জলে নিজেদের দলের বোম্বেটেদের লাশ খুঁজতে লাগল—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যে নয়, লুণ্ঠন করবার জন্যে। যাদের আঙুলে আংটি ছিল তাদের আংটিসুদ্ধ আঙুল কেটে নেওয়া হল, যাদের পকেটে টাকাকড়ি ছিল তাদের পকেট থেকে টাকাকড়ি চুরি করা হল। তারপর মৃতদেহগুলোকে সামুদ্রিক জীবদের মুখে সমর্পণ করে তারা অম্লানবদনে আবার জাহাজে উঠে অগাধ সাগরে পাড়ি দিল।

দলের সাড়ে তিনশ লোক মারা পড়ল, তবু মর্গ্যানের নামের জোরে সঙ্গীর সংখ্যা হল যথেষ্ট! পনেরখানা জাহাজে প্রায় হাজারখানেক বোম্বেটে তার সঙ্গে চলল। দুরাত্মার পাপসঙ্গীর অভাব হয় না। সবচেয়ে বড় জাহাজে রইল মর্গ্যান নিজে—কিন্তু তাতে কামান ছিল মোটে চোদ্দটা, তাও ছোট ছোট।

এবারে মর্গ্যান কিছু মুশকিলে পড়ল। কারণ যাত্রারম্ভের সময়ে তার মাথায় অনেক বড় বড় ফন্দি ছিল; কিন্তু কিছুদিন পরে তার দলের প্রায় পাঁচশ লোকসুদ্ধ সাতখানা জাহাজ অকূল সাগরে কোথায় হারিয়ে গেল। মর্গ্যান কিছুকাল অপেক্ষা করেও তাদের দেখা পেলে না। কাজেই এখানে ওখানে ছোটখাট ডাকাতি করেই সে সময় কাটাতে লাগল।

মর্গ্যানের দলে এক ফরাসি কাপ্তেন আছে, সে আগে ছিল বিখ্যাত লোলোনেজের সঙ্গে। সে পরামর্শ দিলে "আপনিও মারাকেবো শহর লুট করবেন চলুন। আমি সেখানকার পথঘাট চিনি, আমাদের কোনও কষ্ট হবে না।"—এ প্রস্তাবে মর্গ্যানের নারাজ হবার কারণ ছিল না।

তারা মারাকেবোর সমুদ্রে এসে হাজির হল। তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে যখন শহরের খুব কাছে এসে পড়ল, স্পানিয়ার্ডরা তখন তাদের দেখতে পেলে। লোলোনেজের নগরলুণ্ঠনের পর তারা এখন আর একটা নূতন কেল্লা তৈরি করেছিল—সেইখানে বোম্বেটেদের সঙ্গে তাদের বিষম যুদ্ধ হল। কিন্তু এবারেও স্পানিয়ার্ডরা জিততে পারলে না, মারাকেবো শহরের হতভাগ্য বাসিন্দারা আবার নরকযন্ত্রণা ভোগ করলে। সেই একই বিয়োগান্ত নাটকের পুনরাভিনয়। সবিস্তারে আর বর্ণনা করবার দরকার নেই।

তারপর জিব্রালটার নগরের পালা। কিন্তু লোলোনেজ তাদের যে সর্বনাশ করে গিয়েছিল, জিব্রালটারের বাসিন্দারা এখনও তা ভুলতে পারেনি। কাজেই বোম্বেটেদের সাড়া পেয়ে তারা পঙ্গপালের মতো দলে দলে শহর ছেড়ে পলায়ন করতে লাগল—সমস্ত মূল্যবান জিনিস সঙ্গে নিয়ে।

বোম্বেটেরা শহরে ঢুকে দেখলে—সে এক নিঝুম পুরী। না আছে রসদ, না আছে ধনরত্ন, না আছে জনমনুষ্য! চারিদিক সমাধির মতো খাঁ খাঁ করছে!

কেবল একটি লোক পালায়নি। তার পোষাক ময়লা, তালিমারা, ছেঁড়াখোড়া। বোম্বেটেরা জানত না যে, সে জন্মজড়ভরত—পাগল বললেও চলে।

তারা তাকে যত কথা শুধোয়, সে খালি বলে, "আমি কিছু জানি না, আমি কিছু জানি না।"

বোম্বেটেরা তখন তাকে নিজেদের প্রথামত বিষম যন্ত্রণা দিতে শুরু করলে।

পাগলা বললে, "ওগো, আর যাতনা দিওনা! আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমাদের আমার সমস্ত ঐশ্বর্য দান করচি!"

বোম্বেটেরা ভাবলে, এ লোকটা নিশ্চয়ই কোনও ধনী ব্যক্তি, কেবল তাদের চোখে ধুলো দেবার ফিকিরেই গরিবের সাজ পরেছে।

অতএব তারা তার সঙ্গে সঙ্গে চলল। পাগলা তাদের নিয়ে একখানা ভাঙা কুঁড়েঘরে গিয়ে বললে, "দেখো, আমার কত ঐশ্বর্য!"

ঘরের ভিতরে ছিল কেবল কতকগুলো মাটির বাসন ও গুটিতিনেক টাকা।

বোম্বেটেরা খাপ্পা হয়ে বললে, "কী! আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা? দেখ তবে মজাটা!"

পাগলা বললে, "জানো আমি কে? আমার নাম হচ্ছে শ্রীযুক্ত সিবাস্টিয়ান স্যানসেজ, আমি হচ্ছি মারাকেবোর লাটসাহেবের ভাই।"

বোম্বেটেরা তার কথা সত্য ভেবে নিয়ে অধিকতর লুব্ধ হয়ে তাকে আবার যন্ত্রণা দিতে লাগল। তাকে দড়িতে বেঁধে শূন্যে টেনে তুললে এবং তার গলায় ও দুই পায়ে বিষম ভারি ভারি বোঝা ঝুলিয়ে দিলে। তারপর সেই অভাগাকে পাপিষ্ঠরা জ্যান্ত অবস্থায় আগুনে পুড়িয়ে মারলে।

বোম্বেটেরা তারপর সে দেশের বনে বনে চারিদিকে খুঁজে বেড়াতে লাগল এবং অনেক চেষ্টার পর একে একে প্রায় আড়াইশ স্পানিয়ার্ডকে গ্রেপ্তার করলে।

স্পানিয়ার্ডদের সঙ্গে ছিল এক কাফ্রি গোলাম।

মর্গ্যান তাকে হুকুম দিলে, "ওরা কিছুতেই যখন টাকার কথা বলবে না, তখন ওদের দল খানিকটা হালকা করে দে!"

কাফ্রি গোলাম একে একে কয়েকজনকে হত্যা করলে—অন্যান্য বন্দীদের চোখের সামনেই। তারপর বোম্বেটেদের খুশি করবার জন্যে সেই দুষ্ট কাফ্রি একজন বৃদ্ধ স্পানিয়ার্ডকে দেখিয়ে বললে, "ওই লোকটা অনেক টাকার মালিক।"

বুড়োর কপাল পুড়ল। বোম্বেটেরা টাকা চাইলে, বুড়ো বললে, "এ পৃথিবীতে আমার যথাসর্বস্ব হচ্ছে চারশ টাকা।"

বোম্বেটেরা বিশ্বাস করলে না। দড়ি দিয়ে বেঁধে তারা সেই বুড়োর দু'খানা হাতই মড়মড় করে ভেঙে দিলে। তারপর তার হাত ও পায়ের বুড়ো আঙুলে দড়ি বেঁধে তাকে শূন্যে টেনে তুললে। সেই অবস্থায় তারা লাঠি দিয়ে দড়ির উপরে এমন ঝাঁকানি মারতে লাগল যে, প্রত্যেক ঝাঁকানির সঙ্গেই বৃদ্ধের ক্ষীণ প্রাণ বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা হল। এই বর্বরোচিত নিষ্ঠুরতাতেও খুশি না হয়ে বোম্বেটেরা বুড়োর পেটের উপরে সেই অবস্থাতেই আড়াই মণ বোঝা চাপিয়ে দিলে। এবং সেই সঙ্গে আগুন জ্বেলে হতভাগ্যের দাড়ি-গোঁফ, চুল ও মুখের চামড়া—সব পুড়িয়ে দিলে। তারপর তাকে নামিয়ে একটা থামে বেঁধে রাখা হল এবং চারদিন তাকে প্রায় অনাহারে রাখা হল বললেই চলে।

বুড়ো বেচারি খুব ছোট একটা সরাইখানা চালিয়ে কোনও রকমে দিন গুজরান করত। অনেক কষ্ট ও অনেক চেষ্টার পর কিছু টাকা ধার করে এনে বোম্বেটেদের দিয়ে সে যাত্রা সে মুক্তি পেল বটে, কিন্তু তার দেহ এমন ভয়ানক ভাবে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল যে, খুব সম্ভব তাকে আর বেশিদিন এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে হয়নি।

এরাই হচ্ছে প্রেমের অবতার খ্রিস্টদেবের শিষ্য—যাঁর ধর্মের বড় মন্ত্র হচ্ছে প্রেমের মন্ত্র। এবং এরাই ভারতবাসীদের ও আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের ঘৃণা করে বর্বর বলে। উপরন্তু এদের মতে এশিয়ার বাসিন্দারা নাকি নিষ্ঠুরতায় পৃথিবীতে অতুলনীয়। কিন্তু যেসব অকথ্য নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়ে ইংরেজ রাজের কাছ থেকে মর্গ্যান সম্মান, উপাধি ও উচ্চপদ লাভ করেছে, সেগুলোকে আমরা কি পরম করুণার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বলে মাথায় তুলে রাখব? মর্গ্যান ওখানে পূর্বকথিত ব্যাপারটিরও চেয়ে ভয়ানক এমন সব পৈশাচিক কাণ্ডের অনুষ্ঠান করেছিল, পাঠকরা সহ্য করতে পারবেন না বলে এখানে সেগুলোর কথা আর বললুম না। তাদের তুলনায় ঢের বেশি ভদ্র ও শান্ত দু'টো দৃষ্টান্ত এখানে দিচ্ছি।

অনেক স্পানিয়ার্ডকে ধরে মর্গ্যান পায়ে ও হাতে পেরেক মেরে ক্রুশে বিদ্ধ করে রেখেছিল—সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাতের ও পায়ের আঙুলগুলোর ফাঁকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল তৈলাক্ত সলিতা। এবং আরও অনেককে ধরে বেঁধে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে তাদের পাগুলোকে এমন কৌশলে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল যে, যাতে তারা 'রোস্টে'র মতো ধীরে ধীরে সিদ্ধ হয়। এত জঘন্য অত্যাচার কেবল সামান্য টাকার জন্যেই—যে টাকা পরে বোম্বেটেরা মদ খেয়ে জুয়া খেলে দু'দিনেই উড়িয়ে দেবে!

জিব্রালটার শহরে ঐশ্বর্যলাভের দিক থেকে কিছুই সুবিধা করে উঠতে না পেরে মর্গ্যান বুঝলে, এ যাত্রা কপাল তার ভাল নয়। কিন্তু সেই সময়েই খবর পাওয়া গেল, জিব্রালটারের গভর্নর অনেক ধনরত্ন ও শহরের স্ত্রীলোকদের নিয়ে নদীর মাঝখানে একটা দ্বীপে গিয়ে লুকিয়ে আছেন। মর্গ্যান অমনি নৌকো ভাসিয়ে সদলবলে তাদের ধরতে ছুটল।

খবর পেয়ে গভর্নর দ্বীপ থেকে পালিয়ে সকলকে নিয়ে একটা পাহাড়ের শিখরে উঠে বসে রইলেন। বোম্বেটেরাও নাছোড়বান্দা—তারাও পিছনে পিছনে ছুটল। তখন বর্ষাকাল। ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। পাহাড়ে যাবার পথে নদীর জল ফুলে উঠেছে। স্রোতের তোড়ই বা কী! নদী সেদিন পৃথিবীকে অনেকগুলো বোম্বেটের পাপভার সইবার দায় থেকে নিষ্কৃতি দিলে—স্রোতের টানে তারা একেবারে সটান পাতালে চলে গেল।

পাহাড়ের তলায় গিয়ে মর্গ্যানের সব আশা ফুরিয়ে গেল। খাড়া পাহাড়ের গা—পাঁচ সাত হাত উপরেও উঠবার উপায় নেই। একটিমাত্র সরু লিকলিকে পথ টঙে গিয়ে উঠেছে—সে পথে সার বেঁধে পাশাপাশি দু'জন যেতে পারে না। টঙ থেকে যদি একজনমাত্র স্পানিয়ার্ড গুলি চালায়, তাহলে একে একে শত শত বোম্বেটের দেহ হবে প্রপাতধরণীতলে। তার উপরে বৃষ্টির জলে বোম্বেটেদের সমস্ত বারুদ ভিজে জবজবে হয়ে গিয়েছে।

এই সময়ে যদি মাত্র পঞ্চাশজন স্পানিয়ার্ড বুক বেঁধে আক্রমণ করত, তাহলে সেই চার-পাঁচশ বোম্বেটে মনুষ্যসমাজকে আর যন্ত্রণা দেবার সুযোগ পেত না। কিন্তু ঘা খেয়ে খেয়ে স্পানিয়ার্ডরা তখন নেতিয়ে পড়ে সব সাহস থেকেই বঞ্চিত হয়েছে। তারা আক্রমণ করবে কি, গাছের পাতাটি নড়লেও 'ওই বোম্বেটে আসছে' ভেবে আঁতকে পালিয়ে যায়।

কিন্তু মর্গ্যান তা বুঝতে পারেনি। সেই সরু পথে যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর ছায়া দেখে সে আর অগ্রসর হতে সাহস করলে না, সমস্ত লোকজন নিয়ে মানেপ্রাণে সেখান থেকে সরে পড়ল।

জিব্রালটার নগরে ফিরে এসে পাঁচ হপ্তা ধরে নারকীয় কাণ্ড করবার পর বোম্বেটেরা বিষম এক দুঃসংবাদ পেলে। স্পানিয়ার্ডদের তিনখানা বড় বড় যুদ্ধজাহাজ মারাকেবো বন্দরে এসে

হাজির হয়েছে। সবচেয়ে বড় জাহাজখানায় কামান আছে চল্লিশটা, তার চেয়ে কিছু ছোট জাহাজে ত্রিশটা, সব ছোট জাহাজে চব্বিশটা। মর্গ্যানের সবচেয়ে বড় জাহাজেও চোদ্দটার বেশি কামান নেই।

বোম্বেটেদের ফেরবার পথ হচ্ছে মারাকেবো বন্দরের ভিতর দিয়েই। তাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল! আর বুঝি রক্ষা নেই—পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবার সময় এসেছে!

কিন্তু সত্যিকার নেতার আসল গুণ হচ্ছে, দারুণ বিপদেও হাল না ছাড়া। এ গুণ মর্গ্যানেরও ছিল। সে বুক ফুলিয়ে বললে, "কুছ পরোয়া নেই! আসুক ওরা,—আমরাও লড়াই করব!"

স্পানিয়ার্ড নৌ-বাহিনীর অ্যাডমিরালের এক চিঠি এল

"বোম্বেটে সর্দার মর্গ্যান, আমাদের মহারাজের রাজত্বে এসে তুমি যেসব ভীষণ উৎপাত করছ, তা আমি শুনেছি। অতঃপর তুমি যদি আমার কাছে বিনাবাক্যব্যয়ে আত্মসমর্পণ কর আর লুটের সমস্ত মাল ও বন্দীদের ফিরিয়ে দাও, তাহলে আমি স্বীকার করছি, তোমাদের সকলকেই ছেড়ে দেব। আর আমাদের কথা যদি না শোনো, তাহলে এও প্রতিজ্ঞা করছি যে, তোমাদের প্রত্যেককেই আমি বধ না করে ছাড়ব না!"

বোম্বেটেদের পরামর্শসভা বসল। মর্গ্যানের কথার উত্তরে সকলেই একবাক্যে বললে, "সর্দার, জান কবুল! এত বিপদ সয়ে আমরা যে লুটের মাল পেয়েছি আর তা ফিরিয়ে দেব না! যতক্ষণ আমাদের শেষ রক্তবিন্দু থাকবে ততক্ষণ আমরা আত্মসমর্পণ করব না!"

তবু যদি ভালয় ভালয় এই বিপদ চুকে যায়, সেই আশায় মর্গ্যান অ্যাডমিরালের কাছে তিনটি প্রস্তাব করে পাঠালে প্রথমত, আমরা আর মারাকেবো শহরের কোনও অনিষ্ট করব না বা বাসিন্দাদের কাছ থেকে কোনও অর্থ দাবি করব না। দ্বিতীয়ত, বন্দীদের আমরা স্বাধীনতা দেব। তৃতীয়ত, কেবল জিব্রালটারের বাসিন্দারা আমাদের যে অর্থ দেবে বলে স্বীকার করেছে, তা না পাওয়া পর্যন্ত এখানকার চারজন প্রধান ব্যক্তি জামিনদার রূপে আমাদের সঙ্গে থাকবে।

অ্যাডমিরাল জবাবে বলে পাঠালেন : "তোমাদের আর দু'দিন সময় দিলুম। এর মধ্যে যদি আত্মসমর্পণ না কর, তাহলে তোমাদের কারুকে আমি ক্ষমা করব না।"

মর্গ্যান খাপ্পা হয়ে বললে, "সাজো তবে সবাই রণসাজে! নিজের জোরে আমরা এই ফাঁদ ছিঁড়ে বেরিয়ে যাব। দেখি, আমাদের কে রুখতে পারে!"

তখনই তারা সর্বাগ্রে একখানা অগ্নিপোত নির্মাণে নিযুক্ত হল। অগ্নিপোত কাকে বলে এদেশের অনেকেই বোধহয় তা জানেন না। সেকালে জলযুদ্ধে প্রায়ই এই অগ্নিপোত ব্যবহৃত হত। এই অগ্নিপোতের ভিতরে সহজে জ্বলে ওঠে এমন সব জিনিস ভাল করে ঠেসে দেওয়া হত। তার বাইরেটা হত সাধারণ জাহাজের মতোই—কাজেই শত্রুপক্ষ তাকে সন্দেহ করতে পারত না। তারপর সেই অগ্নিপোতখানার ভিতরে আগুন লাগিয়ে শত্রুদের নৌবাহিনীর মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হত। শত্রুদের জাহাজগুলোর কাছে সে যখন যেত, তার সর্বাঙ্গ অগ্নিময় এবং সেই আগুন শত্রুদের জাহাজও অগ্নিময় করে তুলত। আজকালকার যুদ্ধযাহাজ হয় শীঘ্রগামী ও লৌহময়, তাই অগ্নিপোতের ব্যবহার এখন উঠে গেছে।

বোম্বেটেরা সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে বড় বড় নৌকোয় চড়ে বসল, অগ্নিপোতখানাকে সঙ্গে নিলে, তারপর মারাকেবো বন্দরের দিকে তারা অগ্রসর হল, অগ্নিপোতখানা যেতে লাগল আগে আগে।

তারা সন্ধ্যার সময়ে বন্দরে গিয়ে স্পানিয়ার্ড নৌ-বাহিনীকে দেখতে পেলে। এগুলো প্রকাণ্ড জাহাজই বটে, এদের সঙ্গে সাধারণভাবে লড়াই করবার সাধ্য তাদের ছিল না।

দুই পক্ষই পরস্পরকে দেখতে পেয়ে পরস্পরের দিকে অগ্রসর হল।

বোম্বেটেদের অগ্নিপোত দেখে স্পানিয়ার্ডরা তার সাংঘাতিক স্বরূপ আন্দাজ করতে পারলে না। তারা ভাবলে, একখানা অতিসাহসী বোম্বেটে জাহাজ একলাই তাদের আক্রমণ করতে আসছে। অতিসাহসের মজাটা বুঝিয়ে দেবার জন্যে তারা বিপুল উৎসাহে তাকে আক্রমণ করবার জন্যে বেগে তেড়ে এল।

কিন্তু তার কাছে এসেই তাদের চক্ষুস্থির! এ যে অগ্নিপোত, এর ভিতরে যে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে এবং সে আগুন হুহু করে বেড়ে উঠছে মুহূর্তে মুহূর্তে!

স্পানিয়ার্ডদের জাহাজ তিনখানা পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করল—কিন্তু তখন পালাবারও সময় নেই। অগ্নিপোত একেবারে সব চেয়ে বড় শত্রুজাহাজের পাশে গিয়ে লাগল—তখন তার ভিতরকার অগ্নি ঠিক যেন অসংখ্য জ্বলন্ত রক্তদানবের মতো মহাশূন্যে বাহু তুলে তাথৈ তাথৈ তাণ্ডবনৃত্য করছে! মাঝে মাঝে তার গর্ভস্থ বারুদ বিস্ফোরণের ভৈরবধ্বনি,—কান কালা হয়ে যায়!

দেখতে দেখতে স্পানিয়ার্ডদের অতিকায় জাহাজখানাও অগ্নিপোতের মতোই অগ্নিময় হয়ে উঠল! এবং দেখতে দেখতে তার একাংশ আগুনে পুড়ে জীর্ণ হয়ে সমুদ্রগর্ভে অদৃশ্য হয়ে গেল!

স্পানিয়ার্ডদের দ্বিতীয় জাহাজখানা ভয়ে আর সেখানে দাঁড়াল না, তাড়াতাড়ি বন্দরের নিরাপদ অংশে ঢুকে পড়ে একেবারে কেল্লার তলায় গিয়ে উপস্থিত হল। পাছে সেখানা বোম্বেটেদের হাতে গিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে স্পানিয়ার্ডরা নিজেরাই তাকে জলের ভিতরে ডুবিয়ে দিলে।

বোম্বেটেরা তৃতীয় জাহাজখানাকে পালাতেও দিলে না। তারা চারিদিক থেকে প্রবল বেগে তাকে আক্রমণ করলে। এমন দুর্জয় নৌ-বাহিনীর এই কল্পনাতীত পরিণাম দেখে স্পানিয়ার্ডরা তখন ভয়ে ও বিস্ময়ে এত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে যে, বোম্বেটেদের সঙ্গে তারা মাথা ঠিক রেখে লড়তেও পারলে না। অল্পক্ষণ যুদ্ধের পরেই তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল।

কাপ্তেন মর্গ্যানের এই বিচিত্র ও অপূর্ব জয়কাহিনী যখন ইংলণ্ডে গিয়ে পৌঁছল, তখন সেখানেও তার নামে ধন্য ধন্য রব উঠল। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজে বোম্বেটেমহলে তার নাম হল যেন উপাস্য দেবতার নাম! কথায় বলে, ঢাল নেই—খাঁড়া নেই, নিধিরাম সর্দার! কিন্তু ঢাল-খাঁড়া না থাকলেও কেবল উপস্থিত বুদ্ধিবলে যে কি অসাধ্য সাধন করা যায়, নিধিরাম তা জানলে আজ তাকে ঠাট্টার পাত্র হতে হত না। কেবল বুদ্ধিবলেই কাপ্তেন মর্গ্যান আজ বিনা জাহাজে জলযুদ্ধ-বিজয়ী নাম কিনলে!

একাদশ পরিচ্ছেদ

একটিমাত্র তীরে কেল্লা ফতে!

যেমন হয়, এবারেও তেমনই হল! জুয়াখেলা, মাতলামি, বদমাইশি! নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে, শত শত সাধুর জীবনদীপ নিবিয়ে দিয়ে, দুনিয়ার অভিশাপ কুড়িয়ে বোম্বেটেরা যে

টাকা রোজগার করলে, জামাইকা দ্বীপে ফিরে এসে তা দু'হাতে বদখেয়ালিতে উড়িয়ে দিতে তারা কিছুমাত্র বিলম্ব করলে না!

অল্পদিন পরেই দেখা গেল, বোম্বেটেদের পকেট আর বাজে না, তা একেবারেই ফোক্কা!

কাপ্তেন মর্গ্যান ছিল চালাক মানুষ। উড়নচণ্ডীর পুজো সে করেনি কোনওদিন, খরচ করত বুঝেসুঝে। কাজেই এর মধ্যেই সে এমন দু'পয়সা জমিয়ে ফেলেছিল যে ইচ্ছে করলেই বাকি জীবনটা পায়ের উপরে পা দিয়ে গদিয়ান হয়ে বসে বসে খেতে পারত।

কিন্তু তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সামান্য ছিল না। সে চায় এমন যশের শিখরে উঠে দাঁড়াতে, যার নাগাল কেউ পাবে না! দুনিয়ায় অনেক ছোট ডাকাত পরে রাজা মহারাজা হয়েছে, সাগরবাসী বোম্বেটেই বা কেন দেশমান্য মহাপুরুষ হতে পারবে না? হয়তো এমনই সব কথাই ভেবে মনটা তার উসখুস করছিল আবার সাগরে আর সাগরের তীরে তীরে কালবৈশাখীর মতো ছুটে যেতে!

এমন সময়ে এসে ধর্না দিলে তার লক্ষ্মীছাড়া চ্যালা-চামুণ্ডার দল!

—"কিহে, খবর কি? মুখ অত শুকনো কেন?"

—"সর্দার! আমরা খেতে পাচ্ছি না!"

—"বেশ তো, সেজন্য ভাবনা কি? টাকা রোজগার করো!"

—"আমরা তো সেইজন্যেই তোমার কাছে এসেছি সর্দার! আমরা খেতে পাচ্ছি না। আমরা টাকা রোজগার করতে চাই। আমরা আবার সমুদ্রে ভাসতে চাই!"

মর্গ্যান হাসিমুখে বললে, "আচ্ছা, তাই হবে। তোমরা প্রস্তুত হও।"

—"আমরা প্রস্তুত! পাওনাদার হতভাগারা ভারি ছোটলোক, তারা এখানে আমাদের আর তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না!"

মর্গ্যান যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল। এবার সে যে আয়োজনে নিযুক্ত হল, তার আগে পৃথিবীতে আর কোনও পেশাদার বোম্বেটে স্বপ্নেও তা করেছে কিনা সন্দেহ! তার আয়োজনের বিপুলতা দেখলে তাকে আর বোম্বেটে বলেও মনে হবে না। ছোটখাট লুটপাট বা রাহাজানি যারা করে, পৃথিবী তাদের ডাকাত বলে ডাকে। কিন্তু চেঙ্গিজ খাঁ, তৈমুর লং, আলেকজান্দার, সিজার, নাদির শা বা নেপোলিয়নকে ডাকাত বলতে সাহস করে না কেউ। এই হিসাবে, মর্গ্যানও আজ বেঁচে থাকলে, তাকে বোম্বেটে বলে ডাকলে হয়তো মানহানির মামলা আনতে পারত!

মর্গ্যানের এবারকার নৌ-বাহিনীতে জাহাজের সংখ্যা হল সাঁইত্রিশখানা! অ্যাডমিরালের—অর্থাৎ মর্গ্যানের—জাহাজে ছিল বাইশটা প্রকাণ্ড কামান ও ছয়টা ছোট পিতলের কামান। বাকি কোনওখানাতে বিশটা, কোনওখানাতে আঠারটা, কোনওখানাতে ষোলটা, এবং সবচেয়ে ছোট জাহাজেও কামানের সংখ্যা ছিল অন্তত চারটে। লোকও গেল অনেক। তাদের নাবিক ও চাকরবাকর ছিল ঢের, কিন্তু তাদের বাদ দিলেও সৈনিক বা বোম্বেটেরা গুণতিতে দাঁড়াল পুরোপুরি দুই হাজার! এবারে মর্গ্যান নিজের দলকে আর বোম্বেটের দল বলতেও রাজি হল না, তার মতে তারা হচ্ছে ইংলণ্ডপতির কর্মচারী! যারা ইংলণ্ডের রাজার মিত্র নয়, তাদের সঙ্গেই সে নাকি লড়াই করতে যাচ্ছে! ইংলণ্ডের রাজার বিনা হুকুমের ও বিনা মাহিনার ভৃত্য হয়ে তারা নিজেদের পাপকার্য অর্থাৎ নরহত্যা, দস্যুতা ও লুণ্ঠনকেও বৈধ বলে প্রমাণিত করতে চলল।

তারপর আরম্ভ হল আগেকার দৃশ্যেরই পুনরাভিনয়—জলে স্পানিয়ার্ড জাহাজ দেখলেই তারা দখল করে, স্থলে স্পানিয়ার্ডদের শহর বা গ্রাম পেলেই লুণ্ঠন করে, বন্দীদের মেরে ফেলে বা মারাত্মক শাস্তি দেয়। সেন্ট কাথারাইন দ্বীপও তারা অধিকার করলে। কিন্তু এসব কথা আর খুঁটিয়ে না বললেও চলবে।

আমরা এখানে বোম্বেটে মর্গ্যানের জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল ঘটনার কথাই বলব—অর্থাৎ পানামা অধিকার।

পানামার নাম জানে না, সভ্য পৃথিবীতে এখন এমন লোক বোধহয় নেই। সকলেই জানেন, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সংযোগস্থলে আছে এই নগরটি। পানামায় তখন ছিল স্পানিয়ার্ডদের প্রভুত্ব, এখন তা স্বাধীন প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। পানামা নগরের বর্তমান লোকসংখ্যা ৫৯,৪৫৮।

কিন্তু পানামার পথঘাট বোম্বেটেদের ভাল করে জানা ছিল না। কাপ্তেন মর্গ্যান তখন পানামা অঞ্চলের কোনও ডাকাতকে খুঁজতে লাগল। পৃথিবীতে সাধু খুঁজে পাওয়াই প্রায়ই অসম্ভব ব্যাপার, অসাধুর সন্ধান পাওয়া তো অত্যন্ত সহজ! অবিলম্বেই পানামার তিন ডাকাতকে পাওয়া গেল—নৃশংস ও নিম্নশ্রেণীর ডাকাত। লুটের লোভে তারা এক কথাতেই মর্গ্যানের পথপ্রদর্শক হবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলে।

পানামায় যেতে হলে চাগ্রে নদীর ধারে একটা দুর্ভেদ্য কেল্লা পার হয়ে যেতে হয়। মর্গ্যান আগে সেই কেল্লাটা দখল করবার জন্যে সৈন্য ও সেনাপতি পাঠিয়ে দিলে। যেমন নেতা, তেমনই সেনাপতি! তার নাম কাপ্তেন ব্রোডলি, এ অঞ্চলে অগুণতি ডাকাতি করে সে দুর্নাম কিনতে পেরেছে যথেষ্ট। তিনদিন পরে সে চাগ্রে দুর্গের কাছে গিয়ে হাজির হল—স্পানিয়ার্ডরা তাকে সেন্ট লরেন্স দুর্গ বলে ডাকত। এই দুর্গটি উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত—তার চারিদিকে শক্ত পাথরের মতো পাঁচিল। পাহাড়ের শিখরদেশ দুই ভাগে বিভক্ত, মাঝখানে ত্রিশফুট গভীর এক খাল। সেই খালের উপরকার টানা সাঁকোর সাহায্যে দুর্গের একমাত্র প্রবেশপথের ভিতরে ঢোকা যায়। বড় দুর্গের তলায় আছে আবার একটা ছোট—কিন্তু রীতিমতো মজবুত কেল্লা, —আগে সে কেল্লা ফতে না করে নদীর মুখে প্রবেশ করাই অসম্ভব।

গুণধর বোম্বেটেদের সঙ্গে চোখের দেখা হতেই স্পানিয়ার্ডরা মুষলধারে গোলাগুলি বৃষ্টি শুরু করলে। কেল্লা তখনও মাইল তিনেক তফাতে। পথঘাট ধুলোকাদায় ভরা, চলতে বড় কষ্ট। তবু বোম্বেটেরা দাঁড়াল না, তারা যত এগোয় স্পানিয়ার্ডরা ততই পিছিয়ে যায়। এইভাবে অগ্রসর হয়ে বোম্বেটের দল দুর্গের কাছে খোলা জমিতে এসে পড়ল।

ইতিমধ্যেই তাদের লোকক্ষয় হয়নি বড় কম। কিন্তু এখন তাদের বিপদ আরও বেড়ে উঠল। খোলা জমি, শত্রুপক্ষের গুলির ধারা সিধে তাদের দিকে ছুটে আসছে, কোথাও এমন ঠাঁই নেই যে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করা যায়। সামনেই কামানের সারের পর সার সাজিয়ে খাড়া হয়ে আছে বিরাট ওই দুর্গ, দেখলেই মনে হয় ওকে দখল করা অসম্ভব। এবং এই মুক্ত স্থানে আর অপেক্ষা করাও সম্ভবপর বা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। এখন হয় পালানো, নয় আক্রমণ করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই! পালালে অপমান, এগুলেও পরাজয় বা মৃত্যু!

হতাশভাবে গোলোকধাঁধায় পড়ে বোম্বেটেরা অনেকক্ষণ পরামর্শের পর স্থির করল—দুর্গ আক্রমণ করতেই হবে—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন!...এক হাতে তরবারি ও আর এক হাতে বোমা নিয়ে তারা অগ্রসর হতে লাগল অকুতোভয়ে!

স্পানিয়ার্ডরা দুর্গপ্রাকার থেকে কামান ছুড়ছে, ছুড়ছে আর ছুড়ছেই! বোম্বেটেরা হতাহতের ভিতর দিয়ে পথ করে যখন আরও কাছে এগিয়ে এল, স্পানিয়ার্ডরা তখন চিৎকার করে বললে, "ওরে ইংরেজ কুত্তার দল! তোরা হচ্ছিস ভগবান আর আমাদের রাজার শত্রু! আয়, এগিয়ে আয়, তোদের পিছনে যারা আছে তারাও এগিয়ে আসুক! তোদের আর এ যাত্রা পানামায় যেতে হচ্ছে না।"

বোম্বেটেরা কেল্লার পাঁচিলের উপরে ওঠবার চেষ্টা করলে—কিন্তু বৃথা! গরম গরম গোলার ঝড়ে ও গুলির বৃষ্টিতে জীবন্ত সব দেহ মুহূর্তে মৃতদেহে পরিণত হল! তখন সে রাত্রের মতো তারা যুদ্ধে ক্ষান্তি দিয়ে পালিয়ে এল।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার যুদ্ধ আরম্ভ! বোম্বেটেরা বোমা ছুড়ে যখন কেল্লার পাঁচিলকে কাবু করবার চেষ্টা করছে, তখন আশ্চর্য এক কাণ্ড হল! তখন বন্দুকের ব্যবহার আরম্ভ হলেও ধনুকের ব্যবহার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। স্পানিয়ার্ডরা বন্দুকের সঙ্গে ধনুকও ছুড়ছিল। হঠাৎ একটা তীর এসে একজন বোম্বেটের দেহকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিলে। কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করেই সে সেই তীরটা নিজের বুকের উপর থেকে একটানে আবার উপড়ে ফেললে। তারপর তার কি খেয়াল হল খানিকটা তুলো নিয়ে তীরের গায়ে জড়িয়ে সেটা নিজের বন্দুকের নলচের ভিতরে পুরে দুর্গ লক্ষ্য করে সে গুলি ছুড়লে! গুলির সঙ্গে তীরটাও বন্দুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে দুর্গের ভিতরে গিয়ে পড়ল। দুর্গের ভিতরে যেসব বাড়ি ছিল সেগুলোর ছাদ হচ্ছে তালপাতায় ছাওয়া। তীরসংলগ্ন জ্বলন্ত তুলোর গুণে দুই তিনখানা বাড়ির ছাদে আগুনের শিখা দেখা দিলে। যুদ্ধে ব্যস্ত স্পানিয়ার্ডরা সেদিকে নজর দেবার সময় পেলে না। সকলের অজ্ঞাতসারেই সেই অদ্ভুত উপায়ে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি একরাশ বারুদের স্তূপকে স্পর্শ করলে,—সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত, বিষম বারুদ-গর্জন, বহুকণ্ঠের সচকিত চিৎকার ও স্পানিয়ার্ডদের সভয়ে ছুটোছুটি! যুদ্ধ ভুলে সকলেই তাড়াতাড়ি আগুন নেবাবার চেষ্টা করতে লাগল।

বোম্বেটেরা এমন মহা সুযোগ ত্যাগ করলে না, দৈবের অনুগ্রহে আবিষ্কৃত পূর্বকথিত উপায়ে তারা দুর্গের আরও নানা জায়গায় অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করলে। স্পানিয়ার্ডদের ভয়, কাতরতা ও ব্যস্ততা বেড়ে উঠল—একটা আগুন নেবায় তো আরও দু'জায়গায় দপদপ করে নূতন আগুন জ্বলে উঠে!

সেই আগুনে অবশেষে অনেক জায়গায় দুর্গের বেড়া উড়েপুড়ে গেল এবং প্রাচীরের বিরাট মৃত্তিকাস্তূপ ধসে নিচেকার খাল ভরাট করে ফেললে! বোম্বেটেরা তার সাহায্যে অনায়াসে খাল পার হয়ে দুর্গের প্রথম প্রাচীরের ভিতরে গিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল।

তবু যুদ্ধ থামল না—গভীর রাত্রে মানুষেরা স্বজাতিকে ধ্বংস করবার জন্য বন্যপশুর মতো যুঝতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোম্বেটেদের কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারলে না। সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল দেখে বীর স্পানিয়ার্ডরা আত্মসমর্পণের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয় ভেবে দলে দলে জলে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নিলে। দুর্গের গভর্নরও জীবন থাকতে আত্মদান করলেন না, বোম্বেটেরা যখন তাঁর দেহ স্পর্শ করতে পারলে, তখন তাঁর আত্মা পরলোকে। দুর্গের তিনশ চোদ্দজন লোকের মধ্যে জ্যান্ত অবস্থায় পাওয়া গেল মাত্র ত্রিশজন লোক—তাদের মধ্যেও কুড়িজন আহত। কেবল

নয়জন লোক পানামার গভর্নরের কাছে খবর দিতে গেছে—বাকি সবাই মৃত! বোম্বেটেদেরও ক্ষতি বড় সামান্য নয়। তাদের একশজন হত ও সত্তরজন আহত হয়েছে।

জীবিত স্পানিয়ার্ডরা শারীরিক যন্ত্রণার চোটে স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, পানামার গভর্নর বোম্বেটেদের আগমনের সব খবরই আগে থাকতেই পেয়েছেন এবং আগে থাকতেই তাদের ভাল করে অভ্যর্থনা করবার জন্যে দস্তুরমতো প্রস্তুত হয়ে আছেন। চাগ্রে নদীর ধারে সর্বত্রই তাঁর সৈন্যরা অপেক্ষা করছে এবং সর্বশেষে তিনিও অপেক্ষা করছেন তিন হাজার ছয়শ সৈন্য নিয়ে।

অতঃপর বোম্বেটেদের উচ্চ জয়ধ্বনির মধ্যে কাপ্তেন মর্গ্যান তার বাকি বারশত সৈন্য নিয়ে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলে। পানামা বিজয়ের পথের কাঁটা দূর হয়েছে, সকলের মুখেই হাসি আর ধরে না।

যে একশ বোম্বেটে অর্থলোভে সেখানে প্রাণ দিলে, জীবিত সঙ্গীদের মুখের হাসি দেখবার সুযোগ তাদের দেহহীন আত্মারা সেদিন পেয়েছিল কিনা কে জানে!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পানামার যুদ্ধ

১৬৭০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই আগস্ট তারিখে কাপ্তেন মর্গ্যান চাগ্রে দুর্গ ছেড়ে পানামা নগরের দিকে অগ্রসর হল সদলবলে।

যাত্রা শুরু হল জলপথে, নদীতে নৌকোয় চড়ে। যতই অগ্রসর হয়, দেখে নদীর দুই নির্জন তীর মরু-শ্মশানের মতো হা হা করছে, শস্যক্ষেতে কৃষক নেই, গ্রামে বাসিন্দা নেই, পথে কুকুর-বিড়াল নেই, কোথাও জীবনের এতটুকু চিহ্ন পর্যন্ত নেই! স্পানিয়ার্ডরা সবাই পালিয়েছে তাদের ভয়ে এবং সঙ্গে করে নিয়ে গেছে জীবনের যত কিছু আনন্দ!

প্রথম থেকেই ঘটল খাদ্যাভাব। মর্গ্যান সঙ্গে বেশি খাবার নিয়ে ভারগ্রস্ত হতে চায়নি, ভেবেছিল পথে লোকালয়ে নেমে তরোয়াল উঁচিয়ে বিনামূল্যে প্রচুর খাদ্য আদায় করবে। তার সে আশায় ছাই পড়ল। মানুষ নেই, খাবারও নেই। শূন্য উদরের অভাব ভোলবার জন্যে বোম্বেটেরা তামাকের পাইপ মুখে দিয়ে অন্যমনস্ক হবার ব্যর্থ চেষ্টা করে।

তারপর জলপথে নৌকোও হল অচল। বৃষ্টির অভাবে নদী ক্রমেই শুকিয়ে আসছে। নৌকো ছেড়ে বোম্বেটেরা ডাঙায় নামল। চলতে চলতে তারা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে লাগল, শত্রুরা তাদের আক্রমণ করতে আসুক! কারণ শত্রুরা এলে খাবারও তাদের সঙ্গে আসবে এবং শত্রু মেরে তারা সেই খাবারে ভাগ বসাতে পারবে!

আজ যাত্রার চতুর্থ দিবস। আজ শত্রুদের বদলে তাদের পরিত্যক্ত একটা ছাউনি পাওয়া গেল, তার ভিতরে পড়ে ছিল অনেকগুলো চামড়ার ব্যাগ, হয়তো ভুলে ফেলে গেছে! ক্ষুধার্ত বোম্বেটেরা পরম আনন্দে সেই শুকনো চামড়ার ব্যাগগুলো নিয়েই কাড়াকাড়ি করতে লাগল—গরম জলে সিদ্ধ ও নরম করে সেই ব্যাগের চামড়াই খেয়ে আজ তারা পেটের জ্বালা নিবারণ করবে!

পঞ্চম দিনে তারা আর এক জায়গায় এসে স্পানিয়ার্ডদের আর একটা পরিত্যক্ত ছাউনি আবিষ্কার করলে। কিন্তু হায় রে, একটা চামড়ার ব্যাগ পর্যন্ত এখানে পাওয়া গেল না! কী দুর্ভাগ্য! এ হতচ্ছাড়া দেশে কি একটা জ্যান্ত কুকুর বা বিড়াল পর্যন্ত ল্যাজ নাড়ে না? নিদেন দু'চারটে ইঁদুর?

লোকে গালাগালিতে জুতো খেতে বলে। তারাও হয়তো জুতো খেতে রাজি ছিল—ব্যাগ আর জুতোর চামড়ায় তফাৎটা কি? কিন্তু জুতোগুলোও খেয়ে ফেললে খালি পায়ে এইসব কাঁটাভরা জঙ্গল আর কাঁকরভরা উঁচুনিচু পথ দিয়ে ক্রোশের পর ক্রোশ পার হয়ে ধনরত্ন লুটতে যাবে কেমন করে?

তারা বাংলাদেশের সেপাই হলে জুতোগুলো এত সহজে রেহাই পেত না। বাংলায় খালিপায়ে কাঁকর বেঁধে না, কাঁটা ফোটে না!

অনেকে বোধ করি অবাক হচ্ছেন? কিন্তু এতে অবাক হবার কী আছে? পেটের জ্বালা কেমন, দুর্ভিক্ষের দেশ তা জানে। পেটের জ্বালায় মানুষ মানুষের মাংসও বাদ দেয় না। ইতালির এক কারারুদ্ধ কাউন্ট নাকি ক্ষিধের চোটে নিজের ছেলের মাংসও খেতে ছাড়েননি।

...এই নির্জন মরু-শ্মশানে দেবতার হঠাৎ এ কী আশীর্বাদ! কলির দেবতারাও হয়তো ভীতু, কারণ প্রায়ই তাঁরা অসাধুর দিকেই মুখ তুলে চান। বোম্বেটেরা পথের মাঝে এক পাহাড়ের গুহা আবিষ্কার করলে, তার ভিতরে পাওয়া গেল খাবারের ভাণ্ডার—এমন কি ফল আর মদ পর্যন্ত! সম্ভবত স্পানিয়ার্ডরা পালাবার সময়ে এগুলো এখানে লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল!

সবাই উপোসী শকুনির মতো সেই ভাণ্ডার লুণ্ঠন করলে। ভাল করে না হোক, পেট তবু কতকটা ঠাণ্ডা হল।

ষষ্ঠ দিনেও পথের শেষ নেই। কখনও জলপথ, কখনও স্থলপথ,—যখন যেমন সুবিধা। আবার অশ্রান্ত ক্ষুধার আবির্ভাব। চারিদিক তেমনই নিরালা আর নিঝুম, যারা পালিয়েছে তারা খাবারের গন্ধটুকু পর্যন্ত চেঁচেমুছে নিয়ে পালিয়েছে! বোম্বেটেরা মনে মনে কেবল শত্রুকে ডাকতে লাগল। শত্রু! সেও আজ মিত্রের মতো! কেউ গাছের পাতা ছিঁড়ে ও কেউ মাঠের ঘাস উপড়ে মুখে পুরে উদরের শূন্যতাকে ভরাবার চেষ্টা করতে লাগল। স্পানিয়ার্ডরা লড়ে তাদের এমন জব্দ করতে পারত না! গা ঢাকা দিয়ে তারা তাদের কী মারাত্মক শাস্তিই দিচ্ছে! প্রায় দেড়শ বৎসর পরে নেপোলিয়ন এবং খ্রিস্ট জন্মাবারও আগে পারস্যের এক সম্রাট রুশদেশ আক্রমণ করতে গিয়ে এমনই শাস্তিই পেয়েছিলেন।

শয়তানদের উপরে আবার দেবতার দয়া হল! এবারে এক চাষার বাড়িতে তারা পেলে ভুট্টার ভাণ্ডার। ভাঁড়ার লুটে তারা যত পারলে খেলে, বাকি মাল সঙ্গে করে নিয়ে চলল। কিন্তু বারশ ক্ষুধার্ত ডাকাতের কাছে সে ভুট্টার অস্তিত্ব আর কতক্ষণ! ক্ষুধা মিটল না, তবে আপাতত প্রাণ রক্ষা হল বটে!

সপ্তম দিনে দেখা গেল—দূরে একটা ছোট শহর, তার উপরে উড়ছে ধোঁয়া। বোম্বেটেরা আনন্দে নেচে উঠল। কারণ বিনা কার্য হয় না, আগুন বিনা ধোঁয়া হয় না। আর আগুন মানুষ ছাড়া আর কেউ জ্বালে না। বাসিন্দারা নিশ্চয়ই রাঁধছে—ও ধোঁয়া উনুনের ধোঁয়া।

পাগলের মতো তারা শহরের দিকে ছুটল—শূন্যে আকাশকুসুম চয়ন করতে করতে! এই তো, শহর তাদের সামনেই!

কারণ বিনা কার্য হয় না, আগুন বিনা ধোঁয়া হয় না। আর, আগুন মানুষ ছাড়া আর কেউ জ্বালে না।...হ্যাঁ, এ আগুনও মানুষই জ্বেলেছে বটে, স্পানিয়ার্ডরা শহর ছেড়ে অদৃশ্য হয়েছে এবং যাবার সময়ে শহরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে গেছে। বোম্বেটেরা এখানে ক্ষুদকুড়োটি পর্যন্ত পেলে না। একটা জ্যান্ত বা মরা কুকুর বিড়ালও শত্রুরা রেখে যায়নি।

একটা আস্তাবলে পাওয়া গেল কেবল প্রচুর মদ আর পাঁউরুটি। অমনি তারা সারি সারি বসে গেল ফলারে! কিন্তু পানাহার শুরু করতেই তাদের শরীর যাতনায় দুমড়ে পড়ল। চারিদিকে রব উঠল—'শত্রুরা খাবারে বিষ মিশিয়ে রেখে গেছে!' ভয়ে আঁতকে উঠে থু থু করে তারা তখনই মুখের খাবার ধুলোয় ফেলে দিলে।

অষ্টম দিনে বোম্বেটেরা পানামা নগরের খুব কাছে এসে পড়ল। ঘণ্টাদশেক পথ চলার পর তারা বনের ভিতরে একটা পাহাড়ের কাছে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই তাদের উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর বৃষ্টি হতে লাগল। তীর দেখেই বোঝা গেল, রেড ইন্ডিয়ানরাও স্পানিয়ার্ডদের পক্ষ অবলম্বন করেছে। বোম্বেটেরা বেজায় ভয় পেয়ে গেল, কারণ এ সব তীর যারা ছুড়ছে তাদের টিকিটি পর্যন্ত কারুর নজরে পড়ল না।

বোম্বেটেরা বনপথে এগুবার চেষ্টা করলে, অমনি রেড ইন্ডিয়ানরা বিকট চিৎকার করতে করতে তাদের দিকে ছুটে এল। কিন্তু একে তাদের দল বোম্বেটেদের মতো পুরু নয়, তার উপরে তাদের আগ্নেয় অস্ত্রেরও অভাব, সুতরাং বেশিক্ষণ তারা যুঝতে পারলে না। রেড ইন্ডিয়ান সর্দার আহত হয়ে পড়ে গিয়েও আত্মসমর্পণ করলে না, কোনওরকমে একটু উঠে বসে একটা বোম্বেটের দিকে বর্শা নিক্ষেপ করলে, কিন্তু পর মুহূর্তেই পিস্তলের গুলিতে তার যুদ্ধের শখ এ জীবনের মতন মিটে গেল!

খানিক পরেই একটা বনের ভিতরে পাওয়া গেল দুটো পাহাড়। একটা পাহাড়ের উপরে উঠে বোম্বেটেরা দেখলে, অন্য পাহাড়টার উপরে চড়ে বসে আছে স্পানিয়ার্ড ও রেড ইন্ডিয়ানরা। তারা তখন নিচে এল। তাই দেখে শত্রুরাও নিচে নামতে লাগল। বোম্বেটেরা ভাবলে, এইবারে বুঝি আবার যুদ্ধ বাধে! কিন্তু শত্রুরা এখানে লড়াই না করেই কোথায় সরে পড়ল!

সে রাত্রে বোম্বেটেদের বিষের পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ করবার জন্যে আকাশে দেখা দিলে ঘনঘটা এবং তারপরেই নামল অশ্রান্ত বৃষ্টিধারা। নিরাশ্রয়ের মতো সেই ঝড়বাদলকে তাদের মাথা পেতেই গ্রহণ করতে হল। পরদিন সকালে—অর্থাৎ যাত্রার নবম দিনে প্রায় অনাহারে জলে ভিজে অত্যন্ত দুঃখিতভাবে তারা কাদা ভাঙতে ভাঙতে আবার অগ্রসর হল।

আচম্বিতে পথ সমুদ্রতীরে এসে পড়ল এবং দেখা গেল খানিক তফাতে কতকগুলো ছোট ছোট দ্বীপ রয়েছে। বোম্বেটেরা তখনই নৌকোয় চেপে দেখতে গেল, সে সব দ্বীপের ভিতরে কি আছে!

সে দ্বীপে পাওয়া গেল গরু, মোষ, ঘোড়া এবং সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় গাধা। বোম্বেটেরা মনের খুশিতে তাদের দলে দলে বধ করতে আরম্ভ করলে। তখনই তাদের ছাল ছাড়িয়ে আগুনের ভিতরে ফেলে দেওয়া হল। মাংস সিদ্ধ হওয়া পর্যন্তও তারা অপেক্ষা করতে পারলে না, ক্ষুধার চোটে প্রায় কাঁচা মাংসই চিবিয়ে খেতে লাগল। আজ এতদিন পরে এই প্রথম তারা মনের সাধে পেট ভরে খাবার সুযোগ পেলে!

খাবার খেয়ে নূতন শক্তি পেয়ে মর্গ্যানের হুকুমে আবার তারা পথে নামল। সন্ধ্যা যখন হয় হয় তখন দেখা গেল, দূরে প্রায় দুইশত স্পানিয়ার্ড তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে এবং তাদের পিছন থেকে দেখা যাচ্ছে, পানামা শহরের একটা উঁচু গির্জার চুড়ো।

বোম্বেটেরা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বিপুল উল্লাসে জয়ধ্বনি করে উঠল—চারিদিকে পড়ে গেল আনন্দের সাড়া। এইবারে তাদের পথশ্রম, রোদে পোড়া, জলে ভেজা ও পেটের জ্বালা শেষ হল। আসল যুদ্ধ এখনও হয়নি বটে, নগর এখনও নাগালের বাইরে বটে, কিন্তু সে অসুবিধা বেশিক্ষণ আর ভোগ করতে হবে না! আর তাদের বাধা দেয় কে?... সে রাতের মতো তাঁবু গেড়ে তারা ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল হল। শত্রুদের পঞ্চাশজন অশ্বারোহী এসে দূরে থেকেই চেঁচিয়ে শাসিয়ে গেল—"ওরে পথের কুকুরের দল! এইবারে আমরা তোদের বধ করব!"—তারপরেই পানামা নগর থেকে গোলাবৃষ্টি আরম্ভ হল—কিন্তু মিথ্যা সে গোলাগুলোর গোলমাল, কারণ গোলাগুলোর একটাও তাদের কাছ পর্যন্ত এসে পৌঁছল না।

দশম দিনের সকালে বোম্বেটেরা বসে বসে নিশ্চিন্তপ্রাণে খানা খেয়ে নিলে—অনেকেরই এই শেষ খানা!

তারপরেই জেগে উঠল তাদের জয়ঢাক আর রণভেরীগুলো। বোম্বেটেরা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে সমতালে পা ফেলতে ফেলতে অগ্রসর হল।

দেখা গেল, দূরে কামানের সারের পর সার সাজিয়ে স্পানিয়ার্ডরা যুদ্ধক্ষেত্রে অপেক্ষা করছে। তারা জানে, বোম্বেটেরা এই পথেই আসবে।

এমন সময়ে সেই পথপ্রদর্শক ডাকাতরা মর্গ্যানকে ডেকে বললে, "হুজুর, এ পথে অনেক কামান, অনেক বাধা! বনের ভিতর দিয়ে আর একটা পথ আছে, সেটা ভাল নয় বটে কিন্তু সেখান দিয়ে খুব সহজেই শহরে পৌঁছানো যাবে।"

মর্গ্যান তাদের কথামতোই কাজ করলে—বোম্বেটেরা অন্য পথ ধরলে।

স্পানিয়ার্ডদের প্রথম চাল ব্যর্থ হল। বোম্বেটেরা যে হঠাৎ পথ বদলাবে, এটা তারা আশা করেনি। তাদের সমস্ত আয়োজন হয়েছিল এইখানেই। বাধ্য হয়ে তারাও অন্য পথে বোম্বেটেদের বাধা দেবার জন্যে ছুটল,—তাড়াতাড়িতে ভারি ভারি কামানগুলোকে এখান থেকে টেনে নিয়ে যাবারও সময় পেলে না। এই ভুল হল তাদের সর্বনাশের কারণ।

বোম্বেটেরা সভয়ে দেখলে, শত্রুর যেন শেষ নেই! কাতারে কাতারে লোক তাদের আক্রমণ করবার জন্যে বিকট চিৎকারে ধেয়ে আসছে—তাদের পিছনে আবার কাতারে কাতারে সৈন্য। এত শত্রুসৈন্য এক জায়গায় তারা আর কখনও দেখেনি! অশ্বারোহী, পদাতিক, কামানবাহী—কিছুরই অভাব নেই!

তার উপরে আছে আবার হাজার হাজার বুনো মোষের পাল—রেড ইন্ডিয়ান ও কাফ্রিরা মোষগুলোকে তাদের দিকেই তাড়িয়ে আনছে! সেকালে ভারতের রাজারা যুদ্ধক্ষেত্রে যে ভাবে হাতির পাল ব্যবহার করতেন, এরা এই বুনো মোষগুলোকে ব্যবহার করবে সেই ভাবেই!

একটা ছোট পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোম্বেটেরা শত্রুদের এই বিপুল আয়োজন লক্ষ্য করতে লাগল। এখন তাদের পালাবারও পথ বন্ধ। পিছনে জেগে আছে জনহীন, আশ্রয়হীন ও খাদ্যহীন সেই নির্দয় শ্মশানভূমি! নিজেদের বিপদসঙ্কুল অবস্থার কথা ভেবে বোম্বেটেরা

একেবারে মরিয়া হয়ে উঠল। তারা স্থির করলে—হয় মরবে, নয় মারবে! তারা পালাবেও না, আত্মসমর্পণও করবে না!

রণভেরী বেজে উঠল। মর্গ্যান সর্বাগ্রে দুইশত বাছা বাছা সুদক্ষ ফরাসি বন্দুকধারীকে দলের আগে আগে পাঠিয়ে দিলে।

স্পানিয়ার্ডরাও অগ্রসর হতে হতে চিৎকার করে উঠল—"ভগবান আমাদের রাজার মঙ্গল করুন!"

প্রথমেই আসছে শত্রুদের অশ্বারোহী সৈন্যদল। কিন্তু খানিক এগিয়েই তারা এক জলাভূমির উপরে এসে পড়ল—সেখানে ঘোড়া নিয়ে ঘোরাফেরাই দায়!

বোম্বেটে বন্দুকধারীরা এ সুযোগ অবহেলা করলে না, তারা মাটির উপরে এক হাঁটু রেখে বসে, টিপ ঠিক করে বন্দুক ছুড়লে এবং অনেকেরই লক্ষ্য হল অব্যর্থ! ঘোড়সওয়াররা জলাভূমির ভিতরে হাঁকপাক করে বেড়াতে লাগল এবং গুলির পর গুলির চোটে হয় ঘোড়া নয় সওয়ার হত বা আহত হয়ে নিচে পড়ে যেতে লাগল।

অশ্বারোহীদের আক্রমণে ফল হল না দেখে, বোম্বেটেদের ছত্রভঙ্গ করবার জন্যে বুনো মোষগুলো লেলিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু মোষেদের বেশির ভাগই গোলাগুলির আওয়াজে চমকে ও ভড়কে অন্যদিকে ছুটে পালাল, যারা এগিয়ে গেল তাদের বেশি রাগ হল মানুষের বদলে রঙিন নিশানগুলোরই উপরে। তারা পতাকা লক্ষ্য করে তেড়ে এল এবং সেই ফাঁকে বোম্বেটেরা তাদের গুলি করে নিশ্চিন্তপুরে পাঠিয়ে দিলে।

তারপর আরম্ভ হল বোম্বেটেদের সঙ্গে স্পানিয়ার্ড পদাতিকদের লড়াই। বোম্বেটেরা জানত, হারলে তারা কেউ আর প্রাণে বাঁচবে না। তাই তারা এমন মরিয়া হয়ে লড়তে লাগল যে, এক-একজন বোম্বেটেকে তিন-চারজন স্পানিয়ার্ড মিলেও কায়দায় আনতে পারলে না। বোম্বেটেদের এক হাতে পিস্তল, আর এক হাতে তরোয়াল,—দূরের শত্রুকে গুলি ছুড়ে মারে, কাছে পেলে বসিয়ে দেয় তরোয়ালের কোপ! তারা অসম্ভব শত্রু! ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ। স্পানিয়ার্ডরা যে যেদিকে পারলে সরে পড়ল—ছয়শজন মৃত সঙ্গীর দেহ যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে রেখে।

এত আয়োজনের পর এত শীঘ্র লড়াই শেষ হয়ে যাবে, এটা কেউ কল্পনা করতে পারেনি।

পানামার পতন হল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পলাতক বিজয়ী নেতা

খুব সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যেই চেঙ্গিজ খাঁ, আলেকজান্দার, সিজার ও নেপোলিয়ন শত্রুসৈন্য ধ্বংস করতে পারতেন বলেই তাঁদের আজ এত নাম।

তাঁদের সঙ্গে বোম্বেটে মর্গ্যানের তুলনাই চলে না। কিন্তু মর্গ্যানের পানামা বিজয় যে বিশেষ বিস্ময়জনক ব্যাপার, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই।

পূর্বকথিত দিগ্বিজয়ীরা এক বা একাধিক সমগ্র জাতির সাহায্য পেয়েই বড় হয়েছিলেন।

কিন্তু মর্গ্যান হচ্ছে কতকগুলো জাতিচ্যুত, সমাজ থেকে বিতাড়িত, নীতিজ্ঞানশূন্য, হীন বোম্বেটের সর্দার। এবং তাদের শত্রুরা হচ্ছে অসংখ্য স্পানিয়ার্ড সৈনিক, প্রবল পরাক্রান্ত স্পেন

সাম্রাজ্যের অতুলনীয় শক্তি তাদের পিছনে, অস্ত্রশস্ত্রে ও সংখ্যাধিক্যে বোম্বেটেদের চেয়ে তারা ঢের বেশি বলিষ্ঠ। তবু যে তারা এত অনায়াসে হার মানতে বাধ্য হল, এটা একটা মস্ত স্মরণীয় ব্যাপার বলে স্বীকার করতেই হবে।

পানামার পতন হল। তারপর যেসব কাণ্ড আরম্ভ হল পাঠকরা তা কল্পনাই করতে পারছেন। বোম্বেটেরা প্রথমে দু'চোখো হত্যা করতে লাগল—সৈনিক, সাধারণ নাগরিক, কাফ্রি, বালক, নারী ও শিশু—খাঁড়া পড়ল নির্বিচারে সকলেরই উপরে। বোম্বেটেরা দলে দলে ধর্মযাজক বা পাদ্রী বন্দি করলে, প্রথমে তাদেরও পাদ্রী হত্যা করতে বিবেকে বাধল, তাই তাদের ধরে মর্গ্যানের কাছে নিয়ে গেল।

মর্গ্যান পাদ্রীদের কান্নায় কর্ণপাত না করে বললে, "মারো, মারো, সবাইকে মারো!"

লুণ্ঠন চলতে লাগল। পলাতকরা অনেক ধনরত্ন নিয়ে পালিয়েছিল, কিন্তু তখনও শহরে ছিল প্রচুর ঐশ্বর্য। সব পড়ল বোম্বেটেদের হাতে—হীরা, চুনি, পান্না, মুক্তো, সোনারুপোর আসবাব ও তাল এবং টাকাকড়ি আর যা কিছু।

তারপর মর্গ্যান জনকয়েক বোম্বেটেকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, "তোমরা চুপি চুপি শহরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে এসো।"

কেউ কিছু টের পাবার আগেই একদিন অকস্মাৎ সেই বৃহৎ নগরের উপরে অগ্নির রাঙা টকটকে জিভ লকলক করে জ্বলে উঠল। স্পানিয়ার্ডরা সবাই সেই আগুন নেবাতে ছুটল, এর মধ্যে তাদের সর্দারের হাত আছে না জেনে অনেক বোম্বেটেও তাদের সাহায্য করতে গেল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না— দেখতে দেখতে বিরাট অগ্নির বেড়াজালের মধ্যে গোটা শহরটাই ধরা পড়ল! বড় বড় প্রাসাদ, অট্টালিকা, কারুকার্য করা গির্জা, মঠ, গৃহস্থ ও গরিবের বাড়ি সমস্তই গেল আগুনের গর্ভে! সেই অগ্নিকাণ্ডে ছোট-বড় আট হাজার বাড়ি পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেল!

মর্গ্যান রটিয়ে বেড়াল—"স্পানিয়ার্ডরাই এই কাণ্ড করেছে!"

লুণ্ঠনের পর নির্যাতন। গুপ্তধনের সন্ধান। নির্যাতনের শত শত দৃষ্টান্তের মধ্যে একটা এখানে দেখাচ্ছি: জনৈক ধনী ভদ্রলোক বোম্বেটেদের ভয়ে ধনরত্ন নিয়ে পালিয়ে যান। তাঁর গরিব চাকরটা মনিবের একটা দামী পোষাক পেয়ে বুদ্ধির দোষে সেটা নিজে পরে ফেললে। কাঙালের ঘোড়ারোগ বরাবরই সাংঘাতিক। বোম্বেটেরা তাকে দেখেই ধরে নিলে, সে কোনও মস্তবড় লোক।

তার কাছ থেকে তারা টাকা দাবি করলে। সে কোত্থেকে টাকা দেবে? সে বললে, "আমি চাকর ছাড়া আর কিছু নই। এ পোষাক আমার মনিবের।"

বোম্বেটেরা বিশ্বাস করলে না। তখন প্রথমেই তারা সে বেচারার হাত দু'খানা দুমড়ে একেবারে ভেঙে দিলে। তাতেও মনের মতো জবাব না পেয়ে তারা সেই চাকরের কপালের উপর দড়ির ফাঁস লাগিয়ে এমন জোরে পাকাতে লাগল যে, চামড়ায় টান পড়ে তার চোখদুটো ডিমের মতো বড় হয়ে ঠিকরে পড়বার মতো হয়ে উঠল। তখনও গুপ্তধনের সন্ধান মিলল না। তারপর তাকে শূন্যে দড়িতে ঝুলিয়ে রেখে ঘুষি ও চাবুক মারা হতে লাগল। তার নাক ও কান কেটে নেওয়া হল—জ্বলন্ত খড় নিয়ে মুখে ছ্যাঁকা দেওয়া হতে লাগল। শেষকালে সে এই পৈশাচিক যাতনা থেকে মুক্তি পেলে বর্শার আঘাতে। অভাগা মরে বাঁচল।

তিন হপ্তা পরে দুরাত্মা মর্গ্যান পানামার ভস্মস্তূপ ছেড়ে বিদায় গ্রহণ করলে।

সঙ্গে করে নিয়ে চলল ছয়শ বন্দীকে—প্রচুর টাকা না পেলে সে তাদের ছাড়তে রাজি নয়। সেই ছয়শত স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, বালক, যুবা ও বৃদ্ধ বন্দীর মিলিত ক্রন্দনে আকাশ যেন ফেটে যাবার মতো হয়ে উঠল।

ভেড়ার পালের মত বন্দীদের আগে আগে তাড়িয়ে নিয়ে বোম্বেটেরা অগ্রসর হল। মর্গ্যানের হুকুমে বন্দীদের পানাহারও প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হল।

অনেক নারী আর সইতে না পেরে মর্গ্যানের পায়ের তলায় হাঁটু গেড়ে বসে কাতর মিনতির স্বরে বললে, "ওগো, আর আমরা পারি না। আপনার পায়ে পড়ি, আমাদের ছেড়ে দিন—আমরা স্বামী-পুত্রের কাছে ফিরে যাই! আমাদের যথাসর্বস্ব গেছে, তবু পাতার কুঁড়ে তৈরি করে স্বামী-পুত্রের সঙ্গে বাস করব!"

নিরেট লোহার মতো সুকঠিন মর্গ্যান বললে, "আমি এখানে কান্না শুনতে আসিনি—এসেছি টাকা রোজগার করতে। টাকা দিলেই ছাড়ান পাবে, নইলে সারাজীবন বাঁদী হয়ে থাকবে!"

সমুদ্রের ধারে গিয়ে মর্গ্যান বোম্বেটেদের সঙ্গে লুটের মাল ভাগ করতে বসল। নিজের মনের মতো হিসাব করে সকলকে সে অংশ দিলে।

কিন্তু সে অংশ সন্দেহজনক। এতবড় শহর লুটে এত পরিশ্রমের পর এই হল পাওনা, এত কম টাকা!

প্রত্যেক বোম্বেটে বিষম রাগে গরগর করতে লাগল। তাদের দৃঢ়বিশ্বাস হল, মর্গ্যান তাদের ফাঁকি দেবার জন্যে বেশিরভাগ দামী মালই সরিয়ে ফেলেছে! মর্গ্যানকে তারা মুখের উপরে কিছু খুলে বলতে সাহস করল না বটে, কিন্তু প্রত্যেকেই মারমুখো হয়ে রইল।

মর্গ্যান বুঝলে, গতিক সুবিধার নয়। এরা প্রত্যেকেই মরিয়া লোক, যেকোনও মুহূর্তে সে বিপদে পড়তে পারে।

আচম্বিতে একদিন দেখা গেল, চারখানা জাহাজ ও জনকয়েক খুব বিশ্বাসী লোক নিয়ে চোর মর্গ্যান একেবারে অদৃশ্য হয়েছে! একরাত্রেই সে সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে চলে গেল—বোম্বেটেরা তাকে ধরতে পারলে না। ধরতে পারলে কি হত বলা যায় না।

তারপর? তারপর মর্গ্যান আর কখনও বোম্বেটেদের সর্দার হয়নি। হবার উপায়ও ছিল না, হবার দরকারও ছিল না।

মর্গ্যানের চূড়ান্ত সৌভাগ্যের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তার নামডাক শুনে ইংলন্ডের রাজা তাকে দেখতে চাইলেন। তার সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করলেন। তাকে স্যার উপাধি দিলেন। তাকে জামাইকা দ্বীপের গভর্নর করে পাঠালেন। চোর, জোচ্চোর, খুনী, চরিত্রহীন, ডাকাত ও বোম্বেটে মর্গ্যান হল হাজার হাজার সাধুর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা—স্যার হেনরি মর্গ্যান!

বিশ্বের শিয়রে মহাবিচারক মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়েন!

কিন্তু স্পানিয়ার্ডদেরও শাস্তির দরকার হয়েছিল। তাদের ভীষণ অত্যাচারে আমেরিকা নিদারুণ যন্ত্রণায় হাহাকার করছিল। ভগবানের মূর্তিমান অভিশাপেরই মতো হয়তো তাই মর্গ্যান লোলোনেজ, পর্তুগীজ ও ব্রেজিলিয়ানোর দল এসে আবির্ভূত হয়েছিল স্পানিয়ার্ডদের মাঝখানে।

রহস্য কাহিনী

রহস্যের আলো-ছায়া

প্রথম অংশ
অপরাধের কলাকৌশল

॥ প্রথম ॥

অক্ষয়কুমার চৌধুরি পণ্ডিতদের একটি মস্ত বড়ো উক্তি ব্যর্থ করে দিয়েছে।

পণ্ডিতরা বলেন, 'মানুষের মুখ হচ্ছে মনের আয়না।'

কিন্তু অক্ষয়ের মুখের পানে তাকিয়ে তার চরিত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে, এমন লোক কেউ আছে বলে জানি না। তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে পণ্ডিতদের মুখ হবে বন্ধ।

কী হাসি হাসি সরল মুখ তার! সে হাসির ভিতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে যেন সদাশয়তা আর ন্যায়পরায়ণতা! বসুধার সবাই যেন তার কুটুম্ব!

কিন্তু অক্ষয় নিজেই জানে, কেউ যদি তাকে চোর, জুয়াচোর, অসাধু বা দাগাবাজ বলে ডাকে, তবে একটুও মিথ্যা বলা হবে না।

তার ছোটো বাড়িখানিতে থাকে একটি মাত্র আধবুড়ো লোক—একাধারে সেই-ই হচ্ছে পাচক ও বেয়ারা। নাম রামচরণ। সকলের কাছেই সে বলে বেড়ায়, 'আমার মনিবের মতন সৎ, আমুদে আর ভালোমানুষ লোক আর দেখা যায় না। মুখে তাঁর গান আর মিষ্টি কথা লেগেই আছে।'

কিন্তু রামচরণ যদি ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারত, অক্ষয় তার মাইনের টাকা জোগাড় করে বড়ো বিদ্যা চুরিবিদ্যার দ্বারা, তাহলে ব্রহ্মাণ্ডেও তার প্রকাণ্ড বিস্ময়ের স্থান সংকুলান হত না।

চুরিবিদ্যা বড়ো বিদ্যা হতে পারে, কিন্তু বিপজ্জনকও বটে। এ সত্য অক্ষয়ের অজানা ছিল না। চোরের পক্ষে কেউ নেই—বিপক্ষে সবাই।

কিন্তু অক্ষয় এও জানে, মাথা খাটাতে আর অতিলোভ সামলাতে পারলে, চুরিবিদ্যাও লাভজনক হতে পারে।

অক্ষয় অতিলোভী নয়। তার মাথাও আছে। তার দলবল নেই—সে একলা চুরি করে। তার বিরুদ্ধে কেউ 'রাজার সাক্ষী' হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। সে ঘন ঘন চুরি করে না। অনেক বুঝে-সুঝে ফন্দি এঁটে মাঝে মাঝে চুরি করে, তারপর চোরাই মাল বেচে যে টাকা পায় তা নানাবিধ বৈধ উপায়ে খাটায়। আমাদের অক্ষয় চৌধুরি ভারী হুঁশিয়ার লোক। পুলিশ তার কাছে হার মেনেছে।

সে প্রকাশ্যে জহুরির কাজ করত। কিন্তু তার কোনও কোনও সম-ব্যবসায়ীর বিশ্বাস ছিল, অক্ষয়ের কারবার নাকি চোরাই পাথর নিয়ে। তবে এ হচ্ছে সন্দেহমাত্র। কেউ তাকে হাতেনাতে ধরতে পারেনি। কাজেই অক্ষয়ের হাসিখুসি অম্লানই আছে আজ পর্যন্ত।

সুবিধা পেলেই সে চোরাই হিরা-পান্না-মুক্তা নিয়ে কাজ গোছাতে ভোলে না।

গল্পের আরম্ভেই দেখতে পাবেন, অতি গুণধর অক্ষয় সান্ধ্যবায়ু সেবন করছে বাড়ির সামনেকার বাগানে।

এটি একটি গ্রামের বাড়ি। গ্রামের আসল নাম বলব না, আমরা চাঁদনগর নামেই ডাকব। এখান থেকে কলকাতা খুব বেশি দূরে নয়।

বাড়িতে অক্ষয় আজ একলা। রামচরণ ভিন গাঁয়ে কী কাজে গেছে, ফিরবে বেশি রাতে। অক্ষয়কে যখন তখন হঠাৎ গ্রাম ছেড়ে যেতে হত, তাই সে বাড়ির সদরের চাবি করেছিল দুটি। একটি থাকত তার নিজের কাছে, আর একটি থাকত রামচরণের জিম্মায়। যে যখন আসত, তার নিজের চাবি দিয়ে দরজা খুলে বাড়ির ভিতরে ঢুকত। আজও রামচরণ জেনেই গিয়েছে যে, রাত্রে বাড়িতে এসে সে তার মনিবকে দেখতে পাবে না। অক্ষয়কে খানিক পরেই কলকাতায় যেতে হবে। উদ্দেশ্য, খানকয় ছোটো-বড়ো হিরা বেচা। সেগুলি চোরাই বলে অক্ষয়ের মানহানি করব না। কিন্তু সে হিরাগুলি কোথায় আছে জানেন? তার জুতার গোড়ালির ভিতরে!

অবাক হবার কিছুই নেই। অক্ষয়ের একপাটি জুতার গোড়ালি হচ্ছে দেরাজের পুঁচকে সংস্করণ। কৌশলে টানলে তার একটি অংশ 'টানা'র মতন বেরিয়ে আসে। এই উপায়ে পকেটকাটার ও পুলিশের অন্যায় কৌতূহল জব্দ হয়।

সন্ধ্যা। বাতাসে বন্য গন্ধ, অন্ধকারের গায়ে চুমকির মতন জোনাকি। চারিদিক নিঃসাড়। অক্ষয় বাইরে যাবার পোশাক পরেই বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এখনও ট্রেনের সময় হয়নি।

হঠাৎ অদূরে রাস্তায় জাগল কার পায়ের শব্দ।

অক্ষয় ভাবতে লাগল। কোনও অতিথি আসছে নাকি? কিন্তু তার বাড়িতে অতিথি আসে তো কালেভদ্রে!......এখানে কাছাকাছি অন্য কারুর বাড়ি নেই। তার বাড়ির পরেই হচ্ছে পোড়োজমি—একটা অর্ধনির্মিত রাস্তা শেষ হয়েছে সেখানে গিয়েই। এ নতুন পথে তো গাঁয়ের লোক আসে না!

বাগানে ঢোকবার মুখেই ছিল একটি বেড়া। কৌতূহলী অক্ষয় তার উপরে ঝুঁকে ভর দিয়ে অন্ধকারের ভিতরে চোখ চালাবার চেষ্টা করলে।

অন্ধকারের বুকে জ্বলল একটা দেশলাইয়ের কাঠি, দেখা গেল একখানা মুখ, অস্পষ্ট দেহ। আগন্তুক সিগারেট ধরাচ্ছে।

অক্ষয় শুধোলে, 'কে?'

আগন্তুক এগিয়ে এল। কাছে এসে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলে, 'এই পথ দিয়ে কি মানিকপুর জংশনে যাওয়া যায়?'

অক্ষয় ইংরেজিতে বললে, 'না; স্টেশনে যাবার অন্য রাস্তা আছে।'

—'আবার অন্য রাস্তা! রক্ষে করুন মশাই, যথেষ্ট হয়েছে! কে এক বোকা আমায় এমন রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে, ঘুরে ঘুরে পায়ের নাড়ি ছিঁড়ে গেল।'

—'মশাইয়ের কোথা থেকে আসা হচ্ছে?'

—'কলকাতা থেকে এসেছিলুম এখানকার জমিদারবাড়িতে। যাব আবার কলকাতায়। এখন পথ হারিয়ে অন্ধের মতন ঘুরে মরছি। একে আমি চোখে খাটো, তায় এই অন্ধকার। আর পারি না!'

—'আপনি ক-টার ট্রেন ধরতে চান?'

—'সাড়ে আটটার।'

—'তাই নাকি? আমিও ওই ট্রেনে আজ কলকাতায় যাব। কিন্তু এখন সবে সাতটা, আমি আটটা পনেরোর আগে বাড়ি থেকে বেরুব না। আপনি যদি আমার বৈঠকখানায় এসে খানিকক্ষণ বসেন, তাহলে আমরা একসঙ্গেই স্টেশনে যেতে পারি। স্টেশন এখান থেকে আধ মাইলের বেশি হবে না।'

মুখখানা সামনের দিকে বাড়িয়ে চশমাপরা চোখে বাড়ির দিকে তাকিয়ে আগন্তুক কৃতজ্ঞকণ্ঠে বললে, 'ধন্যবাদ মশাই, ধন্যবাদ!'

অক্ষয় বেড়ার দরজা খুলে দিলে। আগন্তুক একটু ইতস্তত ভাব দেখালে। তারপর মুখের আধপোড়া সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বাগানের ভিতরে প্রবেশ করলে।

॥ দ্বিতীয় ॥

বৈঠকখানা অন্ধকার ছিল। অক্ষয় কড়িকাঠ থেকে ঝোলানো একটা ল্যাম্পে অগ্নিসংযোগ করলে। এতক্ষণ পরে দুজনেরই দুজনকে ভালো করে দেখবার সুবিধা হল।

অক্ষয় সচমকে নিজের মনে মনে বললে, 'ও হরি, এ যে দেখছি জহুরি মণিলাল বুলাভাই! হুঁ, মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, আমাকে চেনে না।'

প্রকাশ্যে বললে, 'বসুন মশাই, আরাম করে বসুন! অনেক হাঁটাহাঁটি করেছেন, একটু চা-টা ইচ্ছা করেন?'

মণিলাল ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে। তার পরনে কোট-পেন্টুলুন। মাথায় ধূসর রঙের নেমদার টুপি—অর্থাৎ ফেল্ট হ্যাট। সে টুপিটা ঘরের কোণে একখানা চেয়ারের উপরে রাখলে এবং হাতের ছোটো ব্যাগটা রাখলে একটা টেবিলের উপরে। ছাতাটাও তার গায়ে ঠেসিয়ে দাঁড় করিয়ে সোফার উপরে বসে পড়ল।

বৈঠকখানার একপাশে রান্নাঘর। উনুনে আগুন ছিল। চায়ের জল গরম করতে দেরি লাগল না। চা তৈরি করে অক্ষয় আবার বৈঠকখানায় এসে ঢুকল। চায়ের 'ট্রে'-খানা টেবিলের উপরে রাখলে। একখানা থালায় দুটি রসগোল্লা ও আর একখানা থালায় খান-দুই 'ক্রিম ক্র্যাকার' বিস্কুট দিতেও ভুললে না।

একটি তারা-কাটা দামি কাচের গেলাসে জল ঢেলে বললে, 'কিছু মনে করবেন না, বাড়িতে আপাতত আর কিছু খাবার খুঁজে পেলুম না।'

মণিলাল বললে, 'সঙ্কোচের কারণ নেই। যে-দুটি খাবার দিয়েছেন, ও-দুটিই আমি ভালোবাসি'—বলেই একটি রসগোল্লা তুলে মুখের ভিতর ফেলে দিলে।

মণিলাল যে কেন জমিদারবাড়িতে গিয়েছিল, একথা জানবার জন্যে অক্ষয়ের মনে আগ্রহ হল। কিন্তু অক্ষয় এ সম্বন্ধে তাকে সরাসরি কোনও প্রশ্ন করতে ভরসা পেলে না এবং মণিলালও প্রায় নীরবেই নিজের চা ও খাবার নিয়েই ব্যস্ত হয়ে রইল।

অক্ষয় ভাবতে লাগল, মণিলাল বুলাভাই হচ্ছে একজন নামজাদা জহুরি। সে যখন নিজে জমিদারবাড়িতে এসেছে তখন কাজটা নিশ্চয়ই জরুরি।

কিন্তু কীরকম জরুরি...? হুঁ, বোঝা গেছে।

দিন দশ পরে জমিদারের একমাত্র মেয়ের বিয়ে! এত বড়ো ডাকসাইটে জমিদারের একমাত্র মেয়ের বিয়ে, না জানি কত হাজার টাকার জড়োয়া গহনা যৌতুক দেওয়া হবে। মণিলাল নিশ্চয়ই রাশি রাশি হিরা-চুনি-পান্নার নমুনা নিয়ে এসেছে। ওর জামার আর ওই ব্যাগের ভিতরে খুঁজলে পাওয়া যাবে হয়তো লক্ষপতির ঐশ্বর্য!

অক্ষয় ছিঁচকে চোর নয়। তার মূলমন্ত্র—মারি তো হাতি, লুটিতো ভাণ্ডার! সোনা-দানা সে অপছন্দ করে না বটে, কিন্তু হিরা-পান্নার দিকেই ঝোঁক তার বেশি। হিরা-পান্না বড়ো ভালো জিনিস; ভারী নয়, মস্ত নয়, হাতের মুঠার ভিতরে লুকিয়ে রাখা যায় দস্তুর মতন সাত-রাজার ধন!

অক্ষয় ভাবতে লাগল, মণিলালের কাছে কত টাকার পাথর আছে?

মণিলাল বললে, 'আজ ভারী শীত পড়েছে।'

অক্ষয় বললে, 'হ্যাঁ বড্ড।' তারপর আবার ভাবতে লাগল, 'কত টাকার পাথর আছে? পাঁচ হাজার? দশ হাজার?......উঁহু, তার চেয়েও বেশি! জমিদার যত টাকার পাথর কিনবেন, তাঁকে দেখাবার জন্য মণিলাল নিশ্চয়ই তার চেয়ে ঢের বেশি টাকার জিনিস এনেছে। নইলে ও নিজে আসত না। ওর কাছে বোধহয় পঞ্চাশ হাজার টাকার পাথর আছে!'

অক্ষয় কেমন অস্থির হয়ে উঠল। নিজের অস্থিরতা ঢাকবার জন্যে বললে, 'আপনি ফুলের বাগান ভালোবাসেন?'

মণিলাল শুষ্ক স্বরে বললে, 'মাঝে মাঝে পার্কে হাওয়া খেতে যাই। আমি কলকাতায় থাকি কিনা?'

আবার সে বোবা। এইটেই স্বাভাবিক। অক্ষয় বুঝলে, মণিলাল বেশি কথা কইতে নারাজ, হাজার হাজার টাকার সম্পত্তি যার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে, মুখরতা তার সাজে না। ....ধরলুম ওর কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকার পাথর আছে। পঞ্চাশ হাজার অর্থাৎ আধ লক্ষ টাকা! ও-টাকায় কোম্পানির কাগজ কিনলে মাসে কত টাকা আয় হয়? তার সঙ্গে যদি

আমার জমানো টাকা যোগ করি—তাহলে? ওঃ, তাহলে আর আমাকে চুরি-চামারি করতে হয় না—সারাজীবন পায়ের ওপরে পা দিয়ে বসে বসে খেতে পারি।

অক্ষয় একবার আড়চোখে মণিলালের দিকে তাকিয়ে চট করে আবার নজর ফিরিয়ে নিলে। তার মনের ভিতরে জেগে উঠছে একটা বিশ্রী ভাব—একে দমন করতেই হবে! আমি চুরি করি বটে কিন্তু খুন? না, না, এ হচ্ছে ভয়াবহ পাগলামি! ......হ্যাঁ, একবার শ্যামবাজারের একটা পাহারাওয়ালাকে ছোরা মারতে হয়েছিল বটে, কিন্তু সে তো হচ্ছে তার নিজেরই দোষ! তারপর হাটখোলার সেই বুড়োটা! তার মুখবন্ধ না করলে উপায় ছিল না, আমাকে দেখে সে যা ষাঁড়ের মতন চিৎকার শুরু করে দিয়েছিল! এ-দুটো হচ্ছে দৈব-দুর্ঘটনা—ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাকে কাজ করতে হয়েছিল। এজন্যে আমি নিজেও কম দুঃখিত নই। কিন্তু স্বেচ্ছায় নরহত্যা! খুন করে টাকা কেড়ে নেওয়া! উন্মত্ত না হলে এমন কাজ কেউ করে!......

তবে এ-কথাও ঠিক, আমি যদি খুনি হতুম, এমন সুযোগ আর পেতুম না। এত টাকার সম্পত্তি, খালি বাড়ি, পল্লির বাইরে নির্জন ঠাঁই, রাত্রিবেলা, ঘুটঘুটে অন্ধকার......

কিন্তু এই লাশটা! খুনের পরে যত মুশকিল বাধে এই লাশ নিয়ে। লাশের গতি করা বড়ো দায়—

এমনি সময়ে হঠাৎ একখানা চলন্ত রেলগাড়ির শব্দ শোনা গেল। বাড়ির পিছনকার পোড়োজমির ওপাশ দিয়ে লাইন যেখানে মোড় ফিরে গিয়েছে, গাড়ি আসছে সেইখান দিয়ে।

অক্ষয়ের মাথার ভিতর দিয়ে ধাঁ করে একটা নতুন চিন্তা খেলে গেল। সেই চিন্তা সূত্র ধরে তার মন হল অগ্রসর এবং তার দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল মণিলালের দিকে—সে নিজের মনেই চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে মাঝে মাঝে।

অক্ষয়ের বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। সে তাড়াতাড়ি উঠে মণিলালের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে দেয়ালের বড়ো ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল। তার মন যেন বললে—অক্ষয়, শিগগির বাড়ির বাইরে পালিয়ে যাও!

যদিও অক্ষয়ের দেহ হয়ে উঠেছিল তখন উত্তপ্ত, তবু তার বুকের ভিতরে জাগল যেন শীতের কাঁপন! মাথা ঘুরিয়ে দরজার পানে তাকিয়ে সে বললে, 'কী কনকনে হাওয়া! আমি কি ভালো করে দরজা বন্ধ করে দিইনি?' এগিয়ে গিয়ে দু-হাট করে দরজা খুলে বাইরে উঁকি মারলে। তার ইচ্ছা হল দৌড়ে খোলা বাতাসের কোলে গিয়ে পড়ে, একেবারে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়, এই আকস্মিক খ্যাপামির কবল থেকে মুক্তিলাভ করে।

বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে সে বললে, 'এইবার স্টেশনের দিকে পা চালালে কেমন হয়, তাই ভাবছি।'

মণিলাল চায়ের শূন্য পেয়ালাটা রেখে দিয়ে মুখ তুলে বললে, 'আপনার ঘড়ি কি ঠিক?'

অক্ষয় যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘাড় নেড়ে জানালে, হাঁ।

মণিলাল বললে, 'স্টেশনে গিয়ে পৌঁছোতে কতক্ষণ লাগবে?'

—'বড়ো জোর দশ মিনিট।'

—'এই তো সবে সাতটা-বিশ! এখনও এক ঘণ্টারও বেশি সময় আছে। বাইরের ঠান্ডা অন্ধকারের চেয়ে এ ঘর ঢের ভালো। মিছে তাড়াতাড়ি করবার দরকার আছে কি?'

—'কিছু না, কিছু না।'—অক্ষয়ের কণ্ঠস্বর খানিক খুশি, খানিক বিষাদমাখা। আরও খানিকক্ষণ সে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল—কালো রাত্রির মধ্যে দুই চোখ ডুবিয়ে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো। তারপর দরজা বন্ধ করে দিলে, নিঃশব্দে।

তারপর সে নিজের চেয়ারে বসে বাক্যব্যয়ে নারাজ মণিলালের সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু তার কথাগুলো হল কেমন যেন বাধো-বাধো অসংলগ্ন! সে অনুভব করলে তার মুখ যেন ক্রমেই তপ্ত, তার মস্তিষ্ক যেন ক্রমেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে এবং তার কান যেন করছে ভোঁ ভোঁ! তার চোখ যেন কী এক ভয়াবহ একাগ্রতার সঙ্গে মণিলালের দিকে নজর দিতে চায়! প্রাণপণে সে অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরালে বটে, কিন্তু পরমুহূর্তেই আরও ভয়ানক ভাবে আবার তার দিকেই তাকাতে বাধ্য হল এবং তার মনের ভিতরে কেবল এই প্রশ্নই চলা-ফেরা করতে লাগল—এমন অবস্থায় পড়লে অন্য কোনও খুনি কী করত, কী করত, কী করত? ......দেখতে দেখতে সে ধীরে ধীরে প্রত্যেক দিক থেকে নিজের ভীষণ সংকল্পকে পরিপূর্ণ করে তুললে—কোনও দিকেই কোনও ছিদ্র রাখলে না।

তার মনে জাগল অস্বস্তি। মণিলালের দিকে খর-নজর রেখেই সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পকেটে যার অতুল ঐশ্বর্য তার সুমুখে সে আর বসে থাকতে পারলে না। সভয়ে অনুভব করলে, তার মনের ঝোঁকটা ক্রমেই মাত্রা ছাড়িয়ে উঠছে। এখানে বসে থাকলে সে হঠাৎ নিজের উপরে সমস্ত কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলবে এবং তারপর—

তারপর যা হতে পারে সেটা ভাবতেই অক্ষয়ের সমস্ত শরীর আতঙ্কে শিউরে উঠল, কিন্তু সেইসঙ্গে রত্নের পুঁজি হাতাবার জন্যে তার হাত যেন নিশপিশ করতেও লাগল।

হাজার হোক, অক্ষয় অপরাধী ছাড়া কিছুই নয়। এইসব কাজেই অভ্যস্ত। সে হচ্ছে শিকারি বাঘ! সৎপথে কোনও দিন অর্থোপার্জন করেনি—তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে হিংস্র। সুতরাং এমন সহজলভ্য ঐশ্বর্যকে ত্যাগ করবার প্রবৃত্তি তার হতেই পারে না। এত হিরা-পান্না তার হাতের কাছে এসেও হাত ছাড়িয়ে যাবে, এই সম্ভাবনা অক্ষয়ের চিত্তকে ক্রমেই বেপরোয়া করে তুলতে লাগল।

এই বিষম লোভের নাগাল থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে সে আর একবার শেষ চেষ্টা করবে স্থির করলে, যতক্ষণ না ট্রেনের সময় আসে ততক্ষণ মণিলালের সামনে থাকবে না।

অক্ষয় বললে, 'মশাই, আমি জামা-জুতো-কাপড় বদলে আসি। যেরকম ঠান্ডা পড়েছে, এ পোশাকে বাইরে যাওয়া উচিত নয়।'

মণিলাল বললে, 'নিশ্চয়ই নয়। অসুখ হতে পারে।'

বৈঠকখানার একপাশে ছিল দালান, ঘর থেকে বেরিয়ে অক্ষয় সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল। তার জামা-কাপড় বদলাবার দরকার নেই—ওটা বাজে ওজর মাত্র। তবু সে আনলার কাছে গিয়ে অকারণেই পোশাক পরিবর্তনে নিযুক্ত হল। ভাবলে, এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বাকি সময়টা কাটিয়ে দেবে।

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে—আশ্বস্তির! ওঃ, ও-ঘর হচ্ছে অভিশপ্ত—ওখানকার বাতাস বিষাক্ত। ওখান থেকে পালিয়ে এসে বাঁচলুম—নইলে এখনই হয়তো কী করতে গিয়ে কী করে ফেলতুম! এখানে থাকলে প্রলোভন আর আমাকে আক্রমণ করতে পারবে না।

॥ তৃতীয় ॥

এখানে থাকলে হয়তো প্রলোভন আর আমাকে আক্রমণ করতে পারবে না—হয়তো সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে দেখে মণিলাল নিজেই চলে যাবে! হ্যাঁ, সে একলা চলে গেলেই আমি খুশি হই, তাহলে সমস্ত আপদই চুকে যায়—অন্তত এই ভীষণ সুযোগ বা সম্ভাবনার দায় থেকে আমি রেহাই পাই—আর ওই হিরা-পান্নাগুলো—

একজোড়া নতুন জুতো পরতে পরতে অক্ষয় ধীরে ধীরে মাথা তুললে......

খোলা দরজার দিকে পিছন ফিরে বসে আছে মণিলাল। কাগজ আর তামাক দিয়ে আপন মনে সে নতুন সিগারেট পাকাচ্ছে।

অক্ষয় আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললে। তার জুতো পরা আর হল না। মণিলালের পৃষ্ঠদেশের দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে স্থির হয়ে রইল সে মূর্তির মতো। তারপর দৃষ্টি না ফিরিয়েই পা থেকে জুতোজোড়া খুলে ফেললে!

মণিলাল নিশ্চিন্তভাবে সিগারেট পাকিয়ে তামাকের রবারের থলিটা পকেটের ভিতরে রেখে দিলে। তারপর জামার উপর থেকে তামাকের গুঁড়ো ঝেড়ে ফেলে দেশলাই বার করলে।

আচম্বিতে কী এক প্রবল ঝোঁকের তাড়নায় অক্ষয় চট করে দাঁড়িয়ে উঠল এবং চোরের মতন গুড়ি মেরে পা টিপে টিপে বৈঠকখানার ভিতরে গিয়ে ঢুকল। তার পায়ে এখন জুতো নেই, কোনও শব্দ হল না। বিড়ালের মতন চুপিচুপি সে এগিয়ে চলল ধীরে ধীরে। তার মুখ চকচকে, তার দুই চক্ষু উজ্জ্বল ও বিস্ফারিত এবং নিজের কানে সে শুনতে পেলে ধমনির রক্ত-চলাচল-ধ্বনি!

মণিলাল দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরালে এবং তারপর ধূমপান করতে লাগল।

ধাপে ধাপে নিঃশব্দে এগিয়ে অক্ষয় গিয়ে দাঁড়াল একেবারে মণিলালের চেয়ারের পিছনে। পাছে তার নিশ্বাস মণিলালের মাথার উপরে গিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে সে নিজের মুখ ফিরিয়ে নিলে। ...এইভাবে কেটে গেল আধ মিনিট! সে যেন সাক্ষাৎ হত্যার মূর্তি—বলির জীবের দিকে তাকিয়ে আছে ভয়াল প্রদীপ্ত চক্ষে, উন্মুক্ত মুখবিবর দিয়ে দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে নীরবে, দুই হাতের আঙুলগুলো যেন ধড়ফড় করছে বহুমুখ সর্পের মতো।

তারপর আবার তেমনি নিঃশব্দেই অক্ষয় ফিরে গেল দালানের দিকে। একটা গভীর নিশ্বাস ফেললে। একটু হলেই হয়েছিল আর কী! মণিলালের জীবন ঝুলছিল একগাছা সরু সুতোর ডগায়। সত্যিকথা বলতে কী, আমি যখন চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম, তখন যদি আমার হাতে কোনও অস্ত্র থাকত,—এমনকি একটা হাতুড়ি বা একখানা পাথর—

হঠাৎ অক্ষয়ের চোখ পড়ল দালানের কোণে। সেখানে দেওয়ালের কোণে দাঁড় করানো রয়েছে একটা লোহার গরাদে। বাড়ির জানলা থেকে এটা কবে খুলে পড়েছিল, ভৃত্য রামচরণ এখানে এনে রেখেছিল? ......'এক মিনিট আগে এইটেই যদি আমার হাতে থাকত!'

অক্ষয় লোহাগাছা তুলে নিলে। হাতের উপরে রেখে তার ভার পরীক্ষা করলে। 'হুঁ, এটা হচ্ছে দস্তুর মতো অস্ত্র, ব্যবহার করবার সময় বন্দুক বা রিভলভারের মতন চিৎকার করে পাড়া জাগায় না! আমার কার্যসিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট! ......কিন্তু না, না, এসব কথা নিয়ে মাথা ঘামানো ভালো নয়। এটাকে যথাস্থানে রেখে দেওয়াই উচিত!'

কিন্তু লোহার ডান্ডা সে রেখে দিলে না। উঁকি মেরে দেখলে মণিলাল তখনও সেইভাবে বসেই সিগারেট টানছে।

আবার অক্ষয়ের ভাব-পরিবর্তন হল! আবার তার মুখ হয়ে উঠল রাঙা-টকটকে ও ভ্রূকুটি-কুটিল এবং গলার উপরে ফুলে উঠল একটা শিরা এবং পায়ে পায়ে আবার সে এগিয়ে এল বৈঠকখানার ভিতরে।

মণিলালের চেয়ার থেকে কিছু তফাতে দাঁড়িয়ে সে মাথার উপরে তুললে লোহার ডান্ডা। একটা অস্পষ্ট শব্দ হল। ডান্ডাটা যখন নীচে নামছে, মণিলাল হঠাৎ ফিরে দেখলে। তাইতেই অক্ষয়ের লক্ষ্য আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল—ডান্ডাটা মণিলালের মাথার উপরে না পড়ে একপাশ ঘেঁসে নেমে গেল, একটা অপেক্ষাকৃত সামান্য রকম আঘাত দিয়ে।

ভয়ার্ত বিকট চিৎকার করে মণিলাল লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল এবং প্রাণপণে চেপে ধরল অক্ষয়ের দুই হাত।

তারপর আরম্ভ হল বিষম ধস্তাধস্তি! দুজনেই দুজনকে চেপে ধরলে সাংঘাতিক আলিঙ্গনে এবং দুজনেই কখনও দুলতে থাকে এপাশে-ওপাশে, কখনও এগিয়ে বা কখনও পিছিয়ে

যায়! চেয়ার পড়ল উলটে, টেবিলের উপর থেকে ঠিকরে পড়ল একটা কাচের গেলাস, মণিলালের চশমারও হল সেই দশা, দুজনের পায়ের চাপে গেলাস ও চশমা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

এবং তারপরেও আরও বার-তিনেক জাগল মণিলালের সেই বিকট চিৎকার—বিদীর্ণ করে রাত্রির স্তব্ধতা! সেই উন্মাদগ্রস্ত অবস্থাতেও অক্ষয়ের বুক আতঙ্কে শিউরে উঠল। যদি কোনও পথিক দৈবগতিকে এদিকে এসে পড়ে, যদি সে শুনতে পায়?

নিজের দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে অক্ষয় তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঠেলে নিয়ে টেবিলের উপর ফেলে চেপে ধরলে এবং টেবিলের আচ্ছাদনের এক অংশ তুলে পুরে দিলে তার মুখের ভিতরে। এইভাবে তারা নিশ্চল হয়ে রইল পূর্ণ দুই মিনিট ধরে—সে এক ভয়াবহ নাটকীয় দৃশ্য!

দেখতে দেখতে মণিলালের দেহ পড়ল এলিয়ে, ক্রমে ক্রমে তার মাংসপেশির সমস্ত স্পন্দন থেমে গেল। তখন অক্ষয় তাকে ছেড়ে দিলে, মণিলালের জীবনহীন দেহটা মাটির উপরে এলিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

যা হবার তা হয়ে গেল। এতক্ষণ যে সম্ভাবনাকে অক্ষয় ভয় করছিল, তা পরিণত হল নিশ্চিত সত্যে! যাক, এ বিষয় নিয়ে আর অনুতাপ করা মিথ্যা! অনুতাপের দ্বারা মড়াকে আর করা যাবে না জীবন্ত।

॥ চতুর্থ ॥

অক্ষয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। শীতকালেও সে ঘেমে উঠেছে।

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ঘড়ির দিকে তাকালে।

সবে সাড়ে সাতটা!

এই ক-মিনিটের মধ্যে এতবড়ো কাণ্ড ঘটে গেল! এতক্ষণ প্রত্যেক মিনিটই ছিল যেন এক ঘণ্টার মতন দীর্ঘ।

সাড়ে সাতটা! ট্রেন আসবে সাড়ে আটটায়, হাতে সময় আছে আর একঘণ্টা! এর মধ্যেই বাকি সমস্ত কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। তা এক ঘণ্টা সময় নিতান্ত অল্প নয়।

অক্ষয়ের ভাবভঙ্গি এখন শান্ত। তার একমাত্র দুর্ভাবনা, মণিলালের চিৎকার কেউ শুনতে পেয়েছে কি না! কেউ যদি না শুনে থাকে, তাহলে তাকে আর পায় কে!

সে হেঁট হয়ে মৃতব্যক্তির দাঁতের ভিতর থেটে টেবলক্লথখানা আস্তে আস্তে টেনে বার করে নিলে। তারপর তার জামাকাপড় খুঁজতে আরম্ভ করলে। বেশিক্ষণ লাগল না যা খুঁজছিল তা পেতে।

একটি ছোট্ট চামড়ার বাক্সের ভিতরে আলাদা আলাদা কাগজের মোড়কে রয়েছে হিরা, চুনি, পান্না ও মুক্তা প্রভৃতি অনেক দামি জিনিস। তাহলে তার শ্রম সার্থক! মানুষের প্রাণবধ করেছে বলে তার মনে আর কোনও রকম অনুশোচনার সঞ্চার হল না। বরং নিজেই নিজেকে দিতে লাগল অভিনন্দন।

তারপর সে সুপটু হাতে কর্তব্য সম্পাদনে নিযুক্ত হল। টেবলক্লথের উপরে পড়েছিল কয়েক ফোঁটা রক্ত। লাশের মাথার তলায় কার্পেটেরও উপরে লেগেছে রক্তের ছোপ। জল ও ন্যাকড়া এনে সে আগে সাবধানে রক্ত চিহ্নগুলো ধুয়ে-মুছে ফেললে। তারপর লাশের মাথার তলায় একখানা খবরের কাগজ রেখে দিলে—নূতন রক্ত লেগে যাতে আর কার্পেট কলঙ্কিত না হয়।

তারপর টেবিল-কাপড়খানা আবার টেবিলের উপরে পেতে দিলে, উলটানো চেয়ারখানা দাঁড় করিয়ে দিলে সোজা করে।

কার্পেটের উপরে পড়েছিল একটা পায়ের চাপে চ্যাপটা সিগারেটের ধ্বংসাবশেষ ও একটা দেশলাইয়ের কাঠি। সে দুটো তুলে ছুড়ে দালানের দিকে ফেলে দিলে। কার্পেটের উপরে একরাশ কাচের গুঁড়ো পড়েছিল। সেই তারা-মার্কা গেলাসের ও মণিলালের চশমার ভাঙা কাচ। সেগুলো তুলে আগে সে একখানা কাগজের উপরে জড়ো করলে। তারপর যতদূর সম্ভব যত্ন করে বেছে বেছে চশমা-ভাঙা কাচের টুকরোগুলো আর একখানা কাগজের উপরে তুলে রাখলে। চশমার ফ্রেম ও কাচের চূর্ণগুলো মোড়কে পুরে রাখলে নিজের পকেটের ভিতরে। যেগুলোকে গেলাসের ভাঙা কাচ বলে মনে হল, সেগুলো কাগজে করে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির খিড়কির দিকে গেল। সেখানে একটা আস্তাকুঁড় ছিল—কাগজে-মোড়া কাচগুলো তার ভিতরে ফেলে দিয়ে আবার ফিরে এল।

এইবারে আসল কাজ। টেবিলের টানার ভিতর থেকে সে একটা ফিতার কাঠিম বার করলে। খানিকটা ফিতা ছিঁড়ে নিয়ে মৃতের ছাতা ও ব্যাগটা বেঁধে নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে রাখলে, তারপর ভূমিতল থেকে মৃতব্যক্তিকে টেনে তুললে আর এক কাঁধের উপরে। মণিলাল ছোটোখাটো মানুষ, তার দেহও ভারী নয় এবং অক্ষয় হচ্ছে দীর্ঘদেহ হৃষ্টপুষ্ট বলবান ব্যক্তি—সুতরাং তার পক্ষে বড়োজোর একমন পনেরো বা বিশ সের ওজনের একটা দেহের ভার বহন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়।

শীতার্ত অন্ধ রাত্রি—চারিদিক নিঝুম।

অক্ষয় খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে পোড়োজমির উপরে গিয়ে পড়ল। কুয়াশায় অন্ধকারকে যেন আরও ঘন করে তুলেছে—চোখ চেয়েও কিছু দেখা যায় না।

অক্ষয় খানিকক্ষণ কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল। একটা ভীত শিয়াল বা কুকুরের দ্রুত পদশব্দ ছাড়া আর জন-প্রাণীর সাড়া পাওয়া গেল না।

অক্ষয় তখন দৃঢ়পদে অগ্রসর হল। পোড়োজমিটা এবড়ো-খেবড়ো ও কাঁকর ভরা হলেও

আঁধার রাতে তার খুব অসুবিধা হল না—কারণ এ মাঠ তার বিশেষ পরিচিত।

ঘাসের উপর তার পায়ের শব্দ হচ্ছিল না বটে, কিন্তু সেই সূচীভেদ্য স্তব্ধতার মধ্যে তার কাঁধে ব্যাগ ঝোলানো আর ছাতা পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করে তুলছিল একটা বিরক্তিজনক আওয়াজ। মণিলালের দোদুল্যমান মৃতদেহের চেয়ে সেই ব্যাগ ও ছাতাকে সামলাবার জন্য অক্ষয়কে বিশেষ বেগ পেতে হচ্ছিল।

এই পোড়োজমির পাশেই রেললাইন। সাধারণত জমিটুকু পার হতে তিন-চার মিনিটের বেশি সময় লাগে না। কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে পিঠে একটা মড়া নিয়ে অতি সাবধানে চারিদিকে চোখ ও কান রেখে, চলতে চলতে মাঝে মাঝে হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে আবার অগ্রসর হতে গিয়ে অক্ষয়ের প্রায় আট-নয় মিনিট লাগল।

তারপর পাওয়া গেল রেললাইনের তারের বেড়া। আবার সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি খুঁজতে লাগল কোনও জীবন্ত ছায়া, তার কান খুঁজতে লাগল কোনও জীবনের সাড়া! কিছু নেই। খালি অন্ধকার, খালি নীরবতা।

হঠাৎ দূর থেকে জেগে উঠল চলন্ত রেলগাড়ির চাকার গড় গড় আওয়াজ—তারপর অতিতীব্র বাঁশির চিৎকার!

অক্ষয় সজাগ হয়ে উঠল—আর দেরি নয়! সে তাড়াতাড়ি তারের বেড়া পার হল। তারপর যেখানটায় লাইন বেঁকে মোড় ফিরেছে সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল। লাশটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে মাটির উপরে এমনভাবে উপুড় করে রাখলে, যাতে দেহের কণ্ঠদেশটা পড়ে ঠিক লাইনের উপরে।

তারপর সে পকেট থেকে ছুরি বার করে ছাতা ও ব্যাগের ফিতা কেটে ফেললে। ছাতা ও ব্যাগটাকে রাখলে ঠিক লাশের পাশে। সযত্নে ফিতাটাকে আবার পকেটে পুরলে, লাইনের কাছে পড়ে রইল কেবল ফিতার ফাঁশটুকু। সেটা তার চোখ এড়িয়ে গেল।

গাড়ির শব্দ কাছে এগিয়ে এসেছে। এ খানা নিশ্চয়ই মালগাড়ি।

অক্ষয় শীঘ্রহস্তে পকেট থেকে কাগজের মোড়কটাকে বার করলে। চশমার তোবড়ানো 'ফ্রেম'টা রেখে দিলে মৃতের মাথার পাশে। এবং কাচের টুকরোগুলো ছড়িয়ে দিলে তারই চতুর্দিকে!

ইঞ্জিনের ধূম্র-উদ্‌গিরণের ভোঁস ভোঁস শব্দ শোনা যাচ্ছে অতি নিকটে! অক্ষয়ের ইচ্ছা হল, সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। স্বচক্ষে দেখে যায়, যবনিকা পতনের পূর্বে এই বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যটা—কেমন করে নরহত্যা পরিণত হয় আত্মহত্যায় বা দৈব দুর্ঘটনায়।

কিন্তু না, এখানে তার উপস্থিতি নিরাপদ নয়। তাহলে হয়তো অদৃশ্য হবার আগে কেউ তাকে দেখে ফেলবে। চটপট সে আবার বেড়া পার হল, দ্রুতপদে পোড়োজমির উপর দিয়ে নিজের বাড়ির দিকে ফিরতে লাগল—পিছনে যথাস্থানে আগতপ্রায় রেলগাড়ির বজ্রধ্বনি শুনতে শুনতে।

রেলগাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে!

শ্বাস রুদ্ধ করে ভূপ্রোথিত মূর্তির মতন স্তম্ভিত হয়ে অক্ষয় দাঁড়িয়ে পড়ল—মুহূর্তের জন্যে। তারপর সে প্রায় দৌড়ে নিজের বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল। নীরবে দরজা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিলে।

সে ভয় পেয়েছে। ব্যাপার কী? গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল কেন? নিশ্চয়ই লাশটা আবিষ্কৃত হয়েছে!

কিন্তু এখন কী হচ্ছে ওখানে? ওরা কি তার বাড়িতে আসবে? রান্নাঘরের কাছে দাঁড়িয়ে সে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল। হয়তো এখনই কেউ এসে তার দরজার কড়া নাড়বে।

বৈঠকখানায় ঢুকে পড়ে সে ব্যস্তভাবে তাকিয়ে দেখলে চারিদিকে। সমস্তই বেশ গোছালো।

কিন্তু লোহার ডান্ডাটা এখনও ঘরের মেঝেয় পড়ে আছে।

সে ডান্ডাটা তুলে নিয়ে ল্যাম্পের আলোয় পরীক্ষা করে দেখলে। তার উপরে কোনও রক্তের দাগ নেই। কেবল দুই-এক গাছা চুল লেগে আছে।

রেলগাড়ির ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কের মতন সে টেবিল-কাপড় দিয়ে ডান্ডাটা একবার মুছে ফেললে।

সেটাকে নিয়ে আবার বাড়ির পিছন দিকে দৌড়ে গেল। পাঁচিলের উপর দিয়ে ডান্ডাটাকে ছুড়ে ফেলে দিলে—সেটা পড়ল গিয়ে পোড়োজমির বিছুটির ঝোপের ভিতরে।

ডান্ডাটার ভিতরে তাকে ধরিয়ে দেবার মতন কোনও প্রমাণ ছিল না। কিন্তু সেটাকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়েছে বলেই অক্ষয়ের চক্ষে তা ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল।

সে বুঝলে, এইবার তার স্টেশনের দিকে যাত্রা করা উচিত। যদিও এখনও গাড়ির সময় হয়নি তবু আর বাড়ির ভিতরে থাকতে তার ভরসা হল না। সে চায় না, এখানে এসে কেউ তাকে দেখতে পায়।

অক্ষয় তাড়াতাড়ি বাইরে বেরুবার আয়োজন সেরে নিলে। তারপর একটা ব্যাগ তুলে নিয়ে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে পড়তে গেল।

কিন্তু আবার ফিরে এল, ল্যাম্পটা নিবিয়ে দেবার জন্যে।

আলো নেবাবার জন্যে হাত তুলেছে—হঠাৎ তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল ঘরের একদিকে। কী সর্বনাশ!

॥ পঞ্চম ॥

মণিলালের টুপিটা তখনও পড়ে রয়েছে চেয়ারের উপরে!

তার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন বন্ধ হয়ে গেল—একেবারে আড়ষ্ট! সে মারাত্মক আতঙ্কে ঘেমে উঠল।

আর একটু হলেই তো সে আলো নিবিয়ে চলে যাচ্ছিল—পিছনে তার বিরুদ্ধে এত বড়ো প্রমাণ ফেলে রেখে! বাইরের কেউ যদি এসে এই টুপিটা এখানে দেখতে পেত, কী হত তাহলে?

চেয়ারের কাছে গিয়ে নেমদার টুপিটা তুলে নিয়ে সে তার ভিতর দিকে দৃষ্টিপাত করে শিউরে উঠল!

টুপিটা না দেখে চলে গেলে কি আর রক্ষে ছিল? এখনই যদি কারা এসে পড়ে, তার হাতে বা ঘরে এই টুপিটা দেখতে পায়, তাহলে কেউ তাকে ফাঁসিকাঠ থেকে বাঁচাতে পারবে না।

এই কথা ভেবেই সে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। কিন্তু দারুণ আতঙ্কে বুদ্ধি হারালে না।

রান্নাঘরের উনুনের কাছে ছুটে গিয়ে সে দেখলে, আগুন নিবে গেছে। তখনই কতকগুলো জ্বালানি কাঠ জোগাড় করে এনে অক্ষয় আবার অগ্নি সৃষ্টি করলে। তারপর ছুরি দিয়ে টুপিটা খণ্ড খণ্ড করে কেটে সমর্পণ করলে আগুনের কবলে। তার হৃৎপিণ্ড তখনও যেন দুপ দুপ করে লাফিয়ে উঠছে। যদি কেউ এসে পড়ে—যদি কেউ এসে পড়ে! তার হাতের কাঁপুনি যেন আর থামতেই চায় না—এখনই এত সাবধানতা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল আর কী!

নেমদা বা ফেল্ট সহজে পোড়বার জিনিস নয়। টুপির খণ্ডগুলো ধিকি-ধিকি করে আস্তে আস্তে পুড়ে প্রচুর ধোঁয়ার জন্ম দিয়ে অঙ্গারের মতন হয়ে যাচ্ছে—সত্যিকার ভস্মে পরিণত হচ্ছে না। তার উপরে চুল-পোড়া গন্ধের সঙ্গে রজনের গন্ধ মেশানো এমন একটা বিষম দুর্গন্ধ বেরুতে লাগল যে, অক্ষয় ভয় পেয়ে রান্নাঘরের জানলাগুলো খুলে দিতে বাধ্য হল।

তখনও সে কান পেতে শুনছে আর ভাবছে, বাইরে ওই বুঝি জাগল কার পদ-শব্দ, ওই বুঝি নড়ে ওঠে সদরের কড়া, ওই বুঝি আসে নিয়তির নিষ্ঠুর আহ্বান!

ওদিকে সময়ও আর নেই। সাড়ে আটটা বাজতে বাকি আর বিশ মিনিট মাত্র! আর মিনিট কয়েকের মধ্যেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে না পারলে ট্রেন ধরা অসম্ভব হবে!

আরও অল্পক্ষণ অপেক্ষা করে দেখলে, টুপির খণ্ডগুলোকে আর চেনা যায় না। তখন সে একটা লোহার শিক নিয়ে অঙ্গারগুলোর উপরে সজোরে আঘাত করতে লাগল। পোড়া কাঠ ও কয়লার সঙ্গে টুপির দগ্ধাবশেষ নেড়ে নেড়ে এমন করে মিশিয়ে দিলে যে, সন্দেহজনক কোনও কিছু চোখে পড়বার উপায় আর রইল না। এমনকি ভৃত্য রামচরণ পর্যন্ত কিছু বুঝতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। খুব সম্ভব সে যখন ফিরে আসবে অঙ্গার তখন ভস্মে পরিণত হবে। অক্ষয় ভালো করেই দেখে নিয়েছে, টুপির মধ্যে ধাতু দিয়ে তৈরি এমন কোনও বস্তু নেই, আগুনের কবলেও যা নষ্ট হবার নয়।

আবার সে ব্যাগ তুলে নিলে, আবার সে তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলিয়ে বৈঠকখানার চতুর্দিক পরীক্ষা

করলে, তারপর ঘর ছেড়ে বাড়ির বাইরে গেল। সদর দরজার কুলুপে চাবি লাগালে। তারপর হনহন করে চলল স্টেশনের দিকে।

কিন্তু এবার সে ভুলে গেল, বৈঠকখানার আলো নিবিয়ে দিতে!

ট্রেন আসবার আগেই অক্ষয় স্টেশনে গিয়ে পৌঁছোল। টিকিট কিনলে। তারপর যেন নিশ্চিন্ত ভাবেই প্ল্যাটফর্মের উপরে পায়চারি করতে লাগল।

সে আড়-চোখে বেশ লক্ষ করলে, এখনও ট্রেনের সিগন্যাল দেওয়া হয়নি বটে, কিন্তু চারিদিকেই যেন একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে! যাত্রীরা প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্তে গিয়ে দলবেঁধে রেললাইনের একদিকেই দূরে তাকিয়ে আছে।

সঙ্কোচ ভরা কৌতূহলের সঙ্গে অক্ষয় সেইদিকে এগিয়ে গেল পায়ে পায়ে।

অন্ধকার ফুঁড়ে আত্মপ্রকাশ করলে দুইজন লোক। প্ল্যাটফর্মের ঢালু প্রান্ত দিয়ে উপরে উঠে এল। তারা তেরপলে ঢাকা স্ট্রেচারে করে কী যেন বয়ে আনছে।

সেটা যে কী, তা বুঝতে অক্ষয়ের দেরি লাগল না। তার বুক করতে লাগল ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ।

তেরপলের তলা থেকে একটা অস্পষ্ট দেহের গঠন ফুটে উঠেছে—যাত্রীরা তাড়াতাড়ি এপাশে-ওপাশে সরে গিয়ে সেইদিকে তাকিয়ে রইল আড়ষ্ট, মন্ত্রমুগ্ধ চোখে।

বাহকরা চলে গেল। পিছনে পিছনে আসছিল একটা কুলি। তার হাতে একটা ব্যাগ আর ছাতা।

হঠাৎ যাত্রীদের ভিতর থেকে একটি ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, 'যে লোক কাটা পড়েছে, ওটা কি তারই ছাতা?'

কুলি বললে, 'হাঁ বাবু!' ছাতাটা সে ভদ্রলোকের চোখের সামনে তুলে ধরলে। দামি ছাতা। তার হাতলটা বিশেষ ধরনে রুপো দিয়ে বাঁধানো।

ভদ্রলোক সচমকে বলে উঠলেন, 'হা ভগবান! বলো কী?'

তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন আর একটি দীর্ঘদেহ ভদ্রলোক। তিনি শুধোলেন, 'কেন বসন্তবাবু, আপনি এ কথা বলছেন কেন?'

বসন্তবাবু বললেন, 'ওটা হচ্ছে মণিলাল বুলাভাইয়ের ছাতা। আমি বাঁট দেখেই চিনেছি!'

দ্বিতীয় অংশ

(অপরাধ আবিষ্কারের কলাকৌশল)

॥ প্রথম ॥

[ডাক্তার দিলীপ চৌধুরির এত নামডাক ডাক্তারির জন্যে নয়। তিনি সুবিখ্যাত রসায়নতত্ত্ববিদ। এবং তাঁর আসল খ্যাতির কারণ, বিজ্ঞানের সাহয্যে বিচিত্র উপায়ে তিনি বহু কঠিন ও রহস্যপূর্ণ পুলিশ কেসের কিনারা করেছেন। শ্রীমন্ত সেন হচ্ছেন তাঁর বিশেষ বন্ধু ও নিত্যসঙ্গী। নীচেকার অংশ শ্রীমন্ত সেনের ডায়ারি থেকে তুলে দেওয়া হল।]

সকলেই জানেন, চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে যেখানে আইনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে, সেখানে পুলিশের মাথাওয়ালারা আমার বন্ধু ডাক্তার দিলীপ চৌধুরির সাহায্য লাভ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

কলকাতার বিখ্যাত জহুরি মণিলাল বুলাভাইয়ের মৃত্যুরহস্যের মধ্যে বন্ধুবর দিলীপের কৃতিত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু তাঁর ওই medico-legal পদ্ধতির কোনও কোনও বিশেষত্ব পুলিশকে খুশি করতে পারেনি। ওই বিশেষত্বগুলি যে কী, যথাস্থানে দিলীপের মুখেই তা প্রকাশ পাবে। আপাতত, কেমন করে আমরা এই ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লুম, গোড়া থেকে সেই কথাই বলব।

শীতের কুয়াশামাখা সন্ধ্যা যখন অন্ধকারে একেবারে কালো হয়ে গিয়েছে, আমাদের ট্রেন গতি কমিয়ে ধীরে ধীরে চাঁদনগরের ছোটো স্টেশনের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

দিলীপ কামরার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'আরে আরে, বসন্তবাবু যে!'

সঙ্গে সঙ্গে একটি সহজে-উত্তেজিত-হবার মতন চেহারার ছোটোখাটো চটপটে অথচ হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক আমাদের কামরার কাছে এসে বললেন, 'অ্যাঁ, দিলীপবাবু? জানলার ধারে আপনার মুখ দেখেই চিনেছি! ভারী খুশি হলুম মশাই, ভারী খুশি হলুম! কিন্তু আপনারা হচ্ছেন মস্তবড়ো বিজ্ঞ লোক, আমাকে আপদ ভাববেন না তো?'

দিলীপ হেসে বললেন, 'আপনার দীনতা দেখে লজ্জা পাচ্ছি। কিন্তু যাক সে কথা। এখানে আপনি কী করছেন বলুন দেখি?'

—'আমার ছোটোভাই এখান থেকে কিছুদূরে একটা জমি কিনেছে। আমি তাই দেখতে এসেছিলুম। এই ট্রেনেই কলকাতায় ফিরব।' বলেই বসন্তবাবু দরজা খুলে কামরার ভিতরে উঠে এলেন, তারপর বসে পড়ে বললেন, কিন্তু আপনারা কোথায় গিয়েছিলেন? সঙ্গে ওই রহস্যময় ছোটো বাক্সটিও এনেছেন দেখছি! ও বাক্সটি দেখেই নতুন অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছি! আমার কাছে ওটি হচ্ছে ম্যাজিক-বাক্স!'

দিলীপ বললেন, 'ও বাক্সটি সঙ্গে না নিয়ে আমি কখনও বাড়ির বাইরে পা বাড়াই না।

হঠাৎ কখন কী দরকার হতে পারে কে জানে? ছোটো বাক্স, বইতে কষ্ট নেই, কিন্তু দরকারের সময়ে ওটিকে হাতের কাছে না পেলে নাকালের একশেষ হতে হয়!

বাক্সের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসন্ত বললেন, 'সেই ব্যাঙ্কে খুনের মামলায় ওই বাক্স থেকে যন্ত্রপাতি বার করে আপনি যে আশ্চর্য ভেলকিবাজি দেখিয়েছিলেন, আমার এখনও মনে আছে। অদ্ভুত বাক্স, অদ্ভুত বাক্স! ওর মধ্যে কী জাদু আছে, কে জানে!

দিলীপ মৃদু হেসে সস্নেহে বাক্সটির দিকে তাকিয়ে তার ডালা খুলে ফেললেন। একরত্তি বাক্স—চৌকো একফুট মাত্র। দিলীপ এটিকে বলেন, 'আমার পকেট-রসায়নশালা!' এর মধ্যে খুদে খুদে যে জিনিসগুলি আছে, তার সাহায্যে যে-কোনও রাসায়নিক অনায়াসেই প্রাথমিক পরীক্ষাকার্য সম্পাদন করতে পারেন।

'অদ্ভুত বাক্স, অদ্ভুত বাক্স!'—বলে বসন্তও মুগ্ধচোখে তার ভিতর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার ভিতরে যা কিছু আছে সব এতটুকু-এতটুকু—যেন গালিভারের ভ্রমণ কাহিনিতে বর্ণিত কড়েআঙুলের মতন ছোট্ট মানুষের দেশ লিলিপুটে ব্যবহারযোগ্য, অথচ তার মধ্যে নেই কী? নানা রাসায়নিক তরল পদার্থে ভরা পরীক্ষক-শিশি, কাচনল, স্পিরিট-ল্যাম্প, অণুবীক্ষণ প্রভৃতি!

বসন্ত বললেন, 'এ যেন পুতুলখেলার বাক্স! কিন্তু মশাই, এত ছোটো ছোটো জিনিস নিয়ে কি কাজ করা যায়? ধরুন, ওই অণুবীক্ষণটি—'

দিলীপ বললেন, 'ওটিকে খেলনার মতন দেখতে বটে, কিন্তু ওটি খেলনা নয়। ওর বীক্ষণকাচ ছোটো হলেও যথেষ্ট শক্তিশালী। অবশ্য বড়ো যন্ত্রে কাজের সুবিধা হয় বেশি, কিন্তু পথে-বিপথে যেখানে বড়ো যন্ত্র পাওয়া অসম্ভব, সেখানে তার অভাব এর দ্বারা যথাসম্ভব পূরণ করা চলে। এগুলি হচ্ছে মধুর অভাবে গুড়ের মতো—কিছু-নেইয়ের মধ্যে তবু-কিছু!'

বসন্ত হাত দিয়ে এক-একটি জিনিস তোলেন, আর বালকের মতন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেন। তাঁর অসীম কৌতূহল চরিতার্থ করতে করতে গাড়ি এসে পড়ল চাঁদনগর জংশনে।

বসন্ত বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ও দিলীপবাবু, এইখানেই আমাদের গাড়ি-বদল করতে হবে না?'

দিলীপ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হ্যাঁ।'

আমরা তিনজনেই প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লুম। এবং নেমেই বুঝলুম, এখানে কোনও অসাধারণ ঘটনা ঘটেছে! যাত্রী এবং স্টেশনের লোকজনরা প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্তে গিয়ে সমবেত হয়েছে—চারিদিকেই যেন কেমন একটা চাপা চাঞ্চল্যের ভাব।

স্টেশনের একটি লোককে ডেকে বসন্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কী মশাই?'

—'লাইনের ওদিকে একটি লোক রেলগাড়ি চাপা পড়েছে। দূর থেকে ওই যে একটা লণ্ঠনের আলো দেখা যাচ্ছে, খুব সম্ভব স্ট্রেচারে করে লাশ নিয়ে আসা হচ্ছে।'

আমরা যখন সেই অন্ধকারে দোদুল্যমান আলোটার দিকে তাকিয়ে আছি, তখন টিকিট-ঘর থেকে একটি লোক বেরিয়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল।

লোকটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে দুই কারণে। প্রথমত, তার মুখ হাসিখুশিমাখা হলেও কেমন যেন বিবর্ণ এবং তার চক্ষে ছিল একটা বন্য ভাব; দ্বিতীয়ত, সাগ্রহ কৌতূহলের সঙ্গে রেললাইনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকলেও সে কারুকে কোনও প্রশ্ন করছিল না।

দুলন্ত আলোটা কাছে এগিয়ে এল। তারপর দেখা গেল, দুজন লোক তেরপলে ঢাকা একটা স্ট্রেচার নিয়ে প্ল্যাটফর্মের ঢালু গা বেয়ে উপরে উঠে আসছে। তেরপলের তলায় যে একটা মনুষ্যদেহ আছে, সেটাও আমরা বুঝতে পারলুম।

একটা ছাতা ও একটা ব্যাগ নিয়ে আসছিল একজন কুলি। বসন্তবাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যে লোক কাটা পড়েছে, ওটা কি তারই ছাতা?'

কুলি ছাতাটা তুলে ধরে বললে, 'হাঁ বাবু!'

বসন্ত সচমকে বলে উঠলেন, 'হা ভগবান! বলো কী?'

দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন বসন্তবাবু, আপনি একথা বলছেন কেন?'

বসন্ত বললেন, 'ওটা হচ্ছে মণিলাল বুলাভাইয়ের ছাতা। আমি ওর বাঁট দেখেই চিনেছি!'

দিলীপ বললেন, 'জহুরি মণিলাল বুলাভাই?'

বসন্ত বললেন, 'হ্যাঁ। মণিলালের একটা অভ্যাস ছিল, টুপির তলায় নিজের নাম লিখে রাখা। ওহে বাপু কুলি, লাশের টুপিটা একবার দেখাও দেখি!'

কুলি বললে, 'কোনও টুপি পাওয়া যায়নি। স্টেশনমাস্টার আসছেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন।'

স্টেশনমাস্টার এসে বললেন, 'ব্যাপার কী?'

বসন্ত বললেন, 'এই ছাতা আর এর মালিককে আমি চিনি।'

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'তাই নাকি, তাই নাকি? তাহলে একবার আমার সঙ্গে আসুন, লাশটাও শনাক্ত করতে পারেন কি না দেখি!'

বসন্ত সভয়ে দুই পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, 'ও বাবা!'

—'ভয় পাচ্ছেন কেন?'

—'রেলে কাটা পড়ে মণিলালের চেহারা কীরকম বিশ্রী হয়েছে, কে জানে!'

—'চেহারা মোটেই ভালো হয়নি। ছ-খানা মালগাড়ির চাকা বেচারার ওপর দিয়ে চলে যাবার আগে ড্রাইভার গাড়ি থামাতে পারেনি। ধড় থেকে মুণ্ডটা একেবারে আলাদা হয়ে গিয়েছে।'

খাবি খেতে খেতে বসন্ত বললেন, 'বাপ রে, কী বীভৎস কাণ্ড! মাপ করবেন মশাই, ও-দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারব না। হ্যাঁ দিলীপবাবু, আপনি কী বলেন?'

—'আমি বলি, তাড়াতাড়ি দেহ শনাক্ত করতে পারলে পুলিশের খুব সুবিধা হয়।'

বসন্ত ম্লান মুখে বললেন, 'তাহলে আর উপায় নেই, আমাকে দেখতেই হবে।'

স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে বসন্ত একটি ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন—যারপরনাই অনিচ্ছুকভাবে। কিন্তু এক মিনিট যেতে না যেতেই তিনি দৌড়োতে দৌড়োতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, তাঁর মুখ-চোখ ভীত, উদ্‌ভ্রান্তের মতো।

দিলীপের কাছে ছুটে এসে রুদ্ধশ্বাসে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মণিলাল বুলাভাইই বটে! হায় রে বেচারা! ভয়ানক, ভয়ানক!'

দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'মণিলালের সঙ্গে কোনও দামি পাথর-টাথর ছিল?'

(এই সময়ে, একটু আগে আমি যে হাসিমুখ অথচ ছন্নছাড়ার মতো লোকটাকে লক্ষ করেছিলুম, সে একেবারে আমাদের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনতে লাগল)

বসন্ত বললেন, 'দামি পাথর? থাকাই সম্ভব, কিন্তু আমি ঠিক করে কিছু বলতে পারছি না, তবে মণিলালের কর্মচারীরা নিশ্চয়ই বলতে পারবে। ......হ্যাঁ, একটা কথা আমার রাখবেন?'

—'বলুন।'

—'যদি আপনার সময় থাকে, এই মামলাটার দিকে একটু লক্ষ রাখতে পারবেন? মণিলাল আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন।'

—'বেশ বসন্তবাবু, তাই হবে। আমার হাতে আজ আর কোনও কাজ নেই, আমি না-হয় কাল সকালেই কলকাতায় ফিরব। কী হে শ্রীমন্ত, তোমার কিছু অসুবিধা হবে না তো?'

—'কিছু না।'

বসন্ত বললেন, 'ধন্যবাদ। ওই কলকাতার গাড়ি এসে পড়েছে। কাল দেখা হলে অন্য সব কথা।'

—'কালকেই আপনি সব খবর পাবেন।'

সেই যে অদ্ভুত লোকটা আমাদের কাছে ঘেঁসে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিল, দিলীপের মুখের দিকে সে একবার অত্যন্ত উৎসুক চোখে তাকালে, তারপর যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বসন্তবাবুর পিছনে পিছনে কলকাতার গাড়ির দিকে অগ্রসর হল।

কলকাতার গাড়ি চলে যাবার পর দিলীপ স্টেশনমাস্টারের কাছে গিয়ে জানালেন, বসন্তবাবু তাঁর উপরে কোন ভার অর্পণ করে গিয়েছেন। এবং সেই সঙ্গে বললেন, 'অবশ্য পুলিশ না আসা পর্যন্ত আমি কিছুই করব না। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে তো?'

—'হ্যাঁ। পুলিশ খুব শীঘ্রই এসে পড়বে। পুলিশকে আপনার কথা জানাব।' স্টেশন-মাস্টার এই বলে চলে গেলেন।

আমি আর দিলীপ প্ল্যাটফর্মের উপরে পদচারণা করতে লাগলুম।

দিলীপ বললেন, 'এ ধরনের মামলায় তিন রকম ব্যাখ্যা থাকে। দৈব-দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা,

হত্যা। আর এই তিন রকম তথ্যের সিদ্ধান্ত থেকেই আমাদের একটা মীমাংসায় এসে পৌঁছোতে হবে। প্রথম, মামলার সাধারণ তথ্য; দ্বিতীয়, দেহ পরীক্ষা করে যে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে; তৃতীয়, ঘটনাস্থল পরীক্ষা করে জানা যাবে যে সত্য। আপাতত আমরা যে সাধারণ তথ্যটুকু জানতে পেরেছি, তা হচ্ছে এই—মৃতব্যক্তি হীরক ব্যবসায়ী। নিজের ব্যাবসার জন্যেই যে সে এমন জায়গায় এসেছিল, এটুকু আমরা ধরে নিতে পারি। হয়তো তার সঙ্গে ছিল দামি দামি পাথর। এই তথ্য হচ্ছে আত্মহত্যার বিরোধী। মনে সন্দেহ আনে, হয়তো এর মধ্যে হত্যাকারীর হাত আছে। তারপর প্রশ্ন ওঠে, এটা দৈবদুর্ঘটনা কি না? তাহলে জানতে হবে, যেখানে দেহ পাওয়া গিয়েছে সেখানে কোনও লেভেলক্রসিং কি লাইনের কাছে কোনও রাস্তা আছে কি না? কিংবা ঘটনাস্থলে মৃতব্যক্তির আকস্মিক উপস্থিতির কোনও সঙ্গত কারণ আছে কি না? এসব তথ্য এখনও আমরা জানতে পারিনি। কিন্তু এগুলি আমাদের জানা উচিত।'

আমি বললুম, 'যে কুলিটা ছাতা আর ব্যাগ নিয়ে আসছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলেই তো পারো! ওই দ্যাখো, একদল লোকের কাছে দাঁড়িয়ে সে খুব-সম্ভব আজকের ঘটনাই বর্ণনা করছে। আমাদের মতন নূতন শ্রোতা পেলে তার উৎসাহ আরও বেড়ে উঠতে পারে!'

দিলীপ বললেন, 'শ্রীমন্ত, তোমার কথাই শুনব। দেখা যাক ও কী বলে!'

আমরা কুলিটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম—সত্য-সত্যই সে গল্পের ভার নামাবার জন্যে অতিশয় উৎসুক হয়ে উঠেছে!

দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপারটা কেমন করে ঘটল বলতে পারো!'

সে বললে, 'ড্রাইভার যা বললে তা আমি শুনেছি। ওখানে এক জায়গায় লাইনটা বেঁকে গিয়েছে। মালগাড়ি যখন সেই বাঁকের মুখে এসে পড়ে, ড্রাইভার তখন হঠাৎ দেখতে পায়, লাইনের উপরে কী যেন পড়ে আছে! তারপর ইঞ্জিনের হেড লাইটে দেখা যায়, একজন মানুষ সেখানে শুয়ে আছে। সে তখনই বাষ্প বন্ধ করে দেয়, বাঁশি বাজায় আর ব্রেক কষে। কিন্তু জানেন তো মশাই, এত তাড়াতাড়ি মালগাড়ি থামানো সোজা ব্যাপার নয়। থামবার আগেই ছ খানা গাড়ি লোকটার উপর দিয়ে গড়গড় করে চলে যায়!'

দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'লোকটা কীভাবে শুয়েছিল, ড্রইভার সে কথা কিছু বলেছে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। হেডলাইটে সে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে, লোকটা লাইনের ওপর গলা দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়েছিল। লোকটা ইচ্ছে করেই প্রাণ দিয়েছে মশাই!'

—'সেখানে কোনও লেভেলক্রসিং ছিল?'

—'না বাবু। সেখানে কোনও রাস্তা-টাস্তাও ছিল না। লোকটা নিশ্চয়ই মাঠের ভেতর দিয়ে এসে, তারের বেড়া টপকে লাইনের ওপরে এসেছিল। সে আত্মঘাতী হবে বলে পণ করেছিল।'

—'এত কথা তুমি জানলে কেমন করে?'

—'স্টেশনমাস্টার আমাকে বলেছেন।'

দিলীপের সঙ্গে আমি ফিরে এসে একখানা বেঞ্চির উপরে বসে পড়লুম।

দিলীপ বললেন, 'একদিক দিয়ে লোকটার কথা খুব ঠিক। এটা দৈবদুর্ঘটনা নয়। তবে লোকটা যদি রাতকানা, কালা বা নির্বোধও হত, হয়তো বেড়া ডিঙিয়ে লাইনে নেমে মারা পড়তেও পারত। কিন্তু মণিলাল বুলাভাই সে-শ্রেণির লোক নয়। মণিলাল লাইনের উপরে গলা দিয়ে শুয়েছিল। এথেকেও আমরা দু-একটা অনুমান করতে পারি। হয় সে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছে; নয়, মৃত বা অজ্ঞান অবস্থাতেই তার দেহ পড়েছিল লাইনের উপরে। যতক্ষণ আমরা লাশ পরীক্ষা করবার সুযোগ না পাব, ততক্ষণ এর বেশি আর কিছু জানতে পারা যাবে না। ......ওই দ্যাখো শ্রীমন্ত, পুলিশ এসে পড়েছে! চলো, ওরা কী বলে শোনা যাক।'

॥ দ্বিতীয় ॥

স্টেশনমাস্টার একজন ইউনিফর্ম-পরা পুলিশ ইনস্পেকটারের সঙ্গে কথা কইছিলেন।

দিলীপ ও আমাকে দেখেই তাঁদের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল এবং দুজনেই একবাক্যে জানালেন, এসব ব্যাপারে তাঁরা বাইরের লোকের সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নন।

দিলীপ এতক্ষণ আত্মপরিচয় দেননি। তিনি জানতেন, বাংলা দেশের যেসব পুলিশ কর্মচারী তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত নন, তাঁরাও অন্তত তাঁর নামের সঙ্গে সুপরিচিত। তিনি তাঁর কার্ড বার করে ইনস্পেকটারের হাতে দিলেন।

কার্ডখানা হতে করে ইনস্পেকটার নিজের মনে বিড়বিড় করে কী যেন বকতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'আচ্ছা, আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।'

ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখা গেল স্ট্রেচারটা রয়েছে মেঝের উপরে—সেইভাবেই তেরপল-ঢাকা। কাছেই একটা বড়ো বাক্সের উপরে রয়েছে ব্যাগ ও ছাতাটা। তাদের পাশেই একটা চশমার তোবড়ানো ফ্রেম, তার কাচ নেই।

দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই চশমার ফ্রেমটা কি লাশের সঙ্গেই পাওয়া গিয়েছে?'

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'হ্যাঁ। ফ্রেমটা ঠিক লাশের পাশেই ছিল আর তার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল ভাঙা কাচের টুকরো।'

দিলীপ নোটবুকে কথাগুলো টুকে নিলেন।

এদিকে ইনস্পেকটার লাশের উপর থেকে সরিয়ে দিলেন তেরপলের আচ্ছাদন!

দৃশ্যটা ভীষণ, সন্দেহ নেই। মৃতদেহটা এলিয়ে পড়ে আছে স্ট্রেচারের উপরে। বিচ্ছিন্ন

মুণ্ড—ভাবহীন চোখদুটো দৃষ্টিহীন স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কড়িকাঠের দিকে। মুণ্ডহীন দেহ অস্বাভাবিকভাবে বেঁকে রয়েছে—দেখলেই শরীরে শিউরে ওঠে।

দিলীপ পূর্ণ এক মিনিটকাল ধরে নীরবে হেঁট হয়ে মৃতদেহের দিকে চেয়ে রইলেন, ইনস্পেকটার লণ্ঠনের আলো ফেললেন লাশের উপরে।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'শ্রীমন্ত, আমরা তিনটে অনুমানের ভিতরে দুটোকে বাদ দিতে পারি।'

ইনস্পেকটার কী বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল দিলীপের হাতবাক্সের দিকে।

দিলীপ সেটি খুলে একজোড়া শব-ব্যবচ্ছেদে ব্যবহার করবার মতো ছোট্ট সাঁড়াশি বার করলেন।

ইনস্পেকটার বললেন, 'শব-ব্যবচ্ছেদ করবার হুকুম আমরা পাইনি।'

—'আমি তা জানি মশাই! আমি কেবল মৃতের মুখের ভিতরটা পরীক্ষা করব।' এই বলে দিলীপ সাঁড়াশি দিয়ে মুণ্ডের ঠোঁট টেনে তুললেন এবং মুখের ভিতরটা ভালো করে দেখে একমনে দাঁতগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন।

তারপর মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'শ্রীমন্ত, তোমার আতশিকাচখানা একবার আমাকে দাও তো!'

দিলীপ কী করেন দেখবার জন্যে ইনস্পেকটার লণ্ঠন নিয়ে আগ্রহভরে ঝুঁকে পড়লেন।

দিলীপ মৃতের অসমোচ্চ দাঁতের সারির উপর দিয়ে আতশিকাচখানা এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তারপর সাঁড়াশি দিয়ে দাঁতের উপর থেকে সযত্নে খুব সূক্ষ্ম কী-একটা জিনিস তুলে নিলেন এবং আতশিকাচের ভিতর দিয়ে জিনিসটা দেখতে লাগলেন।

অনেক কাল দিলীপের সঙ্গে সঙ্গে আছি, এরপর তাঁর কী দরকার হবে আমি জানি। আমি তখনই অণুবীক্ষণে ব্যবহার্য একখানা কাচের স্লাইড ও শব-ব্যবচ্ছেদের শলাকা তাঁর দিকে এগিয়ে দিলুম। তিনি সেই সূক্ষ্ম জিনিসটা স্লাইডের উপরে রেখে শলাকা দিয়ে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। ততক্ষণে আমি অণুবীক্ষণ যন্ত্রটা প্রস্তুত করে রাখলুম।

দিলীপ বললেন, 'একফোঁটা Farrant আর একটা cover-glass দাও।'

দিলুম।

দিলীপ তাঁর অণুবীক্ষণ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইলেন। আমি ইনস্পেকটারের মুখের দিকে তাকালুম—তাঁর মুখে বিদ্রূপহাস্য! আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি হাসি চাপবার চেষ্টা করলেন—বোধহয় ভদ্রতার অনুরোধেই!

অপ্রস্তুতভাবে তিনি বললেন, 'এসব আমার বাহুল্য বলে মনে হচ্ছে মশাই! ভদ্রলোকটি মারা যাবার আগে কি খেয়েছিলেন, সেটা জেনে কিছু লাভ আছে কি? আমার বিশ্বাস, ভদ্রলোক কুখাদ্য খেয়ে মারা পড়েননি।'

দিলীপ সহাস্যে মুখ তুলে বললেন, 'মশাই, এ-শ্রেণির মামলায় কিছুই বাহুল্য নয়। প্রত্যেক তথ্যেরই কিছু-না-কিছু মূল্য আছে।'

ইনস্পেকটার দমলেন না, বললেন, 'যার মুণ্ড কাটা গেছে, তার শেষ-খাবারের কথা জেনে কোনওই লাভ নেই।'

—'তাই নাকি? যে অপঘাতে মারা পড়েছে, তার শেষ খাবারের কথাটা কি এতই তুচ্ছ? মৃতের ফতুয়ার গায়ে এই যে গুঁড়ো গুঁড়ো কী জিনিস লেগে রয়েছে, দেখছেন? এথেকে আমরা কি কিছুই জানতে পারব না?'

ইনস্পেকটার অবিচলিতভাবে বললেন, 'এমন কী আর জানতে পারবেন?'

দিলীপ প্রথমে নিরুত্তর হয়ে মৃতের ফতুয়ার উপর থেকে সাঁড়াশির সাহায্যে গুঁড়োগুলো একে একে তুলে নিলেন। তারপর সেগুলো স্লাইডের উপরে রেখে অণুবীক্ষণের ভিতর দিয়ে পরীক্ষা করলেন।

তারপর মুখ তুলে বললেন, 'এই জানা যাচ্ছে যে, ভদ্রলোক মারা যাবার আগে 'ক্রিম-ক্র্যাকার' বিস্কুট খেয়েছিলেন।'

ইনস্পেকটার বললেন, 'আমার মতে, ও কথা না জানলেও চলত। মৃত কী খেয়েছিলেন তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনওই দরকার নেই। এখানে একমাত্র প্রশ্ন হচ্ছে, লোকটা মারা পড়েছে কেন? সে কি আত্মহত্যা করেছে? দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছে? না কেউ তাকে খুন করেছে?'

দিলীপ বললেন, 'মাপ করবেন মশাই! একমাত্র যে প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাচ্ছে না তা হচ্ছে এই—লোকটিকে খুন করেছে কে? আর কেনই বা খুন করেছে? অন্য সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে—অন্তত আমি পেয়েছি!'

ইনস্পেকটার সবিস্ময়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন—সে দৃষ্টিতে ছিল অবিশ্বাসের ছায়াও।

অবশেষে বললেন, 'মামলার কিনারা করে ফেলতে আপনার দেরি লাগেনি দেখছি!' তাঁর কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের ভাব।

দিলীপ দৃঢ়স্বরে বললেন, 'দেরি লাগবার কথা নয়। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে খুনের মামলা। খুনের কারণ আন্দাজ করাও শক্ত নয়। মণিলাল বুলাভাই ছিলেন নামজাদা জহুরি আর খুব সম্ভব তাঁর সঙ্গে অনেক দামি পাথরও ছিল। আপনি বরং মৃতের পোশাক একবার খুঁজে দেখুন।'

মুখে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে ইনস্পেকটার বললেন, 'এ হচ্ছে আপনার বাজে আন্দাজ। মৃতব্যক্তি জহুরি ছিলেন, তাঁর সঙ্গে দামি পাথর ছিল, অতএব ধরে নিতে হবে তিনি খুন হয়েছেন? এও যুক্তি নাকি?'

তিরস্কার-ভরা কঠিন দৃষ্টিতে অল্পক্ষণ দিলীপের দিকে চেয়ে থেকে আবার বললেন,

'মৃতের জামাকাপড় খোঁজার কথা বলছেন? হ্যাঁ, আমরা এসেছি সেইজন্যেই। মনে রাখবেন মশাই, এটা হচ্ছে বিচারাধীন মামলা—খবরের কাগজের পুরস্কার-প্রতিযোগিতা নয়!' বলেই তিনি সদর্পে আমাদের দিকে পিছন ফিরে লাশের পোশাকের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। এবং যা যা পেলেন, বড়ো বাক্সটার উপরে ব্যাগের পাশে সাজিয়ে রাখতে লাগলেন।

এদিকে দিলীপ পরীক্ষায় নিযুক্ত হলেন লাশের সমস্ত দেহটা নিয়ে। বিশেষভাবে আতশিকাচ দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন মৃতের পাদুকা। ইনস্পেকটার মাঝে মাঝে তাঁর দিকে তাকান আর তাঁর মুখ হয়ে ওঠে কৌতুকহাস্যে সমুজ্জ্বল।

তারপর নিজের কাজ সেরে ফিরে বললেন, 'আমি হলে মশাই, খালি চোখেই জুতোটা দেখতে পেতুম! (সহাস্যে স্টেশনমাস্টারকে ইঙ্গিত করে) তবে আপনি হয়তো খালি চোখে ভালো দেখতে পান না!'

দিলীপ কিছু বললেন না, মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন।

তারপর তিনি বড়ো বাক্সটার কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, মৃতের জামাকাপড়ের ভিতর থেকে কী কী জিনিস পাওয়া গিয়েছে।

মানিব্যাগ, পকেটবুক, একখানা চশমা (বোধহয় লেখাপড়ার জন্যে), পকেট ছুরি, দেশলাইয়ের বাক্স, তামাকের রবারের থলি ও কার্ডকেস প্রভৃতি ছোটো ছোটো আরও দু-একটি জিনিস।

দিলীপ প্রত্যেক জিনিসটা ভালো করে উলটে-পালটে পরীক্ষা করতে লাগলেন এবং ইনস্পেকটার তাঁকে লক্ষ করতে লাগলেন কৌতুক ও অবহেলাপূর্ণ চোখে।

দিলীপ চশমার কাচ দু-খানা আলোর বিরুদ্ধে রেখে তাদের শক্তি পরীক্ষা করলেন। থলি থেকে তামাকের গুঁড়ো তুলে দেখলেন। সিগারেট পাকাবার কাগজ ও দেশলাইয়ের বাক্সটাও তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াল না।

ইনস্পেকটার বললেন, 'তামাকের থলি নিয়ে এত নাড়াচাড়া করছেন, ওর ভেতরে আপনি কী দেখতে চান?'

—'তামাক। এর ভেতরে স্টেট এক্সপ্রেস তামাক রয়েছে।'

—'তাও বুঝতে পেরেছেন?'

—'পেরেছি। বাজারে যেসব তামাক চলে তা দেখলেই আমি বলে দিতে পারি সেগুলোর নাম কী? এ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি অনেক পরীক্ষার পর।'

—'আপনার বাহাদুরি আছে।'

—'বিনয় দেখাবার জন্যে সেটা অস্বীকার করতে চাই না। ......কিন্তু আপনি দেখছি মৃতের পকেট থেকে দামি পাথর-টাথর কিছুই পাননি।'

—'না। ওসব কিছু ছিল বলেও মনে হয় না। তবে দামি পাথর না পেলেও দামি জিনিস পেয়েছি বটে। সোনার ঘড়ি আর চেন, একটি গলাবন্ধের হিরার পিন, দু-খানা একশো আর

চারখানা দশ টাকার নোট। বুঝতেই পারছেন, খুন হলে খুনি এসবের মায়া ত্যাগ করত না! আপনার খুনের মামলা ফেঁসে গেল—কী বলবেন মশাই?'

দিলীপ বললেন, 'ওই ভেবে আপনি যদি খুশি হতে চান, খুশি হোন! কিন্তু আমার মত একটুও বদলায়নি। এইবারে কি ঘটনাস্থলটা দেখা উচিত নয়?'

—'চলুন।'

—'হ্যাঁ, আর এক কথা। মালগাড়ির ইঞ্জিনটা কি ভালো করে পরীক্ষা করা হয়েছে?'

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'হ্যাঁ। সামনের আর পিছনের চাকায় রক্তের দাগ লেগে আছে।'

দিলীপ বললেন, 'দেখা যাক, রেললাইনেও রক্তের দাগ পাওয়া যায় কি না!'

স্টেশনমাস্টার বিস্মিত হয়ে কী জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ইনস্পেকটার তাঁকে আর প্রশ্ন করবার অবসর দিলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন—আমাদেরও পাত্তাড়ি গুটোতে হল।

দিলীপ নিজেও একটা লণ্ঠন চেয়ে নিলেন। তাঁর হাতে রইল লণ্ঠন, আমার হাতে তাঁর বাক্স। ইনস্পেকটার আর স্টেশনমাস্টার যেতে লাগলেন আগে আগে।

আমি চুপিচুপি বললুম, 'দিলীপ, আমি এখনও অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছি। তুমি তো দেখছি এরই মধ্যে একটা সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হয়েছ! এ ব্যাপারটাকে তুমি আত্মহত্যা না বলে হত্যা বলছ কেন?'

দিলীপ উত্তরে বললেন, 'প্রমাণ খুব ছোটো, কিন্তু অকাট্য। মৃতের বাঁ রগের উপরে মাথার চাঁদিতে একটা ক্ষত আছে, তুমি দেখেছ? ইঞ্জিনের আঘাতে ওরকম ক্ষত হলেও হতে পারে। কিন্তু এই ক্ষত দিয়ে রক্ত পড়েছে—আর অনেকক্ষণ ধরেই পড়েছে! ক্ষত থেকে নেমে এসেছে দুটো রক্তের ধারা। দুই ধারার রক্তই ডেলা বেঁধে আর আংশিকভাবে শুকিয়ে গিয়েছে। মনে রেখো, এটা হচ্ছে ছিন্নমুণ্ড। আর এই ক্ষতের জন্ম হয়েছে নিশ্চয়ই মুণ্ডচ্ছেদের আগে, কারণ যেদিক থেকে ইঞ্জিনটা আসছিল, ক্ষতটা সেই দিকে নেই। তারপর ভেবে দ্যাখো, ছিন্নমুণ্ডের ভিতর থেকে এ রকম রক্তপাত হয় না। অতএব মুণ্ডচ্ছেদের আগেই এই ক্ষতের সৃষ্টি।

'ক্ষত থেকে শুধু রক্ত পড়েনি—রক্তের ধারা হয়েছে দুটি। প্রথম ধারাটি মুখের পাশ দিয়ে বয়ে জামার 'কলার'কেও রক্তাক্ত করে তুলেছে। দ্বিতীয় ধারাটি ক্ষত থেকে চলে গিয়েছে মাথার পিছন দিকে। শ্রীমন্ত, নিশ্চয়ই তুমি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়ম মানো? রক্ত যদি চিবুকের দিকে নেমে গিয়ে থাকে—প্রথম ধারায় যা হয়েছে—তাহলে বলতে হবে, মণিলাল তখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর রক্ত যদি সমুখ থেকে মাথার পিছন দিকে গড়িয়ে গিয়ে থাকে—দ্বিতীয় ধারায় যা হয়েছে—তাহলে বলতে হবে, মণিলাল তখন উপরদিকে মুখ তুলে চিত হয়ে শুয়েছিল।'

'এখন ড্রাইভারের কথা মনে করো। সে দেখেছে, মণিলাল মাটির দিকে মুখ করে উপুড় হয়ে লাইনের উপরে শুয়েছিল। এক্ষেত্রে রক্তের একটা ধারা বাঁ গাল বয়ে কলার পর্যন্ত এবং আর একটা ধারা মাথার নীচে থেকে উপরে উঠে পিছন দিকে নেমে আসতে পারে না। আসল ব্যাপার কী হয়েছে জানো? মণিলাল যখন সোজা হয়ে বসে বাঁ দাঁড়িয়েছিল, তখন কেউ আঘাত করেছিল তার মাথার উপরে—আর রক্তের প্রথম ধারা নেমে এসেছিল তার গাল বয়ে। তারপর সে চিত হয়ে মাটির উপরে পড়ে যায়, আর রক্তের দ্বিতীয় ধারা চলে যায় তার মাথার পিছন দিকে।'

—'দিলীপ, আমি ভারী বোকা লোক! এসব কিছু ভাবতে বা লক্ষ করতে পারিনি।'

'অভ্যাস না থাকলে কেউ তাড়াতাড়ি অনুমান বা পর্যবেক্ষণ করতে পারে না! ...আচ্ছা শ্রীমন্ত, মৃতের মুখ দেখে তোমার কোনও কথা মনে হয়েছে?'

—'হয়েছে। মনে হয়, ও যেন শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার দরুন মারা পড়েছে।'

—'ঠিক বলেছ। ও মুখ হচ্ছে শ্বাসরুদ্ধ হওয়া মানুষের। তুমি বোধহয় আরও লক্ষ করেছ, ওর জিভ ফোলাফোলা, আর ওর উপর ঠোঁটের ভিতরে দাঁত বসে যাওয়ার দাগ—তার কারণ মুখের উপরে পড়েছিল প্রবল চাপ। এখন এইসব তথ্য আর অনুমানের সঙ্গে মাথার ক্ষতের কথা মিলিয়ে দ্যাখো। খুব সম্ভব, মণিলাল মাথায় আঘাত পাবার পর হত্যাকারীর সঙ্গে যোঝাযুঝি করেছিল, তারপর হত্যাকারী তার মুখ চেপে ধরে শ্বাসরোধ করে তাকে মেরে ফেলে।'

আমি চমৎকৃত হয়ে নীরবে কিছুক্ষণ অগ্রসর হলুম!

তারপর জিজ্ঞাসা করলুম, 'মৃতের দাঁতের ভিতর থেকে তুমি সাঁড়াশি দিয়ে কী বার করে নিয়েছিল? অণুবীক্ষণে সেটা দেখবার সুযোগ আমি পাইনি।'

দিলীপ বললেন, 'ও, সেটা তুমি জানতে চাও? তার দ্বারা আমাদের অনুমান আরও বেশি অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। সেটা হচ্ছে একগোছা বোনা কাপড়ের অংশ। অণুবীক্ষণের ভিতর দিয়ে দেখে বুঝেছি আলাদা আলাদা তন্তুর দ্বারা তা বোনা হয়েছে, প্রত্যেক তন্তুর রং ভিন্ন। তার বেশির ভাগই হচ্ছে রাঙা পশমি তন্তু। সেই সঙ্গে তার মধ্যে আছে কাপড়ের নীলরঙা তন্তু, আর কতকগুলো হচ্ছে হলদে পাটের। এটা হয়তো কোনও মেয়ের রঙিন কাপড়ের অংশ। তবে পাট আছে বলে সন্দেহ হয়, হয়তো এটা কোনও পর্দা বা কম দামি অন্য কিছুর অংশ।'

—'এ থেকে কী বুঝতে হবে?'

—'যদি এটা পরনের কাপড়ের অংশ না হয়, তবে বুঝতে হবে এটা এসেছে কোনও আসবাব থেকে। আর আসবাব মানেই বোঝায় গৃহস্থালি!'

আমি আপত্তি জানিয়ে বললুম, 'এ যুক্তি অকাট্য বলে মনে হচ্ছে না!'

—'না। কিন্তু এর দ্বারা আমার একটা মত রীতিমতো সমর্থিত হচ্ছে।'

—‘কী!’

—‘মৃতের জুতোর তলা দেখে আমি যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছি। খুব ভালো করে জুতোর তলা পরীক্ষা করে দেখেছি, কিন্তু তাতে বালি, কাঁকর, মাটি বা টুকরো ঘাসের কোনও চিহ্নই পাইনি। অথচ মৃতকে রেললাইনের উপরে আসবার জন্যে নিশ্চয়ই এবড়ো-খেবড়ো মাঠ পার হয়ে আসতে হয়েছে—কারণ ঘটনাস্থলের আশেপাশে নাকি কোনও রাস্তা নেই। তার বদলে জুতোর তলায় পেয়েছি তামাকের ছাই আর একটা পোড়া দাগ—যেন সেই জুতো দিয়ে কোনও জ্বলন্ত চুরোট বা সিগারেট মাড়ানো হয়েছে। জুতোর তলায় একটা পেরেক একটু বেরিয়ে পড়েছিল, তার ডগায় লেগেছিল একটুখানি রঙিন তন্তু—তা কার্পেটের অংশ ছাড়া কিছুই নয়। এর দ্বারা বেশ বোঝা যাচ্ছে, লোকটি মারা পড়েছিল কোনও কার্পেট-পাতা ঘরের ভিতরে। তার জুতোর তলায় সেই ঘরে ঢোকবার আগে যেসব দাগ ছিল, কার্পেট বা পাপোশের সংঘর্ষে সব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তারপর ঘর থেকে সে আর পায়ে হেঁটে বেরোয়নি—কারণ মৃত্যুর পর কেউ পায়ে হাঁটতে পারে না। নিশ্চয় কেউ তার মৃতদেহ বহন করে রেললাইনের উপরে রেখে এসেছিল।’

আমি একেবারে নীরব হয়ে রইলুম। দিলীপের সঙ্গে আমার পরিচয় এত ঘনিষ্ঠ, তবু যতবারই তার সঙ্গে যাই, ততবারই আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে নতুন নতুন বিস্ময়! অতি তুচ্ছ সব তথ্য থেকে তিনি সকল দিক দিয়ে সম্পূর্ণ এমন একটি সত্যিকার ও অপূর্ব গল্প খাড়া করে তোলেন, যা শুনলে পরম বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না; মনে হয় দিলীপ যেন মায়াবী!

অবশেষে আমি বললুম, ‘যদি তোমার সিদ্ধান্ত ঠিক হয়, তাহলে তো বলতে হয় আমাদের সমস্ত সমস্যারই সমাধান হয়ে গেল। কোনও বাড়ির ভিতরে আসল ঘটনাস্থল হলে সেখানে নিশ্চয়ই আরও অনেক সূত্র পাওয়া যাবে। এখন প্রশ্ন থাকল খালি একটা। সেই বাড়িটা কোথায়?’

দিলীপ বললেন, ‘হ্যাঁ, আমার মনে এখন শুধু ওই প্রশ্নই জাগছে। কিন্তু ওইটেই হচ্ছে অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন। সেই বাড়িটার ভিতরে একবার উঁকি মারতে পারলে সমস্ত রহস্যই পরিষ্কার হয়ে যায়! কিন্তু উঁকি মারি কেমন করে? আমরা খুনের তদন্ত করছি বলে বাড়ির পর বাড়ি খানাতল্লাশ করতে পারব না। আপাতত আমাদের সমস্ত সূত্রই এক জায়গায় এসে হঠাৎ ছিঁড়ে যাচ্ছে। ছিন্ন সূত্রের অপর অংশ আছে কোনও অজানা বাড়ির মধ্যে, আর আমরা যদি দুই সূত্রকে একসঙ্গে বাঁধতে না পারি তাহলে সমস্যার কোনও সমাধানই হবে না। কারণ আসল প্রশ্ন হচ্ছে, মণিলাল বুলাভাইয়ের হত্যাকারী কে?’

—‘তাহলে তুমি কী করতে চাও?’

—‘এর পরের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, কোনও বিশেষ বাড়িকে এই অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা। ওইদিকেই দৃষ্টি রেখে এখন আমাকে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে আর সেইসব নিয়ে

বিচার করতে হবে। কিন্তু শেষ-পর্যন্ত ওই বাড়িখানাকে যদি আবিষ্কার করতে না পারি, তাহলে এদিক দিয়ে আমাদের সমস্ত অনুসন্ধানই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তখন বেছে নিতে হবে আবার কোনও নতুন পথ।'

আমাদের কথাবার্তা আর অগ্রসর হল না। আমরা যথাস্থানে এসে পড়েছি। স্টেশন-মাস্টার দাঁড়িয়ে আছেন। ইনস্পেকটার লণ্ঠনের আলোকের সাহায্যে রেললাইন পরীক্ষা করছেন।

॥ তৃতীয় ॥

ইনস্পেকটারকে সম্বোধন করে স্টেশনমাস্টার বললেন, 'এখানে রক্ত পাওয়া গেছে অত্যন্ত কম। এটা বড়ো আশ্চর্য! এরকম আরও অনেক দুর্ঘটনা আমি দেখেছি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মাটির উপরে আর ইঞ্জিনের গায়ে দেখেছি প্রচুর রক্ত। কিন্তু এবারকার ব্যাপারে আমি অবাক হয়েছি।'

দিলীপ রেললাইনের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিলেন না। ওখানে রক্ত আছে কি নেই, এ প্রশ্ন তাঁর কাছে যেন নিরর্থক।

তাঁর লণ্ঠনের আলো পড়ল গিয়ে লাইনের পাশের জমির উপরে। কাঁকর-ভরা জমি এবং কাঁকরের সঙ্গে মিশানো রয়েছে খড়ি বা খড়ির মতন সাদা সাদা কীসের চূর্ণ।

ইনস্পেকটার তখন হাঁটু গেড়ে মাটির উপরে বসে পড়েছেন। তাঁর পায়ের জুতোর তলা দেখা যাচ্ছিল।

আলোটা ইনস্পেকটারের জুতোর উপরে ফেলে দিলীপ চুপিচুপি আমাকে বললেন, 'দেখছ?'

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলুম। ইনস্পেকটারের জুতোর তলায় লেগে রয়েছে ছোটো ছোটো কাঁকর ও সাদা সাদা চূর্ণের চিহ্ন। দিলীপের অনুমানই ঠিক। মণিলাল পদব্রজে এখানে এলে তাঁরও জুতোর তলায় থাকত সাদা দাগ ও কাঁকর।

হেঁট হয়ে জমির উপর থেকে একটি ফাঁস-দেওয়া ফিতের মতন কী কুড়িয়ে নিয়ে ইনস্পেকটারকে ডেকে দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি মৃতের টুপিটা এখনও খুঁজে পাননি?'

—'না। টুপিটা নিশ্চয় কাছেই কোথাও পড়ে আছে।' তারপর দিলীপের হাতের দিকে তাঁর নজর পড়ল। তিনি মুখ টিপে হেসে বললেন, 'আপনি দেখছি একটা নতুন প্রমাণ হস্তগত করেছেন!'

দিলীপ বললেন, 'হতেও পারে। এটা হচ্ছে কোনও দু-রঙা ফিতার ছোট্ট টুকরো—

মাঝখানটা সবুজ, দু-পাশে খুব সরু সাদা রেখা। হয়তো পরে এটা কাজে লাগবে। অন্তত এটিকে আমি ত্যাগ করব না।' তিনি পকেট থেকে একটি ছোটো টিনের বাক্স বার করলেন— তার মধ্যে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ছিল খানকয় একরত্তি খাম। একখানা খামের ভিতরে ফিতার টুকরোটি পুরে খামের উপরে পেনসিল দিয়ে কী লিখলেন।

করুণাপূর্ণ হাসিমাখা মুখে ইনস্পেকটার দিলীপের কার্যপদ্ধতি লক্ষ করলেন। তারপর আবার নিযুক্ত হলেন রেলপথ পরীক্ষায়। এবারে দিলীপও যোগদান করলেন তাঁর সঙ্গে।

ইনস্পেকটার চশমার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কাচচূর্ণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'বেচারা চোখে বোধহয় ভালো দেখতে পেত না। তাই ভুলে বিপথে এসে পড়েছিল।'

দিলীপ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, 'হবে।'

একখণ্ড স্লিপারের (যে কাঠের বা তক্তার উপরে রেললাইন পাতা হয়) উপরে ও তার পার্শ্ববর্তী স্থানে কাচচূর্ণগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল। দিলীপ আবার বার করলেন তাঁর টিনের বাক্স এবং আবার বেরুল একখানা খাম।

.আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'আর একবার সাঁড়াশিটা চাই। তুমিও আর একটা সাঁড়াশি নিয়ে আমাকে একটু সাহায্য করো।'

—'কী সাহায্য?'

—'এই কাচের টুকরোগুলো কুড়োতে হবে।'

দুজনে সাঁড়াশি দিয়ে কাচের টুকরো সংগ্রহ করতে লাগলুম।

ইনস্পেকটার বললেন, 'এই কাচের গুঁড়ো যে মৃতের চশমা থেকে পড়েছে, সে-বিষয়েও কোনও সন্দেহ আছে নাকি? লোকটি যে চশমা পরত, তার নাকের দাগ দেখেই আমি বুঝে নিয়েছি।'

—'ও তথ্য যে সত্য, সেটা প্রমাণ করতে কোনও দোষ নেই।' তারপর দিলীপ নিম্নস্বরে আমাকে বললেন, 'কাচের প্রত্যেকটি কণা কুড়িয়ে নেবার চেষ্টা করো।'

দৃষ্টিকে যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে তুলে কাচের কণা খুঁজতে খুঁজতে বললুম, 'এর কারণ আমি বুঝতে পারছি না।'

দিলীপ বললেন, 'পারছ না? বেশ, টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। এদের মধ্যে কতকগুলো আকারে বড়ো, কতকগুলো কণা কণা। তারপর পরিমাণটাও লক্ষ করো। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, যে-অবস্থায় চশমাখানা ভেঙেছে, তার সঙ্গে এই কাচের গুঁড়োগুলো ঠিক মিলছে না। এগুলো হচ্ছে পুরু নতোদর (concave) কাচ, ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু কেমন করে ভেঙেছে? কেবল যে পড়ে গিয়েই ভেঙেছে তা মনে হয় না। তা যদি ভাঙত তাহলে এখানে মাত্র খানকয় বড়ো বড়ো টুকরো কাচ পাওয়া যেত। এগুলো ভারী মালগাড়ির চাকার চাপেও ভাঙেনি। কারণ তাহলে কাচগুলো হয়ে যেত পাউডারের মতন আর সেই পাউডার আমরা লাইনের উপরেও দেখতে পেতুম। কিন্তু লাইনের উপরে তার কোনও চিহ্নই

নেই! সেই চশমার ফ্রেমখানার কথাও ভেবে দ্যাখো। সে-ক্ষেত্রেও এমনি অসঙ্গতি। কেবল পড়ে গেলে 'ফ্রেম'খানা এত বেশি মুচড়ে ভাঙত না, আবার তার উপর দিয়ে রেলগাড়ির চাকা চলে গেলে 'ফ্রেম' খানার অবস্থা যতবেশি শোচনীয় হত, তাও হয়নি।'

—'তাহলে তুমি কী বলতে চাও দিলীপ?'

—'মনে হয়, চশমাখানা মানুষের পায়ের তলায় দলিত হয়েছে। আমাদের অনুমান যদি ভুল না হয়, তাহলে বলতে হবে, দেহটাকে যখন এখানে বহন করে আনা হয়েছে, চশমাখানাকেও আনা হয়েছে সেই সময়ে। আর ভাঙা অবস্থাতেই। সম্ভবত, হত্যাকারীর সঙ্গে যখন মণিলালের ধস্তাধস্তি চলছিল চশমাখানা পদদলিত হয়েছিল সেই সময়ই, তারপর মৃতদেহের সঙ্গেই হত্যাকারী চশমার চূর্ণাবশেষও এখানে নিয়ে এসেছে।'

আমি বোধ করি বোকার মতোই জিজ্ঞাসা করলুম, 'কিন্তু কেন?'

—'এটুকু তোমার বুঝে নেওয়া উচিত। এখন দ্যাখো। আমরা যদি এখানকার প্রত্যেক কাচ-কণা কুড়িয়ে নিয়েও দেখি পুরো চশমার কাচ পাওয়া গেল না, তাহলে বুঝতে হবে বাকি কাচচূর্ণ আছে আসল ঘটনাস্থলেই। কিন্তু আমাদের সংগৃহীত কাচের কণার দ্বারা যদি দু-খানা পরকলা সম্পূর্ণ হয় তাহলে মানতেই হবে যে, চশমাখানা ভেঙেছে এইখানেই।'

আমরা যখন কাচচূর্ণ সংগ্রহ করছিলুম, ইনস্পেকটার ও স্টেশনমাস্টার তখন এক-একটা লণ্ঠন নিয়ে মণ্ডলাকারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন অদৃশ্য টুপিটাকে দৃশ্যমান করবার জন্যে।

লণ্ঠনের আলোয় আতশিকাচের সাহায্য নিয়েও আর এক কণা কাচও পাওয়া গেল না। স্টেশনমাস্টারকে সঙ্গে নিয়ে ইনস্পেকটার তখন লাইন ধরে অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছেন—অন্ধকারের মুল্লুকে তাঁদের হাতে ঝোলানো লণ্ঠন দুটো দেখাচ্ছিল নৃত্যশীল আলেয়ার মতো।

দিলীপ বললেন, 'আমাদের বন্ধুরা ফিরে আসবার আগেই এখানকার কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। তারের বেড়ার কাছে চলো। ঘাসের ওপরে হাত-বাক্সটা রাখো, আপাতত ওটাই হবে আমাদের টেবিল।'

বাক্সের উপরে দিলীপ আগে একখানা কাগজ পাতলেন, পাছে বাতাসে সেখানা উড়ে যায়, সেই ভয়ে চারখানা পাথর কুড়িয়ে কাগজের চার কোণে চাপা দেওয়া হল। তারপর খামের ভিতর থেকে কাচের কণা ও চূর্ণগুলোকে কাগজের উপরে ঢেলে দিলীপ কিছুক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন নীরবে!

হঠাৎ তাঁর মুখে ফুটে উঠল একটা অদ্ভুত ভাব। নিজের কার্ডকেসের ভিতর থেকে তিনি দু-খানা ভিজিটিং কার্ড বার করলেন। তারপর অপেক্ষাকৃত বড়ো কাচের টুকরোগুলোকে একে একে বেছে নিয়ে দু-খানা কার্ডের উপরে সাজিয়ে রাখতে লাগলেন।

চটপটে কৌশলী হাতে দু-খানা কার্ডের উপরে তিনি ডিম্বাকারে কাচের কণাগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে গড়ে তুললেন প্রায়-সম্পূর্ণ দু-খানা পরকলা। দিলীপের মুখের

ভাব দেখে আমিও উত্তেজিত হয়ে উঠলুম। বেশ বোঝা গেল, এখনই একটা কোনও নতুন আবিষ্কারের সম্ভাবনা!

কাগজের উপরে তখনও অনেকখানি কাচের কুচি পড়ে রয়েছে। কিন্তু তা এত সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ হয়ে গিয়েছে যে, তার দ্বারা আর কিছু গড়ে তোলা অসম্ভব।

দিলীপ হাত গুটিয়ে বসে মৃদুস্বরে হাস্য করলেন।

তারপর বললেন, 'এতটা আমি আশা করিনি।'

আমি বললুম, 'কী?'

—'তুমি কি দেখেও বুঝতে পারছ না? বড়ো বেশি পরিমাণে কাচ রয়েছে! আমরা দুখানা পরকলা প্রায় সম্পূর্ণ করে তুলেছি, তবু এতখানি কাচের গুঁড়ো ব্যবহার করতে হল না।'

চেয়ে দেখলুম, সত্যিই তাই! যে চূর্ণগুলো ব্যবহার করা হয়নি, তার দ্বারা হয়তো আরও দু-তিন খানা পরকলা তৈরি করা যায়! বললুম, 'ভারী আশ্চর্য তো! এর মানে কী?'

দিলীপ বললেন, 'আমরা যদি বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন করি, কাচের কুচিগুলোই হয়তো সঠিক উত্তর দেবে!'

দিলীপ কাগজ ও কার্ড দু-খানা তুলে সাবধানে জমির উপরে রাখলেন। তারপর বাক্সের ডালা খুলে বার করলেন অণুবীক্ষণ। তারপর একখানা স্লাইডের উপরে বাড়তি কাচচূর্ণগুলোকে রেখে, লণ্ঠনের আলোতে অণুবীক্ষণের ভিতর দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

তারপর তিনি উচ্চস্বরে বললেন, 'হুঁ, রহস্যের অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে উঠল! এখানে কাচ দেখতে পাচ্ছি খুব-বেশি আর খুব-কম! অর্থাৎ এর ভিতরে চশমার কাচ আছে মাত্র দু-এক টুকরো। এই দু-এক টুকরো গ্রহণ করলেও আমাদের পরকলা দু-খানা সম্পূর্ণ হবে না; কারণ বাকি কাচচূর্ণগুলো চশমার নয়—তা হচ্ছে কোনও ছাঁচে তৈরি জিনিসের। ওগুলো কোনও নলাকার অর্থাৎ চোঙার মতন জিনিস থেকে ভেঙে পড়েছে—খুব সম্ভব কোনও গেলাসের অংশ।'

স্লাইডখানা দু-এক বার সরিয়ে আবার বললেন, 'আমাদের বরাত ভালো শ্রীমন্ত! যা খুঁজছি, পেয়েছি! এক-একটা টুকরোর উপরে কোনও নকশার অংশ খোদা রয়েছে। এই যে আর একটা টুকরো—এর উপরে নকশার বেশ খানিকটা বোঝা যাচ্ছে! এইবার ধরতে পেরেছি! তারার নকশা আঁকা কোনও কাচের গেলাস ভেঙে এই কাচচূর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীমন্ত, তুমিও একবার দেখে নাও!'

আমিও অণুবীক্ষণে দৃষ্টি সংলগ্ন করতে যাচ্ছি, এমন সময়ে এসে পড়লেন ইনস্পেকটার ও স্টেশনমাস্টার।

কাচের গুঁড়ো, বাক্স ও অণুবীক্ষণ নিয়ে আমাদের চুপ করে অমনভাবে বসে থাকতে দেখে ইনস্পেকটার উচ্চহাস্য সংবরণ করতে পারলেন না।

তারপর বোধ করি অভদ্রতা হচ্ছে ভেবেই কিঞ্চিৎ লজ্জিতভাবে বললেন, 'আমি হেসে ফেললুম বলে কিছু মনে করবেন না মশাই! পুলিশের কাজে চুল পাকিয়ে ফেললুম কিনা, কাজেই এ সব যেন কেমন কেমন লাগে! অণুবীক্ষণ ভারী মজার জিনিস বটে, কিন্তু এরকম মামলায় আপনাদের একধাপও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না—পারবে কি?'

দিলীপ বললেন, 'হয়তো পারবে না। কিন্তু ও-কথা যাক। টুপিটা কোথাও খুঁজে পেলেন?'

ইনস্পেকটারের মুখ যেন চুন হয়ে গেল। মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'খুঁজে পাইনি।'

—'আচ্ছা, তাহলে একটু অপেক্ষা করুন, আমরাও আপনাদের সাহায্য করব।'

দিলীপ দু-খানা কার্ডের উপরে ফোঁটা কয়েক xylolbalsam ফেললেন—পরকলায় কাচের কুচিগুলো যাতে স্থানচ্যুত না হয়। তারপর সমস্ত জিনিস বাক্সের মধ্যে পুরে স্টেশন-মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে সবচেয়ে কাছে আছে কোন গ্রাম?'

—'আধ মাইলের ভিতরে কোনও গ্রাম নেই।'

—'রাস্তা?'

—'একটা নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে বটে। এখান থেকে একটু দূরে একখানা মাত্র বাড়ি আছে, রাস্তাটা তার সামনে দিয়েই গিয়েছে।'

—'কাছাকাছি আর কোনও বাড়ি আছে?'

—'না। আধ মাইলের মধ্যে ওইখানেই হচ্ছে একমাত্র বাড়ি।'

—'আচ্ছা, তাহলে বোধহয় ওইদিকেই যাওয়া উচিত। সম্ভবত মণিলাল ওই অসম্পূর্ণ রাস্তা দিয়েই এদিকে এসেছিল।'

ইনস্পেকটারও এই মতে সায় দিলেন।

॥ চতুর্থ ॥

পোড়োজমি। কোথাও আদুড় মাটি, কোথাও বুনো ঘাস, কোথাও কচুবন, কোথাও বিছুটির জঙ্গল। পথ বা রাস্তা নেই। ঝিঁঝি ডাকছে আড়াল থেকে। জোনাকি জ্বলছে মাথার উপরে। চারিদিকে অন্ধকার—কেবল আমাদের সমুখ ও আশপাশ থেকে অন্ধকার সরে সরে যাচ্ছে—যেন আলো দেখে ভয় পেয়ে।

যেখানে ঝোপ পান, ইনস্পেকটার তার ভিতরেই পা ছোড়েন, পদাঘাত করেন—যদি তার ভিতরে হারানো টুপিটা আত্মগোপন করে থাকে!

খানিকক্ষণ পরে আমরা একখানা বাড়ির পিছনদিকে এসে দাঁড়ালুম। চারিধারে তার নিচু দেওয়াল-ঘেরা বাগান।

বাগানের পিছনকার দেওয়ালের তলায় ছিল আর-একটা বিছুটির জঙ্গল। ইনস্পেকটার তারও এখানে-ওখানে পা ছুড়তে লাগলেন!

আচমকা আর্তনাদ শুনলুম—'ওরে বাপ রে, গেছি রে, উ-হু হু-হু!'

—'কী ব্যাপার, কী ব্যাপার?'

ইনস্পেকটার একখানা পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে কাতরস্বরে বললেন, 'কোন হারামজাদা, কোন রাসকেল, কোন গাধা বিছুটির জঙ্গলে এটা ফেলে রেখেছে?'

দিলীপ হেঁট হয়ে জিনিসটা তুলে নিয়ে বললেন, 'একটা লোহার গরাদ। ...এর গায়ে মর্চে-টর্চে কিছুই নেই। তার মানে বিছুটির গাদায় এ বেশিক্ষণ থাকেনি।'

ইনস্পেকটার গর্জন করে বললেন, 'বেশিক্ষণ কি অল্পক্ষণ আমি জানতে চাই না মশাই, কিন্তু আমার ঠ্যাং আর-একটু হলেই খোঁড়া হয়ে যেত! ওই ডান্ডাটা যে ফেলেছে, তাকে যদি একবার হাতের কাছে পাই!'

ইনস্পেকটারের দুর্ভাগ্যে কোনওরকম সহানুভূতি প্রকাশ না করে দিলীপ একমনে ডান্ডাটা পরীক্ষায় নিযুক্ত হলেন। কিন্তু কেবল সেই পরীক্ষাতেই তাঁর মন বোধ করি তুষ্ট হল না, কারণ তারপর তিনি আবার আতশিকাচ বার করে ডান্ডাটাকে আরও ভালো করে দেখতে লাগলেন।

তাই দেখে ইনস্পেকটার এত বেশি উত্যক্ত হয়ে উঠলেন যে, সে দৃশ্য আর সহ্য করতে পারলেন না। খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে বাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। স্টেশন-মাস্টারও করলেন তাঁর অনুসরণ—ভদ্রলোকের মুখ দেখে মনে হল তিনি আমাদের অদ্ভুত জীব বলেই মনে করছেন। অল্পক্ষণ পরেই শুনলুম, বাড়ির সদরের কড়া ঘন ঘন নড়ছে—সঙ্গে সঙ্গে ইনস্পেকটারের হাঁক-ডাক!

দিলীপ বললেন, 'শ্রীমন্ত, একফোঁটা Farrant ঢেলে আমাকে একখানা 'স্লাইড' দাও। এই ডান্ডার ওপরেও দেখছি গাছকয় তন্তু লেগে আছে।'

আমি কথামতো স্লাইড, cover-glass, সাঁড়াশি ও শলাকা এগিয়ে দিলুম এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রটা রাখলুম বাগানের নিচু দেওয়ালের উপরে।

অণুবীক্ষণে চোখ লাগিয়ে দিলীপ বললেন, 'ইনস্পেকটারের দুর্ভাগ্যের জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু ঝোপের উপরে তাঁর পা ছোড়াটা আমাদের পক্ষে হয়েছে অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক! একবার অণুবীক্ষণের ভিতরে তাকিয়ে বলো দেখি, কী দেখতে পাচ্ছ?'

দেখতে দেখতে বললুম, 'রাঙা পশমি তন্তু, নীল কার্পাসসুতোর তন্তু, আর কতকগুলো হলদে উদ্ভিজ্জ—বোধহয় পাটের তন্তু।'

দিলীপ প্রফুল্ল কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ। মনে আছে তো, মণিলালের দাঁতের ভিতরেও ঠিক এই তিনরকম তন্তু পাওয়া গিয়েছে? তাহলে বোঝা যাচ্ছে, দুই ক্ষেত্রেই তন্তু এসেছে এক জায়গা থেকে। ব্যাপারটাও অনুমান করতে পারছি। যে কাপড় চাপা দিয়ে হতভাগ্য মণিলালের

শ্বাসরোধ করা হয়েছিল, এই ডান্ডাটা মোছা হয়েছে বোধহয় সেই কাপড় দিয়েই! আচ্ছা, ডান্ডাটা আপাতত পাঁচিলের ওপরই তোলা থাক—যথাসময়ে এটা কাজে লাগবে। অতঃপর ছলে বলে কৌশলে যেমন করেই হোক, আমাদের ঢুকতে হবে এই বাড়ির ভিতরে। যে ইঙ্গিত পেলুম, তাই যথেষ্ট! এসো।'

তাড়াতাড়ি জিনিস-পত্তর গুছিয়ে নিয়ে আমরা বাড়ির সামনের দিকে গিয়ে হাজির হলুম। সেখানে ইনস্পেকটার ও স্টেশনমাস্টার দাঁড়িয়েছিলেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো।

ইনস্পেকটার বললেন, 'বাড়ির ভিতরে আলো জ্বলছে, কিন্তু বাড়িতে কেউ নেই, সদরে কুলুপ দেওয়া। এত ডাকলুম, এত কড়া নাড়লুম—কেউ সাড়া দিলে না। আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকেই বা কী স্বর্গলাভ হবে, তা জানি না। টুপিটা নিশ্চয়ই রেললাইনের কাছাকাছি কোথাও পড়ে আছে, কাল সকালের আলোয় খুঁজে পাওয়া যাবে।'

দিলীপ কোনও কথা না বলে এগিয়ে গিয়ে আরও দু-চার বার কড়া নাড়লেন।

ইনস্পেকটার বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমি বলছি বাড়ির ভিতরে কেউ নেই, তবু আপনার বিশ্বাস হল না?' বলেই তিনি ক্রুদ্ধভাবে স্টেশনমাস্টারের হাত ধরে চলে গেলেন।

দিলীপ হাসিমুখে লণ্ঠন তুলে এদিকে-ওদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করতে করতে বাগানের ফটকের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তারপর হেঁট হয়ে মাটির উপর থেকে একটা জিনিস তুলে নিলেন!

—'শ্রীমন্ত, এটি হচ্ছে অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ জিনিস।' এই বলে দিলীপ আমার সামনে যা তুলে ধরলেন, তা হচ্ছে একটা আধ-পোড়া সিগারেট!

—'শিক্ষাপ্রদ জিনিস? এর দ্বারা তুমি কী জ্ঞানলাভ করবে?'

—'অনেক। চেয়ে দ্যাখো, এটা হচ্ছে হাতে-পাকানো সিগারেট! বাজারে হাতে-পাকানো সিগারেটের জন্যে যে জিগ-জ্যাগ, কাগজ পাওয়া যায়, তাই এতে ব্যবহার করা হয়েছে। মণিলালেরও পকেট থেকে এই কাগজের প্যাকেট পাওয়া গিয়েছে! এইবার দেখা যাক, সিগারেটের তামাক কোন শ্রেণির!'

দিলীপ একটি আলপিন দিয়ে সিগারেটের একপ্রান্ত থেকে খানিকটা তামাক বার করে নিয়ে দেখে বললেন, স্টেট-এক্সপ্রেস টোবাকো! চমৎকার! মণিলালের রবারের থলির ভিতরেও ঠিক এই তামাক পাওয়া গিয়েছে! কে বলতে পারে, মণিলালই এই সিগারেটটা নিজের হাতে পাকায়নি......আরে, মাটিতে ওটা আবার কী পড়ে রয়েছে?' হেঁট হয়ে সেটা তুলে নিয়ে বললেন, 'একটা দেশলাইয়ের কাঠি! শ্রীমন্ত, মণিলালের পকেট থেকে কোনও মার্কার দেশলাই বেরিয়েছিল, লক্ষ করেছিলে কি?'

—'না।'

—Wimco-এর Club Quality দেশলাই, উপরে ঘোড়ার মুখের ছবি। সে দেশলাই

কিঞ্চিৎ অসাধারণ, কলকাতার বাঙালি পাড়ায় বিকোয় না, সাহেবরা খুব ব্যবহার করে। বাংলার পল্লিগ্রামেও সে দেশলাই কেউ দেখেনি। তার কাঠিগুলো হচ্ছে অতিরিক্ত মোটা, Wimco-র অন্য কোনও মার্কার দেশলাইতেই অত মোটা কাঠি থাকে না। আমার হাতের কাঠিটিও তাই। এটাও যে মণিলালের দেশলাইয়ের বাক্স থেকে বেরিয়েছে, পরে মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে। ...শ্রীমন্ত, আমার অত্যন্ত সন্দেহ হচ্ছে যে, মণিলালকে খুন করা হয়েছে এই বাড়ির ভিতরেই।'

আমরা আবার বাড়ির খিড়কির দিকে গিয়ে হাজির হলুম।

সেখানে দাঁড়িয়ে ইনস্পেকটার অসন্তুষ্ট স্বরে স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে কথা কইছিলেন। আমাদের দেখে বললেন, 'চলুন, এইবারে ফিরে যাই। মিছে কাদা ঘেঁটে মরবার জন্যে কেনই বা এখানে এলুম—আরে, আরে, ও কী! না, মশাই, খবরদার!'

দিলীপ তখন লাফিয়ে উঠেছেন বাগানের নিচু পাঁচিলের উপরে। ইনস্পেকটারের কথা শেষ হবার আগেই তিনি ওপাশে নেমে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ইনস্পেকটার বললেন, 'বিনা হুকুমে পরের বাড়িতে আপনাকে আমি ঢুকতে দিতে পারি না।'

দেওয়ালের উপরে মুখ তুলে দিলীপ বললেন, 'শুনুন মশাই, শুনুন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, মণিলাল বুলাভাই মৃত্যুর ঠিক আগেই এই বাড়ির ভিতরে এসেছিলেন—আমি তার অনেক প্রমাণ পেয়েছি। হয়তো তাঁকে এই বাড়ির ভিতরেই খুন করা হয়েছে। সময় হচ্ছে মূল্যবান, দেরি করলে সমস্ত সূত্র নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আপাতত না দেখেশুনে আমি একেবারে বাড়ির ভিতরেও ঢুকতে চাই না। এখানে দেখছি একটা আস্তাকুঁড় রয়েছে। আমি আগে ওই আস্তাকুঁড়টা পরীক্ষা করতে চাই!'

॥ পঞ্চম ॥

ইনস্পেকটার চমকে উঠে সবিস্ময়ে বললেন, 'আস্তাকুঁড়! আপনি আস্তাকুঁড় ঘাঁটতে চান? বলেন কী মশাই? আপনার মতন আশ্চর্য লোক আমি জীবনে দেখিনি! ভালো, আস্তাকুঁড় ঘেঁটে আপনার কী লাভ হবে শুনি?'

—'আমার সন্দেহ হচ্ছে, ওই আস্তাকুঁড়ের ভিতরে আমি একটা তারার নকশা-কাটা ভাঙা কাচের গেলাসের টুকরো পাব। আস্তকুঁড়ে বা এই বাড়ির ভিতরে ওই গেলাসের টুকরো পাওয়া যাবে বলেই মনে করি।'

ইনস্পেকটার হতভম্বের মতন বললেন, 'ভাঙা গেলাসের টুকরোর সঙ্গে এ মামলার কী সম্পর্ক, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে কি স্টেশনমাস্টার মশাই?'

স্টেশনমাস্টার বোকার মতন ঘাড় নেড়ে বললেন, 'উঁহু!'

—'বেশ, দেখা যাক দিলীপবাবুর অবাক কাণ্ডকারখানা!' ইনস্পেকটারও পাঁচিল ডিঙোলেন। স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে সঙ্গে আমিও বাগানের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালুম।

সামনেই রয়েছে একটা আস্তাকুঁড়ের মতন জায়গা—তার মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে সব নোংরা জঞ্জাল।

দিলীপ বাঁ হাতে লণ্ঠন নিয়ে ডান হাতে একটা কাঠি দিয়ে মিনিট খানেক জঞ্জালগুলো নাড়াচাড়া করে কতকগুলো ছোটো-বড়ো কাচের টুকরো টেনে বার করে আনলেন।

তারপর ফিরে উৎসাহিত কণ্ঠে বললেন, 'দেখুন!'

স্পষ্ট দেখা গেল, দুই-তিনটে বড়ো টুকরোর উপরে রয়েছে নকশা কাটা তারকা!

ইনস্পেকটার প্রথমটা স্তম্ভিতের মতন স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তিনি যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তারপর বললেন, 'কী করে যে আপনি জানলেন কিছুই বুঝতে পারছি না! এরপর আপনি যে আরও কী ভেলকি দেখাতে চান, তাও বুঝতে পারছি না!'

দিলীপ জবাব দিলেন না। নিজের মনেই আস্তাকুঁড় ঘাঁটতে লাগলেন। সাঁড়াশি দিয়ে আরও দুই-তিনটে কাচের কুচি তুলে, ভালো করে দেখে আবার ফেলে দিলেন। একটু পরে খুঁজে খুঁজে আরও দুই-তিনটে কুচি বার করলেন, তারপর সেগুলো আতশিকাচের সাহায্যে পরীক্ষা করে বললেন, 'যা খুঁজছিলুম এতক্ষণ পরে তা পেয়েছি! শ্রীমন্ত, সেই কাচের কুচি বসানো কার্ড দু-খানা বার করো তো!'

আমি সেই প্রায়-সম্পূর্ণ পরকলা বসানো কার্ড দু-খানা বার করে দিলুম। তারপর তার দু-দিকে রেখে দিলুম দুটো লণ্ঠনও।

দিলীপ কিছুক্ষণ সেইদিকে অপলক-চোখে তাকিয়ে থেকে আস্তাকুঁড়ে কুড়িয়ে পাওয়া কাচের কুচিকয়টা আর-একবার পরীক্ষা করতে করতে ইনস্পেকটারকে সম্বোধন করে বললেন, 'আপনি স্বচক্ষে দেখলেন তো, এই কাচের কুচি আমি এইখান থেকে পেয়েছি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'আর কার্ডে বসানো পরকলার কাচ আমি কোথা থেকে পেয়েছি, তাও জানেন তো?'

—'হ্যাঁ মশাই। ওগুলো হচ্ছে মণিলালের চশমার কাচ! ওগুলো আপনি রেলপথ থেকে কুড়িয়ে এনেছেন।'

—'বেশ! এইবারে ভালো করে দেখুন।'

ইনস্পেকটার ও স্টেশনমাস্টার আরও সামনের দিকে এগিয়ে এলেন, সাগ্রহে।

কার্ডের একখানা পরকলার দুই জায়গায় ও আর একখানা পরকলার এক জায়গায় ফাঁক ছিল।

দিলীপ হাতের তিনটে কাচের কুচি দু-খানা পরকলার ফাঁকে ফাঁকে বসিয়ে দিলেন—

সঙ্গে সঙ্গে কার্ডের চশমার কাচ দু-খানা হয়ে উঠল একেবারে সম্পূর্ণ!

ইনস্পেকটার রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'হে ভগবান, এ কী ব্যাপার? ওই কাচের কুচি যে এখানে পাওয়া যাবে, কেমন করে জানলেন?'

—'সে কথা পরে সব শুনবেন! আপাতত আমি বাড়ির ভিতরে যেতে চাই। ওখানে গিয়ে আশা করি আমি একটা পোড়া সিগারেট বা সিগারেটের খানিকটা দেখতে পাব! আরও কী কী পেতে পারি জানেন? ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুট, হয়তো Wimco-র ঘোড়ামুখওয়ালা Club Quality দেশলাইয়ের কাঠি, এমনকি হয়তো মণিলালের হারানো টুপিটাও! এখনও বাড়িতে ঢুকতে আপনার আপত্তি আছে? মনে রাখবেন, আজ বাদে কাল এলে হয়তো আমরা ওই জিনিসগুলোর কোনওটাই আর দেখতে পাব না।'

ইনস্পেকটার পুলিশের সমস্ত আইন-কানুন বিলকুল ভুলে গেলেন। বিপুল আগ্রহে বাড়ির পিছনকার দরজার উপরে ধাক্কা মেরে বললেন, 'ভিতর থেকে বন্ধ। ঢুকতে গেলে ভাঙতে হবে। কিন্তু আমাদের পক্ষে সেটা নিরাপদ নয়।'

—'তবে সদরের দিকে চলুন।'

—'কিন্তু সেখানকার দরজায় তো কুলুপ লাগানো।'

—'আসুন না।'

সবাই আবার পাঁচিল টপকে সদরের দিকে এলুম। দিলীপ আমাদের দিকে পিছন ফিরে সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং পকেট থেকে কী যেন একটা বার করে নিলেন।

পরমুহূর্তে দিলীপের হাতের ঠেলায় দরজাটা দু-হাট হয়ে খুলে গেল!

ইনস্পেকটার দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, 'অ্যাঁঃ!'

—'ভিতরে আসুন।'

—'দিলীপবাবু, আপনি যদি চোর হতেন—'

—'তাহলে আপনাদের চাকরি হয়তো থাকত না। এখন ভিতরে আসুন।'

দিলীপের পিছনে পিছনে আমরা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলুম।

ঢুকেই ডান দিকে একটি ঘর—বৈঠকখানা। একটা ঝোলানো 'ল্যাম্প' জ্বলছে। নীচে-কার্পেট পাতা। সোফা, কৌচ ও টেবিল প্রভৃতি দিয়ে ঘরখানা সাজানো। কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা নেই।

এককোণে একটা তেপায়ার উপরে রয়েছে একটি বিস্কুটের বাক্স। তার উপরে বড়ো বড়ো ছাপানো হরফে বিস্কুটের নাম—ক্রিমক্র্যাকার।

দিলীপ আঙুল দিয়ে সেইদিকে ইনস্পেকটারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

ইনস্পেকটার একেবারে থ। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'অবাক কাণ্ড বাবা!'

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'এ বাড়িতে যে ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট পাওয়া যাবে, এ কথা কে আপনাকে বললে?'

—'কেউ বলেনি।'

—'তবে কী করে জানলেন?'

—'খুব সহজে। শুনলে আপনি হতাশ হবেন।' বলেই দিলীপ এদিকে-ওদিকে তাকাতে তাকাতে ঘর ছেড়ে একটা দালানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর হেঁট হয়ে দুটো কী কুড়িয়ে নিলেন।

ইনস্পেকটার বললেন, 'কী পেলেন?'

—'যা পাবার আশা করেছিলুম। একটা পায়ে থ্যাঁতলানো পোড়া সিগারেটের অংশ, আর একটা দেশলাইয়ের কাঠি।'

ইনস্পেকটার বললেন, 'না মশাই, এইবারে আমি হার মানলুম। এমন ব্যাপার কস্মিন কালেও দেখিনি।'

দিলীপ বললেন, 'মণিলালের স্টেট-এক্সপ্রেস তামাকের থলি, জিগ-জ্যাগ সিগারেটের কাগজ আর কিঞ্চিত অসাধারণ দেশলাইয়ের বাক্স আপনার কাছেই আছে তো?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'তাহলে তাদের সঙ্গে এখানে পাওয়া এই জিনিসগুলি মিলিয়ে দেখুন।

......ইনস্পেকটার কথামতো কাজ করে সচিৎকারে বলে উঠলেন, 'একই তামাক, একই কাগজ, একই দেশলাইয়ের কাঠি! দিলীপবাবু, আপনি কি জাদুকর? বাকি রইল খালি টুপিটা! সেটাও কি এখানে আছে?'

—'জানি না। অন্তত এ ঘরে আছে বলে মনে হচ্ছে না। তবে এখনও আমি হতাশ হইনি। আসুন, খুঁজে দেখি।'

ঘর থেকে গেলুম দালানে। সেখানেও টুপির চিহ্ন নেই।

পাশেই আর একটি ঘর। দিলীপ উঁকি মেরে দেখে বললেন, 'রান্নাঘর। একবার ঢুকেই দেখা যাক না।'

রান্নাঘরের চারিদিকে একবার ঘুরে উনুনের কাছে গিয়ে দিলীপ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তারপর বললেন, 'উনুনের ভিতরটা দেখুন! ওগুলো কী?'

ইনস্পেকটার স্বহস্তে উনুনটা পরীক্ষা করতে করতে বললেন, 'উনুনটা এখনও তপ্ত! একটু আগেও এর মধ্যে আগুন ছিল। কয়লার সঙ্গে এখানে কাঠও পোড়ানো হয়েছিল দেখছি। কিন্তু এগুলো কী? এই ডেলা-পাকানো কালো জিনিসগুলো কাঠও নয়, কয়লাও নয়। খুনি টুপিটা উনুনে পুড়িয়ে ফেলেনি তো। কে জানে? পুড়িয়ে ফেলে থাকলে আর উপায় নেই! আপনি কাচচূর্ণ দিয়ে পরকলা খাড়া করেছেন বটে, কিন্তু খানিকটা অঙ্গার থেকে একটা আস্ত টুপি তো আর গড়তে পারবেন না? অসম্ভব আর কেমন করে সম্ভব হবে বলুন!' তিনি একমুঠো কালো স্পঞ্জের মতন অঙ্গার তুলে দিলীপের সামনে ধরে

দেখালেন। তারপর আবার বললেন, 'পারেন এথেকে একটা গোটা টুপি সৃষ্টি করতে?'

দিলীপ বললেন, 'আবার একটা টুপি সৃষ্টি করতে যে পারব না, সে কথা বলাই বাহুল্য! তবে এটা কীসের অবশিষ্টাংশ, তা বলতে পারি! হয়তো ওর সঙ্গে টুপির কোনওই সম্পর্ক নেই। আসুন বৈঠকখানায়।'

বৈঠকখানায় ফিরে এসে তিনি একটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে অঙ্গারের তলায় ধরলেন। অমনি সেটা বেজায় পটপট শব্দ করে গলে যেতে লাগল এবং তাথেকে খুব ঘন ধোঁয়া উঠল—সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল একটা উগ্র গন্ধ!

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'গন্ধটা বার্নিশের মতো।

দিলীপ বললেন, 'হ্যাঁ। গালার গন্ধ। আমাদের প্রথম পরীক্ষা সফল হয়েছে। এর পরের পরীক্ষায় কিছু সময়ের দরকার।'

তিনি হাতবাক্সের ভিতর থেকে Marsh-এর আর্সেনিক পরীক্ষার উপযোগী একটি ছোটো ফ্ল্যাস্ক, একটি safety funnel, একটি escape tube, একটি দু-পাট তেপায়া, একটি স্পিরিট ল্যাম্প ও একটি অ্যাসবেসটসের চাক্তি বার করলেন। ফ্ল্যাস্কের মধ্যে সেই অঙ্গারীভূত জিনিসের খানিকটা ফেলে তা পরিপূর্ণ করলেন অ্যালকোহলের দ্বারা। তারপর তেপায়ার উপরে অ্যাসবেসটসের চাক্তিখানা রেখে তার তলায় স্পিরিট ল্যাম্পটি জ্বেলে দিলেন।

দিলীপ বললেন, 'অ্যালকোহল গরম হতে থাকুক, ততক্ষণে আমরা আর একটি সন্দেহ মিটিয়ে ফেলতে পারি। শ্রীমন্ত, আবার এক ফোঁটা Farrant ঢেলে আমাকে একখানা স্লাইড এগিয়ে দাও।'

দিলুম। দিলীপ টেবিলের ধারেই বসেছিলেন। একটা ছোটো সাঁড়াশি দিয়ে টেবিলের আচ্ছাদনী থেকে একটুকরো কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে, এই কাপড়ের নমুনা আমরা আগেই পেয়েছি।'

কাপড়ের টুকরো স্লাইডের উপরে রেখে তিনি অণুবীক্ষণের মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক! এর সঙ্গে আমাদের আগেই চেনাশোনা হয়ে গিয়েছে—নীল পশমি তন্তু, নীল কার্পাস, হলদে পাট! আচ্ছা, এবারের নমুনাকে নম্বর মেরে আলাদা করে রাখা যাক, নইলে অন্যগুলোর সঙ্গে গুলিয়ে যেতে পারে।'

ইনস্পেকটার চমৎকৃত হয়ে দিলীপের কার্যকলাপ লক্ষ করছিলেন। তারপর বললেন, 'আমি এখনও অন্ধ হয়ে আছি, কিছুই দেখতে বা ভালো করে বুঝতে পারছি না। মণিলাল কেমন করে মারা পড়েছেন, আপনি কি তা আন্দাজ করতে পেরেছেন?'

—'হ্যাঁ। আমার অনুমান হচ্ছে, হত্যাকারী মণিলালকে যে-কোনও অছিলায় ভুলিয়ে বাড়ির ভিতরে আনে, তাকে জলখাবার খেতে দেয়। মণিলাল হয়তো আপনি যে চেয়ারে

বসে আছেন সেইখানেই বসেছিল। হত্যাকারী সেই লোহার গরাদ নিয়ে তাকে আক্রমণ করে, কিন্তু প্রথম আঘাতেই মণিলালকে বধ করতে পারেনি। তার সঙ্গে হত্যাকারীর ধস্তাধস্তি হয়, তারপর মণিলালকে সে টেবিলক্লথ চাপা দিয়ে মেরে ফেলে। ......ভালো কথা, আর একটা মীমাংসা এখনও হয়নি। আপনি এই ফিতের খণ্ডটি চিনতে পারেন?'

—'হ্যাঁ, ওটি আপনি ঘটনাস্থলে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।'

—'আর সেইজন্যে আপনি আমাকে ঠাট্টা করেছিলেন। যাক, আমি দুঃখিত হইনি। এখন টেবিলের টানার ভিতরে দৃষ্টিপাত করুন। ওই ফিতের কাঠিমটা তুলে নিন। তারপর আমার হাতের এই ফিতের ফাঁসের সঙ্গে ওই কাঠিমের ফিতে মিলিয়ে দেখুন।'

ইনস্পেকটার তাড়াতাড়ি কাঠিমটা তুলে নিলেন। দিলীপ ফিতের ফাঁসটা রেখে দিলেন টেবিলের উপরে।

দুই ফিতা মিলিয়ে দেখে ইনস্পেকটার বিপুল উৎসাহে বলে উঠলেন, 'দুটো ফিতেই এক! মাঝখানটা সবুজ—দু-পাশে সরু সাদা রেখা! বাহবা কী বাহবা! মস্তবড়ো প্রমাণ! দিলীপবাবু, না-জেনে আপনাকে ঠাট্টা করেছি বলে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

দিলীপ হাসতে হাসতে বললেন, 'ক্ষমা প্রার্থনার দরকার নেই। ওই ফিতে নিয়ে খুনি কোন কার্যসাধন করেছিল, আন্দাজ করতে পারেন? তাকে একা লাশটা সামলাতে আর বইতে হয়েছিল। তাই হাত খালি রাখবার জন্যে নিশ্চয়ই সে ছাতা আর ব্যাগটা ফিতে দিয়ে বেঁধে কাঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিল।'

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'আপনি যেভাবে বর্ণনা করছেন, মনে হচ্ছে যেন আপনিও নিজে ঘটনাস্থলে হাজির ছিলেন! কিন্তু টুপির কী ব্যবস্থা করলেন?'

দিলীপ একটি ছোট্ট নল ও একখানা কাচের স্লাইড তুলে নিয়ে বললেন, 'একটা মোটামুটি পরীক্ষা বোধহয় করতে পারব।'

তিনি নলিকাটি ফ্লাস্কের অ্যালকোহলে চুবিয়ে স্লাইডের উপরে ধরলেন। কয়েক ফোঁটা অ্যালকোহল পড়ল। তারপর তার উপরে cover-glass বসিয়ে স্লাইডখানা অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের মধ্যে স্থাপন করলেন।

যন্ত্রে চক্ষু রেখে নিবিষ্ট মনে খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে বললেন, 'মশাই, ফেল্ট বা নেমদা কী দিয়ে তৈরি জানেন?'

ইনস্পেকটার বললেন, 'না।'

—'উচ্চশ্রেণির ফেল্ট তৈরি হয় খরগোশের চুলে। গালার লেপন দিয়ে চুলগুলো বসানো হয়। যে অঙ্গার আমরা পরীক্ষা করছি তার মধ্যে গালা আছে। অণুবীক্ষণের সাহায্যে বেশ কয়েক গাছা খরগোশের চুলও দেখা যাচ্ছে। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এই অঙ্গারগুলো হচ্ছে কোনও ফেল্ট-হ্যাটের দগ্ধাবশেষ। খরগোশের চুলগুলো যখন রং করা নয়, তখন একথাও বলতে পারি, টুপিটার রং ছিল ধূসর।'

ঠিক এই সময়ে পদশব্দ শুনে আমরা চমকে উঠে ফিরে দেখি, ঘরের ভিতরে হয়েছে একটি নূতন লোকের আবির্ভাব!

বিপুল বিস্ময়ে সে বলে উঠল, 'কে আপনারা? কী করছেন এখানে?'

ইনস্পেকটার একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমরা পুলিশের লোক। তুমি কে?'

পুলিশের নাম শুনেও লোকটা একটু দমল না। বললে, 'আমি অক্ষয়বাবুর বেয়ারা।'

—'এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে?'

—'অন্য গ্রামে গিয়েছিলুম।'

—'কখন?'

—'বৈকাল থেকেই আমি বাইরে আছি।'

—'তোমার মনিব?'

—'আজ সন্ধের গাড়িতে তাঁর কলকাতায় যাবার কথা।'

—'কলকাতার কোথায়?'

—'জানি না।'

—'তিনি কী কাজ করেন?'

—'তাও ঠিক জানি না। তবে তিনি বোধহয় জহুরি।'

—'কখন ফিরবেন?'

—'বলতে পারি না। সময়ে সময়ে তিনি তিন-চার দিন বাড়িতে ফেরেন না।'

—'এ বাড়িতে আজ কোনও নতুন লোক এসেছিল?'

—'আমি বাড়িতে থাকতে কেউ আসেনি।'

—'কলকাতায় তোমার মনিবের কোনও বাসা নেই?'

—'জানি না। তবে শুনেছি তিনি কলকাতার বড়োবাজারে কোথায় গিয়ে ওঠেন।'

দিলীপ গাত্রোত্থান করে ইনস্পেকটারকে নিয়ে দালানে গেলেন।

চুপিচুপি বললেন, 'এখানে আর বেশি সময় নষ্ট করবেন না, আসামি একেবারে গা-ঢাকা দিতে পারে। তার কার্যকলাপ দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছে, সে বিষম চতুর ব্যক্তি। অক্ষয়ের বেয়ারাকে নজরবন্দি রাখুন। বাড়িটা পুলিশের হেপাজতে থাকুক। এখান থেকে এককণা ধুলোও যেন না সরানো হয়। আপনি আর একটু অপেক্ষা করুন।—ইতিমধ্যে আমরা থানায় খবর দিয়ে আপনার মুক্তির ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। নমস্কার।'

আমরা সবাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

যেতে যেতে দিলীপ বললেন, 'আমার দৃঢ়বিশ্বাস অক্ষয় কালকেই ধরা পড়বে। সে যখন জহুরি, তখন তার বড়োবাজারের ঠিকানা জানা অসম্ভব হবে না। অক্ষয়ের সমব্যবসায়ীদের কেউ না কেউ তার ঠিকানা বলতে পারবে। ......তারপর শ্রীমন্ত, কর্তব্য তো শেষ হল। অতঃপর?'

আমি বললুম, 'অতঃপর? আমি বেশ বুঝতে পারছি, এইবার তুমি তোমার হাতবাক্সের জয়গান আরম্ভ করবে!'

—'তাই নাকি? অসীম তোমার বোঝবার শক্তি! যাক। আপাতত ভেবে দ্যাখো, এই মামলা হাতে নিয়ে আমরা কী কী শিক্ষালাভ করলুম? ......প্রথমত, একটুও সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আর ঘণ্টাকয়েক পরে এলে বাড়ির ভিতরে ঢুকেও আমরা আর কোনও সূত্রই খুঁজে পেতুম না—সমস্তই উপে যেত কর্পূরের মতো। দ্বিতীয়ত, খুব তুচ্ছ সূত্রকেও অগ্রাহ্য করতে নেই; তাকে অবলম্বন করে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়াই উচিত। দৃষ্টান্ত চাও যদি, ভাঙা চশমার কথা বলতে পারি। তৃতীয়ত, পুলিশের অনুসন্ধানকার্যে একজন শিক্ষিত বৈজ্ঞানিকের সাহায্য অত্যন্ত দরকারি এবং চতুর্থত, আমার এই হাতবাক্সটি হচ্ছে অমূল্য নিধি; একে ছেড়ে বাড়ির বাইরে পা বাড়ানো উচিত নয়।'

আমি বললুম, 'অতএব, জয় হাতবাক্সের জয়!'

(শ্রীমন্ত সেনের ডায়ারি সমাপ্ত)

অবশিষ্ট

বড়োবাজারের একটা ছোটো অন্ধকার রাস্তা—চার-পাঁচ হাতের বেশি চওড়া নয়। কিন্তু তার মধ্যে প্রতিদিন জনস্রোত যেন উপচে পড়ে। প্রত্যহ কত হাজার লোক যে সেখান দিয়ে আনাগোনা করে, কেউ তার হিসাব রাখেনি।

রাস্তা সরু হলে কী হয়, দু-পাশের বাড়িগুলোর অধিকাংশই পাঁচ-ছয় তলার কম নয়। যেন নীচে আলোকের অভাব দেখে মুক্ত আকাশ-বাতাসকে খোঁজবার জন্যে তারা উপরে—আরও উপরে ওঠবার চেষ্টা করেছে।

প্রত্যেক বাড়ির তলায় তলায় যেন পায়রার খোপের পর খোপ সাজানো হয়েছে। এইসব খোপে যারা বাস করে, তাদের মধ্যে বাঙালির দেখা পাওয়া যায় না।

অথচ এমনি একখানা মস্তবড়ো বাড়ির সব উপর তলার একটি ঘরে চৌকির উপরে যে বসে আছে, সে আমাদের অক্ষয় ছাড়া আর কেউ নয়।

শহরে এত জায়গা থাকতে এখানে এসে কেন যে সে বাসা বেঁধেছে তা বলা কঠিন। হয়তো তার অসাধু—কিন্তু সুচতুর মন বুঝেছে, চৌর্য-ব্যবসায় কোনওদিনই নিরাপদ নয়; বিশেষ সাবধানতা সত্ত্বেও যে-কোনও বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা; পুলিশকে ঠকাবার জন্যে যারা নির্জন জায়গায় আশ্রয় নেয়, তারা হচ্ছে নির্বোধ, কারণ পুলিশের দৃষ্টি সর্বাগ্রে তাদেরই আবিষ্কার করতে পারে; কিন্তু জনতাসাগরে হারিয়ে গেলে সহজেই কেউ তার পাত্তা পাবে না!

এইটেই তার বড়োবাজারে বাসা নেবার একমাত্র কারণ কি না জানি না; কিন্তু সেই

অন্ধকার রাস্তার এই ছ-তলা বাড়ির উপর তলায় সত্যসত্যই বাসা বেঁধেছিল আমাদের অক্ষয়। কলকাতায় এলে সে এইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করত।

অক্ষয় চৌকির উপরে বসে আছে। ঘরের অন্য সব দরজা-জানলা বন্ধ। কেবল একটি খোলা জানলা দিয়ে ঘরের ভিতরে আসছে অপরাহ্নের রৌদ্রপীত আলো এবং বড়োবাজারের বিপুল মানব-মধুচক্রের অশ্রান্ত গুঞ্জন।

তার সামনে একখানা কাগজের উপরে ছড়ানো রয়েছে নানা রঙের নানা আকারের রত্ন! হিরা, পান্না, চুনি, মরকত, মুক্তা প্রভৃতি! তাদের উপরে এসে দিনের আলো পড়ছে যেন ঠিকরে ঠিকরে!

অক্ষয় বসে বসে ভাবছে—'একে একে হিসাব করে দেখলুম, এগুলোর বাজার-দর ত্রিশ হাজার টাকার কম হবে না। আশা করেছিলুম আরও বেশি লাভ হবে, কিন্তু মানুষের সব আশা সফল হয় না।

'তবু যা পেয়েছি, তার জন্যে নিজের সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে পারি? নিজের বাড়িতে বসে মাত্র দেড় ঘণ্টার মধ্যে ত্রিশ হাজার টাকা লাভ, এটা কল্পনার অতীত! যদিও মণিলালের উচিত ছিল, আরও বেশি দামের পাথর সঙ্গে করে আনা! এ তো সামান্য চুরি নয়, আমাকে দস্তুর মতন নরহত্যা করতে হয়েছে। নরহত্যায় আরও বেশি লাভ হওয়া উচিত। কারণ নরহত্যায় নিজের জীবন বিপন্ন হয়।

'কিন্তু আমার জীবন কি বিপন্ন হয়েছে? নিশ্চয়ই নয়। ঠিকমতো মাথা খাটাতে পারলে নরহত্যার মতন সহজ আর নিরাপদ ব্যাবসা আর নেই। খুনিরা ধরা পড়ে নিজেদের বোকামির জন্যেই। তেমন বোকামি করবার পাত্র আমি নই।

'পুলিশ কেমন করে আমাকে ধরবে! এমন কোনও সাক্ষী নেই যে বলতে পারে কাল সন্ধেবেলাতেই মণিলাল বুলাভাই এসেছিল আমার বাড়িতে। পুলিশ আমার বাড়িতে এলেও আমাকে সন্দেহ করলেও এমন কোনও সূত্র খুঁজে পাবে না, যার জোরে আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে।

'চারদিকে দৃষ্টি রেখে ঠান্ডা মাথায় ধীরে-সুস্থে আমি কাজ করেছি। সেই সর্বনেশে টুপিটা একটু হলেই আমার নজর এড়িয়ে যেত বটে, কিন্তু যায়নি! সেও এখন আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আমার আবার ভয় কী?

'মণিলালের লাশ পাওয়া গিয়াছে—তা তো যাবেই! নির্বোধের মতন আমি তার লাশ লুকোবার চেষ্টা করিনি। রেলগাড়ির চাকার তলায় সে কাটা পড়েছে। মণিলালের সব জিনিসই—এমনকি ছাতা আর ব্যাগ থেকে চোখের চশমা পর্যন্ত তার সঙ্গেই পাওয়া গিয়েছে। অতি লোভী মূর্খ চোরের মতন মণিলালের সোনার ঘড়ি, চেন, হিরার পিন আর নগদ দুইশো চল্লিশ টাকাও আমি নেবার চেষ্টা করিনি। পুলিশ নিশ্চয়ই স্থির করবে, মণিলাল মারা পড়েছে রেল-দুর্ঘটনায়। কিংবা সে আত্মহত্যা করেছে।

'আমি নিরাপদ। আমি সাধারণ খুনি নই।

'কিন্তু স্টেশনের সেই ঢ্যাঙা লোকটা কে?

'সেই যার হাতে বসন্ত নামে লোকটা মামলা তদ্বিরের ভার দিলে? লোকটা কি ডিটেকটিভ? তার মুখ যতবারই মনে করি, ততবারই আমার বুক ধড়াস করে ওঠে কেন? সে আমার কী করতে পারে! যদিই সে এটাকে খুনের মামলা বলে ধরে নেয়, তাহলেই বা আমার ভয়টা কী? আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ কোথায়? মণিলালের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আবিষ্কার করবে কে?

'কোনও ভয় নেই, কোনও ভয় নেই, আমার কোনও ভয় নেই! যা হবার নয়, তাই যদি হয়, তাহলেই বা আমাকে ধরবে কে? আমার কলকাতার ঠিকানা কেউ জানে না। তোড়জোড় করে তদন্ত শেষ করতেও পুলিশের বেশ কিছুদিন কেটে যাবে। আর আমি কলকাতা থেকেও সরে পড়ছি আজ সন্ধ্যার গাড়িতেই। ব্যাঙ্কের সমস্ত টাকা আমি তুলে নিয়েছি। দূর বিদেশে অদৃশ্য হব—এখন কিছুদিনের জন্যে। আমাকে ধরবে কে?

...'সিঁড়ির ওপর অমন ভারী পায়ের শব্দ কাদের? যেন অনেক লোক উপরে উঠছে একসঙ্গে! উপরতলার ঘরগুলো তো খালি। নতুন ভাড়াটে আসছে নাকি?'

ঘরের দরজায় হল করাঘাত।

অক্ষয় সচমকে রত্নগুলো মুড়ে পকেটে রেখে দিলে। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, 'কে?'

—'দরজা খুলুন।'

—'কে আপনি?'

—'দরজা খুললেই দেখতে পাবেন।'

কেমন যেন বেসুরো কণ্ঠস্বর! এখানে কোনও বাঙালিই তো তাকে ডাকতে আসে না!

অক্ষয় উঠল। এক-মুহূর্তে তার মুখ হয়ে গেল রক্তহীন—যেন সে নিয়তির আহ্বান শুনতে পেয়েছে!

—'দরজা খোলো, দরজা খোলো বলছি!'

অক্ষয় দরজা খুললেন না। দরজা থেকে তিন হাত তফাতে একটা জানলা ছিল। তারই একটা পাল্লা খুলে, বাইরে একবার উঁকি মেরেই দুম করে জানলাটা আবার বন্ধ করে দিল।

ইনস্পেকটর, পাহারাওয়ালার দল।

অক্ষয় উদভ্রান্তের মতন চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে। কোনও দিকেই পালাবার পথ নেই।

দরজার উপরে দুম-দাম পদাঘাত আরম্ভ হল। দরজা এখনই ভেঙে পড়বে।

দাঁতে দাঁত চেপে অক্ষয় নিজের মনেই বললে, 'ধরা দেব? কখনও নয়, কখনও নয়।' তার মুখের ভাব হয়ে উঠল ঠিক সেই রকম—মণিলালকে খুন করবার জন্যে যখন সে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল!

দুম দুম দুম—দরজায় পদাঘাতের পর পদাঘাত!

ওদিকে রাস্তার ধারের বারান্দা—ওদিকেও বাইরে যাবার জন্যেও একটা দরজা!

—'না, না, পালাবার পথ আছে, ওই দরজা দিয়েই আমি পালাব—ওই দরজা দিয়েই।'

দুম দুম দুম দুম!

অক্ষয় উন্মত্তের মতন ছুটে গিয়ে ছ-তলা বারান্দার দরজা খুলে ফেললে।

দুম দুম—হুড়মুড় করে ঘরের দরজা ভেঙে পড়ল!

এবং সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয় একলাফ মেরে বারান্দা ডিঙিয়ে নীচের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অক্ষয়ের রক্তাক্ত দেহ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তার আত্মা তখন পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে!

নাটক

আঁক কষবার নূতন উপায়

(হাবুবাবু পড়বার ঘরে বসে বই বাজিয়ে গান ধরেছে)

চামচিকেকে চিম্‌টি কাটে চিংড়িমাছের চ্যাংড়া খোকা!
বাদায় বসে বংশি বাজায় বংশবেড়ের বক্কু বোকা!
জব্দ জগা জবর জাড়ে
ঘণ্ট খেয়ে ঘণ্টা নাড়ে,
গঞ্জে গিয়ে গেঞ্জি কিনে গঞ্জনা খায় গুবরে পোকা!

হাবুর বাবা॥ (নেপথ্যে) হ্যাঁ রে হেবো!

হাবু॥ আজ্ঞে—এ-এ-এ-এ!

বাবা॥ ওর নাম কি হচ্ছে?

হাবু॥ আজ্ঞে—এ-এ-এ-এ!

বাবা॥ তোকে না আঁক কষতে বলে এলাম?

হাবু॥ আজ্ঞে, আঁক কষচি তো!

বাবা॥ ওর নাম তোর আঁক কষা? বসে বসে ষাঁড়ের মতন চ্যাঁচানো হচ্ছে?

হাবু॥ আর চ্যাঁচাব না বাবা!

বাবা॥ দাঁড়া, আমি এখনি যাচ্ছি। গিয়ে যদি দেখি আঁকটা কষা হয়নি, তাহলে চাবুকের চোটে তোকে লাল করে ছাড়ব।

হাবু॥ আচ্ছা বাবা! (স্বগত) বাবা তো এখনি চাবুক নিয়ে আসবেন, এখন আমি করি কি? এ আঁকটা যে কিছুতেই কষতে পারচি না, কি বিদকুটে আঁক বাবা! যতবার কষি, মাথা গুলিয়ে যায়। এখন উপায়? একটু ভেবে দেখা যাক্। (অল্পক্ষণ চিন্তা করে) হুঁ, ঠিক হয়েছে! যাই, একবার ছিদাম-মুদির দোকানে! আঁকের খাতা-খানাও হাতে থাক।

(খুব মৃদুস্বরে গান গাইতে গাইতে প্রস্থান)

"চামচিকেকে চিম্‌টি কাটে চিংড়িমাছের চ্যাংড়া খোকা!"

এই তো ছিদামের দোকান। ওহে ও ছিদাম, শুন্‌চ?

ছিদাম॥ কি বলচ হাবুবাবু?

হাবু॥ একবার এদিকে এস তো!

ছিদাম॥ না, আমি এখন ওদিকে যেতে পারব না। দেখচ না, দোকানে কি-রকম খদ্দেরের ভিড়!

হাবু॥ আহা, শোনোই না! আমার এই খাতায় লেখা জিনিসগুলো দাও তো!

ছিদাম॥ ও, তাহলে তুমি আমাকে মিছে হয়রান করতে আসোনি? কি কি জিনিস বল তো হাবুবাবু!

হাবু॥ চাল—দুটাকা বারো আনা তিন পয়সা। ডাল—এক টাকা তিন আনা তিন পয়সা। ঘি—দুটাকা পাঁচ আনা তিন পয়সা।

ছিদাম॥ (জিনিসগুলো দিয়ে) আচ্ছা এই দিলাম। আর কিছু আছে?

হাবু॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ—আছে বৈকি!

ছিদাম। তবে শিগগির বল, আমার অন্য খদ্দেররা আর দাঁড়াতে চাইচে না।

হাবু। আটা—একটাকা তিন পয়সা। সুজি—একটাকা এক আনা তিন পয়সা। সাবু—দশ আনা তিন পয়সা।

ছিদাম। এই নাও তোমার জিনিস, বাবু।

হাবু॥ মোট কত হল?

ছিদাম। ন'টাকা তিন আনা দু'পয়সা।

হাবু॥ আমি যদি তোমাকে একখানা দশটাকার নোট দি' তাহলে আমি কত পাব?

ছিদাম। সাড়ে বারো আনা পয়সা। দাও হাবুবাবু, নোটখানা চট করে দাও—খদ্দেররা চলে যাচ্ছে।

হাবু॥ ওহে ভাই ছিদাম, জিনিসগুলো আমি কিনবো না তো। বাবা আমাকে আঁক কষতে দিয়েছিলেন কিনা, আমি যা বললুম, তা হচ্ছে সেই আঁকের হিসেব। ভাগ্যে তুমি ছিলে, তাই আমার আঁকটা কষা হয়ে গেল!

ছিদাম। কি বদমাইস ছেলে রে বাবা! দাঁড়াও তো, তোমায় দেখাচ্ছি মজাটা!

হাবু॥ মজা আর দেখাবে কি, এই দিলুম আমি ভোঁ।

বৈশাখী

(চৈত্রমাসের শেষ দিন। বৈকাল। উপবনের ভিতরে ফুলকুমারীরা খেলা করছে)

ফুলেরা। মঞ্জরী! ও আমের মঞ্জরী! আমরা সবাই খেলা করছি, তুমি এখনো নেমে এলে না কেন ভাই?

আমের মঞ্জরী। না ভাই? আমার ভয় করছে!

ফুলেরা। ভয়! কিসের ভয় ভাই?

আমের মঞ্জরী। তোমরা হচ্ছ জুঁই বেলা গোলাপকলি, তোমরা সব মাথায় ছোট—আমার মতন উঁচুতে উঠতে পারো না তো! আমি উঁচুতে আছি বলেই দেখতে পাচ্ছি, ধু-ধু বালি-মাঠ পেরিয়ে, ধুঁকতে ধুঁকতে আসছে একটা থুত্থুরো বুড়ো! আমি খেলা করি একেলে নতুনের আসরে, সেকেলে বুড়ো দেখলে আমার ভারি ভয় হয়!

গোলাপ। ওরে বেলা, আমের মঞ্জরী কি বলে শোন্ রে!

বেলা॥ মঞ্জরী বোধহয় আমাদের ঠাট্টা করে ভয় দেখাচ্ছে? ঐ যে মৌমাছির গান শোনা যাচ্ছে! ও তো ঐদিক থেকেই আসছে, সত্যি-মিথ্যে ওকেই জিজ্ঞাসা করে দেখা যাক্ না!

[গাইতে গাইতে মৌমাছির প্রবেশ]

গান

গুন্-গুন্ গুন্-গুন্ গান গেয়ে গুণ করি!
সুর শুনে নেচে দোলে জুঁই-বেলা-সুন্দরী।
আঁখি যবে ঘুম-ঘুম, গোলাপের কুঙ্কুম
মাখি আমি মনে মনে বনে বনে গুঞ্জরি'।

কিগো জুঁই, ওদিকপানে অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছ কেন?

জুঁই। মঞ্জরী বললে, ওদিক থেকে একটা বিচ্ছিরি বুড়ো নাকি এদিকে আসছে?

বেলা। বুড়ো দেখলে মঞ্জরীর ভয় হয়।

মৌমাছি। আমি কারুকে ভয় করি না। আর আমি যতক্ষণ এখানে আছি, তোমাদেরও কোন ভয় নেই। জানো তো, আমি খালি মধুই খাই না, হুলও ফোটাতে পারি!

ফুলেরা। তাহলে আমরা নাচি গাই খেলা করি?

মৌমাছি। স্বচ্ছন্দে!

(ফুলেদের গান)

আমরা তাজা হাসির কুঁড়ি, জাগাই রঙের ছন্দ!
অন্ধকারেও হয় না মোদের মনের দুয়ার বন্ধ।
রামধনুকের গান শিখে ভাই! ধুলোয় প্রাণের রং লিখে যাই,
চৈতী হাওয়ায় দি' দুলিয়ে টাট্কা সুরের গন্ধ!

আমের মঞ্জরী॥ ওরে তোরা সবাই পালিয়ে যা রে! ঐ দ্যাখ সেই ছন্নছাড়া বুড়ো আসছে!

(এক বৃদ্ধের প্রবেশ)

বৃদ্ধ। আঃ, তোমাদের কাছে এসে প্রাণ জুড়িয়ে গেল! তোমাদের হাসি-গান শুনে বুঝছি, আমার যৌবনের পরমায়ু এখনো ফুরিয়ে যায়নি!

মৌমাছি। কে তুমি বে-আক্কেলে বুড়ো, এক-মাথা পাকা চুল নিয়ে আমাদের এই কাঁচা-কচির আসর মাটি করতে এসেছ?

ফুলেরা। ও বুড়ো, খড়ের নুড়ো! তুমি এখান থেকে সরে পড়, তোমাকে আমরা চিনি না!

বৃদ্ধ। সে কি খোকা-খুকিরা, আমাকে তোমরা চিনতে পারছ না? তোমাদের জন্ম যে আমার কোলেই!

মৌমাছি॥ মিছে কথা কোয়ো না বুড়ো, ধাঁ-করে এখুনি হুল ফুটিয়ে দেব! ভালো চাও তো শিগ্‌গির তোমার নাম বল!

বৃদ্ধ। আমার নাম তেরো-শো-পঞ্চাশ।

মৌমাছি। ধেৎ, তেরো-শো পঞ্চাশ কারুর নাম হয় নাকি? যেমন চেহারা তেমনি নাম!

বৃদ্ধ। আমি হচ্ছি পুরাতন বৎসর।

মৌমাছি। ও, তাই বল! কিন্তু আমাদের এই নতুনের খেলাঘরে পুরাতনের উৎপাত কেন? জানো না, আজ বাদে কালই হবে নতুন বছরের পয়লা বৈশাখ?

বৃদ্ধ। জানি ভাই, সব জানি। যুগে যুগে বছরে বছরে দেখলুম কত ঋতুর উৎসব, গাইলুম কত নববর্ষের গান—কত নতুন হল পুরানো,কত পুরানো হল আনকোরা নতুন! কত ফুল ফুটল, কত ফুল ঝরল—কত চাঁদ ডুবল, কত সূর্য উঠল! আমি সব জানি ভাই, আমি সব জানি।

জুঁই। ও ভাই বেলা, এ কি হ-য-ব-র-ল বলে রে?

বেলা। পাগল!

মৌমাছি। ওগো তেরো শো পঞ্চাশ মশাই, প্রলাপ শোনবার সময় আমাদের নেই। তোমার মতলবখানা খুলে বল দেখি, নইলে এই বার করলুম হুল!

বৃদ্ধ। বাপু, তুমি হচ্ছ মধুর ব্যাপারী, কিন্তু তোমার কথাগুলির ভেতরে তো মধুর ছিটে-ফোঁটাও নেই।

মৌমাছি। মধু আমি যেখানে-সেখানে ছড়াই না।

বৃদ্ধ। কিন্তু আমি যে তোমার কাছে এসেছি মধু চাইতে!

মৌমাছি। খবরদার বুড়ো, মুখ সামলে কথা কও!

বৃদ্ধ। আর ওগো ফুলকুমারীরা, তোমাদের কাছে এসেছি আমি আতরমাখা রঙ চাইতে!

আমের মঞ্জরী। ও বেলা, জুঁই, গোলাপ, রজনীগন্ধা! ও বুড়ো হচ্ছে ডাকাত, তোরা পালিয়ে আয় রে, পালিয়ে আয়।

মৌমাছি। ওহে তেরো-শো পঞ্চাশ! তুমি কি ভুলে গিয়েছ তেরো-শো একান্নো সাল এসে এখুনি তোমাকে জোর্‌সে গলাধাক্কা দেবে আর সঙ্গে-সঙ্গে তোমাকেও শিঙে ফুঁকতে হবে? মরতে বসেছ, এখনো মধু আর রঙের শখ?

গোলাপ। বুড়োর ভীমরতি হয়েছে! ইচ্ছে হচ্ছে দি' ওর চোখ দুটোতে পট্-পট্ করে কাঁটা ফুটিয়ে।

বৃদ্ধ। কাঁটা নয় গোলাপবালা, তোমার কাছে আমি চাই খালি রঙ আর গন্ধ আর কাঁচা তরুণতা।

মৌমাছি। মরবার আগে ভগবানের নাম কর বুড়ো, আর আমাদের জ্বালিয়ো না।

বৃদ্ধ। কে বলে আমি মরব? আমি অমর! এ পৃথিবীতে সবাই অমর।

মৌমাছি। সবাই অমর? ঐ যে গোলাপবালা তোমার পাগলামি দেখে ফিকফিক্ করে হেসেই সারা হচ্ছে, দুদিন পরে ও যখন ঝরে যাবে তখন কি হবে?

বৃদ্ধ।ঝরে আবার নতুন রূপে ফুটে উঠবে। ঝরা ফুলের ভিতরেই যে থাকে নতুন ফুলের বীজ! মরণ হচ্ছে খালি পুরানো পোশাক ছাড়া। এ পৃথিবীতে কেউ মরে না— পুরাতনই ফিরে আসে এখানে নূতন রূপে।

ফুলেরা। (সাগ্রহে) তাই নাকি?

বৃদ্ধ। হ্যাঁ গো খোকা-খুকিরা, হ্যাঁ। যার বুকে থাকে শক্তি, প্রাণে থাকে মধু, চোখে থাকে রঙ আর কানে থাকে গান, দুনিয়ায় পুরানো হলেও, বুড়ো হলেও কেউ তাকে মারতে পারে না।

মৌমাছি। ওহে তেরো-শো পঞ্চাশ, সেইজন্যেই কি তুমি আমাদের কাছে মধু আর রঙ ভিক্ষা করতে এসেছ?

বৃদ্ধ। হ্যাঁ ভাই। আমার যত মধু আর রঙ ছিল সব বিলিয়ে দিয়েছি পৃথিবীকে। তাই তো আজ

আমি বুড়ো হয়ে পড়েছি। আর তাই তো এসেছি তোমাদের কাছে। এখন পেয়েছি আমি টাট্‌কা মধু আর আতর-মাখা রঙ!

মৌমাছি॥ কিন্তু রঙ আর মধু যেন পেয়েছ, তোমাকে শক্তি দেবে কে? তরুণ করবে কে?

বৃদ্ধ॥ শক্তি? আমাকে শক্তি দেবে, নতুন করবে কালবৈশাখী।

মৌমাছি॥ (সভয়ে) কালবৈশাখী? ও বাবা, সে যে ভয়ানক! সে যে ধ্বংস করে!

বৃদ্ধ॥ না ভাই, সে ভয়ানক নয়। পুরাতনকে মুছে দিয়ে সাজায় সে নূতনের আসন। সে হচ্ছে জীর্ণতার শত্রু, যৌবনের দূত। তোমরা যদি চিরনূতন হতে চাও, তবে গাও সবাই কালবৈশাখীর গান!

বেলা॥ আমরা শিখেছি কেবল বসন্তের সুর, কালবৈশাখীর গান গাইব কেমন করে?

মৌমাছি॥ আমি যে মৌমাছি, ফুল-ফোটানোর গান ছাড়া তো আর কোন গান জানি না!

বৃদ্ধ॥ আচ্ছা, তবে তোমরা সবাই আমার সঙ্গেই গান ধর।

(সকলের গান)

জাগো জাগো কালবৈশাখী!
আর থেকো না সুপ্ত হে!
ঝর-তুরঙ্গ ক্ষেপিয়ে কর
জীর্ণ জরায় লুপ্ত হে!
বজ্র-আগুন-জ্বালা পথে
বন্ধু, এস মেঘের রথে,
পুরাতনের বাঁধন থেকে
চিত্ত কর মুক্ত হে!

আমের মঞ্জরী॥ (সভয়ে চেঁচিয়ে) ওরে, ওরে সর্বনাশ হল! শিগ্‌গির ও গান বন্ধ কর!

ফুলেরা॥ কেন মঞ্জরী, কি হয়েছে?

আমের মঞ্জরী॥ চেয়ে দেখ আকাশের দিকে!

মৌমাছি॥ (সভয়ে) তাই তো আকাশ-ভরা আঁধি! ছুটে আসছে কালো মেঘের দল!

আমের মঞ্জরী॥ (সভয়ে) দূরে ঝোড়ো হাওয়ায় তালগাছগুলো দুলছে টল্‌মল করে! আর আমার রক্ষে নেই!

ফুলেরা॥ (সভয়ে) ওরে, পালিয়ে আয় রে, পালিয়ে আয়!

(দূরে জাগল ঝড়ের কোলাহল)

বৃদ্ধ॥ (উচ্ছ্বসিত স্বরে) এস তুমি কালবৈশাখী! তোমার পাগল ঝড়ের ঝট্‌কায় জীর্ণ পাতার সঙ্গে উড়ে যাক্ আমার পাকা চুলগুলো! তোমার বজ্র এনে দিক্ আমার প্রাণে নতুন শক্তি! তোমার বিদ্যুৎ জ্বালুক আমার চোখে যৌবনের শিখা! এস বন্ধু, এগিয়ে এস, বদলে দিয়ে নতুন কর পুরাতনকে!

(ঝড় ও বজ্রের গর্জন ক্রমে বেড়ে উঠল)

(পরদিনের প্রভাতকাল)

(ঝড় থেমে গেছে। গাছে গাছে পাখিরা গাইছে শান্ত প্রভাতের কলগীতি)

মৌমাছি এসে ডাকলে॥ ও মঞ্জরী! ও ফুলকুমারীরা! বলি, খবর কি?

মঞ্জরী ও ফুলেরা॥ আর খবর! ঝড়ে উড়ে যাইনি, এই ঢের!

মৌমাছি॥ যা বলেছ! আজ এই যে নতুন বছরের প্রথম প্রভাতকে দেখব, সে আশাই ছিল না!

মঞ্জরী। কি সুন্দর প্রভাত! কালকের ঝড় পৃথিবীর সব মলিনতা ঘুচিয়ে দিয়েছে। সারা বনে একটিও ঝরা ফুল শুকনো পাতা নেই—কচি সবুজের উপরে খেলা করছে কাঁচা রোদের সোনা

মৌমাছি॥ কিন্তু এদিকে ও কে আসছে বল দেখি?

ফুলেরা॥ (মুগ্ধ স্বরে) কি চমৎকার ওকে দেখতে!

মৌমাছি॥ মাথায় তোমার রঙীন-ফুলের মুকুট, কপালে তোমার রক্তচন্দনের লেখা, চোখে তোমার নতুন আশার আলো, মুখে তোমার মিষ্টি হাসির ঝরনা—তুমি কে ভাই, তোমার নাম কি?

আগন্তুক॥ আমার নাম তেরো-শো একান্নো।

মৌমাছি॥ ও, তাই বুঝি বুড়ো তেরো-শো পঞ্চাশকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? তুমি এসে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছ বুঝি?

আগন্তুক॥ না।

মৌমাছি॥ তাহলে সে কালকের ঝড়ে উড়ে গেছে!

আমের মঞ্জরী॥ বাঁচা গেছে। কী কদাকার তার চেহারা, আর কী তার জাঁক! বলে কিনা—'আমি কখনো মরব না!'

আগন্তুক॥ না মঞ্জরী, সে তো মরেনি! সে তো রয়েছে তোমাদের সামনেই!

আমের মঞ্জরী॥ কই, দেখতে পাচ্ছি না তো!

আগন্তুক॥ এই যে, আমি। কাল যে আমারই নাম ছিল তেরো-শো পঞ্চাশ!

সকলে॥ (সবিস্ময়ে) তুমি!

আগন্তুক॥ হাঁ, আমি। কেন ভাই, তোমরা কি এরি মধ্যে ভুলে গেলে, তোমাদেরই কাছে এসে পেয়েছি আমি প্রাণের মধু, জীবনের রঙ্! বজ্র দিয়েছে আমাকে যৌবনের শক্তি আর কালবৈশাখী উড়িয়ে দিয়েছে আমার জরার জীর্ণতা!

মৌমাছি॥ এ যে অবাক কাণ্ড!

আগন্তুক॥ আমি চিরপুরাতন, আমি যে চিরনূতন! আমি কখনো মরিনি, আমি কখনো মরব না! তাই তো লোকে যখন নববর্ষ বলে আমাকে অভ্যর্থনা করে, আমি তখন মনে-মনে হাসি! তারা জানে না আমি হচ্ছি পুরাতনেরই রূপান্তর।

মৌমাছি॥ এস মঞ্জরী, এস ফুলকুমারীরা! তাহলে আমরাও আজ চিরনূতন চিরপুরাতনের গান গাই—

(সকলের গান)

চিরনবীন হে, চিরপুরাতন!
    এস হে বন্ধু, এস এস।
বৈশাখে গেয়ে চৈতালী গীতি
    সুখে-দুখে বুকে হেসো হেসো।
যে-ফুল ঝরালে গতবসন্ত
তারি কুঁড়ি এনে কর ফুলন্ত!
অতীতকে এনে নূতনের কোলে
    পুলক-সায়রে ভেসো ভেসো।
মরণে দোলাও জীবনের দোলা—

গৌরীর সাথে খেলে যেন ভোলা!
নৃত্যের তালে নাচিয়ে ধরণী
ভালোবেসো বঁধু, ভালোবেসো।*

রংমহলের রংমশাল

(নাটিকা)

প্রথম দৃশ্য

[মেঘলা আকাশ, দুপুর-বেলাতেও চারিদিক ছায়ামায়াময়। গাঁয়ের প্রান্তে পাঠশালার একচালা। পাঠশালার পরেই ধু-ধু করছে তেপান্তর মাঠ। মাঠের একধার দিয়ে বন-শ্যামলতায় বোনা জরির পাড়ের মতো বয়ে যাচ্ছে সুন্দরী নদী]

ছেলের দল পাত্তাড়ি বগলে করে গান গাইতে গাইতে আসছে—

গান

পাঁচ দুকুনে দশটি গণ্ডা,
সেই হিসেবে দাওনা মণ্ডা।
দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র,
ভুললে পরে পড়বে বেত্র,
গুরুমশাই বেজায় ষণ্ডা!

অমল॥ ওরে, সূয্যি-ঠাকুর আজ সকাল থেকেই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

কমল॥ তাই মেঘে মেঘে বুঝি তাঁর নাক-ডাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে?

বিমল॥ ধেৎ, নাক কি কখনো অত জোরে ডাকতে পারে রে বোকা?

নির্মল॥ সূয্যিঠাকুরের নাসিকা কি বড়—যে-সে নাসিকা রে? বাবার মুখে শুনেছি সূয্যি নাকি আমাদের পৃথিবীর চেয়ে ঢের বড়! সূয্যিমামার নাক, বাজের মতন ডাক!

অমল॥ তোদের নাক-টাকের কথা এখন থো কর্। শুনছিস না, আকাশ যেন আজ আয় আয় বলে ডাক দিচ্ছে? আজ কি আর শুকনো পড়ায় মন বসবে?

কমল॥ ঝিল-বিল যেন আজ শালুক-ফুলের তালুক হয়ে উঠেছে!

বিমল॥ ঠাণ্ডা বাতাস মেখেছে কেয়াফুলের আতর!

নির্মল॥ ময়ূর ডাকছে কেমন বন-কাঁপানো তালে তালে!

সকলে॥ ওরে, চল্ চল্, আজ আর পাঠশালায় ঢোকা নয়, আজ আমরা বন-বাদাড়ে যেখানে

---

* অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর আসরে অভিনীত।

খুশি যাব, মাঠে-বাটে ছুটোছুটি-খেলা করব, নদীর ধারে গলা ছেড়ে গান গাইব!

গান

তেপান্তরের মন্তরে সব মন মেতেছে ভাই!
কে জানে তাই আমরা সবাই কী পেতে চাই!
মন মেতেছে ভাই!
ময়ূর নাচে পেখম তুলে,
ফড়িঙ নাচে ঘাসের ফুলে,
মেঘরা সেধে বলছে চল, স্বপন-দেশে যাই,
মন মেতেছে ভাই!
আকাশ ডাকে, বাতাস ডাকে, নদীর হাসি-ঢেউরা ডাকে,
ডাকছে ভ্রমর-মৌমাছিরা সবুজ-পাতার ফাঁকে ফাঁকে!
পুঁথির পড়ায় ছুটি নিয়ে
চল্ রে ছুটি মাঠ পেরিয়ে,
দিঘির জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পদ্মমুড়ি খাই!
মন মেতেছে ভাই!

অমল॥ হুঁঃ, কিন্তু আমাদের মাথার উপরে কে আছেন জানিস?

কমল॥ হ্যাঁ, গুরুমশাই—

বিমল॥ আর তাঁর সমস্ত বেত—

নির্মল॥ কানুটি, গাঁট্টা!

অমল॥ (শিউরে উঠে) বাপ্‌রে, দরকার নেই আর মেঘের ডাকে সাড়া দিয়ে! চল্ গুটি-গুটি পাঠশালায় ঢুকি, গুরুমশাই এখুনি এসে পড়বেন!

কমল॥ এসে পড়বেন কি, ঐ দ্যাখ এসে পড়েছেন!

(সকলে সভয়ে গাঁয়ের পথের দিকে ফিরে তাকাল)

বিমল॥ কিন্তু উনি কি গুরুমশাই?

নির্মল॥ ওঁর মাথায় টিকি দুলছে না, হাতে বেত লক্-লক্ করছে না, কোমরে ভুঁড়ি হাঁসফাঁসিয়ে উঠছে না উনি কি গুরুমশাই?

কমল॥ (দু'পা এগিয়ে গিয়ে) ওঁর গলায় দুলছে ফুলের মালা, হাতে রয়েছে শ্বেতপদ্ম আর বাঁশি, মুখে শুনি গানের তান আর দুটি পায়ে নাচের ছাঁদ! উনি তো গুরুমশাই নন! ওঁকে দেখে তো পেটের পিলে চম্‌কে উঠছে না!

সকলে॥ তবে উনি কে, তবে উনি কে!

(নাচের ভঙ্গীতে গাইতে গাইতে কবির প্রবেশ)

গান

গানের মানুষ গান গেয়ে যাই—তাইরে না রে, তাইরে না রে!
কেউ শোনে আর কেউ শোনে না গাই তবু গান দ্বারে দ্বারে—
তাইরে না রে, তাইরে না রে!

ঝরনা এখন একলা ঝরে,
নিজের মনে গান সে ধরে,
বিজন বনের দোয়েল শ্যামা গান যে শোনায় বারে বারে—
তাইরে না রে, তাইরে না রে!
প্রজাপতি যে-সুর বোনে নীরব তানে, (তাইরে নানা!)
সেই রাগিণী শুনছি আমি প্রাণের কানে, (তাইরে নানা!)
শুনছি যত গাইছি তত
ফুটিয়ে মুকুল শত শত,
গানের ভেলা ভাসিয়ে চলি কান্না-হাসির পারাবারে
তাইরে না রে, তাইরে না রে, তাইরে না রে, তাইরে না রে!

কমল॥ আপনি কে?

কবি॥ 'আপনি' বললে তো সাড়া দেব না ভাই, আমাকে 'তুমি' বলে ডাকো।

কমল॥ তুমি কে ভাই?

কবি॥ গুরুমশাই!

অমল॥ তোমার মুখে নেই ধমক, তোমার হাতে নেই বেত, তুমি কি রকম গুরুমশাই?

কবি॥ ধমকের বদলে আমার মুখে আছে হাসি, আর বেতের বদলে হাতে আছে বাঁশি। আমি নতুন গুরুমশাই।

বিমল॥ যখন হিতোপদেশ মুখস্থ হবে না, তখন তুমি আমাদের ধমক দেবে?

কবি॥ না, তখন আমি হাসব।

নির্মল॥ যখন আঁক কষতে পারব না, তখন তো তুমি আমাদের বেত মারবে?

কবি॥ না, তখন আমি বাঁশি বাজাব।

সকলে॥ আর পাঠশালায় না গিয়ে আমরা যখন পথে পথে টো টো করে খেলে বেড়াব?

কবি॥ (হেসে) তখন আমি তোমাদের খুব খুব খুব ভালোবাসব!

সকলে॥ (হাততালি দিয়ে নেচে উঠে) ওহো, কী মজা রে, কী মজা!

গান

সকলে—

আমাদের এই মজার গুরু!
হিতোপদেশ তুল্লে শিকেয় শাসায় নাকো কুঁচকে ভুরু!
আঁকের খাতা রাখলে মুড়ে
মারবে নাকো ঘুসি ছুঁড়ে,
বেতের ঠেলা নেইকো যখন হোক্ না শখের খেলা শুরু!

কমল॥ কিন্তু ভাই, তোমাকে তো আমরা গুরুমশাই বলে ডাকতে পারব না! ও-নামে ভয় হয়।

কবি॥ আমাকে তো কেউ গুরুমশাই বলে ডাকে না ভাই!

অমল॥ তবে কি বলে ডাকে?

কবি॥ কবিঠাকুর।

সকলে॥ (সুরে) কবিঠাকুর কবিঠাকুর? বেশ নাম! ও-নামে নেই গুরুগিরির হাঙ্গাম!

কবি॥ আচ্ছা ভাই, এখন বল দিকি তোমরা কি খেলা খেলতে চাও?

সকলে॥ আজ আমরা বন-বাদাড়ে যেখানে খুশি যাব, মাঠে-বাটে ছুটোছুটি-খেলা করব, নদীর ধারে গলা ছেড়ে গান গাইব!

কবি॥ (মাথা নেড়ে হাসতে হাসতে) বেশ, বেশ, তাই ভালো। তোমাদের পুরানো গুরুমশাই আজ বাদ্‌লা পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন, চল, সেই ফাঁকে আমরা চুপিচুপি খানিক বেড়িয়ে আসি। কিন্তু কোনদিকে যাই বল দেখি?

সকলে॥ তুমিই বল কবিঠাকুর!

কবি॥ ঐ যেখানে সবুজ বনের ঠাণ্ডা ছায়ায় সুন্দরী-নদীর জল-বীণায় সুরের লহর দুলছে, যেখানে কেয়া-কদমের শুভ্র হাসির আসর বসেছে, সেখানে রোজ কারা আনাগোনা করে তোমরা তার খবর রাখো কি?

সকলে॥ (সাগ্রহে) কারা আনাগোনা করে, কারা আনাগোনা করে?

কবি॥ যাদের তোমরা চিনেও চেনো না দেখেও দেখ না, তারা।

সকলে॥ তারা কি বাঘ-ভাল্লুক?

কবি॥ না।

সকলে॥ তারা কি ভূত-পেত্নী?

কবি॥ না।

সকলে॥ তবে?

কবি॥ আমার সঙ্গে দেখবে এস।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সুন্দরা-নদীর ধারে বনভূমি, চারিদিকে ছোট-বড় ফুলগাছের সামনে খানিকটা খোলা জমি। সবুজ ঘাসের বিছানায় অজস্র ফুল ছড়ানো।

আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা ও চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুতের ছটা আরো বেড়ে উঠেছে।]

(গাইতে গাইতে কবির প্রবেশ। পিছনে পিছনে আর সকলের আগমন)

কবির গান

বৃষ্টি আসে, বৃষ্টি আসে!
কোন্ সে সজল কাজললতার কাজল ঝরে নীলাকাশে!
দেখে ধরায় কালোয়-কালো,
লুকোতে চায় লাজুক আলো,
ফুলের ফুলুট্ বাজছে তবু লতাপাতায় শ্যাম্‌লা ঘাসে।
ছায়াপরীর ঘুম ভাঙিয়ে বনে বনে,—বৃষ্টি আসে!
মায়াপুরী জাগিয়ে দিয়ে মনে মনে—বৃষ্টি আসে!
কদম-কেয়ার কেয়ারিতে
কাঁপন নাচে দেয়ার গীতে,
ঝিল্‌মিলিয়ে বিজলীকে মেঘমহলে কে আজ হাসে!

ছেলেরা॥ (সকলে সকৌতুকে) ওরে, ওরে, বৃষ্টি এল রে বৃষ্টি এল! আজ বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমরা সবাই ঘর-পালানো খেলা খেলব।

কবি॥ শোনো ছোট্ট বন্ধুরা! চল, আমরা ঐ ঝুপসী বটগাছের তলায় গিয়ে লুকিয়ে বসে থাকি গে।

কমল॥ (সভয়ে) ওখানে দিনের বেলাতেই রাতের বাসা!

অমল॥ ওখানে যে অন্ধকারে চোখ চলবে না!

কবি॥ (সহাস্যে) ওরে ভাই, আজ যে আমাদের সবাইকে বাইরের চোখ বন্ধ করে ফেলতে হবে!

বিমল॥ তাহলে দেখব কেমন করে?

কবি॥ ওরে ভাই, আজ যে আমাদের সবাইকে মনের চোখ খুলে রাখতে হবে!

সকলে॥ (সবিস্ময়ে) মনের চোখ !

কবি॥ হ্যাঁ রে ভাই, হ্যাঁ। মন যাদের জ্যান্তো আর রঙিন, নয়ন মুদে তারা যা দেখতে পায়, বাইরের চোখে বড় বড় দূরবীন লাগিয়েও তা দেখা যায় না! মনের চোখে অন্ধকারও হয়ে ওঠে 'সার্চ লাইটে'র মতো!

কমল॥ (সন্দিগ্ধ স্বরে) তুমি কি সত্যি বলচ কবিঠাকুর?

কবি॥ কবির কাছে কিছুই মিথ্যে নয় ভাই! চল তবে, অন্ধকারে চুপ করে বসে থাকবে চল, এখুনি সেখানে রংমহলের রংমশাল জ্বলে উঠবে।

[কবির পিছনে পিছনে এগিয়ে সবাই ধীরে ধীরে ঝুপ্‌সী বটগাছের অন্ধকারের ভিতরে মিলিয়ে গেল। খানিকক্ষণ জনপ্রাণীকে দেখা গেল না। আলো আরো ঝিমিয়ে পড়ল—ঝরতে লাগল বাদল ঝরণা। অন্ধকারের ভিতর থেকে ভেসে এল কবির বাঁশির মেঘমল্লার সুর।

খোলা জমির উপরে নৃত্যচপল পায়ে ছুটে এল শরীরিণী বর্ষারানী, পরনে মেঘডুম্বুর শাড়ি, কাজলবরণ এলোচুলে জ্বলছে বিদ্যুৎ-চমক।]

বর্ষার গান

রুনুঝুনু রুনুঝুনু—ভুবনের খেলাঘরে,
রিমিঝিমি রিমিঝিমি—আলো-ছায়া খেলা করে।
নূপুরের রুমুঝুমু, নীলঘাসে খায় চুমু,
ছুটোছুটি করে মেঘ চপলার মালা পরে!
ছুঁয়ে আঁখিহাসিধারা চাতকেরা গানে সারা,
ঝুরু-ঝুরু ভিজে বায়ে যূথি-চাঁপা-বেলা ঝরে।

[বর্ষার গান থামল, কিন্তু নাচ থামল না। একদল মেঘের প্রবেশ। বর্ষার চারিদিকে মণ্ডলাকারে ঘুরে ঢিমে তালে নাচতে নাচতে মেঘেরা গান ধরলে। গান থামলেও তাদের নাচ থামল না। তারপর যে-তালে মেঘেরা নাচছে তার দ্বিগুণ দ্রুত—অর্থাৎ দুন্ তালে বিজলিবালা ঢুকে মেঘেদেরও বেড়ে নাচ-গান ধরলে এবং তার গান যেই শেষ হল অমনি বজ্র গান গাইতে গাইতে ঢুকে বিজলিরই তালে তার পিছনে অনুসরণ করতে লাগল। তারপর ঝড়ের প্রবেশ, সে মণ্ডলে যোগ না দিয়েই গান ও এলোমেলো নাচ আরম্ভ করলে।]

গান

মেঘদল॥ তোম্-তানানানা, বোম্-বোম্-বোম্, ববম্-ববম্-বোম্!
ধুমধড়াক্কা, পাইবে অক্কা ব্যোম্-রবি-তারা-সোম!

বিজলিবালার প্রবেশ॥ আমি আজুলি বিজলিবালা,
আঁচলে আলোর ডালা,

পলকে পুলকে আঁকি আর ঢাকি মায়াছবি অনুপম!

মেঘদল ॥ তোম্-তানানানা—প্রভৃতি

বাজ ॥ আমি মহা বাজ, ডাহা জাঁহাবাজ—চপলার দ্বারবান,
চিকুর-চমকে আমার ধমকে পেটে পিলে আন্‌চান্!

ঝড় ॥ আমি শঙ্কর-কিঙ্কর,
ধিঙ্গি, ভয়ঙ্কর!
ভোঁ-ভোঁ ছুটে ধরা ভেঙে-ভুঙে শিঙা বাজাই ভভম্ভম্!

মেঘদল ॥ তোম্-তানানানা—প্রভৃতি

[**সকলের প্রস্থান।** কেউ কোথাও নেই—কেবল কবির বাঁশির রাগিণী শোনা যাচ্ছে। তারপর শোনা গেল বাঁশির সুরের তালে তালে নেপথ্যে নূপুরের ধ্বনি এবং তারপর ফুলকুমারীদের (যূথি, বেলা ও জর্দাগোলাপ) প্রবেশ]

গান

ফুলকুমারীরা ॥ মৌমাছি গো, ঘুমোও নাকি? প্রজাপতি,
ওগো অলি
মিষ্টি তোদের গানের কথাই করছি যে ভাই
বলাবলি!
আকাশ জুড়ে মেঘের ভেলা,
আয়না মোরা করব খেলা,
বসিয়ে নতুন রঙের মেলা ভরিয়ে তুলি কাননতলি।

(গাইতে গাইতে ভ্রমর, প্রজাপতি ও মৌমাছির প্রবেশ)

ফুলকুমারী, ফুলকুমারী!
আজ নেমেছে বাদ্‌লা ভারি,
পাখনা পাছে যায় ভিজে ভাই, ছেড়েছি তাই
কুঞ্জগলি!

(একদিকে দুঃখিতভাবে ভ্রমর প্রভৃতির এবং অন্যদিকে ফুলকুমারীদের প্রস্থান) [অল্পক্ষণ কেউ কোথাও নেই—বাজছে কেবল কবির বাঁশিতে হাসিমাখা খেলার সুর।]

(ব্যাঙ, গঙ্গাফড়িং ও শামুকের প্রবেশ)

কোরাস ॥ গ্যাঙর-গ্যাঙর, তিড়িং-মিড়িং। আজকে যাব
ক্যালকাটা
মার্কেটেতে কিনব মোরা তোপসে-ইলিশ আর বাটা।

ফড়িং ॥ ব্যাঙ-ভায়া গো! শামুক-খুড়ো! জোরসে লাগাও লম্ফ,
পাঞ্জাব-মেল ধরতে গেলে হবে যে বিলম্ব!

শামুক ॥ কেমন করে হাঁটব জোরে, ফুটছে গায়ে চোরকাঁটা!

কোরাস ॥ গ্যাঙর-গ্যাঙর—প্রভৃতি

ব্যাং ॥ ফড়িঙভায়া, বড্ড ক্ষিধে, কোথায় মশা-মক্ষী!
শূন্য-পেটে মূর্ছা গেলে সামলাবে কে ঝক্কি?

শামুক ॥ দৌড়ে গেছে দম বেরিয়ে, তেষ্টাতে বাপ্, প্রাণ টাটা!

কোরাস॥ গ্যাঙর-গ্যাঙর প্রভৃতি

(প্রত্যেকে তাদের স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে প্রস্থান করল)

[আবার খানিকক্ষণ কারুকে দেখা গেল না, খালি শোনা গেল কবির বাঁশির আলাপ]

(নেপথ্যে বাঁ-দিক থেকে গানের সুরে শোনা গেল ঃ)

"সাত-ভাই চম্পা, জাগো, জাগো, জাগো রে!"

(নেপথ্যে ডানদিক থেকে সম্মিলিত কণ্ঠে শোনা গেল ঃ)

"কেন বোন পারুল, ডাকো, ডাকো, ডাকো রে?"

(একদিক থেকে পারুল ও আর একদিক থেকে সাত-ভাই চম্পাদের প্রবেশ)

গান

পারুল॥ এসেছে, রূপকথার এক রাজকুমার!
চাঁদিমা নিছনি যে চায় তার চুমার!
যেতে চায় আমায় নিয়ে
বলে যে, করবে বিয়ে!
শুনে তাই ভয় হয়েছে ভাই আমার!

সাত-ভাই-চম্পারা॥ ওরে বোন পারুলবালা!
রূপে তোর কানন আলা,
কুমারে ভয় কোরো না,
ধরি আয় বিয়ের পালা!

(রূপকথার রাজকুমারের প্রবেশ ও গান)

শোনো গো ফুলের মেয়ে! এসেছি মুখটি চেয়ে,
হাতে মোর হাতটি রাখো আজ তোমার!

(পারুলের লজ্জিত হাত দুখানি নিজের হাতে নিয়ে রূপকথার রাজকুমার মাঝখানে দাঁড়াল এবং তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে সাত-ভাই-চম্পাদের নাচ-গান)

গান

বাদল-মাদল বাজিয়ে চল,
বনের ময়ূর নাচিয়ে চল!
কাজলা বেলায় মেঘলা খেলায়
ফুলের সভা সাজিয়ে চল! (সকলের প্রস্থান)

[বিজন বনে কবির বাঁশি এবার ধরলে করুণ কান্নার সুর। অন্ধকার আরো গাঢ় হয়ে উঠল।]

(অতি-অলস নাচের ভঙ্গীতে ঝরাফুলের প্রবেশ)

গান

ঝরাফুল।। ওগো, আমি ঝরাফুল ঝরে ঝরে পড়ি একলা ঘাসের কোলে,
দেখ, এখনো রয়েছে আতর আমার, রাঙিমা যায়নি জ্বলে।
তবু চায় না আমায় কেহ,
মোর ভেঙেছে তরুর গেহ,

তাই বাদলের বায় করে হায়-হায় কেঁদে দূরে যায় চলে।
ভিজে মেঘের অশ্রুনীরে,
ঝরে পরাগকেশর ধীরে,
আর জাগিব না আমি নবপ্রভাতের বিহগ-বীণার বোলে।
(তৃণশয্যার উপরে দুই চোখ মুদে এলিয়ে শুয়ে পড়ল)

[চারিদিক নিবিড় তিমিরের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল—তখনো জেগে রইল কেবল কবির বাঁশির কান্না।]

তৃতীয় দৃশ্য

পাঠশালার অভ্যন্তর-ভাগ। একদিকে উচ্চাসনে গুরুমশায়ের স্থির মূর্তি।

(বাইরের দরজা দিয়ে কবির প্রবেশ)

কবি।। (বাইরের দিকে তাকিয়ে উচ্চস্বরে) ওহে বন্ধুরা, তোমরা ভিতরে আসছো না কেন? ভয় নেই, পাঠশালায় আসোনি বলে আজ গুরুমশাই তোমাদের কিছু বলবেন না।

কমল।। (দরজার ভিতরে মাথা গলিয়ে ভয়ে ভয়ে) সত্যি বলছ কবিঠাকুর? গুরুমশাই আমাদের কিছু বলবেন না? আমাদের বেত মারবেন না?

কবি।। (হেসে) না, গুরুমশাই আজ কথাও কইবেন না, বেতও তুলবেন না।

(সকলে একে একে সঙ্কুচিতভাবে ভিতরে এসে দাঁড়াল)

কমল।। (চুপি চুপি, কবিকে) গুরুমশাই অমন চুপ করে আছেন কেন? উনি কি বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছেন?

কবি।। কাছে গিয়েই দেখে এস না।

(ছেলেরা সন্তর্পণে গুরুমশাইয়ের কাছে গিয়ে তাঁকে দেখতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে কমল সাহস করে গুরুমশাইয়ের গায়ে হাত দিলে)

কমল।। (সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে) কবিঠাকুর! এ যে পাথরের গা!

(আর সকলেও তাড়াতাড়ি গুরুমশাইয়ের দেহ স্পর্শ করলে)

সকলে।। কবিঠাকুর, এ তো মানুষ নয়, এ যে পাথরের মূর্তি!

কবি।। (সহাস্যে) হ্যাঁ ভাই, তোমাদের গুরুমশাই আজ পাথরের মূর্তি হয়ে গিয়েছেন।

সকলে।। কি সর্বনাশ! কেন কবিঠাকুর, কেন?

কবি।। তোমাদের গুরুমশাই বাইরেই কেবল চলা ফেরা করতেন, ওঁর মনের ভিতরটা ছিল শুকনো পাথরের মতো। পৃথিবীতে এমনি চলন্ত পাথরের মূর্তিই আছে বেশি। তোমাদের মনের চোখ আজ খুলে গেছে বলেই গুরুমশাইয়ের আসল চেহারাখানা দেখতে পেলে! কিন্তু তোমাদের মানসচক্ষু আবার যদি অন্ধ হয়, গুরুমশাইও আবার জেগে উঠে বেত তুলে হুঙ্কার দিতে থাকবেন!

সকলে।। (সমস্বরে) না, না, আর আমরা মনের চোখ বন্ধ করব না!

কবি।। তাহলে তোমাদের চোখের সামনে রঙমহলের রংমশালের আলোও আর কোনদিন নিববে না। দেহের চোখে দেখা যায় কেবল শুকনো পুঁথিপত্র আর পাথুরে-প্রাণ মানুষদের, কিন্তু মনের চোখে সরস আর সজীব হয়ে ওঠে সারা পৃথিবীর সমস্তই। ঐ দেখ, বনভূমির সবাই আবার তোমাদের কাছে ফিরে আসছে, ওরা আর কখনো তোমাদের ছেড়ে চলে যাবে না!

(নানা দ্বার দিয়ে দ্বিতীয় দৃশ্যের সমস্ত পাত্র-পাত্রীর প্রবেশ। কবিকে মাঝখানে রেখে সকলে একসঙ্গে গান ধরলে)

দুষ্টুমি

[আষাঢ় মাসের এক রবিবারের দুপুর। ঝুপ-ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ঘরের ভিতরে বাড়ির কর্তা ও গিন্নি দিবা-নিদ্রার আরাম ভোগ করছেন।

ঘরের সামনের বারান্দায় মুকু, নমু, মঞ্জু এই তিন বোন এবং দীপু ও প্যাঁচা এই দুই ভাই এসে দলবেঁধে দাঁড়াল। তাদের কারুর হাতে তালপাতার ভেঁপু, কারুর হাতে টিনের কানেস্তারা, কারুর হাতে ভাঙা গ্রামোফোনের হর্ন, কারুর হাতে 'হুইসল্' এবং একজনের হাতে লাঠি। বয়সে ছোট হলেও প্যাঁচা হচ্ছে দলের সর্দার।]

প্যাঁচা। দিদি, দাদা! তাহলে আমাদের গড়ের বাজনা আরম্ভ হোক। আমি এই 'হর্নে' মুখ দিয়ে বাজনা শুরু করলেই তোরা সবাই জোরসে বাজাতে থাকবি!

নমু। বা-রে, আমার হাতে খালি একটা লাঠি রয়েছে যে! লাঠি আবার বাজে নাকি?

মুকু। নমুটা ভারি বোকা, কিচ্ছু জানে না!

দীপু। ও দিদি, তুই ঐ দরজার ওপরে খুব জোরে লাঠি মারতে থাক্ না, তাহলেই বাজনা হবে!

প্যাঁচা। সবাই চুপ কর, এইবারে বাজনা আরম্ভ হল! ওয়ান, টু, থ্রি! (গ্রামোফোনের হর্নে মুখ রেখে) ভোঁপ্পর-ভোঁপ্পর-ভোঁ, ভোঁপ্পর-ভোঁপ্পর-ভোঁ, ভোঁপ্পর-ভোঁপ্পর-ভোঁ! (সেই সঙ্গে বাজতে থাকল ভেঁপু, কানেস্তারা, হুইসল্ ও দরজার উপরে দমাদম নমুর লাঠি।)

(ঘরের ভিতরে ঘুম ভেঙে গেল কর্তা-গিন্নির। তাঁরা দুজনে বাইরে ছুটে এলেন)

কর্তা। ওরে, ওরে একি সর্বনাশ!

গিন্নি। ওমা, কি হবে! প্রাণ যে যায়, থাম্ থাম্!

(বাজনা থামল)

প্যাঁচা। বাবা, মা, আমরা গড়ের বাজনা বাজাচ্ছি। আজ যে মঞ্জুর পুতুলের বিয়ে!

গিন্নি। ওরে বাবা, এমন দস্যি পেটে ধরেছি যে, দুপুরবেলায় একটু ঘুমোবারও যো নেই!

মঞ্জু। বা-রে, আমার পুতুলের বিয়েতে বাজনা হবে না বুঝি?

কর্তা। অ্যাঁ, কানের পোকা বার করে তবে ছাড়লে!

প্যাঁচা। ভালোই তো হল বাবা! কানের ভেতর পোকা থাকা তো ভালো নয়!

কর্তা। ওরে এঁচোড়ে-পাকা পালের গোদা! এখুনি বিদেয় হ এখান থেকে! যা সব একতলায়, বাড়ি ঠাণ্ডা হোক্! ফের যদি বাজনা বাজাবি তো মজাটা দেখিয়ে দেব! যা, যা বলছি!

(সবাই পালিয়ে একতলার উঠানে গিয়ে জড়ো হল)

নমু। মা-বাবা যেন কী! পুতুলের বিয়েতে একটু ঘটা করবারও যো নেই!

মুকু। ওরে প্যাঁচা, বাজনা তো বন্ধ হল। এখন আর কি করা যায় বল্ দিকি?

প্যাঁচা। করা যায় অনেক-কিছুই! এয়ার-গান ছুঁড়ে শার্সি ভাঙা যায়, জানলা দিয়ে ইট ছুঁড়ে রাস্তার লোককে মারা যায়; উড়ে বেয়ারাটা এখন ঘুমোচ্ছে, কাঁচি দিয়ে তার ঝুঁটি ছেঁটে দেওয়া যায়—

দীপু। না রে না, ওসব হ্যাঙ্গামা নয়, একটা ভাল খেলার নাম কর।

প্যাঁচা। তবে আয় পুকুর-পুকুর খেলি।

মঞ্জু। পুকুর কোথায় পাব ছোট্দা?

প্যাঁচা। মাথায় বুদ্ধি থাকলে কিছুরই অভাব হয় না। ঝুপ্ ঝুপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে, দেখছিস্? আর এই দ্যাখ্ উঠোন আর ঐ দ্যাখ্ নর্দমা। যা মঞ্জু, ঝাঁ করে খান দুই গামছা নিয়ে আয় তো! নর্দমার মুখে গামছার ছিপি এঁটে দিলেই উঠোন হবে পুকুর।

(বেগে মঞ্জুর প্রস্থান)

নমু। তারপর আমরা কি করব?

প্যাঁচা। পুকুরে সাঁতার কাটব, কাগজের নৌকো ভাসাব, আরো কত কি!

দীপু। ঠিক বলেছিস। দাঁড়া, নৌকো তৈরি করবার জন্যে খবরের কাগজ নিয়ে আসি।

(দীপুর প্রস্থান ও মঞ্জুর প্রবেশ)

মঞ্জু। তিনখানা গামছা এনেছি ছোট্‌দা!

প্যাঁচা। দে। .....এই দ্যাখ্, নর্দমার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। বৃষ্টির জল আর পালাতে পারবে না।

(কাগজ নিয়ে দীপুর প্রবেশ)

দীপু। যতক্ষণ না জল জমে, আমরা নৌকো তৈরি করি আয়!

(সকলে কাগজের নৌকা তৈরি করতে বসল। অল্পক্ষণ পরে)

মঞ্জু। (হাততালি দিয়ে) ও হো, কি মজা, কি মজা! উঠোন হল মস্ত পুকুর!

সকলে। (এক সঙ্গে উচ্চস্বরে), জয়, উঠোন-পুকুর-কি জয়!

প্যাঁচা। ভাসিয়ে দে নৌকোগুলো, ওরে ভাসিয়ে দে নৌকোগুলো!

নমু। পুকুরে তো মাছ থাকে রে প্যাঁচা, কিন্তু আমাদের পুকুরে মাছ কই?

প্যাঁচা। ঠিক বলেছিস মেজদি! তুই চট্ করে এক কাজ কর না! বাইরের ঘরে কাঁচের গামলায় বাবার লালমাছ আছে। সেইগুলো এনে পুকুরে ছেড়ে দে!

(নমুর প্রস্থান)

মুকু। ওরে প্যাঁচা, ওদিকে একবার চেয়ে দেখ! পুকুর যে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকেছে রে! ঐ দ্যাখ, ভাতের হাঁড়ি আর কড়া ভেসে আসছে!

প্যাঁচা। আসবেই তো! ওগুলো হচ্ছে জাহাজ!

(কাঁচের পাত্রে লালমাছ নিয়ে নমুর পুনঃপ্রবেশ)

দীপু। হ্যাঁ, এতক্ষণে আমাদের পুকুরটাকে মানালো! দ্যাখ দ্যাখ মাছরা কেমন সাঁতার কাটছে দ্যাখ!

প্যাঁচা। আয়, এইবারে আমরাও পুকুরে ঝাঁপ দি'।

(সকলে জলের ভিতরে লাফালাফি করতে করতে বলতে লাগল— "ওহো, কি মজা! ওহো, কি মজা!")

তাদের চিৎকার শুনে কর্তা আর গিন্নি আবার বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন।

কর্তা। ও রে বাপ্ রে, এ আবার কি ব্যাপার!

গিন্নি। ওমা, হেঁসেল আর উঠোন এক হয়ে গেছে যে গো! অ্যাঁঃ, হাঁড়ি ভাসছে, কড়া ভাসছে, ঘটি ভাসছে, বাটি ভাসছে!

প্যাঁচা। না, মা, ওগুলো আমাদের জাহাজ ভাসছে!

কর্তা। রোসো, তোমাদের জাহাজ আজ ভাসাচ্ছি! ওগুলো আবার কি গিন্নি? হায় হায় হায় হায়, আমার লালমাছগুলোর সর্বনাশ হল!

গিন্নি। দাঁড়া, আজ তোদের কারুর পিঠের ছাল-চামড়া রাখব না!

কর্তা। মেরো না গিন্নি, মেরো না! মারধর করে এ-সব তে এঁটে ছেলেমেয়েদের কিছু করতে পারবে না! তার চেয়ে আমি ওদের জব্দ করে দিচ্ছি, দেখ না! চ হতভাগারা, আমার সঙ্গে চ! আজ তোদের ভাঁড়ার-ঘরে পুরে চাবি দেব! সারা রাত সেখানে বন্ধ থাকবি! সেখানে আছে সব হাতির মতন ধেড়ে ধেড়ে ইঁদুর, তোদের খেয়ে হজম করে ফেলবে! গিন্নি, প্যাঁচাটা পালাবার চেষ্টা করছে, ওকে তুমি ধর!

সকলে। উঁ-উঁ-উঁ-উঁ (কান্না)

(ভাঁড়ার-ঘরে সকলকে ঢুকিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল)

মুকু, নমু, দীপু ও মঞ্জু। উঁ-উঁ-উঁ-উঁ—

প্যাঁচা। তোরা এখনো কাঁদছিস কেন ভাই?

নমু। রাত্তির হলে এ ঘরে খট্-খট্ করে আওয়াজ হয়। এখানে ভূত আছে! উঁ-উঁ-উঁ-উঁ—

প্যাঁচা। ভূত আছে না ঘেঁচু আছে! ভূত-টুত কিচ্ছু নেই, কিন্তু এ ঘরে ভারি মজার দুটো জিনিস আছে!

দীপু। কি জিনিস?

প্যাঁচা। এক হাঁড়ি রসগোল্লা, আর এক হাঁড়ি ক্ষীরমোহন। আজ সকালবেলায় মামার বাড়ি থেকে তত্ত্ব এসেছিল, জানিস না? মা খাবার-ভরা হাঁড়ি দুটো ঐ উঁচু তাকটার ওপরে তুলে রেখে দিয়েছেন। তোরা খাবি?

মুকু। খেতে তো খুব সাধ হচ্ছে, কিন্তু অত-উঁচুতে আমাদের হাত যাবে না যে।

প্যাঁচা। মাথায় বুদ্ধি থাকলে হাত বাড়িয়ে চাঁদ ছোঁয়া যায়। দাদা আয়, আমি তোর কাঁধে দাঁড়িয়ে হাঁড়িদুটো নামিয়ে ফেলব।

দীপু। কিন্তু মা জানতে পারলে আমাদের আর আস্ত রাখবেন না।

প্যাঁচা। দূর বোকা, জানিস না, পেটে খেলে পিঠে সয়? আগে তো হাঁড়িদুটো খালি করি, তারপর যা হয় হবে!

দীপু। আচ্ছা, তবে চড়্ কাঁধে।

(দীপু বসল, তারপর প্যাঁচাকে কাঁধে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। প্যাঁচা দাদার কাঁধের উপরে দাঁড়িয়ে খাবারের হাঁড়িদুটোকে দু-হাত বাড়িয়ে ধরল)

প্যাঁচা। এই দাদা, তোর গায়ে একটুও জোর নেই, অত টলছিস কেন?

দীপু। ওরে, আর যে পারছি না—এই বুঝি পড়ে গেলুম!

(দীপু ধপাস্ করে বসে কাত হয়ে পড়ল, প্যাঁচাও খেলে সশব্দে এক আছাড়। একটা হাঁড়ি মাটির উপরে, আর একটা হাঁড়ি নমুর মাথার উপরে পড়ে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল)

নমু। (চেঁচিয়ে কেঁদে উঠে) ওগো মা গো, আমার মাথা ফেটে গেল গো!

কর্তা। (ঘরের বাহির থেকে) ও গিন্নি, শিগগির দরজা খুলে দেখ, কি ওখানে ভাঙল, কে পড়ে গেল আর কার মাথা ফাটল!

(দরজা খুলে গেল)

মা। (ব্যস্ত স্বরে) কি হল রে নমু?

নমু। (ক্রন্দন স্বরে) প্যাঁচা মুখপোড়া আমার মাথায় রসগোল্লার হাঁড়ি ফেলে দিয়েছে!

মা। ওগো কি হবে গো! কি সর্বনেশে ছেলেমেয়ে গো! সব রসগোল্লা আর ক্ষীরমোহন নষ্ট হল!

প্যাঁচা। নষ্ট হবে না মা, হুকুম দিলেই ওগুলো সব আমরা খেয়ে ফেলতে পারব!

কর্তা। গিন্নি, এইবারে আমি হার মানলুম! ওরা সব ডাকাত, গুণ্ডা, বোম্বেটে! আমার ছেলেমেয়েদের দুষ্টুমি বন্ধ করতে পারে ত্রিভুবনে এমন কেউ নেই!

এখন যাঁদের দেখছি

এখন
যাঁদের
দেখছি

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি

কলম নিয়ে বসেছিলুম বর্তমানের ছবি আঁকতে। কিন্তু কাগজে কালির আঁচড় পড়বার আগেই দেখি, মনের পটে স্মৃতিদেবী নতুন করে আঁকতে শুরু করে দিয়েছেন একখানি পুরাতন ছবি। তবে পুরাতন হলেও সে ছবি চিরনূতন।

ব্যক্তিত্বের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, মনুষ্যবিশেষের স্বাতন্ত্র্য। এক-একখানি বাড়ির ভিতরেও থাকে এমনি বিশেষ বিশেষ স্বাতন্ত্র্য। শহরে দেখতে পাওয়া যায় হাজার হাজার বাড়ি এবং তাদের প্রত্যেকেরই ভিতরে থাকে কিছু না কিছু পার্থক্য। এই পার্থক্য এতই সাধারণ যে, তার মধ্যে বিশেষ কোনও স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করা যায় না।

কিন্তু এক-একখানি বাড়ি অসাধারণ হয়ে ওঠে এক-একজন মহামনা মহামানুষকে অঙ্কে ধারণ করে। সেই মনস্বীদের ব্যক্তিত্বের স্মৃতি বহন করে ইট-কাঠ-পাথর দিয়ে গড়া বাড়িগুলিও হয় স্বাতন্ত্র্যে অনন্যসাধারণ। হয় যদি তা পর্ণকুটির, সবাই রাজপ্রাসাদ ফেলে তাকে দেখতে ছোটে বিপুল আগ্রহে। এই জন্যেই দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি, বেলুড় মঠ এবং মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির বাসভবন আকৃষ্ট করে বৃহতী জনতাকে।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি!

উত্তরে দক্ষিণে পশ্চিমে তিনটি সংকীর্ণ, নোংরা গলি এবং পূর্বদিকে একটি গণ্ডগোলভরা বাজার। এরই মাঝখানে অভিজাত পল্লী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি নিজের জন্যে রচনা করে নিয়েছে অপূর্ব এক স্বাতন্ত্র্য, বিচিত্র এক প্রতিবেশ। আজ তার নূতন গৌরব করবার কিছুই নেই, কিন্তু তার প্রভূত পূর্বগৌরব তাকে একা গরীয়ান, এমন অতুলনীয় করে রেখেছে যে, এখনও তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে মন হয়ে ওঠে শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ। সে হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতির প্রতীক, সে হচ্ছে সমগ্র দেশের শিল্পী ও সাহিত্যিকগণের প্রধান তীর্থ।

উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের ধর্মে, আমাদের সমাজে, আমাদের জাতীয় জীবনে যাঁরা নূতন রূপ ও নূতন আদর্শ এনেছেন, ওইখানেই তাঁরা প্রথম পৃথিবীর আলোক দেখেছেন, ওইখানেই তাঁরা লালিত-পালিত হয়েছেন এবং ওইখানেই তাঁরা দুনিয়ার পাট তুলে দিয়ে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ওই বাড়ির ঘরে ঘরে দিকে দিকে ছড়ানো আছে অসাধারণ মানুষদের পদরেণু।

এইজন্যে বিদেশীরাও কলকাতায় এলে ঠাকুরবাড়িতে আসবার প্রলোভন সংবরণ করতে পারতেন না। কেবল সাহিত্যক্ষেত্রে নয় চিত্রকলার ক্ষেত্রেও আত্মপ্রকাশ করেছেন ঠাকুরবাড়ির যতগুলি সন্তান, বাংলাদেশে আর কোনও পরিবারে তা দেখা যায় না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও সুনয়নী দেবী এবং এখানকার উদীয়মানদের মধ্যে সুভো ঠাকুর। যাঁরা ভিতরকার খবর রাখেন তাঁরই জানেন, ঠাকুর পরিবারভুক্ত প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিরই মধ্যে আছে সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি সুগভীর অনুরাগ। তাঁরা ইচ্ছা করলেই লেখক বা শিল্পী হতে পারতেন, কিন্তু যে কারণেই হোক তাঁদের সে ইচ্ছা হয়নি।

নতুন বাংলার সঙ্গীতও জন্মলাভ করেছে ঠাকুরবাড়ির মধ্যেই। বাঙালি হচ্ছে কাব্যপ্রিয় ভাবুক জাতি। গানে সুরের ঐশ্বর্যের সঙ্গে সে লাভ করতে চায় কথার সৌন্দর্যও। কথাকে নামমাত্র সার করে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা যখন সুর ও তালের 'ব্যাকরণ' নিয়ে

তাল-ঠোকাঠুকি করছে, বাংলাদেশের লোকসাধারণ তখন একান্ত প্রাণে উপভোগ করছে রামপ্রসাদের গীতাবলী, বাউলসঙ্গীত ও কীর্তনে বৈষ্ণব-পদাবলী প্রভৃতি। যেসব গান সুরের সাহায্যে কথার ভাবকেই মর্যাদা দিতে চায়, আমাদের কাছে তাদেরই আদর বেশি। বাংলাদেশের মেঠো বা ভাটিয়ালী গানও কাব্যরসে বঞ্চিত নয়। নব্য বাংলার বিদ্বজ্জনদের চিত্ত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে ভিন্ন ভাবাপন্ন হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁদের মনের ভিতরেও স্বাভাবিক নিয়মেই থাকে খাঁটি বাঙালির সহজাত সংস্কার। তাঁদের বৈঠকখানায় বা ড্রয়িংরুমে বাংলার সেকেলে গানগুলি প্রবেশ করবার পথ খুঁজে পেত না, কিন্তু ওস্তাদী তানা-না-নাও সহ্য করতে তাঁরা ছিলেন নিতান্ত নারাজ। এই দোটানার মধ্যে দুই কূল রাখবার ব্যবস্থা করলেন ঠাকুরবাড়ির সঙ্গীতাচার্য। আধুনিক যুগের উপযোগী উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর কাব্যকথাকে ফুটিয়ে তোলা হতে লাগল এমন সব সুরের সংমিশ্রণে, যার মধ্যে আছে একাধারে মার্গসঙ্গীত, বাউলসঙ্গীত, কীর্তন-সঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের বিশেষত্ব। এই নতুন পদ্ধতিতে গায়ক কোথাও কথার গতিরোধ করে অযথা দীর্ঘ তান ছাড়বার সুযোগ পান না এবং কবিও কোথাও সুরকে অবহেলা না করে তার সাহায্যেই কথার ভাবকে উচিতমতো প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন। আজ সর্বত্র প্রচারিত হয়ে গিয়েছে এই নূতন পদ্ধতির বাংলা গান এবং এ গান উপভোগ করতে পারেন উচ্চশিক্ষিতদের সঙ্গে অল্পশিক্ষিত শ্রোতারাও।

সাহিত্যকলা, চিত্রকলা ও সঙ্গীতকলার পরে আসে নাট্যকলার কথা। এ ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের অগ্রনায়কদের সঙ্গে দেখি ঠাকুরবাড়ির গুণিগণকে। যে কয়েকটি শৌখিন বাংলা রঙ্গালয়ের আদর্শে এদেশে সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির রঙ্গালয় হচ্ছে তাদের মধ্যে অন্যতম। গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ছিলেন তার প্রধানকর্মী। তারপরেও ঠাকুরবাড়ির সন্তানদের মধ্যে নাট্যকলার ধারা ছিল সমান অব্যাহত। অভিনেতারূপে দেখা দেন রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথ প্রভৃতি আরও অনেকেই। মধ্য যৌবন থেকেই দেখছি, ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রায় প্রতি বৎসরেই এক বা একাধিক নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে আসছে। আজ রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ পরলোকে। কিন্তু আজ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির ধারা অক্ষুণ্ন রেখেছেন; প্রায়ই এখানে ওখানে নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। নাট্যজগতেও ঠাকুর পরিবারের তুলনা নেই।

আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা। আমার বোধহয়, কলকাতা শহরে সর্বপ্রথমে মহিলা নিয়ে অভিনয়ের প্রথা প্রবর্তিত হয় ঠাকুরবাড়ির রঙ্গমঞ্চেই। অভিনেয় নাটিকা ছিল 'বাল্মীকি প্রতিভা'।

নৃত্য যে একটি নির্দোষ আর্ট এবং শিক্ষিত ও ভদ্র পুরুষ আর মহিলারা যে অম্লানবদনে নাচের আসরে যোগ দিতে পারেন, বাংলাদেশে এ বাণী অসঙ্কোচে প্রথম প্রচার করেন ঠাকুরবাড়ির রবীন্দ্রনাথই। তিনি কেবল প্রচার করেই ক্ষান্ত হননি, নিজে হাতে ধরে ছেলেমেয়েদের নামিয়েছিলেন নাচের আসরে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা নৃত্যকলা জাতে উঠল তাঁর হাতের পবিত্র স্পর্শে।

অলিগলির দ্বারা পরিবেষ্টিত বটে, জোড়াসাঁকোর এই ঠাকুরবাড়ি, কিন্তু তার ফটক পার হলেই সংকীর্ণতার কোনও চিহ্নই আর নজরে পড়ে না। সামনেই প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, তারপর ত্রিতল অট্টালিকার ভিতরেও আর একটি বড়ো অঙ্গন। বামদিকে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রাভবন, তারও পশ্চিম দিকে আবার খানিকটা খোলা জমি। ডানদিকে গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের মস্ত বাড়ি, তার দক্ষিণে একটি নাতিবৃহৎ উদ্যানে ফুলগাছের চারা ও বড়ো বড়ো গাছের ভিড়। ধূলিমলিন অলিগলির ইট-কাঠের শুষ্কতার মাঝখানে একখানি জীবন্ত নিসর্গচিত্র—তৃণহরিৎ ক্ষেত্র, ফুলগাছের কেয়ারি, শ্যামলতার মর্মর সঙ্গীত। দখিনা বাতাস বয়, কুঁড়ি ফোটার খবর আসে, জেগে ওঠে গানের পাখিরা।

ঠাকুরবাড়ি আজও জোড়াসাঁকোয় দাঁড়িয়ে অতীতের স্বপ্ন দেখছে, কিন্তু সে বাগান আর নেই। মরুমুল্লুকের মারোয়াড়ি এসে তার বেদরদী হাত দিয়ে লুপ্ত করেছে সেই ধ্বনিময়, গন্ধময়, বর্ণময় স্বপ্ন-নীড়খানি। আর নেই সেই ফুলঝরা ঘাসের বিছানা, সবুজের মর্মরভাষা, গীতকারী বিহঙ্গদের আত্মনিবেদন।

মাইকেলের রাবণ বলেছিল, 'কুসুমিত নাট্যশালাসম ছিল মম পুরী।' আগে ঠাকুরবাড়িও ছিল তাই। কখনও পুরাতন বাড়ির ভিতরে, কখনও রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রাভবনে, কখনও অবনীন্দ্রনাথের মহলে বসত অভিনয়ের বা গানের বা নাচের বা কাব্যপাঠের আসর। বাংলার শিক্ষিত সমাজে নৃত্যকলা যখন অভিনন্দিত হয়নি, ঠাকুরবাড়িতে এসে তখন নাচ দেখিয়ে গিয়েছেন জাপানের সেরা নর্তকী তেঙ্কোয়া এবং স্বর্গীয় শিল্পী যতীন্দ্রনাথ বসু। 'ফাল্গুনী' নাট্যাভিনয়েও আমাদের সামনে এসে নৃত্যচঞ্চল মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, অন্ধ বাউলের ভূমিকায়।

কলকাতায় গানের মালা গেঁথে রবীন্দ্রনাথ ঋতুউৎসবও শুরু করেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেই। বিচিত্রাভবনের পশ্চিমদিকে খোলা জমির উপরে বৃহৎ পটমণ্ডপ বেঁধে আসরে বহু শ্রোতার জন্যে স্থান সংকুলান করা হয়েছিল। বহু গায়ক, গায়িকা ও যন্ত্রী সেই উৎসবে যোগদান করেছিলেন। সেটা বর্ষা কি বসন্ত ঋতুর পালা, তা আর স্মরণ হচ্ছে না, তবে জলসা যে রীতিমতো জমে উঠেছিল, এ কথা বেশ মনে আছে। ঋতুর জন্যে এমন দল বেঁধে ঘটা করে পার্বণের আয়োজন, এদেশে এটা ছিল তখন অভিনব ব্যাপার। কেবল দোলযাত্রায় এখানে রং ছুড়ে হই হই করে হোলির গান গেয়ে মাতামাতি হুড়োহুড়ি করা হয় বটে। কিন্তু সে হচ্ছে নিতান্ত প্রাকৃতজনদের উৎসব, ললিতকলাপ্রিয় শিক্ষিতদের প্রাণ তাতে সাড়া দেয় না।

নাচ-গান-অভিনয় বা কাব্যপাঠের আসর না বসলেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অভাব হত না। তখন বসত গল্প ও সংলাপের বৈঠক এবং সেখানে এসে সমবেত হতেন বাংলাদেশের বিদ্বজ্জন—সমাজের বাছা-বাছা বিখ্যাত ব্যক্তিগণ, তাঁদের নামের সুদীর্ঘ ফর্দ এখানে দাখিল করা অসম্ভব। এমনি সব বৈঠকের আয়োজন করা ঠাকুরবাড়ির চিরদিনের বিশেষত্ব। আমরা যখন ভূমিষ্ঠ হইনি, তখনও ঠাকুরবাড়ির বৈঠকের শোভাবর্ধন করে যেতেন দেশের যত পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিগণ। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে শুরু করে প্রায় প্রত্যেক জ্ঞানী ও গুণী বাঙালি এখানে এসে ওঠা-বসা করে গিয়েছেন। ঠাকুরদের এই প্রাচীন বাসভবনকে যে Historic বা ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাড়ি

বলে গণ্য করা যায় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সারা কলকাতা শহরে এর চেয়ে গরিমাময় বাড়ি নেই আর একখানিও।

তখনকার সেই আনন্দসম্মিলনের দিনে প্রায়ই আমরা অবনীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে উপস্থিত হতুম। কখনও তাঁকে পেতুম দোতলার সুপ্রশস্ত বৈঠকখানায়, কখনও বা পেতুম দক্ষিণের সুদীর্ঘ বারান্দা বা দরদালানে। সেখানকার ছবি মনের ভিতরে খুব স্পষ্ট। প্রায়ই গিয়ে দেখতুম, বাগানের দিকে মুখ করে গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ তিন সহোদর বসে আছেন তিনখানি আরামআসনে। গগনেন্দ্রনাথ হয়তো কোনও বিলাতি পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছেন, সমরেন্দ্রনাথ হয়তো কোনও নাতি কি নাতনিকে আদর করছেন এবং অবনীন্দ্রনাথ পটের উপর তুলিকা চালনায় নিযুক্ত। তারপর ছবি আঁকতে আঁকতেই আমাদের সঙ্গে আলাপ করতেন। একবার চোখ তুলে কথা বলেন, আবার চোখ নামিয়ে পটের ওপরে বুলিয়ে যান তুলি। আলাপের সঙ্গে কলার কাজ।

ভেঙে গিয়েছে আজ ঠাকুরবাড়ির সকল আনন্দের হাট। বুকের মধ্যে দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে বলে সে বাড়ির ভিতরে আর প্রবেশ করি না। ঠাকুরবাড়ি আজ নিরালা, নিস্তব্ধ।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেবল তুলি ধরে ছবি আঁকা নয়, কলম ধরেও ছবি আঁকা। এটা হচ্ছে অবনীন্দ্রনাথেরই শিল্পীমনের বিশেষত্ব। শব্দচিত্রাঙ্কনে তাঁর এই চমৎকার নৈপুণ্যের দিকে সমালোচকদের মধ্যে সর্বপ্রথমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বোধহয় 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। লেখকরূপে ও চিত্রকররূপে অবনীন্দ্রনাথ একই কর্তব্য পালন করেন। ছবিকার হয়েও তিনি যেমন লেখাকে ভুলতে পারেননি, লেখক হয়েও তেমনি ভুলতে পারেননি ছবিকে। পৃথিবীর আরও কোনও কোনও বড়ো চিত্রকর লেখনী ধারণ করেছেন, কিন্তু তাঁদের কারুর রচনায় এ বিশেষত্বটি লক্ষ্য করিনি।

লেখকরূপে ও চিত্রকররূপে অবনীন্দ্রনাথকে জেনেছি বাল্যকাল থেকেই। সে সময়ে এদেশে উচ্চ শ্রেণীর বাল্যপাঠ্য পুস্তকের অভাব ছিল অত্যন্ত। বয়স্ক লিখিয়েরা মাথা ঘামাতেন কেবল বয়স্ক পড়ুয়াদের জন্যেই, কিংবা শিশুদের জন্যে বড়ো জোর লিখতেন পাঠশালার কেতাব। শিশুদের চিত্তরঞ্জন করবার ভার নিতেন ঠাকুমা-দিদিমার দল। কিন্তু শিশুরা যখন কৈশোরে গিয়ে উপস্থিত হত, তখন বয়সগুণে অধিকতর বেড়ে উঠত তাদের মনে ক্ষুধা, অথচ তারা খোরাক সংগ্রহ করবার সুযোগ পেত না। সে বয়সে তাদের মনের উপরে রেখাপাত করতে পারত না শিশুভুলানো ছড়া ও রূপকথা। এই অভাব মোচন করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথও গোড়া থেকেই লেখনী ধারণ করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল'ও রূপকথা বটে, কিন্তু যে উচ্চশ্রেণীর লিপিকুশলতার গুণে রূপকথাও একসঙ্গে নাবালক ও সাবালকদের উপযোগী হয়ে ওঠে, ওর মধ্যে আছে সেই বিশেষ গুণটি। সেই জন্যে কিশোর বয়সে তা পাঠ করে মুগ্ধ হতুম আমরা। তারপর তিনি বলতে শুরু করলেন 'রাজকাহিনী'।

কাহিনীগুলি প্রকাশিত হত বড়োদের পত্রিকা 'ভারতী'তে, কিন্তু ছোটরাও তা সাগ্রহে পাঠ করত এবং পড়ে আনন্দলাভ করত বড়োদেরও চেয়ে বেশি। সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে আকৃষ্ট করেছিল এই 'রাজকাহিনী'-রই শব্দচিত্রগুলি। অবনীন্দ্রনাথের 'ভূতপত্রীর দেশে'ও যেখানে সেখানে পাওয়া যাবে অপূর্ব শব্দচিত্র, সেগুলি ভুলিয়ে দেয় ছেলে-বুড়ো সবাইকে।

অবনীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনার বিস্তৃত সমালোচনা করবার জায়গা এখানে নেই। লিখেছেন তিনি অনেক ঃ গল্প, কাহিনী, নকশা, হাস্যনাট্য, ছড়া এবং প্রবন্ধ প্রভৃতি। প্রত্যেক বিভাগেই আছে তাঁর বিশিষ্ট হাতের বিশদ ছাপা। তাঁর নাম না বলে তাঁর যে কোনও রচনা অন্যান্য লেখকদের রচনাস্তূপের মধ্যে স্থাপন করলেও তাকে খুঁজে বার করা যেতে পারে অতিশয় অনয়াসেই,—এমনি স্বকীয় তাঁর রচনাভঙ্গি। সে ভঙ্গি অননুকরণীয়। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাভঙ্গি অনুকরণ করে অনেকে অল্পবিস্তর সার্থকতা লাভ করেছেন, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের লিখনপদ্ধতির নকল করবার সাহস কারুর হবে বলে মনে হয় না।

ছেলেবেলায় 'সাধনা' পত্রিকায় অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির প্রতিলিপি দেখি সর্বপ্রথমে। ছবিগুলি মুদ্রিত হত শিলাক্ষরে (লিথোগ্রাফ)। রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং তাই অবলম্বন করে ছবি। আমাদের খুব ভালো লাগত। কিন্তু তাদের ভিতরে পরবর্তী যুগের অবনীন্দ্রনাথের সুপরিচিত চিত্রাঙ্কনপদ্ধতি কেউ আবিষ্কার করতে পারবেন না। প্রথম জীবনে তিনি য়ুরোপীয় পদ্ধতিতেই চিত্রাঙ্কন করতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং শিক্ষা পেয়েছিলেন ইতালিয় শিল্পী গিলহার্ডি ও ইংরেজ শিল্পী পামারের কাছে। অবনীন্দ্রনাথের তখনকার আঁকা ছবি তাঁর বাড়িতে এখনও রক্ষিত আছে।

প্রপিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুস্তকাগারে একখানি পুথির মধ্যে মোগল যুগের ছবি দেখে হঠাৎ তিনি দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন, তাঁর চোখ ফিরে আসে বিদেশ থেকে স্বদেশের দিকে। কিছুদিন ধরে চলে ভারতীয় শিল্পসম্পদ নিয়ে নাড়াচাড়া। প্রাচ্য চিত্রকলা পদ্ধতিতে 'কৃষ্ণলীলা' অবলম্বন করে এঁকে ফেললেন কয়েকখানি ছবি। সেগুলি দেখে শিক্ষক পামার চমৎকৃত হয়ে বললেন, 'তোমার শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে, আর তোমাকে কিছু শেখাবার নেই।' অবনীন্দ্রনাথ নিজের পথ নিজেই কেটে নিলেন। ভারতশিল্পের নবজন্মের সূচনা হল।

তারপর কেমন করে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা-প্রসাদাৎ নবযুগের ভারতশিল্প বাংলাদেশে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে বিশাল ভারতবর্ষে আপন বিজয় পতাকা উত্তোলন করে, তা নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করতে চাই না, কারণ অবনীন্দ্রনাথের জীবনী বা ভারতশিল্পের ইতিহাস রচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবেই তাঁকে দেখতে ও দেখাতে চেষ্টা করব।

সাল-তারিখ মনে নেই, তবে কলকাতার সরকারি চিত্র বিদ্যালয়ে তখনও প্রাচ্য চিত্রকলা শেখাবার ব্যবস্থা হয়নি এবং তার সঙ্গে তখনও সংযুক্ত ছিল একটি আর্ট গ্যালারি। সে সময়ে শ্রেষ্ঠ চিত্র বলতে আমরা বুঝতুম য়ুরোপীয় চিত্রই। ওই আর্ট গ্যালারির মধ্যে য়ুরোপীয় শিল্পীদের আঁকা অনেক ছবি সাজানো ছিল—এমন কি রাফায়েলের পর্যন্ত (যদিও তা মূল ছবি নয়)। একদিন সেখানে ছবি দেখতে গিয়েছি। খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর সেই অসংখ্য বিলাতি ছবির ভিড়ের মধ্যে আচম্বিতে এক কোণে আবিষ্কার করলুম জলীয় রঙে আঁকা কয়েকখানি অভাবিত

ছবি। সেগুলি হচ্ছে অবনীন্দ্রনাথের আঁকা মেঘদূত চিত্রাবলী। এক সঙ্গে সচকিত হয়ে উঠল আমার চোখ আর মন। প্রত্যেকখানি ছবি আকারে একরত্তি, সেখানে রক্ষিত ঢাউস ঢাউস বিলাতি ছবি ছেড়ে লোকের চোখ হয়তো তাদের দিকে ফিরতেই চাইত না, কারণ তারা কেবল আকারেই এতটুকু নয়, তাদের মধ্যে ছিল না, পাশ্চাত্য বর্ণবৈচিত্র্য এবং ঐশ্বর্যের বাহুল্যও। তবু কিন্তু তাদের দেখে আমি একেবারে অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার সামনে খুলে গেল যেন এক অজানা সৌন্দর্যলোকের বন্ধ দরজা। মন সবিস্ময়ে বলে উঠল, যে অচিন সুন্দরকে দেখবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এখানে আসিনি, অকস্মাৎ সে নিজেই এসে আমার কাছে ধরা দিল।

আজকের দর্শকরা হয়তো ওই ছবিগুলি দেখে আমার মতন অত বেশি অভিভূত হবেন না। কারণ বহুকাল ধরে অসংখ্য দেশি ছবি নিয়ে অনুশীলন করে চক্ষু তাঁদের অনেকটা শিক্ষিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমি তখন ছিলুম সম্পূর্ণরূপে বিলাতি ছবি দেখতেই অভ্যস্ত, এমনকি যুরোপীয় পদ্ধতিতে চিত্রবিদ্যা শেখবার জন্যে সরকারি আর্ট স্কুলে ছাত্ররূপে যোগদানও করেছি। কাজেই ছবিগুলি আমার কাছে এনে দিলে নূতন আবিষ্কারের বার্তা। সেইদিন থেকেই আমি হয়ে পড়লুম অবনীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত।

মানুষটিকে চোখে দেখবার সাধ হল এবং সুযোগও মিলল অনতিবিলম্বেই। খবর পেলাম, অবনীন্দ্রনাথদের ভবনে শিল্প-সম্পর্কীয় এক সভার অধিবেশন হবে। যথাসময়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলুম। অবনীন্দ্রনাথকে দেখলুম। শান্ত, মিষ্ট মুখ। সহজ সরল ভাব, কোনওরকম ভঙ্গি নেই। ভালো লাগল মানুষটিকে।

সভায় বউবাজার চিত্র বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ (তাঁর নাম কি মন্মথবাবু?) বক্তৃতা দিতে উঠে অবনীন্দ্রনাথের গুণগ্রামের পরিচয় দিলেন। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর (ইউ রায়) দু-চার কথা বললেন। শুনলুম ওঁরা একটি শিল্প-সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করতে চান এবং রবীন্দ্রনাথ তার নামকরণ করেছেন 'কলা সংসদ'। কিন্তু তারপর কি হয়েছিল জানি না, তবে 'কলা সংসদ' সম্বন্ধে আর কোনও উচ্চবাচ্য শুনতে পাইনি।

তারপর কিছুদিন যায়। 'প্রবাসী' ও 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে লাগল অবনীন্দ্রনাথের ছবির পর ছবি। অনেককে তারা করলে আনন্দিত। এবং অনেককে আবার করে তুললে দস্তুরমতো ক্রুদ্ধ; বিলাতি শিক্ষাগুণে তাঁরা এমন মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে, ঘরের ছেলে হয়েও ঘরোয়া রূপের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারলেন না। যে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি অবনীন্দ্রনাথের রচনার শব্দচিত্রগুলি দেখে প্রশংসা করেছিলেন, অবনীন্দ্রনাথের আঁকা প্রত্যেক চিত্রই যেন তাঁর চোখের বালি হয়ে উঠল। তিনি প্রথম শ্রেণীর চিত্র সমালোচক (যা তিনি ছিলেন না) সেজে বারংবার উষ্মা প্রকাশ ও ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। গালিগালাজ যাদের পেশার মতো, এমন আরও বহু ব্যক্তি যোগদান করলে সুরেশচন্দ্রের দলে। বাজার হয়ে উঠল সরগরম।

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন 'যোগাসনে লীন যোগীবরে'র মতো—নিন্দা-প্রশংসায় সমান অটল। ওইসব আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁর মুখে ছিল না কোনও প্রতিবাদ। তরঙ্গের ধারাবাহিক প্রহার চিরদিনই নিশ্চল ও নিস্তব্ধ হয়ে সহ্য করতে পারে সাগরশৈল। তিনি আত্মগত হয়ে বাস

করতে লাগলেন নিজের পরিকল্পনার জগতে। দিনে দিনে নব নব রূপ সৃষ্টি করে ভরিয়ে তুলতে লাগলেন রসজ্ঞ বিদ্বজ্জনদের চিত্ত।

মাঝে মাঝে তুলি ছেড়ে কলম ধরেন, যাদের অনুসন্ধিৎসু মন জানতে চায়, বুঝতে চায়, তাদের জানাতেন এবং বোঝাতে ললিতকলার আদর্শ ও গুপ্ত কথা। তাঁর সেই প্রবন্ধগুলিও প্রাচ্য চিত্রকলার রহস্যোদঘাটনের পক্ষে অল্প সাহায্য করেনি। গঠন করলেন ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টস নামে একটি প্রতিষ্ঠান। সেখানে দেশীয় চিত্র সম্বন্ধে লোকসাধারণের চিত্তকে সচেতন ও শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে বাৎসরিক ছবির মেলা বসাবার ব্যবস্থা করা হল। ওদিকে গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের আসরে আসীন হয়ে তিনি তৈরি করে তুলতে লাগলেন দলে দলে নূতন শিল্পী। ফল যা হয়েছে তা সর্বজনবিদিত। তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা বাংলার জমিতে যে বাক্য-বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিলেন, তা কোনও ফলই প্রসব করতে পারেনি। জয় হয়েছে অবনীন্দ্রনাথেরই।

অবনীন্দ্রনাথেরই বিজয়গৌরব কেবল ভারতে নয়, স্বীকৃত হয়েছে ভারতের বাইরেও। কিন্তু যেখানে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত বাধে এবং পরস্পরবিরোধী আদর্শ দুটি সমান্তরাল রেখার মতো থেকে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে নারাজ হয়, সেখানে অপ্রীতিকর দৃশ্যের অবতারণা অবশ্যম্ভাবী।

ভারতবর্ষে প্রধানত দুই শ্রেণীর শিল্পীর প্রভাব দেখা গিয়েছে। একদল কলকাতা চিত্র বিদ্যালয়ের অনুগামী, আর একদল হচ্ছে বোম্বাই আর্ট স্কুলে শিক্ষিত। হ্যাভেল সাহেব ও অবনীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে আসবার আগে কলকাতার সরকারী চিত্র-বিদ্যালয়ের ছাত্ররা যে রকম শিক্ষালাভ করে বেরিয়ে আসত, বোম্বাইয়ের শিল্পীদের দৌড় তার চেয়ে বেশি ছিল না। তাঁদের আর্ট পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চেষ্টা করত (এবং এখনও করছে) ভারতবর্ষকে প্রকাশ করতে। এই বর্ণসঙ্কর বা দোঁআঁশলা আর্ট সৃষ্টি করতে পারে বড়ো জোর রবি বর্মা বা ধুরন্ধরের মতো শিল্পীকে। রবি বর্মার ছবিতে যে মানুষগুলি দেখা যায়, তাদের প্রত্যেকেরই ভাবভঙ্গি দস্তুরমতো থিয়েটারি। তাঁর 'গঙ্গাবতরণ' নামে জনপ্রিয় চিত্রে হিন্দুদের পৌরাণিক দেবতা মহাদেবের যে ভঙ্গিবিশিষ্ট মূর্তি দেখি, সাজ-পোশাক পরিবর্তন করতে পারলে আনয়াসে তিনি বিলাতী সাহেবে পরিণত হতে পারেন। আগে একাধিক বাঙালি শিল্পীও এই শ্রেণীর ছবি এঁকেছেন, তাদের কিছু কিছু নমুনা আজও বাজারে দুর্লভ নয়।

কিন্তু হ্যাভেল সাহেব ও অবনীন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার পদ্ধতি যখন বাংলার বাইরেও সাগ্রহে অবলম্বিত হতে লাগল এবং নন্দলাল বসু প্রমুখ অসাধারণ শিল্পীর প্রভাব যখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগল, বোম্বাইয়ের শিল্পীদের অবস্থা হয়ে পড়ল তখন নিতান্ত অসহায়ের মতো। বোম্বাই স্কুল অফ আর্টের ভূতপূর্ব পরিচালক গ্লাডস্টোন সলোমন বাংলা পদ্ধতির সেই অগ্রগতি সহ্য করতে পারেননি। প্রায় উনিশ বৎসর আগে 'Essays on Mogul Art' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করে তিনি হ্যাভেল সাহেব, অবনীন্দ্রনাথ ও বাংলার পদ্ধতির বিরুদ্ধে করেছিলেন প্রভূত বিষোদগার। তবু বাতাসের গতি ফিরল না দেখে অল্পকাল আগেও আবার তিনি তর্জন গর্জন (বা অরণ্যে রোদন) করতে ছাড়েননি। কিন্তু বৃথা এসব চেষ্টা! যে ঘুমিয়ে

পড়েছে তাকে জোর করে আবার জাগানো যায়, কিন্তু যে জেগে উঠেছে তাকে জোর করে আবার ঘুম পাড়ানো সম্ভবপর নয়।

এখন অবনীন্দ্রনাথের জীবনের সন্ধ্যাকাল। দিনের কাজ তাঁর ফুরিয়ে গিয়েছে, বেলা-শেষের কর্মশ্রান্ত বিহঙ্গের মতো বিশ্রাম গ্রহণের জন্যে তিনি ফিরে এসেছেন নিজের নীড়ে। একান্তে বসে স্বপ্ন দেখেন,—গত জীবনের সার্থক স্বপ্ন। তাঁর পায়ের তলায় গিয়ে বসলে আমাদেরও মনে আবার জেগে ওঠে অতীতের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া কত দিনের স্মৃতি, কত আনন্দময় মুহূর্ত, কত বিচিত্র রসালাপ!

মানুষ অবনীন্দ্রনাথ

প্রসিদ্ধ লেখক ও 'ভারতী'-সম্পাদক স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের মধ্যম জামাতা। তাঁর মুখে শুনেছি, গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টসের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব একবার কি কারণে অবনীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, 'তুমি বড়ো সেন্টিমেন্টাল।'

অবনীন্দ্রনাথ জবাব দিয়েছিলেন, 'আমি আর্টিস্ট, সেন্টিমেন্ট নিয়েই আমার কারবার। আমাকে তো সেন্টিমেন্টাল হতেই হবে।'

এই সেন্টিমেন্টালিটি বা ভাবপ্রবণতাই অবনীন্দ্রনাথকে চিরদিন চালিত করেছে ললিতকলার নানা দিকে, নানা ক্ষেত্রে। যখনই তাঁর কাছে গিয়েছি, তাঁর কথা শুনেছি, তখনই উপলব্ধি করেছি, তাঁর মন সর্বদাই আনাগোনা করতে চায় ভাব থেকে ভাবান্তরে, রূপ থেকে রূপান্তরে। অলসভাবে বসে বসে দিবাস্বপ্নে মশগুল হয়ে থাকা, এ হচ্ছে তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সর্বদাই তিনি কোনওনা কোনও রূপসৃষ্টির কাজ নিয়ে নিযুক্ত হয়ে থাকতে ভালোবাসেন। নিরালায় একলা বসে ছবি তো আঁকেনই, এমন কি যখন বাইরেকার আর পাঁচজন এসে তাঁকে ঘিরে বসেন তখনও তাঁর কাজে কামাই নেই, গল্প করতে করতেই পটের উপরে এঁকে যান রেখার পর রেখা। যখন ছবির পাট তুলে দেন তখন নিয়ে বসেন কাগজ ও কলম। খাতার উপরে ঝরে পড়ে রঙের বদলে সাহিত্যরসের ধারা। তারপর খাতা মুড়লেও কাজ বন্ধ হয় না। ছোটো ছোটো ভাস্কর্যের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকেন। তারও উপরে আছে অন্যরকম কাজ বা শিল্পীসুলভ খেলা। বাগানে বেড়াতে বেড়াতেও দৃষ্টি তাঁর লক্ষ্য করে, প্রকৃতি দেবী সেখানে নিজের হাতে তৈরি করে রেখেছেন কত সব মূর্তি বা বস্তু। হয়তো এক টুকরো শুকনো ডাল বা পালাকে দেখাচ্ছে ঠিক ডিঙার মতো। অমনি সেটি সংগ্রহ করা হল এবং আর একটি গাছ থেকে সংগৃহীত হল মানুষের মতো দেখতে একটি পালা। অমনি অবনীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় তারা পরিণত হল অপূর্ব একটি প্রাকৃতিক ভাস্কর্য-কার্যে। যেন রূপকথায় বর্ণিত নদ-নদীর মধ্যে জলযাত্রা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে ছোট্টো একখানি তরণী ও তার কর্ণধার। এ তাঁর হেলাফেলার কথা নয়, এ শ্রেণীর অনেক কাজ তাঁর সংগ্রহশালায় সাদরে সুরক্ষিত হয়েছে। তিনি এর কি একটি নাম দিয়েছিলেন বলে স্মরণ হচ্ছে—বোধহয় 'কাটুম-কুটুম খেলা।'

বৈষ্ণব কবি গেয়েছেন, 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপতি ভেল।'

অবনীন্দ্রনাথও ওই দলের মানুষ। রূপ আর রূপ—তিনি সারাক্ষণই সমাহিত হয়ে আছেন আপন রূপলোকে। মনে মনে সর্বদা এঁকে যান ছবি আর ছবি—সেসব ছবি হয়তো কোনওদিন পটেও উঠবে না, কলমেও ফুটবে না, তবু পরিপূর্ণ হয়ে থাকে তাঁর মানস-চিত্রশালা।

চার-পাঁচ বৎসর আগে একদিন অবনীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছি। কথাবার্তা কইতে কইতে হঠাৎ বললুম, 'একটুখানি লেখা দিন।'

তিনি বললেন, 'কাগজ-কলম নিয়ে বোসো। আমি বলি, তুমি লিখে নাও।'

তারপর এক সেকেন্ডও চিন্তা না করেই এবং একবারও না থেমে তিনি মুখে মুখে যে শব্দচিত্রখানি রচনা করলেন, এখানে তা তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারলুম না ঃ

'ময়না বললে দাদামশায় ছবি আঁকবো, বেশ কথা—সবাই ওই কথাই বলে ঃ ছবি যে আঁকে সেই জানে ছবি আঁকা সহজ নয়, কিন্তু যারা দেখে তারা ভাবে এ তো বেশ সহজ কাজ! ওই হল মজা ছবি লেখার।

ময়না রং তুলি নিয়ে আঁকতে বসল হিজিবিজি কাগের ছা—

আমি সেই হিজিবিজি থেকে কখনও কাগের ছা, কখনও বগের ছা বানিয়ে দিই, আর ছবি আঁকার প্রথম পাঠ দি ময়নাকে, যথা—

হিজিবিজি কাগের ছা
লিখে চল যা তা
লিখতে লিখতে পাকলে হাত
লেখার হবে ধারাপাত—

সেই সময় ধারা দিয়ে বৃষ্টি নামে, লেখা মুছে যায় জলের ছাটে, ভাত আসে, দুপুর বাজে, পুকুরঘাটে নাইতে চলে ময়না—দুপুরের ঘুমের আগে প্রথম পাঠ শেষ কোরে।'

রচনারীতি সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের একটি নিজস্ব মত আছে। প্রত্যেক বিখ্যাত লেখকই নিজের জন্যে এক বিশিষ্ট রচনাপদ্ধতি নির্বাচন করে নেন। ফ্রান্সের সাহিত্যগুরু ফ্লবেয়ার একটানা লিখে যেতে পারতেন না, একটিমাত্র শব্দ নির্বাচনের জন্যে কখনও কখনও তিনি কাটিয়ে দিতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা—এমন কি এক বা একাধিক দিবস!

ঔপন্যাসিক বালজাক প্রথম যে পাণ্ডুলিপি ছাপাখানায় পাঠিয়ে দিতেন, তার বাক্যাংশ বা বিষয়বস্তু বা আখ্যানভাগ পাঠ করেও কেউ কিছু বুঝতে পারত না। পরে পরে সাত-আটবার প্রুফ দেখার এবং পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধনের পর তবেই তা পাঠকদের উপযোগী হয়ে উঠত।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রচনার পাণ্ডুলিপি দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে। সেগুলির মধ্যে যথেষ্ট কাটাকুটির চিহ্ন আছে। পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পরও তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারতেন না, নব নব সংস্করণের সময়ে বার বার চলত তাঁর অদলবদলের কাজ।

রচনাকার্যে নিযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেও আমি দেখেছি। তিনিও অনায়াসে রচনা করতেন পারতেন না। যথেষ্ট ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে তিনি লেখনী চালনা করতেন। একবার যা লিখতেন আবার তা কেটে দিয়ে নতুন করে লিখতেন দ্বিতীয়বার।

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের রচনাপদ্ধতি স্বতন্ত্র। আমি যখন 'রংমশাল' পত্রিকার সম্পাদক, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁকে কিছু লেখবার জন্যে অনুরোধ করেছিলুম। সেবারেও তিনি মুখে মুখে বলে গেলেন এবং আমি লিখে নিলুম। লেখাটি সম্পূর্ণ হলে আমি তাঁকে পড়ে শোনালুম, যদি কিছু অদলবদলের দরকার হয়। কিন্তু সে দরকার আর হল না। মনে আছে, সেই দিনই তিনি আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'হেমেন্দ্র, প্রথমে যা মনে আসবে, তাই লিখো, তবেই লেখা হবে স্বাভাবিক।'

বিখ্যাত লেখক ও নানা সংবাদপত্রের সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলতেন, 'একটা বাক্য (sentence) খানিকটা লিখে মনের মতো হল না বলে কেটে দেওয়া ঠিক নয়। সেই বাক্যটাই চটপট সম্পূর্ণ করে ফেলা উচিত, কারণ সাংবাদিকের কাজ শেষ করতে হয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।'

কিন্তু এ রীতি সাংবাদিকের উপযোগী হলেও সাহিত্যিকের নয়। অবনীন্দ্রনাথের কাছে যে পদ্ধতি সহজ এবং যা অবলম্বন করে তিনি রাশি রাশি সোনা ফলাতে পারেন, অধিকাংশ সাহিত্যিকের পক্ষে তা অকেজো হয়ে পড়বার সম্ভাবনা। তবে এখানেও একটা মধ্যপন্থা আছে। মনের ভিতরে প্রথমেই যে বাক্য আসবে, মনে মনেই তা অদলবদল করে নিয়ে তারপর কাগজকলমের সাহায্য গ্রহণ করলে রচনায় বিশেষ কাটাকুটির দরকার হয় না।

অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা বলি। সে বোধ করি তেতাল্লিশ কি চুয়াল্লিশ বৎসর আগেকার কথা।

'ভারতী' পত্রিকার জন্যে রচনা করেছিলুম প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ। সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী বললেন, 'এ লেখার সঙ্গে অজন্তার দুই-একখানা ছবি দেওয়া দরকার। তুমি অবনীন্দ্রনাথের কাছে যাও, আমার নাম করলে সেখানে থেকেই ছবি পাবে।'

সরাসরি অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করবার ভরসা আমার হল না। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির অন্যতম বিখ্যাত লেখক সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন আমার পরিচিত, তিনি আমাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখতেন, মাঝে মাঝে আমার বাড়িতেও পদার্পণ করতেন। আমি তাঁকেই গিয়ে ধরলুম, অবনীন্দ্রনাথের কাছে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে।

সুধীন্দ্রনাথের পিছনে পিছনে অবনীন্দ্রনাথের বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলুম। দ্বারবানদের দ্বারা রক্ষিত দরজা পার হয়েই একখানি ঘর, সেখানে দেওয়ালের গায়ে হাতে আঁকা ছবি। একখানি বড়ো ছবির কথা মনে আছে। তাতে ছিল একটি কলাগাছের ঝাড়। দেশীয় পদ্ধতিতে আঁকা নয়। চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথ স্বয়ং।

সামনেই প্রশস্ত সোপান শ্রেণী—সেখানেও রয়েছে বিলাতি পদ্ধতিতে আঁকা প্রকাণ্ড একখানি তৈলচিত্র—'শূদ্রকের রাজসভা', চিত্রকর যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। ছবিখানি প্রভূত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

দোতালার মস্তবড়ো বৈঠকখানা, সাজানো-গুছানো, শিল্পসম্ভারে পরিপূর্ণ। ঘরের মাঝখানে বসে আছেন অবনীন্দ্রনাথ, পরনে পায়জামা ও পাঞ্জামি। তাঁর সামনে উপবিষ্ট একটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গোছের লোক। তাঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতে অবনীন্দ্রনাথ একবার মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন, তারপর আবার পণ্ডিত গোছের লোকটির দিকে ফিরে বললেন, 'লাইনগুলি একবার বলুন তো!'

তিনি বললেন, 'বৈষ্ণব কাব্যের রাধা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলছেন—

'রন্ধনশালায় যাই
তুঁয়া বঁধু গুণ গাই,
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।'

অর্থাৎ শাশুড়ি-ননদি কোনও সন্দেহ করতে পারবে না, ভাববে চোখে ধোঁয়া লেগেছে বলে আমি কাঁদছি!'

অবনীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'বাঃ, বেড়ে তো! 'ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি!' এ লাইন নিয়ে খাসা একখানি ছবি আঁকা যায়।'

সুধীন্দ্রনাথ আমার পরিচয় দিলেন। আমিও আমার আগমনের উদ্দেশ্য বললুম।

তিনি বললেন, 'বেশ, অজন্তার ছবির ব্যবস্থা আমি করে দেব। আপনার ঠিকানা রেখে যান।'

সেখানেই সেদিন প্রথম মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখেছিলুম, পরে যাঁর সঙ্গে আবদ্ধ হয়েছিলুম ঘনিষ্ঠতম বন্ধুত্ববন্ধনে।

দিন দুই পরেই একটি সাহেবের মতো ফরসা যুবক আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত, হাতে তাঁর অজন্তার দুইখানি ছবির প্রতিলিপি। তাঁর নাম শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, গত যুগের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের পুত্র। অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করে তিনি পরে হয়েছিলেন লাহোরের সরকারি চিত্র বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

এরপর অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে একাধিকবার দেখা হয় গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে প্রাচ্য-চিত্রকলার প্রদর্শনীতে। সেখানে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর বড়দাদা গগনেন্দ্রনাথ নিয়মিতভাবে হাজির থেকে তখনকার আনাড়ি দর্শকদের কাছে ব্যাখ্যা করতেন দেশি ছবির গুণের কথা। প্রাকৃতজনদের কাছে জাতীয় শিল্পকে লোকপ্রিয় করে তোলবার জন্যে সে সময়ে দেখতুম তাঁদের কি অসাধারণ প্রচেষ্টা ও আগ্রহ!

ওই প্রদর্শনা-গৃহেই একদিন অবনীন্দ্রনাথের কাছে ভয়ে ভয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করলুম, আমিও প্রাচ্য চিত্রকলার শিক্ষার্থী হতে চাই।

খুব সম্ভব 'ভারতী' ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত আমার কোনও কোনও শিল্প সম্পর্কীয় রচনা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি বললেন, 'এখন আপনার মতো ছাত্রই আমার দরকার—যারা একসঙ্গে তুলি আর কলম চালাতে পারবে। আঁকুন দেখি একটি পদ্মফুল।'

হঠাৎ এভাবে আঁকতে অভ্যস্ত ছিলুম না, বিশেষ তাঁর সামনে দস্তুরমতো নার্ভাস হয়ে গেলুম।

যে কিম্ভূতকিমাকার পদ্ম এঁকে দেখালুম, তা দেখে তিনি হতাশ হলেন না, বললেন, 'আপনার চেয়েও যারা খারাপ আঁকত, তারাও আমার হাতে এসে উতরে গেছে। আপনার হবে।' বোধ করি সেদিনও তাঁর মত ছিল—

'হিজিবিজি কাগের ছা
লিখে চল যা তা—

লিখতে লিখতে পাকলে হাত
লেখার হবে ধারাপাত।'

কিন্তু হায় রে, ছবি আঁকায় হাত আর আমার পাকল না। এমনভাবে পড়ে গেলুম সাহিত্যের আবর্তে, নজর দেবার অবসরই পেলুম না অন্য কোনও দিকে।

অবনীন্দ্রনাথের গল্প

অবনীন্দ্রনাথ ভাবুক, কিন্তু ভারিক্কে মেজাজের মানুষ নন। এমন সব বিখ্যাত গুণী ব্যক্তি আছেন, অত্যন্ত সাবধানে তাঁদের কাছে গিয়ে বসতে হয়। এমনি তাঁরা রাশভারী যে তাঁদের সামনে মন খুলে কথা কইতেও ভরসা হয় না। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ রাশভারীও নন রাশহাল্কাও নন, তিনি একেবারে সহজ মানুষ। কোনও রকম ছ্যাবলামি না করেও যে-কোনও প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি আর পাঁচজনের সঙ্গে যোগ দিয়ে গল্পসল্প, হাসি-তামাশা বা রঙ্গভঙ্গ করতে পারেন। তাঁর সরস সংলাপ গুরুতর বিষয়কেও করে তোলে সহজ-সরল।

পরম উপভোগ্য তাঁর মজলিশ। সেখানে কারুকেই মুখে চাবিতালা দিয়ে বসে থাকতে হয় না, সবাই অসঙ্কোচে বলতে পারেন তাঁদের প্রাণের কথা। অনেক জ্ঞানী ও গুণী চমৎকার বৈঠকী আলাপ করেন বটে, কিন্তু সমগ্র বৈঠকটিকে একাই এমনভাবে সমাচ্ছন্ন করে রাখেন যে, আর কেউ সেখানে মুখ খুলবার ফুরসৎ পান না কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের বৈঠক Soliloquy বা আত্মভাষণের বৈঠক নয়। সেখানে সবাই তাঁর কথা শোনবার ও নিজেদের কথা শোনাবার অবসর পান। সেখানে কখনও কখনও কারুকে কারুকে মুখরতা প্রকাশ করতেও দেখেছি কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ অধীরতা প্রকাশ করেননি।

তাঁর ভাবপ্রবণ মনে মাঝে মাঝে জাগে এমন সব অদ্ভুত খেয়াল, ভারিক্কে ব্যক্তিদের কাছে যা ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছুই নয়। কলকাতায় বর্ষা নামে, বিদ্যুৎ জ্বলে, বাজ হাঁকে, আকাশে মেঘের মিছিল চলে, দিকে দিকে ছায়ার মায়া দোলে, ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণের বাগানে বাদলের ঝর ঝর ধারা ঝরে, গাছপালার পাতায় পাতায় মর্মরবাণী জাগে, বাতাসের নিঃশ্বাসে ফুলের ও সোঁদা মাটির গন্ধ ভেসে আসে, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের মনে ফোটে না বর্ষার পুরন্ত রূপখানি। বৈষ্ণব কবিদের মতো তাঁরও বিশ্বাস, বর্ষার জলসার সঙ্গে দর্দুর বা ভেকের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। বলেন, 'এখানে ব্যাঙ কই, ব্যাঙ না ডাকলে কি বর্ষা জমে?'

তখনই হুকুম হয়, 'যেখান থেকে পারো কতকগুলো ব্যাঙ ধরে নিয়ে এসো।'

লোকজন ঝুলি নিয়ে ছোটে। হেদুয়া না গোলদিঘির পুকুর পাড়ে নিরাপদে ও নির্ভাবনায় দল বেঁধে বসে যে-সব দর্দুরনন্দন কাব্য বর্ণিত মকধ্বনিতে পরিপূর্ণ করে তুলছিল চতুর্দিক, হানাদাররা হঠাৎ গিয়ে পড়ে তাদের উপরে, টপাটপ করে ধরে পুরে ফেলে ঝুলির ভিতরে। তারপর ঝুলিভরতি ব্যাঙ এনে ঠাকুরবাড়ির বাগানে ছেড়ে দেয়। বাস্তুহারা হয়েও ভেকের দল ভড়কে যায় না, গ্যাঙর গ্যাঙর তানে সম্মিলিত কণ্ঠে চলতে থাকে তাদের গানের আলাপ।

অবনীন্দ্রনাথের মনে বর্ষার ঠিক রূপটি ফোটে। কিন্তু অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে হয়তো বাড়ির লোকের কান আর প্রাণ।

এ গল্পটি আমার কাছে বলেছিলেন অবনীন্দ্রনাথের জামাতা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

ঠাকুরবাড়ির প্রত্যেকেরই একটি শিষ্ট আচরণ লক্ষ্য করেছি। সর্বপ্রথম যখন রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছি তখন তিনি ছিলেন প্রৌঢ়, আর আমি ছিলুম প্রায় বালক। কিন্তু তখন এবং তারপরও অনেক দিন পর্যন্ত তিনি আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতে পারেননি। গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথও আমাকে 'বাবু' বলে সম্বোধন করতেন, এটা আমার মোটেই ভালো লাগত না। অবশেষে আমার অত্যন্ত আপত্তি দেখে অবনীন্দ্রনাথ আমাকে 'বাবু' ও 'আপনি' প্রভৃতি বলা ছেড়ে দেন। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরও আমার পিতার বয়সী হয়েও আমার সঙ্গে ব্যবহার করতেন সমবয়সী বন্ধুর মতো, তবু কিন্তু তিনি আমাকে কোনওদিনই 'তুমি' বলে ডাকতে পারেননি, আমি আপত্তি করলে খালি মুখ টিপে হাসতেন। এ শ্রেণীর শিষ্টাচার দুর্লভ।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক স্বর্গীয় প্রফুল্ল সরকারকে অবনীন্দ্রনাথ একদিন অতিশয় অবাক করে দিয়েছিলেন। ১৩৩১ কি '৩২ সালের কথা। আমি তখন আনন্দবাজারের নাট্য-বিভাগের ভার গ্রহণ করেছি।

প্রফুল্লবাবু একদিন বললেন, 'হেমেন্দ্রবাবু, দোলযাত্রার জন্যে আনন্দবাজারের একটি বিশেষ সংখ্যা বেরুবে। অবনীন্দ্রনাথের একটি লেখা চাই। আপনার সঙ্গে তো তাঁর আলাপ আছে, আমাকে একদিন তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন?'

বললুম, 'বেশ তো, কাল সকালেই চলুন।'

পরদিন যথাসময়ে অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে গিয়ে দেখলুম, বাগানের দিকে মুখ করে তিনি বসে আছেন একলা।

তাঁর সঙ্গে প্রফুল্লবাবুকে পরিচিত করবার জন্যে বললুম, 'ইনি দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে আসছেন।'

অবনীন্দ্রনাথ শুধোলেন, 'সে আবার কোন কাগজ?'

প্রফুল্লবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। সবিস্ময়ে বললেন, 'আপনি আনন্দবাজারের নাম শোনেননি?'

অবনীন্দ্রনাথ মাথা নেড়ে বললেন, 'না। খবরের কাগজ আমি পড়ি না।'

প্রফুল্লবাবু দমে গিয়ে একেবারে নির্বাক।

আমি বললুম, 'আনন্দবাজারের দোল সংখ্যার জন্যে উনি আপনার একটি লেখা চাইতে এসেছেন।'

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, 'বেশ, লেখা আমি দেব।'

অবনীন্দ্রনাথ মজার মানুষ। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে আগে খুব ঘটা করে মাঘোৎসব হত। বিশেষ করে জমে উঠত ব্রহ্ম সঙ্গীতের আসর। রবীন্দ্রনাথ বহু সঙ্গীত রচনা করতেন। সেই সব গান শোনবার জন্যে যাঁরা ব্রাহ্ম নন তাঁরাও সেখানে গিয়ে সৃষ্টি করতেন বিপুল জনতা। নিমন্ত্রিতদের জন্যে জলখাবারেরও ব্যবস্থা থাকত। এখনকার ব্যবস্থার কথা জানি না। একবার

আমার বড়ো ছেলে (এখন ফুটবল খেলার মাঠে রেফারি অলক রায় নামে সুপরিচিত) আবদার ধরলে, আমার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির মাঘোৎসব দেখতে যাবে। তাকে নিয়ে গেলুম। বাইরেকার প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। আমার ছেলের দিকে তাকিয়ে শুধোলেন, 'তোমার সঙ্গে এটি কে?'

বললুম, 'আমার ছেলে।'

অবনীন্দ্রনাথ তো হেসেই অস্থির। বললেন, 'হেমেন্দ্র, তুমি আমার চোখে ধুলো দেবে ভেবেছ? ভাইকে ছেলে বলে চালিয়ে দিতে এসেছ?'

আমি যতই বলি, 'না এ সত্যিই আমার ছেলে' তিনি কিছুতেই সে-কথা মানতে রাজি হলেন না, কারণ আমার নাকি অত বড়ো ছেলে হতেই পারে না!

তিনি আমাকে তরুণ বয়স থেকেই দেখেছেন। সেই তারুণ্যকেই তিনি মনে করে রেখেছেন, আমি যে তখন প্রৌঢ় সেটা তাঁর চোখে ধরা পড়েনি। কেবল প্রৌঢ় নই, আমি তখন ছয়টি সন্তানের পিতা।

অবনীন্দ্রনাথ কেবল তুলি ও কলমের ওস্তাদ নন, তাঁর অভিনয় নৈপুণ্যও অসাধারণ। এটা নিশ্চয়ই সহজাত সংস্কারের ফল। তাঁর পিতামহ গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেছিলেন 'বাবুবিলাস' নাটক এবং নিজের বাড়িতেই করেছিলেন তার অভিনয়ের আয়োজন। তাঁর পিতা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন প্রথম যুগের বাংলা রঙ্গালয়ের একজন বিখ্যাত নাট্য-ধুরন্ধর। তিনি ছেলেবেলা থেকেই নিজের বাড়িতে নাট্যোৎসব দেখে এসেছেন, সুতরাং পাদপ্রদীপের মায়ার দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন স্বাভাবিকভাবেই। রবীন্দ্রনাথ সাধারণত ভারিক্কে ভূমিকা নিয়েই রঙ্গমঞ্চে দেখা দিতেন, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন হালকা কৌতুকরসের ভূমিকা। তাঁর এই শ্রেণীর কয়েকটি অভিনয় আমি দেখেছি এবং মুগ্ধ হয়েছি। তিনি নিজে যেমন সহজ-সরল মানুষ, নাট্যমঞ্চের উপরেও দেখা দিয়েছেন ঠিক সেইভাবেই, একবারও মনে হয়নি কৃত্রিম অভিনয় দেখছি।

সাধারণ রঙ্গালয়েও মাঝে মাঝে তিনি অভিনয় দেখতে গিয়েছেন। 'সীতা' নাট্যাভিনয়ে বাংলা নাট্যজগতে দৃশ্য-পরিকল্পনায় যুগান্তর এনেছিলেন তাঁরই এক শিষ্য শ্রীচারুচন্দ্র রায়। 'মিশরকুমারী' নাট্যাভিনয়ে দৃশ্য-পরিকল্পক স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়ের কাজ দেখে খুশি হয়ে তিনি প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন বলে মনে হচ্ছে। আর একজন নামকরা দৃশ্য-পরিকল্পক স্বর্গীয় পটলবাবু তাঁর কাছে উপদেশ নিয়ে মিনার্ভা থিয়েটারের যবনিকার সম্মুখ অংশে (Proscenium) যে কারুকার্য দেখিয়েছিলেন সকলেই তার প্রশংসা না করে পারেনি।

আজ উদয়শঙ্করের নাম সকলের মুখে মুখে। কিন্তু প্রথম যখন তিনি কলকাতায় আসেন, দেশের কেউ তাঁর নাম জানত না এবং কোথাও তিনি আমল পাননি। সে এক যুগ গিয়েছে। পুরুষের নাচ ছিল থিয়েটারের বকাটে ছেলেদের নিজস্ব, শিক্ষিত ভদ্রঘরের ছেলে নাচবে, এটা ছিল লোকের কল্পনারও অগোচর। উদয়শঙ্কর দস্তুরমতো হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। শেষটা তিনি একদিন আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলেন। আমি বললুম, 'আপনি অবনীন্দ্রনাথের কাছে যান। তিনি শিল্পী, তাঁর মন গণ্ডী মানে না। নিশ্চয় তিনি কোনও পথ বাতলে দিতে পারবেন।'

আমার পরামর্শ ব্যর্থ হয়নি। উদয়শঙ্কর নাচবে শুনে অবনীন্দ্রনাথ বিস্মিত হননি বা তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চাননি, পরম উৎসাহিত হয়ে সুধীসমাজে তাঁকে পরিচিত করবার জন্যে প্রাচ্য কলাভবনের সুবৃহৎ হলঘরে একদিন তাঁর নাচ দেখাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তারপর থেকেই সুগম হয়ে গেল উদয়শঙ্করের পথ। বিদ্বজ্জনগণ তাঁকে দিলেন জয়মাল্য, সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত হয়ে গেল জনসাধারণের বদ্ধ মন ও দৃষ্টি।

এক সন্ধ্যায় পুরাতন ঠাকুরবাড়ির উঠোনে রবীন্দ্রনাথের কি একটি নাচ-গানের আসর বসেছে, পালাটির নাম আর মনে পড়ছে না। উঠোনের দক্ষিণ দিকে রঙ্গমঞ্চ, উত্তরে ঠাকুরদালানে ওঠবার সোপানের উপরে অবনীন্দ্রনাথের পাশে বসে আছি আমি। মঞ্চের উপরে কয়েকটি ছোটো ছোটো মেয়ে নাচতে নাচতে গান গাইছে। অবনীন্দ্রনাথ বললেন, 'দ্যাখো হেমেন্দ্র, আমাদের নাচের একটা বিষয় আমার মনে ধরে না। গানের কথায় যা যা থাকবে, নাচের ভঙ্গিতেও যে তা ফুটিয়ে তুলতে হবেই, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত নয়। নাচ হচ্ছে একটা স্বতন্ত্র আর্ট, গানের কথাকে, সে নকল করবে কেন? সুরের তালের সঙ্গে নিজের ছন্দ মিলিয়ে তাকে স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করতে হবে নূতন নূতন সৌন্দর্য।

'ভারতী' পত্রিকার কার্যালয়ে বসত আমাদের একটি সাহিত্যিক বৈঠক। এই মজলিশে পদার্পণ করতেন প্রবীণ ও নবীন বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক। অবনীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে শুনিয়ে আসতেন স্বরচিত ছোটো ছোটো হাস্যনাট্য বা নকশা। তাঁর পাঠ হত একসঙ্গে আবৃত্তি ও অভিনয়। লেখার ভিতরে যেখানে গান থাকত, নিজেই গুনগুণ করে গেয়ে আমাদের শুনিয়ে দিতেন, গানে সুর সংযোগও করতেন নিজেই। শুনেছি কোনও কোনও যন্ত্রও তিনি বাজাতে পারেন।

চলমান জল দেখতে তিনি ভালবাসতেন। পুরীতে সাগরসৈকতে একখানি বাড়ি করেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন 'পাথরপুরী'। মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে কিছুকাল কাটিয়ে আসতেন। কলকাতাতেও এক সময়ে প্রত্যহ সকালে গঙ্গাবক্ষে স্টিমারে চড়ে বেড়িয়ে আসতেন বহুদূর পর্যন্ত। সেই গঙ্গাভ্রমণ উপলক্ষে তাঁর কয়েকটি চমৎকার রচনা আছে।

আমিও কলকাতার গঙ্গার ধারে বাড়ি করেছি শুনে তিনি ভারি খুশি। উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'আমাকেও গঙ্গার ধারে একখানা বাড়ি দেখে দাও না!'

কিন্তু তাঁর গঙ্গার ধারে থাকা আর হয়নি। তবে এখন তিনি যেখানে বাস করছেন, সেও মনোরম ঠাঁই। নেই শহরের গণ্ডগোল, নিরিবিলি মস্ত বাগান। গাছে গাছে বসে পাখিদের গানের সভা, দিকে দিকে নাচে সবুজ সুষমা, ফুলে ফুলে পাখনা দুলিয়ে যায় প্রজাপতিরা, সরোবরে ঢল ঢল করে রোদে সোনালি জ্যোৎস্নায় রূপালি জল। জোড়াসাঁকোর বাড়ির মতো দক্ষিণ দিকে তেমনি প্রশস্ত দরদালান, আবার তিনিও সেখানে আগেকার মতোই তেমনি বাগানের দিকে মুখ করে আসনে আসীন হয়ে থাকেন। কিছুদিন আগে গিয়েও দেখেছি, বসে বসে কাগজের উপরে আঁকছেন একটি ছেলেখেলার কাঠের ঘোড়া।

কিন্তু আজ ব্যাধি ও বার্ধক্য তাঁর হাত করেছে অচল। একদিন আমাকে কাতর স্বরে বললেন, 'হেমেন্দ্র, বড়ো কষ্ট। আঁকতে চাই আঁকতে পারি না, লিখতে চাই লিখতে পারি না।' স্রষ্টা সৃষ্টি

করতে পারছেন না ইচ্ছা সত্ত্বেও, মন তাঁর জাগ্রত, কিন্তু দেহ অন্তরায়, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য কল্পনা করা যায় না। পৃথিবীর জীবনযাত্রা, আলোছায়া রঙের খেলা তেমনি চলছে, শিল্পীই আজ কেবল নীরব, নিশ্চল দর্শক মাত্র।

অবনীন্দ্রনাথ এখন দূরে গিয়ে পড়েছেন, জীবন-সংগ্রামে আমারও অবসর হয়েছে বিরল, তাঁর কাছে গিয়ে প্রণাম করবার সৌভাগ্য হয় কালেভদ্রে কদাচ। সাহিত্যক্ষেত্রে চরণস্পর্শ করে প্রণাম করেছি মাত্র দুইজন লোককে। তাঁরা হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ।

স্যার যদুনাথ সরকার

ভারতবাসীরা ইতিহাস রচনার জন্যে খ্যাতিলাভ করেনি। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস দুর্লভ। মুসলমানরা এদেশে এসে ইতিহাস রচনার দিকে দৃষ্টিপাত করেন বটে এবং তাঁদের দেখাদেখি অল্প কয়েকজন হিন্দুও কিছু কিছু ঐতিহাসিক রচনা রেখে গিয়েছেন। কিন্তু সে রচনাগুলি প্রায়ই নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না।

এদেশে নিয়মিতভাবে ইতিহাস রচনার সূত্রপাত করেন পাশ্চাত্য লেখকরাই। যদিও সে-সব হচ্ছে বিজেতার লিখিত বিজিত দেশের ইতিহাস, তবু তাদের মধ্যে পাওয়া যায় অল্পবিস্তর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং প্রচুর মূল্যবান তথ্য। এবং একথা বললেও ভুল বলা হবে না যে, বাঙালিরা ইতিহাস রচনা করতে শিখেছে ইংরেজদের কাছ থেকেই।

বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রথম গুরু বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের দিকে বাঙালির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁর যুগেই বাঙালি লেখকরা বিশেষভাবে ইতিহাস রচনায় নিযুক্ত হন। কিন্তু আমাদের ইতিহাস রচনার প্রাথমিক প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য হয়েছিল বলে মনে হয় না। অনেকেরই সম্বল ছিল কেবল ইংরেজদের লিখিত ইতিহাস। অনেকের রচনা হচ্ছে অনুবাদ। অনেকে স্বাধীন চিন্তাশক্তির পরিচয় দিতে পারেননি। অনেকের ভিতরে ছিল না সত্যকার ঐতিহাসিকসুলভ মনোবৃত্তি। অনেকে নন নিরপেক্ষ সমালোচক। অনেকে বিনা বা অল্প পরিশ্রমেই হতে চাইতেন ঐতিহাসিক।

বঙ্কিমোত্তর যুগে বাঙলার ঐতিহাসিক সাহিত্য ধীরে ধীরে উন্নত হতে লাগল। কিন্তু সে উন্নতিকেও সর্বতোভাবে আশাপ্রদ বলা যায় না। সে সময়েও এমন ঐতিহাসিক ছিলেন, যিনি মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত ও গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে করেছেন। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের নাম সুপরিচিত, কিন্তু তিনি ইতিহাস রচনায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেননি এবং তাঁর রচনাও ভূরি ভূরি ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ। তাঁর সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের নাম, কারণ মৌলিক গবেষণা করবার যথেষ্ট শক্তি তাঁর ছিল। কিন্তু সময়ে সময়ে তিনিও পরস্পরবিরোধী তথ্যগুলি ওজন করে নিজের মত গঠন করতেন না; আগে একটি বিশেষ মত খাড়া করে তার সপক্ষেই তথ্যের পর তথ্য সংগ্রহ করে যেতেন, 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থে তার একাধিক প্রমাণ আছে। সিরাজদ্দৌলা চরিত্রের কালো দিকটা সাদা দেখাবার জন্যে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি। এমন একদেশদর্শিতা ঐতিহাসিকের পক্ষে অশোভন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙলার

ইতিহাস' একখানি মূল্যবান গ্রন্থ বটে, কিন্তু তার মধ্যে প্রত্নতত্ত্বের প্রাধান্য আছে বলে সাধারণ পাঠকের তা সুখপাঠ্য হয় না। কেবল রাশি রাশি সাল-তারিখ, মুদ্রা, শিলা বা তাম্রলিপির মধ্যে পড়ে পাঠকের মন দিশাহারা হয়ে ওঠে, আখ্যানবস্তু খুঁজে পাওয়া যায় না। সত্য কথা বলতে কি, আমাদের মাতৃভাষায় আজ পর্যন্ত নিখুঁত ইতিহাস রচিত হয়নি।

মাতৃভাষায় যা হয়নি, ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে একজন বাঙালি ঐতিহাসিকের দ্বারা সেই দুরূহ কার্যটি সম্পাদিত হয়েছে। স্যর যদুনাথ সরকার হচ্ছেন বাঙলাদেশের প্রথম ঐতিহাসিক, যিনি কেবল স্তূপীকৃত, রসহীন প্রমাণপঞ্জীর মধ্যে ছুটোছুটি করতে চাননি, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর শিল্পীর মতো সব রকম তথ্যই সংগ্রহ করে এমন এক অপূর্ব রূপ দিয়েছেন যা একাধারে নিরপেক্ষ সমালোচনা এবং ইতিহাস এবং প্রামাণিক কথা-সাহিত্য। তিনি অলঙ্কারবহুল পল্লবিত ভাষা পরিহার করেও রচনাকে নিরতিশয় সরস করে তুলতে পারেন। বিস্ময়কর তাঁর সংযম। ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে এমনভাবে তিনি নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন, মন চমৎকৃত না হয়ে পারে না। কল্পনার সাহায্যে ঔপন্যাসিক করেন চরিত্র সৃষ্টি, তাঁর চরিত্র সৃষ্টি হয় বাস্তব ঘটনা অবলম্বন করে। তাঁর পরিকল্পনার ইন্দ্রজালে ইতিহাসের মানুষগুলি বহু যুগের ওপার হতে আবার জীবন্ত মূর্তি ধারণ করে ফিরে এসে দাঁড়ায় বর্তমানকালে। তার ইতিহাস-গ্রন্থাবলীর মধ্যে পাওয়া যায় কত উপন্যাস, কত নাটক ও কত গাথার উপাদান।

অদ্ভুত কর্মী পুরুষ এই স্যার যদুনাথ। তাঁর ধৈর্য, পরিশ্রম ও অনুসন্ধিৎসা সত্যসত্যই অসাধারণ। মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের ইতিহাস রচনা করতে কেটে গিয়েছে তাঁর পঞ্চাশ বৎসর। এই কাজে তাঁকে ইংরেজি, ফরাসি, পারশি, সংস্কৃত, হিন্দি ও মারাঠি ভাষা থেকে অসংখ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে হয়েছে। এ সম্বন্ধে আর কোনও ঐতিহাসিকই এমন বিপুল পরিশ্রম স্বীকার করেননি। মোগল সাম্রাজ্যের বিশেষজ্ঞ হিসাবে ভারতে তিনি অদ্বিতীয়।

কিন্তু ঐতিহাসিক কেবল পরিশ্রমী হলেই চলে না। মুটের মতো গলদঘর্ম হয়ে খাটবার লোকের অভাব হয় না। ঐতিহাসিককে তথ্য সংগ্রহের সঙ্গে করতে হয় গভীরভাবে মস্তিষ্কচালনা। রীতিমতো মাথা খাটিয়ে সংগৃহীত তথ্যগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে না পারলে ব্যর্থ হয় সমস্ত পরিশ্রম। তথ্যের থাকে দুটি দিক—স্বপক্ষে ও বিপক্ষে। এই দুটি দিক দিয়ে তথ্যগুলিকে ওজন করে দেখতে হয়—এখানে ঐতিহাসিককে হতে হবে প্রথম শ্রেণীর অনপেক্ষ সমালোচক। অ্যাবট সাহেব ছিলেন নেপোলিয়ান বোনাপার্টের পক্ষপাতী জীবনীকার কিন্তু তাঁর লিখিত বিশাল গ্রন্থের মধ্যে প্রকৃত নেপোলিয়ানকে দেখতে পাওয়া যায় না। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ও সিরাজজীবনী রচনা করেছেন সিরাজের বিরুদ্ধে যেসব ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় সেদিকে না তাকিয়েই। কিন্তু স্যার যদুনাথ এ শ্রেণীর ঐতিহাসিক নন। তাঁর প্রকাণ্ড গ্রন্থ 'ঔরংজেবের ইতিহাস' ও 'শিবাজীর জীবনচরিত' পাঠ করলেই সকলে বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন, প্রত্যেক ঐতিহাসিক চরিত্রকেই তিনি চারিদিক থেকে দেখতে চেষ্টা করেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। তিনি কোনও তথ্য ব্যবহার করেছেন গুণ দেখাবার জন্যে এবং দোষ দেখাবার জন্য ব্যবহার করেছেন কোনও তথ্য। আবার বহু তথ্যকে পরিত্যাগ করেছেন। লোভনীয় হলেও অবিশ্বাস্য বলে।

স্যার যদুনাথের সমগ্র জীবন কেটে গিয়েছে শিক্ষাব্রত ও ইতিহাস চর্চার ভিতর দিয়ে। রাজশাহী জেলার ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম। বাইশ বৎসর বয়সে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষা দেন এবং সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। লাভ করেন সুবর্ণ পদক ও বৃত্তি। তারপর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করে কলকাতায়, পাটনায়, বেনারসে ও কটকে বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস-চ্যান্সেলারের পদে অধিষ্ঠিত হন।

অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে ঐতিহাসিক সাধনা। ছাত্রজীবন সাঙ্গ করেই সর্বপ্রথমে রচনা করেন টিপু সুলতান সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর আরও অনেক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর সর্বপ্রথম স্মরণীয় দান হচ্ছে পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত 'ঔরংজেবের ইতিহাস'। এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে শাজাহানের অর্ধেক রাজত্বকালের ও ঔরংজেবের সমগ্র জীবনকালের কথা। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে আছে শাজাহানের রাজত্বকাল ও উত্তরাধিকারের জন্যে যুদ্ধ। তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে ১৬৫৮ থেকে ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর ভারতের কথা। চতুর্থ খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে ১৬৪৪ থেকে ১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের কথা। পঞ্চম খণ্ড ঔরংজেবের শেষ জীবন নিয়ে রচিত হয়। ওই গ্রন্থ পাঠ করে ঐতিহাসিক বেভারিজ সাহেব তাঁকে 'বাঙালি গিবন' বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি 'শিবাজী ও তাঁর যুগ' রচনা করে পেয়েছিলেন বোম্বাইয়ের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে স্যার জেমস ক্যাম্পবেল সুবর্ণ পদক। 'মোগল সাম্রাজ্যের নিম্নগতি ও পতন' হচ্ছে তাঁর আর একখানি বিরাট গ্রন্থ। এছাড়া তিনি আরও কয়েকখানি উপভোগ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে আরভিনের 'লেটার মোগলস' (দুই খণ্ড), 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' (দ্বিতীয় খণ্ড) ও 'আইন-ই-আকবরি'। তাঁর রচিত বাংলা প্রবন্ধও আছে, তবে সংখ্যায় সেগুলি বেশি নয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ইংরেজিতে তিনি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রচনা ভাষান্তরিত করেছেন। তাঁর ইংরেজি রচনা সমালোচকদের প্রশংসা পেয়েছে। আজ তাঁর বয়স তিরাশি বৎসর। কিন্তু আজও তাঁর মনীষা, মস্তিষ্ক চালনার শক্তি ও কর্মতৎপরতা অটুট আছে। চিরদিনই তিনি মৌলিক গবেষণার পক্ষপাতী। বয়স হয়েছে বলে অলস হয়ে বসে থাকতে ভালোবাসেন না। এখন গত ষাট-বাষট্টি বৎসরের ঐতিহাসিক গবেষণা নিয়ে তুলনামূলক আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে আছেন।

আমাদের অধিকাংশ ঐতিহাসিক টেবিলের সামনে চেয়ারাসীন হয়ে পুথিপত্রের মধ্যেই কালযাপন করেন। কিন্তু যে যে দেশের ইতিহাস বা ঐতিহাসিক ঘটনার কথা বলবেন, স্যার যদুনাথ স্বয়ং বার বার সেই সব দেশে গিয়ে স্বচক্ষে ঘটনাস্থল পরিদর্শন না করলে নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। মহারাষ্ট্র প্রদেশে গিয়েছেন উপরি উপরি পঞ্চাশবার। ঔরংজেব যেখানে যেখানে গিয়ে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়েছেন, বার বার সেইসব স্থান নিজের চোখে দেখে এসেছেন। এই রকম দেশভ্রমণের ফলে তাঁর দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছে বহু নূতন নূতন তথ্য, নানা জায়গা থেকে তিনি সংগ্রহ করে এনেছেন ঔরংজেব ও তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিদের পাঁচ হাজার পত্র।

যাঁরা শস্তায় কিস্তিমাত করে নাম কিনতে চান, তাঁদের উপরে স্যার যদুনাথের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। গায়ে হাওয়া লাগিয়ে দুই-চারখানা ইংরেজি কেতাব পড়ে যা হোক কিছু একটা খাড়া করে

দিলেই চলে না। তিনি জীবনব্যাপী সাধনা করেছেন হঠযোগীর মতো। মাত্র দুই-তিনটি পংক্তির জন্য তাঁকে রাশি রাশি প্রমাণ সংগ্রহ করতে হয়েছে, হয়তো কেটে গিয়েছে দিনের পর দিন। যতদিন না নিজের ধারণা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, ততদিন গভীর চিন্তায় নিযুক্ত থাকতে হয়েছে। লোকপ্রিয়তা অর্জন করবার জন্যে কোনওদিন তিনি সত্যকে বিকৃত বা অতিরঞ্জিত করতে যাননি। অথচ যা করেছেন, সহানুভূতির সঙ্গেই করেছেন, কোনওরকম বিরুদ্ধ ভাবের আশ্রয় নেননি।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ। মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্‌তাবের আমন্ত্রণে সে বৎসরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন হয় বর্ধমানে। সাহিত্য সম্মিলনীতে এত ঘটা আর কখনও দেখিনি। এই রেশনের ও দুর্ভিক্ষের যুগে সেদিনকার রাজকীয় ভূরিভোজনের আয়োজনকে গতজন্মের স্বপ্ন বলে মনে হয়। সে রকম সব খাবারও আর তৈরি হয় না এবং সে রকম খাবার খাওয়াবার শক্তি বা সুযোগও আজ আর কারুর নেই। সম্মিলনের প্রধান সভাপতি ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং ইতিহাস শাখায় সভাপতিত্ব করেছিলেন স্যার যদুনাথ সরকার। তাঁর সঙ্গে প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় হয় সেইখানেই। স্যার যদুনাথ বাংলা ভাষায় একটি অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন। তাঁর বাংলা রচনা তাঁর ইংরেজির মতো চোস্ত ও মধুর না হলেও প্রাঞ্জল।

তারপর তাঁর সঙ্গে বার বার দেখা হয়েছে এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্সের পুস্তকালয়ে। ওঁরা তাঁর প্রকাশক ও আত্মীয়। অল্পস্বল্প আলাপও করেছি মাঝে মাঝে। মৃদুভাষী মানুষ তিনি, প্রকৃতি গম্ভীর বলে মনে হয়। কোনওরকম পোজ বা ভঙ্গিধারণের চেষ্টা নেই। চেহারা ও সাজপোশাক এত সাদাসিধে যে, কেউ বুঝতেই পারে না তিনি কত বড়ো পণ্ডিত ও অনন্যসাধারণ মানুষ। জনতার ভিতরে তিনি অনায়াসেই হারিয়ে যেতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলাপ করলে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনুভব করা যায়।

প্রাচীন বয়সে নিয়তির কাছ থেকে তিনি সদয় ব্যবহার লাভ করেননি। তাঁর চার পুত্র, ছয় কন্যা। তাঁদের মধ্যে বর্তমান আছেন কেবল তিনটি মেয়ে, একটি ছেলে। একটি মেয়ে বিলাতে পড়তে গিয়ে অজ্ঞাত কারণে আত্মঘাতী হন এবং তাঁর কিছুকাল পরেই কলকাতার গত দাঙ্গার সময়ে তাঁর এক পুত্র আততায়ীর হস্তে মারা পড়েন। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও এবং মাথার উপরে কিঞ্চিদধিক আশি বৎসরের ভার নিয়েও স্যার যদুনাথ ভেঙে পড়েননি, অবিচলভাবে সহ্য করেছেন এই সব দুর্ভাগ্যের আঘাত।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বোধহয় সেটা ১৩২০ (কিংবা ১৩২১) সাল। আমি তখন আড়ালে থেকে 'যমুনা' পত্রিকা সম্পাদন করছি—যদিও ছাপার হরফে সম্পাদক বলে পরিচিত ছিলেন স্বর্গীয় ফণীন্দ্রনাথ পাল।

সেই সময় সৌরীন প্রায়ই আসতেন 'যমুনা' কার্যালয়ে। মূর্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অশ্রান্ত গল্পগুজবে আসর মুখরিত করে রাখেন। পেশায় পুলিস কোর্টের উকিল। কিন্তু ওকালতির চেয়ে টান বেশি সাহিত্যের দিকেই। তাই পুলিস কোর্টে তাঁর মন টিকত না। যখন তখন সেখান থেকে পিঠটান দিয়ে তিনি মেলামেশা করতে যেতেন সাহিত্যিকদের সঙ্গে।

'যমুনা' কার্যালয়ে সৌরীনের সঙ্গে আমার চোখাচোখি হত বটে, কিন্তু কথা বলাবলি হত না। তিনি আসতেন, আর পাঁচজনের সঙ্গে কথাবার্তা কইতেন, আমি চুপ করে বসে বসে শুনতুম।

সৌরীনের আসল পরিচয় পেয়েছিলুম আরও কয়েক বৎসর আগে। 'ভারতী'তে ছোটো গল্পে বিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়ে তিনি তখনকার একজন শক্তিশালী উদীয়মান লেখক বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ঝরঝরে হালকা ভাষা, সরল ও মধুর। রচনাভঙ্গিটিও আমার খুব ভালো লাগত এবং আজও লাগে—কারণ তাঁর ভাষা এখনও দরিদ্র হয়ে পড়েনি। এবং সেই সময়েই তিনি সাহিত্যজগৎ থেকে নাট্যজগতেও দৃষ্টিপাত করতে ছাড়েননি। ১৯০৮ ও ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে স্টার থিয়েটারে সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনীত হয় তাঁর রচিত দুখানি কৌতুক নাট্য—'যৎকিঞ্চিৎ' ও 'দশচক্র'।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রথম বয়স থেকেই। ভাগলপুরে বসে শরৎচন্দ্র একটি তরুণ লেখকদের দল গড়ে তুলেছিলেন। তখন শরৎচন্দ্রের নামও কেউ জানত না এবং চিনত না সেই সব তরুণকে। তাঁদের নাম হচ্ছে স্বর্গীয়া নিরুপমা দেবী, স্বর্গীয় গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। ভাগলপুরের দল যে হাতেলেখা পত্রিকায় লেখনী চালনা করতেন, তার নাম ছিল 'ছায়া'। শরৎচন্দ্রের উঠতি বয়সের বহু রচনাই পরে 'ছায়া' পত্রিকার অঙ্ক ছেড়ে প্রকাশ্য সাহিত্যক্ষেত্রে এসে দেখা দিয়েছে।

সৌরীনের বাড়ি কলকাতায়, কাজেই ভাগলপুরে তিনি স্থায়ী হতে পারেননি। উপেন্দ্রনাথও কলকাতায় চলে আসেন। কিন্তু এখানে এসেও তাঁরা সাহিত্যের নেশা ছাড়তে পারলেন না। সাহিত্য চর্চায় উৎসাহী আরও কয়েকজন তরুণকে নিয়ে গঠন করলেন 'ভবানীপুর সাহিত্য সমিতি'। এখানকার হাতেলেখা পত্রিকার নাম হল 'তরণী'।

'ছায়া' ও 'তরণী' করত গুরু শিষ্যের সংবাদবহন। ডাকযোগে তারা আনাগোনা করত কলকাতায় এবং ভাগলপুরে। পরস্পরকে কঠিন ভাষায় ভর্ৎসনা করতেও ছাড়ত না।

তারপর আদ্যলীলার আসর ছেড়ে সৌরীন এসে যোগ দিলেন 'ভারতী'-র সঙ্গে। তখন সরলা দেবী ছিলেন 'ভারতী'-র সম্পাদিকা। কিছুকাল দক্ষ হস্তে পত্রিকা চালিয়ে বিবাহ করে তাঁকে পাঞ্জাবে চলে যেতে হয়। সেই সময়ে সৌরীন কলকাতায় থেকে সরলা দেবীর নির্দেশ অনুসারে 'ভারতী'-র কাজ চালিয়ে যেতেন।

তারপর সৌরীন যে কীর্তি স্থাপন করলেন, বাংলা সাহিত্যের দরবারে তা হচ্ছে একটি বিশেষরূপে উল্লেখ্য ঘটনা।

সাহিত্যসাধনা ছেড়ে শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুনে গিয়ে হয়েছেন মাছিমারা কেরানি। তাঁর নিজের মুখেই প্রকাশ, 'এর পরেই সাহিত্যের সঙ্গে হল আমার ছাড়াছাড়ি, ভুলেই গেলাম যে জীবনে একটা ছত্রও কোনওদিন লিখেছি। দীর্ঘকাল কাটলো প্রবাসে—ইতিমধ্যে কবিকে (রবীন্দ্রনাথ) কেন্দ্র করে যে নবীন বাঙলা সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভরে উঠল আমি তার কোনও খবরই জানিনে।'

শরৎচন্দ্র নিরুদ্দেশ। কিন্তু তাঁর রচনার পাণ্ডুলিপিগুলি যে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

জিম্মায় আছে, সৌরীন এ খবরটা জানতেন। সুরেন্দ্রনাথের কাছ থেকে তিনি 'বড়দিদি' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি আনিয়ে শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাতসারেই 'ভারতী'তে তিন কিস্তিতে ছাপিয়ে দিলেন (১৯০৭ খ্রিঃ)। তার ফলেই শরৎচন্দ্রের রচনার সঙ্গে হয় জনসাধারণের প্রথম পরিচয় সাধন। শরতের চাঁদের মুখ থেকে মেঘের ঘোমটা প্রথম খুলে দেন সৌরীন্দ্রমোহনই। এজন্যে তিনি অভিনন্দন পেতে পারেন।

তারপর কেটে গেল আরও কয়েক বৎসর। শরৎচন্দ্র অজ্ঞাতবাসে। সাহিত্য নিয়ে নেই তাঁর কিছুমাত্র মাথাব্যথা। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে কিছুদিনের জন্যে ছুটি নিয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন।

সে সময়ে ফণীন্দ্রনাথ পাল চালাচ্ছেন 'যমুনা' পত্রিকা, তার সঙ্গে তখনও আমার সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় পত্রিকা চালনায় ফণীবাবুকে সাহায্য করতেন। তাঁরা দুজনেই শরৎচন্দ্রকে ধরে বসলেন, 'যমুনা'-র জন্যে আবার লেখনী ধারণ করতে।

সৌরীন লিখেছেন ঃ 'যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্র পাল আমায় ধরিয়াছেন—যে 'যমুনা'কে তিনি জীবনসর্বস্ব করিতে চান, আমার সহযোগিতা চাহেন। শরৎচন্দ্র আসিলে তাঁকে ধরিলাম—এই যমুনার জন্য লিখিতে হইবে।

শরৎচন্দ্র বলিলেন—'একখানা উপন্যাস 'চরিত্রহীন' লিখিতেছি। পড়িয়া দ্যাখো চলে কিনা।'

'প্রায় পাঁচ আনা অংশ লেখা 'চরিত্রহীন'-এর কপি তিনি আমার হাতে দিলেন। পড়িলাম। শরৎচন্দ্র কহিলেন—'নায়িকা কিরণময়ী। তার এখনও দেখা পাওনি। খুব বড়ো বই হইবে।'

'চরিত্রহীন' যমুনায় ছাপা হইবে স্থির হইয়া গেল। তিনি অনিলা দেবী ছদ্মনামে 'নারীর মূল্য' আমায় দিয়া বলিলেন—আমার নাম প্রকাশ করিয়ো না। আপাতত যমুনায় ছাপাও।

তাই ছাপানো হইল। তারপর দিলেন গল্প—'রামের সুমতি'। যমুনায় ছাপা হইল। বৈশাখের যমুনার জন্যে আবার গল্প দিলেন—'পথনির্দেশ'।

সৌরীন্দ্রমোহন ও উপেন্দ্রনাথ মধ্যস্থ হয়ে না দাঁড়ালে এবং লেখার জন্যে পীড়াপীড়ি না করলে শরৎচন্দ্র যে সাহিত্যক্ষেত্রে পুনরাগমন করতেন, একথা জোর করে বলা যায় না।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা বলে নিই। শরৎচন্দ্রের একটি মজার শখ ছিল। তিনি যেসব লেখককে নিজের শিষ্যস্থানীয় বলে মনে করতেন, তাঁদের প্রত্যেককে উপহার দিতেন একটি করে ভালো ফাউন্টেন পেন। তাঁর একখানি পত্রে দেখি, নিরুপমা দেবী ও সৌরীনের জন্যেও তিনি ফাউন্টেন পেন ঠিক করে রেখেছেন।

যমুনা কার্যালয়ে একদিন আমাকে বললেন, 'হেমেন্দ্র, তুমি যদি আমাকে গুরু বলে মানো, তাহলে তোমাকেও একটি ফাউন্টেন পেন দেব।'

তার ছেলেমানুষি কথা শুনে মনে মনে হেসে বললুম, 'আপনি আমার শ্রদ্ধাভাজন। কিন্তু আমার গুরু রবীন্দ্রনাথ। আর কারুকে তো গুরু বলে মানতে পারব না।' বলাবাহুল্য, আমার ভাগ্যে আর ফাউন্টেন পেন লাভ হয়নি।

প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপরে 'ভারতী' সম্পাদনার ভার

দিয়ে স্বর্ণকুমারী দেবী অবকাশ গ্রহণ করলেন। সেই সময়ে মণিলালের বাল্যবন্ধু সৌরীন্দ্রমোহন হন 'ভারতী'-র সহযোগী সম্পাদক। আমি তখন সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মর্মবাণী'-র সহকারী সম্পাদক। কিন্তু মণিলালের আহ্বানে আমিও যোগ দিই 'ভারতী'-র দলে। ওইখানেই সৌরীনের সঙ্গে আমার মৌখিক কথোপকথন শুরু হয়। ক্রমে ক্রমে বেড়ে ওঠে আমাদের সৌহার্দ্য। কেবল 'ভারতী'-র বৈঠকে আড্ডা দিয়েই আমাদের তৃপ্তি হয় না, কোনওদিন আদালত থেকে ধড়াচূড়ো না বদলেই তিনি সোজা চলে আসেন আমার কাছে, কোনওদিন আমিই সিধে উঠি তাঁর বাড়িতে। দুজনেই নাট্যকলার অনুরাগী, একসঙ্গে গিয়ে বসি এ রঙ্গালয়ে, ও রঙ্গালয়ে।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে 'মিনার্ভা থিয়েটারে' সৌরীনের লেখা 'রুমেলা' নাটক অভিনীত হয়। তারপর 'নাট্যমন্দিরে' ও 'আর্ট থিয়েটারে' তাঁর আরও দুখানি কৌতুকনাটিকার অভিনয় হয়—'হারানো রতন' ও 'লাখ টাকা'। শেষোক্ত নাটকে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী প্রধান হাস্যরসাশ্রিত ভূমিকায় যে চমৎকার অভিনয় এবং মেক-আপে যে বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করেছিলেন, তা আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। এই শ্রেণীর লঘু হাস্যনাট্য রচনায় সৌরীন্দ্রমোহন প্রভূত দক্ষতা জাহির করেছেন। কিন্তু নবযুগের বাংলা নাট্যকলা কিছুদূর অগ্রসর হয়েই নিছক হাসির পালা প্রায় সাঙ্গ করে দিয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাই অমৃতলাল বসুর মতো অতুলনীয় হাস্যনাট্যকার আর এখানে আসর জমাবার সুযোগ পাবেন না। সৌরীন্দ্রমোহনও আর হাস্যনাট্য রচনায় নিযুক্ত হন না। বাঙালি দর্শকদের গোমড়া মুখ দেখলে হাসির পালা বাঁধবার সাধ হয় কার?

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে আমিও 'প্রেমের প্রেমারা' নামে একখানি দুই অঙ্কের হাসির নাটিকা রচনা করেছিলুম। মণিলাল ও সৌরীনের চেষ্টায় পালাটি মিনার্ভা থিয়েটারে গৃহীত হয়। আমি তখন দেওঘরে। সৌরীন নিজেই সানন্দে একখানি পত্রে আমাকে সেই খবরটি দেন এবং নিজেই উদযোগী হয়ে অভিনয় সম্বন্ধে সমগ্র ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেন।

শিশিরকুমারের প্রথম অভিনয় দেখি তাঁরই মধ্যস্থতায়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে। একদিন তিনি আমার কাছে এসে বললেন, 'হেমেন্দ্র, আজ স্টার রঙ্গমঞ্চে বিখ্যাত শৌখিন অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ী 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকে ভীমের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। টিকিট বেচে অভিনয়, কারণ 'সাহায্য-রজনী'। আমি একখানা টিকিট কিনেছি, তুমিও একখানা নাও।'

পুরনো নাটক, শৌখিন অভিনয়। তার উপরে পুরুষরা সাজবে মেয়ে, আমার কাছে যা অসহনীয়। মনে বিশেষ কৌতূহল না থাকলেও সৌরীনের আগ্রহে শেষ পর্যন্ত অভিনয় দেখতে গেলুম। গিয়ে ঠকিনি। সে রাত্রে যে বিস্ময়কর নাট্যপ্রতিভার নিদর্শন দেখেছিলুম, ক্ষীয়মাণ গিরিশোত্তর যুগের নাট্যজগতে তা ছিল সম্পূর্ণরূপেই অপ্রত্যাশিত। সৌরীন রঙ্গমঞ্চের নেপথ্য থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে আনলেন : শৌখীন নাট্য সম্প্রদায়ে শিশিরবাবুর এই শেষ অভিনয়। এরপর তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন সাধারণ রঙ্গালয়ে।

সৌরীন আগে লিখতেন ছোটো গল্প এবং মাঝে মাঝে কবিতাও। তারপর উপন্যাস রচনাতেও নিপুণ হাতের পরিচয় দেন। সরল রচনার ওস্তাদ বলে তিনি শিশুসাহিত্যেও কৃতী লেখকরূপে রীতিমতো নাম কিনেছেন। তাঁর লেখা কেতাবের নামের ফর্দ হবে সুদীর্ঘ। এত

লিখেও তাঁর লেখার উৎসাহ ফুরিয়ে যায়নি। আজও তিনি লিখছেন, অশ্রান্তভাবেই লিখছেন। তাঁর সাহিত্যশ্রম উল্লেখনীয়।

চলচ্চিত্র যখন বোবা, তাঁর রচিত উপন্যাস 'পিয়ারী' চিত্রে রূপায়িত হয়েছিল। নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী চন্দ্রাবতী সেই প্রথম দেখা দেন চলচ্চিত্রপটে। গল্প ভালো। কিন্তু যা সচরাচর হয়ে থাকে, পরিচালনার দোষে ছবিখানি জমেনি। কিন্তু হালে সৌরীন অর্জন করেছেন যশের 'লরেল'। তাঁর উপন্যাস অবলম্বনে রচিত 'বাবলা' এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ বাংলা চিত্র বলে সমাদৃত হয়েছে। বন্ধুর সাফল্যে আমিও আনন্দিত।

সৌরীন আজ প্রাচীন। বয়সে আমার চেয়ে চার-পাঁচ বৎসরের বড়ো। কিন্তু এখনও বালকোচিত স্বভাব ছাড়তে পারেননি। থেকে থেকে কেন যে তিনি অভিমান করবেন, নিজেকে উপেক্ষিত ভেবে মুখভার করে থাকবেন, তার হদিশ পাওয়া কঠিন। হঠাৎ রাগেন, আবার হঠাৎ ঠাণ্ডা হন। বৈশাখের চড়া রোদ আবার আষাঢ়ের মেদুর ছায়া। শেষ যেদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন তিনি বৈশাখী তপ্ততার দ্বারা আক্রান্ত। আমি বলেছিলুম, 'ভাই, আমরা দুজনেই আজ জীবনের প্রান্তদেশে এসে পড়েছি। যা অকিঞ্চিৎকর, তা দিয়ে মাথা ঘামাবার বয়স কি আর আছে?'

নজরুলের জন্মদিন স্মরণে

স্নেহাস্পদ নজরুল ইসলাম চুয়ান্ন বৎসরে পা দিয়েছেন। কিন্তু বহু বৎসর আগেই রুদ্ধ হয়েছে তাঁর সাহিত্যজীবনের গতি। কবির পক্ষে এর চেয়ে চরম দুর্ভাগ্য আর কিছু নেই। জীবন্ত তরু, কিন্তু ফলন্ত নয়।

আর একটা বড়ো দুঃখের কথা হচ্ছে এই ঃ নজরুলের লেখনী আর কবিতা প্রসব করে না বটে, কিন্তু তিনি যে কবি, এ বোধশক্তি আজও হারিয়ে ফেলেননি। এবারের জন্মদিনে কোনও ভক্ত তাঁর স্বাক্ষর প্রার্থনা করেছিলেন। নজরুল তাঁর খাতায় এই বলে নাম সই করেন—'চিরকবি কাজী নজরুল ইসলাম'। এই স্বাক্ষরের আড়ালে আছে যাতনার ইতিহাস।

শিল্পীর পক্ষে এই অবস্থা অত্যন্ত মর্মন্তুদ। অতুলনীয় চিত্রশিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পক্ষাঘাত রোগের আক্রমণে তাঁরও হয়েছিল এ অবস্থা। ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সৃষ্টি করার কাজ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে সেটা ছিল অতিশয় পীড়াদায়ক। একদিন তাঁর ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাসভবনে দ্বিতলের প্রশস্ত অলিন্দে বসে আছি এবং তিনিও তাঁর কারুকাজ করা আসনে আসীন হয়ে নীরবে রোগযন্ত্রণা সহ্য করছেন। হঠাৎ আমার দিকে কাতর দৃষ্টি তুলে অবনীন্দ্রনাথ মৃদু ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'বড়ো কষ্ট, হেমেন্দ্র! আঁকতে চাই, আঁকতে পারি না; লিখতে চাই, লিখতে পারি না!'

একদিন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। সেই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। তাঁর এবং অন্যান্য সকলেরই অজ্ঞাতসারে কালব্যাধি তখনই তাঁর দেহের মধ্যে শিকড় বিস্তার করেছিল। ভিতরে ভিতরে কি সর্বনাশের আয়োজন হচ্ছে, তিনি সেটা ঠিক উপলব্ধি করতে না পারলেও, তখনই শুকিয়ে গিয়েছিল তাঁর রচনার উৎস। সেই সময়ে

আমি ছিলুম এক পত্রিকার (দীপালী) সম্পাদক। নিজের কাগজের জন্যে শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে একটি রচনা প্রার্থনা করলুম। আমি নিশ্চিতরূপেই জানতুম আমার আরজি মঞ্জুর হবে, কারণ তিনি আমাকে যথেষ্ট ভালোবাসতেন। আগেও তাঁর কাছ থেকে লেখা চেয়েছি এবং পেয়েছি। কিন্তু সেবারে আমার প্রার্থনা শুনে অত্যন্ত করুণ স্বরে তিনি বললেন, 'ভাই হেমেন্দ্র, বিশ্বাস করো, আমি আর লিখতে পারি না। লিখতে বসলেই মাথার ভিতরে বিষম যাতনা হয়। কলম ছেড়ে উঠে পড়ি।' তাঁর চক্ষের ও কণ্ঠের আর্ত ভাব এখনও আমি ভুলিনি। তারপর সত্যসত্যই শরৎচন্দ্র আর কোনও নতুন রচনায় হাত দেননি।

এখানে ফ্রান্সের অমর ঔপন্যাসিক আলেকজাণ্ডার ডুমার কথাও মনে হয়। শেষ বয়সেও তাঁর মনের মধ্যে রচনার জন্যে প্রেরণার অভাব ছিল না, তিনি রোজ টেবিলের ধারে গিয়ে বসতেন। তাঁর হাতে থাকত কলম এবং সামনে থাকত কাগজ। কেটে যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিন্তু তিনি আর লিখতে পারতেন না। তাঁর তখনকার মনের যাতনা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ কল্পনা করতে পারবে না।

নজরুলের মন বোধহয় এখন এইরকমই শোকাবিষ্ট হয়েছে। নিজেকে যখন 'চিরকবি' বলে স্বাক্ষর করছেন, তখন মনে মনে এখনও তিনি নিশ্চয়ই বাস করছেন কাব্য-জগতে। কিন্তু নিজে যা দেখছেন, বা বুঝছেন, ভাষায় তা প্রকাশ করতে পারছেন না। এ যেন মূকের স্বপ্নদর্শন। যা দেখা যায়, তা বলা যায় না। বলতে সাধ হলেও বলা যায় না।

পত্রান্তরে নজরুল সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছি। কিন্তু তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে আরও কোনও কোনও কথা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

নজরুল যখন প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণ করেন, তখন এখানে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, কুমুরদঞ্জন মল্লিক ও মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কবিরা সমুদিত ও সুপরিচিত হয়েছেন। আরও দুই-একজন তখন উদীয়মান অবস্থায়। রবীন্দ্রনাথের লেখনী তখনও অশ্রান্ত। আমাদের কাব্যজগতে সেটা ছিল সুভিক্ষের যুগ। কবিতার কোনও অভাবই কেউ অনুভব করেনি।

কিন্তু যুগধর্ম প্রকাশ করতে পারেন, দেশ যে এমন কোনও নূতন কবিকে চায়, নজরুলের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই সত্য উপলব্ধি করতে পারলে সকলেই।

এদেশে এমনিই তো হয়ে আসছে বরাবর। যুগে যুগে আমরা পুরাতন ও পরিচিতদের নিয়েই মেতে থাকতে চেয়েছি, অর্বাচীনদের উপর কোনও আস্থা না রেখেই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালি গদ্যলেখকরা যে উৎকট ভাষা ব্যবহার করতেন, তা ছিল পুরোমাত্রায় সংস্কৃতের গোলাম। আমরা তারই মধ্যে পেতুম উপভোগের খোরাক, সৌন্দর্যের সন্ধান। হঠাৎ টেকচাঁদ ঠাকুর ও হুতোম আবির্ভূত হয়ে যখন আমাদের ঘরের পানে তাকাতে বললেন, তখন আমরা একটু অবাক হয়েছিলুম বটে, কিন্তু তাঁদের করে রেখেছিলুম কোণঠাসা। সাহিত্যের দরবারে কথ্য ভাষাকে কায়েমি করবার জন্যে পরে দরকার হয়েছিল প্রমথ চৌধুরীর শক্তি ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা। যখন বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী' ও মাইকেল মধুসূদন 'মেঘনাদবধ' নিয়ে আসরে প্রবেশ করেন, তখনও কেউ তাঁদের প্রত্যাশা করেনি।

উপরোক্ত যুগান্তকারী লেখকগণের সঙ্গে নজরুলের তুলনা করা চলে না বটে, কিন্তু বহু কবিদের দ্বারা অধ্যুষিত বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি যে এনেছিলেন একটি নূতন সুর সে-কথা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। বিংশ শতাব্দীর তরুণদের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন প্রথম কবি, রবীন্দ্রনাথের যশোমণ্ডলের মধ্যে থেকেও যিনি খুঁজে পেয়েছেন স্বকীয় রচনাভঙ্গি ও দৃষ্টিভঙ্গি।

প্রথম মহাযুদ্ধে নজরুল ইউনিফর্ম পরে সৈনিকের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। পরে ইউনিফর্ম খুলে ফেললেও কাব্যজগতেও প্রবেশ করেছিলেন সৈনিকের ব্রত নিয়েই। দুর্গত দেশবাসীদের শাক্তের গান শুনিয়ে তিনি দুদিনেই জাগ্রত করে তুললেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেও গ্রহণ করলেন নাতিক্ষুদ্র অংশ। রাজরোষ তাঁকে ক্ষমা করলে না, তাঁর স্থাননির্দেশ করলে বন্দীশালায়। কিন্তু তবু দমিত হল না তাঁর বিদ্রোহ।

কিন্তু তাঁর এ বিদ্রোহ কেবল দেশের রক্তশোষক শাসক জাতির বিরুদ্ধে নয়, এ বিদ্রোহ হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিরোধের বিরুদ্ধে, ছুঁতমার্গগামী সমাজপতিদের বিরুদ্ধে, বৈড়ালব্রতী ভণ্ডদলের বিরুদ্ধে—এক কথায় সকল শ্রেণীর অনাচারী দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে।

নজরুল যখন সবে কবিতা লিখতে শুরু করেছেন, তখনই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। নিত্য আমাদেরই বৈঠক ছিল তাঁর হাঁফ ছাড়বার জায়গা। এই সময়েই তাঁর গুটিকয়েক কবিতা পড়ে তাঁকে ভালো কবি বলে চিনতে পেরেছিলুম। তারপরই তিনি আমাকে রীতিমতো বিস্মিত করে তুললেন।

সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকা আমার কাছে আসত নিয়মিতরূপে, তার জন্যে আমি রচনা করেছি উপন্যাস, কবিতা ও গান প্রভৃতি। হঠাৎ এক সংখ্যার 'বিজলী'তে দেখলুম, নজরুলের রচিত দীর্ঘ এক কবিতা, নাম 'বিদ্রোহী'। দীর্ঘ কবিতা আমাকে সহজে আকৃষ্ট করে না। কিন্তু কৌতূহলী হয়ে সে কবিতাটি পাঠ করলুম। দীর্ঘতার জন্যে কোনওখানেই তা একঘেয়ে লাগল না, সাগ্রহে পড়ে ফেললুম সমগ্র কবিতাটি। একেবারে অভিভূত হয়ে গেলুম। তার মধ্যে পাওয়া গেল অভিনব স্টাইল, ভাব, ছন্দ, সুর ও বর্ণনাভঙ্গি। এক সবল পুরুষের দৃপ্ত কণ্ঠস্বর! বুঝলুম, নজরুল আর উদীয়মান নন, সম্যকরূপে সমুদিত। দেশের লোকেরাও তাই বুঝলে। সেই এক কবিতাই তাঁকে যশস্বী করে তুললে সর্বত্র। সবাই বলতে লাগল তাঁকে 'বিদ্রোহী কবি'।

কিন্তু নজরুল কেবল শক্তির দীপক নয়, শুনিয়েছেন অনেক সুকুমার প্রেমের গানও। কখনও ধ্রুপদ ধরেন, কখনও ধরেন ঠুংরি। কখনও তূরী-ভেরী, কখনও বেণু-বীণা। বাজিয়েছেন পাখোয়াজ, বাজিয়েছেন তবলাও। তিনি একজন গোটা কবি।

নজরুল মুখেই শুনেছি, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন, বাল্যকালে তিনিও সেখানে পাঠ করতেন। কিন্তু তিনি বোধহয় বিদ্যালয়ে বেশি বিদ্যালাভ করেননি, নিজেকে শিক্ষিত ও মানুষ করে তুলেছেন বিদ্যালয়ের বাইরে বৃহৎ বিচিত্র পৃথিবীর রাজপথে গিয়ে। একসময়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে তিনি নাকি মফঃস্বলের কোনও চায়ের না রুটির দোকানে বয় বা ছোকরার কাজ করতেও বাকি রাখেননি। পাশ্চাত্য দেশে শোনা যায়, প্রথম জীবনে চাকরের কাজ করে পরে কীর্তিমান হয়েছেন অনেক কবি, অনেক লেখক। কিন্তু চায়ের বা রুটির

দোকানের ছোকরা পরে দেশপ্রসিদ্ধ কবি হয়ে দাঁড়িয়েছেন, বাংলাদেশে এমন দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আছে বলে জানি না।

আগে আমার বাড়িতে নিয়মিতভাবে গানের বৈঠক বসত। তার উদ্বোধন করেন নজরুলই। এক-একদিন তিনি আমার কাছে আসতেন, আর বাড়ি ফেরবার নাম পর্যন্ত মুখে আনতেন না। একদিন যেত, দুদিন যেত, তিনদিন যেত, নজরুল নিজের স্ত্রী-পুত্রের কথা বেবাক ভুলে আমার কাছে পড়ে আছেন গান আর হারমোনিয়াম আর পান আর চায়ের পেয়ালা নিয়ে। স্নান, আহার, নিদ্রা সব আমার সঙ্গেই। আমার বাড়ির পরিবেশ হয়ে উঠত গানে গানে গানময়। অক্লান্ত ধারাবাহিক গানের স্রোত। ঠুংরি, গজল, রবীন্দ্রনাথের গান, অতুলপ্রসাদের গান, মেঠো কবির গান, নিজের গান।

তখনকার নজরুলকে স্মরণ করে কিছুদিন আগে এই কবিতাটি রচনা করেছিলুম ঃ—

নজরুল ভাই, রোজই বাজে
মনের মাঝে স্মৃতির সুর,
সেই অতীতের তোমার স্মৃতি!
—আজকে থেকে অনেক দূর
যৌবনেরই শ্যামল স্মৃতি
এই জীবনে অমূল্য।
বন্ধু, তাহার বিনিময়ে
চাই না আমি কোহিনূর।

দরাজ প্রাণের কবি তুমি,
হস্তে ছিল রুদ্রবীণ,
আকাশ-বাতাস উঠত দুলে
বক্ষে তোমার রাত্রি-দিন।
যেথায় যেতে ছড়িয়ে যেতে
মুক্ত প্রাণের হাস্যকে,
আপন করে নিতে তাকেও
তোমার কাছে যে অচিন।

দিনের পরে দিন গিয়েছে,
রাতের পরে আবার রাত,
চাঁদের আলোয় ভাসত যখন
আমার বাড়ির খোলা ছাত,
তাকিয়ে গঙ্গা নদীর পানে
গানের পরে ধরতে গান—
মুগ্ধ হয়ে নিতাম টেনে

আমার কোলে তোমার হাত।
হায় দুনিয়ায় যে দিন ফুরায়,
যায় না পাওয়া আর তাকে।
বসন্ত আর গাইবে নাকো,
উঠলে আঁধি বৈশাখে।
তাইতো ঘরে একলা বসে
বাজাই স্মৃতির গ্রামোফোন—
আবার কাছে আসে তখন
দূর অতীতে যে থাকে।

নজরুলের কাছ থেকে বরাবর আমি অগ্রজের মতো শ্রদ্ধালাভ করে এসেছি। তিনি আমাকে ভালোবাসতেন। আমার ছোটো ছেলে প্রদ্যোৎ (ডাকনাম গাবলু) কবে অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিল। তার খাতায় তিনি এই শ্লোকটি লিখে দিয়েছিলেন ঃ—

'তোমার বাবার বাবা হও তুমি
কবি-খ্যাতিতে যশে,
তব পিতা সম হও নিরুপম
আনন্দ-ঘন রসে।
স্নেহের গাবলু! অপূর্ণ যাহা
রহিল মোদের মাঝে,
তোমার বীণার তন্ত্রীতে যেন
পূর্ণ হয়ে তা বাজে।

শুভার্থী—কাজীকা'

নজরুলের অনেক কথা প্রবন্ধান্তরে বলেছি, এখানে পুনরুল্লেখের দরকার নেই। যখন আমার বাড়ির বৈঠকের কথা বলব, তখন অন্যান্য নামী গাইয়েদের সঙ্গে মাঝে মাঝে নজরুলেরও দেখা পাওয়া যাবে।

গামা, হাসানবক্স, ছোটগামা

এবার আমরা প্রবেশ করব মল্লসভার মধ্যে। কিন্তু মাভৈঃ, আপনাদের কারুকে আমি 'বীরমাটি' মাখবার জন্যে আহ্বান করব না। 'বীরমাটি' কাকে বলে জানেন তো? আখড়ায় যে-মৃত্তিকাচূর্ণের উপর দাঁড়িয়ে পালোয়ানেরা কুস্তি লড়ে। সেই মাটি গায়ে মর্দন করে যোদ্ধারাই।

স্রষ্টা আমার দেহখানিকে যৎপরোনাস্তি একহারা করে গড়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন পৃথিবীতে। কিন্তু ভ্রমক্রমে আমার মনকে দেহের উপযোগী করে গঠন করেন নি। শেষ পর্যন্ত মসীজীবী লেখক হয়েই জীবনসন্ধ্যায় বিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করতে বাধ্য হয়েছি বটে, কিন্তু আমার বুকের মধ্যে যে মনের মানুষটি বাস করে সকলের অগোচরে, চিরদিনই সে আসীন হতে চেয়েছে কাপালিকের বীরাসনে। সত্য বলছি, অত্যুক্তি নয়।

অবশ্য তালপাতার সেপাইরাও দিবাস্বপ্ন দেখে এবং পুরু গদীর উপরে নিশ্চেষ্টভাবে তাকিয়ে আঁকড়ে বসে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করে। আমি কিন্তু কোনোকালেই তাদের দলের লোক নই। ছেলেবেলা থেকেই নামজাদা ক্লাবের হয়ে ক্রিকেট-হকি-ফুটবল খেলেছি, সাঁতার দিয়ে গঙ্গার এপার-ওপার হয়েছি, জিমনাস্টিক নিয়ে মেতেছি, 'গ্রিপডাম্বেল' ও মুগুর ভেঁজেছি, 'চেস্ট-এক্সপ্যাণ্ডার' ও 'বার-বেল' ব্যবহার করেছি এবং ডন-বৈঠক দিয়েছি। অর্থাৎ বলীদের মধ্যে

একটা কেওকেটা হবার জন্যে চেষ্টার কোনো ত্রুটিই করি নি। চোখের সামনেই ব্যায়াম করে কত একহারা দেখতে দেখতে দোহারা তারপর তেহারা হয়ে উঠল, আমি কিন্তু বরাবরই হয়ে রইলুম মূর্তিমান ভদ্রলোকের এককথার মতো একেবারেই একহারা। নাট্যকার অমৃতলাল যাকে "ভীম ভবানী" উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন, বাল্যকালে বিদ্যালয়ে সে আমার সহপাঠী ছিল। সে তখনও আমার মতো একহারা ছিল না বটে কিন্তু সেই দেহের তুলনায় পরে তার যে চেহারা হয়েছিল, তা অবিশ্বাস্য বলা যেতেও পারে। তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালে নিজেকে মনে হতো যেন মাতঙ্গের পাশে পতঙ্গ।

বলবান লোকদের দেখবার জন্যে বরাবরই আমার মনের ভিতরে আছে উদগ্র আগ্রহ। বাল্যকাল থেকেই এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় নানা আখড়ায় কুস্তি লড়া দেখতে যেতুম। কোথাও দঙ্গলের ব্যবস্থা হয়েছে শুনলে সেখানে যাবার প্রলোভন কিছুতেই সংবরণ করতে পারতুম না। বহুকাল (অর্ধ শতাব্দীরও) আগে কলকাতার মার্কাস স্কোয়ারে কাল্লুর সঙ্গে কিক্কর সিংয়ের কুস্তি প্রতিযোগিতা হয়। তখন গামার নাম কেউ জানত না, কিন্তু কাল্লু ও কিক্কর ছিলেন ভারতবিখ্যাত। টিপে টিপে মায়ের পা ব্যথা করে দিয়ে কত খোসামোদের ও অশ্রুত্যাগের পর যে সেই কুস্তি দেখবার জন্যে অর্থ সংগ্রহ করেছিলুম, তা আজও আমার স্মরণ আছে।

কিক্করের চেহারা ছিল যেমন কুৎসিত, তেমনি ভয়াবহ। মাথায় তিনি সাড়ে ছয় ফুটের চেয়ে কম উঁচু ছিলেন না এবং চওড়াতেও তাঁর দেহ ছিল যে কতখানি, বললে সে-কথা কেউ বোধহয় বিশ্বাস করবেন না (বিশেষজ্ঞের মুখে শুনেছি, তাঁর বুকের ছাতির মাপ ছিল আশী ইঞ্চি—যে-কথা শুনলে স্যান্ডো সাহেবও নিশ্চয় বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে পারতেন না)। আমি অনেক বড় বড় পালোয়ান দেখেছি, কিন্তু লম্বায়-চওড়ায় তাঁদের কেউই কিক্কর সিংয়ের সমকক্ষ নন। কাল্লুও ছিলেন বিপুলবপু, কিন্তু তাঁর বিপুলতা কিক্করের সামনে মোটেই দৃষ্টি আকর্ষণ করত না। কাল্লু যে কিক্করকে হারাতে পারবেন, দেখলে তা কিছুতেই মনে করা যেত না। বর্তমান নিবন্ধমালায় স্বর্গীয় গুণীদের নিয়ে আলোচনা করবার কথা নয়, অতএব আমি সে মল্লযুদ্ধের বর্ণনা দিতে চাই না। কেবল এইটুকুই বলে রাখলেই যথেষ্ট হবে যে, ডেভিডের কাছে গোলিয়াথের মতো কাল্লুর কাছে কিক্করও হয়েছিলেন পরাভূত।

তার কয়েক বৎসর পরে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চের উপরে আমি যে মহাবলবান মানুষটিকে দেখি, বিশেষ কারণে এখানে তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। কারণ তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করেই ভারতের দিকে দিকে—এমন কি বাংলাতেও শত শত যুবক দৈহিক শক্তিচর্চায় একান্তভাবে অবহিত হয়েছে। আমি রামমূর্তির কথা বলছি। তিনি শারীরিক শক্তির যে-সব অভাবিত পরিচয় দিয়েছিলেন, সেদিন সকলেরই কাছে তা ইন্দ্রজালের মতোই আশ্চর্য বলে মনে হয়েছিল। তারপরে অনেকেই তাঁর কয়েকটি খেলার নকল করে নাম কিনেছেন ও কিনছেন বটে, কিন্তু তাঁর অধিকতর দুরূহ কয়েকটি খেলা আজও কেউ চেষ্টা করেও আয়ত্তে আনতে পারেন নি। কারণ সে খেলাগুলির মধ্যে ফাঁকি বা প্যাঁচ ছিল না, রামমূর্তির মতো অমিত শক্তির অধিকারী না হলে কারুরই সে-সব খেলা দেখাবার সাধ্য হবে না। রামমূর্তির প্রদর্শনী ছিল কেবল বাহুবল দেখাবার জন্যে নয়, অর্থ উপার্জনের জন্যেও বটে। তাই কোনো কোনো খেলাতে তিনি দর্শকদের চমকে

অভিভূত করে দিতেন। কিন্তু যেখানে কৌশলের উপর থাকে প্রকৃত শক্তির প্রাধান্য, সেখানে রামমূর্তি আজও অদ্বিতীয় হয়ে আছেন।

আমি বাল্যকালেও দেখেছি, কলকাতার বহু বনিয়াদী ধনীর বাড়িতে ছিল স্থায়ী কুস্তির আখড়া। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সম্পদের জন্যে বিখ্যাত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও ছিল পরিবারের ছেলেদের জন্যে নিয়মিত কুস্তি লড়বার ব্যবস্থা এবং কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকেও কুস্তি লড়ার অভ্যাস করতে হতো। হয়তো সেইজন্যেই তিনি লাভ করেছিলেন অমন সুগঠিত পুরুষোচিত দেহ। তাঁর পিতামহ "প্রিন্স" দ্বারকানাথ ছিলেন শৌখীন কুস্তিগীর।

কিন্তু বাঙালী নিজেকে যতই সভ্য ও শিক্ষিত বলে ভাবতে শিখলে, ব্যায়াম ও কুস্তি প্রভৃতিকে ততই ঘৃণা করতে লাগল। তার ধারণা হলো ও-সব হচ্ছে নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর ব্যক্তির ও ছোটলোকের কাজ। অথচ যে-দেশ থেকে সে লাভ করেছে আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতা, সেই প্রতীচ্যের উচ্চ-নীচ সর্বসাধারণের মধ্যে পুরুষোচিত ব্যায়াম ও খেলাধূলার লোকপ্রিয়তা যে কত বেশি, সেদিকে একবারও দৃষ্টিপাত করা দরকার মনে করে নি। সবল ইংরেজের কাছে দুর্বল বাঙালী পড়ে পড়ে মার খেত, তবু তার হুঁশ হতো না।

কিন্তু তারও ভিতরে ছিল যে একটা subconscious বা অব্যক্তচেতন মন, সেটা টের পাওয়া গিয়েছিল মোহনবাগান যেদিন ফুটবল খেলার মাঠে 'শীল্ড ফাইন্যালে' প্রথম গোরার দলকে হারিয়ে দেয়। শত শত জ্বালাময়ী বক্তৃতাও যে বাঙালীর প্রাণে প্রেরণা সঞ্চার করতে পারে নি, একটি দিনের একটি মাত্র ঘটনায় তা হয়ে উঠল আশ্চর্যভাবে অতিশয় জাগ্রত। ইংরেজী সংবাদপত্রে সেই সময়ে এই গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ঃ মোহনবাগানের বিজয়গৌরবে চারিদিকে যখন সাড়া পড়ে গিয়েছে, তখন চৌরঙ্গীর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল দুই ব্যক্তি, তাদের একজন বাঙালী, আর একজন ইংরেজ। তারা পরস্পরের বন্ধু। বাঙালী পথিকটি বার বার এগিয়ে যাচ্ছে দেখে ইংরেজ সঙ্গীটি জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার আজ এ কি হলো বলতো? তুমি আমাকে বার বার পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছ কেন?' বাঙালী জবাব দেয়, 'দেখছ না, আজ আমাদের জাতিই যে এগিয়ে চলেছে।' কথাগুলি আমার এতই ভালো লেগেছিল যে আজ পর্যন্ত ভুলতে পারিনি।

আজকাল বাতাস কিছু বদলেছে। কিছুকাল থেকে দেখছি বাঙালী যুবকরাও দেহচর্চায় মন দিয়েছে এবং ব্যায়ামের নানা বিভাগে দেখাচ্ছে অল্পবিস্তর পারদর্শিতা। আদর্শ দেহ গঠনে, পেশী শাসনে, ভারোত্তলনে, মুষ্টিযুদ্ধে ও বাৎসরিক কুস্তি-প্রতিযোগিতায় বাঙালী যুবকদের কৃতিত্বের কথা শুনে এই প্রাচীন বয়সেও আমি তরুণের মতো উৎফুল্ল হয়ে উঠি। কিন্তু এইখানেই যথেষ্ট হয়েছে ভেবে থামলে চলবে না—অগ্রসর হতে হবে, আরো অনেক দূর অগ্রসর হতে হবে, শাক্ত জাতি হিসাবে আমাদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে বিশ্বসভার মাঝখানে।

জ্ঞানে নয়, বিদ্যায় নয়, সভ্যতায় নয়, সংস্কৃতিতে নয়, কেবলমাত্র পশুশক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষের উপরে প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল মুসলমানরা। এবং আজ পর্যন্ত নিরক্ষর মুসলমানরাও কেবল দৈহিক শক্তিসাধনারই দ্বারা ভারতের অন্যান্য জাতিদের পিছনে ঠেলে শীর্ষস্থান অধিকার করে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে আছে। আজ ভারতের তথা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মল্ল কে? গামা এবং তার ছোট ভাই ইমাম বক্স। গামার বয়স বোধ করি এখন সত্তরের উপরে এবং ইমামেরও ষাটের

উপরে। কিন্তু এখনও গামা যে-কোন যুবক প্রতিদ্বন্দ্বীরও সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করতে প্রস্তুত। বলেছেন, 'যে আমার ছোট ভাই ইমামকে হারাতে পারবে, তার সঙ্গেই আমি লড়তে রাজী আছি।' কিন্তু ভারত বা য়ুরোপের কোনো মল্লই তাঁর এ-চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সাহসী নয়। গামা অপরাজেয় হয়েই রইলেন। তাঁর আগে গোলাম পালোয়ানও ছিলেন এমনিই অতুলনীয়।

কেবলই কি গামা ও ইমাম? তাঁদের ঠিক নীচের থাকেই যাঁরা আছেন—যেমন হামিদা, গুঙ্গা, হরবন্স সিং, সাহেবুদ্দীন ও ছোট গামা প্রভৃতি আরো অনেকে (এখানে অকারণে সকলের নাম করে লাভ নেই), তাঁদের মধ্যে এক হরবন্স সিং ছাড়া আর সকলেই মুসলমান।

সেটা ১৯১৬ কি ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দ আমার ঠিক মনে নেই। আমি তখন কাশীধামে। গামা তখন ইংলন্ডে গিয়ে জন লেম ও বড় বিস্কো প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশের শীর্ষস্থানীয় পালোয়ানদের হারিয়ে পৃথিবীজোড়া উত্তেজনা সৃষ্টি করে দেশে ফিরে এসেছেন। দুইজন স্থানীয় বন্ধুদের একজন বললেন, 'ঐ দেখুন, গামা পালোয়ান যাচ্ছেন।'

সাগ্রহে তাকিয়ে দেখলুম। পথ দিয়ে যাচ্ছেন কয়েকজন লোক, সকলেরই চেহারা বলিষ্ঠ। কিন্তু তাঁদের মধ্যে একজন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন মধ্যমণির মতো। মাথায় পাগড়ি, গায়ে চুড়িদার পাঞ্জাবি, পরনে লুঙ্গি, পায়ে নাগরা জুতো—পোশাকে আছে রঙ-বেরঙের বাহার। দাড়ি কামানো, মস্ত গোঁফ। দেহ অনাবৃত নয় বটে, কিন্তু বস্ত্রাবরণ ঠেলে তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে আসছে যেন একটা প্রবল শক্তির উচ্ছ্বাস। ভাবভঙ্গিও প্রকাশ করছে তাঁর বিশেষ বীর্যবত্তা। অসাধারণ চোখের দৃষ্টি ফুটিয়ে তোলে ব্যক্তিত্বকে। গামা চলে গেলেন, আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলুম। মন বললে, দেখলুম বটে এক পুরুষসিংহকে।

তার কয়েক বৎসর পরে গামাকে দেখি কলকাতায়। তারিখ সম্বন্ধে আমার একটা দুর্বলতা আছে। আমি বাল্যকালের সব কথাও হুবহু মনে রাখতে পারি, কিন্তু দশ-পনেরো বৎসর আগেকার কোনো বিশেষ তারিখ স্মরণ করতে পারি না। তবে মনে হচ্ছে অন্তত বত্রিশ বৎসর আগে কলকাতায় গড়ের মাঠে তাঁবু ফেলে মস্ত এক কুস্তি-প্রতিযোগিতা হয়েছিল। ভারতের নানা প্রদেশ থেকে এসেছিলেন নামজাদা পালোয়ানরা—কেউ কুস্তি লড়তে, কেউ কুস্তি দেখতে। আমি একদিন সেই কুস্তির আসরে গিয়েছিলুম, গামার সঙ্গে হাসান বক্সের প্রতিযোগিতা দেখবার জন্যে। কিন্তু স্মরণ হচ্ছে অন্যান্য পালোয়ানদের কুস্তি হয়েছিল একাধিক দিবস ধরে।

আমি যেদিন যাই, সেদিন আমার সঙ্গে ছিলেন স্বর্গত বন্ধুবর শ্রীশচন্দ্র গুহ। তিনি ছিলেন কেম্ব্রিজের বক্সিং-এ 'হাফ-ব্লু', পরে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে কিছুকাল প্র্যাকটিস করে মালয়ে গিয়ে আইন ব্যবসায়ে যথেষ্ট নাম কেনেন এবং নেতাজীর 'আই-এন-এ'-র এক পদস্থ কর্মচারী হন। সেই অপরাধে ইংরেজরা তাঁকে বন্দী করে। পরে তিনি মুক্তিলাভ করে আবার দেশে ফিরে আসেন। এই সেদিন তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

তাঁবুর ভিতরে বৃহতী জনতা। তার মধ্যে বাঙালী খুব কম, অধিকাংশই মুসলমান ও হিন্দুস্থানী—তারা চারিধারের গ্যালারি দখল করে বসে হাটবাজারের সোরগোল তুলেছে। রাজ্যের পালোয়ান সেখানে এসে জুটেছেন, তাঁদের মধ্যে দেখলুম বন্ধুবর শ্রীযতীন্দ্র গুহ বা গোবরবাবুকেও। সেদিনকার কুস্তির বিচারক ছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর।

প্রথম দুই-তিনটি কুস্তির পরেই শুনলুম এইবার হবে ভীম ভবানীর সঙ্গে ছোট গামার প্রতিযোগিতা। এই গামা হচ্ছেন প্রখ্যাত কাল্লু পালোয়ানের ছেলে। তিনি তখন সবে যৌবনে পা দিয়েছেন, দেহ রীতিমত তৈরি, তার কোথাও মেদবাহুল্য নেই। কুস্তির খানিক আগে থাকতেই তিনি একটা কাঠের থাম ধরে দেহকে গরম করবার জন্যে খুব স্ফূর্তির সঙ্গে ক্রমাগত বৈঠক দিতে শুরু করলেন।

তারপর ভীম ভবানীর সঙ্গে ছোট গামার কুস্তি আরম্ভ হলো। ভবানী বয়সেও বড় এবং তাঁর বিপুল দেহও অত্যন্ত গুরুভার,—চটপটে ছোট গামাকে দাঁড়িয়ে এঁটে উঠতে না পেরে তিনি নিলেন মাটি—অর্থাৎ আখড়ার উপরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। ছোট গামা বহুক্ষণ ধরে প্রাণপণ চেষ্টা করেও এবং অনেক প্যাঁচ কষেও তাঁকে চিৎ করতে পারলেন না, তবু বিচারকের অদ্ভুত রায়ে সাব্যস্ত হলো, জয়লাভ করেছেন ছোট গামাই! মল্লযুদ্ধে চিরকালই মাটি নেওয়ার রীতি আছে এবং ভূপতিত প্রতিযোগীকে চিৎ করতে না পারলে কুস্তি হয় সমান সমান। মাটি নেওয়া কুস্তির অন্যতম প্যাঁচ ছাড়া আর কিছুই নয়।

তারপর যুদ্ধস্থলে এসে দাঁড়ালেন মহামল্ল গামা এবং হাসান বক্স। আজ পর্যন্ত আমি অনেক বড় পালোয়ান দেখেছি, কিন্তু দৈহিক সৌন্দর্যে হাসান বক্সের কাছে তাঁদের সকলকেই হার মানতে হবে। সেই দেববাঞ্ছিত সুঠাম ও পরম সুন্দর দেহ একাধারে সুকুমার ও শক্তিদ্যোতক। নিখুঁত তাঁর মুখশ্রী। মুগ্ধ চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়—যেন গ্রীক ভাস্করের গড়া আদর্শ পুরুষমূর্তি।

সেদিন গামার নগ্ন দেহও দেখলুম। যেমন বিরাট কবাট-বক্ষ, তেমনি পেশীবহুল বাহু, তেমনি বলিষ্ঠ ও অপূর্ব ঊরু। যেন মূর্তিমন্ত শক্তিমন্ত্র—তার চেয়ে বলীর মূর্তি কল্পনাতেও আনা যায় না।

হাসান বক্স যে একজন প্রথম শ্রেণীর পালোয়ান, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। কারণ তা নইলে তিনিও গামাকে চ্যালেঞ্জ করতে সাহস করতেন না এবং গামাও তাঁর সঙ্গে লড়তে রাজী হতেন না। হাসান বক্স ও গামার প্রতিযোগিতা একটা অত্যন্ত স্মরণীয় ও দর্শনীয় দৃশ্য বলেই সেদিন সেখানে অমন বিপুল জনসমাগম হয়েছিল।

কিন্তু গামা হচ্ছেন গামা, তাঁকে বোঝাতে হলে অন্য কোনো উপমা ব্যবহার করা চলে না। পৃথিবীর অধিকাংশ প্রথম শ্রেণীর মল্ল তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে দুই-চার মিনিটের বেশি দাঁড়াতে পারেন নি। হাসান বক্স তবু তাঁর সঙ্গে খানিকক্ষণ যুঝলেন বটে, কিন্তু শেষ রাখতে পারলেন না। জয়ী হলেন গামাই।

সেই দিনই সেখানে দেখেছিলুম ভারতের আর এক অপরাজেয় মল্ল ইমাম বক্সকে, যাঁর আসন গামার পরেই। অতি দীর্ঘ মূর্তি, অতি বলিষ্ঠ দেহ, হাতে প্রকাণ্ড একটি রূপোর গদা। তবু তাঁর দেহ উল্লেখযোগ্য নয় গামার মতো।

যামিনী রায়

লোকসাহিত্য, লোকশিল্প, লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য প্রভৃতির মধ্যে যে স্বাভাবিক সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য থাকে, উচ্চশিক্ষিতদের দৃষ্টি প্রায়ই তার দিকে আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু মাঝে মাঝে এক-একজন

সত্যদ্রষ্টা কলাবিদ যখন সেই সব নিত্যদৃষ্ট ব্যাপারের ভিতর থেকেই অদৃষ্টপূর্ব সুষমা আবিষ্কার করে তুলে ধরেন সকলের চোখের সামনে, তখন আমাদের বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না।

নিরক্ষর গেঁয়ো কবির বাঁধা একটি গান শুনুন ঃ

'যা রে কোকিলা তুই,
আমার প্রাণপতি গেছে যে দেশে।
এমন করে জ্বালাতন
করিস্ নে আর নিত্যি এসে।
শুনে তোর কুহুস্বর
উসকে ওঠে পরাণ আমার,
প্রাণপতি মোর গেছে গাঙের পার,
তুই ছাড়্‌গে তথা কুহুস্বর।'

এ হচ্ছে আকাটা হীরার মতো। শিক্ষিত কারিকর একেই মেজে ঘষে করে তুলতে পারেন অত্যন্ত অসাধারণ।

লোকসাহিত্যের দিকে রবীন্দ্রনাথ বহুকাল পূর্বেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এবং তারপর লোকসঙ্গীতও যে কি বিচিত্র সৌন্দর্যের খনি, সুরকার রবীন্দ্রনাথ তাঁরও উজ্জ্বল প্রমাণ দিতে বাকি রাখেন নি। আগে যে-সব সুর হেটো বা মেঠো বলে শিক্ষিতদের গানের বৈঠকে ঠাঁই পেত না, তিনি সেইগুলিকে এমন সুকৌশলে ব্যবহার করে জাতে তুলে নিয়েছেন যে, বিদ্বজ্জনদেরও মনের প্রত্যেক ভাব তারা ব্যক্ত করতে পারে অনায়াসেই। কেবল তাই নয়, মার্গ সঙ্গীতের যে-সব রাগ-রাগিণী আগে নিজেদের কৌলিন্যগর্ব বজায় রাখবার জন্যে লোক সাধারণের পথ মাড়াতে রাজী হতো না, তিনি তাদেরই ধরে মেঠো ভাটিয়ালী ও বাউল প্রভৃতি চলতি সুরের সঙ্গে মিলিয়ে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে সৃষ্টি করে গিয়েছেন অপূর্ব সৌন্দর্যলোক।

নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর বলেছেন, "Everything is Folk !" তাঁর মতে, ভারতের মতো লোকনৃত্যের বিপুল ভাণ্ডার পৃথিবীর আর কোথাও নেই। যথার্থ গুণীর হাতে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হলে লোকনৃত্যও অনন্যসাধারণ হয়ে উচ্চশ্রেণীর রূপরসিকদেরও আনন্দ বিধান করতে পারে। উদয়শঙ্করের এই মত যে অভ্রান্ত, তাঁর দ্বারা পরিকল্পিত গ্রাম্য উৎসব, ঘেসেড়া, ভীল, বিদায়ী ও রাসলীলা প্রভৃতি নৃত্য দেখলেই বুঝতে বিলম্ব হয় না।

দরিদ্ররা ধনপতি হলে পূর্ব-দারিদ্র্যের কথা ভুলে যায়, নিজেদের উচ্চতর শ্রেণীর লোক বলে মনে করে। তাদের বংশধররা আবার আরো উঁচু ধাপে উঠে নিজেদের অভিজাত বলে ভাবতে থাকে এবং জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক পর্যন্ত তুলে দিতে চায়। সকল শ্রেণীর শিল্পই ছিল আগে লোকশিল্প। কবিতা, গান, নাচ ও ছবির জন্ম হয় লোকসাধারণের মধ্যেই। তারপর সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আর্ট ভুলে যায় নিজের শৈশবের কথা, লোকসাধারণের ধারণার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে সগর্বে প্রচার করে—আমি অভিজ্ঞ, আমি বড়লোক, আমি ছোটলোকের খেলনা নই।

দশ হাজার বৎসর আগে ফ্রান্স ও স্পেন ছিল অসভ্য। কিন্তু তখনকার শিল্পীরা গিরিগুহার দেওয়ালে যে-সব ছবি এঁকে রেখেছিল বর্তমান যুগের মানুষরাও তা দেখে অবাক হয়ে যায়।

তারপর যুগে যুগে চিত্রকলা যাত্রা করেছে বিভিন্ন পথে, নিজেকে আবদ্ধ করেছে নানা বিধি-বিধানের বন্ধনে, আদিম স্বাভাবিকতা হারিয়ে হরেক রকম 'ইজম্'-এর দাসত্ব করে হতে চেয়েছে বিচিত্র, হতে চেয়েছে লোক-সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য।

কিন্তু আজও পৃথিবীর যেখানে অসভ্য জাতিরা আদিম মানুষদের মতো জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, সেখানকার শিল্পীরা কাজ করে, ছবি আঁকে সেই দশ হাজার বৎসর আগেকার পদ্ধতিতেই। কাল হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকার 'বুশম্যানরা' আধুনিক যুগের লোক। কিন্তু তাদের আঁকা ছবি দেখলে মনে পড়বে সেই দশ হাজার বৎসর আগেকার শিল্পীদেরই কাজ—কি রেখায়, কি বর্ণে, কি পরিকল্পনায়। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের আধুনিক বংশধরদের দ্বারা অঙ্কিত চিত্র সম্বন্ধেও প্রায় ঐ কথাই বলা যায়।

পাশ্চাত্য দেশের একাধিক অতি-আধুনিক শিল্পী ফিরে যেতে চাইছেন আবার প্রাগৈতিহাসিক যুগের দিকে। ফোর্ড ম্যাডক্স ব্রাউন, হোলম্যান হান্ট ও রোসেটি প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীর কয়েক-জন চিত্রকরের দৃষ্টি ছিল যেমন রাফাএল প্রভৃতির পূর্ববর্তী যুগের দিকে, এঁরাও তেমনি আকৃষ্ট হয়েছেন দশ হাজার বৎসর আগেকার শিল্পীদের দ্বারা। তাই এঁদের হাতের কাজে খুঁজে পাওয়া যায় আদিম শিল্পের প্রভাব। হয়তো এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সার্বজনীন হবে না এবং হয়তো দীর্ঘস্থায়ী হবে না চলমান মেঘের ছায়ার মতো এই সাময়িক রেওয়াজ, তবু আদিম কালের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিকতা যে আকৃষ্ট করেছে অতি-আধুনিকদেরও, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। কেবল আদিম ছবি কেন, শিশুদের আঁকা যে সব ছবি দেখলে আগে আমাদের কাকের ছানা বকের ছানার কথা স্মরণ হতো, তার ভিতরেও এঁরা পাচ্ছেন নূতন নূতন সৌন্দর্যের সন্ধান।

আমাদের দেশেও প্রকাশ পাচ্ছে একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গি।

ছেলেবেলায় যখন গুরুজনদের সঙ্গে কালীঘাটে যেতুম এবং চিত্রকলার ভালো-মন্দ কিছুই বুঝতুম না, তখন আমাকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করত সেখানকার পটুয়ারা। তাদের কর্মশালার প্রান্তে চুপ করে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী ও বিস্মিত চোখে নিরীক্ষণ করতুম পটুয়াদের হাতের কাজ। নিজের মনে তারা এঁকে যেত ছবির পর ছবি, কেমন নিশ্চিত হাতে রেখার পর রেখা টেনে, কত অবলীলাক্রমে। অধিকাংশই ছিল গার্হস্থ্য ছবি, লোকে হেলাভরে বলত কালীঘাটের পট। সেগুলিকে কেউ আর্টের নিদর্শন বলে গ্রহণ করত না এবং তাদের ক্রেতাও ছিল না শিক্ষিত ভদ্রলোকরা। কিন্তু আজ উচ্চশ্রেণীর রূপরসিকদের মুখেও তাদের প্রশংসা শোনা যায় এবং ঘটা করে কালীঘাটের পটের প্রদর্শনী খুললে তা দেখবার জন্যে মনীষীরাও আগ্রহ প্রকাশ করেন। আগে আমরা যাদের তাচ্ছিল্য করে 'পোটো' বলে ডাকতুম, আজ তাদের শিল্পী বলে স্বীকার করতেও আমরা নারাজ নই। দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছে বৈকি। আর তা বদলাচ্ছে বলেই আজ শিল্পী যামিনী রায় পেয়েছেন অসংখ্য সমঝদার।

কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি সহজে বা অকারণে বদলায় না, তা পরিবর্তিত হতে পারে প্রতিভার প্রভাবেই। অনেকদিন আগে থেকেই বাংলাদেশে সচিত্র প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়ে আসছে, সেই সব পটের সঙ্গে আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিরা ছিলেন সুপরিচিত। তাদের বিষয়বস্তু, তুলির লিখন এবং পরিকল্পনা কালীঘাটের পটের চেয়ে যথেষ্ট উন্নত হলেও তা দেখে কারুর মনে জাগেনি কোনো সম্ভাবনার ইঙ্গিত। সংস্কৃত ভাষারও চেয়ে সে-সব ছবির ভাষা ছিল অধিকতর মৃত। তা

দেখে পরিতৃপ্ত হতো নয়নমন, ঐ পর্যন্ত। বাউল বা মেঠো সুর শুনেও আমাদের মন নাড়া পেয়েছে, কিন্তু তবু তাদের মুখনাড়া খেতে হয়েছে উপেক্ষণীয় লোকসঙ্গীত বলে এবং বৈঠকী ওস্তাদরাও দিতেন না তাদের পাত্তা। তাদের উচ্চাসনে তুলে পঙ্‌ক্তিভুক্ত করার জন্যে দরকার হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মতো সরস্বতীর বরপুত্রকে।

বাংলাদেশে বড় বড় শিল্পীর অভাব ছিল না, কিন্তু প্রাচীন বাংলার ঘরোয়া পট রচনা পদ্ধতি অবলম্বন করে যে বর্তমান কালেও যুগোপযোগী উচ্চশ্রেণীর কলাবস্তু করা যেতে পারে, এটা দেখবার মতো দৃষ্টিশক্তির অভাব ছিল যথেষ্ট। আমাদের শিল্পীরা যখন প্রতীচ্যের নানাবিধ "ইজম্"-এর দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, যামিনী রায় তখন রূপলক্ষ্মীর মূর্তি গঠনের জন্যে উপকরণ সংগ্রহে নিযুক্ত হলেন গৌড় বাংলার নিজস্ব ঐশ্বর্যভাণ্ডারে। কিন্তু তিনিও একেবারে নিজের পথ কেটে নিতে পারেন নি। প্রথম প্রথম তিনিও এমন সব ছবি এঁকেছিলেন, যাদের ভিতর থেকে আবিষ্কার করা যায় পাশ্চাত্য প্রভাব, চৈনিক প্রভাব বা অন্য কোনো প্রভাব। তারপর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেল কেন জানি না; হয়তো বঙ্গকুললক্ষ্মী মাইকেলের মতো তাঁকেও স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন:

"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তার আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে।"

শিল্পী যামিনী রায়ের অপরূপ রেখাকাব্যগুলি বাংলার খাঁটি প্রাণপদার্থ দিয়ে গড়া। তার মধ্যে "বহু যুগের ওপার থেকে" ভেসে আসে সাবেক বাংলার সোঁদা মাটির গন্ধ এবং সেই সঙ্গে পাওয়া যায় হাল বাংলার পরিচিত প্রাণের ছন্দ। নব নব পরিকল্পনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে রসরূপের যে নির্মল আনন্দ, কোথাও কোনো বিজাতীয় মনোবৃত্তির এতটুকু ছোঁয়া করতে পারে না তাকে পরিম্লান। নিশ্চিত হাতের টানে আঁকা চিত্রার্পিত ও লীলায়িত রেখার সমারোহের মধ্যে সর্বত্রই অনুভব করা যায় ভাবসাধক শিল্পীর মনের গভীর নিষ্ঠা। এই বিকৃত ও অধঃপতিত অতিসভ্যতার যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে লালিত-পালিত হয়েও, নব্য বাংলার এক শিল্পী ঠাকুরঘরে ঢুকে ইষ্টদেবীর গঙ্গোদকে ধোয়া পূজাবেদীর শুচিশুভ্রতা এমনভাবে রক্ষা করতে পেরেছেন দেখে মনে জাগে চরম বিস্ময়ের সঙ্গে পরম পুলক।

পথ ঠিক হয়ে গেল—সে পথের শেষ নেই। জীবন সংক্ষিপ্ত, কিন্তু আর্ট অনন্ত। শিল্পী যামিনী রায় সাধনমার্গে অগ্রসর হলেন এবং এখনো অগ্রসর হচ্ছেন। হালে "মাসিক বসুমতী"তে তাঁর আঁকা "বাঙলায় দুর্ভিক্ষ" নামে ছবির প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়েছে। একটি মাত্র কঙ্কালসার মূর্তি বা অন্য কোনো মর্মন্তুদ বীভৎস দৃশ্য নেই। অত্যন্ত সহজ প্রতীকের সাহায্যে নিরন্ন গৃহস্থবাড়ির অরন্ধনের কথা বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছুকাল আগে তাঁর চিত্রশালায় গিয়েছিলুম। দেখলুম তিনি এক অভিনব বিষয়বস্তু নিয়ে পরীক্ষায় নিযুক্ত হয়েছেন।

স্বর্গীয় গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিউবিস্টের পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে কয়েকখানি ছবি এঁকেছেন। সেই সব ছবি দেখে বিখ্যাত রূপরসিক ডক্টর এইচ্ কজিন্স মতপ্রকাশ করেছিলেন, যে দেশে

কিউবিজমের জন্ম সেই য়ুরোপের শিল্পীরাও তেমন চমৎকার ছবি আঁকতে পারেন না। তার কারণ, গগনেন্দ্রনাথ নকলিয়ার কর্তব্য পালন করেন নি। প্রতিভাবান ভারতীয় শিল্পীর হাতে এসে রূপান্তর গ্রহণ করেছিল য়ুরোপীয় পদ্ধতি।

কলকাতায় বড়দিনের মরসুমে চিত্র-প্রদর্শনী খোলা হয়। গত তিন-চার বৎসরের প্রদর্শনী দেখে মনে ধারণা হয়, বাংলার অতি-আধুনিক চিত্রকলা ক্ষীয়মাণ হয়ে পড়ছে দিনে দিনে। শিল্পীর পর শিল্পী পাশ্চাত্য সব 'ইজম্' নিয়ে প্রমত্ত হয়ে উঠেছেন, কিন্তু তা পরিপাক করতে পারেন নি একেবারেই। ফলে সে-সব উদ্ভট ছবি পাশ্চাত্য 'ইজম্'-এর ব্যর্থ ও নিরর্থক অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই হয়নি। প্রাচ্যে বা প্রতীচ্যে কোথাও তাদের ঠাঁই নেই।

এখন যামিনী রায়ের নূতন পরীক্ষার কথা বলি। য়ুরোপের মধ্যযুগের ধুরন্ধর চিত্রকররা খ্রীস্টের জীবনীমূলক অজস্র ছবি এঁকেছেন। খ্রীস্টধর্ম সম্পর্কীয় সেই সব নরনারীর মূর্তিকে যামিনী রায় এঁকে দেখিয়েছেন বাংলার নিজস্ব পটরচনা পদ্ধতিতে। শিল্পী নকল বা প্রভাবের ধার ধারেন নি, দেখাতে চেয়েছেন দেশী পদ্ধতিতে বিদেশী মানুষদের। বাংলার পটশিল্পে খ্রীস্টদেব ও মেরী মাতা! শিল্পী অসঙ্গতির মধ্যেই অন্বেষণ করেছেন সঙ্গতির ছন্দ। প্রাচীনকালে গান্ধারের ভারতীয় ভাস্কররাও বুদ্ধদেবের মূর্তি গড়বার সময়ে এই রকম চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা গ্রীক প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে নি।

যামিনী রায় একাধিকবার বাংলা রঙ্গালয়ের দৃশ্য-পরিকল্পকের কার্যভার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও তিনি বাংলার পটপদ্ধতি বর্জন করেন নি। বাংলার পট হচ্ছে প্রধানত আলঙ্কারিক আর্ট। তাই রঙ্গমঞ্চের উপরেও তার মধ্যে হয়নি ছন্দঃপাত।

শিল্পী যামিনী রায় আজ হয়েছেন যশস্বী। কেবল স্বদেশী বিদেশী বহু প্রখ্যাত রূপরসিকের অভিনন্দন নয়, লক্ষ্মীলাভও করেছেন। কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত তাঁর যাত্রাপথ হয়নি কুসুমাস্তৃত। তাঁর রেখায় লেখা কবিতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু অনেক সময়েই তাঁর আর্ট হয় Abstract, তিনি প্রচার করতে চান অমূর্তকে, দৃষ্টান্তস্বরূপ পূর্বকথিত "বাঙলায় দুর্ভিক্ষ" ছবিখানির উল্লেখ করতে পারি। ওর মধ্যে চিন্তাশীলতা থাকতে পারে, কিন্তু জনসাধারণ অমূর্ত শিল্প নিয়ে মস্তক ঘর্মাক্ত করতে প্রস্তুত নয়। বহু শিক্ষিত ব্যক্তি আমার বাড়িতে তাঁর আঁকা চিত্রাবলী দেখে সেগুলির সার্থকতা সম্বন্ধে প্রচুর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আমি সাধ্যমত তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়েছে বলে মনে হয় না। সেই জন্যেই বহুকাল পর্যন্ত তিনি অর্থকর লোকপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন নি।

তিনি আমার দীর্ঘকালের বন্ধু, তাঁকে জানি ঘনিষ্ঠভাবেই। সময়ে সময়ে তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে দারুণ অর্থকষ্ট। দারিদ্র্য অপমানকর নয় বটে, কিন্তু বহু শিল্পীর পক্ষেই মারাত্মক শিল্পী যামিনী রায় বিনা অভিযোগে মৌনমুখে এই দারিদ্র্য-জ্বালা সহ্য করেছেন, তবু নিজের পদ্ধতি ছেড়ে অন্য কোনো লোকপ্রিয় পদ্ধতি গ্রহণ করেন নি, কলালক্ষ্মীর আশীর্বাদ পেয়েই পরিতুষ্ট ছিলেন। অবশেষে জয়লাভ করেছে প্রতিভাই। যে লক্ষ্মীদেবীর হাতে থাকে ঝাঁপি আর পায়ের তলায় থাকে পেচক, অবশেষে তাঁরও মুখ হয়েছে প্রসন্ন।

কত ফুল মুকুলেই ঝরে পড়ে, আবার কত ফুল খানিক ফুটে উঠেও আর ভালো করে ফোটে না।

সুকান্ত ভট্টাচার্যকে পরলোকে যাত্রা করতে হয়েছে বালকবয়স পার হয়েই—আঠারো উতরে উনিশে পা দিয়ে। এই বয়সেই তিনি নিজের জন্যে একটি নূতন পথ কেটে নিয়েছিলেন। কিন্তু দুদিনেই ফুরিয়ে গেল তাঁর সেইপথে পদচারণ করবার মেয়াদ। আঠারো শতাব্দীতে আঠারো বৎসর বয়সে বিলাতের কবি চ্যাটারটন মারা পড়েন। ইংরেজরা এই অকালমৃত্যুর জন্য আজও দুঃখ প্রকাশ করে। সুকান্তর কথা মনে করলেই আমার চ্যাটারটনের কথা স্মরণ হয়।

উঠতি বয়সে শ্রীমোহিতলাল মজুমদার ও আমি স্বর্গীয় কুমুদনাথ লাহিড়ীর সঙ্গে হামেশাই ওঠা-বসা করতুম। কাব্য-কাকলীর মধ্য দিয়ে কেটে যেত দীর্ঘকাল। কুমুদনাথ খুব ভালো কবিতা লিখতেন। তাঁর স্বকীয়তা ছিল যথেষ্ট, কারুর দ্বারাই হন নি তিনি প্রভাবান্বিত। রবীন্দ্রনাথের দেখাদেখি আজকাল মিলহীন কবিতা লেখার রেওয়াজ হয়েছে। কিন্তু কুমুদনাথ ছাড়া তাঁর সমসাময়িক কোনো কবিই বেমিল কবিতা-রচনা করতেন বলে মনে পড়ে না। এখানেও ছিল তাঁর নূতনত্ব। "বিল্বদল" নামে তাঁর রচিত একখানি কবিতার বইও সমালোচকদের দ্বারা সাদরে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু অকালে তিনি মারা গেলেন। লোকেও ভুলে গেল তাঁর কথা।

আবার এমন সব কবিরও নাম করতে পারি, উদীয়মান অবস্থায় অল্পবিস্তর যশ অর্জন করেই ছেড়ে দিয়েছেন যাঁরা কাব্যসাধনা। কেন যে ছেড়ে দিয়েছেন, তা ভালো করে বোঝা যায় না। হতে পারে, তাঁরা হয়তো কবিতা রচনা করতেন খেলাচ্ছলেই, ছিল না তাঁদের কবি হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কিংবা হয়তো তাঁদের প্রেরণা ছিল স্বল্পজীবী। যেমন কোনো কোনো ছোট নদী গান গেয়ে জলবেণী দুলিয়ে খানিকদূর এগিয়ে হারিয়ে যায় ঊষর মরু-সিকতায়।

এমনি একজন কবি হচ্ছেন শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়। যাঁদের লেখার জোরে চলত "অর্চনা" পত্রিকা, তিনি ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। গদ্যও লিখতেন, পদ্যও লিখতেন—যদিও কবিতার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি এবং কবিতা রচনা করে তিনি পাঠকদের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর একখানি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছিল, তার নাম "লয়"। একদিক দিয়ে নামটি সার্থক হয়েছে, কারণ তারপর ফণীন্দ্রনাথের আর কোন কাব্যপুঁথি বাজারে দেখা যায় নি। তিনি আজও বিদ্যমান, কিন্তু কবিতার খাতায় আর কালির আঁচড় কাটেন না। তাঁর ছিল নিজস্ব ভাষা, ভক্তি ও বক্তব্য, তাঁর মধ্যে ছিল যথেষ্ট সম্ভাবনা। তিনি ধনী না হলেও অর্থাভাবে কষ্ট পান নি, আজও পায়ের উপর পা দিয়ে বসে নিশ্চিন্ত মনে সরকারী পেন্সন ভোগ করছেন। কেন তিনি কবিতাকে ত্যাগ করলেন? নিশ্চয়ই প্রেরণার অভাবে। শক্তির চেয়েও কার্যকরী হচ্ছে প্রেরণা।

তিনি লেখা ছেড়েছেন বটে, কিন্তু "অর্চনা"-দলের আরো কেউ কেউ সাহিত্যক্ষেত্রে নাম কিনেছেন এবং আজও লেখনী ত্যাগ করেন নি। যেমন শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় (ফণীন্দ্রনাথের অনুজ)। আমিও "অর্চনা"-য় হাতমক্স করতুম—লিখতুম কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ।

ফণীন্দ্রনাথের সঙ্গে জড়িত আছে আমার জীবনস্মৃতির খানিকটা। প্রায় প্রত্যহই তাঁর বাড়িতে আমাদের একটা সাহিত্য-বৈঠক বসত এবং মাঝে মাঝে সেখানে এসে যোগ দিতেন কবিবর

অক্ষয়কুমার বড়াল। খোশগল্পের সঙ্গে সঙ্গে চলত সাহিত্য নিয়ে আলোচনা। অক্ষয়কুমার ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সতীর্থ ও কবিবর বিহারীলালের শিষ্য। আবার বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন"-এর লেখক। তাঁর মুখে শুনতে পেতুম সেকালকার সাহিত্যিকদের কথা। কোন কোন দিন ফণীন্দ্রনাথ হার-মোনিয়াম নিয়ে বসতেন, আর আমি গাইতুম গান। সেই কাঁচা বয়সে জীবনে ছিল না কোন কাজেরই ঝুঁকি, তাই রবীন্দ্রনাথে ভাষায় শুধু অকারণ পুলকেই গাইতে পারত প্রাণ ক্ষণিকের গান ক্ষণিক দিনের আলোকে। সেদিন আর ফিরে আসবে না ; মানুষের জীবন, সাহিত্য ও চারু-কলাও হয়েছে এখন বস্তুতন্ত্রী।

অনেকে অকালে ঝরে পড়েছেন এবং অনেকের প্রেরণা অল্পদিনেই ফুরিয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে সময়ের কথা বললুম, বাংলা সাহিত্যের দরবারকে তখন মুখরিত করে তুলেছিল বহু কবির কলকণ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, গোবিন্দচন্দ্র দাস ও রজনীকান্ত সেন প্রভৃতি অগ্রজগণ বিরাজমান ছিলেন সগৌরবে। উদীয়মান কবিরূপে প্রশস্তি অর্জন করেছেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রভৃতি। কয়েকজন মহিলা কবিও তখন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন—যেমন কামিনী রায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, সরোজকুমারী দেবী, গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী দাসী প্রভৃতি। 'মাইনর' কবিরূপে সুপরিচিত ছিলেন রমণীমোহন ঘোষ, বরদাচরণ মিত্র ও রসময় লাহা প্রভৃতি।

কাব্যজগৎ যখন সরগরম, তখন তাঁদের পরে দেখা দেন শ্রীকালিদাস রায়। বহু পত্রিকার পাতা ওল্টালেই দেখতে পেতুম এই তিনজন কবির কবিতা—জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ও শ্রীকালিদাস রায়।

আজকের পাঠকরা জীবেন্দ্রকুমারকে জানে না। তাঁর দেশ ছিল চট্টগ্রামে। কলকাতার সাহিত্য-পরিষদ ভবনে একবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি ছিলেন পঙ্গু, পদযুগল ব্যবহার করতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর সাহিত্যশ্রম ছিল অশ্রান্ত। বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর রাশি রাশি রচনা পড়ুয়াদের সামনে এসে হাজির হতো। কাব্যকুঞ্জে বাস করেই বোধহয় তিনি নিজের পঙ্গু দেহের দুঃখ ভুলতে চাইতেন। "নির্মাল্য", "তপোবন" ও "ধ্যানলোক" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে তিনি পরলোক গমন করেন।

কুমুদরঞ্জনও পাড়াগেঁয়ে কবি। বহুকাল আগে একবার মাত্র তাঁকে দেখেছিলুম আমাদের "ভারতী"-র বৈঠকে। ছোটখাটো একহারা মানুষ, সাদাসিধে বেশভূষা ও কথাবার্তা, কোনরকম চাল নেই। গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষক, নজরুল ইসলাম কিছুদিন তাঁর কাছে ছাত্রজীবন যাপন করেছিলেন। কুমুদরঞ্জনের বয়স এখন সত্তরের কাছাকাছি, কিন্তু যে নিষ্ঠা ও উৎসাহ নিয়ে তিনি কবিজীবন শুরু করেছিলেন, আজও তা সম্পূর্ণ অব্যাহত আছে। আগেও রচনা করতেন রাশি রাশি পদ্য এবং এখনো পত্রিকায় পত্রিকায় কবিতা পরিবেশন করেন ভুরি পরিমাণেই। তিনিই হচ্ছেন সত্যকার স্বভাবকবি। শহর থেকে নিরালা পল্লীপ্রকৃতির শ্যামসুন্দর স্নিগ্ধছায়ায় বসে আপন মনে গান গেয়ে যায় বনের পাখি, তিনি হচ্ছেন তারই মতো।

কালিদাসও গোড়ার দিকে দস্তুরমত কোমর বেঁধে নিযুক্ত হয়েছিলেন কবিতারচনাকার্যে এবং বেশ কিছুকাল ধরে পূর্ণোদ্যমে চালিয়ে গিয়েছিলেন কবিতার কারখানা। কিন্তু ইদানীং তিনি

যেন উৎসাহ হারিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে চান। সম্পাদকের তাগিদে কখনো-কখনো রচনা করেন দুই একটি কবিতা। কুমুদরঞ্জনের মতো কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীও সত্তর বৎসর বয়সেও বিনা তাগিদে পরম উৎসাহে কবিতা রচনা করতেন। কিন্তু করুণানিধান ও কালিদাস ষাট পার হবার আগেই কবিতার সঙ্গে করে এসেছেন দুয়োরানীর মতো ব্যবহার। করুণানিধান তো লেখনী ত্যাগ করেই বসে আছেন। কয়েক বৎসর আগে আমি যখন "ছন্দা" পত্রিকার সম্পাদক, করুণানিধানের কাছ থেকে একটি কবিতা প্রার্থনা করি। তিনি পত্রোত্তরে জানালেন, কবিতা-টবিতা তাঁর আর আসে না।

কালিদাস কিন্তু একেবারে কলম ছাড়েন নি। মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প পদ্য এবং সেই সঙ্গে অপেক্ষাকৃত বেশি মাত্রায় গদ্য রচনা নিয়ে ব্যাপৃত হয়ে থাকেন। তিনি নাকি স্কুলপাঠ্য পুস্তক লেখেন, যা আমার চোখে পড়বার কথা নয়। কিন্তু বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সাহিত্যনিবন্ধগুলি আমি পড়ে দেখেছি। সেগুলি সুখপাঠ্য রচনা।

তিনি নিজেও শিক্ষাব্রতী। স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখে অর্থ পাওয়া যায়, জীবনধারণের জন্যে যা অত্যন্ত দরকার। কবিতা যশ দিতে পারে, কিন্তু বিত্ত দেবার শক্তি থেকে সে বঞ্চিত। সংসারী হয়ে জীবনের উত্তরার্ধে এই সত্যটা উপলব্ধি করেই হয়তো কবিতার ঝোঁক কমে গিয়েছে কালিদাসের।

হয় "যমুনা", নয় "মর্মবাণী" কার্যালয়ে বসে আমি একদিন কবি করুণানিধানের সঙ্গে বাক্যালাপ করছিলুম। এমন সময়ে একটি যুবক ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। দোহারা চেহারা, মুখখানি হাসি-হাসি, কিন্তু সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তার ঘনকৃষ্ণ বর্ণের দিকে। তিনি হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে করুণানিধানকে প্রণাম করলেন।

করুণানিধান আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ইনি কবি কালিদাস রায়।"

মনে মনে ভাবলুম, পুত্রের বর্ণ দেখেই পিতা বোধহয় নামকরণ করেছিলেন, অনেকের মতো কানা ছেলেকে পদ্মলোচন বলে মনকে দিতে চান নি প্রবোধ।

তারপর জেনেছিলুম কালিদাস কালো চামড়ার তলায় ঢেকে রেখেছেন নিজের পরম শুভ্র ও শুদ্ধ চিত্তটিকে। দলাদলির ধার ধারেন না, বড় বড় সাহিত্যবৈঠকেও তাঁকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। জনতা থেকে দূরে একান্তে থাকতেই ভালোবাসতেন। প্রাণ খুলে সমসাময়িকদের প্রশংসা করতে পারেন। যখন আমার "যৌবনের গান" নামে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, তখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হতো না বললেই চলে এবং এখনো তাঁর দেখা পাই কালেভদ্রে এখানে ওখানে। হঠাৎ একদিন সবিস্ময়ে দেখলুম, একখানি পত্রিকায় "যৌবনের গান"-এর উপরে কালিদাসের লেখা একটি প্রশস্তিপূর্ণ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

কালিদাস কবিতার বই প্রকাশ করেছেন অনেকগুলি—যেমন "কুন্দ", "পর্ণপুট", "বল্লরী", "রসকদম্ব", "ব্রজবেণু", "লাজাঞ্জলি", "ঋতুমঙ্গল" ও "ক্ষুদকুঁড়া" প্রভৃতি। যখন কাশিম বাজারের স্কুলে পড়তেন, পদ্য লেখা শুরু করেছিলেন তখন থেকেই। মাসিক পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করবার আগে সভায় প্রথম যে কবিতা পাঠ করেন, তার মধ্যে ছিল মদ্য ও মদ্যপায়ীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ। আজও তাঁকে 'পিউরিট্যান' কবি বলে বর্ণনা করলে অত্যুক্তি হবে না। স্কুলের চেয়ারে বসে হয়েছেন পাকা মাস্টারমশাই—ছেলেদের দেন হিতোপদেশ। বাড়িতে ফিরে

কবির আসনে আসীন হয়েও তিনি লেখেন না আর প্রেমের কবিতা। তিনি বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীর ভক্ত এবং নিজেও পরম বৈষ্ণব। অথচ বৈষ্ণব কবিরা হচ্ছেন প্রধানত প্রেমের কবিই, এটা দেখেও প্রেমকে তিনি 'বয়কট' করে বসে আছেন।

মাথার চুল পাকলে কেউ যে প্রেমের কবিতা লেখে, এটাও তিনি পছন্দ করেন না। আমি তখন পঞ্চাশ পার হয়েছি। আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু এসে বললেন, "কবি কালিদাস রায় অভিযোগ করছিলেন, এ বয়সে হেমেন্দ্র প্রেমের কবিতা লেখে কেন?"

উত্তরে আমি বললুম, "পঞ্চাশোর্ধেও মনে বনে যাবার ইচ্ছা জাগেনি, তাই।"

তার পরেও তো কেটে গিয়েছে এক যুগ। এই সেদিনও "মাসিক বসুমতী"-তে লিখেছি কয়েকটি প্রেমের কবিতা। কবির দেহ নিশ্চয়ই বয়োধর্মের অধীন কিন্তু কবির মনের কি বয়স আছে? সাহিত্যগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন বয়সেও লিখেছেন প্রেমের কবিতা, প্রেমের গান, প্রেমের গল্প। তাঁর একটি কবিতার খানিকটা তুলে দিলুম ঃ

"ওরে কবি সন্ধ্যা হয়ে এল,
কেশে তোমার ধরেছে যে পাক।
ব'সে ব'সে উর্ধ্ব পানে চেয়ে
শুনতেছ কি পরকালের ডাক?
কবি কহে, সন্ধ্যা হ'ল বটে,
শুন্‌ছি ব'সে ল'য়ে শ্রান্তদেহ
এ পারে ঐ পল্লী হ'তে যদি
আজো হঠাৎ ডাকে আমায় কেহ!
যদি হেথায় বকুলবনচ্ছায়ে
মিলন ঘটে তরুণ-তরুণীতে,
দুটি আঁখির 'পরে দুইটি আঁখি,
মিলিতে চায় দুরন্ত সঙ্গীতে ;—
কে তাহাদের মনের কথা ল'য়ে
বীণার তারে তুলবে প্রতিধ্বনি,
আমি যদি ভবের কূলে ব'সে
পরকালের ভালোমন্দই গণি!"

বোধহয় স্কুলমাস্টারী করলে মানুষের মন বুড়িয়ে যায় তাড়াতাড়ি। কয়েক বৎসর আগে টালিগঞ্জে কালিদাসের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলুম। সদরে বাড়ির নাম লেখা রয়েছে—"সন্ধ্যার কুলায়"। বাড়ির নামেও জীবনসন্ধ্যার ইঙ্গিত! কবির তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আসন্ন অন্ধকারে তিনি শ্রান্ত দেহে বিশ্রাম করবার জন্যে নিজের নীড় বেঁধে নিয়েছেন। কবির পক্ষে এ যেন বড় বাড়াবাড়ি।

কালিদাসকে ভালোবাসি, কিন্তু আজকের কালিদাসকে আমার পছন্দ হয় না। ভাবতে ভালো লাগে সেদিনকার কালিদাসের কথা, যেদিন তিনি কবিতা শুরু করেছিলেন এই বলে— "নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।" স্মরণ আছে, কবিতাটি মন্ত্রশক্তির মতো পাঠকদের

কিভাবে আকৃষ্ট করেছিল কবিতাটি ফিরত লোকের মুখে মুখে, তা মুখস্থ করে ফেলেছিল বালক-বালিকারা পর্যন্ত।

স্মরণ আছে, কবিতাটির খ্যাতি দেখে কোন কোন সাহিত্যিকের মনে হয়েছিল হিংসার উদ্রেক। অত্যন্ত অধ্যবসায় সহকারে পুরাতন সাহিত্য হাতড়ে তাঁরা প্রমাণিত করতে চেয়েছিলেন, এ কবিতাটি হচ্ছে রচনাচৌর্যের দৃষ্টান্ত! আসলে কিন্তু কিছুই প্রমাণিত হয়নি।

কালিদাসের পরে আর একজন সুকবি সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দেন শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এবং ঠিক তাঁর পরেই ধূমকেতুর মতো আত্মপ্রকাশ করেন নজরুল ইসলাম।

একদিন নাট্য-নিকেতনে (এখন 'শ্রীরঙ্গম্') বসে অভিনয় দেখছি। আমার পাশেই ঠিক পাশাপাশি আসন গ্রহণ করেছেন নাট্যকার শ্রীমন্মথনাথ রায় ও কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন।

এমন সময়ে নজরুলের আবির্ভাব।

এসেই তিনি সচীৎকারে বলে উঠলেন, "আরে, এ কি তাজ্জব ব্যাপার! রঙ্গালয়ে মন্মথের পাশে সাবিত্রী! হলো কি?"

সত্যই তো, সাবিত্রীর সঙ্গে মন্মথ—এমন কথা মহাভারতেও লেখে না। সেখানে যাঁরা ছিলেন, সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন।

এমনি ভাবে লোককে হাসাতে পারতেন নজরুল। কিন্তু আজ তাঁর নিজের হাসবার এবং অন্যকে হাসাবার পালা ফুরিয়ে গিয়েছে। ভেবে দুঃখ পাই।

যতীন্দ্র গুহ (গোবরবাবু)

স্বর্গীয় বন্ধুবর নরেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন একজন ধনী ও সুরসিক ব্যক্তি। তাঁর বসতবাড়ি ছিল মসজিদবাড়ি স্ট্রীটে পূর্বদিকের প্রায় শেষ প্রান্তে। সেইখানে প্রায়ই—বিশেষ করে প্রতি শনিবারে হতো বন্ধু-সম্মিলন। যাঁরা উপস্থিত থাকতেন তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন নবীন ও উদীয়মান ব্যারিস্টার। অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরও অভাব ছিল না। নরেনবাবুর সাহিত্য-বোধও ছিল, তাই একাধিক সাহিত্যিকও যেতেন তাঁর বৈঠকে। তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছি আমি। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুবৃহৎ গ্রন্থ "বাঙ্গলার ইতিহাস" প্রকাশিত হয়েছিল নরেনবাবুরই অর্থানুকূল্যে।

একদিন সেই বৈঠকে গিয়ে দেখলুম এক অসাধারণ মূর্তি। বিপুলবপু—যেমন লম্বায়, তেমনি চওড়ায়। দেখলেই বোঝা যায়, বিষম জোয়ান তিনি। তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে অমিত-শক্তির প্রত্যেকটি লক্ষণ। বাঙালীদের মধ্যে তেমন চেহারা দুর্লভ।

জিজ্ঞাসা করে জানলুম, তিনি হচ্ছেন নরেনবাবুর আত্মীয় পালোয়ান গোবরবাবু।

গোবরবাবু! তার আগেই তাঁর নাম এর-তার মুখে কিছু কিছু শুনতে পেতুম বটে, কিন্তু সে বিশেষ কিছুই নয়। যেখানে বৃহৎ বৃক্ষের অভাব সেখানে লোকে মস্ত বলে ধরে নেয় এরণ্ডকেই। কবি বলেছেন, "অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব।" এদেশে তখন কেউ আখড়ায় গিয়ে মাস-কয়েক কুস্তি লড়লেই পালোয়ান বলে নাম কিনে ফেলত। কিন্তু গোবরবাবু যখন তরুণ (প্রায় বালক) বয়সে দ্বিতীয়বার ইংলন্ডে যান, তখন তিনি সেখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লদের

সগর্বে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন এবং তাঁর কীর্তিকাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল "প্রবাসী" পত্রিকায়।

প্রথমে তাঁর সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করে স্কটল্যান্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর ক্যাম্পবেল। তাকে হার মানতে হলো গোবরবাবুর কাছে। তারপর তাঁর সঙ্গে লড়তে আসে জিমি ইসেন। বেজায় তার খাতির, কারণ সে ছিল সমগ্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের চ্যাম্পিয়ন—অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ বাহাদুর মল্ল। ইংরেজরা মনে মনে টিক দিয়ে রেখেছিল যে, এই ছোকরা কালা আদমি তাদের সেরা পালোয়ানের পাল্লায় পড়ে নাস্তানাবুদ ও হেরে ভূত হয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ালো অন্যরকম। খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তির পরেই ইসেন বুঝতে পারলে, গোবরবাবুর কাছে সে নিজেই ক্রমেই কাবু হয়ে পড়ছে। তখন নাচার হয়ে অন্যায় উপায়ের দ্বারা নিজের মান বাঁচাবার জন্যে সে কুস্তি ছেড়ে বক্সিংয়ের প্যাঁচ কষলে—অর্থাৎ গোবরবাবুকে করলে মুষ্ট্যাঘাত। কিন্তু নাছোড়বান্দা গোবরবাবু কুস্তির প্যাঁচেই তাকে করলেন কুপোকাত। "দুর্বল" বলে কীর্তিত বাঙালীর ছেলে হলো ইংলণ্ডের সর্বজয়ী মল্ল!

"প্রবাসী" পত্রিকায় এই অভাবিত "রোমান্সের" কাহিনী পাঠ করবার পর থেকেই আমি হয়ে পড়েছিলুম গোবরবাবুর একান্ত ভক্ত। সাহিত্যে ও ললিতকলায় কোনোদিনই বাঙালীর সাধুবাদের অভাব হয় নি। কিন্তু মল্লযুদ্ধেও বাঙালী যে বলদর্পিত ইংরেজদের গর্ব খর্ব করতে পারবে, সেদিন পর্যন্ত এটা ছিল একেবারেই কল্পনাতীত। কিন্তু তখনও আমাদের মন ছিল এমন চেতনাহীন যে ব্রিটিশ-সিংহের ঘরে গিয়ে তাকে লাঞ্ছিত ও পরাজিত করে প্রথম বাঙালীর ছেলে যেদিন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন, সেদিন পুষ্পমাল্য, পতাকা নিয়ে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করবার কথা কারুর মনেই উদয় হয় নি। বোধহয় আমরা ভাবতুম, পালোয়ান উচ্চশ্রেণীর মানুষ বলেই গণ্য হতে পারে না। আজও কি জাগ্রত হয়েছে আমাদের চেতনা? কত দিকে কত সফরী স্বল্পজলে লাফঝাঁপ মেরে এখানে জনসাধারণের দ্বারা অভিনন্দিত হচ্ছে, কিন্তু য়ুরোপ-আমেরিকার প্রথম দিগ্বিজয়ী বাঙালী যোদ্ধাকে তাঁর স্বদেশ আজ পর্যন্ত দিয়েছে কি কোনো অভিনন্দন?

নরেনবাবুর মজলিসে জাতির গৌরব এই বঙ্গবীরকে সামনা-সামনি পেয়ে আমার মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

একটা কথা ভেবে প্রায়ই আমার মনে জাগে বিস্ময়। স্বাধীন ভারতের হামবড়া কর্তাব্যক্তিরা আজ বাঙালীকে কাবু ও কোণঠাসা করবার জন্যে কোনো চেষ্টারই ত্রুটি করেননি। বাংলার বর্তমান রাজ্যপাল এই সেদিন স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ভারতের অন্য কোনো দেশের লোকই বাঙালীকে দু-চোখে দেখতে পারে না। অথচ এই বাঙালী জাতিই উচ্চতর অধিকাংশ বিভাগে সর্বপ্রথমে আধুনিক ভারতের মর্যাদা বাড়াবার চেষ্টা করেছে! বাগ্মিতার জন্যে ইংলণ্ডে সর্বপ্রথমে খ্যাতিলাভ করেছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। আর্যধর্মপ্রচারের দ্বারা ভারতের দিকে পৃথিবীর দৃষ্টি সর্বপ্রথমে আকৃষ্ট করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতের অতুলনীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিভা বলে সর্বপ্রথম খ্যাতিলাভ করেছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। ভারতীয় আধুনিক কাব্য যে বিশ্বসাহিত্যে স্থান পেতে পারে, নোবেল পুরস্কার লাভ করে তা সর্বপ্রথম প্রমাণিত করেছেন বঙ্গসাহিত্যগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রাচ্য চিত্রকলাপদ্ধতি প্রবর্তিত করে আধুনিক ভারতশিল্পকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সর্বপ্রথমে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতীয় অভিনেতৃ সম্প্রদায় নিয়ে

সর্বপ্রথমে পাশ্চাত্য দেশে দেখা দিয়েছেন নাট্যাচার্য শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী। ভারতীয় নৃত্য-কলাকে নবজন্ম দিয়ে প্রতীচ্যকে অভিভূত করেছেন সর্বপ্রথমে নটনসুর শ্রীউদয়শঙ্কর এবং ভারতবর্ষ যে অধৃষ্য মল্লের দেশ, এ-সত্য য়ুরোপের চোখে আঙুল দিয়ে সর্বাগ্রে দেখিয়েছিলেন গোবরবাবু ও শ্রীশরৎকুমার মিত্র ; কারণ তাঁরাই গামা, ইমামবক্স, গামু ও আহম্মদ বক্স প্রভৃতিকে সঙ্গে করে সর্বপ্রথমে নিয়ে গিয়েছিলেন য়ুরোপে। এর আগেও আরও দুইজন ভারতীয় পালোয়ান অবশ্য য়ুরোপে গিয়েছিলেন। প্রথম হচ্ছেন প্রাচীন ভুটান সিং ; কিন্তু যুবক হেকেন-স্মিথের কাছে তিনি পরাজিত হন। দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন গোলাম, ভারতে আজ পর্যন্ত যাঁর নাম অতুলনীয় হয়ে আছে। কিন্তু তুর্কী পালোয়ান আহম্মদ মদ্রালীর কাছে হার মানতে হয়েছিল তাঁকেও। কিন্তু গামা ও ইমামবক্স য়ুরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ পালোয়ানদের অনায়াসেই ভূমিসাৎ করে অজেয় নাম কিনে দেশে ফিরে আসেন। সেই-ই প্রথম য়ুরোপে ভারতীয় পালোয়ানদের জয়যাত্রার সূত্রপাত।

মল্লযুদ্ধের দিকে গোবরবাবুর প্রবৃত্তি হয়েছিল সহজাতসংস্কারের জন্যেই। বাংলাদেশে এই পুরুষোচিত ক্রীড়ার চর্চা চলে আসছে তাঁদের পরিবারে বহুকাল থেকেই। তাঁর পিতামহ অম্বুবাবু ও ক্ষেতুবাবু প্রভৃত অর্থের মালিক হয়েও সাধারণ নিষ্কর্মা ধনীদের মতো কমলবিলাসীর জীবন-যাপন করতেন না। মুক্তকচ্ছ হয়ে বৈষ্ণবী মায়া নিয়ে তাঁরা মেতে থাকেননি, শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা পেয়ে তাঁরা হয়েছিলেন বীরাচারী শক্তিসাধক। বাড়িতেই ছিল তাঁদের বিখ্যাত কুস্তির আস্তানা, সেখানকার মাটি গায়ে মাখেননি, ভারতের প্রথম শ্রেণীর পালোয়ানদের মধ্যে এমন লোকের সংখ্যা বেশি নয় এবং অম্বুবাবু ও ক্ষেতুবাবু নিজেরাও ছিলেন প্রখ্যাত কুস্তিগীর, তাদের নাম ফিরত লোকের মুখে মুখে। কেবল বাংলাদেশে নয়, বাংলার বাইরেও। গোবরবাবুর পিতৃদেবকেও আমি দেখেছি। তিনিও কুস্তি লড়তেন কিনা ঠিক জানি না, কিন্তু খুব সম্ভব লড়তেন। কারণ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে তিনিও ছিলেন বিশালকায়। এমন বলী বংশে জন্মগ্রহণ করলে যোদ্ধা না হওয়াই অস্বাভাবিক।

ধীরে ধীরে গোবরবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ জমে উঠতে লাগল। এবং ধীরে ধীরে আমার সামনে খুলে যেতে লাগল তাঁর প্রকৃতির নূতন নূতন দিক। সাধারণত লোকের বিশ্বাস, পালোয়ানরা কেবল কুস্তি লড়ে, মুগুর ভাঁজে ও ডন-বৈঠক দেয় এবং অবসরকালে ভোম হয়ে থাকে ভাঙের নেশায়। জানি না গোবরবাবু বাঙালী বলেই এটা সম্ভবপর হয়েছে কিনা, কিন্তু তাঁকে দেখে বুঝলুম, পালোয়ানকুলেও প্রহ্লাদ জন্মায়।

নরেনবাবুর বাড়িতে কেবল গালগল্পের মজলিস বসত না। প্রতি শনিবারে সেখানে নাতিবৃহৎ মাইফেলের আয়োজন হতো এবং প্রতি শনিবারের সন্ধ্যায় কেবল নামজাদা স্থানীয় শিল্পীরা নন, বাংলার বাইরেকার ভারতবিখ্যাত গাইয়ে-বাজিয়েও এসে আসরে আসীন হতেন। এমন দিন ছিল না, গোবরবাবু যেদিন সেখানে হাজিরা না দিতেন। কেবল হাজিরা দেওয়া নয়, তাঁর মুখ দেখলেই বোঝা যেত, সঙ্গীতসুধা পান করছেন তিনি প্রাণ-মন-কান ভরে। সস্তায় সমঝদার সাজবার জন্যে থেকে থেকে বাঁধা বুলি কপচে উঠতেন না, চুপ করে বসে বসে উপভোগ করতেন গানবাজনা। পরে শুনলুম তিনি নিজেও সঙ্গীতশিল্পী, তাঁকে তালিম দিয়েছিলেন প্রখ্যাত ব্যাঞ্জোবাদক স্বর্গীয় ককুভ খাঁ।

ক্রমে গোবরবাবুর সঙ্গে পরিচয় হলো আরো ঘনিষ্ঠ। মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে সাহিত্য সম্পর্কীয় আলোচনাও হতে লাগল। বুঝলুম পালোয়ানি প্যাঁচের মধ্যে পড়ে তাঁর মস্তিষ্ক আড়ষ্ট হয়ে যায় নি, তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ আছে, সাহিত্য-প্রসঙ্গ তুললেও তাঁর মুখ বন্ধ হয় না, স্বদেশী ও বিদেশী সাহিত্য সম্বন্ধেও খবরাখবর রাখবার জন্যে তাঁর আগ্রহের অভাব নেই।

তারপর প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই বসতুম গিয়ে তাঁর বৈঠকখানায়। আর-একজন সাহিত্যিক সেখানে শিকড় গেড়ে বসলেন, তিনি হচ্ছেন শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী। গালগল্প হতো, খেলাধূলার আলোচনা হতো, দুনিয়ার বিখ্যাত বলবান ব্যক্তিদের কথা হতো, সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পের প্রসঙ্গও বাদ দেওয়া হতো না। সেখানে আরো যে-সব ব্যক্তি উপস্থিত থাকতেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন গোবরবাবুর আখড়ার শিক্ষার্থী পালোয়ান এবং মাঝে মাঝে আসরাসীন হতেন বিখ্যাত ভীম ভবানীও। উচ্চতর আলোচনা পরিপাক করবার শক্তি তাঁদের ছিল না বটে, তবে তাঁরা চুপচাপ বসে বসে শুনতেন আমাদের কথোপকথন। এর আগেই বলেছি, ভীম ভবানী এক সময়ে বিদ্যালয়ে আমার সহপাঠী ছিলেন। পরে তিনি অল্পবয়সেই লেখাপড়া ছেড়ে শক্তিচর্চা নিয়ে মেতে ওঠেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি যদি মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্যে অল্পবিস্তর অবহিত হতেন, তাহলে সিদ্ধির পথে নিশ্চয়ই হতে পারতেন অধিকতর অগ্রসর।

দেহে ও মনে সমানভাবে শিক্ষিত যোদ্ধারা যে কতদূর অগ্রসর হতে পারেন, আমেরিকার বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা জেনে টুনির কথা স্মরণ করলেই সে-সত্য উপলব্ধি করা যায়। উচ্চশিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে টুনি ছিলেন বিদ্বজ্জনদেরই একজন, অথচ মুষ্টিযুদ্ধ নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছিলেন আট নয় বৎসরকাল। এই সময়ের মধ্যে তিনি একবার মাত্র হেরে গিয়েছিলেন প্রখ্যাত যোদ্ধা হ্যারি গ্রেবের কাছে। কিন্তু তারপরেই তাঁকে উপরি-উপরি তিনবার হারিয়ে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেন। টুনি যে বৎসর মুষ্টিযুদ্ধ শুরু করেন, সেই বৎসরেই (১৯১৯ খ্রীঃ) জ্যাক ডেম্প্‌সি "পৃথিবীজয়ী" উপাধি লাভ করেন। তারপর থেকে তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারে পৃথিবীতে এমন কেউ আর রইল না। একজন মাত্র মুষ্টিযোদ্ধাকে তাঁর সমকক্ষ বলে সকলে মনে করত, তিনি হচ্ছেন ফ্রান্সের জর্জেস কার্পেনটিয়ার। কিন্তু ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে ডেম্প্‌সি তাঁকেও মাত্র চার রাউণ্ডে হারিয়ে দিলেন। তারই তিন বৎসর পরে টুনিও হারিয়ে দিলেন কার্পেনটিয়ারকে এবং ডেম্প্‌সিকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধের জগতে ডেম্প্‌সি তখন বিরাজ করছেন নেপোলিয়নের মতো, তাঁর নাগাল ধরবার জন্যে টুনিকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। অবশেষে ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে টুনির সঙ্গে ডেম্প্‌সির শক্তিপরীক্ষা হয় এবং দশ রাউণ্ডের মধ্যে ডেম্প্‌সি হেরে যান. "পৃথিবীজেতা" উপাধি হারিয়ে পূর্ব গৌরব পুনরুদ্ধার করবার জন্যে পর বৎসরেই ডেম্প্‌সি আবার টুনির সঙ্গে মুখোমুখি হন এবং আবার হেরে যান। ডেম্প্‌সির পতনের পর টুনি হলেন পৃথিবীজেতা মুষ্টিযোদ্ধা ও বিপুল বিত্তের অধিকারী, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে গ্রহণ করলেন চিরবিদায়। বললেন, "আমি হাতে বক্সিং-এর দস্তানা পরেছিলুম কেবল টাকা রোজগারের জন্যে। আমার সে-উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, আর লড়াই নয়, এবার থেকে লেখাপড়া নিয়ে আমি কাল কাটাতে চাই।" আমেরিকার মুষ্টিযুদ্ধের দীর্ঘ ইতিহাসে দেখা যায়, টুনি হচ্ছেন একমাত্র "হেভি-ওয়েট" যোদ্ধা, পৃথিবীজেতা উপাধি লাভ করবার পরেও যিনি অক্ষুণ্ণ গৌরবে বিদায় নিতে পেরেছিলেন। আর সবাই অতিরিক্ত টাকার লোভে যৌবনসীমা পেরিয়েও বার বার লড়াই

করেছেন এবং অবশেষে মান ও উপাধি হারিয়ে সরে পড়েছেন চোখের আড়ালে। টুনি ছিলেন বিদ্বান, এ ভ্রম তিনি করেননি। এখন তাঁর বয়স তিপ্পান্ন বৎসর চলছে এবং মুষ্টিযুদ্ধের আসর থেকে তিনি বিদায় নিয়েছিলেন ত্রিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হবার আগেই। কেবল টুনি নন, আমেরিকার আরো কয়েকজন মুষ্টিযোদ্ধা উচ্চশিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন।

সর্বকালেই অতুলনীয় জ্যাক জনসন। শ্বেতাঙ্গরা তাঁকে কোনোদিনই হারাতে পারতো কিনা কে জানে, কিন্তু "পৃথিবীজেতা" উপাধি ত্যাগ না করলে পাছে তাঁকে শ্বেত গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হয় সেই ভয়ে জ্যাক জনসন দায়ে পড়ে জেস উইলার্ড নামে এক নিকৃষ্ট যোদ্ধার কাছে যেচে হার মানতে বাধ্য হন।

জনসন জাতে নিগ্রো এবং পেশায় মুষ্টিযোদ্ধা বটে, কিন্তু তাঁকেও অন্তত বিদ্বৎকল্প বলা যেতে পারে। কারণ সাংবাদিকরা যখনই তাঁর কাছে গিয়েছেন তখন প্রায়ই তাঁর মুখে শুনেছেন দর্শনশাস্ত্রের কথা। ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণীর পালোয়ানদের মধ্যে গোবরবাবু ছাড়া আর কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন বলে জানি না। এখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ দুই পালোয়ানই (গামা ও ইমাম) নিরক্ষর।

গোবরবাবু যখন দ্বিতীয় বার ইংলণ্ডে গিয়ে শ্বেতদ্বীপ জয় করেন, তখন মরিস ডিরিয়াজ নামে একজন প্রথম শ্রেণীর পালোয়ান প্যারিস শহরে একটি মস্ত দঙ্গলের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং সেখানে কুস্তি লড়েছিলেন বহু শ্বেতাঙ্গ পালোয়ান। গোবরবাবুও সেই দঙ্গলে যোগ দিয়েছিলেন। সম্ভবত সেটা ১৯১২ কি ১৩ খ্রীস্টাব্দের কথা। জ্যাক জনসন তখন শ্বেতাঙ্গ গুণ্ডাদের অত্যাচারে আমেরিকা ছেড়ে প্যারিসে পালিয়ে এসেছিলেন এবং সেই সময়ে গোবর-বাবুর সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় হয়।

কেবল কুস্তির কৌশল নয়, পালোয়ানদের দৈহিক শক্তির উপরেও যথেষ্ট নির্ভর করতে হয়। গায়ের জোরে স্যাণ্ডো যে গামার চেয়ে বলবান ছিলেন, এমন কথা মনে করবার কারণ নেই। গোবরবাবুও একজন মহাবলী ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর মুখে মুষ্টিযোদ্ধা জ্যাক জনসনের সহ্যক্ষমতা ও শারীরিক শক্তির যে বর্ণনা শুনেছি, তা চমকপ্রদ ও বিস্ময়জনক।

বক্সারদের মুষ্টি আর ভারতীয় পালোয়ানদের "রদ্দা", এ দুই-ই হচ্ছে ভয়াবহ ব্যাপার। যাদের অভ্যাস নেই, মহাবলবান হলেও বড় পালোয়ানের হাতের এক রদ্দা খেলে তারা মাটির উপরে আর পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। কিন্তু জ্যাক জনসন একদিন শখ করে গোবরবাবুকে তাঁর ঘাড়ের উপরে রদ্দা মারবার জন্যে আহ্বান করেছিলেন। গোবরবাবু তাঁকে বিশ-পঁচিশবার রদ্দা মারেন সজোরে, কিন্তু জনসন একটুও কাতর না হয়ে হাসিমুখে অটলভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিলেন।

তারপর জনসন একটি সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে গিয়ে গোবরবাবুকে বলেন, "এইবারে আমাকে ঘুষি মারো দেখি।" কিন্তু এমনি তাঁর ক্ষিপ্রকারিতা ও পাঁয়তারার কায়দা যে, বহু চেষ্টার পরেও গোবরবাবু জনসনের দেহ স্পর্শ করতেও পারেননি।

গোবরবাবুর বৈঠকখানায় আমরা বেশ কিছুকাল সানন্দে কাটিয়ে দিয়েছিলুম। সন্ধ্যার পর প্রায়ই সেখানে আসতেন অদ্বিতীয় সরোদবাদক স্বর্গীয় ওস্তাদ করমতুল্লা খাঁ, স্বর্গীয় ওস্তাদ গায়ক জমীরুদ্দিন খাঁ, প্রসিদ্ধ তবলাবাদক স্বর্গীয় দর্শন সিং ও গায়ক শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে প্রভৃতি

শিল্পীগণ। গুণীরা বইয়ে দিতেন সুরের সুরধুনী এবং লীলায়িত হয়ে উঠত আমাদের মন তারই ছন্দে ছন্দে। এক-একদিন আমাদের সৌন্দর্যের স্বপ্নভগ্ন হতো প্রায় ভোরের বিহঙ্গকাকলির সঙ্গে সঙ্গে।

তারপর গোবরবাবু আবার দীর্ঘকালের জন্যে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে গেলেন আমেরিকার দিকে।

ইয়াঙ্কিস্থানে বাঙালী মল্ল

অনেক সময় কেবল কৌশলেই প্রতিপক্ষকে কুপোকাৎ করা যায়। আমি এমন লাঠিয়াল দেখেছি, যার ক্ষুদে একহারা চেহারা একেবারেই নগণ্য। কিন্তু তার সামনে অতিকায়, মহাবলবান ব্যক্তিও লাঠি হাতে করে দাঁড়াতে পারে নি।

কুস্তিতেও প্রতিপক্ষকে কাবু করবার একটা প্রধান উপায় হচ্ছে, প্যাঁচ। কাল্লু পালোয়ানের কাছে কিক্কর সিং হেরে গিয়েছিলেন, সে কথা আগেই বলেছি। অথচ কেবল শারীরিক শক্তির উপরেই যদি কুস্তির হারজিত নির্ভর করত, তাহলে কাল্লুর সাধ্যও ছিল না কিক্করকে হারিয়ে দেবার। কারণ কিক্কর যে কাল্লুর চেয়ে ঢের বেশি জোয়ান ছিলেন এ-বিষয়ে আমার একটুও সন্দেহ নেই।

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ছে আর একটি কথা। ইতিপূর্বেই গামা বনাম হাসান বক্সের কুস্তির কথা বর্ণনা করছি। জয়লাভের পর গামা যখন বিজয়গৌরবে উৎফুল্ল হয়ে একটি মস্ত রুপোর গদা কাঁধে করে আখড়ার চারিদিক পরিক্রমণ করেছেন, তখন দর্শকদের আসন থেকে হঠাৎ এক জাপানী ভদ্রলোক উঠে এসে গামাকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করলেন। সবাই তো রীতিমত অবাক, কারণ গামার সঙ্গে জাপানীটির চেহারা দেখাচ্ছিল বালখিল্যের মতোই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু জাপানীটি ছিলেন যুযুৎসু যুদ্ধে বিশেষজ্ঞ। বললেন, গামা যদি জামা-কাপড় পরে আসেন তাহলে তিনি তখনি তাঁর সঙ্গে লড়তে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু গামা হচ্ছেন কুস্তির খলিফা, যুযুৎসুর প্যাঁচ তাঁর অজানা, কাজেই জাপানীর প্রস্তাবে রাজী হলেন না। অথচ গামা কেবল প্যাঁচের জোরে লড়েন না, তাঁর দেহেও আছে প্রচণ্ড শক্তি। এমন কথাও জানি, গামা তাঁরও চেয়ে আকারে ঢের বড় ও ভারী ওজনের বিখ্যাত পালোয়ানকে পিঠে নিয়ে সিধে হয়ে মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

গোবরবাবুও একজন মহাশক্তিধর। বহুকাল আগে বিডন রো নামক রাস্তায় তাঁর যে আখড়া ছিল, সেখানে আমি মাঝে মাঝে কুস্তি লড়া দেখতে যেতুম। সেই আখড়ায় দেখেছিলুম আমি ভীষণ এক মুগুর। যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি গুরুভার—ওজনে হবে কয়েক মণ। ভেবেছিলুম সেটা সেখানে রক্ষিত আছে হয়তো কেবল শোভাবর্ধনের জন্যই, কারণ তেমন মুগুর নিয়ে কেউ যে ব্যায়াম করতে পারে, আমার কাছে তা সম্ভবপর বলে মনে হয় নি। কিন্তু পরে শুনলুম ব্যায়ামের সময়ে গোবরবাবু সেই মুগুর ব্যবহার করেছেন।

সেখানে আর একটি দ্রষ্টব্য জিনিস ছিল। মস্ত বড় একটা পাথরের হাঁসুলি। তারও ওজন বোধ করি দেড় মণের কম হবে না। শুনলুম সেই হাঁসুলি গলায় পরে গোবরবাবু দেন ডন-বৈঠক। পুরাতন "প্রবাসী" পত্রিকায় হাঁসুলি-পরা গোবরবাবুর একখান ছবিও প্রকাশিত হয়েছিল।

গোবরবাবুর বৈঠকখানার আনন্দ-আসর উঠে গেল, কারণ প্রধান বৈঠকধারী পাড়ি দিতে চললেন মহাসাগরের ওপারে। তেমন জমাট আসর ভেঙে যাওয়াতে মন একটু খুঁতখুত করেছিল বটে কিন্তু বন্ধুবর সিন্ধুপারে যাচ্ছেন শ্বেতাঙ্গদলনে, এটা ভেবে মনের সে-খুঁতখুতনি সেরে যেতে দেরি লাগল না।

অতঃপর বাঙালী পাঠকদের অবগতির জন্যে পাশ্চাত্য দেশের মল্লযুদ্ধ সম্বন্ধে দুই-চার কথা বলা দরকার মনে করছি, কারণ তার সঙ্গে ভারতীয় মল্লযুদ্ধের পার্থক্য আছে অল্প-বিস্তর। এ-দেশে অনেক সময়ে হাল্কা ওজনের পালোয়ানের সঙ্গে ভারী ওজনের পালোয়ানের প্রতিযোগিতা হয় এবং কোনক্রমে প্রতিপক্ষকে একবার চিত করে দিতে পারলেই লড়াই ফতে হয়ে যায়। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের আইনকানুন আলাদা।

সেখানে কুস্তি হয় প্রায় সমান ওজনের পালোয়ানদের মধ্যে। ওজন অনুসারে পালোয়ানদের শ্রেণী বিভাগ করা হয়, যেমন হেভিওয়েট, লাইট হেভিওয়েট, মিডল ওয়েট, ওয়েল্টার ওয়েট ও লাইট ওয়েট প্রভৃতি। বক্সিংয়ের মতো কুস্তিতেও সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় গুরুভার বা হেভিওয়েট পালোয়ানদের।

গুরুভার পালোয়ানদের মধ্যে বিখ্যাত হয়েছেন টম কোর্নস, জ্যাক কারকিক, ইভান লিউইস, য়ুসুফ (তুর্কী), জর্জ হেকেন্সস্মিথ, ফ্রাঙ্ক গচ (অজেয় অবস্থাতেই কুস্তি ছেড়ে দেন), জো স্টেচার, আর্ল ক্যাডক, স্টানিসলস বিস্কো, টম জেঙ্কিন্স ও ডাঃ রোলার প্রভৃতি।

তিনবার কুস্তি লড়া হয়। যে বেশিবার প্রতিপক্ষকে মাটির উপরে চিত করে ফেলতে পারে, জয়ী হয় সেই-ই। কিন্তু কেবল চিত করলেই চলে না, ভূপতিত প্রতিদ্বন্দ্বীর দুই স্কন্ধ এক সময়েই মাটি স্পর্শ করা চাই (এ-দেশে গামা ও হাসান বক্সের কুস্তির সময়ে দেখেছি, হাসান বক্সকে আধা-চিত করেই গামা জয়ী বলে নাম কিনেছিলেন। পাশ্চাত্য দেশে ও-রকম জয় নাকচ হয়ে যেত)।

বর্তমান শতাব্দীর প্রায় প্রথম থেকে যারা পরে পরে পৃথিবীজেতা কুস্তিগীর বলে পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁদের নাম হচ্ছে এই ঃ জর্জ হেকেনস্মিথ (১৯০৩—১৯০৮) ফ্রাঙ্ক গচ (১৯০৮—১৯১৬) ; জো স্টেচার (১৯১৬—১৯১৮) ; আর্ল ক্যাডক (১৯১৮) ; জো স্টেচার (১৯২০) ; ডবলিউ বিস্কো (১৯২১) ; এডওয়ার্ড লুইস (১৯২১) ; স্টানিসলস বিস্কো (১৯২২) এবং এডওয়ার্ড লুইস (১৯২২)। লুইসের পর আর কারুর নাম করা বাহুল্য মাত্র, কারণ তিনি পৃথিবীজেতা থাকতে থাকতেই গোবরবাবুর সঙ্গে তাঁর কুস্তি প্রতিযোগিতা হয়।

য়ুরোপ-আমেরিকাতেও সাধারণত মনে করা হয়, একান্তভাবে পশুশক্তির সাধনা করে কুস্তি-গীররা নেমে যায় মনুষ্যত্বের নিম্নতম ধাপে। কিন্তু এডওয়ার্ড লুইস এ-শ্রেণীর লোক নন। তিনি শিক্ষিত ও মার্জিত ভদ্রলোক। প্রথম কুস্তি আরম্ভ করে তিনি ডাক্তার রোলার (যিনি ভারতের গামার কাছে পরাজিত হয়েছিলেন), চার্লি কাটলার, ফ্রেড বিল ও আমেরিকাসের কাছে হেরে যান। কিন্তু তারপর একাগ্রচিত্তে সাধনা করে তিনি সত্য সত্যই একজন প্রথম শ্রেণীর দক্ষ ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হয়ে ওঠেন। তিনি একরকম হাতের প্যাঁচ আবিষ্কার করেন, তার চাপে প্রতিদ্বন্দ্বীদের দম বন্ধ হয়ে আসত। তাঁর এই প্যাঁচ সামলাতে না পেরে সবাই হেরে যেতে লাগল। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে নিউ ইয়র্ক শহরে একটি সার্বজাতিক কুস্তি প্রতিযোগিতা হয়, সেখানে (নিশ্চয় ভারতবর্ষ ছাড়া) পৃথিবীর সর্বদেশের পঞ্চাশ জন বিখ্যাত পালোয়ান যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু

লুইস তাঁর দারুণ হাতের প্যাঁচের জোরে পরাজিত করেছিলেন তাঁদের প্রত্যেককেই। সেই থেকে তাঁর নাম হয় স্ট্রাঙ্গলার (বা শ্বাসরোধকারী) লুইস।

লুইস প্রথমে হারান পৃথিবীজেতা জো স্টেচারকে। তারপর স্টানিসলস বিস্কোর কাছে হেরে (১৯২২) ঐ বৎসরেই আবার তাঁকে হারিয়ে পৃথিবীজেতা উপাধি লাভ করেন।

পরে ঐ উপাধি হারিয়েও মল্লসমাজে লুইসের মানমর্যাদা ছিল যথেষ্ট। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে য়ুরোপ-আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ থেকে পঁচিশ জন বিখ্যাত পালোয়ান ভারতবর্ষে এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে লুইসেরও এখানে আসবার কথা ছিল। কিন্তু তাঁর সৌভাগ্যবশত শেষ পর্যন্ত তিনি আসেন নি, কারণ এলে পরে নিশ্চয়ই তাঁকে মুখে চুন-কালি মেখে দেশে ফিরে যেতে হোত ভারতীয় মল্লদের কেল্লা রক্ষা করেছেন তখন অপরাজেয় গামা এবং ইমাম বক্স। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে আর একজন ভূতপূর্ব পৃথিবীজেতা শ্বেতাঙ্গ মল্ল স্টানিসলস বিস্কো পাতিয়ালায় গামার সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করতে গিয়ে এক মিনিট পূর্ণ হবার আগেই ভূতলশায়ী হয়েছিলেন। এবারেও বিদেশী মল্লদের ক্রমাগত লাফালাফি করতে দেখে গামা ঘোষণা করলেন—"এই আমি ব্যাঙ্কে পাঁচ হাজার টাকা জমা রাখলুম। আমি এক দিনে এক আখড়ায় দাঁড়িয়ে একে একে পঁচিশ জন সাহেবের সঙ্গে লড়ব। যদি কেউ আমাকে হারাতে বা আমার সঙ্গে সমান সমান হতে পারেন, তাহলে তিনিই পাবেন ঐ পাঁচ হাজার টাকা।" গামা তখন বৃদ্ধ, বয়স উনষাট বৎসর। কিন্তু ঐ পঁচিশ জনের একজনও সাহস করে তাঁর সঙ্গে লড়তে রাজী হলো না! আর তারা গামা বা ইমামবক্সের সঙ্গে লড়বে কি, তাদের অধিকাংশই হেরে গিয়েছিল ভারতীয় মল্লসমাজে তখনও পর্যন্ত অখ্যাতনামা হরবন্স সিংয়েরই কাছে।

আমাদের গোবরবাবু আমেরিকায় যান স্ট্রাঙ্গলার লুইসেরই সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করার জন্যে। কিন্তু তিনি তখন পৃথিবীজেতা পালোয়ান এবং গোবরবাবু হচ্ছেন একে কালা আদমি, তার উপরে নবাগত। বহুকাল আগে তিনি ইংলণ্ডের সেরা সেরা পালোয়ানকে ভূমিসাৎ করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর সে পরিচয় বিশেষ কোনো কাজে লাগল না। আমেরিকায় কালা আদমিরা হচ্ছে চোখের বালির মতো। আমি গোবরবাবুর মুখেই শুনেছি, আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গদের হোটেলে তাঁর প্রবেশাধিকারই ছিল না। যেখানে বর্ণবিদ্বেষ এমন প্রবল, সেখানে সুবিচারের সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে। এমন কি ইংরেজরাও প্রথমে গামা ও ইমামবক্স প্রভৃতিকে আমলে আনতে রাজী হয় নি। আসল কথা শ্বেতাঙ্গদের মুল্লুকে কৃষ্ণাঙ্গদের লড়াই করতে যাওয়া অনেকটা বিড়ম্বনারই মতো। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের চ্যাম্পিয়ন জিমি ইসেন শেষ পর্যন্ত গোবরবাবুর কাছে হারতে বাধ্য হয়েছিল বটে, কিন্তু লড়তে লড়তে সে যখন মুষ্টিযুদ্ধের আশ্রয় নিয়েছিল, তখন শ্বেতাঙ্গ বিচারক তা 'ফাউল' বলে গণ্য করে নি। তবু কপাল ঠুকে গোবরবাবু বেরিয়ে পড়েছিলেন ইয়াঙ্কিদের দর্পচূর্ণ করবার জন্যে। তবে নতুন করে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দেবার জন্যে তাঁকে উপরে উঠতে হলো সিঁড়ির নিচের ধাপ থেকে।

এখানে আর একটা কথা বলে রাখা দরকার। গোবরবাবু ভারতীয় কুস্তি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন মাত্র একবার—তাও পরিণত বয়সে। এবং সেই যুদ্ধই তাঁর শেষ যুদ্ধ। যদিও এ-দেশে থাকতে নানা আখড়ায় তিনি কুস্তি লড়েছেন অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ মল্লের সঙ্গেই। শুনেছি একবার ইমামবক্সের সঙ্গেও কুস্তি লড়ে তিনি সমান সমান হয়েছিলেন। তাঁর নিজেরই আখড়ায় ছিলেন

মাহিনা-করা প্রথম শ্রেণীর পালোয়ানরা। যদিও গোবরবাবু ভারতীয় কুস্তিগীরদের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখেন নিজের নখদর্পণে, তবু আখড়ার কুস্তি নিয়ে বাইরে নাড়াচাড়া করার রেওয়াজ নেই।

আখড়ার কুস্তিতে পালোয়ানরা নিজেদের সম্যক শক্তি ব্যবহার করেন না। প্রদর্শনী বা exhibition কুস্তি ও মুষ্টিযুদ্ধেও অনেকটা ঐ ব্যাপারই দেখা যায়। যোদ্ধাদের কাছে তা হচ্ছে প্রায় খেলার সামিল, জনসাধারণকে আনন্দদানই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু বুদ্ধিমান যোদ্ধারা ঐ কুস্তি বা মুষ্টিযুদ্ধের প্রদর্শনীতে প্রতিপক্ষের শক্তির মাত্রা কতকটা আন্দাজ করে নিতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ সালিভান ও কর্বেটের বিখ্যাত মুষ্টিযুদ্ধের উল্লেখ করা যায়। মুষ্টিযুদ্ধের ক্ষেত্রে জন এল সালিভান যখন অদ্বিতীয় এবং কারুর কাছে কখনো পরাজিত হন নি, সেই সময়ে উদীয়মানা যোদ্ধা জেমস জে কর্বেটের সঙ্গে তাঁর প্রদর্শনী-যুদ্ধের ব্যবস্থা হয়। কর্বেট তার আগেই একজন সাধারণ যোদ্ধার কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু আমেরিকায় তাঁকেই হেভীওয়েটে সবচেয়ে চতুর যোদ্ধা বলে স্বীকার করা হয়। প্রদর্শনী-যুদ্ধে সালিভানের সঙ্গে মাত্র চার রাউণ্ড লড়েই কর্বেট তাঁর শক্তির পরিমাণ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আন্দাজ করে নিয়ে পর বৎসরেই (১৮৯২) তাঁকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেন এবং যুদ্ধে জয়ী হয়ে "পৃথিবীজেতা" নাম কেনেন।

সুতরাং প্রথম শ্রেণীর নামজাদা ভারতীয় পালোয়ানদের সঙ্গে বারংবার ধস্তাধস্তি করে গোবরবাবুও যে তাঁদের শক্তির পরিমাপ সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পেরেছিলেন, এ-কথা অনায়াসেই অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু তবু তিনি এদেশী পালোয়ানদের সঙ্গে প্রকাশ্যে কুস্তি না লড়ে বার বার পাশ্চাত্য দেশে গিয়েছেন, সেখানে প্রতিষ্ঠিত করতে ভারতের বিজয়গৌরব। প্রথমবার তিনি গামা ও ইমামবক্স প্রভৃতিকে নিয়ে ইংলণ্ডে গিয়ে সেখানে তাঁদের প্রতিষ্ঠা বাড়িয়ে আসেন। দ্বিতীয়বার নিজেই গিয়ে ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লরূপে পরিচিত হন। তৃতীয়বার তিনি যান আমেরিকায় সর্বোচ্চ "পৃথিবীজেতা" উপাধি অর্জন করবার জন্যে।

কিন্তু এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল করবার জন্যে তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে অসামান্য কায়িক শ্রম। বৎসরের পর বৎসর ধরে তিনি শ্বেতাঙ্গ পালোয়ানের পর পালোয়ানকে ধরাশায়ী করেছেন। তাঁর তখনকার কথা নিয়ে আমি যথাসময়ে বাংলা পত্রিকায় আলোচনা করেছি। বাংলা কাগজওয়ালারা যা তা ব্যাপার নিয়ে প্রচুর আবোল তাবোল বকতে পারেন, কিন্তু বাঙালীর এই অতুলনীয় কীর্তি নিয়ে কেউ মাথা ঘামানো দরকার মনে করেন নি। গোবরবাবুর অবদান বাংলাদেশে প্রায় অবিখ্যাত হয়ে আছে। গামা মাত্র দুইজন শ্রেষ্ঠ শ্বেত পালোয়ানকে (রোলার ও বিস্কো) হারিয়ে নাম কিনেছেন, কিন্তু গোবরবাবু ধুলিলুণ্ঠিত করেছেন দলে দলে শ্বেতাঙ্গ যোদ্ধাকে। ভারতের আর কোনো পালোয়ানই এত বেশি শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হন নি।

সবাই যখন হার মেনে পথ ছেড়ে দিলে, তখন বাকি রইল কেবল সর্বোচ্চ শ্রেণীর দুইজন মাত্র অধৃষ্য কুস্তিগীর। গুরুভার স্ট্র্যাঙ্গলার এডওয়ার্ড লুইস এবং পৃথিবীজয়ী লঘুতর গুরুভার (লাইট হেভি-ওয়েট) অ্যাড স্যান্টেল। গোবরবাবু প্রথমে সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করলেন অ্যাড স্যান্টেলকে। দুজনে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু স্যান্টেল দাঁড়াতে পারলেন না গোবর বাবুর সামনে। বাঙালীর ছেলের মাথায় উঠল পৃথিবীজয়ীর মুকুট। আর কোনো ভারতীয় মল্ল

আজ পর্যন্ত এই সম্মান অর্জন করতে পারেন নি। এরপরে গোবরবাবুর সামনে রইলেন কেবল স্ট্র্যাঙ্গলার লুইস।

বাঙালী মল্লের অভিযান

লাইট-হেভিওয়েটে পৃথিবীজেতা পদবী লাভ করার মানেই হচ্ছে অসামান্য সম্মানের অধিকারী হওয়া, কারণ সমগ্র পৃথিবীর প্রথম বা সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লের পরেই লাইট-হেভি ওয়েটের আসন। গামা থেকে আরম্ভ করে আর কোনো ভারতীয় মল্লই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার সুযোগ গ্রহণ করেন নি। গামা কেবল ইংলন্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লরূপে "জনবুল বেল্টে"-র অধিকারী হয়েছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র গোবরবাবুই ঐ পদবী লাভ করতে পেরেছেন। যে বাংলাদেশে দুই যুগ আগে উচ্চশ্রেণীর কুস্তিগীর ছিল দুর্লভ, সেই সময়েই গোবরবাবু অভাবিত ভাবে প্রমাণিত করেছিলেন যে, কেবল জ্ঞান বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ললিতকলার ক্ষেত্রে নয়, বীরাচারীর কর্তব্য পালনে সকলের পুরোভাগে গিয়ে দাঁড়াতে পারে ব্যাঘ্রভূমি বঙ্গভূমির সন্তান।

ফুটবল খেলার মাঠে মোহনবাগান প্রথম "শীল্ড" বিজয়ী হয়ে অর্জন করেছে চিরস্মরণীয় কীর্তি। মোহনবাগানের সম্মানকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করেই বলতে পারি, ফুটবলের মাঠে জয়লাভ করা যায় প্রধানত ক্রীড়ানৈপুণ্যের জন্যেই। তার নিরিখ নির্ণীত হয় যদি শারীরিক শক্তি হিসাবে, তাহলে এখনো কোনো বাঙালী দলই কোনো নিম্নতর শ্রেণীর ইংরেজ দলের জয়পতাকাকেও নমিত করতে পারবে কিনা সন্দেহ! তার উপরে আমরা নিম্নতর শ্রেণীর ইংরেজ দলকে হারাতে পারি স্বদেশে বসেই। খাস বিলাতে গিয়ে সেখানকার প্রথম শ্রেণীর পেশাদার দলকে হারাতে পারে, ভারতবর্ষে এমন ফুটবল খেলোয়াড়ের দল বোধ করি আজ পর্যন্ত গঠিত হয় নি।

গোবরবাবুর পক্ষে সবচেয়ে শ্লাঘনীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, তাঁর সম্বল ছিল কূট-কৌশলের সঙ্গে অমিত দৈহিক শক্তি। উপরন্তু সাত সাগরের পারে বিদেশ-বিভুঁয়ে সিংহের বিবরে গিয়ে তিনি পরাস্ত করে এসেছেন পশুরাজকে। কৃষ্ণাঙ্গ-বিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গদের স্বদেশে গিয়ে সেখানকার শ্রেষ্ঠদের বাহুবলে হারিয়ে দিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করবেন বাংলার এক ছেলে, এটা ছিল কল্পনাতীত ব্যাপার।

আগেই বলেছি, পাঞ্জাবকেশরী গামা অতুলনীয় ও ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পালোয়ান হলেও, পাশ্চাত্য দেশ তাঁর শক্তি সম্বন্ধে সম্যকরূপে পরিচিত নয়। কারণ তিনি সেখানকার উল্লেখযোগ্য দুইজনের বেশি পালোয়ানের (ডাঃ রোলার ও বিস্কো) সঙ্গে কুস্তি লড়েন নি। আর গোবরবাবু, পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে সেখানকার সর্বশ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ পালোয়ানদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে শক্তি পরীক্ষা করেছেন।

জো স্টেচার হেভি ওয়েটে পৃথিবীজয়ী হয়েছিল দুইবার (১৯১৬ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত ; এবং ১৯২০)। বিস্কোও দুইবার ঐ উপাধি লাভ করেছিল। গোবরবাবুর সঙ্গে তাদের লড়াই হয় একাধিকবার। কখনো জিতেছেন গোবরবাবু কখনো জিতেছে তারা। জিম লণ্ডস ও সনেনবার্গও পরে হয়েছিল পৃথিবীজয়ী। প্রথম ব্যক্তি গোবরবাবুর সঙ্গে সমান সমান হয়েছিল এবং শেষোক্ত ব্যক্তি হেরে গিয়েছিল তাঁর কাছে। এ-ছাড়া আরো যে কত নামজাদা শ্বেতাঙ্গ পালোয়ান

গোবরবাবুর পাল্লায় পড়ে ভূমিচুম্বন করেছিল, এখানে তার ফর্দ দাখিল করবার জায়গা নেই। মোট কথা, এত বেশি শ্বেতাঙ্গ পালোয়ানের গর্বখর্ব করতে পারেন নি আর কোন ভারতীয় মল্ল।

অ্যাড স্যান্টেলকে হারাবার পর আমেরিকার স্ট্র্যাঙ্গলার লুইস ছাড়া গোবরবাবুর যোগ্য আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না। সুতরাং গোবরবাবু তাকেই যুদ্ধে আহ্বান করলেন। কিন্তু তাঁর সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি ; অক্ষমতার জন্যে নয়, বিচারকের সমূহ অবিচারে। কালোর অদ্বিতীয়তা যখনই প্রমাণিত হবার উপক্রম হয়, ধলোরা এমনি সব উপায়েই মান বাঁচাবার চেষ্টা করে।

তার আর একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে, জ্যাক জনসন বনাম জেস উইলার্ডের মুষ্টিযুদ্ধ। কালা আদমী পৃথিবীজেতার আসনে অটলভাবে উপবিষ্ট, এর জন্যে শ্বেতাঙ্গদের মনস্তাপের অবধি ছিল না। তাই আগেই বলেছি, গুপ্তহত্যার ভয় দেখিয়ে জনসনকে হার মানতে বাধ্য করা হয়েছিল, নইলে উইলার্ডের মতো যোদ্ধা তাঁর পাশে দাঁড়াবারও যোগ্য ছিল না। উইলার্ড যখনই দ্বিতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর যোদ্ধার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, তখনই পরাজিত হয়েছেন। গানবোট স্মিথ কখনো পৃথিবীজেতা হতে পারেননি। জনসনের সামনে গেলে তাঁর অবস্থা হোত হয়তো তোপের মুখে উড়ে যাবার মতো। তাঁর আর উইলার্ডের দেহের ওজন ছিল যথাক্রমে ১৮৫ ও ২৫০ পাউণ্ড এবং দেহের দীর্ঘতা ছিল যথাক্রমে ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি এবং ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি। তবু উইলার্ড জিততে পারেননি। টম ম্যাক্‌মোহন নামে এক সাধারণ যোদ্ধার কাছেও তিনি হেরে গিয়েছিলেন। এমন একটা বাজে লোকের কাছেও শ্বেতাঙ্গদের মানরক্ষার জন্যে জনসন হার মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। উইলার্ড পরে জ্যাক-ডেম্প্‌সি ও লুইস ফির্পোর সামনেও দাঁড়াতে পারেন নি, অথচ জনসন তারপর বহু যোদ্ধার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকবারেই জয়ী হয়েছেন। এমনকি জনসনের বয়স যখন তেতাল্লিশ বৎসর, তখন তার চেয়ে বয়সে সতেরো বছরের ছোট হোমার স্মিথও তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন।

গোবরবাবু ভারতবর্ষে প্রকাশ্যভাবে একবার মাত্র কুস্তি প্রতিযোগিতায় দাঁড়িয়েছিলেন। সেবারেও বিচার-প্রহসন হয়নি বটে, কিন্তু হয়েছিল বিচার-বিভ্রাট। সে-কথা পরে বলব।

আমেরিকায় কুস্তি প্রতিযোগিতা লোকপ্রিয় হয়েছে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। কিন্তু সেখানকার পেশাদার কুস্তিগীররা টাকার লোভে প্রায়ই কৃত্রিম যুদ্ধের (বা Mock fight) ব্যবস্থা করত বলে কুস্তির প্রতি লোকে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছিল। বর্তমান শতাব্দীতে কুস্তির মান ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে বটে, কিন্তু ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার স্ট্র্যাঙ্গলার লুইসের "পৃথিবীজেতা" উপাধি লাভের পর থেকেই মল্লযুদ্ধের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় সকলের দৃষ্টি।

ডাঃ বিএফ রোলারের পেশা হচ্ছে ডাক্তারী, কিন্তু মল্লযুদ্ধেও তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন। শুনেছি অল্পকালের জন্যে তিনি "পৃথিবীজেতা" উপাধি লাভ করেছিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতরূপে কিছু বলতে পারি না। তবে তিনি প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধা ছিলেন বলেই গামার সঙ্গে তাঁর কুস্তি হয়েছিল, অবশ্য সে প্রতিযোগিতায় তিনি হেরে যান। স্ট্র্যাঙ্গলার লুইসও উঠতি বয়সে একবার তাঁর কাছে হেরেছিলেন।

ডাঃ রোলার বলেন, "ফ্রাঙ্ক গচ (তিনি 'পৃথিবীজেতা' উপাধি বজায় থাকতে থাকতেই পূর্ণ গৌরবে অবসর নিয়েছিলেন) একজন মহামল্ল ছিলেন বটে কিন্তু আমার বিশ্বাস তাঁর পূর্ণ গৌরবের

যুগেও বর্তমান কালের দুই-তিনজন কুস্তিগীর তাঁকে হারিয়ে দিতে পারতেন। গচ যখন নাম কিনেছিলেন, তখনকার কুস্তিগীররা ছিলেন মধ্যম শ্রেণীর। স্ট্র্যাঙ্গলার লুইস গচের চেয়ে বলবান আর ওজনে ভারী এবং চাতুর্যে ও গতির ক্ষিপ্রতায় তিনি গচের চেয়ে কম যান না। হাতের প্যাঁচের (head-lock) দ্বারা তিনি গচকে পরাজিত করতে পারতেন।"

লুইসের মাথার উচ্চতা ছিল ছয় ফুট। উঠতি বয়সে যখন তিনি ডাঃ রোলার প্রভৃতির দ্বারা পরাজিত হয়েছিলেন, তখন তাঁর দেহের ওজন ছিল মাত্র ১৭৫ পাউণ্ড। কিন্তু যখন গোবরবাবুর সম্মুখবর্তী হন, তখন ছিলেন দস্তুরমত গুরুভার। গোবরবাবুরও দেহ বিরাট—যেমন দৈর্ঘ্যে (বোধ করি তিনি ছয় ফুটের চেয়ে মাথায় উঁচু), তেমনি প্রস্থে।

লুইসের সবচেয়ে বড় প্যাঁচ ছিল "হেড-লক"। অন্যান্য পালোয়ানরা নিজেদের মাথা এগিয়ে দিয়ে তাঁকে তা অভ্যাস করবার সুযোগ দিতে সম্মত হতো না, কারণ সে প্যাঁচ কষলে মানুষের দম বন্ধ হয়ে আসতো লুইস তাই কতকগুলো কাঠের নরমুণ্ড তৈরি করিয়ে নিয়েছিল—সেগুলোর ভিতর হোত ফাঁপা। দু-ভাগ করা ফাঁপা মাথার, মাথার ভিতরে থাকত খুব জোরালো স্প্রিং—যেমন থাকে স্যাণ্ডোর গ্রিপ ডাম্বেলের ভিতরে। বাহুর চাপ দিয়ে স্প্রিং য়ের বিরুদ্ধে কাঠের মাথার দুই অংশ এক করতে গেলে দরকার হতো একজন মহাবলবান ব্যক্তির চূড়ান্ত শারীরিক শক্তি। এই প্যাঁচ অভ্যাস করতে করতে লুইসের বাহুর কতকগুলো পেশী অসাধারণ স্ফূর্তিলাভ করেছিল।

কিন্তু ভারতীয় পালোয়ানদেরও মানসিক তূণে সঞ্চিত আছে অসংখ্য মারাত্মক প্যাঁচ, বিলাতী কুস্তিগীররা তার খবর রাখে না। এইজন্যেই গামা ও ইমামবক্স প্রমুখ পালোয়ানদের পাল্লায় পড়ে ডাঃ রোলার, বিস্কো ও জন লেম প্রভৃতি বিলাতী যোদ্ধারা কয়েক মিনিটের মধ্যেই হয়েছিলেন পপাত ধরণীতলে। সুতরাং লুইসের "হেড-লক"-এর নামে শ্বেতাঙ্গ কুস্তিগীরদের হৃদ্‌কম্প হলেও গোবরবাবুর ভয়ের কারণ ছিল না।

লুইসের সঙ্গে গোবরবাবুর কুস্তি শুরু হলো। লুইস ভেবেছিল তার "হেড-লক"-এর বিষম ধাক্কা সহ্য করতে পারবেন না গোবরবাবু। কিন্তু তাঁর ভ্রম ভাঙতে দেরি লাগল না। খানিকক্ষণ কুস্তির পর সে গোবরবাবুকে একবার চিত করতে পারল বটে, কিন্তু তাকেও হতে হলো চিতপাত। গতবারেই বলেছি, পাশ্চাত্য দেশে তিনবার (সময়ে সময়ে পাঁচবারও) কুস্তি লড়বার পর হার-জিত সাব্যস্ত হয়। দুইবারের পর লুইস ও গোবরবাবু হলেন সমান সমান। তৃতীয়বারে যে চিত হবে, হার মানতে হবে তাকেই।

কিন্তু প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তৃতীয়বার অবতীর্ণ হয়েই লুইস নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল, গোবরবাবু বড় সাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বী নন, তাঁর কাছে তার হারবার সম্ভাবনা আছে যথেষ্ট। প্রতিযোগীদের কেউ যখন নিয়মবিরুদ্ধ অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তখনই বোঝা যায়, নিজের সক্ষমতা সম্বন্ধে তার মনে জেগেছে সন্দেহ। তাই গোবরবাবুকে কিছুতেই এঁটে উঠতে না পেরে বহুকাল আগে ইংরেজ কুস্তিগীর জিমি ইসেন যা করেছিল, লুইসও তাই করলে—অর্থাৎ কুস্তি ছেড়ে বক্সিংয়ের আশ্রয় নিলে। গোবরবাবুকে করলে সে মুষ্ট্যাঘাত। যেমন অন্যায়কারী যোদ্ধা, তেমনি অসাধু বিচারক। কৃষ্ণাঙ্গের বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধও ন্যায়সঙ্গত, এইটেই হচ্ছে পাশ্চাত্য বিধান

কারণ জিমি ইসেন ঘুষি মারলেও বিচারক "ফাউল" করেছে বলে তাকে বসিয়ে দেননি, লুইসও মুষ্টি ব্যবহার করে পরাজিত বলে স্বীকৃত হয়নি—মল্লযুদ্ধের আইন অনুসারে যা হওয়া উচিত।

বিচারক দেখেও কিছু দেখলেন না বটে, কিন্তু গোবরবাবু এতটা ব্যভিচার মুখ বুজে সহ্য করতে পারলেন না। তিনি যখন কুস্তি থামিয়ে বিচারকের দিকে ফিরে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলেন, লুইস তখন পিছনদিক থেকে এসে তাঁর পা ধরে প্রচণ্ড এক টান মারলে অতর্কিতে এমন অভাবিত ভাবে আক্রান্ত হয়ে গোবরবাবু মাটির উপরে আছড়ে পড়লেন এবং মাথায় পাটাতনের চোট লেগে তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

বিচারক লুইসকেই জয়ী বলে মেনে প্রমাণিত করলেন, পাশ্চাত্য দেশেও কাজীর বিচার হয়। এইজন্যেই আমি বলেছিলুম, যেখানে বর্ণবিদ্বেষ প্রবল, সেখানে সুবিচারের আশা থাকে না বললেই চলে।

লুইসের সঙ্গে গোবরবাবুকে আর কুস্তি লড়বার সুযোগ দেওয়া হয় নি। কাজেই তিনি লাইট হেভিওয়েটে পৃথিবীজেতা কুস্তিগীরের পদে বহাল থেকেই স্বদেশে প্রত্যাগমন করলেন। এই পদের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে আর তিনি সাগরপারে পাড়ি দেন নি বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশ থেকেও কেউ এসে তাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে ঐ পদবী কেড়ে নিতে পারে নি। তাঁর "পৃথিবীজেতা" বলে সম্মান অক্ষুণ্ণই আছে।

গোবরবাবু কলকাতায় আবার নিজের বৈঠকে এসে জাঁকিয়ে বসলেন। তাঁর ঘরে আবার আরম্ভ হলো আমাদের আনন্দ-সম্মিলন। পুরাতন দিনের গল্প, আমেরিকার গল্প, ললিতকলার গল্প, গান-বাজনাও বাদ পড়ল না।

তারপরই গোবরবাবু বড় গামাকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করে চারিদিকে জাগিয়ে তুললেন এক বিশেষ উত্তেজনা। পাঞ্জাবকেশরী নামে বিখ্যাত গামা, পৃথিবীর বড় বড় পালোয়ানরাও যাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ভরসা পায় না! একটু চমকিত হলুম বটে, কিন্তু গোবরবাবুর উপরে আমাদের বিশ্বাসের অভাব ছিল না। নিজের ও বড় গামার শক্তি-সামর্থ্য না বুঝে হঠকারীর মতো নিশ্চয় তিনি প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হবেন না।

শিবনারায়ণ দাসের গলিতে বরাটবাড়ির পিছনকার অঙ্গনে কুস্তির এক সুবিস্তৃত আখড়া তৈরি করা হলো। নিয়মিতভাবে কুস্তি অভ্যাস করবার জন্যে গোবরবাবু পশ্চিম থেকে আনালেন গুট্টা সিং নামে এক বিখ্যাত পালোয়ানকে। দিনে দিনে তাঁর দেহ অধিকতর তৈরি হয়ে এমন সুগঠিত হয়ে উঠল, দেখে আমাদের চোখ জুড়িয়ে গেল। বাঙালীর তেমন পুরুষসিংহ মূর্তি আমি আর দেখি নি।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রকাণ্ড এক মণ্ডপ প্রস্তুত হতে লাগল। কাগজে যখন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে এবং মণ্ডপের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন সার্থক হলো সেই প্রবাদবাক্য—'মানুষ গড়ে, ভগবান ভাঙেন!' হঠাৎ দারুণ ডিপথিরিয়া রোগে গোবরবাবু একেবারে শয্যাগত হয়ে পড়লেন, তারপর দীর্ঘকাল ধরে তাঁর প্রাণ নিয়ে টানাটানি। বড় গামার সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা আর হলো না। আয়োজন-পর্বেই গোবরবাবুর বহু সহস্র টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল—সবই হলো ভস্মে ঘৃতাহুতির মতো।

তারপর ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে গোবরবাবুর সঙ্গে ছোট গামার যখন কুস্তি হয়, তখন ছোট গামা যুবক ও তিনি বয়সে প্রৌঢ়। সে কুস্তি দেখবার সুযোগ আমার হয় নি। কিন্তু ভারতীয় ব্যায়াম ও মল্লযুদ্ধ সম্বন্ধে একজন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ শচীন্দ্র মজুমদার যা বলেছেন, এইখানে আমি সে-কথাগুলি উদ্ধৃত করে দিলুম ঃ

'আমার মনে হয় গোবরবাবুর প্রতি চরম অবিচার করা হয়েছিল। কুস্তির একটা বাঁধাধরা নিয়ম আছে যে লড়তে লড়তে আখড়ার সীমানায় গিয়ে পড়লে বিচারক কুস্তি ক্ষণিকের জন্যে বন্ধ করে প্রতিদ্বন্দ্বীদের আখড়ার মাঝখানে এসে লড়তে হুকুম দেবেন। নূতন করে লড়বার সময়ে পূর্বে যে যে-অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থা থেকে কুস্তি আরম্ভ হবে। গোবরবাবু ও ছোট গামা যখন সীমানার দড়ির উপর গিয়ে পড়লেন, বিচারক তাঁদের আখড়ার মাঝে আসতে হুকুম দিলেন। গোবরবাবু প্রতিপক্ষকে ছাড়লেন বটে কিন্তু প্রতিপক্ষ হুকুম আগ্রাহ্য করে গোবরকে চিত করে দিলেন। দর্শকগণ গামার জয়-জয়কার করে উঠল এবং বিচারকও ভড়কে গিয়ে তাদের সমর্থন করেন। এ-ধরনের বিচার একাধিকবার কলকাতায় দেখা গেছে। ...বিচারকের দোষে একজনের চেষ্টা বিফল হলে আপসোস করবার যথেষ্ট কারণ থেকে যায়।'

ছোট গামা কলকাতায় এসে দুইবার কুস্তি লড়েছিলেন বাঙালী মল্লের সঙ্গে এবং দুইবারই জয়ী বলে সাব্যস্ত হয়েছিলেন বিচার-বিভ্রাটের ফলে। টীকা অনাবশ্যক।

গোবরবাবুর অসাধারণ শারীরিক শক্তি সম্পর্কীয় কয়েকটি চিত্তাকর্ষক গল্প আমি জানি। কিন্তু পুঁথি বেড়ে যাচ্ছে, অতএব এইখানেই রুদ্ধ হলো আমার লেখনীর গতি।

দিলীপকুমার রায়

দিলীপকুমারের পিতৃদেব প্রখ্যাত কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ-কারের কাহিনী মৎলিখিত 'যাঁদের দেখছি' পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে। সে বোধহয় চুয়াল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগেকার কথা—ঠিক তারিখ মনে নেই। সেই সময়েই আমি দেখি দিলীপ-কুমারকে। আমি তখন তরুণ যুবক এবং দিলীপ কুমার বালক।

তারিখের কথা ভুলেছি বটে, কিন্তু মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে সেদিনের ছবিটি।

একতলার বৈঠকখানা। উত্তর দিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটি টেবিল, তার সামনে চেয়ারে আসীন দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁর দুই পাশে দণ্ডায়মান পুত্র দিলীপকুমার ও কন্যা মায়া দেবী। পূর্ব দিকে উপবিষ্ট আমরা—অর্থাৎ স্বর্গীয় কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল, 'অর্চনা' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস চন্দ্র, সুকবি শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায় ও আমি।

নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র রাণা প্রতাপসিংহকে অবলম্বন করে একখানি ঐতিহাসিক নাটক লিখতে শুরু করেছিলেন। রচনাকার্য কিছুদুর অগ্রসর হবার পর তিনি খবর পান, দ্বিজেন্দ্রলালও রচনা করেছেন 'রাণা প্রতাপ' নাটক। সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্র লেখনী ত্যাগ করেন। পরে সেই অসমাপ্ত নাটকখানি 'অর্চনা'-র কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

কৃষ্ণদাসবাবু 'অর্চনা'-র সেই সংখ্যাগুলি দ্বিজেন্দ্রলালের সামনের টেবিলের উপরে স্থাপন করলেন। সাগ্রহে সেগুলিকে টেনে নিয়ে তৎক্ষণাৎ পাঠে নিযুক্ত হলেন দিলীপকুমার।

দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে লাগলেন। বাংলাদেশের ও বিলাতের অভিনয়কলা নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা এবং স্যর হেনরি আর্ভিংয়ের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের তুলনাও করলেন। স্পষ্ট বললেন, আর্ভিংয়ের চেয়ে গিরিশচন্দ্র নিরেস অভিনয় করেন না।

পিতা যখন অভিনেতা হিসাবে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে আর্ভিংয়ের তুলনায় নিযুক্ত, বালক দিলীপকুমারও তখন যে নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে নিজের পিতাকে তুলনা করতে ব্যস্ত হয়ে আছেন, সেটা টের পাওয়া গেল অবিলম্বেই।

হঠাৎ 'অর্চনা' থেকে চোখ তুলে তিনি বলে উঠলেন, 'বাবা, বাবা, গিরিশবাবুর প্রতাপ সিংহের চেয়ে তোমার 'রাণা প্রতাপ' আরো ভালো বই হয়েছে!'

পুত্রের কাছ থেকে এই অযাচিত ও অলিখিত 'সার্টিফিকেট' লাভ করে দ্বিজেন্দ্রলাল সহাস্যে মুখ ফিরিয়ে করলেন দিলীপকুমারের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত। আমাদের সকলেরই মুখে ফুটল কৌতুকহাসি।

দ্বিজেন্দ্রলালের সাথে দেখা করতে গিয়েছি কয়েকবার, কিন্তু আর কোনোদিন পিতা ও পুত্রকে একসঙ্গে দেখিনি। দ্বিজেন্দ্রলালের পরলোকগমনের পরেও বহুকাল পর্যন্ত দিলীপকুমারের সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়নি। আবার যখন দেখা হলো, আমি তখন প্রৌঢ় ও দিলীপকুমার এসে দাঁড়িয়েছেন যৌবনের প্রান্তভাগে।

ইতিমধ্যে তাঁর খবর পেয়েছি মাঝে মাঝে। মন দিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন। এঁর-ওঁর-তাঁর কাছে গান শিখছেন। গোড়ার দিকে তাঁর একজন সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন বকুবাবু (তাঁর ভালো নামটি ঠিক মনে পড়ছে না, তিনি ছিলেন সুগায়ক এবং সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনেতারূপেও অল্পবিস্তর নাম কিনেছিলেন)। তারপর শুনলুম, দিলীপকুমার য়ুরোপে যাত্রা করেছেন।

য়ুরোপ প্রত্যাগত দিলীপকুমারকে অভিনন্দন দেবার জন্যে রামমোহন লাইব্রেরীতে এক সভার আয়োজন করা হয়। সেইখানে আবার তাঁর দেখা পাই এবং প্রথম তাঁর গান শুনি। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গানের ভক্ত হয়ে পড়ি। সেইদিনই বুঝতে পারি, সঙ্গীতসাধনায় তিনি সিদ্ধির পথে এগিয়ে গিয়েছেন কতখানি। তাঁর একটি-মাত্র গানই তাঁকে উঁচুদরের শিল্পী বলে চিনিয়ে দিতে পারে।

তারপর এখানে-ওখানে দিলীপকুমারের সঙ্গে দেখা হয়। আলাপ জমে। ক্রমে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। নিজের গানের আসর বসলেই তিনি পত্র লিখে আমাকে আমন্ত্রণ করতে ভোলেন না। আমিও 'সঙ্গীতসুধা তরে পিপাসিত চিত্ত' নিয়ে যথাস্থানে হাজিরা দিতে ভুলি না—কখনো একাকী এবং কখনো সপরিবারে। এইভাবে তিনি যে কতদিন আমাদের আনন্দবিধান করেছেন, তার আর সংখ্যা হয় না।

দিলীপকুমারের সঙ্গীতশিক্ষা সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। তিনি কেবল সুবিখ্যাত সঙ্গীতাচার্যদের কাছে তালিম নিয়ে এলেম লাভ করেননি, গোটা ভারতবর্ষ ঘুরে এখানকার অধিকাংশ প্রথম শ্রেণীর ধুরন্ধর গায়ক-গায়িকার সঙ্গেও সম্বন্ধ স্থাপন করতে পেরেছেন। আমি যখন সাপ্তাহিক 'বিজলী'-র নিয়মিত লেখক, সেই সময়ে ঐ পত্রিকায় দিলীপকুমারের দেশে দেশে সফরের কাহিনী ও গায়ক-গায়িকাদের বিবরণী প্রকাশিত হতো। সেই পরম উপাদেয় রচনাগুলি

আমি সাগ্রহে পাঠ করতুম। সেগুলি কেবল সুখপাঠ্য নয়, শিক্ষাপ্রদও বটে। উচ্চাঙ্গের ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে দিলীপকুমার যে ধারণা পোষণ করেন, ঐ নিবন্ধগুলির মধ্যে তার বিশদ পরিচয় আছে। অধিকাংশ স্থলেই তাঁর ধারণার সঙ্গে আমার ধারণা মিলে যায় অবিকল।

কিন্তু কেবল ভারতীয় সঙ্গীতেই দিলীপকুমার প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করেননি, য়ুরোপে থাকতে যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করেছেন পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্বন্ধেও। সেখানেও তিনি শুনেছেন অনেক ভালো ভালো শিল্পীর গান এবং তাঁদের কাছ থেকে শিখেছেনও যে অনেক কিছুই, এটুকু অনুমান করাও কঠিন নয়।

তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত পিতার বিখ্যাত পুত্র—চলতি কথায় যাকে বলে "বাপ কো বেটা"। তাঁর বাবা নাটক, কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছেন, গান গেয়েছেন ও সুরসৃষ্টি করেছেন। দিলীপকুমারও ঔপন্যাসিক, কবি, প্রবন্ধকার, সুরকার ও গায়ক। নাটকও রচনা করেছেন একাধিক। এদেশে বহু পরিবারেই বংশানুক্রমে সঙ্গীতের অনুশীলন চলে। এ-সব পরিবারের শিল্পীদের বলা হয় "ঘরানা গায়ক"। দিলীপকুমারও তাই। কেবল তিনি ও তাঁর পিতা নন, তাঁর পিতামহ কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ও ছিলেন খ্যাতিমান সঙ্গীতবিদ্।

তাঁর উপন্যাস পেয়েছে শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে প্রশংসা। তাঁর কবিতাও লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তি। কিন্তু আমি হচ্ছি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, ওঁদের কাছে আমার মতামত তুচ্ছ। তবু এইটুকুই খালি বলতে পারি, দিলীপকুমারকে আমিও সুলেখক বলে গণ্য করি বটে, কিন্তু আমি সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট হই তাঁর গানের দিকেই। তাঁর আসল কৃতিত্ব সঙ্গীতক্ষেত্রেই। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, কাব্য ও চিত্র প্রভৃতিকে যেমন ধরে রাখা যায়, গান, নাচ ও অভিনয়-কলাকে তেমন চিরস্থায়ী করা যায় না। গায়কের, নর্তকের ও অভিনেতার জীবনদীপ নেবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের ব্যক্তিগত আর্ট চলে যায় মানুষের দেখাশোনার বাইরে তবু লোক পরম্পরায় মুখে মুখে ফেরে তাঁদের নাম। তানসেন আজও মরেন নি। গ্যারিক আজও অমর। পাবলোভা আজও বেঁচে আছেন। দিলীপকুমারকেও বাঁচতে হবে ঐ সঙ্গীতস্মৃতির জগতেই।

বাংলা গানে তিনি এনেছেন একটি অভিনব ঢঙ বা ভঙ্গি, যা সম্পূর্ণরূপেই তাঁর নিজস্ব। যেমন রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাপদ্ধতি, অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কনপদ্ধতি, শিশিরকুমারের অভিনয় পদ্ধতি ও উদয়শঙ্করের নৃত্যপদ্ধতি সম্যকভাবেই তাঁদের ব্যক্তিগত, অগণ্য পদ্ধতির মধ্যেও তারা স্বয়ংপ্রধান হয়ে বিরাজ করে, দিলীপকুমারের গান গাইবার পদ্ধতিও সেই রকম অপূর্ব। ওস্তাদী "ব্যাকরণে"-র দ্বারা কণ্টকিত ও উৎপীড়িত না করেও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের দ্বারা যে সর্বশ্রেণীর শ্রোতার শ্রবণেই মধুবর্ষণ করা যায়, দিলীপকুমারের আসরে আসীন হলেই পাওয়া যায় সে প্রমাণ। কি উন্মাদনা আছে তাঁর গানে, কি রসের ব্যঞ্জনা আছে তার সুরে, আর কি কল-কণ্ঠের অধিকারী ও দরদী গায়ক তিনি! চিত্তও তাঁর নির্মুক্ত, কোনো গানই তাঁর কাছে উপেক্ষিত নয়। থিয়েটারি গান ও থিয়েটারি সুর ওস্তাদদের আসরে অচ্ছুৎ হয়ে থাকে, দিলীপকুমার তাকে আদর করে নিজের কণ্ঠে টেনে নেন। বাংলা রঙ্গালয়ে থিয়েটারি সুরে গেয় গিরিশচন্দ্রের একটি সেকেলে গান আছে—"রাঙা জবা কে দিল তোর পায়ে মুঠো মুঠো"। ঐ গান আর ঐ সুর দিলীপকুমারের কণ্ঠগত হয়ে কি সুধাসুমধুর হয়ে উঠেছে, গ্রামোফোনের রেকর্ডে সে প্রমাণ পাকা হয়ে আছে।

ভালো গায়কের গান শোনবার জন্যে দিলীপকুমারের আগ্রহ সর্বদাই সজাগ। আমার জ্যেষ্ঠ-তাতপুত্র সতীশচন্দ্র রায় বহুকাল সঙ্গীতসাধনা করে এখন পরলোকগমন করেছেন। এক সময়ে ভালো গায়ক বলে তাঁর প্রচুর প্রসার ছিল। গ্রামোফোনের রেকর্ডেও প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর অনেকগুলি গান। একদিন তাঁর গান শোনবার জন্যে দিলীপকুমার এলেন আমাদের বাড়িতে। তারপরও একাধিকবার তিনি আমাদের বাড়িতে পদার্পণ করেছেন, তবে পরের গান শুনতে নয়, নিজের গান শোনাতে।

তারপর দিলীপকুমার করলেন সন্ন্যাস গ্রহণ, চলে গেলেন পণ্ডিচেরীর অরবিন্দাশ্রমে। সেখানকার জন্যে দান করলেন নিজের সর্বস্ব। বোধ করি তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েই আর একজন অতুলনীয় সঙ্গীতশিল্পীও পণ্ডিচেরী যাত্রা করে একেবারেই ভেস্তে গিয়েছেন, তাঁর নাম শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়।

কিন্তু সুখের বিষয় যে দিলীপকুমার সন্ন্যাসী হয়েও সঙ্গীত ও সাহিত্যকে ত্যাগ করেননি।

পণ্ডিচেরীতে গিয়েও তিনি আমার সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দেননি। একাধিক পত্রিকার সম্পাদক-রূপে যখনই তাঁর রচনা প্রার্থনা করেছি, তখনই তা পেয়েছি। তাছাড়া আমাকে তিনি পত্র লিখতেন প্রায়ই এবং আমাকেও পত্র লেখবার জন্যে অনুরোধ করতেন। তাঁর বহু পত্রই আমি রক্ষা করেছি, সেগুলির মধ্যে আছে সাহিত্য ও সঙ্গীতের কথা। নিজের কথাও আছে। তাঁর একখানি সুদীর্ঘ পত্রের অংশবিশেষ এখানে তুলে দিলুম—পত্রের তারিখ হচ্ছে ঊনত্রিশে নভেম্বর, ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ ঃ

প্রিয়বরেষু,

আপনার পত্র পেয়ে খুব হাসলাম। আপনার কবিতা ("ছন্দা"র) বেশ লেগেছিল। আপনার গানগুলি পেয়ে সুখী হলুম। দেখব কি করা যায়। সুর মাথায় না এলে মুস্কিল। কিন্তু আপনার আরো কয়েকটা গান পাঠাবেন। প্রেমের গানও দু-একটা পাঠাবেন কিন্তু—আমি প্রেমের গান যে একেবারেই গাই না বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। সেদিন Chopin-এর একটি জর্মন গানের অনুবাদ করেছি, আপনাকে পাঠাচ্ছি—ঐ ছন্দে মিলে সুরে। যদি ভালো লাগে "ছন্দা"-য় ছাপবেন। কিন্তু ভালো না লাগলে দোহাই ধর্ম, ছাপাবেন না—আমি কিছু মনে করব না।

দেখুন প্রিয়বর, একটা কথা বলে রাখি অত্যন্ত সরল বিনয়ে। কাব্যজগতেও আমি সাধ্যমত সত্যপন্থী হতে চেষ্টা করি। কিন্তু ফলে অনেক বন্ধু হারিয়েছি—কারুর কারুর কাব্যকে ভালো বলতে না পারার দরুন। আপনার বন্ধুত্ব আমার কাছে সত্যই কাম্য বলেই ভয় হয়, পাছে আপনার সব গানকে ভালো বলতে না পারলে আপনিও আমাকে বিসর্জন দেন। আপনার একজন প্রিয় কবির কবিতা আমার ভালো লাগে না। তিনি আমাকে বহু উপরোধ করেছেন তাঁর কাব্য সমালোচনা করতে—আমি করতে পারিনি—যদিও তাঁর কাজের কোথাও নিন্দা করিনি—কিন্তু তিনি চটে গেলেন মোক্ষম। ...আমার গান কবিতা কিছুও যদি আপনার ভালো না লাগে তবু আপনার প্রীতিকে আমি সমানই চাইব, কেননা আমি সার বুঝি ভালোবাসার অহেতুক স্নেহকে। আপনি আমাকে স্নেহ করেন এইটুকুই আমি চাই—আর কিছু না। ...প্রগলভতা মার্জনা

করবেন ঃ তবে আপনি প্রবীণ লোক, অনেক দেখেছেন শুনেছেন, কাজেই মনে হয় বুঝবেন আমার সঙ্কোচ ও আক্ষেপ। পুজো সংখ্যা "ছন্দা" একখানা আমাকে পাঠাবেন? যেখানা পাঠিয়েছিলেন সেটি রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন, তাঁর কাছেই আছে প্রভৃতি।

কিন্তু আমার ভাগ্যে সে দিলীপকুমার আজ একেবারেই বদলে গেছেন। পত্রালাপ বন্ধ করে দিয়েছেন। কলকাতায় এলেও খবর নেন না বা গানের আসরে আমন্ত্রণ করেন না। কারণ ঠিক জানি না। তবে একটা কারণ হয়তো এই ঃ কয়েক বৎসর আগে তাঁর রচিত "উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল" পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সম্বন্ধে যথেষ্ট অন্যায্য মতামত প্রকাশ করা হয়েছিল। গুরুস্থানীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে সে-সব উক্তি আমি মেনে নিতে পারিনি, আমিও কয়েক সপ্তাহ ধরে "দৈনিক বসুমতী"-তে তার প্রতিকূল আলোচনা করেছিলুম। দিলীপকুমারের অভিমানের কারণ হয়তো তাই। উপরের পত্রে লিখেছেন, সত্যপন্থী হয়ে তিনি অনেক বন্ধুকে হারিয়েছেন। ঠিক অনুরূপ কারণেই আমিও হারিয়েছি তাঁর বন্ধুত্ব। কিন্তু তবু আমি তাঁর অসাধারণ সঙ্গীতপ্রতিভাকে শ্রদ্ধা করি। আজও তাঁকে আমি আগেকার মতোই ভালোবাসি। সাহিত্যিক বাদ-প্রতিবাদকে ব্যক্তিগত জীবনে টেনে আনতে আমি অভ্যস্ত নই।

কৃষ্ণচন্দ্র দে

আধুনিক বাংলার লোকপ্রিয় সঙ্গীত-ধুরন্ধরদের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র দে উর্ধ্বাসনের অধিকারী। সে আসনের উচ্চতা কতটা, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই ; কিন্তু কোন কোন বিভাগে কৃষ্ণচন্দ্রের আর্ট অতুলনীয় ও অননুকরণীয় হয়ে আছে, এ-কথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না।

বয়সে কৃষ্ণচন্দ্র এখন ষাটের পরের ধাপে এসে পড়েছেন (তাঁর জন্ম ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে)। স্বর্গীয় বন্ধুবর নরেন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে প্রথম যেদিন তাঁর গান শুনি, তখন তিনি বয়সে যুবক। সেদিন শিক্ষার্থী হলেও তিনি ছিলেন নামজাদা উদীয়মান গায়ক। তারও বহু বৎসর পরে যখন ওস্তাদ বলে সর্বত্র সমাদৃত হয়েছে, তখনও সঙ্গীতকলার প্রত্যেক বিভাগে নতুন কিছু শেখবার জন্যে তাঁকে শিক্ষার্থীর মতো আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখেছি। লাটিনে চলতি উক্তি আছে—আর্ট অনন্ত, কিন্তু জীবন হচ্ছে সংক্ষিপ্ত। সংস্কৃতেও অনুরূপ বাণী আছে—"অনন্ত শাস্ত্রং বুহু বেদিতব্যং স্বল্পাশ্চ আয়ুঃবহশ্চ বিঘ্নাঃ।" এমন শ্রেষ্ঠ শিল্পী আমি কয়েকজন দেখেছি, যাঁরা ভুলে যেতে চান এই পরম সত্যটি। কৃষ্ণচন্দ্র এ শ্রেণীর শিল্পী নন। নিয়তি তাঁকে দয়া করেনি। ভগবান তাঁকে চক্ষুষ্মান করেই পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বাল্যবয়স পর্যন্ত দুই চোখ দিয়ে তিনি উপভোগ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন সুন্দরী এই বসুন্ধরার দৃশ্যসঙ্গীত—আলোছায়ার ছন্দ, ইন্দ্রধনুবর্ণের আনন্দ, কান্তারশৈলের সৌন্দর্য ও চলমান তরঙ্গিনীর নৃত্য। কিন্তু কৈশোরেই বঞ্চিত হন দৃষ্টির ঐশ্বর্য থেকে। জন্মান্ধ চোখের মর্যাদা ততটা বোঝে না। কিন্তু চক্ষুরত্ন লাভ করেও তা থেকে বঞ্চিত হওয়া, এর চেয়ে চরম দুর্ভাগ্য কল্পনা করা যায় না।

বন্ধ হয়ে গেল লেখাপড়া। ভগবানদত্ত দৃষ্টি হারালেন বটে, কিন্তু নিয়তি তাঁর ভগবানদত্ত সুকণ্ঠ কেড়ে নিতে পারলে না। কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গীতসাধনায় নিযুক্ত হয়ে রইলেন একান্তভাবে। ষোলো বৎসর বয়সে স্বর্গত সঙ্গীতবিদ শশিমোহন দে-র শিষ্যত্ব স্বীকার করলেন এবং তারপর

সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, গয়ার মোহিনীপ্রসাদ, প্রফেসর বদন খাঁ ও করমতুল্লা খাঁ প্রভৃতির কাছে সাগরেদী করে টপ্পা, ঠুংরী ও খেয়ালে নিপুণতা অর্জন করেন। কীর্তনবিদের কাছে কীর্তন শিক্ষা করেছেন পরিণত বয়সেও। শুনেছি ওস্তাদ জমীরুদ্দীন খাঁও তাঁকে কোনো কোনো বিষয়ে সাহায্য করেছেন।

অন্ধ হয়ে বিদ্যালয় ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর বাড়ির লেখাপড়া বন্ধ হয়নি। একাধিক ভাষায় তিনি অর্জন করেছেন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। আলাপ করে বুঝেছি, তাঁর মধ্যে আছে যথেষ্ট সাহিত্যবোধ ও কাব্যানুরাগ—অধিকাংশ ওস্তাদ গায়কের মধ্যে যার অভাব অনুভব করেছি।

প্রথমে পূর্বোক্ত নরেনবাবুর বাড়িতে এবং পরে বিশ্ববিখ্যাত পালোয়ান শ্রীযতীন্দ্র গুহ বা গোবরবাবুর বাড়িতে প্রায়ই বসত উচ্চশ্রেণীর গান-বাজনার বৈঠক। গান গাইতেন স্বর্গীয় ওস্তাদ জমীরুদ্দীন খাঁ ও কৃষ্ণচন্দ্র। তাঁদের গান শেষ হলেও প্রায় মধ্যরাত্রে সরোদ নিয়ে বসতেন অনন্যসাধারণ শিল্পী করমতুল্লা খাঁ সাহেব। তবলায় সঙ্গত করতেন স্বর্গীয় দর্শন সিং। সময়ে সময়ে আসর ভাঙ্গত শেষ রাতে। জমীরুদ্দীন ও কৃষ্ণচন্দ্রের গানের ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত।

আমাদের ওস্তাদ গায়কদের গানের গলা হয় অত্যন্ত শিক্ষিত এবং সঙ্গীতকলার কোনো কলাকৌশলই তাঁদের অজানা থাকে না। শাস্ত্রের সব বিধিনিষেধ মেনে তাঁরা গান গেয়ে যেতে পারেন যন্ত্রচালিতবৎ, কোথাও একটু-আধটু এদিক ওদিক হতে দেখা যায় না। এ হিসাবে তাঁদের নিখুঁত বলতে বাধে না। কৃষ্ণচন্দ্রও আগে গান গাইতেন ঐ ভাবেই।

কিন্তু ক্রমে ধীরে ধীরে বদলে আসে তাঁর গান গাইবার পদ্ধতি। আগেই বলেছি, কৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যে আছে প্রভূত কাব্যরস, মানে না বুঝে সুরে কেবল কথা আওড়ানো নিয়েই তিনি তুষ্ট হয়ে থাকতে পারলেন না, কথার অর্থ অনুসারে সুরের ভিতরে দিতে লাগলেন চমৎকার ভাবব্যঞ্জনা (Expression)। একে নাটকীয় কোনো কিছু (Dramatic) বলুন, বা কল্পপন্থা (Romantic) বলেই ধরে নিন ; কিন্তু এই পদ্ধতিতে গানের ভিতর যে যথেষ্ট প্রাণসঞ্চার করা যায়, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। সর্বপ্রথমে বাংলা গানের ঐ ভাবব্যঞ্জনার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং সেই জন্যেই রবীন্দ্রসঙ্গীতে কথা ও সুর সর্বদাই আপন আপন মর্যাদা বাঁচিয়ে পরস্পরকে সাহায্য করতে পারে।

গ্রামোফোনের রেকর্ডে বিশ্বনাথ ধামারী, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও অঘোরনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি স্বর্গীয় সঙ্গীতাচার্যদের বাংলা গান ধরা আছে। সেগুলি শুনলেই উপলব্ধি করতে পারবেন, তাঁদের গানের মধ্যে আছে সুরতাললয়ের প্রচুর মুনশীয়ানা এবং তাঁরা প্রত্যেকেই নিখুঁত গায়ক। কিন্তু যাঁরা গানের শব্দগত ভাবব্যঞ্জনা খুঁজবেন, তাঁদের গানে তাঁরা সে জিনিসটি খুঁজে পাবেন না। ঐ-সব সুরে তাঁরা যদি অন্য গানের কথাও ব্যবহার করেন, তাহলেও ইতরবিশেষ হবে না। ওস্তাদ গায়কদের মধ্যে সর্বপ্রথমে কৃষ্ণচন্দ্রই গানের এই ভাবব্যঞ্জনার দিকে ঝোঁক দেন। তিনি যখন প্রথম রঙ্গালয়ের সংস্পর্শে আসেন, তখনই এই বিষয়টি বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিশির-সম্প্রদায়ের বা রবীন্দ্রনাথের,—কার প্রভাবে এই পরিবর্তন সাধিত হয় তা আমি বলতে পারি না।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রথম যখন নাট্য-সম্প্রদায় গঠন করেন, তখন দুইজন সঙ্গীতবিদ তাঁর সম্প্রদায়ে যোগ দিয়েছিলেন—স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণচন্দ্র। গুরুদাস ছিলেন কলাবিদ রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দৌহিত্র এবং যুরোপীয় সঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন তখন ওস্তাদ গায়কদের অন্যতম। তাঁরা দুজনেই সম্প্রদায়ের প্রথম পালা "বসন্তলীলা"-র সুর সংযোজনার ভার গ্রহণ করলেন।

সেই সময়ে গানের ভূমিকা নিয়ে কৃষ্ণচন্দ্রকে রঙ্গমঞ্চের উপরে দেখা দেবার জন্যেও অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তিনি বড়ই নারাজ, বললেন, "থিয়েটারে গান গাইলে গায়কসমাজে আমার জাত যাবে।" এদেশে যাঁরা বড় গায়ক হতে চেয়েছেন, তাঁরা বরাবরই চলতেন রঙ্গালয়কে এড়িয়ে। বাংলা রঙ্গালয়ে যাঁরা সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন—যেমন রামতারণ সান্যাল, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, দেবকণ্ঠ বাগচী প্রভৃতি—তাঁরা সঙ্গীতবিদ হলেও ওস্তাদ-সমাজের অন্তর্গত ছিলেন না। পাশ্চাত্য দেশে দেখা যায় অন্য রকম ব্যাপার। শালিয়াপিন ও ক্যারুসো প্রমুখ গায়করা ওস্তাদ বলে অক্ষয় যশ অর্জন করেছেন রঙ্গালয়ের গীতাভিনয়ে ভূমিকা গ্রহণ করেই। ভাগনর প্রমুখ অমর সুরকাররা সুর সৃষ্টি করেছেন রঙ্গালয়ের গীতিনাট্যের জন্যেই।

যা হোক শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণচন্দ্রকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করানো গেল। "বসন্তলীলা" পালায় তিনি রঙ্গমঞ্চের উপরে অবতীর্ণ হয়ে কয়েকখানি গান গেয়ে লাভ করলেন অপূর্ব অভিনন্দন। তার পরে দেখা দিলেন "সীতা" পালায় বৈতালিকের ভূমিকায়। আমার রচিত "অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে" গানটি তাঁর স্বর্গীয় কণ্ঠের গুণে এমন উতরে গেল যে, তারপর থেকে ফিরতে লাগল পথে পথে লোকের মুখে মুখে। কৃষ্ণচন্দ্রেরও ভ্রম ভেঙে গেল। রঙ্গালয়ের সম্পর্কে এসে গায়কসমাজে তাঁর খ্যাতি একটুও ক্ষুণ্ণ হলো না, ওদিকে জনসমাজে হয়ে উঠলেন তিনি অধিকতর লোকপ্রিয়।

তাঁকেও পেয়ে বসল থিয়েটারের নেশা। শিশির-সম্প্রদায় থেকে মিনার্ভা থিয়েটারে, তারপর রঙমহলে তিনি কেবল গানের সুর সংযোজনা নিয়েই নিযুক্ত হয়ে রইলেন না, রঙ্গমঞ্চের উপরেও দেখা দিতে লাগলেন ভূমিকার পর ভূমিকায় এবং প্রমাণিত করলেন, দৃষ্টিহারা হয়েও তিনি করতে পারেন উল্লেখযোগ্য অভিনয়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি কোনো না কোনো দিক দিয়ে নাট্য-জগতের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক বজায় না রেখে পারেন নি। সাধারণ রঙ্গালয় ছেড়েছেন বটে, কিন্তু বাস করছেন চলচ্চিত্রের জগতে। সেখানেও সুর দিয়েছেন, গান শুনিয়েছেন, অভিনয় দেখিয়েছেন, পরিচালনা করেছেন। তাঁর মধ্যে উপ্ত ছিল যে গুপ্ত নাট্যনিপুণতা, শিশিরসম্প্রদায়ের প্রসাদেই ফলেছে তাতে সোনার ফসল।

এক সময়ে আমি সঙ্গীত রচনার প্রেরণা লাভ করতুম কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকেই। আমার রচিত গান গাইবার জন্যে তিনি অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করতেন এবং আমার কাছ থেকে চাইতেন গানের পর গান। এবং আমিও সমর্পণ করতুম গানের পর গান তাঁর হাতে। শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, জমীরুদ্দীন খাঁ, হিমাংশু দত্ত সুরসাগর ও শচীন দেববর্মণ প্রভৃতি আরো বহু শিল্পী আমার অনেক গানে সুর সংযোজন করেছেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র আমার যত গানে সুর দিয়েছেন তার আর সংখ্যাই হয় না। তাঁর গলায় নিজের গান শোনবার জন্যে আমি উন্মুখ হয়ে থাকতুম এবং বাংলার জনসাধারণের ঔৎসুক্যও যে কম ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যায় আমার

দ্বারা রচিত ও কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বারা গীত 'নয়ন য' দিন রইবে বেঁচে তোমার পানেই চাইবো গো', 'চোখের জলে মন ভিজিয়ে যায় চলে ঐ কোন্ উদাসী', 'মন-কুসুমের রংভরা এই পিচকারীটি রাধে', 'বঁধু চরণ ধরে বারণ করি টেনো না আর চোখের টানে' ও 'শিউলী, আমার প্রাণের সখি, তোমায় আমার লাগছে ভালো' প্রভৃতি আরও বহু গানের অসাধারণ লোকপ্রিয়তা দেখে।

হ্যাঁ, কৃষ্ণচন্দ্রের কণ্ঠের ইন্দ্রজাল উপভোগ করবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকতুম সত্য সত্যই. তিনিও আমাকে হতাশ করতেন না। প্রতি মাসেই অন্তত একবার করে সদলবলে আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত হতেন এবং আমাকে শুনিয়ে দিতেন গানের পর গান। খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, গজল এবং আমার রচিত বাংলা গান কিছুই বাদ যেত না। কেটে যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা, রাত্রি হয়ে উঠত গভীর, কিন্তু আমাদের কোনোই হুঁশ থাকত না, হারিয়ে ফেলতুম সময়ের পরিমাপ।

কখনো কখনো পূর্মিমার রাত্রে তেতলার ছাদের উপর বসত গানের আসর। নীলাকাশে চাঁদমুখের রুপোলী হাসি, সামনে জ্যোৎস্নাপুলকিত গঙ্গার চলোর্মি-সঙ্গীত এবং সেই সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের অমৃতায়মান কণ্ঠে সুরের সুরধুনী, এই বিচিত্র ত্রয়ীর মিলনে দৃশ্য ও শ্রাব্য সৌন্দর্যে চিত্ত হয়ে উঠত ঐশ্বর্যময়। পূর্ণিমার সেই বৈঠকে মাঝে মাঝে এসে যোগ দিতেন চিত্রতারকা কল্যাণীয়া শ্রীমতী চন্দ্রাবতী বা অন্য কোনো গুণীজন। তাঁদের উপস্থিতি অধিকতর উপভোগ্য করে তুলত বৈঠককে। আজ থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবি—হায়, সে আনন্দের মুহূর্তগুলি আর ফিরে আসবে না। সৌভাগ্যক্রমে কৃষ্ণচন্দ্র আজও বিদ্যমান বটে, কিন্তু আমার সহধর্মিণীর পরলোকগমনের পর ভেঙে গিয়েছে সেই আনন্দের আসর।

যাঁরা ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীত সাধনায় সিদ্ধ হয়ে ওস্তাদ আখ্যা লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে পনেরো আনা লোকই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মর্যাদা রাখতে পারেন না। অনেকে আবার রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে একান্ত নারাজ। কৃষ্ণচন্দ্র এ-শ্রেণীর ওস্তাদ নন। তাঁর কণ্ঠে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে আত্মপ্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সঙ্গীতও। কেবল তাই নয়, যে কোনো শ্রেণীর সঙ্গীতে আছে তাঁর অপূর্ব দক্ষতা। এ থেকেই বোঝা যায়, তাঁর সিদ্ধ সাধনা সর্বতোমুখী।

কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে একজন আজ প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি হচ্ছেন ত্রিপুরার কুমার শ্রীশচীন্দ্র দেববর্মণ।

আমাদের দল

সে আজ তেতাল্লিশ বৎসর আগেকার কথা। আমাদের যে নিজস্ব দলটি সর্বপ্রথমে গড়ে উঠেছিল শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শ্রীঅমল হোম, শ্রীচারুচন্দ্র রায় ও শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার প্রভৃতিকে নিয়ে, তাঁরা প্রত্যেকেই আজ সাহিত্য ও ললিতকলার বিভিন্ন বিভাগে খ্যাতিলাভ করেছেন—এমন ব্যাপার সচরাচর দেখা যায় না। এথেকেই প্রমাণিত হবে, আমাদের সেই বন্ধুসভার কোনও সভ্যই কেবল সাময়িক খেয়ালে মেতে সাহিত্য ও শিল্পকে অবলম্বন করেন নি, চিত্তের মধ্যে একান্ত নিষ্ঠা নিয়ে এবং সাহিত্য ও শিল্পের উচ্চাদর্শের দিকে অবিচলিত দৃষ্টি রেখেই তাঁরা অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন সাধনামার্গে।

আমি যখন সাহিত্য ক্ষেত্রে হাত মক্স করছি, স্বর্গীয় নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের সম্পাদনায় তখন 'জাহ্নবী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিছুকাল পরে কাগজখানি বন্ধ হয়ে যায়। তারপর স্বর্গীয় সুধাকৃষ্ণ বাগচি আবার নব পর্যায়ের 'জাহ্নবী' প্রকাশ করতে থাকেন এবং তাঁর পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লেখনি চালনা করবার জন্যে আমাকে আহ্বান করেন। নামে সুধাকৃষ্ণই 'জাহ্নবী'র সম্পাদক হলেন বটে, কিন্তু তাঁর মধ্যে ছিল না সম্পাদকের উপযোগী মনীষা। সেই সময়ে পত্রিকা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করলেন প্রভাত, অমল, সুধীর ও প্রেমাঙ্কুর প্রভৃতি। প্রত্যেকেই তরুণ, আমার চেয়ে বয়সে কিছু ছোটো এবং প্রভাত, অমল ও সুধীর তখনও বিদ্যালয়ে ছাত্রজীবন যাপন করছেন। কিন্তু সেই বয়সেই তাঁরা পড়ে গিয়েছিলেন সাহিত্যের আবর্তে। বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার চেয়ে সাহিত্য জগতের লেখা এবং পড়ার দিকেই তাঁদের ঝোঁক ছিল বেশি।

'জাহ্নবী' ছোটো কাগজ। এবং তার কার্যালয় ও আমাদের বৈঠকও আয়তনে বড়ো ছিল না। কিন্তু সেখানে প্রত্যহ যেসব বিষয় নিয়ে (কখনও কখনও উত্তপ্ত) আলোচনা চলত, তার মধ্যে থাকত এদেশি এবং বিদেশি সাহিত্য ও শিল্পের তাবৎ বিভাগ।

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তখন রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রথম শ্রেণির সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকদের ভুরি ভুরি দানের অভাব ছিল না এবং রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের মধ্যে থেকেই নূতন যুগের তিনজন কবিও—যতীন্দ্রমোহন, সত্যেন্দ্রনাথ ও করুণানিধান—ধীরে ধীরে আরোহণ করছিলেন খ্যাতির সোপানে। কিন্তু নূতন যুগের মান রাখতে পারেন এমন একজন প্রতিভাবান কথাশিল্পীর অভাব অনুভব করতেন সকলেই। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস রচনার জন্যে অবসর পেতেন অল্প—যদিও অন্যান্য বিভাগের মতো কথাসাহিত্য ক্ষেত্রেও তিনিই ছিলেন বাংলাদেশের প্রধান শিল্পী এবং সে গৌরব থেকে আজও কেউ তাঁকে বিচ্যুত করতে পারেননি। লোক সাধারণের মানসক্ষুধা নিবৃত্তির পক্ষে তাঁর দান অমৃতায়মান হলেও চাহিদা হিসাবে অপ্রচুর ছিল। মন বলত—''আরও চাই, আরও।'' কিন্তু কতদিক নিয়ে রবীন্দ্রনাথের হাত জোড়া, একান্তভাবে একদিক নিয়ে নিযুক্ত থাকবার সময় তাঁর কই?

ঠিক এই সময়েই 'যমুনা' পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ্যভাবে দেখা দিলেন শরৎচন্দ্র। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হতে লাগল 'রামের সুমতি', 'চন্দ্রনাথ', 'পথনির্দেশ' ও 'বিন্দুর ছেলে' প্রভৃতি বড়ো গল্প ও উপন্যাস। তার কয়েক বৎসর আগে (১৩১৪ সালে) 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' নামে

শরৎচন্দ্রের একটি পুরাতন রচনা প্রকাশিত হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁর অজ্ঞাতসারেই। সুতরাং অনায়াসেই বলা যেতে পারে যে, 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় শরৎচন্দ্র প্রথম আত্মপ্রকাশ করেননি।

এর অল্পদিন পরেই 'যমুনা'র কর্ণধার স্বর্গীয় ফণীন্দ্রনাথ পাল পত্রিকা সম্পাদনায় সাহায্য করবার জন্যে আমাকে আমন্ত্রণ করলেন। আমিও গিয়ে হাজির হলুম 'যমুনা'র বৈঠকে। তারপর আমাদের দলের বাকি কয়জনও আসন পাতলেন সেই আসরেই। তারপর ক্রমেই আমাদের দল বৃহত্তর হয়ে উঠতে লাগল। কারণ 'যমুনা'র মজলিসে ওঠাবসা করতেন স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্গীয় রসময় লাহা, স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক। তারপর নৈবেদ্যের উপরে চূড়া সন্দেশের মতো 'যমুনা'র আসরে এসে আসীন হলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিছুকাল পরে আমাদের দল পুষ্ট হয়ে উঠল অধিকতর। দলের নতুন বৈঠক বসতে লাগল 'ভারতী' কার্যালয়ে। আগেকার কেউই দলছাড়া তো হলেনই না, উপরন্তু প্রমথ চৌধুরি, দীনেশচন্দ্র সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচি, সুকুমার রায়চৌধুরি, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী ও শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি স্বর্গীয় মনীষীগণও শোভাবর্ধন করতেন আমাদের দলের মধ্যে। আসতেন ভাষাতত্ত্ববিদ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব ও নজরুল ইসলাম। আসতেন চিত্রশিল্পী শ্রীঅসিতকুমার হালদার ও শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরি এবং নাট্যাচার্য শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি এবং স্বর্গীয় নাট্যশিল্পী রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও নির্মলেন্দু লাহিড়ি। মোট কথা, তখন আমাদের দলের মতো শক্তিশালী বৃহৎ ও বিখ্যাত দল বাংলাদেশের আর কোথাও ছিল না এবং তারপর আজ পর্যন্ত তেমন দল আর গঠিত হয়নি। চুম্বকের দিকে যেমন লৌহের আকর্ষণ অবশ্যম্ভাবী, আমাদের সেই দলের দিকে তেমনি আকৃষ্ট হত সর্বশ্রেণির সাহিত্যিক ও শিল্পীর দৃষ্টি। সেখানে আসন লাভ করবার জন্যে সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করতেন, কিন্তু সে সৌভাগ্যলাভের সুযোগ পেতেন না সকলেই।

যশস্বী সাহিত্যিক শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বয়সে যখন অতি তরুণ ছিলেন, তাঁর তখনকার মনের কথা তিনি এইভাবে ব্যক্ত করেছেন '(ভারতীর) ইলেকট্রিক চায়ের কেটলির চারিদিকে যে সাহিত্য-পরিবার গড়িয়া উঠে, বাংলা সাহিত্যের জীবনে তাহা একটি নতুন সাহিত্যিক অনুভূতি আনিয়া দিয়াছে। *** আমি জানি একটি কিশোর মনে 'ভারতী'র এই সঙ্ঘ কী সুন্দর পরিকল্পনার খোরাক জোগাইত। প্রয়োজনবাদের সাগরের মধ্যে সেই সঙ্ঘটুকু সুন্দরের মন্দির বলিয়া মনে হইত। একদল লোক—একই অনুভূতি তাহাদের, একই সাধনা তাহাদের, একই প্রতিবন্ধক তাহাদের, একই মৈত্রীর বন্ধনে বদ্ধ। বাংলার সাহিত্য জীবনে এই মৈত্রী-সাধনার যে কতখানি প্রয়োজন তাহা যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের ভিতরের সহিত সামান্য পরিচিত তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন।'

আমাদের দলের পরে সাহিত্য সমাজে উল্লেখযোগ্য আর একটি মাত্র নূতন দল আত্মপ্রকাশ করেছে এবং তা হচ্ছে 'কল্লোল'-এর দল। আমাদের দলের তুলনায় তা অনেক ছোটো হলেও উল্লেখযোগ্য, কারণ তার ভিতর থেকে দেখা দিয়েছেন কয়েকজন নতুন ও শক্তিশালী সাহিত্যিক। যে দল নূতন সাহিত্যিক গড়তে পারে না, তার সার্থকতা অল্প। আমাদের দল কোনওদিনই গতানুগতিক ছিল না। ভবিষ্যতের সম্ভবনাকে তা অভিনন্দন দিতে পারত। সেইজন্যেই আমাদের দলেরও কয়েকজন 'কল্লোল' পত্রিকার লেখক শ্রেণিভুক্ত হতে ইতস্তত করেননি। পরে যথাসময়ে 'কল্লোল'-এর দল নিয়েও আলোচনা করব।

কিন্তু আমাদের দল আর নেই। দলের অধিকাংশই আজ স্বর্গত। "যাঁদের দেখেছি" শীর্ষক প্রবন্ধমালায় তাঁদের অনেকেরই কথা নিয়ে আলোচনা করেছি। বাকি যাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে আজও বিদ্যমান আছেন তাঁরাও হয়েছেন জরাগ্রস্ত, যৌবনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা থেকে বঞ্চিত। দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত হয়ে জীবনযুদ্ধে নিযুক্ত থেকে কেউ আর কারুর খবর বড়ো রাখতে পারেন না, হয়ত সমুজ্জ্বল অতীতের স্বপ্ন দেখেই পরিতৃপ্ত হয়ে থাকেন। তাঁদেরও কয়েকজনের কথা বর্তমান নিবন্ধমালায় আলোচিত হয়েছে। কিন্তু আরও কারুর কথা এখনও বলা হয়নি। সেই কথা বলে আমাদের দলের প্রসঙ্গ শেষ করব।

'জাহ্নবী' কার্যালয়ে আমাদের দল গড়ে ওঠবার কয়েক বৎসর আগেই শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আমার বয়স তখন ষোলো-সতেরোর বেশি হবে না। প্রভাতের আরও কম। আমি তখন কোনও কোনও ছোটো কাগজের লেখক এবং আমার রচিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও যন্ত্রস্থ হয়েছে—নাম তার 'আমাদের জাতীয় ভাব।' বঙ্গবিভাগের পরে সারা দেশে তখন শুরু হয়েছে প্রবল স্বদেশী আন্দোলন এবং তখনকার অধিকাংশ যুবকের মতো আমিও সেই আন্দোলনে মেতে উঠেছি। তখন সরকারি বাগানগুলিতে ব্রিটিশ-সিংহকে বাক্য বন্দুকের বুলেটের দ্বারা ঘায়েল করবার জন্যে প্রতিদিন বৈকালেই অগণ্য সভার আয়োজন করা হত এবং আর সকলকার মতো আমিও ছিলুম সে সভার একজন নিয়মিত শ্রোতা।

বিডন বাগানে টহলরাম নামে এক পাঞ্জাবি ভদ্রলোকের নেতৃত্বে প্রত্যহই হত সভার অধিবেশন। তিনি বাংলা জানতেন না, কিন্তু ইংরেজিতে 'Curzon and Curzonians'-এর বিরুদ্ধে যেসব গরম গরম বচন ঝাড়তেন, জনসাধারণের পক্ষে সেগুলি হত অত্যন্ত শ্রবণরোচক। টহলরামের পর সেখানে আরও কেউ কেউ বক্তৃতা দিতেন এবং তাঁদের মধ্যে প্রভাত ছিলেন অন্যতম। বয়সে তখন তাঁকে কিশোর বলাই চলত, সেই বয়সেই তাঁর মুখের উপরে বিরাজ করত দাড়ি-গোঁফের গভীর অরণ্য। এবং সেই বয়সেই তিনি জনসভায় অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন অকুতোভয়ে।

কেমন করে আমরা দুজনেই যে দুজনের দিকে আকৃষ্ট হলুম তা আর স্মরণে আসে না। তবে এইটুকু আমার মনে আছে যে, আমার রচিত পুস্তকখানি তিনি সভার শ্রোতাদের মধ্যে হাতে হাতে বিক্রয় করবার ভার নিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হয়নি, কারণ টহলরাম হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে সমস্ত ভেস্তে দিলেন। কারুর কারুর মুখে শুনলুম, তিনি ছিলেন ইংরেজদের গুপ্তচর। সম্ভবত মিথ্যা গুজব।

কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রভাতের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে। কখনও টহলরামের বাসায় তাঁদের কার্যালয়ে গিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে গল্প করে আসতুম এবং কখনও তিনি এসে দেখা দিতেন আমার পাথুরেঘাটার বাড়িতে।

তারপর 'জাহ্নবী' কার্যালয়ে গিয়ে প্রভাতের আরও কোনও কোনও বিশেষত্বের সঙ্গে পরিচিত হলুম। অল্প বয়সেই তিনি সমসাময়িক পাশ্চাত্য সাহিত্যকে রাখতে পেরেছিলেন নিজের নখদর্পণে। তিনি ছিলেন প্রায় সর্বদর্শী, প্রেমাঙ্কুর তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন 'সবজান্তা লরেন্স।' কী সাহিত্য, কী ললিতকলা, কী রাজনীতি, কী ইতিহাস, কী নাট্যশিল্প, কী খেলাধুলো প্রত্যেক বিভাগেই নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহের জন্যে তাঁর আগ্রহ ছিল উদগ্র। তর্ক এবং

গলাবাজিতেও তিনি যে কী-রকম তুখোড় ছিলেন, শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীর প্রসঙ্গে আগেই দিয়েছে তার অল্পবিস্তর নমুনা।

বাংলাদেশে যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে একজন অদ্বিতীয় লেখক আত্মপ্রকাশ করেছেন, 'জাহ্নবী' কার্যালয়ে এসে এখবর সর্বপ্রথমে দেন প্রভাতচন্দ্রই। সে সময়ে এই সংবাদ দিকে দিকে প্রচার করবার জন্য প্রভাতের যে বিপুল আগ্রহ লক্ষ করেছি তাও উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কাছে গিয়ে তিনি শরৎচন্দ্রের রচনা পাঠ করে শুনিয়ে আসেন। বিস্মিত ও মুগ্ধ বিজয়চন্দ্র সেই অভাবিত আবিষ্কারের সংবাদ জানান কবিবর ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালকে এবং তিনিও শরৎচন্দ্রের অসাধারণ রচনাচাতুর্যের পরিচয় পেয়ে তাঁর ভক্ত হয়ে পড়েন। প্রভাতচন্দ্র প্রভৃতির মৌখিক বিজ্ঞাপনের মহিমাতেই শরৎচন্দ্রের নাম প্রায় বিদ্যুৎ-গতিতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু প্রভাতচন্দ্র চিরদিনই মুখফোড়। যত বড়ো লোকই হোন, কারুর যুক্তিহীন উক্তিই তিনি সহ্য করতে একান্ত নারাজ। আমি যখন মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'মর্মবাণী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক, সেই সময়ে তাঁর কার্যালয়ে বসে শরৎচন্দ্র একদিন বললেন, 'রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে-বাইরে' লিখেছেন। তোমরা দেখে নিও, আমি এবারে যে উপন্যাস লিখব 'ঘরে-বাইরে'র চেয়ে ওজনে তা একটুও কম হবে না।'

প্রভাতচন্দ্র অমনি তাঁর মুখের উপরে বলে বসলেন, 'সবুজ পত্রে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস এখনও শেষ হয়নি, আর আপনার উপন্যাস এখনও লেখাই হয়নি। তবু এমন কথা আপনি কী করে বলছেন!' শরৎচন্দ্র কোনও জুতসই জবাব দিতে পারলেন না এবং তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীও সফল হয়নি। তাঁর পরের উপন্যাসের নাম 'গৃহদাহ'। তা'ঘরে-বাইরে'র সমকক্ষ হতেও পারেনি, বরং তার মধ্যে আছে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা চিত্রিত একটি বিখ্যাত চরিত্রের স্পষ্ট অনুকরণ। শরৎচন্দ্র একখানি পত্রে নিজেই সেই অনুকরণকে চুরির নামান্তর বলে স্বীকার করেছেন!

আমি বরাবরই লক্ষ করে এসেছি, উচ্চশ্রেণির সাংবাদিক ও সম্পাদকের যেসব গুণ থাকা উচিত, প্রভাতচন্দ্রের মধ্যে ছিল তা পূর্ণ-মাত্রায় বিদ্যমান। কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত তিনি নিজের উপযোগী ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ পাননি, নানা বৈঠকে লক্ষ্যহীনের মতো বিবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা ও তর্কাতর্কি করে এবং কাঁড়ি কাঁড়ি বই পড়ে জীবনের দীর্ঘকাল কাটিয়ে দিয়েছেন। তারপর পরিণত বয়সে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম হয়ে সাংবাদিকের কাজ শুরু করেন এবং তারপর দৈনিক 'ভারত'-এর সম্পাদকের পদে নির্বাচিত হন। তিনি বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গেই নিজের কর্তব্য পালন করেছিলেন। কিন্তু পরে 'ভারত' নিষিদ্ধ পত্রিকায় পরিণত ও তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। বোধ করি পত্রিকা সম্পর্কীয় কোনও কারণের জন্যেই কিছুকাল তাঁকে কারাবরণও করতে হয়।

রাজনীতি নিয়ে তিনি কিশোর বয়স থেকেই মাথা ঘামিয়ে এসেছেন এবং প্রাচীন বয়সে বিধানসভার সভ্যপদ প্রার্থী হয়ে নির্বাচন-দ্বন্দ্বেও যোগদান করেছেন।

আজও প্রভাতচন্দ্রের প্রকৃতি, কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গি একটুও পরিবর্তিত হয়নি। মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে যখন দেখা হয়, তাঁর দুর্দান্ত আকার, এলোমেলো পাকা চুল ও ঘন দাড়ি-গোঁফের মধ্যে ফিরে পাই সেই নবীন ও পুরাতন প্রভাতচন্দ্রকেই।

আমাদের দলের আরও কিছু

যে সময়ে আমাদের দল গঠিত হয়, তখন বাংলা ভাষা উচ্চশ্রেণির অনুবাদ-সাহিত্যে বিশেষ পরিপুষ্ট ছিল না। 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকায় মাঝে মাঝে মোপাসাঁ প্রমুখ দুই-তিনজন গত যুগের লেখকের ছোটোগল্প প্রকাশিত হত। এবং তখনকার কয়েকজন বিখ্যাত বাঙালি লেখক (দীনেন্দ্রকুমার রায় ও হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি) নিম্নতর শ্রেণির বিলাতি গল্পকে মৌলিক বলে চালিয়ে দিতে ইতস্তত করতেন না।

অনুবাদ হচ্ছে সাহিত্যের একটি প্রধান বিভাগ। অনুবাদ-সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার খুলেই ইংরাজি ভাষার প্রয়োজনীয়তা আজ এতটা বেড়ে উঠেছে। একমাত্র তার মাধ্যমেই আমরা পরিচিত হতে পারি পৃথিবীর অধিকাংশ সাহিত্যের সঙ্গে। বিভিন্ন দেশীয় সাহিত্যের আদর্শ চোখের সামনে এনে রাখলে বাংলা সাহিত্যের আদর্শও যে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হবে, এ বিশ্বাস ছিল আমাদের বরাবরই।

কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রখ্যাত লেখকই অনুবাদ-সাহিত্যের প্রতি সদয় ছিলেন না। এমন কি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো লেখকও অনুবাদের সার্থকতা স্বীকার করতেন না। অনুবাদ করতে দেখলে আমাকে তিনি ভর্ৎসনা করতেন। বলতেন, 'অনুবাদ করা মানেই হচ্ছে পণ্ডশ্রম করা।' অথচ মজা এই, সাহিত্য জীবনের পূর্বার্ধে তিনি নিজেই দুইখানি বড়ো বড়ো ইংরেজি উপন্যাস বাংলা ভাষায় তর্জমা করেছিলেন।

'জাহ্নবী'কে কেন্দ্র করে আমাদের দল যখন গড়েওঠে, তখন প্রথম থেকেই আমরা অনুবাদ-সাহিত্যের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিই। তখনকার ইউরোপের নানা দেশের অতি আধুনিক সাহিত্যিকদের রচনার সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলুম। কিন্তু কেবল তাঁদের রচনা পাঠ করেই আমরা তৃপ্তিলাভ করতে পারতুম না। ভালো জিনিস যেমন আর পাঁচজনকে খাইয়ে সুখ হয়, বাঙালি পড়ুয়াদের কাছে তেমনই পাশ্চাত্য সাহিত্যের রস নিবেদন করবার জন্যে আমাদেরও আগ্রহ ছিল যথেষ্ট।

অনতিবিলম্বেই যাঁদের নিয়ে আমাদের দল বৃহত্তর হয়ে ওঠে, সেই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন ওই একই মতাবলম্বী। সে যুগের পাশ্চাত্য সাহিত্যের বহু শ্রেষ্ঠ রত্ন তাঁরা উপহার দিয়েছেন বাঙালি পাঠক-সমাজের কাছে। সত্যেন্দ্রনাথ যত কবিতার অনুবাদ করেছেন, এদেশের আর কোনও কবি তা করেননি। কিন্তু কেবল পদ্য নয়, গদ্যানুবাদেও তাঁর দান আছে। মৌলিক রচনাতেও যে পূর্বোক্ত লেখকরা প্রচুর কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন, একথা সকলেই জানেন। কিন্তু তাঁদের কেহই অনুবাদকে পণ্ডশ্রম বলে মনে করতেন না। তাঁরা অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন নিজেদের নাম কেনবার জন্যে নয়, মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করবার জন্যেই। এ বিভাগে আমাদের দলের অবদান অতিশয় উল্লেখযোগ্য। তাঁরা যে পথে অগ্রণী হয়েছিলেন, আজ সেখানে দেখা দিয়েছেন বহু নবীন পথিক। আমাদের অনুবাদ-সাহিত্যের ভাণ্ডার তাই ক্রমেই অধিকতর পুষ্ট হয়ে উঠছে।

আগেই বলেছি শ্রীঅমলচন্দ্র হোম যখন আমাদের দলে যোগ দিয়েছিলেন, তখন তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্র। বয়সেও ছিলেন প্রায় কিশোর। কিন্তু সেই বয়সেই তাঁর অধীত বিদ্যার পরিধি ছিল বিস্ময়কর। দেশ-বিদেশের সাহিত্যের হাটে নিত্য ছিল তাঁর আনাগোনা। এবং আসরে

আসীন হয়ে যখন তিনি সাহিত্য ও ললিতকলার বিবিধ বিভাগ নিয়ে নিজের মতামত জাহির করতেন, তখন পাওয়া যেত তাঁর প্রভূত মনীষার পরিচয়। বিদ্যালয়ে পড়তে পড়তে সাহিত্যের আবর্তে গিয়ে পড়লে গুরুজনদের দ্বিতীয় রিপু যে শান্ত থাকে না, নিজের জীবনেই তার প্রমাণ পেয়েছি। অমলচন্দ্রও যে গুরুজনদের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছেন, বন্ধু-বান্ধবদের মুখেই শুনেছি একথা। কিন্তু সাহিত্যের নেশা হচ্ছে আফিম-এর মৌতাতের মতো। ধরলে আর ছাড়ান পাবার উপায় থাকে না। অমলচন্দ্রও সাহিত্যর্চচা ও আমাদের দল ছাড়তে পারেননি। ''জাহ্নবী''র আসর থেকে উঠে গিয়ে বসেছেন 'ভারতী'র বৈঠকে—এবং চিরদিনই বন্ধুরূপে নির্বাচন করেছেন সাহিত্যিক ও শিল্পীদেরই। মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতেও গিয়েছি এবং তখনও আমাদের আলাপ্য বিষয় হত কেবল সাহিত্য ও শিল্পই।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিজেকে সাহিত্যিক নয়, সাংবাদিক বলেই মনে করতেন। 'প্রবাসী'র জন্যে লিখতেন কেবল বিবিধ সংবাদ। কিন্তু সাহিত্য বিচারে যে তাঁর অসামান্য শক্তি ছিল, সম্পাদকরূপে সেটা তিনি বিশেষভাবেই প্রমাণিত করে যেতে পেরেছেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রথম জীবনে গুটিকয় ছোটো গল্প রচনা করেছিলেন, কিন্তু আজ আর বাজারে তার চাহিদা নেই। আর আছে তাঁর কিছু কিছু চুটকি সমালোচনা, তারও কোনও স্থায়ী মূল্য নেই। অথচ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে তাঁর নাম। কিন্তু তিনি যে ছিলেন কত বড়ো রসবেত্তা, তাঁর 'সাহিত্য' সম্পাদনার মধ্যেই আছে তার অতুলনীয় প্রমাণ। এক একজন লোক সাহিত্য সৃষ্টি না করেও সাহিত্য-সমাজে মধ্যমণির মতো বিরাজ করতে পারেন।

অমলচন্দ্রকে এই শ্রেণির মধ্যে গণ্য করা চলে। তিনি একজন প্রথম শ্রেণির সাহিত্যবোদ্ধা, সাহিত্য ও চারুকলা নিয়ে মুখে মুখে অনর্গল আলাপ-আলোচনা করতে পারেন এবং রচনাশক্তিতেও তিনি বঞ্চিত নন। কিন্তু নিজের রচনা নিয়েই সময় কাটাবার দিকে তাঁর তেমন ঝোঁক নেই। 'জাহ্নবী'র জন্যে তিনি কিছু লিখেছেন বলে মনে পড়ছে। কিন্তু লেখার চেয়ে ভালো করে পত্রিকা পরিচালনার দিকেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। 'জাহ্নবী'তে হাত মক্স করে তারপর তিনি যখন 'মিউনিসিপ্যাল গেজেট'-এর সম্পাদকরূপে দেখা দেন, তখন তাঁর বিশেষ গুণপনা আকৃষ্ট করেছিল সকলের দৃষ্টি। একখানি সাধারণ পত্রিকাকে তিনি করে তুলেছিলেন অনন্যসাধারণ। এবং সুযোগ পেলেই ওর ভিতর দিয়েই তিনি প্রকাশ করতেন সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে নিজের রসগ্রাহিতাকে। 'মিউনিসিপ্যাল গেজেট'-এর রবীন্দ্র সংখ্যা সৌন্দর্যে ও ঐশ্বর্যে অবিস্মরণীয়। সেই সময়ে আরও অনেকগুলি পত্রিকার রবীন্দ্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু 'মিউনিসিপ্যাল গেজেট'-এর সেই সংখ্যায় সুযোগ্য সম্পাদক সুদক্ষ হাতে যেসব বিচিত্র তথ্য পরিবেশনের ভার নিয়েছিলেন তা হয়েছিল সবচেয়ে উপভোগ্য। অমলচন্দ্র বালক বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ-এর দুর্লভ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন, কবি সম্পর্কীয় বহু তথ্যই তাঁর নখদর্পণে এবং রবীন্দ্র সাহিত্যেও আছে তাঁর পরিপূর্ণ অধিকার। কাজেই তাঁকে পরের মুখে ঝাল খেতে হয়নি। রবীন্দ্রনাথের উপরে তাঁর অচলা নিষ্ঠা এবং আমাদের দলের প্রত্যেকেই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পূজারি। রবীন্দ্র জয়ন্তীর সময়েও অমলচন্দ্রের সম্পাদনায় একখানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল।

অতি আধুনিক সাহিত্য নিয়েও তিনি মস্তিষ্ক চালনা করেন এবং সে সম্বন্ধেও নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন একখানি পুস্তিকায়। সাহিত্য সমাজে তা বিলক্ষণ আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

এখন তিনি সম্পাদকের গদি ছেড়ে অধিকার করেছেন সরকারি প্রচার সচিবের আসন।

তাঁর পক্ষে খুব গুরুতর ব্যাপার না হলেও এপদেরও গুরুত্ব বড়ো অল্প নয়।

কিশোর, তরুণ ও প্রাচীন অমলচন্দ্র জেগে আছেন আমার চোখের উপরে। তবে আগে তাঁর সঙ্গে যেমন ঘন ঘন দেখা হত, এখন আর তা হয় না বটে, কিন্তু কালেভদ্রে দেখা হলেই বুঝতে পারি, অমলচন্দ্রের পরিবর্তন হয়নি। তাঁর একহারা দেহ আজ দোহারা (মাঝে তেহারাও হয়েছিল) হয়েছে বটে, কিন্তু আজও তাঁর স্বভাব হারিয়ে ফেলেনি তারুণ্যের প্রভাব। অমলচন্দ্র কোনওদিন বোধ করি দেহে বুড়ো হলেও মনে বুড়ো হবেন না।

আর একজনের কথা বলে আমাদের দলের প্রসঙ্গ শেষ করব। তিনি হচ্ছেন শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার। তিনি হচ্ছেন একাধারে সাহিত্যিক, সম্পাদক ও পুস্তক-প্রকাশক। সুধীরের আগে বাংলাদেশের আর কোনও সাহিত্যিক বিখ্যাত প্রকাশকরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন বলে মনে পড়ছে না এখন। এই পথে দেখি একাধিক ব্যাক্তিকে। অনেকেরই মতে লেখকদের সঙ্গে প্রকাশকদের হচ্ছে খাদ্য ও খাদকের সম্পর্ক। সুধীরের বেলায় ও-কথা খাটে না।

'জাহ্নবী'র ছোটো আসরেই সুধীরের সঙ্গে আমার পরিচয়, বোধ করি তিনি তখন সবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। সেই পাঠদ্দশাতেই সাহিত্যিক হবার উচ্চাকাঙক্ষা নিয়ে তিনি করেছিলেন লেখনীধারণ। একাধিক পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর রচনা।

তারপর 'জাহ্নবী', 'যমুনা', 'সঙ্কল্প' ও 'মর্মবাণী' পত্রিকা পরে পরে উঠে গেল। এ-সব কাগজের সঙ্গেই সুধীরের ও আমার সম্পর্ক ছিল। একদিন আমরা দুজনে সুকিয়া (এখন কৈলাস বসু) স্ট্রিট দিয়ে যাচ্ছি। এমন সময়ে কান্তিক প্রেস থেকে স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের আহ্বান করলেন।

মণিলাল বললেন, 'স্বর্ণকুমারী দেবী আমার উপরে 'ভারতী'র ভার অর্পণ করতে চান। আপনারা দুজনে যদি আমাকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেন, তাহলে সে ভার আমি গ্রহণ করতে পারি।'

তাঁর প্রস্তাবে আমরা রাজি হলুম। তারপর নতুন করে আবার 'ভারতী' প্রকাশিত হতে লাগল এবং আমাদের দল রূপান্তরিত হল 'ভারতী'র দলে।

সুধীরের পিতৃদেব স্বর্গীয় এম সি সরকার রায়বাহাদুরের একখানি আইন সংক্রান্ত পুস্তকের দোকান ছিল। সুধীরও তখন বি-এ পাস করে আইন পড়ছিলেন। তারপর হঠাৎ আইনের পড়া ছেড়ে দিয়ে বইয়ের দোকানে গিয়ে বসতে শুরু করলেন। তিনি হচ্ছেন সাহিত্যিক, তাই শুকনো আইনের কেতাব নিয়ে নিযুক্ত থাকতে চাইলেন না। প্রকাশ করতে লাগলেন বাংলা কথাসাহিত্যের পুস্তক। এ বিভাগে তাঁদের দ্বারা প্রকাশিত প্রথম দুখানি বই যথাক্রমে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমার দ্বারা রচিত। আজ তিনি ফলাও করে ব্যবসা ফেঁদেছেন, 'এম সি সরকার এণ্ড সন্স' হয়ে উঠেছে বাঙলাদেশের অন্যতম প্রধান প্রকাশক। কিন্তু এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের মূলে আছে একমাত্র সুধীরেরই মনীষা, সততা ও অমায়িকতা। আজ পর্যন্ত একাধিক ব্যক্তি তাঁকে ঠকিয়েছে, কিন্তু কোনও লেখককেই তাঁর কাছে ঠকতে হয়নি।

সুধীরের প্রধান কীর্তি 'মৌচাক'। ছত্রিশ বৎসর আগে 'ভারতী'র আসরে কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের দ্বারা যখন 'মৌচাক'-এর নামকরণ হয়, তখন বাংলাদেশের খুব কম লেখকই শিশুসাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইতেন। সুধীরের নির্বন্ধাতিশয়েই গত যুগের ও বর্তমানকালের অধিকাংশ প্রখ্যাত লেখক 'মৌচাক'-এর মাধ্যমে আমাদের শিশুসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। 'মৌচাক'-এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ

দত্ত ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি স্বনামধন্য স্বর্গীয় লেখকরা। এবং 'মৌচাক' আমন্ত্রণ না করলে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নরেন্দ্র দেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, শিবরাম চক্রবর্তী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল ও স্বর্গীয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ছোটোদের জন্যে কলমই ধরতেন কিনা সন্দেহ! আমাকেও বড়োদের আসর থেকে টেনে এনে ছোটোদের খেলাঘরে নামিয়েছে ওই 'মৌচাক'ই। তার আসরে এসে আসীন হয়েছেন আজ পর্যন্ত কত বিখ্যাত লেখক। ছোটোদের আর কোনও পত্রিকা তেমন গর্ব করতে পারবে না।

শরৎচন্দ্রের প্রথম পুস্তক 'বড়দিদি' কোনও পুস্তক ব্যবসায়ী প্রকাশ করেননি। 'যমুনা' সম্পাদক স্বর্গীয় ফণীন্দ্রনাথ পাল তা ছাপিয়েছিলেন শখ করেই। প্রকাশকদের মধ্যে সর্বপ্রথমে সুধীরই বইয়ের বাজারে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে দেখা দেন। শরৎচন্দ্রের সর্বশেষ পুস্তক 'ছেলেবেলার গল্প'ও তাঁরই দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। মৃত্যুশয্যায় শায়িত শরৎচন্দ্রের যখন অনটন হয়েছিল, সুধীরই তাঁকে অর্থ সাহায্য করতে অগ্রসর হয়েছিলেন।

আমাদের সব সাহিত্য বৈঠক আজ অতীত স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে। বিদ্যমান আছে কেবল এই 'মৌচাক'-এর বৈঠক। যদিও তার আগেকার ঔজ্জ্বল্য আর নেই, তবু এখনও যে সে শিবরাত্রির সলতের মতো টিমটিম করে জ্বলছে, এইটুকুই হচ্ছে আনন্দের কথা। কিন্তু সেখানে বিদ্যমান আছেন আগেকার সুধীরচন্দ্রই। সেখানে গেলেই আবার মনের চোখে দেখতে পাই তাঁদের প্রিয় মুখগুলি, জীবনের যাত্রাপথে চলতে চলতে আজ যাঁরা হারিয়ে গিয়েছেন—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। মনের চোখে তাঁদের দেখি এবং মনে মনে তাঁদের সঙ্গসুখ উপভোগ করি।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে শিশুসাহিত্য শাখার সভাপতিরূপে সুধীরচন্দ্র যে চমৎকার অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন,তার মধ্যে আছে চিন্তাশীলতা ও বহু জ্ঞাতব্য তথ্য। সুধীরের মাথার কালো চুল একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর কলমে আজও ঘুণ ধরেনি।

শিশিরকুমারের আত্মপ্রকাশ

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশের বিভাগে এখনও এমন কয়েকজন প্রতিভাধর বাঙালি বিরাজ করছেন, সমগ্র ভারতে যাঁরা অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। যেমন চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু, ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, নাট্যশিল্পী শিশিরকুমার ভাদুড়ি ও নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর।

একটি কারণে শিশিরকুমারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলার বাইরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস ও নৃত্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু বাংলার বাইরে উল্লেখযোগ্য সাধারণ রঙ্গালয় নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না। পশ্চিম ভারতের একাধিক শহরে যেসব অভিনয় দেখেছি তা রীতিমত হাস্যকর। দক্ষিণ ভারতের অনেক গুণী সাহিত্য, শিল্প ও নৃত্যচর্চায় প্রভূত শক্তি প্রকাশ করেছেন বটে এবং চলচ্চিত্রেও সেখানকার কয়েকজন খ্যাতিমানের নাম করা যায়, কিন্তু আধুনিক কালেও সেখানে দানীবাবু, নির্মলেন্দু, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার, নরেশচন্দ্র মিত্র ও অহীন্দ্র

চৌধুরি প্রভৃতির সঙ্গে তুলনীয় একজন শিল্পীকেও আবিষ্কার করা যাবে না।

এ আমার নিজস্ব মত নয়। কিছুদিন আগে বোম্বাই প্রদেশ থেকে আগত একটি বিদুষী মহিলাকে আমি কলকাতার কোনও কোনও রঙ্গালয়ে নিয়ে গিয়েছিলুম। তিনি সবিস্ময়ে বলেছিলেন, 'অভিনয় যে এমন অপূর্ব হওয়া সম্ভবপর, দক্ষিণ ভারতে কেউ তা কল্পনাতেও আনতে পারবে না। আমাদের দেশে মাঝে মাঝে অভিনয়ের যে আয়োজন হয়, এখানকার তুলনায় তাকে অভিনয় বলাই চলে না।' বিশেষভাবে তাঁকে অভিভূত করেছিল শিশিরকুমারের কৃতিত্ব। তাঁকে তিনি বলেছিলেন, 'আপনি যদি আমাদের দেশে যান, তাহলে সর্বত্রই অভিনন্দন লাভ করবেন।'

এবারে আমরা শিশিরকুমারের কথাই বলব। কিন্তু তাঁর গুণপনা ভালো করে বুঝতে হলে কী-রকম পটভূমিকার উপরে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, সে সম্বন্ধেও কিছু কিছু ইঙ্গিত দেওয়া দরকার।

গিরিশোত্তর কালে প্রায় একযুগের মধ্যে বাংলা রঙ্গালয়ে এমন একজন নূতন শিল্পীকে দেখা যায়নি, যিনি দ্বিতীয়—এমন কি তৃতীয় শ্রেণিতেও স্থানলাভ করতে পারেন। গিরিশ-যুগের গৌরবময় ঐতিহ্য বহন করে তখনও বিদ্যমান ছিলেন যে কয়েকজন বিখ্যাত নট-নটী, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন দানীবাবু, তারকনাথ পালিত, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তারাসুন্দরী।

কিন্তু দানীবাবুর তারকা তখন আর ঊর্ধ্বগামী নয়। তিনি ভালো অভিনয় করেন বটে, কিন্তু যারা আগেকার দানীবাবুকে দেখেছিল, তারা তাঁর অভিনয়ের ভিতর থেকে আর কোনও নূতনত্ব আবিষ্কার করতে পারত না।

তারক পালিত, অপরেশচন্দ্র ও তারাসুন্দরীর শক্তি তখনও অটুট ছিল। আমার তো মনে হয়, নাট্যজীবনের উত্তরার্ধেই অপরেশচন্দ্রের নাট্যনৈপুণ্য উঠেছিল অধিকতর উচ্চশ্রেণিতে। কিন্তু দর্শকদের মধ্যে প্রাকৃতজনরা সে সময়ে দস্তুরমত দলে ভারী হয়ে উঠেছিল। উচ্চশ্রেণির অভিনয়ের চেয়ে নিম্নশ্রেণির নাটকের রোমাঞ্চকর ঘাত-প্রতিঘাতই তাদের আকৃষ্ট করত বেশি মাত্রায়।

ওথেলো নাটকে তারক পালিত, অপরেশচন্দ্র ও তারাসুন্দরী অপূর্ব অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু দর্শকদের সহানুভূতির অভাবে সে নাটকের পরমায়ু হয়েছিল খুব সংক্ষিপ্ত। ইবসেন অবলম্বনে রচিত 'রাখীবন্ধন' নাটকেও তারক পালিত ও তারাসুন্দরীর অভিনয় হয়েছিল যারপরনাই চমৎকার। কিন্তু সে নাটকও দর্শক আকর্ষণ করতে পারেনি। তারপরেই তারক পালিতও রঙ্গালয়ের সংস্রব ত্যাগ করেন। কিন্তু তখনকার দর্শকরা অমন উঁচুদরের একজন শিল্পীরও অভাব অনুভব করেছিল বলে মনে হয়নি। আজকাল কাগজে কাগজে নাট্যজগতের রামা-শ্যামার যা-তা খবর প্রকাশ করা হয়। কিন্তু নাট্যজগতে যাঁর স্থান ছিল ঠিক দানীবাবুর পরেই, সেই তারক পালিত কবে ইহলোক ত্যাগ করেন, সে খবর পর্যন্ত কোনও কাগজেই স্থান পায়নি।

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ। শুনলুম মনোমোহন থিয়েটারে একখানি ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় দেখবার জন্যে কাতারে কাতারে লোক ভেঙে পড়ছে। কৌতূহলী হয়ে দেখতে গেলুম। কিন্তু পুরো এক অঙ্ক পর্যন্ত অভিনয় দেখতে পারলুম না—যেমন নিকৃষ্ট নাট্যকারের রচনা, তেমনই প্রাণহীন অভিনয়! দানীবাবু পর্যন্ত নূতন কোনও চরিত্র সৃষ্টির চেষ্টা না করে নিজের পূর্বসঞ্চিত পণ্যের

(Stock-in-trade) ভিতর থেকে বেছে বেছে যে কলাকৌশলগুলি প্রয়োগ করে গেলেন, তা ঘন ঘন হাততালির দ্বারা অভিনন্দিত হল বটে, কিন্তু তার প্রত্যেকটিই ছিল আমার কাছে সুপরিচিত। বিতৃষ্ণা ভরা মন নিয়ে প্রকাশ্যে নাটক ও অভিনয়ের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করে প্রেক্ষাগার ছেড়ে বেরিয়ে এলুম। মজা দেখলুম এই, জনপ্রাণীও আমার বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রতিবাদ করলে না।

মনোমোহন থিয়েটারের পরেই লোকপ্রিয় ছিল তখন মিনার্ভা থিয়েটার। সেখানে আমার রচিত একখানি নাটিকা অভিনীত হয়েছিল। সেই সূত্রে আমি প্রায়ই রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে আনাগোনা করতুম। অবিলম্বে একখানি নূতন নাটকের মহলা শুরু হবে শুনলুম। একদিন গিয়ে দেখলুম নূতন পালার আপন আপন ভূমিকা নিয়ে মিনার্ভার দুইজন বিখ্যাত নট পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করছেন। একজন আর একজনকে ডেকে বললেন, 'ওহে, পার্ট নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি তো অমুক পালায় অমুক পার্ট করেছ। এ পার্টটাও তারই মতো। সেই পার্টটার মতো করে এটা ছকে নিলেই চলবে।'

কথা শুনে বিস্মিত হলুম। সত্যিকার অভিনেতারা এক একটি পুরাতন ভূমিকাও নূতন নূতন ধারণা (Conception) অনুসারে প্রস্তুত করে তুলতে চেষ্টা করেন, আর এঁরা পুরাতন ভূমিকার ছাঁচে ফেলেই তৈরি করতে চান নূতন ভূমিকা!

আসল কথা, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিনেতার স্বাধীন মস্তিষ্কের সঙ্গে থাকত না অভিনয়ের সম্পর্ক। ধরাবাঁধা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সকলে কাজ করে যেতেন কলের পুতুলের মতো। যেসব নাটকের চরিত্র, ভাব ও ভাষা হত সম্পূর্ণ অভিনব, তখনকার বেশির ভাগ অভিনেতার কাছেই তা হয়ে উঠত অত্যন্ত গুরুপাক।

এইজন্যেই নব্য বাংলার সুধীসমাজের সঙ্গে গিরিশোত্তর যুগের বাংলা রঙ্গালয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠবার সুযোগ হয়নি। শিক্ষিত ও সুরসিক দর্শকরা যে বাংলা রঙ্গালয়কে একেবারেই বয়কট করেছিলেন এমন কথা বলতে পারি না। কিন্তু দলে হালকা ছিলেন তাঁরা এবং দলে ভারী ছিল সেখানে প্রাকৃতজনরাই। প্রায় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা রঙ্গালয়ের অবস্থা ছিল অল্পবিস্তর একই রকম। এ অবস্থা যে হঠাৎ পরিবর্তিত হবে, এমন কোনও লক্ষণ দেখা যায়নি তখন পর্যন্ত।

এই সময়ে কলকাতার ওল্ড ক্লাব নামক শৌখিন নাট্য প্রতিষ্ঠান থেকে স্টার থিয়েটারে একটি সাহায্য রজনীর আয়োজন হয়। শৌখিন শিল্পীদের উপরে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তবু উপরোধে পড়ে একখানি টিকিট কিনি। শুনলুম ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের শিশিরকুমার ভাদুড়ি 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকে ভীম ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। প্রফেসররূপে তাঁর খ্যাতি আগেই আমার কানে গিয়েছিল এবং লোকের মুখে মুখে শুনতুম, তিনি নাকি ভালো অভিনয় করেন। কিন্তু অতি সেকেলে পৌরাণিক নাটক 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'-এ একজন আধুনিক অধ্যাপক এমন কী স্মরণীয় অভিনয় করবেন, সেটুকু ধারণায় আনতে পারলুম না।

যবনিকা উঠল। দেখা গেল প্রথম দৃশ্য। গোড়া থেকেই দৃষ্টি হয়ে উঠল সচকিত, তারপর ক্রমে ক্রমে যা দেখতে ও শুনতে লাগলুম, আমার কাছে ছিল তা একেবারেই অভাবিত ব্যাপার! সেকেলে নাটক 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'কে মনে হল আনকোরা নতুনের মতো। অভিনেতাদের চেহারাই খালি সুন্দর নয়, প্রত্যেকের ভাব, অঙ্গভঙ্গি, সংলাপ—এমন কি প্রবেশ ও প্রস্থানের পদ্ধতি পর্যন্ত কল্পনাতীতরূপে অভিনব। কোথাও বহুপরিচিত কৃত্রিম থিয়েটারি ঢং নেই, প্রয়োগ

কৌশলেও প্রভূত স্বাতন্ত্র্য। এ-রকম উপভোগ্য বিস্ময়ের জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিলুম না, আমার অবস্থা হল আকাশ থেকে সদ্য-পতিতের মতো।

আর একটা ব্যাপার সেইদিনই লক্ষ করলুম। বাল্যকাল থেকেই অভিনয় দেখে আসছি। কিন্তু বাংলা রঙ্গালয়ে কোনওদিনই কোনও পালাতেই প্রত্যেক নট-নটীকে সমানভাবে একসঙ্গে আপন আপন ভূমিকার উপযোগী অভিনয় করতে দেখিনি। এমন কি যে পালায় গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখর প্রভৃতি অতুলনীয় অভিনেতারা থাকতেন, সেখানেও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও অপ্রধান ভূমিকাগুলির অভিনয় প্রায়ই হত নিতান্ত নিম্নশ্রেণির। তাই দেখে দেখে আমরা এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলুম যে কৌতুক বোধ করলেও অসুবিধা বোধ করতুম না। লোকে তখন এক-একজন বিখ্যাত ব্যক্তির উচ্চশ্রেণির অভিনয় দেখলেই পরিতুষ্ট হত, ছোটো ছোটো ভূমিকা নিয়ে কিছুমাত্র মাথা ঘামাত না।

কিন্তু 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'-এর সেই শৌখিন পুনরাভিনয়েই বাংলা রঙ্গালয়ে প্রথম দেখলুম, নাট্যাভিনয়ে প্রত্যেকেই—এমন কি মূক দৌবারিকটি পর্যন্ত ভূমিকার উপযোগী নিখুঁত অভিনয় করে গেল। এও এক আশ্চর্য অগ্রগতি। শিশিরকুমারের যে কোনও নাট্যানুষ্ঠানে আজ পর্যন্ত এই বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। তাঁর আগে আর কেউ এদিকে সমগ্রভাবে দৃষ্টি দেননি। কেবল অর্ধেন্দুশেখর এদিকে দৃষ্টি রাখবার চেষ্টা করতেন বটে, কিন্তু সে চেষ্টাও সম্পূর্ণরূপে সুফল প্রসব করতে পারত না। কিন্তু তাঁরও একটি বিশেষ দুর্বলতা ছিল। গিরিশচন্দ্রের উক্তি থেকে জানতে পারি, অনেক সময় তিনি বড়ো বড়ো ভূমিকাকে অবহেলা করে ছোটো ছোটো ভূমিকা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থাকতেন।

'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'-এর সেই অভিনয়ে শিশিরকুমার যে প্রথম শ্রেণির কলাকুশলতা প্রকাশ করলেন, এতদিন পরে তা নিয়ে আর বিশেষ আলোচনা না করলেও চলবে। কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে ভেবেছিলুম দেখব কোনও নবীন শিক্ষার্থীকে, কিন্তু গিয়ে দেখলুম এক প্রতিভাবান ওস্তাদকে। তারপর সেইদিনই খবর পেলুম, শৌখিন শিল্পীরূপে এই হচ্ছে শিশিরকুমারের শেষ অভিনয়,অদূর ভবিষ্যতেই তিনি আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রকাশ্যভাবে যোগদান করবেন। মন আশান্বিত হয়ে উঠল।

সেদিনকার নাট্যানুষ্ঠানে আরো যাঁদের দেখা পাওয়া গেল, তাঁদের মধ্যেও নির্মলেন্দু লাহিড়ি, বিশ্বনাথ ভাদুড়ি, ললিতমোহন লাহিড়ি ও রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (দৃশ্য-পরিকল্পক) পরে সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগ দিয়ে নাম কিনে গিয়েছেন। এক দলে এতগুলি গুণীর আবির্ভাব! একালে আর কোনও শৌখিন নাট্য প্রতিষ্ঠান এমন গৌরব অর্জন করতে পারেনি।

আমি তখন দৈনিক 'হিন্দুস্থান' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তার পৃষ্ঠায় উচ্ছ্বসিত ভাষায় এই অভিনব শিল্পীসম্প্রদায়কে অভিনন্দন দান করলুম। তার ফলেই আমি শিশিরকুমারের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হই।

অনতিবিলম্বেই 'আলমগির' নাটকের নাম-ভূমিকায় শিশিরকুমারের রঙ্গাবতরণ হল ম্যাডানদের কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে। সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা এতদিন সাধারণ রঙ্গালয়কে বিশেষ প্রীতির চোখে দেখতেন না, সেই বিদ্বজ্জনগণ দলে দলে এসে প্রেক্ষাগৃহকে পরিপূর্ণ করে তুলতে লাগলেন। যাঁরা কখনও সাধারণ রঙ্গালয়ে পদার্পণ করেননি, তাঁদেরও দেখা পাওয়া যেতে লাগল কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে। বাংলা রঙ্গালয়ের জন্যে নূতন এক শ্রেণির দর্শক তৈরি হয়ে উঠল।

শিশিরকুমারের নাট্যসাধনা

১৯২১ খ্রিস্টাব্দ। মনোমোহন থিয়েটারে, স্টার থিয়েটারে ও মিনার্ভা থিয়েটারে যথাক্রমে অভিনীত হচ্ছে 'হিন্দুবীর', 'অযোধ্যার বেগম' ও 'নাদির শাহ' প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক। কী ইতিহাসের দিক দিয়ে এবং কী নাটকত্বের দিক দিয়ে এ-নাটক তিনখানি আদৌ উল্লেখযোগ্য ছিল না—সেই থোড় বড়ি খাড়া, আর খাড়া বড়ি থোড়। তবে প্রধানত স্বর্গীয়া তারাসুন্দরীর অপূর্ব নাট্যনৈপুণ্যের গুণে 'অযোধ্যার বেগম' যথেষ্ট পরিমাণেই রসিক দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল।

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদও ঐতিহাসিক নাটকের চাহিদা আছে দেখে একখানি নাটক রচনা করেছিলেন—'আলমগির'। এ পালাটির মধ্যে পূর্বোক্ত তিনখানি নাটকের চেয়ে উচ্চতর শ্রেণির ভাব, ভাষা, চরিত্রচিত্রণ ও অবস্থা-সঙ্কট (situation) থাকলেও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকাবলীর মধ্যে এখানি উচ্চাসন দাবি করতে পারে না। যতদূর জানি, পালাটি তখনকার কোনও রঙ্গালয়ে পঠিত হয়েছিল, কিন্তু গৃহীত হয় নি। নির্বাচকরা তার মধ্যে কোনও সম্ভাব্যতা আবিষ্কার করতে পারেননি।

এই সময়ে ম্যাডানরা বেঙ্গলি থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি খুলে পরদেশীয় আগা হাসারকে অবলম্বন করে 'অপরাধী কে?' প্রভৃতি পালা বা ছেলেখেলা দেখিয়ে বাঙালিকে ভোলাতে না পেরে হাবুডুবু খেয়ে থই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। উপায় না দেখে তাঁরা (হয়ত মরিয়া হয়েই) প্রবৃত্ত হলেন নূতন পরীক্ষায়। দৃষ্টিপাত করলেন শৌখিন নাট্যজগতের দিকে—সেখানকার নটনায়ক ছিলেন অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ি। তাঁদের আহ্বানে সাধারণ রঙ্গালয়ে এসে নবীন অধ্যাপক শিশিরকুমার প্রথমেই নির্বাচন করলেন প্রাক্তন অধ্যাপক ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগির' নাটক। নাট্যবোদ্ধা শিশিরকুমারের বুঝতে বিলম্ব হল না যে, এই পালাটির মধ্যে উচ্চশ্রেণির অভিনয় কৌশল দেখাবার যথেষ্ট সুযোগ আছে।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর তারিখে মঞ্চস্থ হল 'আলমগির'। সঙ্গে সঙ্গে গিরিশোত্তর যুগের বাংলা নাট্যজগতের অচলায়তনের মধ্যে বিদ্যুতের মতো সঞ্চারিত হয়ে গেল এক অভাবিত প্রতিভার দীপ্তি। প্রথম থেকেই শিশিরকুমার এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। প্রথম থেকেই সকলে উপলব্ধি করতে পারলে, আধুনিক যুগে তিনি হচ্ছেন অতুলনীয়। এবং প্রথম থেকেই বিপুল জনসাধারণ তাঁকে একবাক্যে দান করলে অবিস্মরণীয় অভিনন্দন।

সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল বাংলা রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগৃহের প্রতিবেশ (enviroment)। আগে ছিল সেখানে নিম্নশ্রেণির গ্যালারির দেবতাদের প্রভাব ও উপদ্রব, যাদের জন্যে রঙ্গালয় হয়ে উঠেছিল প্রায় ইতরদের আড্ডাখানার মতো। স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা সেখানে সঙ্কুচিতভাবে যেতেন বটে, কিন্তু তাঁদের প্রাধান্য ছিল নগণ্য। কিন্তু শিশিরকুমারের আবির্ভাবের পরে কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে গিয়ে দেখতুম, ইতরজনরা আত্মগোপন করেছে কোন অন্তরালে এবং অধিকাংশ আসন অধিকার করে আছেন মার্জিতমুখ বিদ্বজ্জনগণ। কেবল কি ভদ্র পুরুষরা? সেই প্রথম দেখলুম দলে দলে ভদ্রমহিলা উপরতলা ছেড়ে একতলায় নেমে এসে পুরুষদের পাশে নির্ভয়ে বসে অভিনয় দর্শন করছেন। এও ছিল কল্পনাতীত।

'আলমগির'-এর পর 'চাণক্য' ও 'রঘুবীর'-এর নাম ভূমিকায়। শিশিরকুমারের প্রতিভা যে অনন্যসাধারণ, এ সম্বন্ধে কারুর আর কোনও সন্দেহই রইল না।

মনোমোহন থিয়েটার তখনও দেওয়ালের লিখন পাঠ করতে পারলে না, কিন্তু মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মিত্র ও অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র রায় ছিলেন শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ব্যক্তি। বাতাস কোনদিকে বইছে, সেটা বুঝতে তাঁদের দেরি লাগল না। তাঁরা ধরনা দিলেন শৌখিন নাট্যজগতের আর দুইজন প্রখ্যাত অভিনেতার কাছে—রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্রর কাছে। তাঁরাও মিনার্ভায় এলেন এবং লাভ করলেন শিক্ষিত দর্শকের অভিনন্দন।

এদিকে শিশিরকুমার উপলব্ধি করতে পারলেন একটি নিশ্চিত সত্য। পরের চাকরি করে দিন গুজরান করতে তিনি আসেননি নাট্যজগতে। নাট্যকলার প্রত্যেকটি বিভাগ নিজের নখদর্পণে রেখে কর্তৃত্ব করবার অধিকার না থাকলে নাট্যজগতে কেউ সৃষ্টি করতে পারে না অখণ্ড, অভিনব সৌন্দর্য। ম্যাডানদের কাছে সে স্বাধীনতা পাবার সম্ভাবনা নেই। তিনি আবার অদৃশ্য হলেন যবনিকার অন্তরালে।

কিছুদিন কাটল চলচ্চিত্র নিয়ে। তাঁর পরিচালানায় দেখানো হল শরৎচন্দ্রের প্রথম চিত্রকাহিনি 'আঁধারে আলো'।

ইতিমধ্যে নবযুগের অগ্রনেতারূপে যে নতুন মার্গের সন্ধান তিনি দিয়ে গিয়েছেন, তার উপরে দেখা যেতে লাগল নব নব মার্গিককে। তাঁকে হারিয়ে ম্যাডানরা অবলম্বন করলেন নির্মলেন্দু লাহিড়িকে। তারপর চোখ ফুটল স্টার থিয়েটারের। আর্ট সম্প্রদায়ের পরিচালনায় সেখানে দেখা দিয়ে তিনকড়ি চক্রবর্তী, শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরি, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইন্দু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তরুণ শিল্পীর দল 'কর্ণার্জুন'-এর মতো নিতান্ত সাধারণ নাটককেও নিজেদের অভিনয়গুণে অসাধারণরূপে সাফল্যমণ্ডিত করে তুললেন। বাংলা রঙ্গালয় যে চায় নব যুগের শিল্পী, শিশিরকুমার সর্বপ্রথমে যদি এ সত্য প্রমাণিত না করতেন, তাহলে আজও হয়ত আমাদের সহ্য করতে হত বালখিল্যদের অত্যাচার। নির্মলেন্দু আমার কাছে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছিলেন, 'শিশিরবাবু আগে না এলে পাবলিক থিয়েটারে যোগ দেবার সাহস আমাদের হত না।' সুতরাং শিশিরকুমারকে মাত্র জনৈক ব্যক্তি না বলে একটি প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করা যায় অনায়াসেই। এ-কথা হয়ত কারুর কারুর পছন্দসই হবে না, কিন্তু একথা অত্যুক্তি নয়। যেকোনও বাংলা রঙ্গালয়ের দিকে তাকালেই দেখা যাবে তাঁর শিষ্য বা প্রশিষ্যের দলকে। জেনে বা না জেনে অনেকেই করেন তাঁরই অনুসরণ।

সেটা ঠিক কোন বৎসর স্মরণ হচ্ছে না, তবে ১৯২৩ কি ২৪ খ্রিস্টাব্দ। ইডেন গার্ডেনে বসে মস্ত এক প্রদর্শনী। কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে শিশিরকুমার আবার সেখানে পাদপ্রদীপের আলোকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পান। তিনি ললিতমোহন লাহিড়ি, বিশ্বনাথ ভাদুড়ি, যোগেশচন্দ্র চৌধুরি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রীরবি রায় ও জীবন গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি আরও অনেককে নিয়ে গড়ে তুললেন একটি নূতন সম্প্রদায় এবং নাটক নির্বাচন করলেন দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'। প্রথমে নির্মলেন্দু লাহিড়িও সম্প্রদায়ে ছিলেন, কিন্তু পারিবারিক দুর্ঘটনায় (বোধ করি পিতৃবিয়োগ) শেষ পর্যন্ত অভিনয়ে যোগ দিতে পারেননি—কেবল একদিন কি দুইদিন শম্বুকের ভূমিকায় মহলা দিয়ে গিয়েছিলেন।

এবার নাট্যাচার্য ও পরিচালকরূপে শিশিরকুমার অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি বিভাগে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে কাজ করবার ক্ষেত্র পেলেন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই। ফলও পাওয়া গেল হাতে হাতেই। অভিনয় ও প্রয়োগনৈপুণ্য হল এমন উচ্চশ্রেণির যে, রাত্রির পর রাত্রি ধরে প্রেক্ষাগৃহে আর

তিল ধারণের ঠাঁই থাকত না। প্রদর্শনী শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিনয় বন্ধ হয়নি। বেশ বোঝা গেল, সাধারণ রঙ্গালয়ে অল্পদিন অভিনয় করবার পর দীর্ঘকাল চোখের আড়ালে থেকেও শিশিরকুমার জনসাধারণের মনের আড়ালে যাননি। সবাই তাঁকে চায়? তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। স্থির করলেন দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নিয়ে স্বাধীনভাবেই আবার দেখা দেবেন সাধারণ রঙ্গালয়ে। ভাড়া নেওয়া হল আলফ্রেড থিয়েটার।

দুর্ভাগ্যক্রমে 'সীতা'র অভিনয়স্বত্ব তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল। কিন্তু শিশিরকুমার হতাশ হলেন না। যোগেশচন্দ্র চৌধুরিকে নিয়ে প্রস্তুত করতে লাগলেন রাম-সীতার পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে নতুন একটি পালা। 'সীতা'কে সবদিক দিয়ে অভিনব ও নবযুগের উপযোগী করে তোলবার জন্যে শিশিরকুমার প্রস্তুত হতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল আলফ্রেড থিয়েটারের অভিনয়। সেইটেই হল কুবিখ্যাত মনোমোহন থিয়েটার তথা পুরাতন দলের পতনের প্রধান হেতু।

ব্যাপারটা একটু খুলেই বলি। আলমগিরের ভূমিকায় শিশিরকুমারের প্রথম আবির্ভাবের সময়েই লোকের চোখ ফোটে সর্বপ্রথমে। প্রাকৃতজন ছাড়া আর সকলেই উপলব্ধি করতে পারে যে গিরিশোত্তর যুগের অভিনয় এদেশে আর চলবে না। মনোমোহন ছিল ওই শ্রেণির অভিনয়ের প্রধান কেন্দ্র। তারপর শিশিরকুমার গেলেন অজ্ঞাতবাসে। কিন্তু মনোমোহনের পাণ্ডারা আশ্বস্তির নিশ্বাস ছাড়তে না ছাড়তে রঙ্গভূমে প্রবেশ করলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ি (বেঙ্গলি থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি) ও 'কর্ণার্জুন'-এর নবাগত শিল্পীবৃন্দ (আর্ট থিয়েটার লিঃ)। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের জনপ্রিয়তা হয়েছিল যথেষ্ট। কিন্তু মনোমোহনও নেববার আগে আর একবার জ্বলে উঠল তৈলহীন প্রদীপের মতো। 'বঙ্গে বর্গি' (ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র এই পালাটির নাম দিয়েছিলেন 'বঙ্গে মুর্গি') নামক 'অখাদ্য' নাটকও দানীবাবুর লম্ফঝম্প ও তর্জন-গর্জনের মহিমায় গ্যালারির দেবতাদের অসামান্য দয়াদাক্ষিণ্য লাভ করে। মনোমোহনের অধঃপতনের মুখে সেই পালাটিই হল ঠেকোর মতো, তার সাহায্যেই সে আর্ট থিয়েটারের নবাগতদের প্র[illegible]ন্দ্বিতা কোনওরকমে সামলে নিতে পারলে। তারপর সে খুললে 'আলেকজান্ডার'। কিন্তু তরুণ দিগ্বিজয়ীর ভূমিকায় জরাজর্জর দানীবাবুকে কেউ দেখতে চাইলে না। এই সময়েই শিশিরকুমারে পুনরাগমন। ওদিকে আর্ট সম্প্রদায় এবং এদিকে শিশির সম্প্রদায়—দুইদিকে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী, মনোমোহনের নাভিশ্বাস উঠতে বিলম্ব হল না। দীপ-নির্বাণের আগে আবার সে খুললে নূতন নাটক 'ললিতাদিত্য'। কিন্তু তবু সে বাঁচতে পারলে না। সেখানে আবার নূতন আসর পেতে যবনিকা তুললেন শিশিরকুমার। অভিনীত হল 'সীতা'—১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ই আগস্ট তারিখে।

ওই তারিখটি বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে সোনার হরফে লিখে রাখবার মতো। কারণ 'সীতা' নাট্যাভিনয়ে অভিনয় ও প্রয়োগ-নৈপুণ্যের যে সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ দেখা গিয়েছিল, আগে কেউ তা কল্পনাতেও আনতে পারেনি, এমন কি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তার অভিনয়ে নূতনত্ব, তার দৃশ্যসংস্থানে নূতনত্ব, তার গানের সুরে নূতনত্ব, তার নৃত্যপরিকল্পনায় নূতনত্ব। অল্পবিস্তর দুর্বলতা ছিল কেবল নাট্যকারের রচনায়, কিন্তু শিশিরকুমারের অপূর্ব আবৃত্তির ইন্দ্রজালে অভিভূত হয়ে সে দুর্বলতাটুকু সাধারণ দর্শকরা উপলব্ধি করতে পারত না। শ্রেষ্ঠ কবি, শিল্পী, পণ্ডিত, দেশনেতা ও মহারাজা একযোগে 'সীতা' নাট্যাভিনয়ের জন্যে উচ্ছ্বসিত ভাষায় করেছেন প্রশস্তি রচনা। সেইদিন থেকে বাংলা নাট্যজগতে এসেছে সত্যকার যুগান্তর এবং সবাই পেয়েছে সম্যকভাবে শিশিরপ্রতিভার পরিচয়।

তারপর একে একে অভিনীত হতে লাগল বিচিত্র সব নাটকের পর নাটক—'পাষাণী', 'পুণ্ডরীক', 'ভীষ্ম', 'জনা', 'দিগ্বিজয়ী', 'ষোড়শী', 'শাজাহান', 'বির্সজন', 'শেষরক্ষা', 'প্রফুল্ল' ও 'তপতী' প্রভৃতি এবং প্রত্যেক পালাতেই শিশিরকুমার দেখালেন নূতন প্রয়োগনৈপুণ্য ও নানা ভূমিকার নূতন নূতন ধারণা। তারপরেও কত নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন এবং এখনও করছেন, কিন্তু এমনই অসাধারণ তাঁর তারুণ্য যে এই প্রাচীন বয়সেও তাঁর শক্তি এতটুকু জীর্ণ না হয়ে অধিকতর প্রবল হয়ে পথ কেটে নেয় নব নব পরিকল্পনার ক্ষেত্রে। সেসব কথা এখানে বলা বাহুল্য। আমি আজ তাঁর অভিনয়ের সমালোচনা করতে চাই না, কারণ সে কাজ করেছি বিভিন্ন পত্রিকায় বারংবার। এখানে দেওয়া হল কেবল তাঁর কর্মজীবনের একটি রেখা চিত্র।

রঙ্গমঞ্চের উপরে অভিনেতা শিশিরকুমারের প্রকৃষ্ট পরিচয় পেয়েছেন সকলেই। কিন্তু যবনিকার অন্তরালে বাস করেন যে শিল্পী, সাহিত্যরসিক, সংলাপপটু ও নাট্যাচার্য শিশিরকুমার, তাঁকে দেখবার ও জানবার সুযোগ হয়নি বাইরের লোকের। এইবারে সেই কথা বলে সাঙ্গ করব বর্তমান প্রসঙ্গ।

নেপথ্যে শিশিরকুমার

শিশিরকুমার যে সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করবেন সেকথা তখন পাকা হয়ে গিয়েছে। একদিন বৈকালে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে স্বর্গীয় বন্ধুবর গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের বৈঠকখানায় বসে আছি। গজেনবাবু ছিলেন অত্যন্ত সদালাপী ও সামাজিক মানুষ। তখনকার সাহিত্য সমাজের সকলেই তাঁকে ভালবাসতেন এবং তাঁর বৈঠকে প্রত্যহ এসে আসন গ্রহণ করতেন প্রবীণ ও নবীন বহু সাহিত্যিক ও অন্যান্য শ্রেণির শিল্পী। তিনি ছিলেন সকলেরই 'গজেনদা'।

সেইখানেই এসে উপস্থিত হলেন গজেনদার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীরামগোপাল ঘোষের সঙ্গে শিশিরকুমার, ছাত্রজীবনে ওঁরা দুজনে ছিলেন সহপাঠী। প্রথমেই চিনি চিনি করেও ভালো করে শিশিরকুমারকে চিনতে পারলুম না, কারণ তার আগে তাঁকে একবার মাত্র দেখেছিলুম 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাট্যানুষ্ঠানে অভিনেতার ছদ্মবেশে।

কিন্তু তাঁর চেহারা যে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, সে-কথা বলাই বাহুল্য, —তাঁর মূর্তি আজও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার কারণ কেবল দৈহিক সৌন্দর্য নয়, শিশিরকুমারেরও চেয়ে সুপুরুষ আমি অনেক দেখেছি। কিন্তু তাঁর মুখে-চোখে যে ধী, প্রতিভা ও সংস্কৃতির স্পষ্ট ছাপ আছে, সাধারণত তা দুর্লভ। দেখলেই মনে হয়, মানুষটি গুণী, অনন্যসাধারণ।

আমরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হলুম। কথা আরম্ভ করলেন তিনি সাধারণভাবেই। বললেন, 'হেমেন্দ্রবাবু, 'হিন্দুস্থান' পত্রিকায় 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'-এর যে সমালোচনা বেরিয়েছে, শুনলুম সেটি আপনার লেখা। আমার ভালো লেগেছে।'

জবাবে কী বলেছিলুম মনে নেই। 'আপনার ভালো লেগেছে শুনে সুখী হলুম'—হয়ত বলেছিলুম এই রকম কোনও কথাই।

তারপর শিশিরকুমার বেশ খানিকক্ষণ ধরে বসে বসে বাক্যালাপ করে গেলেন। প্রথম দিনেই উপলব্ধি করতে পারলুম, তিনি অনায়াসেই অভিনেতা না হয়ে সাহিত্যিক হতে পারতেন। কারণ তাঁর মুখ দিয়ে অনর্গল নির্গত হতে লাগল কাব্য ও আর্টের কথা! গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল বসুর

সংলাপ শুনেছি। গিরিশচন্দ্রের সংলাপ সংবলিত একখানি পুস্তকও প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের সংলাপ ছিল জ্ঞানগর্ভ। কিন্তু তাঁরা দুজনেই ছিলেন গ্রন্থকার। সুতরাং তাঁদের পক্ষে সাহিত্যিকদের মতো আলাপ করা সম্ভবপরই ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ বিখ্যাত নটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযোগ স্থাপন করে দেখেছি, তাঁরা সাহিত্যিকদের মতো আলাপ করবেন কী, তাঁদের অনেকেরই স্বদেশী-বিদেশী সাহিত্যরসের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কই নেই। এমন সব নামজাদা অভিনেতাও দেখেছি, যাঁরা পাশ্চাত্য সাহিত্যের কথা দূরে থাক, ঘরের জিনিস রবীন্দ্ররচনারও সঙ্গে পরিচিত নন। 'শেষের কবিতা' সামনে ধরলে তাঁরা চোখে সরষে ফুল দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়বেন। একাধিক গণ্ডমূর্খও এখানে প্রথম শ্রেণির শিল্পী বলে অভিনন্দিত হয়েছেন। নাটকও সাহিত্যের অন্তর্গত। সাহিত্যরসে বঞ্চিত হয়েও নাট্যাভিনয়ে তাঁরা নাম কিনেছেন হয়ত কেবল গুরুকৃপাতেই। তাঁদের কাছে গিয়ে শুনেছি শুধু আজেবাজে গালগল্প।

এমন কি, কাব্য ও ললিতকলা নিয়ে শিশিরকুমারের মতো মুখে মুখে বিচিত্র আলোচনা করতে পারেন, এরকম সাহিত্যিকও আমি খুবই কম দেখেছি। সাধারণ কথায় তিনি বড়ো কান পাতেন না, অশ্রান্তভাবে বলতে ও শুনতে চান কেবল আর্ট ও সাহিত্যের যেকোনও প্রসঙ্গ এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই আবৃত্তি করে যান স্বদেশী ও বিদেশী কবিদের বচনের পর বচন। কেবল তাঁর অভিনয় দেখা নয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ করাও একটি পরম উপভোগ্য আনন্দ। এই প্রাচীন বয়সেও এবং রঙ্গালয় সম্পর্কীয় নানা দুশ্চিন্তায় কাতর হয়েও তাঁর কাব্যগত শিল্পীর প্রাণ একটুও শ্রান্ত বা অন্যমনা হয়ে পড়েনি,—গানের পাখি যেমন গান গাইবেই, শিশিরকুমারের রসনাও তেমনই শোনাবেই শোনাবে শিল্প ও সাহিত্যের বাণী। নির্জন বাড়িতে আমি নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করি। সেখানে যখন মাঝে মাঝে শিশিরকুমারের আবির্ভাব হয়, আমার মনে জাগে অপূর্ব আনন্দের প্রত্যাশা। নির্জনতা পরিণত হয় যেন জনসভায়—কানে শুনি কত গুণীর, কত কবির ভাষা। শিশিরকুমার একাই একশো।

রবীন্দ্রনাথ কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে অতিশয় ভালবাসতেন, তাঁর অকালমৃত্যু তাঁকে অভিভূত করেছিল। তাই প্রাণের দরদ ঢেলে রচনা করেছিলেন অসাধারণ ও সুদীর্ঘ একটি শোক কবিতা। কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরিতে সত্যেন্দ্রনাথের জন্যে একটি জনবহুল শোকসভার অনুষ্ঠান হয় এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত থেকে ভাবগম্ভীর উদাত্তকণ্ঠে সেই কবিতাটি পাঠ করেন। সভাস্থলে শ্রোতা ছিলেন অসংখ্য সাহিত্যিক ও বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে শিশিরকুমারও। সকলেরই মনকে একান্ত অভিভূত করে তুলেছিল মৃত কবির উদ্দেশ্যে কবিগুরুর সেই অপূর্ব ভাষণ।

সভাভঙ্গের পর আমাদের সঙ্গে শিশিরকুমারও বাইরে এসে দাঁড়ালেন। তারপর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ভাই, আমার জন্যে রবীন্দ্রনাথ যদি এই রকম একটি কবিতা রচনা করেন, তাহলে এখনই আমি চলন্ত মোটরের তলায় চাপা পড়ে মরতে রাজি আছি।' বাংলা দেশের আর কোনও অভিনেতার—এমন কী সাহিত্যিকেরও মুখ দিয়ে নির্গত হত না এমন উক্তি। এর মধ্যে একসঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর রচনার অতুলনীয়তা সম্বন্ধে কাব্যগতপ্রাণ শিশিরকুমারের মনের ভাব। একসঙ্গে সমালোচন ও মহাপুরুষার্চন।

শিশিরকুমার অভিনেতা, সুতরাং নাট্যজগৎ নিয়েই তাঁর একান্তভাবে নিযুক্ত হয়ে থাকবার কথা। যেমন ছিলেন গিরিশচন্দ্র। তিনি সামাজিক ও সাহিত্যিক বৈঠকে বা সভায় যেতে চাইতেন না। কিন্তু শিশিরকুমারের প্রকৃতিতে দেখি এর বৈপরীত্য। নাট্যসাধনাকেই জীবনের প্রধান সাধনা

করে তুলেছেন বটে, কিন্তু রঙ্গালয়ের প্রতিবেশ তাঁকে সর্বক্ষণ খুশি করে রাখতে পারে না—তাঁর চিত্ত কামনা করে সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সঙ্গ।

অধুনালুপ্ত 'ভারতী'র বৈঠক এখনকার সাহিত্য সমাজে বিখ্যাত হয়ে আছে। সেখানে যাঁরা ওঠা-বসা করতেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন রবীন্দ্রপন্থী সাহিত্যিক। শেষের দিকে সেই বৈঠকে যখন কতকটা মন্দা পড়ে এসেছে, তখনই শিশিরকুমারের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। তখন সকালে আসর বসত 'ভারতী' কার্যালয়ে এবং সন্ধ্যার সময়ে বসত গজেনদার বাড়িতে। শিশিরকুমার প্রায়ই হাজিরা দিতেন দুই বৈঠকেই এবং প্রধান কাব্যরস পরিবেশকের ভার গ্রহণ করতেন সংলাপপটু শিশিরকুমারই। যে কোনও সাহিত্যিকের সঙ্গেই তিনি অনায়াসে ভাব বিনিময় করতে পারতেন। হাসি, গল্প ও কাব্যপ্রসঙ্গ নিয়ে কেটে গিয়েছে সুদূর অতীতের যে সুমধুর প্রহরগুলি, আর তা ফিরে আসবে না বটে, কিন্তু তাদের স্মরণ করলে মনের মধ্যে আজও শুনতে পাই মাধুর্যের সঙ্গীত।

এই সাহিত্যপ্রীতির জন্যে শিশিরকুমারও চিরদিন আকৃষ্ট করেছেন সাহিত্যিকদের। তাঁর 'নাট্যমন্দির' হয়ে উঠেছিল সাহিত্যিকদের অন্যতম বৈঠকের মতো। অভিনয় বা মহলা যখন বন্ধ হত, শুরু হত তাঁদের আলাপ-আলোচনা। অনেক রাতের আগে আসর ভাঙত না। তখনকার বৈঠকধারীদের কেউ কেউ এখন স্বর্গগত। কেউ কেউ জরা বা ব্যাধিগ্রস্ত এবং কেউ কেউ জীবনসংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত। আর কোনও বৈঠকেই যাবার শক্তি বা সময় তাঁদের নেই। তাঁদের অভাব শিশিরকুমার অনুভব করেন নিশ্চয়ই, তাই মাঝে মাঝে নিজেই পুরাতন বন্ধুদের কাছে এসে দু-দণ্ড হাঁফ ছেড়ে যান।

শিশিরকুমারের মতো অধ্যয়নশীল ব্যক্তি আমি এ যুগের রঙ্গালয়ে আর একজনও দেখিনি। সাহিত্য জগতেও তাঁর মতো পড়ুয়ার সংখ্যা বেশি নয়। বই পড়া তাঁর এক মস্ত নেশার মতো, বই বিনা তিনি থাকতে পারেন না। নতুন ভালো বই দেখলেই তখনই তা কেনবার জন্যে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। মাঝে মাঝে বলেন, 'হাতে যদি আরও বেশি টাকা পাই, তাহলে মনের সাধে আরও বেশি বই কিনতে পারি।'

একদিন কোনও অতি বিখ্যাত ও প্রবীণ নট (এখন স্বর্গত) আমাকে বললেন, 'আমাকে একখানা পড়বার মতো বই পড়তে দিতে পার?'

আমি শুধালুম, 'পড়বার বই মানে তুমি কী বলতে চাও?'

তিনি বললেন, 'যা পড়লে নতুন কিছু শিখতে পারা যায়।'

আমি বললুম, 'অভিনয় সম্পর্কীয় বই?'

তিনি বললেন, 'না, অভিনয় সম্বন্ধে আমার আর নতুন কিছু শেখবার নেই।'

শুনে বিস্মিত হলুম। অভিনেতারা হচ্ছেন শিল্পী এবং সত্যকার শিল্পীরা আমরণ নিজেদের শিক্ষার্থী বলেই মনে করেন—'আমার আর নতুন কিছু শেখবার নেই' এমন দম্ভোক্তি তাঁদের মুখে শোভা পায় না। শিশিরকুমার প্রাচীন ও বিদগ্ধ এবং ভারতীয় নাট্যজগতের সর্বোচ্চ আসন অধিকার করে আছেন, কিন্তু এমন অশোভন উক্তি তাঁর মুখে আমি কোনওদিনই শ্রবণ করিনি। নাট্যকলা সম্পর্কীয় নতুন কোনও বইয়ের নাম শুনলে তা পাঠ করবার জন্যে আজও তিনি শিক্ষার্থীর মতোই আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। সেইজন্যে নাট্যশাস্ত্রে তাঁর মতো হালনাগাদ বা up-to-date ব্যক্তি আমি আর একজনও দেখিনি।

কথাসাহিত্য, নাট্যসাহিত্য, কাব্যসাহিত্য ও চারুকলা সম্পর্কীয় গ্রন্থ পাঠ করবার আগ্রহই

তাঁর বিপুল নয়, যেমন তিনি অধ্যয়নশীল, সেই সঙ্গে তেমনই চিন্তাশীলও। তিনি ভাবতে ভাবতে পড়েন এবং পড়তে পড়তে ভাবেন এবং পাঠশেষে যে মতামত প্রকাশ করেন, তা শ্রেষ্ঠ সমালোচকেরই উপযোগী।

সাধারণ দর্শকরা হয়ত উপলব্ধি করতে পারেন না, কিন্তু শিশিরকুমারের প্রত্যেক ভূমিকাভিনয়ের মধ্যে থাকে তাঁর এই তীক্ষ্ণ মনীষার প্রভাব। অভিনেতা আছেন দুই রকম—আত্মহারা ও সচেতন। দানীবাবু (ও অমৃতলাল মিত্র) প্রমুখ অভিনেতারা ভূমিকার মধ্যে ডুবে গিয়ে বাঁধা সুরে ভূমিকার কথাগুলি উচ্চারণ করে যেতেন। কিন্তু শিশিরকুমারের কাছে বাঁধা সুর বলে কিছু নেই, তাঁর কণ্ঠস্বর সর্বদাই বিভিন্ন শব্দের বিভিন্ন অর্থানুসরণ করেই পরিবর্তিত হয় এবং বুঝতে বিলম্ব হয় না যে বাঁধা সুরকে আশ্রয় করে ভূমিকার শব্দগত অর্থ ভুলে তিনি আত্মহারা হয়ে যাননি, অভিনয়কালে তাঁর মস্তিষ্ক হয়ে আছে রীতিমত সক্রিয়। 'প্রফুল্ল' ও 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে যোগেশ ও চাণক্যের ভূমিকায় দানীবাবু ও শিশিরকুমারের অভিনয়ের এই পার্থক্য খুব সহজেই ধরা পড়ত।

এই কারণেই শিশিরকুমার হচ্ছেন আদর্শ নাট্যাচার্য। তাঁর কাছে ঐতিহ্য বলে কিছু নেই। পরম্পরাগত উপদেশবাক্য অনুসারে তিনি কোনও কাজ করেন না। প্রত্যেক নূতন পালার নিজস্ব মূল সুর অবলম্বন করে এক-একখানি নাটক ও তার বিভিন্ন ভূমিকা তিনি বিভিন্নভাবে আপন বিশেষ ধারণা অনুযায়ী তৈরি করে তোলেন। এবং সেইজন্যেই শিশিরকুমারের শিষ্যরা তাঁর কাছে শিক্ষা পেয়ে শিক্ষার্থী হয়েও প্রকাশ করতে পারেন উচ্চশ্রেণির নাট্য-নৈপুণ্য। অভিনেতা শিশিরকুমারকে সকলেই দেখেন। কিন্তু মহলার সময়ে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার হচ্ছেন অধিকতর চিত্তাকর্ষক। কারণ সেই মহলা দেবার চমৎকার পদ্ধতির মধ্যেই ধরা পড়ে তাঁর অভিনয়ের যথার্থ তাৎপর্য।

আজকাল চারিদিকেই জাতীয় রঙ্গালয় নিয়ে অরণ্যে রোদন শুনতে পাই। এখানে জাতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করবার মতো প্রতিভা ও বহুদর্শিতা আছে একমাত্র শিশিরকুমারেরই। কিন্তু তথাকথিত অরণ্যে রোদনের মধ্যে তাঁর নাম কেউ করে না। তাই যিনি দুই হাত ভরে দান করতে পারতেন, নিজের ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি আমাদের অধিকতর মহার্ঘ ঐশ্বর্য দিয়ে দিতে পারলেন না।

কল্লোলের দল

'কল্লোল যুগ' নামে একখানি বই বেরিয়েছে, লেখক হচ্ছেন শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। বইখানি ভালো লাগল। পূর্বস্মৃতির কাহিনি ভালো করে গুছিয়ে বলতে পারলে বরাবরই উপভোগ্য হয়ে ওঠে। মানুষ যৌবনের সীমানা পেরিয়ে যতই প্রাচীনতার দিকে অগ্রসর হয়, ততই তার মন ফিরে আসে অতীতের দিকে। কারণ অতীতে থাকে সুখের শৈশব, উৎসবমুখর যৌবন। এমন কি অতীতের অশ্রুও হয় না তেমন বেদনাদায়ক।

প্রাচীনদের ভবিষ্যতে থাকে মৃত্যুর দুঃস্বপ্ন। বর্তমানকে নিয়েও হয় না তারা পরিতুষ্ট। তাই সর্বদেশের সর্বকালের বৃদ্ধেরাই চিরদিনই অতীতের দিকে ফিরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ওঠে—'হায় রে সোনার সেকাল!' সকলেই এ বিলাপ আগেও শুনেছে, আজও শুনছে এবং ভবিষ্যতেও শুনবে। এই অতীত প্রীতির ফলেই হয় স্মৃতিকথার জন্ম।

কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে, আমাদের দেশে 'কল্লোল যুগ' বলে কোনও যুগের অস্তিত্ব ছিল কি? ক্ষুদ্র পত্রিকা 'কল্লোল'-এর পরমায়ু দীর্ঘস্থায়ী হয়নি এবং তাকে যুগস্রষ্টা বলেও গ্রহণ করা চলে না। 'কল্লোল'-এর সময়েই তার সমধর্মী আর একখানি পত্রিকা ছিল—'কালি-কলম'। 'ভারতী' বেঁচে থাকতে থাকতেই 'কল্লোল'-এর জন্ম এবং 'ভারতী'র আসরে আর একদল শক্তিশালী আধুনিক সাহিত্যিক সাহিত্য সাধনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের সামনেও ছিল বিশেষ এক আদর্শ। উপরন্তু 'শনিবারের চিঠি'তেও আর এক শ্রেণির সুলেখক নিয়মিতভাবে লেখনীচালনা করতেন (এই সঙ্গে 'প্রবাসী', 'মানসী ও মর্মবাণী' 'মাসিক বসুমতী' ও 'ভারতবর্ষ'-এর নাম না করলেও চলে, কারণ ওগুলি ছিল সব দলের পত্রিকা)।

মোট কথা হচ্ছে এই, পূর্বকথিত কোনও পত্রিকাকেই নবযুগের প্রবর্তক বলে গণ্য করা যায় না। তাদের কারুর আদর্শ ও রচনাভঙ্গিই আজ পর্যন্ত সর্বজনীন হতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের জীবনকালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে তারা প্রত্যেকেই লালিত হয়েছে রবীন্দ্র প্রভাবের মধ্যেই। সুতরাং আসলে সেটা ছিল রবীন্দ্রযুগ। ছিল বলি কেন, এখনও আমরা রবীন্দ্রযুগের প্রভাবের দ্বারাই আচ্ছন্ন হয়ে আছি। রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করা তো দূরের কথা, অদ্যাবধি আর কেউ তাঁর কাছাকাছি গিয়েও হাজির হতে পারেননি। অতি আধুনিক লেখক যাযাবর রচিত 'দৃষ্টিপাত' অতিশয় লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং 'দৃষ্টিপাত' যে সার্থক রচনা, সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নেই। কিন্তু তার মধ্যেও সর্বত্র পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের প্রভূত প্রভাব! রবীন্দ্র সাহিত্য হচ্ছে মহানদের মতো। 'ভারতী', 'কল্লোল', 'কালি-কলম' ও 'শনিবারের চিঠি' প্রভৃতি হচ্ছে সেই মহানদ থেকে নির্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখার মতো, কিছু দূর অগ্রসর হয়েই যারা হারিয়ে যায়, শুকিয়ে যায় বালুকাবিতানের ভিতরে! 'কল্লোল যুগ' হচ্ছে অশ্রুতপূর্ব কথা। তবে হ্যাঁ, 'কল্লোল'-এর একটি নিজস্ব দল ছিল বটে এবং সে দল গঠিত হয়েছিল কয়েকজন রচনাকুশল তরুণ সাহিত্যিকের দ্বারা। আজ তাঁরা চল্লিশের কোঠা পেরিয়ে পঞ্চাশের কোঠায় চলাফেরা করছেন এবং সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে কিনেছেন যথেষ্ট সুনাম।

সেই দলের নেতা ছিলেন স্বর্গীয় দীনেশরঞ্জন দাস। দীনেশ আমার বাল্যবন্ধু ও সমবয়সী। আমি যখন এগারো-বারো বছর বয়সের বালক, তখন আমার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়িতে মাঝে মাঝে তাঁর দেখা পেতুম। তারপর সুদীর্ঘকাল আর দীনেশের দেখা পাইনি, তাঁর কথা আমি প্রায় ভুলে গিয়েছিলুম বললেও অত্যুক্তি হবে না।

দুই যুগেরও বেশি কাল কেটে গেল। হঠাৎ খবর পেলুম দীনেশ একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। আমাদের 'ভারতী' কার্যালয়ের অনতিদূরে অবস্থিত কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের ছোট্ট একটি কার্যালয় থেকে ছোট্ট কাগজ 'কল্লোল' প্রকাশিত হত। দীনেশের সঙ্গে দেখাও হল এবং দুইজনেই আবার ধরলুম পুরাতন বন্ধুত্বের খেই। দুই-একদিন 'কল্লোল' কার্যালয়েও হাজিরা দিলুম, কিন্তু সেখানকার আসর তখনও ভালো করে জমে ওঠেনি। এ হচ্ছে ১৯২৪ কি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের কথা।

সেই সময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পরলোকগমন করেন। দীনেশের অনুরোধে দেশবন্ধুর তিরোধান উপলক্ষে একটি কবিতা রচনা করে 'কল্লোল'-এর কার্যালয়ে দিয়ে এলুম। 'কল্লোল'-এর জন্যে সেই আমার প্রথম রচনা। তার কিছুকাল পরে 'কল্লোল'-এর কার্যালয় উঠে যায় পটুয়াটোলায় এবং পত্রিকার আকারও কিছু বাড়ে। তার পৃষ্ঠায় ছাপা হয় আমার কয়েকটি কবিতা এবং দুই-একটি ছোটো গল্প। 'কল্লোল' কার্যালয়েও গিয়ে মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছি। সে ঘরখানিও ছোটো

এবং সেখানকার বৈঠকও ছিল না আমাদের 'ভারতী'র মতো বড়ো। কিন্তু সেই অপ্রশস্ত ঘরে প্রশস্ত চিত্ত নিয়ে যে কয়েকটি তরুণ হামেশাই ওঠাবসা করতেন, তাঁদের চক্ষে ছিল মনীষার দীপ্তি, তাঁদের মুখে ছিল সাহিত্যের বাণী এবং তাঁদের মনেও ছিল বোধ করি নিজেদের ভবিষ্য সম্ভাবনা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। অপরিসর জায়গার মধ্যে কোনওক্রমে নিজেদের কুলিয়ে নিয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে কিংবা সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তাঁরা করতেন কলালাপ, করতেন গল্প-গুজব, করতেন হাস্য-পরিহাস। জীবনের বন্ধুর যাত্রাপথে অনেকদূর এগিয়ে এসেও আজও তাঁরা নিশ্চয় ভুলতে পারেননি পিছনে পড়ে থাকা আশায়-আনন্দে রঙিন সেই সুমধুর দিনগুলিকে। অন্তত অচিন্ত্যকুমার যে ভুলতে পারেননি তার নজির হচ্ছে তাঁর 'কল্লোল যুগ'।

'কল্লোল' পয়সা খরচ করে বিজ্ঞাপন দিত না বটে, কিন্তু তার নাম বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত করবার জন্যে প্রদীপ্ত উৎসাহে নিযুক্ত হয়েছিলেন 'শনিবারের চিঠি'র দল। তার ফলে লাভবান হয়েছিল উভয় পক্ষই। বেড়ে উঠেছিল দুই পত্রিকারই গ্রাহক-সংখ্যা। নানা রচনায় স্থলবিশেষ উদ্ধার করে 'শনিবারের চিঠি' প্রমাণিত করতে চাইলে, 'কল্লোল' হচ্ছে একখানা অপাঠ্য, অতি অশ্লীল পত্রিকা। বঙ্কিমচন্দ্র কোথায় যেন এই মর্মে বলেছিলেন যে কোনও কোনও দুরন্ত ছেলে ভূতের ভয় দেখালে ভয় পায় না, উল্টে ভূতকে দেখবার জন্যেই আগ্রহ প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় অনেকটা সেই রকমই। 'কল্লোল'-এ অশ্লীল গল্প বেরোয় শুনে অনেকেই তা পাঠ করবার জন্যে ট্যাঁকের কড়ি ফেলতে লাগল। সুতরাং 'শনিবারের চিঠি'র গালাগালি 'কল্লোল'-এর পক্ষে হয়ে দাঁড়াল শাপে বরের মতোই।

'শনিবারের চিঠি'-র অভিযোগ নিয়ে আমি এখানে মাথা ঘামাতে চাই না। অশ্লীলতার জন্যে 'কল্লোল'কে আক্রমণ হয়তো অন্য কোনও উদ্দেশ্য সাধনের একটা উপলক্ষ মাত্র। কারণ তথাকথিত অশ্লীলতার আশ্রয় না নিলেও আক্রান্ত হতেন 'কল্লোল'-এর লেখকরা। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিজের কথাই বলতে পারি। 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত আমার কোনও কোনও কবিতাও ধিক্কৃত হয়েছে 'শনিবারের চিঠি'তে। কিন্তু অশ্লীলতার জন্যে এ পরিবাদ নয়, আমি আক্রান্ত হয়েছি কেবল 'কল্লোল'-এর লেখক বলেই।

কী যে শ্লীল, আর কী যে অশ্লীল, তার মানদণ্ড নির্ধারণ করা সহজ নয়। সমস্তই নির্ভর করে এক এক শ্রেণির পাঠকের মানসিক প্রতিক্রিয়ার উপরে। 'ম্যাডাম বোভারি' রচনা করে অশ্লীলতার জন্যে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হয়েছিলেন ফরাসি সাহিত্যাচার্য ফ্লবেয়ার। কিন্তু সেই 'ম্যাডাম বোভারই'ই আজ স্থান পেয়েছে বিশ্বসাহিত্যে। এমন আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

কিন্তু তখনকার 'কল্লোল'-এর সেই নবীন লেখকরা আজ হয়েছেন প্রবীণ। হয়তো আগে তাঁদের কারুর কারুর রচনার ভিতরে অন্বেষণ করে পাওয়া যেত অল্পবিস্তর ময়লামাটি। কিন্তু তাঁদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ময়লামাটি ক্রমে ক্রমে থিতিয়ে পড়েছে নিচের দিকে এবং তাঁদের রচনাও ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠেছে স্বচ্ছ ও নির্মল।

'কল্লোল'-এর লেখকদের মধ্যে ছিলেন শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবুদ্ধদেব বসু, শ্রীঅজিত দত্ত, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীমণীশ ঘটক (যুবনাশ্ব) ও শ্রীহেমচন্দ্র বাগচি এবং আরও কেউ কেউ। ওঁদের মধ্যে প্রথম চারিজনের সাহিত্যসাধনা আজও আছে অব্যাহত। কিন্তু বাংলাদেশের দুর্গত সিনেমার নেশায় মেতে প্রেমেন্দ্র এখন সাহিত্য-জগতে মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মারেন মাত্র। মণীশের মধ্যে ছিল প্রভূত সম্ভাবনা, কিন্তু তিনি এখন লেখনী ত্যাগ

করে বসে আছেন। হেমচন্দ্র বাগচি বেশ কবিতা লিখতেন, কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তির বিধানে তিনি হন উন্মাদগ্রস্ত।

এই প্রসঙ্গে আর এক ভাগ্যবান কবির কথা মনে হচ্ছে। নজরুল ইসলাম। আমার মতো তিনিও ঠিক 'কল্লোল' গোষ্ঠীভুক্ত সাহিত্যিক ছিলেন না, তবে তার সম্পর্কে এসেছেন বটে। দেশবন্ধুর তিরোধান উপলক্ষে আমার সঙ্গে তাঁরও কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল 'কল্লোল'-এর পৃষ্ঠায়। তার কিছুকাল পরে স্বর্গীয় কবিবর যতীন্দ্রমোহন বাগচির আরপুলি লেনের ভবনে এক সন্ধ্যায় আহূত হয়ে গিয়ে দেখি, সেখানে উপস্থিত আছেন নজরুল ইসলাম ও 'কল্লোল'-এর কোনও কোনও সাহিত্যিক। নজরুল হারমোনিয়াম নিয়ে গান গাইতে শুরু করলেন।

তার আগেই আমাদের নিজস্ব আসরে নজরুলের কণ্ঠে শুনেছি অসংখ্য গান। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল না বটে শিক্ষিত ওস্তাদের মতো, কিন্তু তাঁর আন্তরিকতার গুণে প্রত্যেক শ্রোতাই হতেন বিশেষভাবে আকৃষ্ট। আগে তিনি গাইতেন রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদ সেন প্রভৃতির গান, কিন্তু সেদিনকার আসরে গীতিকার ও সুরকাররূপে নজরুলের পরিচয় পেলুম সর্বপ্রথমে। তাঁর মুখে শুনলুম গজল গানের পর গজল গান। বাংলাদেশে গজল গান আগেও ছিল। আমাদের ছেলেবেলায় লোকের মুখে এই গজলটি শুনতুম—'কুঞ্জবনে যমুনারি তীরে, রাধা রাধা বলে কে বাঁশি বাজায়।' কিন্তু সেদিন নজরুলের রচিত যে গজলগুলি শুনলুম, তাদের গড়নও সম্পূর্ণ নতুন এবং কবিত্বেও তারা সর্বপ্রকারে সমৃদ্ধ।

তারপর 'কল্লোল'-এ আত্মপ্রকাশ করল নজরুলের সেই প্রখ্যাত গজলটি—'বসিয়া বিজনে কেন একা মনে, পানিয়া ভরনে চল লো গোরী!' তাঁর আরও কয়েকটি গজল 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত হয়েছিল এবং অনতিবিলম্বেই সেগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ঘরে-বাইরে যেখানে সেখানে। বাংলাদেশে কিছুকাল ধরে চলল গজল গানের রেওয়াজ।

নজরুলের কথা অন্যত্র বিস্তৃতভাবেই বলেছি, সুতরাং আর তা নতুন করে বলবার দরকার নেই। এরপর আমি 'কল্লোল'-এর অন্যান্য কয়েকজনের কথা নিয়ে আলোচনা করব।

কল্লোল গোষ্ঠীর দুইজন

এখনকার অধিকাংশ মাসিক পত্রিকার কার্যালয়ে গেলে শোনা যায় খালি কাজের কথা। সাহিত্যিকরা সেখানে আসেন, বসেন, দুটো-চারটে কথা বলেন,—কিন্তু সবই প্রয়োজনের তাগিদে। ভালো করে আসর জমিয়ে নিয়মিতভাবে বৈঠকি আলোচনা সেখানে আর হয় না।

আগেকার মাসিক পত্রিকার কার্যালয়েও যে কাজের ভিড় থাকত না, এমন কথা বলি না। কিন্তু কাজকর্ম চুকে যাবার পর প্রতিদিনই বিকালের দিকে সেখানে বসত বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত লেখকদের বৈঠক। হত সাহিত্য ও ললিতকলা নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান। হত গল্পগুজব, হাসিমস্করা এবং কোথাও কোথাও শোনা যেত সঙ্গীতের কলরবও। এরই মধ্যে দিয়ে নিবিড় হয়ে উঠত পরস্পরের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক। 'জাহ্নবী', 'অর্চনা', 'মানসী', 'যমুনা', 'সঙ্কল্প', 'মর্মবাণী', 'ভারতী', 'কল্লোল' ও 'শনিবারের চিঠি' প্রভৃতি পত্রিকা ছিল এমনই সব আলাপ-আলোচনার কেন্দ্র।

কিন্তু কেবল পত্রিকার কার্যালয়ে নয়, তখন কোনও কোনও সাহিত্যরসিক গৃহস্থের বাড়িতেও

নানা শ্রেণির গুণীদের জন্যে বিছানো হত রীতিমত ঢালা আসর। কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে অক্সফোর্ড মিশনের পার্শ্ববর্তী বাড়ির কর্তা ছিলেন স্বর্গীয় গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। দুই যুগ আগেও তাঁর বৈঠকখানায় প্রত্যহ গদিয়ান হয়ে বিরাজ করতেন উচ্চশ্রেণির বহু সাহিত্যিক ও শিল্পী। কারুর হাতে সিগারেট, কারুর হাতে চুরোট ও কারুর হাতে গড়গড়ার নল এবং ঘন ঘন আসছে আর যাচ্ছে চায়ের পেয়ালা ও তাম্বুলের থালা। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত কোনও কথাই সেখানে অনালোচনীয় ছিল না। তর্ক-বিতর্ক হতে হতে মাঝে মাঝে উঠত চায়ের পেয়ালার তুমুল তরঙ্গ।

সেই আসরেই স্বর্গীয় কৌতুকাভিনেতা চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, নাট্যাচার্য শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি, স্বর্গীয় ওস্তাদ করমতুল্লা খাঁ, রাজনীতিক শ্রীনির্মলচন্দ্র, অভিনেতা শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র, কবি নজরুল ইসলাম, সুলেখক শ্রীধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও হাস্যরসিক দাদাঠাকুর শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত প্রভৃতির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়।

নজরুল হই হই করে এসেই বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করতেন টেবিল হারমোনিয়ামটাকে এবং কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের যানবাহন ও মুক্ত জনতার বিষম গোলমাল গ্রাহ্যের মধ্যেও না এনে গেয়ে যেতেন গানের পর গান এবং গাইতে গাইতে থালা থেকে তুলে নিতেন পানের পর পান। কেবল কাঁড়ি কাঁড়ি পান নয়, আঠারো-বিশ পেয়ালা চা না পেলেও সিক্ত হত না তাঁর কণ্ঠদেশ।

নজরুলের সঙ্গে প্রায়ই আসতেন একটি স্বল্পবাক তরুণ। তাঁর মাথায় লম্বা চুল, দেহ একহারা, বর্ণ শ্যাম, সাজগোজ সাদাসিধা, মুখে শালীন ভাব। নাম শুনলুম শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে আমরা নজরুলের বন্ধু বলেই গ্রহণ করলুম। তাঁর অন্য কোনও পরিচয় জানতুম না এবং আসরের বিখ্যাত সব গুণী জ্ঞানীর মাঝখানে তাঁর দিকে ভালো করে মনোযোগ দিতেও পারিনি।

নৃপেন্দ্র ছিলেন বর্ণচোরা আমের মতো। নানা আসরে এমন অনেক লোককে দেখেছি যাঁরা উল্লেখযোগ্য গুণের অধিকারী না হয়েও বিখ্যাত ব্যক্তিদের মাঝখানে বসে সবজান্তার মতো অনর্গল কথার খই ফোটাতে এমন পারেন যে, সহজেই তাঁদের দিকে আকৃষ্ট হয় আর সকলের দৃষ্টি। এই মুখর মানুষগুলি যে সুচতুর, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। নিজেদের ঢনঢনে মস্তিষ্ক সম্বন্ধে জ্ঞান তাঁদের অত্যন্ত টনটনে। তাই বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে ওঠাবসা করে তাঁদের খ্যাতির খানিকটা তাঁরা প্রতিফলিত করতে চান নিজেদের মধ্যে। বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখেছি এমনই সব হসন্ত-মার্কা জীবকে।

নৃপেন্দ্র অন্য ধরনের মানুষ। মুখের কথায় বা হাব-ভাব-ব্যবহারে কোনওদিনই নিজেকে তিনি বিজ্ঞাপিত করতে, কিংবা স্বয়ং প্রধান হয়ে উঠতে চাননি। তাই কিছুদিনের আলাপের পরেও আমি পাইনি তাঁর প্রকৃত পরিচয়।

তারপর 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশিত হল এবং 'কল্লোল'-এর পৃষ্ঠায় মধ্যেই আবিষ্কার করলুম যথার্থ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণকে। তাঁর চেষ্টাবর্জিত, প্রসাদগুণবিশিষ্ট ও তৃপ্তিদায়ক মিষ্ট ভাষা এবং প্রবন্ধ রচনায় সুদক্ষ হাত দেখে সত্য সত্যই আমি বিস্মিত না হয়ে পারিনি। এমন একজন শিল্পী আমাদের সঙ্গে এসে মেলামেশা করেছেন, অথচ আমরা তাঁকে কেবল নজরুলের পার্শ্বচর এক সাধারণ ভক্ত ছাড়া আর কিছু বলেই ভাবতে পারিনি!

তারপর নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের সঙ্গে সুদৃঢ় বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। বহু সাহিত্য-বৈঠকে, 'নাট্যমন্দির' ও 'নাট্য-নিকেতন'-এর অন্দরের আসরে এবং আমার নিজের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় কাটিয়ে দিয়েছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কোনও অসতর্ক মুহূর্তেও তাঁর মুখে শুনিনি কোনও অশোভন উক্তি এবং আত্মগৌরব কথনেও কখনও দেখিনি তাঁর এতটুকু আগ্রহ।

বরং বারংবার এই কথাই আমার মনে হয়েছে যে সর্বদাই তিনি যেন আপনাকে সরিয়ে রাখতে চান সকলের পিছনে এবং তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ নিজেই যেন সে সম্বন্ধে সচেতন নন! তাঁর আর একটি মস্ত গুণ, কখনও তিনি অন্য সাহিত্যিকের বিরুদ্ধে গ্লানি প্রচার করেন না। ব্যক্তিগত হিংসাদ্বেষ তাঁর মনে ঠাঁই পায় না।

কিন্তু তিনি হচ্ছেন বাংলাদেশের সাহিত্যিক। এখানে সাহিত্যের সঙ্গে সৌভাগ্যের সম্পর্ক যদি কিছু থাকে, তবে তা এত দূর সম্পর্ক যে কদাচ হতে পারে তারা পরস্পরের নিকটস্থ। ঠিক সেইজন্যে কি না জানি না, অধিকাংশ সময়েই নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের মুখের উপরে দেখেছি উদাস উদাস ভাব। গল্পগুজব ও হাস্যকৌতুকের মাঝখানেও কেমন যেন অনাসক্ত হয়ে থাকেন। কী যেন খুঁজছেন, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছেন না।

মাঝে মাঝে হয়তো অর্থাভাবেই তিনি স্বক্ষেত্র ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চান। উপন্যাস রচনা করেন, কিন্তু সফল হন না। চলচ্চিত্রে নায়কের ভূমিকায় দেখা দেন, কিন্তু বিফল হন। উপন্যাসে ও প্রবন্ধ রচনার মধ্যে পার্থক্য আছে যথেষ্ট। মেকলে ও কার্লাইলের রীতি একরকম, স্কট ও ডিকেন্সের রীতি আর একরকম। এটুকু ভুললে শক্তিশালী লেখকরাও নিজেদের সুনাম রক্ষা করতে পারবেন না। আবার লেখক ও অভিনেতা দুজনেই শিল্পী বটে, কিন্তু তাঁরা বিচরণ করেন সম্পূর্ণ ভিন্ন মার্গে। অভিনয়ে অনেকের অশিক্ষিত পটুত্ব থাকতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত গুরুর অধীনে দীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষা গ্রহণ না করলে কেহই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হয় না। তেমনই যারা অভিনয়ে অভ্যস্ত, সাহিত্যসাধনা না করে হঠাৎ কলম ধরে সেও রাতারাতি লেখক হয়ে উঠতে পারে না। এইজন্যেই প্রবাদে বলে—'যার কাজ তারে সাজে, অন্যের পিঠে লাঠি বাজে।' কুস্তির মহামল্লও যুযুৎসুর মল্লের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজি হয় না—অথচ দুজনেরই কর্তব্য হচ্ছে মল্লযুদ্ধ করা। আমি স্বচক্ষে একজন ক্ষুদ্রকায় জাপানি যুযুৎসু-বিশেষজ্ঞকে বিশ্ববিজয়ী বিপুলবপু গামাকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করতে দেখেছি, কিন্তু গামা বুদ্ধিমানের মতো তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কারণ যুযুৎসুর আর কুস্তির পদ্ধতি এক নয়।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের অতুলনীয় গুণপনা দেখা যায় সন্দর্ভ রচনায় এবং জীবন চিত্রাঙ্কনে। শেষোক্ত বিভাগে তিনি কলমের রেখায় যে সব জীবনচিত্র এঁকেছেন, সেগুলি হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য ও অভিনব ঐশ্বর্য। এ শ্রেণির আরও অনেক ছবি বাংলাদেশেই পাওয়া যাবে, কিন্তু আর কোনও ছবিকারই নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের নিকটস্থ হতে পারবেন না। সেগুলি কেবল সুলেখকের রচনা নয়, সেগুলি হচ্ছে উচ্চশ্রেণির শিল্পীর রচনা। যাঁদের ভিতর ও বাহির ফুটোতে চান, সম্যকরূপে ও জীবন্তভাবে তিনি তা ফুটিয়ে তুলেছেন, অথচ যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন রেখে নিজের আর্টকে এবং বিশেষজ্ঞমাত্রই জানেন, যে আর্ট নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারে, তাই-ই হচ্ছে বড়ো আর্ট। যাঁদের কলমের ছবি তিনি এঁকেছেন; আবার তাঁদেরই দেখাবার চেষ্টা করেছেন এমন আরও লেখকের অভাব নেই। কিন্তু চারপৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনার পর তাঁরা যতটুকু দেখিয়েছেন, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ মাত্র চারটি লাইনে তার চেয়ে ঢের বেশি দেখাতে পেরেছেন। তাঁর এই নিরতিশয় ভাবগর্ভ লিপিকুশলতা বোঝাতে কি শব্দালঙ্কার ব্যবহার করব? বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর উপমাটা বড়োই পুরাতন হয়ে গিয়েছে। তিনি হচ্ছেন একজন অনন্যসাধারণ রেখাচিত্রকার।

প্রায় সেই সময়েই আর একজন উদীয়মান লেখকের সঙ্গে পরিচয় হয়, এখন তিনি সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি হচ্ছেন শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী। যদিও তিনি সাহিত্যসাধনা শুরু করেছিলেন স্বতন্ত্রভাবেই, তবু তাঁকে 'কল্লোল' গোষ্ঠীভুক্ত সাহিত্যিকদেরই মধ্যে গণ্য করতে

পারি। সেই সঙ্গে এটাও মনে হয়, তিনি তাঁদের সঙ্গে উঠতেন, বসতেন, আলাপ ও বিচরণ করতেন বটে, তবে অদ্যাবধি নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন—অর্থাৎ সব দলের সঙ্গেই মেলামেশা করেন, কিন্তু কোনও বিশেষ দলের খাতায় নিজের নাম লিখতে রাজি হন না।

তখন আমাদের 'ভারতী' উঠে গিয়েছে, কিন্তু 'ভারতী' কার্যালয়ের বাড়ি থেকেই মুদ্রিত হয় 'নাচঘর', যার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলুম আমি ও নলিনীমোহন রায়চৌধুরি। আমরা ত্রিতলে বসে কাজ করতুম, একতলায় ছিল স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কান্তিক প্রেস'। সেই ছাপাখানায় মুদ্রিত হত শিবরামের দ্বারা সম্পাদিত একখানি সাময়িক পত্রিকা, তার নাম আমার সঠিক স্মরণ হচ্ছে না—হয়ত 'যুগান্তর'। শিবরামের তখন প্রথম যৌবন। কিন্তু সেই বয়সেই তিনি কেবল সম্পাদক নন, গ্রন্থকার রূপেও আত্মপ্রকাশ করেছেন। তবে সেদিনকার লেখক শিবরাম এবং এখনকার হাসির গল্প-লিখিয়ে ও শব্দশ্লেষের রাজা শিবরামের মধ্যে পার্থক্য আছে অনেকখানি। আগেকার শিবরাম ঘুরে বেড়াতেন সাহিত্য জগতের নানা পথে কখনও সাংবাদিক, কখনও ঔপন্যাসিক, কখনও নাট্যকার, কখনও প্রবন্ধকার এবং কখনও-বা কবি রূপ ধারণ করে। কিন্তু এখনকার মানুষ শিবরাম আজও দুপুর রোদে গোটা কলকাতার পথে-বিপথে, অপথে-কুপথে হাঘরের মতো, চরকির মতো টো-টো করে ঘুরে বেড়ান বটে, তবে লেখক শিবরাম আশ্রয় নিয়েছেন সাহিত্যজগতের বিশেষ এক প্রান্তে। বড়োদের জন্যে মাঝে মাঝে এখনও দুই-একটা লেখায় হাত দেন, কিন্তু ছোটোদের জন্যেই তাঁর বেশি মাথাব্যথা।

শিবরাম কবি। দিব্যি কবিতা লিখতেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতেও ছিল প্রভূত নূতনত্ব। তাঁর কবিতার কেতাবও বাজারে বেরিয়েছে, কিন্তু আজ তা ক্রেতাদের পুস্তকাগারে সুরক্ষিত আছে, কিংবা তথাকথিত 'শ্বেত পিপীলিকা'-দের কবলগত হয়েছে, সে খবর দিতে পারব না। যে কারণেই হোক, কাব্যলক্ষ্মীর সঙ্গে এখন তাঁর আর বড়ো-একটা বনিবনাও নেই, অথচ তাঁর কবিত্বের ক্ষেতে যে অজন্মার যুগ আসেনি, সে প্রমাণও পাই মাঝে মাঝে।

শিবরাম নাট্যকার এবং কাঁচা বয়স থেকেই পাকা নাট্যবোদ্ধা। যখন তিনি উদীয়মান, সেই সময়েই শরৎচন্দ্রের 'দেনা-পাওনা'কে নাট্যাকারে পরিবর্তিত করে তার নাম রাখেন "ষোড়শী"। যদিও তা 'ভারতী'তে প্রকাশিত এবং রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছিল শরৎচন্দ্রেরই নামে, কিন্তু নাট্যরূপের সফলতার জন্যে অনেকখানি প্রশংসার উপরে দাবি করতে পারেন শিবরামই। তারপরেও তিনি 'নাট্য নিকেতন'-এর কর্তৃপক্ষের অনুরোধে নিরুপমা দেবীর 'দিদি' উপন্যাসকেও নাট্যাকারে পরিবর্তিত করেছিলেন বটে, কিন্তু শিশিরকুমারের প্রতিভা ও শরৎচন্দ্রের নামের মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়ে 'দিদি' লোকপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি।

মৌলিক নাটক রচনাতেও তিনি হচ্ছেন রীতিমত করিৎকর্মা। বহুকাল আগে রচনা করেছিলেন 'চাকার নিচে' নামে এক নাটক এবং আমার 'নাচঘর'-এ তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করবার সময়ে গৌরচন্দ্রিকায় আমি লিখেছিলুম 'শিবরামবাবু এই নাটকখানি রচনা করেছেন অতি-আধুনিক প্রথায়। এবং একটিমাত্র অঙ্কে, একটিমাত্র ঘরের ভিতরে মোট তিন-চার ঘণ্টা সময়ের মধ্যে তিনি আধুনিক জীবনের যে বিচিত্ররসবহুল, অপূর্ব ও জীবন্ত চিত্র অঙ্কন করেছেন, আমরা আগে থাকতে তার আভাস দিয়ে রসভঙ্গ করব না। পাঠকরা ধীরে ধীরে তার পরিচয় পাবেন এবং পরিণামে যে মুগ্ধ ও তৃপ্ত হবেন, সে বিষয়েও কিছুমাত্র সন্দেহ নেই'...প্রভৃতি।

কিন্তু তিনি নাট্যকার হয়েও হলেন না—'ছেড়ে দিলেন পথটা, বদলে গেল মতটা।' বিপুল উৎসাহে ঢুকে পড়লেন ছোটোদের খেলাঘরে, তাঁর অশ্রান্ত লেখনী হুড়হুড় করে রচনা করতে

লাগল রাশি রাশি হাসির গল্প, ভূরি পরিমাণে শব্দশ্লেষ (pun) ও অনুপ্রাস ছড়াতে ছড়াতে পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে। আজকের বাংলা সহিত্যে তাঁর মতো এত বেশি হাসির গল্প রচনা করেননি আর কোনও লেখকই।

'পান'-এর দিকে ঝোঁক তাঁর অতিমাত্রায়। তার লোভে তিনি গল্পের বাঁধুনিও শ্লথ করে ফেলবার জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত। প্রাণপণে 'পান'এর পরে 'পান' চালিয়ে তিনি পান আনন্দ এবং এদিকে তাঁর বিস্ময়কর কৃতিত্ব জাহির হলেও গল্পের আর্টও ক্ষুণ্ণ হয় অল্পবিস্তর। কেবল লেখবার সময় নয়, বন্ধুসভায় আসীন হয়ে গল্প করবার সময়েও তাঁর সংলাপ হয়ে ওঠে শব্দশ্লেষের জন্যে কৌতুককর।

বেশ আলাভোলা, মিষ্ট মানুষ এই শিবরাম। গতি তাঁর সর্বত্রই, কিন্তু কোথাও বেশিক্ষণ থাকবার পাত্র নন। এক আড্ডা ছেড়ে ছোটেন আর এক আড্ডার দিকে, তারপর আর এক আড্ডায়। চিরকুমার, নেই কোনও সংসারজ্বালা এবং সেই কারণেই হয়তো যখন-তখন নির্মল কলহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারেন। বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তরলমতি বালকের মতো হাবভাব। বুড়োর চেয়ে আকৃষ্ট হন বালকদের দিকেই। যখন কারুর বিরুদ্ধে কোনও মজার গল্প বলেন, তখনও তাঁর ভিতরে থাকে না তিলমাত্র রাগের ভাব। তাঁর সঙ্গসুখ উপভোগ করবার জন্যে কখনও কখনও তাঁকে জোর করে ধরে এনেছি। এবং অনুভব করেছি খানিকটা মুক্ত বাতাসের মিষ্ট স্পর্শ।

কল্লোল গোষ্ঠীর ত্রয়ী

কল্লোল গোষ্ঠীর ত্রয়ী বলতে বোঝায় এই তিনজনের নাম—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীবুদ্ধদেব বসু ও শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। এঁরা তিনজনেই কবি, ঔপন্যাসিক ও গল্প-লেখক। তিনজনেই কিছু কিছু অন্যান্য শ্রেণির রচনাতেও হাত দিয়েছেন।

এঁরা তিনজন এবং কল্লোল গোষ্ঠীভুক্ত আরও কয়েকজন শক্তিশালী লেখক আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তথাকথিত অশ্লীলতার অপরাধে নিষ্ঠুরভাবে আক্রান্ত ও ধিকৃত হন। সেই সময়ে—অর্থাৎ প্রায় দুই যুগ আগে—আমি এঁদের পক্ষ সমর্থন করে লিখেছিলুম 'তবে কি এই অশ্লীলতাই স্বাভাবিক? আমাদের তো বিশ্বাস তাই। এ বিশ্বাস ভুল হতেও পারে। এবং অশ্লীলতার যে একটা সীমারেখা আছে, তাও আমরা না মেনে পারব না। কিন্তু একেবারে একেলে সাহিত্য সেই সীমারেখাকে অতিক্রম করেছে কি না, এখন সেইটেই হচ্ছে বিবেচ্য। ***"What is Art" লেখবার পরেও টলস্টয়ের মতো লোক যে দুর্বলতা পরিহার করতে পারেননি, তার কবল থেকে আত্মরক্ষা করা যে সহজ নয়, সে কথা বলা বাহুল্য। এ দুর্বলতা আছে এবং থাকবেও। স্বাভাবিকতার উচ্ছেদ অসম্ভব। কেবল এই চেষ্টাই করা ভালো, যেন সে কুৎসিত না হয়, যেন সে শিষ্টতার সীমানা না ছাড়ায়, যেন সে রূপের সেবা না ভুলে যায়। রূপকে আমরা ব্যাপক অর্থে ধরছি। * * * আমরা অস্কার ওয়াইল্ডের এই বিখ্যাত উক্তি উড়িয়ে দিতে পারি না—'লেখার দোষে শ্লীলও অশ্লীল হয়ে দাঁড়ায় এবং লেখার গুণ তার উল্টোটাকেই প্রকাশ করে। যে কোনও কুৎসিত বিষয় সুন্দর ও রুচিকর করে দেখানো যেতে পারে'...প্রভৃতি।

একটা বড়ো মজার ব্যাপার এই যে, যুগে যুগে অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ লেখকেরই বিরুদ্ধে আনা

হয়েছে অশ্লীলতার অপরাধ। অনেক সময়ে আবার দেখা গিয়েছে, অভিযোক্তাকেই হতে হয়েছে একই অপরাধে অভিযুক্ত। রবীন্দ্রনাথের রচনাকে অশ্লীল বলে প্রতিপন্ন করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। তারপর রবীন্দ্রভক্তরা দেখিয়ে দিলেন অশ্লীলতায় তিনিও বড়ো কম যান না। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর অনেক পরে শিশিরকুমার যখন তাঁর 'পাষাণী' নাটক মঞ্চস্থ করেন, তখন রুচিবাগীশরা এত জোরে চ্যাঁচাতে শুরু করে দেন যে রীতিমত সুঅভিনীত হয়েও পালাটি ভালো করে জমতে পারেনি।

স্বর্গীয় ঔপন্যাসিক যতীন্দ্রমোহন সিংহ অশ্লীলতার উপরে হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন। অশ্লীল লেখা দেখলেই কলম উঁচিয়ে তেড়ে আসতেন। অবশেষে বুড়ো বয়সে নিজেই ফেঁদে বসলেন এমন এক অশ্লীল গল্প যে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল ধিক্কার ধ্বনিতে।

কল্লোল গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোক্তা ছিলেন 'শনিবারের চিঠি'র দল। অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব ও জীবনানন্দ দাশ প্রভৃতির অশ্লীলতার প্রমাণ 'শনিবারের চিঠি'তে বিতরিত হত ভূরি পরিমাণে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও অতিশয় স্পষ্টভাবেই দেখা যেতে লাগল, 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত গল্পে ও কবিতাতেও অশ্লীলতার কিছুমাত্র অপ্রতুলতা নেই। সুতরাং সবাই যখন ভূত, মিছামিছি রামনাম নিয়ে টানাটানি কেন?

কী শ্লীল, কী অশ্লীল, কে বলতে পারে? এর আগে আমার একটি গল্পের দুর্দশার কথা বলেছি। 'কল্লোল' সম্পাদক সেটিকে শ্লীল বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর গল্পটিকে চালান করা হয় 'ভারতবর্ষ' কার্যালয়ে। সেখান থেকে সেটি ফেরত আসে অশ্লীলতার অভিযোগ বহন করে। ধাঁধায় পড়লুম, নিজেই বুঝতে পারলুম না আমি কি শ্লীল, কি অশ্লীল? কাশীধাম থেকে এল 'উত্তরা'র জন্যে লেখার তাগিদ। গল্পটিকে প্রেরণ করলুম সেইখানেই। শ্লীল কি অশ্লীল তা নিয়ে 'উত্তরা' মাথা ঘামালে না, তাকে ছাপিয়ে দিলে বিনা বাক্যব্যয়ে। 'উত্তরা'য় প্রকাশিত আমার একটি কবিতার দুটি লাইনের জন্যে গালিগালাজে বাজার সরগরম হয়ে উঠেছিল—ওই অশ্লীলতার অপরাধেই। কিন্তু আমার সেই একাধারে শ্লীল ও অশ্লীল (!) গল্পের জন্যে কোনও চায়ের পেয়ালাতেই ওঠেনি উত্তাল তরঙ্গ।

একই গল্প যখন হতে পারে কারুর মতে শ্লীল এবং কারুর মতে অশ্লীল, তখন বিচারের মানদণ্ড কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে, এ ক্ষেত্রে বাচনিক বিচারে সুরাহা হওয়া অসম্ভব। যে রচনা সুরচিত এবং যা মনকে নোংরা করে না, নিন্দা করেও তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। মুক্ত চক্ষু ধুলোর মধ্যে কুড়িয়ে পায় রোদের সোনা। অন্ধ ধুলো হাতড়ালে ছুঁয়ে ফেলে সারমেয়-বিষ্ঠা। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অশ্লীল মনই আবিষ্কার করে অশ্লীলতাকে। পরমহংসদেবের একটি বাণীর মর্মার্থ হচ্ছে শকুনি পক্ষবিস্তার করে উড়ে বেড়ায় নির্মলনীল আকাশে, কিন্তু তার নজর পড়ে থাকে নিচে ভাগাড়ের দিকেই।

রসিক হন মরালের মতো। জলভাগ ত্যাগ করতে পারেন অনায়াসেই।

অশ্লীলতাকে অন্বেষণ করবার জন্যে কোনওদিনই আমি অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র ও বুদ্ধদেবের রচনাবলী নিয়ে নাড়াচাড়া করিনি, বঞ্চিত হইনি তাই উপভোগের আনন্দ থেকে। তাঁদের উপন্যাস পড়েছি, ছোটোগল্প পড়েছি, কবিতা পড়েছি। মুগ্ধ করেছে আমাকে অনেক রচনাই। আবার কোনও কোনও রচনার বিষয়বস্তু হয়ত আমার মনের মতো হয় নি। কিন্তু এই ভালো লাগা আর না লাগার মধ্যে একটা যে সত্য সর্বদাই উপরে ছাপিয়ে উঠেছে তা হচ্ছে এই: তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে উচ্চশ্রেণির লিপি-কুশলতা। তাঁদের ভাষা ও শব্দবিন্যাস হচ্ছে বিষয়বস্তু

নিরপেক্ষ। তাঁদের কোনও গল্পের আখ্যানবস্তু বা কোনও কবিতা ভালো না লাগলেও তাঁদের ভাষা ও রচনাভঙ্গির দিকে পাঠকরা বিশেষভাবে আকৃষ্ট না হয়ে পারবেন না।

'ভারতী', 'কল্লোল' ও 'শনিবারের চিঠি' প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এক এক দল শক্তিধর সাহিত্যিক পুরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। 'ভারতী' গোষ্ঠীর ভিতর থেকে আমরা পেয়েছি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচি, মোহিতলাল মজুমদার ও হেমেন্দ্রলাল রায়—যাঁরা আজ স্বর্গে। এবং সেই সঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি জীবিত লেখকদের। শরৎচন্দ্রেরও প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতী'তেই। তারপর 'ভারতী'তে তাঁর একাধিক রচনা প্রকাশিত হলেও তিনি নিয়মিত লেখক শ্রেণিভুক্ত ছিলেন না বটে, কিন্তু ওইখানেই ছিল তাঁর নিজস্ব আসর। হামেশাই উঠতেন বসতেন, আলাপ-আলোচনা করতেন আমাদের সঙ্গে। তিনি ছিলেন একান্তভাবেই আমাদের ঘরের লোক।

'কল্লোল' গোষ্ঠীর ভিতর থেকে দেখা দিয়েছেন দীনেশরঞ্জন দাশ, গোকুলচন্দ্র নাগ,—এঁরা এখন স্বর্গীয়। তারপর আছেন হেমচন্দ্র বাগচি, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, মণীশ ঘটক (যুবনাশ্ব), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, অজিতকুমার দত্ত, ভূপতি চৌধুরি ও জসীমউদ্দীন প্রভৃতি।

একটি বিশেষ আদর্শ সামনে রেখে, একই ভাবের অনুপ্রেরণায় এমন দলবদ্ধ হয়ে সাহিত্য-সাধনার মধ্যে কেবল যে একটি সমষ্টিগত শক্তির উপলব্ধি থাকে তা নয়, উপরন্তু সেই সঙ্গে পাওয়া যায় পরম আনন্দ ও বিপুল উৎসাহ। ভিন্ন ভিন্ন পথ, লক্ষ্য কিন্তু এক।

কিন্তু আজকের দিনের তরুণ লেখকরা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে সাহিত্য সাধনা করতে চান না বা করতে পারেন না। 'কল্লোল' লুপ্ত হবার পর কয়েকজন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ করেছেন, কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে দেখি ভ্রাতৃভাবের পরিবর্তে ছাড়া ছাড়া ভাব। বোঝা যায় না তাঁদের লক্ষ্য ও আদর্শ। সাহিত্যক্ষেত্রে গোষ্ঠীই সৃষ্টি করতে পারে নব নব পদ্ধতি বা 'স্কুল'। ফরাসি সাহিত্যে এটা বারবার দেখা গিয়েছে এবং বাংলাদেশেও 'বঙ্গদর্শন', 'সবুজপত্র', 'ভারতী' ও 'কল্লোল' প্রভৃতি পত্রিকা বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীবদ্ধ সাহিত্যিকদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল বলেই যুগে যুগে বাংলা সাহিত্যে এসেছে নতুন নতুন ধারা ও ভঙ্গি।

অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল ঠিক কোনখানে, আমার মনে পড়ছে না। তবে হয় 'কল্লোল', নয় 'মৌচাক' কার্যালয়ে। স্মরণ হচ্ছে 'কল্লোল' প্রকাশিত হবার আগেই 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় যেন তাঁর একটি রচনা পাঠ করেছি। তারপর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে নানা জায়গায়। এবং আমি তাঁকে অন্যতম অন্তরঙ্গ বলেই গ্রহণ করেছি। একহারা দেহ, রঙটি কালো হলেও মুখে-চোখে আছে বুদ্ধির প্রাখর্য। শান্ত স্বভাব, সংলাপ শিষ্ট ও মিষ্ট। কথার ঝড় বহিয়ে দেন না, বাক্যব্যয় করেন বেশ সংযতভাবেই।

'কল্লোল যুগ' পাঠ করলে বোঝা যায়, 'শনিবারের চিঠি'র ধারাবাহিক আক্রমণ তাঁর মনকে তিক্ত করে তুলেছিল। সেই সময়ে 'কল্লোল'-এর দলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছি বলেই হোক বা অন্য যে কোনও কারণে আমিও 'শনিবারের চিঠি'র দ্বারা বার বার আক্রান্ত হতে লাগলুম। কিন্তু আমি মার খেয়ে সয়ে থাকবার মানুষ নই। একই খেলা দুই পক্ষই খেলতে পারে, এটা

দেখিয়ে দেবার জন্যে 'নাচঘর'-এ খুললুম একটি বিশেষ বিভাগ। তারপর কিছুকাল ধরে চলতে লাগল দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল বাক্যযুদ্ধ—গদ্যে এবং পদ্যে। আমার লেখা কোনও কোনও ব্যঙ্গ-কবিতা নজরুল ইসলাম এবং আরও কেউ কেউ মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। অচিন্ত্যকুমারও উৎসাহিত হয়ে একদিন 'নাচঘর' কার্যালয়ে এসে ছদ্মনামে লেখা একটি ব্যঙ্গ-কবিতা দিয়ে গেলেন আমার হাতে। এই বিভাগে তিনি এবং অন্য কোনও কোনও লেখক করেছিলেন আরও কিছু কিছু সাহায্য। ফাঁপরে পড়তে হল 'শনিবারের চিঠি'কে। সে হচ্ছে মাসিক, 'নাচঘর' ছিল সাপ্তাহিক, কাজেই মাসে একবার আক্রান্ত হলে প্রতি-আক্রমণ করবার সুযোগ পায় মাসে চারবার। 'শনিবারের চিঠি' মুখ বন্ধ করবার সঙ্গে সঙ্গেই 'নাচঘর'-এর এই বিশেষ বিভাগটি তুলে দেওয়া হয়। তারপর 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকের সঙ্গে স্থাপিত হয়েছে আমার বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক। আমি তাঁর 'দাদা'।

অচিন্ত্যকুমার কেবল প্রভূত শব্দসম্পদের অধিকারী নন, শব্দ প্রয়োগও করেন নিপুণ শিল্পীর মতো। 'কল্লোল'এর দলের মধ্যে ভাষা নিয়ে তিনিই বোধ করি সবচেয়ে মাথা ঘামান বা খাটান। একেবারে চাঁচাছোলা, ওজন করা, তীক্ষ্ণধার ভাষা, যেখানে যা মানায় খুঁজে পাওয়া যায় তাকেই। অতি-মার্জনার ও শব্দালঙ্কারের এই প্রাধান্য হয়ত সহজ সরলতার অনুকূল নয়, কিন্তু পাঠকদের চিত্তকে সমৃদ্ধ করে তোলে রীতিমত।

তারপর তিনি ছিলেন সরকারি চাকুরে। সচল পদে অধিষ্ঠিত হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আর আমি পড়ে রইলুম কলকাতার একটেরে, গঙ্গার ধারে। দুজনের মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে তিনি যে আধ্যাত্মিকতার দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন, সে খবর পাইনি। আচম্বিতে তাঁর অতি আধুনিক রচনা 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' পাঠ করে সবিস্ময়ে উপলব্ধি করতে পারলুম সেই সত্য। শিল্পীর তুলি দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি পরমহংসদেবের অনুপম জীবনচিত্র।

স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ('শ্রীম') ছিলেন পরমহংসদেবের শিষ্য এবং সমসাময়িক। ঠাকুরকে তিনি যেমনটি দেখেছিলেন ঠিক সেইভাবেই দেখিয়েছেন তাঁর অতুলনীয় গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'তে। সে হচ্ছে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা। সাদাসিধে, নিরলঙ্কার, চলিত ভাষার ভিতর দিয়ে জলজিয়ন্তভাবে দেখা যায় একটি বালকের মতো সহজ সরল, ভাবে ভোলা, কিন্তু দিব্যজ্ঞানী ও অনন্যসাধারণ মহামানবকে। কিন্তু তিনি যে নিজে একজন উঁচুদরের সাহিত্যশিল্পী, অচিন্ত্যকুমার একথা ভুলতে পারেননি। ঠাকুরকে তিনি সাজাতে চেয়েছেন সমুজ্জ্বল ভাষার ঐশ্বর্য দিয়ে, দুইখানি জীবনচিত্রের মধ্যে এই হচ্ছে পার্থক্য।

এইবারেই দু-একটি ব্যক্তিগত কথা বলি। অচিন্ত্যকুমারের সখ্য আমার কাছে সত্য সত্যই প্রীতিপ্রদ। মানুষটিকে ভালো লাগে। একদিন দুপুরে সহধর্মিণী ও দুই কন্যাকে নিয়ে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট দিয়ে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ দেখতে পেলুম গুরুদাস লাইব্রেরির ভিতরে বসে আছে অচিন্ত্যকুমার। তৎক্ষণাৎ গাড়ি থেকে নেমে পড়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করলুম। এবং তাঁর কোনও আপত্তি আমলে না এনে সোজা দিয়ে উঠলুম চৌরঙ্গির চাঙ্গুয়া রেস্তরাঁয়। তারপর সপরিবারে ও বন্ধু সমভিব্যাহারে বহুক্ষণ ধরে চলল গল্পগুজব এবং পানাহার।

আর একদিনের কথা। আমার বাড়ির ত্রিতলের অলিন্দই হচ্ছে আমার লেখবার, পড়বার, বসবার ও গল্প করবার জায়গা। হাতে যখন কাজ থাকে না, প্রবহমান গঙ্গার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকি। স্রোতস্বিনীর চলোর্মিমালার সঙ্গে সাঁতার কাটতে কাটতে অনেকদূর চলে যায় নয়ন এবং মন।

এক বৈকালে সহধর্মিণী ও পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে সেইখানে বসে আছি, হঠাৎ গঙ্গাতীরে দেখতে পেলুম দুটি তরুণীকে। একটি মেয়ের ক্রীড়াচঞ্চল সপ্রতিভ ভাববঙ্গি আমাকে করল আকৃষ্ট। সাধারণত বাঙালির মেয়েরা নিজেদের নারীত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হয়ে কতকটা আড়ষ্টভাবেই পথের উপরে দেখা দেন। এ মেয়েটি সেরকম নন, জীবনের আনন্দে যেন উচ্ছ্বসিত। ভালো লাগল। ছোটো ছেলেকে বললুম, 'মেয়েটিকে বাড়িতে ডেকে আনো তো!'

স্ত্রী বললেন, 'অচেনা বাড়িতে ওঁরা আসবেন কেন?'

আমি বললুম, 'গৃহিণী, ওঁরা হচ্ছেন নতুন বাংলার মেয়ে। রজ্জু দেখে ওঁরা সাপ বলে ভয় পান না। সাপ দেখলেও আত্মরক্ষা করবার শক্তি আছে ওঁদের।'

সত্য হল আমার অনুমান। আমার বাড়িতে তাঁরা অসঙ্কোচে চলে এলেন। সদর দরজার কাছে এসে একজন বললেন, 'শুনেছি এইখানে কোথায় হেমেন রায়ের বাড়ি আছে।'

ছেলে বললে, 'আপনারা তো সেই বাড়িতেই এসেছেন।'

তারপর মেয়েটির পরিচয় পেলুম। একজন হচ্ছেন অচিন্ত্যকুমারের পত্নী। আর একজন তাঁর শ্যালিকা, অবিবাহিতা ও কলেজের ছাত্রী।

তারপর অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে দেখা হতে বললুম, 'অচিন্ত্য, সেদিন তোমার স্ত্রী হরণ করেছিলুম!'

খুব খানিকটা হেসে নিয়ে অচিন্ত্যকুমার বললেন, 'শুনেছি হেমেনদা।'

প্রেমেন্দ্রের ভাষা আমাকে বরাবরই আকর্ষণ করে। তা প্রসাদগুণে মনোরম। তা শব্দগত নয়, ভাবগত। তার মধ্যে শব্দ-সম্পদের গন্ধ নেই, চেষ্টার লক্ষণ নেই, কিন্তু স্বয়মাগত শব্দ ব্যবহার করে যথাযথ ভাব ফুটিয়ে তোলা হয়। লেখকের মনের কথা স্বাভাবিকভাবেই পরিণত হয় পাঠকের মনের কথায়। নিজস্ব স্টাইল দেখাবার অছিলায় জোরে জোরে শব্দ-ঝুমঝুমি বাজিয়ে ও বহুতর মুদ্রাদোষের সাহায্য নিয়ে অনেকেই দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চান, কিন্তু প্রেমেন্দ্রের স্টাইল হচ্ছে স্বভাবসঙ্গত ও অকৃত্রিম। তাকে চালাতে হয় না, সে আপনি চলে। তাঁর ভাষা দেখলে বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ মনে পড়ে —'সরলতাই ভাষার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।'

ফরাসি সাহিত্যাচার্য ফ্লবেয়ার বলেছিলেন 'সাদা কথায় সাদাকে ফোটানোই হচ্ছে উচ্চতর শক্তির কাজ।' সমালোচকরা ইংরেজি বাইবেলের ভাষার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু তা কত সহজ কত সরল! আধুনিক যুগের আর এক ফরাসি সাহিত্যাচার্য আনাতোল ফ্রঁশও ছিলেন একান্তভাবেই জটিলতার বিরোধী। কোনোদিন তিনি কুয়াশার ধার দিয়েও যাননি, সাদা কথায় গেয়ে গিয়েছেন আলোকের গান। আবার তাঁরই পাশে দাঁড়িয়ে ফরাসি কবি স্টিফেন ম্যালার্মির পরে এলেন পল ভ্যালেরি, লোকে তাঁকে বলে 'নীরবতার বাণী' এবং তিনি বলেন—আমার নীরবতা সম্পূর্ণ নির্বাক হলেই আমি হতুম মহত্তর। তিনি অভিযোগ করলেন—আনাতোল ফ্রাঁশের রচনা বড়ো সরল! বঙ্কিমচন্দ্র ও ফ্রাঁশের সেকালের মত একালে বোধ করি চলবে না। আধুনিকরা হয়ত বলবেন—ভাষার শ্রেষ্ঠ ত্রুটি হচ্ছে, সরলতা। সে যাই হোক, প্রেমেন্দ্র একেলে লেখক হয়েও যে বঙ্গদেশীয় ম্যালার্মি ও ভ্যালারিদের দলভুক্ত হননি, এইটেই হচ্ছে আনন্দের কথা। বুঝতে পারব না বলে লেখা পড়ব? এ মত যুক্তিহীন। এবং এই আজব মতের দোহাই দিলে সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত যাঁরা অতুলনীয় বলে স্বীকৃত হয়েছেন, আসর ছেড়ে সরে পড়তে হবে তাঁদের প্রত্যেককেই। আপন আপন আত্মীয়সভার কবি হচ্ছে ম্যালার্মি ও ভ্যালারি। শেক্সপিয়রের

নিজের আত্মীয়দের কেউ চেনে না, কিন্তু সমগ্র বিশ্বের বাসিন্দারা হচ্ছে তাঁর আত্মীয়। বার্নাড শ'য়ের জীবনব্যাপী প্রোপাগাণ্ডার পরেও বিশ্বের বাসিন্দারা শেক্সপিয়রকে বয়কট করেনি। জানি ওয়াকারের ভাষায় Born 1564, still going strong!'

রচনার ওই প্রসাদগুণের জন্যেই প্রেমেন্দ্র অতি অনায়াসে বড়োদের আড্ডা ছেড়ে ছোটোদের আসরে এসে নিজের জন্যে জায়গা করে নিতে পারেন। বাজারে গুজব শুনি, ছোটোদের জন্যে লেখা কেতাবের চাহিদা নাকি যথেষ্ট। তাই হয়ত কৌতূহলী হয়ে অনেকেই ছোটোদের খেলাঘরে এসে মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মারেন। কিন্তু ফল হয় না সন্তোষজনক। শরৎচন্দ্রের একখানি এই শ্রেণির বই আছে—আমি তার নামকরণ করেছিলুম, 'ছেলেবেলার গল্প'। শরৎচন্দ্রের অন্যান্য রচনার তুলনায় এ-বইখানির কাটতি আশাপ্রদ নয়। যে গল্পের রচনারীতি সাবালকদের উপযোগী, তা পরিবর্তিত না করলে নাবালকদের মনে সাড়া দেয় না। আবার এক-একজন এমন লেখক আছেন, যাঁরা সাবালকদের নিয়ে কারবার করবার সময়েও স্বতঃস্ফূর্ত, সহজ ও স্বাভাবিক সরলতাটুকু ঢেকে রাখবার চেষ্টা করেন না। তাই তাঁদের সে লেখা নাবালকরাও উপভোগ করতে পারে। প্রেমেন্দ্র হচ্ছেন এই শ্রেণির লেখক। ছোটোদের জন্যে লেখবার সময়ে তিনি নিজের রচনারীতি বিশেষ পরিবর্তিত না করেই দৃষ্টি রাখেন কেবল তাদের উপযোগী বিষয়বস্তুর দিকে। তাঁর ঝরঝরে প্রাঞ্জল ভাষা ছোটোবড়ো উভয়ের পক্ষে উপভোগ্য।

পটুয়াটোলা লেনে 'কল্লোল' কার্যালয়ে প্রেমেন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়। ছোটোখাটো শ্যামবর্ণ মানুষটি, সাজগোজের ভড়ং নেই, প্রফুল্ল মুখ। তারপর এখানে ওখানে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হতে লাগল। পরিচয়ও ক্রমেই নিবিড় হয়ে উঠতে লাগল। আমি তাঁকে হয়তো তেমন আকৃষ্ট করতে পারিনি, কিন্তু তিনি আকৃষ্ট করেছিলেন আমাকে। 'কল্লোল'এর মাধ্যমে যে কয়েকজন সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলুম, তাঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্রের সঙ্গেই বেশিবার সংযোগ স্থাপনের সুযোগ পেয়েছি।

একদিন তিনি আমার বাড়িতে পাঠগৃহের ভিতরে এসে বসলেন। সে ঘরের তিনদিকে ছিল কেতাবের আলমারি। প্রেমেন্দ্র চুপ করে তাকিয়ে তাকিয়ে বইগুলো দেখতে লাগলেন। তারপর হাসিমুখে বললেন, 'হেমেনদা, আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে গেল।'

আমি বললুম, 'বদলে গেল? কেন?

কেতাবের আলমারির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বললেন, 'এই সব দেখে।'

আগে আমার সম্বন্ধে তাঁর কী ধারণা ছিল, সে কথা আমি আর জিজ্ঞাসা করলুম না, তিনিও খুলে কিছু বললেন না।

তাঁকে ভালবেসেছিলুম সত্য সত্যই। রাজপথে, প্রকাশকের পুস্তকালয়ে, ফুটবল খেলার মাঠে, যেখানেই তাঁকে দেখেছি, আমার বাড়িতে ধরে এনেছি। একবার কয়েকদিন তাঁর দেখা নেই, অথচ তাঁকে কাছে পাবার জন্যে মন ব্যস্ত হয়ে উঠল। কোথায় বাগবাজারের গঙ্গার ধার, আর কোথায় কালীঘাটের আদিগঙ্গার ধার। ট্যাক্সি ডেকে সেই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে একেবারে তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম। তিনি বেরিয়ে আসতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে টেনে আনলুম নিজের বাড়িতে। তখন তিনি নিজেও প্রায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করতেন। একদিন এলেন যুগলে—অর্থ নববিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে। নিজেও যেমন ছোটো মানুষ সহধর্মিণীরূপেও বেছে নিয়েছেন তেমনই একটি ছোট্ট তরুণীকে। বলা যায় মানিকজোড়।

ভেবেছিলুম প্রেমেন্দ্রকে পেলুম স্থায়ী বন্ধুরূপে, কিন্তু হঠাৎ সিনেমা এসে বাধ সাধলে। আজ

কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি অদৃশ্য হয়ে আছেন। সিনেমার যে প্রতিবেশ আমার কাছে অসহনীয়, তার মধ্যেই দিব্য বহাল-তবিয়তে তিনি করছেন জীবনযাপন। তিনি কেবল আমাকেই ভোলেননি, প্রায় ভুলে গিয়েছেন সাহিত্যকেও। আগে তাঁর লেখনী প্রসব করত রচনার পর রচনা। এখন ন-মাসে ছ-মাসে তাঁর কলম থেকে ঝরে পড়ে দু-এক ফোঁটা কালি—তাও রীতিমত জোর তাগিদের পর। শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়েরও ওই দশা।

ওঁদের সাহিত্যজীবনের প্রথম দিকটা অর্থাভাবে প্রীতিকর হয়নি। শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন : 'সর্বক্ষণ যদি দারিদ্র্যের সঙ্গেই যুঝতে হয়, তবে সর্বানন্দ সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনা কোথায়? কোথায় বা সংগঠনের সাফল্য? শৈলজা খোলার বস্তিতে থেকেছে, পানের দোকান দিয়েছিল ভবানীপুরে। প্রেমেন্দ্র ঔষধের বিজ্ঞাপন লিখেছে, খবরের কাগজের অফিসে প্রুফ দেখেছে।'

কিন্তু তবু তখন তাঁরা সাহিত্যধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি। অমর ফরাসি লেখক গতিয়েরকেও জীবিকা নির্বাহের জন্যে অমনি সব উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করতে হত, কিন্তু তিনি সাহিত্যকে ত্যাগ করে পারেননি। ইংলন্ডের কবি ও শিল্পী বেক সারাজীবন কাটিয়ে দিয়েছেন নিরতিশয় দারিদ্র্য জ্বালা ভোগ করতে করতে, কিন্তু তবু তিনি নিজের আর্টকে ভুলে থাকতে পেরেছেন? চিত্রকর রেমব্রান্ড যখন সর্বহারা, বাজারে যখন তাঁর চাহিদা নেই এবং দেশের লোক তাঁকে ভুলে গিয়েছে, তখনও তিনি এঁকে গিয়েছেন ছবির পর ছবি। আমাদের দেশের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস এক হাতে করতেন দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ, আর এক হাতে করতেন কবিতা রচনা।

সাহিত্যের জন্যে অর্থ আসতে পারে—কারুর কারুর যে আসছে, স্বচক্ষেই তো সেটা দেখছি। কিন্তু অর্থের জন্যে সাহিত্য নয়, সাহিত্য নয় অর্থের জন্যে! বরং অর্থ ক্ষুণ্ণ করে আর্ট ও সাহিত্যকে। প্রমাণ প্রেমেন্দ্র ও শৈলজানন্দ। অর্থের জন্যে তাঁরা হয়েছেন সিনেমাওয়ালা। আশা করি, সুগম হয়েছে তাঁদের অর্থাগমের পথ। আশা করি, ওদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন এখন তাঁরা। তবু সিনেমার কাজের ফাঁকে তাঁরা যে সাহিত্যসেবার জন্যে খানিকটা সময় ব্যয় করতে পারেন না, এ কথা আমি বিশ্বাস করিনা। মনে হচ্ছে প্রেমেন্দ্রই কোথায় যেন এই মর্মে বলেছিলেন—'আর্টের জন্যে আমি প্রিয়াকে ছাড়তে পারি, কিন্তু প্রিয়ার জন্যে ছাড়তে পারি না আমার আর্টকে।' স্বধর্ম ত্যাগ না করলে এতদিনে তাঁর সাহিত্যসাধনার একটা মহান পরিণতি দেখবার প্রভূত সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাথেকে আমার বঞ্চিত। প্রেমেন্দ্রের জন্যে আমি দুঃখিত।

'শনিবারের চিঠি'-র সম্পাদক 'কল্লোল' গোষ্ঠীভুক্ত লেখকদের পক্ষে পরমবন্ধুর কাজ করেছেন। 'কল্লোল' এর মতো ছোটো ছোটো আরও অনেক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেছে বাংলা দেশে। তবে জনসাধারণের দৃষ্টি তাদের দিকে ভালো করে আকৃষ্ট হবার আগেই ফুরিয়ে গিয়েছে তাদের পরমায়ু। কিন্তু 'শনিবারের চিঠি' হয়েছিল 'কল্লোল'এর লোভনীয় বিজ্ঞাপনের মতো। 'চিঠি'র সম্পাদকই হয়েছিলেন 'কল্লোল'-এর প্রচারকর্তা। তার অশ্লীলতার অভিযোগ শুনে অনেককেই কৌতূহলী হয়ে 'কল্লোল' এর সঙ্গে পরিচিত হন। তারপর তথাকথিত অশ্লীলতার জন্যে কারুর মন অশুচি হয়েছিল কিনা সে কথা আমি বলতে পারব না তবে এটুকু অনায়াসেই অনুমান করা যায় যে, একদল অজানিত ও শক্তিধর লেখকের অভাবিত আবির্ভাব থেকে সকলেই বিস্মিত না হয়ে পারেননি। কারুর কারুর কাছে তাঁদের রচনার স্থলবিশেষ হয়ত স্বাস্থ্যকর বলে মনে হয়নি, কিন্তু সমগ্রভাবে তাঁদের রচনা যে বলিষ্ঠ, গরিষ্ঠ ও বিশিষ্ট এ সম্বন্ধে

মতদ্বৈধ ছিল না নিশ্চয়ই। তাঁরা কাঁচা হাতে বেলেখেলা খেললে অশ্লীলতার খোরাক যুগিয়েও কিছুতেই টেকসই হতে পারতেন না। কিন্তু তাঁরা কচি হাতেও খেলতে পেরেছিলেন পাকা খেলা। লোকে তাই তাঁদের ভুললে না, চিনে রাখলে।

এই দলেরই অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র হচ্ছেন বুদ্ধদেব। কাঁচা বয়সে হয়তো তিনি বয়সোচিত দুর্বলতা প্রকাশ করেছিলেন অল্পবিস্তর। কারণ 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্প 'রজনী হলো উতলা' (নামটি খাসা) সম্বন্ধে নিজেই তিনি মত প্রকাশ করেছেন—গল্পটি কিন্তু স্বাস্থ্যকর নয়। ঐটিই তাঁর রচিত প্রথম গল্প কি না, সে খবর আমি রাখি না। তবে প্রথম গল্প না হলেও ওটি তাঁর প্রথম বয়সেরই রচনা। সে হিসাবে গল্পটির রচনানৈপুণ্য বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

বুদ্ধদেবের নিজের মুখ থেকেই জানতে পারি, এগারো বৎসর বয়সেই তিনি তিন-চারখানা খাতা কবিতায় ভারিয়ে ফেলেছেন এবং তখন তাঁকে আকৃষ্ট করত আমারই কোনও কবিতা। সে আজ প্রায় তিন যুগ আগেকার কথা। তিনি বলতেন 'যখন যে লেখা ভালো লাগত, তক্ষুণি তার অনুকরণে কিছু লিখে ফেলতে না পারলে আমি টিকতেই পারতুম না। মৌচাকের দ্বিতীয় সংখ্যায় গ্রীষ্ম-বিষয়ক একটি কবিতা বেরুল—খুব সম্ভব হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা, আমি চটপট তার একটি নকল খাড়া করে মৌচাকে পাঠিয়ে দিলুম এবং চটপট সেটি ফেরৎ এল।'

কিন্তু আজ তাঁর নকল করে লেখবার এবং লেখা ফেরত আসবার দিন আর নেই। পত্রিকা সম্পাদকের কাছে তাঁর রচনা এখন মহার্ঘ। কেবল বাংলাতে নয়, ইংরেজিতেও তাঁর লেখার হাত রীতিমত পরিপক্ক। তিনি কেবল গল্প-উপন্যাস-কবিতা লেখেন না, বেশ লেখেন প্রবন্ধও। এক সময়ে নাটক রচনাতেও হাত দিয়েছিলেন, তারপর ও-বিভাগ থেকে হাত গুটিয়ে বসে আছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নতুন এবং আধুনিক যুগের উপযোগী। গত যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি তেমন শ্রদ্ধাবান নন। কিন্তু গত যুগের কোনও কোন সাহিত্যিকের মতন এমন মস্ত মস্ত গ্রন্থ রচনা করতে পারেন যে দেখলে চক্ষু বিস্ফারিত হয়—তাদের মধ্যে 'কোয়ালিটি' ও 'কোয়ান্টিটি' দুই-ই পাওয়া যায়, সাধারণত যা দুর্লভ।

'কল্লোল' কার্যালয়ে প্রেমেন্দ্রর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের সময়ে প্রথম দেখি বুদ্ধদেবকে। তাঁর লেখা পড়লে মনে জাগে, একটি একরোখা মানুষের মূর্তি, মুখে যাঁর 'কুছ পরোয়া নেহি' গোছের অদম্য ভাব। কিন্তু চেহারাটি শান্তশিষ্ট নিরীহ ধরনের, দশজনের ভিতর থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। তাঁর লেখায় যে ব্যক্তিত্ব পাই, তাঁর চেহারায় তা নেই, হাসতে হাসতে এবং কথা কইতে কইতে সিগারেটের পর সিগারেট পুড়িয়ে ছাই করেন।

ভারি সিগারেটের ভক্ত। অস্কার ওয়াইল্ডের মতো তাঁর কাছেও সিগারেট বোধ করি 'নিখুঁত আনন্দ'। ওইখানে তাঁর সঙ্গে আমার মিল আছে। সিগারেটের অভাব হলে চোখে আমি অন্ধকার দেখি। অচিন্ত্যর সঙ্গে বুদ্ধদেব একদিন আমার বাড়িতে পদার্পণ করেছিলেন।

অচিন্ত্য বললেন, 'হেমেনদার বাড়িতে যেখানেই বসি, সেইখানেই দেখি খালি ছাইদান আর ছাইদান।' বুদ্ধদেব গম্ভীরভাবে বললেন, 'প্রত্যেক ভদ্রলোকের বাড়িতেই তা থাকা উচিত।'

জাত-সাহিত্যিক এই বুদ্ধদেব। সাহিত্যের প্রতি তাঁর অটল নিষ্ঠা। এসেছে সৌভাগ্য, এসেছে দুর্ভাগ্য, কিন্তু টাকার প্রভাবে বা অভাবে কোনদিনই বিসর্জন দেননি সাহিত্যধর্ম। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি।

ঘরোয়া গানের সভা

নিজের স্মৃতি-মঞ্জুষার সঞ্চয়ই আমার অবলম্বন। কাজেই মাঝে মাঝে নিজের কথা না বলেও উপায় নেই। এবারেও নিজের প্রসঙ্গ নিয়েই লেখা শুরু করব।

আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব রাধিকানাথ রায় নিজেকে পণ্ডিতজন মনে না করলেও ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যে ছিলেন লব্ধপ্রবেশ। তাঁর রচনাশক্তিও ছিল। কখনও প্রকাশ করতেন না বটে, কিন্তু দার্শনিক প্রবন্ধ রচনা করতেন এবং সেগুলি সুলিখিত। তাঁর খুব একটি ভালো অভ্যাস ছিল। তিনি ধার করে বই পড়তেন না, কিনে পড়তেন। ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখকগণের গ্রন্থাবলী ছিল তাঁর সংগ্রহশালায়। সাহিত্য সাধনার প্রেরণা লাভ করেছি আমি আমার পিতৃদেবের কাছ থেকেই।

পিতৃদেবই আমার মনে বপন করেছেন সংগীতের বীজ। তিনি নিজে যন্ত্রসংগীতে ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। অনেকরকম বাজনা বাজাতে পারতেন—বিশেষ করে ফ্লুট ও এসরাজ বাদনে তাঁর নামডাক ছিল যথেষ্ট। এখনও চোখের সামনে দেখি, বাবা এসরাজ বাজাচ্ছেন, আর তাঁর দুই পাশে দাঁড়িয়ে আমার দুই ভগ্নী সমস্বরে গান গাইছে। এ ছিল প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আমার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র স্বর্গত সতীশচন্দ্র রায় ছিলেন গতযুগের একজন বিখ্যাত গায়ক। গ্রামোফোনের রেকর্ডেও তাঁর কয়েকটি গান তোলা আছে। সতীশদাদাকে নিয়ে বাবা প্রায়ই গান-বাজনার আয়োজন করতেন এবং নিজে বাজাতেন কোনওদিন তবলা ও কোনওদিন এসরাজ। গভীর রাত্রি পর্যন্ত গান-বাজনা চলত এবং আসরে থাকত না তিলধারণের ঠাঁই। সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে অন্যান্য গায়করাও আসরের শোভাবর্ধন করতেন। বাল্যকাল থেকে এই পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়ে আমারও মনের ভিতরে গেঁথে গিয়েছিল গানের শিকড়।

আমার বয়স যখন বছর পনেরো, তখন গ্রামোফোনের মাধ্যমে স্বর্গীয় গায়ক লালচাঁদ বড়ালের নাম ফিরছে বাংলার ঘরে-বাইরে লোকের মুখে মুখে। তাঁর বসতবাড়ি ছিল প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটে। একদিন সাহস সঞ্চয় করে তাঁর কাছে গিয়ে ধরনা দিলুম। সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতলে উঠে দেখলুম, একটি ঘরের দরজার সামনে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। সৌম্য মুখ, দোহারা চেহারা, সাজ-পোশাক বেশ ফিটফাট।

তিনি শুধোলেন, 'কী দরকার বাবা?'

বললুম, 'আজ্ঞে, আপনার কাছে গান শিখতে চাই।'

লালচাঁদবাবু স্মিতমুখে জানালেন, তিনি গুরুগিরি করেন না।

তারপর গেলুম তখনকার আর একজন প্রথম শ্রেণীর গায়ক স্বর্গীয় মহিম মুখোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি স্বর্গীয় রাধিকা গোস্বামীর অন্যতম প্রধান শিষ্য। তাঁর গানের গলাও ছিল সুমধুর। তিনি আগে শুনতে চাইলেন আমার কণ্ঠস্বর। তারপর শুনে বললেন, 'বেশ, আমি তোমাকে গান শেখাব।'

ব্রজদুলাল স্ট্রিটের একখানা ছোটো বাড়িতে ছিল মহিমবাবুর সংগীতবিদ্যালয়। রাধিকা গোস্বামীও মাঝে মাঝে সেখানে এসে দুই-চারদিন থেকে যেতেন। গান শিখতে আসত সেখানে আরও কয়েকজন ছাত্র। তাদের সঙ্গে আমারও কিছুদিন কেটে গেল সেইখানেই।

কিন্তু বেশিদিন নয়। গান নিয়ে মেতে থাকতে থাকতেই আমার মনের মধ্যে প্রবলতর হয়ে উঠল সাহিত্যের নেশা। তানপুরা তুলে রেখে কাগজ, কলম ও দোয়াত নিয়েই আমার কেটে

যেতে লাগল সারাক্ষণ। হাতমকশো করতে করতে আর গলা সাধবার সময় পেতুম না।

নিজে গায়ক হলুম না বটে, কিন্তু সংগীতকে ভুলতে পারলুম না। ভালো গান শোনবার লোভে নানা আসরে গিয়ে হাজিরা দিতে লাগলুম। তখনকার দিনে জলসার ছড়াছড়ি ছিল না। রঙ্গালয়ে শোনা যেত নিম্নতর শ্রেণীর গান এবং রঙ্গালয়ের বাইরে ঘরোয়া গানের সভা বসাতেন ধনী ব্যক্তিগণ বা সম্পন্ন গৃহস্থরা। আজ রঙ্গালয়ে গানের পাট প্রায় তুলে দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু চারিদিকেই দেখা যায় গানের অতি বাড়াবাড়ি। গ্রামোফোন আছে, সিনেমা আছে, রেডিয়ো আছে, আর আছে বড়ো বড়ো সংগীত-সম্মিলন। গান হয়ে উঠেছে সর্বসাধারণের সম্পত্তি। ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল। আগে কড়ি ফেলতেন ধনীরা এবং তেল মাখতে পেতেন কেবল তাঁরাই, সমঝদার বলে যাঁদের আমন্ত্রণ করা হত। এমন কথাও মাঝে মাঝে মনে হয়, একালে গানের আধিক্য হয়েছে যতটা, ততটা হয়নি গুণের আধিক্য। আজ স্বল্প জলেও পুঁটিমাছরা সাঁতার কাটতে পারে পরমানন্দে, কিন্তু সেকালের গুণীদের বৈঠকে স্বল্পবিদ্যার খাতির ছিল না।

শ্রীনির্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাসভবনে তাঁর খুল্লতাত ব্যাচাবাবু মাঝে মাঝে যে মাইফেলের আয়োজন করতেন, অনায়াসেই এখনকার সংগীতসম্মিলনীর সঙ্গে তার তুলনা করা যায়। কেবল কলকাতার বড়ো বড়ো গাইয়ে নন, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে শ্রেষ্ঠ সংগীতশিল্পীরা আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে যোগদান করতে আসতেন। আরও বড়ো বড়ো আসর ছিল। সংগীতের প্রতি প্রভূত অনুরাগ থাকলেও একালের অধিকাংশ ব্যক্তিই সাধারণ সংগীত-সম্মিলনে আসন গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ ভালো আসনগুলি এমনি অগ্নিমূল্য যে মধ্যবিত্তদের চিত্তে আগ্রহ থাকলেও বিত্তে কুলায় না। কিন্তু সেকালে সুরসিকরা ট্যাঁক গড়ের মাঠ হলেও বড়ো বড়ো ঘরোয়া আসরে গিয়ে আসীন হতে পারতেন অনায়াসেই। এবং সংগীতসুধার সঙ্গে সঙ্গেই থাকত কিছু কিছু 'অধিকন্তু'। অর্থাৎ বিনামূল্যে পানের খিলি ও সিগারেট প্রভৃতি। আগেকার ধনীদের দস্তুরমতো দিল ছিল। এখনকার ধনীরা একলসেঁড়ে নিজের নিজের ফুর্তি নিয়েই মশগুল, পাঁচজনের সঙ্গে মিলেমিশে উৎসব করার কথা তাঁদের মনেও জাগে না।

আগেকার বদান্যতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সাহিত্যগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন 'বিচিত্রা বৈঠক'। সুপ্রশস্ত আসর—বৃহতী জনতারও স্থান সংকুলান হত। সেখানে থিয়েটার হত, যাত্রা হত, নাচ হত, দেশি-বিদেশি গুণীর গান হত এবং সেই সঙ্গে হত কবিতা বা নাটক বা গল্প বা প্রবন্ধ পাঠ ও বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা। বৈঠকের নিজস্ব ও প্রকাণ্ড পুস্তকাগারে যেসব মহার্ঘ গ্রন্থ রক্ষিত ছিল, কলকাতার কোনও বিখ্যাত লাইব্রেরিতেও তা পাওয়া যেত না। সভ্যরা ইচ্ছা করলেই যে কোনও বই বাড়িতে নিয়ে যেতে পারতেন। 'বিচিত্রা'র সভ্য-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি—একাধারে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র। তাঁরা ইচ্ছা করলেই মুক্তহস্তে প্রচুর টাকা চাঁদা দিতে পারতেন। আবার সভ্যদের মধ্যে আমার মতো অনেক লোকও ছিলেন, যাদের ধনগৌরব উল্লেখ্য নয় আদৌ। যিনি রাজাসনে বসে লক্ষ লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখেন এবং যারা স্বপ্ন দেখেন ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে, তাঁদের উভয়েরই সামনে ছিল 'বিচিত্রা'র দ্বার উন্মুক্ত। তাঁরা উভয়েই লাভ করতেন সেখানে সমান অধিকার, সমান ব্যবহার, সমান আতিথেয়তা। এবং তাঁদের কারুকেই ব্যয় করতে হত না একটিমাত্র সোনার টাকা বা রূপোর টাকা বা কানাকড়ি। 'বিচিত্রা'র বহু সভ্যই আজও ইহলোকে বিদ্যমান। কিন্তু অনুরূপ কোনও প্রতিষ্ঠানের আয়োজন করে তাঁদের চিত্তরঞ্জন করতে পারেন, এমন কোনও ব্যক্তিই আজ বাংলাদেশে বর্তমান নেই। এখন যাঁদের দেখছি

তাঁদেরও অনেকেই বসে আছেন টাকার পাহাড়ের টঙে। সোনাদানার ভার বইতে পারে তো গর্দভরাও, কিন্তু ললিতকলার আসরে রাসভ-সংগীতের স্থান কোথায়?

গেলবারে সুকবি শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়ের কথা বলেছি। তাঁর শ্বশুরবাড়ি শান্তিপুরে। একদিন তাঁর সঙ্গে আমরা দল বেঁধে সেখানে গিয়ে হাজির হলুম। শান্তিপুর হচ্ছে ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। চৈতন্যদেবের পবিত্র পায়ের ধুলো বুকে নিয়ে শান্তিপুর পরিণত হয়েছে বৈষ্ণবদের তীর্থক্ষেত্রে। এখানে আছে তাঁর অনেক অবদান। কিন্তু সে সব কিছুর জন্যে আমরা আকৃষ্ট হইনি শান্তিপুরের দিকে। আমরা বেরিয়ে পড়েছিলুম কলকাতার বাইরে গিয়ে খানিকটা হাঁপ ছাড়বার জন্যে। রাণাঘাট থেকে পদব্রজে চূর্ণি নদীর খেয়াঘাটের দিকে চললুম। চন্দ্রপুলকিত রজনী। পথের দুইধারে বনে বনে আলোছায়ার মিলনলীলা। চারদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে সুরসংযোগ করছে গানের পাখিরা। এক জায়গায় বনের আড়ালে বেজে উঠল কার বাঁশের বাঁশি। সেই নিরালায় জ্যোৎস্নার বন্যায় মুরলীমুর্চ্ছনায় আমারও মন হয়ে উঠল সংগীতময়। বাঁশির তান তেমন মিষ্ট আর কখনও লাগেনি—বোধ করি এ স্থান-কালের গুণ। ঠিক সময়ে ঠিক সুরটি যদি প্রাণের তন্ত্রীতে এসে লাগে, তবে তা আর ভোলা যায় না।

কিন্তু সে যাত্রা আমাদের শান্তিপুরে যাওয়া সার্থক হয়েছিল আর একটি বিশেষ কারণে। শুনলুম বিখ্যাত হারমোনিয়াম বাদক (এখন স্বর্গীয়) শ্যামলাল ক্ষেত্রীর শিষ্য বীণবাবু (ভদ্রলোকের ডাকনামটিই কেবল মনে আছে) শান্তিপুরেই বাস করেন। সন্ধ্যাবেলায় আমরা দল বেঁধে তাঁর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। আমাদের দলে ছিলেন 'অর্চ্চনা'র সহকারী সম্পাদক স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস চন্দ্র, প্রসিদ্ধ গল্পলেখক ও অ্যাডভোকেট এবং 'অর্চ্চনা'র সম্পাদক শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, কবি শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়, সাহিত্যিক শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় এবং আরও কেউ কেউ, সকলের নাম স্মরণে আসছে না।

কেউ ভালো হারমোনিয়াম বাজান, এটা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক কথা নয়। বড়ো বড়ো ওস্তাদরা সুনজরে দেখেননি হারমোনিয়াম যন্ত্রটাকে। এদেশে তার আভিজাত্যও নেই, এক শতাব্দী আগেও এখানে হারমোনিয়ামের চলন ছিল না। শুনেছি এখানে তার আবির্ভাব হয় রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগ্রহে। অথচ রবীন্দ্রনাথ নিজেই পরে গানের বৈঠকে হারমোনিয়াম বর্জন করেছিলেন। আর সত্য কথা বলতে কী, এখানে হারমোনিয়ামের অবস্থা হয়ে উঠেছে বেওয়ারিস মালের মতো। যে পায় তাকে নিয়ে যখন-তখন অপটু হাতে টানা-হেঁচড়া করে বলে পাড়ার লোকের কাছে অনেক সময়ে যন্ত্রটা হয়ে ওঠে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক।

কিন্তু যথার্থ গুণীর হাতে পড়লে ওই যন্ত্রই যে কী মন্ত্রশক্তি প্রকাশ করতে পারে, সেদিন বীণবাবুর বাজনা শুনেই তা প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছিলুম। নামেও বীণবাবু, তাঁর হাতের ছোঁয়ায় হারমোনিয়ামের ভিতর থেকেও জেগে উঠল যেন কোনও নতুন বাজনা। ছন্দে ছন্দে ইন্দ্রজালের ব্যঞ্জনা। আমাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

পরে বীণবাবুর সঙ্গে কলকাতাতেও দেখা হয়েছিল। তাঁর গুরু শ্যামলালবাবুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলুম। তিনিও আমাকে হ্যারিসন রোডে শ্যামলালবাবুর বাসায় নিয়ে গেলেন। অত্যন্ত অমায়িক প্রিয়দর্শন ভদ্রলোক, চারুকলাকে অবলম্বন করে বিবাহ করতে ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর আস্তানায় এসে ভারতের সর্বশ্রেণীর খ্যাতিমান সংগীতশিল্পীরা জটলা করতেন। শ্যামলালবাবুকে দেখলুম বটে, কিন্তু তাঁর বাজনা শোনবার সুযোগ আর সেদিন হল না, পরেও হয়নি।

স্বর্গীয় বন্ধুবর নরেন্দ্রনাথ বসুর বাসভবনে আমাদের একটি ঘরোয়া সংগীতসভা ছিল। সেখানে উচ্চশ্রেণীর গানবাজনার আয়োজন হত প্রতি শনিবারেই। বাংলার বাইরে থেকেও সেরা সেরা গুণীজনকে আমন্ত্রণ করে আনা হত। একদিন এসেছিলেন এক অতুলনীয় শিল্পী, তাঁর নাম সোনে কী সনিবাবু, ঠিক মনে করতে পারছি না, তিনি গয়ানিবাসী ভারতবিখ্যাত হারমোনিয়াম বাদক স্বর্গীয় হনুমানপ্রসাদের পুত্র। তিনিও যা বাজালেন নামেই তা হারমোনিয়াম, কিন্তু শোনালে এমন বেণুবীণার কাকলী যে, মন আমাদের ভেসে গেল সুরের সুরধ্বনির উচ্ছলিত ধারায়। তারপর কেটে গিয়েছে কত বৎসর, কিন্তু আজও সেই অমূর্ত সুরের মায়া খেলা করে বেড়ায় আমার মনের পরতে পরতে।

সাধারণ হারমোনিয়াম যে শিল্পীর সাধনায় একেবারেই অসাধারণ হয়ে ওঠে, আর একদিন তার প্রমাণ পেয়েছিলুম স্বর্গীয় সংগীতাচার্য করমতুল্লা খাঁয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র রফিক খাঁয়ের বাজনা শুনে। তাও হচ্ছে অরূপ অপরূপ সুরবাহার।

বছর চারেক আগে সেরাইকেলায় গিয়ে আবার রফিক খাঁয়ের দেখা পেয়েছিলুম। তিনি তখন সেরাইকেলার রাজাসাহেবের বৈতনিক শিল্পী। সেবারে তাঁর একক বাজনা শোনবার সুযোগ পাইনি, অন্যান্য যন্ত্রীর সঙ্গে তিনি হারমোনিয়াম বাজালেন ছউ নৃত্যের তালে তালে। ঐকতানের মধ্যে শিল্পীর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আবিষ্কার করা দুষ্কর ব্যাপার।

এইবারে আমার নিজের বাড়ির গানের বৈঠকের কথা বলব। সেখানেও আপনারা দেখতে পাবেন আধুনিক যুগের বহু যশস্বী সংগীতশিল্পীকে।

কুমার শচীন্দ্র দেব-বর্মণ

আমার ঘরোয়া বৈঠকের শোভাবর্ধন করেছেন বাংলাদেশের বহু কীর্তিমান গায়কই। তাঁদের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তি হচ্ছেন স্বর্গীয় ওস্তাদ জমীরুদ্দীন খাঁ, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে ও শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রভৃতি। তাঁদের কথা নিয়ে আগেই বিশেষভাবে আলোচনা করেছি ভিন্ন গ্রন্থে বা ভিন্ন প্রবন্ধে। প্রথমোক্ত দুই শিল্পী আমার বাড়িতে এসে যে কতবার সুরস্বর্গ সৃষ্টি করেছেন, তার আর সংখ্যা হয় না। একবার সবচেয়ে দীর্ঘ গানের মাইফেল চালিয়েছিলেন জমীরুদ্দীন খাঁ সাহেব। হারমোনিয়াম নিয়ে বসলেন এক দোলপূর্ণিমার দিন দুপুরে; তারপর রাত দুপুর ছাড়িয়েও চলল তাঁর গানের অবিরাম স্রোত। একাই বারো ঘণ্টারও বেশি গান গেয়েও তিনি শ্রান্ত হয়ে পড়েননি। জমীরুদ্দীন ছিলেন বিস্ময়কর গায়ক এবং তাঁর গানের ভাণ্ডারও ছিল অফুরন্ত। কিন্তু বড়োই দুঃখের বিষয় যে, অত্যন্ত মদ্যপানের ফলে প্রৌঢ় বয়সেই ফুরিয়ে যায় তাঁর পৃথিবীর মেয়াদ। তাঁর পুত্র বালিও একসঙ্গে পিতার দোষ ও গুণ দুয়েরই অধিকারী হয়েছিলেন। গাইতেন চমৎকার গান এবং করতেন অতিরিক্ত সুরাপান। তাঁকেও কাঁচা বয়সেই করতে হয়েছিল মহাপ্রস্থান। গায়ক সমাজে মৈজুদ্দীন খাঁ ছিলেন ঐন্দ্রজালিকের মতো। এমন আশ্চর্য ছিল তাঁর অশিক্ষিতপটুত্ব, ভারতের যে কোনও প্রথম শ্রেণীর ওস্তাদের সঙ্গে তিনি পাল্লা দিতে পারতেন। তিনি ছিলেন শ্রুতিধর। একবার মাত্র শ্রবণ করলেই বড়ো বড়ো রাগরাগিণীকে নিজের করে নিতে পারতেন। কিন্তু সুরার স্রোতে সাঁতার দিয়ে তিনিও অকালে ভেসে গিয়েছিলেন পরলোকে। নট ও গায়ক বিশেষ করে এই দুই শ্রেণীর শিল্পীর সামনেই সুরা খুলে দেয় সর্বনাশের পথ। শিল্পীর আর্টকেও করে অবনত এবং শিল্পীর দেহকেও করে অপহৃত। অথচ রঙ্গালয়ে এবং গায়ক সমাজেই দেখা যায় সুরার অধিকতর প্রভাব।

আধুনিক বাংলাদেশের একজন অতুলনীয় গায়ক হচ্ছেন শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। প্রায় চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে ফুটবল খেলার মাঠে প্রায়ই দেখতুম একটি গেরুয়াধারী ক্রীড়াকৌতুকপ্রিয় উৎসাহী তরুণকে—মাথায় তাঁর দীর্ঘকেশ, চক্ষে তাঁর বুদ্ধির দীপ্তি। তখন তাঁর নামধাম জানতুম না, কিন্তু জনতার ভিতর থেকে আলাদা করে মনের পটে লিখে রেখেছিলুম তাঁর মুখচ্ছবি। বহুকাল পরে এক গানের আসরে আবার তাঁর দেখা পেলুম গায়করূপে। তখন তিনি বয়সে অধিকতর পরিণত বটে এবং তাঁর পরণেও নেই আর গেরুয়া, কিন্তু কিছু পরিবর্তিত হলেও সেই পূর্বদৃষ্টমূর্তি। তাঁর গানে তাঁর গলার কাজে মন হল মুগ্ধ। নাম শুনলুম ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়।

তারপর ভীষ্মদেবের কণ্ঠে শুনেছি অনেক গান। তাঁর সঙ্গে পরিচয়ও হয়েছে। জেনেছি তিনি কেবল গীতিকার নন, একজন ভালো সুরকারও। যথাযথভাবে সুর সংযোগ করে আমার কয়েকটি গানকে তিনি সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। এবং সেই গানগুলি তিনি যখন কারুর গলায় তুলে দিতেন, আমিও তখন মাঝে মাঝে হাজির থাকবার লোভ সামলাতে পারতুম না। আর, কোনও লোকের সঙ্গে তিনি একদিন আমার বাড়িতেও পদার্পণ করেছিলেন। কিন্তু সে ছিল অপরাহ্ণকাল, গান শোনবার সময় নয়। তিনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন আর একদিন এসে গান শুনিয়ে যাবেন।

কিন্তু ওই পর্যন্ত। তার কিছুকাল পরেই গৃহাশ্রম এবং সংগীতসাধনা ত্যাগ করে ভীষ্মদেব প্রস্থান করলেন পণ্ডিচেরিতে। সুরসৃষ্টিতে ভীষ্মদেবের শক্তিমত্তা দেখে তাঁর কাছ থেকে অনেক আশাই করেছিলুম। কিন্তু আমাদের সে আশায় ছাই দিয়ে তিনি অবলম্বন করলেন মৌনব্রত। ফুল ফুটতে ফুটতে হঠাৎ পণ করে বসল—আর আমি ফুটব না। তার ফলে আখেরে তাঁর কী লাভ হল জানি না, কিন্তু বাংলাদেশ বঞ্চিত হল এক উদীয়মান সংগীতশিল্পীর পূর্ণতাপ্রাপ্ত অবদান থেকে। শিল্পীর সাধনা হচ্ছে শিল্পের মধ্য দিয়েই, শিল্পকে ত্যাগ করে নয়। এদেশেই বিশেষ করে একথা খাটে। সংগীতের মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করে গিয়েছেন সাধক রামপ্রসাদ। কীর্তন হচ্ছে বাংলাদেশের নিজস্ব সংগীত পদ্ধতি। চৈতন্যদেব ঐহিক সবকিছুই ছাড়তে পেরেছিলেন, কিন্তু ছাড়তে পারেননি কীর্তনকে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধনমার্গেও সংগীত করেছিল বিশেষ সহযোগিতা। ভারতবর্ষ সংগীতের ভিতর দিয়েই লাভ করে পরমার্থ।

ভীষ্মদেব আবার অরবিন্দ-আশ্রম ছেড়ে গৃহাশ্রমে প্রত্যাগত হয়েছেন। কিন্তু তিনি যে সংগীতজগতে পুনরাগমন করেছেন, এমন সংবাদ পাইনি।

আধুনিক গায়কদের মধ্যে কুমার শ্রীশচীন্দ্র দেব-বর্মণের পসার হয়েছে যথেষ্ট। তিনি আগে ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের শিষ্য, তারপর তালিম নেন ভীষ্মদেবের কাছে। ত্রিপুরার রাজবংশে তাঁর জন্ম, কিন্তু আলস্য চর্চা না করে তিনি সংগীতকেই করেছেন জীবনের সাধনা।

আজকাল রেকর্ড, রেডিয়ো ও সিনেমার প্রসাদে অরসিকদের জনতার মাঝখানে এরন্ডরাও মহামহীরুহের অভিনন্দন আদায় করে নিতে পারছে। যেখানে সম্মানিত হন না সুশিক্ষিত প্রাচীন সংগীতকুশলীরা, সেখানে যশের মাল্য পরে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কুড়োতে দেখি এইসব আনাড়ি অর্বাচীনদের। মাত্র একটি কারণেই তাঁরা পারানি না দিয়েও নদী পার হবার সুযোগ পান এবং সে কারণটি হচ্ছে, তাঁদের গলা তৈরি না হলেও শুনতে মধুর। আগেও এ শ্রেণীর গাইয়ের অভাব ছিল না। কিন্তু যেমন মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত, কচি ও কাঁচামিষ্ট গলার জোরে তাঁরা বড়ো জোর বসবার জায়গা পেতেন আমুদে ছোকরাদের আড্ডাখানায়। বড়ো

বড়ো সার্বজনীন আসরে কলকে পাবার জো ছিল না তাঁদের। কিন্তু এখন সেসব জায়গাতেও তাঁদের দেখা পাওয়া যায়।

শচীন্দ্রদেব ওই শ্রেণীর গায়ক নন। গান ও কণ্ঠস্বর নিয়ে প্রভূত অনুশীলন করেছেন বলেই সাধনমার্গে তিনি নিশ্চিত পদে অগ্রসর হতে পেরেছেন। বড়ো দরদী তাঁর কণ্ঠস্বর, একটু ভাঙা ভাঙা—কিন্তু তাতেই বেড়ে ওঠে যেন তার মাধুর্য। উপরন্তু তাঁর আছে নিজস্ব গাইবার ভঙ্গি, গান শুনলেই গায়ককে চেনা যায়।

যতদূর মনে পড়ে, প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসর আগে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দের সঙ্গে সর্বপ্রথম তিনি আমার বাড়িতে পদার্পণ করেন। একজন উচ্চশ্রেণীর সংগীতশিল্পী বলে বাজারে আজ তাঁর প্রচুর খাতির, কিন্তু সেদিন তাঁর এতটা খ্যাতি ছিল না। তখন তিনি ছিলেন শিক্ষার্থী, কিন্তু শচীন্দ্রদেবের গান শুনেই আমার বুঝতে বিলম্ব হয়নি যে, ভবিষ্যৎ তাঁর সমুজ্জ্বল।

আমি ভালোবাসতুম তাঁর কণ্ঠে সুরের খেলা এবং তিনি ভালোবাসতেন আমার রচিত গানের কথা। স্বাভাবিকভাবে দুজনেই আকৃষ্ট হলুম দুজনের দিকে। দেখতে দেখতে সুদৃঢ় হয়ে উঠল আমাদের বন্ধুত্ববন্ধন। তারপর থেকে আমন্ত্রণে বা বিনা আমন্ত্রণেই আমার বাড়িতে হতে লাগল তাঁর ঘন ঘন আবির্ভাব। এবং কিছুদিন তাঁকে দেখতে না পেলে আমিও গিয়ে উপস্থিত হতুম তাঁর কাছে।

আমার বাড়িতে প্রায়ই বসত তাঁর গানের আসর। অন্যান্য গায়করাও থাকতেন। শচীন্দ্রদেবকে দেখলেই—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমার চিত্ত পিপাসিত হয়ে উঠত গীতসুধার তরে। তিনিও সংগীত ধরতেন তদগত-চিত্তে এবং নৃত্য করতে থাকত শ্রোতাদেরও চিত্তশিখী। গানে গানে সুরের টানে মন চলে যেত অরূপসায়রে রূপের সন্ধানে। গান অমূর্ত আর্ট বটে, কিন্তু তার ভিতরেও কি মূর্তি খুঁজে পাওয়া যায় না?

'এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর।'

গায়কের কণ্ঠ যখন সুরে সুরে এই কথাগুলি নিয়ে খেলা করে, তখন কি ঝর ঝর বাদল ধারায় অভিষিক্ত নির্জন পল্লিপ্রকৃতির মাঝখানে শূন্য কোনও ঘরে কান্তহীন শয্যার উপরে একাকিনী বসে থাকতে দেখি না এক বিরহিণী নারীকে? শিল্পীর সংগীতে অরূপই হয় রূপায়িত।

সুরকাররূপেও শচীন্দ্রদেব অল্প শক্তির পরিচয় দেননি। তাঁর অধিকাংশ বাংলা সংগীতে সুরসংযোগ করেছেন তিনি নিজেই। গানের কথাকে ক্ষুণ্ণ না করেও সুরকে ফুটিয়ে তোলবার নিপুণতা আছে তাঁর অসাধারণ।

'বুলবুলিকে তাড়িয়ে দিলে
ফুলবাগানের নতুন মালি'

এবং

'আজকে আমার একতারাতে,
একটি যে নাম বাজিয়ে চলি
কাজলকালো বাদল-রাতে'—

আমার এই দুটি গানে সুরসংযোগ করে শচীন্দ্রদেব যেদিন আমাকে শুনিয়ে গেলেন, সেদিন তাঁর এই নূতন শক্তির পরিচয় পেয়ে আমি বিস্মিত হয়েছিলুম।

তারপর—

'ও কালো মেঘ, বলতে পারো
কোন দেশেতে থাকো?'

আমার এই গানটিতে সুর দিয়ে শচীন্দ্রদেব যখন হিন্দুস্থান রেকর্ডের মাধ্যমে নিজেই গেয়ে শোনালেন, তখন শ্রোতাদের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন প্রচুর সাধুবাদ। সুরের ও গাওয়ার গুণে গানটিই কেবল অতিশয় লোকপ্রিয় হয়নি, শচীন্দ্রদেবেরও নাম ফিরতে লাগল সঙ্গীতরসিকদের মুখে মুখে।

আধুনিক কাব্যগীতিতে সুরসংযোগ করবার পদ্ধতিটি শচীন্দ্রদেব দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্তে আনতে পেরেছেন। আগে বাঁধা সুরের কাঠামোর উপরে যে কোনও গানকে বসিয়ে দেওয়া হত। রামপ্রসাদী সুর হচ্ছে এরকম কিন্তু তা সংযোগ করা হয় রামপ্রসাদের যে কোনও গানের কথার সঙ্গে এবং সেসব গান ভক্তিরসপ্রধান বলে শুনতে বেখাপ্পা হয় না। কিন্তু সাধারণ প্রেমের গানে সে সুর কেবল অচল হবে না, হবে রীতিমতো হাস্যকর। ওস্তাদদের আমি গম্ভীর বাঁধা সুর বসিয়ে গম্ভীরভাবে এমনি অনেক হাস্যকর গান গাইতে শুনেছি। উচ্চতর সংগীতের সেকেলে আসরে কথার দৈন্যকে আমলে না এনে সুরের প্রাধান্য দেখেই সবাই ধন্য ধন্য রব করে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই শ্রেণীর একটি হিন্দি গান উদাহরণরূপে উদ্ধার করেছেন,— 'কারি কারি কমরিয়া গুরুজি মোকো মোল দে—অর্থাৎ কালো কালো কম্বল গুরুজি আমাকে কিনে দে।' এমনি সব কাব্যগন্ধহীন রাবিসের সঙ্গেও ভালো ভালো সুর জুড়ে শ্রোতাদের শ্রবণবিবরে নিক্ষেপ করা হয় এবং কেউ আপত্তি তো করেই না, বরং তারিফ করে নিজের রসিকতার প্রমাণ দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

উচ্চতর মনীষার জন্যে ভারতবর্ষে বাঙালির একটা সুনাম আছে। তাই পূর্বোক্ত পদ্ধতির বিরুদ্ধে সর্বপ্রথমে বিদ্রোহ প্রকাশ করলেন বঙ্গদেশীয় সংগীতশিল্পীগণ। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'সুরের সঙ্গে কথার মিলন কেউ রোধ করতে পারবে না। ওরা পরস্পরকে চায়, সেই চাওয়ার মধ্যে যে প্রবল শক্তি আছে, সেই শক্তিতেই সৃষ্টির প্রবর্তনা।' তিনি নিজে অগ্রনেতা হয়ে সুকৌশলে মিলিয়ে দিলেন কথাকে সুরের এবং সুরকে কথার সঙ্গে। এই বিভাগে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ আরও কারুর কারুর দানকেও অসামান্য বলা চলে। এঁদের চেষ্টাতেই ভারতীয় সংগীতে 'কাব্যগীতি' নামে নূতন সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই ঐতিহ্যের অনুসরণ করেই পরে স্বর্গত সুরসাগর হিমাংশু দত্ত, নজরুল ইসলাম ও শচীন্দ্রদেব প্রভৃতি সুরকারগণ বাংলা গানের আসরকে জমিয়ে তুলেছেন।

অতি-আধুনিক যুগের গায়কদের মধ্যে সর্বপ্রথমে নাম করতে হয় কুমার শচীন্দ্রদেবেরই। সংগীতবিদ শ্রীদিলীপকুমার রায় লিখেছেন 'বাংলা গানের গড়ন আগের চেয়ে উঁচুতে উঠেছে—সঙ্গে সঙ্গে সুরবিহার কণ্ঠকৃতিত্বেও নানা স্থলেই অভাবনীয় রংবাহারের দীপ্তি ঝিলিক দেয় থেকে থেকে। একথা সব চেয়ে বেশি মনে হয় কুমার শচীন্দ্র দেব-বর্মণের কলকণ্ঠে কোনও কোনও বাংলা গান শুনতে শুনতে।

কিন্তু একটা কথা ভেবে আশঙ্কা হচ্ছে। শচীন্দ্রদেবও পড়েছেন সিনেমার প্রেমে। আজ কিছুকাল যাবৎ দক্ষিণ ভারতীয় চিত্রশালার সঙ্কীর্ণ পরিবেশের মধ্যে কালযাপন করছেন, সিনেমাওয়ালাদের জন্যে জোগান দিচ্ছেন ফরমাজী মাল। সিনেমা ফেরি করে হেটো মাল এবং সংগীতকলা নয় হেটো জিনিস। সিনেমার কবলে পড়লে দুর্গত হয় চারুকলা।

ঘরোয়া বৈঠকের শিল্পীগণ

এই প্রবন্ধমালায় মাঝে মাঝে এমন কারুর কারুর কথাও কিছু কিছু বলতে হচ্ছে, যাঁরা আর ইহলোকে বাস করেন না। কিন্তু এত অল্পদিন আগেই তাঁরা দেহত্যাগ করেছেন যে, মন যেন তাঁদের অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করতে রাজি হয় না। কোনও মানুষই এই মানসিক দুর্বলতাকে পরিহার করতে পারে না। প্রিয়জনের মৃত্যুর পরেও কিছুদিন ধরে মনে হয়, যেন তাঁরা আমাদের সামনে না থাকলেও কাছাকাছি কোথাও বিদ্যমান আছেন, হয়তো এখনই তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হতে পারে। এমন সন্দেহ যুক্তিহীন হলেও স্বাভাবিক। এবং তা গভীর শোকের মধ্যেও করে কতকটা সান্ত্বনার সঞ্চার।

কিছুদিন আগে সুরসাগর হিমাংশু দত্তের মৃত্যুসংবাদ পেয়েছি, কিন্তু এখনও মনে হয় না তিনি পৃথিবী থেকে মহাপ্রস্থান করেছেন। চোখের সামনে না থাকলেও যেন তিনি শহরেরই কোনও একান্তে বসে এখনও নূতন নূতন গানে করছেন নূতন নূতন সুরসংযোগ।

আকারে ছোটোখাটো, শান্তশিষ্ট, মৃদুভাষী, সুদর্শন মানুষটি। তরুণ বয়সেই প্রবীণ শিল্পীর মতো সুরসৃষ্টি করবার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। তাঁকে মনে হলেই আমার স্মরণ হয় রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দৌহিত্র, সংগীতকলাবিশারদ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের কথা। যৌবনসীমা পার হতে না হতেই তিনিও ধরাধাম ত্যাগ করেছেন, জনসাধারণের কাছে সুপরিচিত হবার আগেই। তবে বাংলা রঙ্গালয়ে যাঁরা 'মুক্তার মুক্তি', 'বসন্তলীলা' ও 'সীতা' প্রভৃতি নাটক-নাটিকার গান শুনেছেন, তাঁরা সুরকার গুরুদাসের কিছু কিছু পরিচয় পেয়েছেন।

আমার রচিত উপন্যাসকে যখন কালী ফিল্মস 'তরুণী' নামক চিত্রে রূপায়িত করে, তখন তার কয়েকটি গানে সুর-সংযোজনার ভার নেন হিমাংশু দত্ত। সেই সময়ে কালী ফিল্মসের স্টুডিয়োতেই হিমাংশু দত্তের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তাঁর সুর দেবার শক্তি ও শিল্পীসুলভ সংলাপ আমাকে আকৃষ্ট করে। দুদিন পরেই বুঝতে পারলুম, দেশি গান সম্বন্ধে সুপণ্ডিত হয়েও তিনি গোঁড়া ওস্তাদদের মতো ছুঁতমার্গের ধার ধারতেন না, স্বীকার করতেন আধুনিক যুগধর্ম। দরকার হলে উচ্চশ্রেণীর কলাবিদের মতো পাশ্চাত্য সংগীতের কোনও কোনও বিশেষত্বকে একেবারে ঘরোয়া জিনিস করে নিতে পারতেন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের মতো তিনিও ইউরোপীয় সংগীতে লব্ধপ্রবেশ ছিলেন কি না বলতে পারি না, তবে বিলাতি সুরের সঙ্গে তিনি যে সুপরিচিত ছিলেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

মাঝে মাঝে তিনি আমার বাড়িতে এসেছেন এবং আমার অনুরোধে গানও গেয়েছেন কিন্তু মৃদুকণ্ঠে। আমার রচিত আর একখানি চিত্রনাট্যের (শ্রীরাধা) গানেও তিনি চমৎকার সুর দিয়েছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানির একজন স্থায়ী সুরকারের দরকার হয়, আমি কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁরই নাম বলি। তাঁরা উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করে তাঁকে নিয়ে যান।

কিছুদিন পরে হিমাংশু দত্ত এসে বললেন, 'হেমেন্দ্রবাবু, আমি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছেড়ে দিয়েছি।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনিবনাও হল না বুঝি?'

তিনি বললেন, 'না, তা নয়। বাংলা আর হিন্দি ছবির রাশি রাশি গানে খুব তাড়াতাড়ি সুর দেবার ভার পড়ত আমার উপরে। যেমন তেমন ভাবে তাড়াহুড়ো করে সুর দিয়ে আমি আনন্দ পাই না। কাজেই আমার পোষাল না।'

খাঁটি শিল্পীর উক্তি—সচরাচর যা শোনা যায় না। আর্টের মস্ত শত্রু হচ্ছে, ব্যস্ততা। কিন্তু

এদেশের সাধারণ রঙ্গালয়ে এবং চলচ্চিত্রশালায় ও-যুক্তি খাটে না। মার্কামারা পেশাদার না হলে কোনও শিল্পীই সেখানে তিষ্ঠোতে পারে না। দরকার হলে সেখানে দুই-এক দিনের মধ্যেই তিন-চারটে নাচ বা গানের কাজ সেরে ফেলতে হয়। থিয়েটার বা সিনেমার কাজ যেমন তেমন করে চলে যায় বটে, কিন্তু শিল্পী বোঝেন, তাঁর কাজ হল নিম্নশ্রেণীর। পেশার খাতিরে পেটের দায়ে সাধারণ শিল্পীরা এ বিষয় নিয়ে উচ্চবাচ্য করেন না, কিন্তু হিমাংশু দত্ত ছিলেন অসাধারণ শিল্পী।

নজরুল ইসলামের বেলায় দেখেছি এর ব্যত্যয়। তিনি যে অসাধারণ শিল্পী সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু তাঁর মনে গানের কথার সঙ্গে সুর আসত জোয়ারের মতো। কতদিন দেখেছি, রীতিমতো জনতা ও হরেক রকম বেসুরো গোলমালের মধ্যে অম্লানবদনে বসে তিনি রচনা করে যাচ্ছেন গানের পর গান। দেখে অবাক হতুম, কারণ আমি নিজে তা পারি না। নির্জন জায়গা না পেলে আমার কলমই সরে না।

আর কেবলই কি গান? সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত অনায়াসে সুর রচনা করতেন নজরুল। প্রথম প্রথম মনে করতুম, চলতি সব বাঁধা সুরের সঙ্গেই তিনি নিজের গানের কথাগুলি গেঁথে নিতেন। এমন বিশ্বাসের কারণও ছিল।

একদিন মেগাফোন রেকর্ডের কার্যালয়ে বসে আছি, একজন তরুণী মুসলমান গায়িকার কণ্ঠ পরীক্ষা হচ্ছে। তিনি একটি উর্দু গান গাইলেন, শুনে সচকিত হয়ে উঠলুম। সে গানের সুরের সঙ্গে নজরুলের 'মোর ঘুমঘোরে এলে প্রিয়তম' নামে বিখ্যাত গানটির সুর অবিকল মিলে গেল। জিজ্ঞাসা করে জানলুম, উর্দু গানটি নূতন নয়। বোঝা গেল, নিজের গানের সঙ্গে নজরুল উর্দু গানটির সুর হুবহু চালিয়ে দিয়েছেন। এ কাজ তিনি কেবল একলাই করেননি, বাংলাদেশের আরও বহু বিখ্যাত গীতিকারই উর্দু বা হিন্দি গানের সুর ধার করে বাংলা গান শুনিয়েছেন। এমনকী রবীন্দ্রনাথেরও প্রথম দিকের কোনও কোনও গানে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে।

গোড়ার দিকে নজরুলও হয়তো তাই করতেন। কিন্তু তারপর নিয়মিতভাবে সংগীত অনুশীলনের ফলে তাঁর কণ্ঠ হয়েছিল স্বাধীন সুরের প্রস্রবণের মতো। তখন তিনি আর পরের ধনে পোদ্দারি করতেন না, নিজেই করতেন সুরসৃষ্টি। হাতে নাতে আমি তার প্রমাণ পেয়েছি। শ্রীমন্মথনাথ রায়ের 'কারাগার' নাটকের জন্যে আমি দশটি গান রচনা করেছিলুম, একটি গানে সুর দিই আমি নিজেই। বাকি নয়টি গানে সুর দেবার ভার নিলেন নজরুল। যখন তিনি সুর দিতেন, আমি বসে থাকতুম তার পাশে। নানা শ্রেণীর গান ছিল—গম্ভীর, চটুল, প্রেমের, হাসির। চাল আর ছন্দও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কোনও চলতি বাঁধা সুর কিছুতেই আমার বিভিন্ন গানের কথার সঙ্গে খাপ খেত না। কিন্তু নজরুল আমার গানের কথাগুলি পড়ে নিয়ে প্রত্যেক গানের ভাব, চাল ও ছন্দ অনুসারে এত সহজে ঠিক লাগসই সুর বসিয়ে যেতে লাগলেন যে, বিস্মিত না হয়ে পারলুম না। গানের সুর শুনে অভিভূত হত দর্শকরা।

'পায়ে পায়ে বাজে লোহার শিকল,
তালে তালে তার আমরা গাই—
শিকলের গান—শিকলের গান,
শিকলের গান শোনাব ভাই!'

এই জাতীয় ভাবোদ্দীপক গানটিতে নজরুলের দেওয়া অপূর্ব সুর রঙ্গমঞ্চের উপরে যে উদ্দীপক ভাব সৃষ্টি করত, তা এখনও আমার মনে আছে। কিন্তু প্রথম কয়েক রাত্রির পরে

আমার ওই গানে ইংরেজ গভর্নমেন্ট রাজদ্রোহের গন্ধ আবিষ্কার করেন এবং তা নিষিদ্ধ হয়।

কাব্যকার, গীতিকার ও সুরকার নজরুল সাধারণ মানুষ হিসাবে চঞ্চলতায় ও দুরন্তপনায় ছিলেন অদ্বিতীয়! আর কোনও কবিকে তাঁর মতো মন খুলে হো হো করে অট্টাহাস্য করতে শুনিনি। প্রায় প্রৌঢ় বয়সেও তিনি ছিলেন বিষম দামাল। আমার বাড়িতে শেষ যেদিন তাঁর গানের সভা বসে, সে দিনের কথা স্মরণ হচ্ছে। অনেক রাত্রে গান বন্ধ হল। তাঁর সঙ্গে সেদিন ছিলেন আমার আর এক গায়ক বন্ধু শ্রীজ্ঞান দত্ত (এখন তিনি দক্ষিণ ভারতে চলচ্চিত্র জগতের সুরকার)।

নজরুল বললেন, 'হেমেনদা, রাত হয়েছে, আজ এইখানেই আমার আহার আর শয়ন। জ্ঞানও থাকবে।'

এ রকম প্রস্তাব নতুন নয়। তাঁদের দুজনের জন্যে ত্রিতলের শয়নগৃহ ছেড়ে দিয়ে আমি নেমে এলুম দোতলায়।

গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল আচমকা। ত্রিতল থেকে দুড়ুম দুড়ুম করে শব্দ হচ্ছে আর সারা বাড়ি কেঁপে কেঁপে উঠছে।

তাড়াতাড়ি উপরে ছুটে গিয়ে শয়নগৃহের দরজায় ধাক্কা মারতে মারতে বললুম, 'ওহে কাজি, কাজি! ব্যাপার কী? তোমরা দুজনে কি মারামারি করছ?' নজরুল দরজা খুলে দিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন।

না, মারামারি নয়। নজরুল ও জ্ঞান কেউ কারুকে খাটে শুয়ে ঘুমোতে দিতে রাজি নন। একজন খাটে উঠলেই আর একজন তাঁকে ধাক্কা মেরে মেঝের উপরে ফেলে দেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলছে এই কাণ্ড।

মার্গ সংগীতের অন্তর্গত হলেও টপ্পাকে বনেদি গান বলে মনে করা হয় না, কারণ বয়স তার বেশি নয়। কিন্তু বাংলাদেশের জনসাধারণের ধাতের সঙ্গে রূপের ও খেয়ালের চেয়ে টপ্পা বেশি খাপ খায় বলে একসময়ে এখানে টপ্পার চলন হয়েছিল যথেষ্ট। বাংলায় টপ্পার গান বেঁধে কীর্তিমান হয়েছেন অনেকেই এবং তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন রামনিধি গুপ্ত বা নিধিবাবু। তাঁর কোনও কোনও গান সুরকে ত্যাগ করে কেবল কথার জন্যে সাহিত্যেও স্থায়ী আসন লাভ করেছে। নটনাট্যকার গিরিশচন্দ্র প্রমুখ লেখকরাও নিধুবাবুর প্রভাব এড়াতে পারেননি। আমাদের বাল্যকালেও নিধুবাবুর টপ্পা শুনতুম যেখানে সেখানে। কিন্তু আমাদের অতি আধুনিক কবিরা টপ্পার গান রচনা করেন না এবং অতি-আধুনিক গায়করাও বিশেষ ঝোঁক দেন না টপ্পার দিকে। আমি কিন্তু টপ্পা ভালোবাসি, তাই কিছু কিছু টপ্পার গান বেঁধেছি এবং সেগুলি গায়কপ্রবর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দের কণ্ঠে আশ্রয়লাভ করেছে। টপ্পা হচ্ছে ঠুংরির অগ্রদূত, ওর দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

অনেক দিন পরে আমাদের আসরে এসে নিধুবাবুর টপ্পা শুনিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীকালী পাঠক। আধুনিক গায়কদের মধ্যে তাঁকে টপ্পার অন্যতম প্রধান ভাণ্ডারী বলা চলে। বেশ মিষ্ট গলা তাঁর। গ্রামোফোন ও রেডিয়োর মাধ্যমে তাঁর গান সুপরিচিত হয়েছে। তাঁর জন্যেও আমি গান রচনা করেছি। সম্প্রতি এক আধুনিক যাত্রার আসরে তাঁর অন্য শ্রেণীর গানও শুনে এসেছি। গুণী লোক।

আমার বাড়ির আসরে এসে আসীন হয়েছেন আরও অনেক সুগায়ক, সকলের পরিচয় দেবার জায়গা হবে না। শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আর দেখা হয় না, তাঁর নামও শুনি না। মাঝে মাঝে তিনি এসে রবীন্দ্রনাথের গান শুনিয়ে যেতেন। তাঁর সুকণ্ঠে রবীন্দ্রগীতি

ভালো লাগত। শ্রীবিজয়লাল মুখোপাধ্যায় এবং কে. মল্লিক গ্রামোফোনের রেকর্ডে গান গেয়ে একসময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরাও আমার আমন্ত্রণ রক্ষা করেছেন। শ্রীজ্ঞান দত্ত ও শ্রীধীরেন দাস তো প্রায়ই দেখা দিতেন। উদীয়মান অবস্থায় অকালমৃত হরিপদ বসু, শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী ও শ্রীঅনুপম ঘটকও আমার বাড়িতে পদার্পণ করেছেন। আরও অনেকে আসতেন, কিন্তু নামের ফর্দ আর বাড়িয়ে কাজ নেই।

আজ ভাঙা হাটে একলা বসে সেসব দিনের কথা স্বপ্ন বলে মনে হয়, এখনও মাঝে মাঝে কেউ কেউ দেখা দিয়ে যান বটে, কিন্তু ভাঙা আসর আর জমে না।

সজনীকান্ত দাস

লিখতে লিখতে একটা কথা মনে হচ্ছে, তাও এখানে লিখে রাখি না কেন?

অর্ধশতাব্দী আগে যখন আমার সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত হয়, সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের পরলোকগমনের পর তখনও এক যুগ অতীত হয়নি। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব উত্তরোত্তর বেড়ে উঠছিল বটে, কিন্তু তখনও এখানে সাহিত্যাচার্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যশিল্পী রূপে অভিনন্দিত হতেন বঙ্কিমচন্দ্রই। তাঁর সহকর্মী বা সমসাময়িকদের অধিকাংশই তখনও সশরীরে বর্তমান। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত সাহিত্যে ও শিল্পে স্বনামধন্য অধিকাংশ ব্যক্তির সঙ্গেই সংযোগস্থাপনের দুর্লভ সুযোগ আমি লাভ করেছি এবং এই সৌভাগ্যের জন্যে আত্মপ্রসাদও অনুভব করি মনে মনে। গত অর্ধশতাব্দী ধরে অতীতের ও বর্তমানের নানাশ্রেণীর ধুরন্ধরদের আমি নিজে যেমনভাবে দেখেছি, ঠিক সেইভাবে দেখবার জন্যেই গ্রন্থে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলি লিখিত হয়েছে। 'যাঁদের দেখেছি' এবং 'এখন যাঁদের দেখছি' এই দুইখানি পুস্তকের মধ্যে আমি সাজিয়ে রাখলুম অর্ধশতাব্দীর সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ছবির মালা। জীবনের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি, পাছে আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এইসব ব্যক্তিগত ছবি লুপ্ত হয়ে যায়, তাই সময় থাকতে থাকতেই কাগজ-কলম দিয়ে এগুলিকে এঁকে রাখবার চেষ্টা করছি।

সাহিত্যক্ষেত্র এবং ব্যক্তিগত কার্যক্ষেত্রকে অনেকে পৃথক করে দেখতে অভ্যস্ত নন। তাই সময়ে সময়ে জীবনের শান্তিভঙ্গ হয়। একাধিক পত্রিকায় সমালোচকের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে হারিয়েছি আমি একাধিক বন্ধুকে। আমি তাঁদের এখনও বন্ধু বলেই মনে করি, কিন্তু আমার সমালোচনা তাঁদের মনের মতো হয়নি বলে তাঁরা আমাকে শত্রু বলেই ধরে নিয়েছেন।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে আর একটা কথাও বলে নিই। 'বোবার শত্রু নেই'—এ উক্তি মিথ্যা। আমার এক বিখ্যাত ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমার সঙ্গে পত্রালাপ ও বাক্যালাপ দুইই বন্ধ করে দিয়েছেন, কারণ তাঁর রচনা সম্বন্ধে আমি ভালোমন্দ কিছুই বলিনি।

অতঃপর যা বলছিলুম। আমার তো মনে হয়, ব্যক্তিগত আমি এবং সাহিত্যগত আমি—এই দুই আমিকে এক বলে স্বীকার না করলে যথেষ্ট ঝঞ্ঝাট ও হৃদয়দাহ থেকে অব্যাহতি লাভ করা যায়। সাহিত্যক্ষেত্রে ঐকমত্য নেই বলে বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর মনের অনৈক্য হবে কেন? আমি বেশ ভালো করেই জানি, আমার কোনও কোনও বন্ধু লেখক হিসাবে আমাকে পছন্দ করেন না। কিন্তু সেজন্যে আমার মনে কোনও গ্লানিই পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠেনি, অম্লানবদনে তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করি, তাঁরা যে আমার লেখা ভালো বলেন না, এটা আমি জানি বলেও তাঁদের জানতে দিইনি। তাঁরা যে বন্ধুরূপে আমাকে পছন্দ করেন আমার পক্ষে

সেইটুকুই পরম লাভ। সকলের লেখা সকলের ভালো লাগে না। এ সত্য মেনে না নিলে পৃথিবীতে জীবনযাত্রা হয় অসহনীয়।

আগে ছিলেন বন্ধু, পরে প্রতিকূল সমালোচনায় হয়ে দাঁড়ালেন শত্রুর মতো,—এও যেমন দেখেছি, তেমনি এও দেখেছি যে, আগে বিরুদ্ধ সমালোচনায় আহত হয়ে পরে বন্ধুরূপে কাছে এসে কেউ কেউ আমার সঙ্গে করেছেন সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপন। এও লক্ষ করেছি যে, শেষোক্ত শ্রেণীর বন্ধুদের সঙ্গে পরে মতের অমিল হলেও আর মনের অমিল হয় না। আমার এই রকম এক বন্ধু হচ্ছেন শ্রীসজনীকান্ত দাস।

সেটা হচ্ছে ১৩৩৪ সাল। তখনও সজনীকান্তের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি, তবে এর-ওর মুখে শুনতুম, তিনি 'প্রবাসী' পত্রিকার কার্যালয়ের কর্মচারী। তিনি এবং উক্ত পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 'শনিবারের চিঠি' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং মোহিতলাল মজুমদার ও শ্রীনীরদ চৌধুরী প্রভৃতি তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। আমি তখন 'নাচঘর' পত্রিকার সম্পাদক।

'ভারতী' সবে উঠে গিয়েছে। স্বর্গীয় বন্ধুবর দীনেশরঞ্জন দাশ সম্পাদকের আসনে আসীন হয়ে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীবুদ্ধদেব বসু ও শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ তরুণ লেখকদের নিয়ে খুব ঘটা করে চালাচ্ছেন 'কল্লোল' পত্রিকা। আমিও ছিলুম 'কল্লোলের' লেখক।

'শনিবারের চিঠি'তে কিছু কিছু সুলিখিত ও সুচিন্তিত সন্দর্ভ প্রকাশিত হত, কিন্তু সে বেশি ঝোঁক দিয়েছিল রঙ্গব্যঙ্গ ও সমসাময়িক পত্রিকার দোষকথনের দিকে। কোথায় কে কামজ রচনার বেসাতি করছে, 'চিঠি' হত তারই সন্দেশবহ। কেবল সে খবরদার হয়ে হরেক রকম টীকাটিপ্পনী কেটে কটূক্তি করত না, ওই সঙ্গে করত সেই সব ধিকৃত রচনা থেকে নমুনার পর নমুনা উদ্ধার। সেইসব উদ্ধৃতির মধ্যে থাকত যে অশ্লীলতা, তা উপভোগ করবার জন্যে পাঠকেরও অভাব হত না। এইভাবে 'শনিবারের চিঠি' আসর সরগরম করে দস্তুরমতো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

'শনিবারের চিঠি'র বাক্যবাণের প্রধান চাঁদমারি হয়ে ওঠে 'কল্লোল' পত্রিকা। প্রথমে আমি রেহাই পেয়েছিলুম। কিন্তু তারপর আমার উপরেও আক্রমণ শুরু হল। গদ্যে ও পদ্যে—অত্যন্ত ঝাঁঝালো ভাষায়। আদিরস পরিবেশনের জন্যে আমি আক্রান্ত হইনি। তাই মনে হয় আমার একমাত্র অপরাধ ছিল আমি 'কল্লোলের' লেখক। সঙ্গদোষে আমিও হয়েছিলুম 'নষ্ট'।

অবশেষে আমিও মৌনব্রত ভঙ্গ করতে বাধ্য হলুম এবং অন্যপক্ষও একই খেলা খেলতে পারে দেখাবার জন্যে 'নাচঘরে' খুললুম 'রংমহলের পঞ্চরং' নামে একটি নূতন বিভাগ। গদ্যে ও পদ্যে দিতে লাগলুম পালটা জবাব। অচিন্ত্যকুমার প্রমুখ কয়েকজন কবি ও লেখক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে অল্পবিস্তর সাহায্য করেছিলেন বটে, কিন্তু 'নাচঘরে'র অধিকাংশ রচনা ছিল আমারই লেখনীপ্রসূত। 'চিঠি'র ব্যঙ্গকবিতাগুলির রচয়িতা ছিলেন সজনীকান্ত। সেই লেখনীযুদ্ধ জনসাধারণের চিত্তরোচক হয়েছিল।

কোনও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নয়, ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল কৌতুকচ্ছলেই—যদিও কৌতুকটা গড়িয়েছিল যেন কিছু বেশিদূর পর্যন্ত। এবং আমার পক্ষেই সুবিধা ছিল অধিক। 'শনিবারের চিঠি' মাসিক, 'নাচঘর' সাপ্তাহিক। 'চিঠি' মাসে একবার বচনবাণ ছাড়লে, আমি বাক্যবুলেট ছোড়বার সুযোগ পাই মাসে চারবার। এইভাবে চলল কিছুকাল।

প্রথমে আক্রমণ আরম্ভ করে শেষটা 'শনিবারের চিঠি'ই প্রথমে দিলে রণে ক্ষান্ত। তুষ্ণীভাব অবলম্বন করল আমারও লেখনী।

খেলাচ্ছলেই আমরা দাঁড়িয়েছিলুম পরস্পরের বিরুদ্ধে, আমাদের মধ্যে ছিল না কিছুমাত্র রেষারেষি ভাব। তাই কিছুদিন পরে যখন পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হলুম, বেশ সহজ ও স্বাভাবিকভাবে দুজনেই গ্রহণ করলুম দুজনকে। আমাদের বিরোধটা ছিল অভিনয় মাত্র।

আসল কথা বলতে কী, ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে সজনীকান্ত 'কল্লোলের' দলকেও আক্রমণ করেছিলেন বলে মনে হয় না। সেও ছিল ভান। 'শনিবারের চিঠি'র চাহিদা বাড়াবার জন্যেই তিনি তুলেছিলেন অশ্লীলতার অজুহাত। ব্যবসাদারি চাল ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ যে শ্রেণীর রচনার জন্যে তিনি 'কল্লোল'কে আক্রমণ করতেন, ঠিক সেই শ্রেণীর গল্পই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'শনিবারের চিঠি'তে।

'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন 'পুরীতে বেড়াতে গিয়েছি বুদ্ধদেব, আমি আর অজিত। একদিন দেখি সমুদ্র থেকে কে উঠে আসছে। পুরাণে-মহাভারতে দেখেছি কেউ কেউ অমনি উদ্ভূত হয়েছে সমুদ্র থেকে। তাদের কারুর হাতে বিষভাণ্ডও হয়তো ছিল। কিন্তু এমনটি কাউকে দেখব তা কল্পনাও করতে পারিনি। স্বর্গ-নৃত্য সভার কেউ নয়, স্বয়ং সজনীকান্ত।

একই হোটেলে আছি। প্রায় একই ভোজনভ্রমণের গণ্ডীর মধ্যে একই হাস্য-পরিহাসের পরিমণ্ডলে।

সজনীকান্ত বললে, 'কেবল বিষভাণ্ড নয়, সুধাপাত্রও আছে। অর্থাৎ বন্ধু হবারও গুণ আছে আমার মধ্যে।'

সজনীকান্ত অত্যুক্তি করেননি। তাঁর মধ্যে বন্ধু হবার গুণ আছে এবং অপরকেও তিনি খুব সহজেই বন্ধুরূপে আকৃষ্ট করতে পারেন। এই গুণের জন্যেই তিনি কয়েকজন প্রখ্যাত রচনাকুশল সাহিত্যিককে নিয়ে একটি শক্তিশালী নিজস্ব গোষ্ঠী গঠন করে 'শনিবারের চিঠি'র মতো নতুন ধরনের পত্রিকাকে সার্থক, লোকপ্রিয় ও দীর্ঘজীবী করে তুলতে পেরেছেন। 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' ও 'বসুমতীর' মতো সুবৃহৎ সুচিত্রিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকার কথা ছেড়ে দিই, 'চিঠি' যে সময়ে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, তখনকার আর কোনও মাসিক পত্রিকা আজ পর্যন্ত এমনভাবে সজীব হয়ে বাজার দখল করে রাখতে পারেনি। বরাবর দেখে আসছি, এদেশের ছোটো ছোটো ও মাঝারি মাসিক কাগজগুলি ভেকচ্ছত্রের মতো দলে দলে জন্মগ্রহণ করে, যেন অনতিবিলম্বে মৃত্যুমুখে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়েই। অকালমৃত্যুই যেখানে প্রায়নিশ্চিত, ক্ষুদ্র 'শনিবারের চিঠি' সেখানে অভাবিতরূপে কেবল সুদীর্ঘ পরমায়ুরই অধিকারী হয়নি, উপরন্তু ক্রমে ক্রমে অধিকতর পরিপুষ্টি লাভ করে রীতিমতো গরিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তার সমসাময়িক ও প্রধান প্রতিযোগী 'কল্লোল' আসর জমাবার জন্যে রীতিমতো হুল্লোড় তুলেছিল এবং সে-ও লাভ করেছিল এক বিশেষ শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠীর কাছ থেকে অকৃপণ রচনাদাক্ষিণ্য। কিন্তু জীবনযুদ্ধে হার মেনে তাকেও বরণ করতে হয়েছে অকালমৃত্যু।

চাহিদা বাড়াবার জন্যে 'শনিবারের চিঠি'কে যে প্রথম প্রথম কিছু কিছু উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়েছিল, এ সত্য স্বীকার না করে উপায় নেই। কিন্তু স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হবার শক্তি অর্জন করবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সে সংস্কৃত ও যথার্থরূপে গুণসুন্দর করে তুলতে পেরেছে। 'শনিবারের চিঠি' হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলা ভাষার একখানি শ্রেষ্ঠ পত্রিকা। সমাজপতির 'সাহিত্য', দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর 'নব্যভারত' এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী'র মতো 'শনিবারের চিঠি'ও সজনীকান্তের নিজস্ব অবদানরূপে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কিন্তু 'চিঠি', তাঁর একমাত্র কীর্তি নয়। তিনি হচ্ছেন কবি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

নির্মলচন্দ্র চন্দ্র

সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মিলনস্থানকে কেউ যদি 'আড্ডা' বলে মনে করতেন, তাহলে 'ভারতী' সম্পাদক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রতিবাদ করে বলতেন, "সাহিত্যিকদের আসরকে আড্ডা বলা উচিত নয়। আড্ডা শব্দটির মধ্যে কিছুমাত্র আভিজাত্য নেই। নানা স্থলে তার কদর্থও হতে পারে।"

মণিলালের মত সমর্থনযোগ্য।

কিন্তু আটত্রিশ নম্বর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে দুই যুগ আগে স্বর্গীয় গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের ভবনে প্রতিদিন বৈকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত যে বৈঠকটি বসত, তাকে আড্ডা বললে অন্যায় হবে না। কারণ সেখানে এসে ওঠাবসা করতেন বটে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ, সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ও সঙ্গীতাচার্য করমতুল্লা খাঁ প্রমুখ তখনকার অধিকাংশ প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও নানাশ্রেণীর শিল্পিগণ, কিন্তু সেই সঙ্গে সেখানে আড্ডা মারতে আসতেন এমন সব ব্যক্তিও অনায়াসেই যাঁদের গোলা লোক বলে গণ্য করা চলে। জ্ঞানী-গুণী-নামীদের সঙ্গে তথাকথিত র‍্যাম-শ্যামের সম্মিলন গজেনবাবুর বৈঠকটিকে করে তুলেছিল রীতিমতো বিচিত্র। সে বৈঠকে বাদ পড়ত না কোনও কিছুই—জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত।

ওইখানেই প্রথম আলাপ হয় শ্রীনির্মলচন্দ্র চন্দ্রের সঙ্গে।

তক্তাপোশের উপর ফরাশ পাতা। মাথার উপরে ঘুরছে বিজলিপাখা। ফরাশের উপরে তাকিয়া এবং তাকিয়ার উপরে আড় হয়ে হেলান দিয়ে আলবালার নলে মাঝে মাঝে টান দিচ্ছেন এবং মাঝে মাঝে কথা কইছেন নির্মলচন্দ্র। দোহারা দেহ। গৌরবর্ণ। সৌম্য, প্রসন্ন মুখ। সম্প্রতি পত্রিকায় পত্রিকায় তাঁর যেসব প্রতিকৃতি বেরিয়েছে, তার ভিতর থেকে তখনকার নির্মলচন্দ্রের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না বললেও চলে। বহুকাল পরে কিছুদিন আগে মিনার্ভা থিয়েটারে এক সভায় নির্মলচন্দ্রের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। 'হেমেনদা' বলে তিনি যখন আমাকে সম্ভাষণ করলেন, তখন প্রথমটা তাঁকে আমি চিনতেই পারিনি। প্রৌঢ়ত্বের পরে দেহের এই দ্রুত অধঃপতন একটা ট্রাজেডির মতো। আমার পনের বৎসর আগেকার ফোটোর মধ্যে আমার আজকের চেহারা খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ এই পনের বৎসরের মধ্যে একটুও বদলায়নি আমার মন। মনে হয়, বিধাতার এটা সুবিচার নয়।

বন্ধুবান্ধবদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আলবলার নল হাতে করে নির্মলচন্দ্র ধীরেসুস্থে বসে বসে সকলের সঙ্গে গল্প করছেন এবং যখন-তখন ভিতরে থেকে বাড়ির গৃহিণী বৈঠকধারীদের জন্যে পাঠিয়ে দিচ্ছেন চায়ের পেয়ালা ভরা 'ট্রে'র পর 'ট্রে' আর রাশিকৃত পানের খিলি ভরা রেকাবির পর রেকাবি। পেয়ালা আর রেকাবি খালি হয়ে যায় ঘন ঘন।

ধোপদস্ত গিলে করা ফিনফিনে পাঞ্জাবি ও চুনট করা তাঁতের ধুতি এবং দামী জুতো পরে প্রবেশ করেন এক বিপুলবপু সুপুরুষ। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় কোনও ফুর্তিবাজ শৌখিন

যুবক—আসলে কিন্তু তিনি হচ্ছেন পৃথিবীখ্যাত প্রত্নবিদ্যাবিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মৌখিক ভাষণেও থাকে না প্রত্নতত্ত্বের ছিটেফোঁটা, বরং জাহির হয় অল্পবিস্তর খিস্তিখেউড়!

আসেন নরহস্তীর মতো বিশাল চেহারা নিয়ে আমাদের 'চিদ্দা'—জনসাধারণের কাছে যিনি হাস্যসাগর চিত্তরঞ্জন গোস্বামী। তাঁর জন্যে আসে শ্বেতপাথরের পেয়ালায় ঢালা চা এবং চায়ে চুমুক দিতে দিতে তিনি শুরু করেন ছেবলামিভরা চুটকি গালগল্প এবং কথার পর কথা সাজিয়ে কথার খেল। রাখালের মনের মতো জুড়ি। বৈঠকী হাস্যরসাভিনয়ে চিত্তরঞ্জন ছিলেন একেবারেই অতুলনীয়।

আসেন সর্বজনপ্রিয় 'দাদাঠাকুর' বা শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত। তিনিও একটি অসাধারণ চরিত্র। তাঁর একটি হাসির রচনায় পরিপূর্ণ পত্রিকা ছিল, নাম 'বিদূষক'। তিনি একাই ছিলেন 'বিদূষকে'র সম্পাদক, লেখক, মুদ্রাকর, প্রকাশক ও ফেরিওয়ালা। পথে পথে ঘুরে নিজের কাগজ নিজেই বিক্রি করতেন। অতি সাদাসিধে মানুষ। একহারা দেহ। টকটকে গৌরবর্ণ। নগ্ন পদ। গায়ে জামার বদলে চাদর। হাসিখুশি, গালগল্পে মাতিয়ে রাখেন সবাইকে।

একদিন তিনি বৈঠকে বসে আছেন, এমন সময়ে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তিনি বললেন, "এই যে, 'বিদূষক' শরৎচন্দ্র।"

দাদাঠাকুর তৎক্ষণাৎ পাল্টা সম্ভাষণ করলেন, "এসো এসো 'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্র!" তার কিছুকাল আগে শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাস বাজারে বেরিয়েছিল।

মুখের মতো জবাব পেয়ে শরৎদা নির্বাক।

এমনই নানা শ্রেণীর গুণীরা এসে আসর ক্রমে জাঁকিয়ে তোলেন। এবং তাঁদের মাঝখানে আসীন হয়ে আলবলার নল হাতে নিয়ে নির্মলচন্দ্র করতে থাকেন সকলের সঙ্গে সরস বাক্যালাপ। কেটে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। নেই কোনও ব্যস্ততা বা তাড়াহুড়ো। যে চেনে না সে মনে করবে, তিনি কোনও কমলবিলাসী, পরম আরামী ব্যক্তি—ধার ধারেন না কোনও ঝুঁকির। অথচ কত দিকে তাঁর কত কর্মশীলতা! তিনি বিখ্যাত আইনব্যবসায়ী, রাজনৈতিক এবং দেশের নেতা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কর্মসহচর, মহাত্মা গান্ধীর অনুগামী। কলকাতার পৌরসভার সভ্য। বঙ্গীয় আইনসভার এবং ভারতীয় আইনসভার সদস্য হয়েছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আপাতত আমার আর কিছু বলবার নেই। বর্তমান প্রবন্ধমালার উদ্দেশ্যও নয়, কারুর জীবনকাহিনী বর্ণনা করা। আমি কেবল আঁকতে চাই এক একজন গুণীর এক একখানি রেখাছবি।

সে সময়ে বাংলাদেশের ও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঘটছে চিত্তোত্তেজক ঘটনার পর ঘটনা। দেশব্যাপী অশান্তি, অবিচার ও নির্যাতিতের আর্তনাদ। কালাপানির ওপারে বসে ক্রুদ্ধ গর্জন করছে জনবুলের পোষা ব্রিটিশ সিংহ এবং তার প্রতিধ্বনি ভেসে আসছে কন্যা-কুমারিকা পার হয়ে রাহুগ্রস্ত জম্বুদ্বীপে। ইংরেজ ভেবেছিল এ দেশে তার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিত পাকা করে গাঁথা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই জীর্ণ ভিত যে ভিতর-ফোঁপরা হয়ে এসেছে, এ সন্দেহ তখনও সে করতে পারেনি। প্রদেশে প্রদেশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সন্ত্রাসবাদীরা—বিশেষ করে বাংলা দেশে। তার উপরে মহাত্মা গান্ধী শুরু করলেন অসহযোগ আন্দোলন—নিরস্ত্রের পক্ষে এক নূতন অস্ত্র। অহিংসার দ্বারা হিংসাকে দমন। একদিকে সন্ত্রাসবাদ আর

একদিকে অসহযোগ আন্দোলন, মাঝখানে পড়ে রক্তশোষক বিদেশি শাসকদের অবস্থা হল অত্যন্ত কাহিল। সিপাহী যুদ্ধের সময়ে সহস্র সহস্র অস্ত্রধারী সিপাহীরাও ইংরেজদের এমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তুলতে পারেনি। তাদের মাথা খারাপ হয়ে গেল। হন্তদন্ত হয়ে তারা অবলম্বন করলে দমননীতি। ভাবলে, জেলে পুরে, নির্বাসনে পাঠিয়ে ও বুলেট চালিয়ে ভেঙে দেবে দুরন্তদের মেরুদণ্ড।

সেই চিরস্মরণীয় মুক্তিসংগ্রামের যোদ্ধাদের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন, নির্মলচন্দ্র হচ্ছেন তাঁদেরই অন্যতম। এক একদিন এক একটি ঘটনার সংবাদ বিদ্যুতের মতো দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে, আর নির্মলচন্দ্র এলেই আমরা চারিদিক থেকে সাগ্রহে তাঁকে ঘিরে বসি, তাঁর মুখ থেকে ভিতরের কথা শুনতে পাব বলে। তিনিও আমাদের আগ্রহ নিবারণ করতে আপত্তি করতেন না। বেশ গুছিয়ে গুছিয়ে আমাদের শোনাতেন তখনকার নানা রাজনৈতিক ঘটনার কথা। তাঁর মুখে আমরা সে যুগের প্রখ্যাত রাজনীতিজ্ঞদের ব্যক্তিগত জীবনেরও অনেক কথা শ্রবণ করেছি।

কিন্তু কেবল রাজনীতি, আইন ব্যবসায় বা দেশহিতকর বিবিধ কর্তব্য নিয়েই নির্মলচন্দ্র নিজেকে ব্যাপৃত রাখেননি। সাহিত্যিক না হয়েও তিনি সাহিত্যরসিক। নইলে কর্মব্যস্ততার ভিতর থেকে ছুটি নিয়ে যখন-তখন সাহিত্যিকদের সঙ্গে উঠতে বসতে আসতেন না। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ববন্ধন সুদৃঢ় হয়ে উঠেছিল। শরৎচন্দ্রও কিছুকাল রাজনীতি নিয়ে যারপরনাই মাথা ঘামিয়ে ছিলেন। প্রায়ই গিয়ে হাজির হতেন নির্মলচন্দ্রের ভবনে। তাঁদের দু'জনের মধ্যে কে বেশি করে কার প্রেমে মশগুল হয়েছিলেন, সে কথা আমি বলতে পারব না।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও নির্মলচন্দ্রের দেখা পেয়েছি। তিনি প্রকাশ করেছিলেন একখানি দৈনিক পত্রিকা। বৈকালে দেখা দিত বলে তার নাম হয়েছিল 'বৈকালী'। বোধ করি সে হচ্ছে ঊনত্রিশ-ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। সম্পাদনায় তাঁকে সাহায্য করতেন শ্রী প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (পরে 'ভারত' সম্পাদক)। শ্রী পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ও তাঁদের দলে ছিলেন বলে মনে হচ্ছে। কিছুদিন আমিও ছিলুম 'বৈকালী'র নিয়মিত নিবন্ধলেখক।

মাঝে মাঝে শখ করে 'বৈকালী' কার্যালয়ে বেড়াতে যেতুম। 'বৈকালী' কার্যালয় বলতে বুঝায় 'বসুমতী' কার্যালয়। 'বসুমতী সাহিত্যমন্দিরে'র দ্বিতলের দালানের একদিকে বসে কাজ করতেন 'বৈকালী'র কর্মীরা। এখন সে জায়গাটা ঘিরে নিয়ে হয়েছে 'বসুমতী'র বিজ্ঞাপন বিভাগের আপিস। 'বৈকালী' ছাপা হত 'বসুমতী' প্রেসেই।

সেইখানে আলাপ-পরিচয় হয় 'বসুমতী'র কর্ণধার স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি সংবাদপত্র চালনা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করলেন। তাঁর সঙ্গে হয়েছিল আরও কোনও কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনা। এতদিন পরে সব কথা মনে পড়ে না। ইউরোপ থেকে 'দৈনিক বসুমতী'র জন্যে মস্ত বড় এক নতুন প্রেস এসেছে, একদিন তিনি আমাদের নিয়ে নিচে নেমে তাই দেখিয়ে আনলেন। বেশ সদালাপী মানুষ।

নাট্যকলার জন্যেও নির্মলচন্দ্রের মনের মধ্যে ছিল যথেষ্ট প্রেরণা। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে শিশিরকুমারের আবির্ভাবের ফলে গিরিশোত্তর যুগের বাংলা রঙ্গালয়ের পুরনো বনিয়াদ নড়বড়ে হয়ে যায়। তবে সে যাত্রা শিশিরকুমার এখানে স্থায়ী হতে পারেননি। সকলকে অভিভূত করে

তিনি দৃশ্যমান ও অদৃশ্য হন ধূমকেতুর মতো। কিন্তু নাট্যরসিক বাঙালির মন তখন সচেতন হয়ে উঠেছে। অভিনয়ের নামে ছেলেখেলা নিয়ে ভুলে থাকতে তারা আর রাজি হল না। চাইলে সবাই নবযুগের অভিনব অবদান।

সেই চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে বাইরে থেকে যাঁরা বাংলা রঙ্গালয়ের অন্দরমহলে প্রবেশ করলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন নির্মলচন্দ্রও। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও বাংলা রঙ্গালয়ের অনুরাগী ছিলেন। মনে মনে তিনি এখানে জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পও পোষণ করতেন, কিন্তু তা বিফল হয় তাঁর অকালমৃত্যুর জন্যে। দেশবন্ধুর অনুগামী নির্মলচন্দ্রও যে নাট্যকলারসিক হবেন, সেটা কিছু বিস্ময়কর নয়। তিনিও হলেন নবগঠিত আর্ট থিয়েটারের অন্যতম পরিচালক।

এই নব প্রতিষ্ঠানের পরিচালকরা প্রথমেই বুঝে নিলেন, একান্তভাবে সেকেলে মালের বেসাতি আর চলবে না। চাই আধুনিকতা, চাই তাজা মুখ, চাই নূতন রক্ত। অতএব তাঁদের আমন্ত্রণে সাড়া দিলেন স্বর্গীয় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় ইন্দু মুখোপাধ্যায়, স্বর্গীয় তিনকড়ি চক্রবর্তী, শ্রী নরেশচন্দ্র মিত্র ও শ্রী অহীন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি। সুফল ফলতেও বিলম্ব হল না। নাটক হিসাবে 'কর্ণার্জুন' কিছুমাত্র অসাধারণ না হয়েও কেবল নূতন রক্তের জোরেই একাদিক্রমে শতাধিক রজনী অভিনীত হবার গৌরব অর্জন করলে।

আর্ট থিয়েটারের সকলেই শিশিরকুমারের পক্ষে ছিলেন না। নিজের সম্প্রদায় নিয়ে তিনি যখন নাট্যজগতে পুনরাগমন করলেন, তখন তাঁরা সাধ্যমতো বাধা দিতে ছাড়েননি। কিন্তু ওখানকার অন্যতম পরিচালক হয়েও নির্মলচন্দ্র ছিলেন শিশিরকুমারের অনুরাগী বন্ধু। তাই শিশিরকুমারের যাত্রাপথ সুগম করবার জন্যে তিনি আর্থিক সাহায্য দান করতেও বিরত হননি।

সামাজিকতার দিকেও তিনি যথেষ্ট সচেতন। ক্রিয়াকর্মে বহু বন্ধুবান্ধবকে সাদর আমন্ত্রণ করতে ভোলেন না। একাধিকবার আমাকেও স্মরণ করেছিলেন। তাঁর রসালাপ শুনে ও ভূরিভোজন করে ফিরে এসেছি। ভূরিভোজন! এই 'রেশনে'র যুগে কথাটাকে আজব বলে মনে হয়।

একবার তাঁর একসঙ্গে জোড়া পুত্রলাভ হয়। তিনি ঘটা করে এক দোলযাত্রার দিনে স্টিমার-পার্টির আয়োজন করলেন। আমন্ত্রিত হলেন বহু বিখ্যাত ব্যক্তি। আমিও বিখ্যাত না হলেও উপেক্ষিত হইনি। যাত্রা শুরু হল সকাল বেলায়। ত্রিবেণী পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলুম সারাদিন কাটিয়ে। জলযানে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ, মুক্তবায়ু সেবন, বন্ধু-সম্মিলন, রসভাষণ, শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দে'র সঙ্গীত শ্রবণ এবং ভূরিভোজন। সেই আনন্দময় দিনটিকে আজও মনে করে রেখেছি।

সবদিক দিয়ে শিষ্ট, মিষ্ট ও বিশিষ্ট এই মানুষটি কলকাতার পুরাধ্যক্ষ বা মেয়র পদে বৃত হয়েছেন। নির্বাচকরা করেছেন যথার্থ গুণীর আদর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেরাইকেলার রাজাসাহেব

উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ ও পাটনা প্রভৃতির মতো সেরাইকেলাও এতদিন ছিল একটি করদ রাজ্য। আকরে বৃহৎ নয়। সম্প্রতি ভারতের অন্তর্গত হয়েছে।

কিছুকাল আগে সেরাইকেলাকে বিহারের ভিতরে চালান করে দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু তার উপরে আছে উড়িষ্যার ন্যায়সঙ্গত দাবি। কারণ সেখানকার বাসিন্দারা নিজেদের উড়িয়া বলেই মনে করে এবং উড়িয়া ভাষাতেই কথা কয়। বাংলাদেশের সঙ্গেও তার যথেষ্ট সংস্রব আছে, কারণ সে বাংলারই প্রতিবেশী এবং সেরাইকেলার বাসিন্দারা বাংলাভাষাও বেশ বোঝে।

কিন্তু বাংলাদেশের প্রতিবেশী হলেও তের-চোদ্দ বৎসর আগেও আমি সেরাইকেলার নাম পর্যন্ত জানতুম না, কারণ তার কোনও বিশেষ অবদান বাংলাদেশের ভিতরে এসে পৌঁছয়নি।

তাই স্বর্গত প্রমোদ-পরিচালক হরেন ঘোষ যখন প্রস্তাব করলেন, "সেরাইকেলার রাজাসাহেবের কাছ থেকে আমন্ত্রণ এসেছে। ওখানকার স্থানীয় নাচ দেখতে যাবেন?" আমি প্রলুব্ধ হলুম না। বহুকাল আগে ইংলন্ডের এক যুবরাজের কলকাতা আগমন উপলক্ষে এখানে ময়ূরভঞ্জের পাইকদের নাচ দেখানো হয়েছিল এবং সে নাচ হয়েছিল অত্যন্ত লোকপ্রিয়। কিন্তু সেরাইকেলার নাচ কখনও দেখিনি বা তার কথাও কারুর মুখে শুনিনি। কাজেই অবহেলাভরে হরেনের প্রস্তাব প্রত্যাখান করলুম। পরের বৎসরে আবার এল রাজাসাহেবের আমন্ত্রণ। ইতিমধ্যে নৃত্যবিশেষজ্ঞ হরেন ঘোষের মুখে সেরাইকেলার ছৌ নাচের উজ্জ্বল বর্ণনা শ্রবণ করে মনের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে প্রভূত কৌতূহল। গ্রহণ করলুম দ্বিতীয়বারের আমন্ত্রণ। কলকাতা থেকেই রাজাসাহেবের অতিথিরূপে ট্রেনে গিয়ে আরোহণ করলুম।

ছৌ নাচ দেখলুম যথাসময়ে। পাহাড়, প্রান্তর, কান্তার ও নদীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝখানে শহর থেকে দূরে গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে মনুষ্যসৃষ্ট চারুকলার এত ঐশ্বর্য যে লুকিয়ে থাকতে পারে, এমন কল্পনা মনেও আসেনি। কেবল পরিকল্পনার মাধুর্যে ও বিস্ময়প্রাচুর্যে নয়, ছন্দসৌকুমার্যে, ভঙ্গি বৈচিত্র্যে ও কাব্যলালিত্যেও সেরাইকেলার এই ছৌ নৃত্য আমার চিত্তকে করে তুললে সমৃদ্ধ ও উৎসবময়। ভারতের অধিকাংশ প্রাদেশিক নৃত্যের মতো এ নাচ একদেশদর্শী নয়, মানুষের বিচিত্র জীবনকে এ দেখতে ও দেখাতে চেয়েছে সকল দিক দিয়েই। পৌরাণিক, আধুনিক, লৌকিক, আধ্যাত্মিক, ঐতিহাসিক, সাংসারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, কাল্পনিক ও বস্তুতান্ত্রিক তাবৎ চিত্রই ফুটে ওঠে এই নাচের ছন্দোবদ্ধ আঙ্গিক অভিনয়ের ভিতর দিয়ে। উদয়শঙ্করের আবির্ভাবের আগেই এমন এক সর্বতোমুখ নৃত্য বাংলাদেশের পাশেই সেরাইকেলার সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে লালিত হয়ে এসেছে, অথচ সে সংবাদ বাইরের কেহই পায়নি। বাংলা দেশে এই অপূর্ব নৃত্যের কাহিনী সর্বপ্রথমে প্রকাশিত হয় আমার দ্বারা সম্পাদিত 'ছন্দা' পত্রিকায়, সে হচ্ছে মাত্র এক যুগ আগেকার কথা।

ভারতনাট্যম, কথাকলি, মণিপুরী বা কথক প্রভৃতি নৃত্য প্রচুর প্রশস্তি লাভ করেছে, কিন্তু ওদের কোনটির মধ্যেই প্রকাশ পায় না আধুনিক যুগধর্ম, ওরা প্রাণপণে আঁকড়ে আছে অতীতকেই। আমরা ওদের দেখি, খুশি হই, উপভোগ করি, অভিনন্দন দিই, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার কোলে মানুষ হয়ে ওদের প্রাণের আত্মীয় বলে মনে করতে পারি না, কারণ ওদের মধ্যে খুঁজে পাই না বর্তমানের প্রাণবস্তু। এইজন্যেই উদয়শঙ্কর যখন অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রেখে নব নব পরিকল্পনায় আধুনিক মনের খোরাক জোগাবার ভারগ্রহণ করলেন, তখনই তিনি হয়ে উঠলেন আবালবৃদ্ধবনিতার প্রেয় স্বজন। তাঁরও বিশেষ গুণপনা এবং সৃষ্টিক্ষম প্রতিভার দিকে সর্বপ্রথমে বাংলা দেশের রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল মৎসম্পাদিত 'নাচঘর' পত্রিকাতেই।

কিন্তু উদয়শঙ্করের আগেও যে অতীতের ঐতিহ্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ না করেও গোঁড়ামির শৃঙ্খল ছিঁড়ে ভারতীয় নৃত্যকলার মধ্যে যুগোপযোগী নূতনত্ব আনবার চেষ্টা হয়েছিল, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই ছৌ নাচ। তবে সে সত্য বহুদিন পর্যন্ত সকলের অগোচরে থেকে গিয়েছিল চক্ষুষ্মান সমালোচকের অভাবে।

ছৌ নাচের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিপালক হচ্ছেন সেরাইকেলার রাজা শ্রী আদিত্যপ্রতাপ সিং দেও বাহাদুর। নাচ দেখবার পর তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হল। আমি বললুম, "রাজাসাহেব, সেরাইকেলার এমন একটা অপূর্ব অবদানের কথা বাইরের লোক জানে না। দুঃখের বিষয়, তাঁদের জানাবার জন্যে কোনও উল্লেখযোগ্য চেষ্টাও হয়নি।"

সেখানে আরও কেউ কেউ উপস্থিত ছিলেন। কে একজন বললেন, "এ নাচকে আমরা সেরাইকেলার নিজস্ব বলে মনে করি। একে দেশের বাইরে নিয়ে গেলে আরও অনেকেই এর নকল করতে পারে।" অর্থাৎ তাঁর ধারণা, সাত নকলে আসল খাস্তা হওয়ার সম্ভাবনা।

ভারতবর্ষে আর্টের কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই রকম সংকীর্ণ মনোবৃত্তি পোষণ করা হয়—বিশেষ করে 'ক্লাসিকাল' সঙ্গীতকলার। ওস্তাদরা সঙ্গীতের বিশেষ বিশেষ গুপ্তকথা বাইরে কারুর কাছে ব্যক্ত করতে চাননি, তা জানতে পেরেছে বংশানুক্রমে কেবল তাঁদের উত্তরাধিকারীরাই।

পরমাণু বোমার নির্মাণপদ্ধতি লুকিয়ে রাখা উচিত, কারণ তা সুলভ হলে পৃথিবী থেকে মনুষ্যজাতি লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ললিতকলা করে বিশ্বের কল্যাণসাধন। যা সর্বজনভোগ্য, তাকে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বন্দী রাখা স্বার্থপরতা।

উপরন্তু অনুকরণের দ্বারা শ্রেষ্ঠ আর্টের মহিমা কোনদিনই ক্ষুণ্ণ হয়নি। অননুকরণীয় হচ্ছেন কাব্যে রবীন্দ্রনাথ, চিত্রে অবনীন্দ্রনাথ, অভিনয়ে শিশিরকুমার, নৃত্যে উদয়শঙ্কর প্রভৃতি। অনুকারীরা যখনই এঁদের অবলম্বন করেছেন, হাস্যাস্পদ ছাড়া আর কিছুই হতে পারেননি। পরে আমি ছৌ নাচেরও ('শ্রীদুর্গা' নৃত্যের) অনুকরণ দেখেছি। কিন্তু সে অনুকৃতি দেখে আমার মনে পড়েছে চেরাগের তলায় অন্ধকারের কথা।

হরেন ঘোষের চেষ্টায় অবশেষে রাজা আদিত্যপ্রতাপের মত পরিবর্তন হয়। সেরাইকেলায় নির্মোক ভেঙে ছৌ নাচ প্রথমে কলকাতায় আসে এবং তারপর যায় ইউরোপেও।

সেরাইকেলার যে প্রতিবেশের মধ্যে ছৌ নাচ অনুষ্ঠিত হয়, দেশের বাইরে গিয়ে তার থেকে তাকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল। ছৌ নাচের স্বাভাবিক আসর হচ্ছে যাত্রার আসরের মতো, শিল্পীদের চারিদিকেই দর্শকরা আসন গ্রহণ করে মণ্ডলাকারে। আধুনিক নাচঘরের অপ্রশস্ত আবেষ্টনের মধ্যে তার আবেদন ও স্বাধীনতা কতকটা ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারে না। কিন্তু তবু এখানে এবং পাশ্চাত্য দেশেও ছৌ নাচ দেখে সবাই তুলেছিল ধন্য ধন্য রব। তাইতেই বোঝা যায় তার আবেদন হচ্ছে সর্বজনীন এবং তাকে প্রাদেশিক নৃত্য বলে গণ্য করা যেতে পারে না। আমাদের অধিকাংশ প্রাদেশিক নৃত্য সম্বন্ধে এমন কথা বলা যায় না। জন্মভূমির—বিশেষত ভারতের—বাইরে গেলে তাদের পক্ষে জনপ্রিয়তা অর্জন করা কঠিন হয়ে উঠবে। কারুর প্রধান ভাষা হচ্ছে মুদ্রা, কারুর ভঙ্গি এবং কারুর বা নূপুরের বোল। যারা অধ্যবসায় সহকারে সে সব ভাষা শেখেনি, তাদের কাছে মাঠে মারা যায় নাচের সৌন্দর্য।

ছৌ নাচ একটি বারংবার প্রমাণিত সত্যকে প্রমাণিত করেছে পুনর্বার। ললিতকলার মাধ্যমে কেবল ব্যক্তিবিশেষের নয়, কোনও অজানা দেশ বা জাতিও প্রখ্যাত হয়ে উঠতে পারে। পনের বৎসর আগে ক্ষুদ্র রাজ্য সেরাইকেলার নাম জানত কয়জন? কিন্তু ছৌ নাচের প্রসাদে সেরাইকেলার নাম আজ ভারতের সর্বত্র এবং ইউরোপেও সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। একেই বলতে পারি সাংস্কৃতিক দিগ্বিজয়।

রাজা আদিত্যপ্রতাপ এবং তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর স্বর্গীয় বিজয়প্রতাপের তত্ত্বাবধানে যে সব ছৌ নৃত্য পরিকল্পিত হয়েছে, সংখ্যায় সেগুলি অসামান্য। ভারতনাট্যম ও কথাকলির নৃত্যসংখ্যা আমি জানি না, কিন্তু যে বিশ্ববিখ্যাত রুশিয় নৃত্যসম্প্রদায় পৃথিবীভ্রমণ করেছিল, তার চেয়ে ছৌ নাচের সংখ্যা অনেক বেশি। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে সেরাইকেলা নৃত্যসম্প্রদায় মোট একচল্লিশটি নাচ নিয়ে গিয়েছিল ইতালি, ফ্রান্স ও ইংলন্ডে। কিন্তু সেরাইকেলার নৃত্য তালিকা এর চেয়ে ঢের বেশি দীর্ঘ—বোধ করি শতাধিক হবে।

সাধারণত রাজা-মহারাজারা নিজেরাও শিল্পী হবার জন্যে আগ্রহপ্রকাশ করেন না, তাঁরা হন নানা কলাবিদ্যার পৃষ্ঠপোষকমাত্র। শিল্পীদের উৎসাহ দেন, অর্থসাহায্য করেন, তার বেশি আর কিছু নয়। কিন্তু সেরাইকেলা নৃত্যসম্প্রদায়ের মধ্যে রাজা এবং রাজবংশীয় অন্যান্য ব্যক্তিগণ শিল্পীরূপেই যোগদান করেন। রাজা আদিত্যপ্রতাপ কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র নন, নিজেও একজন নৃত্যশিল্পী এবং চিত্রবিদ্যাতেও সুনিপুণ। বিশেষজ্ঞ সমালোচকরা জানেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের দ্বারা যে সব মুখোশ গঠিত ও চিত্রিত হয়েছে, ললিতকলায় তা উচ্চস্থান অধিকার করে আছে। সেরাইকেলার নর্তকরা নাচের সময়ে মুখোস ব্যবহার করেন। অধিকাংশ মুখোশই রাজা আদিত্যপ্রতাপের নিজের হাতেই তৈরি। বিভিন্ন রসাশ্রিত নৃত্যনাট্যের পাত্র-পাত্রীদের চারিত্রিক বিশেষত্ব সেই সব মুখোশের উপরে ফুটে উঠেছে যথাযথ বর্ণের আলেপনে ও তুলির টানে চমৎকার ভাবে।

রাজভ্রাতা স্বর্গীয় কুমার বিজয়প্রতাপও ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী এবং উড়িয়া ভাষার একজন সুলেখক। তিনি কবিতা, নাটক ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন রাজাসাহেবের দক্ষিণ হস্তের মতো। সেরাইকেলার অধিকাংশ নৃত্যনাট্য পরিকল্পনা ও রচনা করেছেন তিনিই এবং সেই সঙ্গে নিয়েছেন নাচ শেখাবারও ভার।

স্বর্গীয় কুমার শুভেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন রাজাসাহেবের পুত্র ও সম্প্রদায়ের প্রধান শিল্পী। তাঁর মধ্যে ছিল প্রথম শ্রেণীর নৃত্যপ্রতিভা। শুভেন্দ্রনারায়ণের নাচ দেখে বিলাতের সমালোচক উদয়শঙ্করের সঙ্গে তাঁর তুলনা করেছিলেন। তাঁর রাধাকৃষ্ণ, ময়ূর, চন্দ্রভাগা, দুর্গা, নাবিক ও সাগর প্রভৃতি অমৃতায়মান নাচের কথা কখনও ভুলতে পারব না। আজ তিনি অকালে গিয়েছেন পরলোকে, কিন্তু আজও মনের মধ্যে জীবন্ত হয়ে আছে নৃত্যপর শুভেন্দ্রনারায়ণের লীলায়িত মূর্তি।

রাজাসাহেবের আরও দুই নৃত্যপটু পুত্র নৃত্যনাট্যে বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই রাজবংশের আর এক অসাধারণ নৃত্যশিল্পী হচ্ছেন কুমার শ্রী হীরেন্দ্রনারায়ণ। রৌদ্র ও বীর রসের নাচে তাঁর অতুলনীয় দক্ষতা।

বহু রাজপরিবারের কথা জানি, কিন্তু এমন শিল্পী রাজপরিবার আর দেখিনি। আমাদের দেশিয় নৃপতিদের বিলাস-ব্যসনের কথা পরিণত হয়েছে প্রবাদবচনে। কিন্তু এই এক অদ্বিতীয়

রাজপরিবার, যেখানে সকলেই অবহিত হয়ে থাকেন শিল্পসাধনায়। তাঁরা কেবল শিল্পী নন, প্রত্যেকেই কৃতবিদ্য, বিনয়ী ও সদালাপী। সেরাইকেলার রানীসাহেবও শিল্পী স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী। স্বর্গত পুত্র শুভেন্দ্রনারায়ণের জন্যে তিনি যে স্মৃতিসৌধের মডেল স্বহস্তে গড়েছিলেন, তা দেখেই আমি তাঁর শিল্পবোধের পরিচয় পেয়েছিলুম। সেরাইকেলার যুবরাজও নট এবং নাট্যকার। রাজা আদিত্যপ্রতাপের প্রেরণাতেই এই পরিবারের মধ্যে যে উপ্ত হয়েছে সাহিত্য ও ললিতকলার বীজ, এটুকু অনুমান করা যায় অনায়াসেই।

চৈত্র মাসে এখানে যে বসন্তোৎসব হয়, তার নাম 'চৈত্র-পর্ব'। গাছে গাছে পাখিরা গান গায়। বনে বনে ফুল ফোটে। চোখের সামনে জাগে তরুণ শ্যামলতা। সুগন্ধনন্দিত সমীরণে পাওয়া যায় যে আনন্দের ছন্দ, তারই প্রতিধ্বনি বাজতে থাকে নরনারীর অন্তরে অন্তরে। বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে মিলে যায় অন্তঃপ্রকৃতি এবং ছৌ নাচের নূপুরে নূপুরে সেই মিলনেরই বাণী ধ্বনিত হয়ে ওঠে। তখন বাজে বংশী, বাজে মৃদঙ্গ এবং জাঁকিয়ে বসে নাচের সভা। সভানায়ক হন স্বয়ং রাজাসাহেব।

ছয়-সাত বৎসর আগে চৈত্র-পর্বের সময়ে শুভেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রাজাসাহেবের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে আমি দ্বিতীয়বার সেরাইকেলায় যাই এবং তাঁর অনুরোধে একটি বৃহৎ সভায় শুভেন্দ্রনারায়ণের নৃত্যকুশলতা নিয়ে আলোচনা করি। যথাসময়ে সেই আলোচনাটি 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে।

সেরাইকেলা থেকে সিনি স্টেশনে আনাগোনা করবার পথটিও আমার বড় ভাল লাগে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোহিতলাল মজুমদার

আমার বয়স তখন কত? ঠিক মনে নেই, তবে অর্ধশতাব্দী আগেকার কথা বলছি নিশ্চয়ই। এবং এটাও ঠিক, তখনও আমি কৈশোর অতিক্রম করিনি।

স্বর্গীয় ডক্টর সত্যানন্দ রায় ছিলেন আমার প্রতিবেশী ও দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়। ছেলেবেলায় তাঁর চেয়ে ঘনিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সুহৃদ আমার আর কেউ ছিলেন না। সত্যানন্দ পরে বিলাতে যান এবং সেখান থেকে ফিরে এসে কলকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা বিভাগে প্রধান কর্মচারীর পদে অধিষ্ঠিত হন।

সত্যানন্দের সঙ্গে সেই কিশোর বয়স থেকেই শুরু হয়েছিল আমার সাহিত্যসাধনা। বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ বিখ্যাত রচনা তখনই আমরা পড়ে ফেলেছি এবং বিলাত থেকেও আনাতুম বালকদের উপযোগী ভাল ভাল বই। তখনকার এক চমৎকার গ্রন্থমালার কথা আজও আমার মনে আছে, তা হচ্ছে বিখ্যাত ডবলিউ টি স্টেডের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'দি বুক ফর দি বের্নস'। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রখ্যাত কথাগ্রন্থগুলি ছোটদের উপযোগী করে পরিবেশন করা হত। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্যও ছিল যৎসামান্য।

সত্যানন্দ ও আমার, দু'জনেরই ছিল একখানি করে হাতে লেখা পত্রিকা। সত্যানন্দ ছিলেন কেবল প্রবন্ধকার, কিন্তু আমি সমান বিক্রমে আক্রমণ করতুম প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা প্রভৃতি

বিভাগকে। লেখাগুলিকে অবশ্য ছাইভস্ম বললে অত্যুক্তি হবে না। যদিও আমার সেই হস্তলিখিত পত্রিকারই একটি গল্প দু' তিন বৎসর পরে ছাপার হরফে 'বসুধা' মাসিকপত্রে স্থান পায়। সেই-ই আমার প্রকাশিত প্রথম রচনা। আর এক বিষয়েও সত্যানন্দ আমার কাছে হেরে যেতেন। তিনি তুলি ধরতে পারতেন না, আমি পারতুম। (এবং আঁকতুম কেবল কাকের ছানা বকের ছানা)। কাজেই আমার পত্রিকা ছিল সচিত্র।

আমাদের সেই সাহিত্যসাধনার উদ্যোগ-পর্বে সত্যানন্দের বাড়িতেই প্রথম দেখি মোহিতলাল মজুমদারকে। সত্যানন্দের সঙ্গে তাঁরও কি যেন একটা দূর-সম্পর্ক ছিল। সে বয়সে আলাপ জমতে দেরি হয় না। বালকরা কথায় কথায় বন্ধু পায় এবং বন্ধু হারায় (আর বলতে কি সাহিত্যক্ষেত্রে তরলমতি বুড়ো খোকারও অভাব নেই)। মোহিতলাল সেখানে গিয়েছিলেন দুই-তিনবার। সে সময়ে কিরকম বিষয়বস্তু আমরা আলাপ্য বলে মনে করতুম, আজ আর তা স্মরণে আসছে না। মোহিতলাল সেই বয়সেই কাব্যকুঞ্জবনে প্রবেশ করেছিলেন কিনা, তাও আমি বলতে পারব না। অন্তত তাঁর মুখ থেকে এ সম্পর্কে কোনও কথা শুনেছিলুম বলে মনে হচ্ছে না। তবে তাঁর দিকে যে আমি আকৃষ্ট হয়েছিলুম, তাতে আর সন্দেহ নেই।

আমাদের সেই সাহিত্যের বেলেখেলাঘরেই মাঝে মাঝে আর একটি বালক আসতেন, পরে যিনি এখানকার সাহিত্য সমাজে বিশেষ আলোড়ন উপস্থিত করেছিলেন। তিনি হচ্ছেন 'কল্লোল' সম্পাদক স্বর্গীয় দীনেশরঞ্জন দাস। কিন্তু তিনি তখন কালিকলম নিয়ে সুবোধ বালকের মতো ইস্কুলের লেখাপড়া ছাড়া আর কিছু করতেন বলে মনে হয় না।

বালক হল যুবক, কাঁচা হল পাকা। কেটে গেল কয়েকটা বছর। আমার নানাশ্রেণীর রচনা প্রকাশিত হয় 'ভারতী', 'নব্যভারত', 'মানসী', 'বাণী', 'ঐতিহাসিক চিত্র', 'অর্চনা', 'জন্মভূমি' ও অন্যান্য পত্রিকায়। সেই সময়ে একদিন আধুনালুপ্ত প্রখ্যাত বিদ্যায়তন 'শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা'র ত্রিতলের ঘরে গিয়ে সবিস্ময়ে দেখলুম কবির এক পরম সাধক মূর্তি। দেখলুম শয্যাগত, উত্থানশক্তিহীন বৃদ্ধ কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেনকে। তাঁর দৃষ্টি প্রায় অন্ধ, সর্বাঙ্গ বাতে পঙ্গু, হাতে কলম পর্যন্ত ধরতে পারেন না, তবু নিদারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যে প্রশান্ত আননে মুখে মুখেই তিনি রচনা করে যাচ্ছেন কবিতার পর কবিতা। কোনও কবিতার মধ্যেই নেই ব্যাধিজর্জর দেহের দুঃখ-বেদনার সুর, কোনও কবিতাতেই নেই অন্ধকারের ছোপ, প্রত্যেক কবিতাই হচ্ছে আলোর কবিতা, যার প্রভাবে হাহাকারও হয় নন্দিত ও নিস্তব্ধ। মন করলে নতিস্বীকার।

কবির রোগশয্যার পার্শ্বেই আবার দেখা পেলুম বাল্যবন্ধু মোহিতলালের।

তীর্থযাত্রীর মতো প্রায় প্রত্যহই যেতুম দেবেন্দ্রসদনে। প্রতিদিন না হোক, প্রায়ই সেখানে মোহিতলালের সঙ্গে দেখাশুনো হতে লাগল, এবং অবিলম্বেই আবিষ্কার করলুম তিনি তখন হয়েছেন কাব্যগতপ্রাণ। কেবল কবিতা-পাঠক নন, কবিতা-লেখকও—যদিও সাময়িক পত্রিকায় তাঁর কোনও কবিতা তখনও আমার চোখে পড়েনি। তিনি নিজেই স্বলিখিত কবিতা পাঠ করে শোনালেন। ভাল লাগল।

দিনে দিনে জমে উঠল আমাদের আলাপ, দৃঢ়তর হল আমাদের মৈত্রীবন্ধন। দেখা হলেই কবিতার প্রসঙ্গ, সময় কাটে কাব্যালোচনায়। কোনও কোনও দিন এক সঙ্গেই যাই কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচি বা কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। সেখানেও হত নতুন নতুন

কবিতা শোনা, উঠত স্বদেশি-বিদেশি নানা কবি ও কবিতার প্রসঙ্গ। জীবন হয়ে উঠেছিল কবিতাময়। দু'জনের কেহই তখনও সংসারে লব্ধপ্রবেশ হতে পারিনি, কারুকেই ঝড়-ঝাপটাও সহ্য করতে হয়নি, তাই এটা আমাদের ধারণার বাইরে থেকে গিয়েছিল যে, কবিতা যতই মহত্তম হোক, জীবনের যাত্রাপথে তাকে সম্বল করে পথ চলতে হলে যথেষ্ট বিড়ম্বনার সম্ভাবনা আছে। মোহিতলালের মনের কথা বলতে পারি না, তবে নিজে আমি এ সত্যটি উপলব্ধি করেছি বহু বিলম্বে, অত্যন্ত অসময়ে। তিনকাল গিয়ে যখন এক কালে ঠেকে, তখন আর কেঁচে গণ্ডুষ করা চলে না।

'যমুনা' পত্রিকার কার্যালয়ে বসল আমাদের বৃহৎ আসর। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বৈঠক হয়ে উঠল জমজমাট। সেখানেও সর্বদাই কাব্যকৌমুদীতে মন হয়ে থাকে প্রসন্ন। নিয়মিতভাবে আসা-যাওয়া করেন মোহিতলাল। তাঁর লেখনীও কবিতা প্রসব করে ঘন ঘন। তিনি কেবল লিখেই তুষ্ট থাকতে পারেন না, স্বরচিত কবিতা অপরকে শোনাবার জন্যেও আগ্রহ তাঁর উদগ্র। হয়তো সন্ধ্যা উতরে গিয়েছে। কলকাতার পথে গ্যাসের আলো জ্বলেছে। মোহিতলাল চলেছেন পদব্রজে। তাঁর পকেটে আছে একটি নূতন কবিতা। বুঝি সেটি তখনও কারুকে শোনানো হয়নি। হঠাৎ এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। মোহিতলাল অমনি ফুটপাথের উপরে একটা গ্যাসপোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর সেই জনাকীর্ণ পথকে গ্রাহ্যের মধ্যে না এনেই বন্ধুকে সামনে রেখে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন।

'যমুনা' পত্রিকা উঠে গেল। সেখানেই বসল সাপ্তাহিক সাহিত্যপত্রিকা 'মর্মবাণী'র বৈঠক। সভ্যের সংখ্যা আরও বেড়ে উঠল। এলেন কথাশিল্পী মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, এলেন কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ও আসতেন মাঝে মাঝে। করুণানিধান ও অন্যান্য কবিরাও আসতেন। সেইখানেই শ্রী কালিদাস রায়কেও প্রথম দেখি। মোহিতলাল আসতেন। তিনি তখন উদীয়মান কবি হিসাবে সুপরিচিত হয়েছেন।

অধিকাংশ বাংলা পত্রিকাই দীর্ঘজীবন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে না। খোঁটার জোর থাকলেও অকালমৃত্যু তাদের ছিনিয়ে নেয়। আমাদের সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাস হচ্ছে ঘন ঘন জন্ম ও মৃত্যুর ইতিহাস। নাটোরাধীশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেও 'মর্মবাণী' আত্মরক্ষা করতে পারলে না। এক বৎসর পরে মাসিক 'মানসী'র সঙ্গে মিলে কোনরকমে তখনকার মতো মানরক্ষা করলে। এখন 'মানসী ও মর্মবাণী'ও অতীতের স্মৃতি।

'ভারতী' সম্পাদনার ভার গ্রহণ করলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে আহূত হলুম আমি। 'ভারতী' কার্যালয়েই বসল আমাদের নতুন বৈঠক—রবীন্দ্রনাথের ভক্ত না হলে সেখানে কেউ বৈঠকধারী হতে পারতেন না। সেখানেও মোহিতলাল যোগ দিলেন আমাদের দলে। এই সময়েই তাঁর কবিতাপুস্তক 'স্বপনপসারী' প্রকাশিত হয়।

মোহিতলাল আধুনিক কবি হলেও এবং তিনি আধুনিক যুগধর্মকে স্বীকার করলেও, তাঁর কবিতার মূল সুরের মধ্যে পাওয়া যাবে পুরাতন যুগেরই প্রতিধ্বনি। কি পদ্যে এবং কি গদ্যে তাঁর ভাষাও মেনে চলে অতীতের ঐতিহ্য। তথাকথিত নূতনত্ব দেখাতে গিয়ে কোথাও তিনি যথেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেন না। এই নূতনত্বের মোহে একেলে অনেকের কবিতা হয়ে ওঠে রীতিমতো উদ্ভট। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আধুনিক কবি এখনও এদেশে জন্মগ্রহণ করেননি। ভাবে

ও ভাষায় তাঁকে ডিঙিয়ে আর কেউ এগিয়ে যেতে পারেননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোথাও উদ্ভট নন। শ্রেষ্ঠ কবিরা উদ্ভট হতে পারেন না। মোহিতলালেরও এ দোষ নেই।

কবিরূপে মোহিতলালের আসন যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে, তখন তিনি হাত দেন সাহিত্যের অন্য এক বিভাগে। পদ্যে নয়, গদ্যে। তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময়েই বুঝতে পারতুম, তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যবোদ্ধা। দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠগ্রন্থ তিনি কেবল সাগ্রহে অধ্যয়নই করেন না, অধীত বিষয় নিয়ে স্বাধীনভাবে যথেষ্ট চিন্তাও করেন। সমালোচক হবার অনেক গুণ পূর্বেই তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছিলুম, কিন্তু গোড়ার দিকে প্রকাশ্যভাবে তিনি সমালোচকের আসনের দিকে দৃষ্টিপাত করেননি, মশগুল হয়ে ছিলেন কবিতার প্রেমেই।

বাংলা দেশে আজকাল সাহিত্যপ্রবন্ধের এবং সমালোচনার অভাব হয়েছে অত্যন্ত। প্রবন্ধের দৈন্য বেড়ে উঠছে দিনে দিনে এবং যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তার অধিকাংশেরই মধ্যে থাকে না সাহিত্যরস। মাসিকপত্রগুলি হাতে নিলে দেখি, রাশি রাশি গল্প আর উপন্যাসের ভিড়ে দু'একটা চুটকি নিবন্ধ কোনরকমে কোণঠাসা হয়ে আছে। আগেকার ধারা ছিল আলাদা। আগে গল্প বা উপন্যাস নয়, পত্রিকার গৌরববর্ধন করত প্রবন্ধই। এদেশে যাঁরা শ্রেষ্ঠ সমালোচক ও প্রবন্ধকার বলে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের কেহই অতিআধুনিক যুগের মানুষ নন। গল্প ও উপন্যাস সাহিত্যের অন্যতম অঙ্গ বটে, কিন্তু প্রবন্ধদৈন্য ও স্থায়ী সমালোচনার অভাব থাকলে কোনও সাহিত্যই উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হতে পারে না।

মোহিতলাল মানুষ হয়েছেন গত যুগেরই প্রতিবেশ-প্রভাবের মধ্যে। তাই অতিআধুনিকদের ছোঁয়াচ লাগেনি তাঁর মনে। তিনি এই সাহিত্যপ্রবন্ধের দুর্ভিক্ষের যুগেও অবহিতভাবে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে করে যাচ্ছেন প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ রচনা। প্রাচীন বয়সেও এ বিভাগে মোহিতলালের সাহিত্যশ্রম দেখলে বিস্মিত হতে হয়। আজকাল কবিরূপে নয়, সমালোচকরূপেই তাঁর দেখা পাওয়া যায় যখন তখন। তাঁর সব মতের সঙ্গে যে সকলের মত মিলবে, এমন আশা কেউ করে না। বিভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি হয় বিভিন্ন। কিন্তু নির্ভীক, নিরপেক্ষভাবে সাহিত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা রেখে যিনি নিজের কর্তব্য পালন করবেন, তাঁকে অনায়াসেই অভিনন্দন দেওয়া চলে।

বলেছি, প্রাচীন বয়সেও মোহিতলালের সাহিত্যশ্রম হচ্ছে বিস্ময়কর। কিন্তু যখন তিনি ঠিক বৃদ্ধত্ব লাভ করেননি, তখনই তাঁর মনে জেগেছিল নিরাশার সুর। ষোল বৎসর আগে ঢাকা থেকে একখানি পত্রে তিনি লিখেছিলেন "ভাই হেমেন্দ্রকুমার, তোমার অতীত স্মৃতির আবেগভরা স্নেহপূর্ণ পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমাদের কাল এখন 'সেকাল' হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে যুগ এখনই কাব্যস্মৃতিময় হইয়া উঠিয়াছে। দুই চারিজন এখনও যাহারা এখানে-ওখানে ছড়াইয়া আছি, তাহাদের মধ্যে প্রাণের সূক্ষ্মতন্ত্রীর যোগ অদৃশ্য হইলেও দৃঢ় ও অটুট হইয়া আছে, বরং জীবনসায়াহ্নে প্রভাতের সেই অরুণ রাগ ক্রমেই করুণ ও কোমল হইয়া উঠিতেছে, তার প্রমাণ তোমার ও আরও দুই-একজন বন্ধুর চিঠি। তুমি জানো, সাহিত্য আমার ধর্মব্রত ছিল; যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, তাহার জন্য নির্মমভাবে নিজের সকল স্বার্থ, আত্মপ্রীতি ও মমতা সকলই বর্জন করিয়াছি। সেজন্য 'কত বান্ধব হয়েছে বিমুখ'। কিন্তু আজ আমি ক্লান্ত শ্রান্ত অবসন্ন, আমার শরীর একেবারে ভাঙিয়াছে, মনের উৎসাহ আবেগ আর

নাই, গত কয়েক মাস যাবৎ আমি লেখনীকর্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। যদি একটু সুস্থ হইতে পারি, তবে হয়তো জন্মগত ব্যবসায় আবার কিছু কিছু করিতে হইবে। তুমি যে এখনও সমান উৎসাহে সাহিত্যব্রত উদযাপন করিতেছ, ইহা কম কৃতিত্বের কথা নয়। প্রার্থনা করি, তোমার আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হউক এবং আমাদের বিদায় গ্রহণের বহু পরেও গত যুগের সাক্ষীরূপে তুমি মাঝে মাঝে আমাদিগকে স্মরণ করিও। সেজন্যও তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করি" প্রভৃতি।

কিন্তু মহাকালের কবলে 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান'—মোহিতলাল, না আমি? তারই যখন নিশ্চয়তা নেই, তখন মোহিতলাল ইহলোকে বিদ্যমান থাকতে থাকতেই বন্ধুকৃত্যটা সেরে ফেলাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কার্য। তিনি তো আমারই সমবয়সী, কার ডাক কবে আসবে, কে জানে?

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনসন্ধ্যায় কবি করুণানিধান লাভ করেছেন জগত্তারিণী পদক। পদক বা উপাধি দিয়ে প্রমাণিত করা যায় না কোনও কবির শ্রেষ্ঠতা। তবে রসিকজনসমাজে কবি যে উপেক্ষিত হননি, এইটুকুই বোঝা যেতে পারে। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও একাধিক কবি ওই পদক লাভ না করেই ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন। এজন্যে তাঁদের উচ্চাসনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়নি, কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে আমাদের গুণগ্রাহিতারই অভাব।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট অবজ্ঞাপ্রকাশ করে বলেছিলেন, 'ইংরেজরা হচ্ছে দোকানদারের জাত।' কিন্তু একসময়ে ইংল্যান্ড ছিল কবিদের দেশ বলে বিখ্যাত। নেপোলিয়নের যুগে ফরাসিদেশে যেসব কবি ছিলেন, তাঁদের নাম আর শোনা যায় না। কিন্তু ইংল্যান্ডের কাব্যকুঞ্জ মুখরিত হয়ে উঠেছিল (বার্নস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, সাদে, ব্লেক, বাইরন, শেলি ও কিটস প্রভৃতি) কবিদের কলসংগীতে।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশও বরাবর কবিদের দেশ বলে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। রাজ্যবিপ্লব বা রাজনৈতিক পরিবর্তনের যুগেও বাঙালি কবিদের গান স্তব্ধ হয়নি। বাংলা দেশের শেষ স্বাধীন রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভায় সর্বদাই শোনা যেত কাব্যগুঞ্জন। বাংলার উপরে যখন ইসলামের পূর্ণ-প্রভাব, তখনও বাংলার আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল বৈষ্ণব কবিদের বীণার ঝংকারে। তারপর আবার পলাশীর প্রান্তরে হল যখন আর এক বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয়, তখনও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় কবিদের আসন শূন্য থাকেনি।

ইংরেজ আমলের নূতন বাংলায় দেখি কবি ঈশ্বর গুপ্তকে। তাঁর আগেই কবি রামনিধি গুপ্ত কাব্যসংগীত রচনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং কবিত্বের দিক দিয়ে তা ছিল ঈশ্বর গুপ্তের রচনার চেয়ে উচ্চতর। কিন্তু কেবল কবিরূপে নয়, সাহিত্যাচার্যরূপেই ঈশ্বর গুপ্ত অর্জন করেছিলেন সমধিক খ্যাতি। বিলাতে লেখক জনসনকে নিয়ে কেউ আজ মাথা ঘামায় না, কিন্তু সাহিত্যাচার্য ডা. জনসন হয়েছেন অক্ষয় যশের অধিকারী। ঈশ্বর গুপ্তও ওই কারণেই অমর হয়ে থাকবেন। কেবল বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু মিত্র নয়, সে যুগের সমস্ত নবীন কবিদের উপরেই যে তাঁর প্রভাব ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি থেকেই এটা আমরা জানতে পারি। তারপর একে একে দেখা দিলেন মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বিহারীলাল চক্রবর্তী ও কামিনী রায় প্রভৃতি।

এল গৌরবময় রবীন্দ্রযুগ। কিন্তু এ যুগে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলেও আরও যেসব উচ্চশ্রেণির কবির নাম করা যায়, তাঁদের মধ্যে প্রধান তিনজন হচ্ছেন দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। সেই সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজয়চন্দ্র মজুমদার,

গোবিন্দ্রচন্দ্র দাস, রমণীমোহন ঘোষ, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ও রজনীকান্ত সেন প্রভৃতিকেও ভুললে চলবে না এবং বলা বাহুল্য এই ফর্দ সম্পূর্ণ নয়; উল্লেখযোগ্য পুরুষ ও মহিলা কবি ছিলেন আরও কয়েকজন।

তারপরেও ধারা ঠিক বজায় রইল। পূর্ববর্তী কবিদের জীবদ্দশাতেই রবীন্দ্রনাথকে গুরুর আসনে বসিয়ে দেখা দিলেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীকালিদাস রায় ও শ্রীমোহিতলাল মজুমদারও তাঁদের সমসাময়িক—দেখা দিয়েছেন কেউ কিছু আগে বা কেউ কিছু পরে। আসল কথা, বাঙালি কবিদের শোভাযাত্রা অব্যাহত হয়েই আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

> 'শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
> ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
> শতেক যুগের গীতিকা!
> শত শত গীত-মুখরিত বন-বীথিকা।'

করুণানিধান সম্বন্ধে একজন লিখেছেন 'ইনি পঞ্চকোট পাহাড়ের উপরে আদরা স্টেশনের কাছে 'শৈলকুটীর' নামে একটি আশ্রম নির্মাণ করেন। এইখানেই ইঁহার কবিতার প্রথম বিকাশ।'

শৈল সানুদেশে অনন্ত নীলিমার তলায় নিরালা পর্ণকুটির, চোখের সামনে হয়তো জাগত প্রান্তরবাহিনী রবিকরোজ্জ্বলা নটিনি তটিনী, শ্রবণে হয়তো ভেসে আসত বিজন কান্তারের অশ্রান্ত মর্মরসংগীত। এই প্রাকৃতিক পটভূমিকার উপরে তরুণ কবির চিত্ত-শতদল ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে ওঠবারই কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় করুণানিধানের প্রথম জীবনের কোনও খবরই আমি রাখি না, কারণ আমি ভূমিষ্ঠ হবার প্রায় এক যুগ আগেই তিনি দেখেছিলেন পৃথিবীর আলোক। পরে কবির সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছিলুম বটে, কিন্তু তিনি তাঁর পূর্বজীবনের কথা নিয়ে কোনওদিন আমার সঙ্গে ঘুণাক্ষরেও আলোচনা করেননি। এমন অনেক কবি ও লেখক দেখেছি, যাঁদের কাছে হচ্ছে নিজের কথাই পাঁচ কাহন। তাঁদের এই অশোভন আত্মপ্রকাশের অতি-আগ্রহ যে শ্রোতাদের শ্রবণ-যন্ত্রকে উত্যক্ত করে তুলছে, এটা উপলব্ধি করলেও তাঁরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না। করুণানিধান এ দলের লোক নন। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হয়, তিনি যেন নিজেকে একজন উঁচু দরের কবি বলেই জানেন না। বীণা তো জানে না, সে হচ্ছে স্বর্গীয় সংগীতের স্রষ্টা, সে কথা জানে কেবল বীণাবাদক। কবি করুণানিধানও হচ্ছেন বাণীর হাতের বীণাযন্ত্রের মতো।

যতদূর স্মরণ হয়, করুণানিধান যখন উদীয়মান, সত্যেন্দ্রনাথ তখনও কাব্যজগতে প্রকাশ্যভাবে দেখা দেননি। তবে যতীন্দ্রমোহন বাগচী সুপরিচিত হয়েছিলেন তাঁর আগেই। সর্বপ্রথমে 'বঙ্গমঙ্গল' নামে একখানি ছোটো কবিতার বই পড়ে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়

করুণানিধানের দিকে। রবীন্দ্রনাথের নব পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' তখনও বোধ হয় চলছিল। তারপর 'প্রসাদী' (সে বইখানিও আকারে বড় নয়) পাঠ করে আমি তাঁর ভক্ত হয়ে পড়লুম।

মৃত্যুশয্যাশায়ী কবি রজনীকান্ত যখন রোগযন্ত্রণাগ্রস্ত দেহ থেকে নিজের চিত্তকে বিযুক্ত করে অতুলনীয় কাব্যসাধনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন, সেই সময়েই একদিন কবি মোহিতলালের সঙ্গে গিয়ে করুণানিধানের সঙ্গে পরিচিত হলুম। সে হচ্ছে ১৩১৬ কি ১৩১৭ সালের কথা। হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ দিকে ছিল স্বর্গীয় পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউশনের বাড়ি—স্কুলের অস্তিত্ব তখন ছিল কি ছিল না বলতে পারি না। দোতলার বারান্দায় হুঁকো নিয়ে উবু হয়ে বসে করুণানিধান ধূমপান করছিলেন। বয়সে তখন তিনি যৌবনসীমা পার হননি, কিন্তু বয়সোচিত কোনও শৌখিনতার লক্ষণই তাঁর মধ্যে খুঁজে পেলুম না। শ্যামবর্ণ দীর্ঘ একহারা দেহ, পরনে ইস্ত্রিহীন ছিটের কোট ও আধময়লা কাপড়। মাথায় অযত্ন বিন্যস্ত চুল, মুখে দাড়িগোঁফের ভিতর দিয়ে থেকে থেকে ফুটে ওঠে সরল, মিষ্ট, মৃদু হাসি। দৃষ্টি ও চেহারা অত্যন্ত নিরভিমান। কবি নয়, নিরীহ ও সাধারণ স্কুলমাস্টারের চেহারা এবং কলকাতার শহরতলিতে তখন তিনি সত্য সত্যই কোনও বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদে বহাল ছিলেন।

এমন মানুষের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুলতে বিলম্ব হয় না। তারপর তাঁর সঙ্গে দেখা হতে লাগল ঘন ঘন। কখনও অমূল্যবাবুর বাড়িতে, কখনও তাঁর নিজের বাড়িতে। দু-একবার তিনি আমার বাড়িতেও এসে হাজির হয়েছেন। সর্বদাই আত্মভোলা ভাবুকের ভাব, অথচ দৃষ্টি দেখলে মনে হয় যেন তা অন্তর্মুখী, যেন তিনি মনে মনে খুঁজে বেড়াচ্ছেন কোনও হারিয়ে যাওয়া রূপের স্বপ্ন। তাঁর কবিতাগুলিই প্রমাণিত করবে, তিনি ছিলেন নিছক সৌন্দর্যের পূজারি, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দারিদ্র্য ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ করতে পারতেন না। কেবল তাঁর জামাকাপড়ই অত্যন্ত স্থূল ও আটপৌরে ছিল না, তাঁর বসতবাড়িতেও ছিল না সাজসজ্জা বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কোনও বালাই। কিন্তু চিত্ত যার রূপগ্রাহী, ধূলিশয্যায় শয়ন করেও সে দৃষ্টি নিবন্ধ করে রাখতে পারে উদার আকাশের নির্মল নীলিমার দিকে।

করুণানিধানের সঙ্গে মন খুলে মেলামেশা করেছি যে কতদিন, তার আর সংখ্যা হয় না। তিনি কেবল নির্বিরোধী ও কোনওরকম দলাদলির বাইরে ছিলেন না, তাঁর মনও ছিল ঈর্ষা থেকে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত। এক দিনও তাঁকে অন্য কবির বিরুদ্ধে একটিমাত্র কথা বলতে শুনিনি, অধিকাংশ কবিই যে দুর্বলতা দমন করতে পারেন না।

করুণানিধানের প্রথম জীবনের বন্ধু স্বর্গীয় সাহিত্যিক চারুচন্দ্র মিত্র একদিন আমাকে বললেন, 'করুণার কাছ থেকে বাংলা দেশের এক বিখ্যাত কবি (তাঁর নাম এখানে করলুম না) তাঁর নূতন কবিতার খাতা পড়বার জন্যে চেয়ে নিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে খাতাখানা আবার ফিরে এল বটে, কিন্তু তাঁর রচনাগুলি ছাপা হবার আগেই দেখা গেল, সেই বিখ্যাত

কবির নবপ্রকাশিত কবিতাগুলির মধ্যে রয়েছে করুণার নিজের উদ্ভাবিত সব বাক্য।' সাহিত্যক্ষেত্রে রচনাচৌর্যের দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। আমাকেও এজন্যে একাধিকবার বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়েছে, কিন্তু তবু আমি উচ্চবাচ্য করিনি এবং এ শিক্ষা লাভ করেছি আমি করুণানিধানের কাছ থেকেই। ওই বিখ্যাত কবি ছিলেন আমাদের দুজনেরই বন্ধু। কিন্তু করুণানিধানের নিজের মুখ থেকে তাঁর ওই কবিবন্ধুর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগই শ্রবণ করিনি।

করুণানিধান কবিতা, তার আদর্শ বা তার রচনা-পদ্ধতি প্রভৃতি নিয়ে বড়ো বড়ো ও ভারী ভারী বচন আউড়ে কোনওদিন আসর গরম করবার চেষ্টা করেননি। ওসব বিষয়ে তাঁর একান্ত মৌনব্রত দেখে যে-কোনও ব্যক্তি সন্দেহ করতে পারত যে, উচ্চশ্রেণির কাব্যকলা সম্বন্ধে হয়তো তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁকে একান্তে পেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠের কাছে তরুণ শিক্ষার্থীর মতো আমি কাব্যকলাকৌশল সম্বন্ধে যখন প্রশ্ন করতুম, তখন তিনি সেসব প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পারতেন না এবং সেই সব উত্তরের মধ্যেই থাকত কবিতার আর্ট ও ছন্দ সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য। এইজন্যে আজও তাঁর কাছে আমার ঋণ স্বীকার করতে পারি অকুণ্ঠ কণ্ঠেই।

এবং তিনি যে কত বড়ো কাব্যকলাবিদ, তাঁর কবিতাবলির মধ্যেই আছে তার অজস্র প্রমাণ। 'প্রসাদী'র পর যখন তাঁর নূতন কবিতার পুথি 'ঝরাফুল' প্রকাশিত হল, রসিকসমাজ তখনই পেলেন করুণানিধানের প্রতিভার প্রকৃত হদিস। তখনকার সাহিত্যিকদের মধ্যে রীতিমতো সাড়া পড়ে গিয়েছিল। সেটা বোধ করি ১৩১৮ সাল। 'ঝরাফুল' পাঠ করে ধুরন্ধর কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন মত প্রকাশ করেছিলেন:

'অমর কবি মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্যের মতো এ কাব্যখানি মাধুর্যে পরিপূর্ণ। কবির যেমন শব্দসম্পদ, তেমনই ভাববৈভব। কবি প্রকৃতি দেবীর অপূর্ব উপাসক। এ পূজায় কৃত্রিমতা নাই। মাতাল যেমন মদিরা পানে উন্মত্ত হইলে নিজ শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখে না, এ কবিও তেমনি প্রকৃতি-দেবীর সৌন্দর্যসুধা পান করিয়া বিভোর হইয়া যান—প্রকৃত সাধক-জনোচিত তন্ময়তা লাভ করেন। এই আত্মবিস্মৃতিই উচ্চ অঙ্গের কাব্যের একটি অপরিহার্য লক্ষণ। এইজন্যই সুবিখ্যাত মহাত্মা বলিয়াছেন—'Oratory is heard, but Poetry is overheard.' এ কবিতাসুন্দরী দর্শন দিবামাত্রই চিত্ত হরণ করে। ইহাকে দেখিলেই হৃদয়ে এক অননুভূত আনন্দের উদয় হয়। এ মোহিনী আদিনারী Eve সুন্দরীর মতো লাবণ্যবতী। প্রথম দর্শনে চিত্ত বিস্ময়ে অভিভূত হয়। মহিলা কাব্যের কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মতো বলিয়া উঠিতে ইচ্ছা করে

এলোকেশে কে এল রূপসী?
কোন বনফুল, কোন গগনের শশী?'

'ঝরাফুলে'র মালা শুকিয়ে যায়নি, সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পরে আজও তা নিয়ে নাড়াচাড়া

করলে চিত্ত পরিপূর্ণ হয়ে যায় সৌরভের গৌরবে। এই কাব্যগ্রন্থখানিই নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন করলে যে, বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে করুণানিধানও হচ্ছেন অন্যতম। তারপর প্রকাশিত হয় তাঁর 'শান্তিজল', 'ধানদুর্বা' ও 'রবীন্দ্র-আরতি' প্রভৃতি। এগুলি তাঁর কণ্ঠহারের আরও কয়েকটি রত্ন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠিকই ধরেছেন। করুণানিধান হচ্ছেন 'প্রকৃতিদেবীর অপূর্ব উপাসক। এ পূজায় কৃত্রিমতা নাই।' প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে প্রত্যেক কবিই আকৃষ্ট হন অল্পবিস্তর মাত্রায়। কিন্তু সে আকর্ষণের মধ্যে আছে যথেষ্ট পার্থক্য। অনেকেই আর্টের কৃত্রিমতা দ্বারা স্বভাবকে আচ্ছন্ন করে ফেলেন, স্বভাব হয় না স্বতঃস্ফূর্ত। এখানে স্বভাব বলতে আমি বোঝাতে চাই নিসর্গকেই। করুণানিধানের কাব্যে যে নিসর্গ-শোভা ফুটে ওঠে, তার মধ্যে পাওয়া যায় কবির স্বাভাবিক রক্তের টান ও নাড়ির স্পন্দন। তাঁকেই বলি সত্যিকার স্বভাবকবি। এবং ছোটোখাটো খুঁটিনাটির ভিতর দিয়ে বৃহত্তর প্রকৃতির শব্দস্পর্শগন্ধ ও রূপরসছন্দ প্রকাশ করবার জন্যে তিনি ভাবুকের মতো বেছে বেছে যেসব শব্দ উদ্ভাবন করেন, তার মধ্যেও থাকে খাঁটি কলাবিদের হাতের ছাপ। বাংলার কাব্যজগতে তাঁর মতো নিসর্গ-চিত্রকর সুলভ নয়।

কবিবর দেবেন্দ্রনাথ আত্মবিস্মৃতিকে উচ্চাঙ্গ কাব্যের অপরিহার্য লক্ষণ বলেছেন। কিন্তু কেবল কাব্যে নয়, করুণানিধানের ব্যক্তিগত জীবনেও যে আত্মবিস্মৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, সাধারণের কাছে তা কৌতুকপ্রদ বলে মনে হতে পারে। কবির (এবং আমারও) বন্ধু পূর্বোক্ত চারুবাবু আর একদিন আমাকে বলেছিলেন, 'করুণার কাণ্ডের কথা শুনেছেন? সেদিন দেখি সে আনমনার মতো হেদোর চারিদিকে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর মাঝে মাঝে হেঁট হয়ে রাস্তা থেকে কী সব কুড়িয়ে নিচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখলুম তার কোটের পকেট রীতিমতো ফুলে উঠেছে। পকেট হাতড়ে পাওয়া গেল একরাশ ঢিল, পাটকেল, নুড়ি।' এমন অবোধ শিশুর মতো সরলতা বোধ হয় আর কোনও বাঙালি কবির মধ্যে আবিষ্কার করা যাবে না।

করুণানিধানের সঙ্গে দেখা হয়নি সুদীর্ঘকাল। কার্য থেকে অবসর নিয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন স্বগ্রাম শান্তিপুরে, তাঁর প্রিয় মুখ দেখবার সৌভাগ্য থেকে আমাদের বঞ্চিত করে এবং ততোধিক দুঃখের বিষয় এই যে, জরাজর্জর হবার আগেই ক্রমে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়েছে তাঁর কাব্যরচনার প্রেরণা। পনেরো কি বিশ বৎসরের মধ্যে কদাচিৎ তাঁর দু-একটি রচনা চোখে পড়েছে, কিন্তু সেগুলির মধ্যে 'ঝরাফুল' প্রণেতার সিলমোহর খুঁজে পাইনি। কবি আছেন, কিন্তু কবিতা নেই। দুর্ভাগ্য।

অসিতকুমার হালদার

১৩১৬ কি ১৩১৭ সালের কথা। আমি তখন 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। একদিন 'ভারতী' সম্পাদিকা ও বঙ্কিম যুগের সর্বপ্রধান মহিলা লেখিকা স্বর্ণকুমারীদেবীর সানি পার্কের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে আছি এবং তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করছি, এমন সময়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন বোধ হয় আমারই সমবয়সী একটি তরুণ যুবক। গৌরবর্ণ, সৌম্যমুখ, একহারা দীর্ঘ দেহ। চেহারায় আছে মনীষা ও সংস্কৃতির ছাপ, সহজেই তা দৃষ্টি করে আকৃষ্ট।

স্বর্ণকুমারীদেবী বললেন, 'এর নাম অসিতকুমার হালদার, আমাদেরই আত্মীয়।' পরিচয়ের পর হল গল্পসল্প। সাহিত্যের প্রসঙ্গ, চিত্রকলার প্রসঙ্গ। তাঁর মৌখিক আলাপ এবং হাসিখুশিমাখা মুখ ভালো লাগল।

তারপরেও স্বর্ণকুমারীদেবীর ভবনে অসতিকুমারের সঙ্গে দেখা এবং আলাপ-আলোচনা হয়েছে এবং সেই সময়েই পাকা হয়ে গিয়েছে আমাদের বন্ধুত্বের বনিয়াদ। বন্ধুত্ব লাভের সুসময় হচ্ছে প্রথম যৌবন। মানুষের বয়স যত বাড়ে, স্বার্থের সংঘাতে দশজনের সঙ্গে যতই মনান্তর ও মতান্তর হতে থাকে, নরচরিত্রের মহানুভবতা সম্বন্ধে ততই সে সন্দিহান হয়ে ওঠে। রাম তখন শ্যামকে সহজে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত হয় না। তাই পরিণত বয়সের বন্ধুত্বের মধ্যে সরলতার মাত্রা থাকে অল্প। প্রথম পরিচয়ের পর দুই পক্ষই পরস্পরকে ভালো করে না বাজিয়ে গ্রহণ করতে পারে না। প্রথম দর্শনেই প্রেম হবার সুযোগ থাকে মানুষের যৌবনকালেই।

সেটা ছিল বাংলা চিত্রকলার রেনেসাঁস বা নবজন্মের যুগ। তার আগেও বাঙালিরা কি ছবি আঁকতেন না? আঁকতেন বই কি, খুব আঁকতেন। কিন্তু যে বিলাতি পদ্ধতি তাঁদের ধাতে সইত না, তাইতেই শিক্ষিত হয়ে তাঁরা কেবল পাশ্চাত্য শিল্পীদের অনুসরণ করতেন পদে পদে। সেই প্রাণহীন অনুকরণের মধ্যে থাকত না কলালক্ষ্মীর কোনও আশীর্বাদই। আগে শ্রেষ্ঠ চিত্রকর বলে শশীকুমার হেশের ছিল খুব নামডাক। তিনিই হচ্ছেন ইউরোপে শিক্ষিত প্রথম বাঙালি চিত্রকর, বোধ করি ইতালিতেই গিয়ে ছবি আঁকা শিখে এসেছিলেন। প্রতিমূর্তি চিত্রণে তাঁর দক্ষতা ছিল। কিন্তু তাঁর নিজের ধারণা অনুসারে আঁকা সাধারণ ছবি আমি দেখেছি। আঁকতেন তিনি শিক্ষিত নিপুণ হাতেই, কিন্তু কল্পনাকে উল্লেখযোগ্য রূপ দিতে পারতেন না। তাই নিখুঁত অঙ্কনপদ্ধতিও বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি তাঁর নামকে, আজ কয়জন লোক তাঁকে চেনে? ছবি যতই বাস্তব হোক, দেশের মাটির সঙ্গে যোগ না রাখতে পারলে তাকে অস্বাভাবিক বলে মনে হবেই। বিলাতি চিত্রপদ্ধতিতে উচ্চশিক্ষিত হয়েও অবনীন্দ্রনাথ ওই সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যথাসময়েই। নিজ বাসভূমে পরবাসীর মতো তিনি থাকতে পারলেন না, আবিষ্কার করলেন প্রাচ্য চিত্রকলাপদ্ধতি, উপহার দিলেন স্বদেশি

সৌন্দর্যের সম্পদ। সেই সময়ে তিনি ও নন্দলাল বসু প্রমুখ তাঁর শিষ্যবর্গ নবজীবনের প্রেরণায় প্রবুদ্ধ হয়ে আপন আপন স্বাধীন পরিকল্পনা অনুসারে পরিবেশন করতে লাগলেন নব নব রসরূপ। অসিতকুমার হালদার হচ্ছেন অবনীন্দ্রনাথেরই অন্যতম শিষ্য।

কিন্তু উঠল বিষম সোরগোল। বিলাতি ছাপমারা বোতলে সস্তা দেশি মদ খেতে অভ্যাস করে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যাদের রুচি, তারা ছেড়ে কথা কইতে রাজি হল না। প্রাচ্য পদ্ধতিতে আঁকা ছবিগুলির প্রতিলিপি প্রকাশিত হত প্রধানত 'প্রবাসী' ও 'ভারতী'তে। বিরুদ্ধ দলের মুখপাত্র ছিলেন 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, হঠাৎ রাতারাতি শিল্পসমালোচক সেজে প্রাচ্য চিত্রকলার শিল্পীদের নিয়ে আবোল তাবোল বকতে শুরু করে দিলেন। বলা বাহুল্য আমি ছিলুম প্রাচ্য শিল্পের পক্ষেই এবং তার প্রসঙ্গ নিয়ে সে সময়ে প্রভূত কালিকলম ব্যবহার করতেও ছাড়িনি এবং প্রাচ্য চিত্রকলার একজন উদীয়মান শিল্পী বলেই অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছিলুম অসিতকুমারের দিকে।

তারপর কেটে গেল কয়েকটা বৎসর। সুকিয়া (এখন কৈলাস বোস) স্ট্রিটে নব পর্যায়ের 'ভারতী' পত্রিকার কার্যালয়ে গড়ে উঠল আমাদের নূতন আস্তানা। তখন আমাদের মন ও বয়স পরিণত হয়েছে বটে, কিন্তু সে সময়েও আমাদের সকলকেই সর্বদাই সমাচ্ছন্ন করে রাখত কাব্য ও ললিতকলার কল্পলোক। মুখ্য আলোচনার বিষয়ই ছিল আর্ট ও সাহিত্য, এবং সে আলোচনায় সাগ্রহে যোগ দিতেন অসিতকুমারও। দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগল আমাদের সৌহার্দ্য।

'ভারতী'র আস্তানা কেবল সাহিত্যিকদের আকর্ষণ করত না, সেখানে ওঠা-বসা করতেন অনেক বিখ্যাত গায়ক, অভিনেতা ও চিত্রকরও। শেষোক্তদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের কথা আগেই বলেছি, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে আসতেন অসিতকুমার, শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী ও শ্রীচারুচন্দ্র রায় প্রভৃতি। এমন বিভিন্ন শ্রেণির শিল্পী-সমাগম আমি আর কোনও সাহিত্যবৈঠকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। এমনকি ব্যঙ্গরঙ্গরসে বিখ্যাত স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন গোস্বামী একদিন এসে আমাকে বললেন, 'হেমেন্দ্র, তোমাদের আস্তানায় গিয়ে আমি কীর্তন শুনিয়ে আসতে চাই।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী কীর্তন চিন্দা? হাসির কীর্তন?'

তিনি বললেন, 'না হে ভায়া, না। গম্ভীর কীর্তন, করুণ কীর্তন। যে কীর্তন শুনে ভাবুক লোকে কাঁদে। ব্যবস্থা করতে পারো?'

চিত্তরঞ্জনকে আমরা সবাই নানা বৈঠকে কৌতুকাভিনয় করতে দেখেছি। শিশিরকুমারের 'নাট্যমন্দিরে'ও তিনি অভিনয় করেছেন এবং চলচ্চিত্রেও দেখা দিয়েছেন হাস্যরসাত্মক নানা ভূমিকায়। কিন্তু কীর্তনিয়ারূপে তাঁর পরিচয় জানে না জনসাধারণ, আমিও জানতুম না তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েও।

'ভারতী' কার্যালয়ের তিনতলায় বড়ো ঘরে মেঝের উপরে শতরঞ্জি ও চাদর বিছিয়ে আসর প্রস্তুত করা হল, আমন্ত্রণ করা হল অনেক লোককে। নির্দিষ্ট দিনে সাত-আট জন

সহকারী ও বাদ্যভাণ্ড নিয়ে চিত্তরঞ্জন এলেন এবং ঘণ্টা দুই ধরে সকলকে শুনিয়ে দিলেন রীতিমতো কীর্তনগান। সে হচ্ছে উপভোগ্য সঙ্গীত।

'ভারতী'র সে আসর ছিল উচ্চশ্রেণির বিদ্বজ্জনসভা, তাই তার দিকে ঝুঁকতেন নানা শ্রেণির শিল্পী। সভ্যদের মধ্যে যে-কয়জন আজও ইহলোকে বিদ্যমান আছেন, তার অভাব একান্তভাবে অনুভব করেন তাঁরা সকলেই। এই নষ্টনীড়ের কথা স্মরণ করেই প্রায় দুই যুগ আগে অসিতকুমার (তিনি তখন লক্ষ্ণৌয়ের সরকারি চিত্রবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ) আমাকে একখানি পত্রে লিখেছিলেন: 'হেমেন, তোমার চিঠিখানি পেয়ে ভারী আনন্দ হল। আমাদের দলের মধ্যে তোমার সহৃদয়তার গর্ব আমরা বরাবরই করে থাকি। কলকাতায় যাই, কিন্তু মনে হয় যেন ডানা ভাঙা—বাসা থেকেও বাসা নেই। আমাদের সেই নীড়ের কথা কি কখনও ভোলা যায়?'

অসিতকুমার ছবি এঁকেছেন প্রধানত প্রাচ্য চিত্রকলাপদ্ধতি অনুসারেই। তিনি যে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য, তাঁর ছবি দেখলেই এ কথা বোঝা যায়, যদিও তাঁর নিজস্ব স্টাইলটুকুও ধরতে বিলম্ব হয় না। বর্তমানের চেয়ে অতীতের ঐতিহ্যের দিকেই তাঁর দৃষ্টি অধিকতর জাগ্রত, কেবল তাঁর কেন, প্রাচ্য চিত্রকলার অধিকাংশ শিল্পী সম্বন্ধেই এ কথা বলা যায়।

প্রাচ্য চিত্রকলাপদ্ধতিকে আজকাল ইংরেজিতে 'বেঙ্গল স্কুল' বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু বেঙ্গল স্কুলের নাম শুনলেই কতিপয় অবাঙালি শিল্প-সমালোচকের মাথা গরম হতে শুরু করে। সম্প্রতি পত্রান্তরে শ্রীরমণ নামে এক দক্ষিণী ভদ্রলোক ফতোয়া দিয়েছেন: 'তথাকথিত বেঙ্গল স্কুলের প্রতিষ্ঠা বাংলা দেশেই হয়েছিল বটে, কিন্তু তার শিল্পীদের সকলেই বাংলা দেশের লোক নন।' এই অর্থহীন উক্তির দ্বারা ভদ্রলোক কী বোঝাতে চেয়েছেন, বুঝতে পারিনি। বেঙ্গল স্কুলের শিল্পীরা বাংলা দেশের ভিতরেই থাকুন আর বাইরেই থাকুন কিংবা তাঁরা জাতে অবাঙালি হোন, তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ তাঁদের একই গোষ্ঠীভুক্ত বলেই মনে করতে হবে। তাঁরা একই আদর্শে অনুপ্রাণিত, একই সাধনমন্ত্রে দীক্ষিত। এই ধারা চলে আসছে বেঙ্গল স্কুলের জন্মের পর থেকেই। অবনীন্দ্রনাথের কাছে মানুষ হয়েছিলেন যেসব শিল্পী, তাঁদের মধ্যে ছিলেন অবাঙালিও। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যরাও (নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মুকুল দে ও দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রভৃতি) বাংলা দেশের ভিতরে এবং বাহিরে নানা চিত্রবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আরও কত অবাঙালি ছাত্রকে তৈরি করে তুলেছেন, তার সংখ্যা আমার জানা নেই। কিন্তু তাঁরা বাংলা দেশের বাইরেই থাকুন, কিংবা অবাঙালিই হউন, তাঁদেরও বলতে হবে বেঙ্গল স্কুলের শিল্পীই। 'বেঙ্গল স্কুল প্রাদেশিক নয়, জাতীয় স্কুল।' শ্রীরমণের এ উক্তির মধ্যে নেই কিছুমাত্র নূতনত্ব, কারণ এটাও সর্বসম্মত। বেঙ্গল স্কুল ভারতের সর্বত্র যে জাতীয় শিল্পের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছে, তারই ফলভোগ করছি আমরা সকলে জাতিধর্মনির্বিশেষে।

শ্রীরমণ আরও বলেন, বাংলা চিত্রকলা (অর্থাৎ বেঙ্গল স্কুল) আজ নাকি বন্ধ্যা, তার

অবস্থা বদ্ধ জলাশয়ের মতো। আমার মতে এখনও একথা বলবার সময় হয়নি, কারণ এখনও নন্দলাল, অসিতকুমার ও দেবীপ্রসাদ প্রভৃতি শিল্পীরা তুলিকা ত্যাগ করেননি, যদিও এ সত্য অনস্বীকার্য নয় যে তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন খেয়ালের মাথায় বিপথে গিয়ে আবার নব নব উদ্ভট পাশ্চাত্য ইজমের মোহে আচ্ছন্ন হতে চাইছেন। কিন্তু তাঁদের নাম বেঙ্গল স্কুলের অন্তর্গত করা যায় না এবং তাঁদের কেউ যদি এখানে শিক্ষালাভ করেও থাকেন, তবে আজ তাঁকে বলতে হবে, বেঙ্গল স্কুলের নাম-কাটা ছেলে।

আর এক কথা। সকল আর্টের ক্ষেত্রেই যুগে যুগে বদলে যায় পদ্ধতির পর পদ্ধতি। চিত্রকলাতেও প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত কত পদ্ধতির জন্ম ও প্রাধান্য হয়েছে তা বর্ণনা করতে গেলে আর একটি স্বতন্ত্র ও বৃহৎ প্রবন্ধ রচনা করতে হয়। কিন্তু কোনও পদ্ধতিই ব্যর্থ হয়নি। ইমপ্রেসানিজম বা কিউবিজম প্রভৃতি আসরে দেখা দিয়েছে বলে কি রাফায়েল, মিকেলাঞ্জেলো ও দ্য ভিঞ্চি প্রভৃতির প্রতিভা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে? 'বাংলা চিত্রকলা আজ বন্ধ্যা', একথা বলা বিমূঢ়তা। আজ তা সুফলাই হোক আর অফলাই হোক, তার গৌরব অক্ষয় হয়েই থাকবে। মতিভ্রান্ত ভারতীয় চিত্রকলার দৃষ্টিকে সে ঘরমুখো করতে পেরেছে, এই তার প্রধান গৌরব। প্রথম জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই সে একদল শক্তিশালী, সৃষ্টিক্ষম শিল্পী গঠন করতে পেরেছে, এই তার আর এক গৌরব। তারপর ভারতের দিকে দিকে প্রত্যন্তপ্রদেশ পর্যন্ত আজ সে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে, এই তার আরও একটি গৌরব। এই সব কারণে বাংলা চিত্রকলাপদ্ধতি চিরদিনই অতুলনীয় হয়ে থাকবে।

বাংলা চিত্রকলার নবজাগরণের যুগে যে-কয়েকজন শিল্পী অগ্রনেতারূপে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, অসিতকুমার হচ্ছেন তাঁদেরই অন্যতম। কিন্তু তাঁর হাতে কেবল তুলিই চলে না, কলমও চলে অবাধগতিতে। তাঁর গদ্যও আসে, পদ্যও আসে। অল্পদিন হল তিনি কালিদাসের 'মেঘদূত' ও 'ঋতুসংহার'-এর সচিত্র কাব্যানুবাদ প্রকাশ করেছেন—একধারে দেখেছি তাঁর কবি ও চিত্রকর রূপ। সুমিষ্ট কবিতা, বিচিত্র চিত্র। এত ভালো লেগেছিল যে, 'দৈনিক বসুমতী'তে সুদীর্ঘ সমালোচনার দ্বারা তাঁকে করেছিলুম অভিনন্দিত। কিন্তু চিত্রবিদ্যালয়ের গুরুতর কর্তব্যভার নিয়ে তাঁকে নিযুক্ত হয়ে থাকতে হয়, ইচ্ছামতো সাহিত্যচর্চার অবকাশ তিনি পান না। তাই দুঃখ করে আমাকে লিখেছিলেন: 'সময় আমার বড়োই কম, তাই সাহিত্যচর্চার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তবু চিরকালের অভ্যাস কি ছাড়া যায়? তাই কখনও-সখনও বেরিয়ে পড়ে এক-আধটা লেখা।'

তাঁর সাকিন লক্ষ্ণৌ, আমি আসীন কলকাতায়। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ কেটে গেছে, তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। কালে-ভদ্রে হয়েছে পত্রালাপ। একখানি পত্রে তিনি আশা দিয়েছিলেন: 'এবার কলকাতায় গেলে তোমার সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ ছাড়ব না।'

শুনলুম, একদিন তিনি দেখা করতে এসেওছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তখন বাড়ির বাইরে। দেখা হয়নি।

তার কয়েক বৎসর পরে প্রখ্যাত প্রমোদ-পরিবেশক স্বর্গীয় হরেন ঘোষের আস্তানায় অভাবিতভাবে হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর দিকে তাকিয়েই আমার দৃষ্টি হয়ে উঠল সচকিত। স্মৃতির পটে আঁকা আছে যুবক অসিতের ছবি, আর এ অসিত যে বৃদ্ধ—এমন চেহারা দেখবার কল্পনা মনে জাগেনি। ঋজু দেহ নত, কেশে জরার শুভ্রতা, বলিরেখাযুক্ত দেহের ত্বক। আমাকেও দেখে তাঁর মনে নিশ্চয়ই অনুরূপ ভাবের উদয় হয়েছিল। 'এই নরদেহ।'

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

পুরাতন বন্ধু। কিছু-কম পাঁচ যুগ আগে প্রেমাঙ্কুরের সঙ্গে হয় আমার প্রথম পরিচয়। পৃথিবীর নাট্যশালায় আজও আমার যে দুই-চারজন সত্যকার মরমি বন্ধু বিদ্যমান আছেন, তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন প্রেমাঙ্কুর। আমার কাছে তিনি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বা প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক নন, আমার কাছে তিনি বন্ধু—কেবল বন্ধুই। এই বিষাক্ত দুনিয়ায় অকপট বন্ধুলাভ যে কতটা দুর্ঘট, দুনিয়াদারিতে ভুক্তভোগীর কাছে তা অবিদিত থাকবার কথা নয়।

প্রেমাঙ্কুরের সঙ্গে যখন আমার প্রথম পরিচয় হয়, তখন তিনি সাহিত্যিক ছিলেন না, ছিলেন কেবল সাহিত্যরসিক। কিন্তু লেখক হবার জন্যে তখনই যে গোপনে হাতমক্স শুরু করেছেন, সে প্রমাণ পেয়েছিলুম অল্পদিন পরেই।

সুধাকৃষ্ণ বাগচী এক তৃতীয় শ্রেণির যুবক, তার মূলমন্ত্র ছিল—'ভুলিয়াও সত্য কথা কহিবে না।' নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের 'জাহ্নবী' নামে মাসিক কাগজ উঠে যাবার কয়েক বৎসর পরে সে ওই নামেই আর একখানি পত্রিকা প্রকাশ করে। নামে সেই-ই ছিল সম্পাদক, কিন্তু তার রচনাশক্তি বা সম্পাদকের উপযোগী বিদ্যাবুদ্ধি ছিল না। পত্রিকা পরিচালনার ভার নিয়ে যে কয়েকজন তরুণ যুবক তখন 'জাহ্নবী' কার্যালয়ে ওঠা-বসা করতেন, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই আজ বিভিন্ন বিভাগে হয়েছেন দেশের ও দশের কাছে সুপরিচিত। তাঁরা হচ্ছেন শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (পরে অধুনালুপ্ত দৈনিক 'ভারতে'র সম্পাদক), শ্রীঅমল হোম (পরে 'মিউনিসিপ্যাল গেজেটে'র সম্পাদক এবং এখন সরকারের প্রচারসচিব), শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার (পরে 'মৌচাক' সম্পাদক ও বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক) , শ্রীচারুচন্দ্র রায় (পরে চিত্রকর ও চিত্র-পরিচালক রূপে নাম কেনেন) এবং শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী (পরে ঔপন্যাসিক ও চিত্র-পরিচালক)। এই দলে আর একজনও ছিলেন, পরে ভেস্তে গিয়েছেন কেবল তিনিই। তাঁর নাম শ্রীনরেশচন্দ্র দত্ত। কার্যক্ষেত্রে আরম্ভ করেছিলেন তিনি আশাপ্রদ জীবন। কাজ করতেন সুরেন্দ্রনাথের বিখ্যাত দৈনিক 'বেঙ্গলী'র সম্পাদকীয় বিভাগে। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে 'বেঙ্গলী'কে ছেড়ে অবলম্বন করলেন মসির বদলে অসি—অর্থাৎ সৈনিকবৃত্তি। দেশে ফিরে হলেন সাবডেপুটি। ওই পর্যন্ত।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটা কথা মনে হচ্ছে। প্রেমাঙ্কুর আর আমারও জীবন হয়তো বদলে যেত। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ইংরেজ গভর্নমেন্ট সেনাদলে ভরতি হবার জন্যে বাঙালি যুবকদের আহ্বান করেন। প্রেমাঙ্কুর ও আমি পরামর্শের পর স্থির করলুম, আমরাও ধারণ করব মসির বদলে অসি। বিপুল উৎসাহে আমি একদিন যথাস্থানে গিয়ে সেনাদলে নাম লিখিয়ে এলুম। প্রেমাঙ্কুর তো তখন থেকেই সেকালকার গোরা সৈনিকদের মতো খাটো করে চুল ছাঁটতে শুরু করে দিলেন। দুজনে মিলে দেখতে লাগলুম যুদ্ধক্ষেত্রের রক্তাক্ত স্বপ্ন। সে যাত্রা সৈনিক হবে বলে নাম লিখিয়েছিল প্রায় ছয় শত জন বাঙালি যুবক। কিন্তু হঠাৎ গভর্নমেন্টের মত গেল বদলে। বললেন, না, আপাতত আর বাঙালি ফৌজের দরকার নেই। প্রথম ছয় শত জনের নাম খারিজ করে দেওয়া হল। কিছুদিন পরে আবার এল সরকারি আহ্বান—বাঙালি ফৌজ চাই। নতুন করে সবাই নাম লেখাও। আমাদের ভিতর থেকে সে আহ্বানে সাড়া দিলেন কেবল নরেশচন্দ্র। প্রেমাঙ্কুরের ও আমার সে প্রবৃত্তি আর হল না। প্রথম বারেই প্রত্যাখ্যাত হয়ে জুড়িয়ে গিয়েছিল আমাদের প্রতপ্ত উৎসাহ। ভুল করেছি বলে মনে হচ্ছে না। কারণ আজ জেনেছি অসির চেয়ে মসির শক্তিই বেশি। সারা পৃথিবীতে এখন এই যে 'কোল্ড ওয়ার' বা 'ঠান্ডা যুদ্ধ' চলছে, তার প্রধান অস্ত্রই তো হচ্ছে কালি ও কলম।

যাক। 'জাহ্নবী' কার্যালয়ের কথা হচ্ছিল। ওখানে আমিও প্রত্যহ যেতুম বটে, কিন্তু পত্রিকা পরিচালনার সঙ্গে আমার কোনও সংস্রব ছিল না। আমি ছিলুম 'জাহ্নবী'র নিয়মিত লেখক। যে তরুণদের দলটি নিয়ে 'জাহ্নবী'র বৈঠকটি গঠিত হয়, তাঁদের মধ্যে সাহিত্যক্ষেত্রে আমিই ছিলুম তখন সবচেয়ে অগ্রসর, কারণ সে সময়ে 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'সাহিত্য', 'নব্যভারত', 'মানসী', 'অর্চনা' ও 'জন্মভূমি' এবং অন্যান্য বহু পত্রিকায় আমার অনেক প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা প্রকাশিত হত।

মনে ছিল তখন ভবিষ্যতের কত সম্ভাবনার ইঙ্গিত, সাহিত্যের রূপকথাই ছিল আমাদের আনন্দের একমাত্র সম্বল। সাহিত্যের মাদকতা আমাদের মত্ত করে তুলেছিল এবং সে নেশার ঘোর আজও কাটেনি। তখনও পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান ছিল, যদিও তখনকার অধিকাংশ উদীয়মান সাহিত্যিকের গুরুস্থানীয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথই। নাট্যসাহিত্যে চলছে তখন দ্বিজেন্দ্রলালের যুগ। 'বিন্দুর ছেলে' ও 'রামের সুমতি' প্রভৃতি গল্প বোধ হয় তখনও বেরোয়নি কিংবা সবে বেরিয়েছে, কিন্তু সুপরিচিত লেখক হিসাবে জনসাধারণের বা আমাদের মনে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কোনও স্থানই ছিল না।

বয়সে ছিলুম সকলেই তরুণ, বয়সের ধর্মকে অস্বীকার করতেও পারতুম না। ঝোঁকের মাথায় প্রায়ই তুমুল তর্কাতর্কির ঝড়ের ভিতরে গিয়ে পড়তুম। এখন সেই বালকতার কথা মনে করলেও হাসি পায়, কিন্তু তখন সেই তর্কের হার-জিতের উপরে নির্ভর করত যেন আমাদের সমস্ত মানসম্ভ্রম। দু-পক্ষের একমাত্র লক্ষ্য থাকত, সুযুক্তি বা কুযুক্তির সাহায্যে

যেমন করেই হোক প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ করা। কিন্তু মুখ তো বন্ধ হতই না, বরং আরও বেশি করে খুলে যেত।

একবার তর্ক বাধল বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে। একপক্ষে ছিলুম প্রেমাঙ্কুরের সঙ্গে আমি এবং অন্য পক্ষে প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। অন্যেরা থাকতেন মধ্যস্থের মতো। বাকবিতণ্ডা চরমে উঠলে উত্তেজিত হয়ে তারস্বরে চিৎকার করতুম আমরা তিনজনেই। তর্ক শুরু হত সন্ধ্যার আগে 'জাহ্নবী' কার্যালয়ে। সন্ধ্যার পর আসত রাত্রি। কার্যালয় বন্ধ হয়ে যেত। তবু বন্ধ হত না আমাদের বাকপ্রপঞ্চ। কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের জনবহুল ফুটপাথের উপরে আমাদের তর্ক চলত অশ্রান্তভাবে। ওদিকে হেদুয়া আর এদিকে শ্রীমানী মার্কেট। ওদিক থেকে এদিকে আসি, আবার এদিক থেকে যাই ওদিকে এবং চলতে চলতে ফোটাই অনবরত কথার খই। মাঝে মাঝে হঠাৎ এত জোরে ছুড়ি বাক্যবন্দুক যে, রাজপথের চলমান পথিকরা চমকে ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অবাক হয়ে তাকায় আমাদের মুখের দিকে। ক্রমে রাত বাড়ে, পথ জনবিরল হয়ে পড়ে, কিন্তু তর্ক থামে না। প্রেমাঙ্কুর ও প্রভাত থাকেন এক পাড়ায়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের আশেপাশে এবং আমি তখন থাকতুম পাথুরিয়াঘাটায় আমাদের পৈতৃক বাড়িতে। আমি যদি হই বাড়িমুখো, অন্য কেউ আমার সঙ্গ ছাড়তে নারাজ। বিডন স্ট্রিট ধরে চিৎপুর রোডের মোড়। তর্ক তখনও প্রবল। তাকে আধাখ্যাঁচড়া রেখে কারুরই বাড়ি যেতে মন সরে না। সবাই ঢুকি বিডন গার্ডেনে। আবার বসে তর্কসভা। মধ্য রাত্রি। বাধ্য হয়ে সবাই উঠে দাঁড়াই। প্রেমাঙ্কুর ও প্রভাত প্রভৃতি নিজেদের পাড়ার দিকে পদচালনা করেন। হঠাৎ আমার মনে হয়, তূণের কতিপয় চোখা চোখা বাক্যবাণ এখনও ছোড়া হয়নি। আমিও সেইগুলি ব্যবহার করতে করতে আবার চলি তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে। বিডন স্ট্রিটের আধখানা পার হয়ে আবার কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে। তবু তর্ক থেকে যায় অমীমাংসিত। সেদিন অতৃপ্ত মনে সবাই বাড়ি ফিরলুম বটে, কিন্তু তর্কের খেই ধরা হল আবার পরদিন। এমনি চলল দিনের পর দিন। প্রত্যেকেই নাছোড়বান্দা।

পাড়ার লোকেরা দস্তুরমতো অতিষ্ঠ। প্রেমাঙ্কুরের পিতৃদেবের কাছে গিয়ে তারা নালিশ করলেন, 'মশাই, আপনার ছেলে আর তার বন্ধুদের উপদ্রবে এ-পাড়া থেকে ঘুমের পাট উঠে যেতে বসেছে। রোজ দুপুর রাত্রে তারা 'বঙ্কিমচন্দ্র' আর 'রবীন্দ্রনাথ' বলে এমন ভয়ানক জোরে বীভৎস তর্জনগর্জন করে যে, ঘুমোতে ঘুমোতে আমাদের আঁতকে জেগে উঠতে হয়। এ ভয়ানক কাণ্ড বন্ধ না করলে আমাদের প্রাণ তো আর বাঁচে না।'

চিৎকারে আমাদের মধ্যে প্রভাতই ছিলেন অগ্রগণ্য। তাঁর একার কণ্ঠে ছিল চারজনের সম্মিলিত কণ্ঠের চিৎকার করবার শক্তি।

তর্কাতর্কি একেবারে ব্যর্থ হত না। তার মধ্যে থেকে পেয়েছি আমার কয়েকটি নূতন রচনার উপাদান। প্রেমাঙ্কুরও রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানি'কে বিশ্লেষণ করে প্রকাণ্ড একখানি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে ফেলেছিলেন।

প্রেমাঙ্কুরের সঙ্গে স্থাপিত হল আমার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। প্রতিদিনই কেউ কারুকে না দেখে থাকতে পারি না। পরে পরে 'যমুনা', 'মর্মবাণী', 'সঙ্কল্প' ও 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকার আসরে, বিভিন্ন বন্ধুবাড়ির বৈঠকে, থিয়েটারে, সিনেমায়, গান-বাজনার মজলিসে—এমনকি কুস্তির আখড়ায় ও খেলাধুলোর মাঠেও আমাদের দুজনের আবির্ভাব হত একসঙ্গে মানিকজোড়ের মতো। এইভাবে কেটে গিয়েছে বৎসরের পর বৎসর, বহু বৎসর। শহরের ভিতরে এবং বাহিরে কত দিন রাত কাটিয়েছি এক শয্যায়।

কিন্তু জীবনসংগ্রাম একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও বিক্ষিপ্ত করে ইতস্তত, তাদের টেনে নিয়ে যায় পরস্পরের চোখের আড়ালে। আমি শিকড় গেড়ে মোতায়েন আছি সাহিত্য-ক্ষেত্রেই, কিন্তু প্রেমাঙ্কুর যেদিন থেকে প্রবেশ করেছেন সিনেমা জগতে, সেই দিন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় ন-মাসে ছ-মাসে। তবে আমাদের মনের সম্পর্ক যে আজও একটুও শিথিল হয়নি, মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা হলেই সেটুকু বুঝতে বিলম্ব হয় না।

গোড়ার দিকেও তিনি আর একবার বেশ কিছুকালের জন্যে সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দিয়ে চাকরিতে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিছুকাল পরে আবার হন বেকার। কিন্তু তাঁর মতন একজন মনীষী ব্যক্তির অলস হয়ে বসে থাকাটা আমার ভালো লাগেনি। সেই সময়ে স্বর্গীয় ললিতমোহন গুপ্ত 'হিন্দুস্থান' নামে একখানি ভালো দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং আমি ছিলুম তার একজন নিয়মিত লেখক। প্রেমাঙ্কুরকেও আমি 'হিন্দুস্থানে'র সম্পাদকীয় বিভাগে ভিড়িয়ে নিই (পত্রিকাখানি ছয় বৎসর ধরে চলেছিল)। তারপর থেকে তাঁর লেখনী হয়ে ওঠে রীতিমতো সচল। পরে পরে তিনি রচনা করেন অনেকগুলি জনপ্রিয় গল্প ও কয়েকখানি উপন্যাস। ক্রমে ক্রমে বেড়ে ওঠে তাঁর হাতযশ। পরিচিত হন তিনি 'ভারতী' গোষ্ঠীভুক্ত অন্যতম বিখ্যাত লেখকরূপে। তাঁর সাহিত্য সাধনার সম্যক পরিচয় দেবার স্থান এখানে নেই। তবে এটুকু উল্লেখ করা চলে যে, জীবনের পূর্বার্ধে তিনি লোকপ্রিয় সুলেখক বলে সুনাম কিনেছিলেন বটে, কিন্তু 'মহাস্থবির জাতক' রচনা করে সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন প্রাচীন বয়সেই। প্রায় দুই যুগ আগে একখানি নাটক রচনা করেছিলেন—'তখৎ-এ-তাউস'। সম্প্রতি তা মঞ্চস্থ হয়েছে শিশিরকুমারের 'শ্রীরঙ্গমে'। বাল্যকাল থেকেই তাঁর ঝোঁক ছিল নাট্যকলার দিকে। তরুণ বয়সেই তিনি শৌখিন অভিনয়ে যোগ দিতেন এবং পরিণত বয়সে এই নাট্যানুরাগের জন্যেই আকৃষ্ট হন চলচ্চিত্রের দিকে। কেবল পরিচালনায় নয়, চিত্রাভিনয়েও তাঁর দক্ষতা আছে। কয়েক বৎসর পূর্বে নিউ থিয়েটারের 'পুনর্জন্ম' কথাচিত্রে তিনি অভিনয় করেছিলেন প্রধান ভূমিকায়।

বন্ধুরা সকলেই তাঁর সঙ্গ প্রার্থনা করে। তাঁর উপস্থিতিতে সরস ও সজীব হয়ে ওঠে যে-কোনও শ্রেণির বৈঠক। মিশতে পারেন তিনি শিল্পীদের সঙ্গে শিল্পীর মতো, আবার রাম-শ্যামের সঙ্গে রাম-শ্যামের মতো। তাঁর মুখে হাসির বুলি ও হাসির গল্প জমে ওঠে অপূর্বভাবে। এমন গল্পিয়া মানুষ আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে আমি আর দেখিনি। অতি

সাধারণ কথা তাঁর ভাষণ-ভঙ্গিতে হয়ে ওঠে অতি অসাধারণ। আজ তিনি রোগজর্জর, জরাকাতর, কিন্তু এখনও মন তাঁর হয়ে আছে চিরহরিৎ, কথায় কথায় সেখান থেকে উচ্ছলিত হয়ে ওঠে হাসিরাঙা রসের ফোয়ারা।

একদিন বৈকালে বাড়ির ত্রিতলে রচনাকার্যে নিযুক্ত হয়ে আছি, হঠাৎ রাস্তা থেকে ডাক শুনলুম, 'হেমেন্দ্র, হেমেন্দ্র!'

জানলার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কে?'

—'আমি প্রেমাঙ্কুর।'

বহু—বহুকাল অদর্শনের পর আচম্বিতে প্রেমাঙ্কুরের এই অভাবিত আবির্ভাব কেন? নীচে গিয়ে শুধালুম, 'ব্যাপার কী?'

প্রেমাঙ্কুর অভিভূত কণ্ঠে বললেন, 'বাড়িতে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল, দুনিয়ায় আমি একা। তুমি ছাড়া আমার আর কোনও বন্ধু নেই। তাই ছুটতে ছুটতে তোমার কাছেই চলে এসেছি।'

অজিতকুমার চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে আমরা 'ভারতী'র আসরে বাস করতুম একটি সুখী পরিবারের মতো। সে আসর ভেঙে গেছে, প্রায় সব দীপ নিবে গেছে। দু-তিনটি জীবনদীপ এখনও টিমটিম করে জ্বলছে বটে, কিন্তু তাদেরও তেল ফুরোতে দেরি নেই।

অহীন্দ্র চৌধুরী

মাত্র দুই বৎসর। মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে বাংলা নাট্যকলার মোড় ঘুরে গেল একেবারে। যা ছিল ক্ষীণ, জরাজর্জর, লাভ করলে তা তাজা রক্ত, উত্তপ্ত যৌবন। পুরাতন সরে দাঁড়াল পিছনে, নূতন এগিয়ে এল সামনে। এই অভাবিত আকস্মিক পরিবর্তন বিস্ময়কর।

মনোমোহন থিয়েটারে বৃদ্ধ দানীবাবু করছিলেন নিশ্চিন্তভাবে অতীতের রোমন্থন। পূর্বসঞ্চিত পুঁজি ভাঙিয়ে কোনও রকমে চালিয়ে দিচ্ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের জীবদ্দশায় যে দানীবাবুকে একই ভূমিকায় বারংবার দেখে দেখেও আমাদের আশা মিটতে চাইত না, 'মনোমোহনে'র নূতন নাটকেও তিনি আর দিতে পারতেন না নূতনত্বের পরিচয়। চলাফেরা, অঙ্গহার, সংলাপ, সব-কিছুর ভিতরেই আগে যা দেখেছি ও শুনেছি, আবার তাই-ই প্রকাশ পেত। তাঁর সঙ্গে আর যাঁরা অভিনয় করতেন, তাঁরা ছিলেন আবার রীতিমতো বাজে মার্কার। বিয়োগান্ত নাটককেও তাঁরা প্রহসনে পরিণত করতে পারতেন অবলীলাক্রমে।

এই ভাঙা হাটে প্রথমে এসে দাঁড়ালেন শিশিরকুমার। তাঁর কয়েক মাস পরে এলেন রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও নরেশচন্দ্র মিত্র। তারই অল্পদিন পরে দেখা দিলেন নির্মলেন্দু

লাহিড়ী। এবং তারপর ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে আমরা এক সঙ্গে লাভ করলুম দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, তিনকড়ি চক্রবর্তী ও অহীন্দ্র চৌধুরীকে। ভাঙা হাট জমে আবার সরগম হয়ে উঠল। এ সব হচ্ছে মাত্র দুই বৎসরের ঘটনা।

রেনেসাঁস পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে লেগেছিল আরও কিছুকাল। শেষোক্ত দলের শিল্পীরা যখন দেখা দেন, শিশিরকুমার ছিলেন তখন যবনিকার অন্তরালে। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে নাট্যজগতে হয় তাঁর পুনঃপ্রবেশ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হয় 'মনোমোহনে'র পতন। ক্রমে শিশিরকুমারের চারিপাশে এসে দাঁড়ালেন ললিতমোহন লাহিড়ী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন চৌধুরী, অমিতাভ বসু, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রবি রায় ও জীবন গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। লুপ্ত হয়ে গেল বাংলা রঙ্গালয়ের গতানুগতিক ধারা। নূতন স্রোত এল পুরাতন খাতে। সেই স্রোত এখনও চলছে। তখনকার নবীনরা আজ হয়েছেন প্রবীণ। অনেকে পরলোকে গিয়েছেন। তাঁদের স্থান গ্রহণ করেছেন নূতন নূতন শিল্পী। সৌভাগ্যক্রমে এখানকার সর্বাগ্রগণ্য ও সৃষ্টিক্ষম দুইজন শিল্পী আজও সক্রিয় অবস্থায় আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। ওঁদের একজন হচ্ছেন শিশিরকুমার, আর একজন অহীন্দ্র চৌধুরী।

নবযুগের অধিকাংশ অভিনেতার মতো অহীন্দ্রেরও হাতেখড়ি হয়নি সাধারণ রঙ্গালয়ে। তাঁরও নাট্যসাধনা শুরু হয়েছিল শৌখিন নাট্যজগতেই। কেবল তাই নয়। পেশাদার রঙ্গালয়ে মঞ্চাভিনয়ে যোগ দেবার আগেই তিনি চলচ্চিত্রের পর্দাতেও দেখা দিয়ে নিজের নৈপুণ্য প্রকাশ করেছিলেন। অধুনালুপ্ত বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'কল্লোলে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ডাঃ কালিদাস নাগের ভ্রাতা স্বর্গীয় গোকুলচন্দ্র নাগ প্রভৃতির চেষ্টায় 'ফোটো প্লে সিন্ডিকেট অফ ইন্ডিয়া' নামে একটি চিত্র-প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। তার প্রথম ছবির নাম 'সোল অফ এ স্লেভ'। নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন অহীন্দ্র চৌধুরী। তাঁর অভিনয় বেশ উতরে গিয়েছিল।

সাধারণ রঙ্গালয়ে তাঁর প্রথম ভূমিকা হচ্ছে 'কর্ণার্জুন' নাটকে অর্জুন। প্রথম আবির্ভাবেই তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিলেন প্রত্যেক দর্শকের দৃষ্টি। দীর্ঘ, সুঠাম ও বলিষ্ঠ দেহ এবং সুশ্রী মুখ, নাকের উপযোগী আদর্শ চেহারা। গম্ভীর, উদাত্ত ও ভাবব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর। গলায় স্বরের খেলায় বেশি বৈচিত্র্য না থাকলেও ভাবের অভিব্যক্তি প্রদর্শিত হয় সুকৌশলে। সংলাপ ও অঙ্গহারের মধ্যে সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে একজন জাত-অভিনেতা এবং পরিপক্ক শক্তি নিয়েই রঙ্গমঞ্চে দেখা দিয়েছেন, তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সকলে সে কথা উপলব্ধি করতে পেরেছিল।

অদূর ভবিষ্যতেই তিনি নাম কিনবেন, এটুকু অনুমান করতে আমার বিলম্ব হয়নি। নাট্যজগতে নিজেকে আমি 'ভেটার‍্যান' দর্শক বলে মনে করতে পারি (ভেটার‍্যান অভিনেতা যদি থাকতে পারে, তবে ভেটার‍্যান দর্শকই বা থাকবে না কেন?)। বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত অভিনয় দেখে দেখে মাথার চুল পাকিয়ে ফেললুম, একবার দেখলেই চিনতে পারি ভালো অভিনেতাকে। তাই অহীন্দ্র চৌধুরীকেও চিনতে বিলম্ব হয়নি।

কিন্তু একজন উঁচুদরের চৌকস শিল্পীকে যাচাই করতে হলে অর্জুন ভূমিকাটি বেশি কাজে লাগবে না। শিল্পীর শ্রেষ্ঠতার আদর্শ কী, তিনি কতটা উঁচুতে ও কতটা বৈচিত্র্য দেখাতে পারেন, সে প্রমাণ পেতে গেলে দরকার অন্য রকম ভূমিকার। 'কর্ণার্জুনে'র পর অহীন্দ্র আরও কোনও কোনও নাটকে দেখা দেন। প্রতিবারেই করেন উল্লেখযোগ্য অভিনয়। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রেও তাঁর যথার্থ শক্তি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করতে পারিনি।

তারপরেই হল তাঁর প্রকৃত আত্মপ্রকাশ। উপর উপরি রবীন্দ্রনাথের দুইখানি নাটকে ('চিরকুমার সভা' ও 'গৃহপ্রবেশ') তিনি যথাক্রমে গ্রহণ করলেন চন্দ্র ও যতীনের ভূমিকা। দুটি ভূমিকাই সম্পূর্ণরূপে পরস্পরবিরোধী। একটি হাস্যতরল ও আর একটি অশ্রুসজল। চন্দ্রবাবু নিজে হাসেন না, বরং গম্ভীর হয়েই থাকেন, কিন্তু লোকে তাঁর ভাবভঙ্গি, চলনবলন, অন্যমনস্কতা ও মুদ্রাদোষ প্রভৃতি দেখে হেসে খায় লুটোপুটি। অনেকটা এই শ্রেণির অধ্যাপককে বাস্তবজীবনেও আবিষ্কার করা অসম্ভব হবে না। চন্দ্রের ভূমিকায় অহীন্দ্রের অপরূপ অভিনয় নাট্যজগতে কেবল আলোড়ন ও উত্তেজনা সৃষ্টিই করলে না, সেই সঙ্গে সকলকে দেখিয়ে দিলে কতখানি উন্নত শক্তির অধিকারী তিনি। ভূমিকার উপযোগী প্রকৃতি-নির্দেশক রঙ্গসজ্জার দ্বারাও তিনি দর্শকদের করলেন চমৎকৃত।

তারপর যতীনের ভূমিকা। অত্যন্ত কঠিন ভূমিকা। কেবল সুকঠিন নয়, বাংলা রঙ্গালয়ের এমন নূতন রকম ভূমিকা আর কখনও দেখা যায়নি—আগেও না, পরেও না। একটিমাত্র দৃশ্য, নাটকের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যধিগ্রস্ত, মৃত্যুন্মুখ উত্থানশক্তিহীন যতীন শয্যাশায়ী অবস্থায় সংলাপ চালিয়ে যাবে হিমীর (শ্রীমতী নীহারবালা) সঙ্গে। মেলো-ড্রামাটিক ভাবভঙ্গি ও প্যাঁচ দেখাবার, চিৎকার ও রঙ্গমঞ্চ পরিক্রমণ করবার এতটুকু সুযোগ নেই, তবু সেই নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চেষ্ট অবস্থাতেই নাটকের প্রাণবস্তু ফুটিয়ে তুলে এবং ভাবভিব্যক্তির চরমে উঠে কেবল সংলাপ সম্বল করেই অহীন্দ্র সকলকে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। দুইবার দেখেছি 'গৃহপ্রবেশ' এবং দুইবারই অহীন্দ্রের অনুপম শক্তি দেখে বিস্মিত হয়ে ফিরে এসেছি। আরও দেখবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাংলা রঙ্গালয়ের অরসিক দর্শকদের অনাদরে 'গৃহপ্রবেশে'র পরমায়ু হয়েছিল অতিশয় সংক্ষিপ্ত। 'গৃহপ্রবেশে'র মধ্যে যে আধুনিক উচ্চতর শ্রেণির নাটকীয় ক্রিয়া ছিল, তা শারীরিক নয়, সম্পূর্ণরূপেই আন্তরিক। তাই প্রাকৃতজনদের পক্ষে তা হয়েছিল রীতিমতো গুরুপাক। রুশিয়ার নাট্যকার লিওনিউ আন্দ্রিভ এই শ্রেণির নাটক রচনার পক্ষপাতী ছিলেন। শেষ বয়সে আমাদের গিরিশচন্দ্রও এই শ্রেণির নাটকরচনার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু মৃত্যু তাঁর বাসনা পূর্ণ হতে দেয়নি।

ব্যবসায়ের দিক দিয়ে 'গৃহপ্রবেশ' জমল না। কিন্তু গৌরবের দিক দিয়ে আর্ট থিয়েটার হল প্রভূত লাভবান এবং যশের দিক দিয়ে অহীন্দ্রের তারকা হল নিরতিশয় ঊর্ধ্বগামী। সবাই বুঝলে, তিনি কেবল বাংলা দেশের একজন প্রথম শ্রেণির অভিনেতা নন, কোনও কোনও বিভাগে সত্য সত্যই অতুলনীয়।

স্টারে মঞ্চস্থ হল 'চন্দ্রগুপ্ত', অহীন্দ্র সেলুকসের ভূমিকায়। প্রথমে সেলুকস সাজতেন প্রিয়নাথ ঘোষ, তারপর কুঞ্জলাল চক্রবর্তী প্রভৃতি। তাঁদের দেখানো সেলুকসের ছবি মুছে দিলে অহীন্দ্রের অভিনয়।

বিজ্ঞাপিত হল, অহীন্দ্র দেখা দেবেন ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর' নাটকের নামভূমিকায়। কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ে ওই বিশেষ ভূমিকাটিতে অবিস্মরণীয় অসাধারণ অভিনয় করে শিশিরকুমার কিনেছিলেন এমন তুলনাহীন নাম যে, অন্য কোনও শ্রেষ্ঠ অভিনেতাও ওর দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে সাহস করতেন না। নির্মলেন্দু লাহিড়ীও আলমগীর সেজেছিলেন বটে, কিন্তু মফস্‌সলে। অহীন্দ্রের দুঃসাহস দেখে সকলেই বিস্মিত। আমিও কৌতূহলী হয়ে নির্দিষ্ট দিনে অহীন্দ্রের অভিনয় না দেখে থাকতে পারলুম না। তারপর অভিনয় দেখে বুঝলুম, তিনি হচ্ছেন দস্তুরমতো সুকৌশলী শিল্পী। জানি না যে-কোনও কারণে তিনি ওই ভূমিকাটি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন কি না, কিন্তু শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মতোই নিজের মান রক্ষা করে তিনি দিলেন বিশেষ চাতুর্যের পরিচয়। কোনও শ্রেষ্ঠ শিল্পীই যে কোনও ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করতে পারেন না, যে ভূমিকা রামের উপযোগী, তা শ্যামের উপযোগী না হতেও পারে। আলমগীর ভূমিকাটি অহীন্দ্রের উপযোগী ভূমিকা নয়। কিন্তু তবু তাঁর অভিনয় নিরেস হল না। ওই ভূমিকাটির স্থানে স্থানে সংলাপের মধ্যে আছে যথেষ্ট উচ্ছ্বাস, কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনের দ্বারা শিশিরকুমার যা চমৎকারভাবে অভিব্যক্ত করেন। অহীন্দ্র কিন্তু সেভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশের চেষ্টা করলেন না, তাঁর সংলাপ হল কাটা কাটা। আলমগীর ভূমিকায় তিনি দিলেন একটি সম্পূর্ণ নূতন ধারণা, তাঁর সঙ্গে কেউ শিশিরকুমারের তুলনা করবার অবসরই পেলে না। এমনকি তাঁর রঙ্গসজ্জা পর্যন্ত হল অভিনব।

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবদ্দশায় তাঁর 'সাজাহান' ও 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের কয়েকটি ভূমিকার উপযোগী অভিনয় হয়নি। চন্দ্রগুপ্ত, আন্টিগোনাস ও সেলুকস প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছেন নবযুগের অভিনেতারাই। তাঁর 'সাজাহানে'র নাম ভূমিকাকেও সর্বপ্রথমে যথার্থ মর্যাদা দিয়েছেন অহীন্দ্র চৌধুরীই।

আরও কত ভূমিকায় অহীন্দ্র করেছেন স্মরণীয় অভিনয়। এখানে তার ফর্দ দাখিল করা সম্ভব নয়। চলচ্চিত্রক্ষেত্রেও আছে তাঁর ব্যাপক প্রাধান্য। মঞ্চের উপরে এবং পর্দার গায়ে তাঁকে দেখা গিয়েছে যত ভূমিকায়, তত বোধ হয় আর কারুকেই নয়। আজ প্রাচীন বয়সেও তিনি অশ্রান্তভাবে দেখা দিচ্ছেন নানা শ্রেণির ভূমিকার পর ভূমিকায়। অসাধারণ তাঁর সহনশক্তি। এক এক দিন দিবাভাগে তিনি যোগ দিয়েছেন চিত্রাভিনয়ে এবং রাত্রে করেছেন একাধিক রঙ্গালয়ে একাধিক ভূমিকায় অভিনয়। কেবল গম্ভীর ও উচ্চশ্রেণির হাস্যরসাত্মক ভূমিকায় নয়, 'লো-কমিক' অভিনয়েও তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব দেখেছিলুম 'লাখটাকা' হাস্যনাট্যের একটি ভূমিকায়!

ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের সুযোগ পেয়েছি অসংখ্যবার।

বাকপ্রপঞ্চে অহীন্দ্রের উল্লেখযোগ্য অসাধারণতা নেই বটে, আগে আগে রঙ্গালয়ের অভিনয় শেষ করে প্রায়ই তিনি আমার বাড়িতে পদার্পণ করতেন। হরেক রকম আলাপ-আলোচনায় কেটে যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা, আমাদের অজ্ঞাতসারেই। তারপর যখন রাত্রে ডিনার খেতে বসতুম, তখন হয়তো কলরব করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে ভোরের পাখিরা।

একদিন রাত দুপুরে হঠাৎ আমার খেয়াল হল, কলকাতার কাছাকাছি কোনও ডাকবাংলোয় বেড়িয়ে আসতে।

অহীন্দ্র বললেন, 'কলকাতার খুব কাছে ডাকবাংলো আছে রাজারহাট বিষ্ণুপুরে।'

বললুম, 'চলো তবে যাই সেখানে।'

অহীন্দ্রও নারাজ নন। তখনই এল ট্যাক্সি। আমরা যাত্রা করলুম রাজারহাট বিষ্ণুপুরে। উল্লেখযোগ্য ডাকবাংলো নয় বটে, কিন্তু বন্ধুর সান্নিধ্য সব স্থানকেই করে তোলে সুমধুর। সেখানেই রাত কাবার করে ফিরে এলুম পরদিনের ভোরবেলায়।

কিন্তু 'তে হি নো দিবসা গতাঃ'।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

অনেককেই তো দেখলুম—কবি, ঔপন্যাসিক, সম্পাদক, চিত্রকর, ঐতিহাসিক, গায়ক-গায়িকা, নট-নটী, নর্তক—এমনকি মল্ল পর্যন্ত। কিন্তু আধুনিক কোনও নাট্যকারের সঙ্গে এখনও পাঠকদের পরিচিত করা হয়নি।

বাংলা নাট্যজগতে স্মরণীয় অবদান রেখে গিয়েছেন মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু, মনোমোহন বসু, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও অমৃতলাল। প্রথমোক্ত দুইজনকে কখনও চোখে দেখবারও সৌভাগ্য হয়নি। বাকি কয়েকজনের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছি এবং তাঁদের কথা নিয়ে অন্যত্র আলোচনাও করেছি।

এটা বাংলা দেশের জল-বাতাসের গুণ কি না জানি না, কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ করে বিস্মিত হতে হয়। এখানে নানা বিভাগে যাঁদের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়, বরণীয় ও অতুলনীয়, তাঁরা আত্মপ্রকাশ করেছেন প্রথম দিকেই। রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা পরে পরে পেয়েছি যেসব শক্তিধরকে, আজ তাঁদের সঙ্গে তুলনা করবার মতো মানুষ গোটা বাংলা দেশ খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। তুলনা করব কী, বাংলার রাজনীতি আজ প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছে বললেও চলে। কথাসাহিত্যেও আমরা পরে পরে পেয়েছি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে। আধুনিক কথা-সাহিত্যিকদেরও লেখনী প্রসব করছে কাঁড়ি কাঁড়ি রচনা, কিন্তু সেগুলি ধারে কাটে না ভারে কাটে সে কথা 'বুঝ নর যে জানো সন্ধান'। চিত্রকলার ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও যামিনী রায় প্রভৃতিকে সমসাময়িক বলতে পারি। কিন্তু তার পরেই বাংলা চিত্রশিল্পের ধারা হয়ে পড়েছে ক্ষীয়মাণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধ থেকে

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত বাগ্মিতার জন্যে বাংলা দেশ ছিল বিখ্যাত। কিন্তু এখন? কেশবচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র প্রভৃতির বাগবৈদগ্ধের কথা ছেড়েই দিই, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল বসুর মতো বৈঠকি-সংলাপ জমিয়ে তুলতে পারেন, এমন লোকও আজ দুর্লভ। আরও নানা বিভাগের কথা তোলা যেতে পারে, কিন্তু পুথি না বাড়িয়ে কেবল নাট্য-বিভাগের দিকেই দৃষ্টিপাত করা যাক।

এদেশে আমরা যাঁদের প্রথম শ্রেণির নাট্যকার বলে মনে করি, তাঁদের কেহই আধুনিক যুগের মানুষ নন। সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ে নবযুগ আসবার আগেই তাঁদের দান ফুরিয়ে গিয়েছিল। শিশিরকুমারের আবির্ভাবের পরেও ক্ষীরোদপ্রসাদ কিছুদিন লেখনী চালনা করেছিলেন বটে, কিন্তু তার আগে থেকেই তাঁর শক্তি হয়ে পড়েছিল যথেষ্ট রিক্ত। 'আলমগীর' অবলম্বন করেই শিশিরকুমার দেখা দিয়েছিলেন। কিন্তু ও-নাটকখানি বিখ্যাত হয়েছে নাটকত্বের জন্যে নয়, শিশিরকুমারের অভিনয়গুণেই। আসলে গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা নাটকের স্বর্ণযুগ অতীত হয়ে গিয়েছিল। শিশিরকুমারের 'নাট্যমন্দির' যখন চলছে, তখন অমৃতলাল 'যাজ্ঞসেনী' নামে একখানি উৎকৃষ্ট নাটক আমাদের উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু ও-রকম একটি কি দুটি রচনা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

গিরিশোত্তর যুগ হচ্ছে বাংলা নাট্যজগতের অন্ধ-যুগ। শিশিরকুমারের আবির্ভাবের আগে এক যুগের মধ্যে একজনমাত্র উল্লেখযোগ্য নূতন অভিনেতার দেখা পাওয়া যায়নি; এবং সাড়া পাওয়া যায়নি একজনমাত্র প্রথম শ্রেণির নূতন নাট্যকারেরও। এ সময়ে নাটক রচনা করে সুপরিচিত হয়েছিলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশিকান্ত বসু, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীদাশরথি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনজন ছিলেন প্রায় তুল্যমূল্য। তাঁদের রচনাও ছিল অপেক্ষাকৃত উন্নত। নির্মলশিবেরও কোনও কোনও রচনা হয়েছিল সহনীয়। বাকি তিনজন ছিলেন সবচেয়ে লোকপ্রিয় এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণির। তাঁদের নাটকে ছিল না কোনও মহৎ ভাব বা নিজস্ব রচনাভঙ্গি। কিন্তু হেটো দর্শকদের গ্রাম্য মনোবৃত্তিকে উত্তেজিত করবার কৌশল আয়ত্তে এনে তাঁরা বাজার একেবারে দখল করে ফেলেছিলেন। কৌতূহলী হয়ে সাহস সঞ্চয় করে ওঁদের তিনজনেরই এক-একখানি নাটকের অভিনয় আমি দেখতে গিয়েছিলুম, কিন্তু তারপরেই আমার কৌতূহল দস্তুরমতো ঠান্ডা হয়ে যায়। তেমন সব ওঁচা রচনাও যে রঙ্গালয়ের মালিকের সামনে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার খুলে দিতে পারে, সে জ্ঞান আমার ছিল না। তারপরে বহু রাত্রেই রঙ্গালয়ের নেপথ্যে উপস্থিত ছিলুম। মঞ্চের উপরে 'বঙ্গে বর্গী' প্রভৃতির অভিনয় চলেছে, কিন্তু কোনও দিনই প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে বসবার আগ্রহ হয়নি।

কিন্তু কেবল রাবিসের পর রাবিসের দ্বারা কতদিন একটা জাতির চিত্ত আচ্ছন্ন করে রাখা যায়? দিনে দিনে লোকের চোখ ফুটতে লাগল। প্রেক্ষাগারে শিক্ষিত দর্শকের সংখ্যাবৃদ্ধির

সঙ্গে সঙ্গে এ শ্রেণির পালার চাহিদা কমে এল। বোধ করি নাট্যকারের জনপ্রিয়তা দেখেই শিশিরকুমারও এই দলের একজনের একটি পালা মঞ্চস্থ করেছিলেন। কিন্তু দর্শকরা তখন সচেতন হয়ে উঠেছে। শিশিরকুমারের প্রতিভাও পালাটিকে দীর্ঘায়ু করতে পারেনি।

'বঙ্গে বর্গী' ও 'মোগল-পাঠান' প্রভৃতি নাটকের আসর মাটি হল বটে, কিন্তু নূতন যুগের নূতন নাট্যকারের সাড়া পাওয়া গেল না। অপরেশচন্দ্র, বরদাপ্রসন্ন ও ভূপেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগ দিলেন যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, ওঁরা সকলেই প্রায় সমশ্রেণির নাট্যকার। এই সময়ে একাধিক রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি নাটক উপর-উপরি অভিনীত হয়। 'চিরকুমার সভা', 'শোধবোধ', 'পরিত্রাণ', 'বিসর্জন' ও 'শেষরক্ষা' প্রভৃতি। তার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ', 'ষোড়শী'। গিরিশোত্তর যুগে এই সময়ে প্রথম রঙ্গালয়ে নাটকের মান বেড়ে ওঠে।

শ্রীমন্মথ রায়ও প্রবেশ করলেন নাট্যজগতে। তাঁর ভাষা ও রচনাভঙ্গি প্রশংসনীয় হলেও তাঁর নাটকীয় বিষয়বস্তু ছিল না আধুনিক। ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্তও একাধিকবার নাট্যজগতে দেখা দিয়েও শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকলেন না। কবি শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়ও নাট্যকাররূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। এসেছিলেন আরও কেউ কেউ, কিন্তু আসর বেশিদিন রাখতে পারেননি।

বাংলা নাটকের যখন শোচনীয় দুরবস্থা, সেই কুখ্যাত 'মনোমোহন' আমলেই এখানে নূতন নাট্যকার রচিত নবযুগের উপযোগী প্রথম নাটক অভিনীত হয় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে। ম্যাডানদের রঙ্গালয়ে খোলা হয় স্বর্গীয় সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মুক্তার মুক্তি'। কিন্তু একে শিশিরকুমারকে সদ্য হারিয়ে ম্যাডানদের রঙ্গালয় তখন গৌরবচ্যুত হয়ে পড়েছে, তার উপরে 'বঙ্গে বর্গী' ও 'মোগল-পাঠানে'র কোলাহলে নাট্যজগৎ এমন পরিপূর্ণ হয়েছিল যে, এই চমৎকার পালাটির দিকে লোকের দৃষ্টি ভালো করে আকৃষ্ট হয়নি। মণিলালের মধ্যে সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট, কিন্তু তিনি অকালেই পরলোকগমন করেন।

এখানে আধুনিক যুগোপযোগী দ্বিতীয় নাটক হচ্ছে শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'রক্তকমল'। চিত্রজগতে সুপরিচিত স্বর্গীয় অনাদিনাথ বসু যখন মনোমোহন থিয়েটারের ভার গ্রহণ করেছেন, সেই সময়েই সেখানে এই পালাটি মঞ্চস্থ হয়। নাটকখানি আমার ভালো লেগেছিল এবং নাট্যমার্গ ত্যাগ না করলে শচীন্দ্রনাথ যে এ বিভাগে স্মরণীয় অবদান রেখে যাবেন, এটাও মনে মনে বুঝতে পেরেছিলুম।

শচীন্দ্রনাথ যখন সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকার সম্পাদক এবং আমি তার নিয়মিত লেখক, সেই সময়েই আমরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলুম। কিন্তু সে কেবল মৌখিক পরিচয়। তখন তিনি ছিলেন সাংবাদিক। নাট্যজগৎ যে তাঁর কাছ থেকে কিছু আশা করতে পারে, একথা আমি জানতুম না এবং তিনি নিজেও বোধ হয় জানতেন না।

যতদূর মনে পড়ছে, সুলিখিত ও সুঅভিনীত হলেও এবং প্রশংসা অর্জন করেও 'রক্তকমল' উচিতমতো অর্থ অর্জন করতে পারেনি। তখনকার দিনে নাটক আকারে মস্ত এবং ওজনে গুরুভার না হলে জনসাধারণের চিত্তরোচক হত না। সামাজিক নাটকের একেলে ভঙ্গিও

বোধ করি দর্শকদের ভালো লাগত না। এই কারণে শচীন্দ্রনাথের আরও কোনও কোনও উৎকৃষ্ট রচনা লোকপ্রিয় হয়নি। যেমন 'ঝড়ের রাতে' ও 'জননী'। বাঙালি দর্শকদের এই অদ্ভুত মনের ভাব আজও পরিবর্তিত হয়নি। এই সেদিনেও 'শ্রীরঙ্গমে' অভিনীত পরম উপাদেয় সামাজিক নাটক 'পরিচয়' রসিকজনদের খুশি করেও সাধারণ দর্শকদের অভিনন্দন পায়নি। আমাদের জনসাধারণের মন বুড়িয়ে পড়েছে। তারা আজও চলতে চায় সেকেলে বাঁধা রাস্তা ধরে, নতুন পথে পা বাড়াতে ভরসা করে না।

কিছুদিন পরে মনোমোহন থিয়েটারের পরিচালক ও মালিক হলেন বন্ধুবর শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহ। প্রথমেই খুললেন শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাহাঙ্গীর' এবং তারপর শ্রীমন্মথ রায়ের 'মহুয়া'। আমাকেও গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলেন তাঁর রঙ্গালয়ে নৃত্য পরিকল্পনার জন্যে। শচীন্দ্রনাথও সেখানে নিয়মিতভাবে আনাগোনা করতেন এবং অল্পকালের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে উঠল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

তারপর সেখানে শচীন্দ্রনাথের 'গৈরিক পতাকা' খোলবার আয়োজন হয়। প্রথমে আমার মনে সন্দেহ জেগেছিল, গিরিশচন্দ্রের 'ছত্রপতি'র পর শিবাজীকে অবলম্বন করে রচিত আর কোনও নাটক দর্শকরা গ্রহণ করবে কি না? কিন্তু পাণ্ডুলিপি পাঠ করে সে সন্দেহ দূর হল। যদিও নাটকখানি পুরাতন আদর্শেই রচিত, তবু তার আখ্যানে নূতনত্ব ও চরিত্রচিত্রণে নিপুণতা ও ভাষায় বিষয়োপযোগী দৃঢ়তা এবং গাম্ভীর্যের পরিচয় পেলুম যথেষ্ট।

পালাটি মঞ্চস্থ করবার জন্যে প্রবোধবাবু প্রচুর পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও আয়োজন করেছিলেন। গান রচনা ও নৃত্য পরিকল্পনার ভার পড়েছিল আমার উপর (এবং কোনও কোনও গানে সুরও দিয়েছিলুম আমি)। তারপর থেকে 'নাট্য-নিকেতনে' অভিনীত শচীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকেই আমাকে ওই দুটি কর্তব্য পালন করতে হয়েছে। যেন একটা বাঁধা-ধরা নিয়ম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে, শচীন্দ্রনাথের লেখনী নূতন নাটক প্রসব করলেই গান লিখতে ও নাচ দিতে হবে আমাকেই।

তোড়জোড় দেখেই অনুমান করতে পেরেছিলুম, 'গৈরিক পতাকা' মন্দ চলবে না। তবে খুব একটা বড়ো কিছুর আশা করিনি। কিন্তু পালাটি খোলার সঙ্গে সঙ্গেই যে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করলে, সেটা আমরা কেহই কল্পনাতেও আনতে পারিনি। ওই বাড়িতেই 'সীতা' খোলা হয় এবং তার অসামান্য লোকপ্রিয়তার কথা কারুর কাছেই অবিদিত নেই। কিন্তু 'গৈরিক পতাকা' দেখবার জন্যে প্রথম কয়েক রাত্রে প্রেক্ষাগৃহে যে মহতী জনতা সমাগত হয়েছিল তার নিবিড়তা ছিল 'সীতা'র চেয়েও বেশি। বিডন স্ট্রিট দিয়ে খানিকক্ষণের জন্যে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যেত এবং ভিড় সামলাবার জন্যে পুলিশবাহিনী মোতায়েন রাখতে হত। জনতাকে নিয়মিত করবার জন্যে রঙ্গালয়ের অঙ্গনেও বাঁশের বেড়া বাঁধতে হয়েছিল।

'গৈরিক পতাকা' শচীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা নয়। তিনি তার চেয়ে ভালো একাধিক নাটক রচনা করেছেন। তার গঠন ও আবেদনও অল্পবিস্তর মামুলি। হয়তো সেইটেই তার কাজে

লেগে গিয়েছে। আগেই ইঙ্গিতে বলেছি, এদেশি দর্শকদের মন আজও অতিআধুনিক বাস্তব নাটকের জন্যে প্রস্তুত হয়ে ওঠেনি। নবযুগেও এখানে যেসব নাটক (কর্ণার্জুন, সীতা, আত্মদর্শন, দিগ্বিজয়ী ও গৈরিক পতাকা) সবচেয়ে লোকপ্রিয় হয়েছে, তার কোনওখানিরই রচনা পদ্ধতি আধুনিক নয়। 'কিন্নরী'র মতো নিম্নশ্রেণির নাটকেরও পুনরাভিনয় দেখবার জন্যে আজও বাংলা রঙ্গালয়ে ভিড় ভেঙে পড়ে।

প্রায় পঁচিশ বৎসর আগে খোলা হয়েছিল 'গৈরিক পতাকা', কিন্তু আজও লোকে তাকে দেখতে চায়। অভিনয়ের দিক দিয়ে, নাচ-গানের দিক দিয়ে এবং সাজপোশাক ও দৃশ্যপটাদির দিক দিয়ে 'গৈরিক পতাকা' তার পূর্বগৌরব হারিয়ে ফেলেছে, তবু এখনও বিভিন্ন রঙ্গালয়ে তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি চলে।

নাট্য-সমালোচকরা যখন তখন দাবি করেন—নূতন যুগের জন্যে চাই নূতন আদর্শের নাটক। কিন্তু তাঁদের সে দাবি মিটবে কেমন করে? দাবিদারদের কথামতো কাজ করতে গেলে রঙ্গালয়ের পর রঙ্গালয়ে নিবে যাবে সাঁঝের বাতি যেমন নিবে গিয়েছিল 'নাট্য-মন্দিরে', রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' খুলে।

শচীন্দ্রনাথ নূতন যুগের উপযোগী নূতন আদর্শের নাটক রচনা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ঝড়ের রাতে'র নাম করতে পারি। পরিকল্পনা, সংলাপের ভাষা, ভাববৈচিত্র্য, চরিত্রচিত্রণ ও আখ্যানবস্তু প্রভৃতি সব দিকেই নাট্যকারের বিশেষ মুনশিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও সম্পূর্ণ আধুনিক। শ্রীসতু সেন দৃশ্য পরিকল্পনাতেও প্রভূত আধুনিকতা প্রকাশ করেছিলেন এবং স্বর্গীয় রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী ও নীহারবালা প্রভৃতির অভিনয়ও হয়েছিল অনবদ্য। তবু নাটকখানি বেশিদিন চলেনি। তাঁর 'জননী' সম্বন্ধেও ওই কথা। আরও দুই-তিন খানি নাটকেও শক্তির পরিচয় দিয়েও দর্শকদের হৃদয় হরণ করতে না পেরে, অবশেষে তিনি পুরাতন পদ্ধতিতেই রচনা করলেন 'সিরাজদ্দৌলা' এবং সঙ্গে সঙ্গে সার্থক হল তাঁর পরিশ্রম। নাবালক সিরাজের ভূমিকায় বৃদ্ধ নির্মলেন্দু, তাও লোকের চোখে বিসদৃশ ঠেকল না, রাত্রির পর রাত্রি প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল বিপুল জনতায়। 'গৈরিক পতাকা'র মতো 'সিরাজদ্দৌলা'রও পুনরাভিনয়ের আয়োজন হয় বিভিন্ন রঙ্গালয়ে। শচীন্দ্রনাথের সমগ্র নাটকাবলির মধ্যে এই দুটি পালাই যেন প্রধান হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাঁর যেসব নাটক উচ্চতর শ্রেণির, তা প্রায় অবজ্ঞাত বা উপেক্ষিত হয়ে আছে। বাঙালি নাট্যকারদের কপাল এমনই পাথরচাপা।

শচীন্দ্রনাথ কেবল বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও নব যুগধর্মের পুরোধা নন বর্তমান কালের প্রধান নাট্যকার বলে পরিচিত করতে গেলে তাঁর ছাড়া আর কারুর নাম মনে ওঠে না।

শিবদাস ভাদুড়ী

বাংলায় sport বলতে বুঝায় খেলা বা ক্রীড়া-কৌতুক। এখানে জ্ঞানীরা ও-ব্যাপারটাকে মোটেই আমল দেন না বা দিতেন না এবং জাতীয় জীবনে তার বিশেষ প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করতেন না। কিন্তু ইউরোপীয়দের, বিশেষ করে ইংরেজদের কথা স্বতন্ত্র। পুরুষোচিত দেহগঠনের তথা জাতিগঠনের উপযোগী ক্রীড়া-কৌতুকের অসামান্য সাফল্য তারা প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণিত করেছে। ইংরেজরা বলে, আমরা ওয়াটার্লুর যুদ্ধে জিতেছি ইংল্যান্ডের ক্রীড়াক্ষেত্রেই। তারা জানে, পঙ্গু দেহে সক্রিয় মস্তিষ্কের চেয়ে সক্ষম দেহে সবল মস্তিষ্কের কার্যকারিতা হচ্ছে বেশি। তারা বড়ো বড়ো পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও শিল্পীর সঙ্গে ডন ব্র্যাডম্যান প্রমুখ খেলোয়াড়দেরও স্যার উপাধিতে ভূষিত করতে ইতস্তত করে না।

ক্রীড়াক্ষেত্রে মোহনবাগানের অবদান ভারতবর্ষে অমর হয়ে থাকবে। শিবদাস ছিলেন সেই মোহনবাগানের অতুলনীয় মুকুটমণি। প্রায় চল্লিশ বছর আগে মোহনবাগান ফুটবল খেলার মাঠে বিখ্যাত একটি ইংরেজ খেলোয়াড়ের দলকে পর্যুদস্ত করে যখন শিল্ড লাভ করেছিল, তখন সারা দেশে যে বিস্ময়, আনন্দ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, এ যুগের বালক ও যুবকদের কথা ছেড়ে দিই, প্রৌঢ়রাও তা উপলব্ধি করতে পারবেন না। ও ঘটনাটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় পলাশীর যুদ্ধের প্রতিশোধের মতো। কলকাতার পথে পথে সেদিন যেসব স্মরণীয় দৃশ্য দেখেছি, তা দেখতে পাইনি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা দিবসেও।

অতিবৃদ্ধ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দেহ তাঁর রোগে পঙ্গু। তিনি কারবার করেন সাহিত্য ও শিল্প নিয়ে, খেলার মাঠে কোনোদিন পদার্পণ করেছেন বলে শুনিনি। এই অভাবিত সংবাদ শুনে উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলে উঠলেন, 'বাঃ! আমাদের আজ বড়ো আনন্দের দিন! বাংলা দেশের ছেলেদের উপর কিছু ভরসা হচ্ছে! এও যে দেখব তা ভাবিনি। ...মনে করে দ্যাখো দেখি, যে লাল মুখ দেখলে আমরা ভয়ে আঁতকে উঠি, বরাবর মনে করে থাকি আমরা চেষ্টা করলে তাদের চেয়ে intellectually বড়ো হলেও হতে পারি, কিন্তু বাহুবলে তাদের কাছে কস্মিন কালে এগুতে পারব না—শিখ গোরখা কেবল তাদের কাছে যেতে পারে—সেই জাতের মিলিটারি দলকে খেলায় পরাজিত করা কম কাজ নাকি? একটা ভয়—

একটা সঙ্কোচ—যেটা শুধু মনগড়া ছায়া—সেটা দূর হয়েছে। এখন আমরা মনে করতে পারি যে বাহুবলে আমরা তাদের সামনে এগিয়ে যেতে পারি—প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে চেষ্টা করে তাদের পরাজিত করতে পারি। বাঃ, খুব বাহাদুর! বাংলা দেশকে এই খেলায় জিতে দশ বছর এগিয়ে দিয়েছে।'

সেই বিখ্যাত খেলায় নেমেছিলেন মোহনবাগানের এগারো জন খেলোয়াড় এবং প্রত্যেকেরই ক্রীড়ানৈপুণ্য হয়েছিল চমৎকার। কিন্তু তাঁদের ভিতরে শিবদাস বিরাজ করেছিলেন মধ্যমণির মতো। মোহনবাগানকে বিজয়গৌরবে গরীয়ান করেছিল শিবদাসের প্রতিভাই।

আমি তখন গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের ছাত্র। মার্কাস স্কোয়্যারে গিয়ে প্রতিদিন ক্রিকেট-ফুটবল-হকি খেলারও চর্চা করি কিছু কিছু। আমার তখনকার সমসাময়িক খেলোয়াড়দের মধ্যে ডোঙাবাবু, হাবুলবাবু ও স্বর্গীয় ভূতি সুকুল পরে মোহনবাগানের দলে যোগ দিয়েও যশস্বী হয়েছিলেন (শেষোক্ত দুই জন তো শিল্ড-বিজয়ী দলের মধ্যেও ছিলেন)। আর্ট স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার আগে প্রত্যহই গড়ের মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলা দেখে আসতুম। সেই সময়ে আমার চোখের সামনেই মোহনবাগান প্রথম ট্রেডস কাপ লাভ করে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। তখনকার দিনে ওই প্রতিযোগিতার গৌরব ছিল আজকের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু মোহনবাগান উপর উপরি তিন-তিন বার ট্রেডস কাপ জিতে চ্যাম্পিয়ান আখ্যা লাভ করে। তখন তার প্রধান প্রতিযোগী ছিল মিলিটারি মেডিক্যাল ও ন্যাশন্যাল স্পোর্টিং-এর দল। প্রথমোক্ত দলটিতে খেলত অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা এবং তাদের উইলিয়মস নামে এক দীর্ঘদেহ যুবকের নিপুণ খেলা এখনও আমার মনে আছে। শেষোক্ত দলটির সব খেলোয়াড়ই ছিলেন বাঙালি এবং তাদের গোলরক্ষক বাঁকাবাবু তখন খুব নামজাদা। ন্যাশন্যাল-এর আর-এক খেলোয়াড় ছিলেন ক্ষেত্রবাবু। ছোটোখাটো বেঁটে মানুষটি, কিন্তু তাঁর অগ্রগতি রোধ করা ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। স্মরণ আছে, এক বৎসর ন্যাশন্যাল-এর বিরুদ্ধে উপর উপরি তিন দিন খেলে মোহনবাগান জয়ী হতে পেরেছিল।

কেবল তিন বার ট্রেডস কাপ জয় করার জন্যে নয়, আর-এক বিশেষ কারণে মোহনবাগানের নাম ফিরতে লাগল লোকের মুখে মুখে। ইংল্যান্ডের অসামরিক দলের মধ্যে তখন সমধিক প্রতাপ ছিল ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের। তাকে যে নিম্নতর শ্রেণিভুক্ত কোনো দেশীয় দল হারিয়ে দিতে পারে, এটা ছিল একেবারেই

কল্পনার অতীত। কিন্তু মোহনবাগান সেই অসাধ্য সাধনই করলে। মিন্টোফেট-এর এক প্রতিযোগিতায় তার কাছে হেরে গেল ক্যালকাটার দল। কিন্তু মোহনবাগানের দলে একজন বাইরের খেলোয়াড় আছে, এই অজুহাতে কর্তৃপক্ষ সে খেলাটি নাকচ করে দেন।

মোহনবাগানের এইসব বিজয়-যাত্রার অধিনায়ক রূপে অতুলনীয় খ্যাতি অর্জন করলেন শিবদাস ভাদুড়ী।

সাধারণত তিনি লেফট লাইনে খেলতেন। একহারা ছিপছিপে দেহ, বিপুলবপু ইংরেজ প্রতিযোগীদের পাশে কী নগণ্যই দেখাত! কিন্তু বলের উপরে যেমন তাঁর অসামান্য দখল ছিল, তেমনি তাঁর গতিও ছিল অত্যন্ত দ্রুত। প্রতিযোগীদের অনায়াসেই এড়িয়ে একেবারে কর্নারের কাছে গিয়ে তিনি সেন্টার করতেন, নয় বলটিকে এক পদাঘাতে প্রেরণ করতেন গোলপোস্টের দিকে। লাইন থেকে তাঁর মতো আর কোনো খেলোয়াড়কে আজ পর্যন্ত এত বেশি গোল দিতে দেখিনি— অধিকাংশ খেলাতে গোল দেবার কৃতিত্ব অর্জন করতেন তিনিই। হয় নিজে গোল দিয়েছেন, নয় সুগম করে দিয়েছেন গোল দেবার পথ। তাঁর আর-একটি অদ্ভুত অভ্যাস ছিল। বেগে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গিয়ে গোলের দিকে বল মেরেই তিনি প্রায়ই হতেন ভূতলশায়ী। হয়তো অতিরিক্ত দ্রুতগতির টাল তিনি সামলাতে পারতেন না।

আর-একটি ব্যাপার লক্ষ করেছি। লেফট ইনে অর্থাৎ ঠিক পাশেই তাঁর দাদা বিজয়দাস ভাদুড়ী না থাকলে শিবদাসের খেলা তেমন খুলত না। দাদার সঙ্গে তাঁর ঠিক মনের মিল ছিল বলেই তাঁরা দুজনেই বুঝতেন দুজনের খেলার ধরন ও কৌশল। সামনে বাধা পেলেই দুই ভাই এমন কায়দায় পরস্পরের সঙ্গে বল বিনিময় করতেন যে, প্রতিপক্ষেরা দেখত দুই চক্ষে অন্ধকার। বিজয়দাসও একজন সুচতুর ভালো খেলোয়াড় ছিলেন।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দের শিল্ড ফাইন্যাল-এর ছবি আজও চোখের সামনে ভাসছে। কিন্তু কী অবিশ্বাস্য কষ্ট স্বীকার করেই যে সে খেলা দেখতে হয়েছে! জানতুম মোহনবাগানের নামেই মাঠে জনতার সৃষ্টি হয় এবং শিল্ডের চরম খেলায় সেই জনতা যে বহুগুণ বেড়ে উঠবে, এটাও আমার অজানা ছিল না। বেশ সকাল সকালই মাঠে গিয়ে হাজির হলুম। কিন্তু দেখলুম এক কল্পনাতীত, অসম্ভব দৃশ্য! সমস্ত গড়ের মাঠটা পরিণত হয়েছে জনতা সাগরে, তেমন বিপুল জনতা জীবনে আর কখনো চোখে দেখিনি। খেলার মাঠের দিকেও অগ্রসর হবার কোনো

উপায়ই নেই। তখন তো গ্যালারি ছিল না, লোকে খেলা দেখত ভাড়া দিয়ে ছয় ফুট থেকে বারো-চোদ্দ ফুট উঁচু মাচানের উপরে চড়ে। নিতান্ত পলকা, বিপজ্জনক মাচান, প্রায়ই মানুষের ভার সইতে না পেরে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ত—কারুর মাথা ফাটত, কারুর হাত-পা ভাঙত। কিন্তু সে-সব মাচানেও আর তিলধারণের ঠাঁই নেই, দ্বিগুণ ভাড়ার লোভ দেখিয়েও একটুখানি পা রাখবার জায়গা সংগ্রহ করতে পারলুম না।

ইডেন গার্ডেনে ফিরে গিয়ে ম্লানমুখে জনকোলাহল শ্রবণ করছি, এমন সময়ে এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা, তিনি ওই বাগানের রক্ষক। আমার দুঃখের কথা শুনে তিনি তখনই একখানা লম্বা মই আনিয়ে বললেন, 'দক্ষিণ দিকের একটা দেবদারু গাছে চড়ে খেলা দেখুন।' অন্য কোনো উপায় না দেখে তাই করতে হল।

প্রায় আড়াই তলা উঁচু একটা ডালের উপরে বসে সানন্দে দেখলুম, জনতার ফ্রেমে বাঁধানো গোটা খেলার মাঠটি চোখের সামনে পড়ে রয়েছে। বাইরের মাঠও মানুষের মাথায় মাথায় কালো হয়ে উঠেছে, কিন্তু তখনও জনতার পর জনতার স্রোত। দেখতে দেখতে দুই পক্ষের খেলোয়াড়দের আবির্ভাব, রেফারির বংশিধ্বনি এবং খেলা হল শুরু।

মোহনবাগানের প্রতিযোগী ইস্ট ইয়র্কের দল ঠিক বিজেতার মতোই প্রবল বিক্রমে খেলতে লাগল, বাঙালিরাও বাধা দিতে লাগল প্রাণপণে। বল একবার ছুটে যায় ওদিকে, আবার ছুটে আসে এদিকে। অবশেষে মোহনবাগানের গোল থেকে বেশ খানিকটা দূরে ইস্ট ইয়র্ক পেলে একটি ফ্রি কিক। কিন্তু কী দুর্বিপাক! গোলরক্ষক হীরালালকে এড়িয়ে বল সাঁৎ করে ঢুকে গেল মোহনবাগানের গোলপোস্টের ভিতরে! বাঙালি দর্শকরা বজ্রাহত! ইংরেজরা প্রচণ্ড আনন্দে উন্মত্ত—চিৎকার করতে করতে কেউ লাফায়, কেউ শূন্যে টুপি ছোড়ে, কেউ পায়রা উড়িয়ে দেয়। কালা আদমির কাছে পরাজয়! কবি হেমচন্দ্রের ভাষায়—'নেভার, নেভার!'

কিন্তু তারপরেই পাওয়া গেল শিবদাসের অপূর্ব প্রতিভার আশ্চর্য পরিচয়! তিনি যেন মরিয়া, তিনি যেন একাই একশো! তাঁর স্থান যে লেফট লাইনে এ কথা আর তাঁর মনে রইল না—কখনো তিনি মাঠের ডান দিকে, কখনো মাঝখানে, কখনো পুরোভাগে, কখনো এদিকে, কখনো ওদিকে, কখনো সেদিকে

এবং বলও ছুটছে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। সর্বত্রই শিবদাস! সে যেন ইস্ট ইয়র্ক বনাম শিবদাসের খেলা! আচম্বিতে শিবদাসের পদ ত্যাগ করে একটি বল উল্কাবেগে ছুটে গেল ইস্ট ইয়র্কের গোলের দিকে এবং তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ গোলকিপার ক্রেসি তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারলেন না।

গোল! গো-ও-ল! গো-ও-ল! বিশাল জনসাগরের সেই গগনভেদী কোলাহল গঙ্গার ওপার থেকেও শোনা গিয়েছিল! আমার পাশের গাছের একটা উঁচু লম্বা ডালে মাথার উপরকার আর একটা ডাল ধরে শাখামৃগের মতো সারি সারি বসে ছিল দশ-বারো জন লোক। উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত হয়ে উপরকার ডাল ছেড়ে তারা দুই হাতে তালি দিতে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝুপ ঝুপ করে মাটির উপরে গিয়ে অবতীর্ণ হল সশব্দে। তাদের আর্তনাদ শুনতে শুনতে সভয়ে আমি কোঁচা খুলে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে নিজের দেহকে বেঁধে ফেললুম। কী জানি বাবা, বলা তো যায় না, আমারও যদি দৈবাৎ হাততালি দেবার শখ হয়!

মায়াবী শিবদাসের ইন্দ্রজাল তখনও শ্রান্ত হয়নি, তখনও তিনি বল নিয়ে দুর্বার গতিতে ছুটোছুটি করছেন এখানে-ওখানে যেখানে-সেখানে। রীতিমতো মস্তিষ্ক চালনার সঙ্গে সঙ্গে পদচালনা না করলে সেরকম খেলা কেউ খেলতে পারে না। প্রতিপক্ষের দশাসই চেহারাগুলো কিছুতেই তাঁর ক্ষিপ্রগামী ছিপছিপে দেহের নাগাল ধরতে পারছে না—যেন তিনি আলেয়া। আবার তিনি হলেন গোলের নিকটবর্তী। একজন প্রতিযোগী বাঘের মতো তাঁর সামনে এসে পড়ল, কিন্তু তিনি টুক করে বলটি তুলে দিলেন নিজেদের সেন্টার ফরোয়ার্ড অভিলাষের পায়ের উপরে এবং অভিলাষও কিছুমাত্র ভুল করলেন না।

আবার ইংরেজদের কানে ভয়াবহ সেই হাজার হাজার কণ্ঠের আকাশ ফাটানো জয়ধ্বনি ও করতালি! নর্তন ও কুর্দন! সাহেবদের আসনে সমাধির স্তব্ধতা।

বাজল খেলাশেষের বাঁশি। বাঙালির প্রথম শিল্ড অধিকার। পুরুষোচিত ক্রীড়াক্ষেত্রে কালোর কাছে গোরার প্রথম পরাজয়। তার পরের দৃশ্য বর্ণনাতীত। বাড়ি ফিরেছিলুম সারা শহর মাড়িয়ে, অনেক রাতে।

খেলার মাঠে সেদিন শিবদাসের যে-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলুম তার তুলনা পাইনি অদ্যাবধি। অবশ্য তার পরে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার ও আলাপ করবার সুযোগ পেয়েছিলুম বটে, কিন্তু ক্রীড়কের বিশেষত্ব ক্রীড়ানৈপুণ্যে, তাই তার মুখের ভাষা লিপিবদ্ধ না করলেও ক্ষতি নেই।

মরণ-বিজয়ীর দল

রবীন্দ্রনাথের মুখে তোমরা বন্দিবীর বান্দার অপূর্ব কাহিনি শ্রবণ করেছ। চিত্তোত্তেজকে গল্পের দিক দিয়ে ধরলে, ও গাথাটির তুলনা নেই।

কিন্তু এখানে সাধারণ পাঠকের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। কারণ আমরা বলব ইতিহাসের কথা এবং রবীন্দ্রনাথের ওই কবিতাটি পাঠ করলে ঐতিহাসিকেরা খুব বেশি বোধ করি অভিভূত হবেন না।

বান্দা যে জাতির জন্যে, ধর্মের জন্যে প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছিলেন, সে কথা কেহই অস্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে মুসলমান নরনারী—এমনকি অজাত শিশুর উপরে তিনি যেসব অকথ্য, অমানুষিক ও পৈশাচিক অত্যাচার করেছিলেন, ইতিহাসে তা স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে। অধিকন্তু বান্দার অনুচরদের কবল থেকে বহু হিন্দুও মুক্তিলাভ করতে পারেননি। এই সব কথা মনে করলে বান্দার প্রতি আমাদের সহানুভূতি যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বলতে ইচ্ছা হয় যে, বান্দা একজন সাধারণ অপরাধী ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে, বান্দা কেমন করে স্বহস্তে নিজের পুত্রকে বধ করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাস বলে, বান্দা স্বহস্তে পুত্রহত্যা করেননি। ব্যাপারটা হয়েছিল আরও মর্মন্তুদ, আরও ভয়ানক।

বধ্যভূমিতে (দিল্লির কুতুব মিনারের সামনে) বন্দি বান্দার কোলে তাঁর তিন বছরের ছেলেকে তুলে নিয়ে বলা হল, 'একে হত্যা করো।'

বান্দা হুকুম গ্রাহ্য করলেন না। এমন হুকুম তামিল করতে পারে না কোনো পিতাই।

ঘাতক তখন এক সুদীর্ঘ ছুরিকার আঘাতে শিশুকে হত্যা করলে এবং তার উদরের ভিতর থেকে যকৃত টেনে বের করে বান্দার মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে দিলে।

তারপর বিষম যন্ত্রণা দিয়ে একে একে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে নিয়ে বান্দাকেও হত্যা করা হল।

কয়েক বৎসর ধরে পাঞ্জাবের দিকে দিকে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে রাজশক্তির

বিরুদ্ধে যুদ্ধের পর যুদ্ধ করে বান্দা শেষটা সদলবলে বন্দি হলেন গুরুদাসপুর গড়ে (১৭১৫ খ্রিঃ)। দীর্ঘ ছয় বৎসর ধরে যে বিদ্রোহী মোগল সম্রাটের বিপুল জনবল ও অর্থবল ব্যর্থ করে এসেছিলেন, তাঁর ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে পাওয়া গেল মাত্র ১,০০০ তরবারি, ২৭৮ ঢাল, ১৭৩ ধনুক, ১৮০ বন্দুক, ১১৪ ছোরা, ২১৭ লম্বা ছুরি, খানকয় সোনার গহনা, ২৩টি মোহর ও কিছু বেশি ৬০০ টাকা। গুরুদাসপুর গড়ও মোগলরা গায়ের জোরে কেড়ে নিতে পারেনি, কেবল নির্জল উপবাসের যন্ত্রণা সইতে না পেরেই শিখেরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, দুর্গের মধ্যে অবরুদ্ধ শিখদের দুর্দশা এমন চরমে উঠেছিল যে, অনেকে নাকি অন্য খাদ্যের অভাবে আপন আপন উরু থেকে মাংস কেটে নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে তারই সাহায্যে করেছিল উদর-পূর্তি।

গুরুদাসপুর গড়ের পতনের পর যে নাটকীয় দৃশ্যের অভিনয় হয় এবং শিখদের যে অলৌকিক বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তা নিয়ে একাধিক বিচিত্র কাব্য রচনা করা যেতে পারে। কিন্তু আমি এখানে কবিতা কিংবা অত্যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করব না। সাধাসিধে ভাষায় সোজাসুজি মূল ঘটনাগুলি বর্ণনা করে যাব। দেখবেন, তার ভিতরেই অসাধারণ রূপ ফুটে উঠে হৃদয়কে অভিভূত করে দেবে।

অগুনতি শিখকে হত্যা করা হল। সাত শত চল্লিশ জন শিখ হল বন্দি। দিল্লির রাজ-দরবার থেকে হুকুম এল—ছত্রপতি শিবাজির পুত্র রাজা শম্ভুজিকে বন্দি করে যেভাবে রাজধানীতে নিয়ে আসা হয়েছিল, বান্দা ও তাঁর অনুচরদেরও সেইভাবে দিল্লিতে নিয়ে আসতে হবে।

নির্দিষ্ট দিনে দিল্লি দুর্গের লাহোরি ফটক থেকে আমেদাবাদ পর্যন্ত কয়েক মাইল-ব্যাপী পথের দুই ধার জুড়ে দাঁড়াল অস্ত্রধারী সৈনিকরা এবং পথের উপর ভেঙে পড়ল বিপুল জনতা-সাগরের তরঙ্গের পর তরঙ্গ।

প্রথমেই দেখা গেল, হাতির উপরে লোহার খাঁচা এবং তার ভিতরে বন্দি বান্দা। অঙ্গে তাঁর স্বর্ণখচিত সমুজ্জ্বল ও বহুমূল্য পোশাক। পিছনে দাঁড়িয়ে লৌহবর্মধারী মোগল সেনানী, হাতে তার নগ্ন তরবারি। বান্দার হাতির সুমুখে দেখা যাচ্ছে শত শত বংশদণ্ডের উপরে নিহত শিখ যোদ্ধাদের ছিন্ন মুণ্ড, তাদের লম্বা চুলগুলো মুখের উপরে পড়ে দুলছে ঝালরের মতো।

বান্দার হাতির পিছনে পিছনে আসছে দলে দলে উট। প্রত্যেক উটের উপরে

বসে আছে দুজন করে শিখ বন্দি। তাদের পরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিসদৃশ পোশাক, অনেককে দেখতে হয়েছে পশুর মতো।

জনতার মধ্যে জাগল ঘন ঘন জয়ধ্বনি। বন্দিদের লক্ষ্য করে অনেকে টিটকারি দিতে লাগল। কিন্তু বন্দিরা তা শুনে বিচলিত হল না। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও তারা কেউ ভীত ভাব প্রকাশ করলে না, বরং অনেকের মুখ দেখলে মনে হয় যেন তারা সানন্দে চলেছে কোনো উৎসব সভার দিকে।

কেউ ঠাট্টা করলে তারা নির্ভয়ে পাল্টা জবাব দিতেও ছাড়লে না। কেউ তাদের 'খুন করব' বলে ভয় দেখালে তারা বলে, 'মারো, আমাদের মেরে ফ্যালো—মৃত্যুকে আমরা ভয় করব কেন? কেবল ক্ষুধাতৃষ্ণা সইতে না পেরেই আমরা তোমাদের হাতে ধরা দিয়েছি। আমাদের সাহস আর বীরত্ব কি তোমরা জানো না?'

স্থির হল, প্রতিদিন একশো জন করে বন্দিকে বধ করা হবে।

বধ্যভূমিতে দর্শকদের দলে উপস্থিত ছিলেন কয়েকজন ইউরোপীয় ভদ্রলোকও। সকলেই বলেন, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও শিখ বন্দিরা যে ধীরতা, দৃঢ়তা ও বীরত্বের পরিচয় দিলে, তা বিস্ময়কর!

বন্দিদের বলা হল, 'জীবন ভিক্ষা চাও তো মুসলমান হও।'

প্রত্যেক বন্দি এককণ্ঠে বললে, 'মুণ্ড দেব, ধর্ম দেব না।'

তাদের কারুর এতটুকু মৃত্যুভয় নেই, ঘাতককে ডাকতে লাগল 'মুক্তিদাতা' বলে। সকলে মহা আনন্দে ঘাতকের সামনে ছুটে গিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'মুক্তিদাতা, আগে আমাকে হত্যা করো!'

সাড়ে সাত শত শিখ বন্দি। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে তরবারি শূন্যে ওঠে চকমকিয়ে এবং পরমুহূর্তে নীচে নেমে উড়িয়ে দেয় এক এক বীরের মুণ্ড। কাটতে কাটতে তরবারি ভোঁতা হয়ে যায়, আবার তাকে শানিয়ে নিতে হয়। সাত শত চল্লিশ জন বন্দির ভিতর থেকে একজন মাত্র মৃত্যুভীত কাপুরুষকে পাওয়া গেল না। সাত শত চল্লিশ মহাবীর একে একে মুণ্ড দিলে, ধর্ম দিলে না। সাত শত চল্লিশ মহাবীরের রক্ত শোষণ করে বধ্যভূমি হয়ে উঠল বীরভূমি।

বান্দা তো দলের নেতা, সব দিক বুঝে প্রস্তুত হয়েই তিনি ধারণ করেছিলেন বিদ্রোহের পতাকা। কিন্তু এই সাত শত চল্লিশ জন শিখ, এদের অধিকাংশই-সাধারণ লোক—অনেকেই হয়তো নিরক্ষর ও চাষাভুষো শ্রেণির। তবু এদের

কেউ ধর্মের বিনিময়ে জীবন ভিক্ষা করলে না। বান্দার মৃত্যুর চেয়েও এদের আত্মদান অধিকতর গৌরবময়।

প্রতিদিন উচ্চ হয়ে ওঠে মৃতদেহের স্তূপ। মৃত্যুর পরেও বীরদেহগুলির উপরে কিছুমাত্র সম্মান প্রকাশ করা হল না। গাড়িতে করে দেহের স্তূপ নগরের বাইরে চালান করা হল। তারপর প্রত্যেক দেহকে ঝুলিয়ে দেওয়া হল গাছের ডালে।

কিন্তু এর চেয়েও স্মরণীয় ঘটনা আছে। আমরা মরণের ভয়ের কথাই জানি, মরণের আনন্দের কথা বড়ো একটা শোনা যায় না। আজীবন প্রাণ বাঁচাতে বাঁচাতেই আমাদের প্রাণান্ত হয়, জীবনকে ঘৃণা করবার ও মরণকে ভালোবাসবার আশ্চর্য সুযোগ হয় কয়জনের?

কুতব-উল-মুল্ক ছিলেন তখন ভারত সম্রাটের উজির। তিনি হচ্ছেন সেই ইতিহাস বিখ্যাত সৈয়দ ভ্রাতৃযুগলের অন্যতম—যাঁদের প্রভাবে বা কৃপা কটাক্ষে ময়ূর-সিংহাসনের উপর বসেছেন সম্রাটের পর সম্রাট। কুতব-উল-মুল্কের হিন্দু দেওয়ানের নাম রতনচাঁদ। তিনি উজিরের বিশেষ প্রিয়পাত্র।

এক নারী রতনচাঁদের কাছে গিয়ে ধর্না দিয়ে পড়ল।

নারী বললে, 'হুজুর, আমি অসহায়া বিধবা। আমাকে দয়া করুন।'

রতনচাঁদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তুমি?'

—'আমি এক বালক শিখ-বন্দির মা।'

—'আমার কাছে এসেছ কেন?'

—'আমার বালক পুত্রের উপর প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়েছে। ওই ছেলেটি ছাড়া এই দুনিয়ায় আমাকে আর দেখবার লোক কেউ নেই। সে মারা পড়লে আমার কী গতি হবে হুজুর!'

—'তোমার ছেলেকে বাঁচাবার ক্ষমতা আমার নেই। সে বালক হতে পারে, কিন্তু রাজবিদ্রোহী।'

—'হুজুর, আমার ছেলে রাজবিদ্রোহী নয়। এমনকি সে গুরু বান্দার শিষ্যও নয়। তার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা। তাকে ভুল করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হুজুর, তাকে রক্ষা করে এই অনাথাকে রক্ষা করুন!'

অবশেষে মায়ের সেই করুণ ক্রন্দন আর সহ্য করতে না পেরে দেওয়ান রতন চাঁদ তার আরজি নিয়ে গেলেন উজিরের কাছে। প্রিয়পাত্রের অনুরোধ এড়াতে না পেরে কুতব-উল-মুল্ক সেই বিধবা নারীর বালক-পুত্রকে জীবন ভিক্ষা দিলেন।

বেচারা মা আনন্দের অশ্রুজল ফেলতে ফেলতে উজিরের আদেশ পত্র নিয়ে ছুটল কোতোয়ালের কাছে।

বন্দিকে কারাগারের বাইরে এনে কোতোয়াল বললে, 'তুমি মুক্ত।'

বালক সবিস্ময়ে বললে, 'আমি মুক্ত? না না, এ অসম্ভব!'

তার মা কাছে এগিয়ে এসে বললে, 'হ্যাঁ বাছা, তুমি মুক্ত। তুমি তো বিদ্রোহী গুরুর শিষ্য নও, তাই আমার কথা শুনে উজিরমশাই তোমায় ছেড়ে দিয়েছেন!'

ভয়াবহ মৃত্যুকে পিছনে রেখে সামনে এসে দাঁড়াল নবযৌবনের উদ্দাম জীবন। নূতন আশায় উচ্ছ্বসিত জননীর স্নেহহাসিমাখা মুখ। কিন্তু সেদিকে না তাকিয়ে প্রাণপণে হৃদয়ের আবেগ দমন করে বালক কঠিন স্বরে কোতোয়ালকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কে এই নারী!'

কোনো জননীর সামনে কোনো পুত্রের মুখে এমন নিষ্ঠুর কথা বোধহয় আর কখনো উচ্চারিত হয়নি। মা তো একেবারে অবাক! হয়তো ভাবলেন, জেলখানায় গিয়ে মৃত্যুভয়ে ছেলের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

কোতোয়াল বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'সে কি, ইনি যে তোমার মা!'

বালক অবিচলিত কণ্ঠে বললে, 'না, এই নারীকে আমি চিনি না।'

—'ইনি তোমার মা নন?'

—'না। ইনি কী চান তাও আমি জানি না। এঁর কথা সত্যি নয়। আমি বিদ্রোহী, আমি গুরুজির শিষ্য। গুরুজির সঙ্গে আমিও প্রাণ দিতে চাই। জয়, গুরুজির জয়!'

বালক জীবন ভিক্ষা নিলে না, জীবন দান করলে।

পৃথিবীর কোনো দেশের ইতিহাসে আছে এর চেয়ে অদ্ভুত কাহিনি?

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

একদিন 'বসুমতী' কার্যালয়ে গিয়েছি। সম্পাদকের ঘরে প্রবেশ করে দেখলুম টেবিলের ধারে তাঁর সামনে বসে আছেন জনৈক হৃষ্টপুষ্ট প্রাচীন ভদ্রলোক। মার্জিত চেহারা, মুখে-চোখে বিশিষ্টতার স্পষ্ট পরিচয়। চিনতে পারলুম না বটে, কিন্তু তাঁকে প্রফেসর বলেই মনে হল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখেছি, প্রফেসরদের চিনিয়ে দেয় কেবল তাঁদের মুখ। বহু কবি ও লেখক বর্ণচোরা চেহারার অধিকারী।

দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রভৃতিকে কেউ চেহারা দেখে কবি বলে ধরতে পারত না। জীবিত কবিদের মধ্যেও এমন লোকের অভাব নেই। যেমন করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার ও শ্রীকালিদাস রায় প্রভৃতি।

সম্পাদক শুধালেন, 'হেমেনদা, এঁকে চেনেন?'

আমি মাথা নেড়ে জানালুম, না।

—'ইনি হচ্ছেন ডক্টর সুশীলকুমার দে।'

সুশীলকুমার! সানন্দে ঝুঁকে পড়ে তাঁর বাহুমূল ধরে বললুম, 'ইনি যে আমার প্রথম যৌবনের বন্ধু!'

চোখের সুমুখ থেকে সরে গেল কিছু কম চার যুগের পুরাতন পর্দা। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন সবে আত্মপ্রকাশ করেছেন, সেই সময়ে 'যমুনা' পত্রিকার বৈঠকে সুশীলকুমারের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়। তখনও তিনি কৃতবিদ্য হলেও প্রখ্যাত ছিলেন না। তাঁর নাম বিদ্বজ্জনসমাজে সুপরিচিত।

সুশীলকুমার সহাস্যে বললেন, 'আমাকে চিনতে তো পারেননি?'

বললুম, 'আমরা ছিলুম যুবক, আজ হয়েছি বৃদ্ধ। এত কালের অদর্শনের পর আর কি মানুষ চেনা যায়?'

সুশীলকুমার 'ভারতী'র বৈঠকের কথা তুলে বললেন, 'অমন চমৎকার বৈঠক আর হবে না।'

সত্য কথা। আর হবে না। আজকের তরুণ সাহিত্যিকরা উচিত মতো একজোট হবার অভ্যাস ক্রমেই বেশি করে হারিয়ে ফেলছেন। 'যমুনা', 'মর্মবাণী' ও বিশেষ করে 'ভারতী' পত্রিকার সাহিত্য-বৈঠকেই আমি আধুনিক কালের অধিকাংশ সাহিত্যিক ও শিল্পীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করার সুযোগ পেয়েছিলুম। এবং সেইজন্যেই আমার এই আলোচনায় বার বার ওই সব বৈঠকের প্রসঙ্গ এসে পড়ে।

'ভারতী' কার্যালয়ের ওই বৈঠকেই স্বর্গীয় সুলেখক সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি তরুণ যুবক মাঝে মাঝে আসতে লাগলেন। নাম তাঁর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। শুনলুম, তিনি তাজহাটের রাজার ভাগিনেয়। চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র। তাঁর চেহারা, ভাবভঙ্গি ও কথাবার্তা সপ্রতিভ।

দেবীপ্রসাদের দেহ দেখেই বুঝতে বিলম্ব হল না যে, তিনি নিয়মিতভাবে ব্যায়াম অভ্যাস করেন। বাংলা দেশের অধিকাংশ কলমবিলাসী কবি ও শিল্পীদের

ঠুনকো দেহ দেখলেই সন্দেহ হয়, যেন তাঁরা তথাকথিত চকোরের মতো কেবল জ্যোৎস্না পান করেই বেঁচে থাকতে চান। কারুর কারুর দেহ আবার দস্তুরমতো মেয়েলি। তাঁরা কথা কন নাকি সুরে, হাসেন মুচকি হাসি, চলেন কোমর দুলিয়ে। কিন্তু দেবীপ্রসাদের মতো বলিষ্ঠ, পেশিবদ্ধ ও পুরুষোচিত চেহারা বাঙালি কবি ও শিল্পীদের মধ্যে আমি আর দ্বিতীয় দেখিনি। রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটতেন, অপরিচিত লোকেরা নিশ্চয়ই তাঁকে পলোয়ান ছাড়া আর কিছু বলে মনে করতে পারত না।

এক-একদিন আমাদের অনুরোধে তিনি গায়ের জামা খুলে ফেলে যখন মাংসপেশির খেলা দেখাতেন, আমরা চমৎকৃত হয়ে তাকিয়ে থাকতুম তাঁর পরিপুষ্ট দেহের দিকে। কণ্ঠের, বক্ষের, উদরের ও বাহুর সমস্ত মাংসপেশিই ছিল তাঁর আজ্ঞাধীন।

যে হাতে গদাই মানায় বেশি, সেই হাতই সুপটু ছিল সূক্ষ্ম তুলিকা-চালনায়, আবার সেই হাতেই একদিন সবিস্ময়ে দেখলুম ছোট্ট একটি বাঁশের বাঁশি!

বললুম, 'আরে দেবী, তুমি আবার বাঁশি বাজাতেও পারো নাকি?'

দেবীপ্রসাদ হেসে বললেন, 'পারি।'

—'বাজাও তো, শুনি।'

বিনাবাক্যব্যয়ে মাথাটি কাত করে তিনি দিলেন বাঁশিতে ফুঁ। মুরলীগুঞ্জনে খেলা শুরু হল সপ্তগ্রামের। সেই বিচিত্র ধ্বনিতরঙ্গের মধ্যেও আবিষ্কার করলুম একজন অসামান্য শিল্পীকে। তারপর একাধিক গানবাজনার আসরে শুনেছি দেবীপ্রসাদের বাঁশের বাঁশি। সৌখিন হলেও তিনি নিপুণ বংশীবাদক বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

পুরুষোচিত দেহের মধ্যে থাকা উচিত পুরুষোচিত মন। তাই পরে তিনি বন্দুক ধারণ করেছেন শুনে বিস্মিত হইনি। শিকারির বেশে বনে বনে ঘুরে বেড়ান। হাতি-গন্ডার হয়তো হাতের কাছে পাননি, তবে একাধিক ব্যাঘ্রপুঙ্গব পঞ্চত্বলাভ করেছে তাঁর হাতে। এবং নিজেই তিনি দিয়েছেন এ সন্দেশ। মুখে নয়, বন্দুক চালনার পর লেখনীচালনা করে। তাঁর লেখা শিকারকাহিনি আমার ভালো লাগে। পরিণত বয়সে লেখক রূপেও আত্মপ্রকাশ করে তিনি রচনাকার্যে নিযুক্ত হয়েছেন। কেবল শিকারকাহিনি নয়, গল্প ও উপন্যাসও। তাঁর ভাষা জোরালো।

প্রথমে সকলে তাঁকে গ্রহণ করেছিল উদীয়মান চিত্রকর বলে। তারপর সকলে জেনেছে তিনি একজন উচ্চশ্রেণির ভাস্কর। তাহলে দেখা যাচ্ছে মানুষটি বহুরূপী। চিত্রকরের তুলি, ভাস্করের বাটালি, লেখকের কলম, সঙ্গীতবিদের বাঁশি, ব্যায়ামবীরের মুগুর ও শিকারির বন্দুক এ সবেরই সদ্ব্যবহার করতে পারেন দেবীপ্রসাদ। একাধারে তাঁর মনের উপরে কাজ করেছে ক্ষত্রধর্মের সঙ্গে চিত্র, ভাস্কর্য, সাহিত্য ও সংগীত প্রভৃতি চারুকলা। ঠিক এই শ্রেণির শাক্ত ও সব্যসাচী শিল্পী বাংলা দেশে তো দেখাই দেননি, ভারতের অন্য কোনো প্রদেশেও আছেন বলে মনে হয় না।

চিত্রকলায় কয়েকজন প্রথম শ্রেণির বাঙালি শিল্পীর নাম করা যায়। কিন্তু ভাস্কর্যকলা নিয়ে অবহিতভাবে সাধনায় নিযুক্ত হয়ে আছেন, এমন কোনো উচ্চশ্রেণির বাঙালি শিল্পীর নাম সেদিন পর্যন্ত আমরা জানতুম না, যদিও শখের খাতিরে এ বিভাগে মাঝে মাঝে হস্তক্ষেপ করেছেন, কোনো কোনো চিত্রশিল্পী। যেমন শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ। কিন্তু সে হচ্ছে খেলাচ্ছলে কোনো-কিছু গড়ে তোলা এবং তাও টুকিটাকি ভাস্কর্যের কাজ।

অনেক কাল আগে তাই প্রথম যেদিন শুনলুম, দেবীপ্রসাদ ভাস্কর্যকলাকেও বিশেষভাবে অবলম্বন করেছেন, তখন মনে জেগেছিল আনন্দের সাড়া। দেবীপ্রসাদের আমন্ত্রণে একদিন সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম। তাঁর হাতের কী কী কাজ দেখেছিলুম তা আর মনে নেই, তবে প্রমাণ নরদেহের চেয়ে ঢের বেশি উঁচু একটি মূর্তির কথা স্মরণ হচ্ছে। সেটি তাজহাটের রাজার—অর্থাৎ দেবীপ্রসাদের মাতুলের প্রতিমূর্তি।

তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গড়েছেন মূর্তির পর মূর্তি। একটু আগেই তাঁকে বলেছি সব্যসাচী। সত্যই তাই। তিনি সব্যসাচীর মতোই দুই দক্ষ হাতে কাজ করতে পারেন। ডান হাতে ধরেন তুলি এবং বাম হাতে ধরেন বাটালি। আজ তাঁর ভারতজোড়া নাম। তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ভাস্কর। তাঁর কৃতিত্বের জন্যে আমরা অনায়াসেই গর্ব অনুভব করতে পারি।

কলকাতায় বার্ষিক শিল্পপ্রদর্শনী হয়। সেখানে গেলে বোঝা যায়, ভাস্কর্যকলার দিকে আজকাল তরুণ বাঙালি শিল্পীদের দৃষ্টি হয়েছে অধিকতর আকৃষ্ট। ভাস্করদের সংখ্যা অবশ্য বেশি নয়, দুই-চারি জনের দুই চারিটি হাতের কাজের নমুনা থাকে মাত্র। তবু এটা আশাপ্রদ লক্ষণ বলে ধরে নিতে পারি।

কিন্তু মনে হয়, আমাদের তরুণ ভাস্কররা গোড়াতেই গলদ করে বসতে চান। কারণ অন্তর্মুখী নয় তাঁদের দৃষ্টি, তা হচ্ছে বহির্মুখী। পরিকল্পনার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেন না তাঁরা আপন আপন মনের ভিতর থেকে স্বাধীনভাবে। তাঁরা করতে চান অনুকরণ। তাঁদের চোখের সামনে সর্বদাই বিরাজ করে এপস্টিন, জ্যাডকাইন, বার্বারা হেপওয়ার্থ, মুর, লিয়ন আন্ডারউড, জন স্কিপিং ও রিচার্ড বেডফোর্ড প্রমুখ অতি আধুনিক ভাস্করদের কাজ। তাঁদের চোখ দিয়ে তাঁরা গোড়া থেকেই দেখতে শুরু করেছেন মানুষ ও পৃথিবীকে। অথচ ভিতরের কথা কিছু বুঝেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বাংলার আধুনিক ভাস্কর্যকলা নবজাত শিশু, এখনও সে ভালো করে চলতে শেখেনি কিংবা কোনোরকম ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পারেনি। কিন্তু এর মধ্যেই সে যদি নিজের মায়ের কথা ভুলে বিদেশিনী বিমাতার স্তন্যপান করতে উদ্যত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তার কপালে নেই কল্যাণময়ী কলাকমলার আশীর্বাদ লাভ। আর্ট হচ্ছে সার্বজাতিক—এই একেলে ভুয়ো ফতোয়ার কোনো মূল্য নেই। নিজের জাতীয়তা ভুললে কোনো দেশের কোনো আর্টই আপন পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সর্বজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না। আফ্রিকার বেনিন অঞ্চলের নিগ্রো ভাস্কর্যের কথা অর্ধশতাব্দী আগেও অবিদিত ছিল। সেখানকার অসভ্য শিল্পীরা গ্রিক বা মধ্য বা আধুনিক যুগের কোনো ভাস্কর্যেরই নমুনা দেখেনি। তাদের প্রত্যেকেই পরিস্ফুট করতে চেয়েছে বিশেষ এক আদর্শে স্বকীয় পরিকল্পনাকেই। এই যে বিশেষ আদর্শ, এটা আসেনি তাদের দেশের বাহির থেকে এবং এইজন্যেই এর মধ্যেই আছে তাদের আর্টের জাতীয়তা। আজ তাই বেনিন ভাস্কর্য করতে পেরেছে পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ। উপরন্তু তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন আধুনিক পাশ্চাত্য ভাস্কররাও। ঠিক অনুরূপ কারণেই প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যও প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে পাশ্চাত্য শিল্পীদের মনের উপরে। তাকে অল্পবিস্তর অবলম্বন করে একাধিক বৈদেশিক শিল্পী আধুনিক যুগের উপযোগী মূর্তিগঠনও করেছেন। দুঃখের বিষয়, আমাদের আধুনিক শিল্পীদের দৃষ্টি এই সত্যটা দেখেও দেখতে পায় না।

বলেছি দেবীপ্রসাদের পুরুষোচিত দেহ ও পুরুষোচিত মন। তাঁর চিত্র ও ভাস্কর্যের মধ্যেও প্রকাশ পায় এই পৌরুষের ভাব। আর্টের ভিতর দিয়েও তিনি করতে চান শক্তিসাধনা। তাঁর আঁকা ছবিগুলির রেখার টানে ও বর্ণবিন্যাসে

থাকে যে বলিষ্ঠতা, যে-কোনো সাধারণ দর্শকও তার দ্বারা অভিভূত না হয়ে পারবে না। এইখানেই তাঁর প্রধান বিশিষ্টতা, যা অন্য কোনো ভারতীয় শিল্পীর কাজে আবিষ্কার করা সহজ নয়।

দেবীপ্রসাদ মাদ্রাজের সরকারি চিত্রবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। তাঁর কথা সর্বদা মনে পড়লেও তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হবার সুযোগ আর ঘটে ওঠে না। তাই তিনি কলকাতায় এসেছেন শুনে কিছুকাল আগে এক সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম দুজনে একান্তে বসে অতীত স্মৃতির রোমন্থনে খানিকটা সময় কাটিয়ে দেব। কিন্তু তা আর হল না, কারণ গিয়ে দেখলুম, তাঁর ঘরে বসে গেছে একটি সাহিত্য সভা। উপস্থিত আছেন শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর (ইনিও কবি ও চিত্রশিল্পী), শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরও কেউ কেউ। অতীতের কথা আর উঠল না, বর্তমানকে নিয়েই আলাপ-আলোচনা ও হাস্যপরিহাস চলতে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে পানভোজন। খাবারের পর খাবার আসে—রীতিমতো দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্। মুখ বন্ধ করে ও ডান হাতের ব্যাপার সেরে যখন বাড়ির দিকে ফিরলুম তখন নিশুতি রাত। নির্জন, নিস্তব্ধ, নিদ্রামগ্ন শহর। দেবীপ্রসাদ অতিথি সৎকার করতেও জানেন।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

'ভারতী'র আসরে তখনও নেবেনি সন্ধ্যাদীপ। বৈকাল থেকে নিত্য বসে আমাদের বৈঠক। আমাদের দেহ বাস করত মাটির পৃথিবীতে, কিন্তু আমাদের মন বিচরণ করত চারুকলার রম্য ভুবনে।

কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের একটি মনিহারির দোকানে দাঁড়িয়ে এটা-ওটা-সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, এমন সময়ে পাশে এসে দাঁড়ালেন একটি যুবক। রংটি কালো হলেও মুখশ্রী চিত্তাকর্ষক। আমার দিকে অল্পক্ষণ তাকিয়ে থেকে তিনি শুধোলেন, 'আপনিই তো হেমেন্দ্রবাবু?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

যুবক বললেন, 'আমার নাম শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।'

অচেনা নাম নয়। মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচিত কয়লাকুঠি সংক্রান্ত গল্পগুলি তখন প্রশস্তি লাভ করেছে পাঠকসমাজে। কয়লার খনি এবং সেখানকার হাজার হাজার কুলিকে আমরাও অনেকেই দেখেছি। কিন্তু সে দেখা চোখের দেখা, মনের দেখা নয়। কুলির কাজ করে যেসব নর-নারী, তাদের দৈনন্দিন জীবনের ছোটো ছোটো সুখদুঃখ আশা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আমরা কেহই পরিচিত হতে পারিনি—পরিচিত হবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশও করিনি। প্রবীণ লেখকরা উচ্চতর শ্রেণির নরনারীদের নিয়ে রোমান্স রচনায় নিযুক্ত হয়ে থেকেছেন এবং নবীন লেখকরা মানুষের প্রথম রিপুটির উপরে বিসদৃশ ও অশোভন ঝোঁক দিয়ে পাঠক আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দরদী প্রাণ ও শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে শৈলজানন্দ প্রবেশ করেছেন কয়লাকুঠিতে ও কুলিদের পল্লিতে। বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন সেখানকার জীবনযাত্রা, সেখানকার মেঘ ও রৌদ্র, অশ্রু ও হাসির ছন্দ। এমনকি কয়লাকুঠির চলতি ভাষা পর্যন্ত কণ্ঠস্থ করে ফেলতে ত্রুটি করেননি। হাতের ক্যামেরায় তুলে নেওয়া যায় কুলিদের জনবহুল বস্তির হুবহু ফোটো। কিন্তু সেই সঙ্গে কুলিদের চিত্তবৃত্তি দেখাতে পারে কেবল মনের ক্যামেরাই। শৈলজানন্দও ব্যবহার করেছেন শেষোক্ত ক্যামেরা। তাঁর সুনির্বাচিত শব্দচিত্রে কুলিজীবনের যে সব বিচিত্র ও অপূর্ব দৃশ্য আমরা দেখেছি, আজ পর্যন্ত তা দেখাতে পারেননি আর-কোনো বাঙালি লেখক। বাইরের ফোটো, ভিতরের ফোটো। বাস্তবতার মধ্যে রোমান্স। কালো কয়লার গুঁড়োর ভিতরে আলো করা হিরার টুকরো। শৈলজানন্দ কুলিবস্তির নিরতিশয় দারিদ্র্যের মধ্যেও আবিষ্কার করেছেন অভাবিত সাহিত্যসম্পদ।

শৈলজানন্দ নিজেই তাঁর আত্মপরিচয়। তখন আমি বললুম, 'আপনার গল্প আমি পড়েছি। আমার খুব ভালো লাগে।'

শৈলজানন্দের সঙ্গে সেই হল আমার প্রথম পরিচয়।

কয়লাখনির কুলিজীবন নিয়ে তিনি 'মাসিক বসুমতী'তে প্রথম যে গল্প লিখেছিলেন, তখন তাঁর বয়স হবে কত? বাইশ কি তেইশের বেশি নয়। কিন্তু সেই বয়সেই লেখনীধারণ করে তিনি দেখাতে পারতেন যথেষ্ট মুনশিয়ানা। অচিন্ত্য, প্রেমেন ও বুদ্ধদেব প্রভৃতির নাম তখনও অপরিচিত। শৈলজানন্দ তাঁদের চেয়ে বয়সেও বড়ো এবং নামও কিনেছেন তাঁদের আগে।

'কল্লোল' পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করে তিনি খ্যাতি লাভ করেননি বটে, কিন্তু

কিছুকালের জন্যে তিনিও 'কল্লোলে'র দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ছিল অতিশয় অর্থের অপ্রতুলতা এবং সে অনটন মেটাবার সাধ্য ছিল না 'কল্লোলে'র। কাজেই অবশেষে দলছাড়া হয়ে তিনি 'কালিকলমের' সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন এবং ঠিক ওই কারণেই তাঁর পদানুসরণ করেন প্রেমেন্দ্রও।

তাঁর কয়লাকুঠির গল্পগুলি পাঠ করে আমরা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করতুম, এই একজন শক্তিশালী নূতন লেখক দেখা দিয়েছেন, যাঁর মধ্যে আছে প্রভূত সম্ভাবনার ইঙ্গিত। বাস্তবিক পাশ্চাত্য দেশের বহু লেখকই অনুরূপ শক্তিপ্রকাশ করে একসঙ্গে পেয়েছেন লক্ষ্মী ও সরস্বতীর আশীর্বাদ। ডবলিউ ডবলিউ জেকব কেবল সমুদ্রের নাবিকদের গল্প লিখেই রোজগার করেছেন কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। তিনি পরলোকে যান ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ঊনআশি বৎসর বয়সে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করে গিয়েছেন একমাত্র সাহিত্যের দৌলতেই। ওখানে আরও কেউ কেউ খ্যাতিমান ও ধনবান হয়েছেন ইহুদিদের কিংবা নিগ্রোদের জীবনীচিত্র দেখিয়ে।

শৈলজানন্দও বাংলা কথাসাহিত্যে খুলেছিলেন একটি সম্পূর্ণ নূতন বিভাগ। তাঁর কয়লাকুঠির গল্পগুলি পড়ে লোকে তাঁকে বাহবা দিয়েছিল খুব, কিন্তু টাকা দেয়নি বেশি। প্রথম বয়স থেকেই অর্থকৃচ্ছ্রতায় তিনি দারুণ কষ্টভোগ করেছেন। ব্রাহ্মণের ঘরের শিক্ষিত যুবক, বাস করতে হয়েছে বস্তিতে। ভাত-কাপড়ের জন্যে খুলতে হয়েছে পানের দোকান। লেখনীধারণ করে নাম কিনলেন, অবস্থারও উন্নতি হল অল্পবিস্তর, কিন্তু সে উন্নতিও উল্লেখযোগ্য নয়। যৎকিঞ্চিৎ ঘরে এলেও ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না।

এই তো আমাদের সাহিত্যিকদের অবস্থা। এইজন্যেই বাংলার কবিকে আক্ষেপ করে বলতে হয়েছে

'হায় মা ভারতি, চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে?
যে জন সেবিবে ও পদযুগল,
সেই সে দরিদ্র হবে।'

ইউরোপের কবির মুখে এমন আক্ষেপ মানায় না। সেখানে সাহিত্যসাধনার সঙ্গে নিশ্চিত দারিদ্র্যের সম্পর্ক নেই।

'কল্লোল' বন্ধ হল, সম্পাদক দীনেশরঞ্জন ছুটলেন সিনেমা জগতে অর্থের

সন্ধানে। তাঁর আগেই স্বর্গত 'কল্লোলে'র অন্যতম সম্পাদক গোকুল নাগ এদিকে পথপ্রদর্শন করেছিলেন। তিনি আরও কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে Photoplay Syndicate of India নামে একটি চিত্র-সম্প্রদায় গঠন করে Soul of a Slave নামে একখানি চমৎকার ছবি তুলেছিলেন এবং সেই ছবিতে পর্দার গায়ে প্রথম দেখা দেন শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী। গোকুলবাবু (তিনি ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগের ভ্রাতা) অকালেই পরলোকগমন করেন, তাই চিত্রজগতে আর কোনো উল্লেখযোগ্য দান রেখে যেতে পারেননি। কিন্তু বাংলা দেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথমে যোগ দেন চলচ্চিত্রশালায়। তারপর একে একে অনেক লেখকই ওইদিকে ছুটেছেন মধুলুব্ধ মধুকরের মতো। শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী, দীনেশরঞ্জন দাস, 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'য়ের বর্তমান সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, 'নাচঘরে'র সহকারী সম্পাদক শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য ও শ্রীপ্রণব রায় প্রভৃতি। শ্রীদেবকী বসুও প্রথম জীবনে ছিলেন মফস্‌সলের এক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। আমিও একসময়ে আকৃষ্ট হয়েছিলুম সিনেমার দিকে। বৎসর দুই হাতেনাতে কাজও করেছি নানা বিভাগে। পরিচালকরূপে পত্রিকায় একবার আমার নামও বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। কিন্তু সিনেমা আমাকে পুরোপুরি আবিষ্ট করতে পারেনি কোনোদিনই। যথাসময়েই বুঝে নিয়েছিলুম একসঙ্গে সিনেমা ও সাহিত্যের জোড়া ঘোড়া চালাবার সাধ্য আমার হবে না। তাই পালিয়ে এসেছি আবার সাহিত্যজগতে। প্রেমাঙ্কুর, শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র প্রভৃতি তা পারেননি, তাই সাহিত্যসভা থেকে তাঁদের বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছে। অবশ্য প্রেমাঙ্কুর আবার নতুন করে কলম ধরেছেন বটে। কিন্তু সিনেমার সঙ্গে এখন আর তাঁর কোনো সম্পর্কও নেই।

কেবল সাহিত্যিক নন, অভিনেতা ছাড়া অন্যান্য শ্রেণির অধিকাংশ শিল্পীও সিনেমা নিয়ে মাতলে নিজের ধর্মরক্ষা করতে পারে না। চিত্রশিল্পীরূপে শ্রীচারুচন্দ্র রায়ের তারকা হচ্ছিল ক্রমেই ঊর্ধ্বগামী। সিনেমা জগতে গিয়েও তিনি শিল্পকর্ম ছাড়েননি বটে, কিন্তু একক শিল্পীরূপে তিনি করতেন যেসব রূপসৃষ্টি, প্রকাশ করতেন নিজের যে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, রূপরসিকদের কি তা থেকে বঞ্চিত হতে হয়নি? সিনেমায় এখন তিনি কী করছেন না করছেন বাইরে তার খবর আসে না। এবং তাঁর নিজের হাতে আঁকা কোনো ছবিও আর কারুর চোখে পড়ে না। লোকে তাঁকে এর মধ্যেই ভুলে যেতে বসেছে। আর তাঁর চেয়ে বয়োকনিষ্ঠ শিল্পী

দেবীপ্রসাদ নিজের সাধনায় অবহিত থেকে তাঁকে ছাড়িয়ে কত দূরে এগিয়ে যেতে পেরেছেন?

অনন্যসাধারণ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁর এককালীন শিষ্য শ্রীশচীন্দ্র দেববর্মণকে দেখুন। বৈঠকি গানের আসরে কৃষ্ণচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের উচ্চতা বেড়ে উঠছিল ক্রমশই। কিন্তু তাঁর সে উচ্চগতি আজ হয়েছে রুদ্ধ, কারণ তিনি এখন সিনেমার প্রেমে মশগুল। তবু তো তিনি বেশ কিছু কাল ধরে দরাজ হাতে দান করে গিয়েছেন নব নব আনন্দ। কিন্তু শচীন্দ্র দেব উদীয়মান অবস্থাতেই প্রধান করে তোলেন টাকার ধান্ধা। তারপর থেকে তিনি একান্তভাবেই চিত্রজগৎবিহারী হয়ে স্বদেশি গানের আসর ছেড়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন বোম্বাই শহরের এ স্টুডিয়ো থেকে ও স্টুডিয়োয়। ব্যাঙ্কের খাতায় অঙ্ক বাড়ছে নিশ্চয়ই, কিন্তু বোবা হয়ে গেছে তাঁর ব্যক্তিগত মুখর আর্ট!

চলচ্চিত্র যে শিল্পীদের ব্যক্তিগত শক্তির পরিপন্থী, রবীন্দ্রনাথেরও ছিল এই ধারণা। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ হচ্ছেন রবীন্দ্রসংগীতে বিশেষজ্ঞ এবং আজন্ম শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্র। সিনেমাওয়ালারা তাঁকেও দলে টানবার জন্যে চেষ্টা করেছিল। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পত্র লিখে রবীন্দ্রনাথের মতামত জানতে চান। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে যে উষ্ণ উত্তর দেন, তা পাঠ করে শান্তিদেব সিনেমাওয়ালাদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখেন।

জীবিকা নির্বাহের জন্যে অর্থের প্রয়োজনীয়তা কে অস্বীকার করে? কিন্তু অর্থাগম হলেই শিল্পসৃষ্টির কথা ভুললে শিল্পীর জন্যে দুঃখ হয়। বিগত যুগের অধিকাংশ বাঙালি সাহিত্যিকই লেখবার সময়ে টাকার কথা মনেও আনতেন না এবং ভারতবর্ষে বাংলা সাহিত্যের অতুলনীয় সমৃদ্ধির জন্যে পনেরো আনা গৌরব তাঁদেরই প্রাপ্য। এখনকার শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে দেখুন। যখন তাঁর জেব ছিল রিক্ত, তখনও তাঁর কলমের বিরাম ছিল না। এখন পদস্থ সরকারি চাকুরে হয়ে অর্থের জন্যে নেই তাঁর কোনোই দুর্ভাবনা, কিন্তু আজও তাঁর লেখনী অত্যন্ত অশ্রান্ত। এইখানেই পাওয়া যায় সাহিত্যিক মনোবৃত্তির পরিচয়। সুবর্ণপিঞ্জরে বন্দি করলেও বনের পাখিকে ভুলানো যায় না অরণ্যের সংগীত। আসুক সুখ, আসুক দুঃখ, সত্যিকার শিল্পীকে করতে হবেই শিল্পসৃষ্টি। প্রেমেন্দ্র ও শৈলজানন্দকে আমি সত্যিকার সাহিত্যিক বলেই শ্রদ্ধা করি। তাই তাঁদেরও মধ্যে দেখতে চাই সাহিত্যিক মনোবৃত্তি।

আমি তখন কালী ফিল্মের একখানি গীতিনাট্য-চিত্রের (বিদ্যাসুন্দর) জন্যে গান রচনার এবং নৃত্য পরিকল্পনা ও পরিচালনার ভার পেয়েছি। স্টুডিয়োতে যেতে হয় প্রত্যহ। সেই সময়ে একদিন কালী ফিল্মের মালিক বন্ধুবর শ্রীপ্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় আমার হাতে একখানা কেতাব দিয়ে বললেন, 'হেমেনদা, বইখানা পড়ে দেখবেন তো, ছবিতে জমবে কি না?'

বইখানির নাম 'পাতালপুরী'। লেখক শৈলজানন্দ। এও কয়লাকুঠির কাহিনি। এ শ্রেণির লেখায় শৈলজানন্দের জোড়া নেই। সুতরাং গল্পটি যে ভালো লাগল সে কথা বলা বাহুল্য। কেবল সাধারণ গল্প হিসাবে নয়, চিত্রকাহিনি হিসাবেও তার উপযোগিতা ছিল যথেষ্ট। প্রিয়বাবুকে সেই কথাই বললুম।

প্রিয়বাবু যথেষ্ট শ্রম, যত্ন ও আয়োজন করে ছবিখানি তুলেছিলেন। কয়লাখনির ভিতরকার দৃশ্য যথাযথভাবে দেখাবার জন্যে তাঁর অর্থব্যয়ও বড়ো কম হয়নি। নজরুল ইসলাম নিয়েছিলেন গান রচনার ও সুর সংযোজনার ভার। শৈলজানন্দ নিজেও দেখা দিয়েছিলেন একটি ছোটো ভূমিকায়।

ছবিখানি ভালো হলেও আশানুরূপ অর্থকর হয়নি। কিন্তু শৈলজানন্দ সেই যে চিত্রজগতের অন্দরমহলে ঢুকে পড়লেন, আজ পর্যন্ত আর বেরিয়ে আসেননি। সে বোধ হয় আঠারো-উনিশ বৎসর আগেকার কথা।

আগে তিনি মাঝে মাঝে আমার বাড়িতে এসে দেখা দিতেন। আমি বরাবরই শিল্পীদের সাহচর্য ভালোবাসি। তাঁকে পেলে খুশি হতুম।

একদিন দেখিয়েছিলুম তাঁকে নৈশজীবন। কলকাতায় নয়, চন্দননগরে। সেখানে গঙ্গার ধারে ছিল স্যাভয় হোটেল। সেখানে বাঙালিরা বড়ো একটা উঁকিঝুঁকি মারত না বা মারতে সাহস করত না। সেখানে হেসে গেয়ে নেচে আসর রাখত সাহেব-মেমরাই। হোটেলের স্বত্বাধিকারিণী রুশীয় মহিলা ম্যাডাম লোলা ছিলেন আমার বন্ধু। তাঁর আমন্ত্রণে আমার সাহিত্যিক ও শিল্পী সুহৃদদের নিয়ে প্রায়ই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতুম। একদিন সন্ধ্যার পর সেখানে নিয়ে গেলুম শৈলজানন্দকেও এবং ফিরে এলুম পরদিন সূর্যোদয়ের পর।

ছড়া ও কবিতা

ছড়া

প্রলাপ ছড়া

কে সদরে নাড়ছে কড়া এখন রাত্রি দুপুরে?
কে ধরে রে ইলিশ-ছানা উনিশ-বিঘে পুকুরে?
অশোকবাবু? আসুন-আসুন! আসন পেতে আসুন দি,
অমন করে গোসলখানায় খাবেন না আর কাসুন্দি!
রসগোল্লার গোল্লা খতম, রস যে পড়ে চলকে।
বটুকবাবু গুড়ুক টানেন, নেই যদিও কলকে।
কে নাচেরে মৌমাছি-নাচ সুধীরবাবুর আসরে?
কে বাজায় রে ওস্তাদি-সুর ভাঙা ফাটা কাঁসরে?
খোকন ডাকে 'আম, আম, আম।' চাকর দিলে তিনটে আম,
জানেনা সে, খোকন মোদের 'আম' বলে যে বলতে 'রাম'।
গদাইভায়া পদ্য লিখে সদ্য পাঠায় 'মৌচাকে',
তাই পড়ে আজ ধরল মাথা, তাই ঘোষেদের বউ-হাঁকে।
গুম্ফ থাকা ভালো কিংবা ভালো দাড়ি কামানো।
এই নিয়ে কি ঘুষোঘুষি যায় না ওদের থামানো।
কোকিল পাখির বাসায় গিয়ে শিখছে যে গান কালপ্যাঁচা,
চটপটাপট হাততালি দে, হো-হো কোরে খুব চ্যাঁচা।
হাবুবাবুর হাস্যে কাঁপে হোগল-কুড়িয়া,
হেথায় করে হাতাহাতি মোগল-উড়িয়া।
বাদলা গেল পাগলা হয়ে দেখে নতুন জোছনা;
ডাকছে খালি—'আয় মেঘ আয় আলোর লিখন মোছনা'।
ভট্ট সতীশ ডাকাচ্ছে নাক, স্তম্ভিত মাস-পয়লা,
গোরুগুলো তুলল পটল, খাচ্ছে যে ঘাস গয়লা।
মশার জ্বালায় জ্বলে-পুড়ে কলের কামান দাগছি,
শব্দ শুনে ভিরমি গেল শ্রীঅপূর্ব বাগচী।
চক্ষু মুদে চন্দ্র দেখে পাতালপুরের মাতালরা,
ডেনটিস্টদের কবলগত বড়ো বড়ো দাঁতালরা।

বেড়াল দেখে মাসি বলে চিনতে পারে শার্দুলরা?
লম্বা লোকের বুদ্ধি বেশি? কিংবা চালাক বাঁটকুলরা?
মা কালীকে চমকে দিয়ে ধমকে ওঠে পটকা,
'সোনার পাথরবাটিতে আজ কাঁচা ফলার চটকা'।
এক টাকাতে একটি মুড়ি অনেক খুঁজেও পেলুম না,
এ শনিবার তাইতে আমি মামার বাড়ি গেলুম না।
সর্বজনীন পূজার ভিড়ে সর্বজনের প্রাণান্ত;
শিঙে-ফোঁকার ইংরেজি কি? জানিনে তার বানান তো!
আমার লেখা পোড়ে তোমরা ভাবছো কি তাই বলো তো,
রাঁচীর মানুষ হচ্ছে মনে, বেশ সেখানেই চলো তো!
আমার হয়ে দাও যদি কেউ রাঁচীর ভাড়া চুকিয়ে,
গারদখানায় যেতে বললেও পড়ব নাকো লুকিয়ে।

কাগজের নৌকো

আকাশ গাঙে বান ডেকেছে রম-ঝম-ঝম-ঝম
বাজের অট্টহাসে ভুবন করছে রে গম-গম!
ধানের খেতে নদীর দোলা,
কইরে যদু, আয়রে ভোলা!
বৃষ্টিতে আজ ভিজব মজায়, আমরাও নই কম।

তেপান্তরে দাঁড়িয়েছে আজ একটি কোমর জল,
সাঁতার কাটে দোপাটি আর চাঁপা, জুঁই-কমল!
আন খবরের কাগজ তোরা,
নৌকো জাহাজ গড়ব মোরা,
ভাসব সবাই ভাসিয়ে তরী টলমল টলমল!

মাঠ সাগরে আজ যে শুনি সাত সাগরের গান,
ওরে, মোদের বক্ষে লাগে নিরুদ্দেশের টান।
কোথায় কঙ্কাবতীর দেশে
পাগলা তরী চলল ভেসে,
দেখবে কোথায় শিবের বিয়ের তিনটি কন্যে দান!

তন্দ্রাপুরীর ছন্দারানী কোথায় একেলা
টাটকা স্বপন-ফুলের তোড়া বাঁধছে দু-বেলা!
লাল মাছেদের কাছে কাছে
ঝিনুক খুলে মুক্তো নাচে,
প্রবাল ছুড়ে জলপরীরা করছে কি খেলা!

রামধনুকের রঙিন মুলুক, রঙের রাজত্ব!
রঙিন রসগোল্লা সেথায় সব রোগে পথ্য!
কাফ্রি রাঙা টুকটুকে রে
আমরাও তাই বুক ঠুকে রে
নাচের রঙের দুলাল হয়ে করছি তিন সত্য।

আনব তরী বোঝাই করে সোনার পারিজাত
ঘুমল-ঘাটে ফেলব নঙর এলে কাজল রাত।
ভেট পাঠাবে ঘুমতিবুড়ি
পদ্ম মুড়ি ঝুড়ি ঝুড়ি
আমরা খেতে বসব পেতে সবুজ কলাপাত!

আকাশ ডাকে বাতাস ডাকে, ডাকছে মেঘের জল,
অঙ্ক কষে, হিস্ট্রি পড়ে মরবে কে আর বল?
মাস্টার আজ করবে কামাই,
মিথ্যে কেন মাথা ঘামাই?
কোমর বেঁধে আজ কাগজের নৌকো ভাসাই চল!

টাপুর-টুপুর তানে

ভোর না হতে কে এলে গো? বাদল নাকি? বটে!
তাই বুঝি নেই আলোর তুলি আজকে আকাশপটে?
যেই দিয়েছি জানলা খুলে
শিশুর কলহাসি তুলে
বৃষ্টির ছাট ঘরে ঢুকে কি কথা কয় কানে—
টাপুর-টুপুর টাপুর-টুপুর টাপুর-টুপুর তানে।

রবিবারের বৃষ্টি তুমি খেলতে এলে বুঝি?
ঘরে ঘরে খেলার সাথী করছ খোঁজাখুঁজি।
চল তবে বেরিয়ে পড়ি
মানস-পক্ষীরাজে চড়ি
অজানা সব মাঠে-বাটে অচেনা দেশ পানে—
এই সুমধুর টাপুর-টুপুর টাপুর-টুপুর তানে।

মেঘ পাখোয়াজ বাজিয়ে তুমি, জলের নূপুর পায়ে,
বনে বনে কি নাচ নাচো, ছায়ার চাদর গায়ে।
সেই নাচেরই মাতন লেগে
পাগলা ঝোড়ো উঠছে জেগে
দোল দিয়ে যায় জল-থই-থই খেতের ধানে-ধানে—
একটানা ওই টাপুর-টুপুর টাপুর-টুপুর তানে।

গাঁয়ের পথে পথ নেই আর—নতুন নদীর খেলা,
দস্যি ছেলে ঝাঁপাই ঝোড়ে ভাসিয়ে কলার ভেলা।
বাঁধা-বটের রোয়াকটাতে
ব্যাঙেরা সব আসর পাতে,
থেকে থেকে ময়ূর কোথায় দিচ্ছে সাড়া গানে—
সারা বেলাই টাপুর-টুপুর টাপুর-টুপুর তানে।

যেদিকে চাই কেবল দেখি তাজা ছবির বাজার
রং-চঙে কি ফুল ফুটেছে কত হাজার হাজার।
ফুলঝুরি ওই ঝরছে দেয়ার,
থরথরে বুক কদম কেয়ার,
পদ্মপুটে লুকোয় অলি, ভয় জাগে তার প্রাণে—
মন ভরে যায় টাপুর-টুপুর টাপুর-টুপুর তানে।

আকাশ চাওয়া বন্ধু এল আকাশ ছাওয়া বেশে
মন ছোটে মোর শিবঠাকুরের আর তিন কন্যের দেশে।
ছেলেবেলা গল্প নিয়ে
বাদল আসে জানলা দিয়ে
পুরোনো দিন নতুন করে ফিরিয়ে যেন আনে—
ঘুম-ভোলানো ঘুম-পাড়ানো টাপুর-টুপুর তানে।

খোকার বীরত্ব

(প্রথমে ভেরী বা বিউগল বাজবে—ফৌজের বাদ্যের অনুকরণে)

[খোকা]

মাগো, তোমার ছেলে ভর্তি হবে রাজার সেপাই-দলে
ডাকলে কামান, এগিয়ে যাব যেথায় লড়াই চলে।
খোকার টুপি ইজের জামায়
দেখবে মানায় কেমন আমায়
বন্দুক আর সাঙন নিয়ে
মাতব ডাঙায়, জলে—
ভর্তি হব রাজার সেপাই-দলে!

[মা]

সোনার যাদু, বুকের রতন
বীর কে হবে তোমার মতন......?
বাংলা-মায়ের আশিস-মালা
দুলবে তোমার গলে—

[খোকা]

ভর্তি হব রাজার সেপাই-দলে।

[দিদি]

ভাই আমাদের বিজয়-রথে
আসবে কোরে লড়াই ফতে,
বাঙালিকে দেখব তখন
কে কাপুরুষ বলে!

[খোকা]

ভর্তি হব রাজার সেপাই-দলে
(ভেরী বা বিউগল বাজল)
হব না হীন কেরাণী মা
বলছি আমি সাচ্চা!
কলম ফেলে ধরব অসি
তোমার মরদ বাচ্চা!
ঘরের কোণে ভাত খেয়ে বেশ,
ঘুমোক যত গোবর-গণেশ!
আমার খেলায় জীবন মরণ
হাসবে চরণ-তলে

ভর্তি হব রাজার সেপাই-দলে।

[মা]

মন আছে যার দেশের কাজে
অমর সে যে ভুবন মাঝে
বাংলা-মায়ের শ্যামলা-ছেলের
ভয়ে কি প্রাণ টলে?

[খোকা]

ভর্তি হব রাজার-সেপাই-দলে

[দিদি]

ধন্য বিধি, ধন্য বিধি
হয়েছি ভাই তোমার দিদি!
তোমার গুণে দেখব দেশের
সোনার স্বপন ফলে!

[খোকা]

মাগো, তোমার ছেলে ভর্তি হবে রাজার সেপাই-দলে।

(খুব জোরে ভেরী বা বিউগল বাজবে)

আমার ছবি

বন্ধু তুমি দেখছ কি ভাই উল্টে ছবির খাতা?
আমার ছবি আছে যে এই পৃথিবীতেই পাতা!
ঐ যেখানে ধানের ক্ষেতে
বুলবুলিরা উঠছে মেতে,
ঐ যেখানে তাল-নারিকেল খুলছে সবুজ পাতা।

তোমরা জানো ছবি থাকে দেয়ালেতেই ঝোলানো,
আমার ছবি কুঞ্জলতায় মঞ্জু হাওয়ায় দোলানো।
প্রজাপতির পাখ্না-পুটে
জ্যান্ত ছবি উঠছে ফুটে,
কাঁচা রোদের সোনার তুলি দিকে দিকে বোলানো।

ঐ যেখানে পাহাড়তলির নির্ঝরিণী গান ধরে,
রূপের লহর মেখে গায়ে হয়তো পরী স্নান করে।
গহন-বনের ফাঁকে ফাঁকে
আলোক-ছায়া নকশা আঁকে,
নদীর ঘাটে একটি মেয়ে রাঙা মাটির ঘট ভরে।

মেঘরা কখন বাজনা বাজায় শুনলে বাদল-নূপুর,
ছন্দপাগল আকাশ-বাতাস
সন্ধ্যা সকাল-দুপুর,
ধু-ধু-ধু পথ! কদম ঝরে!
ময়ূর নাচে পেখম ধরে!
ছল-ছল-ছল মাঠ ভরা জল! টাপুর-টুপুর-টুপুর!
বসন্তে ভাই ফুল বাতাসে কত রঙের জল্পনা,
বকুল চাঁপা গোলাপ নিয়ে ফুলকারী আর কল্পনা
শীতকালে দূর কুহেলিকায়
আবছা স্বপন-ছবি লিখায়,
শরৎ-মেঘের পাতলা ভেলায় শিল্পী চাঁদের আল্পনা।

অনন্ত এই রূপের নাটে মন হল ভাই শ্রীমন্ত,
চিত্র আমার গায় গীতিকা—চিত্র আমার জীবন্ত!
ছবির খাতা বন্ধ কর,
ডাকছে গোপন চিত্রকর,
বাইরে গেলেই বুঝবি সবাই—চিত্রশালা ভুবন তো!

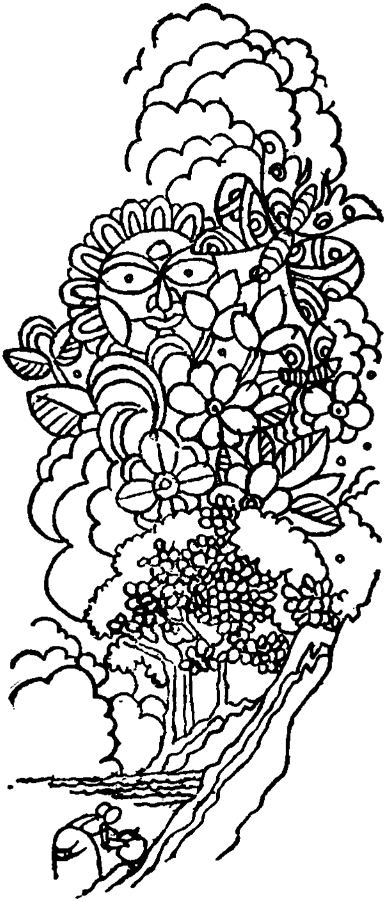

গল্প শোনার সময়

রোদের কোলে মেঘের দোলা,
আলো ছায়ার মিতালি,
একটু আগে দেখেছিলাম ;
বৃষ্টি-ভেজা দীপালী!
যায় বেলা গো! আকাশ-নাটে
সূর্য এখন বসল পাটে,
অস্তাচলে ব্যস্ত খেলায়
সোনালী আর রূপালী
ওরা যেন রঙিন গীতি,
মৌন ইমন-ভূপালী!
চিত্রশালা ঢেকে বাদল
বাজালে ফের মৃদঙ্গ,
কাঁপল গগন, পালিয়ে গেল
ভীরু আলো-কুরঙ্গ।
পাগ্‌লা হাওয়া বেগে ছোটে,
গঙ্গা নদী চল্‌কে ওঠে,
শূন্য ফুঁড়ে ফুটছে কেবল,
উগ্র বাজের ভ্রূ-ভঙ্গ,
বিশ্ব যেন গিল্‌তে আসে
ক্রুদ্ধ তিমির-মাতঙ্গ!
মেঘ-ঝরনা রম্‌-ঝম্‌-ঝম্‌
ঝরছে, শোনো, ঝরছে রে,
রূপকাহিনীর রাজ্য সে যে
বন্য গানে ভরছে রে!
তেপান্তরের মাঠের বুকে
বন্যা হয়ে ছুটছে সুখে,
রাজার ছেলের ব্যাকুল ঘোড়া
ভিজে ভিজে মরছে রে।

রক্ষোপুরে রাজকুমারীর
মন যে কেমন করছে রে!
আমার কাছে এস এখন
শুনবে যদি গল্প ভাই!
অসম্ভবের দেশে যাবার
সম্বল মোর অল্প নাই!
আঁধার আসে? আসুক না সে!
বসে দেখ আমার পাশে,
কালো রাতের পায়ে কেমন
বৃষ্টিধারার মল পরাই,
বাদলাকে আজ মধুর করে
হাসবে আমার কল্পনাই।

কোথা যায় কালো মেঘ

কোথায় যায় কালো মেঘ, পারবো না বলতে!
ক্ষ্যাপা মন খালি চায় তার সাথে চলতে!
কালো মেঘ উড়ে যায়
জল-বাণ ছুঁড়ে যায়
জ্বলে উঠে পুড়ে যায় বিজলীর পল্‌তে।

শহরের টঙে কভু দাঁড়ায় সে থম্‌কে,
বাজখাঁই হাঁকে তার খোকা যায় চমকে।
দেখে তার ছায়াছবি
লাজে মুখ ঢাকে রবি
আঁধারের পর্দায় ঢেকে ফেলে ব্যোমকে।

কভু দেখি কাননের উপরে সে দুলচে
রুপোলী তটিনী-জলে খালি কালি গুলচে।
মাট বাট ধুয়ে যায়
তালবনে ছুঁয়ে যায়
রোদ যেই উঁকি মারে, রামধনু তুলচে!

কভু গিয়ে যোগ দেয় সাগরের নৃত্যে,
মৃদঙ্গ-তাল তোলে আকাশের চিত্তে।
মাটি নেই, তীর নেই—
কিছু পৃথিবীর নেই,
মেঘে জল, নীচে জল—আর সব মিথ্যে!

মরুভূমি ছুটে গিয়ে আনে ধারা-ছন্দ,
ওয়েসিসে খোলে রং খোলে ফুলগন্ধ।
ধু-ধু-ধু বালুকা পট,
নাচে সেথা ছায়ানট,
বেদুইন ভাবে বসে এ নয় তো মন্দ!

চল মন! চল মেঘ, দেখে কত দেশ যে,
হাতি-ঘোড়া দেবাসুর ধরে কত বেশ যে!
ছোটে মেঘ, ছোটে মন,
আসে গিরি নদী বন,
সীমাহারা ছোটাছুটি, নাহি তার শেষ যে!

বৃন্দাবনী চুটকি

॥ ১ ॥

বৃন্দাবনে এলেম এবার, মালাই খেলেম খুব দেদার,
হাঁসফাসিয়ে লম্বা হলেম দাদা, আমি, আর কেদার।
আচ্ছা করে জড়িয়ে ধরে আরাম ভরা গীদ্দেকে,
চক্ষু বুঁজে আমি যখন সাধছি শুয়ে নিদ্রেকে,
রাত্রি তখন অনেক হবে, শব্দ-টব্দ কিচ্ছু নেই!
হঠাৎ যেন—ও বাবা গো! কামড়াল কী বিচ্ছুতেই?
ধড়মড়িয়ে লাফিয়ে উঠি—নয়তো এটা গোখরো সাপ?
হাত বুলিয়ে পিঠের ওপর চেঁচিয়ে বলি বাপরে বাপ!
দাদা-টাদা জেগে উঠে বলেন, 'ওরে হল কী?'
হতাশভাবে বললুম, 'দ্যাখো, ভায়া তোমার মোলো কী!
পিঠের ওপর লতার ছোবল—জলদি জ্বালো পিদ্দিমে!'
'বলিস কিরে!'—বলেই দাদা জ্বাললে আলো টিমটিমে।

॥ ২ ॥

তারপরেতে দেখলুম যাহা, লাগল তাতে ধাঁধা হে!
ঘরের ভেতর উড়ছে যেন চামচিকেরই গাদা হে!
হো হো হেসে বললে দাদা ডেকে কেদার বসাকে,
'বোঝা গেছে, সাপ ভেবেছে বৃন্দাবনী মশাকে!'
ওরে বাবা, মশা ওরা? শুনেই চক্ষু চড়কগাছ!
মশা হলেও নেইকো কোথাও মশার মতন ধরন-ধাঁচ!
বোঁ বোঁ করে আসছে তেড়ে শানিয়ে হুলের করাত যে,
শোঁ শোঁ করে রক্ত শোষে মন্দ ঠেকে বরাত যে!
একটা মারি দশটা আসে, তার পিছনে দুশোটা,
ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঠিক যেন সে ঘুষোটা!
মারতে মশা নিজের গালে কষিয়ে দেদার চাপড়টা,
ধ্যাত বলে ফের কেতরে পড়ি, মাথায় দিয়ে কাপড়টা!

॥ ৩ ॥

মুড়ি দিয়েও নেই বাঁচোয়া, উলটে বাড়ে পোঁ পোঁ বোল,
চাদর ফুঁড়ে আদর করে, নাকের ডগা হল ঢোল!
'রোস তো' বলে লাফিয়ে উঠি, ঘুরিয়ে ছুড়ি ছাতাটা.
মশার তাতে বয়েই গেল, ফাটল দাদার মাথাটা।
দাদা এল পাকিয়ে ঘুষি, মশা এল শানিয়ে হুল,
চক্ষু চেয়ে পষ্ট দেখি, ফুটছে হাজার সর্ষে-ফুল!

ভড়কে আমি, বিছনা ছেড়ে তড়াক করে পগার পার
ঘুষির ভাবনা গেল বটে, রইল কিন্তু মশার সার!
মানুষ দেখে যত মশা খালি করে নর্দমা,
বাজিয়ে ভেঁপু পালে পালে নিতে এল গর্দানা!
মেঘের মতো মশার ঝাঁকে ছিষ্টি কালো কিষ্টি হে,
স্মরণ করি ইষ্টিদেবে, ঝাপসা হল দিষ্টি হে!
শিকার পালায় দেখে তারা দিচ্ছে রুখে বাগড়া রে,
গায়ে যেন বসায় দাড়া সুমুদ্দুরের কাঁকড়া রে!
যাচ্ছি কোথা জানিনেকো—দক্ষিণে না উত্তুরে?
ওগো বাবা, খেলে বুঝি আজকে তোমার পুত্তুরে!
বৃন্দাবনে কৃষ্ণে দেখে পেলুম বুঝি কৃষ্ণে গো!
ওরে মশক, দে রে ছেড়ে, প্রাণটা কেড়ে নিসনে গো!
রক্ত বুকে উছলে ওঠে—মশার বাঁশি শুনে আজ,
কাছা-কোঁচা খুলে চোঁচা ছুটছি সোজা নেইকো লাজ।
মুখ খিঁচিয়ে চুলকে গা-টা, ফুলে হলুম হস্তীটি!
উধাও ছুটে পেরিয়ে এলাম শহরের শেষ-বস্তিটি!
প্রাণটা তখন ওষ্ঠাগত পেয়ে হুলের নমুনা,
থমকে হঠাৎ চমকে দেখি, সামনে কালো যমুনা।
একটুখানি ভাবনা হল—ফিরি কিংবা ঝম্ফ দি?
ক্যাঁক করে ফের মশার কামড়—অমনি দিলাম লম্ফটি!

॥ ৪ ॥

নাক-বরাবর চোবাই জলে, এড়িয়ে মশার সীমানা,
যাচ্ছিল এক মালসা ভেসে মাথায় তুলি সেইখানা!
কালীয়-সাপের ছ্যানা আছে শুনেছিলুম জলেতে,
'ল্যাজ দিয়ে পাক জড়িয়ে' যদি দ্যায় সে আমার গলেতে?
তারপরেতে—কাছিম-চাচা? বলি, জেগে আছ কি?
ঠ্যাঙের ওপর দাঁত বসাতে তুমিও তেগে আছ কি?
নেক-নজরে চাইবে নাকি, নইলে আমি যাই মারা,
রাখতে পারো, মারতে পারো, করব কী আর নাই চারা!
একটা রাতের অতিথ আমি, গেছে সকল ভরসা-সুখ,
ভাগব আমি দেখতে পেলেই সুয্যি-মামার ফরসা মুখ।
গোপীনাথজি সুখে থাকুন, মালপো ভোগে হোন মোটা,
মশারা সব লুটুক মজা, নয় সে বড়ো মন্দটা;
চাইনে আমি মাখন-ননি, বাঁচে যদি আজ মাথা—
এক ছুটেতে টিকিট কেটে—এক দমেতে কলকাতা!

ডাকপেয়াদা

পাগলা ঝোড়ো ঝটকা মারে বাঁশের ডালে ঠকঠকি—
আকাশ চিরে ফিনকি তোলে ডাইনি-বুড়ির চকমকি!
ঝমঝমিয়ে বিষ্টি পড়ে, নদীর জলে ডাকছে বান,
ঘুটঘুটে ওই আঁধার রাতে হি হি শীতে কাঁপছে প্রাণ।
ডাকপেয়াদা, এই বাদলে বাইরে হবে রাতকানা,
ঘরের ভেতর এসে ভায়া, নাও তাতিয়ে হাতখানা।

বনের পথে আছে বাঘা, চোখে আগুন গনগনে
হালুম করে আসবে তেড়ে দেখলে তোমার লণ্ঠনে।
কালপ্যাঁচারা করছে চ্যাঁ-চ্যাঁ, গর্তে গ্যাঙায় ব্যাংগুলো,
শেওড়া-ডালে দুলছে হুনো, হাত সরু তার ঠাং ফুলো।
ডাকপেয়াদা, শুনছ দাদা? দেখছ তো ওই অন্ধকার?
আজকে যে লোক হাঁটবে পথে কপাল ভারী মন্দ তার।
ঘ্যাঘোর গিন্নি নাকেশ্বরী পুকুরপাড়ে শিল কুড়োয়।
খোক্কসেরই বাচ্চা কাঁদে, পেঁচো এসে খিলখিলোয়।
গোরস্থানে ঢুলছে বসে মামদো-ভূতের বিশ পিসে,
বেম্মদত্যি পইতে মাজে, রংটা কালো মিশমিশে।
আজকে রাতে একানোড়ে নাচছে চড়ে তালগাছে,
ডাকপেয়াদা, ঘরে থাকো, আজ বাদে তো কাল আছে!

তার চেয়ে ভাই, জমবে এখন তোমার মুখের গল্পটা,
কত দেশেই বেড়িয়ে বেড়াও—নয় সে বড়ো অল্পটা।
আছে কি ভাই, নদীর পারে তেপান্তরের ঘুমপুরী?
রুপোর খাটে কন্যে ঘুমোয়,—সত্যি সে কি সুন্দুরী?

বলতে পারো, সাতভাই-চম্পা ফুটে আছে কোনখানে?
রাজার ছেলে কোন পথে যায় পক্ষীরাজের সন্ধানে?

আদর ছড়া

ও আমার!
ধিনতাধিনা পাকা-নোনা,
নাচ ধরেছে খোকন-সোনা।
থাম রে তোরা, করিসনে গোল—
নইলে ভোঁদড় মারবে ঠোনা!
আয় রে ছুটে ভুঁড়োশেয়াল!
ন্যাংটা নাগার দেখ সে খেয়াল
দুলছে কেমন ফুলের মালা,
বাজছে কেমন জোড়া ঘুঙুর

ন্যাজ ঝোলারা ডালে বসে
শুনছে কেবল ঝুমুর ঝুমুর।
ট্যাপাটোপা ট্যাপারিটি
গাল দুটি ঠিক গোলাপ-পাতা!
জোছনা-মাখা দাঁতগুলি যে
হেঁট করে দেয় চাঁদের মাথা!
দেখবে এসো দাঁতে মিশি
বন-কাপাসি মাসি-পিসি!
বন থেকে আয় বেরিয়ে টিয়ে
খোপ থেকে আয় বকম-বকম
কদম ফুলের মৌমাছিরা
দেখ সে খোকার রকম-সকম!

ভুরু দুটি আলতো আঁকা
চোখদুটি ওর ঢুলুঢুলু
যাদুমণির হাসির সুরে
ফুটছে নদীর কুলু-কুলু।
ওরে আমার বুলবুলিটি!
নরম নরম ক্ষীর-পুলিটি!
ওরে আমার পুঁচকে মাতাল!
আবোল-তাবোল ময়না পাখি!
আমার ঘরে এলি মানিক,
সাত-রাজাকে দিয়ে ফাঁকি!

শান্ত ছেলে

দুড়ুম-দড়াম, ঝন-ঝনা-ঝন! বাপ রে, একী ধুমধাড়াক্কা!
কাঁপছে বাড়ি, ঝরছে বালি—বুকের ভিতর ঢেঁকির ধাক্কা!
ওই যাঃ! বুঝি ভাঙল শার্সি,
গুঁড়িয়ে গেল দেয়াল আরশি!
কে আছিস রে, দেখ রে গিয়ে ফাটল বুঝি মাথার খুলি!
শুনলুম শেষে হাবুবাবু খেলছেন ঘরে ডান্ডাগুলি!

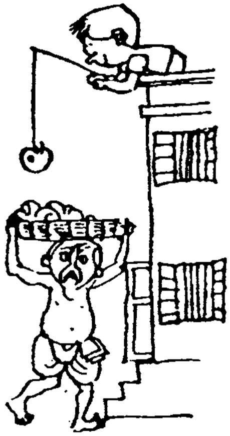

হাবুবাবু ঠান্ডা ছেলে, বাপের ক্ষুরে পেনসিল কাটেন,
পুরুতঠাকুর বসলে পুজোয় ক্যাচ করে তাঁর টিকি ছাঁটেন
লম্বা সুতোয় বড়শি গেঁথে
ছাদের ধারে ওতটি পেতে,
হাবু আছেন ঘুপটি মেরে, পথ দিয়ে যায় ফিরিওলা,
ঝাঁকা থেকে অমনি তাহার ফল কী খাবার টেনে তোলা।

হাবুবাবু লক্ষ্মী ছেলে ঘরের মেঝেয় গাব্বু খোঁড়েন,
খোকার মাথায় লাট্টু ঘোরান, খুকির পিঠে ধনুক ছোড়েন।
এয়ার-গানটা কাঁধে নিয়ে,
শিকার করতে সেদিন গিয়ে,
জলের কুমির পেলেন নাকো, দ্যালের গায়ে টিকটিকিটে,
মারতে তাকে, লাগল আমার চশমাটাতেই গুলির ছিটে!

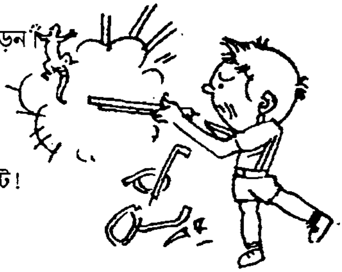

হাবুর ফুটবল সেদিন গিয়ে পড়ল পাশের বাড়ির ভেতর,
কর্তা তাদের চটে বলেন—'বল দেব না আজকে রে তোর।
ছেলেপুলের ভাঙবে মাথা
ওরে গোঁয়ার, জানিস না তা?'
হাবু বলে কাঁদো-মুখে, 'ভয় কী তোমার ছেলে গেলে?
একটি মোটে বল যে আমার, তোমার আছে সাতটা ছেলে।'

হাবুবাবুর ভরসা কত! চ্যাটালো তার বুকের পাটা!
দিনের বেলায় মারতে পারেন ভূতের টাকে দশটা চাঁটা!
বোনের পায়ে ল্যাং লাগিয়ে,
হারিয়ে তারে দ্যান ভাগিয়ে—
সন্ধে হলেই চক্ষু বুজে, এক্কেবারে খুলে জামা
মায়ের বুকে লুকিয়ে বলেন, 'ভূতের গল্প শুনব না মা!'

হট্টমালার যজ্ঞিবাড়ি

হট্টমালার ছোট্ট দেশে অট্ট-গোলের রান্না
আসল 'সোনার পাথর-বাটি' দৌড়ে গিয়ে আন না।
বারো-'হন্দী' কাঁকুড়ের ওই বিচির বহর মস্ত,
মাপলে হবে একেবারে পাকা তেরো হস্ত।
'ঘন্ট' খাবে? ঘন্ট তারই হচ্ছে ওরে রন্ধন,
খোকন, তুমি বোকনো বাজাও, আর কোরো না ক্রন্দন।
আস্তাবলে টাট্টু ঘোড়া প্রত্যহ দেয় ডিম্ব,
পট্ট-বাঁশের 'ষষ্টি-মধু',—নয় তো তেতো নিম্ব।
'বুনো-ওল' আর 'বাঘা-তেঁতুল' ভীষণ-রকম মিষ্টি,—
'ছাই-ভস্মের' খেচরান্নে নোলায় ঝরে বিষ্টি।
'দগ্ধকচু'র মোরব্বাতে ভুর-ভুরে কি গন্ধ,
গবগবিয়ে গিলছে গবা চক্ষু করে বন্ধ।
'আচাভূয়ার বোম্বা-চাকে' ঝরছে মধুর বিন্দুই,
ছুচুন্দরের ছ্যাঁচড়া খেলে রয় না খিদে দিন-দুই।
গাছপাকা এক কাঁঠাল দিয়ে হয় খাসা আমসত্ত্ব,
মাগনা পেয়ে টাকনা দিলেই বুজবে ভুঁড়ির গর্ত্ত।
'উড়ুম্বরের-পুষ্প'-ভাজা খাচ্ছে খেঁদা গোষ্ঠ,
কোঁতকোঁতিয়ে ঢোক গিলে আর ফাঁক করে দুই ওষ্ঠ।
'সরষেফুলে'র নাম শুনেছ, চেকেছ তার খাট্টা?
এগিয়ে এসে খাও তবে কিল তিনশো-সাড়ে-আটটা।
কাঁটা-মনসার দুগ্ধ ঢেলে হচ্ছে তোফা রাবড়ি,
উচ্চিংড়ের মালাই-কারি না খেলে দেয় দাবড়ি।
'ঘেঁচুর চাটনি' চাটিয়ে যখন বলবে খেতে 'খাবিং',
তখন কিন্তু পালিয়ে এসো লাগিয়ে মুখে 'চাবিং'।

বাদলা

হো হোঃ হো হোঃ! বিষ্টি ঝরে,
জলের ছাটে ছিষ্টি ভরে!
করলে ফুটো আকাশটাকে,
বাঁশবাগানে বাতাস ডাকে,

মেঘ মাতিয়ে সাজল বাদল,
দুমদুমিয়ে বাজল মাদল,
কোন সাপুড়ে ধমকে ওঠে,
বিজলি-সাপ ওই চমকে ছোটে!

তাল-পুকুরের রাণায় রাণায়,
জল উঠেছে কানায় কানায়,
একসা হল খাল-বিলেতে,
লাফায় মাছের পাল ঝিলেতে।

বান ডেকেছে ষাঁড়াষাঁড়ি,
রোদ-মেঘেতে আড়াআড়ি,
দিন-দুপুরেই রাত করেছে,
আবছায়াতে আঁত ভরেছে।

মা, তোর খোকার দিস খুলে সাজ,
কেউ যাবে না ইশকুলে আজ,
যেমনি ছুটি সুয্যি-মামার,
তেমনি ছুটি বুঝছি আমার!

বাগিয়ে ধরে মাথার ছাতায়,
নৌকো গড়ে পাতার খাতায়,
কী মজা ভাই, ভাসাই যদি—
বাইবে নিজে কাঁসাই নদী!

নৌকোখানি ছুটবে দুলে,
কাগুজে পাল উঠবে ফুলে,
কঙ্কাবতী ডাকবে তারে—
ড্যাঙাতে আর থাকবে না রে!

ক্ষীর-সাগরে খানিক গিয়ে,
সাত-রাজার-ধন মানিক নিয়ে
নৌকো আবার ভাসবে ধীরে,
আমার কাছে আসবে ফিরে!

মেঘলা হাওয়ার চুমকুড়িতে,
আজকে কি ভাই ঘুমপুরীতে,
রাজার মেয়ে উঠল বসে,
নয়ন-কমল ফুটল ও সে!

তেপান্তরের স্যাঁতলা মাঠে,
রাজার ছেলে একলা হাঁটে।
হেথায় মেয়ে—হোথায় ছেলে,
প্রাণ এসেছে কোথায় ফেলে।

কাজলা মেঘের বিষ্টি ঝরে—
ছিষ্টি কালোকিষ্টি করে!
ময়ূর ডাকে বনের ভেতর,
সাধ জাগিয়ে মনেতে মোর,

পদ্মমধু কে খাবি আজ—
ফুলের মেলায় যে যাবি, সাজ!
টাপুর-টুপুর বিষ্টি-ঝরা,
জলছবি দেখ, দিষ্টি-ভরা!

ঠাকুমা গো! গল্প যা-হয়
শোনাও—তবে অল্প না-হয়!
সাতটি চাঁপার বোনের কথা,
দুয়োরানির মনের ব্যথা!

জপের মালা আজকে তোলো,
ঠাকুরঘরের কাজকে ভোলো!
গল্প বলো মিষ্টি করে—
ঝাপসা আলোয় বিষ্টি ঝরে!

বাঁকা-শ্যামের ব্যায়রাম

রেগে করে গজ-গজ,
বাড়ি ওর বজ-বজ,
বাঁকা শ্যাম বেঁচে আছে গিলে খালি সালসা!
দাও যদি শরবত,
মুখ হবে পর্বত,
লাথি মেরে ভেঙে দেবে মেঠায়ের মালসা!
দিতে এলে দই-টই,
মানা করে পই-পই,
আঁত তার ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ খেতে দিলে কুলপি!
নেই কিছু রস-কস,
রুখু চুল খস-খস,
দাড়ি-গোঁফ চাঁচে বটে, কামাবে না জুলপি!
প্রাণে নেই শখ-টক,
কেশে মরে খক খক,
যায় নাকো পুকুরেতে, পাছে হয় মগ্ন!
শুঁকবে না ফুল-টুল,
পুষবে না বুলবুল,
মুদবে না চোখ আর দেখবে না স্বপ্ন!
ফুট-ফুটে জোছনায়,
সালসা সে রোজ খায়,
আর খায় ছাঁচি-পানে মিঠে-কড়া দোক্তা।
বড়ো বড়ো ডাক্তার,
লুটে নেয় ট্যাঁক তার,
আসে-যায়, বোঝে নাকো এ কেমন রোগ তা!
'হা হা হু হু জান যায়!'
এই বলে গান গায়,
দিনে দিনে বেড়ে ওঠে ডাহা আমপিত্তি!
হাড়ে নেই মাস-টাস,
বিছানায় হাঁসফাঁস,
ঠ্যাং ছোড়ে খুব জোরে মাথা কুটে নিত্যি!
কবিরাজ রামধন,
শেষে বলে—'শ্যাম, শোন,—
ভালো যদি হতে চাস, মোর কাছে যাস তো!'
গেল শ্যাম ঠুক ঠুক,
দেখে তার মুখ-বুক,
দিল তাকে সালসা না,—খাবি খেতে আস্ত!

শ্যাম বলে, 'জয় জয়!
নেই আর ভয়-টয়!'
চিৎ হয়ে খেল খাবি, বার করে দন্ত!

সেরে গেল রোগ তার,
যত-কিছু ভোগ আর,
কবিরাজ রামধন সোজা লোক নন তো।

হাবুবাবুর মনের কথা

আবার এসো দুগ্‌গা-ঠাকুর, কৈলাসের ওই কোণ হতে,
নতুন কাপড়, নতুন জুতো জুটবে তোমার দৌলতে!
দুগ্‌গা-ঠাকুর! একটি কথা আমায় তুমি দাও বলে,
থাকতে এমন বাপের বাড়ি, আবার কেন যাও চলে?
শ্বশুরবাড়ি শ্মশান তোমার, বরটি তোমার আস্ত সং,
ট্যাক্সি-মোটর চোখের বালি, চড়তে ষাঁড়ে ব্যস্ত হন।
ভাং খাবে আর টানবে গাঁজা, রুক্ষ্ম জটায় গোখরো সাপ,
শ্যাঙাত যত দৈত্য-দানা, ভূতের ছানা—বাপ রে বাপ!
নেই সেখানে যাত্রা এমন, লাফ মারে না বীর হনু,
ভীমার্জুনের নেইকো গদা, হুহুঙ্কার আর তির-ধনু,
বরফ পড়ে রাত্রি-দিনই, শীতের চোটে প্রাণ কাঁপায়,
সর্দি হাঁচির অত্যাচারে সুয্যি-চাঁদের ট্যাঁকাই দায়!
রসগোল্লা কোথায় পাবে, নেই সে দেশে বাগবাজার,
শিব ভিখারি,—দেয় না এনে মটুক তাগা চন্দ্রহার!
শ্মশানেতে হাট বসে না—শক্ত জোটা মালসাটাও,
গণেশদাদার অসুখ হলে কৈলাসে কি সালসা পাও?
ডাল-ভাতে-ভাত তাও জোটে কি? পাওনা বোধহয় অম্বলও?
এমন দেশেও দেবতা থাকে! আরে ছো ছো রাম বলো!
আছ হেথায় রাজভোগে আর অঙ্গে রানির সাজ পরো,
এসব কি মা ছাড়তে আছে?—তার চেয়ে এক কাজ করো!
শ্বশুরবাড়ি আর যেয়ো না, শিবের কথা যাও ভুলে,
সারা-বছর পুজোর ছুটি পাই তাহলে ইশকুলে।
হিস্ট্রি-গ্রামার-ব্যাকরণের ভক্ত হবে উইপোকা,
বন্ধ হবে মাস্টারদের বেত-নাড়া আর তাল-ঠোকা!

মা-বাবা আর খেলতে দেখে বকবে নাকো কান ধরে,
আমরা খালি যাত্রা দেখে হাসব হো হো প্রাণ ভরে!
ঠাকুর, তোমার হোক সুমতি, আর যেয়ো না পায় পড়ি!
আমার কথা শুনলে পাবে রোজই পাঁঠার চচ্চড়ি!

শীত

আদ্দি-কালের বদ্দি-বুড়ি, বৃদ্ধ শীতের ধাই!
ছেলে তোমার হিম-সাগরে মারছে কেবল ঘাই!
সাঁতার-খেলার হিমের ছিটে,
দেয় ভিজিয়ে পৃথিবীটে,
হিমালয়ের গর্তে শুয়ে তুলছ তুমি হাই,
শীতব্যাটাকেও নাও না ডেকে,—নইলে মারা যাই!

দাঁত-ঠকঠক, বুক শির শির, কনকনানি খুব!
দখিন হাওয়া আজ বিবাগি, কোকিলগুলো চুপ!
চাঁদামামার মুখখানা চুন,
সর্দি লেগে হয় বুঝি খুন,
প্রাণের কাঁদন শিশির হয়ে ঝরছে রে টুপ টুপ,
আজ কুয়াশার ফানুস-ঢাকা পূর্ণিমার ওই রূপ!

বুড়ো শীতের ফোগলা মুখে বরফ-গোলা হাঁপ,
ঝাপটা মেরে দুনিয়াটাকে করলে বুঝি গাপ!
কোত্থেকে যে জুটল অবুঝ,
শুকিয়ে দিলে বনের সবুজ,
ফুলের সাথে হয় নাকো আর মৌমাছির আলাপ,
শিকার-রাতের স্বপন দেখে গর্তে ঢুকে সাপ!

বদ্দি-বুড়ি ঢুলছে তবু, ওই তো বুড়ির দোষ!
লক্ষ বছর নিদ্রা দিয়েও মিটল না আফসোশ!
ঠান্ডাতে বুক যায় কালিয়ে,
পথ থেকে সব আয় পালিয়ে,
আংরাটাতে কয়লা দিয়ে, চারপাশে তার বোস!
বন্ধ করে জানলা-দুয়ার, আন রে বালাপোশ!

পালোয়ান প্যালারাম

হাঁপ ছেড়ে হুস হুস ভাঁজি কষে ডম্বল,
খাসা আছি! হয়নাকো জ্বর, কাশি, অম্বল।
মহাবীর হব আমি, লেখা আছে কুষ্টিতে,
খ্যাপা হাতি কুপোকাৎ, এত জোর মুষ্টিতে!
আমাদের গুষ্টিতে একা আমি পালোয়ান—
শীতকালে ঘেমে মরি, চাইনাকো আলোয়ান!
টপাটপ ডন দিই, খপাখপ বৈঠক,
দৌড়েতে হারে রানা প্রতাপের 'চৈতক' !
চড়িনাকো এনে দিলে 'ফিটন' কি 'ল্যান্ডো'ই,
হাঁটি দশ-বিশ ক্রোশ— কোথা লাগে স্যান্ডোই!
চোর-টোর আসে নাকো আমাদের রাস্তায়,
ভ্যারেণ্ডা ভেজে শুধু গুণ্ডারা ঘাস খায়!
মাস্টার মারে বটে বিষ্টু ও কেষ্টকে,
মোর কাছে হেসে বলে— 'ভালোবাসি বেশ তোকে!'
সাঁতারেতে গাং পার — লাফে পার পর্বত,
তেষ্টাতে গিলি খালি বাদামের শরবত!
ভোরবেলা উঠে রোজ পাঁঠা গিলি আস্ত হে,
একমন মাছ খেলে হয়নাকো দাস্ত হে!
পাঁচ হাড়ি দইয়ে গুলে গুটি ত্রিশ মণ্ডা গো,
তার সাথে দাও যদি রুটি বিশ গণ্ডা গো,
ফাউ চাই সের-বারো বোঁদে, গজা, রসকরা,
তাইতেই ভরে পেট, ভেব না এ মশকরা!
পেটুক তো নই আমি ক্ষুধা মোর অল্পই,—
হাসছ যে? ভাবছ কি এটা গাল-গল্পই?
ফের হাসি, বেয়াদব! আমি তবে রাগবই,
আখড়ায় ছুটে গিয়ে 'বীর-মাটি' মাখবই,
তাল ঠুকে দেব হুঁ-হুঁ, হা-রে-রে-রে হুঙ্কার,
তাই শুনে, হাসবে যে মুখ হবে চুন তার!
হতে পারি আমি যাদু, রোগা, বেঁটে-খর্বুটে,
দিতে পারি তবু তোর ভিরকুটি ছরকুটে!
ক্রোধানল জ্বলে যদি, কিছুতেই ক্ষমা নয়,
অতিশয় তাড়াতাড়ি যাবে বাছা যমালয়!

উলটো-বাজির দেশে

কালকে আমি গিয়েছিলুম উলটো-বাজির দেশে।
এমন দেশটি আর পাবে না,—সবই সর্বনেশে!
রামের সেথায় নেইকো ধনুক, নেইকো ভীমের গদা,
শ্যামের বাঁশির নাম শোনেনি হেবো, মোনা, পদা!
সীতা সেথায় যাননি বনে, রাবণ আজও জ্যান্ত,
হনুমানের নেইকো লাঙুল—লম্ফত্যাগে খ্যান্ত!
সিংহ থাকে শহরে ভাই—বনের ভেতর মানুষ,
নৌকো ওড়ে আকাশ দিয়ে, জলেই ভাসে ফানুস!
ব্যাঘ্র সেথায় ভক্ত ঘাসের, হাড়ডি চেবায় ছাগল,
পণ্ডিতেরা মুখ্যু সেথায়, পদ্য লেখে পাগল!
প্যাঁচারা ভাই গানের রাজা, কোকিলগুলো বোবা,
পইতে-টিকি পুড়িয়ে ফেলে হিন্দু বলে 'তোবা'!
হস্তীগুলো বিশ্রী রোগা, ফড়িংগুলো ষণ্ডা,
বাঁদর বসে অঙ্ক কষে ছ-কুড়ি দু-গণ্ডা!
নিদ্রাতে ভাই নাক ডাকে না, খেলেই বাড়ে ক্ষুধা,
ঘোটক চালায় মানুষ-গাড়ি,—সাপের মুখে সুধা!
মোছলমানের নেইকো দাড়ি, নিগ্রোরা সব সাদা,
সাহেবগুলো ভূতের মতো; বোকারা নয় হাঁদা!
চাকর-দাসী হুকুম চালায়, মনিব বলে হুজুর!
মানুষ দেখে মামদো পালায়, মুখ চুন হয় জুজুর!
প্রজারা সব রাজ্য করে, রাজা জোগায় খাজনা,
হারমোনিয়াম ফেলে সবাই শোনে ঢাকের বাজনা!
মণ্ডা-মেঠাই খায়নাকো কেউ, খায় চিরেতা-নালতে,
উনুনটাকে জ্বালতে হবে সাত-ঘড়া জল ঢালতে!
মাস্টারেরা ডুকরে কাঁদে, ছাত্র মারে বেত্র,
মরুভূমির বুকেই নাচে সবুজ ধানের ক্ষেত্র!
রবিবারে ইশকুলেতে কামাই হলেই ফাইন,
বাকি ছ-দিন খেলতে পারো,—এমনি ধারাই আইন!
মেয়েরা সব কর্তা সেথায়, পুরুষ ভারী বাধ্য,
মরলে মানুষ হাসতে হবে; জ্যান্তে করে শ্রাদ্ধ!
স্ত্রীলোকেরা আপিস করে গলায় দিয়ে চাদর,
অন্দরেতে পুরুষ যত খোকায় করে আদর!
ছোকরারা সব শান্ত-সুবোধ, বৃদ্ধেরা সব দস্যি,
চুরুট ফোঁকে নাক দিয়ে আর কর্ণে গোঁজে নস্যি!
চোর-ডাকাতে বিচার করে, সাধু পচেন জেলে,
দুষ্টু বাপের কানটি মলে শাসন করে ছেলে!
অন্ধকারে দিন কেটে যায়, সুয্যি আসে রাত্রে,
ভিক্ষুকেরা ভিক্ষে করে পক্ক সোনার পাত্রে!

আকাশ পড়ে পায়ের তলায়, মাথার ওপর মাটি,
সত্যি মানে মিথ্যে এবং নকল মানে খাঁটি!
কী ভয়ানক উলটো-বাজি!—বলতে আসে কান্না,
শুনলে পরেও মন দমে যায়, ক্ষান্ত হলুম—আন্না!

আজব দেশ

এক যে আজব দেশ আছে ভাই, মিথ্যে এ নয়, খাঁটি,
ও তার মাথার ওপর আকাশ সদাই, পায়ের তলায় মাটি!
শুনলে তুমি অবাক হবে, নদীতে ঢেউ খেলে,
খিদের সময় পাবেই খিদে, মরে না কেউ খেলে!
বর্ষা এলে মেঘগুলো বাপ, চ্যাচায় গুড়ু গুড়ু,
বনের পাখির ডানাগুলো কেবল উড়ু-উড়ু!
সমুদ্দুরের জলেতে ঠিক নীল-পেনসিল গোলা,
জ্যান্ত মানুষ জলে ডোবে, কিন্তু ভাসে সোলা!
পাহাড়গুলো বেড়ায় নাকো, হয়ে থাকে অটল,
নাক দুটোকে ধরলে টিপে, মানুষ তোলে পটল!
অমাবস্যের অন্ধকারে মোটেই যায় না দেখা,
দিনের বেলায় চাঁদ ওঠে না, সুয্যিমামা একা!
ঘুমের সময় নাকগুলো সব চেঁচিয়ে ডাকতে থাকে,
মন্ডা-মেঠাই ফেলে না কেউ, ভুঁড়ির ভেতর রাখে!
মাকে সবাই বলে 'মাতা', বাবাকে কয় 'বাবা',—
অন্ধ-লোকের চোখ ফোটে না, বোবারা হয় হাবা!
মেয়েদের ভাই গজায় না গোঁফ, পুরুষদের নাই খোঁপা,
নাপিত সেথায় চুল ছাঁটে আর কাপড় কাচে ধোপা!
নাকে সেথায় নস্যি দিলে হাঁচবে জোরে হ্যাঁচ্চো!
কুকুর যদি তাড়া লাগায়, বেরাল করে—'ফ্যাঁচ্চো'!
বলব কী ভাই, আজব দেশে সবই উলটো ব্যাপার,
শীতকালেতে সবাই চড়ায় মোজা, গেঞ্জি, র‍্যাপার!
মুন্ডু দিয়ে কেউ হাঁটে না, হাঁটে সবাই ঠ্যাঙে,
ছিপ ফেলে লোক মাছই ধরে,—ধরে নাকো ব্যাঙে!
পিছলে যদি যায় কারু পা, আছাড় খাবে দড়াম—
ভুঁইপটকা ছুড়লে খোকা আওয়াজ হবে গড়াম!
বেঁটেরা হয় খাট্টো এবং ঢ্যাঙা মস্ত লম্বা,
মুখ্যু-ছেলে ইশকুলেতে খায় হে অষ্টরম্ভা!
অঙ্কগুলো শক্ত বড়ো, যায় না বোঝা কিচ্ছু,
বাঁদর কাঁদে কিচির-মিচির কামড়ে দিলে বিচ্ছু!

কাতুকুতু দিলে হাস্য আসে হো হো হি হি,
হাততালিতে অশ্ব লাগায় বেজায় চোঁ-হো চি-হি!
রাত্রি হলে হুতোম হাঁকে হুমহুমাহুম হুম হে!
দস্যি ছেলের পৃষ্ঠে পড়ে দুমদুমাদুম দুম হে!
তানসেনেরা গান করে যেই 'সা-রে-গা-মা-পা-ধা'—
তার সনেতে তান ধরে সেই মাধাই ধোপার গাধা!
আর এক কথা শুনলে সবাই হতভম্ব হবে—
টিকটিকিরা চ্যাঁচায় নাকো হাম্বা হাম্বা রবে!
আজব দেশে এমনিতরো কাণ্ড নানান খানা,
তোমরা যদি মিথ্যে ভাবো, বলব 'তা না না না'!

দুপুরে

চোখ পড়ে ঢুলে গো, মন পড়ে ঢুলে গো,
তপনের মায়াতে,
চোত গেছে পালিয়ে, তাপ-শিখা জ্বালিয়ে,
স্বপনের ছায়াতে।

ফটিকের ধারা কই, চাতকেরা সারা ওই,—
বুক হল মরু যে!
সুর-ভোলা পাপিয়া! মূর্ছিত কাঁপিয়া
বকুলের তরু যে!

কাছে আর সুদূরে, দুপুরের নূপুরে,
হু-হু তান আগুনের,
শোনা যায় ক্ষিতিতে, শুধু আজ স্মৃতিতে
'কুহু' গান ফাগুনের!

গোলাপের রেণু নাই, প্রলাপের বেণু তাই
বাতাসেতে গুঞ্জে,
একি কাল-বেলি এ, কুঁড়ি তাই এলিয়ে
হুতাশেতে কুঞ্জে!

রাখাল সে ঘুমিয়ে, বাঁশি-মুখ চুমিয়ে,
ধূপ-শুকো হাওয়া রে!
মহিষেরা কর্দম মাখে শুধু হর্দম!
আর খোঁজে ছাওয়া যে!

ঘু-ঘু-ঘু ওই ডাকে নির্জনে বৈশাখে
কোথা দূর বনেতে,

রোদ-ভরা পথ দিয়ে, প্রাণ-ভরা ঘুম নিয়ে
আসে সুর মনেতে!

ঘু-ঘু-ঘু ডাকেরে, মরমের ফাঁকেরে
ছায়া মাখা ছন্দে,
যেন সুর নাচেরে, করুণায় যাচেরে,
ঘুমেরই আনন্দে!

ঘু-ঘু-ঘু আসে গীত, আকাশে ভাসে প্রীত,
সাথে নিয়ে তন্দ্রা,
চোখ পড়ে ঢুলে গো, মন পড়ে ঢুলে গো,
তাপে আনে চন্দ্রা!

চৈনিক চৈতন-চুটকি

স্বপনে কাল পেয়েছিলাম আলাদিনের প্রদীপ রে ভাই!
ঘষতে প্রদীপ সামনে হাজির মস্ত বড়ো দৈত্যমশাই!
বললে আমায়—'খোকাবাবু! ডাকলে কেন! কী চাই বলো?'
বলনু আমি—'আলিবাবার রত্নগুহায় নিয়ে চলো?'

গেলাম সেথায়, কাসিম-মিয়া শুনলে যেথায় শমন-ডাক।
চল্লিশজন দস্যু সেথায় আর বলে না—'চিচিং-ফাঁক'!
গুহা আছে—মোহর তো নেই! কলশিগুলো ফক্কা হায়,
সাত-রাজার-ধন মানিক-টানিক কিছুই এখন নেই সেথায়।

বেরিয়ে এসে বলনু আমি—'শুনো শুনো দৈত্যবর!
বলতে পারো, সিন্দবাদের রক-পাখিদের কোথায় ঘর?'
দৈত্য বলে—'রক-পাখিদের বধ করেছে স্বয়ং যম,
বাসা তাদের উড়িয়ে দিলে হিরোসিমার অ্যাটম-বোম!'

বলনু আমি—'গল্পে শুনি তুমি নাকি একদিনেই
তৈরি করে দিয়েছিলে সাতমহলা প্রাসাদকেই?'
হাহা-হোহো হাস্য করে বললে দৈত্য-জাঁহাবাজ—
'আরে সে যে তাদের প্রাসাদ, তৈরি করা শিশুর কাজ!'

জিজ্ঞাসিনু—'হ্যাঁগো দাদা, আলাদিনের বংশধর,
সাকিন তাদের কোথায় এখন, জানো কি ভাই তার খবর?'
'আটশো বছর বয়স আমার, ঠিকানা আর নাইকো স্মরণ,
দেখবে খোকা, জবর জিনিস? কাছে আছে চিনে-চৈতন।'

'চিনে-চৈতন? বাক্যি শুনে হচ্ছি দাদা হতজ্ঞান!'
'চৈতনকেই টিকি বলে বাংলা ভাষার অভিধান।
শেষ-বিদায়ের দিনে আমায় বলেছিলেন আলাদিন—
'আমার মাথার এই টিকিটি নাও উপহার তুমি জিন'!'

আলাদিনের চিনে-চৈতন লম্বায় প্রায় আটাশ ফিট,
তাই দিয়ে কেউ রাখলে বেঁধে পাগলা হাতি হবে টিট।
চোখ পাকিয়ে দেখতে গিয়ে মিলিয়ে গেল স্বপ্নলোক,
জাগরণের দেশে এলাম দু-হাত দিয়ে কচলে চোখ।

গল্প

হাবুবাবুর কীর্তি কাহিনী

আমি হচ্ছি হাবুবাবু, আমাকে মা ভালোবাসেন, বাবা ভালোবাসেন, সবাই ভালোবাসেন।

আমি যেমন লক্ষ্মী ছেলে, আমার বুদ্ধিও খেলে তেমনি। সেদিন দুপুর বেলায় বাবা শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। ঘুমোতে ঘুমোতে ডাকছিল বাবার নাক।

হঠাৎ আমার মনে হল আচ্ছা,—ঘুমোলেই বাবার নাকের ভেতর থেকে অমন-ধারা বেয়াড়া আওয়াজ হয় কেন? আমিও তো ঘুমোই, কিন্তু আমার নাককে তো ডাকতে শুনিনি! (অল্পক্ষণ নীরবে ভাবিয়া) হুঁ, ঠিক হয়েছে! বাবা যেই ঘুমোন, অমনি একটা দুষ্টু ঝিঁঝি পোকা সাঁৎ করে বাবার নাকের ভেতরে ঢুকে পড়ে! তারপর সেখানে আরামে বসে বসে গান গাইতে শুরু করে! দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা!—চট্ করে একটা সন্না নিয়ে এলুম। এই সন্না দিয়ে ঝিঁঝি-পোকাটাকে ক্যাঁক করে চেপে ধরব, তারপর ব্যাটা আর যায় কোথায়!

দিলুম সন্নাটা বাবার নাকের ভেতরে সড়াৎ করে ঢুকিয়ে। অমনি ঝিঁঝি ব্যাটার গান গেল থেমে, কিন্তু বাবা উঠলেন "ওরে বাবারে, গেছিরে" বলে চেঁচিয়ে! মা ছুটে এলেন "কি হলো কি হলো বলে! বাবার নাক দিয়ে তখন ঝর্‌ঝর্ করে রক্ত পড়ছে, ঝিঁঝি পোকাটার পিণ্ডি নিশ্চয়ই চট্‌কে দিয়েছি!

আমি বললুম, "বাবা, তোমার নাকের ভেতরে একটা ঝিঁঝিপোকা ঢুকেছিল কিনা, তাই—"

বাবা চেঁচিয়ে বললেন, "তোর মুণ্ডু হয়েছিল রে হতভাগা! এঃ, আমার নাকের দফা রফা করে দিয়েছে!"

তারপরেই বাবা তুললেন ঘুষি, মা তুললেন চড়,—বেগতিক বুঝে আমি পড়লুম সরে!

তবু, আমি হচ্ছি হাবুবাবু, আমাকে মা ভালোবাসেন, বাবা ভালোবাসেন, সবাই ভালোবাসেন।

বাবা বলেন, ছেলেমেয়েদের কথায় নির্ভর করা উচিত। নইলে তারা নাকি মানুষ হতে পারে না। মা তাই আমার কথায় খুব নির্ভর করেন।

সেদিন একটা বোমা-লাটাই আর ক' কাটিম সুতো কেনবার জন্যে আমার দেড়টাকার দরকার হল। ঘোষদের পট্‌লা আর বামুনদের ফট্‌কে কাল থেকে বোমা-লাটাই নিয়ে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে; তাদের জাঁক আর সহ্য হয় না।

মা বসে বসে চন্দ্রপুলি গড়ছিলেন। থালা থেকে ধাঁ করে দুখানা চন্দ্রপুলি ছোঁ মেরে নিয়ে, টপ করে সেখানা মুখে ফেলে দিয়ে বললুম, "মা, আমাকে গোটাদেড়েক টাকা দাও তো!"

মা বললেন, "কেন বাছা, টাকা নিয়ে কি করবি?"

আমি বললুম, "সে একটা মজা হবে মা! দাও না টাকা!" বলেই আবার আমি চন্দ্রপুলির থালার দিকে হাত বাড়াচ্ছিলুম, মা কিন্তু তার আগেই থালাখানা আমার নাগালের বাইরে সরিয়ে রেখে বললেন, "যা এখানে আর গোল করিস্‌নে! আমার বাক্সে খুচরো দেড়টাকা আছে, তাই নিয়ে বিদেয় হ! কিন্তু দেখিস্ বাপু, বাক্সে একখানা পাঁচ টাকার নোটও আছে, ভুল করে সেখানা নিস্ নে!"

আমি তখনি গিয়ে বাক্স খুললুম। পাঁচ টাকার নোটখানা নিয়ে পট্‌লা আর ফট্‌কের দর্পচূর্ণ করতে ছুটলুম।

তার পরদিন সকাল বেলায় বাবার সামনে আমাকে ধরে এনে মা বললেন, "হ্যাঁরে হেবো, কাল আমি তোকে পাঁচটাকার নোটখানা নিতে মানা করেছিলুম না?"

আমি বললুম, "হ্যাঁ মা, তুমি আমাকে বলেছিলে, যেন আমি ভুল করে পাঁচটাকার নোটখানা না নিই।"

মা বললেন, "তবে?"

আমি বললুম, "কেন মা, আমি তো তোমার কথা মতই কাজ করেচি! আমি ভুল করে নোটখানা নিইনি,—জেনে-শুনেই নিয়েচি!"

বাবা আমার দিকে এগিয়ে আসতেই আমি সেখান থেকে অদৃশ্য হলুম।

কিন্তু তবু, আমি হচ্ছি হাবুবাবু, আমাকে মা ভালোবাসেন, বাবা ভালোবাসেন, সবাই ভালোবাসেন।

মাস্টারমশাই সেদিন বললেন, "হাবু, আজ স্কুলে যাওনি কেন?"

আমি দুঃখিতভাবে বললুম, "হায় হায় মাস্টারমশাই! আজ যে দুঃখের দৃশ্য দেখেচি, তাতে আর ইস্কুলে যেতে মন সর্‌ল না!"

মাস্টার বললেন, "তাই নাকি?"

আমি ফোঁস্ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম, "আমি ইস্কুলে যাব বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েচি, এমন সময়ে দেখি, ঘোষেদের ভোঁদা এক কোঁচড় মার্বেল কিনে পথের ওধার থেকে আস্‌চে। এমন সময়ে বলব কি মাস্টারমশাই, একখানা মোটর-গাড়ি—" বলতে বলতে আমার মুখ কাঁদো-কাঁদো হয়ে এল।

মাস্টার ব্যস্ত হয়ে বললেন, "অ্যাঁঃ, বল কি! তারপর তারপর?"

কাঁদো-কাঁদো গলায় আমি বললুম, "তারপর আর কি মাস্টারমশাই, সে দুঃখের কথা বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে! মোটর গাড়িখানা কাছে আসতেই ভয়ে ভোঁদার পা পিছলে গেল! আর অমনি সেই এক কোঁচড় মার্বেল কোঁচড় থেকে পড়ে গড়িয়ে গেল একেবারে ড্রেনের ভেতরে! তাই দেখে আমার আর ইস্কুলে যাওয়া হল না!"

মাস্টারমশাই আমার দিকে একবার কট্‌মট্ করে চেয়ে বাবাকে এই দুর্ঘটনা জানাতে গেলেন।

কিন্তু আমি হচ্ছি হাবুবাবু, আমাকে বাবা ভালোবাসেন, মা ভালোবাসেন, সবাই ভালোবাসেন।

ছোটকাকার রাজভোগ খেতে সাধ হয়েছে। আমায় ডেকে বললেন "যা তো হাবু, দু-আনার রাজভোগ কিনে আন্।"

আমি বললুম, "আমাকেও দেবে তো?"

ছোটকাকা নাচার হয়ে বললেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, এখন যা তো!"

খানিক পরে আমাকে মুখ মুছতে মুছতে শুধু-হাতে ফিরতে দেখে ছোটকাকা বললেন, "হেবো, আমার রাজভোগ কোথায়?"

আমি বললুম, "দু-আনায় মোটে একটা রাজভোগ দিলে!"

—"হ্যাঁ, তাইতো দেবে। কিন্তু সেটা কোথায় গেল?"

—"কেন ছোটকাকা, তুমি তো আমায় রাজভোগ দেবে বলেছিলে! আমার ভাগ আমি নিয়েচি। এখন আর দু'আনা পয়সা পেলেই তোমার ভাগ এনে দেব।"

ছোটকাকা আমার কান ধরতে এলেন, কিন্তু আমি ধরতে দিলুম না।

আমার চিৎকার শুনে মা এসে বললেন, "কিরে-হেবো, অমন ষাঁড়ের মতন চ্যাঁচাচ্চিস্ কেন?"

আমি বললুম "চ্যাঁচাচ্চি কি সাধে? তোমার আদুরে খোকা আমার চোখে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েচে!"

—"আহা, খোকা যে অবোধ। চোখে আঙুল দিলে লাগে, ও যে তা জানে না।" এই বলে মা চলে গেলেন।

খানিক পরেই খোকার পাড়া-কাঁপানো কান্না শুনে মা ছুটে এসে বললেন, "হাবু, হাবু, খোকা কাঁদে কেন?"

আমি পিঠ্‌টান দিতে দিতে বললুম, "খোকা এইবারে জানতে পেরেচে যে, চোখে আঙুল দিলে কেমন লাগে।"

তবু আমি হচ্ছি হাবুবাবু,—আমাকে মা ভালোবাসেন, বাবা ভালোবাসেন, সবাই ভালোবাসেন!

সাদা ঘুষি আর কালো ঘুষি

কালো-ধলোর যুদ্ধ হচ্ছে জগতের চিরকেলে যুদ্ধ।

পুরাণের সুর-অসুরের এবং ইতিহাসের আর্য-অনার্যের যুদ্ধও এই কালো-ধলোর যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নয়।

য়ুরোপ-আমেরিকার সঙ্গে এশিয়া ও আফ্রিকার যুদ্ধও প্রকারান্তরে ঐ কালো-ধলোর যুদ্ধই বলতে হবে।

একেলে ধলোরা একটা নতুন নাম আবিষ্কার করেছে—"রঙিন জাত।" চীনে, জাপানী, তাতারী, ভারতীয় ও কাফ্রি প্রভৃতি যে সব জাতির রং সাদা নয়, তাদের সবাইকেই ঐ একই কোঠায় ফেলে একই নামে ডাকা হয়।

একরকম ভালোই হয়েছে। এর ফলে সমস্ত অশ্বেত জাতির ভিতরে একটা একতার বন্ধন

সুদৃঢ় হয়ে উঠবে। এই জন্যেই কালো আবিসিনিয়ার বিপদে পীত জাপান চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

আবিসিনিয়ার সঙ্গে ইতালির ঝগড়া বাধবার উপক্রম হওয়াতে ইতালির কবি দান্নুনসিও খুব বড়াই করে বলেছিলেন —"কালো জাতের সঙ্গে যুদ্ধে আমরা কখনো হারিনি।"

এটা ডাহা মিথ্যা কথা। কারণ গেল শতাব্দীর শেষ-ভাগে ইতালি ঠিক যখন এখনকারই মতন বাজে ওজর দেখিয়ে আবিসিনিয়া দখল করতে গিয়েছিল, তখন অ্যাডোয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে সম্রাট মেনেলেকের হাতে তাকে যে কী বিষম মার খেয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছিল, ইতিহাসে সে কথা স্পষ্ট করে লেখা আছে।

কালোর উপরে ধলোর বড় রাগ! কার্নেরা ছিল ইতালির আদুরে মুষ্টিযোদ্ধা। কিছুদিন আগে একজন কাফ্রি মুষ্টিযোদ্ধার হাতে কার্নেরাকে ভয়ানক নাকাল হতে হয়েছিল। তাই ইতালির সর্বময় কর্তা মুসোলিনির রাগের আর সীমা-পরিসীমা ছিল না। এবং কার্নেরারও কেঁদে-ককিয়ে বলতে লজ্জা হয়নি যে, "কালোর হাতে আমি কখনো হারতুম না! কিন্তু কি করব, লড়াইয়ের আগে ওরা নিশ্চয়ই আমাকে বিষ-টিষ কিছু খাইয়ে দিয়েছিল!" বলা বাহুল্য, কার্নেরার এই ন্যাকামির কথা শুনে খালি কালোরা নয়, সারা পৃথিবীর ধলোরা পর্যন্তও না হেসে থাকতে পারেনি।

কৃষ্ণাঙ্গ মুষ্টিযোদ্ধার হস্তে শ্বেতাঙ্গের পরাজয় এই প্রথম নয়। অনেক দিন আগে কাফ্রি মুষ্টিযোদ্ধা জ্যাক জন্সনের পরাক্রমের কাহিনী 'মৌচাকে' আমি তোমাদের কাছে বলেছি।

পৃথিবী-জেতা মুষ্টিযোদ্ধা টমি বার্নস্ ও জিম জেফ্রিস্ এই মহাবীর জন্সনের হাতে পড়ে বেদম প্রহার খেয়ে প্রায় মারা যেতে যেতে বেঁচে গিয়েছিলেন বললেও চলে।

আমেরিকার সাহেবরা আগে জন্সন্কে খুব ভালোবাসত। কিন্তু কালো জন্সনের কবলে পড়ে সবচেয়ে বড় সাদা মুষ্টিযোদ্ধাদের দুরবস্থা দেখে আমেরিকানদের মন গেল বেঁকে। তারপর থেকে শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারে জন্সনের প্রাণ-বাঁচানো দায় হয়ে উঠল। এই বিপদ থেকে মুক্তিলাভের আর কোন উপায় নেই দেখে জ্যাক্ জন্সন্ তখন যেচে জেস্ উইলার্ড নামে একটা বাজে মুষ্টিযোদ্ধার কাছে হার মেনে শ্বেত-জগৎকে ঠাণ্ডা করলেন। মুখে স্বীকার না করলেও সে লড়াইটা যে সাজানো লড়াই, সমস্ত বিশেষজ্ঞই মনে মনে সে কথা জানেন। কারণ তারপরেও দশ-বারো বছর পর্যন্ত (অর্থাৎ জ্যাক্ জন্সন্ যখন প্রায় বুড়ো হয়েছেন) য়ুরোপ আমেরিকার অনেক বড় বড় জোয়ান মুষ্টিযোদ্ধাকেও তিনি ঘুষির চোটে ঠাণ্ডা করেছেন, কিন্তু কেউ তাঁকে হারাতে পারেনি। জন্সন্ জন্মেছিলেন ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ ৪৬ বৎসর বয়সেও তাঁকে হোমার স্মিথ নামে একজন বিখ্যাত ও যুবক মুষ্টিযোদ্ধাকে দশ রাউণ্ডের মধ্যেই হারিয়ে দিতে দেখি! যাঁরা মুষ্টিযুদ্ধের খবর রাখেন তাঁরা জানেন যে, এটা কি রকম অতুলনীয় ব্যাপার! তারপর জন্সন্ যখন পঞ্চাশ পার হয়েছেন, তখনো খবরের কাগজে পড়েছিলুম যে, মুষ্টিযুদ্ধ ছেড়ে তিনি কুস্তি লড়তে শুরু করেছেন। এবং এ বিভাগেও নাম কিনেছেন।

জন্সন্ আগে যখন-তখন বলতেন, "কালোরা যে সাদার চেয়ে কোন অংশে কম নয়, এইটেই আমি গায়ের জোরে প্রমাণিত করতে চাই।"

কেবল জ্যাক্ জন্সন্ নন, মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে দেখা যায়, এই বিভাগে বরাবরই কৃষ্ণাঙ্গের প্রতিপত্তি অত্যন্ত বেশি। পিটার জ্যাক্সন্, স্যাম্ ল্যাংফোর্ড, জো জেনেট্, স্যাম ম্যাক্ভে, জো ওয়ালকট্। জো গ্যানস্, ইয়ং পিটার জ্যাক্সন্, ইয়ং গ্রিফো, হ্যারি উইল্স্ ও জো লুইস প্রভৃতি নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধার নাম পৃথিবীতে আজ অমর হয়ে আছে।

কালো মুষ্টিযোদ্ধাদের সবচেয়ে মুশকিল হচ্ছে এই যে, তাঁদের শক্তির পরিচয় পেলেই বড়

বড় সাদা মুষ্টিযোদ্ধা আর তাঁদের সঙ্গে লড়তে রাজী হন না। জ্যাক্ জন্‌সন্ অনেক দিন অপেক্ষা করবার পর অনেক কষ্টে বার্নস্ ও জেফ্রিসের সঙ্গে লড়াইয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন। তারপর থেকে কিন্তু আর কোন শ্বেতাঙ্গ যোদ্ধা 'পৃথিবী-জেতা' উপাধি লাভ করে কোন কালো যোদ্ধার সঙ্গেই সম্মুখ-সময়ে অবতীর্ণ হননি। এই সেদিনও জ্যাক্ ডেম্পসি আর সকলকে হারিয়ে 'পৃথিবী-জেতা' উপাধি পেয়েছিলেন। হ্যারি উইলস্ নামে বিখ্যাত নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধাও অন্য সকলকে হারিয়ে দিয়ে ডেম্পসিকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। ডেম্পসি কিন্তু হারবার ভয়ে যুদ্ধে নারাজ হয়ে শ্বেত-জাতির মান বাঁচান। মান বাঁচাবার এর চেয়ে সোজা উপায় আর নেই!

উপরে যে পিটার জ্যাক্‌সনের নাম করেছি, বিশেষজ্ঞরা বলেন, তিনি নাকি জ্যাক্ জন্‌সনের চেয়েও বড় মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন। এবং তাঁর স্বভাবটিও ছিল এমন মিষ্ট যে, শ্বেতাঙ্গ না হলেও পিটার জ্যাক্‌সনের নামে য়ুরোপ-আমেরিকায় সকলেই আজও শ্রদ্ধায় মাথা নত না করে পারে না।

পিটার জ্যাক্‌সন্ জন্মেছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে। খুব অল্প বয়সেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর শ্বেতাঙ্গ বন্ধুরা পরলোকগত আত্মার প্রতি সম্মান দেখাবার জন্যে সেখানে একটি চমৎকার স্মৃতি-সৌধ তৈরি করিয়ে দিয়েছেন।

কোন শ্বেতাঙ্গ যোদ্ধাই পিটার জ্যাকসনের সামনে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারত না। যখন আর সকলেই হেরে গেল তখন স্থির হল, পিটারকে ফ্র্যাঙ্ক স্ল্যাভিন্ নামে অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় মুষ্টিযোদ্ধার সঙ্গে লড়াই করতে হবে। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে পিটারের সঙ্গে স্ল্যাভিনের এই চিরস্মরণীয় যুদ্ধ হয়। দুই যোদ্ধাই ছিলেন আকারে বিপুল ও দৈর্ঘে ছয় ফুট দেড় ইঞ্চি। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হবার অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল, পিটারের সামনে স্ল্যাভিন্ দাঁড়াতেই পারছেন না। মাত্র দশ রাউন্ড পরেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল, স্ল্যাভিন্ তখন অত্যন্ত কাহিল ও অসহায় এবং পিটারের দারুণ মুষ্টির প্রহারে তাঁর সর্বাঙ্গ থেঁত্‌লে ও ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে। স্ল্যাভিন্‌কে তখনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। খানিক পরে পিটারও সেখানে এসে হাজির। শয্যাশায়ী স্ল্যাভিনের হাত ধরে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত স্বরে বললেন, "বন্ধু, যুদ্ধে হার-জিত আছেই। আশা করি আসচে বারে তোমারই জিতের পালা আসবে।"

সেই সময় আমেরিকায় শ্বেত-জগতের সবচেয়ে বড় মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন জন. এল. সলিভ্যান্। এই ব্যক্তি লড়তে পারতেন যেমন ভালো, তাঁর মুখে লম্বা লম্বা কথারও খৈ ফুটত বেশী! পৃথিবীর কারুকেই তিনি যেন আমলেই আনতে চাইতেন না। পিটারের সমকক্ষ মুষ্টিযোদ্ধা যখন দুনিয়ায় আর কারুকেই পাওয়া গেল না, পিটার তখন সলিভ্যান্‌কে যুদ্ধের জন্যে ডাক দিলেন। কিন্তু সে ডাক শুনেই সলিভ্যানের সাহসের ভাণ্ডার ফুরিয়ে গেল। মান বাঁচাবার জন্যে তাড়াতাড়ি ওজর দেখালেন, "আমার গায়ের রং সাদা, কালা আদমির সঙ্গে আমি লড়াই করি না!" অথচ শ্বেতাঙ্গরা এই সলিভ্যান্‌কেই "পৃথিবী-জেতা" বলে গর্ব করতে লজ্জিত হন না।

স্যাম্ ল্যাংফোর্ড হচ্ছেন আর একজন অদ্ভুত মুষ্টিযোদ্ধা। মুষ্টিযুদ্ধের ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ একুশ বছর কালের ভিতরে তাঁর কাছে পরাজিত হননি, এমন বিখ্যাত শ্বেত-যোদ্ধা খুব কমই আছেন। এমন কি "পৃথিবী-জেতা" বলে বিখ্যাত হবার পরে জ্যাক্ জন্‌সন্‌ও উপাধি হারাবার ভয়ে তাঁর সঙ্গে লড়তে রাজি হননি। পৃথিবীতে যে সময়ে অনেক প্রথম-শ্রেণীর মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন, ল্যাংফোর্ড সেই সময়কার লোক বলেই আরো বেশী নাম কিনতে পারেননি। নইলে জ্যাক্ জন্‌সনের সঙ্গে তিনি প্রায় তুল্যমূল্যই ছিলেন।

এক সময়ে যিনি য়ুরোপের সর্ব-প্রধান মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন, সেই কার্পেন্টিয়ারও যোদ্ধা-জীবনের

প্রথমে ও শেষে দুজন কালো মুষ্টিযোদ্ধার কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁদের নাম হচ্ছে জো জেনেট্ ও ব্যাটলিং সিকি। যে বছরে ডেম্পসীর সঙ্গে কার্পেন্টিয়ারের লড়াই হয়, ঠিক তার পরের বছরই সিকিও কার্পেন্টিয়ারকে মাত্র ছয় রাউন্ডের মধ্যেই হারিয়ে দেন। জ্যাক্ জনসন্ প্রভৃতির মতো উঁচুদরের যোদ্ধা না হলেও কার্পেন্টিয়ারকে হারিয়ে সিকির খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু কার্পেন্টিয়ারের যুদ্ধ-প্রতিভা যখন সবদিক দিয়েই পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, যখন তিনি ইংলন্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বোম্মাডিয়ার ওয়েল্স্ ও আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ শ্বেত-যোদ্ধা গানবোট্ স্মিথকে হারিয়ে য়ুরোপ-আমেরিকার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মুষ্টিবীর বলে অতুল খ্যাতি অর্জন করেছেন, জো জেনেট তাঁকে হারিয়ে দিয়েছিলেন সেই সময়েই। মুষ্টিযোদ্ধার জগতে জো জেনেট হচ্ছেন আর একজন অসামান্য ব্যক্তি। এই নিগ্রো যোদ্ধার চেহারাও ছিল দানবের মতো। তাঁর মাথার উচ্চতা প্রায় সাত ফুট! ইনিও জ্যাক্ জনস্ন্ ও স্যাম্ ল্যাংফোর্ডের সমসাময়িক। জন্সন্ ও ল্যাংফোর্ডের সঙ্গে যুদ্ধে অনেক বারই তিনি সমান-সমান গিয়েছিলেন। জন্সনের পর ল্যাংফোর্ড এবং জেনেটও খুব সম্ভব "পৃথিবী-জেতা" উপাধি লাভ করতে পারতেন, কিন্তু গায়ের রং কালো বলে তাঁদের সে সুযোগ দেওয়া হয়নি।

আসল কথা, কালো বলে উপেক্ষা না করলে ও ঠেলে না রাখলে য়ুরোপ-আমেরিকায় আজ নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধারাই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হতে পারতেন। কালো যোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াই করবার সময় সাদা যোদ্ধারা অনেক সময়েই অবৈধ উপায় অবলম্বন করে থাকেন, কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ যোদ্ধারা বরাবরই ধর্মযুদ্ধ করে এসেছে। এইজন্যেই ও-দেশের একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, "Colored fighters have as a rule, been hard opponents to defeat in the ring, and they have also been very fair in their fighting."

কাঙ্গারু-মুল্লুকে—অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ায়, এক কালো যোদ্ধা ছিল, তার নাম হচ্ছে ইয়ং গ্রিফো। স্বদেশের সমস্ত সাদা চামড়ার উপরে ঘুষির চোটে কালশিরার সৃষ্টি করে গ্রিফো ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকায় এসে হাজির হল। মাথায় মোটে পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি উঁচু এই ছোটোখাটো কাফ্রি যোদ্ধাটিকে দেখে আমেরিকানদের মনে কিছুমাত্র শ্রদ্ধার উদয় হল না। সেখানে জেরি মার্শ্যাল নামে এক সাদা যোদ্ধার সঙ্গে সর্বপ্রথমে তার শক্তি-পরীক্ষা হয়। কিন্তু চার-পাঁচ মিনিটের ভিতরেই গ্রিফোর বিষম ঘুষির চোটে মার্শ্যাল এমনি কাবু হয়ে পড়ল যে, মান বাঁচাবার জন্যে সে অন্যায় যুদ্ধের আশ্রয় না নিয়ে পারলে না। মধ্যস্থ (referee) তখন বাধ্য হয়ে গ্রিফোকেই জয়ী সাব্যস্ত করলেন। তারপর গ্রিফোর সামনে এসে যখন আরো অনেকেই নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ল, আমেরিকার লোকেদের তখন হুঁশ হল যে, এই ছোট্ট-খাট্ট কাফ্রিটি হচ্ছে একজন অসাধারণ মুষ্টিযোদ্ধা।

তোমরা জানো বোধ হয়, দেহ যাদের হাল্কা, ভারী ওজনের যোদ্ধাদের সঙ্গে তারা কিছুতেই লড়তে পারে না। কিন্তু গ্রিফোর কাছে এ-সব নিয়ম খাটত না। এমনি তার মাথা ও পা সঞ্চালন করবার ক্ষমতা ছিল এবং এমন বিদ্যুতের মতন বিপক্ষের ঘুষি এড়িয়ে সে সরে যেতে পারত যে, তার চেয়ে ঢের বেশি ভারী ও লম্বা-চওড়া মুষ্টিযোদ্ধাও তাকে সামলে উঠতে পারত না। গ্রিফোর হাতের ঘুষির পর ঘুষি খেয়েও তাকে মারতে গিয়ে বিফল হয়ে সকলেই হতভম্ব হয়ে যেত।

গ্রিফো কখনো Champion বা "বাহাদুর" মুষ্টিযোদ্ধা বলে নাম কিনতে পারেনি। তার প্রধান কারণ হচ্ছে আলস্য। পেশাদার যোদ্ধা হতে গেলে প্রতিদিন চার-পাঁচ-ছয় ঘণ্টাব্যাপী ব্যায়াম করতে হয়। কিন্তু ব্যায়াম করতে সে মোটেই রাজী হত না। তবু তার দেহের স্বাভাবিক শক্তির জন্যে কোন

"বাহাদুর" মুষ্টিযোদ্ধাই তার সামনে এসে দাঁড়াতে পারত না।

গ্রিফোর আর একটি মারাত্মক দোষ ছিল। সে অত্যন্ত মদ্যপান করত। শিকাগো শহরে একবার উইর নামে মস্ত বড় এক মুষ্টিবীরের সঙ্গে তার যুদ্ধের দিনে গ্রিফোর টিকিটি পর্যন্ত আর দেখা গেল না। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব উঠল। যুদ্ধের খানিক আগে অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন তাকে এক শুঁড়িখানার ভিতরে আবিষ্কার করা গেল তখন তার আর পায়ের উপরে ভর দিয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। সেই অবস্থাতেই তাকে ধরাধরি করে এনে তার প্রতিপক্ষের সামনে হাজির করা হল। তার টলমল মূর্তি দেখে সকলেই বুঝলে যে এ-যাত্রা তার আর কোনই আশা নেই। কিন্তু লড়াইয়ের ঘণ্টা বাজবামাত্রই গ্রিফোর সব নেশা ছুটে গেল! তার গরম গরম ঘুষির চোটে উইর সাহেবের দুরবস্থার আর অবধি রইল না। সে-যুদ্ধে গ্রিফোরই জিত হয়।

সমালোচকরা বলেন, গ্রিফো কোনদিন "বাহাদুরি" যোদ্ধা নাম কিনতে অগ্রসর হয়নি বটে, কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধের জগতে সে হচ্ছে একজন অদ্বিতীয় পালোয়ান। আজ পর্যন্ত তার জুড়ি খুঁজে পাওয়া যায়নি।

আর একজন অদ্ভুত কালো যোদ্ধার নাম হচ্ছে, জো ওয়ালকট্। মাথায় সে গ্রিফোর চেয়েও ছোট ছিল। কিন্তু তার সামনে কোন মস্ত-বড় সাদা-চামড়াও এসে দাঁড়াতে পারত না। এই হাল্কা-ওজনের ছোট্ট কালো পালোয়ানের কাছে জো চয়নস্কি ও জর্জ গার্ডনারের মতন পৃথিবীবিখ্যাত "হেভি-ওয়েট"দেরও হেরে ভূত হয়ে যেতে হয়েছিল। জ্যাক্ জন্সন্ যখন মুষ্টিযুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন উক্ত চয়নস্কির কাছে তাঁকেও পরাজিত হতে হয়েছিল। মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে আর কখনো এমন অসম্ভব সম্ভবপর হয়নি। বড়-বড় শ্বেতাঙ্গ মুষ্টিযোদ্ধার কাছেও এই ক্ষুদে কালো পালোয়ানটি ছিল মূর্তিমান বিভীষিকার মতন। শ্বেতাঙ্গরা তাকে পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময় বলেই মনে করত।

বব্ টম্পসন্ হচ্ছে আর এক মস্ত কাফ্রি যোদ্ধা। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে মুষ্টিযোদ্ধার সমাজে তার প্রভাব-প্রতিপত্তির সীমা ছিল না। তখনকার সমস্ত বিখ্যাত শ্বেতাঙ্গ মুষ্টিযোদ্ধার সঙ্গেই সে শক্তি পরীক্ষা করেছিল। পৃথিবী-জেতা অমর মুষ্টিযোদ্ধা জ্যাক্ জন্সন্ পর্যন্ত প্রথম জীবনে তার কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। তখনকার দিনে মুষ্টিযুদ্ধে এখনকার মতন টাকা রোজগার করা যেত না। তবু সাদার মুখে কালো ঘুষি মেরে টম্পসন্ অনেক টাকা রোজগার করেছিল। কিন্তু তার প্রাণ ছিল এমন দরাজ যে নিজের হাতে রোজগার করা তিন লক্ষ টাকা উড়িয়ে দিয়ে শেষটা তাকে পথের ঝাড়ুদারের কাজ করতে হয়েছিল। সেই অবস্থাতেই টম্পসন্ তার বোনের আটটি ছেলেমেয়েকে খাইকে-দাইয়ে ও লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছিল! তার প্রকৃতি এমন সাধু ছিল যে শ্বেতাঙ্গরা পর্যন্ত বলে, "যদি কেউ কখনো স্বর্গে গিয়ে থাকে তাহলে সে হচ্ছে বব্ টম্পসন্।"

আমেরিকার সর্বপ্রথম কাফ্রি 'হেভি-ওয়েটে চ্যাম্পিয়ান' হচ্ছে জর্জ গডফ্রে। 'লাইটওয়েটে' জো গ্যানস্-এর চেয়ে ভালো মুষ্টিযোদ্ধা আজ পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গদের ভিতরেও পাওয়া যায়নি। 'হেভি-ওয়েটে' সবচেয়ে চারজন বিখ্যাত কাফ্রি মুষ্টিযোদ্ধার নাম হচ্ছে—টম মলিনিয়াক্স, পিটার জ্যাকসন্, জ্যাক্ জন্সন্ ও স্যাম ল্যাংফোর্ড। এঁদের মধ্যে ল্যাংফোর্ড বেচারীর অদৃষ্ট ছিল সবচেয়ে খারাপ, কারণ কোনদিনই তিনি নিজের যোগ্যতার যথার্থ পুরস্কার লাভ করতে পারেননি। তিনি 'পৃথিবী-জেতা' মুষ্টিযোদ্ধার সম্মান লাভ করতে পারতেন, কিন্তু বরাবরই সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছেন। আগেই বলেছি জ্যাক জন্সনের সঙ্গে একবার তাঁর প্রতিযোগিতা হয়েছিল এবং সে-যুদ্ধে তিনি জিততে পারেননি বটে, তবু এমন শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন যে, 'পৃথিবী জেতা'র

খ্যাতিলাভ করবার পরে জন্‌সন্ পর্যন্ত আর কখনো তাঁর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করতে সাহসী হননি। জন্‌সনের সঙ্গে আর একবার লড়াই করবার সুযোগ পেলে ল্যাংফোর্ড যে জয়লাভ করতে পারতেন না, এমন কথা বলা যায় না। শ্বেতাঙ্গরা ল্যাংফোর্ডকে "আল্‌কাতরা-খোকা" বলে ডাকত। একটু আগে জো জেনেট নামে আর একজন কৃষ্ণাঙ্গ যোদ্ধার নাম করেছিলুম। সাত ফুট উঁচু এই বিরাট-দেহ কালো যোদ্ধাটির কাছে কেবল কার্পেন্টিয়ার নন, জ্যাক্ জন্‌সন্‌কেও একবার পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। অবশ্যা তার পরে জন্‌সন্‌ও সে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন।

শ্বেতাঙ্গ যদি সুযোগ দিত, তাহলে আগেকার যুগে জ্যাক্ জন্‌সনের পরে স্যাম ল্যাংফোর্ড ও জো জেনেট এবং তারপরে হ্যারি উইলস্ প্রভৃতি কালো যোদ্ধারাই অনায়াসেই 'পৃথিবী-জেতা বাহাদুর' বলে সম্মান অর্জন করতে পারতেন।

কিন্তু শ্বেতাবতারেরা এত করেও মান রক্ষা করতে পারেননি। কারণ আজ কয়েক বৎসর ধরে 'পৃথিবী-জেতা বাহাদুর' উপাধি ধারণ করে আছেন আর এক মহাশক্তিধর কৃষ্ণাঙ্গ যোদ্ধা,—নাম তাঁর জে লুইস।

মানুষের বন্ধু আমেরিকার সিংহ

মানুষকে ভয় করে না এমন জন্তু বোধ হয় খুব কম। কবে এবং কেন যে জন্তুরা মানুষকে প্রথম ভয় করতে আরম্ভ করলে তারও ইতিহাস কেউ জানে না। মানুষকে কোন জন্তুই বিশ্বাস করে না। এমন কি অধিকাংশ জানোয়ারই জীবনে প্রথম মানুষ দেখলেও তাড়াতাড়ি সরে পড়বার চেষ্টা করে।

কিন্তু তোমাদের এমন এক হিংস্র জন্তুর কথা বলতে পারি, যে মানুষকে ভয় করে না, বরং বন্ধুর মতন দেখতে চায়!

উত্তর ও দক্ষিণ—দুই আমেরিকাই হচ্ছে এই জন্তুটির স্বদেশ। ও-অঞ্চলে বৃহৎ বিড়াল জাতীয় জন্তুদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে জাগুয়ার। তার পরেই স্থান পায় পুমা। ব্রেজিলে পুমাকে ডাকে 'কাউগার' নামে। উত্তর-আমেরিকায় তাকে 'পেন্টার' নামেও ডাকা হয়। কিছুকাল আগেও দুই আমেরিকার সর্বত্রই বাস করত এই পেন্টার বা কাউগার বা পুমার দল। সভ্যতা ও মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুমারা দলে হাল্‌কা হয়ে পড়েছে। পুমা 'আমেরিকার সিংহ' নামেও প্রসিদ্ধ।

কিন্তু আমেরিকার এই সিঙ্গী-মামা আকারে ল্যাজসুদ্ধ ছয় থেকে নয় ফুটের চেয়ে বড় হয় না। তার পিঠের ও দুই পাশের রঙ্ পিঙ্গল, পেট সাদা ও ল্যাজের ডগাটা ধূসর। তার কানদুটো কালো, উপর-ঠোঁট সাদা এবং নাক মাংসবর্ণের।

পুমারা সবচেয়ে ভালোবাসে ঘোড়ার মাংস খেতে। উদর-জ্বালা নিবারণের জন্যে তারা আমেরিকার বুনো ঘোড়াদের মেরে মেরে সাবাড় করে ফেলেছে এবং ঘোড়ার অভাবে এখন যা পায় তাই খায়—গরু, ভেড়া, হরিণ থেকে শুরু করে খরগোশ, ইঁদুর—এমন কি শামুক-গুগ্‌লি পর্যন্ত! গেছো বানররাও পুমার কবল থেকে নিরাপদ নয়। কারণ সে গাছের উপরে চড়েও আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে বানরদের তাড়া করতে পারে। বিশ ফুট উঁচু লাফ মেরেও গাছে চড়তে পুমাদের কষ্ট হয় না এবং লম্বালম্বি লাফেও তাদের প্রায় চল্লিশ ফুট পার হয়ে যেতে দেখা গিয়েছে!

তাদের ঘোড়া শিকার করার কায়দা হচ্ছে এই রকম। পিছন থেকে এসে লাফ মেরে ঘোড়ার পিঠের উপরে চড়ে বসে, এক থাবা দিয়ে ঘোড়ার বুক চেপে ধরে এবং আর এক থাবা দিয়ে ধরে ঘোড়ার মাথা; তারপর সজোরে এক মোচড়েই ঘোড়ার ঘাড় ভেঙে ফেলে।

উত্তর আমেরিকার বাসিন্দারা বলে, পুমা হচ্ছে কাপুরুষ। যদিও তারাও মানে যে, আহত পুমা

মানুষের পক্ষে অত্যন্ত বিপদ্‌জনক এবং তার এক থাব্‌ড়া খেলে পর কোন সাহসী শিকারী-কুকুরও আর তার কাছে এগুতে ভরসা পায় না।

কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার বাসিন্দাদের মত হচ্ছে, পুমারা মোটেই ভীরু নয়। তাদের ব্যবহার মানুষের কাছে একরকম, অন্যান্য জীবের কাছে আর-একরকম। মানুষকে তারা আক্রমণ করতে অনিচ্ছুক; এমনকি সময়ে সময়ে মানুষের দ্বারা আক্রান্ত হলেও আত্মরক্ষা করতে চায় না। এর নাম কাপুরুষতা নয়। হয়তো তাদের উপরে মানুষের এমন কোন রহস্যময় প্রভাব আছে যার কারণ আজও জানা যায়নি।

পুমা তার চেয়ে বড় ও শক্তিমান জাগুয়ারকে দেখলেও তেড়ে আক্রমণ করতে যায়, অথচ মানুষ দেখলেই টেনে পিঠটান দিতে চায়! এও দেখা গেছে, মানুষের সামনে পড়ে পুমা আক্রমণ করা তো দূরের কথা, কাঁপতে কাঁপতে অত্যন্ত নিরীহের মতো বসে পড়েছে এবং সেই অবসরে মানুষ তাকে হত্যা করেছে।

এর চেয়েও বড় দৃষ্টান্ত আছে। বনের ভিতরে জাগুয়ার হয়তো কোন মানুষের উপর হানা দিয়েছে, এমন সময় কোথা থেকে পুমা এসে আক্রমণ করেছে মানুষের শত্রু সেই জাগুয়ারকেই। এটা কাপুরুষতার লক্ষণ নয়।

দক্ষিণ আমেরিকার বাসিন্দারা পুমাকে বলে "ক্রীশ্চানের বন্ধু"! ডবলিউ এইচ. হাডসন বলেন, পুমারা স্বেচ্ছায় মানুষের রক্ষক হতে চায়। একবার এক শিকারী গহন বনে শিকার করতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে পা ভেঙে ফেলে। সারা রাত তাকে বনের ভিতরে পড়ে থাকতে হয়। সামনে তৈরি খাবার দেখে এক জাগুয়ার তার সদ্ব্যবহার করতে এল।

কিন্তু একটা পুমা ব্যাপার দেখে তখনি এসে শিকারীকে আগলে দাঁড়াল। জাগুয়ারের গায়ে জোর বেশি, তবু পুমা ভয় পেল না। জাগুয়ার অগ্রসর হলেই পুমা তাকে তেড়ে যায়! এইভাবে সারা রাত কাটল। সকালের আলো ফুটলে পর জাগুয়ার খাবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে সরে পড়ল। মানুষকে বাঁচিয়ে পুমাও (বোধ করি খুশি-মনেই) ফিরে গেল নিজের বাসায়। একেই বলে নিঃস্বার্থ পরোপকার! মানুষের জন্যে মানুষেও হয়তো এতটা করতে সাহস পেত না!

পুমার মতন মাংসপ্রিয় বন্য ও হিংস্র জন্তু মানুষের প্রতি কেন যে এতটা সদয়, জীববিজ্ঞানবিদরা আজ পর্যন্ত তার কারণ আবিষ্কার করতে পারেননি। বিশেষত মানুষ যখন কোনদিনই এমন ব্যবহার করেনি, যার জন্যে পুমা তাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করতে পারে!

পুমার বিরুদ্ধেও একটা প্রমাণ আছে। একবার ওয়াশিংটনের একদল ইস্কুলের ছেলে ছুটির পর বাড়ি ফিরতে ফিরতে দেখতে পেলে, পথের পাশের জঙ্গলের ভিতরে লুকিয়ে-লুকিয়ে কি-একটা হলদে রঙের জানোয়ার তাদের সঙ্গে-সঙ্গেই আসছে। কুকুর-টুকুর ভেবে তারা তার দিকে নজর দিলে না। কিন্তু খানিক পরে জঙ্গলের ভিতর থেকে একটা পুমা লাফিয়ে বেরিয়ে পড়ল এবং চকিতে একটি ছোট্ট শিশুকে মুখে করে নিয়ে আবার জঙ্গলের ভিতরে পালিয়ে গেল।

বছর বারো বয়সের একটি সাহসী ছেলে তখনি পুমার পিছনে ছুটল। তার হাতে ছিল মাত্র একটি খালি বোতল। সেই বোতল তুলেই পুমার মাথায় এক ঘা বসিয়ে দিলে। গোলমাল দেখে শিশুকে ফেলে পুমা অদৃশ্য হল!

অনেকে অনুমান করলেন, পুমা নিশ্চয়ই শিশুকে উদরস্থ করতে আসেনি, কারণ তাহলে সে এত সহজে তাকে ছেড়ে দিত না। হয়তো সে শিশুটির সঙ্গে একটু খেলা করতেই এসেছিল!

এ-রকম অনুমানের কারণও আছে। পুমারা ঠিক বিড়াল-ছানার মতই খেলা করতে

ভালোবাসে। ছোটবেলায় পুমাদের ধরে পালন করলে তারা অত্যন্ত পোষ মানে এবং মানুষের ঘরেও দিন-রাত খালি খেলা করতে চায়! কুকুরের মতন তারা মনিবের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে-ফেরে, বাড়ির ভিতরে নিতান্ত শান্তশিষ্টের মতন বেড়িয়ে বেড়ায়, অচেনা লোক দেখলেও কামড়াতে বা ধম্‌কাতে চায় না!

মানুষ দেখলে পুমা যে খেলা করতে আসে, তারও প্রমাণ আছে!

জে. ডবলিউ বি. হোয়েট্‌হামের ভ্রমণ-কাহিনীতে একটি গল্প আছে। এক কাঠুরে বনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার পায়ের উপরে কোন নরম জীবের স্পর্শ অনুভব করলে।

চম্‌কে মুখ নামিয়ে সে দেখলে, একটা পুমা ঠিক বিড়ালের মতই খাড়া ল্যাজ তুলে, ঘড়্‌-ঘড়্‌ শব্দ করতে করতে খেলার ভঙ্গীতে তার দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে আনাগোনা করছে! দুর্ভাগ্যক্রমে কাঠুরে এই খেলার মর্ম বুঝলে না, কুড়ুল তুলে তার উপরে বসিয়ে দিলে এক ঘা, পুমাও বিপদ দেখে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল!

উপরের ঐ শিশুটির সঙ্গেও যে পুমা খেলা করতে এসেছিল এমন কথা জোর করে বলা যায় না। কারণ উত্তর-আমেরিকার পুমারা যে বিনা কারণেই মানুষদের আক্রমণ করে তার আরো দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার পুমাদের নামে এ অপবাদ নেই।

আর এক বিষয়ে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পুমাদের ভিতরে একটা বিভিন্নতা দেখা যায়। উত্তরের পুমারা কুকুরদের হয়তো পছন্দ করে না, কিন্তু তাদের দেখলে ক্রুদ্ধ হয় না তত। আর দক্ষিণের পুমারা কুকুর দেখলেই ক্ষেপে যায়!

প্যাটাগোনিয়ার এক মেষরক্ষক একদল কুকুর নিয়ে একটা পুমার সামনে গিয়ে পড়ে। কুকুরগুলো পুমাকে দেখে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পড়ল, কিন্তু মেষরক্ষক মারলে তাকে লাঠির বাড়ি। পুমা লাঠি এড়িয়ে সরে গেল—তার চোখ রইল কুকুরদের উপরে। মেষরক্ষক আবার লাঠি মারলে, পুমা আবার সরে দাঁড়াল, মাটির উপরে পড়ে লাঠিগাছা ভেঙে গেল!

মেষরক্ষক মনে করলে আর বাঁচোয়া নেই,—পুমাটা নিশ্চয়ই এবারে তাকেই আক্রমণ করবে!

কিন্তু পুমা তার দিকে একবার চেয়েও দেখলে না, সে বেগে দৌড়ে গেল কুকুরদের দিকেই। সেই সময় মেষরক্ষকের এক বন্ধু এসে পুমাকে গুলি করে মেরে ফেললে।

আধুনিক য়ুরোপীয়রা দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে পুমা বধ করতে দ্বিধাবোধ করে না, কিন্তু ওখানকার লোকেরা এ-বিষয়ে বড়ই বিরোধী। আজ বলে নয়, এ কুসংস্কার তাদের বহুকালের। ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে পাদরিরা দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে দেখেছিলেন হাজার হাজার পুমায় সারা দেশ ছেয়ে গেছে, তাদের অত্যাচারে গরু-ভেড়া কিছুই রাখবার যো নেই, বনের সমস্ত হরিণ তারা প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে, তবু আদিম অধিবাসীরা পুমা বধ করতে একেবারেই নারাজ। তাদের বিশ্বাস ছিল, যে পুমা মারবে তাকেই মারা পড়তে হবে!

আজও সে বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়নি। এমন-কি ওখানকার এক প্রবাসী ইংরেজও বলেন, জীবনে একবারমাত্র একটি পুমাকে বধ করে তাঁর মনে অত্যন্ত অনুতাপের উদয় হয়েছিল।

তাঁর কথা শোন ঃ

"গলায় ল্যাসো (একরকম দড়ির ফাঁসকল) লাগিয়ে পুমাটাকে বন্দী করা হয়। সে একটা পাথরের উপরে পিঠ রেখে চুপ করে বসে রইল। আমি ছোরা বার করে যখন তার দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলুম, তখনও সে নড়বার বা পালাবার চেষ্টা করল না। তার অদৃষ্টে যে কী আছে সে যেন সেটা বুঝতে পেরেছিল। সে কাঁপতে আরম্ভ করলে, তার দু-চোখ বয়ে জল ঝরতে

লাগল। আমি ছোরা তুললুম, সে বাধাও দিলে না, আমাকে তেড়েও এল না, মৃদুস্বরে কাঁদতে লাগল। তাকে মেরে ফেলবার পর আমার মনে হল—আমি যেন হত্যাকারী!"

ক্লডিয়ো গে বলেন, পুমার সাহস ও শক্তির অভাব নেই, কিন্তু মানুষ তাকে আক্রমণ করলে সে যেন একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে—এমন ভাবে কাঁপতে ও কাঁদতে শুরু করে দেয়, যেন দয়ালু মানুষের কাছে সে প্রাণ ভিক্ষা চাইছে!

পুমাই হচ্ছে বৃহৎ বিড়াল-জাতীয় একমাত্র হিংস্র জন্তু, মানুষকে যে বিশ্বাস করে। কিন্তু মানুষ সে বিশ্বাসের মর্যাদা রাখেনি।

সংলাপী রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রধান বিশেষত্বগুলি এত-বেশী স্পষ্ট যে, বাংলা দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে তার মোটামুটি পরিচয় দেবার কোনই দরকার নেই। তবে এ-কথা সত্য যে, আর্ট ও সাহিত্যের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে দেখে বহু আলোচনার অবসর আছে। কিন্তু সেজন্যে প্রচুর সময়ের দরকার আমার হাতে যা নেই।

তোমাদের কাছে আজ আমি আর একদিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে দেখাবার চেষ্টা করব। আজ কয়েক যুগ ধরে রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য রচনা-রত্নের সঙ্গে জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধন হয়েছে। কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথের এমন কতকগুলি অপূর্ব বিশেষত্ব ছিল, বাইরের পৃথিবী যার কোন খবর রাখবার সুযোগ পায়নি।

তাঁর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে, সংলাপ-পটুতা। সংলাপ বলতে এখানে সাধারণ এলোমেলো কথাবার্তা বোঝাচ্ছে না। ইংরেজীতে যাকে বলে Conversation, সেটি হচ্ছে একটি উচ্চ শ্রেণীর আর্ট। ইংলণ্ডের বিখ্যাত লেখক ডা. জনসন্ ও কবি কোলরিজ এবং জার্মানির সাহিত্য-সম্রাট গেটে প্রভৃতি এই শ্রেণীর Conversation বা সংলাপের জন্যে অমর হয়ে আছেন।

এদেশেও আমি কয়েকজন অসাধারণ সংলাপ-পটু ব্যক্তির সঙ্গে অনেকবার আলাপ করবার সৌভাগ্য পেয়েছি। যেমন, স্বর্গীয় নাট্যকার অমৃতলাল বসু এবং বিখ্যাত সাহিত্যসেবক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি।

এবং বহুবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদ-প্রান্তে বসবার সুযোগ পেয়ে বুঝেছি যে, সংলাপে তিনি ছিলেন একেবারেই অতুলনীয়। ডা. জনসন আজও পৃথিবীর মধ্যে এতটা সুপরিচিত হয়ে আছেন, তাঁর রচনাশক্তির জন্যে নয়। একথা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, আজকের পাঠকরা তাঁর লিপিকুশলতার কোন খবরই রাখেন না। কিন্তু ভাগ্যে তিনি বস্ওয়েলের মতন অনুগত নিত্য-সহচর পেয়েছিলেন তাই তাঁর জীবন-চরিতে প্রকাশিত অপূর্ব সংলাপের মধ্যেই তিনি আজ সারা পৃথিবীর বাসিন্দাদের সম্ভাষণ করবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হননি।

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এমন রবীন্দ্রনাথ কোন বস্ওয়েলকে লাভ করেননি। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনকালের মধ্যে জগতের কত শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য শ্রেণীর বিখ্যাত গুণীর সঙ্গে কত বিচিত্র বিষয় নিয়ে তিনি কত না উপভোগ্য ও মূল্যবান আলোচনা করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি লিখে রাখবার মতন লোক যদি রবীন্দ্রনাথের পাশে বর্তমান থাকতেন, তাহলে আজ অনায়াসেই প্রমাণিত করা যেত যে, সংলাপেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বর্তমান পৃথিবীর মধ্যে হয়তো সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এমন কি লিপিবদ্ধ করে রাখলে, রবীন্দ্রনাথের সেই বিরাট সংলাপগ্রন্থ তাঁর নিজের হাতের সৃষ্ট বিখ্যাত ও অমর সাহিত্যের পাশে কিছুমাত্র নিষ্প্রভ হয়ে পড়ত না।

সংলাপ যে কতখানি উচ্চস্তরে উঠতে পারে, রবীন্দ্রনাথের কাছে যাবার আগে আমার সে ধারণাই ছিল না। বলবার গুণে সাধারণ কথাগুলিও তাঁর মুখে হয়ে উঠত অত্যন্ত অসাধারণ! আবার তিনি যখন সহজভাবেও কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন, তখনও তাঁর বাণীর মধ্যে দিয়ে প্রতি মুহূর্তেই ঝরে পড়ত আর্ট ও সাহিত্যের অজস্র সৌন্দর্য।

আমি এমন কয়েকজন সংলাপ-নিপুণ বিখ্যাত গুণীকে দেখেছি যাঁদের আলাপ মূল্যবান হলেও শোনাত অনেকটা উপদেশের মতো। তাঁরা নিজেরাই অনর্গল কথা বলে যেতেন, কিন্তু শ্রোতাদের কারুকে মুখ খোলবার অবকাশ দিতেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ-শ্রেণীর সংলাপী ছিলেন না। আমার বেশ মনে আছে, ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বৎসর আগে প্রথম যেদিন রবীন্দ্রনাথের সামনে উপস্থিত হই, তখন বালক-সুলভ মুখরতা ও চপলতার মহিমায় তাঁর সঙ্গে বহু বাক্যব্যয় করতে সাহসী হয়েছিলুম। কিন্তু সেই অপরিচিত ও প্রায়-বালক আমার প্রতিও তিনি এতটুকু অবহেলা প্রকাশ করেননি। আমার নির্বোধ প্রশ্ন শুনেও একবারও তাঁকে অধীর হতে দেখিনি। বরং মৃদুহাস্য-রঞ্জিত মুখে এমনভাবে তিনি তাঁর বাক্য-মাধুরী প্রকাশ করেছিলেন, যেন আমি তাঁর সমবয়সী ও সমকক্ষ ব্যক্তি! সেদিনের কথা স্মরণ হলে আজও আমার লজ্জা হয়।

সেদিনকার আরও একটা কথা মনে হল। একই বিষয়কে সোজা ও উল্টো দিক দিয়ে দেখবার ও দেখাবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অদ্ভুত। অধিকাংশ ব্যক্তিই এক-একটি বস্তুকে কেবল একদিক দিয়েই দেখতে পারে। অন্তত ভাববার সময় না পেলে একটি বস্তুকে বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করতে গেলে তারা বক্তব্য বিষয়ের খেই হারিয়ে ফেলে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সে-কথা বলতে পারা যায় না।

মনে আছে সেদিন আমি তাঁর সঙ্গে প্রাচ্য-চিত্রকলা নিয়ে তর্ক করবার চেষ্টা করেছিলুম। স্মরণ হচ্ছে সেখানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সেন। তিনিও তখন বালক। সে সময় সবে প্রাচ্য চিত্রকলার নবজীবন শুরু হয়েছে; এবং অনেকের মতন আমিও ছিলুম তার একজন গোঁড়া ভক্ত।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, এবং তোমরাও জানো বোধ হয়, প্রাচ্য চিত্রকলার সেই নূতন আন্দোলনের মূলেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূর্তিমান প্রেরণার মতো। সুতরাং তিনিও যে প্রাচ্য চিত্রকলার একান্ত অনুরাগীই ছিলেন, এ-কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু প্রাচ্য চিত্রকলা নিয়ে আমার অতিরিক্ত মুখরতা, উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস দেখে তাঁর মনের ভিতরে জাগল বোধ হয় কৌতুকের ইঙ্গিত! তিনি এমনভাবে আলোচনা আরম্ভ করলেন যে, আমি তাঁকে প্রাচ্য চিত্রকলার একজন বিশিষ্ট শত্রু বলে সন্দেহ না করে পারলুম না। ফলে ক্রুদ্ধ হলে অনেক তার্কিকেরই যেমন দশা হয়, আমারও তাই হল। মনে মনে চটে গিয়ে নিশ্চয়ই আমি এমন সব কথা বলেছিলুম যা নিতান্তই বালকোচিত ও যুক্তিহীন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না, সেই মধুর মৃদুহাস্য-রঞ্জিত মুখেই এমন সুন্দরভাবে প্রাচ্য চিত্রকলার ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখাতে লাগলেন যে, আমার পক্ষে মুখ বন্ধ করা ছাড়া মুখরক্ষার কোন উপায় রইল না।

রবীন্দ্রনাথ গুরুগম্ভীর ভাবে আলাপ করতেন না এবং তাঁর সংলাপ হত প্রায়ই নির্মল হাস্যরসে সমুজ্জ্বল। অথচ তাঁর খুব লঘু হাসির ভিতর দিয়েও প্রকাশ পেত না এতটুকু কুরুচি। তাঁর আটপৌরে ঘরোয়া কথাগুলির মধ্যেও থাকত সাবলীল আর্টের ছোঁয়া এবং হাসির আলোয় সেগুলি করত নির্ঝর-ধারার মতন ঝিল্‌মিল্‌।

দার্শনিক-সুলভ গাম্ভীর্যের দ্বারা আচ্ছন্ন না হলেও রবীন্দ্রনাথের মুখ-চোখ ও ভাব-ভঙ্গীর ভিতর দিয়ে এমন একটা গভীর ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠত যে, পরিণত বয়সেও তাঁর কাছে যেতুম রীতিমত ভয়ে ভয়ে! বৃহৎ জনতার মধ্যেও এই ব্যক্তিত্ব তাঁক আর সকলের কাছ থেকেই সম্পূর্ণ

বিচ্ছিন্ন করে রাখত।

সংলাপের আসরে মাঝে মাঝে আর একটি আশ্চর্য শক্তির দ্বারা সকলকে তিনি করে দিতেন বিস্ময়ে বিমুগ্ধ। কেউ গল্প শুনতে চাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ মুখে মুখেই চমৎকার সব গল্প ও উপন্যাসের প্লট বা আখ্যানবস্তু রচনা করতে পারতেন! আমরা ক্ষুদ্র লেখকের দল, উপন্যাস লেখাই আমাদের পেশা, কিন্তু এ সত্য আমরা জানি যে, প্রত্যেক উপন্যাসের কাঠামো তৈরি করবার জন্যে কত দিন ধরে কত কাঠ-খড় পোড়াতে ও যন্ত্রণা ভুগতে হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র মন যেন ইচ্ছা করলেই গল্প ও উপন্যাস সৃষ্টি করতে পারত, এ শক্তি আর কোন লেখকের ছিল বলে শুনিনি। আমার স্বর্গীয় বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভাবেই রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তাঁর কয়েকখানি উপন্যাসের আখ্যানবস্তু সংগ্রহ করেছিলেন।

প্রজাপতির রূপকথা

একটি রূপক-কথা শোনো। প্রাচীন বিদেশী কাহিনী অবলম্বন করে গল্পটি শুরু করা হচ্ছে ঃ

কপির পাতার উপরে বসেছিল একটি শুঁয়াপোকা।

রঙিন ফুলের পাপড়ির মতন ডানা নাচিয়ে প্রজাপতি বললে, "বন্ধু হে, তুমি আমার ছেলেমেয়েদের পালন করবে? আমার এই ডিমগুলির দিকে চেয়ে দেখ। আমি মারা গেলে ওদের দেখবে কে?"

শুঁয়াপোকা কপিপাতা খাওয়া বন্ধ করে শুনতে লাগল।

প্রজাপতি বললে, "কিন্তু দেখো ভাই, আমার বাচ্চাগুলিকে যেন যা-তা খেতে দিয়ো না! তোমার খাবার তারা হজম করতে পারবে না। তাদের খোরাক হচ্ছে, ফুলের মধু আর ঘাসের শিশির। আর তাদের ডানা গজালেই প্রথম-প্রথম বেশি উড়তে দিয়ো না। কিন্তু আ আমার পোড়াকপাল, তুমি যে ছাই নিজেই উড়তে জানো না! এখন কি করি? এই কপির পাতার ওপরে ডিম পেড়ে আমি কি অন্যায়ই করেছি! আর তো নতুন ঠাঁই খোঁজবার সময় নেই! ওদের সঁপে দিলুম তোমারই হাতে! হ্যাঁ, কিছু উপহারও নেবে নাকি? এই নাও, আমার পাখ্‌না থেকে ঝরানো সোনার রেণু! মাগো, আমার মাথা ঘোরে কেন? ভাই শুঁয়াপোকা, খোরাকের কথা যা বললুম মনে রেখো—" বলতে-বলতেই প্রজাপতি তার দুই ডানা মুড়ে মারা পড়ল।

শুঁয়াপোকা ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, হতভম্বের মতো। প্রজাপতি নিজের কথাই সাত-কাহন করে গেল, সে জবাব দেবারও সময় পেলে না।

ডিমগুলো হতাশভাবে দেখতে-দেখতে সে বললে, "জানিনে বাপু, কী মুশকিলেই যে পড়লুম! মরবার সময়ে প্রজাপতির নিশ্চয়ই ভীমরতি হয়েছিল, নইলে আমার মতন বুকে-হাঁটা জানোয়ারের ওপরে কেউ এমন কচি-কচি ছোট্ট বাচ্চাদের ভার দিয়ে যায়? ডানা গজালে ওরা কি আর আমার কথা মানবে? ফুর-ফুর করে কোথায় যে উড়ে পালাবে জানতেও পারব না! ডানার সোনার রেণু আর পরনে রং-বেরঙের কাপড় থাকলে কি হয়, প্রজাপতির বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুই নেই!

মা-হারা বাচ্চাদের ডিমগুলি সাজানো রয়েছে কপির পাতার উপরে। শুঁয়াপোকা নির্দয় নয়, ডিমগুলিকে সে ফেলে যেতে পারলে না। কিন্তু ভাবনায় রাতে তার ঘুম গেল ছুটে, সারারাত ডিমগুলোর চারিধারে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিলে—পাছে তাদের কোন অনিষ্ট হয়!

সকাল বেলায় ভাবলে, এক মাথার চেয়ে দুই মাথার বুদ্ধি হয় বেশী, কোন জ্ঞানী জীবকে

ডেকে তার সঙ্গে পরামর্শ করা যাক—নইলে শুঁয়াপোকা করবে প্রজাপতি পালন? অসম্ভব!

কিন্তু কার সঙ্গে পরামর্শ করব? ও-পাড়ার ভুলো কুকুরটা মাঝে মাঝে এধারে বেড়াতে আসে বটে, কিন্তু বাপরে, যা দস্যি! হয়তো লট্‌পটে ল্যাজের এক ঝাপটা মেরেই কপির পাতা থেকে ডিমগুলোকে ঝেড়ে ফেলে দেবে! তাহলে লজ্জা রাখবার ঠাঁই থাকবে না যে!

রায়েদের বাড়ির মেনী-বেড়ালটাও আসে এখানে রোদ পোয়াতে। কিন্তু সে যা একলসেঁড়ে! তার ওপরে আবার মহা খেঁকি!

আচ্ছা, পাপিয়া-পাখিকে ডাকলে কেমন হয়? সে আকাশের কত উঁচুতে যায়, কত দেশের কত দৃশ্যই দেখতে পায়, নিশ্চয়ই সে খুব চালাক-চতুর!

শুঁয়াপোকা নিজে উড়তে পারে না, কাজেই আকাশে যারা ওড়ে তাদের সম্বন্ধে তার ভারি উচ্চ ধারণা!

বাগানের মস্ত আমগাছটার মগডালে বাসা বেঁধেছিল এক পাপিয়া। শুঁয়াপোকা তাকে ডেকে বললে, "ভায়া হে, প্রজাপতি এই ডিমগুলো দিয়ে গেছে আমার হাতে। কিন্তু আমি কেমন করে এদের বাঁচিয়ে রাখি বল দেখি? তুমি তো নানান দেশে বেড়াও, কত কি দেখ-শোনো, এ-বিষয়ে আমায় কিছু খোঁজখবর এনে দিতে পারো?"

—"আচ্ছা ভাই, দেখব!" বলেই সে ঘন-নীল জ্বলজ্বলে আকাশের দিকে উড়ে গেল, প্রাণের গান গাইতে গাইতে। খানিক পরে শুঁয়াপোকা অনেক কষ্টে উপরদিকে মাথা তুলে দেখবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পাপিয়া তখন হারিয়ে গেছে অসীম নীলিমার ভিতরে। তখন সে আবার ডিমগুলোর চারিধারে ধীরে ধীরে প্রদক্ষিণ করতে লাগল এবং খুঁটে খুঁটে খেতে লাগল কপি-পাতার টুকরো।

পাখির ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে শুঁয়াপোকা আপন মনে বললে, "বাব্বাঃ, পাপিয়া যে ফেরবার নামও করে না! গেল কোথায়, কত দূরে? আশ্চর্য ঐ নীলাকাশ! ওখানে সে কি দেখে, জানতে বড় সাধ হয়। সে ডানা মেলে উড়ে যায়, গলা খুলে গান গায়, আবার ফিরে আসে নিজের বাসায়। কিন্তু মনের কথা কারুকে বলে না। মজার পাখি!"

অনেকক্ষণ পরে পাপিয়ার গানের সুর শোনা গেল, শুঁয়াপোকার বুকে লাগল আনন্দের ছন্দ।

পাপিয়া এসে বললে,—"সুখবর, বন্ধু হে, খাসা খবর! কিন্তু মুশকিল কি জানো? আমার খবর তুমি বিশ্বাস করবে না!"

শুঁয়াপোকা তাড়াতাড়ি বললে, "না, না, সে কি কথা! তুমি যা বলবে আমি তাই বিশ্বাস করব!"

পাপিয়া ডিমগুলির দিকে ঠোঁট বাড়িয়ে ইঙ্গিত করে বললে "বহুৎ আচ্ছা! বল দেখি, প্রজাপতির বাচ্চাগুলোকে কি খাবার খাওয়াতে হবে? বলতে পারো?"

শুঁয়াপোকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "আমি যা পারব না তাই খাওয়াতে হবে আর কি! ঘাসের শিশির, ফুলের মধু!"

পাপিয়া মাথা নেড়ে বললে, "উঁহু, তা নয় গো, তা নয়! তার চেয়ে ঢের সস্তা খাবার, যোগাড় করতে তোমার কোনই কষ্ট হবে না!"

—"ভায়া সস্তা খাবার বলতে আমি তো বুঝি কপির পাতা।"

পাপিয়া উৎসাহ-ভরে বললে, "ঠিক, ঠিক! তুমি ঠিক ধরেছ! ওদের কপির পাতাই খাওয়াতে হবে!"

শুঁয়াপোকা রাগ করে বললে, "মরে যাই, কি খবরই দিলে তুমি! ওদের মা মরবার সময়ে

ঠিক ঐ খাবারই খাওয়াতে মানা করে গেছে!"

পাপিয়া দৃঢ় স্বরে বললে, "ওদের মা কিছুই জানে না! আর তুমি যখন অবিশ্বাসী, তখন খামোকা আমাকে পরামর্শ করবার জন্যে ডেকেছ কেন?" শুঁয়াপোকা ব্যস্ত হয়ে বললে, "ওগো, না গো না, আমি তোমার সব কথাই বিশ্বাস করি।"

পাপিয়া বললে, "বিশ্বাস কর, না ছাই কর! সামান্য খাবারের কথাই মানতে চাইছ না, এখনো তবু আসল কথাটাই শোনোনি!"

—"আসল কথা!"

—"হ্যাঁ, আসল কথা। বল দেখি ডিমগুলোর ভেতর থেকে কি বেরুবে?"

—"কেন, প্রজাপতি!"

—"দুয়ো, বলতে পারলে না! ডিম ফুটে বেরুবে একদল শুঁয়াপোকা!" বলেই পাপিয়া ফুড়ুক করে উড়ে গেল আকাশের দিকে! কেবল শোনা যেতে লাগল তার গানের সুর অদৃশ্য বীণার গুঞ্জনের মতো!

ডিমগুলোর চারিধারে ঘুরতে ঘুরতে শুঁয়াপোকা বললে, "ভেবেছিলুম পাপিয়া ভারি বুদ্ধিমান। কিন্তু এখন দেখছি তার মাথাটি গোবরে ভরা! উঁচুতে উড়ে উড়ে নীচেকার কিছুই সে জানে না!"

একটু পরেই পাপিয়া আবার নেমে এসে বললে, "আরে জবর খবর আছে হে! সেটাও বলে রাখি, শোনো। তুমি নিজেও একদিন হবে প্রজাপতি!"

এবার শুঁয়াপোকা খাপা হয়ে বললে, "দুষ্টু পাখি, আমার চেহারা ভালো নয় বলে আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ? তুমি খালি বোকা নও অতি নিষ্ঠুরও! যাও, চলে যাও—চলে যাও এখান থেকে!"

পাপিয়াও এবারে বিরক্ত হয়ে বললে, "তুমি অবিশ্বাসী!"

শুঁয়াপোকা বললে, "বিশ্বাসযোগ্য হলে আমি সব কথাই বিশ্বাস করি। কিন্তু তুমি যদি বল, রাঙা প্রজাপতির ডিম ফুটে বেরুবে কালো শুঁয়াপোকা, আর বুকে-হাঁটা শুঁয়াপোকার পিঠে গজাবে সোনালি পাখনা, উড়ে যাবে সে দখিনা বাতাসে, তাহলে কেমন করে তা বিশ্বাস করি? পাখি, নিজেই জানো এ-সব হচ্ছে ডাহা আজগুবি কথা!"

পাপিয়া বললে, "আমার কাছে আজগুবি বা অসম্ভব বলে কিছুই নেই। সবুজ পৃথিবীর রঙিন বাগানে বাগানে, বাতাসে ঢেউ-খেলানো ধানের ক্ষেতে ক্ষেতে, কূলে কূলে উপছে-পড়া নদীর তীরে তীরে, আলো-ছায়ার দোল-দোলানো বনে বনে আর নীল আকাশের সাদা সাদা মেঘের কোলে কোলে—কোথায় না আমি গান গেয়ে উড়ে বেড়াই, আমার চোখের সামনে খোলা থাকে কত না আশ্চর্য দৃশ্যপট! জানি আমি, এ সব আশ্চর্যেরও আড়ালে আছে আরো কত বিচিত্রের লীলা! তাই তো আমি খালি গেয়ে বেড়াই বিশ্বাসের গান। ওগো শুঁয়াপোকা, কপির পাতার উপরে তুমি হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াও, ওর বাইরে যা আছে তাকেই তুমি ভাবো অসম্ভব!"

শুঁয়াপোকা এবারে খুব চেঁচিয়ে বললে, "খালি বাজে কথা! চেয়ে দেখ আমার এই কুৎসিত দেহের দিকে! আমি হব রাঙা প্রজাপতি? নির্বোধ!"

পাপিয়া হেসে বললে, "হে বুদ্ধিমান বন্ধু, তোমার কাছে সত্যকথা বলে আমি হলুম নির্বোধ। দেখছি, যার অভাবে কিছুই মেলে না, তোমার সেই জিনিসটিই নেই।"

—"জিনিসটি কি?"

—"বিশ্বাস! কৃষ্ণ মেলে বিশ্বাসেই।"

সেই মুহূর্তেই শুঁয়াপোকা চোখের সম্মুখে অদ্ভুত দৃশ্য দেখলে। ডিমের পর ডিম ফুটে বেরিয়ে

আসছে কচি-কচি শুঁয়াপোকার পর শুঁয়াপোকা। তারপরেই তারা কপির পাতা খেতে শুরু করে দিলে।

বড় শুঁয়াপোকার মন লজ্জায় আর বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তারপরেই তার মন নাচতে লাগল বিপুল আনন্দে। একটা অসম্ভব যখন সম্ভবপর হল, তখন দ্বিতীয় অসম্ভবটাই বা ব্যর্থ হবে কেন? আগ্রহ ভরে সে বললে, "পাপিয়া, ভাই পাপিয়া! শোনাও আমাকে তোমার বিশ্বাসের রূপকাহিনী!"

পূর্ণকণ্ঠে পাপিয়া ধরলে অপূর্ব—সঙ্গীত ছন্দে তার পাপড়ি-খুলে ফুটে উঠল যেন স্বর্গের পারিজাত, ঝঙ্কারে তার মূর্তি ধরল যেন মর্তের অদেখা স্বপ্ন!

সেইদিন থেকে শুঁয়াপোকা আঁকড়ে রইল তার নতুন-পাওয়া বিশ্বাসকে। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা হলেই বলে, "ওগো, শুনছ! আমি একদিন প্রজাপতি হব! ঢল-ঢল কাঁচা সোনার মতন কচি রোদে, গোলাপী আতর-মাখা ফাগুন-বাতাসে, রামধনুর রং বুলানো মিহিন্ পাখনা নাচিয়ে আমি ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াব, আর উধাও হয়ে উড়ে যাব ঐ নীলপদ্ম-নিংড়ানো সুন্দর আকাশের দিকে!"

আত্মীয়-স্বজনরা বিশ্বাস করে না!

তারপর একদিন গুটির ভিতরে ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে শুঁয়াপোকা চেঁচিয়ে বললে, "শুনে রাখো, সবাই শুনে রাখো। এইবার আমি প্রজাপতি হব!"

আত্মীয়-স্বজনরা হেসে বললে, "মাথা একেবারে বিগড়ে গেছে। বেচারা!"

তারপর সত্যসত্যই সে যখন প্রজাপতি হল এবং তারপর আকাশ-বাতাসের সমস্ত আনন্দ লুণ্ঠন করে সেও যখন মৃত্যুর দ্বারে এসে দাঁড়াল, তখন বিশ্বের কানে কানে আশাভরা কণ্ঠে বললে, "আজ আমি বিশ্বাস করে সত্যকে পেয়েছি। ওগো বিচিত্র বিশ্ব, তাই আমি বিশ্বাস করি, মরণের পরেও আছে নূতন আশা, নূতন জীবন!"

আমার কথা ফুরলো।

হালুয়ার ভাঁড়

তখন বয়সে আমি তোমাদেরই অনেকের মতন। মা-বাবার সঙ্গে গিয়েছি বৃন্দাবনে। গলির ভিতরে একটি দোতলা বাড়িতে আমাদের বাসা।

বৃন্দাবনে রাবড়ি ভারি সস্তা। মা সের-খানেক রাবড়ি আনালেন। আমার ভাগে পড়ল পোয়া-খানেক। রাবড়ির ভাঁড়টি জানলার কাছে রেখে হাত ধোবার জন্যে ঘরের বাইরে গেলুম। মিনিট-খানেক পরে ঘরে ঢুকে দেখি, ভাঁড়-সুদ্ধ রাবড়ি অদৃশ্য!

হতভম্ব হয়ে এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছি, হঠাৎ চোখ গেল জানলার বাইরে। গলির ওপারে একখানা একতলা বাড়ির ছাদের উপর বসে একটা মস্তবড় গোদা বাঁদর,—তার হাতে আমার সাধের রাবড়ির ভাঁড়! করুণ চোখে চেয়ে রইলুম। বাঁদরটা ভাঁড়টা চেটেপুটে সব রাবড়ি খেয়ে, আমার দিকে একটা অবহেলার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ধীরে ধীরে চলে গেল।

বাবা বললেন, "সামান্য বাঁদরও তোকে ঠকিয়ে গেল। তুই বাঁদরেরও চেয়ে বোকা!"

সেইদিনই বাবা ভাত খেতে বসেছেন, হঠাৎ কোথা থেকে দুটো বাঁদর এসে তাঁর ভাতসুদ্ধ পাতা টেনে নিয়ে চম্পট দিলে।

বাবা বৃন্দাবনের বানর-জাতি সম্বন্ধে যে-সব কথা বললেন তা ছাপবার জায়গা এখানে নেই।

আমি গভীর চিন্তায় মগ্ন হলুম। কলকাতার মানুষের উপরে টেক্কা মারবে বৃন্দাবনের বাঁদর, এ দুঃখ অসহনীয়।

দুপুর বেলায় বাজারে বেরিয়ে কিনে আনলুম দুই পয়সার হালুয়া এবং দুই পয়সার সিদ্ধি। হালুয়ার সঙ্গে বেশ করে সিদ্ধি-বাটা মিশিয়ে একটা ভাঁড়ে ভরে জানলার কাছে রেখে দিলুম।

ঘরের বাইরে গিয়ে আবার দুই মিনিট পরে ফিরে এলুম। জানলার ধার থেকে ভাঁড় আবার অদৃশ্য হয়েছে!

মনের মধ্যে নেচে উঠল প্রবল আনন্দ! ছুটে জানলার কাছে গিয়ে দেখি, একতলা বাড়ির ছাদের উপর আরো দশ-বারোটা বানরের মাঝখানে বসে সেই গোদা বাঁদরটা পরম পরিতৃপ্তভাবে হালুয়ার ভাঁড়টা খালি করছে। কারুকে এককণা প্রসাদও দিলে না।

মিনিট-তিন পর সে অত্যন্ত সন্দিগ্ধভাবে খালি ভাঁড়টা বারংবার শুঁকতে লাগল। মিনিট পাঁচেক পরে সে ছাদের উপরে শুয়ে পড়ল। সাত-আট মিনিট পরে তার নড়া-চড়া বন্ধ হয়ে গেল। অন্য বাঁদরগুলো ভীতভাবে দূর থেকে তার দিকে তাকাতে লাগল, তারপর একে একে লম্বা দিলে।

দেখতে দেখতে আশপাশের সমস্ত বাড়ির ছাদ ভরে গেল বাঁদরে বাঁদরে। বোধহয় বৃন্দাবনের সমস্ত বাঁদর সেখানে এসে জুটল। প্রত্যেকেরই বিস্ফারিত দৃষ্টি সেই অচেতন গোদা বাঁদরের দিকে। কিন্তু ভরসা করে কেউ তার কাছে এলো না। তারপর এলো রাতের অন্ধকার।

পরদিন সকালে উঠে গোদা বাঁদরকে আর দেখতে পেলুম না।

তারপর যে-কয়দিন বৃন্দাবনে ছিলুম, আমাদের বাসার ত্রিসীমানায় একটা বাঁদরকেও আবিষ্কার করতে পারিনি।

যেখানে বাঁদর-হনুমানের উপদ্রব, তোমরা যদি সেখানে বেড়াতে যাও, আমার এই মুষ্টিযোগটি পরীক্ষা করে দেখতে পারো।

মহাযুদ্ধের গল্প

রোজ আমি যেখানে বসে লিখি, তার বাঁ-দিকে তাকালে দেখা যায়, গঙ্গার নীলাভ জল-রেখা বিপুল এক ধনুকের মতন বেঁকে বালি-ব্রিজের তলা দিয়ে চলে গিয়েছে দূরে দূরান্তরে এবং ডানদিকে মুখ ফেরালে দেখি, নীলাকাশের আলো-মাখা ছোট্ট একটি ছাদ।

ঐ ছাদের উপরে একটি বাগান রচনা করেছিলুম, রোজ সেখানে ফুটত পাঁচ-ছয় শো নানা জাতের নানা রঙের ফুল। বন্ধুদের চোখে-মুখে বাগানটি জাগিয়ে তুলত অপ্রত্যাশিত বিস্ময়।

সে বাগান আর নেই—আছে ধ্বংসাবশেষ। নিতান্ত কড়া-জান, এমন গুটিকয় ফুলগাছ আজও একেবারে মরতে রাজি হয়নি। বাকি টবগুলো ও কাঠের বাক্সের মধ্যে আসর পেতেছে বুনো আগাছার এলোমেলো জঙ্গল। একটা মস্তবড় লোহার টবের ভিতরে কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এক নিমগাছ। প্রায় সাত-আট ফুট উঁচুতে মাথা তুলে হাওয়ায় দুলতে দুলতে সে এই জঙ্গল-সভায় করে সভাপতিত্ব।

আজ সকালে শীতের কাঁচা রোদ এসে ছাদটিকে যখন ধুয়ে দিচ্ছে সোনার জলে, তখন তোমাদের জন্যে কলম নিয়ে বসলুম।

হঠাৎ পোড়ো ছাদ-বাগান থেকে ভেসে এল বিষম কলরব। উঁকি মেরে দেখি, সেখানে বেঁধেছে দুই শালিকের তুমুল লড়াই। তারা প্রথমে ঘন ঘন মাটির দিকে মাথা নামিয়ে ঠিক যেন পরস্পরকে সেলাম করে, তারপর টপাটপ লাফ মারতে মারতে করে এ ওকে ঠুক্‌রে বা আঁচড়ে

দেবার চেষ্টা। মাঝে মাঝে কী প্যাঁচ কষে তারা পরস্পরের পা জড়িয়ে ধরে পড়ে থাকে এবং থেকে থেকে পরস্পরকে ঠুক্‌রে দেয়।

একটা মেয়ে-শালিক অনবরত চিৎকার করছে, মাঝে মাঝে ছাদের পাঁচিলে উঠে চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে কোন দিক থেকে নতুন কোন বিপদ আসবার সম্ভাবনা আছে কিনা, মাঝে মাঝে আবার দুই যোদ্ধার কাছে নেমে এসে শালিক-ভাষায় যা বলছে তার অর্থ হবে বোধ হয় এই ঃ "নাঃ, পুরুষদের নিয়ে আর পারি না বাপু। খালি মারামারি, খালি ঝগড়াঝাঁটি! কি মুশকিলে পড়লুম গো!"

এদিকে এই লড়াইয়ের খবর রটে গিয়েছে দিকে দিকে। ঘটনাস্থলে নানান দর্শক এসে জুটতে লাগল। ছাদের উপরে ছায়া ফেলে ফেলে চক্র দিয়ে হেঁট মুখে ঘুরতে লাগল চার-পাঁচটা শঙ্খচিল ও গোদা চিল। পাঁচ-সাতটা কাক কা-কা করতে করতে ছাদের পাঁচিলে এসে বসে পড়ল। তাদের উত্তেজিত ভাবভঙ্গী দেখলে সন্দেহ হয়, তারা যেন শালিক-যোদ্ধাদের উপরে গুণ্ডামি করতে চায়—যদিও তারা অতখানি আর অগ্রসর হল না, কেন তা জানি না।

গঙ্গাতীরে খোড়ো-নৌকোর উপর থেকে খবর পেয়ে উড়ে এল এক ঝাঁক ফচ্‌কে চড়াই পাখি! তারা যোদ্ধাদের চারিপাশে নেচে নেচে বেড়ায় আর যেন কিচির-মিচির করে বলতে থাকে "নারদ, নারদ, বাহবা-কি বাহবা!" তিনটে পায়রা লোহার রেলিংয়ের উপরে ভীত স্তম্ভিতের মতন বসে দেখছে এই কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড।

একটা কাঠবিড়ালীও শিস্ দিতে দিতে ছুটে এল। তার আগ্রহ আবার সবচেয়ে বেশী! সে সুড়-সুড় করে যোদ্ধাদের খুব কাছে এগিয়ে গেল। অমনি মাদি শালিকটা চট্ করে তার সামনে এসে বললে—কোঁ-কটর্-কটর্, কোঁ-কটর্-কটর্ কোঁ-কটর্-কটর্! অর্থাৎ—"হট্ যাও, নইলে মারলুম এই ঠোকর!"

কাঠবিড়ালী ল্যাজ তুলে লোহার টবের উপরে লাফ মারলে, তারপর চট্‌পট্ নিমগাছটার মগডালে উঠে কিচ্-কিচ্ করে বলতে লাগল, "আয় না দেখি পোড়ারমুখী! আয় না দেখি শালিক্-ছুড়ী!"

শালিক-বউ কিন্তু তার কথা গ্রাহ্যের মধ্যেও আনলে না।

পনের মিনিট কাটল, তবু তার লড়াই থামবার নাম নেই। দুই যোদ্ধা বেজায় হাঁপাচ্ছে, তাদের গা থেকে পালক খসে পড়ছে, দু-চার ফোঁটা রক্তও ঝরল—তবু তারা কেউ পিছ-পাও হতে রাজী নয়। যুদ্ধের কারণ নিশ্চয় গুরুতর!

লেখা ভুলে নিশ্চল অবাক হয়ে লড়াই দেখছি। আমি একটা মনুষ্য-জাতীয় ভয়াবহ জীব যে এত কাছে বসে আছি, ওরা প্রত্যেকেই যেন সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

কিন্তু তারপরেই বুঝলুম, —না, আমার সম্বন্ধে ওরা রীতিমত সজাগ। বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি হচ্ছে দেখে আমি যেই সশব্দে চেয়ার টেনে উঠে দাঁড়ালুম, অমনি এই নাট্যলীলার পাত্র-পাত্রীরা ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে যে যেদিকে পারল সরে পড়ল।

ছাদ আবার স্তব্ধ। আগাছার জঙ্গলে ফুটে আছে সাদার সঙ্গে বেগুনী রঙ-মিশানো ছোট ছোট নামহীন ফুল। একটা একরত্তি হলদে প্রজাপতি তাদের কাছে গেল মধু আহরণের চেষ্টায়। কিন্তু তারপরেই নিজের ভুল বুঝে একদিকে উড়ে গেল ক্ষুদে পাখনা নাড়তে নাড়তে—রোদ-সায়রে ভাসন্ত পরীশিশুদের খেলাঘরের পাল-তোলা নৌকার মতো।

আমি দেখলুম যে-জগৎ আমাদের নয় সেখানকার এক চলচ্ছবি। এমন ছবি তোমরা কোন

সিনেমা-প্রাসাদে গেলেও দেখতে পাবে না! অথচ প্রকৃতির চিত্রজগতে আমাদের আশেপাশেই এমন কত ছবির বাজার নিত্যই খোলা থাকে! আমাদের দেখবার মতন চোখ আর বোঝবার মতন মন নেই বলেই এমন সব বিচিত্র ছবির রস আমরা উপভোগ করতে পারি না।

ধর্মসংহিতার মজার গল্প

তোমরা Talmud নামে ইহুদীদের ধর্মসংহিতার কথা জানো? নানাদেশী পুরাতন ধর্মসংহিতার মতন এর মধ্যে ও বেশ মজার মজার গল্প আছে। আজ তারই একটি নমুনা দিচ্ছি।

এক ধনী ও বুড়ো ইহুদী বুঝতে পারল যে, তার অন্তিমকাল উপস্থিত হয়েছে। তার একমাত্র ছেলে তখন দূর বিদেশে। শিয়রে মরণ, ছেলেকে খবর পাঠাবার সময় নেই!

বাংলা প্রবাদে বলে, 'আসন্ন কালে মানুষের বিপরীত বুদ্ধি হয়'। ঐ ধনী ইহুদীর অন্তিম কালের আচরণ দেখে তোমরাও হয়তো প্রবাদ-বাক্যটিকে সত্য বলে মনে করবে। কারণ মৃত্যু নিশ্চিত জেনে সে তার গোলাম বা ক্রীতদাসকে ডেকে বললে, "ওহে বাপু, তোমার কাজ-কর্ম দেখে আমি ভারি খুশি হয়েছি। আমি আর বাঁচব না। আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমাকেই দান করলুম।"

ক্রীতদাস আনন্দের সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করে বললে, "হুজুরের জয় হোক্!"

—"কিন্তু একটি শর্ত আছে।"

—"কি শর্ত হুজুর?"

—"এই সম্পত্তির ভিতর থেকে আমার ছেলে যে কোন একটিমাত্র জিনিস চাইবে, তোমাকে তা দিতে হবে।" এই বলে বুড়ো মারা পড়ল।

নিজের সৌভাগ্যে ক্রীতদাসের প্রাণ নাচতে লাগল। তার প্রভুর সম্পত্তির ভাণ্ডার অফুরন্ত। প্রভু-পুত্র এর ভিতর থেকে বড়-জোর একটিমাত্র জিনিস চাইতে পারবে,—এ তো তুচ্ছ ব্যাপার! বাকি অধিকাংশ যা থাকবে তাই নিয়েই সে জীবন কাটাতে পারবে রাজার হালে! অতএব ক্রীতদাস প্রভু-পুত্রের হাঙ্গামাটা চট্‌পট্ মিটিয়ে ফেলবার জন্যে অতিশয় ব্যস্ত হয়ে উঠল।

প্রভুর ছেলে যে-বিদেশে আছেন সেইখানে গিয়ে সে হাজির হল।

ক্রীতদাসের মুখে সমস্ত শুনে ধনীর ছেলে বাপের আক্কেল দেখে বিষম খাপ্পা হয়ে উঠল। কোন বাপ যে নিজের একমাত্র ছেলেকে বঞ্চিত করে এমন অদ্ভুত উইল করতে পারে, এটা ছিল তার কল্পনার অতীত। সে তাড়াতাড়ি এক ইহুদী পণ্ডিতের কাছে গিয়ে স্বর্গীয় পিতার এই অন্যায় উইলের কথা উল্লেখ করলে।

পণ্ডিত প্রশংসায় অভিভূত হয়ে বললেন, "কী জ্ঞানী লোক তোমার পিতা! কী আশ্চর্য তাঁর বুদ্ধি! কী চমৎকার তাঁর দূরদৃষ্টি!"

ছেলে হতভম্বের মতন বললে, "কী বলছেন আপনি?"

পণ্ডিত বললেন, "ভাগ্যে তোমার বাবা এমন উইল করে গিয়েছেন, তাই তোমার সম্পত্তি থেকে কেউ আর তোমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না। দেশ থেকে তুমি এত দূরে পড়ে আছ, তোমার বাবা এ-রকম উইল না করলে ঐ ক্রীতদাস সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে কোথায় যে পালিয়ে যেত, কেউ জানতেও পারত না।"

ছেলে বললে, "কিন্তু ক্রীতদাসই তো এখন আমার বাবার সমস্ত সম্পত্তির মালিক!"

পণ্ডিত হাসতে হাসতে বললেন, "না হে বাবাজী, না! তুমি কি জানো না, আইন অনুসারে সমস্ত সম্পত্তিরই অধিকারী হচ্ছেন তার প্রভু? তোমার তো একটিমাত্র জিনিস পাবার কথা? বেশ, তুমি ঐ ক্রীতদাসকেই প্রার্থনা কর তাহলেই ওর সম্পত্তি হবে তোমারই সম্পত্তি।"

পিতার দূরদর্শিতাকে ধন্যবাদ দিয়ে পুত্র চেয়ে নিলে সেই ক্রীতদাসকেই।

চোরের নালিশ

এক যে ছিল চোর তার নাম আমি জানি না। একদিন সে পা টিপে টিপে গেল সওদাগরের বাড়িতে চুরি করতে।

সেই সওদাগরটা ভারী ফিচেল ছিল, বাড়িতে চোর আসা সে মোটেই পছন্দ করত না। তাই বাড়ির সদর দরজা সবসময়েই সে বন্ধ করে রাখত। কাজেই চোর তখন পাঁচিলের ওপরে উঠে, একটা জানলার ভেতর দিয়ে, গরাদ ভেঙে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে গেল।

কিন্তু জানলাটা তেমন শক্ত ছিল না। তাই চোর যেই জানলাটা ধরলে অমনি সেটা হুড়মুড় করে ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চোরও সেই উঁচু থেকে বোঁটা ছেঁড়া কাঁটালের মতন একেবারে মাটির ওপরে দড়াম করে এক আছাড় খেয়ে পড়ল।

আছাড় খেয়ে চোরের ঠ্যাং গেল খোঁড়া হয়ে। সে তখন ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে রাজা হবুচন্দ্রের কাছে গিয়ে নালিশ করলে, 'মহারাজ, অবধান করুন। আমি সওদাগরের বাড়িতে চুরি করতে গিয়েছিলুম। কিন্তু তার বাড়ির জানলাটায় হাত দিতে না-দিতেই সেটা ভেঙে গেল। কাজেই পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলেছি। এখন আপনি এর যা হয় একটা বিহিত করুন।'

শুনেই রাজা হবুচন্দ্র খাপ্পা হয়ে সেপাইকে ডেকে বললেন, 'সওদাগরের কান ধরে এখানে টেনে আনো তো!' সেপাই সওদাগরের কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনলে। রাজা বললেন, 'হ্যাঁ হে সওদাগর, এ কী শুনছি? এই চোর তোমার বাড়িতে চুরি করতে গিয়েছিল, কিন্তু তোমার জানলা ভেঙে যাওয়াতে বেচারি পড়ে গিয়ে পা খোঁড়া করে ফেলেছে। জানলায় তুমি পেরেক মেরে রাখো না কেন?'

সওদাগর জোড়হাতে বললে, 'মহারাজ অবধান করুন। এ তো আমার দোষ নয়, যে জানলা তৈরি করেছে, এ সেই ছুতোরের দোষ!'

রাজা বললেন, 'সেপাই, ছুতোরকে টিকি ধরে টেনে আনো তো।

সেপাই ছুতোরকে টিকি ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল।

রাজা বললেন, 'ওরে ছুতোর, জানলা তুই আলগা করে বসিয়েছিস কেন? দেখ দেখি তোর জন্যে চোর বেচারির ঠ্যাং খোঁড়া হয়ে গেছে।'

ছুতোর জোড়হাতে বললে, 'মহারাজ, অবধান করুন। এ তো আমার দোষ নয়, যে রাজমিস্ত্রি জানলা বসিয়েছে এ তারই দোষ।'

রাজা বললেন, 'সেপাই, দাড়ি ধরে রাজমিস্ত্রিকে এখানে টেনে আনো তো!'

দাড়িতে হ্যাঁচকা-টান পড়তেই রাজমিস্ত্রি এসে হাজির। রাজা বললেন, 'মিস্ত্রি, ভালো করে তুমি জানলা বসাওনি কেন?'

মিস্ত্রি জোড়হাতে বললে, 'মহারাজ, অবধান করুন। রাস্তা দিয়ে একটি সুন্দরী মেয়ে যাচ্ছিল, তার পরনে কী চমৎকার রঙিন কাপড়! তাই দেখে আমি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম, কী করতে কী করে ফেলেছি, আমার মনে নেই।'

তখনই সেই সুন্দরী মেয়েকে এনে রাজসভায় হাজির করা হল। রাজা বললেন, 'সুন্দরী মেয়ে, কেন তুমি সেদিন রঙিন কাপড় পরেছিলে?'

সুন্দরী মেয়ে জোড়হাতে বললে, 'মহারাজ, অবধান করুন। এতে আমার দোষ নেই, যে কাপড়ে বুনেছে—যত নষ্টের গোড়া সেই বোকা তাঁতি।'

বোকা তাঁতিকে তখনই ধরে আনা হল। কিন্তু রাজার কথায় সে কোনওই জবাব দিতে পারলে না—শুধু ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

রাজা বললেন, 'সুন্দরী মেয়ে ঠিক বলেছে—যত নষ্টের গোড়া এই বোকা তাঁতি! এ আমার কথায় তাই জবাব দিতে পারছে না! বেঁটে জল্লাদ, বোকা তাঁতির মাথা এখনই ঘ্যাঁচ করে কেটে ফ্যালো।

বেঁটে জল্লাদ তখনই বোকা তাঁতিকে ধরে বাইরে নিয়ে গেল। বোকা তাঁতির মাথাটি সেদিন নিশ্চয় কাটা যেত, কিন্তু সে বেজায় ঢ্যাঙা ছিল বলে বেঁটে জল্লাদের তরোয়াল তার মাথা পর্যন্ত উঠল না।

বেঁটে জল্লাদ তখন রাজার কাছে ফিরে গিয়ে বললে, 'মহারাজ, অবধান করুন। বোকা তাঁতি বড়ো ঢ্যাঙা। আমি বেঁটে মানুষ, তার মাথার নাগাল পাচ্ছি না।'

রাজা হবুচন্দ্র তখন ফাঁপরে পড়ে, মন্ত্রী গবুচন্দ্রের পরামর্শ চাইলেন। গবুচন্দ্র কানের তুলো খুলে বুদ্ধি বার করে, অনেক মাথা ঘামিয়ে বললেন, 'মহারাজ, বোকা তাঁতি ঢ্যাঙা বলেই তো বেঁটে জল্লাদ তার মাথা কাটতে পারছে না? এতে আর ভাবনার কী আছে? একটা বেঁটে লোককে খুঁজে বার করলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়!'

রাজা বললেন, 'ঠিক কথা। কিন্তু এখন আমার খিদের চোটে পেট চুঁই চুঁই করছে, বেশি খোঁজাখুঁজির সময় নেই। একটা বেঁটে লোক হলেই চলবে তো? বেশ, ওই বেঁটে জল্লাদকেই তবে কেটে ফেলা হোক।'

তখনই বেঁটে জল্লাদের কাঁধ থেকে মুণ্ডু গেল উড়ে। রাজার সুবিচারে খুশি হয়ে খোঁড়া চোর ঠ্যাঙের ব্যথা ভুলে বাড়ি গেল, আর সকলেও হাঁপ ছেড়ে বাঁচল—আর আমার কথাটিও ফুরুল।

বাঘের মাসির গ্রহণযাত্রা

॥ ১ ॥

রংটা ছিল তার একেবারে কালো কুচকুচে—কোথায় লাগে অমাবস্যার ঘুরঘুট্টে অন্ধকার! সেই কালো রঙের ভিতর থেকে, তার দু-দুটো গোল গোল চোখকে, দেখাত ঠিক যেন জ্বলন্ত কয়লার দুটো টল-গুলির মতো।

তাকে কেউ ডাকেওনি, আনেওনি, কে জানে কোথা থেকে হঠাৎ সে একদিন উড়ে এসে জুড়ে বসল। তার শয়তানের মতো বিদঘুটে চেহারা দেখে, নেপাল সেইদিনই তাকে লাথি মেরে দূর করে খেদিয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু নেপালের মা বললেন, 'আহা, থাক, থাক! কেষ্টোর জীব এসেছে, ওকে তাড়াসনে নেপু!'

বিড়ালটা সেইদিন থেকেই নেপালদের বাড়িতে জাঁকিয়ে আস্তানা গেড়ে বসেছিল। সবাই তার নাম দিলে কেলেমুখী।

॥ ২ ॥

শুধু চেহারা নয়, কেলেমুখীর স্বভাবেও যে কতখানি শয়তানি ছিল, ক্রমেই তা ফুটে বেরুতে লাগল।

রোজ সে নিয়ম করে হাঁড়ি খেত। এত বড়ো তার বুকের পাটা ছিল যে, খেতে বসে নেপালচন্দ্র একটু অন্যমনস্ক হয়েছে কী, অমনি সে ফস করে নুলো মেরে পাত থেকে একখানা মাছ নিয়ে, ল্যাজ তুলে দে চম্পট! খোকার হাত থেকে থাবা মেরে খাবার কেড়ে নেওয়া, খুকির দুধ চেটেপুটে খেয়ে যাওয়া, এসব ব্যাপার তো প্রায় হামেশাই ঘটত।

শেষটা কেলেমুখীকে দেখলেই নেপাল রেগে পাগলের মতো হয়ে উঠত। কেলেমুখীকে মারতে গিয়ে নেপাল যে পা হড়কে দুমদাম কত আছাড় খেয়েছে, বাপের কত ভালো ভালো লাঠি ভেঙেছে, তা আর গুনে বলা যায় না। কেলেমুখী কিন্তু এমনি সেয়ানা ছিল যে, কিছুতেই সে নেপালকে ধরা-ছোঁয়া দিত না। উলটে, লাঠি ভাঙার দরুন নেপালকেই বাপের কাছে বকুনি আর চড়-চাপড়টা খেয়ে হজম করতে হত।

॥ ৩ ॥

নেপাল সেদিন বাজারে গিয়ে, নিজে দেখে-শুনে শখ করে একটা ইলিশমাছ কিনে এনেছে। ঝি মাছ কুটে, ধুয়ে, কোটা মাছগুলো একখানা গামলা চাপা দিয়ে রেখে গেল। কেলেমুখীও সে খোঁজ পেলে। যখন কেউ কোথাও নেই, কেলেমুখী আস্তে আস্তে এসে, গামলাখানা নুলো মেরে উলটে দিয়ে, একে একে মাছগুলো পেটের ভিতরে পুরতে লাগল। বুঝেই দ্যাখো, টাটকা ইলিশমাছ। খেতে তার বড়োই আয়েস হচ্ছিল!

এমন সময় নেপাল এসে হাজির। কিন্তু মাছগুলো তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অত

সাধের মাছ কেলেমুখীর পেটে সেঁধুচ্ছে দেখে, প্রথমটা নেপাল চক্ষুস্থির করে দাঁড়িয়ে রইল।

কেলেমুখী কিন্তু নেপালকে দেখেই, গতিক বড়ো সুবিধের নয় বুঝে লম্বা এক দৌড় মারলে। নেপালও তাকে ধরবার জন্যে পিছনে পিছনে ছুটল বটে, কিন্তু তাকে ধরতে পারবে কেন? কেলেমুখী দিব্যি জানলার রেলিং গলে পাশের বাড়ির ছাদে গিয়ে পড়ল। তারপর নেপালের মুখের দিকে তাকিয়ে—'মে-এ-এ-অ্যাঁও!' বলে ডেকে, বেশ ধীরে-সুস্থে বসে বসে নিশ্চিন্ত মনে হাত দিয়ে মুখ মুছতে লাগল।

নেপাল তো আর কেলেমুখীর মতো জানলার রেলিং গলে বাইরে যেতে পারলে না, চটে লাল হয়ে ঘরের ভিতর থেকেই সে খাঁচায় বন্ধ বাঘের মতো লম্ফঝম্ফ আর তর্জন গর্জন করতে লাগল। কেলেমুখী হচ্ছে পাজির পা-ঝাড়া, সে বেশ জানে মানুষরা তার মতো ফুড়ুক করে জানলা দিয়ে গলতে পারে না, কাজেই সে নেপালের তর্জন-গর্জনে একটুও কেয়ার করলে না। মাঝে মাঝে সে খালি ঝাঁটার মতো গোঁফ ফুলিয়ে 'মে-এ-এ-অ্যাঁও' বলে ডাক ছাড়ে, আর মাথা নেড়ে হাত দিয়ে মুখ মোছে।

নেপালের মনে হল কেলেমুখী তাকে দাঁত খিঁচিয়ে ঠাট্টা করে বলছে, 'ওরে ছোঁড়া, মার না দেখি।' নেপালের রাগ তখন দস্তুরমতো মাথায় চড়ে গেল, সে হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে, বাপের চটিজুতোর এক পাটি ঘরের মেঝে থেকে তুলে নিয়ে, কেলেমুখীকে যত জোরে পারে ছুড়ে মারিলে। জুতো কেলেমুখীকে পেরিয়ে, দু-দুটো বাড়ি ছাড়িয়ে কোথায় যে গিয়ে পড়ল তা বোঝা গেল না। কেলেমুখীর কিছুই হল না, বরং সেদিন জুতো হারিয়ে বাপের হাতে নেপালেরই বেশ একচোট উত্তম-মধ্যম লাভ হল। মার খেয়ে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে নেপাল প্রতিজ্ঞা করলে, কেলেমুখীকে যমের বাড়ি না পাঠিয়ে সে আর জল খাবে না।

॥ ৪ ॥

সেইদিনই বিকালবেলায়, কেলেমুখী রান্নাঘরে উনুনের ছাইয়ের গাদায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পরম আরামে নিদ্রা দিচ্ছিল, এমন সময়ে পা টিপে টিপে এসে নেপাল ক্যাঁক করে তার টুঁটি টিপে ধরলে। কয়লার গাদায় চটের একটা মস্ত থলে ছিল, নেপাল তার মধ্যে আগে দুখানা ইট পুরে, তারপর কেলেমুখীকে ঢুকিয়ে খুব কষে থলের মুখ বেঁধে ফেললে। সে মনে মনে ঠিক করেছে, কেলেমুখীকে আজ থলে সুদ্ধ গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে এসে, তবে অন্য কাজ। পাছে থলে ভেসে ওঠে, তাই তার ভিতরে থান ইট দুখানা পুরে দিয়েছে।

মা এসে বাধা দিয়ে বললেন, 'আহা কেষ্টোর জীব!'

নেপাল বললে, 'হ্যাঁ, কেলেমুখী যাতে চটপট কেষ্ট পায়, সেই বন্দোবস্তই করা যাচ্ছে!' এই বলে সে থলে কাঁধে করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

তার মনটা আজ ভারী খুশি। কেলেমুখী তাকে বড়ো জ্বালানোই জ্বালিয়েছে, আজ তার সব শেষ। কেলেমুখীর কালামুখ আর কেউ তার বাড়িতে দেখতে পাবে না।

গঙ্গার ধারে এসে, নেপাল আগে একটা জাহাজ বাঁধবার জেটির ওপরে গিয়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু থলেটা বারকতক ঘুরিয়ে যেই সে গঙ্গার ভিতরে ছুড়ে ফেলে দিলে, অমনি টাল সামলাতে না পেরে নিজেও ঝুপ করে পড়বি তো পড়—একেবারে ডুব-জলের মধ্যে।

জলে পড়ে নেপাল যখন ভয়ানক নাকানি-চোবানি খাচ্ছে, তখন কী ভাগ্যি একজন

খালাসি তাকে দেখতে পেলে, নইলে কেলেমুখীর সঙ্গে তাকেও সেদিন এক ডুবে পাতালে গিয়ে হাজির হতে হত!

খালাসি যখন তাকে জল থেকে টেনে ডাঙায় এনে তুললে, নেপালচন্দ্রের অবস্থা তখন বড়োই কাহিল। তার জুতো ভেসে গেছে, জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেছে, পেটটি জল খেয়ে মস্ত একটি ঢাক হয়ে উঠেছে।

নেপাল মনে মনে বললে, 'কেলেমুখী মরবার সময়েও আমাকে জ্বালিয়ে গেল। জামা-কাপড় ছেঁড়া আর জুতো হারানোর জন্যে আজ আবার একচোট মার খেতে হবে দেখছি! যাক, কেলেমুখী আর তো আমাকে জ্বালাতে আসবে না, ওইটুকুই যা লাভ!'

॥ ৫ ॥

কিন্তু নেপাল যখন বাড়ি ফিরে এল, তখন সে যা দেখলে তাতে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলে না। অ্যাঁঃ! ও কী,—কেলেমুখী। না, কেলেমুখীর ভূত?

সত্যিই তাই! রান্নাঘরের দরজার গোড়ায়, মাটির ওপরে থাবা পেতে জাঁকিয়ে বসে, ল্যাজ তুলে ঘাড় বেঁকিয়ে কেলেমুখী একমনে বামুন-ঠাকরোনের মাছ ভাজা দেখছিল। নেপালকে দেখেই সে 'মে-এ-এ-অ্যাঁও' বলে ঠাট্টা করে এক দৌড়ে পালিয়ে গেল।

নেপাল হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এমন সময়ে মা এসে আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ রে নেপু, অবেলায় নেয়ে এলি বড়ো যে?'

সে কথার কোনও জবাব না দিয়ে নেপাল বললে, 'হ্যাঁ মা কেলেমুখী আবার কোত্থেকে ফিরে এল, আমি তো ওকে এইমাত্র গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসছি।'

মা হেসে বললেন, 'থলের তলায় মস্ত একটা ছ্যাঁদা ছিল যে! তুই যেই থলেটা কাঁধে ফেললি, কেলেমুখী অমনি সেই ছ্যাঁদা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল।'

নেপাল কাঁদো কাঁদো মুখে বললে, 'মা, তুমি কেলেমুখী পালাচ্ছে দেখেও সেকথা আমায় বলে দাওনি!'

মা বললেন, 'আহা, কেষ্টোর জীব!'

হবু-গবুর মুল্লুকে

এক যে ছিল মেয়ে—নামটি তার খুদি। সে যে রাজার মেয়ে নয়, নাম শুনেই সেটা বোধহয় তোমরা ধরে ফেলেছ। রাজা তো দূরের কথা, সে ধনীর মেয়েও নয়। তার বাপ হচ্ছে সামান্য এক চাষা।

এখন, খুদি সেদিন খেলার সাথি না পেয়ে, ঘরের দাওয়ায় একলাটি পা ছড়িয়ে বসে, আকাশ-পাতাল নানান কথা ভাবছিল। কী ভাবছিল সেটাও তোমাদের বলছি, শোনো।

খুদি ভাবছিল, 'আমি যখন বড়ো হব, তখন নিশ্চয়ই রূপকথার এক পরমসুন্দর রাজপুত্তুরের সঙ্গে ধুমধাম করে আমার বিয়ে হবে। আর বিয়ে হলেই আমার ক্ষীরের পুতুলের মতো একটি সুন্দর ফুটফুটে খোকাও হবে তো! খোকনের নামটি রাখব মানিক। যদি হঠাৎ কোনও অসুখে মারা পড়ে,—যেমনি এই কথা মনে হওয়া, অমনি খুদুমণির নাকি সুরে কান্না শুরু! 'ওমা, কী হবে গো—ওমা, কী হবে গো!'

খুদির মা রান্নাঘরে উনুনের উপরে ভাতের হাঁড়ি চড়াতে যাচ্ছিল, মেয়ের কান্না শুনে তাড়াতাড়ি দাওয়ায় বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে,—'কী লা খুদি, সকালবেলায় কান্না ধরলি কেন?'

খুদি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, 'বিয়ের পরে যদি আমার খোকা হয়, আর সে যদি মারা যায়? তাই কাঁদছি!'

যেমনি এই কথা শোনা, অমনি খুদির মাও মাথায় হাত দিয়ে ধপাস করে বসে পড়ে, কান্না জুড়ে দিলে—'ওরে আমার খুদুর খোকা! ওরে আমার নাতি! ওরে আমার স্বর্গের বাতি! তুই যদি মারা যাস রে বাছা—' সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মায়ে-ঝিয়ে এমনি কান্নাটা কাঁদলে যে, রান্নাবান্না কিছু সেদিন আর হল না।

দুপুরবেলায় খেতে লাঙল ঠেলে, রোদ্দুরের তাতে ধুঁকতে ধুঁকতে তেষ্টায় টা টা করতে করতে, খুদির বাপ বুদ্ধু বাড়ি ফিরে এল।

বাড়িতে ঢুকেই মড়া-কান্না শুনে তার পিলে চমকে গেল। তারপর এদিক-ওদিক দেখে সে বললে, 'একী, তোরা কাঁদচিস ক্যান রে? আর আমার খাবারই বা কোথায়?'

খুদির মা তখন সব কথা খুলে বললে। শুনেই বুদ্ধু রেগে তিনটে হয়ে বললে, 'অ্যাঁঃ! আমার খেতের গোরু দুটোর বুদ্ধিও যে তোদের চেয়ে বেশি। কোথায় বিয়ে, কোথায় খোকা তার ঠিক নেই, এখুনি উদ্দেশেই কান্না! দুৎতোরি, নিকুচি করেছে—এমন নিরেট বোকার সঙ্গে ঘরকন্না করা আমার পোষাবে না।' এই না বলে রাগে গসগস করতে করতে চাষা বাড়ি থেকে সোজা বেরিয়ে গেল।

একটা, দুটো, তিনটে,—এমনি অনেকগুলো গ্রাম, মাঠ, নদী পার হয়ে, বুদ্ধু, শেষটায় এক অচেনা দেশে এসে হাজির।

হঠাৎ দেখলে এক জায়গায় একটা ঝুপসি বটগাছের তলায় কিসের জটলা হচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখে, প্রায় দুশো-তিনশো লোকে মিলে একখানা তক্তার দুদিক ধরে ক্রমাগত টানাটানি করছে আর গলদঘর্ম হয়ে হাঁপিয়ে মরছে।

বুদ্ধু বললে, 'তোমাদের একী হচ্ছে বাপু?'

তারা বললে, 'এই তক্তা দিয়ে আমরা ওই নদীর একটা সাঁকো তৈরি করতে চাই। কিন্তু কাঠখানা এত ছোটো যে, নদীর ওপার পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না। তাই আমরা সবাই মিলে টেনে টেনে তক্তাখানাকে লম্বা করার চেষ্টায় আছি, কিন্তু কিছুতেই পারছি না।'

বুদ্ধু বললে, 'আচ্ছা, আমি যদি এখুনই তক্তাখানাকে লম্বা করে দিতে পারি?'

সে দেশের যিনি রাজা, তাঁর নাম হবুচন্দ্র। তিনি তাঁর মন্ত্রী গবুচন্দ্রের দিকে ফিরে গোঁফে মোচড় দিতে দিতে বললেন, 'ওহে মন্ত্রী, লোকটা পাগল নাকি?'

মন্ত্রী তাঁর গণেশদাদার মতো নাদা পেটে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'সেকথা আর দুবার বলতে মহারাজ। এ রাজ্যের গণ্ডা গণ্ডা যণ্ডা লোক মিলে যা করতে পারলে না, ও কিনা একলা সেই কাজ হাসিল করতে চায়? লোকটা নিশ্চয়ই কোনও চোরের স্যাঙাৎ।'

রাজা হবুচন্দ্র তখন বুদ্ধুর দিকে ফিরে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, 'আচ্ছা, তুমিও না হয় একবার চেষ্টা করে দ্যাখো! কাঠখানাকে লম্বা করতে পারলে, তোমাকে আমি বিশ মোহর বকশিশ দেব, নইলে কান দুটি করাত দিয়ে কুচ করে কেটে নেব।'

বুদ্ধু তখন করলে কী জানো? আর একখানা কাঠ নিয়ে এসে, সেই কাঠখানার সঙ্গে

পেরেক মেরে শক্ত করে লম্বালম্বি জুড়ে দিলে। কাজেই আকারটা দুগুন হয়ে গেল বলে, তখন সেই কাঠ দিয়ে সাঁকো তৈরি করতে আর কোনওই বেগ পেতে হল না। রাজা হবুচন্দ্রও খুশি হয়ে বুদ্ধুর কান আর কেটে নিলে না, উলটে নগদ বিশ মোহর বকশিশ দিলেন।

বুদ্ধু মোহরগুলো সাবধানে কাছায় বেঁধে রেখে আবার হাঁটতে শুরু করলে। খানিকক্ষণ পরে একটা গাঁয়ে এসে দেখলে, এক জায়গায় একটা নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে, কিন্তু তার উপরে-নীচে কোথাও একটাও জানলা নেই। সেই বাড়ির সামনের সবুজ মাঠের উপরে একদল লোক কেবলই জাল গুটুচ্ছে আর ফেলছে।

বুদ্ধু আশ্চর্য হয়ে বললে, 'ওহে মাঠের ওপরে জাল ফেলে তোমরা সবাই ব্যাং ধরছ না গঙ্গাফড়িং ধরছ?'

তারা বললে, 'ওই নতুন বাড়ির ভেতরে আলো ঢোকে না। তাই আমরা জাল ফেলে সূর্যের আলো ধরে ওই বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাবার চেষ্টায় আছি, কিন্তু কিছুতেই পারছি না।'

বুদ্ধু বললে, 'আচ্ছা, আমি যদি ওই বাড়ির ভেতরে আলো যাবার বন্দোবস্ত করে দিই, তাহলে তোমরা আমাকে কী দেবে?'

বাড়ির কর্তা বললেন, 'নগদ একশো টাকা।'

বুদ্ধু তখন ছুতোর মিস্ত্রি ডাকিয়ে, সেই বাড়ির চারিদিকে গোটাকতক জানলা ফুটিয়ে দিলে, আর দেখতে দেখতে সমস্ত ঘরেই সোনার জলের মতো চিকমিকে রোদের আলো এসে পড়ল।

বাড়ির কর্তার কাছ থেকে নগদ একশোটা টাকা নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজে, বুদ্ধু আবার পথ চলতে লাগল।

খানিকদূর গিয়েই দেখলে, এক জায়গায় দুজন স্ত্রীলোক একটা রামছাগলের শিং আর ল্যাজ ধরে টানাটানি করছে, কিন্তু ছাগলটা কিছুতেই এক পাও এগুতে রাজি হচ্ছে না।

বুদ্ধু বললে, 'ওগো বাছারা শ্রীরামছাগল কেন যে তোমাদের সঙ্গে যেতে চাইছে না, তার খবর কিছু রাখো?'

তারা বললে, 'না।'

বুদ্ধু বললে, 'ওই রামছাগলের মামাতো ভাই শ্যামছাগলের আজ যে বিয়ে। আর সেই বিয়েতে ওর যে নীতবর হবার কথা।'

তারা বললে, 'ওমা, তাই নাকি।'

বুদ্ধু বললে, 'হ্যাঁ, সেইজন্যেই তো ওকে বিয়েবাড়িতে নিয়ে যাব বলে আমি এসেছি।'

শুনেই তারা রামছাগলকে বুদ্ধুর হাতে ছেড়ে দিলে। বিয়ে বাড়িতে নীতবর হয়ে যাচ্ছে— কিছু সাজগোছ চাই তো! কাজেই তাদের একজন নিজের গলা থেকে একছড়া সোনার হার খুলে নিয়ে রামছাগলের গলায় পরিয়ে দিলে।

বুদ্ধু ছাগল নিয়ে চলে গেল। তারপর একটু আড়ালে গিয়েই ছাগলের গলা থেকে হারছড়া খুলে নিয়ে, ছাগলটাকে দমাস করে এক লাথি মেরে 'ভাগো হিঁয়াসে' বলে বিদায় করে দিলে।

এদিকে সেই স্ত্রীলোক দুটি বাড়িতে এসে সকলের কাছে শ্যামছাগলের বিয়েতে রামছাগলের নীতবর হওয়ার গল্প করলে। শুনেই বাড়ির বুদ্ধিমান কর্তা লাফিয়ে উঠে বললেন, 'সর্বনাশ! নিশ্চয় একটা জোচ্চোর এসে তোমাদের হাঁদা মেয়েমানুষ পেয়ে ডাহা ঠকিয়ে গেছে।'

কর্তা তখনই একটা ঘোড়ায় চড়ে বুদ্ধুর খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। খানিকদূর গিয়েই দেখেন, একটা লোক মনের খুশিতে তুড়ি দিয়ে গলা ছেড়ে টপ্পা গান গাইতে গাইতে পথ চলছে। সে বুদ্ধু।

কর্তা ঘোড়া থামিয়ে বললেন, 'ওহে ভাই, এ পথ দিয়ে রামছাগল নিয়ে একটা লোককে যেতে দেখেছ?'

বুদ্ধু তখনই ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে চটপট বললে, 'হুঁ, দেখেছি বইকী! সে লোকটা এইমাত্র ওই মাঠ পার হয়ে চলে গেছে। আপনি যদি তাকে ধরতে চান, তবে এইবেলা শিগগির দৌড়ে গিয়ে ধরুন।'

কর্তা বললেন, 'ঠিক বলেছ, না দৌড়লে তাকে ধরতে পারব না বটে। কিন্তু ঘোড়ায় চড়ে আমি নিজে দৌড়ব কেমন করে?'

বুদ্ধু বললে, 'বেশ তো, তার জন্যে আর ভাবনা কী! ঘোড়াটাকে ধরে আমিই না হয় এইখানে দাঁড়িয়ে আছি—আপনি শিগগির দৌড়ে যান।'

বুদ্ধুর হাতে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে কর্তা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োতে লাগলেন।

বুদ্ধুও অমনি একলাফে ঘোড়ায় চড়ে বাড়ির দিকে রওনা হল।

বাড়ি ফিরে এসে বুদ্ধু হাসতে হাসতে তার বউকে বললে, 'বুঝেছিস বউ, দুনিয়ায় তোদের চেয়েও বোকা লোক ঢের আছে। তাই আমি ফের বাড়ি ফিরে এলুম,—নইলে এতক্ষণে হয়তো ভস্ম মেখে সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয় পাহাড়ে চলে যেতুম।'

বাহাদুর হাবু

মনে মনে যে আঁক কষা হয়, তার নাম মানসাঙ্ক। এটা তোমরা নিশ্চয়ই জানো, কারণ তোমাদের সকলকেই মানসাঙ্ক কষতে হয় তো? তবে তোমরা যতই সেয়ানা হও না কেন, এদিকে আমাদের হাবুবাবুর মতন বাহাদুরি যে তোমাদের কেউ দেখাতে পারবে না, এ কথা আমি জাঁক করে বলতে পারি।

সেদিন ইশকুলের মাস্টারমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা হাবু, ঝুড়ির ভেতরে যদি তিনটে আঁব থাকে—'

হাবু ভারী খুশি হয়ে চটপট বলে উঠল, 'কী আঁব স্যার, দিশি না ন্যাংড়া?'

মাস্টার : আচ্ছা, না হয় ধরেই নাও ন্যাংড়া আঁব! এখন শোনো। তোমার মা যদি ঝুড়ির ভেতরে তিনটি ন্যাংড়া আঁব রেখে দেন, আর—

হাবু বাঃ! তা কী করে হবে স্যার? ন্যাংড়া আঁব তো এখনও ওঠেনি!

মাস্টার আহা, মনে করেই নাও না যে, আঁবগুলো ন্যাংড়া।

হাবু (হতাশভাবে) তাহলে আঁবগুলো সত্যিই ন্যাংড়া না?

মাস্টার না।

হাবু তবে কি আপনি দিশি আঁবের কথা বলছেন!

মাস্টার : না, না, আমি কোনও আঁবের কথাই বলছি না। ধরে নাও, ঝুড়ির ভেতরে যেন তিনটে আঁব আছে।

হাবু : (আঁবের নামেই সে পকেট থেকে ছুরিখানা বার করেছিল, এখন সেখানা ফের মুড়ে পকেটের ভেতরে রাখলে) তাহলে আপনি সত্যিকার আঁবের কথাও বলছেন না?

মাস্টার না। ঝুড়ির ভেতরে যেন তিনটে আঁব আছে। এখন তোমার ছোটো বোন যেন একটা আঁব খেয়ে চলে গেল—

হাবু : না স্যার, তিন-তিনটে আঁব থাকতে, মোটে একটা আঁব খেয়েই আমার বোন কখনও সেখান থেকে নড়বে না। সে আগে তিনটে আঁবই সাবাড় করবে, তবে যাবে। হুঁ, আমার বোনটির গুণের কথা তো আপনি জানেন না!

মাস্টার : আচ্ছা, মনে করো তুমিও সেখানে দাঁড়িয়েছিলে। তোমার ভয়ে সে একটার বেশি আঁব খেতে পারলে না।

হাবু বাঃ, আমি সেখানে থাকলে আমার বোনকে একটা আঁবই বা খেতে দেব কেন?

মাস্টার আচ্ছা, মনে করো তোমার মা এসে যেন তাকে একটা আঁব খেতে দিলেন।

হাবু তাই বা কী করে হবে? মা যে এখন মামার বাড়িতে গেছেন।

মাস্টার (রেগে উঠে) হাবু, ওসব বাজে কথা রাখো। আমি এই শেষবার তোমায় জিজ্ঞাসা করছি, ঠিক উত্তর দাও। ঝুড়ির ভেতরে যেন তিনটে আঁব আছে। তোমার বোন একটা আঁব খেয়ে ফেললে। এখন বলো তো দেখি, ঝুড়ির ভেতরে কটা আঁব রইল?

হাবু একটাও না।

মাস্টার একটাও না! কী রকম?

হাবু আজ্ঞে, আমার বোন যদি সত্যিই একটা আঁব খেয়েই চলে যায়, তবে বাকি দুটো আঁব যে তখুনি আমিই খেয়ে ফেলব।

মাস্টার (হাল ছেড়ে দিয়ে ক্লাসের অন্য ছাত্রদের ডেকে) তোমাদের ছুটি হল, বাড়ি যাও। হাবু এখন পাঁচটা পর্যন্ত গাধার টুপি পরে একপায়ে বেঞ্চির ওপরে দাঁড়িয়ে থাকবে।

ছিদামের পাদুকা-পুরাণ

॥ ১ ॥

বেচারি ছিদাম! ভগবান তাকে রূপও দেননি। জাতে ছিল সে কুমোর, সারাদিন বসে বসে হাঁড়ি-কুড়ি গড়াই ছিল তার ব্যাবসা।

ছিদামের বউ থাকোমণির মুখ যদি একটু মিষ্টি হত, তাহলেও ছিদাম বরং কতকটা খোশমেজাজে থাকতে পারত। কিন্তু ভগবান তার কপালে সে আরামটুকুও লেখেননি।

গায়ে গয়না পরতে পায় না বলে থাকোমণি উঠতে বসতে বরের সঙ্গে গায়ে পড়ে কোঁদল করে। যখন তখন গঞ্জনা দিয়ে বলে, 'যার এক পয়সা ট্যাঁকে নেই, তার আবার বিয়ে করার আম্বা কেন?'

ছিদামও বুঝত, তার মতন লোকের পক্ষে, বিয়ে করার আম্বাটা হচ্ছে কাঙালের ঘোড়া-রোগের মতো। তাই সে ঘাড় হেঁট করে, বোবা-কালা ইশকুলের ছেলের মতন একেবারে চুপ হয়ে বসে থাকত।

কিন্তু সেদিন তার ভালোমানুষিও থাকোমণির ধাতে আর সইল না। মুখ বেঁকিয়ে হাত নেড়ে সে বললে, 'দ্যাখো, তুমি এই লক্ষ্মীছাড়া ব্যাবসাটা ছাড়বে কি না আমাকে আজ স্পষ্ট করে খুলে বলো!'

ছিদাম আশ্চর্য হয়ে বললে, 'সে কি বউ, জাত-ব্যাবসা ছাড়লে যে পেটে দুটো ভাতও জুটবে না! তখন করব কী? ভিক্ষে?'

থাকো বললে, 'বুদ্ধির ছিরি দ্যাখো না! পোড়া কপাল, ভিক্ষে করতে যাবে কেন? তুমি জ্যোতিষী হবে—লোকের হাত দেখে টাকা আনবে।'

ছিদাম ভয়ানক চমকে উঠে, কপালে চোখদুটো তুলে বললে, 'জ্যোতিষী? আমি কুমোরের ছেলে, আমি হব জ্যোতিষী? সে যে দুর্বোঘাসে পাকা লাঠি! বউ, তুমি বলো কী? তোমার মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো?'

থাকো বললে, 'আমি ঠিক কথাই বলছি। ওই দ্যাখো না কেন, পাড়ায় হরি মুকুয্যে জ্যোতিষী হয়ে কত টাকা রোজগার করে, আর তার বউ গায়ে কত গয়না পরে!'

ছিদাম বললে, 'কিন্তু আমি মোটেই গুনতে শিখিনি যে।'

থাকো এবারে রেগে চেঁচিয়ে বাড়ি মাত করে বললে, 'দ্যাখো, তুমি আর আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। যদি জ্যোতিষী না হও, আমি তাহলে আজকেই বাপের বাড়ি চলে যাব। তখন কে তোমাকে ডাল-ভাত ছত্রিশ তরকারি রেঁধে খাওয়ায়, তা দেখে নেব।'

ছিদাম বউকে ভারী ভয় করত। কাজেই সে তখন কাঁচুমাচু মুখে আস্তে আস্তে বললে, 'আচ্ছা, তাহলে আমি না হয় জ্যোতিষীই হব! কিন্তু গিন্নি, এর চেয়ে মানুষ খুন করাও ঢের সহজ বলে মনে হচ্ছে।'

॥ ২ ॥

জ্যোতিষীরা যে পুথি বগলে করে পথের ধারে বসে থাকে, ছিদাম তা দেখেছিল। কিন্তু ছিদাম হচ্ছে জাত কুমোরের ছেলে। তার কোনও পুরুষে বই কেনেওনি, পড়েওনি—কাজেই তার ঘরেও বই-টই কিচ্ছুই ছিল না।

ছিদাম তখন বুদ্ধি খাটিয়ে, নিজের ছেঁড়া চটিজুতো জোড়া বেশ করে প্রথমে কাপড়ে জড়িয়ে নিলে। তারপর পুথির মতন করে সেই জুতোজোড়া বগলে পুরলে। সেই সঙ্গে কপালে একটা মস্ত তিলকও কাটতে ভুললে না।

কিন্তু বাড়ি থেকে বেরুতে তার বুকটা ভয়ে দমে গেল। শহরের সবাই তাকে চেনে। তার এই ভোল ফেরানো দেখলে লোকে বলবে কী?

যাহোক, অনেক করে মনকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শেষটা সে মরিয়া হয়ে যা থাকে কপালে বলে পথে বেরিয়ে পড়ল। তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে চেঁচাতে লাগল, 'আমি জ্যোতিষী! আমি জ্যোতিষী! চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রের নাড়ির খবর সমস্তই আমার এই পুথিতে লেখা আছে।'

রাস্তায় লোকজনরা সবাই তো হতভম্ব!

কেউ বললে, 'ছিদামের মাথা খারাপ হয়ে গেছে!'

কেউ বললে, 'ছিদাম বোধহয় ঠাট্টা করছে!'

কেউ বললে, 'ছিদাম, হাঁড়ি-কুড়ি গড়ায় তোমার কি অরুচি ধরে গেছে ভায়া?'

ছিদাম কিন্তু কারুর কথাই আমলে আনলে না। সে নিজের মনেই গড়গড় করে হেঁকে যেতে লাগল, 'আমি জ্যোতিষী! আমি জ্যোতিষী!'

ঠিক সেই সময়ে রাজার জহুরি পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রথমে তিনি রাস্তার গোলমালে কান পাতলেন না,—কারণ সেদিন তিনি ভারী একটা বিপদে পড়ে অন্যমনস্ক হয়েছিলেন। তাঁর ঘরে রাজার একখানা দামি মানিক ছিল, কাল সেখানা চুরি গেছে! এখন রাজা যদি সেকথা জানতে পারেন, তাহলে তাঁর দশা কী হবে?'

হঠাৎ ছিদামের চিৎকার তাঁর কানে গেল। তিনি অমনি তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে বললেন, 'সত্যিই কি তুমি জ্যোতিষী?'

ছিদাম বুকে ভয় মুখে সাহস নিয়ে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর! আমার এই পাদুকা-পুরাণে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানে একেবারে হাতে ধরা আছে।'

জহুরি চুপি চুপি বললেন, 'দ্যাখো আমার ঘর থেকে রাজার মানিক চুরি গেছে। সেই মানিক এখন কোথায় আছে যদি তুমি তা বলতে পারো, তাহলে পাঁচ হাজার টাকা বকশিশ পাবে। না পারলে জোচ্চোর বলে রাজার কাছে তোমাকে ধরিয়ে দেব। কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা করে, তোমাকে সকল কথা বলতে হবে।'

ছিদামের মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। সে বুঝলে থাকোমণির কথায় জাল-জ্যোতিষী সেজেই আজ তাকে এই বিষম মুশকিলে ঠেকতে হল। আপনাকে সামলাতে না পেরে সে বলে বসল, 'ছি ছি, মেয়েমানুষ কী ভয়ানক জাত! নিজের স্বামীকে বিপদে ফেলতেও তাদের মনে দয়া হয় না। ধিক!'

আসল ব্যাপারটা কী জানো? স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে তাঁকে জব্দ করবার জন্যেই জহুরির স্ত্রী মানিকখানা লুকিয়ে রেখেছিল। জহুরি ভুলেও একবার সে সন্দেহ করেননি! কিন্তু চোরের মন কিনা! তাই জহুরি যখন বাইরে বেরিয়ে গেলেন, তখন তিনি থানায় খবর দেন কি না জানবার জন্যে জহুরির স্ত্রী নিজের এক বিশ্বাসী দাসীকে স্বামীর পিছনে পিছনে পাঠিয়ে দিয়েছিল। দাসী এতক্ষণ ভিড়ের ভিতরে লুকিয়ে থেকে ছিদাম আর জহুরির কথাবার্তা শুনছিল। কিন্তু ছিদাম যখন বললে, 'ছি ছি! মেয়েমানুষ কী ভয়ানক জাত,'—দাসী তখন মনে করলে, ছিদাম আসল চোরের কথা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছে। সে আর দাঁড়াল না, একছুটে বাড়িতে ফিরে জহুরির বউকে সব কথা খুলে বলল।

জহুরির স্ত্রীর বুকের রক্ত যেন শুকিয়ে গেল। ভয়ে শিউরে সে বলে উঠল, 'দাসী, উনি জানতে পারলে যে আর রক্ষে রাখবেন না! জ্যোতিষী নিশ্চয়ই কাল সকালে এসে সব কথা ওঁকে বলে দেবে। যা, যা,—তুই শিগগির একখানা পালকি ডেকে আন, আমি এখুনি জ্যোতিষীর বাড়ি যাব।'

ছিদাম ততক্ষণে বাড়ি ফিরে এসে, দাওয়ার উপরে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। কাল তাকে জেলে যেতে হবে, এই ভাবনায় এখন থেকেই সে অস্থির হয়ে উঠেছে।

এমন সময় জহুরির স্ত্রী এসে পালকি থেকে নেমে 'আমাকে বাঁচাও' বলে তার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল।

ছিদাম ভারী আশ্চর্য হয়ে বললে, 'কে আপনি?'

জহুরির স্ত্রী তখন তাকে সব কথা খুলে বললে।

শুনে ছিদামের ধড়ে প্রাণ যেন আস্তে আস্তে আবার ফিরে এল। সে মস্ত ওস্তাদের মতো মাথা নেড়ে বললে, 'হুঁ, আমি সব কথা জানতে পেরেছি বটে। আপনি আমার কাছে না এলে কাল সকালেই আমি জহুরিমশায়ের কাছে গিয়ে সমস্ত বলে দিতুম। আপনি যদি বাঁচতে চান, তবে এখুনি বাড়ি গিয়ে আপনার স্বামীর মাথার বালিশের নীচে মানিকখানা রেখে দিন গে যান। নইলে আপনাকে আমি ধরিয়ে দেব।'

জহুরির স্ত্রী তখন ছিদামকে অনেক টাকা বকশিশ দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাড়ি ফিরে গেল।

পরের দিন সকালে ছিদাম জহুরির বাড়ি গিয়ে হাজির।

জহুরি বললেন, 'কী হে, খবর কী?'

ছিদাম 'পাদুকা-পুরাণে'র ওপরে হাত বোলাতে বোলাতে তিনবার ফুঁ দিয়ে বললে, 'হুজুর, মানিক আপনার বালিশের নীচেই আছে।'

জহুরি অবিশ্বাস করে বললেন, 'কী! আমার সঙ্গে ঠাট্টা?'

ছিদাম আপনার কাপড়ে মোড়া জুতো-জোড়া কপালে ছুঁইয়ে বললে, 'হুজুর, ছি ছি পাদুকা-পুরাণের কথা মিথ্যে হবার জো কী! পেত্যয় না হয়, আপনি গিয়ে বরং স্বচক্ষে দেখে আসুন।'

জহুরি অগত্যা বাড়ির ভেতরে গেলেন। খানিক পরে আহ্লাদে আটখানা হয়ে ছুটতে ছুটতে ফিরে এসে বললেন, 'ওঃ, অবাক কারখানা! ছিদাম, তোমার মতো জ্যোতিষী এ রাজ্যে আর কেউ নেই!'

ছিদাম আসল কথাটা তুলে বললে, 'হুজুর, আমার বকশিশের পাঁচ হাজার টাকাটা—'

জহুরি বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আলবত! এখুনি আনিয়ে দিচ্ছি।'

॥ ৩ ॥

দেশে দেশে জ্যোতিষী ছিদামের নামে ঢাক পিটে গেল। কিন্তু যত নাম-ডাক বাড়ে, ছিদামের ভয়ও ততই বাড়তে লাগল। কে জানে কোথা দিয়ে কখন আবার কী বিপদ ঘাড়ের ওপরে এসে পড়বে, তখন কী হবে?

জ্যোতিষীর ব্যাবসাটা ছেড়ে দিতে পারলে ছিদাম হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে পারত। কিন্তু জহুরির কাছ থেকে বকশিশের টাকা পেয়ে, থাকোমণির লোভ আরও দশগুন বেড়ে গেছে। তার গায়ে অনেক গয়না হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে তার আর মন উঠছে না। সে এখন প্রকাণ্ড সাতমহলা অট্টালিকায় দাস-দাসী নিয়ে বড়োলোকের গিন্নির মতো থাকতে চায়। কাজেই ছিদাম জ্যোতিষীর কাজ ছাড়তে চাইলেই সে-ও শাসিয়ে বলে, 'তবে চললুম এই বাপের বাড়ি!'

এমনি সময়ে রাজবাড়িতে বিষম এক চুরি হয়ে গেল। রাজার মালখানায় চল্লিশ ঘড়া মোহর আর মণি-মুক্তো জমা করা ছিল, হঠাৎ একদিন সকালে দেখা গেল ঘড়াগুলো আর ঘরের ভেতরে নেই। একদল চোর রাত্তিরে সিঁদ কেটে সেগুলো নিয়ে সরে পড়েছে।

রাজ্যময় হুলুস্থুল! রাজার বাড়িতে চুরি—সে তো বড়ো সোজা কথা নয়! চারিদিকেই সেপাই-সান্ত্রী ছুটছে—ধর-পাকড় হচ্ছে। কিন্তু আসল চোর ধরা পড়ল না, রাজার মেজাজও রেগে চটাং। শহর-কোটাল হাতে মাথা-কাটা যার কাজ সে চোর ধরতে পারলে না বলে রাজার হুকুমে তারই মাথা গেল ঘ্যাচ করে কাটা।

তারপর মন্ত্রীরও মাথাটি যখন যায় যায় হয়েছে মন্ত্রী তখন একবার শেষ চেষ্টা করে জোড়হাতে বললেন, 'মহারাজ, শুনেছি শহরের ছিদাম জ্যোতিষীর ভারী হাত-যশ। একবার তাকে আনিয়ে দেখলে হয় না?'

জ্যোতিষে-ফোতিষে রাজা একতিলও বিশ্বাস করতে না। তবু তিনি বললেন, 'আচ্ছা, এও আর বাকি থাকে কেন? নিয়ে এসো ছিদামকে।'

খানিক পরেই একদল পাইক ছিদামকে ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে এল। সারা পথ বলিদানের পাঁঠার মতো সে এমন ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে এসেছে যে, তার বগল থেকে পাদুকা-পুরাণখানা কখন কোথায় খসে পড়ে গেছে, তা সে টেরও পায়নি।

রাজার সুমুখে এসে ছিদামের ঘটে যেটুকু বুদ্ধি ছিল সেটুকুও গেল উবে। সে একেবারে রাজার দু পা জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'মহারাজ, আপনার পাইকরা বিনিদোষে আমাকে ধরে এনেছে।'

রাজা বললেন, 'আমার মালখানা থেকে চল্লিশ ঘড়া মোহর আর মণি-মুক্তো চুরি গেছে, তার খবর রাখো কিছু?'

ছিদাম ঢোক গিলে বললে, 'মহারাজ, আমি তো সেগুলো চুরি করিনি, আমাকে ছেড়ে দিতে আজ্ঞা হয়।'

রাজা বললেন, 'না, চুরি করোনি বটে, কিন্তু তুমি জ্যোতিষী—তোমাকে গুনে চোর ধরে দিতে হবে। যাও, তোমাকে সাতদিন সময় দিলুম। এর মধ্যে চোর ধরতে পারলে তোমাকে লাখ টাকা বকশিশ দেব, না পারলে নেব গর্দান।'

আর সাতদিন! তারপরে?—ওঃ, বাপ রে! ভাবতেও ছিদামের বুকটা ধড়াস করে কেঁপে উঠল। সে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে গেল।

ছিদামকে কাঁদতে কাঁদতে আসতে দেখে থাকোমণি বললে, 'ওকী, কাঁদছ কেন?'

ছিদাম ধুপ করে দাওয়ায় বসে পড়ে বললে, 'গর্দান যাবে শুনলে কার মুখে হাসি আসে?' এই বলে সে নিজের বিপদের কথা বউকে সব জানালে।

থাকো বললে, 'তার জন্যে আবার কচি খোকার মতো কান্না কেন? গুনে-টুনে চোর ধরে দাও।'

ছিদাম বললে, 'ক খ পড়তে পারি না, আমি আবার গুনব? কুমোর যে গণক হয় না তা কি তুমি জানো না? না গিন্নি, আমি গুনবও না, গর্দানও দেব না—আমি এদেশ ছেড়েই দেব লম্বা।'

থাকো খেঁকিয়ে উঠে বললে, 'পালাবে? ভারী আবদার যে! জানো তাহলে আমি নিজেই রাজবাড়িতে গিয়ে তোমার পালানোর খবর দিয়ে আসব।'

ছিদাম হাল ছেড়ে দিয়ে ফোঁশ করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'সিঁথের সিঁদুর যেদিন মুছবে, থানকাপড় যেদিন পরবে, মাছচচ্চড়ি যেদিন খেতে পাবে না, সেইদিন তুমি আমার দুঃখ বুঝবে—তার আগে না।'

॥ ৪ ॥

এদিকে চোরের দল বেজায় মুশকিলে পড়ে গেছে। তারা মোহর আর মণিমুক্তো ভরা ঘড়াগুলো শহরের একটা পচা এঁদো পুকুরের ভেতরে লুকিয়ে রেখেছে বটে কিন্তু ধরা পড়বার ভয়ে সেগুলো নিয়ে শহর থেকে আর পালাতে পারছে না।

তারপর চোরেদের সর্দার যখন শুনলে যে ছিদাম-জ্যোতিষীর হাতে চোর ধরবার ভার পড়েছে তখন ভয়ে তার পেটের পিলে গেল চমকে। সে সাত-পাঁচ ভেবে দলের একটা লোককে ডেকে বললে, 'ওহে আজ সন্ধের সময়ে তুমি ছিদামের ঘরের পাশে লুকিয়ে থেকে আড়ি পেতে শুনবে—আমাদের কথা সে টের পেয়েছে কি না?'

সন্ধের সময়ে একটা চোর গিয়ে ছিদামের ঘরের জানলার পাশে জুজুবুড়ির মতন গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ছিদামের মাথায় তখন খালি এক কথাই ঘুরছে-ফিরছে—সাতদিন—মোটে সাতদিন—তারপরেই তার আশা-ভরসা সব ফরসা! বিশেষ সাতদিনই বা আর কোথায়? সাতদিনের একদিন তো আজকেই ফুরিয়ে গেল বলে।

থাকো তাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী গো অতখানি মস্ত হাঁ করে ভাবছ কী? চুরির কথা?'

ছিদাম গুম হয়ে বললে 'হুঁ'। তারপর দিনগুলো মনে রাখবার জন্যে দেয়ালে সে খড়ি দিয়ে সাতটা দাগ কেটে একটা দাগ মুছে দিয়ে বললে, 'সাতের এক যেতে আর দেরি নেই, বাকি রইল ছয়।'

এখন দৈবগতিকে চোরের দলেও লোক ছিল মোট সাতজন। জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে চোরটা যখন শুনলে ছিদাম বলছে সাতের এক যেতে আর দেরি নেই তখন সে ভাবলে ছিদাম নিশ্চয়ই গণনা করে তার কথা জানতে পেরে তাকে ধরতে আসছে। তার মনে ভারী ভয় হল। সে একেবারে একদৌড়ে সর্দারের কাছে গিয়ে হাজির।

সর্দার বললে, কীরে হাপরের মতন অত হাঁপাচ্ছিস কেন?'

চোর বললে, 'সর্দার, সর্দার! ছিদাম সব টের পেয়েছে! আর একটু হলেই আমি ধরা পড়েছিলুম আর কী?'

সর্দার বললে, 'বলিস কীরে? সব কথা খুলে বল তো শুনি?'

চোর তখন সব কথা খুলে বলল।

সর্দার বললে, 'উঁহু আমার বিশ্বেস হচ্ছে না! হয়তো তুই ভুল শুনেছিস। আচ্ছা, কাল তোরা সন্ধের সময়ে দুজনে গিয়ে ছিদামের ঘরের পাশে লুকিয়ে থাকবি।'

পরের দিন সন্ধের সময়েও ছিদাম বিমর্ষ হয়ে ঘরের এককোণে বসে ভাবছিল আকাশ-পাতাল কত কী!

থাকো বললে, 'কীগো, এত যে ভাবছ কিনারা কিছু হল?'

ছিদাম দেয়ালের আর একটা খড়ির দাগ মুছে দিয়ে বললে, 'কিনারা আর কী করব, সাতের দুই যেতে আর দেরি নেই, বাকি রইল পাঁচ।'

যেমনি এই কথা শোনা, ছিদাম ধরতে আসছে ভেবে অমনি চোর দুজনও সে মুল্লুক ছেড়ে দে চম্পট।

সেদিনও সর্দারের মনের ধোঁকা গেল না। বললে, 'এতগুলো টাকা কি ফস করে ছাড়া যায়? আর একবার দেখা যাক। কাল তোরা তিন জনে যাবি।'

সেদিনও ওই ব্যাপার। সর্দার শুনলে যে, ছিদাম বলেছে, 'সাতের তিন যেতে আর দেরি নেই, বাকি রইল চার।'

আতঙ্কে সর্দারের অমন যে মোটাসোটা নাদুস-নুদুস ভুঁড়ি তাও চুপসে হয়ে গেল এতটুকু। সে কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'বাবা প্রাণ থাকলে অমন ঢের টাকা রোজগার করতে পারব। চলো ভাইসব, আমরা ছিদামের পায়ে ধরে মাফ চাই-গে চলো।'

ছিদাম সেইদিন থেকেই শয্যা নিয়েছে—সে বুঝল আর তার বাঁচবার কোনওই আশা নেই।

অনেক রাত্রে হঠাৎ সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল।

'মরছি নিজের জ্বালায় এত রাত্রে আবার কড়া নাড়ে কে রে বাপু!' এই বলে ছিদাম বিরক্ত হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে সদর দরজা খুলে দিলে।

কিন্তু দরজা খুলেই ছিদাম দেখে সামনেই কালো-মুস্কো সাত-সাতটা ষণ্ডা চেহারা।

সে আঁতকে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে বাপ রে ডাকাত! চৌকিদার, চৌকিদার!'

কিন্তু চোরেরা সাতজনেই একসঙ্গে ছিদামের পা জড়িয়ে ধরে বললে, 'ছিদামবাবু! দোহাই আপনার চৌকিদার ডেকে আমাদের ধরিয়ে দেবেন না। আমরা আপনার কাছে মাফ চাইতে এসেছি।'

ছিদাম আশ্চর্য হয়ে বললে, 'মাফ? কেন?'

সর্দার একে একে সব কথা বললে।

ছিদাম যেন আকাশ থেকে পড়ল। কিন্তু মনের ভাব লুকিয়ে বুক ফুলিয়ে সে কড়া সুরে বললে, 'তবে রে শয়তানদের দল। আমি ছিদাম-জ্যোতিষী—ছি ছি, পাদুকা-পুরাণের আগাগোড়া আমার মুখস্থ, আমার সঙ্গে চালাকি? বল শিগগির ঘড়াগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস!'

সর্দার হাত জোড় করে বললে, 'আজ্ঞে চণ্ডীতলার ওই তালপুকুরের উত্তুর কোণে।'

ছিদাম বললে, 'এখন ভালো চাস তো এ রাজ্যি ছেড়ে সরে পড়। কিন্তু খবরদার ফের যদি সে টাকার ওপরে লোভ করিস তবে তোদের ডালকুত্তো দিয়ে খাওয়াব।'

॥ ৫ ॥

ভোর না হতেই ছিদাম গুটি গুটি রাজবাড়িতে গিয়ে উঠল।

রাজা বললেন, 'খবর ভালো?'

ছিদাম বললে, 'আজ্ঞে না মহারাজ! এ কদিন অষ্টপহর ছি-ছি-পাদুকা-পুরাণ ঘেঁটে আমি বুঝলুম যে, এ যাত্রা আপনি একসঙ্গে চোর আর চোরাই মাল দুই-ই পাবেন না। হয় চোর নয় ঘড়াগুলো—এ দুইয়ের কোনটা আপনি চান?'

রাজা বললেন, 'চোর ধরতে পারি তো ভালোই—নইলে সেই মোহর আর মণিমুক্তো ভরা চল্লিশটা ঘড়াই আমি আগে চাই।'

ছিদাম বিড়বিড় করে কী পড়তে লাগল, 'ওঁ-ওঁ-ওং, হুসহুস—ভুসভুস—বোঁ বনবন সোঁ সনসন—হিং টিং ফট আয় চটপট লাগে ভোজবাজি চোর বেটাদের কারসাজি, ঠিক দুপুরে রোদ্দুরে তালপুকুরের উত্তুরে—কার আঁজ্ঞে না পাদুকা-পুরাণের আঁজ্ঞে—মহারাজ! শিগগির লোক পাঠান, চণ্ডীতলার তালপুকুরের উত্তুর কোণে আপনার চল্লিশটা ঘড়াই পাবেন।'

তখনই দলে দলে সেপাই-সান্ত্রী চণ্ডীতলার তালপুকুরে ছুটল। খানিক পরেই তারা পুকুর থেকে সত্যিসত্যিই চল্লিশটা ঘড়া তুলে নিয়ে ফিরে এল।

ছিদামও হাঁপ ছেড়ে লাখ টাকা বকশিশ নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরের দিকে চলল—তার মুখে হাসি আর ধরে না।

গায়ে দু সেট গয়না হল, সাতমহলা বাড়ি হল, দাসদাসী গাড়িঘোড়া হল, তবু কিন্তু থাকোমণির সাধ মিটল না। যতদিন না রাজরানি হয়, ততদিন তার মনে আর সুখ নেই।

কাজেই দুদিন না যেতে যেতেই সে আবার ছিদামকে গিয়ে বললে, 'দ্যাখো, তোমাকে আরও টাকা রোজগার করতে হবে।'

ছিদাম বললে, 'কেন বলো দেখি?'

থাকোমণি বললে, 'সেই টাকায় তুমি একটা রাজ্য কিনবে। তখন তুমি হবে রাজা আর আমি হব রানি।'

ছিদাম বললে, 'একটা রাজ্য কেনবার মতো টাকা আমি পাব কেমন করে?'

থাকোমণি বললে, 'কেন, আবার জ্যোতিষী হও।'

ছিদাম সে কথা হেসেই উড়িয়ে দিয়ে বললে, 'ঢের হয়েছে, গিন্নি, ওসব কথা ভুলে যাও। জ্যোতিষী-টোতিষী এ জীবনে আর হচ্ছি না।'

থাকোমণি চটে লাল হয়ে বললে, 'হবে না কী, হতেই হবে। নইলে এখুনি আমি বাপের বাড়ি চলে যাব।'

ছিদাম হাঁক দিলে, 'গঙ্গাফড়িং শিং! গঙ্গাফড়িং শিং! গিন্নি বাপের বাড়ি যাবে, পালকি আনতে বলো।'

গঙ্গাফড়িং শিং দরোয়ান উত্তর দিলে, 'জো, হুকুম হুজুর।'

ছিদাম আবার হাঁক দিলে, 'ওরে আর কে আছিস রে, শিগগির একটা ঘটক-টটক ডেকে আন।'

থাকোমণি বললে, 'কেন, ঘটক আবার কী হবে?'

রুপোর গড়গড়ার নলে ফুড়ুক করে একটা টান মেরে ছিদাম বললে, 'তুমি তো বাপের বাড়ি চললে। কিন্তু আমি এত বড়ো বাড়িতে একলা থাকব কেমন করে? তাই তোমার বদলে আর একটা বিয়ে করব ভাবছি।'

থাকোমণির মুখ শুকিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল, 'না না, আমি ঘাট মানছি আর কখনও বাপের বাড়ি যেতে চাইব না।'

আশার বাতি

॥ ১ ॥

স্বপন-সায়রে ঝিলের ঢেউ যেখানে দিন-রাত খালি আকাশে হাত তুলে উছলে উঠছে, ঠিক তারই কোল ঘেঁষে, তারই বুকে চঞ্চল ছায়া ফেলে, দাঁড়িয়ে আছে সেই মনোরম প্রাসাদখানি।

যেন পরির হাতে মায়া-তুলিতে আঁকা, ঘুমপুরীর ছবিখানি। আগাগোড়া তার আরশির মতন পালিশ-করা মার্বেল পাথর দিয়ে গড়া—হঠাৎ দূর থেকে দেখলে মনে হয়, চাঁদের আলো যেন সেখানে কার যাদুমন্ত্রে জমাট হয়ে আছে।

পুরীর ফটকের ওপরে জ্বলন্ত সোনার অক্ষরে বড়ো বড়ো করে লেখা রয়েছে—'এর ভিতরে ঢুকে যে যা চাইবে, সে তাই পাবে।'

॥ ২ ॥

পথিক পথের ওপর দাঁড়িয়ে সেই সোনার লেখা পড়ে দেখলে। তার বয়স অল্প—ষোলোর বেশি হবে না। লেখাগুলো পড়ে পথিকের মন লোভে ভরে উঠল। সে ফটকের ভিতর ঢুকতে যাচ্ছে, এমন সময় শুনলে, কে একজন হা হা হা হা করে হেসে উঠল।

চমকে উঠে পথিক চেয়ে দেখে, ফটকের গায়ে ঠেসান দিয়ে থুত্থুড়ো এক বুড়ো মাটির ওপরে পা ছড়িয়ে বসে আছে। তার দাড়ি ঠিক যাত্রার নারদের দাড়ির মতো ধবধবে সাদা। তার পোশাক ছেঁড়াখোড়া, তালিমারা, ময়লা। সেই বুড়োই তার দিকে চেয়ে হাসছিল।

পথিক রাগ করে বললে, 'বুড়ো, আমাকে দেখে তুমি হাসছ বটে, কিন্তু তুমি হচ্ছ একটি আস্ত গাধা।'

বুড়ো হাসি থামিয়ে বললে, 'কেন বলো দেখি বাপু?'

পথিক বললে, 'ফটকের নীচেই তুমি পথের ভিখারির মতো ধুলোয় বসে আছ—আর তোমার মাথার ওপরে রয়েছে ওই সোনার লেখা, তা কি তুমি চোখে দেখতে পাচ্ছ না? তোমার কি কোনও সাধ নেই?'

বুড়ো বললে, 'সাধ হয়তো আছে! কিন্তু ওই বাড়িতে ঢুকে আমি আমার সাধ মেটাতে চাই না।'

পথিক একটু ভয় পেয়ে বললে, 'বুড়ো, সব কথা খুলে বলো। এটা কি কোনও রাক্ষসপুরী? লোভে পড়ে যে এর ভেতর ঢোকে, সে কি আর প্রাণ নিয়ে ফেরে না?'

বুড়ো মাথা নেড়ে বললে, 'না, না, তা কেন? তুমি স্বচ্ছন্দে এই প্রাসাদের ভেতরে যেতে পারো। কেবল এইটুকু মনে রেখো, বিপদকে যে ডাকে, বিপদ শুধু তার কাছেই ঘনিয়ে আসে।'

পথিক বললে, 'আমি আবার ফিরে আসতে পারব তো?'

বুড়ো বললে, 'হ্যাঁ, বাড়ির ভেতরে গিয়ে যদি তোমার মনে কোনও লোভ না হয়।'

পথিক বললে, 'সে কী!'

বুড়ো বললে, 'তা জানো না? লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু!'

॥ ৩ ॥

পুরীর সামনে গিয়ে পথিক দেখলে, তার দরজা দুটি জাফরি-কাটা চন্দন কাঠে তৈরি—কী চমৎকার তার ভুরভুরে গন্ধ!

দরজার ওপরে ঝুলছে এক পাকা সোনার ঘণ্টা, তার ভেতরে দুলছে এক মুক্তোর ঘুন্টি, হাঁসের ডিমের মতন বড়ো।

মুক্তোটি পাছে ভেঙে যায়, সেই ভয়ে পথিক খুব আস্তে আস্তে ঘণ্টাটি বাজালে। চন্দন কাঠের দরজা অমনি খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটি সুন্দরী মেয়ে এসে, হাতছানি দিয়ে পথিককে ডেকে গানের মতন মধুর সুরে বললে, 'পথিক ভেতরে এসো!'

মেয়েটির পরনে ঝলমলে জরির কাপড়, মাথা থেকে পা পর্যন্ত হিরে-মানিকের গহনা—রাত্তিরে ফুলের ঝোপে যেমন হাজার জোনাকের দেয়ালি জ্বলে—ঠিক তেমনি ধারাই ঝকমক করে উঠছে।

পথিক মোহিত হয়ে বললে, 'তুমি কি রাজকন্যে?'

সে মুচকি হেসে বললে 'না, আমি তাঁর দাসী।'

পথিক অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগল, যাঁর দাসীরই এত রূপ, এত গয়না—না জানি সেই রাজকন্যে দেখতে কেমন! সে বললে, 'রাজকন্যেকে গিয়ে বলো, এক পথিক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

দাসী বললে, 'রাজকন্যে এখন হাওয়া খেতে গেছেন, ফিরতে রাত হবে। ততক্ষণ আপনি ভেতরে আসুন, সব দেখুন-শুনুন, বিশ্রাম করুন।'

পথিক বললে, 'তার নাম কী?'

দাসী বললে, 'কামনা দেবী।'

পথিক বললে, 'তাঁর বিয়ে হয়েছে?'

দাসী বললে, 'না, তিনি বিয়ে করবেন না।'

পথিক আশ্চর্য হয়ে বললে, 'সে কী! কীসের দুঃখে তিনি বিয়ে করবেন না?'

দাসী বললে, 'দুনিয়ার কারুকে তিনি ভালোবাসেন না।'

পথিক আরও আশ্চর্য হয়ে বললে, 'কারুকেই না?'

দাসী বললে, 'কী মানুষ, কী দেবতা, কী যক্ষ-রক্ষ কারুকেই না।'

পথিক বললে, 'কেন?'

দাসী বললে, 'মানুষের বুকের ভেতরে হৃদয় থাকে, আমাদের রাজকন্যের হৃদয় নেই।'

পথিক শিউরে উঠে বললে, 'হৃদয় নেই! রাজকন্যের বুকের ভেতরে তবে কী আছে?'

দাসী বললে, 'পদ্মের রক্তে ডোবানো, বৃষ্টিতে ধোয়া পাথরের মতন কনকনে একখানি রাঙা টুকটুকে পদ্মরাগ মনি—ঠিক হৃদয়েরই মতো তিন কোনা!'

॥ ৪ ॥

সে যে কী অপূর্ব প্রাসাদ, তা লিখে বলা যায় না। তার সমস্ত ঘরের দেয়ালগুলি ঝকমকে ঝিনুক দিয়ে বাঁধানো, তার ছাদের কড়িবরগাগুলো রুপো দিয়ে গড়া, তার মেঝেগুলি স্ফটিক দিয়ে তৈরি—চলতে গিয়ে পথিকের পা পিছলে যেতে লাগল। তার মনে হল, সে যেন বরফের উপর দিয়ে চলছে।

সে বললে, 'দাসী, স্ফটিকের মেঝে দেখতেই ভালো, কিন্তু কোনওই কাজের নয়।'

দাসী মুখ টিপে ফিক করে একটুখানি হাসলে।

ঘরে ঘরে রুপোর শিকলে ঝোলানো হাজার হাজার প্রবালের ঝাড়ে, মরকতের ডোমে সার সার বিজলির বাতি জ্বলছে, চারিদিকে যেন মোলায়েম রাঙা আলোর মালা দুলছে।

পথিক বললে, 'দাসী, দিনের বেলায় জানলা বন্ধ করে তোমরা আলো জ্বেলে রেখেছ কেন?'

দাসী বললে, 'সূর্যের আলোয় বড়ো তাত—রাজকন্যের ননির মতন গায়ে তা সইবে না তো।'

পথিক বললে, 'কিন্তু জানলা বন্ধ বলে ঘরের ভেতরে যে খোলা হাওয়াও আসতে পারবে না।'

দাসী বললে, 'বাইরের হাওয়ায় ধুলো-কুটো থাকে, রাজকন্যের ফোটা গোলাপের মতো রং তাতে ময়লা হয়ে যাবে যে!'

পথিক বললে, 'কিন্তু আমার যে হাঁপ ধরছে, গরমে প্রাণ যায় যায় হচ্ছে!'

দাসীর ইশারায় অমনি দুজন লোক এসে পথিকের দুপাশে দাঁড়িয়ে শুক্তির বাঁট লাগানো চামর ঢুলোতে শুরু করলে।

পথিক বললে, 'চামরে হাওয়া হয়, কিন্তু প্রাণ ঠান্ডা হয় না।'

দাসী মুখ টিপে ফিক করে একটুখানি হাসলে।

॥ ৫ ॥

পথিক এবার যে ঘরে ঢুকল, সে ঘরের মেঝেতে সাত হাত পুরু মোমের মতন নরম গালচে পাতা—সে গালচে লাখো লাখো প্রজাপতির রঙিন পাখনা দিয়ে তৈরি করা।

পথিক দেখলে ঘরের আশেপাশে এ-কোণে সে-কোণে চারিদিকে মানুষের মতন মাথায় উঁচু দলে দলে সোনার পুতুল দাঁড়িয়ে আছে।

পথিক বললে, 'এত সোনার পুতুল কেন?'

দাসী বললে, 'ওরা আগে মানুষ ছিল, এখন অতি লোভের শাস্তি ভোগ করছে।'

পথিক বললে, 'সে কী রকম?'

দাসী বললে, 'ওরা এখানে এসে বর চেয়েছিল, ওরা যা ছোঁবে তাই যেন সোনা হয়ে যায়। কিন্তু লোকগুলো এমনি বোকা যে বর পেয়েই সবাই নিজের নিজের গা অজান্তে ছুঁয়ে ফেললে। কাজেই এখন ওরা সোনার পুতুল হয়ে আছে—না পারে নড়তে, না পারে চলতে, না পারে কথা কইতে।'

আর একটা ঘরে গিয়ে পথিক অবাক হয়ে দেখলে একদল বুড়ো ঘরের মেঝেয় শুয়ে একসঙ্গে কান্নাকাটি করছে। তারা এমন ভয়ানক বুড়ো হয়ে পড়েছে যে, সকলেরই চোখে ধরেছে ছানি, মুখ হয়েছে ফোকলা, কানে লেগেছে তালা, আর গায়ের কোঁচকানো মাংসগুলো একহাত ঝুলে পড়ে থলথল করছে।

পথিক ভয়ে ভয়ে বললে, 'এরা কারা?'

দাসী বললে, 'এরা বর চেয়েছিল অমর হবার জন্যে। কিন্তু এদের তখন খেয়াল হয়নি যে, অমর হলে লোকে মরে না বটে, কিন্তু যতই দিন যায় চিরকাল ধরে ততই বেশি বুড়ো হয়েও বেঁচে থাকতে হয়। এরা দাঁড়াতে পারে না, কারণ পায়ে জোর নেই, এরা খেতে পারে না, কারণ হজমের জোর নেই, এরা হাসতে পারে না, কারণ মনে সুখ নেই। এরা তাই দিনরাত শুধু মাথা কোটে আর কেঁদে মরে।'

পাশের ঘরে ঢুকে পথিক দেখলে, একদল লোক মেঝের উপরে উপুড় হয়ে হুমড়ি খেয়ে আছে, আর তাদের প্রত্যেকের পিঠের ওপরে এক-একটা মস্ত বস্তা! সেই বস্তার চাপে থেঁতলে লোকগুলো থেকে থেকে বিষম চেঁচিয়ে ককিয়ে উঠছে!

পথিক বললে, 'এ আবার কী ব্যাপার?'

দাসী বললে, 'এরা এখানে এক-একটা থলে কাঁধে করে এসে বর মেগেছিল, যেন ওদের থলেগুলো মোহরে ভরে যায়। তাই হল। কিন্তু অমন মস্ত মস্ত থলে-ভরা বিশ-পঁচিশ মন মোহর কাঁধে করতে গিয়ে, সেই যে ওরা ঘাড় গুঁজড়ে মাটিতে আছড়ে পড়েছে, আর উঠতে পারেনি।'

পথিক বললে, 'আহা, বেচারিদের বড়ো কষ্ট হচ্ছে তো! তোমরা লোক এনে থলেগুলো ওদের পিঠ থেকে সরিয়ে দাও না কেন?'

দাসী বললে, 'ওদের লোভ এত বেশি যে, প্রাণ যায় তাও স্বীকার, তবু মোহরের থলেগুলো ছাড়তে ওরা কিছুতেই রাজি হবে না!'

পথিকের চোখ হঠাৎ ঘরের আর-এক কোণে গেল। সেখানেও খাটের ওপরে মেয়ে-মানুষের মতো যেন কারা সব শুয়ে আছে, তাদের দেখতে মানুষের মতোও বটে, আবার মানুষের মতো নয়ও বটে! তাদের মুখে-চোখে-ঠোঁটে রূপের দেমাক যেন মাখানো রয়েছে!

পথিক হতভম্বের মতো তাদের দিকে চেয়ে আছে দেখে দাসী বললে, 'ওই মেয়েগুলি বর চেয়েছিল, পরমাসুন্দরী হবার জন্যে। ওরা রেশমের মতন নরম চুল চেয়েছিল, তাই ওদের মাথার চুলগুলো আসল রেশমই হয়ে গেছে। ওরা পটল-চেরা চোখ, বাঁশির মতন নাক, মুক্তোর মতন দাঁত, আর সাদা ধবধবে রং চেয়েছিল, তাই ওদের চোখ হয়েছে বঁটিতে চেরা পটলের মতো, আর গায়ের রংও হয়েছে চুনকামের মতো, ওরা যা চেয়েছে তাই পেয়েছে—কিন্তু দেখতে কী ভয়ানক!'

পথিক বললে, 'দাসী, রূপ তো সবাই চায়! তবে ওদের বেলায় এমন শাস্তি কেন?'

দাসী বললে, 'শুধু রূপ যারা চায়, তাদের কপাল অমনি খারাপ হয়। যার গুণ নেই তার রূপও নেই!'

এমন সময়ে একটি মেয়ে পথিকের দিকে চেয়ে, যেন হুকুম চালিয়েই বললে, 'শুনছ আমাকে একটু পাশ ফিরিয়ে দাও তো!'

পথিক বললে, 'দাসী, ওরা কি আপনা-আপনি পাশ ফিরে শুতেও পারে না?'

দাসী বললে, 'না! ওরা রূপের সঙ্গে আরও চেয়েছিল ভারী ভারী সোনার গয়নায় মাথা থেকে পা পর্যন্ত মুড়ে ফেলতে। তাই-ই হয়েছে। এখন গয়নার চাপে আর ভারে ওদের নড়ন-চড়নের ক্ষমতা নেই।'

পথিক যখন মেয়েটিকে পাশ ফিরিয়ে ভালো করে শুইয়ে দিলে, মেয়েটি তখন চেরা-পটল-চোখ তুলে রূপের দেমাকে ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, 'কি গো, এই এক-গা গয়নায় আমায় কেমন দ্যাখাচ্ছে বলো দেখি?'

পথিক বললে, 'কিম্ভুতকিমাকার!'

মেয়েটি বললে, 'আমাকে তুমি বিয়ে করবে?'

পথিক ভয়ে চোখ বুজে ফেলে বললে, 'আগে মরে ভূত হই!'

ঘরে ঘরে এমনি সব ব্যাপার দেখে, পথিকের মন একবারে দমে গেল। সে কাতরভাবে বললে, 'দাসী, আর আমি এসব দেখতে পারছি না—আমার মন যেন নেতিয়ে পড়ছে।'

দাসী বললে, 'পথিক, এসো, এখন কিছু জলখাবার খেয়ে ঠান্ডা হবে চলো।'

জলখাবার ঘরে গিয়ে পথিক দেখলে, চকচকে স্ফটিকের মেঝের ওপরে পোখরাজের চমৎকার কাজ-করা একখানি হাতির দাঁতের পিঁড়ি। সামনেই সোনার থালায় নানান রকমের খাবার সাজানো। সেসব খাবারের এমন খাসা গন্ধ যে, প্রাণ যেন তর হয়ে যায়!

খিদের সময়ে এমন ভালো ভালো খাবার পেয়ে পথিকের মনটা ভারী খুশি হয়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি খেতে বসে, দুটিখানি পোলাও ভেঙে মুখে দিল। কিন্তু তখুনি আবার থু থু করে ফেলে দিয়ে বললে, 'রাম! রাম! পোলাওয়ে চাল নেই, আছে শুধু গরম মশলা। কী তেঁতো—বাপ!' মাছভাজা খেতে গিয়ে দেখলে, সে মাছ তেলের বদলে আতর দিয়ে ভাজা—কার সাধ্যি জিভে ঠেকায়!

'আর খাবার খেয়ে কাজ নেই বাবা, শুধু জল খেয়েই খিদে মেটানো যাক'—এই ভেবে পথিক জলের সোনার গেলাসটা মুখে তুলেই 'ওয়াক' করে পিঁড়ি ছেড়ে উঠে পড়ল। গেলাসে ছিল খাঁটি গোলাপজল!

পথিক বললে, 'দাসী, তোমাদের জলখাবারে মনমাতানো গন্ধ আছে, কিন্তু এতে পেট ভরে না।'

দাসী মুখ টিপে ফিক করে একটুখানি হাসলে।

পথিক হতাশভাবে বললে, 'দাসী, এখন আর কী করবার আছে?'

দাসী বললে, 'এখন শয়নাগারে বিশ্রাম করবে এসো। তারপর কামনাদেবী এলে তাঁর কাছে বর চেয়ে নেবে।'

শয়নাগারের বারান্দায় সারি সারি রুপোর টবে, সোনার গাছে, পান্নার পাতায়, হিরে-চুনি-জহরতের হাজার হাজার রং-বেরং ফুল ফুটে আছে—দেখতে সুন্দর, কিন্তু গন্ধ নেই একটুও। ভোমরারা পর্যন্ত সেসব ফুলের কাছে ভুলেও এসে গুনগুন করে গান গায় না।

ঘরের ভেতরেও সোনার পালঙ্কে ময়ূরপুচ্ছ মোড়া তোষকের ওপরে, হিরে-মোতির চুমকি বসানো, সোনার সুতোয় বোনা অপরূপ চাদর পাতা বিছানা রয়েছে।

'তবু ভালো, এখন একটু ঘুমিয়ে বিশ্রাম করে বাঁচব।' এই ভেবে পথিক বিছানায় গিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বললে,—'আঃ, আঃ, কী আরাম!'

কিন্তু খানিকবাদেই ভিন্ন সুরে বললে—'ওঃ, ওঃ, কী আপদ!'

সে বিছানায় ঘুম তো দূরের কথা, চুপ করে শুয়ে থাকাই অসম্ভব! সেই সোনার সুতোর চাদরে পথিকের গা ছড়ে গেল, হিরে-মোতির চুমকিগুলো পট পট করে তার পিঠে ফুটতে লাগল।

এতক্ষণে পথিক স্পষ্ট বুঝলে যে, ভগবান মানুষকে যেভাবে যে-অবস্থায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন, মানুষ যদি তাতে তুষ্ট না থাকে, তবে তাকে এমনি করেই নাকাল হতে হয়।

পথিক ধড়মড় করে উঠে পড়ে বললে, 'দাসী, আমি চললুম।'

দাসী বললে, 'সে কী, কামনাদেবীর সঙ্গে দেখা করবে না?'

পথিক বললে, 'কামনাদেবী আমার মাথায় থাকুন, আমি বর-টর কিছু চাই না।'

দাসী মুখ টিপে ফিক করে একটুখানি হাসলে।

পুরীর ভিতরে হিরে-মোতি সোনা-দানার মাঝখানে, পথিককে দেখাচ্ছিল ছন্নছাড়া ভিখারির মতো, কিন্তু বাইরে আসবামাত্র চাঁদের আলোর ঝরনা চারিদিক থেকে ঝরে পড়ে, তার সর্বাঙ্গে মুড়ে দিলে মধুর রুপোলি সাজে। ফুলের গন্ধ নিয়ে বাতাস এসে পথিকের বুক জুড়িয়ে, তার গায়ে যেন ঠান্ডা হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগল।

ফটকের ধারে বসেছিল সেই বুড়ো। পথিককে দেখেই সে হা-হা-হা-হা করে হেসে বলে উঠল, 'বাপু, আমি জানতুম, তুমি আবার ফিরে আসবে! এই দ্যাখো, তোমার জন্যে আমি গাছ থেকে মিঠে ফল, নদী থেকে মিষ্টি জল এনে রেখেছি। ভগবানের দেওয়া এই জলখাবার লোক-দেখানো জাঁকজমকের জন্যে নয়, এতে গরম মশলাও নেই, গোলাপজলও নেই, কিন্তু এসব খেলে পেট ভরে, প্রাণ বাঁচে। নাও, এখন খাও-দাও, প্রাণ ঠান্ডা করো!'

পথিকের খাওয়া শেষ হলে বুড়ো আবার বললে, 'ওই দ্যাখো, তোমার জন্যে সবুজ ঘাসের গালচের ওপরে খড়ের তোষক বিছিয়ে, ফুল-পাতার চাদর পেতে রেখেছি। এতে সোনার সুতো আর হিরে-মোতির চুমকি নেই বটে, কিন্তু এর ওপরে ঘুম-পাড়ানি মাসি-পিসির হাত বুলোনো আছে,—শুতে-না-শুতেই ঘুমিয়ে পড়বে।'

পথিক জিজ্ঞাসা করলে, 'বুড়ো, তোমার নাম কী?'

বুড়ো বললে, 'সন্তোষ।'

বউনির দিনে

দাঁতের ডাক্তার নীলমণি বড়ো সাধে ডিসপেনসারি খুলে বসল। কিন্তু হায় রে পোড়াকপাল, আজ ছ মাসের মধ্যে একটিও রুগির টিকি দেখা গেল না।

অথচ তার অনুষ্ঠানের ত্রুটি ছিল না। সাজানো ডাক্তারখানা, চকচকে ইস্পাতের যন্ত্র, কাচ-ঢাকা জানলায় বড়ো বড়ো দাঁতওয়ালা পাথরের মুখ, এ-সমস্তই ছিল দস্তুরমতো। রোজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফিটফাট সায়েব সেজে সেখানে এসে গম্ভীর মুখে বসে থাকত নীলমণি। কিন্তু তবু দুষ্টু রুগির সাড়া পাওয়া যায় না।

শেষটা নীলমণি যখন হতাশ হয়ে দাঁতের ডাক্তারি ছেড়ে ঘোড়ার ডাক্তারি ধরবে বলে মনে করছে, তখন হঠাৎ একদিন দেখতে পেলে যে, রাস্তার ওপারে একটি রোগাপানা লোক একখানা বাঁধানো খাতা-হাতে দাঁড়িয়ে, একদৃষ্টিতে তার ডাক্তারখানার দিকে তাকিয়ে আছে!

নীলমণি দেখেই বুঝে নিলে যে, লোকটা নিশ্চয় দাঁতের ব্যামোয় ভুগছে—কেবল ভয়ে ডাক্তারখানার মধ্যে ঢুকতে পারছে না।

নীলমণি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে ডাক দিলে, 'আসুন মশাই, আসুন! আসতে আজ্ঞা হোক!'

লোকটি আস্তে আস্তে ডাক্তারখানার ভিতরে এল।

নীলমণি বললে, 'বসুন—বসুন, ওই চেয়ারখানায় বসুন। হাতের খাতাখানা ওই টেবিলের ওপরে রেখে দিন। আচ্ছা, একবার হাঁ করুন তো, আপনার দাঁতগুলো দেখি!'

আগন্তুক হাঁ করলে কেমন যেন নারাজভাবে।

তার মুখের ভিতরটায় একবার উঁকি মেরে দেখেই নীলমণি চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ওরে বাসরে, কী ভয়ানক!'

আগন্তুক চমকে বললে, 'কেন মশাই, কী হয়েছে?'

নীলমণি বললে, 'আর কী, যা ভেবেছি তাই হয়েছে! আপনার ওপর-পাটির দাঁতগুলো সব খারাপ! এখনই না তুলে দিলে নয়!'

আগন্তুক লাফিরে উঠে বললে, 'ও বাবা, বলেন কী?'

নীলমণির ভয় হল, হাতে এসেও খদ্দের বুঝি চম্পট দেয়! সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'দাঁত তোলবার নামে ভয় পাচ্ছেন কেন?-মুখের ভেতরে পচা দাঁত থাকলে শরীরে নানান ব্যাধি হয়, তা জানেন?'

আগন্তুক বললে, 'হ্যাঁ, তা আমি জানি। কিন্তু—'

নীলমণি বাধা দিয়ে বললে, 'এর মধ্যে আর কিন্তু-টিন্তু নেই মশাই! রামচরণ, এদিকে এসো তো শিগগির!'

নীলমণির যণ্ডা চাকর রামচরণ এগিয়ে এসে কোমর বেঁধে দাঁড়াল।

নীলমণি জামার আস্তিন গুটোতে গুটোতে বললে, 'আসুন, আপনার ওপরপাটির দাঁতগুলো খুব আস্তে আস্তে তুলে দি। চুপ করে বসে থাকুন, যেন—'

আগন্তুক ব্যস্ত হয়ে বাধা দিয়ে বললে, 'কিন্তু মশাই, আগে আমার কথা শুনুন, তারপর—'

নীলমণি চট করে আগন্তুকের মুখ চেপে ধরলে,—তার ভয় হল, পাছে সে ফস করে 'দাঁত তোলাব না' বলে ফেলে! ডাক্তারির এই বউনির দিনে প্রথম রুগিকে নীলমণি কিছুতেই সরে পড়বার অবকাশ দিলে না। সে ইশারা করবামাত্রই জোয়ান রামচরণ আগন্তুককে চেয়ারের ওপরে দুইহাতে চেপে ধরলে—প্রায় চিঁড়ে-চ্যাপটা করে আর কী!

নীলমণি তাড়াতাড়ি কী-একটা যন্ত্র দিয়ে রুগির মুখের মধ্যে পুরে দিলে, তার মুখটা মরা মাছের মুখের মতো হাঁ হয়ে রইল—সে আর কোনও কথা কইতে পারলে না,—খালি চোখ কপালে তুলে গোঁ গোঁ করে গ্যাঙাতে আর কলে-পড়া ইঁদুরের মতো ছটফট করতে লাগল।

নীলমণি একটা সাঁড়াশি বাগিয়ে ধরে বললে, 'রামচরণ, আরও জোরে চেপে ধরো—হুঁ, আরও জোরে! কোনও ভয় নেই মশাই, আমি একটা একটা করে পচা দাঁতগুলো এখনই টপাটপ উপড়ে ফেলব। এই যে—উঃ, আপনার দাঁত কী শক্ত—মারি কাটি জোয়ান—হেঁইও! ব্যাস—একটা দাঁত তুলে ফেলেছি! এইবার আর একটা! ওকী মশাই, কাঁদছেন কেন—রামচরণ, আরও জোরে চেপে ধরো—হুঁ, মারি কাটি জোয়ান—হেঁইও!—'

এমনিভাবে একে একে উপর পাটির সব দাঁত সাঁড়াশির টানে চারামূলোর মতো উপড়ে ফেলে নীলমণি রুগিকে ছেড়ে দিলে।

রুগির সর্বাঙ্গ তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে! খানিকক্ষণ সে আর একটাও কথা কইতে পারলে না—চেয়ার থেকে মাটির উপরে টলে পড়ে অজ্ঞান আচ্ছন্নের মতন হয়ে রইল!

নীলমণি একগাল হেসে বললে, 'ব্যাস, আর আপনার দাঁতের ব্যথা হবে না! এইবার আপনার দাঁতগুলো বাঁধিয়ে নিন!'

রুগি লাফিয়ে উঠে রাগে ফুলতে ফুলতে বললে, 'এইবার দাঁত বাঁধাব, না, তোমার মুণ্ড চিবিয়ে খাব! হতভাগা, রাসকেল, হাতুড়ে ডাক্তার!'

নীলমণি বললে, 'ওকী মশাই, খামকা গালাগাল দিচ্ছেন কেন?'

রুগি বললে, 'এই চললুম আমি থানায়। তোমাকে ছ মাস জেল খাটিয়ে তবে ছাড়ব!'

নীলমণি বললে, 'কলিকালে লোকের ভালো করলে মন্দ হয়। কী দোষে আমি জেল খাটব মশাই? আমি ডাক্তার, আপনার দাঁতের ব্যায়রামের চিকিৎসা করেছি বই তো নয়!'

রুগি মুখ খিঁচিয়ে বললে, 'চিকিৎসা করেছ, না আমার সর্বনাশ করেছ! আমার কোনও-পুরুষে দাঁতের ব্যথা নেই—তুমি আমার তাজা ভালো দাঁতগুলো সব জোর করে উপড়ে নিয়েছ! ওই খাতাখানা নিয়ে আমি বেরিয়েছিলুম বারোয়ারির চাঁদা আদায় করতে!'

—'বারোয়ারির চাঁদা আদায় করতে—অ্যাঁ—বলেন কী! কই, আপনি আগে তো সে কথা বললেন না?'

—'তুমি আমাকে বলতে দিলে কই—আমার মুখ চেপে ধরে এখন আবার সাধু সাজা হচ্ছে!—উহু, বাপ রে—কটকট—ঝনঝন—প্রাণ যে যায় রে বাবা!'

বউনির দিনে এ কী মুশকিল! নীলমণি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

বুদ্ধদেবের বুদ্ধি

(জাতকের গল্প)

বুদ্ধদেব এই পৃথিবীতে অনেকবার জন্মেছিলেন—কখনও মানুষ আবার কখনও বা পশু-পক্ষী রূপে।

অনেক অনেক দিন আগেকার কথা।

বারাণসী-ধামে রাজা ব্রহ্মদত্ত তখন সিংহাসনে। শহরে একটি গরিব লোক ছিল, পাথর কেটে তার দিন চলত। বুদ্ধদেব তার ছেলে হয়ে জন্মালেন। বড়ো হয়ে তিনিও বাপের ব্যাবসাই ধরলেন।

একবার একটি পোড়ো গাঁয়ের ভিতরে বুদ্ধদেব পাথর কাটতে গেলেন। সে গাঁয়ে কোনও লোক ছিল না, ঘর-বাড়ি সব ভেঙে পড়েছে, পথে-ঘাটে জঙ্গল জমেছে।

অনেকদিন আগে এই গাঁয়ে এক সওদাগর ছিল, তার এত টাকা যে, গুনে ওঠা ভার! সওদাগর মারা গেলে পর তার বউ সব টাকার মালিক হল। কিন্তু সে এমন কিপটে ছিল যে, একটি পয়সাও খরচ করতে পারত না। এই টাকা আগলাতে আগলাতে সওদাগর-বউও মারা পড়ল। তারপর সে ইঁদুর হয়ে জন্মে আবার টাকার উপর পাহারা দিতে লাগল।

সওদাগরের টাকা যেখানে লুকানো ছিল, বুদ্ধদেব তার কাছে বসেই রোজ নিজের মনে পাথর কাটতে থাকেন। ইঁদুরও রোজ তফাতে বসে বসে তাঁকে দেখে আর ভাবে, এ গরিব বেচারি জানে না যে, এর হাতের কাছেই আছে সাত রাজার ধনের ভাণ্ডার।

এইভাবে দিন যায়। ইঁদুর যখন দেখলে বুদ্ধদেব বড়ো শান্তশিষ্ট লোক, কারুর উপরে অত্যাচার করেন না, তখন সে তাঁর কাছে এসে বসতে শুরু করল।

তারপর একদিন সে মনে মনে ভাবতে লাগল, আমার এত টাকা, কিন্তু হায়, এ টাকা তো কোনও কাজেই লাগছে না! মিছিমিছি টাকায় ছাতা ধরিয়ে লাভ কী? কবে মরে যাব তার ঠিক নেই, তার চেয়ে এই বেলা ওই ভালো মানুষটির সঙ্গে কিছুদিন সুখ ভোগ করে নি।

ইঁদুর একটি টাকা মুখে করে বুদ্ধদেবের কাছে এসে দাঁড়াল।

বুদ্ধদেব তাকে দেখে বললেন, 'ইঁদুরভায়া যে! এখানে কী মনে করে?'

ইঁদুর বললে, 'মিতে, এই টাকাটা নিয়ে বাজারে যাও। কিছু মাংস কিনে আনো, দুজনে মিলে ভাগাভাগি করে খাব।'

বুদ্ধদেব বাজার থেকে মাংস কিনে আনলেন। ইঁদুর তাঁর সঙ্গে সেই মাংস ভাগাভাগি করে খেলে।

এমনি রোজই ইঁদুর একটি করে টাকা দেয়, পরে বুদ্ধদেব মাংস কিনে আনেন। খেয়ে-দেয়ে দুজনেরই শরীর বেশ মোটাসোটা হয়ে উঠল।

একদিন ইঁদুর নিজের ঘরে গিয়ে বসে মাংস খাচ্ছে, হঠাৎ কোত্থেকে এক বিড়াল এসে হাজির! ইঁদুরকে দেখেই সে কপ করে ধরে ফেললে।

ইঁদুর কেঁদে বললে, 'ভাই বাঘের মাসি, আমাকে মেরো না, তোমার পায়ে পড়ি!

বিড়াল বললে, 'আলবৎ তোকে মারব—খিদের চোটে পেট আমার চুঁই-চুঁই করছে!'

ইঁদুর বললে, 'ভাই বাঘের মাসি, এক দিন আমার একরত্তি দেহ খেয়ে তোমার খিদে মিটবে না! তার চেয়ে আমাকে যদি ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে রোজ মাংস খাওয়াব!'

বিড়াল বললে, 'আচ্ছা, সে কথা মন্দ নয়। কিন্তু মাংস না পেলেই আমি তোর ঘাড় মটকাব, তা কিন্তু আগে থেকে বলে রাখছি।'

ইঁদুর রোজই বিড়ালকে নিজের ভাগ থেকে মাংস দিতে লাগল।

দিন-কয়েক পরে দ্বিতীয় এক বিড়াল এসে ইঁদুরকে কপ করে ধরে ফেললে। মাংসের লোভ দেখিয়ে ইঁদুর বেঁচে গেল সে-যাত্রাও।

ইঁদুর রোজই দুই বিড়ালকে নিজের ভাগ থেকে মাংস খাওয়াতে লাগল।

দিন কয়েক পরে তৃতীয় এক বিড়াল এসে ইঁদুরকে ফলার করে ফেলে আর কি! মাংসের লোভ দেখিয়ে সে ছাড়ান পেলে সেবারেও।

ইঁদুর রোজই তিন বিড়ালকে নিজের ভাগ থেকে মাংস খাওয়াতে লাগল।

একদিন বুদ্ধদেব পাথর কাটছেন, ইঁদুর বিমর্ষের মতো তাঁর পাশটিতে এসে বসল। তিন বিড়ালের জুলুমে ইঁদুরের নিজের ভাগে আর কিছু থাকে না। সে আবার রোগা হয়ে পড়েছে।

বুদ্ধদেব বললেন, 'কিহে ইঁদুরভায়া, খাচ্ছ-দাচ্ছ তবু রোগা হয়ে পড়ছ কেন?'

ইঁদুর বললে, 'দুঃখের কথা আর বলো কেন? প্রাণে প্রাণে বেঁচে আছি, এই ঢের!' সে বুদ্ধদেবের কাছে একে একে সব কথা খুলে বললে।

বুদ্ধদেব সব শুনে বললেন, 'এর জন্যে আর ভাবনা কী ভায়া? রও, আমি তোমার উপায় করে দিচ্ছি!'

তারপর একটি কাচের ঘর বানিয়ে বুদ্ধদেব আবার ইঁদুরকে বললেন, 'এবার যখন বিড়াল আসবে, তুমি এই কাচের ঘরের ভেতরে বসে থেকো।'

ইঁদুর কাচের ঘরের ভিতরে মজা করে বসে আছে, এমন সময়ে প্রথম বিড়াল এসে হাজির। এসেই বললে, 'কি লো চেরন-দাঁতি, আমার মাংস-টাংস দেখতে পাচ্ছি না যে বড়ো?'

ইঁদুর বুক ফুলিয়ে বললে, 'আয় আয় থ্যাবড়া-নাকী! মাংস তুই বাজার থেকে নিজে কিনে খে গে যা, আমার কাছে আর আবদার খাটবে না!'

বিড়াল কাচ চিনত না, ইঁদুর যে কাচের ঘরের ভিতরে আছে, তাও বুঝতে পারলে না, মহা খাপ্পা হয়ে সে ইঁদুরের ঘাড় মটকাবার জন্যে যেই লাফ মারলে, অমনি কাচে মাথা ঠুকে তুললে পটল!

একটু পরেই দ্বিতীয় বিড়াল এসে বললে, 'মাংস লে আও!'

ইঁদুর বললে, 'ভারী সুখ যে, ভাগো হিয়াসে!'

বিড়াল রেগে বললে, 'গোঁ—গোঁ—গররর ফ্যাচ' —তারপরেই লাফ মেরে কাচের ঘরের উপরে পড়ে মাথা ফেটে একেবারে তার দফা রফা!

দেখতে দেখতে তৃতীয় বিড়াল এসে বললে, 'ওরে নেংটে ইঁদুর, আমার মাংস কোথায়?'

ইঁদুর বললে, 'যা, আমাকে আর জ্বালাসনে, এখানে ফের গোলমাল করলে দেব তোর ল্যাজ কামড়ে!'

বিড়াল বললে, 'হু-উ-উ-উ— বটে?'—তারপরই কাচের ঘরের উপরে লাফ মেরে সাঙ্গ করলে লীলা খেলা!

তখন ইঁদুরের ফুর্তি দেখে কে! সে নাচতে নাচতে বাইরে এসে বুদ্ধদেবকে বললে, 'মিতে, তুমি আমাকে বাঁচালে, আমিও তোমার কিছু উপকার করব!' এই বলে সে গুপ্তধনের ঠিকানা জানিয়ে দিলে।

বুদ্ধদেবকে সে-জন্মে আর পাথর কাটতে হল না! ইঁদুরকে নিয়ে তিনি শহরে গিয়ে মস্ত এক বাড়ি তৈরি করে ফেললেন, তারপর দিন কাটাতে লাগলেন দুজনে মিলে পরম সুখে।

কাঠুরের কপাল

জমিদার রত্নাকর সুন্দরবনে শিকার করতে গিয়ে, এক মস্তবড়ো গর্তে ঝুপ করে পড়ে গেল।

যখন বাঘের উৎপাত বেশি হয়, কাঠুরেরা তখন বনের ভেতরে বড়ো বড়ো গর্ত খুঁড়ে রাখে। গর্তের মুখ খড়কুটো আর গাছের ডালপালায় ঢাকা থাকে, তার তলায় যে গর্ত আছে সেটা আর টের পাওয়া যায় না। বাঘেরা তখন সেই খড়কুটো আর ডালপালার উপর দিয়ে যেতে গেলেই হুড়মুড় করে গর্তের ভেতরে পড়ে যায়, তারপর কাঠুরেরা এসে বাঘটাকে খুঁচিয়ে মেরে ফেলে।

রত্নাকর মানুষ হয়েও দেখতে না পেয়ে এমনি এক গর্তের মধ্যে পড়ে গেছে। গর্তের ভেতরে— বাপ রে, কী ঘুটঘুটে অন্ধকার! যেন অমাবস্যার রাত্রি এসে সেখানে বাসা বেঁধেছে! তাকিয়ে দেখতেও গা শিউরে ওঠে!

খালি কি অন্ধকার? তাহলেও তো রক্ষে ছিল! অন্ধকারের ভেতরে যে আবার কতরকম ভয়ানক আওয়াজ হচ্ছে, তাও আর বলবার-কইবার নয়। ফোঁস ফোঁস,—কিচির-মিচির— হালুম-হুলুম—এমনি আরও কত কী!

ভয়ে রত্নাকরের প্রাণপক্ষী দস্তুরমতো খাবি খেতে লাগল— কাঁদবে কী, টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করতে পারলে না—একেবারে 'নট-নড়ন-চড়ন নট-কিচ্ছু' হয়ে আড়ষ্টের মতো বসে রইল। সন্ধে হল, রাত হল, আবার ভোর হল। রত্নাকর কিন্তু তখনও 'এই মরি, এই মরি' করে ঠায় বসে আছে তো বসেই আছে— ছবিতে আঁকা মানুষের মতো!

দিনের আলো গর্তের ভেতরে যেন ভয়েই সেঁধুতে পারলে না। কিন্তু গর্তের বাইরে মানুষের সাড়া পাওয়া গেল।

রত্নাকর চেঁচিয়ে ডাকলে, 'ওহে ভাই, ওহে ভাই, দয়া করে আমাকে বাঁচাও ভাই!'

বাইরে থেকে সাড়া এল—'কে ও!'

—'আমি জমিদার রত্নাকরবাবু, গর্তে পড়ে বেজায় কাবু হয়ে আছি। তুমি কে ভাই?'

—'আমি কাঠুরে।'

—'কাঠুরে হও আর যাইই হও, আগে আমাকে বাঁচাও! অনেক বকশিশ দেব।'

—'বকশিশ দাও তো ভালোই, না দিলেও তোমাকে বাঁচাব'— এই বলে কাঠুরে লম্বা একটা গাছের ডাল ভেঙে এনে, গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বললে, 'এসো, এই ডাল ধরে উঠে এসো!'

ডাল ধরে উঠে এল— ওমা, মস্ত এক রূপী বাঁদর! রত্নাকরের মতো সে-বেচারিও গর্তে পড়ে জব্দ হয়েছিল— এখন যাঁহাতক ডাল পাওয়া, তাঁহাতক উঠে আসা।

—'তবে কি ওই বাঁদরটাই মানুষের মতো গর্তের ভেতর থেকে আমার সঙ্গে কথা কইছিল? বাপ, তাহলে ওটা তো বাঁদরও নয়, বাঁদরের চেহারায় আসল ভূত!' এই ভেবে কাঠুরে চটপট লম্বা দিতে গেল।

কিন্তু গর্তের ভেতর থেকে আবার মানুষের গলা এল, 'ভাই, ডাল নামিয়ে তুলে নিলে কেন? আমাকে বাঁচাও ভাই, তোমাকে মুঠো মুঠো মোহর দেব!'

ভরসা পেয়ে কাঠুরে ফের লম্বা ডালটা গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে। এবারে সড়াৎ করে ডাল বেয়ে উঠে এল মস্ত এক গোখরো সাপ!

কাঠুরে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'বাপ রে বাপ, সাপে কথা কইলে মানুষের মতো। এ যে বেজায় ভূতুড়ে কাণ্ড বাবা! আর এখানে থাকা নয়!'

গর্তের ভেতর থেকে আবার মানুষের গলায় শোনা গেল, 'যেয়ো না ভাই, যেয়ো না— তোমার দুটি পায়ে পড়ি! আমাকে বাঁচাও, আমি জমিদার রত্নাকর, আমাদের অর্ধেক জমিদারি তোমাকে দেব!'

কাঠুরে কী আর করে, আস্তে আস্তে ডালটা আবার গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে। ডাল বেয়ে এবারে এক প্রকাণ্ড বাঘ উঠে এসে, বনের ভেতরে ল্যাজ তুলে দৌড় মারলে!

কাঠুরে হাউ-মাউ করে চেঁচিয়ে বললে, 'নাঃ, এ ভূতুড়ে কাণ্ড ক্রমেই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে যে! আগে বাঁদর, পরে সাপ, তারপরে বাঘ! এখন প্রাণটা থাকতে থাকতেই প্রাণ নিয়ে পালানো যাক!'

গর্তের ভেতর থেকে কাকুতি-মিনতি করে রত্নাকর বললে, 'আমাকে ফেলে পালিয়ো না ভাই, পালিয়ো না— ভগবান তোমার ভালো করবেন। আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব! দেব, দেব, দেব— এই তিন সত্যি করলুম!'

কাঠুরের দয়ার শরীর, কাজেই ভয়ে ভয়ে রাম-নাম জপতে জপতে আর একবার সে গর্তের মধ্যে ডালটা ঢুকিয়ে দিলে।

এবারে বাস্তবিকই মানুষকে উঠে আসতে দেখে কাঠুরে 'দুর্গা', বলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল!

রত্নাকর বললে, 'কাঠুরে, তোমার উপকার আমি কখনও ভুলব না।'

কাঠুরে হাত জোড় করে বললে, 'জমিদারবাবু, আপনি কি সত্যিই আমাকে আপনার অর্ধেক জমিদারি আর মেয়েটিকে দেবেন?'

রত্নাকর বলল, 'হ্যাঁ, দেব বইকী। তুমি আমার বাড়িতে যেয়ো, তারপর কথা হবে।'

দুই

গরিব কাঠুরে, কখনও ধন-দৌলতের মুখ তো দেখেনি! আজ তার প্রাণ যেন আহ্লাদে

আটখানা হয়ে গেছে। নাচতে নাচতে সে জমিদার রত্নাকরবাবুর বাড়ির দিকে চলেছে। মনে মনে ভাবছে, 'আঃ, বাঁচা গেল! আর কুড়ুল কাঁধে করে বনে বনে ঘুরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে না, অর্ধেক জমিদারি পেলে আমার আর ভাবনা কী! তার ওপরে আবার জমিদারের মেয়েও আমার গলায় মালা দেবে। জমিদারের মেয়ে, দুধ-ঘি খায়, কত আদরে থাকে, সে নিশ্চয়ই দেখতে পরমাসুন্দরী। আহা, আমার শ্বশুরমশায়ের ভারী দয়ার শরীর গো, ভগবান তাঁর ভালো করুন।'

রত্নাকরবাবুর বাড়ির ফটকের সামনে এসে দারোয়ানকে ডেকে কাঠুরে বললে, 'এই দারোয়ান, বাবুকে গিয়ে বলগে যা, আমি এসেছি।'

দারোয়ান বাড়ির ভেতরে ঢুকে ফের যখন ফিরে এল, কাঠুরে তখন বললে, 'কী রে, বাবু কী বললে?'

—'বাবুজি বললেন, লাঠি মেরে তোর মাথা ভেঙে দিতে!' এই বলেই গালপাট্টা নেড়ে বন বন করে লাঠি ঘুরিয়ে তেড়ে এল দারোয়ান।

বেগতিক দেখে কাঠুরে ভোঁ-দৌড় দিয়ে সে যাত্রা কোনওগতিকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালে বটে, কিন্তু তার বড়ো সাধের বাড়া ভাতে যেন ছাই পড়ল।

মুখখানি চুন করে কাঠুরে-বেচারি বনের মাঝে নিজের ভাঙা কুঁড়েঘরে ঢুকেই, থমকে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল! ওরে বাবা, ঘরের ভেতরে বসে আছে গর্তের সেই বাঁদর, গোখরো সাপ, আর ইয়া গোঁফওয়ালা মস্ত বাঘটা! দেখেই তো তার পেটের পিলে গেল চমকে! বুঝলে, লাঠির ঘা থেকে আজ মাথা বাঁচলেও এদের খপ্পর থেকে আর কিছুতেই বাঁচোয়া নেই!

কাঠুরে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'হা ভগবান, যাদের আমি বাঁচালুম, তাদের সবাই কিনা আমারই শত্রু হয়ে দাঁড়াল!'

কিন্তু কী আশ্চর্য! সেই বাঘ, সাপ আর বাঁদর কাঠুরেকে দেখে একটুও তেড়ে এল না, বরং তার পায়ের তলায় গড়িয়ে পড়ে আদর করে তার পা চেটে দিতে লাগল! কাঠুরে তো একেবারে গালে হাত দিয়ে অবাক!

তারপর বাঁদরটা তাড়াতাড়ি বনের গাছ থেকে ভালো মিষ্টি ফল পেড়ে আনলে, বাঘটাও একছুটে বাইরে গিয়ে কোথা থেকে একটা নধর হরিণ মেরে এনে দিলে, আর গোখরো সাপ তার জ্বলজ্বলে মাথার মণিখানা কাঠুরের পায়ের তলায় নামিয়ে রাখলে!

কাঠুরে চোখের জল মুছে, তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, 'ওরে, তোরা দেখছি জন্তু হয়েও মানুষের চেয়ে ঢের ভালো, উপকার পেয়ে উপকার ভুলে যাস না! দুষ্টু রত্নাকর আমাকে আজ বড়ো দাগাটাই দিয়েছে, অর্ধেক জমিদারি আর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া চুলোয় যাক— উলটে কিনা লাঠি নিয়ে পেছনে তাড়া? ছি, ছি, মানুষকে ধিক!'

হরিণের মাংস আর ফলমূল পেট ভরে খেয়ে মণিটি ট্যাঁকে গুঁজে কাঠুরে শহরে গিয়ে হাজির হল।

একটি জহুরির দোকান দেখে সে তার ভেতরেই ঢুকল। ঠিক করলে মণিটি বেচে যে টাকা পাওয়া যাবে, তাই নিয়েই এ-জীবনটা সে কাটিয়ে দেবে, কুড়ুলে গাছ কুপিয়ে আর তাকে খেটে খেতে হবে না।

জহুরিকে ডেকে সে বললে, 'ওহে, এই মণিটি আমি বেচব!'

মণিটি দেখে জহুরি তো হতভম্ব! এ যে সাত রাজার ধন এক মানিক! কাঠুরের কাছে এমন দামি মণি এল কেমন করে? নিশ্চয়ই চুরি করেছে! চোরাই মাল কিনে পাছে মুশকিলে পড়ে, সেই ভয়ে জহুরি তখনই চুপি চুপি শহর-কোটালের কাছে খবর পাঠালে। কোটাল এসে তখনই কাঠুরের হাত পিছমোড়া করে বেঁধে, তাকে একেবারে রাজার সামনে নিয়ে গিয়ে হাজির করলে।

রাজাও মণি দেখে বললেন, 'যে রত্ন আমার ভাণ্ডারে নেই, তুই কাঠুরে হয়ে তা পেলি কোথায়?'

কাঠুরে তখন কাঁদতে কাঁদতে জমিদার রত্নাকরের কথা থেকে শুরু করে, মণি পাওয়া পর্যন্ত সব কথা খুলে বললে।

রাজা বললেন, 'আচ্ছা, জমিদার রত্নাকরকে ডেকে নিয়ে আয় তো রে, সে কী বলে শুনি।'

রাজার হুকুমে তখনই জমিদার রত্নাকরকে সভায় ডেকে আনা হল।

রাজা বললেন, 'ওহে রত্নাকর, এই কাঠুরে তোমাকে গর্ত থেকে বাঁচিয়েছিল বলে তুমি কি একে তোমার মেয়ে আর অর্ধেক জমিদারি দেবে বলেছিলে?'

রত্নাকর হাত জোড় করে, চোখদুটো কপালে তুলে বললে, 'মহারাজ, এ যে ডাহা মিছে কথা! এই কাঠুরেটাকে এর আগে আমি কখনও চোখেও দেখিনি।'

রাজা রেগে টং হয়ে কাঠুরেকে বললেন, 'তবে রে হতভাগা চোর! আমার সঙ্গে মিছে কথা? জল্লাদ!'

জল্লাদকে খাঁড়া কাঁধে করে আসতে দেখে কাঠুরে ভয়ে মাটির ওপরে আছড়ে পড়ে বললে, 'মহারাজ, আমি সত্যি কথাই বলছি!'

রত্নাকর বললে, 'মহারাজ, এর কথা যে সত্যি, তার সাক্ষী কোথায়?'

হঠাৎ সভাসুদ্ধ লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে চারিদিকে ছোটাছুটি, চ্যাঁচামেচি করতে লাগল! তারপরেই দেখা গেল, হেলতে-দুলতে এক মস্ত বাঘ এসে সভার মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়াল,—তার পিঠে এক রূপী বাঁদর,—আর বাঁদরের গলা জড়িয়ে মাথার ওপরে কাছির মতো একটা মোটা গোখরো সাপ!

রত্নাকরের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল! ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে সে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে পড়ল।

কাঠুরে জো পেয়ে বললে, 'রত্নাকরবাবু, আপনি কি এদের চেনেন না?'

রত্নাকর আমতা আমতা করে বললে, 'এগুলো যে সেই গর্তের জন্তু!'

কাঠুরে বললে, 'মহারাজ! এরাই আমার সাক্ষী!'

বাঘ তখন এগিয়ে এসে ডাকলে,—'হালুম!'

বাঁদর ডাকলে—'কিচ-কিচ, কিচির-মিচির—কোঁও!'

গোখরো সাপ ডাকলে—'স-স-স-র-র-র—ফোঁস-স!'

পাছে তারা পায়ে কামড়ে দেয় সেই ভয়ে রাজা তাড়াতাড়ি পা দুটো সিংহাসনের ওপরে

তুলে ফেলে বললেন, 'বাছা কাঠুরে, তোমার সাক্ষীদের বাসায় ফিরে যেতে বলো। আমি বুঝেছি, তোমার সব কথাই সত্যি। রত্নাকর! দ্যাখো, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে! যে লোক উপকার ভুলে যায়, আমার রাজ্যে সে আর থাকতে পাবে না। তোমার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে, তোমাকে গাধার পিঠে চড়িয়ে আজকেই শহর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। আর, তোমার সব জমিদারি আমি এই কাঠুরেকে দিলুম, তোমার মেয়েকেও কাঠুরেই বিয়ে করবে।'

তারপর? তারপর আর কী, রত্নাকরের পরমাসুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে জমিদারির আয়ে কাঠুরের মনের সুখে দিন কাটতে লাগল। সুখের দিনে সে কিন্তু তার তিন-বন্ধুকেও ভুলে গেল না—বাঘ, বাঁদর আর সাপকেও আদর করে নিজের বাড়ির ভেতরে এনে রাখলে। তারপর? নোটে-গাছটি মুড়ুল কি না জানি না, কিন্তু আমার কথাটি ফুরুল।

হাঙর-মানুষের চোখের জল

তোতারো এক মস্ত যোদ্ধা! একবার তিনি ঘোড়ায় চড়ে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন।

নানাদেশে ঘুরতে ঘুরতে তিনি একদিন একটি সাঁকোর উপর দিয়ে নদী পার হচ্ছেন, হঠাৎ এক মূর্তি দেখে চমকে উঠলেন!

তোতারো দেখলেন, পোলের ধারে একটা কিম্ভুতকিমাকার জীব বসে আছে। তার দেহ কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত অবিকল মানুষের মতন, কিন্তু মুখখানা একেবারে হুবহু হাঙরের মতন ভয়ানক! মুখে বড়ো বড়ো বিশ্রী দাড়ি, চোখ দুটো সবুজ হিরের মতন জ্বলজ্বলে আর গায়ের রং কাফ্রির চেয়েও কালো কুচকুচে!

তোতারো প্রথমটা হতভম্ভ হয়ে গেলেন, মুখ দিয়ে তাঁর কোনও কথাই বেরুল না! কিন্তু সেই অদ্ভুত জীবটার চোখ দুটোতে এমন এক দুঃখের ভাব মাখানো ছিল যে, শেষটা তিনি ভরসা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তুমি?'

সে বললে, 'আমি হচ্ছি হাঙর-মানুষ!'

—'সে আবার কী?'

—'আমরা সমুদ্র-রাজার প্রজা। আমি তার সেনাপতি ছিলুম। আমার নাম সম্বিতো। হঠাৎ একদিন আমার মাথায় দুর্বুদ্ধি জুটল, নদীর ভেতরে বেড়াবার জন্যে। কিন্তু নদীর ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতেই একদল জেলে জাল ফেলে আমাকে ডাঙায় তুললে। কিন্তু আমার চেহারা দেখে জেলেরা 'বাপ রে' বলে সেই যে ছুটে পালাল, আর ফিরে এল না। তারপর থেকে আজ তিন দিন আমি অনাহারে এখানে একলাটি পড়ে আছি মশাই, দয়া করে আমার প্রাণ বাঁচান।'

সম্বিতোর অবস্থা দেখে তোতারোর মনে ভারী দয়া হল। তিনি তাকে সঙ্গে করে নিজের বাসায় নিয়ে গেলেন! তাঁর বাসার বাগানে একটি পুকুর ছিল; সম্বিতোকে তিনি সেই পুকুরে থাকতে দিলেন—অবশ্য খাবার দিতেও ভুললেন না।

কিছুদিন যায়। তোতারো একদিন এক মেলায় গিয়ে হঠাৎ একটি পরমাসুন্দরী মেয়েকে দেখতে পেলেন! মেয়েটির মুখ বরফের মতন ধবধবে সাদা, তার ঠোঁট দুখানি যেন গোলাপ ফুলের পাপড়ির মতন। আর তার কথা—সে যেন বসন্তকালে পাপিয়ার ঝঙ্কার।

মেয়েটির রূপ দেখে তোতারো একেবারে মোহিত হয়ে গেলেন। তিনি খোঁজ নিয়ে জানলেন যে, তার নাম তামানা—এখনও তার বিয়ে হয়নি! তাকে বিয়ে করবার জন্যে দেশ-বিদেশ থেকে দলে দলে বর আসছে, কিন্তু তামানার কঠোর পণের কথা শুনে সকলকে ধুলো-পায়েই বিদায় হতে হচ্ছে!

তামানার প্রতিজ্ঞা, দশ হাজার মানিক দিতে না পারলে সে কারুকেই বিয়ে করবে না!

দশ হাজার মানিক! কথায় বলে, একখানা মানিকই সাত-রাজার ধনের সমান! এমন দশ হাজার মানিক কি কুবেরেরও ভাঁড়ারে আছে? তোতারোর বুক ভেঙে গেল, তিনি বুঝলেন যে তামানাকে বিয়ে করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু তোতারোর মন তবু শান্ত হল না, তামানার কথা ভেবে ভেবে দিন-কে-দিন তিনি রোগা হয়ে পড়তে লাগলেন, শেষটা বিছানা থেকে আর তাঁর ওঠবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত রইল না।

ডাক্তার এসে জবাব দিয়ে গেলেন যে, 'ওষুধে কোনও ফল হবে না, তামানাকে না পেলে এ ব্যামো সারবার নয়।'

তোতারোর অসুখের খবর পেয়ে সম্বিতো তার পুকুর থেকে ডাঙায় উঠে মনিবকে দেখতে এল।

তোতারো তাকে দেখে বললেন, 'হায় সম্বিতো, আমি মরে গেলে আর কে তোমাকে খাবার দেবে?'

সম্বিতো তার প্রভুর দশা দেখে হাউ মাউ করে কেঁদে অস্থির!

তোতারো অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন, সম্বিতোর অশ্রু প্রথমে রক্তের মতন রাঙা হয়ে ঘরের মেঝেতে ফোঁটা ফোঁটা ঝরছে, তারপরেই প্রত্যেক ফোঁটাটি হয়ে যাচ্ছে, এক-একখানি জ্বলন্ত মানিক!

এই আশ্চর্য মানিক-অশ্রু দেখবামাত্র তোতারো আনন্দে দিশাহারা হয়ে বললেন, 'আর

আমি মরব না, আর আমি মরব না! সম্বিতো, তোমার চোখের জলই আবার আমাকে বাঁচিয়ে তুলবে!'

সম্বিতো কান্না থামিয়ে বললে, 'প্রভু, আমার চোখের জল দেখে আপনি হঠাৎ এত খুশি হচ্ছেন কেন?'

তোতারো তখন তাকে সব কথা জানিয়ে বললেন, 'সম্বিতো, তুমি চোখের জল ফেললেই যখন মানিক হয় তখন আর ভাবনা কী! আমি দশ হাজার মানিক যৌতুক দিয়ে তামানাকে বিয়ে করে আনব!'

তারপর তোতারো তাড়াতাড়ি ঘরের মেঝের উপরে ছড়ানো মানিকগুলো গুনে বললেন, 'দশ হাজার পূর্ণ হতে এখনও ঢের বাকি! সম্বিতো, কাঁদো—আর একটু কাঁদো!'

সম্বিতো রাগে মুখ ভার করে বললে, 'প্রভু, আপনি কি মনে করেন, আমি মেয়েমানুষের মতন যখন-খুশি কাঁদতে পারি? দুঃখ হলে আমার বুকের ভেতর থেকে অশ্রু আপনি গড়িয়ে আসে! আপনি সুস্থ হয়েছেন, আর আমার কান্না আসছে না! জীবন হচ্ছে হাসবার জন্যে,—কান্নার জন্যে নয়!'

তোতারো মিনতি করে বললেন, 'দশ হাজার মানিক না পেলে আবার আমার অসুখ হবে! কাঁদো সম্বিতো, লক্ষ্মীটি, আর একটু কাঁদো।'

প্রভুর কাতরতা দেখে সম্বিতোর মনে দয়া হল। সে খানিকক্ষণ ভেবে বললে, 'আজ আমি আর কাঁদতে পারব না। কাল আমাকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে যাবেন। সেখানে গেলে আমার দেশের কথা, আমার ঘরের কথা, আমার মা-বোন-মেয়ের কথা মনে পড়বে। তাহলে হয়তো আবার আমি কাঁদতে পারব।'

পরদিন তোতারো নিজে সম্বিতোকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

সমুদ্রের পানে তাকিয়ে সম্বিতো চুপ করে বসে রইল। তারপর দেশের কথা ভাবতে ভাবতে তার দুই চোখ সত্যিই ভরে উঠল অশ্রুজলে, দেখতে দেখতে সেই অশ্রু গড়িয়ে মাটির উপরে পড়েই জ্বলন্ত মানিক হয়ে উঠতে লাগল!

সম্বিতোর দুঃখের দিকে কিন্তু তোতারোর কিছুমাত্র নজর ছিল না, তিনি আগ্রহভরে প্রত্যেক মানিকখানা তুলে নিয়ে বলতে লাগলেন, 'ভাই সম্বিতো, আরও একটু কাঁদো, আরও একটু কাঁদো!'

তারপর সম্বিতোর চোখের জলে ঠিক দশ হাজার মানিক তৈরি হল!

এমন সময়ে আচম্বিতে শোনা গেল এক স্বর্গীয় সংগীতের তান! তোতারো আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, সমুদ্রের নীল-জলের উপরে মেঘ-দিয়ে তৈরি মস্ত একটি রক্ত-কমল জেগে উঠেছে, আর তারই উপরে এক প্রকাণ্ড রত্ন-প্রাসাদ!

সম্বিতো দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'বিদায় প্রভু, বিদায়! ওই দেখুন, সমুদ্র-রাজের প্রাসাদ! আমার দেশের ডাক এসেছে, আর আমি থাকতে পারব না!'—এই বলেই সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেল!

তোতারো তখনই দশ হাজার মানিক নিয়ে তামানার বাড়ির দিকে চললেন।

যথাসময়ে খুব ঘটা করে রূপসী তামানার সঙ্গে তোতারোর বিয়ে হয়ে গেল!

তার অনেক দিন পরেও, তামানার গলায় যখনই সেই মানিকের মালা দেখতেন, তোতারোর তখনই মনে পড়ত হাঙর-মানুষ সম্বিতোর কথা, তার প্রভুভক্তি ও দেশভক্তির কথা, তার অশ্রুজলের কথা! আর তাকে দেখতে পাবেন না বলে তোতারোর চোখ দুটি ছলছলে হয়ে আসত।

ভুলুর ভুল

বিজয়া দশমী। সন্ধেবেলা। ঠাকুমার ঘরে ঢুকে দেখি, একটি বাটিতে ক্ষীরের মতন কী-খানিকটা রয়েছে। ঠাকুমা খুব ভালো ক্ষীর করতে পারতেন। মনে বড্ড লোভ হল—সামলাতে পারলুম না। ঢক করে খানিকটা দিলুম গলায় ঢেলে।

কিন্তু খেয়েই বুঝলুম, এ তো ক্ষীর নয়! তবে? সিদ্ধি! বিজয়া দশমীর জন্যে দুধ-চিনি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে! ভয়ে প্রাণটা উড়ে গেল!

একটু পরেই রগ টিপ টিপ, বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল! তার ওপরে আবার বাবার পায়ের শব্দ পেলুম। সিদ্ধি খেয়েছি জানলে বাবা তো আর আমাকে আস্ত রাখবেন না! তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে দিলুম টেনে লম্বা!

আকাশে সেদিন চাঁদা-মামার মুখ দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু গাঁয়ের পথঘাটগুলো কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে গেছে। যেদিকে তাকাই খালি ধোঁয়া আর ধোঁয়া আর ধোঁয়া! টলতে টলতে ঘুরতে ঘুরতে চলেছি তো চলেছিই—কোথায় যে যাচ্ছি তা কিন্তু মোটেই টের পাচ্ছি না!

হঠাৎ পা বাড়িয়ে আর মাটি পেলুম না, মনে হল আমি নীচে পড়ে যাচ্ছি! ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে না বুঝতেই ঝুপ করে অথই জলের ভেতরে গিয়ে পড়লুম! ও বাবা, এ যে একেবারে নদী! নিশ্চয় আমি সাঁকোর ওপর থেকে পড়ে গিয়েছি!

একবার তলিয়ে গিয়ে ফের ওপরে উঠতেই দেখি, পাশ দিয়ে একটা গাছের গুঁড়ি ভেসে চলেছে। দু-হাতে সেটাকে জড়িয়ে ধরলুম।

ওঃ, জলে সেদিন কী টান! কুটোটি পড়লে দুখান হয়ে যায়। ঠিক তিরের মত বোঁ বোঁ করে ভেসে চললুম, কোন দিকে, কতক্ষণ ধরে তা জানি না—কারণ গাছের গুড়িটা জড়িয়ে ধরেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম।

যখন জ্ঞান হল দেখলুম, আমি একটা বালি-চরে গাছের গুড়িটার সঙ্গে কুপোকাৎ হয়ে পড়ে আছি। আস্তে আস্তে উঠে বসে মাথা চুলকে ভাবতে লাগলুম—এটা কোন দেশ, আমাদের গাঁ থেকে কতদূরে?

—'হুম-হুমা-হুম-হুম!'

ও কিসের শব্দ! চমকে চারিদিকে চাইতে লাগলুম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলুম না।

—'হুম-হুমা-হুম-হুম!'

তুই আবার কে রে বাবা? ভূত না জানোয়ার? সুমুখেই একটা অন্ধকার ঝোপ—শব্দটা আসছে তার ভেতর থেকেই। প্রাণের আশা একেবারেই ছেড়ে দিলুম।

এমন সময়ে বাজখাঁই গলায় কে আমাকে ডেকে বললে, 'বলি, ও ভুলুবাবু, আমাকে চিনতে পারো?'

ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে চেয়ে দেখি, ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল মস্ত-বড়ো এক হুতুমথুমো! তার চোখদুটো যেন আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলছে!

হুতুমথুমোকে দেখে আজ কিন্তু আমার একটুও ভয় পেল না। আমি খালি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম, সে মানুষের মতো কথা কইছে কেমন করে? আর আমার নামই-বা কী করে জানলে?

হুতুমথুমো তার ধারালো ঠোঁটটা আমার মুখের কাছে নেড়ে বললে, 'তারপর—ভুলুবাবু, এখানে কী মনে করে?'

আমি বললুম, 'সিদ্ধি খেয়ে জলে পড়ে গিয়েছিলুম। ভাসতে ভাসতে এখানে এসেছি!'

হুতুমথুমো মুখ খিঁচিয়ে বললে, 'একরত্তি ছেলে তুমি, গলা টিপলে দুধ বেরোয়, এই বয়সেই নেশা করতে শিখেছ? হুম-হুমা-হুম-হুম! একেবারে গোল্লার দোরে গেছ দেখছি! তারপর? এখন কী করবে? বাড়ি যাবে না?'

আমি রেগে বললুম, 'বাড়ি যাব না তো এখানে বসে বসে তোমার ঠোঁটনাড়া খাব নাকি?'

হুতুমথুমো বললে, 'কিন্তু ছোকরা, যাবে কী করে? তুমি যে তেরো নদীর পারে এসে পড়েছ!'

আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললুম, 'তাহলে উপায়?'

হুতমথুমো ডানা ঝাড়া দিয়ে বললে, 'এক উপায় আছে। তুমি যদি আমার পিঠে চড়ে বসো, তাহলে আমি তোমাকে তোমার বাড়িতে রেখে আসতে পারি।'

আমি বললুম, 'বিলক্ষণ! শেষটা তোমার পিঠ থেকে যদি পিছলে যাই, তাহলে মাটিতে পড়ে ছাতু হয়ে যাব যে!'

হুতুমথুমো বললে, 'আরে না না—রামচন্দ্র! পড়বে কেন, আমার পিঠে চড়ে বেশ বাগিয়ে গলাটা জড়িয়ে ধরো দেখি!'

কী আর করি—যেমন করেই হোক বাড়িতে যেতেই হবে তো! কাজেই আস্তে আস্তে শুকনো মুখে হুতুমথুমোর পিঠের ওপরেই নাচার হয়ে চড়ে বসলুম। হুতুমথুমোও অমনি হুস করে উড়ে গেল!

হুতুমথুমো ক্রমেই উপরে উঠতে লাগল,—এঁকে-বেঁকে, ঘুরে ঘুরে! অনেক নীচে ধরাখানা দেখতে পেলুম সত্যিই ঠিক সরার মতো! তারপর সব ধোঁয়া ধোঁয়া, আবছায়ার মতো! বুঝলুম, আমরা মেঘের রাজ্যে এসে পড়েছি! একবার একটা মেঘের পাহাড়ে মাথাটা আমার ঠক করে ঠুকে গেল! ক্রমে মেঘের রাজ্যও ছাড়িয়ে উঠলুম—সেখানে আকাশগঙ্গায় নীল জল থই থই করছে, আর সেই জলে মস্তবড়ো চাঁদখানা ভাসতে ভাসতে পশ্চিম দিকে চলেছে!

ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'অ হুতুমথুমো, এ কোথায় যাচ্ছ ভাই?'

—'আপাতত চাঁদের ওপরে!'

—'কেন?'

—'ভারী হাঁপিয়ে পড়েছি, একটু না জিরিয়ে নিলে চলবে না।'

আমি ভয় পেয়ে বললুম, 'কিন্তু চাঁদ যে বেজায় গোল, ওর ওপরে গেলে গড়গড়িয়ে পড়ে যাব যে!'

হুতুমথুমো চটে বললে, 'সেসব দেখবার দরকার আমার নেই! এই চাঁদের কাছে এসেছি, ভালো চাও তো আমার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ো—নইলে এমনি ঝটাপট ডানাঝাড়া দেব যে, একেবারে ছিটকে পৃথিবীর দিকে নেমে যাবে!'

ইসটুপিড হুতুমথুমোর কথায় আমার ভয়ানক রাগ আর ভয় হল! কিন্তু যখন বুঝলুম, পৃথিবীতে পড়ে হাড় গুঁড়ো হয়ে মরার চেয়ে এটা তবু মন্দের ভালো, তখন চাঁদের ওপরেই লম্বা এক লাফ মারলুম। বাপ রে, চাঁদ কী বরফের মতো ঠান্ডা, আর চুকচুকে তেলা! সর্বাঙ্গ যেন জমে গেল। আমি গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিলুম—তাড়াতাড়ি কী-একটা হাতে ঠেকতেই কপ করে সেটা আঁকড়ে ধরলুম।

এমন সময়ে শুনলুম, হুতমথুমো হা-হা করে হেসে বলছে, ওরে হতভাগা ভুলু, ওরে বজ্জাত! মনে পড়ে কি, তোদের চিলের ছাতে আমি যখন বাসা করেছিলুম, তখন তুই একদিন ছাতে উঠে আমার ডিমগুলো সব ভেঙে দিয়েছিলি? আজ আবার নতুন বাসার খোঁজ পেয়ে সেখানেও তুই নষ্টামি করতে গিয়েছিলি—ভাগ্যে আমি হাজির ছিলুম, নইলে তুই আবার আমার সর্বনাশ করতিস! সেইজন্যেই তো বাড়িতে নিয়ে যাবার অছিলায় তোকে আজ আপদের মতো এখানে বিদায় করে দিতে এসেছি! এখন চাঁদের ভেতরে পড়ে শীতে জমে থাক—যেমন কর্ম তেমনি ফল, আমার সঙ্গে চালাকি?'

ইচ্ছে হল, পাজি-নচ্ছারের ঘাড়টা ধরে দি মট করে মটকে! কিন্তু পাছে হাত ছাড়লে গড়িয়ে পড়ে যাই, সেই ভয়ে তা আর পারলুম না—হুতুমথুমোও দেখতে দেখতে গোঁত্তা খেয়ে পৃথিবীর দিকে নেমে, সোঁ-সোঁ করে মেঘের মাঝে মিলিয়ে গেল!

কী ধরে ঝুলছি তা দেখবার জন্যে চোখ তুলে দেখি—ওমা, এ যে একটা চরকা! এখানে চরকা এল কোত্থেকে?

হঠাৎ খট করে একটা শব্দ হল—চাঁদের গায়ে একটা দরজা অমনি খুলে গেল। তারপর এক আদ্দিকালের বদ্যিবুড়ি লাঠি ধরে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বাইরে বেরিয়ে এল। চরকার পাশে এসে বসে, চশমাখানা চোখে দিয়েই সে আমাকে দেখতে পেলে।

চমকে উঠে বুড়ি বললে, 'তুই কে রে ছোঁড়া?'

আমি বললুম, 'আমি ভুলু।' বুড়ি বললে, 'ভুলু? এ যে মানুষের নাম বলে মনে হচ্ছে!'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ গো বুড়ি, আমি মানুষই তো!'

বুড়ি গালে হাত দিয়ে বললে, 'মানুষ? চাঁদে মানুষ কেন? আরে গেল যা আবার আমার চরকাখানা দুহাতে চেপে ধরা হয়েছে! ও বুঝেছি, বুঝেছি, 'স্বর্গবাসী' সংবাদপত্রে আমি পড়েছি বটে, পৃথিবীতে গান্ধি বলে কে একজন লোক আজকাল সবাইকে চরকা ঘোরাতে বলেছে! তুই বুঝি তাই ভালো চরকা না পেয়ে আমার এই সাধের চরকাখানি চুরি করতে এসেছিস? বটে, ভারী আবদার যে, ছাড় ছোঁড়া, আমার চরকা ছাড় বলছি।'

আমি কাকুতি-মিনতি করে বললুম, 'না বুড়ি, তাহলে পড়ে হাড় গুঁড়ো হয়ে মরব। সত্যি বলছি, আমি তোমার চরকা চুরি করতে আসিনি!'

বুড়ি মাথা নেড়ে বললে, 'মানুষরা ভারী মিথ্যে কথা কয়, তাদের কথা আমি বিশ্বাস করি না, তুই আমার চরকা ছাড়বি কি না বল!'

আমি চরকাখানা আরও শক্ত করে ধরে বললুম, 'না।'

বুড়ি চোখ রাঙিয়ে বললে, 'ওমা, কী দস্যি ছেলে গো, কথায় কান পাতে না। দেখ, এখনও বলছি, ভালো চাস তো চরকা ছাড়!'

তার বকবকানিতে ঝালাপালা হয়ে আমি বললুম, 'যা বুড়ি যা, কানের কাছে আর ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করতে হবে না—সরে পড় এই বেলা, নইলে তোর ওই টিয়াপাখির মতো লম্বা নাকটা এক কামড়ে কেটে নেব।'

বুড়ি তার ভাঁটার মতো চোখদুটো রাঙিয়ে বললে, 'কী, আমাকে তুইমুই, আমার নাক তুই কামড়ে কেটে নিবি, এতবড়ো স্পর্ধা! রোস তো, মজাটা টের পাওয়াচ্ছি!' বলেই চাঁদের বুড়ি তার লাঠিটা তুলে আমার হাতের ওপরে দুমদাম ঘা-কতক বসিয়ে দিলে!

'ওরে বাবা রে, গেছি রে' বলে চেঁচিয়ে আমি চরকাখানা তখনই ছেড়ে দিলুম, আর সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে ঝুপ করে পড়ে গেলুম পৃথিবীর দিকে।

পড়ছি, পড়ছি, পড়ছি—ক্রমাগতই পৃথিবীর দিকে পড়ছি—

—এ-জন্মের লীলাখেলায় এইখানেই তবে ইস্তফা!

ওকী-ও! চারিদিক আলো করে আমারই মতন আর-একটি কে ও পড়ছে না? হ্যাঁ, তাই তো! এ যে একটি ছোটো খোকা!

আমি আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলুম, 'এমন সোন্দর খোকাকে কোন পাষণ্ড ফেলে দিলে রে?'

খোকা হাসিতে হিরের আলো ফুটিয়ে বললে, 'চাঁদের বুড়ি।'

—'তুমি কার খোকা? তোমার মা কে?'

—'জোছনা।'

—'তোমার নাম কী?'

'তারা! তোমরা আকাশে যে তারা দ্যাখো, আমি তাই।'

—'তাহলে সব তারাই কি তোমারই মতন এক-একটি খোকা?'

—'হ্যাঁ। চাঁদের বুড়ি ভারী দুষ্টু। আমরা তার চরকা নিয়ে খেলা করতে চাই বলে, বাগে পেলেই বুড়ি আমাদের ধরে ফেলে দেয়।'

—'ভাই তারা-খোকা, তোমার ভয় করছে না?'

—'ভয় আবার কীসের? তোমার বুঝি ভয় করছে? কিচ্ছু ভয় নেই' —এই বলে তারা-খোকা তার ছোটো ছোটো হাত দুখানি দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলে।

আমি বললুম, 'যতই ধরো ভাই, পৃথিবীতে পড়লেই আমাদের হাড়গোড় সব দাঁতের মাজনের মতন গুঁড়ো হয়ে যাবে।'

তারা-খোকা হেসে বললে, 'দূর বোকা! আমরা পৃথিবীতে পড়তে যাব কেন? ওই দ্যাখো, সুমুদ্দুর! আমরা ওইখানেই পড়ব!'

শিউরে উঠে আমি বললুম, 'তারপর?'

তারা-খোকা বললে, 'তারপর আর কী! আমি ঝিনুকের পেটে ঢুকে মুক্তো হয়ে জন্মাব!'

—'আর আমি?'

তারা-খোকা জবাব দেবার আগেই আমরা সুমুদ্দুরের ভেতরে ঝপাং করে পড়লুম—তারা-খোকা যে কোথায় ছটকে গেল তা বুঝতেও পারলুম না—আমি কিন্তু একেবারে পাতালের দিকে তলিয়ে গেলুম!

তারপরেই দেখি দশটা হাতির মতো বড়ো একটা তিমিমাছ হাঁ করে আমাকে গিলে ফেলতে আসছে! 'বাবা গো, আমাকে খেলে গো' বলে আমি সাঁতরে অন্যদিকে সরে যেতে গেলুম, কিন্তু তিমিটা হঠাৎ আমার মুখে ল্যাজের এক ঝাপটা বসিয়ে দিলে! সে কি বড়ো সিধে ঝাপটা, মনে হল মাথাটা যেন ধড় থেকে পট করে ছিড়ে ঠিকরে পড়ল ফুটবলের মতো!

সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম, 'ওরে ছ্যাঁচড়া—ওরে পাজির পা-ঝাড়া! সিদ্ধি খেয়ে এখানে পড়ে ঘুমুনো হচ্ছে, একেবারে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেছ?'

গালের ওপর আবার এক বিষম থাবড়া—কোথায় গেল তিমিমাছ, আর কোথায় গেল সুমুদ্দুর—চোখের সামনে দেখতে লাগলুম খালি হাজার হাজার সর্ষেফুলের বাগান!

সিদ্ধি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, এখন চড় খেয়ে তাড়াতাড়ি জেগে উঠে দেখি, পুকুর-ঘাটে আমি পড়ে রয়েছি, আর বাবা চোখ রাঙিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন!

তাহলে হুতুমথুমো, চাঁদের বুড়ি, তারা-খোকা এ-সব ডাহা মিথ্যে—শুধু নেশার খেয়াল? আরে ছোঃ, সিদ্ধির নিকুচি করেছে—এমন জিনিসও মানুষে খায়?—ভাগ্যিস, পাগল হয়ে যাইনি!

মুরগিচাচা

এটি একটি মুরগির গল্প। ইংরেজদের এক আদি কবি চসার এই মুরগির গল্প শুনিয়েছিলেন বটে, কিন্তু গল্পটি তাঁর নিজস্ব নয়। কারণ, ফরাসি দেশেও এই গল্পটি প্রচলিত আছে। আমরাও গল্পটিকে বাংলা দেশের উপযোগী করে নিয়ে তোমাদের কাছে বলতে চাই।

হানিফের মা একটি মুরগি পুষেছিল। তাকে সে চাচা বলে ডাকত। চাচা মোরগ হলে কী হয়, তার ধরনধারণ সব ছিল দস্তুর মতন মুরুব্বির মতো।

বাস্তবিক, চাচার মতন চমৎকার মুরগি বড়ো একটা নজরে পড়ে না। তার পালকের রং ছিল রোদে-ধোয়া চকচকে সোনার মতো। তার ঠোঁট ছিল কষ্টিপাথরের চেয়ে কালো। আর তার মাথার উপরকার জমকালো চূড়াটি দেখলেই মনে হত, জ্বলছে যেন টকটকে লাল আগুনের শিখা।

নিজের চেহারার জন্য চাচার জাঁকের সীমা নেই। নিজেকে সে মনে করত পক্ষীরাজ্যের সম্রাট। সে সর্বদাই থাকত বুক ফুলিয়ে এবং জোরে জোরে পা ফেলত মাটির উপরে।

চাচার সময়-জ্ঞান ছিল এমন, যে-কোনও ভালো ঘড়িও হার মানতে বাধ্য। রোজ সকালে যথাকালে সে পৃথিবীকে জানিয়ে দিত, সূর্যোদয় হতে দেরি নেই, আর দেরি নেই।

মেদী পাতার বেড়ার উপরে লাফিয়ে উঠে, দুই রঙিন ডানা ঝটপটিয়ে নেড়ে এবং গলাটি প্রাণপণে বাড়িয়ে এমন তীক্ষ্ণস্বরে সে করত চিৎকারের পর চিৎকার যে ঘুম পালিয়ে যেত সে পাড়া ছেড়ে।

ক্রমে চাচার মনে হল অতি-দর্পের সঞ্চার। এটা ভালো কথা নয়। কারণ কে না জানে, অতি দর্প হচ্ছে অধঃপতনের পূর্ব লক্ষণ।

শোনা যায়, চাচা নাকি ইদানীং মনে করত যে, তারই ডাক শুনে অন্ধকার পালিয়ে যায় পৃথিবী থেকে এবং তারই হুকুমে সূর্য ছুটে আসে ভোরের আকাশে।

গাঁয়ের পরে মাঠ, মাঠের পারে গহন বন।

সেই বনে বাস করত এক ভুঁড়োশেয়াল। চাচাকে দেখলেই তার জিভ দিয়ে ঝরত জল। কিন্তু আজ তিন বছর ধরে অনেক চেষ্টা করেও সে চাচার ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে পারেনি। শেয়াল অবশেষে স্থির করলে, চাচার অতি-দর্প আরও বাড়িয়ে দিয়ে সে করবে নিজের কার্যোদ্ধার।

চাচা কিন্তু এদিকে মোটেই বোকা ছিল না। সে নিজে থাকত সর্বদাই সতর্ক এবং নিজের বউ-ঝিদের রাখত পরম সাবধানে। সঙ্গে নিজে না থাকলে ছেলেমেয়ে বউদের সে কোথাও যেতে দিত না। পরিবারের কেউ কোনও ভালো খাবার চাইলে সে নিজে গিয়ে ঠোঁটে করে খুঁটে তুলে নিয়ে আসত।

চাচা একদিন খাবারের খোঁজে মাঠে গিয়ে হাজির হয়েছে। তীক্ষ্ণ চোখে সে পোকা-মাকড়ের লোভে এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছে, হঠাৎ খুব কাছের একটা ঝোপ হঠাৎ একটু দুলে উঠল। চমকেই চাচা দেখতে পেলে ঝোপের ফাঁকে শেয়ালের নাকের ডগা।

চাচা তৎক্ষণাৎ দুই পক্ষ বিস্তার করল—শূন্যে ওড়বার জন্যে।

শেয়াল তাড়াতাড়ি মুখ বাড়িয়ে বললে, 'ও চাচা, উড়ো না, উড়ো না। আমি তোমাকে ভক্ষণ করতে আসিনি।'

চাচা পায়ে পায়ে পিছু হটতে হটতে বললে, 'তাই নাকি?'

শেয়াল বললে, 'হ্যাঁ চাচা। আমি গান বড়ো ভালোবাসি কিনা, তাই তোমার গান শুনতে এসেছি।'

চাচা আরও খানিক পিছু হটে গিয়ে বললে, 'আমি এখন গান গাইতে চাই না, এখান থেকে সরে পড়তে চাই।'

শেয়াল বললে, 'তোমার বাবার সঙ্গে আমার ভাব ছিল। তিনিও খাসা গান গাইতেন।'

এইবারে চাচার আত্মদর্প জেগে উঠল। সে জিজ্ঞাসা করলে, 'বাবা কি আমার চেয়েও ভালো গান গাইতে পারতেন?'

শেয়াল বললে, 'তোমার বাবার কণ্ঠস্বর ছিল স্বর্গীয়। তুমিও বেশ গাও, তবে আমার মনে হয়, তোমার বাবার গাইবার পদ্ধতিটি ছিল আরও ভালো।'

চাচা কৌতূহলী হয়ে বললে, 'কী রকম?'

শেয়াল বললে, 'তোমার বাবা আকাশের দিকে চোখ তুলে দুই চোখ মুদে ফেলে গান গাইতেন। আমার বিশ্বাস, ওইভাবে গান গাইলে তুমিও তোমার বাবাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে।'

শেয়ালের ধাপ্পায় ভুলে চাচা তখনই আকাশমুখো হয়ে দুই চক্ষু মুদে ডাক ছাড়লে— 'কোঁকর-কোঁ, কোঁকর-কোঁ, কোঁকর-কোঁ।'

শেয়াল অমনি এক লাফে এগিয়ে এসে ঘ্যাক করে চাচাকে কামড়ে ধরে ছুট মারলে বনের দিকে।

চাচা তখন দেখিয়ে দিলে কাকে বলে গলার জোর। সে এমন বিষম চিৎকার শুরু করলে যে, চারিদিক থেকে দৌড়ে এল সারা গাঁয়ের লোকজন। তারা হই চই করে ছুটে চলল শেয়ালের পিছনে পিছনে।

মাঠ শেষ হয়-হয়, সামনেই গহন বন।

এত বিপদেও চাচা কিন্তু বুদ্ধি হারায়নি। সে বুঝলে, শেয়াল যদি একবার বনের ভিতরে গিয়ে ঢুকতে পারে, তাহলে আর তার নিস্তার নেই।

ভেবে-চিন্তে সে বললে, 'ওহে শেয়াল, তুমি অত বোকা কেন? যারা ছুটে আসছে তাদের ডেকে বলো না, তুমি যখন বনের এত কাছে এসে পড়েছ তখন আর কেউ তোমাকে ধরতে পারবে না।'

শেয়াল ভাবলে এ পরামর্শ মন্দ নয়, একথা শুনলে লোকগুলো নিশ্চয়ই আর আমাকে তাড়া করবে না।

সে কথা বলবার জন্যে হাঁ করতেই তার মুখ থেকে খসে পড়ল চাচার দেহ।

চাচা অমনি সোঁ করে উড়ে গিয়ে বসল একটা বড়ো গাছের উঁচু ডালের উপর।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল হতভম্ব শেয়াল।

একেই বলে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।

বুদ্ধদেবের গল্প

উপদেশ দেবার সময়ে বুদ্ধদেব এই গল্প দুটি বলেছিলেন।

প্রথম গল্পটির নাম 'দুই ভোঁদড় ও একটি শেয়াল।'

গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছিল দুটি ভোঁদড়। হঠাৎ দেখা গেল জলের ভিতর দিয়ে সাঁতরে যাচ্ছে একটা মস্ত মাছ।

একটা ভোঁদড় তখনই জলে ঝাঁপ খেয়ে মাছের ল্যাজটা কামড়ে ধরলে। কিন্তু মাছটা এমন প্রকাণ্ড যে, ভোঁদড় তাকে টেনে ডাঙায় তুলে আনতে পারলে না।

সে তখন দ্বিতীয় ভোঁদড়কে ডাক দিয়ে বললে, 'শিগগির এসো ভায়া। মাছটাকে আমি একলা সামলাতে পারছি না।'

দ্বিতীয় ভোঁদড়ও জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন তারা দুজনে মিলে মাছটাকে বধ করে ডাঙার উপরে তুলে আনলে।

তারপর দুজনের মধ্যে লেগে গেল ঝগড়া।

প্রথম ভোঁদড় বললে, 'এটা আমার মাছ। আমি একে আগে ধরেছি।'

দ্বিতীয় ভোঁদড় বললে, 'বাজে কথা রেখে দাও। আমি না এলে মাছটা তো পালিয়ে যেত। এটা আমার মাছ।'

তাদের চ্যাঁচামেচি শুনে ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা শেয়াল। কাছে এসে সে শুধোলে, 'কী হে, ব্যাপার কী?'

সব কথা তাকে জানিয়ে ভোঁদড়রা বললে, 'শেয়ালভায়া, তোমাকেই আমাদের উকিল নিযুক্ত করলুম। এখন তুমিই একটা মীমাংসা করে দাও।'

শেয়াল প্রথমে মাছের মাথা এবং তারপর তার ল্যাজ কামড়ে কেটে ফেললে। বললে, 'আমার মতে তোমরা দুজনেই সমান অংশের অধিকারী।'

শেয়াল মাছের মাথাটা দিলে প্রথম ভোঁদড়কে এবং দ্বিতীয় ভোঁদড়কে দিলে মাছের ল্যাজটা। তারপর মাছের ধড়টা নিজে নিয়ে সেখান থেকে মারলে ছুট।

ভোঁদড়রা চিৎকার করলে, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। মাছের আসল অংশটাই নিয়ে তুমি যে পালিয়ে যাচ্ছ।'

শেয়াল বললে, 'তা ছাড়া আর কী করব ভায়া? তোমরা কি জানো না, উকিল রাখলেই ফি দিতে হয়। তোমরা নিজেরাই মীমাংসা করতে পারলে গোটা মাছটা থাকত তোমাদেরই।'

এই কাহিনীটির সার মর্ম হচ্ছে; সাধ্যমতো চেষ্টা করবে উকিলদের এড়িয়ে চলতে।

দ্বিতীয় গল্পটির নাম, 'বাঁদর ও কলাইশুঁটি।'

মহাপ্রতাপশালী কাশীর মহারাজা। তিনি ধন-ধান্যে ভরা প্রকাণ্ড রাজ্যের মালিক। অগুনতি প্রজা। তাঁর ঐশ্বর্যের নেই সীমা।

কাছেই ছোট্ট একটি রাজ্য, তার ভূমি নয় সুজলা সুফলা এবং অবস্থাপন্ন লোকও বাস করে না সেখানে।

কাশীর মহারাজা স্থির করলেন, সৈন্যসামন্ত নিয়ে এই তুচ্ছ দেশটি দখল করবেন।

মন্ত্রী বললেন, 'মহারাজ, আপনার সম্পদের তুলনা নেই। কী ছার ওই দেশ, ওটা দখল করবার জন্যে আর যুদ্ধবিগ্রহ লোকক্ষয় করে লাভ কী?'

মহারাজা বললেন, 'আমার লাভ-লোকসান নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। যুদ্ধযাত্রার ব্যবস্থা করুন।'

সেই ব্যবস্থাই হল। সৈন্যসামন্ত নিয়ে মহারাজা করলেন যুদ্ধযাত্রা। তারপর খানিক দূর অগ্রসর হয়ে দেখা গেল এক মজার দৃশ্য।

জনকয় সৈন্য কলাইশুঁটি সিদ্ধ করেছিল। পথের ধারে ছিল একটা গাছ এবং সেই গাছে ছিল একটি বাঁদর। হঠাৎ গাছ ছেড়ে মাটিতে লাফিয়ে পড়ে সে কতকগুলো কলাইশুঁটি চুরি করে আবার লাফ মেরে গাছে উঠল এবং খেতে আরম্ভ করে দিলে।

তার হাত ফসকে পড়ে গেল একটা কলাইশুঁটি। বোকা বাঁদরটা লোভী চোখে সেইদিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হাতের অন্য কলাইশুঁটিগুলো ফেলে দিয়ে সেই একটিমাত্র কলাইশুঁটি আবার হস্তগত করবার জন্যে গাছ থেকে নেমে এল।

কিন্তু এবারে তার মনের বাসনা সফল হল না। একজন সৈনিক তাকে দেখতে পেয়ে মার মার করে তেড়ে এল। আত্মরক্ষার জন্যে সমস্ত কালইশুঁটি ত্যাগ করে বাঁদরকে আবার গাছের উঁচু ডালে আশ্রয় নিতে হল। সেইখানে বসে এমন দুঃখিতভাবে সে বারংবার মাটির দিকে তাকাতে লাগল, যেন মস্ত এক রাজ্য তার হাতছাড়া হয়েছে।

মন্ত্রী বললে, 'মহারাজ, দেখলেন?'

মহারাজা বললেন, 'হ্যাঁ মন্ত্রী, দেখলুম। বাঁদরটা এমন নির্বোধ যে, একটা কলাইশুঁটির লোভে সব কলাইশুঁটি হারাল।'

মন্ত্রী বললেন, 'একটুখানির জন্যে অনেকখানি হারানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। মহারাজ, তুচ্ছ এক দেশ জয় করতে গিয়ে আপনিও কত সৈন্য হারাতে পারেন, সেটা একবার ভেবে দেখেছেন কি?'

মহারাজা বললেন, 'সৈন্যগণ, আবার কাশীতে ফিরে চলো। আমি আর যুদ্ধযাত্রা করব না।'

কাহিনীটির সারমর্ম হচ্ছে বেশি-কিছু লাভের লোভে যেন তুমি হাতে যা আছে তাও হারিয়ে ফেলো না।

একটার বদলে দুটো

(প্রাচীন জার্মান রূপকথা)

এক

হের ক্লাসেন বললেন, 'দ্যাখো বাপু, আমার কথার আর নড়চড় হবে না। আমি এক কথার মানুষ। অবশ্য, যদি তোমার পিঠের কুঁজটি পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারো, তাহলে

তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হতে পারে, নইলে নয়! এই বলে তিনি বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন!

ফ্রিডেল বেচারি মুখখানি চুন করে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময়ে কাথারিনা এসে হাজির। কাথারিনা হচ্ছে সরাইখানার মালিক হের ক্লাসেনের মেয়ে।

কাথারিনা বললে, হ্যাঁ ফ্রিডেল, তুমি অমন করে দাঁড়িয়ে আছ কেন, হয়েছে কী?'

ফ্রিডেল দুঃখিতভাবে বললে, 'কাথারিনা, তোমার বাবাকে আজ বললুম যে আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই, কিন্তু তোমার বাবা আমাকে জামাই করতে রাজি নন।'

কাথারিনা ব্যস্ত হয়ে বললে, 'সে কী ফ্রিডেল, তোমার পিঠে যে কুঁজ আছে, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে কেমন করে?'

ফ্রিডেল একেবারে হতাশ হয়ে বললে, 'কাথারিনা, তুমিও আমাকে কুঁজো বলে ঘেন্না করো! তা হলে তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা!' বলেই সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল!

কাথারিনা লজ্জিত হয়ে ব্যাকুলভাবে বললে, ফ্রিডেল, ও ফ্রিডেল! শোনো, শোনো, শোনো—যেয়ো না! আমি হঠাৎ ও-কথা বলে ফেলেছি, আমি তোমাকে সত্যিই ঘেন্না করি না! যেয়ো না ফ্রিডেল, তোমার পায়ে পড়ি!' কিন্তু ফ্রিডেল তার কথা শুনতে পেলে না!

দুই

গাঁয়ের একটি বিয়ে-বাড়িতে সে দিন বড়ো ধুম! খাওয়া-দাওয়ার পর রূপসি মেয়েরা আর পুরুষেরা নাচবার জন্যে সারবন্দী হয়ে অপেক্ষা করছে,—কিন্তু ফ্রিডেল আসেনি বলে নাচ শুরু হচ্ছে না।

সে অঞ্চলে ফ্রিডেলের মতন বেহালা বাজাতে আর কেউ পারত না! আর সে বেহালা না বাজালে নাচতে পারত না মেয়েরাও।

একটু পরেই একজন বলে উঠল, 'ওই ফ্রিডেল আসছে!'

কিন্তু আর একজন ভালো করে দেখে বললে, 'না, না, ও তো ফ্রিডেল নয়, ওযে কুঁজো হিন্‌য!'

হিন্‌যও সেই গাঁয়ে থাকে, ফ্রিডেলের মতো তার পিঠেও কুঁজ আছে, আর সে-ও বেহালা বাজায়। তবে পিঠে কুঁজ থাকলেও ফ্রিডেলের চেহারা ছিল সুন্দর ও স্বভাব ছিল শান্ত, কিন্তু হিন্‌য ছিল একেবারে উলটোধরনের লোক! দেখতেও সে যেমন কুৎসিত, প্রকৃতিও তার তেমনি বিশ্রী। তার বেহালাও কেউ শুনতে চাইত না, কারণ হিন্‌যের বাজনা ঝালাপালা করে দিত লোকের কানকে!

হিন্‌য সকলের মাঝখানে এসে মুরুব্বি-আনা চালে মাথা নেড়ে বললে, 'এই যে, সকলেই নাচের জন্যে তৈরি দেখছি যে! আচ্ছা, আমিও প্রস্তুত! আমি বাজাই, তোমরা নাচো!' বলেই সে বেহালা ও ছড়ি বাগিয়ে ধরলে!

বিয়ে-বাড়ির লোকেরা বললে, 'ওহে হিন্‌য, আজ আর তোমাকে বাজাতে হবে না,—

তুমি খাও-দাও, ফুর্তি করো! আজকের নাচে বেহালা বাজাবার জন্যে তোমার আগেই আমরা ফ্রিডেলকে বলে রেখেছি, সে এখনই আসবে।'

হিন্‌য রাগে মুখ বেঁকিয়ে বললে, 'বটে, বটে, আমার আগেই তোমরা ফ্রিডেলকে বলে রেখেছ? কেন, ফ্রিডেলও কি আমারই মতন কুঁজো নয়?'

এমনি সময়ে ফ্রিডেলও এসে হাজির! মেয়েরা সবাই খুশি হয়ে ফ্রিডেলকে ঘিরে দাঁড়াল—হিন্‌যের দিকে কেউ আর ফিরেও তাকালে না!

ফ্রিডেলের সামনে তারা আদর করে খাবারের থালা এনে ধরলে। তারপর তার খাওয়া শেষ হলে পর সকলে বললে, 'ভাই ফ্রিডেল, এইবার তুমি বেহালা বাজাও, আর আমরা সবাই নাচি!'

বেহালাখানি টেবিলের নীচে রেখে ফ্রিডেল খেতে বসেছিল। এখন বেহালা টেনে বার করে ফ্রিডেল অবাক হয়ে দেখলে তার সমস্ত তারগুলি কে ছিঁড়ে দিয়েছে!

সবাই রেগে বললে, 'এ সেই কুঁজো হিন্‌যের কাজ। হতভাগা গেল কোথায়?'

খুঁজতে খুঁজতে হিন্‌য ধরা পড়ে গেল। সে টেবিলের তলাতেই মাথা গুজড়ে লুকিয়ে বসেছিল! সবাই তখনই তাকে টেনে-হিঁচড়ে বাইরে বার করে আনলে।

কেউ বললে, 'ওকে জেলখানায় পাঠিয়ে দাও!'

কেউ বললে, 'ওকে আচ্ছা করে বেত মারো!'

কেউ বললে, 'ওকে চ্যাংদোলা করে নদীর ভেতরে ফেলে দাও!'

ফ্রিডেল বললে, 'আহা, ওকে ছেড়ে দাও! আমি এখনই বাড়িতে ছুটে গিয়ে নতুন তার নিয়ে আসছি!'

তিন

বিয়ে-বাড়িতে বাজিয়ে ফ্রিডেল অনেক রাত পর্যন্ত পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কাথারিনার জন্যে তার মন কেমন করছিল! হায়, সে যদি না কুঁজো হত, তাহলে আজ কাথারিনাকে অনায়াসেই বিয়ে করতে পারত।

ঠিক রাত-বারোটার সময়ে ফ্রিডেল আবার বাড়ির দিকে ফিরলে। পথে-ঘাটে কোথাও জন-মানবের সাড়া নেই—দু-পাশে খালি গাছপালারা অন্ধকারের ভিতরে লুকিয়ে আর্তনাদ করছে।

হঠাৎ দূরে অনেকগুলো আলো দেখে ফ্রিডেল কেমন চমকে উঠল। আরও কিছু এগিয়ে সে দেখলে, দিনের বেলায় যেখানে হাট বসে, এই নিষুতি রাত্রে সেখানে চারিদিকে দুলছে আলোর মালা! অত্যন্ত অবাক হয়ে সে পায়ে পায়ে এগুতে এগুতে আরও দেখলে, সেখানে কারা সব চলা-ফেরা করছে!

ফ্রিডেলের মনে ভারী ভয় হল, কিন্তু বাড়ি ফেরবার আর পথ নেই বলে অগ্রসর হওয়া ছাড়া তার অন্য উপায়ও রইল না।

হাটের মাঝে রুপোলি ঝালরওয়ালা সামিয়ানা টাঙানো রয়েছে, নীচে সোনালি গালিচা

পাতা। চারিধারে সোনার থালা-বাটি সাজানো আর নানারকম আহারের আয়োজন! অনেকগুলি পরমাসুন্দরী মেয়ে সেজেগুজে বসে রয়েছে, তাদের অনেকের মুখ দেখে ফ্রিডেল চিনতেও পারলে!

ফ্রিডেলের বুক একেবারে দমে গেল, কারণ যাদের সে চিনতে পারলে তারা এই গাঁয়েরই মেয়ে বটে, কিন্তু তারা কেউ আর বেঁচে নেই!

এমন সময়ে মেয়েরাও তাকে দেখতে পেলে। একজন তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললে, 'এই যে ফ্রিডেল, তুমি ঠিক সময়েই এসে পড়েছ! আমাদের খাওয়া শেষ হয়েছে, তুমি বাজনা শুরু করো, আমরা সবাই মিলে নাচি আর গাই!'

ফ্রিডেল-বেচারি তখন ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে! কিন্তু উপায়ও নেই, প্রাণের দায়ে সে বেহালা নিয়ে তারের উপরে দিলে ছড়ির টান!

বেহালা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েগুলি উঠে হাত-ধরাধরি করে নাচগান আরম্ভ করলে! বেহালার সুর যত দ্রুত হয়, মেয়েগুলির আনন্দও তত বেড়ে ওঠে! ফ্রিডেল যেন স্বপ্নের ঘোরে বাজাতে বাজাতে দেখতে লাগল, মেয়েগুলি বাতাসে ওড়া ফুলের পাপড়ির মতো ঘুরতে ঘুরতে নাচছে, কিন্তু তাদের কারুর পা মাটিতে ঠেকছে না!

হঠাৎ যে মেয়েটি কথা কয়েছিল, সে আবার বললে, 'ফ্রিডেল, আমাদের সাধ মিটেছে, তুমি বাজনা থামাও!'

ফ্রিডেল তাড়াতাড়ি বাজনা থামিয়ে সেখান থেকে পালাবার উপক্রম করলে। কিন্তু মেয়েটি বাধা দিয়ে বললে, 'দাঁড়াও ফ্রিডেল, যেয়ো না! তুমি চমৎকার বাজিয়েছ, এসো, আমি তোমাকে খুশি করে দি!'

ফ্রিডেল ভয়ে ভয়ে তার কাছে এগিয়ে দাঁড়াল। মেয়েটির হাতে একটি সোনার দণ্ড ছিল, তাই দিয়ে ফ্রিডেলের পিঠের কুঁজটি স্পর্শ করে সে বললে, 'আজ থেকে তোমার পিঠে আর কুঁজ থাকবে না!'

তারপরই সব আলো নিবে গেল—চারিদিক অন্ধকার! ফ্রিডেল বাড়িতে ফিরে এল ঠিক মাতালের মতো টলতে টলতে!

কাথারিনার বাপ হের ক্লাসেন সকালবেলায় সরাইখানায় বসে আছেন, এমন সময়ে একটি সুশ্রী যুবক এসে তাঁকে নমস্কার করলে।

হের ক্লাসেন হতভম্ব হয়ে যুবকের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'কী আশ্চর্য! ছোকরা, তোমার পিঠে যদি কুঁজ থাকত, তাহলে আমি তোমাকে ফ্রিডেল বলেই ভাবতুম! কিন্তু তোমার পিঠে যখন কুঁজ নেই, তখন তুমি কী?'

ফ্রিডেল হেসে বললে, 'আমি ফ্রিডেল। আমার পিঠে এখন আর কুঁজ নেই, এখন আপনি নিজের কথামতো কাজ করুন—আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিন!'

হের ক্লাসেন মাথা নেড়ে বললেন, 'তুমি কখনওই ফ্রিডেল নও! পিঠের কুঁজ কখনও আপনা-আপনি খসে পড়ে না।'

ফ্রিডেল তখন গেল-রাতের কথা একে একে সব খুলে বললে। সমস্ত শুনে হের ক্লাসেন বললেন, অবাক কারখানা! আমিও অনেকবার কানাঘুষো শুনেছি বটে যে, হাটে রাত-

বারোটার পর ভূতুড়ে আসর বসে, কিন্তু সেসব গল্প আমি বরাবরই গাঁজাখুরি বলে ভাবতুম। যাক, তোমার পিঠে যখন আর কুঁজ নেই, তখন তোমাকে জামাই করতে আমারও আর কোনও আপত্তি নেই।'

তারপর একদিন খুব ধুমধাম করে ফ্রিডেলের সঙ্গে কাথারিনার বিবাহ হয়ে গেল!

চার

কুঁজো হিন্‌য যখন ফ্রিডেলের সৌভাগ্যের কথা শুনলে, তখন রাগে আর হিংসায় তার চোখ দুটো জ্বলতে লাগল!

বিয়ের রাতে ফ্রিডেল তাকে নাচের বাজনা বাজাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছিল, হিন্‌য কিন্তু সেখানে না গিয়ে, রাত-বারোটার সময়ে বেহালা বগলে নিয়ে হাটের দিকে যাত্রা করলে।

হাটের কাছে গিয়ে হিন্‌যও দেখলে, সাজানো-গুছানো আসরের মধ্যে পরমাসুন্দরী মেয়েরা বসে আছে, চারিধারে আলোর মালা দুলছে!

হিন্‌যকে দেখেই মেয়েরা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'এসো, এসো, আমাদের নাচের সময় হয়েছে, তুমি বেহালা ধরো!'

হিন্‌য জাঁকে ডগমগ হয়ে নাচের তালে বেহালা বাজাতে শুরু করলে! কিন্তু মেয়েদের মধ্যে চেনা মুখ দেখে সে ফ্রিডেলের মতন চুপ করে থাকতে পারলে না, বাজাতে বাজাতে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'এই যে, জমিদারদের ছোটো বউ যে! আরে আরে, ও-পাড়ার পুরুত-বউ নাকি? বলি কেমন আছ? ওহো, তোমাকেও যে চিনি,— আমাদের বুড়ো-ডাক্তারের নাতনি, না?'— কিন্তু হিন্‌য যেই এক-একজনের নাম ধরে ডাকে, অমনি সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়! দেখতে দেখতে দলের অধিকাংশ মেয়েই মিলিয়ে গেল! তার উপরে হিন্‌যের কর্কশ আর বেতালা বাজনার সঙ্গে নাচতে না পেরে বাকি সকলেও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল! তারপর ধীরে ধীরে আলোগুলো ম্লান হয়ে আসতে লাগল।

একটি মেয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'বাজনা বন্ধ করো!'

হিন্‌য বাজনা থামিয়ে বললে, 'ওঃ, যথেষ্ট পরিশ্রম হয়েছে, এখন আমাকে খুশি করো!'

মেয়েটি বললে, 'তোমাকে খুশি করব?

হিন্‌য বললে, 'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ! তোমরা ফ্রিডেলকে খুশি করেছ, আমিও বকশিশ চাই!'

মেয়েটি বললে, 'তুমি এখানে ফ্রিডেলের মতন হঠাৎ এসে পড়োনি, লোভে পড়ে এসেছ! তোমার বেতালা বেহালার জন্যে আমাদের নাচ বন্ধ হয়ে গেছে। তোমার কথা শুনে আমাদের দলের মেয়েরা পালিয়ে গেছে! এই নাও তোমার যোগ্য পুরস্কার!'— এই বলে মেয়েটি হিন্‌য-এর বুকে হাতের স্বর্ণদণ্ড ছুঁইয়ে দিলে,— অমনি ফ্রিডেলের সেই খসে পড়া কুঁজটি তার বুকের উপরে এমন কায়েমি হয়ে বসে গেল যে, দেখলে মনে হয় যেন সেটি তার জন্মাবধিই সেইখানে ওই ভাবেই আছে!.....

পরদিন সকালে উঠে নিজের বুকে হাত দিয়ে হীন্‌য দেখলে যে, কালকের রাতের ব্যাপারটা মোটেই দুঃস্বপ্ন নয়, কারণ তার বুকের উপরে সত্যই একটা মস্ত কুঁজ গজিয়ে উঠেছে এবং বাকি জীবনটা তাকে একটার বদলে দুটো কুঁজের ভার বহন করে বেড়াতে হবে!

বংশীধারীর বাঁশি

অমর ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিংয়ের একটি বিখ্যাত গাথা আছে, তার নাম The Pied Piper of Hamelin—এবারে সেই গল্পটি তোমাদের শোনাব।

হ্যামেলিন হচ্ছে জার্মানির একটি পুরাতন শহর। তার তলা দিয়ে বয়ে যায় ওয়েসার নদী।

জায়গাটি ভারী চমৎকার। কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি, তখন ওখানকার বাসিন্দারা পড়েছিল বড়ো বিপদে।

ইঁদুর আর ইঁদুর আর ইঁদুর! শহরের ঘরে ঘরে ইঁদুরের বিষম উপদ্রব। তারা দলে দলে কুকুরের সঙ্গে লড়াই করে, বিড়ালদের বধ করে, দোলনায় ঘুমন্ত শিশুদের কামড়ে দেয়, গৃহস্থদের খাবার খেয়ে ফেলে, মানুষদের টুপির ভিতরে ঢুকে বাসা বাঁধে— এমনকী তাদের কিচকিচিনিতে গল্প করতে বসে মেয়েরা পরস্পরের কথা পর্যন্ত শুনতে পায় না।

বাসিন্দারা আর সহ্য করতে পারলে না। তারা খেপে উঠে বললে, 'আমাদের কর্পোরেশনের নিকুচি করেছে! কাউন্সিলাররা আমাদের টাকায় দিনে দিনে কেবল ভুঁড়ির বহরই বাড়িয়ে তুলছে! আমরা আর তাদের মানব না। হয় তারা ইঁদুর তাড়াবার ব্যবস্থা করুক, নয় আমরা তাদেরই তাড়াবার ব্যবস্থা করব!'

মহা ফাঁপরে পড়ে মেয়র এক সভা আহ্বান করে কাউন্সিলারদের ডেকে বললেন, 'ভদ্র মহোদয়গণ, অনেক মাথা চুলকেও আমি কোনওই উপায় আবিষ্কার করতে পারছি না— আমি একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি!'

সভাগৃহের দরজায় বাহির থেকে করাঘাতের শব্দ হল।

মেয়র বললেন, 'কে ওখানে? ভেতরে এসো।'

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল এক আশ্চর্য চেহারা! তার মুখে গোঁফ দাড়ি নেই, চোখদুটো কুতকুতে আর ঠোঁটে মাখানো হাসি।

সবাই অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, এ আবার কে রে বাবা?

সে হেসে বললে, 'আমার নাম বংশীধারী। আকাশে যারা ওড়ে, জলে যারা সাঁতরায়, আর ডাঙায় যারা দৌড়োয়, এমন সব জীবকে বশ করবার যাদু আমি জানি। যেসব জীব মানুষের শত্রু, বিশেষ করে তাদেরই আমি জব্দ করতে পারি। এই শহর থেকে সমস্ত ইঁদুর যদি আমি তাড়িয়ে দি, তাহলে তোমরা আমাকে হাজার টাকা বকশিশ দিতে রাজি আছ?'

মেয়র আর কাউন্সিলাররা একবাক্যে বলে উঠলেন, 'মাত্র এক হাজার কেন, আমরা পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে রাজি।'

ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বংশীধারী রাস্তায় বেরিয়ে গেল, তারপর নিজের বাঁশিটি বার করে দিলে তিন ফুঁ।

সঙ্গে সঙ্গে দূরে জেগে উঠল, যেন বিপুল এক সেনাদলের চিৎকার!

তারপরেই দেখা গেল, চারিধার ছেয়ে ছুটে আসছে ইঁদুর আর ইঁদুর আর ইঁদুর! কালো ইঁদুর, ধলো ইঁদুর, রোগা ইঁদুর, মোটা ইঁদুর, বুড়ো ইঁদুর, ছোঁড়া ইঁদুর, মা ইঁদুর, বাবা ইঁদুর, ভাই ইঁদুর, বোন ইঁদুর কাতারে কাতারে হাজারে হাজারে, ল্যাজ উঁচিয়ে গোঁফ ফুলিয়ে!

বাঁশি বাজাতে বাজাতে বংশীধারী এগিয়ে যায়, ইঁদুররাও ছোটে তার পিছু পিছু। এ পথ সে পথ দিয়ে বংশীধারী শেষটা ওয়েসার নদীর তীরে গিয়ে দাঁড়াল, আর মন্ত্রমুগ্ধ ইঁদুরের দল ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীর জলে, কেউ আর ডাঙায় উঠতে পারলে না।

বংশীধারী তখন ফিরে বললে, 'এইবার আমি হাজার টাকা চাই।'

মেয়র চোখ মটকে বললেন, 'স্বচক্ষে দেখলুম ইঁদুরগুলো নদীর জলে ডুবে মরল! আর যখন তারা বাঁচবে না, তখন খামোকা তোমাকে হাজার টাকা দেব, আমরা এমন বোকা নই! বাপু, গোটা পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছি, এই নিয়ে খুশি হয়ে সরে পড়ো।'

বংশীধারী বললে, 'হাজার টাকা দেবে না? কিন্তু আবার যদি আমি বাঁশি বাজাই তাহলে উলটো বিপত্তি হবে কিন্তু!'

মেয়র চটে বললেন, 'কী, ছোটো মুখে বড়ো কথা! বাজা তোর বাঁশি, আমরা থোড়াই কেয়ার করি।'

বংশীধারী আবার তার বাঁশিতে দিলে তিন ফুঁ। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল তিনটি এমন মধুর স্বরতরঙ্গ, যা শুনে পৃথিবী যেন মুগ্ধ হয়ে গেল!

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে উঠল ছোটো ছোটো কত পায়ের শব্দ, ছোটো ছোটো কত হাতের তালি আর ছোটো ছোটো কত মুখের হাস্যকলরোল! দেখা গেল কাতারে কাতারে হাজারে হাজারে ছুটে আসছে এ শহরের যত খোকা আর খুকি— গালে তাদের গোলাপি রং, মাথায় তাদের কোঁকড়া-চুল, চোখে তাদের খুশির আলো, দাঁতে তাদের মুক্তার পাঁতি। নাচতে নাচতে ছুটে চলল তারা বংশীধারীর পিছু পিছু।

মেয়র হতভম্ব, কাউন্সিলাররা স্তম্ভিত— সবাই যেন নিস্পন্দ কাঠের পুতুল! খোকা-খুকিদের বাধা দেবে কী, কেউ একখানা হাত পর্যন্ত নাড়তে পারলে না।

সামনে এক আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়। সকলে বুঝলে, এইবারে বংশীধারী আর খোকা-খুকিদের গতিরোধ হবে!

কিন্তু না, হঠাৎ পাহাড়ের একটা জায়গা গেল ফটকের মতন খুলে! বংশীধারী ও শিশুরা ভিতরে ঢুকতেই ফটক আবার বন্ধ হয়ে গেল, পাহাড়ের গায়ে কোনও দাগ পর্যন্ত রইল না।

হ্যামেলিন শহরে উঠল হাহাকার! যেখানে ফুলের মতো শিশুরা নেই, সে ঠাঁই তো মরুভূমি!

ব্রাউনিংয়ের গল্প তোমরা শুনলে। এটি গল্প বটে, কিন্তু আজও জার্মানির হ্যামেলিন শহরে গেলে তোমরা দেখতে পাবে, এই ঘটনার নায়ক Pied Piper বা বর্ণবিচিত্র বংশীধারীর বাড়ি। ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে ওই বাড়িখানি নির্মাণ করা হয়েছিল।

নতুন সিনেমার ছবি

রোজ আমি যেখানে বসে লিখি, তার বাঁ দিকে তাকালে দেখা যায়, গঙ্গার নীলাভ জল-রেখা বিপুল এক ধনুকের মতন বেঁকে বালি 'ব্রিজে'র তলা দিয়ে চলে গিয়েছে দূরে দূরান্তরে এবং ডান দিকে মুখ ফেরালে দেখি, নীলাকাশের আলো-মাখা ছোট্ট একটি ছাদ।

ওই ছাদের উপরে একটি বাগান রচনা করেছিলুম, রোজ সেখানে ফুটত পাঁচ-ছয় শো নানা জাতের নানা রঙের ফুল। বন্ধুদের চোখে-মুখে বাগানটি জাগিয়ে তুলত অপ্রত্যাশিত বিস্ময়। একটুখানি ছাদের উপরে এত রকম গাছ, এত রঙের ফুল?

সে বাগান আর নেই— আছে তার ধ্বংসাবশেষ। নিতান্ত কড়াজান, এমন গুটিকয়

ফুলগাছ আজও একেবারে মরতে রাজি হয়নি। বাকি টবগুলো ও কাঠের বাক্সের মধ্যে আসর পেতেছে বুনো আগাছার এলোমেলো জঙ্গল। একটা মস্তবড়ো লোহার টবের ভিতরে কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এক নিমগাছ! প্রায় সাত-আট ফুট উঁচুতে মাথা তুলে হাওয়ায় দুলতে দুলতে সে এই জঙ্গল-সভায় করে সভাপতিত্ব।

আজ সকালে শীতের কাঁচা রোদ এসে ছাদকে যখন ধুয়ে দিচ্ছে সোনার জলে, তখন তোমাদের জন্যে কলম নিয়ে বসলুম।

হঠাৎ পোড়ো ছাদের কার্নিশ থেকে ভেসে এল বিষম কলরব। উঁকি মেরে দেখি, সেখানে বেধেছে দুই শালিকের তুমুল লড়াই। তারা প্রথমে ঘন ঘন মাটির দিকে মাথা নামিয়ে ঠিক যেন পরস্পরকে সেলাম করে, তারপর টপাটপ লাফ মারতে মারতে ও একে ঠুকরে বা আঁচড়ে দেবার চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে কী প্যাঁচ কষে তারা পরস্পরের পা জড়িয়ে ধরে পড়ে থাকে এবং থেকে থেকে পরস্পরকে ঠুকরে দেয়।

একটা মেয়ে-শালিক অনবরত চিৎকার করছে, মাঝে মাঝে ছাদের পাঁচিলে উঠে চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে কোনওদিক থেকে নতুন কোনও বিপদ আসবার সম্ভাবনা আছে কি না, মাঝে মাঝে আবার দুই যোদ্ধার কাছে নেমে এসে শালিক-ভাষায় যা বলছে তার অর্থ হবে বোধহয় এই 'নাঃ, পুরুষদের নিয়ে আর পারি না বাপু। খালি মারামারি, খালি ঝগড়াঝাঁটি। এ কী মুশকিলে পড়লুম গো।'

এদিকে এই লড়াইয়ের খবর রটে গিয়েছে দিকে দিকে। ঘটনাস্থলে নানান দর্শক এসে জুটতে লাগল। ছাদের উপরে ছায়া ফেলে চক্র দিয়ে হেঁট মুখে ঘুরতে লাগল চার-পাঁচটা শঙ্খচিল ও গোদা চিল। পাঁচ-সাতটা কাক কা-কা করতে করতে ছাদের পাঁচিলে এসে বসে পড়ল। তাদের উত্তেজিত ভাবভঙ্গি দেখলে সন্দেহ হয় তারা যেন শালিক-যোদ্ধাদের উপরে গুণ্ডামি করতে চায়— যদিও তারা অতখানি আর অগ্রসর হল না, কেন তা জানি না।

গঙ্গাতীরে খোড়ো-নৌকার উপর থেকে খবর পেয়ে উড়ে এল এক ঝাঁক ফচকে চড়াই পাখি! তারা যোদ্ধাদের চারিপাশে নেচে নেচে বেড়ায় আর যেন কিচির-মিচির করে বলতে থাকে—'নারদ, নারদ, বাহবা-কী-বাহবা!' তিনটি পায়রা লোহার রেলিংয়ের উপর ভীত স্তম্ভিতের মতন বসে দেখছে এই কুরুক্ষেত্র কাণ্ড।

একটা কাঠবিড়ালিও শিস দিতে দিতে ছুটে এল। তার আগ্রহ আবার সব চেয়ে বেশি। সে সুড় সুড় করে যোদ্ধাদের খুব কাছে এগিয়ে গেল। অমনি মাদি শালিকটা চট করে তার সামনে এসে বললে—কোঁ-কটর-কটর, কটর-কটর, কোঁ-কটর-কটর! অর্থাৎ—'হট যাও, নইলে মারলুম এই ঠোকর।'

কাঠবিড়ালি ল্যাজ তুলে লোহার টবের উপরে লাফ মারলে, তারপর চটপট নিমগাছটার মগডালে উঠে কিচ কিচ কিচ কিচ করে বলতে লাগল—'আয় না দেখি পোড়ারমুখী! আয় না দেখি শালিক-ছুঁড়ি!'

শালিক-বউ কিন্তু তার কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনলে না।

পনেরো মিনিট কাটল, তবু লড়াই থামবার নাম নেই। দুই যোদ্ধা বেজায় হাঁপাচ্ছে, তাদের গা থেকে পালক খসে পড়ছে। দু-চার ফোঁটা রক্তও ঝরল— তবু তারা কেউ পিছপাও হতে রাজি নয়। যুদ্ধের কারণ নিশ্চয়ই গুরুতর।

লেখা ভুলে নিশ্চল অবাক হয়ে লড়াই দেখছি। আমি একটা মনুষ্যজাতীয় ভয়াবহ জীব যে এত কাছে বসে আছি, ওরা প্রত্যেকেই যেন সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

কিন্তু তারপরই বুঝলুম, না, আমার সম্বন্ধে ওরা রীতিমতো সজাগ। বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে দেখে আমি যেই সশব্দে চেয়ার টেনে উঠে দাঁড়ালুম, অমনি এই নাট্যলীলার পাত্র-পাত্রীরা ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে যে যেদিকে পারলে সরে পড়ল।

ছাদ আবার স্তব্ধ। আগাছার জঙ্গলে ফুটে আছে সাদার সঙ্গে বেগুনি রং-মিশানো ছোটো ছোটো নামহীন ফুল। একটা একরত্তি হলদে প্রজাপতি তাদের কাছে গেল মধু আহরণের চেষ্টায়। কিন্তু তারপরেই নিজের ভুল বুঝে একদিকে উড়ে গেল খুদে পাখনা নাড়তে নাড়তে— রোদ-সায়রে ভাসন্ত পরিশিশুদের খেলাঘরের পালা-তোলা নৌকার মতো।

আমি দেখলুম যে-জগৎ আমাদের নয় সেখানকার এক চলচ্ছবি। এমন ছবি তোমরা সিনেমা-প্রাসাদে গেলেও দেখতে পাবে না। অথচ প্রকৃতির চিত্র-জগতে আমাদের আশেপাশেই এমন কত ছবির বাজার নিত্যই খোলা থাকে। আমাদের দেখবার মতন চোখ আর বোঝবার মতন মন নেই বলেই এমন সব বিচিত্র ছবির রস আমরা উপভোগ করতে পারি না।

দাদুর গল্প

হুগোর নাম তোমরা শুনেছ তো? ভারতের যেমন কালিদাস, ইংরেজদের যেমন শেকসপিয়ার, ফরাসিদের তেমনি ভিক্টর হুগো।

হুগোর ছিল একটি নাতি, আর একটি নাতনি। তাদের নিয়ে দাদামশাইয়ের দিন কাটে ভারী আমোদে।

নাতনি একদিন কচি কচি ছোটো হাত দুখানি নিয়ে হুগোর গলা জড়িয়ে ধরে হুকুম দিলে, 'দাদু, একটা গল্প বলো।'

দাদু বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি কি গল্প বলা যায় বাছা?'

নাতনি বললেন, 'ইস, তুমি অত বড়ো বড়ো বই লিখেছ, আর একটা ছোট্ট গল্প বলতে পারো না?'

দুদিক থেকে নাতি আর নাতনি বায়না নিয়ে দাদুর গলা জড়িয়ে ধরলে আরও জোরে। দাদু তখন দায় ঠেকে গল্প শুরু করলেন : এটি হচ্ছে দুষ্টু রাজা আর শিষ্ট মাছির কাহিনী। এক সময়ে এক দেশে এক রাজা ছিলেন—ভারী দুষ্টু রাজা। তাঁর অত্যাচারে প্রজারা প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিল। সেই খবর পেলে একটি মাছি। তোমরা যেসব মাছি দ্যাখো এ মাছিটি তেমন অভদ্র ছিল না। সে মনে মনে দুষ্টু রাজাকে জব্দ করবে বলে স্থির করলে। রাত্রে রাজা পরম আরামে নরম বিছানায় শুয়ে আছেন, হঠাৎ পট করে তাঁর গায়ে ছুঁচের মতন কী বিঁধল। রাজা যাতনায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কে রে?' জবাব শোনা গেল,—'আমি একটি মাছি। তোমাকে সায়েস্তা করতে চাই।'— কী! একটা মাছি? রও, তোমাকে মজাটা দেখাচ্ছি।'

রাজা এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে লেপ, চাদর, তোষক ঝাড়তে শুরু করে দিলেন কিন্তু একটি খুব সহজ কারণেই মাছি ধরা পড়ল না। সে তখন রাজার একহাত লম্বা দাড়ির

অরণ্যের মধ্যে গা ঢাকা দিয়েছে। পাপ বিদায় হয়েছে ভেবে রাজা আবার শুয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি নাক ডাকাবার আগেই মাছি দাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে আবার তাঁকে কট করে কামড়ে দিলে। রাজা মহা খাপ্পা হয়ে বললেন, 'ওরে খুদে মাছি, আমি এত বড়ো রাজা, তুই কিনা আমাকে কামড়াতে চাস?'

মাছি কোনও জবাব দেওয়া দরকার মনে করলে না, ক্রমাগত তাঁকে কামড়াতে লাগল। সারারাত রাজার চোখে ঘুম নেই, সকালে উঠেই তিনি লোকজন ডেকে সারা প্রাসাদ ঝেঁটিয়ে ধুয়ে সাফ করিয়ে ফেললেন। কিন্তু মাছি তখন রাজার জামার ভিতরে। সেদিন ভালো করে ঘুমোবেন বলে রাজা সন্ধ্যা হতেই বিছানায় গিয়ে শুয়ে যেই চোখ মুদেছেন, মাছি দিলে অমনি কটাস করে এক কামড়।

—'কে রে বেটা?'

—'আমি সেই মাছি।'

—'কী চাস তুই?'

—'আমি চাই তুমি সৎ হও, প্রজাদের সুখী করো!'

রাজা চিৎকার করে হাঁকলেন, 'হে সৈন্যগণ, হে সেনাপতিগণ, হে মন্ত্রীগণ, তোমরা শীঘ্র এসে আমাকে উদ্ধার করো।'

সবাই ছুটে এল, কিন্তু সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও মাছিকে আবিষ্কার করতে পারলে না। মাছি তখন রাজার চুলের ভিতরে। রাজা অন্য ঘরে ঢুকে শুলেন এক নতুন বিছানায়। কিন্তু মাছির কামড়ের পর কামড় খেয়ে সারা রাত কাটল তাঁর অনিদ্রায়। পরদিন প্রভাতে রাজা দেশের সমস্ত মক্ষিকা-বংশ ধ্বংস করবার হুকুম দিলেন। কিন্তু তবু তিনি সেই সুচতুর মক্ষিকার কবল থেকে উদ্ধার পেলেন না। রাতের পর রাত যায়, জেগে জেগে রাজা হয়ে উঠলেন উন্মত্তের মতো। তিনি বুঝলেন, এভাবে আর কিছুদিন ঘুমোতে না পেলে পটল তোলা ছাড়া তাঁর আর কোনও উপায় নেই। নাচারভাবে রাজা শেষটা বললেন, 'ওরে মাছি, আমি হার মানলুম। আমায় কী করতে হবে বল?'

মাছি বললে, 'তোমাকে প্রজাদের সুখী করতে হবে।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন করে আমি তাদের সুখী করব?'

মাছি বললে, 'মুকুট খুলে রাজ্য ছেড়ে চলে যাও।'

দেশ ছেড়ে রাজা মাছির কামড় থেকে উদ্ধার পেলেন। প্রজাদের আনন্দের সীমা নেই। তারা আর নতুন কোনও রাজার খপ্পরে পড়তে চাইলে না, দেশে প্রতিষ্ঠিত করলে প্রজাতন্ত্র।

ইঁদুরের কীর্তি-কাহিনী

জার্মানির বংশীধারী কেমন করে ইঁদুর তাড়িয়েছিল, সেদিন তোমাদের কাছে সে গল্প বলেছি। আজও তোমাদের শোনাব জার্মান দেশের আর একদল ইঁদুরের কীর্তি-কাহিনী। এ গল্পটি বলেছেন ইংরেজ কবি Robert Southey তাঁর 'Bishop Hatto' নামক কবিতায়।

হ্যাটো হচ্ছেন বিশপ, অর্থাৎ ধর্মাধ্যক্ষ; কিন্তু তিনি যে-সে ধর্মাধ্যক্ষ নন, অনেকটা

আমাদের দেশের মোহান্তরই মতো। তিনি বড়ো বড়ো প্রাসাদ, জমিজমা ও প্রচুর ধনরত্নের মালিক। তাঁর মস্ত মস্ত গোলাবাড়ির ভিতরে জমা করা আছে পর্বতপ্রমাণ শস্যের স্তূপ।

সেবার দেশে হল বিষম দুর্ভিক্ষ। দেশে দুর্ভিক্ষ হলে গরিবদের কী অবস্থা হয়, এই সেদিনে বাংলা দেশেই তোমরা সেটা স্বচক্ষে দর্শন করেছ, সুতরাং এখানে ওসব কথা সবিস্তারে বর্ণনা করবার দরকার নেই। কাজেই অনাহারে মরো মরো হয়ে দলে দলে লোক যে বিশপ হ্যাটোর দ্বারদেশে গিয়ে ধরনা দিয়ে পড়বে, এটা কিছু বিচিত্র কথা নয়।

গরিবরা উপবাস-শীর্ণ হাত তুলে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, 'ওগো প্রভু, ওগো গরিবের মা-বাপ, তোমার আছে ভাণ্ডার-ভরা শস্যের স্তূপ! তারই কিছু কিছু বিলিয়ে দিয়ে তুমি আমাদের মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করো—ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।'

দিনের পর যত দিন যায়, গরিবদের কান্না ও আকুল প্রার্থনা তত গগনভেদী হয়ে ওঠে। বিশপ হ্যাটো বুঝলেন, অভাগাদের মুখ আর বন্ধ না করলে উপায় নেই।

তিনি প্রচার করে দিলেন, 'এ অঞ্চলে যত গরিব-দুঃখী আছে, সবাইকে আমি গোলা-বাড়িতে আসবার জন্য আমন্ত্রণ করছি। আমি তাদের দুঃখ দূর করার ব্যবস্থা করব।'

চারিদিকে পড়ে গেল আনন্দের সাড়া! দয়ালু বিশপ যখন মুখ তুলে চেয়েছেন, তখন আর ভাবনা নেই। দলে দলে, হাজারে হাজারে, কাতারে কাতারে ছুটে এল অনাহারী গরিবেরা। দেখতে দেখতে গোলাবাড়ির ভিতরে আর তিলধারণের ঠাঁই রইল না।

বিশপ হ্যাটো হুকুম দিলেন, 'দ্বারবান! আগে গোলাবাড়ির দরজা বন্ধ করো; তারপর ওর চারিদিকে আগুন লাগিয়ে দাও।'

দ্বারবানরা প্রভুর আদেশ পালন করলে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুনের রক্তশিখা, আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে জেগে উঠল আর্তদের মর্মভেদী ক্রন্দন!

হ্যাটো হেসে বললেন, 'বাহবা, কী চমৎকার দৃশ্য! দেশের ধনীরা এইবারে আমাকে ধন্যবাদ দেবে, কারণ কাঙালদের কবল থেকে আমি তাদের উদ্ধার করলুম। গরিবরা হচ্ছে ইঁদুরের মতো, কেবল শস্য ধ্বংস করতেই তাদের জন্ম।'

প্রাসাদে ফিরে এসে হ্যাটো নির্বিকার মনে ভালো ভালো খাবার খেতে বসলেন। তারপর পরম আরামে শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। এই তাঁর শেষ ঘুম।

পরদিনের প্রভাত। হ্যাটো বৈঠকখানায় এসে বসেই দেখতে পেলেন, দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো তাঁর প্রকাণ্ড প্রতিকৃতির সমস্তটাই ইঁদুররা কুরে কুরে খেয়ে গেছে—বাকি আছে কেবল ছবির ফ্রেম! হঠাৎ যেন মৃত্যুর ইঙ্গিত দেখেই হ্যাটো উঠলেন শিউরে!

এমন সময়ে এক ভৃত্য ছুটে এসে বললে, 'হুজুর, হুজুর! গোলাবাড়িতে গিয়ে দেখলুম, ইঁদুররা আপনার সমস্ত শস্য খেয়ে ফেলেছে।'

আর একজন ভৃত্য ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে ভয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'হুজুর, হুজুর! শিগগির পালান—শিগগির! হাজার হাজার ইঁদুর আমাদের আক্রমণ করতে আসছে! এত ইঁদুর জন্মে আমি চক্ষে দেখিনি! হয়তো কাল আমরা যা করেছি, এ হচ্ছে সেই পাপের শাস্তি।'

হ্যাটো তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন; 'কুছ পরোয়া নেহি! রাইন নদীর ওপারে আমার যে পাঁচিল-ঘেরা প্রাসাদ আছে, আমি সেইখানে গিয়ে আশ্রয় নেব। তুচ্ছ ইঁদুররা অতবড়ো নদী পেরিয়ে আর অত উঁচু পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকতে পারবে না।'

হ্যাটো পালিয়ে গেলেন নদী পারের প্রাসাদে। তারপর বন্ধ করে দিলেন সমস্ত দরজা, জানালা ও ছিদ্র।

রাত্রে নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে চোখ মুদেছেন, হঠাৎ সে কী তীক্ষ্ণ আর্তনাদ! চমকে চেয়ে দেখেন দপ দপ করে জ্বলছে দুটো অগ্নিচক্ষু!

তারপরই বুঝলেন, ওটা তাঁর পোষা বিড়াল! কিন্তু কী দেখে সে অমন ভয় পেয়ে আর্তনাদ করছে?

হ্যাটো আলো জ্বেলেই আঁতকে উঠলেন। ঘর ভরে গেছে ইঁদুরে ইঁদুরে—সে যে কত হাজার ইঁদুর, গুনে বলা অসম্ভব! এত ইঁদুর কেউ কখনও দেখেনি।

হ্যাটো আতঙ্কে জড়সড় হয়ে মাটির উপরে বসে পড়ে মালা জপতে জপতে বললেন, 'ভগবান রক্ষা করো! ভগবান রক্ষা করো!'

কিন্তু নদী পেরিয়ে, পাঁচিল ডিঙিয়ে, দরজা-জানালা ফুটো করে সেই লক্ষ লক্ষ ইঁদুর এখানে ছুটে এসেছে ভগবানেরই আদেশ বহন করে। হ্যাটো গরিবদের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন ইঁদুরদের—ওদের বুকে আশ্রয় নিয়েছে সেই গরিবদেরই ক্ষুধার্ত-আত্মা।

এত ইঁদুর এসেছে—কিন্তু এখনও ঘরের ভিতরে আসছে দলে দলে আরও ইঁদুর! জানালায় ইঁদুর, দরজায় ইঁদুর, ছাদ থেকে নামছে ইঁদুর, মেঝে ফুঁড়ে বেরুচ্ছে ইঁদুর! তারপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল বিশপ হ্যাটোর দেহের উপর।

পরদিন সকালে পাওয়া গেল কেবল হ্যাটোর মাংসহীন নগ্ন কঙ্কাল!

বাঁদরের মেটুলি-চচ্চড়ি

(জাপানি রূপকথা)

সমুদ্রের ধারে তোমরা জেলিমাছ দেখেছ তো? জেলিরা থসথসে পিণ্ডের মতন দেখতে বলে এই মাছের এমন নাম হয়েছে। তাদের দেহে এখন পা নেই, হাড়ও নেই, উপরে ঝিনুকের মতো শক্ত খোলাও নেই। এমন দশা তাদের কেন হল, আজ তোমাদের কাছে সেই গল্পই করব।

জাপানের সমুদ্রের তলায় এক সাগর-রাজ বাস করতেন, তাঁর নাম রিন-জন; এ অনেক হাজার বছর আগেকার কথা।

রাজা রিন-জনের মনে সুখ নেই, তাঁর পরমাসুন্দরী রানির বড়ো অসুখ। বড়ো বড়ো ডাক্তার দেখানো হল, কিন্তু রানির অসুখ আর সারে না।

শেষে একদিন কাঁদতে কাঁদতে রানি বললেন, 'ওগো, আমার অসুখ সারবার এক উপায় আছে।'

রাজা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কী উপায় রানি, কী উপায়?'

রানি বললেন, 'যদি আমি জ্যান্ত বাঁদরের পেট থেকে মেটুলি বার করে নিয়ে চচ্চড়ি বানিয়ে খেতে পাই, তাহলে এখুনি আমার রোগ সেরে যায়!'

রাজা খানিক ভেবে জেলিমাছকে ডাক দিলেন।

জেলিমাছ এসে তার খোলার ভেতর থেকে মুখ বার করে বললে, 'কী আজ্ঞা হয়, মহারাজ?'

রাজা বললেন, 'দ্যাখো, তোমার পা আছে, তুমি ডাঙায় উঠে চলাফেরা করতে পারবে। তুমি শিগগির সমুদ্রের ওপরে গিয়ে একটা জ্যান্ত বাঁদরকে ভুলিয়ে নিয়ে এসো, তার মেটুলির চচ্চড়ি না খেলে আমার রানির রোগ সারবে না।'

এতবড়ো একটা কাজের ভার পেয়ে জেলিমাছ ভারী খুশি! সে তখনই সাঁতার দিয়ে এক দ্বীপে গিয়ে উঠল। তারপর খানিক এদিক-ওদিক পায়চারি করতেই দেখলে, গাছের ডাল ধরে একটা বাঁদর আরাম করে দোল খাচ্ছে!

জেলিমাছ ডেকে বললে, 'ওহে বাঁদর ভায়া, কী খারাপ দেশেই তোমরা আছ—আরে ছ্যা!'

বাঁদর বললে, 'তোমাদের সমুদ্র আমাদের ডাঙার চেয়ে ভালো নাকি?'

জেলিমাছ বললে, 'নিশ্চয়, সে কথা আবার বলতে হবে? আমাদের দেশে কত মণি-মুক্তোর ছড়াছড়ি, গাছে গাছে কত মিষ্টি ফল! বিশ্বাস না হয়, আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করছি, তুমি আমার পিঠে চড়ে বসো, তোমাকে এখনই আমাদের দেশ দেখিয়ে আনব!'

মিষ্টি ফলের লোভে বাঁদর তখনই রাজি হয়ে জেলিমাছের পিঠে চড়ে বসল।

তারা যখন প্রায় রাজা রিন-জনের প্রাসাদের কাছে এসেছে, জেলিমাছ তখন জিজ্ঞাসা করলে, 'হ্যাঁ, ভালো কথা! আচ্ছা ভাই বাঁদর, তুমি তোমার মেটুলি সঙ্গে করে এনেছ তো?'

বাঁদর একটু আশ্চর্য হয়ে বললে, 'এমন বেয়াড়া কথা তুমি জানতে চাও কেন বলো দেখি?'

বোকা জেলিমাছ বললে, 'আমাদের রানি যে জ্যান্ত বাঁদরের মেটুলি-চচ্চড়ি খেতে চান!'

বাঁদর দু-চোখ ছানাবড়ার মতো করে বললে, 'অ্যাঁ, সে কী? এ-কথা তুমি আগে আমাকে বলোনি কেন?'

জেলিমাছ বললে, 'ভায়া, তাহলে তুমি হয়তো আমার সঙ্গে আর আসতে না!'

বাঁদর বললে, 'তুমি বড়োই ভুল করেছ দেখছি! আসল কথা কী জানো, আমার অনেক মেটুলি আছে বটে, কিন্তু সেসব আমার বাসায় গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে এসেছি! আগে জানলে তোমাদের রানির মুখ চেয়ে অন্তত একটা মেটুলিও আমি নিশ্চয় সঙ্গে আনতুম!

জেলিমাছ বললে, 'তবে চলো, আবার ফিরে যাই!'

জেলিমাছ সাঁতার দিয়ে আবার ডাঙায় গিয়ে উঠল। চোখের পলক না পড়তে বাঁদর হুপ করে এক লাফে গাছে চড়ে মুখ খিঁচিয়ে বললে, 'ওরে হাঁদা-গঙ্গারাম, মেটুলি আছে আমার পেটের ভেতর, আর তাই খাবেন তোমাদের রানি চচ্চড়ি করে? একি মামার বাড়ির আবদার? যাও—ভাগো হিঁয়াসে!'

জেলিমাছ হতাশ হয়ে সমুদ্রের তলায় রাজার কাছে ফিরে গিয়ে সব কথা নিবেদন করলে।

রাজা মহা খাপ্পা হয়ে হুকুম দিলেন, 'ওরে, কে আছিস রে, এই বোকাচন্দ্রের গতর চূর্ণ করে দে তো রে!'

জেলিমাছ এমন মার খেলে যে, তার খোলা আর হাড়গোড় সমস্ত গুঁড়ো হয়ে গেল! সেইদিন থেকেই তার এই অবস্থা।

বিখ্যাত চোরের অ্যাডভেঞ্চার

এক বিশ্ববিখ্যাত চোরের সত্যিকার অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি!

কিছু কম চারশো বছর আগে বিলাতে এই চোরের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু আজ সারা পৃথিবীর সব দেশই তাকে ঘরের লোকের মতন আদর করে। কেবল আদর নয়, শ্রদ্ধাও করে। আর কোনও চোরই পৃথিবীর কাছ থেকে এত সম্মান, এত ভালোবাসা পায়নি। এই সবচেয়ে বিখ্যাত চোরের নাম তোমাদেরও অজানা নয়। গল্প শুনতে শুনতে তার নামটি আন্দাজ করো দেখি!

বিলাতে ওয়ারউইকসায়ার বলে একটি জেলা আছে। তার শুকনো বুক ভিজিয়ে বয়ে যায় সুন্দরী অ্যাভন নদী। তারই তীরে চার্লেকোট নামে এক তালুক। জমিদারের নাম, স্যার টমাস লুসি।

মস্ত বড়ো তালুক—তার মধ্যে গ্রামও আছে, বনও আছে। বনে দিকে দিকে চরে বেড়ায় হরিণের দল। এসব হরিণ, স্যার টমাসের নিজের সম্পত্তির মধ্যে গণ্য! কেউ হরিণ চুরি করলে তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। হরিণদের উপরে পাহারা দেবার জন্যে অনেক লোক নিযুক্ত আছে। তবু আজকাল প্রায়ই হরিণের পর হরিণ চুরি যাচ্ছে।

কাজেই স্যার টমাস ভয়ানক খাপ্পা হয়ে উঠেছেন। দেওয়ানকে ডেকে ধমক দিয়ে তিনি বললেন, 'ব্যাপারখানা কী বলো দেখি? ফি হপ্তায় দেখছি আমার জমিদারি থেকে হরিণ চুরি যাচ্ছে! চোরেরা বাছা-বাছা হরিণ নিয়ে পালায়! এ-চুরি বন্ধ করতেই হবে! চারিদিকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করো! আমার বিশ্বাস, এসব এক আধজন চোরের কীর্তি নয়, এর মধ্যে অনেক লোক আছে!'

দেওয়ান ভয়ে-ভয়ে বললে, 'হুজুর, চারিদিকেই আমি পাহারা বসিয়েছি। এতদিন পরে কালকে একদল চোর প্রায় ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছে! সেপাইরা তাদের পেছনে তাড়া করেছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কারুকেই ধরতে পারেনি!'

স্যার টমাস জিজ্ঞাসা করলেন, 'কারুর ওপরে কি তোমার সন্দেহ হয় না?'

দেওয়ান বললে, 'গাঁয়ে গিয়ে আমি খোঁজ নিয়েছি। কতকগুলো ছোকরাকে দেখলুম, তারা আপনার নামে যা-খুশি-তাই বলে বেড়ায়! হরিণ-চুরির কথা তুলতে তারা আবার মুখ টিপে-টিপে হাসে। কিন্তু তাদের মধ্যে কে চোর আর কে সাধু, সে কথা বলা ভারী শক্ত!'

স্যার টমাস মুখভঙ্গি করে বললেন, 'একবার যদি হতভাগাদের ধরতে পারি, তাহলে তাদের কেউ আর মুখ টিপে টিপে হাসবে না! বারবার চুরি! দেওয়ান, এ চুরি বন্ধ করতেই হবে!'

হঠাৎ বাইরে একটা গোলমাল উঠল—বাদ-প্রতিবাদ, ধস্তাধস্তি!

তারপরেই একজন লোক ঘরের ভিতর ঢুকে সেলাম করে বললে, 'হুজুর, কাল রাত্রে একটা চোর ধরা পড়েছে!'

স্যার টমাস অত্যন্ত আগ্রহে বলে উঠলেন, 'কোথায় সে বদমায়েশ?'

—'অনেক কষ্টে তাকে ধরে এনে কাছারি বাড়ির একটা ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছে!'

—'তাকে তুমি চেনো?'

—'না হুজুর! কিন্তু গাঁয়ের সবাই তাকে চেনে। হাড়-বখাটে ছোকরা, আরও দু-একবার নাকি অন্যায় কাজ করে ধরা পড়েছে।'

—'কেমন করে তাকে ধরলে?'

—'হরিণটাকে মেরে কাঁধে তুলে সে বনের ভিতর দিয়ে পালাচ্ছিল। সেই সময়ে দেখতে পেয়ে আমাদের লোকেরা তাকে তাড়া করে। তখন যদি হরিণটাকে ফেলে দিয়ে সে পালাত, তাহলে কেউ তাকে ধরতে পারত না!'

বিকট আনন্দে স্যার টমাস বললেন, 'নিয়ে এসো—এখনই তাকে এখানে নিয়ে এসো, পরদ্রব্য চুরি করার মজাটা সে ভোগ করুক! দেওয়ান, তুমি এখন যেতে পারো। কিন্তু সাবধান! মনে রেখো, আরও অনেক চোর আমার বনে বেড়াতে আসে, একে একে তাদের সবাইকে ধরে দশ ঘাটের জল খাওয়াতে হবে!'

স্যার টমাস কেবল জমিদার নন। তিনি পার্লামেন্টের সভ্য, আদালতের বিচারক! কাজেই তাড়াতাড়ি নিজের পদ-মর্যাদার উপযোগী জমকালো পোশাক পরে নিলেন। তারপর খুব ভারিক্কেচালে পা ফেলে, মুখখানা প্যাঁচার মতো গম্ভীর করে তুলে প্রকাণ্ড হলঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। এইখানে বসেই তিনি জমিদারির কাজকর্ম করেন, প্রজাদের আবেদন-নিবেদন শোনেন, দোষীদের শাস্তি দেন। হরিণ-চোর ধরা পড়েছে শুনে স্যার টমাসের পরিবারের অন্যান্য স্ত্রী-পুরুষেরাও মজা দেখবার জন্যে সেখানে এসে জুটলেন।

শোনা গেল, দূর থেকে একটা গোলমাল ক্রমেই বাড়ির কাছে এগিয়ে আসছে। তারপর অনেক লোকের পায়ের শব্দ হলঘরের দরজার সামনে এসে থামল। তারপর দুজন পাহারাওয়ালা দুদিক থেকে এক নবীন যুবককে ধরে টানতে টানতে ঘরের ভিতরে এনে হাজির করলে। তার পিছনে আর একজন লোকের কাঁধে একটা দিব্য মোটাসোটা মরা হরিণ। আর একজন লোকের হাতে রয়েছে একটা ধনুক—এই ধনুকেই বাণ জুড়ে চোর হরিণটাকে বধ করেছে। সব পিছনে আরও একদল লোক, তারাও এসেছে মজা দেখতে। পৃথিবীতে চিরদিনই চোরের শাস্তি দেখা ভারী একটা মজার ব্যাপার!

চোরের বয়স কুড়ি বছরের মধ্যেই। দেখতে সুপুরুষ, মাথায় ঢেউখেলানো লম্বা চুল, ডাগর-ডাগর চোখ, মুখে কচি গোঁফ-দাড়ির রেখা, মাঝারি আকার। তাকে দেখলে কেউ চোর বলে সন্দেহ করতে পারবে না।

কড়া চালে, চড়া স্বরে স্যার টমাস বললেন, 'এগিকে এগিয়ে এসো ছোকরা!'

চোর এগিয়ে এল।

—'কী নাম তোমার?'

চোর নিজের নাম বললে।

নাম শুনে স্যার টমাসের কিছুমাত্র ভাব-পরিবর্তন হল না। তখন সে নামের কোনওই মূল্যই ছিল না, যদিও আজ সে নাম শুনলে বিশ্বের মাথা নত হয়!

দুই চোখ পাকিয়ে স্যার টমাস বললেন, 'তোমার নামে চুরির অভিযোগ হয়েছে। তোমার

বিরুদ্ধে যারা সাক্ষ্য দিয়েছে, তাদের সন্দেহ করবার কোনও উপায় নেই। তুমি বামাল সমেত ধরা পড়েছ। তোমার অপরাধ গুরুতর। কাজেই তোমার দণ্ডও লঘু হবে না। এ-অঞ্চলে তোমার মতন আরও কয়েকজন পাজি চোর-ছ্যাঁচোড় আছে বলে খবর পেয়েছি। তাই তোমাকে আমি এমন শাস্তি দিতে চাই, যাতে সবাই সময় থাকতে সাবধান হয়।'

চোর মৃদু স্বরে বললে, 'বেশ, আমি জরিমানা দেব।'

স্যার টমাস কঠোর কণ্ঠে বললেন, 'না!'

—'তাহলে আমাকে জেলে পাঠান।'

স্যার টমাস কঠোর কণ্ঠে বললেন, 'না, না! তোমার জরিমানাও হবে না, তোমাকে জেলেও পাঠাব না! তোমার পৃষ্ঠে ত্রিশবার বেত্রাঘাত করা হবে!'

বেত্রাঘাত ছিল তখন অত্যন্ত অপমানকর দণ্ড। আসামির মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। এমন দণ্ডের কথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি, তাড়াতাড়ি আর্তস্বরে সে বলে উঠল, 'জরিমানা করুন—জেলে পাঠান, কিন্তু দয়া করে বেত-মারার হুকুম দেবেন না!'

স্যার টমাস অটলভাবে বললেন, 'আসামিকে নিয়ে যাও এখান থেকে! তার পিঠে সপাসপ ত্রিশ ঘা বেত মারা হোক!'

চোরকে সবাই টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল। তারপর তাকে সকলকার সামনে এক প্রকাশ্য স্থানে দাঁড় করিয়ে তার দুই হাত বেঁধে, পিঠে বেতের পর বেত মারা হল।

সেদিন রক্তাক্ত দেহে মাথা নিচু করে চোর বাড়িতে ফিরে এল, তখন পিঠের যাতনার চেয়ে মনের যাতনাই তাকে বেশি কাবু করে ফেলেছে। প্রতিহিংসা নেবার জন্যে তার সারা প্রাণ ছটফট করতে লাগল, কিন্তু মহাধনী মহা শক্তিশালী জমিদার স্যার টমাস লুসির বিরুদ্ধে কী প্রতিহিংসা সে নিতে পারে? তার সহায়ও নেই, সম্পদও নেই! আবার কি সে বনে ঢুকে হরিণ চুরি করবে? না, চারিদিকে সতর্ক পাহারা, এবারে ধরা পড়লে, অপমানের আর অন্ত থাকবে না।

কিন্তু প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—যেমন করে হোক প্রতিশোধ নিতেই হবে—ধনী স্যার টমাসকে বুঝিয়ে দিতেই হবে, গরিবও প্রতিশোধ নিতে পারে। চোর বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। হঠাৎ ছেলেবেলার স্কুলের কথা তার মনে পড়ল। ছেলেরা এক দুষ্ট মাস্টারের নামে পদ্য লিখে তাঁকে প্রায় পাগল করে ছেড়েছিল। হ্যাঁ, প্রতিশোধ নেবার এই একটা সহজ উপায় আছে বটে। কিন্তু সে তো জীবনে কখনও পদ্য লেখেনি। সে তো পদ্য লিখতে জানে না! আচ্ছা, একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী?

চোর কাগজ নিলে, কলম নিলে এবং একমনে স্যার টমাসের নামে পদ্য লিখতে বসল। লিখতে লিখতে সবিস্ময়ে সে আবিষ্কার করলে যে, তার পক্ষে পদ্য লেখা মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়। শেষ পর্যন্ত কবিতাটি যা দাঁড়াল, তা পাঠ করলে স্যার টমাস যে আহ্লাদে আটখানা হবেন না, এইটুকু বুঝে চোরের মন অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হল। সমস্ত পদ্যটি এখানে তুলে দেবার সময় নেই, মাত্র কয়েকটি লাইনের নমুনা দেখলেই তোমরা তার কতকটা পরিচয় পাবে।

'পার্লামেন্টের সভ্য সে যে,
আদালতের জজ সে হাঁদা,

ঘরের ভেতর জুজুবুড়ো,
বাইরে তাকে দেখায় গাধা।
কান ধরে তার নিয়ে গিয়ে
গাধীর সঙ্গে দাও-গে বিয়ে'—প্রভৃতি।

আমাদের কবি তখনই তার এই অপূর্ব রচনাটি নিয়ে দৌড়ে গাঁয়ের সঙ্গীদের কাছে হাজির হল এবং সকলকে আগ্রহ-ভরে পড়ে শোনালে। কবিতাটি তাদের এত চমৎকার লাগল যে, তখনই তারা মুখস্থ করে ফেললে। তাদের মধ্যে ছিল একজন গাইয়ে, সে আবার সুর দিয়ে কবিতাটিকে গানের মতন গাইতে আরম্ভ করলে। দুদিন যেতে-না-যেতেই সারা গাঁয়ের লোক মনের আনন্দে উচ্চস্বরে কবিতাটি আওড়াতে বা গাইতে শুরু করে দিলে। সে-অঞ্চলে স্যার টমাসকে কেউ পছন্দ করত না।

কিন্তু এতেও নবীন কবির মনের সাধ মিটল না। কারণ, স্যার টমাস হয়তো স্বকর্ণে এমন মূল্যবান কবিতাটি শ্রবণ করেননি। অতএব সে এক রাত্রে চুপি চুপি গিয়ে জমিদার-বাড়ির ফটকের গায়ে কবিতাটি লটকে দিয়ে এল।

পরদিন সকালে ছেলে মেয়ে বউ নিয়ে স্যার টমাস খেতে বসেছেন, এমন সময়ে এক চাকর সেই কবিতার কাগজখানা নিয়ে এসে তাঁর হাতে দিয়ে বললে, 'হুজুর, এখানা ফটকে ঝুলছিল। আমরা পড়তে জানি না, দেখুন তো দরকারি কাগজ কি না?'

স্যার টমাস কাগজখানার উপরে চোখ বুলিয়েই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, 'হতভাগা, নিশ্চয়ই তুই পড়তে জানিস। কাগজখানা পড়েই আমাকে দেখাতে এসেছিস। দূর হ, বেরো এখান থেকে। চাবকে তোর বিষ ঝেড়ে দেব জানিস?'

চাকর তো এক ছুটে পালিয়ে বাঁচল,—সত্যিই সে লেখাপড়া জানত না।

স্যার টমাস একটু ভেবেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বুঝেছি, এ সেই পাজির-পা-ঝাড়া চোরের কাণ্ড! আমি তার কান কেটে নেব—আমি তার কান কেটে নেব!'

চোর-কবির কান অবশ্য কাটা যায়নি, কিন্তু স্যার টমাসের অত্যাচারে তাকে গ্রাম ছেড়ে পালাতে হল। তবে অনেক বছর পরে আবার যখন গ্রামে ফিরে এল, তখন সে একজন দেশবিখ্যাত কবি ও নাট্যকার।

স্যার টমাস কবে মারা গিয়েছেন। আজ তাঁকে কেউ চিনত না! কিন্তু পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার তাঁকে নিয়ে প্রথম কবিতা রচনা করেছিলেন বলেই লোকে আজও তাঁর নাম ভোলেনি। চারশো বছর আগেকার সেই হরিণ-চোরের নাম কী তোমরা শুনতে চাও? তিনি উইলিয়ম শেক্সপিয়ার।

বাগানের বাঘ

মুকু, নমু, দীপু, মঞ্জু আর প্যাঁচাবাবুর সঙ্গে তোমাদের এখনও পরিচয় হয়নি বোধহয়? এরা হচ্ছে ভাই-বোন। দীপু আর প্যাঁচা হচ্ছে ভাই, মুকু, নমু আর মঞ্জু হচ্ছে বোন। সবচেয়ে ছোটো হচ্ছে প্যাঁচা আর মঞ্জু, কিন্তু সবচেয়ে ডানপিটে হচ্ছে তারা দুজনেই। দুষ্টুমি বুদ্ধিতে দাদা-দিদিরা তাদের কাছে থই পায় না।

তাদের জ্বালায় দাদু বেচারার ঘুমিয়েও শান্তি নেই। মঞ্জু চুপি চুপি গিয়ে ঘুমন্ত দাদুর নাকের ভেতরে করবে নস্যির ডিবে খালি, আর কাঁচি নিয়ে প্যাঁচা দেবে দাদুর গোঁফজোড়া কচ করে ছেঁটে। দাদুকে শাস্তি দেওয়ার এমনি নিত্য-নতুন ফন্দি আবিষ্কার করতে তাদের জুড়ি নেই।

মুকু, নমু আর দীপু অতটা দুষ্টুমি করে না বটে, কিন্তু দাদু যখন ভয়ানক হাঁচতে হাঁচতে জেগে উঠে ঠোঁটে হাত দিয়ে শখের গোঁফজোড়া আর খুঁজে পান না, তখন তাদের একটুও দয়া হয় না, উলটে তারা খিলখিল করে হেসেই খুন হয়। দাদু যদি রেগে ওঠেন তবে তারাও আরও জোরে হেসে ওঠে।

রাগ করলেও যেসব নাতি-নাতনির হাসির ধুম বাড়ে, তাদের নিয়ে কী আর করা যায় বলো? দাদু তখন নাচার হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বলেন, 'আচ্ছা দাদু, আচ্ছা, দিদি, তোমরা কি আমাকে একটু ঘুমোতেও দেবে না?'

নমু ঘাড় নেড়ে বলে, 'না, আমাদের সামনে ঘুমটুম চলবে না।'

মুকু গম্ভীর মুখে বলে, 'দাদু হলে ঘুমোতে নেই।'

দাদু বলেন, 'তা হলে আমায় কী করতে হবে শুনি?'

দীপু বলে, 'খালি গল্প বলতে হবে।'

'অর্থাৎ জেগে জেগে স্বপ্ন দেখতে হবে? বেশ! এখন হুকুম করো, কী গল্প শুনতে চাও?'

দীপুর বড়ো শখ, বাঘ শিকার করবে। সেইজন্যে সে একটা এয়ারগানও কিনেছে। দুই চোখ পাকিয়ে বলল, 'বাঘের গল্প।'

দাদু কোনওরকমে গোঁফের শোক সামলে বাঘের গল্প শুরু করলেন।

নস্যির ডিবে আর কাঁচি নিয়ে মঞ্জু আর প্যাঁচা চক্ষুলজ্জার খাতিরে ঘরের বাইরে পালিয়ে গিয়েছিল। গোঁফ-ছাঁটা দাদু হাঁচি থামিয়ে গল্প শুরু করেছেন শুনেই তাদের সমস্ত চক্ষুলজ্জা একেবারেই ছুটে গেল। গুটি গুটি ঘরে ঢুকে দাদুর পিছনে এসে ভিজেবিড়ালের মতো শান্তভাবে গল্প শুনতে বসল।

দাদু সেই পুরোনো বই 'কঙ্কাবতী'-র গল্প বলতে লাগলেন। বনের ভেতরে একরকম শিকড় পাওয়া যায়, যার গুণে মানুষ নাকি বাঘের রূপধারণ করতে পারে। বলা বাহুল্য, গল্পটা জমে উঠল রীতিমতো।

গল্প শেষ হলে পর দীপু বললে, 'আচ্ছা দাদু, বাঘরা তো ঝোপে জঙ্গলে থাকে?'

'তা নয় তো কী?'

প্যাঁচা বললে, 'আমাদের খিড়কির বাগানে তো অনেক ঝোপঝাপ আছে। সেখানে দিনের বেলায় রোজ আমরা খেলা করি, কিন্তু বাঘ-টাঘ তো দেখিনি, দাদু!'

প্যাঁচাই যে তাঁর গোঁফজোড়াকে বলি দিয়েছে, দাদু এটা বুঝতে পেরেছিলেন, কাজেই তাকে ভয় দেখাবার জন্যে তিনি বললেন, 'দিনে ওখানে বাঘ থাকে না বটে, কিন্তু রোজ রাতে আসে। এবার দুষ্টুমি করলেই তোমাদের ধরে নিয়ে যাবে।'

প্যাঁচা হচ্ছে বিষম ছেলে, ভয় পাওয়ার পাত্রই নয়। বলল, 'ইস, গুলতি ছুড়ে বাঘের মাথা ফাটিয়ে দেব!'

দাদু ভয়ে ভয়ে বললেন, 'গুলতি ছুড়ে বাঘের মাথা ফাটাতে চাও ফাটিয়ো, কিন্তু দেখো ভাই, ও জিনিসটি নিয়ে বুড়োদাদুর টাকের দিকে যেন টিপে কোরো না।'

সেইদিনই সন্ধ্যার আগে দাদা-দিদিদের পরামর্শ সভার এক গোপনীয় অধিবেশন হল। সভাপতিরূপে দীপুবাবু এই ছোট্ট বক্তিতাটি দিলেন

'দাদুর মুখে শোনা গেল, যেখানে জঙ্গল, ঝোপঝাপ থাকে সেইখানেই রাতের বেলায় বাঘেরা বেড়াতে আসে। আমাদের বাড়ির পিছনের বাগানে ফুলগাছের চেয়ে ঝোপঝাপই বেশি। দিনের বেলায় আমরা সবাই স্বচক্ষে দেখেছি, তার ভেতরে গিরগিটি থাকে, বেজি থাকে,

হেলে সাপ থাকে, ডাঁশ-মশা থাকে, সুতরাং রাত্তিরে সেখানে বাঘেরাই বা আসবে না কেন? আমার এয়ারগান আছে, আর প্যাঁচার আছে গুলতি। আজ আমরা বাঘ শিকার করব।'

একখানা গিনি-চকোলেট চুষতে চুষতে মুকু বললে, 'কিন্তু দাদুর গল্পে শুনলি তো, সে বাঘ মানুষ-বাঘও হতে পারে।'

দীপু বললে, 'তুমি আর হাসিয়ো না দিদি! মানুষ কখনও বাঘ হতে পারে? ওসব হচ্ছে গল্পের কথা।'

নমু বললে, 'কিন্তু রাত্তিরে যে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি?'

—'আজ আর কেউ ঘুমোব না। বাবা-মা ঘুমোলেই আমরা পা টিপে টিপে ঘর থেকে পালিয়ে আসব।'

'কিন্তু দীপু, রাত্তিরে বাগানে বাঘ ছাড়া আরও কেউ কেউ তো বেড়াতে আসতে পারে?'

'আবার কে আসবে?'

'ভূত আর পেতনি? আমাদের দেখতে পেলে তারা কী বলবে?'

এইখানেই দীপু মস্ত ধাঁধায় পড়ে গেল। সে বাঘ শিকার করতে পারে, কিন্তু ভূত-পেতনির সঙ্গে দেখা করতে রাজি নয়। বাপ রে, তাদের পায়ের গোড়ালি নাকি সামনের দিকে। যদি 'কঙ্কাবতী'র ঘ্যাঁঘো, নাকেশ্বরী প্রভৃতির উদয় হয়, তবে তাদের সামলানো তো বড়ো চারটি-খানিক কথা নয়। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দীপু মাথা চুলকোতে লাগল।

প্যাঁচা বললে, 'ভাবছিস কেন দাদা, বাগানে না গিয়েও তো বাঘ শিকার করা যায়!'

'কেমন করে?'

'বাগানের ওপরেই তো আমাদের হলঘর। জানলার পাল্লাগুলো একটুখানি ফাঁক করে ভেজিয়ে রেখে আমরা লুকিয়ে বাগানের দিকে নজর রাখব। ভূত-পেতনিরা আমাদের দেখতেও পাবে না, কিন্তু বাঘ দেখলেই আমরা বন্দুক আর গুলতি ছুড়তে পারব।'

প্যাঁচা বয়সে ছোটো হলে কী হয়, তার পদ্ধতিটিই যে উদ্যানবাসী প্রেতাত্মাদের হাত থেকে নিস্তার লাভ করবার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ, সভ্যদের মধ্যে এ সম্বন্ধে মতভেদ হল না।

কিন্তু মঞ্জু প্রতিবাদ করে বললে, 'বা রে, আমার বন্দুকও নেই গুলতিও নেই, আমি কী নিয়ে বাঘ শিকার করব?'

দুই দিদিই একসঙ্গে মাথা নেড়ে বলে উঠল, 'মেয়েরা বাঘ শিকার করে না, মেয়েরা খালি দেখে।'

কিন্তু এই কচি বয়সেই মঞ্জুর মনের মধ্যে নারীজাতির অধিকার সম্বন্ধে একটা বিশেষ ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে-ও প্রবল মাথা-নাড়া দিয়ে বললে, 'ওসব হবে-টবে না, বাঘ শিকার আমি করবই!'

বুদ্ধিমান প্যাঁচাই আবার মঞ্জুকে ঠান্ডা করবার জন্যে বল্লালে, 'হ্যাঁ রে মঞ্জু, তুইও শিকার করবি বই কি! কিন্তু সবাই একরকম অস্তর নিলে চলবে কেন? তুই কতগুলো বড়ো বড়ো ইট-পাথর নিয়ে আয়, বাঘ দেখলেই দমাদ্দম ছুড়ে মারবি।'

রাত এগোরাটার পর প্যাঁচা লেপের ভেতর থেকে উঁকি মেরে দেখলে, মা আর বাবা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। প্যাঁচা নিজের মনেই বললে, 'বাবার সঙ্গে মা রোজ ঝগড়া করেন, তাঁর নাক নাকি ডাকে না। হুঁ, এই তো আমি নিজের কানে শুনছি, মা-র নাক দস্তুরমতো ডাকে! রোসো, কাল বাড়িসুদ্ধু সব্বাইকে বলে দিচ্ছি।'

তারপর প্যাঁচা চিমটি কেটে আর সব ভাইবোনকে জাগিয়ে দিলে। সকলে একে একে হলঘরে গিয়ে জুটল।

হলঘরের একটা জানলায় গুলতি নিয়ে প্যাঁচা, আর-একটা জানলায় বন্দুক নিয়ে দীপু, আর-একটা জানলায় মঞ্জু গিয়ে দাঁড়াল—তার সামনে রাশিকৃত ইট-পাথর, এমনকি দুটো ভাঙা বোতল পর্যন্ত। মুকু আর নমু দুজনে একসঙ্গে আর-একটা জানলায় গিয়ে আশ্রয় নিলে, তারা নিরস্ত্র—কারণ শিকার করবার নয়, কেবল শিকার দেখবারই শখ তাদের আছে।

ভেজানো জানলার ফাঁক দেখা গেল, বাগানে আবছা চাঁদের আলো এসে চারদিক করে তুলেছে ছায়ামায়াময়। কোথাও জনপ্রাণী নেই—শব্দের মধ্যে শোনা যাচ্ছে কেবল গাছে গাছে বাতাসের কান্না আর ঝোপেঝাপে ঝিঁঝিদের একঘেয়ে ডাক। বাঘের দেখা বা সাড়া নেই।

কিন্তু তাদের মনের ভেতরে তখন বাসা বেঁধেছে শিকারির ধৈর্য, কাজেই অন্ধকার ঘরে সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

হলঘরের বড়ো ঘড়িতে যখন বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত বেজে গেল এবং বাঘের আশায় তারা যখন দিয়েছে জলাঞ্জলি এবং নমু ও মুকু যখন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই চোখ মুদে ঘুমোবার চেষ্টা করছে, তখন প্যাঁচার মনে হল, ছায়ার মতন কী-একটা বড়ো মূর্তি সাঁৎ করে এ ঝোপ থেকে ও ঝোপে গিয়ে ঢুকল। দীপুও দেখেছিল, মঞ্জুও দেখেছিল।

ঝোপ থেকে মূর্তিটা আবার যেই আত্মপ্রকাশ করলে, অমনি দীপু ছুড়লে হাওয়ার বন্দুক, প্যাঁচা ছুড়লে গুলতি এবং মঞ্জু ছুড়লে ভাঙা বোতল। সঙ্গে সঙ্গে বিকট এক আর্তনাদ—'বাপ রে, মা রে, মরে গেছি রে!'

এ যে মানুষের গলা! 'ওগো, মাগো, ভূত গো!' বলে চেঁচিয়েই নমুদিদি দিলে তিরবেগে সে ঘর থেকে চম্পট! দীপুদাদার শিকারের শখ উপে গেল, ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে তৎক্ষণাৎ সে বন্দুক ত্যাগ করলে। মুকুদিদির তো লেগে গেল দাঁতকপাটি। ভূতের জন্যে তারা কেউ প্রস্তুত ছিল না।

কিন্তু প্যাঁচা ভয় কাকে বলে জানে না, মঞ্জুও তাই। প্যাঁচা বললে, 'মঞ্জু, ছোড়, ইট,—

আমি ছুড়ি গুলতি। ওটা মানুষ-বাঘ, ওটাকে মেরে ওর কাছ থেকে শেকড় কেড়ে নিতে হবে!' ঝোপের ওপরে ফটাফট গুলতির গুলি আর ধপাধপ ইট বৃষ্টি হতে লাগল। কিন্তু বাঘের আর সাড়াই নেই।

নমু যখন নিজেদের ঘরে ঢুকে বিছানার ওপরে ঝাঁপ খেয়েছে, তখন গোলমালে তার মা-বাবার ঘুম গেছে ভেঙে। বাবা বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী রে নমু, কী হয়েছে?'

'ও বাবা, বাগানে একটা ভয়ানক ভূত এসেছে'—বলেই সে সোজা লেপের ভেতরে ঢুকে গেল, কারণ সে জানত লেপের ভেতরে একবার ঢুকতে পারলে আর ভূতের ভয় থাকে না। নমুর বাবা লাঠি নিয়ে তখনই বাগানে ছুটলেন।

বাগানের ঝোপের ভেতরে পাওয়া গেল একটা হতভাগ্য চোরের অচেতন দেহ। তার রগে লেগেছিল গুলতির গুলি। তার দেহও ইট আর ভাঙা বোতলের চোটে রক্তাক্ত। কী অশুভক্ষণেই সে আজ এ বাড়িতে চুরি করতে ঢুকেছিল। তার অবস্থা দেখে তাকে থানায় না পাঠিয়ে হাসপাতালেই পাঠানো হল।

কিন্তু দাদুর অবিচারটা দ্যাখো! কোথায় এইসব বীর নারী ও বীর পুরুষকে অভিনন্দন দেবেন, না তিনি কিনা ফস করে বলে বসলেন, 'আজকেই ও সর্বনেশেদের এয়ারগান আর গুলতি কেড়ে নিয়ে নিরস্ত্র করা হোক! আমার গোঁফ ওরা কেটে নিয়েছে, এইবারে ওদের নজর পড়বে আমার টাকের ওপরে।'

দাদুর সন্দেহ সত্য কি না জানি না, কিন্তু মুকু, নমু, দীপু, প্যাঁচা আর মঞ্জুকে তোমরা চিনে রাখো, কারণ ভবিষ্যতে ওদের সঙ্গে তোমাদের আবার দেখা হলেও হতে পারে।

সাপ, বাঘ, মুরগি

একত্রিশ বছর কেটে গেছে তারপর।

ছোটো ছোটো বন্ধুরা, একত্রিশ বছর আগে তোমরা কোথায় ছিলে? নিশ্চয়ই বলতে পারবে না, কারণ গতজন্মের কথা এ জন্মে মনে করা যায় না।

কিন্তু একত্রিশ বছর আগে আমি কোথায় ছিলুম জানো? উড়িষ্যায়। মনে হচ্ছে এ তো সেই সেদিনের কথা!

তখনকার একটি দিনের কথা আমার মনে আজও জ্বলজ্বল করছে। বিশেষ আশ্চর্য কথা নয়, তবে লোকের কাছে বললে নিতান্ত মন্দ শোনাবে না।

উড়িষ্যায় কোনওকালে নাগ রাজার রাজত্ব ছিল কি না জানি না, কিন্তু যতবারই ও-অঞ্চলে গিয়েছি, রকম-বেরকমের সাপের সঙ্গে দেখা হয়েছে।

একবার ওখানে যেরকম গোখরো সাপ দেখেছিলুম, আজও তার জুড়ি খুঁজে পাইনি। এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে 'মৌচাক' পত্রিকার সম্পাদক মশাইকে আহ্বান করতে পারি। আমরা কয়েকজন সাহিত্যিক ও শিল্পী বন্ধু মিলে বাসা বেঁধেছি তখন ভুবনেশ্বরে।

এক লোক সাপ খেলাতে এসে এমন এক গোখরো বার করলে যাকে দেখেই আমাদের চক্ষু স্থির! ফনা না তুললে তাকে আমরা দূর থেকে অজগর সাপ বলেই ভ্রম করতে পারতুম। ইয়া লম্বা, ইয়া মোটা! মনে হচ্ছে রং ছিল তার চকচকে ও কুচকুচে কালো। হয়তো সেটা ছিল কেউটে জাতীয়।

আমরা ছিলুম উঁচু রোয়াকের ওপরে, সাপুড়ে ছিল উঠোনে। সেই নতুন-ধরা সাপটাকে বার করবামাত্র সে ভীষণ ফোঁশ শব্দের সঙ্গে ফনা তুলে প্রায় আড়াই ফুট উঁচু হয়ে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে 'মৌচাক' সম্পাদকমশাই 'ইস' বলে চিৎকার করে পিছন না ফিরেই পিছন দিকে মারলেন মস্ত-লম্বা এক লম্ফ! সাপ আবার বলল, 'ফোঁশ'! 'মৌচাক' সম্পাদকও আবার বললেন, 'ইস!'—এবং তারপরেই পিছন দিকে আর-একটা তেমনি লাফ! আবার 'ফোঁশ!' আবার 'ইস!' এবং আবার লাফ! সম্পাদকমশাইয়ের বপুখানি ভগবানের ইচ্ছায় বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, বাংলাদেশে যদি কোনওদিন পিছনদিকে লাফ মারার প্রতিযোগিতা হয়, তাহলে অমন হৃষ্টপুষ্ট গুরুভার দেহ নিয়েও 'মৌচাক'-সম্পাদক হবেন এখানকার চ্যাম্পিয়ন!

করদ রাজ্য সেরাইকেলা হচ্ছে উড়িষ্যার আর একটি দেশ, এখন মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। বছর তিনেক অগে সেরাইকেলার মহারাজা বাহাদুরের আমন্ত্রণে আমি দেশ-বিদেশে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষের সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলুম। প্রথম দিন বৈকালে পথে বেরিয়েই আধ মাইলের ভেতরেই পরে পরে তিনটি বাচ্চা সাপের সঙ্গে দেখা হল! স্থানীয় লোকদের ডেকে হরেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওগুলো কী সাপ?' তারা যে নাম বললে তা স্মরণে নেই, কিন্তু আর-একটি যে খবর দিলে তা ভোলবার নয়। তারা বললে, 'সেরাইকেলায় নাকি সময়ে সময়ে আকাশ থেকে সর্পবৃষ্টিও হয়। এ কথা সত্য কি না জানি না, কিন্তু যে তিন দিন সেরাইকেলায় ছিলুম আমি আর বাড়ি থেকে বেরোইনি। যে-দেশে সর্পবৃষ্টি হয় এবং পথে পথে পদে পদে সাপ করে কিলবিল সেখানে ছাদের তলার চেয়ে ভালো ঠাঁই আর নেই।

এইবারে একত্রিশ বছর আগেকার কথা বলি।

যাচ্ছি গরুর গাড়িতে চড়ে ভুবনেশ্বর থেকে খণ্ডগিরির দিকে। এ পথে তোমরা অনেকে নিশ্চয় গিয়েছ। দু-ধারে খেত, মাঠ, জঙ্গল, মাঝখানে মেটে পথ। তোমরা এ পথে গিয়ে নিরাপদেই ফিরে এসেছ, কিন্তু সেবার আমার যাত্রাটাই ছিল খারাপ। তিনবার তিন রকম সাপের সঙ্গে দেখা হয় যে যাত্রায়, তাকে ভালো বলি কেমন করে?

খণ্ডগিরি যাওয়ার পথে ছোট্ট একটি নদী বা নালা। গোরুর গাড়ি অনায়াসেই সেটা পার হয়ে গেল।

আরও খানিক এগিয়েই গাড়োয়ান গাড়ি থামিয়ে ফেলে একটা ঝোপের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

সেদিকে ভালো করে তাকাতে-না-তাকাতেই দেখি, গাছের ওপর থেকে মাঝারি আকারের একটা অজগর নীচের একটা ছাগলের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মাথার দিকটা কামড়ে ধরলে এবং তারপরেই তারা হারিয়ে গেল ঝোপের ভেতরে। কেবল ঝোপটা দুলতে লাগল ঘন ঘন।

সঙ্গীরা ভয় পেয়ে গাড়োয়ানকে আবার ভুবনেশ্বরে ফিরে যেতে বললেন।

কিন্তু গাড়োয়ান আবার গাড়ি চালিয়ে দিয়ে বললে, 'ভয় নেই বাবু, ও সাপ এখন শিকার নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থাকবে, আমাদের দিকে ফিরেও চাইবে না।'

অনেকের মতো আমারও আগে ভুল বিশ্বাস ছিল যে, অজগররা প্রথমে ল্যাজ দিয়ে জড়িয়ে শিকার ধরে। সেদিন ভুল ভাঙল।

তারপর খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির তলায় গিয়ে হাজির হলুম যথাসময়ে। ওখানকার বর্ণনা আর দেব না, কারণ ১৩১৬ সালের 'ভারতী' পত্রিকার সে বর্ণনা দিয়েছি।

ওখানে পাহাড়ের ওপরে ছোটো-বড়ো অনেক গুহা আছে—কোনওটির নাম রানিগুহা, কোনওটির নাম ব্যাঘ্রগুহা, কোনওটির নাম সর্পগুহা। কিন্তু সর্পগুহায় সাপ দেখিনি, দেখলুম আর একটি গুহায় গিয়ে। ভেতরে কালো রঙের মস্ত-বড়ো একটা ঝুড়ির মতন কী ওটা? ভালো করে পরীক্ষা করবার জন্যে কাছে এগিয়েই দেখি, প্রচণ্ড তীব্র দুটো হিংসুক চোখ নিষ্পলক হয়ে আমার পানে তাকিয়ে আছে! সাপ! অজগর সাপ! এমন প্রকাণ্ড ও স্থূল অজগর সাপ জীবনে আমি আর দেখিনি!

শুনেছি সাপের চোখে সম্মোহনী শক্তি আছে। আছে কি না জানি না, কিন্তু সেই অতিক্রুর দৃষ্টির সামনে আমার পা যেন পাহাড়ের পাথরের মধ্যে ঢুকে গেল আধ ইঞ্চি, আর নড়াতে পারলুম না। সঙ্গীরা তখনও নীচে, কিন্তু তাদের ডাকবার ক্ষমতাও হল না। প্রতি মুহূর্তে মনে হতে লাগল, এইমাত্র পথে ছাগলটার যে দুর্দশা দেখেছি আমারও অদৃষ্টে আজ তাই লেখা আছে।

প্রাণের আশা যখন একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি, সাপটা তখন হঠাৎ কুণ্ডলি থেকে মাথা তুলে গুহার দেওয়ালের কোণে একটা বড়ো গর্তের ভেতরে ঢুকতে লাগল ধীরে ধীরে, খুব ধীরে! তার দেহ ঢুকছে আর ঢুকছেই, যেন তার শেষ নেই!

তখন সাড় হল। আমার প্রতি অজগরের এই অসম্ভব অনুগ্রহের কারণ বুঝতে পারলুম না, বুঝতে চেষ্টাও করলুম না, পাগলের মতো দৌড় মেরে নীচে এসে সকলের কাছে হাঁপাতে হাঁপাতে সব কথা বললুম।

শুনে সঙ্গীরা তখনই পাহাড় থেকে নেমে গাড়িতে উঠে বসলেন। আমার উপরে সেদিন

বোধ হয় শনির দৃষ্টি ছিল, বললুম, 'তোমরা যাও, আমি পরে যাব। আমাকে খণ্ডগিরির সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে হবে, গুহাগুলোর মাপজোক না নিয়ে আমার ফেরবার উপায় নেই।'

আমি থেকে গেলুম। তারপর মাপজোক নিতে নিতে কখন যে বেলা পড়ে এসেছে এবং আকাশে যে পুরু মেঘের উদয় হয়েছে, মোটেই তা খেয়ালে আসেনি। হঠাৎ গায়ে দু-চার ফোঁটা জল পড়তেই তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে নামতে লাগলুম।

নীচে যখন নেমেছি, এমন তোড়ে বৃষ্টি এল যে দৌড়ে ডাকবাংলোয় ঢোকা ছাড়া আর কোনও উপায় রইল না।

সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে যখন মেঘের অন্ধকার আরও ঘনিয়ে উঠল, বৃষ্টির সঙ্গে জাগল বিষম ঝোড়ো হাওয়া। বুঝলুম আজ এই নির্জন পার্বত্য অরণ্যেই দুর্যোগের রাত্রি কাটাতে হবে একাকী!

বাংলোর বেয়ারার কাছে খবর নিয়ে জানলুম, আপাতত খাবারের কোনও ব্যবস্থাই হতে পারে না।

অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে একটা লণ্ঠন চেয়ে নিয়ে ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে খাটে উঠে শুয়ে পড়লুম।

কী ঝড়! কী বৃষ্টি! অরণ্যের মর্মর আর্তরব, পাহাড়ের গা বেয়ে হুড় হুড় করে জল নেমে আসার শব্দ, মড় মড় করে গাছের ডাল ভেঙে পড়ার আওয়াজ এবং সেই সঙ্গে আচম্বিতে জেগে উঠল ক্ষুধার্ত বা ক্রুদ্ধ বা জল-ঝড়ে বিপন্ন এক ব্যাঘ্রের গর্জনের পর গর্জন!

একলা সেই অচেনা ঘরে শুয়ে চারিদিকেই বিভীষিকার ছবি দেখে ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠতে লাগলুম। একবার মনে হল ঘরের দরজা বন্ধ করিনি, বাঘটা যদি ভিতরে ঢুকে পড়ে? তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দেখি,—না, দরজায় খিল দেওয়াই আছে!

তারপর সন্দেহ হল, খাটের তলায় বোধ হয় কেউ লুকিয়ে আছে!

আবার উঠলুম। লণ্ঠন নিয়ে খাটের তলায় একবার উঁকি মেরেই শিউরে এক লাফে আবার উপরে উঠে পড়লুম।

খাটের তলায় মেঝের উপরে এঁকেবেঁকে একটা একহাত লম্বা সাপ স্থির হয়ে পড়ে আছে।

এমন বিপদে কেউ পড়ে? খাটের উপরে আড়ষ্ট মূর্তির মতো বসে প্রায় অর্ধ অচেতনের মতো শুনতে লাগলুম বৃষ্টির শব্দ, ঝড়ের চিৎকার, অরণ্যের কান্না, ব্যাঘ্রের গর্জন।

আমার সেই সময়ের মনের ভাব, 'খণ্ডগিরির ডাকবাংলোয় রাত্রির ধ্বনি' নামে একটি কবিতায় ফোটাবার চেষ্টা করেছিলাম। কবিতাটি অনেককাল আগে 'ভারতী'তে ও 'আমার যৌবনের গান' পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। তার কয়েক লাইন এখানে তুলে দিলুম

'চুপ চুপ! ওই শোন—রম্-ঝম্ রম্-ঝম্!
ঝঞ্ঝার ঝন-ঝন—চারধার গম-গম!

অ্যাঁৎ সব ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ, স্যাঁৎ-স্যাঁৎ, হিম-হিম,
ঢাক মুখ, বোজ চোখ—ঝিম্-ঝিম্, ঝিম্-ঝিম্!
দুদ্দাড় ভাঙ দ্বার—ঝড় দেয় ঝাপটা,
বাঁশডাল টলটল—ফোঁসফোঁস সাপটা!
কুক্কুর ঘেউ-ঘেউ—ব্যাঘ্রের দলবল—
ঝরনার ঝর্ঝর—বন্যার কলকল!
বিছনায় আইঢাই, জান যায়, জান যায়,
ক্রন্দন হায়-হায় আন্ধার আবছায়!
ভয়-ভয় সবদিক—এই দিক, ওই দিক—
কে ধায়, কে চায়, কে গায়, নেই ঠিক!
কই চাঁদ—কই, কই,—আয় ভোর আয় আয়!
প্রাণটা হিমসিম—জান যায়, জান যায়!'

নিদ্রাদেবী সে রাত্রে আমার কাছে ঘেঁষতে সাহস করলেন না এবং কাছে এলেও আমি তাঁকে আমল দিতুম না। সেই ভাবেই ছবিতে আঁকা মানুষের মতো স্থির হয়ে সারারাত খাটের ওপরে বসে রইলুম।

অবশেষে ঝড় পালাল, বৃষ্টি থামল, বাঘ বিদায় নিলে, ভোর হল।

কিন্তু আমি এখন খাট থেকে নামি কেমন করে? পা বাড়ালেই সাপ-বেটা যদি ফোঁস করে কামড়ে দেয়?

সাপটা এখনও খাটের তলায় আছে কি না দেখবার জন্যে খুব সাবধানে হেঁট হয়ে একটুখানি মুখ বাড়ালুম।

আশ্চর্য! সে ঠিক তেমনি এঁকেবেঁকে সেইখানেই আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে! তবে কি ওটা মরা সাপ?

সকালের সঙ্গে সঙ্গে তখন আমার সাহসও ফিরে এসেছে। হাতের কাছেই আমার লাঠিগাছা ছিল, সেটা তুলে নিয়ে মেঝের ওপরে বার-কয়েক খটাখট শব্দ করলুম। তারপর আবার মুখ বাড়িয়ে দেখি, সাপটা একটুও নড়েনি।

তখন ভরসা করে লাঠিটা দিয়ে লাগালুম এক খোঁচা—সাপটার আড়ষ্ট দেহ খানিক তফাতে গিয়ে ছিটকে পড়ল, এতটুকু নড়ল না!

একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে খাট থেকে নেমে এগিয়ে গিয়ে দেখি, সেটা হচ্ছে স্বাভাবিক রং করা রবারের সাপ,—কলকাতার খেলনার দোকানে কিনতে পাওয়া যায়।

বাংলোর বেয়ারা আসতেই সাপটাকে তুলে তার দিকে ছুড়ে ফেলে দিলুম।

সে হাঁউমাঁউ করে চেঁচিয়ে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেল।

আমি বললুম, 'থাম থাম, অত চ্যাঁচাতে হবে না। ওটা রবারের সাপ।'

'রবারের?'

'হ্যাঁ। ওই খাটের তলায় ছিল। কিন্তু ওটা কোত্থেকে এল?'

খানিকক্ষণ রবারের সাপটার দিকে চেয়ে ভাবতে ভাবতে বেয়ারার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, 'কাল সকালে এক বাবু বাড়ির ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এখানে এসেছিলেন। ওই সাপটাকে এক খোকার হাতে দেখেছিলুম। খোকাই বোধহয় ওটাকে ভুলে ফেলে গিয়েছে।'

সম্ভব। কিন্তু অজানা এক খোকার ভুলের জন্যে শাস্তি পেলুম আমি, নিয়তির এটা সুবিচার নয়।

উড়িষ্যায় বেড়াতে এসেছিলুম আমি পাঁচবার। কিন্তু এই খণ্ডগিরি থেকে ফেরবার পথে আরও দু-বার উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল।

একবার সন্ধ্যার মুখে ভুবনেশ্বরে ফিরে যাচ্ছি। পথের পাশের ঝোপে ঝোপে গা ঢাকা দিয়ে একটা চিতাবাঘ অনেকদূর পর্যন্ত অনুসরণ করেছিল আমাদের গোরুর গাড়িকে। সম্ভবত তার দৃষ্টি ছিল গোরুদুটোর ওপরে।

আর-একবার কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে খণ্ডগিরির ডাকবাংলোয় উঠেছি।

উড়ে বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করা হল, এখানে সস্তায় মুরগি পাওয়া যায় কি না?

পাওয়া যায় শুনে মুরগি কেনবার জন্যে তখনই তাকে একটা টাকা দেওয়া হল।

তার পথ চেয়ে সকলে বসে আছি। ঘণ্টা তিনেক পরে বেয়ারা মস্ত এক বস্তা কাঁধে করে এসে হাজির।

ব্যারিস্টার-বন্ধু শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভড় সবিস্ময়ে বললেন, 'এ কী ব্যাপার, একটিমাত্র টাকায় এক বস্তা মুরগি! এত সস্তা!'

পাছে বস্তার মধ্যে মুরগিগুলো দম বন্ধ হয়ে মারা পড়ে সেই ভয়ে চটপট বস্তার মুখ খুলে ফেলা হল। দেখা গেল আমাদের ভয় অমূলক, মারা পড়বার কোনও উপায়ই নেই।

কারণ বস্তার মধ্যে রয়েছে কেবল কাঁড়ি কাঁড়ি মুড়কি। হতচ্ছাড়া উড়ে-বেয়ারা মুরগি আনেনি, কিনে এনেছে এক টাকার মুড়কি!

বিপদ-নাট্যের দুটি দৃশ্য

প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে ছোটো ছোটো এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যা বর্ণনা করলে গল্পের আসরে নিতান্ত মন্দ শোনায় না। বারকয়েক আমিও এমনি ঘটনা-বিপ্লবে পড়েছিলুম, অবশ্য ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। আজ গুটি দুয়েক ঘটনার কথা তোমরা শোনো। কিন্তু মনে রেখো, এ দুটি সত্য-সত্যই সত্য ঘটনা!

প্রথম ঘটনাটি ঘটেছিল বছর ষোলো আগে, দেওঘরে। সপরিবারে হাওয়া খেতে গিয়ে বাসা বেঁধেছিলুম উইলিয়ামস টাউনে। আমাদের বাসা ছিল ওদিককার শেষ বাড়িতে। তারপরই মাঠ আর বন, তারপর নন্দন পাহাড়।

পূর্ণিমা। নন্দন পাহাড়ের ওপরে একলাটি বসে বসে দেখলুম, পশ্চিমের আকাশকে রঙে ছুপিয়ে সূর্য নিলে ছুটি। তারপর কখন যে বেলাশেষের আলোর সঙ্গে ঝরঝরে চাঁদের আলো মিলে অন্ধকার আবির্ভূত হওয়ার পথ বন্ধ করে দিলে, কিছুই জানতে পারিনি। মিষ্টি জোছনায় চারদিক হয়ে উঠল স্বপ্নলোকের চিত্রশালার মতো। মনের ভেতর থেকে বাসায় ফেরবার জন্যে কোনও তাগিদ এল না।

কিন্তু হুকুম এল বাইরে থেকে। বোধ করি অন্ধকারই ষড়যন্ত্র করে হঠাৎ একরাশ কালো মেঘকে দিলে আকাশময় ছড়িয়ে, চন্দ্রালোক হল তাদের মধ্যে বন্দি। যদিও অন্ধকার খুব গাঢ় হল না, তবু রাত্রির রহস্যের ভেতরে চিত্রজগৎ গেল অদৃশ্য হয়ে। কবিত্বের খেয়াল ছুটে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে ধরলুম বাসার পথ।

হাঁটতে হাঁটতে উইলিয়ামস টাউনে এসে পড়েছি, ওই তেমাথাটা পার হলেই বাসার পথ। তেমাথা পার হয়ে বাসায় গিয়ে পৌঁছতে দেড় মিনিটের বেশি লাগে না।

কিন্তু ঠিক তেমাথার পথ জুড়ে বসে আছে কে ও? যদিও অন্ধকারে তার চেহারা বোঝবার উপায় ছিল না, তবু সে যে মানুষ নয় এতে আর সন্দেহ নেই। কুকুর? উঁহু, কুকুর অত বড়ো হয় না। কালো গোরু কি মোষ? না, তাও তো মনে হচ্ছে না! আমার কাছ থেকে হাত-পনেরো তফাতে দাঁড়িয়ে গম্ভীর ভাবে সে আমাকে নিরীক্ষণ করছে, অন্ধকারের চেয়ে কালো এক পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মতো,—এবং দপ দপ করে জ্বলছে তার দু-দুটো দুষ্টু, হিংসুক চক্ষু!

হাতে ছিল একগাছা বাবু-ছড়ি—অর্থাৎ যার দ্বারা ইঁদুরও বধ করা যায় না। তবু সেইটেকেই মাটিতে ঠুকে ঠকাঠক শব্দ করে বললুম, 'এই! হট, হট!'

ভয় পাওয়া দূরে থাক—অন্ধকার মূর্তিটা আমার দিকে আরও কয়-পা এগিয়ে এসে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে নীরবে আমাকে লক্ষ করতে লাগল। নির্জন নিস্তব্ধ রাত্রে তার বেপরোয়া নীরবতাকে ভয়ানক বলে মনে হল। ওটা কী জানোয়ার? ও কি আমাকে খাবার বলে মনে করেছে?

বুকের মধ্যে শুরু হয়েছে তখন রীতিমতো কাঁপুনি। তবু বাইরে কোনওরকম ভয়ের ভাব না দেখিয়ে পকেট থেকে বার করলুম সিগারেটের কৌটো। ধাঁ করে মাথায় কী বুদ্ধি এল, একসঙ্গে দুটো সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে খুব বেশি হুস হুস শব্দে টানতে লাগলুম! ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছে, তবু টানের পর টানের আর বিরাম নেই।

দুই সিগারেটের আগুন আর ধোঁয়া দেখে জানোয়ারটা কী ভাবলে জানি না, কিন্তু পায়ে পায়ে এগিয়ে তেমাথা পার হয়ে আরও খানিক দূরে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল, তারপর

সেই ভয়ানক দপদপে চোখদুটো দিয়ে আমাকে দেখতে লাগল। বোধহয় সে কিঞ্চিৎ ভড়কে গেছে; বোধহয় সে কখনও একটা মানুষের মুখে দুটো জ্বলন্ত জিনিস দেখেনি।

আমি বুঝলুম, এই আমার সুযোগ। প্রাণটি হাতে করে দুটো সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে আমি অগ্রসর হলুম—তাকে যেন গ্রাহ্যই করি না এমনি ভাব দেখিয়ে।

তেমাথার মোড় ফিরে বাসার পথে পড়লুম। কয়েক পা চলে মাথাটি একটু ফিরিয়ে আড়চোখে দেখলুম, সেই মস্ত বড়ো কালো জন্তুটা আবার আমার অনুসরণ করছে। আমাকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে দেখে সে বোধকরি বুঝতে পেরেছে, আমার মুখে একাধিক আগুন থাকলেও তার পক্ষে আমি বিপজ্জনক নই!

আর নিজেকে সামলাতে পারলুম না। প্রাণপণ বেগে ছুটতে শুরু করলুম। জন্তুটাও তখন আমার পিছনে পিছনে ছুটে আসছিল কি না জানি না। কারণ আমি আর ফিরে তাকাইনি। বাসাবাড়ির সদর দরজার দিকে গেলুম না, কারণ দরজা হয়তো ভেতর থেকে বন্ধ আছে এবং খুলতে দেরি হলে পিছনের জানোয়ারটা হয়তো হুড়মুড় করে আমার ঘাড়ের ওপরেই এসে পড়তে পারে। অতএব লম্বা দৌড়ে চার-পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে এসে পড়লুম বাসার পাঁচিলের সামনে এবং তারপর একটিমাত্র লাফে পাঁচিল টপকে একবারে ভেতরকার উঠোনে।

তোমরা আমার ছোটো ছোটো বন্ধু এবং বন্ধুদের কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, জীবনে আর কখনও আমি সেদিনকার মতো ভয়ানক ভয় পাইনি।

পরদিন সকালে খবর পেলুম, গতকল্য রাত্রে উইলিয়ামস টাউনে একটা ভাল্লুক নৈশ-বায়ু সেবন করতে এসেছিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল প্রায় সাতাশ-আটাশ বৎসর আগে। আমার বয়স তখন অল্প। জীবনটা কবিত্বের রঙিন কল্পনায় সুমধুর।

গোমো জংশন খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা শুনে বাবা আমায় পাঠালেন গোমোয় একখানা বাড়ি ভাড়া করবার জন্যে।

বসতি হিসাবে আজকাল গোমোর কতটা উন্নতি হয়েছে বলতে পারি না; কিন্তু যখনকার কথা বলছি তখন গোমোয় হাওয়া-ভক্ষকদের উপযোগী বাড়ি পাওয়া যেত না। অনেক খুঁজে রীতিমতো জঙ্গলের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা বাসা পাওয়া গেল, তার নাম ডি কস্টা সাহেবের বাংলো।

আমার চোখে মনে হল তাকে আদর্শ বাংলো। মানুষের বেড়াতে যাওয়া উচিত এমন কোনও জায়গায়, যেখানে নেই ঘিঞ্জি শহরের ধোঁয়া, ধুলো আর হট্টগোলের উপদ্রব। এক শহর থেকে আর এক শহরে গেলে বায়ু পরিবর্তন হয় না।

ডি কস্টা সাহেব কবিতা লিখতেন কি না খবর পাইনি, কিন্তু মনে মনে তিনি কবি ছিলেন নিশ্চয়। কারণ বাংলোখানি তৈরি করেছিলেন শ্রেণিবদ্ধ শৈলমালার কোলে, লোকালয় থেকে দূরে। ওপরে পাহাড়ের বুকে আমলকী গাছের সবুজ ভিড়, নীচে চারদিকে শালবনের পর শালবন আর ছোটো-বড়ো ঝোপঝাপ। মানুষের চিৎকার নেই, আছে শুধু মর্মর তান আর পাখিদের গান। দূরে দেখা যাচ্ছে, নীলাকাশের অনেকখানি জুড়ে, ধবধবে সাদা জৈন মন্দিরের চূড়ো পরে চিরস্থির নিরেট মেঘের মতো পরেশনাথ পাহাড়। প্রকৃতির রূপে মন নেচে উঠল। বাংলোখানি ভাড়া করে ফেললুম।

নির্দিষ্ট দিনে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে আমরা সপরিবারে গোমোয় গিয়ে হাজির হলুম।

কিন্তু বাংলোর অবস্থা দেখেই আমার বাবার চক্ষুস্থির! রেগে আমাকে বললেন, 'হতভাগা ছেলে, আমাদের তুই বনবাসে এনেছিস? সব তাতেই তোর কবিত্ব? এখানে শেষটা কি বাঘ-ভালুকের পেটে যাব? এ যে গহন বন, কী সর্বনাশ!'

আমার দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলোর হাতার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল একটা রাখাল ছেলে। বাবার কথায় সায় দিয়ে বললে, 'হ্যাঁ বাবুজি, এ কুঠি কেউ ভাড়া নেয় না। শীতকালে ওই বারান্দায় বাঘ এসে শুয়ে থাকে।'

তখন শীতকাল। বাবা অত্যন্ত চমকে উঠে বললেন, 'অ্যাঁঃ, বলিস কী রে? না, মজালে দেখছি।'

মা কিন্তু বাংলোর পিছনের পথের দিকে খুশি-চোখে তাকিয়ে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলেন, 'আহা, কী চমৎকার! ওগো, দ্যাখো—দ্যাখো, ওখানে কেমন বনের হরিণরা চরে বেড়াচ্ছে,—ঠিক যেন তপোবন!'

বাবা আরও রেগে গিয়ে বললেন, 'রাখো তোমার তপোবন! খবরদার, কেউ আর মোটমাট খুলো না, আজ রাতটা কোনওগতিকে এখানে কাটিয়ে কালকেই কলকাতায় পালাতে হবে।'

মা বেঁকে বসে বললেন, 'কলকাতায় পালাতে হয় তুমি একলা পালিয়ো। আমরা এখানেই থাকব।'

অনেক কথা-কাটাকাটির পর মায়ের জিদ দেখে বাবা শেষটা হার মানতে বাধ্য হলেন।

কিন্তু বাবা যে মিথ্যে ভয় পেয়েছিলেন তা নয়। তোমরা মহাকবি রবীন্দ্রনাথের দিদি, সুপ্রসিদ্ধ মহিলা কবি ও ঔপন্যাসিক স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর নাম নিশ্চয়ই শুনেছ? তাঁর কাছেও পরে আমি এই বাংলোর উজ্জ্বল বর্ণনা করেছিলুম। বাংলোখানি বিক্রয় করা হবে শুনে তিনি কেনবার জন্যে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। পরে স্বচক্ষে বাংলোর অবস্থান দেখে তাঁর সমস্ত উৎসাহ জল হয়ে যায় এবং আমাকে চিঠিতে লেখেন, 'হেমেন্দ্র, বাঘ-ভালুক কি

ডাকাতের পাল্লায় পড়ে আমার প্রাণ গেলেই কি তুমি খুশি হও? এ কী ভীষণ স্থান, এখানে কি মানুষ বাস করতে পারে?'

সুতরাং তোমরা বুঝতেই পারছ, আমি কবিত্বে অন্ধ হয়ে কীরকম জায়গা নির্বাচন করেছিলুম! কিন্তু এটাও শুনে রাখো, দু-মাস সেখানে ছিলুম, বাংলোর মধ্যে কোনওরকম বিপদে পড়িনি।

কিন্তু বিপদে পড়েছিলুম বাংলোর বাইরে প্রাকটিক্যাল জোক করতে গিয়ে। সেই কথাই এবারে বলছি।

খাঁচায় বন্ধ পাখি ওড়বার শক্তি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু কলকাতার মেয়েরা দিনরাত ইটের পিঞ্জরে বন্দি হয়ে থেকেও পদচালনার শক্তি যে হারিয়ে ফেলেন না, তাঁদের শহরের বাইরে নিয়ে গেলেই সে প্রমাণ পাওয়া যায়।

পরিবারের অন্যান্য মেয়েদের নিয়ে মা রোজ বিকালেই মহা-উৎসাহে বেড়াতে যান এবং বনজঙ্গল পাহাড়ের ভেতর দিয়ে নদীর ধার পর্যন্ত গিয়ে সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত ভ্রমণ করে তবে বাংলোয় ফিরে আসেন।

বাবা নিয়মিত-রূপে প্রতিবাদ করেন। আমিও মানা করি। সত্যই এটা বিপজ্জনক। কিন্তু মেয়েরা কেউ আমাদের আপত্তি আমলেই আনেন না।

শেষটা মনে দুষ্টবুদ্ধি মাথা নাড়া দিয়ে উঠল। আমার একখানি ব্যাঘ্রচর্ম ছিল। আমি সেখানিকে আসনরূপে ব্যবহার করবার জন্যে গোমোতেও নিয়ে গিয়েছিলুম।

একদিন বিকালে বাড়ির মেয়েরা নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছেন, সেই বাঘ-ছালখানি গুটিয়ে সঙ্গে নিয়ে আমিও বাংলো থেকে বেরিয়ে পড়লুম। নদীর ধার থেকে বাংলোয় ফেরবার পথ আছে একটিমাত্র,—মেয়েদের সেই পথ দিয়েই ফিরতে হবে।

স্থির করলুম, এই বাঘ-ছালে নিজের সর্বাঙ্গ মুড়ে, পথের ধারের কোনও ঝোপের ভেতর থেকে মেয়েদের ভয় দেখাতে হবে। তা হলেই, অর্থাৎ একবার ভয় পেলেই তাঁরা কেউ আর বনজঙ্গলে বেড়াতে আসবেন না।

অবশ্য এই প্র্যাকটিকাল জোক-এর মূলে ছিল সাধু উদ্দেশ্য। কিন্তু ফল দাঁড়াল হিতে বিপরীত।

পথের ধারে, পাহাড়ের পায়ের তলায় যুতসই একটি ঝোপ খুঁজে পেলুম। আকাশে তখন সূর্য নেই, সন্ধ্যা হয় হয়। বাঘের ছালে সর্বাঙ্গ ঢেকে সেই ঝোপের মধ্যে আধখানা দেহ ঢুকিয়ে জমি নিয়ে বাগিয়ে বসলুম।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পরই দূর থেকে শুনতে পেলুম মেয়েদের কৌতুক-হাসিময় কণ্ঠ। বুঝলুম, সময় হয়েছে।

বাঘ-ছালের মুখের দিকটা নিজের মুখের ওপরে চাপা দিতে যাচ্ছি, হঠাৎ পাহাড়ের

ওপর দিকে চোখ পড়ে গেল অকারণেই। যা দেখলুম দুঃস্বপ্নেও কখনও দেখিনি।

হাত ত্রিশেক ওপরে, ঢালু পাহাড়ের গায়ে স্থিরভাবে বসে, একটা আসল মস্তবড়ো বাঘ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার পানে!

প্রথমটা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। কিন্তু পরমুহূর্তেই সমস্ত সন্দেহ ঘুচে গেল। কারণ বাঘের দেহটা স্থির বটে, কিন্তু তার ল্যাজটা লটপট করে আছড়ে পড়ছে পিছনের ঝোপ দুলিয়ে বারংবার। ওরকম ল্যাজ আছড়ানোর অর্থ বোধহয়, সে উত্তেজিত হয়েছে দস্তুরমতো!

এ দৃশ্য দেখবার পরেও কারুর প্রাণে আর প্র্যাকটিক্যাল জোক-এর প্রবৃত্তি থাকে না,—থাকে কি? তাড়াতাড়ি বাঘ ছালখানা ছুড়ে ফেলে দিয়ে টেনে লম্বা দিতে যাচ্ছি,—

এমন সময়ে ওপরের বাঘটা অস্পষ্ট একটা গর্জন করে হঠাৎ লাফ মেরে তার পিছনের ঝোপের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল! অদৃশ্য হওয়ার সময়ে তার সেই চাপা গর্জনের অর্থ তখন বুঝতে পারিনি, কিন্তু পরে মনে হয়েছে, সে বোধহয় বলতে চেয়েছিল, 'ওরে ধূর্ত মানুষের বাচ্চা! তুই আমাকে যতটা বোকা ভাবছিস, আমি ততটা বোকা নই!'

বলা বাহুল্য, আমি কিন্তু সেখানে আর এক সেকেন্ডও দাঁড়াইনি। পাগলের মতন দিলুম বাংলোর দিকে সুদীর্ঘ এক দৌড়,—একবারও এ কথা মনে উঠল না যে, বাঘটা যদি আবার তদারক করতে আসে তা হলে বাড়ির মেয়েদের অবস্থা কী হবে!

কিন্তু বাংলোয় পৌঁছে নিজের কাপুরুষতার কথা মনে করবার সময় পেলুম। বাসায় বাবা তখন ছিলেন না। লাঠিসোটা, চাকর-বাকরদের নিয়ে আবার যখন বেরিয়ে এলুম তখন দেখি, মেয়েরা মনের সুখে হাসতে হাসতে ও গল্প করতে করতে ফিরে আসছেন!

ভাবলুম, বাঘটা হঠাৎ অমন করে পালাল কেন? বোধহয় একে ব্যাঘ্রচর্মাবৃত মানুষ দেখেই সে চমকে গিয়েছিল, তার ওপরে মরা বাঘের চামড়াখানা ছুড়ে ফেলে দিতে দেখে জ্যান্ত বাঘটা ভেবে নিয়েছিল যে, তাকে বিপদে ফেলবার জন্যে দুষ্টু মানুষের এ কোনও নতুন ফাঁদ বা ফন্দি! এ ছাড়া তার আচরণের আর কোনোই মানে হয় না।

আমার স্মৃতির গ্রামোফোনে আরও কয়েকটি বিচিত্র ঘটনার রেকর্ড আছে। কিন্তু এক দিনেই আমার পুঁজি খালি করতে চাই না। তোমাদের ভালো লাগলে ভবিষ্যতে আরও গল্প বলতে পারি।

আমার অ্যাডভেঞ্চার

[অনেককাল আগে একটি বিলাতি গল্প পড়েছিলুম। লেখকের নাম মনে নেই। কিন্তু গল্পটি ভালো লেগেছিল বলে তার প্লট এখনও বেশ মনে আছে। তোমাদেরও ভালো লাগতে

পারে এই বিশ্বাসে সেই গল্পটির ছায়া অবলম্বন করে এই কাহিনিটি আরম্ভ করা হল।]

'অন্নচিন্তা চমৎকারা' কি না জানি না, কারণ বাবা পরলোকে গিয়েছেন ব্যাংকের টাকা ইহলোকে রেখেই। কাজেই 'কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই।' ওরই মধ্যে একটুখানি ফাঁক পেলেই তাস-দাবা খেলি আর পরচর্চা করি।

উঃ, জীবনটা কী একঘেয়েই না লাগছে! তিতিবিরক্ত হয়ে স্থির করলুম, এইবারে দু-একটা অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ব।

কিন্তু আমার উপযোগী অ্যাডভেঞ্চার কই? গায়ে জোর নেই, পথে-ঘাটে কাবলিওয়ালার সঙ্গে হাতাহাতি বা ফুটবলের মাঠে গোরার সঙ্গে গুঁতোগুঁতি করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এমন সাহস নেই যে, উড়োজাহাজে চড়ে অন্য কারুর রেকর্ড ভাঙব। এমনকি আমি ব্যাডমিন্টন বা টেবিলটেনিস পর্যন্ত খেলতে পারি না।

ছেলেবেলায় মার্বেল, গুলি-ডান্ডা আর হা-ডু-ডু-ডু খেলেছিলুম বটে, কিন্তু সে সবকে তোমরা তো কেউ অ্যাডভেঞ্চার বলে মানতে রাজি হবে না?

কিন্তু আমার বুদ্ধি আছে বলে আমি বিশ্বাস করি। কেবল সুবুদ্ধি নয়, দুষ্টুবুদ্ধিও। অতএব নিজের বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে আমি একটা নতুন অ্যাডভেঞ্চারের পথ আবিষ্কার করে ফেললুম। অর্থবলের সঙ্গে বুদ্ধিবল থাকলে অ্যাডভেঞ্চারের ভাবনা কী?

সেদিন রাঁচি ফাস্ট প্যাসেঞ্জার হাওড়া থেকে খড়গপুরে যেতে পুরো আধ ঘণ্টা লেট হয়ে গিয়েছিল কেন, তোমরা কি কেউ সে গুপ্ত খবর রাখো?

হাওড়া থেকে ট্রেনের একখানা ফাস্ট ক্লাস কামরায় ঢুকে দেখি, গাড়ির ভেতরে যাত্রী আছেন খালি আর-একটি ভদ্রলোক! চেহারা দেখলেই মনে হয়, যেন একটি পেট-মোটা গ্লাডস্টোন ব্যাগ।

নিজের আসনে বসে খানিকক্ষণ স্টেশনের ভিড় দেখলুম। তারপর ফিরে কামরার ভদ্রলোকটিকে ডেকে শুধালুম, 'মশাইয়ের কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

ভদ্রলোক তাঁর শিকারি বিড়ালের মতো গোঁফে তা দিতে দিতে বললেন, 'রাঁচি।'

'হাওয়া খেতে?'

'না, সেখানে আমার জমিদারি আছে।'

'মশাই তাহলে জমিদার?'

ভদ্রলোক আমার দিকে মস্তবড়ো গোলগাল মুখখানা ফিরিয়ে গোঁফের আড়ালে হাসলেন কি দাঁত খিঁচোলেন, স্পষ্ট বোঝা গেল না।

আমি মুখ তুলে কমিউনিকেশন কর্ডের দিকে তাকালুম। ওখানে লেখা রয়েছে, অকারণে ওই কর্ড বা শিকল ধরে টানলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হবে। এ নোটিশ তোমরাও নিশ্চয় ট্রেনে চড়ে লক্ষ করেছ? পথে হঠাৎ কোনও বিপদ হলে ওই কর্ড বা শিকল ধরে টানলেই চলন্ত ট্রেন তখনই থেমে যায়।

ট্রেন তখন হাওড়া ছেড়ে মাঠের ভেতর দিয়ে, গ্রামের পর গ্রামের পাশ দিয়ে দৌড়তে শুরু করেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। খানিকক্ষণ চুপচাপ বাইরের দৃশ্য দেখলুম। কিন্তু সেখানে অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ না পেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালুম এবং কমিউনিকেশন কর্ড ধরে মারলুম এক জোর-টান!

গোঁফে তা দেওয়া শেষ করে জমিদার তখন ঘুমোবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু ব্যাপার দেখে তিনি চমকে, আশ্চর্য স্বরে বলে উঠলেন, 'অ্যাঁ-অ্যাঁ—করেন কী?'

আর করেন কী, দেখতে দেখতে মাঠের মধ্যিখানে ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ল।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম, গার্ড সাহেব হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে।

আমি একগাল হেসে বললুম, 'Good evening guard!'

'কর্ড ধরে কে টেনেছে?'

'আমি।'

'কেন? কামরায় কেউ খুন হয়েছে?'

'নাঃ!'

'কামরায় হঠাৎ কারুর অসুখ করেছে?'

'উঁহু। আচ্ছা, গার্ড! আজ কেমন সুন্দর চাঁদ উঠেছে বলো দেখি?'

গার্ড প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে তাকিয়ে বলল, 'ও, তাই নাকি? কতটা মদ খাওয়া হয়েছে?'

'মদ! চাঁদ দেখা আর মদ খাওয়া এক কথা নাকি?'

'বাজে কথা রাখো! কর্ড ধরে টেনেছ কেন বলো।'

'শখ হয়েছে তাই টেনেছি। এই শখের দাম পঞ্চাশ টাকা তো? আমি দাম দিতে রাজি আছি। দামটা কি এখনই নেবে?'

'আচ্ছা, খড়্গপুরে পৌঁছে সেটা দেখা যাবে। আপাতত তোমার নাম আর ঠিকানা দাও।'

নাম-ঠিকানা নিয়ে গার্ড গজগজ করতে করতে চলে গেল। ট্রেন আবার ছুটল।

আড়-চোখে চেয়ে দেখলুম, জমিদারের শিকারি গোঁফজোড়া কী এক ভয়ে কাবু হয়ে ঝুলে পড়েছে। আমি আবার কমিউনিকেশন কর্ডের দিকে স্থির-চোখে তাকিয়ে রইলুম।

জমিদার ত্রস্ত স্বরে বললেন, 'ওকী মশাই, আপনি ওদিকে তাকিয়ে আছেন কেন? শিকল ধরে ফের টান মারবেন নাকি?'

আমি হাসিমুখে বললুম, 'বোধহয় আর-একবার টান মারব।'

জমিদার তাড়াতাড়ি উঠে অনেক দূরে গিয়ে আড়ষ্টভাবে বসে পড়লেন। তারপরে যেই আন্দুল স্টেশনে গাড়ি থামল, তিনি শশব্যস্ত হয়ে নিজের ব্যাগটা তুলে নিয়ে কামরা ছেড়ে নেমে গেলেন।

আমি বললুম, 'কী মশাই, এই না বললেন, আপনি রাঁচি যাচ্ছেন?'

জমিদার আমার দিকে একটা ভীত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই দৌড় মারলেন। বোধহয় তিনি অন্য কামরায় গিয়ে উঠলেন। বোধহয় তিনি আমাকে বদ্ধ পাগল ভাবলেন।

গাড়ি ছাড়ল। অনেকক্ষণ ধরে কবিত্বের চর্চা করলুম—অর্থাৎ দেখতে লাগলুম, ধু ধু মাঠ, ঝোপঝাপ, গাছপালা আর ঘুমন্ত গ্রামের ওপরে চাঁদের আলোর কল্পনা। চাঁদের বাহার দেখে শিয়ালরা হুক্কা-হুয়া গান গেয়ে উঠল।

কিন্তু বেশি কবিত্ব আমার ধাতে সয় না। আমি চাই অ্যাডভেঞ্চার! অতএব গাত্রোত্থান করে আবার কর্ড ধরে দিলুম জোরে এক টান!

আবার গাড়ি থামল। অবিলম্বেই গার্ডের পুনরাবির্ভাব। এবারে তার অগ্নিমূর্তি। হুমকি দিয়ে বললে, 'মাতলামি করবার জায়গা পাওনি? জানো, তোমাকে আমি গাড়ি থেকে নামিয়ে দেব?'

আমি পরম শান্ত ভাবেই বললুম, 'জানো, আমি জীবনে কখনও মদ খাইনি? জানো, আমি ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জার? জানো, আমাকে অপমান করেছ বলে আমি তোমার নামে রিপোর্ট করব?'

'তোমার যা-খুশি কোরো বাবু! কিন্তু কেন তুমি আবার কর্ড ধরে টেনেছ? এবারেও কি শখ হয়েছে?'

'না, এবারে শখ নয়। এবারে আমার ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। তোমার ঘড়ির সঙ্গে সেটাকে মিলিয়ে নিতে চাই।'

'কী আশ্চর্য, এই জন্যে তুমি ট্রেন থামিয়েছ? দু-বারে তোমাকে একশো টাকা জরিমানা দিতে হবে। এরপরে আবার কর্ড ধরে টানলে ট্রেন আর থামবে না।'

'রাত্রে যদি আমি ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখি, তাহলেও ট্রেন থামবে না? তাও কি হয় বন্ধু? আমি আরও জরিমানা দেব, আবার কর্ড ধরে টানব। গাড়ি না থামলে আমি তোমার নামে নালিশ করব। আইন না মানলে তোমার শাস্তি হবে। বুঝেছ?...যাও, আর আমায় বাজে বকিয়ো না!'

গার্ড ফিরে যেতে যেতে হঠাৎ কী ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর বললে, 'তোমার টিকিট দেখি!'

আমি অনেকক্ষণ ধরে পকেট হাতড়ে হাতড়ে হাওড়া থেকে খড়্গপুরের একখানা থার্ড ক্লাস টিকিট বার করলুম।

গার্ড মহা উৎসাহে এক লাফ মেরে বলে উঠল, 'যা ভেবেছি তাই!'

আমি গম্ভীর স্বরে বললুম, 'তুমি কী ভেবেছ, আমি জানতে চাই না। তবে এই টিকিটের ওপরে বাড়তি যা দাম হবে আমি তা দিতে রাজি আছি।'

গার্ড কড়াস্বরে বললে, 'রেখে দাও তোমার ওসব চালাকি! নামো ফার্স্ট ক্লাস থেকে! যাও থার্ড ক্লাসে।'

গদির ওপরে জাঁকিয়ে, সম্পূর্ণ বিদেশি কায়দায় আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পড়ে বললুম, 'আমি এখান থেকে নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু, বাবা! আমি আইন জানি। তুমি এখান থেকে আমাকে তাড়াতে পারবে না।'

গার্ড ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, 'আচ্ছা, পরের স্টেশনেই, তোমার কী অবস্থা হয়, দেখো। ট্রেন লেট হয়ে গেছে, এখানে আমি আর গোলমাল করতে চাই না।'

আমি দুই হস্তের দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বললুম, 'তুমি আমার কলা করবে। আমি পাঁচশো টাকা বাজি হারব—পরের স্টেশনে কেউ যদি এই কামরা থেকে আমাকে এক-পা নড়াতে পারে।'

কামরার সামনে, লাইনের ওপরে তখন অন্যান্য আরোহীরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। সেই জনতার শেষপ্রান্তে আমি জমিদারমশাইয়ের শিকারি গোঁফজোড়াও আবিষ্কার করলুম।

গার্ডও তাঁকে দেখে বললে, 'বাবু, আপনিও এই কামরায় ছিলেন না?'

জমিদার বললেন, 'ছিলুম। কিন্তু পাগলের কাছ থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি।'

গার্ড বললে, 'আপনাকে আমি সাক্ষী মানব।'

আমি বললুম, 'জমিদারমশাই, আমরা দুজনেই সহযাত্রী ছিলুম, আপনি আমার সাক্ষী।'

শিকারি গোঁফ-জোড়া আবার ঝুলে পড়ল, নিজের মোটা দেহ নিয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে জমিদার অদৃশ্য হয়ে গেলেন তৎক্ষণাৎ।

গার্ড বললে, 'তুমি আমার সাক্ষী ভাঙাবার চেষ্টা করছ? বহুত আচ্ছা, পরের স্টেশনেই তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে।'

আমি হো হো করে হেসে বললুম, 'আমি প্রস্তুত হয়েই রইলুম। তোমার মতন দশ-বিশটা গার্ডকে আমি ট্যাঁকে পুরতে পারি। বাছাধন, পরের স্টেশনে খালি তুমি কেন, সমস্ত রেল কোম্পানিকে আমি অভ্যর্থনা করতে রাজি আছি।'

রাগে ফুলতে ফুলতে জনতা সরিয়ে, গার্ড নিশান নেড়ে সিগন্যাল দিলে। গাড়ি আবার চলল।

আবার খানিকক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে বসে দেখতে লাগলুম, গাছের ওপরে চাঁদের রুপোলি আলো আর গাছের নীচে কালো অন্ধকার। মাঠে মাঝে মাঝে পুকুরের জল চকচক করছে।

একবার কমিউনিকেশন কর্ডে-র দিকেও দৃষ্টিপাত করলুম। কিন্তু তাকে নিয়ে তৃতীয়বার টানাটানি করতে ভরসা হল না।

পরের স্টেশন হচ্ছে উলুবেড়িয়া। ট্রেন স্টেশনের ভেতরে-ঢুকল। খানিক পরেই গার্ড এল স্টেশনমাস্টার এবং আরও জনকয়েক লোককে সঙ্গে নিয়ে। স্টেশনমাস্টার আমাকে ডেকে হুকুম দিলে, 'গাড়ি থেকে তুমি নেমে এসো। তোমার টিকিট দেখাও।'

বললুম, ‘গাড়ি থেকে না নেমেই আমি টিকিট দেখাতে পারি। এই দ্যাখো!’ বসেই ফস করে একখানা ফার্স্ট ক্লাস টিকিট বার করে ফেললুম।

দুই চক্ষু ছানাবড়ার মতো বিস্ফারিত করে গার্ড খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইল। তারপর বিস্মিত স্বরে বললে, ‘একটু আগেই ওই বাবু আমাকে থার্ড ক্লাস টিকিট দেখিয়েছে।’

বললুম, ‘হতে পারে। আমি দু-রকম টিকিট কিনেছি। খুশি হলে আমি চার রকম টিকিটও কিনতে পারি। কিন্তু সেটা বেআইনিও নয়, আর সেজন্যে তোমাদের মুখনাড়াও সইতে রাজি নই। যাও, এখান থেকে সরে পড়ো!’

স্টেশনমাস্টার গলাটা যথাসম্ভব ভারিক্কে করে তুলে বললে, ‘কর্ড ধরে টেনে তুমি দু-বার ট্রেন থামিয়েছ।’

‘হ্যাঁ, এই নাও দাম’ বলেই একখানা একশো টাকার নোট বার করে ফেলে দিলুম।

স্টেশনমাস্টার বললে, ‘এ যাত্রা তোমাকে ছেড়ে দিলুম, কিন্তু ভবিষ্যতে এমন কাজ আর কোরো না।’

অদূরে আবার দেখা দিয়েছে সেই শিকারি গোঁফজোড়া। গোঁফের মালিককে সম্বোধন করে বললুম, ‘আসুন জমিদারবাবু, আবার এই কামরায় এসে উঠুন। আপনার আর কোনও ভয় নেই।’

কিন্তু আমার পাগলামি সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ এখন বোধহয় দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। গোঁফের সঙ্গে তাঁর মুখখানা আবার সাঁৎ করে কোথায় মিলিয়ে গেল।

আমার কিছু টাকা খরচ হল বটে, কিন্তু এই অ্যাডভেঞ্চারটা তোমাদের কেমন লাগল?

ভোম্বলদাসের ভাগনে

[সত্য ঘটনা]

॥ এক ॥

শিকারের গল্পে আমরা বাঘ-ভালুক ও সিংহ-গন্ডারের অনেক কথাই পড়ি,—কখনও হিংস্র পশু এবং কখনও-বা মনুষ্য বধের কথা। সেসব হচ্ছে দুঃসাহসিকতার ও ভীষণতার কাহিনি। কিন্তু মানুষের সঙ্গে যখন হিংস্র পশুর মুখোমুখি দেখা হয়, তখন সময়ে-সময়ে কীরকম হাস্যরসের অবতারণা হতে পারে, এখানে তার কিছু কিছু পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করব। সকলে মনে রাখবেন, এগুলি গালগল্প নয়, বিখ্যাত সত্য ঘটনা! প্রত্যেক ঘটনার বহু সাক্ষী আছে।

মার্টিন জনসনের ‘Lion’ নামক পুস্তকে প্রথম গল্পটি আছে। ঘটনাক্ষেত্র হচ্ছে আফ্রিকা—

পশুরাজ সিংহের স্বদেশ। প্রথম ঘটনাটির নায়ক হচ্ছেন ভারতবাসী, তিনি 'ব্রিটিশ ইস্ট-আফ্রিকান রেলওয়ে'র একটি ছোটো স্টেশনের মাস্টার ছিলেন। ওই রেল লাইনে ভারতের আরও অনেক লোক চাকরি করত। কেবল ওখানে নয়, আফ্রিকার নানা প্রদেশে হাজার হাজার ভারতীয় লোক আছে।

স্টেশনের নাম কিমা। নির্জন স্থান, চারদিকে গভীর জঙ্গল।

হঠাৎ কোন খেয়ালে সেখানে বেড়াতে এসে একটা মস্ত সিংহ টের পেলে যে, এখানে খুব সহজেই মানুষ-খাদ্য পাওয়া যায়। সে রোজ সেখানে এসে হানা দিতে লাগল এবং কয়েকজন কুলিকে পেটে পুরে তার রাক্ষুসে খিদে আরও বেড়ে উঠল। যে-সিংহ বা যে-বাঘ একবার মানুষের মাংসের স্বাদ পায়, সে আর কোনও পশুর দিকে ফিরেও তাকায় না।

এসব হাসিঠাট্টার কথা নয়,—চারদিকে ভয়ের সাড়া পড়ে গেল। মানুষরা আর ঘর থেকে বেরোয় না, সিংহের বড়োই অসুবিধা।

তখন সে স্টেশনে তদন্ত করতে এল। স্টেশনমাস্টার নিজের ঘরে বসে কাজকর্ম করছেন, হঠাৎ মুখ তুলে দেখেন, প্লাটফর্ম দিয়ে পশুরাজ আসছেন তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে।

বলাবাহুল্য, এরকম আলাপে তিনি রাজি হলেন না। একলাফে উঠে দমাদম দরজা-জানলা বন্ধ করে দিলেন।

মানুষের অভদ্র-ব্যবহার ও অসভ্য অভ্যর্থনা দেখে পশুরাজের রাগ হল। 'হালুম' বলে গর্জন করে সে একলাফে স্টেশনের ছাদের ওপরে গিয়ে উঠল।

ছাদটা ছিল করোগেটের! বড়ো বড়ো থাবা আর দাঁত দিয়ে সিংহ করোগেটের পাত টেনে খুলে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল।

ঘরের ভেতর বসে সিংহের মতলব বুঝে স্টেশনমাস্টারের নাড়ি ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম হল। পাঁচ-ছয় মন ওজনের মস্ত একটা সিংহের ভারে ও থাবার চোটে স্থানে স্থানে করোগেটের পাত ফাঁক হয়ে গেল! স্টেশনমাস্টার পরিত্রাহি চিৎকার করতে লাগলেন, কিন্তু কারুর সাড়া পাওয়া গেল না। যাদের সাহায্য করবার কথা, পশুরাজের আবির্ভাবে তারা চটপট অন্তর্হিত হয়েছে!

সিংহকে তাড়াবার আর কোনও উপায় নেই দেখে স্টেশনমাস্টার তখনই ট্রাফিক ম্যানেজারের কাছে এই চমৎকার টেলিগ্রাম পাঠালেন—'সিংহ স্টেশনের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। শীঘ্র সৈন্য প্রেরণ করুন—(Lion fighting with station, Send urgent succour)!

ভারতীয় স্টেশনমাস্টারের এক অপূর্ব টেলিগ্রাম আফ্রিকায় অমর হয়ে আছে। সেখানকার লোকেরা বিদেশি শিকারিদের কাছে আগে এই গল্পটি বলে।

উপসংহারে জানিয়ে রাখি, স্টেশনের সঙ্গে যুদ্ধ করে সিংহ সেবারে জয়ী হতে পারেনি!

॥ দুই ॥

দ্বিতীয় ঘটনাটি পেয়েছি প্রসিদ্ধ শিকারি মেজর ডবলু রবার্ট ফোরান সাহেবের 'Kill or Be Killed' নামক গ্রন্থে।

কেনিয়ার জঙ্গলে সিম্বা বলে ছোটো একটি রেল স্টেশন আছে—সেখানকারও স্টেশনমাস্টার হচ্ছেন একজন ভারতীয় বাবু!

ওদেশি ভাষায় সিম্বা বলতে সিংহ বোঝায়। সুতরাং সিম্বা স্টেশনে সিংহের যে অবাধ আধিপত্য, সেটা বোধহয় আর খুলে বলতে হবে না।

ভারতের নিরীহ বাবু অতশত খবর রাখতেন না, চাকুরির লোভে সেখানে গিয়ে পড়লেন তিনি মহাফ্যাসাদে। কারণ সিংহেরা সেখানেও রোজ 'স্টেশনের সঙ্গে যুদ্ধ' করতে আসতে লাগল! ভারতের বাবু, বাঘের কথাই জানেন, সিংহের বিক্রম দেখে প্রমাদ গুণলেন।

স্টেশনে ভারতীয় কুলিরা কাজ করত। খিদে পেলেই সিংহেরা এসে তাদের কারুকে-না-কারুকে মুখে তুলে নিয়ে চলে যেত। সিম্বা স্টেশন হয়ে দাঁড়াল সিংহদের খাবারের দোকানের মতো। হ্যাঁ, দোকানের মতো বটে, কিন্তু খাবারের জন্যে পয়সা লাগে না।

স্টেশনটি নতুন। তখনও সেখানে পাকা ঘর তৈরি হয়নি। কাজেই স্টেশনমাস্টারকে থাকতে হত তাঁবুর ভেতরেই।

তাঁবুর ভেতরে বাবু রাত্রে ঘুমোতে পারেন না। নিস্তব্ধ রাত্রের নীরবতা টুটে চারদিকে বনে বনে গন্ডার ঘোঁতঘোঁত করে, হায়েনা হা হা হাসে, হিপোপটেমাস ভয়ানক চ্যাঁচায়, চিতেবাঘ খ্যাঁক-খেঁকিয়ে ওঠে এবং সবচেয়ে যারা ভয়ংকর সেই সিংহের দল মেঘের মতো গর্জন করে যেন বলে—মানুষের গন্ধ পাই, আজ কাকে খাই!

তাঁবুর আনাচে-কানাচে সিংহদের পায়ের শব্দ শোনা যায়, বাবু আঁতকে উঠে মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে থাকেন।

প্রতিদিনই এই কাণ্ড। প্রতিদিনই বাবুর মনে হয়, আজই তাঁর জীবনের শেষ দিন।

কুলিরা গাছে চড়ে রাত কাটায়। কিন্তু বাবুর সে ভরসাও হয় না, গাছে চড়ে ঘুমোবার অভ্যাস তাঁর নেই।

ভারতের বাবু, বুদ্ধি তো কম নয়। চট করে একটা উপায় আবিষ্কার করে ফেললেন।

স্টেশনের প্লাটফর্মের ওপরে পড়ে ছিল প্রকাণ্ড একটা জলের ট্যাংক, তার ভেতরে জল ছিল না।

বাবু ট্যাংকের ফোকরে মাথা গলিয়ে দেখলেন, কোনওরকমে ভেতরে তাঁর ঠাঁই হতে পারে। খুশি হয়ে তিনি মনে মনে বললেন, সিম্বা স্টেশনের ধুম্সো সিংহ! আজ থেকে এর মধ্যে ঢুকে তোকে আমি সুবৃহৎ কদলী দেখাব! লোহার ট্যাংক তুই ভাঙতেও পারবি না, আর এই ছোট্ট ফোকর দিয়ে তোর অতখানি গতরও গলবে না! ওহো, কী মজা!'

মজার কথাই বটে! বাবু তখনই কুলিদের হুকুম দিলেন, 'এই! ট্যাংকটাকে তোরা আমার তাঁবুর ভেতর টেনে নিয়ে যা!'

সে রাত্রে ট্যাংকের মধ্যে বালিশ ও বিছানা ফেলে দিয়ে বাবুও ঢুকে পড়লেন। ট্যাংকের ফোকরটা রইল ওপর দিকে। সে রাত্রেও সিংহরা 'মানুষের গন্ধ পাই' বলে চ্যাঁচাতে ও চতুর্দিকে টহল দিতে লাগল। বাবু মনে মনে হেসে বললেন, 'তোদের আমি থোড়াই কেয়ার করি! আর তোরা আমাকে খুঁজে পাবি না।' অনেক রাত পরে বাবু আজ নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রাদেবীর সেবা করলেন।

এক রাত, দুই রাত, তিন রাত যায়। বাবু রোজ প্রাণ ভরে ঘুমোন। স্টেশনের অন্যান্য লোক বাবুর সৌভাগ্যে হিংসায় ফেটে মরে। এমন মজার শয়ন-গৃহ সিম্বা স্টেশনে আর ছিল না। কেল্লার মতো দুর্ভেদ্য শয়ন-গৃহ, পশুরাজের জারিজুরি সেখানে খাটবে না।

চতুর্থ রাত্রে এক সিংহের ভারী খিদে পেলে। খাবারের দোকান সিম্বা স্টেশনে, কিন্তু সেখানে খাবারের গন্ধটুকুও নেই। জ্যান্ত খাবারগুলো ঝুলছে উঁচু উঁচু গাছের মগডালে, লাফ মেরেও নাগাল পাওয়া যায় না।

খাবার খুঁজতে খুঁজতে সিংহ গেল স্টেশনমাস্টারের তাঁবুর কাছে এবং গিয়েই মানুষের গন্ধ পেলে। থাবা মেরে তাঁবুর কাপড় ছিঁড়ে সে ভেতরে ঢুকল। সেখানেও খাবার নেই!

কিন্তু গন্ধ আছে! আর শোনা গেল সুখে নিদ্রিত বাবুর নাক-ডাকার আওয়াজ! সিংহ এক লাফে ট্যাংকের ওপরে আরোহণ করলে। ফোকরে নাক রেখে ভোঁস করে এক নিশ্বাস টেনে মনে মনে বললে, কী তোফা মানুষের গন্ধ! প্রাণ জুড়িয়ে গেল!

ততক্ষণে বাবুর ঘুম ভেঙে গিয়েছে এবং ফোকরের দিকে কটমট করে তাকিয়ে তিনি নিদ্রাভঙ্গ হওয়ার মূর্তিমান কারণটিকে দেখতেও পেয়েছেন। এবং বুঝতেও পেরেছেন, এই মজার শয়নগৃহের আসল মজাই হচ্ছে, এখান থেকে পালাবার কোনও উপায়ই নেই। বাইরে থাকলে ছুটে পালাবার পথ পাওয়া যেত, কিন্তু আজ তিনি মজার শয়নগৃহে থেকেই মজলেন!

সিংহ ফোকরের মধ্যে ঝাঁকড়া চুলে ভরা হেঁড়ে মাথাটা গলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে, কিন্তু গলল না। তখন লম্বা লম্বা নখগুলো বার করে একখানা থাবা ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে সে ঘন ঘন নাড়তে লাগল—পরমান্নের কড়ায় হাতা দিয়ে লোকে যেমন করে নাড়ে!

বাবু আড়ষ্ট ও চিত হয়ে ট্যাংকের তলার সঙ্গে মিশিয়ে পড়ে রইলেন—নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু! এবং তাঁরই দেহের কয়েক ইঞ্চি ওপরে ক্রমাগত বোঁ বোঁ করে ঘুরছে আর ঘুরছে আর ঘুরছে পশুরাজের বিপুল থাবা! থাবা যদি আর এতটুকু নীচে নামে, তাহলেই বঁড়শিতে গাঁথা মাছের মতো বাবুর দেহ টপ করে উঠে পড়বে ট্যাংকের ওপরে! এমন দৃশ্য কেউ কল্পনা করতে পারেন?

প্রতি মিনিটেই সেই ভয়াবহ থাবা ট্যাংকের ভেতরে নতুন নতুন দিকে ঘুরতে থাকে, আর বাবুর চোখদুটো ছানাবড়ার মতো হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে পড়তে চায় ও দাঁতে দাঁত লেগে ঠকাঠক করে আওয়াজ হয়! এই ব্যাপার চলল ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে!

তারপর পশুরাজ থাবা তুলে নিয়ে ট্যাংকের ওপরে বসে আক্রমণের নতুন ফন্দি ঠিক করতে লাগল। বাবু অল্প একটু হাঁপ ছেড়ে স্বগত বোধহয় বললেন, হে মা সিংহবাহিনী, তোমার সিংহকে সুবুদ্ধি দাও মা, তাকে অন্য কোথাও যেতে বলো!

কিন্তু সিংহের সুবুদ্ধি হল না, খানিক জিরিয়ে নিয়ে অন্য কোনও উপায় না দেখে আবার সে ট্যাংকের ভেতরে বিষম থাবা নাড়া শুরু করলে। বাবু মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যান। জ্ঞান হলে পর আবার চেয়ে দেখেন, সিংহের থাবা তখনও বোঁ বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে তাঁকে খুঁজছে! আবার অজ্ঞান হয়ে যান। থাবার এত কাছে এমন টাটকা খাবার দেখে ভোম্বলদাসের ভাগনের উৎসাহ কিছুতেই কমতে চায় না। সিংহ বা মানুষ, কেউ কখনও এমন মুশকিলে ঠেকেনি।

তাঁবুর বাইরে গন্ডার, হিপোপটেমাস, হায়েনা ও অন্যান্য সিংহদের কোরাস ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে একেবারে থেমে গেল। অরণ্যের অন্ধকার সরিয়ে অল্পে অল্পে ঊষার আলো ফুটতে লাগল। ভোরের পাখিদের গলায় জাগল নতুন প্রভাতের আশার গান।

তখন সিংহের মনে পড়ল, আর বাসায় না ফিরলে চলবে না। বিরক্ত মনে মুখের খাবার ফেলে সে ট্যাংক থেকে নেমে পড়ে সুড় সুড় করে আবার বনের ভেতরে গিয়ে ঢুকল।

কুলিরা তখন বৃক্ষশয্যা ত্যাগ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে মহা হইচই লাগিয়ে দিয়েছে!— 'বাবু কই? বাবু কই? এখনও বাবুর দেখা নেই, তিনিও সিংহের ফলার হলেন নাকি?'

একজন ভেবেচিন্তে বললে, 'মজার শয়নগৃহে শুয়ে বাবু এখনও মজায় নিদ্রা দিচ্ছেন। চল, তাঁকে জাগিয়ে দিই গে!'

মজার শয়নগৃহে উঁকি মেরে দেখা গেল, বাবু একেবারে অচেতন! এবং তাঁবুর ভেতরে পশুরাজের পদচিহ্ন! তখন আসল ব্যাপারটা আন্দাজ করতে বিলম্ব হল না। তারপর বহু কষ্টে বাবুর মৃতবৎ দেহকে টেনে বার করে আনা হল। সেই এক রাত্রেই অসম্ভব আতঙ্কে বাবুর মাথার কালো চুল পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে!

অনেকক্ষণ পরে বাবুর জ্ঞান হল। তাঁর দুর্দশার ইতিহাস শুনে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

বাবু ক্ষীণস্বরে বললেন, 'পরের ট্রেনে আমি এখান থেকে পালাব। পরের স্টিমারে আমি ভারতবর্ষে ফিরে যাব। আমার চাকরি চাই না, আপনি বাঁচলে বাপের নাম!'

ভারতীয় কুলিরা বললে, 'সিম্বা স্টেশনে আমাদেরও আর থাকা পোষাবে না। গাছের ডালে বসে আর আমরা ঘুমোতে পারব না।'

পরদিন থেকে সিম্বায় এল নতুন স্টেশনমাস্টার, নতুন কুলির দল। তাদের পরিণামের কথা ফোরানসাহেব বলেননি।

সিঙ্গির মামা ভোম্বলদাসকে কেউ দেখেনি। কিন্তু তাঁর ভাগনেকে হাতের কাছে পেয়ে একবার একটি মানুষ কীরকম ঠকিয়ে দিয়েছিল, পৃথিবী বিখ্যাত শিকারি লেফটেনান্ট কর্নেল প্যাটার্সন সাহেবের কেতাবে তা লেখা আছে।

এ ঘটনাটিও ঘটেছিল আফ্রিকার পূর্বোক্ত রেলপথ নির্মাণের সময়ে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে হাজার হাজার কুলি কাজ করতে যেত বলে সিংহদের ভোজসভায় মহোৎসব পড়ে গিয়েছিল। এমন সুযোগ সিংহরা আর কখনও পায়নি।

সিংহ-ব্যাঘ্রদের কাছে মানুষের চেয়ে নিরীহ ও সহজ শিকার আর নেই। বনবাসী অধিকাংশ জীবেরই কামড়াবার জন্যে মস্ত ধারালো দাঁত, বা গুঁতোবার জন্যে লম্বা-লম্বা শিং, বা লাথি ছোড়বার ও পালাবার জন্যে খুরওয়ালা দ্রুতগামী পা, বা আঁচড়াবার জন্যে ভীষণ নখওয়ালা চারখানা ঠ্যাং আছে, কিন্তু মানুষ বেচারাদের সেসব কিছুই নেই। তুচ্ছ ভেড়াদেরও মতো তারা জোরসে ঢুঁ পর্যন্ত মারতে পারে না এবং সাপের মতো বিষ ও পাখির মতো ডানা থেকেও তারা বঞ্চিত। মানুষকে ধরো, মারো আর গপ করে খেয়ে ফ্যালো,—তারা অতীব নিরাপদ সুখাদ্য!

সারাদিনের কাজকর্ম সেরে কুলি এবং অন্যান্য কর্মচারীরা তাঁবু খাটিয়ে অসাড়ে নিদ্রা যেত। সকালে উঠে প্রায়ই দেখত, দলের দুই-এক জন লোক কমেছে। ব্যাপারটা তাদের একরকম গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল।

এক রাত্রে তাঁবুর মধ্যে আরামে ঘুমোচ্ছিল এক গ্রিক। শীতের ঠান্ডা রাত, গ্রিক লোকটির সর্বাঙ্গ লেপে ঢাকা।

নিঝুম রাত, কিন্তু নিস্তব্ধ নয়। আফ্রিকার অরণ্য রাত্রেই বেশি করে শব্দময় হয়ে ওঠে, তার প্রত্যেক শব্দই ভয়াবহ!

একটা সিংহ নিঃশব্দে গ্রিকের তাঁবুর ভেতরে গিয়ে ঢুকল। সিংহরা যখন শিকার করতে চায় তখন টুঁ শব্দটি করে না, তখন সে হয় মৃত্যুর মতন নীরব!

তাঁবুর ভেতরে ঢুকে সিংহ গ্রিক লোকটিকে দেখতে পেলে না, কারণ সে তখন লেপের মধ্যে অদৃশ্য। কিন্তু নরখাদক সিংহরা জানে, শীতকালে মানুষরা থাকে লেপের তলাতেই। এ সিংহটারও সে বুদ্ধি ছিল, কাজেই অন্য কোনও গোলমাল না করে সে প্রকাণ্ড এক হাঁ করে লেপ ও বিছানা একসঙ্গে কামড়ে ধরে বাইরে টেনে নিয়ে গেল।

বলা বাহুল্য গ্রিক-বাবাজির ঘুম তখন ভেঙে গিয়েছে এবং বুঝতে পেরেছে সে পড়েছে সিংহের কবলে! কিন্তু ভয়ে ভেবড়ে গিয়ে সে বোকার মতন চেঁচিয়ে উঠল না, একেবারে চুপটি মেরে রইল। সে যে জেগেছে সিংহ তা সন্দেহ করতেও পারলে না, সস্তা খোরাকের বস্তা নিয়ে মস্ত বনের ভেতরে ঢুকে পড়ল।

বনের মধ্যে দিব্যি একটি নিরিবিলি জায়গা পেয়ে সিংহ তার মোট নামিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে

বসল। মানুষের টাটকা রক্ত-মাংসে আজকের নৈশভোজটা সুসম্পন্ন হবে, তার মনে ফুর্তি আর ধরে না!

থাবা মেরে একটানে লেপখানা সরিয়ে দিয়েই কিন্তু দুই চক্ষু তার স্তম্ভিত! লেপের তলায় খাবার নেই। ফোক্কা!

সে যখন হিড়হিড় করে লেপ ও বিছানা টেনে আনছিল, দুষ্টু মানুষটা সেই সময়ে কোন ফাঁকে মাঝখান থেকে চুপিচুপি হড়কে বেরিয়ে সরে পড়েছে, কিছুই টের পাওয়া যায়নি!

ফরাসি বিপ্লবে বাঙালির ছেলে

কিছু কম দুশো বছর আগেকার কথা।

পৃথিবীর স্থলপথে তখন ডাকাতদের ভিড়, আর জলপথে বোম্বেটেদের জয়যাত্রা।

পৃথিবীর দেশে দেশে তখন দাসব্যাবসা চলছে পুরোদমে। বোম্বেটেরা জলে করত যাত্রীদের জীবন ও সর্বস্ব হরণ এবং আফ্রিকার ডাঙায় নেমে করত কালো মানুষ চুরি! লাল মানুষদের দেশ আমেরিকায় উড়ে গিয়ে জুড়ে বসে সাদামানুষরা গোলাম আর কুলির কাজে খাটাবে বলে এইসব কালো মানুষকে দাম দিয়ে কিনে নিত।

কালো মানুষ বলতে সাধারণত বোঝায়, কাফ্রিদের। হতভাগ্য কাফ্রি জাতি! ইতিহাসের প্রথম যুগ থেকেই দেখি, পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্য দেশেই কাফ্রিরা বন্দি হয়ে গোলাম রূপে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটছে! রোমে, আরবে—এমনকি, ভারতেও রাজাবাদশা ও বড়োলোকদের ঘরে ঘরে কাফ্রি গোলাম রাখার প্রথা ছিল।

আঠারো শতাব্দীতে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে সম্ভ্রান্ত সমাজের সুন্দরী বিলাসিনীরাও শখ করে

কাফ্রি গোলাম পুষত। গোলামদের গায়ের রং সাদা নয় বলে তাদের মানুষ বলেই মনে করা হত না। আমরা যেমন কুকুর, বিড়াল ও পাখিদের আদর করে পুষি, অথচ তাদের উচ্চতর জীব বলে মনে করি না, ইউরোপীয় শৌখিন মেয়েরাও ওই কাফ্রি গোলামদের সেই ভাবেই দেখতেন। দিগ্বিজয়ী সম্রাট নেপোলিয়নের ছোটোবোন পলিন স্পষ্টই বলেছিলেন, 'কাফ্রিদের সামনে আবার লজ্জা করব কেন? কাফ্রিরা মানুষ নাকি?'

আর একটা কথা জানিয়ে রাখি। ইউরোপীয় সুন্দরীদের কাছে তখন সবচেয়ে বেশি আদর ছিল, কাফ্রি-জাতের ছোকরা গোলামদের।

বাঙালিদের রং কাফ্রিদের মতন কালো নয় বটে, কিন্তু তামাটে। সাহেবদের চোখে তামাটে ও কালো রঙের মধ্যে কোনও তফাত ধরা পড়ে না। তারা দুই রংকেই এক বলে ধরে নিয়ে গালাগালি দেয়। অথচ পর্তুগাল ও স্পেনের অনেক ইউরোপীয়েরও গায়ের রং অনেক ভারতবাসীর চেয়ে কালো। কিন্তু ইউরোপে জন্মেছে বলে তারা কালো হলেও কালো নয়!

প্রায় দুশো বছর আগে বাংলায় ছিল ফিরিঙ্গি বোম্বেটেদের বিষম দৌরাত্ম্য।

পূর্ববাংলা নদনদীপ্রধান বলে ফিরিঙ্গি বোম্বেটে সেইখানেই অত্যাচার করবার সুবিধা পেত বেশি। তারা নৌকায় ও ছোটো ছোটো জাহাজে চড়ে নদী বেয়ে দেশের ভিতরে ঢুকত। মাঝে মাঝে ডাঙায় নেমে গ্রাম ও শহর লুট করে আবার পালিয়ে যেত। বোম্বেটেদের জ্বালায় পূর্ববাংলা তখন অস্থির হয়ে উঠেছিল।

একদিন শ্যামল বাংলার এক কালো শিশু হয়তো গ্রামের পথে বা নদীর ধারে আপন মনে নেচেখেলে বেড়াচ্ছিল; কিংবা হয়তো সে স্নেহময়ী মায়ের কোলে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে খেলার স্বপন দেখছিল। হয়তো তার নাম ছিল কালু বা ভুলু, কানাই বা বলাই। হয়তো সে ছিল বাঙালি মুসলমানের ছেলে—তার নাম ছিল করিম বা অন্য কিছু। এসব বিষয়ে ঠিক করে আমি কিছু বলতে পারি না। কারণ, ইতিহাস এসম্বন্ধে নীরব। ইতিহাস কেবল বলে, ওই অনামা খোকাটি বাংলারই ছেলে।

গ্রামে হানা দিতে এসে ফিরিঙ্গি বোম্বেটেদের শনির দৃষ্টি পড়ল হঠাৎ সেই খোকাটির উপরে। তাদের মনে পড়ে গেল, ইউরোপের সুন্দরীমহলে কৃষ্ণবর্ণ শিশুগোলামের ভারী আদর! এ কাফ্রি শিশু নয় বটে, কিন্তু রং যার সাদা নয়, তাকে কাফ্রি ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

বোম্বেটেরা বাংলার সেই দুলালকে চুরি করে পালিয়ে গেল।

সেদিন সেই শিশু মাকে হারিয়ে এবং তার মা কোলের ছেলেকে হারিয়ে কত কেঁদেছিল, ইতিহাস তার বর্ণনা করেনি, কিন্তু আমরা অনুমান করতে পারি। আরও কল্পনা করতে পারি, সেখানকার সেই কান্না সারা জীবনই জেগে ছিল তার বুকের ভিতরে। এবং যারা তার এই কান্নাকে স্থায়ী করেছিল, সে যে তাদের ক্ষমা করতে পারেনি, এটাও আমরা জানতে পারব যথাসময়ে।

চলো, তোমাদের কত সাগর কত নদীর ওপারে, কত যুগ আগেকার নতুন দেশে নিয়ে যাই।

দেশের নাম হচ্ছে, ফ্রান্স। দুশো বছর আগে ইউরোপে ফ্রান্সের তুলনা ছিল না। ফরাসিরা যে খাবার খায়, সারা ইউরোপ তাই খেতে ভালোবাসে; ফরাসিরা যে পোশাক পরে, সারা ইউরোপ তারই নকলে সাজগোজ করে।

এই বিখ্যাত দেশের মস্ত রাজা তখন পঞ্চদশ লুই। একদিকে লুই যে নির্দয় রাজা ছিলেন, তা নয়; কিন্তু রাজা হতে গেলে যে যে গুণের দরকার, পঞ্চদশ লুইয়ের মধ্যে তা ছিল না। তিনি রাজকার্য দেখতেন না, সর্বদাই তুচ্ছ আমোদ প্রমোদ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকতেন। ফলে ফ্রান্স হয়ে পড়ে অরাজক দেশের মতো এবং প্রজাদের হয় অত্যন্ত দুরবস্থা। এইজন্যেই পঞ্চদশ লুইয়ের মৃত্যুর পর ষোড়শ লুইয়ের রাজত্বকালে প্রজারা খেপে উঠে বিদ্রোহী হয়ে রাজা রানি ও আমিরওমরাদের হত্যা করে। ইতিহাসে ওইসব ঘটনা ফরাসি বিপ্লব নামে বিখ্যাত।

কাউন্ট দ্যুব্যারির বউয়ের সঙ্গে পঞ্চদশ লুইয়ের অত্যন্ত বন্ধুত্ব হয়—সে মাদাম দ্যুব্যারী নামে সুপরিচিত।

দ্যুব্যারি ছিল খুব সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী। রাজা তার গল্প শুনতে ভালোবাসেন, তার পরামর্শে ওঠেন বসেন। দ্যুব্যারির মুখের কথায় বড়ো বড়ো ওমরাকে রাজপদ থেকে বঞ্চিত করা হয়, আবার তার একটি ইঙ্গিতে পথের ভিখারিও আমির হয়ে দাঁড়ায়! সকলেই তার অনুগ্রহ লাভের জন্য ব্যস্ত। কারণ, আগে সে খুশি না হলে, রাজা খুশি হন না!

দ্যুব্যারি রাজবাড়িরই এক মহলে থাকে। রাজা নিত্য তাকে দামি দামি ভেট পাঠান। নয় মন ওজনের সোনার তাল এনে রাজা তার ড্রেসিং টেবিলের আসবাব গড়িয়ে দিলেন! তার এক-একটি পোর্সিলেনের কফির পিয়ালার দাম হাজার হাজার টাকা। তার জামাকাপড়ের দাম যে কত লক্ষ টাকা, সে হিসাব রাখা অসম্ভব। তার জড়োয়া গহনার বিনিময়ে একটি রাজ্য বিকিয়ে যায়। এইভাবে দ্যুব্যারির মন রাখবার জন্যে রাজা দু-হাতে প্রজার টাকা খরচ করেন। রাজ্যময় অভাবের হাহাকার, কিন্তু প্রজাদের কাছ থেকে কেড়ে আনা অর্থে দ্যুব্যারির প্রমোদকক্ষ আলোকোজ্জ্বল! দ্যুব্যারির নাম শুনলে প্রজারা জ্বলে ওঠে!

একটা তুচ্ছ নারীর শক্তি রাজার চেয়েও বেশি দেখে দেশের আমিরওমরারাও দ্যুব্যারির উপরে খড়্গহস্ত হয়ে উঠল।

দ্যুব্যারির একটি কাফ্রি খোকাগোলাম পোষবার শখ হল! বাজার থেকে তখনই একটি গোলাম কিনে আনা হল—যেমন করে কিনে আনা হয় বানর বা কুকুর।

সে হচ্ছে ফিরিঙ্গিদের চুরি করে আনা আমাদের সেই বাংলার অনামা ছেলে।

সোনার খাঁচায় বন্দি করলে বনের পাখি কি খুশি হয়? দেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে বাপ-মায়ের আদরের কোল হারিয়ে বাংলার ছেলে ফিরিঙ্গি রাজবাড়ির গোলামি পেয়ে কি খুশি হয়েছিল? একটু পরেই আমরা জানতে পারব!

গোলামকে দ্যুব্যারির ভারী পছন্দ হল! পোষা কুকুরকে নাম দিতে হয়, নতুন গোলামকে কী নামে ডাকা যায়?

সবাই শুধোয়, 'ওরে তোর নাম কী?'

বাঙালির ছেলে, ফরাসি ভাষা জানে না, কাজেই চুপ করে থাকে।

তখন একজন প্রিন্স তার নাম দিলেন, 'জামোর'! ইতিহাসে বাংলার ছেলে এই নামেই বিখ্যাত হয়ে আছে।

দ্যুব্যারির কৃপায় জামোর খাঁটি সোনার কাজকরা বহুমূল্য পোশাক পেলে। তার জন্যে ব্যবস্থা হল

ভালো ভালো খাবারের। রাজবাড়ির ঘরে ঘরে দ্যুব্যারির আদরের দুলাল হেসে নেচে খেলে বেড়ায়। যেখানে আমিরওমরার প্রবেশ নিষেধ, সেখানেও জামোরের অবাধ গতি! আমিরওমরারা জামোরকে প্রসন্ন রাখতে ব্যস্ত, কারণ, সে দ্যুব্যারির প্রিয়পাত্র! দ্যুব্যারি এক মিনিটও তাকে চোখের আড়ালে রাখতে পারে না—এত তাকে ভালোবাসে!

কিন্তু বাংলার ছেলে জামোর কি বুঝতে পারেনি, দ্যুব্যারি নিজের পোষা কুকুরকেও তার চেয়ে কম ভালোবাসেন না?

সাধারণ লোকেরা জামোরকে কাফ্রি বলে জানত। কিন্তু ঐতিহাসিকরা স্পষ্টভাষায় তাকে 'native of Bengal' বলে বর্ণনা করেছেন। বিখ্যাত ফরাসি চিত্রকর Decrenze দ্যুব্যারির সঙ্গে জামোরের একখানি তৈলচিত্র এঁকেছিলেন। দ্যুব্যারি কফির পেয়ালা নিয়ে পান করছে, আর বালক জামোর ঠিক প্রিয় কুকুরের মতো কর্ত্রীর মুখের পানে চেয়ে ট্রে হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। তার রং কালো বটে, কিন্তু তার নাক-মুখ-চোখে 'কাফ্রিত্ব' নেই। রাজ-চিত্রকর স্বচক্ষে জামোরকে দেখেই তার মূর্তি এঁকেছিলেন।

প্রসিদ্ধ ফরাসি লেখক গনকোর্ট এই বলে জামোরের বর্ণনা করেছেন : 'তাকে বিকটাকার মনুষ্যত্বের নমুনারূপে দেখা হত। সে সকলকে জলখাবারের থালা জোগাত, মেয়েদের ছাতা বহন করত, খুশি হলে ডিগবাজি খেত। আঠারো শতাব্দীর বিজাতীয় রুচি এই শ্রেণির ছোট্ট বিকৃতাকার জীবকে অত্যন্ত পছন্দ করত এবং নিগ্রোদের ভাবত ক্ষুদ্র দু-পেয়ে জন্তুর মতো!

বাংলার ছেলে জামোর ফ্রান্সে থেকে নিশ্চয়ই ফরাসি ভাষা শিখেছিল। এবং সে যখন শুনত, তাকে বিকটাকার কাফ্রি ও দু-পেয়ে জন্তুর মতন দেখা হয়, তখন তার মন কি কর্ত্রীঠাকুরানির প্রতি কৃতজ্ঞতায়

পরিপূর্ণ হয়ে উঠত? এত সানুগ্রহ সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য কি তখন তার সর্বাঙ্গে বিষাক্ত কাঁটার মতো বিঁধত না? শীঘ্রই এর উত্তর পাওয়া যাবে।

বাঙালি হচ্ছে—কাফ্রি। বাঙালি হচ্ছে—দু-পেয়ে জন্তু। কেননা, তার চামড়া কটা নয়!

ফ্রান্সের রাজার ছিল অনেক প্রাসাদ এবং প্রত্যেক প্রাসাদেই সর্বময় কর্তারূপে থাকতেন একজন করে গভর্নর। গভর্নরের পদে তখন পদবিওয়ালা সম্ভ্রান্ত লোক ছাড়া আর কারুকে বসানো হত না। একদিন রাজার কাছে দ্যুব্যারি আবেদন জানালে, 'মহারাজ, আপনার লুসিয়েনেস প্রাসাদে গভর্নরের আসন খালি হয়েছে। আমার জামোরকে ওই আসনে বসাতে চাই!'

পঞ্চদশ লুই চমকে উঠে বললেন, 'বলো কী! সম্ভ্রান্ত লোক ছাড়া আর কেউ যে গভর্নরের পদ পায় না। জামোর গভর্নর হলে অন্যান্য গভর্নরদের মান কোথায় থাকবে? রাজ্যের লোক কী মনে করবে?'

দ্যুব্যারি বললে, 'রাজ্যের লোকের কথা আমি গ্রাহ্য করি না! এখানকার আমিরওমরারা আমার শত্রু! আমি তাদের বুঝিয়ে দিতে চাই, আমার চোখে তারা জামোরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়!'

রাজা হেসে বললেন, 'বেশ, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। এসো জামোর, আজ থেকে তুমি গভর্নর! তোমার মাহিনা হল চারশো টাকা!'

সেযুগে চারশো টাকার দাম এখনকার চেয়ে ঢের বেশি ছিল!

যেদেশে জামোরের জন্ম, সেখানে পশুবানরের বিবাহে কোনও কোনও মানুষবানর লাখ টাকা খরচ করেছে। সে-ও পোষা কুকুর বিড়ালের মতন জীবন্ত খেলনা, তাকে গভর্নরের পদে বসিয়ে তার মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান দেখানো হল না, বরং তার নীচতাকে যে উঁচু করে তুলে ধরা হল দেশের উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মাথা নিচু করবার জন্যেই, এটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি যে বাঙালির ছেলে জামোরের ছিল না, একথা মনে করা চলে না।

গনকোর্ট হয়তো সেইজন্যেই বলেছেন, 'প্রাসাদ হল গভর্নর জামোরের—বনের পাখির সোনার খাঁচার মতো!'

'বিকটাকার মানুষ', 'দু-পেয়ে জন্তু' জামোর মহামান্য গভর্নর হয়ে মুখে নিশ্চয় একগাল হেসেছিল, কিন্তু তার অপমানিত মনের মধ্যে কী প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠেছিল, পরের দৃশ্যেই আমরা তা দেখতে পাব!

পরের দৃশ্যের যবনিকা তুললুম প্রায় বিশ বৎসর পরে।

ইতিমধ্যে পঞ্চদশ লুই মারা পড়েছেন, ষোড়শ লুই কয়েক বৎসর রাজ্য করে, পূর্বপুরুষদের পাপে নির্দোষ হয়েও বিদ্রোহী প্রজাদের হাতে রানির সঙ্গে প্রাণ দিয়েছেন।

সমস্ত ফরাসি জাতি রক্তপিপাসায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, সকলেরই মুখে এক কথা,—'এতদিন ধরে যারা প্রজাদের রক্ত শোষণ করেছে, আমাদের অনাহারে রেখে আমাদেরই কষ্টার্জিত অর্থে বিলাসের খেলনা কিনেছে, আজ তাদের রক্ত চাই!'

জামোর সেদিন রাজবাড়িতে ছিল না,—ছিল সশস্ত্র বিদ্রোহী প্রজাদের সঙ্গে! সে আর বালক নয়, পূর্ণবয়স্ক যুবক। সেদিন সে আর কারুর গোলাম নয়, বাংলার সুনীল আকাশেরই মতন স্বাধীন! সেদিন সে

ভালো করেই বুঝতে পেরেছে, তাকে 'দু-পেয়ে জন্তু' ভেবে এতদিন কারা তার মনুষ্যত্বকে ব্যঙ্গ করেছে!

বিচারালয়ের কাঠগড়ায় উঠে বন্দিনী দ্যুব্যারি সভয়ে স্তম্ভিত নেত্রে দেখলে, তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্যে উঠে দাঁড়াল, রাজবাড়ির পোষা জ্যান্ত খেলনা, বিকটাকার মনুষ্যত্বের নমুনা, জামোর। আজ জামোরের মুখে কৃপাপ্রার্থী আবদারের হাসি নেই, তার দুই চক্ষে জ্বলজ্বল করছে বাংলা দেশের মুক্ত জাগ্রত মনুষ্যত্বের প্রতিহিংসাবহ্নি!

জামোর একে একে দ্যুব্যারির সমস্ত কথা প্রকাশ করে দিলে।

শেষ দৃশ্য।

চারিদিকে বিপুল জনতা। সকলেই চিৎকার করছে—'মার, মার। যারা মনুষ্যত্বকে মর্যাদা দেয়নি, গরিবকে মানুষ ভাবেনি, তাদের সকলকে হত্যা কর।'

গিলোটিনের তলায় হাড়িকাঠে গলা দিয়ে অভাগিনি দ্যুব্যারি সকাতরে চেঁচিয়ে উঠল, 'বাঁচাও, বাঁচাও! দয়া করো! আমার যথাসর্বস্ব দান করব।'

ভিড়ের ভিতর থেকে নিষ্ঠুর ভাষায় কে বললে, 'তোমার যথাসর্বস্ব তো প্রজাদেরই নিজস্ব সম্পত্তি।'

গিলোটিনের খাঁড়া নেমে এল। দ্যুব্যারির ছিন্নমুণ্ড আর কোনও কথা কইলে না।

এদৃশ্য চোখে দেখা যায় না। জনতার ভিতরে কি জামোরও ছিল?

জানি না।

ইতিহাস আর তাকে নিয়ে মাথা ঘামায়নি।

শিকলপরা বাঙালি গোলাম জামোর, ফরাসিদের সাহিত্যে ও চিত্রকলায় অমর হয়ে আছে। কিন্তু গোলামির শিকল খুলে স্বাধীন জামোর কোথায় গেল, সেকথা কেউ বলতে পারে না।

বনের পাখিকে সোনার খাঁচায় বন্দি করে কেউ ভেব না, তার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করছে। তোমরা যাকে মনে করো পাখির আনন্দের গান, সে হচ্ছে পাখির দারুণ অভিশাপ।

অ্যাডভেঞ্চারের রোমাঞ্চ

॥ ক ॥

রাবিশ। লোকে নাকি রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার খোঁজে? তারা হচ্ছে পয়লা নম্বরের ভ্যাবা-গঙ্গারাম! তারা জানে না অ্যাডভেঞ্চারের রোমাঞ্চ কতখানি মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে!

উঃ, সেদিনের কথা মনে করলে আজও হিম হয়ে যায় আমার হাত-পা—জল হয়ে যায় আমার বুকের রক্ত! তারপর থেকে স্বচক্ষে দেখেও আমি আর সহসা কোনোকিছুই বিশ্বাস করতে রাজি হই না।

ব্যাপারটা আপনারা তলিয়ে বুঝতে পারছেন না? তাহলে গোড়া থেকে সব কথা খুলেই বলি।

ইষ্টক-পিঞ্জরে বন্দি শহুরে মানুষরা প্রকৃতির আশীর্বাদ আদায় করবার জন্যে রেল গাড়িতে চড়ে দূর-দূরান্তরে—দেশ-দেশান্তরে গিয়ে হাজির হয়। আমার মতে, এটা হচ্ছে খামোখা অর্থ ও সময়ের অপব্যয়।

টালিগঞ্জের রিজেন্ট পার্কের ভিতর দিয়ে পুব-মুখো রাস্তা ধরে সাইকেলে চেপে সোজা গড়ের দিকে চলে যান। ঘণ্টাখানেক পরে সাইকেল থেকে নেমে পড়ুন। তারপর ডান দিকে মিনিট-কয়েক পদচালনা করুন। ব্যাস, শহরতলিতে থেকেও কলকাতাকে আপনি ভুলে যাবেন।

কেবল এই দিকেই নয়, কলকাতার আশেপাশে আমাদের নাগালের ভিতরে প্রকৃতিদেবীর এমনি আরও সব জায়গা আছে, সে-সব আমরা দেখেও দেখি না।

সেদিন আমি গিয়েছিলুম গড়ের দিকেই। পাশেই আদিগঙ্গার শুকিয়ে আসা ধারা ঝির-ঝির করে বয়ে যাচ্ছে। একটা আট-নয় হাত চওড়া ভাঙা নড়বোড়ে সাঁকো পেরিয়ে এগিয়ে চললুম দক্ষিণ দিকে। তাপর সিকি মাইল পথ পার হতে না হতেই গিয়ে দাঁড়ালুম একেবারে নির্জনতার অন্তঃপুরে।

কোথায় ইষ্টকস্তূপ, ধুলোধোঁয়া এবং যন্ত্রযান ও মনুষ্যকণ্ঠের গণ্ডগোল? বদলে গিয়েছে সমস্ত দৃশ্য এবং শব্দ-গন্ধ স্পর্শ! চোখে পড়ে কেবল দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়া নিছক শ্যামলতার মহোৎসব এবং কানে জাগে কেবল বিহঙ্গ, সমীরণ ও তরুমর্মরের মিশ্র সংগীত। কোথাও নেই জনমানবের দেখা বা সাড়া। বড়ো ভালো লাগল।

সামনেই রয়েছে চষা শস্যখেতের পর শস্যখেত। মাঝখান দিয়ে একটা খুব সরু পায়ে চলা পথ ক্রমোন্নত হয়ে বেশ উঁচু ও বড়োসড়ো একটা টিপির উপরে গিয়ে উঠেছে। টিপির টঙে ছোটো একখানা চালা ঘর—বাঁখারি ও দরমার দেওয়াল, সামনে একটুখানি দাওয়াও আছে। আসবাবহীন খোলা ঘর। বোধ হয় কৃষাণরা এইখানে বসে শস্যখেতের উপরে পাহারা দেয়।

॥ খ ॥

সে সময়ে ঘরে কেউ ছিল না। আমি দাওয়ায় গিয়ে বসে পড়লুম।

শীতের দুপুর উতরে গিয়েছে। দিকে দিকে ঝরে পড়ছে সুখদ তপ্ততা মাখা রোদের সোনালি। কোথায় কোন গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে একটা বনকপোত নিজের অস্তিত্ব জাহির করছিল। তা ছাড়া চারিদিক নিঝুম।

গোয়েন্দা কাহিনি পড়তে আমি ভারী ভালোবাসি। একখানা আধা-পড়া বই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলুম—ধুমধাম সিরিজের ধুন্ধুমার সেন লিখিত 'ধূমাবতী হত্যারহস্য'। বিষম চমকদার বই, পড়তে বসলে আর কোনো জ্ঞান থাকে না। দাওয়ায় বসে তারই ঘটনার ধারার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললুম।

পড়তে পড়তে সেই জায়গায় এসে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় রুদ্ধ হবার উপক্রম—যেখানে ধুরন্ধর গোয়েন্দা ধনেশচন্দ্র ধূমাবতীর ধুমসো ধুমসো হত্যাকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এবং ধমাধম বেদম মার খেয়েও ধাক্কাধাক্কি ও ধস্তাধস্তি করতে ছাড়ছেন না! অবশেষে তিনি তিন-তিনবার অনায়াসেই রিভলভারের গুলিকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে একাই চারজন লোককে তুলে তুমুল আছাড় মারলেন এবং তারপর—

এবং তারপর গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম করে তিন-তিন বার আগ্নেয়াস্ত্রের ভীষণ গর্জন!

সচমকে বই ফেলে উঠে দাঁড়ালুম। কেতাবি আগ্নেয়াস্ত্র বড়ো জোর মনকে চমকে দিতে পারে, কিন্তু এ যে বাবা কানে তালা ধরিয়ে দিগ্বিদিক তোলপাড় করে তুললে! ভয়ার্ত চিৎকারে চারিদিক মুখরিত করে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি সে পাড়া ছেড়ে সরে পড়ল। উঁহুঁ, এ তো ধূমাবতীর হত্যাকারীদের রিভলভার বলে সন্দেহ হচ্ছে না, খুব কাছেই নিশ্চয় কারা বন্দুক ছুড়েছে!

শিকারিরা এখানে কি পাখি শিকার করতে এসেছে?

তারপরেই নারীকণ্ঠে মর্মভেদী পরিত্রাহি চিৎকার—'রক্ষা করো, রক্ষা করো, রক্ষা করো!'

এবং পরমুহূর্তে বহু পুরুষ-কণ্ঠে শোনা গেল ক্রুদ্ধ চিৎকার—'ধরো, ধরো!' 'খুন করো!' 'বন্দি করো!'

কী সর্বনাশ! আচম্বিতে আমি কি কোনো সত্যিকার অ্যাডভেঞ্চারের সম্মুখীন হতে চলেছি?

শহরের বুকের ভিতরে প্রকাশ্য দিবালোকেই আজকাল রাহাজানি, হানাহানি ও খুনখারাপি তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে; সুতরাং দুরাত্মারা যে অনায়াসেই এখানকার নির্জন ও নিরালা গ্রাম্য পরিবেশের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে, এটুকু সহজ বুদ্ধিতেই বুঝতে বিলম্ব হয় না।

কিন্তু অতঃপর আমার কী কর্তব্য? বেশ বোঝা যাচ্ছে, দুরাত্মারা রীতিমতো দলে ভারী এবং তাদের কাছে আছে আগ্নেয়াস্ত্র। আমি হচ্ছি কবিবর্ণিত 'অন্নধ্বংসী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব', রোমাঞ্চকর উপন্যাসের ভক্ত হলেও 'ধূমাবতী হত্যারহস্যে'র ধুরন্ধর গোয়েন্দা ধনেশচন্দ্রের মতো একাই একদল পাষণ্ডকে তুলে আছাড় মারবার শক্তি আমার নেই। একদল তো দূরের কথা, মাত্র একজনকেও আমি তুলে আছাড় মারতে পারব না। কিন্তু তবু আমার পক্ষেও একটা যাহোক কিছু করা উচিত তো?

অন্তত চুপিচুপি দুই পা এগিয়ে গিয়ে আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে দোষ কী?

দাওয়া থেমে নামলুম। কিন্তু চালাঘরের পাশ দিয়ে পায়ে পায়ে একটু অগ্রসর হয়েই চমকে এবং থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। যা দেখলুম তা কেবল স্বপ্নাতীত নয়, ভয়ংকর রূপে রোমাঞ্চকর।

আগেই বলেছি, আমি উঠেছিলুম বেশ উঁচু ও বড়োসড়ো একটা ঢিপির টঙে। সেখান থেকে নীচেকার সমস্ত দৃশ্য দেখাচ্ছিল যেন সমতল পাহাড়তলির মতো। অনেক দূর পর্যন্ত চোখের সামনে ছবির মতো পড়ে রয়েছে কোথাও শস্যখেত, কোথাও তৃণশ্যামল ময়দান এবং কোথাও বা জঙ্গল ও ঘনসন্নিবিষ্ট গাছপালা।

একটা মাঠের উপর দিয়ে প্রেতভয়গ্রস্তের মতো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে তিনজন ভদ্রবেশী যুবক ও একটি সুসজ্জিতা তরুণী।

ছুটতে ছুটতে তরুণী হঠাৎ মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল যুবক তিনজনও। একজন তাড়াতাড়ি ফিরে এসে হেঁট হয়ে পড়ে তরুণীকে আবার তুলে দাঁড় করাবার চেষ্টা করছে, এমন সময়ে আচম্বিতে একদল যমদূতের মতো ভীষণদর্শন লোক বড়ো বড়ো লাঠি নিয়ে তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। যুবকরা খালি হাতেই বাধা দেবার চেষ্টা করলে কিন্তু পারলে না, বেপরোয়া লাঠির ঘায়ে একে একে তারা হল ধরাশায়ী।

তারও পর আরও কিছু দেখবার ভরসা আমার হল না, অবিলম্বে সেই বিপজ্জনক স্থান ত্যাগ করে যে পথে উপরে উঠেছিলুম সেই পথ দিয়েই নীচে নেমে এলুম প্রাণপণ বেগে।

॥ গ ॥

নড়বোড়ে সাঁকোর এপারেই পথের উপরে ছিল একখানা মুদির দোকান।

আমাকে অমন উঠি তো পড়ি ছুটতে দেখি মুদি সবিস্ময়ে বললে, 'কী মশাই, ব্যাপার কী?'

আমি চিৎকার করে বললুম, 'থানা কোন দিকে—থানা কোন দিকে?'

মুদি একদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললে, 'ওই দিকে। কিন্তু হয়েছে কী? থানায় যাবেন কেন?'

আমি থানার পথে ছুটতে ছুটতে বললুম, 'খুন! রাহাজানি! মেয়ে চুরি!'

* * *

আমার মুখে সংক্ষেপে সব কথা শুনে থানার অফিসার শুধোলেন, 'কী বললেন? তাদের কাছে বন্দুকও আছে?

—'হ্যাঁ স্যর! আমি তিনবার বন্দুকের আওয়াজ শুনেছি!'

চিন্তিত মুখে তিনি বললেন, 'তাহলে আমাদেরও তো দস্তুরমতো তৈরি হয়ে যেতে হয়!'

...একদল পাহারাওয়ালা নিয়ে আমরা আবার যখন সেই সাঁকোর কাছে এসে পড়লুম, তখন মুদির দোকানের সামনে অপেক্ষা করছিল প্রকাণ্ড এক উত্তেজিত জনতা। এর মধ্যেই লোকের মুখে মুখে ভয়াবহ খবরটা রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে দিকে দিকে!

আমরা সাঁকো পার হলুম—সেই প্রকাণ্ড জনতাও চলল আমাদের পিছনে পিছনে। ঢিপির উপরে উঠে চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করেও জনপ্রাণীকে আবিষ্কার করা গেল না। তবে কি দুরাত্মারা কার্যোদ্ধার করে সরে পড়েছে?

ঢিপির ওপাশ দিয়ে নেমে সমতল ক্ষেত্রের উপরে গিয়ে দাঁড়ালুম।

একটু এগিয়ে মোড় ফিরেই দেখি, মস্তবড়ো একটা ঝাঁকড়া বটগাছের ছায়ায় বসে বা দাঁড়িয়ে গুলতানি করছে এক দঙ্গল লোক।

প্রথমেই আমার অতিরিক্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পড়ল, সে সুসজ্জিতা তরুণী মহিলাটিকে একটু আগেই বিপদগ্রস্ত দেখেছিলুম, তিনিই এখন সেই যমদূতের মতো দেখতে লোকগুলোর মাঝখানে বসে পরম নিশ্চিন্তে হাসিমুখে চা পান করছেন!

॥ ঘ ॥

পুলিশ ও জনতা দেখে একজন ভদ্রলোক কৌতূহলী মুখে এগিয়ে এল।

ইনস্পেকটার শুধোলে, 'কে আপনি?'

লোকটা একগাল হেসে বললে, 'আমাকে চেনেন না? আমি হচ্ছি হৈমবতী ফিল্ম কোম্পানির পরিচালক হরেন হালদার। আর ওই মহিলাটি হচ্ছেন আমার স্ত্রী চিত্রতারকা হাসিনী হালদার।'

—'এখানে কী করছেন?'

—'এখানে এসেছি 'হইহইপুরের হন্তারক' ছবির একটা দৃশ্য তুলতে। দুরাত্মারা নায়ক আর তার দুই বন্ধুকে কাবু করে নায়িকাকে হরণ করে নিয়ে গেল।'

আমাদের পিছনের জনতার ভিতর থেকে বহুকণ্ঠে সমস্বরে উঠল এমন তুমুল অট্টহাস্য যে, কাঁপতে লাগল আকাশ, বাতাস, মাঠ ও অরণ্য।

আমি যখন মনে মনে ভাবছি—ভগবতী বসুন্ধরে, দ্বিধা বিভক্ত হও, ইনস্পেকটার তখন আমার কাঁধ ধরে নাড়া দিয়ে কঠোর স্বরে বললে, 'ভুল খবর দিয়ে আপনি পুলিশকে হাস্যস্পদ করতে চেয়েছেন। আপনাকে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।'

তার পরের কাহিনি আর না বলাই ভালো।

গুপ্তধন চাই

হাতে ছাতা থাকতে যদি বৃষ্টিতে ভেজে, তাকে তোমরা কী বলে ডাকবে? গাধা?

সামনে খাবার থাকতে যদি না খেয়ে মরে, তাকেই বা তোমরা কী সম্বোধন করবে? পাগল?

আচ্ছা, আগে আমার বাল্য জীবনের একটা ঘটনা শোনো, তারপর অন্যান্য দৃষ্টান্ত।

আমাদের সাবেক বাড়ি ছিল কলকাতার পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটে। তারই একতলার একখানা পরিত্যক্ত ঘর ভাড়া নিয়ে বাস করত একটি বুড়ো হিন্দুস্থানি, নাম তার বদরি। যখনকার কথা বলছি আমার বয়স তখন আট-নয় বৎসরের বেশি হবে না।

বদরির ঠিক বয়স ছিল কত জানি না। তবে সত্তরের কম নয়। মাথায় ধবধবে সাদা চুল তৈলাভাবে রুক্ষ ও এলোমেলো। ঝাপসা-দেখতে চোখ দুটো একেবারে কোটরাগত, অতিশয় শীর্ণ, হাড়-বের করা দেহখানা কুমড়োর ফালির মতো বেঁকে পড়েছে। সে দুর্বল পায়ে চলা-ফেরা করে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে।

ময়লা কপনি ছাড়া তাকে আর কিছু পরতে দেখিনি এবং ছাতু ও চানা ছাড়া তাকে আর কিছু খেতেও দেখিনি। তার ঘরের আসবাব বলতে বোঝাত একটা পিতলের লোটা, গোটা কয়েক পুরানো ও মলিন মেটে হাঁড়ি এবং একটা ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুটুলি ও একখানা ছেঁড়া কাঁথা।

বদরির একমাত্র পেশা ছিল ভিক্ষা। রোজ সকালে ছাতু বা চানা খেয়ে সে ভিক্ষে করতে বেরিয়ে যেত এবং ফিরে আসত আবার সন্ধ্যার সময়ে। অন্ধকার হলেও ঘরে সে আলো জ্বালত না। আমি ভাবতুম, পয়সার অভাবে তেল কিনতে পারে না বলেই তার ঘরে বোধহয় আলো জ্বলে না।

বদরি বুড়োকে আমার খুব ভালো লাগত এবং সে-ও ভালোবাসত আমাকে। প্রায়ই তার ঘরে গিয়ে আমি দরজার চৌকাঠের উপরে উবু হয়ে বসতুম, আর সে-ও আমাকে শোনাত তার দেশের নানা কাহিনি। হিন্দুস্থানি হলেও সে বেশ ভালো বাংলা বলতে পারত।

যদি জিজ্ঞাসা করতুম, 'বদরি তুমি দেশে যাও না কেন?'

সে বলত, 'দেশে আমার কেউ নেই খোকাবাবু!'

মাঝে মাঝে সে আমাকে আদর করে ফলমূল খেতে দিত।

শুধোতুম, 'এ-সব কোথায় পেলে?'

—'ভিক্ষে করে পেয়েছি।'

—'তুমি খেয়েছ তো?'

—'না, ও-সব আমার সহ্য হয় না।'

মাঝে মাঝে বলতুম, 'বদরি, রোজ রোজ ছাতু আর চানা খেতে কি তোমার ভালো লাগে?'

—'আমি যে ভিখিরি। ভালো না লাগলে আমার চলবে কেন খোকাবাবু?'

—'ভাত আর তরকারি খাবে বদরি? মায়ের কাছ থেকে নিয়ে আসব?'

বদরি ঘাড় নেড়ে হাসতে হাসতে বলত, 'না বাবু, ভাত-তরকারি খেলে আমার অসুখ হবে!'

হঠাৎ একদিন দেখা গেল বদরির ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। তার পরদিন ও তার পরদিনও কেটে গেল, বদরি দরজা আর খোলে না। তখন থানায় খবর দেওয়া হল। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে আবিষ্কার করলে বদরির মৃতদেহ। কিন্তু কেবল মৃতদেহই নয়, পুলিশ আবিষ্কার করলে অভাবিত আরও কিছু! বদরির ছেঁড়া কাঁথার তলা থেকে পাওয়া গেল কয়েক হাজার টাকা। কত হাজার টাকা মনে নেই, তবে মা-বাবার মুখে শুনেছিলাম, সেই টাকা সুদে খাটালে বদরি পায়ের উপরে পা দিয়ে বসে জীবন কাটাতে পারত সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেই!

আমার জানা ঘটনার কথা বললুম। কিন্তু খুঁজলে বদরির জুড়ি পাওয়া যাবে পৃথিবীর সকল দেশেই। এক আমেরিকাতেই ওরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে। আমরা এখানে মাত্র তিনটি ঘটনার উল্লেখ করতে পারি।

* * *

আমেরিকার আটলান্টিক সিটি নগরে একটি ঘরভাড়া নিয়ে একটি স্ত্রীলোক বাস করত। তার নাম আনা হ্যানে, বয়স বাহান্ন বৎসর। প্রতিবেশীরা কখনও তাকে পোশাক বদলাতে দেখেনি, পরত সে একটিমাত্র পোশাক এবং তার একমাত্র খোরাক ছিল খুব শক্ত 'ক্র্যাকার' বিস্কুট। পয়সার অভাবে সে অন্য কিছু খেতে পারে না ভেবে পড়ার একটি দয়ালু স্ত্রীলোক একদিন তাকে ভালো ভালো খাবারের ডালি উপহার দিতে গেল। কিন্তু হ্যানে সে খাবার স্পর্শও করলে না। উলটে প্রতিবেশীর মুখের উপরে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। পরদিন পাওয়া গেল তার মৃতদেহ। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, হ্যানের মৃত্যুর কারণ হচ্ছে অনাহার। কিন্তু হ্যানের ঘরে একটি রন্ধন-পাত্রের ভিতরে পাওয়া গেল ৭৭,৪০০ ডলার (এক ডলারের দাম প্রায় পাঁচ টাকা)।

লুইস স্টুবারের বয়স অষ্টআশি। তিনি ওসো শহরের নিকটে একা বাস করতেন। কারুর সঙ্গে দেখা করতেন না। খাদ্যগ্রহণ করতেন যৎসামান্যই। তাঁর সময় যে কী করে কাটত ভগবান ছাড়া কেউ তা বলতে পারবেন না, কারণ তাঁর কোনো রকম শখের কথাই শোনা যায়নি। গত ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে একাকী শয্যাশায়ী হয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর বাড়ির একটি গুপ্তস্থান থেকে পাওয়া যায় নগদ ৮২,০০০ ডলার এবং ব্যাঙ্কের খাতায় ৫৩,০০০ ডলার। নগদ টাকাগুলো গুনতে চারজন লোকের সময় লেগেছিল সকাল নটা থেকে সন্ধ্যা

ছয়টা পর্যন্ত। পরে এ গুপ্তধনের অংশীদার হন লুইস সাহেবের দূর সম্পর্কীয় সাতজন আত্মীয়।

হোজেকেন শহরে একখানা তিনতলা বাড়ির মালিক ছিলেন ফোস্টার সি. হেনিয়ন। বয়স্ তাঁর আশির কম নয়। লোকে তাঁকে 'বুড়ো হেনিয়ন' বলে ডাকত। তিনি কিন্তু কারুর সঙ্গে মিশতেন না। বরং তিনি প্রতিবেশীদের রীতিমতো পরিহার করেই চলতেন। পঁয়ষট্টি বৎসর-অর্থাৎ বালক বয়স থেকে ওই বাড়িতে বাস করছেন, কিন্তু পাড়ার কোনো লোকের সঙ্গে তিনি বাক্যালাপ পর্যন্ত করেননি। বাড়ির বাইরেও তিনি পা বাড়াতেন কালে-ভদ্রে, কদাচ।

এই অদ্ভুত রহস্যময় লোকটিকে নিয়ে পাড়ায় যে রীতিমতো জল্পনা-কল্পনা চলত সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে একদিন ফুরিয়ে গেল সমস্ত জল্পনা-কল্পনা। হেনিয়ন বহুলক্ষপতি। তাঁকে কোটিপতি বলাও চলে! তাঁর সম্পত্তির মূল্য হল সাতাশ লক্ষ বাহান্ন হাজার চুয়াল্লিশ ডলার! পাছে কোনো লোভী জুয়াচোরের পাল্লায় পড়েন সেই ভয়ে হেনিয়ন মনুষ্যসমাজের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করেছিলেন। তাঁর এক ভাইপো ছিল, তার কাছেও তিনি ছিলেন অপরিচিতের মতো।

কিন্তু এত কষ্ট স্বীকার ও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন করেও হেনিয়ন তাঁর ভাইপোকে ফাঁকি দিতে পারলেন না। সেই হল তাঁর বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

কৃপণদের বুদ্ধির আসল গলদ কোথায় জানি না। নিজে উপবাসী হয়ে পরের জন্যে অর্থ সঞ্চয় করার মধ্যে আমি কোনো অর্থই খুঁজে পাই না। অবশ্য এমন একাধিক ব্যক্তির নাম শুনেছি, যাঁরা সকল রকম আত্মসুখ বর্জন করে জীবনকালে কৃপণ বলে কুবিখ্যাত হয়ে মৃত্যুকালে সমস্ত সম্পত্তি দান করে গিয়েছেন, দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য। তাঁরা হচ্ছেন মহাত্মা, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

গোবেচারা

আরব দেশের সিরিয়া শহর।

ধু-ধু-ধু মরুভূমির উত্তপ্ত বুক মাড়িয়ে এক পথিক সেখানে এসে হাজির। ভাবুক পথিক, সর্বদাই স্বপ্নরাজ্যে বসে মনের পুলকে করেন কাল্পনিক পুষ্পচয়ন।

হাতের লাঠি আর পরনের জামা-কাপড় ছাড়া তাঁর সঙ্গে নেই আর কোনো মোটঘাট।

সুন্দর শহর এই সিরিয়া! আকারেও মস্তবড়ো। সবিস্ময়ে এদিকে-ওদিকে তাকাতে তাকাতে পথিক অগ্রসর হয়েছেন। রাজপথের মাঝখান দিয়ে কত প্রাসাদ, কত মসজিদ, কত সরাইখানা!

পথিকের মনে জাগে জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা, কিন্তু জবাব দেবার কেহ নেই। তিনি পরদেশী, তাঁর ভাষা বোঝে না এখানকার বাসিন্দারা।

দ্বিপ্রহর। সামনেই প্রকাণ্ড এক সরাইখানা—আগাগোড়া মার্বেল-পাথর দিয়ে বাঁধানো। তার ভিতরে-বাহিরে জনতার প্রবাহ।

পথিক নিজের মনে-মনেই বললেন, 'নিশ্চয়ই এটা হচ্ছে নমাজ পড়বার জায়গা।' তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন।

মস্ত একখানা ঘর, চমৎকার সাজানো-গোছানো। ভেসে আসছে সংগীতের সুর-লহরী। দলে দলে জমকালো পোশাক-পরা লোক সারে সারে বসে আছে, সামনে তাদের রকমারি খাদ্য এবং পানীয়।

পথিক মনে মনে বললেন, 'উঁহু, এটা তো নমাজ পড়বার জায়গা হতে পারে না! নিশ্চয় এ হচ্ছে রাজবাড়ি। যুবরাজ নিজের বন্ধুদের ভোজ দিচ্ছেন।'

একটি লোক তাঁর দিকে এগিয়ে এল সসম্ভ্রমে। পথিক তাকে যুবরাজের কোনো কর্মচারী বলেই আন্দাজ করলেন।

লোকটি পথিককে নিয়ে একটি আসনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ইঙ্গিতে তাঁকে বসতে বললে।

পথিক আসন গ্রহণ করলেন। তাঁর সামনে সাজিয়ে দেওয়া হল নানা আকারের থালা, বাটি, গেলাস। সব পাত্র পূর্ণ করে রয়েছে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়! ভুর ভুর করছে গন্ধ, নয়নের আনন্দ।

একমনে পথিক খাবারগুলোর সদ্ব্যবহার করতে লাগলেন। শুকনো মরুভূমি পার হয়ে আসছেন, কতদিন চোখেও পড়েনি ভালো খাবার। পাত্র যত শূন্য হয়, পূর্ণ হয়ে ওঠে তাঁর উদর। শেষটা আর তিনি পারলেন না, হাত-মুখ ধুয়ে উঠে পড়লেন।

সদর দরজার কাছে এক বলিষ্ঠ দীর্ঘদেহ লোক এসে তাঁর পথ জুড়ে দাঁড়াল।

পথিক নিজের মনেই বললেন, 'নিশ্চয়ই ইনিই হচ্ছেন যুবরাজ!' তিনি তাড়াতাড়ি কুর্নিশ করে ধন্যবাদ দিলেন।

দীর্ঘদেহী নিজের ভাষায় বললে, 'মহাশয়, খাবার-দাবার খেয়ে দাম না দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন কেন?'

পথিক সে ভাষার একটা অক্ষরও বুঝলেন না। আবার হেঁট হয়ে পড়ে কুর্নিশ করলেন।

দীর্ঘদেহী ভাবলে, এ বিদেশিটা নিশ্চয় ভবঘুরে, কাছে একটা কানাকড়িও নেই, তবু খাবার খেয়ে এখন লম্বা দেবার ফিকিরে আছে।' সে হাততালি দিলে, অমনি চারজন পাহারাওয়ালা এসে হাজির। পথিকের দুই পাশে দাঁড়িয়ে তারা সব অভিযোগ শ্রবণ করতে লাগল।

তাদের সাজগোজ ও ধরন-ধারণ পথিকের ভালো লাগল। তিনি ভাবলেন, এঁরা বোধহয় এই শহরের বিশিষ্ট লোক।

পাহারাওয়ালারা ইশারায় পথিককে তাদের সঙ্গে যেতে বললে। পথিক আপত্তি করলে না।

আদালত। লোক গিজগিজ করছে, চারিদিকে। উচ্চাসনে উপবিষ্ট এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, দীর্ঘ শ্মশ্রু, পরিধানে কারুকার্যখচিত রেশমি পোশাক।

পথিকের ধারণা হল ইনিই হচ্ছেন নরপতি। তিনি আবার হেঁট হয়ে পড়ে সেলাম ঠুকলেন।

পাহারাওয়ালারা বিচারকের কাছে খুলে বললে সব কথা।

বিচার চলতে লাগল। দুই পক্ষের উকিল গাত্রোত্থান করে জুড়ে দিলে লম্বা আইনের তর্ক। পথিকের আনন্দ আর ধরে না, ভাবলেন, তাঁরই গুণকীর্তন হচ্ছে!

অবশেষে বিচারক রায় দিলে 'আসামিকে বাইরে নিয়ে যাও। ওকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দাও, আর ওর গলায় ঝুলিয়ে দাও এমন একখানা পদক, যার উপরে লেখা থাকবে আসামির অপরাধের বিবরণ। তারপর ওকে ঘুরিয়ে আনবে শহরের পথে পথে। একজন পাহারাওয়ালা যেন উচ্চৈঃস্বরে আসামির অপরাধ বর্ণনা করতে করতে ঘোড়ার আগে আগে যায়।'

বিচারকের হুকুম তামিল করা হল অবিলম্বে।

ঘোড়া পথিককে নিয়ে পথে পথে ঘুরতে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে দামামা ও ভেঁপু বাজিয়ে চলতে লাগল বাদকের দল। দুই পাশের বাড়িগুলোর ভিতর থেকে কাতারে কাতারে বেরিয়ে এল কৌতূহলী বাসিন্দারা। পথিকের অবস্থা দেখে তারা হেসেই অস্থির। পালে পালে ছোকরা ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলল পথিককে টিটকারি দিতে দিতে।

বিষম আনন্দের চোটে এইবারে পথিক যেন পাগল হয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন তাঁর গলায় যে পদকখানা ঝুলছে, ওটি হচ্ছে বিশেষ রাজানুগ্রহের চিহ্ন। এবং জনতার এই চিৎকার হচ্ছে তাঁরই উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি। আহা, এ কী চমৎকার শোভাযাত্রা।

তারপর পথিক যখন দেখলেন পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে তাঁরই এক দেশের লোক, তখন আর তিনি চুপ করে থাকতে পারলেন না, সানন্দে চিৎকার করে উঠলেন।

'বন্ধু, ও বন্ধু! কী খাসা শহরে এসেছি আমি। কী উদার আর পরোপকারী এর বাসিন্দারা। এরা রাজবাড়িতে নিয়ে গিয়ে পেট ভরে খাওয়ায় অনাহুত অতিথিদের। এখানে অতিথিদের সঙ্গে মেলামেশা করেন রাজা-রাজড়ারা। এখানে অতিথিরা উপহার পায় রাজানুগ্রহের চিহ্ন আর তাদের অভিনন্দন দেবার জন্য বেরোয় শোভাযাত্রা। এ হচ্ছে স্বর্গীয় শহর।'

বন্ধু এ দেশের ভাষা জানে। সব বুঝে কোনো কথা না বলে ঘাড় নেড়ে হাসতে হাসতে চলে গেল।

এগিয়ে চলল মিছিল।

রূপকথার ঘুম

রূপকথার গুহা

গৌরীশৃঙ্গ। রোদ-মাখা ভোরবেলা। চারিদিকে অকলঙ্ক তুষারের শুভ্র আবরণ। আকাশ দিয়ে পেঁজা তুলোর মতো তুষার ঝরছে—বাতাসে তুষারের কণা উড়ছে।

থমথমে গভীর স্তব্ধতা, এত স্পষ্ট যে, হাত দিয়ে যেন স্পর্শ করা যায়!

একটি গুহা। ভিতরে কেবলমাত্র একটি পাখি চুপি চুপি নিঃসাড় গলায় গান গাইছে—সুদূর কানন-ভূমির শ্যামল গান! গুহার ফাটলে ফাটলে দু-চারটি সবুজ তৃণ, ভয়ে থরো থরো মাথা বার করে একমনে সেই গান শুনছে। তৃণগুলির গায়ে গায়ে গুটিকয় ছোটো ছোটো রঙিন ফুল,—গানের সুরের দীর্ঘশ্বাসে তারা কেঁপে উঠছে।

গুহার ভিতরে আলো-আঁধারের আবছায়া। নীচের উপত্যকা থেকে পেড়ে-আনা কচি ফুল-পাতার বিছানা পেতে, গুহার একধারে রূপকথা শুয়ে আছে—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপন দেখে রাঙা ঠোঁট দু-খানি ফাঁক করে সে হাসছে। গোলাপি

মুখখানির আশেপাশে ভ্রমররা ঘুম-ভাঙানো গুঞ্জনধ্বনি করছে—তারা এসেছে মানস-সরোবরের কমল-রেণু গায়ে মেখে। রূপকথার নিশ্বাসে মলয়-হাওয়ার সুগন্ধ, অল্প খোলা চোখ দুটিতে জ্যোৎস্নার আভাস, পরনে বাসন্তী রঙে ছোপানো, লতার সুতায়-বোনা একখানি হালকা-মিহি কাপড়। নধর-নিটোল ডান হাতখানি একটি কুসুমলতার মতন বুকের উপরে এলিয়ে আছে, শিথিল মুষ্টিতে একগুচ্ছ পদ্মকলি।

গুহার বাইরে নীরবতার স্তব্ধ ঐকতান আচম্বিতে শিউরে উঠল। নীরবতা যেন নীরবে সভয়ে বলে উঠল—ও কে গো, ও কে গো, ও কে?

রূপকথার ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে সে উঠে বসে, অবাক হয়ে সে গুহার দরজার দিকে খানিকক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে রইল।

কিছুই বুঝতে না পেরে বললে, কেন আমার ঘুম ভাঙল?...এ কী! আমার শ্যামাপাখির গান থেমেছে, তৃণ ফুল সব বেরঙা হয়ে ঝরে পড়েছে, কমল-কলি শুকিয়ে গেছে!...কেন এমন হল? অসময়ে কেন আমার সোনার স্বপন মিলিয়ে গেল?

গুহার দরজার উপরে সূর্যালোকের খানিকটা কালো করে কার ছায়া এসে পড়ল।

রূপকথা তাড়াতাড়ি আপনার ধবধবে আদুড় বুকখানির উপরে আঁচল টেনে দিলে। ভয়ে ভয়ে বিবর্ণ মুখখানি এগিয়ে নিয়ে উপরে গিয়ে বাইরে একবার উঁকি মেরে দেখলে, তারপর অস্ফুট আর্তনাদে বলে উঠল—মানুষ।

সে-ও রূপকথাকে দেখতে পেয়েছিল। দরজার কাছে এসে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে সে রূপকথার মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

রূপকথা মাথায় ঘোমটা টেনে বললে, কে তুমি?

—মানুষ।

—কোথায় থাকো?

—তিব্বতে।

—এখানে কেন?

—সায়েবদের সঙ্গে এসেছি।

—সায়েব! সায়েব কী?

—সায়েব জানো না? তারা যে পৃথিবীর রাজা।

—ও! যারা কলের গাড়ি চালায়, বিজলিকে বেঁধে রাখে, সমুদ্রকে শাসন করে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, —তারাই।

—তারা এখানে এসেছে?

—হ্যাঁ, ওই যে তাদের গলায় আওয়াজ।

—এই শিবের রাজত্বেও শান্তি নেই। কেন, কেন তারা এখানে এসেছে?

—গৌরীশৃঙ্গ দখল করবে বলে।

রূপকথা কেঁদে উঠল, গুহার দরজা বন্ধ করে দিলে।

রাজপুত্রের গুহা

রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র ও কোটাল পুত্র বসে বসে গল্প করছে।

রাজপুত্র। উঃ কী শীত!

মন্ত্রীপুত্র। আংরাটা গেল কোথায়?

কোটালপুত্র। তাতে আগুন নেই।

রাজপুত্র। সওদাগরের ছেলে নীচের উপত্যকায় কাঠ আনতে গেছে। এলে বাঁচি, আগুন পুইয়ে স্যাঁতা বুকটা তাতিয়ে নি।

মন্ত্রীপুত্র। আমরা আর কতদিন এখানে থাকব? ক্রমেই যে বুড়ো হয়ে পড়ছি।

কোটালপুত্র। রূপকথা না বললে তো আমরা আর যেতে পারি না।

রাজপুত্র। রূপকথা তো দিন-রাত ঘুম নিয়েই অজ্ঞান হয়ে আছেন।

মন্ত্রীপুত্র। আমি কিন্তু আর পারছি না—পৃথিবীর জন্যে আমার মন কেমন করছে।

কোটালপুত্র। বসে থেকে থেকে আমার গেঁটে বাত হয়েছে। পৃথিবীতে গেলে রাজবৈদ্যের কাছ থেকে আগেই একটা অব্যর্থ বাত-বিনাশক তৈল কিনতে হবে।

রাজপুত্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। তারপর বললে,—আমার তরোয়ালে মরচে ধরে গেছে। অমৃতকুণ্ডের ধারে সেই যে রাক্ষসী বধ করেছিলুম সে আজ কত দিনের কথা।

মন্ত্রীপুত্র। তোমার ঘুমপুরীর রাজকন্যার ঘুম ভাঙাবার লোক আজ আর নেই, সোনার কাঠির সন্ধান তুমি ছাড়া তো আর কেউ জানে না।

রাজপুত্র। রাজকন্যা এখনও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপনে আমাকে দেখে কি? এতদিন পরে গিয়ে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে কন্যার ঘুম যদি ভাঙাই তাহলে সে হয়তো আর আমাকে চিনতেই পারবে না।

কোটালপুত্র। আমরা চার বন্ধুতে মিলে কত দেশেই যেতুম। অন্ধকারের নদীর

ধারে, সেই তেপান্তরের মাঠের পারে, বনের গাছটিতে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি বাসা বেঁধে থাকত, তারা আমাদের দেশ-বিদেশের পথ বলে দিত। আহা, কী দিনই গেছে হে।

রাজপুত্র। বনের ভেতরে চাঁদ যেদিন রংমশাল জ্বালত, তখন সাত ভাই চাঁপা তাদের ফুটফুটে মুখগুলো বার করে পারুলবোনকে গান গাইতে বলত, পারুল বোনের গান শুনে সাতটি চাঁপা তালে তালে দুলতে থাকত, আর জ্যোছনার মুখে হাসি যেন ধরত না।

মন্ত্রীপুত্র। তারপর সেই সোনার শ্রীফল, কাঠের ঘোড়া, সোনার চাঁপা, পাথর-পাখি, মানিকজোড় পায়রা—কত দিনই যে এ-সব চোখে দেখিনি।

কোটালপুত্র। রাজপুত্র, তোমার সুয়োরানি দুয়োরানি মায়েরা এখন না জানি কী করছেন।

রাজপুত্র। তাঁরা কি আর বেঁচে আছেন!

কোটালপুত্র। মন্ত্রীপুত্র, তোমার মেঘবতী কন্যাকে কি আর মনে পড়ে?

মন্ত্রীপুত্র। (করুণ স্বরে) হায় রে, তা আর মনে পড়ে না, দিঘির ধারে অপ্সরিকে পুঁতে রেখে, কত কষ্টেই যে তাকে উদ্ধার করে এনেছিলুম।

কোটালপুত্র। সে সব দিনের কথা ভেবে আমার কান্না আসছে।

রাজপুত্র। ইচ্ছে হচ্ছে, যাই আবার পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে। কিন্তু প্রজারা হয়তো আর আমাকে চিনতেই পারবে না।

মন্ত্রীপুত্র। কেন চিনতে পারবে না? সেদিন মানস-সরোবরের ধারে রূপকথার জন্যে পদ্ম ফুল আনতে গিয়েছিলুম। মহাদেবের নন্দীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা। সে পৃথিবীতে শিবরাত্রির মোচ্ছব সেরে ফিরে আসছিল। তার মুখে শুনলুম, পৃথিবীতে ঠাকুমারা এখনও নাকি আমাদের ভোলেননি। তুলসিতলায় সন্ধ্যা-প্রদীপ দিয়ে, এখনও রোজ তাঁরা হরিনামের মালা ঘোরাতে ঘোরাতে আমাদেরই নাম করেন। খোকা-খুকিরা এখনও আমাদের দেখতে চায়।

রাজপুত্র। আর যুবারা?

মন্ত্রীপুত্র। যুবারা? তারাই নাকি আমাদের শত্রু। তারা সব বড়ো বড়ো শহরে থাকে, চোখে চশমা দিয়ে দিন-রাত বড়ো বড়ো পুথি পড়ে আর খালি বড়ো বড়ো বুলি কাটে আর তর্ক করে। আমাদের কখনও চোখেও দেখেনি, আমরা যে বেঁচে আছি—তাও তারা মানতে চায় না। তারা কেবল কলকব্জা নিয়ে মেতে আছে, সারাজীবন ষোড়শোপচারে যন্ত্র-রাক্ষসের পুজো দিচ্ছে। তাদের প্রাণ শুকনো যেন

পাথর, নিংড়ালেও এক ফোঁটা রস বেরোয় না, কবিতা আর রূপকথার নাম শুনলেই তারা মারমুখো হয়ে তেড়ে আসে।

রাজপুত্র। তবেই তো!

কোটালপুত্র। ওদের ভয়েই তো আজ আমরা দেশছাড়া।

রাজপুত্র। ভয়? কীসের ভয়? আমরা কি কাপুরুষ? এই হাতে আমি কত দৈত্য-দানব বধ করেছি, তা কি তোমাদের মনে নেই? সামান্য মানুষকে আমরা ভয় করব। চলো আজ আমরা পৃথিবীতে ফিরে যাই। তাদের ভালো করে জানিয়ে দিই গে—আমরা আছি, আমরা জেগে আছি, আমরা জ্যান্ত আছি।

কোটালপুত্র। কিন্তু রূপকথার ঘুম এখনও ভাঙেনি যে।

রাজপুত্র। কবে তাঁর ঘুম ভাঙবে।

মন্ত্রীপুত্র। যতদিন না পৃথিবীর যন্ত্র-রাক্ষসকে কেউ বধ করে।

রাজপুত্র। চলো, আমরাই গিয়ে তার গলা টিপে দিয়ে আসি।

মন্ত্রীপুত্র। উঁহু, অস্ত্রে সে মরবে না। আগে তার প্রাণপাখিকে খুঁজে বার করতে হবে।

রাজপুত্র। আমরাই তা খুঁজে বার করব।

কোটালপুত্র। কিন্তু রূপকথা না বললে আমরা তো যেতে পারব না।

রাজপুত্র দমে গিয়ে চুপ করলে।

কোটালপুত্র। উঃ, কী কনকনে হাওয়া।

মন্ত্রীপুত্র। সওদাগরের ছেলে এখনও ফিরল না তো। কাঠ আনতে বুড়ো হয়ে গেল যে।

তিনজনে বসে বসে শীতের বাতাসে কাঁপতে লাগল...হঠাৎ তিনজনেই এক সঙ্গে চমকে উঠল।

রাজপুত্র। ও কী-ও!

মন্ত্রীপুত্র। কিছুই বুঝছি না তো।

কোটালপুত্র। চলো, চলো,—বাইরে গিয়ে দেখে আসি।

যন্ত্র-রাক্ষসের আক্রমণ

হিমালয়ের একটি উচ্চ শিখর। সূর্যকরোজ্জ্বল তুষারশয়নের উপরে মেঘের পর্দা দুলছে।

চারিদিকের নীরবতার মাঝে একটা অশ্রান্ত, নিষ্ঠুর শব্দ শোনা যাচ্ছে—যেন কোনো অশরীরী দানবের গভীর গর্জন।

রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র ও কোটালপুত্র আকাশের দিকে বিস্মিত চোখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজপুত্র। শুনছ?

মন্ত্রীপুত্র। হুঁ। স্তব্ধতার বুক যেন চিরে যাচ্ছে।

কোটালপুত্র। কীসের শব্দ ও?

রাজপুত্র। কে জানে, শব্দটা কিন্তু ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে।

মন্ত্রীপুত্র। এমন শব্দ তো কখনও শুনিনি।

কোটালপুত্র। বাপরে বাপু, রাক্ষসদের চিৎকারের চেয়েও এ শব্দ ভয়ানক।

রাজপুত্র। এ কি বৃদ্ধ হিমালয়ের কান্না?

মন্ত্রীপুত্র। বোধহয় নরকের প্রেতাত্মাদের আর্তনাদ।

কোটালপুত্র। কৈলাসের শ্মশানে বুড়ি ডাকিনি হাড়ের মাদল বাজাচ্ছে না তো?

সবাই আবার চুপ করে শুনতে লাগল।

রাজপুত্র। শব্দটা খুব কাছে এসেছে।

মন্ত্রীপুত্র। হ্যাঁ, সামনের ওই শিখরটার পিছনে। কোটালপুত্র। আমার বুকটা কেমন ছমছম করে উঠছে।

রাজপুত্র। শব্দটা যেন 'কাকে খাই', 'কাকে খাই' করছে।

মন্ত্রীপুত্র। ও শিবের ধ্যান ভেঙে দেবে।

কোটালপুত্র। চলো ভাই, গুহার ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিই-গে।

রাজপুত্র। ও আবার কে? ঝড়ের মতন ছুটে আসছে?

মন্ত্রীপুত্র। হ্যাঁ—এই দিকেই।

কোটালপুত্র। ওকে চিনতে পারছ না? ও যে সওদাগরের ছেলে।

রাজপুত্র। ওর মাথার তাজ কোথায় গেল?

মন্ত্রীপুত্র। গায়ের উত্তরীয় কোথায় ফেলে এল।

কোটালপুত্র। নিশ্চয় কোনো বিপদ হয়েছে।

রাজপুত্র। শব্দটা কি ওরই পিছনে তাড়া করেছে?

মন্ত্রীপুত্র। তাই হবে।

কোটালপুত্র। আমার গা ঠকঠক করে কাঁপছে। সবাই গুহার ভেতরে চলো।

সওদাগরপুত্র ছুটে কাছে এসে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে বারবার পিছনে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

রাজপুত্র। বন্ধু, বন্ধু, কী হয়েছে বলো।

সওদাগরপুত্র। ভয়ানক বিপদ।

রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র। (একসঙ্গে) বিপদ?

সওদাগরপুত্র। সাংঘাতিক বিপদ। তোমাদের সাবধান করতে ছুটে আসছি।

কোটালপুত্র। ভূতপ্রেতরা বিদ্রোহী হয়েছে কি?

রাজপুত্র। হিমালয়ের তুষার মুকুট খসে পড়েছে?

মন্ত্রীপুত্র। শিবের ষাঁড় কি চুরি করে সিদ্ধি খেয়ে খেপে গিয়েছে? তোমার পিছনে তাড়া করেছে?

সওদাগরপুত্র। না, না,—ওসব বিপদ নয়।

রাজপুত্র। তবে?

সওদাগরপুত্র। মানুষ।

রাজপুত্র। কোথায়?

সওদাগরপুত্র। মানস-সরোবরের পথে।

রাজপুত্র। মানস-সরোবরের পথে মানুষ? অসম্ভব।

সওদাগরপুত্র। আমি নিজের চোখে দেখে আসছি। এক-আধজন নয়—দলে দলে, অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে।

রাজপুত্র। অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে? কী উদ্দেশ্যে?

সওদাগরপুত্র। জানি না। তাদের সঙ্গে আছে যন্ত্র-রাক্ষস।

রাজপুত্র। যন্ত্র-রাক্ষস। মানুষরা যার গোলাম? যার জন্যে আজ আমরা দেশছাড়া? যার ভয়ে পৃথিবী থেকে রূপকথা পালিয়ে এসেছেন?

মন্ত্রীপুত্র। সর্বনাশ।

কোটালপুত্র। যন্ত্র-রাক্ষস কি এখানেও আমাদের আক্রমণ করতে এসেছে?

রাজপুত্র। কিন্তু আকাশে ও কীসের শব্দ, বলতে পারো?

সওদাগরপুত্র। যন্ত্র-রাক্ষসের গর্জন।

কোটালপুত্র। ওরে বাপরে যার গর্জন এমন ভয়ানক—না জানি তার চেহারা কী বিকট। আমার তো ভাবতেই মূর্চ্ছার উপক্রম হচ্ছে।

রাজপুত্র। আচ্ছা, আসুক সে,—আজ এসপার কি ওসপার। কতদিন আর অলসের মতন নির্বাসনে থাকব? আজ আমি যন্ত্র-রাক্ষসকে বধ করব। —এই বলেই রাজপুত্র খাপ থেকে তরোয়াল খুললে।

সওদাগরপুত্র। কিন্তু যন্ত্র-রাক্ষস বড়ো যে-সে রাক্ষস নয়। মানুষকে পিঠে করে সে আকাশে ওড়ে।

রাজপুত্র। উড়ুক। আমারও পক্ষীরাজ ঘোড়া আছে।

সওদাগরপুত্র। কিন্তু তোমার কাছে বাজ নেই! মানুষেরা দেবরাজ ইন্দ্রের বাজ কেড়ে এনেছে। তুমি পারবে কেন?

হঠাৎ দূরে বন্দুকের শব্দ হল।

সওদাগরপুত্র। ওই শোনো।

রাজপুত্র। ও আবার কীসের শব্দ?

সওদাগরপুত্র। মানুষ তার বাজ ছাড়ছে।

মন্ত্রীপুত্র। দ্যাখো, দ্যাখো,—আকাশে কী ওটা?

কোটালপুত্র। ও বাবা, ওর নাক দিয়ে হুস হুস করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

সওদাগরপুত্র। যন্ত্র-রাক্ষস।

আকাশে একখানা উড়োজাহাজ ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে আসছে। সকলে শ্বাস বন্ধ করে দেখতে লাগল।

রাজপুত্র। ও কার কান্না?

সওদাগরপুত্র। তাই তো, এ যে রূপকথার গলা।

কোটালপুত্র। রূপকথার ঘুম ভাঙল কী করে?

সওদাগরপুত্র। বোধহয় যন্ত্র-রাক্ষসের গর্জনে।

রূপকথা কাঁদতে কাঁদতে আলুথালু বেশে ছুটে এল। যেখানে তার পা পড়ছে, সেইখানেই তুষারের উপরে এক-একটি টুকটুকে পদ্ম ফুটে উঠছে—যেন শুচি-শুভ্র তুষার পটে তরুণী ঊষার বিকশিত রাঙা-বাসনার রেখা।

রূপকথা। বাছা, এখানেও মানুষের বিদ্রোহ মাথা তুলেছে—ত্রিভুবনে আমার কি কোথাও একটু ঠাঁই নেই।

রাজপুত্র। তোমার কোনো ভয় নেই মা, আমরা তোমাকে রক্ষা করব।

রূপকথা। পালিয়ে আয় বাছারা, পালিয়ে আয়,—ওই যন্ত্র-রাক্ষসের মুখে পড়লে তোরা কি আর বাঁচবি?

রাজপুত্র। কাপুরুষের মতো পালিয়ে যাব! মা, তুমি কী বলছ!

রূপকথা। যা বলছি, শোন, এ তোর মায়ের হুকুম।

কৈলাস

আকাশ-গঙ্গা ঝরে পড়ছে হিমারণ্যের তুষার-তাজের উপরে—দুধের মতো ধবল তার ধারা।

বিশালপুরী। সিংহদ্বারের বাইরে একপাশে দুই থাবার উপরে মুখ রেখে দুর্গার সিংগি শুয়ে শুয়ে ঝিমুচ্ছে, আর একপাশে শিবের ষাঁড় দাঁড়িয়ে ল্যাজ নেড়ে গায়ের উপর থেকে মাছি তাড়াচ্ছে।

সিংহদ্বারের ভিতরে, আঙিনার এককোণে বসে ভূতের দলের মাঝখানে নন্দি আর ভৃঙ্গির আড্ডা খুব জমে উঠেছে।

মণি-মন্দিরের দরদালানে শিবের আসর। একখানা বাঘছালের উপরে শিব বসে আছেন। সামনেই মড়ার মাথার খুলিতে ফল-মূল সাজানো।

আর-একপাশে পার্বতী বসে বসে শিবের খাওয়ার তদারক করছেন, জয়া-বিজয়া তাঁর চুল আঁচড়ে দিচ্ছে।

পার্বতী। হ্যাঁ গা, এতকাল ধরে পৃথিবীর শহরে শহরে আনাগোনা করলে, তবু এই বদ-অভ্যাসটা ছাড়তে পারছ না?

শিব। বদ-অভ্যাস আমার কী দেখলে?

পার্বতী। এই, মড়ার মাথার খুলিতে খাওয়া?

শিব। তুমিও কি আমাকে কার্তিকের মতন একেলে হতে বলো? ও-সব পুরানো অভ্যাস আমি ছাড়তে পারব না, পছন্দ না হয়, আমাকে 'ওল্ডফুল' বলে ত্যাগ করতে পারো।

পার্বতী। তোমার সঙ্গে কথা কওয়াও ঝকমারি দেখছি। একটুতেই মেজাজ একেবারে তেরিয়া! গাঁজাখোরের স্বভাব, যাবে কোথায়।

শিব সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে, সিদ্ধির বাটির দিকে হাত বাড়ালেন। আসন্ন নেশার স্ফূর্তিতে চোখদুটি তাঁর ঢুলঢুলে হয়ে এল। কিন্তু বাটিটা মুখের কাছে ধরেই দেখলেন, তাতে সিদ্ধি বড়ো কম রয়েছে! অমনি চেঁচিয়ে হাঁক দিলেন নন্দি!

নন্দি 'আজ্ঞে' বলে কাছে এসে দাঁড়াল।

শিব। সিদ্ধি আজ এত কম কেন। ক-আনা পয়সা চুরি করেছিস?

নন্দি। আজ্ঞে, আজ তো আমি বাজার করতে যাইনি।

শিব। তবে কে বাজারে গিয়েছিল শুনি?

নন্দি। আজ্ঞে, বেম্মদত্যি।

শিব। হুঁ, ব্যাটা পাকা ছিঁচকে-চোর। বেম্মদত্যিকে এখনই বেলগাছ থেকে কান ধরে নামিয়ে, দূর করে তাড়িয়ে দে।

নন্দি। যে আজ্ঞে।

শিব। আর শোন। বেশ করে একছিলিম গাঁজা সেজে দিয়ে যা দেখি।

নন্দি। আজ্ঞে, আজ তো বাজার থেকে গাঁজা আসেনি।

শিব। কী! একে সিদ্ধি কম, তায় গাঁজা নেই। ভৃঙ্গি, নন্দিকে এখনই ধরে খড়ম-পেটা করে দে তো।

নন্দি। আজ্ঞে, আমার দোষ কী, বাজারে দোকানিরা যে আজ 'হরতাল' করেছে—সব দোকান বন্ধ।

শিব। রোজ রোজ 'হরতাল'। দোকানিরা ভারী চালাকি পেয়েছি দেখছি। আচ্ছা শোন, এবারে অন্নপূর্ণো পুজোর সময়ে তুই পৃথিবীতে গিয়ে, ছদ্মবেশে একটা কৃষি-বিদ্যালয়ে ভরতি হবি। তারপর শিবরাত্তির সময়ে আমি গিয়ে তোকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব। কিন্তু এর মধ্যে তোকে সিদ্ধি আর গাঁজার চাষ শিখে নিতে হবে। এবারে আমি কৈলাসপুরীর বাগানে সিদ্ধি আর গাঁজার চাষ করাব। হরতালের মজাটা টের পাইয়ে দিচ্ছি রোসো না! কেমন, পারবি তো?

নন্দি আজ্ঞে, তা আর পারব না!

এমন সময়ে শুঁড় নাড়তে নাড়তে ও ভুঁড়ি দোলাতে দোলাতে গণেশ এসে গরম হয়ে ডাকলে—বাবা।

শিব। এসো বাপধন, এসো, তোমার আবার কী আরজি?

গণেশ। ভালো চাও তো তোমার সাপকে সাবধানে রাখো নইলে এবারে আমি ওর দফা রফা করে দোব—তা কিন্তু আগে থাকতেই বলে দিচ্ছি—হ্যাঁ।

শিব। আরে গেল, আমার সাপ আবার কী করলে তোর?

গণেশ। তোমার সাপ আমার ইঁদুরকে ধরে, আজ আর একটু হলেই পেটে পুরে ফেলত।

শিব। আপদ যেত। তোর ইঁদুর রোজ আমার বাঘছাল কেটে দিয়ে যায়।

গণেশ। আচ্ছা আমার কথায় কান না দাও, মজাটা দেখতেই পাবে। কাল থেকে আমি একটা বেজি পুষব।

গণেশ মুখ ভার করে শুঁড় তুলে চলে গেল।

শিব। গিন্নির আদরে গণেশছোঁড়ার বড়ো বাড় হয়েছে। একালের ছোঁড়াগুলোর হল কী। বাপের মুখের উপরে লম্বা-লম্বা কথা।

এমন সময়ে পাশের ঘর থেকে হারমোনিয়াম বাজিয়ে কার্তিক গান ধরলে—

'যে যাহারে ভালোবাসে, সে তাহারে পায় না কেন?'

শিব চেঁচিয়ে বললেন—কেতো, কেতো! থাম ইস্টুপিড, গেরস্তবাড়িতে বসে বাপের কানের কাছে এইসব ছাই গান। একেবারে গোল্লার ফেরে গিয়েছ?

গান থেমে গেল।

শিব। নাঃ, এমন সব ছেলেপুলে নিয়ে আর বাঁচতে সাধ নেই। কী বলব, আমি যে অমর—নইলে এখনই গলায় দড়ি দিতুম। নন্দি, শিগগির সোমরস নিয়ে আয় তো বাবা!

পার্বতী। আবার ও-সব ঢালাঢালি কেন? বুড়ো হলে, লজ্জা করে না?

নন্দি ফিরে এসে বললে—সোমরস নেই।

শিব তিন চোখের তিন ভুরু কুঁচকে বললেন—সোমরস নেই কীরকম? সবে কাল কিনে আনা হয়েছে যে।

নন্দি। আজ্ঞে, সোমরসের পাত্রটা দেখলুম, কার্তিকদাদার টেবিলের উপর উপুড় হয়ে আছে।

শিব। হুঁ, বুঝেছি—এ কেতোর কীর্তি! গিন্নি এর জন্যেও তুমিই দায়ী।

পার্বতী। তা তো বলবেই গো—ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো আছি আমি,—যত পারো বলে নাও।

শিব। বলব না তো কী? তোমাকে না ফি-বছরে বারণ করি, কেতোকে নিয়ে বাপের বাড়ি যেতে? কলকাতায় গিয়ে যত কুসংসর্গে মিশে, ছোঁড়ার চরিত্র একেবারে বিগড়ে গেছে। তুমি যদি ওকে ফি-বছর সোহাগ করে সঙ্গে না নিতে, তাহলে আজ ওকে কে চিনত?

পার্বতী। সঙ্গে করে নিয়ে যাই বেশ করি। আমার বাপের বাড়ির দোষ কী? কার্তিক যেমন দেখছে তেমনি শিখছে—তোমারই ছেলে তো, বংশাবলির ধারা বজায় রাখবে না?

শিব। তোমার লেকচার থামাও গিন্নি। এ কলকাতা শহর নয়—এ কৈলাস-ধাম, এখানে স্ত্রী-স্বাধীনতা একেবারেই আউট-অফ-প্লেস।

পার্বতী। দ্যাখো, আমাকে বেশি রাগিয়ো না বলে দিচ্ছি। আমার সেই দশবাহু-চণ্ডী মূর্তির কথা মনে নেই বুঝি? ধরব নাকি সেই মূর্তি?

শিব আর উচ্চবাচ্য করলেন না—হতাশভাবে চুপ মেরে গেলেন।

আচম্বিতে সিংগির হালুম-হুলুম আর ষাঁড়ের গাঁ গাঁ শোনা গেল।

শিব। নন্দি, দেখ, দেখ,—ষাঁড়ের সঙ্গে সিংগি ঝগড়া করছে বুঝি। সেবারে ওই হতভাগা সিংগি থাবা মেরে আমার ষাঁড়ের আধখানা ল্যাজ ছিঁড়ে দিয়েছিল।

নন্দি সিং-দরজা খুলে বললে—না, ষাঁড় আর সিংগি ঝগড়া করছে না, একটি সুন্দরী কন্যা এসেছে, তাকে দেখেই ওরা চ্যাঁচাচ্ছে।

শিব। পরমাসুন্দরী কন্যা!

পার্বতী। পরমাসুন্দরী কন্যা। এই কৈলাসে!

জয়া-বিজয়ার দিকে ফিরে পার্বতী চুপিচুপি বললেন—এ আবার কে, লো?

জয়া। আবার সেই ত্রেতাযুগের মোহিনী-টোহিনীর মতন কেউ এল না তো?

বিজয়া। সেবারে মোহিনী তো কর্তাবাবুকে সাত-ঘাটের জল খাইয়ে তবে ছেড়েছিল।

পার্বতী। নন্দি, মেয়েটাকে এখান থেকে চলে যেতে বল।

পার্বতীর মনের ভাব বুঝে শিব হেসে বললেন—গিন্নি, আমাকে তা বলে তুমি এতটা খেলো ভেবো না।

পার্বতী। পুরুষকে বিশ্বেস নেই।

নন্দি। এতক্ষণে চিনতে পেরে বললে, 'চিনেছি, চিনেছি। উনি রূপকথা-ঠাকরোন ওই যে, রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র আর সওদাগরপুত্র সবাই সঙ্গে রয়েছে।

শিব। রূপকথা এখানে কী করতে?

নন্দি। উনি ভেতরে আসতে চাইছেন।

শিব। আসতে দে।

রূপকথা পুরীর ভিতরে এসে ঢুকল। —পিছনে রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র ও সওদাগরপুত্র। সকলে একে একে এসে শিবের ও পার্বতীর পায়ের কাছে জড়ো হয়ে প্রণাম করলেন।

রূপকথার পদ্মের পাপড়ির মতন চোখে শুকনো শিশিরের ফোঁটার মতন অশ্রু টলটল করছিল।

শিব। তুমি কাঁদছ কেন বাছা? তোমার কীসের দুঃখ?

রূপকথা। বাবা, জানেন তো একদিন সারা-পৃথিবীতে আমারই রাজত্ব ছিল।

শিব। জানি বই কি! প্রত্যেক মানুষের প্রাণ ছিল তরুণ কবির মতন—তারা মর্ম দিয়ে ভাব-রস-রূপের মর্ম বুঝত।

রূপকথা। কিন্তু লোকে আর আমাকে মানে না, তারা আমাকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিয়েছে। তারা আগে আমাকে প্রাণের মতো ভালোবাসত। সে ভালোবাসার বিনিময়ে আমি তাদের দিতুম—কল্পনার অগাধ ঐশ্বর্য, কবিত্বের মনোরম আকাশ-কুসুম আনন্দের সুমধুর সুধাপাত্র। তাই নিয়ে আজ পৃথিবীর দুঃখ-দৈন্য-হাহাকারের মধ্যেও দু-দণ্ডের তরেও বিস্মৃতির দুর্লভ আস্বাদ পেত।

শিব। মানুষ তোমাকে এখন মানে না কেন?

রূপকথা। তারা যন্ত্র-রাক্ষসের পাল্লায় গিয়ে পড়েছে। তারা আর আমাকে বিশ্বাস করে না, আমার সব মিথ্যে। তারা এখন কল্পনার রঙিন আলোতে যা

দেখা যায়, তাকে ফেলে, স্পষ্ট সূর্যের উত্তাপে চোখ দিয়ে যা দেখা যায়, তাকেই সত্যি বলে মানে।

শিব। ভুল করে। চোখের দেখা দু-দিনের, কিন্তু মনের দেখা চিরদিনের।

রূপকথা। সেই দুঃখেই তো আমি এই কৈলাসের ছায়ায় পালিয়ে এসে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নালোকে বাস করতুম।

শিব। তা আমি শুনেছি।

রূপকথা। অবিশ্বাসীদের যুক্তিতে আমার সে-সব ভক্তের মন আজও টলেনি, তারা তবু এই ভেবেও সুখী যে, রূপকথা মিথ্যা নয়—সে তার কবিত্ব আর কল্পনাকে নিয়ে হিমালয়ের এই গোপন অন্তঃপুরে, এই অজানা রহস্যলোকে আজও বাস করছে। যন্ত্র-রাক্ষস তাদের পূজা পায়নি। সংসার-মরুর তপ্ত বালুরাশির ভিতরে এই বিশ্বাসই তাদের মনকে শ্যামল করে রেখেছে। কিন্তু অবিশ্বাসীদের প্রাণে আমার একটু পূজাও সইল না। আমাকে বধ করবার জন্যে, কল্পনার এই সর্বশেষ আশ্রয়টুকু বাস্তবের আড্ডা করে তোলার জন্যে তারা দলবল নিয়ে হই হই করে ছুটে এসেছে।

শিব। তারা কারা?

রূপকথা। মানুষ। তাদের সঙ্গে যন্ত্র-রাক্ষস।

রাজপুত্র বললে—আমি যন্ত্র-রাক্ষসকে বধ করতে চাই, কিন্তু মা আমাকে বারণ করছেন।

শিব। বাছা, তাকে তুমি বধ করতে পারবে না। মানুষ সে কাজ একদিন নিজেই করবে।

রাজপুত্র। কিন্তু মানুষ যে যন্ত্র-রাক্ষসের বন্ধু!

শিব। হ্যাঁ। কিন্তু এ বন্ধুত্ব চিরদিনের নয়। মানুষ আজ তার বন্ধু কারণ মানুষই এখন তাকে চালাচ্ছে। কিন্তু শীঘ্রই পৃথিবীতে এমন দিন আসবে, যেদিন যন্ত্র-রাক্ষসই মানুষের চালক হয়ে উঠবে। সেদিন মানুষের মোহ কেটে যাবে, তার প্রাণ বিদ্রোহী হবে। যন্ত্র-রাক্ষসের বিষ দাঁত মানুষ নিজেই সেদিন ভেঙে দেবে।

রূপকথা। কিন্তু খালি আমাকে মারতে নয়; যন্ত্র-রাক্ষসকে নিয়ে মানুষ যে এই কৈলাসপুরীও দখল করতে ছুটে আসছে।

শিব। কী করে জানলে? মানুষের এত সাহস হবে না।

রূপকথা। আমরা সকলে স্বচক্ষে দেখে আসছি।

রাজপুত্র। এতক্ষণে আজ তারা মানস-সরোবরের পথে এসে পড়েছে।

শিবের তৃতীয় নেত্র আস্তে আস্তে ডাগর হয়ে উঠতে লাগল। বিস্মিত স্বরে বললেন, এত দূরে তারা এসেছে?

রূপকথা। হ্যাঁ,—মানুষ আর যন্ত্র-রাক্ষস।

শিব। আমার এই কৈলাসপুরী অপবিত্র করবে—এতবড়ো সাহস কি তাদের হবে?

রাজপুত্র। তারা নাকি বলছে যে, এই কৈলাসপুরীর টঙে তারা বিজয় নিশান পুঁতে দিয়ে যাবে।

শিব গম্ভীর স্বরে বললেন, নন্দি কৈলাসের চুড়োয় উঠে দেখত কারা এদিকে আসছে।

কৈলাসের মেঘ-ভেদী সর্বোচ্চ শিখরের উপরে উঠে নন্দি একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলে। সেখান থেকে পৃথিবীর সবুজ বুক পর্যন্ত শূন্যতার অবাধ বিস্তার। নন্দি তাড়াতাড়ি নেমে এসে ব্যস্ত ভাবে বললে, আজ্ঞে বিষম বিপদ।

শিব। অধীর ভাবে জটা-নাড়া দিয়ে বললেন, বিপদ! আমার আবার বিপদ! কী দেখলি আগে তাই বল!

নন্দি। আজ্ঞে দেখলুম—মানস-সরোবরের জলে নীলকমল সব শুকিয়ে গুটিয়ে গেছে, মরালরা আর জলকেলি করছে না। দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর আর অপ্সরা-বালারা কী এক অজানা বিপদের ভয়ে ঘাট থেকে উঠে দলে দলে পালিয়ে যাচ্ছে। চারি তীরে তরু-কুঞ্জে আজ বসন্তের লীলা নেই, তাদের শ্যামশ্রীর উপরে কালিমার গাঢ় ছায়া নেমেছে, ফল-ফুল সব খসে পড়েছে, ভ্রমর আর প্রজাপতিরা মূর্ছিত হয়েছে, কোকিলরা সব দেশ ছেড়ে চলে গেছে।

শিবের তৃতীয় নেত্র ধক ধক করে জ্বলে উঠল। নন্দি ভয়ে সুমুখ থেকে সরে দাঁড়াল। মনে মনে বললে, কী জানি বাবা, ও আগুন-চাউনির একটা ফিনকি গায়ে লাগলে আর তো রক্ষে নেই—একেবারে মদন ভস্ম হয়ে যাব!

শিব রুক্ষস্বরে বললে, আর কী দেখলি?

নন্দি। আকাশ-গঙ্গার স্রোত আকাশেই স্তম্ভিত হয়ে আছে, ভয়ে আর নীচে নামতে পারছে না।

শিব। গঙ্গা-গঙ্গা-আমার গঙ্গাও ভয় পেয়েছেন! আচ্ছা, আর কিছু দেখলি?

নন্দি। আর দেখলুম দূরে, মানস-সরোবরের পথে একখানা উড়ো-রথ তার সারথি মানুষ। বরফের উপর দিয়ে আসছে দলে দলে মানুষের পর মানুষ।

শিব তার চকচকে ত্রিশূলের দিকে সুদীর্ঘ বাহু বিস্তার করে উদ্যত বজ্রের মতন প্রদীপ্ত নেত্রে গম্ভীর স্বরে বললেন, মানুষ? ভালো করে দেখেছিস?

নন্দি। আজ্ঞে হ্যাঁ,—ফিরিঙ্গি!

ত্রিশূলে ভর দিয়ে শিব উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মাথার জটাজুট, গলায় হাড়ের

ও সাপের মালা এবং কোমরে বাঘছাল দুলতে লাগল। নিষ্ঠুর আকাশ-বাতাস চমকে দিয়ে এবং কৈলাসের শিখরের পর শিখরে প্রতিধ্বনির আর্তনাদ জাগিয়ে তিনি বললেন, মানুষ! কৈলাসের উপরে মানুষের আক্রমণ। হাঃ হাঃ। পাথরের শিব দেখে তারা কি ভেবেছে—সত্যি সত্যিই আমি অমনি প্রাণহীন? তারা কি ভুলে গেছে—আমিই বিলয়-কর্তা? এই এক লাথিতে সারা পৃথিবীটাকে গাঁজার কলকের মতো গুঁড়িয়ে, এক ফুঁয়ে ধুলোর মতো আমি শূন্যে উড়িয়ে দিতে পারি, তারা কি তা জানে না? বটে! আচ্ছা—দেখুক তবে? শিব প্রচণ্ড বেগে তাঁর দক্ষিণ পদ উপরে তুললেন।

পার্বতী প্রমাদগুণে তাড়াতাড়ি শিবের পা চেপে ধরে বললেন,—প্রভু, প্রভু! লঘুপাপে গুরুদণ্ড দেবেন না।

শিব। লঘুপাপ! কৈলাসে মানুষের আক্রমণ! —একি লঘুপাপ? পার্বতী, তুমি বলো কী? এ চিন্তাও যে অসহ্য।

পার্বতী। প্রভু, মানুষ অবোধ জীব—এ যাত্রা সামান্য দণ্ডেই তাদের চোখ ফুটিয়ে মুক্তি দাও।

রূপকথা। দেবাদিদেব, অবিশ্বাসীদের জন্যে আমার ভক্তরাও কেন দণ্ড ভোগ করবে? পৃথিবী ধ্বংস হলে আমার ভবিষ্যতের আশা দাঁড়াবে কোথায়?

পার্বতী। পৃথিবীতে আমারও তো ভক্ত আছে। বিনা দোষে তাদের উপরেও দণ্ড দেবে কেন প্রভু?

শিব আপনাকে কতকটা সামলে নিয়ে বললেন—আচ্ছা, এ যাত্রা নির্বোধগুলোকে অল্পে-অল্পেই ছেড়ে দিচ্ছি। প্রভঞ্জন।

প্রভঞ্জন এসে শিবের চরণে প্রার্থনা করে জোড়-হাতে দাঁড়াল।

শিব। প্রভঞ্জন। তোমার ঊনপঞ্চাশ বায়ুকে এখনই মানস-সরোবরের পথে পাঠিয়ে দাও, তুষারের ঝড় উঠুক, তুষারের স্তূপ ধসে পড়ুক, হিমাচলের বুক দুপদুপিয়ে কাঁপতে থাকুক, তুচ্ছ মানুষের বাচালতাকে ক্ষণিক স্বপ্নের মতো লুপ্ত করে দিক।

প্রভঞ্জন তখনই লাফাতে লাফাতে ছুটে চলে গেল।

শিব। নন্দি, তুমি আবার কৈলাসের শিখরে উঠে দ্যাখো।

শিব আবার বাঘের ছালের উপরে স্থির হয়ে বসলেন, নিবিড় মেঘে যেমন জ্বলন্ত সূর্য ঢেকে যায়, তাঁর অগ্নিবর্ষী তৃতীয় নেত্র তেমনি চোখের পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

কৈলাসের শিখরে শিখরে অকস্মাৎ প্রভঞ্জনের ভৈরব হুঙ্কার ধ্বনিত হয়ে

উঠল—সঙ্গে সঙ্গে ঊনপঞ্চাশ বায়ু অন্ধকার গিরিকন্দর থেকে ছাড়ান পেয়ে হুড়মুড় করে পিঞ্জর-খোলা বন্যের মতো নীচে নেমে গেল, তাদের নির্দয় পদাঘাতে হিমাচলের বিপুল ললাট থেকে তুষারের বৃহৎ স্তূপ সব চারিদিকে খসে খসে পড়তে লাগল—বহু যুগের শীতল নিদ্রার অনাহার থেকে জেগে উঠে, তুষার স্তূপেরা যেন সাক্ষাৎ ক্ষুধিত মৃত্যুর মতো মানস-সরোবরের ঢালু পথ ধরে, ক্রুদ্ধ আবেগে ছুটল।

মরণের পূতি গন্ধ পেয়ে, শিবের চ্যালা জীবন্ত তিমির মূর্তির মতো ভূত-প্রেতরা ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নাচতে নাচতে, বিকট 'হর-হর-শংকর' চিৎকারে কৈলাসপুরী থেকে বেরিয়ে পড়ল।

শিব মনের খুশিতে একবার ডমরুটা ডিমি ডিমি বাজিয়ে নিয়ে দুলতে দুলতে বললেন—ব্যোম, ব্যোম, ব্যোম। অনেকদিন পরে এই খণ্ড প্রলয়ের সূচনা দেখে আমারও পা-দুটো আজ তাণ্ডবে মাতবার জন্যে উশখুশ করে উঠছে।

পার্বতী বললেন—ঢের হয়েছে, থামো! বুড়োবয়সে আর নাচের শখে কাজ নেই।

আকাশপটে আঁকা ছবির মতো, হিমালয়ের সব উঁচু শিখরের টঙে, ততক্ষণে নন্দিও ত্রিশূল ঘুরিয়ে নাচ লাগিয়ে দিয়ে বলছে—ব্যোম ভোলানাথ। ব্যোম ভোলানাথ। ব্রাভো প্রভঞ্জন, কতক মলো, কতক পালাল—পথ একেবারে সাফ। যাদুরা ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ তো দ্যাখোনি। এইবার দ্যাখো। ব্রাভো। ক্যা-পি-ট্যা-ল। এখনই থামলে কেন—এনকোর।

শিব। আমিও একবার ব্যাপারটা দেখে আসব নাকি?

পার্বতী। না, না—তাও কি হয়। তোমার কি আর ডানপিটে-গিরি করবার বয়স আছে গা? বরফে পা হড়কে পৃথিবীর গর্তে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে যে।

মানস-সরোবর

রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র ও সওদাগরপুত্র আগে আগে আসছেন—পিছনে রূপকথা।

রাজপুত্র। কী চমৎকার রাত।

মন্ত্রীপুত্র। প্রকৃতি যেন রূপের ধ্যানে বসেছে।

কোটালপুত্র। মানস-সরোবরে চাঁদের হাসি ফুটে উঠেছে।

সওদাগরপুত্র। গাছে গাছে আবার সবুজ পাতা গজিয়েছে, রাঙা রাঙা ফুল

ফল ফুটেছে, বসন্ত আবার কোকিলের গানের সঙ্গে দক্ষিণ হাওয়ায় বেহালার সুর মেলাচ্ছে।

রাজপুত্র। এমনি এক রাতেই ঘুম-পরির রাজকন্যার সঙ্গে আমার প্রথম চোখে-চোখে মিল হয়।

মন্ত্রীপুত্র। আমার সাধ হচ্ছে, মানস-সরোবরের অথই অপার রুপোলি জলে সাতখানা ডিঙা সাজিয়ে ভেসে যাই, আর জ্যোৎস্নার কানে কানে সারা রাত চুপিচুপি মনের কথা কই।

রূপকথা। বাছারা, দেবাদিদেবের অনুমতি পেয়েছি, আজ থেকে আমরা এই মানস-সরোবরের তীরেই বাস করব।

রাজপুত্র। তাহলে আর আমাদের নীচের সেই গুহাতে ফিরতে হবে না?

রূপকথা। না—যন্ত্র-রাক্ষসের ছায়ায় সে স্থান অপবিত্র হয়েছে। সেখানে আমাদের ঠাঁই নেই।

সকলে। আঃ, বাঁচা গেল, আর শীতে মরতে হবে না।

রূপকথা। ওই যে রাঙা ফুলের কুঞ্জটি রয়েছে, আমি এখন ওইখানেই চললুম।

রাজপুত্র। কেন মা?

রূপকথা। ঘুমুতে।

রাজপুত্র। আবার ঘুম?

রূপকথা। জেগে জেগে কষ্ট সওয়া যে বড়ো দায় বাছা।

রাজপুত্র। এবারে কতদিন পরে আবার জাগবে?

রূপকথা। যতদিন না যন্ত্র-রাক্ষসের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহ মাথা চাগাড় দেয়।

রাজপুত্র। তারপর?

রূপকথা। তারপর আবার আমাদের দিন ফিরে আসবে—কবিত্বের দিন, কল্পনার দিন, পরির দিন, মানুষের বুকটা সেদিন আর কঠোর গদ্যে চাপা থাকবে না—সেখানে জেগে উঠবে সুরের ছন্দ, পারিজাতের গন্ধ আর রূপের আনন্দ।

রাজপুত্র। সেদিন আবার আমার পৃথিবীতে ফিরে যাব?

রূপকথা। আবার তেপান্তরের মাঠে আমার পক্ষীরাজ ছুটবে? আমি ঘুমপুরীতে যাব? আমার সোনার কাঠি খুঁজে পাব?

মন্ত্রীপুত্র। মেঘবতী-কন্যা আমাকে দেখে কেঁদে ফেলবে?

কোটালপুত্র। মানুষ আবার আমাদের আদর করবে?

সওদাগরপুত্র। সাতডিঙা নিয়ে আবার আমি কমলে-কামিনীকে খুঁজতে বেরুব?

রূপকথা। হ্যাঁ বাছা, তোদের সকলেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। মানুষ তোদের পেলে বর্তে যাবে। বুঝবে, তোদের নির্বাসনে পাঠিয়ে এতদিন তারা কী ভুলই করেছিল।

রাজপুত্র। সে আর কতদিন—আর কতদিন!

রূপকথা। জানি না। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না, ঘুম আমাকে ডাক দিয়েছে, আমার চোখ ঢুলে আছে, আমি ঘুমোতে যাই—ঘুমোতে যাই।

গোলাপের জন্ম

সে বলছে একটি রাঙা গোলাপ এনে দিলে আমার সঙ্গে নাচবে। কিন্তু হায়, আমার সারা বাগানে একটিও রাঙা গোলাপ নেই!

গাছের ডালে বাসায় বসে পাপিয়া ছাত্রের এই করুণ কথাগুলো শুনতে পেলে। পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে পাপিয়া অবাক হয়ে ভাবতে লাগল।

ছাত্রের বড়ো বড়ো চোখদুটি অশ্রুজলে ভরে উঠল। কান্নার স্বরে সে আবার বললে, 'আমার সারা-বাগানে একটিও রাঙা গোলাপ নেই! হায়, কী তুচ্ছ জিনিসের জন্যে প্রাণের সব শান্তি-সুখ ব্যর্থ হয়ে যায়! জ্ঞানীদের সব লেখা আমি পড়ে ফেলেছি, ষড়দর্শন আমার কণ্ঠস্থ,—কিন্তু তবু, সামান্য একটি রাঙা গোলাপের অভাবে আজ আমি এমন লক্ষ্মীছাড়া!'

পাপিয়া বললে, 'হ্যাঁ, এতদিনে একজন আসল প্রেমিকের দেখা পেলাম! প্রেমিককে চিনতুম না, কিন্তু রাতের পর রাত গলা ভেঙে তারই জন্যে গান গেয়েছি, তারায় তারায় তার বার্তা পাঠিয়েছি আজ তাকে আমার সামনে মূর্তিমান দেখতে পেলাম! তার চুলগুলো কালো যেন কৃষ্ণকলি; তার ঠোঁট দু-খানি তারই চাওয়া গোলাপের মতন রাঙা! কিন্তু দুঃখ তার কপালে নিজের হাতের ছাপ রেখে গেছে, কষ্ট তার মুখকে সন্ধ্যার আকাশের মতো বিষণ্ণ করে তুলেছে!'

যুবক ছাত্র নিজের মনে গুণগুণ করে বললে, 'রাজবাড়িতে আজ উৎসবের বাঁশি বেজেছে! আমি যাকে ভালোবাসি, সে-ও আমন্ত্রণ পেয়েছে। সে বলেছে,

আমি যদি তাকে একটি রাঙা গোলাপ উপহার দি, তাহলে সে আমার সঙ্গে নাচবে। আমি যদি তাকে একটি রাঙা গোলাপ দি, তবে তাকে আমার এই আলিঙ্গনের ভিতরে ধরতে পারব, তার মুখখানি বিরাজ করবে আমার এই কাঁধের উপরে, তার হাতদুটি এলিয়ে থাকবে আমার এই মুঠির ভিতরে। কিন্তু আমার বাগানে তো রাঙা গোলাপ নেই!...দোসর-হারা আমি নীরবে বসে থাকব, আর আমারই সুমুখ দিয়ে সে চলে যাবে—আমার পানে একটিবার ফিরেও না তাকিয়ে। হায়, অবহেলায় বুক যে আমার ভেঙে যাবে!'

পাপিয়া বললে, 'হুঁ, লোকটি প্রেমিক না হয়ে আর যায় না! যা নিয়ে আমি গান গাই, তার জন্যেই এ ব্যথা পাচ্ছে; আমার সুখ ও দুঃখ! সত্যি, কী অপূর্ব এই প্রেম! পান্নার চেয়ে অমূল্য, মণির চেয়ে দুর্লভ! মুক্তার মালার বদলে তাকে পাওয়া যায় না, হাটে-বাজারে তা কিনতে মেলে না!'

যুবক বললে, 'বাদকরা বীণার তারে তারে রিঞ্জিনী তুলবে, আর তারই তালে তালে সে নাচ শুরু করবে। তার গতি এমন মেঘের মতন লঘু, যে নরম-নধর পা-দু-খানি মাটি ছোঁয় কি না-ছোঁয় তা বোঝা যাবে না। তার চারিপাশে ভক্তের দল এসে ভিড় করে থাকবে। কিন্তু আমার সঙ্গে সে নাচবে না—কারণ আমার বাগানে রাঙা গোলাপ ফোটেনি!'—যুবক ঘাসের উপরে লুটিয়ে পড়ল এবং দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

একটা গিরগিটি ল্যাজ তুলে ছুটে যেতে যেতে বললে, 'লোকটা কাঁদে কেন?'

রবির একটি ঝিলমিলে কিরণ-ধারায় স্নান করতে করতে প্রজাপতি বললে, 'সত্যিই তো, কাঁদে কেন?'

সরোবরে কমলিনী এক সখীর কানে কানে ফিস ফিস করে বললে, 'সত্যি, কাঁদে কেন?'

পাপিয়া বললে, 'একটি রাঙা গোলাপের জন্যে ও-বেচারি কাঁদছে।'

'একটি রাঙা গোলাপের জন্যে! ও হরি, এমন সৃষ্টিছাড়া কথাও তো শুনিনি কখনও!'—গিরগিটি তো হেসেই অস্থির।

কিন্তু যুবকের বুকের দরদ পাপিয়ার বুকে বাজল। সে নীরবে গাছের ডালে বসে রইল আর ভাবতে লাগল প্রেমের কী রহস্য!...

আচম্বিতে দুই ডানা ছড়িয়ে সে একদিকে উড়ে গেল—এক টুকরো ছায়ার মতো উপবনের পুষ্পকুঞ্জ পেরিয়ে!

খানিকটা ঘাসে-ঢাকা জমি। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এক সুন্দর গোলাপগাছ।

তারই এক ছোটো শাখায় গিয়ে বসে পাখিরা বললে, 'আমাকে একটি রাঙা গোলাপ দাও। আমার সব গানের সেরা যে গান, তাই তোমাকে শোনাব।'

গাছ মাথা নেড়ে বললে, 'আমার গোলাপ যে সাদা-সুমুদ্দুরের ফেনার মতো! হিমালয়ের তুষারও তত সাদা নয়। তবে ঝরনার পাশে আমার ভায়ের কাছে গেলে তোমার আশা হয়তো মিটতে পারে।'

পাপিয়া আবার উড়ে গেল—ঝরনার ধারে যে গোলাপগাছ বাসা বেঁধেছে তার কাছে। বললে, 'আমাকে একটি রাঙা গোলাপ দাও। আমার সব গানের সেরা যে গান তাই তোমাকে শোনাব।'

গাছ মাথা নেড়ে বললে, 'আমার গোলাপ যে হলুদে—তৈল-স্ফটিকের আসনে পাতালের যে মৎস-নারী বসে থাকে, তারই চুলের মতো। পীত কুমুদও তত হলদে নয়। তবে যুবক ছাত্রের জানালার তলায় আমার ভাইয়ের কাছে গেলে তোমার আশা হয়তো মিটতে পারে।'

পাপিয়া আবার উড়ে গেল—যুবক ছাত্রের জানালার তলায় যে গোলাপগাছ বাসা বেঁধেছে তার কাছে। বললে, 'আমাকে একটি রাঙা গোলাপ দাও। আমার সব গানের সেরা যে গান তাই তোমাকে শোনাব।'

গাছ মাথা নেড়ে বললে, 'আমার গোলাপ রাঙা-কপোতের পায়ের মতো। সুমুদ্দুরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে যে প্রবাল দোলে সে-ও তত রাঙা নয়। কিন্তু শীতে আমার শিরা-উপশিরা হিম হয়ে গেছে, তুষার আমার কুঁড়ির উপরে খিমচি কেটে গেছে, ঝড় আমার ডালপালা ভেঙে দিয়ে গেছে! এবার সারা-বছরে আমার গোলাপ ফুটবে না।'

পাপিয়া কাতর স্বরে বলে উঠল, 'একটি—শুধু গোলাপ আমার দরকার! কিছুতেই কি তা পাওয়া যায় না?'

গাছ বললে, 'হ্যাঁ, এক উপায় আছে কিন্তু সে এমন ভয়ানক উপায় যে তোমাকে বলতেও আমার মুখ বোবা হয়ে যাচ্ছে!'

পাপিয়া বললে, 'বলো, বলো,—তুমি সব খুলে বলো। আমি ভয় পাব না।'

গাছ বললে, 'যদি তুমি রাঙা গোলাপ চাও, তবে চাঁদের আলোয় গানের সুরে তোমাকে তা রচনা করতে হবে, আর বুকের রক্তে তাকে রাঙাতে হবে। নিজের বুকে একটি কাঁটা বিঁধিয়ে আমার ডালে বসে তোমাকে গান গাইতে হবে। সারারাত ধরে তুমি গান গাইবে, কাঁটা তোমার বুকের ভেতরে গিয়ে ঢুকবে আর তোমার প্রাণের রক্ত আমার শিরায় শিরায় ঢুকে আমারই রক্ত হয়ে যাবে।'

পাপিয়া করুণ সুরে বললে, 'মরণের বদলে একটি রাঙা-গোলাপ,—দাম যে বড়ো চড়া! জীবন কার প্রিয় নয়? সোনার রথে সূর্য ওঠা, মুক্তার রথে চাঁদ ওঠা—সবুজ বনে বসে সেই দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকা কী আনন্দের!

পাহাড়ের উপরে-নীচে বিচিত্র যেসব রঙিন ফুল ফোটে, তাদের গন্ধ কী মধুর!...তবু, জীবনের চেয়ে প্রেমই শ্রেয়, আর মানুষের প্রাণের তুলনায় একটা পাখির প্রাণের মূল্যই বা কতটুকু?'

পাপিয়া দুই ডানা ছড়িয়ে আবার উড়ে এল—এক টুকরো ছায়ার মতো উপবনের পুষ্পকুঞ্জ পেরিয়ে।

যুবক তখনও ঘাসের উপরে শুয়েছিল, তার ডাগর চোখ দুটি থেকে অশ্রু তখনও শুকিয়ে যায়নি।

পাপিয়া বললে, 'খুশি হও, খুশি হও! তোমার রাঙা গোলাপ তুমি পাবে। চাঁদের আলোয় গানের সুরে আমি তা রচনা করব, নিজের বুকের রক্তে আমি তা রাঙিয়ে তুলব! তোমার কাছ থেকে আমি খালি একটি প্রতিদান চাই। তুমি যেন খাঁটি প্রণয়ী হও—কারণ সব জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শনের চেয়ে প্রেমই হচ্ছে শ্রেয়। আগুনের রঙের মতো রঙিন। তার ওষ্ঠাধর, মধুর মতো মিষ্ট, আর তার নিশ্বাসে ধুপ-ধুনার সুগন্ধ!'

যুবক মুখ তুলে পাপিয়ার স্বর শুনলে, কিন্তু তার কথা বুঝতে পারলে না, কারণ কেতাবে যা লেখা আছে তা ছাড়া আর কিছুই সে বুঝতে পারে না।

কিন্তু শালগাছ তার বাণী বুঝতে পারলে। কারণ পাপিয়াকে সে বড়ো ভালোবাসত, তার ডালে পাপিয়ার বাসা। সে চুপিচুপি বললে, 'আমাকে তোমার শেষ গান শুনিয়ে যাও। তোমাকে বিদায় দিয়ে একলাটি আমার মন বড়ো খাঁ খাঁ করবে।

পাপিয়া তাকে বিদায় গান শোনাতে লাগল—তার সে সুরের ধারা যেন রুপোর ঝারি থেকে উছলে-পড়া গন্ধ জলের মতন।

পাপিয়ার গান থামলে যুবক ছাত্র আস্তে আস্তে উঠে বসল এবং কাগজ-কলম নিয়ে ভাবতে লাগল; 'আমার প্রিয়ার গড়ন সুডৌল, এটা সকলকেই মানতে হবে। কিন্তু তার প্রাণে কি মমতা আছে?...বোধহয় না। আসলে, সে আর আর কলাবিদের মতো; তার ভঙ্গি আছে কিন্তু সরলতা নেই। সে দিন-রাত খালি গান আর গান নিয়েই মেতে আছে, আর কে না জানে কালমাত্র স্বার্থপর? তবু এটা বলতেই হবে যে, বাস্তবিকই তার সুর-বোধ আছে। কিন্তু বড়োই দুঃখের বিষয়, সে সুরের অর্থ পাওয়া যায় না, আর তা সংসারের কোনো কাজেই লাগে না।' যুবক তার ঘরে গিয়ে ঢুকল, তার বিছানায় শুয়ে নিজের প্রেমের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল।

স্বর্গের ছায়ায় যখন চাঁদের মুখ জেগে উঠল, পাপিয়া তখন গোলাপগাছের ডালে গিয়ে সারারাত ধরে সে গান গেয়ে গেল, আকাশের চাঁদ পশ্চিমে ঢলে

পড়ে কান পেতে সে গান শুনতে লাগল। পাপিয়া যত গান গায়, রাত তত গভীর হয়ে ওঠে, কাঁটা তত বুকের ভিতরে গিয়ে বেঁধে, আর তার প্রাণের রক্ত ততই কমে আসতে থাকে।

পাপিয়া প্রথমে গাইলে, বালক-বালিকার হৃদয়ে প্রেমের জন্ম-কাহিনি। সঙ্গে সঙ্গে গাছের টঙের ডালে অপূর্ব এক গোলাপের কুঁড়ি ফুটে উঠল। সুরের ধারার পর সুরের ধারা আসে, আর সেই কুঁড়িতে পাপড়ির পর পাপড়ি ফোটে। প্রথমে সে ফুল ছিল পাণ্ডু-নদীর জলের উপরে দোলায়মান কুয়াশার মতো। রূপের আয়নায় যেমন গোলাপের ছায়া, সরোবরের জলে যেমন গোলাপের ছায়া,—গাছের টঙের ডালে ফোটা তেমনি বেশ অপরূপ গোলাপটি!

গাছ হেঁকে বললে, 'আরও জোরে, আরও জোরে বুক চেপে ধরো, নইলে গোলাপ ফোটা শেষ হবার আগেই দিন এসে পড়বে।'

পাপিয়া কাঁটার উপরে আরও জোরে বুক চেপে ধরলে, তার গানের সুর পর্দায় পর্দায় আরও চড়তে লাগল—তখন সে যুবক-যুবতীর হৃদয়ে প্রেমের জন্ম-কাহিনি গাইছিল।

গোলাপের পাতার উপরে একটুখানি কোমল লালচে আভা ফুটে উঠল। কিন্তু কাঁটা তখনও পাপিয়ার অন্তরের মাঝখানে গিয়ে পৌঁছোয়নি, তাই গোলাপের হৃদয় শুভ্র হয়ে রইল—কারণ পাপিয়ার বুকের রক্ত ভিন্ন গোলাপের বুক রাঙা হতে পারে না।

গাছ হেঁকে বললে, 'আরও জোরে, আরও জোরে, বুক চেপে ধরো, নইলে গোলাপ ফোটা শেষ হবার আগেই দিন এসে পড়বে।

পাপিয়া আরও জোরে কাঁটার উপরে বুক চেপে ধরলে, কাঁটা তার হৃদয়কে স্পর্শ করলে এবং তীব্র এক যাতনা বিদ্যুতের মতো তার সর্বাঙ্গ ভেদ করে বয়ে গেল। তিক্ত,—বড়ো তিক্ত সে যন্ত্রণা! তার গানের সুর তখন ক্রমেই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠতে লাগল—কারণ পাপিয়া তখন সেই প্রেমের কাহিনি গাইছিল, মরণের দ্বারা যা পরিপূর্ণ এবং শ্মশানের চিতা যাকে গ্রাস করতে পারে না।

অপূর্ব সেই গোলাপ লাল হয়ে উঠল—পূর্বাকাশের নিত্য-বিকশিত জ্বলন্ত গোলাপের মতো।

পাপিয়ার স্বর কিন্তু ক্রমেই ঝিমিয়ে এল, তার ডানা কাঁপতে লাগল, তার চোখের উপরে একটা পর্দা ঘনিয়ে উঠল। তার গান হল মৃদু হতে মৃদুতর এবং তার মনে হল, গলা যেন বন্ধ হয়ে আসছে।

পাপিয়া তখন প্রাণপণে সংগীতের শেষ সুরের মূর্ছনা দিলে চাঁদ তাই শুনে

ঊষার কথা ভুলে আকাশের উপর স্থির হয়ে রইল। রাঙা গোলাপ তা শুনতে পেল, তার সর্বাঙ্গে এক পুলকহিল্লোল বয়ে গেল এবং শীতার্ত ভোরের বাতাসে তার পাপড়িগুলো ছড়িয়ে পড়ল। পাপিয়ার শেষ সুরের ঝঙ্কার নিয়ে প্রতিধ্বনি চারিদিকে ছুটে গেল এবং রাখালদের রাতের স্বপন থেকে জাগিয়ে তুলল। তটিনীর জল-বাঁশির রন্ধ্রে সে সুর ব্যাপ্ত হয়ে গেল এবং সমুদ্রের কাছে আপনার বার্তা পাঠিয়ে দিলে।

গাছ চেঁচিয়ে বললে, 'দ্যাখো, দ্যাখো! এতক্ষণে গোলাপ-ফোটা শেষ হয়েছে!'

কিন্তু পাপিয়া শুনতে পেলে না। সে তখন ঘাসের উপরে মরে পড়ে আছে,— তার বুকের উপরে বেঁধা সেই নিদারুণ কাঁটা।

দুপুরবেলা যুবক ছাত্র জানালা খুলে দেখে সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'কী সৌভাগ্য! এই যে একটি রাঙা গোলাপ ফুটেছে...মরি, মরি, এমন গোলাপ তো জীবনে কখনও দেখিনি! আহা, কী সুন্দর! উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে নিশ্চয়ই এর একটা কোনো জমকালো নাম আছে!' যুবক ঝুঁকে পড়ে গোলাপটি চয়ন করলে।

তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে গোলাপটি হাতে করে সে তার অধ্যাপকের বাড়ির দিকে ছুটল—অধ্যাপকের কন্যাই তার প্রিয়তমা।

অধ্যাপকের কন্যা দরজার কাছে এসে বসে বসে লাটিমে রেশমের সুতো জড়াচ্ছে, তার পায়ের তলায় ঘুমিয়ে আছে একটি ছোটো কুকুর।

যুবক উল্লাসভরে বললে, 'একটি রাঙা গোলাপ পেলে তুমি আমার সঙ্গে নাচবে বলেছিলে। এই নাও দুনিয়ার সব চেয়ে রাঙা গোলাপ! এটিকে তোমার বুকের উপরে আজ সন্ধ্যায় গুঁজে রেখো। মনে রেখো, আমি তোমাকে কত ভালোবাসি।'

ভুরু কুঁচকে যুবতী বললে, 'উঁহু, আমার পোশাকের সঙ্গে এ গোলাপ তো খাপ খাবে না। আর এখন আমার গোলাপের দরকারও নেই, আমার এক ধনী বন্ধু আমাকে আসল জড়োয়া গয়না পাঠিয়ে দিয়েছে। দামি গয়নার কাছে আবার ফুল!'

যুবক ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'তুমি পাষাণী।'—কাছ দিয়ে একটি ময়লা-ফেলা গাড়ি যাচ্ছিল, যুবক হাতের গোলাপটি সেইদিকে নিক্ষেপ করলে, গাড়ির চাকা গোলাপটিকে ছিন্নভিন্ন করে থেঁতলে চলে গেল।

যুবতী বললে, 'আমি পাষাণী। তোমার কথা এমন অভদ্র কেন?...আর সত্যি কথা বলতে গেলে, তোমাতে-আমাতে কীসের সম্পর্ক? তুমি তো সামান্য এক গরিব ছাত্র! আমাকে যে গয়না পাঠিয়েছে, তার মূল্য কত টাকা, সে খবর কিছু রাখো?—এই বলে যুবতী বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

যুবক ধীরে ধীরে চলতে আপন মনে বললে, 'প্রেম কী বোকামির ব্যাপার! ন্যায়-শাস্ত্রের মতন উপকারীও নয়, তার দ্বারা কোনো কিছু প্রমাণিত হয় না, সে যা বলে তা কখনও ঘটে না, সে যা বিশ্বাস করে তা কখনও সত্য হয় না। আসলে প্রেমটা অচল। আর আমার প্রেমে কাজ নেই, তার চেয়ে ষড়দর্শন আর মনোবিজ্ঞানে মনোযোগ দিলে ঢের বেশি লাভ হবে।'

যুবক তখন বাড়িতে ফিরে এল এবং একখানা ধুলাভরা মস্ত কেতাব টেনে নিয়ে পড়তে বসল।

Oscar Wild-এর The Nightingle and the Rose হইতে

নকল-শিকারির সংকট

আমি পেশাদার বা শৌখিন, কোনো শ্রেণিরই শিকারি নই—গোড়াতেই এই 'নোটিশ' দিয়ে রেখে পাকা শিকারিদের বিদ্রোহী রসনাকে শান্ত করতে চাই। তবে নিজেকে নকল-শিকারি বলে বিজ্ঞাপিত করলে বোধকরি বিশেষ বিড়ম্বিত হতে হবে না।

আজ কলম ধরলেও হাত কাঁপে, কিন্তু যখন বয়স ছিল বন্দুক ধরতে পারতুম নিষ্কম্প হস্তে। আর তখন বন্দুক ধরবার বেশি সুযোগ পেতুম কুচবিহারের জঙ্গলেই। কিন্তু বাঘ-গন্ডার মারবার স্বপ্ন দেখিনি কখনো, আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা দৌড় মারত পক্ষীরাজ্য পর্যন্ত। প্রথম প্রথম পক্ষীদের সম্বন্ধেও বাছবিচার ছিল না, কাক-বক কেউ পেত না আমার হাত থেকে রেহাই, কারণ নতুন শিকারির মতো নিষ্করুণ জীব দুনিয়ায় দুর্লভ। মনে আছে, কাকরাও আমাকে 'শত্রু নম্বর এক' বলে দস্তুরমতো চিনে রেখেছিল। আমি বন্দুক কাঁধে নিয়ে পথে বেরুলেই তারা ঝাঁকে ঝাঁকে তারস্বরে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে অরণ্যরাজ্য মুখরিত করে তুলে দিগ্‌বিদিকে নিরাপদ ব্যবধানে সরে পড়ত। কিছুদিন পরেই এই নির্বিচারে পক্ষীহত্যার ঝোঁক কমে গেল আপনা-আপনি।

একটা পাখি-মারা বন্দুক (স্মুদ্-বোর গান) নিয়ে টো টো করে ঘুরে বেড়াতুম বনে বনে। মাঝে মাঝে শিকারের পাখি পেতুম বটে, কিন্তু অধিকাংশ দিনই ফিরে আসতুম খালি হাতে। তবে ব্যর্থ হলেও কোনোদিন স্যাঁতসেঁতে হয়ে পড়েনি আমার উৎসাহ। কারণ পাখি না পেলেও অফুরন্ত মাত্রায় পল্লিপ্রকৃতির সান্নিধ্য লাভ করে মজুরি পুষিয়ে যেত যথেষ্টরও বেশি।

মাছ ধরবার নাম করে ছিপ হাতে নিয়ে আমি পুকুরপাড়ে বসে থাকতেও খুব ভালোবাসি। নিতান্ত যাদের পরমায়ু ফুরিয়েছে এমন কোনো কোনো অভাগা মাছ আমার ছিপের সুতোয় সংলগ্ন হয়ে মাঝে মাঝে আত্মহত্যা করেছে বটে, কিন্তু তারা এমন বোকামি না করলেও আমার দুঃখ হয় না। আমি মাছ ধরতে যেতে চাই কিছুক্ষণের মতো শহুরে ইষ্টক-কারাগার থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। আমি চাই সবুজ ঘাসের ফ্রেমে আঁটা সরোবরের রোদ-ঝলমলে 'কাকচক্ষু জল'—যেখানে জলকেলি করতে আসে আকাশনীলিমার স্নিগ্ধ স্বপন; যেখানে তটে তটে জলসা বসায় মর্মরমুখরিত নৃত্যশীল তরুবৃন্দ এবং তাদের পল্লবিত ও পুষ্পিত শাখায় শাখায় হয় জানা আর নাম-না-জানা বিহঙ্গদের সংগীতসভার অধিবেশন; যেখানে সুরেলা বাতাসও এসে গান গেয়ে ছড়িয়ে দেয় ভুরভুরে ফুলের আতর। আমার মাছধরা অনেকটা অজুহাত মাত্র—প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ভুরি পরিমাণে উপভোগ করার অজুহাত।

আমার মৎস্যশিকারের মতো আমার পক্ষীশিকারেরও শখ ছিল ওই শ্রেণির। পাখিরা আমাকে ফাঁকি দিলেও আমার আক্ষেপ হত না বেশি। বাঘ-ভাল্লুকের মতো শিকারের পাখিরাও বনবাসী জীব। তাদের সঙ্গেও শহরের ড্রয়িংরুমে বসে মুলাকাত করা চলে না, উপবনে তাদের বিহারভূমি নয়, তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে যেতে হয় এমন নির্জন বনভূমির মধ্যে, যেখানে দিকে দিকে

সাজানো থাকে প্রকৃতির নিজস্ব ভাণ্ডার। সেখানে পাখিরা বিমুখ হলেও প্রকৃতি কারুর প্রতি বিমুখতা প্রকাশ করেন না—মহাজন বা অভাজন সকলের কাছেই অকৃপণভাবে বিলিয়ে দেন তিনি অজস্র সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য। সেখানে পদার্পণ করলে আমার প্রাণে জেগে ওঠে রক্তভৃষার বদলে রূপের নেশা এবং তখন আমি তাইতেই খুশি হয়ে মনে মনে রচনা করি পল্লিগাথা বা পল্লিদৃশ্যবিষয়ক এমন কোনোকিছু, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'আইডিল (Idyll)'। তালেবর শিকারিদের ব্যাঘ্রহত্যার রোমাঞ্চকর কাহিনি পাঠ করবার পর আমার এই 'আইডিল'টুকু মিঠে চাটনির মতো লাগতে পারে। মৃগয়ায় বেরিয়ে আমার কাছে শিকারের পশুপক্ষীই সবচেয়ে দ্রষ্টব্য হয়ে ওঠে না, আমার মানসপটে প্রাধান্য বিস্তার করে রূপেরসে জীবন্ত, বর্ণবিচিত্র পল্লিচিত্র।

কিছু কম অর্ধ শতাব্দী আগেকার কথা।

বোধহয় তার নাম ফ্রান্সিস। তবে হলপ করতে পারব না, কারণ কেউ যদি বলেন—না, তার নাম টম কি হ্যারি, তাহলে আমার প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা নেই। এতকাল পরে স্মৃতিবিচ্যুতি হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু যখনই তার কথা স্মরণে আসে, মনে হয় তার নাম ফ্রান্সিস, তাই তাকে ওই নামেই ডাকা বিধেয়।

বিলাতে কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের পরলোকগমনের পর সে এদেশে এসে রাজসরকারে চাকরি গ্রহণ করেছিল। কুচবিহারের গদির অধিকারী তখন মহারাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ।

ফ্রান্সিস বয়সে যুবক, আমার চেয়ে কিছু বড়ো। সুজনবাবুর মধ্যস্থতায় তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, তিনি ছিলেন সেখানকার ফোটোগ্রাফার। আমি থাকতুম আমার মেসোমহাশয় স্বর্গীয় সূর্যনাথ গুপ্তের কাছে, তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ভাগিনেয়, সুতরাং সম্পর্কে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের শ্যালক।

শীতের এক দুপুরে সুজনবাবু ও ফ্রান্সিসের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলুম, উদ্দেশ্য পাখিশিকার। সুজনবাবু ও আমার হাতে ছিল বন্দুক, কিন্তু ফ্রান্সিসের আবদারে আমার বন্দুকটি তার হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য হলুম অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

শহরের সীমানা ছাড়িয়ে একটি ঝিল কি বদ্ধ নদীর ধারে গিয়ে পড়লুম, স্থানীয় লোকেরা তার নাম রেখেছে 'ছোটো তোর্সা'। এতদিনে সেটি একেবারে মজে গিয়েছে কি না জানি না, কিন্তু তখন সেই জলাশয়ের ধারটি ছিল নিরিবিলি মনোরম ঠাঁই। দুই পাড়ে ঘাস-বিছানার উপরে দাঁড়িয়ে পুলকে কম্পমান পাদপরা কালো জলের ভিতরে দেখত নিজেদের সবুজ ছায়ার ছবি। ঝিলে কুতূহলে সাঁতার দিয়ে ভেসে যেত অমলধবল রাজহংসযূথ; জলে রঙিন বিদ্যুৎপ্রভার মতো ঝাঁপ

খেয়ে চকিতে আবার উড়ে গাছের ডালে গিয়ে বসত মাছরাঙারা; এখানে ওখানে তীরে তীরে এক ঠ্যাং তুলে যেন কৃচ্ছ্রসাধন করত ধ্যানী বকের দল; এবং মাথার উপরে শ্যামল শামিয়ানার আড়ালে থেকে থেকে সুরে ডেকে উঠত গীতকারী কত পাখি! শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ ভরা সে বড়ো চমৎকার জায়গা, আজও তার মোহ আমাকে ছাড়েনি—দিবাস্বপ্নে কত দিন চলে যাই আবার সেইখানে।

ছায়াঢাকা, মায়ামাখা, পাখিডাকা 'ছোটো তোর্সা'র নিরালা তটভূমি পিছনে ফেলে এগিয়ে চললুম খোলা মাঠের উপর দিয়ে। দূরে দেখা যাচ্ছিল দিকচক্রবালরেখার উপরে আঁকা কৃষ্ণাভ নীল অরণ্যলেখা—আমাদের গন্তব্য স্থল। ডাইনে বামে শস্যখেত, পায়ে-হাঁটা মেঠো পথ। মাথার উপরে নীলোৎপল নিংড়ানো রং মাখা আকাশের অসীমতা নিয়ে পথিক সূর্য জেগে আছে শূন্যমার্গের মাঝামাঝি—প্রখর রৌদ্রে ঝলমল করছে পরিদৃশ্যমান পৃথিবী, ধু ধু মাঠের হু হু হাওয়া তপ্ততা ভরা, মাঠের প্রান্ত পর্যন্ত এসেই সেই শীতের দুপুরেও দেহ হয়ে উঠল ঘর্মাক্ত, কণ্ঠ হয়ে উঠল তৃষ্ণার্ত।

সেইখানে ছোটো একটি গ্রাম। আমাদের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে জনকয় কোমরে কাপড় বাঁধা আদুল-গা চাষা, গুটিকয় পূর্ণ-দিগম্বর বালক ও শিশু এবং খোড়ো কুটিরগুলোর আশপাশেও উৎসুক চোখে উঁকিঝুঁকি মারছে পাঁচ-সাতটি কিশোরী ও বুড়ি কালোকোলো কৃষাণী। একপাল দেশি কুকুরও কোথা থেকে বেগে ছুটে এল এবং আমাদের মূর্তিমান উপদ্রবের মতো মনে করে ক্রুদ্ধ ঘেউঘেউ রবে সম্মিলিত কণ্ঠে তাদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতে লাগল।

পুরোভাগে চলেছেন মেদবহুল বপুর উপরে প্যান্ট-কোট-টুপি চাপিয়ে কালো সাহেব সুজনবাবু, তারপর দীর্ঘদেহ খাঁটি গোরা ফ্রান্সিস এবং সর্বশেষে ধুতি ও ফ্লানেলের শার্ট পরে কৃশতনু কালা আদমি আমি—বোঝা গেল, এই অভাবিত ত্রয়ীকে দেখে সেই বৈচিত্র্যহীন গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে বেশ কিঞ্চিৎ উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়েছে।

অরণ্যের সামনে এসে সুজনবাবু প্রস্তাব করলেন, শিকারের সুবিধার জন্যে তিনি যাবেন একদিকে এবং ফ্রান্সিসের সঙ্গে আমি যাত্রা করব অন্যদিকে। তাই সই।

আমার বন্দুক পরহস্তগত। সুতরাং আমার আর করণীয় ছিল না বিশেষ কিছু। সুড়সুড় করে চললুম ফ্রান্সিসের পিছু পিছু।

অরণ্যের মধ্যে পদার্পণ করে ফ্রান্সিস বললে, 'দ্যাখো বয়, ইংল্যান্ড থেকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে এদেশে এসেছি, অন্তত একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার বধ করব।'

আমি বললুম, 'শুনেছি এ বনে বাঘ আছে। কিন্তু আপাতত তার কথা ভুলে যাও, কারণ আমাদের কাছে আছে একটিমাত্র পাখিমারা বন্দুক।'

সে বললে, 'হুঁ, টাইগার এলে মোটেই জুত করে উঠতে পারব না। তবে আজ যদি দু-একটা হিমালয়ের পায়রা কি ময়ূর পাই, তাহলেও আমি সুখী হব।'

অরণ্য বলতে একটিমাত্র বন বুঝায় না। তার বিরাট অন্দরমহলে থাকে ছোটো-বড়ো-মাঝারি অনেক বন। বিশেষ করে তাদের বর্ণনা দেবার জায়গা এখানে নেই। এইটুকুই খালি বলে রাখি যে, প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে আমরা দুজনে এ-বন সে-বন ঘুরে বেড়ালুম। কোথাও কোথাও বন ঘনসন্নিবিষ্ট লতাপাতায় ও ঝোপেঝাপে এমন দুর্ভেদ্য ও দুরধিগম্য যে পদচালনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। মাথার উপরেও পত্রাবরণে শূন্যকে ঢেকে দলে দলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে মহা মহা মহীরুহ, এমনকি সেখান থেকে মুখ তুলে দেখা যায় না আকাশ এবং সূর্যালোককেও।

হিমালয়ের পায়রা বা ময়ূর তো দূরের কথা, শিকারের উপযোগী কোনো পাখিরও দেখা বা সাড়া পাওয়া গেল না।

অবশেষে একটা ফর্দা জায়গায় গিয়ে আমরা হতাশ ভাবে দাঁড়িয়ে পড়লুম।

একটি ছোট্ট মাঠ। আমাদের কাছ থেকে হাত ত্রিশ তফাতে সামনেই রয়েছে কতগুলো ঝোপঝাপ এবং তার দুই দিকে উচ্চভূমির উপরে সারিবাঁধা নিবিড় জঙ্গল।

আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখা গেল, সূর্য তখন পশ্চিম পথের যাত্রী।

আমি বললুম, 'ওহে, খানিক পরেই চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসবে।'

ফ্রান্সিস রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললে, 'চলো, এইবার ফেরা যাক।'

আচম্বিতে দুলে দুলে উঠল সামনের ঝোপটা। এবং সঙ্গে সঙ্গে সচকিতে জাগ্রত হয়ে উঠল আমাদের সর্বাঙ্গ।

ঝোপের দুলুনি দেখেই বেশ বোঝা গেল, তার মধ্যে প্রবেশ করেছে কোনো বড়ো জাতের জানোয়ার।

তৎক্ষণাৎ বন্দুক বাগিয়ে ধরে ফ্রান্সিস বললে, 'আমি ওকে দেখেছি। টাইগার!'

চমৎকার কথা,—আমি নিরস্ত্র এবং ফ্রান্সিসের হাতে একটা পাখিমারা বন্দুক! তখনকার মনের ভাব ভাষায় বর্ণনা না করাই ভালো!

আড়ষ্ট চক্ষে সেইদিকে তাকিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, ঝোপটা আবার খুব নড়ে উঠল এবং পরমুহূর্তেই ঠিক যেন একটা হলদে রঙের বিদ্যুৎ শূন্যে লাঙ্গুল আস্ফালন করে ঝোপ থেকে লাফ মেরে পাশের উচ্চভূমির উপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দেখতে ভুল হল না—সেটা একটা চিতাবাঘ! বোধ করি সে আমাদেরও চেয়ে বেশি ভয় পেয়েছে।

কাহিনি এইখানেই শেষ করলে চলত, কিন্তু আমাদের বিপদের পাত্র পূর্ণ হয়নি তখনও কানায় কানায়!

বাঘটা পিঠটান দিলে, আমরাও সে স্থান ত্যাগ করলুম—ধীরে-সুস্থে নয়, রীতিমতো জোরকদমে!

কোথায় যাচ্ছি তা জানি না, কিন্তু পথ যে ভুলেছি সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। মনের মধ্যে কেবল এক চিন্তা জেগে রইল—এই বিপজ্জনক স্থান থেকে যত দূরে যাওয়া যায় ততই ভালো!

বনের আলো ক্রমেই ম্লান হয়ে আসতে লাগল ধীরে, ধীরে, ধীরে।

মিনিট পঁচিশ দিশেহারার মতো পদচালনা করবার পর এমন এক অদ্ভুত জায়গায় এসে পড়লুম যেটাকে প্রায় শুঁড়িপথ বলা যেতে পারে। বেশ লম্বা পথ,—ঠিক বীথির মতো। দুই ধারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বড়ো বড়ো গাছের পর গাছ এবং দেখতে যেন নিরেট জঙ্গলের প্রাচীর। উপরদিকটাও লতায় পাতায় ঢাকা, আকাশ দেখা যায় না। সেখানে দিনের বেলাতেও বাস করে সন্ধ্যার সান্দ্র অন্ধকার। অনেক দূরে পথের শেষে দেখা যাচ্ছে আলোকোজ্জ্বল বনভূমির খানিকটা।

কিন্তু সেই বাইরের দিক থেকে আমাদের দিকে দঙ্গল বেঁধে এগিয়ে আসছে কালো কালো কী জানোয়ার ওগুলো? মোষ নয়, গোরু নয়, কিন্তু ছোটো জানোয়ারও নয়।

দাঁতাল শূকর—অর্থাৎ বন্য বরাহ! ওদের খপ্পরে পড়লে আর রক্ষা নেই!

মরিয়ার মতো পাশের দিকে মারলুম এক লম্বা লাফ—কাপড়, জামা ও গায়ের চামড়া কাঁটাগাছের আলিঙ্গনে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল বটে, কিন্তু সশরীরে অবতীর্ণ হলুম জঙ্গলের ওপারে।

তারপরেই ফ্রান্সিসের আর্তনাদ শুনলুম—'কাঁটায় আমায় ধরেছে—জলদি এসো, জলদি!'

ফিরে দেখি ফ্রান্সিসও কাঁটাঝোপের নিবিড় আলিঙ্গনে বন্দি হয়ে ঠিক ক্রুশবিদ্ধ যিশুখ্রিস্টের মতো দুই হাত দুই দিকে ছড়িয়ে দিয়ে নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়িয়ে আছে!

বরাহের দল কাছাকাছি আসবার আগে তাড়াতাড়ি তাকে সেই অসহায় অবস্থা থেকে উদ্ধার করে আর-একদিকে পা চালিয়ে দিলুম।

অরণ্যের গর্ভে অন্ধকার যখন আরও ঘন হয়ে উঠেছে, সেই সময়ে কানে এল কোনো নদীর 'জলদলকলরব'। তারপরেই এসে দাঁড়ালুম একেবারে মুক্ত আকাশের তলায়।

অস্তগামী সূর্যের স্বর্ণকিরণ নিয়ে খেলা ও ছন্দে ছন্দে সংগীত সৃষ্টি করতে করতে বয়ে যাচ্ছে আনন্দময়ী স্রোতস্বতী।

তোর্সা নদী।

আহা, চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। সেদিন তাকে দেখে কল্পনাও করতে পারিনি, এই তোর্সাই কোনোকালে প্রলয়ংকারী মূর্তি ধরে কুচবিহারের রাজধানী পর্যন্ত আক্রমণ করতে পারে।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ

॥ ক ॥

বিধু বলত, 'ম্যাট্রিক পাস করেই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ হব।'

বিধু যে ম্যাট্রিকের ফটক পেরুতে পারবে, এত বড়ো দুরাশার জন্ম অসম্ভব। বিড়ালের কাছে কুকুর যেমন, তার কাছে ইস্কুলের বইগুলোও ছিল তেমনি চক্ষুশূল। দিন-রাত পড়ত খালি গোয়েন্দা-কাহিনি!

অসংখ্য গোয়েন্দা-কাহিনি পড়ে পড়ে বিধুর এখন দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, ডিটেকটিভ হতে গেলে যা যা জানা দরকার সে-সবের কিছুই তার আর জানতে বাকি নেই!

বিধু যখন-তখন নাক মুখ সিঁটকে বলত, 'যত হাঁদারাম গিয়ে বাংলা দেশের পুলিশের দলে ভরতি হয়েছে। চোর-ডাকাত ধরবার আসল ফন্দিই তারা জানে না। শার্লক হোমসের মতো পাকা ডিটেকটিভ এখানে নেই। আমিই হব বাংলা দেশের প্রথম শার্লক হোমস।'

বিধুর মুখে রোজ এমনি সব কথা শুনে শুনে ক্রমে আমারও তার বুদ্ধি আর শক্তির উপরে শ্রদ্ধা বাড়তে লাগল।

যখন শোনা যেত অমুক জায়গায় খুব বড়ো চুরি হয়ে গেছে, কিন্তু পুলিশ চোর ধরতে পারছে না, বিধু তখন আপশোশ করে বলত, 'ওঃ, বাংলা দেশের পুলিশ কেবল 'ফুলিস' নয়, বদ্ধ অন্ধও! আমি হলপ করে বলতে পারি, ঘটনাস্থলে চোর নিশ্চয় কোনো চিহ্ন রেখে গেছে! একটা বোতাম, আঙুলের দাগ, কি একটা পায়ের ছাপ! তাই দেখেই আমি চোর ধরে দিতে পারি! এ-সব মামলার কিনারা করবার জন্যে পুলিশ আমার কাছে আসে না কেন? বিলাতের পুলিশ তো শার্লক হোমস-এর কাছে আনাগোনা করত!'

আমি চমৎকৃত হয়ে বলতুম, 'ভাই বিধু, এদেশে কেউ তোমাকে চিনতে পারলে না, গেঁয়ো যোগী ভিক্ষা পায় না কিনা! কিন্তু তোমাকে বন্ধুরূপে পেয়ে আমি গর্বিত!'

বিধু মুরুব্বিআনা-চালে বার-দুয়েক আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলত, 'শার্লক হোমসের সঙ্গে ছায়ার মতন থাকতেন তাঁর বন্ধু ওয়াটসন। তুমিই হবে আমার ওয়াটসন! আমরা দুজনে বাংলা দেশের চোর-ডাকাতের বংশ নির্মূল করে ছাড়ব!'

আমি বলতুম, 'এ আমার সৌভাগ্য!'

সেইদিন থেকেই বিধু আমাকে ওয়াটসন বলে ডাকতে শুরু করলে।

॥ খ ॥

আমার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না, হঠাৎ একদিন আমাদের বাড়িতে হল এক দুষ্ট চোরের আবির্ভাব।

রাত্রে চোর এসে লোহার সিন্দুক খোলবার চেষ্টা করছিল। পাশের ঘরে ছিলেন বাবা। হঠাৎ কী শব্দ শুনে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। তিনি উঠে গোলমাল করতেই চোর দেয় চম্পট! কিচ্ছু চুরি করতে পারেনি।

বিধু সেই খবর শুনেই উত্তেজিত হয়ে বললে, 'ওয়াটসন, এই ব্যাপার থেকেই আমাদের ডিটেকটিভ জীবনের পত্তন করা যাক! যে চুরি করতে এসেছিল আমি তাকে ধরে দেব!'

সবিস্ময়ে বললুম, 'কেমন করে?'

বিধু মুখে বিপুল গাম্ভীর্যের বোঝা চাপিয়ে বললে, 'ডিটেকটিভের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, সূত্র আবিষ্কার করা। ঘটনাস্থলে চোর কিছু চিহ্ন রেখে গেছে?'

—'গেছে। একটা কোট।'

—'কোট? কোট তো থাকে গায়ে, চোর সেটা ফেলে গেছে কেন?'

—'কাল রাতে কী-রকম গুমোট গরম গেছে জানো তো? সিন্দুক খোলবার আগে কাজের সুবিধা হবে বলে চোর বেটা বোধ হয় কোটটা গা থেকে খুলে রেখেছিল। তারপর তাড়া খেয়ে তাড়াতাড়িতে কোটটা নিয়ে লম্বা দিতে পারেনি।'

আমার পিঠ চাপড়ে বিধু বললে, 'ওয়াটসন, তোমার আন্দাজ করবার শক্তি দেখে খুশি হলুম! বহুৎ আচ্ছা, নিয়ে এসো সেই কোটটা!'

এক দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে কোটটা নিয়ে এলুম। ছোটো ছোটো চৌকো ঘর-কাটা ছিটের কোট।

কোটের পকেট থেকে বেরুল এক প্যাকেট 'পাসিং সো' সিগারেট আর কাগজে মোড়া খানিকটা দোক্তা। এবং একটা আধলা।

বিধু একটা ফিতে নিয়ে কোটটা খানিকক্ষণ ধরে মাপলে। তারপর গম্ভীর স্বরে বললে, 'ওয়াটসন, যে এই কোটের মালিক, সে পান খেতে ভালোবাসে, সে বড়োলোক নয়, সে দেহে খুব লম্বা-চওড়া!'

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললুম, 'কী করে এমন অদ্ভুত আবিষ্কার করলে?'

—'সে চিনের বাদামও খায়!'

—'কী আশ্চর্য, কী করে জানলে?'

—'পকেটে যে দোক্তা নিয়ে বেরোয় সে পানের ভক্ত না হয়ে যায় না। যার সম্বল খালি একটা আধলা আর যে 'পাসিং সো'র মতো কম দামের সিগারেট

ব্যবহার করে নিশ্চয়ই সে বড়োলোক নয়। কোটের গলা, ছাতি আর ঝুলের মাপ দেখেই বোঝা যাচ্ছে লোকটার দেহ খুব লম্বা-চওড়া। পকেটের ভেতরে কতকগুলো চিনের বাদামের খোসা পেয়েছি, সুতরাং চোর চিনের বাদামও খায়।'

আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললুম, 'ধন্য বিধু, ধন্য তোমার বুদ্ধি!'

বিধু গর্বিত কণ্ঠে বললে, 'চোরের চেহারা আর স্বভাব জানা গেল। এখন তাকে গ্রেপ্তার করতে আর বেশি দেরি লাগবে না। বলতে কী, সে তো আমার এই হাতের মুঠোয়'—বলেই সে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে তুলে ধরলে।

আমি বিস্ফারিত চোখে রোমাঞ্চিত দেহে বিধুর হাতের মুঠোর দিকে তাকিয়ে রইলুম—যদিও বুঝতে পারলুম না যে, তার অতটুকু মুঠোর ভিতরে অত বড়ো একটা চোর বন্দি হবে কেমন করে।

বিধু আবার বললে, 'ধিক এই বাংলা দেশের পুলিশ! এইবারে দেখুক তারা, বুদ্ধি থাকলে কত সহজে টপ করে চোর ধরা যায়!'

॥ গ ॥

বিধু মুখে আবার বিপুল গাম্ভীর্যের ভাব এনে বললে, 'ডিটেকটিভের দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে, সর্বদা সতর্ক চোখ খুলে রাখা।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, সর্বদা চোখ খুলে রাখলে চোখে কিছু পড়বেই—অন্তত পোকামাকড়টাও।'

তারপর কিছুকাল বিধু পথে পথেই দিন কাটায়। আমাকেও দায়ে পড়ে তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকতে হয়—কারণ আদি শার্লক হোমসের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো থাকতেন তাঁর বন্ধু ওয়াটসন, আর আমি হচ্ছি সেই ওয়াটসনেরই মূর্তিমান দ্বিতীয় সংস্করণ! না বলবার জো নেই।

ঘুরে ঘুরে পায়ে পড়েছে যখন ফোসকা এবং রোদে পুড়ে পুড়ে গায়ের রং হয়েছে যখন তামাটে, তখন হঠাৎ একদিন আমাদের খুলে-রাখা সতর্ক চোখে পড়ল একটি অতিশয় সন্দেহজনক মূর্তি!

বিধু উত্তেজিত আনন্দে একটি লম্ফত্যাগ করে বললে, 'ওয়াটসন, দেখছ লোকটার চেহারা কী-রকম লম্বা-চওড়া?'

—'হুঁ।'

—'ওর গায়ের কোটটা দ্যাখো!'

—'ছোটো ছোটো চৌকো ঘরকাটা ছিটের কোট। চোর আমাদের বাড়িতে যে কোটটা ফেলে গেছে ঠিক যেন তারই জোড়া।'

—'লোকটা একটা সিগারেটও টানছে। কিন্তু ওটা কী সিগারেট?'

'পাসিং সো হতে পারে। কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে আসব নাকি?'

—'ওয়াটসন, তুমি একটি আস্ত এবং মস্ত ass! তাহলে ও সন্দেহ করবে যে! ...আরে দ্যাখো দ্যাখো, লোকটা কাকে ডাকলে!'

—'চিনেবাদামওয়ালাকে।'

—'সব হুবহু মিলে যাচ্ছে! চলো, আমরা ওর পিছু নি!'

পিছু নিলুম। আধ ঘণ্টা এ-পথে সে-পথে ঘুরে ঘুরে লোকটা একটা পানওয়ালার দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বিধু তফাত থেকে উঁকি মেরে দেখে বললে, 'ওয়াটসন, এ কী হল! ও যে 'গোল্ডফ্লেক' সিগারেটের প্যাকেট কিনলে!'

—'বেটা বোধহয় অন্য কোথাও চুরি করে হঠাৎ বড়োলোক হয়ে পড়েছে!'

—'ওয়াটসন, তুমি একটি জিনিয়াস! ঠিক ধরেছ! এখন একবার যদি ওর কোটটা হাতে পাই!'

—'তাহলে কী হবে?'

—'চোরের কোটের সঙ্গে ওর কোটের মাপ মিললেই তো কেল্লা ফতে!'

—'কিন্তু ও তোমার হাতে কোটটা দেবে কেন?'

—'সেইটেই তো সমস্যা! লোকটা গুন্ডার মতো দেখতে। জোর করে কোট দেখতে চাইলে হয়তো ধাঁ করে মেরেই বসবে।'

লোকটা আবার চলতে সুরু করল। আমরাও তার সঙ্গ ছাড়লুম না।

তারপর সে হঠাৎ একখানা বাড়ির ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাড়িখানার উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিধু বললে, 'আজ রাত বারোটার সময়ে এইখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে।'

॥ ঘ ॥

বিধু মুখে বিপুল গাম্ভীর্যের জাহাজ নামিয়ে এনে বললে, 'ডিটেকটিভের তৃতীয় কর্তব্য হচ্ছে, অসীম সাহসে বিপদ-আপদকে তুচ্ছ করা। ওয়াটসন, নিশ্চয়ই তুমি ভিতু নও!'

রাত বারোটা। আবছা চাঁদের আলোয় আমরা দুজনে সেই বাড়িখানার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। চারিদিক কী স্তব্ধ! পথে নেই জনপ্রাণী।

আমি বললুম, 'আমার বিশ্বাস আমি ভিতু নই। আমাকে কী করতে হবে বলো।'

—'বাড়ির গা বেয়ে ওই যে দেখছ নলটা, ওইটে অবলম্বন করে দোতলায় উঠতে হবে। অবশ্য আমিও উঠব।'

প্রস্তাব শুনেই হৃৎকম্প উপস্থিত হল। কিন্তু মুখে বললুম, 'তারপর?'

—'সেই লোকটা নিশ্চয়ই এখন কোনো ঘরে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘুমোবার আগে কোটটা সে খুলে রেখেছে। আমাদের সেই কোটটা আবিষ্কার করতে হবে।'

—'যদি ধরা পড়ি?'

—'এটা দেখলে কেউ আর আমাদের ধরতে আসবে না! দেখছ, এটা কী?'

আমি আঁতকে উঠে বললুম, কী সর্বনাশ! তুমি কি মানুষ খুন করতে চাও? ওটা যে রিভলভার!'

বিধু হেসে বললে, 'হ্যাঁ, নকল-রিভলভার! বিলাতি খেলনার দোকানে পাওয়া যায়। এখন এসো, আমরা উপরে উঠি।'

নল বেয়ে দোতলায় ওঠার হাঙ্গামাটা আমার মোটেই ভালো লাগল না। একবার হাত ফসকালেই হয় হাসপাতাল, নয় নিমতলা-ঘাটে যাত্রা করতে হবে সজ্ঞানে না অজ্ঞানে। ওয়াটসন হওয়ার এত বিপদ তা জানতুম না। মনে মনে ভগবানকে ডাকতে লাগলুম। কিন্তু তবু ছাড়ান নেই, শেষপর্যন্ত উঠতে হল।

ফাঁড়ার প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেল। জ্যান্ত অবস্থাতেই ছাদের উপরে গিয়ে দাঁড়ালুম বটে, কিন্তু বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দ শুনতে পেলুম স্পষ্ট।

একহাতে টর্চ, আর একহাতে নকল-রিভলভার নিয়ে বিধু চুপিচুপি বললে, 'ওইদিকে সিঁড়ি রয়েছে। পা টিপে টিপে আমার সঙ্গে নেমে এসো।'

পা টিপে টিপেই অগ্রসর হলুম বটে, কিন্তু মনে হতে লাগল আমার বুকের দুপদুপনির শব্দে সারা পাড়া এখনই জেগে উঠবে। মনে মনে বললুম, 'হে মা কালী, হে মা দুর্গা! এ-যাত্রা যদি মানে মানে আমাকে রক্ষা করো, তাহলে আমি আর কখনো ওয়াটসন হবার চেষ্টা করব না।'

কিন্তু আমার কাতর প্রার্থনা মা-কালী বা মা-দুর্গার কাছে পৌঁছবার আগেই বারান্দার ওধারের অন্ধকারের ভিতর থেকে গর্জন করে কে বলে উঠল,—'কে রে! কে রে! কে রে!' তারপরেই অতি দ্রুত পায়ের শব্দ।

বারান্দার এপাশ হাতড়ে বিধু তৎক্ষণাৎ একটা দরজা আবিষ্কার করে ফেললে এবং চোখের পলক পড়বার আগেই আমাকে টেনে নিয়ে একটা অন্ধকার ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে।

॥ ৬ ॥

বিধু বললে, 'ডিটেকটিভের চতুর্থ কর্তব্য হচ্ছে, উপস্থিত বুদ্ধি খাটাতে পারা। ভাগ্যিস আমি উপস্থিত বুদ্ধি হারাইনি, নইলে এতক্ষণে ওরা আমাদের ধরে ফেলত!'

হঠাৎ 'সুইচ-টেপার শব্দ,'—সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরে যেন তীব্র আলোর ঝড় খেলে গেল!

এক মুহূর্ত অন্ধের মতো থেকে যখন আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে পেলুম তখন স্তম্ভিত নেত্রে দেখলুম যে, খাটের উপরে অবাক বিস্ময়ে বসে আছেন আমাদেরই ইস্কুলের হেডপণ্ডিতমশাই!

নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারলুম না,—এও কি সম্ভব? আমাদের ইস্কুলের সদাই-খাপ্পা হেডপণ্ডিতমশাই, ভয়ংকর খোট্টাই গাঁট্টার আবিষ্কারক রূপে ছেলেমহলে যিনি অত্যন্ত বিখ্যাত, আমরা কি আজ অজান্তে তাঁরই বাড়িতে, তাঁরই শয়নগৃহে এসে পড়েছি? একেবারে বাঘের মুখে! ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ভয়ে আমার মূর্চ্ছার উপক্রম হল!

ওদিকে বাহির থেকে ঘরের দরজার ধাক্কা পড়তে লাগল এবং সেই সঙ্গে চিৎকার শোনা গেল—'চোর, চোর! দাদা তোমার ঘরে চোর ঢুকেছে!'

এ আবার কী হল,—চোরের খোঁজে এসে নিজেরাই চোর বলে ধরা পড়ব নাকি?

হেডপণ্ডিত শুধোলেন—কে রে? প্রেমলাল না? আরে, বিধুভূষণও যে! ব্যাপার কী হে, তোমার হাতে রিভলভারের মতন ওটা আবার কী? তোমরা স্বদেশি ডাকাত হয়েছ নাকি?'

ধন্য বিধু, তখনই সে উপস্থিত বুদ্ধি হারাতে রাজি হল না, সে মুখে হাসি আনবার মিথ্যা চেষ্টা করে বললে, 'আজ্ঞে না স্যার, আমরা স্বদেশি ডাকাত নই—আমরা হচ্ছি প্রাইভেট ডিটেকটিভ!'

—'প্রাইভেট ডিটেকটিভ? বটে, বটে! তাই রাত বারোটার সময়ে চোরের মতো ঢুকেছ আমার বাড়িতে? ওদিকে তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছ আমার ঘরে? আমাকে ন্যাকা পেয়েছ, না? আচ্ছা দাঁড়াও!'—পণ্ডিতমশাই খাট থেকে লাফিয়ে পড়ে বেগে তেড়ে এসে বিধু ডিটেকটিভের মাথায় 'ধঠাৎ' করে বসিয়ে দিলেন তাঁর প্রসিদ্ধ খোট্টাই গাঁট্টা!

ইতিমধ্যে আমার ভীত ও ব্যস্ত চোখে পড়ল, ঘরের একটা জানলায় একটা গরাদে নেই! পণ্ডিতমশাইয়ের দ্বিতীয় গাঁট্টা বিধুর মাথায় অবতীর্ণ হবার আগেই

সেই ভাঙা জানলা দিয়ে আমি রাস্তায় ঝাঁপ খেলুম। হাতে-পায়ে যথেষ্ট চোট লাগল বটে, কিন্তু সুবিখ্যাত খোট্টাই-গাঁট্টার তুলনায় সে-সব আঘাত কিছুই নয়।

॥ চ ॥

পরদিন সকালে বিধু ম্লানমুখে এসে দেখালে, গাঁট্টার চোটে তার মাথার এগারো জায়গা ফুলে ঢিবি হয়ে উঠেছে।

খোট্টাই-গাঁট্টার কীর্তি-দর্শন যখন শেষ হল, বিধু অভিমান ভরে বললে, 'ওয়াটসন, তুমি যে এমন কাপুরুষ আমি তা জানতুম না! আমাকে যমের মুখে ফেলে অনায়াসে চম্পট দিলে?'

দুঃখিত স্বরে বললুম, 'পালিয়ে আর এলুম কোথায় ভাই, যমের মুখ থেকে কি পালিয়ে আসা যায়? ইস্কুলে গেলেই টের পাবে, খোট্টাই-গাঁট্টা আমারও জন্যে বিপুল বিক্রমে অপেক্ষা করছে!'

বিধু মাথা নেড়ে বললে, 'না, তোমার আর ভয় নেই! তুমি হচ্ছ মাত্র ওয়াটসন আর আমি হচ্ছি বাংলার শার্লক হোমস—তোমার চেয়ে ঢের বড়ো, আর বড়ো গাছই ঝড়ে পড়ে!'

বিধুর জাঁক আজ আর ভালো লাগল না। বিরক্ত ভাবে বললুম, 'তার মানে?'

বিধু বললে, 'সমস্ত ঝড় আমার মাথার উপর দিয়েই বয়ে গেছে, তোমার আর কোনো ভয় নেই।'

—'তাই নাকি, গাঁট্টা-বৃষ্টি যখন থামল তুমি তখন কী করলে?'

—'আমি পণ্ডিতমশাইকে সব কথা খুলে বললুম। শুনে তিনি পাঁচ মিনিট ধরে হো হো করে হেসে বললেন—'এ সব কথা জানলে আমি তোমাকে এত জোরে অতগুলো গাঁট্টা মারতুম না!' তাঁর ঘরে রসগোল্লা ছিল, আমাকে মিষ্টিমুখ করিয়ে তবে ছেড়ে দিলেন।'

—'আমরা যার পিছু নিয়েছিলুম, সে লোকটা কে?'

—'পণ্ডিতমশায়ের ভাই। আমাদের বড়োই ভুল হয়ে গেছে, আবার দেখছি গোড়া থেকে তদন্ত আরম্ভ করতে হবে! ডিটেকটিভের পঞ্চম কর্তব্য হচ্ছে—'

বাধা দিয়ে বললুম, 'তোমার ও ডিটেকটিভের কর্তব্যের তালিকা রেখে দাও! মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য হচ্ছে, নিজের প্রাণ বাঁচানো। আমি আর তোমার দলে নেই।'

—'সে কী ওয়াটসন?'

—'কে ওয়াটসন? আমার নাম প্রেমলাল মিত্র। নিজের নাম আর কখনো আমি ভুলব না!'

একদিনের অ্যাডভেঞ্চার

(সত্য ঘটনা)

অনেকদিন আগেকার কথা। আমি তখন কুচবিহারে, মেসোমশাইয়ের কাছে। আমার বয়স তখন অল্প, কিন্তু তখন থেকেই দেখতে শুরু করেছি অ্যাডভেঞ্চারের স্বপ্ন।

আমার মেসোমশাই ছিলেন স্বর্গীয় ধর্ম-সংস্কারক মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের ভাগিনেয়। তিনি কুচবিহারের রাজকর্মচারী ছিলেন। ভালো শিকারি বলে তাঁর নামডাক ছিল যথেষ্ট। প্রায় প্রতি বৎসরেই কুচবিহারের মহারাজার সঙ্গে তিনি শিকারে যাত্রা করতেন।

এখনকার কুচবিহার শহরের কথা বলতে পারি না, কিন্তু তখনকার শহরের আশেপাশে চিতাবাঘের অত্যাচারের কথা শোনা যেত প্রায়ই। সাধারণত তারা গৃহপালিত জীবজন্তুদের উপরেই হানা দিত বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে বাগে পেলে নরহত্যা করতেও ছাড়ত না।

মেসোমশাই মাঝে মাঝে বন্দুক কাঁধে করে বেরিয়ে যেতেন এবং প্রতি বারেই ফিরে আসতেন একটা মরা চিতাবাঘ নিয়ে। দেখে-শুনে আমার ধারণা হল, বাঘ শিকার করা হচ্ছে একটা ভারী সহজ ব্যাপার। বন্দুক ছোড়ার অভ্যাস থাকলে যে কোনো লোক বাঘ মারতে পারে।

মাঝে মাঝে আমিও মেসোমশাইয়ের পাখি-মারা বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়তুম এবং শহরের বাইরে গিয়ে পক্ষী-রাজ্যের মধ্যে করতুম দারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি। প্রথম শিকারির মতন নিষ্ঠুর জীব বোধ হয় আর নেই—কারণ জীবহত্যার আনন্দ তাকে যেন একেবারে পেয়ে বসে। নতুন বন্দুক ছুড়তে শিখে আমিও কোনো পাখিকেই রেহাই দিতুম না। তা সে শকুনিই হোক আর কাক-বক-চিলই হোক!

পক্ষী শিকারে আমার সঙ্গে থাকত কুচবিহারের বাসিন্দা একটি ছেলে। এতদিন পরে নামটি আমার মনে পড়ছে না, সুতরাং তাকে প্রশান্ত বলেই ডাকব।

প্রশান্ত ছিল অতি-ওস্তাদ ছেলে। কোনো কাকই সবচেয়ে উঁচু ডালে বাসা বেঁধেও তার হাত থেকে রেহাই পেত না, প্রশান্ত গাছে চড়ে ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা দেবে বলে কাকের ডিম চুরি করবেই। কোনো গৃহস্থই দুরারোহ পাঁচিল দিয়েও

তার কবল থেকে বাগানের পাকা ফল রক্ষা করতে পারত না। প্রতিমাসে অন্তত দিন-পনেরো সে ইস্কুল থেকে পালিয়ে পথে-বিপথে টো টো করে ঘুরে বেড়াত, অথচ বাৎসরিক পরীক্ষায় সে নাকি নম্বর পেত সবচেয়ে বেশি!

প্রশান্তের শিকারের শখ ষোলোআনা, কিন্তু বন্দুক ছিল না। এ অভাব সে কতকটা পূরণ করে নিলে ধনুকধারী হয়ে। বাঁখারি ও কঞ্চি দিয়ে স্বহস্তে তৈরি করে নিলে ধনুক ও বাণ।

তার অস্ত্র দেখে আমি হেসে ফেললুম।

প্রশান্ত বললে, 'হেসো না হে ভায়া, হেসো না! তির-ধনুক বড়ো ফ্যালনা নয়! ত্রেতায় রামচন্দ্র আর দ্বাপরে অর্জুন এই তির-ধনুকের জোরেই মহাবীর হতে পেরেছিলেন, বুঝেছ?'

আমি বললুম, 'কিন্তু রাম আর অর্জুন কলিকালে জন্মালে তাঁদের বীরত্বকে লুপ্ত করবার জন্যে দরকার হত মাত্র একটি দোনলা বন্দুক!'

প্রশান্ত মাথা নেড়ে বললে, 'না হে, না! আমি কেতাবে পড়েছি, সেকালেও বন্দুক ছিল, নাম তার নালিকাস্ত্র। কিন্তু রাম আর অর্জুন তারও চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন ধনুক-বাণকে।'

আমি বললুম, 'বেশ, তাহলে পরীক্ষা করে দেখা যাক শ্রেষ্ঠ কে? তোমার ধনুক, না আমার বন্দুক?'

পরীক্ষা প্রায়ই হত। সব সময়ে আমার বন্দুক যে জিতত এমন কথা বলতে পারি না, কারণ লক্ষ্যভেদ করবার ক্ষমতা আমার চেয়ে প্রশান্তেরই ছিল বেশি।

তার সঙ্গে একদিন পাখি-শিকারে বেরিয়েছি। ঠান্ডা শীতে তপ্ত রোদের ছোঁয়া পেয়ে চারিদিকের শ্যামলতার ভিতর দিয়ে লীলায়িত হয়ে যাচ্ছে যেন পুলকের হিল্লোল। এ-গাছ ও-গাছ থেকে কাকের দল আমাদের দুই মূর্তিকে দেখেই কা কা রবে নিরাপদ ব্যবধানে উড়ে পালাতে লাগল। কাকদের সমাজে আমরা বোধ হয় 'হত্যাকারী' বলে মার্কামারা হয়ে গিয়েছিলুম।

কুচবিহার শহরের উপকণ্ঠে একটি বদ্ধ নদী আছে। আমরা প্রায়ই তার তীরে তীরে পাখির খোঁজে ঘুরে ঘুরে বেড়াতুম। সেদিনও সেখানে গিয়ে দেখি স্রোতহীন নদীর জলে সাঁতার কাটছে একটি ধবধবে রাজহাঁস।

প্রশান্ত বললে, 'ভাই, তুমি বন্দুক ছুড়ো না। আমি আজ রাজহংস শিকার করব।'

আমি বললুম, 'হাঁসটা যদি কারুর পোষা হয়?'

প্রশান্ত বললে, 'সেইজন্যেই তোমাকে বন্দুক ছুড়ে শব্দ করতে মানা করছি। আমার ধনুক কেমন নীরবে কার্যোদ্ধার করে দ্যাখো।' বলেই সে বাগিয়ে ধরলে ধনুক।

ধনুক নীরবেই বাণ ত্যাগ করলে বটে, কিন্তু পরমুহূর্তেই নদীর ওপার থেকে বিষম চিৎকার করে কেঁদে উঠল একটা দিগম্বর ছেলে!

ধনুকের বাণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বিদ্ধ করেছে সেই ছেলেটার একখানা হাতকে।

আমি বললুম, 'সর্বনাশ, করলে কী প্রশান্ত?'

প্রশান্ত বললে, 'যা হবার হয়ে গেছে, আর কোনো উপায় নেই। এখন তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সরে পড়ি এসো!'

আমি দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললুম, 'কিন্তু আমাদের কি এখন ওই ছেলেটারই কাছে যাওয়া উচিত নয়?'

আমার হাত ধরে টানতে টানতে প্রশান্ত বললে, 'পাগল? মানুষ-শিকারের অপরাধে জেলে যেতে চাও নাকি?'

আমরা দ্রুতপদে মাঠের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলুম। খানিক দূর এগিয়ে গিয়েই পিছনে শুনলুম মহা কোলাহল।

ফিরে দেখি, বিশ-পঁচিশ জন লোক বেগে ছুটে আসছে আমাদের দিকে। তাদের অনেকের হাতে রয়েছে বড়ো বড়ো লাঠি।

প্রশান্ত দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'ওদের মাথার ওপর দিয়ে একবার কি দু-বার বন্দুক ছোড়ো তো! বন্দুকের ধমক শুনলে ওরা আর পালাবার পথ পাবে না!'

আমি বললুম, 'মাপ করতে হল! শেষটা টিপ ফসকে যদি কারুর গায়ে গুলি লাগে? তুমি কি আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে চাও?'

—'কিন্তু ওরা আমাদের ধরতে পারলে কী-রকম আদর করবে জানো?'

—'জানি। কিন্তু ওরা আমাদের ধরতে পারবে কেন? মারো দৌড়!'

মারলুম দৌড়। যে সে দৌড় নয়, যাকে বলে রীতিমতো ভোঁ দৌড়! অত জোরে যে দৌড়তে পারি আমি নিজেই তা জানতুম না! হোঁচট খাই, বেদম হই, চোখে অন্ধকার দেখি, তবু দৌড়, দৌড় আর দৌড়!

মাঠ পেরিয়ে পেলুম বন। বেপরোয়ার মতো ঢুকে পড়লুম বনের ভিতরে। বন ক্রমেই নিবিড়, পদে পদে বাধা, বড়ো বড়ো গাছের পর গাছ, কাঁটাজঙ্গল,

ঝোপঝাপ, আগাছায় ঢাকা ঢিপিঢাপা, পথের রেখা অদৃশ্য!

আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব! দেহের শক্তিও গেল ফুরিয়ে! একটা মস্ত গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে প্রশান্ত ধপাস করে বসে পড়ল, আমিও আসন নিলুম তার পাশে।

প্রশান্ত হাপরের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'এখন স্বয়ং যম এলেও আমাকে এখান থেকে এক পা নড়াতে পারবে না।'

আমি বললুম, 'আপাতত যম বা মানুষ কেউ এখানে আসবে বলে মনে হচ্ছে না। এসো, আগে প্রাণ ভরে হাঁপ ছেড়ে নি।'

হাঁপ ছাড়তে ছাড়তে করুণ চোখে দেখলুম, দেহের অবস্থা হয়েছে শোচনীয়। বারংবার ছোবল মেরে কাঁটা-ঝোপগুলো কেবল সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত করেই দেয়নি, জামা-কাপড়েরও অনেক অংশ টেনে ছিঁড়ে কেড়ে নিয়েছে এবং গাছে গাছে ধাক্কা ও উঁচু-নিচু জমিতে আছাড় খেয়ে দেহের সর্বত্র পড়েছে বড়ো বড়ো কালশিরা। প্রশান্তেরও অবস্থা আমারই মতো; উলটে তার নাকটা এমনভাবে ফুলে উঠেছে যে তাকে আর নাক বলে চেনবার কোনো উপায় নেই! আমার বন্দুকটা এখনও হাতছাড়া হয়নি, কিন্তু প্রশান্তের ধনুক-বাণ আর তার কাছে নেই।

সেই দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই সে ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, 'চুলোয় যাক ধনুক-বাণ! ওই অলক্ষুনে ধনুক-বাণের জন্যেই তো আজ আমাদের এই দুর্দশা! আর কখনো ধনুক ধরব না!'

ঠিক সেই সময়েই আর এক কাণ্ড। খানিক তফাতে জঙ্গল হঠাৎ নড়ে উঠল এবং তার পরেই একটা ঝোপ সরিয়ে বেরিয়ে এল এক চিতাবাঘ!

আমরা একেবারে আড়ষ্ট!

বাঘটাও আমাদের দেখে দস্তুরমতো চমকে উঠল এবং পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎ বেগে লম্বা এক লাফ মেরে পাশের একটা বড়ো ঝোপের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল!

আমি কম্পিত স্বরে বললুম, বন্ধু!'

—'উঁ!'

—'এখানে যম আসেনি বটে, কিন্তু যমদূত এসেছে!'

—'হুঁ।'

—'এখন কী করি?'

—'বন্দুক ধরো।'

—'পাখি মারা বন্দুক?'

—'তাও মন্দের ভালো। বন্দুকটা ছোড়ো, বাঘের পিলে ভয়ে চমকে যেতেও পারে।'

কিন্তু তারপরেই পিলে চমকে গেল আমাদেরই! আচম্বিতে আকাশ, বাতাস, জঙ্গল ও আমাদের বুকের ভিতরটা পর্যন্ত কাঁপিয়ে জেগে উঠল বাঘের গর্জনের পর গর্জন! সামনের বড়ো ঝোপটার এধার থেকে ওধার পর্যন্ত যেন বিষম যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল!

আমরা একেবারে স্তম্ভিত ও হতভম্ব! প্রশান্তের কথায় বন্দুকটা বাগিয়ে ধরেছিলুম, কিন্তু অবশ হাত থেকে খসে বন্দুক পড়ে গেল মাটির ওপরে!

তারপরেই সভয়ে দেখলুম, বাঘটা আবার ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এবং একটা হলদে রঙের মূর্তিমান ঝড়ের মতো ছুটে আসতে লাগল আমাদেরই দিকে!

দারুণ আতঙ্কে দাঁড়িয়ে উঠে লাফ মেরে মাথার উপরকার গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়লুম এবং তারপর কোনো-গতিকে দুই হাত ও দুই পায়ের সাহায্যে উঠে বসলুম ডালের উপরে।

বিস্ফারিত চক্ষে চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখলুম। বাঘটা আবার অদৃশ্য হয়েছে এবং পাশের একটা ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে বারংবার দুই পা ছুড়ছে প্রশান্ত।

শুকনো গলায় বললুম, 'শান্ত হও প্রশান্ত, বাঘ আর নেই।'

প্রশান্ত আমারই মতো হাত ও পায়ের সাহায্যে তার ডালের উপরে উঠে বসল। তার মুখ তখন রক্তহীন।

বললুম,—'ব্যাপারটা কিছুই বোঝা গেল না। বাঘটা—'

প্রশান্তের চোখদুটো আবার চমকে হয়ে উঠল ছানাবড়ার মতো। তার দৃষ্টির অনুসরণ করে আমার চোখও দেখলে আবার এক দৃশ্য!

বাঘটা এইমাত্র যে ঝোপ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল, তার ভিতর থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে একটা মস্ত বড়ো মোটাসোটা বন্য বরাহ, তার মুখ ও গা রক্তাক্ত এবং পড়ন্ত রোদে চকচক করছে তার দুটো বড়ো বড়ো নিষ্ঠুর দাঁত!

বরাহটা একবার সগর্বে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলে। তারপর পিছনের পা দুটো মাটির উপর বার কয়েক ঠুকে ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলে গেল একদিকে।

প্রশান্ত বললে, 'এতক্ষণে ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে। বাঘটা আমাদের দেখে

বিরক্ত হয়ে ওই ঝোপটার ভিতরে গিয়ে ঢুকেছিল। ওখানে গিয়ে দেখে তার জন্যে অপেক্ষা করছে বরাহ্ অবতার। তারপরেই শুরু ঝটাপটি। বরাহের দাঁতের খোঁচা খেয়ে ব্যাঘ্রের পলায়ন। বিজয়ী বরাহের আবির্ভাব আর অন্তর্ধান!'

—'সবই তো বুঝলুম। কিন্তু দেখতে পাচ্ছ বেলা আর বেশি নেই?'

—'দেখতে পাচ্ছি।'

—'এইবারে কি আমাদের ডাল ছেড়ে আবার ভূমিষ্ঠ হওয়া উচিত নয়?'

—'পাগল?'

—'মানে?'

—'এইবারে আমি আরও উঁচু ডালে গিয়ে উঠব।'

—'তারপর?'

—'তারপর আসুক সন্ধ্যা, আসুক রাত্রি, আসুক অন্ধকার, আমি আজ আর ভূতলে অবতীর্ণ হচ্ছি না।'

—'কী খাবে?'

—'বাতাস।'

প্রশান্তের পরামর্শই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হল।

সারারাত কেমন করে কাটল এবং পরের দিন বাসায় ফিরে এসে মেসোমশাই ও মাসিমার কাছে যে অভ্যর্থনা লাভ করলুম সে সব কথা আর কাগজে কলমে প্রচার করে লাভ নেই।

মেসোমশাই আমার হাত থেকে বন্দুকটি কেড়ে নিয়ে লুকিয়ে রাখলেন এবং প্রশান্তও আর কোনোদিন ধনুক ধারণ করেছে বলে সন্দেহ হয় না।

বনবাসী অভিশাপ

॥ ১ ॥

ছেলেবেলা থেকেই আমার বড়ো শিকারের শখ। ভারতবর্ষের নেটিভ বাঘ, গন্ডার ও ভাল্লুক প্রভৃতি অনেক চতুষ্পদই আমার হাতে জীবন-জ্বালা নিবারণ করেছে বটে, কিন্তু ওসব পশু বধ করে আমি আর নূতন আনন্দ খুঁজে পাই না।

গেল মহাযুদ্ধের সময় হঠাৎ আমার আফ্রিকায় যাবার সুযোগ উপস্থিত হল—অবশ্য বন্দুকধারী সৈনিক বা শিকারি রূপে নয়, কলমধারী কেরানি রূপে। কিন্তু আফ্রিকায় গিয়েও বাঙালি কেরানি আমি ছুটি পেলেই শিকারি মূর্তি ধারণ করতুম।

সেই সময়েরই একটি অদ্ভুত কাহিনি আজ আমি তোমাদের কাছে বলতে এসেছি।

আমি তখন আফ্রিকার কিভু অরণ্যে গিয়ে তাঁবু ফেলেছি। এই কিভু অরণ্যের খ্যাতির প্রধান কারণ, গরিলা। এত বেশি গরিলা আর কোথাও দেখা যায় না, সেইজন্যেই এই অরণ্যকে 'গরিলার স্বর্গ' বলে ডাকা হয়। অবশ্য এখানকার এবং এর কাছাকাছি জঙ্গলে কেবল গরিলা নয়,—হাতি, বুনো মহিষ, চিতে বাঘ, হিপোপটেমাস, অজগর, গন্ডার, সিংহ, ম্যানড্রিল ও আরও অনেক হিংস্র জন্তুও পাওয়া যায়।

গরিলা শিকারে বিপদের ভয় পদে পদেই। একে তো গরিলারা গায়ের জোরে বাঘ ও সিংহেরও উপরে টেক্কা মারতে পারে, তার উপরে তাদের বুদ্ধির জোরও যে-কোনো পশুর চেয়ে বেশি। তারা যখন দঙ্গল বেঁধে জঙ্গলের ভিতরে বেড়িয়ে বেড়ায়, তখন হাতি সিংহ বা গন্ডার পর্যন্ত তাদের পথ ছেড়ে দিয়ে মানে মানে সরে পড়ে হাঁপ ছাড়ে। কাজেই খুব সাবধানে নদীর ধারে একটা খোলা জমি বেছে নিয়ে আমি তাঁবু ফেললুম।

আমার সঙ্গে ছিল বারো জন কাফ্রি কুলি। এই কুলিদের সর্দারের নাম হচ্ছে মুরু। সে খুব পাকা লোক—বনের ভিতরে শিকারিদের পথপ্রদর্শক হয়ে মাথার চুল সে পাকিয়ে ধবধবে করে ফেলেছে। মুরু এ অঞ্চলের পথঘাট সব জানে, এখানকার বন্য অসভ্য জাতিদের সঙ্গে তার পরিচয়ও খুব ঘনিষ্ঠ।

প্রথম রাত্রেই কিভুর জঙ্গলে একটা ঘটনা ঘটল। অনেক রাতে আচমকা আমার ঘুম গেল ভেঙে। কেন সে ঘুম ভাঙল তার কারণ কিছুই বুঝতে পারলুম না, কিন্তু কেবলই মনে হতে লাগল যে আমার তাঁবুর ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে যেন মূর্তিমান কোনো অজানা বিপদ এসে হানা দিয়েছে। তাড়াতাড়ি ইলেকট্রিক টর্চটা তুলে নিয়ে তাঁবুর চারিদিকে আলো ফেলে দেখলুম, কিন্তু কোথাও সন্দেহজনক কিছুই আবিষ্কার করতে পারলুম না। কিছু দেখতে পেলুম না বটে, কিন্তু একটা ব্যাপার অনুভব করলুম। তাঁবুর ভিতরে কেমন যেন একটা দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে—যেন কোনো বন্য জন্তুর গায়ের বিশ্রী গন্ধ!

বন্দুকটা তুলে নিয়ে তাঁবুর দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম। সামনের খোলা জমি চাঁদের আলোয় ধবধব করছে। দূর থেকে নদীর কলরব ভেসে আসছে। নদীর ওপারে ছায়ামাখা অরণ্যের প্রাচীর নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও কোনো জীবজন্তুর ছায়া পর্যন্ত নেই।

মিথ্যা ভয় পেয়েছি ভেবে আবার তাঁবুর ভিতরে এসে শুয়ে পড়লুম।

॥ ২ ॥

কিন্তু পরদিন সকালে উঠেই টের পেলুম, কাল রাতে আমি মিথ্যা ভয় পাইনি। আমার তাঁবুর ভিতরে সত্যিই কেউ অনধিকার প্রবেশ করেছিল।

কারণ প্রভাতি চা তৈরি করতে গিয়ে আবিষ্কার করলুম, আমার এক টিন বিস্কুট টেবিলের উপর থেকে বিনা নোটিশে অদৃশ্য হয়েছে! একেবারে নতুন টিন, এখনও খোলা হয়নি।

যদি মনে করা যায় তাঁবুর ভিতরে কাল কোনো জন্তু এসে হাজির হয়েছিল, তাহলে সে জন্তু টিন নিয়ে যাবে কেন? বিস্কুটের বন্ধ টিন চিনতে পারে, পৃথিবীর কোনো বনেই এমন কোনো জন্তু বাস করে না। গরিলারা অনেকটা মানুষের মতন দেখতে বটে এবং তাদের বুদ্ধিবলও যথেষ্ট, কিন্তু এয়ারটাইট বন্ধ টিনের মধ্যে যে খাবার থাকে, এটা আন্দাজ করবার শক্তি নিশ্চয়ই তাদের নেই।

তবে?—আর কিছু নয়, নিশ্চয়ই আমার কোনো লোভী কুলি এই কাজ করেছে।

তখনই চেঁচিয়ে মুরুকে ডেকে সব কথা বললুম। মুরু সমস্ত শুনে কুলিদের কাছে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে এসে বললে, 'হুজুর, তারা কেউ আপনার বিস্কুটের টিন চুরি করেনি।'

আমি বললুম, 'তাই নাকি? তবে কি তুমি বলতে চাও, আমার বিস্কুটের টিন পায়ে হেঁটে বনের ভিতরে হাওয়া খেতে গেছে?'

মুরু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'না হুজুর, বিস্কুটের টিন যে হাওয়া খেতে যায় একথা কখনো আমি শুনিনি। কিন্তু সে যে কোথায় পালিয়েছে কুলিরা তা জানে না।'

আমি আর কিছু বললুম না।

সেদিন সন্ধ্যার সময় হঠাৎ আকাশে মেঘ করে বৃষ্টি নামল। দুপুরবেলায় একটা বনমুরগি মেরেছিলুম, তারই মাংসে কারি বানিয়ে পেট ভরিয়ে সেদিন সকাল সকালই বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নিলুম। ভিজে ঝোড়ো হাওয়ায় কিন্তু অরণ্যের ক্রুদ্ধ কোলাহল, উন্মাদিনী নদীর উচ্ছ্বসিত জল-তরঙ্গের আর্তনাদ ও

আমার তাঁবুর চারিদিকে অশ্রান্ত বৃষ্টিনূপুর-ধ্বনি শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। এবং সে রাত্রে আমার স্বপ্নহীন সুখনিদ্রা ভাঙাবার জন্যে তাঁবুর ভিতরে আর কোনো বিভীষিকা এসে সাড়া দিলে না। কিন্তু পরদিন সকালে উঠে আবার সেই দুষ্ট চোরের অপকীর্তি জানতে পারা গেল।

আজ আর বিস্কুটের টিন নয়, পেটুক চোর আজ নিয়ে গেছে ভর্তি একটিন চিনি।

এ তো ভারী মুশকিলে ফেললে দেখছি! আমি এখন কোনো শহরে বাস করছি না যে ইচ্ছে করলেই বাজারে গিয়ে টপাটপ পয়সা ফেলে যত খুশি খাবার কিনে আনব। সভ্যতার কাছ থেকে এত দূরে এই সঙ্গীহীন নিবিড় অরণ্যের মধ্যে এসে রোজ যদি চোরের এমন অত্যাচার সইতে হয় তাহলে দু-চার দিন পরে অনাহারেই মারা পড়তে হবে যে!

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আমি তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে গেলুম। কিন্তু সেখানে গিয়েই আর একটা নতুন জিনিস চোখে পড়ল। কালকের রাত্রের বৃষ্টিতে তাঁবুর দরজার সামনে মাটি ভিজে কাদার সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই কাদার উপরে রয়েছে মানুষের পায়ের কয়েকটা স্পষ্ট ছাপ। খুব চিৎকার করে ডাকলুম, 'মুরু, মুরু!'

'হুজুর!' বলে মুরু সেলাম ঠুকে দাঁড়াল।

—'মুরু, আজ আবার আমার চিনির টিন চুরি গিয়েছে।'

—'কাল বিস্কুট, আজ চিনি? বলেন কী হুজুর!'

—'শুধু তাই নয়, চোর যে মানুষ, আজ আমি সে প্রমাণও পেয়েছি। এ চোর তোমার ওই কুলিদের দলেই লুকিয়ে আছে।'

'কেমন করে জানলেন?'

'ওই মাটির দিকে তাকিয়ে দ্যাখো।'

মুরু অবাক হয়ে মাটির উপরেই সেই দাগগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল—অনেকক্ষণ ধরে। তারপর সেইখানে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে আরও ভালো করে পরীক্ষা করতে লাগল।

আমি জানতুম, আফ্রিকার বনেজঙ্গলে যারা থাকে, পায়ের দাগ দেখে তারা অনেক তথ্যই আবিষ্কার করতে পারে। কাজেই এই দাগগুলো দেখে মুরু কী বলে তা শোনবার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

মুরু যখন উঠে দাঁড়াল তখন তার মুখে-চোখে যেন কেমন একটা রহস্যের ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে।

আমি বললুম, 'কেমন মুরু, এখন বিশ্বাস হল তো যে এ চুরি তোমার কুলিদেরই কীর্তি?'

মুরু মাথা নাড়া দিয়ে বললে, 'না হুজুর, এ পায়ের দাগ আমার কোনো কুলিরই নয়।'

—'কোনো কুলিরই নয়? তুমি কি বলতে চাও, এই গহন বনে আমরা ছাড়া আর কোনো মানুষ আছে?'

মুরু খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে মৃদুস্বরে বললে, 'বনে কত রহস্য থাকে তা কে জানে!'

আমি দৃঢ় স্বরে বললুম, 'বনের কোনো রহস্যের কথাই আমি জানতে চাই না। কিন্তু এই হতভাগা চোরকে আজ আমি হাতে হাতে ধরতে চাই।'

—'কেমন করে হুজুর?'

—'তাঁবুর সামনের ওই গাছটার উপরে উঠে আজ রাতে তোমাকে পাহারা দিতে হবে। আর তাঁবুর ভিতরে বন্দুক নিয়ে বসে পাহারা দেব আমি। কিন্তু কুলিদের কারুর কাছেই এসব কোনো কথাই তুমি প্রকাশ কোরো না।'

মুরু ঘাড় নেড়ে বললে, 'আচ্ছা। কিন্তু হুজুর, আমার আর-একটা কথা আপনি বিশ্বাস করবেন?'

—'কী কথা?'

মুরু আমার আরও কাছে সরে এসে চুপিচুপি ভীত স্বরে বললে, 'হুজুর, এই যে পায়ের দাগগুলো দেখছেন এগুলো মেয়েমানুষের পায়ের দাগ।'

আমি স্তম্ভিত মনে ভাবতে লাগলুম মুরু কী বলতে চায়। সে কি ভূত-পেতনির কথা বলছে?

॥ ৩ ॥

দুপুরবেলায় দু-একটা পাখি-টাখি মারবার মতলবে নদীর ধার ধরে এগিয়ে চললুম। ছোট্ট নদীটি এখানে রোদের আভায় চকচকে একটি রুপোর হাঁসুলির মতো বেঁকে বনের ভিতরে চলে গিয়েছে, যেন শ্যামলতার স্নিগ্ধ ছায়াকে খুঁজতে। অরণ্যের ভিতরে বিপুলদেহ বনস্পতিদের আশেপাশে দাঁড়িয়ে বাতাসের তালে তালে দুলছে বাঁশঝাড়ের পর বাঁশঝাড়। এইসব ঝাড়ের কচি কচি বাঁশ ও পাতা

হচ্ছে গরিলাদের প্রধান খাদ্য। কিভুর অরণ্যে বাঁশঝাড়ের সংখ্যা হয় না! সেইজন্যেই গরিলারা এখানে এসে রাজ্য স্থাপন করেছে।

বনে পাখি দেখলুম অনেক, কিন্তু তারা শিকারের পাখি নয়। শ্যামলতার আড়ালে বসে তারা কেউ গান গায়, কেউ পুচ্ছ দুলিয়ে নেচে বেড়ায়, কেউ রামধনু রঙের বিদ্যুতের মতো চোখের সামনে দিয়ে উড়ে যায়, এই ভয়াবহ অরণ্যকে তারা রূপে আর সুরে উৎসবময় করে তোলে; নিষ্ঠুর বন্দুকের জন্যে তারা সৃষ্ট হয়নি।

বনের পাখি আজ আমার উদরের স্বর্গলাভে বঞ্চিত হল বুঝে ধীরে ধীরে আবার তাঁবুর দিকে ফিরলুম। কিন্তু কয়েক পা এগুবার পরেই নদীর ধারে একটা জিনিস আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বালির উপরে পড়ে কী একটা জিনিস সূর্যের আলোতে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। কৌতূহলী মনে কাছে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলুম, আমার বিস্কুটের টিনটা সেখানে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে। বলাবাহুল্য, তার ভিতরে একখানা বিস্কুটও ছিল না।

মহাবিস্ময়ে আমি একেবারে অভিভূত হয়ে গেলুম। মুরু বলে যে-চোর আমার তাঁবুতে ঢুকেছিল সে নাকি স্ত্রীলোক; কিন্তু ভয়ংকর এই কিভুর গহন বন, নরখাদক ব্যাঘ্র, মত্ত হস্তীর দল এবং তাদের চেয়ে ভীষণ হাজার হাজার গরিলা এখানে মূর্তিমান মৃত্যুর মতো বিচরণ করে, দিনের আলোকেও সাহসী পুরুষরা এখানে প্রবেশ করলে আতঙ্কে মূর্ছা যায়, এমন জায়গায় রাতের বেলায় একাকিনী যে ভ্রমণ করতে পারে, কে সেই সাহসিনী নারী? ...আমি জানি কিভুর অরণ্যের সবচেয়ে কাছে যে গ্রাম আছে, তাও এখান থেকে অন্তত বিশ মাইল দূরে। অত দূর থেকে যে কোনো স্ত্রীলোক এসে রোজ আমার খাবার চুরি করবে আর এই হিংস্র জন্তুভরা বনে নিশুত রাতে নদীর ধারে বসে নির্ভয়ে আহার করবে, এ কথা অসম্ভব—সম্পূর্ণ অসম্ভব:

তাহলে এ কে? এ কি তবে মানুষ নয়? তবে কি প্রেতাত্মা বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব সত্য সত্যই আছে? ...কিন্তু ভূতের কর্তব্য তো মানুষকে ভয় দেখানো। এ ভূত তো ভয় দেখায় না, ভয়ে ভয়ে খাবার চুরি করে লুকিয়ে পালিয়ে যায়! আফ্রিকার ভূত কি এতই ভীত?...

সে রাত্রে গাছের ডালে বসে রইল মুরু, আর আমি রইলুম তাঁবুর ভিতরে

চেয়ারে বসে। আলো দিলুম নিবিয়ে এবং হাতে রইল তৈরি বন্দুক।

সারা রাত জেগে ঠায় বসে বসে জঙ্গলের নানান জীবজন্তুর গর্জন ও আর্তনাদ শুনতে লাগলুম, কিন্তু যার আশায় বসে আছি তার পদশব্দ শুনলুম না।

ভোরের পাখির গান শুনে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলুম, পূর্ব আকাশের অঙ্গনে সুন্দরী ঊষা প্রাত্যহিক হোরির আবির খেলা শুরু করে দিয়েছে এবং গাছের উপর থেকে নেমে মুরু আসছে আমার তাঁবুর দিকেই।

তিক্ত স্বরে বললুম 'মুরু, আমাদের রাত জাগাই সার হল, চোর এল না।'

মুরু গম্ভীরভাবে বললে, 'চোর এসেছিল হুজুর!'

—'এসেছিল? কোথায়? কখন?'

—'ওই বাঁশঝাড়ের তলায়। কাল শেষ রাতে।'

—'তুমি তাকে দেখলে, অথচ ধরলে না?'

মুরু ধীরে ধীরে বললে, 'কেমন করে ধরব হুজুর? চাঁদের আলোয় দেখলুম হামাগুড়ি দিয়ে একটা ছায়ামূর্তি বাঁশঝাড়ের তলা থেকে বেরিয়ে এল, তারপর খানিকক্ষণ মাটির উপরে স্থিরভাবে বসে রইল, তারপর বিদ্যুতের মতন আবার ঝুপসি গাছের তলায় কোথায় মিলিয়ে গেল। বোধহয় সে আমাকে দেখতে পেয়েছিল।'

আমি রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলুম, 'তার চেহারা কী রকম মুরু? সে জন্তু, না মানুষ, না—'

—'দূর থেকে কিছুই বুঝতে পারিনি হুজুর!'

আমি দৃঢ়স্বরে বললুম, 'মুরু, আজ রাত্রে আর গাছের উপরে নয়, আমার পাশের তাঁবুতে তুমি জেগে বসে থাকবে। আমার তাঁবুতে আমিও জেগে থাকব। এই চোরকে গ্রেপ্তার না করে এখান থেকে আমি নড়ব না!'

॥ ৪ ॥

রাত বারোটা, একটা, দুটো বেজে গেল। অন্ধকার তাঁবুর ভিতরে একলা আমি শুয়ে আছি, ঘুমের ঘোরে চোখ ভেঙে আসছে, তবু আমি ঘুমোইনি।

অরণ্যের গভীরতার ভিতর থেকে আজও তেমনি জীবন ও মৃত্যুর কোলাহল ভেসে আসছে—কেউ করছে প্রচণ্ড গর্জন, কেউ করছে করুণ আর্তনাদ। গানের

পাখিরা এখন গান গেছে ভুলে, মাঝে মাঝে খালি অমঙ্গলের সম্ভাবনা জানিয়ে কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠছে পেচকরা এবং জীবজন্তুর সেইসব শব্দের উপরে আর একটা ভয়ানক শব্দ সারাক্ষণ জেগে রয়েছে, যা অবর্ণনীয়। হুম-হুম, হুম-হুম—যেন বনবাসী নিশীথিনীর হৃৎপিণ্ডের অশ্রান্ত শব্দ! সেই অরণ্য-শ্মশানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হচ্ছে কালরাত্রি, তার ক্ষুধিত নিষ্ঠুর আত্মা যেন তালে তালে হুংকার দিয়ে ক্রমাগত বলে যাচ্ছে—'রক্ত কই? রক্ত চাই! রক্ত কই? রক্ত আন! রক্ত কই? রক্ত দে!'—বুনো রাতের এই ভাষা বোঝে বলেই হয়তো প্রতি রাত্রে বনে বনে সিংহ জাগে, চিতা হানা দেয়, অজগর পাকসাট মারে!

আচম্বিতে আমার তাঁবুর দরজার পর্দা আস্তে আস্তে সরিয়ে খানিকটা চন্দ্রকিরণ ভিতরে প্রবেশ করল।

তাড়াতাড়ি আমি চোখ মুদে ফেললুম—হয়তো এই চাঁদের আলোর সঙ্গে এখনই সে মূর্তিমান বিভীষিকা তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করবে।

নিবিড় অন্ধকারেও তার চোখ অন্ধ হয় না। আমি জেগে আছি দেখলে হয়তো সে দরজার কাছ থেকেই উঁকি মেরে আবার অদৃশ্য হবে।

কিন্তু কে সে—কে সে! সে জন্তু নয় তা জানি, কিন্তু সে কি মানুষ?

ডান হাতে রিভলভার ও বাম হাতে ইলেকট্রিক টর্চটা প্রাণপণে চেপে ধরলুম।

তারপরেই খুব মৃদু পায়ের শব্দ পেলুম। শব্দটা ক্রমে আমার মাথার কাছে এসে হঠাৎ থেমে গেল। বিষম একটা বোঁটকা গন্ধে চারিদিক বিষাক্ত হয়ে উঠল—যেন কোনো বন্য জন্তুর গায়ের গন্ধ।

ফোঁস করে একটা তপ্ত নিশ্বাস আমার মুখের উপর এসে পড়ল! বিভীষিকা তাহলে আমার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে—হয়তো জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমাকেই লক্ষ করছে! কিন্তু যদি সে হঠাৎ আমাকে আক্রমণ করে? এই সম্ভাবনা মনে জাগবামাত্রই তিরের মতো উঠে পড়লুম—এবং সঙ্গে সঙ্গে টর্চের চাবিও টিপে ধরলুম।

টর্চের আলোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে যে মুখখানা দুঃস্বপ্নের মতো ফুটে উঠল, সে কি মানুষের মুখ? সে কি স্ত্রীলোকের মুখ? সে কি পুরুষের মুখ?

—দপদপ করছে দুটো অগ্নিভরা বুভুক্ষু দৃষ্টি, ঝকমক করছে অনেকগুলো হিংস্র দন্ত, লটপট করছে রাশীকৃত কুণ্ডলী-পাকানো সাপের মতো কেশমালা! তারপরেই আলোকরেখার ভিতর থেকে সেই বিভীষণ মুখখানা বিদ্যুতের মতন সাঁৎ করে সরে গেল।

যত জোরে পারি চেঁচিয়ে উঠলুম, 'মুরু! মুরু! মুরু!'

দ্রুত পদধ্বনি—এবং পরমুহূর্তেই তাঁবুর বাইরে বিকট এক অমানুষিক তীব্র গর্জন ও বিষম আর্ত চিৎকার।

এক লাফে আমিও তাঁবুর বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় যা দেখলুম, সে কী দৃশ্য! তাঁবুর দরজার সামনেই মাটির উপরে পড়ে ছটফট করছে হতভাগ্য মুরু এবং মুরুর বুকের উপর পড়ে তার গলা কামড়ে ধরেছে প্রেতিনীর মতন বীভৎস একটা কালো মূর্তি।

আমাকে দেখেই সে আবার গর্জন করে লাফিয়ে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে লক্ষ্য করে আমিও রিভলভারের ঘোড়া টিপে দিলুম!—অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এক চিৎকার করে মূর্তিটা মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ে স্থির হয়ে রইল।

ঠিক সেই সময়েই গভীর অরণ্যের ভিতর থেকে আর একটা বিচিত্র ভয়াবহ রোমাঞ্চকর কোলাহল জেগে উঠল—যেন বিরাট অরণ্যের ভয়ংকর বিপুল আত্মা প্রচণ্ড হিংসার নেশায় অধীর হয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে—এগিয়ে আর এগিয়ে আর এগিয়ে আসছে!

এ আমার বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা নয়, কিন্তু স্তম্ভিত বিস্ময়ে স্পষ্টই দেখলুম, বনের বড়ো বড়ো বাঁশগুলো টলমল টলমল করে দোল খাচ্ছে, মড়মড় করে গাছের পর গাছ ভেঙে পড়ছে এবং যেন জীবন্ত অন্ধকারের একটা সুদীর্ঘ প্রাচীর পৃথিবীকে থরথরিয়ে কাঁপিয়ে আমাদের লক্ষ্য করেই তেড়ে আসছে!

কী করব বুঝতে না পেরে আচ্ছন্নের মতন দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় আমার পিছন থেকে একটা কালো মূর্তি সেই জীবন্ত অন্ধকারের দিকে ছুটে গেল কালবৈশাখীর মতই তীব্র বেগে।

চমকে পিছন ফিরে দেখি, আমার রিভলভারের গুলিতে আহত সেই ভয়াবহ মূর্তিটা আর সেখানে মাটির উপরে পড়ে নেই।

নিজের আহত কণ্ঠদেশে হাত দিয়ে মুরুও তখন উঠে দাঁড়িয়েছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম, 'মুরু! মুরু! এ কী ব্যাপার? বনের ভিতরে ও কীসের শব্দ? কী এগিয়ে আসছে?'

যাতনাবিকৃত স্বরে মুরু বললে, 'না হুজুর, ওরা আর এগিয়ে আসছে না, ওরা আবার বনের ভিতরে ফিরে যাচ্ছে।'

'ওরা? কারা?'

—'ওরা গরিলা!'

—'গরিলা? ওরা এগিয়েই বা আসছিল কেন, আর ফিরেই বা যাচ্ছে কেন?'

—'নুমা হুজুর, নুমা! নুমা হচ্ছে গরিলাদের মেয়ে, তাকে ফিরে পেয়েই ওরা আবার ফিরে যাচ্ছে।'

—'মুরু, কী তুমি বলছ!'

—শুনুন হুজুর। এখান থেকে বিশ মাইল তফাতে কাফ্রিদের একটা গ্রাম আছে। নুমা ছিল কাফ্রিদের সর্দারের মেয়ে। তার বয়স যখন দেড় বছর, গরিলারা একদিন এসে তাকে চুরি করে নিয়ে যায়। সেই থেকে গরিলাদের সঙ্গে থেকে নুমাও এখন গরিলাদের মেয়ে হয়ে গেছে। আর-কোনো মানুষই তাকে দেখতে পায়নি। সে আজ ষোলো বছরের কথা।'

অবাক হয়ে নিষ্পলক নেত্রে অরণ্যের দিকে তাকিয়ে রইলুম। স্বপ্নময় চাঁদের আলোয় চারিদিক রুপোলি ছবির মতো অপূর্ব হয়ে উঠেছে।

নদীর সমুজ্জ্বল হীরকখচিত জলবীণায় যে গানের আনন্দ বেজে উঠেছে, তার মধ্যে আর এতটুকু ভয় বা বিষাদের আভাস নেই।

গরিলাদের পোষা মেয়ে নুমা নিশ্চয়ই আর কখনো তার মানুষ-মায়ের কোলে ফিরে আসেনি।

জঙ্গলের নাট্যাভিনয়

ভারতে সেই আমার শেষ ব্যাঘ্র-শিকারের চেষ্টা।

কিন্তু আমার হাতের বন্দুক হাতেই রইল, আমাকে হতে হল এক বন্য নাটকের নির্বাক ও নিশ্চল দর্শক। শিকার করতে পারলাম না বটে, কিন্তু সেদিনের আগ্নেয়-স্মৃতি চিরদিন জাগ্রত থাকবে আমার মানসপটে।

সে অঞ্চলে একটা মস্ত বাঘ এসে বড়োই উৎপাত শুরু করেছিল। গত রাত্রেই সে বধ করেছিল একটা পোষমানা গ্রাম্য মহিষকে। তারপর খানিকটা খেয়ে মৃতদেহের বাকি অংশটা লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল জঙ্গলের ভিতরে।

আজ সে নিশ্চয়ই বাকি দেহটার লোভে ঘটনাস্থলে পুনরাগমন করবে, এই আশায় আমি প্রস্তুত হয়ে বসে আছি মাচান বেঁধে এক গাছের উপরে।

বনের ভিতরে নেমে আসছে ছায়াময়ী সন্ধ্যা। দিনের জীবরা বোবা হয়ে ঘুমুতে গিয়েছে যে যার বাসায়। হানা দিতে বেরিয়েছে কেবল নিশাচর হত্যাকারীর দল, এবং জেগে আছে কেবল রাতের কীটপতঙ্গরা, তাদের অশ্রান্ত কণ্ঠস্বরে সারা বনভূমি হয়ে উঠেছে বিচিত্র শব্দময়।

বন্যজগতে সন্ধি নেই, শান্তি নেই, আছে কেবল যুদ্ধ আর হানাহানি। জীবন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে যুদ্ধের ক্ষান্তি নেই। সবচেয়ে বেশি যার যোগ্যতা ও চাতুর্য, সবচেয়ে বেশি দিন ধরে সেই-ই আত্মরক্ষা করতে পারে মৃত্যুর কবল থেকে।

আমি একলা। আমার সামনে রয়েছে খানিকটা খোলা জমি ও জলাভূমি। তারপরেই দেখা যায় নিবিড় জঙ্গলের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। জলার বাতাস, ঠান্ডা ও মিষ্টি, তপনতাপিত মনকে মাতিয়ে তোলে। প্রকৃতির এই শয্যাগৃহের চিত্র দেখে চমৎকৃত হয় না, বোধ করি এমন মানুষ কেউ নেই।

আচমকা আমি সতর্ক হয়ে উঠলুম। ঝোপঝাড়ের মধ্যে শোনা যাচ্ছে কার পায়ের শব্দ! নলখাগড়ার বন দুলে উঠে দুমড়ে পড়ল এবং পরমুহূর্তেই দেখলুম একটু বিপুলবপু বন্যমহিষ সামনের খোলা জমির উপরে এসে দাঁড়াল! মাদি মহিষ, তার মাথার উপরে রয়েছে এমন প্রকাণ্ড দুটো শৃঙ্গ, যার জোড়া খুঁজে পাওয়া ভার। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে যেন প্রচণ্ড শক্তির তরঙ্গ!

লোভনীয় শিকার! বন্দুক ছোড়বার জন্যে মনটা উসখুস করে উঠল। কিন্তু আমি এখানে এসেছি বাঘ মারতে, অতএব বন্দুক ছোড়বার লোভ সংবরণ করতে বাধ্য হলুম। আজ খুশি হয়ে মনে করি, ভাগ্যে সেদিন বন্দুক ছুড়িনি।

তারপর মস্তবড়ো সেই বুনোমোষটা চারিদিকের আঘ্রাণ নিতে লাগল সন্দিগ্ধ ভাবে। একবার আকাশের দিকে মুখ তুলে চিৎকার করে উঠল উচ্চকণ্ঠে। এমন বিষম সে চিৎকার, সারা বন যেন কাঁপতে লাগল।

দূরে—বহু দূরে বনের ভিতরে জেগে উঠল আর-একটা মহিষের কণ্ঠধ্বনি, নিশ্চয়ই তার জোড়া। সে তখন সানন্দে মদ্দা মহিষটার ডাকে সাড়া দিলে এবং শিং নামিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল।

তারপর সে এদিকে-ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে ব্যাঘ্রের কবলে নিহত গ্রাম্যমহিষটার

ভুক্তাবশিষ্ট দেহের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একমনে মিনিট দুই লাশটা শুঁকে দেখলে, তারপর আবার মাথা তুলে ক্রুদ্ধকণ্ঠে গর্জন করে কাঁপিয়ে তুললে চারিদিক! সে গর্জন যেন বলতে চায়—যুদ্ধং দেহি যুদ্ধং দেহি!

আচম্বিতে তার দেহে জাগল কেমন যেন অস্বাচ্ছন্দ্যের ভাব। চট করে সে ফিরে দাঁড়াল এবং মাথা নিচু করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে জঙ্গলের একপ্রান্তে। সঙ্গে সঙ্গে আমারও চোখ গেল সেইদিকে এবং সে যা দেখেছে আমিও তা দেখতে পেলুম।

ঘাসজমির উপর দিয়ে গুঁড়ি মেরে চুপি চুপি এগিয়ে আসছে মস্ত একটা বাঘ! তারপরেই মহিষটাকে দেখতে পেয়ে থমকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, ছটফট করতে লাগল কেবল তার লাঙ্গুলটা!

চিরশত্রু বাঘতে সামনে দেখে মহিষ পদাঘাতে চারিদিকে ছড়িয়ে দিলে মাটির গুঁড়ো।

দুই প্রতিযোগীই সমান সতর্ক এবং পরস্পরের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে অত্যন্ত প্রস্তুত। উভয়েরই হিংস্র চক্ষে মারাত্মক ঘৃণার দৃষ্টি।

বাঘটাকে মারতে পারতুম, কিন্তু আমি মারব না। আমি আজ কেবল দেখতে চাই, গহন বনের এই বিস্ময়কর নাট্যাভিনয়ের কোনখানে পড়বে শেষ যবনিকা!

ধীরে ধীরে ডোরাকাটা কেঁদোবাঘটা তার নমনীয় দেহ নিয়ে তেমনি গুঁড়ি মেরেই এগিয়ে আসতে লাগল। তার স্থির জ্বলন্ত দৃষ্টি মহিষের দিকেই নিবদ্ধ এবং বারংবার মাটির উপরে ছিপটির মতো আছড়ে পড়তে লাগল তার ক্রুদ্ধ লাঙ্গুলটা। তার প্রচণ্ড চোয়াল বেয়ে ঝরে পড়ছে লালার ধারা।

মহিষ কিন্তু এগুলও না, পিছুলও না—কেবল নিজের মুখ রাখলে বাঘের মুখের দিকে। বিপজ্জনক তার ভাবভঙ্গি।

মহিষের চারিদিকে বাঘটা ঘুরতে লাগল চক্রের পর চক্র দিয়ে। ...ক্রমে ক্ষুদ্রতর হয়ে এল চক্রের আয়তন। বাঘের ইচ্ছা, পিছন থেকে লাফ মেরে মহিষের পিঠের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে; মহিষ কিন্তু তারও চেয়ে তৎপর, তাকে দিলে না সে সুযোগ। চমৎকার তার পাঁয়তারা, জঙ্গলের কোনো প্যাঁচই তার অজানা নেই।

আচম্বিতে বাঘটা দাঁড়িয়ে পড়ে ল্যাজ আছড়াতে আছড়াতে বলের মতো গোল করে ফেললে নিজের দেহকে, মুখে সে কোনো শব্দই করলে না, কিন্তু তার

দেহটা বাতাস কেটে এগিয়ে এল রকেটের মতো। ঠিক সেই মুহূর্তেই ভীষণ চিৎকার ও দুই শৃঙ্গ উদ্যত করে মহিষও করলে প্রতি-আক্রমণ, শূন্য পথেই হল দুজনের সঙ্গে দুজনের ঠোকাঠুকি এবং একসঙ্গে দুজনেই হল পপাতধরণীতলে। কিন্তু চোখের পলক পড়বার আগেই দুজনেই আবার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, তারপর একসঙ্গে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে আবার করলে পরস্পরকে আক্রমণ।

এবারে ফাঁক পেয়ে বাঘটা লাফ মেরে মহিষের পিঠের পিছন দিকে গিয়ে পড়ল। কিন্তু কামড় খাবার আগেই বাঘকে পিঠের উপরে নিয়েই মহিষ শূন্যে লম্ফত্যাগ করে চিত হয়ে উলটে পড়ল ভূমিতলে। তার এই সুন্দর কৌশলটি ফলপ্রদ হল তৎক্ষণাৎ।

পাছে মহিষের গুরুভার দেহের তলায় হাড়গোড় ভেঙে থেঁতলে মরতে হয়, সেই ভয়ে বাঘ তাড়াতাড়ি তাকে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, এবং আবার লাফ মেরে শত্রুর ডান স্কন্ধ কামড়ে ধরলে। মহিষ এক ঝটকান মেরে বাঘটাকে আবার মাটির উপরে গেড়ে ফেললে ক্রুদ্ধ গর্জন করতে করতে। তারপর শিং দিয়ে শত্রুকে উলটে ফেলে প্রকাণ্ড একটা পাকুড়গাছের মোটা গুঁড়ির উপর চেপে ধরলে প্রাণপণে।

মহিষের গর্জনমুখর মুখ থেকে তখন হু হু করে রক্ত ঝরে পড়ছে এবং তার ক্ষতবিক্ষত কণ্ঠ, স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশ থেকেও রক্তধারা ঝরছে দরদর ধারে। সে কয় পা পিছিয়ে এসেই আবার সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুকে একেবারে সাবাড় করে ফেলবার জন্যে।

কিন্তু বাঘটা অত্যন্ত আহত হলেও তার লড়বার শক্তি তখনও ফুরিয়ে যায়নি। সে-ও যে-সে যোদ্ধা নয়। আবার সে করলে লম্ফত্যাগ, এবং এবারে অবতীর্ণ হল মহিষের দুই শৃঙ্গের ঠিক মাঝখানে। তার ডোরাকাটা রঙিন দেহের উপরার্ধ ভাগ এমন ভারে ঝুলে পড়ল যে, সম্পূর্ণরূপে ঢেকে গেল মহিষের মুখমণ্ডল। তার দাঁত ও নখ গভীর ভাবে বসে গেল মহিষের মাংসের ভিতরে এবং তার দুই কষ থেকেও শত্রুর গা বেয়ে বেরুতে লাগল টকটকে রক্তস্রোত।

মহাযন্ত্রণায় মহিষ চেঁচিয়ে উঠল উচ্চৈঃস্বরে। একটা গাছের গুঁড়ির দিকে দৌড়ে গেল প্রবল বেগে—তার পিঠের বোঝা তখনও তার মুখের উপরে হুমড়ি খেয়ে আছে। তারপরেই কানে এল একটা ঢপাৎ করে শব্দ! শত্রুকে পিঠের উপর থেকে ঝেড়ে ফেলে মহিষ একবার বসে পড়েই টপ করে দাঁড়িয়ে উঠল।

ব্যাঘ্রের কণ্ঠ ভেদ করে নির্গত হল ক্ষীণ একটা গর্জন। বুঝলুম তার অবস্থা রীতিমতো কাহিল। একেবারে অবশ হয়ে সে ভেঙে পড়ে হাঁপাতে লাগল।

মহিষ কিন্তু শত্রুর শেষ রাখতে রাজি নয়। সে একটু পিছিয়ে এসে ভালো করে নিজের লক্ষ্য স্থির করলে। তারপর বেগে ছুটে গিয়ে নিষ্ঠুর ও তীক্ষ্ণাগ্র শৃঙ্গ দিয়ে বাঘকে গুঁতোতে লাগল বারংবার। বাঘ আত্মরক্ষা করবার জন্যে ঝোপের আড়ালে সরে যাবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু সে সুযোগ পেলে না।

এ মানুষে মানুষে প্রতিযোগিতা নয়। কারণ, সেক্ষেত্রে মধ্যস্থ এতক্ষণে প্রতিযোগিতা বন্ধ করে দিতেন, কেননা বাঘটা যে নিশ্চিত রূপেই হেরে গিয়েছে, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু জঙ্গলে মধ্যস্থ কোথায়? লড়াই থামাবে কে? এখানকার আইন-কানুনে নেই দয়ামায়ার ঠাঁই। এখানে লড়াই থামতে পারে কেবল একপক্ষেরই মৃত্যুর পর।

বিজয়ী বীরের মতো মহিষ পূর্ণকণ্ঠে এমন গর্জন করে উঠল যে, আমার মাচান পর্যন্ত থর থর করতে লাগল। এইবারে করলে সে শেষ আক্রমণ। ব্যাঘ্রের ক্ষতবিক্ষত, হাড়গোড়ভাঙা দেহটা সে শিঙে করে আবার শূন্যে তুলে নিলে, তারপর মাথার এক ঝাঁকুনি মেরে দেহটাকে খানিক তফাতে ছুড়ে ফেলে দিলে একটুকরো খড়ের মতো অনায়াসেই। মহিষ এগিয়ে শত্রুর দেহটা আর পরীক্ষা পর্যন্ত করলে না। তার যে মৃত্যু হয়েছে, এ বিষয়ে সে নিশ্চিত।

মনে হল, ধন্য ধন্য বলে চেঁচিয়ে উঠে বিজেতাকে অভিনন্দন দিই। বলা বাহুল্য, শিকার আমাকে বঞ্চিত করলেও আমার সহানুভূতি ছিল মহিষের দিকেই। আজ যে অভাবিত দৃশ্য দেখবার সুযোগ পেলুম, তার কাছে তুচ্ছ যে-কোনো শিকার। মানুষের জীবনে এমন সুযোগ দুর্লভ।

চারিদিকে ঘন হয়ে আসছে রাত্রের কালো ছাউনি। শিশু-চাঁদ উঠছে বনের মাথায়। নীলাকাশে তারারা করছে টিপ টিপ টিপ।

মহিষের কণ্ঠে ফুটল আবার বিজয়গর্জন। এবারে ঘন বনের কাছ থেকেই শোনা গেল মদ্দা মহিষের গলা। তখনই হুড়মুড় করে সশব্দে জঙ্গল ভেঙে মাদি মহিষটা ছুটে গেল তার সাথির সন্ধানে। জঙ্গলের নাট্যলীলার উপরে পড়ল যবনিকা।

বাঘের দেহটা সেইখানেই ফেলে চলে এলুম। ও দেহ আমার নয়।*

---

*মেজর আর ফোরান পৃথিবীর দেশে দেশে শিকার করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর লিখিত শিকারকাহিনিও যথেষ্ট বিখ্যাত। উপরের কাহিনিটির বক্তা হচ্ছেন তিনি নিজেই।